

মালঞ্চ

শিল্পী—শ্রীবিজয়া মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৬২ | …ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলা ও রাজ্য পুনর্গঠন সুপারিশ

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ উত্তরপ্রদেশ ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সন্তোষজনক হয় নাই এই মন্তব্য চতুর্দ্দিকেই শুনা যায়। অন্যদিকে পণ্ডিত নেহরু হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উচ্চ অধিকারী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আদি ধর্ম্মাধিকরণ একবাক্যে বলিতেছেন,"স্থির হও, এ বিষয়ে তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া চিন্তা কর।"

ভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে সুপারিশের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আবার কতক অঞ্চলে নূতন দাবি-দাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে, কোথায়ও-বা এ বিষয়ে প্রতিরোধের সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে আমরা নির্ব্বিকার নিস্পন্দ। দুই-একটি সংবাদপত্র কিছু কটুবাক্য ছড়াইয়াছে, তাহাও নিজেদের কর্ত্তৃপক্ষের উপর, অন্য অধিকারী বা কমিশনের সদস্যদিগের উপর নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাঙালীই এদেশে এখন একমাত্র পরম বৈষ্ণব, একমাত্র ক্রোধরিপুর অতীত, অহিংস, নির্ব্বিকল্প, নিষ্কাম জীব।

অবশ্য আমরা চাই না যে, এখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় বা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার ঢেউয়ে দেশ অশান্তিতে ছাইয়া যায়। কিন্তু এইরূপ যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াহীন অবস্থা ইহার বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা বর্ত্তমান জগতে জড়ভরতের ঐহিক পরিত্রাণের কোনও বিশেষ আশা নাই, পরলোকে যাহাই থাকুক।

একটি পত্রিকায় লেখা হইয়াছে যে, বাংলাকে কমিশন "ভিখারী বিদায়" দিয়াছে। এবং দেখা যাইতেছে যে, ঐ ভিখারী বিদায়ও শান্তিতে বা বিনা ঝঞ্ঝাটে হওয়া সম্ভব নয়। যদি এখানে আমরা চুপ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি আগাইয়া দিই তবে যাহা দেওয়ার সুপারিশ হইয়াছে তাহাও ঝুলিতে আসিবে কিনা সন্দেহ। "বোবা কালার শত্রু নাই" ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার কল্যাণকামী মিত্র যে পথেঘাটে ভিড় করিয়া আছে এ কথাও কেহ বলে না। আমাদের আজিকার অবস্থা তো সর্ব্বত্রই বোবা-কালারই অনুরূপ, লোকসভায়, রাজ্যসভায়, এবং নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে।

বাঙালী যে বাঁচিয়া আছে, সে যে কিছু দাবীদাওয়া রাখে, ইহার কোনও পরিচয় যদি কেহ দিয়া থাকে তবে সে মানভূমের লোক-সেবক সঙ্ঘের মুষ্টিমেয় সেবক ও তাঁহাদের সহকর্ম্মীবৃন্দ। পশ্চিম বাংলার তো কোনও প্রাণ-স্পন্দনের চিহ্ন দেখা যায় নাই।

বস্তুতঃপক্ষে এখন বাঙালীর যাহা কিছু বিক্রম, যাহা কিছু প্রতিক্রিয়া সব কিছুই ঘরে, নিজের লোকের উপরে, এবং তাহাও প্রায় সব কিছুই কলিকাতা বা বড়জোর হাওড়ায়। ইহার বাহিরে যে পশ্চিম বাংলার কিছু আছে তাহা বুঝা দায়।

দেশের ভিতরেও, অর্থাৎ কলিকাতায়, যে সকল "আন্দোলন" হয় তাহাও সব কিছুই অত্যন্ত ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ, নিতান্তই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত বা দলগত স্বার্থ প্রণোদিত। সমষ্টিগত চিন্তার লেশমাত্র নাই তাহাতে, একের স্বার্থে যে অনেকের ক্ষতি হইতে পারে সে বিষয়েও কোন তাপ-উত্তাপ নাই, "আমাদের দাবী মানতে হবে, অন্যেরা মরুক" এই তো স্লোগান। "অন্য" যাহারা তাহারাও মূক-বধিরের ন্যায় সবই সহ্য করে, সব কিছুই মান্য করে শিরোধার্য্য করে, সুতরাং ভাবনা কি? দেশে তো যাহা কিছু আন্দোলন যাহা কিছু দাবী সবই চালাইতেছে অর্ব্বাচীনে, অপোগণ্ডে এবং অল্পবুদ্ধি স্বার্থান্বেষীতে।

এইরূপ যে দেশের অবস্থা, তাহাকে যে চতুর্দ্দিকেই উপেক্ষা-অবহেলার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এক প্রাচীন বন্ধু দীর্ঘদিন পরে কলিকাতায় আসেন। তিনি ভিন্ন প্রদেশীয় বিশেষ খ্যাতিমান সাংবাদিক এবং বাংলা ও বাঙালীর প্রতি বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধাভাব পোষণ করেন। সে সময় কলিকাতায় একটা আন্দোলন চলিতেছিল। তিনি আন্দোলনের কারণ ও চালকদিগের নামধাম শুনিয়া অবাক। পরে তিনি আমাদের বলেন, "তোমরা কি বুঝিতে অক্ষম যে এই ভাবের আন্দোলনে, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের মত, ইহারা নিজের, দেশের ও দশের দারুণ ক্ষতি করিতেছে? দেশ যদি এই ভাবে "emotionally spent" হইয়া যায় তবে কাজের সময় যখন আসিবে তখন দেশ ক্লান্ত ও নির্জ্জীব হইয়া থাকিবে।"

ইহার কথার কোনও জবাব না দিতে পারায় আমরা সেকথা আমাদের এক প্রবীন বন্ধুকে বলি যিনি এদেশের প্রাচীন সাংবাদিক-দিগের মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন, "আপনার বলা উচিত ছিল

যে, "দেশ চলছে এখন পদীপিসির আপ্তবাক্যে এবং ধূর্ত্ত নেতা ও অকালপক্কের আন্দোলনে। প্রবীণ বা অভিজ্ঞ লোকের কথার এদেশে কোনও মূল্য নাই।"

বাংলার প্রতি ও বাঙালীর প্রতি কমিশনের সুপারিশে সুবিচার হয় নাই ইহা সত্য, কিন্তু সুবিচার অর্জ্জনের যোগ্যতা আমাদের কতটা অবশিষ্ট আছে তাহাই এখন বিচারের সময় আসিয়াছে।

দেশের যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা যদি রাষ্ট্রনীতি বলিতে শুধু দলগত স্বার্থই বুঝেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ যাহাদের হাতে, বাংলার ও বাঙালীর আশা-ভরসা যাহারা, তাহারা যদি অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল বয়োজ্যেষ্ঠদিগের পরামর্শকে অবহেলা করিয়া শুধু উদ্দাম-উচ্ছ্বাসে নাচিয়া বেড়ায়, তবে ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লইয়া "হরিবোল" ধ্বনি করা উচিত। কমিশনের সুপারিশ আলোচনায় লাভ কি?

কমিশনের সুপারিশ যে সকল যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে সঙ্গতির অভাব অনেক ক্ষেত্রে আছে। বস্তুতঃ একের ক্ষেত্রে যাহা সপক্ষে বলা হইয়াছে অন্যের পক্ষে তাহার বিপরীত যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে অনেক স্থলেই। কিন্তু সে সবের বিচারের অবকাশ এখন রহিয়াছে একমাত্র লোকসভায়, সুতরাং সেখানে আমাদের প্রতিনিধি যাঁহারা তাঁহাদের উপরই শেষ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেসের আজ্ঞাধীন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধীন। সুতরাং মূল দায়িত্ব কোথায় সে ত দেখাই যাইতেছে।

ভিন্ন দল হইতে যাঁহারা লোকসভায় গিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা ত আরও অদ্ভুত। তাঁহাদের ত বাংলার স্বার্থে মুখ খুলিবার অধিকার বা সাহস কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। একদিন ত সারা দেশের নামে তাঁহারা বাংলার স্বার্থকে বলিদান করিয়াই আসিয়াছেন। এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কিনা জানি না। তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাংলার জন্য লড়েন তবে কংগ্রেসের সভ্যদলও দায়ে পড়িয়া লড়িতে বাধ্য হইবেন।

মূলতঃ এই সকল প্রতিনিধিই দেশের লোকের নিকট দায়ী। কিন্তু দেশের লোক নিজ অধিকার সম্পর্কে যদি মুখর হইয়া উঠে, যদি দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয় হইয়া উঠে তবেই কার্য্যতঃ কোনও ফল হইবে।

আমাদের যাহা ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য সে সম্বন্ধে দাবি করার অধিকার চিরদিনই আমাদের থাকিবে। কিন্তু দায়িত্ব বিনা অধিকার আসে না। একথা যতদিন আমরা না বুঝিব ততদিন আমাদের প্রাপ্য যাহা কিছু তাহা সকলই নির্ভর করিবে অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর। দায়িত্ববিহীন কর্ম্মবিমুখ ক্লীবের আস্ফালন কেহই গ্রাহ্য করে না, তাহার সাক্ষ্য এই রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ। রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলন ত এদেশে—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে—আদৌ হয় নাই। বাঙালীর আন্দোলন বলিতে যাহা তাহার কিছু পরিচয় একমাত্র মানভূমের একাংশে হইয়াছে। সেখানে অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ লোকের পরামর্শ লোকে শ্রদ্ধায় লইয়াছে, উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিপদ অত্যাচারকে তুচ্ছ করিয়াছে। আমরা যেটুকু পাইয়াছি তাহা উঁহাদেরই প্রাপ্য।

জন আন্দোলন বাংলায় অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর বিদ্যমান। তাহার মধ্যে যাহাতে স্থিরবুদ্ধি প্রবীণের বলিষ্ঠ মতবাদ ছিল, বিচারবুদ্ধি-প্রসূত চিন্তা ছিল তাহার সুফল ফলিয়াছিল।

আজিকার দিনে চিন্তা, অভিজ্ঞতা, আদর্শবাদ ইত্যাদির কোনই মূল্য নাই, আছে বিপ্লবের নামে ফাঁকা আওয়াজ, আছে আত্মঘাতী উচ্ছৃঙ্খলতা। তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে।

শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকের কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতেছে। নূতন কলকারখানা এ দেশে সামান্যই বসিতেছে। কেন তাহার উত্তরে নিম্নে উদ্ধৃত বিদেশী সংবাদ সাক্ষ্য দিতেছে।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' সংবাদপত্রের এদেশস্থ বিশেষ সংবাদদাতার কলিকাতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট উক্ত মার্কিনী কাগজে প্রকাশিত হয়। এখানকার অবস্থা যে ভাবে দেখানো হয় তাহা উক্ত রিপোর্টের নিম্নস্থ আংশিক অনুবাদে পাওয়া যাইবে:

"কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম নগর এবং এদেশের বৃহত্তম পাট-শিল্পের ও গণ্ডগোলের আধার।"

"শ্রমিক আন্দোলনে দাঙ্গা, যাহার কারণ অভাব ও দৈন্য, কম্যুনিষ্ট নেতারা পরিপুষ্ট করিয়া এই নগরটিকে সারা ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অশান্তি ও উদ্বেগের আকর দাঁড় করাইয়াছে। প্রতি নগরেরই একটা নিজস্ব ভাব আছে, সেটি কলিকাতার ক্ষেত্রে—সম্যক অশান্তি। উহার উৎস কেবলমাত্র শ্রমিকদল নহে, সেই সঙ্গে আছে রাস্তায় উদ্বাস্তুর দল ও নিরাশ ছাত্রবৃন্দ।"

"বিদেশী কারবারীরা, যাঁহারা কার্য্য পরিচালনার ও (টেকনিক্যাল) বৈজ্ঞানিক কার্য্যক্রমে এদেশের পুরোভাগে এখনও আছে, সকলেই মনে করে যে কলিকাতায় কারবার রাখা বিপজ্জনক এবং এখান হইতে সরানই শ্রেয়ঃ। সকল কারবারেই শ্রমিক আন্দোলনের ভয় রহিয়াছে।"

"মার্কিন রাষ্ট্রদূত শেরমান কুপার বিখ্যাত লাডলো পাটকলে যাইতে পারেন নাই, কেননা সেখানে শ্রমিক বীমা লইয়া ভীষণ গণ্ডগোল চলিতেছিল। গণ্ডগোল দাঙ্গায় দাঁড়ায়। শ্রমিকগণ চিকিৎসা ও বীমার জন্য পয়সা দিতে চায় নাই।"

"ব্রিটিশ পাটকল ও বিদেশী তৈল ব্যবসায়ীরাও শ্রমিক গণ্ড-গোলের আশঙ্কায় ব্যস্ত।"

ছাত্র আন্দোলনের ফলে বাঙালী ছাত্রের যে কি অবনতি হইয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষরূপে পাইয়াছি কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষক রূপে। পাঁচ-ছয়টি পরীক্ষায় একটিও বাঙালী ছাত্র উত্তীর্ণ হয় নাই। কারণ, যুক্তিহীন বাচালতা এবং জ্ঞানের ও শিক্ষার অভাব। জ্ঞানবৃদ্ধি অর্জ্জনের অবসর কোথায়, সৎ পরামর্শ শোনার ইচ্ছা কোথায়?

কিন্তু তবুও নিরাশ হইলে চলিবে না। যাঁহারা স্থিরবুদ্ধি তাঁহাদের এখন উচিত এ বিষয়ে অবহিত হইয়া দেশকে জাগাইবার ও দেশের অধিকারিবর্গের সুবুদ্ধি উদ্রেক করার চেষ্টা করা। "অরণ্যে রোদন" বলিয়া ক্ষান্ত হইলে বাঙালীর ধ্বংস অনিবার্য্য।

সবশেষে দিই পণ্ডিত নেহরুর উপদেশ :

"মাদ্রাজ, ২রা অক্টোবর—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশগুলি ঠাণ্ডা মাথায় ও নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করার এবং তাহা লইয়া মারাত্মক রকম উত্তেজিত না হইয়া ওঠার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ ভারতের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

কোন সমস্যারই এরূপভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়, যাহাতে ভারতের প্রতিটি মানুষ সন্তুষ্ট হইবে : কারণ পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ ও মতামতের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হউক না কেন, কিছু সংখ্যক লোক উহাতে সন্তুষ্ট হইলেও কিছু সংখ্যক অসন্তুষ্ট হইবেনই। এমতাবস্থায় নিজেদের মধ্যে হানাহানি না করিয়া গণতন্ত্রসম্মত একটি উপায় বাহির করিতে হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় গৃহীত হইয়াছে। আইনটি জোড়াতালিতে ভরা। গরীব চাষীর চেয়ে ধনী মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় বিলটি সচেষ্ট। ইহার সবচেয়ে বড় নিদর্শন এই যে, কলিকাতাকে এই আইনের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। আইনে প্রত্যেককে ২৫ একর (প্রায় ৭৫ বিঘা) করিয়া জমি রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় কয়েক জন ধনীর জমি প্রায় ২৫০০ শত বিঘা কিংবা ততোধিক আছে, যথা : ভাঙ্গর, বিড়লা, চারু ষ্টেট প্রভৃতি; ইহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কলিকাতা এলাকায় এ আইনটি প্রযোজ্য নহে। ইহারা ৫০ টাকায় বিঘা কিনিয়া ৫০০০্ টাকায় কাঠা বিক্রয় করিতেছে। নূতন আইন প্রযুক্ত হইলে ইহাদের এমন লাভের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই কলিকাতাকে আইনের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কিশারী কিংবা মৎস্য জমি এই আইনের কবলের বাইরে। ইহার পিছনে আছে অবশ্য বড় রাজনীতি যাহার আবর্তে অনেক বিধান-সরকার বিপদগ্রস্ত হইবে। সোজা কথায় বলিতে গেলে কতিপয় ব্যক্তি নামে এবং বেনামীতে কলিকাতা অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ভেড়ীর মালিক। কলিকাতার মাছের বাজার ইহাদের একচেটিয়া এবং সেই কারণে মাছের দাম ৩।৪০ টাকার নীচে নামে না। কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ত দেন যে কলিকাতার দৈনিক প্রয়োজন ৫০০ শত মণ মাছ, সেই তুলনায় এখানে ১৫০।২০০ মণ মাছ দৈনিক ধরা হয়, সুতরাং চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দাম বেশী থাকিতে বাধ্য। যে কয় মাস পাকিস্থানী ইলিশের আমদানী থাকে, সেই কয় মাস কলিকাতার লোক অন্ততঃ কিছু পরিমাণ মাছ পায়।

কিন্তু পাকিস্থানী ইলিশ ফুরাইলে কলিকাতার মাছের বাজার মৎস্যশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেমন বর্তমানে হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যবিভাগের কার্য্যাবলী কি? যে কয়েকটি ট্রলার কেনা হইয়াছে তাহারা কি সমুদ্রে হাওয়া খাইয়া বেড়ায় না মাছ ধরে? যদি মাছ ধরে ত কি মাছ এবং তাহার পরিমাণ কত? সে মাছ যায় কোথায় এবং কে খায়? অন্ততঃ কলিকাতার বাজারে সে মাছ দেখা যায় না এইটুকু বলা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যবিভাগের কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী কয়েক দফায় পালা করিয়া নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ বেড়াইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সে দেশ হইতে কি শিখিয়া আসিলেন? কেমন করিয়া মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায়, না সুপরিকল্পিত উপায়ে মৎস্য পরিকল্পনাগুলিকে বানচাল করিয়া দেওয়া যায়? তবে একথা নিঃসন্দেহ, বর্তমান ব্যবস্থা থাকিতে কলিকাতার মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

ইচ্ছা থাকিলে গত ছয়-সাত বৎসরে কলিকাতায় মাছের আমদানী বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইত। কলিকাতার আশেপাশের অনেক স্থলে মাছের চাষ করিলে কলিকাতায় মাছের আমদানী বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারিত।

কলিকাতার বাহিরেও পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে মাছের যথেষ্ট অভাব আছে। যেমন, মেদিনীপুর কিংবা বাঁকুড়া শহরে। মেদিনীপুর জেলায় শহরের কাছাকাছি (যেমন জকপুরে) কয়েকটি বিরাট দীঘি আছে, এইগুলিতে মাছের চাষের বন্দোবস্ত করিলে মেদিনীপুর শহরে মাছের আমদানী বৃদ্ধি পাইত। মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে শরশঙ্ক ও বিদ্যাধর বলিয়া দুইটি কয়েক মাইলব্যাপী বিরাট জলাশয় আছে। শুধু ট্রলারের পিছনে টাকা খরচ না করিয়া এই সকল জলাশয়ে মাছের চাষের বন্দোবস্ত করিলে কলিকাতার এবং জেলাগুলিতে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইত।

বস্ত্রশিল্পের সমস্যা

মানুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু বাতিক থাকে, ইহাতে সমাজের ক্ষতি হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধাররা যখন বাতিকগ্রস্ত হন তখন দেশের পক্ষে ইহা সমূহ ক্ষতি করে। মিলবস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু বাতিকগ্রস্ত নয়, ইহা খামখেয়ালীতে ভরা। কয়েক বৎসর হইতেই তাঁহাদের মাথায় চাপিয়াছে যে, তাঁতবস্ত্র-শিল্পকে উন্নত করিতে হইবে এবং মিল বস্ত্রশিল্প ইহার প্রতিকূল আর সেই কারণে মিল বস্ত্রের উৎপাদনের উচ্চ সীমা তাঁহারা নির্দ্ধার করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মিল বস্ত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। সরকারী নীতির আলোচনা করিতে হইলে মিল বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানা অবশ্য প্রয়োজন।

মিল বস্ত্রশিল্প ভারতের বৃহত্তম শিল্প; ইহার মোট মূলধন ১১৩ কোটি টাকা। ভারতের সমস্ত যৌথ কারবারী মূলধনের ইহা ১৫ শতাংশ। বস্ত্রশিল্পের বাৎসরিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ৩৩৫ কোটি টাকার মত; মোট শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের ইহা ৩৫ শতাংশ; ভারতে বৎসরে ৯৮০ কোটি টাকার মূল্যের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ভারতের মিলগুলি ভারতে জাত প্রায় ৩৮ লক্ষ গাঁইট তুলা খরচ করে; ইহা ব্যতীত আমদানী তুলার মধ্যে ৭। লক্ষ গাঁইট ক্রয় করে। অর্থাৎ, ভারতে উৎপন্ন ১৫০ কোটি টাকার তুলা ভারতীয় মিলগুলি ক্রয় করে। সুতরাং দেখা যায় যে, এ দেশের

তুলাচাষীদের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে মিলগুলির উপর। অধিকন্তু, জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং তৈল বাবদ বস্ত্রশিল্প বৎসরে ১১ কোটি টাকা খরচ করে। অন্যান্য সহকারী শিল্প, যথা: রং, কেমিক্যাল দ্রব্য, আয়তন এবং প্যাকিং দ্রব্যের শিল্প বস্ত্রশিল্প দ্বারা পোষিত হয়; ২৬ কোটি টাকার মত এই সকল দ্রব্য বস্ত্রশিল্প বৎসরে ক্রয় করে।

বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারকে বিভিন্ন প্রকার কর বাবদ বৎসরে ৪০ কোটি টাকার মত প্রদান করে। যৌথ কারবারগুলির মধ্যে এক বস্ত্রশিল্পে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোক নিয়োজিত আছে—প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত। রাষ্ট্র আজ যখন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট, তখন বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক নিয়োগ করিবার ক্ষমতা অবশ্য বিচার্য। এই শিল্পের যত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ততই শ্রমিকেরা কাজ পাইবে; ইহার উৎপাদন হ্রাস করা মানে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করা।

শ্রমিকের মাহিনা এবং কর্মচারীদের বেতন বাবদ বস্ত্রশিল্প হইতে বৎসরে ৮০ কোটি টাকার মত আসে। বোম্বাই শহরের এক জন বস্ত্রশিল্প-শ্রমিকের বৎসরে গড়পড়তা আয় প্রায় ১,৬০০ টাকা (ভারতে মাথাপিছু বাৎসরিক গড়পড়তা আয় ২৮৪ টাকা)। ভারতীয় তাঁতশিল্পকে সূতার জন্য নির্ভর করিতে হয় মিলগুলির উপর। এদেশের একটি বিরাট সংখ্যক লোক তুলা, সূতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং ইহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন-সীমানা ছিল ৫০০ কোটি গজ বস্ত্র এবং ১৬৪ কোটি পাউণ্ড সূতা। ১৯৫৪ সনে ভারতীয় মিলগুলি উৎপাদন করে ৫০২ কোটি গজ বস্ত্র এবং ১৫৭ কোটি পাউণ্ড সূতা। গত বৎসর তাঁতশিল্পে ১৬০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁতশিল্প ও মিলশিল্পের মোট বস্ত্র উৎপাদনের দ্বারা আমাদের মাথাপিছু বৎসরে মোটে ১৮ গজ করিয়া কাপড় পাওয়া যায়; তবে ইহার সবটাই দেশের আভ্যন্তরিক ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায় না। একটি মোটা অংশ রপ্তানী হইয়া যায়। ১৯৫৪-৫৫ সনে ৫৫ কোটি টাকার মূল্যে ৭৬ কোটি গজ মিলবস্ত্র রপ্তানী হয়, আর প্রায় ৮ কোটি টাকার মূল্যের ৫ কোটি গজ তাঁতবস্ত্র রপ্তানী হয়। ভারতের মোট রপ্তানীর ১৩ শতাংশ মিলবস্ত্র রপ্তানী হয়। আভ্যন্তরিক ব্যবহারের জন্য মাথাপিছু গড়পড়তায় ১৬ গজ করিয়া কাপড় পাওয়া যায়; আমেরিকা ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু গড়পড়তায় ৮০-৮৪ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মিলবস্ত্রের উৎপাদন-সীমানা বৎসরে ৫৫০ কোটি গজে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; প্রথম পরিকল্পনা হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোটে ৫০ কোটি গজ মিলবস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে; ইহা যৎসামান্য। তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন-সীমানা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে ৩২০ কোটি গজে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থকে উপেক্ষা করিতেছেন। মিলবস্ত্রের অবাধ উৎপাদন থাকিলে মূলধন বৃদ্ধি পাইবে, বেকার সমস্যা হ্রাস হইবে এবং দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। ভারতবর্ষের রপ্তানী বৃদ্ধি করা জাতীয় প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। এই অবস্থায় বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না দেওয়া জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

মিলবস্ত্র উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিলে উপকার হইবে কাহার? ভারতের জনসাধারণের নিশ্চয়ই নয়, উপকার হইবে মুষ্টিমেয় মিল-মালিকদের। ব্যক্তিগত আয়ের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং বস্ত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য; এই অবস্থায় উৎপাদন যেখানে নিয়ন্ত্রিত এবং তাহার ফলে বস্ত্রের সরবরাহ সীমাবদ্ধ, সেখানে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে মিল মালিকরা অধিক হারে মুনাফা পাইবে। মিলবস্ত্রের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত লাভ করিবে তাহা হইলে মিল-মালিকরা।

মিল এবং তাঁতের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হওয়া উচিত—ইহারা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগী না হইয়া সহযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাদের উৎপাদন-ক্ষেত্র বিভিন্ন এবং জনসাধারণের রুচি ও চাহিদার মান এবং আয়তনও ভিন্ন: তাঁতের শাড়ী ও মিলের ধুতির বাজার চিরকালই থাকিবে এবং ইহাদের চাহিদাও চিরপ্রসারশীল। মিলের শাড়ীর চাহিদার ক্ষেত্র স্বল্প, সেই রকম তাঁতের ধুতির। আহমাদাবাদে সম্প্রতি সর্ব্বভারতীয় খাদি বোর্ডের যে সভা হইয়াছে তাহাতে দাবি করা হইয়াছে যে, মিলবস্ত্রের উৎপাদন যেন ৫০০ শত গজের অধিক না হয়। এই প্রকার দাবি জাতীয় স্বার্থের বিরোধী।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ

ইতিপূর্ব্বেই এ বিষয়ে আমাদের মতামত লিখিত হইয়াছে। এখন সুপারিশের বিবরণের চুম্বক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে বর্ত্তমান ভারতরাষ্ট্রের সাতাশটি রাজ্যের স্থলে ষোলটি রাজ্য গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দিল্লী, মণিপুর এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলরূপে গণ্য করা হইবে। প্রস্তাবিত নূতন রাজ্যগুলি হইতেছে: মাদ্রাজ, কেরল, কর্ণাটক, হায়দরাবাদ, অন্ধ্র, বোম্বাই, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা এবং জম্মু ও কাশ্মীর। বর্ত্তমান হায়দরাবাদ রাজ্যকে কমিশন তিনভাগে বিভক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। এক খণ্ড লইয়া গঠিত হইবে নূতন কর্ণাটক রাজ্য, দ্বিতীয় খণ্ড যাইবে বোম্বাই রাজ্যে এবং অবশিষ্টাংশ লইয়া হায়দরাবাদ রাজ্য পুনর্গঠিত হইবে।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে লুপ্ত হইবে: যথা—হিমাচল প্রদেশ, পেপসু, আজমীঢ়,

কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, মধ্যভারত, ভূপাল, বিন্ধ্যপ্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মহীশূর, মণিপুর ও দিল্লী। ত্রিপুরা আসামের সহিত যুক্ত হইবে। বোম্বাইয়ের সহিত যুক্ত হইবে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ। দিল্লী, মণিপুর এবং আন্দামান কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলরূপে পরিগণিত হইবে।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সীমানা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। পুনর্গঠিত হায়দরাবাদ রাজ্য সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছেন যে, ১৯৬১ সন নাগাদ যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে সেই নির্ব্বাচনের পর হায়দরাবাদ বিধানসভার সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি অন্ধ্র রাজ্যের সহিত অন্তর্ভুক্তি হইতে চাহেন তাহা হইলে এই রাজ্যটিকে অন্ধ্রের সহিত যুক্ত করিতে হইবে।

কমিশন এই তিনটি নূতন রাজ্য গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন: কেরল, কর্ণাটক এবং বিদর্ভ।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য দূরীভূত হইবে এবং 'গ' শ্রেণীর রাজ্য লুপ্ত হইবে।

কমিশন এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের রাজ্য পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তবে উহার একটা সীমা অবশ্যই স্বীকার্য। সমগ্র দেশের জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল কারণকে ওজন করিয়া এবং সারা ভারতের সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার বিচার প্রয়োজন।

কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, রাজ্য পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী। কারণ ব্যাপকভাবে পরিকল্পনার কাজ করিতে হইলে স্থায়ী রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে রাজ্যগুলিকে বিবেচনা করিতে হইবে। কমিশন এই পুনর্গঠন কার্য্য আর বিলম্বিত না করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের তিন জন সদস্য ছিলেন: শ্রী এস. ফজল আলী (চেয়ারম্যান), শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং শ্রী কে. এম. পানিকর (সদস্যদ্বয়)। শ্রীআলী ও শ্রীপানিকরের দুইটি স্বতন্ত্র নোট ব্যতীত কমিশনের সুপারিশসমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চেয়ারম্যান শ্রীআলী তাঁহার স্বতন্ত্র বক্তব্যে বলিয়াছেন যে, বিহারের সহিত তিনি সুদীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে আঞ্চলিক বিতর্কে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই। হিমাচল প্রদেশ সম্পর্কেও কমিশনের সহিত একমত হন নাই। তাঁহার মতে হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে পৃথক ইউনিট হিসাবে থাকা উচিত।

শ্রীপানিকর উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে কমিশনের সহিত ভিন্নমত পোষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, আগ্রাকে রাজধানী করিয়া নূতন আগ্রা রাজ্য গঠিত হওয়া উচিত।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কিছু বৃদ্ধি পাইবে। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ণিয়া জেলার কতকাংশ এবং চাস থানা ব্যতীত মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

কমিশন বলিয়াছেন যে, যে রাজ্যের অধিবাসীদের শতকরা ৭০ বা ততোধিক ভাগ এক ভাষায় কথা বলে তাহাকে এক ভাষাভাষী রাজ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। যে রাজ্যে শতকরা ৩০ বা ততোধিক ভাগ অধিবাসী ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু, সেই রাজ্যকে শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য দ্বিভাষিক রাজ্য হিসাবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

কমিশনের মতে এই ভাষানীতি জেলা ভিত্তিতে প্রয়োগ করা উচিত। যে জেলায় মোট অধিবাসীর শতকরা ৭০ বা ততোধিক ভাগ ভাষাগত সংখ্যালঘুদের দ্বারা অধ্যুষিত সেই জেলায় সংখ্যালঘুদের ভাষাই জেলার সরকারী ভাষারূপে গণ্য হওয়া উচিত, উক্ত রাজ্যের ভাষা নহে।

সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে অভিযোগাদি বিবেচনা করিয়া কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোনো রাজ্যে চাকুরীতে গ্রহণের সময়ে নাগরিকদের মধ্যে কতদূর পর্য্যন্ত বৈষম্য করা চলিতে পারে সেই বিষয়ে শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা উচিত।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট মুদ্রিত ২৬৭ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হইয়াছে। কমিশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষ হইতে মোট ১,৫২,০০০টি দলিল ও স্মারকলিপি পাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ২,০০০ স্মারকলিপি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে।

১৯৫৪ সনের ১লা মার্চ্চ দিল্লীতে কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হয় এবং ১৯৫৫ সনে জুলাই মাসে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয়। কমিশন মোট ৩৮ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়া ৯ হাজার ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

ওয়ার্কিং কমিটিতে পুনর্গঠন সুপারিশ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতামতের মূল্য আজকাল ক্রমেই কমিতেছে। এক্ষেত্রেও তাহার গুরুত্ব বিশেষ দেখা যায় না। সুতরাং নীচে সংবাদমাত্র দেওয়া হইল:

"নয়াদিল্লী, ১৩ই অক্টোবর—প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অদ্য সাধারণভাবে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন, তবে সেই সঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে, সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের সম্মতিক্রমে পরিবর্ত্তনেরও সুযোগ থাকিবে।

আগামীকল্য পুনরায় কমিটির বৈঠকে কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কমিটির সাধারণ মতামত সম্বলিত এক প্রস্তাব গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অদ্য ছয় ঘণ্টারও অধিককাল বৈঠক চলে এবং প্রায় সকল সদস্যই অদ্যকার আলোচনায় যোগদান করেন।

প্রকাশ, কমিটির সুচিন্তিত অভিমত এই যে, একটি উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন কমিশন যখন এই পুনর্গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন তখন সাধারণভাবে উহা অনুমোদন করাই ঠিক। তবে এই সঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ইহার ফলে ছোটখাটো পরিবর্ত্তন অথবা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্মতিক্রমে পরিবর্ত্তন সাধনে

প্রতিবন্ধক-সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। প্রকাশ, এই প্রসঙ্গে পঞ্জাবের সহিত যুক্ত করার পরিবর্ত্তে হিমাচল প্রদেশকে পৃথক রাজ্য হিসাবে রাখিবার প্রস্তাব এবং পৃথক বিদর্ভ রাজ্য গঠনের পরিবর্ত্তে উহাকে বোম্বাই রাজ্যের সহিত যুক্ত করার বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা হয়।

কোন কোন মহল হইতে কেরল ও তামিলনাদকে লইয়া একটি রাজ্য গঠনের যে প্রস্তাব হইয়াছে সাধারণ আলোচনার সময় তাহার উল্লেখ করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, বোম্বাই রাজ্য গঠন ও প্রস্তাবিত মধ্যপ্রদেশের আয়তন সম্পর্কেও বিশেষভাবে আলোচনা হয়।

বিহারে পুনর্গঠনের প্রতিক্রিয়া

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নের সংবাদটি এখনও সমর্থিত বা প্রমাণিত হয় নাই, কিন্তু উহার অত্যন্ত গুরুত্ব আছে। সুতরাং উহা উদ্ধৃত হইল:

"কলিকাতার প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কিষণগঞ্জ মহকুমার বিস্তৃত অংশের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির সুপারিশ করায় সেখানকার অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ১২ই অক্টোবরের সভা ও শোভাযাত্রার ফলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়াছে।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্ররোচনায় মহকুমার সর্ব্বত্র বাঙালী বিরোধী বিক্ষোভ প্রকাশ পাইতেছে। কোন কোন জায়গা হইতে বলপ্রয়োগ, এমনকি মারপিটেরও খবর পাওয়া যাইতেছে।

গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে কিষণগঞ্জে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে, 'গোয়ালপাড়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙালীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াও এবং কিষণগঞ্জকে রক্ষা কর।' সরকারী উদ্যোগে শহরে ও গ্রামে গ্রামে গোপন বৈঠক বসিতেছে। সর্ব্বত্রই শোনা যাইতেছে, বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হইবে। শোভাযাত্রী ও বিক্ষোভকারীদিগকে উন্মত্ততা প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। নানা রকমের বাঙালীবিদ্বেষী ধ্বনি করা সত্ত্বেও কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না।"

পণ্ডিত নেহরু ও ভাষা-সমস্যা

মাদ্রাজের এক জনসভায় পণ্ডিত নেহরু ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে নিম্ন প্রকাশিত মতামত জ্ঞাপন করেন। সেইসঙ্গে উত্তরাঞ্চলের ছাত্রদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়েও তিনি মন্তব্য করেন:

"ভাষা-সমস্যা সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতে শিক্ষার মানের অবনতি সম্পর্কে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকও শিক্ষার মানের এই অবনতিতে আতঙ্কিত। ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে যে ব্যাপক বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে, উহাই শিক্ষার মানের অবনতির অন্যতম কারণ বলিয়া নেহরুজী মনে করেন।

তিনি বলেন যে, কোন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিবে, ছাত্রগণ তাহা জানে না। ফলতঃ প্রতিটি ভাষা সম্পর্কেই তাহারা সমান অজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে।

সর্ব্ব-ভারতীয় সরকারী ভাষা সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, "কেহই জনগণের উপর জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দিতে চাহে না। তবে ইংরেজীও জাতীয় ভাষা হিসাবে অব্যাহত থাকিতে পারে না, কারণ জনগণের শিক্ষার জন্য বৈদেশিক মাধ্যমের প্রবর্ত্তন করিতে আমরা পারি না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে, আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, আমরা যদি একটিও অ-ভারতীয় ভাষা না শিখি, তবে তাহা ভারতের ও ভারতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথে মহা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। এমতাবস্থায় ইংরেজী শিক্ষাই সবচেয়ে সহজ।

নেহরুজী বলেন যে, ইংরেজী, হিন্দী, তামিল, তেলুগু বা অন্য কোন ভাষার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নাই। তামিল এই অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ভাষা। উত্তর-ভারতের জনগণের তাই তামিল বা অন্য কোন একটি দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। কিন্তু ইংরেজী না শেখা ভুল হইবে। কারণ ইংরেজী শুধু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষাই নয়, সম্ভবতঃ সর্ব্বাধিক প্রচারিতও।

উত্তর-ভারতের যুব সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ করিয়া নেহরুজী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি এলাহাবাদ, পাটনা ও উত্তর-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্রদের আচরণকে "বালচাপল্য" নামে অভিহিত করেন।

নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা খুবই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বড় নির্ম্মম আজিকার পৃথিবী, বড়ই হৃদয়হীন। উচ্ছৃঙ্খলতা জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং জাতি যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে পৃথিবী মোটেই অনুগ্রহ করিবে না। দুর্ব্বল জাতি অনুগ্রহ লাভের অধিকারীও নয়।

শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতীয়দের সহস্র সহস্র বৎসরের গৌরবময় এক ইতিহাস আছে, আছে ইতিহাসলব্ধ সুবিপুল অভিজ্ঞতা। ইহাই জাতিকে প্রাজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে, বয়সোচিত স্থৈর্য্য আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু তবুও যদি ভারতীয়েরা বালসুলভ চাপল্যের পরিচয় দেয়, তবে তাহারা মাতৃভূমির ক্ষতিই করিবে। মাতৃভূমির ক্ষতি-সাধন সর্ব্বসময়েই অন্যায়; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে ক্ষতি হইবে যারপর নাই মারাত্মক।

নেহরুজী বলেন, দৈববশে বা আকস্মিকভাবে ভারতীয়েরা স্বাধীনতা পায় নাই—নিয়মনিষ্ঠ আচার-আচরণ, কঠোর পরিশ্রম ও অসীম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে।

কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলী ও শ্রীনেহরু

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু রবিবার ১৬ই অক্টোবর রাজভবনে এক ছাত্র-সমাবেশে ভাষণপ্রসঙ্গে দেশের ছাত্র

ও তরুণদের চরিত্রগঠনে উদ্যোগী হইতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, দীর্ঘকাল পরশাসনে থাকিয়া আমাদের চরিত্রহানি ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই অবস্থার আশু অবসান আজ একান্ত দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই ছাত্র সভায় পণ্ডিতজী ছাত্রদের নানা বিষয়ে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিতে এবং দেশের সমস্যা উপলব্ধি করিতে উপদেশ দেন এবং বলেন যে, ভারতে আজ দেশ গঠনের যে বিপুল উদ্যম চলিয়াছে তাহার সম্পর্কে অনেকেরই কোন ধারণা নাই। কিন্তু সকলেরই আজ জানা দরকার যে, ভারতে বর্ত্তমানে এমন এক কর্ম্মোদ্যম চলিতেছে যাহা জাতির ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই।

ভারতকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য যে বৈপ্লবিক সাধনা চলিয়াছে তাহারও এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতে মূল-শিল্প প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও বিশ্লেষণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে ভারতের বিভিন্ন নদী উপত্যকা ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন পরিকল্পনাসমূহের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অত্যন্ত দ্রুততার সহিত এই সমস্ত বিরাট পরিকল্পনার কাজ আগাইয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়ার সাহসের দরকার হয়, আর সাহস ছাড়াও দরকার ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতা। এই সমস্ত পরিকল্পনায় বহুসংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য কর্ম্মী নিযুক্ত আছেন। ভারতের প্রায় সমস্ত অংশেই ছোট বড় কোন-না-কোন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে।

উল্লিখিত পরিকল্পনাগুলির বিবরণ দিয়া তিনি দেশে শিল্প স্থাপনের অত্যাবশ্যকতা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, মূল শিল্প হইল সেইগুলি যাহা হইতে দেশের বহুবিধ শিল্প গড়িয়া উঠে। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের কথা উল্লেখ করেন। লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ছাড়া দেশে শিল্প গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্তু ভারতে এই শিল্প যাহা আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তিনি স্বীকার করেন যে, এই দিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি এত দিন দেওয়া হয় নাই। তিন চার বৎসর আগে হইতে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের প্রতি জোর দিলে ভাল হইত। যাহা হউক, ভারত সরকার দেশে আরও তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিতেছেন এবং আগামী পাঁচ বৎসরে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন যাহাতে চার গুণ বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী সকলকে মূল-শিল্প ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের শিল্পের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে বলেন। দেশে এই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন-শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলেও মূল-শিল্প গঠনের দরকার। আর মূল-শিল্পের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। যে তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইবে তাহারও কলকব্জা জার্ম্মানী, রাশিয়া ও ইংলণ্ড হইতে আনা হইবে। মূল-শিল্পের প্রসার না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা হইবে না। শিল্পে আত্মনির্ভরশীলতা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা মানচিত্রের স্বাধীনতা অথবা আইনগত স্বাধীনতায় পর্য্যবসিত হইবে। কোন দেশ নামে স্বাধীন হইয়াও অর্থনৈতিক দিক হইতে পরনির্ভরশীল হইতে পারে এবং এই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা হইতে রাজনৈতিক মতামত নির্দ্ধারণের স্বাধীনতাও ব্যাহত হইতে পারে। সুতরাং ভারতকে প্রকৃত স্বাধীন করিতে হইলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্ত দরকার। আবার শিল্পের যন্ত্রপাতি সবই যদি বিদেশ হইতে আনিতে হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব হইবে না। এই কারণেই দেশে মূল শিল্প স্থাপন করা খুবই দরকার। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে সকলকে একটি বিষয় মনে রাখিতে বলেন। বিষয়টি হইল এই যে, মূল অথবা ভারী শিল্পের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হয় এবং ভারী শিল্পে নিযুক্ত এই অর্থ হইতে আবার বহুদিন ধরিয়া কোন লাভ পাওয়া যায় না। পরে অবশ্য লাভ ভালই হয়। কিন্তু লাভ পাইতে বহু বিলম্ব হয়। পণ্ডিতজী তাই বলেন যে, কতকটা উল্লিখিত কারণে এবং কতকটা জীবিকা সমস্যা ইত্যাদির কারণে সরকার বৃহৎ শিল্পের সহিত ছোট ও গ্রাম্য শিল্প পাশাপাশি চালাইতেছেন।

প্রধানমন্ত্রী অতঃপর দেশের উন্নয়ন কার্য্য পরিচালনা করার ব্যাপারে দুইটি নীতি বিশ্লেষণ করেন। সেই নীতি দুইটির একটি হইল নিরবচ্ছিন্নতা ও অপরটি দ্রুত পরিবর্ত্তন। নিরবচ্ছিন্নতা হইল—পূর্ব্ব হইতে যেরূপ চলিয়া আসিতেছে সেইভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া, আর দ্রুত পরিবর্ত্তন হইল বিপ্লব। একেবারে নিরবচ্ছিন্নতা অবশ্য সম্ভব নহে, কারণ বিভিন্ন ব্যাপারে পরিবর্ত্তন হইবেই। কোন দেশই স্থাণু হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ তাহার অর্থ হইল মৃত্যু। বিপ্লব আবার হঠাৎ হয় না। দীর্ঘ পরিবর্ত্তনের ধারার পরিসমাপ্তি হইল বিপ্লব। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও আসিয়াছে বহু ঘটনার মধ্য দিয়া। ২০০ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের কালে বহুবিধ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। কংগ্রেসের ইতিহাসও অনুরূপ। প্রথমে উহা ছোট ছোট আন্দোলন করিত, পরে গান্ধীজী উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া গণ-আন্দোলনের রূপ দেন। পণ্ডিত নেহরু এই প্রসঙ্গে ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও চীনের বিপ্লবের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, এই সমস্ত বিপ্লবেই বহুদিন আগে হইতেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। বহুদিন আগে হইতেই জনগণের ক্ষোভ সঞ্চিত হইতেছিল এবং শাসকশক্তি নানা কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর চূড়ান্ত আঘাতের সময়ে ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের পরিচালনায় গণশক্তি শাসক শক্তির উপর শেষ আঘাত হানিয়া শাসক শক্তিকে পরাজিত করিয়াছিল। পণ্ডিতজী আরও বলেন যে, বিশেষ অবস্থার পরিণতি হিসাবে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। রুশ বিপ্লব ঘটিয়া যাইবার পর আবার নিরবচ্ছিন্নতার

ধারা বিপ্লবের ধারার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমস্ত বিপ্লবের পরেই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু রুশ-বিপ্লবের বিচক্ষণ নেতৃবৃন্দ উভয় ধারার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সঙ্কট উত্তীর্ণ হন। বিশ্ব-বিপ্লবের লক্ষ্য লইয়া বিপ্লব করিয়াও পরে তাঁহারা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ অথবা অর্থনৈতিক নীতি বিসর্জ্জন দেন নাই। তবে, তাঁহাদের বাস্তব দৃষ্টি লইয়া নীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। চীনের বিপ্লব সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, ১৯১১ সন হইতে ৪০ বৎসর ধরিয়া চীনে গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল।

অতঃপর ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের বিপ্লব এক নূতন পথে আসিয়াছে এবং উহা অভূতপূর্ব্ব। অহিংস-বিপ্লব হইলেও ভারতের বিপ্লবকে এক মহান বিপ্লব বলা যাইতে পারে। ভারতে পর পর দুইটি বিপ্লব ঘটিয়াছে। একটি হইল ভারতের স্বাধীনতালাভ, অপরটি হইল দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতভুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের ব্যাপক ভূমিসংস্কার প্রচেষ্টারও উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের পড়াশুনা করিতে ও চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়া বলেন যে, আজ সকলেরই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেশের অগ্রগতির পরিমাণ নির্ণয় করার প্রধান উপায় হইল দেশে কিরূপ শক্তি উৎপাদন হইতেছে তাহার হিসাব লওয়া। কারণ এই শক্তির পরিমাণই প্রকৃতপক্ষে দেশের উন্নয়ন-ক্ষমতার পরিমাপ। বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি ও অন্যান্য উৎপাদনের দ্বারা আজ মানুষের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে আজও ভারতের শক্তি-উৎপাদনের প্রধান বস্তু হইল গোবর। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে এই অবস্থা ছিল। তবে বর্ত্তমানে ভারতে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীনেহরু বলেন যে, আমাদের দেশের যুবকরা ও অন্যান্য বহু লোক দেশের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা না করিয়াই বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সর্ব্বাগ্রে তাহাদের বিক্ষোভের ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। তাহাদের স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা দরকার। বহু লোক, এমন কি অনেক কংগ্রেসসেবীও ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভারতের সম্মুখে আজ উহার ৩৫ কোটি লোকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের বিরাট সমস্যা বিদ্যমান। কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান হঠাৎ হওয়া সম্ভব নহে। এমন কি একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হওয়াতেও সোভিয়েট দেশের সম্যক উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য সময় ও শ্রম দরকার।

পণ্ডিতজী ছাত্রদের চরিত্রগঠনের প্রতি যত্নবান হইতে উপদেশ দিয়া বলেন যে, দীর্ঘকাল পরশাসনের ফলে আমাদের চরিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গান্ধীজী জাতির চরিত্রগঠন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোককে সাহসী করিয়া তোলার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দেশের তরুণদেরও আজ চরিত্রগঠন করিতে হইবে।

উত্তর-প্রদেশে মাৎস্যন্যায়

আমরা বহুদিন যাবৎ ভারতে নৈতিক মানের অবনতি সম্বন্ধে লিখিতেছি এবং উহার দ্রুত অধোগতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমানে দেশের নানা অঞ্চলে যেরূপ অরাজকতার বৃদ্ধি হইয়াছে নিম্নস্থ সংবাদ তাহারই একটি নৈরাশ্যজনক উদাহরণ :

"লক্ষ্ণৌ, ১১ই অক্টোবর—গতকল্য অপরাহ্ণে বড়বাঁকী জেলার একটি গ্রামে এক জনসভায় বিধানসভার সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীঅওয়ধ-শরণ বর্ম্মা এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী কর্ম্মী শ্রীসীয়ারাম অনুমান পাঁচ শত সশস্ত্র জনতার আক্রমণে নিহত হইয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, শ্রীঅওয়ধশরণ সীয়ারামের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের জীবন দান করেন। আক্রমণকারীরা মৃতদেহ দুইটি লইয়া গিয়াছে।

বড়বাঁকী-সীতাপুর সীমান্তবর্ত্তী বন্দুপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এক শক্তিশালী পুলিশবাহিনী উক্ত গ্রামে গমন করিয়াছে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্য শ্রীভগ-বতীপ্রসাদ শুক্লকে বড়বাঁকীতে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। শ্রীঅওয়ধশরণ বর্ম্মার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে উত্তর-প্রদেশ বিধানসভায় এই দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ড. সম্পূর্ণানন্দের প্রস্তাবে স্পীকার শ্রীখের জলযোগের সময় পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখেন।

দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দান প্রসঙ্গে ড. সম্পূর্ণানন্দ বলেন যে, বন্দুপুর গ্রামে একটি সভা হইতেছিল, শ্রীঅওয়ধশরণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, অকস্মাৎ লাঠিধারী চার-পাঁচ শত লোকের এক জনতা সভায় হানা দেয় এবং দাবি করে যে, সভায় উপস্থিত সীয়ারামকে তাহারা হত্যা করিতে চায়।

পুলিস সুপার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীগেণ্ডা সিং বলেন যে, বড়বাঁকীতে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় নাগরিক জীবন বিপন্ন হইয়াছে।

সংযুক্ত দলের নেতা শ্রীবন্দেন্দু শা বলেন, 'গ্রামাঞ্চলে যে কি পরিমাণ অরাজকতা বিদ্যমান, তাহা এই হত্যাকাণ্ড হইতে বেশ বুঝা যায়।' শ্রীরামনারায়ণ ত্রিপাঠী (সোস্যালিষ্ট) হত্যার পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, তাহার ইঙ্গিত দেন এবং ঘটনার পিছনে একদল জমিদারের হাত আছে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বড়বাঁকীর কংগ্রেসী-সদস্য শ্রীজগন্নাথ সিং বলেন যে, তাঁহার জেলায় জনসেবার কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশেষে অধ্যক্ষ শ্রীখের বলেন যে, হত্যাকাণ্ডের ফলে এই রাজ্যে নাগরিক জীবনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

পথঘাটের দুর্দ্দশা

দেশের পথঘাটে লোক-চলাচলের কষ্ট এখনও সম্পূর্ণ দূর হইতে দেরী আছে। নিমতিতা-ধুলিয়ান রাস্তার সম্পর্কে "ভারতী" লিখিতেছেন :

"গঙ্গার ভাঙনের ফলে সম্প্রতি রেলকর্ত্তৃপক্ষ নিমতিতা ও ধুলিয়ানের মধ্যে ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যাত্রীসাধারণকে নিমতিতা ষ্টেশনে নামিয়া নয় মাইল দূরবর্ত্তী এই পথ পদব্রজে, গোযানে কিংবা মোটরবাসযোগে যাইতে হইতেছে। নিমতিতা-ধুলিয়ানের মধ্যে পাকুর লিঙ্ক রোড় ধরিয়া বাস সার্ভিস চলিতেছে। ইহাই বর্ত্তমানে এই অঞ্চলের দুর্গত জনসাধারণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা। শুধু ধুলিয়ানের যাত্রী নয় মালদহ তথা উত্তরবঙ্গগামী বহু যাত্রী এই পথে ধুলিয়ান ঘাট হইতে লঞ্চে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

"প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ নিমতিতা-ধুলিয়ানের সংযোগকারী এই পাকুর লিঙ্ক রোডটির অবস্থা বর্ত্তমানে অত্যন্ত শোচনীয়। এই রাস্তাটি তৈয়ারী করিবার জন্য সরকার বহু টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ইহার কাজও সুরু হইয়াছে। কিন্তু যেভাবে রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্য চলিতেছে তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। শোনা যাইতেছে, রাস্তাটির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া অন্ততঃ উক্ত রাস্তার এই অংশটুকু গত বর্ষার মধ্যেই সমাপ্ত হইবার কথা ছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই কার্য্য সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হয় নাই। ফলে এই রাস্তাটিতে যে সমস্ত বড় বড় পাথর ফেলা হইয়াছে তাহারই উপর দিয়া মোটর-বাসগুলিকে যাতায়াত করিতে হইতেছে। তাহাতে মোটর-বাসগুলিরই যে অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে এই সামান্য পথ অতিক্রম করিতে অসম্ভব সময়ও লাগিতেছে। ট্রেন বাস ও লঞ্চের যে সময়তালিকা বর্ত্তমানে চালু আছে তাহাতে রাস্তার এই দুরবস্থার জন্য অনেক সময়েই বাসগুলি ট্রেনের প্যাসেঞ্জার লইয়া লঞ্চ বা লঞ্চের প্যাসেঞ্জার লইয়া ট্রেন ধরাইয়া দিতে পারিতেছে না। ইহাতে যাত্রীসাধারণকে অবর্ণনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইতেছে।"

বাঙালীর অধোগতির কারণ

বাঙালীর অবস্থার বিপর্য্যয় ও তাহার জীবনের মানের দ্রুত অবনতির অন্যতম কারণ সামাজিক দায়। বস্তুতঃ সারা ভারতে অন্য একটি জাতি নাই যেখানে সামাজিক দায় এই ভাবে জনসাধারণকে নিগড়বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে রক্তমোক্ষণ করিতেছে। এই পাপ কবে বিদায় হইবে? "জি-টি রোড" এ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার আংশিক আমরা উদ্ধৃত করিলাম :

"মেয়েদের বিবাহের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বংশ, গোত্র, গাঁই এই সব—অর্থাৎ পাত্র পছন্দ হ'ল টাকাও হ'ল কিন্তু এইখানে এসে ঠেকল। এর ফলে মেয়েদের বিবাহের পরিসর দেখা যাচ্ছে ক্রমেই কমে আসছে। এর উপর আবার এক ভুয়া এবং সুবিধামত সমস্যা আছে ঠিকুজির মিল। কোষ্ঠীতে তো সবাই পণ্ডিত—বলে বসলেন মেয়ে রাক্ষসগণ ও-মেয়ে ঘরে আনা যায় না। এমনি ভাবে মেয়ের বিয়েতে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি হয়। একটি সমস্যা হলে কথা ছিল—মেয়েকে পাত্রপক্ষ এত রকম যাচাই করে যা উপন্যাসের নায়িকা ছাড়া পাওয়া দুর্লভ। সুন্দরী হতে হবে—হীরাবাঈ-এর মত গাইয়ে হবে—আনা পাবলোভার মত নাচিয়ে হবে—শুক্তো, চচ্চড়ি হতে কালিয়া, কোর্ম্মা, চপ, কাটলেট রাঁধতে হবে—উচ্চশিক্ষিতা না হোক অন্ততঃ একটা পাস করা হবে—লক্ষ্মীমন্ত হবে, শাশুড়ি যে পাশে বসতে বলবে সেই পাশেই বসে থাকবে—খুব বড়ও হবে না আবার নেহাৎ ছেলে মানুষও হবে না—অর্থাৎ যাকে বলে বামুনের গরু, দুধ দেবে বেশী খাবে কম। এতগুলো গুণসম্পন্না মেয়ে বাংলা দেশে কেন ভূভারতে আছে কি না অন্ততঃ আমার জানা নাই—কিন্তু এখানেই শেষ নয় এরপর হ'ল যৌতুকের পালা। খুব যারা এ বিষয়ে উদার তারা কম-সম করে যা দর হাঁকেন তাতে সেই পাত্রের আঁতুড় খরচ হতে শিক্ষা প্রভৃতি যা কিছু ব্যয় হয়েছে—সব খরচই সেই হিসাবে ধরা আছে। তারপর তত্ত্ব তাগাদা—ছেলে হতে মেয়ে বাড়ী আসবে ছেলের দু'একখানা গয়না অন্নপ্রাশন এই রকম সুদের সুদ তস্য সুদ তো আছেই।

"সকলে unanimously ভাল বললে তবে পাত্র রাজী হবে তারপর পাত্রের মা বাপ আছে। পছন্দ যদি হ'ল তারপর পাকা দেখা [পাঠকপাঠিকারা ভাবছেন এতেও বুঝি পাকা দেখা হ'ল না] এই সব নিয়ে একটা বিয়ের অর্দ্ধেক খরচ। আর মেয়েদের নিয়ে এই ব্যাপারে ছেলেখেলার অন্ত নাই—লিখিয়ে-গাইয়ে-চলিয়ে-বলিয়ে প্রশ্নের উত্তর যাচাই করে চুলের মাপ, পায়ের গোছা হাতের রেখা, নাকের বাঁক, চোখের চাউনি সবই যাচাই হবে একবার নয় একশোবার বিভিন্ন দল বা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে। এমন vulgar approach এই ব্যাপারে দিনের পর দিন চলছে—পাত্রী বা পাত্রীর বাপের যে কোনরূপ আত্মসম্মান আছে এ কথা পাত্রপক্ষ বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করে না!

"কেন এমন হয়? অন্য কিছু নয় পাত্রীর পিতার গরজ বেশী বলে। এই গরজ কেন? কারণ সামাজিক ব্যবস্থা মেয়েদের চৌদ্দ বছর বয়স হলেই বিয়ে দিতে হবে, না দিলে জাত যাবে। আজকাল অবশ্য এ মতবাদ লোপ পাচ্ছে তবে মেয়ের বিয়ের সমালোচনা এই বয়স হতেই প্রতিবেশিনীরা সুরু করে দেয় এবং মেয়ের মায়ের কানে তাই যায় আর তখন থেকে সেই মেয়ে বাড়ীর ভারস্বরূপ মনে হয়। তা ছাড়া ছেলেদের এই বয়সে মেয়েদের এই বয়সে ভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে—এদের চোখে চোখে রাখতে হয়—এই চোখে চোখে রাখা বিয়ে পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে হয়। এর জন্যও মেয়ের বিয়ের কথাটা সব সময় বাপ মায়ের মনে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"এত সমস্যার কি তবে সমাধান নাই। নিশ্চয়ই আছে। হয়

পূর্ব্বের মত ছেলে মেয়ের বিয়ে অতি শৈশবে দিতে হবে—নতুবা মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ পাত্র নির্ব্বাচনের ভার দিতে হবে। ছেলেরা যেমন খুশীমত মেয়ে গ্রহণ করতে বা বাদ দিতে পারে মেয়েদের সে অধিকার দিতে হবে অর্থাৎ ছেলেদের মতই শক্ত করে মেয়েদের মানুষ করতে হবে। আধুনিক শিক্ষা দেব এবং সে ঠাকুরমাদের মত পর্দ্দানশিন ও অপরের মুখাপেক্ষী করে মেয়েদের রাখব তা চলবে না। ছেলেদের মত মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। এতে বিপদ আছে বৈকি—কিন্তু এই ধিকি ধিকি আগুন জ্বলার চেয়ে একবার জ্বলে ওঠা ভাল। যা দাহ্য পদার্থ তা পুড়ে ছাই হবে আদাহ্যতা টিকে থাকবে। মেয়েদের পছন্দ অপছন্দর ওপর যখন বিবাহ নির্ভর করবে তখন সমস্যাটা জলের মত হয়ে যাবে, অন্য কোন উপায়ে নয়।"

পেরাম্বুরে রেলবগীর কারখানা

রেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণের যেরূপ কারখানা চিত্তরঞ্জনে স্থাপিত হইয়াছে সেইরূপ একটি কারখানা রেল শকট (বগী) নির্ম্মাণের জন্য মাদ্রাজের পেরাম্বুর নগরে স্থাপিত হইয়াছে। উহা চিত্তরঞ্জনের কারখানা অপেক্ষা কিছু ছোট।

সেই কারখানার উদ্বোধনে শ্রীনেহরু যে ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে বৃহৎ কল-কারখানা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য, কেননা ঐ সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। সংবাদটি এইরূপ :

"মাদ্রাজ, ২রা অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পেরাম্বুরে পূর্ণাঙ্গ বগি নির্ম্মাণ কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি আজ বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময়ে বার হাজারের অধিক লোকের এক সমাবেশে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে একটি বোতামে চাপ দেওয়া মাত্র কারখানা হইতে 'পূর্ণাঙ্গ ধরনে'র প্রথম বগি বাহির হইয়া আসে।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পেরাম্বুরস্থিত নূতন কারখানা আমাদের অগ্রগতির পথে আর একটি বৃহৎ পদক্ষেপ এবং শিল্পায়নের পথে আমাদের অগ্রগতির পরিচায়ক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের উন্নয়নে বড় বড় কারখানা-সমূহের এবং ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন দ্বন্দ্ব নাই। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, কিজন্য এই পবিত্র দিবসে গান্ধী-জয়ন্তী দিবসে এই কারখানার উদ্বোধন করা হইতেছে? গান্ধীজী ও এই বিরাট কারখানার মধ্যে সম্পর্ক কি? গান্ধীজী বাহ্যতঃ বড় বড় কারখানার অনুরাগী ছিলেন না; তিনি গ্রাম ও গৃহ সম্বন্ধে অনেক অধিক চিন্তা করিতেন, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। আজ গান্ধীজী যদি তাঁহাদের সহিত থাকিতেন, তাহা হইলে বড় সৌভাগ্যের বিষয় হইত। তিনি এই কারখানার উদ্বোধনে আনন্দিত হইতেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, অপর সমস্ত কারখানার ন্যায় এই কারখানাও গ্রাম শিল্পসমূহের উন্নয়নের এবং গ্রামের ও সহরের অধিবাসীদের জীবনযাপন পদ্ধতির উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নহে। কতক লোক গান্ধীজীর আদর্শসমূহের বহুমুখী প্রকৃতির সমস্ত দিক উপলব্ধি না করিয়া উহাদিগকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

তিনি মনে করেন, অনেকে গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি না করিয়াই ইহার উপর জোর দিয়া থাকেন। একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতারূপে ভারতে বিরাট আন্দোলন সুচারুরূপে পরিচালনের নিমিত্ত গান্ধীজী গ্রামীণ শিল্পের উপর জোর দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, সেই সময় যাঁহারা তাঁহার (গান্ধীজীর) কথায় সন্দিগ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই এখন গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির সমর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, বড় বড় কারখানা বিনা ভারতের বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কল্যাণ কিংবা উন্নতি অথবা অগ্রগতি কিছুই হইবে না। 'কল-কারখানা' না থাকিলে আমরা জাতীয় স্বাধীনতা পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিব না। এই সঙ্গে পল্লী-শিল্পের ব্যাপক উন্নতি না হইলে ভারতের কোন কল্যাণ এবং অধিক সংখ্যক নাগরিকের কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়াও তিনি মনে করেন না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই সম্পর্কে আমার মনে কোনরূপ দ্বন্দ্ব নাই। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায়ই হউক, অথবা ক্ষুদ্র পল্লী-শিল্পের ক্ষেত্রেই হউক সর্ব্বাধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে আমরা বর্ত্তমান জগতের সহিত সমান তালে অগ্রসর হইতে পারিব না। বর্ত্তমান জগতের শক্তির সকল উৎস কাজে লাগাইতে না পারিলে আমরা বর্ত্তমান বিশ্বে তাল রাখিয়া চলিতে পারিব না।'

শ্রীনেহরু বলেন, 'আজ আমরা আণবিক যুগের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আমরা এই বিরাট শক্তির উৎসকে উপেক্ষা করিতে পারি না। আমরা উপেক্ষা করিলেও অন্যেরা ইহাকে কাজে লাগাইবে। এই হেতু আমাদিগকে শক্তির সকল উৎসকেই কাজে লাগাইতে হইবে। এই সঙ্গে প্রত্যেকটি জিনিষই মানব-কল্যাণের মানদণ্ডে বিচার করিতে হইবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গান্ধী-জয়ন্তীর এই পুণ্যলগ্নে এখানে আসিয়া এই বৃহৎ কারখানার উদ্বোধন করায় তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, রেলের বগী নির্ম্মাণের এই কারখানাটি বৃহত্তর আরও কিছুর দ্যোতক।

পূর্ব্ব-পঞ্জাবে বন্যা

দেশ ত এখনও উড়িষ্যার বন্যার ভীষণ ধ্বংসলীলার আঘাত সামলাইতে পারে নাই। তাহার পর আসিয়াছে পঞ্জাবের বন্যার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সংবাদ।

পঞ্জাবে অনুরূপ প্লাবনের ইতিবৃত্ত মানুষের স্মরণে নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও ইহা অপেক্ষা কম। দৈনিকে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহা নীচে প্রদত্ত হইল। কিন্তু তাহাতে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের নিদারুণ দুর্দ্দশা ও ভয়াবহ বিপদের ছায়ামাত্র পাওয়া যায় :

"১৩ই অক্টোবর—পঞ্জাবে বন্যার ধ্বংসলীলা সম্পর্কে প্রথম

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণদান প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজগৎনারায়ণ অদ্য এখানে বলেন যে, ক্ষতির পরিমাণ অনুমান প্রায় ১০০ কোটি টাকা হইবে। তিনি সাংবাদিকগণকে বলেন, পঞ্জাবের বন্যার ফলে এক সহস্র লোক এবং শতকরা ৬০ হইতে ৭০টি গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

পি-টি-আই'র সংবাদে প্রকাশ, পেপস্থর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবৃষভান পাতিয়ালায় বলেন যে, পেপস্থতে বন্যায় দুই শত লোকের প্রাণহানি হইয়াছে। শ্রীবৃষভান ও শ্রীজগৎনারায়ণ তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের পর উপরোক্ত বিবরণ প্রদান করেন। শ্রীবৃষভান বলেন, তাঁহার রাজ্যে দশ সহস্র গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। পাঁচ সহস্রাধিক বর্গমাইলব্যাপী চারি সহস্র গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং প্রায় ১৭ লক্ষ একর শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

পেপস্থতে বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য শ্রীবৃষভান চারি কোটি টাকার এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, অন্ততঃ আট দিন বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ এবং গৃহহীনদের জন্য সাময়িক আশ্রয় নির্ম্মাণ ঐ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি ঋণও মঞ্জুর করা হইবে।

তিনি মন্তব্য করেন যে, এই অভূতপূর্ব্ব ও অপ্রত্যাশিত বিপদ সত্ত্বেও জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ আছে এবং তাহারা দৃঢ়তার সহিত এই অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে।

তিনি বলেন, একটি দুঃখের বিষয় এই যে, খাদ্যদ্রব্যে অতিরিক্ত মুনাফা শিকারের ঝোঁক দেখা দিয়াছে।"

পাকিস্থানী পঞ্জাবে প্রবল বন্যা

পঞ্জাবের পঞ্চ নদের মধ্যে চেনাব (চন্দ্রভাগা), রাবি (রেবা) বিয়াস (বিতস্তা) ও সতলুজের (শতদ্রু) জলপ্লাবনে দেশ বিধ্বস্ত করিয়াছে। পূর্ব্ব-পঞ্জাবের বন্যার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। পশ্চিম-পঞ্জাবে ছয়টি বড় শহর বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং সেখানে প্লাবনের ধ্বংসলীলা পূর্ব্ব-পঞ্জাব হইতে কয়েক গুণ অধিক। লাহোরের বন্যার সম্পর্কে ঐ স্থানের একটি দৈনিকের সংবাদ নীচে দেওয়া হইল :

"নয়াদিল্লী, ১৪ই অক্টোবর—লাহোরের উর্দ্দু দৈনিক 'অঞ্জাম'-এর প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে, ইরাবতীর বন্যা সম্পর্কে ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের সতর্কবাণী পাকিস্থানী সরকারী কর্ম্মচারিগণ তিন বার অবিশ্বাস করিয়াছেন।

সংবাদে বলা হইয়াছে, তৃতীয় বার সতর্কবাণী করা হইলে লাহোরের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ জনৈক ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীকে বলেন, "বন্ধু, ইরাবতীতে কি এত জল থাকিতে পারে।" ইহার উত্তরে উক্ত ভারতীয় কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন, "আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু বলিবেন না, ইহা হইতেও পারে অথবা নাও হইতে পারে।" জল প্রকৃতপক্ষে আপনাদের এলাকায় পৌঁছিয়াছে। জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত।

উক্ত সংবাদে বলা হয়, প্রথম সতর্কবাণীর পর উহার সমর্থন লাভের চেষ্টায় 'এইভাবে ১২ ঘণ্টা সময় নষ্ট করা হয়। জনসাধারণ কিভাবে জানিবে যে, বন্যা সম্পর্কে ৩৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে যে সতর্কবাণী করা হইয়াছে, সংবাদপত্র যখন তাহাদের নিকট পৌঁছিবে সেই সময়ের মধ্যে উক্ত সময় অতিক্রম করিয়া যাইবে?'

'যে সময় সংবাদপত্র জনসাধারণের নিকট পৌঁছায় তাহার পূর্ব্বেই ইরাবতীর বন্যার জল ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ১৮ ফুট উচ্চ বাঁধ অতিক্রম করিয়া লাহোর শহরে প্রবেশ করিয়াছে। ঐতিহাসিক শালিমার উদ্যানের পিছনে মাহমুদবাটী বাঁধের তিন স্থান ভাঙ্গিয়া জল যখন বাদামীবাগ, মিশরীশাহ, তাজপুরা ও রাসোনপুরায় প্রবেশ করিতেছিল তখন সন্তনগর, কৃষ্ণগড়, রামগড়, রাজগড় ও অন্যান্য সন্নিহিত উপকণ্ঠের জনসাধারণ শান্তভাবে আপিস, দোকান ও কারখানায় যাইতেছিল। ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে বন্যা আসিতে পারে এই আশঙ্কায় তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গকে সতর্ক করিয়া দিয়া প্রয়োজন হইলে অপরাহ্নের দিকে গৃহ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের জন্য সেই অপরাহ্ন আর আসে নাই।'

'অঞ্জাম'-এর সংবাদে বলা হয়, প্রথম সতর্কবাণীর পর দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব করায় 'সহস্র সহস্র চাকুরিয়া ও ব্যবসায়ী তিন দিন যাবৎ তাহাদের পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টায় তাহাদিগকে সমস্ত রাত্রি লাহোরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। প্রায় তিন লক্ষ লোককে তিন দিন তাহাদের বাড়ীর ছাদে থাকিতে হইয়াছে, কারণ তাহাদের বাড়ীতে এক মানুষ জল জমিয়াছিল।'"

তুর্কী-ইরাকী সামরিক জোটে পাকিস্থান

পাকিস্থান সম্প্রতি তুর্কী-ইরাকী সামরিক জোটে যোগদান করিয়াছে। আমরা জানিতাম যে মার্কিন দেশের সহিত সামরিক চুক্তির উহা অতি অবশ্যম্ভাবী ফল।

এ বিষয়ে রুশীয় "ইজভেস্তিয়া" পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনেক তথ্য আছে :

"পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট ২৩শে সেপ্টেম্বর তুর্কী-ইরাকী চুক্তিতে পাকিস্থানের যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণার দ্বারা তাঁহারা নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে সামরিক জোট সম্প্রসারিত করার পথে একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, ১৯৫৫ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাগদাদে তুর্ক-ইরাকী চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে ব্রিটেন এই চুক্তিতে যোগদান করে। এখন পাকিস্থানও এই চুক্তিতে যোগদান করায় জোর গুজব রটিয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শীঘ্রই এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে। "টাইমস অব করাচী" পত্রিকার খবর অনুসারে, এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বাপর অত্যধিক আগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছে। নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে সামরিক জোট সম্প্রসারিত করার ঝোঁক স্পষ্টই চোখে পড়ে। মনে রাখিতে হইবে, এই জোটের সরিকরা ও সংগঠকরা উক্ত

অঞ্চলের অপরাপর রাষ্ট্রগুলিকেও উহার মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

তুর্কী-ইরাকী চুক্তির মোড়লরা এই সামরিক জোট সম্প্রসারিত করিতেছেন কেবল প্রস্থের দিক হইতেই নহে, গভীরতার দিক হইতেও। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে খবর বাহির হইয়াছে যে, তুর্কী-ইরাকী চুক্তির ৬ নং ধারার উপর ভিত্তি করিয়া অগোণে মন্ত্রী-দপ্তর পর্যায়ে চুক্তি পত্রের স্বাক্ষরকারীদের এক স্থায়ী পরিষদ গঠন করা হইবে। এই ব্যাপারে পাকিস্থানী সংবাদপত্র "ডন"-এর খবর লক্ষ্য করিবার মত। এই সংবাদে প্রকাশ যে, করাচীর ওয়াকিবহাল মহল মধ্য প্রাচ্যে এক সম্মিলিত সামরিক সৈনাপত্য গঠনের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেয় নাই। ফলে 'ন্যাটো' ও 'সিয়াটো'র মতই এই নূতন সামরিক জোটটিও একটি কেন্দ্র গঠন করার পরিকল্পনা করিয়াছে, যে কেন্দ্র এই জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রচেষ্টার মধ্যে সংযোগ সাধন করিবে এবং উপরোক্ত সামরিক জোট দুইটির অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারা যায়, ঐ কেন্দ্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে পশ্চিমের বৃহৎ শক্তিবর্গ। এই বিষয়ে লণ্ডন টাইমস পত্রিকার সময়োচিত ভরসার ভাব সবিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। টাইমস জানাইয়াছেন, আলোচ্য সমস্যাবলী সম্পর্কে এক অভিন্ন মনোভাব গড়িয়া তুলিতে ঐ সম্মিলিত সংস্থা এক সুনিশ্চিত সহায়ক হইবে। এই সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা হইতে উত্তর অতলান্তিক জোটের লেজুড় হিসাবে তুর্কী-ইরাকী চুক্তির ভূমিকা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

পাকিস্থানের নেতারা যুক্তি দেখাইতেছেন, আরব প্রাচ্যের 'নিরাপত্তা' রক্ষার জন্যই এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়িয়াছে। এই ব্যাখ্যা আদৌ যুক্তিসহ নয়। পাকিস্থান ও আরব দেশগুলির জনমত এই ব্যাখ্যা সমর্থন করে না। করাচীর 'নাইন সিস্ত' সংবাদপত্রখানি লিখিয়াছেন, এই কথা জলের মত পরিষ্কার যে, কোন দিক হইতেই পাকিস্থানের আক্রান্ত হওয়ার কোন বিপদ দেখা দেয় নাই। এই সংবাদপত্রখানির অভিমতে, পাকিস্থান তুর্কী-ইরাকী চুক্তিতে যোগদান করিয়াছে তাহার নিজের নিরাপত্তা বা নিকট প্রাচ্যের দেশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার ভাবনায় নয়, যোগদান করিয়াছে আমেরিকাকে খুশী করার জন্য। আরব দেশগুলির জনমত তুর্কী-ইরাকী মিতালিতে পাকিস্থানের অংশগ্রহণকে অনুমোদন করে নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে সৌদী আরব গবর্ণমেণ্ট 'আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলির একেবারে মর্ম্মস্থলে এক প্রচণ্ড আঘাত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আরব জনমত পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করিতেছে তাহা তুর্কী-ইরাকী চুক্তির নির্ভুল মূল্য বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরব জনমত এই চুক্তিকে মনে করে এক সামরিক জোট, যাহার দ্বারা আরব রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইবে এবং নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া উঠিবে। এই চুক্তির সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের কোন মিল নাই। তাই প্রবল বৈদেশিক চাপ সত্ত্বেও আরব রাষ্ট্রগুলি তুর্কী-ইরাকী সামরিক মিতালিতে যোগ দেয় নাই। বাগদাদ চুক্তি কেবল সেই সব শক্তিরই স্বার্থের সহিত সুসঙ্গত যাহারা নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে ও বাড়াইতে চায় এই ভূখণ্ডের রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া, শান্তি ও নিরাপত্তার আদর্শ পণ্ড করিয়া। এই কারণেই আরব জনমত এই চুক্তির নিন্দাবাদ করিতেছে।

সুতরাং বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে পাকিস্থানের নীতির পিছনে যুক্তি মিলিবে আরও কম।

এই কথা সুবিদিত যে, আন্তর্জাতিক অবস্থার ভালোর দিকে মোড় ঘুরিয়াছে। সকল জাতি ও সকল রাষ্ট্রের সম্মুখে এখন এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য হইতেছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র হইতে অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব দূর করা, সামরিক জোটগুলি কর্ত্তৃক প্রচারিত 'শক্তির ভিত্তির' নীতির পরিবর্ত্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-যোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাব প্রতিষ্ঠিত করা এবং আলাপ-আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ উপায় মারফত আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সমাধানের নীতি অনুসরণ করা। এই সমস্যা সমাধানের পথে চতুঃশক্তির সরকারী কর্ণধারদের জেনেভা সম্মেলন এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু ইহা এখনও সফল পরিণতি লাভ করে নাই। ছোট ও বড় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে বাস্তব কার্য্যকলাপের দ্বারা 'জেনেভার মনোভাব' আরও বাড়াইয়া তোলার জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হইতে হইবে।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ষ্টীমার

"বরিশাল হিতৈষী" নিম্নস্থ সংবাদটি দিতেছেন :

"ষ্টীমারের লাইট-এর পক্ষে অপরিহার্য্য কার্ব্বনের অভাবে পূর্ব্ব বাংলার সমস্ত ষ্টীমার সার্ভিস তাহাদের রাত্রের যাতায়াত গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফলে যে খুলনা ষ্টীমার দুপুর ১টায় ছাড়িয়া পরের দিন ভোর ৫টায় পৌছিত—এখন তাহা এখান হইতে ভোর ৫টায় ছাড়িয়া সন্ধ্যায় খুলনা পৌছে। ঢাকা ও পটুয়াখালীও ঐ একই সময় বরিশাল ত্যাগ করে। এই ব্যবস্থায় যাত্রী সাধারণের যে কি চরম কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহই বুঝিবে না।

"এখন প্রশ্ন হইল, আজ হঠাৎ এই কার্ব্বনের কেন অভাব হইল? এতদিন কোথা হইতে এই কার্ব্বন সংগ্রহ করা হইত এখনই বা সংগ্রহ করা সম্ভব নয় কেন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এক বিবৃতি মারফত ইহার একটি কৈফিয়ত দিবেন কি?"

সন্ধানী আলোর আর্কলাইট কার্ব্বন বিদেশ হইতে আমদানী হয়। তার জন্য ডলার বা পাউণ্ড লাগে। সুতরাং কারণ সেখানে।

উত্তর-আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশ

ইউরোপের কয়েকটি জাতি পৃথিবীর নানা অনুন্নত দেশে সাম্রাজ্য

ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রভূত অর্থ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই কারণে ঐ সকল সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এখনও প্রভুত্ব ছাড়িয়া তাহাদের অধীনস্থ অনুন্নত জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যে শোষণ-নীতির বা শাসক ও শোষিত জাতির অধিকার-বৈষম্যের স্থান নাই।

ফ্রান্স ঐ ভাবে ইন্দোচীনে অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং উত্তর-আফ্রিকায় ঐ কারণেই দমননীতি চালাইয়াছে। জাতিসঙ্ঘে সেই বিষয়ে আলোচনা উঠিলে ফরাসী প্রতিনিধিগণ সভা ত্যাগ করিয়া যান।

ফলে উত্তর আফ্রিকায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নিম্নস্থ সংবাদে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়:

"কায়রো, ৪ঠা অক্টোবর—মরক্কো ও আলজিরিয়ায় ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে, উহা এক নেতৃত্বাধীনে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া আজ রাত্রিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। সম্মিলিত মুক্তিফৌজ 'বৈদেশিক আক্রমণকারীর প্রভুত্ব হইতে উত্তর আফ্রিকার মুক্তির জন্য গঠিত সেনাবাহিনী' নামে অভিহিত হইবে।

ফেজ (মরক্কো), ৪ঠা অক্টোবর—বিদ্রোহীদের অবিরত গুলী-গোলা বর্ষণের ফলে রিফ পার্ব্বত্য এলাকায় অবরুদ্ধ ফরাসী বৈদেশিক বাহিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য আজ আরও নূতন সৈন্য অগ্রসর হইতেছে।

স্পেনীয় মরক্কো সীমান্ত সন্নিকটে উক্ত পর্ব্বতেরই অপর এক অংশে আর একটি সাঁজোয়া বাহিনীও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

জনৈক ফরাসী সামরিক অফিসার বলেন, বিদ্রোহীরা ত্রিশখানা সাঁজোয়া গাড়ী লইয়া অগ্রসর ফরাসী বৈদেশিক বাহিনীকে যেভাবে 'অচল' করিয়া দিয়াছে, তাহাতে 'আতঙ্কিত' হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বিদ্রোহীদের এই কৌশলের ফলে এমন এক নূতন অবস্থা দেখা দিয়াছে, যাহাতে এই হাঙ্গামার রূপই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে।

বিদ্রোহী অঞ্চল প্রত্যাগত জনৈক ফরাসী সেনা বলেন, বিদ্রোহীদের ন্যায় সাহসী আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। বিদ্রোহীরা বৃটেন বা আমেরিকায় নির্ম্মিত অটোমেটিক অস্ত্র হইতে অব্যর্থ গুলী-গোলা নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে।

বিদ্রোহীরা নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের চূড়া হইতে যেমন অবিরাম গুলীগোলা নিক্ষেপ করিতেছে, ফরাসী বৈদেশিক বাহিনীও তেমনই নির্ম্মমভাবে পাল্টা আঘাত হানিতেছে। কিন্তু আখনৌল শহর হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বৌরথেদ শহরে ফরাসী বাহিনী আজ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি আরও বলেন, আওজলি ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ সৈন্যদের সাহায্যার্থ আখনৌল হইতে যাহারা অগ্রসর হইতেছিল, তাহারাও বিদ্রোহিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

রিফ পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তাজা শহরের উত্তরে সমগ্র এলাকায় হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিদ্রোহীরা চক্রাকারে যে বৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহা ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসার জন্য ফরাসী সেনারা মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতেছে। উপজাতিগণের এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় গত শনিবার। ফরাসী সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, মরক্কোর স্পেনীয় অঞ্চলে বিদ্রোহীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে এবং সেখান হইতে সীমান্ত এলাকার তিজি আওজলি বৌরথেদ সামরিক ঘাটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

স্পেনীয় এলাকা হইতে আগত অভিযাত্রী দলের সহায়তায় বিদ্রোহীরা ইমৌজের শহর আক্রমণ করিয়া সেখানকার ইউরোপীয় অধিবাসিগণকে হত্যা করে।"

সোভিয়েট ও ফরাসী উপনিবেশ

জাতিসঙ্ঘে উত্তর আফ্রিকাস্থ ফরাসী উপনিবেশ সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপনে ফরাসীদের মনে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ জাগিয়াছে। এই সম্পর্কে রুশ মুখপাত্র ক্রুশ্চেফের মত "প্রাভদা"র সংবাদদাতা নিম্নরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"প্রশ্ন: ফরাসী পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের সহিত আলাপ-আলোচনা কালে উত্তর আফ্রিকা প্রসঙ্গে আপনি যে উক্তি করিয়া-ছিলেন, কতিপয় ফরাসী সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কথা বিবেচনা করিয়া আপনি এই প্রশ্নটির বিষয়ে খোলসা করিয়া কিছু বলিবেন কি?

উত্তর: উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনা কালে আমার চোখের সামনে সর্ব্বাগ্রে ছিল এই সত্য যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন না এবং ফরাসী ইউনিয়নের জাতিগুলির ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও জাতীয় স্বার্থের কথা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া তবেই উপরোক্ত সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে।

সোভিয়েট জনগণের মনোভাবের কথা—জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জন্য জাতিসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সোভিয়েট জনগণের নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতির কথা বহুকাল যাবৎই সুবিদিত। আমার অভিমতে এই বিষয়টি বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সৌর রশ্মির ব্যবহার

সূর্য্যতাপ মানুষের ব্যবহারে পরোক্ষভাবেই আসে। রন্ধনাদিতে তাহার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের চেষ্টা এদেশে দীর্ঘকাল চলিতেছে। বিদেশে কিছুদিন যাবৎ সে চেষ্টা খুব বিস্তৃতভাবে করা হইতেছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কৃষি প্রদর্শনীতে দুইটি সোলার ওয়াটার হিটারের জল গরম করার (সৌর-রশ্মি-চালিত উত্তাপ-যন্ত্রের) কার্য্যকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

একটি হইতেছে চলমান ব্যবস্থাযুক্ত। ইহার সাহায্যে চব্বিশ ঘণ্টায় (যখন বাতাসের উত্তাপ ২৫ হইতে ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে) ৮০০ হইতে ১২০০ মিটার পরিমিত জল ৬০ হইতে ৭০

ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত গরম করা যায়। অপরটি হইতেছে স্থির ব্যবস্থাযুক্ত। ইহার দ্বারা (বাতাসের উত্তাপ যখন ১০ ডিগ্রী) ১৮০০ লিটার পরিমিত জল ৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত গরম করা যায়।

কৃষি প্রদর্শনীতে হীটার দুইটির ডিজাইনও দেখান হইয়াছে। ইহারা এইভাবে নির্ম্মিত: পশ্চাতে টিনের পাত সহ একটি ঝকঝকে ফ্রেম। পুরাপুরি কালো পেণ্ট-করা টিনের উপরে বসানো থাকে জল-ভরা ধাতুর টিউব। রৌদ্র দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া জল টিউবের মধ্য দিয়া উঠিয়া একটা বড় ট্যাঙ্কে গিয়া পড়ে এবং ট্যাঙ্কের তলদেশের ঠাণ্ডা জল টিউবে উঠিয়া যায়। সবটাই এক স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন জলধারা দৈনিক ৬০-৭০ জন লোকের প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

শূন্যপথে মানুষের অভিযান

গল্পে পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোক, মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদিতে ভ্রমণের কাহিনী বহুদিন হইতেই চলিত আছে। কিন্তু এতদিনে মানুষ বায়ুমণ্ডলের উপরে ও বাহিরের জগতের সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে অনুসন্ধানের উদ্যোগ করিতেছে। মার্কিনবার্ত্তা সেই বিষয়ে যে খবর দিয়াছেন তাহা নীচে দেওয়া হইল। রকেট বলিতে হাওয়াই বুঝায় কিন্তু এই রকেট অতি বৃহৎ অগ্নি-চালিত যন্ত্র।

"ওয়াশিংটন, ৬ই অক্টোবর—মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করা হইবে, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য সুরু হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বৎসরে (১৯৫৭ সনের জুলাই হইতে ১৯৫৮ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অবদান হইবে মহাশূন্যে উপগ্রহ নির্ম্মাণ।

মহাশূন্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কর্ত্তৃক গত ২৯শে জুলাই এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণার পর হইতে এসম্পর্কে এই সর্ব্বপ্রথম সরকারীভাবে সংবাদ প্রচার করা হইল।

প্রতিরক্ষা দপ্তর বলেন যে, মেরীল্যাণ্ডের অন্তর্গত বাল্‌টিমোরের গ্লেন এল মার্টিন বিমান কোম্পানীর সহিত এই পরিকল্পনার প্রধান অংশ কার্য্যকরী করিবার জন্য চুক্তি করা হইয়াছে।

ভাইকিং রকেটের নির্ম্মাণকারী মার্টিন বাস্কেট বলের অনুরূপ উপগ্রহটি মহাশূন্যে প্রেরণের জন্য রকেট নির্ম্মাণ করিবেন। এই উপগ্রহ মনুষ্যচালিত হইবে না। ভাইকিং রকেট উর্দ্ধাকাশে ১৫৮ মাইল পর্য্যন্ত উঠিয়া বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল।

জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী রকেটের মোটরটি সরবরাহ করিবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহ নির্ম্মাণ করিবে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের ঘোষণায় বলা হইয়াছে, উপগ্রহ উর্দ্ধাকাশে প্রেরণের জন্য শীঘ্রই একটি স্থান নির্ব্বাচন করা হইবে।

রকেটটি তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত থাকিবে। প্রথম পর্য্যায়ে যে যন্ত্রপাতি থাকিবে তাহার সাহায্যে রকেটটি শূন্যে উত্থিত হইবে। অতঃপর মূল রকেটটি বিভক্ত হইবে এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উহা পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আরও শূন্যে যাত্রা করিবে। তৃতীয় পর্য্যায়ে রকেটটির গতি বর্দ্ধিত হইয়া ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইলেরও অধিক হইবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করার জন্যই এই প্রচণ্ড গতির প্রয়োজন হইবে।

মহাশূন্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে উপগ্রহের পরিক্রমণ পথ বৃত্তাকার না হইয়া ডিম্বাকৃতি হইবে। পৃথিবী পরিক্রমণকালে উপগ্রহ হইতে পৃথিবীর নিকটতম দূরত্ব হইবে ২০০ মাইল এবং কয়েকদিন যাবৎ প্রতি এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর একবার করিয়া উহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিবে।

প্রতিরক্ষা দপ্তর বলেন, উপগ্রহটির সঠিক আকৃতি ও আয়তন এখনও পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই।"

তিরিশে আশ্বিন

স্বদেশী আন্দোলন যে দুইটি দিনে বিশেষভাবে আরম্ভ হয় তাহার মধ্যে ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন (১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর) অন্যতর। এই দিন হইতে পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী জাতি আজিও ইহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এবং নব আশা উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়। লর্ড কার্জ্জনের হুমকিতে এই তারিখে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হইল এবং বাঙালী জাতির ঐক্য, সংহতি, সাহিত্য, সংস্কৃতির মূলেও কুঠারাঘাত পড়িল। কিন্তু বাঙালী জাতি তাহাতে দমিয়া না গিয়া স্বাদেশিকতা মন্ত্র নূতন করিয়া গ্রহণ করে ও এই কুব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ঐ দিন সকালে বিখ্যাত রাখীবন্ধন উৎসব প্রতিপালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল', কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর রাখী-সঙ্গীত প্রভৃতি এই দিনটিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দিন বৈকালে দুইটি সভার অধিবেশন হয়। আপার সারকুলার রোডে ফেডারেশন হলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ব্যারিষ্টার ও চিন্তাবীর আনন্দমোহন বসু মহাশয়। ভাঙা বাংলার মিলন-কেন্দ্র এবং কর্ম্ম-কেন্দ্রস্বরূপ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কল্পনা। সন্ধ্যায় পশুপতি বসুর বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণের বিরাট সভায় প্রায় সত্তর হাজার টাকা তুলিয়া 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ফণ্ড' গঠন করা হইল। উদ্দেশ্য—দেশীয় চরখা-তাঁত ও অন্যান্য শিল্পের উন্নয়ন। ঐ দিনে অরন্ধন প্রতিপালিত হয়। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে একটি সভায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পঠিত হইল। বঙ্গনারী এই দিন হইতে উক্ত ব্রত পালনে অগ্রসর হইলেন। এই ব্রতের মূল কথা—'ভেদ নাই ভেদ নাই, ভাই ভাই এক ঠাঁই'। তবেই বাংলার লক্ষ্মী বঙ্গভূমিতে অটলা অচলা থাকিবেন। তিরিশে

আশ্বিন বাংলার নরনারী যে স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল তাহা অনুসরণে জাতি প্রচুর শক্তি লাভ করে। কয়েক বৎসর পরে শুধু বঙ্গভঙ্গই রদ হয় নাই, শিক্ষায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় আমরা অভিনব শক্তির অধিকারী হই। আজ সেই অবিস্মরণীয় তিথিতে আশ্বিনকে শ্রদ্ধাভরে নতি জানাই।

প্রমথনাথ বসু জন্ম-শতবার্ষিকী

গোরুমহিষানী (টাটা) লৌহখনির আবিষ্কর্তা বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর জন্ম-শতবার্ষিকী গত ১৪ই অক্টোবর জামসেদপুর টাটানগরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিহারের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ। উৎসব-সভার উদ্বোধন করেন ভারতরাষ্ট্রের শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী টি.টি. কৃষ্ণমাচারি। উভয়েই প্রমথনাথের বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা করেন, এবং ভারতীয় খনিজের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে তাঁহার কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। কলিকাতায়ও জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে একাধিক সভার অনুষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে হইয়াছিল। এই বৎসরে যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজীর (পূর্ব্বেকার বেঙ্গল টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট) কর্তৃপক্ষ প্রমথনাথের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি কলেজ হলে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন। জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমথনাথের বহুমুখী প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া একখানি প্রামাণ্য ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

প্রমথনাথ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে চব্বিশপরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা—গৈপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পাইয়া তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে পাঁচ বৎসরকাল একাদিক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন এবং ভূতত্ত্ব বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হন; বাগ্মীবর লালমোহন ঘোষের সহকারী রূপে রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দেন। তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ভূতত্ত্ববিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় হইতে দীর্ঘ তেইশ বৎসর তিনি ভূতত্ত্ববিভাগে কার্য্য করেন। ভারতীয় খনিজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাঁহাকে ভারতবর্ষের শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্য ও পার্ব্বত্য অঞ্চলেও গমন করিতে হয়। ১৯০৩ সনে তাঁহার জুনিয়র সহকর্মীকে উচ্চপদ দান করায় প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর ময়ূরভঞ্জের 'ষ্টেট জিওলজিষ্ট' হন। এই সময়েই তিনি সুবিখ্যাত টাটা লৌহখনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানা যে আজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে প্রমথনাথ বসুর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার। প্রমথনাথ স্বাধীনভাবেও খনিজ অনুসন্ধানাদি কার্য্যে পরে রত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ সন হইতে ১৯৩৪ সনে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শেষজীবন তিনি রাঁচিতে কাটান।

প্রমথনাথ শুধু বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ্ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মনীষী ও চিন্তা-নেতা। ভারতবর্ষের স্থায়ী মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইতে পারে ইহাই ছিল তাঁহার সারাজীবনের ভাবনা। গত শতকের শেষ পাদেই তিনি এদেশে কারিগরি শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের গবেষণাকল্পে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের জন্য সরকার এবং দেশবাসীকে সচেতন করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মধ্যে প্রমথনাথ তাঁহার বহুবর্ষ-পোষিত ভাবনাকে স্পষ্ট রূপ দিতে খানিকটা সমর্থ হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ক্রমে তাঁহার এই ভাবনাকে রূপায়ণে তৎপর হইলেন। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কয়েক বৎসর প্রমথনাথ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 'রেক্টর' পদেও বৃত হইয়াছিলেন। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল এক সঙ্গে যে মিলিত হইতে পারিয়াছিল তাহারও মূলে প্রমথনাথের মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাই।

স্বদেশের শিল্পোন্নতির জন্যও প্রমথনাথ অবিরত চিন্তা করিতেন। এ হেতু তিনি নিজে যথেষ্ট ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকারও করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতায় প্রথম একটি ভারতীয় শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে স্বদেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। তাঁহার সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন দীর্ঘকাল স্বদেশের কৃষি ও শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দান, প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান, শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠাতাদের পরামর্শ দান, মূলধন সংগ্রহে আনুকূল্য প্রভৃতি কার্য্যে রত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে কলিকাতায় নিখিল-ভারত শিল্প সম্মেলন হয়। তিনি তাঁহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে বাঙালীরাও যে একেবারে ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ নহেন যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তাহা শিল্প-নেতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। টাটা লৌহ কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় প্রমথনাথের ত্যাগস্বীকার সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী জীবনে শিল্পাদির উন্নয়নে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁহার মত অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছিল। রাঁচি অবস্থানকালে আদিবাসীদের সেবায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তিতেই যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সম্প্রদায়ের মিলন সম্ভব, অন্যথায় নহে, এই বিষয়টি তিনি নানা ভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। গ্রন্থকার হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

টাটা কোম্পানী প্রমথনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। প্রস্তাব হইয়াছে, চাইবাসা কলেজে পি. এন্, বসুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ইহা ব্যয়িত হইবে। জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত উক্ত উৎসব-সভায় শ্রীযুক্তা সুষমা সেন, এম-পি, জামসেদপুরেই প্রমথনাথের নামে একটি বিজ্ঞান-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহাতে সাগ্রহে সম্মতি প্রদান করেন। প্রমথনাথ বসুর স্থায়ী

স্মৃতিরক্ষা জাতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। যেখানেই হউক, তাঁহার নামে একটি বিজ্ঞান-গবেষণাকেন্দ্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা সকলেরই সমর্থন লাভ করিবে।

এই উৎসবে ভারতরাষ্ট্রের সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু প্রমথনাথ বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়

যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী পুনরায় উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এবারে কলিকাতায়ই চার-পাঁচটি জায়গায় সভার আয়োজন হইয়াছিল। মহাপুরুষদের গুণকীর্তন যতই হয় ততই ভাল। তবে কলিকাতায় একটি প্রশস্ততর স্থলে কি জনসভার আয়োজন করা চলে না? যেমন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে সভার আয়োজন হইতেছে সেইরূপ কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে একটি বড় রকমের সভার আয়োজন হওয়াও উচিত। আরও একটি কথা, এক দিনে প্রায় একই সময়ে এই সকল সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। তাহাতে বহু সুধীজনের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হইতে সাধারণে বঞ্চিত হন। আলাদা সভা ভিন্ন ভিন্ন দিনে করা সম্ভব কি না এই সকল সভার অনুষ্ঠাতারা তাহাও বিবেচনা করিবেন।

রাজা রামমোহন রায় যুগপ্রবর্তক বলিয়া সর্বত্র পরিকীর্তিত হইতেছেন। কিন্তু কি কি কারণে তিনি এই সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা আমরা সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখি না। তাঁহার জ্ঞানলাভে অদম্য উৎসাহ, কর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, স্বদেশের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে অবিরাম প্রয়াস—সর্বোপরি স্বদেশীয় ধর্ম ঐতিহ্য সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতীচ্যের নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণে আগ্রহ তাঁহাকে দেশী-বিদেশীর প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিতে শক্তি দান করিয়াছে। মাৎস্যন্যায়াধীন ভারতবর্ষকেও তিনি সংযম শৃঙ্খলার পথে অনেক দূর আগাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামমোহন-প্রসঙ্গে আর একটি কথা আজিকার দিনে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। নব্যশিক্ষিত বাঙালী সেযুগে 'ঘরকুনো' অপবাদ খণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিজ গুণে—ত্যাগে সেবায় নিষ্ঠায় বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। বাঙালী কখনও দূরকে নিকট করিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। আজ যে ইহার ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে তাহা শিক্ষিত বাঙালী জাতির আদর্শ বহির্ভূত। রামমোহন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিদেশে গমনাস্তর বাঙালী যে তেজীয়ান নির্ভীক তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিদিবস উদ্‌যাপনে আমরা যেন আত্মস্থ হই।

বিদ্যাসাগর-স্মরণে

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব বাঙালী জাতির পক্ষে একটি বিস্ময়কর ঘটনা—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে গিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের কীর্তিগাথা কত বই পুঁথিতে, প্রবন্ধে, নাটকে বর্ণিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গত দুই মাসের মধ্যে তাঁহার জন্ম-মৃত্যুতিথি উপলক্ষে কলিকাতায় ও মফস্বলে তাঁহার গুণাবলী কীর্তিত হইয়াছে, কলিকাতায় একটি বিদ্যাসাগর-প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় জাতির প্রাণকেন্দ্রে যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন এসমুদয় তাহারই বহিঃপ্রকাশ।

দীন দুঃখী, বিশেষতঃ নারী-জাতির উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুমুখী প্রয়াস বর্তমান যুগেও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার 'দয়ার সাগর' উপাধিটিও একান্তই সার্থক। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ—নানা দিকে সংস্কার ও উন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে তাঁহার ঐকান্তিক প্রয়াস শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই কমবেশী অবগত আছেন। তিনি যে অবলা, অসহায়া বিধবাদের জন্য হিন্দু ফেমিলি এনুয়িটি ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহা হয়ত অনেকে জানেন না। গত তিরাশী বৎসর যাবৎ এই ফাণ্ড দ্বারা কত নারী যে জীবনে মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন তাহার সীমাসংখ্যা হয় না। এখানে অনুষ্ঠিত গত স্মৃতিসভায় ইহার উদ্বোধন কালে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল ফাণ্ডের দীর্ঘকালব্যাপী সমাজসেবার একটি স্মারকগ্রন্থ রচনার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুকৃতি এই ফাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ-জীবনে ছড়াইয়া পড়িতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার সম্যক পরিচয় এরূপ গ্রন্থে আমরা পাইতে পারি। বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে এ প্রস্তাবটি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে যে-কিছু আলোচনা হয় তাহাই আমাদের সমর্থন লাভ করিবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় ষান্মাসিক সূচী (বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৬২) দেওয়া গেল না। আগামী সংখ্যায় এই ষান্মাসিক সূচী সন্নিবেশিত করা হইবে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ৫ই কার্ত্তিক (২৩শে অক্টোবর) হইতে ১৯শে কার্ত্তিক (৬ই নবেম্বর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুলিবার পর হইবে।

এই সূত্রে জানানো যাইতেছে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, প্রবাসী অপ্রাপ্তি—এতদ্‌বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

ভবিষ্যতের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

দ্বিতীয় পর্ব

আমরা প্রথম পর্বে[১] এই কথা আলোচনা করেছি যে, রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে বেঁচে থাকবে তাঁর গান, তাঁর আঁকা ছবি এবং তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্র। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটবে আঙ্গিক এবং কলাকৌশলের পরিবর্তনে। মানুষের রুচির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে রূপ-রেখারও রূপান্তর হবে। এ যুগের কীর্তিমান, খ্যাতিমান কলাকারের দল আগামী যুগের রসের আসরে আর সমাদর পাবেন না। এ হ'ল মানুষের খেয়ালী রুচির কারবার। মানুষ এমনি করেই যুগে যুগে নূতনকে সংবর্ধনা জানিয়েছে; পুরাতনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে নূতনকে পাবার জন্য। পুরাতন হয় ত আছে, বেঁচেও থাকে, তবু মানুষের জীবনের সঙ্গে তাদের স্বর্ণময় যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়। তারা বেঁচে থাকে, যেমন বেঁচে আছে ফ্যারাওদের মমি। এমনই করে হয় ত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টি বেঁচে থাকবে ভবিষ্যতেও। তবে রবীন্দ্রনাথের গান, তাঁর তুলিতে আঁকা ছবি আর কালিকলমে আঁকা কয়েকটি চরিত্র নিত্যকাল বেঁচে থাকবে, রসের প্রাণবন্যায় সজীব এবং সবুজ করে রাখবে আগামী যুগের মানুষের মনকে। তাদের নিত্য গতায়াত থাকবে যেখানে রসিকদের দরবার বসে। তাদের নিত্য যোগ থাকবে মানুষের প্রাণের আনন্দলোকের গভীরতম সুরটির সঙ্গে। আমরা গানের কথা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে ছবি আর কয়েকটি চরিত্রের কথা বলব।

ছবির কথা বলি। ছবি হ'ল অপ্রবুদ্ধ কবিমনের অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। কবি নিজেই তাঁর এই সৃষ্টির রহস্যটিকে ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারেন নি। এ তাঁর বোধাতীত ছিল। এমন কোন অর্থে, এমন কোন ব্যঞ্জনায় এই সৃষ্টিটুকু তাঁর কাছে অর্থময় হয়ে ওঠে নি যার ফলে তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে একে গ্রহণ করতে পারতেন। সার্থক সৃষ্টির জগতে তাঁর ছবির স্থান কোথায় এ সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি বললেন[২]:

"তাই গান সম্বন্ধে আমার অহংকারের বিষয় আছে, ছবিটা কিন্তু আমার অহংকারের ডিগ্রিতে পৌঁছয় নি। কারণ তাতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার কাছে এমন একটা কিছু প্রকাশ করেছে যা বিশ্বাসের সীমান্তে আসে নি। বুঝতে পারি নে।" অনেক সংকোচ, অনেক দ্বিধা, অনেক অপ্রত্যয়ের বেড়া ডিঙিয়ে যখন চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ রসিকজনের দরবারে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ মূঢ় বিস্ময়ে কবির এই বৃদ্ধ বয়সের আঁকা আঁকা খেলার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের না বোঝার ঔদ্ধত্য কলরবে ফেটে পড়ল, তবে কলারসিকেরা আগামী যুগের শিল্পের দিগ্‌দর্শন করলেন রবীন্দ্রনাথের অবচেতন মনের এই অপরূপ প্রকাশে। কবি যেখানে রং ব্যবহার করলেন সেখানে রেম্‌ব্রান্টের অঙ্কন-কৌশল প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। কোথাও-বা ভ্যান্ গঁগের কথা মনে পড়ল। গাঢ় রঙের পটভূমিকায় হাল্‌কা রঙের অনবদ্য রূপসৃষ্টি। রেখাচিত্রগুলো দেখে মনে হ'ল ড্রয়িং বা রেখাঙ্কনে কবি বুঝি অপটু। এতদিনকার বাস্তবানুগ চিত্রশৈলীর, অঙ্কন-রীতির অনুবর্তন-সুলভ দৃঢ়তা বা সামঞ্জস্য খোলা চোখে ধরা পড়ল না রবীন্দ্রনাথের ড্রয়িঙে। দু'এক জন সমালোচক অনুযোগ করলেন যে, কবির রেখাঙ্কন দুর্বল। তাঁরা বুঝলেন না—ড্রয়িঙের রীতি ত কবির হাতে পড়ে পরিবর্তিত হবেই। কেননা রবীন্দ্রনাথ প্লেটো এরিষ্টটলের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে নূতন ঐতিহ্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। টলস্টয় রাস্‌কিনের তত্ত্বকথা এ যুগের শিল্প-সমালোচনায় অচল। বস্তুটিকে যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনই করে দেখানোর মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। কবি দেখলেন বস্তুর অন্তর্নিহিত ছন্দ-রূপটিকে। যে ছন্দে প্রাণ বস্তুর সীমায় ছন্দিত সেই ছন্দটুকু ছবিতে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল শিল্পীর কাজ। শিল্পীরা এই ছন্দকে দেখেন তাঁদের স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে, নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই তাঁদের দেখার মধ্যে এবং তাকে প্রকাশ করার রীতিতে এত বৈচিত্র্য।

এবষ্ট্রাক্টধর্মী বা সুর-রিয়ালিষ্ট অন্যান্য শিল্পীদের থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র। কবির অবচেতন মনে বস্তুর প্রাণছন্দ ছবি আঁকে, সে ছবি আর পাঁচ জনার ছবি থেকে পৃথক্। মগ্নচৈতন্যে যে রূপ বাস করে, যার প্রকাশ দেখি ক্যানভাসে, তার রেখা-ভঙ্গিমা ত একটু শিথিল হবেই। প্রাক্-চৈতন্যের জড়ত্বের মধ্যে যারা লালিত তাদের অস্তিত্বকে ঘিরে আছে স্বপ্ন। স্বপ্নের জগতের বস্তুগুলো আবছা রেখায় সীমায়িত। তাদের অতিনির্দিষ্ট রূপ দেখা চলে না বাঁধা রেখার সুস্পষ্টতায়। তাই রেখার গতানুগতিক দার্ঢ্য রবীন্দ্রনাথের

১। 'ভবিষ্যতের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পর্ব' প্রবাসী আশ্বিন ১৩৬২ দ্রষ্টব্য

২। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১২৭

ছবিতে না দেখলে তাকে কবির অপটুতার নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ না করাই ভালো। রবীন্দ্রনাথ শিল্পে বস্তুবাদী ছিলেন না। শিল্পকৃতি হ'ল বাস্তব-অবাস্তব বিবেচনার আওতার বাইরে। অগ্র-পশ্চাৎ, পূর্বাপর, কারণ-ফল এই সব লজিকের কাঠামোয় শিল্পকে ঠিকমত ধরা যায় না। যে কথাটা লজিকে সত্য হয়, শিল্পে তা সত্য নাও হতে পারে। তাই মহাদার্শনিক ক্রোচে বললেন, শিল্পে বাস্তব-অবাস্তবের ধারণাটুকু অবান্তর। শিল্পকর্ম দৃশ্যমান বস্তু-জগৎকে অনুকরণ করল কি না সে কথাটা বাহ্য। তাই রবীন্দ্রনাথও কাব্যসত্যকে 'রূপের ট্রুথ' বলেছেন। এ সত্যের প্রতিষ্ঠা বাস্তবধর্মিতায় নয়। এ সত্য সত্য হ'ল আপনার অন্তর্নিহিত রূপমাধুর্যের প্রকাশে। যাকে ছন্দ বলছি, সেই ছন্দের সম্যক্ প্রকাশটুকুই হ'ল শিল্প। সমস্ত পশ্চিম দেশ জুড়ে সেদিন ক্যানভাসে এই ছন্দটুকুকে ধরে দেবার সাধনা চলছিল। কেমন করে জানি না রবীন্দ্রনাথও আপন অজ্ঞাতসারে সেই তপস্যাই করছিলেন—কেমন করে প্রাণপ্রেতিকে ধরে দেওয়া যায় রেখায় ও রঙে। বস্তুর স্থূল রূপের সুষমাটুকুকে বাদ দিয়ে সেখানে প্রাণের সুষমাটুকুকে প্রকাশ করতে হবে। এই প্রয়াস করলেন কবি।

প্রাণছন্দ নিত্যসঞ্চারী। তার বিরাম নেই আপনাকে প্রকাশ করার কাজে। সংসারের গতিশীল বস্তুতে খোলা চোখে আমরা প্রাণের স্পন্দন দেখি—চলমান প্রাণশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করি। আর যে প্রাণশক্তি বস্তুর বন্ধনে বন্দী হয়ে স্থির হয়ে আছে, সে আমাদের চোখে অপ্রত্যক্ষ থেকে যায়। কবির দৃষ্টি বস্তুর বহিরাবরণকে অতিক্রম করে তার মর্মমূলে পৌঁছয়। তাই ত আপাত-স্তব্ধ শিলীভূত বস্তু-প্রাকারের অন্তরালে শিল্পী দেখেন প্রাণের নিত্যলীলা। রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে স্থাবরে এবং জঙ্গমে প্রত্যক্ষ করেন। স্থাবরের শাসন-নাশনে প্রাণের ধারা অন্তঃসলিলা হয়। কবির চোখে তবুও সে ধারার চলমানতা ধরা পড়ে। তিনি বলেন :

'হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে,
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি—
এই গিরিরাজি
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।'১

স্তব্ধ জীবনের নিস্তব্ধ জগতের মর্মস্থলে যে প্রাণস্রোত নিত্যপ্রবাহিত, নিত্যস্পন্দমান, তাকে কবি ধরে দিলেন তাঁর ছবিতে। এ ছবির ভাষা সাধারণের বোধগম্য নয়—যেমন নিস্তব্ধ জগতের ভাষা সকলের কানে শব্দময় হয়ে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে না নূতনতর মহিমায়। এই প্রাণছন্দ স্থাবরে এবং জঙ্গমে, প্রয়াসে এবং অপ্রয়াসে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। তার দুটি রূপ—প্রত্যক্ষ গতিশীল (dynamic) এবং অপ্রত্যক্ষ গতিশীল (static)।২ গতিশীলতা, তা প্রত্যক্ষই হোক আর অপ্রত্যক্ষই হোক, বস্তুপ্রকৃতির শেষ কথা। কোন কিছু স্তব্ধ হয়ে নেই। সবাই ছুটে চলেছে—প্রাণ সর্বত্রই স্পন্দিত। তৃণাঙ্কুরে যে প্রাণ স্পন্দিত সেই প্রাণই গিরিরাজিকে প্রাণময় করে তুলেছে। এ গতিবেগ প্রত্যক্ষ করা শুধু শিল্পীর অলস কল্পনা নয়। এ হ'ল বিজ্ঞানেরও শেষ কথা। নিউটনের ধারণা ছিল বস্তুমাত্রই স্থিতিপ্রবণ। মহামনীষী আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন যে, বস্তুমাত্রই গতিপ্রবণ, গতিশীল। বিশ্বের বস্তুপুঞ্জ ছুটে চলেছে অনন্তের দিকে ; চলার অধীর আবেগে তারা কম্পমান। তাই সারা বিশ্বের আয়তন বেড়ে চলেছে। আপাতস্থির বস্তুপুঞ্জ বিজ্ঞানীর চোখেও চলার আবেগে বেগবান। রেখার বন্ধনে, আপনার গুরুভারে সে আর স্থাণু হয়ে বসে নেই।

খোলা চোখে আমরা গতির এই সার্বিকতাকে দেখি না। যেগুলো স্থূল ভাবে প্রত্যক্ষ সেগুলোই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। প্রত্যক্ষ গতিশীল যে ছন্দ, যে ছন্দ ধাবমান তুরঙ্গের ধাবমানতায় বিদ্যমান তাকে দেখা সহজ। সে ছন্দের আবেদন সব মানুষের কাছে। আর যে ছন্দ গোপনচারী, যে ছন্দের উন্মাদনা অঙ্কুরের পাখায় পাখায়, যে ছন্দে গিরি-রাজও ধাবমান, সে ছন্দটুকু দেখেন জাত-শিল্পীরা। যে ত্রস্তা হরিণী হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে তার নিশ্চলতায় যে সুঠাম ছন্দের প্রকাশ তা হ'ল অপ্রত্যক্ষ। তমাল, তালের নিত্য কাল ধরে আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে থাকার মধ্যে যে চঞ্চলতা তা হ'ল অপ্রত্যক্ষ। এই অপ্রত্যক্ষ, দুর্নিরীক্ষ্য ছন্দটুকুকে শিল্পে ধরে দেবার সাধনাই হ'ল শিল্পীর সাধনা। রবীন্দ্রনাথ এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। তাঁর সৃষ্ট ছবিগুলো অপূর্ব্ব অদ্ভুত। সাধারণ মানুষের বুদ্ধির আয়ত্তে

১। 'বলাকা', বলাকা কাব্যগ্রন্থ
২। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের 'রবীন্দ্রচিত্রকলা'

এল না তারা। এমনিধারা ছবি আগে তারা দেখে নি। কাজে কাজেই অনভ্যস্ত ইন্দ্রিয় এদের রস গ্রহণ করতে পারল না। তাদের দোষ দিই না। রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা, তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা, সুন্দরের বোধ এবং তাঁর চিত্র-রীতির স্বয়ম্প্রকাশ ইতিহাস তাঁর ছবিকে যথাযথ ভাবে বোঝবার পথে প্রধান অন্তরায়। তিনি যে রীতিতে প্রাণ-ছন্দকে রূপায়িত করলেন তার পূর্ব-ইতিহাস নেই। এবস্‌ট্রাক্টধর্মী শিল্পীগোষ্ঠীর আঙ্গিক ও শিল্পরীতির সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। তাই যাঁরা আধুনিক চিত্রকলার রীতি-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরাও কবির শিল্পকে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এই নূতন পথে এতখানি সাফল্য অবশ্য আর কেউ লাভ করেন নি এ যুগে। তিনি এই নব্যরীতির পথিকৃৎ। রবীন্দ্রোত্তর শিল্পরীতিতে এই বহু আয়াসলভ্য ছন্দটুকুকে প্রকাশ করার সাধনা চলছে। নব্যরীতির অদ্ভুত অদ্ভুত রূপরেখার এবং রঙের সমন্বয়ে সৃষ্টি হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। মানুষের শিল্পীমন কেমন করে জানি না সুসঙ্গতের মধ্যে অসঙ্গতকে দেখে। সুসমঞ্জস বস্তুর রূপের মধ্যে সঙ্গতি-বিহীন অদ্ভুতকে প্রতিষ্ঠা করার তার দুর্নিবার আগ্রহ। সে আগ্রহ এ যুগে যেমন শিল্পের রূপান্তর ঘটিয়েছে, প্রাচীনকালে ঠিক তেমনটি পারে নি। তবে সে যুগেও এই অদ্ভুতকে সৃষ্টি করবার একটা চেষ্টা চলেছিল, যার ফলে মানুষের শিল্পলোকে প্রবেশ করল দ্রাবিড়ী শিল্পীর ষড়ভুজ, যালী, চীনা শিল্পীর ড্রাগন, মিশরের সেকৃমেন্টের মূর্তি।[১] মানুষের অবচেতন মনে বস্তুর প্রাণছন্দের একটা ছবি ধরা পড়ে। শিল্পী তার মনের সেই অবস্তু বোধকে নির্দিষ্ট করে তোলেন তার শিল্পকর্মে। সেই শিল্প হয়ত বাইরের বস্তুর সঙ্গে মেলে না—সে হ'ল শিল্পীর মানস-প্রতিমা। বস্তুর বন্ধনের পীড়নে যে প্রাণছন্দ আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে পারে নি, সেই ছন্দ অনন্য মূর্তিতে রূপায়িত হয়ে ওঠে শিল্পীর হাতে। তার মুক্ত কল্পনা বস্তুর ভাবমূর্তিটিকে যথাযথ রূপায়িত করে। আমরা সে রসময় রূপটিকে ঠিক চিনতে পারি না। অনভ্যস্ত চোখে সে রূপের আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। শিল্পীর দেখা এই রূপে বহু বৈচিত্র্য। এই বহুবিচিত্র রূপের সত্যতা হ'ল 'রূপের ট্রুথ'। প্রাচীনকালে এই ছন্দপ্রকাশ-সাধন-ধর্মী শিল্পার সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। আজকে এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে নূতন নূতন রূপকল্পনা নিয়ে। এই আধুনিক প্রকাশরীতি সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত শিল্পবেত্তার কথা উদ্ধৃত করে দিই। লিন্-উ-টাং তাঁর *My Country and My People* শীর্ষক গ্রন্থে এই নব পদ্ধতির ব্যাখ্যা করে বললেন :

"Modern art is in search of rhythms and experimenting on new forms of structure and pattern. It has not found them yet."

রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দটুকুকে পেলেন এবং তাকে রেখায় ও রঙে রূপায়িত করলেন। সাধারণ মানুষের চোখে সে সৃষ্টির অর্থ ধরা পড়ল না। দু'চার জন বোদ্ধা সমালোচক—যাঁরা এই ছবির ভাষা বুঝলেন, তাঁরা দ্বিধা এবং সঙ্কোচবশতঃ এই নূতন রীতিকে স্বীকৃতির ছাপ দিলেন না। কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে একদিন যে তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘটেছিল আবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনে। তাঁর নিজের দেশের মানুষ যখন নির্বাক হয়ে বসে রইল তখন পশ্চিম দেশের খ্যাতনামা সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে অভি-নন্দন জানালেন। তাঁর ছবি-লেখার নিগূঢ় রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হ'ল এই সব বিদেশী শিল্পবিদের চোখে। পল ভেলেরি, আঁদ্রে জিদ্, হেনরী বিদ্ব প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান সমালোচকেরা অবাক বিস্ময়ে কবিকে অভিনন্দিত করলেন তাঁর অপূর্ব শিল্পকর্মের জন্য।

এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর কথা উদ্ধৃত করছি : "প্যারিসে যখন তাঁর প্রথম একজিবিশান্ হ'ল, তাঁর মুখেই শুনলুম পল ভেলেরি এবং আঁদ্রে জিদ্ ছবি দেখে বলেছিলেন, 'ডাঃ টাগোর, আমরা এখন সবেমাত্র যা ভাবতে সুরু করেছি, আমাদের দেশের সেই সব বিচিত্র আর্ট আন্দোলনের তলায় তলায় যে নূতনকে পাবার চেষ্টা লুকানো রয়েছে, আপনি কি করে এত সহজে সেই জিনিসকে চোখের সামনে এনে ধরলেন? আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি যে কত বড়, তা হয় ত এখন সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না—সংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে মানুষের চিন্তাশক্তি যতই বিকশিত হবে, এই চিত্রগুলির কথা ততই তারা বুঝতে পারবে।"

রবীন্দ্রনাথের চিত্র-সৃষ্টির ইতিহাস বড় বিচিত্র। লেখা-কাটাকুটির মধ্য থেকে জন্ম নিল এযুগের অন্যতম সার্থক শিল্প-সৃষ্টি। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-শিক্ষাটুকু সম্পূর্ণ হয়েছিল—স্বরের ছন্দ, সুরের ছন্দ, চিন্তার ছন্দ তাঁর আয়ত্তে এসেছিল অল্প আয়াসেই। জীবনের তুচ্ছতম ঘটনা, নগণ্য অনুষ্ঠানও যখন ছন্দ-আশ্রয়ী হয় তখন তারা সুন্দর হয়ে ওঠে, এ সত্য রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন এই জন্যে। তাই রচনা-কাটাকুটির কুশ্রীতাকে অতিক্রম করে কবির নিপুণ লেখনী যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করল তার

১। শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের [illegible]

মূল কথা হ'ল জীবনছন্দের সার্থক রূপায়ণ। ছন্দোময় রূপ এসে ঢেকে দিল লেখা-কাটাকুটির অসুন্দরকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই সব কাটা লেখাগুলোর কুশ্রীতা তাঁকে পীড়া দিত। কাটাকুটিগুলো যেন মুক্তির জন্য চীৎকার করত। কবি তাই তাদের মুক্তি দিতে চাইলেন কুশ্রীতার কারাগার থেকে। যখন তাঁর হাতে সেই কারাগারের আগল ভাঙল তখন তারা অপূর্ব সৌন্দর্য-সুষমায় মণ্ডিত হয়ে বেরিয়ে এসে আসন গ্রহণ করল শিল্পলোকের খাস দরবারে। কবির চিত্রচর্চার প্রবেশিকা হ'ল এই কাটাকুটি খেলা। তার পর এল দ্বিতীয় পর্যায়। খাঁটি ছবি আঁকার চেষ্টা তিনি করলেন। কাল্পনিক পশুপক্ষী আঁকা হ'ল—মুখোশের নানান্ ধরনের অলঙ্করণকার্যে বিভিন্নধর্মী প্যাটার্নের সৃষ্টি হ'ল। তার পর তৃতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ 'ফিগার' আঁকলেন—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত মানুষের মূর্তি আঁকা হ'ল নানান্ ধরনের। বর্ণাঢ্য ফুলের ছবিও তিনি আঁকলেন। মানুষের অধিকাংশ ছবিই[১] হ'ল বাস্তবতা-বর্জিত। এই ছবিগুলোর রূপের ছান্দিক অর্থ টুকুই হ'ল এদের মূল্য। কবি প্যারিসে প্রদর্শিত তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর চিত্র পরিচিতি পত্রের ভূমিকায় বললেন :

> "If, by chance, they (pictures) are entitled to claim recognition, it must be primarily for some rhythmic significance of Form which is ultimate and not for any interpretation of an idea or representation of a Fact."

আমরা আগেই বলেছি, অঙ্কনশিল্পে রূপের এই ছন্দোময় অর্থ টুকুকে প্রকাশ করাই হ'ল এ যুগের শিল্পীর সাধনা। আধুনিক কালের শিল্পীগোষ্ঠী বস্তুর পরিচিত রূপ-রেখার বাঁধনকে অস্বীকার করে আর এক নূতন রূপের কাঠামো দিয়ে তাকে গড়ে তুলছেন। এ এক অভিনব পদ্ধতির নৈরূপ্যবাদ। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই নৈরূপ্যবাদ আরও জটিল, আরও মনোধর্মী হয়ে উঠল। সকলে তাঁকে তাই বুঝল না। পল ভেলোরি বা আঁদ্রে জিদের সমানধর্মা দু' একজন মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমত বুঝলেন ; তাঁরা তারিফ করলেন। আগামী যুগের মানুষ হয়ত বুঝবে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে—এই রকম আশ্বাস দিলেন কয়েকজন মনীষী। আমরাও এই বিশ্বাসই পোষণ করি যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির ভাষা বোঝবার মত মানসিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা এ যুগে দুর্লভ। আগামী যুগের অথবা তারও পরের যুগের মানুষের আন্তর শক্তির অধিকতর উন্মেষ হলে তারা বুঝবে পারবে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-শিল্পকৃতির মূল্য। তার রবীন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেবে সেদিন। তাই বলি রবীন্দ্রনাথ অনাগত দিনের শিল্পী এক দিন 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে হেঁয়ালি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। সে সন্দেহের নিরসন হয়েছে যখন স্বচ্ছ বোধের আলোয় তাঁর কাব্যসত্যটি পাঠকের কাছে ধরা পড়েছে। আজ রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যে বাদানুবাদ চলেছে তারও নিরসন হবে আগামী যুগে—যখন মানুষের বুদ্ধি এবং বোধ হয়ত আরও পরিণত হবে ; তাই বলছিলাম রবীন্দ্রনাথের ছবি হ'ল আগামী কালের এবং শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের অনেক অগ্রবর্তী।

আর ভবিষ্যৎ কালের মানুষ স্মরণ করবে কবি-সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্রকে—যে চরিত্রগুলি হাসিতে, অশ্রুতে, ব্যথায়, বেদনায়, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে অতুলনীয়। আগামীকাল ভুলবে না কর্ণকে, ভুলবে না কচকে ; উপনন্দ, অমল, ঠাকুর্দা, জয়সিংহ, লাবণ্য, মোহিনী, নন্দিনী, রঘুপতি এবং আরও অনেকে হারিয়ে যাবে না বিস্মরণের অতলস্পর্শ অন্ধকারে। যেমন করে মিরান্দা, শকুন্তলা, দেসদিমোনা, ওথেলো, লিয়র আমাদের কাছে সত্য হয়ে আছে, ঠিক তেমনি করেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কতকগুলো অনবদ্য চরিত্র বেঁচে থাকবে। ঠাকুর্দা বেঁচে থাকবেন। ঠাকুর্দা বিনিসুতোয় মুক্তাহার গাঁথেন, অদেখাকে মনের চোখে দেখেন, অলিখিত লেখন পাঠ করেন চরাচরে। ঠাকুর্দা ভক্ত ; তাঁর ভক্তিতে ভগবানের সৃষ্টি-রহস্যটুকু স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তাঁর চোখে। শূন্য পরিপূর্ণ হয়। তাঁর শক্তি হ'ল অন্তরের শক্তি, তাই তিনি বাইরের চোখ-রাঙানিকে অতি সহজে উপেক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা হলেন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহীর প্রতিরূপ। মানুষের মনের অদৃশ্য কেন্দ্রে যে অসীম শক্তির উৎস লুকানো রয়েছে, সে অধ্যাত্মশক্তিই হ'ল ঠাকুর্দার চারিত্রবল। তাই বিঘ্ন বিপদ কখনও তাঁর হাসিটুকুকে ম্লান করে না। সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীর মত ঠাকুর্দার জীবনচর্যার ইতিকথা আগামী যুগের মানুষ স্মরণ করবে। বেঁচে থাকবেন জয়সিংহ আর রঘুপতি ট্র্যাজিক জীবনের সবটুকু আনন্দ-বেদনা নিয়ে। মিল্টনের শয়তান-চরিত্রের মতই রবীন্দ্রনাথ রঘুপতিকে উন্নত পট-ভূমিকায় সুদৃঢ় রেখাঙ্কনে সৃষ্টি করেছেন। রঘুপতি দুর্ধর্ষ, রঘুপতি অতি-মানবিক শক্তির অধিকারী। 'রঘুপতি জটিল মানবমনের একটি অপরূপ সৃষ্টি।' রবীন্দ্রনাথের এই

১। প্রসঙ্গতঃ 'চিত্রলিপি' গ্রন্থের ৫নং, ৬নং, ৭নং, ছবির উল্লেখ করছি।

চরিত্রটিকে আগামী যুগের পাঠক সহজে ভুলবে না। ভুলবে না জয়সিংহকে। জয়সিংহ সংস্কারাবদ্ধ, ধর্মান্ধ, আমাদের মত সাধারণ মানুষের প্রতিরূপ। তাঁর মাহাত্ম্য তাঁর কঠোর সংযমে—কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি অসাধারণ। এই কঠোর সংযম তাঁর চরিত্রকে অপার্থিব ট্রাজিক মহিমায় ভাস্বর করেছে।

এমনিভাবে অমলের কথা ভাবীকালের মানুষ স্মরণ করবে যখনই শরতের নীলাকাশে শুভ্র মেঘের দল উড়ে চলে যাবে সীমাহীন দিগন্তের পানে। যখন অবকাশের ঘণ্টা বাজবে 'ঢং ঢং ঢং' তখনই মনে পড়ে যাবে রুগ্ন অমলের কথা, যার চিরপ্রতীক্ষা সত্য হয়ে রইল সমস্ত মানুষের জীবনে। অমল অন্তরে রাজার ডাক শুনতে পায় ; সে ঘরে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যে পত্রের মধ্যে লেখন নেই তারও মধ্যে সে রাজার আমন্ত্রণলিপি পাঠ করে। তাই ত চিঠি আসাই অমলের জীবনের একমাত্র সত্য। চিঠির জন্য অমলের যে নিরন্তর ব্যাকুলতা তার অনুভূতি সব মানুষেরই ঘটে। এই সার্বিক ব্যগ্রতা, চিঠির জন্য ক্লান্তিহীন প্রতীক্ষা, এ ত শুধু অমলের একার নয়। এ হ'ল সমস্ত কালের সমস্ত মানুষের সম্পদ। অমলের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। তাই অমল কালান্তরের মানুষের বাসনায় বেঁচে থাকবে। আর বেঁচে থাকবেন লাবণ্য তাঁর প্রেমের সীমাহীন মাধুর্য এবং অতুলনীয় মর্যাদা নিয়ে। বেঁচে থাকবেন মোহিনী। জীবনরহস্যের ঘেরাটোপে তাঁর সবটুকু সৌন্দর্য, তাঁর নারীত্বের সুতীব্র দ্যুতি অম্লান থাকবে। সুগভীর ট্রাজিক সুষমায় মণ্ডিত রক্তকরবীর নন্দিনী বেঁচে থাকবে যতদিন মানুষের জীবনে অন্দরের সঙ্গে বাইরের দ্বন্দ্ব চলবে, যতদিন কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার বিরোধ চলবে। আর আগামী যুগ গ্রহণ করবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট পৌরাণিক চরিত্রগুলির নবতর সংস্করণ। কর্ণ, কচ, চিত্রাঙ্গদা—এই চরিত্রগুলি কবির হাতে বিশিষ্ট মহিমা লাভ করেছে।

উদাহরণ স্বরূপ কচ-চরিত্রের কথা বলি। মহাভারতকার কচকে যে রূপে, যে রঙে চিত্রিত করেছেন তাঁর চেয়ে অনেক মহনীয় রূপ, অনেক উজ্জ্বলতর রঙে কবি চিত্রিত করেছেন তাঁর কচ-চরিত্রকে। আধুনিক যুগের কাব্যধর্মপ্রসূত রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ কচকে দেবযানীর সঙ্গে একই ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে নি। কচ উন্নততর জীবনাদর্শ, ত্যাগের ও ক্ষমার মহত্তর বোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যাখ্যাতা দেবযানী যখন কচকে অভিশাপ দিলেন তখন কচ পুরুষোচিত ঔদার্যতা ও ক্ষমার সঙ্গে দেবযানীকে আশীর্বাদ করে এই কামনা করলেন যেন দেবযানী প্রেম-প্রত্যাখ্যানের সবটুকু গ্লানি ভুলে যান। বিপুল গৌরবের মধ্যে তিনি যেন তাঁর অতীত জীবনের সবটুকু অমর্যাদাকর স্মৃতিকে ডুবিয়ে দিতে পারেন। মহাভারতকার যে কচ-চরিত্র অঙ্কিত করেছেন সে কচ দেবযানীর অভিশাপটুকু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অভিশাপের পরিবর্তে অভিশাপ দিয়ে কচ যে দুর্বলতা প্রকাশ করেছে তা এ যুগের কাব্যাদর্শে গ্রহণীয় নয়। এ কালের কাব্যাদর্শে এই প্রত্যভিঘাতের লেশমাত্র অসংলগ্ন। তাই রবীন্দ্রনাথ নূতন করে কচ-চরিত্রকে সৃষ্টি করলেন সর্বযুগীয় মানবতার আদর্শে। মহাভারতকার কচ ও দেবযানীর মিলনের পথে যে বাধা সৃষ্টি করলেন তা লৌকিক, মনস্তাত্ত্বিক নয়। কচ ও দেবযানী পরস্পরকে ভাইবোন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রথমে, তাই এই বাধা। এই তুচ্ছ সামাজিক বাধার কথা, এই পাতানো সম্পর্কের বাধার কথা এ যুগের পাঠক অকিঞ্চিৎকর মনে করবেন। তাই রবীন্দ্রনাথ কচের মনে যে বাধার সৃষ্টি করলেন তা হ'ল কর্তব্যের বাধা। মিলনের পথে অন্তরায় হ'ল কচের কর্তব্যবোধ, তাঁর শুভবুদ্ধির দাবি। বাধার রূপভেদের জন্য এবং কচের মনের নিঃসঙ্গ প্রকাশহীন ভালোবাসার আংশিক অস্ফুট স্বীকৃতির জন্য কচ-চরিত্র মহত্তর মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর ত্যাগের মাহাত্ম্যটুকু পাঠকহৃদয়ে চিরদিনের মত মুদ্রিত হয়ে রইল।

এবার কর্ণ-চরিত্রের কথা বলি। মহাভারতকার কর্ণ চরিত্রকে ততখানি মহিমা দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ, যে মহিমায় রবীন্দ্রনাথ কর্ণ-চরিত্রকে ভূষিত করেছেন। মহাভারতে আমরা কর্ণ-কুন্তীর কথোপকথনের মধ্যে যে সুর পাই, সেখানে যেন প্রাণের অভাব, মাধুর্যের অভাব, মর্যাদার অভাব। কর্ণ সেখানে বারবার কুন্তীর মাতৃসুলভ কোমল হৃদয়বৃত্তিকে আঘাত করেছেন। কুন্তীকে ব্যথা দেওয়ার জন্য, তাঁর জীবনের আদিম ভুলটুকুকে বারবার তাঁর স্মরণপথে এনে দেওয়ার জন্য কর্ণের দ্বিধাহীন প্রয়াস আধুনিক কালের কাব্যাদর্শে কর্ণকে কতকটা ছোট করে দিয়েছে। কুন্তীর মাতৃত্বের মর্যাদা-ভিক্ষার উত্তরে কর্ণ বলেছেন যে, তিনি সুতপুত্র। কুন্তীকে 'মা' সম্বোধনে পরিতৃপ্ত করতে কর্ণ দ্বিধা বোধ করেছেন। গর্ভধারিণী মাতার সব ব্যাকুলতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কর্ণ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা সূর্যপুত্র কর্ণের যোগ্য নয়। সহজাত কবচকুণ্ডলে যাঁর অধিকার তাঁর এই অতি সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দেয় নি। তাই তিনি আর এক কর্ণের সৃষ্টি করলেন —যে কর্ণ ত্যাগে ক্ষমায় বীর্যে এবং মানবতায় উজ্জ্বলতর। আমরা শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে এই মহৎ প্রাণের মাধুর্যটুকু অবলোকন করি। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ অনুপম ট্রাজিক মহিমায় ভাস্বর।

শুধুমাত্র বিরূপ ঘটনাপরম্পরার অধীন হয়ে কর্ণকে পরাজিত হতে হয় নি। এ পরাজয় ভাগ্যের লিখন। সন্ধ্যার আকাশে কর্ণ ঘোর যুদ্ধ-ফলের ইঙ্গিত দেখেন—সে ইঙ্গিত কর্ণের পরাজয়ের কথা বলে। প্রসঙ্গতঃ, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে কর্ণ কুন্তীর সাক্ষাৎ ঘটেছিল প্রভাতকালে আর রবীন্দ্রনাথ মাতাপুত্রের সাক্ষাৎ ঘটালেন প্রদোষচ্ছায়ায়। দিনান্তের বিদায়-বিধুর আকাশে কর্ণ এই সঙ্কটময় সংগ্রামের পরিণাম প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি তাঁর গর্ভধারিণী মাতাকে বলেন : 'যে পক্ষের পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে ক'রো না আহ্বান'। কর্ণের জন্ম-মুহূর্তে যে ট্রাজেডির বীজ রোপিত হয়েছিল তা এতদিনে শাখায় পল্লবে আপনাকে প্রসারিত করে এই চরম পরিণতি লাভ করল। কর্ণ-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় অনন্যপূর্ব মর্যাদা ও সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ কর্ণ বীর-শ্রেষ্ঠ ; এ কর্ণ আদর্শচরিত্র। রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট পূর্ণতর কর্ণ চরিত্র কেনই বা শাশ্বত কালের কাছে চিরন্তন মর্যাদার দাবি করবে না ?

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলি অনবদ্য চিত্রণভঙ্গীতে এবং সীমাহীন মানবীয় মর্যাদায় অতুলনীয়। তাদের আবেদন কোন দিনই ব্যর্থ হবে না মানুষের কাছে—কেননা এই চরিত্রগুলি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, জীবনবাদ ও জীবনাদর্শকে রূপ দিয়েছে। সে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে তারা অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। তবু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ আছে। তাদের আনন্দ বেদনা, তাদের সাফল্য ব্যর্থতা সবই সাধারণ মানুষের জীবন থেকে আহরণ করা। রবীন্দ্রনাথের হাতে তাদের চিত্রণ ঘটেছে মানুষের মহত্তর জীবন-কল্পনার পট ভূমিকায়। তাই তাদের মৃত্যু নেই।

বাল্যস্মৃতি

শ্রীকালিদাস রায়

অবাক করিত মোরে
কেমনে শীর্ণ বিঙের লতাটি ফুলে ফুলে যেত ভরে।
ভাবিতাম লতা কোথা হতে এত হলুদিয়া রঙ পায়,
সবুজ কেমনে হলুদ হইয়া খড়ের চালাটি ছায়।
ভাবিতাম তাই বৈকালী রোদ পান করি তার হাসি
ফুটে কি উঠিত দোচালা ভরিয়া ফুল হয়ে রাশি রাশি ?

অবাক করিত মোরে
শূন্য সে মাঠ সবুজ ধান্যে ভরিত কেমন করে।
বৈশাখে শুধু করিত যা ধূ ধূ বহিত তপ্ত হাওয়া
এমন শ্যামল সুষমা সেখানে কেমনে যাইত পাওয়া।
আকাশের মেঘগুলোরে মাটিতে বেঁধে কি রাখিত কেউ ?
উড়িতে না পারি চঞ্চল হয়ে তুলিত কেবল ঢেউ ?

অবাক করিত মোরে
কেমন করিয়া আষাঢ়ে আকাশ ঢেকে যেত ঘন ঘোরে।
ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে খাঁ খাঁ চারিদিক ঝলসিয়ে যেত আঁখি
চাতক শিশুর তৃষিত কণ্ঠ ফেটে যেত ডাকি ডাকি.
ছুটিয়া আসিত হয়ে কি ব্যথিত শুনিয়া 'ফটিক জল'
ঝরাইত জল তৃষ্ণা হরিতে তাই কি মেঘের দল ?

অবাক করিত মোরে
মৌমাছিগুলি কেমন করিয়া মৌচাক তোলে গ'ড়ে।
বনের ভিতরে গাছে ফুল ফুটে কেমনে তা পায় খোঁজ।
কতটুকু মধু ছোট মুখটিতে বয়ে আনে তারা রোজ।
সুমধুর সুরে গুঞ্জন করি ঘুরে তারা দলে দলে
তাই কি জমিয়া মোম হয় আর তাই মধু হয়ে গলে ?

অবাক করিত মোরে
বাবুই বাসাটি গড়ে তালগাছে কত দিনরাত ধ'রে।
শাবকেরই তরে বাসা নয় দোলা, ভিজে ভিজে মরে নিজে
ভাবিতাম দেখি সে ত ছোট পাখী, তারও ভালবাসা কি যে।
আহার আনিতে যায় দূর পথে বাসা চিনে ঠিক ঢোকে,
মিহিন সুতায় বাঁধা থাকে সে কি দেখিতে পাইনি চোখে ?

গোবিন্দ মাসী



শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ট-আপিসটা রাস্তার ধারেই পড়ে, একটা বড় কম্পাউণ্ডের ভেতরের দিকে। রিক্সা করে যেতে যেতে দূর হই দেখতে পেলাম, বারান্দার ওপর একটা কাউণ্টারের ন রীতিমত জটলা লেগে গেছে। রিক্সাওলাকে একটু তাড়ি চালিয়ে যেতে বললাম, যদি পকেটমার হয় ত দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে আসব।

পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু মত বদলাতে হ'ল; রিক্সাওলার একটা ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় বললাম—'শীগগির ফেরা সা।'

জিজ্ঞেস করলে—'কেন বাবু?'

'সে শুনবি'খন, তুই ফেরা আগে!'—বলে তার জামাটা পে ধরলাম। জোরে চালিয়েছিল, ব্রেক কষতে কষতেও ন্তু খানিকটা এগিয়ে গেল, পোস্ট-আপিসের প্রায় সামনা-মনি। ঘোরাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখন আর উপায় নেই; রা পড়ে গেছি।

কোন পকেটমার নয়, গোবিন্দ মাসী। আওয়াজটা কানে গিয়েছিল, শুধু এমন সময় এখানে এ অবস্থায় ওঁর উপস্থিতির কথাটা ভাবতে পারি নি বলেই একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম, রিক্সাটা ঘোরাতে গিয়েই বোধ হয় আরও নজরে পড়ে গিয়ে থাকব, গোবিন্দ মাসী ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে হাত তুলে চীৎকার করে উঠলেন—'এই রিক্সাওলা, দাঁড়াবি! দাঁড়া, নয় ত তোরই একদিন কি আমারই এক দিন! একটা ভদ্দরলোকও এসে দেখুক অবলা মেয়েছেলে দেখে কি জুলুমটা করছে এরা!...ডেকে দে না...বলি, ও বাছা, শুনছ?...বলি, ও ভদ্দরলোক!...বড় আমার ভদ্দরলোক রে!...ঘুরে চায় না!'

সব শুলতনেই কতকগুলা করে চ্যাংড়া জোটে, তারাও ডাক দিতে দিতে এগিয়ে আসছে, তাদের পেছনে গোবিন্দ মাসীও। নামছি না দেখে ওঁর ভারাও ক্রমে ক্রমে উগ্র হয়ে উঠছে। আমি মুখটা ফিরিয়ে বলেছিলাম, রিক্সাওলাটার যে ভ্যাবাচাকা লেগে গেছে, তাকে তাগাদাও দিচ্ছিলাম, শেষে আর উপায় না দেখে নেমে পড়ে সামনাসামনি হয়ে দাঁড়ালাম।

গোবিন্দ মাসী থমকে একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন। দূর থেকে নিশ্চয় চিনতে পারেন নি, ঘুরেও বসেছিলাম, এখন সামনাসামনি হতে একটু অবাক হয়ে গিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন—'আমাদের শৈল না? তুই এই আজাড়ে কোথা থেকে?'

চ্যাংড়াগুলো ঘেরে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে আছে। বললাম—'এই গাড়িতেই নামলাম, বাড়িতে যাচ্ছিলাম। তা, তুমি এখানে?—আমি ত বুঝতেই পারি নি এতক্ষণ। ব্যাপারখানা কি? একটা যেন গোলমাল কি হয়েছে—গাঁটকাটা নয় ত?'

আমায় হঠাৎ দেখতে পেয়ে খানিকটা বিস্ময়ে এবং খানিকটা আহ্লাদে গোবিন্দ মাসীর গলাটা নরম হয়ে এসেছিল, আবার সপ্তমে চড়ে গেল, একেবারে ঘুরে পোস্ট-আপিসের দিকে মুখ করে হাত দুটো তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—'গাঁটকাটা!...গাঁটকাটা ত এদের সামনে সোনার চাঁদ। এরা একেবারে গলায় ছুরি দেবে! এই এদের ব্যবসা দাঁড়িয়েছে। তা এবার পাল্লায় পড়েছে, কে কার গলায় ছুরি বসায় দেখছি, আমারও নাম গোবিন্দ মাসী!...'

বারান্দার ভিড়টা ধারে সরে এসে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। পাঁচমিশালি ভিড়, সদর জায়গা, খুবই বিব্রত হয়ে পড়তে হ'ল। বললাম—'ব্যাপারখানা কি?'

'ওরা আমায় টেলিগেরাপ করতে দেবে না। ন্যায্য-পাওনার ওপর এত ঘুষ দাও ত পাঠাব, নৈলে রইল পড়ে, তোমার টেলিগেরাপ। বড় থেকে নিয়ে ছোট পজ্জন্ত সব একজোট হয়েছে—সব শেয়ালের মুখে এক রা—এত দাও তবে যাবে, নৈলে যেমনকার টেলিগেরাপ তেমনি থাকবে পড়ে।'

চ্যাংড়াদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললে—'ওনারা বলছে দু'টাকা আট আনা লাগবে। ইনি বলছেন বারো আনার বেশী কখনও দোব না; এই নিয়ে ঝগড়া।'

পুরোপুরি না বুঝলেও একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। গোবিন্দ মাসী যখন কোট ধরে চলেছেন তখন যুক্তি দেখাতে গেলে কাজ ত হবেই না, উলটে ওদের দলে ফেলে আমারও আদ্যশ্রাদ্ধ করতে বাধবে না ওঁর।

ওঁর দিকেই টেনে বললাম—'আবদার ত! মগের মুল্লুক নাকি? কৈ, টেলিগ্রামটা আছে তোমার কাছে?'

গোবিন্দ মাসী বললেন—'না, ওদের কাছেই আছে।'

'দিতে চাইছে না?'

'দিচ্ছে কে ফিরিয়ে যে দিতে চাইবে না? ওদের বুকের ওপর বসে ঐ টেলিগেরাপ করাব তবে আমার নাম। দিচ্ছে কে যে ফিরিয়ে রেখে জমি?'

বললাম—'তা হলে বাড়ী গিয়ে সেই ব্যবস্থাই করিগে

চলো। মুখের কথায় ত শোনবার লক্ষণ দেখছি না; বাড়ী গিয়ে ওপরওলাদের কাছে কড়া চিঠি ঝাড়তে হবে···'

কৌতূহলী ভিড় জমে উঠছে; এ ধরনের নির্ব্বোধের মত কথা বলতে যেন মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু এ অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচি আপাততঃ। গোবিন্দ মাসী খুব কষ্টে আমার ডান হাতটা মুঠিয়ে ধরলেন, আর ভূমিকা না করে পোস্ট-আপিসের দিকে এক রকম টানতে টানতেই নিয়ে যেতে যেতে চীৎকার করতে লাগলেন —'তুই যে মেয়েমানষেরও বেহদ্দ হলি রে শৈল! কতকগুলো গুণ্ডো-বাটপাড় শহরের মধ্যিখানে বসে যা খুশি তাই করবে, কোথায় পুরুষের মতন এগিয়ে গিয়ে তাদের বিষদাঁতগুলো উপড়ে দিবি, না, ঘরের কোণে বসে চিঠি লিখতে চললি! এমন মেনিমুখো তুই কবে থেকে হলি?—কৈ, ছিলি না ত এর আগে···চল্, আমি রয়েছি, কে তোর কেশাগ্র স্পর্শ করে দেখি···'

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে ভিড়ের মধ্যে সেঁধুলেন। অবশ্য আমায় নিয়েই। দৃশ্যটা যথেষ্ট কটু হয়ে উঠেছে, আমি প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে আর চরমে নিয়ে গেলাম না। কাউণ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় একটু সামনে ঠেলে দিয়ে বললেন—'এই এসেছে—তিনটে পাস—আর অবলা মেয়েমানুষ নয় একটা যে যা বুঝবে নির্ব্বিচারে শুনে যাবে—করুক বোঝাপড়া ওর সঙ্গে, আমি এই বসলুম গ্যাঁট হয়ে।'

বারান্দার শেষ দিকটায় একটা শানের বেঞ্চ রয়েছে, গোবিন্দ মাসী তার ওপর গিয়ে বসতে যারা বসেছিল সমীহ করে সরে এল। গঙ্গাস্নানের ফেরত ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছে; গোবিন্দ মাসীর পরনে মট্‌কার থান, বাঁ হাতে কমণ্ডলু, ভিজে কাপড় আর গামছাটা পাট করে মাথার ওপর বসানো। বেঞ্চে বসে বললেন—'শোন্ শৈল, ওরা কি বলতে চায়; শুনে বিহিত কর্। দেওয়ানী, ফৌজদুরী কিছুতে ডরাবি নে; আমি এই রয়েছি।'

কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে কাপড় গামছা সরিয়ে মাথায় দু'তিন বার চাপড়ে চাপড়ে দিয়ে একবার ভিড়ের সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নূতন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলেন। একটা চ্যাংড়া কমণ্ডলুতে আর কতখানি জল আছে দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে গলা বাড়িয়েছিল, কড়া দাবড়ানি খেয়ে পিঠ দিয়ে ঠেলা মেরে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকের চাপ আরও বেড়ে উঠেছে। সব নিশ্চুপ। নূতন এ পর্বটা কিভাবে সুরু হয় দেখবার জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। কাউণ্টারের ওদিকেও ছোটখাটো একটি ভিড়, পোস্ট-আপিসের আমলারা একত্র হয়েছে, টেলিগ্রামের একটা ফর্ম হাতে করে যে ছেলেটি সামনেই দাঁড়িয়েছিল তাকে বেশ একটু কুণ্ঠিত ভাবেই প্রশ্ন করলাম —'কি হয়েছে? আপনিই টেলিগ্রাফিষ্ট?'

ছোকরার মুখটা বেশ থমথমে, দেখে মনে হয় অনেক অশ্রুতিমধুর বিশেষ্য বিশেষণ কানে গিয়ে মাথাটা ভারি করে রেখেছে। বললেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছেন—একে ত কাকে দিয়ে লিখিয়েছেন, কি লিখিয়েছেন—মাথামুণ্ডু কিছুই ধরা যাচ্ছে না—মরুক গে ভাবলাম যা দেখছি অক্ষর ধরে পাঠিয়ে দিই, বললাম—এত চার্জ পড়বে—দু'টাকা আট আনা—বলেন কোনমতেই দেবেন না। কবে কোন্ মাসে কাকে একটা টেলিগ্রাম করতে বারো আনা পয়সা লেগেছিল, সেই হিসেব ধরে বসে আছেন।'

ঘুরে না চেয়েও দেখলাম গোবিন্দ মাসী বেঞ্চের ওপর বসে ফুলছেন। ঐ কথাগুলার ওপরই মাথাটা একটু দুলিয়ে কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে আবার একবার মাথায় চাপড়ে দিলেন। আত্মসংযম, কি প্রস্তুতি ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

বললাম—'ওঁকে হিসেবটা বুঝিয়ে দিয়েছেন?—মেয়েছেলে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'একবার নয় মশাই, হাজারবার হাজার রকম করে—এতগুলি কথা আছে। আটটা পর্যন্ত এত পড়ে, তার পরে এই হিসেব। উনি কোনমতে শুনবেন না। না হয় নিয়েই যান, অন্য পোস্ট-আপিসে ভজিয়ে নিন, তাও নয়। এইখান থেকেই করাবেন, সেই বারো আনার বেশী দেবেন না। গাল-মন্দর কথা বাদই দিলাম, বুড়ো মানুষ; কিন্তু কাজের ত ক্ষতি হচ্ছে! ওঁর সামনেই* আরও তিন জনের নিলুম। বলতে বললেন—জোচ্চোর, বাটপাড়।

জিজ্ঞেস করলাম—ন্যায্য না হলে ওরাই বা দেবে কেন? বললেন—হাঁদা, অপোগণ্ড, গবেট; তাই দিয়ে যাচ্ছে।'

গোবিন্দ মাসী শুধু মাথাটা একটু দোলালেন।

প্রশ্ন করলাম—'আগে কম ছিল এখন রেট যে বেড়েছে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন?'

বুঝছি এ প্রশ্নগুলা রুচিকর হচ্ছে না গোবিন্দ মাসীর, অথচ কোন্ পথে অগ্রসর হব বুঝতে পারছি না। কতকটা ওঁকেও ঠাণ্ডা করে রাখবার জন্য বললাম—'এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি, বুঝিয়ে বললে উনি না বোঝবার মানুষ নয় ত।'

অনুভব করলাম—কি ভেবে এতেও মাথাটা একটু দোলালেন গোবিন্দ মাসী।

ছোকরা বললে—'ঐ ত বললাম সব রকমে বুঝিয়েছি মশাই, ইনি কোনমতেই···'

আর শেষ করতে হ'ল না। গোবিন্দ মাসী হঠাৎ এমন হুঙ্কার করে বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, ভিড়টা খানিকটা যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এগিয়ে এসে আমার হাতটা আবার চেপে ধরে বললেন—'ও অলপ্পেয়েরা তোকেও নিজের মতন করে বুঝিয়ে ছাড়বে। তোর যদি নিজের বুদ্ধি না থাকে, তোর তিনটে পাস যদি শুধু ভস্মে ঘি ঢালা হয়ে থাকে ত কাজ নেই, তুই চলে আয়, ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে ওপরওলাকে চিঠি লিখবি চল্‌।...সব শেয়ালের এক রা!...টেলিগেরাপের দর যে বেড়েছে তা গোবিন্দ মাসী জানে—আজ জন্মায় নি, কচি খুকী নয়। টেলিগেরাপ কেন গরীবের পোষ্টোকার্ট এক পয়সা থেকে দু'পয়সা, দুই থেকে তিন পয়সা হয়েছে; খাম ঠেকেছে গিয়ে দু'আনায়—গোবিন্দ মাসী আজকের নয়, বসে বসে সব দেখেছে—গরীবের নিঃশ্বেসে অত বড় যে ইংরেজ রাজা তাকেও তল্পিতল্পা গুটিয়ে সমুদ্দুর পারে পালাতে হ'ল তাও দেখলাম, এবার এদেরও যে ভাগাড়ে গিয়ে উঠতে হবে, তাও দেখে যাব, মরব না...'

বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, একটু জানিয়ে দেওয়া দরকার। তবু বিরক্তিটা যথাসাধ্য চেপেই বললাম—'একটু চুপ করুন না; বুঝি ব্যাপারটা...'

গোবিন্দ মাসী একেবারে ফেটে পড়লেন—'তুই বুঝবি নি! ও গুণ্ডোরা জাদু জানে, বোঝবার মতন অবস্থা তোর আর রাখে নি! এক পয়সার পোষ্টোকার্টটা তিন পয়সা হয়েছে—দু' পয়সার খামটা দু' আনা করেছে, কিন্তু ওরা যে আবদার ধরেছে দুটো বেশী কথা লিখলে টেলিগেরাপে বেশী দিতে হবে, তা আমায় বুঝিয়ে দিক, পোষ্টোকার্টে দুটো বেশী কথা লিখে কবে কাকে বেশী গুনগার দিতে হয়েছে; খামে দুটো বেশী কথা লিখে কবে কার জরিমানা হয়েছে?—বলুক ওরা আমায়; বড় বোঝানে-ওলা হয়েছে, বুঝিয়ে দিক্‌...'

কাউণ্টারের ওদিকে যারা জড়ো হয়েছিল তাদের মধ্যে রোগাগাছের একজন ভেতর থেকে ঠেলে এসে বিজ্ঞের মত একটু মাথা দুলিয়ে বললে—'কেন, খাম ওজনে বেড়ে গেলে দিতে হয় না বেশী, ভোলাপিন্থু...'

ভারী শরীর হলেও সে ক্ষিপ্রতা শুধু গোবিন্দ মাসীতেই সম্ভব। মুহূর্তের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রাফ বাবুর হাত থেকে টেলিগ্রামের ফর্মটা ছিনিয়ে মুঠোর মধ্যে দুমড়ে দিয়ে ধাঁ করে লোকটার নাক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন, বললেন—'দুটো বেশী কথায় এর ওজনটা কত বেড়েছে, বল্‌, না, সে ড্যাকরা—বল্‌, বল যে হিসেব বোঝাতে [illegible] ঠেলেঠুলে...সাঁকামি রেখে, [illegible]'

বড্ডই বিসদৃশ হয়ে পড়ছে ব্যাপারটা। পেছনে নূতন এক জন এসে দাঁড়ালেন। ভারিক্কি-গোছের, দেখে মনে হ'ল যেন স্বয়ং পোষ্টমাষ্টার, এতক্ষণ সরেজমিনে কেন উপস্থিত হন নি বুঝতে পারা গেল না। আমাকেই প্রশ্ন করলেন—'মশাই, আপনার আত্মীয়া ইনি?'

এটা সাধ্যমত গোপন করবারই ইচ্ছা ছিল এ পরিবেশে, তাই এতক্ষণ সম্বন্ধ ধরে ডাকিনিও, একটু আমতা আমতা করে বললাম—'হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন মাসী আমার—একটু দূর সম্পর্কের...'

গোবিন্দ মাসী হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে আমার মুখের দিকে বক্র-কটাক্ষে চেয়ে শুনছিলেন, বললেন—'বল্‌, বল্‌—শুনে যাচ্ছি ...তোর কি হ'ল রে শৈল!—দূর সম্পর্কের বলতে মুখে একটু বাধল না ত! ওর মা হ'ল গোঁদোলপাড়ার সুবাদে আমার দিদি—গোবিন্দ বলতে অজ্ঞান হ'ত, আর তার ছেলে পাঁচ জন গুণ্ডোর পাল্লায় পড়ে ভয়ে ভয়ে বলে কিনা...'

ভদ্রলোক শান্তভাবেই বললেন—'সহোদর বোন নয় ত; ইনি সেই কথা বলছেন...'

গোবিন্দ মাসী আবার উলসে উঠলেন, ভদ্রলোকের দিকেই একটু কুঁজো হয়ে হাত-পা নেড়ে বললেন—'আছে সহোদর বোন, থাকবে না কেন? তবে সে যদি বোনের মতন বোন হ'ত তা হলে কি এই এতগুলো গুণ্ডো এক-জোট হয়ে আমায় নাকাল করতে পারত আজ? তা হলে কি...'

ভদ্রলোকের মাথাটা প্রকৃতই খুব ঠাণ্ডা। পাবলিককে সন্তুষ্ট রাখতে পোস্ট-আপিসের আমলাদের ওপর বিশেষ অনুশাসন থাকে, তাতে মনে হ'ল উনি দেখে-ঠেকে অনেকখানিই পোক্ত হয়ে উঠেছেন। মনে হ'ল—বোনও যদি বোনের মত হ'ত তা হলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াত সেকথা ভেবে ভেতরে ভেতরে একটু শিউরেই উঠেছেন; কিন্তু ওদিকটা চাপা দিয়ে একটু সান্ত্বনার স্বরেই বললেন—'তা আর হয় কোথায় সব সময় বলুন?...কিন্তু সে আপসোস থাক্‌। আপনি বসুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার দিকে চেয়ে বললেন—'আপনি একটু ভেতরে আসবেন দয়া করে?'

আবহাওয়াটা একটু নরম হয়েছে। আমারও মাথায় একটা মতলব উঁকি মারছে, খুবই সহজ একটা উপায় রয়েছে। চেঁচামেচি হৈ-হট্টোগোলের মধ্যে মনে আসছিল না; মনে হ'ল ভদ্রলোকও বা ঠাহর করেছেন তা এ-ই।

কিন্তু এত সহজ কথা যে গোবিন্দ মাসীর মাথায় আসবে না তাই বা হয় কি করে? চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনে যাচ্ছিলেন, আমি না বাড়াতেই তাঁর হাতটা খপ করে ধরে

ফেললেন, বললেন—'কোথায় যাস? ওদের ভাঁওতায় পড়ে তুই যাস কোথায় শুনি?'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু বিরক্ত ভাবেই বললাম—'ভদ্রলোক ডাকছেন, প্রবীণ লোক, শুনেই আসি না একটু—যখন বলছেন ঠিক হয়ে যাবে। এমন ভাবে সমস্ত দিন এখানে কাটানও ত যায় না। বলুন।'

এগিয়েই গেলাম। পেছনে গোবিন্দ মাসী আবার গলা তুলেছেন—'তোকে ছেলেমানুষ পেয়ে, হাঁদা গঙ্গারাম দেখে যত চায় ভাঁওতা দিক, কিন্তু গোবিন্দ মাসী শক্ত ঘানি শৈল। প্রবীণ! প্রবীণ ঢেঁকি, না হলে এতগুনোর ওপর সদ্দারি করছে! ওদের চিনি—ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, বারো আনা দিয়ে তেরো আনা নেয়।...মিলিয়ে দেখগে, তোর প্রবীণ যদি বাকি পয়সাটা তোর ঘাড় ভেঙে আদায় করে গোঁজামিল দেওয়ার কথা না বলে ত মাসীর নামে দুটো কুকুর পুষে রাখিস। তা তোকে ভাঁওতা দিক, আমার কাছে চলবে না। তোর মেসোকে তার করেছিলুম—সেই তেরো সনের অঘ্রাণে, আমার কাছে তার রসিদ রয়েছে; ও কত বড় প্রবীণ আর তুই বামনের ঘরের কত বড় মুখ্যু টের পেতে আমার দেরি হবে না। পোস্টোকাট বেড়েছে, খাম বেড়েছে, তেমনি আমিও বারো আনাটাকে না হয় পুরোপুরি এক টাকা করে দিচ্ছি—তার ওপর এক পাই যদি বেশী হয়...'

বকে যাচ্ছেন। ভিড়ের মধ্যে ব্যাপারটা জীইয়ে রাখবার লোকের অভাব নেই। উৎসাহ দিচ্ছে, বুদ্ধির তারিফ করছে, চাপা গলায় বোধ হয় যুগিয়েও দিচ্ছে বুদ্ধি। ভেতর থেকে শুনছি—মাসী আসর ক্রমে আরও গরম করে তুলছেন।

পোষ্টমাষ্টার মশাইয়ের ঘরটা ভেতরের দিকে, সামনা-সামনি হয়ে টেবিলের দু'পাশে বসলাম দু'জনে। ঐ প্রস্তাবই ছিল ওঁর; যুক্তি চলছে না, সরাবার উপায় নেই, এদিকে পোষ্ট-আপিসের কাজ বন্ধ। এক টাকার অতিরিক্ত পয়সাটা দিয়ে চালিয়ে নেওয়ারই প্রস্তাব ছিল ওঁর। গোবিন্দ মাসীর মন্তব্যগুলা কানে যেতে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন—'তা হলে ও মতলবও ত খাটল না মশাই। এ যে কঠিন সমস্যায় পড়া গেল। সত্যি ত পুলিস ডাকা যায় না; পোষ্ট-আপিস ত এদিকে মেছোহাটার অধম হয়ে দাঁড়িয়েছে!

একটু রগ দুটো টিপে বললেন—'একটা নয় কাজ করি?—আপনি ত রয়েছেনই। আপিসের কার্বনে টাকাটা ঠিক থাক, ওর রসিদটা না হয় আলাদা করে—যা বলছেন, এক টাকা তাই করে দোব?'

বললাম—'মতলব হিসেবে মন্দ নয়, তবে তাতে পুলিস-কেসে পড়বার ষোল আনা চান্স। ওর মাথায় যখন ঢুকেছে, তখন হরেকরকম সন্দেহ হবে, ভয়ানক সূক্ষ্ম দৃষ্টি এদিকে। হয়ত রসিদ হাতে নিয়েই আমায় টানতে টানতে সোজা থানায় গিয়ে উঠবেন।'

'তা হলে উপায়? সাতাশ বছরের চাকরি মশাই, রিটায়ার করতে যাচ্ছি, এমন ফ্যাসাদে ত কখনও পড়তে হয় নি!'

'ফ্যাসাদ বৈকি, আমারও মাথায় কিছু আসছে না। আমিও ভেবেছিলাম এক টাকার অতিরিক্ত চার্জটা পকেট থেকে দিয়ে হাঙ্গামটা মিটিয়ে ফেলব, সে চাল ত ধরা পড়ে গেল।'

এক, দম ফুরিয়ে গেলে লোকে ঠাণ্ডা হয়, তারও কোনও সম্ভাবনা নেই। যে পাড়ায় থাকেন, সমস্ত দিন কাক চিল বসতে পায় না; উনি এক দিকে আর রাঙা খুড়ীকে নিয়ে সমস্ত পাড়াটা এক দিকে; তবুও বেদম হতে তারাই হয়। আর এ ত ক'জন নিরীহ কেরানি, আইন-যুক্তি দেখানো ভিন্ন যাদের অন্য সম্বল নেই।

দম ফুরাবার কথাই আসে না। দু'জনে রগ টিপে দু'দিকে বসে আছি।

অথচ একটা খুবই সহজ উপায় ছিল, এবং সেটা মনে পড়ল অবস্থা যখন একেবারে চরমে এসে দাঁড়িয়েছে; তাই ত সাধারণতঃ হয়ও এসব ক্ষেত্রে—

যতই বিলম্ব হচ্ছে, বাইরে গোবিন্দ মাসী ওদিকে ততই উগ্রমূর্তি ধারণ করছিলেন, শেষে আর থাকতে না পেরে চীৎকার করতে করতে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে আপিস-ঘরে ঢুকতে যাবেন, আমি তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। যা ঠাহর করেছি তাতে বোধ হয় সমস্যাটা এবার মিটবে, সুতরাং একটু যেন বিরক্তির ভাবই টেনে এনে বললাম—'মাসী, এত উতলা হলে চলে? আমি কি বসে আছি? কাগজপত্র ঘেঁটে এঁদের নিয়মকানুন যেমন দেখছি—তাতে দু'টাকা আট আনার কথা ত বাদই দাও, এঁরা একটা টাকাও পেতে পারেন কিনা সন্দেহ আছে আমার—তুমি যেটা ক্যামাঘেন্না করে দিয়ে দিতে চাইছ আর কি। তবে, আর একটু পাকা করে বুঝে নিতে দাও, গবর্ণমেন্টের পাওনা ত।'

গোবিন্দ মাসী একেবারে নির্বাক হয়ে গেছেন; চোখ দুটো বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন—'একটা টাকাও দাবি করতে পারে না! অথচ চাইছে আড়াই টাকা! এদের ফাঁসিকাঠে তুলছে না কেন?'

ভিড়টাও একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি উত্তর করলাম—'তবে আর বলছি কি? কিন্তু একটু ভাল করে দেখে নিতে দাও আমায় আগে। সেই পুরনো সময় আর এ সময় মিলিয়ে দেখতে হবে ত। একটু বসো গিয়ে স্থির হয়ে। তুমি একটুখানি গলদ ভেবেছিলে, অনেক গলদ!'

মাসী ফিরে গেলেন। কানে গেল—'এইবার সামলাও। এ আর অবলা মেয়েছেলে নয় একটা।…তোমরা কেউ যাবে না, তামাশাটা দেখে যাও।'

ভেতরে এসে বললাম—'কই, টেলিগ্রামটা দেখি মশাই।'

টেলিগ্রাফিষ্ট ছোকরা এনে দিলে।

পুরো একখানি ফর্মে ঠাসা একরাশ কথা। অনেক কষ্টে সারমর্ম যা ধরতে পারলাম তা এই যে, গোবিন্দ মাসী তাঁর ভাইপো বটকৃষ্টকে লিখছেন কালই এসে তাঁকে নিয়ে যেতে। রাঙা-খুড়ীর সঙ্গে এঁটে ওঠার আর সাধ্য নেই তাঁর।

রাঙা-খুড়ীর সম্বন্ধে বিশেষণই রয়েছে পাঁচটা। কে লিখে দিয়েছে জানি না, তবে বিশেষণগুলো ইংরেজীতেই—Burnt-forehead, House-burner, Good-eater, Hundred-eater, Husband-eater—অনুমান করলাম—পোড়াকপালী, ঘরজ্বালানী, ভালোখাকী, শতেক খোয়ারী ইত্যাদি। অন্য একটা ফর্মে ছেঁটে ছুঁটে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে বললাম—'নিন, চৌদ্দ আনার একটা রসিদ লিখে দিন। ওরটা এখন ছিঁড়বেন না যেন।'

সমস্ত রাস্তাটা রিক্সাতে চুপ করেই বসে রইলেন গোবিন্দ মাসী। কি যেন ভাবছেন, উনিই জানেন; আমি আর ঘাঁটালাম না। বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাঁ রে শৈল, আবাগীর ব্যাখ্যানা করে যে কথাগুলো নিকিয়ে দিয়েছিলুম, সেগুনো বাদ দেবে না ত পোড়াকপালেরা। দেখলি ত, সব পারে ওরা। বেশ, বটুর হাতে টেলিগেরাপটা ত দেখতেই পাব।'

গোবিন্দ মাসীর কোন ব্যাপারেরই জের একেবারে মেটে না। ও নিয়ে আর আপাততঃ মাথা ঘামানো দরকার মনে করলাম না।

সিমলায় কয়েক দিন

শ্রীমাণিকলাল মুখোপাধ্যায়

সুদূর উত্তরাপথে—সিমলা। ব্রিটিশ আমলের পূর্ব্বে সিমলার এ রূপ ছিল না। আমরা সিমলায় যখন পৌছলাম, সবে



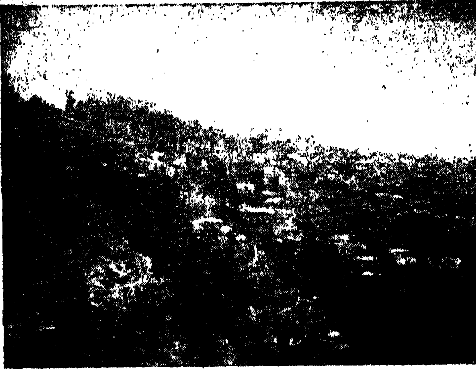
কালীবাড়ী, সিমলা

সন্ধ্যা হয়েছে তখন—একে একে সিমলার বৈদ্যুতিক আলোকমালা জ্বলে উঠেছে—সহসা আকাশে ঘনঘটা করে এল। যেদিকে তাকাই দেখি—মেঘাবৃত [illegible] আর কানে আসে বজ্রনির্ঘোষ। সিমলায় এরই মধ্যে বর্ষা আগতপ্রায়।

মল্-এ বেড়াতে বেড়াতে উঠলাম সিমলা কালীবাড়ীতে।



সিমলার সাধারণ দৃশ্য



পাহাড়ের উপর (বাঁদিকে শীর্ষস্থানে)
গ্র্যাণ্ড হোটেলের দৃশ্য

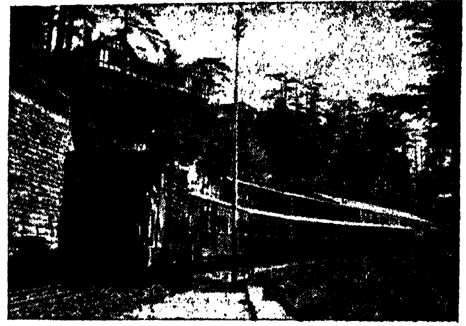
তখন দেবীর আরতি হচ্ছিল। খানিক পরেই ভজনগান শুরু হ'ল। সিমলার কালীবাড়ী প্রবাসী বাঙালীর উল্লেখ-যোগ্য কীর্ত্তি। একটি টিলার উপর কালীবাড়ীর মন্দির এবং তৎসংলগ্ন যাত্রীনিবাস। এখানেই সিমলার প্রবাসী বাঙালীদের সন্ধান মেলে। দিনান্তে তাঁরা এখানে এসে সমবেত হন—লাইব্রেরী আছে, ক্লাব আছে, থিয়েটারের স্টেজ আছে। লেডী প্রতিমা মিত্র হলটি ভারি চমৎকার।

সিমলায় বাঙালীরা সবাই ধুতি চাদর পরেন না। পরলে চলেও না—কারণ এ হ'ল শীতপ্রধান দেশ। পায়জামা ও পাঞ্জাবীর রেওয়াজই এখানে বেশী। বাঙালী মেয়েদের মধ্যেও এইরূপ পোশাকের প্রচলন আছে।



গ্র্যাণ্ড হোটেলে

এক দিন ঘুরতে ঘুরতে দেখি এক জায়গায় রাস্তার ধারে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—Himalaya Brahmo Mandir—কাছে গিয়ে দেখি কাঠের ট্যাবলেটে লেখা—Founded by Brahmananda Keshub Chandra Sen—



রেলপথ, সিমলা

অর্থাৎ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এটির ভিত্তিস্থাপন করে গেছেন। ফটক পার হয়ে দেখি রাস্তা এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেছে। সেই রাস্তা ধরে নেমে এলাম প্রায় চার তলা নীচে, শেষে ব্রাহ্মমন্দিরে পৌঁছলাম। একটি কাঠের বাড়ীতে উপাসনা-মন্দির, তারই পাশে আর একটি কাঠের বাড়ী—অপরটিতে থাকেন শ্রীনবকুমার দত্ত—মন্দিরের সেক্রেটারী। আলাপ হ'ল—বেশ লোক। বন্ধুবর শ্রীনীরোদ-বরণ নাথ হিমাচল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী—তিনিও থাকেন এরই কাছে। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত, চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত উপাসনা-মন্দিরটি দেখতে বড় ভাল লাগল।



জেনারেল পোষ্ট অাপিস, সিমলা

১৯শে জুন সন্ধ্যা ছয়টায় সময় হিমালয় ব্রাহ্ম-মন্দিরের ৬৮তম উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। আমিও নিমন্ত্রিত হয়ে গেলাম। বিচারপতি মিঃ জে. এল. কাপুর এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন। বাঙালীর মধ্যে বাইরে থেকে এসেছিলেন ড. এস. এম. রায়, এম-এ, পিএইচ-ডি—অল্পসংখ্যক স্থানীয় প্রবাসী বাঙালীও উৎসবে যোগ-

দান করেছিলেন, তবে অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী দেখলাম। মিঃ কাপুরের বক্তৃতা অতি উপভোগ্য হয়েছিল। ১৮৮১ সনে এখানে এসেছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ১৮৮৩ সনে আসেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। হিমালয় ব্রাহ্ম-সমাজের রিপোর্ট থেকে পাই—১৮৮৫ সনে রেভারেণ্ড ভাই কাশীরাম ২,০৫০ টাকায় ৩২,৩১৫ বর্গগজ ভূসম্পত্তি নীলামে



প্রান্তে 'মলে'র দৃশ্য

ক্রয় করেন। ১৮৮৬ সনে মন্দিরের উদ্বোধন করেন বিচার-পতি মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে। ১৮৮৫ সনের শীতকালে তুষারপাতের মধ্যেই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সুরু হয়। একটি বোর্ড অব ট্রাস্ট গঠিত হয় ১৮৯৭ সনে। প্রতাপচন্দ্র মজুম-দার ও ভাই কাশীরাম প্রভৃতি ছিলেন এর সদস্য।

এবার সিমলা কালীবাড়ীর কথা বলি। ১৮৯৯ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর সিমলার অধিবাসীরা মিলে সিমলা কালী-বাড়ীর ভিত্তিপত্তন করেন। প্রতি বৎসর অনধিক সাত জন বাঙালী হিন্দুকে নিয়ে এর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয় এবং বৎসরে একটি করে সাধারণ সভা আহূত হয়।

সিমলায় জুন মাসে সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ হচ্ছে—৭৯ ডিগ্রী এবং সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ ৬১ ডিগ্রী।

কালীবাড়ীতে জায়গা পাই নি বলে আমি আশ্রয় নিয়ে-ছিলাম বেঙ্গল হোটেলে। এটা শুনলাম পূর্ব্বে শেরউড সাহেবের বাড়ী ছিল। নীচের তলা থেকে উপরে উঠবার সময় প্রায়ই ভুল হ'ত। সিমলার বাড়ীভাড়ার ব্যবস্থায় অভিনবত্ব আছে। এখানে মাসিক বাড়ীভাড়ার বদলে বাৎসরিক হিসাবে বাড়ীভাড়া দিতে হয়। এক-একটি বাড়ীর ভাড়া বৎসরে দুই শত টাকা থেকে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত। সিমলার রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাস্তার ধারে নোটিশ বোর্ডে এই মর্ম্মে লেখা আছে যে, রাস্তায় [illegible] নিক্ষেপ করলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে।



বর্ষণান্তে—'মলে'র রাস্তা

সিমলার টমাস কুক কোম্পানী দ্বারা ভ্রমণকারীদের অনেক উপকার হয়। রেলের টিকিট এই কোম্পানিই করে দেয়। সিমলায় টুরিস্ট ব্যুরো আছে। ব্রাহ্মসমাজ, হোটেল সিসিল, সেন্ট্রাল হোটেল, চাডউইক্ হাউস, যক্ষ-পাহাড়, কামনা দেবীর মন্দির, লক্করবাজার ইত্যাদি এখানে অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। টুরিস্টদের পক্ষে সিমলা গ্র্যাণ্ড হোটেলটিই বিশেষ সুবিধাজনক। এখানে খরচও অপেক্ষাকৃত কম। পরিবেশটিও উৎকৃষ্ট। কাছেই ব্যাঙ্ক, বাজার, মল, কালীবাড়ী, সিনেমা, থিয়েটার। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ঠিক পাদদেশে সিমলা কালীবাড়ী। অ্যানানডেল ছিল সিমলার পুরাতন ঘোড়দৌড়ের মাঠ—এখানেই পূর্ব্বে ডুরাণ্ড ফুটবল খেলা হ'ত। মল রোড থেকে ছোট ছবির মত দেখায়।



হিমাচল প্রদেশ, কৌন্সিল হাউস, সিমলা

এইবার যক্ষপাহাড়ে আরোহণের কথা বলি। সিমলা মল হচ্ছে সিমলার চৌরঙ্গী—এখানে রয়েছে লালা লাজপত রায়ের প্রতিমূর্ত্তি। নীচে দাঁড়িয়ে আমরা এর ফোটো তুললাম

পঞ্জাব কেশরীর প্রতিমূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল তাঁর শেষ বাণী—"যে আঘাত আজ আমার বক্ষে করা হ'ল তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শবাধারে একটি পেরেকের মত বিঁধে রইল।" মল পার হলেই সিমলার রীজ—এটা ঠিক যক্ষ-পাহাড়ের নীচেই। নিকটেই খ্রীষ্টানদের গির্জ্জা ও মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী—সেখানে মহাত্মা গান্ধীর বিরাট একখানি তৈলচিত্র বিদ্যমান। চিত্রটিকে যেন জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। রীজ থেকে যক্ষপাহাড় প্রায় দুই-আড়াই মাইল হবে। শেষের দিকে খুব খাড়াই। আমি রিক্সাতে গিয়েছিলাম। উপরে



কান্দাঘাট রেলওয়ে ষ্টেশন

উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই একপাল বাঁদর এসে ঘেরাও করলে। সঙ্গে ছোলা নিয়ে গিয়েছিলাম—সেগুলো ছড়িয়ে দিলাম, নিয়ে চলে গেল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে হনুমানজীর মন্দির। এখানে বন্ধুবর শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নাথ কতকগুলি আলোক-চিত্র তুললেন।

সিমলার রিক্সাওয়ালার কষ্ট দেখলে মনে দুঃখ হয়। ছোট্ট ফিটনের মত রিক্সা—দু'জন টানে সামনে দুজন ঠেলে পিছন থেকে। সিমলার চড়াই আর উৎরাই পথে শুধু হাত-পা নিয়ে চলতেই রীতিমত কষ্ট হয়—এমতাবস্থায় রিক্সাওয়ালাদের সওয়ার নিয়ে আরোহণ-অবরোহণ করতে যে কত বেগ পেতে হয় তা সহজেই অনুমেয়।

সিমলার মালবাহী কুলীর অবস্থা আরও মর্ম্মন্তুদ। তাদের লোকে যেভাবে খাটায় তা দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়।

আর একদিন রিক্সা করে গেলাম কামনা দেবীর মন্দির দেখতে—মল রোড ছেড়ে আমরা আর একটা রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি গভীর খাদ—চারি ধারে পাহাড়ের পর পাহাড়ের মালা। যখন পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম তখন বেলা চারটা হবে—প্রায় দুই মাইল চড়াই পথ বেয়ে উঠে মন্দির দেখলাম। সেবাইত জ্যোতিষী সীতারাম অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক। এখানে একটি ট্যাঙ্ক আছে—তাতে শুনলাম বর্ষার জল ও শীতের বরফ ধরে রাখা হয়। সেই জলই সম্বৎসর ব্যবহার করা যায়।



কালকার নিকট নদীর উপর সেতু

সিমলা পাহাড়ের তিনটি শিখর। একটি হচ্ছে যক্ষ-পাহাড়, দ্বিতীয়টি কামনাদেবী এবং অপরটি তারা-দেবী। তারাদেবীর মন্দিরে বিগ্রহ বহু প্রাচীন বলেই অনুমিত হয়। তারাদেবী যেতে হলে সামার হিল হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। কামনাদেবীর সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, দেবী নাকি জঙ্গার রাজাকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার জন্য প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নাদেশ দেন। যথাসময়ে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর ক্রমশঃ এই মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।



কামনাদেবীর পাহাড়ে

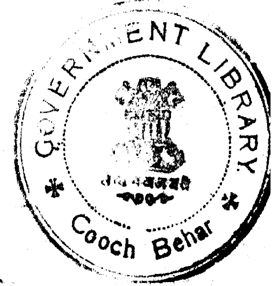
সিমলায় ফল বেশ সস্তা। আপেল, চেরী, পীচ, খোবানী ও আঙুর অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। পেঁয়াজ এবং অন্যান্য

আনাজপাতি কিন্তু তেমন সুবিধার নয়। আলু এখানে খুবই সস্তা।

ডিসেম্বরের মধ্যভাগ থেকে মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সিমলায় শীতকাল। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সিমলায় নাকি বরফ পড়ে—কখনও কখনও ডিসেম্বরের শেষ অবধি তুষারপাত হয়ে থাকে, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। মার্চ মাসের শেষ ভাগ থেকে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত সিমলায় গ্রীষ্মকাল।

সিমলার আবহাওয়া ভারি চমৎকার। শীতকালে বক্ষ-পাহাড়ের কোলে তিন থেকে পাঁচ ফুট গভীর তুষারপাত হয়ে থাকে। 'মলে' তখন এক ফুট দেড় ফুট আন্দাজ বরফ জমে।*

এই প্রবন্ধের ছবিগুলি শ্রীশৈলেন নাথ কর্ত্তৃক গৃহীত



অনির্ব্বচনীয়

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আকাশ আজি তেমনি নীল, তেমনি আলো-ছায়া,
বিবাগী মেঘ তেমনি দূর নিরুদ্দেশে ভাসে,
নিশীথে রচে রূপালি চাঁদ স্বপ্নভরা মায়া,
প্রভাত এলে সবিতা তার স্বর্ণরথে আসে।

তুমি কি আছ তেমনি 'তুমি', আমি কি আছি 'আমি'?
তোমারে আর আমারে সেই খুঁজিয়া মরি মিছে।
এমনি বৃথা অন্বেষণে কেটেছে দিন-যামী,
কোথায় পাবে? কে পারে যেতে ফেলিয়া-আসা পিছে?

কখন কেকা থামিয়া গেছে, শিখীরা নাহি নাচে,
নিকষ-কালো আকাশে নাহি মেঘের গুরু গুরু,
পাই না দেখা কাহার? কোথা তবুও জানি আছে,
যাহার সুরে অশ্রু ঝরে, বক্ষ দুরু দুরু।

শরতে চলে স্রোতস্বিনী কলধ্বনি তুলে,
ফুলেরা ফোটে যেমন-ধারা ফুটিত তারা আগে।
ধরণী যায় বৃষ্টি-ঝরা বেদনা তার ভুলে,
দ্যুলোক থেকে রৌদ্রে কোন্ মাধুরী এসে লাগে

প্রকৃতি আসে মোহন তার পুরানো রূপ ধরি,
বর্ষ পরে বর্ষে তার দেখি যে সেই হাসি,
যুগান্তরে সে রূপে আজো হৃদয় ওঠে ভরি,
সে নহে মোর অপরিচিতা, তাহারে ভালবাসি।

তেমনি রাতি, তেমনি দিবা, তেমনি শশী-রবি,
মমতাময়ী তেমনি ধরা শ্যামাঞ্চলে ঢাকা,
নদীর জলে তেমনি কাঁপে নীল-নভের ছবি
হিল্লোলিত বক্ষে তার লক্ষ তারা আঁকা।

তাহারা আছে, থাকিবে তারা এমনি যুগে যুগে,
রূপান্তর-চক্রে কোন্ আমরা শুধু ফিরি,
তৃষ্ণাভরা নয়নে তাই এ চাহে ওর মুখে,
প্রাণে-প্রাণে অশ্রুনদী বহে যে ধীরি ধীরি।

নিজের পানে পরের পানে চাহি যে বারে বারে,
প্রহেলি-ভরা জীবন এ যে, পড়ে না সে ত ধরা।
জীবনে আমি ভাবি যে চিনি, চিনি না তবু তারে,
সে নহে শুধু অশ্রু-হাসি দুঃখ-সুখে গড়া।

আমরা চলি রূপ হতে যে রূপান্তর-পানে,
হায় রে, পরিবর্ত্তনে সে সাধ্য কি যে রুধি?
তাই তো স্মৃতি স্বপ্ন-রূপে ফুটিয়া ওঠে গানে;
নিয়তি নাহি ফিরিয়া চাহে, রহে সে আঁখি মুদি'।

আমরা থাকি না-থাকি তাহে কি-ই বা আসে যায়?
প্রকৃতি থাকে, পৃথিবী থাকে, প্রেম সে থাকে, প্রিয়।
জীবনে আমি জেনেছি—ইহা কেমনে বলি হায়,
জীবন সে যে অনির্ব্বচনীয়।

শারদ তর্পণ

শ্রীকালীপদ ঘটক

আশ্বিন এলো ফিরে
আবার হাসিছে কাশের গুচ্ছ গণ্ডক নদী তীরে।
জলভরা মেঘ নিয়েছে বিদায়
সবুজ ছড়ায়ে তৃণ লতিকায়,
নবীন প্রভাত উঁকি দিয়ে যায় নিতি মোর বাতায়নে ;
দুয়ারে দাঁড়ায়ে শারদ লক্ষ্মী সে কথা ছিল-না মনে।

আমার নিরালা নিভৃত কুঞ্জে
এলোমেলো সুরে মধুপ গুঞ্জে
উন্মনা আজি কেন মধুকর ফুলে কি জাগে' নি মধু
কানে কানে তার সে সুরবাহার গাহে না কি ফুলবধূ!

ফুটেছে গুচ্ছ মাধবীলতায়,
বেড়া ভরে গেছে অপরাজিতায়,
রঙ ফিরেছে কি পাতাবাহারের ? সহসা দেখিনু চেয়ে—
জানি না কখন কুঞ্জ আমার ফুলে ফুলে গেছে ছেয়ে।

ফুটেছে গোলাপ রজনীগন্ধা,
হাসনুহানার টুটেছে তন্দ্রা,
দীঘল আগল ঘোমটা খসায়ে চেনা-বৌগুলি হাসে ;
ঝরা শেফালীর আলপনা আঁকা শ্যামল দূর্ব্বাঘাসে।

স্থলপদ্মের কুঁড়ির আগায়
আজ শুধু রাঙা রঙ ঝরে নাই,
ঈষৎ মেলিয়া গৈরিক দল চাহিয়া শূন্য পানে
আধ ফোটা কলি অরুণ আঁখির করুণ দৃষ্টি হানে।

এ ফুল-বাসরে ওরে ও কমল,
তোর মুখে কেন হাসি নাই বল ;
শিশিরকণায় নয়ন আসারে কি ব্যথা পড়িছে ঝরি,
বেদনা যে তোর গুমরিয়া ফিরে ফুলে ফুলে সঞ্চরি!

রাতের আঁধারে মুখখানি ঢাকি
আমার বুকের চাপা কান্না কি
শুনেছিস কভু কান পেতে মোর নিভৃত শিয়রে জাগি ;
স্বপ্ন যেথায় স্বপনে জড়ায়ে কাঁদে স্বপনের লাগি।

জানি তোর বুকে বাজে সেই ব্যথা—
জানি জানি তোর মনের বারতা,
মনে পড়ে সেই অতীত দিনের মধুময় শারদীয়া,
[illegible] সমতী সাজাত নিশা।

এই সে কুঞ্জ এই সে বিতান,
কত লুকোচুরি মান অভিমান ;
কত দিন কত মাধবী সন্ধ্যা, কত উৎসব রাতি,
হেথায় দু'জনে কেটেছে কূজনে চাঁদেরে করিয়া সাথী।

কত দিন রচি' বাসক-শয়ন
ঈষৎ হাসিয়া বিকচ নয়ন
দিয়েছে সে মোর কণ্ঠে জড়ায়ে কুসুমের মালাগাছি,
ও তনু পরশ সোহাগে ছানিয়া অঙ্গে যে মাখিয়াছি।

কি যে মায়া তার দু'চোখে জড়ান
অধরে হাসির যূথিকা ছড়ান,
সিঁথিমূলে তার খেলিত রঙ্গে তরুণ অরুণ-লিখা ;
সে-হারা জীবন সাহারা মরু যে, স্মৃতি শুধু মরীচিকা।

সবই আছে শুধু সে আজিকে নাই
আঁখিজলে সে যে নিয়েছে বিদায় ;
জীবনে যে ধন হারাল সে জন ফিরে কি পেয়েছে তারে,
শেষের শরণ শঙ্কাহরণ মরণ-সিন্ধুপারে ?

সেথা কি ধরায় ধূলিরে স্মরিয়া
ক্ষণেকের তরে সকরুণ হিয়া
ঝরে নাকি তার, নয়নপ্রান্তে দুটি ফোঁটা আঁখিজল,
মায়াঘেরা এই ধরণীর লাগি করে নাকি টলমল!

আজি এ শারদ প্রভাতবেলায়
বোধনের বাঁশী রোদনে মিলায়,
চাঁদোয়ারা তটে মনে পড়ে এক মেঘলা মেদুর দিনে,
ভাসায়ে দিয়েছি সোনার প্রতিমা এই ভরা আশ্বিনে।

কাশবনে ঘেরা নীল নদী জল,
নীল কণ্ঠে কি পিয়ালো গরল ?
কৈলাস বুঝি লুটায়ে পড়েছে দেবীর চিতার প'রে,
মূর্চ্ছিত সেথা সতীহারা শিব বেদনার বালুচরে।

দেখেছি সে ছবি দুটি চোখ ভরে',
আঁকা আছে আজো মনের গভীরে ;
সে চিতার ছাই অঙ্গে মেখেছি, অস্থির মালা গেঁথে
কতবার বুকে দুলায়েছি তার ছোঁয়াটুকু ফিরে পেতে।

জুড়াল না হিয়া, ভরিল না বুক,
মনে পড়ে সেই একখানি মুখ ;
স্মরণের তীরে একা বসে' আমি জপি শুধু তাঁরি নাম
কাশবনে সেথা কাঁদে আশ্বিন অবিরত অবিরাম।

তারকার তপস্যা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

(নাটিকা)

পাত্র-পাত্রীগণ :

মঞ্জরী (উচ্চশিক্ষিতা তরুণী)
মঞ্জুল (মঞ্জরীর প্রেমমুগ্ধ তরুণ)
অনিমেষ (মঞ্জরীর দাদা)
কুহেলি (মঞ্জরীর বান্ধবী)
কুঞ্জবাবু (মঞ্জরীর পিতা)
হরিমতী (মঞ্জরীর মাতা)
নবীন (মঞ্জরীর প্রতিবেশী কিশোর)
রামু (কুঞ্জবাবুর বাড়ীর চাকর)
মোক্ষদা (কুঞ্জবাবুর বাড়ীর ঝি)
গোবিন্দ ডাক্তার (কুঞ্জবাবুর ফ্যামিলী ডাক্তার)
হিমাঙ্গ ডাক্তার (পাগলের ডাক্তার)
ভৈরব বাঁড়ুয্যে ও অন্যান্য ভদ্রলোক,
ললিতা, মাধবী, কমল, অরুণ
(পিক্‌নিক্‌ পার্টির মেম্বার)
কফি-হাউসের খানার্থিগণ ও বয় ।

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতার একটি অভিজাত কফি-হাউসের একাংশে। কলেজ-ফেরত কয়েকটি তরুণ-তরুণী তিন-চারিখানি টেবিলের চারপাশের চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছে ও কথোপকথন করিতেছে। একটি টেবিলের সামনের চেয়ারে মঞ্জরী। টেবিলের উপরে এক পাশে বই-খাতা। হাতে একপাত্র ধূমায়িত কফি। জানালা দিয়া রাস্তার জনপ্রবাহ দেখা যাইতেছে। মঞ্জরী সেই দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে কফির পাত্রে চুমুক দিতেছে। সেই টেবিলে আর কেহ নাই। বয় আসিয়া খোঁজাখোঁজ করিয়া গেল। অন্য টেবিলে বিল রাখিয়া দুই-একখানি এলোমেলো চেয়ার ঠেলিয়া ঠিক করিয়া দিল।

এই সময় মঞ্জুল প্রবেশ করিল। মঞ্জরীকে দেখিতে পাইয়া তাহার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল ও বয় আসিয়া দাঁড়াইতে এক কাপ কফির অর্ডার দিল।]

মঞ্জুল। তোমার বাবা কি বলেছেন জান ?

মঞ্জরী। না তো।

মঞ্জুল। কথাটা পেড়েছিলেন সম্পর্কে আমার দাদু অবিনাশ-বাবু। ঐ যে,—তোমার বাবার কোর্টের পুরোনো উকীল। তোমার বাবা স্পষ্ট বলেছেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে অসম্ভব।

মঞ্জরী। তারপর ?

মঞ্জুল। তারপর লিখেছেন কালিদাসের উপমা, [illegible] বামনঃ। অর্থাৎ, তোমাকে পাওয়া [illegible] ।

মঞ্জরী। দাদা কিছু বলেছেন তোমাকে ?

মঞ্জুল। না, তবে কথাটা শুনে অনিমেষ দুঃখিত হয়েছে বলে মনে হয়।

[এই সময়ে বয় কফির কাপ টেবিলের উপর রাখিয়া গেল]

মঞ্জরী। এখন তা হলে উপায় ?

মঞ্জুল। ভুলে যেতে হবে আমাদের অতীত জীবন। একই কলেজে পড়া, একসঙ্গে টেনিস খেলা, সিনেমা দেখা, কলেজের ড্রামাটিক ক্লাবে অভিনয় করা। আর ভুলে যেতে হবে তোমাদের বাড়ীতে আগের মত যাওয়া।

মঞ্জরী। সে কি! তুমি আর আমাদের বাড়ীতে যাবে না ?

মঞ্জুল। হয়ত যাব একদিন, যেদিন তুমি এক বিশিষ্ট শুভ লগ্নে ফুলে-চন্দনে সেজে অপেক্ষা করবে আর এক ভাগ্যবানের। যাব তোমার কুমারী-জীবনে তোমায় শেষ দেখা দেখতে, তোমায় শোনাতে আমার বিদায়-বেলার বাণী, বেলাশেষের গান,—(মৃদু হাস্য করিয়া কফির কাপে চুমুক দিল)

মঞ্জরী। আঃ, থাম। এত বেশী সেন্টিমেন্টাল হওয়া ঠিক নয়।

মঞ্জুল। তোমার দাদা অনিমেষ আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। মনে পড়ে, সে দিনের সেই ফ্রক-পরা কিশোরী মঞ্জরী কেমন করে পঞ্চতন্ত্র নেলসন রীডার ছেড়ে কালিদাস শেক্সপীয়ার হাতে নিয়ে হঠাৎ শাড়ী-পরা তরুণী হয়ে উঠল, সে এভলিউশন ত আমার অজানা নয়। তার পর কলেজ ম্যাগাজিনে আমি কবিতা লিখেছি তোমার উদ্দেশে, তুমিও লিখেছিলে আমারই উদ্দেশে। মনে পড়ে, আমার কবিতা "একটি নব-মঞ্জরীর প্রতি" ? তুমি তার পরের সংখ্যায় লিখলে "মঞ্জুল কাঞ্চন এল"। এই নিয়ে ক্লাসে কত ঠাট্টা, কত হাসাহাসি চলেছিল, মনে পড়ে ? তুমি তখন পড়তে ফার্স্ট ইয়ারে, আমি পড়তাম ফোর্থ ইয়ারে।

মঞ্জরী। আমার ক্লাসের কুহেলি সেনের কথাটা কি ভুলে গেলে ? আমাদের দু'জনার নামে একটা গানই রচনা করে একদিন লাগিয়ে দিলে সে নোটিশ-বোর্ডে। গানটা মনে আছে ত ?

মঞ্জুল। খুব মনে আছে,—মঞ্জুল মঞ্জরী ফুটবে কবে ?— হাঃ হাঃ (হাস্য)

[এই সময়ে কোন কোন টেবিল হইতে দুই কেহ উঠিয়া গেল, নূতন খানার্থী কেহ কেহ আসিয়া বসিল।

বয় খোঁজাখোঁজ করিল।]

মঞ্জরী। সত্যি দেখ, কুহেলি সেনের জীবনটা কেমন [illegible] বদলে গেল। বি-এ ফেল করে এই [illegible] সে সিনেমায় ঢুকেছে, এখন তার কত নাম! আগে [illegible] মধ্যে [illegible] থাকত সে আমাদের

বাড়ীতে, এখন আর সময় পায় না আসবার। কিছুদিন আগে আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিল সে, লিখেছিল, আর এক জগতে বাস করছে সে এখন। শুধু আর্ট আর আনন্দ, আনন্দ আর আর্ট। তার "তৃষার মরীচিকা" ছবিতে কি চমৎকার প্রেমের অভিনয় করেছে সে, দেখ নি?

মঞ্জুল। তুমিও ত চমৎকার অভিনয় করতে পার, ঢুকবে সিনেমায়?

মঞ্জরী। (হাসিয়া) কি পার্ট প্লে করব বলত?

মঞ্জুল। কেন, হিরোইন।

মঞ্জরী। (হাসিয়া) তুমি হিরো হবে ত?

মঞ্জুল। সত্যিকারের হিরো হওয়াটা চলল না বলে, নকল হিরো হয়েই থাকব আমি, এইটিই কি চাও তুমি?

মঞ্জরী। দোষই বা কি?

মঞ্জুল। দেখ মঞ্জরি, তুমি হিরোইন্ হলে তোমার সব ছবিতেই আমিই যে হিরো হয়ে থাকব, এটা ত হতে পারে না। যখন এক হিরোর বদলে অন্য হিরো এসে প্রেমালাপ সুরু করে দেবে, তখন? আর্ট আর আনন্দ তোমাকে নিয়ে যাবে নতুন নতুন পথে, পারবে চলতে?

মঞ্জরী। বাধাই বা কি? (হাস্য) অন্ততঃ তোমার ত ঈর্ষা হবে।

মঞ্জুল। আমার ঈর্ষা ঠিক সেখানে নয় মঞ্জরি! ঈর্ষাটা আসবে তোমার অভিনয় দেখে, ভাবব কলেজের সব সোশ্যাল ফাংশানে যেমন "নটীর পূজা," "তপতী", "চণ্ডালিকা", "বিসর্জ্জন," "শাপ-মোচন","রক্তকরবী" প্রভৃতির শিল্পী মঞ্জরী দেবী বৃহত্তর ক্ষেত্রে পাবে বৃহত্তর সীমানা, যে সীমানায় একদিন হারিয়ে যাবে এই নগণ্য মঞ্জুল।

মঞ্জরী। (মঞ্জুলের বাম হস্তখানি নিজের হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া) মঞ্জরীর জীবনে যেদিন মঞ্জুল যাবে হারিয়ে, সেদিন সে শুকিয়ে পড়বে ঝ'রে। এ স্মরণীয় কথাটা কি তোমাকে বার বার মনে করিয়ে দিতে হবে?

মঞ্জুল। (হাসিয়া) নারীর প্রথম প্রেমের আবেগে যেটাকে অবিস্মরণীয় বলে মনে হয়, এমন দিন আসে যখন সেটাকে বিস্মরণ করাই তার পক্ষে একান্ত কাম্য হয়ে পড়ে।

মঞ্জরী। সব জায়গায় তোমার এ ফিলোসফি খাটে না মঞ্জুল! আমার জীবনে ত নয়ই।

মঞ্জুল। কেন বল ত?

মঞ্জরী। নারী সবকিছু ভুলতে পারে, ভুলতে পারে না শুধু তার প্রথম প্রেম। সেই প্রথম প্রেমের আলোয় যে এনেছে তার অর্ঘ্য আমার কাছে, সে যে মঞ্জুল ছাড়া আর কেউ নয়, এ কথা কি তোমাকে বার বার মনে করিয়ে দিতে হবে?

মঞ্জুল। এখন তা হলে কি করবে?

মঞ্জরী। জমিটি বল না।

মঞ্জুল। তোমার বাবার ধারণা তোমাকে পেতে হলে যেসব দুর্লভ গুণ থাকা আবশ্যক, সেসব কিছুই নেই আমার। আমি জমিদার নই, ব্যাঙ্কার নই, ব্যারিষ্টার নই, চার্টার্ড একাউট্যান্ট নই, সম্প্রতি হয়েছি সামান্য একজন আই-এ-এস—তুমি ভুল করো না মঞ্জরি, তোমার বাবার কথা শোন, তিনি তোমাকে তাঁর মনোমত পাত্রে অর্পণ করে সুখী হোন্, তুমিও সুখী হও।

মঞ্জরী। তুমি কি ও সব কথা বলে আমার মনে আঘাত দিতে চাও?

মঞ্জুল। আঘাত দিলে আঘাতই পেতে হয়, এটাই জগতের নিয়ম। তা সে আঘাত যে ভাবেই আসুক না কেন? কোন দিন ত তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি মঞ্জরি। যদিও বা হঠাৎ আঘাত দিয়ে ফেলেছি বলে মনে করো, সে আঘাত যে আমারই বুকে ফিরে এসেছে শত বার। তোমাকে পাবার আশা আমার পক্ষে কবির ভাষায় 'ডিজায়ার অফ দি মথ্ ফর দি ষ্টার'।

মঞ্জরী। মায়ের কিন্তু আমাদের বিয়ের ব্যাপারে খুব মত আছে। কত বার বাবার কাছে তোমার কত সুখ্যাতি করেছেন।

মঞ্জুল। আমার সুখ্যাতি বা অখ্যাতিতে কি আসে যায় তোমার বাবার মত একজন প্রবীণ ডিসট্রিক্ট এণ্ড সেসন্স জজের। প্রতিদিন তাঁর কোর্টে সুখ্যাতি ও কুখ্যাতির চরম অভিনয় হয়। এক পক্ষ বলে, আসামী নির্দ্দোষ, অপর পক্ষ বলে দোষী। তাঁর যে বিচারের মাপকাঠিতে আমার কোন মূল্যই নেই, অন্ততঃ যোগ্যতা নেই তোমাকে পাবার, সে বিষয়ে আর আলোচনা করে ফল কি? অধিকারই বা কোথায় আমার?

মঞ্জরী। কেন, ভালবাসার অধিকার।

মঞ্জুল। যে ভালবাসা জীবনে দানা বাঁধবার সুযোগ পায় না, সেটা শুধু একটা পাসিং সেন্টিমেন্ট, একটা ক্ষণিকের নেশা।

মঞ্জরী। সেটা হয় তোমাদের কাছে। আমাদের কাছে কিন্তু তা নয়। ঐ সেন্টিমেন্ট বা নেশাটাই নারীর কাছে পরম বাস্তব হয়েই দেখা দেয়। ওরই ওপরে এক দিন গড়ে ওঠে প্রেমের তাজমহল।

মঞ্জুল। (মৃদু হাসিয়া) তাজমহল চিরদিনই সত্যিকারের পাষাণ হয়ে আছে মঞ্জরি, ওকে জীবন্ত করে রেখেছে শুধু মানুষের মন। সেখানে প্রেমের স্বপ্নটাই বড় নয়, বড় হ'ল প্রেমের সার্থকতা।

মঞ্জরী। আমাদের উভয়ের জীবনে যদি সে সার্থকতা কোন দিন আসে?

মঞ্জুল। দেখা যাচ্ছে বর্ত্তমানে সে পথে বহুবন্ধ বিঘ্নাঃ।

মঞ্জরী। কিন্তু কবি বলেছেন: মেঘ দেখে তুই ভরিস নাকো, আড়ালে তাঁ'র সূর্য্য হাসে।

মঞ্জুল। তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি মঞ্জরি, ইংরেজীতে যাকে বলে ট্রাই, ট্রাই, ট্রাই এগেন। এই না?

মঞ্জরী। হাঁ তাই। নিজেকে অত অবিশ্বাস করছ কেন? (হাসিয়া) ভগবানের দোষ কি?

মঞ্জুল। কিন্তু এ যে হারানো চাঁদকে ফিরে পাবার জন্যে প্রশান্ত মহাসাগরের তপস্যা মঞ্জরি।

[এই সময়ে অনিমেষ কফি-হাউসে প্রবেশ করিল এবং মঞ্জরী ও মঞ্জুলকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের টেবিলে আসিয়া এক-খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। বয় আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহাকে এক কাপ কফির অর্ডার দিয়া মঞ্জুলের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল।]

অনিমেষ। ভালই হ'ল তোদের দেখা পেয়ে গেছি, আমার জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছিস নাকি? কিন্তু ঠিক সময়েই এসেছি আমি। কাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে আমাদের এন্যুয়াল পিকনিকে যাচ্ছিস ত তোরা?

মঞ্জুল। সার্টেনলি অনিমেষ, এটা যে কলেজের একটা ইউনিক ফাংশন।

মঞ্জরী। আজ আর আমার ইউনিভার্সিটির ক্লাস নেই দাদা—চল না, একসঙ্গেই বাড়ী যাই। ফাংশন সম্বন্ধে ডিসকাস করা যাবে।

[বয় আসিয়া টেবিলে এক কাপ কফি রাখিয়া গেল।]

অনিমেষ। (কফির কাপে চুমুক দিয়া) কালকের পিকনিকটা আশা করা যায় খুবই হ্যাপি হবে মঞ্জুল। কলেজের প্রাক্তন ষ্টুডেন্ট-দের সঙ্গে বর্ত্তমান ষ্টুডেন্টদের মিলন, এ মেমোরেবল ইনসিডেন্ট ইন্‌ডিড! আর সবচেয়ে বড় কথা, আমিই এর অর্গানাইজার—হাঃ—হাঃ—(হাস্য)

মঞ্জরী। প্রোগ্রামে কি কি আছে দাদা?

অনিমেষ। নো প্রোগ্রাম—যার যা ইচ্ছা—খাও-দাও, গান গাও, গল্পগুজব করো, ব্যাডমিন্টন খেল, তাস চালাও—সিমপলি এ মিটিং অব দি ওল্ড এণ্ড দি নিউ, বয়েজ এণ্ড গার্লস—প্রোফে-সাররাও অনেকে যাবেন।

[কফির কাপ নিঃশেষিত করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। বয় আসিয়া দাঁড়াইতেই অনিমেষ বলিল: "বিল নিয়ে এস"—বয় চলিয়া গেল।]

অনিমেষ। কাল সকালে আটটায় পৌঁছুতে হবে—এটা যেন মনে থাকে মঞ্জুল। আমি ও মঞ্জরী ঠিক সময়ে ষ্টার্ট করব।

মঞ্জুল। ও. কে. অনিমেষ। ঠিক সময়েই হাজির হবো।

[বয় আসিয়া টেবিলের উপর বিল রাখিতেই অনিমেষ মনিব্যাগ বাহির করিয়া একটা নোট বয়ের হাতে দিল। বয় চলিয়া গেল।]

অনিমেষ। নাউ লেট'স গো—

[অগ্রে অনিমেষ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ মঞ্জুল ও মঞ্জরী কফি-হাউস হইতে বাহির হইয়া গেল।]

([illegible])

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কুঞ্জবাবুর বাড়ীর একটি কক্ষ। লম্বা ইজিচেয়ারে কুঞ্জবাবু শায়িত। মাথার চুল প্রায় সবই পাকিয়া গিয়াছে। সাদা গোঁফ, হৃষ্টপুষ্ট শরীর। রামু চাকর গড়গড়ার মুখে কলিকা বসাইয়া পাখার বাতাস দিতেছে। পরে নলটি কুঞ্জবাবুর হাতে দিয়া রামু একটু সরিয়া দাঁড়াইল। হরিমতী প্রবেশ করিলেন। পরনে চওড়া কস্তাপাড় শাড়ী। হাতে একটি ডিসে জলখাবার। তিনি ডিস টীপয়ের উপর রাখিলেন। তাঁহার পশ্চাতে মোক্ষদা ঝি আসিয়া সেই টীপয়ের উপর এক গ্লাস জল রাখিল।]

হরিমতী। (মোক্ষদার প্রতি) দেখ্ মুখী, আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি ঠাকুরকে। তুই শুধু আলু আর পেঁয়াজগুলো আলাদা আলাদা কুটে দিবি, বুঝলি? আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

মোক্ষদা। সে আমি সব ঠিক করে নোব মা। (প্রস্থান)

হরিমতী। (রামুর প্রতি) দেখ্ রামু, বাজার থেকে সবকিছু এনেছিস, আর আদা আনতে ভুল করলি? যা, এক্ষুণি যা, আদা কিনে নিয়ে আয়। আর দেখ্, মোক্ষদাকে বলে দিস, আলু পেঁয়াজ কোটা হয়ে গেলে যেন আদাটা বেঁটে রাখে।

রামু। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) মাঝে মাঝে আমার ঐ কেমন ভুল হয়ে যায় মা,—যাই আদা নিয়ে আসি,—আদা আদা—আদা—আদা—

(মুখস্থ করিতে করিতে প্রস্থান)

[হরিমতী একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া কুঞ্জবাবুর পার্শ্বে বসিলেন।]

হরিমতী। (মৃদু হাসিয়া) ক'দিন থেকেই আবার কথাটা বলব বলব মনে করছিলাম, বললে রাগ করবে না তো?

কুঞ্জবাবু। (গড়গড়া টানিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া) রাগ করবো কেন? কথাটা বলেই ফেলো না।

হরিমতী। মঞ্জরীর ত আর বিয়ে না হলে ভাল দেখায় না। বি-এ পাস করে এম্-এ পড়ছে,—এবার বিয়ে না দিলে লোকনিন্দে হবে যে।

কুঞ্জবাবু। হুঁ,—তা ত বুঝতেই পাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা একটু চটপট বলে ফেল, অত গৌরচন্দ্রিকা কেন?

হরিমতী। আমি বলি, আমাদের অনিমেষের বন্ধু ঐ মঞ্জুলের সঙ্গে মঞ্জরীর—

কুঞ্জবাবু। (গড়গড়ার নল ফেলিয়া দিয়া ইজিচেয়ারে অর্দ্ধোত্থিত ভাবে বসিয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে) বার বার তোমাকে বলেছি মঞ্জুলের হয়ে ওকালতি করতে এসো না, ও-রকম ছেলে বাজারে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর তা ছাড়া মঞ্জুলের বাপ ছেত্রো চক্কত্তি হ'ল আমার কোর্টের মুহুরী। রাত দিন আমার কাছে হাতজোড় করে সাধু সাধু করে। [illegible] ঐ মঞ্জুল। ওর সঙ্গে দেবো আমার মেয়ে মঞ্জরীর বিয়ে? তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল, গিন্নী?

হরিমতী। মাথা আমার খারাপ হতে যাবে কেন, হয়েছে তোমারই। তা না হলে আজ তুমি মঞ্জুলকে চিনতে পারছ না। কথায় বলে পিদীমের নীচেই অন্ধকার। দেখতে পাবে কেন? রায় লিখে লিখে চোখ যে কানা হয়ে গেছে। মঞ্জুল যে কত ভাল স্বভাবের ছেলে তা তুমি বুঝবে কি করে? বরং অনিমেষকে জিগ্যেস করে দেখ।

কুঞ্জবাবু। করেছি, করেছি অনেক জিগ্যেস করেছি। যেমন তুমি, তেমনি তোমার ঐ অনিমেষ, সব এক মতের দল। অনিমেষটা বলে কিনা মঞ্জুলের মত ভাল ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। (অনিমেষের উদ্দেশে) আরে বাপু, তুই দেখেছিস আর ক'টা? জেলায় জেলায় বদলী হতে হতে লোকচরিত্র জানতে আমার আর বাকী নেই। পলিটিক্যাল আসামীগুলোকে দেখেছিস কখনও? সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, চোখে দীপ্তি, বুক ফুলিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াত। স্পষ্ট মুখের ওপর বলত—"মিথ্যে বলব কেন, হাঁ করেছি এ কাজ। শাস্তি দিন আমাদের।" চশমার ফাঁক দিয়ে দেখে নিতাম তাদের মুখগুলি। কেমন যেন মায়া হ'ত। কিন্তু রায় লেখবার বেলায়—যাক্ সে কথা। বল ত, মঞ্জুল দাঁড়াতে পারে তাদের কাছে? পারে?

হরিমতী। ও সব কথা ছেড়ে দাও। আমি কিন্তু অনেক কিছুই লক্ষ্য করেছি, তোমার মঞ্জরীও মঞ্জুল বলতে অজ্ঞান।

কুঞ্জবাবু। দেখ, গিন্নী, দোষটা কিন্তু তোমার। মঞ্জুলের এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করে দাও, দেখবে অজ্ঞানের জ্ঞান ঠিক ফিরে এসেছে।

হরিমতী। বাইরের মেলামেশা বন্ধ করবে কি করে?

কুঞ্জবাবু। কড়া নজর রাখতে হবে। অনিমেষকে বলে দেবে। রামুকে সঙ্গে পাঠাবে কলেজ যাবার সময়। তা ছাড়া মঞ্জরীর অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে গেলে, তখন সে চিনতেই পারবে না মঞ্জুলকে। এ আমি অনেক দেখেছি। কথায় বলে, মেয়েমানুষের মন, সামনে যতক্ষণ। নতুন অবস্থা মানিয়ে নিয়ে চলতে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে হাজার গুণ পটু।

হরিমতী। থাক্, অত আর ব্যাখ্যানে কাজ নেই। যা বলি তাই করো। এই মাসেই মঞ্জুলের সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ে দিয়ে দাও।

কুঞ্জবাবু। আমি কি করবো জান? স্পষ্ট মঞ্জুলটাকে বলে দেবো—তুমি আর এ বাড়ীতে এসো না। বাস্।

হরিমতী। তাতে কিন্তু ফল অন্য রকম দাঁড়াবে। ছেলে মেয়ে সব বিগড়ে যাবে। শেষে একদিন দেখবে অনিমেষ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিচ্ছে।

কুঞ্জবাবু। (অধৈর্য্যভাবে) ত্যজ্যপুত্র করবো, সম্পত্তি মিশনে দান করে যাবো। বাইল—

হরিমতী। অত ভয় দেখাচ্ছ কা'কে। আজকালকার ছেলে-মেয়ে অত ল' ক' মানবে না। কেন শুধু শুধু একটা কেলেঙ্কারী করবে। আমি মেয়ের মা, আমি যতটা বুঝি, তুমি তার কতটা বোঝ, শুনি? এত দিন শুধু এজলাসে বসে হাকিমী করে এসেছ, সংসারের কোন খবর রেখেছ কি? এখন আর চোখ রাঙালে চলবে কেন? সংসারের কিসে ভাল হবে সে ভার আমার, তোমার নয়। বেশী হাকিমী মেজাজ দেখাতে গেলে কি হবে জান?

কুঞ্জবাবু। কেন কি হবে?

হরিমতী। শুধু অনিমেষ বেগড়াবে না, মঞ্জরীও বেগড়াবে।

কুঞ্জবাবু। মঞ্জরী আবার কি করবে?

হরিমতী। ঐ ত, ওকেই বলে হাকিমী বুদ্ধি। আইনের খবর ত সব রাখ, মেয়েমানুষের মনের খবর কতটা রাখ, শুনি? আমার শুধু মাথার সামনে দুটো চোখ নেই, মাথার পিছনেও দুটো চোখ আছে। আমি সব দেখতে পাই, সব বুঝতে পারি। মঞ্জুলকে মঞ্জরী ভালবেসে ফেলেছে গো, ভালবেসে ফেলেছে।

কুঞ্জবাবু। (ক্রুদ্ধস্বরে) তুমি ভালবাসতে দিলে কেন?

হরিমতী। হা আমার বরাত! ভালবাসা বুঝি হুকুম মেনে চলে? কার হুকুমে তুমি আমাকে প্রথম ভালবাসতে শিখেছিলে শুনি?

কুঞ্জবাবু। আরে, আইনের ভুল করছ গিন্নি, তুমি হলে আমার বিয়ে-করা বউ। ভালবাসা আসতে বাধ্য।

হরিমতী। ও সব বোঝা তোমার হাকিমী বুদ্ধিতে চলবে না। আজকালকার ছেলেমেয়ে একসঙ্গে কলেজে পড়ছে, একসঙ্গে পার্টিতে মিশছে, একসঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে—তুমি বন্ধ করবে কি করে?

কুঞ্জবাবু। হুঁ—(গড়গড়ার নল তুলিয়া লইয়া ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।)

হরিমতী। আর একটা কথা, এই মাসেই যাতে বিয়েটা হয়, তার ব্যবস্থা করো। শেষে অমন ছেলে হাতছাড়া হবে। ভাল চাকরী পেয়ে হয়ত দেশ ছেড়েই চলে যাবে।

কুঞ্জবাবু। তার আগে আমিই দেশছাড়া হয়ে যাবো। থাক তোমরা।

হরিমতী। অত যে ড্যাবড্যাবাচ্ছ, কোথায় যাবে শুনি? মুরোদ ত কত, রাতদিন শুধু 'গিন্নি' আর 'গিন্নি'। বলি, আমি না থাকলে একদণ্ডও বাড়ীতে চলে তোমার? বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে দেখছি। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও মুখী, রামু ফিরে এলে কর্তার জন্যে ওভালটীন তৈরি করে আনতে বল, বুঝলি?

(পট পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় দৃশ্য

[পিকৃনিক্ দৃশ্য। বোটানিক্যাল গার্ডেনের একাংশ। এক-পার্শ্বে একটি বেঞ্চ। দুই-তিনটি সুসজ্জিতা তরুণ-তরুণী ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিতেছে। বেঞ্চে মঞ্জুল, মঞ্জরী ও অনিমেষ। অনিমেষ একটি ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। আবৃত্তিশেষে মঞ্জুল ও মঞ্জরী হাসিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে তাহাদের হাসির সঙ্গে হাসি মিলাইয়া দুইটি তরুণ ও দুইটি তরুণী ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট-হাতে প্রবেশ করিল]

অনিমেষ। কি

মাধবী। আমি আর ললিতা এক সেটে ছিলাম, অরুণবাবু ও কমলবাবুকে আমরা মিক্স লাভ-এ হারিয়েছি।

অনিমেষ। (হাসিয়া) ছাটস গুড, আই কনগ্র্যাচুলেট ইউ ফর ইওর স্পেলেনডিড ভিক্টরি—সত্যি অরুণ,তা হলে হেরে গেলে?

অরুণ। হেরেই ত আছি আমরা। লভ সম্পর্কে চিরদিনই হার আমাদের।

ললিতা। নট নেসেসারিলি, কখনও আমরা উইন করি, আপনারা লুজ করেন, কখনও-বা ভাইসি ভার্সা। (হাস্য)

কমল। হেরে যাওয়ার মধ্যেও আনন্দ থাকে, যদি সে পরাজয় আসে আপনাদের মত—

অরুণ। তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ। শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং—

মাধবী। থাক্, শিখরিদশনা বলছেন আমাদের? দ্যাটস সিম্পলি হরিবল্। তা ছাড়া শ্লোকটা আদিরসাত্মক তা জানেন?

ললিতা। দেখুন অরুণ বাবু, কালিদাসের যুগের কথা এ যুগে অচল, তাই এতে আমাদের রাগ করবার কিছু নেই—তার চেয়ে বরং এ যুগেই ফিরে আসুন—চলুন একটু চা খাওয়া যাক—

কমল। ঠিকই ত, আরও গিয়ে দেখা যাক পোলাও মাংসের কত দেরী।

[কমল, অরুণ, ললিতা ও মাধবীর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

অনিমেষ। পার্টিতে লোক হয়েছে মন্দ নয়, বড় বটগাছতলায় গানবাজনার আসর বসবে এবার। আর্টিষ্টদের অনেকেই এসেছেন—যাবি নাকি তোরা ওদিকে?

মঞ্জুল। নিশ্চয়। তবে আরম্ভ হলেই যাওয়া ভাল। আগে থেকেই ভিড়ের মধ্যে চুপ করে বসে থাকা ইমপসিবল্।

মঞ্জরী। আমারও সেই মত দাদা।

অনিমেষ। বেশ, তোরা এখন এখানেই থাক্। আমি একটু ঘুরে আসি, আর দেখে আসি, ওদের দেরী কত।

[শিস দিতে দিতে অনিমেষের প্রস্থান]

মঞ্জুল। আজ হ্যাপি ডে মঞ্জরি, আকাশে মেঘ নেই।

মঞ্জরী। যদি বলি, আছে।

মঞ্জুল। হৃদয়াকাশে নাকি?

মঞ্জরী। কতকটা তাই।

মঞ্জুল। আকাশ চিরকালের, মেঘ ক্ষণেকের, সুতরাং মাভৈঃ।

মঞ্জরী। মনে পড়ে মঞ্জুল, বছর তিনেক আগে কলেজ-জীবনে একদিন মনে মনে বর্ষায় মেঘকে আমরা দু'জনে বলেছিলাম, হে মেঘ, তুমি আর একটু থাক, আরও একটু বর্ষণ কর। কালিদাস তোমাকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন দূর অলকাপুরীতে; আজ আমরা তোমাকে বলি, স্থির, [illegible] আমাদের মত [illegible] ষ্ট্রীটে স্থির—

মঞ্জুল। সত্যি, সেদিন আমাদের [illegible] একটিমাত্র ছাতায় ছিল পাশাপাশি দু'জনার [illegible], ঐ মেঘেরই কৃপায়।

মঞ্জরী। মনে পড়ে, কুহেলি সেন সেদিন আমাদের কত ঠাট্টা করেছিল, বলেছিল, একই ছাতার নীচে আজ যারা আছে, তারা যে-কোন এক শুভদিনে একই ছাদের নীচে আশ্রয়লাভ করবে না, এ কথা ত স্বয়ং প্রজাপতির খাতায় লেখা নেই। অতএব ব্লেসেড বি সেই ছাতা আর মেঘ।

মঞ্জুল। কলেজ-জীবনের সেই পুরানো পথে আবার যদি চলতে পারতাম মঞ্জরি!

[এই সময়ে কুহেলি সেন প্রবেশ করিল। পোশাকে, ষ্টাইলে, রূপসজ্জায় যেন ঝলমল করিতেছে। কাঁধের উপর দিয়া একটি মূল্যবান্ ভ্যানিটি ব্যাগ ষ্ট্র্যাপে ঝুলিতেছে।]

কুহেলি। পুরানো পথের মায়ায় যে বদ্ধ থাকে, নতুন পথ চলার আনন্দ সে ত পায় না, বন্ধু।

মঞ্জরী। (আশ্চর্য হইয়া হাসিমুখে) অ্যাঁ, কুহেলি! এই একটু আগেই তোর কথা হচ্ছিল ভাই। হঠাৎ এতদিন পরে এ পিক্‌নিকে যে আসতে পারবি তা ভাবি নি। তবু ভাল, যে মনে পড়ল আমাদের।

কুহেলি। হঠাৎ যাদের মনে পড়ে, তুই ত সে দলের নোস মঞ্জরী। (মঞ্জুলকে নমস্কার করিয়া) তার পর মঞ্জুলবাবু, কেমন আছেন?

মঞ্জুল। মোটেই ভাল নয় মিস কুহেলি। আপনার সেই নোটিশ বোর্ডের মঞ্জুল-মঞ্জরীর গান এবার ব্যর্থ হ'ল।

কুহেলি। কেন বলুন ত?

মঞ্জুল। মঞ্জরীর পিতার কঠোর ভ্রুকুটী অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুহেলি। সত্যি?—তা হলে ব্যাপারটা ত মোটেই সুবিধার নয়। এখন তুই কি করতে চাস মঞ্জরি?

মঞ্জরী। ভেবে যে কিছুই ঠিক করতে পারছি না ভাই।

কুহেলি। মঞ্জুল বাবু কি কোনই সুপরামর্শ দিতে পারছেন না? এ রকম ক্ষেত্রে উপন্যাসে বা সিনেমা ছবিতে যা ঘটে থাকে অর্থাৎ ইলোপমেন্ট, মঠ, হিমালয়, সেবাব্রত, শিক্ষিকার চাকুরী, ইচ্ছাকৃত মোটর এক্সিডেন্ট, সিনেমায় অভিনয়—

মঞ্জরী। থাম কুহেলি। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুই বলতে চাস, সিনেমায় অভিনয় করা মেয়েদের হতাশ প্রেমের পরিণাম? তোর নিজের কেসটাও তাই নাকি?

কুহেলি। মেনে নিতে ক্ষতি কি? কলেজে একসঙ্গে পড়বার সময় আমিও ভালবেসেছিলাম একজনকে, তার পর যখন বুঝলাম সে আর একটি মেয়েকে ভালবাসে তখন সেই সহপাঠিনী তিলোত্তমার জন্যে আত্মহারা হলাম।

মঞ্জরী। (হাসিয়া) তোর তিলোত্তমাটি কে ভাই, বল ত।

কুহেলি। তোদের প্রেমের ট্র্যাজিডি দেখে সত্যিই আমি অস্থির হচ্ছি। তবে একটা চমৎকার আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে, এতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে—এ জোগাড় কর, পারবি তুই?

মঞ্জরী। অর্থাৎ—?

কুহেলি। আমি জানি অভিনয় করা তোর জীবনের একটা স্‌প্লেনডিড সাকসেস। কলেজের প্রত্যেক ফাংশনে তুই করেছিস অপূর্ব্ব অভিনয়।

মঞ্জরী। তার পর?

কুহেলি। চ্যারিটি বিগিনস্‌ এ্যাট হোম, মাই ডিয়ারি, চ্যারিটি বিগিনস্‌ এ্যাট হোম, অর্থাৎ, বাড়ীতেই হোক তোর কাজ সুরু।

মঞ্জুল। আপনার কথাগুলো ভেরি ইণ্টারেষ্টিং হয়ে দাঁড়াচ্ছে মিস কুহেলি—আমি যেন দুর্য্যোগময়ী রাত্রিশেষে উষার আভাস দেখতে পাচ্ছি।

মঞ্জরী। এখন আমাকে কি করতে হবে, বল্‌ কুহেলি।

কুহেলি। একটু অভিনয়, পাগল সাজার অভিনয়।

মঞ্জরী। সে কি! পাগল সাজব কেন?

কুহেলি। তা না হলে মঞ্জুল-মঞ্জরী দুলবে না, ফুলবে না।

মঞ্জরী। (হাসিয়া) ওঃ বুঝেছি—কিন্তু ধরা পড়ে যাই যদি?

কুহেলি। অভিনয় পারফেক্ট হওয়া চাই, বুঝলি? মনে কর্‌ তুই এক চিত্র-তারকা, অপূর্ব্ব অভিনয় করে চলেছিস। সব রকম অভিনয়ই করতে হবে তোকে, প্রেমের অভিনয়ও বাদ পড়বে না। (হাসিয়া) মঞ্জুলবাবুকে কো-এক্টর না পেলেও চলবে। তবে পাগলের অভিনয় যাতে মোষ্ট সাকসেসফুল হয় তার জন্যে লজ্জা ভয় সব বিসর্জ্জন দিতে হবে তোকে। শুধু বাড়ীর লোক নয়, পাড়াপড়শীদেরও জানিয়ে দিতে হবে তোর মাথা খারাপ হয়েছে। লজ্জাসঙ্কোচ করলে পাগলের অভিনয় করা চলবে না।

মঞ্জুল। কিন্তু মঞ্জরী যদি ধরা পড়ে যায়?

কুহেলি। পড়বে কেন? সেটুকু সাফল্য আমি প্রত্যাশা করি শিল্পী মঞ্জরীর কাছ থেকে। মঞ্জরী ভুলিস নে তুই চিত্র-তারকা হয়ে গেছিস—হাঁ, তারকা—তোর তপস্যা সার্থক হয়ে উঠবে, এ আমি মুক্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছি।

মঞ্জুল। কিন্তু মিস কুহেলি, মঞ্জরী ত তারকা নয়, ও যে ফ্লাওয়ার, এ মারভেলাস ফ্লাওয়ার।

মঞ্জরী। হাঁ মঞ্জুল, কবি বলে গেছেন—বর্ণ টু ব্লাশ আনসিন, এণ্ড ওয়েষ্ট ইটস সুইটনেস ইন দি ডেজার্ট এয়ার। আচ্ছা, সত্যি করে বল ত কুহেলি, কোন বিপদ নেই ত এতে?

কুহেলি। বিপদ অর্থাৎ মঞ্জুলবাবুকে হারাবার ভয়—এই ত? বিশ্বাস কর্‌ আমাকে, তোর সাফল্যের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। আমি কলেজের নোটিশ বোর্ডে একদিন তোদের যে ভবিষ্যৎ-বাণী ঘোষণা করেছিলাম, আজও তা ভুলি নি। শুনতে চাস?

মঞ্জুল। কিন্তু গানের সুরে। কি বল মঞ্জরি?

মঞ্জরী। না না, মঞ্জুল-কথা নিয়ে ও গান আর শুনব না কুহেলি।

কুহেলি। কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতা একদিন না শুনিয়ে ছাড়বে না, এ আমি বলে রাখছি।

মঞ্জুল। মঞ্জুল-কথাও অভিধানে আছে, মঞ্জরীও আছে, এতে দোষের কি আছে? তা ছাড়া বোটানিক্যাল গার্ডেনের বুকভরা কত মঞ্জুল-মঞ্জরী।

কুহেলি। সত্যিই তাই। তবে শোন্‌—(গাহিতে লাগিল)

(গান)

মধু— মঞ্জুল-মঞ্জরী ফুটবে কবে,
কত আশায় আশায় আর ফাগুন রবে!
আকাশ নিথর নীল তৃষায় হারা,
মাটির ধরণী কাঁদে বুকে সাহারা!
কবে কাজল মেঘের আঁখি সজল হবে?
মধু— মঞ্জুল-মঞ্জরী ফুটবে কবে!
বুঝি দখিন্‌ বাতাস আজ হ'ল উদাসী,
খোঁজে নতুন চলার পথে হারানো বাঁশী,
—সে কি মিলন-সাহানা সুরে সে ভার লবে?
মধু—মঞ্জুল-মঞ্জরী ফুটবে কবে!

মঞ্জরী। এ গান এবার থেকে আর গাস না ভাই।

কুহেলি। কেন, এখনও কি আশার আলো দেখতে পাস নি? আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তুই তারকা হয়েছিস, ছবির পর ছবি উঠছে, তোরা দু'জনেই প্রডিউসার, আর জ্বল জ্বল করছে ব্যানারে তোদের নাম—"দি মঞ্জুল-মঞ্জরী ফিল্ম কোম্পানী লিমিটেড"।

মঞ্জুল। বাঃ, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া ত!

মঞ্জরী। (হাসিয়া) আবার লিমিটেড পর্য্যন্ত জুড়ে দিলি যে কুহেলি।

কুহেলি। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে) তা না হলে মঞ্জুলবাবু যে ভয়ানক রাগ করবেন ভাই।

মঞ্জরী। তোর সব তাতে ঠাট্টা, যাঃ—

কুহেলি। পথ ছেড়ে যেতে ত হবেই ভাই আমাকে। এক এক সময়ে ভাবি, আসরার দাবি নিয়ে যারা আসে, যাবার দাবি ত সব সময়ে তারা মানে না ভাই। কিন্তু যারা আসবার দাবি হারিয়ে ফেলে, তাদের যাবার দাবি যে সকলের আগে।

মঞ্জরী। হেঁয়ালি ছাড়া কি কথা বলতে জানিস না কুহেলি?

কুহেলি। নামেই কি পরিচয় পাস নি? তা ছাড়া জীবনটাই যে হেঁয়ালি। ওমর খৈয়াম পড়েছিস ত? ওখানে দুটো সত্যি জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়, সুরা আর সাকী। এদের রূপক অর্থ নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের দলে আমি নই। তাঁদের কারবার মস্তিষ্ক নিয়ে। কিন্তু আমার কাছে এর দাম যে দেবে সে হ'ল হৃদয়। সত্যিকারের ওমর খৈয়াম ধরা পড়ে সেখানেই।

মঞ্জরী। এই হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার তোর জীবনে কি কোন দিন ঘটে নি?

কুহেলি। (হাসিয়া) ব্যাপার একটা কিছু ছিল হয়ত, কিন্তু হৃদয়টি বাদ পড়ে গিয়েছিল। তোদের দু'জনার মধ্যে ঐ হৃদয় অক্ষয় হয়ে থাক, এখন এই কামনাই করি আমি।

মঞ্জুল। কামনা করাটা সোজা মিস কুহেলি, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ।

কুহেলি। সন্দেহ করলেই বিশ্বাস শিথিল হয়ে যায়, এই সাধারণ নিয়মটা মানেন ত? আবার বিশ্বাস যেখানে দৃঢ়, সন্দেহ সেখানে আসেই না, কি বলিস মঞ্জরি?

মঞ্জরী। আসতেও ত পারে।

কুহেলি। না, সে হয় না, সেটা অনিয়ম। হলে বুঝব জিনিষটা খাঁটি নয়। আমার জীবনে আগেই ওটা ধরা পড়েছিল ভাই।

মঞ্জরী। সত্যি করে বল ত কুহেলি, কোথায় যেন তোর একটা লুকানো ব্যথা আছে।

মঞ্জুল। এক্সকিউজ মি, আমারও তাই মনে হয়।

কুহেলি। (হাসিয়া) সত্যি? আচ্ছা, কি মনে হয় বলুন ত মঞ্জুলবাবু?

মঞ্জুল। ধরেও যেন ধরতে পারছি না।

কুহেলি। প্রেফ মিষ্টিসিজম, কি বলেন? বেশ, একদিন বুঝিয়ে দেব।

মঞ্জরী। আবার কবে তোর দেখা পাব?

কুহেলি। যে দিন তুই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করবি। অর্থাৎ, তোর পাগলের অভিনয়ে দেবতা তৃপ্ত হয়ে বর দিতে আসবেন বরমাল্য হাতে।

মঞ্জরী। সত্যি কি সেদিন আসবে।

কুহেলি। আসবে, আসবে, আসবে। নদী একদিন সাগরে মিশবেই।

[এই সময়ে একদল তরুণ ও তরুণীর প্রবেশ]

তরুণীদল। এই যে এখানে মঞ্জুলবাবু—

তরুণদল। মিস মঞ্জরী ও মিস কুহেলিও রয়েছেন যে এখানে

[তরুণদল এক দিকে ও তরুণীদল অন্য দিকে দাঁড়াইল ও দ্বৈত ভাবে গান ধরিল—]

(গান)

তরুণদল। জীবন যদি নদীর মত বয়েই শুধু চলত,

তরুণীদল। —আহা চলত!

তরুণদল। দু'কূলে তার সোনার গাছে মুক্তা হীরা ফলত,

তরুণীদল। —আহা ফলত!

তরুণদল। চাঁদের আলো জমাট বেঁধে ঢেউগুলো তার গড়ত,

তরুণীদল। —আহা গড়ত!

তরুণদল। মন-দোলানো গানের সুরে সুধার ধারা ঝরত,

তরুণীদল। —আহা ঝরত!

তরুণদল। রাজার ছেলে প্রবাল-ভেলায়
আসত এসে সাঁঝের বেলায়,

তরুণীদল। রাজার মেয়ে সাজিয়ে ডালি
বাঁধত তারে বরণ-মালায়!
চিরদিনী সেই [illegible] বলত,

তরুণদল। —আহা বলত!

উভয়দল। জীবন যদি নদীর মত বয়েই শুধু চলত,
আহা চলত!

[গান শেষ হইলে তরুণদল মঞ্জুলকে টানিতে টানিতে একদিকে ও তরুণীদল মঞ্জরী ও কুহেলিকে টানিতে টানিতে অন্য দিকে প্রস্থান করিল।]

(পটপরিবর্ত্তন)

চতুর্থ দৃশ্য

[কুঞ্জবাবুর বাড়ীর বারান্দার একাংশ। রামু চাকর জামা ও কাপড়গুলি আলনায় সাজাইয়া রাখিতেছে। মোক্ষদা ঝি মাটিতে পানের ডাবর লইয়া পান সাজিতেছে। সময় প্রাতঃকাল।]

রামু। খবর শুনেছিস মুখী?

মোক্ষদা। মুখী, মুখী করিস না, পষ্ট করে নাম বলবি, তা না হলে সাড়া দোব না।

রামু। মুখী বললে চটিস কেন? তোকে ত আর পোড়ার মুখী বলছি না। এতে সাড়া না দিয়ে যাবি কোথায়? এ দিকে যে ব্যাপার গুরুতর।

মোক্ষদা। কিসের ব্যাপার রে?

রামু। দাদাবাবু, দিদিমণি, মঞ্জুলবাবু কোথায় গিয়েছিল জানিস?

মোক্ষদা। জানি, ঝিক্‌মিক্ করতে।

রামু। হাসালি মুখী, হাসালি। ঝিকমিক নয় রে, ওকে বাবুরা বলে পিকনিক। ইংরেজি নাম, শুনেছি ওর মানে চড়ুই-ভাতি অর্থাৎ চড়াই আর নামাই, আবার নামাই আর চড়াই। বুঝলি?

মোক্ষদা। আমার আর বুঝে কাজ নেই। এখন ব্যাপারটা কি বল ত?

রামু। কাউকে বলিস না যেন। দিদিমণি কাল সন্ধ্যের ফিরে এসে এখন পর্য্যন্ত কারোর সঙ্গে ভাল করে কথা কয় নি। আজ সকাল থেকেই মুখভার করে বসে আছে, ঘর থেকে বেরোয় নি।

মোক্ষদা। শরীর খারাপ হয় নি ত?

রামু। মনে ত হয় না। হাত মুখ নেড়ে কি যেন বিড় বিড় করে বকছে, কখনও মাথা নাড়ছে, কখনও হাসছে।

মোক্ষদা। সে কি রে! তুই দেখলি কি করে?

রামু। কর্ত্তাবাবুর হুকুমে দিদিমণিকে চা খেতে ডাকতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি এই কাণ্ড। একটু ভয়ও হ'ল বৈ কি। তবে কাউকে কিছু বলি নি এখনও, এই তোকে যা বললাম। ব্যাপারটা আরও একটু দেখে শুনে তখন বরং কর্ত্তাবাবু গিন্নিমাকে বলব।

মোক্ষদা। আগেই বলে এলি না কেন? তুই ত বড় বে-আক্কেলে দেখছি। অসুখ-বিসুখ হতেও ত পারে।

রামু। না, রে না। অসুখ নয়, আমি কি আর বুঝতে পারি না? এই ভেবে ভেবে দিদিমণির মাথা খারাপ হয়েছে।

মোক্ষদা। কিসের ভাবনা বল ত?

রামু। (চারিদিক সতর্কভাবে চাহিয়া) যেমন তোর জন্যে আমার ভাবনা।

মোক্ষদা। দূর হতচ্ছাড়া, মরণ আর কি! আমার জন্যে তুই ভাবতে যাবি কেন?

রামু। ভাবব না? আইন পাস হয়ে গেছে জানিস? খবরের কাগজে বেরিয়েছে।

মোক্ষদা। কিসের আইন রে?

রামু। তা আর জানবি কেমন করে? পাড়ার দোকানে বাবুদের এই নিয়ে কত কথা হয়। সব শুনে এসেছি। এখন আর তোর আর আমার বিয়ে আটকাবে না। আমারও বউ তেয়াগ, আর তোরও সোয়ামী তেয়াগ! তারপর দু'জনায় মালাবদল।

মোক্ষদা। দূর হ মুখপোড়া, ফের যদি ওসব কথা বলবি ত আমি গিন্নিমাকে সব কথা বলে দোব।

রামু। আহা-হা, রাগ করিস কেন? আইন পাস হয়ে গেছে, না করলেই জেল জরিমানা, সেই কথাটাই ত বলছি। তুই অমনি চটে উঠলি। তোর ঐ যে কেমন স্বভাব, একটা ভাল কথা বললেও অমনি দপ করে জ্বলে উঠিস।

মোক্ষদা। কি আমার ভাল কথা রে! রেখে দে তোর আইন-কাইন। আমি গিন্নিমাকে এখনি সব কথা বলে দোব। তোকে এ বাড়ীছাড়া করে তবে ছাড়ব।

রামু। আ মর্! তোকে বললাম ভাল কথা, আর তুই আমাকে শাসাচ্ছিস। আমাকে বাড়ীছাড়া হয়ে যেতে হলে, তোকেও যে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীছাড়া করব তা জানিস?

মোক্ষদা। কেন রে হতচ্ছাড়া?

রামু। (হাসিমুখে) আইন হয়েছে যে!

মোক্ষদা। মানলে ত? অমন আইনের কপালে আগুন। জরিমানা দোব, জেলে যাব, তবু তোর মত হতচ্ছাড়ার গলায় মালা দোব না। মুখপোড়ার আসপদ্দা দেখ না। ওরে অলপ্পেয়ে, আমার সংসারে আগুন ধরাতে চাস?

রামু। আহা-হা চটিস কেন? আচ্ছা, ও কথা এখন থাক। এদিকে বাড়ীর ব্যাপার কিছু বুঝছিস?

মোক্ষদা। বুঝতে খুব পারি, শুধু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারি না। তুই-ই না হয় আমাকে বুঝিয়ে বল্ না।

রামু। থাক আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। তোর আবার পেটে কথা থাকে না। কাকে আবার কি বলতে কি বলবি।

মোক্ষদা। পেটের কথা বেফাঁস করে মোক্ষদা তেমন মেয়ে নয়। তুই যে এক্ষুণি অত কথা আমাকে বললি, আইনের কথা তুললি, বল্, আমি কি বলতে যাচ্ছি কাউকে? আমার সৈরভী মাসী বলত, মুখীর বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না। সংসারে সবকিছু দেখে শুনে ভাবি, আর ভাবি।

রামু। তা ত ভাববি। কিন্তু আমার কথা কিছু ভাবিস?

মোক্ষদা। আ মর্! ফের তোর ঐ এক কথা! তোর কথা ভাবতে যাব কেন রে মুখপোড়া? তুই আমার কে রে?

রামু। আপন ভাবলে পর হয় আপন, পর ভাবলে আপন হয় পর, এই ত শাস্তরের কথা। তোর সঙ্গে পাঁচ-পাচটা বছর এ বাড়ীতে কাজ করছি, আমার ওপর একটুও কি মায়া পড়ে নি তোর? তোকে দেখলেও যে পরানটা ঠাণ্ডা হয় মুখী।

মোক্ষদা। দাঁড়া, ঠাণ্ডা হওয়াচ্ছি। এখনি গিন্নিমাকে বলে দিয়ে আসি।

রামু। এই দেখ, আবার চললি! যেতে চাস যা, আমি তোরও সব কথা বলে দোব—

মোক্ষদা। কি বলবি, শুনি?

রামু। ভাঁড়ারঘর থেকে সরের নাড়ু টপ করে মুখে ফেলেছিল কে? গিন্নিমার পানের ডিবে থেকে পান নিয়ে আঁচলে বেঁধেছিল কে? আমি যেন কিছু দেখি নি, না?

মোক্ষদা। (সুর নরম করিয়া) তোর ঐ কেমন স্বভাব, ঠাট্টা বুঝতে পারিস না। হ্যাঁ রামু, সত্যি করে বল ত, ঐ রকম আইন পাস হয়েছে?

রামু। হ্যাঁ রে সত্যি, সত্যি, সত্যি—এই তোর পা ছুঁয়ে বলছি। (গাত্রস্পর্শের জন্য হস্ত প্রসারণ)

মোক্ষদা। (সরিয়া গিয়া) থাক, আর পা ছুঁতে হবে না, তোরই কথা মেনে নিলাম। যাই গিন্নিমাকে পানের ডিবেটা দিয়ে আসি। তুই ততক্ষণ কর্তার চানের ঘরে জল রেখে আয়।

[মোক্ষদা পানের ডিবা হস্তে একদিকে চলিয়া গেল।]

(পট-পরিবর্তন)

পঞ্চম দৃশ্য

[কুঞ্জবাবুর বাড়ী। মঞ্জরীর শয়নকক্ষ। খাটের উপর হইতে উঠিয়া মঞ্জরী একবার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তারপর পুনরায় খাটের এক পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিল]

মঞ্জরী। অভিনয়, অভিনয়, শুধু একবার অভিনয়। কুহেলির কথা সত্যি হতেও ত পারে। মঞ্জুলকে পাবার জন্যে আমাকে সাজতে হবে পাগল। কিন্তু এ ছাড়া অন্য উপায়ও ত কিছু দেখছি না। তপস্যায় সফল না হই, তখন জীবনদেবতা যে পথে নিয়ে যাবেন, যাব।

[হরিমতী প্রবেশ করিলেন, হাতে একখানা চিঠি।]

হরিমতী। শিবপুর থেকে ভৈরব বাঁড়ুয্যে আবার চিঠি দিয়েছেন, আজ যে তাঁরা তোকে দেখতে এসে বিয়ের কথা পাকা করে যাবেন। এই নে পড়ে দেখ চিঠি, এদিকে অনিমেষ আবার সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেল।

মঞ্জরী। (ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে) তুমিই পড়ে দেখ, আমার পড়বার সময় নেই।

হরিমতী। সময় নেই! কি বলছিস মঞ্জরী? শিবপুরের ভৈরব বাঁড়ুয্যে এই নিয়ে ক'খানা চিঠি দিয়েছেন জানিস?

মঞ্জরী। আমার জানবার কিছু দরকার নেই, আমি বিয়ে করবো না।

হরিমতী। বিয়ে করবি নে? আজ তারা পাকা কথা কইতে আসছে, অমন সুপাত্র শেষে হাতছাড়া হবে? কর্ত্তারও যে এতে সম্পূর্ণ মত। এখন তাঁদের কি বলি বল দেখি।

মঞ্জরী। বলবে, তোমার মেয়ে কোন দিনই বিয়ে করবে না, কোনদিনই নয়।

হরিমতী। ওসব খেয়ালী কথা ছেড়ে দে, অমন কত হয়। তার জন্যে কি কোন মেয়ের বিয়ে বন্ধ থাকে? যা বলি তা শোন, নিজের সর্ব্বনাশ করিস না।

মঞ্জরী। সর্ব্বনাশটা কোথায় দেখলে মা? (অভিনয়ের ভঙ্গীতে) বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে,—কে যেন একটা শেকল নিয়ে এগিয়ে আসছে আমায় চিরদিনের জন্যে বাঁধতে! একটা আদ্যিকালের শেওলাধরা পাথরের জেলখানা খুলছে তার নড়বড়ে লোহার কবাট আমায় চিরবন্দী রাখতে। কাঁদো নারী, অনন্তকাল ধরে কাঁদো, দেখি তোমার চোখের জলের কত ঢেউ। আকাশে-ওড়া ছাড়া-পাখীকে ধরতে চায় সমাজ ছোট্ট খাঁচায়? আমায় বেঁধো না মা, বেঁধো না—(হাত নাড়িয়া ঘরের অন্যদিকে ছুটিয়া গিয়া পুনরায় আসিয়া খাটের উপর বসিল।)

হরিমতী। (ভয় পাইয়া) অমন করছিস কেন মঞ্জরী, কি হ'ল তোর?

মঞ্জরী। মা মা, তোমার মঞ্জরীকে ভুলে যাও—আর কোন দিন ফিরবে না সে তোমাদের ঘরে। (জানালার দিকে এক হস্ত প্রসারিত করিয়া) ঐ ছায়ালোকের মায়াপথ ডাকছে আমায় হাতছানিতে। হাঁ, ঐ সেই পায়ে চলার পথ, আমার মত কত মেয়ের পায়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওর রূপালী ধূলিতে। আমাকে আর পিছনে ডেকো না মা, আমার শুভযাত্রায় যেতে দাও। মা—মা—

হরিমতী। (অত্যন্ত ভয় পাইয়া) মুখী ও মুখী, (মোক্ষদার প্রবেশ) শীগগির কর্ত্তাকে ডাক, শীগগির যা—আর অডিকলোনের শিশিটা নিয়ে আয়—

মোক্ষদা। কি হ'ল মা?

হরিমতী। মঞ্জরী কি আবোলতাবোল বকছে!

মোক্ষদা। আঁ্যা! ও মা, কি হবে গো! (দ্রুত প্রস্থান)

হরিমতী। মঞ্জরী, অমন করছিস কেন? (খাটের উপর বসিয়া মঞ্জরীকে কাছে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) তুই যদি অমন করিস, আমি কি করে বাঁচব?

মঞ্জরী। তোমাকে যে বাঁচতেই হবে মা, লক্ষ কোটি প্রাণীর মায়েরা যেমন বেঁচে থাকে এই দুনিয়া বস্তীতে। নীল সায়রের বুকে জাগে প্রবালদ্বীপ, কোটি কোটি মায়ের পাঁজরের পলিমাটিতে গড়ে-ওঠা শ্যামলিমায় ফুটে ওঠে কি করুণ তার ইতিহাস! কত যুগের মায়ের স্নেহ মরণের দ্বারে এসে জানিয়ে গেছে সৃষ্টির আশীর্ব্বাদ। মা মা, এত মেঘ কেন? এত মেঘ কেন? (ছুটিয়া জানালার কাছে গেল)

হরিমতী। মেঘ আবার কোথায় দেখলি? এখন যে ভরা-রোদ্দুর। শরীর খারাপ বোধ হয় চুপ করে শুয়ে থাক। আবোল-তাবোল বকতে হবে না আর।

[ব্যস্তভাবে কুঞ্জবাবুর প্রবেশ, তৎপশ্চাৎ একটা শিশি হাতে মোক্ষদা]

কুঞ্জবাবু। কি হয়েছে?

হরিমতী। কি জানি, মঞ্জরী কি সব পাগলের মত বকছে।

কুঞ্জবাবু। কেন রে মঞ্জরী?

মঞ্জরী। আমার মন-সায়রের স্বপন-হংসী চায় আজ উড়ে যেতে মানস-যাত্রায় পাখা মেলে, তার কাছে নীলাকাশ কেউ নয়, ঊষার আলো কেউ নয়, শুধু তার অন্তরের ধ্যানলোকে জেগে আছে মানস-সরোবর—যার বুকে কৈলাস পাহাড় দেখে তার সাদা জটার ছায়া, আর আকাশ দেখে তার নীলচোখের মায়া—

কুঞ্জবাবু। অঁ্যা, তাই ত! রামু, রামু, ওরে রামু—(রামুর প্রবেশ) শীগগির পাশের বাড়ীর ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্, আর অনিমেষ এলেই পাঠিয়ে দিবি এখানে—(রামুর প্রস্থান)

হরিমতী। ওগো আমার কি হ'ল গো! আমার মঞ্জরী বুঝি সত্যি পাগল হ'ল। আজ যে শিবপুর থেকে ওর বিয়ের পাকা কথা কইতে ভৈরব বাঁড়ুয্যে আসবে গো! [একখানি পাখা লইয়া মঞ্জরীর মাথায় হাওয়া করিতে লাগিলেন।]

কুঞ্জবাবু। থাম গিন্নি। চেঁচামেচি করো না। মঞ্জরী মা, সত্যি করে বল কি হয়েছে তোর? [একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া মঞ্জরীর কাছে বসিলেন।]

হরিমতী। (ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে) হয়েছে আমার মাথামুণ্ডু! মেয়ের বিয়ের চেষ্টা না করে ধিঙ্গী করে রেখেছ, তার ফল এবার বোঝ।

[গোবিন্দ ডাক্তারের প্রবেশ। গলায় ষ্টেথসকোপ, পাকাচুল,
বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামু একটি ছোট
চামড়ার ব্যাগ বহিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল]

কুঞ্জবাবু। এই যে এসেছ গোবিন্দ, দেখদেখি মঞ্জরীর কি হয়েছে, কি সব বাজে বকছে।

গোবিন্দ ডাক্তার। (মঞ্জরীর নিকটে বসিয়া) দেখি মা, তোমার বাঁ হাতখানা।

মঞ্জরী। হায়, ডাক্তার কাকা, পাল্স দেখে আমার হার্টের খবর কি বুঝবেন আপনি! জীবনের তটে তটে উঠছে লক্ষ আকাঙ্ক্ষার ঢেউ, অবাধ—উদ্দাম—ফেনিল—

রামু। (অন্যদিকে মোক্ষদার প্রতি) শুনছিস মুখী, ফিনাইল খাইছে—

মঞ্জরী। সেই ঢেউয়ের বুকে রামধনুরঙা ফেনার দোলায় দুলে দুলে ভটে ভটে খাব উতল আছাড়—

মোক্ষদা। (অনাজিকে রামুর প্রতি) শুনছিস রামু, আবার বেঁকের আচার খাব বলছে।

মঞ্জরী। হায়, ডাক্তার কাকা, পালস দেখে অন্তরের কথা বোঝা কি এতই সহজ? বিশ্বকবি কি বলেছেন জানেন না? (সুর করিয়া) "আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে, আমায় বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে—"

গোবিন্দ ডাক্তার। কুঞ্জ, টেম্পারেচারটা একুরেটলি দেখতে হবে। এই নাও থারমোমিটার, একবার জিভের তলায় দাও ত মা মঞ্জরী। বৌঠাকরুণ, হাত পাখাটা একবার বন্ধ রাখুন।

মঞ্জরী। না, না, পাখা বন্ধ করো না মা—বিশ্বকবি কি বলে গেছেন জান না? (সুর করিয়া)

"বহুদূর তীরে কা'রা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি মাখা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কর না পাখা।"

[গোবিন্দ ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুঞ্জবাবুকে এক পার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া]

গোবিন্দ ডাক্তার। দেখ কুঞ্জ, সিম্পটমস বেশ ভাল বুঝছি না। ভাগাস আর প্যারা সিম্পেথেটিকের ওপর একটা সাডেন প্রেসার পড়ে হাইপারটেনশন দেখা দিয়েছে, সেইজন্যেই ভুল বকতে আরম্ভ করেছে। আমি হালফিল ক'টি কলেজের মেয়ের এ রোগের ট্রিটমেণ্ট করেছি। তুমি মঞ্জরীকে কমপ্লীট রেষ্ট দাও। কাছে লোক থাকলেই ওর ডিলিরিয়াস টেণ্ডেন্সি বেড়ে যাবে। আমি এখনই একটা সিডেটিভ মিক্সচার পাঠিয়ে দিচ্ছি। দু'ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবে। লিকুইড ডায়েট—যেমন ডাবের জল, ঘোল, ছানার জল, মিছরির জল, বার্লি ওয়াটার, কমলালেবুর রস, আর একটু একটু টমাটোর সুপ—। আর এক কথা, বাড়ী থেকে আলট্রা-মডার্ন নাটক নভেল আর ধোঁয়াটে কবিতার বইগুলো এট ওয়ান্‌স রিমুভ করো—

হরিমতী। (গোবিন্দ ডাক্তারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া) সারবে ত ডাক্তারবাবু?

গোবিন্দ ডাক্তার। ওষুধ দিচ্ছি, সারবে ঠিকই, তবে এ রোগের পক্ষে বয়েসটা একটু খারাপ কিনা—

কুঞ্জবাবু। যা ব্যবস্থা করবার করো ভাই গোবিন্দ, ধরে নাও মঞ্জরী তোমারই মেয়ে।

গোবিন্দ ডাক্তার। বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকো ত মা, ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে।

মঞ্জরী। ভয়? (অদ্ভুত ধরনের নৈরাশ্যব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া) মনকে তাই বলি, কিসের ভয় তোর মন, বিশ্বকবি যে অভয় দিয়ে গেছেন—

"ভয় নাই তোর, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা,
কুসুম ফুটিবে বাঁধন টুটিবে
পূরিবে সকল কামনা—
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না।"

[গোবিন্দ ডাক্তার অর্থসূচক ভাবে মাথা নাড়িলেন।]

গোবিন্দ ডাক্তার। এখন তবে আসি কুঞ্জ, দরকার হলে খবর দিও।

কুঞ্জবাবু। রামু, ডাক্তারবাবুর ব্যাগটা পৌঁছে দিয়ে আয়

[অনিমেষের প্রবেশ]

অনিমেষ। ব্যাপার কি? ডাক্তারবাবু এসেছিলেন কেন মঞ্জরীর কি হয়েছে?

হরিমতী। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) হয়েছে আমার মাথা, মঞ্জরী সকাল থেকে আবোলতাবোল বকছে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে—(অর্দ্ধস্ফুট ক্রন্দনাবেগ)

কুঞ্জবাবু। চলে এসো গিন্নি, ওসব কথা এখানে নয়। আয় অনিমেষ, সব কথা বলছি···

[কুঞ্জবাবু, হরিমতী ও মোক্ষদার প্রস্থান]

অনিমেষ। (স্বগত) ব্যাপারটার যেন কিছু কিছু আভাস পাচ্ছি এবার। মঞ্জুলটা একেবারে ষ্টুপিড, গাধা, যাচ্ছি তার কাছে বোঝাপড়া করতে—

[মঞ্জরীর দিকে একবারমাত্র চাহিয়া প্রস্থান করিল।]

মঞ্জরী। মনে হয় আমার একটিং খুব স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রথমটা কিন্তু বড্ড লজ্জা করছিল। [উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া কি দেখিয়া] এবার আমার অভিনয়ের মোড় অন্য দিকে ফেরাতে হবে—

[সঙ্কুচিতভাবে সামনের বাড়ীর নবীনের প্রবেশ। বয়স বছর পনের-ষোল, ছিপছিপে গড়ন, ফর্সা রং, মুখে কৈশোর-সরলতা, হাতে একখানি খাতা, পায়ে স্যাণ্ডেল, পরনে হাফপ্যাণ্ট ও হাফ-সার্ট, চুলগুলি ঈষৎ ঝাঁকড়া ও কোঁকড়া।]

নবীন। চুপি চুপি এসেছি মঞ্জরীদি, কেউ দেখতে পায় নি আমায়। কাল রাত্তির বারোটা ছাব্বিশ পর্য্যন্ত জেগে একটা কবিতা লিখেছি, আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে দেবার জন্যে। একটু দেখে দেবেন? আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে কালই দিতে হবে।]

মঞ্জরী। কি সাবজেক্ট নিয়ে লিখেছ নবীন? দেখি।

(কবিতাটি হাতে লইয়া মনে মনে পাঠ)

বেশ হয়েছে, নামটিও ভাল দিয়েছ—"কলিকাতায় বর্ষা।"

নবীন। স্কুলের ম্যাগাজিনে কালই দিতে হবে বলে খুব চোখে লিখেছি কি না, আপনি ভাল করে কারেক্ট করে দিন। ভাল না হলে ওরা ছাপবে না।

মঞ্জরী। (উচ্চৈস্বরে কবিতা পাঠ)

বর্ষার ঝুপঝাপ নূপুরের ধ্বনি
কাজল-বুলানো কালো আকাশের মাথা,
হুঙ্কার করিয়া যেন কাঁদে সৌদামিনী,
মিছিল করিয়া চলে সারি সারি ছাতা।

বেশ লিখেছ নবীন, তবে নূপুরের ধ্বনি ঝুপঝাপ নয়, ঝিন্ ঝিন্ বা ঝুন্ ঝুন্ বা ঝিম ঝিম বা ঝুম ঝুম এই রকম দেখে। কাজল-বুলানো কালো মাথা হয় না, হবে চোখ। আর হুঙ্কার করে কেউ কাঁদে না, বেচারী সৌদামিনীর ঘাড়ে ওটা চাপিয়েছ কেন? আর সৌদামিনীর সঙ্গে ধ্বনি ভাল মিল নয়, বুঝলে?

নবীন। (লজ্জিত ভাবে) ঠিক বলেছেন মঞ্জরী-দি। এবার থেকে আমার সব কবিতা আপনাকে দেখিয়ে নোব।

মঞ্জরী। (স্বগত) এবার তবে নবীনকেই কো-এক্টর ভেবে খানিকটা অভিনয় করা যাক। আমার যে মাথা খারাপ হয়েছে সেটা নবীনেরও মনে জাগা চাই। (প্রকাশ্যে) নবীন, কাছে এস, ঠিক আমার পাশটিতে বসো।

[নবীন কবিতার খাতাখানি লইয়া মঞ্জরীর পাশে বসিল।]

মঞ্জরী। আমি তোমার কে বল ত নবীন?

নবীন। কেন, মঞ্জরী-দি।

মঞ্জরী। (নবীনের মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া) না, মঞ্জরী-দি নয়, শুধু মঞ্জরী বলেই ডাক ত আমাকে, শুধু মঞ্জরী।

(নবীন অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মঞ্জরী নবীনের একখানি হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গাহিতে লাগিল—)

গান

আমার মনের আঁধার গহনে
কে ডাকে, কে ডাকে, কে ডাকে,
—সে কি তুমি, সে কি তুমি গো?
নব বসন্ত-উন্মন বনে
রাঙা পলাশের ফাঁকে ফাঁকে,
—সে কি তুমি, সে কি তুমি গো?
উদাসী পাপিয়া খুঁজে খুঁজে প্রিয়া মরে যায়,
আধফোটা কলি না আসিতে অলি ঝ'রে যায়,
সাথীহারা কোন্ বন-হরিণীরে
নিশি-অভিসারে কে ডাকে?
—সে কি তুমি, সে কি তুমি গো?
অকরুণ প্রিয়, কোথায় লুকায়ে গেলে?
তোমায় ও-ডাকে এ মায়া কোথায় পেলে?
যে কামনা আজ ফুটে ওঠে আঁখি মেলে'
(তারে) তুষার আগারে কে রাখে?
—সে কি তুমি, সে কি তুমি গো?

[নবীন হতভম্ব হইয়া একটু সরিয়া বসিল]।

মঞ্জরী। [illegible] আমি যে তোমার কল্পলোকের মধু-মঞ্জরী। ওগো আমার কামনা-আকাশের বাতি-তারা, তোমারি স্বপন বুকে নিয়ে, তোমারি মুখপানে চেয়ে আমি যে অনন্তকাল জেগে আছি তন্দ্রাহারা। দাও আমাকে তোমার একবিন্দু প্রেম, যা মুক্ত হয়ে বন্দী রবে আমার মনের গুপ্তিকারায়। কথা কও, ওগো কথা কও, শুধু বলে যাও আমায় সেই কথাটি, যা শোনবার জন্যে উতলা হয়ে আছে এ তৃষিত হৃদয়।

[নবীন এবার খাট হইতে নামিয়া মেঝের উপর দাঁড়াইল]

নবীন। (ভয়ে ভয়ে) আমি এখন চললাম মঞ্জরী-দি, আবার আসব— (গমনোন্মুখ)

মঞ্জরী। না না, আর একটু থাকো। এবার বুঝি বন-হরিণীর চোখে নিভে এল তার মন-কুটীরের ভীরু দীপশিখা, নিঃশ্বাসে তার ছড়িয়ে পড়ল ফাগুনহারা যূথীবনের হাহাকার! শুনতে পাও নি বন্দীর কাতরানি অন্তরের এ অন্ধ-কারায়? আরো কাছে এসো—কান পেতে শোন—(নবীনের একটি হাত ধরিল)

নবীন। (স্বগত) একি, মঞ্জরী-দি পাগল হলো না-কি?

[নবীন বিলক্ষণ ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিস্মিত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মঞ্জরীর দিকে চাহিতে চাহিতে প্রথমে কিছুদূর পশ্চাতে হাঁটিয়া গিয়া তার পর দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে পলায়ন করিল]।

মঞ্জরী। (উচ্চহাস্য করিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ—চমৎকার অভিনয় করেছি, চমৎকার! এইবার আমার পাগল হওয়ার কথা পাড়ায় রটতে আর দেরী হবে না,—অগ্রণী শ্বশুরের দল খবর পেয়েই পিছিয়ে পড়বে—হাঃ হাঃ—

[মঞ্জরী বিছানার উপর শুইয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল]

(পট পরিবর্ত্তন)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[কুহেলির গৃহ। আধুনিক ভাবে সজ্জিত একটি কক্ষে কুহেলি দাঁড়াইয়া আছে। বাতায়ন দিয়া সূর্য্যকিরণ শয্যাপ্রান্তে পড়িয়াছে। একটি অর্গান। অর্গানের উপর একটি ছোট্ট ফুলদানিতে একটি বড় ফুল।]

কুহেলি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বেশ আছি, চমৎকার! জীবনের এ একটা নতুন রূপ, নতুন আলো। অবশ্য তার সবকিছু নিঃশেষ করে দেয় নগর গড়ে তুলতে, আমি পারব না? খুব পারব। তবু মনে হয় হয়ত ভুল পথে এগিয়ে চলেছি। মনের এ দাহ—এ জ্বালা—মুখের হাসি দিয়ে ঢাকব কি করে? না না, এ যে আমারি নিজের গড়া ভুল—তবু এতে ভরে উঠেছে আমার সারা মন, আমার এই ভালো, এই ভালো।

[অর্গানের সম্মুখে গিয়া বসিয়া অর্গান বাজাইয়া গাহিতে লাগিল]

(গান)

যে বনে ফুল ফোটে না, চাঁদ ওঠে না,
[illegible]!
[illegible]
[illegible]?

সখা, দীপ কেন জ্বালো ?

যে বনে সুর ভুলে হায়, সাথীর আশায়

বিহগী কাঁদে,

যে বনে ঝরা-পাতায় উদাস হাওয়ায়

মিতালী বাঁধে।

সখা, মিতালী বাঁধে।

বালুর তলে লক্ষ্য-হারা

বইছে তবু ফল্গুধারা,

ফোটায় আজো সন্ধ্যাতারা

গোধূলি আলো !

সখা, গোধূলি আলো !

যে বনে ফুল ফোটে না, চাঁদ ওঠে না,

ফাগুন হারালো

সে বনে অভিসারে তোমার দ্বারে

দীপ কেন জ্বালো ?

সখা, দীপ কেন জ্বালো ?

[অর্গানের উপর মাথা নীচু করিয়া ঝুঁকিয়া এলাইয়া পড়িতেই একসঙ্গে প্রায় সব রীডগুলি বাজিয়া উঠিল।]

(পট পরিবর্ত্তন)

সপ্তম দৃশ্য

[মঞ্জরীর কক্ষ। মঞ্জরী জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। শিশি হস্তে হরিমতীর প্রবেশ।]

হরিমতী। গোবিন্দ ডাক্তার এই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, নে খেয়ে ফেল। ভাল হয়ে যাবি মা, ভাল হয়ে যাবি।

(মঞ্জরীর কাছে বসিলেন)

মঞ্জরী। (হাত বাড়াইয়া শিশি লইল) জল কৈ ?

হরিমতী। ওমা, তাই ত, ও মুখী, মুখী—আচ্ছা আমিই জল নিয়ে আসছি। (দ্রুতবেগে কক্ষের বাহিরে গেলেন)

[মঞ্জরী হাসিয়া শিশির ঔষধ জানালা দিয়া বাহিরে ঢালিয়া ফেলিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তে হরিমতী প্রবেশ করিলেন, হাতে এক গ্লাস জল।]

হরিমতী। (শিশি লক্ষ্য করিয়া) খেয়েছিস ওষুধ ?—এই নে জল। (অল্প জল খাইয়া মঞ্জরী জলের গ্লাস টেবিলের উপর রাখিল।) লক্ষ্মী মা আমার, চুপ করে শুয়ে থাক, তুই যে আমাদের বড় আদরের মেয়ে—

মঞ্জরী। আমি ত তোমার মেয়ে নই মা—আই এম দি ডটার অফ আর্থ এণ্ড ওয়াটার, এণ্ড দি নার্সলিং অফ দি স্কাই ; আই পাস থ্রু দি পোরস অব দি ওসেন এণ্ড শোরস ; আই চেঞ্জ, বাট আই ক্যান্‌ট ডাই।

হরিমতী। আবার বকতে আরম্ভ করলি মঞ্জরী, আমার যে কান্না পাচ্ছে, তোর জন্যে আমি কি মাথা খুঁড়ে মরব ? সত্যিই তুই কি পাগল হ'লি— (কুঞ্জবাবুর প্রবেশ)

কুঞ্জবাবু। চুপ কর গিন্নি, গোবিন্দ ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে আসছেন পাগলের ডাক্তার হিমাঙ্গ বাবুকে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখব না আমি। (মঞ্জরীর দিকে অগ্রসর হইতেই হরিমতী কুঞ্জবাবুর হাত চাপিয়া ধরিলেন।)

হরিমতী। ওগো, মঞ্জরীর অত কাছে যেও না তুমি—

মঞ্জরী। (হরিমতীর প্রতি) মা, তুমি আমাকে এমন কথা বলতে পারলে ?

হরিমতী। (মৃদু হাসিয়া মঞ্জরীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া) লক্ষ্মী মা আমার, এই ত তোর মাথা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে—তুই শুয়ে থাক আমার কোলে—

মঞ্জরী। না, আমি থাকব না, আমি চলে যাব ময়ূরাক্ষীর ড্যামে। সেই ড্যামের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে স্লাইং ফিশের মত দু'হাত মেলে দিয়ে বাতাসে ভাসব দু' সেকেণ্ড, তার পর একেবারে নোজ-ডাইভ—

হরিমতী। (কুঞ্জবাবুর প্রতি) ওগো, কি সব বলছে, শুনছ ?

কুঞ্জবাবু। শুনছি সব, গিন্নি, শুনছি সব—

(রামুর প্রবেশ)।

রামু। বাবু, ডাক্তারবাবু ও আর একজন কে এসেছেন।

কুঞ্জবাবু। (ব্যস্ত হইয়া) ওঁরা এসেছেন গিন্নি, (রামুর প্রতি) যা রামু, ওঁদের এখানেই নিয়ে আয়।

(রামুর প্রস্থান)

কুঞ্জবাবু। শহরের সেরা পাগলের ডাক্তার এই হিমাঙ্গবাবু।

হরিমতী। এখন আমাদের বরাত !

(গোবিন্দ ডাক্তার ও হিমাঙ্গবাবুর প্রবেশ)

গোবিন্দ ডাক্তার। হিমাঙ্গবাবুকে সঙ্গে করেই এনেছি।

কুঞ্জবাবু। আসুন, নমস্কার। দেখুন ত আমার মেয়ে মঞ্জরীকে। কি যে হয়েছে ওর ব্রেনে—

হিমাঙ্গ। চুপ করুন। আমি নিজেই আগে ডায়াগনোজ করি, তার পর আপনার কথা শুনব।

[মঞ্জরীর নিকটে গিয়া খানিকক্ষণ কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তার পর মঞ্জরীর বামহস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন ও তৎপরে প্রশ্ন করিলেন—]

হিমাঙ্গ। হঠাৎ দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আবোলতাবোল বকতে সুরু করেছে ?

কুঞ্জবাবু। আজ্ঞে হাঁ।

হিমাঙ্গ। কখনো কাঁদে, কখনো হাসে।

কুঞ্জবাবু। আজ্ঞে হাঁ।

হিমাঙ্গ। মুচকি হাসি, না অট্টহাসি ?

কুঞ্জবাবু। মাঝামাঝি।

হিমাঙ্গ। বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে চায়, জলে ঝাঁপ দিতে চায় ?

কুঞ্জবাবু। আজ্ঞে হাঁ, ময়ূরাক্ষীর ড্যাম থেকে।

হিমাঙ্গ। (গোবিন্দ ডাক্তারের প্রতি) 'টিজ এ কেস অব ষ্ট্রেয়ারকেস ইনসানিটি, অর্থাৎ, যে-কোন কারণেই হোক্ মনের কালোমেঘ থেকে ধাপে ধাপে মাথায় উঠে এসেছে কালবোশেখী। একে এখনি আমার "উন্মাদ-তপোবনে" পাঠিয়ে দিন। নইলে রোগ আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। অবশ্য মেয়েটি থাকবে ফিমেল ওয়ার্ডে, আমার পার্সোন্তাল সুপারভিশনে।

কুঞ্জবাবু। সে কি মশাই, মেয়ে আমার পাগলাগারদে যাবে কি! কেন বাড়ীতে রেখে কি চিকিৎসা হয় না?

হিমাঙ্গ। না না, তা হয় না মশাই, হয় না। তা না হলে আমার "উন্মাদ-তপোবন" ওয়ার্ল্ড রেকগানশন পাচ্ছে কি করে? দেখুন, আমি ত্রিশ বছর এ লাইনে আছি। হাজার হাজার রোগিণীর ফুডোফোবিয়া, ড্রেসোম্যানিয়া, নিউরোসিস, সাইকোসিস, হিষ্টিরিয়া, প্যারাফিলিয়া, প্যারানোইয়া কিওর করেছি। শুধু যে ওয়েষ্টার্ণ মেডিসিনস ব্যবহার করি তা নয়, অনেক হিমালয়ান হার্বস ও ইণ্ডিজেনাস ড্রাগসও আমার জানা আছে।

কুঞ্জবাবু। আমি বলি, দিনকতক দেখাই যাক্ না বাড়ীতে চিকিৎসা করে।

গোবিন্দ ডাক্তার। দেখুন হিমাঙ্গবাবু, কুঞ্জবাবু যখন আপনার উন্মাদ-তপোবনে মেয়েকে পাঠাতে চাচ্ছেন না তখন বাড়ীতেই চিকিৎসা চলুক। আমি দু'বেলাই আসব আর ফোনে আপনাকে খবর দোব।

হিমাঙ্গ। বেশ, তা হলে আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করে ওষুধের ব্যবস্থা করে পাঠাব। একটু বিশেষ ওয়াচ রাখবেন, আর একটা খাতায় সবকিছু নোট করবেন। এখন তা হলে আসি। চলুন গোবিন্দবাবু।

কুঞ্জবাবু। চলুন, আমিও যাচ্ছি।

[কুঞ্জবাবু, হিমাঙ্গবাবু, গোবিন্দ ডাক্তার ও রামুর প্রস্থান]

হরিমতী। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আজ আবার ভৈরব বাঁড়ুয্যেদের আসবার দিন। যাও-বা একটা সুপাত্র জুটল, আমার অদৃষ্টের দোষে মঞ্জরীর ঠিক আজই মাথা খারাপ হ'ল। শিবপুরের ভৈরব বাঁড়ুয্যের শুনেছি অগাধ পয়সা, কিন্তু এককথার মানুষ। আজ তাঁদের ফিরিয়ে দোব কি করে? এদিকে ভৈরব বাঁড়ুয্যেদের আসবার সময়ও হয়েছে। এখন আমি কি যে করি!

মঞ্জরী। ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে

জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে—

হরিমতী। আবার কি সব বকতে আরম্ভ করলি মঞ্জরি? আমি কি তোর জন্তে গলায় দড়ি দিয়ে মরব? একটু চুপ করে থাক্ বাছা, অন্ততঃ আজকের দিনটা ভৈরব বাঁড়ুয্যের কাছে আমাদের মুখরক্ষা কর।

মঞ্জরী। আজকের দিন তোমাদের কাছে অতি গুরুদিন বা, কিন্তু আমার কাছে? না না, শুনতে পাচ্ছ না বিয়ের শেকল-পরা লক্ষ লক্ষ মেয়ের দীর্ঘশ্বাস? হায় অসহায়িকা, উৎপীড়িতা নারি, সমাজের লৌহদ্বারে মাথা কুটে কি পেয়েছ তুমি?—রক্তধারা—শুধু রক্তধারা—

হরিমতী। রক্ত কি রে! (আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও "কর্তাকে ডাকো" বলিয়া মোক্ষদাকে হাঁক দিলেন।)

[কুঞ্জবাবুর দ্রুত প্রবেশ]

কুঞ্জবাবু। কি হ'ল আবার? মঞ্জরি—মঞ্জরি—

হরিমতী। রক্ত—রক্ত—বলে চেঁচিয়ে খুনোখুনি করতে যায়! ওগো, আমার মঞ্জরীর এ কি দশা হ'ল গো!

কুঞ্জবাবু। চুপ কর গিন্নি, আমারি ভুল হয়েছে। হিমাঙ্গবাবু ওকে মেনটাল হসপিটালে নিয়ে যেতে চাইলেন, আমিই যেতে দিলাম না। কিন্তু যদি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতে চায় তখন অগত্যা···

(রামুর প্রবেশ)

রামু। বাবু, বাবু, শিবপুর থেকে ক'জন লোক এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

হরিমতী। ঐ গো, ভৈরব বাঁড়ুয্যের দল এসেছে! এখন কি হবে বলত? এ অবস্থায় মেয়ে দেখানো যায় কি করে?

কুঞ্জবাবু। ভদ্রলোকেরা এসেছেন আমার বাড়ীতে, মেয়ে না দেখালে, ওরা ভাববে আমারি কোন কারসাজি। আবার দেখালেও মুশকিল! যদি মঞ্জরী কোন কিছু বেফাঁস কথা বলে বসে, আমাকে ওরা বলবে জোচ্চোর, পাগল মেয়েকে চালাতে চাচ্ছি। আমার যে উভয় সঙ্কট হ'ল গিন্নী।

হরিমতী। আমি বলি, ওঁরা এসেছেন যখন, কোন রকমে মঞ্জরীকে একবার দেখিয়ে দাও ওঁদের। তার পর যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। এই ঘরেই না-হয় তাঁদের ডেকে আন। তার পর অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বললেই হবে। বিয়ে ত আর একুণি হচ্ছে না, তত দিনে মঞ্জরী আমার ভাল হয়ে যাবে।

কুঞ্জবাবু। তবে তাই হোক। ওঁদের সব এই ঘরেই ডেকে আনি। তুমি ততক্ষণ মঞ্জরীকে একটু সামলে রাখ। (প্রস্থান)

হরিমতী। অদেষ্ট ছাড়া একে আর কি বলব? ঠিক বিয়ের কথা পাকাপাকি হবার সময়েই হ'ল এ রোগ। আমার সব আশায় ছাই পড়ল। দেখ, মঞ্জরী, লক্ষ্মী মেয়ে তুই, শুধু খানিকক্ষণ একটু ভাল হয়ে থাকিস। বেশী কথা বলিস না, যা-তা কিছু করিস না—ঐ বুঝি ওঁরা আসছেন, আমি একটু আড়ালে যাই। (প্রস্থান)

মঞ্জরী। অভিনয়, অভিনয়, শুধু অভিনয়—এ অভিনয় ছাড়া কোন উপায়ই নেই মঞ্জুলকে পাবার। মঞ্জুল-মঞ্জরী নাম একসঙ্গে শুনতে কত মিষ্টি। কিন্তু ভৈরব বাঁড়ুয্যের দলকে তাড়াতেই হবে।

[কথা কহিতে কহিতে কুঞ্জবাবুসহ তিন জন লোকের প্রবেশ]

কুঞ্জবাবু। মেয়েটি আমার এই বছর বাংলা অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছে ভৈরববাবু।

ভৈরব বাঁড়ুয্যে। বেশ, বেশ।

১ম ভদ্রলোক। দেখতেও বেশ সুশ্রী।

২য় ভদ্রলোক। লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত মুখটি।

৩য় ভদ্রলোক। এমন বৌমা না হলে ঘর মানায়!

ভৈরব বাঁড়ুয্যে। (হাসিমুখে মঞ্জরীর প্রতি) সব ভার কিন্তু মা নিতে হবে তোমায় এই বুড়ো শ্বশুরের।

কুঞ্জবাবু। তা খুব পারবে। আমার সমস্ত ভার ত মঞ্জরী মা নিয়েছে। বুড়ো বাপের জন্যে কত যে খাটতে হয় ওকে। কি বলিস মা?

[মঞ্জরী জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল]

১ম ভদ্রলোক। (ভৈরব বাঁড়ুয্যের প্রতি নিম্নস্বরে) দেখলেন ভৈরববাবু, শিক্ষিতা মেয়ের কাণ্ড, একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করলে না।

২য় ভদ্রলোক। (নিম্নস্বরে) অহঙ্কার, বুঝলেন, অহঙ্কার।

৩য় ভদ্রলোক। (নিম্নস্বরে) বিদ্যেরও বটে, আবার রূপেরও বটে!

ভৈরব বাঁড়ুয্যে। (নিম্নস্বরে) চুপ করুন। (কুঞ্জবাবুর প্রতি) আপনার মেয়েকে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই।

কুঞ্জবাবু। (হাসিমুখে) স্বচ্ছন্দে।

ভৈরব বাঁড়ুয্যে। অবশ্য বি-এ পাস মেয়েকে এ সব জিজ্ঞেস করতে আমাদেরও সঙ্কোচ হয়, তবে গেরস্থ ঘরের বউ হতে হলে রান্নাবান্নাও একটু-আধটু শেখা চাই। (মঞ্জরীর প্রতি) রান্নাবান্না কিছু শিখেছ মা? আমি খুব শুক্ত খেতে ভালবাসি। বল ত মা শুক্ত কি করে রাঁধে?

মঞ্জরী। তা আর জানি না—এ ভেরি সিম্পল এফেয়ার—গরম মশলা এণ্ড তেঁতুল দিয়ে।

ভৈরব বাঁড়ুয্যে। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি! হাঁ কুঞ্জবাবু, আপনাদের বাড়ীতে ঐ রকম মশলায় শুক্ত রাঁধা হয় নাকি?

কুঞ্জবাবু। না না, তা হবে কেন? মঞ্জরি, মা, একটু ভেবে চিন্তে উত্তর দে।

ভৈরব বাঁড়ুয্যে। আচ্ছা থাক্, এখন বল ত মা, শাকঘণ্ট কি করে রাঁধতে হয়? আমি ওটাও খেতে খুব ভালবাসি।

মঞ্জরী। কি শাক?

ভৈরব বাঁড়ুয্যে। ধর, নটে।

মঞ্জরী। উহু, পালং।

ভৈরব। তাই না হয় হলো।

মঞ্জরী। উহু, পুঁই।

ভৈরব। আচ্ছা তাই।

মঞ্জরী। উহু, কলমী।

ভৈরব। বেশ, তাই হলো।

মঞ্জরী। উঁহু, শুশনি।

ভৈরব। (বিরক্তিপূর্ণ স্বরে) আচ্ছা, আচ্ছা, ধরে নাও, যে-কোন একটা শাক। কচুর শাক থেকে আরম্ভ করে লাউ, কুমড়ো, মটর, মুলো, হিঞ্চে, ডিমে, ডেঙ্গো, বেতো, বিষ্কি, ঘে-পুণ্যে, থুলকুড়ি, পুনকো, মায় লেটুস শাক পর্য্যন্ত যা ইচ্ছে তোমার। এখন রাঁধবে কি করে তাই বল।

মঞ্জরী। না, আমি বলব না। হুঁ, হুঁ, ভারি চালাক আপনি, আমি বলি আর আপনি শিখে নেন আর কি!

ভৈরব। আরে! পাগল নাকি?

মঞ্জরী (সুর করিয়া) ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর—

ভৈরব। সর্ব্বনাশ! এ সব কি ব্যাপার কুঞ্জবাবু? (সঙ্গী ভদ্রলোকের প্রতি) শুনছ হে গুরুচরণ—

মঞ্জরী। ঠিক ধরেছেন, ব্যাপারটাও ঐ গুরুচরণ—

কুঞ্জবাবু। মঞ্জরি, মঞ্জরি, এঁদের এ সব তুই কি বলছিস, ভদ্রলোকেরা এসেছেন তোকে দেখতে, বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে, আর তুই (ক্রোধে ও অভিমানে)—সব—সব—মাটি করলি?

মঞ্জরী। বেশ, আমি চুপ করলাম, এইবার আপনারা বিয়ের সম্বন্ধটা সিমেণ্ট দিয়ে পাকা করে নিন্।

ভৈরব। কুঞ্জবাবু, আমরা উঠলাম। আপনার মেয়ে পাগল, একথা আগেই বলা উচিত ছিল আপনার। এ মেয়ে চালাতে চান শিবপুরের ভৈরব বাঁড়ুয্যের বাড়ী? লজ্জা করে না আপনার?

১ম ভদ্রলোক। থাক্ থাক্, কুঞ্জবাবুর মনে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে? চল, বাঁড়ুয্যে ফিরে চল—

মঞ্জরী। (সুর করিয়া) সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে—

[ক্রোধভরে ভৈরব বাঁড়ুয্যের দলের প্রস্থান। কুঞ্জবাবু মাথায় হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। হরিমতী প্রবেশ করিলেন]

হরিমতী। আড়াল থেকে সব শুনেছি আমি। ছি, ছি, কি ঘেন্নার কথা। এখন আমি কি করে এ পাগল মেয়ের বিয়ে দি' বল ত? হা আমার পোড়াকপাল!

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন]

(পট পরিবর্ত্তন)

অষ্টম দৃশ্য

[মঞ্জুলদের বাড়ী। ঘরের একপাশে একটি আলমারিতে বই। একটি ছোট টেবিলের উপরও দুই-তিনখানা বই রহিয়াছে। জানালার কাছে আলনায় খানচারেক কাপড়। অনিমেষ ও মঞ্জুল দুইখানি চেয়ারে সামনাসামনি বসিয়া আছে, হাতে চায়ের কাপ]।

অনিমেষ। সব ত শুনলি। তা হলে তুই মঞ্জরীকে বিয়ে করতে রাজী আছিস?

মঞ্জুল। সে কথা ত তুই জানিস অনিমেষ। তবে আর এ প্রশ্ন তুলিস কেন? দু'জনার মনের ঢেউ ত তোর অজানা নয়।

অনিমেষ। এদিকে সেই ঢেউ জমে বরফ হয়ে যে টাইটানিক ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছে, সেটা ভেবে দেখেছিস? কি কাণ্ডটা আরম্ভ হয়েছে বাড়ীতে জানিস? বাবা-মায়ের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিবি কি করে? তুই একটা ইডিয়ট, এটা যে কতটা রিসকি তা যদি বুঝতিস!

মঞ্জুল। তোর বাবার কিন্তু এ বিয়েতে দারুণ অমত, সেটাও ত বুঝিস।

অনিমেষ। মায়ের এতে যে সম্পূর্ণ মত আছে, সুতরাং বাবার মত ফেরাতে দেরী হ'ত না। কিন্তু আগেই তোরা প্ল্যান করে—

মঞ্জুল। দেখ, অনিমেষ, জাষ্ট বিলিভ মি, তোর বাবার যখন ধারণা হয়েছে আমি মঞ্জরীর উপযুক্ত নই, তখন মায়ের দ্বারা ইন্‌ফ্লুয়েন্স করে তাঁর মত বদলানো আমার মতে ঠিক নয়।

অনিমেষ। আর এটা খুব ঠিক হচ্ছে, নয়? ডাক্তারের দল আসছে, বাড়ীর লোক ব্যতিব্যস্ত হয়েছে, চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে—আর তুই সবটাই মঞ্জরীর ওপর ছেড়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে দূরে সরে আছিস? তুই যে এত বড় স্কাউণ্ড্রেল, আমি তা আগে জানতাম না।

মঞ্জুল। বৃথা আমার উপর রাগ করছিস ভাই। আমি ত তোর সব একিউজেশন মাথা পেতে নিচ্ছি—মঞ্জরী যে এই পথেই যাবে এটা আগে ঠিক আইডিয়া করতে পারি নি—

অনিমেষ। কিন্তু মঞ্জরী যে পথ নিয়েছে, ওটার ইন্‌ভেনশন তোদের কারোর মাথা থেকে আসে নি। তোরও নয়, মঞ্জরীরও নয়। সে রহস্যের আভাস আমি কিছু কিছু পেয়েছি। আমি সাইকোলজিতে বৃথা এম-এ পাস করি নি। তবে আমার ভয়, অনেকটা এগিয়ে গেছে মঞ্জরী, ইয়েস টু ফার এবং তার মূলে আছে তোর মত কাওয়ার্ড।

মঞ্জুল। তুই কিনা শেষে আমাকে কাউয়ার্ড বলতে চাস?

অনিমেষ। ইয়েস, সার্টেনলি, হেজিটেটিং লাভার্স আর অলওয়েজ কাউয়ার্ডস, পার্টিকুলারিলি দি মেল সেক্স। কিন্তু সত্যি করে বল ত এ পথ ধরতে কে বললে? বিশ্বাস হয় না এটা তোর ইন্‌স্ট্রাক্‌শন, বিশ্বাস হয় না এটা মঞ্জরীর ইন্‌ভেনশন, হাওয়েভার ক্লেভার শী মাইট বি।

মঞ্জুল। আচ্ছা সে কথা পরে শুনিস। মঞ্জরীর কাছে হয় ত এ পথ ছাড়া অন্য পথ নেই।

অনিমেষ। শাট আপ! (শ্লেষভরে) মঞ্জরী পথ দেখিয়ে দেবে আর তুই সে পথে চলবি, না? তোর সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। যাক বিষ-তরুকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, এতে মঞ্জরীর অবস্থা, আই মীন পজিশন, আরও খারাপ হতে পারে। আর দেরী নয়, চল তুই আমার সঙ্গে—

মঞ্জুল। আমাকে দেখে তোর বাবা যদি অপমান করে বলেন?

অনিমেষ। আশ্চর্য্য! আমাদের পুরুষ জাতটার ওপর নিজেরই ঘৃণা আসছে। একটি মেয়ে কি দুঃসাহসিক কাজই না করে যাচ্ছে, আর তুই ভাবছিস অপমানের কথা! তোর সেখানে যেতে সাহসই নেই। আই সি দি ডিফারেন্স।

মঞ্জুল। ঠিক তা নয় ভাই; আমাকে ভুল বুঝিস না। আই মীন, আমি গেলে মঞ্জরী ধরা পড়ে যাবে এইটেই তুই বলতে চাস?

অনিমেষ। ইউ সিলি ডগ, আমি চাই এ ব্যাপারের যবনিকা পতন হোক্। মঞ্জরীর জেল খাওয়ার পর কি রকম পাত্র আর কিছু কি তোর মাথায় আসছে না?

মঞ্জুল। আমি তোদের বাড়ীতে গেলে যদি যবনিকা পতন হয় লোকে সন্দেহ করতে পারে, তাতে মঞ্জরীর প্রেষ্টিজ কতটা আহত হবে তা কি ভেবে দেখেছিস?

অনিমেষ। সেটা আমার ওপর ছেড়ে দে না ভাই। একটা দৈবটৈব গোছের ওষুধের দোহাই দিয়ে আমি সেটা ঠিক ম্যানেজ করে নোব। তবে তোর শেষ কথার উত্তরে বলব, নো এবসোলিউটলি নো। যবনিকা পতনের পর এ নিয়ে আর কেউ আলোচনা করবে না। দ্যাটস কোয়াইট সিওর—আর দেরী করিস না মঞ্জুল, চলে আয়—নান বাট দি ব্রেভ ডিজার্ভ দি ফেয়ার—চলে আয়—

[মঞ্জুলকে একরকম টানিতে টানিতে কক্ষ হইতে প্রস্থান]

(পট-পরিবর্ত্তন)

নবম দৃশ্য

[কুঞ্জবাবুর বাড়ী। মঞ্জরীর কক্ষ। মঞ্জরী জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। কুঞ্জবাবু দাঁড়াইয়া ও হরিমতী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন]

কুঞ্জবাবু। সবই ভাগ্য গিন্নি, সবই ভাগ্য। এমন সুন্দরী মেয়ে, বি-এ পাস করেছে, ভাল ঘরে ভাল বরে পড়বে এইটেই আশা করেছিলাম কিন্তু আমার সে আশায় ছাই পড়ল। মেয়েকে এখন শ্বশুর বাড়ীর বদলে পাগলা গারদে পাঠাও।

হরিমতী। পাগলা গারদে পাঠাব কি গো? তার চেয়ে মেয়ের বিয়ে দাও ঐ মঞ্জুলের সঙ্গে।

কুঞ্জবাবু। তা হয় না গিন্নি। তোমাকে ত আগেই বলেছি। মঞ্জুলের বাপ আমার কোর্টের মুহুরী। হাতজোড় করে রাতদিন আমার কৃপা ভিক্ষা করে। আজ আমি তার কাছে গিয়ে হাতজোড় করব? লোকে আমায় কি বলবে বল ত? যাকে আমি চোখ রাঙিয়েছি, তারই ছেলে হবে আমার জামাই? আমার মেয়ে মঞ্জরী কি তার ঘরে গিয়ে দাসীবৃত্তি করবে? না না, গিন্নি, মেয়ে আমার পাগলা গারদে যায়, সেও ভাল। আমি হেরো চক্কোত্তির ছেলে ঐ মঞ্জুলটার সঙ্গে কিছুতেই মঞ্জরীর বিয়ে দেব না।

হরিমতী। ওর বাপের কথাটাই কেবল ভাবছ, ছেলের কথা ত ভাবছ না! আজকাল অমন ছেলে ক'টা পাওয়া যায়। আমার অনিমেষের সঙ্গে কত ভাব। কথায় বলে, বাচা বর ছাড়তে নেই। আর মঞ্জুল ছাড়া তোমার এ পাগল মেয়েকে বিয়েই বা করবে কে, সেটা ভেবে দেখেছ?

কুঞ্জবাবু। ভেবে অনেক কিছুই দেখেছি গিন্নি, কিছু কূল-কিনারা পাচ্ছি না। তাই ভৈরব বাঁড়ুয্যের অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে হ'ল। মঞ্জুল মঞ্জুল বলে ত বেশ ওকালতি করছ, ভেবে দেখেছ কি মঞ্জুলদের বাড়ী গিয়ে ওর পাগলামি যদি আরও বেড়ে যায়, তখন কি হবে? মঞ্জুল নিজে এসে তোমার মেয়েকে চিরদিনের জন্যে ফেলে রেখে যাবে, পাগল বলে আর নিয়ে যাবে না, বুঝলে? এ রকম কেস আমি অনেক দেখেছি।

হরিমতী। বিয়ের হাওয়া গায়ে লাগলে ওর পাগলামি সেরেও ত যেতে পারে?

কুঞ্জবাবু। ডাক্তারের চেয়েও তুমি বেশী বোঝ দেখছি। হিমাঙ্গ ডাক্তার যে সব কথা বলে গেলেন, মনে আছে?

হরিমতী। (মাথা ঝাঁকিয়া) খুব আছে। যত সব বাজে কথা। (মঞ্জরীর নিকটে গিয়া) হাঁ রে মঞ্জরি, খিদে পেয়েছে তোর? আহা অনেকক্ষণ কিছু ত খাস নি মা, কি খাবি বল।

মঞ্জরী। (জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া) কি আর খাব মা? দেবাদিদেব মহেশ্বর পান করেছিলেন হলাহল সমুদ্রমন্থনে। কিন্তু তিনি মরেন নি। সেই নীল আভা কণ্ঠে ধরে তিনি হলেন নীলকণ্ঠ। তাঁর স্পর্শে বিষ হ'ল অমৃত। দেবে মা সেই অমৃত আমায় খেতে? আমি অমৃত খাব—আমি অমৃত খাব—

হরিমতী। অমৃত্তি খাবি? তাই বল। ওরে রামু, কোথায় গেলি? শীগগির মোড়ের খাবারের দোকান থেকে এক টাকার অমৃত্তি নিয়ে আয়।

কুঞ্জবাবু। অমৃত্তি নয় গিন্নি, অমৃত। মেয়ের আমার অমৃত খেতে সাধ গেছে।

মঞ্জরী। (আপন মনে) সেই নীলকণ্ঠের নীল আভা আজও ফুটে ওঠে ময়ূরের কণ্ঠে, যখন আকাশের মেঘ-সাগরের বুকে জাগে মন্থনের প্রলয়। কেকাধ্বনি তুলে ময়ূর পেখম ছড়ায় রামধনুর স্বপ্নে; মেঘের মৃদঙ্গ ধ্বনিতে সে চঞ্চল হয় নৃত্যের আনন্দে, তাই সারা নিখিলের মনের ময়ূরও নাচে তালে তালে। "হৃদয় আমার নাচে রে—নাচে রে—"। (হাত নাড়িয়া নৃত্যমুদ্রা প্রদর্শন)

হরিমতী। (কুঞ্জবাবুর প্রতি) আমি একদিন তোমাকে বলেছিলাম, মঞ্জরীকে আর কলেজে পড়িও না, নাচের স্কুলে পাঠিও না। তুমি শোন নি সে কথা। এখন মেয়ের মুখে বড় বড় বুলি শোন, নাচের ভঙ্গী দেখ।

কুঞ্জবাবু। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল! আমি ভেবে পাচ্ছি না গিন্নি, এ অবস্থায় কে এ মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে?

(চিন্তিত ভাবে এক দিক দিয়া প্রস্থান)

হরিমতী। সত্যিই ত কে আর এখন মঞ্জরীকে বিয়ে করতে আসবে!

[অন্য দিক দিয়া অনিমেষ ও মঞ্জুলের প্রবেশ]

অনিমেষ। এই যে মঞ্জুল এসেছে মা। ওকে আজ ধরে এনেছি। কিন্তু ব্যাপার কি বল ত? রামু বলছিল কারা যেন মঞ্জরীকে শিবপুর থেকে দেখতে এসেছিল?

হরিমতী। এসো বাবা মঞ্জুল এসো। সেদিন তোমাদের বনভোজন থেকে ফিরে আসবার পর মঞ্জরী কেমন যেন হঁটো গেছে। কি সব আবোলতাবোল বকছে। গোবিন্দ ডাক্তার এল, হিমাঙ্গ ডাক্তার এল—

মঞ্জুল। বলেন কি মাসীমা, এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে?

হরিমতী। শুধু কি তাই—এদিকে শিবপুর থেকে ভৈরব বাঁড়ুয্যে এসেছিলেন মঞ্জরীর বিয়ের কথা পাকা করতে, ব্যাপার দেখে রাগ করে তাঁরা বিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন।

অনিমেষ। (ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে) শিবপুরের ভৈরব বাঁড়ুয্যের বাড়ী মঞ্জরীর বিয়ে দিতে চাও তুমি মা? জান, ভৈরব বাঁড়ুয্যের অত টাকা হ'ল কোথা থেকে? যারা ষড়যন্ত্র করে দেশের চাল লুকিয়ে ফেলে একদিন অসহায় দরিদ্র নর-নারীকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিয়েছিল, আর পথের ওপর পড়ে-থাকা সেই অনাহারে-মরা কঙ্কালদেহগুলোকে উপহাস করে যারা মোটর চড়ে বেড়িয়েছে, তোমার ঐ ভৈরব বাঁড়ুয্যে তাদেরই একজন।

হরিমতী। ও সব কথা আর কেন বাবা। এখন আর মঞ্জরীকে কে বিয়ে করতে চাইবে বল?

অনিমেষ। কেউ যদি সত্যিই বিয়ে করতে চায় মা—রূপে-গুণে সোনার চাঁদ ছেলে—যদিও সে আমার কাছে ইডিয়ট নাম্বার ওয়ান।

হরিমতী। তা হলে বুঝব, এত দুঃখের মধ্যেও ভগবানের দয়া হারাই নি।

অনিমেষ। তবে এই নাও মা মঞ্জুলকে। ওর সঙ্গেই মঞ্জরীর বিয়ে দাও—ও রাজী, আমি বলছি মা, ও রাজী।

হরিমতী। (হাস্যমুখে) সত্যি?

অনিমেষ। কি রে মঞ্জুল, মায়ের কাছে বল্ না, রাজী আছিস?

[মঞ্জুল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল, অনিমেষ ডাকিতেই মঞ্জরীও আসিয়া মঞ্জুলের পার্শ্বে দাঁড়াইল এবং উভয়ে নত হইয়া হরিমতীকে প্রণাম করিল]

হরিমতী। এসো বাবা এসো, (উভয়ের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তৎপরে কুঞ্জবাবুর উদ্দেশে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) ওগো শুনছ—শীগগির এস, দেখে যাও তোমার মেয়ে-জামাইকে।

(কুঞ্জবাবুর প্রবেশ)

কুঞ্জবাবু। কি হয়েছে আবার! একি এ যে মঞ্জুল,—

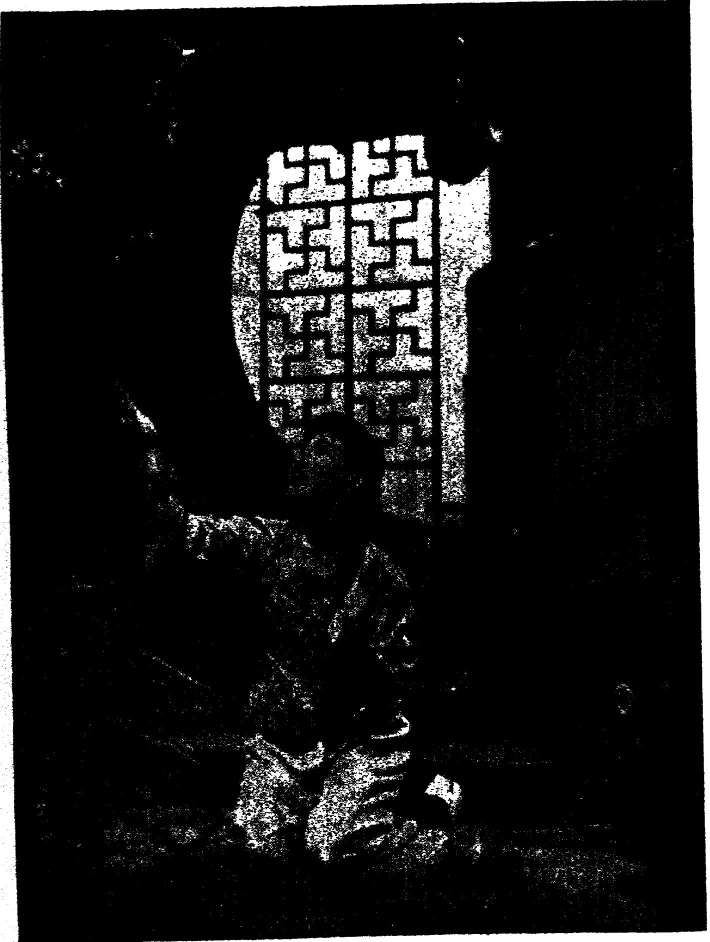
হরিমতী। হাঁ হাঁ, মঞ্জুল। নাও, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর। মঞ্জরী আমার ভাল হয়ে গেছে।

[মঞ্জুল ও মঞ্জরী উভয়ে নত হইয়া কুঞ্জবাবুকে প্রণাম করিল ও পদধূলি লইল]

কুঞ্জবাবু। থাক্ থাক্, আর প্রণাম করতে হবে না।

হরিমতী। (কুঞ্জবাবুর দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া) আর অভিমানে কাজ নেই, দাও আশীর্ব্বাদ কর—

কুঞ্জবাবু। (মঞ্জুল ও মঞ্জরীর মাথায় হাত ঠেকাইয়া) সেটা আমি মনে মনে আগেই সেরে নিলাম গিন্নি। আমার মঞ্জরী ভাল হয়ে গেছে, এর চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নেই। তবে হাঁ, বাহাদুর ছেলে বটে এই মঞ্জুল। গোবিন্দ ডাক্তার, হিমাঙ্গ ডাক্তার, যা পারে নি, মঞ্জুল তা পেরেছে।



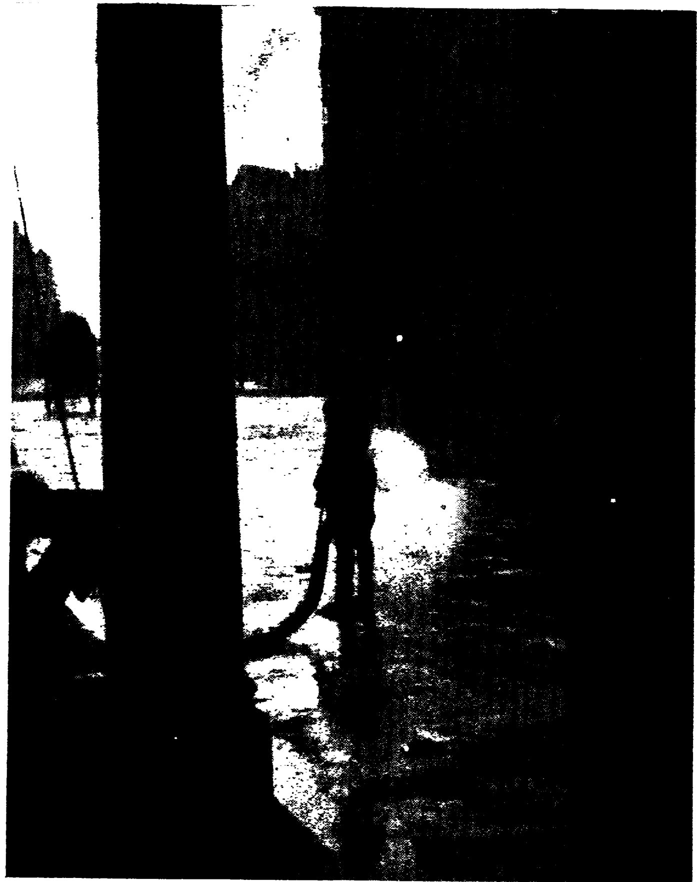
বি-বি-সি টেলিভিশনে চীনা অভিনেত্রী



বি-বি-সি হিন্দী সার্ভিসে নৃত্যকলা প্রদর্শনরত নৃত্যশিল্পী সিতারা দেবী



"বাজিয়ে যাব মল্‌..." [ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ



নিশাত্যয় [ফোটো : শ্রীগৌর দত্ত

হরিমতী। তুমি এক্ষুণি পুরুতঠাকুরের কাছে লোক পাঠাও। আজকালের মধ্যেই লগ্ন ঠিক হয়ে যাক্। আর মঞ্জুলের বাপের সঙ্গে পাকা কথা কয়ে এস। আশীর্ব্বাদ বিয়ের দিনই হবে। কা'কে কা'কে নেমতন্ন করবে একটা লিষ্টি করে ফেল—ওতে হিমাঙ্গ ডাক্তারকে বাদ দিও না যেন। আর অনিমেষকে নিয়ে কাপড়-চোপড় কিন্‌তে বেরিয়ে যাও। আজই নেমন্তন্নর চিঠি ছাপিয়ে ফেল, চিঠির ওপরে যেন প্রজাপতির ছবি থাকে, আর ছাদের ওপর ম্যারাপ বাঁধবার জন্যে গোবর্দ্ধনকে বায়না দিয়ে এসো—

কুঞ্জবাবু। আহা থাম না, সবগুলো একসঙ্গে বললে মনে থাকবে না যে!

হরিমতী। খুব থাকবে। আর দেখ, ভাল করে বাড়ীটা চুনকাম আর রং করতে হবে, তুমি রাজেন মিস্ত্রিকে ডেকে পাঠাও—সানাই বসাতে হবে, তার ব্যবস্থা করো। হালুইকর ঠাকুর জন-চারেক চাই—দানপত্তর আর ঘরসাজানোর জিনিষগুলো ভাল দেখে কিনবে—আমার বিয়ে-বাড়ীর সব কাজ যে বাকী—এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কি করে? এসো আমার সঙ্গে—

[কুঞ্জবাবুকে টানিতে টানিতে কক্ষ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন]

অনিমেষ। তোদের প্ল্যানের কিছু কিছু আগেই ধরে ফেলেছি আমি। এতে লজ্জা পাবার কি আছে বোন্? দেয়ার ইজ নাথিং আনফেয়ার ইন লাভ এণ্ড ওয়ার, যাক্, শেষটা খুব ক্লেভারলি ম্যানেজ করা গেছে। নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস।

মঞ্জুল। কিন্তু যে দেবীর বরে এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল তিনি কি এই শুভক্ষণে অন্তরালে থাকবেন? তা ত হয় না, অন্ততঃ অন্তরালে থাকা উচিত নয়। আমি এখনি যাচ্ছি—

অনিমেষ। তাঁর সম্বন্ধে আগেই অনুমান করেছিলাম, আই গেসড একজ্যাক্টলি—(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) লো, দি কঙ্কারিং হিরোইন কামস—

[কুহেলির প্রবেশ]

মঞ্জরী। (হাস্যমুখে) এই যে কুহেলি এসেছিস। তোরই কথা এইমাত্র হচ্ছিল।

কুহেলি। আসতেই হ'ল ভাই। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে জানিস ত,—হত্যাকারী হত্যাস্থানে একবার ফিরে আসবেই আসবে।

মঞ্জরী। (কৃত্রিম অভিমানে) একে তুই হত্যাকাণ্ড বলতে চাস?

কুহেলি। (হাসিয়া) যদি বলি আত্মহত্যা।

অনিমেষ। নাউ আই অ্যাম সিওর, কোয়াইট সিওর—সাইকো-এনালিসিস্ পায় এক্সেলেন্স।

মঞ্জরী। আত্মহত্যা! কার বল ত!

কুহেলি। (মঞ্জরীর হাত ধরিয়া) বল্লে যে, আমার। আজ আমারও বড় শুভদিন ভাই।

অনিমেষ। এক্সকিউজ মি, এ শুভদিন ত আপনারই সৃষ্টি মিস কুহেলি।

কুহেলি। বর্ষার মেঘ একদিনেই গড়ে ওঠে না অনিমেষবাবু। কতদিনের সঞ্চিত বাষ্প রূপ নেয় একটা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে।

অনিমেষ। কিন্তু তারই জন্য ত পথ চেয়ে থাকে ধরিত্রীর রুক্ষ ধূলিকণা।

কুহেলি। সেই ধূলিকণাই মেঘের অশ্রুতে ভিজে গিয়ে জাগিয়ে তুলবে আশার অঙ্কুর। সেখানে ফুটবে ফুল, দুলবে ফল। কিন্তু যে মেঘ নিজেকে হারিয়ে গেল তারই বুকে প্রাণের স্পন্দন দিতে, সেই মেঘের কথা কি আর তার মনে থাকবে?

অনিমেষ। কোয়াইট ট্রু, কোয়াইট ট্রু, মিস কুহেলি। সায়েন্স বলে, মেঘ ত মরে না, হারানো মেঘ আবার নতুন মেঘ হয়ে আকাশের আর একদিকে ত দেখা দিতে পারে!

কুহেলি। ও সব ফিলসফি শুনতে বেশ লাগে অনিমেষবাবু, কিন্তু ফিলসফিটাই জীবনের সব নয়, আরও একটা দিক আছে, যেখানে—

[কুহেলি ধীরে ধীরে একবার জানালার কাছে গেল, তার পর ফিরিয়া আসিয়া গাহিতে লাগিল—]

(গান)

ঝরে-পড়া ফুল কাঁদিছে আকুল দখিনা বাতাস ফিরে আয়।
—ফিরে আয়!
প্রথম মুকুল-ফোটার স্বপন আজো জেগে আছে পিয়াসায়।
—ফিরে আয়!
হারানো স্মৃতির বেদনা চাহে সে ভুলিতে,
অভিমানে আজ ঢাকে মুখ পথধূলিতে।
শেষ সুবাসের ভীরু বাণী তা'র রেখে যেতে চায় এ ধরায়।
—ফিরে আয়!
শুকতারা তা'রে দিয়েছে যে-গান
কেড়ে নিল সাঁঝ-তারা,
সে-বেদনা বুকে লুকানো আশায়
চেয়ে আছে লাজহারা।
নিভে আসে আলো, সকলি ফুরালো, তবু কেন মন তারে চায়।
—ফিরে আয়!

[গান শেষ হইলে মঞ্জরীর হাত দুটি ধরিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—]

কুহেলি। কনগ্র্যাচুলেশনস! কনগ্র্যাচুলেশনস! কনগ্র্যাচু-লেশনস। এবার তবে আসি ভাই, মঞ্জুলবাবু নমস্কার—আর অনিমেষবাবু—

অনিমেষ। ঐ নমস্কার।

মঞ্জরী। সে কি! এখনি চললি যে! না না, সে হতেই পারে না—(হাত চাপিয়া ধরিল)

কুহেলি। আর থাকবার উপায় নেই মঞ্জরী। আজ আমাদের

ষ্টুডিওতে একটা খুব—খুব—জরুরী শুটিং আছে। একটু পরেই আরম্ভ হবে, এক্ষুণি যেতে হবে ভাই আমাকে। (হাসিয়া) আমি যে ষ্টার, ছায়ালোকের তারকা—বুঝলি ?

অনিমেষ। আজ যখন শুভদিনে আমাদের হাতে ধরা পড়েছেন, যেতে দোব না আপনাকে—

কুহেলি। ধরা পড়ার চেয়ে ধরা দেওয়াটা কত শক্ত, তা কি জানেন না অনিমেষবাবু ? তবে মনে রাখবেন কাল নিরবধি, পৃথ্বীও বিপুলা—ধরা দিতেও ত পারি—হাঃ—হাঃ—

(কুহেলির হাসি যেন থামিতে চায় না। তারপর হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া)

ওঃ—বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে—আচ্ছা তবে আসি—মঞ্জরী, গুড লাক টু ইউ !

[কুহেলি তাহার ভ্যানিটি ব্যাগটি দোলাইতে দোলাইতে প্রস্থান করিল। মঞ্জুল, মঞ্জরী ও অনিমেষ তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল]।

[যবনিকা পতন]

অপকলঙ্ক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জীবনে অলীক নিন্দার ভার
বহা নহে নিষ্ফল।
মায়ের কৃপায় সুধা হয়ে ওঠে,
অন্তে সেই গরল।
বটে নিদারুণ মর্ম্মভেদী সে দুখ,
গড়ে ভেঙে চুরে নূতন করিয়া বুক,
আঁখির তপ্ত প্রতি অশ্রুটি
গড়ায় মুক্তাফল।

২

হিংসার খল-ভুজঙ্গ চায়—
বিষ ঢেলে দিতে ক্ষতে,
অজ্ঞাতে ঝরে মাণিক যে তার—
উদ্যত ফণা হতে।
বিষধর মরে—মাণিকই তাহার থাকে,
দষ্টের জয়-ললাটিকা সেই আঁকে,
মৃগনাভি হয় কিরাতের দেওয়া
আঘাত ভবিষ্যতে।

৩

অপকলঙ্ক যত বড় হোক,
যতই করুক ক্ষতি,
ক্রুরের ছিটানো কালিমা-পঙ্কে
কমে না হীরার জ্যোতি।
বিচার-বিমূঢ় দম্ভে ও অভিমানে—
নিজের ধ্বংস নিজেই টানিয়া আনে,
ঋষির কণ্ঠে মৃত পন্নগ
তক্ষে দেয় দুর্গতি।

৪

বিলম্বে হয় প্রকাশ সত্য—
গোপন শত্রু হাসে,
শেষে সে শিহরে গরল বাষ্প
বহে তার নিঃশ্বাসে।
যায় না নষ্ট-চন্দ্রের মধুরিমা—
রাকা শশী জাগে কোজাগর পূর্ণিমা,
সে শোভা দেখিতে মহালক্ষ্মী যে
আসেন মহোল্লাসে।

৫

দুর্ব্বহ হোক, অলীক নিন্দা—
তবু হিতকরী বুঝি—
বাড়াইয়া করে বিপুল গোপনে
সেই পুণ্যের পুঁজি।
নাম যজ্ঞের সে যে দধিকর্দ্দম,
পরিণামে করে রমণীয়-মনোরম,
অপাপবিদ্ধে মন্দার-মালা
দেবতারা দেন খুঁজি।

৬

ভাবেন জননী, নিরপরাধেরে
ভুলাতে দিবেন কি যে
আপন ভালের খণ্ড-চন্দ্র
তার ভালে দেন নিজে
কনক-কেশরী গর্জ্জন করি ওঠে,
খড়্গের দ্যুতি দিক্ দিগন্তে ছোটে,
জগন্মাতার বিশাল নয়ন
করুণায় যায় ভিজে।

মহাপণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার

(কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ইংরেজ শাসনের আরম্ভকালে দুই জন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক জন হইলেন ত্রিবেণীর স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—সংস্কৃতশাস্ত্র ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতসম্প্রদায়ের প্রতি বাঙ্গালীর ক্রমবর্দ্ধমান অবজ্ঞা ও বিদ্বেষসত্ত্বেও তাঁহার স্মৃতি নানাভাবে অদ্যাপি বঙ্গদেশে জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহার প্রামাণিক বিবরণ আমরা পূর্ব্বে মুদ্রিত করিয়াছি (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৪; বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃ. ২২৫-৩৩);[১] অদ্য আমরা অপর মহাপণ্ডিত কাশীনিবাসী কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের প্রামাণিক বিবরণী বহু বৎসরব্যাপী গবেষণা দ্বারা উদ্ধার করিয়া সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতির যে সকল উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের এযাবৎ জ্ঞানগোচর হইয়াছে তন্মধ্যে এই তর্কালঙ্কারের নাম সর্ব্বোপরি কীর্ত্তনীয়—বাঙ্গালী তাঁহাকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইল ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কলিকাতা মাদ্রাসা। তাহার দশ বৎসর পরে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর তারিখে (শুভ বৃহস্পতিবারে) ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বিদ্যাপীঠ সংস্কৃত কলেজ কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশীর তৎকালীন শাসক (Resident জোনাথান ডানকান্ সাহেবের নাম এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপকরূপে কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন "Sero Shastri Guru Tarkalankar Cashinath Pandit Inder Bedea Behadar।" ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই বিচিত্র নামটি বিশুদ্ধাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলাম (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২, পৃ. ৭৬৭)—"সর্ব্বশাস্ত্রগুরু তর্কালঙ্কার কাশীনাথ পণ্ডিতেন্দ্র বিদ্যাবাহাদুর।" বাঙ্গলা প্রবন্ধ গবেষকদের গোচরে কদাচিৎ আসিয়া থাকে—সম্প্রতি প্রামাণিক গবেষণা-গ্রন্থে (Sen-Misra : Sanskrit Documents, 1951, Intro. p. 52) উক্ত কাসিমুলক ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ নাম "শিরঃ শাস্ত্রী গুরু তর্কালঙ্কার কাশীনাথ পণ্ডিত যজুর্বেদী" (!)রূপে পঠিত হইয়াছে। বিকৃত ফার্সি ও ইংরেজী অনুবাদ হইতে মূল সংস্কৃত ভাষার উদ্ধারসাধন করা বস্তুতঃই দুরূহ ব্যাপার। নবস্থাপিত কলেজের তিনিই ছিলেন প্রথম অধ্যক্ষ (Principal, Director বা Head Preceptor)। তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ২০০৲ দুই শত টাকা এবং তাঁহার অধ্যয়নের বিষয় ছিল "সাধারণ বিদ্যা" (General Knowledge)। প্রতিষ্ঠাকালে অধ্যক্ষ ব্যতীত কলেজে আট জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—তন্মধ্যে দুই জন বাঙ্গালী ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক শতবর্ষজীবী "রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননে"র পরিচয়াদি আমরা উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি (বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা, পৃ. ২৮২-৩, ৩০২)। ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন অধ্যক্ষ কাশীনাথেরই পুত্র "শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য্য"। এই দুই জন অধ্যাপকের বেতন ছিল মাসিক ১০০৲ এক শত টাকা। বৃত্তিভোগী প্রথম নয় জন "শেবী"



১নং চিত্র

অর্থাৎ ছাত্রের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন বাঙ্গালী ছিলেন—রামকানাই (মাসিক বৃত্তি ১৫৲), কাশীনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ (১০৲) ও গোবিন্দ-নারায়ণ (১০৲)।—Bengal : Past & Present, Vol. viii, pp. 136-7 দ্রষ্টব্য।

ইংরেজ শাসনের প্রভাব-পরিপুষ্ট এই 'ভৃতকাধ্যাপক' পরিচালিত অভিনব বিদ্যায়তনের প্রথম পরিণাম অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। নানা চক্রান্তে এবং "শিবনাথ পণ্ডিত" প্রমুখ অবাঙ্গালী অধ্যাপকের বিরুদ্ধাচরণে কাশীনাথ অপদস্থ হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কর্ণেল উইলফোর্ড প্রমুখ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কাশীনাথ

১। বাঙ্গলার বর্ত্তমান রাজ্যপাল মহারাজ ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজেকে ত্রিবেণীর জগন্নাথের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের বার্ষিক বিবরণীতে জগন্নাথের পরিবর্ত্তে শারমুদ্রিত হইয়াছে "জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন" (!) এবং জন্ম-মৃত্যুর যে তারিখ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও ভুল।

পদচ্যুত (dismissed) হন এবং কলেজ বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে কাশীনাথ তদানীন্তন লাটসাহেব লর্ড মর্নিংটনের নিকট ফার্সি ভাষায় লিখিত এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। জাতীয় দপ্তরখানায় এই মূল্যবান্ আবেদনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং



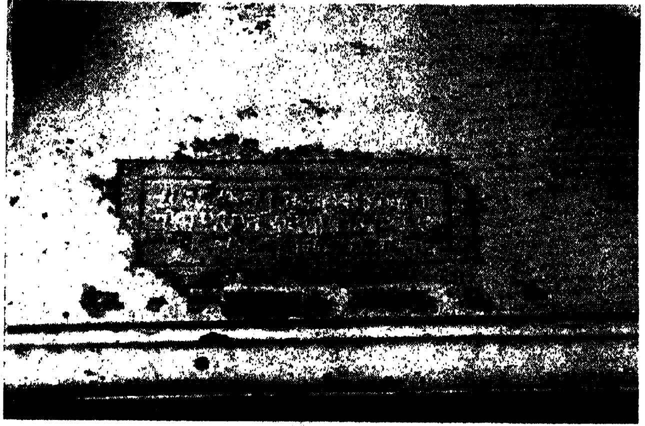
২নং চিত্র

পূর্ব্বোক্ত Sanskrit Documents গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে তাহা কর্তৃপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল। এই আবেদনপত্রের আরম্ভে কাশীনাথ স্রগ্ধরা ছন্দের দুইটি মনোহর সংস্কৃত শ্লোকে "লাট-মার্ট্নি-ভূপ"-কে সম্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছেন। এই আবেদনপত্রে কাশীনাথ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে-কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের মূল প্রস্তাব তাঁহারই কল্পিত বটে, এবং এই দাবির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কোন আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। আবেদনের সারাংশ উদ্ধৃত হইল :

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে ভগবদ্গীতার আদি ইংরেজী অনুবাদক ইংরেজদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতবিৎ বলিয়া পরিচিত সুবিখ্যাত সার চার্লস উইল্কিন্স সাহেব সংস্কৃতশাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য কাশীধামে গিয়াছিলেন। যে সকল পণ্ডিতকে সাহেব আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেকে সাহেবকে শাস্ত্র পড়াইতে অস্বীকার করেন এবং অন্যেরা সুচারুরূপে অধ্যাপনা করিয়া দুরূহ স্থলে সাহেবের সন্দেহভঞ্জনে অসমর্থ হন। পরিশেষে পণ্ডিত কাশীনাথই সাহেবকে পড়াইয়া দিয়া অল্পকালমধ্যেই তাঁহার তুষ্টিবিধান করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হইলে কাশীনাথ উইল্কিন্স সাহেবের নিকট কাশীতে অনুরূপ একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল এবং হেষ্টিংস কাশীনাথকে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাশীনাথ যখন কলিকাতা গিয়া পৌঁছিলেন তখন হেষ্টিংস সাহেব বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাশীনাথের দশ বৎসরব্যাপী প্রচেষ্টা অবশেষে ডান্কান্ সাহেবের আমলে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। (আবেদনে অবশিষ্টাংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল)।

কাশীতে কাশীনাথের প্রতিষ্ঠা :—আবেদনপত্রে উল্লিখিত কাশীনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠার কথা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। সেকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে "একা বিদ্যা সুশিক্ষিতা" নীতি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হইত এবং পণ্ডিতগণ যাবজ্জীবন একটিমাত্র শাস্ত্রের চর্চ্চায় কাটাইয়া দিতেন—নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি অথবা ব্যাকরণ। কিন্তু অসামান্য প্রতিভাবলে কাশীনাথ ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে এবং রাজকীয় প্রমাণপত্রে চারিটি উপাধি দ্বারা বিভূষিত ছিলেন—তন্মধ্যে "তর্কালঙ্কার" নিশ্চয়ই তাঁহার উপাধ্যায়প্রদত্ত বিদ্যোপাধি এবং সম্ভবতঃ নব্যন্যায়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যসূচক। তাঁহার স্বাক্ষরিত একটি অভিনন্দনপত্রের বর্ণনায় ইংরেজীতে তর্কালঙ্কারপদের অর্থ করা হইয়াছে "Ornament of Logic" (পূর্ব্বোদ্ধৃত Sanskrit Documents, p. 51 f.n. 128)। ১৮৫২ সম্বতে ফাল্গুনী শুক্লা-সপ্তমীতে (=১৫ মার্চ ১৭৯৬ খ্রীঃ) বারাণসীর পণ্ডিতগণ হেষ্টিংস সাহেবকে যে সম্বর্দ্ধনাপত্র প্রেরণ করেন তাহার স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কাশীনাথের নাম, উপাধি ও শীলমোহর সর্ব্বাগ্রে প্রদত্ত হইয়াছিল। "পণ্ডিতেন্দ্র" উপাধি কাশীর বিদ্বৎসমাজে তাঁহার সর্ব্ববাদিসম্মত প্রাধান্য সূচনা করে—কলেজে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সময়ে তাঁহার বিপক্ষ সম্প্রদায়েও কেহ তাঁহার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই ("Kasinatha's scholarship has not been called into question by any of his critics". ঐ ঐ)। "সর্ব্বশাস্ত্রগুরু" উপাধিটি অনন্যসাধারণ. ত্রিবেণীর জগন্নাথও প্রকাশ্যে ঐরূপ কোন উপাধি ধারণ করেন নাই। কাশীনাথের বংশধরদের নিকট জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি "পশুভাষা ইত্যাদি বিদ্যাতে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।" সুতরাং তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য কেবল তরল স্তুতিবাদ মাত্র নহে। "বিদ্যাবাহাদুর" উপাধি অদ্বিতীয়—উইল্কিন্স সাহেবের সহিত পরিচয়ের পর কাশীনাথ সাহেব-মহলে খ্যাতিলাভ করেন এবং এই "বাহাদুর" উপাধি রাজদত্ত বটে। ইংরেজ শাসনে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে উপাধিমণ্ডিত করার ইহাই বোধ হয় প্রাচীনতম নিদর্শন। কাশীনাথ বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং সর্ব্বদা বিদ্বৎ-পরিবেষ্টিত হইয়া

থাকিতেন। বেদান্ত সূত্রের "সমঞ্জসা" বৃত্তিকার অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি এই "কাশীনাথবিচক্ষণস্য সদসি স্থিত্বা" (অর্থাৎ, কাশীনাথ পণ্ডিতের সভায় অবস্থান করিয়া) "সীতাশতক" নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।১ অনুলিপির অন্তে যে "১৮৬২ সম্বৎ" লিখিত আছে তাহা বোধ হয় রচনাকাল (।১৮০৫-৬ খ্রীঃ)। সংস্কৃত কলেজে কর্মচ্যুতির প্রায় ৫ বৎসর পরেও তাহা হইলে কাশীনাথের প্রতিষ্ঠা কাশীতে অক্ষুণ্ণ ছিল বুঝা যায়।



৫নং চিত্র

কাশীনাথের রচনা :—কাশীনাথ নানা শাস্ত্রে বহু গ্রন্থই রচনা করিয়া থাকিবেন। আমরা তদ্রচিত দুইটি গ্রন্থ কেবল পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণপ্রদত্ত হইল। কাশী অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলেতাঁহার অন্যান্য গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। (১) "শব্দসন্দর্ভসিন্ধু"—সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পূর্ব্বে ১৭১২ শকাব্দে কাশীনাথ সাহেবদের "আদেশে" এই বর্ণানুক্রমিক অভিধান রচনা করেন—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি পুঁথিশালায় ইহার নাগরাক্ষর প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষে বর্ণানুক্রমে অভিধান রচনায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা বটে। ৪৯ তরঙ্গে বিভক্ত এই গ্রন্থে পর্য্যায় ও নানার্থ উভয়ই সিদ্ধবৎ লিখিত হইয়াছিল—ব্যুৎপত্তি কিম্বা প্রমাণবচন ইহাতে নাই। আরম্ভের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :

> ধ্যাত্বা বিশ্বেশপাদাম্বুজযুগমমলং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
> তর্কালঙ্কার-সিদ্ধ-ত্রিপুরহরপুরে পণ্ডিতেন্দ্রঃ ক্ষিতীন্দ্রাৎ।
> বিদ্যাবাহাদুরাখ্যামলভত ভুবনে সর্ব্বশাস্ত্রে গুরুর্যঃ
> শ্রীকাশীনাথশর্ম্মা বিরচয়তি মুদা শব্দসন্দর্ভসিন্ধুম্॥

১৮৪৭ সম্বতের ফাল্গুন মাসে (১৭৯১ খ্রীঃ) অনুলিখিত সোসাইটির পুঁথির পাঠ উদ্ধৃত হইল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথি ১৮৪৮ সম্বতের ফাল্গুনে অনুলিখিত (১৭৯২ খ্রীঃ)—তাহাতে "যোগিভির্ধ্যানগম্যং" স্থলে "লোকধর্ম্মানুশাস্তা" এবং "সিদ্ধ" স্থলে "সংজ্ঞ" পাঠ আছে। কাশীনাথ তর্কালঙ্কার সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং কাশীর বিদ্যাসমাজে পণ্ডিতেন্দ্র ও রাজার নিকট বিদ্যাবাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রগুরু বলিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

> গ্রন্থঃ চাণ্ড সতাং সুবোধজনকং রম্যং জনানাং মুদে
> বিস্পষ্টীকৃত-বিস্তৃতার্থ-বিলসচ্ছব্দাবলী-সংযুতম্।
> ইঙ্গলণ্ডোদ্ভব-মেন্দ্র-বৈদ্যতিলকপ্রাদেশতঃ শ্রীমতো
> বিদ্বৎপুষ্পপোষণাদ্ভুত-যশোরাকাসুধাংশুপ্রিয়ঃ॥

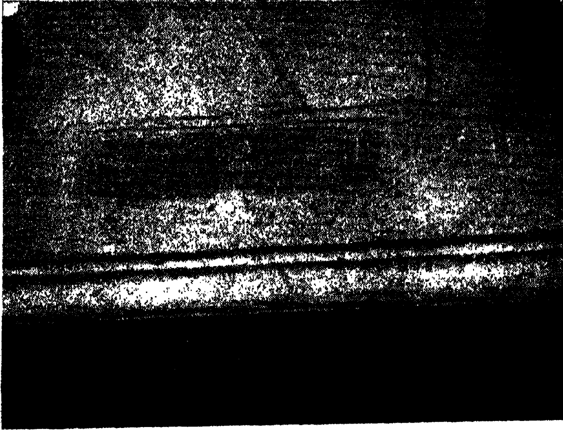
এই শ্লোকে পণ্ডিতসমাজের পৃষ্ঠপোষক কোন্ "বৈদ্যতিলক" সাহেবের মনোহর স্তুতিবাদ রহিয়াছে বুঝা গেল না। সংস্কৃত কলেজের পুঁথিতে শ্লোকটি অনেক পরিবর্ত্তিত—তাহাতে কোন সাহেবের উল্লেখ নাই। উইল্‌সন্ সাহেব তাঁহার অভিধানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন কাশীনাথ সার্ উইলিয়াম জোন্‌সের জন্য এই অভিধান রচনা করেন—কিন্তু কাশীনাথের বর্ণনা জোন্‌সকে নির্দ্দেশ করে না। লক্ষ্য করা আবশ্যক কাশীনাথের প্রথম পৃষ্ঠপোষক উইল্‌কিন্‌স তখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গিয়াছেন। গ্রন্থশেষে রচনা সমাপ্তির কাল লিখিত আছে :

> শাকেঽব্দে যুগলেন্দু-সিন্ধুধরণী-সংখ্যামিতে শ্রীমতা
> কাশীনাথ-বরামরেণ বিদুষা হর্ষেণ সন্নির্ম্মিতঃ।
> গ্রন্থো ধীরজনপ্রমোদজনকঃ সংদৃষ্টনামঃ সুখং
> পাণ্ডিত্যপ্রদ এষ শাম্ভবপুরেঽপূর্ব্বঃ সমাপ্তিং গতঃ॥

অর্থাৎ, এই "অপূর্ব্ব" গ্রন্থ কাশীতে ১৭১২ শকাব্দে (১৭৯০-৯১ খ্রীঃ) সমাপ্ত হইয়াছিল।

(২) কাশীনাথ "শ্যামাসপর্য্যাবিধি" নামে একটি উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন এবং অভিধানে উল্লিখিত "সিদ্ধ" পদ হইতে জানা যায় তিনি স্বয়ং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রাজসাহীর বোড়িয়া গ্রামে নাটোর রাজবংশীয় শশিভূষণ ঠাকুরের গৃহে রক্ষিত ২৪৮ পত্রে

১। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত "গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস", ১৩৬০ সন, পৃ. ২৮৫-৬। উপসংহার-শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ সংশোধনীয়—"ভাগ্যবশতঃ তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিতেন্দ্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যিনি সর্বান্তরনায়ক অর্থাৎ ইংরাজ রাজপুরুষকর্তৃক বিদ্যাবাহাদুর উপপদদ্বারা বিজ্ঞাত ছিলেন (জ্ঞানার্থক গম্-ধাতুর প্রয়োগ) সেই শ্রীযুত পণ্ডিত কাশীনাথের সভায় বসিয়া অনূপনারায়ণ শ্রীসীতাশতক নামে অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।" ছন্দোদুষ্ট শেষ পঙক্তির পাঠ হইবে বোধ হয় "শ্রীসীতাশতকাভিধামৃতশিরোঽস্তানুপনারায়ণঃ।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, "সমঞ্জসা"র বঙ্গাক্ষর লিপিকার "শঙ্করানন্দদণ্ডী"ও (ঐ, পৃ. ২৮২-৮৩) বাঙ্গালী ছিলেন বুঝা যায়—লিপিকাল ১৭২১ শকাব্দ (১৭৩১ মধ্যে, 'নেত্র' শব্দ দুই অঙ্কের বাচক—জ্যোতিস্তত্ত্বাদি দ্রষ্টব্য) সমঞ্জসা-রচনার অল্প পরবর্ত্তী হইবে। মেদিনীপুরের শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ কাশীতে অনূপনারায়ণ ও শঙ্করানন্দ উভয়ের ছাত্র ছিলেন (সা-প-প, ৬০, পৃ. ২৯)। উভয়েই কাশীনাথের সভাসদ্ ছিলেন মনে করা যায়।



৪নং চিত্র

উত্তরতন্ত্র, উত্তরাতন্ত্র, কামাখ্যা, কালিকোপনিষৎসার, কালীকল্প, কালীতন্ত্র, কুব্জিকা, কুমারীকল্প, কুমারীতন্ত্র, কুলার্ণব, কৌলতন্ত্র, গুপ্তসাধন, গুরুতন্ত্র, চিন্তামণি, জ্ঞানতন্ত্র, তন্ত্ররাজ, তারাতন্ত্র, তারাবিলাস, তারাসূক্ত, নিরুক্ত, পুরশ্চর্য্যারসোল্লাস, বালাবিলাস, ভূতশুদ্ধি, মহাকালসংহিতা, মাতৃকাভেদ, যোগিনী, যোনি, রাধা, রুদ্রযামল, বিমলা, বিশ্বসার, বীরতন্ত্র, শক্তিসঙ্গম, সঙ্গোপন, সময়া, সরস্বতী, স্বতন্ত্র।

সংগ্রহগ্রন্থ : কালিকার্চ্চাবিধি, কালীতত্ত্ব, কৃত্যার্ণব, কৌলাবলী, কৌলিকার্চ্চনদীপিকা, ক্রমপূজাক্রমলতা, তন্ত্রজীব, তন্ত্রসার, তত্ত্ববোধ, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, তারাকল্পলতা, তারাপ্রদীপ, তারাভক্তিসুধার্ণব, তারারহস্যবৃত্তি, ত্রিপুরাসার, ফেৎকারিণী, মন্ত্রদর্পণ, মন্ত্রমহোদধি, শাক্তক্রম, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, শারদাতিলক, শ্যামারহস্য। এই সকল তন্ত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া তিনি সাধকদের হিতের জন্য স্বকীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন :

> ইত্যাদি কুলশাস্ত্রাণি সমালোচ্য পুনঃ পুনঃ।
> সাধকানাং হিতার্থায় গ্রন্থমেনং বদাম্যহম্॥

গ্রন্থটি সাত "বিভাগে" বিভক্ত—প্রাতঃকৃত্যাদিবিবরণ (১৯।১ পত্র), অন্তর্যজনাদি (৪১।১ পত্র), বহির্যাগাদি (৬৭।১ পত্র), জপরহস্যাদি (৯২।২) ও নৈমিত্তিকার্চ্চনাদি (১০৯.২)—এই পাঁচ বিভাগ পর্য্যন্ত সোসাইটির পুথিতে আছে। বাকী দুইটি (কাম্যসাধনাদি ও বিদ্যামাহাত্ম্যাদি) বিভাগ এই পুথিতে নাই। একটি পরিপূর্ণ পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—"ইতি নিগমাগমবিদ্যাবিদ্যোতিত-সর্ব্বশাস্ত্রগুরু-শ্রীকাশীনাথ-তর্কালঙ্কার-ভট্টাচার্য্যবিরচিতে সিদ্ধান্তসারাত্মকে শ্যামাসপর্য্যাবিধৌ প্রাতঃকৃত্যাদিবিবরণং নাম প্রথমো বিভাগঃ সমাপ্তঃ।" কাশীনাথ তান্ত্রিক "কুলাচারে"র সাধক ছিলেন। গ্রন্থের চতুর্থ বিভাগে 'কুলাচারাদিবিবরণ' দৃষ্ট হয় এবং তন্মধ্যে কুলাচারীদের অতিপ্রিয় স্বরূপাখ্যস্তোত্রের (অর্থাৎ কর্পূরাদিস্তোত্রের) কাশীনাথ রচিত টীকা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে :

> কালীচরণসরোজং নত্বা শ্রীকাশী শর্ম্মণা।
> ক্রিয়তে স্বরূপাখ্যনুতিরহস্যার্থসাধিকা টীকা॥ (৭৯।১ পত্র)

ইতি...শ্রীকাশীনাথ-তর্কালঙ্কার-ভট্টাচার্য্যবিরচিতা রহস্যার্থসাধিকা স্বরূপাখ্যস্তোত্রটীকা সমাপ্তা (৮৪।২ পত্র)। কুলাচার সম্বন্ধে অতি প্রামাণিক গ্রন্থ গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যরচিত "কুলমূলাবতার" হইতে তিনি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩৯।১ পত্র)। তান্ত্রিক সাধনায় তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। নিম্নলিখিত ঘটনা তাঁহার সম্বন্ধে কাশীতে শ্রুত হওয়া গিয়াছে। কুলাচারে মদ্য আবশ্যক হয় এবং তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা প্রচুর মদ্য প্রস্তুত থাকিত। একদা তাঁহার কোন শত্রু ঈর্ষ্যাবশতঃ কলেজের সাহেব সেক্রেটারিকে তাঁহার

সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের বিবরণী মুদ্রিত করিয়াছেন (Notices of Sans. Mss. Vol. II, p. 202)। প্রারম্ভ শ্লোক এই :—

> সাষ্টাঙ্গং নমনং বিধায় পদয়োঃসাধ্যপীঠে গুরোঃ
> চিন্ময়্যাশ্চরণাম্বুজে বিজয়দে মোক্ষাস্পদে চাদ্ভুতে।
> জ্ঞাত্বা তন্ত্রচয়ং বিচার্য্য বহুধা "বন্দ্যোদিতঃ" শ্রীযুতঃ
> কাশীনাথবরামরঃ প্রতনুতে শ্যামাসপর্য্যাবিধিম্॥

এই গুরুবন্দনা ও মঙ্গল শ্লোকে কাশীনাথ 'বন্দ্যোদিত' পদে কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তিনি "বন্দ্য" বংশীয় অর্থাৎ বানার্জি ছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছি তাঁহার কুলগুরু "খড়দহ" নিবাসী ছিলেন, কিন্তু বহুকাল যাবৎ সংযোগ না থাকায় তাঁহার পরিচয়াদি অজ্ঞাত। গ্রন্থশেষে রচনাকাল সৌভাগ্যবশতঃ লিখিত আছে :

> শাকেঽঙ্ক-গ্রহসম্মিতে রসযুতে চন্দ্রে দিনে ভাস্করে
> মার্গে মাসি সিতেতরে হরতিথৌ স্বার্থং সতাং তুষ্টয়ে।
> কাশীস্থাখিলতন্ত্রমন্ত্রবিদুষামালোচ্য সিদ্ধং মতং
> শ্যামার্চ্চা বিধিমদ্ভুতং সুকৃতবান্ সর্ব্বার্থসম্পাদকম্॥

অর্থাৎ, কাশীর সমস্ত তান্ত্রিক পণ্ডিতের মত আলোচনা করিয়া এই "অদ্ভুত" গ্রন্থ ১৬৯৯ শকাব্দে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে "হর" তিথি রবিবার (১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে) রচিত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের নাগরাক্ষর প্রতিলিপি সংগৃহীত হয়—তাহা এখন সোসাইটিতে রক্ষিত আছে (পত্র সংখ্যা ১০৯)। খণ্ডিত বলিয়া রচনাকাল-সূচক শ্লোকটি ইহাতে নাই। মঙ্গল শ্লোক এই :

> চিদানন্দরূপাং জগদ্ধেতুভূতাং, মহামোক্ষকর্ত্রীং শিবাং সেবকানাম্।
> কৃপাসিন্ধুচিন্ত্যাং মহামেঘবর্ণাং, সতাং কামদাত্রীং সদাহং প্রপদ্যে॥

গ্রন্থারম্ভে কাশীনাথ-পরীক্ষিত তন্ত্রগ্রন্থের মূল্যবান্ সূচী আছে। আমরা বর্ণানুক্রমে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মূলতন্ত্র :—অন্নদাকল্প, আচারসার, আথর্ব্বণশ্রুতি, উড্ডীশতন্ত্র,

বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিবার জন্ম অতর্কিতে তাঁহার গৃহে মদ্যভাণ্ড দেখাইবার জন্ম সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান—কিন্তু তাঁহারা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে পান যে সমস্ত মদ্যভাণ্ড দুগ্ধে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

এই "ভুবন"-বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম-পরিচয়াদি কাশীর কোন বিবরণী-গ্রন্থে (বাঙ্গলা বা ইংরেজীতে) মুদ্রিত হয় নাই এবং তাঁহার বাসস্থান কাশীধামে কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আমরা বহু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়া তাঁহার কুল-পরিচয়, বংশধারা এবং মন্দিরাদিপ্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ কৃতার্থ হইতেছি। কাশীনাথের এক অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮১-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে "পূর্ণ অষ্টকম্" নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন—তন্মধ্যে স্বরচিত বাঙ্গলা ও হিন্দী আটটি গান ও ভজনসহ নানা স্তোত্রাদি মুদ্রিত হয়। ইহার প্রারম্ভে "বংশাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং কিঞ্চিৎ নিবেদন" আছে। আমরা সংশোধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পূর্ণচন্দ্র "গরীব পূরণদাস" নাম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ যষ্টি হস্তে পরিভ্রমণ করিতেন—তাঁহার বেশভূষা, বিরাট গুম্ফরাজি ও কথাবার্ত্তায় হিন্দী শব্দের প্রাচুর্যহেতু তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া ধরা যাইত না, যদিও তিনি বার্দ্ধক্যে কাশীর দেবনাথপুরায় অধ্যাপক সারদাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে বাস করিতেন। পূর্ণচন্দ্র কাশীনাথের চারিটি উপাধিই যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (কেবল বিদ্যাবাহাদুর স্থলে "বিদ্যাবাহাদুরেশ্বর" লিখিত হইয়াছে)—কিন্তু সংস্কৃত কলেজে তাঁহার নিয়োগবার্ত্তা তখন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কাশীনাথের পিতা "রাঢ়ীশ্রেণী, ফুলে মেল, শ্রীপতির সন্তান, সাগরদিয়ার বন্দিঘাটি"-বংশীয় "লক্ষ্মীনারায়ণ" নবদ্বীপ হইতে কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। ভগীরথের পুত্র শ্রীপতির নাম ধ্রুবানন্দ মিশ্র উল্লেখ করিয়াছেন (মহাবংশাবলী, পৃ. ১৩৩)—সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৫০০ খ্রীঃ। শ্রীপতিগোষ্ঠীতে অন্ততঃ পাঁচ জন লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন—তন্মধ্যে কালানুসারে একজনকে কাশীনাথের পিতা বলিয়া ধরা যায়, অপর সকলেই পরবর্ত্তী বটে। শ্রীপতির অধস্তন সপ্তম পুরুষ (শ্রীপতি—দুর্গাদাস—রাঘব—জয়রাম—রাজা রঘুরাম—শ্রীধর—লক্ষ্মীনারায়ণ) এক লক্ষ্মীনারায়ণের নাম আমরা ১৭২০ শকাব্দে অনুলিখিত একটি কুলপঞ্জীতে পাইতেছি (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথি ৬৭১১ পত্র)—তাঁহার অভ্যুদয়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পড়ে। লক্ষ্মীনারায়ণের অধস্তন ধারা এই :

লক্ষ্মীনারায়ণ—কাশীনাথ তর্কালঙ্কার—শ্যামানন্দ বিদ্যালঙ্কার—জগচ্চন্দ্র (নিঃসন্তান) ও জগদীশচন্দ্র—গুরুদাস (অবিবাহিত মৃত) বরদাদাস, সারদাদাস ও ঠাকুরদাস (চারি পুত্র)। বিগত পুরুষ পর্যন্ত জগচ্চন্দ্রাদি সকলেরই উপাধি ছিল "পণ্ডিত"। পূর্ণচন্দ্র ও কাশীনাথের বর্ত্তমান বংশধরগণ শ্যামানন্দের নাম পরিজ্ঞাত নহেন। তাঁহারা জগদীশচন্দ্রকে কাশীনাথের পুত্র বলিয়া থাকেন। ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের ধারণা। কারণ বলিতেছি।

কাশীনাথের ইষ্টকালয় ও মন্দির: শব্দসন্দর্ভসিন্ধুর উক্তিবলে আমরা জানিতেছি ১৭১২ শকাব্দের (অর্থাৎ, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের)



১নং চিত্র

পূর্ব্বেই কাশীনাথ "ক্ষিতীন্দ্র" হইতে বিদ্যাবাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষিতীন্দ্র ডানকান সাহেব না হইয়া (গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস, পৃ. ২৮৬ দ্রষ্টব্য) তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উচ্চতর রাজপুরুষ হইবেন। কাশীনাথের ছাত্র উইলকিন্‌স সাহেব ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। আমাদের অনুমান তৎপূর্ব্বেই কাশীনাথ রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন—উক্ত উপাধি ও তৎসহ "করেকখানা গ্রাম"। বর্ত্তমান বংশধরদের মতে তাঁহার সাতগ্রামের জমিদারী ছিল। তন্মধ্যে পঞ্চক্রোশী সড়কের সংলগ্ন রোহণীয়া থানার অন্তর্গত "অমরা" গ্রামে কাশীনাথ ইষ্টকালয় করিয়া শিবমন্দির স্থাপনা করেন। অমরাগ্রাম হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরবর্ত্তী। মন্দিরটি এখনও উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দাঁড়াইবার স্থানের অভাবে মন্দিরদ্বয়ের চূড়ার অংশ ছবিতে বাদ পড়িয়াছে (১নং চিত্র)। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। ২নং ছবিতে সম্পূর্ণ চূড়াসহ পশ্চিমাংশ দ্রষ্টব্য। উভয় মন্দিরই "সপ্তরত্ন" অর্থাৎ, সপ্তদশ চূড়াবিশিষ্ট। পশ্চিমাংশের দ্বারদেশে নাগরাক্ষরে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে—তাহার পাঠ এই (৩ নং ছবি দ্রষ্টব্য) :

সর্ব্বশাস্ত্রগুরুতর্কালঙ্কারশ্রীকাশী-
নাথপণ্ডিতেন্দ্রবিদ্যাবাহাদুরেশ্বরঃ॥
সম্বৎ ১৮৫০ চৈত্রমাসীয় পূর্ণিমায়া

পূর্ব্বাংশের দ্বারদেশস্থ শিলালিপির পাঠ (৪ নং ছবি দ্রষ্টব্য) :

(৭ অক্ষর অপাঠ্য) ভট্টাচার্য্যশ্রীশ্যামানন্দ-
পণ্ডিতরাজবিদ্যালঙ্কারবাহাদুরেশ্বরঃ॥
সম্বৎ ১৮৫০ চৈত্রমাসীয়পূর্ণিমায়াম্॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে পিতা-পুত্র একই সময়ে মন্দিরের দুই অংশে দুইটি শিব নিজ নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিক্রম-সম্বৎ "চৈত্রাদি"—১৮৫০ সম্বতের চৈত্র পূর্ণিমা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পড়িয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে কাশীনাথের পুত্রের নাম লিখিত আছে শুধু—"Shamanund Bhattacharji son of Cashenauth"। কিন্তু শিলালিপিতে ভট্টাচার্য্য ছাড়া তাঁহার তিনটি উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে—"পণ্ডিতরাজ", বিদ্যালঙ্কার ও "বাহাদুর"। অর্থাৎ, তিনিও কাশীর পণ্ডিতসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ১০০্ টাকা বেতনে "Professor or Teacher of the Dherm Shaster" নিযুক্ত হইয়াছিলেন—তৎকালে তাঁহার বয়স ৪০-৫০এর কম হইবে না এবং তাঁহার জন্মতারিখ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না।

পূর্ণচন্দ্রের লেখানুসারে জগদীশচন্দ্র কাশীনাথের পুত্র অর্থাৎ শ্যামানন্দের ভ্রাতা হইলে দুই ভ্রাতার মধ্যে বয়োব্যবধান হয় ন্যূনপক্ষে ৪০, কারণ জগদীশের পুত্র বরদাদাস ১৩০৪ সালে স্বর্গত হইয়াছিলেন। যাঁহার পুত্র ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবীণ অধ্যাপক তাঁহার পৌত্র শতাধিক বৎসর পরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, ইহা প্রায় অসম্ভব। জগদীশচন্দ্রকে তজ্জন্য আমরা যুগ্মমন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্যামানন্দের পুত্ররূপে ধরিতেছি। জগদীশচন্দ্র মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন এবং মন্দিরের পূর্ব্বভাগে অশ্বত্থ গাছও সম্ভবতঃ তাঁহারই রোপিত। কাশীনাথের ইষ্টকালয় এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত—ভগ্নাবশেষের ছবি দ্রষ্টব্য (৫নং ছবি)।৩

৩। প্রবন্ধলেখকের ভাগিনেয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী "অমরা" পরিদর্শন করিয়া ছবিগুলি তুলিয়া পাঠাইয়াছে।

কাশীনাথের বংশধারা : কালক্রমে কাশীনাথের জমিদারী নষ্ট হইয়া যায় এবং ১২৬৮ বঙ্গাব্দে তিন ভাই বরদাদাস, সারদাদাস ও ঠাকুরদাস পৃথগন্ন হইয়া দারিদ্র্য বরণ করিতে বাধ্য হন। তখন তাঁহাদের মাতা জীবিত ছিলেন। ঠাকুরদাস ও তাঁহার জননী অমরাগ্রামেই দেহত্যাগ করেন—তাঁহার একমাত্র পুত্র মহেশচন্দ্র নিঃসন্তান মৃত। বরদাদাস অমরা ত্যাগ করিয়া কাশীশহরে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। তাঁহার ১৩০৪ সনে ৺কাশীলাভ হয়। তাঁহার চারি পুত্র ছিল—নবীনচন্দ্র, গুরুপ্রসন্ন, রামচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র। নবীনচন্দ্র ভিন্ন সকলেই অবিবাহিত মৃত। নবীনচন্দ্র একমাত্র পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে এক বৎসরের শিশু রাখিয়া (১২৮২ সাল) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন এবং ২১ বৎসর পরে জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছাদিত দেহে আসিয়া দর্শন দেন—তৎকালে তাঁহার পিতা-মাতা জীবিত ছিলেন। ১৩০৯ সনের মাঘ মাসে তাঁহার সমাধিলাভ হয় এবং সন্ন্যাস বিধি অনুসারে তাঁহার পূতদেহ গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। পূর্ণচন্দ্র (১২৮১-১৩৪৮ সন) নিঃসন্তান স্বর্গত হইয়াছেন—তাঁহার আত্মকাহিনী তাঁহার পুস্তিকায় বর্ণিত আছে।

সারদাদাস যৌবনকালেই এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া স্বর্গত হন—এই কন্যা নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্করের মাতামহী। পুত্র উমেশ-চন্দ্র রেলওয়েতে চাকুরী করিতেন—১৩৪১ সনের আষাঢ় মাসে ৮২।৮৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গত হন। তাঁহার সাত পুত্র ৺বিপিন-বিহারী, ৺বিনোদবিহারী, ৺ললিতবিহারী, ৺কুঞ্জবিহারী, ৺ব্রজ-বিহারী, শ্রীবঙ্কুবিহারী ও শ্রীকৃষ্ণবিহারী। বর্ত্তমানে উমেশচন্দ্রের পুত্রদ্বয়ব্যতীত বিপিনবিহারীর ৫ পুত্র এবং বিনোদবিহারীর এক পুত্র জীবিত থাকিয়া মহাপণ্ডিত কাশীনাথের বংশরক্ষা করিতেছেন। বিনোদবিহারীর পত্নী অসহায় অবস্থায় অমরাগ্রামে কাশীনাথের কীর্ত্তিস্থলে বাস করিতেছেন (৫নং ছবি দ্রষ্টব্য)। ঐ অঞ্চলে আর কোন বাঙ্গালী নাই। বিনোদবিহারীর পত্নী সপুত্রক কাশী শহরে বাস করেন।৪

৪। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র অনুজ-কল্প অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য পূর্ণচন্দ্রের দুর্ল্লভ পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়া দেন এবং বিপিনবিহারীর পত্নী শ্রীতারকেশ্বরী দেবীর প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া বহু তথ্য প্রেরণ করেন। কাশীনাথের লুপ্তস্মৃতি বস্তুতঃ তিনিই বহু কষ্টে উদ্ধার করিয়াছেন।





গুরুদক্ষিণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাস তিনেক পরের কথা। গরমের ছুটির পর। চন্দ্রভূষণবাবু ইস্কুল খুলবার চার-পাঁচ দিন আগেই এসেছেন। ছুটির মধ্যেও বারদুয়েক এসেছিলেন। ইস্কুলের ব্যবস্থায় ও বন্দোবস্তে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনে আসতে হয়েছিল। আয়োজন অনেক। স্কুল বোর্ডিঙের চারিদিকে কম্পাউণ্ড ওয়াল তৈরি হচ্ছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে নতুন বাড়ীও তৈরি হচ্ছে, হেড মাষ্টারের কোয়ার্টার; হেডমাষ্টারই হবেন বোর্ডিং সুপারইন্‌টেণ্ডেণ্ট। আরও কয়েকখানা পাকা ঘরের একটি বোর্ডিং হাউস তৈরি হচ্ছে—তাতে নতুন মাষ্টার যাঁরা আসছেন—তাঁরা থাকবেন। এই সঙ্গে ইস্কুলের বাড়ী, পুরানো বোর্ডিং হাউসের বাড়ীও মেরামত হচ্ছে—চুণকাম হচ্ছে। সেই সবগুলি দেখাশুনা করবার জন্য ছুটির মধ্যে বারদুয়েক তাঁকে আসতে হয়েছিল। কাজকর্ম্ম চৈতন্যবাবুর এষ্টেট থেকেই হচ্ছে, তাঁরাই করাচ্ছেন, তবু দেখেশুনে নেওয়ার ভার তাঁর উপর ছিল। সরকার থেকে এজন্যে টাকা দিয়েছেন—খরচের একটা মোটা অংশ এবং এর জন্যে তাঁরা অনেক নিয়মকানুনেরও কড়াকড়ি করেছেন। ভালোই করেছেন।

গরমের ছুটির বন্ধের দিনই বিদায়ী শিক্ষকেরা অবসর নিয়েছেন—ওই দিনই তাঁদের কার্য্যকাল শেষ হয়েছে। সে দিন ইস্কুলে একটি বিদায়-অভিনন্দনের সভারও আয়োজন হয়েছিল। অতি সকরুণ বেদনা এবং অকপট অশ্রুজলের মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটেছে। সেকেণ্ড মাষ্টার সুশাঙ্ক রায়, থার্ড মাষ্টার রামরতন পাল, ফিফথ মাষ্টার যামিনী মিত্র, সিক্সথ মাষ্টার গোপাল সরকার, থার্ড পণ্ডিত যতীন মণ্ডল—বিদায় নিয়েছেন। ওরা নিজেরাই রেজিগনেশন দিয়েছিলেন। তবুও, মাথা নত করে চোখের জল ফেলে নিঃশব্দে ভাগ্যহতের মত বিদায় নিয়েছেন তাঁরা। হাসতে হাসতে স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে কথা বলে—অনেক কথা বলে বিদায় নিয়েছেন থার্ডমাষ্টার রামরতনবাবু।

ছেলেরা এই বিদায় সভার জন্য বেশ কিছু টাকা চাঁদা তুলেছিল। তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলেছিল—এখানকার প্রাক্তন ছাত্র সমিতিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাঁদা তুলে বর্ত্তমান ছাত্রদের হাতে দিয়েছিল; সেই টাকাটাই বেশী টাকা, পরিমাণ অপ্রত্যাশিত, পাঁচ শ' টাকা। সবশুদ্ধ প্রায় সাত শ' টাকা হয়েছিল। যে শিক্ষকেরা থেকে গেলেন—তাঁরাও সকলে একশ' টাকা দিয়েছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষককে কাপড়-চাদরের সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও প্রণামী দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক শিক্ষককে একটি করে একশ' টাকার তোড়া তারা দিয়েছে। ইস্কুল থেকেও প্রত্যেককে এক এক মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে। তাঁরা নিজে থেকে রিজাইন দিয়ে থাকলেও ম্যানেজিং কমিটি এ বেতন বিশেষ বিবেচনা করে মঞ্জুর করেছেন। সকলেরই এতে উপকার হয়েছে। তিন মাস থেকে পাঁচ-ছ' মাসের বেতন পেয়েছেন তাঁরা। নেন্ নি কেবল রামরতনবাবু। ইস্কুলের দেওয়া বেতন প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন—"এ বেতন নিলে বলতে হয়—'ম্যানেজিং কমিটি আমাকে ডিসমিস করেছেন।' এ বেতন আমার আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান

করতে হচ্ছে।” ছেলেদের টাকাটা না নিয়ে বলেছিলেন—“আমার আনন্দের আর সীমা নাই। তোমাদের গুরুভক্তি দেখে আমার বুক গর্ব্বে ফুলে উঠেছে। কিন্তু টাকার আমার প্রয়োজন নাই। বাড়ীতে ধানচাল হয়, খাওয়ার কষ্ট হবে না। সংসারে সন্তানের মধ্যে একটি কন্যা। স্ত্রী অনেকদিন মারা গেছেন,। নিজের প্রয়োজন আমার যৎসামান্য তা তোমরা জান। আমি জামা গায়ে দিই না, জুতোর দরকার হয় না। তামাক পানও খাই না। সুতরাং টাকাটা তোমরাই রাখ। আমি মাথায় ঠেকিয়ে ফেরত দিচ্ছি। আমাদের মধ্যে যিনি বেশী বিব্রত হবেন—প্রয়োজন যাঁর বেশী, টাকাটা তোমরা তাঁর প্রণামীর সঙ্গেই যোগ করে দাও।”

টাকাটা মৃগাঙ্কবাবুকে দেওয়া হয়েছে। হিসেব করলে মাসিক বেতনের অনুপাতে টাকাটা তিনিই কম পেয়েছিলেন, নিয়েছেনও তিনি।

এটা সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, এ উদ্যোগের মূলে ছিল—হীরেন আর সমর, চৈতন্যবাবুর দৌহিত্র এবং পৌত্রী-জামাতা। দু'জনেই ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র; ওরাই এখানকার প্রাক্তন ছাত্র সমিতির কর্ণধার। এরাই দু'জনে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নূতন মেম্বার হয়েছে; শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি এরাই তৈরি করে কমিটিতে দাখিল করেছে। চন্দ্রভূষণবাবু বুঝেছেন—নিঃসন্দেহে বুঝেছেন যে, এই তরুণ দুটি বয়সের উৎসাহে, তরুণ-মনের সৎসঙ্কল্পের দৃঢ়তায়—বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আন্তরিক বেদনা সত্ত্বেও এ কাজ করেছে। শিক্ষকদের উপরে তাঁদের অশ্রদ্ধা বা কোন আক্রোশবশে এ কাজ তারা করে নি, করেছে ইস্কুলের উন্নতিকল্পে—ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার হিসেবে কর্ত্তব্যবোধে। অবশ্য স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর ও আত্মীয় হিসেবে একটু-আধটু মালিকানিবোধের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার হয়ত থাকলেও থাকতে পারে। হয়ত থাকতে পারে কেন—থাকেই, এ ক্ষেত্রেও আছে। তা থাক, সদিচ্ছা পরিমাণে অনেক বেশী, এবং শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বেদনাবোধেরও পরিচয় তারা দিয়েছে। প্রাক্তন ছাত্র-সমিতিও তাদের দু'জনের গড়া প্রতিষ্ঠান। বড় ঘরের ছেলে, বড় সমাজের প্রেরণা পায়—সচ্ছলঘরের ছেলেদের দুধের সঙ্গে সর ও মধুর মত; ওদের পক্ষে এই ধরনের কল্পনা করতে পারা স্বাভাবিক। প্রাক্তন ছাত্র-সমিতি ইস্কুলের মেধাবী গরীব ছেলেদের সাহায্য করে; মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে, আরও অনেক সৎ কাজ করে। এ ক্ষেত্রেও এই সমিতিই ইস্কুলের ছাত্রদের ডেকে এই বিদায়-অনুষ্ঠান করবার পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়েছে। পাঁচ শ' টাকার মধ্যে হীরেন আর সমর দু'জনে একশ' টাকা করে দু'শ' টাকা দিয়েছে। কথাটা সকলেই জানে, বিদায়ী শিক্ষকেরাও জানেন। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কোন কথা তোলেন নি, কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নি। রামরতন-বাবুও কোন কথা তোলেন নি, শুধু হেসে প্রত্যাখ্যানই করেছেন। এবং সভায় তিনিই বিদায়ী শিক্ষকদের পক্ষ থেকে যা বলবার বলেছিলেন। বলেছিলেন—“পুরনো যায় নতুন আসে—এই ত সংসারের নিয়ম, এই নিয়মেই ত সৃষ্টি চলে। এই যাওয়া-আসার নিয়মের গুণেই পৃথিবীর রং বজায় থাকে। না হলে রং উঠে ফিকে হয়ে, হয়ত সাদা হয়ে যেত, নয় ত ধুলো-ময়লা পড়ে ময়লা হয়ে যেত। যা ময়লা তাই কালো। সেই নিয়মেই আমরা যাচ্ছি, তোমাদের ইস্কুলে নতুন মাষ্টার আসছেন, ইস্কুল নতুন হচ্ছে। নতুন মানেই খুশীর কথা। নতুন কাপড় নতুন জামা নতুন বই জীবনে নতুন রস নতুন উৎসাহ আনে। নতুন শিক্ষকেরাও তোমাদের জীবনে নতুন প্রেরণা আনবেন। আমাদেরও তাই। অনেক দিন এক জায়গায় চাকরি একঘেয়ে পুরানো হয়ে গিয়েছিল। আমরাও নতুনের সন্ধানে চললাম। তোমরা পড়েছ, ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা ইংরিজী পোয়েট্রি—টেনিসনের লেখা:

Men may Come and Men may go
But I go on for ever.

নদী বলছে। এখানেও তাই; পুরনো ছাত্র যাচ্ছে নতুন ছাত্র আসছে; পুরনো মাষ্টাররাও যায়, প্রতি বছর যায় না। পাঁচ-সাত বছর পর যায়, দশ বছর পর যায়। যেতে মোটকথা হয়। আমরাও যাচ্ছি। তোমাদের ইস্কুল চলছে নদীর মত। চলুক, ক্রমশঃ প্রসারে বড় হয়ে স্রোতে প্রখর হয়ে চলুক। দেশে মানুষের অবস্থা সগরসন্তানের মত—তারা উদ্ধার হোক। আমাদের হেডমাষ্টার মশায় ইস্কুলকে তুলনা করেন আলোর সঙ্গে। তাঁর কথাটি বড় ভালো। Darkness, Darkness everywhere; এই অন্ধকারের মধ্যে এই ইস্কুলটি চণ্ডীমণ্ডপে দশবাতি আলোর মত জেলে দিয়েছেন এখানকারই এক মহাপুরুষ। সেই দশবাতি আলোটি পঞ্চাশ বাতি—এক শ' বাতি—হাজার বাতি হয়ে উঠুক। তোমরা যত দলে দলে আসবে—বসবে মণ্ডল করে—তত জোর হবে আলোর। মাষ্টারেরা বাতিবরদার, তেল জোগাবেন চিমনী মুছবেন পলতে কাটবেন। মধ্যে মধ্যে এদের বদল হয়, বদল হবে। তা হোক—আলোটি উজ্জ্বল হোক—তার ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বাড়ুক। তোমরা কিন্তু বাবু ভালো করে পড়াশুনো করো, মানুষের মত মানুষ হতে পেরো।”

অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। গোটা অনুষ্ঠানটির ভেতরে ভেতরে শিক্ষক ক'জনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের যে দুঃখ-বেদনা চাপা-কান্নার মত বইছিল—একটা গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেটি কাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

মাষ্টারেরা হাসতে হাসতেই চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যেও অক্ষমতা বা অযোগ্যতার অপবাদে ছাড়িয়ে দিলে বলে যে অভিমান ক্ষোভ ছিল—তাও কেটে গিয়েছিল। কেবল মৃগাঙ্কবাবু হাসেন নি। সংসারকে তিনি বড় ভয় করেন—সে ভয় তাঁর কিছুতেই—নিতান্ত করে ওই সময়টির হাসিখুশীর মধ্যেও কাটে নি। একেবারে শেষকালটায়, অর্থাৎ অনুষ্ঠান-শেষে চন্দ্রবাবুর বোর্ডিঙের ঘরটার সামনে চাতালে বসে তামাক খেয়ে উঠবার সময় একটা কথায় সবকিছুর উপর যেন কালি ছিটিয়ে কালো করে দিয়েছেন।

তামাক খেয়ে উঠবার সময় নমস্কার করে বলেছিলেন—চলি চন্দ্রবাবু। বলিদান হয়ে গেল—এইবার হোম লাগান—তিলক পরুন, ভোগ লাগান—প্রসাদ পান—দক্ষিণে মোটা হোক; মন খারাপ করবেন না, যে ছাগল-ভেড়াগুলো বলি হ'ল তাদের মরণ-চীৎকার বেশীক্ষণ মনে থাকে না, থাকবেও না। শুধু হুঁসিয়ার থাকবেন, বাস্।

তারপরই খুব হা-হা শব্দে হাসতে চেষ্টা করেছিলেন। হাসিটা ঠিক হয় নি—তাই নিজেই থেমে গিয়েছিলেন, এবং পকেটে হাত দিয়ে একটু চমকে ওঠার ভান করে বলেছিলেন—ওরে বাবা—বলির সময়ের চাল-বেলপাতা ক'টা গেল কোথায়। গরু মেরে জুতো দান ব্রতের জুতো? আজকের দেওয়া টাকা ক'টা? এই আছে।

বলেই হনহন্ করে চলে গিয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু চুপ করে বসেছিলেন চাতালটিতে দীর্ঘক্ষণ।

রামরতনবাবু গভীর রাত্রে এসে তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—উঠুন মাষ্টারমশাই। আপনার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কেষ্ট ক'বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছে। ডাকতে সাহস করে নি। আপনার ত কোন দোষ নেই, সে ত সবাই জানে। মৃগাঙ্কবাবুও জানেন। কিন্তু আজ ওর মাথার ঠিক নেই। সামান্য দুঃখে উনি ভগবানকে গাল দেন, এত বড় আঘাতে আপনাকে গাল দিয়েছেন—আপনি ভাগ্যবান। ভগবানকে গালাগালির কিছুটা অন্ততঃ আপনি নিতে পেরেছেন।

রামরতনবাবু নিজে সামনে বসে তাঁকে খাইয়েছিল। খাওয়ার পর চন্দ্রবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি যা বললেন—তা আপনার অন্তরের কথা ত রতনবাবু?

—আমার অন্তরের অন্তরের।

—আমার কি রেজিগনেশন দেওয়া উচিত ছিল?

—না। ইস্কুলের স্বার্থ সবচেয়ে বড়। ইস্কুলের প্রয়োজন আছে আপনাকে। আপনার চেয়ে বেটার হেডমাষ্টার অবশ্যই পাওয়া যেত—কিন্তু তাঁরা ইস্কুলকে আপনার মত ভালবাসত না। যদি তাও [illegible] গরীব ছাত্রদের আপনার মত মমতা করতে পারত না, ভালবাসতে পারত না। ইস্কুলের আপনাকে প্রয়োজন আছে। আপনারও অন্য স্থানে চাকরি মিলত কিন্তু সেখানে গিয়ে সে ইস্কুলকে আপনি এত ভালবাসতে পারতেন না।

হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেছিলেন—পরকালে বিচার সকলেরই হয়। আপনার বিচারের সময় যদি প্রশ্ন ওঠে—ইফ দে মেক এনি চার্জ ফর দিস—আমি সাক্ষী দেব।

এবার একটু হেসেছিলেন চন্দ্রবাবু। তামাক খেতে খেতে হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন—আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কিন্তু সকলের থেকে স্বতন্ত্র।

—আই নো চন্দ্রবাবু। ইয়েস ইট ইজ ট্রু। বিপ্লবীদের আমি জানি। তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। কিছুদিন আগেও এক জন বড় বিপ্লবী এ্যাবস্কণ্ডার আমার বাড়ীতে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেছেন।

—ইস্কুলে ছাত্রদের মধ্যে আপনি—?

—হ্যাঁ। করেছি বৈকি প্রচার। দিয়েছি বৈকি শিক্ষা। দেশকে স্বাধীন করার মহান্ শিক্ষাই যদি না দিতে পারলাম ত দিলাম কি? দিয়েছি। তবে দুঃখ—খাঁটি মেটাল পাই নি। তলোয়ার তৈরি হয় নি। তবে কতকগুলো ঘোড়ার পায়ের নাল তৈরি হয়েছে। রাস্তা তৈরির জন্যে গাঁইতি-কোদাল হয়েছে। কুড়ল কাটারী দু'একখানা—দিস মাচ।

ছুটির পর নতুন শিক্ষকেরা আসবেন।

এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার হুগলী জেলার লোক ব্রজবিহারী চ্যাটার্জ্জী বি-এসসি। সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনলাল মুখার্জ্জী বি-এ। দু'জনেই ডিষ্টিংসনের সঙ্গে পাস করেছেন। মাখনলাল তাঁর জানা লোক, তাঁর বাড়ীর চার মাইলের মধ্যেই বাড়ী। ভাল ছাত্র। বয়সে নবীন। তা হোক ছেলেটির অনেক সুখ্যাতি শুনেছেন তিনি। ম্যাট্রিকুলেশনে স্কলারশিপ পেয়েছিল। ইংরিজীতে ছেলেটির ভাল দখল। থার্ড মাষ্টার আসছেন হাওড়া থেকে, ওখানকার একটি এম-ই ইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। যামিনীর জায়গায় আসছে গৌর ঘোষ ফিফথ মাষ্টার; সিক্সথ মাষ্টার নবগ্রামেরই ছেলে—এখানকারই ছাত্র; সেকেণ্ড পণ্ডিত আসছেন তিনিও স্থানীয় লোক—নর্ম্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক—ড্রিলের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ট্রেনিং এবং সার্টিফিকেট আছে। এদের সঙ্গে আরও এক জন পণ্ডিত বেড়েছে ছোট ছেলেদের ক্লাসের জন্য। সেও নর্ম্ম্যাল পাস, ত্রৈবার্ষিক নয়—দ্বৈবার্ষিক।

নতুন মানুষের দল। বয়সে সকলেই নবীন। নতুন রুচি—নতুন বুদ্ধি। নতুনকে মানুষের একটা ভয় আছে,

অবিশ্বাস আছে। পুরানো ভাঙা ঘর—মাটির ঘর ছেড়ে নতুন তৈরি প্রাসাদে এসেও মানুষের মন অস্বস্তি বোধ করে, ঘুম হয় না। নূতন পথে—সে রাজপথ হলেও মানুষ নিজেকে অসহায় মনে করে; এরা ত মানুষ।

তিনি জ্যেষ্ঠ তাঁরা কনিষ্ঠ, তিনিই এক্ষেত্রে গৃহস্থ তাঁরা নবাগত; তাঁদের সঙ্গে বনিয়ে চলার দায়িত্বটা তাঁরই বেশী। তাই তিনি চিন্তিত হয়েছেন। এ ছাড়া আরও চিন্তা হয়েছে তাঁর। রতনবাবুই বলে গেছেন তাঁকে। বলে গেছেন—ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এখন টনক নড়েছে, তাদের দৃষ্টি পড়েছে শিক্ষা বিভাগের উপর। ইংরিজী পড়ে এ দেশের ছেলেরা বিপ্লবী হচ্ছে। বিপ্লব চিন্তার জন্মস্থান নূতন কালের ইস্কুল কলেজ। মেকী ফিরিঙ্গী আর ইংরেজের উচ্ছিষ্ট অনুরাগী জাতনাশার দল তৈরি করবার জন্যে যে আয়োজন করেছিল সেই আয়োজন থেকেই এদেশে জন্মাল রামমোহন বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র। বিলিতী শিক্ষার সারের রসে পাঁচ হাজার বছরের উপনিষদ গীতা রামায়ণ মহাভারতের বীজে আশ্চর্য্য ফলন ফলেছে। Y ur basket catcher বলে যে বাঙালী বেবুনেরা দালালী করত কোম্পানির আমলে, ফোঁটা-তিলক কেটে যারা ঢাক বাজিয়ে জলন্ত চিতায় মেয়েদের পোড়াত, যারা—'কলিশেষে একচ্ছত্র হইবে যবন' বচন শিরোধার্য্য করে ইংরেজকে বিশ্বজয়ী বলে মেনে নিয়েছিল—তাদের নাতি-পুতিদের এ কি চেহারা? এক মুঠো ল্যাঙলেঙে চেহারা—চোখ খারাপ বাঙালীর ছেলে বোমা মেরে ইংরেজ তাড়াবার কল্পনা করে! যার শিল যার নোড়া তারই দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্যে নোড়া শক্ত-পাঞ্জায় পাকড়েছে! কানাইয়ের ফাঁসীর হুকুমের পর তার ওজন বাড়া দেখে প্রথমটা ভেবেছিল নিতান্তই একটা ব্যতিক্রমের ব্যাপার। কিন্তু আর ব্যতিক্রম ভাবতে পারছে না। এই সেদিন বালেশ্বরে যতীন মুখুজ্জের লড়াই দেখে ওদের শঙ্কা হয়েছে। ইস্কুল কলেজ-গুলোকে ওরা কঠিন বাঁধনে বাঁধবে।

হেসে রতনবাবু বলেছিলেন—পেডলার সারকুলার মনে আছে মাষ্টার মশাই? পেডলার সারকুলার। ডি-পি-আই আলেকজেণ্ডার পেডলার? ১৯০২ সালের সারকুলার? ইম্মরাল সারাউণ্ডিং সম্পর্কে সারকুলার? এবারও অজুহাত হবে তাই। বোর্ডিঙের চারি পাশে পাঁচিল দেওয়ার অর্ডার দেখে বুঝছেন না? বোর্ডিঙে ছেলেদের কে কোথায় যাচ্ছে তার রেকর্ড রাখার হুকুম দেখে বুঝছেন না? যুক্তি দিয়ে বা কোন মহত্তর আরাধনার পথ দেখাতে না পারার অক্ষমতায় যারা দেবমূর্ত্তি পূজা বন্ধ করতে পারে না—তারাই দেবমূর্ত্তি ভেঙে কলুষে কলুষিত করে দেয় যে, এর পর ফেলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না। ১৯০২।৩ সালে এ অভিযোগ খানিকটা সত্যি ছিল। কিন্তু এখন এ অভিযোগ একটা অজুহাত।

চমকে উঠেছিলেন চন্দ্রবাবু।—তা হলে—আপনি বলছেন—

—অনুমান করেছেন? একটু সাবধান হবেন। শিক্ষক-দের মধ্যে যাঁদের খোদ ইনস্‌পেক্টরের পৃষ্ঠপোষকতা আছে তাঁরা হয় ত—।

এই ভয়ও করছেন চন্দ্রবাবু।

তিনি অবশ্য রতনবাবুর পথের পথিক নন্, এই পথকে তিনি সংর্থনও করেন না, করবার মত সাহস নাই। মনে মনে অনেক প্রশংসা পোষণ করেন—অগাধ বিস্ময় অনুভব করেন। ঋষিপুত্র নচিকেতার প্রশংসা কে না করে? কিন্তু নিজের ছেলেকে নচিকেতার পথ অনুসরণ করতে কেমন করে দেবেন? তা কি কেউ পারে? মুখেও বলতে পারেন না। তা ছাড়া তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, বোমা পিস্তল মেরে—লড়াই করে ইংরেজকে তাড়ানো যায়! এ অসম্ভব। সুতরাং শিক্ষকদের মধ্যে কেউ সরকারের গোপন অনুচর থাকলেও তাঁর নিজের ভয় নেই। কিন্তু তাঁর ছেলেদের!—এই সব নানান চিন্তায় তিনি বিব্রত হয়ে রয়েছেন।

—চন্দ্র!

রামজয় এসে হাজির হলেন। সেই সাদা কাপড়ের ছাউনি-দেওয়া ছত্র তার মাথায় এবং চাদরখানি তার গলায়, পায়ে চটি।

—এস।

—কি এখনও স্নান কর নি?

—না। হাসলেন চন্দ্রবাবু।

—কি করছিলে এতক্ষণ?

—ভাবছিলাম।

—ভাবছিলে? কি ভাবছিলে?

—সে অনেক কথা। কিন্তু সে সব শুনে তোমার কাজ নেই।

—কি বলে—কন—কনফিডান—কনফিডান শেয়াল—না কি, তাই বুঝি?

—তাই বটে।

—তবে থাক। শুনে কাজ নাই আমার। কিন্তু তুমি স্নান করে নাও। ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেছে। গিন্নী মাছের ঝোল চড়িয়েছেন আমি দেখে এলেছি।

রামজয় আজ তাঁকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছে। ও বেলা খোদ গিন্নীমায়ের বাড়ীতে। কাল থেকে বোর্ডিঙের ঠাকুর আসবে, রান্নাবান্না হবে।

ইস্কুল বোর্ডিঙের সদ্য চুণকাম করা চেহারার দিকে তকিয়ে রামজয় বললে—বা বা বা! যা খোলতাই হয়েছে ইস্কুলের! কথায় আছে—কামালে জোমালেই বর আর নিকুলে-চুকুলেই ঘর। কপালে চন্দন আর চোখে কাজল দিলেই কন্যাটিকে বধূর মত লাগে।

চন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন না, মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ইস্কুলের দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

—তোমার কোয়ার্টার কেমন হ'ল? কি বল্লে—কমপ্লিটিং?

—কমপ্লিটিং নয়, সংস্কৃতের অনুস্বার নাই। কমপ্লিট। না—এখনও কমপ্লিট হয় নাই। অনেক কাজ বাকী।

—মেয়েছেলে তা হলে আনছ কখন?

—দেখি!

—তাড়াতাড়ি আন। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে দিনকতক কর্ম্মের সঙ্গে সংসারধর্ম্ম কর। স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে ঘর করবার অবসরই হ'ল না তোমার।

কেষ্ট এসে হাজির হ'ল। পোষ্টাপিস থেকে ডাক নিয়ে এল।—একখানা টেলিগেরাপ আছে।

—টেলিগ্রাম?

—হ্যাঁ। মাষ্টারবাবু বললেন।

এখানে টেলিগ্রাফ আপিস নাই, টেলিগ্রাম আসে ডাকের সঙ্গে। আরজেণ্ট টেলিগ্রাম হলে আর মেসেঞ্জার ফি দেওয়া থাকলে এখান থেকে ছ'মাইল দূরের আপিস থেকে লোক এসে বিলি করে যায়। নইলে ওই আপিস পর্য্যন্ত যথারীতি বার্ত্তা তারে এসে ওখান থেকে পত্রের মত পোষ্টাপিসে এসে পত্রের সঙ্গেই বিলি হয়।

কে টেলিগ্রাম করলে। চন্দ্রবাবু বললেন—খোল ত রামজয়, আমার হাতে তেল লেগেছে। কেষ্ট চশমাটা আন ত!

খামটা ছিঁড়ে রামজয় কাগজখানা মেলে ধরলেন। চন্দ্রবাবু পড়লেন—রিচিং বিষগ্রাম সাটারডে মর্নিং। ব্রজবিহারী

নতুন এসিস্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার। শনিবার সকালে আসছেন। অর্থাৎ কাল। আজই শুক্রবার।

—মাখনলাল ত আমাদের রাণীহাটের হেরম্ব মুখুজ্জে মশায়ের নাতি।

—হ্যাঁ।

—এই ব্রজবাবুই অজানা লোক?

—হ্যাঁ ডার্ক হর্স।

—অশ্বার্থ? হর্স মানে ত ঘোড়া! যে ঘোড়ায় ঘাস ভক্ষণ করে।

—হ্যাঁ মানে কালো ঘোড়া—আসল অর্থ হ'ল—অজানা ঘোড়া।

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। গরুর গাড়ী থেকে নামলেন ব্রজবাবু। রামজয় চন্দ্রবাবুর হাতে ইসারা দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—ও চন্দ্র! যা বললে তাই যে মিলে গেল। কৃষ্ণাশ্ব! কালো ঘোড়া!

ছ'ফুটের উপর লম্বা—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় একটি মানুষ, চোখে এক জোড়া হাই পাওয়ার চশমা। বয়স বড় জোর পঁচিশ। হেসে বললেন—নমস্কার মাষ্টার মশাই! নমস্কার! গলায় চাদর পায়ে চটি পরনে থান—আপনি নিশ্চয় হেডপণ্ডিত মশায়।

কণ্ঠস্বরটি ভরাট জোরালো।

পণ্ডিত বললেন—নমস্কার! আপনি খবর দিয়ে এসেছেন—না দিলেও আমিও অনায়াসে বলতে পারতাম আপনি ব্রজবিহারী।

—আমার রং দেখে?

অট্টহাস্য করে উঠলেন ব্রজবিহারীবাবু। ভরাট জোরাল গলার প্রাণখোলা অট্টহাসি গোটা ইস্কুল বাড়ীটার কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে।

রবিবার পর্য্যন্ত মাষ্টারেরা সবাই এসে গেলেন।

মাখনবাবু চেহারায় ব্রজবাবুর ঠিক বিপরীত। নধর দেহ গৌরকান্তি আয়ত চোখ মিষ্ট কণ্ঠ। ব্রজবাবু বললেন—শিক্ষায়তনে মেয়েদের কথা বাদ দিয়েই কথা বলতে হয়, সুতরাং বিউটি এণ্ড দি বীস্ট-এর উদাহরণ এখানে সার্থক ভাবে আমি এবং মাখনবাবু!

বলেই সেই হা-হা শব্দে অট্টহাসি।

ক্রমশঃ



আমরা ও তাহারা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত দুই মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "আমরা ও তাহারা" প্রবন্ধ পড়িয়া কয়েকজন পরিচিত এবং কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তিও লেখককে পত্র লিখিয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন যেন ধারাবাহিক রূপে "আমরা ও তাহারা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা নাকি এই বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হইতে পারে, এবং শিক্ষা বিষয়ে "কর্ণধারগণের" টনক নড়িতে পারে; লেখক এই দুইটি সম্ভাবনায় বিশেষ সন্দিহান।

যাহা হউক, এই প্রবন্ধে শিক্ষা সম্পর্কীয় পরিকল্পনা লইয়াই আলোচনা করিব। পরিকল্পনার সাধারণ অর্থ হইতেছে—ভবিষ্যৎ সমস্যা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই সমস্যা সমাধানের বা প্রয়োজন মিটাইবার উপায় নির্দ্ধারণ করা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন পরিকল্পনার দরকার, তেমনি জাতীয় জীবনেও ইহার গুরুত্ব খুবই। আমাদের ব্যক্তিগত এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিকল্পনার দু'একটি উদাহরণ দিতেছি। একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুর কথা বলিতেছি—তাঁহার একমাত্র পুত্রকে তিনি ইঞ্জিনীয়ার করিবার অভিপ্রায়ে পুত্রের বয়স যখন ন'দশ বৎসর তখন হইতেই অঙ্কন (ড্রয়িং) এবং অঙ্ক সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বন্ধুর মতে এই দুই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার মূল ভিত্তি; বন্ধুর পরিকল্পনা সফল হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে। পুত্র এখন গ্লাসগোতে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা অর্জ্জনে নিযুক্ত আছে। আবার এমন বন্ধুর কথাও জানি—যিনি কোন পরিকল্পনার ধার ধারেন না। তাঁহার এক পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"একটা মস্ত ভাবনা থেকে বেঁচে গেছি। ছেলেটা পাস করলে ভাবতে হ'ত কোন্ লাইনে দোব, ফেল করেছে—বাস, বলে দোব 'আর একবার পরীক্ষা দে—মোটেই ভাবতে হবে না।" এই বন্ধুর দলই ভারী।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক ছোট বড় বিষয়ের জন্যই পরিকল্পনার প্রয়োজন। আমাদের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বহু পূর্ব্ব হইতেই ভাবিতেছি ৺মহাপূজার সময় পরিবারবর্গের, কুটুম্ব প্রভৃতির জন্য কি কি কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং উহার জন্য অর্থাদি কিরূপে সংগৃহীত হইবে। অনেক কাটছাট করিতেছি, তবুও আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না। আবার "এবারে ভাবতেও পারছি না"—এ গল্পও শুনিয়াছি। গল্পটি এই—এক জন ভদ্রলোকের শ্যালিকার বিবাহ স্থির হইয়াছে, বিবাহের বহু পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রীর সহিত বহু জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে—কি উপহার দেওয়া হইবে, কিন্তু অর্থ-সঙ্কট হেতু শেষ পর্য্যন্ত কোন উপহারই দেওয়া হইল না। ইহার ঠিক দুই বৎসর পর ভদ্রলোকের আর এক শ্যালিকার বিবাহের সংবাদ আসিল। এই বার উপহার সম্বন্ধে তিনি স্ত্রীর সহিত কোন আলোচনা করিলেন না, একেবারে নির্ব্বাক রহিলেন। বিবাহের দিন যখন অতি নিকটে তখন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"গতবারে "—"র বিয়ের সময় উপহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলে, অবশ্য কিছু দেওয়া হয় নাই, এবারে একটি কথাও বলছ না"। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন "গত বারে ভাবতে পেরেছিলাম, এবারে ভাবতেও পারছি না।" আমাদের মধ্যে "ভাবতে না পারার" দলই ভারী। এতক্ষণ হয়ত "আবোল-তাবোল" লিখিলাম, এখন দেখি দুই-একটা কাজের কথা বলিতে পারি কি না।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে খাঁটি নাগরিক সৃষ্টির কথাই লিখিয়াছি। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাই ইহার প্রথম এবং প্রধান সোপান। এই কথা সর্ব্ববাদিসম্মত—কোন মতবিরোধ নাই। কিন্তু এই দুইটি বিষয়েই আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে এখনও তেমন কোন সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় নাই; অবশ্য চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা অন্য দেশের তুলনায় অতি নগণ্য।

১৯৫০ সনে আমেরিকায় ১২,০০,০০০ শিক্ষক ছিলেন। ঐ সনে তথায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩,১০,০০,০০০, ইহা ব্যতীত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র এবং আংশিক শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩,০০,০০,০০০। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৬০ সনের শেষের দিকে ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইবে—৪,২০,০০,০০০ এবং ইহাদের শিক্ষাদানের জন্য ১৮,০০,০০০ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। এখন হইতেই ১৯৬০ সনের প্রয়োজনের হিসাব-নিকাশ চলিতেছে; এবং তদনুসারে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। ইহাও হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদিও ১৯৫০ সনে শিক্ষা খাতে ১০,০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু প্রয়োজন ছিল ১৭,০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার। আশা হইতেছে ১৯৬০ সনে ১৫,০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার বরাদ্দ হইবে, কিন্তু আনুমানিক প্রয়োজন হইতেছে ২২,০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার। অঙ্কটটা একবার উপলব্ধি করুন। [এক ডলার ৪৲ টাকার উপর] শিক্ষকদের বেতনের হার এইরূপ ছিল:

১৯০০	৩২৫ ডলার
১৯২০	৮৭১ "
১৯৩০	১৪২০ "
১৯৫০	৩০১০ "
১৯৫৩-৫৪	৩৬০৫ "

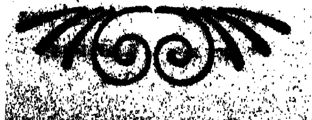
এই তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির হার কত জানি না ; তবে না জানিলেও কতকটা আন্দাজ করিতে পারি। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে বর্তমান উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষাদানকে কার্য্যকরী করিতে হইলে অতি দক্ষ, অতি অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। অতীতে ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের যে মনোভাব ছিল বর্তমানে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধান হইতেছে—ছাত্র-ছাত্রীদিগের ব্যক্তিগত প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। পাঠ্যতালিকা বা পাঠ্যবিষয় এইরূপ ভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে যে, ছাত্র-ছাত্রীগণ নিজেদের শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারে।

সেখানেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের সমস্যা আছে। বর্তমানে যে হারে উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। প্রত্যেক বৎসরে কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১00,000 শিক্ষকের প্রয়োজন ; কিন্তু দেখা যাইতেছে ইহার এক পঞ্চমাংশের উপর কিছু উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে। কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও শিক্ষকের অভাব ঘটিবে। গত ৫০ বৎসরে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯০০ সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৩৭,000। ১৮ হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কদের মধ্যে ইহা শতকরা ৪ জন মাত্র। ১৯৫০ সনে ইহার সংখ্যা ছিল ২৭,00000 ; উপরোক্ত বয়সের যুবক-যুবতীদের মধ্যে ইহা শতকরা ৩০ জন। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইবে।

আমাদের দেশের জনসাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষা, শিক্ষা-প্রণালী, পরীক্ষা, শিক্ষক প্রভৃতি সম্বন্ধে খুবই সমালোচনা করেন। কিন্তু কোন কার্য্যকরী পন্থা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন না। মোটকথা, আমাদের সমালোচনা খুবই খাপছাড়া, এলোমেলো এবং গঠনমূলক নহে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে, আমাদের দেশে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হয় ; জনসাধারণের মতামতের কোন মূল্য নাই। কিন্তু আমেরিকার সমালোচনা, তর্কবিতর্ক হয় বটে, কিন্তু তাহার ফলে পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়, এবং পরিকল্পনা অনুসারে কাজও আরম্ভ করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের মত সেখানকার লোকদের মধ্যেও অনেকের মত এই যে অতীতের স্কুল, কলেজের পাঠ্যতালিকা এবং শিক্ষাদান বর্তমান সময়ের পাঠ্যতালিকা এবং শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই মত পোষণ করেন না। তাঁহাদের মতে বর্তমান পাঠ্যতালিকা এবং শিক্ষাদান অধিকতর সময়োপযোগী। অধিকাংশের মত এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া উহার সঙ্গে সঙ্গে যত রকমের বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ততই দেশের ও দশের পক্ষে ভাল।

সর্ব্ববিষয়ে সকলকে সমানভাবে সুযোগ দেওয়াই আমেরিকার বৈশিষ্ট্য ; এবং তাঁহাদের মতে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এমন কি প্রৌঢ়দের শিক্ষাদান বিষয়ে ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। বিভিন্ন স্তরের—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী নিজেদের অবস্থা, প্রবণতা, প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের বৃত্তি শিক্ষার জন্য যাহাতে সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা আমেরিকা করিয়াছে। এবং সুদৃঢ় ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিবার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছে। কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া নানাবিধ বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

কিন্তু কেবল শিক্ষা দিলেই খাঁটি নাগরিক সৃষ্টি হইবে না। গত ২২শে সেপ্টেম্বর উত্তর কলিকাতা মহিলা-সমিতি পরিচালিত "বিদ্যা-ভবন" উদ্বোধন উপলক্ষে রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষা পাইলেই খাঁটি মানুষ হয় না, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব খুবই অধিক। তিনি উদাহরণ দিয়াছিলেন, আমি রাজ্যপাল, আমি যদি কাহারও বৈঠকখানায় গিয়া বসি এবং সেই বৈঠকখানায় রক্ষিত একটি ছোট ঘড়ি থাকে, বৈঠকখানায় যদি কেহই না থাকে আমি ঘড়িটি পকেটে পুরিয়া লইয়া আসিলে কেহই কোন সন্দেহ করিবে না যে, আমি ঘড়িটি লইয়া আসিয়াছি ; বরং চাকর-বাকরকেই উৎপীড়িত করা হইবে। কিন্তু ঘরে যদি একটি খুব ছোট ছেলেও থাকে, তবে আমি ঘড়িটি পকেটে পুরিতে সাহস করিব না। কি জানি ছেলেটি যদি বাড়ীর কাহাকেও কথা বলিতে না পারিলেও ইঙ্গিতে আভাসে বলিয়া দেয়। একটি শিশুকে আমরা ভয় করি, কিন্তু আমরা যদিও মুখে বলি ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন, সবই দেখিতে পাইতেছেন—ঈশ্বরকে মোটেই ভয় করি না। ঘড়িটি লইবার সময় একটুও মনে হয় না যে, কেহ না দেখিলেও ঈশ্বর আমার চুরি দেখিতে পাইতেছেন। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে ভয় করাটাও শিখাইতে হইবে। তবেই খাঁটি নাগরিক সৃষ্টি হইবে।



বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা

সূচনা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সংমিশ্রণে বঙ্গদেশে যে নব্য-শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে তাহা সম্যক্‌রূপে ধৃত হইয়াছে বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মাত্র কয়েক বৎসর এইটি জীবিত ছিল, কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যেই সমাজদেহে ইহার প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। সে যুগের দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ জনেরা নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধিমত এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

সমাজ-বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্ত্বের চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মাত্র গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ইহাকে একটি বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। আর এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব 'পজিটিভিজম' বা 'প্রত্যক্ষ-বাদে'র প্রবর্ত্তক আগষ্টাস কোঁৎ নামক ফরাসী দার্শনিক-প্রবরের। সমাজকে 'দেবী' বলিয়া স্বীকার, এবং ইহার সেবাই মানুষের ইহ-পরলোকের প্রকৃষ্ট করণীয়—এই অনুভূতি হইতেই সমাজ-বিজ্ঞান অনুশীলনের উপর তিনি অতখানি জোর দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র ভিতরেও এই মতবাদ সবিশেষ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সমাজ-বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্ত্বের সুষ্ঠু আলোচনা ও অনুশীলনের জন্য ১৮৫৭ সনে বিলাতে একটি সভা স্থাপিত হয়। ইহার নাম দেওয়া হয়—"National Association for the Cultivation of Social Science in Great Britain"। বিখ্যাত সমাজ-সেবক এবং নারীহিতৈষী মিস মেরী কার্পেণ্টার এই সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। যে দুর্ব্যবহারের জন্য বিলাতে অপরাধীদের বন্দীজীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে এবং তাহাদের অপরাধ-প্রবণতা ক্রমে বাড়িয়াই চলে তাহা নিরাকরণের নিমিত্ত মিস কার্পেণ্টার প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। কারাসংস্কারক হিসাবেও তাই তাঁহার এত প্রসিদ্ধি। সাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পেও বিলাতের উক্ত সভা আত্মনিয়োগ করে। মেরী কার্পেণ্টারের মত কর্ম্মীর একনিষ্ঠ সাধনা ও সেবার দ্বারা সমাজ-বিজ্ঞান সভার সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রজা-দরদী ভারতবন্ধু পাদ্রী লঙ কয়েক বৎসর বিলাতে অবস্থানের পর ১৮৬৬ সনে এদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি দীর্ঘ-কাল বাংলা দেশের জন-সাহিত্যের অনুসন্ধান ও অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন। বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের (Family Literary Club) তিনি কয়েক বৎসর সভাপতিত্বও করেন। কলিকাতায় ফিরিবার পর পাদ্রী লঙ এই সাহিত্য-সমাজের নবম বার্ষিক অধিবেশনে—২৭শে এপ্রিল ১৮৬৬ তারিখে "Social Science—its Utility for India" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি বিলাতস্থ উক্ত সভার আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতির বিশদ আলোচনা করেন। মানুষের সামাজিক জীবনের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধনে একান্তভাবে লিপ্ত থাকাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগারের ব্যবস্থা, সৎ সাহিত্য প্রচার, সমবায় সমিতি গঠন, সুরাপান নিবারণ, সমাজের বিভিন্ন বিষয়-সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে ইহার কর্তৃপক্ষ রত থাকেন।

ভারতবর্ষেও যে অনুরূপ কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন, পাদ্রী লঙ বক্তৃতায় তাহার উপর বিশেষ জোর দেন। এদেশীয়দের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, ভাষা-সাহিত্য, পাল-পার্ব্বণ, আমোদ-উৎসব, আচার-আচরণ, শ্রেণীগত বৃত্তি বা পেশা ইত্যাদি বহু বিষয়ে অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্রহ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বাংলার সমাজ-জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে খণ্ড প্রয়াস ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে কয়েকজন গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করেন। টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র), হুতোম প্যাঁচা (কালীপ্রসন্ন সিংহ), মধুসূদন দত্ত, শশিচন্দ্র দত্ত কয়েকখানি পুস্তকের ভিতর দিয়া বাংলার সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। লঙ এই সকল বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক বঙ্গদেশে উক্ত সভার আদর্শে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রোতৃ-বর্গের নিকট ঐকান্তিক আবেদন জানান। সাহিত্য-সমাজের এই অধিবেশনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ কানাইলাল দে, সি. এইচ. এ. ড্যাল এবং ডবলিউ. ব্রবসনের নাম আমরা পাইতেছি। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের কেহ কেহ লঙের বক্তৃতার পর আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

২

লঙের এতাদৃশ অত্যাবশ্যক প্রস্তাবটির কথা চারিদিকে প্রচারিত হয়, এবং এ সম্বন্ধে কি আয়োজন করা সম্ভব সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু জল্পনা-কল্পনা যে না হইয়াছিল তাহা নয়। এরূপ একটি আয়োজনের সুযোগও কয়েক মাস পরে দেখা দিল। বিলাতের সমাজ-বিজ্ঞান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিস মেরী কার্পেণ্টার ১৮৬৬ সনের শেষ দিকে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন ২০শে নবেম্বর দিবসে। কার্পেণ্টারের ভারত-পরিক্রমার উদ্দেশ্য ছিল—এখানকার নারীকুলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখা এবং তাহাদের শিক্ষার উৎকর্ষসাধনে যথোপযুক্ত সহায়তা করা। পাদ্রী লঙের বক্তৃতার পর সমাজ-বিজ্ঞান সভা স্থাপনে যাঁহারা আগ্রহশীল ছিলেন তাঁহারা মিস মেরী কার্পেণ্টার মারফত বিলাতের প্রস্তাব

কার্য্যাদি শ্রবণে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া একটি সভার অনুষ্ঠান করিলেন।

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ভবনে ১৮৬৬ সনের ১৭ই ডিসেম্বর সভা হইল। সভায় দেশী-বিদেশী বিদ্বজ্জনেরা উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট, ছোটলাট এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণও যোগ দিলেন। মিস কার্পেন্টার সভায় বিলাতের সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশদরূপে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতায় তিনি এদেশেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের শাখাস্বরূপ উহারই আদর্শে একটি সভা স্থাপনের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করেন। তাঁহার আবেদনে কাজ হইল। সভায় বঙ্গদেশে একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। কলিকাতায় অবস্থানকালে মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা চালাইবার জন্য কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লইয়া একটি পরামর্শ সভাও গঠিত হয়। ইহার সভ্যদের মধ্যে ছিলেন হাইকোর্টের তিন জন বিচারপতি, পাদ্রী লঙ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

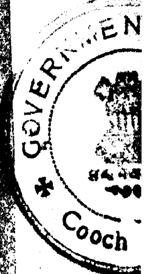
সাময়িকভাবে কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত অস্থায়ী কমিটি এবং নিয়মাবলী রচনার জন্য সাব-কমিটিও গঠিত হইল। বলা বাহুল্য, অস্থায়ী কমিটিতে গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী কয়েকজন ব্যক্তির স্থান হইয়াছিল। সাব-কমিটিতে স্থান পাইলেন ডবলিউ. এস. সিটন-কার, পাদ্রী জেমস লঙ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র।

সাব-কমিটি অবিলম্বে কার্য্যও আরম্ভ করিলেন। মোট তেইশটি নিয়ম, নয় ভাগে বিভক্ত হইল। প্রায় সবগুলিই সভা পরিচালনা-সম্পর্কিত। মূল উদ্দেশ্য নিয়মাবলীতে নির্দ্ধারিত হয় এইরূপ: "The object of the Association is to promote the development of Social Science in the presidency of Bengal"—অর্থাৎ, বঙ্গপ্রদেশে সমাজ-বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধন। সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া কার্য্য পরিচালনা করিবেন। সম্বৎসরে সভার অধিবেশন চারি বার হইবে ঠিক হয়। কর্তৃপক্ষ বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান করিবেন প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে। ত্রৈমাসিক সভাসমূহে প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা চলিবে। প্রত্যেক সভ্যের বাৎসরিক চাঁদা বারো টাকা। এককালীন এক শত টাকা দিলে আজীবন সদস্য হইবার অধিকার জন্মিবে। মফস্বলে যে সব শাখা-সমিতি গঠিত হইবে তাহার প্রত্যেক সদস্যকে অন্ততঃ ছয় টাকা মূল প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রেণীর সদস্যই সভার সবরকম সুবিধার অধিকারী। ত্রৈমাসিক সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বলিত একখানি পুস্তক বা Transactions মধ্যে মধ্যে বাহির হইবে। এখানিরও এক খণ্ড করিয়া প্রত্যেক সভ্য পাইবেন। নিয়মাবলীতে অধ্যক্ষ-সভার সদস্য-সংখ্যা এবং কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নির্ণীত হয়।

পরবর্তী ২২শে জানুয়ারী ১৮৬৭ তারিখে টৌনহল হলে সাধারণ সভার অধিবেশন হয় বঙ্গের ছোটলাটের সভাপতিত্বে এই সভায় নিয়মাবলী গৃহীত হইল। আরও স্থির হয় যে, নিয়মাবলী দৃষ্টে সভার একখানি অনুষ্ঠানপত্র শীঘ্রই রচনা করিতে হইবে। অনুষ্ঠানপত্রে সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যসূচী বিশদভাবে বর্ণিত থাকিবে। এই অধিবেশনে অধ্যক্ষ-সভা এবং চারিটি শাখা সভা গঠিত হইল। অধ্যক্ষ-সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন—ডবলিউ. এস. সিটন-কার। সহকারী সভাপতি হন—জে. পি. নর্ম্যান এবং রমানাথ ঠাকুর; সম্পাদক এইচ. বিভার্লি ও প্যারীচাঁদ মিত্র। এতদ্ব্যতীত সদস্য বারো জন—ছয় জন ইউরোপীয় ও ছয় জন ভারতীয়। ইউরোপীয় সদস্য যথাক্রমে—জেমস বাড ফিয়ার, ডবলিউ. এস. এটকিন্সন, ডাঃ টি. ফারকুহার, মেজর এফ. বি. নর্ম্যান, এ. ম্যাকেঞ্জি ও পাদ্রী জেমস লঙ; আর ভারতীয় ছয় জন—মানকজী রুস্তমজী, দিগম্বর মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, মোলবী আবদুল লতিফ খাঁ।



মিস্ মেরী কার্পেন্টার



নিয়মাবলীতে চারিটি শাখা গঠনও নির্দ্দেশিত হইয়াছে: (১) ব্যবহারশাস্ত্র, (২) শিক্ষা, (৩) স্বাস্থ্য, এবং (৪) অর্থনীতি ও বাণিজ্য। এ চারিটি শাখা-সমিতির কর্তৃপক্ষও উক্ত অধিবেশনে মনোনীত হন। প্রথম বিভাগের সভাপতি বিচারপতি জে. পি. নর্ম্যান, সম্পাদক ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার; দ্বিতীয় বিভাগের সভাপতি জেমস বাড ফিয়ার, সম্পাদক কলিকাতা গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এইচ. এইচ. লক; তৃতীয় বিভাগের সভাপতি ডাঃ টি. ফারকুহার, সম্পাদক ডাঃ এ. জি. বেষ্ট এবং ডাঃ কানাইলাল দে; চতুর্থ বিভাগের সভাপতি আর. স্কট মনক্রিফ, সম্পাদক এ. ম্যাকেঞ্জি। প্রত্যেকটি বিভাগেই গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্থান পাইয়াছিলেন। শিক্ষা-শাখায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই চারিটি বিভাগের কার্য্যের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল সাধারণ-

তালিকা হইতে মাত্র কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল : ভগবানচন্দ্র বসু (ফরিদপুর), শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেনরি বিভারিজ, চন্দ্রনাথ বসু, জে. বি. ব্লকম্যান, কৈলাসচন্দ্র বসু, প্রেমচাঁদ বড়াল, জর্জ ক্যাম্বেল (নাগপুর), মেরী কার্পেন্টার (ইংলণ্ড), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বারুইপুর), ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী, সি. এইচ. এ. ড্যাল, ডাঃ কানাইলাল দে, রেভাঃ লালবিহারী দে, নীলমণি দে, হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, শিবচন্দ্র দেব, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, মানকজী রুস্তমজী, জে বি. নাইট, শ্যামুয়েল লব (হুগলী), পাদ্রী জেমস লঙ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কাশীশ্বর মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), প্রসাদদাস মল্লিক, রেভাঃ জে রবিন্‌সন, কুমার চন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), কুমার প্রমথনাথ রায় (রাজশাহী), শ্যামাচরণ সরকার, কেশবচন্দ্র সেন, জে বি. ফিয়ার, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চার্লস টনি, সর্ রিচার্ড টেম্পল, হেন্‌রি উড্রো, এইচ. এইচ. লক প্রভৃতি। অধ্যক্ষ-সভা এবং বিভাগীয় সভার সদস্যেরা সকলেই যে ইহার সভ্য ছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রথম বাৎসরিক বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ সম্বৎসরে তিনটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন : (১) কৃষি-শ্রমিক ; (২) কলিকাতার দেশীয় শিল্পিক শ্রেণীর অবস্থা ; (৩) স্ত্রীশিক্ষা। ইহার প্রত্যেকটি বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহেরও যথারীতি আয়োজন করা হইয়াছিল। এবারে ত্রৈমাসিক সভা একটি মাত্র অনুষ্ঠিত হয়। পরে এই রীতিই বহাল দেখি।

৫

সমাজ-বিজ্ঞান সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইল ২৯শে জানুয়ারী ১৮৬৮ তারিখে। বার্ষিক রিপোর্ট বা কার্য্যবিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হয়। সভাপতি ফিয়ার সভার উদ্দেশ্য ও সম্বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন।

বার্ষিক সভার পরদিনই ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইল। প্রবন্ধ-পাঠ সম্পর্কে যেরূপ নিয়মকানুন রচিত হয় তাহার ফলে এক দিনেই সকালে ও বিকালে অধিবেশন করিয়া ইহা সমাপ্ত করা সম্ভব হইয়াছিল। চার বিভাগেই কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ এবং সমসাময়িক সমস্যাসমূহের আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করিলেন। প্রথম বিভাগে দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়—(১) বঙ্গে জুরিপ্রথা বিষয়ক —প্রবন্ধ-কর্ত্তা ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ; (২) বেনামী ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে—রচয়িতা শ্যামাচরণ সরকার। জুরি-প্রথার প্রবর্ত্তনে ভাল মন্দ উভয় দিক লইয়া প্রথম প্রবন্ধটিতে আলোচনা হয়। সেই সময়ে সাধারণ শিক্ষিতেরা জুরি-প্রথার পক্ষপাতী হইলেও কোন কোন মনীষী যে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন প্রবন্ধ পাঠে তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

সমাজ-বিজ্ঞান সভা শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা-গবেষণায় যে বিশেষ তৎপর ছিলেন তাহা আমরা প্রথম হইতেই দেখিতেছি। এবারকার একটি প্রবন্ধে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বঙ্গদেশে মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা পাঠ করেন। সাধারণের ধারণা—সর্ সৈয়দ আহ্‌মদই সর্ব্বপ্রথম মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাবও তৎকর্ত্তৃক প্রথম উত্থাপিত হয়। এ ধারণার মূলে কিন্তু সত্য আদবে নাই। আবদুল লতিফই সমাজ-বিজ্ঞান সভায় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা কত, নানা যুক্তিপ্রমাণসহকারে ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী মাসে তাহা উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়া দিলেন। ইহার পর সর্ উইলিয়ম হাণ্টারের 'দি মুসলমানস' নামক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হয়। শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টেও "Moslem Education" শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, আবদুল লতিফের উপরোক্ত বক্তৃতার পর সরকারের দৃষ্টিও এদিকে বিশেষ ভাবে পড়ে। শিক্ষাবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ চন্দ্রনাথ বসু কৃত। 'হিন্দু নারীদের শিক্ষাদানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি ?'—ইহাই ছিল তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। তখন আধুনিক পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সবে সুরু হইয়াছে। এ সময় এইরূপ চিন্তার বাস্তবিকই প্রয়োজন হইয়াছিল।

স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা তখনও তেমন দানা বাঁধে নাই। এ বিভাগে মাত্র একটি প্রবন্ধ পড়া হইল। ডাঃ ফারকুহার 'জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াদির বিবরণ' একটি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করেন। তবে চতুর্থ বিভাগে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া চারিটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। জেমস উইলসন 'ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো' শীর্ষে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সমাজবিজ্ঞান সভার লক্ষ্য—ভারতীয় সমাজ ; এ কারণ তাঁহাদের ভাষা-সাহিত্য, পাল-পার্ব্বণ, আচার-আচরণই আলোচনার মূল লক্ষ্য। কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'হিন্দু পাল-পার্ব্বণ' এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গনারীর অর্থ-রোজগারের উপায়সমূহ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি তাৎকালিকবঙ্গসংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। পাদ্রী লঙ বাংলা প্রবাদ সংগ্রহে দীর্ঘকাল যাবৎ রত ছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকও তখন প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি ইহার মধ্য হইতে কতকগুলি বাছাই করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলা প্রবাদ কৃষক, জনমজুর এবং নারী-জাতির অবস্থার কথা কতখানি প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা তিনি উক্ত প্রবন্ধে দেখান। এ সম্পর্কে সমাজ-বিজ্ঞান সভার আলোচনা হইতে এই বিষয়টির গুরুত্ব শিক্ষিত জনের বিশেষভাবে নজরে পড়িল। প্রবন্ধ ইংরেজীতে রচিত হইলেও, লঙ বাংলা ভাষার মর্ম্মস্থলে কিরূপ প্রবেশ করিয়াছিলেন ইহা হইতে তাহা সবিশেষ অনুভূত হয়।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ

[১৩ই আষাঢ় ১২৯৪—৩১শে ভাদ্র ১৩৬১]

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

আধুনিক কাব্য-সরস্বতীর বীণাযন্ত্রে যে তারগুলো কেবল অনুরণন সৃষ্টির জন্য সংযোজিত হয় নি, বিশিষ্ট সুরসৃষ্টির প্রয়োজনে যে তন্ত্রীগুচ্ছের বিন্যাস, যতীন্দ্রনাথের কাব্যের সুর যে সেগুলোরই কোন একটি সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের প্রায়-সমকালীন ও রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্যের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই আশা করি সেকথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করবেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বাভিভাবী প্রতিভা যখন সমুন্নতির প্রায়-শীর্ষে সমুত্থিত, তাঁর কাব্যের বর্ণোচ্ছ্বাস আর সুর-ঝঙ্কারে রসিক চিত্ত যখন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সমাচ্ছন্ন, কাব্যপিপাসু মনের সেই শুভক্ষণে এবং কাব্যসাধকের সেই কঠোর পরীক্ষার সময়ে (১৩১৭) যতীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার সমারম্ভ। কিন্তু তাঁর এই সাধনা এমনই অনন্যনিষ্ঠ ঐকান্তিকতা ও দুশ্চর প্রয়াস-পুষ্ট ছিল যে, তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে বিদগ্ধচিত্ত পাঠক অচিরেই আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। রবীন্দ্রানুকৃতির প্লাবনের মুখে বেতসবৃত্তির সহজ পন্থা পরিহার করে নব পথ-সৃষ্টির পৌরুষ তার যোগ্য সমাদর না পেলেও অনাদৃত হয় নি; বরং সত্যানুরোধে একথা স্বীকার করাই ভাল যে, সমসাময়িকের কাছে নূতন পথের স্বীকৃতি সাধারণত যতটা বিলম্বিত হয় তার বহু পূর্বেই তিনি রসগ্রাহী জনের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। অবশ্য কাব্যসৃষ্টিতে যতীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার কথা সশ্রদ্ধভাবে মেনে নিয়েও একথা স্মরণ না করলে প্রত্যবায় হবে যে, কাব্য সাধনার প্রথম স্তরে যতীন্দ্র-নাথও রবীন্দ্রাভিভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেন নি। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করা যাক :

"যে গানে তার উঠে ভোরের রবি,
সেই গানেতে ফুটে সাঁঝের তারা
চোখের 'পরে ভাসে হাজার ছবি,
বুকের তলে মুক্তা এক জলে
সকল আলো-করা !"

(প্রবাসী, মরীচিকা)

এখানে বাচনভঙ্গী, বক্তব্য আর ছন্দোবিন্যাস যে প্রায় সম্পূর্ণ রবীন্দ্রগন্ধী তা কোন সাবধানী কাব্যপাঠকেরই সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ মরীচিকার অলির প্রণয়, অকাজের জীবন, যৌবন বিস্ময় (গান), অভি-মান (গান), অকালবসন্ত, শেষযাত্রী ইত্যাদি কবিতায়ও রবীন্দ্র-প্রভাব সুস্পষ্ট। তা ছাড়া আত্মজগৎ, শীত, নব নিদাঘ, অকাল বর্ষায় এবং আর দু'চারটি কবিতাতেও রবীন্দ্র-নাথের কতকগুলি প্রসিদ্ধ কবিতার ছন্দ ও বাচনভঙ্গী এত স্পষ্টভাবে অনুসরণ করা হয়েছে যে, সেগুলি পড়বামাত্রই



যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ কবিতার রূপ মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এ কোন কবির পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক না হলেও সাধনার প্রাথমিক স্তরে সাধকের পক্ষে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রগামীর অনুগমন করা যে অস্বাভাবিক নয়, যে-কোন কবির কাব্যের ক্রমবিকাশ-ধারা লক্ষ্য করলে তা বোঝা যাবে। তা সত্ত্বেও যখন দেখি, নবপথ সন্ধানের আন্তরিকতা ও নিঃসংশয় প্রয়াস এ কবিতাগুলোর মধ্যেও পরিস্ফুট তখন, কবির সাধননিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ার অণুমাত্র অবকাশও থাকে না।

বাংলা কাব্যের সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পক্ষে যে সাধারণ অন্তরায় বিদ্যমান, যতীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনায় কাজও সে বাধা থেকে মুক্ত নয়। সে বাধা হল, কবির জীবনের সঙ্গে

পাঠকের অপরিচয়ের বাধা। দু'এক জন সৌভাগ্যবান কবি ছাড়া বাংলা দেশের অধিকাংশ কবির জীবন সম্বন্ধেই পাঠকের অপরিচিতি এত নিবিড় যে, তাঁদের কাব্যকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বার সুযোগ তাঁরা পান না বললেই চলে। কাব্যের এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় যে পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়, এ কথা প্রাচ্য ও প্রতীচীর আধুনিক সমালোচকদের প্রায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর এ সিদ্ধান্ত যে অনুপেক্ষণীয়, সে কথা কোন সত্যকার কাব্যানুরাগীই অস্বীকার করতে পারেন না। যতীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনায়ও যে সে অভাব স্বীকার করে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে, যতীন্দ্র-কাব্যের সন্ধানী পাঠক-মাত্রেই তা অবগত আছেন। তাঁর মৃত্যুর আগে ও পরে তাঁর জীবন সম্বন্ধে যে একটু-আধটু আলোচনা হয়েছে তাতে তাঁর মানস-জীবনের উপর আলোকপাত বড় বেশী কিছু হয় নি, তাঁর কাব্যসৃষ্টির উৎস সন্ধানেও তা বিশেষ কিছু সাহায্য করে না।

যতীন্দ্রনাথকে দুঃখবাদী কবি বলা হয়। তাঁর কাব্যের মূল সুর যে দুঃখবাদ সে কথা অস্বীকারও করা যায় না। কিন্তু দুঃখবাদী কবি বললেই যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। ভারতীয় জীবনদর্শনে দুঃখবাদ যে কোন নূতন জিনিস নয়, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় যাঁদের আছে তাঁরাই তা জানেন। সাংখ্যদর্শন এই দুঃখবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্য-কারিকায় উক্ত হয়েছে ঃ

> তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
> লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তে তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন ॥ ৫৫ ॥

অর্থাৎ, জীব যত দিন শরীর ধারণ করে, তত দিনই সে জরামরণজনিত দুঃখ পেয়ে থাকে। অতএব দুঃখভোগ জীবের স্বভাব।

কিন্তু জীবন দুঃখময় শুধু এই কথা বলেই সাংখ্যশাস্ত্র নিবৃত্ত হয় নি, দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তার উপায় নির্দেশ করতেও সে শাস্ত্র ত্রুটি করে নি। সাংখ্যসূত্রকার ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন ঃ

> অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।

অর্থাৎ, ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) অত্যন্ত নিবৃত্তি বা উচ্ছেদই পরম পুরুষার্থ।

বস্তুত, শুধু সাংখ্যদর্শনের নয়, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনেরও যে ভিত্তি এই দুঃখবাদে ও দুঃখমুক্তির পন্থা-প্রদর্শনে তা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে। কেবল হিন্দুদর্শনই বা কেন, ভারতের আরও দুটি প্রধান ধর্ম—বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম—যে দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাও দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে তার থেকে মুক্তির সন্ধানেই মানুষকে প্রবর্তনা দিয়েছে। ভগবান তথাগত যে চতুরার্য-সত্যের উপদেশ দান করে-ছিলেন, তার প্রথম কথাই ত হ'ল সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়।

কিন্তু ভারতীয় দর্শনে বিবৃত দুঃখবাদে ও কবি যতীন্দ্র-নাথের দুঃখবাদে যে পার্থক্য সর্বাপেক্ষা প্রকট তা হ'ল এই যে, ভারতীয় দার্শনিকেরা দুঃখকে কখনই চরম তত্ত্ব বা সত্য বলে মেনে নেন নি। তাঁরা সকলেই একথা দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, জীবনকে তাঁদের প্রদর্শিত পন্থায় পরিচালিত করলে দুঃখের নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে দুঃখকেই চরম সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি যে দুঃখেই সেকথা দ্বিধা-হীন কণ্ঠে করেছেন ঃ

> মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
> সত্য সত্য সহস্র গুণ সত্য জীবের দুখ !
>
> (দুঃখবাদী, মরুশিখা)

জীবের কাছে দুঃখই যে চরম সত্য কবির মতে তার কারণ ঃ

> দুঃখ হইতে জনম এদের দুঃখেই পরিচয় !
>
> [ঘুমের ঘোরে (সপ্তম শ্লোক)—মরীচিকা]

যাঁরা দুঃখকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে আনন্দকে চরম সত্য বলে বরণ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কবির আক্রোশের অন্ত নেই। তাঁদের শ্লেষের উদ্যত কশা দেখিয়ে তিনি বলেন ঃ

> যা প্রত্যক্ষ নিঠুর দুঃখ, তারে মায়া ভ্রম বলি,
> টেনে বুনে তারে আনন্দ বলে আপনারে কেন ছলি ?
> চোখ বুজে যারে আনন্দ বলে' আনন্দ কর দাদা,
> চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা ?
>
> [ঘুমের ঘোরে (সপ্তম শ্লোক)—মরীচিকা]

কবি দুঃখকে চরম তত্ত্ব বলে বরণ করে নিয়েছেন, তাই তাঁর আরাধ্য দেবতা চিরদুঃখব্রতী মহাদেব। কবির মতে দুঃখব্রতী বলেই তিনি মৃত্যুঞ্জয়, কারণ সুখ ক্ষণস্থায়ী আর দুঃখই শাশ্বত, চিরন্তন সত্য। সেই মৃত্যুঞ্জয়ী আরাধ্যকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন ঃ

> "সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
> সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর—তুমি মৃত্যুঞ্জয় !"
>
> (শিবস্তোত্র, মরুশিখা)

পাকা সোনাকে তামা মিশিয়ে গিনি করা হয় তাকে অধিকতর স্থায়ী ও দৃঢ় করে তোলার জন্য। যতীন্দ্রনাথও তাঁর দুঃখবাদকে নির্ভেজাল অবস্থায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন নি। তাঁর নিছক দুঃখবাদের আবরণ বিদীর্ণ করে

কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে অসহায় ক্রন্দনের অশ্রুবাষ্প নির্গত হতে পারে, এই আশঙ্কায় কবি তাঁর দুঃখবাদের সঙ্গে লোকায়ত মতের মিশাল দিয়ে তাঁকে এক অনমনীয় কাঠিন্য দান করেছেন। তাঁর :

"বেদ বেদান্ত প্রাণ প্রাণান্ত আফিং গাঁজার চাষ,
খুব সস্তায় তাঁর আশে পাশে হয় না ক' বার মাস।"

বা

"সার্থক তোরা ছাগদল,
মায়ের পূজায় খড়্গেতে যায়
চতুর্বর্গ পাবি ফল!
কান্না কিসের ভাই?
বাজনা বাজায়ে স্বর্গে চলেছ
তবু কি তৃপ্তি নাই?"

(সার্থক, মরুমায়া)

এই ভেজাল মিশ্রণেরই ফল। এ যেন "চতুর্বেদানাং কর্তারঃ ভণ্ডাঃ ধূর্তাঃ নিশাচরাঃ"রই প্রতিধ্বনি।

কবি তাঁর জীবনদর্শনকে তীব্র ও ঝাঁজালো করে তোলার জন্য প্রায়শঃই তার মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষের মশলা প্রক্ষেপ করেছেন। কবি নিজেও বলেছেন :

"সাধ্যমত সে অশ্রু সে চিন্তা, ভুলিতে ভোলাতে জ্বালা।
বিদ্রূপে বিঁধে চাহিল গাঁথিতে নিটোল হাসিরই মালা।"

(দুঃখের কবি, মরুমায়া)

কখনও-বা এই শ্লেষব্যঙ্গ কশা হয়ে উঠে অব্যর্থ নির্মমতায় লক্ষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে।

আমরা ফুলের গন্ধ উপভোগ করি, ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরে বা ফুলের গুচ্ছ ফুলদানিতে সাজিয়ে সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচয় দেই, কখনও-বা ফুল দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবতাকে নিবেদন করে পরিতৃপ্তি লাভ করি। বাসক-সজ্জায় ফুলের সমারোহ নবদম্পতীর দেহমন রসোজ্জ্বল করে তোলে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এ সবের মধ্যে 'ঘ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ সঁপা' ফুলের পরম দুর্ভাগ্যের ক্রন্দনই অভিব্যক্ত হতে দেখে। তাই তিনি বলেন :

"প্রতি সন্ধ্যায় কোটী কুসুমের অকাল মরণ পাতি',
ঘরে ঘরে নামে খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমের কামুক রাতি।
ভোরের ভক্ত গুণ গুণ গাহি' বোঁটা হতে ছিঁড়ি ছিঁড়ি,
চন্দন বাঁটি ফুলে ফুল আঁটি গাঁথে স্বর্গের সিঁড়ি।"

(মরুমায়া, পাষাণপথে)

বস্তুতঃ ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ, সংশয় আর অবিশ্বাস তাঁর বাচনভঙ্গীর গুণে এমন এক উপভোগ্য আস্বাদের সৃষ্টি করেছে যে, পাঠক তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। তা ছাড়া, রবীন্দ্রকাব্যের লালিত্যে ও মাধুর্যরসে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠক স্বাদান্তর হিসাবেও যতীন্দ্রনাথের কাব্যের বাচনভঙ্গীর অনন্যতা, উপমা-উৎপ্রেক্ষার চমকপ্রদ অভিনবত্ব, ভাষার স্পষ্টতা, রুক্ষতা ও অসাধারণতা পরম আগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। কাব্যের বহিরঙ্গ, এমনকি বক্তব্যের দিক দিয়েও যতীন্দ্রনাথের কাব্য যে কিছু পরিমাণে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাসের কাব্যের সমধর্মী, এমনকি কতকটা তাঁর দ্বারা প্রভাবিতও এ কথা বললে আশা করি যতীন্দ্রনাথের কাব্যের অনন্যতার মর্যাদা ক্ষুন্ন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হব না।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখবাদের আবির্ভাব কি ভাবে হ'ল তা নির্ণয় করা দুরূহ। কবি বাল্যকালে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি করাল ব্যাধির আক্রমণে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। এই দুঃখবাদ তাঁর রোগজর্জর দেহের বিক্ষুব্ধ মনের কাব্যিক অভিব্যক্তি বলে কেউ কেউ মনে করেন। রবীন্দ্রকাব্যের আত্মতৃপ্ত রসবিমুগ্ধ ভাবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে অভিনবত্ব আমদানির জন্য কবি স্বেচ্ছায় এক নূতন পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন, এ সম্ভাবনাও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু কবি নিজে যে তাঁর কাব্যে এই দুঃখবাদ উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না, তাঁর একটা উক্তি থেকেই তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন :

"আমার কাব্যের দুঃখবাদ পারিবারিক জীবনের দুঃখ হইতে উদ্ভূত নহে; এ ভূত কোথা হইতে ঘাড়ে চাপিল, জানি না—প্রথম কৈশোর হইতেই সে আমার পিছু লইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।"

(শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃ ১১৭)

পরেও কাব্যসাধনায় 'সায়ম্'-এর স্তরে এসে এবং তার কবির রুক্ষ মরুসন্ধানী চোখে যদিও মাঝে মাঝে সৌন্দর্য-মুগ্ধতার ছোঁয়াচ লেগেছে, রোমান্টিকতা-বর্জনপ্রয়াসী কবির কাব্যে যদিও কখনও কখনও রোমান্টিকতার আমেজ ভেসে উঠেছে, তবুও যতীন্দ্রনাথের কাব্যের দুঃখবাদ যে তাঁর জীবন-দর্শনেরই অকপট অভিব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে বলেই আমরা মনে করি। তাঁর এই দুঃখবাদ খাঁটি ও অকৃত্রিম ছিল বলেই জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসেও তিনি পার্থিব জীবনের থেকে মুক্তি পাওয়াকেই জীবনপ্রভাত বলে অকুণ্ঠ ও নির্ভীক অভিনন্দন জানাতে পেরেছেন। কবির জীবনদর্শনের সঙ্গতি ও পরিণতি বোঝবার জন্যে 'অনুপূর্বা'র দ্বিতীয় সংস্করণের শেষ কবিতা 'ভোর হয়ে এল' খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তা থেকে এখানে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি :

"ভোর হয়ে এল কবি ভোর।

....

জীবন-রজনী শেষে দাঁড়ায়ে শিয়র দেশে
মরণ-অরুণ ওই চাহিয়া নির্নিমেষে ;
তোরই ঘুম ভাঙাতে
তোরই পথ রাঙাতে
বাহিয়া তিমিরতরী এল সে।"

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' ১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩) প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থখানিতে 'ঘুমের ঘোরে' শীর্ষক সাতটি কবিতার একটি গুচ্ছ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। কবির জীবনদর্শনের একটা সুসঙ্গত ও সুসংবদ্ধ রূপ এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যেই সর্বপ্রথমে পাওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথের কাব্যের যাঁরা অনুরাগী পাঠক তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পরবর্তীকালে নানা কবিতায় বিচিত্র ছন্দে, অভিনব শব্দবিন্যাসে, অনুপম উপমায় ও বর্ণনায় যে ভাবনাকে তিনি কুসুমিত ও পল্লবিত করে তুলেছেন, সে ভাবনা বীজাকারে এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট রয়েছে। কাজেই যতীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনায় এই কবিতাগুচ্ছ সবিশেষ মনঃসংযোগের দাবি রাখে। সেইজন্যেই আমরা এখানে কবিতাটির বক্তব্য সংক্ষেপে অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি।

শাস্ত্রে পুরাণে সাহিত্যে লোকমুখে যিনি ভগবান বলে আখ্যাত, সেই বহুস্তুত বা বহুনিন্দিত সত্তাই এই কবিতাগুচ্ছে কবির 'বন্ধু'। কবি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ খোলাখুলি ভাবে তাঁকে অন্তরের যে জ্বালাময় কথাগুলো শুনিয়েছেন, 'ঘুমের ঘোরে' তারই কাব্যময় অভিব্যক্তি। কবির মতে, ভগবানের সৃষ্ট এই জগৎ একটা হেঁয়ালিবিশেষ—এখানে 'যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি' :

"জগতের যত শৃঙ্খলা
স্বপ্নেরি মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা।"

অবশ্য তিনি কোন নিয়মই মানেন না কবি সে কথা বলেন না, কারণ কবির মতে 'একটি নিয়ম মান তুমি, সেটি কোন নিয়ম না রাখা।' পৃথিবীর গতি, গ্রহনক্ষত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সবই 'গতি বিজ্ঞানে বাঁধা' তবু মানুষের খোঁড়া ঠ্যাং কিন্তু সব বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করেই খালের ভিতরে গিয়ে পড়ে। ভগবানকে যে কেউ পিতা, কেউ মাতা কিংবা কেউ করুণাময় বলে কবি তা মোটেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না, কারণ কবির চোখে তা 'চির ভোটহীন' অধীন মানুষের নিরুপায়তার ডাক। যে সূর্যকে গতি-বিজ্ঞানের একটা আদর্শ প্রতীক বলে মনে করা হয়, যে ঠিক সময়ে উদিত হয়ে 'কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে', যাঁর কৃপায় লোকে আলোক পায়, মেঘ-সৃষ্টি হয়ে পৃথিবী শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে বলে চতুর্দিকে যাঁর জয়জয়কার, কবি তাঁর অসহায়তার রূপটি একটি কলমের খোঁচায় প্রকট করে দিয়েছেন। কবি প্রশ্ন করেছেন—

"শুধাই তোমায়—কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ ?
চেরাপুঞ্জির থেকে,
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে ?"

কবির মতে আমাদের সুখদুঃখ কিছুই ভগবানের দান নয়, 'জীবনে ও দুটাই শ্লেষ' মাত্র। কিন্তু তাই বলে সুখ-দুঃখ মিথ্যা, এ কথা বলাও কবির অভিপ্রেত নয়। কবির ভাষায় :

"যদি বল তুমি, সুখ দুঃখ নাই—দুটাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশান ক্রম।"

তবে আমাদের দুঃখ ঘোচাবার বা সুখ দেবার কোন শক্তি বা ইচ্ছাই ভগবানের নেই। আমাদের স্তবস্তুতিতে বা ক্ষোভে-ক্রোধে তাঁর আনন্দ বা অসন্তোষ কোন ভাবান্তরই হয় না। তিনি নির্বিকার দৃষ্টিতে বিশ্বজোড়া ঘুরণচাকের খেলা দেখছেন বটে, কিন্তু তাঁর অশ্রু বা হাস্য 'নহে সে মোদের তরে'। তবু যে আমরা তাঁকে ডেকে 'যন্ত্রণা পাই—সান্ত্বনা চাই'—তাতে 'আপনারে দিই ফাঁকি'। কারণ জগতের কল্যাণ 'ভগবান চান—তবু হয় না'ক, একথা পাগলে বলে।' বস্তুতঃ মানুষ 'আসে, হাসে, কাঁদে চলে যায় ঘুরে বায়স্কোপের ফিতা'। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে 'তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে', আর 'যাহার পাঁঠা সে যে দিকে কাটুক তাতে অপরের কি ?'—এ একই কথার এ-পিঠ ও-পিঠ। কিন্তু জীবনে সুখী মানুষও যে আছে সে কথা কবি অস্বীকার করেন না, কিন্তু সে সুখ বহু জনের দুঃখের বিনিময়েই গড়ে ওঠে :

"আমার প্রমোদ ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটাহীন ?
আমার দীপালি রাতি
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন বাতি ?"

অথবা

"কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্য ছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা !"

কবির কাছে প্রেম ও ধর্মেরও কোন শোভন সুন্দর সত্তা নেই। তাই তাদের উপরও কবির শ্লেষ আপতিত হয়েছে এই তীব্র ঝাঁজাল ভাষায় :

"প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাত্তি।"

কবির মনে কখনও কখনও ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জেগে উঠেছে। তাই তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন :

"সে কেবল মরীচিকা
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি না থাকাই তার থাকা।"

আবার কখনও তাঁর মনে হয়েছে যে, অসীমকে সীমায় বাঁধার বা অচেনাকে চিনে নেওয়ার যে প্রয়াস তা 'মিথ্যা আশায় ঝাঁপা'। তাই কবি জগতে 'রঙিন কথার বিশ্ব' সৃষ্টির পরিবর্তে এমন বাণীকে আবাহন করেছেন যা জগতের সত্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দেখাবে, যা 'জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি' আর অকপটে ঘোষণা করবে, 'ধানভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে'। জগতে অসত্যের পর্দা ছিন্ন করে সত্যের নগ্ন কঠোর মূর্তির স্বরূপ চিত্রিত করতে পারে, তেমন মানুষের অভাব চতুর্দিকেই দেখে কবি অন্তর্জ্বালায় বলে উঠেছেন:

"কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা?"

কবি জানেন জগদ্ব্যাপী ফাঁকিরই রাজত্ব চলেছে, থাকা-না-থাকা ভগবানের তা নিয়ন্ত্রণে কোন ক্ষমতা বা হাত নেই, কিংবা ইচ্ছাও হয় ত নেই। তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি নিঃসন্দেহ নন। তবু কবি ভগবানকে স্বীকার করে নেওয়ারই পক্ষপাতী। কারণ তাঁকে স্বীকার করে নেওয়ার একটা সার্থকতা এই যে, 'তোমা ছেড়ে মোর থাকে না কিছু বাকী'। তা ছাড়া:

"জীবনের মূল খুঁড়িতে খুঁড়িতে যত তলাইয়া যাই,
জীবনের ফুল খুঁজিতে যখনি আকাশটা হাতড়াই
সকল সময় রহস্যময়! তুমি রহ পাছে পাছে,"

অসীম, অনন্ত, ভূমা প্রভৃতি কথাকেও কবি খুব প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না। অসীমকে প্রকৃতপক্ষে তিনি একটা কারাগারের সামিলই মনে করেন। তাঁর কাছে:

"চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো-আঁধারের গরাদে বসান' অপার বিশ্ব-কারা।"

মানুষ এই কারাগারের বাহিরে কি রহস্য পুঞ্জিত হয়ে আছে তা জানবার জন্য মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দেয়, কিন্তু বহু ব্যর্থতায় অবশেষে বুঝতে পারে:

"সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারো দেয় উঁকি
খাওড়া-তলায় ফুটে' চেয়ে থাকে সখের সূর্যমুখী।"

তাই এই অসীমের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কবির প্রার্থনা:

"বন্ধু, আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখ,
এত বড় খাঁচা—মুক্তির ধাঁচা—বিদ্রূপ করো নাকো।"

কবি ব্যঙ্গে বিদ্রূপে শ্লেষে, কৌতুকে 'বন্ধু'র কাছে তাঁর অন্তরের জ্বালা উজাড় করে দিয়ে, অবশেষে এই সার সত্যে এসে পৌঁছেছেন যে, ভগবান নিজেই দুঃখময়, সারা বিশ্বের বেদনাও তিনিই বহন করে চলেন, তাঁর সবলও একমাত্র দুঃখই। কাজেই দুঃখ ছাড়া মানুষকে দেবার তাঁর আর কিছু নেই। কারণ:

"যাহা আছে যার, তাহা ছাড়া আর কি পারে সে পরে দিতে
অপার দুঃখ তোমা হতে তাই ঝরে পড়ে চারিভিতে।"

আর মানুষ সম্বন্ধেও তাই কবির সিদ্ধান্ত:

"দুঃখ হইতে জনম এদের দুঃখেই পরিচয়।"

পূর্বেই বলেছি, যতীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর কাব্যের প্রধান সুর মূলতঃ এই ভাবধারারই সম্প্রসারণ, রূপান্তরসাধন বা পরিণতি মাত্র। কাব্যসাধনার প্রথমেই একটি পরিণত জীবনদর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া এবং তাকে আশ্রয় করে সমগ্র জীবনব্যাপী অব্যাহত নিষ্ঠায় কাব্যানুশীলন করা সত্য সত্যই মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে বটে, কিন্তু মনে একটা অতৃপ্তিও সৃষ্টি না করে তা নয়। শুধু একটি সুপক্ব ফল আহৃত হলে আমাদের রসনার পরিতৃপ্তি হয় কিন্তু তার পত্রপল্লবে, তার পুষ্পের বর্ণ-গন্ধে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় যে রসাস্বাদন করে তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। তরুলতার ক্রমপরিণতি যেমন শুধু তাদের ফল দেখে বোঝা যায় না, এই রকম পরিণত চিন্তাদর্শের সাক্ষাৎ প্রথমেই পেলে স্বভাবতঃই তার চিন্তা সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগে—'কোনো কালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী'।

তা ছাড়া যতীন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতর দিয়ে যে জীবনাদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে, সে সম্বন্ধেও দু'একটা কথা বলবার আছে। যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন যে জীবনের খণ্ড-দর্শন, জীবনকে এক চোখ দিয়ে দেখা, তাতে যে জীবন শতদলের কাঁটাই বিশেষ করে প্রকট হয়ে উঠেছে, কাঁটা, বর্ণ, গন্ধ সব মিলিয়ে একটি পূর্ণ শতদলের রূপ ফুটে ওঠে নি, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। অনেক কবি যেমন শতদলের রূপ ও গন্ধকেই কাব্যের একমাত্র উপজীব্য করে তুলেছেন, যতীন্দ্রনাথ তেমনি বর্ণগন্ধ বাদ দিয়ে শুধু কণ্টকাঘাতের ব্যথা বেদনাকেই কাব্যে অক্ষয় করে তুলেছেন। কবির ভাষায়:

"অন্যায় জনতা যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছে ক্ষিপ্র বেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম।" যতীন্দ্রনাথ

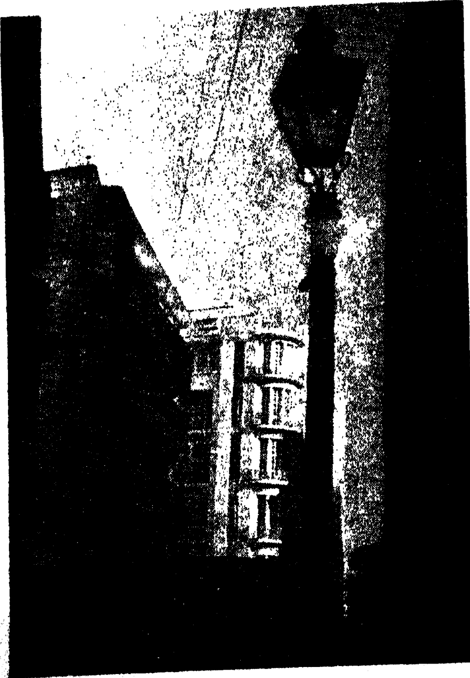
এ একাভিমুখিতা হলেও সান্ত্বনা এই যে, বর্ণ-গন্ধ-সৌন্দর্যের ভক্তিতে সুন্দর কবির কোন সাহিত্যেই অপ্রতুলতা নেই, কিন্তু কাঁটার ব্যথা ভাষায় কোটাবার কবি বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ প্রায় একক। পুত্রশোকাতুরা পাঁচীর দুঃখে এক ফোঁটা অশ্রু ফেলবার, ক্ষেমিন বিলিকের নগ্ন রূপ দেখাবার, কপট [illegible] মুখোশ রূঢ় করে ছিন্ন করে ফেলবার, [illegible] বেদনায় আর্তনাদ করে

উঠবার, শুধু মানুষের নয় সমস্ত জড়প্রকৃতির অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবার মত নির্ভীক বলিষ্ঠ লেখনী আজ স্তব্ধ। সেজন্য সকলে না করুক, দীন-দুঃস্থ, আর্ত-নিপীড়িতের দল নীরবে নিভৃতে দু'ফোঁটা বেদনাশ্রু মোচন করবেই, সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যানুরাগী আমাদেরও অলক্ষ্যেই মন ও চোখ বাষ্পাপ্লুত হয়ে উঠবে।

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

৮ই নভেম্বর '৫৩। দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে এল সকাল। কলকাতার হেমন্ত-সকাল। আশেপাশের বাড়ীগুলোর টানা-পোড়েনের ফাঁক দিয়ে ফিকে রোদ্দুরটা উঁকি দিল দু'একবার চুপি চুপি। আলমারির গায়ে কি মশারির কোণায় হঠাৎ একটুখানি ছোঁওয়া দিয়েই পালিয়ে যায়। সারা দিনে আর আসে না। বিকেলেই যেন সন্ধ্যা ঘনায় ঘরে ঘরে। মনে মনেও ঘনায়—পথে ছুটে গিয়ে উজ্জ্বল আকাশের পাতায় মনের কথা লিখবার একটা দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কোথায় আকাশ!



বিকাল বেলার কলিকাতা

এই সকাল কাল থেকে আসবে অন্য বেশে, নানান্ পরিবেশে। মনে হ'ল, বাঁচলাম রোদের লুকোচুরি খেলা থেকে। মনে হ'ল, ঐটুকু যেন মনের অনেকটা জুড়ে ছিল। আজ থেকে ছাড়া-ছাড়ি।

ঐ ঝিকমিকে স্বপ্ন-সকাল সুরু হ'ল, শেষ হ'ল। দুপুর এল, চলে গেল। বিকেল শেষে শুধু এ-ঘর ও-ঘর করলাম অস্থির পদ-ক্ষেপে। খুটিনাটি, ছোটখাটো অনেক জিনিষ এখানে ওখানে ছড়ান ছেটান। এদেরও ছেড়ে যেতে হবে। আজ থেকে সঙ্গী হবে এদের স্মৃতিকথা।

হাওড়ার প্লাটফর্মে জড় হ'ল অনেকে, চেনাশুনা, কাছের ও দূরের। জড় হ'ল অনেক মালা, ফুল, ফল, মিষ্টি, রোলি ফ্লেক্সে কয়েকটা ফ্লাশ ফটো নেওয়া হ'ল। আবেগে, উত্তেজনায় ঘাম দেখা দিল কপালে। অফুরন্ত অবসর যাদের, প্লাটফর্মের সেই ঘুরে বেড়ানোর দলও থমকে দাঁড়াল।

মার কাছে বিশেষ দাঁড়াই নি। কত ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু দূরে দূরে আর সকলের মাঝে মিশে ছিলাম। ব্যস্ত ছিলাম কথার আদান-প্রদানে।

গার্ড সাহেব সবুজ আলো দোলালেন সবশেষে একটা অদ্ভুত ছন্দ মিলিয়ে। গাড়ী ছাড়ল। ঝাপসা অনেকগুলো হাত আর রুমাল নড়ছিল। এক সময় মিলিয়ে গেল চিমনীর ধোঁয়ার রাশির পেছনে।

১০ই নবেম্বর '৫৩। ট্রেনটার বোম্বে পৌঁছাবার কথা সকাল সওয়া আটটায়। আমাদের সৌভাগ্য, তিন ঘণ্টার বেশী লেট হয় নি। মনে হ'ল, নির্দ্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে গেলাম বুঝি।

কয়েকটা টানেল পার হয়ে এলাম। পশ্চিমঘাটের দৃশ্য বেশ স্নিগ্ধ। চোখ দুটোয় তৃপ্তি উপচে ওঠে। পাহাড়, ঘাস, মাটি। আর হাই ভোল্টেজ ট্রান্সমিশানের উঁচু উঁচু খুটিগুলো সব মিলে যেন প্রদর্শনীর একটা সেরা ক্যানভাস তৈরি করেছে।

শোনা ছিল, বম্বের মেরিন ড্রাইভ আর প্যারিসের বুলভারে তফাৎ খুব অল্পই। মেরিন ড্রাইভ হয় ত মন-মাতান ঝলমলে নয় ততটা। তবু এখানে মানুষের চলাফেরায় আছে অনেক স্বস্তি। আছে কর্ম্মান্তের মিষ্টি অলসতা। সুন্দর বৃক্ষ সারিতে সাজান পথে অশোভন চাঞ্চল্য নেই এতটুকু। পথের এ পাশে আকাশ ছোঁয়া

স্থাপত্যের পুনরাবৃত্তি। একঘেয়েমির তুলি-টানা বাড়ীগুলো। ও-পারে বহুদূরে সমুদ্র-শেষে ঝাপসা দিগন্ত।

ঘণ্টা তিনেকের অবসরে শহর দেখার পিপাসা মেটালাম বেবি ট্যাক্সিতে। দেখলাম হর্নবি রোডের কর্ম্মব্যস্ততা ও ফ্লোরা ফাউ-ণ্টেনের লাল রঙা ট্রামবাসের কিউ। লক্ষ্য করলাম ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের কুলি মজলিস ও গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার অনমনীয় আভিজাত্য। আর দেখলাম, বম্বেবাসীর পাশ্চাত্য রীতিনীতির নিখুঁত অনুকরণ-প্রচেষ্টা। এ বিষয়ে সমগ্র প্রাচ্যে টোকিওবাসী-দের পরেই এদের স্থান।

শহর তবু শহরই। বিচিত্রতা নেই এক তিলও। এ শুধু শহরবাসীর কয়েদখানা আর গ্রামবাসীর গোলকধাঁধা।

১১ই নবেম্বর '৫৩। ব্রেকফাষ্ট জুটল না এত সকালে। ঘুম থেকেই ওঠে নি বোধ হয় কেউ। হোটেল মালিক কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে আছে চব্বিশ ঘণ্টাই। পাওনা আদায়ের সুযোগ ফাঁকি দিয়ে না পালায়। হয় ত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এপ্রেন্টিস ছিল কিছু কাল।

চললাম ব্যালার্ড পিয়ারে।

নানান ঝঞ্ঝাট, অনেক রীতি, বিরক্তিকর লম্বা লম্বা কিউ। তার উপর কুলীদের কচকচি। আর প্যাসেঞ্জারের পঙ্গপাল। যেন একটা মহাসমরের প্রস্তুতি।

বেশ বেলায় ডেকে এসে চড়লাম। ঝকঝকে জাহাজটায় সবে-মাত্র চোখ বুলাচ্ছি, অমনি কে একজন টানতে টানতে নিয়ে গেল। আবার আর একটা লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যাপার অবিশ্যি সামান্য। ডাইনিং রুমের টেবিল ঠিক করে নিতে হবে। নিলামও অগত্যা। খাওয়াটাকে ত উপেক্ষা করা যায় না।

বেলা এগারটায় জাহাজ ছাড়ল ভোঁ দিয়ে, মাইক্রোফোনে ঘোষণা করে। হাতে হাতে কাগজ-রিবনের ছড়াছড়ি, ছোঁড়াছুড়িও—জাহাজের মেঝেময় ছেড়া পাঁপড়ি, রাঙতা জরীর চুমকি। মঞ্চ ঘাটে দোলায়মান হাতগুলো ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। ঐ দিকেই চেয়ে থাকতে হ'ল, যতক্ষণ দেখা গেল, কি জানি, কেন।

যারা চলেছে পৈতৃক ব্যাঙ্ক বোঝার ভার কমিয়ে, তাদেরই বিদায়ে এত জাকজমক। আর আমরা চলেছি সরকারী বৃত্তি নিয়ে—অনাদরে, গ্লানি বয়ে। আমাদের জন্যে আসে নি কেউ এক-বুক শুভেচ্ছা নিয়ে। জাহাজ-ঘাটেও হাত নাড়ছে না কেউ, কেউ না।

কেবিনে ফিরে এলাম, ভাবলাম, আবার এক দিন ওখানে জাহাজ নোঙর ফেলবে। কুলীদের হট্টগোলে মাথা ঝিম ঝিম করছে। আবার কলকাতার রাস্তায়, গলিতে দেখব অগণিত মানুষের ঢেউ। যেন আর এক কালো সমুদ্র। আর শুনব ট্রামবাসের ঘড়ঘড়ানি, যাত্রীদের কলকোলাহল—সে আর এক অনুভূতি।

১২ই নভেম্বর '৫৩। অজয়বাবু রসিক লোক। [illegible] শুধু কথাবার্ত্তা। উনিই আমাদের প্রাণ খুলে হাসি [illegible]।

ভদ্রলোক ফিরে [illegible] নি। [illegible]

একাধারে চিত্রশিল্পী, কারিগর ও কবি হতে পারতেন না। এখন হয়েছেন বলে পরিতৃপ্ত। বয়স চল্লিশের কোঠা ডিঙিয়ে বেশ কিছু এগিয়ে গেছে। রোমে চলেছেন গীর্জ্জার স্থাপত্যশিল্পের গবেষণায়—আমাদেরই মত সরকারী বৃত্তি নিয়ে।



জাহাজের 'সুইমিং পুলে' স্নানরতা

তিনি একটি গল্প বললেন। লক্ষ্ণৌয়ের সূক্ষ্ম রসিকতা। লক্ষ্ণৌয়ের অনেক রসিকতাই বহুল প্রচলিত। হয় ত এটিও।

চার জন লোক এসেছে রাজার দরবারে। ভেট আনে নি। গুপ্ত সংবাদ আনে নি। যুদ্ধ জয়ের খবরও আনে নি। ওদের কাজ চাই।

হোমরাচোমরা বেটি, সে বললে—রাজাবাহাদুর, আমরা জপ করে আপনার সমৃদ্ধি বাড়াব। আপনার অশেষ অর্থ হবে, অপরাজেয় প্রতিপত্তি হবে, পরখ করুন।

রাজা বললেন—বেশ।

ওরা চার জন বসে গেল। ওদের গলায় পৈতে, মাথায় টিকি।

ওদের কথাবার্ত্তা ওদের মধ্যেই হ'ল, আর কেউ শুনল না। প্রথম জন চোখ বুজে সুর করে আরম্ভ করল—জপ করি, জপ করি, জপ করি···

দ্বিতীয়টি বলে চলল—ও যা করছে, আমিও তাই করছি, ও যা করছে, আমিও তাই করছি। ও যা করছে···

পরের জন বলছে—এ বেইমানি কতদিন চলবে, এ বেই-মানি কতদিন চলবে, এ বেইমানি···

চতুর্থ জন সুরু করল—যত দিন চলে ততদিন খাও, না চললে ঘরে ফিরে যাও। যত দিন চলে তত দিন খাও, না চললে ঘরে ফিরে যাও। যত দিন চলে···

তাই অজয়বাবু বললেন—মশাই, দুই সরকারের ঘাড়ে ভূত চেপেছে, [illegible] দিয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আর



এক পারে আরব, আর পারে মিশর—সুয়েজ খাল

কি! এই রাজার হালে খাওয়া আর বসা। বসা আর শোওয়া। যত দিন চলে তত দিন খাও, না চললে ঘরে ফিরে যাও।

আমরা ক'জন এক চোট হেসে নিলাম, তারিফ করলাম। হক কথা।

ছুপুর একটায় 'এশিয়া' করাচীর জেটিতে ভিড়ল। আমরা তখন লাঞ্চে বসেছি। সবে চিকেন্ স্যুপে চামচ ডুবিয়েছি। ওদিকে ক'জন চরম উল্লাসে সেকেণ্ড কোর্সের হুকুম জারি করে পোর্ট-হোলের কাঁচে নাক লাগিয়ে বসেছে। জাহাজের ইঞ্জিনটা থেমে গেল। থেমে গেল হঠাৎ কাপ, প্লেট, চামচ, কাঁটার ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা। ষ্টুয়ার্ডটা এদিকেই আসছে। আমি মেন্যু-কার্ডের রেখা-ঢেউয়ে চোখ ছুটোকে ডুবিয়ে দিলাম।

বিকেলের দিকে আমরা বেরুলাম। ডক্টর মুখার্জি, দীপক, মারাঠী ডাক্তার মিঃ নাটেকার, তাঁর স্ত্রী, ছোট্ট মেয়ে আর আমি। অক্ষয়বাবু দল পাকিয়ে বেড়াতে ভালবাসেন না। একলাই বেরিয়ে গেছেন লাঞ্চের পরেই।

ট্যাক্সি ভ্রমণে উদ্দীপনা আছে, নেই একটুও উপভোগের আনন্দ—তবু ট্যাক্সি নিতে হ'ল। সঙ্গে ছিল বৃদ্ধ, নারী, শিশু আর স্বল্প সময়।

আমরা বিকেল আর সন্ধ্যের হাত ধরে বেরিয়েছিলাম। মুঠো মুঠো আবীর-ছড়ানো আকাশের গায়ে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলাম 'ক্লিফটন্'-এ পারে মিলিয়ে যাওয়া সমুদ্র ফেনা ছুয়ে—নরম ভিজে বালির বুকে পা ফেলে। দূরে শহর-পটে আবছা বাড়ীগুলো। এটুকুই ত বেশ ছিল। ঐ সিমেণ্ট লোহার পুলটা, ঐ ধোয়াটে সুসজ্জিত রেস্তোরাঁটা, মানুষের তৈরী ঐ কৃত্রিম বাগান, আর ঐ পিচ-বাঁধান পথে পথে ধূলার অণু-পরমাণু। ওরা সব এখানে কেন? আকাশের সপ্ত রঙে কালি ঢেলেছে ওরাই। সমুদ্রের ঢেউকেও শাসন করছে ওরা। ঢেউয়ের ছুটাছুটি মাতলামি কত যেন কমে গেছে। শুধু ট্যুরিষ্টরা গদ গদ হয়ে চোখ বুজছে। ভাবে বিভোর হয়ে ভাবছে, সবই আছে, শুধু নেই আদম, শুধু নেই ইভ।

ধূসর গোধূলিতে এলাম জিন্না-লিয়াকতের কবর-স্থানে। ছ'জন সঙ্গীনধারী প্রহরী ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওদের দেখে মনে হ'ল, পাষাণপুরীতে ঢুকেছি, জীয়ন-কাঠি ছুইয়ে জিন্নার ঘুম ভাঙাতে বুঝি।

হঠাৎ কোথাও সান্ধ্য নামাজের সুর শোনা গেল কাছেই, প্রতিবেশী-বস্তি থেকে। পথের ধূলাই যাদের অক্সিজেন, অনাহার যাদের রাজভোগ, তাদের এনক্লেভ ঐ বস্তির বুক জুড়ে। দেওয়ালে দেওয়ালে বিচিত্র ঘুটে শিল্প, বিচিত্রতর হোগলা, টিন, বেড়ার জ্যামিতিক ডিজাইনগুলো।

সন্ধ্যায় বন্দর রোডে আলোকিত বিপণির ধারে ধারে ঘুরে বেড়ালাম অকারণে।

জাহাজে যখন ফিরলাম, সারা শরীরে ক্লান্তি জমেছে অনেক।

১৩ই নভেম্বর '৫৩। করাচী থেকে জাহাজ ছাড়ল রাত আট-টায়। আবার ত্রিশ ঘণ্টা পর সুরু হ'ল ইঞ্জিন-ঘরের একটানা শব্দ। সুরু হ'ল দোলন। জাহাজ পাড়ি দিল এডেনের পথে।

পানের পিক্-রঞ্জিত, মফঃস্বল-মার্কা মোটরবাস-আকীর্ণ করাচী শহরকে পেছনে ফেলে এলাম।

নোটিশে দেখলাম, ডিনারের পর ভারতীয় সিনেমা দেখাবে। পুলকিত হলাম। ডেকে গিয়ে দেখি বসবার জায়গা নেই, সুরু হতে মিনিট পনের তখনও বাকি, তা হলেও পুলক জেগেছে সবারই প্রাণে। আমার চেয়েও অনেক বেশী।

কেবিনে চলে এলাম, বাড়ীর চিঠিটা লিখে রাখতে।

লেখা-শেষে উপরে গিয়ে দেখি ছবি সুরু হয়েছে। দেবানন্দ ও নিম্মিকে চিনলাম, পরিবেশ বম্বে-ছাচের।

এ ত একেবারে বম্বের হিন্দী ফিল্ম। এতে আওয়ারা-নায়ক সাহেব সেজে ধনী, বিদূষী, নৃত্যগীত-পটীয়সী নায়িকার সঙ্গে প্রেম করবে। নায়ক চাকরি পেলে নায়িকা কাঁদবে। আবার নায়কের চোখ ছলছল হলে নায়িকা দাঁত বের করে হাসবে, নায়ক মারা গেলে নায়িকা গান ধরবে। আবার সবশেষে, কেমন করে যেন নায়ক বেঁচে উঠে নায়িকার বাবার সঙ্গে গরিলা-যুদ্ধে নামবে ও নায়িকা চোখের জলে বালিশের ওজন বাড়াবে। হঠাৎ কেমন সময়

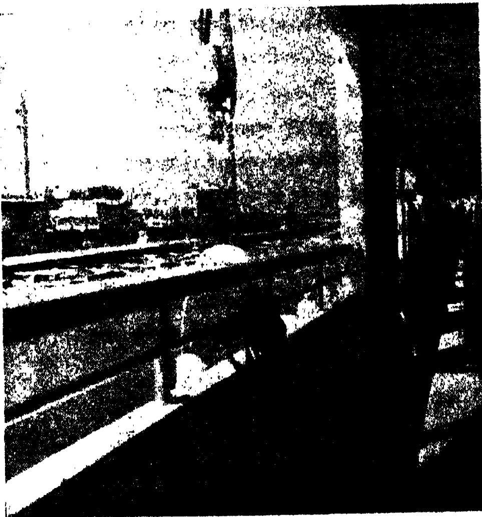
ট্যাক্সি করে ছুটবে, চার্চ্চ গেট ষ্টেশন ছাড়িয়ে, রেলের লাইনে, ট্রেনের চাকায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে। তারপর? ট্যাক্সি-ড্রাইভারই বোধ হয় নায়ক।

এই ছবিটার কি গল্প, নামই বা কি, আমি জানি না। একটা রীল দেখেই কেবিনে এসে শুয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন দুপুরে।

মুখার্জ্জি মশাই বাইরে গেছেন, বোধ হয় ওপরে—ডেকে। কেবিনে আমরা তিন জন।

অক্ষয়বাবু বললেন—আপনারা মশাই বিশ বছরের ছোকরা, নিস্মি দেখলেন না?



ডেক হইতে পোর্ট সৈয়দের একাংশ দেখা যাইতেছে

আমি বললাম—আপনারা বুড়ো হলেন, তবু শখ ষোল আনা। আমরা ত সিনেমাই দেখতে যাই, তাতে রেহানা রইল কি গীতা-বালী রইল, ভাববার প্রয়োজনই নেই।

উনি বললেন—তবু এ ত মশাই ডিফারেন্ট জিনিস। অনেক সেন্টিমিটার তফাৎ। ভারতীয় ছবির দোষই এই, এ তিন পাকা ফোড়া, চুলবুল করছে, চার পাশে চুলকে বেড়াচ্ছি, কোথায় হাত দেবার জো নেই। উত্তেজনা এতে আরও বাড়ে বই কমে না।

আমরা অনেকক্ষণ হাসলাম বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে।

আমি বললাম—ব্যস্ত হবেন না। মার্কিন, ইটালীয়ান সব ছবিই দেখাবে। তবর [illegible] [illegible]। [illegible] আর ঘুরে মরতে হবে না।

১৫ই নভেম্বর '৫৩। [illegible] হচ্ছি। কলকাতা থেকে [illegible]

আর দেরে [illegible]

আরব সমুদ্র-তীরে উঁচুনীচু হাল্কা পাথরী রঙের স্তূপ। এডেনে বুঝি এসে গেলাম।



কার্ডিনাও দ্য লেসেপ্স্-এর মূর্ত্তি

সুইমিং পুলের চারপাশে অনেক লোকের মেলা। পুল তো দশ হাত চৌকো একটা চৌবাচ্চা। নেমেছে যেন কয়েকটা পাঁকচুরী। হাত পা ছোঁড়ার বহর অসম্ভব সবরকম প্রচেষ্টা। যেন ছোট ছেলের হাত থেকে মোয়া কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার ওপর আবার লাইফ সেভিং বেল্ট।

কালো 'নেটিভ' মনকে অনেক করে প্রবোধ দিলাম—যা পার, এই খেলা দেখে নাও, শ্বেতাঙ্গদের জল-কেলি।

মন মানল না। এ তো গামলায় বসে খুকুর জল খাবড়ানো। জল-কেলি না ছাই!

—কিন্তু দেখ, দুনিয়াতে তো যাওয়া হচ্ছে না। কাজেই ভেবে নাও না বাবু, "[illegible]"-এর পার্কে এডিসন দেখছ। কি? একের খুশি হও?

মন মুখ ভার করে বসে আছে। কি যেন ভাবছে।

—কি ভাবছ ?

—ভাবছি দেশের কথা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাঁতার দেয় কীর্তিনাশায়। ঢেউয়ের তালে নাচে। বললে শোনে না। কতদূর চলে যায়। ভয় ডর নেই একটুও। আর এই বিলাস-বহুল 'এশিয়া'র সুইমিং পুল! ফুঃ!

—তা তুমি কি বর্ণ জাহাজে আরব সাগরের ঢেউ নাচাতে ?

মন বলল—তা নয়। পুল আরও বড় করতে হবে। নইলে চৌবাচ্চায় নেমে কেচ্ছার প্রয়োজন নেই।

আমি বললাম, ছোটই যদি মালিকরা করে, আমাদের দোষ কি ? আমরা জলে নামব না ?

—একশ' বার নামবে। কিন্তু হাত পা ছোঁড়ার ঢঙে লোক জড়ো কর' না। আর ফুল-ছাপ-নেংটি ও কাঁচুলী দেখলেই চোখ বড় করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। সেটা অসভ্যতা। মেকি জলুসকে উপেক্ষা করতে শেখো।

বুঝলাম। অগত্যা টেবিল-টেনিসের ওয়েটিং লিষ্টে ঝুলে গেলাম। সভ্য হলাম।

১৬ই নভেম্বর '৫৩। রাত ন'টায় এডেন এল। পাহাড়ের গায়ে আর সমতল রাস্তায় সারি সারি আলোকসজ্জা। মাঝে মাঝে ফেনিয়ে-ওঠা ঢেউয়ের মাথায় চিক্‌চিক্ করছে। দশমীর চাঁদ পাহাড়গুলোকে আরও একটু স্পষ্ট করল। মোটরলঞ্চগুলো গুন-গুনিয়ে ফিরছে জাহাজগুলোর চারপাশে। 'বয়' ভাসছে, এখানে-ওখানে। ওপারে তাকালাম। বহু দূরে দু' একটা লাল-হলুদ আলো নজরে আসছে সোমালিল্যাণ্ডের তীরে।

রাত সওয়া দশটায় ঘোষণা করা হ'ল—যাত্রীরা এখন এডেনে যেতে পারে। জাহাজ ছাড়বে রাত একটায়।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল হঠাৎ। সবাই যাবে কেনাকাটা করতে এডেনের সস্তার বাজারে। ফার্ষ্ট ক্লাশে বেরোবার দরজায় পিঠে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি তিন-চারটে লাইন।

বেশ লাগছিল। রোমাঞ্চের নূতনত্বে। মাথার ওপর ছাই-রঙা আকাশ, সাদা চাঁদ ও হলদে তারা। আর দুর্দ্ধর্ষ কালো সোমালি। এডেনের অলিতে-গলিতে ওদের আড্ডা।

দু'জনে আমরা দল ভারী করলাম। ভারী মনটাকে হাল্কা করলাম। মাঝরাতের জনহীন রাস্তায় আমাদের ট্যাক্সি ছুটল শহরের কেন্দ্র লক্ষ্য করে। দু'দিকে পাহাড়-স্তূপ, নতুন নতুন বাড়ীঘর। মধ্যে সরু রাস্তা। মাঝে মাঝে হু হু করে জলো ঠাণ্ডা হাওয়া নাকে মুখে ঝাপটা দিচ্ছিল।

দোকান খোলা ছিল দুটো কি তিনটে। ওরা দোকান খুলেছিল প্রথম দিন। বোধহয় বন্ধ করবে সেদিন, যেদিন উঠে যাবে। জাহাজ আসার বিরাম নেই।

তবু যা চাইলাম, পেলাম না। যা পেলাম, তা জলের দরে দেবে না। যেমন শুনেছিলাম, তেমন সত্যি নয়।

১৮ই নবেম্বর '৫৩। উপরের ডেকে আজ অসহ্য গরম। রেড সী'র উষ্ণতার খ্যাতি আছে শোনা ছিল। এখন প্রমাণ পেলাম। কিন্তু নবেম্বরেও যে এতটা হবে, ভাবতে পারি নি। পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত একঘরে হয়েই কাটাতে হবে। কেবিনে বসে ঢেউ গুনব।

ব্রেকফাষ্টের পর এক ফাদার-এর সঙ্গে আলাপ হ'ল। আয়ার্লণ্ডের পাদ্রী। নামবেন নেপল্‌সে।

যে জমিতে কুসংস্কারের সার আছে, যেখানে অশিক্ষার চারা মহীরুহ হয়েছে, সেখানেই ঐ পাদ্রীরা আবাদ করে। ছেটায় ধর্ম্ম-বীজ। ফসল-কাটার গানের বদলে শোনায় নিউ টেষ্টামেণ্টের প্যারাবল্। অজ্ঞ আদিবাসীদের সভ্য করবে। আর ওরা, ঐ আদিবাসীরা টাই-ট্রাউজারে শোভিত হয়ে রবিবারের গীর্জ্জায় উপাসনায় বহু সহস্র বছরের পুরোনো নিজস্ব কৃষ্টিকে বিসর্জ্জন দিবে চিরকালের মত। তারা আধুনিক হবে। তারা জানে না, পরমাণু-যুদ্ধে মেতেছে যারা, তাদের ঐ আধুনিকতম ধর্ম্মগুরুরা যীশুকে ভুলে গেছে অনেক দিন। আজ হিরোশিমা, বিকিনি আইল্যাণ্ড ওদের জেরুজালেম।

—Didn't you attend the Fancy Dress Ball last night? (তুমি কি গত রাত্রে ফ্যান্সি ড্রেস বলে যোগ দাও নি)?

চমকে উঠলাম। অন্যমনস্ক ছিলাম।

বললাম, Did you say Fancy Dress Ball? (আপনি কি ফ্যান্সি ড্রেস বলের কথা বলছিলেন?) Oh, no, I had no liking. (ও, না, তাতে আমার আকর্ষণ ছিল না)।

ফাদার বললেন—But, there were many. (কিন্তু, সেখানে অনেকে ছিলেন)।

মুখে সলজ্জ হাসি হাসলাম। যেন ভুল করেছি। কিন্তু আমি তো জানি, আমি অনেকের মধ্যে মিশে হারিয়ে যেতে চাই না। নিজেকে স্বতন্ত্র করে ভাবায় হয়তো গৌরব নেই, কিন্তু আত্মপ্রসাদ আছে। একেবারে নিজস্ব। ও তুমি বুঝবে না ফাদার।

পাদ্রীসাহেব বললেন—How do you like the trip? (বেড়ানোটা তোমার কি রকম লাগছে?)

—I think it's rather tedious. (আমার ওটা বরং বিরক্তিকরই মনে হচ্ছে)।

—How old are you? (তোমার বয়স কত?)

—Twenty-one. (একুশ বৎসর)।

—You say tedious! No, Impossible! (তুমি বলছ বিরক্তিকর! না, অসম্ভব!)

ইনি সব বোঝা বয়সের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বোধ হয় বলতে চাইলেন, এই তো বয়স, এই তো সময়, এই তো সুযোগ!

জাহাজ ভর্ত্তি কতই তো রয়েছে দেখবার, শোনবার, অনুভব করবার, হয়তো শোনাবারও। কত আবেগ, কত চাঞ্চল্য। তবু কি করে ফাদারকে বোঝাব, বয়স আর মন কখনো হাত ধরে পথ চলে না। মন যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে বয়সকে পেছনে ফেলে।

১৯শে নবেম্বর '৫৩। বিকেলে শোনা গেল, মিসেস নাটেকার নাকি এ পর্য্যন্ত একটা শাড়ী দু'বার পরেন নি।

ভাবলাম, এতে অবাক হওয়ার কি আছে। এটা তো বিজ্ঞাপনেরই যুগ। লোকের আকর্ষণ তো তারই ওপর, যে নিজেকে জাহির করে সবচেয়ে বেশী। মিসেস নাটেকারের চেহারা সুন্দর, গড়ন চলনসই। জাহাজের সেরা সুন্দরী। না হয়, তের দিনে তেরটা শাড়ী পরবে আর বলবে—তোমরা আমায় দেখো।



জেলে ডিঙ্গি, পোর্ট সৈয়দ

ঐ যে মিশকালো নিগ্রেস। মাথাটা কদম ফুল। কান দুটো গর্ব্বাকার কুলো। অনেক মেহনত করে আঁকা লাল হিপো-ঠোঁট। নিতম্বের মাংস-স্তূপে অসীম অসাম্য। সকাল-বিকেল সেও তো লাল, নীল, হলুদ সেজে ডেকে অনর্থক ঘুরে বেড়ায়। আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচায় তোমাদের চোখের মণি। তার বেলা?

বিশ্বনিন্দুক বিশ্ববাসীর নিন্দা করে না, করে স্বদেশবাসীর। স্বভাবধর্ম্ম কয়লার রঙের মতই চিরস্থায়ী।

২০শে নবেম্বর '৫৩। ব্রেকফাষ্টে আজ পরীজ নিই নি সংক্ষেপে সারব বলে। জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে চলেছে। চকোলেটের চুমুকেও মন নেই। ছুটলাম ডেকে।

এক পারে আরব। আর এক পারে মিশর। দুই পারেই লম্বা টানা রাস্তা। পাশেই রেললাইন। তারপর কালো মাটির পড়ো জমি। হঠাৎ মাঝে মাঝে দু'একটা ঘাঁটি রয়েছে মুদীগঞ্জ, তারপাশার মত। সুয়েজের গঞ্জগুলো জনশূন্য। সমৃদ্ধিও নেই তিলমাত্র। তবে সবুজের পরশ আছে গঞ্জের গাছপালাগুলোর।

বেলা দশটায় পোর্ট সৈয়দ দেখা দিল ডেকের যাত্রী-মেলার সামনে। একটা চাপা কোলাহল সুরু হ'ল হঠাৎ। কি সুন্দর! কি অদ্ভুত। আচ্ছা, ওটা কি? ঐ যে। গম্বুজটার পাশে। ঐ তো! জবাব দিল কেউ কেউ। এ পথ দিয়ে যারা আগেও দু'একবার গেছেন তারাই আজ 'হিরো'। আমরা উপগ্রহ হয়ে রইলাম।

মাটিতে পা দিয়েই মনে হ'ল, এই তো সীমান্ত-বন্দর। এদিকে পূব, ওদিকে পশ্চিম। এখানে পূব-পশ্চিমের মিলন ঘটবে।

আকাশে, তারায়, চাঁদে সন্ধ্যা নামল। অস্পষ্ট-পরিক্রমার শ্রান্তি বয়ে এনে জাহাজে চড়লাম। জাহাজ পাড়ি দিল ভূমধ্য-সাগরে।

অনেক দূরে অস্পষ্ট হয়ে এল কার্ডিনাণ্ড দ্য লেসেপস-এর মূর্ত্তি। একটাও আলো নেই। অথচ শত শত কিলোওয়াট জ্বলছে বন্দরের বাজারে, দোকানে, কাফেতে। এরই নাম বোধ হয় আধুনিক সভ্যতা।

ডেকেও লেসেপস নিয়ে গুঞ্জন নেই এতটুকু। গম্বুজের নক্সায়, মিশরবাসীর আলখাল্লায়, সাইমন আর্জেট-এর আভিজাত্যে, কত রঙীন মন্তব্য তুবড়ির ফুলের মত ছিটিয়ে দিয়েছিল যাত্রীরা। এখন হয়তো সওদার গুণাগুণ নিয়ে ব্যস্ত। কে কত জিতেছে, কার জামায় ক'টা ফুটো বেরিয়েছে, এরই গবেষণা চলেছে কেবিনে কেবিনে।

পেছনে-হারিয়ে-যাওয়া বন্দর-মুখে জেলে ডিঙ্গির মাস্তুলগুলো দাঁড়িয়ে রইল অবহেলিত ঐ লেসেপস-মূর্ত্তির বন্দী হয়ে। আর হতাদরের সাক্ষী ছিল আকাশের তারা।

২১শে নবেম্বর '৫৩। আজ বিদায়ী-ভোজ। সবাই বলে ক্যাপটেন্‌স ডিনার। এতদিন যা খেয়ে এলাম, আজ হয়তো তার রূপ বদল হবে। খদ্দর ও গান্ধী টুপিতেও তো রূপ বদল হয়। তবু তারা কি ভেজাল কম মেশায়, না আয়কর ফাঁকি দেয় না?

এ ক'দিন যেন বড় বস্তুকেন্দ্রিক ছিলাম। খুঁজিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছুরই বিরূপ সমালোচনায় ব্যস্ত হতাম। তবু আজকের অসার বাহ্য আড়ম্বরও নিমন্ত্রণ জানাল জিভের জলকে।

রোজ টেবিলে বসে মেনু নিয়ে তর্কবিতর্ক হ'ত। দীপক, অজয়বাবু আর আমি।

কিন্তু আজ একেবারে থৈ থৈ ব্যাপার। রঙীন কাগজে ও কায়দে,

ফুলে ও পাতায় ফিল্ম-অভিনেত্রীর অভ্যর্থনাকেও হার মানাল। সবাই ট্রাঙ্ক উবুড় করে সেরা সাজে এসেছে। নানারকম গন্ধ একটা সুড়সুড়ি দিচ্ছে নাকে। হাঁচিও আসছে না, নেশাও জমছে না।

যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্প মারে দইয়ে। মেনুতে অভিধানের বাইরে থেকে অনেক অবোধ্য শব্দ এনে বসিয়েছে। সে সবের সত্যিই কোন অর্থ আছে কিনা, আমার স্বল্প ও পরিমিত জ্ঞানে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। অবশ্য বোঝার দরকারও ছিল না। নির্বাচনের দিকে নজরই দিই নি আজ। আজ যা দেবে তাই নেব।

অক্ষয়বাবুর চোথ-ইশারায় লজ্জাকে শিকেয় তুলে নিশ্চিন্ত হলাম। রসনাতেও একবার শান দিয়ে নিলাম।

এপোটাইজার মামুলি। শুধু শাড়ী ব্লাউজটা পাল্টেছে। স্যুপও পুরোনো ও একঘেয়ে। রোজই আপিস বেরোবার মুখে সেই 'সকাল করে এসো'র মত। বয়েল্ড উল্‌ফ-ফিশ ওদের হয়তো রুই, কিন্তু আমাদের স্বাদে নিতান্তই বেলে মাছ। তবু ওরই মাঝে রসনার আংশিক তৃপ্তি হ'ল বেকেড টার্কিতে। বিয়ে বাড়ীর পংক্তি-ভোজনে আমাদের রুই মাছের কালিয়ার মত ওদেরও ক্রিসমাস-ভোজে চাই টার্কি। টার্কির রিপু দিয়ে অন্য ফাঁকগুলো বুঝি ঢাকবার চেষ্টা হ'ল। আর ছিল মিক্সড আইসক্রীম, এসর্টেড কেক ও ফল—যেমন আমাদের থাকে দই, মিষ্টি ও পান।

হ্যাঁ, 'রাম্' দিয়েছিল আজ। বিনা মাশুলেই। হয়তো নিকৃষ্টতারও শ্রেণীবিভাগ আছে। এ যেন সকল শ্রেণীর বাইরে। ঠোঁটে ছুঁইয়েই বুঝলাম, এ গলা দিয়ে নামালে উল্‌ফ-ফিশ উঠে এসে ভূমধ্যসাগরে ঝাঁপ দেবে, টার্কি বেরিয়েই ডানা মেলবে। আর আমি খালি পেটে সজনেডাটা ও কুমড়ো-বড়ির খোয়াব দেখব! না, ধন্যবাদ। তার চেয়ে ঐ রাম্‌টুকু দিয়ে ষ্টুয়ার্ডকে রাম্ টিপস দিয়ে দিই আজকের মত। রইল পড়ে রাম্। লাউঞ্জের কালো কফিতে ওর চেয়ে অনেক বেশী আরাম। ক্রমশঃ

নবায়মানা

শ্রীআশুতোষ সান্ন্যাল

গৃহিণীর সাজে ছিলে সারাদিন,
সন্ধ্যায় হ'লে 'প্রিয়া',
কোন্ যাদুকর দিয়েছে অঙ্গে
মায়া তুলি বুলাইয়া?
কে জানিত আগে এত তব রূপ—
পূর্ণিমা চাঁদে করে বিদ্রূপ!—
করে অনঙ্গ কত যে রঙ্গ
অপাঙ্গে লুকাইয়া!

বহু দিন-দেখা সেই পুরাতন
দুটি ওষ্ঠের 'পর,
না জানি কেমনে তাম্বুল রাগ
হ'ল এত মনোহর।
কত দিন শোনা—তবু যেন হায়,
পাগল করিছে আজি সন্ধ্যায়
প্রথম মিলন-সম্ভাষ সম
তব কণ্ঠের স্বর!

দিনের অন্তে এলে কি প্রেয়সী,
পঞ্চদশীর বেশে?
উজ্জয়িনীর অগুরু-সুবাস
ঝুরিছে তোমার কেশে!
কত মালবিকা আর সাগরিকা,
কত নিপুণিকা আর চতুরিকা,
নিয়ে যৌবন তব দেহতটে
দাঁড়াল আজিকে হেসে?



দশভুজা (মৃন্ময় মূর্তি) [ফোটো—শ্রীবিনয়ভূষণ দাস



পল্লীপথে [ফোটো ঃ শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ



ক্রাউন প্রিন্স অব ল্যাওস কর্ত্তৃক দেরাদুনে 'চেটউড বিল্ডিংয়ে'র সম্মুখে মিলিটারি প্যারেড পরিদর্শন

কালিদাস-সাহিত্যে শিব-পার্ব্বতী

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাইবে, সে সময় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত কয়েকটি সম্প্রদায় থাকিলেও তিনি নিজে কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তখনকার দিনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে সাধারণ লোকে একটি বা দুইটি অথবা তিনটিরই প্রতি ভক্তি দেখাইতেন; মহাকবির সাহিত্যেও যেখানে যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দেওয়ার থাকে, সেখানেই তিনি সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া আপন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সমান-ভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইলেও তাঁহার সাহিত্য লইয়া যদি সমগ্রভাবে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভক্তির উৎস পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের প্রতি প্রবাহিত ছিল, তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা ছিলেন শিব, আরাধ্যা দেবী ছিলেন পার্ব্বতী।

মহাকবি তাঁহার কাব্য বা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশে শিব অথবা শিব-পার্ব্বতী উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'রঘুবংশ' মহাকাব্য আরম্ভ করিবার সময় তিনি বাক্য ও তাহার অর্থের উপর প্রতিপত্তি লাভ করার আশায় প্রথমে 'বাক্য ও অর্থের ন্যায় সংযুক্ত জগতের পিতা মাতা পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন (জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ'। রঘু—১।১)

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকেরও প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রথম অঙ্কের প্রথম শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, "জগতের যিনি 'একেশ্বর' হইয়াও, এবং ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বহু ফল প্রদান করিতে থাকা সত্ত্বেও নিজে কৃত্তিবাস অর্থাৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহে স্ত্রী সতত সংযুক্ত হইয়া থাকিলেও যিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অনাসক্তচিত্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তিদ্বারা নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া থাকা সত্ত্বেও মনে যাঁহার অভিমানের লেশমাত্র নাই, সেই ঈশ তোমাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত তোমাদের মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন।"

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের নান্দী লিখিবার সময়, 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা' বলিয়া যে শ্লোকটি তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাতেও ঈশ্বরকে অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এবং জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, ভূমি প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তির [illegible] মহাকবি [illegible] বলিয়াছেন, 'বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ' অর্থাৎ [illegible] মূর্ত্তিগুলির দ্বারা ঈশ (অর্থাৎ [illegible]) তোমাদিগকে রক্ষা করুন।'

কালিদাস তাঁহার [illegible]

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং 'ঈশ তাঁহার অষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন' বলিলে ঈশ অর্থে যে তিনি শিবকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহাতে আর কোনও রূপ সন্দেহ থাকে না।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রারম্ভে যেমন শিবের উদ্দেশ্যে মঙ্গল-প্রার্থনা, তেমনি নাটকের শেষ কথাও 'নীল-লোহিতে'র অর্থাৎ শিবের কাছে প্রার্থনা করিয়া শেষ হইয়াছে।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকেরও প্রথম অঙ্কের প্রথম শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, "সকল বেদান্তে যাঁহাকে 'এক পুরুষ' ('একমেব অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'—মল্লিনাথ) বলা হইয়া থাকে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, 'ঈশ্বর' শব্দে যিনি ছাড়া আর অপর কাহাকেও বুঝায় না, মোক্ষকামীরা প্রাণবায়ুগুলি সংযত করিয়া যাঁহাকে সতত মনের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া থাকেন, একাগ্রভক্তি দ্বারা যাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়, সেই স্থাণু (শিব) তোমা-দিগকে মুক্তি প্রদান করুন।"

'কুমারসম্ভব' কাব্যেরও প্রধান বিষয়বস্তু, কেবল প্রধান বলিলে ভুল হইবে, একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় শিব-পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর জন্ম, তাঁহার রূপবর্ণনা ও বাল্যকাল, শিবের তপস্যা, পার্ব্বতীর শিবপূজা, মদনদহন, পার্ব্বতীর তপস্যা, শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি বিষয়গুলি এমন সুন্দরভাবে ও সুললিত ভাষায় মহাকবি তাঁহার প্রাণের পূর্ণ আবেগ দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, এ কাব্যের নাম যদি 'কুমারসম্ভব' না দিয়া, তিনি এর নামকরণ করিতেন 'শিব-পার্ব্বতী' কাব্য, তাহা হইলে, মনে হয় যেন কিছুমাত্র অশোভন হইত না।

যাহা হউক, মহাকবি তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পগুলি যাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন দক্ষরাজকন্যা সতীর দেহত্যাগের পর হইতে। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সর্গের ৫৩ তম শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, 'তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ', অর্থাৎ সেই হইতে পশুদের পতি (পশুপতি-শিব) বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া রহিলেন, বিবাহও আর করিলেন না। তিনি তপস্যা করার জন্য হিমালয় পর্ব্বতের এক সানুদেশে সংযতচিত্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যে স্থানটিতে তিনি বাস করিতেন মহাকবি তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। স্থানটির চারিদিকে দেবদারুবৃক্ষ, পাশ দিয়া গঙ্গার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, মৃগনাভির গন্ধে ভরপুর, মাঝে মাঝে কিন্নরদের সুমিষ্ট গানও শুনা যাইতেছে। এহেন স্থানে তিনি বাস করিতেন, [illegible], তাঁহার অনেকগুলি প্রমথ ছিল, তাহারা [illegible] 'শিলাজতুর গন্ধে সুবাসিত পর্ব্বতের গুহায়',

পরিধান করিত ভূর্জ্জপত্রের ছাল। হিমালয়ে উৎপন্ন মনঃশিলা নামক একপ্রকার ধাতুদ্রব্য দিয়া দেহ অলঙ্কৃত করিত, এবং নমেরু বৃক্ষের পুষ্প চয়ন করিয়া সেই পুষ্প অলঙ্কারের মত ধারণ করিয়া থাকিত। তাঁহার বাহন প্রকাণ্ড বৃষ, বড় যে-সে বৃষ ছিল না, সিংহের গর্জ্জন শুনিতে পাইলে সেও (ভয় পাওয়া দূরে থাকুক) দর্পভরে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে থাকিত।

এই স্থানটিতে শঙ্কর নিজেরই অষ্টমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি—অগ্নি, সম্মুখে প্রজ্বলিত করিয়া তপস্যা করিতেন। মহাকবি বলেন, 'কেহ তপস্যা করিলে, সে তপস্যার ফল যিনি দান করেন, তিনি যে আবার কিসের কামনায় তপস্যা করিতেন, তাহা আর কে বলিতে পারে?' (কু—১।৫৭)।

তাঁহার এই 'বনটি' (কু—৩.২৪), মহাকবির টীকাকার মল্লিনাথ যাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'আশ্রম', সেটি নেহাৎ ক্ষুদ্র ছিল না, সেখানে বহু লতা এবং আম্র, অশোক, পলাশ, পিয়াল, কর্ণিকার প্রভৃতি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ ছিল, কৃষ্ণসার মৃগমৃগী ও হস্তী-হস্তিনীরাও সেখানে বাস করিত, কিংপুরুষ ও তাহাদের রমণীরা সেখানে বেড়াইতে আসিত এবং তিনি ছাড়া আরও কয়েকজন তপস্বী সে আশ্রমে বসিয়া তপস্যা করিতেন। স্বয়ং পশুপতি যেখানে বসিয়া তপস্যা করিতেন, সে স্থানটির চারিদিক লতার দ্বারা এমনভাবে বেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, দেখিলে মনে হইত, সেটি একটি 'লতাগৃহ'। কেবল যে মনে হইত তাহা নহে, মহাকবি বলেন যে, এই লতাগৃহটির একটি দ্বারও ছিল, এবং সে দ্বারের সম্মুখে তাঁহার প্রভুভক্ত ভৃত্য নন্দী সুবর্ণের বেত লইয়া পাহারা দিতেন, মধ্যস্থলে ছিল এক দেবদারু বৃক্ষ, মূলদেশে তাহার বাঁধানো বেদী, শিব সেই বেদীর উপর ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সে ধ্যানমূর্ত্তির শান্ত অথচ 'প্রভাবপূর্ণ' রূপ তাঁহার ভক্তকবির কল্পনানেত্রে কিরূপ দেখাইত, 'কুমারসম্ভব' হইতে তাহার বর্ণনার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তাঁহার চরণ দুইটি উভয় উরুর উপর বিন্যস্ত ('বীরাসনে বদ্ধ'), দেহের উপরিভাগ উন্নত ও স্থির, করযুগল ক্রোড়ের উপর স্থাপিত, দেখিলে মনে হয় দুইটি প্রস্ফুটিত রক্তকমল তাঁহার অঙ্কের উপর স্থাপিত রহিয়াছে, মস্তকের জটা উচ্চ করিয়া সর্প দিয়া বদ্ধ, কর্ণে দুলিতেছে দুইটি করিয়া অক্ষের কুণ্ডল, পরিধানে কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম, কণ্ঠের নীল আভা লাগাতে গাঢ় নীল দেখাইতেছে, চক্ষুর তারা ঈষৎ প্রসারিত, স্তিমিত, নাসিকার উপর সন্নিবদ্ধ, ভ্রূযুগল নিশ্চল।

মহাকবি তাঁহার ধ্যানমূর্ত্তির আরও বর্ণনা দিতে গিয়া বলিতেছেন, তাঁহার সে নিষ্কম্প ধ্যানমূর্ত্তি 'যে বৃহৎ জলাশয়ের প্রত্যেক তরঙ্গটি স্থির নিষ্কম্প হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রশান্ত জলাধারকে মনে পড়াইয়া দিতেছিল, দেখাইতেছিল যেন বর্ষণের পূর্ব্বে জলপূর্ণ শান্ত মেঘরাশি, অথবা যেন বায়ুহীন স্থানের নিষ্কম্প প্রদীপ। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত যে জ্যোতির প্রবাহ সূক্ষ্মরূপে ললাটস্থ নয়ন হইতে বাহির হইতেছিল, নবোদিত শশীর পদ্মের মৃণাল অপেক্ষা সুকোমল জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যও যেন তাহার কাছে কিছু নহে। ইন্দ্রিয়গণের নয়টি দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমাধির বলে বশীভূত মন হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া তিনি আপনার আত্মাতে সেই অবিনাশী আত্মাকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করিতেন।'

এই আশ্রমে পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী পিতার নির্দ্দেশমত প্রতিদিন তাঁহার সখীদের সহিত আসিয়া শিবপূজা করিয়া যাইতেন, শুধু যে শিবার্চ্চনা করা তাঁহার কাজ ছিল তাহা নহে, প্রত্যুষে আসিয়া তিনি পূজার পুষ্প ও জল তুলিয়া রাখিতেন, নিয়মানুষ্ঠানের কুশগুলি গুছাইয়া দিতেন, এবং বেদীটিও পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। এই সমস্ত কাজ সারিতে যখন তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন, মহাকবি বলেন, "তখন গিরিশের শিরস্থিত চন্দ্রের কিরণে তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া লইতেন।'

মহাকবি পূর্ব্বে পার্ব্বতীর রূপ বর্ণনার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার রূপের তুলনা ছিল না, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত বুঝি বিশ্বসংসারে উপমা দেওয়ার মত যত কিছু সুন্দর বস্তু আছে, তাহাদের সব কয়টিকে একসঙ্গে এক জায়গায় দেখিতে পাইবেন এই আশা লইয়া বিধাতা তাঁহার রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মত একটি অসামান্যা রূপসী তরুণী যে প্রতিদিন আশ্রমে আসিবেন, সংযমীশ্রেষ্ঠ শিব তাহা অনুমোদন করেন কিরূপে, বিশেষত, মহাকবি বলেন, যখন তিনি বুঝিলেন পর্ব্বতরাজকন্যা 'সমাধেঃ প্রত্যর্থিভূতা' অর্থাৎ সমাধির বিঘ্ন!'। মহাকবি এ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন এই বলিয়া যে, পার্ব্বতীকে যে তিনি তাঁহার আশ্রমে আসিয়া নিয়মিতভাবে তাঁহার সেবা ও পূজা করিতে নিষেধ করিলেন না তাহার কারণ পার্ব্বতীকে দেখিয়া তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র বিকার আসিল না, যেন বিকার আসার এত বড় কারণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মনে যখন কিছুমাত্র বিকার আসিল না, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন, পার্ব্বতীর আগমন নিষেধ করার প্রয়োজন বোধ হইল না। অবশ্য, যদি তিনি পার্ব্বতীকে 'সমাধির বিঘ্ন' ভাবিয়া আশ্রমে প্রতিদিন আসিতে নিষেধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে মদন হয়ত ভস্ম হইয়া যাইতেন না, তাঁহাকেও আশ্রম ছাড়িয়া অপর জায়গায় চলিয়া যাইতে হইত না বা তপস্বীজীবন সাঙ্গ করিয়া বিবাহিত জীবন-যাপন করিতে হইত না, কিন্তু স্বয়ং যিনি বিধাতা, নিজের বিধান তিনি লঙ্ঘন করেন কি করিয়া।

মহাকবি তাঁহার আরাধ্য দেবতার স্বরূপ কি ভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, দেখা যাক। 'কুমারসম্ভবে' তিনি শিব সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনা দিয়াছেন, সেগুলি পড়িলে মনে হয় যেন তিনি দেখাইতে চাহেন, তাঁহার আরাধ্য কোনও কামনা বা বাসনার বশীভূত নহেন, তিনি নিষ্কাম, নিস্পৃহ, অনাসক্ত যোগীশ্বর, কোনও স্বার্থবোধ তাঁহার মনে আবিলতা আনিতে পারে না, কোনও প্রলোভন তাঁহার চিত্তকে জয় করিতে পারে না, কোনও ভোগের বাসনা তাঁহার

মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। যেন কেবল পরের মঙ্গল সাধনা করিয়া যাওয়া, এবং সংসারের ভোগের মাঝে থাকিয়াও স্বয়ং কি ভাবে অনাসক্তচিত্তে সংসারী হইয়া থাকা যায়, তাহার বাস্তব আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

হয়ত এই আদর্শের বাস্তব রূপ দেখাইয়া দেওয়ার জন্য স্ত্রী-লোকের রূপের প্রতি আসক্তিহীন, স্ত্রীলোক নিকটে আসিলে যিনি অস্বস্তিবোধ করিতেন, সেই পুরুষ বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিবার কারণ জানাইয়া দিবার জন্য শিব 'সপ্তর্ষিমণ্ডলে'র সাত জন ঋষি, যাঁহাদিগকে তিনি তাঁহার বিবাহে 'ঘটকালি' অর্থাৎ হিমালয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার 'বিবাহের সম্বন্ধ' স্থির করিয়া দিবার জন্য মনে মনে স্মরণ করিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "আপনারা জানেন, আমার কোনও কাজ নিজের জন্য করা হয় না, কেবল পরের মঙ্গল করার জন্য আমার এই অষ্টমূর্ত্তিতে আবির্ভাব হওয়া। চাতকপাখী যেমন তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, দেবতারাও তেমনি অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আমার একটি পুত্র প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব যজমান যেমন যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্য কাষ্ঠ আহরণ করে, আমিও তেমনি পুত্রোৎ-পত্তির নিমিত্ত পার্ব্বতীকে আহরণ করিতে চাই (কু—৬:২৬-২৮)

মহাসুর তারক যখন দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বর্গ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, এবং অধিকাংশ দেবতাকে ভৃত্যের মত খাটাইতেছিলেন, তখন দেবতারা নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে পারে, এমন একজন সেনাপতি চাহিয়াছিলেন, লোক-পিতামহ তাঁহাদের সকল কথা শুনিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত সেনাপতি সৃষ্টি করা এক শঙ্করের পক্ষে সম্ভব যদি তিনি পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে স্বীকার করেন। সুতরাং এই দেবকার্য্য সম্পাদন করার নিমিত্ত বিবাহ করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না, যেন ইহাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

যাঁহার নিজের স্বার্থ বলিয়া কিছু নাই, কামনা নাই, বাসনা নাই, কেবল পরের মঙ্গল করার জন্য আবির্ভাব, তাঁহার জীবন-যাপনের প্রণালী যে সাধারণের জীবনযাপনের প্রণালী হইতে বিভিন্ন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। হয়ত এই কারণে শিবচরিত্রে যে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল, সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সরল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য মহাকবি 'কুমারসম্ভবে'র পঞ্চম সর্গে ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশী শিব ও তপস্যারতা পার্ব্বতীর কথোপকথন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এই সর্গে বর্ণিত বিষয় পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস যে কেবল শিবের পরমার্থ স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি যেন তাঁহার সমসাময়িক অশৈবগণের বিরূপ সমালোচনার উত্তর এখানে প্রদান করিয়াছেন, হয়ত তখনকার দিনে যাঁহারা শৈবপন্থী ছিলেন না, তাঁহারা শিব সম্বন্ধে যে সমস্ত অদ্ভুত ও অসাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, মহাকবি পার্ব্বতীর মুখ দিয়া তাঁহাদের সমালোচনার সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া যোগ্য উত্তর দেওয়াইয়াছেন. যেন শিব-পার্ব্বতীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া তিনি অশৈবপন্থীদের সমালোচনা ও শৈবপন্থীদের উত্তর স্পষ্ট অথচ শিষ্টজনোচিত ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এখানে দুই-একটি উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়া গেল। ছদ্মবেশী শিব বলিতেছেন, "প্রথমেই এক বিড়ম্বনা, যদি অপর কাহাকে বিবাহ করিতে গজরাজের পৃষ্ঠে বসিয়া বেড়াইতে পাইতে, আর ইহাকে বিবাহ করিলে বসিতে হইবে এক বৃদ্ধ ষাঁড়ের পৃষ্ঠে, ভাল লোকেরা দেখিতে পাইলে লজ্জায় মস্তক নত করিয়া থাকিবে।" পার্ব্বতী ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "যখন তিনি বৃষভের পৃষ্ঠে বসিয়া গমন করিতে থাকেন, জানেন কি, পথে দেখা হইলে, অমন যে ঐরাবত হস্তীর আরোহী স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, তিনিও নামিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে মুকুট স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিয়া পদাঙ্গুষ্ঠগুলি প্রস্ফুটিত মন্দার কুসুমের পরাগে রক্তিম করিয়া তুলেন?"

শঙ্করের অনিন্দ্যসুন্দর চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি 'মদনদহন' ও 'পার্ব্বতীর তপস্যা' এই দুইটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। বসন্তের সহায়তায় এবং পার্ব্বতীর অলৌকিক রূপ ও নিজের 'সম্মোহন' নামক পুষ্পশরের দ্বারা শঙ্করকে জয় করিতে গিয়া কামদেব মদনকে কি ভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল এবং রূপসজ্জার সকল আয়োজনবর্জ্জিত কঠোর তপস্যায় নিমগ্না উপবাসক্লিষ্টা পার্ব্বতীর দ্বারা শঙ্করের হৃদয় জয় মহাকবি 'কুমারসম্ভবে'র দুইটি সর্গে অতি নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যেন রূপের দ্বারা যাঁহাকে জয় করিতে পারা গেল না, কঠোর তপস্যার সাহায্যে তাঁহাকে জয় করা সম্ভব হইল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'কুমারসম্ভবে'র সমালোচনায় মহাকবি কালিদাসের এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি অতি সুন্দর তথ্যপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' হইতে তাঁহার কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলিতেছেন, "স্বর্গের দেবরাজের দ্বারা উৎসাহিত এবং বসন্তের মোহিনী শক্তিদ্বারা সহায়বান্ মদনকে কালিদাস কেবল পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই, তাহার স্থলে যাহাকে জয়ী করিয়াছেন, তাহার সজ্জা নাই, সহায় নাই, তাহা তপস্যায় কৃশ, দুঃখে মলিন, স্বর্গের দেবরাজ তাহার কথা চিন্তাও করেন নাই।" রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা ভালভাবে বুঝাইবার জন্য দুইটি চিত্র স্পষ্ট করিয়া দেখানো গেল:

প্রথম চিত্র—তপস্বী শিবের আশ্রম, দেবদারু বৃক্ষের তলায় বেদীর উপর সমাধিমগ্ন শিব। আশ্রমে আসিয়াছেন বসন্ত; তখন বসন্তকাল না হইলেও সহসা বসন্তের আগমনে চারিদিক পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছে, পশু-পক্ষী, নর-কিন্নর সকলের মধ্যে সজীব সচঞ্চল ভাব, এহেন সময় সেখানে রতিকে লইয়া আসিলেন স্বয়ং কামদেব মদন, হস্তে পুষ্পধনু ও 'সম্মোহন' নামক অব্যর্থ শর, তাঁহার আসিবার

সঙ্গে সঙ্গে সারা আশ্রম প্রেমের আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল যে পশু-পক্ষী, নর-কিন্নর তাহা নহে, এমনকি লতাবধূরা পর্য্যন্ত প্রেমের প্রভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল; অপ্সরাদের প্রেমের গীতিতে আশ্রম মুখরিত হইয়া পড়িল। এহেন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আসিয়াছেন শিবের সম্মুখে পার্ব্বতী—দেহে অসামান্য রূপ, উদ্ভিন্ন যৌবন, সর্ব্বাঙ্গে বিচিত্র পুষ্পের আভরণ—যেন শঙ্করের হৃদয় জয় করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, মদন তাহার সমস্তই পাইলেন, তাঁহার আয়োজন সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ বলিলে যেন কিছু কম বলা হয়, সম্পূর্ণের অপেক্ষাও বেশী বুঝাইবার মত ভাষা যদি থাকিত, লেখনী তাহা ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিত না। মদনের স্থির বিশ্বাস, তিনি তাঁহার 'সম্মোহন' শরে ও পার্ব্বতীর রূপের দ্বারা শিবের হৃদয় জয় করিবেন, পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিবেনই। পার্ব্বতী আসিলেন শিবের সম্মুখে, অতি নিকটে, কিন্তু পরিণামে কি হইল? মদনের সদম্ভ অভিযান, পার্ব্বতীর অসামান্য রূপ, ব্রহ্মার নির্দ্দেশ, দেবরাজের আগ্রহ, বসন্তের প্রাণপণ চেষ্টা সমস্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া 'ভবের নেত্রজাত বহ্নি মদনকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল।' কামদেবের দর্প, স্ত্রীলোকের অসামান্য রূপ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় চিত্র—তপস্বিনী পার্ব্বতীর আশ্রম, শিলার উপর বসিয়া পার্ব্বতী জপিতেছেন অক্ষমালা। ওষ্ঠে তাঁহার আলতা নাই, চক্ষুতে কাজল নাই, মুখে লোধ্রপুষ্পের রেণু মাখানো নাই, দেহে আভরণ নাই, মনোহর পুষ্পবেশ নাই, আছে কি? তৈলহীন রুক্ষ কেশ, উপবাসে পাণ্ডুর মলিন মুখ, তপস্যায় কৃশ দেহ, আশাভঙ্গ-জনিত দুঃখপূর্ণ মন। মাথার উপর আবরণ নাই, বর্ষার জল, গ্রীষ্মের রোদ, শীতের হিম সমানভাবে তাঁহার উপর পড়িতেছে, তবু তিনি অনাহারে, অনিদ্রায় কঠোর তপস্যায় রত রহিয়াছেন। তপস্বিনীর সম্মুখে তাঁহার কঠোর তপস্যায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিতে আসিলেন ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে শিব। পার্ব্বতীর তপস্যা, অকুণ্ঠ ভক্তি ও একাগ্র নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ" (কু—৫।৮৬) অর্থাৎ, 'আজ হইতে সুন্দরি, আমি তোমার তপস্যায় তোমার ক্রীতদাস হইয়া রহিলাম।'

স্ত্রীলোকের রূপের দ্বারা, মদনের সদর্প অভিযান ও প্রাণপণ চেষ্টার দ্বারা যাঁহাকে জয় করিতে পারা গেল না, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা, ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনের দ্বারা তাঁহাকে 'ক্রীতদাস' করিয়া ফেলা হইল। মহাকবি কালিদাস যেন নারীর মধ্যে তাঁহার সাবলীল মোহিনী রূপের অপেক্ষা তাঁহার সাধনাপূত কল্যাণী রূপকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া জগতের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব আদর্শ স্থাপনা করিয়াছেন।

মনে হয় যেন মহাকবি আরও একটি বিষয় এখানে দেখাইতে চাহিয়াছেন, তিনি যেন বলিতে চাহেন, তপস্যা সকলের পক্ষে সারাজীবন অনুষ্ঠানের জন্য নহে। যে উদ্দেশ্য সাধন করার নিমিত্ত পার্ব্বতী আপনাকে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা যখন সফল হইল, তখন তিনি তপস্যা ছাড়িয়া গৃহে গেলেন এবং তাহারই অল্পকাল মধ্যে শিবের বিবাহিতা পত্নী হইয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শিবের বেলাতেও মহাকবি এই ভাবটি দেখাইয়াছেন, কিছুকাল তপস্যা করার পর বিবাহ করিয়া তিনি বিশ্বসংসারের সকলকার হিতসাধনে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন, এমনকি একদিন যে মদনকে তপস্যার বিঘ্ন বলিয়া তৃতীয় নয়ন হইতে নির্গত বহ্নির তেজে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আবার বিবাহরাত্রিতে 'বাসরঘরে' দেবতাদের অনুরোধে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন। যেন সারা-জীবন তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাওয়ার অপেক্ষা প্রথম যৌবনে কঠোর সাধনার অনলে দেহমনের সকল আবিলতা, সকল উদ্দামতা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া পবিত্রচিত্ত হইয়া বিবাহ করিয়া, অনাসক্তচিত্তে ও নিঃস্বার্থভাবে সর্ব্বজীবের মঙ্গলাত্মক কর্ম্মে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়া ফেলাই মনুষ্যজীবনের আদর্শ হওয়া উচিত, ইহাই যেন মহাকবি তাঁহার 'কুমারসম্ভবে' শিক্ষা দিতে চাহিতেছেন।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'কালিদাস' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, কালিদাস যেন লোককে বলিতে চাহেন—কার্ত্তিকের মত সর্ব্ববিজয়ীপুত্র লাভ করিতে হইলে কিংবা সর্ব্বদমন (শকুন্তলার পুত্র), যাঁহার পরে নাম হইয়াছিল ভরত, এবং যাঁহার নামে আমাদের এই দেশ 'ভারত' নামে অভিহিত হইতেছে, তাঁহাদের মত পুত্রের জননী হইতে হইলে, জননীদের কিছুকাল যমনিয়মে এবং সাধনায় নিযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। শুদ্ধ ও সংযতভাবে জীবনযাপন করিতে না পারিলে যে অতুলনীয় গুণে গুণবান সন্তানলাভ হয় না, ইহাই মহাকবির অভিমত। এই মত ছিল বলিয়াই তিনি গুরুর নির্দ্দেশে, সূর্য্যবংশের রাজা দিলীপকে সস্ত্রীক রাজপ্রাসাদের ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটিরে ভূমির উপর শুইয়া, ফলমূল খাইয়া, সংযতচিত্তে কিছুকাল অতিবাহিত করাইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তিনি যেন দেখাইয়াছেন, রাজা-রাণী রঘুর মত দিগ্বিজয়ী বীরপুত্র লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ বর্ণনা 'কুমারসম্ভবে'র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকবি যাঁহাকে একাধিক বার 'একেশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, 'ঈশ্বর' শব্দে যাঁহাকে ছাড়া অপর আর কাহাকেও বুঝায় না বলিয়াছেন, নিষ্কাম কর্ম্মযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠের রূপ দিয়া যাঁহার চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, সমস্ত হৃদয় দিয়া যাঁহার সমাধিমগ্ন রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই আবার বর সাজাইয়া তাঁহার বরবেশী রূপ এমন নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, যিনিই তাহা পাঠ করুন না কেন কৌতূহলপূর্ণ আনন্দ তাঁহার মনে আসিবেই।

শঙ্করের বরবেশী রূপ বর্ণনার একটা উদাহরণ দিলাম। যে

সমস্ত পুরনারী 'বর আসিতেছে' শুনিয়া জানালার ধারে বা 'চিকফেলা' বারান্দায় বর দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন, বর দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একে অপরকে বলিতেছেন, "লোকে যে বলে ইনি নাকি ক্রোধবশত মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা সত্য নয়, এ দেবতাটির রূপ দেখিয়া কাম নিজেই লজ্জায় দেহত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ, স্বয়ং রতিপতি মদনের অতুলনীয় রূপও মহেশ্বরের রূপের কাছে কিছুই নহে।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মহাকবি তাঁহার 'রঘুবংশে' রাজকুমার অজের বরবেশী রূপের বর্ণনা নিরীক্ষমাণা নারীদের মুখ দিয়া যেভাবে দেখাইয়াছেন, 'কুমারসম্ভবে'ও মহেশ্বরের বরযাত্রা ও বরবেশী রূপের বর্ণনা অনেকটা সেই একই প্রকারে করিয়াছেন, এমনকি এক স্থানে শ্লোকের পর শ্লোকে দুইটি বর্ণনার হুবহু মিল দেখা যায়। অথচ অজ ছিলেন রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসে প্রতিপালিত, মহামূল্য পরিচ্ছদ ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত কান্তিমান তরুণ, আর শঙ্কর—তপোবনে বাসকারী কঠোর সংযমে অভ্যস্ত, সাধারণ বেশধারী বৃষারূঢ় পরমতপস্বী দেবাদিদেব।

'কুমারসম্ভব' ছাড়া মহাকবির অন্যান্য কাব্যনাটক হইতে শিব-পার্ব্বতীর সম্বন্ধে কি বিবরণ পাওয়া যায় দেখা যাউক। 'মেঘদূত' গীতিকাব্যে মহাকবি উজ্জয়িনীর অদূরে ত্রিভুবনের গুরু, 'চণ্ডীশ্বরে'র ধামের উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকবির টীকাকার মল্লিনাথ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'চণ্ডীশ্বরে'র ধামকে 'মহাকাল' নামে অভিহিত করিয়াছেন ('মহাকালাখ্যং স্থানং'—পূ-মে ৩৪), তাহার কারণ মহাকবি নিজেই পরবর্ত্তী শ্লোকে 'চণ্ডীশ্বর' শিবমন্দিরের অবস্থিতির স্থানকে 'মহাকাল' বলিয়াছেন। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যেও মহাকালের শিবমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'রঘুবংশের' ষষ্ঠ সর্গের ৩৪তম শ্লোকে কালিদাস বলিতেছেন যে, 'উজ্জয়িনীর অনতিদূরে মহাকাল নামক স্থানে চন্দ্রশেখর বাস করেন, সুতরাং তাঁহার শিরস্থিত চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতেও অবন্তীনাথ জ্যোৎস্নার আলোক উপভোগ করিতে পান।' 'মেঘদূতে' মহাকালের এই চণ্ডীশ্বর শিবমন্দির সম্বন্ধে মহাকবি যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সেখানকার মন্দিরটি ছিল বিখ্যাত এবং মন্দিরে শিবপূজার ব্যবস্থাও ছিল অনুপম। শিবের যে বিগ্রহ ছিল, তাহার কণ্ঠ নীল আভায় রঞ্জিত ছিল এবং প্রতি সন্ধ্যায় যখন শূলধারী শঙ্করের পূজা হইত, সে সময় পটহ বাজানো হইত এবং নর্ত্তকীরা সাবলীল ভঙ্গীতে চামর দোলাইতে থাকিত, এমনকি 'সন্ধ্যারতির পর' মহাকবি বলেন, 'স্বয়ং পশুপতি মা-ভবানীর সম্মুখে হাত দোলাইয়া নৃত্য করিতেন' এবং গজাসুরকে বধ করিয়া তাহার যে রক্ত মাখানো চর্ম্মখানি তিনি আনিয়াছিলেন, তাণ্ডব নৃত্য করার সময় সেখানি হাতে ধরিয়া থাকিতেন। 'শশিভৃৎ' অর্থাৎ মহেশ্বর যে স্বর্গ উদ্ধার করার জন্য দেবসেনা পরিচালনার উপযুক্ত সেনাপতি স্বীয় ইচ্ছায় স্কন্দের (কার্ত্তিকের) জন্ম দিয়াছিলেন, মহাকবি 'পূর্ব্বমেঘের' [illegible] তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। 'পূর্ব্বমেঘে'তেই মহাকবি বিরহী যক্ষের মুখ দিয়া মেঘকে অলকায় যাওয়ার পথ নির্দ্দেশ করার প্রসঙ্গে হিমালয়ের এক স্থানের শিবমন্দিরের বিবরণ দিয়াছেন, সে শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, 'তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ 'সেখানে যে শিলাটিতে মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রধারীর (শিবের) চরণচিহ্ন রহিয়াছে।' মহাকবি এই চরণচিহ্নের কথায় উক্ত শ্লোকেই বলিতেছেন যে, সিদ্ধগণ প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সেই চরণচিহ্নের পূজা করিয়া থাকেন যাহাকে দর্শন করিলে ও ভক্তি সহকারে প্রদক্ষিণ করিলে নিষ্পাপ হইতে পারা যায়, এবং দেহত্যাগের পর তাঁহার নিকট তাঁহার প্রমথ হইয়া বাস করিতে পারা যায়। মহাকবি আরও বলেন যে, হিমালয়ের এই শিবমন্দিরে কিন্নরীরা মধুর কণ্ঠে শঙ্করের ত্রিপুর বিজয়ের সুললিত গীত গাহিয়া থাকেন। শঙ্করের বাসস্থান কৈলাসের বিবরণ দিতে গিয়া যক্ষ গুহ্যক মেঘকে বলিতেছেন, সে যখন উত্তর দিকে যাইতে যাইতে কৈলাসে গিয়া পৌঁছিবে, "সে সময় যদি দেখ যে শম্ভু সেই 'ক্রীড়া-শৈলে' আপনার হাত হইতে সর্প বলয়গুলি খুলিয়া রাখিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া দুই জনে বেড়াইতেছেন তাহা হইলে তুমি সে সময় তোমার ভিতরকার জল ঘনীভূত করিয়া নিজেকে সোপানের মত করিয়া লইয়া তাঁহাদের পায়ের নিকট থাকিয়া তাঁহাদের (পর্ব্বতের) মণিময় তটে আরোহণ করার সুবিধা করিয়া দিও।" (পূ-মে ৬১)

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে পাওয়া যায় যে, যে 'সঙ্গমনীয় মণি'র স্পর্শের প্রভাবে লতায় পরিণতা উর্ব্বশী তাঁহার অপ্সরা-রূপ আবার ফিরিয়া পাইলেন, সেই রক্তবর্ণ মণির সৃষ্টি হইয়াছিল গৌরীর চরণকমলের অলক্তক হইতে।

শঙ্করের শিরস্থ জটার মধ্যে যে গঙ্গার পুণ্যসলিল প্রবাহিত থাকে, তাহার বর্ণনা যেমন কয়েকটি পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, মহাকবির 'রঘুবংশে'র ত্রয়োদশ সর্গেও তেমনি পাওয়া যায়। সেখানে মহাকবি বলিতেছেন, 'ত্রিস্রোতসং ত্র্যম্বকমৌলিমালাম্' অর্থাৎ, 'ত্র্যম্বকের মস্তকের মালার মত'। শঙ্করের মস্তকে যেরূপ থাকে, তাহা মহাকবির অন্যান্য কাব্য নাটকের ন্যায় 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকেও পাওয়া যায়। চতুর্থ অঙ্কে বিকৃতমস্তিষ্ক রাজা পুরূরবা বলিতেছেন, 'শিখামণিং বালমিবেন্দুমীশ্বরঃ' অর্থাৎ, 'ঈশ্বর (শিব) যেমন চন্দ্রকে তাঁহার শিরোভূষণ করিয়াছেন, আমিও এই মণিটিকে সেইরূপ আমার শিরোভূষণ করিব।'

'বিক্রমার্কচরিতে'র পঞ্চদশ উপাখ্যানে মহাকবি বারাণসী তীর্থস্থানে বিশ্বেশ্বর শিবের উল্লেখ করিয়াছেন। 'রঘুবংশে'র অষ্টম সর্গে দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতটে 'গোকর্ণতীর্থে'র শিবমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোকটির অর্দ্ধাংশ দিলাম—'অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ শ্রিত গোকর্ণ নিকেতমীশ্বরম্।' অর্থাৎ, সেই সময় দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত 'গোকর্ণ' নামক স্থানের 'ঈশ্বর'কে (শিবকে) বীণা বাজাইয়া গান শুনাইবার জন্য নারদ আকাশপথ দিয়া যাইতেছিলেন।

অতীত

শ্রীসুবোধ বসু

পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে পুরাতনকে নূতনের মত আকর্ষণীয় মনে হওয়াই তো উচিত। অসীমের আশা ছিল, দার্জ্জিলিং এবারও মধুর মনে হবে। বেশ খানিকটা হতাশ হতে হ'ল। শহরের ঘরবাড়ী বেড়েছে, দোকানপসার, লোকজনও বৃদ্ধি পেয়েছে; তবে মোট চেহারার দিক থেকে হিমালয়ের এই নীড়টির বড় বেশী পরিবর্ত্তন হয় নি। নিজের বাড়ীর দোতলার প্রকাণ্ড কাচের জানালা দিয়ে পার্ব্বত্য বসতির পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশের অধিকাংশই অসীমের নজরে পড়ে। লাল টিনের ছাদবিশিষ্ট বিলিতী স্থাপত্য-রীতির বাংলোগুলি পাহাড়ের বিভিন্ন স্তর মৌচাকের মৌমাছির মত ছেয়ে রয়েছে। কাছে ও দূরে পাইনগাছের সারি আর পাহাড়ের তরঙ্গরেখা, চা-বাগানের বসতির অস্পষ্ট আভাস, বিচিত্রবেশ পাহাড়ী নর-নারীর কলগুঞ্জনমিশ্রিত ব্যস্ততা। কাঞ্চনজঙ্ঘা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেও লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে; শীতের ভয়ে বড় একটা মুখের ঢাক্‌না খুলছে না। তবে সময় সময় দু'একবার ঝিলিক দিয়ে না যায়, এমন নয়।

নির্জ্জনে বসে কিছু ছবি আঁকবে স্থির করেই অসীম এসেছে। বেছে নিয়েছে সাত হাজার ফুট উঁচুতে এই বাড়ী। মেহনতের ভয়ে পরিচিতেরা যথাসাধ্য কম আনাগোনা করবে। তা ছাড়া ওপর থেকে শহর এবং সুদূর পর্ব্বতরেখার দৃশ্য যতটা সমগ্রভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, নীচ থেকে তা সম্ভব হ'ত না।

বাইরে বড় একটা বের হচ্ছে না। গত সাত দিনে মাত্র এক বার শহরের সরকারী স্থানগুলিতে অসীম আত্মপ্রকাশ করে এসেছে—তাও সন্ধ্যার অস্পষ্ট দীপালোকিত আবছায়ায়। সৌভাগ্যক্রমে পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হয় নি। তার নির্জ্জনতা কত দিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, তা জোর করে বলা যায় না। এখন মাত্র এপ্রিলের সুরু; এইবার ক্রমে সীজনের লোক আসা আরম্ভ হবে।

চুপচাপ ভালোই আছে। কিছু ছবি আঁকাও চলছে। তবে শহরটা কিন্তু আগের মত আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না। ঠিক কোথায় যে এর শ্রীর হানি ঘটেছে, ধরতে পারছে না, তবে দার্জ্জিলিং আর সে দার্জ্জিলিং নেই, এটা নিশ্চিত!

কারণ অচিরেই এক দিন উপলব্ধি হ'ল। সেদিন প্রচুর জ্যোৎস্নায় পাহাড়ের বিভিন্ন পথরেখা ও পাইনগাছের সারি ছবির রেখার মত সুন্দর হয়ে উঠেছে। পর্ব্বতের এই সুন্দর প্রকাশ নজরে পড়ায় অসীম হাতের বই রেখে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারি চেনা চেনা মনে হচ্ছে রাতটাকে। হ্যাঁ, তাই তো! পঁচিশ বছর আগে ঠিক এই রাতটিকেই তো সে বহু বার দেখে গেছে! পাহাড়ের গায়ে নিঃশব্দ প্রহরীর মত উষ্ণীষধারী পাইনের সারি, তার উপরে বাঁকা চাঁদ, সর্পিল পাহাড়ী রাস্তা চকচক করে উঠেছে, আর পাহাড়ী সুরে বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে দুই ভুটিয়া বন্ধু—অবিকল সেই পাহাড়ী জ্যোৎস্না রাত! অসীম বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে, তার জানালার তলার রাস্তার ঠিক নীচের রাস্তায় একটি মেয়ে আর তার যুবক সঙ্গী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নিরুদ্দেশে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের আলাপ কারুরই কর্ণগোচর হওয়ার কথা নয়, অসীমের জানালার উচ্চতা থেকে তো নয়ই; কিন্তু সে ভাষা যে মদিরতায় পূর্ণ, এই হেঁটে যাওয়া যে কবিতার মত সরস, তা স্বতঃপ্রকাশ। চমকে উঠল অসীম। স্পষ্ট বুঝতে পারলে, পঁচিশ বছর আগে কেন এমন মদির মনে হয়েছিল দার্জ্জিলিং; কেন এই পার্ব্বত্য উপনিবেশ তার অপূর্ব্ব নিসর্গ-শোভা সত্ত্বেও আজ আর আগের মত আকর্ষণ করে না।

অসীম বুড়ো হয়ে গেছে। পঁচিশ বছরের যুবক আজ পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়।

সত্যই, যৌবনটা কি আশ্চর্য্য সময়! যা-ই সে স্পর্শ করে, তাই সোনা হয়ে ওঠে! নইলে আর কি সম্বল ছিল অসীমের? নূতন আর্টিষ্ট। কেউ পোঁছে না, কেউ ছবি কেনে না। প্রাইভেট ট্যুইশনিই ভরসা। তাও ধনী ছাড়া কে আর বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখাবে। প্রাইভেট ট্যুইশনিও কখনও জোটে, কখনও জোটে না। সেবার এক এগজিবিশনে তার একটা অয়েল পেন্টিং গবর্নরের পদক পেল। তারই কৃপায় সার্ হরিশ ব্যানার্জির বাড়ীতে ছবি-আঁকা শেখাবার কাজ জুটে গেল রীতিমত বেশী পারিশ্রমিকের—অর্থাৎ, মাসিক চল্লিশ টাকা! এর আগে এটা সে ভাবতেও পারে নি।

এদের দৌলতেই অসীম প্রথম দার্জ্জিলিং এসেছিল। না, এদের বাড়ীতে বা এদের পয়সায় নয়; তবে তার ছাত্র ও ছাত্রী দার্জ্জিলিঙে ছুটিতে বসে ছবি আঁকা শিখতে ইচ্ছুক, এই সুমতিই তার মাসিক চল্লিশ টাকা আয় অব্যাহত রাখে। এই টাকাটা লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়মের তৃতীয় শ্রেণীতে থাকার আংশিক খরচ মেটাতে সমর্থ হবে ভেবেই অসীম দার্জ্জিলিং চলে আসে। হিমালয়ের প্রতি তার আশৈশব আসক্তি। ব্যয় সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়েই সে চলে এসেছিল প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যনিকেতনে। তার ক্ষমতা প্রস্ফুরণের দিক থেকে এই দুঃসাহস যে বিশেষ ফলবান হয়েছিল, অসীমের বর্ত্তমান খ্যাতি তার অভ্রান্ত প্রমাণ। হিমালয় অঞ্চলের কত সৌন্দর্য্য যে তার ছবিতে বিকশিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু হিমালয় যতই বিরাট ও বিচিত্র হোক, যত সৌন্দর্য্যই তার রেখায় রেখায়, তার সানুদেশে ছড়ানো থাক, এমন বিশেষভাবে তা অসীমের আনন্দলোকে ঘা দিতে পারত না, যদি এর মধ্যে

একটি মেয়ে তার মায়া বুলিয়ে না দিত। সে মেয়ে অনীতা—সার্ হরিশেরই ছোট মেয়ে। অসীমের ছাত্রী সে নয় ; তার ছাত্র-ছাত্রীর ছোট পিসীমা অনীতা। কলকাতার বাড়ীতে তার সঙ্গে দু'একবারের বেশী অসীমের দেখা হয় নি। দার্জ্জিলিং ছোট জায়গা ; এখানে সার্ হরিশের বাড়ীও কলকাতার বাড়ীর চার ভাগের এক ভাগের চেয়ে বড় নয়। বাড়ীর ও বাইরের ভিড় কম। বাধ্য হয়ে অনীতাকে এখানে অনেক বেশী প্রকাশ হতে হয়। কলকাতার মত দূরত্ব রক্ষা করা চলে না।

তবু অনীতা প্রভু-কন্যা। অসীম সামান্য মাষ্টার। অসীম অনীতাকে সমীহ করে ; অনীতা অসীমকে অবজ্ঞা করে। এই অবজ্ঞা লাঘব করল অসীমের ক্ষমতার প্রতি অন্যদের সম্মান প্রদর্শন। এক দিন অনীতা তার বেঁটে ছাতা হাতে নিয়ে, ভ্যানিটি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে একাই বেড়াতে বের হয়েছে। বন্ধু সুনীলার সঙ্গে চৌরাস্তায় মিলবার কথা ছিল। সুনীলার দেখা পাওয়া গেল না, কিন্তু দেখা গেল তার ছোট ছোট ভাইবোনেরা চৌরাস্তায় দস্যিপনা করে বেড়াচ্ছে। তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল, দিদিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কলকাতার প্রতিবেশিনী মিসেস গডক্রে অবজার-ভেটরি পাহাড়ে উঠেছেন। অবজারভেটরি পাহাড় এমন কোনও দুরধিগম্য জায়গা নয় ; চৌরাস্তা থেকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে অনীতা অবজারভেটরি পর্ব্বত-আরোহণ সুরু করলে।

দুর্জ্জয়লিঙ্গের বিগ্রহ ডান পাশে রেখে, হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির নক্সা-ঘরটির কাছাকাছি ভিজিটরদের একটা ছোটখাটো ভিড় আবি-ষ্কার করে অনীতা কাছে উপস্থিত হ'ল। সবিস্ময়ে দেখলে, এক ডজন ইউরোপীয় ও ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষের আবেষ্টনীর মাঝখানে তাদের বাড়ীর আকার মাষ্টার বসে আছে, আর একটা ছোট ইজেলে রাখা ছবির গায়ে রং বুলোতে বুলোতে সহাস্যে তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। এমন সময় এই ভিড়ের মধ্য থেকে সুনীলা বেরিয়ে এসে অনীতার কাঁধে হাত রাখলে। বললে, 'দেখেছিস, কি সুন্দর ছবি আঁকেন ভদ্রলোক! ক'দিন ধরেই দেখছি, সাহেব-মেমগুলো এঁকে পেয়ে বসেছে। আমাদের মিসেস গডক্রে তো এঁকে দিয়ে নিজের বাচ্চাদের ছবি আঁকাবেন বলছেন। আরও নাকি অনেকে এঁর আঁকা ছবি কিনতে চাইছেন…'

এই কৌতূহলীদের কাছ থেকে অসীম বিশেষ কিছু লাভ করে নি। যেটা লাভ করেছিল, সেটা অনীতার সম্ভ্রমবোধ। এর থেকেই তাদের বন্ধুত্বের সৃষ্টি। এর পর অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছিল দার্জ্জিলিং শহর। তার বর্ণ এবং বিভঙ্গ আরও বিচিত্র ও সুষমান্বিত হয়ে উঠেছিল। যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, সেটা এখানেই। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া যেমন কখনও রূপালী, কখনও সোনালী, কখনও সোনায়-রূপোয়, আলোয় ও আঁধারে অপরূপ হয়ে ওঠে, দার্জ্জিলিং শহরও তেমনি এই বিচিত্র বর্ণে ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমন জাদু দার্জ্জিলিঙের পক্ষেও আশ্চর্য্য ব্যাপার।

ঠিক আজকের মত রূপালি জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে এক সন্ধ্যায় অনীতা ও অসীম হেঁটে চলেছে। পথ নির্জ্জন ; রাস্তার রেলিঙের ওধারে নিস্তব্ধতা রক্ষাকারী সান্ত্রীর মত দীর্ঘাকার পাইন গাছগুলি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জলপ্রপাতের আওয়াজ আসছে পথের বাঁকের অরণ্যাস্তৃত গহ্বর থেকে। উপরকার পাহাড়ের চূড়ায় পাইন ও রডোডেণ্ড্রনের জঙ্গলের ওপর দিয়ে বড় একটা চাঁদ উঁকি দিয়েছে। এই স্বপ্নলোকের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে তারা।

'তা হলে বিচার করে কি ঠিক করা হ'ল ?' অনীতার কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং ঈষৎ ব্যঙ্গময়।

'তা ত তুমি জানই, অনীতা।' অসীম কুণ্ঠিত ক্লিষ্টস্বরে জবাব দিলে। 'তুমি রাগ করো না। তোমার পক্ষে শুভ হবে বলেই আমার এ সিদ্ধান্ত…'

'থাক, আমার শুভ কাউকে ভাবতে হবে না। আমি হালকা মেয়ে নই। না ভেবে আমিও ছেলেমানুষি করি নে…'

'তা আমি জানি।' অসীম সসম্ভ্রমে বললে।

'তবে তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ কেন ? আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে ; নিজের ভালমন্দ স্থির করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি। এতে যদি বাড়ীর লোকের অমত হয়, আমার পথ আমি নিজেই বেছে নিতে পারব…'

'সে শক্তি তোমার আছে, অনীতা। কিন্তু আমার নেই। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং নিশ্চিত দারিদ্র্যের মধ্যে কখনই তোমাকে আমি টেনে নিতে পারব না।…আমি অখ্যাত আর্টিষ্ট। কোনও দিন প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারব কিনা, তা একেবারেই অনিশ্চিত। নিশ্চিত আমার দারিদ্র্য। একটা ন্যূনতম নির্দ্দিষ্ট আয় পর্য্যন্ত আমার নেই। দারিদ্র্যের অপমান অসহনীয়। তোমাকে আমি ঐশ্বর্য্যময়ী সৌন্দর্য্যময়ী রূপেই ভাবতে শিখেছি, দৈন্যের অসৌন্দর্য্যের মধ্যে কি করে তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারি ? আর সব আমার সহ্য হবে, শুধু তোমার দীপ্তি ম্লান হলে আমার চলবে না।…তোমার সমাজে তোমার বিয়ে হোক, ঐশ্বর্য্যে আভিজাত্যে তুমি দীপ্ত হয়ে ওঠ, সুন্দর হয়ে ওঠ, এই আমি প্রার্থনা করি…'

'অনেক ধন্যবাদ!' সব্যঙ্গে মন্তব্য করলে অনীতা। 'আমি জানতাম, তোমরা—কবি-সাহিত্যিক-আর্টিষ্টেরা—মিনমিনে মানুষ। জোর করে কেড়ে নিতে ত ভয় পাওই। কেউ দিতে চাইলে ও, গ্রহণ করার মত সাহস পর্য্যন্ত তোমাদের নেই। কল্পনাবিলাস নিয়ে কাটাতেই তোমরা ভালবাস। কিন্তু সবাই ত কবি নয়। যারা পৃথিবীর মানুষ, তাদের চাওয়া-পাওয়ার মূল্য আছে। তারা ভালবাসে, তারা ঘৃণা করে। যা চায়, তা সত্যই চায়। না পাওয়ার দুঃখ তাদের—কিন্তু থাক্ এসব কথা।…দার্জ্জিলিং থেকে চলে যাবার আমার কোনও সঙ্গত অজুহাত নেই যে, বাড়ীতে বলি। তুমি চলে যাবে কি ? পথে বের হলেই যেন দেখাদেখি না হয়, অন্তত এটুকু কি আশা করতে পারি না ?…'

দার্জ্জিলিং থেকে অসীমের প্রস্থানের সময় ঘনিয়ে এল।

প্রকৃতই স্বর্গ হতে বিদায়। প্রায় দু'মাসের অবর্ণনীয় উন্মাদনার পর সহসা পুণ্যবল ক্ষীণ হ'ল। অর্দ্ধেকটা হৃদয় ফেলে রেখে ফিরে গেল সে কলকাতায়।

তার পর গত পঁচিশ বছরের মধ্যে অনীতার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। অসীম চিত্রকর হিসাবে আশাতীত প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। অর্থের আর অভাব নেই। ঘুরে এসেছে ইউরোপ, ঘুরে এসেছে চীন-জাপান-ইন্দোনেশিয়া। তার ছবি ঘরে রাখা আভিজাত্যের লক্ষণ। যে ভয়ে অনীতাকে এক দিন সে গ্রহণ করে নি, তাকে প্রত্যাখ্যান করে তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেছিল, সে ভয় অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ সাফল্যের ওপর কোনও দাবি ছিল না। হয় ত নাও আসতে পারত। এই অনিশ্চিতের ভরসায় মানসীকে জীবনে টেনে আনার দুঃসাহস অসীম করে নি, এ জন্য সে লজ্জিত নয়। আত্মত্যাগে বরঞ্চ সে গর্ব্বই বোধ করে এসেছে।

আজ দার্জ্জিলিঙের চন্দ্রালোকিত পথে নবীন প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখে নিজের বিগত দিনের স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ে গেল। পাহাড়ী শহরটার পুরাতন মোহের ছোঁয়া পলকে গায়ে লেগে পলকে গেল মিলিয়ে। দোষটা তা হলে দার্জ্জিলিঙের নয়, দোষ অসীমের নিজের!

এর কিছু দিন পরে এক সন্ধ্যাবেলা অসীম পুস্তক সংগ্রহের জন্য চৌরাস্তার এক বইয়ের দোকানে এসেছে। শেলফের বই নেড়ে চেড়ে সময় কাটাবার উপযুক্ত বইয়ের সন্ধান করছে, এমন সময় পেছন থেকে ডাক শুনলে, 'মাষ্টার মশায়?'

চমকে পাশে তাকালে। দেখলে, বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তার চোখে পরিচিতের দৃষ্টি। চিনতে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হ'ল। সেই অবকাশে যুবকটি নিজের কেতাদুরস্ত সাহেবী-পোশাক সত্ত্বেও অসীমের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আমি বিনয়, ছোটবেলা আপনার কাছে ছবি আঁকা শিখেছি। সার হরিশ ব্যানার্জ্জি আমার···'

'আর বলতে হবে না, চিনতে পেরেছি।'—বলে অসীম তাকে জড়িয়ে ধরলে। 'কি করছ এখন?'

'ব্যারিষ্টার। আপনি কোথায় উঠেছেন?'

'জলা পাহাড়ে একটা বাড়ী নিয়েছি। দি পীক্। কত বড় হয়ে গেছ, ব্যারিষ্টার সাহেব! আমাকে মনে রেখেছ দেখছি···'

'আপনার কথা আমরা সর্ব্বদাই বলি। আপনি এক একটা সম্মান লাভ করেন, আর আমাদের মনে হয় যেন এ আমাদেরই গৌরব! আজও সকালে ছোট পিসীমার সঙ্গে আপনার কথা হচ্ছিল —প্যারিসের এগজিবিশনে আপনার যে ছবিটা নিয়ে এত হৈ-চৈ হ'ল সেটা সম্বন্ধে।···ছোট পিসেমশায় তো রগড় করে পিসীমাকে বললেন, "অসীম রায়ের ছবির হিরোয়িনদের মুখের আদল তোমার মুখের ধাঁচের হয় বলেই তার এত সুখ্যাতি নয় তো!" পিসেমশায়কে নিয়েই আমি দার্জ্জিলিং এসেছি। প্লুরিসিতে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। ডাক্তার এখানে পাঠিয়ে দিলেন।···আসছে মাসে বাড়ীর অন্যান্যেরাও আসতে পারে। এলে আপনার ছাত্রীটি কত বড় হয়েছে, তাও দেখতে পাবেন। ওর স্বামী এফ-আর-সি-এস ডাক্তার; মেডিক্যাল কলেজে আছে।···একদিন আমাদের বাড়ীতে আসুন না, মাষ্টার মশায়? ছোট পিসেমশায় আর একটু সেরে না উঠলে ছোট পিসীমার ত বের হবার উপায় নেই···'

'আচ্ছা, দেখি যদি পারি।' অসীম অন্যমনস্ক ভাবে বললে।

অনীতাও তা হলে দার্জ্জিলিং এসেছে। আশ্চর্য্য যোগাযোগ! যেন পুরানো দিনের সঙ্গে তফাৎটা সুস্পষ্ট করে তোলবার জন্যই এই ঘটনাচক্র। সবই আছে, সেই পাহাড়ের তরঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র চূড়া, পাইনের উদ্ধত সমারোহ, আলো ও কুয়াশার অনন্ত আলিঙ্গন, ঘোড়ার খুরের শব্দ, ঝর্ণাকলধ্বনিমুখর সর্পিল পথ এবং সবার চেয়ে যা অপরূপ—অসীমের মানসী অনীতা, যার আকৃতি আঁকতে গিয়েও সে সম্পূর্ণ সফল হয় নি, বার বার যে মূর্ত্তি তার ছবিতে ফুটে উঠেছে, সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। অসীমের আজ বিত্তের অভাব নেই, খ্যাতির অভাব নেই, সে নিজেই স্বয়ংসিদ্ধ অভিজাত। কিন্তু যে সুযোগ সে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছে, তা ফিরে পাবার আর উপায় নেই। যৌবনকে অবিশ্বাস করে সে কি ভাল কাজ করেছিল?

একবার দেখতে কৌতূহল হয় বৈকি। কিন্তু এ কৌতূহলের কোনও মানে হয় না। আদর্শের মর্য্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করা চাই। বিনয়ের ছোট পিসেমশায়ের মন্তব্যটা অসীম ভুলতে পারছে না। যেন লজ্জিত বোধ করছে। অন্যায়টা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাড়ীতে যাবার জন্য বিনয়ের আমন্ত্রণটা রক্ষা করা হবে না, তা সে তখনই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল।

এর পর দিন সাতেক কেটেছে। আজ সকাল থেকেই চমৎকার রৌদ্রে সারা শহর এবং অধিত্যকা উদ্ভাসিত। সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই নগাধিরাজ হিমালয়ের শুভ্রোজ্জ্বল মহিমান্বিত প্রকাশ সারাটা উত্তর আকাশে আঁকা দেখে অসীমের মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্য্য রূপসৃষ্টি! দিনটাই যেন পবিত্র হয়ে উঠেছে হিমালয়ের স্নিগ্ধ নেত্রপাতে!

বসবার কামরায় বসেই অসীম প্রাতরাশ সারলে। যত দেখ তবু আশা মেটে না, এমনই বিস্ময় এই হিমালয়। ঘরের প্রকাণ্ড কাচের জানালা দিয়ে এই মহিমমণ্ডিত দেবতাত্মা যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। অসীম ভাবতে লাগল, একটা ছবি আঁকবে কিনা—ভারতবর্ষের উপর কল্যাণময় পর্ব্বতের আশীর্ব্বাদপূত সস্নেহ নেত্রপাত।—এমন সময় বাড়ীর নেপালী চৌকিদার এসে খবর দিলে, এক মেমসাহেব দেখা করতে এসেছেন।

কলকাতার বাড়ীতে নানা দেশের বহুলোক এসে সারাক্ষণ হানা দেয়। পাশ্চাত্ত্যে তার প্রসিদ্ধিই এর কারণ। তার দার্জ্জিলিঙের

ঠিকানাও যে এরা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন, এতটা সে মনে করে নি। আসতে বলতেই হ'ল। অনতিবিলম্বেই মধ্যবয়স্কা এক বাঙালী মহিলা কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

'চিনতে পারছ?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। পারছি বৈ কি। অনীতা!' ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে থাকবার পর তবেই অসীম জবাব দিলে। 'বসো।'

'বিনু বললে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একদিন আসবে বলেছ। অপেক্ষায় ছিলাম। আজ এদিকে একবার উঠতে হয়েছিল। ভাবলাম, দেখা করে যাই। মস্ত লোক হয়েছ, তুমি নিজে যাবে, এমন আশা করলে ঠকতে হবে···অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন? চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?···'

'হবারই কথা। পঁচিশ বছরের ব্যবধানে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়।···তোমার স্বামী কেমন আছেন? তিনি অসুস্থ শুনেছিলাম···'

'ক্রমে ভালো হচ্ছেন।···ক'দিন থাকবে এখানে? ছবি আঁকছ কিছু?'

'কিছুদিন থাকব। কিছু আঁকবার ইচ্ছে আছে।'

'প্যারিসের এগজিবিশনের তোমার সেই বিখ্যাত ছবি "অনুপমা"র প্রতিকৃতি একটা বিখ্যাত কাগজে দেখেছিলাম। মুখটা খুব চেনা চেনা মনে হয়েছে। মূলটা দেখতে পেলে আরও ভালো বোঝা যেত। কোন্ আমেরিকান ক্রোড়পতি কিনেছেন কাগজে দেখেছিলাম—পনেরো হাজার না কত ডলার দিয়ে···'

'আমি বেচি নি।' অসীম সংক্ষেপে বললে। 'ওটা এখানেই আছে।'

'বেচ নি!' সবিস্ময়ে বললে অনীতা। 'আরও বেশী দাম চাও?···এক বার দেখতে পারি কি সেটা। আমার মত আনাড়িকে দেখাতে যদি আপত্তি না থাকে···'

'বসো। নিয়ে আসছি।' বলে অসীম ধীরে উঠে দাঁড়াল।

দুটো ঘর পার হয়ে নিজের শোবার ঘরে উপস্থিত হয়ে "অনুপমা"র সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অসীম। যেন সদ্য শোক পেয়েছে। ভগবান। কেন অনীতা হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল! এ যে আলাদা মানুষ! কপালে বলিরেখা, গালের মাংস ঝুলে পড়েছে, চুলে সাদার ছোঁয়াচ, স্থূলদেহে প্রৌঢ়ত্বের জড়তা! কোথায় অনুপমার কুরঙ্গিনীর বিভঙ্গ, কোথায় মদির চোখের সেই ভাবগর্ভ দৃষ্টিপাত, কোথায় মুখরেখার সেই অনির্ব্বচনীয় ইঙ্গিত? কেন তার মনোলোকের অনুপমা আসন্ন জরার সাজে অনর্থক কাছে এসে উপস্থিত হ'ল? তার ধ্যান মূর্ত্তিকে বিচূর্ণ করবার একি অসুন্দর প্রয়াস! অনীতার কৌতূহল অমার্জ্জনীয়। এত বড় দুর্ঘটনার জন্ম অসীম প্রস্তুত ছিল না।

'কতক্ষণ আমাকে একা বসিয়ে রেখেছ, একবার ভেবে দেখ।' অসীমকে প্রবেশ করতে দেখে অনীতা ঈষৎ অভিমানের কণ্ঠে মন্তব্য করলে। 'বাঃ, কি সুন্দর ছবি! যেন প্রাণ আছে! যেন ঠোঁট দুটো কাঁপছে!···'

'এই ছবিটা তোমাকে আমি দিলাম, অনীতা।' অসীম গলা সাফ করে বললে। 'কিন্তু দয়া করে তুমি এখানে আর এসো না···'

'তার মানে!' স্তম্ভিত হয়ে অনীতা বললে। 'তোমার স্ত্রী আপত্তি করবেন?···শুনলাম, তিনি এখানে আসেন নি···'

'তিনি আমাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস কিছুই জানেন না।'

'তোমার উচিত-অনুচিতের বাতিক আমাদের এ বয়সে অনাবশ্যক নয় কি? আমি জানি, তুমি খুব "অনারেবল"। কিন্তু ভয় নেই, আমার স্বামী জানেন আমি এখানে আসব। তিনি আমাদের সব কথাই জানেন। তাঁর দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার···'

কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল অসীম। বেচারী অনীতা! সে শুধু সাংসারিক দিকটার কথাই ভাবতে পারে। আর্টিষ্টের বিচার যে নির্ম্মম, তার মাপকাঠি যে আলাদা রকমের এ কথা একবারও তার মনে উদয় হয় নি!

'সরাসরি বাড়ী ফিরবে তো?' অসীম খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করলে।

'হাঁ। কেন?' সবিস্ময়ে তাকালে অনীতা।

'চলো, তোমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

অনীতাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে জামা বদলাবার অজুহাতে অসীম তাড়াতাড়ি পাশের কামরায় চলে এলো।···



শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, বিষ্ণুকর্ণ-মলোদ্ভূত মধুকৈটভ নামক মহাসুরদ্বয়ের দৌরাত্ম্যে ভয়ার্ত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখে মহামায়ার উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে স্তুতি আরম্ভ করেছেন। উদ্দেশ্য হ'ল এই দুর্দ্ধর্ষ অসুরদ্বয়ের সংহার সাধিত না হলে তাঁর অমূল্য সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং এদের নিপাতের জন্যে নারায়ণের জাগরণ আশু প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে দেবীর স্তবে ব্রহ্মা বলেছেন :

"প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ হ'ল—'তুমিই সমস্ত জগতের মূলরূপা প্রকৃতি, গুণত্রয় তোমা হতেই সমুদ্ভূত, এবং কালরাত্রি, মহারাত্রি, আর ভয়ঙ্কর যে মোহরাত্রি তৎস্বরূপাও তুমিই।' বহুবিধ স্তুতিবাদের ভিতর উক্ত শ্লোকটির মর্ম্মার্থই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্লোকটির শব্দার্থসমন্বয়ে এরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ পেলেও প্রকৃত বিশ্লেষণের নিরীক্ষণে তাতে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, কারণ শ্লোকে প্রকৃতি শব্দের প্রয়োগে মূল কারণরূপে এখানে সাংখ্যের 'প্রকৃতি' অভিমত হয়ে থাকলে তাকে 'সর্ব্বস্য প্রকৃতিঃ' বলে স্তুতি করা সঙ্গত হয় না, কারণ সর্ব্ব বলতে তদন্তর্গত পুরুষতত্ত্বও অভিহিত হতে পারে। কিন্তু পুরুষতত্ত্ব তদপেক্ষা স্বতন্ত্র। অথচ দেখা যায়, 'গুণত্রয়বিভাবিনী' শব্দ সান্নিধ্যে সাংখ্যের প্রকৃতিই এখানে উদ্দিষ্ট হয়েছে। আর প্রকৃতি শব্দটি এখানে মূল কারণমাত্র ; এ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়ে থাকলে অবশ্য সাংখ্যের প্রকৃতিই কেবল লক্ষ্য হতে পারেন না। ব্রহ্মতত্ত্বই হবে তার প্রতিপাদ্য। কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ বা সর্ব্বদানন্দস্বভাব ব্রহ্ম আবার তদ্বিরুদ্ধ আবরকস্বভাব কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি হবেন কি উপায়ে? তদ্ব্যতীত ব্রহ্মা নিদারুণ ভয়ে ভীত হয়ে সর্ব্বভয়বারণ নারায়ণের স্তুতি করবেন—এটিই স্বাভাবিক ; তা না করে এই মায়ার স্তুতি করবেন কেন ? কেবলমাত্র 'নারায়ণকে পরিত্যাগ কর', অর্থাৎ তাঁর নিদ্রাচ্ছন্নতা চলে যাবে—এতেই উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, কারণ ব্রহ্মা পরিশেষে যে প্রার্থনা জানিয়েছেন তাতে মধুকৈটভকেও বিমুগ্ধ করে দেবার কথা এবং তাদের নিধনকার্য্যে নারায়ণকে উন্মুখ করবারও প্রার্থনা দেখা যায়—"মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ"। পুনরায় দৃষ্ট হয়—"বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ"।

সুতরাং এর প্রকৃত পরিচয় কি ? তাঁর প্রসন্নতায় নারায়ণ প্রসন্ন হবেন, এর কি যুক্তি আছে ? একের মনস্তুষ্টিতে অপরের প্রসন্নতাবিধান হতে পারে না। আর যদি-বা কার্য্যকারণ-বৈচিত্র্যে তা সম্ভবও হয় তবে প্রশ্ন আসে এই মায়াময়ী তবে কে ? সাংখ্যের জড় প্রকৃতির জড়াতীত নারায়ণের উপর কি এত প্রভাব সম্ভব হতে পারে, যুক্তি বুদ্ধির সহায়ে তার মীমাংসাও সহজ নয়। আর দ্বিতীয়ার্দ্ধের কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি শব্দগুলি প্রায় সমানার্থক বলে মনে হয়, কারণ ধ্বংসদ্যোতক কাল শব্দ প্রয়োগে যদি সর্ব্বধ্বংসই এখানে অভিপ্রেত হয়ে থাকে এবং তদনুসারে প্রলয়কালকে কালরাত্রি বলে উল্লেখ করা হয়, তা হলে সাধারণ দৈনন্দিন রাত্রিতে জীবের বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম-অনুষ্ঠানাদি লয় পেলেও, চরম ধ্বংসকালটিই সর্ব্বনাশক বলে মহারাত্রিপদে ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রলয়কালকেই বুঝে নিতে হয়, আর তাতে মোহ অর্থাৎ নাশ—সুতরাং সর্ব্ববিধ জ্ঞাননাশ নিবন্ধন তাই মোহরাত্রিও বটে ; এতে কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং মোহরাত্রি পদগুলি অভিন্ন তত্ত্বেরই বোধক বলে প্রতিপন্ন হয়। অথচ এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলে সমানার্থক বিভিন্ন শব্দের সহায়ে তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে বলে শ্লোকটি পৌনরুক্ত্য এবং ব্যর্থতা-দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। উপরন্তু অন্তিম শব্দে মোহরাত্রি পদে একটি বিশেষণ রয়েছে 'দারুণা', তাতে একটিকে অন্য থেকে পৃথক্ করে দেখানো হয়েছে—একথাও স্পষ্ট। বিশেষতঃ পূর্ব্বাংশের সঙ্গে বিরুদ্ধ অপর অংশের তাৎপর্য্য মূলে এমন কি সঙ্গতি রয়েছে, যাতে দুটি অংশের সমন্বয়ে কোন গভীরার্থ ধ্বনিত হয়ে শ্লোকটিকে যথার্থতঃ পূর্ণ সার্থক করে তুলতে পারে !

উপরি-লিখিত সমস্যা সমাধানে টীকাকারদের মত পর্য্যালোচনা করে দেখতে পাই যে, টীকাকারগণ সকলেই একবাক্যে প্রথমাংশের 'প্রকৃতি' শব্দে মূল কারণ অর্থ নিয়ে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করেছেন, এবং তাতেই 'গুণত্রয়বিভাবিনী' বাক্যের সামঞ্জস্য ও বিন্যাস করেছেন। চতুর্ধরী টীকাকার বলেছেন—"প্রকৃতির্মূলকারণম্, গুণত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণং বিভাবয়িতুমনুবর্ত্তয়িতুং শীলং যস্যাঃ।" অর্থাৎ, মূলকারণই প্রকৃতি, যার সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ে অনুবৃত্ত হওয়াই—বা তদ্রূপ অবলম্বন করে প্রকাশিত হওয়াই স্বভাব।

টীকাকার নাগোজী ভট্ট এখানে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন—"সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ৈর্বিভাব্যতে বা সর্বস্য জড়বর্গস্য প্রকৃতিঃ মূলং প্রধানতত্ত্বাখ্যং সা ত্বমেব"

সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যিনি প্রকাশগোচর এবং সবকিছু জড়বস্তুরাশির প্রকৃতি অর্থাৎ মূল যে প্রধান নামক তত্ত্ব, তা তুমি ভিন্ন আর কিছু নয় ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত টীকাকারদের এরূপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনুধাবন করে একথা বুঝা গেল এঁরা সকলেই বলছেন—সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারে সবকিছুরই কারণস্বরূপ যে মূল প্রধান তত্ত্ব—যাকে বলা হয় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, সাংখ্যশাস্ত্র যাকে 'একা, নিত্যা' এসব শব্দ

প্রয়োগে গৌরবদান করেছেন—সেই প্রকৃতি তত্ত্বটি তুমিই, সুতরাং এখানে 'সর্ব্বস্য' কথাটির অসঙ্গতি আসে বলে 'সর্ব্ব' শব্দের সঙ্কুচিত অর্থ উৎপদ্যমান সর্ব্ব বা জড় পদার্থসমূহ এদের অভিপ্রেত বলে বুঝতে হবে। টীকাকার নাগোজী ভট্ট 'সর্ব্ব' শব্দের ঐ ব্যাপক অর্থে অসঙ্গতি আশঙ্কা করে তজ্জন্য স্পষ্টই বলেছেন—'সর্ব্বস্য জড়বর্গস্য'। সুতরাং মর্ম্মার্থ হ'ল, এ সবের মূল কারণ বলে প্রসিদ্ধ যে প্রধানাত্মিকা প্রকৃতি, তা কোন অতিরিক্ত তত্ত্বই নয়, তুমিই প্রকৃতিরূপ ধারণ কর। তুমিই সেই পরিণমমান গুণত্রয়াদির অবস্থান্তর সংঘটন সম্ভব কর এবং গুণত্রয়াদির মধ্যে তুমিই অনুবর্ত্তমানা বা জগদ্রূপে অভিব্যক্তা। এইরূপে জড়াপ্রকৃতিটিই কি মহামায়া অর্থাৎ মহামায়ার জড়াপ্রকৃতিই তত্ত্ব বলে টীকাকারদের অভিমত পরিব্যক্ত হয়েছে, অথবা তদতীত কোন মহিমান্বিত তত্ত্বই সবকিছুর অন্তর্গত এই প্রকৃতিও বটে, এই ব্যাখ্যাই ধ্বনিত হয়েছে, এ প্রশ্নেরও মীমাংসা প্রয়োজন। প্রকৃতির অতীত কোন তত্ত্ববলে ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে স্বীকার করলে সাংখ্যের একা নিত্যা প্রকৃতির চরম তত্ত্বটি এখানে রক্ষিত হয় না। অথচ টীকাকারদের বিভিন্ন উক্তির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিও যেন অচিন্তনীয় কোন পরমতত্ত্বেরই একটি বিভাব।

কালরাত্রি প্রভৃতি রাত্র্যন্তপদত্রয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাস্কর রায় বলেছেন—"কালরাত্রিরিতি, দৈনন্দিন প্রলয়-ব্রহ্মলয়-মহাপ্রলয়-রূপেতি রাত্র্যন্তপদত্রয়ার্থঃ, ইত্যাহুঃ"—অর্থাৎ, কালরাত্রি হ'ল দৈনন্দিন প্রলয়, মহারাত্রি হ'ল ব্রহ্মলয় আর মোহরাত্রি মহাপ্রলয়। কথাগুলির আর কোন বিশ্লেষণ টীকাকার কিছু দেখতে যান নি।

নাগোজী ভট্ট এই অংশের ব্যাখ্যায় আবার পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার তুলনায় কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য অবলম্বন করে কথা বলেছেন। কালরাত্রিপদের ব্যাখ্যা করেছেন—ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা রাত্রি, অর্থাৎ, ব্রহ্মলয়, মহারাত্রি পদে বলেছেন প্রলয়রাত্রি। এই প্রলয়—কল্পান্তপ্রলয় কি মহাপ্রলয় তা পরিষ্কার করেন নি।

মোহরাত্রি পদের তিনি অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "কালরাত্রিরিতি ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা। মহারাত্রিঃ প্রলয়রাত্রিঃ। মোহরাত্রিঃ মমতাবর্ত্তমোহগর্ত্তপাতিনী। মহামায়াখ্যা সংসৃতিকর্ত্রী।" নাগোজী মোহরাত্রি পদের একটি সঙ্গত এবং সরস বিশ্লেষণই দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"মোহরাত্রিঃ মমতাবর্ত্তমোহগর্ত্ত-পাতিনী মহামায়াখ্যা সংসৃতিকর্ত্রী", অর্থাৎ, জগৎ সৃষ্টিটিই যেখানে মায়ার কাজ সেখানে সৃষ্টিতে মোহ অবশ্যম্ভাবী। মোহ অর্থাৎ স্বরূপবোধ অসামর্থ্য বা স্বরূপের অবরোধ ঘটিয়েই জগতের সৃষ্টি সম্ভব। মায়ার আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি দুটি একসঙ্গে কাজ করে বলে জগৎ। একটিতে স্বরূপ আবৃত হয়ে যায়, অপরটিতে ঐ আবরণের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত দর্শন—তাই হ'ল মায়ার এই জগৎ। অন্যথা মোহ না থাকলে এ মায়ার জগৎও ব্রহ্মময় হয়েই উঠত। তাই বলেছেন—"সংসৃতিকর্ত্রী"; সেই [illegible] মহামায়াই মোহরূপ রাত্রি-স্বরূপা।

পূর্ব্বোক্ত দুটি টীকা গ্রন্থের তুলনায় চতুর্দ্ধরী এবং শান্তনবী টীকা-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্ধরী টীকাকার এখানে বলেছেন—

"কালো মরণং তদুপলক্ষিতা রাত্রিঃ, কল্পান্তরাত্রিরিত্যর্থঃ। মহতঃ ঈশ্বরস্য রাত্রিঃ মহারাত্রিঃ। মহতঃ ব্রহ্মণো মরণোপলক্ষিতা রাত্রিরিতি যাবৎ। মোহঃ অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যমিতি গ্রহঃ স এব রাত্রিরিব রাত্রিঃ, বুদ্ধিমোহকত্বাৎ মোহরাত্রিঃ, নিদ্রাস্বরূপা বা দারুণা দুষ্পরিহারা। রাত্র্যন্ত তিনটি পদে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রকাশই এখানে প্রতীত হয়েছে। কালরাত্রি পদে—কালশব্দ মরণার্থক বলে মরণ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিমরণ প্রকাশিকা কল্পান্ত রাত্রিকেই গ্রহণ করা যেতে পারে। মহারাত্রি পদে ব্রহ্মলয়োপ-লক্ষিতা রাত্রি গৃহীত হতে পারে। কল্পান্ত অপেক্ষা এ রাত্রিটি মহতী, কারণ সেখানে ব্রহ্মা নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন। অবশ্য টীকাকার এখানে 'মহতঃ রাত্রিঃ' এই ষষ্ঠী সমাস দেখিয়ে 'মহতঃ ঈশ্বরস্য রাত্রিঃ অথবা ব্রহ্মণঃ কারণোপলক্ষিতা রাত্রিঃ' এই ব্যুৎপত্তি দেখাবার চেষ্টা করে মহৎ শব্দের দার্শনিক অর্থটি সমন্বিত করবার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু মহৎ শব্দের স্থানে 'মহা' আদেশটি এরূপ ভেদাম্বয় স্থলে ব্যাকরণসম্মত হয় কিনা চিন্তনীয়। উক্ত ব্যাখ্যায় এরূপ স্থলে 'মহারাত্রি' পদই যুক্তিযুক্ত। শান্তনবী টীকাকার এরূপ কোন সংশয়ের অবকাশ দেন নি। যা হোক, এতাদৃশ বিশ্লেষণের অবসরে কল্পান্তলয় এবং ব্রহ্মলয় অর্থাৎ প্রলয়ের সম্ভাবনা দেখিয়ে 'মোহরাত্রি' পদে ইনি আবার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন। 'মোহ' অর্থাৎ বুদ্ধিবিভ্রান্তিকর অপ্রকৃতিস্থতা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসামর্থ্য। প্রাণিমাত্রেই এটি বিদ্যমান। এটি রাত্রির তুল্য। কেননা রাত্রিকাল সাধারণতঃ স্বচ্ছ নয়, তাতে তার স্বাভাবিক অস্বচ্ছতার অবসরে এই রাত্রি আমাদের অনেক সময় বিপর্যস্ত করে থাকে। তেমনি 'মোহ'ও মানুষের বুদ্ধিগত স্বাভাবিক তত্ত্ব-নির্দ্ধারণের শক্তিটি আবৃত করে দেয় বলে তাকেও রাত্রিধর্ম্মাক্রান্ত বলে গৌণতঃ রাত্রি বলা যেতে পারে। সুতরাং মোহই রাত্রি—মোহরাত্রি। মানুষ মাত্রেই এই মোহ বিদ্যমান আছে। অথবা নিদ্রাচ্ছন্ন হলে মানুষ কর্ম্মশক্তি হারিয়ে ফেলে, সুতরাং তা রাত্রি-তুল্য বস্তুর আবরক। এজন্য নিদ্রাস্বরূপা এ অর্থও হতে পারে। এই মায়া মোহকে সহজে অতিক্রম করা যায় না বলেই এটি দারুণা। মহামায়া এই মোহস্বরূপা।

নাগোজী ভট্ট সুন্দর ভাবে এ ব্যাখ্যাটি সাজিয়েছেন। শান্তনবীর টীকা এক্ষেত্রে নাগোজী টীকার সঙ্গে এক মত। বিশেষতঃ এ শ্লোকের সর্ব্বাংশেই শান্তনবী টীকাকার সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"হে দেবি, ত্বমেব কালরাত্রিঃ জগৎসংহারকারিণী যামভঞ্জিনী যত্র প্রলীয়তে জগৎ। সা কালরাত্রিঃ, হে দেবি, ত্বমেব মহারাত্রিঃ যত্র চতুর্মুখো মুক্তিমগাৎ। হে দেবি, ত্বমেব দারুণা মোহরাত্রি-রসি। মমতাগর্ত্তপাতিনী মহামায়াখ্যা সংসৃতিঃ।" ইত্যাদি।

"হে দেবি, তুমিই কালরাত্রি অর্থাৎ জগৎসংহারকারিণী, যামাদি দিবস রাত্রি বিভাগভঙ্গকারিণী যাতে সমস্ত জগৎ কল্পান্তে বিলীন হয়ে যায় একমাত্র ব্রহ্মা নিদ্রাচ্ছন্ন থাকেন। সেই হ'ল কালরাত্রি। সে কালরাত্রি অন্য কোন তত্ত্ব নয় তুমিই সেই কল্পান্ত-রাত্রি। হরিবংশেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়—"অন্ত্যান্তমুস্তমোবারা নিশাদিবসনাশিনী" ইত্যাদি। আর নির্দ্ধারিত প্রজাপতিত্ব লয় পায়, তিনিও স্বরূপে থাকেন না, সেই রাত্রিটি, অর্থাৎ, সেই সর্ব্ব-কার্য্যনাশক অবস্থাটিই মহারাত্রি। সাধারণ রাত্রি, এমনকি কল্পান্ত রাত্রি অপেক্ষা ইহার মহত্ত্ব অধিক। কেননা দিবস-রাত্রির বিভাগ-কর্ত্তা স্রষ্টা ব্রহ্মারও সে রাত্রি—অর্থাৎ, লয়োপলক্ষিত রাত্রিকাল। আর তুমিই সে দারুণ মোহরাত্রি। কারণ তুমিই জগৎ-সংসারের মায়ামমতা রূপে বর্ত্তমান থেকে সংসার স্থিতি সাধন ঘটাও, তোমার এমনি প্রভাব যে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়ে এই দারুণ মমতার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন না, সুতরাং সংসার-নিদানভূত হ'ল সেই মোহ বা মায়ামমতা। তা রাত্রিকালের ন্যায় মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয়, সুতরাং এই মোহ রাত্রিগুণসম্পন্ন, তাই—মোহরাত্রি। এটি তুমিই; কারণ তুমি জগৎসংসারকারিণী। এতে মোহরাত্রি পদে মহামায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যাই দেখানো হ'ল। কোন ধ্বংসকালের চিত্র এ'টি নয়। অথচ গুপ্তবতী টীকাকার এই তত্ত্বটিকে মহাপ্রলয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মহামায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যাতে এখানে দারুণা পদটিও সুসমঞ্জস হয়ে উঠেছে। মোহরূপা মহামায়া যে দারুণা তাতে আর সন্দেহ কি? কারণ একমাত্র দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন তার নিবৃত্তির বা তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতির আর কোন উপায়ই নেই। একথাটি নাগোজী ভট্ট স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন—"দারুণকাস্যাঃ ব্রহ্মজ্ঞানাতিরিক্তানিবর্ত্ত্যত্বেন" ইত্যাদি।

এই সকল টীকাকার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির যে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে শব্দার্থের সঙ্গতিমূলে বিভিন্ন তাৎপর্য্যাবগাহী একটি সুন্দর ব্যাখ্যা উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল বটে, কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হ'ল না। শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের সামঞ্জস্য একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ শ্লোক পাঠে সহজেই একথা বোঝা যায় যে দুটি তত্ত্ব এতে কৌশলে সুবিন্যস্ত হয়েছে। একটি সৃষ্টির আদি কথা, অপরটি প্রলয়কাহিনী বা শেষের বাণী। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়েই বলা হয়েছে—"প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।" আমরা সৃষ্ট জগৎটির তত্ত্ব নিরীক্ষণ করে এ কথা বুঝতে পারি—সর্ব্বত্র দেখা যায় অব্যক্ত থেকে পরিব্যক্ত অবস্থা। সুতরাং এই সুপরিব্যক্ত জগতেরও একটি অব্যক্তাবস্থা থেকেই আবির্ভাব ঘটেছে। জগতের এই মূলকারণী-ভূত অব্যক্তকেই বলা হয় প্রকৃতি। তার বিভিন্নরূপে বৈচিত্র্যময় প্রকাশই হ'ল অভিব্যক্তি বা পরিণাম। সুতরাং অব্যক্তের পরিণামে জগৎ। এই পরিণাম যে হঠাৎ একদিনে আকস্মিকভাবে হতে পারে না তাও আমরা বস্তুজগতের স্বভাব অনুধাবন করে বুঝে নিতে পারি এবং প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, তা ক্রমিক অর্থাৎ অব্যক্তের ক্রমপরিণতিতে জগদ্রূপাভিব্যক্তি। এই ক্রমধারাতেই সাংখ্যশাস্ত্র প্রকৃতিকে মূল ধরে তার পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টিভূত কারণশরীর—প্রকৃতিগত সত্ত্বাংশের প্রাবল্যবত্তা বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তদনন্তর অহঙ্কারতত্ত্ব বা ব্যষ্টিগত কারণশরীর ব্যাখ্যাত হয়েছে। তা থেকে সেই ক্রমধারার অনুবর্ত্তনে এসেছে এ মোহ, পঞ্চতন্মাত্র; ইন্দ্রিয়গ্রাম। তদনন্তর ভূতবর্গ ইত্যাদি স্থূলাভিব্যক্তিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণাবিভাবন, তাই বলা হয়েছে গুণত্রয়বিভাবিনী।

এই প্রকৃতিকেই অপর দার্শনিক বলে থাকেন মায়া। কিন্তু আরো বলে থাকেন, চেতনাধিষ্ঠিত না হয়ে কারও দ্বারা কোন সৃষ্টানুকূল ক্রিয়াই সম্ভব হতে পারে না, এজন্য চেতনরূপী ব্রহ্মকে বলা হয় সর্ব্বকারণকারণ। চেতনের জ্ঞান-ক্রিয়া-ইচ্ছা ব্যতীত কারও পক্ষে অঙ্গুলি-হেলনও অসাধ্য। তাই এ মতে মায়া বা প্রকৃতি যন্ত্র মাত্র, মূল কারণ বা কর্ত্তা হলেন চেতন পুরুষ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম আবার স্বরূপতঃ বা স্বভাবতঃ "নির্গুণোহয়ং নিরঞ্জনঃ।" অর্থাৎ, নির্গুণ নির্বিশেষ অর্থাৎ একাত্মক, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্, (ছান্দোগ্য ৬-২-১); তাই শ্রুতি—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। এখন প্রশ্ন হ'ল একমাত্র ব্রহ্মই যদি তত্ত্ব হয়ে থাকেন, তিনি আবার বিভিন্নতাবর্জিত, তবে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ এল কোথা থেকে, ব্রহ্ম কারণ যদি! কি দিয়ে তিনি গড়লেন জগৎ—তাতে যাকে তিনি পেলেন সে বস্তুটি কি? সেটি যদি যথার্থতঃ অস্তিত্বশীল হয় তবে একমাত্র ব্রহ্মই তত্ত্ব এ সিদ্ধান্ত আর নিশ্চল থাকে না। তাই এ'দের অভিমত হ'ল আসলে একমাত্র ব্রহ্মই তত্ত্ব, আর যা দেখায় বৈচিত্র্যময় এ জগৎ, সবই হ'ল অযথার্থ প্রকাশ, যথার্থ স্বরূপকে না দেখার দোষে এ সব হ'ল তার ফল। এই অযথার্থ প্রকাশ বা জগৎ রূপটি সম্ভব হ'ল কি করে? অনাদি জীবের কর্ম্মধারাই মূলে থেকে এর সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, চেতনাধিষ্ঠিত না হয়ে জড়বস্তু কখনও কিছু করবার সামর্থ্য বহন করতে পারে না। সুতরাং এ কর্ম্মধারাটিও তা পারে না। এজন্য সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বর অনাদি জীবের কর্ম্মমূলে জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন বলেই এটি সৃষ্ট হয়েছে। তাই শ্রুতি বলেছেন—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।" (ছান্দোগ্য, ৬-২-৩)। "সোঽকাময়ত" "তত্তপোঽকুরুত"—তিনি পর্য্যালোচনা করে বুঝলেন এক আমি বহু হব, তাই বহুর ইচ্ছা করলেন, তজ্জন্য তপস্যা করলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই জগৎ রচনার জন্য নিজেই ইচ্ছাপূর্ব্বক বহুরূপে প্রকটিত হলেন। স্বভাবতঃ এক কি করে বহু হতে পারেন—তাই বলা হয় বহুটি স্বভাবতঃ বা স্বরূপতঃ নয়। কারণ দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কখনও কারও স্বভাব হতে পারে না। তাই মায়ারূপ তার নিজস্ব শক্তি বা তদীয় প্রকাশ ধর্ম্মকে অবলম্বন করে স্বমায়ায় বহু হলেন। তাই শ্রুতি বলেছেন—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" এই একই পুরুষের স্বকৃত বিভজন তত্ত্বটির সমর্থন "রত্নত্রয়পরীক্ষা" গ্রন্থে* আমরা সুন্দররূপে

* রঙ্গরাজপুত্র অপ্পয়দীক্ষিত রচিত, কাশীস্থ চন্দ্রপ্রভা থেকে ১৯০৫ সালে মুদ্রিত। এই গ্রন্থে শিব, উমা এবং নারায়ণের পঞ্চ-ব্রহ্মাত্মকতা প্রমাণিত হয়েছে।

বিস্তৃত দেখতে পাই, যথা :—"নিত্যং নির্দ্দোষগন্ধং নিরতিশয়সুখং ব্রহ্মচৈতন্যমেকং ধর্ম্মো ধর্ম্মীতি ভেদদ্বিতয়মিতি পৃথগভূয় মায়াবশেন ধর্ম্মস্তত্রানুভূতিঃ সকলবিষয়িণী সর্ব্বকার্য্যানুকূলা শক্তিশ্চেচ্ছাদিরূপা ভবতি গুণগণশ্চ, অশ্রয়স্ত্বেক এব কর্ত্তৃত্বং তত্র ধর্ম্মী কলয়তি জগতাং পঞ্চ সৃষ্ট্যাদিকৃত্যৌ, ধর্ম্মঃ পুংরূপমাদ্যা সকলজগদুপাদানভাবং বিভর্ত্তি। স্ত্রীরূপং প্রাপ্য দিব্যা ভবতি চ মহিষীস্বাশ্রয়স্যাদিকর্তুঃ, প্রোক্তে ধর্ম্মপ্রভেদাদপি নিগমবিদাং ধর্ম্মিবদ্ ব্রহ্মকোটী' ইতি। 'সে নিত্যনিরঞ্জন দোষগন্ধহীন পরমানন্দতত্ত্ব এক ব্রহ্ম চৈতন্যই মায়া বশে ধর্ম্ম আর ধর্ম্মী এই দুটি বিশেষ অবস্থায় বিভক্ত হয়ে প্রকটিত হয়েছেন। ধর্ম্মটির পরিচয় হ'ল সর্ব্ববিষয়ক অনুভূতি, সর্ব্বকার্য্য-সাধিকা ক্রিয়া এবং তদ্রূপ ইচ্ছাও বটে আর যাবতীয় গুণরাশি, তৎ-সমুদায়ই তাঁর ধর্ম্মপদবাচ্য ; আশ্রয়টি কিন্তু একই। কর্ত্তৃত্বটি ধর্ম্মী স্বয়ং জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যসাধনে প্রয়োগ করেন। পুরুষরূপ পরিগ্রহাদি ধর্ম্ম জগতের উপাদানভাব অর্থাৎ কারণভাব পূর্ণ করেন। আর স্ত্রীরূপ অবলম্বন করে সে ধর্ম্ম নিজের আশয়রূপী পরমকর্ত্তার দিব্য মহিষীভাবে বিরাজ করেন। উহাতে ধর্ম্মের বিভিন্নতা জ্ঞান-গোচর হলেও শাস্ত্র বদ্‌দের মতে ধর্ম্মীর একতত্ত্বের ন্যায় ধর্ম্মগুলিও ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত বলে বস্তুতঃ অভিন্ন।' এর মর্ম্মার্থটি গুপ্তবতী টীকাকার এক কথায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"একমেব ব্রহ্ম অনাদি-সিদ্ধয়া মায়য়া ধর্ম্মী ধর্ম্মশ্চেতি দ্বিবিধমভূৎ।···ব্রহ্মধর্ম্মশ্চ ধর্ম্মাভিন্ন এব—'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' ইতি শ্রুতেঃ, তস্যৈব ধর্ম্মস্য শক্তিরিতি সংজ্ঞা" ইত্যাদি। এতে স্পষ্টই নিরূপিত হ'ল অদ্বিতীয় তত্ত্ব ব্রহ্মেরই মায়াবশে ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ইত্যাদি বিভাব। এই ধর্ম্মতত্ত্বেরই সংজ্ঞা শক্তি। এই শক্তিই সবকিছুর মূল, তাই একে প্রকৃতি সংজ্ঞায় ভূষিত করা হয়ে থাকে। সুতরাং শক্তিরূপ ব্রহ্মধর্ম্ম যে ব্রহ্মেরই অভিন্নতত্ত্ব তাই পরিস্ফুট হ'ল। দেব্যথর্বশীর্ষোপনিষদেও এ তত্ত্বটি আমরা পরিব্যক্ত দেখতে পাই—সেখানে উপনিষদ্ বলছেন—"সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ, কাসি ত্বং মহাদেবি ? সাঽব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কার হ'ল যে শক্ত্যভিন্ন ব্রহ্মই শক্তিরূপে বিভাবিত হয়ে গুণত্রয়ের অনুবর্ত্তন দ্বারা জগৎ পরিব্যক্ত করেছেন। তাই এখানে উক্ত হয়েছে "প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্ব্বস্য গুণত্রয়-বিভাবিনী"। পূর্ব্বে এ কথা আমরা বলেছি যে, জাগতিক বস্তু-তত্ত্বের চরিত্র-চিত্র নিরীক্ষণ করে এ কথা বলা যায় এই জগদভি-ব্যক্তি কখনও আকস্মিক উপায়ে এক দিনে সম্পন্ন হয় নি। কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রমধারা অনুসরণ করেই তা সম্ভব হয়েছে এবং একথাও আমরা বলেছি যে চেতনাধিষ্ঠিত না হয়ে জড়ের পক্ষে এই ক্রমগতির যথা নিয়মে অনুবর্ত্তন সম্ভব নয়, তদনুসারেই কূটস্থ পরমতত্ত্ব তাঁর এই স্বীয় অপরিমিত শক্তিরূপা মায়া সহায়ে ক্রমধারাতে প্রথমতঃ প্রকৃতি বা মায়ায় উপহিত ঈশ্বরতত্ত্ব অতিক্রম করে হিরণ্য-গর্ভ বা ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রজাপতিরূপে আবির্ভূত হলেন। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইত্যাদি (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল)। এজন্য ইনিই হলেন প্রথম জীব—"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত"। এই হিরণ্যগর্ভরূপী কার্য্যব্রহ্ম থেকেই আকাশাদিক্রমে পৃথিব্যন্তভূত-বর্গের অর্থাৎ প্রথমে আকাশ, তা থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে পরিশেষে পৃথিবী, তারপর ঔষধি, অন্ন প্রজা ইত্যাদি। এই পথে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ও প্রাণিবর্গের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এই কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভরূপী প্রজাপতিতত্ত্বই সাংখ্যসম্মত মহত্তত্ত্ব। এখন দেখা গেল এই প্রজাপতিই ভূতবর্গের মূল, ইনিই হলেন ব্রহ্মা। শরীরী হয়ে ইনিই জগদুদ্ভব ঘটালেন। ইনি থাকলেই জগৎ থাকে, এঁর অভাবে আর জগৎ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আশঙ্কা হতে পারে এমন সুন্দর বিচিত্র জগৎ নিত্য নবরূপে বর্দ্ধমান, এর অভাবের বা ধ্বংসের সম্ভাবনা কি এমন দেখা গেল ? এর উত্তর অতি সহজ—সৃষ্ট বা উৎপদ্যমান বস্তুমাত্রেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—একথা যুক্তিসিদ্ধ বলে বস্তু জগতেই প্রমাণিত, সুতরাং জগৎ যেহেতু সৃষ্ট বা মায়াপ্রসূত সে জন্যে এ' কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না। প্রশ্ন হ'ল যদি বা এর ধ্বংস অনিবার্য্যই হয়ে থাকে তবে এ ধ্বংসকার্য্য কবে এবং কি প্রণালীতে সম্ভব হতে পারে ? তাতে একটু যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। এ কথাটি সহজবোধ্য যে, ভৌতিক পদার্থগুলির বিনাশ তাদের উপাদান কারণের লয় প্রাপ্তির পরভাবী কখনও হতে পারে না। কেননা প্রথমেই কারণগুলি বিলীন হয়ে গেলে আশ্রয়াভাবে কার্য্যের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। মৃত্তিকা নেই ঘট আছে বা সুবর্ণ নেই কুণ্ডল আছে একি বলা যেতে পারে ? সুতরাং এসে গেল সিদ্ধান্ত যে, সৃষ্টিক্রমের বিপরীত ধারা বয়েই হতে পারে এদের বিলয়। সুতরাং যার হয়েছিল সর্ব্বশেষ জন্ম তার হবে সর্ব্বপ্রথম লয়। আর যার হয়েছিল সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব তার ঘটবে সর্ব্বশেষ তিরোধান।

অবশ্য এই প্রলয় নিয়ে দার্শনিক সমাজে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। মীমাংসক আচার্য্যগণ প্রলয় স্বীকারই করেন না। 'ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ' হ'ল তাদের অভিমত। মহামনীষী নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বহুবিধ অনুমানাদির দ্বারা প্রলয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করেছেন। পুরাণশাস্ত্র ত মুক্তকণ্ঠে প্রলয়ের রূপকীর্ত্তন করে থাকেন। মনীষী বাচস্পতি মিশ্র আবার কোন কোন গ্রন্থে আত্যন্তিক প্রলয় অঙ্গীকার করেন নি। যা হোক্ বৈদান্তিক আচার্য্যগণ নিঃসঙ্কোচে আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেছেন। 'প্রলয়' এই কথাতেই প্রলয় বলতে একরূপ অবস্থাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। অবস্থার বৈলক্ষণ্য অনুসারে সংজ্ঞাভেদ হয়ে থাকে। এজন্যে এই প্রলয়ের হয়েছে তদনুযায়ী সংজ্ঞা তারতম্য। অর্থাৎ বৈদান্তিক দৃষ্টিতে জীবের দৈনন্দিন 'জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি' এই অবস্থা ত্রয়ের মধ্যে সুষুপ্তিতে কোনরূপ বস্তুজগতের জ্ঞান না থাকাতে সব লয় পেয়ে গেছে—বলা হয়, তাও একরূপ প্রলয়। তা দৈনন্দিন প্রলয় বা নিত্যপ্রলয়। আর সমুদায়

ভূতবর্গের অধীশ্বর শরীরী কার্য্যব্রহ্ম প্রজাপতি যে জগৎ সৃষ্টি করলেন, তার সে সৃষ্টি চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত কাল অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে, তারপর তাঁর বিশ্রান্তিরূপে আসে এই সৃষ্ট বস্তুরাশির ধ্বংস। তখন সবকিছু সেই কারণরূপী প্রজাপতি ব্রহ্মতেই লীন হয়ে যায়। এভাবে সকলের যেদিন মুক্তি আসবে, অজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়ে যাবে, সুতরাং সব শেষ, এরই নাম মহাপ্রলয় বা আত্যন্তিক প্রলয়। এখানে 'মোহরাত্রি' পদে ঐ আত্যন্তিক প্রলয় লক্ষ্য করেও কোন কোন টীকাকার বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। যাঁরা এই সর্ব্বমুক্তিরূপ আত্যন্তিক প্রলয়ের প্রমাণ নেই বলে তা স্বীকার করেন না, তাঁরা মোহরাত্রি পদে ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন। বৈদান্তিক আচার্যগণ শেষোক্ত মত সমর্থন করেন, প্রমাণ স্বরূপ "সর্ব্ব একীভবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিও নির্দ্দেশ করে থাকেন। যে সকল টীকাকার মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না, তাঁরা মোহরাত্রি পদে মোহাত্মিকা ব্রহ্মশক্তি মায়ারূপা মহামায়াকে নির্দ্দেশ করে জগৎসংসৃতিকর্ত্রীপদ যোজনা করেছেন।

সুতরাং দেখা গেল সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়াগুলি একই তত্ত্বের ক্রীড়া। বিভিন্ন অবস্থার বিকাশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ। কাজেই বলা যায় সৃষ্টি আর ধ্বংস এই বিরুদ্ধ মূর্ত্তিতেও এক পরম তত্ত্বই কেমন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সর্ব্বদা প্রকাশমান—এ তত্ত্বটি যেন কৌশলে রূপায়িত করে দিয়েছেন এই শ্লোকটিতে। আমরা ভেবে থাকি, যা কিছু সুন্দর, মহনীয়, তা হ'ল দেবতার আশীর্ব্বাদ, আর অমঙ্গল যা কিছু, অশুভ সূচনা যেখানে, সেখানেই ভাবি সেটি শয়তানের প্রতিক্রিয়া। এ বিভ্রান্তিটিরও সুন্দর শিক্ষা রয়েছে এতে যে, কি সৃষ্টি আর কি সংহার সর্ব্বত্রই রয়েছে একই বিধাতার আপন হস্তের মঙ্গল স্পর্শ। তদুপরি যে তত্ত্বটি এখানে এই বিন্যাস আর বিনাশের মাধ্যমে বুঝান হল তাও চরম বিশ্লেষণমূলক। এতে বুঝা যায় যে, এই উভয় বিভাবে অধিষ্ঠিত থেকেও উভয়ের অন্যতর রূপও নয়। উভয় রূপও নয় সে পরমতত্ত্ব। কারণ সৃষ্টি আর ধ্বংস কখনও একই সময়ে সংঘটিত হয় না। অন্যতর স্বরূপ হলে অপর বিভাবে তদাত্মকতা সম্ভবই হ'ত না। স্বভাবের কখনও রূপান্তর হতেই পারে না। তা হলে বলতে হয়—তত্ত্বতঃ সেটি উভয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থেকেও উভয়ের অতীত। সুতরাং সর্ব্বাতীত সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মতত্ত্বই এখানে মহামায়াতত্ত্বের নিষ্কর্ষরূপে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কাজেই এ কথা বলা সমীচীন হবে না যে, শ্লোকের পূর্ব্বভাগ এবং পর ভাগে সমন্বয় কৌশল আবরণে গূঢ় রয়েছে বলে এর গভীর তাৎপর্য্যটি রহস্যাবৃত করা হয়েছে। সুতরাং নিদ্রারূপিণী মায়ের প্রতি ব্রহ্মার এই স্তুতি তত্ত্বতঃ পরম পুরুষেরই। তবে তা তদ্রূপবিভাবের স্তুতি।

অভিনন্দন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দুর্দিনের অন্ধরাতে পণ করি' সমগ্র জীবন
তোমরা চলেছ পথে শিরে লয়ে ঝঞ্ঝা বারিধারা—
ঘরে ঘরে রুদ্ধদ্বার আতঙ্কিত পুরবাসিগণ,
তোমাদের চোখে কোন্ দিগন্তের আলোর ইশারা।

কারাকক্ষ অন্ধকার স্বপ্নালোকে করেছ উজ্জ্বল,
অন্তরে শুনেছ কোন্ অনাগত ভবিষ্যের বাণী,
আপন অস্থিতে গড়ি' প্রলয়ের রুদ্র বজ্রানল
দহিয়া দর্পীর দম্ভ চলিয়াছ সত্যের সন্ধানী।

দেশের লাঞ্ছনা-কাছে অতি তুচ্ছ দেহের লাঞ্ছনা,
সগৌরবে সহিয়াছ সর্ব্বক্ষতি সব অত্যাচার,
আত্মার অমৃতস্পর্শে জ্বালাহীন মরণ-যন্ত্রণা,
সাধন-শিখায় জ্বলে সমভাবে নিন্দা-পুরস্কার।

আজিকে মুক্তির দিন, অপগত নিশার তিমির,
অতীতের বিভীষিকা মুছে গেছে গগন-ললাটে,
নব কর্ম্মভার তবু অপেক্ষিছে হে বিজয়ী বীর,
চঞ্চল তরণী আজো বাহি' নিতে হবে ঘাটে ঘাটে।

দেবতার আশীর্ব্বাদ ঝরিতেছে আলোক-ধারায়
সে আলোকে কর স্নান, নব ব্রতে হও পুনঃ ব্রতী,
তপস্যার গূঢ় মন্ত্র জনে জনে শিখাও সবায়,
শত শত হৃদয়ের শ্রদ্ধা নম্র লহ এ প্রণতি।*

মহাপ্রসাদ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কিছুই কিছু না—আসল কথা হ'ল গিয়ে মন। ও হাজার বার বেরতো কর—তীর্থি ধম্মো কর—এইটি শুদ্ধ না হলে সব ভস্মে ঘি ঢালা। জানালার বাইরে পান-দোক্তার পিক্ ফেলে মন্তব্য করলেন সুরপিসি।

ঠাসাঠাসি একগাড়ি লোক, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির ব্যাপারটা স্বয়ংক্রিয়। গরম গরম বাক্য বিনিময় ক্ষেত্রবিশেষে ঘুসোঘুসিতেও গড়ায়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য দু'পক্ষের চোখা চোখা বাক্যবাণেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রইল। সুর-পিসি কৃতী মেয়ে বলতে হবে। বাক্যবাণে যখন দু'পক্ষ অত্যন্ত উত্তেজিত ও অভিভূত—সেই সুযোগে এর পাশ কাটিয়ে তার হাতের তলা গলিয়ে ধারের বেঞ্চির চার আঙুল পরিমিত জায়গায় নিজের স্থূল কলেবরটিকে সাধ করিয়ে দিলেন। এ পাশের পুরুষ মানুষটি স্বভাবতঃই কিছু সঙ্কুচিত হ'ল—ও পাশের তরুণী মেয়েটিও যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ করে উঠল।

সুরপিসি মুখে আক্ষেপসূচক শব্দ করে উঠলেন, আহাহা—লাগল নাকি মা? পোড়ারমুখোরা টিকিট বিক্রী করছে হপ্তে হয়ে—মানুষের বসবার জায়গাটুকুন রাখে নি। এমন ব্যবসা যদি গোল্লায় না যায় তো কি বলেছি মা।

কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজের বপুটিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করলেন।

পাশের মেয়েটি কিন্তু এই সান্ত্বনাবাক্যে ভুলল না। ঈষৎ ঝাঁজালো স্বরেই বলল, তা বলে মানুষের গায়ের ওপর বসবার ব্যবস্থা তো কোম্পানী করে নি! অপরের কষ্ট যে না বোঝে—

আহাহা—কি কথাই বলেছ মা! অপরের কষ্ট বোঝে না বলেই তো পিরথিমীতে এত ঝেষাঝিষি ঝেষাঝিষি।...তা তীর্থিধম্মো করতে বেরিয়ে কে আর সুখের আশা করে থাকে মা, গাড়ীতে চাপা এক ঝক্মারি ব্যাপার! তোমারও কষ্ট, আমারও কষ্ট, সবারই কষ্ট। এখন সব কষ্টের সার্থক হয় সেই সব কষ্ট নিবারণ শ্রীহরিকে দেখতে পেলে। যেন নাউ-মাচা, পুঁই-মাচা না দেখি মা। ছিক্কেত্তর চলেছ তো মা?

মেয়েটির দেহে তখনও অস্বস্তি লেগে রয়েছে—কথার সুরে তার আঁচটুকু ঝরে পড়ল, না তীর্থ করবার বয়স আমার হয় নি। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকলে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পায়—এটা গাড়ীতে ওঠবার আগে বুঝতে পারি নি!

ওমা, একি কথা গো ভালমানুষের মেয়ে! আমি তোমার দিদিমার বয়সী—আমাকে কিনা এই উত্তুর! বলি তীর্থিধম্মোর আমার বয়স আছে নাকি!

তীর্থস্থানে সবাই তো ধর্ম করতে যায় না—সংসারও থাকে অনেকের। মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল।

ওমা, তা আর থাকবে না—[illegible] হলে গিয়ে ভগমানের সংসার। এখানে সবই বাজীকরের খেলা। এক আঙুল জায়গা নিয়ে কেউ আসে নি, এক আঙুল জায়গা সঙ্গে করে নিয়েও যাবে না। তবু আমাদের পোড়া মনের এমনই দশা—মায়ায় বদ্ধ হয়ে আমার আমার করে মরি। ওই যে গানে আছে না:

> দিন দুই তিন ভবে
> কত্তা বলে সবাই কবে,
> সেই কত্তাকে দেবে ফেলে কালাকালের কত্তা এলে।

মেয়েটি মুখ ভার করে রইল, কোন জবাব দিল না।

সুরপিসি হাতের ঝুলি থেকে পান দোক্তার কৌটা বার করলেন। এক খিলি পান ও এক চিমটি দোক্তা গালে দিয়ে কামরার পানে চাইলেন। গাড়ীটা অল্প অল্প চলছে, বচসার সুরটাও নরম হয়েছে। মানুষগুলি যে যেখানে পেরেছে স্থির হয়ে দম নিচ্ছে।

ওরই মধ্যে এক জন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল.

গৌর প্রেমানন্দে সবাই একবার হরি হরি বল।

সবাই আধ-মিয়ানো সুরে হরিধ্বনি দিল। বাতাসটা আরও খানিক হাল্কা হ'ল।

সেই হাল্কা মন নিয়ে যথাকালে ওঁরা শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছলেন।

দলটি নেহাত ছোট নয়; কোলের বাচ্চাগুলিকে আধখানা হিসাবে ধরলেও সতেরো জন। রেলের টিকিট কাটবার সময় হরেন জিজ্ঞাসা করেছিল সুরপিসিকে, সতেরো খানা টিকিট কাটি পিসি, কি বল?

সুরপিসি অবাক হয়ে বলেছিলেন, তুই যে অবাক করলি হরু! দশ হাত কাপড়ে কাছা না দিয়ে আমরা যেটুকু বুদ্ধি ধরি—বলি তোর ঘটে কি সেটুকুও নেই? কুচো চারটেকে ওদের মায়েরা কোলে-কাঁখে করে নিক। পেট পেরুলে গাড়ীর বেঞ্চিতে শুইয়ে দেবে ভাল করে। ক্যাঁতা চাপা দিয়ে রাখলে রেলের বাবারও সাধ্যি নেই যে বয়েস হিসেব করে! বলে এই করে করে কত আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে হিল্লী দিল্লী ঘুরে এলাম—এতো বাড়ীর দোরে ছিক্কেত্তর! কোন গতিকে রাতটুকু কাটানো।

রাতটুকু নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটল।

কিন্তু পুরীর গাড়োয়ানগুলি ভারি অবুঝ। এরা তর্ক তুলল, মায়েরা কোলে কাঁখে করে নিলেও ভার তো লাঘব হবে না।...এ তো ইঞ্জিন-টানা গাড়ী নয়, এখানে মানুষই ইঞ্জিন। এখানে আধা ভাড়ার রেওয়াজ নাই। হয় পুরো ভাড়া দাও, না হয় পুরো একখানা গাড়ী নাও।

সুরপিসি আক্ষেপ করলেন, কলিকাল। না হলে কথায়

বলে—বালক ভগমান। তাকে বইবার জন্ত পুরো ভাড়া চায় অধম্মে মিনসে [illegible] দেবতার থানে তককতা! ছি হরির যদি হাত থাকতো—তাহলে এর প্রতিফল দিতেনই দিতেন।

বাহিনী অন্নয [illegible] মিলল না ধর্ম্মশালায়—সবাই উঠলেন পাণ্ডার যাত্রী-নিবাসে। দিন হিসাবে মাথাপিছু ভাড়া প্রত্যেকটি ঘরের। কচিগুলোর আধা বরাদ্দ নয়—পুরোপুরিই লাগল। উপায় বা কি! পাণ্ডাদের তরফের যুক্তিও দুর্ব্বল নয়।

কি করব বলুন, যা কিছু উপায় এই রথের ক'টা দিন। না হলে দিন দিন মানুষ যেমন নাস্তিক হচ্ছে, আমাদের রুজি-রোজগারও শেষ হয়ে এলো। ছিলাম ঠাকুরের আশ্রয়ে—এক দোরে, এবার নানান্ দোরে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে বয়ে ফিরতে হবে।

তা বলে দুগ্ধপোষ্য শিশু—ওরা জগবন্ধুর মহিমা কিবা বোঝে! পুতুল দেখার মত করে ঠাকুর দেখে। বায়না ধরে ওইটে নেব ঠাকুমা।—ভাড়া কমানোর জন্ত শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন সুরপিসি।

পাণ্ডা হেসে বলল, আমরাও ছেলেদের চেয়ে ভাল করে দেখি না, মা। আমরাও বায়না ধরি, ওঁকে নেব, পাই না।

আহা—কি কথাই বলেছ বাবা, চাওয়ার মতন চাই না বলেই তো পাই না। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে সুরপিসি চোখ বুজলেন।

একটু পরে চোখ চেয়ে বললেন, তা বাবা এখানে তেল পাওয়া যায় তো? দ্বারকায় খালি বাদাম তেল। তাই দিয়ে রাঁধ বাড় —গায়ে মাখ—যা খুশি কর। সারারাত্তির গাড়ীতে বসে বসে মাজা পিঠ কনকন্ করছে—সর্ব্বাঙ্গে পাকা ফোড়ার বেদনা। একটু মালিশ-টালিশ না করলে—

সরষের তেলের অভাব কি মা, যত চান পাবেন।

বেশ বাবা, বেশ। তাহলে এবেলা আর রান্নার উদ্যুগ করব না, ধুলো পায়ে একবার ঠাকুরদর্শন করে আসি। তারপর নাইতে ধুতে বেলা তো গড়িয়েই যাবে, তারপর পেসাদ—

—প্রসাদ তো সন্ধ্যের সময় হবে।

বল কি গা—এত বেলা অবধি না খাইয়ে রাখো ঠাকুরকে? বলে যার দৌলতে তোমাদের পেটে ভিরকুটি দানা পড়ছে দু-বেলা —তাকেই দেখাচ্ছ ভু! তিন পহর বেলা পর্য্যন্ত পিত্তি পাড়িয়ে—

আজকাল এই ব্যবস্থাই চলছে মা।

তা আর হবে না, কলির যে তিন পোয়া পূর্ণ হল। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন সুরপিসি। হরেনকে বললেন, তাহলে একবার বাজারটি ঘুরে আয় বাবা, গোপলা আর বিশেকে সঙ্গে নিয়ে যা। কার কি চাই না চাই—

পেটকাপড় থেকে টাকার গেঁজিয়াটা টেনে বার করে পয়সা গুনতে লাগলেন সুরপিসি।

এই ন্যাও একটা আধুলি। আধ সের আলো চাল, দুটো আলু, এক পয়সার নুন আর মটরডাল আর কাঁচা লঙ্কা আনবি। শিশিতে গাওয়া ঘি আছে। কোনরকমে দুটো ভাতে ভাতে ফুটিয়ে নেব'খন। আমার হাঁড়ি আনতে হবে না, পেতলের সরা আছে—ওতেই হয়ে যবে। আর দেখ বাবা, তোরা তো উনুন জ্বালবিই, কাঠের দাম যা ভাগে পড়ে নিয়ে নিস।

ভারি তো কাঠের দাম! হরেন হাসল।

ওমা সে কি কথা! তীর্থিস্থানে, একে তো কাউকে দিতে-থুতে পারি নে কিছু, তার ওপর পরের দান নিয়ে কি মরব! না বাবা, সামান্তের জন্তে আমায় পাপের ভাগী করিস নে।

আচ্ছা—আচ্ছা দিও তুমি। আর কি কি চাই বল, এক সঙ্গে বাজার সেরে আসি।

সবাই এক পরিবারের লোক নয়, গোটা পাঁচেক পরিবার মিলে ছেলেয় বুড়োয় উনিশ জন। তিন শ্রেণীর কামরা জুড়ে আস্ত একখানা রেলগাড়ী যেমন পুরীতে এলো। হরেনকে ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করলে গার্ডের পদমর্য্যাদা একমাত্র সুরপিসিরই। দলটিকে পরিচালনা করেছেন উনিই। বহু তীর্থ ঘুরেছেন উনি—কোন কোন তীর্থে একাধিকবার। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—বহুক। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, সংসারে থেকেও সংসারের ঝঞ্চাট পোয়াতে ভালবাসেন না। কিছু অর্থ আছে, দেহে আছে সামর্থ্য এবং বাক্যে আছে ক্ষুরের ধার। আত্মীয়স্বজন সবাই সমীহ করে চলে পিসিকে। বারব্রত পূজাপার্ব্বণ—তীর্থধর্ম্ম এই সব নিয়েই কাটে ওঁর দিনগুলি। ঘর ছেড়ে—যখনই কোন দল পথে বার হয়, পিসি তাদের সঙ্গ নেন। তা কে জানে কেদার-বদরী—কিবা জানে তারকেশ্বর। ঘরের কাছে নবদ্বীপ আর দূরের পথে জ্বালামুখী দুই তুল্যমূল্য পিসির কাছে। কেউ তীর্থে যাচ্ছে শুনলে উনি পা বাড়িয়েই আছেন।

নিকট-আত্মীয়েরা অলক্ষ্যে মন্তব্য করে, ঘর-জ্বালানী, পর ভোলানী।

ঘুরে-ফিরে রঙীন হয়ে সে মন্তব্য পিসির কানে পৌঁছয়। পিসির মুখে-চোখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, ঘর জ্বলে গেছে বলেই তো পরকে নিয়ে ভুলতে চাই। পর কিন্তু সত্যিই পর নয়। আমরাই বুঝবার ভুলে—দেখবার দোষে দূরে সরিয়ে রাখি।

দুঃখ ব্যথা হয়তো সুরপিসির মনের গভীরে কোনকালে থিতিয়ে পড়েছে; কোনদিনই তাকে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরেন না উনি। শুধু বলেন, কি হবে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। আমি করলাম কর্ম্ম আর ফল ভোগ করবে অন্তে! তা হলে যে দিনরাত্তির মিথ্যে হয়ে যায়। তাঁর বিচার নিক্তির ওজনে, একটু ইদিক-উদিক হবার জো নেই।

কিন্তু দলের সবাই তো সুরপিসিকে জানে না। পটেশ্বরীকে নিয়ে গোল বাধল। তিনিও ব্রাহ্মণের বিধবা—শুদ্ধাচারিণী; বয়স হয়েছে—অনেক তীর্থে ঘুরেছেন। বললেন, ওমা চেয়ে আমরা

দু'জনে একটা আলাদা উনুন তৈরি করে একসঙ্গেই রান্না করি, দিদি। আপনি বুড়ো হয়েছেন—কেন আর হাত পুড়িয়ে কষ্ট করবেন!

সুরপিসি বললেন, এ আবার কষ্ট কি ভাই, বড় বড় ঝক্কি ঠেলে এলাম, আর একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে পারব না, খুব পারব।

পটেশ্বরীর মুখ অন্ধকার হ'ল। বললেন, সে কথা আলাদা। কিন্তু আমিও ব্রাহ্মণের বিধবা, মন্তর নিয়েছি—হাতের জল অশুদ্ধ নয়। আমার হাতে খেলে—

সুরপিসি কোমল কণ্ঠে বললেন, ভুল বুঝচ কেন ভাই, কারও হাতে খাব না—এতবড় অহংকার করি না। তবু শরীলে ক্ষ্যামতা রয়েছে যতদিন, আর কেন? কাউকে সেবাযত্ন তো করিনি আর জন্মে, সেবার পিত্যেশ বা কার কাছে করব!

পটেশ্বরী বললেন, যাই বল ঘুরিয়ে—আমরাও সব বুঝি।

বলে, 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি।

আর যার মাথায় পাকা চুল তারেই বলে বুড়ী।'

সব তীর্থে বিচার আচার আর পটপটানি শোভা পায়—পায়না শুধু ছিক্কেত্তরে।

সুরপিসি কোন মন্তব্য করলেন না—যেন অবাক—একটু বা আহত হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

চারটি উনুন জ্বলল। আষাঢ়ের উত্তপ্ত দিন ঘরের মধ্যেকার ধোঁয়া আর আগুনের তাপে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

রান্না সেরে সুরপিসি বাচ্চাদের পরিচর্য্যায় লাগলেন। মায়েরা ব্যস্ত রয়েছে রান্নার কাজে—ওদের একটু আসান দেওয়া দরকার।

সকলের রান্নার পাট চুকলে ঘরের এক কোণে নিজের আহার্য্য নিয়ে বসলেন সুরপিসি।

পটেশ্বরী সেদিকে চেয়ে বললেন, ছেলেদের ছোঁয়ানেপা কাপড়-খানা পর্য্যন্ত ছাড়ে না যারা তাদের আবার আচারবিচারের পট-পটানি কত!

একটু উত্তাপ জমেই রইল মনে। আহত সম্মানে পটেশ্বরী এড়িয়ে চলতে লাগলেন সুরপিসিকে। কিন্তু সেখানেও বহু বাধা।

মন্দিরের অন্ধকার গর্ভে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে শ্রীমূর্ত্তি দেখলেন দু'জনে, অন্ধকার ধাপে ওঠা-নামার কালে টাল সামলে নিলেন পরস্পরকে ধরে, একসঙ্গে রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করলেন—স্পর্শ করলেন, মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে আরতি দেখলেন, আরাত্রিক-দীপের তাপ নিলেন এবং বাইরে এসে বসলেন পাশাপাশি।

সুরপিসি বললেন, আজ চমৎকার দর্শন হয়েছে। আহা, প্রভু যেন রত্নবেদী আলো করে রয়েছেন।

পটেশ্বরী বললেন, পূজোরীগুলোর খালি 'দেহি দেহি' রব। আবার মাথায় পটাপট খাড়ী মেরে পয়সা আদায়ের কি ধুম!

হরেন বলল, যাই বল দিদি—ঠাকুর নিয়ে এমন ব্যবসা ভাল নয়।

সুরপিসি বললেন, তবে এর মধ্যে ব্যবসা দেখলি কোথায়? জগবন্ধুর কৃপায় এতগুলি মানুষ পিত্তিপালন হচ্ছে। পাণ্ডা ছড়িদার এরাও তো জীব—এদের জীবনধারণের দরকার আছে কিনা? আমি তো দেখছি সবই প্রভুর মাহিত্তির—তিনি সবাইকে পালন করছেন।

তাই যদি,—আপনি ধ্বজা বাঁধা, আটকে বাঁধা, চরণপুজো এসব করবেন না বললেন কেন? একটি মেয়ে শুধোল।

সুরপিসি হাসলেন, শোন কথা—নিজের ক্ষ্যামতা বুঝে তো করব? যা করতে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়—তা না করাই ভাল। মনটাকে একদিকে ফেলে দেওয়া ভাল। এ ধ্বজা-পুজো, চরণপুজো কি রকম জানিস—কোন গতিকে ভবে পার! ওরা পেয়ে মনে করবে কিছুই পেলাম না, আমরাও দিয়ে মনে করব অনেক দিলাম। দু' পক্ষেরই কষ্ট। কথায় আছে না:

ছাগল বলে আলুনি খেলাম

গেরস্ত বলে প্রাণে মলাম!

এও ঠিক তাই।

পটেশ্বরী ধ্বজা বেঁধেছিলেন পাঁচ সিকেয়। কাঁচা আটকে বেঁধেছিলেন—আট টাকা আট আনায়—আর চরণপূজা করবেন ঠিক করেছেন যৎসামান্য দিয়ে। ভাবলেন, কথাটা সুরপিসি তাঁকেই ঠেস দিয়ে বললেন।···

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, যা রীত তা করতেই হয়। কম দেয়া—বেশী দেয়া যার যেমন সামর্থ্য। একেবারে আঁচলের গেরো কষে বাঁধার চেয়ে তো ভাল।

সুরপিসি হেসে বললেন, ঠিক বলেছ ভাই, কথায় বলে দিলে ধুলে তবে হাত খোলে। কিন্তু সবেতেই বরাত করা চাই।

পটেশ্বরী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, বার বার বরাত বরাত কর কেন দিদি—ভগবান তোমাকেও তো অনাথা গরীব করেন নি। দেবে না পষ্ট বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। পয়সা খরচের বেলায় বরাত, পূর্ব্বজন্ম, কর্ম্মফল—যত টালবাহানা। মন মুখ এক না হলে কোন কাজই ঠিক হয় না।

হয় না-ই তো। সুরপিসি সায় দিলেন। আমরা যেটুকু করি লোকদেখানো—বড়াই করবার জন্য। নইলে কে কি করলে না করলে সে হিসেব নিতে কেন ভালবাসি! একটা গল্প মনে পড়ল ভাই, শোন। এক জনের স্বামী মরে গেছে, কান্না শুনে পড়শীরা ছুটেছে দেখতে। এখন এক জনা ঘরের কাজ ফেলে যেতে পারে নি—মনটা পড়ে আছে সেইখানে। এরা ফিরে আসতে আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলে দিদি? কি হয়েছিল?

কি করে কখন মৃত্যু হয়েছে এরা সব বলল। সে জিজ্ঞাসা করল, বউটি আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদছে তো? আহা অভাগীর কপাল ভাঙল যে।

এরা বললে, না, সে কাঁদছে না, চুপটি করে বসে আছে স্বামীর পাশে।

ওমা, কেমন বউ গো! অবাক হয়ে গালে হাত দিল সে।

যার ইন্দিরের মত সোয়ামী চলে গেল—সে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল না!

গল্প শেষ করে সুরপিসি বললেন, কাঁদার বড়াইটাই বোঝে সবাই, না কাঁদতে পেরে বুকের ভেতরটা যে জ্বলে-পুড়ে যায়—যার তাপে চোখের জল যায় শুকিয়ে—সে বোঝে ক'টা মানুষ! সংসারে বাইরেটাই দেখে লোকে।

পটেশ্বরী হরেনের দিকে ফিরে কান্নার সুরে বললেন, বাবা হরেন, তুমি যদি আমার থাকবার আলাদা ব্যবস্থা না করে দাও—এই ঠাকুরের মন্দিরে বলছি—না খেয়ে আমি দিন কাটাব।

হরেনের বউ সুরপিসিকে একান্তে ডেকে বলল, পিসিমা, এখন এই অশান্তি থেকে রক্ষে করুন।

অশান্তি কিসের!···একসঙ্গে থাকলে হাঁড়ী-কলসীতে ঠোকাঠুকি হয় না? কথার ঘা সইতে পারে না যারা—তাদের আলাদা থাকাই ভাল। শান্তিতেই থাকবে তবু। গম্ভীর গলায় বললেন সুরপিসি।

এক সঙ্গে এতদূর এসে···এতে যে অশান্তিই বাড়বে পিসীমা। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল হরেনের বউ।

আচ্ছা—আচ্ছা, থাম ছুঁড়ি! এ বিদেশ বিভুঁই যাবে কোথায়? একি দেশের বাড়ী যে রাগ করে খাব না বলে পড়শীর বাড়ী চলে গেলাম—কি দুয়োরে খিল দিয়ে মোণ্ডামেঠাই খেলাম! একটা গল্প মনে পড়ল—শোন বলি। শ্বশুরবাড়ীতে তখন হাঁসের পুরী—যে যার নিজের নিজের আতের জন নিয়ে দেয়াল তুলেছে। আছে এক অন্নে, অথচ দুধটা, সন্দেশটা, আমটা, আনারসটা যে যার আনাচ্ছে, ঘরে বসে বসে সেবা করছে। আমরা দুই বিধবা জায়ে হাঁসের পুরীর হাঁড়ি ঠেলছি দু'বেলা। এক দিন বড় বউ তো বাধালো তুমুল ঝগড়া। মনের ইচ্ছা পৃথক হয়ে বাসা পাতবে শহরে। একটা ছুতো চাই তো, তাই ঝগড়া।

ভাত খাব না বলে দোরে খিল দিল। বাড়ীশুদ্ধ সবাই মিলে কত সাধ্যি-সাধনা—কিছুতেই খাবে না, ধনুকভাঙ্গা পণ। সারাদিন খিল খুলল না, নীচেয় নামল না। এমনি করে দু'দিন গেল। বাড়ীর সবাই ত ভয়ে ভাবনায় কাঠ! দু'টো দিন ডাহা উপোস দিয়ে রয়েছে কি করে? এতে যে গেরস্তর অকল্যাণ। আবার চলল—সাধাসাধি, খোশামুদি। আমি কিন্তু প্রথম দিনেই ব্যাপারটি টের পেয়েছিলাম। বড় বউ চান করে, পুকুরঘাটে যায়, কাপড় কাচে—শুকোতে দেয়, কিন্তু রান্নাঘরের চৌকাট মাড়ায় না। দু'ঘণ্টা জল না খেলে মহাপ্রাণী টা-টা করে—আর দু' দুটো দিন এমনি গেল। তক্কে তক্কে রইলাম। শেষে দেখি যা ভেবেছি—তাই। সন্ধ্যেবেলায় বড় বউয়ের ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে ঝুপ করে পড়ল এত আমের খোলা আর আঁটি। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল—সে নাকি ময়রার দোকান থেকে নিমকি সিঙ্গাড়া কাঁচাগোল্লা আরও কি যেন লুকিয়ে এনে দিয়েছে। আমরা সবাই দেখলাম—বউ উপোস করে রইল, অথচ একঘেয়ে আলু আর ডাটা চচ্চড়ির বদলে এমন মুখ বদলানো তলে তলে। অমন সুখের উপোস দিতে পারলে আমরা ত স্বর্গে যাই।

সবাই হেসে উঠল।

পটেশ্বরী কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আলাদা ঘরে গিয়ে উঠলেন।

সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে সুরপিসি বললেন, না বাবা, এই বালির গাদাতেই পিট পেতে দিচ্ছি—একটু পরশো হলেই যথেষ্ট। গোগগে বালি, সমুদ্দুরের বালিই ত।

সবাই বালি মেখে সমুদ্র-স্নান করল; অবাক হয়ে দেখল সমুদ্র। এত খোলামেলা জল, এমন বড় বড় ঢেউ, এমন গর্জ্জন—অবাক হবার কথা বটে।

সুরপিসি বললেন, সমুদ্দুরের জল ভারি শুদ্ধ। সেকালে রাজারা সিংহাসনে বসবার সময় সাত সমুদ্দুরের জল দিয়ে চান করতেন। ওই যে চক্রতীর্থ আছে—সেখান থেকে একটা খাল নাকি মাটির নীচে দিয়ে মন্দির পর্য্যন্ত এসেছে। ওইটুকুন জল নাকি ভারি মিষ্টি। ওই জলে ভগবান চান করেন।

সমুদ্রের ধারেই আর একটা ব্যাপার ঘটল। ট্রেনের সেই মুখ-বাঁকানো মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে স্নান করতে নেমেছে জলে, তীরে তার তিন বছরের ছেলেটি কান্না জুড়ে দিয়েছে তারস্বরে। সবাই দেখছে চেয়ে—কেউবা মৌখিক সান্ত্বনা দিচ্ছে। সুরপিসি ভিজে কাপড় ছেড়ে এগিয়ে এসে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন।

ছেলের মাও সেই অবসরে ছুটে এসেছে ভিজে কাপড়ে। বলল, আহা, আপনি আবার ওকে কোলে নিলেন কেন?

কচি ছেলের কান্না সইতে পারি নে মা—কেমন লাগে। কাপড় ছেড়ে নাও তোমার খোকাকে।

বউটি ছেলে কোলে নিয়ে হাসি মুখে বলল, আপনাকে যেন দেখেছি কোথায়?

কোথায় আবার—ট্রেনে! তোমার গতর চূর্ণ করে বসেছিলাম, সারা রাত্তির কত কষ্ট দিয়েছি—ভুলব কোন মুখে মা! তা ভাল ঘর দোর পেয়েছ ত? আমার জগবন্ধুকে দেখলে, না সংসার নিয়েই রয়েছ?

—যা বলেন। বলে মেয়েটি পায়ের কাছে নীচু হ'ল। আপনাকে আবার চান করতে হবে মাসীমা, আমরা জাতে কায়স্থ।

শিশু ভগবান, ওর আবার জাত কি? আর এ যে শ্রীধাম পুরী—এখানে একজনই রাজা, আমরা সবাই তাঁর প্রজা।

বউটির মুখ ঝলমল করে উঠল। বলল, আসবেন এক দিন আমাদের বাসায়? মন্দিরের পশ্চিমে—

বাসায় গিয়ে থাকি ত সংসারের কথা। আলুনি লাগে মা। এই ত এখানে ভাবসাব হ'ল—তুমিও পর নও, আমিও দূরের নই। কত কষ্ট দিয়েছি—তাকি মনে রাখতে পারলে, মা?

সুরপিসির চোখের কোল চিক্ চিক্ করে উঠল।

আপনি কাঁদছেন? অবাক কণ্ঠে শুধাল বউটি।

না, না। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলেন সুরপিসি।

আসবেন না আমাদের বাসায়? মেয়েটি সজলস্বরে মিনতি জানাল।

না মা, পোড়া মনকে বিশ্বাস নেই। এমনি মহামায়ার মায়া—রেখেছে কি কুহক করে। যে বাঁধন নিজের হাতে ঘুচিয়েছেন তিনি—তাতে আর গেরো দেবার চেষ্টা করব না মা। আশীর্বাদ করি জন্মএয়োস্ত্রী হও। স্বামীপুত্তুর নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর।

সুরপিসি পিছন ফিরলেন—আর ফিরে চাইলেন না।

চক্রতীর্থ, গম্ভীরা, সিদ্ধ বকুলতলা, টোটা গোপীনাথ, সাধক হরিদাসের সমাধিমন্দির, মাসীর বাড়ী, আঠারনালা, জটিয়া বাবার মঠ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, সাক্ষীগোপাল—একে একে সবই সারা হ'ল।

সুরপিসি পাণ্ডাকে বললেন, দেখ—যা তা বলে ভুজুং ভাজুং লাগিও না। যা দেখবার তাই দেখিয়ো, আজে বাজে কত কি বুঝিয়ে প্রভুর মাহিত্যির খাটো করো না।

হরেনকে বললেন, বিদেশ বিভুঁই শক্ত হতে হয়। সবতাতেই এটা কি—ওটা কি বলে আদেখলেপনা করতে নেই। কথায় বলে

পথ চলবে জেনে—
কড়ি রেখে গুনে।

না হলে সর্বত্র যা দেখি সেই সব, ফতুর হয়ে যাবি।

কেন পিসি, তুমিই ত সেদিন বললে, ভগবান ওদেরও পেট চালাবার ভার নিয়েছেন। এই উপায়ে ওরা উপার্জন করে।

করুক না উপার্জন—তা বলে আমরা ঠকব কেন? সংসার করতে বসে গাঁটের হিসেব ভুললে চলবে কেন। সন্ন্যাসী হোস ত যা খুশি করগে যা।

হরেন হেসে বলল, পিসি, তুমি ভারি এলোমেলো। কথা বল, তোমার কোন্ কথাটা ঠিক বুঝতে পারি না।

মনটাই মানুষের এলোমেলো যে। যেদিকে বন্ধ—তার উল্টো দিকে উড়ে চলা। [illegible] নিস্তার নেই? যেমন হাওয়া তেমনি উড়ে উড়ে পড়ে।

একটু থেমে বললেন, কাল আর [illegible], সকলে একসঙ্গে বসে মহাপ্রসাদ মুখে দেব। [illegible] হ'ল তো—মহাপ্রসাদ বন্ধ। [illegible]।

সবাই মহাপ্রসাদ নিয়ে বসল। সুরপিসির [illegible] মাঝখানে। নিজে হাতে তুলে নিলেন [illegible], একে একে সকলের মুখে দিলেন। [illegible]। তার

ফিরে, দে না। এ যে ছিক্কেত্তর—এখানে মানুষের জাতও নেই, ধম্মও নেই—মানসম্মানও নেই, সেই একজনাই এখানকার সব!

সব সঙ্কোচ-দ্বিধা কেটে গেল—এ ওর মুখে মহাপ্রসাদ তুলে দিতে লাগল।

পটেশ্বরী কোথায় রে? পাশের ঘরে? চ, তাকেও মহাপ্রসাদ খাইয়ে আসি।

ঘরে বসে মালা জপ করছিলেন পটেশ্বরী। মহাপ্রসাদ হাতে সামনে এসে বসলেন সুরপিসি। বললেন, এস ভাই, তোমার দিদিটিকে মাপ কর। মহাপ্রসাদ নাও।

মুখে তুলে দিলেন মহাপ্রসাদ।

মালা সরিয়ে রাখছিলেন পটেশ্বরী, সুরপিসি বললেন, এ তো অন্ন নয়, প্রসাদ। মালা এঁটো হবে না, ওতে জপের শক্তি বাড়বে—নাও, আমার হাত থেকে মহাপ্রসাদ নাও, আমার মুখে দাও। আজ থেকে তুমি হ'লে আমার মহাপ্রসাদ।

এক হাতে জপের মালা—অন্য হাতে প্রসাদ তুলে নিলেন পটেশ্বরী। ওঁর চোখে জল টল টল করছে।

তেমনি ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠেছে সুরপিসির দল। তেমনি গালিগালাজ, চীৎকার, গুঁতোগুঁতিতে ট্রেনের কামরা ভরে উঠেছে। শ্রীক্ষেত্র থেকে ফিরছে সবাই, যে মন নিয়ে এসেছিল—সেই মন নিয়েই। মাঝের কয়েকটা দিন—সমুদ্র, শ্রীমন্দির, বিগ্রহ আর মহাপ্রসাদ যে দূর সীমার সন্ধান জানিয়েছিল, তা ট্রেনের ছোট কামরায় উঠতে না-উঠতেই হারিয়ে গেছে।

সুরপিসি জানালা ঘেঁষে বসেছেন। এক খিলি পান ও এক চিমটি দোক্তা গালে ফেলে পাশের পটেশ্বরীকে বললেন, ভাই মহা-প্রসাদ, কেউ বোঝে না কেন ঘুরি পথে পথে। সোয়ামীর ভাল-বাসা, ছেলেমেয়ের মায়া, সংসারের সুখ—দিয়েছিলেন বিধাতা সবই—ওদের নিয়েই পাশের লোককে করেছিলাম পর। ভগবান বললেন, এত দম্ভ, দাঁড়া ভাঙছি তোর অহংকার। একে একে সকলকেই নিয়ে নিলেন। কিন্তু মনের মধ্যে [illegible] রইল যেটুকু অহংকার—তাকে নিতে পারলেন না কেন?

বলতে বলতে গলাটা ভারী হয়ে এল—একটু থেমে বললেন, ভাই ত জানালার ধারে না বসলে মনটা কেমন হাঁপাই-হাঁপাই করে ভাই। মনে হয়—চারটে দেয়াল যেন অষ্টবন্ধনে বাঁধছে। তাই লোকের অসুবিধে করেও—এইখানটিতে এসে বসি। জানিনে—এইটুকু সুখের ইচ্ছে এখনও কেন রেখেছেন ভগবান। এটুকু না কাটলে আমার মুক্তি নেই ভাই।



ইটালীর শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টা

·· বর্ত্তমান ইটালীতে শিল্পোন্নয়ন-প্রচেষ্টা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। ফ্যাক্টরিসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা আগেকার তুলনায় প্রভূত পরিমাণে



'বাইকোক্কা'র (মিলান) একটি কারখানায় টায়ার নির্ম্মাণ

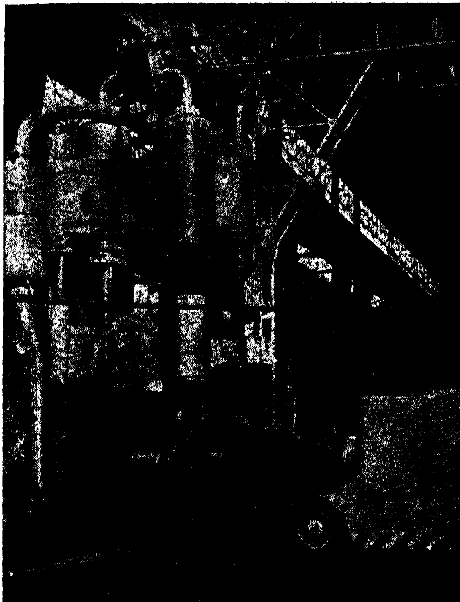
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ইটালী সমান তালে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং এদেশে বিভিন্ন শিল্পের ক্রমোন্নতি ইহার এক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে।

১৯৫৪ সনে ইটালীর ইস্পাতের কারখানাগুলিতে মোট চার লক্ষাধিক টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল। ইটালীর ইস্পাতশিল্পের



মাসা কার্‌রারা প্রদেশের আউল্লাতে একটি 'জুট ফ্যাক্টরি'র ভিতরকার দৃশ্য

উন্নয়নে কর্নিগ্লিয়ানো প্ল্যান্ট প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে— এই প্ল্যান্টে ১,২০০,০০০ টন "শীট ষ্টীল" উৎপন্ন হয়। এই



কর্নিগ্লিয়ানোর (জেনোয়া) ইস্পাতের কারখানার একটি দৃশ্য

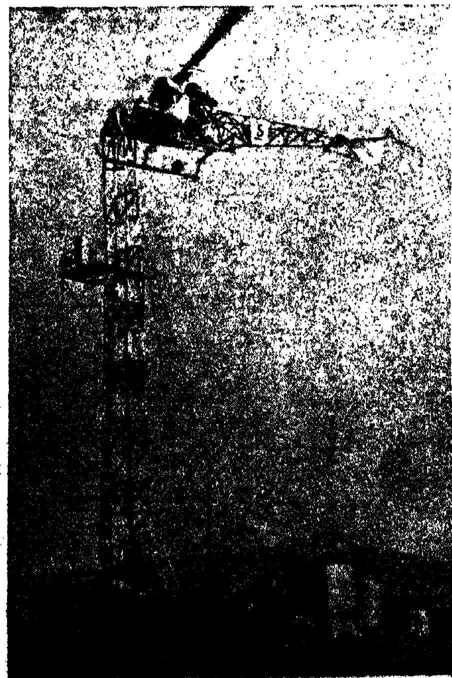
বর্ত্তমানে ইটালীর ১০১টি বিভিন্ন কারখানায় প্রতি বৎসর ৯৮ হাজার টন স্বাভাবিক এবং সিন্থেটিক রবার উৎপন্ন হয়। এই মোট উৎপাদনের শতকরা উনষাট ভাগই ব্যবহৃত হয় টায়ার নির্ম্মাণে।

ইটালীর শিল্প-সংগঠনে বয়ন-শিল্প এখনও পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছে—যদিও গত কয়েক বৎসর যাবৎ কৃত্রিম বয়ন-শিল্পজাত বাজার দখল করায় ছোটখাটো রকমের সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ১৯৫৪ সনে পাটের সুতার পরিমাণ ৩৫ হাজার টন এবং পাট হইতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ২৯ হাজার টন হইয়াছিল।

ইটালীতে বয়ন-শিল্পের ক্ষেত্রে হোসিয়ারি-গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার



আব্রিজো্তায় তৈল-অনুসন্ধান-কার্য্য



কাতানিয়া প্রদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র

বৎসরেই ইটালীয়াম ধ্বংসপ্রাপ্ত [illegible] উৎপাদিত ইস্পাতের পরিমাণ চার লক্ষাধিক টন।

[illegible] করিয়াছে। ৩৭০টি [illegible] মধ্যে ২০০টিই [illegible]।

এগুলিতে আধুনিকতম মেশিনে ব্যাপকভাবে বহুমূল্য সিল্কের জিনিষ এবং প্রচুর পরিমাণে নাইলন ষ্টকিং তৈরি হইয়া থাকে।



ইটালীয় হোসিয়ারীর একটি বিভাগ

ইটালীতে তৈল-অনুসন্ধান কার্য্যও ব্যাপক ভাবে চলিতেছে। রাগুসা এবং কাতানিয়ার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রের পর এখন আগ্রিজেন্তোর পালা। এখানে ২১৯,০০০ হেক্টেয়ার পরিমিত স্থানে ইটালীয় এবং বৈদেশিক ফার্ম্মসমূহ তৈলক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছে।

যুদ্ধোত্তর ইটালীর সম্পদের নূতন উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস এই দেশের সর্ব্বত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। ইউরোপের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসোলাইন ইটালীতেই অবস্থিত—এবং ইহা এই দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে জালের মত ঘিরিয়া সাড়ে তিন হাজারের অধিক কিলোমিটার জুড়িয়া প্রসারিত। ইহা প্রত্যহ ২০ লক্ষ কিউবিক মিটার তৈল বহন করিতে পারে।

ন. ভ.

আনন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

করো আনন্দ সখী এস
ঘরে বন্ধু আমার ফিরে,
হরি- করুণায় প্রাণ তরী
ভব- সাগরে ভিড়িল তীরে।

বৃথা খুঁজেছি তাহারে বনে
গিরি মন্দিরে প্রতিমায়
কত করেছি আরতি পূজা
দীপ বার বার জ্বালি' হায়!
হরি কেমন—জানি নি তবু,
বাতি তারাদিশা জানে কি রে!
হাতে ভেঙেছি কাঁকন-রঙ্গ
তা কি' বিলাসিনী সখী-সঙ্গ,
সাঝে সকালে বৈরাগিণী-
বেশে পথে পথে ফিরে ফিরে।

কত শুনেছি সাধুর কথা,
প্রেম মিলনের সে-বারতা ;
তার ভালো ও মন্দ নিয়ে
মীরা ঘুম যায় প্রেমনীড়ে।

নাথ আমারে অবলা জানি'
নিল অঙ্কে চরণে টানি'
গেল যুগের বাঁধন কাটি'
গুরু শ্যামের কৃপা লভি রে!

(ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দী ভজনের অনুবাদ)



আদিবাসীদের নৃত্যোৎসব

আদিবাসীদের লোকনৃত্য

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১৮৭৫ সনের কথা। স্পেনের সান্তান্দার প্রদেশের ভূম্যধিকারী সিনর দ্য সানতুওলা তাঁর জমিদারী এলাকার অন্তর্ভুক্ত এক গুহায় গিয়ে আবিষ্কার করলেন লাল কালো ইত্যাদি হরেক রঙে আঁকা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাইসন প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর ছবি—পরবর্ত্তীকালে এই গুহা সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিতিলাভ করল আলতামিরা গুহা নামে। পণ্ডিতদের গবেষণায় প্রমাণিত হ'ল, এই গুহার ছবিগুলো এঁকেছিল অরিগ্নেসিয়ান যুগের আদিম মানবেরা খ্রীষ্টের জন্মের কুড়ি হাজার বৎসর পূর্ব্বে। মনুষ্যজাতির মধ্যে তারাই নাকি প্রথম শিল্পী। এই গুহায় নৃত্যরত স্ত্রী-পুরুষের যে-সকল ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে তার থেকে প্রমাণিত হয়—সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই আদিম মানুষ শুধু যে রূপসৃষ্টির প্রেরণায় গুহাগাত্রে ছবিই আঁকত তা নয়, তাদের অন্তরের আনন্দ অভিব্যক্ত হয়ে উঠত স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যগীতের মাধ্যমেও।

আদিম চিত্রকলা এবং লোকনৃত্যের ধারা সেই স্মরণাতীতকাল থেকেই যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চল, আরণ্যভূমি এবং অগণিত জনপদকে সঞ্জীবিত করে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

আদিম চিত্রকলা ও লোকনৃত্য শুধু যে যুগযুগান্তর ধরে তথাকথিত সভ্যতার সংস্পর্শ হতে দূরে থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এসেছে তা নয়, পরোক্ষভাবে সভ্যজগতের চিত্রকলা ও লোকনৃত্যকে প্রভাবিত করে ওগুলোকে দিয়েছে নূতন রূপ এবং বিপুল প্রাণশক্তি। বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে আদিম জাতিসমূহের দান যে কতখানি তার যথাযথ পরিমাপ আজও পর্য্যন্ত হয় নি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব শুধু ভারতের আদীবাসীদের লোকনৃত্যের মধ্যে। ভারতের আর্য্য-সংস্কৃতি অনার্য্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে উপকরণ আহরণ করে কি পরিমাণ পুষ্টিলাভ করেছে তৎসম্বন্ধে আমরা অনেকেই সম্যক্‌রূপে সচেতন নই। ভারতের নিত্যকালীন আর্য্য-সংস্কৃতির বিকাশের ধাপে ধাপে যুগে যুগে এর মর্ম্মমূলে নবশক্তি সঞ্চারিত করেছে আদিম জাতির রসকল্পসম্পদ। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যে আদিম জাতির ভাস্কর্য্যশিল্পের কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে রূপরসিক বিশেষজ্ঞের চোখে; ভারতীয় চিত্রকলা আদিম চিত্রকলার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত তা উদ্ঘাটিত হয়েছে ভারতশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টির আলোকে। ভারতীয় চিত্রকলার উপর আদিম চিত্রকলার প্রভাব সম্পর্কে

আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেনঃ

"In the sphere of pictorial art, even after the reign of classic phases of the Ajanta and Bagh Schools for over seven hundred years, the feeling and technique of the 'primitives' burst forth in the miniatures of the Gujerati Schools (the so-called "Jaina" paintings) in the 12th century and live a vigorous life of popularity covering nearly four centuries. Even so late as the sixteenth century another primitive revelation blossoms forth in the magnificent "Ragini" miniatures of the Orcha School, making a "new" beginning, as it were, discarding the formula of the earlier classical phases and going back to the primitive folk-language of a tertiary prakrita. . . ."

এর তাৎপর্য্য হচ্ছে এইঃ চিত্রকলার ক্ষেত্রে শতাব্দীরও ঊর্দ্ধকাল যাবৎ অজন্তা এবং বাঘগুহার শিল্পরীতির একাধিপত্য সত্ত্বেও ভারতীয় চিত্রকলায় আদিম প্রভাব কিন্তু



আবর নৃত্য

একেবারে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে গেল না, আদিম জাতি-সমূহের অনুভূতি এবং তাদের রচনাশৈলী দ্বাদশ শতাব্দীতে অকস্মাৎ অভিব্যক্ত হ'ল গুজরাটী পদ্ধতির (তথাকথিত "জৈন" চিত্রকলার) মাধ্যমে এবং প্রায় চার শতাব্দী ধরে তার জনপ্রিয়তা রইল অক্ষুণ্ণ। ষোড়শ শতাব্দীতে ওরচা পদ্ধতির রাগিণী 'মিনিয়েচার'গুলির মধ্য দিয়ে হ'ল আদিম চিত্রকলার আর একটি লৌকিক এবং প্রাকৃত রূপের অভিব্যক্তি।

কিন্তু চিত্রকলার চেয়েও ভারতীয় নৃত্যকলা আদিম লোকনৃত্যের নিকট অধিকতর ঋণী। ভারতীয় ক্লাসিক্যাল নৃত্য মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) দক্ষিণ-ভারতের দেবমন্দিরসমূহকে কেন্দ্র করে বিকশিত ভরত নাট্যম্; (২) দাক্ষিণাত্যেরই কেরল দেশের নৃত্যনাট্য কথাকলি; (৩) উত্তর-ভারতে হিন্দু এবং ইসলাম এই উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভূত কথক, আর (৪) পূর্ব্ব-ভারতের রাধাকৃষ্ণের লীলারসমাধুর্য্যে সঞ্জীবিত মণিপুরী নৃত্য।

এই চারি শ্রেণীর ক্লাসিক্যাল নৃত্যের মধ্যে কথাকলি আর মণিপুরী এই দুটিই মূলতঃ আদিম জাতির সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত। কথাকলি নৃত্যের প্রসঙ্গে বিখ্যাত কলা-সমালোচক ও নৃত্যরসিক জি. ভেঙ্কটাচলম্ বলেনঃ

"In its present form it may be said to date back to the early eighteenth century . . . But its root can be traced to a race and civilisation much anterior to the Aryan, and its antiquity must indeed be very remote considering it has certain primitive elements in its rhythm, music, make-up, dress and ornaments. . . . It has certainly absorbed and assimilated parts of Bharat Natyam, which gives it its cultured character."—(*Dance in India*, p. 100).

অর্থাৎ, বর্ত্তমানে কথাকলি নৃত্যের যে রূপ আমরা দেখতে পাই, একথা বলা যেতে পারে যে, তার বিকাশ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কিন্তু মূলতঃ যে জাতির সভ্যতার উৎস থেকে ঐ নৃত্যকলা উৎসারিত তা আর্য্যসভ্যতার বহুকাল পূর্ব্বেকার; এবং এর ছন্দ, সঙ্গীত, মেক-আপ, রূপসজ্জা এবং আভরণের মধ্যে যে সকল আদিম উপকরণ নিহিত রয়েছে সেগুলো বিবেচনা করলে মনে হয় যে, এই নৃত্য অতি প্রাচীন—অতি দূর অতীতে এর উদ্ভব। একথা নিশ্চিত যে এই নৃত্য ভরত নাট্যমের কতকগুলো অঙ্গ আত্মসাৎ করে নিয়েছে এবং সুসংস্কৃত রূপ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের এক বিশিষ্ট রূপময় প্রকাশ বিংশ শতাব্দীতে প্রথম আবিষ্কার করেন কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ। আজ মণিপুরী নৃত্য স্বকীয় মহিমায় গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত—সমগ্র পৃথিবীতে কলারসিক মহলে এর পরিচিতি। মণিপুরী নৃত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুরীর অপরূপ রূপায়ণ দেখে যখন আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মহারা হই তখন ভুলেও একথা আমাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুর অধ্যাত্মভাবধারাপূত এ অপূর্ব্বমনোহর নৃত্যকলা উদ্ভূত হয়েছে মণিপুরে আবহমানকাল প্রচলিত লোকনৃত্য থেকেই। মণি-পুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লোকনৃত্যের নাম লাই হরওবা। লাই হরওবা কথাটার মানে দেবতাদের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি আমোদ করা। মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রাচীন লাই হরওবা নৃত্যের আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হ'ল এবং অবশেষে তাই পরিণত হ'ল শাস্ত্রীয় নৃত্যে। আজ মণিপুরী নৃত্যের পূর্ণবিকশিত রূপের

মধ্যে এই আদিম জাতির লোকনৃত্যের প্রচ্ছন্ন ধারাটি খুঁজে পাওয়া কঠিন।



পূর্ণাঙ্গ নৃত্যসজ্জায় সাঁওতাল যুবক

পূর্ব্ব-ভারতের আসাম প্রদেশে মণিপুরী ছাড়া আবর, মিরি, মিশমি, গারো, খাসিয়া লুসাই, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগা ইত্যাদি বহুসংখ্যক আদিম জাতির বাস। এই সব আদিবাসীদের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজস্ব লোকনৃত্য আছে। একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, আসামের আদিবাসীদের লোকসঙ্গীতের চেয়ে লোকনৃত্য অধিকতর সমৃদ্ধ—নৃত্য যে শুধু এদের উৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ তা নয়, নৃত্য এদের জীবনযাত্রার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। অবশ্য একথা সত্য যে, আসামের আর কোন আদিম জাতির নৃত্যই মণিপুরী নৃত্যের মত সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত এবং ভাবরসসমৃদ্ধ নয়।

আসামের নাগারা প্রধানতঃ আঙ্গামী, আও, লোটা, সেমা ইত্যাদি একুশটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকেরই নৃত্যকলা স্বকীয়, স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নাগারা রণনিপুণ বীরের জাত—এদের তাণ্ডব-নৃত্যেও মুখ্যতঃ তাই বীররসের অভিব্যক্তি।

নাগাদের মধ্যে নৃত্যানুষ্ঠানকালে অগ্নি প্রজ্বলিত করবার প্রথা আছে। নৃত্যমণ্ডলের মাঝখানে আগুন জালিয়ে এরা তার চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে নৃত্য করে। [illegible] করিকলা নৃত্যেও অনুরূপ প্রথা বিদ্যমান। অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি এবং আফ্রিকার অরণ্যচারী জাতিদের মধ্যেও অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নৃত্যের রেওয়াজ আছে। এই সাদৃশ্য কৌতূহলোদ্দীপক —এই সমস্ত আদিবাসী এবং আসামের নাগাসম্প্রদায় একই আদিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কি না তা গবেষণার বিষয়।

আঙ্গামী নাগা নৃত্যঃ 'খোনোমা', 'কোহিমা' আর 'বিশ্বেমা' আঙ্গামীদের এই তিনটি প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের নৃত্যের প্রচলন আছে। এদের অন্তরের উল্লাস সর্ব্বাধিক অভিব্যক্ত হয় 'কেদোহোই' বা যুদ্ধনৃত্যে—এই যুদ্ধনৃত্য রীতিমত এক বিরাট অনুষ্ঠান। এই নৃত্যে ঢাল-তলোয়ার ভল্ল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক ব্যক্তি পাঁয়তারা কষতে কষতে লম্ফঝম্ফ সুরু করে দেয় এবং বর্শা



করমা নৃত্য

ঘোরাতে ঘোরাতে তারস্বরে গর্জ্জনপূর্ব্বক প্রতিপক্ষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে। নৃত্যকারীরা উপরের দিকে লাফ দিতে দিতে কখনও সামনের দিকে অগ্রসর হয়, কখনও-বা পিছনের পানে হটে আসে।

খনোমা গোষ্ঠীর নৃত্যকারীদের রূপসজ্জার ঘটা দেখবার জিনিষ। নৃত্যে অংশগ্রহণকারী সকলেই নবীন যুবক—জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে এবং আরণ্য পত্র-পল্লবে দেহকে সুসজ্জিত করে এরা নৃত্যে প্রবৃত্ত হয়। নৃত্যকারীরা ধীরমন্থর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হতে এক বৃত্ত রচনা করে এবং পিছনের পংক্তিতে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বসে যায়। বাহ্য এবং আভ্যন্তর উভয় মণ্ডলীর মধ্যেই নর্ত্তক আপন নৃত্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। কখনও কখনও বাইরের সারির নৃত্য-কারীরা ঘূর্ণগতিতে নৃত্য করতে করতে ভেতরের সারিতে চলে আসে, ওদিকে ভেতরের সারির নাচিয়েরা আবার বাইরে চলে যায়। নৃত্যকারীদের দৃঢ় পদক্ষেপ এবং হাত ও বাহুর এক বিশিষ্ট ভঙ্গী দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের

বাহুর কনুইয়ের নিম্নাংশ নৃত্যের তালে তালে কখনও উপরে ওঠে, কখনও নীচে নামে। বাহুগুলো যখন নৃত্যচ্ছন্দে ওঠা-নামা করে, হাতের আঙুলগুলি তখন থাকে ঋজুভাবে।

কোহিমা গোষ্ঠীর নৃত্যকারীরা বাঁশ অথবা কাগজের হালকা পোশাক পরে' নৃত্য করে থাকে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের নাগাদের মত নৃত্যকালে পশুশৃঙ্গনির্ম্মিত গোলাকৃতি শিরোভূষণ পরবার রেওয়াজ এদের নেই, সেজন্য বিবিধ প্রকারের অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন এদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। অল্প-বয়সের নৃত্যকারীরাই এই নাচে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বিখেমা গোষ্ঠীর নর্ত্তকদের নৃত্যে লম্ফঝম্পের বহর খুব বেশী। এদের নৃত্যোৎসবে বয়স্ক ব্যক্তিরা গৌণ অংশ গ্রহণ করে। ধানকাটার মরশুমের সময় অথবা হাতে যখন কাজকর্ম্ম থাকে না তখন এরা নৃত্যোৎসবে মেতে ওঠে, নাচের সঙ্গে সঙ্গে চলে অধুনা-অপ্রচলিত, অতি-প্রাচীন ভাষায় রচিত পরম্পরাগত সঙ্গীত।



বুন্দেলখণ্ডের আদিবাসীদের শৈলা নৃত্য

সেমা নাগাদের নৃত্য : সেমা নাগারা বড়ই নৃত্যপ্রিয় এবং নৃত্যনিপুণ জাতি। নৃত্যব্যতিরেকে এদের কোনো উৎসবই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলে গণ্য হয় না। প্রত্যেক সামাজিক উৎসবে ভোজন-পর্ব্ব সম্পন্ন হবার পরই সুরু হয় নৃত্যানুষ্ঠান। এদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের বহুসংখ্যক নৃত্য প্রচলিত আছে, প্রত্যেকটি নৃত্যই নির্দ্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ। প্রায়শঃই উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা সামাজিক ভোজদাতার গৃহের সামনে জ্বলন্ত আগুনের চতুষ্পার্শ্বে হয় এদের নৃত্যানুষ্ঠান।

এদের দুই শ্রেণীর নৃত্য বিখ্যাত এবং বহুলপ্রচলিত : (১) যচুমি কেখিলে আর (২) যেৎসিমি কেখিলে। এই উভয় নৃত্যেই নৃত্যকারী প্রথমে ডান পা দিয়ে মাটির উপর প্রচণ্ডভাবে তিন বার আঘাত করে আর বামপদের সহায়তায় করে উল্লম্ফন। তারপর বিপরীত-ক্রম-অনুসারে বাম পদ দিয়ে আঘাত এবং ডান পায়ের সাহায্যে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে। এমনি ভাবে নর্ত্তকমণ্ডলী এক সারিতে অবস্থানপূর্ব্বক একবার এগিয়ে যায় সামনের দিকে, তার পর শরীরটাকে নেয় ঘুরিয়ে।

এদের মধ্যে পরস্পরের হাতধরাধরি করে বেষ্টনী রচনাপূর্ব্বক নৃত্য করবারও রেওয়াজ আছে। এই নৃত্যের নিয়মশৃঙ্খলা লক্ষণীয়। একসঙ্গে মিলে অনেকে নৃত্য করে, কিন্তু তাদের পদক্ষেপ এবং দেহভঙ্গীর মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয় না। এদের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য নৃত্য হচ্ছে অকহজী—যাতে নৃত্যচ্ছলে দেখানো হয় জলাভূমির মহাপঙ্কে হস্তীযূথের নিমজ্জন-দৃশ্য। সেমা মেয়েরা একে অপরের হাত ধরে বৃত্তাকার বেষ্টনী রচনাপূর্ব্বক সমস্বরে সঙ্গীত আর সমতালে নৃত্য করতে থাকে। নৃত্য-কারিণীরা প্রথমে দক্ষিণ পদের উপর দেহভার ন্যস্ত করে সুমুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তার পর দেহকে মনোরম ভঙ্গীতে লীলায়িত করে পিছন দিকে।

আও নাগা নৃত্য : সেমাদের ন্যায় আও নাগাদের যাবতীয় উৎসবানুষ্ঠান এবং পূজাপার্ব্বণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে নৃত্য। আওদের নৃত্যে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের প্রত্যেককেই পর্য্যায়ক্রমে গানও গাইতে হয়। সামাজিক ভোজদাতার গৃহে তার প্রশস্তি-গান গেয়ে গেয়ে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলে করে তুসুঙ্গ-সঙ্গ নৃত্য। আর এক শ্রেণীর নৃত্য আছে যাতে জলে সন্তরণশীল মৎস্যের ভঙ্গীকে ফুটিয়ে তুলতে হয়—এর নাম অঙ্গোকজু বা অঙ্গামলু। এদের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর নৃত্য হচ্ছে চঙ্গনৃত্য যাকে মিরি ইয়রিও বলা হয়ে থাকে। উচ্চতার তারতম্য অনুসারে তরুণ-তরুণীরা পৃথক পৃথক দুটি দীর্ঘ পংক্তি রচনা করে দাঁড়িয়ে যায়, তার পর বৃত্ত রচনা করে চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করতে থাকে—এই নৃত্যের সঙ্গে ঢাক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হয় না, নৃত্যকারীরা মুখ দিয়ে এক প্রকার আওয়াজ বার করে তার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করে।

খাসিয়া নৃত্য : খাসিয়া জাতি প্রধানতঃ দুটি শাখায় বিভক্ত—খাসিয়া ও সিন্টেং। শিলং থেকে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী স্মিট নামক স্থানে প্রতি বৎসর মে মাসে নংক্রেমের পূজা এবং তদুপলক্ষ্যে খাসিয়া মেয়েদের নাচ হয়। জুন মাসে জৈন্তা পাহাড়ের রাজধানী জোয়াইয়ে বে-ডিং খালম পরব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে।*

আসামের অন্যান্য আদিম জাতির লোকনৃত্য

আসামের অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে নাগাদের ন্যায়

* নংক্রেম নাচ ও বেডিং খালম নৃত্যের বিবরণ লেখকের "আসামের অপরিচিত প্রতিবেশী" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

আবর জাতির নৃত্যও বিশেষ উপভোগ্য। আবর পুরুষেরা যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মাদল বাজাতে বাজাতে তালে তালে নৃত্য করে। মিকির জাতির মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে কুমার-কুমারীদের একসঙ্গে মিলে নাচের রেওয়াজ আছে।*

সাঁওতাল নৃত্য—আসামের মণিপুরীদের ন্যায় উন্নত না হলেও বাংলা ও বিহারের সাঁওতালদের নৃত্যের প্রসিদ্ধি আছে। সাঁওতাল লোকসঙ্গীতের ন্যায় সাঁওতাল লোকনৃত্যও স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যে মণ্ডিত। এই আদিম জাতির সহজাত সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় উৎসবাদি উপলক্ষে



আদিবাসী বালকদের শৈলা নৃত্য

অনুষ্ঠিত এদের বিভিন্ন নৃত্যে। পূর্ণিমা নিশীথে বননিবিড় সাঁওতাল-বস্তির উপর দিয়ে যখন জ্যোৎস্নার বান ডেকে যায়, গ্রামের তরুণীরা তখন কুসুমভূষণে সজ্জিত হয়ে এক বৃক্ষতলে এসে জড়ো হয়। ওদিকে তরুণেরা এসে হাজির হয় বাদ্যভাণ্ড ও পতাকা হস্তে। তরুণীরা নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করতে থাকে আর ভান করে যেন তরুণদের তারা দেখতে পায় নি। তরুণেরা কিন্তু একটু একটু করে এগোতে এগোতে তরুণীদের একেবারে কাছে এসে পড়ে, তারপর তরুণ-তরুণী পরস্পরের বাহু-ধরাধরি করে নৃত্য আরম্ভ করে দেয়। সাঁওতালী স্ত্রীলোকদের 'সোহরায়' 'বাহা' এবং 'লাগেড' নৃত্য আর পুরুষদের 'দাসায়', 'ভাণ্ডা' এবং 'পৈক' নৃত্য পরম চিত্তাকর্ষক। আনন্দোচ্ছল সাঁওতাল-জীবনের আশ্চর্য প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তাদের লোকনৃত্যে।

সাঁওতালদের ন্যায় আর একটি আদিমজাতির লোকেরাও চন্দ্রালোকিত রাত্রে অন্তরে নৃত্যের এক বিপুল প্রেরণা অনুভব করে—সেটি ছোটনাগপুরের 'পাহাড়িয়া'। জ্যোৎস্নারাতের নিরুপম সৌন্দর্য 'পাহাড়িয়া'দের মনে যেন নেশা ধ[illegible] শুক্লপক্ষের চাঁদ যখন পরিপূর্ণ মহিমায় আকাশ থেকে আলোক বিকিরণ করতে থাকে, পাহাড়িয়ারা তখন তাদের উৎসবানুষ্ঠানের তিথি নির্দ্ধারিত করে। ছোটনাগপুরের প্রতিবেশী অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় নৃত্য পাহাড়িয়াদের প্রত্যেক উৎসবানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত এবং প্রত্যেকটিতেই ধান্যেশ্বরীরও সদ্ব্যবহার হয় প্রচুর পরিমাণে। এদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ হয় ভুঁইয়েও বা পৃথ্বীদেবতার জন্মোৎসব অনুষ্ঠানকালে—এই উপলক্ষে তিন দিন চলে একটানা আনন্দোচ্ছাস। উৎসবক্ষেত্রের মাঝখানে পোঁতা হয় শাল-গাছের দুটি শাখা এবং এগুলির চতুষ্পার্শ্বে পুরুষ ও নারীরা নৃত্য করে। পুরুষদের তৈলনিষিক্ত কেশে গোঁজা থাকে নানা প্রকার ফুল, মেয়েদের গলায় দোলে উজ্জ্বল লাল প্রবালের তৈরি কণ্ঠহার।



শিরোভূষণ এবং বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত শবর নর্তক

ঝুমুর নৃত্যের চটুল ছন্দে পদক্ষেপ করে পুরুষ এবং নারীরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটো দীর্ঘ পংক্তির সৃষ্টি করে—এই উভয় পংক্তির মধ্যস্থলে অবস্থান করে গায়ক এবং বাদকগণ। মেয়েরা দাঁড়ায় পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে—ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্য্যন্ত একত্রে জড়ো করে। অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যুক্ত বাহু-যুগল থাকে সুমুখের দিকে ঋজুভাবে প্রসারিত। পুরুষেরাও অনুরূপভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাতধরাধরি করে নৃত্য করে। তালে তালে বাজতে থাকে ঢোলক ও বাঁশী আর নর্তক-নর্তকীরা যেন নৃত্যছন্দে লীলায়িত করতে

* মিকিরদের নৃত্যের বিশদ বিবরণ লেখকের '[illegible] প্রতিবেশী' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

করতে অগ্রসর হয়। কখনো তারা সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়ে, কখনো বা দাঁড়িয়ে যায় খাড়া ভাবে।

পাহাড়িয়াদের কোনো উৎসবেই স্ত্রীপুরুষের একই সারিতে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পরের হাতধরাধরি করে নাচের প্রথা নেই।

মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের নৃত্য

আমাদের দেশে নর্ম্মদা এবং গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আদিম জাতীয় লোকের বাস। বিন্ধ্যভূমি বুন্দেলখণ্ড এই বিস্তীর্ণ ভূভাগেরই অন্তর্গত। বুন্দেলখণ্ডের আদিবাসীদের করমা এবং শৈলা গীত প্রসিদ্ধ। এই উভয় গীতানুষ্ঠানই নৃত্যসম্বলিত। করমা গীত এই অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, কিন্তু এ হচ্ছে বিশেষ ভাবে বৈগাদের প্রিয় গীত। আগারিয়া, গোন্দ, কঁওর, পণিকা, ভূমিয়া, খৈরওয়ার প্রভৃতি আদিবাসীদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের পর যে গীত গাওয়া হয়, তার নাম 'মরমী'। উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনার পর স্ত্রীলোকেরা "সুয়া" নামক নৃত্যগীতে তাঁর তৃপ্তিবিধান করে থাকে।



পানিয়া নৃত্য

দক্ষিণ ভারতের আদিম জাতিদের মধ্যে পূর্ব্ব-গোদাবরী, বিশাখাপত্তন প্রভৃতি জেলার অধিবাসী শবররা অত্যন্ত কলা-নিপুণ জাতি। এদের বাদ্যযন্ত্রই অনূ্যন চব্বিশ প্রকার। উৎসবাদি উপলক্ষে এরা বিচিত্র বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক, বিপুল উৎসাহ সহকারে নৃত্য করে। এদের মোষের শিং এবং ময়ূরপুচ্ছে শোভিত শিরোভূষণের বাহার দেখবার জিনিষ। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে চলে বিবিধ বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গত। শবরদের লোকনৃত্য এবং লোকসঙ্গীতের মধ্যে এমনি একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাধুর্য্য আছে যে তা সম্যক্ সংরক্ষণযোগ্য।

বিশাখাপত্তন এজেন্সীর বোন্দা পোরজাদের নৃত্য হাস্য-রসপ্রধান। তরুণেরা পায়ে একটা সুতোর মধ্যে কতকগুলো ঘুঙুর বেঁধে নৃত্য করে। মেয়েরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে নাচের তালে তালে হাততালি দিতে থাকে, মাঝে মাঝে তারা তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে। পুরুষরা থপ থপ করে লাফায় এবং নিজেদের কুঠারের উপর ভর দিয়ে নৃত্য করতে করতে তাদের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করে।

দক্ষিণ ভারতের মালাবারের আদিম জাতিদের মধ্যে পানিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পানিয়াদের মধ্যেও নাচের বিশেষ প্রচলন আছে।

মধ্য ও পশ্চিম ভারতের ভীল জাতি আমাদের দেশের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিম জাতি। ভীল লোকনৃত্যের মধ্যে যে সহজ সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তা ধরা পড়ে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের চোখে। উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভীল নৃত্য শুধু ভারতের সর্ব্বত্র নয়, ভারতের বাইরেও প্রদর্শিত এবং প্রশংসিত হয়েছে। মণিপুরী রাস-নৃত্যের ন্যায় ভীলদের গৌরীনৃত্যেও আদিম লোকনৃত্যের সঙ্গে হিন্দু পুরাণকথার সংশ্লেষ ঘটেছে, ফলে গৌরীনৃত্য এক অনাবিল অধ্যাত্মরসে এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। গৌরীনৃত্যে দেখতে পাওয়া যায়—ভীলজাতির রূপভাবনা এবং ধর্ম্মসাধনার এক অপূর্ব্ব সমন্বয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভীলরা অনেকে তাদের এই গৌরবময় জাতীয় রিক্থের উপর বিরূপ হয়ে উঠেছে, ফলে এই নৃত্য ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে—কেবলমাত্র মেবারের ভীলরাই আজও পর্য্যন্ত তাদের এই নিজস্ব জাতীয় সম্পদকে পরম যত্নে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। সাম্প্রতিককালে অন্যত্র এর ধ্বংসাবশেষ-টুকুও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শুধু ভীলদের মধ্যেই নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কোনো কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিজস্ব লোক-নৃত্যের উপর একটা উপেক্ষামূলক মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে—আধুনিক সভ্যতার তীব্র রশ্মিচ্ছটায় বিভ্রান্ত হয়ে তারা নিজেদের পরম গৌরবের জিনিষকে হেয় জ্ঞান করতে শিখেছে। যে লোকনৃত্যের ধারা যুগযুগান্তর ধরে আদি-বাসীদের চিত্তভূমিকে সরস ও সঞ্জীবিত করে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তার বিনষ্টি শুধু আদিবাসীদের নয়, ভারতের সংস্কৃতির পক্ষেও যে গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে

দেশবাসীকে আজ সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং মণিপুরী নৃত্যের ন্যায় ভারতের অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের নৃত্যকলাকেও পুনরুজ্জীবিত করে গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টায় নৃত্যরসিকদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি থেকে সাহায্য পেয়েছি।

চমার্রী আদিম জাতিয়াঁ (হিন্দী) শ্রীঅখিল বিনয়। বিন্ধ্যভূমি (হিন্দী ত্রৈমাসিক)

The Art of Cave Dweller—G. B. Brown, *The Primitives*—O. C. Gangoly, *Dance in India* G. Venkatachalam, *The Angami Nagas*—J. H. Hutton, *The Ao Nagas*—J. P. Mills, *The Story of an Indian Upland*—F. B. Bradley Birt, *Report on the Socio-Economic Conditions of the Aboriginal Tribes in the Province of Madras*— Dr. A. Aiyappan, M.A., Ph.D.

স্কাইলাইট-ঘর

ও' হেন্‌রী

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মিসেস পার্কার প্রথমেই আপনাকে জোড়া-বৈঠকঘর দেখাবেন। তারপর ঘরগুলির নানা সুবিধা এবং গত আট বছর থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সব ভদ্রলোক সেখানে বাস করেছেন তাঁদের গুণাবলীরও এমন বর্ণনা দেবেন যে, আপনাকে স্রেফ চুপ করে সে সব শুনে যেতে হবে। এমন সময় আপনি হয় ত বলে ফেললেন যে, আপনি ডাক্তার কিম্বা ডেন্টিষ্ট কোনটাই না। আপনার কথা শুনে তিনি তখন এমনই মুখভঙ্গী করবেন যা দেখে নিজেরই বাপ-মায়ের ওপর আপনারই আর আগের শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকবে না—মিসেস পার্কারের ঘরের যোগ্য করে তাঁরা আপনাকে লেখাপড়া শেখান নি বলে।

এর পর, আপনি একটি সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠলেন। তিন তলার সে ঘরগুলির ভাড়া আট ডলার করে, কিন্তু মিসেস পার্কার আপনাকে কমিয়ে দেবেন। তাদের আসল ভাড়া হ'ল বার ডলার।

মিঃ টুজেন্‌বেরী তাঁর ভাইয়ের কমলা-বাগানের ভার নিয়ে পামবীচের কাছে ফ্লোরিডায় চলে গেলেন, নইলে এই সেদিনও তিনি বার ডলার করেই ভাড়া দিয়ে গেছেন। আর মিসেস ম্যাকিণ্টায়রি ত প্রতি বছর এই সামনের দুখানা ঘর, আর সঙ্গের বাথরুম নিয়ে সারা শীতকালটাই এখানে কাটিয়ে যান।

এ সব শুনে সঙ্কুচিত হয়ে আপনি হয় ত বললেন—আপনি আরও সস্তায় ঘর খুজছেন।

এর পরও যদি আপনি শ্রীমতীর বিরাগভাজন না হন, এবার তিনি আপনাকে চারতলায় মিঃ স্কিডারের বড় হল ঘর দেখাতে নিয়ে যাবেন, যদিও ঘরখানি খালি ছিল না।

মিঃ স্কিডার দিনভর এ ঘরে বসে সিগারেট ফুঁকতেন, আর নাটক লিখতেন। কিন্তু যে কেউ ঘর খুঁজতে আসলে তাকে একবার তাঁর ঘরের দামী ঝালর-পর্দাগুলি দেখান হ'ত। আর সেই সেগুলি দেখে গেলেই পাছে ভদ্রলোককে উঠে যেতে বলা হয় সেই ভয়ে তিনিও সেবারের ভাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে দিতেন।

তার পর—আপনার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে—তার পরও যদি আপনি সঙ্কোচ করেন আর পকেটের ঘামে ভেজা তিনটি ডলার তপ্ত হাতে চেপে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে আপনার অমার্জ্জনীয় এবং উৎকট দারিদ্র্য জানান, মিসেস পার্কার আর আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেন না। তিনি এবার জোর গলায় 'ক্লারা' বলে হাঁক দিয়ে আপনার দিকে পেছন ফিরে গটগটিয়ে নীচে নেমে যাবেন। তখন কাল গোছের একটি দাসী এসে আপনাকে নিয়ে কার্পেট-বিছান মই বেয়ে পাঁচতলার স্কাইলাইট-ঘরখানা দেখাবে। হল ঘরের মাঝখানে ৭×৮ ফুট মাপের এই ঘরের চারিদিকে একটি করে অন্ধকার গুদাম। আসবাবের মধ্যে একটি লোহার খাট, হাত ধোয়ার পাত্র, আর একটি চেয়ার। তাকে আয়না রেখেই ড্রেসিং টেবিলের কাজ চলে। ঘরের চারটে ন্যাড়া দেয়াল যেন শবাধারের চারটে পাল্লার মত আপনাকে ঠেসে ধরবে। আপনার হাত আপনিই গলার কাছে সরে আসবে, আপনি একবার 'খাবি' খেয়ে যেন সেই কুয়ার ভেতর থেকে ওপরে তাকিয়ে তবে নিশ্বাস ফেলে বাঁচবেন। কারণ ছোট স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে এক ফালি নীল আকাশ চোখে পড়ে।

ক্লারা এবার তাচ্ছিল্যভরে বলবে—আজ্ঞে, দু' ডলার।

মিস লীসন ঘর খুঁজতে খুঁজতে একদিন এখানেই এসে উপস্থিত হ'ল। তার হাতে একটি ভারি টাইপ রাইটার—বোধ হয় কোন জোয়ান হাতেই সেটা বেশী মানাত।

মেয়েটি আকারে খুবই ছোট, কিন্তু তার চুল এবং চোখ দুটি যেন তার দেহের বাড় স্থগিত হবার পরও বেড়ে গেছে। সর্ব্বদাই

যেন বলছে ওকে—আশ্চর্য্য! তুমি আমাদের সঙ্গে বাড়তে পারলে না? মিসেস পার্কার যথারীতি তাকে জোড়া-বৈঠকঘর দেখালেন।

এ ঘরে—তিনি বললেন—তুমি নরকঙ্কাল এনিসথেটিক (সংজ্ঞানাশক পদার্থ) কিম্বা কয়লা রাখতে পার।

কুমারী লীসনের গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল; বললে—কিন্তু আমি ত ডাক্তার কিম্বা ডেন্টিষ্ট কোনটাই না।

শ্রীমতী পার্কার তাকে সেই স্নেহময়, কৃপাকঠোর দৃষ্টি হানলেন (যারা ডাক্তার কিম্বা ডেন্টিষ্ট হতে পারে নি তাদের সঙ্গে তিনি এমনিই করতেন)। তিনি এবার তিন তলায় এলেন।

আট ডলার!—লীসন চমকে উঠল—আমায় ছিমছাম দেখছেন বটে, কিন্তু আমি গরীব মানুষ—খেটে খাই। নীচের বা ওপরের দিকে আমায় আরও কিছু সস্তার দেখান।

এমন সময় মিঃ স্কিডারের দরজায় টোকা পড়ল। বেচারি ঘর ভর্ত্তি সিগারেটের টুকরোর মধ্যে হাত থেকে আর একটি টুকরো ছুড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

মাপ করবেন মিঃ স্কিডার—ভদ্রলোকের ফ্যাকাশে মুখের দিকে ডাইনীর হাসি হেসে মিসেস পার্কার বললেন—আপনি ঘরে আছেন জানতাম না। মেয়েটিকে একবার ঘরের পর্দ্দাগুলো দেখাতে এনেছিলাম।

ভারি সুন্দর!—কুমারী লীসনের মুখে দেবকন্যার মত পবিত্র হাসি।

ওরা চলে গেল। মিঃ স্কিডার চট করে তাঁর অধুনাতম (অনভিনীত) নাটকের ঢ্যাঙা, কাল চুলওলা নায়িকাকে রবার দিয়ে ঘষে তুলে তার জায়গায় একটি ছোট্ট রূপসীকে বসিয়ে দিলেন—নবীনার মাথায় সোনালী ঘন চুল আর চোখে মুখে উচ্ছল হাসি। মিঃ স্কিডার এবার পর্দ্দার উপর পা মেলে দিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'আনা হেল্ড, (আগের নায়িকা) এবার হিংসায় জ্বলে মরবে।' তারপর সিগারেটের ধোঁয়ায় একটি ক্ষুদ্র মেঘলোকের সৃষ্টি করে বায়বীয় কাট্‌ল্‌-মাছের মত তাতেই অদৃশ্য হলেন।

সহসা ক্লারার নামে ডাক পড়তে মিস লীসনের আর্থিক সংগতি জগতে প্রচার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি কাল মেয়ে-দৈত্য এসে, তাকে সিড়ির বৈতরণীর ওপর দিয়ে টেনে এনে একটি ঘরের মধ্যে ঠেলে দিলে—ঘরের চারিদিকে অন্ধকার, কেবল ওপর দিয়ে একটু আলো আসছে।

ক্লারা বললে—দু'ডলার।

এটাই নেব—মিস লীসন নড়বড়ে খাটখানির ওপর বসে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। মিস লীসন রোজ দিনের বেলায় কাজে বেরিয়ে যেত, রাত্রে হাতে-লেখা কতকগুলি পাণ্ডুলিপি এনে টাইপরাইটারে তারই নকল ছাপত।

কোন কোন দিন রাত্রে হাতে কাজ থাকে না; তখন সে অন্যান্য ভাড়াটেদের সঙ্গে ছাতের একটি উঁচু জায়গায় এসে সিড়ির ওপর বসে থাকত।

যখন লীসনের সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়, তাকে স্কাইলাইট-ঘরে রাখার কোন উদ্দেশ্যই বোধ হয় বিধাতার ছিল না।

প্রফুল্ল-হৃদয় মেয়েটির স্বভাব সত্যি বড় কোমল, আবার অনেক আজগুবি খেয়ালও ছিল তার মাথায়।

এক দিন সে মিঃ স্কিডারকে তাঁর বিশাল (অপ্রকাশিত) ব্যঙ্গ-নাট্যের পুরো তিনটে অঙ্কই পড়ে শোনাতে দিল।

মিস লীসন যখনই দু'এক ঘণ্টার জন্য ছাতের সিড়িতে এসে বসে, তখনই পুরুষ ভাড়াটেদের মধ্যে একটি খুশীর চাঞ্চল্য দেখা যায়।

মিস লংনেকার নামে একটি ঢ্যাঙা মেয়ে ওপরের ধাপে এসে বসত। সে কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং তার একটি মুদ্রাদোষ আছে—প্রত্যেক কথাতেই বলে—'বটে, তাই নাকি!'

নীচের ধাপেও আর একটি মেয়ে বসে—নাম ডোর্ণ। সে কোনও বড় দোকানে চাকরি করে আর প্রতি রবিবারে 'কোণী'তে গিয়ে জুয়া খেলে আসে। কিন্তু মিস লীসন মাঝের ধাপে এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষেরা তাকে ঘিরে ধরে বসে যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিঃ স্কিডার। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর ব্যক্তিগত (অবশ্য গোপন) জীবন-নাট্যের প্রধান ভূমিকায় মেয়েটিকে মনে মনে স্থির করে রেখেছেন। আর আছেন মিঃ হুভার—বয়স পঁয়তাল্লিশ; মোটা এবং গবেট।

মিঃ ইভান্স আবার বয়সে অতি তরুণ। তিনি থেকে থেকে ভান করে উৎকাশি তোলেন, ইচ্ছাটা এই—মিস লীসন একবার তাকে সিগারেট খাওয়া ছাড়বার জন্য তোষামোদ করুক।

পুরুষেরা সবাই একমত হয়ে বলে—লীসনের মত এমন হাসি-খুশী মেয়ে আর হয় না।

কিন্তু উপর আর নীচের ধাপের মেয়ে দুটির মনে কোন মার্জনা নেই।

গ্রীষ্মকাল। এক দিন সন্ধ্যায় মিসেস পার্কারের ভাড়াটেরা এভাবে ছাতে বসে আছে। মিস লীসন আকাশের পানে চেয়ে হেসে উঠল, কেন ঐ ত বিলি জ্যাকসন। আমি এখান থেকেও বেশ দেখতে পাচ্ছি।

জ্যাক্‌সন-চালিত হয়ে সবাই একসঙ্গে উপরে তাকাল—কেউ আকাশচুম্বী হর্ম্ম্যগুলির গবাক্ষপথে, আবার কেউ বা বিমানপোতের সন্ধানে।

মিস লীসন তখন ছোট আঙ্গুল দেখিয়ে বললে—ঐ তারাটির কথা বলছি; ঐ যে বড় একটা ঝিক্‌মিক্ করছে, সেটা নয়—তার পাশের নীলাভ স্থির তারাটা। আমার ঘরের স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে ওটাকে দেখা যায় কিনা, তাই নাম রেখেছি 'বিলি জ্যাক্‌সন'।

'বটে, তাই নাকি!' মিস লংনেকার বললে—আপনি [illegible] একজন জ্যোতির্বিদ তা ত জানতাম না, মিস লীসন।

ওতো ভারি!—ক্ষুদে জ্যোতির্বিদ বললে—আসছে বছর [illegible] গ্রহে কি ধরনের জামার হাতা লোকে পরবে তাও বলে দিতে [illegible]

"বটে, তাই নাকি !—মিস লংনেকার আবার বললে, আপনি যে তারাটার কথা বলছেন, ওটা কেসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত একটি বিশেষ নক্ষত্র—নাম 'গামা'। ওটা একটা দ্বিতীয় আকারের নক্ষত্র, ওর গতিরেখা হ'ল···

তরুণ ইভান্স তাকে বাধা দিয়ে বললে—আপনি যাই বলুন, ওর চেয়ে বিলি জ্যাকসন নামটা কিন্তু ঢের ভাল।

আমারও তাই মত—মিঃ হুভার চড়া গলায় মিস লংনেকারের কথা কেটে বললেন—আমার মনে হয় প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদ্‌দের মত মিস লীসনেরও নক্ষত্রের নাম রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

বটে, তাই নাকি !—মিস লংনেকার বললে।

ওটা ধূমকেতু নয় ত ?—মিস ডোর্ণ বললে—এবারকার কোণীতে আমি দশটার মধ্যে ন'দানই জিতে এসেছি।

এখান থেকে ওটাকে তত ভাল দেখা যায় না—মিস লীসন বললে—দেখতে হয় আমার ঘর থেকে।

আপনি জানেন বোধ হয় কুয়ার ভেতর থেকে দিনের বেলাও তারা দেখা যায়। রাতের বেলা আমার ঘরখানাও একটি কয়লার খাদ হয়ে যায়, আর তারই সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বিলি জ্যাকসনকে দেখলে মনে হয় ওটা যেন তামসী রাত্রির অঙ্গবাসে একটি বড় হীরার পিন।

এরপর এক সময় এল যখন বাড়ীতে এনে নকল করার মত কোন কাজ লীসন পেত না। সুতরাং, চাকরির চেষ্টায় সে সারাদিন আপিসে আপিসে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু চাকরি ত হ'লই না, বরং দুর্বিনীত চাকরের দ্বারা প্রত্যাখাত হয়ে বিষাদে ওর মন ভরে গেল।

এ ভাবেই কতদিন গেল।

রোজ রাত্রে যে সময়ে সে রেস্তোরায় খেয়ে ফিরত, সেই সময়েই এক দিন সে ক্লান্তপদে মিসেস পার্কারের বাড়ীর উপর তলায় চড়তে লাগল। হলঘরে আসতেই মিঃ হুভার তাকে দেখতে পেলেন। সুযোগ বুঝে তিনি তাঁর মেদবহুল দেহখানা তুষারপর্বতের মত তার মাথার উপর ঝুঁকিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে বসলেন। মেয়েটি কোন মতে মাথা বাঁচিয়ে সিঁড়ির কোণ চেপে ধরল। ভদ্রলোক এবার তার হাত ধরবার চেষ্টা করলেন।

লীসন হাত টেনে নিয়ে তাঁর গালে একটি লঘু আঘাত করে রেলিঙে ভর দিয়ে এক এক পা করে দেহখানা উপরে টেনে নিয়ে চলল।

এবার সে মিঃ স্কিডারের দরজা পার হ'ল। তিনি তখন লাল কালি দিয়ে তাঁর (প্রত্যাখ্যাত) মিলনাত্মক নাটিকার নায়িকা মিস ডেলোর্মে (মিস লীসনের) জন্য মঞ্চনির্দেশ লিখছিলেন—নৃত্যছন্দে মঞ্চের বাঁ দিক থেকে বেরিয়ে কাউন্টের (অভিজাত-পুরুষের) পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

মিস লীসন হামাগুড়ি দিয়ে কার্পেটপাতা মইটা পার হয়ে স্কাইলাইট ঘরের দরজা খুলল। তার তখন পোষাক বদলানোর কিংবা আলো জ্বালবারও শক্তি নেই। সে খাটের উপর তার ভঙ্গুর দেহখানা এলিয়ে দিল—খাটের পুরনো স্প্রীংগুলো একটুও দমল না তবু। তারপর পাতালসদৃশ সেই অন্ধকার ঘরে শুয়ে সে তার ক্লান্ত চোখের পাতা মেলে একটু হাসল। 'বিলি জ্যাকসন' তখন স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে।

আঁধারে চারিদিক মুছে গেছে—লীসনও যেন ডুবে গেছে সেই অতলান্ত আঁধারের গভীরে। কেবল পাণ্ডুর আকাশের এক ফালি চতুষ্কোণ কাঠামোয় বাঁধা আছে সেই তারাটা—মনের খেয়ালে সে যার নাম দিয়েছিল, 'বিলি জ্যাকসন'।

মিস লংনেকার বোধ হয় ঠিকই বলেছেন—কেসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের সামান্য একটি নক্ষত্রই হয় ত 'গামা'; তবু ত সে ওটাকে 'গামা' বলে মেনে নিতে পারছে না—পারছে না বলতে 'বিলি জ্যাকসন' নয় ওটা।

মেয়েটি শুয়ে শুয়েই দু'বার হাত তোলার চেষ্টা করল, তৃতীয়বারে শীর্ণ দুটি আঙুল ঠোঁটের উপর রেখে সেই অন্ধকার কোটরের ভেতর থেকে 'বিলি জ্যাকসনে'র উদ্দেশ্যে একটি চুম্বন পাঠিয়ে দিল। তার হাতখানা আবার পাশে নেতিয়ে পড়ল।

বিদায়, 'বিলি', চললাম—ক্ষীণকণ্ঠে বললে সে—লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে তুমি; একবার কি চোখের পলকও ফেললে না আমার দিকে। তবু ত তুমি আমার দৃষ্টিপথেই জেগে আছ! চারিদিকের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ছাড়া চোখে যখন আর কিছুই পড়ে না, তখনও আমি তোমায় ঐখানেই দেখেছি—তাই না ?

···লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে···বিদায় 'বিলি জ্যাকসন।'

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ—হাবসী-দাসী ক্লারা দেখল তার দরজা বন্ধ। দরজা ভেঙে খোলা হ'ল। সির্কা, হাতঘষা—এমনি কি পোড়া পালখ শুকিয়েও যখন কোন ফল হ'ল না, এক জন ছুটল এম্বুলেন্স ডাকতে।

একটু পরেই হৈ চৈ করে দরজার কাছে গাড়ী এসে দাঁড়াল। সাদা জিনের কোট গায়ে দিয়ে চটপটে ছোকরা ডাক্তারটি বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ছুটতে লাগল।

৪৯ নম্বরে এ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছিল!—ডাক্তারটি চট করে জিজ্ঞেস করলে—ব্যাপার কি ?

হাঁ, ডাক্তারবাবু।—অন্যের বিপদের চেয়ে তাঁর বাড়ীতেই বিপদটি ঘটায় গুরুত্ব যে বেশী, এ ভাবে মুখ বিকৃত করে মিসেস পার্কার বললেন—আমি ত বুঝতেই পারছি না মেয়েটার কি হয়েছে ? অনেক চেষ্টা করেও ত জ্ঞান আনা গেল না। মেয়েটার বয়স বেশী না—নাম এলসী—হাঁ, এলসী লীসন। আমার বাড়ীতে আগে কখনো···

ঘরটা কোথায় ?—ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল। হতচকিত হয়ে মিসেস পার্কার বললেন—স্কাইলাইট-ঘরে। ওটা···

মনে হ'ল ডাক্তার স্কাইলাইট ঘরের হালচাল সবই জানে। সে একসঙ্গে চারটে করে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে গেল। মিসেস পার্কার আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্ম ধীরে ধীরে তার পিছু নিলেন।

দোতলায় উঠে দেখলেন ডাক্তার দু'হাতে মেয়েটিকে উঠিয়ে নেমে আসছে। তাঁকে দেখে ডাক্তার এবার দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁর প্রতি রসনারূপী কৌশলী ডাক্তারী ছুরিকা প্রয়োগ করল—অবশ্য জোরে নয়।

ক্রমে মিসেস পার্কার যেন কাঁটায় ঝোলান মাড়-দেওয়া পোষাকের মত কুঁচকে লম্বা হয়ে গেলেন—সে কুঞ্চনের রেখা সারা জীবন আর তাঁর দেহমন থেকে মুছল না।

সময়ে সময়ে তাঁর কৌতূহলী ভাড়াটেরা জিজ্ঞেস করত—ডাক্তার আপনাকে কি বলেছিল বলুন ত?

থাক না ওসব—মিসেস পার্কার উত্তর দেন—ওকথা শোনার পরও যদি মার্জ্জনা পাই, তা হলেই আমি খুশী হব।

শিকারের পেছনে যেমন কুকুরের দল ঘিরে ধরে, এম্বুলেন্স ডাক্তারটিও তেমনি লোকের ভীড় ঠেলে মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে চলল। লজ্জিত হয়ে অনেকে পথের এক ধারে সরে দাঁড়াল; কারণ ডাক্তারের মুখ দেখে মনে হ'ল সে যেন নিজেরই কোন লোকের শব বহন করে চলেছে।

দেখা গেল এ্যাম্বুলেন্সে পাতা বিছানায় মেয়েটিকে না শুইয়ে, গাড়ীতে উঠেই ডাক্তার হুকুম করল—

উইলসন, হাঁকাও—যত জোরে পার।

এই ত ঘটনা—কিন্তু গল্প হ'ল কই? পরদিন সকালের কাগজে একটি ছোট খবর দেখলাম এবং তারই শেষের ক'টি কথা থেকে আপনারাও হয়ত (আমার মত) ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে নিতে পারবেন।

তাতে লেখা ছিল—

'৪৯ নম্বর' পূর্ব্ব—রাস্তা থেকে একটি তরুণীকে বে.লভ্যু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মেয়েটি দীর্ঘ অনশন হেতু দুর্ব্বলতায় আক্রান্ত হয়েছিল।

শেষ ছত্র এরূপ—

'এ্যাম্বুলেন্স ডাক্তার—উইলিয়াম জ্যাকসন, (যিনি রোগিণীর চিকিৎসা করেছিলেন), বলেছেন রোগিণী আরোগ্যের পথে।'

পরিচয়

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নিঃস্ব হয়েও বিশ্বে কারেও লিখি নাই দাসখত
তোষামোদে নত করি নি উচ্চশির,
দৈন্যে কোথাও হই নাই নত খাড়া আছি পর্বত
ভিন্ন যে আমি পান্থ এ পৃথিবীর।
ভাগ্যের রোষ জীবনের পথে ঘটাল বিপর্য্যয়
কাহারো দুয়ারে পাতি নাই তবু হাত,
বিপদেতে কেউ কাছে এসে মোরে দিয়ে গেছে বরাভয়
এমন কখনো হয় নি সুপ্রভাত।
জীবনের এই অগ্নিদাহের চলন্ত গতিপথে
জ্বলন্ত আমি দহিতেছি নিশিদিন,
সর্ববিপদ তুচ্ছ করিয়া বেঁচে আছি কোনোমতে
চলিয়াছি তবু ছন্দে বাজায়ে বীণ।
চারিদিকে মোর কালবৈশাখী দুর্য্যোগ সাইক্লোন্
কর্মের পথে সঙ্গী বজ্রাঘাত,
দৈবেরি এই বিদ্রূপে আমি সব ভয় ভঞ্জন-
টলাবে না মোরে লক্ষ বিপৎপাত।
জীবনসিন্ধু মন্থন করি উঠেছিল যত সুধা
সঙ্গীরা মোর লুটে নিল নিজমুখে,
ছিল কালকুট তাই দিয়া মোর মিটাইনু সব ক্ষুধা
বিদ্রূপ করি হাসে সবে কৌতুকে।

একদা কাব্যহিংসার বিষে ধ্বংসিতে যারা মোরে
ভাগ্য দুয়ারে এসে দিয়েছিল হানা,
খ্যাতির উর্দ্ধে রহি তারা হায় আজো কাছে এসে ঘোরে
তাদের খবর হ'ল না কাহারো জানা।
কর্মক্ষেত্র মরুভূমি মোর অগ্নি শয্যাতল
ক্ষুধার খাদ্য নীচদের বিদ্রূপ,
তবু টলি নাই খাড়া আছি আমি ধৈর্য্যে অচঞ্চল
পথের ধূলিতে জ্বলে মোর দীপধূপ।
সমুদ্রসম অতল দুঃখ শূন্যের হতাশায়—
বহিবারে মোর শক্তি দিলেন যিনি,
সেই দয়ালের দয়া কহিবার শক্তি আমার নাই
দিনরাত মোর পথের সঙ্গী তিনি।
আমি যে আগুন—আমি যে পদ্ম—এসোনাকো কেউ কাছে
যদি ভালো লাগে—ভালবেসো দূরে থাকি',
শিশুর মতন সরলের লাগি' এ দুয়ার খোলা আছে
তাহাদের আমি বুকের মাঝারে রাখি।
শ্রেষ্ঠ মানুষ খুঁজে নাহি পাই এই দুঃখেতে দহি'
তাই কারো পায়ে করি নাই নতিদান,
নিজেরে কোথাও করি নি খর্ব এই গর্ব্বেরে বহি'
গেয়ে চলি একা দুঃখ জয়ের গান।

আমাদের অজানা সৈনিক

ভবানী আক্কার যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স আট বৎসর মাত্র। পরের বছর, মাত্র বারো বৎসর বয়সে বসন্ত-রোগে তাঁর স্বামী মারা যান। তখন থেকেই তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বাস করে আসছেন, এর মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই তাঁর কেটেছে ধারওয়ারে তাঁর ভায়ের আশ্রয়ে। ঘর-গৃহস্থালির কাজে তিনি তাঁর ভ্রাতার পরিবারের সবাইকে সাহায্য করে থাকেন। নিজ পরিবারে এবং বন্ধু-বান্ধবদের পরিবারে তিনি প্রসূতিদের পরিচর্য্যা করেন, বিবাহ-অনুষ্ঠানে, পীড়িতের রোগশয্যাপার্শ্বে, সর্ব্বত্রই তিনি হাজির থাকেন, কারো অন্তিমকাল উপস্থিত হলে সেখানেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। কাছের মানুষ এবং প্রিয়জনের নিকট তিনি একধারে নার্স, ধাত্রী, পাচিকা, রজকিনী সব কিছুই। অন্যে তাঁকে দিয়ে এসব কাজ করাতে চায় বলেই যে তিনি এসব করে থাকেন তেমন নয়, সকলের সেবা করবার উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি এসব কাজে রত হন। নিজের হাতে বিবাহিতা তরুণীদের প্রসাধনকার্য্য করে দেওয়াও তাঁর প্রিয় কাজ এবং এতে তিনি আনন্দ পান।

একথা বলা হয় যে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা স্বামীর মৃত্যুর পর সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁরা তাঁদের স্বামীর মৃত্যুর পর উন্নয়ন-সংস্থা পরিচালনা করে আসছেন, দুগ্ধ-বিতরণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করছেন, অনাথাশ্রম চালাচ্ছেন, কিন্তু উপরের নজীর থেকে দেখা যাবে যে, সমাজকর্ম্মের এমন আর একটি দিক আছে যাকে বাস্তবরূপ দান করছেন ভবানীর মত হিন্দু বিধবারা। পরিবারে যখন কারো দীর্ঘকালব্যাপী অসুখ হয়, তখন ভবানী দিনরাত তার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থেকে অক্লান্তভাবে তার সেবাশুশ্রূষা করেন যদিও এখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধা। প্রসূতিপরিচর্য্যায় এই বয়সেও তিনি গুরুতর পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মজনিত ক্লান্তিবোধ করেন না।

কেউ কেউ বলেন, সমাজকর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয় যখন কোন বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান ঠিকমত চালু থাকে না। আমাদের সমাজে বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়েছে যার দরুন বিধবাদের প্রতি সমাজের সেবামূলক কর্ত্তব্যের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে, কিন্তু আমি একথা বলব যে, ভারতের হিন্দু বিধবাদিগকে সামগ্রিকভাবে এমন একটি সামাজিক সংস্থাস্বরূপ গণ্য করা যায় যার সেবাকার্য্য দ্বারা সমাজ উপকৃত হচ্ছে। ভবানী নিজের পরিচিত যে-কোন লোকের জন্য কল্যাণকর্ম্ম করে থাকেন, এই কাজের জন্য তাঁর কোন পারিশ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না এবং সে দাবিও তিনি কখনো করেন না। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সেবাকার্য্যের জন্য যে-কোন মুহূর্ত্তে তাঁকে পাওয়া যায়। আমি মনে করি না যে, এই অবস্থায় তিনি কোন প্রকার আর্থিক আনুকূল্য কামনা করেন, তা সত্ত্বেও কিন্তু এই শ্রেণীর বিধবাদের জন্য কোন-না-কোনরূপ সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন এবং এর ব্যবস্থা করতে পারে একমাত্র পরিবারই; এবং তা-ই করা উচিত, বিশেষতঃ পরিবার যখন তাঁর নিকট থেকে সর্ব্বোত্তম সমাজসেবামূলক কর্ম্ম পেয়ে থাকে। ভারতে এমন অনেক ভবানী আছেন, যাঁরা সামাজিক বা আর্থিক কোন সাহায্য দাবি না করে সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন—অর্থের আকারেই হোক অথবা নিরাপত্তার আকারেই হোক, কোন পারিশ্রমিক তাঁরা পাচ্ছেন না। এ পর্য্যন্ত এ ধরনের স্বার্থলেশহীন কাজ আমাদের স্বীকৃতিলাভ করে নি। সুতরাং আজ সমাজের কর্ত্তব্য আমাদের দেশের অনেক ভবানীর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা।

কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজকর্ম্মী

টি. এন. জগদীশন

এই প্রবন্ধে আমরা কুষ্ঠব্যাধির সামাজিক দিকের উপর জোর দিব এবং কুষ্ঠ আরোগ্য ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের সমাজকর্ম্মের কথা—যাহা অধিকাংশ সমাজকর্ম্মীর সাধ্যায়ত্ত—কতকটা খুঁটিনাটি সহ বর্ণনা করিব। কিন্তু তাহার আগে আমাকে একথা উল্লেখ করিতেই হইবে যে, আজ যদি কুষ্ঠরোগের দরুন অনেক সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে তো তাহার কারণ এই যে, ইহা মূলতঃ স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা। এ বিষয়টা বরাবরই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ কুষ্ঠব্যাধির দরুন যে সমস্যা দেখা দেয়, তাহা স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সমস্যা। ইহাও অন্যান্য ব্যাধির মত একটি ব্যাধি এবং ইহার প্রতি চিকিৎসা-বিভাগের ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মীদের মনোযোগ যথোচিতরূপে এবং ব্যাপক ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

সুতরাং কুষ্ঠব্যাধির সম্পর্কে সমাজকর্ম্মের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আন্তরিকতার সহিত এ কথাও বলিব যে, যে পর্য্যন্ত না সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, চিকিৎসা-বৃত্তিজীবিগণ এবং পাবলিক হেলথ-এর কর্তৃপক্ষ কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উৎসাহান্বিত এবং তৎপর হইয়া উঠিবেন সেই পর্য্যন্ত এই পুরাতন এবং বহু আশঙ্কিত ব্যাধির সঙ্গে সম্পর্কিত শোচনীয় সামাজিক সমস্যাসমূহের অবসানও আমরা দেখিতে পাইব না।

এখন প্রশ্ন এই যে, কুষ্ঠবিষয়ক তথ্যাদি শিক্ষাদান সম্পর্কে সমাজকর্ম্মী কি করিতে পারেন?

গোড়াতেই আমি আপনাদিগকে মন হইতে কুষ্ঠব্যাধি সম্পর্কে যাবতীয় পূর্ব্বধারণা ঝাড়িয়া ফেলিতে অনুরোধ করিব। ইহা সহজ নয়। কিন্তু বিষয়টি ঠিকমত বুঝিয়া আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা ইহা করা সম্ভব। কুষ্ঠকে নিবার্য্য এবং চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, জটিলতর অবস্থায় উপনীত হইলেও এই রোগ অপ্রতিকার্য্য নহে।

কুষ্ঠ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত তথ্যগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া সমাজকর্ম্মীরা প্রভূত কল্যাণকর্ম্ম করিতে পারেন।

১। কুষ্ঠ এমন একটি ব্যাধি যাহা নিবার্য্য এবং চিকিৎসাসাধ্য।

২। কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া লজ্জাকর নহে। ইহা অভিশাপস্বরূপও নয়—মূলতঃ ইহা কুৎসিত ব্যাধি নয়।

৩। কুষ্ঠ বংশগত ব্যাধি নয়। ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের দরুন যক্ষ্মার মত ইহাও পরিবারগুলিতে সংক্রামিত হইতে পারে।

৪। কুষ্ঠব্যাধির শতকরা আশীটি 'কেস' সংক্রামক নহে।

৫। কুষ্ঠের সংক্রমণক্ষমতা মৃদু, কিন্তু সংক্রমণক্ষমতা-বিশিষ্ট রোগীদের পক্ষে শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা উচিত নয়, কেননা বিশেষভাবে শিশুদের দেহেই এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৬। রোগীদের অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং চিকিৎসা চালাইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু কুষ্ঠ-রোগের ক্ষেত্রে নাটকীয় দ্রুততায় ফললাভের কিংবা আরোগ্যের আশা করা সমীচীন নয়। কুষ্ঠব্যাধির সাম্প্রতিক কালের ঔষধ "সালফোন"সমূহ খুবই ফলপ্রদ। এগুলিকে ধীরভাবে ক্রিয়াশীল কিন্তু অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৭। "পৃথককরণ" "স্বতন্ত্রীকরণ" প্রভৃতি শব্দ লোকের মনে প্রায় নির্ব্বাসনদুঃখের অনুরূপ বেদনাদায়ক অনুভূতি সঞ্চারিত করে। কিন্তু কুষ্ঠরোগের বেলায় পৃথককরণ মানে সংক্রামক রোগী এবং শিশুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ নিবারণের পন্থা অবলম্বন।

৮। কুষ্ঠরোগ-প্রতিষেধ-কার্য্যের অগ্রগতির পথে সকলের চেয়ে বড় বাধা হইতেছে যুগযুগান্তরের কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা। যখন একবার আমরা সর্ব্বসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাইতে পারিব যে, কুষ্ঠ একটি সাধারণ ব্যাধিবিশেষ তখন আমরা ইহাকে একটি সাধারণ স্বাস্থ্যঘটিত সমস্যারূপে দেখিয়া এ সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইব।

৯। কুষ্ঠরোগীর পক্ষে যে স্বতন্ত্র আশ্রয়স্থল বা অনাথ আশ্রমের প্রয়োজন হইবেই এমন কোন কথা নাই, তাহার চিকিৎসার এবং মাঝে মাঝে হাসপাতালে অবস্থানের প্রয়োজন। কিন্তু যতদূর সম্ভব, তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে রাখার ব্যবস্থা আমা-দিগকে করিতে হইবে অথবা জীবনযাপনের এমন ক্ষেত্র তাহার জন্য তৈরি করিতে হইবে যেখানে আছে তাহার উপ-যোগিতা, যেখানে বজায় থাকিবে তাহার আত্মসম্মান।

১০। যে জিনিষটির জন্য কুষ্ঠকে ভীতিপ্রদ ব্যাধি বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইতেছে এই ব্যাধিজনিত বিকলাঙ্গতা—যাহার দরুন অনেক রোগীকে দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। অঙ্গহানি

এবং উপেক্ষাসঞ্জাত অঙ্গহানির পরিণামে মনুষ্যশক্তির প্রভূত অপচয় হইয়া থাকে। ডক্টর পল, ডবল্যু ব্র্যাণ্ড এবং তাঁহার ভেল্লোরস্থ সহকর্ম্মীরা ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদের স্মরণীয় কার্য্যের জন্য কুষ্ঠরোগীদের সম্পর্কে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। কেননা এখন আমরা একথা জানি যে, কুষ্ঠজনিত বিকলাঙ্গতা সারানো যাইতে পারে। এমন কি ইহা নিবার্য্যও বটে।

১১। সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ এবং সমাজকর্ম্মীরা কুষ্ঠব্যাধি নিবারণ-অভিযানে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিতে পারেন, যদি তাঁহারা ভারতের শহর এবং গ্রামসমূহে এই রোগের কারণ এবং প্রতিকার ইত্যাদিবিষয়ক তথ্যাবলী ব্যাপকভাবে প্রচার করেন এবং যদি এই কথার উপর জোর দেন যে সংক্রমণক্ষমতা বিশিষ্ট কুষ্ঠরোগী যেখানে থাকুক না কেন নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি মানিয়া চলিলে সে কুষ্ঠব্যাধি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করিতে পারে।

(ক) রোগীকে একটি আলাদা কক্ষে শয়ন করিতে হইবে এবং শিশুদের সঙ্গে যাহাতে একত্রে না শুইতে হয় সে বিষয়ে তাহাকে খুব সাবধান থাকিতে হইবে।

(খ) তার বিছানাপত্র এবং খাওয়ার ও রান্নার পাত্রাদি আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) তার ব্যক্তিগত কাপড়চোপড়, শয্যাবস্ত্রাদি এবং গামছা ইত্যাদি ধুইবার পূর্ব্বে বীজাণু-প্রতিষেধক দ্রব্যে (Anti-septic Solution) ভিজাইয়া লইতে হইবে। ইহার চেয়েও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইতেছে পরিবারের কাপড়চোপড় হইতে আলাদা ভাবে এগুলি ধুইবার ব্যবস্থা করা।

(ঘ) তাহার নিজস্ব চেয়ার এবং মাদুর থাকা উচিত, এবং তাহার পক্ষে শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা সমীচীন নয়।

কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত এই সকল বিষয় ব্যাপক ভাবে প্রচার করিয়া সমাজকর্ম্মী, রোগীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে নির্ব্বান্ধব নিঃসঙ্গতা বোধ তাহা দূর করিতে সক্ষম হয়। এমনি ভাবে রোগীর দুর্ব্বহ মানসিক বোঝা লাঘব করিয়া কর্ম্মী এবং সাধারণ লোকেরা যে কল্যাণকর্ম্ম করিতে পারে বাস্তবিকই তাহা অমূল্য। অনুরূপভাবে, কুষ্ঠরোগের কথা চিন্তা করিলে অধিকাংশ নারী ও পুরুষের মনে যে ভয় এবং আতঙ্কের উদ্রেক হয় তাহা হইতেও আমরা তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারির। আমি জোর গলায় বলিতে পারি যে, জনসাধারণের প্রতি ইহা এক [illegible]। কেননা ইহার মাধ্যমে আমরা তাহাদিগকে [illegible] দিতেছি—তাহা [illegible]।

কুষ্ঠব্যাধি-সংক্রান্ত নানা বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারপূর্ব্বক আমরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেছি যাহা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণকে সম্ভাব্য করিয়া তুলিবে।

রোগীদের পরিবারের বন্ধুরূপে সমাজকর্ম্মী কি করিতে পারেন ?

সমাজকর্ম্মী নিঃস্ব লোকেদের মধ্যে কুষ্ঠব্যাধির এত আধিক্য দেখিয়াছেন যে, প্রথমে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের কথাই তাঁহার মনে পড়িয়া থাকে। নিঃস্ব রোগী নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে আমাদের সাহায্য পাইবার যোগ্য, কিন্তু যে সমাজকর্ম্মী কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণে সহায়তা করিবেন তাহাকে প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কুষ্ঠব্যাধি আসলে একটি গার্হস্থ্য সমস্যা।

ভারতে কুষ্ঠরোগ ছড়াইয়া পড়িবার অতি সাধারণ কারণটি হইতেছে সুস্থ শিশুদের সঙ্গে একই ঘরে সংক্রমণ ক্ষমতাবিশিষ্ট রোগীদের বাস—তাহাও আবার প্রায়শঃই বহু জনাকীর্ণ অবস্থায়। যদি সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট রোগীদের সুস্থ শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় তাহা হইলে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যাইবে, কেননা শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ বন্ধ হইলে সমাজে কুষ্ঠ টি'কিয়া থাকিতে পারে না। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞ এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইলেও তাহারা তদনুসারে চলিতে সমর্থ হয় না। অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী সম্প্রদায়ের লোকেরা সকল ক্ষেত্রেই যে কম অজ্ঞ হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহাদিগকেও যখন কি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায় তখন ইহার ফলে পাছে রোগের কথা জানাজানি হইয়া পড়ে সেই ভয়ে তাহারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা পরিহার করিয়া চলে। কুষ্ঠসমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হইতেছে কুষ্ঠ সম্বন্ধে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' ভাব পরিহার করা এবং তাহা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হইবে যখন লোকে ইহাকে একটি নিবার্য্য, চিকিৎসাসাধ্য সাধারণ ব্যাধি বলিয়া মনে করিবে এবং যখন এই ধারণাও তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইবে যে, এই রোগ সম্বন্ধে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। যখন আপনি কোন রোগীকে তার করণীয় কি এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে চাহিবেন তখন নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম অবলম্বন করিবেন।

(১) বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইবেন—

(২) রোগী যদি সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট হয় তবে প্রথম যা করণীয় তাহা হইতেছে এই যে, শিশুরা—তাহারা নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক যাহাতে তাহার সঙ্গে না থাকে

সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শিশুদিগকে আপনি আপনার নিজের পরিবারে লইয়া যাইতে পারেন। শিশুদিগের দায়িত্ব লইবার জন্য আপনি রোগীর আত্মীয়স্বজনকে প্রণোদিত করিতে পারেন, অথবা আপনি তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন শিশুনিকেতনসমূহে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উপযোগী চিন্তাধারা অথবা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা রোগীর নিকট হইতে পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। কাজেই তাহার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনকে সহানুভূতির সহিত অসুবিধাগুলিকে মানিয়া লইয়া, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী কি কি প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং রোগীর সংবেদনশীলতাকে আঘাত না করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) রোগীর চিকিৎসা অবশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু তাহার নিজের কিংবা অপরের যে-সকল শিশুকে তাহার সংস্পর্শে থাকিতে হয় তাহাদের সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের পর তবেই রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্তের দিকে মনোযোগ দিতে হইবে।

সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট রোগীকে কোন স্বাস্থ্যনিবাসে প্রেরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু যখনি আপনি কোন লোককে তাহার গৃহ হইতে দূরে পাঠাইবেন তখনই আপনাকে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহার পরিবারের লোকদের যথোপযুক্ত সংস্থান হয়। প্রত্যেক সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট রোগীরই কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসে যাইবার প্রয়োজন নাই। রোগের সংক্রামকতা এবং গুরুত্বেরও মাত্রাভেদ আছে। সংক্রামকতা যেখানে অতিরিক্ত রকমের নয় অথবা রোগী যেখানে যথাযথভাবে শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারে, সেখানে তাহাকে সমাজে থাকিয়া নিজের কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে এবং সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে এই ভ্রান্ত ধারণা-বশতঃ শিশুদের শিক্ষাদান ইত্যাদি যে সকল বৃত্তির দ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ সেগুলিতে তাহাকে নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কুষ্ঠব্যাধি নিবারণে যাহারা উৎসাহী, তাহাদের এই মতবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা উচিত যে, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেই যে জীবনের সকল সুযোগ-সুবিধার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। যে রোগ সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট নহে, সমাজ যাহাতে তাহাকে পরিত্যাগ না করে সে বিষয়ে আপনি আপনার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারেন। আপনি তাহার কর্ম্মপ্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন অথবা তাহাকে কোন কাজে নিযুক্ত করিতে পারেন।

আরোগ্যনিকেতন (Relief home) এবং হাসপাতাল সংগঠিত করিয়া সমাজকর্ম্মী কি করিতে পারেন সে বিষয়ে বিশদভাবে আমি কিছু লিখিতে চাই না। ঐ ধরণের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রত্যেক কর্ম্মীর সাধ্যায়ত্ত নহে। যে সকল অসাধারণ কর্ম্মী সংগঠনক্ষমতাসম্পন্ন, ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ এবং যাহাদের উৎসাহ অফুরন্ত তাহারা ঐরূপ বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে কতটুকু করিতে পারি আপনাদিগকে তাহা বলাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য সুতরাং আপনাদের নিকট আমার চরমকথা হইতেছে এই :—

কুষ্ঠব্যাধি-সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্যসমূহ অবগত হইয়া আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন। এই ব্যাধি সম্বন্ধে আপনার ভয় পরিহার করুন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবেরাও যাহাতে ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। যে কোন রোগীকে আপনি জানেন তাহার বন্ধু হোন। তাহাদিগকে আপনার সদ্ভাব এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করুন, কিন্তু তাহাদিগকে কেবল-মাত্র কৃপা করিবেন না। বন্ধুর মত রোগীর ব্যক্তিগত সমস্যা-সমূহের সমাধান করিবার চেষ্টা করুন। তার মনের ভার লাঘব করিবার চেষ্টা করুন এবং তাহার নিকটে আনন্দ এবং আশার বার্ত্তা আনয়ন করুন। আপনার পরিচিত কোনো রোগী যদি বিকলাঙ্গ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়া থাকে তো প্রায়ই তাহার সঙ্গে দেখা করুন, তাঁর একাকিত্বের দুঃসহ যাতনা দূর করুন, কথাবার্ত্তায় তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলুন—তাহাকে বই পড়িয়া শোনান, তাহার নিকট চিঠি লিখুন, তার দৌত্যকার্য্য করুন। আপনি তখন হইবেন নির্ব্বান্ধবের সুহৃদ এবং যাহারা নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত তাহাদের নিকট আপনার পদধ্বনি আশার সঙ্গীতের মত প্রতিভাত হইবে।

পরিত্যক্ত শিশু

পরিত্যক্ত শিশুটি শুয়েছিল ভীমা নদীর তীরে। পাণ্ঢার-পুরের সাবজজ রাওবাহাদুর লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর এটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল, তখনকার দিনের ভারতে যার কোন সমাধান ছিল না। এটা হ'ল ১৮৭৫ সনের ঘটনা।

পাণ্ঢারপুরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাবজজ স্থির করলেন যে এই একটি মাত্র শিশুকে নিয়েই তিনি কুড়িয়ে

পাওয়া শিশুদের জন্য একটি আশ্রম (home) প্রতিষ্ঠা করবেন এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র জীবন যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সে বিষয়ে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

দুই বৎসর পরে ফাউণ্ডলিং হোমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় একটি অনাথ আশ্রম এবং এর মাধ্যমে এই ধরণের শিশুদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হয়। ভিন্ন এলাকায় বদলী হওয়ার সময় রাও বাহাদুর এই হোমের প্রশাসনের ভার বোম্বাইয়ের সমাজসেবামূলক সংস্থা—'প্রার্থনা-সমাজে'র উপর ন্যস্ত করেন।

এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, অবৈধ শিশু বলে কিছু নেই, থাকতে পারে কেবলমাত্র অবৈধ পিতা এবং মাতা। অবৈধ শিশুর পিতামাতার কাহিনী যতই মর্ম্মান্তিক হোক না কেন, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার দুর্গত মা প্রায়ই তাকে মেরে ফেলে অথবা কোন প্রকাশ্য স্থানে তাকে ফেলে দিয়ে আসে—এদের সম্পর্কে আমাদের এমন দায়িত্ব আছে, মানবতার দিক দিয়ে যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই সমস্ত শিশুকে সাহায্য করার যথাযথ পন্থা সম্বন্ধে রক্ষণশীল সমাজকে প্রবুদ্ধ করা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়, এবং সমাজ-কর্ম্মীদের প্রতিকূল জনমতের তরঙ্গ অথবা নিছক ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধেএজন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

এই সকল অসুবিধা এবং বিরুদ্ধতার দরুন, ১৯০৮ সনের পূর্ব্বে কুমারী-মাতাদের জন্য এমন কোন আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নি যেখানে এসে তারা উপেক্ষিত এবং সমাজচ্যুত হওয়ার পরিবর্ত্তে সন্তানপ্রসবের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করতে পারত। যদিও বহু ক্ষেত্রে সামাজিক অপরাধের জন্য তারা কতটুকু দায়ী সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ ছিল তথাপি সমাজ তাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিচার-বিবেচনা করে নি এবং অনেক অবিবেকী ব্যক্তি তাদের দুর্ভাগ্যকে উপলক্ষ্য করে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিতেও কসুর করে নি। ভারতে বালিকারা কেন কুমারী অবস্থায় মা হয় তার বহু কারণ আছে। বালবিধবাদের সঙ্গে প্রায়শঃই—এমন কি পারিবারিক পরিধির মধ্যেও, পাপাচরণ করা হয়, অভিভাবকত্বের পদে আরূঢ় অথবা কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও তাদের সুযোগসমূহের অপব্যবহার করে থাকেন। বিধবা মায়ের সঙ্গে অথবা একাকিনী অবস্থানকারিণী অরক্ষিতা বালিকা হয় প্রবঞ্চিত—পাণিপ্রার্থীরা ভঙ্গ করে তাদের প্রতিজ্ঞা। কখনও কখনও নিছক অর্থাভাব কোন কোন বালিকাকে উন্মার্গগামিনী হতে বাধ্য করে। এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই যে, ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের পরিণামে স্ত্রীলোকেরা ভণ্ড গুরু এবং [illegible] লোকেদের দ্বারা বিপথগামিনী হয়।

ক্রমোন্নতির ফলে বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে অনাথ আশ্রম ছাড়া অতিরিক্ত আরও তিনটি বিভাগ সংশ্লিষ্ট হয়েছে:—মেটার্নিটি হোম বা মাতৃসদন, গৃহহারাদের গৃহ এবং সংশোধনাগার (Reclamation Home)। তিন থেকে ছয় বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য একটি মন্তেসরি ক্লাস খোলা হয়েছে এবং ছেলে মেয়ে উভয়কেই স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহে ভর্ত্তি করানো হয়। ছেলেরা মাত্র দশ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে।

ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এবং এখানকার সরল ও স্বাভাবিক গৃহ-জীবনের অংশীদার হয়। তাদের গার্হস্থ্য কর্ম্ম ও হাতের কাজ শেখানো হয় এবং সঙ্গীত শেখাবার ব্যবস্থাও করা হয়। নার্স অথবা আয়ার কাজে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভের দরুন অনেক স্ত্রীলোক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আসার পর নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়।

এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়প্রাপ্তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত কাহিনীগুলি এত মর্ম্মস্পর্শী যে তা আর বলবার নয়; কিন্তু এ কথা সত্য যে, পাণ্ঢারপুরের 'ডবল্যু. ডি. নাওবংগে অর্ফেনেজ এণ্ড ফাউণ্ডলিং এসাইলাম' নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি এখন স্ত্রীলোক এবং যে সকল শিশুর তত্ত্বাবধান করা দরকার তাদের পক্ষে প্রকৃত স্বর্গে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে চূড়ান্ত যত্নের সঙ্গে নারী এবং শিশুদের তত্ত্বাবধান করা হয় এবং গোপন কথা যাতে ব্যক্ত না হয়ে পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। এই সব মেয়ে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং ভারতের সমুদয় অঞ্চল থেকে আগতা। ১৯৪১-৫০ সনের নিয়োদ্ধৃত পরিসংখ্যান থেকে এখানকার কর্ম্মপ্রচেষ্টা কি ধরণের এবং তার দ্বারা কত জন উপকৃত হয়েছে তা বুঝতে পারা যাবে।

১।	মেটার্নিটি হোমে ভর্ত্তি হওয়া স্ত্রীলোক	১১০৯
২।	পরিত্যক্তা স্ত্রী	১৬২
৩।	বিধবা	৬৬৪
৪।	অবিবাহিতা বালিকা	২৮৩
৫।	গৃহে জাত শিশু	১৭৯

এটা লক্ষণীয় যে, অবিবাহিতা বালিকাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে আগতা। যে-কোন বিশেষ বৎসরে ভর্ত্তি-হওয়া কুমারী-মাতার গড়পড়তা সংখ্যা ৪০ থেকে এক শতের মধ্যে। পাণ্ঢারপুরের 'হোম' প্রকৃত গৃহে পরিণত হয়েছে বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট "বাবা"র কল্যাণে। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী—যিনি বালিকা ও শিশুদের মাতৃস্থানীয়া, [illegible] সন থেকে ওখানে আছেন। এই "পিতামাতা" এবং তাদের "কন্যা"দের মধ্যে একটা নিবিড়

প্রীতির বন্ধন আছে এবং বিয়ের পর অনেক মেয়ে শিশুদের নিয়ে হোমে এসে অবস্থান করে—মনে হয় তারা যেন তাদের পিতামাতার নিকট এসেছে।

প্রধান সমস্যা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সমস্যা—এর বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৯০,০০০ টাকা। অধিকাংশের পক্ষেই আহার এবং বাসস্থান বাবদ কিছু দেওয়া সম্ভবপর হয় না এবং মাথাপিছু সাহায্য যথেষ্ট নয় বলে পাণ্ঢারপুর পৌর কর্তৃপক্ষের (Municipal Authority) ক্ষুদ্র বার্ষিক দানের পরিপূরকস্বরূপ দাতব্য বাক্স সঞ্চয়ের (Charity box Collection) উপর নির্ভর করতে হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এই হিতকারী প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বোচ্চ বার্ষিক অর্থসাহায্য ১৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

হোমের যে সকল সমস্যার সমাধান হয় নি তার অন্যতম হচ্ছে কুড়িয়ে-পাওয়া শিশুদের মৃত্যুহারের আধিক্য। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই মৃত্যুহার কিছুতেই শতকরা বাহান্নর কমে নামছে না। এর কারণগুলো সুস্পষ্ট। সন্তান-প্রসবের পূর্ব্বকালীন অবস্থায় তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ অভাব, পিতামাতার স্বাস্থ্যহীনতা, জোর করে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো ইত্যাদি শিশুদের অকালমৃত্যু না ঘটিয়ে ছাড়ে না—তারা এরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায় যে, তাদের ওজন সাড়ে তিন পাউণ্ডের বেশী হয় না।

প্রেমের বারি

তখন দুর্ভিক্ষের সময়, কোথাও ছিল না একবিন্দু জল। কুয়োর একেবারে তলদেশে যে সামান্য পরিমাণ জলও পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করে এক পাত্র-ভর্ত্তি জল নিয়ে আসবার জন্যে ছোট শিশুদের দড়ি দিয়ে বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হ'ত কুয়োর নীচে।

তখন দেবতারা যেন প্রকাশ করছিলেন প্রচণ্ড কোপ। পশু এবং পাখীরা কিছু জল পাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে জলের অভাবে মরছিল। এই বন্ধ্যা ভূমিতে কূপ খনন করে জল পাওয়ার কোন আশাই ছিল না।

এমনি দারুণ গ্রীষ্মে এক দিন অপরাহ্ণকালে আমরা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। সেই গ্রামে দেখা গেল মোটামুটিভাবে সঙ্গতিপন্ন চাষীরা পর্য্যন্ত ক্ষেতে মজুরের মত খাটছে। দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতি-নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ পেয়েছিল। আমাদের দেখামাত্র নিজেদের কাজ ফেলে তারা আমাদের চার পাশে জড়ো হয়ে নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল। তাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা এবং তাদের দুঃখের অবসান হোক এই আশা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করবার ছিল না।

আমরা বিদায় নেবার তোড়জোড় করছিলাম। "কিন্তু থামুন" হঠাৎ ভিড়ের মাঝখান থেকে এগিয়ে এল এক মধ্য-বয়সী ব্যক্তি—"আমি যেখানে আপনাদের নিয়ে যেতে চাই সে জায়গা না দেখা পর্য্যন্ত তো আপনারা এ স্থান পরিত্যাগ করতে পারেন না।" আমি একথা বলে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে, আমাদের কয়েকটি স্থানে যাওয়ার দরকার ছিল, কাজেই যদি খুব জরুরি এবং একান্ত প্রয়োজনীয় না হয় তো তার সঙ্গে গিয়ে কোন ফায়দা নেই।

সে কিন্তু, পীড়াপীড়ি করতে লাগল—"আমি বিষয়টা সংক্ষেপে সেরে ফেলছি" সে বললে—"আপনাদের ওখানে নিয়ে যেতে আমি কৃতসঙ্কল্প। দীর্ঘকাল যাবৎ এমন কারুর জন্যে আমি অপেক্ষা করছি যিনি আমার সঙ্গে ওখানে যাবেন। এইবার বিশ্বাস করুন আপনাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া আমার চাই-ই।"

আমার সঙ্গী এতে বিরক্ত হলেন, বললেন—"পাগলের মত এখানে সেখানে ছুটোছুটি করো না। অন্ধকার হওয়ার আগে আমাদের যে কতদূর যেতে হবে তা তো তুমি জান না।"

কিন্তু লোকটি তবু জেদ করতে লাগল, "আপনাদের যে আসতেই হবে। ওটা মাত্র আধ মাইল দূরে—মোটর-কারে ওখানে যেতে চার মিনিটও লাগবে না।"

সুতরাং তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা মোটর চালিয়ে এগোতে লাগলাম, আমরা এক মাইলও গিয়েছি কিনা সন্দেহ এমন সময় লোকটি বললে—"আমরা এখানে থামব।"

আমার সঙ্গী ভাবলেন যে, তামাশা অনেক দূর অবধি গড়িয়েছে—তাঁর তিরস্কারে গ্রাম্য লোকটি তাঁর কাছে এল।

"আপনার যদি ইচ্ছে হয় তো আপনি গাড়ীতে থাকতে পারেন, কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে অপরেরা আসুন এবং আমার কথা শুনুন," সে বললে।

আমরা গাড়ী থেকে নামলাম এবং পায়ে হেঁটে চলে গেলাম সদ্যখনিত একটি পুষ্করিণীর কাছে। আমার সঙ্গীর পক্ষে নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তিনি একেবারে ফেটে পড়লেন—

"আহা কি দেখলাম! তুমি আমাদের কেন এখানে নিয়ে এসেছ? মনে হচ্ছে এই পুষ্করিণীর জন্যে 'টাকাভি' কর্জ্জ পাবার উদ্দেশ্যে তুমি এই টোপ ফেলেছ।"

"অবশ্য আমার কি বলবার আছে সেকথা শুনতে আপনারা চাইবেন না। স্বভাবতঃই গরীব লোকের পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যশালী লোকদিগকে নিজের কথা শুনানো খুবই কঠিন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কাছে সুখ এবং দুঃখের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে কিনা সন্দেহ। আমি কোন 'টাকাভি' চাই না, অন্য কোন পুরস্কারও আমার কাম্য নয়। যা আমি কামনা করেছিলাম তা হচ্ছে—এই যে বিষয়টা কিছুকাল যাবৎ আমার উপর বোঝার মত চেপে বসে ছিল তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং সেইজন্যেই আপনাদের এখানে এনে কষ্ট দিয়েছি। আমার নিজের হাতে খনন-করা ঐ যে পুষ্করিণী এতে এখন প্রচুর জল আছে।"

আমার সঙ্গী কিন্তু রইলেন অবিচলিত। "এ সমস্তই অতি উত্তম, কিন্তু আমাদের বল কি পরিমাণ 'টাকাভি' তুমি চাও।"

"ধৈর্য্য ধরুন বন্ধু! কোন 'টাকাভি' আমি চাই না। বারো বৎসর আগে আমি হারিয়েছি আমার স্ত্রী আর শিশু সন্তানদের। আমার মত গরীব লোক তাদের স্মারক হিসাবে কি নির্ম্মাণ করতে পারে তাই হয়ে দাঁড়াল আমার ভাবনা। কিন্তু কিছু করা চাই তো, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত আমি সুরু করে দিলাম এই পুষ্করিণী খনন। এ হচ্ছে একটি প্রস্তরময় অঞ্চল এবং এ কাজ সম্পূর্ণ করতে আমার এই দীর্ঘ সময়ের সবটুকুই লেগেছে। সবে গতকাল মাত্র প্রথম ভূগর্ভ থেকে জল উত্থিত হয়েছে। আমার মনে হ'ল সবাইকে আমি আমার কুয়ো থেকে জল খেতে দেব। কাজেই যারই সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে তাকেই ডাকছি আমি।" হঠাৎ সে ধাপগুলোর উপর দিয়ে দৌড়ে নীচে চলে গেল এবং কিছু জল নিয়ে ফিরে এল। আমি চুমুক দিয়ে গ্লাস থেকে একটু জল খেলাম। আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। সে যখন আমার পানে তাকিয়েছিল তখন এই পবিত্র এবং ধার্ম্মিক লোকটির প্রতি আমি নীরব শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করলাম।

তাজ নির্ম্মাণ করতে গিয়ে শাহজাহান ব্যয় করেছিলেন তাঁর অর্থ—সে ছিল ক্ষমতা এবং ধনের গৌরব, কিন্তু এ পুণ্যকৃত্যের মূল উৎস হচ্ছে প্রেম।

কীর্ত্তিনীর জীবনব্রত

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইন্দোনেশিয়ার নারীদের দান এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর জাতিগঠনমূলক কার্য্যে তাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সর্ব্বাগ্রে যাঁর কথা মনে পড়ে, তাঁর নাম মাদাম রাদেন আজেং কীর্ত্তিনী। ইন্দোনেশিয়ার নারীসমাজ যে আজ যুগযুগসঞ্চিত অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে [illegible] হয়ে উঠেছে তার মূলে মুখ্যতঃ রয়েছে এই মহীয়সী মহিলার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও কর্ম্মশক্তি। যদিও তাঁর জীবনের মেয়াদ ছিল খুবই কম—মাত্র পঁচিশটি বৎসর এ পৃথিবীতে তিনি বেঁচেছিলেন।

কীর্ত্তিনীর পিতা ছিলেন উত্তর-মধ্য যবদ্বীপের জাপারার রিজেন্ট। বিলাসিতা এবং আয়েসের মধ্যেই তাঁর জীবনের যাত্রা সুরু হয়েছিল। শৈশবে মিঃ ভান ডেকেন্টার নামক

জনৈক ওলন্দাজ রাজকর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তিনি ইউরোপীয় প্রাইমারী স্কুলে যোগদান করেন। ইন্দোনেশীয় নারীদের মধ্যে প্রথম শিক্ষার আলোক লাভ করেন তিনিই। অতঃপর তিনি ডাচ হাই স্কুলে যোগ দেন এবং ইউরোপীয় নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। এটা হচ্ছে গত শতাব্দীর শেষ পাদের কথা। তৎকালে নারীদের অধিকারলাভের জন্য ইউরোপে যে সংগ্রাম চলছিল, একান্ত আগ্রহের সহিত সে সকল কাহিনী তিনি শুনতেন। স্বভাবতঃই নিজের দেশের নারীদের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি নিজে অবশ্য ইউরোপে যেতে পারেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও নেদারল্যাণ্ডের লেখনী-বন্ধুদের (Pen-friends) চিঠিপত্রের মারফতে তিনি ঘটনাবলী সম্পর্কে থাকতেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। বৈষম্যমূলক আর্থিক ব্যবস্থার দরুন ইন্দোনেশিয়ার নারীদের প্রতি কৃত অবিচার, ধর্ম্মীয় বিধানের জন্যে তাদের বহু বিবাহকে নির্ব্বাকভাবে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া এই সকল বিষয় তাঁর মনে গভীর বেদনার সঞ্চার করে এবং ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে তিনিই প্রথম তাঁর বিদেশের লেখনী-বন্ধুদের কাছে স্বদেশবাসিনীদের শোচনীয় অবস্থার কথা প্রকাশ করেন। নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁর পরিকল্পনা-সমূহের কথা তিনি পত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০৪ সনে সংগৃহীত এবং প্রকাশিত এই সকল পত্রই ইন্দোনেশিয়ার নারীদের মনে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জীবনে পুরুষদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমান অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত প্রেরণার সঞ্চার করে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়াকার দিকে সমগ্র এশিয়া জুড়ে যে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন হয় এবং দেশের প্রগতির জন্যে কীর্ত্তিনী যে পন্থা নির্দ্দেশ করেন তার দরুন কীর্ত্তিনী স্কুল প্রতিষ্ঠা সুরু হয় এবং দেখতে দেখতে তা সমগ্র দেশকে জালের মত ঘিরে ফেলে। এগুলো ছিল নারীদের জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়। নারীদের নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে আন্দোলন চালাবার পূর্ব্বে প্রয়োজন ছিল খানিকটা মূলগত শিক্ষালাভের।

ওদিকে কতকগুলি সংস্থা যুগপৎ নারীমুক্তি আন্দোলন-মূলক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ল। ১৯১২ সনে গঠিত হ'ল "পুতেরি মারদেকা" (স্বাধীন নারী) নামক সংস্থা। এর কাজ হ'ল যে সকল মেয়েদের স্বল্প আর্থিক সংস্থান আছে, অথবা একেবারেই নেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইসলামিক এবং খ্রীষ্টান সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব ধর্ম্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নারীদের উন্নয়ন-কার্য্যে ব্রতী হ'ল। এই বৎসরেই সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ত্রিশটি নারীকল্যাণ সংস্থা।

১৯৩৫ সনে জাকার্ত্তায় অনুষ্ঠিত হ'ল দ্বিতীয় সারা ইন্দোনেশীয় নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনের পর নারী-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আর কতকগুলি নারীকল্যাণ সংস্থা সংগ্রাম করতে লাগল নারীর ভোটাধিকার লাভের জন্য। ১৯৩৮ সনে সুরভায়া, বান্দুং এবং সেমারাঙের পৌর পরিষদে (Town Council) তিন জন নারী নির্ব্বাচিত হলেন—এই হ'ল নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের প্রথম বিজয়লাভ। ইতি-মধ্যে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ মহিলাদের সার্বিক (universal) ভোটাধিকার দানের কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করলেন। সবাই দাবি করলেন যে, এই অধিকার ইন্দোনেশীয় নারীদের মধ্যেও সম্প্রসারিত করা হোক্। অব-শেষে রাজনৈতিক চাপের দরুন ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশীয় নারীদেরও ভোটাধিকার প্রদান করতে সম্মত হলেন।

যুদ্ধের পরে এবং প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার প্রাক্কালে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া জুড়ে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি চলল। মুখ্য সংস্থাগুলো আত্মনিয়োগ করল সমাজ-কর্ম্মে—যেমন সাধারণ এবং দলগত রন্ধনশালা প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক সাহায্য (first aid) কেন্দ্র পরিচালনা, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নিকট খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ পাঠানো ইত্যাদি।

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৯ সনে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল, ফলে কওয়ানি নামে একটি নূতন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রীর পত্নী মাদাম আলি শাস্ত্রমিদজোজো ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান অধিনায়িকা। সম্প্রতি তিনি স্বদেশে সমাজ কল্যাণকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে-ছেন এবং ইন্দোনেশিয়ায় 'শ্রমদান' আন্দোলন সংগঠিত করছেন।

ইন্দোনেশিয়া এগিয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে। সাজাহিরির পরিষদে সমাজ-উন্নয়নের দপ্তর এক জন নারীর উপর অর্পিত হওয়া খুবই সময়োপযোগী এবং সমীচীন হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অংশীদার হওয়ার জন্য ইন্দোনেশিয়ার নারীসমাজে যে ধরনের প্রস্তুতি চলেছে তা ফলপ্রদ হতে বাধ্য—এবং তা অদূর ভবিষ্যতেই…

দেশ-বিদেশের কথা

গোরীপুর কলোনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের বিবরণ

গত ১লা সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া—গৌরীপুর কুষ্ঠ-কলোনীর সপ্তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কুষ্ঠাশ্রমবাসীদের উদ্যোগে জেলাশাসক এম. টি. আয়েঙ্গার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনা-সঙ্গীত 'হে রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ প্রণাম লহ শ্রীচরণে' গানটি দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভাপতি, প্রধান অতিথি সম্বলপুর হাতিবাড়ী কুষ্ঠাশ্রমের অধীক্ষক আইজাক সান্ত্রা আমন্ত্রিত বিশিষ্ট নাগরিকগণকে মাল্যভূষিত করেন। কুষ্ঠাশ্রমের অধীক্ষক ডাঃ পার্ব্বতী-চরণ সেন মহাশয় আশ্রমবাসীদের প্রতিষ্ঠান 'মিলনী সঙ্ঘে'র হস্তলিখিত পত্রিকা 'মিলনী' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলোনীর কার্য্যধারা সম্পর্কে মিলনী সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকারের লিখিত একটি বিবরণ পাঠ করেন শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন। তারপর আশ্রমবাসীদের সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও কৌতুকাভিনয়ের পর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আশ্রমের অতীত ইতিহাস, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, কুষ্ঠ ব্যাধিতে পূর্ণ বাঁকুড়া জেলায় এই আশ্রমের গুরুত্ব, কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক মর্য্যাদা দান এবং এই রোগের আধুনিক প্রতিষেধক ঔষধের গুণ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সভায় গীত কয়েকটি গান ও শ্রীযুক্ত সমর সেনের কৌতুকাভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। কুষ্ঠব্যাধিতে পঙ্গুপ্রায় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সুন্দর একটি কীর্ত্তন গান করেন। এই ব্যাধিতে তার স্বরনালীটি বিকৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গীত-সাধনার দ্বারা ইহাকে তিনি অটুট রাখিয়াছেন। আশ্রমবাসী শ্রীযুক্ত ভোলা বসুর স্বরচিত সঙ্গীত 'পৃথিবীর ইতিহাসে…' সময়োপযোগী হইয়াছিল। তিনি

নিজেই গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দদান করেন। তারপর কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে দৃষ্টিশক্তিহীন শ্রীযুক্ত সত্যেন মৈত্রের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা সকলকে অভিভূত করে।

মিলন সঙ্ঘের সভাপতি তাঁর অভিভাষণে বলেন, "আজ আমাদের উপনিবেশ-জীবনের একটি মহা আনন্দের দিন। আজ থেকে সাত বৎসর পূর্ব্বে এই উপনিবেশটির দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছিল। যে সংস্থার সভাপতি হিসাবে আমি আজ আপনাদের কাছে প্রাণের কথা নিবেদন করছি সেই মিলন সঙ্ঘের জন্ম হয়েছিল ১৯৫০ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী। সেদিনকার কয়েকজন সহায়সম্বলহীন কর্ম্মীর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে গড়ে ওঠে মিলন সঙ্ঘ। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, আজ মাননীয় রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার পূর্ব্বতন জেলাশাসক শ্রদ্ধেয় অশোক-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনলাল গোয়েঙ্কা প্রমুখ অনেকে আমাদের প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন। ডিষ্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে আমরা যে সাহায্য পেয়েছি তা সম্ভব হয়েছে আমাদের জেলাশাসক মাননীয় এম. এ. টি. আয়েঙ্গার মহোদয়ের অক্লান্ত চেষ্টায়।"

ডাক্তার পার্ব্বতীচরণ সেনের ভাষণ হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে এই কলোনীতে ৩২১ জন রোগী আছে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ২৯৫ জন, বিহারের অধিবাসী ১১ জন, ভারত ইউনিয়নের অন্যান্য রাষ্ট্রের ৮ জন এবং পাকিস্থানের ১৩ জন অধিবাসী আছে। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত কলোনীতে অবস্থানকারী পশ্চিমবঙ্গবাসী ২৯৫ জন রোগীর মধ্যে ১৩৬ জন রোগী অর্থাৎ শতকরা ৪৬ জনই বাঁকুড়া জেলার লোক। এই প্রতিষ্ঠান পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোকের মধ্যে কুষ্ঠরোগের প্রসার প্রতিরোধের চেষ্টা করিবে।

ডাক্তার সেনের ভাষণ হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, ১৯৪৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আজ পর্য্যন্ত কলোনীর হাস-পাতালে ৫৬১ জন রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯ জন সংক্রামক রোগী সংক্রামণ-দোষমুক্ত হইয়া কলোনী হইতে নিজ-নিজ আবাসে গিয়াছে। এই সকল রোগীর মধ্যে একজন ম্যাট্রিক পাস থাকায় তাঁহাকে রাজ্যসরকার কেরানীর কাজে বহাল করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ১৯৫২ সাল হইতে এখানে যেসব রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে তন্মধ্যে ২৩ জন রোগী সংক্রামণ-দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছে। যদি ইহাদের


উৎসবের
আয়োজনে বর্ষে বর্ষে ঋতুর রঙ্গমঞ্চে
প্রকৃতি সাজিয়ে নিয়ে আসেন তাঁর
রম্য অর্ঘের ডালি। বর্ণ, রূপ ও গন্ধের
বিচিত্র সমারোহে সেই ডালি চিরদিনই
পূর্ণ। এই পূর্ণতার অনুভূতিই উৎসবের
অন্তরের কথা। প্রসাধন-বিলাসীদের মনেও
"লক্ষ্মীবিলাস" তেমনি একটি সুরভিত
অনুভূতির স্পর্শ এনে দেয় বলে সকল
উৎসবেই এর আবেদন চিত্তাকর্ষক।
লক্ষ্মীবিলাস
তেল
এম. এল. বসু অ্যাণ্ড কোং লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস :: কলিকাতা

শারীরিক অবস্থা কোন কারণে খারাপ না হয় তাহা হইলে আর এক বৎসরের মধ্যে ইহারা বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ডাঃ আইজাক সান্ত্রা, ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, ডাঃ অনাথবন্ধু রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণের পর সভাপতি শ্রী এম. এ. টি. আয়েঙ্গার একটি মনোজ্ঞ ভাষণে কুষ্ঠ-রোগীদের প্রতি অবজ্ঞামূলক মনোভাব পরিহার করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তীর্থ-সংস্কার আন্দোলন

(১৩৬১ সালের কার্য্যবিবরণী)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী প্রবর্ত্তিত জাতি ও সমাজ গঠনমূলক বিবিধ কর্ম্মধারার মধ্যে তীর্থ-সংস্কার আন্দোলন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ তীর্থস্থানগুলি নানাবিধ কুসংস্কার এবং এক শ্রেণীর পাণ্ডার শোষণ উৎপীড়ন ও দৌরাত্ম্যের জন্য ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রতিকারকল্পে সঙ্ঘনেতা প্রায় সকল প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে সঙ্ঘের শাখাকেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক যাবতীয় অনাচার অত্যাচার দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া যাত্রী-সাধারণের পরম কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে ঐ সকল তীর্থ-সংস্কার-কেন্দ্রের ১৩৬১ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী প্রদত্ত হইল:

গয়া সেবাশ্রম: আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ২০,১৪৬; আহার্য্যপ্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা—১১১১; চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১২,৫১৫ (নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ে), পিতৃপক্ষ মেলায় ২০০ স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়। উক্ত যাত্রীনিবাসে একটি সাধারণ গ্রন্থাগারও গড়িয়া উঠিয়াছে। ৩৮৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্যদান করা হইয়াছে।

পুরী সেবাশ্রম: আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ১৬,৫৩২, আহার্য্য-প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ১০১৯; পাথেয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ৩১;

চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৮৬৪০, (নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ে); ছাত্রসংখ্যা ৪০ (আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়ে)।

প্রয়াগ সেবাশ্রম : আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ৩৩০৫, আহার্য্য-প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ৮৭০; পাথেয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ২০, চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৮৭৯ (নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ে); মাঘমেলায় সেবাকার্য্য; প্রত্যহ ৮২টি শিশুকে দুগ্ধ বিতরণ।

কাশী সেবাশ্রম : আশ্রয় ও আহার্য্যপ্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ১৫১২; চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১৫৫২ (নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ে), সাময়িক দান ৮৮০৲, বিদ্যার্থী ভবনে স্থানসংখ্যা ৪; বিশ্বনাথ মন্দিরে অন্নকূট মেলায় ৩০০ স্বেচ্ছাসেবক সহ সেবাকার্য্য পরিচালনা এবং আশ্রমে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে বিরাট উৎসব ও হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্মেলন।

বৃন্দাবন সেবাশ্রম : আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ৫৪০২, আহার্য্যপ্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ২০৫, চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১২,৬৬২; বিদ্যার্থী ভবনের ছাত্রসংখ্যা ২ জন।

কুরুক্ষেত্র—আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ৪৩৭ জন।

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি পাস করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কলিকাতা পোরসিলেন ওয়ার্কস লিমিটেড নামক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে যোগদান করেন। কর্ম্মদক্ষতা গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে উক্ত কোম্পানীর প্রস্তুত সেনিটারি, ইলেকট্রিক্যাল ও গৃহস্থদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বাজারে যথেষ্ট প্রশংসালাভ করিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের মান উন্নয়ন সম্পর্কে অধিকতর শিক্ষালাভ করিবার উদ্দেশ্যে সুনীল কুমার গত ২০শে সেপ্টেম্বর বিমানযোগে ইংলণ্ডে পটারি শিল্পের কেন্দ্রস্থল ষ্টোক্-অন-ট্রেন্টে রওনা হইয়াছেন। সুনীলকুমারের পৈতৃক নিবাস বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর।

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা

"জিতাষ্টমী"

শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ

বিগত ১৩৬১ ভাদ্র সংখ্যার পৃঃ ৫২৯-৫৩২ মধ্যে শ্রীসুখময় সরকার লিখিত 'জিতাষ্টমী' প্রবন্ধ পড়িলাম। বাঁকুড়া জেলায় ঐ পূজা ব্রাহ্মণ্য রীতি অনুযায়ী হইয়া থাকে ও উহা ইন্দ্রের পূজা বুঝিলাম। ঐ সময়ে নষ্টচন্দ্রের রাত্রি সম্পর্কিত অনুষ্ঠানও হয় জানিয়া বিস্মিত হইলাম।

মেদিনীপুরেও ধুমধামের সহিত এই পূজা হইয়া থাকে। শহরে প্রত্যেক পল্লীর মধ্যস্থলে অসংখ্য স্থানে এক একটি ধামায় নানা ফল ও ইক্ষুদণ্ডসহ পুরনারীগণ উপস্থিত হইয়া রাত্রে পূজা সম্পন্ন করান। প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামেও এই পূজা হয়। আমাদের গ্রাম বাসুদেবপুরে বাজার পাড়ার মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ গর্ত্তে কলাচারা রোপিত হয়। ধর্মের পূজক আঙটধারী ডোমপণ্ডিত পূজা করেন। চলতি কথায় এই পূজাকে জিতার গোট বলে। পূজার পূর্ব্ব রাত্রে প্রতি গৃহের কর্ত্রী মটর কলাই ভিজাইয়া রাখেন। পূজায় উহাই প্রধান নৈবেদ্য। উপকরণস্বরূপ একটি শশা, আতা কিম্বা ঝিঙ্গা দেওয়া হয়। পরদিন ঐ ভিজা কলাই, শশা ও ঘুসো মাছ যোগে পুঁই-শাকের তরকারী রাঁধিয়া খাওয়া হয়। পল্লীর দাই, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সকালে ঐ ভিজা কলাই চাহিতে আসে। পূজা রাত্রে একবার কোথাও কোথাও চারি প্রহরে চারিবারও হয়। মেদিনীপুরের মোদক প্রধান লোয়াদায় মূর্ত্তি গড়িয়া জীমূতবাহন পূজা হয়। ঐ পূজা ব্রাহ্মণই চারি প্রহরে করেন। একবার আমাকেও উক্ত পূজা করিতে হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ কথাসরিৎসাগরে জীমূতবাহনের উপাখ্যান আছে। তিনি বোধিসত্ত্বরূপে বর্ণিত। বোধিসত্ত্বের অর্থ তিনি কোন ভবিষ্যৎ জন্মে স্বয়ংবুদ্ধ হইবেন। তিনি রাজপুত্র ও পরোপকারের জন্য দেবতরু কল্পবৃক্ষ দান করেন এবং শঙ্খচূড়কে রক্ষার জন্য গরুড়ের খাদ্যরূপে নিজ দেহ অর্পণ করেন। আমাদের গ্রামের ধর্ম্মপূজক ডোমপণ্ডিত ঐ পূজা করায় উহা বৌদ্ধ অনুষ্ঠান বলিয়া সংশয় হয়।

বাঁকুড়ার মত মেদিনীপুর শহরের আবাসগড়ে পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট শক্রোত্থান দিবসে (এই বৎসর ২৩শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার) ইদ পরব অনুষ্ঠিত হয়। রাজা একটি বৃহৎ দণ্ড তুলিয়া এই ইন্দ্রপূজা বা ইদ সম্পন্ন করেন। মহাভারতের মতে উপরিচর রাজা দণ্ড উত্তোলন করিয়া এই পর্ব্বের সূচনা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে আদিবাসিগণই বহু সংখ্যায় এই পর্ব্বে যোগ দেন। বোম্বাই রোডে উক্ত ইদ কাষ্ঠ আছে।

পরিশেষে বাঁকুড়ায় এই পূজার রাত্রিতে নষ্টচন্দ্র অনুষ্ঠান কিরূপে প্রবেশ করিল তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। বাংলা ও সারা উত্তর ভারতে নষ্টচন্দ্র অনুষ্ঠান দেখিয়াছি। হিন্দুস্থানে ইহাকে চৌথ বলে। নষ্টচন্দ্র সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বচন :—"পঞ্চানন গতে ভানৌ পক্ষয়োরুভয়োরপি। চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন।" ইহার মর্ম্ম—ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষের চতুর্থীর চন্দ্র দেখিতে নাই। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির মতে শ্রীকৃষ্ণ এই চন্দ্র দেখিয়া প্রসেন বধ ও স্যমন্তক অপহরণরূপ মিথ্যা কলঙ্কে জড়িত হইয়াছিলেন। তাই সাধারণের বিশ্বাস এই চন্দ্র দেখিলে মিথ্যা কলঙ্ক হয়। স্যমন্তক উপাখ্যান শ্রবণ ও "সিংহ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ। সুকুমারকো মা রোদী স্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥" মন্ত্রপূত জলপান দৈবাৎ ঐ চন্দ্র দর্শনের প্রতীকার। সাধারণ প্রথামত পরের জিনিস চুরি কিম্বা ঢিল ছুড়িয়া অপরকে আহত করাই দৈবাৎ ঐ চন্দ্র দর্শনের কাটান। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী বা জিতাষ্টমীর পরদিনই শ্রীদুর্গা দেবীর নবম্যাদি কল্পারম্ভ হয়। পিতৃপক্ষের মধ্যেই এই দুইটি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শ্রাবণ সংক্রান্তির রাত্রে চতুর্থী হইলে মাসে তিনটি নষ্টচন্দ্র হইতে পারে।

পুস্তক পরিচয়

পূর্ণিমা—'ভাস্কর'। প্রকাশক: ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ, ৯ সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য দেড় টাকা।

রস-রচনায় ভাস্করের খ্যাতি আছে। ছোট গল্পকে সরস করিয়া বলিবার কৌশল তিনি জানেন। দীর্ঘ উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা। স্বল্প-পরিসর গল্পের ক্ষেত্রে যে ব্যঙ্গ-রসিকতা নিটোল মুক্তার মত উজ্জ্বল, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাহিনীতে তাহা শিথিলবন্ধ। যুগস্থিত জীবনকে ধরিয়া দিবার চেষ্টা তিনি আলোচ্য উপন্যাসে করেন নাই।

বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক উচ্চমনা যুবকের সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের স্বল্প শিক্ষিতা একটি মেয়ের প্রেম-কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র নিজ নিজ শিক্ষা ও ভালবাসা লইয়া মূল চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে, এবং সবগুলিকে লইয়া উপন্যাস হইয়াছে মিলনান্তক। গল্পকার ভাস্করের পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে না থাকিলেও গল্পটি সাধারণ পাঠকের ভালই লাগিবে।

পরমারাধ্যা শ্রীমা—শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। ভারতী বুক ষ্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা।

সাধুসন্তরা ভারতবর্ষকে বলিয়াছেন দেবভূমি। এই দেশের জল, মাটি আর বাতাসের গুণে মানুষের অন্তরের সদ্‌বৃত্তিগুলি পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করে, তখন পশুবৃত্তির কুপ্রভাব কাটাইয়া উঠা তাহার পক্ষে তেমন দুঃসাধ্য বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অবশ্য কোন কোন মনোবিদ বলেন, অন্তরের দুর্দম কামনাগুলি ইহলৌকিক ভোগে পরিতৃপ্ত হইবার সুযোগ-সুবিধা না পাইলে এক পারলৌকিক রাজ্যের মহিমা সন্ধান করিয়া ফেরে এবং স্বর্লোক ও দেব-কল্পনায় সেগুলিকে সংহত করিয়া একটি রূপলোকে অধিরূঢ় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ বহু সাধকের জীবন—বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী সারদামণির জীবন এই মতবাদের ব্যতিক্রম। ইঁহাদের জীবনে দেখা যায়—শিক্ষা-দীক্ষা, আচার, প্রথা, বিধিবিধান, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক মিলিয়া—প্রচণ্ড কামনাকে দিয়াছে সংযত শান্ত রূপ ; তাহারই প্রভাবে চিত্তবৃত্তি হইতে কলুষ-কর্দ্দমের কালিমা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, জীব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া ইঁহারা নিজে হইয়াছেন সার্থক, অপরকে করিয়াছেন সুখী। এই ভাবে পরাবিদ্যার অনুশীলনে যাঁহারা ভারতবর্ষের সাধক গোষ্ঠীতে উন্নীত হইয়াছেন, আপন জ্ঞান, কর্ম্ম, বিদ্যা প্রভৃতিকে জন-কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন—তাঁহাদেরই আমরা পুরুষানুক্রমে প্রতিদিন স্মরণ করিয়া থাকি। শ্রীমাও পুণ্যশ্লোকা নিত্যস্মরণীয়, এই সকল—ত্যাগব্রতীদের সমপর্য্যায়ভুক্তা।

শ্রীমায়ের জীবনের ইতিহাস অস্পষ্ট নহে। খুব বেশী দিনের কথা নহে—তাঁহার সদ্‌গুণের সৌরভ জয়রামবাটী-কামারপুকুর হইতে উঠিয়া সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ সারা ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বহু দেশে তাহা সুরভি-মণ্ডল রচনা করিয়াছে।

নশ্বর জগতের বস্তুনিচয় নশ্বর দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও আসলে দেহের যিনি অধিকর্তা সেই মনের ক্রিয়াতেই মানুষের সুখ-দুঃখের বোধ। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় জগৎকে লইয়া মন, কিন্তু মনের মধ্যে অহরহ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে—তাহারই প্রতাপে আমরা মুহ্যমান হইয়া আছি। সুখ-দুঃখের এমন কোন নিরিখ নাই—যাহা সকলের অনুভূতির সঙ্গে সমান তালে একই সুরে বাঁধা পড়ে। কাজেই জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতির উপচার বহন করিয়া পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনকে বোধযুক্ত করিলেও মন সেই সীমাতেই বাঁধা থাকে না—রূপাতীত, গুণাতীত বস্তু সন্ধান করিয়া আপন ধর্ম্ম পালন করে। ব্যক্তিগত ত্যাগ, তপস্যা, জীবনদর্শন তখন সমষ্টিগত জীবনকে স্পর্শ করে এবং তাহাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া গণ্য হয়।

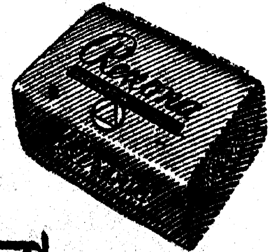
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন ত্যাগ ও উদার মতবাদের দ্বারা শ্রীসারদামাতার অন্তরে জনকল্যাণ-বোধের প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়াছিলেন—ইহলৌকিক দেহ-সুখের অভিলাষ সেই আলোকে ভস্ম হইয়া গিয়াছিল। মাতা সারদামণি অবিচল নিষ্ঠায় সেই দীপশিখাটিকে মাতৃত্বের তৈলনিষেকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন। অগণিত পথহারা সন্তান সেই দীপবর্ত্তিকায় পথ চিনিয়া [illegible] জীবন ধন্য করিয়াছে, লাভ করিয়াছে অপার আনন্দ। শ্রীমায়ের

আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...

ক্যাডিল্ * যুক্ত রেক্সো-না'কে আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে উন্মোচন করতে দিন

রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়-তায় ভরে তুলেছে।

* ত্বক্-পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।



বড় সাইজেও পাওয়া যায়

রেক্সোনা

ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান

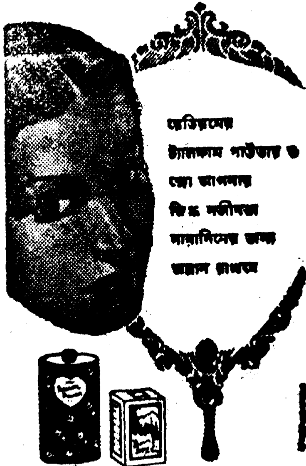
RP. 181-X38 BG

রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

পুণ্যচরিতকথা আস্বাদ্য হইবার উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

লেখক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পুণ্যকাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন। এটি শ্রীমায়ের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়, তাঁহার সাধনার ভাব-ব্যাখ্যা। পুস্তকখানিতে 'পরমপুরুষে'র রচনারীতি অনুসৃত হইলেও—শ্রীমায়ের মহিমা ও সাধনার দিকটি নূতন রূপে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন চরিত্র আর দুটি নাই বলিয়াই ত্যাগ তিতিক্ষা স্নেহমাখানো এই চরিতকথা বারবার পড়িয়াও ক্লান্তি আসে না।

বিনোদিনীর ডায়েরী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য চার টাকা।



কাহিনীর নায়িকা জমিদার ঘরের মেয়ে এবং জমিদার ঘরের বধূও। নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ঘরের আচার নিয়ম প্রথা প্রভৃতির সঙ্গে ইহাদের জীবনযাত্রার বেশ খানিকটা অমিলও আছে। ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক, উন্মার্গগামী স্বামী প্রভৃতির চিত্র কথাসাহিত্যে নূতন নহে, এবং এ যুগের পাঠক সাধারণের কৌতূহলও এ সম্বন্ধে হয়তো তেমন উগ্র নয়। এসব সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্য-শিখরে সমাসীনা একটি বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনা সাধারণ-মানব মনের দুয়ারে আসিয়া যখন আঘাত করে তখন তাহাকে একপাশে ঠেলিয়া রাখাও অত্যন্ত কঠিন। বিনোদিনীর মনের ঘাত-প্রতিঘাত এই দিক দিয়া পাঠক-চিত্তে সমবেদনা জাগাইবে, গল্প শেষ করিবার কৌতূহল জীয়াইয়া রাখিবে। অবশ্য গল্প বলিবার সহজ ভঙ্গীটুকু ইহার অন্যতম হেতু।

গল্পের প্রথমাংশ কিছু মন্থর—শেষাংশে গল্প জমিয়াছে। বিনোদিনী ও দেবকী ভট্টাচার্য্য সুচিত্রিত। গল্পের শেষাংশ pornography পর্য্যায়ে নামিবার সম্ভাবনা ছিল—এই সঙ্কটারূঢ় মুহূর্ত্তটিকে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন লেখক। তাঁহার লিপিকুশলতা প্রশংসনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা—শ্রীকপিল ভট্টাচার্য্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী লিঃ, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ পৃষ্ঠা ১৮৬। মূল্য চার টাকা।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই দেশের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই এক বা একাধিক নদনদীর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতেছে। কৃষিপ্রধান জনবহুল দেশে নদ-নদীর উপর স্বতঃই মানুষকে নির্ভর করিতে হয় এবং এজন্য দেশের সরকার যে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া নদী-পরিকল্পনার দ্বারা জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি, জল নিষ্কাশণ ও নূতন জমি উদ্ধার, মজা-নদীর পুনরুদ্ধার, নাব্য প্রণালীর উন্নতি ও সৃষ্টি, শহরে ও শিল্পে জল-সরবরাহ, মৎস্য চাষের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যনিবাস পত্তন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা খুবই সময়োচিত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্যের জন্য তোড়জোড় চলিতেছে।

জাতির এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য এই সকল বিরাট পরিকল্পনা যত স্বল্প ব্যয়ে এবং ভুলভ্রান্তি অপচয় এড়াইয়া হয়, ততই ভাল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপব্যয় ও অপচয় ব্যতীত সরকার বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের উপদেশে এরূপ কার্য্যে হাত দিয়াছেন যাহাতে ভবিষ্যতে দেশের বৃহৎ স্বার্থ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। কৃষির উন্নতির নামে আত্মহারা হইয়া সমগ্র দেশকে চিরকালের জন্য কৃষি ও কাঁচামালের উৎপাদক করিয়া রাখার পরিকল্পনাও কোন বুদ্ধিমান জাতির পক্ষে উচিত নহে; লেখক একজন প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার। এই গ্রন্থে সাধারণ পাঠকের জন্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলার নদ-নদীর সমস্যাগুলি বর্ত্তমান সরকারের তৎসংক্রান্ত পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছেন, এবং নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে মোট ষোলটি অধ্যায়ে লেখক বাংলা দেশের নদ-নদীর সাধারণ কথা, যুগে যুগে খাত পরিবর্তন, ও তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ব-দ্বীপের কথা, সুন্দরবনের কথা, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মুমূর্ষু ও পরিণত অংশের নদীগুলি, কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা, পশ্চিমবঙ্গের উপনদী, দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা, ফরাক্কা গঙ্গা-ব্যারেজ পরিকল্পনা, বৃষ্টি, বন্যা, প্লাবন, জলপ্রবাহের পরিমাপ, বন্যায় নদীর গর্ভ বসবে কেন?, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন রহস্য, জলশক্তি ও দেশের জলের হিসাব এবং নদী-পরিকল্পনার বিষয়ে অবশ্যজ্ঞাতব্য নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনায় বহু কোটি টাকা খরচের পর ইহার ফলস্বরূপ হুগলী নদীর নাব্যতা হইবে এবং কলিকাতা বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ইহাই লেখকের মত। ফরাক্কা

ব্যারেজ দ্বারাও হুগলী নদীর নাব্যতা রক্ষা করা যাইবে না ইহা লেখক অনুমান করেন। বহুস্থানে লেখক যুক্তি দেখাইয়া সরকারী কার্য্যের ও পরিকল্পনার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

এই গ্রন্থের বহুলপ্রচার শিক্ষিত সমাজে নদ-নদী সম্বন্ধে আগ্রহের বৃদ্ধি করিবে এবং জলের মত যে অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে তাহার প্রতি জনমত সজাগ রাখিবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কথিকা—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। ৪৪।১ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

জীমূতবাহন কথা, স্বর্গারোহণ, উর্ব্বশীসম্ভব, পান্থশালা, হস্তিরাজ কথা, ধর্ম্মান্ধ, শ্রীমন্তের হংস প্রভৃতি কয়েকটি গল্প-কবিতা। লেখায় চমৎকারিত্ব না থাক, একটি তৃপ্তিকর সহজ সুর আছে। তাই পড়িতে ভালো লাগে। কালীকিঙ্করবাবুর আরও কয়েকখানি কাব্য পাঠকদের সমাদর লাভ করিয়াছে, মনে হয়, ঐ পরিচ্ছন্ন সহজ ভঙ্গীটির জন্যই। আজকাল চটকদার কবিতার যুগ। নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ কম কবিরই আছে। আলোচ্য গ্রন্থের কবি জাতির জীবন ও সাহিত্য হইতে কথাবস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন, দেখিয়া ভালো লাগিল। কবিতাগুলিতে স্বদেশের ভাবজীবন প্রতিফলিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর জীবন—শ্রীসুধেন্দুকুমার রায়। প্রাপ্তিস্থান: এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ। কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

গান্ধীজীর জীবন-সাধনা প্রধানতঃ গীতার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত—আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। রচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে কিন্তু অসংখ্য ছাপার ভুল গ্রন্থের মর্য্যাদাহানি করিয়াছে।

নুরজাহান—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার। বঙ্গবাণী, ২৬ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য আট আনা।

"জনম লভিয়া এই জগতের কোলে,
নুরজাহানে যে বা দেখেনি কোন কালে,
বৃথাই জনম তার বৃথাই জীবন,
কুড়ালো ঝিনুক শুধু ফেলিয়ে রতন।"

এই মহাসত্য ঘোষণার জন্য পদ্য-পুস্তিকাখানির অবতারণা। পার্থসারথি, বুদ্ধদেব এবং যীশুখ্রীষ্ট প্রমুখ মহাপুরুষগণ 'নুর জাহান' অর্থাৎ জগজ্জ্যোতির দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ইহাই গ্রন্থের বক্তব্য। 'নূরজাহান'-ই কি প্রচলিত বানান নয়? বানান যাহাই হউক, নাম লইয়া লেখক একটু কসরৎ দেখাইয়াছেন বটে।

কল্পনা—শ্রীতুলসীদাস সিংহ। প্রাপ্তিস্থান: বিশ্ব প্রেস, বাঁকুড়া। মূল্য দেড় টাকা।

তিনটি গল্প: মায়ের ডাক, ভিখারিণী, অপমৃত্যু। কলাকৌশলের বিচারে কিছু কিছু ত্রুটি হয়তো ধরা পড়িবে, তবু বড় কথা হইতেছে এই যে, জীবনের ছবি অনেক স্থানে স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে। প্রথম গল্পে রাইচরণ, মানদা ও রতনের দুঃখ-দারিদ্র্য, মান-অভিমান সহজেই হৃদয় স্পর্শ করে।

কলিকা—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। বাণীবীথি, ১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দশ আনা।

নব্বইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিমূলক পদ্যের সমষ্টি। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, তাহা হইতে বুঝা যায়, পাঠকসমাজে ইহার আদর হইয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও জরানিবারণ—শ্রীআদিনাথ সেন। গুরুদাস ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

বইখানিতে লেখক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

তিনি চিকিৎসক কিনা গ্রন্থে সে পরিচয় নেই, কিন্তু দেশী ও বিদেশী চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান তাঁর প্রচুর। তিনি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বহু মূল্যবান তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। বইয়ের শেষের দিকে আছে রোগ পরিচয় ও কতকগুলি রোগের লক্ষণ বর্ণনা। লোকের মুখে মুখে আজকাল প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বো-হাইড্রেট ক্যালসিয়াম ও ক্যালোরী প্রভৃতি শব্দ শোনা যায়, কিন্তু অনেকেরই সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। লেখক এই গ্রন্থে তার প্রতিটি জিনিষের কথা পরিষ্কার করে লিখেছেন। শরীরের জন্য এর কোনটা কতখানি দরকার, প্রাত্যহিক খাদ্যে ভিটামিন প্রভৃতি গুণ কতটা বিদ্যমান, কোন্ খাদ্যে কতখানি তাপের (ক্যালোরী) সৃষ্টি হয় সে সবই সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার বয়সের তারতম্য হিসাবেও খাদ্যের তারতম্যের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই বইখানি পাঠ করলে সকলেই উপকৃত হবেন। স্বল্পপরিসরের মধ্যে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ভাষা কিছু জটিল হয়েছে। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে লেখক সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন। এই ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

রাজঘাট—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দাম তিন টাকা।

লেখকের সতেরটি ছোট গল্পের সংগ্রহ এই গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ভাষায় প্রসাদগুণ থাকায় গল্পগুলি পড়তে মন্দ লাগে না। প্রথম গল্পের নামানুসারেই বইয়ের 'রাজঘাট' নামকরণ করা হয়েছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে (স্যাটায়ার) লেখকের হাত পাকা কিন্তু ছোটগল্প লেখার টেকনিক তাহার অনায়ত্ত। বিশেষ মতবাদ থাকায় ও বক্তৃতা প্রধান হওয়ায় ভাষার বাঁধুনি অত্যন্ত ঢিলে। 'নিষ্কৃতি', 'আমাদের বড়বাবু' প্রভৃতি দু'একটি গল্প ছাড়া বেশীর ভাগ গল্পই জমাট বাঁধে নি। এ ছাড়া গল্পগুলি নাটকীয়ভাবে শেষ করবার চেষ্টা করা হয়েছে বলে গল্পের স্বাভাবিক পরিণতিতে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে মনে হয়।

ময়না নদী—শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ। জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী এ্যাভিনু, কলিকাতা-২৯। মূল্য তিন টাকা।

ময়না নদী উপন্যাস। মজে যাওয়া ময়না নদীর তীরে রতনগঞ্জ গ্রাম। জয়নারায়ণ রতনগঞ্জের ধনী জমিদার। গরীব প্রজাদের শোষণ করে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ী গড়ে উঠেছে। তিনি কেবল নিজের সুখ-সুবিধাই দেখেন, প্রজাদের শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য, সুখদুঃখ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি একান্তই উদাসীন। রাজীব কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী, এম-এ পাস করে গ্রামে ফিরে এসেছে। পল্লীবাসী প্রজাসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা দ্বারা, তাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-বিধানই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। জমিদারের সহানুভূতির ভিতর দিয়ে সে প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান করতে চায়। জমিদারের অর্থে বুজে যাওয়া ময়না নদী কাটাবার ব্যবস্থা করতে সে জমিদার বাড়ীতে গেল। সেখানে জয়নারায়ণের মেয়ে রত্নার সঙ্গে রাজীবের পরিচয়। তা'রপরে রত্না ও রাজীবের প্রেমই বইখানার প্রধান উপজীব্য, প্রজাদের সুখদুঃখ বা জমিদারের শাসন, শোষণ ও স্বার্থপরতা এর কিছুই এ কাহিনীর ভেতর ফুটে উঠে নি। ময়না নদী কাটানো হ'ল বটে, নদীতীরে গ্রাম, গঞ্জ, স্কুল, হাসপাতালও গড়ে উঠল কিন্তু তাতে রাজীবের চেয়ে জমিদার জয়নারায়ণের ও রত্নার কৃতিত্বই বেশী। বইয়ের মাঝখান থেকে জয়নারায়ণের পুত্র জগৎনারায়ণ ও মজুর-পত্নী দুলালীকে কেন্দ্র করে কাহিনী এগিয়ে চলেছে কিন্তু তার স্বাভাবিক কোন পরিণতি নেই; প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থের অজুহাত তৈরী করে লেখক এখানে গোঁজামিল দিয়েছেন। চরিত্র-চিত্রণ ও কাহিনী দুর্ব্বল হলেও লেখকের নিঃসংশয় মত ও প্রকাশভঙ্গী পাঠকদের ভাল লাগবে।

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



পদ্মানদীর মাঝি

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

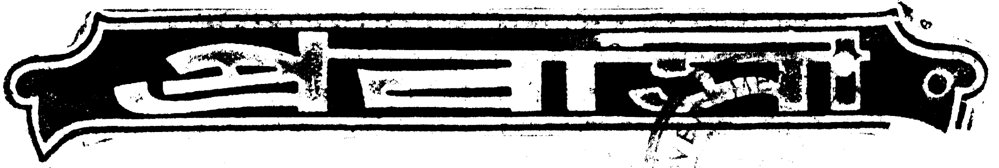


প্রসাধন



কার্যের পথে

ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ
২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতির ভবিষ্যতের আধার

পণ্ডিত নেহরুর জন্ম-বার্ষিকী উত্তর ভারতের কয়েক স্থলে, বিশেষতঃ দিল্লীতে শিশু-দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইহা সকল দিক হইতেই যথাযথ ও সঙ্গত হইয়াছে। কেননা জাতির ভবিষ্যৎ যদি কোনও আকরে, কোনও আধারে রক্ষিত থাকে তবে তাহা জাতির শিশু-মণ্ডলীতে। বিদেশের জাতি-গঠনের যে কয়টি অভিনব পন্থা আমরা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি সেই সব কয়টিতেই দেশের শিশু ও কিশোরের শিক্ষা, দৈহিক উন্নতি ও মানসিক উদ্যমের স্ফুরণ, এই সকলের উপর চরম গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও হইতেছে।

জাতির নবজাগরণ ও নবজীবন বিকাশের কোনও পথের কথা আমরা শুনি নাই যাহাতে শিশু ও কিশোরের যত্ন, পরিপুষ্টি ও লালন-পালন মূলনীতি নহে। মুসোলিনীর নূতন ইটালী গঠন—যে কথা আমরা এখন "ফ্যাসিজম" নামক ভূতের ভয়ে ভুলিতেছি—সম্ভব হইত না যদি সেই সঙ্গে "বালিল্লা" সঙ্ঘগুলি না গড়িয়া তোলা হইত। হিটলারের কিশোর-মণ্ডলী গঠন ত পাশ্চাত্ত্য জগৎকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

মুসোলিনী ও হিটলার যে উদ্দেশ্যে এইরূপে ইটালী এবং জার্ম্মানীর শিশু ও কিশোরকে নূতনরূপে নব-বিকাশের পথে, সুগঠিত ও সতেজে স্ফুরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু যেভাবে অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ঋণভার-ক্লিষ্ট, দুর্নীতিপরায়ণ অলস ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ইটালীয় জাতিকে মুসোলিনী বলিষ্ঠ ও উদ্যমশীল জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা বিশ্ব-জগতে আদর্শরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত ছিল এবং সে সময়ে হইয়াছিলও।

হিটলারের কিশোর-পালন ও তাহাদের মধ্যে নূতন উদ্যমের অনুপ্রেরণা দান, যাহা তাহার "যুগেণ্ড" নামক বর্গের মধ্যে, কায়িক পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দলাভের পথ দেখায়, সে ত আজও পাশ্চাত্ত্য জগতে এক অত্যাশ্চর্য্য পুনরভ্যুত্থানের নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী যেরূপে নিষ্পেষিত ও নিঃস্বীকৃত হইয়াছিল তাহা ত এখন ইতিহাসের অংশ। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ চিরদিনের মত অন্ধকার থাকে। তাহার সকল কলকারখানা বিনষ্ট, তাহার যুবক ও পূর্ণবয়স্ক পুরুষের প্রায় অর্দ্ধেক যুদ্ধে নিহত—তাহার মাথার উপর নিদারুণ ক্ষতিপূরণের ঋণভার; উপরন্তু তদারককারীদিগের অমানুষিক অত্যাচার, এই ত ছিল প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানীর অবস্থা। কেহই ভাবিতে পারে নাই যে, জার্ম্মানী শত বৎসরেও উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

সেই জার্ম্মানী হিটলারের জাতিগঠনের সুপরিকল্পনায় মাত্র নয়-দশ বৎসরে দুর্দ্ধর্ষ মহাপরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

আমরা উপরের দুই জনের নৈতিক আদর্শকে কোনপ্রকার মর্য্যাদা দিতে চাহি না। কিন্তু তাঁহাদের জাতির শিশু-কিশোর-যুবকুল এই সকলের লালনপালন, পোষণ ও শিক্ষা যে পথে হইয়াছিল তাহাকে আদর্শ করিবার কথাই বলিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করিয়াছিল সে দেশের, সে সময়ের, শিশুশিক্ষা ও শিশুপালন এবং কিশোরদিগের দেহমন গঠনের প্রণালী। সেখানেও দেখা গিয়াছিল নূতন রুশরাষ্ট্র চতুর্দ্দিকে অসীম বাধা ও অশেষ সমস্যার মধ্যেও কিরূপে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া জাতির ভবিষ্যতের আধারকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পোষণ করিতেছে।

আমাদের বাংলার অবস্থা এখন দ্রুত অবনতির পথে চলিতেছে, দেশের তরুণ ও কিশোর যেভাবে আদর্শহীন উদ্দাম জীবনের পথে চলিতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, অদূরভবিষ্যতে বাঙালী শুধু বিদ্রূপ ও অবহেলার পাত্ররূপেই বাঁচিয়া থাকিবে। পুলিসের হাতে নূতন ক্ষমতা দিলে এই উদ্দামতা সাময়িকভাবে ব্যাহত হইতে পারে, কিন্তু তরুণের স্বভাব কখনই পরিবর্ত্তিত হইবে না। মুদালিয়র কমিটির উপর রং ফলাইলে কংগ্রেসের অনুচরবর্গ পরিপুষ্ট হইতে পারে শিক্ষার কিছুই হইবে না।

প্রয়োজন হইয়াছে এ বিষয়ে বিচার করার এবং নূতন কার্য্যক্রমের সূচনা করার, কিন্তু করিবে কে?

শিশুর প্রয়োজন খাদ্য, পরিমিত পরিমাণে শরীর সঞ্চালন যাহা ক্রীড়ার মধ্যে চলে, এবং স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য মুক্ত বাতাস ও আলো আর অল্পে অল্পে শিক্ষা। খাদ্যের মধ্যে শরীর গঠনের জন্য একপ্রকার আহার্য্য চাই এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অন্যপ্রকার অতিরিক্ত কিছু চাই, যাহাকে রক্ষণকারী খাদ্য (protective diet) বলে। ক্রীড়া ইত্যাদিতেও তাহার স্বাস্থ্যহানি না হয় অথচ শারীরিক পূর্ণ বিকাশের জন্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠুরূপে গঠনের জন্য মৃদু ব্যায়াম হয়, ইহাও প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহার মানসিক বিকাশ যাহাতে ঠিক পথে হয় তাহার গোড়াপত্তন দৃঢ়ভাবে হওয়া দরকার।

হিটলার ও মুসোলিনী এবং সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ এ সকলই প্রায় ঠিকমত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি এরূপ বিষয় দিয়াছিলেন যাহা আমরা একেবারেই বাঞ্ছনীয় মনে করি না। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যে মাটিতে দেবতার মূর্ত্তি গড়া হয়, সেই উপকরণেই অসুরেরও হয়। উপকরণ একই, প্রথা ও কারুশিল্প একই, মানুষের মনে যাহা আছে তাহার উপর নির্ভর করে শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে।

আমাদের এখন প্রয়োজন ধ্বংসোন্মুখ জাতির রক্ষার জন্য নূতন ভাবে প্রথম হইতেই তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রাখা সবকিছুর উপর। দেশের অশিক্ষিতা মাতা, সঙ্গতিহীন পিতা, অর্থচিন্তায় ব্যাকুল শিক্ষক ও শিক্ষিকা মানুষ গড়িবে কি করিয়া যদি রাষ্ট্র ইহাতে হাত না দেয়?

জানি আমাদের অর্থের অভাব। কিন্তু যে ভাবে প্রতি রাজ্যে গ্রাম উন্নয়ন ইত্যাদি আংশিক ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে সে ভাবে কি শিশু ও কিশোরের কল্যাণ আরম্ভ করা যায় না?

সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি অনেক কিছুই তো দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় রহিয়াছে। বাংলায় শিশু ও কিশোরের দেহমন ও চরিত্র গঠন বিষয়ে ঐরূপ কমিউনিটি প্রজেক্ট গঠন করা কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। যেখানে শত শত কোটি টাকা ইটপাথর কংক্রীটে ঢালা হইতেছে, নূতন কলকারখানায় অর্ব্বুদের অঙ্কে অর্থের ব্যবস্থা হইতেছে সেখানে ইহার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হইতে পারে। জাতিগঠন ইহা ভিন্ন সম্ভব নহে।

ভেজাল ঘি

বর্ত্তমানে বাজারে ঘি অনেকরকম পাওয়া যায়, তবে তাহা খাঁটি নয়, আর খাঁটি বলিয়া যা পাওয়া যায় তাহা ঘি নয়। খাঁটি গব্যঘৃত বলিয়া পদার্থটি ছিল প্রায় পনর বৎসর আগে (অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে), বর্ত্তমানে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে এখন বাজারে খাঁটি ভেজিটেবল্ ঘি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে গব্য কিংবা ভয়সা কথাটি রূপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যদিও বাজারে তথাকথিত গাওয়া ঘি বা ভয়সা বলিয়া জিনিষ পাওয়া যায়, আসলে তাহা কিন্তু ভেজিটেবল ঘৃত। বিজ্ঞানের কৃপায় ঘিয়ের নকল রং এবং গন্ধ উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে, তাই ভেজিটেবল ঘিয়ের সঙ্গে এই দুইটি জিনিষের সংমিশ্রণে নিরামিষ ঘি তৈরি হয়।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্য অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাজারে যে সকল ঘি প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা তেত্রিশ ভাগের মধ্যে ঘি বলিয়া কোন পদার্থ নাই। শতকরা পঁচিশ ভাগ ঘিয়ের নমুনায় অর্দ্ধেক করিয়া ভেজাল থাকে, আর অন্যান্য তেত্রিশ শতাংশ নমুনায় ঘিয়ের ছিটেফোঁটা নামমাত্র থাকে। ব্যস, আমরা আনন্দে এই জিনিষই ঘি বলিয়া ক্রয় করিয়া থাকি এবং উদরস্থ করি। ইহার জন্য যদিও অসৎ ব্যবসায়ীরা নিঃসন্দেহে দায়ী, কিন্তু তাহাদের চেয়ে বেশী দায়ী আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ। তাঁহারা জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত উদাসীন কেন? কেন তাঁহারা এই সকল অসৎ ব্যবসায়ীদের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই? ইহাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। ভারতে খাদ্যে ভেজাল নূতন কিছু নয়; ইহা প্রথম মহাযুদ্ধের অবদান। ঘিয়ে ভেজাল সাধারণ খাদ্য-ভেজালের একটি রূপান্তর মাত্র, অসাধারণ ব্যাপার কিছু নহে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কর্ত্তৃপক্ষ খাদ্যে ভেজাল নিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

গত পনর বৎসর যাবৎ খাদ্যে ভেজাল প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ শুধু নিরপেক্ষ নহেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। একটি উদাহরণ দিলেই সরকারী নিশ্চেষ্টতা প্রমাণিত হইবে। শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের মন্ত্রিত্বকালে বাংলা দেশে ময়দায় সোপষ্টোন চূর্ণ ও তেঁতুলবীচি চূর্ণ ব্যাপকভাবে মেশানো হইত, যাহারা এই অপকর্ম্মের জন্য দায়ী তাহাদের খুব ঘটা করিয়া সাড়ম্বরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; কিন্তু পরে চুপে চুপে নীরবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কারণ ময়দার সহিত সোপষ্টোন চূর্ণ মিশাইয়া যাহারা মানুষের জীবনকে বিপজ্জনক করিয়া তোলে তাহাদের শাস্তি দেওয়ার মত কোন ধারা নাকি ভারতীয় পীনালকোডে নাই, ফলে এই সকল জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অন্ততঃ যতদূর মনে পড়ে ঘোষ মহাশয় তখন এই কৈফিয়তই দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে পীনালকোডের খসড়া যখন মেকলে সাহেব তৈয়ারি করেন তখন তাঁহার কল্পনায় আসে নাই যে মানুষের মধ্যে এত ঘৃণ্য পশুবৃত্তি কার্য্যকরী ভাবে থাকিতে পারে। আর যদি আইনের ফাঁক থাকিয়াও থাকে, তবে তাহার সংশোধন বহু পূর্ব্বেই হইতে পারিত যদি আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ, সচেষ্ট থাকিতেন।

আজ যে বাজারে খাঁটি ঘি লুপ্ত এবং ভেজাল ঘি অপর্য্যাপ্ত, তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে না হইলেও প্রধানতঃ দায়ী। চুরি করিতে পারিলে বা করিতে দিলে চুরি করিতে গররাজী এই রকম সাধুর সংখ্যা অতি নগণ্য। শাস্তি যেখানে নাই, অপরাধ সেখানে 'অপরাধই' নয়।

এত কথা বলিবার কারণ এই যে, বাজারে ভেজাল ঘি পরি-

ব্যাপ্তির কারণ বুঝিতে হইলে বনস্পতি-তত্ত্ব জানা অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। সোজা কথায়, ভেজাল ঘিয়ের মূলে আছে বনস্পতি, বনস্পতি দ্বারা অতি সহজেই ঘিয়েতে ভেজাল দেওয়া যায়। তবে কর্তৃপক্ষ যে কেন ভেজালের পথ বন্ধ করিয়া দিতেছেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইদানীং কর্তৃপক্ষ কুটিরশিল্পের দিকে ঝোঁক দিয়াছেন, কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্য বৃহদায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। যথা, বস্ত্রশিল্প—যাহা বর্ত্তমানে ভারতের বৃহত্তম শিল্প। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের প্রতি আরও বেশী জোর দেওয়া হইবে এবং বেসরকারী বৃহদায়তন শিল্পগুলির কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় দেখা যায় যে, অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় বৃহদায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন হ্রাস করার প্রস্তাব আছে, কিন্তু সেখানে বনস্পতি-শিল্পের কোনও উল্লেখ নাই। এই শিল্পের ভাগ্য ভাল, কারণ ইহার উপর সরকারী কোপদৃষ্টি এখনও পড়ে নাই। কুটিরশিল্প হিসাবে ঘিয়ের উৎপাদন সম্ভবপর, কিন্তু বনস্পতি বিদ্যমানে ভেজাল ঘি অবশ্যম্ভাবী এবং ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় ঘিয়ের কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। পৃথিবীর গৃহপালিত গবাদি পশুর এক তৃতীয়াংশ আছে ভারতবর্ষে, গো-উন্নয়নে মন দিলে খাঁটি ঘিয়ের উৎপাদন দ্রুত বাড়িতে পারে। সেই সঙ্গে যদি বনস্পতি-জাতীয় কৃত্রিম পদার্থে এরূপ রং দিতে আইনতঃ বাধ্য করা হইত, যাহার সহজে পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে, তবে ভেজালের পথেও কাঁটা পড়িত।

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাখনের উৎপাদন অতিরিক্ত হওয়ায়, তাহারা প্রস্তাব করিয়াছিল যে এই মাখনকে ঘি করিয়া ভারতবর্ষে রপ্তানী করা হইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘি-আমদানী করিতে দেন নাই, কারণ তাহাতে নাকি ভারতের ঘি শিল্পের ক্ষতি হইত। আমেরিকার ঘি আসিলে লোকে তবু সস্তায় খাঁটি ঘি খাইতে পাইত। বাজারে এখন ঘিয়ের ফিরিস্তি দেখিয়া মনে হয় যে, কৃত্রিম ঘিয়ের স্বার্থরক্ষার্থে কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার খাঁটি ঘি আমদানী করিতে দেন নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না যে, বাজারে ভেজাল ঘিয়ের জন্য দায়ী সরকারী নিশ্চেষ্টতা।

পৌরপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদিগের শিক্ষালাভের প্রথম সোপান পৌরপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাংলা দেশের অধিকাংশ পৌর-প্রতিষ্ঠানই বর্ত্তমানে দুর্নীতিগ্রস্ত। পৌরপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি এবং তাহার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" ২৭শে কার্ত্তিক লিখিতেছেন যে, পৌরসভার দুর্নীতি ও গলদের চারিটি প্রধান রাস্তা আছে, সেগুলি বন্ধ করিতে পারিলেই গণতান্ত্রিক উপায়ে দুর্নীতি ও গলদের প্রতিকার হইতে পারে।

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন :

"অনুগৃহীত ব্যক্তিদের বাড়ীর ট্যাক্স কমাইয়া রাখা এক নম্বর দুর্নীতি। দুর্নীতির এই দ্বার বন্ধ করিতে হইলে, এসেসমেণ্ট ধার্য্য হইবার পর প্রত্যেক বাড়ীর মালিকের নাম, ঠিকানা (বাড়ীর নম্বরসহ) ও ধার্য্য টাকার অঙ্ক ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে হইবে। দুই নম্বরের দুর্নীতি দেখা দেয় ট্যাক্স-আদায়ের ব্যাপারে। যাহাদের এক শত টাকার বেশী ট্যাক্স বাকী পড়িবে, তাহাদের নাম প্রকাশ করিবার ব্যবস্থায় (ভাগ্যবান্ ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদের টাকা বাকী পড়ে বেশী) দুর্নীতির এই দ্বিতীয় দ্বারটি বন্ধ হইয়া যাইবে। তিন নম্বরের দুর্নীতির প্রবেশ বন্ধ হইবে টেণ্ডারদাতাদের নাম প্রকাশ ও কণ্ট্রাক্ট-প্রাপ্তদের নাম প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে। চার নম্বর দ্বার বন্ধ হইবে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মপ্রার্থীদের নাম ও যোগ্যতা এবং কর্ম্মপ্রাপ্তদের নাম প্রকাশ করিলে। এতদ্ব্যতীত পৌর-ইলেক্টো-র‍্যাল রোল ঢালিয়া সাজিতে হইবে।

"এই কাজ অবশ্য অত্যন্ত শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। বহু দিনের সঞ্চিত গলদ এবং দুর্নীতি ইহার পরতে পরতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। সৎ ও সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত দক্ষ কর্ম্মচারীর সহায়তায় দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় এই গলদ দূর করিতে হইবে।

"পৌরসভায় কায়েমি স্বার্থলোভী সদস্যদের অশুভ প্রভাব হইতে ভোটার-তালিকাকে মুক্ত করিয়া আনিতেই হইবে। নতুবা দুর্নীতির মূল থাকিয়াই যাইবে।

"আর এই সঙ্গে দিতে হইবে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি ও সংবাদ-পত্রসেবীদের পৌরসভার প্রত্যেক অধিবেশনে প্রবেশাধিকার। গোপনতাই পাপ—কাজেই যেখানে সাধারণের মঙ্গলজনক কাজের আলোচনা চলিবে সেখানে গোপন কিছু থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

"আমাদের মনে হয়, পৌরকর্ত্তৃপক্ষ যদি আমাদের এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখেন ও উপযুক্ত সৎ পন্থা অবলম্বন করেন তবেই তাঁহাদের সেবিত পৌর-প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা অ-গণতান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না বলিয়া মনে করি।"

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা"র উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যে কতদূর বাস্তব-ধর্ম্মী, ১৫ই কার্ত্তিক "জি, টি, রোড" পত্রিকায় আসানসোল পৌর-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিপর্য্যয় সম্পর্কে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

"জি, টি, রোড" লিখিতেছেন : "আসানসোল পৌরসভার সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য হইতেছে পৌরসভার প্রাক্তন এবং বর্ত্তমান সদস্যদের করধার্য্যের ত্রুটি। প্রায় সকল পৌরসদস্য এবং তাঁহাদের পেটোয়া লোকদের অত্যন্ত কম হারে ট্যাক্স ধরা হইয়াছে। ইঁহাদের ট্যাক্স চার গুণ হইতে দশ গুণ বাড়াইলেও কম থাকিয়া যাইবে। যেখানে সদস্যেরা নিজে কর কম করে সেখানে অপরের বেলায় কম না করিয়া পারে না। ফলে যে পরিমাণ কর ধার্য্য হওয়া উচিত তাহা হয় না। ভবিষ্যতে করবৃদ্ধি করিবার মতলবও পৌরসদস্যদের নাই। পৌরসভাকে জাহান্নামে দিয়া কেবল করের ক্ষেত্রে ভোট-দাতাদের সুবিধা দেখাইয়া ভোট আদায়ের অপকৌশলের ফলেই

একই দল বারে বারে নির্ব্বাচিত হইতেছে।" ফলে পৌরসভার দুর্নীতি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে।

আসানসোল পৌরসভার আর্থিক দুরবস্থা এমন পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা পর্য্যন্ত খরচ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এমনকি নির্ব্বাচনী জমার টাকা পর্য্যন্ত পরিশোধ করা কঠিন হয়। অথচ প্রায় দশ লক্ষ টাকার বেশী কর বাকী রহিয়াছে। এই বাকী কর আদায় করা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান বর্ষের করই শতকরা ৬০ ভাগের বেশী আদায় হয় না। অবশ্য সমগ্র কর আদায় হইলেও তাহাতে কোনও প্রকারে পৌরসভার দৈনন্দিন কার্য্য চালাইবার মত অর্থ উঠিতে পারে—"রাস্তাঘাট, জলসরবরাহ বা অন্য কোন উন্নয়নমূলক কার্য্যের জন্য এক কপর্দ্দকও থাকে না।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসানসোল পৌরসভার ইতিহাসে বাজেট-নির্দ্দিষ্ট কর কখনও সমগ্র পরিমাণ আদায় হয় নাই।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন

বিগত অক্টোবর মাসে যে পুনর্ব্বাসন সচিবগণের সম্মেলন দার্জ্জিলিঙে হইয়াছিল, 'যুগান্তরে'র নিজস্ব সংবাদদাতা তাহার বিবরণ দিয়াছেন।

উদ্বাস্তু সমস্যার অনেক দিকই আলোচিত হইয়াছে উক্ত সম্মেলনে, কিন্তু পুনর্ব্বাসনের বাধার মূলে যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্তরায় এক শ্রেণীর উদ্বাস্তু সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে তাহার কোনও আলোচনা হয় নাই। সেই সকল অন্তরায় যতদিন থাকিবে ততদিন পাকিস্থান বা ভারত যতই সং চেষ্টা করুক পুনর্ব্বাসন সম্যক ভাবে হইতে পারিবে না। বাস্তুঘুঘুজাতীয় দুর্নীতি-পরায়ণ লোক, যাহারা অন্যের বিপদে নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথ খোঁজে, যতদিন মনের আনন্দে কাজ চালাইতে পারিবে ততদিন এ সমস্যা পূরণ অসম্ভব। যাহা হউক আমরা সম্মেলনের সংবাদ নীচে দিলাম :

দার্জ্জিলিং, ২১শে অক্টোবর—আজ এখানে রাজভবনে পূর্ব্ব-ভারতের রাজ্যসমূহের পুনর্ব্বাসন সচিব সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য এবং বাস্তুত্যাগ বন্ধ করার জন্য পাঁচ দফা কর্ম্মসূচির সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলি হইতেছে : (১) পূর্ব্ব পাকিস্থান ও সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থা; (২) যাতায়াতের কড়াকড়ি হ্রাস; (৩) পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ভারতে টাকা পাঠাইবার সুবিধাদান; (৪) সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের বিনিময় এবং (৫) পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে ব্যবসায়, চাকুরী, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যথোপযুক্ত সুবিধাদান। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকার যে সমস্ত বাড়ী ও সম্পত্তি রিকুইজিশন করিয়াছেন সেগুলি ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের আগমন বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্মেলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাবোধের অভাবই উদ্বাস্তুদের [illegible] বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন-সচিব শ্রীখান্না সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে তাহাদের বহু শতাব্দীর পৈতৃক ভিটামাটি পরিত্যাগ করিয়া আর না চলিয়া আসে সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ যাহাতে পুরাপুরি কার্য্যকরী করা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে পাকিস্থান সরকারের নিকট পুনরায় আবেদন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনৈক প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীখান্না বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবিত পূর্ব্ববঙ্গ সফরের ফলে অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। যদি প্রয়োজন হয়, তবে শ্রীখান্নাও ডাঃ রায়ের সহিত যাইবেন।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বাসন-সচিব শ্রীমতী রেণুকা রায় আজ শ্রীখান্নার ভাষণের অব্যবহিত পরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, উভয় বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের আশ্বাস এবং সদিচ্ছা ও শান্তির বাণী যদি দূরতম গ্রামসমূহের অধিবাসীদের নিকট না পৌঁছায়, তাহা হইলে তাঁহাদের যুক্ত সফরে কোনও লাভ হইবে বলিয়া শ্রীমতী রায় মনে করেন না। পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দ ও সরকারের আশ্বাসের প্রতি অধিক আস্থা রাখিয়া বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, সকল প্রকার অবস্থার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

শ্রীখান্না বলেন যে, মাসখানেক হইল পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের আপিসে প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা তেমন কিছু কমে নাই। শ্রীখান্না এই আশা প্রকাশ করেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের নূতন জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলী তথাকার হিন্দুদের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনিতে এবং ভারতে আগত পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে উৎসাহিত করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীখান্না বলেন যে, ভারত নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি পুরাপুরি কার্য্যকরী করিয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ মুসলমান উদ্বাস্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ভারতে তাহাদের স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সম্পত্তি ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের শুধু ঐ সম্পত্তি ফিরাইয়াই দেওয়া হয় নাই, অধিকন্তু গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য, ঋণ দান করিয়া উল্লেখযোগ্য ভাবে আর্থিক সাহায্য পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে খুব কম সংখ্যক হিন্দুই পাকিস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসার আগ্রহই দেখা যাইতেছে। যাহারা পাকিস্থানের সম্পত্তির একটি বিলিবন্দোবস্ত করিয়া আসিতে চায়, তাহারা উপযুক্ত সুযোগ সুবিধাও পাইতেছে না। প্রতিযোগিতার অভাব ও মন্দার জন্য ভারতে চলিয়া আসার পূর্ব্বে হিন্দুদের পক্ষে সম্পত্তি বিক্রয় করাও আর সহজ নয়। এমন কি, যে সমস্ত স্থানে নিতান্তই কম দরে এই বিক্রয়কার্য্য সমাধা হইয়াছে, সেখানেও টাকা প্রেরণ ঘটিত অসুবিধা একটা বাধা হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে দুর্গতির পরিমাণও বাড়িয়াছে। এই শ্রেণীর ক্ষেত্রে টাকা প্রেরণের সুযোগ-সুবিধা দিবার জন্য পাকিস্থান সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। অন্যথায় নেহরু-লিয়াকৎ

চুক্তিতে সম্পত্তি বিক্রয়ের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

নূতন বাড়ীভাড়া বিল

এই বিল সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। আজিকার দিনে এইরূপ ঘৃণ্য বিল যে হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। নীচে আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার নাগরিক সংস্থার মতামত যাহা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল :

বিগত ২৩শে কার্ত্তিক সন্ধ্যায় নাগরিকগণের চারিটি সংস্থার পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী এস. কে. লাহিড়ী প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ বাড়ী ভাড়া বিলটির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার পর ইহাকে সর্ব্বতোভাবে 'গৃহ-মালিকের আইন' বলিয়া অভিহিত করেন।

পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কল্যাণসমিতি, ভাড়াটিয়া কংগ্রেস, কলিকাতা ভাড়াটিয়া সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ শহরাঞ্চলিক ভাড়াটিয়া সমিতির নামে ব্রিষ্টল হোটেলে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেষোক্ত সংস্থার প্রেসিডেন্ট মিঃ ই. জে. স্যামুয়েল আলোচনার সূত্রপাত করিয়া বলেন, প্রস্তাবিত বিলের দ্বারা ভাড়াটিয়াদের অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও খারাপ হইবে।

অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কল্যাণসমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস. কে. লাহিড়ী প্রস্তাবিত বিলের বিধানাবলী বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন, বিলের 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে' বলা হইয়াছে যে, লোকে যাহাতে গৃহ-নির্ম্মাণে অর্থ নিয়োগ করিতে উৎসাহবোধ করে, সরকার তাহাই করিতে চাহেন। ফলে সরকার গৃহ-মালিকদের স্বার্থ নিরাপদ করার উৎকণ্ঠায় বাড়ী-ভাড়া আইনটি সর্ব্বতোভাবে 'গৃহ-মালিকের আইনে' পরিণত করিতেছেন। পক্ষান্তরে ভাড়াটিয়ারা বর্ত্তমান আইনে এবং অন্যান্য আইনের বিধানবলে এযাবৎ যে সব অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহাও বাতিল করিয়া দেওয়া হইতেছে। বস্তুতঃ ভাড়াটিয়াকে এই বিলে কোন নূতন সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

সুন্দরবনে হত্যাকাণ্ড

দৈনিক পত্রে নিম্নস্থ সংবাদ বিগত ২৮শে কার্ত্তিক প্রকাশিত হয় :

"২৪ পরগণার সন্দেশখালি অঞ্চলে গত ৮ই নবেম্বর হইতে এক জন ফরেষ্ট অফিসার এবং তাঁহার দুই জন সহকর্ম্মী নিখোঁজ হন বলিয়া জানা যায়। পুলিস নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ করিতে থাকে। ১২ই নবেম্বর পাঁচকানিয়ার নিকটে গভীর জঙ্গলের মধ্যে পুলিস ফরেষ্ট অফিসারের নোটবহি এবং কিছু পরিত্যক্ত জিনিষপত্রসহ একটি ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দেখিতে পায়। মৃতদেহে দা'য়ের আঘাতের চিহ্ন ছিল। ফরেষ্ট অফিসার এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদ্বয় নিহত হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। প্রকাশ যে, উক্ত ফরেষ্ট অফিসার ও তাঁহার দুই জন সহকর্ম্মী নৌকাযোগে সন্দেশখালি অঞ্চলে নৈশকালীন টহলদানকালে নিখোঁজ হন। তাঁহাদের নৌকা এবং রাইফেলেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিস এতৎসম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।"

এই অঞ্চলে আরও একটি মৃতদেহ ঐরূপ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পরে পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহ নাই যে, ইঁহাদের আততায়ীরা অন্য অঞ্চল হইতে আসিয়া লুকাইয়া শিকার ও মাছধরা চালাইতেছিল। কেননা ঐরূপ ব্যাপার কিছুদিন যাবৎ খুবই চলিতেছে। এখন প্রয়োজন তীব্র সন্ধানী আলো ও মেসিনগানযুক্ত মোটর-বোটের টহল। নহিলে সুন্দরবনের ঐ অঞ্চল বেহাত হইবার দাখিল হইবে।

পুলিস ও জনবিক্ষোভ

বিগত ১৭ই কার্ত্তিকের আনন্দবাজারে নিম্নস্থ বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ঐরূপ সংশোধনের সঙ্গে কিভাবে পুলিসকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে তাহার উপরই সবকিছু নির্ভর করে :

"ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন পদমর্য্যাদার অফিসার ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর পুলিস কর্ম্মচারীকে কোন বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় অসংযত কার্য্যে লিপ্ত বিক্ষোভকারীদের সম্পর্কে সরাসরি নিজ দায়িত্বে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক্ষণে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়।

সম্প্রতি কতকগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট নাকি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীদের আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক ধরনের কোন কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও তাহারা ঐগুলি নিবারণার্থ সক্রিয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বা করিতে পারে নাই। এমনকি টেলিফোন সংযোগ অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যাপারেও নাকি ঘটনাস্থলের নিকট উপস্থিত পুলিস উহা বন্ধের জন্য কোনরূপ সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ নাকি এরূপ মনে করেন যে, পুলিসের আচরণ সম্পর্কে যে ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার আছে তদনুযায়ী ঊর্দ্ধতন কোন অফিসারের (ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন পদমর্য্যাদার) অনুকূল সুনির্দিষ্ট নির্দ্দেশ ব্যতীত পুলিস এরূপ সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না এবং সেইজন্যই তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলেও কিছু করে না। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট ঐ ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সংশোধন অথবা সংস্কার সাধনের প্রশ্নটি এক্ষণে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার সেক্রেটারীয়েটে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত ঊর্দ্ধতন পুলিস অফিসারগণ ও স্বরাষ্ট্রসচিবের এক বৈঠক হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রকরণের আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। যেভাবে এখন শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে দেশের লোকের কাছে প্রাচীন প্রবাদ বাক্য "লিখিবি পড়িবি মরিবি দুখে, মৎস্য মারিবি খাইবি সুখে" অনাবিল সত্যরূপেই প্রমাণিত হইতেছে।

শিক্ষা প্রকরণ বদলাইলে বা শিক্ষার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান সরকারী কুক্ষিগত করিলেই এই অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হইবে আমরা মনে করি না।

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ক্ষুদ্রতম রাজ্যে পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি মন্ত্রীসভার শিক্ষার ব্যাপার অতি স্থবির বা অযোগ্য লোকের হাতেই ন্যস্ত আছে। ফলে শিক্ষার ব্যাপারে কাহারও মাথাব্যথা নাই। বরাদ্দ টাকা যে-কোনভাবে খরচ করিয়া দিনগত পাপক্ষয়ই শিক্ষার ব্যবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ইহার বিষময় ফল সমাজের প্রতি স্তরে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু বুঝা যায় যে সরকারী কুম্ভকর্ণদিগের ইহাতেও চেতনা হয় নাই। না হইলে নিম্নস্থ বিবৃতির কোনও অর্থ হয় না। উদ্ধৃত বিবৃতি ২২শে কার্ত্তিকের আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, বিবৃতির শেষ প্যারাগ্রাফটি সরকারী স্তোকবাক্য মাত্র:

"কলেজী শিক্ষা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের সমুদয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী পরিচালনায় পরিচালিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা শীঘ্রই চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে।

প্রকাশ, মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষা-সংস্কার-কল্পে ঐ পরিকল্পনার খসড়া রচিত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী বিদ্যার্থীদের সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরী ও হাতেকলমে কোন-না-কোন একটা বৃত্তি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে এবং এতদ্বারা বিদ্যার্থীকে স্বাধীন ভারতের অত্যাবশ্যক নাগরিকরূপে পরিণত করা হইবে। সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক ও অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐরূপ কারিগরী শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করা হইবে।

রাজ্য সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে ৬০টি সর্ব্বার্থ-সাধক বিদ্যালয় স্থাপন করার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ঐ ধরণের বিদ্যালয় নূতনভাবে স্থাপন করা ছাড়াও কতকগুলি বিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়া সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হইতেছে। সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়গুলিতে ১১টি শ্রেণী থাকিবে (বর্ত্তমানে দশটি শ্রেণী আছে) এবং ঐ একাদশ শ্রেণী হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিদ্যার্থী সরাসরি ডিগ্রী ক্লাশে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ফলে যে-কোন বিদ্যার্থীর পক্ষে তিন বৎসরের মধ্যে ডিগ্রী লাভ করা সম্ভব হইবে। সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় ব্যতীত অপর যে সব উচ্চ বিদ্যালয় থাকিবে, সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স নামে একটি অতিরিক্ত কোর্স প্রবর্ত্তন করার বিষয়ও সরকার নাকি বিবেচনা করিতেছেন। বর্ত্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১,৪০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলিই উচ্চ বিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে থাকিয়া যাইতে পারে, আর কতকগুলি সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়া জানা যায়। ১৯৫৭ সন হইতে সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়গুলি কার্য্যকরী হইবে, অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর ইচ্ছা করিলে যে-কোন ছাত্র বৃত্তিমূলক উচ্চ শিক্ষা অথবা অন্য কলেজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে।

সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় এবং অপরাপর বিদ্যালয়ের (যেগুলিতে কারিগরী শিক্ষাদান সম্পর্কিত অত্যাবশ্যক বিষয় থাকিবে) জন্য নূতন পাঠ্যক্রম ইতিমধ্যেই রচিত হইতেছে বলিয়া জানা যায়। উহাও শীঘ্রই চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারকল্পে রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক রচিত পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলিয়া প্রকাশ। এক্ষণে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং উহাতে ৬০ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। সরকার মনে করেন যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযোগী ২৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আছে। উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ১৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বর্ত্তমানে শিক্ষালাভ করিতেছে। রাজ্য সরকার আরও অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ও রাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার বিষয় চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক করার বিষয় রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুভূত হইলেও ঐগুলিতে উহা সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী হয় না বলিয়া সরকার মনে করেন। সরকার পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি মিউ-নিসিপ্যালিটি এবং রাজ্যের অপর দুইটি মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার পরীক্ষামূলকভাবে নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে কলিকাতা কর্পোরেশন সমেত সমুদয় মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাও সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নামে পশ্চিমবঙ্গে যে স্বয়ংশাসিত সংস্থাটি রহিয়াছে, তাহা আগামী বৎসরের মধ্যেই পুনর্গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রকাশ, ঐ নব-গঠিত পর্ষদে অধিকসংখ্যক সরকার-মনোনীত সদস্য রাখিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা যাহাতে যথার্থভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থাই করার বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালনায় চলিলেও

কার্য্যতঃ উহাতে সরকারী হাত থাকিবে। তবে এই ক্ষেত্রে মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে উপদেষ্টা বোর্ডরূপে কাজ করিবে বলিয়া জানা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে দলগত রাজনীতি যাহাতে প্রাধান্য না পায় এবং এতদ্দ্বারা শিক্ষা প্রসারের পথ বিঘ্নিত না হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন বলিয়া সরকারী মহল মনে করেন।"

মশানজোড় বাঁধ

ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বাঁধ দেওয়া শেষ হওয়ায় উক্ত পরিকল্পনা এখন মূর্ত্ত হইল। নিম্নে সংবাদপত্রে প্রকাশিত মশানজোড়ের বাঁধ সক্রিয় করার বিবরণ দেওয়া গেল, কিন্তু ঐ সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লোকের কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, বিহারীদের তুমুল বিরোধ না হইলে ঐ বাঁধটি আরও উচু হইত এবং ১৯৫৪ সনের জুন মাসে সম্পূর্ণ হইত। বাঁধের জমি সস্তায় লইয়া চড়া দামে বেচিয়া (যেমন সিন্দ্রীতে হইয়াছিল) মুনাফা করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ঐ সব অপপ্রয়াসের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারের অক্লান্ত চেষ্টা এবং বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারগণের অবিশ্রাম উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে বাঁধের কার্য্য যেরূপ অগ্রসর হয় তাহা প্রায় ব্যর্থ হয় বিহারী মুনাফাখোরের লালসায় ও বাঙালী বিদ্বেষে।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈমাতৃক দৃষ্টির ফলে টাকা যোগান বন্ধ হয়। সুষ্ঠুভাবে কাজ হওয়ায় চুরি করার সুযোগ হয় নাই। তাহাতে কেন্দ্রীয় বিশেষ বিভাগের কয়েকজন কুখ্যাত ব্যক্তি এই পরিকল্পনাটিকে বিষনজরে দেখেন। কানাডা টাকা না দিলে আরও দুই বৎসর লাগিত।

"কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ লেষ্টার বি. পিয়ার্সন মঙ্গলবারের রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে মশানজোড়ে এক বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিবামাত্র কানাডা বাঁধের তিনটি লৌহ দরজা খুলিয়া যায়। বাঁধের আটক গৈরিক জলরাশি কংক্রীটের নালিপথে বাহির হইয়া দুরন্ত বেগে ময়ূরাক্ষীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তারপর সোল্লাস গর্জ্জনে ভাটির দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে।

মিঃ পিয়ার্সন, তাঁহার পত্নী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ, পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী, অন্যান্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও রাজ্যের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ, বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং সাধারণ লোক সকলেই স্মিতহাস্যে আশান্বিত হৃদয়ে কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকেন। এইভাবে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর পশ্চিমবঙ্গের এক সুবৃহৎ জলধারা "কানাডা বাঁধে"র উদ্বোধন হয়। কলোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত সেই জলরাশি দেখিয়া মনে হইতেছিল শুধুমাত্র "কানাডা বাঁধে"র লৌহনির্ম্মিত তিনটি দ্বারই খুলিল না এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির দ্বার, এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বারও বুঝি খুলিয়া গেল।

কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা ভারতকে যে আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছিল, এই বাঁধটির নির্ম্মাণকার্য্যে সেই অর্থের অনেকখানি ব্যয় করা হইয়াছে। কানাডার সেই দানের স্মারক হিসাবে ময়ূরাক্ষী বাঁধের নাম "কানাডা বাঁধ" দেওয়া হয়। ভারতে এইরূপ উদাহরণ ইহাই প্রথম।

মিঃ পিয়ার্সন তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁহার বাণীতে এই বাঁধটিকে ভারত ও কানাডার মৈত্রী ও সহযোগিতার সেতু বলিয়া অভিহিত করেন। ডাঃ রায় বলেন, ভারতের উন্নতিতে কানাডা যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, এই বাঁধই তাহার স্থায়ী নিদর্শন হইয়া থাকিবে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ পিয়ার্সন বলেন যে, এই বাঁধের গুরুত্ব অসাধারণ। কানাডা-ভারত সহযোগিতার পরিচয় ইহার প্রতিটি ক্ষেত্রে মিলিবে। নব ভারত গঠনে ময়ূরাক্ষীও আজ হইতে বিশিষ্ট একটি ভূমিকা গ্রহণ করিল।

কালনাতে গো-দুগ্ধের অভাব

আমদানীকৃত গুড়া দুধের প্রচলন কালনাতে এত বেশী হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে শহরের কোন স্থানেই খাঁটি গরুর দুধ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলিয়া কালনার স্থানীয় সাপ্তাহিক "পল্লীবাসী" সংবাদ দিতেছেন। এই বিষয়ে এক মন্তব্যে পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "জানা গিয়াছে যে, শহরের বিভিন্ন দোকান হইতে মোট ছাব্বিশ-সাতাশ সের গুড়া দুধ বিক্রয় হইয়া থাকে। পৌর স্বাস্থ্যবিভাগ এদিকে নজর দিবেন কি?" (২২শে কার্ত্তিক)

গোপালন ও গাভীর উন্নয়ন এই দুই ব্যাপারে বাংলা বোধ হয় সারা ভারতের পিছনে পড়িয়া আছে। কালনার অবস্থা কিছু আশ্চর্য্য নয়, পশ্চিম বাংলার অন্য অনেক শহরেই ঐরকম অবস্থা বহুদিন যাবৎ রহিয়াছে।

ব্রিটিশ সভ্যতার নিদর্শন

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত দক্ষিণ রোডেশিয়া একটি ব্রিটিশ কলোনী। ১৯৫৩ সনে সেণ্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন গঠিত হয়, কিন্তু দক্ষিণ রোডেশিয়া উক্ত ফেডারেশনের সদস্য হইলেও উহার রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধন হয় নাই। যদিও দক্ষিণ রোডেশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে ব্রিটিশ সরকার সচরাচর সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করেন না তথাপি শাসনতান্ত্রিক প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আফ্রিকান জনসাধারণ-সম্পর্কিত বিধিগুলির জন্য পূর্ব্বাহ্নেই ব্রিটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেট অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতেই হয়।

আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানেই যে বর্ণবৈষম্য নীতি শ্বেতাঙ্গগণ জোর করিয়া চাপাইয়াছে, দক্ষিণ রোডেশিয়াতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এইরূপ বর্ণবৈষম্যনীতি কিভাবে কার্য্য করিতেছে সম্প্রতি-প্রকাশিত একটি ঘটনা তাহার উপর আলোকপাত করিতেছে।

প্রচলিত আইন অনুযায়ী শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গগণ পৃথক পৃথক স্থানে বসবাস করে। বলা বাহুল্য, শহর এবং গ্রামের শ্রেষ্ঠতর অংশগুলিই শ্বেতাঙ্গগণ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত ও পাকিস্থানের দুই জন কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী সলসবেরীতে কার্য্যব্যপদেশে গমন করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের পক্ষে কোন উপযুক্ত বাসস্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—স্বভাবতঃই প্রতিনিধিদ্বয় (অন্ততঃ শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিতে) কৃষ্ণাঙ্গ, কাজে কাজেই শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চলে তাঁহারা কোন বাসভবন পান নাই, অথচ কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চলে এমন বাড়ী খুব কমই আছে যেখানে থাকিয়া কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কার্য্যকলাপ সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। অবশেষে দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী লর্ড ম্যালভার্ণ (Malvern)-এর সহায়তায় সাময়িকভাবে তাঁহারা একটি বাসস্থান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কৃষ্ণকায় কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ যে কেবলমাত্র বাসস্থান সংগ্রহের ব্যাপারেই অসুবিধার সম্মুখীন হন তাহা নহে। সিনেমা, হোটেল, রাস্তাঘাট সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে এইরূপ বৈষম্যনীতির দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে হয়।

ইহাই শ্বেতাঙ্গ (এস্থলে ব্রিটিশ) সভ্যতার রূপ। "মহান্ সভ্যতার" মর্ম্মার্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়াই না মূর্খ আফ্রিকাবাসী ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের পদত্যাগ

ভারত সরকার ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে যে কেন্দ্রীয় সম্পাদক বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তাহার ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়। প্রকাশ, বিগত ১লা নবেম্বর ড. মজুমদার তাঁহার কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সম্পাদক বোর্ডের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের মতানৈক্য বহুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রধানতঃ সেই কারণেই কোন ইতিহাস রচিত হইবার পূর্ব্বেই সরকার জুন মাসে বোর্ড ভাঙিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু আলোচনার পর সরকার বর্ত্তমান বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বোর্ডের মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে সম্মত হন। ভারতীয় ইতিহাস রচনা করা এক দিনে সম্ভব নহে এবং সেজন্য উপযুক্ত পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বোর্ড অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই বহু মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তথাপি সরকার বোর্ডের কার্য্যকালের মেয়াদ আর বাড়াইতে রাজী হন নাই।

ড. মজুমদারের পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ইতিহাস রচনার ব্যাপারে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া চলিবার জন্য ইতিহাসে অনভিজ্ঞ বোর্ড সদস্যদের পীড়াপীড়ির সহিত তিনি একমত হইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্ম্মাণ

১৯৫১ সনের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, ভারতে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ গ্রাম্য গৃহ রহিয়াছে। অনুমান করা হয়, উহাদের মধ্যে ৪ কোটি ৬ লক্ষ গৃহই প্রচলিত মানদণ্ডের বিচারে অনুপযুক্ত বিবেচিত হইবে, ইহাদের পুনর্নির্ম্মাণ প্রয়োজন। তাহা ছাড়া অত্যধিক ভিড়ের চাপ কমাইবার জন্য অবিলম্বে ৬৫ লক্ষ নূতন গৃহনির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আরও ছয় লক্ষ নূতন গৃহনির্ম্মাণ আবশ্যক। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ গ্রাম্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ বা পুনর্নির্ম্মাণ করা দরকার। প্রতি গৃহের জন্য গড়পড়তা খরচ দুই হাজার টাকা ধরা হইলে উপরোক্ত সংখ্যক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ১৯,৬৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থার ভার ছিল রাজ্য সরকারগুলির উপর। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে এইজন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু পরিমাণে তাহা নিতান্তই নগণ্য। আজ পর্য্যন্ত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত অঞ্চলগুলিতে মাত্র ৪৩৫টি নূতন গৃহের সংস্কারসাধন করা হইয়াছে। অর্থাৎ সোজা কথায়—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য গৃহনির্ম্মাণ সম্পর্কে কিছুই করা হয় নাই বলিলেও চলে।

১৫ই নবেম্বর তারিখের "এ. আই. সি. সি. ইকনমিক রিভিয়ু" পত্রিকায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য গৃহনির্ম্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রী এন্. আর. মালকানী লিখিতেছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ বিষয় সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং গ্রাম্য গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনার জন্য অন্ততঃপক্ষে নাগরিক গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনার সমান অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। গ্রামে গৃহনির্ম্মাণের সমস্যা শহরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল—কারণ সেখানে জমি সস্তা, গৃহনির্ম্মাণের মালমশলাও নিকটেই পাওয়া যায়, জীবনধারণের মানও অপেক্ষাকৃত সাধারণ।

লেখক প্রাথমিক কার্য্য হিসাবে কৃষি-মজুরদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ গৃহ-মজুরদের সংখ্যা (তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়সহ) ১৯৫১ সনে চার কোটি ত্রিশ লক্ষ ছিল। ইহাদের বাসগৃহের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আশী লক্ষ গৃহের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ গৃহের সম্পূর্ণ পুনর্নির্ম্মাণ বা সংস্কারসাধন প্রয়োজন। শ্রীমালকানীর মতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অন্ততঃপক্ষে এইটুকু ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এই গ্রাম্য গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে গ্রামাঞ্চলে কর্ম্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে একথাও স্মরণ রাখা দরকার।

মাদ্রাজ প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট

১৯৫৪ সনের নবেম্বর মাসে মাদ্রাজ সরকার মাদ্রাজ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিয়া উহার উন্নতিবিধানের পন্থা-নির্দ্দেশের জন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা-কমিটি নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. আলাগাপ্পা চেটিয়ার, অপরাপর সদস্য ছিলেন—এস. মীনাক্ষীসুন্দর মুদালিয়র; কে.

অরুণাচলম ; এম. অরুণাচলম ; এবং এস. গোপালকৃষ্ণ আয়ার। বিগত ২রা অক্টোবর ঐ কমিটি মাদ্রাজ সরকারের নিকট তাহাদের রিপোর্ট পেশ করেন।

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রদত্ত সংবাদে জানা যায় যে, মাদ্রাজ সরকার রিপোর্ট সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রাজ্যবিধানসভার সহিত পরামর্শ করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রিপোর্টটি শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে। তবে সরকার যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন তাহা ১৯৫৬-৫৭ সনের বিদ্যালয়-বর্ষ হইতে কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে সরকারী সূত্র হইতে গৃহীত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত পত্রিকার ১৫ই অক্টোবর সংখ্যায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কমিটি প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান কাঠামোর কোন আমূল সংস্কারের পরামর্শ দেন নাই। বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ বুনিয়াদী-ব্যবস্থায় পরিণত করিবার সুপারিশ করিলেও কমিটি এই ব্যাপারে কোনরূপ হঠকারিতার সমর্থন করেন নাই, এ সম্পর্কে রাজ্যসরকার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন মোটামুটিভাবে কমিটি তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তবে দ্বিপ্রহরে ছাত্রদিগকে খাদ্য-সরবরাহ করিবার জন্য ব্যবস্থার উপর কমিটি বিশেষ জোর দিয়াছেন। কমিটির মতে তিন শত হইতে পাঁচ শত অধিবাসীসম্পন্ন প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ছাত্র যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় ঐ সকল বিদ্যালয়ে যোগদান করে কমিটির অভিমতে তজ্জন্য সরকারের উচিত বিনামূল্যে পুস্তক, শ্লেট এবং দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য সরবরাহ করা। প্রারম্ভিক ব্যবস্থা কমিটি পরামর্শ দিয়াছেন যে, যে সকল গ্রামে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বিদ্যালয়ে দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য সরবরাহের মোট ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ আদায় হইতে পারে সেই সকল স্থানে অবিলম্বেই অবৈতনিক দ্বিপ্রাহরিক আহার্য্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য আঞ্চলিক কমিটি গঠনের একটি অভিনব প্রস্তাব কমিটি করিয়াছেন। জেলা-স্কুল-বোর্ডসমূহের ক্ষমতা এই আঞ্চলিক বোর্ডগুলিকে দেওয়া হইবে এবং উহারা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য দায়ী থাকিবে। কমিটি বলিয়াছেন যে, অতঃপর কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটি এবং আঞ্চলিক বোর্ডগুলিই প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিতে পারিবে। তবে কোন বোর্ডের অধীনে ২০০-এর বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে না। ব্রিটেনের নজীর দেখাইয়া কমিটি বলিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপরই সর্ব্বাধিক জোর দিতে হইবে। ব্রিটেনে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ করা হয় এবং তন্মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং ব্যয়িত হয় বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য।

কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিন বৎসরের মধ্যে মনোনীত পাঠ্য পুস্তকের পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে।

যে সকল বিদ্যালয় এক জন শিক্ষককে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সকল একক-শিক্ষক-সম্পন্ন বিদ্যালয়ে যাহাতে শিক্ষকগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় কমিটি তজ্জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, কারণ এই ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ এই সকল স্কুলে কাজ করিবার প্রেরণা পাইবেন।

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত (mentally defective) বালকদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় খুলিবার পরামর্শ দিয়া কমিটি সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যেন রাজ্যের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত শিশুদের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়।

কমিটি বলিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পাঠ্যতালিকায় ধর্ম্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়াছেন।

১৯৩৯ সনে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পাঠ্য তালিকা প্রণীত হইয়াছিল তাহার সংশোধনের জন্য কমিটি একটি এডহক কমিটি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি দিন দিন ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের একচেটিয়া জমিদারী ছিল ব্রিটেনের, রাশিয়া এখানে আসিত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে ব্রিটেনের ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের মিশর ও ইরাণ ছিল ব্রিটেনের বড় ঘাঁটি, আজ এই দেশগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন। মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। ইরাণ, ইরাকের তৈল-সম্পদ পৃথিবীর তৈলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, আর ভূমধ্যসাগরে কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলে মধ্যপ্রাচ্যের উপর প্রাধান্য অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভূমধ্যসাগরে আছে ব্রিটেনের নৌ-ঘাঁটি, প্রধানতঃ ক্রীট এবং সাইপ্রাস দ্বীপে। এতদিন পর্য্যন্ত রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের মিশর, সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশগুলিতে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মিশর চেকোশ্লোভাকিয়ার নিকট হইতে অস্ত্র সাহায্য লইতেছে এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশও চেকোশ্লোভাকিয়ার নিকট হইতে অস্ত্র ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছে। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার মাধ্যমে রাশিয়া মিশরকে অস্ত্র সাহায্য দিতেছে।

অস্ত্র সাহায্য ব্যতীতও মধ্যপ্রাচ্যের ছোট ছোট দেশগুলির সহিত রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে। লিবিয়ার সহিত রাশিয়া সম্প্রতি রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। লিবিয়া অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি ইজারা দিয়াছে এবং লিবিয়াকে রাশিয়া এংলো-আমেরিকান শক্তির উপগ্রহ হিসাবেই এতদিন গণ্য করিত। এখন

রাশিয়া লিবিয়ার বড় পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দাঁড়াইয়াছে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে লিবিয়া যাহাতে সভাপদ পাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

সৌদী আরবদেশ ও ইয়েমেনের সহিতও রাশিয়া রাষ্ট্রদূত বিনিময় ব্যবস্থা করিয়াছে। আরব রাষ্ট্র তৈলখনির জন্য বিখ্যাত এবং তৈলখনির নিকটবর্ত্তী এলাকা ধরহন্ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ইজারা দিয়াছে। সম্প্রতি ইয়েমেনের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি হইয়াছে। ইয়েমেনের ইমাম ইহুদী বিরোধী এবং ইয়েমেন বিপক্ষে থাকিলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে এডেন বন্দরের সামরিক বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। ব্রিটিশের এডেন বন্দর লোহিত সাগরকে পাহারা দেয় আর সমৃদ্ধিশালী পারস্য উপসাগরের প্রবেশ দ্বারে ইহা অবস্থিত হওয়ায় ইহার সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। সেইজন্য ইয়েমেন রাশিয়ার প্রভাবে থাকিলে মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য।

সুদূর আফ্রিকা মহাদেশেও রাশিয়া পাড়ি দিতে সুরু করিয়াছে। সুদানের রাজধানী খার্টুমে রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া তাহাদের সওদাগরী আপিস খুলিয়াছে। অদূরভবিষ্যতে সুদান স্বাধীন হওয়ার দাবী রাখে এবং সুদানে ঘাঁটি স্থাপন দ্বারা রাশিয়া আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিল। মিশর, সিরিয়া ও লেবাননের সহিত রাশিয়ার বাণিজ্যিক চুক্তি আছে; অধিকন্তু সম্প্রতি এই তিনটি দেশকে রাশিয়া অর্থনৈতিক ও শিল্পী-প্রশিক্ষণ সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ইহাদের সকলেরই বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা আছে, কিন্তু অর্থাভাবে সেগুলিকে কার্য্যকরী করিতে পারে নাই। মিত্রশক্তিবর্গের নিকট হইতে ইহারা অর্থ সাহায্য প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই; তাহার কারণ আমেরিকা চায় যে তাহার সঙ্গে সামরিক কিংবা কূটনৈতিক চুক্তি না করিলে কোনও প্রকার সাহায্য দিবে না।

কিন্তু এই দেশগুলি আমেরিকার সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে নারাজ, ফলে আমেরিকাও ইহাদের অর্থনৈতিক সাহায্য করিতে রাজী নয়। রাশিয়া যে অর্থনৈতিক কিংবা শিল্পী-প্রশিক্ষণ শিক্ষা দিতে রাজী হইয়াছে, তাহার পিছনে কিন্তু কোনও রাজনৈতিক সর্ত্ত নাই; সেই কারণে মিশর আজ আমেরিকাকে ছাড়িয়া রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছে। লেবাননের হাসবনী ও লিতনী নদীর সেচ এবং জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনায় রাশিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে। সিরিয়ার ইয়ারমুক নদী-পরিকল্পনায়ও রাশিয়া সাহায্য করিবে। মিশরে নীল নদের উপর আসওয়ানের দক্ষিণে ৬০ কোটি ডলারের যে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে সে ব্যাপারে রাশিয়া সাহায্য করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইলে বর্ত্তমান কৃষিভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষিজমি হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে; এবং সস্তায় জল-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ার ফলে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে।

কিছুকাল যাবৎ মিশর চেষ্টা করিতেছে যাহাতে বিশ্বব্যাঙ্ক কিংবা পাশ্চাত্ত্যদেশসমূহ হইতে ব্যক্তিগত ঋণ পায়। সম্প্রতি মিশর ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে যে, মিশর মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক সন্ধি সংস্থায় (M.E.D.O.) যোগ না দেওয়ায় এই দুইটি দেশ মিশরকে ঋণদান ব্যাপারে দেরী করাইয়া দিতেছে। রাশিয়ার নিকট হইতে মিশর সাহায্য পাইবার পর মিশরের পত্রিকাগুলি এক বাক্যে আমেরিকার চারশীলা (Point Four) সাহায্যকে প্রত্যাখান করার দাবি জানাইয়া আসিতেছে। ১৯৫১ সন হইতে চারশীলা অনুসারে আমেরিকা মিশরকে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিক্ষা এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত গত বৎসর রেলপথ, স্থলপথ ও জলপথ উন্নয়নের জন্য মিশরকে চার কোটি ডলার দিয়া সাহায্য করিয়াছে। সেই কারণে মিশর দুই পক্ষের নিকট হইতেই অর্থ সাহায্য লইতে প্রস্তুত। নীল নদের উপর উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণ ব্যাপারে মিশর পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতেই অর্থনৈতিক ও টেক্নিক্যাল সাহায্য লইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইংরেজ, জার্ম্মান ও ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার লইয়া আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হইয়াছে এবং নীল নদের বাঁধ নির্ম্মাণ ব্যাপারে এই কমিশন সাহায্য করিবে।

মিশর রাশিয়ার (অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়ার) নিকট হইতে অস্ত্র ক্রয় করাতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইডেন প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ইহাতে মধ্যপ্রাচ্যের ভারসাম্য নষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমেরিকা যখন পাকিস্থানকে অস্ত্র সাহায্য দিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাতে ভারতবর্ষ একাকীই প্রতিবাদ করিয়াছিল যে, ইহাতে ভারতের বিরুদ্ধে ভারসাম্য যাইবে, বিশেষতঃ কাশ্মীর লইয়া যখন ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিবাদ বর্ত্তমান; কিন্তু তাহার প্রতিবাদে তখন মিঃ ইডেনের গলা শোনা যায় নাই। মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কী ও ইরাক সামরিক চুক্তিবদ্ধ এবং ইহারা মিত্রশক্তির পক্ষে। মধ্যপ্রাচ্য সামরিক সংস্থার প্রধান সভ্য হইতেছে ব্রিটেন, পাকিস্থান, ইরাক ও তুর্কী। ইস্রায়েলের পিছনে আছে মিত্রশক্তিবর্গ। এক দিকে রাশিয়ার প্রাধান্য এবং অন্য দিকে আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস।

ভারতস্থিত বৈদেশিক ব্যবসায়ে ভারতীয় কর্ম্মচারী

"হিন্দু" পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন, ভারতে অবস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতীয় কর্ম্মী-নিয়োগ সম্পর্কে সর্ব্বশেষ যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সকলেই সাধারণভাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৫ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঐরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মী নিয়োগের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এইরূপ :

বৎসর	ভারতীয় কর্ম্মীর সংখ্যা	বিদেশী কর্ম্মীর সংখ্যা	মোট কর্ম্মীর সংখ্যা
১৯৪৭	৬,১৬২	৭,৬২৩	১৩,৭৮৫
১৯৪৮	৭,৯০২	৮,০৫২	১৫,৯৫৪

১৯৪৯	১০,০৩৩	৮,২৮৬	১৮,৩১৯
১৯৫০	১১,৮০৩	৮,৩১৮	২০,১২১
১৯৫৪	১৮,৬৪২	৭,৭৫০	২৬,৩৯২
১৯৫৫	২১,২৪২	৭,৫২৬	২৮,৭৬৩

এই সকল পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মাসিক ৩০০-৪৯৯ টাকা বেতন গ্রুপে চীনা, পাকিস্থানী এবং ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই গ্রুপে ভারতীয় কর্ম্মীর সংখ্যা ১৯৫৪ সনে শতকরা ৯৮·৮ ভাগ হইতে ১৯৫৫ সনে শতকরা ৯৮·২ ভাগে দাঁড়ায়।

মাসিক ৫০০-৯৯৯ এবং ১০০০ টাকা বেতনের ভারতীয় কর্ম্মীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমোক্ত গ্রুপে অর্থাৎ ৫০০-৯৯৯ বেতনে নিযুক্ত কর্ম্মীদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা কারিগরী পদগুলিতে শতকরা ৯৩·৩ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৯৪·৫ ভাগে দাঁড়ায় এবং অ-কারিগরী (non-technical) পদগুলিতে শতকরা ৯০·৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৯২·৯ ভাগে দাঁড়ায়।

যে সকল প্রতিষ্ঠানে হাজার টাকা এবং তাহার উপরে মাসিক বেতন পান এরূপ কর্ম্মীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশী রহিয়াছে সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৫৪ সনে ছিল নয়টি—১৯৫৫ সনে তাহা পাঁচটিতে নামিয়া আসে।

যে ধরনের প্রতিষ্ঠানে বিদেশী কর্ম্মীবৃন্দ অর্দ্ধেকেরও বেশী পদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে: খনিশিল্প (৬৬·১ %), ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানী (৬৪%), চিনি এবং মদ্যোৎপাদন কারখানা (৬২%); ইনসিওরেন্স কোম্পানী (৬২·১%) কাপড়ের কল (৬০·৫%), যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কারখানা (৫৬·৮%), মোটর ব্যবসায়ী (৫৫·৯%) এবং অন্যান্য কোম্পানী (৫৬%) ও পুস্তক প্রকাশনা সম্পর্কিত ব্যবসায় (৫৫%)।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ ব্যবসায়

সমগ্র অ-কমিউনিষ্ট জগতের উৎপাদনের প্রায় এক চতুর্থাংশ এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সমগ্র উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধাংশ ৫০০টি বৃহৎ মার্কিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। দুইটি ব্যতীত এই ৫০০টি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটির বার্ষিক বিক্রয়ের মূল্য পাঁচ কোটি ডলার (পঁচিশ কোটি টাকার মত)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে তিন লক্ষ ষাট হাজার শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, ঐ ৫০০টি প্রতিষ্ঠান সংখ্যার দিক হইতে উহাদের শতাংশের দুই-দশমাংশ অপেক্ষাও কম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি বৎসর যে পরিমাণ বিক্রয় করে এই ৫০০টি প্রতিষ্ঠান তাহার শতকরা ৫১ ভাগ নিয়ন্ত্রিত করে। সমগ্র নীট মুনাফার শতকরা ৬৬ ভাগ পায় এই ৫০০ প্রতিষ্ঠান। সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত সম্পদের (assets) শতকরা ৫৬ ভাগ ইহাদের হাতে, যদিও শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অর্দ্ধেকেরও কম—শতকরা ৪৪ জন মাত্র—ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত আছে।

এই পাঁচ শতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন। ১৯৫৪ সনে এই প্রতিষ্ঠান ১০০০ কোটি ডলার (প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা) মূল্যের পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করে। জেনারেল মোটরস-এর পর উল্লেখযোগ্য হইল ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল (নিউ জার্সি)—ইহাদের বাৎসরিক বিক্রয়ের মূল্য ৫৭০ কোটি ডলার। এই গোষ্ঠীতে তৃতীয় স্থান অধিকারী হইল ফোর্ড—ইহাদের বাৎসরিক বিক্রয়ের মূল্য ৩২০ কোটি ডলারেরও অধিক; চতুর্থ হইল ইউ. এস. ষ্টীল।

বহু শিল্পেই তিনটি বা চারটি প্রতিষ্ঠান প্রভুত্ব চালাইতেছে।

উপরোক্ত তথ্যগুলি "এ.আই.সি.সি ইকনমিক রিভিয়ু" পত্রিকার ১৫ই অক্টোবর সংখ্যা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ায় নির্ব্বাচনের ফলাফল

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই—হয়ত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহা প্রকাশিত হইবে। তবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দলের ভোট সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার খুব একটা অদলবদল হইবার সম্ভাবনা কম।

নির্ব্বাচনে ১৯০টি পার্টি এবং সংগঠন যোগদান করিয়াছিল—নির্ব্বাচনের ফলে উহাদের অধিকাংশই ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমিকা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী "অস্থায়ী" পার্লামেণ্টে যে সকল পার্টির সদস্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল—নির্ব্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, সেইরূপ কয়েকটি পার্টিও জনসমর্থন লাভে অক্ষম হইয়াছে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক জীবন এখন প্রধানতঃ চারটি পার্টি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে। উক্ত পার্টিগুলি হইতেছে পি. এন. আই (জাতীয়তাবাদী), মসজুমী (মুসলিম), নাদাতুল উলেমা (রক্ষণশীল মুসলিম) এবং কমিউনিষ্ট পার্টি।

ইন্দোনেশিয়ার নির্ব্বাচনে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের ভোটাধিকার ছিল—তাঁহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৭৫জন নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। পুরুষ এবং নারী ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় সমান সমান। যদিও নির্ব্বাচনে কোনরূপ দুর্নীতি দেখা দেয় নাই বলা ঠিক হইবে না তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মোটামুটিভাবে সুষ্ঠুভাবেই নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে।

ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে ইন্দোনেশিয়াতে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আর একটি নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচকমণ্ডলী ৫২০ জন সদস্যসম্বলিত এক গণপরিষদ গঠন করিবেন। উক্ত গণপরিষদ ইন্দোনেশিয়ার সংবিধান প্রণয়ন করিবেন।

পাকিস্থান প্রেস কমিশন

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানের সংবাদ-পত্রগুলির নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাহা প্রতিবিধানের নিমিত্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া সুপারিশ করিবার জন্য একটি প্রেস কমিশন গঠন করেন। প্রথম হইতেই পাকিস্থান সংবাদপত্র সম্পাদকসঙ্ঘ উক্ত কমিশনের বিরোধিতা করে। ফলে সম্প্রতি সরকার উক্ত কমিশন ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দোনেশিয়া

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" নাটকের অভিনয় হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ভাষণদান প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডাঃ সোয়েকার্ণো বলেন যে, ১৯২৭ সনে রবীন্দ্রনাথ যখন ইন্দোনেশিয়ায় আগমন করেন তখন রবীন্দ্র-নাথের বাণীই তাঁহাকে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করে।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যনীতি অবসানের পদক্ষেপ

গত নবেম্বর এক নির্দ্দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সাধারণের ব্যবহৃত পার্ক, স্নানাগার, সুইমিং পুল ও স্নানের জন্য ব্যবহৃত সমুদ্রসৈকতে বর্ণগত পৃথকীকরণ আইন বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মেরীল্যাণ্ড ও ভর্জিনিয়ায় এই নির্দ্দেশ প্রযুক্ত হইবে।

"মার্কিনবার্ত্তা" বলিতেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় সংবাদপত্র সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্তে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।" দক্ষিণাঞ্চলে সুপ্রীম কোর্টের রায় কার্য্যকরী করার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইয়া "নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" বলেন :

"মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট যখন ১৯৫৪ সনের ১৭ই মে সরকারী বিদ্যালয়ে বর্ণবিভেদ অবৈধ বলিয়া ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন, তখনই কোর্ট বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য হয়। সোমবারের সিদ্ধান্ত দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট সেই পথই অনুসরণ করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত দুইটি সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পার্ক, সমুদ্রসৈকত ও গলফ মাঠে বর্ণগত পৃথকী-করণ নীতি অনুসরণ করার অর্থ সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার অস্বীকার করা।

অত্যন্ত অল্পসংখ্যক শব্দের সাহায্যে সুপ্রীম কোর্টের রায় জারী করা হইয়াছে। ইহার জন্য অধিক কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় নাই। সকল বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ইহা ব্যতীত অন্যরূপ কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার কথা কল্পনা করা কঠিন।

দক্ষিণাঞ্চলে অনিবার্য্যভাবেই বিরোধিতা দেখা দিয়াছে। তবে ইহারই মধ্যে আনন্দের বিষয় এই যে, মেরীল্যাণ্ডের গবর্ণর জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্য সুপ্রীম কোর্টের আদেশ কেন অমান্য করিবে তিনি তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পান না।"

এবারে নোবেল প্রাইজ

এবারে সুইডিশ একাডেমী নোবেল পুরস্কার বিতরণে তাহাদের গতানুগতিক ধারার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিয়াছেন। সাধারণভাবে সুইডিশ একাডেমী তাহাদের বিরুদ্ধমতসম্পন্ন কোন লেখককে পুরস্কার দিতে চান না এবং একাডেমীর অধিকাংশ সদস্যের দৃষ্টি-ভঙ্গীই রক্ষণশীল। পুরস্কার বিতরণে তাঁহাদের এই রক্ষণশীল নীতির যে কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই তাহা বলা চলে না। কিন্তু সাধারণভাবে একথা সত্য যে, প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে খুব কমই নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সাহায্যের জন্য যাঁহাদিগকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের নামের তালিকা দেখিলেও বুঝা যাইবে সুইডিশ একাডেমীর সদস্যবৃন্দের চিন্তাধারা কিরূপ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুদূর আইসল্যাণ্ড দ্বীপের হ্যাল্ডর কিলিয়ান ল্যাক্সনেসকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ল্যাক্সনেসের নাম গত আট বৎসর যাবৎ সুইডিশ একাডেমীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি বারই তিনি পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই বৎসর এক জন বিখ্যাত ফরাসী কবি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে ছিলেন।

ল্যাক্সনেস-এর কোন রচনা বাংলায় অনূদিত না হইলেও ইংরেজীতে তাঁহার অনেকগুলি রচনার অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য "সাল্কাভাল্কা", "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল", "দি বেল অব আইসল্যাণ্ড", "দি ফেয়ার হেডেড গার্ল", "ফায়ার ইন্ কোপেনহেগেন", "এটমিক বেস" এবং "দি উইভার ফ্রম কাশ্মীর"।

১৯৫৫ সনের পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে তিন জন মার্কিন বিজ্ঞানীকে। পদার্থবিজ্ঞানের পুরস্কারটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডব্লিউ. ই. ল্যাম্ব এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ পলিকার্প কুশ-এর মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। উক্ত পদার্থবিজ্ঞানীদ্বয় বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল আড্রিয়ান মরিস ডির‍্যাকের ভুল সংশোধন করিয়া এই বৎসর নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই সংশোধনের ফলে পরমাণুর মধ্যে কি ঘটিতেছে তাহা বুঝা সহজতর হইয়াছে এবং পরমাণুর গুণাগুণ ও উহার উপাদান নির্ভুল-ভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে।

রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হইবে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিনসেণ্ট ড্যু ভিনো-কে। যে দুই প্রকার হর্ম্মোন বা জৈব রাসায়নিক পদার্থ সন্তানজন্মের ব্যাপারে সহায়তা করে এবং মূত্রগ্রন্থির মত গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত রাখে, ডাঃ ভিনো তাহাদের বিষয়ে গবেষণা করিয়া নোবেল পুরস্কার

লাভ করেন। সুইডিশ একাডেমীর কর্তৃপক্ষ ডাঃ ভিনোর গবেষণাকে "জৈব রসায়নশাস্ত্রে এক ঐতিহাসিক অবদান" বলিয়া বর্ণনা করেন।

পূর্ববঙ্গে বাংলা একাডেমী

সাপ্তাহিক "যুগশক্তি"র এক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গ সরকার নাকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য ঢাকায় একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ একাডেমীতে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিষয়ে পরিভাষা রচিত হইবে এবং অন্যান্য ভাষা হইতে বাংলায় বিভিন্ন পুস্তকাদির অনুবাদের ব্যবস্থা করা হইবে। এই একাডেমীর পরিকল্পনা নাকি হক্ মন্ত্রীসভা প্রথম গ্রহণ করেন। বর্তমানে আবুহোসেন সরকার পরিচালিত মন্ত্রীসভা উহার রূপদানে সচেষ্ট হইয়াছেন।

কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে ২২শে অক্টোবর প্রকাশিত "কাশ্মীর পোষ্ট" পত্রিকায় কয়েকটি মন্তব্য করা হইয়াছে। "দুর্বৃত্ত ও নির্বোধ" (Knaves and Fools) শীর্ষক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীরে মুষ্টিমেয় একদল রহিয়াছে বক্সী গোলাম মহম্মদ সরকারের বিরোধিতা করাই যাহাদের পেশা। বাস্তব সত্যাসত্য বিচার করিবার কোন চেষ্টা ইহাদের নাই—ইহারা কেবল সরকারের সমালোচনাতেই আনন্দ উপভোগ করেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাষায় "ইহারা হয় দুর্বৃত্ত না হয় নির্বোধ এবং ইহাদের চিন্তাধারার মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নাই।" এই বিরোধী দলের প্রধান নেতৃবৃন্দের মধ্যে মির্জ্জা আফজল বেগ অন্যতম।

মির্জ্জা আফজল বেগের আচরণ সম্পর্কে ঐ সংখ্যাতেই অপর এক মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাশ্মীর সফরের সময় মির্জ্জা আফজল বেগ এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ যে ব্যবহার করেন তাহা নিতান্তই হাস্যকর। ইহারা প্রথমে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেন যাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্বর্দ্ধনাতে কেহ যোগদান না করে। তাঁহাদের পূর্ব্ব কৃত কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া জনসাধারণ যখন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না দেখা গেল তখন বেগ সাহেব ও তাঁহার দলবল ভোল পাল্টাইয়া ফেলিলেন। তাঁহারা রাষ্ট্রপতিকে তাঁহাদের আনুগত্য সম্পর্কে বহু আশ্বাস দিলেন। এমনকি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনা সভাতেও তাঁহারা যোগদান করিলেন। প্রথম সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদান না করিবার কারণ সম্পর্কে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, রাজ্যসরকারের "অগণতান্ত্রিক এবং দমন নীতি"র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই তাহা করা হইয়াছিল।

"কাশ্মীর পোষ্ট" লিখিতেছেন: "ইহারা কাহাকে ঠকাইতে চান তাহা বুঝিতে পারা শক্ত। বর্ত্তমানে তাঁহাদের কার্য্যাবলীর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হইল বক্সী সরকার এবং তাহাদের নীতি সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা। সামান্যমাত্র প্রভাবশালী ভারতবাসী আসিলেও ইহারা তাঁহার সহিত দেখা করেন ও তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে রাজ্যসরকার তাঁহাদিগকে ভারতবিরোধী বলিয়া গালাগাল করিলেও আসলে ইহারা ভারতবিরোধী নহেন। এইরূপ অবস্থায় প্রকাশ্যে এই অভিমত ঘোষণা করিবার পথে বাধা কোথায়?"

পত্রিকাটির অভিমত অনুযায়ী মিঃ বেগ এবং তাঁহার অনুগামীদের চেষ্টা হইল বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন কথা বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত জয় করা এবং প্রয়োজন মত তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। ইহারা নিজেরা ভারতবিরোধী নহেন এবং কেবলমাত্র আত্মসম্মানের খাতিরেই একথা ইহারা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে পারিতেছেন বলিয়া যে যুক্তি ইহারা দেখান কাশ্মীর এবং উহার রাজনীতির সহিত পরিচিত কোন ব্যক্তিই তাহাতে প্রবঞ্চিত হইবেন না।

কাশ্মীরে অন্যপ্রকার গোলযোগের কথা বিদেশী সংবাদে পাওয়া যায়। তাহার কোনও উল্লেখ এদেশের কোনও সংবাদে পাওয়া যায় না। যদি সে সকল সংবাদ অমূলক হয় তবে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ্যে করা উচিত। ব্রিটিশ বেতারবার্ত্তা কিছুদিন পূর্ব্বে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিয়াছে। তাহার কোনও উল্লেখ আমরা কোথাও পাই নাই। যদি ঐ সংবাদও অমূলক হয় তবে ব্রিটিশ সরকারকে এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া উহার সংশোধন করানো প্রয়োজন।

নারী ও রাজনীতি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (UNESCO)-এর উদ্যোগে ইউরোপের চারিটি যথা ফ্রান্স, নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়া এবং জার্ম্মান ফেডারেল রিপাবলিকে (পশ্চিম জার্ম্মানীতে) উক্ত দেশগুলির রাজনীতিতে নারীদের স্থান সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কার্য্য চালানো হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নারীজাতির অবস্থাসম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক আহূত হইয়া উক্ত সংগঠন (UNESCO)-এর সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সনে ঐ অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালিত করে। এই অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া প্যারিস এবং বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মরিস দ্যুভার্গো (Maurice Duverger) "নারীজাতির রাজনৈতিক ভূমিকা" (Political Role of Women) শীর্ষক একটি পুস্তক লেখেন।

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নানাবিধ তথ্য ঐ পুস্তকে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক দ্যুভার্গো লিখিতেছেন যে, উক্ত চারিটি দেশে নারীদিগকে পুরুষদিগের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হইলেও রাজনৈতিক জীবনে পুরুষের সমান অংশগ্রহণ করা নারীদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নাই। যদিও বর্ত্তমানে নিয়মিতভাবে পুরুষদের সহিত সমতালে নির্ব্বাচনে নারী ভোটদান করে তথাপি সরকারের উপর নারীদিগের প্রভাব খুবই সীমাবদ্ধ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুদের

যন্ত্র, আইন প্রণয়ন এবং গৃহ-নির্ম্মাণসম্পর্কিত বিষয়গুলিতেই কেবলমাত্র নারীদের প্রভাব ঘটে। কোন রাজনৈতিক পদ যতই উঁচে হয় নারীদের পক্ষে সেই পদ লাভ করা ততই কঠিন হয়। কেবলমাত্র সরকারী চাকুরী সম্পর্কেই যে একথা খাটে তাহা নহে, রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সঙ্ঘ এবং ব্যক্তিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

অধ্যাপক ভার্গা লিখিতেছেন : বিশেষ বিশেষ সংস্কারের মাধ্যমে নারীদিগকে রাজনৈতিক জীবনে অধিকতর অংশ গ্রহণের সুযোগ-দানের চেষ্টা বৃথা। রাজনৈতিক জীবনে নারীদের এই গৌণ ভূমিকা সাধারণভাবে নারীজাতির প্রতি সমাজের গতানুগতিক মনোভাবেরই সাক্ষ্য বহন করে। প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীরা যে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাহাতে তাহারা এইরূপ অবস্থাকেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করে। উক্ত অধ্যাপকের অভিমতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংস্কারের একমাত্র সুফল হইল এই যে, অভ্যাস এবং প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে আঘাত হানিয়া তাহা নারীজাতিকে আত্ম-সচেতন করিয়া তুলিতে সাহায্য করে।

উপসংহারে অধ্যাপক ভার্গা লিখিতেছেন যে, শারীরতাত্ত্বিক (physiological) এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা হীনতর এই বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো অধিকতর প্রয়োজনীয়। জাতিগত এবং শ্রেণীগত ক্ষেত্রে যেমন হীনতর জাতি অথবা হীনতর শ্রেণীর অস্তিত্ব নাই তেমনি স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে কেহই অন্য অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু কতকগুলি জাতি এবং কতকগুলি শ্রেণীর ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রেও অনেকেই রহিয়াছে যাহারা দীর্ঘকাল হীনতর অবস্থায় থাকিয়া নিজদিগকে হীনতর ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ

১লা কার্ত্তিক "দেশপ্রাণ" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে : "মেদিনীপুরে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা আমরা খুবই সমর্থন করি, কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মোটর যাত্রীদের নিকট হইতে টিকিট প্রতি দুই পয়সা করিয়া আদায় করিয়া উক্ত কলেজের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে ইহাতে আমরা একমত হইতে পারি না।"

মোটর-যাত্রীদের অধিকাংশই স্বল্পবিত্ত—ইহাদের নিকট হইতে যাতায়াতে টিকিট প্রতি দুই পয়সা আদায় করা প্রায় জুলুমের মত। তাহার উপর এমন অনেকেই রহিয়াছেন যাহাদের প্রতি সপ্তাহে বা মাসে বহুবার মোটরে ভ্রমণ করিতে হয়। "দেশপ্রাণ" বলেন, তাঁহাদের পক্ষেও এইরূপ পবর্দ্ধিত ভাড়া দেওয়া সহজ নহে।

লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিয়া একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে হয়ত সঙ্গতিপন্ন পরিবারের মেয়েরা উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে—মেদিনীপুর শহরের বাহিরের মেয়েরা ইহাতে যে বিশেষ উপকৃত হইবে তাহা মনে হয় না। মেদিনীপুরের অধিকাংশ গ্রামেই মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নাই। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং শহরে কলেজে যেরূপ সহশিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন রহিয়াছে—যে সকল গ্রামে মেয়েদের জন্য পৃথক কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও হয়ত কিছু মেয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইত। 'মাধ্যমিকে এক জন শিক্ষয়িত্রী ও ঝি'র বেতন এবং আনুষঙ্গিক কিছু খরচের জন্য সরকার যদি প্রস্তুত হইতেন তাহা হইলে সাধারণ মফস্বলের দু'পাঁচটি মেয়ে এককালে কলেজে পড়িবার আশা করিতে পারিত। সরকার সে বিষয়ে যখন মোটেই চিন্তা করেন না তখন মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ করিবার প্রেরণা যাত্রী সাধারণের মধ্যে আসিতে পারে না।"

এই অবস্থায় "দেশপ্রাণ" জেলাশাসক মহাশয়কে এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুল সম্পর্কে শুধু একজন শিক্ষয়িত্রী ও ঝি'র বেতন ও "আনুসঙ্গিক" কিছু টাকার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ স্কুল কি প্রকারে কয়টি চলিতে পারে তাহার বিশদ বিবরণ কিছু দেন নাই। মফস্বলবাসীদের মধ্যে কোথায়ও কেহ ঐরূপ সাহায্য পাইলেই যদি স্কুল স্থাপন ও চালনার অন্য খরচের যোগাড় করিতে প্রস্তুত থাকেন তবে সেই সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

মানুষ লইয়া ব্যবসা

সাপ্তাহিক "নবজাগরণ" ২৮শে আশ্বিন এক চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "জানা যায় কাশীতে তথাকথিত এক অনাথালয় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু বালক-বালিকাকে ভুলাইয়া লইয়া তথায় অসং উদ্দেশ্যে আটক করিয়া এক শ্রেণীর লোক ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে।"

সংবাদে আরও প্রকাশ যে, উক্ত অনাথ আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট জনৈক দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িয়া জামসেদপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুইটি বালক ঐ অনাথ আশ্রমে আটক পড়ে। কিন্তু একদিন ভোরবেলা তাহারা কোনক্রমে আশ্রম হইতে পলাইয়া যায়। একটি বালকের পা কাটিয়া যাওয়ায় মোগলসরাইয়ে জনৈক ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার জন্য যায়; ডাক্তারবাবুর সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুলিসে সংবাদ দেন তখন পুলিস বালক দুইটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কাশীর পুলিসকে সংবাদ পাঠায়। উক্ত আশ্রমে হানা দিয়া কাশীর পুলিস এক দল বালক বালিকাকে উদ্ধার করে। আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হইয়াছে।

সংবাদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশবিভাগ এবং অর্থনৈতিক দুর্গতির ফলে বহুলোকের জীবনেই যে অশ্চিয়তা দেখা দিয়াছে এক দল লোক তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের পাপ ব্যবসায় জাকাইয়া বসিয়াছেন। বিভিন্ন রূপেই এই ব্যবসা চলে

তবে তাহার অন্যতম রূপ হইতেছে অনাথ আশ্রম। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতে সময় সময় এই সকল আশ্রমের কুকীর্তির দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয়। দুর্গত দেশবাসীর সেবার অন্যতম প্রতিষ্ঠান অনাথ আশ্রম—আবার এই অনাথ আশ্রমের মাধ্যমেই দেশবাসীর অপরিমেয় ক্ষতি সম্ভব। অনাথ আশ্রমে যাহারা যায় তাহাদের অনেকেরই পক্ষে উহা ছাড়িয়া আসা সম্ভব হয় না। কারণ বহির্জগতে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের উপায় আজ খুবই সীমাবদ্ধ। তাহাদের উপায়হীনতার সুযোগ আজ এক দল দুর্বৃত্ত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেছে।

বর্তমান ঘটনার যে বিবরণী "নবজাগরণ" প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দুই-একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। সংবাদে দেখা যায় যে, বালক দুইটি বাঙালী এবং জামসেদপুরের অধিবাসী। তাহাদের কাকা তথাকার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। কি প্রলোভনে তাহারা জামসেদপুর পরিত্যাগ করিয়া কাশীর অনাথালয়ে গিয়াছিল? চিত্রজগতে অভিনয়ের প্রলোভনে নহে ত?

এইরূপ ব্যবসায়ে ক্রেতা কাহারা সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত।

অথ সন্ন্যাসী-ভৈরবী কথা

ভারতীয় সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রার একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা ২৬শে আশ্বিনের সাপ্তাহিক "ভারতী"তে প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জের শ্মশান-সংলগ্ন স্বরূপানন্দ আশ্রমের এক ভৈরবী গত ৮ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় শ্মশানকালীর পূজারী জনৈক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত সেবাশ্রমের মাঠে ঐ সন্ন্যাসী এক দল যুবককে ব্যায়াম শিক্ষা দিত। ঘটনার দিন ব্যায়ামচর্চ্চার পর উক্ত সন্ন্যাসী ছেলেদের লইয়া ব্যায়ামের সাজসরঞ্জাম সেবাশ্রমের একটি ঘরে রাখিবার দাবি করে। ভৈরবী উহাতে আপত্তি জানায়। দুই জনের মধ্যে অতঃপর বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয় এবং উত্তেজিত সন্ন্যাসী ভৈরবীকে প্রহার করে। পরে থানা হইতে পুলিসকে আসিয়া আশ্রমের শান্তিরক্ষা করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ২রা কার্ত্তিক "ভারতী" লিখিতেছেন: "ব্যাপারটি শুনিয়া অনেকেই হয়ত যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিবেন, কারণ আমাদেরই মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ইঁহাদের শরণাপন্ন হন এবং সংসার অসার, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি নানাপ্রকার হিতোপদেশ লাভ করেন। যাহাই হউক, বিষয়টি যদি সংসারী মানুষের সহিত ঘটিত তবুও ইহার মর্ম্ম বুঝা যাইত, কিন্তু উভয়েই যখন সংসার ত্যাগ করিয়া শ্মশান সার করিয়াছেন তখন এই জাতীয় ঘটনা সাধারণের বিস্ময় ও দুঃখের বটে।..."

দেশে এখন সকল সংস্কার বিষয়েই প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। পতনোন্মুখ জাতির দেহে বিষক্রিয়ার সকল লক্ষণই ত আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং বিস্ময় ও দুঃখের কোনই কারণ নাই। উক্ত সন্ন্যাসীর শিষ্য-শিষ্যাবৃন্দ ঐরূপ ব্যাপারেরও নিশ্চয়ই কোন অদ্ভুত বা আদিভৌতিক কারণ শুনিয়া থাকিবেন।

নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন বসিবে মাদ্রাজ শহরে। অধিবেশনের সময় ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫ হইতে ২রা জানুয়ারী ১৯৫৬। যাহাতে সম্মেলনের সদস্যগণ মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্মেলনের সদস্যদিগকে একই ভাড়ায় মাদ্রাজ যাতায়াতের সুযোগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া জানানো হইয়াছে।

বিহারে শিক্ষা-প্রসারের নমুনা

মানভূম হইতে প্রকাশিত "সংগঠন" পত্রিকা ২১শে কার্ত্তিক বিহারে শিক্ষা-প্রসারের সরকারী ব্যবস্থার একটি নমুনা তুলিয়া দিয়াছেন। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, পটমদা থানাতে সরকারী হিন্দী বিদ্যালয়ে মাত্র ১০।১৫ জন ছাত্র রহিয়াছে তথাপি সেখানে পাঁচ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও অনুরূপ অবস্থা। অথচ তাহারই পাশে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০০।১২০ জন ছাত্রের জন্য দুই জন শিক্ষকেরও বেতন মঞ্জুর করা হয় না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ত্রিপুরা সফর

বিগত ৪ঠা নবেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েক ঘণ্টার জন্য আগরতলা গমন করেন। তথায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৯ সনের ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় শাসনে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল বকেয়া খাজনা বিনাসর্ত্তে মকুব করা হইল। তাহা ব্যতীত ১৯৪৬ সনে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত রিয়াং সম্প্রদায়ের সাহায্যকল্পে ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা যে আশী হাজার টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে যে অর্থ আদায়ের জন্য নানাবিধ মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি সেই ঋণ মকুব সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সফর সম্পর্কে ২৬শে কার্ত্তিক "সেবক" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি তাৎপর্য্যপূর্ণ: "কুঞ্জবন প্রাসাদে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব রিজেন্ট মাতামহারাণী শ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৫ মিনিট কাল আলাপ-আলোচনা করেন। চারি জন মহারাজকুমারও পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ত্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদের ত্রিপুরা সফরকালীন, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা সফরে আসিলেও রাজপরিবারের কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দেখা যায় নাই। এই সাক্ষাতের মূলে যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয়।"

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় গত ১২ই নবেম্বর ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এফ-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে 'ভারতবর্ষ' মাসিকখানি তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহে প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রখানি যে প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই বাংলাভাষী এবং সাহিত্যরসিকের এত সমাদর লাভ করিয়াছিল তাহার মূলেও রহিয়াছে হরিদাস বাবুর সুবিবেচনাপূর্ণ পরিচালনা। সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস, গল্প দীর্ঘকালব্যাপী 'ভারতবর্ষ' মাসিকের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল।

হরিদাসবাবু শুধু পুস্তক-ব্যবসায়ীই ছিলেন না, যৌবনে দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের "ইভনিং ক্লাবে"র সদস্য রূপে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'বলিদান' প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের পরিচালক হন এবং নিজের নাট্যরসপ্রিয়তার সবিশেষ পরিচয় দেন।

হরিদাসবাবু সর্ব্বদা অন্তরালে থাকিতে পছন্দ করিতেন। তথাপি কর্ত্তব্যের আহ্বানে কখন কখন কোন কোন সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁহাকে যোগ রাখিতে হইত। প্রকাশক সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মার্জ্জিতরুচি নাট্য ও সাহিত্যরসিক রূপেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

রামনাথ বিশ্বাস

বিগত ১লা নবেম্বর ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাস কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। ঐদিন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বাষট্টি বৎসর হইয়াছিল।

রামনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত ছিলাম। ভূপর্য্যটক রামনাথ, লেখক রামনাথ, মানুষ রামনাথ নানা ভাবেই তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। তিনি বেশী লেখাপড়া শেখেন নাই; ভাষা বহু সময় অপরিচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু তাঁহার প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি কর্ম্ম এবং প্রতিটি চিন্তার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের ছাপ পাওয়া যাইত। আর এই জন্যই নিতান্ত দুর্ব্বৃত্তও তাঁহার নিকটে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইত। তিনি নিজে এক সময় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা দুই হাতে বিলাইয়াছেন। শেষ জীবনে যখন তিনি অর্থকষ্টের মধ্যে কাটাইতেছিলেন তখনও দীন-দুঃখীকে অর্থ-বস্ত্রাদি দিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। আবার 'সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ভূপর্য্যটকের ধর্ম্ম নষ্ট করে' এরূপ কথাও তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। জীবনের শেষ দুই বৎসর তিনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য পাইতেন।

রামনাথ ১৩০০ সালে শ্রীহট্টের অন্তর্গত বিখ্যাত বানিয়াচঙ্গ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে তিনি 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য রূপে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি দেশী পল্টনে প্রবিষ্ট হন। এ কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাকে আফগানিস্থান, ইরাণ পর্য্যন্ত যাইতে হয়। ইহা ত্যাগ করিয়া তিনি সিঙ্গাপুরে যান। সেখানে জাহাজী আদালতে ১৯২৪ হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত দোভাষীর কার্য্য করেন। এই বৎসরই তাঁহার ভূপর্য্যটন সুরু হয়। তিনি পর্য্যটন ব্যপদেশে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এই চারিটি মহাদেশের বহু অঞ্চলে গমন করেন। তাঁহার পর্য্যটনের বৈশিষ্ট্য—সাইকেলে এবং পায়ে হাঁটিয়া বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ। সিঙ্গাপুর হইতে তাঁহার ভ্রমণ আরম্ভ হয়। প্রাচ্যের প্রায় সমুদয় দেশ পর্য্যটনান্তর তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরি-ভ্রমণ করেন। তার পর আফগানিস্থান, ইরাণ, ইরাক, তুরস্ক হইয়া ইউরোপে যান। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়া বাদে তিনি ঐ মহাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র গমন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-আফ্রিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাও ভ্রমণ করিলেন। কানাডায় তাঁহাকে জেলে বাস করিতে হয় প্রায় এক মাস। কিন্তু তিনি হাল ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। দ্বিতীয় বার কানাডায় যাইয়া সে দেশও পর্য্যটন করিয়া আসেন।

কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর পূর্ব্বে সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে রামনাথ বিশ্বাসের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনীগুলি বাহির হইতে থাকে। আমরা এই সকল পাঠ করিয়া তখন ভাবিতাম, রামনাথ বাঙালী তথা ভারতবাসীর সত্য সত্যই মুখরক্ষা শুধু নয়, মুখ উজ্জ্বল করিয়া দিতেছেন। তাঁহার এই সকল প্রবন্ধ পরে বিভিন্ন ভ্রমণ-পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার ইংরেজী বাংলা পুস্তক চল্লিশখানার কম হইবে না। ইহার মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক অল্পদিন পূর্ব্বে 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' কর্ত্তৃক "রামনাথ গ্রন্থাবলী"র অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের মনে ভ্রমণ-প্রবৃত্তি জাগ্রত করাইবার জন্য তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন। তিনি একটি পর্য্যটক সমিতি গঠন করেন এবং ইহার মুখপত্রখানির কিছুকাল সম্পাদকও ছিলেন। রামনাথ বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অমায়িক, অসমসাহসী, স্পষ্টবাদী এবং দরিদ্রের বান্ধব রামনাথের প্রতি আমরা আমাদের প্রীতিশ্রদ্ধা অর্পণ করি।

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ভিত্তিতে শিব-শক্তিতত্ত্ব

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন

এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান, সবিশেষ জ্ঞান, বাহ্য পদার্থের জ্ঞান (material science) আর প্রজ্ঞানের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা পরম জ্ঞান অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান—পরম আত্মজ্ঞান (spiritual science) বা নির্বিশেষ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। এই বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী জ্ঞানের ভিত্তিতে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ যিনি স্বপ্রভ (স্বপ্রকাশ) দ্বৈতবর্জিত অর্থাৎ "একমেবাদ্বিতীয়ম্", যিনি অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপ, তিনি যখন নিজের অখণ্ড রস বা আনন্দকে লীলা করিবার ইচ্ছায় বহুরূপে বা নানারূপে ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন তখন সেই ইচ্ছা অথবা কামনা হইতে তাঁহার ভিতর যে স্পন্দন হয় ঐ স্পন্দন-শক্তি কিংবা ক্রিয়া-শক্তির নামই আদ্যাশক্তি। উহাই ব্রহ্মের আদি ইচ্ছা-শক্তি। ইনিই বিশ্বের জননী। ইনিই প্রকৃতি। চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মে যখন কোন স্পন্দন থাকে না তখন তাঁহার শক্তির অব্যক্ত অবস্থা, উহাই ব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা। সে অবস্থায় দেশ নাই, কাল নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র যাহা কিছু দৃশ্য বস্তু উহাদের কিছুই থাকে না। তখন থাকেন একমাত্র তিনি—ব্রহ্ম। তখন তাঁহার শক্তি থাকেন তাঁহাতে বিলীন অবস্থায়, নিস্পন্দ অবস্থায়। শক্তির ইহাই প্রাগ্ অবস্থা। সুতরাং এই অভেদ বা অদ্বৈত অবস্থাকে চৈতন্যও বলিতে পার অথবা অব্যক্ত শক্তিও বলিতে পার, কারণ এ অবস্থায় শক্তি ও চৈতন্য এক। শক্তি প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যেরই অবস্থান্তর বা ব্যক্তাবস্থা মাত্র।

একই শক্তি যখন নিস্পন্দ অবস্থায় থাকেন তখন তাঁহার নাম নির্গুণ ব্রহ্ম এবং ঐ শক্তিই যখন স্পন্দিত বা dynamic অবস্থায় ব্যক্ত হন তখন তাঁহার নাম হয় Energy বা শক্তি। ঐঅবস্থার নামই আদ্যাশক্তি, বা সগুণ ব্রহ্ম। বিজ্ঞান বলেন এই শক্তি কিংবা 'Energy' হইতেই বিশ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্র একমত। বিজ্ঞান বলেন শক্তির দুটি অবস্থা। একটি static বা নিস্পন্দ এবং অপরটি dynamic বা ক্রিয়াশীল। এখানে লক্ষ্য করুন— যাহাকে বিজ্ঞান শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা বলে উহাই আমাদের মা আদ্যাশক্তি—বিশ্বের জননী, এবং যাহাকে নিস্পন্দ অবস্থা বলে উহাই চৈতন্য বা শক্তির (ব্রহ্মের) নির্গুণ অবস্থা। এই নিষ্ক্রিয় শববৎ অবস্থাকেই আমাদের শাস্ত্র শবরূপী শিব বলেন এবং ঐ শবরূপী শিবের বক্ষেই মা মহাশক্তি আদ্যাশক্তি কালী নৃত্য করিতেছেন ত্রিবিধ ভঙ্গিতে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় রূপে। বিজ্ঞান সৃষ্ট বস্তুসমূহকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছে— যাহাকে আমরা জড় পদার্থ বলি উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে পাওয়া যায় মোলিকিউল ও এটম, তার পর পাওয়া যায় ইলেকট্রন ও প্রোটন এবং উহাদিগকে আরও বিশ্লেষণ করিতে করিতে পাওয়া যায় প্রোটাইল (Protile)—সর্বশেষে পাওয়া যায় একমাত্র শক্তি। সুতরাং বিশ্বে যাহা-কিছু দেখা যায় তাহা শক্তি হইতেই জাত এবং শক্তিরই ভেদমাত্র। বিজ্ঞান বলেন, শক্তিই বিশ্বের জননী এবং শক্তিরই বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দনে বিভিন্ন এটম ও মোলিকিউল হয় এবং শক্তিরই বিভিন্ন স্পন্দনে ঐ এটম ও মোলিকিউল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সজ্জিত হইয়া বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্ট হয়। ইহা বিজ্ঞানেরই কথা। আমাদের শাস্ত্রও বলেন—স্পন্দন হইতেই এই বিশ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তবে শাস্ত্র আরও বলেন যে, ব্রহ্মের কামনা বা ইচ্ছা হইতে সঞ্জাত যে ক্রিয়া-শক্তি, ঐ Energy বা শক্তিরই বিভিন্ন স্পন্দনে কিংবা বিভিন্ন ক্রিয়াশীল অবস্থা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের কারণ যে Energy (শক্তি) এ সম্বন্ধে আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান একমত হইলেও শক্তি যে ব্রহ্ম বা চৈতন্য বস্তু হইতে সঞ্জাত এ বিষয়ে উভয়ে মোটেই একমত নহেন। বিজ্ঞান যাহাকে শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা বলে, ঐ ক্রিয়াশীল অবস্থা ফুটিয়া উঠে static বা শান্ত অবস্থার বুকে। আমাদের শাস্ত্র-মতে উহাই নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশ। উহাই শান্ত শববৎ নিষ্ক্রিয় শিবের বুকে শক্তির নৃত্যলীলা বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় রূপ লীলা। ব্রহ্মের সঙ্কল্পবশতঃ যখন তদীয় শক্তি হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায় তখন তাহাকে বলে কল্পারম্ভ এবং লীলাবসানে যখন ঐ সঙ্কল্প ব্রহ্মের বুকে বিলীন হয় তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডসহ প্রকৃতি ব্রহ্মে প্রলীন হন। এই অবস্থাকে বলে কল্পান্ত। অনন্তকাল ধরিয়া শান্ত শিবের বুকে এই কল্পারম্ভ ও কল্পান্তরূপ লীলা চলিতেছে। শাস্ত্র বলেন, এইরূপ লীলা করাই তাঁহার স্বভাব বা প্রকৃতি।

বিজ্ঞান শক্তিকে জড় বলে, কিন্তু শাস্ত্র বলেন, যে মহাশক্তি অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি সমন্বিত এই সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া এমন সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনি কখনও চৈতন্যহীন হইতেই পারেন না। নিশ্চয়ই তিনি এক অদ্বয় চৈতন্য বস্তুরই ক্রিয়াশক্তি এবং ঐ চৈতন্য হইতে অভিন্ন। ঐ শক্তির তলদেশে যে এক অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তু আছেন বিজ্ঞান তাহা পরীক্ষণাগারে যন্ত্র-সাহায্যে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াও লক্ষ্য করিতে পারে নাই; অথবা ঐ শক্তি যে এক ও অদ্বিতীয় বস্তুরই অবস্থান্তর মাত্র এবং উহা হইতে অভিন্ন ইহাও ধরিতে পারে নাই। মানব-বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে জাত এবং প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন যন্ত্র-সাহায্যে আমাদের সসীম বুদ্ধি কেবলমাত্র প্রকৃতিরই স্থূল রহস্য পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিবে, কিন্তু যে বস্তু ইন্দ্রিয়াতীত তাঁহাকে কোন দিনই সন্ধান করিতে পারিবে না। চৈতন্য বস্তুকে ধরিতে গেলে চাই প্রজ্ঞা—ঋতাম্বরা প্রজ্ঞা।

পূর্বেই বলিয়াছি প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ প্রকৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর কিছুই নাই সেই অধ্যাত্মজ্ঞান। চিত্ত যখন নির্মল হয়, অন্তঃকরণের সকল আবরণ যখন বিদূরিত হয় তখন এই স্থূল জগতের অন্তরদেশে সর্বত্র এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঘন আত্মবোধময় স্বরূপেরই প্রকাশ হয়। এই স্থূল জগতের নামরূপাত্মক অংশ হইতে সাধকের দৃষ্টি অপসারিত হইয়া যখন এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের যে কারণ (ঋত) সেই কারণকে (ঋতকে) যখন জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া একাগ্র হয়, তন্ময় হয় এবং তাঁহারই ফলে যখন সাধকের মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি অন্তর্মুখে স্থির হয়, তখনই সর্বকারণের যিনি কারণ তাঁহারই প্রকাশ হয়। কেবলমাত্র যন্ত্র-সাহায্যে চৈতন্য-স্বরূপ বস্তুকে কোন দিনই ধরা যাইবে না। তাঁহাকে পাইবার জন্য চাই প্রজ্ঞানের অনুশীলন, চাই মনের একাগ্রতা এবং প্রাণের ব্যাকুলতা ও তন্ময়তা। তবেই তিনি কৃপা করিয়া প্রকাশিত হইবেন। তাই শাস্ত্র বলেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। এই চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন একমাত্র তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্"—তাঁহারই নিকটে এই পরমাত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহার পরবর্তী শ্লোকে কঠোপনিষদ আরও পরিষ্কারভাবে বলিলেন—কি ভাবে সেই চৈতন্য-স্বরূপ বস্তুকে পাওয়া যায়। পূর্বশ্লোকে বলিলেন যে পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন একমাত্র তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন এবং নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশদ করিয়া বলিয়াছেন কাহাকে তিনি (পরমাত্মা) বরণ করেন এবং কাহাকে করেন না:

> "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ
> নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"—কঠ, ২।২৪

যে ব্যক্তি পাপকার্য্য হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-লোলুপতা হেতু যাহার চিত্ত শান্তিহীন, যে ব্যক্তি একাগ্রতা-হীন, ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃ যাহার মন সর্বদা অশান্ত সে ব্যক্তি এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না—পরমাত্মা তাহাকে বরণ বা অনুগ্রহ করেন না। তবে কে তাহাকে পায়? যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য হইতে বিরত, সংযতেন্দ্রিয়, কর্মফলে বীতস্পৃহ এবং প্রশান্তমনা। কি উপায়ে পান? উত্তরে বলা হইল একমাত্র প্রজ্ঞান দ্বারা—পরমাত্মাবিষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা। প্রজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারাই পূর্বকথিত গুণরাশি বিকশিত হয় এবং তাহারই ফলে চিত্ত নির্মল হইলে তাহাতে পরমাত্ম-সত্তা প্রতিফলিত হয়। দিব্য ভাগবত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিজেকে উপরি-উক্ত উপায়ে ক্রমশঃ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ঊর্ধ্ব হইতে জ্ঞানের আলোক পাওয়ার জন্য নিজের আত্মাকে পরমাত্মার নিকট খুলিয়া ধরিতে হইবে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তবেই তাঁহার কৃপায় তোমার প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে, তোমার অন্তরে প্রেম ও ভক্তির উদয় হইবে এবং উহারই ফলে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবে। বিজ্ঞানবিদ্ কেবলমাত্র যন্ত্র-সাহায্যে কোনও দিন তাঁহাকে বা তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে লাভ করিতে পারিবেন না। ইহার কারণ ব্রহ্মবস্তু প্রাকৃতিক মন ও বুদ্ধির অতীত।

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান (অধ্যাত্মজ্ঞান) উভয়ই চায় জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া পরম আনন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্ত করাইতে। তাই বিজ্ঞানের চেষ্টাও জীবের দুঃখ-নিবারণে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং আরও হইবে। বিজ্ঞানচর্চ্চায় মানবের মন একাগ্র হইয়া ধারণা ও ধ্যানের যোগ্যতা লাভ করে এবং বিজ্ঞান-সাধক জাগতিক যে-কোন বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হন তাহাতেই সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকেন। উহারই ফলে যতকিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে এবং জগতের বর্তমান সভ্যতা ও সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কামনা-বাসনায় লুব্ধ মানবের মন স্বার্থপরতন্ত্রতাবশতঃ ঐ সমস্ত সিদ্ধিশক্তিসমূহকে নিজ নিজ জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য হাইড্রোজেন বোমা, এটম বোমা, কামান, বন্দুক ও ধ্বংসাত্মক আগ্নেয়াস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া অপর জাতিকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। উহারই ফলে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানি চলিতেছে। [illegible]

তেছে। মানুষ কিছুতেই শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইবে না যত দিন না মানুষ বিজ্ঞানের সহিত প্রজ্ঞানের (অধ্যাত্মজ্ঞানের) অনুশীলন করিবে।

প্রজ্ঞান মানুষকে কি শিক্ষা দেয়? এই প্রজ্ঞানই মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, একই অখণ্ড ব্রহ্মশক্তি বা প্রকৃতি হইতেই আমরা সকলে জাত হইয়া ঐ একই প্রকৃতি-রূপিণী মায়ের কোলে পালিত হইতেছি এবং আমরা সকলেই ঐ অখণ্ড ব্রহ্ম-প্রকৃতির সহিত এমনই অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, প্রকৃতির কোন অংশ অর্থাৎ কোন জীব বা জাতি যদি অপর কোন জীব কিংবা জাতিকে হিংসা করে তবে সে বা তাহারা নিজের এবং সমগ্র বিশ্বেরই ক্ষতি করিবে। সুতরাং এই প্রজ্ঞানই প্রকৃত মানবতার এবং বিশ্বপ্রেম ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। এই প্রজ্ঞানই প্রকৃত সত্যের পথ, শান্তির পথ এবং আনন্দলাভের পথ দেখাইয়া দেয়। বিজ্ঞান মানুষের মন ও বুদ্ধিকে সর্বদা বহির্মুখে নিবদ্ধ রাখায় মনুষ্যগণ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম-বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। মায়ামুগ্ধ মানবের এই প্রকৃত আনন্দবস্তুলাভে অসামর্থ্যের আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ব্রহ্মশক্তি বা প্রকৃতি—যাহা হইতে জীবগণ জাত হইয়াছে—ঐ মায়া বা প্রকৃতির দুইটি শক্তি আছে। একটি আবরণ-শক্তি, অপরটি বিশেষ শক্তি। শাস্ত্র বলেন—

"ব্রহ্মণ্যবস্থিতা মায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপিণী।
আবৃত্যাখণ্ডতাং তস্মিন্ জগজ্জীবৌ প্রকল্পয়েৎ।"
(৩৮ দৃক্-দৃশ্যবিবেক)

অর্থ—আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুটি শক্তিসমন্বিত মায়া (ব্রহ্মশক্তি) ব্রহ্মে অবাস্থিত থাকিয়া ঐ শক্তিদ্বয় সাহায্যে ব্রহ্মের অখণ্ডতাকে আচ্ছাদিত করিয়া জগৎ এবং জীব সৃজন করেন। সন্তানের সহিত লীলা (আনন্দলীলা) করিবার জন্য মায়া বা প্রকৃতি জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া এবং বহির্মুখে বিক্ষিপ্ত করিয়া সংসারলীলায় আবদ্ধ রাখিয়াছেন। সুতরাং জীব কিছুতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ-স্বরূপকে জানিতে না পারিয়া সংসারলীলায় মুগ্ধ রহিয়াছে। বিক্ষেপ শব্দের অর্থ বিবিধকরণ (পৃথক পৃথক করণ)। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ, সুতরাং একই বস্তু। তিনি তাঁহার "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" রূপ সত্তাকে নিজ শক্তি দ্বারা বহু রূপে ব্যক্ত করেন এবং আবরণশক্তি দ্বারা তাঁহার অদ্বয় অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপকে আবৃত করিয়া নিজ সৃষ্ট বা অংশসম্ভূত বহুজীবের সহিত আনন্দলীলা করেন। পরমহংসদেব বলিতেন চক্ষু না বাঁধিলে "কানামাছি" খেলা যায় না। জীবের আবরিত চক্ষু তাহার অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপকে দেখিতে ও জানিতে না পারায় এই সংসারলীলায় মুগ্ধ থাকে। ঠিক এই কথার পোষকতা করিয়া কঠোপনিষদও বলেন—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
স্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষ—
দাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠ ৪।১

অর্থ—ভগবান মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্যগণের ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের বিষয়জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ হওয়ায় ঐ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে মনুষ্যগণ কেবলমাত্র বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ এইরূপ হইলেও কোন বিবেকবান পুরুষের অন্তরে যখন এই জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অমৃতময় জীবনলাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয় তখন তিনি তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্মুখী গতি একাগ্র করিয়া অন্তর্মুখে স্থির করিলেই সাধনবলে অন্তরস্থ আত্মাকে দেখিতে পান—কারণ ইন্দ্রিয়গণ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে স্থির হইলেই বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, মনের আসক্তি দূর হয় এবং চিত্ত ও বুদ্ধি নির্মল হয়। সেই নির্মল বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহাই প্রজ্ঞানলাভের পথ, ভগবানকে পাইবার পথ। শাস্ত্র প্রজ্ঞানলাভের বহু পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সকল পন্থারই মূল হইতেছে মনকে ইন্দ্রিয়-সহ একাগ্র করিয়া অন্তর্মুখে স্থির করিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখী করার অর্থ হইল মন ও অপর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অন্তরস্থ ভগবানে ক্রমে ক্রমে স্থির করিতে হইবে। আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবানে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে জগতের হিতার্থে কর্ম করিতে হইবে এবং আমাদের সকল কর্ম ও সকল চেষ্টার লক্ষ্য হইবে বিষ্ণু-প্রীতি। আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ উৎসৃষ্ট হইবে ভগবানের প্রীত্যর্থে, জাতির স্বার্থে, জগতের স্বার্থে। সুতরাং বিজ্ঞান বলে আমরা যাহা-কিছু লাভ করিব তাহা সমগ্র জগতের হিতার্থ জগদীশ্বরের প্রীতির জন্য উৎসর্গ করিব। যিনি বিশ্বেশ্বর বিশ্বাধার—যিনি এই বিশ্বরূপে, অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন একমাত্র তাঁহার প্রীত্যর্থে সকল কর্ম করিলেই সমগ্র জগতের শান্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজ নিজ স্বার্থেরও পরিপূরণ হইবে। গাছের গোড়ায় জল ঢালিলে যেমন উহার শাখাপল্লবাদি পুষ্টিলাভ করে তদ্রূপ সমগ্র বিশ্বের যিনি মূল ও সমষ্টি তাহাকে তুষ্ট করিলেই সমগ্র জগৎ তুষ্ট হয়। ইহাই প্রজ্ঞান বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং এই প্রজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেই মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করে—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই বেদ বলেন, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিলেই ব্রহ্মত্ব-

লাভ হয়, ব্রহ্ম সাযুজ্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

ঐ প্রজ্ঞানকে বাদ দিয়া কর্মপথে চলিতে থাকিলে তুমি বিজ্ঞানবলে যতই বলীয়ান হও না কেন, এই কর্মক্ষেত্রে যতই কৃতিত্ব লাভ কর না কেন, দক্ষরাজের মত সকল কর্মে তুমি যতই দক্ষতা লাভ কর, বিজ্ঞানবলে তুমি যতই বৈভবসম্পন্ন হও, তোমার সকল কর্ম পর্যবসিত হইবে ঐ পৌরাণিক দক্ষরাজের শিবহীন যজ্ঞের মত ধ্বংসলীলার ভূত-প্রেতের তাণ্ডবনৃত্যে। ইহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রজ্ঞানহীন মানবের মন কামনা-বাসনায় লুব্ধ থাকায় স্বার্থপরতন্ত্রতাবশতঃ নিজ নিজ বিজ্ঞানলব্ধ সিদ্ধিশক্তিসমূহকে নিজ নিজ জাতির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য ধ্বংসাত্মক আগ্নেয়াস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া অপরাপর জাতিসমূহকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহারই ফলে বিজ্ঞান মানুষকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। এই প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মিলনপথই মানুষকে পূর্ণত্বে পৌঁছাইবে এবং প্রকৃত সাম্যবাদ শিক্ষা দিয়া সমগ্র বিশ্বকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। উহাই প্রকৃত শান্তির পথ এবং একমাত্র ঐ পথেই বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বিজ্ঞান যাহাকে static ও dynamic forces বলে, প্রজ্ঞান তাহাকেই শিবশক্তিতত্ত্ব বলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ শিবশক্তিতত্ত্বেরই মূর্ত্ত প্রতীক, ইহা বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা উভয়েরই কথা। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও ধরিতে বা বুঝি পারে নাই যে, ঐ Energy বা শক্তি বস্তুটি জ্ঞানময়, করুণা ও সর্ব্বজ্ঞ এবং তাহাই সৎ চিৎ ও আনন্দময় সত্তা অর্থা উহার ব্যক্তিত্ব (personality) আছে। প্রজ্ঞান অর্থাৎ শা (উপনিষদ) বলেন—তাঁহার হস্ত ও পদ না থাকিলেও তি গ্রহণ করিতে এবং সর্বত্র চলিতে পারেন, চক্ষু ও ক না থাকিলেও তিনি দেখিতে এবং শুনিতে পান। গীতা ভাষায় তিনি "সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত" হইলেও তিনি সর্বেন্দ্রি "গুণাভাস"যুক্ত অর্থাৎ তাহার কোনও ইন্দ্রিয় স্পষ্ট ন থাকিলেও তিনি সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য করিতে সমর্থ আমরা যে-কোন দেবদেবীরই উপাসনা করি না কেন এব শৈব, শাক্ত, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বিগণ যাহারই উপাসনা করুন, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই ঐ একই তত্ত্বের নানাভাবে উপাসনা করিতেছেন। ঐ শক্তি তাঁহার আধারবস্তু—অভেদ এবং তিনিই আমাদের উপাস্য তিনি নির্গুণ এবং তিনিই আবার সগুণ হন। ঐ এক এব অদ্বয় সত্তা যিনি নিজকে বহুরূপে প্রকাশিত করিয়া পুন "সর্বভূতান্তরাত্ম"রূপে রহিয়াছেন, বহুর মাঝে তাঁহাকে—ঐ এক তত্ত্বকে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং চর সার্থকতা।

ফিরে যাই

শ্রীকরুণাময় বসু

জীবনের বৃত্ত আঁকা খণ্ড বদ্ধ সংকীর্ণ পরিধি ;
তবু আছে ছায়াপথ, শুকতারা, মালঞ্চের ঘন ছায়াবীথি,
পাহাড়ের স্বপ্নদেখা চোখ ;
উঁচু নীচু রাঙা পথ, শালবনে একমুঠো হাওয়ার ঝলক।
দৈনন্দিন জীবনের ঝরাপাতা পার হয়ে যাই,
পথের কি শেষ আছে, শুধু ডাকে চড়াই উৎরাই।
নিরাশ্বাস দিনগুলি আসে,
তবু দেখি বাঁকা চাঁদ হাসিমুখে তাকায় আকাশে।

তবু ভাবি আছে প্রেম, আঁখিকোণে এক ফোঁটা জল,
ফেলে আসা দিনগুলি আঁকে তবু মায়ার কাজল ;
পাহাড়ের ছোট নদী, বনে বনে সবুজ ময়ূর,
লতায় পাতায় ফুল, সেই দেশ দূর আরো দূর।
তবু ভাবি জীবনের ভাঙা বালুচর,
শুধু মিছে বেঁধেছিনু ঘর
খড়-কুটো, ফুল-লতা, সবুজ পাতায়,
ছোট প্রেম, ছোটখাটো অবুঝ কথায় ;

সেই দেশে ফেলে আসা কবেকার স্বপ্নের ফসল
কেবলি পিছনে ডাকে, মুসাফির, আর কেন,
ঘরে ফিরে চল্‌।



গুরুদক্ষিণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস দুয়েক পর।

ইস্কুল বসবার আগে চিরাচরিত প্রথায় স্তোত্রপাঠ শেষ হয়ে ইস্কুল বসবার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। অফিস রুমে মাষ্টার মশাইরা সকলে খাতায় সই করে আপনার-আপনার ক্লাসে বেরিয়ে গেলেন। গেলেন না শুধু ব্রজবিহারী বাবু। ব্রজবিহারী বাবু এই ঘণ্টায় সেকেণ্ড ক্লাসে অঙ্ক কষিয়ে থাকেন। চন্দ্রবাবু বরাবরই ফার্স্ট আওয়ারে অফিস-ওয়ার্ক করে থাকেন। চন্দ্রবাবু ব্রজবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। ব্রজবাবু ফার্স্ট আওয়ারে যেদিন ক্লাসে না গিয়ে আপিস ঘরে থাকেন সেদিন বুঝতে হবে আজ একটা কিছু ঘটবে।

ব্রজবাবু ডাকলেন—কেষ্ট। থার্ড ক্লাসের কিশোরী আর মুরলীকে ডাক।

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—কিশোরী? সে কি করলে?

এক প্যাকেট রেলওয়ে মার্কা সিগারেট এবং একটা দেশলাই পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখেন ব্রজবাবু। কাল সন্ধ্যাবেলা কিশোরীর পকেট থেকে পেয়েছে।

—কিশোরীর পকেট থেকে?

কিশোরী বিল্বগ্রামেরই গোবিন্দপদ বাবুর ছেলে, ভাল ছেলে। থার্ড ক্লাসে দুটি ছেলে আছে শ্যামাবিলাস আর কিশোরী। দুটিই অসাধারণ মেধাবী ছাত্র; চন্দ্রবাবু প্রত্যাশা করেন—দু'জনেই [illegible] স্কলারশিপ পেয়ে ইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। [illegible] দাদা সবিতা, সেও অসাধারণ মেধাবী ছাত্র। শুধু তাই নয়, বিল্বগ্রাম বাবুদের গ্রাম, এ গ্রামে সকলেই প্রায় জমিদার; সকলেই উদ্ধত দাম্ভিক এবং চালচলনে প্রত্যেকেই প্রায় উচ্ছৃঙ্খল। এই সমাজে গোবিন্দপদবাবু সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ, সর্ব্বোপরি চরিত্রবান ব্যক্তি। ছেলেদের তিনি সযত্নে মানুষ করছেন। তাঁর ছেলে কিশোরী এরই মধ্যে সিগারেট খেতে শিখেছে?

মুরলীধর বাবুদের ছেলে। এখানকার জমিদারবাড়ীর দৌহিত্র এবং উত্তরাধিকারী। সে সিগারেট খায়। খেতে পারে। কিন্তু তাকে এ নিয়ে শাসন করাতেও বিপদ আছে। বিশেষ করে শাসনের মাত্রা যদি একটু কঠোর হয় তবে অনেক গণ্ডগোল হবে। ব্রজবাবু নতুন লোক; অবশ্য এর মধ্যেই তিনি এখানকার হালচাল অনেক বুঝেছেন। আশ্চর্য্য বুদ্ধি এবং আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণধী কর্ম্মী। দু'মাসের মধ্যেই স্কুলটার চেহারা পাল্টে গিয়েছে। সতরঞ্চির আসনের উপর খেরো-খাতা, শরের কলম, মাটির দোয়াতের সেরেস্তাটা যেন দু'মাসের মধ্যে একেবারে কেতাদুরস্ত চেয়ার টেবিল বাঁধা খাতা ব্লটিং প্যাড, নিবের কলম, লাল কালো দোয়াতযুক্ত—ঘড়ির-কাটায়-চলা পাকা হাল-আমলের আপিসে পরিণত হয়েছে এবং নতুন যন্ত্রের মত মসৃণ গতিতে চলেছে।

আজকাল প্রত্যেকটি ছেলে প্রত্যেকটি শিক্ষক ঠিক সাড়ে দশটায় এসে হাজির হয়। কেষ্ট চাকর সাড়ে দশটার আগেই প্রতি ক্লাসের এটেণ্ডান্স রেজিষ্ট্রার টেবিলের উপর রেখে আসে। সাড়ে দশটায় ক্লাসের [illegible] ছেলেদের

'রোলকল' করা হয়। পাঁচ মিনিটের বেশী দেরি হলেই লেট প্রেজেণ্ট করা হয়। মাসে পনর দিন লেট প্রেজেণ্ট হলে একদিন এবসেণ্ট বলে ধরা হয় এবং এক আনা জরিমানা ধার্য্য হয়। এর পর স্কুল শেষ হওয়া পর্যন্ত সব সময়টাই খাতা টেবিলের উপর পড়ে থাকে। প্রতি ঘণ্টায় শিক্ষক এসে মিলিয়ে দেখে নেন কোন ছাত্র আছে কোন ছাত্র নেই। প্রত্যেক বিষয়ে মাসে একটা করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। রীতিমত পরীক্ষা নয়। প্রত্যেক মাসের হোম টাস্কগুলির উপর নম্বর দিয়ে—সেই নম্বর রেকর্ড করা হয়। বছরের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সে নম্বরগুলিকেও বিবেচনা করা হবে। সবচেয়ে কৃতিত্বের কাজ করেছেন ব্রজবাবু মাইনে আদায়ের ব্যাপারে। মাসের সাত তারিখের মধ্যে মাইনে দিতে হবে। না দিলে তার উপর ফাইন হবে। চন্দ্রবাবু প্রথমটা মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। বলেছিলেন—আপনি শহর থেকে আসছেন ব্রজবাবু, আমাদের গ্রামের লোকের, বিশেষ করে এখানকার লোকের দারিদ্র্যের কথা জানেন না। মাইনের ব্যাপারে এ রকম কড়াকড়ি করলে অনেক ছেলের পড়া হবে না।

ব্রজবিহারী বাবু হেসে বলেছিলেন—জানি মাষ্টার মশাই। গ্রামের কথা আমিও জানি। তবে এখানকার গ্রামের কথা জানি না এটা ঠিক। কিন্তু সেখানকার গ্রাম আর এখানকার গ্রামে খুব তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। আমাদের দেশে সবই হয়—সবকিছুর খরচই কোন রকম জোটে, শুধু ছেলেদের লেখাপড়ার খরচটাই জোটে না। সংসারে সেই জিনিষটেই জোটে না—যেটাকে আমরা দরকারী মনে করি না। আর আদায়ের তাগিদ যেখানে নেই সেখানে আমরা জোটাই না। কড়াকড়ি করুন, দেখবেন—একবার ছেলেদের নাম কাটা গেলেই ছেলেদের পড়ানোটাও দরকারী হয়ে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে জুটিয়েও নেবেন গার্জেনরা। যারা সত্যিই গরীব—তাদের বরং ফ্রিশিপ দিন, হাফ ফ্রিশিপ দিন। কিন্তু মাইনে আদায়ের ব্যাপার ঢিলে যতদিন রাখবেন, ততদিন মাইনে আদায় কখনও হবে না। কিছু দিন আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে দেখুন।

চন্দ্রবাবু অবাক হয়ে গেছেন; ব্রজবিহারী বাবুর কড়া নিয়ম আশ্চর্য্যভাবে কার্য্যকরী হয়ে উঠেছে। ছেলেরা সব—একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বই জন ঠিক সময়ে মাইনে দিতে সুরু করেছে। শুধু তাই নয়—সব দিকেই ইস্কুলে একটা আশ্চর্য রকমের শৃঙ্খলা এনেছেন ব্রজবিহারী বাবু। সোয়া ছ' ফুট কালো মানুষটি মোটা লেন্স চশমা পরে ইস্কুলের ভিতরে যখন হেঁটে যান—তখন গোটা ইস্কুলটা যেন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। থম থম করে। লোকটির আশ্চর্য্য গুণ। ছুটির পরই বাইসিক্লে চেপে ছুটবেন খেলার মাঠে। ফুটবল খেলাটা চন্দ্রবাবু খুব বেশী পছন্দ করেন না। শুধু ফুটবল খেলা কেন—বেশী দাপাদাপির কোন খেলাই তাঁর খুব পছন্দসই নয়। কোথায় হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে! মারামারি করবে। তা ছাড়া ঘণ্টাখানেক মাঠে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড়ে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে পড়তে বসেই ঢুলতে সুরু করবে। আর ওই খেলার নেশা একবার পেয়ে বসলে—সে ছেলের হয়ে গেল। পড়াশুনার দফা গয়া। এ ছাড়া আরও আছে। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখলেন যে, যে ছেলে পড়ায় ভাল, সে ছেলে খেলায় ভাল নয়, আর যে ছেলে খেলায় ভাল সে ছেলে পড়ায় ভাল নয়। আরও আছে—শুধু পড়াশুনায় মন্দ হয়েই এরা ক্ষান্ত হয় না, রীতিমত উদ্ধত হয়ে ওঠে। একেবারে গুণ্ডা। সারাটা জীবন এই বিশ্বগ্রামের বাবুদের বাড়ীর এই ধরণের ছেলেগুলোকে নিয়ে জলে পুড়ে মরেছেন তিনি। অনেক কষ্টে দশ বছরে আয়ত্তে এনেছেন। ঠাণ্ডা হয়েছে। নতুন নিয়মে খেলার উৎসাহ দিতে হবে। না দিয়ে উপায় নেই। ছেলেদের কাছ থেকে বছরের প্রথমেই এক টাকা হিসেবে গেমস-ফি আদায় হচ্ছে। একজন শিক্ষককে গেমস টিচার হিসেবে রাখতে হয়েছে। নতুন থার্ড মাষ্টার সে ভার নিয়েছেন। তার জন্য তাঁর মাইনের উপরে মাসে আরও দশ টাকা দিতে হয়। তিনি নিজে ছেলেদের সঙ্গে খেলেন, খেলা শেখান। ব্রজবিহারী বাবুও তাদের সঙ্গে জোটেন। চশমা পরে খেলা হয় না। বিনা চশমায় দেখতে পান না, তিনি রেফ্রিইং করেন। ফলে সেখানেও আর মারামারি হয় না। হৈ-হুল্লোড় হয় না। বেটারা, সব খুদে শয়তানেরা ইচ্ছেমত পোঁ-পোঁ করে বার্ডসাই বিড়ি টানতে পায় না।

ব্রজবিহারী বাবু সন্ধ্যায় বেরিয়ে যান। এখানকার থিয়েটার ক্লাবে গিয়ে জোটেন। বিশ্বগ্রামের থিয়েটার ক্লাব অনেক দিনের। চৈতন্যবাবুর ছোট ছেলে বর্ত্তমানে ইস্কুলের সেক্রেটারী পবিত্র থিয়েটার ক্লাবের পাণ্ডা। টাকাকড়ি খরচ-খরচা সেই সব করে। নিজে আবার নাটকও লেখে। তাদের আড্ডায় গিয়ে জোটেন ব্রজবিহারী বাবু। এইটি আদৌ ভাল লাগে না চন্দ্রবাবুর। ব্রজবিহারী বাবু শিক্ষক, শিক্ষকের পক্ষে কি ওই রঙ্গরসের আসর ভাল? এবং এদের আসরের কথা তো চন্দ্রবাবু জানেন। ভাল নয়, ভাল নয়, আদৌ ভাল নয় আসরটি। সভ্যেরা অধিকাংশই তাঁর ছাত্র। তাদের তাঁর চেয়ে কে বেশী ভাল জানে? সবাই প্রায় অকালে লেখাপড়া-ছাড়া ছেলের দল। নানারকম অপবাদ এদের নামে। একদিন ব্রজবিহারী বাবুকে তিনি বলেছিলেন—ও সব জায়গায় গিয়ে কাজ কি মাষ্টার মশাই?

আরো সব মাষ্টার-টাষ্টার মানুষ আমাদের ও সব ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা কি ভাল নয় ?

এতেও হো-হো করে হেসেছিলেন ব্রজবাবু।

এই হো-হো করে হাসি ব্রজবিহারীর যেন একটা মুদ্রাদোষ।

হেসে বলেছিলেন ব্রজবাবু—আপনি বলছেন আমরা মানে মাষ্টাররা ব্রাহ্মণঘরের শুচিবাইগ্রস্ত বাল-বিধবা ! অতি সহজেই আমরা ছোঁয়াচ পড়ি !

উত্তর খুঁজে পান নি চন্দ্রবাবু।

ব্রজবাবু বলেছিলেন—একটু-আধটু রিক্রিয়েশন ছাড়া বাঁচব কি করে মাষ্টার মশাই ! সেই জন্যে যাই। একটু-আধটু প্রম্‌ট করে দি। চেহারা তো দেখছেন—এতে জল্লাদ ছাড়া আর কিছু সাজবে না। তাও এক্টিং আমার আসে না। ওই খেলার মতন। ওখানে রেফ্রিইং করি বাঁশী বাজাই, এখানেও প্রমটিং করব আর সিন চেঞ্জের বাঁশী বাজাব। ভাববেন না, আমি ছোঁয়াচ পড়ব না।

কি বলবেন চন্দ্রবাবু ? আর কিছু বলেন নি তিনি।

আরও একটা ক্ষেত্রে ব্রজবাবুর সঙ্গে তাঁর অমিল আছে। ব্রজবাবু রেগে গেলে আর রক্ষা থাকে না। তখন তিনি ছেলেদের যে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেন তা তিনি সহ্য করতে পারেন না। সে প্রহার ভাষণ প্রহার। এই দু'মাসের মধ্যেই তিনি মারের চোটে দুটি ছেলেকে ইস্কুল ছাড়িয়েছেন। দুটিই অবশ্য ইস্কুলের মহাপাপ স্বরূপ ছিল। মহাপাপ তিনি দূর করেছেন।

একটি বামনচন্দ্র। ফার্ষ্ট ক্লাসের শিবনাথের বয়সী, কিন্তু পড়ত ফিফ্‌থ ক্লাসে। ক্লাসের মাষ্টারকে পেটে ঢুঁ মেরে ফেলে দিয়েছিল, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন নতুন ফিফ্‌থ মাষ্টারটি। নিতান্ত ছোকরা মানুষ। নিরীহ লোক। অপরাধের মধ্যে তিনি বামনকে ক্লাসে গোলমাল করতে বারণ করেছিলেন, বামন তাতে গ্রাহ্য তো করেই নি উপরন্তু মুখ ভেংচে বলেছিল—যা-য-যা ! ঢের দেখেছি। বলে হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা শুধায় কত জল ?—ফিফথ মাষ্টার আর থাকতে পারেন নি, বলেছিলেন—ষ্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ। বামন বেঞ্চের উপর উঠে কেষ্ট ঠাকুরের মত বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে বলেছিল—জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে !

ফিফথ মাষ্টারের নাম রাধানাথ।

ফিফথ মাষ্টার আর সহ্য করতে পারেন নি, তিনি এবার এসে বামনের কানে ধরেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বামন মাথা দিয়ে ফিফ্‌থ মাষ্টারের পেটে ঢুঁ মেরেছিল। প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ফিফথ মাষ্টার। খবর শুনেই ব্রজবাবু ফিফ্‌থ ক্লাসে গিয়ে বামনের চুলের মুঠো ধরে টেনে স্কুলের হলে এনে একটা টুলের উপর দাঁড় করিয়ে বেত মেরেছিলেন। পা থেকে পিঠ পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলেন। বামন সেইদিন যে ইস্কুল থেকে গিয়েছে আর একটি দিনের জন্যও এদিকে পা বাড়ায় নি।

বামনের পর কুড়োরাম চন্দ্র। কুড়োরামের নাম ছিল চিতাবাঘ। ব্রজবাবু তাকে বেতের ঘায়ে ডোরা বাঘ করে দিয়ে ইস্কুল থেকে বের করে দিয়ে বলেছিলেন—এ বনে আর ঠাঁই হবে না, বড় বনে যাও তুমি।

আজ পড়েছেন মুরলীধর আর কিশোরীকে নিয়ে। কি কতদূর হবে তিনি বুঝতে পারছেন না।

মুরলীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিশোরী কিন্তু দমে নি।

ব্রজবাবু বললেন—কাল রাত্রে, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা, আমি গ্রাম থেকে ফিরছিলাম যখন—তখন তোমরা দু'জন গ্রামের বাইরে রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে কি করছিলে ? এত রাত্রে রেল লাইনের ধারে তোমাদের কি দরকার ছিল ?

কিশোরী বললে—আমরা অভয় আর ভৈরবের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম স্যার।

—অভয় আর ভৈরব ? কেন ? তারা তো বাজার-পাড়ার ছেলে। গ্রামের বাইরে লাইনের ধারে কোথা থেকে আসবার কথা তাদের ?

—তারা বাউরীপাড়ায় হাঁস কিনতে গিয়েছিল স্যার।

—হাঁস কিনতে ?

—রাত্রে আমাদের ফিষ্ট করবার কথা ছিল।

—এত রাত্রে ফিষ্ট ?

—বাজী রেখে ভৈরব আর অভয় হেরেছিল, দুটো হাঁসের দাম দেবার কথা ছিল।

—কিসের বাজী ?

চুপ করে রইল কিশোরী। এবার আর কোন উত্তর দিলে না।

ব্রজবাবু বললেন—আমি অনুমান করতে পারি কিসের বাজী। তাসের বাজী। তাসের বাজী নয় ?

—হ্যাঁ স্যার। তাসে ওরা হেরেছিল।

—তাস খেলতে আমি তোমাদের বারণ করেছিলাম না ?

কিশোরী নীরব হয়ে রইল।

—থিয়েটারের রিহারস্থালের ফেরত আমি তোমাদের তাসের আড্ডার বন্ধ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কতদিন বারণ করে এসেছি। বলেছি—এত রাত্রি পর্যন্ত তাস খেলো না এবং তাস খেলাটাও উচিত নয় তোমাদের। শোন নি তোমরা ?

—শুনেছি স্যার।

—তবে ? একটু অপেক্ষা করে থেকে ব্রজবাবু আবার বললেন—কিন্তু কৈ আজ ছ'সাত দিন তো তোমাদের আড্ডায় কোন সাড়া পাই নি। আমি ভেবেছিলাম—তোমরা ছেড়েছ তাসখেলা। তা হলে তোমরা আমার নজর এড়াবার জন্য আড্ডা পাল্টেছ ?

—হ্যাঁ স্যার।

—হুঁ। কিন্তু ভৈরব আর অভয় হাঁসের দামের টাকা কোথায় পেলে ? ওদের মা বাপকে চেয়ে পেয়েছে না অন্য কোন মন্দ উপায়ে জোগাড় করেছে ?

—সে আমরা জানি না স্যার।

—কেষ্ট, ভৈরব আর অভয়কে ডাক। তারপর—এখন উত্তর দাও, আমি ফিরবার সময় তোমাদের দু'জনকে দেখলাম তোমাদের একজন সিগারেট খাচ্ছিলে। দু'জনে তোমরা এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলে যে কে ঠিক খাচ্ছিলে আমি ধরতে পারি নি। আমাকে দেখেই সিগারেট ফেলে দিয়ে সেটা পা দিয়ে চেপে দিয়েছিলে। কে খাচ্ছিলে সিগারেট ?

কিশোরী ব্রজবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমি খাই নি স্যার—আমি সিগারেট খাই নে।

ব্রজবাবু তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—তাই জানতাম। তোমার কথায় অবিশ্বাস করতেও ইচ্ছা হয় না, কিন্তু তোমার পকেটে সিগারেট-দেশলাই ছিল কেন ?

—আমার গায়ে জামা ছিল, আমার পকেটে রাখতে দিয়েছিল, আমি রেখেছিলাম।

—মুরলীধর ?

—স্যার।

—তুমি রাখতে দিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ স্যার।

—তুমিই সিগারেট খাচ্ছিলে ?

—হ্যাঁ স্যার।

—হুঁ। সিগারেট খেতে তুমি পয়সা কোথায় পাও ? কে দেয় ? বাড়ীর লোকে জানে তুমি সিগারেট খাও ? বল। স্পীক আউট।

—একটু একটু জানে। মা জানে। বাবা জানে না।

—নো। নো। নো। ওই ভাবে কথা বলে না। বল—'মা জানেন, বাবা জানেন না।' মা কি তোমাকে সিগারেট খেতে পয়সা দেন।

—না। আমি অন্য ছল-ছুতো করে চেয়ে নি।

—হুঁ। ব্রজবিহারী বাবু একটু চুপ করে রইলেন। ভাবলেন বোধ হয়। তারপর আবার বললেন—

—ভাল। এখন অন্য কথার জবাব দাও। তোমাদের তাসের আড্ডা কোথায় বদলেছ ? কিশোরী !

—নরেনবাবুর বৈঠকখানায়।

—কোথায় সেটা ?

—গলির ভিতরে ভিতরে যেতে হয়। বাড়ীটায় কেউ থাকে না। শিক-দেওয়া ফটক পার হয়ে আমরা সেখানে যাই।

—কি কি হয় সেখানে ? শুধু তাসখেলা ?

—মধ্যে মধ্যে ফিষ্ট হয়।

—আর কিছু ?

—না স্যার।

—আর ক'টি এমন আড্ডা আছে ?

—কুলীনপাড়ায় একটা আছে, শুঁড়ীপাড়ায় একটা আছে—বাজারেও একটা আছে।

কেষ্ট ভৈরব এবং অভয়কে নিয়ে এসে দাঁড়াল। ব্রজবাবু সরাসরি প্রশ্ন করলেন—বাজী রেখে তাসখেলায় হেরে দুটো হাঁস এদের দেব বলেছিলে ?

অভয় নামেও অভয় কাজেও অভয়, বামন কুড়োরামের সমান না হলেও তাদের কাছাকাছি যায়। সে বললে—বলেছিলাম।

—হাঁস কিনবার টাকা কোথায় পেয়েছ ? কে দিয়েছে ? মা না—বাবা ?

—আমি বাবার কাছে দু'চার পয়সা করে নিয়ে জমিয়ে হাঁস কিনে বাউড়ীদের পালতে দিয়েছি। চারটে হাঁস কিনে দিয়েছিলাম এখন দশটা হয়েছে। তা থেকেই দুটো দেব বলে আনতে গিয়েছিলাম।

—হুঁ। ভৈরবের কাছে একটা হাঁসের দাম নিতে না ?

—ও কিছু কিছু করে দেবে বলেছিল।

—আমি শুনেছি তুমি আরও অনেক আড্ডায় যাও।

—যাই।

—তুমি এবার প্রমোশন না পেলে তোমাকে ইস্কুল থেকে বের করে দেব আমি। আর শোন, আজ তোমাদের আমি মাফ করলাম। ভবিষ্যতে কঠিন শাস্তি দেব। রাত্রি সাড়ে ন'টার পর এক ঘণ্টা তোমরা তাস খেলতে পারবে। কিন্তু বাজী রাখতে পারবে না। তোমরা জান আমি তোমাদের প্রত্যেকটি খবর রাখি। গ্রামে থিয়েটারের আড্ডায় আমি এই জন্তেই যাই। ফেরবার পথে কে কি করছ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শুনে আসি দেখে আসি। আমাকে ফাঁকি তোমরা দিতে পারবে না। যাও। শুধু মুরলীধর না। ইউ ষ্টে হিয়ার—

ওরা তিন জন চলে যেতেই ব্রজবাবু বললেন—তোমাকে যে কথাটা বলতে চাই, ওদের সামনে সেটা বলব না বলেই তোমাকে থাকতে বলেছি মুরলী। সিগারেট খেতে আমি বারণ করব না, কিন্তু বাপ-মায়ের পয়সায় সিগারেট খেয়ো না। নিজে উপার্জ্জন করে তবে খাবে। নট নাউ:— এখন নয় পরে। ভবিষ্যতে ইস্কুলের ছাত্র যতদিন থাকবে তার মধ্যে কোন দিন যদি আর দেখি তোমাকে সিগারেট খেতে তোমাকে আমি মার্জ্জনা করব না। যাও।

মুরলী চলে গেল।

চন্দ্রবাবু এতক্ষণে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—রাত্রে আপনি ওদের আড্ডায় আড্ডায় আড়ি পেতে বেড়ান না কি?

হো হো করে হেসে উঠলেন ব্রজবিহারী বাবু। বললেন—দিব্যি কালো রঙে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাই!

চন্দ্রবাবুর মনে পড়ল—রতনবাবু থার্ড মাষ্টারের কথা। খোদ ইনস্‌পেক্টার সাহেব পাঠিয়েছেন ব্রজবাবুকে। ব্রজবাবু কি? স্পাই? সে কি সম্ভব? ক্রমশঃ

প্রবোধানন্দ সরস্বতী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল-ভট্টগোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে 'ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় শ্রীপ্রবোধানন্দে'র নাম উল্লেখ করিয়া আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের সনাতন গোস্বামিপাদকৃত দিগ্‌দর্শনী-টীকায়ও গোপালভট্টকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলা হইয়াছে। যথা:

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপাল-ভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ॥

অর্থাৎ, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট রূপসনাতন ও রঘুনাথদাসের সন্তোষ বিধান করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সমাহরণ করিতেছেন।

সনাতনগোস্বামিকৃত টীকা—"ভগবৎপ্রিয়স্যেতি বহুব্রীহিণা তৎপুরুষেণ বা সমাসেন তস্য মাহাত্ম্যজাতং প্রতিপাদিতম্ এবং তচ্ছিষ্যস্য গোপালভট্টস্যাপি তাদৃশত্বং বোদ্ধব্যম্।" অর্থাৎ, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহার প্রিয়, সেই প্রবোধানন্দের (বহুব্রীহি); অথবা ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় (তৎপুরুষ) প্রবোধানন্দের এই উক্তি দ্বারা প্রবোধানন্দের মাহাত্ম্যরাশি প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তাঁহার শিষ্য গোপালভট্টেরও সেইরূপ মাহাত্ম্য বুঝিতে হইবে।

জীবগোস্বামিপাদ গোপালতাপনীর 'সুখবোধিনী' টীকার উপসংহার-শ্লোকে প্রবোধযতিকৃত টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

বিশ্বেশ্বরক-জনার্দ্দন, ভট্টাভ্যাং বৈদিকাগ্রভ্যাম্।
তদ্বৎ প্রবোধযতিনা, লিখিতং রচিতমত্র তারতম্যেন॥
শ্রীসনাতন-রূপস্য চরণাজস্য ধন্য না।
পূরিতা টিপ্পনী চেয়ং জীবেন সুখবোধিনী॥

দেবকীনন্দনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় প্রবোধানন্দের



প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সমাধি, কালীয়দহ, বৃন্দাবন

নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়:

প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব-যতনে।
যে করিল মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে॥

দেবকীনন্দনদাস মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্রাহ্মণ গোপালের

১। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বেদ-গোপাল-তাপনী (সটীক) হস্তলিখিত পুঁথি নং ২৩৮ (বাণ্ডিল, তোলির নং ২৩)

অন্যতম পুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের আদেশে উক্ত বৈষ্ণব-বন্দনা রচনা করেন।

কবিকর্ণপুর গোস্বামীর নামে যে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-গ্রন্থের প্রচার আছে, (১৪৯৮ শক=১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) তাহাতে প্রবোধানন্দযতিকে ব্রজলীলার সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদা, তুঙ্গবিদ্যা (শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠা অষ্টসখীর অন্যতমা)



গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সমাধিমন্দির, বৃন্দাবন

এবং শ্রীগৌরসুন্দরের উচ্চকীর্ত্তনকারী সরস্বতীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা।
সা প্রবোধানন্দ-যতি-গৌরোদগান-সরস্বতী ॥১

কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বা শ্রীচৈতন্য-চরিতমহাকাব্যে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামোল্লেখ নাই। মুরারিগুপ্তের নামে প্রচারিত সংস্কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত বা মুরারিগুপ্তের কড়চা, যাহা অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কোন নাম বা প্রসঙ্গ নাই।

হিন্দী ভক্তমালের রচয়িতা নাভাদাসজী (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক রচনা) তাঁহার ছপ্পয়ে পরমধর্ম্মের প্রতিপোষক সন্ন্যাসিগণের মুকুটমণি আট জন সন্ন্যাসীর অন্যতম-রূপে প্রবোধানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।২

হিতহরিবংশের সঙ্গী হরিরামব্যাস (১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ) তাঁহার রচিত 'ব্যাসবাণী' নামক পদাবলীর মধ্যে একটি পদের দ্বারা প্রবোধানন্দের গুণবর্ণন করিয়াছেন ঃ

প্রবোধানন্দ সে কবি থোরে।
জিন রাধাবল্লভ কী লীলারস মেঁ সব রস ঘোরে।
কেবল প্রেমবিলাস আস করি, ভববন্ধন দৃঢ় তোরে॥
সহজ মাধুরী বচননি, রসিক অনন্যনি কে চিত চোরে।
পাবন রূপ-নাম-গুণ উর ধরি, বিষৈ-বিকার জু মোরে॥
চারু চরণ-নখ-চন্দ্র-বিম্ব মেঁ, রাখে নৈন চকোরে।
জায়া মায়া গৃহ দেহী সোঁ, রবিসুতবন্ধন ছোরে॥
লোকবেদ সারঙ্গ অঙ্গ কে, সেত হেত কে ফোরে।
যহ প্রিয় 'ব্যাস' আস করি, হিত হরিবংশহিঁ প্রতি কর জোরে॥৩

নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিলাস (রচনাকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ ?) গ্রন্থে দেখা যায়, মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমে চাতুর্মাস্যের চারিমাস শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্টের গৃহে অবস্থানকালে তাঁহার কৃপায় ভট্টপরিবার রাধাকৃষ্ণের উপাসক হন। এতৎ প্রসঙ্গে প্রবোধানন্দ ও তাঁহার বিদ্যাশিষ্য গোপালভট্টের কথা উক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু প্রবোধানন্দকে গোপালভট্টের মাতাপিতার বিয়োগের পর বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিবার কথা বলিয়া যান ঃ

'প্রবোধানন্দ পানে প্রভু চান হাসি হাসি।
তোমার শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণরাশি॥'
'তারে এত কহি কহে প্রবোধানন্দেরে।
একবার বৃন্দাবনে পাঠাবে ইহারে॥
সেই প্রবোধানন্দ প্রভুর প্রাণসম।
প্রভু কৃপা করি কৈল ভাগবতোত্তম॥'

যথাকালে প্রবোধানন্দ রূপসনাতনের নিকট এক পত্র লিখিয়া তৎসহ গোপালকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গোপালভট্ট তথায় রূপসনাতনের ইচ্ছানুসারে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে নিজ বিদ্যাগুরু প্রবোধানন্দের নাম উল্লেখ করেন।৪

১৭০৭ বিক্রম সংবতে (=১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে) ভগবত মুদিত নামক এক হিন্দুস্থানী কবি ব্রজভাষায় প্রবোধানন্দ

১। কবিকর্ণপুর প্রণীত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১৬৩ শ্লোক, বহরমপুর ২য় সং ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

২। হিন্দী ভক্তমাল ১৮১ ছপ্পয় (৮৭৬ পৃ.) দ্রষ্টব্য, নবলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৯১৩ খ্রীঃ।

৩। 'ভক্তকবি ব্যাস জী' (হিন্দী) ১৯৫ পৃ., প্রভুদয়াল মীতল সম্পাদিত, অগ্রবাল প্রেস, মথুরা, ২০০৯ সংবৎ।

৪। বহরমপুর মুর্শিদাবাদ রাধারমণ-যন্ত্র হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, ১৮শ বিলাস ২৭৪-২৭৫ পৃষ্ঠা।

সরস্বতীপাদকৃত শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের সপ্তদশ শতকের পদ্যানুবাদ করেন।১ উপক্রমে—

জৈ জৈ শ্রীপরমমোদ মোদ বৃন্দাবন গায়ো।
বহুবিধ হরষ হুলাস বাস যহ বচন ছচায়ো ॥
শ্রীবৃন্দাবন রতি শত কিয়ো বাণী মোদ-প্রবোধ।
ভগবন্ত সো ভাষা করো সাখা মনকী সোধ ॥



কাম্যবনে বিমলকুণ্ড

উপসংহার ঃ

সংবত দসপৈ সাতসৈ অরু সাত বরষ হৈ জানি।
চৈত মাস মে চতুর বর ভাষা কিয়ো বখানি ॥

ইনি নিজেকে বৃন্দাবনাধিদেব শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধিকারী হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য এবং নিজের পিতার নাম 'মাধব মুদিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।২ নাভাদাসজীকৃত হিন্দী ভক্তমালেও ইহার নামে ছপ্পয় দৃষ্ট হয়।৩

উক্ত শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য 'সাধনদীপিকা'-কার রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী গোপালভট্টের নমস্কার-প্রসঙ্গে প্রবোধানন্দের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দস্য ভ্রাতুষ্পুত্র-কৃপালয়ম্।
শ্রীমদ্‌গোপালভট্টং তং নৌমী শ্রীব্রজবাসিনম্ ॥৪

—প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কৃপাপাত্র ব্রজবাসী গোপালভট্টকে নমস্কার করিতেছি।

১৭৫৩ সংবৎ বা ১৬১৮ (?) শকাব্দে (১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ? রচিত) মনোহর দাসের অনুরাগ-বল্লীতে প্রবোধানন্দ গোপালভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে :

বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম।
গোপাল ভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমাণ ॥
অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে।
পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে ॥৫

নাভাদাসজী কৃত হিন্দী ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়াদাসজী তৎকৃত 'ভক্তিরসবোধিনী' টীকায় (১৭৬৯ সংবৎ= ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) প্রবোধানন্দকে পরমরসিক, আনন্দকন্দ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়পার্ষদ, রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-



কাম্যবনে কমলকুণ্ড

কেলির নূতনতররূপে বর্ণনকারী, বৃন্দাবনবাসী ও বৃন্দাবনের মহিমা-কীর্ত্তনকারীরূপে বর্ণন করিয়াছেন।৬ অনেকে বলেন, প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি, শ্রীসঙ্গীত-মাধব-গীতিকাব্য, শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রিয়াদাসজী ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

'প্রেমপত্তনম্' নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার কবি রসিকোত্তংস স্বগ্রন্থে প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নামোল্লেখ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১।৪৯) একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।৭ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গ্রন্থকার—"তথোক্তং শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিমহাশয়ৈঃ দানকেলিকৌমুদী-টীকায়াম্"—এইরূপ উল্লেখ করিয়া বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদকৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, রসিকোত্তংসজী বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের (যাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতটীকার সমাপ্তিকাল—১৬২৬ শকাব্দ=১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ)৮ পরিবর্ত্তীকালে 'প্রেমপত্তন' গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবিন্দভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ রূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার তৃতীয়-শ্রীচৈতন্যাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের টীকায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের ৫৬তম শ্লোক উদ্ধার করিয়া "এবমুক্তম্

১। শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত, প্রকাশক—বাবা বংশীদাস, গোবিন্দকুণ্ড, বৃন্দাবন,—৩, ৪ ছপ্পয়, ১ ও ৪৬ দোঁহা, ৯১ পৃ.।

২। ঐ ৯০ পৃষ্ঠা।

৩। হিন্দী ভক্তমাল ১৯৮ ছপ্পয়, ৯৭৩ পৃ.।

৪। সাধন দীপিকা, ৮ম কক্ষা, ২১৪ পৃঃ, শ্রীহরিদাস দাস সং নবদ্বীপ।

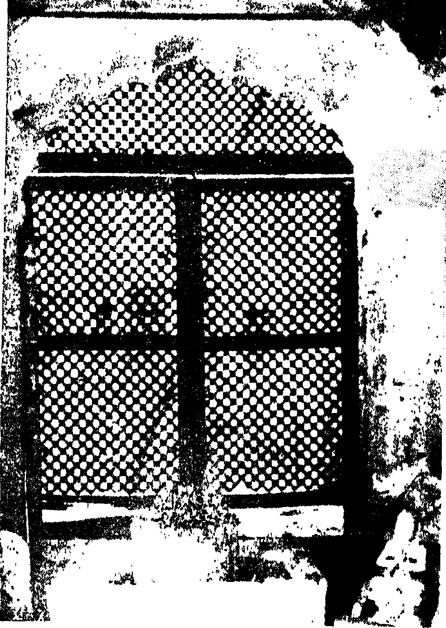
৫। অনুরাগবল্লী, ৪ পৃঃ, মৃণালকান্তি ঘোষ, ৩য় সং, কলিকাতা, ৪৪৫ গৌরাব্দ।

৬। হিন্দী ভক্তমাল, ৬১২ টীকা কবিত্ত, ৮৭৩ পৃষ্ঠা।

৭। প্রেমপত্তনম্, ৩৬ পৃঃ অচ্যুতগ্রন্থমালা সং, কাশী, ১৯৮৯ সংবৎ।

৮। শ্রীসারার্থদর্শিনীর উপসংহার।

......প্রবোধানন্দৈঃ" এই বাক্যে বিশেষ সম্মানের সহিত প্রবোধানন্দের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ ১৬৮৬ শকে (=১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) স্তবমালার অন্তর্গত 'উৎকলিকাবল্লরী'র টীকা রচনা সমাপ্ত করেন।



কাম্যবনে কামেশ্বর শিব

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের প্রশিষ্য নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে গোপাল ভট্টগোস্বামীর পিতৃব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ভট্ট বিবরণ।
শ্রীগোপাল ভট্ট হন বেঙ্কট নন্দন॥
শ্রীবেঙ্কট ভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে॥
ত্রিমল, বেঙ্কট আর প্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র।
দক্ষিণ-ভ্রমণকালে প্রভু গৌররায়।
ভট্টগৃহে চারিমাস আনন্দে গোঙায়॥১

ভক্তিরত্নাকরে প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে গোপালভট্টের বিদ্যাগুরুরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

পিতৃব্য-কৃপায় সর্বশাস্ত্র হৈল জ্ঞান।
গোপালের সম এথা নাহি বিদ্যাবান॥

কেহ কহে, প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী॥২

এতৎপ্রসঙ্গে নিত্যানন্দ দাস, নরহরি চক্রবর্ত্তী ও মনোহর দাস (অনুরাগবল্লীতে) সমর্থক শ্লোকরূপে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটি এবং উহার শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদকৃত টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী পুনরায় ভক্তিরত্নাকরের অন্যস্থানে—'তত্র (সাধনদীপিকায়াং) প্রসিদ্ধমেব'—এইরূপ বাক্য বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সাধনদীপিকার শ্লোকটিও উদ্ধার করিয়াছেন।৩

এই পর্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসকল হইতে পাওয়া গেল, প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ, গোপালভট্ট গোস্বামীর শিক্ষাগুরু, গোপালতাপনীর টীকাকার, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণবর্ণনকারী, ব্রজলীলায় সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদা তুঙ্গবিদ্যা, পরমধর্ম্মপোষক সন্ন্যাসীমুকুটমণি, জয়দেবের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসবিলাস-বর্ণনকারী, বৃন্দাবন মহিমামৃত-কীর্ত্তনকারী, বৃন্দাবনবাসী এবং রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জকেলির নূতনতররূপে বর্ণনকারী।

আর সাধনদীপিকাকার রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া মনোহর দাস, নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ লেখকগণ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকে গোপালভট্টের পিতৃব্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ, গোপালভট্টগোস্বামী, জীবগোস্বামী, দেবকীনন্দন দাস, কবিকর্ণপুর গোস্বামী, নাভাদাসজী, হিতহরিবংশের সঙ্গী হরিরামব্যাস, ভগবত মুদিত, রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, নিত্যানন্দ দাস, মনোহর দাস, প্রিয়াদাসজী, রসিকোত্তংস, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদের প্রশিষ্য নরহরি চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত কেহই প্রবোধানন্দকে কাশীবাসীরূপে বর্ণনা করেন নাই।

জীবগোস্বামিপাদের নামে আরোপিত বৈষ্ণব-বন্দনায় এইরূপ দেখা যায়—

প্রবোধানন্দসরস্বতীং বন্দে বিমলাং যয়া মুদা।
চন্দ্রামৃতং রচিতং যৎ শিষ্যো গোপালভট্টঃ॥৪

—যাঁহার শিষ্য গোপালভট্ট এবং যিনি চন্দ্রামৃত রচনা করিয়াছেন, সেই প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে বন্দনা করি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকার আনন্দী (ইনি ১৬৪০ শকে=১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে শীঘ্রবোধ-নামক ব্যাকরণ রচনা করেন)৫—টীকার উপক্রমে তিনি গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন

১। ভক্তিরত্নাকর ১।৮১-৮৩, ৮৫।

২। ভক্তিরত্নাকর—১।১৪৮-৯

৩। ভক্তিরত্নাকর—৪।৩২৯।

৪। বরাহনগর, শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির, পুথি নং ৪৪০।

৫। "কৃতমানন্দিনা শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং লঘু। শাকে কলাবেদষড়ৃভ্যো (১৬৪০) নীলাদ্রৌ বটসাগরে॥"

"শ্রীশ্রীপাদপরিব্রাজকরাজো বেদান্ত-সাংখ্য-বৈশেষিক-পাতঞ্জল-মীমাংসাগম-নিগম মহাপুরাণ-পুরাণ-সেতিহাস- পঞ্চরাত্রালঙ্কার কাব্যনাটকাদি-রহস্য-সিদ্ধান্তানর্গল-বক্তৃত্বোজ্জ্বলীকৃতাসখ্য-কাশীবাস্যন্তেবাসিক-জনান্তঃকরণকঃ সর্বাবতারিণঃ স্বয়ং ভগবতোঽঙ্গীকৃতাহ্লাদিনী-শক্তিসারভূত-শ্রীরাধিকাভাব রূপস্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ কৃপাদৃষ্টিপাতেন স্ফুরিতযথার্থসিদ্ধান্তঃ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পরমমহানুভাবস্তস্যৈবোপাস্যত্বং নির্ণয়ন তদ্গুণবর্ণন-প্রধান-চৈতন্যচন্দ্রামৃতাভিধান-মঙ্গলস্বরূপ-গ্রন্থমারভতে।"

ইহা হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ, বেদান্তাদি অশেষশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বক্তা ও অসংখ্য কাশীবাসিশিষ্যগণের গুরু ছিলেন এবং শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিপাতে যথার্থ সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যায়।

লালদাসের বাংলা 'ভক্তমাল'-গ্রন্থেই (রচনাকাল—খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষপাদ, তিনি তৎপূর্ব্বে ১৬৮৪ শকাব্দায় [=১৭৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে] উপাসনাচন্দ্রামৃত গ্রন্থ রচনা করেন১) পাওয়া যায় যে, কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দকেই মহাপ্রভু প্রবোধানন্দ নাম প্রদান করেন—

প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তার ছিল।
প্রভুহ প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল ॥২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রমুখ প্রাচীন ও প্রামাণিক চরিতকারগণ কেহই এই কথা উল্লেখ করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের তথা বিজলী খাঁর নাম পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আর যে প্রকাশানন্দের উদ্ধার-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনটি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা রহিয়াছে,৩ তাহাতে ঐ প্রধান কথাটি বর্ণিত হয় নাই, ইহা একটি ভাবিবার বিষয়।

ঈশান নাগরের নামে প্রচারিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' নামক এক পুস্তকে দেখা যায়—

কাশী পূর্ণ হৈল গোরার প্রভাব সম্বন্ধে।
অনেক বৈষ্ণব হৈলা সেই অনুবন্ধে।
তথি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী খ্যাতি।
সন্ন্যাসীর মধ্যে যিহ বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
শ্রীপ্রবোধানন্দে গোরা বড় দয়া কৈলা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে প্রেমভক্তি দিলা ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব করে পদ্য বিরচিয় ॥৪

এই উক্তি অনুসারে প্রকাশানন্দের নাম পরে প্রবোধানন্দ হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায় না; বরং মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বেও প্রবোধানন্দ নাম ছিল, এইরূপই বুঝা যায়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের কতিপয় শ্লোক (১৯, ৬০, ৯৯



যমুনার তটে চীরঘাট, বৃন্দাবন

ইত্যাদি) হইতে কেহ কেহ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পূর্ব্বে কাশীবাসী মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ করিতে চাহেন। ঐ সকল শ্লোকের টীকায় 'আনন্দী' এ জাতীয় কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ সকল শ্লোকে অন্যাভিলাষ, নির্ভেদজ্ঞানযোগকর্ম্মাদি অভক্তি-মার্গমাত্রেরই (কাশীবাসীর মুমুক্ষা, গয়ার কর্ম্মকাণ্ড, বিষয়ীর গ্রাম্যচেষ্টা, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার-নিষ্ঠার) নিরসন দৃষ্ট হয়।

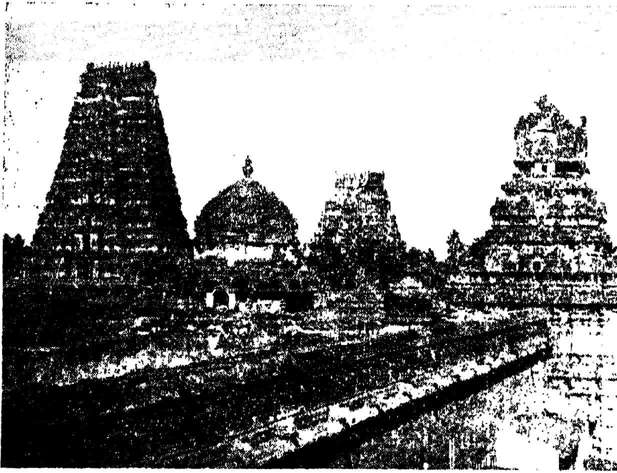
শ্রীচৈতন্যভাগবতের (মধ্য ৩য় ও ২০শ অধ্যায়ের) বর্ণনানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলাকালে—"কাশীতে পড়ায় প্রকাশানন্দ। সেই করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥" আবার প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের উক্তি অনুসারে মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলার পর যখন নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তখন—"প্রবোধানন্দ প্রভুর প্রাণসম।" মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গম-ত্যাগকালে প্রভুর বিরহে অধীর (প্রেমবিলাস ১৮।৭৯-৮০); "তিরুমলয় বেঙ্কট আর প্রবোধানন্দ। তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ তিন পূর্ব্বেতে। রাধাকৃষ্ণ রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥" (ভক্তিরত্নাকর ১।৮৩-৮৪);

১। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন-কৃত বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং) ৯০৮-৯ পৃষ্ঠা।

২। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, ২২শ মালা, ৩৫৮ পৃঃ, বলাইচাঁদ গোস্বামি-সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আ ৭।৪৯-১৫২; মধ্য ১৭।১০৪-১৪৩, ২৫।৫-১৬০ পয়ার।

৪। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ—১৭ অধ্যায়, ৭৭পৃঃ, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।



শ্রীরঙ্গম্—মন্দির ও গোপুর

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনানুসারে মহাপ্রভু (সম্ভবতঃ ১৪৩২ শকাব্দায়) দক্ষিণ যাত্রা করিয়া দুই বৎসর পরে দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসেন; ১৪৩৭ শকে বৃন্দাবন যাইবার কালে একবার কাশীতে পদার্পণ করেন এবং ঐ বৎসরই বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে দ্বিতীয় বার কাশীতে বিজয় করিয়া তথায় দুই মাস অবস্থান করেন এবং প্রকাশানন্দকে উদ্ধার ও সনাতনকে শিক্ষা দান করেন। এখন বিবেচনার বিষয়, মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলাকালে (আনুমানিক ১৪২৫ শক হইতে ১৪৩০ বা ১৪৩১ শকাব্দা পর্য্যন্ত) যিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মবিরোধী, কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ, তিনিই ১৪৩২ বা ১৪৩৩ শকাব্দায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-বিজয়কালে শ্রীরঙ্গমবাসী শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবীণ বৈষ্ণব প্রবোধানন্দ এবং মহাপ্রভুর কৃপায় রাধা-কৃষ্ণের উপাসক ও গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণব হইয়া আবার তিনিই ১৪৩৭ শকাব্দায় কিরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাশীবাসী মায়াবাদাচার্য্য গৌরবিরোধী প্রকাশানন্দ যতি হইতে পারেন? আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত দুই জন প্রবোধানন্দ (অর্থাৎ গোপাল ভট্টের শিক্ষাগুরু ভূতপূর্ব্ব বৈষ্ণব প্রবোধানন্দ আর কাশীবাসী পূর্ব্ব মায়াবাদী প্রকাশানন্দ, মহাপ্রভুর কৃপায় পরে নাম পরিবর্ত্তনের দ্বারা প্রবোধানন্দ) স্বীকার করিলে কবিকর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ প্রভৃতি গ্রন্থে, কিংবা কোনও প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে (এমনকি নাভাদাসের হিন্দী ভক্তমালে), অধিক কি, লালদাসের বাংলা ভক্তমালে (যাহাতে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশানন্দকেই পরে প্রবোধানন্দ বলা হইয়াছে) দুই প্রবোধানন্দের পৃথক পৃথক চরিত বর্ণন বা কোনওরূপ উল্লেখ নাই কেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী যাঁহার বিশেষ প্রেরণায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন, তাঁহারই শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর রচিত প্রামাণিক গ্রন্থ 'সাধন-দীপিকা' হইতে প্রবোধানন্দ যে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপালভট্টের পিতৃব্য ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট ভাবেই জানা যায়। তৎপূর্ব্বে স্বয়ং গোপালভট্টও হরিভক্তি বিলাসে এবং শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদও টীকায় তাহাই বলিয়াছেন। 'দাক্ষিণাত্য ভট্ট' গোপালের পিতৃব্য দাক্ষিণাত্যবাসী ও বৈষ্ণব হইবারই কথা। তিনি পরমপুণ্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে—ক্ষেত্রসন্ন্যাসই হউক অথবা শ্রীসম্প্রদায়ের প্রণালী অনুযায়ী কোনও যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই হউক বাস করিতেন, এবং পরা বিদ্যার গৌরবে সরস্বতী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর প্রবোধানন্দ রাধাকৃষ্ণ-উপাসক হন এবং কিছুকাল পরে নীলাচলে আগমনপূর্ব্বক সপার্ষদ মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের প্রমাণ হইতে জানা যায়, প্রবোধানন্দ নীলাচলে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্য (২৭ শ্লোক), বক্রেশ্বর পণ্ডিত (৪৪ শ্লোক) প্রমুখ পার্ষদগণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে সাক্ষাৎভাবে (১৬,৭৯,৮৬,১২৯,১৩১,১৩৫,১৩৬) দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপ্রকট লীলার পরেই তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। প্রবোধানন্দ শেষ জীবনে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন এবং তথারই বৃন্দাবনমহিমামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনেও তিনি ভজন করিতেন শুনিতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনেই তাঁহার তিরোভাব হয়। অদ্যাপি কালীয়দহে তাঁহার সমাধিপীঠ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বহুকাল হইতে একটি কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হিতহরিবংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইবার পরও প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয় প্রশিষ্য হিতহরিবংশকে আশ্রয় প্রদান করেন। প্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে মহাপ্রভুকে গৌরনাগরবর[১]-রূপে স্তব করা হইয়াছে এবং সরস্বতীপাদ

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—১৩২ শ্লোক, বহরমপুর সং ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

তাঁহার গ্রন্থে স্বকীয়বাদ খ্যাপন করিয়াছেন। এই সকল কারণে প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই প্রবোধানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থ হইতে কোনও প্রমাণাদি উদ্ধার করেন নাই বা তাঁহার গ্রন্থের টীকা প্রভৃতিও রচনা করেন নাই।১

'গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥'
—শ্রীচৈতন্য ভাগবত আ ১৫।৩০

প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, ২। শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্, ৩। শ্রীসঙ্গীতমাধব-গীতিকাব্যম্, ৪। শ্রীরাধারসসুধানিধিঃ, ৫। শ্রীরাসপ্রবন্ধঃ, ৬। শ্রীশ্রুতিস্তুতি ব্যাখ্যা, ৭। শ্রীগোপাল-তাপনী-টীকা ইত্যাদি।

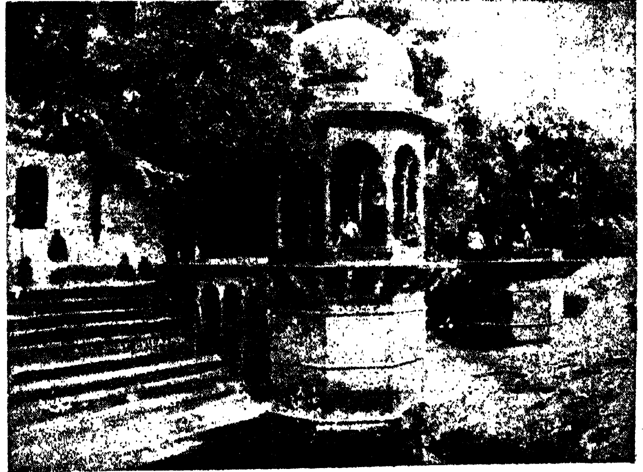
১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের অসমোর্দ্ধ মহিমা ও তৎপ্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দুইটি টীকা দৃষ্ট হয়। আনন্দিকৃত 'রসিকা-স্বাদিনী টীকায় ১২শ প্রকরণে ১৪৩টি শ্লোক দেখা যায়। কিন্তু 'তরঙ্গিণী'-নামক অপর টীকা অনুসারে ১৫৩ শ্লোক—ইহাতে কোনও প্রকরণ-বিভাগ নাই।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের বিশেষ কথা এই—(৮৮ শ্লোকে) পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যচরণে যতটা ভক্তিলাভ করিবেন, তাঁহার হৃদয়-শ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমসুধাসমুদ্রও অকস্মাৎ সেই পরিমাণেই উদিত হইবে। (৬৮ শ্লোকে) যাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে অকপট প্রেমলাভ হয়, একমাত্র তাঁহারই হৃদয়ে শ্রীরাধিকার পদনখমণিজ্যোতি উদিত হয়, অন্যের নহে। (১৩০ শ্লোকে) শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যদি অদ্ভুত প্রেমতত্ত্ব, নাম-মহিমা, বৃন্দাবনমাধুরী এবং পরমরসচমৎকার মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধিকা-তত্ত্ব আবিষ্কার না করিতেন, তবে কেহই তাহা জানিতে পারিতেন না।

২। শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্—এই গ্রন্থ একশত শতকে সম্পূর্ণ বলিয়া প্রচারিত আছে। দ্বাবিংশ শতক পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ১৭শ শতক পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতকের পুথিই বহু স্থানে অধিক দৃষ্ট হয় এবং উহার ভগবত মুদ্রিত কৃত ... হিন্দী পদ্যানুবাদও মুদ্রিত হইয়াছে। গ্র... রাধারস-সুধানিধির ন্যায় শ্রীবৃন্দাবন মহিমা... রাধারই উজ্জ্বলিত মহিমময় বৃন্দাবনবাসনিষ্ঠা প্রচার করিয়াছেন। ১৭শ শতকের প্রথমে মহাপ্রভুর বন্দনা আছে।

৩। শ্রীসঙ্গীতমাধব-গীতিকাব্যম—এই গ্রন্থ পঞ্চদশ সর্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে রচিত হইয়াছে। ইহার প্রায় প্রতি গীতির শেষে 'সরস্বতী বর্ণিত' 'সরস্বতী-গীত' ইত্যাদি রূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় এবং উপসংহারে শ্রীমন্মহা-প্রভুর বন্দনা আছে।

৪। শ্রীরাধারসসুধানিধিঃ—এই স্তোত্রকাব্য গ্রন্থটিতেও সরস্বতীপাদ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের ন্যায় রাধাপাদপদ্ম ভজননিষ্ঠা ও রাধার উপাসনার উৎকর্ষ প্রচার করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে (৬৮, ৮৮, ১৩০ শ্লোকে) যে সকল প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরাধারসসুধানিধিতে সম্পূর্ণ সফলীকৃত হইয়াছে।



কালীয়দমনঘাট ও কেলিকদম্ববৃক্ষ—কালীয়দহ, শ্রীবৃন্দাবন—ইহারই সন্নিকটে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাধিস্থান

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত ও শ্রীসঙ্গীতমাধব গ্রন্থের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের সহিত শ্রীরাধারসসুধা-নিধির ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারাদির যথেষ্ট সাম্য দৃষ্ট হয়। শ্রীসঙ্গীতমাধবের (৪।১৪) "গতা দূরে গাবো...প্রাণিনিষবঃ॥" ...(২।৯) "অহো মুখর-নূপুর...সুরত-সঙ্গরো জৃম্ভতে॥" এই শ্লোকদ্বয়ের সহিত শ্রীরাধারসসুধানিধির (২২৯) "গতা দূরে গাবো...প্রাণিনিষবঃ॥" এবং (২২৫) "অনঙ্গজয়-মঙ্গল...রতিরণোৎসবো জৃম্ভতে॥"—এই শ্লোকদ্বয়ের হুবহু মিল আছে। সঙ্গীতমাধবে (২।৭) শ্রীরাধিকার যে কুট্টমিত বিলাসটি অবশ্যকীর্ত্তনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই

১। 'অতএব ...

শ্রীরাধারসসুধানিধিতে (১০ম শ্লোকে) ও শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতে (১৭।১০৬) পরিস্ফুট রহিয়াছে। আরও দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের (৬৭ শ্লোক) 'চৈতন্যেতি কৃপাময়েতি পরমোদারেতি'... ইত্যাদি শ্লোকের সহিত শ্রীরাধারসসুধানিধির (৩৮ শ্লোক) 'শ্যামেতি সুন্দরবরেতি মনোহরেতি'... শ্লোকের; পুনরায় শ্রীচন্দ্রামৃতের (১৩৪ শ্লোক) 'ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি' ইত্যাদি শ্লোকের সহিত শ্রীরাধারসসুধানিধির (১৬৭) 'ক্ষণং মধুরগানতঃ ক্ষণমমন্দ-হিন্দোলতঃ' ইত্যাদি ও (২০৪) 'ক্ষণং শীৎকুর্ব্বাণা ক্ষণমথ মহাবেপথুমতী' ইত্যাদি এবং শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (৩।১৬) 'ক্ষণাচ্ছরদুপাগমং ক্ষণত এব বর্ষাগমং' ইত্যাদি বহু শ্লোকের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারাদিগত মিল রহিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে রসিকোত্তংস তাঁহার রচিত প্রেমপত্তন গ্রন্থে[১] হিতহরিবংশের নামে শ্রীরাধারস-সুধানিধির দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। রসিকোত্তংসের গ্রন্থ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে এবং প্রবোধানন্দের অভ্যুদয়ের কয়েক শতাব্দী পরে উহা লিখিত হইয়াছে; সুতরাং আভ্যন্তরীণ অসংখ্য প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া উহার একটিমাত্র অসংলগ্ন শব্দকে অকাট্য প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায় না। কবিকর্ণপূরের গুরু শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদের রচিত 'শ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষা'র 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি বহু পণ্ডিত গবেষক—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের "শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুর-তরোস্তারাঙ্কুরঃ" শ্লোকটিকে ভাবার্থ-দীপিকার শ্রীধরস্বামীর শ্লোক বলিয়া অনেকেই উদ্ধার করিয়াছেন; এমনকি রূপগোস্বামিপাদের রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং শ্রীজীব গোস্বামিপাদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভক্তিসন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভকে কোন কোন আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় গবেষক সনাতন গোস্বামীর রচিত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[২] পাশ্চাত্ত্যদেশীয় অনেক গবেষক দ্বারাও এইরূপ বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে।

১। কাশী—অচ্যুত গ্রন্থমালায় কৃষ্ণপন্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত, সংবৎ ১৯৮৯। পৃষ্ঠা ৩৫।

২। 'A History of Indian Philosophy' by S. N. Dasgupta, Vol. IV, p. 394

৫। আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ—ষোড়শ-বীজগর্ভ রাসলীলা-বর্ণনময় কাব্য। এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা অবলম্বনে রচিত হইলেও ইহাতে কবির নিজ অনুভবজাত কিছু বৈলক্ষণ্য ও অদ্ভুতত্ব আছে।

৬। শ্রুতিস্তুতি-ব্যাখ্যা—ইহা শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধের ৮৭শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা। সরস্বতীপাদ শ্রুতিসমূহকে 'মিশ্র-প্রেমরসময়ী শ্রুতিরূপা' ও 'নিত্যশুদ্ধ ভাবময়ী গোপীরূপা' ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৭। গোপালতাপনী-টীকা—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পুথিশালায় (বেদপুথি নং ২০৮) শ্রীজীবপাদের উপসংহার-শ্লোক-সহ গোপালতাপনী টীকার একটি পুথি (বঙ্গাক্ষরে লিখিত) রক্ষিত আছে। উক্ত কলেজের পুথির প্রাচীন তালিকায় (Vol X pp 158-99) প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত গোপালতাপনী-টীকার উল্লেখ ছিল; বর্ত্তমানে তালিকার নম্বরগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন দেবনাগর অক্ষরে লিখিত, কীটদষ্ট গোপাল-তাপনী-টীকার যে পুথিটি পাওয়া যায়, তাহার শেষ পাতার উপসংহার শ্লোকের কয়েকটি স্থান অত্যন্ত কীটদষ্ট হওয়ায় উক্ত টীকাকারের নাম উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়াছে। মঙ্গলাচরণেও টীকাকারের কোনও নামোল্লেখ নাই। বৃন্দাবনে রাধারমণ ঘেরার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী মহাশয়ের পুথিশালায় প্রবোধানন্দ সরস্বতীর পুষ্পিকাসহ উক্ত তাপনী টীকার একটি পুথি দৃষ্ট হয়। উহা শ্রীজীবপাদের গোপালতাপনী-ব্যাখ্যার সহিত প্রায়ই মিলিয়া যায়, তবে কিছু কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যাও আছে। ১২৯১ বঙ্গাব্দে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ রাধারমণ যন্ত্র হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় (২য় সংস্করণ) ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দে রামদেব মিশ্র, পণ্ডিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের ভূমিকাসহ (৪র্থ সং) গোপালতাপনী-টীকা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত বলিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকে প্রবোধযতির নামই দৃষ্ট হয়। যে-কোনও কারণেই হউক, প্রবোধানন্দকৃত তাপনী-টীকার সহিত শ্রীজীবপাদের টীকার একাকার হইয়াছে।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত 'বিবেক-শতক' নামক (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Notices vii p 261, No 2510 একটি গ্রন্থের কথাও জানা যায়।



রিক্সাওয়ালা

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

বসন্তের প্রভাত। মাঝে মাঝে কোকিল ডাকে বাড়ীর পিছনের নিমগাছে। উঠান থেকে বেলফুলের গন্ধ ভেসে আসে। পরিবেশ চমৎকার। তন্ময় হয়ে পড়ছি বাইরের ঘরে বসে। হঠাৎ একটা চিৎকার ওঠে। ছোট ছেলের আর্তনাদ—বাবারে, মারে, মেরে ফেললে রে।

রাস্তায় বেরিয়ে আসি। দীনু ময়রার দোকানের সামনে লোক জমেছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি ধুলোর ওপর রসগোল্লার ছড়াছড়ি, কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর প্রাণ ভরে খাচ্ছে আর দাওয়ার ওপর অগ্নিশর্মা দীনুর অজস্র কিল চড় পড়ছে বছর-দশেকের একটা ছেলের সারা দেহে। দীনু বলছে—অকম্মার ঢেঁকি, যার খাবে তার লোকসান করবে। কতদিন আর সহ্য করতে পারে মানুষ? রায়বাড়ীর বিয়ের বায়না নিয়েছি এখন মাল যোগাই কি করে? রাতভর খেটে তৈরি করলাম জিনিস আর তুই অর্ধেক দিলি গোল্লায়। তোর কি কোন কালেই হুঁশ হবে না হারামজাদা?

একজন বয়স্থা স্ত্রীলোক চুপ করে থাকতে না পেরে বলে—আহা, অত মারছ কেন? ছেলেমানুষ অন্যায় করে ফেলেছে, ছেড়ে দাও। মারের চোটে আধমরা হয়ে গিয়েছে বেচারা।

দীনু রেগে গস গস করে। মুখভঙ্গি করে বলে—থাম ঠাকরুণ, বাজে বকো না। মালে মেহনতে আমার দশ টাকা জলে গেল, আমি ওকে অমনি ছেড়ে দেব? ওর হাড় গুঁড়ো করে ছাড়ব। সামান্য ব্যবসা করে খাই। রোজ রোজ লোকসান গেলে সংসার চলে কেমন করে?

দীনু ছেলেটির চুলের মুঠি ধরে মাথা ঝাঁকানি দিতে থাকে আর সেও প্রাণপণ চেঁচায়। পাড়ার একটি তেজীয়ান ছোকরা রুখে ওঠে—এত বাড়াবাড়ি করবেন না মশাই। ছেলেমানুষ পেয়ে ভাবি যে গায়ের জোর দেখাচ্ছেন। বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে, শরীরে দয়ামায়া নেই? ফের যদি ওর গায়ে হাত দেন তো মজা টের পাবেন।

চোখরাঙানিতে একটু ভয় পেয়ে দীনু সরে দাঁড়ায়। তার কাণ্ড দেখে আমি অবাক। ছেলেমেয়ের বাপ এতদূর নির্দয় হতে পারে! দীনুর নৃশংস ভাব দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নে। তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে একখানা দশ টাকার নোট এনে তার সামনে রেখে বলি—আমি তোমার ক্ষতি-পূরণ করছি। ছেলেটি তোমার দোকানে আর কাজ করবে না। সামান্য ক'টা টাকার জন্য তুমি ওকে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিলে। ছিঃ, এমন কাজ আর করো না। চুলে পাক ধরেছে, পরকালের ভয় নেই?

আমার অপ্রত্যাশিত আচরণে চমকে ওঠে দীনু। ধড়িবাজ ব্যবসাদার, চোখের চামড়া নেই। নির্লজ্জভাবে নোটখানা ফতুয়ার পকেটে পুরে গলার স্বর মোলায়েম করে বলে—মাষ্টারবাবু দয়া করলেন, ছোঁড়া বেঁচে গেল। নইলে ওর নষ্টামি ঘুচিয়ে দিতাম।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরি। তাকে বৈঠক-খানায় বসিয়ে জিজ্ঞাসা করি—হাঁরে, অতগুলো মিষ্টি ফেললি কি করে?

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—ইচ্ছে করে ফেলি নি। গামলাটা হাত পিছলে পড়ে গেল। অত বড় গামলা কি সামলাতে পারি?

—ঠিক হয়েছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল।

ছেলেটির পাণ্ডুর অধরে হাসির রেখা। আমার সহানু-ভূতিতে সজীব হয়ে উঠেছে সে। জিজ্ঞাসা করি—তোর নাম কি?

—আজ্ঞে নশিরাম।

—বাড়ী কোথায়?

—বাসুদেবপুর।

—দেশে ইষ্টিশানে নামতে হয়?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বাবার নাম কি?

—কেনারাম রাজবংশী। বাবা মরে গিয়েছে অনেকদিন, আমার কিছু মনে নেই।

বাসুদেবপুর আমাদের গ্রামের কাছে। ছেলেবেলায় কয়েকবার গিয়েছিও। কিন্তু কৈ কেনারামকে তো চিনতে পারি নে। জিজ্ঞাসা করি—এখানে তোর কে আছে?

—মা আছে, নগেন্দ্রনগরে বাড়ুজ্যেবাড়ী কাজ করে।

নশিরামের ওপর বড় মায়া হয়। দেশের ছেলে, গরিব, বাপ নেই। তার হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলি—তুই মার কাছে যা। ভাবনা কি? কাজ একটা জুটে যাবেই। কাজ সাবধানে করতে হয়—বিশেষ করে পরের কাজ, বুঝলি।

কৃতজ্ঞতায় নশিরামের চোখ ছলছল করে। সে ধীরে ধীরে নগেন্দ্রনগরের দিকে চলে যায়।

এই অপ্রীতিকর ঘটনা ফাল্গুনের সুরভিত প্রভাতবেলার সমস্ত মাধুর্য হরণ করে আমার অন্তরে আনে বেদনার

অনুভূতি। বড় অসহায় ছোট ছেলেমেয়েরা, একটুও প্রতিবাদ করতে পারে না, নীরবে সহ্য করে বড়দের অত্যাচার। পাঠশালা-জীবনের কথা মনে পড়ে। পণ্ডিতমশাই আমার এক সহপাঠীর মাথা ঠুকে দিয়েছিলেন দেয়ালে। ভয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তাই দেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আমার পেটে রুল পেনসিলের খোঁচা মেরে পণ্ডিত-মশাই বলেছিলেন—"কোথাকার হাবা ছেলে! হারুকে মারছি তাতে তোর কান্না আসে কোত্থেকে?" আমার কাছে বিবরণ শুনে জ্যাঠাইমা ভারি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পণ্ডিতমশাইকে বলেছিলেন—"ছোট ছেলে নারায়ণ। তার গায়ে হাত দিলে অপরাধ হয়।" জ্যাঠাইমার সে কথাগুলি আজও আমার কানে বাজে।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে। বোধ হয় রবিবার। দুপুরের দিকে একটি বিধবা স্ত্রীলোক সরাসরি বাড়ীর ভিতর ঢুকে বলে—মাষ্টারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পরিচয় দিয়ে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করি। স্ত্রীলোকটি ঢিপ করে প্রণাম করে বলে—আমি নশিরামের মা, নগেন্দ্র-নগর থেকে আসছি। পরের বাড়ী কাজ, ইচ্ছে হলেও আসা যায় না। আপনি না থাকলে নশি আমার বাঁচত না। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আপনার সোনার দোয়াত-কলম হউক। গরিব দুঃখীর দিকে ক'জন তাকায় মাষ্টার বাবু? আপনি যা করেছেন—

নশিরামের মার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। কিছুক্ষণ বাদে চোখ মুছতে মুছতে আবার বলে—আমার তিন তিনটে ছেলে মরে গিয়েছে, নশিই একমাত্র সম্বল। এমন মার মেরেছে দীনু ময়রা যে বাছার আমার গায়ের ব্যথা সারতে পাঁচ দিন লেগেছে। এক এক সময় রেগে বলে—'দীনু ময়রাকে আমি দেখে নেব'। ছেলে-বুদ্ধি কখন কি করে বসবে জানি নে। পুলিসের হাঙ্গামায় পড়ব না তো? আমার ভয় হয় মাষ্টারবাবু। আমাদের মেজবাবু ইষ্টিশানে কাজ করেন, আশা দিয়েছেন ওখানকার চায়ের দোকানে নশির চাকরি করে দেবেন। হলে বাঁচি, কাজ পেলে সব ভুলে যাবে।

—রাগ তো হবেই নশির। অমন মার দেখলে আমাদেরই মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। রক্তমাংসের শরীর তো। ওর জন্য ভাবনার কারণ নেই। অন্য জায়গায় কাজ পেলে সেদিনের কথা আর মনে থাকবে না। ছেলেমানুষের মন বদলাতে কতক্ষণ।

আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আর বার বার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে কাত্যায়নী বিদায় নেয়। বেশ মানুষটি! কথাবার্তা চমৎকার। সরলতা ও ভদ্রতার সুন্দর সমন্বয়তার চরিত্রে।

মাসতিনেকের মধ্যে আমি কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে আসি কর্মসূত্রে ঘুরে বেড়াই সারা বাংলার নানা স্থানে। চিরপথিক মানুষ—চঞ্চলতায় ভরা তার জীবন। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা! যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা—পর্বের পর পর্ব রচনা করে মনের মহাভারতে। চট্টগ্রামে বোমার হিড়িকে দারুণ দুর্ভাবনায় কাটে দিন। ঘটনাকে বিকৃত করে রটনা, চিত্তকে করে তোলে বিক্ষিপ্ত। নিষ্প্রদীপের যুগ শেষ। আলো জ্বলে রাজধানীর রাজপথে। কিন্তু কলকাতা কালো হয়ে ওঠে চোরাবাজারে। দু'পুরুষের দোকানী চালে-ডালে কাঁকর মেশাতে কুণ্ঠা বোধ করে না। নাম-করা ডাক্তারখানা থেকে বেমালুম বেরিয়ে আসে ভেজাল ওষুধ, দিকে দিকে দুর্নীতি আর দুর্মতির কি দুরন্ত প্রকাশ! পুরনো প্রতিবেশী আড়ালে থেকে বাড়ীতে আগুন লাগায় আর তার বাবুর্চী-বেয়ারারা প্রকাশ্যে জিনিস-পত্র লুঠ করে। মানুষের প্রতি মানুষের নির্মম আচরণ জীবনে বিতৃষ্ণা জাগায়। মুক্তির প্রথম স্বাদ পেয়ে পাড়ায় পাড়ায় তরুণরা প্রতিষ্ঠা করে সবুজতন্ত্র। তার জুলুমও কম নয়। জীবনের সব অভিজ্ঞতা কি ব্যক্ত করা যায়? সে ক্ষমতাই বা থাকে ক'জনের? বর্তমানের ব্যথা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন অতীতকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়। তাই বাসুদেবপুরের কেনারাম, নগেন্দ্রনগরের কাত্যায়নী, দীনুর দোকানের নশিরাম—কে কোথায় ডুবে যায় বিস্মৃতির তিমিরে।

১৯৫৩ সন। এপ্রিলের শেষ। প্রায় পনের বছর বাদে কৃষ্ণনগর যেতে হবে। অনেকদিন পরে পুরনো জায়গায় যাবার সম্ভাবনা একটা অদ্ভুত অনুভূতি আনে। মনে আনাগোনা সুরু করে কত মুখ, কত কথা, কত ঘটনা। স্মৃতির বিজন পথে সহসা যেন ভিড় জমে যায়। কিন্তু আমার যাওয়াটা এতই অভাবনীয় এবং যে কাজের জন্য যাওয়া সেটা এতই জরুরি যে আমার কল্পনায় কৃষ্ণনগর রঙিন হয়ে ওঠে না। বিগত জীবনকে রোমন্থন করার অবকাশ আমার নেই। প্রয়োজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। ছাতা আর সুটকেস নিয়ে দু'টার লোকাল ধরি শেয়ালদায়। ব্যারাকপুর যেতে না যেতেই কাল-বৈশাখীর আবির্ভাব। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়। ট্রেন লেট হয়—রাণাঘাটে আসে সাড়ে আটটার পর। ষ্টেশনে খুব হৈ-চৈ। কৌতূহলী হয়ে ব্যাপার কি জানতে চেষ্টা করি।

যা শুনি তাতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তাহেরপুরের উদ্বাস্তুদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ। তারা অর্থনৈতিক পুনর্বাসন চায়। আন্দোলনকারীরা আজ চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। রেল লাইন ব্লক করে রেখেছে সন্ধ্যা থেকে। বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ। রাত্রের মধ্যেই কৃষ্ণনগরে পৌঁছানো দরকার। পরদিন ভোরবেলা কাজ। উপায় কি?

দুশ্চিন্তায় দেহমন অবসন্ন। এ অঞ্চলে শিল পড়ায় তাপ-মাত্রাও অনেকখানি নেমে গিয়েছে। প্লাটফর্মের স্টলে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিই। যে ছেলেটি চা তৈরি করছিল তার নাম হরিচরণ। তাকে জিজ্ঞাসা করি—এখন কৃষ্ণনগরে যাবার বাস পাওয়া যাবে কি?

—না। ট্রেন বন্ধ, যাত্রীর অভাব নেই। অন্য দিন হলে একটা ব্যবস্থা হ'ত। কিন্তু আজ কোন আশা দেখছি নে। যে দুর্যোগ!

—বড় মুশকিলে পড়েছি। ভোরে অত্যন্ত জরুরি কাজ।

হরিচরণ ভুরু কুঁচকে বলে—বৃষ্টি থেমে যাবার পর আদর্শ হিন্দু হোটেলের সামনে একখানা সাইকেল রিক্সা দেখেছি। রিক্সাখানা কৃষ্ণনগর থেকে এসেছে কোন একটা উপলক্ষে। রিক্সাওয়ালা হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আরও কি কথা বলছিল। আপনি চা খান। আমি চট করে খোঁজ নিয়ে আসি, সে আজ কৃষ্ণনগর ফিরবে কিনা।

—দেখ ভাই দেখ। যদি একটা উপায় করতে পারো ত বড় উপকার হয়।

মনের কোণে আশার ক্ষীণ আলো দেখা দিয়ে আবার নিভে যায়। মিনিট পনেরর ভিতর হরিচরণ ফিরে এসে জানায়—রিক্সাওয়ালা আজ ফিরবে না। বলে—'আকাশের গতিক ভালো নয়। আবার ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া জ'লো হাওয়ায় এতখানি রাস্তা গাড়ি চালালে অসুখ হবে।'

—এমন অঘটন কল্পনাও করতে পারি নি। যাত্রাটা নিতান্তই অশুভ। কি যে করি—

কেটলিটা তোলা উনুনের মরা আঁচে বসিয়ে হরিচরণ বলে—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? আপনি চলুন আমার সঙ্গে। নিজে গিয়ে বললে আপনার অবস্থা শুনে রিক্সাওয়ালা রাজী হতেও পারে।

হরিচরণের সঙ্গে আদর্শ হিন্দু হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াই। অন্ধকার বারান্দার নীচে চাদর মুড়ি দিয়ে রিক্সায় বসে বিড়ি টানছে রিক্সাওয়ালা। হরিচরণ এগিয়ে গিয়ে বলে—ও ভাই, বাবু বড় বিপদে পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। একটু কষ্ট করে ওঁকে নিয়ে যাও কৃষ্ণনগরে। ভালো বকশিশ দেবেন।

—বলেন কি মশাই! এই রাতে কেউ গাড়ি চালায়? কি জোর শিল একবার ভাবুন দেখি! গাড়ি চালানো আমার ব্যবসা, বার বার বলতে হবে কেন? কিন্তু শরীর আগে না পয়সা আগে? রাত-বিরেতে বিপদ হতেই বা কতক্ষণ?

আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই—বিশেষ জরুরি কাজ, নইলে কি এই অসময়ে মানুষকে বিরক্ত করি? এক যুগ পরে দেশে আসছি। ভগবান যে এমন ফ্যাসাদে ফেলবেন তা কি জানি! মা সিদ্ধেশ্বরীর নাম করে রওনা হওয়া যাক, ঠিক পৌঁছে যাব নির্বিঘ্নে।

আমার কথা শুনে আধপোড়া বিড়িটা ফেলে দেয় রিক্সাওয়ালা। আমার মুখের ওপর টর্চ ফেলে দেখে। তারপর জিজ্ঞাসা করে—কৃষ্ণনগরে কোন্ পাড়ায় যাবেন আপনি?

—গোলাপটি।

—আচ্ছা, আসুন।

হরিচরণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে রিক্সায় উঠে পড়ি। তখন রাত দশটা। কালবৈশাখীর প্রথম তাণ্ডবের পর নিথর পল্লীপ্রকৃতি। পথ পথিকহীন। আশেপাশে নিযুপ্ত গ্রাম। ঝোপে ঝোপে শুধু ঝিঁঝির ডাক। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়—মসিমাখা আকাশ বিকট হাসি হেসে যেন ব্যঙ্গ করে করকাহতা সঙ্কুচিতা পৃথিবীকে। সন সন করে রিক্সা চলে। থেকে থেকে হর্ন বাজে। অদম্য উৎসাহ রিক্সা-চালকের!

শান্তিপুর পিছনে ফেলে আসি। কখন ঘুমের ঘোর আসে বুঝতে পারি নে। বারোয়ারিতলায় রিক্সা থামতেই ঘোর কেটে যায়। সুটকেসটি নামিয়ে নিয়ে সানন্দে জিজ্ঞাসা করি রিক্সাওয়ালাকে—কি নেবে?

- কিছুই নেব না।

—ও, ভারি চালাক। পরখ করতে চাও বাবুর কেমন দরাজ হাত। তা লজ্জা কি? তুমি আমার জন্য যার-পর-নেই কষ্ট স্বীকার করেছ। যা চাইবে তাই পাবে।

—মাষ্টারবাবু, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না। আমি নশিরাম। এই পাড়ায় দীনু ময়রার দোকানে কাজ করতাম ছেলেবেলায়। আপনি একদিন—

তিরোহিত হয় কালের তিরস্করণী। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দীনবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ক্রন্দন-কাতর বালকের মুখ। বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে বলি—তুমিই সেই নশিরাম! তুমি আমায়—

—বাণাঘাটে আপনার গলার আওয়াজে মনে হ'ল এ যেন চেনা গলা, কোথায় যেন শুনেছি। টর্চের আলোয়

আপনার মুখ দেখে আর সন্দেহ রইল না। আমি এখন রিক্সা চালাই। মালিকের পাওনা মিটিয়ে মাসে শ'খানেক টাকা থাকে। আপনার আশীর্বাদে আমার কোন অভাব নেই।

—তুমি আজ যে উপকার করেছ নশিরাম তার মূল্য নেই, কিন্তু সামান্য কিছু পুরস্কার না নিলে আমাকে যে নিজের কাছে অপরাধী হতে হবে।

—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন মাষ্টারবাবু। আপনার কাছে কি টাকা নিতে পারি? কাঠুরেপাড়ায় থাকি, যখন দরকার হবে খবর দেবেন।

করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে রিক্সায় চেপে কদমতলার কর্দমাক্ত পথে অদৃশ্য হয়ে যায় নশিরাম।

জীবনে কত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু নশিরামের মধ্যে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় পেলাম তা চিরকাল মনে থাকবে। ক্লান্তবর্ষণ নিশান্তে নিদ্রাহীন শয়নে বার বার সেই কথাটাই মনে জাগে। কৃতঘ্ন জগতে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ মেঘ-ভাঙা রৌদ্রের মত অভাবনীয় আনন্দ আনে। তাই মানুষ আছে, সমাজ আছে, সৎকর্মের প্রেরণার উৎস এখনও শুকিয়ে যায় নি, সৃষ্টির মহাকাব্য আজও সরস।

সনেট

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

তুমি কি গিয়েছো ভুলে? সেই ভীরু চঞ্চল প্রহর,
অলস ঘুমের ঘোরে বুজে আসে দু'চোখের তারা,
জানালায় ফিসফাস কথা কয় লাজুক হাওয়ারা,
জীবনে আশ্চর্য্য সেই একত্র হওয়ার অবসর!
জাফরির ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকে ম্লান চন্দ্রকর,
অদূর অশথ শিরে পাখী এক ডাকে ঘুমহারা,
আবছা নদীর জলে ঝিলিমিলি মেঘের চেহারা—
মৌন অনুরাগে মাথা রেখেছিলে কাঁধের উপর!

আজ তুমি নেই আর! মিশে গেছো প্রভাতসমীরে,
ডুবেছো নদীর জলে, আকাশের ঘন কালো মেঘে,
শিউলি ঝরা সে রাত্রির ছোঁয়াটুকু তবু আছে জেগে,
আজো খুঁজি সেই রাত্রি বিস্মৃতির মরা নদীতীরে।
চন্দ্রালোকে দিগন্তরে কোন খানে পড়ে নাই কিরে,
ভঙ্গুর চরণচিহ্ন যেতে যেতে যাওনি কি এঁকে?

২

সুমেরু-সমুদ্র শেষে কোন খানে কোন কল্পলোক
হয়ত এখনো আছে—মানুষের দৃপ্ত পদ রেখা
যার রক্তধূলি 'পরে হয়ত হয়নি আজো লেখা,
ধোঁয়ায় মলিন নয় যেখানেতে আকাশ আলোক—
সাম্রাজ্য বাণিজ্য লুব্ধ মানুষের ক্ষুধাতুর চোখ
বিধ্বস্ত করেনি তাকে, নিঃসঙ্গ নির্ম্মল আজো একা
মেহগিনি দেবদারু দারুচিনি ছায়া দিয়ে দেখা—
হয়ত সে মায়ারাজ্য দিগন্তরে ছড়ায় পুলক!

একটি মুহূর্ত্ত শুধু দুর্লভ রঙীন ভোর বেলা,
হাতে হাতে ধরাধরি পাওয়া যেতো যদিগো সেখানে—
গুঞ্জরিত নদীতীরে, পাখীডাকা পুষ্পিত বাগানে,
প্রাণ ভ'রে শুধু যেতো শঙ্কাহীন লুকোচুরি খেলা,
ভুলে যাওয়া যেতো যদি প্রত্যহের তুচ্ছতার মেলা,
আরো কি সুন্দর হ'ত শরতের আনন্দ কে জানে!

৩

যতই অশান্ত হোক এ পৃথিবী, তুমি শান্ত থাকো—
বিচ্ছিন্ন বিদ্বিষ্ট যারা থাক্ তারা সঙ্ঘর্ষের পথে,
তোমার জীবন-নদী বয়ে যাক্ নিত্য স্নিগ্ধ স্রোতে,
হাসি দিয়ে আলো দিয়ে সকলকে আরো কাছে ডাকো।
ক্ষুদ্র বলে, তুচ্ছ বলে, কারুকে অবজ্ঞা কোরো নাক,
সবার মিলিত শ্রমে মানবসভ্যতা সুরু হতে
উঠেছে সার্থক হয়ে—জ্ঞানে কর্ম্মে শিল্পের আলোতে,
প্রীতির সহজ দৃষ্টি সকলের পরে মেলে রাখো।

অখণ্ড চলার বেগে যুগে যুগে কত বিবর্ত্তন,
গুহা থেকে, বন থেকে, উঠেছে জাগ্রত লোকালয়,
আদিম পশুত্ব থেকে সীমাহীন সম্ভাবনাময়
দেবত্ব নিয়েছে জন্ম—পরাভূত হয়েছে মরণ
মানুষের প্রতিভায়। পাপতাপ, স্খলন-পতন,
তার ঊর্দ্ধে মনুষ্যত্ব যুগে যুগে রাখে পরিচয়!

বিনোবা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

বিভিন্ন সময়ে গান্ধী বিভিন্ন গঠন-সংস্থা সৃষ্টি করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের সকলেরই এক: লোকশক্তির উদ্বোধন, লোকশক্তির সংগঠন। উদ্দেশ্য এক হইলেও পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় যে, পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করার দরুন শক্তির অযথা কতকটা অপচয় হইতেছে আর একাগ্র বুদ্ধির স্থলে বহুমুখী বুদ্ধি দেখা দিয়াছে। তাই জীবনের শেষ দিকে গান্ধী সমগ্র গ্রামসেবার কথা বলিতেছিলেন আর একই সংস্থার মারফতে যাবতীয় গঠনকর্ম্ম পরিচালনা করার কথা ভাবিতেছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখ (১৯৪৮) তাঁহার নির্দ্দেশে সেবাগ্রাম আশ্রমে ভারতের নানা অঞ্চলের গঠনকর্ম্মীদের এক সভা আহূত হয়। ৩০শে জানুয়ারী গান্ধী ইহধাম হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্কল্পকে কার্য্যে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব বর্ত্তাইল গান্ধীর মত ও পথে বিশ্বাসীদের উপর। মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে তাঁহারা সেবাগ্রামে একত্রিত হইলেন।

গান্ধী নাই। কোন সংস্থা চাই। গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা উঠিল। কেহ বা বলিলেন, নূতন সংস্থা গড়িতে হয় গড়ুন, কিন্তু গান্ধীর নামে তার নামকরণ করুন। বিনোবা বলিলেন, ভারতের রীতি তাহা নয়। ব্যক্তিকে নয়, বিচার বা সিদ্ধান্তকে ভারত চিরকাল গুরুত্ব দিয়া আসিয়াছে। বিনোবার কথায়ই তাহা বলা ভাল:

"দোষ দিয়ে বলা হয় সংস্কৃত সাহিত্যে ভাল ইতিহাস নেই। অভিযোগ মিথ্যা নয়। কেননা যে দেশে শঙ্কর-ভাষ্যের মত মহান্ ভাষ্য লিখিত হয়েছে, যে দেশে যোগসূত্রের মত সূত্র রচিত হয়েছে, সে দেশের লোকেরা কি ইতিহাস লিখতে পারতেন না? কিন্তু লেখেন নাই। লেখেন নাই তার কারণ তাঁরা ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিতেন না, দিতেন বিচারকে। আমরাও তেমনি সেবাগ্রামের সভায় বিচারান্তে স্থির করেছি, কোন ব্যক্তির নামে আমাদের সংস্থার নামকরণ করা ঠিক হবে না। তাই 'গান্ধী-সঙ্ঘ' নামের বদলে 'সর্ব্বোদয় সমাজ' নাম রাখা হয়েছে।"

ভারত-সংস্কৃতির মূর্ত্ত বিগ্রহ বিনোবার কাছ হইতে ভারত অন্য কিছু আশা করিতে পারে কি? না বিনোবা অন্য কিছু দিতে পারেন? যাঁহারা গান্ধীর নাম বাদ দিলেন, 'সর্ব্বোদয় সমাজের' মত নৈর্ব্যক্তিক নামকরণ করিলেন তাঁহারা ভারত-সংস্কৃতির রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। গান্ধী তাঁহাদের কাছ হইতে যাহা প্রত্যাশা করিতেন তাঁহারা তাহাই করিয়াছেন। গান্ধীর মত ও পথকে তাঁহারা 'পন্থে' পরিণত হওয়ার হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি নাই।

বিনোবা ঠিক পথ দেখাইলেন। গান্ধীর অনুগামীরা গান্ধীর তত্ত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু গান্ধীর নাম পরিহার করিলেন। আর গান্ধী তো তাহাই চাহিয়াছিলেন:

"আমায় ভুলে যান। সংঘের (গান্ধী-সেবা-সংঘের) সহিত আমার নাম জুড়ে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। আমার নাম আঁকড়ে থাকবেন না, আঁকড়ে থাকুন সিদ্ধান্ত। আর সেই সিদ্ধান্তের কষ্টিপাথরে আপনাদের প্রতিটি কার্য্য আপনারা যাচাই করে নেবেন এবং যে সমস্যাই দেখা দিক না, নির্ভীকভাবে তার সম্মুখীন হবেন—

Forget me therefore, my name is an unnecessary adjunct to the name of the Sangh (Gandhi-Seva-Sangh); cleave not to my name but cleave to the principles, measure every one of your activities by that standard and face fearlessly every problem that arises."

বিনোবা তাঁহার সহযোগীদের ঠিক এ কথাই বলিয়াছিলেন:

"আমি কলা খেলাম আর পরিপাক করলাম। কলার সত্তা আমার শরীরে এল। সে কলা এখন আর কোথায় রইল? তা তো আমার দেহের মধ্যে লীন হয়ে গেছে। তেমনি যে বিচার আমি মেনে নিয়েছি তা আমার হয়ে গেছে। আর আমার বস্তুতে আমার যে মমতা সে মমতা দিয়ে সে বিচার আমি অন্যের কাছে ধরব। 'ঘর কার?' তো বলি 'আমার'। ঘর আমার, সম্পত্তি আমার আর সিদ্ধান্ত বা বিচার গান্ধীজীর! এ কেমন কথা? ভাল, সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর হয় তো, ঘর আর সম্পত্তিও গান্ধীজীর একথা কেন বলব না? গান্ধীজীর কোন সিদ্ধান্ত হ'ত তো মৃত্যুর পরে তা তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কিন্তু তা নয়। সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর নয়, পরন্তু গান্ধীজীর দ্বারা তা প্রকট হয়েছে। সে সব সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব যখন আমি গ্রহণ করি তখন তা আমার হয়ে যায়। লোকের কাছে তা গান্ধীর নামে ধরতে হবে এমন কোন কথা নেই। অন্য ভাবেও লোককে আমরা বুঝাতে পারি। লোকের মনে তা রেখাপাত করলে, তাদের হয়ে গেলে তবেই না আচরণে তা তারা করবে—এটাই আমি বলি। এ ভাব থেকে যদি আমরা কাজ করি তবে ভারতবর্ষের রূপ বদলে যাবে। কাগজে লোকে মন্ত্রের অক্ষর লেখে। মন্ত্র বুঝে তদনুযায়ী নিজ জীবন বদলালেই না মন্ত্র কাজে আসে। অন্যথায় পোকা কাগজসমেত তা খেয়ে শেষ করে দেয়। পোকার তা থেকে কোন লাভই হয় না। বিচারের কথায়ও তা-ই।"

২

সর্ব্বোদয় একটি মন্ত্র। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে মূর্ত্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রের রচয়িতা গান্ধী। শব্দটির

স্রষ্টা গান্ধী হইলেও আর তাঁহার সকল কাজ সকলের 'উদয়ে'র জন্য হইলেও, তাঁহার জীবদ্দশায় সর্বোদয় শব্দের প্রচলন হয় নাই। তার কারণ গান্ধীর জীবন সর্বোদয়ের ভিত্তি-রচনায়, সর্বোদয়ের প্রথম সোপান-সংগঠনে ব্যয় হইয়া যায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সর্বোদয়ের প্রথম সোপান বলা হইল এই হেতু যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সর্বোদয়ের দ্বিতীয় সোপান অর্থাৎ আর্থিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ঐ পাদের কর্মযোগ-সাধনার শব্দ স্বভাবতঃই সত্যাগ্রহ ছিল। স্বরাজের দ্বিতীয় পাদ, দ্বিতীয় সোপান-রচনার কাজে হাত দিতে পাইলে গান্ধী ঐ কাজকে সম্ভবতঃ সর্বোদয় সাধনা বলিতেন।

গান্ধী গেলেন। কিন্তু মন্ত্র রাখিয়া গেলেন। সেই মন্ত্রের প্রসঙ্গে বিনোবা বলিয়াছেন :

"সর্বোদয় শব্দ যদি এখন না আসত তবে স্বাধীনতালাভের পরে হয় আমরা লক্ষ্যহীন হয়ে যেতাম, নয় তো ভুল পথে চলতাম। সর্বোদয় শব্দ লক্ষ্যের ঠিক সন্ধান আমাদের দিচ্ছে। স্বাধীনতা-লাভের আগে স্বরাজ শব্দ আমাদের কর্মপ্রেরণা যোগাত। কিন্তু এখন এরূপ কোন শব্দ চাই যা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে আমাদের প্রেরণা দান করবে। 'সর্বোদয়' সে শব্দ।

"গান্ধীজীর নির্বাণের পরে 'সর্বোদয় সমাজের' ভাব লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানেই যাই লোকে জিজ্ঞেস করে, 'সর্বোদয় সমাজ কি? তার সংগঠন কিরূপ?' জবাবে আমি বলে থাকি 'সংস্থা এ নয়। এ হচ্ছে এক মহান্ বিপ্লবাত্মক শব্দ। মহান্ শব্দে যে শক্তি নিহিত থাকে কোন সংস্থায় সে শক্তি থাকে না। শব্দ তারকও হয়, মারকও হয়। শব্দ থেকে উত্থানও হয়, শব্দ থেকে পতনও হয়। এরূপ এক মহা শব্দ আমরা গ্রহণ করেছি। এই শব্দ কি বলে? কতিপয়ের 'উদয়' আমাদের লক্ষ্য নয়। অধিক লোকের উদয়ও আমাদের লক্ষ্য নয়। বহুসংখ্যক লোকের উদয়েও আমরা তুষ্ট নহি। আমরা চাই সকলের উদয়। একমাত্র তাতেই আমাদের তুষ্টি। ছোট-বড়, বুদ্ধিমান-অবোধ সকলের উদয় আমরা চাই। আর তবেই আমাদের স্বস্তি। এই বিশাল ভাব এ শব্দে বর্তমান।

"...দেশে আজ অনেক সংস্থা রয়েছে। আর একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে তাদের সংখ্যা আমি বাড়াতে চাই না। জীবনের লক্ষ্য দেখাতে পারবে এমন এক বিচারের ছাঁচে আমি আমার জীবন ঢেলে সাজতে চাই আর সেই বিচার বন্ধু-বান্ধবদের বুঝাতে চাই। ব্যক্তির জীবনে যদি সেই বিচার রূপ পরিগ্রহ করে তবে আগুনের শিখার মত আপনা হতে তা ছড়িয়ে পড়বে।

"...এমনিতে ত কারও সঙ্গে সর্বোদয়ের বিরোধ নাই। কিন্তু যারা সকলের উদয় চায় না, অল্প কিছু লোকের, বিশেষ কিছু লোকের উদয় চায়, অথবা বলে যে এ জাতির লোক বা এ সব লোক শ্রেষ্ঠ আর তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা রাখতে হবে, এরূপ লোকের সহিত সর্বোদয়ের বিরোধ ত রয়েছেই। আর সে বিরোধ কোন প্রকারেই মিটবার নয়। হয় এ থাকবে, নয় ও থাকবে—এমনই এই দুয়ের বিরোধ।...আলো যদি অন্ধকারের বিরুদ্ধতা না করে তবে আলো নিজেই শেষ হয়ে যাবে। অতএব এই পরিমাণ বিরোধ থাকবেই। কিন্তু তা ছাড়া সব রকম বিচার-প্রবাহের ঠাঁই সর্বোদয়ে হতে পারে। আর তা সপ্রমাণ করার দায় আমাদের—আমরা যারা এখানে উপস্থিত।

"...সর্বোদয় সমাজ তত্ত্ববিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক মণ্ডলী। একে সংগঠনের রূপ দেবার কোন সঙ্কল্প নেই। তার মানে এই নয় যে, আমাদের কাজ পারস্পরিক সম্পর্করহিত হবে, বিচ্ছিন্ন থাকবে। আমাদের অভীপ্সিত কর্ম করার জন্য কোন সংস্থা আমাদের নেই তা নয়। আমাদের যে সকল সংস্থা রয়েছে আর যে সকল সংস্থা স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করছে তৎসমুদয়কে আমরা সংগঠিত রূপ দিচ্ছি। তা থেকে সর্ব্ব-সেবা-সঙ্ঘের উদ্ভব হচ্ছে। সর্ব্ব-সেবা-সঙ্ঘ হবে আমাদের কাজের বাহন। আর এই যে সর্বোদয় সমাজ তা সহবিচারের, সহচিন্তনের, তত্ত্ব-সংকীর্ত্তনের, নাম-জপের সাধন হোক এটাই আমরা চাই। যন্ত্র তা নয়ই। তা বন্ধনহীন বিচার—যা আমরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই। আর যাকে বিশ্বব্যাপী করতে হবে শরীরী তা হতে পারে না, অশরীরী তাকে হতেই হবে। তাই দেহ তৈরি করছি না। দেহী তৈরি করলে কাজ হবে না তা নয়। হবে। তবে বিশ্বব্যাপী প্রসার তার হবে না। এক দিকে আমরা কাজের উপযোগী পূর্ণ-সুব্যবস্থিত ও সংগঠিত নিখুঁত যন্ত্র তৈরি করছি, অন্য দিকে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-প্রসারের নিমিত্ত এক বিদেহী সত্তা সৃষ্টি করছি।

"...এ হতভাগ্য দুনিয়ায় উদয় কারও নেই। সকলেরই অস্ত। কারও ঘরে উনুন জ্বলে না আর কারও ঘরে রুটি পুড়ে খাক হয়।...সমাজে যারা ধনবান তাদের জীবন কবেই পূর্ণ ভাবে অস্ত হয়ে গেছে আর যারা দরিদ্র তাদের অস্ত ত আছেই।...ধনী-দের বুদ্ধি জড় ধনের সংস্পর্শে জড় ও নিস্তেজ হয়ে যায়। যারা জড় বনে গেছে তাদের আর যারা খেতে পায় না তাদের দুইয়েরই উদয় হতে বাকী।

"রাজ-তন্ত্রের যুগ গিয়েছে; অভিজাত-তন্ত্রের যুগও গিয়েছে। প্রজা-তন্ত্রের দিনও ফুরিয়েছে। সর্ব্ব-রাজের দিন আগত। সর্ব্ব-রাজের অর্থ সকলের ভোটাধিকার মাত্র নয়, আন্তরিক সহযোগ। সবেতে আমি, আর আমাতে সব, এই অনুভূতি-রাজ্যের যুগ আসছে। তা আসবেই। আমরা উল্টো চেষ্টা করলেই আসবে। তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা যদি কাজ করি তো নবযুগ প্রবর্ত্তনের গৌরবের অংশীদার আমরা হব।"

সেই যুগ হইতেছে সর্বোদয়ের যুগ। কিন্তু কম্যুনিজমের সহিত বিনা সঙ্ঘর্ষে বুঝিবা সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে না। বিনোবা বলেন :

"এ পরিক্রমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ়

হয়েছে যে,পৃথিবীর কোন দুই শক্তির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধে ত বাধবে—লোকে যাকে কম্যুনিজম বলে তার আর সর্ব্বোদয়ের বিচারের মধ্যে। অপর যে সব শক্তি আজ জগতে সক্রিয় তার কোনটিই বেশীদিন টিকবে না। এই সেই দুই মতবাদ যাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য, কারণ এ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য যেমন অধিক, বিরোধও তেমনি যথেষ্ট। অন্য কথায় এটাই কালের দাবি।"

সর্ব্বোদয় কালের দাবি। কিন্তু সর্ব্বনাশ আগে কি সর্ব্বোদয় আগে? এই প্রশ্নের মীমাংসায়ই বিনোবা নিরত। সর্ব্বনাশ কোন পথে ঠেকানো যাইবে, আর সর্ব্বোদয় কোন পথে আসিবে সে আলোচনাও যথাস্থানে করা যাইবে।

৩

বিনোবা নির্জ্জনতাপ্রিয়। বিনোবা তপস্বী। একান্তে তাঁহার তপ চলিতেছিল। তপ মানে গীতার কর্ম্ম। তপ মানে গান্ধীর কাজ। বিনোবার কথাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

"আমি 'একান্ত' (নির্জ্জনতা) প্রিয়। গান্ধীজী যা বলতেন তা আমি করতাম। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ত আজও নির্জ্জনে থেকে তাঁর কাজ করতাম। আমি ছিলাম তাঁর 'হনুমান'।"

গুরুর কাজ শিষ্যকে অর্শে। গান্ধীর কাজ বিনোবাতে বর্ত্তিল। বিনোবা বলিতেছেন (শুক্রবার, ৩০. ৩. ৪৮, রাজঘাট, দিল্লী) :

"এখানকার আমার কাজ যে প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হচ্ছে তা ঠিকই হচ্ছে। বাপুর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল প্রার্থনা দিয়ে। সেকথা আপনারা জানেন, সুতরাং উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর আমার কথা সেখানে কাজও দেবে না। তাঁর সঙ্গে প্রথম মিলন ঘটে বত্রিশ বছর আগে। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। যে গঠনকার্য্যের পাঠ বাপু আমাদের দিয়েছিলেন, নীরবে তা করে এসেছি। এখন আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।...

"একরূপ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরে ভারতের আবহাওয়া অত্যন্ত দূষিত হয়েছে। তা পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা অন্তিম নিঃশ্বাস অবধি তিনি করে গেছেন। এ পতিত অবস্থা থেকে মনুষ্যত্বকে তুলে ধরার চেষ্টায় তিনি দেহত্যাগ করেছেন। আর সে কাজ তিনি এখন আমাদের 'পর সঁপে গেছেন ...।"

গান্ধীর মাসিক তিথিতে—(৩০-৯-৪৮)—রাজঘাটে

"...গুরু গুড় দিয়া মীঠা,
কহ কবীর মঁ্যা পূরা পায়া, সব ঘট সাহিব বীঠা।"

এই চরণ আবৃত্তি করিয়া প্রার্থনা-প্রবচনে বিনোবা বলেন :

"ভাল-মন্দ বলে গণ্য দুনিয়ার সব বস্তুতে যে ভগবানকে দেখে সে পুরো পায়।

"আমাদের গুরুও আমাদের এ কথাই বলেছিলেন আর এ সাধনায়ই তাঁকে প্রার্থনা-ভূমিতে নিজ দেহ ত্যাগ করতে হয়। দুনিয়ায় যত লোক আছে তাদের সঙ্গে যেন সমান ব্যবহার করি, কোন ভেদ না রাখি; যে কোন ধর্মের কোন দেশের—কোন জাতের কথা বলে এ প্রশ্ন যেন মনে স্থান না দিই, এ কথাই তিনি আমাদের বলেছেন। এ গুড় আমাদের গুরু নিজে আস্বাদ করেছিলেন, আমাদের আস্বাদ করিয়েছিলেন আর আস্বাদ করতে করতেই এ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আর আমাদের জন্য এ শিক্ষা রেখে গেছেন যে, এ বস্তু যদি তোমরা ধরে থাক ত তোমাদের কল্যাণ হবে। এ সাধনায় যদি প্রাণ দিতে হয় ত দেবে।"

গুরুর অসমাপ্ত কাজ শিষ্য হাতে লইলেন। কাজ ছিল দুই। এক—আশু। আর এক—নিত্য। এক—ভারতের ঐক্যে আঘাতকারী অশান্তির উপশম। দুই—অর্দ্ধ স্বাধীনতাকে (যাকে বিনোবা 'একরূপ স্বাধীনতা' আখ্যা দিয়াছেন) পূর্ণ স্বাধীনতার রূপদান।

বিনোবা অশান্তির অকুস্থল দিল্লীতে আসিলেন। অভেদবুদ্ধি নাই ত ঐক্য নাই; ঐক্য নাই ত শান্তি নাই; শান্তি নাই ত প্রকৃত স্বরাজ অর্থাৎ সাধারণ লোকের স্বরাজ নাই। ভারতবর্ষ উপমহাদেশ বিশেষ। হিংসার পথে চলিলে ভারত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এত বড় দেশের ঐক্যের জন্য চাই একদিকে উদার অভেদ-বুদ্ধি, আর অন্য দিকে চাই অহিংসায় নিষ্ঠা। বিনোবা এই আশু কাজ হাতে লইলেন। যেখানেই অশান্তি সেখানেই শান্তি-সৈনিক বিনোবা—দিল্লীতে, আজমীরে, বখতারপুরে, বুড়িয়ায় (আম্বালা) খণ্ডোয়ায়, ইন্দোরে, এলাহাবাদে, জয়পুরে, উদয়পুরে, বিকানীরে, হায়দরাবাদে। একটানা ছয় মাস (৩০-৩-৪৮ হইতে ১৫-১০-৪৮) তাঁহার এই শান্তি-যাত্রা চলিত। এখানে-সেখানে যাইতেন, আবার রাজঘাটে ফিরিয়া আসিতেন। অন্য কারণেও দেশের অন্য ভাগে, স্থানান্তরেও তাঁহাকে যাইতে হইতেছিল। ঐ সময়ে মেওদের পুনর্বাসনের কাজও তিনি হাতে লইয়াছিলেন। সেই সময়কার সুন্দর বর্ণনা ও তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মের পূর্ব্বাভাস নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে পাওয়া যাইবে :

"...ভোর হয়েছে আর সূর্য্য ওঠে নাই, মধ্যেকার এ সময়টা হচ্ছে ঊষা—না রাত, না দিন। তদ্রূপ পরাধীনতার যুগ ত গেছে, কিন্তু স্বাধীনতার যুগ এখনও আসে নাই; এরূপ সময়ে আমরা রয়েছি। লোকে ভাবে স্বাধীনতা এসে গেছে। সে ধারণা ভুল। স্বাধীনতা আসতে এখনও বাকী। আমরা এখন সন্ধি-কালে রয়েছি। এ সন্ধিকাল হচ্ছে অধ্যয়ন করার সময়। আমাদের দেশের সৃষ্টি কিরূপ হবে সেকথা ভেবে দেখার সময়। চিন্তা করার এ সময়টাতে তাড়াহুড়ো করতে নাই। ধ্যানযোগের এ অবসর। এখনকার সর্ব্বপ্রথম কাজ ভারতের পূর্ণ একতাবিধান। একতা স্থাপিত হয়েছে তো নানাবিধ কার্য্যক্রম সবেগে চলবে। সে বিষয়ে এখন উতলা হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু আজ নিজ নিজ কার্য্যক্রম ও ভাবনা নিয়ে সকলে ব্যস্ত-সমস্ত। কেউ সাম্যবাদের কথা বলে তো কেউ গায় সনাতন ধর্মের গীত। আমি বলি, একটু সবুর কর আর ভাব..."

বিনোবা শান্তিসংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, অধ্যয়ন

করিতেছিলেন, চিন্তা করিতেছিলেন। অহিংসার পথে ভারত রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। অহিংসার পথে কি ভাবে ভারতের আর্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা যায় সে পথ বিনোবা খুঁজিতেছিলেন। উপরে দেখিয়াছি যে লব্ধ স্বাধীনতাকে বিনোবা 'এক প্রকারের স্বাধীনতা' বলিয়াছেন। কেন বলিয়াছেন ?

তার কারণ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্দ্ধ স্বাধীনতা মাত্র। পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার তা ধাপ বা সুযোগমাত্র। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাকে জীবদেহের হৃৎপিণ্ডের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের কাজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাদের সবল,সুস্থ, কার্যক্ষম রাখা। আর যখন কোন অঙ্গ ক্লিষ্ট হয় তখন অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নেহাত যতটুকু রক্ত সঞ্চালন না করিলে চলে না ততটুকু মাত্র করিয়া বাকী বেশীর ভাগ রক্ত ক্লিষ্ট অঙ্গে সঞ্চালনপূর্ব্বক তাহাকে তাড়াতাড়ি সবল-সুস্থ করিয়া তুলিতে হৃৎপিণ্ড সক্রিয় হইয়া ওঠে—ইহা প্রকৃতির বিধান। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-রূপ হৃৎপিণ্ড দ্বারা সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এই যে রক্ত-সঞ্চালনক্রিয়া তাহাকে আর্থিক স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে।

যে অর্থনীতি সমাজদেহের ক্লিষ্ট অঙ্গের কথা আগে ভাবে আর ক্লিষ্ট অঙ্গে অধিক রক্ত সঞ্চালন করে সে অর্থনীতির কথা গান্ধীর মনে ছিল। আর সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যই তিনি চিরজীবন কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিনোবার স্বাধীনতার চিন্তা-ধারাও গান্ধীর চিন্তাধারারই অনুরূপ। যাহাকে তিনি স্বাধীনতার সন্ধিকাল বলিয়াছেন, অধ্যয়নের সময় ও ধ্যানযোগের অবসর বলিয়াছেন—সে সন্ধিকাল সম্পর্কে কোন বক্তৃতায় গঠনকর্ম্মীদের লক্ষ্য করিয়া বিনোবা বলিতেছেন :

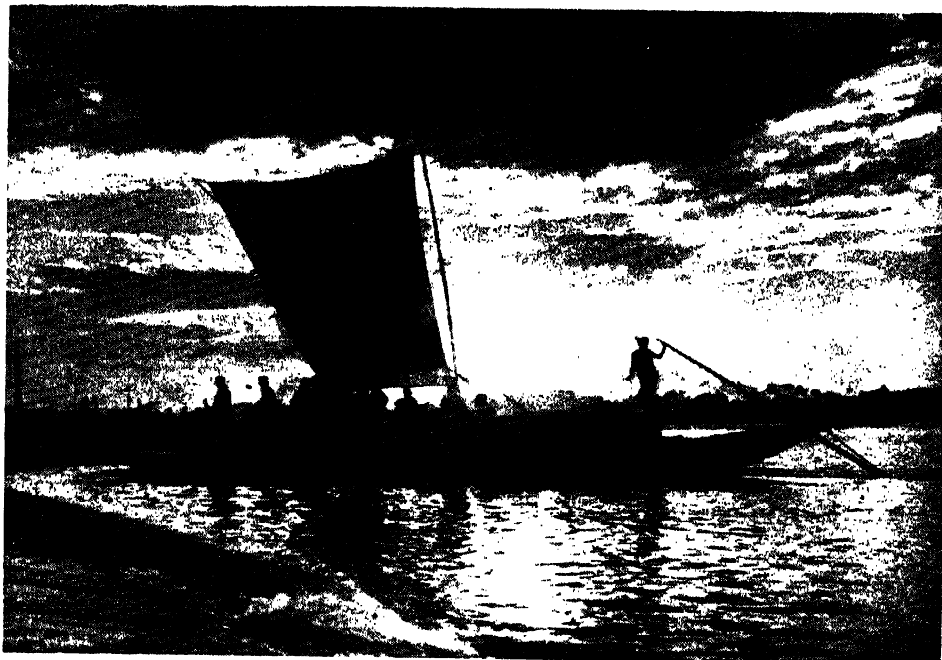
"শরীরের কোন অবয়ব ক্লিষ্ট হলে আমাদের সকল লক্ষ্য তাতে গিয়ে নিবদ্ধ হয়। উত্তম সমাজের হওয়া চাই শরীরের ন্যায়। সমাজের দুঃখী অংশের দিকে সারা সমাজের নজর যাওয়া চাই।"

এই তো হইতেছে গান্ধী, তথা বিনোবার কাম্য সমাজের রূপ। সে অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে আজিকার অবস্থার সহিত পরিচয় থাকা চাই। প্রজা নামে রাজা, কাজে ভৃত্য। আর শাসক নামে ভৃত্য, কাজে রাজা। প্রজা-স্বাধীনতার নামে দুনিয়া-জোড়া এই কারচুপি চলিতেছে। ভৃত্যের সেবার আতিশয্যে বেচারা প্রজা আজ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া বলিতেছে, 'কাজ নেই সেবায়, রক্ষে করো।' সেবার এই নাটকীয়তা সর্ব্বত্র চলিতেছে।

ইহার কারণ প্রজার প্রভুত্বের আধার শূন্য। মাহুতের হাতে অঙ্কুশ নাই। 'প্রভু' প্রজার হাতে এমন কোন অস্ত্র নাই যাহা দ্বারা সে ভৃত্যকে তাঁবে রাখিতে পারে, বেয়াদবি করিলে, প্রজার অধিকার হরণ করিতে বা ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে চাহিলে তাহাকে শায়েস্তা করিতে পারে ? 'রাজার' হাতে রাজদণ্ড নাই তাই অমিত শক্তিশালী হইলেও প্রজা নাকে-দড়ি দেওয়া ভালুকের মত বলহীন। অতএব প্রজার হাতে রাজদণ্ড আসা চাই, অর্থাৎ প্রজাতে এমন শক্তির উন্মেষ হওয়া চাই, এমন দণ্ড তার হাতে আসা চাই যাহা দ্বারা ক্ষমতাধারীকে সে তাঁবে রাখিতে পারিবে, ক্ষমতাধারী ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে চাহিলে তাহা নিবারণ করিতে পারিবে—সে প্রজার অধিকার হরণ করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে শায়েস্তা করিতে পারিবে, ভুল বা কুটিল পথে চলিলে সোজা পথে আনিতে পারিবে। আর সে দণ্ড বা অস্ত্র এমন হওয়া চাই যে, রাজশক্তির সাধ্য নাই প্রজার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লয়—রাজশক্তি আজ যেরূপ যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা প্রজার হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতেছে। বিভিন্ন সমাজ-শাস্ত্র এ যাবৎ নানা মোহন চিত্র প্রজার কাছে ধরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এরূপ দণ্ড, এরূপ অস্ত্র তার হাতে দেওয়ার আগ্রহ কোন সমাজ-বিজ্ঞান কোন দিন দেখায় নাই, সে প্রয়োজনও বোধ করে নাই। গান্ধীর সকল কাজের লক্ষ্য ছিল প্রজাকে এই শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তোলা। সত্যাগ্রহ সেই শক্তি, রাজদণ্ড বা অস্ত্র। আত্মিক শক্তি তথা অহিংস সংঘশক্তি কাড়িয়া লওয়া যায় না। আর এই অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রয়োগ করার জন্য দালালও ধরিতে হয় না। প্রজাতে এই শক্তির বিকাশ হইলেই কেবল প্রজার অভিষেক হইবে।

এই অভিষেক-আয়োজনে আর একটি উপচার চাই। আর তাহা অহিংস সংঘশক্তির তথা সত্যাগ্রহের বনিয়াদস্বরূপ। অন্ন-বস্ত্রাদি জীবনের অত্যাবশ্যক বস্তুর উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণব্যাপারে স্বাবলম্বী, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইলে কস্মিন্ কালেও প্রজা এই শক্তির অধিকারী হইবে না। অতএব প্রতিটি পল্লীকে অন্নবস্ত্রাদিতে স্বয়ংপূর্ণ এক একটি খুদে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পল্লী-প্রজাতন্ত্র হইতে হইবে—অন্নবস্ত্রাদিতে স্বাবলম্বী কিন্তু অপর সকল বিষয়ে একে অন্যের অন্তরঙ্গ সহযোগী। রাজশক্তির হাতে জীবনের সবকিছু অবলম্বন সঁপিয়া দিলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় কি ? যায় না। রাষ্ট্র অন্ন বন্ধ করিবে, বস্ত্র বন্ধ করিবে, জল বন্ধ করিবে, আলো বন্ধ করিবে। তখন ? অতএব প্রজার অভিষেক চাই তো রাজ-শক্তির হাতে বা অপর কাহারও হাতে জীবনধারণের প্রধান প্রধান উপকরণের উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া চলে না। তার মানে গান্ধী চাহিয়াছিলেন—শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও রাজশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ। এই দুই ব্যতিরেকে গণের বন্ধন-মুক্তি নাই। অথচ সব মত বা 'ইজম'-এর দৃষ্টি শিল্পের কেন্দ্রীকরণের ও রাজশক্তির কেন্দ্রীকরণের উপর নিবদ্ধ। ইহা হইতেছে পুব দিকে পিছন ফিরিয়া পুব দিকেই চলার মত।

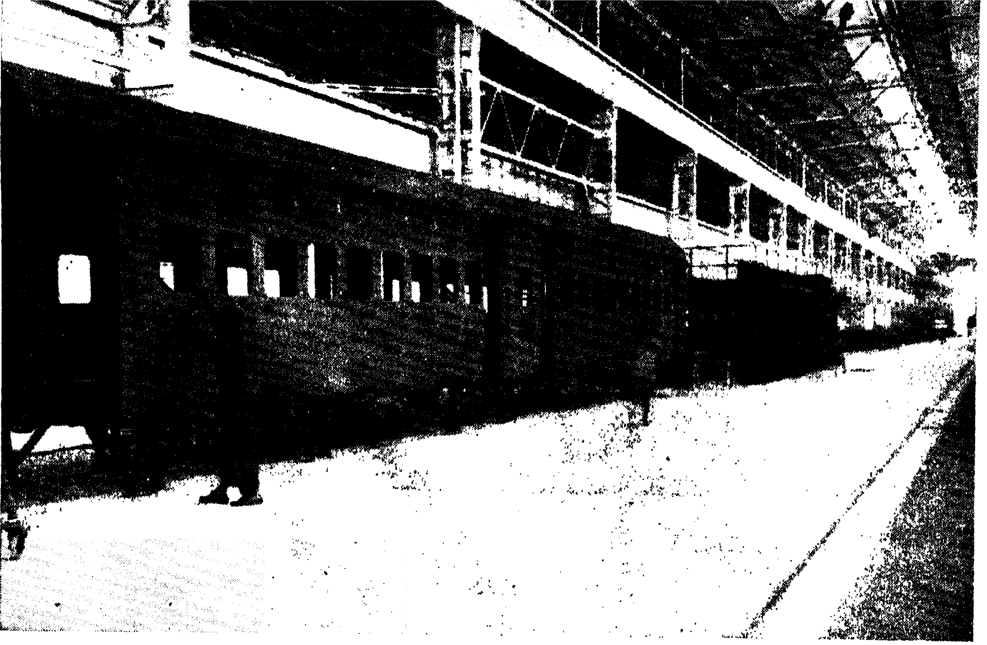
বলা হইবে, হিংসার দ্বারা অধিকার সংরক্ষণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিবারণ করা যায় না, এমন নহে। আর সে নজির ভুরি ভুরি আছে। আছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই নজিরও ভুরি পরিমাণই আছে যে, সরকার-বিরোধী হিংস্র আন্দোলনের সংঘটক দালালকে দালালি দিতেই লব্ধ অধিকার প্রজার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। King Log-এর জায়গায় King Stork আসিয়াছে। শাসকের চিরন্তন আসক্তি ক্ষমতা আহরণের অতএব



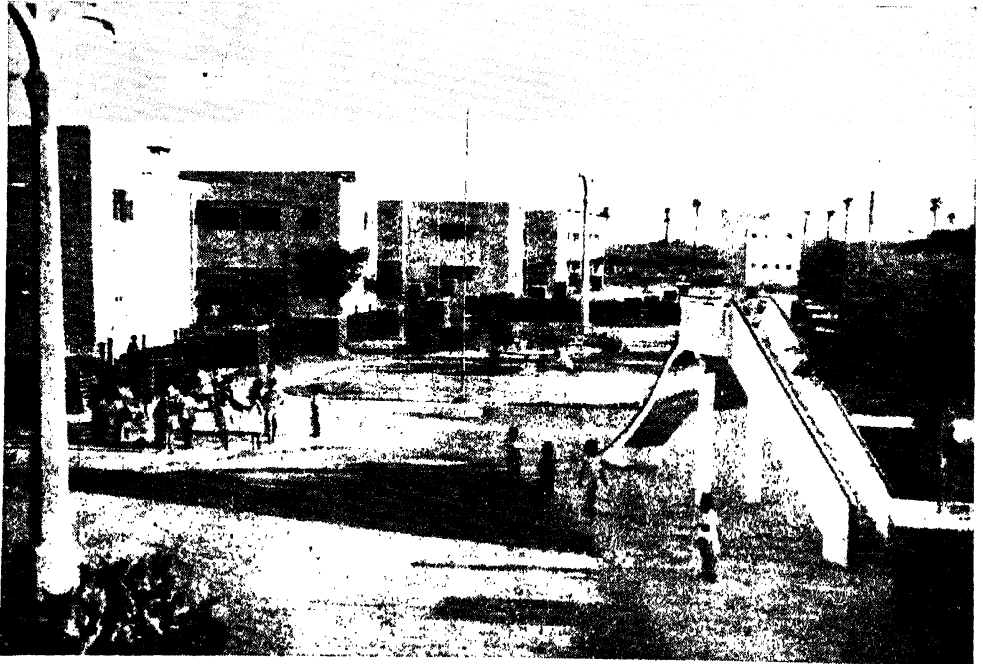
নদীপথে [ফোটো : শ্রীরুণু বসু



জম্মুতে একটি 'মর্টার' পরিদর্শনরত রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ



পীরাম্বুর 'ইন্‌টিগ্রেল কোচ ফ্যাক্টরি'তে নির্ম্মিত একটি যাত্রীবাহী রেলগাড়ী



পীরাম্বুরের 'ইন্‌টিগ্রেল কোচ ফ্যাক্টরি'র কর্ম্মীদের উপনিবেশ-সংলগ্ন শিশু-বাগ

প্রজার অধিকার হরণের দিকে। উহার প্রতিকার-পন্থার সন্ধান জগৎ চিরকাল করিয়া আসিয়াছে। নানা পরীক্ষা চলিয়াছে। আজও তার অন্ত হয় নাই। সমাধান মিলে নাই। গান্ধী সেই সমাধানের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তার অর্থ দুনিয়া যে পথে চলিয়াছে গান্ধীর প্রদর্শিত পথ তার বিপরীত। দুনিয়া চলিয়াছে—কি শিল্পের ক্ষেত্রে, কি রাজশক্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণের দিকে। আর গান্ধী চাহেন পল্লী-শিল্পের পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও শাসন-ক্ষমতার বিভাজন।

এই সমাধানের পথে চলার ও তাকে কার্যে রূপ দেওয়ার দায় ও গৌরব ন্যস্ত হইল গান্ধীর অনুগামীদের উপর। আর গান্ধীর অনুগামীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল বিনোবার প্রতি। ওদিকে বিনোবাও চিন্তা করিতেছিলেন—যে অহিংসার পথে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে সেই অহিংসার পথে কি ভাবে ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন করা যায়। দেশের নানা স্থানে অশান্তি চলিতেছিল। শান্তি-সৈনিক রূপে বিনোবা সে সব জায়গায় অশান্তির উপশমের জন্য ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানেই যান আর যাহাই করেন তাঁহার মন, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা নিরন্তর খুঁজিতেছিল—অহিংসার পথে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান।

৪

একটা জিনিস স্পষ্টই ছিল। তাহা এই: গান্ধী ভারত-বাসীকে সত্য ও অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন আর এই দুইয়ের (সত্যাগ্রহের) মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনয়ন করিলেন। বিনোবার উপর পড়িল লোককে অপরিগ্রহ ও অস্তেয়ের আদর্শে দীক্ষিত করিয়া এই দুইয়ের (সর্বোদয়ের) সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা-সৌধের অপরার্দ্ধ গঠন করা—তাহা ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধন।

এক অর্থে বিনোবার কাজ গান্ধীর কাজ হইতে অধিকতর কঠিন। ভারত ছিল ইংরেজের অধীন। পরাধীনতার লাঞ্ছনা লোকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল। পরাধীনতার জ্বালা লোকের বুকে জ্বলিতেছিল। যাহাদের মনে পরাধীনতার জ্বালা ছিল না বা তেমন তীব্র ছিল না এমন সব লোকও গান্ধীর পরোক্ষ সহায়ক ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের স্বার্থ ছিল—ইংরেজ চলিয়া গেলে ইংরেজের হস্তস্খলিত শাসনসূত্র তাহাদের হাতে আসিবে। আর ব্যবসায়ীশ্রেণী দেখিয়াছিল—ইংরেজ চলিয়া গেলে বণিক ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের হাতে আসিবে। এইরূপ পরাধীন ভারতে ত্রিবিধ মনোভাব গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে কাজ করিতেছিল। তাই গান্ধীর পিছনে প্রায় সমগ্র ভারতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তা ছিল।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে। শাসনক্ষমতা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হস্তগত হইয়াছে। ইংরেজ গিয়াছে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মনস্কাম বহুলাংশে পূর্ণ হইয়াছে। প্রভুত অর্থ মানে প্রভুত প্রভাব। প্রভুত প্রভাব মানে প্রচুর ক্ষমতা। ইংরেজ বণিকের ইঙ্গিতে ইংরেজের রাজদণ্ড পরিচালিত হইত। আজ ভারতীয় বণিক-প্রধানদের পরোক্ষ প্রভাবে ভারতের রাজদণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অতএব শাসনক্ষমতা যাহাদের হাতে আর ব্যবসা-বাণিজ্য যাহাদের হাতে তাহাদের উভয়েরই স্বার্থ বর্তমান অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা।

অন্য দিকে বিনোবা চাহেন বর্তমান অবস্থার বিপর্যয় ঘটাইতে। তাই বিনোবাকে বহু লোকে সুনজরে দেখিতে পারিতেছেন না, দেখিতেছেন আড় চোখে। স্বাধীনতার দ্বিতীয় পাদ গঠনে হাত দিতে পাইলে গান্ধীকেও এই পরোক্ষ বিরোধের সম্মুখীন হইতে হইত।

আজ চলিতেছে পরিগ্রহের যুগ, স্তেনের যুগ। আর বিনোবা দিতেছেন লোককে অপরিগ্রহের দীক্ষা আর অস্তেয়ের শিক্ষা।

বিনোবা দেখিলেন দুনিয়ায় পয়সার প্রভুত্ব চলিতেছে। আর দুনিয়ার ব্যাধির মূলে রহিয়াছে পয়সা ও পয়সার খেলা। পয়সার প্রভুত্বের অবসান না ঘটাইতে পারিলে ধনের উৎপাদক শ্রমিকের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে না, সুতরাং দুনিয়ার ব্যাধিও দূর হইবে না। বর্ষ-ভর চিন্তার পরে ১৯৪৯ সনের ১লা ডিসেম্বর বিনোবা সাম্যযোগী সমাজ-রচনার ভিত্তিপত্তন করিলেন—পরমধাম পওনারে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ১৯৫০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে বাহির হইতে কোন খাদ্য বা পরিধেয় দ্রব্য তাঁহারা সংগ্রহ করিবেন না, ব্যবহার করিবেন না।

হাতে মাত্র এক মাস। বস্ত্রে তাঁহারা স্বাবলম্বী ছিলেনই। কিন্তু শাক-সবজি বিষয়ে কতকটা পরনির্ভরশীল ছিলেন। খেতির কাজে আশ্রমবাসীরা তেমন পটু ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা বিনোবাতে দেখিলেন ঐকান্তিক আগ্রহ আর এক নবীন দীপ্তির স্ফুরণ। আশ্রমবাসীদের তিনি বলিলেন, জগতের সর্বোৎকৃষ্ট সবজি আমাদের উৎপাদন করিতে হইবে; রাজার কপালে যাহা জোটে না কাঞ্চনমুক্ত প্রজার পক্ষে তাহা সুলভ করা চাই। আর আশ্রম-বাসীরা সকলে একাগ্রমনে খেতির কাজে লাগিয়া গেলেন। কোদাল দিয়া বিনোবা খেত কোপাইতে লাগিলেন—কঠোর শ্রম করিতে লাগিলেন। এই হাত-খেতির নাম দিলেন তিনি 'ঋষি-খেতি'। 'ঋষি-খেতি'কে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বিনোবা পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

১। ঋষি-খেতি: চাষের সকল কর্ম হাতে করা।

২। বৈল-খেতি: ধান আদি উৎপাদন।

৩। হুরবাড়ী: কুয়া হইতে কূপ-যন্ত্র দ্বারা জল-সেচন করিয়া গবাদি পশুর খাদ্য ঘাস, আখ ও কলার চাষ।

৪। বাগিচা: ঔষধি ও অন্য গাছ-গাছালির উৎপাদন।

এই সাম্যযোগ পরীক্ষার উদ্দেশ্য দুই: এক—শিক্ষিতদের

শ্রমিক ও শ্রমিকদের শিক্ষিত করিয়া তোলা। দুই—যে সব কৃষকের চাষ-আবাদের উপকরণ নাই, যে সকল কৃষকের জমি কম এই পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের পথ প্রদর্শন করা।

সোয়া একর জমিতে দৈনিক চারি ঘণ্টা হিসাবে ২৮৫ দিন কাজ করা হয়। খরচ বাদে আয় হয় ২৮৫৲। তার মানে ঘণ্টা প্রতি মজুরির হার দাঁড়ায় চারি আনা। পরমধাম পওনার আশ্রমের আশপাশের মজুরির হার ছিল তখন আট ঘণ্টায় ৸৵০ আনা (পুরুষ) ও ।৵০ আনা (স্ত্রীলোক); অথবা স্ত্রীপুরুষের গড়পড়তা মজুরির হার ছিল আট ঘণ্টায় ॥৵০ আনা। অর্থাৎ, ঘণ্টা প্রতি আয় ছিল ৴৫ পয়সা—আশ্রমবাসীদের আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ। তবু তো আশ্রমের জমি নিকৃষ্ট—একেবারে তৃতীয় পর্য্যায়ের।

ঋষি-খেতি দ্বারা বিনোবা ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা দুইটি বিষয় সপ্রমাণ করিলেন। এক: সেচের সুব্যবস্থা হইলে টুকরা জমিতেও চাষ করিয়া পোষায় (পোষায় না একথাই এতদিন বলা হইয়াছে), আর দুই: জমির মালিক ও জমির চাষী যদি একই ব্যক্তি হয় তবে আয় তিন গুণ হয়।

এক নব দৃষ্টি লাভ হইল। এক নতুন পথ পাওয়া গেল। সর্ব্বজনীন সংস্থাসমূহকে পয়সার জন্য নতি স্বীকার করিতে হয়, আর নিজ নিজ অভীষ্টচ্যুত হইতে হয়। ঋষি-খেতি দ্বারা তাহা হইতে বাঁচা যায়। বিনোবা অপর সংস্থাসমূহকে এই পথ অবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। গান্ধীর সেবাগ্রাম আশ্রমের কর্ম্মীদের কাছে তাঁহার এই বিচার উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন:

"এখন সকলকে শ্রমিক হতে হবে। শ্রমিক ও আশ্রমবাসী এ ভেদ অন্ততঃ আশ্রমে থাকা উচিত নয়। স্বাতন্ত্র্যোত্তরকালে সেবাগ্রাম আশ্রমের মত সংস্থার পয়সার দান গ্রহণ করা ঠিক হবে না। 'গান্ধী-স্মারক-নিধি'র পরে যেন অর্থসংগ্রহের কণ্ড আর না হয়।"

বিনোবা আরও বলেন:

"গান্ধীজী যদি আজ বেঁচে থাকতেন আর পয়সার এরূপ দান গ্রহণ করে আশ্রম চালাতেন তা হলে তিনি নিজ কার্য্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলতেন। কিন্তু সদা বিকাশশীল গান্ধী স্বাতন্ত্র্যোত্তরকালে এরূপ দান গ্রহণ করতেন না বলেই আমার বিশ্বাস।"

বিনোবার কাঞ্চনমুক্তির সাধনার পরিচয় কাকা কালেলকরের কথায় এইরূপ:

"বর্ত্তমান দুনিয়া পয়সার প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে আর তা হয়েছে তার কাল, এটা বিনোবা দেখতে পেলেন। তাই বিত্তের নিদর্শন অর্থকে প্রভুর আসন থেকে চ্যুত করার আবশ্যকতা অনুভব করলেন। গভীর চিন্তার পরে, উপবাসান্তে* বিনোবা সঙ্কল্প করলেন অর্থের দান গ্রহণ করবেন না। আর অর্থোপার্জ্জনের কথা ত তাঁর বেলায় ওঠেই না।

"শ্রম ও ধন জগতের দুই শক্তি। শ্রম করতে না হয় একজন্য লোকে সঞ্চয় করে। অর্থকে যত দিন শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হবে তত দিন শ্রম প্রতিষ্ঠালাভ করবে না—যতই হোক না কেন তার উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি। বিনোবা অর্থের প্রভুত্ব অস্বীকার করছেন, শ্রমের মর্য্যাদা বাড়িয়েছেন। আর নিজ জীবনে এ পরিবর্ত্তন সাধন করে তিনি অপরিগ্রহের অর্থাৎ সঞ্চয়-বৃত্তি খর্ব্ব করার কথা বলার অধিকারী হয়েছেন।"

* উপবাস=ভগবানের পাশে উপবেশন।

বিদায়ের দিন হবে কি মোদের শুভ মিলনের দিন!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অকাল সন্ধ্যা প্রতারণা করে যৌবন-উৎসবে,
অসতী রজনী অভিসারে নেমে আসে:
সন্ধ্যার ফুল ধূপাধার সম কহে কি দীর্ঘশ্বাসে?
জীবনের মহা গায়কের বাঁশী কে জানে বাজিবে কবে!
অস্থির প্রাণে শিথিল প্রণয় তন্দ্রায় যাবে মুছে,
প্রভাতী মনের বর্ণলিপিকা তবুও বেড়াই খুঁজে!

জলশাড়ী-পরা যেথায় জেগেছে জীবননদীর চর
উর্ম্মিমুখর বাতাসের দোল খেয়ে,
রূপের প্রভায় তুমি কেন রাণু! দাঁড়ালে আমারে পেয়ে?
সবুজ ধানের মঞ্জরী মেখে পথেরে করেছ ঘর।
চিরযাযাবর ভালোবাসা লয়ে কেন ক্ষণিকের খেলা?
কালের যন্ত্রে বাজে নানা সুর: পড়ে গেছে কেন বেলা!

আধফোটা যুঁথি ঝরে ঝরে কাঁদে পাতাঝরা আঙিনায়,
দিতে চাওয়া আর পেতে চাওয়া ক্ষণে মোর:
তৃণের বুকেতে ধরার মেয়ের ঝরিছে অশ্রুলোর।
রাত্রির মাঝে প্রভাতের মত কেহ কি প্রতীক্ষায়
অন্ধকারের জপমালা লয়ে রয়েছে মোদের পানে?
মনে হয় মোর দূর দিগন্তে মেঘেরা চিকুর হানে।

কুসুম-অলির নৈশ বিহারে আলেয়া শুধুই জাগে,
কথা দুলে ওঠে মোর কামনার মাঝে।
জীবন-মৃত্যু মাঝখানে কার অসীম করুণা বাজে?
কত তরঙ্গ-যাত্রী নিয়ত মহাসিন্ধুরে ডাকে!
তুমি আর আমি এক হয়ে যাবো শোধ করে সব ঋণ,
বিদায়ের দিন হবে কি মোদের শুভ মিলনের দিন?

বিজয়িনী

শ্রীহিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

নূতন বাড়ীতে আসার স্বল্পকাল পরেই ফাতিমাবিবির নাম শুনি। আমাদের পক্ষে সেটা আশ্চর্য্য কথা নয়, কারণ তিনি শুধু আমাদের গৃহস্বামীর পুত্রবধূই নন, সৌখীন পাড়ায় প্রশস্ত 'লন্' ও বাগান-সমেত এই প্রকাণ্ড বাড়ীটির তিনিই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী। আমরা সামান্য এক অংশ নিয়ে থাকি, তাঁদের প্রজাবিশেষ, অতএব তাঁদের জানব না—এটা হতেই পারে না! কিন্তু কেবল আমরা নই, এ বাড়ীর আশেপাশে এমন কেউই নেই যিনি ফাতিমা-বিবির নাম শোনেন নি। এমনকি এই ছোট শহরের দূর প্রান্তেও কোথাও কোথাও তাঁর নামের সৌরভ ভেসে আসতে দেখেছি।

অথচ তিনি এখানে থাকেন না। তাঁর স্বামী সরকারের উচ্চ-পদস্থ তরুণ কর্ম্মচারী, তাই বাইরে বাইরেই থাকেন। ছেলে-বৌ দু' এক বছর অন্তর অন্তর বুড়ো বাপ-মার কাছে বেড়িয়ে যান কয়েক-দিনের জন্যে, জানিয়ে যান অনেককেই যে তাঁরা এসেছিলেন। থাকেন না বেশীদিন। কারণ এ বাড়ীতেই আর এক অংশে মুখ বুজে থাকেন এঁদের এক আত্মীয়া। তিনি বলেন, "দুই 'শের' কি এক জায়গায় থাকতে পারে?" আমাদের গৃহস্বামিনীকে 'শের' আখ্যা দেওয়াটা যে কতদূর সঙ্গত তা আমরা জানি, আর বেচারা তিনিও জানেন যিনি এ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে তুলনীয় যিনি, তিনি আর যাই হোন্ অবহেলার পাত্র নন্। এর কাছে ফাতিমাবিবি এক অসীম রহস্য ও রসের বস্তু। আমার স্ত্রীর কাছে যখনই আসেন, গল্পে গল্পে ফাতিমা বহিনের কথা উঠেই পড়ে। সে আলাপে করুণরস ছাড়া নবরসের বাকী আর সব ক'টি রসই ফাতিমাবিবির ব্যক্তিত্বের চারপাশে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। ভয়ে ভয়ে কথা বলেন, খুব বেশী ভাঙেনও না, পাছে উনি ধরা পড়ে যান এবং গৃহস্বামিনী বেগমের কাছে গঞ্জনা শোনেন। তাই আভাসে ইঙ্গিতে এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করে চলে যান। সেই পরিবেশের পটভূমিকায় ফাতিমাবিবির কাহিনী অনেকটা রূপকথার রূপ নেয় মাত্র; কিন্তু রহস্যের কুহেলিকা ঠিক ভেদ করে উঠতে পারি নি। তবে এটুকু বুঝা গিয়েছিল শ্রীমতী যুবতী এবং রূপসী। তাঁর পিতা মুসলমান কিন্তু মাতা পূর্ব্ব ইউরোপ-নন্দিনী। একমাত্র সন্তান; অনেক টাকাকড়ি পেয়েছেন। রূপে, সাজসজ্জায় এবং দেমাকের চটকে ঝলসে যেতে হয়। মহিমান্বিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী থেকে দাসদাসী পরিজন সকলে সর্ব্বদা তটস্থ। তবু এই বলার মধ্যে না-বলা অংশ যতটুকু থেকে যায় তারও তাৎপর্য্য কম নয়। হঠাৎ স্থানীয় এক বাড়ীতে একটি পার্টিতে একদিন শ্রীমতীর কথা উঠে পড়ল। একজন রহস্যের সুরে বললেন, তাঁর স্বামী যখন মীরাটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন [illegible] আসরে শ্রীমতী এমন সাজে আসতেন যে প্রবীণেরা নাকি তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতে ভরসা পেতেন না। বুঝলাম শ্রীমতী একাধারে বাঘিনী ও মোহিনী দুই-ই। সেটা বড় কম কথা নয়।

ফাতিমাবিবি আমাদের কাছে হয় তো এই কল্পনার রূপ-কথার রাজ্যেই থেকে যেতেন, কিন্তু ভাগ্য ছিল অন্যরকম। শোনা গেল শ্রীমতীর স্বামী দীর্ঘকালের জন্যে সাগরপারে যাচ্ছেন কর্ম্মসূত্রে। ইতিমধ্যে আমাদের গৃহস্বামীও সপরিবারে কয়েক মাস পাকিস্থানে বেড়িয়ে আসবার সঙ্কল্প করেছেন। এক 'শের' কিছুকালের জন্যে স্থানান্তরিত হওয়ায় অন্য 'শের' স্বচ্ছন্দে এসে থাকতে পারেন। তাই পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে এই মনোরম বাড়ীটিতে নিশ্চিন্তে কিছুকাল বসবাস করবেন স্থির করেছেন।

কথাটা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর দাস-দাসী লোক-জনের মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। সেটা যে ঠিক উল্লাস নয় তা সহজেই বুঝা গেল। এরা বহুকাল ধরে এ বাড়ীর মালিকের সেবা করে আসছে, বাড়ীর লোকজনের মতই থাকে। হঠাৎ শ্রীমতীর মত স্বনামধন্যা নূতন মালিকের পাল্লায় দীর্ঘদিন কাটাবার সম্ভাবনায় একটু ব্যাকুল হয়ে পড়ল। নানা সম্ভাবনায় প্রতীক্ষায় আমাদেরও মনটা উদগ্রীব হয়ে রইল। গোপন করব না, তলে তলে বেশ একটা কৌতূহলও জেগে রইল—এই রূপ-কথার পরীটিকে চর্ম্মচক্ষে দেখবার।

বেশীদিন অপেক্ষা করতে হ'ল না। গৃহস্বামী সপরিবারে রওনা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই অগ্রদূত এল একরাশ লাটবহর নিয়ে; পেছনে পেছনে মোটরে এলেন শ্রীমতী ফাতিমা। বিরাট কালো মোটরখানা ফটক পার হয়ে পোর্টিকোর নীচে এসে যখন দাঁড়াল তখন চারপাশে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল, ঘরের ভেতর থেকেই তা বুঝতে পারলাম। নিতান্ত বেহায়াপনা হবে ভেবে নিজেরাও উকিঝুঁকি মারার প্রলোভন সংবরণ করলাম।

প্রথম দিন দুই বোধ হয় গোছগাছ করতে কাটল। তার পরিচয় কিছু কিছু এ পাশেও ভেসে আসছিল। তার পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছি। ফটকের ভেতর ঢুকেই দেখলাম গোধূলির আবছা আলোয় লনের ওপর ধীরপদক্ষেপে পায়চারি করছেন একটি অপরিচিতা মহিলা। ঐ ধূসর দূরত্ব থেকেও যতটা আঁচ পেলাম তাতে বুঝতে দেরি হ'ল না শ্রীমতী ফাতিমা স্বয়ং। একটু বিব্রত ভাবেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকতেই মেজো বলল, "দেখলে। সত্যি সুন্দরী বটে।" বললাম, "দেখি নি, পালিয়ে এসেছি।" ঠাট্টা করে বললেও কথাটা মিথ্যে নয়। মনের

কোণে কোথায় যেন একটু আপসোস বিঁধে ছিল—দেখলেই হ'ত আর একটু ভাল করে।

আমাদের গৃহস্বামী স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যক্তি—অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই প্রচুর, ভাবটাও সেইরকম নাক-উঁচু। তাই আমরা ওঁদের সম্বন্ধে কোনরকম গায়ে-পড়া ভাব দেখাতাম না, নিজেদের মধ্যেই থাকতাম গুটিয়ে। ওঁরা সকৃপণ ভদ্রতায় যতটুকু এগিয়ে আসতেন ঠিক ততটুকুই সাড়া দিতাম। ওঁদের সম্ভ্রান্ত আত্মীয়স্বজনদের অনেকেই আসতেন এবং চলে যেতেন, আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। অতএব বিশেষ করে শ্রীমতী ফাতিমা যে আমাদের ছায়াও মাড়াবেন না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, এবং পাছে অন্যরকম কিছু ভাবেন তাই একটু বেশী করেই যেন পাশ কাটিয়ে চলছিলাম। দু-এক দিন পরেই এক দিন সকালবেলা তাঁর আত্মীয়াটির মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, "ঐ যে ফাতিমাবিবি আছেন না। উনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমাকে বললেন, জিজ্ঞেস করে এস আসতে পারি কি না।"

নিরতিশয় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। বেশী দেরি করলে হয় তো ভাববে—ওঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অথচ তৎক্ষণাৎ ওঁর সঙ্গে দেখা করাও সমস্যা। সেরকম প্রস্তুত নই। বিশেষ করে রেবা রান্নাঘরে। যাই হোক, তাড়াতাড়ি একটু সামলে নিয়ে রেবাকে খবর পাঠিয়ে মেয়েটিকে বললাম, "যা, ডেকে নিয়ে আয়।"

একটু পরেই এসে দাঁড়ালেন বাইরের ঘরের দরজার সামনে। মনে হ'ল এক ঝলক আলো এসে চোখে লাগল। সাতাশ-আটাশ বছরের পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী রমণী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। দীর্ঘায়ত সুঠাম তনু হাল্কা নীল রঙের একটি জর্জেট শাড়ীর নিবিড় বেষ্টনে ঘাটে ঘাটে ফুটে উঠেছে। ভরা শরীরটি যৌবনের রসে টলটল্ করছে। চোখ দুটি ঈষৎ নীলাভ। কোঁকড়ানো কালো চুলের ঘন গুচ্ছ নিখুঁত মুখখানির একটি অপরূপ পটভূমিকা রচনা করেছে। সুষ্ঠু ভঙ্গীতে সুডৌল হাত দুটি জোড় করে অভিবাদন করলেন, মধুর স্মিতহাস্যের সঙ্গে। লাল রং-মাখানো দুটি পুরন্ত ঠোঁটের মাঝখানে সুন্দর দাঁতগুলি ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। এক দৃষ্টিতেই অভিভূত করে দেখার মত চেহারা।

কোনরকমে প্রতিনমস্কার করে সাদরে ঘরের ভেতর আহ্বান করলাম। ভেতরে রেবার কাছে নিয়ে যাব, না বাইরের ঘরেই বসাব তা ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। নিজেই কৌচটার ওপর বসে পড়ে সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

বললেন, "এসেই বাড়ীঘরদোর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নয় তো এর আগেই আপনাদের কাছে আমার আসা উচিত ছিল।"

অগোপন কৃতার্থতার সুরে বললাম, "সে কি কথা! আপনার এত লটবহর, সেগুলো খুলতে আর গোছাতে কি কম সময় লাগে! এ সবের মধ্যেও আমাদের কথা মনে করেছেন সেটা আমাদেরই পরম সৌভাগ্য।"

বললেন, "জিনিষপত্তর এখনও প্রায় কিছুই খোলা হয় নি। বাড়ী পরিষ্কার করাতেই আমার তিন দিন লাগল। যা নোংরা হয়েছিল! গৃহস্থালি সম্বন্ধে আমার আবার একটু বেশী খুঁত-খুঁতুনি আছে। সহজে মন ওঠে না! আর আজকালকার চাকর-বাকর যা হয়েছে! যেমন নোংরা তেমনি কুঁড়ে! তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতেই ত অর্দ্ধেক দম বেরিয়ে যায়।"

ফাতিমাবিবির কণ্ঠস্বর কেমন অদ্ভুত। সুমিষ্ট বলা যায় না; অথচ তাতে কেমন একটা মোহিনী শক্তি আছে। পূর্ণ ঘট থেকে জল ঢালতে গেলে যেমন সজল গম্ভীর আওয়াজ হয়, অনেকটা তেমনি। উচ্চারণে একটা মন্থর জড়িমা আছে, যা নেশার আমেজ লাগিয়ে দেয়।

রেবা এসে বসল জড়সড় হয়ে এক কোণে। স্বল্প মিষ্টি হেসে তাঁর সঙ্গে অভিবাদনের আদান-প্রদান করলেন, কিন্তু সে রকম যেন আমল দিলেন না। কথাটা যেন আমার সঙ্গেই চালাতে লাগলেন।

একটু পরেই উঠে পড়লেন। যাবার সময় বললেন, "একলা আছি চাকর-বাকরদের ভরসায়। আপনারা প্রতিবেশী। একটু খবরাখবর রাখবেন আশা করি।"

যথাযোগ্য বিনয় সহকারে উত্তর দিলাম। উনি চলে গেলে রেবা কেমন একটা বিমূঢ় মুখভঙ্গী করে বলল, "চালচলনে দেমাকী আছেন বটে। কিন্তু যা শোনা গিয়েছিল তা ত নয়। বেশ ভালই ত মনে হ'ল মহিলাটিকে—না গো? আর কি রূপ বাবা! সাধে কি বলে!..."

"দেখা যাক, শেষ পর্য্যন্ত কি রকম দাঁড়ায়।" এই বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিলাম।

অনেক দ্বিধাসঙ্কোচ কাটিয়ে ভদ্রতার খাতিরে রেবাকে একদিন যেতে হ'ল ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল, "বাবা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ওসব রূপসী সোসাইটি লেডিদের সঙ্গে কি আমার মত গেরস্ত বৌদের পোষায়?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, জমলো না, নাকি?"

রেবা বলল, "উনি কি আর সে ভরসায় ছিলেন? নিজের কথাতেই মশগুল। মীরাটের গল্প, সীতাপুরের গল্প। আর লোক-জনদের সম্বন্ধে অশ্রান্ত অভিযোগ। আমি চুপ করে মুখ বুজে গেলাম আর কি!"

বললাম, "বাড়ী খুব ফিটফাট দেখলে?"

রেবা বলল, "বাবা? তা আর বলতে? ঐ বুড়ী বেয়ারা, পাকা গিন্নী, তার জোরেকেই বাড়ী তক্‌তক্ করে। কিন্তু এ এসে একেবারে ভোল ফিরিয়ে দিয়েছে।" বলে হাসতে হাসতে বলল, "খানসামা আর বেয়ারাদের মুখের চেহারা দেখলে কষ্ট হয়; হাসি পায়। সব দুয়ে দুয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।"

তারপর বলল, "তুমি না যাওয়ায় হেসে বললেন, মিঃ—এলেন না, বাড়ীতে পুরুষমানুষ নেই বলে? সে সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমি যে পর্দানশীন মেয়ে নই তা ত দেখছেনই। আমার স্বামী ত কাজে-কর্মে বাইরে বাইরেই থাকেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের খাতিরযত্ন ত আমাকেই করতে হয়। নয় ত ম্যাজিস্ট্রেটের বউয়ের চলা ভার।"

রেবাকে বললাম, "সে দেখা যাবে।" কিন্তু মনে মনে পুলকিত হলাম অমন মধুর সঙ্গলাভের সম্ভাবনা কল্পনা করে।

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলাম ফাতিমাবিবির আবির্ভাবের খবরটা মোটামুটি রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ওঁদের পরিচিত লোকেদের ও বন্ধুবান্ধবদের আসা যাওয়া সুরু হ'ল। প্রায়ই নতুন নতুন গাড়ী ও অপরিচিত নরনারী আসতে যেতে দেখি। একা পুরুষেরাও কেউ কেউ আসেন, স্বামী বা অন্য পুরুষ বাড়ীতে নেই বলে সঙ্কোচের কোন লক্ষণ দেখলাম না। শ্রীমতীও মোটরে খুব ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। বৃহৎ কালো মোটরখানা যখন তখন হুস করে সামনে দিয়ে আসে যায়। যাওয়া আসার পথে কখনও কখনও সামনে পড়ে গিয়েছি। কখনও দূর থেকে অভিবাদনের আদানপ্রদান হয়, কখনও ত্বরিৎ-গতিতে কুশলবার্তায়। সব সময়েই মন-ভোলানো হাসিটি মুখে লেগেই আছে। দিনের আলোতে বা উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোয় লাল ঠোঁটের মধ্যে দাঁতগুলি ঝকঝক করে ওঠে, কিম্বা জলজলে নীলাভ চোখের তারা ঝিলিক মারে। সব সময়েই কেমন একটা আবেশ রেখে যায়। মাঝে মাঝে প্রবল বাসনা হয় গিয়ে একটু খবর নিয়ে আসি। একা যাওয়া চলে না রেবা থাকতে। তাতে দু'জনের কাছেই জিনিষটা বিসদৃশ ঠেকতে পারে। অথচ রেবাকেই বা আমার সঙ্গে যেতে বলি কোন অছিলায়। উনি আর ত শুভ পদার্পণ করেন নি আমাদের বাড়ী। অতএব মনের ইচ্ছা মনেই থেকে গেল।

একদিন সকালে একটু বেলার দিকে বাইরের ঘরে বসে কাজ করছি, এমন সময় বাইরে লঘু পদপাতের আওয়াজ পেলাম এবং শুনলাম, "মিঃ—, আপনাকে এক মিনিট একটু বিরক্ত করতে পারি কি?"

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। মূল্যবান বিলাতী সেন্টের মৃদু সৌরভ চারিদিক আমোদিত করেছে। একটি ক্রীম রঙের ব্লাউজ ও লাল টকটকে একখানা সিল্কের শাড়ী পরেছেন। কাঁধের ওপর থেকে সাদা ধপধপে লেডীজ ব্যাগ ঝোলানো। সেই দীর্ঘ, চোখ-ঝলসানো মূর্ত্তি।

নমস্কার করে সামনে দাঁড়াতেই হেসে বললেন, "বড় দুঃখিত, আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল। একটু মুস্কিলে পড়েছি। টাকা-কড়ির আদা দেওয়ার ব্যবস্থা আমার স্বামীই করে থাকেন, আমি জিনিষ নিয়েই থাকি। কিন্তু আমার স্বামী বাইরে যাওয়ায় এবার আমাকেই চেক লিখতে হচ্ছে। যদিও আমাদের জয়েন্ট একাউন্ট আছে, [illegible] চেক লিখিনি। তাই ব্যাঙ্কে যাবার আগে আপনাকে একবার একটু দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাই ঠিক লেখা হয়েছে কি না।" বলে আমার কাছে এগিয়ে এসে চেক বইটা আমার সামনে খুলে ধরলেন। এই দু'পা এগোনোতেই পূর্ণ দীঘির জল যেন টলমল করে উঠল, এবং সেই মৃদু তরঙ্গোচ্ছ্বাস যেন আমাকে এসে আঘাত করল। তাইতেই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লাম। চুলের ও মুখের বিচিত্র সৌগন্ধ্য নিতান্ত কাছে এসে সেই আবেশকে যেন আরও জমিয়ে তুলল।

খুব সংযত কণ্ঠেই বললাম, "হ্যাঁ, এ ত ঠিকই আছে। আপনিও আবার তেমনি! একটা চেক ভরা আবার আপনার পক্ষে সমস্যা না কি?" কিন্তু কণ্ঠস্বরে যতটুকু অস্বাভাবিকতা ছিল তা আমার কান এড়ায় নি। তাঁর কাছে ধরা পড়েছিলাম কি না জানি না।

নীল চোখ দুটি এবার আমার ওপর নিবদ্ধ করে সহজ কণ্ঠে বললেন, "না, সত্যি বিশ্বাস করুন। এই সব ব্যাপারে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করি। যাই হোক, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।" বলে বাতাসে হিল্লোল তুলে মন্থর গতিতে চলে গেলেন।

ঘরে ফিরে এসে এই ছোট ঘটনাটির তাৎপর্য্য অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম। রেবা আসাতে চমক ভাঙল।···

ফাতিমাবিবির ভবনে আগন্তুকদের মধ্যে বিশেষ করে একটি ছোকরাকে প্রায়ই দেখা যেত। বেশ মার্কামারা কাপ্তেনী চেহারা। বেশভূষার পারিপাট্যও মন্দ নয়। হাবভাবে স্পষ্টই বোঝা যায় ভ্রমর-জাতীয় ব্যক্তি, নব নব পুষ্পের সন্ধানে ভোঁ ভোঁ করে বেড়ান। তিনি অচিরাৎ আমার ও রেবার দু'জনেরই দৃষ্টি ও কৌতূহল আকর্ষণ করেন। এ বাড়ীর মহিলাটির কাছে অনুসন্ধানে জানা গেল, যুবকটি এখানকার একটি জমিদারবংশের নিকর্ম্মা ছেলে, ফাতিমা-বিবির স্বামীর একজন বাল্যবন্ধু, স্বনামখ্যাত কীর্ত্তিমান ব্যক্তি। এর ঘন ঘন আসা যাওয়ার ব্যাপারের উল্লেখে মহিলাটি স্পষ্ট কিছু বললেন না; কিন্তু যে কুটিল স্মিতহাস্য আননে ফোটালেন তাতে অনেক-কিছুই জানিয়ে দিলেন। কিছুকালের মধ্যেই এর আবির্ভাব বেশ নিত্য-নিয়মিত হয়ে উঠল। ফাতিমাবিবির মোটরে দু'জনে বেরিয়ে যেতেন; ড্রাইভার সঙ্গে থাকত না। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল শ্রীমতী মোটর চালানো শিখছেন। শিক্ষার্থিনীও ওস্তাদ, কারুরই উৎসাহ কম বলে মনে হ'ল না। কোনও কোনও দিন গাড়ীখানা স্থগিত থাকত, ঘরের ভেতরেই বোধ হয় খোশগল্প চলত। এক এক দিন বেশ রাত হয়ে যেত। রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ শুনতাম ওঁদের দিকের দরজাটা খোলা হ'ল; বাইরের বড় বারান্দায় পদশব্দ, শ্রীমতী বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় দিলেন, দরজাটি আবার বন্ধ হ'ল; বারান্দার আলো নিবে গেল, আবার চারিদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল।

আশ্চর্য্য হয়ে অনুভব করতে লাগলাম যুবকটির সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় আক্রোশ আমার অন্তরে জেগে উঠেছে, ঈর্ষানল জ্বলছে

হয়ে উঠছে। ওকে আসতে দেখলেই চিত্ত একান্তভাবে বিরূপ হয়ে উঠত এবং রাত্রির বিদায়-সম্ভাষণের পর যখন ও চলে যেত তখন অনেকক্ষণ কোনও কাজে মন লাগত না। আমার মধ্যে অহেতুক এই ভাবের উদয় দেখে এক এক সময় হাসিও পেত, লজ্জিতও হতাম, কিন্তু ভাবের উপশমের কোন লক্ষণ দেখলাম না। একদিন একটু বেশী রাত্রে ম্লান জ্যোৎস্না উঠেছে, চারিদিকে একটা অস্পষ্ট স্বপ্নময় ভাব, জানলা দিয়ে অজানা ফুলের সুবাস ভেসে আসছে। একটি বইয়ের মধ্যে গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কানে আওয়াজ আসতে চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম ফটক থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত দীর্ঘ রাস্তাটায় ওরা দু'জনে পায়চারি করছে। শ্রীমতীর কণ্ঠই বেশী শুনছিলাম; উচ্ছল সুরে কথা বলে চলেছেন। মাঝে মাঝে হাসির আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল। সে রাত্রে অনেকক্ষণ আমার চোখে ঘুম এল না।

একটা কথা ভেবে আমার বিস্ময় লাগত। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই ধরনের চাল-চলন, মেলা-মেশা—ব্যাপারটাকে এরা মেনে নিতেন কি করে? অবশ্য কাণাঘুসোর ত্রুটি হয় নি। তবে ফাতিমাবিবি এমনই প্রকাশ্যভাবে, সহজভাবে সব কিছু করতেন যে লোকে কিছু বলবার যেন পথ পেত না। তা ছাড়া তিনি ফাতিমাবিবি। তাঁর কথাই আলাদা।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পর্ব্বও গড়ে উঠছিল। বাড়ীতে যতগুলি লোকজন কাজ করত—খানসামা, বেয়ারা, ভিস্তি, মালী, ধোপা, দরজি ইত্যাদি—প্রত্যেককে নিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র ইতিহাসের সৃষ্টি হচ্ছিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এদের প্রত্যেকের উপরেই ফাতিমাবিবি বিরূপ হয়ে উঠলেন। প্রত্যহই একটা করে বিপ্লব। বিবিসাহেবার রোষবহ্নির দাহ থেকে কেউই মুক্তি পেলে না। এক অদম্য নির্ম্মমতার সঙ্গে তিনি প্রত্যেকের জীবন বিষময় করে তুললেন। কাকে কোনখানে আঘাত করতে হবে এ বিষয়ে শ্রীমতীর জ্ঞান ও নৈপুণ্য অভ্রান্ত এবং উৎসাহও অপরিসীম বলে প্রতীয়মান হ'ল। চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। অনেকেই অনেকদিন আগেই পলাতক হ'ত। কিন্তু এরা সব পুরাতন ভৃত্য, অনেকে ছেলে-বৌ নিয়ে বাড়ীর চৌহদ্দিতেই থাকত। তা ছাড়া গৃহস্বামীর প্রতি একটা দৃঢ়মূল আনুগত্যবোধও ছিল। তাই কোন রকমে মুখ বুজে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু যখন তখন, যেখানে সেখানে, চাকর-বাকরদের জটলা ও উত্তেজিত আলাপ-আলোচনায় বোঝা যেত নরক গুলজার হয়ে আছে।

একদিন স্বচক্ষেই একটি ঘটনা দেখলাম। শ্রীমতী সঙ্গে করে নিজের যে ড্রাইভারটিকে এনেছিলেন তাকে ত দু'দিনেই বিদায় করেছিলেন। তারপরে আরও একটি এসেছে এবং গিয়েছে। তৃতীয় যে ড্রাইভারটি এ কয়দিন টিকে আছে সেটি বেশ তুখড় জোয়ান ছোকরা। কাজকর্ম্ম ভালই জানে শুনেছিলাম। তাই বোধ হয় একটু দেমাকের ভাবও ছিল। অন্য কেউ ওকে সহসা ঘাটাতে সাহস করত না, বরঞ্চ লোকজনেরা ওকে বেশ তোয়াজই করে চলত। কিন্তু ওর সম্বন্ধে বিবিসাহেবার কোনও ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় নি। হুকুম ফরমায়েসের দাপট বেশ পুরোদস্তুর বজায় ছিল। ধমকধামকেরও কমতি ছিল না। ছোকরা গোঁজ হয়ে সব সহ্য করে যেত এবং মেমসাহেবের হুকুম তামিল করত। ওর রুদ্ধ অসন্তোষ শ্রীমতীকে কিছুমাত্র বিচলিত করত না।

সেদিন বিকেলের দিকে ঘরে বসেছিলাম। বাইরে একটা চাঞ্চল্যের আভাস পাচ্ছিলাম; প্রায়ই পেয়ে থাকি বলে বিশেষ খেয়াল করি নি। হঠাৎ যেন বোমাফাটার মত একটা বিকট আওয়াজ হ'ল, "চুপ রহো, শুয়ার কহী কা!" চমকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম, ফাতিমাবিবি রণচণ্ডীমূর্ত্তিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং রাগে কাঁপছেন আর ড্রাইভার ছোকরা পোর্টিকোর নীচে মোটরের কাছে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধমকটা এমনি আকস্মিক ও এমনি প্রচণ্ড হয়েছিল যে ওই রাশভারী জোয়ান ছোকরাও বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তারপর কি একটা বলবার চেষ্টা করাতে দ্বিগুণ বিক্রমে আবার সেই ধমক। অমন সুশ্রী মহিলার কণ্ঠস্বর যে অমন ভয়ঙ্কর, এমন বিকট হতে পারে, তা ভাবা যায় না। দ্বিতীয় ধমক আমার চোখের সামনে দেওয়ায় দেখলাম উদ্ধত যৌবনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রচণ্ড বেগ কণ্ঠে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, সারা শরীরটা দুলে উঠল, যেন ভরা নদীতে তুফান এসেছে। রাগে, দুঃখে, অপমানে ছোকরাটির কেঁদে ফেলার উপক্রম হ'ল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে অন্যদিকে চলে গেল। শ্রীমতী তীক্ষ্ণ, তীব্র কণ্ঠে "ড্রাইভার! ড্রাইভার!" বলে চীৎকার করলেন, কিন্তু এবারে সে কর্ণপাত না করে ওদিকে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী হন্ হন্ করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুই-তিনজন পুলিস এসে হাজির। জানা গেল শ্রীমতী বাইরে গিয়ে পুলিসের কর্ত্তার কাছে ফোন করে ওদের আনিয়েছেন। বাড়ীর চারপাশে সোরগোল পড়ে গেল; লোকজন এসে জড়ো হ'ল। আমরা ঘর থেকেই দেখতে লাগলাম। শ্রীমতী রুষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে পুলিসদের বোঝাতে লাগলেন যে, ড্রাইভার বেয়াদবি ও অবাধ্যতা করাতে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং পুলিসের সহায়তা নিতে বাধ্য হন। পুলিসরা যেন তৎক্ষণাৎ আসামীকে বাড়ী থেকে বার করে দেয় ও তাকে সাবধান করে দেয়। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, বিরাট মোটরখানা সারাদিন ধরে সে পালিশ ও পরিষ্কার করে; মেমসাহেব বিকেলে এসে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ আবার আগাগোড়া পালিশও পরিষ্কার করবার হুকুম দেন। তার অপরাধ সে বলেছে যে, সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। সাধ্যমত পরিষ্কার সে করেছে তবু মেমসাহেবের পছন্দ যদি না হয়ে থাকে ত আজকে যেন মাপ করেন, কাল সে আবার কাজে হাত দেবে। এইতেই উনি গালিগালাজ সুরু করেন। শ্রীমতী ওসব কথায় কর্ণপাতও করলেন না। পুলিসদের হুকুম করলেন, "ইসকো অব্ হী নিকাল দেও।" অবশ্য

অনুনয়-বিনয় ও বোঝানোর পর ড্রাইভারের ন্যায্য পাওনা থেকে কিছু অংশ জরিমানা কেটে নিয়ে তাকে তখনই পোঁটলা-পুঁটলি সমেত বিদেয় করে দেওয়া হ'ল। প্রয়োজন হলে ফাতিমাবিবি যে কতদূর যেতে পারেন তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে অন্য লোকজনেরা ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। এখানে ওখানে প্রকাশ্যভাবে যে সব জটলা হ'ত তাও বন্ধ হয়ে গেল।

এই ঘটনার পরদিনই শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে এলেন। কালকের বিকেলের সে মানুষই নয়। প্রভাতের সূর্য্যালোকে ঝলমল যেন পূর্ণ হ্রদ একখানি, তার বুকে আলোছায়ার তরঙ্গলীলা; তার চারপাশে প্রগাঢ় প্রশান্তি। একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাল আছেন?" সুমিষ্ট হাসির সঙ্গে বললেন, "লোকজনকে শাসন করতে ব্যস্ত আছি। এই একটা জিনিষ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না—ছোট-লোকের বেয়াদবি। আমার ড্রাইভার ছোঁড়াটার বড় বাড় বেড়েছিল! নিজের সম্বন্ধে ও কি ভাবে কে জানে। কাল ওকে জীবনের মত শিক্ষা দিয়েছি। সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহিলাদের সঙ্গে কি রকম আচরণ করতে হয় আশা করি, সে শিক্ষা কাল ওর হয়েছে।"

নিতান্ত প্রতিবাদ না করলেও—চুপ করে থাকাই হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু সেটুকু সৎসাহসও যেন পেলাম না। নির্লজ্জের মত ওঁর কথায় সায় দেবার সুরে বললাম, "হ্যাঁ, ছোটলোকদের নিয়ে আজকাল বড় সমস্যা। আপনার খুব কড়া শাসন দেখছি।"

আরও একটু কাছে সরে এসে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আমার বন্ধুরা আমাকে বলেন, আজকাল আর সেদিন নেই। এখন লোকজনদের মন রেখে না চললে উপায় নেই। আমি একথা একেবারেই মানি না, বুঝলেন মিঃ—। ছোটলোকদের খোশামোদ প্রাণ থাকতে আমার দ্বারা হবে না। চাকর যতদিন রাখব, পায়ের তলায় থাকবে। নয়তো নিজে কাজ করব, তাতে আপত্তি নেই।"

দেহের সুমিষ্ট সুবাস, মুখের রক্তিম আভা, নীল চোখের চঞ্চল চাহনি, চুলের গুচ্ছের মৃদু হিল্লোল—সব মিলে একটা অদ্ভুত মোহের সৃষ্টি করল। আমার মুগ্ধ চোখে মোহের সে অঞ্জন শ্রীমতীর চোখ নিশ্চয়ই এড়ায় নি।

"আচ্ছা, আসি" বলে নমস্কার জানিয়ে হঠাৎ ঘরের দিকে চলে গেলেন। অপস্রিয়মাণ নিটোল দেহরেখা থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। দৃষ্টি ঘুরিয়ে গেলেও মনটা তখনও পিছনে পিছনে ছুটে গেল।...

সেই কাপ্তেনী ছোকরার আসা-যাওয়া কিছুকাল হ'ল বন্ধ হয়েছে। মধ্যে আর এক মহাপ্রভুর উদয় হয়েছিল। তিনি বিরাট একটি সাদা রঙের মোটর নিয়ে হুস করে আসতেন এবং শ্রীমতী ফাতিমাকে নিয়ে ছুট করে বেরিয়ে যেতেন। তিনিও কিছুদিন হ'ল বিদায় হয়েছেন। [illegible] একটা

বেরুচ্ছেন না। সারাদিন প্রায় বাড়ীর ভেতরেই থাকেন। কখনও কখনও নিজেদের বড় দরজাটা খুলে বারান্দায় পোর্টিকোর সামনে এসে দাঁড়ান, বাইরে লনের উপর ও দূরের দেওয়ালের ধারে বড় দেবদারু গাছগুলোর উপর রৌদ্রের খেলার দিকে চেয়ে থাকেন, তারপর নিঃশব্দে ভেতরে চলে যান। সন্ধ্যায় প্রায়ই লন-এ পায়চারি করেন। কখনও কখনও গুন্ গুন্ স্বরে গানের গুঞ্জনও কানে ভেসে আসে। উনি বাইরে থাকলে বাইরে যাবার প্রবল বাসনা হলেও শোভনতার খাতিরে সাধ্যমত ভিতরে থাকতাম। তবু কখনও কখনও সামনে পড়ে গিয়েছি। শান্তভাবে এগিয়ে এসে সুললিত সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেছেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় এই বিশ্রম্ভালাপ চিত্তে নেশা ধরিয়ে দিত। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলাপের সীমা টানতে হ'ত। রেবা সঙ্গে থাকলে রেশটাকে আরও কিছুদূর টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত। কোন কোন দিন রেবার সঙ্গে বা একলাই বাড়ীর ভেতরের রাস্তায় পায়চারি করছি। রাত্রের দিকে অস্ফুট চন্দ্রালোক উঠেছে। চারিদিকে ঝাপসা তন্দ্রাচ্ছন্ন পরিবেশ। হঠাৎ দেখলাম ওঁদের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। একটি রমণীমূর্ত্তি আবছায়া আলো-অন্ধকারের মধ্যে বারান্দায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ঋজু দেহরেখা অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত অগ্নিশিখার মত স্তব্ধ হয়ে রইল। পিছনে খোলা দরজার অন্তরালে ঘনীভূত অন্ধকার যেন কোন অজ্ঞাত পাতালের রহস্যময়তা নিয়ে আহ্বান করত—সমস্ত চিন্তা, সমস্ত চেতনা তার মধ্যে বিলুপ্ত করে দেবার জন্যে। অজগরের দৃষ্টিতে হরিণ-শিশুর কি সর্বনাশা আকর্ষণ আছে তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতাম ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের অব্যক্ত ইসারায়। অলক্ষ্য গতিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম সেই রসাতলের অভিমুখে।

একটি আকস্মিক ব্যাপার এসে এই মায়াজালকে কতকটা ছিন্ন করে দিলে।

কানাঘুসো শোনা যাচ্ছিল ফাতিমাবিবির শেষ আক্রোশ গিয়ে পড়েছে বাড়ীর মেথরটার ওপর। এ অঞ্চলে অভিজাত মুসলমানদের বাড়ীতে মেথররা অন্যান্য কাজ ছাড়া ঘর ঝাটপাটও দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে বিবিসাহেবার খুঁতখুঁতুনির আর শেষ নেই। মেথর মটরুর বৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা চলেছিল। তবে বেচারা সব চেয়ে দীন ও দরিদ্র বলেই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী সহ্য করে-ছিল। তবু মালিকানীর তৃপ্তি নেই, নিত্যই নানা উপদ্রব চলে এসেছে। আত্মীয়াটি জানিয়ে গেলেন মটরুকে বিবিসাহেবা বিদেয় করবেন বলে উঠে পড়ে লেগেছেন।

সেদিন বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে কিছু রাত হয়েছে। ফটকের ভেতর ঢুকতেই দেখলাম সামনের বারান্দায় আলো-জ্বালা। উজ্জ্বল আলোর নীচে শ্রীমতী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ পরেছেন চাঁপা রঙের সাটিনের [illegible], গায়ে সাদা ধপধপে মলমলের কামিজ, [illegible]-রঙের ওড়নাটা বক্ষে লুটোচ্ছে।

আমাকে ঢুকতে দেখেই এগিয়ে এলেন। হাসিমুখে বললেন, "আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আবার একটু বিরক্ত করব আপনাকে। একটু এদিকে আসুন দয়া করে।" বলে বারান্দার মাঝখানে যেখানে মাথার ওপর আলোর বৃহৎ গোলকটা ঝুলছিল তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও এগিয়ে গেলাম।

আলোর নীচে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী যেন ঝলমল করতে লাগলেন। ছোট কামিজটি অঙ্গে অঙ্গে চেপে বসায় পূর্ণ যৌবনশ্রী যেন উদ্ধত-ভাবে ফুটে উঠেছে। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছিল। তাইতে দোপাট্টার আঁচল আর চূর্ণ অলক তালে তালে উড়ছিল। দেহের বিচিত্র সৌগন্ধ্য বাতাসকে ভরে রেখেছিল। মুহূর্তেই যেন মদির নেশায় আবিষ্ট হয়ে পড়লাম।

অপরূপ মোহন সুরে বললেন, "স্বাধীন ভারতে হিন্দী না জানা এক মহা অপরাধ। কিন্তু বলতে লজ্জা হয়, আমি একবর্ণ হিন্দী জানি না। আমার চাকরানীটা—যাকে সঙ্গে এনেছি, তার শরীরটা খারাপ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলাম। ওকে আবার যেতে বলেছে এবং এই তারিখটা দিয়েছে হিন্দীতে লিখে। দয়া করে একটু পড়ে দেবেন?" বলে প্রায় আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা কার্ড আমার সামনে তুলে ধরলেন। ওঁর সুগন্ধ উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ের ওপর অনুভব করতে লাগলাম।

নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরে অল্প একটু সরে গিয়ে ওঁর দিকে সামনাসামনি ঘুরে দাঁড়ালাম। তবু সান্নিধ্য এত নিকট ছিল যে, গলার চকচকে পেনডেন্টের রেখা অনুসরণ করে আমার মুগ্ধ চোখ দুটি সরে-যাওয়া দোপাট্টার অন্তরালে তুষারশুভ্র পূর্ণ দুটি বক্ষের মধ্যসন্ধিস্থলে ঠেকে ফিরে এল। আমার মাথাটা যেন দুলে উঠল। তবু যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে তারিখটা পড়ে দিলাম।

মনোহরণ হাসির সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে তার পর বললেন, "হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আরও একটা কথা ছিল, যার সঙ্গে আপনিও কিছুটা জড়িত। আমাদের মেথরটাকে বিদেয় করব স্থির করেছি। তার বেআদবি সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। সে আপনার বাড়ীতেও কাজ করে, তাই আপনাকেও কথাটা জানানো দরকার। আশা করি আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি কালই একটি ভাল মেথর যোগাড় করে দেব। আপনি সেজন্যে কোন চিন্তা করবেন না। সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।"

স্থির মস্তিষ্কে কোন কথা চিন্তা করার বা বলার মত অবস্থা তখন আমার ছিল না।

অনেকটা মোহাবিষ্টের মতই বললাম, "সে আপনি যা ভাল বোঝেন তাই হবে। তবে আমার স্ত্রীকে একবার জানানো প্রয়োজন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে কাল আপনাকে জানাব।"

কথাটা শ্রীমতীর যেন খুব মনঃপূত হ'ল না। টকটকে মুখখানির ওপর দিয়ে যেন একটু ছায়ার ঝিলিক খেলে গেল। তবু মিষ্ট কণ্ঠেই বললেন, "তা বেশ।" বলে নমস্কার জানিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।...

ঘরে এসে রেবাকে কথাটা বলাতে সে রেগে অস্থির। আমাকে ভৎর্সনার সুরে বলল, "তুমি কি করে বললে একথা! তোমার কি একটু মনুষ্যত্ব বা মানসম্মান জ্ঞান নেই? ব্যাপারটা কি হয়েছে কিছু জানো না শোন না। মহারাণী হুকুম করলেন আর বিনাবাক্যব্যয়ে অমনি তা মেনে নিলে?"

কথাটা রেবা ঠিকই বলেছে। এর জবাব ছিল না। তবু নরম সুরে বললাম, "মেনে আর কোথায় নিলাম! ওঁকে তো বললামই যে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করব।"

একটু নরম হয়ে রেবা বলল, "না, না! মটরু নিরীহ গোবেচারা, মাটির মানুষ। সে কোন বেআদবি করবে এ আমার বিশ্বাসই হয় না। ওঁর সব তাতেই ওইরকম। ঢং দেখে গা জ্বলে যায়। তুমি বাপু কাল বলে দিও আমরা মটরুকে বিনা দোষে ছাড়ব না।"

বললাম, "দাঁড়াও, আগে সব ব্যাপারটা জানা যাক্‌, তার পর যা হয় স্থির করা যাবে।" নিজের দুর্ব্বলতায় তখন বেশ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে উঠেছি। রেবার কথায় আরও চেতনা হ'ল। স্থির করলাম, নিতান্ত অবিচার কিছু হতে দেওয়া ঠিক হবে না।

পরদিন মটরু এলে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি। ওর মুখটা শুকনোই ছিল, আমার কথায় আরও অন্ধকার হয়ে গেল। মুখ নীচু করে করুণ কণ্ঠে যা বলে গেল তার মর্ম্মার্থ এই যে, ঘরদোর জিনিষপত্তরের ঝাড়পোঁছ নিয়ে ফাতিমাবিবি প্রথম দিন থেকেই ওর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিলেন। যে কাজ এক ঘণ্টায় হয় তা সারতে ওর চার-পাঁচ ঘণ্টাতেও কুলিয়ে উঠত না। ওর সরকারী কাজও আছে, সেখানে গিয়ে ঠিক সময়ে হাজির দিতে হয়। কিন্তু মেমসাহেব সে কথায় কান দেন না, ওকে কিছুতেই ছাড়তে চান না, বলেন ওঁর কাজ আগে শেষ হওয়া চাই, তার পর অন্য কথা। এই নিয়ে খেঁচাখেঁচি ধমক-ধামক গালমন্দ নিত্যই লেগে ছিল। ও ছাপোষা মানুষ, ছেলেপিলের মুখ চেয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে। কাল ওর শরীরটা ভাল ছিল না। দু'দিন থেকে একটু করে জ্বর হচ্ছে। তাই কাজ সারতে অল্প দেরি হচ্ছিল। ফলে গালিগালাজের মাত্রাটাও বেড়ে গিয়েছিল। ও শেষ পর্য্যন্ত সহ্য না করতে পেরে হাত জোড় করে বলেছিল, "গরীব পরবর, প্রাণ দিয়ে আপনার কাজ করি, তবু আপনার মন পাই না। আমার দ্বারা এর বেশী আর হবে না। আপনি না হয় অন্য লোক দেখুন।"

তার পর আমার দিকে ফিরে হাত জোড় করে বলল, "হুজুর, এই কথা বলার মেমসাহেব আমার দিকে তেড়ে এলেন। আমি মদ্দ জোয়ান, আজ বাদে কাল আমার নাতি হবে। উনি এসে বিনা আমার গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন।" বলতে বলতে ওর চোখে জল এসে গেল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "হুজুর, এমন বে-ইজ্জতি আমার এ বয়েস পর্য্যন্ত কখনো হয় নি। আজকালকার

হাতে মার খেতে হবে এ কথা কখনো ভাবি নি। আমি ওঁকে বলেছি অন্য লোক দেখে নিতে।"

মটরুর কাহিনী শুনে রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। ওর গলা শুনে রেবাও এসে দাঁড়িয়ে সব শুনল। সে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, "পোড়া কপাল অমন মেয়েমানুষের। দেমাকে ধরাকে একেবারে সরাজ্ঞান করেন। লোকজনকে মানুষই বলে মনে করেন না উনি, এত অহঙ্কার! তুমি খবরদার মটরুকে ছাড়াবে না। মেমসাহেবকে সোজা এই কথা বলে এস।" বলে গরগর করতে করতে ভেতরে চলে গেল।

উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠাতে শ্রীমতী ফাতিমার কাল্পনিক ইন্দ্রজাল কতকটা আবার যেন ফিরে এল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে মন সরল না। একটা চিঠিতে জানালাম, মটরুকে আমি ওর বেয়াদবির জন্যে খুব ধমকে দিয়েছি, আশা করি শ্রীমতী ওকে ক্ষমা করবেন। তা ছাড়া আজকাল পছন্দমত বিশ্বাসী মেথর পাওয়া কঠিন। তাই এ যাত্রা শ্রীমতী যেন ওর কসুর মাপ করে ওকে কাজে বহাল রাখেন।

চিঠিটা পাঠিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম, শ্রীমতীর সামনে না পড়ে যাই। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে শুনলাম ফাতিমাবিবি ওঁর লোকজনকে ঢালা হুকুম দিয়েছেন মটরু যেন ওঁর বাড়ীর ফটকের ভেতর না ঢোকে। শুনে নিজেকে নানা ভাবে অপদস্থ বোধ করলাম। একে ত ফাতিমাবিবি আমার অনুরোধকে গ্রাহ্যও করলেন না, তার ওপর আমার ওপরেও জবরদস্তি করতে চাইছেন। আমি বাড়ীর যখন ভাড়াটে, তখন বাড়ীর যাতায়াতের পথের ওপর আমারও অধিকার আছে। আমাদের বাড়ীতে কে কাজ করবে না করবে তার চূড়ান্ত বিচার করব আমরা। এ বিষয়ে অন্যের কিছু বলবার কি অধিকার আছে? রেবাও এ সম্বন্ধে আমাকে খুব খানিকটা আরও উত্তেজিত করল এবং বলল এ অপমান মটরুকে নয়, এ অপমান উনি আমাদের করেছেন।

এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাই ভাবতে এবং পরামর্শ করতে বাইরে বেরুতেই ফটকের বাইরে মটরু চোরের মত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বললাম, "সব শুনেছি। আমি তোকে বিপদে ফেলতে চাই না। কিন্তু তুই যদি সাহস করে আমার এখানে কাজ করতে আসিস ত আমি আপত্তি করব না।"

শুকনো গলায় মটরু বলল, "হুজুর, আপনারা আমার মা-বাপ। আপনাদের কাজ কখনও ছাড়তে পারি না। কিন্তু মেমসাহেব আমাকে শাসিয়েছেন আমি যদি বাড়ীর ফটকের ভেতর ঢুকি তা হলে আমায় পুলিসে দেবেন। উনি মোটরে করে থানার দিকে গেলেনও একটু আগে। সেই ড্রাইভারের ঘটনার পর আমাদের বিশ্বাস হয়েছে উনি সব পারেন।"

কথাটা মিথ্যে নয়। যদিও রাগে গা রি রি করছিল, তবুও স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটা প্রকাশ্য ঝগড়ায় নামতে স্বাভাবিক সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। তাই একটু কেশে ওকে বললাম, "আচ্ছা, এক কাজ কর্। তোকে বাড়ীতে ঢুকতে মানা করেছে, তুই না হয় ক'দিন আসিস না, তোর বৌকে পাঠাস আমাদের এখানে কাজ করতে। দেখা যাবে তখন কি করে।"

প্রস্তাবটায় মটরু যেন একটা কিনারা পেল। বলল, "যে আজ্ঞে, হুজুর। তবে দেখবেন, গণ্ডগোল না পাকায়। এই আওরাৎকে কিছুই বিশ্বাস নেই।"

পরদিন মটরুর বৌ ভয়ে ভয়ে আমাদের কাজ করে দিয়ে চলে গেল। ফাতিমাবিবি শুনলাম মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসারের কাছে স্বয়ং গিয়ে একটা মেথরের ব্যবস্থা করে এসেছেন। তা নয় ত হ'তও না, কারণ একজন মেথর ছাড়লে আর কাউকে পাওয়া ভার। এই ভাবে দু'তিন দিন চলল। ওঁর কাজে রোজ একটি করে লোক আসে এবং একদিন কাজ করেই পালায়। উনিও ছাড়বার পাত্রী নন। রোজ মোটর হাঁকিয়ে হেলথ অফিসারকে গিয়ে চড়াও করেন। ওঁর আর্জ্জি অস্বীকার করতে কে পারে? বিশেষতঃ একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের বৌ। সুতরাং হেড জমাদার নিজে রোজ একটি করে লোক নিয়ে এসে কাজে লাগিয়ে দেয়। এতে শ্রীমতীও নাস্তানাবুদ কম হচ্ছিলেন না। কিন্তু তাতে দমবার বা নরম হবার কোন লক্ষণ ওঁর দেখা গেল না।

কিন্তু ওঁর ব্যবস্থা না মেনে আমি যে নিজের মনোমত একটা ব্যবস্থা করে নিলাম এবং ওঁর চোখের সামনেই নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ চালাতে লাগলাম এটা বোধ হয় শ্রীমতীর সহ্য হ'ল না। দু'তিন দিন পরে একদিন সকালে বাইরে ডাক পড়ল। শ্রীমতীর মুখে সেই হাসি, কিন্তু চোখের কোণে এবং গলার সুরে কোথায় যেন একটু অভিমানের রেশ লেগে ছিল। সঙ্গে হেড জমাদারও ছিল। শ্রীমতী বললেন, "সেই মেথরটা যাওয়ায় আপনার বড় অসুবিধে হয়েছে। আমিও খুব নাস্তানাবুদ হচ্ছি। মেথরের বৌটা আপনার বাড়ী কাজ করে যায়। স্ত্রীলোক দিয়ে এ সব কাজ ভাল হয় না। তা ছাড়া ওরা সরকারী চাকর। প্রাইভেট বাড়ীতে লুকিয়ে কাজ করাটা ওদের বিশেষ ভাবে বারণ। জানতে পারলে ভীষণ শাস্তি দেয়। হেড জমাদার বলছিল ওর নামে রিপোর্ট করে দেবে। আমি বারণ করে দিয়েছি। মিছিমিছি ওর চাকরী খেয়ে লাভ কি? যাই হোক, জমাদার একটি লোক ঠিক করেছে। এ সরকারী চাকর নয়। তাই এর কাজ করতে বাধা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছে আমরা একে রাখতে পারি। লোকটাকে আমি দেখেছি, ভালই মনে হ'ল। আপনার যদি আপত্তি না থাকে ত আপনার বাড়ীতেও ও কাজ করতে পারে।"

ওঁর কথার সমস্ত গূঢ় ইঙ্গিত উপলব্ধি করে ভয়ানক রাগ হ'ল। এও বুঝলাম, শ্রীমতী স্বয়ং উপযাচিকা হয়ে এসে আমার মন ভিজোতে চাইছেন। এটা ভালই জানেন যে, সামনাসামনি ওঁকে বিমুখ করার মত পুরুষ কমই আছে। তা ছাড়া, ভেতরে ভেতরে বিষম মনকষাকষি চললেও বাইরে প্রকাশ্য ভাবে এখনো ওঁর সঙ্গে কোন বাকবিতণ্ডায় নামে নি। তাই আমিও যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠে

বললাম, "তা বেশ তো! আপনার এখানে রোজ এক জন করে লোক আসে আর চলে যায় দেখি। দেখুন না, এই লোকটা কি রকম কাজ করে। যদি আপনার পছন্দ হয় আর শেষ পর্য্যন্ত টিকে যায় তা হলে আমরাও ওর কথা ভেবে দেখব।"

ব্যাপারটা যে এইভাবে কৌশলে এড়িয়ে গেলাম এবং নিজের জেদ ঠিকই বজায় রাখলাম একথা শ্রীমতী পরিষ্কার বুঝলেন তাঁর মুখের ভাবে তা স্পষ্ট বুঝলাম। তবু ভদ্রভাবেই বিদায়-সম্ভাষণ করে পালাটা শেষ হ'ল। পরে শুনলাম, মটরুর বৌকে জমাদার শাসিয়েছে, সে যদি কাল থেকে আমার এখানে কাজে আসে তা হলে ওর নামে রিপোর্ট করে দেবে। এ ব্যাপারে শ্রীমতী ফাতিমার অলক্ষ্য নির্দ্দেশ বুঝতে দেরি হ'ল না।

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে অবিচার-সুবিচারের প্রশ্ন তো ছিলই। তা ছাড়াও শেষ পর্য্যন্ত একটা জেদাজেদির লড়াইয়ে গিয়ে দাঁড়াল, আত্মসম্মানের প্রশ্ন এসে গেল। একটি স্বল্পপরিচিতা মহিলা খাম-খেয়ালের বশে একটা অন্যায় জবরদস্তি করবেন আর তাই মেনে নিতে হবে? যেন পণ করেই বসলাম, যা হবার হোক, কিছুতেই হটব না। এ বিষয়ে রেবার পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি থাকাতে মনের কোনরকম দুর্ব্বলতাকে আরও যেন প্রশ্রয় দিতে চাই নি। এর মধ্যে যেন আমার এবং রেবারও সম্মানের দায়িত্ব এসে পড়ল।

মটরুর কাছে খবর পাঠালাম, তার বৌকে যদি না কাজ করতে দেয় তো তার মেয়েকে যেন পাঠায়। সে তো আর সরকারী কাজ করে না, ফলে ওদের কিছু বলবার মুখ থাকবে না। আর মেয়েটাকে ওরা যদি ভয়টয় দেখায় তো আমি তার ব্যবস্থা করব, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

পরদিন মটরুর মেয়েটা যখন কাজ করতে এল আমি নিজে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং যতক্ষণ কাজ করল ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। জমাদারটা দূর থেকে সব লক্ষ্য করল। তবে আমাকে দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই হোক্ বা যে জন্যেই হোক্ এদিকে আর ঘেঁষে নি। ওদেরও তো কিছুটা দয়া-মায়া আছে, একেবারে অন্যায় জুলুম করলে ওদের জাত-বেরাদরীতেই বা বলবে কি? এই ভাবে আরও দু'দিন কাটল।

আমার এই নূতন চালের পর শ্রীমতী তাঁর কর্ত্তব্য কি ভাঁজ-ছিলেন জানি না। হয় তো এর পরেও আমার প্রতিবন্ধক হওয়াটা একেবারেই বেআইনী হবে ভেবে আপাততঃ চুপ করে ছিলেন। তবে আত্মীয়টি খবর দিয়ে গেলেন যে এই ক'দিনের ঘটনায় রাগে আক্রোশে ফাতিমাবিবির আহার-নিদ্রা ঘুচে যাবার উপক্রম হয়েছিল। উনি বলছিলেন যে, ওঁর ইচ্ছার এতখানি বিরুদ্ধাচরণ ইতিপূর্ব্বে নাকি কেউ কখনো করে নি। আর ঘটনাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ায় ওঁর বেইজ্জতি নাকি আরও দুঃসহ হয়েছে। যদিও ন্যায়ের পক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করাতে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম, তবু এই গ্লানিকর ব্যাপারে আমাদের নামটা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠাতে আমিও বড় অস্বস্তিতে কাল কাটাচ্ছিলাম। শ্রীমতী ফাতিমার সঙ্গে যে সূক্ষ্ম মধুর রসালো সম্বন্ধটা গড়ে উঠছিল আমার কল্পনায়, তাতে এইরকম একটা রূঢ় ব্যাঘাত ঘটায় অন্তরের গোপন কোণে একটু একটু অনুতাপও যে হচ্ছিল না তা নয়। তলে তলে চাইছিলাম যে-কোন উপায়ে এই কুৎসিত পর্ব্বটার একটা শোভন পরিসমাপ্তি ঘটুক।

অনেকটা এই রকম মনের অবস্থায় ঘরের বাইরে একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম। সন্ধ্যার ঝাপসা আলো ক্রমশঃ অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল। শ্রীমতী ফাতিমা বাড়ীর একেবারে অন্য দিকে লনের দূরপ্রান্তে ধূসর আলোয় স্তব্ধভাবে পায়চারি করছিলেন। রেবা সাজসজ্জা করে এসে বলল, "বোস-গিন্নীর কাছে অনেক দিন যাই নি। আজ একটু ঘুরে আসি। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। তুমি না হয় চাও ত একটা পাক দিয়ে এস।"

উদাসভাবে বললাম, "দেখি।"

রেবা বেশ খোশমেজাজে পা চালিয়ে বাড়ীর রাস্তা পার হয়ে ফটকের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু পরে শ্রীমতীও বাড়ী ঢুকে গেলেন। তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে।

ক্লান্ত অন্যমনস্ক চিত্তে বসেই রইলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু ঝিল্লীরব শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ ওঁদের বড় দরজাটা খোলার মৃদু আওয়াজ হ'ল। ফাতিমাবিবির চাকরানীটি বারান্দার অন্ধকার ভেদ করে ধীরপদে এগিয়ে এসে নমস্কার করে আমার কাছে দাঁড়াল; তারপর আমার দিকে একটা কাগজের টুকরা বাড়িয়ে দিল। আমি সেটা নিতেই আবার নমস্কার করে বাড়ীতে না ঢুকে বাইরের দিকে চলে গেল।

ঘরে এসে আলো জ্বেলে কাগজের টুকরার ভাঁজ খুলে দেখলাম একটি চিঠি:

প্রিয় বন্ধু,

আপনার সঙ্গে একটি বিশেষ জরুরি কথা আছে। অনুগ্রহ করে একবার আসবেন কি? আশা করি নিরাশ করবেন না।

ইতি আপনাদের ফাতিমা খাতুন।

চিঠিটা পড়েই বুকটা কেঁপে উঠল। বাইরে এসে চেয়ারটায় বসে পড়লাম। হাত-পা তখনও থর্ থর্ করে কাঁপছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের মত মনের আকাশে খেলে গেল। উপযুক্ত অবসর দেখে শ্রীমতী নিক্ষেপ করেছেন তাঁর শেষ ব্রহ্মাস্ত্র, সন্ধান করেছেন তাঁর অমোঘ মোহিনী মায়াজাল। চূড়ান্ত চেষ্টায় দেখে নিতে চান শেষ পর্য্যন্ত তাঁর হার হবে কি জিত হবে। তার জন্যে হয়ত প্রস্তুত হয়েছেন সর্ব্বস্ব পণ করতে।

মূঢ় বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখলাম আধখোলা দরজা দিয়ে আলোর রশ্মি অন্ধকার বারান্দায় এসে পড়েছে বিজয়িনীর অভিনন্দন সঙ্কেত নিয়ে, ইশারা করছে বহু অভীপ্সিত পথের দিকে।

রক্তের মধ্যে ঝন্ ঝন্ করে উঠল অবরুদ্ধ কামনার চরম সিদ্ধির রাগিণী। নিজের অজ্ঞাতেই সজোরে আকড়ে ধরলাম চেয়ারের হাতল দুটোকে। মনের দিগন্ত ঘুলিয়ে উঠল উন্মত্ত আবেগ আর অগণিত চিন্তাকণার তুমুল সংগ্রামে।

রেবার পায়ের শব্দে চেতনা ফিরে পেলাম।

"কি! এখনও এইখানে সেই থেকে—ঠায় বসে আছ? তোমার আজ হ'ল কি!" কোন জবাব দিলাম না। বলল, "চল চল, ভেতরে চল।" বলে আমার জামার আস্তিনে টান দিল।

"চল," বলে অনেকটা যেন টলতে টলতেই উঠে পড়লাম।

পরের দিন শোনা গেল ফাতিমাবিবি অকস্মাৎ মুসৌরী যাত্রা করলেন। সেই আগেকার কাপ্তেন ছোকরাটিও নাকি সঙ্গে ছিল।

লোকেরা যে-যাই বলে থাকুক, আমার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের ইতিহাসের শেষ পর্বটা থেকে গেল সকলেরই অগোচরে।

রেবা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁগো, ফাতিমাবিবি এমন হঠাৎ উধাও হলেন যে? ব্যাপার কি?"

ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিলাম, "বিবিজানের মরজি!"

বলা বাহুল্য, মেথর মটরুর ব্যাপারটা নিয়ে আমার আর নূতন কোনও পীড়ার কারণ হয় নি।

উত্তর হিন্দুস্থানে শিশুর জন্মোৎসব ও গ্রাম্য সঙ্গীত

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

উত্তর হিন্দুস্থানে আজও সঙ্গীতের বহুল প্রচলন আছে এবং নারীরা উৎসবাদি উপলক্ষে বহু প্রকার সঙ্গীত গেয়ে থাকে। ঐ সমস্ত সঙ্গীত থেকে আমরা তাদের সমাজের সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও মনোভাবের পরিচয় পাই। তাদের সামাজিক জীবনে বিবাহ-উৎসব একটি শ্রেষ্ঠ উৎসব, তার পরই স্থান লাভ করে শিশুর জন্মোৎসব। সে সমাজে পুত্রবতী নারীদের মান-মর্যাদা অত্যন্ত বেশী। পুত্র-সন্তানের বদলে কন্যা-সন্তানের জন্ম হলে সবাই অতি ক্ষুণ্ণ হয়। পরিবারে কন্যার মাতার কিরূপ অনাদর হয়, তা নিম্নপ্রদত্ত গান থেকে বুঝা যায়:

আগম্নি পির কম্বরমে, সই আব না রহু তেরে ঘরমে
শাস ননদ বোসিঠুসি মারে, যায়কে রহু জঙ্গলমে,
জঙ্গলমে হো বাগানমে।
ঘরকা সঁইয়া দিলাশা দেওয়ে,
যায়কে রহ বাংলনমে হো, মহলমে হো।
আব বিটিয়া জায়, খাট চড় ব্যঠি, উত্তর গরি,
সবে ঘরসে হো, বাহরসে হো, বালম সেহো।
আব লড়কা জায়, পালঙ্ক চড় ব্যঠে,
হুকুম করে সব ঘরসে হো, বাহরসে হো, বালম সে হো।
শাস ননদ সে খিচড়ী বনআওয়ে
ঘিও পরশাওয়ে বলম সে হো।

—কোমরে ব্যথা শুরু হয়েছে, স্বামী আর তোমার ঘরে থাকব না। শাশুড়ী ননদের কথাবার্তা আর ভাল লাগে না। আমি জঙ্গলেই চলে যাব।—স্বামী সান্ত্বনা দিয়ে বলে জঙ্গলে যেয়ো না, বাড়ীতেই থাক।

খাটে চড়ে বসে ছিলাম, ছেলের জন্ম হবেই ভেবে মেয়ে বসলাম। এখন ঘরে বাইরে, স্বামী ও সবার কাছ থেকেই অনাদর পাচ্ছি।

এখন ছেলের জন্ম হয়েছে, খাটে বসে স্বামীকে, সবাইকে ঘরে বাইরে হুকুম করছি। শাশুড়ী ননদকে দিয়ে খিচুড়ী রান্না করাচ্ছি, আর স্বামীকে পাতে ঘি পরিবেশন করতে বলছি। এখন পুত্রবতী মা, ছেলের গরবে গরবিনী, তাই সবার উপর প্রভুত্ব করছে।

শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ দিনে সব আত্মীয়স্বজন একত্র হয়। বাড়ীতে খাওয়াদাওয়া হয়, নারীরা গান গায়। রাত্রে ষষ্ঠীপুজো হবে ও পিসী শিশুর চোখে প্রথম কাজল পরাবে। শিশুর ঘরের দেয়ালে চালের গুঁড়োতে রং করে ছয়টি দেবীর মূর্ত্তি আঁকবে, দেবীকে ঘি গুড় ও নানাবিধ রান্নার জিনিষ সাজিয়ে নৈবেদ্য দেবে। পিসী শিশুকে কোলে নিয়ে বসবে, কাজললতা থেকে শিশুর এক চোখে কাজল লাগিয়েই ভাইয়ের বৌকে বলবে আমার প্রাপ্য দাও। বধূ ননদকে কোনকিছু জিনিষ উপহার দিলে পিসী তখন দু'চোখেই কাজল পরাবে। তখন নারীরা গান ধরে—

আজ ছটিকি রাত মান্নি, আজ মঙ্গলকী রাত মান্নি।
জৌনে দিন মোরি ধিয়া, তোমারি জনম ভয়ে
হো গয়ি বজর কি রাত মান্নি।
শাস ননদ মেরি মুখো নবোলে
স্বামী চলে পরদেশ মান্নি।

—আজ ষষ্ঠীপুজোর দিন, আজ শুভ রাত। যেদিন কন্যা তোমার জন্ম হ'ল সেদিন আমার কাল রাত এল। শাশুড়ী ননদ আমার সঙ্গে কথা বলল না, স্বামী ও পরদেশে চলে গেল।

আজ ছটিকি রাত মান্নি, আজ মঙ্গলকী রাত মান্নি
আব জৌনে দিন বেটে পুত, তোমরা জনম ভয়ে,

হো গয়ী সোনেকি রাত মাঝি।

শাস ননন্দ মোরী মঙ্গল গাওয়ে, শ্বশুর লোটাওয়ে দানমে।

হাম'রা বলম বেনীয়া ডোলায়ে

এইসা সুখ সবাইকা হোয় মাঈ—

—আজ ষষ্ঠীপূজোর দিন, আজ শুভরাত, ছেলে যেদিন তোমার জন্ম হ'ল, সেদিন আমার সোনার রাত হ'ল। শাশুড়ী-ননদ আমার মঙ্গল কামনা করল, শ্বশুর দানধর্ম করতে লাগল, আর আমার স্বামী আমাকে পাখারবাতাস করতে লাগল। ষষ্ঠী মা, এমন সুখ যেন সব নারীরই হয়।

শিশুর জন্মের দশ দিন পর প্রসূতি নখ কেটে শুচি স্নান করে শুদ্ধ হয়ে কুয়া-পূজো করতে যায়। নাপ্তেনীই প্রসূতির সমস্ত কাজ করে দেয়। নাপ্তেনী একটা কুলোতে দুই রকমের চাল, আটা, ডাল, সাতটি হলুদের গাঁট, সাতটি সুপারি, ঘি, গুড়, কুঙ্কু, এ সব পূজোর উপকরণ সাজিয়ে নেয়। শিশুর মা সেজেগুজে অন্য নারীদের নিয়ে নাপ্তেনীর পেছনে পেছনে কুয়োতে চলে। শিশুর মায়ের মাথায় দুটি ঘটি থাকে, সে ঐ সমস্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করে কুয়ো-পূজা করে এবং কুয়ো থেকে জল তুলে দু'ঘটি জল ভরে নেয় ও নিজের বাড়ীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। নারীরা গানের ভিতর দিয়ে ডাকতে থাকে, 'কে আছ, শিশুর মায়ের মাথা থেকে জলের ঘটি নামাও।' তখন ভিতর থেকে দেবর, নয়ত ননদের বর এসে বলে, "আগে আমাকে পাঁচ টাকা দাও তবে ঘটি নামাব।" যে অবস্থাপন্ন সে পাঁচ টাকাই দেয়, নয়ত অন্যেরা আড়াই টাকা, কি সওয়া টাকা দিলে, দেবর জলের ঘটি নামিয়ে নেয়। শিশুর মা তখন ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পাবে ননদের কাছ থেকে। ননদ ঘরের দোর আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। বধূ তখন বহু খোশামোদ করে ননদকে হাতের আংটি বা কানের ফুল উপহার দেয়। তখন ননদ হাসিমুখে ঘরের দরজা ছেড়ে দেয়। কুয়োপূজোর সময়ের গান—

জল ভর লেও, ভিলোর হিলোর রশি রেশমকী

রেশম রশরী যব নীক্ লাগে

সোনেকা ঘয়লা হোয়।

সোনেকা ঘয়লা যব নীক্ লাগে,

মোতিন গেরুলী হোয়।

মোতিন গেরুলী যব নীক্ লাগে,

পাতলি রাণিয়া হোয়।

পাতলি রাণিয়া যব নীক্ লাগে

গোদি হরি লোয়া হোয়।

কাশী মুড় নওয়া তোয়,

কাশী মুড়ন যব নীক্ লাগে, সোনেকা ছোড়া হয়।

—রেশমের রশি ঝুলিয়ে জল ভরে নাও। যখন রেশমের রশি দেখতে সুন্দর লাগে তখন সোনার ঘড়া হয়, সোনার ঘড়া যখন দেখতে সুন্দর লাগে তখন মোতির বিড়া হয়। মোতির বিড়া যখন সুন্দর লাগে তখন রাণী ছিপছিপে হয়। ছিপছিপে রাণী যখন সুন্দর লাগে, তখন কোলে শিশু হয়। কাশীতে শিশুর মুণ্ডন হয়, কাশীতে মুণ্ডন যখন সুন্দর লাগে তখন সোনার ছেলে হয়।

উপর বাদর ঘরায়ে, নীচে গোরী পাণিকে নিকলী

জায়সে কহিও শ্বশুরসে, আঙ্গনমে কুয়া খোদাও,

তোমারি বহু পাণিকে নিকলি।

জায়সে কহ বাঢ়ে জেঠসে

রেশম ডোরি লে আওয়ে

তোমারি বহু পাণিকে নিকলি।

উপর বাদর ঘরায়ে···

জায়সে কহ বাঢ়ে দেওরসে

মোতিনে কড়ারি লে আও

তোমারি ভৌজি পাণিকে নিকলি।

জায়সে কহ বাঢ়ে বলমসে

সোনেকে ঘড়া লে আও

তোমারি রাণী পাণিকে নিকলি।

কাঞ্চন চৌক পুরাও।

—আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, গৌরী জল আনতে যাচ্ছে। শ্বশুরকে বল তার পুত্রবধূ জল আনতে যাচ্ছে, তার জন্যে কুয়া খুঁড়িয়ে দিতে।

ভাসুরকে বল—তার ভাইবৌ জল আনতে যাচ্ছে—তার জন্যে রেশমের দড়ি নিয়ে আসতে।

আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে, দেবরকে বল কলসীর জন্য মোতির বিড়া আনতে, তার ভাইবৌ জল আনতে যাচ্ছে।

স্বামীকে বল সোনার কলসী নিয়ে আসতে, তার রাণী কুয়োতে জল আনতে যাচ্ছে। আলপনার জায়গা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দাও।

বার দিনের দিন শিশুকে দোলনায় তুলিয়ে নাম রাখা হয়। তখন ঐ উৎসব উপলক্ষে চারদিকে পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়, বাজনা বাজে, নারীরা গান গায়, নিমন্ত্রিতেরা ভূরিভোজন করে শিশুকে উপহার দিয়ে যায়। একটা ঘরে নারীরা গোল হয়ে বসে, একজন বয়স্কা মহিলা ঢোলক বাজাতে থাকে। দুই-এক জন নারী হাতে ছোট ছোট পাথর নিয়ে ঠকাঠক্ আওয়াজ করে তাল রাখতে থাকে, অন্য নারীরাও সে গানে যোগ দেয়। কোন কোন গানে দুই দল নারী উত্তর প্রত্যুত্তর করতে থাকে, তাকে সোহর বলে।

শিশুর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রণ দিবার গান—

বধাই নন্দকে ঘরে আজ—

ঠ্যার ঠ্যার সুগর নাওনিয়া,

নগর বোলাওয়া দেয় বধাই।

সব সখিয়ানে এইসাই কহিয়ো

চলো বিলম্ব না হোয়।

—আজ নন্দের ঘরে আনন্দের দিন, চতুর নাপ্তেনীকে

—নগরের ঘরে ঘরে এই শুভ জন্মোৎসবের সুখবর যেন দেয়। সব সখীদের বলো যেন শীগ্‌গির এসে এই উৎসবে যোগ দেয়।

বধাই নন্দকে ঘরে আজ
আপনে আপনে মহলন ভিতর
সব সখি করত শৃঙ্গার।
পাটি পারে, মাব সাওয়াঁরে
বিন্দী দীপক লীলার।

—আজ নন্দের ঘরে আনন্দ-উৎসব। সখীরা যে-যার বাড়ীতে সাজসজ্জা করছে। সুন্দর করে কেশবিন্যাস করে, সিঁথি কেটে বিন্দী পরেছে, আর সেই বিন্দী প্রদীপের মত ঝক্‌মক্ করছে।

ঠ্যারো ঠ্যারো সুগর নাওনিয়া
জাজম দেত বিছায়
ব্যঠো ব্যঠো এ মোরি সখিয়া
মঙ্গল গাও চার।

—চতুর নাপ্‌তেনী থাম, থাম, বসবার সতরঞ্চি বিছিয়ে দাও। প্রিয় সখীরা, এসো, বসো, দু'চারটি মঙ্গলগীত গাও।

বাবা নন্দ হাটে যাঁই হে
সালু বাট লে আও
পহেরো পহেরা, এ মোরী সখিয়া,
—জো জিকে আঙ্গ সোহার।
পহের, ওড়, জব ঠারি ভই সখিয়া—
—ডর মুখ দেও আশিস,
যুগ যুগ বাঢ়ে রাণী বারা হরিলোয়া
রাখে সবকা মান।

—বাবা নন্দ হাটে গিয়ে বাটটি রঙীন বস্ত্র কিনে নিয়ে এসো, —সখিগণ, তোমাদের যার যেটা ভাল লাগে, সেটা নিয়ে পর, মাথায় ওড়না দাও। তোমরা প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করো—আমার বধূরাণী, আর ছোট শিশু দীর্ঘজীবী হয়ে আমাদের মান রাখুক।

ননদ ভাজের সোহর—

ননদ ভোজাই দুনো খেল করে, ঔর খেয়াল করে।
ননন্দ কহতি ভউজী, তুম্‌হারে যে হই হাঁয় হরিলোয়া
কাঁকনওয়া হাম্ লেওবে।

—ননদ—ভাজে হাসিতামাশা করে খেলা করছে। ননদ বলে বৌদি, তোমার যদি ছেলে হয় তবে আমাকে হাতের কাঁকন দেবে।

বধূ বলছে—

তোর মুখ চুমু ননদীয়া, ঔর ঘি গুড় পূজোও,
কাঁকনকা জোট, জোড় পছলওয়া, দুইনো ভাই দেবে,
বো হই মোর হরিলোয়া।

—ননদ, তোর মুখে চুমু খাব, ঘি গুড় দিয়ে পূজো দেব। যদি আমার ছেলে হয় তবে তোকে হাতের একজোড়া কাঁকন আর এক জোড়া অনন্ত দেব।

নওমাস ভাবরীতে, হরিলোয়া জনম লিয়ে,
বাজে লাগি আনন্দ বধাইয়া, গাওয়ে সখি সোহায়।

—ন'মাস পরে ভাইবৌয়ের দিকে শিশুর জন্ম হ'ল, চারদিকে আনন্দ-উৎসব, সখীরা সোহার গায়।

বধূ বলছে—

ধীরে বাজে আনন্দ বধাইয়া, ধীরে উঠে সোহার।
শুনি হাঁয় ননন্দ হামারি, কাঁকনা লেলেঙ্গ হাঁয়।

—বাজনা ধীরে বাজাও, আনন্দগান ধীরে কর, আমার ননদ শুনতে পেলে কাঁকন নিয়ে যাবে।

ননদ বলছে—

তেজে বাজে আনন্দ বধাইয়া, তেজে উঠে সোহার
ভৌজী কঁকনা কি জোট, পছলয়া দুনো গেইলেবে।

—জোরে বাজনা বাজাও, সোহার জোরে গাও, বৌদি, আমি হাতের কাঁকন আর অনন্ত নেব।

—ভাইবৌ বলছে—

কি তেরে ভাইয়া বনওয়া, কি বাবা মোল কিয়া,
কাঁকনা তো হামারে নাইহরে কা, কাঁকনা ন দেবে।

—কাঁকন কি তোর ভাই বানিয়ে দিয়েছে, না তোর বাবা কিনে দিয়েছে? কাঁকন ত আমার বাপের বাড়ীর, আমি কাঁকন দেব না।

সভিয়া ব্যঠে ভাইয়া, বহিন আরজি করে
ভাইয়া, ভউজী কাঁকনা হামে হারি
আর কাঁকনা নেহি দেতী।

—ভাই সভাতে লোকজন নিয়ে বসেছে, বোন নালিশ করছে, ভাইয়া বৌদি আমার সঙ্গে বাজীতে হেরেছে, এখন আমাকে কাঁকন দিচ্ছে না।

এক পাও ধরে অঙ্গন, দোসরা ভিতর,
তিসরে পা ধরে সেজ, রাণি সমঝাও।
রাণি কাড়, কাঁকনকো কীর, বহিন পহেরাও।

—ভাই এক পা এক পা করে ভিতরে গিয়ে বৌকে অনেক বুঝিয়ে বললে, রাণি তোমার হাতের কাঁকনের খিলি খুলে বোনকে পরিয়ে দাও।

কাড়ি কাঁকনাকা কীড়, অঙ্গন দ্যায় মারি,
পহের কঁকনা হামারে, বৈরিন্ তোকে ব্যাঠ।

—ভাইবৌ হাতের কাঁকন খুলে উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে আমার হাতের কঁকন পরে শত্রু হয়ে বোস।

বাজত আওয়ে নাগারা, ওড়ত আওয়ে কেশর,
নাচত আওবে ননন্দ, বিরণ ঘর সোহর।
দূরসে আরি ননন্দী, আঙ্গনমে ঠারি,
ভিতরসে নিকলে ভাইয়া রাণী সমঝাওয়ে।
রাণি, আওয়ত বহিন হামারি, নিগর পইয়া লাগারো।
গরব জিন বলিও, মান জিন তোরিও।

—ঢাক বাজছে, আবীর উড়ছে, ননদ নেচে নেচে ভাইয়ের ঘরে আসছে আনন্দ-উৎসবে। দূর থেকে বোন এসেছে—ভাই

স্ত্রীকে বোঝাচ্ছে, আমার বোন তোমাকে প্রণাম করতে আসছে তার মান রেখো, অহঙ্কারের সঙ্গে কথা বলো না।

আঙ্গনসে আয়ি ননন্দী, ভিতরমে ঠারি ননন্দী।
লিজিয়া ভরা মোর হাত, পইয়া কৈ সে লগায়ো॥

—ননদ ভিতরে এসে দাঁড়াল। ভাইবৌ বললে, আমার গোবরভরা হাত, কি করে প্রণাম করবে।

ননদ বলছে—

ভৌজী, ন হোও মোরি ভৌজী, তুহুঁ মোর ভৌজী
বিরিয়া ভরি মোবে জিব, আশিস কাঁইসা দিহ।
ভিতরমে বাঠি ননন্দ, ভাতিজ হুলেরাও,
ভৌজী লেহ মোর হাতকা কাঁকনা, গলে কি তিলরিয়া
ভৌজী লেবে আসল ঘোড়, বহাশি ঘর যাওবে।

—বৌদি তুমিই আমার বৌদি আমার জিবভর্ত্তি পান, তোমাকে কি করে আশীর্ব্বাদ করি।

ভিতরে বসে ননদ ভাতিজাকে আদর করতে করতে বলল, বৌদি, তুমি আমার হাতের কাঁকন, গলার হার নাও, আর আমাকে আসল ঘোড়া আনিয়ে দাও, খুশী মনে বাড়ী যাই।

ভাইবৌ উত্তর করলে—

না দেহ হাতকা কাঁকনা, না গলেকে তিলরিয়া,
ননন্দী না দেওবে আসল ঘোড়, রোওত ঘর জাইহোঁ।

—তোমার হাতের কাঁকন, গলার হার দিও না। আসল ঘোড়া দিব না, তুমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী যাও।

রোওয়ত নিকলী ননন্দীয়া
শুষকত ভাইয়ঁ নাওয়া
বেহঁাতে নিকলে নন্দোই, সরহজমন তোড়ে।

—ভাইপোকে রেখে কাঁদতে কাঁদতে ননদ বের হ'ল। শালার বৌ মন ভেঙে দিল, ননদের বরও ঘর থেকে বের হয়ে চলল। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—

রানিয়া, নহোও মোরী রানিয়া, তুমহি মোরী রানিয়া
পহিলা বণিজ হাম যাওবে, কাঁকন লে আওবে।
দোসরে বণিজ হাম যাওবে, তিলরি লে আওবে
তিসরে বণিজ হাম যাওবে, ঘোড়া লে আওবে
নাইহর ত্যজ দিও হো।

—রানি, তুমিই আমার পত্নী, আমি প্রথম বাণিজ্যে গিয়ে তোমার জন্ম হাতের কাঁকন নিয়ে আসব, দ্বিতীয় বাণিজ্যে গিয়ে তোমার গলার হার নিয়ে আসব। তৃতীয় বাণিজ্যে গিয়ে আসল ঘোড়া নিয়ে আসব, তুমি 'নাইহর' (বাপের বাড়ী) ছেড়ে দাও।

তখন স্ত্রী উত্তর করলে—

আগ লাগে তোর কাঁকনা, বজর পরে তিলরি,
উখরি পড়ে তোর ঘোড়া, নাইহর ক্যাইসা ত্যজিয়ো।
যব বড় হইয়ো ভাতিজাওয়া, দূরী খেলনো জাইবো
স্বামী ধন্ত ধন্ত মেরি ভাগ, বুয়া কহকে বুলাওয়ে।

—তোর কাঁকনে আগুন লাগুক, গলার হারে বজ্র পড়ুক, তোর ঘোড়া পড়ে মরে যাক, আমি বাপের বাড়ী কেন ছাড়ব? যখন ভাতিজা বড় হয়ে দূরে খেলতে যাবে, আর পিসী পিসী করে ডাকবে তখন আমি ধন্য হয়ে যাব।

এই গ্রাম্য সঙ্গীতগুলি বড় মর্ম্মস্পর্শী। কন্যা চিরদিনের জন্ম পিতৃগৃহ ছেড়ে গেলেও তার আজন্মের প্রিয় নীড়কে ভুলতে পারে না, তাই যখন ভাইবৌয়ের ছেলে হওয়ার খবর পেল তখনই ছুটে এল পিত্রালয়ে ভাতিজাকে দেখতে। অন্য গৃহের কন্যা ভাইবৌ এখন তার প্রিয় পিতৃগৃহের অধিকারিণী। ভাইবৌ ননদিনীকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে না, নানাভাবে তাকে অপমানিত করতে লাগল, নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলল।

ব্যথিতা কন্যার স্বামী তখন সহানুভূতি জানালে, কন্যা অমনি চটে উঠে যা বলল, তার শেষ দুটি পংক্তিতে পিতৃগৃহের প্রতি কন্যার গভীর আকর্ষণ ও ভাইপোর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় সোঁহার—

ভাইয়া ঘর যব বেটা ভয়ে হাঁয়
হামনে শুনা আধিরাত
আবি মেরেকো সোনারে ঘর জাই।
যাটে রূপেয়াকি ঝঙ্গা ঝাঙ্গুলিয়া
পঁচিশ নগদ লে আই।
আবি মেরে কো সোনার ঘর জাই।

—মাঝরাতে শুনতে পেলাম ভাইয়ের ছেলে হয়েছে, এখন আমি ষাট টাকা নিয়ে যাচ্ছি সোনার গয়না আনতে, আর সঙ্গে নিয়ে যাব পঁচিশ টাকা।

ভাইয়া পুছে আপনি ধনাসে
কিয়া বহিন কো চাহি—
মিশ্রুকা লহংগা, কুসুমরং চুনোরী
ভাই ননন্দ কো চাহি।

—ভাই তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, আমার বোনের জন্ম কি কি কিনতে হবে? ভাইবৌ বললে একটা লাল ঘাঘরা আর কুসুম রঙের ওড়না।

শ লেকে আইহোঁ, পঁচাশ ন পায়ো
ঝকমারে আয়ো।

বাবা দুয়ারে চন্দন এক বিরোয়া
ওহি মে লগাই রেশম ডোরি।
ননন্দ কো বান্ধো, নন্দোই কো বান্ধো
আউর ননন্দজীকে ভাইয়া।
রহো, রহো ননন্দী, ভোর হত সমঝাই,
উচওই, উচই যাও ননন্দীয়া, পাছে পবণ জিন ধয়রো।

ননদ বলছে, "একশ টাকা নিয়ে এসেছিলাম, পঞ্চাশও পেলাম না, ঝকমারি করে এসেছি।"

বাবার বাড়ীর দুয়ারে এক চন্দনগাছ আছে, তাতে ননদ, নন্দাই,

আর ননদের ভাইকে ভাইবৌ রেশমের দড়ি দিয়ে সারা রাত বেঁধে রাখল। ভোর হলে রশি খুলে দিয়ে বলল, "ননদী উচু রাস্তা ধরে যাও, আর পেছন ফিরে যেন এস না।"

রাণপড়োশী পুছন লাগি
কাঁহা বিরণঘর পায়ো
লিয়া দিয়া সব কোণে ধরা হায়
জী মেরা দান লে আইয়ো।

—ননদ বাড়ী ফিরলে পাড়া-প্রতিবেশী বললে, ভাইয়ের বাড়ী থেকে কি আনলে? ননদ বিরস মুখে উত্তর করলে, "যা দিয়েছি পেয়েছি, সবই কোণায় ধরে দিয়ে এসেছি। শুধু নিজের প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছি।

এই গানটিতে বহু ঈর্ষাকাতর ভাইবৌয়ের মানসচিত্র ফুটে উঠেছে। নারীরা এসব ননদ-ভাজের সোহর খুব উল্লাসে গায়, আর হাসিতামাশা করে, পান খেয়ে নানা গোলগল্পে উৎসবকে জীবন্ত করে তোলে।

ভাদ্র মাসের ষষ্ঠীর দিনে নারীরা শিশুর কল্যাণার্থে হরছট ব্রত পালন করে। আমাদের দেশের অরণ্য-ষষ্ঠীর মতই এই ষষ্ঠীব্রত। এই ব্রতের কাহিনী ও পূজার পদ্ধতি বাংলা দেশ থেকে বেশী পৃথক নয়। শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার ষষ্ঠীব্রতের কাহিনী বড় সুন্দর, এবং ঐ কাহিনীর সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের ও উত্তর হিন্দুস্থানের এই হরছট ব্রতের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে।

হরছট ব্রতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই:—এক বধূ ছিল তার কোন সন্তান হয় না। বন্ধ্যা নারী; তাকে সর্ব্বদাই শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা সইতে হয়। এক দিন তাকে শাশুড়ী, ননদ, এমনকি স্বামীও ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। বৌটি কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গলের দিকে চলল, অনেক দূর গিয়ে দেখতে পেল ক্ষেতের মাঝখানে এক ছোট গাছের ঝোপে এক বুড়ী বসে আছে। বুড়ী আর কেউ নয়, হরছট-মাতা বুড়ীর রূপ ধরে বসে ছিলেন।

তিনি বললেন, "বৌ তুই কাঁদিস কেন?"

বৌটি উত্তর করলে, "আমার সন্তান-সন্ততি হয় না। আমি বড় দুঃখী, শাশুড়ী, ননদ, স্বামী সবাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমার কোথাও ঠাঁই নেই।"

হরছট-মাতার দয়া হ'ল, বললেন—আঁচল পাত, বর দিচ্ছি।"

বৌটি আনন্দে আঁচল পেতে হরছট-মাতার বর নিয়ে নিল, কিন্তু হরছট-মাতাকে বৌটির এই প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল যে, তার ছেলের জন্মের পর থেকে তাকে হরছট-মাতার পূজা দিতে হবে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে।

হরছট-মাতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেবীর বরে বৌটি যথাসময়ে সন্তানের জননী হ'ল, এবং প্রতি বৎসর নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে হরছট ব্রত পালন করতে লাগল।

তখন থেকে সব নারীই পরম নিষ্ঠার সহিত উপবাস থেকে সন্তানের কল্যাণার্থে এই হরছট-মাতার পূজা করে। পূজার পর ব্রতচারিণীরা একত্র হয়ে ব্রতের গান করতে থাকে। একজন নারী ঢোলক বাজায়, অন্যরা গান গায়। গানগুলি থেকে কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া হ'ল।

এক বৌ—তার ছেলেমেয়ে কিছু নেই, বন্ধ্যা বৌটিকে সবাই যখন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন সে কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গলের দিকে চলল।

এক বনগয়ী, দোসরা বনগয়ী
তিসরা আনন্দ বনমে আয়ী,
ওহিসে নিকলী বাঘিন।

বাঘিন পুছে—রাণী কাঁহাসে তুম আয়ি, কাঁহা তুম জাওগী?

—প্রথম বন পার হয়ে বউ দ্বিতীয় বনে এল, দ্বিতীয় বন পার হয়ে তৃতীয় বনে আসতেই এক বাঘিনী বন থেকে বেরুল।

বাঘিনী জিজ্ঞেস করল, "রাণী তুমি কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে?" বৌটি উত্তর করলে,

শাসত কহে বাঁঝিন, ননদ কহে ব্রিজবাসিন্
জিস প্রভু মাই বিয়হি, ও ঘরসে নিকালে।

—শাশুড়ী আমাকে বাঁজা বলে, ননদ বলে ব্রিজবাসিনী, যাকে আমি বিয়ে করেছি সেই প্রভুই আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাঘিনী কহে—

জহাসে তুম আয়ি হো, উহাই চলী যাও,
জো তুমকো হম্ খায়, বাঁঝিন হো যায়।

—বাঘিনী উত্তর করলে, তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই চলে যাও, আমি যদি তোমাকে খাই তবে আমিও বাঁঝিন হয়ে যাব।

বৌটি বাঘিনীর কথা শুনে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চলতে সুরু করল।

এক বন গয়ী, দোসরা বন আয়ী,
তিসরে আনন্দ বনমে আয়ী,
ওহিসে নিকলী এক নাগিন।

নাগিন পুছে, "রাণী কাঁহাসে তুম আয়ী, কাঁহা তুম জাওগী?"

—বউটি চলতে চলতে প্রথম বন, দ্বিতীয় বন পার হয়ে তৃতীয় বনে এল, সেখান থেকে একটা নাগিনী বের হ'ল। সাপ বউকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, "রাণী, তুমি কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে?"

বৌটি বললে—

শাস ত কহে বাঁজিন, ননদ কহে ব্রিজবাসিন্
জিস প্রভু ম্যাই বিওহী, ও ঘরসে নিকালে।

নাগিন বললে—

জাহাসে তুম আয়ী হো, উহাই চলী যাও,
জো তুমকো হম্ খায়, বাঁঝিন হো যায়।

—বৌটি উত্তর করলে, "শাশুড়ী আমাকে বলে বাঁজা, ননদ বলে

ব্রজবাসিনী, যাকে বিয়ে করেছি সেই প্রভুই আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

সাপটি বললে, "তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানেই চলে যাও, তোমাকে খেলে আমিও বাঁজা হয়ে যাব।"

নাগিনীর উত্তর শুনে বৌটি কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে এল। মাকে বললে,

মায়া, তুমহি মোরি মায়া
মায়া কোন জনম দিহ,
বাঁঝিন বহু আয়ো।

—মাগো, তুমি ত আমার মা, আমাকে কি জন্মই দিলে যে সবাই আমাকে বন্ধ্যা বলে।

মা উত্তর করলে—

বেটি তুম না হও, তুম মেরী বেটী,
জন্ম দিয়া বিটিয়া, করমকা সাথী নেহি।
বেটি জাঁহাসে তুম আওয়ে, উহাঁই চলী যাও,
রোনা সুনে ভৌজাই তুম হার, বাঁঝিন হো জয়ে।

—কন্যা, তুমি ত আমারই কন্যা, আমি তোমার জন্ম দিয়েছি সত্য, কিন্তু তোমার কর্মফল দিই নাই। কন্যা তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানেই চলে যাও, নয়ত তোমার কান্না শুনে তোমার ভাইবৌও বাঁজা হয়ে যাবে।

মার উত্তরে বৌটির মনে আরও বেশী দুঃখ হ'ল, সে দুঃখে অভিমানে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল।

এক বন গয়ী, দোসরা বন গয়ী,
তিসরে চন্দনবনমে বহু চলী আয়ী।

—চলতে চলতে বউ চন্দনবনে পৌছল। ওখানে এক বড় চন্দনগাছের নীচে দাঁড়িয়ে বৌ কাঁদতে কাঁদতে বললে—

জো তুম সত্য হো, তো তুমকে ধরিতি সমাও।

—চন্দনগাছ তুমি যদি সত্য হও, তবে তোমার অঙ্কে আমাকে স্থান দাও—বলে চন্দনগাছকে প্রদক্ষিণ করলে। চন্দনগাছ দুভাগ হয়ে গেল, বৌটি তার মধ্যে প্রবেশ করতেই আবার চন্দনের জোড়া বন্ধ হয়ে গেল।

এই গানটিতে আমরা তখনকার দিনের সমাজচিত্র দেখতে পাই ও গ্রাম্য নারীদের মনোভাব বুঝতে পারি। বন্ধ্যা বধূ শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী ননদ, সবারই অনাদৃতা। সন্তানহীনা, উপেক্ষিতা, গৃহবিতাড়িতা বধূ সান্ত্বনার জন্য মায়ের কাছে ছুটে গেল। সেখানেও আদর এবং স্নেহের পরিবর্তে উপেক্ষা দেখে তার মন গভীর দুঃখে অভিমানে, ভেঙে পড়ল। সে জঙ্গলে চলে গেল। বন্ধ্যা নারীর এমনই দুর্ভাগ্য যে তাকে গভীর জঙ্গলে বাঘেও খায় না, সাপেও খায় না অবজ্ঞা ভরে। তখন সে চন্দনগাছকে দু'ভাগ হতে বলে তাতেই অদৃশ্য হয়ে এই পৃথিবীর দুঃখজ্বালা থেকে উদ্ধার পেল।

গঙ্গা যমুনা কা তীরে, বাণি এক ঠাড়ি হাঁয়
গঙ্গা দেওনা তো আপনে লহরিয়াঁ, গঙ্গামে বুরোঁ।

—আর এক অনাদৃতা নারী গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়িয়েছে, গঙ্গাকে মিনতি করে বলছে, "গঙ্গা মা তোমার এক ঢেউয়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও, আমি ডুবে মরি।"

গঙ্গা উত্তর করলেন—

তোমারি শাস শ্বশুর দুঃখ, কি নাইহর কি দূর বাস?
কিবে বালম পরদেশ? কৌন দুঃখসে বুরোগী?

তোমার শ্বশুর শাশুড়ী যন্ত্রণা দিচ্ছে, তোমার পিতৃগৃহ কি বহু-দূর, না তোমার স্বামী বিদেশে, কোন দুঃখে তুমি আমার জলে ডুবে মরতে চাও?

বৌ বললে,

না মোরি শাস শ্বশুর দুঃখ, নহী নাইহর দূর বাস,
নহী বালম দূর দেশ, কোখে দুঃখ বুরোঁ।

—আমার শ্বশুর শাশুড়ীর কোন যন্ত্রণা নেই, বাপের বাড়ীও বেশী দূর নয়, স্বামীও বিদেশবাসী নয়, শুধু আমি অভাগী সন্তান-হীনা। তাই এই দুঃখে ডুবে মরতে চাই।

গঙ্গা মা বললেন—

তোমারা পুরুষ অধর্মী, ধরম নেহি জানে,
মারে অযোধ্যাপুরে গাইয়া, সম্পাৎ ক্যাইসে পাওয়ে।

—তোমার স্বামী অধর্মী ধর্ম জানে না, অযোধ্যায় সে গোবধ করেছে, সে কি করে সন্তানলাভ করবে।

ব্রতের দিন এই ভাবে ব্রতচারিণীরা বন্ধ্যা নারীর দুঃখ খেদ সম্বলিত বহু গান গাইতে থাকে। এ সব গীত থেকে বুঝা যায়, গ্রাম্য সমাজে বন্ধ্যা নারীদের কত অনাদর।

সন্তানবতী নারীরা পরম নিষ্ঠার সহিত সন্তানের মঙ্গল-কামনায় পূজা করে সগৌরবে গৃহে ফিরে। মাতৃত্বের গৌরবে তারা মহীয়সী।



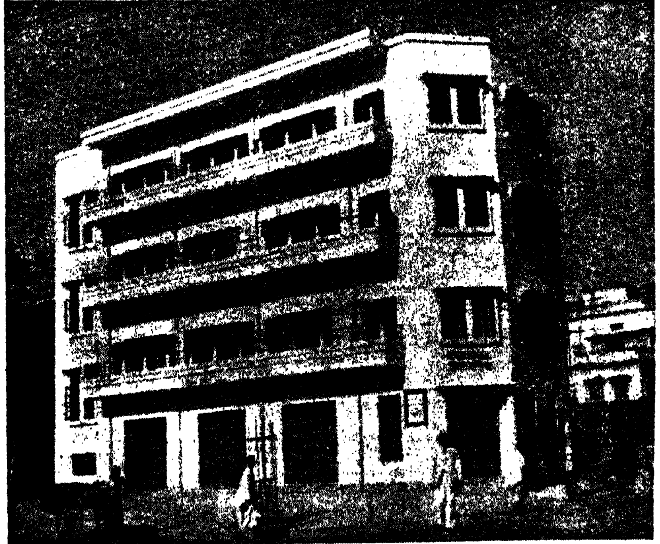
মিলন-মন্দির

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কলিকাতা আপার সারকুলার রোডের উপর, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় এবং কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ের মাঝখানে বহু দিন যাবৎ এক খণ্ড জমি খালি পড়িয়া ছিল। মধ্যে মধ্যে সাময়িক ভাবে নির্ম্মিত চালায় কিছু কিছু কাজকর্ম্মও চলিত। কৌতূহলী লোকেরা এই খালি জমির প্রতি নজর দিয়া কোনরূপ হদিস্ করিতে পারিত না। আবার যাঁহারা একটু বেশী কৌতূহলী তাঁহারা প্রাচীনদের নিকট শুধাইয়া জানিয়া লইতেন, এখানে সেই বহু বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে একটি হল নির্ম্মাণের কথা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই স্থানে একটি স্বল্পায়তন ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে, নাম দেওয়া হইয়াছে মিলন মন্দির। সেদিন ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবও সম্পন্ন হইয়া গেল খানিকটা আড়ম্বরের সঙ্গে।

এখন, এই মিলন-মন্দিরটি কি সে সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার যে একটি বিচিত্র ইতিহাস আছে তাহা সাধারণে হয়ত জানে না। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ করিলেন। বাংলাকে ভাঙিয়া দুই খণ্ড করা হইল। পশ্চিম অংশ গেল বিহার-উড়িষ্যার সঙ্গে; পূর্ব্ব অংশ জুড়িয়া দেওয়া হয় আসামের সহিত। বাঙালী জাতির ঐক্য, সংহতি, ভাষা, সংস্কৃতির মূলে এইরূপে একটা ভীষণ আঘাত দিবার ব্যবস্থা হয়। এই বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার নিমিত্ত যে সব উদ্যোগ-আয়োজন হয় এবং বাঙালী জাতি ঐ সকল কার্য্যে পরিণত করিতে যে প্রয়াস করে তাহাই জাতীয় ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই আন্দোলনকে সার্থক করিবার জন্য, বাঙালী জাতির সংহতিকে স্থায়িত্ব দানের নিমিত্ত অন্যতম সুষ্ঠু প্রয়াস—কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে একটি ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠা।

বিভক্ত বঙ্গের ঐক্য-সংহতির প্রতীক্-স্বরূপ একটি ভবন বা মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে উদিত হয়। তিনি দেখিয়াছেন, ফ্রান্সে হোটেল ডি' ইন্‌ভ্যালিডে ফরাসীদের মনে জাতীয় ঐক্য জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশের এক-একটি প্রতীক্ বা মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইতেছিল। ফ্রান্সের অঙ্গ আল্‌সেস্-লোরেন তখন পরহস্তগত। কিন্তু উহারও একটি মূর্ত্তি সেখানে রাখা হইয়াছে, তবে সেটি বস্ত্রাচ্ছাদিত। ঠিক বঙ্গভঙ্গের দিনে যাহাতে উক্ত রূপ একটি ভবন কলিকাতায়ও প্রতিষ্ঠার



মিলন-মন্দির

ব্যবস্থা হইতে পারে তাহার প্রস্তাব করিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই প্রস্তাব নেতৃবৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। দানবীর তারকনাথ পালিত এবং ভারতগতপ্রাণা সিষ্টার নিবেদিতা উভয়েই এই প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন। আপার সারকুলার রোডে উপরি-উক্ত স্থলে তখন অনেকটা জমি পড়িয়া ছিল—পরিমাণ হইবে চার বিঘার কিছু উপর। এই স্থানই উক্ত ভবনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। তখন হইতেই ইহা 'ফেডারেশন হল' নামে আখ্যাত হইতে থাকে।

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু তখন সারকুলার রোডের অপর পারে বাস করিতেছিলেন। স্বদেশের সেবায় তিনি তিলে তিলে নিজেকে

উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত; এই রোগশয্যাই শেষে মৃত্যুশয্যা হইয়া দাঁড়ায়। ফেডারেশন হল বা মিলন-মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিতে হইবে বঙ্গভঙ্গের দিনেই; আর এ কার্যের জন্য বঙ্গদেশে আনন্দমোহন ব্যতীত কে অধিকতর উপযুক্ত? বৈকাল চারটার সময় হলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উৎসব। বাংলার জ্ঞানী-গুণীরা সভায় সমাগত। শিক্ষাবিদ্, প্রাক্তন বিচারপতি সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ উৎসবে না আসিয়া পারেন নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত। আর কত জনের নাম করিব? বাঙালী জাতির মর্ম্মবেদনা এই দিনকার রাখী-বন্ধন-কার্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এ সভায়ও লোকে লোকারণ্য। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগীর চেয়ারে করিয়া আনন্দমোহনকে উৎসব-ক্ষেত্রে লইয়া আসা হইল। সভায় শান্ত গম্ভীর পরিবেশ। আনন্দমোহনের ইংরেজী বক্তৃতা ওজস্বিনী ভাষায় পাঠ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এই বক্তৃতা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন—এটি বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে যুক্ত বা মিলিত বঙ্গের অভিনব চার্টার বা সনন্দ। জাতীয় জীবনকে সংহত, সক্রিয় এবং সতেজ করিয়া তুলিতে হইলে কি কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে তাহারও পরিষ্কার নির্দ্দেশ পাওয়া গেল এই বক্তৃতার মধ্যে।

অভিভাষণ পাঠান্তে তুমুল বন্দে মাতরম ধ্বনির মধ্যে সভাপতি আনন্দমোহন ফেডারেশন হল বা মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর সভাস্থলে স্থাপন করিলেন। এ স্থানটি কিন্তু তখনও ক্রয় করা হয় নাই। এ বিষয়ে পরে বলিতেছি। এই সভায় আনন্দমোহন-বিরচিত একটি প্রতিজ্ঞাপত্রও পঠিত হইল। ইংরেজী প্রতিজ্ঞাপত্রটি পাঠ করেন স্বদেশী-আন্দোলনের অন্যতম হোতা আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়, বাংলায় পাঠ করিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। ইংরেজী ও বাংলায় ঘোষণাপত্রটি ছিল যথাক্রমে এইরূপ:

ইংরেজী—

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengalee Nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power, to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintan the integrity of our race. So God help us."—A. M. Bose.

বাংলা—

"যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

এই দিনে রাখীবন্ধন এবং মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একাধিক সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। এগুলির কোন কোনটিও সভাক্ষেত্রে গীত হইল। বাঙালী জাতির লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল 'ভেদ নাই ভেদ নাই, ভাই ভাই এক ঠাঁই'। রবীন্দ্রনাথ নিম্নোক্ত অমর সঙ্গীতে বাঙালী জাতিকে—পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বাংলাভাষী যে যেখানে আছে সকলকেই বঙ্গভূমির প্রতিটি রেণুর প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে, বাঙালীর প্রত্যেক সুকৃতিকে অভিনন্দন করিতে, সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত হইতে আহ্বান জানাইলেন:

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান—
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান—
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান—
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

এই দিনে অন্যান্য কার্য্যও আরম্ভ হইল। কিন্তু এখানে শুধু মিলন মন্দির বা ফেডারেশন হলের কথাই বলিতেছি। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমেই বেশ জোরালো হইয়া উঠিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ দেশকর্ম্মকে বেশীদিন উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। সমগ্র দেশের আবেদন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া আন্দোলনকে দলন করিতেই কর্তৃপক্ষ তৎপর হইলেন। নানাবিধ উৎপীড়ন, অত্যাচার, হিন্দু-মুসলমানে স্থায়ী বিভেদসৃষ্টির প্রয়াস প্রভৃতি ভারতীয় রাজনীতিকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। সরকারী নিপীড়নের প্রতিরোধে বিপ্লবীরাও বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইলেও কি ভূমি-ক্রয় কি মিলন-মন্দির নির্ম্মাণ কিছুতেই তখন নেতৃবৃন্দ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অবশেষে ১৯০৯ সনে ঐ ভূমি (চারি বিঘার উপর জমি) ক্রয়ের ব্যবস্থা হইল। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ক্রয়মূল্য কর্জ্জ দিলেন। ফেডারেশন হলের জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়া-

ছিল। এই অস্থায়ী কমিটির পক্ষে ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত অর্থ ধার করেন এবং জমিও উভয়ের নামেই ক্রয় করা হয়। ১৯০৯ সন হইতে ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। তবে এ সময় উক্ত চারি বিঘা জমি হইতে আড়াই বিঘা পরিমাণ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় এবং আনন্দমোহন বসুর দুই পুত্রকে বিক্রয় করা হইয়াছিল। বিক্রয়-মূল্য যাহা পাওয়া গেল তাহাতে ব্যাঙ্কের যাবতীয় দেনা পরিশোধ হইল। ভূমি-খণ্ডের ভিতর দিয়া কলিকাতা করপোরেশন রাস্তা বাহির করেন 'ফেডারেশন রোড' নামে। ইহাতেও কতকটা জায়গা চলিয়া যায়। কাজেই ফেডারেশন হলের জন্য দায়মুক্ত অবস্থায় মাত্র এক বিঘা জমি অবশিষ্ট রহিল।

প্রথমাবধি অস্থায়ী কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, পৃথ্বীশচন্দ্র রায় এবং ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অস্থায়ী কমিটি কাজ চালাইতেন ফেডারেশন হল সোসাইটির পক্ষে। ১৯১৭ সনের ২৭শে এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ সভায় সাময়িক ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া একটি স্থায়ী কমিটি বা পরিচালক-সভা গঠিত হইল। পরিচালক-সভার সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেক্রেটারী বা কর্ম্মসচিব হন অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায় এবং ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জমির ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং ডাঃ নীলরতন সরকার। যে মূল উদ্দেশ্য লইয়া ফেডারেশন হল গঠনের কথা ছিল তাহা নিম্নোক্ত কর্ম্মধারার মাধ্যমে এই সময়ে বিধৃত হইল :

(১) জমির উপরে গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে, ইহার মধ্যে একটি 'হল' থাকিবে। এসব সংরক্ষণেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

(৩) এই সকল গৃহে বা প্রধান হল-ঘরে সময়ে সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-রাজনীতি সম্পর্কীয় সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইতে পারিবে।

(৪) হল-ঘরের মধ্যে বা বাহিরে বিখ্যাত ব্যক্তিদের পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি এবং চিত্রাদি থাকিবে।

(৫) হল-ঘরে বা অন্য প্রকোষ্ঠে একটি গ্রন্থাগার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই গ্রন্থাগারে বিশেষ ভাবে রাজ-নীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং শাসনকার্য্য-সংক্রান্ত পুস্তকাদি সংগৃহীত হইবে।

(৬) সোসাইটির অর্থ সংরক্ষণের পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইবে সিকিওরিটি দ্বারা বা অন্যবিধ উপায়ে। সোসাইটির প্রয়োজনে এই অর্থ আংশিক ভাবে ব্যয় করা যাইবে।

(৭) এখানে একটি ক্লাব থাকিবে।

(৮) প্রয়োজনবোধে বাড়ী বা জমি লীজ দেওয়া চলিবে।

(৯) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য ও কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক তাহা করিতে হইবে।

ফেডারেশন হল সোসাইটি জীবিত থাকিলেও এতকাল প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিলেন। সময়ে সময়ে অস্থায়ী চালাঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ভাড়া দেওয়া হইত এবং কিছু অর্থও সংগৃহীত হইত। বর্ত্তমানে সোসাইটি পুনরায় উপরের উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যে পরিণত করিতে তৎপর হইয়াছেন। এ বিষয়ে ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগী। মিলন-মন্দির বাঙালী জাতির ঐক্যের প্রতীক্। বৃহদাকারে ইহা প্রতিষ্ঠিত হউক তাহাই কামনা।



গ্লাডিওলাস

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

গাঙ্গুলী ব্রাদার্স হগ সাহেবের বাজারে বড় ফুলের দোকান। সাইন-বোর্ডটা লক্ষ্য করে থাকবেন।

সেই দোকানে গোলমাল বাধল এক অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে।

সেরা কারবার শীতের মরশুমে গ্লাডিওলাস বেচা। হল্যাণ্ডের ফুল, অষ্ট্রেলিয়ায় চাষ, আমেরিকায় তার ফ্যাশান বন্যা—আজ সারা সভ্য-জগতে গ্লাডিওলাস ক্লাব, গ্লাডিওলাস সোসাইটি, গ্লাডিওলাস ব্রাদারহুড, এক গ্লাডিওলাসের উপরই মাসিক পত্রিকা গুচ্ছের। ওদের দেশে ত চমক নিয়েই বন্যা আর বন্যা নিয়েই চমক।

সেই বন্যার ধাক্কা এল হগ সাহেবের বাজারে গাঙ্গুলী ব্রাদার্সের শার্সী-আঁটা আলমারীর থাকে থাকে।

থরে থরে নানা রঙের গ্লাডিওলাসগুলো যখন গুচ্ছ গুচ্ছ ডাটির মাথায় ফুটে থাকে তখন মনে হয়,এই বুঝি 'মন্দার' বা 'পারিজাত'। আর সাহেবপাড়া উজাড় করে লোক আসত গাঙ্গুলী ব্রাদার্সের গ্লাডিওলাস কেনার আগ্রহে। অমন গ্লাডিওলাস আর কারুর দোকানে থাকে না।

প্রথম প্রথম ওরা আনাত দার্জ্জিলিঙের এক গাঁয়ের মালীর বাগান থেকে। মাঝে নেপাল থেকেও আসত। এমনকি শেষ অবধি ওরা অষ্ট্রেলিয়া থেকেই ফুল আনিয়ে বেচেছে। কিন্তু যুদ্ধের সময়টা একেবারে সব বানচাল হয়ে গেল।

আশ্চর্য্য বটে, সেই মুখে গাঙ্গুলী ব্রাদার্স কোথা থেকে এক মালীর খবর পেলে। তার তৈরি গ্লাডিওলাসের কাছে সবার মাথা হেঁট হ'ল। সেই বাগান থেকে ওরা একচেটিয়া গ্লাডিওলাস কিনতে লাগল। বেচবার সময়ে আর বাছ-বিচার রইল না। যা দাম বলে সেই দামেই বিক্রী হয়ে যায় হু হু করে।

অথচ মালী নেহাত দেশী। তার বাগানও কলকাতার সন্নিকটে, দেশগাঁয়ে। সেখানে নিজের অধ্যবসায়ে, নেশায়, স্বপ্নের মাদকতায় কোন এক মালী জীবনের তপস্যা ঢেলেছে—এই গ্লাডিওলাসের গালে রং ফোটাবার তৃষ্ণায়, তার প্রতি দলে নবতর চিহ্ন এঁকে দেবার আরাধনায়; তার স্তবকে স্তবকে মর্য্যাদা, রুচি, স্বাস্থ্য আর শোভা বাড়িয়ে দেবার অক্লান্ত চেষ্টায়।

কিন্তু গাঙ্গুলী ব্রাদার্সের দোকানে গ্লাডিওলাস আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ। কত চিঠিপত্র কত কি। তবু কোনও পাত্তাই রইল না সেই মালীর। যেন কোন দিন গ্লাডিওলাস বলে কোনও ফুলের খবরই নেই তাদের কাছে।

কলেজ ষ্ট্রীটের বাজারে রাত এগারটা আন্দাজ একটি বছর কুড়ির ছেলে আসত নিয়মিত এক ঝাঁকা গ্লাডিওলাস নিয়ে। ওরা গিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট বাজার থেকে নগদ দামে সেটা কিনে আনত। তা বছর সাত-আট হবে এই কারবার চলেছে। ছেলেটির বয়স তখন কুড়ি ছিল আর আজ আটাশ। সেই একভাবে ফুলের ঝাঁকা আনে, বেচে, চলে যায়। কোনও চিহ্ন রেখে যায় না। কিন্তু তার কোন সন্ধানই যে পাওয়া যাচ্ছে না!

এখন গাঙ্গুলী ব্রাদার্সের মাখন গাঙ্গুলী ক্রমাগত খোঁজ করে বেড়াচ্ছে, সেই ছেলেটির কথা। শুভো বলে ডাকত সবাই। ঐ অবধি জানে। আর কেউ কিছু বলতে পারে না।

হয়ত ফুল নইলে শুভোর চলতে পারে, মাখন গাঙ্গুলীর চলে না। তার নানা হোটেলের, দেশ-বিদেশের কণ্ট্রাক্ট যায় যায়। খোঁজ নিতে লাগল মাখন।

শেষ অবধি একটা ঝাঁকামুটে বলল, 'শুভোবাবু কাটোয়া লাইনের শেষ গাড়ী থেকে নামতেন আর প্রথম গাড়ীতে চলে যেতেন। মাঝের সময়টুকু কলেজ ষ্ট্রীট বাজার আর ষ্টেশনেই কাটাতেন'।

কাটোয়া লাইনের চেকারের কাছ থেকে ষ্টেশনের খবর পাওয়া গেল। শেষ অবধি মাখন গাঙ্গুলী আর তার ভাই গোকুল গাঙ্গুলী একদিন পরামর্শ করে মাছধরার অছিলায় বেরিয়ে পড়ল সেই ষ্টেশনের টিকিট কেটে।

প্রথম গাড়ী থেকেই ষ্টেশনে নেমে ষ্টেশনমাষ্টারকে প্রশ্ন, শুভোর হদিস জানেন কিনা। ভদ্রলোক নূতন বদলী হয়ে এসেছেন, কোনও খোঁজ দিতে পারলেন না। অগত্যা গ্রামের পথ ধরে চলা। বেশ চলছিল। হাতে বঁড়শী। লোকে ভাবছে সৌখীনবাবু এসেছেন মাছ ধরতে। কলকাতার ব্যবসায়ী, গাঁয়ে এসেছেন ফুলের খোঁজে। কেমন যেন লজ্জা। তাই ঢাকবার জন্যে বঁড়শী আড়াল।

খানিকটা এগিয়ে পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। এখন ওরা কোন দিক ধরে! একটা চাষীকে জিজ্ঞাসা করলে, "শুভোবাবুর বাগান কোথায় বলতে পার?"

চাষী বললে, "মাছ ধরবেন বুঝি? তা বাগান কেন? সামনেই কেলেগড়ের পুকুর। বাবুদের বলুন গে, খুশীমনে মাছ ধরতে দেবেন।" তারপর হেসে বললে, "কলকাতার বাবু কিনা, বাগানে মাছ ধরতে চান। মাছ পাওয়া যায় পুকুরে। তবে বাগান দেখতে চান ত ডাক্তারবাবুর বাগান দেখে আসবেন। যেন নন্দনকানন।"

"কোথায় সে বাগান? কেমন দেখতে? কেমন ফুল?" গোকুল আগ্রহভরে বলে ফেলল।

"কেমন বাগান কেমন করে বলি? দেখেই যা বোঝা যায় না, না দেখে তার কি বুঝবেন? হাটের বেলা হচ্ছে। আমি যাই। এগিয়ে যান, ডাক্তারবাবু বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে।"

গ্রামের পথের নেশা। হাতে ছিপ, কাছে পুকুর। গোকুল বলে, "ফুল থাক্ একটু পুকুরে বসা যাক্।"

কলকাতা থেকে এসেছে শুনে কেলেগড়ের পুকুরে ওদের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মাছ ধরতে বসেও গেল ওরা। খানিক বাদেই একটা সেরচারেক কাৎলা ধরলে গোকুল। মাখন সেটাকে বঁড়শী থেকে ছাড়াতে যেতেই হাতের চেটোয় বঁড়শী গেল গেঁথে। বেশ লম্বা বিলাতী বঁড়শী। মাছধরা মাথায় উঠল। বঁড়শী ছাড়ানো নিয়ে বিভ্রাট বাধল। পাড়ার লোকেরা ছুটে এল, অপরাধ যেন তাদের। সবাই বললে, 'চল ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া যাক।'

পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল চমৎকার বাগান একখানা। যেমন তাতে গোলাপ তেমনি গ্লাডিওলাস। গ্রামের ভেতর অমন রুচির সঙ্গে সাজানো একটা গোলাপবাগান মাখন বা গোকুল কেউ কল্পনা করতে পারে নি। কোথায় তখন বঁড়শী, আর কোথায় ডাক্তারবাবু; মাখন তখন ঈদের চাঁদ দেখতে পেয়েছে। ওর সেই গ্লাডিওলাস। থরে থরে দাঁড়িয়ে আছে ফুলের ডাটি। বিঘেটাকের উপর জমি ভরে আছে রঙের উপর রঙের বৈচিত্র্যে। বাগানটায় চিতা আর মনসার বেড়া। একটা বাঁশের আগড়। কিন্তু মালী দারোয়ান সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করছে। এত ফুল, অথচ ওরা ফুলের দুর্ভিক্ষে মরছে।

ঐ হাত নিয়েও একটা ফুল ছিঁড়ে নিলে মাখন। মালী তখন প্রায় হৈ-হৈ করে তাড়িয়ে দিলে ওদের। সঙ্গের ভদ্রলোকেরা বললে, "ভয়ে কেউ ঢুকি না এ বাগানে।"

"ভয়? কিসের ভয়?" বলে কলারে গুজে রাখলে ফুলটা।

"না, দৈত্যদানব ভূতপ্রেতের ভয় নয়; ভয় ঐ ডাক্তারবাবুকেই। ঐ ডাক্তারকে ভয় করে না এমন লোক এই দেশগাঁয়ে পাবেন না আপনি।"

হাসলে শহুরে মাখন আর গোকুল চোখ চাওয়াচাওয়ি করে।

একজন লক্ষ্য করে বললেন, "শহরে বাস আপনাদের। আসল রোগও দেখেন নি, তার প্রকোপও দেখেন নি। আর এই সব জায়গায় একজন দরদী ডাক্তারের সাহায্যের কি দাম বোঝবার দরকারও বোধ করেন নি। এই ডাক্তারবাবু যখন থাকবেন না তখন আমাদের কি দশা হবে ভাবতেও ভয়ে ডরে মারা যাই। বিচক্ষণ ডাক্তার মশায়, ধন্বন্তরি। সার্জ্জারিতে মেডেল পেয়েছিলেন। যক্ষ্মারোগ ওর কাছে রোগ নয়, টাকা পয়সা ধুলোমাটি। মানুষটি এই এতটুকু, মনটা এই এত বড়। ডাক্তার বটে! ঐ দেখুন না চেয়ে, বেলা আড়াইটা হবে, এখনও ঐ বারান্দায় রুগীর দল দেখছেন? খালি হবেন সেই সন্ধ্যায়। তখন চান আহার। দিনে ঐ একবার।"

সত্যিই মাখন আর গোকুল চেয়ে দেখল সামনেই চার-পাঁচটা ভাঙা প্রাচীন মন্দিরঘেরা মস্ত একটা জায়গা। কোনও কালে চণ্ডীমণ্ডপগোছের কিছু একটা ছিল। তারই একধারে আট-দশটা থাম-লাগানো একটা বারান্দা-মত জায়গা। তার সিঁড়িতে, সামনের খোলা জায়গায়, ছই-লাগানো, কাত করা তিন-চারখানা গরুর গাড়ীর মধ্যে প্রায় ত্রিশ জনের কাছাকাছি রোগী।

একজন বুড়োগোছের মানুষ; গলায় ষ্টেথিস্কোপ ঝোলানো। নিবিষ্ট মনে একের পর এক জনকে দেখছেন আর কাগজে প্রেস্ক্রিপশান লিখে যাচ্ছেন। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই ওরা বারান্দার ধারে এসে পড়ল, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল।

চেহারায় জরা নেমেছে, তবু নাক, চোখ আর চিবুকে ধরা যায় সেই শুভোর মুখ; যার খোঁজে ওদের আসা। ডাক্তারই শুভোর বাপ এতে সন্দেহ নেই।

বাঁকাভাবে একবার চেয়ে একজন রোগীর বগলের একটা ফোঁড়া কাটার ব্যবস্থা করতে করতে ডাক্তার বললেন, "বিজয় যে? পেত্নী-মাসীর দাঁত গজাল? ভাল আছে?"

সঙ্গের ভদ্রলোকটি বললেন, "হ্যাঁ ভাল আছে। মা বলছিলেন আপনাকে একবার..."

ছুরির আঘাতে রোগীটি চীৎকার করে উঠল। কম্পাউণ্ডার আর দুটো লোক তাকে ধরে ঠেসে রেখেছে। ডাক্তার হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে বললেন, "যেতে বলেছেন নয়?... আবার যখন দাঁতের ব্যথা হবে তখন যাব। এখন দেখ না, এই নরককুণ্ড ছেড়ে কোথায় যাই? সঙ্গে দেখছি রুগী এনেছ। কি মাছ ধরলেন এঁরা?" হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন না চেয়ে।

কী আশ্চর্য্য! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখে নিয়েছেন কখন। অথচ একটা রোগীর অপারেশন সেরে নিচ্ছেন। পর পর দুটো ইঞ্জেকশন করে এবার আর একজনকে বললেন—"বেলকাঁটা তোর পা নেবেরে পঞ্চা। এ পা খানা বাদ দিতে হবে। ভেবে দেখগে যা। আর কোলকেতায় যেতে চাস যা। পা খানা যাবে তার আগে সব বুঝে আয়। নৈলে বলবি গেঁয়ো ডাক্তার পায়ের দফা সারলে।" এর মধ্যে গোটা দুই প্রেসক্রিপশান হয়ে গেল। পঞ্চা বললে, "কাটুনই পা ডাক্তার বাবু। আপনার ওপর কথা নেই। যন্ত্রণা আর সইতে পারি না।"

ডাক্তার যেন জল। পঞ্চার কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "এই নে ত্রিশটা টাকা নে পঞ্চা। এই বাবুদের সঙ্গে কোলকেতায় যা। একবার যা দেখিয়ে আয়। শান্তি পাবি। দেহের অঙ্গ। যাওয়ার দুঃখু কি কম? যা বাবা একটিবার দেখিয়ে আয়। আরও লাগে দেব। ভাবিস না। থাকলে মানুষ খরচই করে।"

ইতিমধ্যে কখন এসে মাখনের হাতখানা খপ করে ধরেই এক চাপ। বঁড়শীটা একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে চেটোর অপর পারে মুখ বার করলে। যন্ত্রণায় মাখন নীল হয়ে উঠে বললে, "ব্রুট!" বলেই হাতটা সরিয়ে নিলে।

ডাক্তার গোকুলের মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, "তেমন তেমন যন্ত্রণায় রুগী আরো কত কি বলে। ও ত মুখেই শুধু বললে।"

পঞ্চা বললে, "আপনিই কাটুন।"

রুদ্রমূর্ত্তি ডাক্তারের—"না না, এখন আমার মাথার ঠিক নেই।

এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব না। দেখিয়ে আসতে হবেই তোমায়, যাও।"

একটা তারকাটা কাঁচি নিয়ে মাখনের হাতে বঁড়শীর সুতাবাঁধা মুখটা কেটে ফেলে অন্য দিকটা সহজে টেনে বার করে ফেলে দিলেন। বিশেষ লাগল না মাখনের। একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে একটু এন্টিসেপটিক লাগিয়ে ছেড়ে দিলেন।

ততক্ষণ রোগীর দল প্রায় খালি।

মাখন আর গোকুল দাঁড়িয়ে। বললে, "আপনার ফি?"

"ষোল টাকা"—গম্ভীরভাবে বললেন ডাক্তার।

ওরা চুপ করে আছে দেখে বললেন, "নেই বুঝি? আচ্ছা থাক।" তার পরেই ডেকে বললেন, "ওরে চৈ, ভেতরে গিয়ে বল এ ভদ্রলোক দু'জন খাবেন।" বলেই মাখনের কলারের থেকে গ্লাডিওলাসটা হেঁচকা টান মেরে তুলে নিয়ে সন্তর্পণে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, "এ গাঁয়ে এ ফুল কেউ ব্যবহার করে না। কেন নিয়েছেন? কোথায় পেলেন? নিশ্চয় মালী দেয় নি।"

মাখনের ভাল লাগছিল না ডাক্তারের মেজাজ। বললে, "না মালীকে বারণ করার অবসর না দিয়েই ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। এককালে টাকা দিয়ে অনেক কিনেছি কিনা, তাই আজ একটা নিলামই বা।"

"টাকা দিয়ে?...কবে?...ইদানী?"...ক্ষেপে গেলেন যেন ডাক্তার।

তাড়াতাড়ি গোকুল বললে, "না না ঢের আগের কথা। আপনার ছেলে আমাদের সাপ্লাই করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

"আপনারা গাঙ্গুলী?"

"হাঁ, শুভোবাবু কোথায়?"

ডাক্তার বললেন, "ভেতরে আছে। দেখা হবে যান। এখন নাওয়া খাওয়া সারুন।"

গোকুল সুবিধে পেয়ে বলল, "মাছ ধরতে আসি নি। এসেছি এই ফুলের তল্লাসে। এ ফুল না পেলে না খেয়ে মরতে হবে। আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি। বলুন হতাশ করবেন না। তবে খাব।"

ডাক্তারবাবু মধুমাখা কণ্ঠে বললেন, "দেবতা আপনারা; কিন্তু ফুল ত আমার নয়। ফুল সব তারই। সে নিজের সখে আমার পেঁপেবাগান ফেলে দিয়ে ঐ ফুলের বাগান করেছে। তারই সখ। আমি ত এই নিয়েই থাকি। ফুলের আর কি করি। আপনারা আমার অতিথি। নাওয়া খাওয়া সারুন। তারপর তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন। যদি বোঝাতে পারেন, সে-ই ব্যবস্থা করে দেবে। আমি বাধা দেব না।"

গোকুল আর মাখন পরম পরিতোষ সহকারে খাওয়া সারল। ইচ্ছে ছিল বিকেলের গাড়ীতে যায়; কিন্তু খাওয়া সেরে গড়িয়ে উঠতে উঠতে পাঁচটার গাড়ী চলে গেল। শীতের বেলা। তখন সন্ধ্যা। চা খেয়ে ওরা ডাক্তারবাবুর ঘরে গেল।

ছোট্ট ঘর। একটা দরজা আর একটা জানলা। জানলাটা খোলা। ওপরের অর্দ্ধেকের একটা পাট খোলা। ঘরের ওপর বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো। মশারির চালে মশারি গুটিয়ে তোলা। কনকনে মেঝের একখানা মাদুর বিছানো। আর শিয়রের ধারে একগাদা মাসিক পত্র। সবই বিলিতী; গ্লাডিওলাস সংক্রান্ত মাসিক পত্র। সারা দেওয়ালে পেরেক গাঁথা; তাতে সব নানা আকারের থলে ঝোলানো। মেঝেয় কাগজের দোনা, কাপড়ের থলে, কাঠের বাক্স, বড় মুখওয়ালা বোতল, টিন ইত্যাদি জড়ো রয়েছে। সবের মধ্যে ছোট ছোট পেঁয়াজের আকারের গুটি ভরা। ডাক্তার একটা পাইপের মধ্যে বিড়ির তামাক ঠাসছেন আর ধমকে ধমকে ধোঁয়া ছাড়ছেন। হাঁটু দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে বসে আছেন। ওদের দেখেই বললেন, "এসেছেন? আসুন, বসুন।" অতি ধীর নম্র কণ্ঠস্বর। যেন অক্লান্ত জরাগ্রস্ত। অন্য মানুষই যেন। ঘরের মেঝেয় একটি হারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে।

গোকুল তখন কলকাতা ফেরার জন্য ব্যস্ত। অন্ততঃ রাত নটার গাড়ীখানা যদি ধরা যায়। বসেই বললে, "কৈ ডাক্তার বাবু, শুভোবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না?"

ডাক্তার জুল জুল করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পরেই বললেন, "খবর দিয়েছি। দেখা হবে। ততক্ষণ বসুন, কথা হোক। গ্লাডিওলাসের কারবার কতদিন করছেন?"

"আমরা ত ফুলেরই কারবার করি। বাগানও আছে নিজেদের। গ্লাডিওলাস বেচতাম কালিম্পং থেকে আনিয়ে।"

"ষ্ট্যার্টের ঐ থ্যাবড়ামুখো কাঞ্চনফুলগুলিকে আপনি আর গ্লাডিওলাস বলবেন না মশায়। তা হলে এ ঘরে অনেকে কেঁদে উঠবে। ঐ দেখছেন দেয়ালে সব সারি সারি থলে ঝুলছে; দেখছেন মেঝে! এ সব রক্তবীজের প্রাণ। জ্যান্ত প্রেতাত্মা ভরা ওতে। থলেতে থলেতে ঘুমোনো আত্মা। গ্লাডিওলাসের বাল্‌ব। প্রত্যেকের গায়ে বংশ, বছর, রং ইত্যাদি সব ঠিকুজী লেখা। এদের মিশিয়ে মিশিয়ে, এর সঙ্গে ওর মিলন ঘটিয়ে, ও থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়ে, এর আত্মার সঙ্গে ওর দেহের মিতালি করিয়ে, আমায় কারবার চালাতে হয়। এর গালের রং ওর ঠোঁটে নিতে হয়, ওর চাউনি দিয়ে একে সাজাতে হয়, এর চপলতা দিয়ে ওর দেহের গুরুত্বকে লঘু করতে হয়। এদের জাত আছে, বংশ আছে, গোত্র আছে, আভিজাত্য আছে। এদের সমাজে বসে আপনি আর ষ্ট্যার্টের নাম মুখে আনবেন না।"

গোকুল অবাক হয়ে শুনছিল। বললে, "যেন কোনও তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর শবসাধনার কথা শুনছি।"

"ঐখানেই ভুল। দেখুন আমরা অতীত আর বর্ত্তমান নিয়েই যত কাব্যকলা ইত্যাদি রচনা করি। তাজমহল, মৃতা মমতাজের স্মৃতিসৌধ—যা দেখি সবই 'ছিল' বা 'আছে'। 'হবে' যা, তাকে আমরা দেখি না। শবসাধনাও ত যে দেহ 'ছিল' তাকে নিয়ে সাধনা। আমার সাধনা 'যে হবে' তাকে নিয়ে। এই বাল্‌ব...

দেখুন। আমি এটাকে বেঁধে রেখেছি আর একটার সঙ্গে। দুটো টুক্‌রোকে আমি বেঁধে রেখেছি। মনে হচ্ছে এ থেকে বেরুবে নতুন একটা ফুল, যার পাতায় দুটো রং ধরবে। এখন এদের মিলন যদি সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত হয়ে থাকে তবে আসছে শীতে গ্লাডিওলাসের ফ্যাশান-মহলে নতুন একটা পোশাকের ঝিলিমিলি খেলে যাবে। এমনি প্রত্যেকটাকে নিয়ে আমার খেলা চলছে। কেবল সৃষ্টির খেলা। তাই আমার সাধনা শবসাধনা নয়, প্রাণ-সাধনা, জীবন-সাধনা।"

গোকুল বললে, "তবে বললেন আপনি কিছু জানেন না, শুভোবাবুই জানেন। এখন তো দেখছি আপনিই সব করছেন।"

বাল্‌বগুলো বোতলে ভরতে ভরতে ডাক্তারবাবু বললেন— "না, না—শুভোই সব করে, শুভোই। আমি তো দিনরাত কেবল ডাক্তারি করি। ও-ই একবার গিয়েছিল কোয়েটায়। সেখানে এক ডাচ সাহেবের কাছে এই বিদ্যে আয়ত্ত করে কিছু বাল্‌ব নিয়ে এসে গাঁয়ের জমিতে আর্জায়। জোয়ান ছেলে, গিয়েছিল এঞ্জিনীয়ারিঙের কাজে বিদেশে। ফিরে এল মেয়েলি এক বিদ্যে আর সর্বনাশা এক নেশা নিয়ে। রাগ হ'ল। এক-দিন বেদম মার লাগালাম। ওরা অবশ্য বলে আমি সেদিন মদ খেয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা, মদ আমি রোজই খেতাম, এখনও খাই। তা বলে কি রোজই মারি? এই ধরুন না আপনাদেরই কি মেরেছি? আর যদি মারিই, জোয়ান ছেলে—পালমুনারি আর্টারিজ রাপচার হয়ে যাবে একি একটা কথা হ'ল? কিন্তু হলে কি হবে? গ্লাডিওলাস ওর প্রাণ। ও তাই নিয়ে মেতে রইল। আমি তো রাগ করে দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। ও তখন বাগানেই কুঁড়ে বেঁধে থাকতে লাগল। বলুন তো কার কথা বলছি?—খেই হারিয়ে যাচ্ছে না তো? আপনাদের সেই শুভোবাবুর কথা। তখনই ঐ ফুল নিয়ে সে বেচতে যেত। নইলে খাবে কি? তা না হলে শুভো বেচবে গ্লাডিওলাস? বাপের মাংস বেচবে ও তবু গ্লাডিওলাস বেচবে না, এমনই ভালবাসতো ও গ্লাডিওলাসকে। আরে মশাই বলব কি, মুখুজ্যে বাড়ীর সেরা মেয়ে, ওর খেলার সাথী মনের জুটী দুর্গাকে ও ভালবাসতো। বিয়ে ঠিক। গ্লাডিওলাস নিয়ে আমার সঙ্গে বিবাদ শুনে ওর বাপ বললে, "দুর্গার বিয়ে দেব না তোমার সঙ্গে যদি গ্লাডিওলাস না ছাড়।" হ'ল না বিয়ে মশাই, হ'ল না। দুর্গার বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু শুভো রইল গ্লাডিওলাস নিয়ে। এমনি ছিল ওর গ্লাডিওলাস প্রীতি। কিন্তু পালমুনারি আর্টারিজ যার ছেঁড়া তার আর আছে কি? দিনে মাঠের কাজ, রাতে হাটের কাজ, সবই তো ওর শীতকালে! ঠাণ্ডায়, জাগরণে, পরিশ্রমে, চিন্তায় গ্লাডিওলাস ওকে ধরল যেন—La Belle Sans Merci-র মতো—ওঃ বুঝলেন না কথাটা? যাক্ সব বুঝে কাজও নেই। এখন অবশ্য আমি ওর খুশীতে খুশী। আমার সব বাগান তুলে আমি কেবল গ্লাডিওলাস লাগিয়েছি। দেখেছেন তো বাগানখানা। বেশ হয়েছে, নয়?"

গোকুল কথা বলতে পেয়ে যেন বাঁচল। বললে, "সত্যিই অপূর্ব বাগান। বেচেন না কেন ফুল? ওর তো হাজার হাজার টাকা দাম।"

রেগে বলেন ডাক্তার—"ছিল তাই। এখন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা দাম। জিগ্যেস করুন শুভোকে। শুভোর এখন ঐ সব। এত লোভ এখন ওর ওই ফুলে যে কারুকে দেয় না। সব ফুল নিজে নিয়ে বসে থাকে, নিজে সাজে, নিজে ভোগ করে। কারুকে একটি দেয় না। চলুন শুভোর ঘরে যাই। পাশেই শুভোর ঘর।"

চমকে উঠল যেন গোকুল। পাশেই ঘর? অথচ বাড়ীখানা নিঝুম। ডাক্তারের গলা এমন কিছু খাটো নয়। একটা হাল্‌কা নরম সুস্নিগ্ধ গন্ধ নাকে আসছিল; যেন রাশি রাশি গ্লাডিওলাস নিকটেই কোথাও ফুটে আছে।

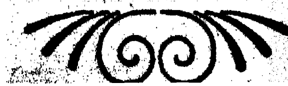
ডাক্তার বেরুলেন। ওরা দু'ভাই পিছু নিলে। পাশে একখানা ঘরে দরজা ভেজানো। ডাক্তার বললেন, "দাঁড়ান, আগে দেখি, জেগে না ঘুমিয়ে।" বলেই ঢুকে গেলেন। ওরা দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে একটা ম্লান সুস্নিগ্ধ আলো। ধূপের গন্ধে মিশে মিষ্টি গ্লাডিওলাসের গন্ধ। ডাক্তার ডাকল "আসুন, জেগে বসে আছে বিছানায়।"

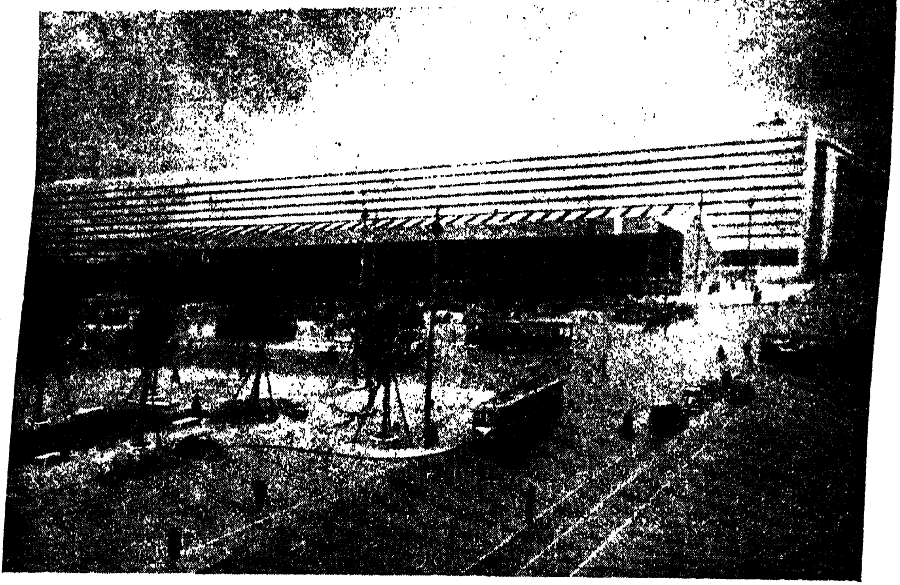
গোকুল ভিতরে ঢুকেই মাখনের হাতটা ঠেসে ধরে দাঁড়িয়ে রইল—বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে।

ঘরের মেঝেয় ধবধবে বিছানা পাতা। তার শিয়রে তিনটি ঘিয়ের প্রদীপ। বিছানার ওপর উজাড় করে ঢালা গ্লাডিওলাসের রাশ। তারই বর্ডার করা, সাজ করা, বিচিত্র বর্ণসমাবেশে। যেন সুনিপুণ হাতে তৈরি কার্পেট একখানা! পাশে চকচকে একখানা সিলভারের পিকদানী। একটা জলচৌকীর উপর ধূপদানে ধূপ পুড়ছে। জনপ্রাণী নেই ঘরে। ডাক্তার বিছানার পায়ের গোড়ায় বসে বলছে—"দেখছেন কেমন হাসছে শুভো? চেনা জন কিনা, তাই। তা বলে ফুল ও একটাও দেবে না কারুকে। বিশ্বাস না হয়, আপনারাই জিজ্ঞাসা করুন।"

শূন্য ঘরে কথাগুলো যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাত ন'টার গাড়ীতেই ওরা ফিরে এল কলকাতায়। ডাক্তার নিজে ওদের ষ্টেশনে দিয়ে গেলেন।





রেলষ্টেশন, রোম

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

দুই

২৩শে নভেম্বর '৫৩। ঘুম ভাঙল অক্ষয়বাবুর ডাকে—ও কুণ্ডুসাহেব, নেপলস এসে গেছে! উঠুন, উঠুন। ও কুণ্ডুসাহেব!

আমি পাশ ফিরে বললাম—ইশ! এমন ঘুমটা মাটি করে দিলেন! ভোরের আমেজটুকু, কি আরাম বলুন দেখি। আপনাকে আর মানুষ করা গেল না।

—মাটি করব কি মশাই? মাটিই ত এসেছে। ঐ দেখুন।

—আসুক গে। আমার জলই ভাল ছিল। চাই না মাটি।

—হাঁ, তা ছিল না! নইলে কাল রাত্রে বারটা একটা পর্য্যন্ত লাউঞ্জে হাউসি-হাউসি আর হর্স-রেস নিয়ে মেতে থাকবেন কেন?

—আজকের টিপস-এর শিলিংগুলো কালই কিন্তু গুছিয়ে নিয়েছি। আর তা ছাড়া করবই বা কি! আপনি ত আপনার আধ্যাত্মিক দর্শনে ডুবে থাকেন। দীপক ছুটোছুটি করছে রঙীন প্রজাপতিদের পেছনে। মুখার্জ্জিমশাই আছেন ওঁর ইংরেজী নভেল নিয়ে। তা হলে আমি যাই কোথায়?

—কেন, ডেকে ঐ মজলিসিদের দলে?

এর পরেও আর শুয়ে থাকার সুখ সইবে কেমন করে? উঠে বসতেই হ'ল।

আমি বললাম, ও, ঐ যাদের কথায় ফুলঝুরি, হাসিতে রংমশাল, আপনি তাদের কথা বলছেন? হাঁ, একদিন বসেছিলাম ওদের মজলিসে। কে কবে যেন এক ওভারে দুটো উইকেট পেয়েছিল, একটুর জন্যে হ্যাটট্রিক্‌টা মিস করেছিল। কে এবারে ডি-ফিল পেতে গিয়ে অনেকদিন স্নানও করে নি, খায়ও নি। মধুবালা ওদেরই একজনকে অনেক সেধেছিল ওর সঙ্গে কো-এক্ট করতে। কিন্তু মধুবালার চুলে কোটি'র উগ্র গন্ধ, সেটাই ও সহ্য করতে পারে নি। একটি মেয়ে বলল, ও একবার ওর প্রেমিকের 'অবসটিনাসি' সহ্য করতে না পেরে এমন চড় মেরেছিল যে বেচারীকে মাসখানেক দু'বেলা দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে হ'ত। আর একজন কে পাঁচ বছরেও বি-কম পাস করতে পারল না যখন, তখন ওর কোটিপতি পিতা বললেন, 'তোর এখানে কিছু হবে না, তুই বিলেতেই যা।' আর আমি বসতে পারি নি। পরেও আর কোন দিন যাই নি। ঐ প্রথম ও শেষ।

অক্ষয়বাবু অবাক হয়ে বাক্স-গোছানোয় মন দিলেন। নিঃশব্দে। সদ্য জেগে উঠে বিছানায় বসেই এত কথা বলব, তার জন্যে নিশ্চয়ই তৈরি ছিলেন না। বেশ টের পেলাম।

পোর্ট-হোল দিয়ে উঁকি দিলাম। সকালের সোনালি রোদ বন্দরের বাড়ী-ঘর রাঙিয়েছে। সামনেই ছোট-বড় কতকগুলো জাহাজ, ক্রেন, মাল-টানা লরী। ন্যাপোলি বন্দর।

মুখার্জ্জিমশাই মনে হয় বাড়ীর শিকড় অবধি উপড়ে নিয়ে এসেছেন। হয়ত ফেরবার তাগিদ নেই। কিংবা উনি মিসেস নাটেকারের জগতের লোক। দু'বেলা দু'রকম স্যুট না পরলে পুরোপুরি সাহেব হওয়া যায় না হয়ত। ওঁর দুটো কেবিন-ট্রাঙ্ক, দুটো স্যুটকেস, তিনটে হাত-ব্যাগ, একটা ছাতি, একটা লাঠি। পরনে তিন-পিস স্যুট, হাতে ওভারকোট, মাথায় ফেল্ট, মুখে সিগার।

কিন্তু উনি চলেছেন যখের ধন আগলে—আবিষ্কার করতে আর এক স্বপ্ন-চিচিংফাঁক। ওঁর সামান্য 'টিপস'-এর অসামান্য মহিমায় সমস্ত মাল পড়ে রইল নীচে, ডকের উপর। কাষ্টমসে এলই না। শেষে অক্ষয়বাবু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এক পোর্টার পাকড়ালেন।

নূতন আর এক জট পাকাল আমাদের ইন্দ্র। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে অবশেষে এক ট্যুরিষ্ট-গাইডের আঁচলে গাঁটছড়া বাঁধল। আমরা পথের চিন্তায় চোখ বুঝলাম। রেল-ষ্টেশনে পৌঁছে কপালকে দোষী করে গাইডের মুখে হাসি ফুটালাম। পকেটের বোঝা অনেকটা কমল। সবশেষে কুলীন সাহেব-কুলিদের জুলুমি দক্ষিণা মিটিয়ে রোমের ট্রেনে চড়ে বসলাম। তখন বেলা এগারটা।

রেলপথের দু'ধারে সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে আছে। সুন্দর মিষ্টি রোদ। উঁচু-নীচু পাহাড়। মাঝে মাঝে টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ী। আর জনপদ ঘিরে সবুজ ফসল-ক্ষেত।

তবু তিতো মন এই মিছরির জলেও ভিজল না। ঐ ছড়ানো সৌন্দর্য্য শুধু চোখ দিয়ে খুঁটে কুড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি যেন। ভাবছি, ভাষা জানি না। চেনা লোক নেই, আস্তানা দূরে থাক। তার উপর মাছি-ভনভন ট্যুরিষ্ট-গাইড ও চোখ-মিটমিট গুণ্ডা-কুলি। শাঁসালো শিকার ওরা এক নজরেই চিনে নেয়। আবার ভাঙা কপালটার ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে ভাবনাকে উড়িয়ে দিলাম আকাশে।

রোমের রেল-ষ্টেশনে পা দিয়েই মনে হ'ল, এমনটি আর কোন দেশে নেই। হয়ত আধুনিকতার লীলাভূমি আমেরিকাতেও না। আমেরিকায় যদি আধুনিক, রোম-ষ্টেশন তবে আধুনিকতম। ভারী কাঁচের এমন শিল্প-নিপুণ প্রয়োগ সবারই চোখে-মুখে বিস্ময় ফোটায়। ঝকঝকে মেঝেটা আয়নার মতই প্রতিফলক। যত্রতত্র শুয়ে বসে নেই কেউ। নেই গয়াযাত্রীর পোঁটলা নিয়ে কুলিদের হাতাহাতি।

ইন্দ্রর কনুইয়ের খোঁচায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মিসেস গোস্বামী এসেছেন মিঃ মুখার্জ্জিকে স্বাগত জানাতে। মিষ্টার গোস্বামী কি একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার চাকুরে—রোমেই।

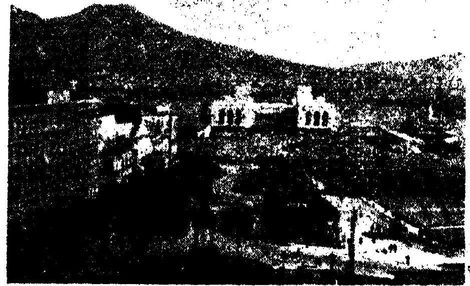
মিসেস গোস্বামী বার-তিনেক বললেন, আমার ত মাত্র একটা এক্সট্রা কট আছে, শোবার ব্যবস্থাই বড় অভাব। I am so sorry! Really! (আমি সত্যি সত্যিই বড়ই দুঃখিত)।

এর পর উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকাটা [illegible]। আমি বললাম, আপনি মুখার্জ্জিমশাইকে [illegible] নিয়ে যান।

আমরা যাহোক করে খুঁজে পেতে নেব। আপনি ভাববেন না।

মিসেস গোস্বামীর ঠোঁট দুটোয় লজ্জা-মেশানো হাসি ফুটল। আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অক্ষয়বাবু নির্ব্বিকারচিত্তে হাতের ব্যাগটা ডান হাত বাঁ হাত করলেন। মুখার্জ্জিমশাই আমাদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে ছড়ি ছাতা সামলে গাড়ীতে উঠলেন। আমরা বাঁচলাম। এখন থেকে শুধু নিজেরটাই নিজেকে সামলাতে হবে।

ইন্দ্রকে নিয়ে যেতে এসেছেন মিষ্টার রাও। হয়ত এমব্যাসির কেউ হবেন। ওরাও চলে গেল।



নেপ্‌লস্‌

যশোবন্ত আর আমি ভাগ্যের ডিঙি চড়ে ভেসে পড়লাম অজানা রোম-সমুদ্রে। অজানায় আশঙ্কা আছে। রোমাঞ্চও আছে।

২৪শে নভেম্বর '৫৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রী-দপ্তরের কাজগুলো শেষ করে 'ইসমেও'তে গেলাম। 'ইসমেও'র আসল নাম 'ইসতিতুতো ইতালিয়ানো পের ইল মেদিও এদ এসত্রেমো ওরিয়েন্তে।' এটা ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট। ডিরেক্টর স্বনামখ্যাত প্রফেসর তুচ্চি। এখানে হিন্দী, চীনা, জাপানী এবং আরও অনেকগুলো ভাষা শেখানো হয়। এশিয়ার সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা হয়।

আলাপ হ'ল ভারতীয় ডক্টর তোমর-এর সঙ্গে। অনেক কথা হ'ল ভারতভক্ত ইটালীয়ান মহিলা সিনিয়রিনা লোকুর্চোর সহিত। দু'জনেই 'ইসমেও'র উৎসাহী কর্ম্মী ও প্রফেসর তুচ্চির এসিষ্ট্যান্ট। মিস লোকুর্চো দু'বছরে হিন্দী আয়ত্ত করেছেন, বললেনও অত্যন্ত সহজভাবে। আর ভারতীয় আমি প্রতিবারই বিদেশী ইংরেজীকে আঁকড়ে ধরলাম। অপরিসীম লজ্জায় বার বার মাথা নীচু করেছিলাম।

বললাম, আপনি এতদূর যখন এগিয়েছেন তখন জানেন নিশ্চয়ই, আমাদের ভাষা অনেক, উপভাষার অন্ত নেই।

মিস লোকুর্চোকে আর কিছু বলতে হয় নি। উনি এবার ইংরেজীতেই সুরু করলেন। বুঝিয়ে দিলেন রামায়ণ মহাভারতের মূল সুরটি। বুঝিয়ে দিলেন [illegible] ভাষা বাংলার সঙ্গে রাষ্ট্র-

ভাষা হিন্দীর কোথায় মিল, কোথায় গরমিল। বুঝিয়ে দিলেন আমাদের প্রদেশগত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির বৈষম্য।

অবাক হলাম।

—কি, বলুন ত, এ-সব সত্যি কিনা?

মিস লোকুর্চো আমাকে প্রশ্ন করে সকৌতুক দৃষ্টিতে তোমরজীর দিকে তাকালেন।

বললাম, চমৎকার। আমাদের দেশ সম্বন্ধে আপনার এই আগ্রহ দেখে সত্যিই গর্ববোধ করছি।

ডক্টর তোমর বাঙালী নন্। কিন্তু পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন। শান্তিনিকেতনে ছিলেন অনেকদিন।

আধ ঘণ্টার আলাপে গভীর আন্তরিকতার আভাস মিলল। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, বাংলাকে আমি ভালবাসি। বললেন আরও নানান কথা, ধীরভাবে, শুধোলেন ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন। শান্তিনিকেতনের লাল ধুলোয় আগের মতই বৈশাখী ঝড় উঠে কিনা। পৌষ-মেলায় সাওতালদের বাঁশীর সুরে এখনও হিন্দী গানের ছোঁয়াচ লাগে নি, না? বাংলায় সম্প্রতি কি কি বই সাড়া জাগিয়েছে? আচ্ছা, কলকাতার রাস্তায় এখনও কি ষাঁড়ের সভায় যানবাহনের কবিতা-যুদ্ধ চলে? আজকাল নিউ এম্পায়ারে গুরুদেবের গীতি-নাট্যগুলোতে লক্ষণীয় কোনটা, অভিনয়ের সমারোহ না অনুভূতির গভীরতা?

এক সময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে থেমে গেলেন তোমরজী। হয় ত শান্তিনিকেতনের কোন বিশেষ জায়গায় মনটা ওঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল।

পাশাপাশি আমরা হাঁটলাম আরও কিছুক্ষণ। হাঁটলাম বিকেলের সোনালি রোদ্দুরে, গাছের ছায়ায় ছায়ায়, ঝলমল শহরকেন্দ্রের ধারে ধারে—এ-পথে, ও-পথে। পুলকে পুলকে ভরে গেল মনের সবটুকু।

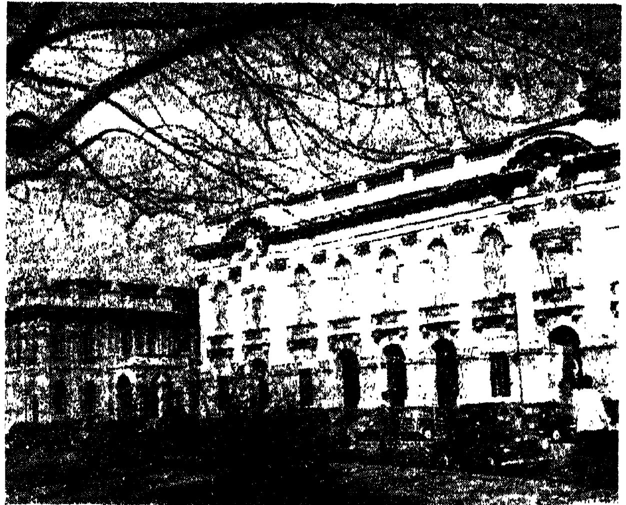
সময় ছিল না আর। বিদায় নিলাম। মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপও যে বিদায়ের সময় মনকে এতখানি ব্যথিত করে তোলে এটাও যেন নতুন করে অনুভব করলাম। মনে থাকবে বহুদিন আজকের এই মুহূর্তগুলো। মনে থাকবে, রোমের এই বিকেলটা, পথের শীতে শীর্ণ হলুদ পাতাগুলো।

রাতের গাড়ীতে চেপে বসলাম—ইন্দ্র, যশোবন্ত আর আমি। মিলান আমাদের শেষ বিরতি। রোমের পান্থশালায় একটা রাত থেমেছিলাম—স্কলারশিপের টাকা গুণতে। আর জানতে সেই ঘরের ঠিকানা, যেখানে আমাদের কাঁধের বোঝা নামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেব। সে কতদূর? আর কতদূর?

২৫শে নভেম্বর '৫৩। ষ্টেশনের জমা-ঘরে মালপত্র সঁপে দিয়েই পলিটেক্নিকে ছুটলাম। আমাদের লক্ষ্য মিলান পলিটেক্নিক্। উপলক্ষ—জ্ঞানের আবাদে জল-সিঞ্চন।

উদ্বেগ ছিল না একটুও। কারণ, ট্রলি বাসের কাণ্ডাক্টরটি ইংরিজী বলে—যেমন হিন্দী বলে আমার-কাছে-শেখা ভারতীয় সাহেবেরা। কাজেই ষ্টপেজ-হদিশের বিড়ম্বনায় মনকে পীড়ন করতে হ'ল না। নির্বিকার দৃষ্টি মেলে অপস্রিয়মাণ মিলান-প্যানোরামা উপভোগ করলাম।

পলিটেক্নিকের সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম। আমার ডিপার্টমেণ্টে পৌছলাম অবশেষে। দেখা হ'ল সেক্রেটারি



মিলান পলিটেকনিক

সিনিয়ার রেশপিগি ও তাঁর মেয়ে সিনিয়রিনা মারিয়াপিয়া রেশপিগির সঙ্গে। শেষ হ'ল পরিচয় দেওয়া ও নেওয়া, মাথা নোয়াল, আর ঠোঁটে একটু হাসি ফোটাল। মাঝে মাঝে হাতে হাত মেলাল, নরম সুরে দু'একটা কথা—রোম কেমন লাগল? ট্রেনে কষ্ট হয় নি ত?

জাহাজে গ্রামার-বইগুলোতে মনোযোগ কিছু কম দি' নি। কিন্তু সংস্কৃতের ধাতুরূপও ত সারা বছর ধরে পড়ে পরীক্ষার সময় ঠিক ভুল হয়ে যেত। আজও ক্রিয়াপদের লেজুড়গুলো বাদ দিয়েই অসমাপিকায় কথাবার্ত্তা চালালাম।

বৃদ্ধ রেশপিগি মশাইয়ের খাতির-যত্নে লজ্জা পেলাম। অপচয়ের মাত্রা-জ্ঞান এখনও ওঁর হয় নি। কবে আর হবে!

উনি আমাকে নিয়ে এলেন পাঁচ মিনিটের পথ ষ্টুডেন্ট-হোষ্টেলে—'কাসা দেল্লো স্তুদেন্তে'তে। সোজা খাবারঘরে নিয়ে গেলেন।

কুয়াশা-কুয়াশা ধোঁয়ায় আর লক্ষ ভ্রমর-গুঞ্জনে লাঞ্চ চলেছে তখন। বেলা একটায়।

টেবিলে চেয়ারে বিরাট হলটা ভরতি। কয়েকজন অপেক্ষমাণ ছাত্রছাত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা বিশ্রী অস্বস্তি নিয়ে। শূন্য চেয়ার খুঁজে খুঁজে চোখ দুটোয় ক্লান্তি এল। দাঁড়িয়ে থেকে পাদুটো অবসন্ন হ'ল।

এক সময় একটি মেয়ে-পরিচারিকা হাতছানি দিয়ে ডাকল। মনে হ'ল আমাকেই, আর একবার মনে হ'ল আর কাউকে হয় ত। পেছনে চাইলাম। পেছনের ছেলেটি মৃদু হেসে আমাকে ঠেলে দিল। ওর চোখ দুটো যেন বলে দিল—যাও। তোমাকেই ডাকছে।

এমন অকারণ পক্ষপাতিত্বের সলজ্জ স্বীকৃতি জানিয়ে আমি অগ্রসর হলাম সামনের তিন জনের পাশ কাটিয়ে। বেশপিগি মশাই বিদায় নিলেন।

খেয়ে ঘরে একটু বসেছি। চার দেওয়ালে চোখ নাচাচ্ছিলাম। দরজায় টোকা পড়ল। সিনিয়র ফিলিপ্পিনি বেশপিগির সহকারী। আমার অবাক হওয়া চোখের সামনে হাত মুখ নাড়লেন। থেমে থেমে ইটালীয়ানে বাকিটুকু বললেন। বোঝালেন, আমার সঙ্গে ষ্টেশনে যাবেন। জমা-ঘর থেকে আমার মালগুলো নিয়ে আসতে। ভাবছিলাম, অবাক হব কি খুশী হব। কোনটার জন্যেই সময় পেলাম না। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ফিলিপ্পিনি রাস্তায় নামলেন। তখনও ভাবছি।

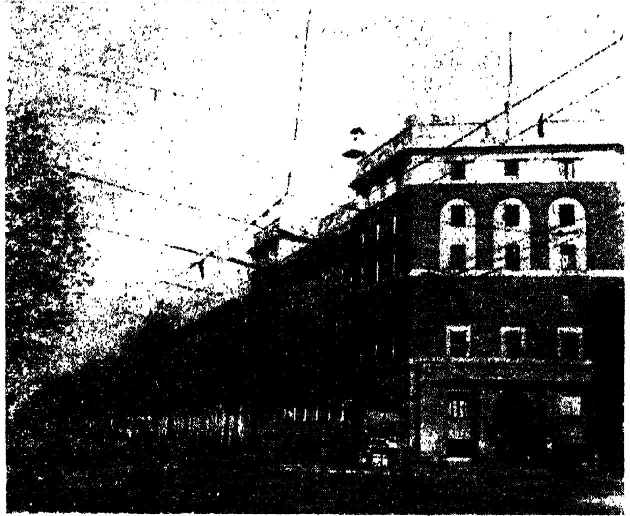
বাস না নিয়ে উনি হাঁটা পথ ধরলেন। মিনিট কুড়ির রাস্তা। ভাঙা ইটালীয়ান, গোটা ইংরিজী, আর কিছু অঙ্গভঙ্গী, সব মিশিয়ে অনেক পিপাসা মেটালাম সিনিয়র ফিলিপ্পিনির। শুনালাম সোদরে বাঘের কথা, বাজার-দোকান কাফে-রেস্তোরা। পরিবৃত আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, ধর্ম্ম ও শ্রেণীর কথা। এমনিধারা অনেক বিচিত্র আলোচনায় ষ্টেশনে পা দিলাম।

ফিলিপ্পিনি আমার গন্ধমাদন স্যুটকেসটা ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সি, ট্যাক্সি থেকে ঘরে এনে দিলেন। কুলিকে ফাঁকি দিলেন। আমায় করলেন অশেষ কৃতজ্ঞ। আমার মুখ দেখে বুঝলেন। তাড়াতাড়ি মাথা থেকে টুপিটা একটু তুলে বললেন—এ কিছু না, কিছু না। এতে আপনার লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

ওঁর কথায় আমার দুই চোখে বুঝি কৃতজ্ঞতা আরও বেশী করে ফুটল। উনি তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন।

৩০শে নবেম্বর '৫৩। একটু আগেই পৌঁছেছি পলিটেক্নিকে। আজ আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সূচনা-সভা। ডিরেক্টর প্রফেসর কজ্জির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ছেলেরা ব্যস্ত পায়ে আনাগোনা করছে। নতুন বছরের নানান সম্ভাবনায় হয় ত মশগুল হয়েছে ওরা। এবারে যাদের ফাইনাল, তাদের কপালে দুশ্চিন্তার কুঞ্চিত রেখা। চলাফেরা ত্রস্ত। মুখভাব স্তিমিত। করিডোরের মেয়েরা, ঐ যারা চলেছে অকারণে



কাসা দেল্লো'স্তুদেন্তে: মিলান

হল্লা করে, ওরাও তাদের চোখে চাঞ্চল্য ফোটাতে পারে না এতটুকু।

শীত এখনও আসে নি।

প্রফেসর সিলভিও কজ্জি এলেন। খুব আগ্রহভরে হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—You are really punctual. To the minute! That's nice! (ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এসেছ। বেশ।) চল।

কন্ফারেন্স রুমে পা দিয়ে অন্য সাত জন ছাত্রকে দেখলাম। ঘরটির পরিচ্ছন্নতায় ও স্নিগ্ধতায় খুশী হলাম।

প্রফেসর কজ্জি বলে গেলেন অনেক কথা। কতদিন পড়া হবে, কতদিন ছুটি। যাঁরা পড়ান, তাঁরা একাধারে কৃতী শিক্ষক ও অভিজ্ঞ শিল্পপতি। তাঁরা শুধু পুথির বিদ্যা নিয়েই শিক্ষকতা করছেন না। বললেন, ছাত্র হিসেবে আমাদের কি কর্ত্তব্য। বললেন সব খুটিনাটি। প্রায় দু'ঘণ্টা পর যখন থামলেন, তখন আর কিছুই জিজ্ঞাসা করার ছিল না। উনিই সব সহজ ও স্বচ্ছ করে দিয়েছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর '৫৩। আজ অবসর পেয়েছি ঘুরে বেড়ানোর। সান্-সেট বুলভারে, আর মণিমালিনীর গলিতে।

মিলান শিল্প-শহর। শহর ছোট। শহরতলীটাই বড়।

শহরে ছাই-ছাই বাড়ী। যেন সারি-দেওয়া তালগাছ। অনেক উচু-উচু। না আছে রং, না আছে শোভা।

শীত এসেছে। রাস্তায় লোকজন অল্প। কুয়াশা প্রচুর। গাছে পাতা নেই। আগ্রহ নেই চলাফেরায়, কারুরই। সমস্ত নির্জীব, ঠাণ্ডা—এমনকি সকালবেলার দুধটা পর্য্যন্ত।

কিন্তু শহর-কেন্দ্রে উষ্ণতার যতি নেই। ভিয়া মান্জোনিতে, স্কালার আশেপাশে সপ্ত রঙের রোশনাই। অগণিত আয়না-পালিশ মোটর। 'বার'-এর বোতলে গেলাসে নানা রঙের সুরা-রামধনু। অনেকেরই গায়ে ধূসর-খয়েরি ফার। মর্য্যাদায় ঘন, দামেও ভারী।



'সান্-সেট' বুলভার, মিলান

আর শহরতলীতে চিমনির আসর জমেছে। বড়, ছোট। ঘন কালো ধোঁয়া। শিল্পশালার দ্বারে দ্বারে শ্রমিকদের-জটলা। ওরা কাজে যায়, যখন ভোরের কুয়াশা নামে। নিদ্রোত্থিত কাফেগুলোয় আলো জ্বলে ওঠে—একটা দুটো করে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট শ্রীহীন কুঁড়ে, ম্লান ও জীর্ণ। চুন-বালি খসে পড়া দেওয়ালে দেওয়ালে শুকনো জীবনের স্বাক্ষর। পর্দ্দার রঙে স্বপ্ন। টবের ফুলে ভিজে নিঃশ্বাস। ওরা শহরতলীর শ্রমিক।

শহরের কুলীন নাচঘরের প্রবেশপত্র ওদের মুঠোর বাইরে। স্কালা থিয়েটারে ভের্দি কি তসকানিনি'র অপেরা ওরা জীবনে মাত্র একবারই দেখতে যায় মধুচন্দ্রমায়। লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে তুলো-নরম সিগারেট-ছাইয়ে ফুটপাথ ভরিয়ে দেয়। সামনের সভ্য শহুরে লোকটির ভুরু-কোঁচকানো কটাক্ষেও ওরা বিচলিত হয় না। আজ আশেপাশের সবকিছুকেই অবহেলায় উড়িয়ে দিয়ে ওরা দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে হাসে। একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির হাসি।

১৪ই ডিসেম্বর '৫৩। লাঞ্চের পর রাত্রের মেনুতেও চোখ বুলিয়ে আসা অভ্যেস হয়ে গেছে। আজ কাটলেট আছে। অপেক্ষায় ছিলাম কয়েক দিন। খাবারঘরের আইটেমগুলো পৌনঃপুনিকের মতই ঘুরে ঘুরে আসে। বীফষ্টেক্ চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁতে ব্যথা জমলেই কাটলেটের আবির্ভাব হয়।

সহদেব আর আমি আমার ঘরে গল্প নিয়ে মেতে ছিলাম। বিকেলে বাইরে যাই নি। খেয়ালই ছিল না, ঘড়ি দেখলাম। গল্পে গল্পে কখন ঘড়ির কাঁটা সাতের ঘর পেরিয়ে গেছে।

আমি বললাম—তোমার জীনার কথা একটু থামাও। চল খেতে যাই, নইলে কাটলেট শেষ হয়ে যাবে।

সহদেব বলল—ইন্দ্র বাইরে গেছে। ওর জন্যে অপেক্ষা করবে না? আর একটু শোন।

বললাম—বেশ

আবার সুরু হ'ল। জীনার কানের পাশে সরু এক গোছা চুল কি অদ্ভুতভাবে কুঁকড়ে থাকে। চোখের নীল তারায় ঘন-আকাশের গভীরতা। আর···

ফারনাণ্ডো এল। বলল—ইন্দ্র বলে গেছে আজ ডিনারে আসবে না। আমরা যাই চল।

আমি বললাম—আমরা বসে আছি সেই বিকেল থেকে। এখন সোয়া আটটা বাজে। তুমি একথা আগে বল নি কেন? আজ কাটলেট ছিল, জানো না নিশ্চয়ই!

ফারনাণ্ডো লজ্জা পেয়ে বলল—সত্যি? ছি, ছি!

কাউণ্টারে কুপন কিনছি, ইন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল—I am sorry! Extremely sorry! (আমি দুঃখিত, বড়ই দুঃখিত)।

সহদেব বলল—আমরা ভাবছিলাম, তুমি ভাগ্যবান। ডিনারের নিমন্ত্রণ পেয়েছ।

ইন্দ্র ম্লানমুখে বলল—আমিই এম্ব্যাসাডর হোটেলে এক জনকে ডিনারে ডেকেছিলাম! সে আসে নি।

কাটলেট সত্যিই ছিল না। জানতাম, থাকবেও না। বেচারী ইন্দ্র!

১৯শে ডিসেম্বর '৫৩। আজ ক্রিসমাসের ছুটি হয়ে যাবে। পলিটেক্নিকে যাব বলে জুতোর ফিতে বাঁধছিলাম। যাওয়া হ'ল না। বৃষ্টি এল জোরে, জানলার কাঁচে ঝাপটার শব্দ জানিয়ে।

জুতো খুলে চটিটা টেনে নিয়ে ফারনাণ্ডোর ঘরে গেলাম। বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সময় কাটল। একদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে। নীচু জায়গায় জমা-জলে বৃষ্টির ফোঁটা-গুলো বিচিত্র নক্সা আঁকছে। রাস্তার বাঁধানো-পীচে কেমন একটা

অদ্ভুত উজ্জ্বলতা। ফুলের দোকানের বুড়ীটা একটুকরো চালার নীচে হাত গুটিয়ে বসে আছে। আজ এই ডিসেম্বরের বর্ষায়ে ফুল দেওয়া-নেওয়ার কথা ভাববে কি কেউ? হয় তো ঐ কথাই ভাবছে বুড়ী। ছাতা-মাথায় দু'এক জন দ্রুতপদে হাঁটছে।

ঘরের ভিতর কারনাগোর গীটারে সুরের ঝড় চলছিল। এখনো ওর শেখার দিন আসে নি। সবে আলাপের মহড়া চলছে।

বৃষ্টির পাগলামিতে রোমান্স আছে। বিছানায় শুয়ে মোপাসা পড়তে ভাল লাগে না। ভাল লাগে না মিথ্যে কথার কাব্য মিশিয়ে বিশেষ কাউকে চিঠি লিখতে। হোষ্টেলের আড্ডা-সুখও মনকে টানে না। একটা কালো বাড়ীকে পেছনে রেখে পড়ন্ত বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর দিকে চেয়ে থাকায় কি সুখ, বুঝতে পারি না। তবু চেয়ে থাকতে হয়। আর আছে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বৃষ্টির ঝিরঝিরে শব্দে। ঘরের গীটারকে দূরে সরিয়ে শুনতে হয় বাইরের বৃষ্টি সঙ্গীত।

শুকনো গাছের ঐ ডালগুলোয় আজ প্রাণ নেই। আছে একফালি কাকজ্যোৎস্না। বৃষ্টির জলে ভিজে চিক্‌চিক্ করছে। পাখীরা সব ভেন্টিলেটারে মাথা গু জেছে। যেন উদ্বাস্ত। অন্যদিন ওরাই মুখর করে রাখে পলিটেক্‌নিকে যাবার ঐ নির্জন রাস্তাটুকু।

গাছের নীচে, ট্রাম-ষ্টপেজে একটি মেয়ে। জুতোর হিল, নাইলন আর ওভারকোটের একটুখানি। আর সব ছাতার আড়ালে।

কারনাগোর গীটারে তখনও সপ্তরাগ বেজে চলেছে। দুপুর গড়িয়ে এল।

বৃষ্টি একটু কমতেই আজই ছাতা কেনার সঙ্কল্প করে পলিটেকনিকের দিকে পা বাড়ালাম। পিয়াতসা লেয়োনার্দো দা ভিঞ্চি আজ বর্ষাসিক্ত, প্রেমিক-প্রেমিকা-শূন্য। নইলে দেখেছি, দুপুর-রোদেও বসবার বেঞ্চগুলোয় জায়গা থাকে না। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেমের রিহার্সাল চলে। নূতনদের হয় হাতেখড়ি। আজকের বৃষ্টি-ধোওয়া বেঞ্চগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলার গতি যেন আপনিই কমে এল।

ঘরে পা দিয়েই বললাম, বুয়ন্ জোর্নো (শুভ দিন)!

ঘরে শুধু মারিয়াপিয়ার বন্ধু গীতি। প্রফেসর কজ্জিও নেই। ছাত্র-বন্ধুরাও অদৃশ্য। আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। বুঝলাম, ছুটির পর আড্ডা দেওয়া এ দেশের রীতি নয়।

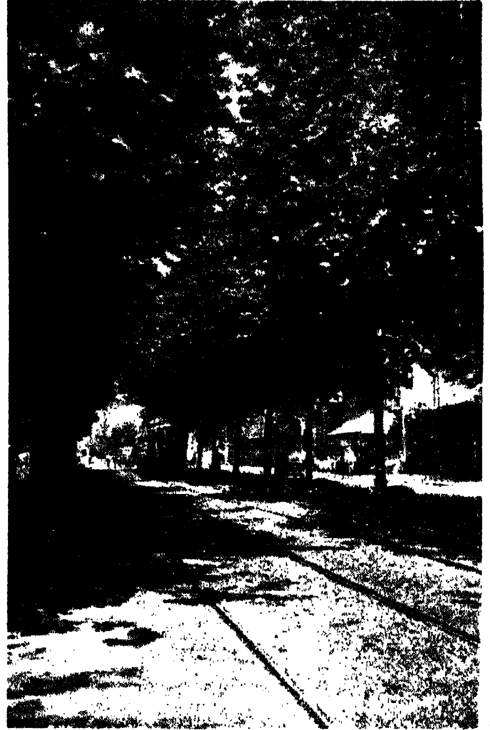
গীতি দ্রুত কাছে এসে আমার ওভারকোট নিল। চেয়ার এগিয়ে দিতেই বসলাম। একটু হেসে ধন্যবাদের পালা শেষ করলাম।

চুপ করে ছিলাম। কিভাবে সুরু করব ভাবছিলাম। ব্যাকরণের পাতা থেকে ক্রিয়াপদের রূপগুলো স্মরণে আনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে শুধু চেষ্টাই! হুগোর ডিক্সনারীটা মাঝে মাঝে কোটের পকেটে অনুভব করছিলাম।

গীতিই সুরু করল—এই সময় কি মনে করে? কি দরকার বলুন। কিছু টাইপ করে দিতে হবে?

আমি বললাম, না। ধন্যবাদ।

আবার খানিকক্ষণ কাটল স্তব্ধতায়।



পলিটেকনিকে যাবার নির্জন রাস্তা, মিলান

হঠাৎ গীতি জিজ্ঞাসা করল—হোষ্টেল কেমন লাগছে? খাওয়া-দাওয়া?

আমি বললাম, হোষ্টেলের খাওয়া-দাওয়া কি কারও ভাল লাগে? তবু অভ্যাস করতেই হবে।

—জানেন বোধ হয়, ইউরোপে একমাত্র আমাদের দেশেই রান্নার একটু প্রচলন আছে। তাতে মনে হয়, স্বাদের দিক থেকে আপনার অসুবিধে হবে না।

সমর্থন জানিয়ে আমি চুপ করে রইলাম। ভাবলাম, আমাদের রাণীর-র ধো ফেন-গালা পরমান্নের স্বাদও এরা পায় নি, বিয়ে-বাড়ীর ছেঁচড়াই এদের অমৃত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, শীতকালে ইটালীর কোথায় যাওয়া যায়? ক্রিসমাসের ছুটিতে? মারিয়াপিয়ার একটা বড় ইটালীর ম্যাপ আছে। সেটা খুলে দেখালে আমার পক্ষে সুবিধা হবে।

চোখে মুখে খুশি ছড়িয়ে অনেক উৎসাহে গীতি ইটালীর ম্যাপ খুলে বসল। দেখিয়ে দিল আল্পস-এর বরফ-ঢাকা গ্রাম। ঝিকি-মিকি রোদ্দুর, স্কি আর স্কেটিং-এর দেহাত। দেখিয়ে দিল চির-বসন্তের দেশ ভূমধ্যসাগরের রিভিয়েরা। যেখানে সারা বছরই লেগে আছে ফুল ও ফলের মরশুম। আর আছে আরব্য-উপকথার সরাইখানা। সেখানে রাজা, মহারাজা ও চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাদের হাট। পয়সার ছিনিমিনি ও মন-পসরার বিকিকিনি চলে হাটের ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়ে।

সুলতান সিকান্দর লোদীর হুকুমত

(ফার্সী অবলম্বনে)

অধ্যাপক শ্রীনীরদভূষণ রায়

লোদীবংশীয় সিকান্দর শাহ (১৪৮৯-১৫১৭) খ্যাতনামা সুলতান। জাতিতে আফগান। সাহুখেল বংশে জন্ম। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার এন্তেকাল ঘটে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যকলাপ দ্বারা তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কার্য্যাবলী দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) পিতৃলব্ধ ক্ষুদ্র রাজ্যের বিস্তার, (২) প্রজাবর্গের সুখশান্তি বিধান। অবিরাম সংগ্রামের ফলে তাঁহার রাজ্যবিস্তার কার্য্য সম্পন্ন হয়। রাজপুত অধিপতিগণই প্রধানতঃ তাঁহার বিরোধিতা করেন, কিন্তু তিনি প্রায় সকলকেই পর্য্যুদস্ত করেন।

ইরাণের অধিপতি দুর্দ্ধর্ষ নাদিরশাহের আক্রমণের পর (১৭৩৯ খ্রীঃ) ভারতে হিন্দুর ক্ষাত্রশক্তির পুনরুন্মেষ ঘটিয়াছিল। আচার্য্য যদুনাথ সরকারের চারি খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থ—"The Fall of the Mughal Empire"-এ ইহাই বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অবসানে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের পরও এইরূপ ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ হইয়াছিল। দিল্লীর রাজতক্তের 'শান' ও 'সৌকত' তৈমুরের আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হয়। সেই সুযোগে বাংলা, মালব, গুজরাট, জৌনপুরে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়, কিন্তু সেই সময়ই উত্তর ভারতে কয়েকটি রাজপুত রাজবংশ প্রাধান্যলাভ করে। যেমন—(১) মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত ভোঁনগাওয়ের চৌহান রাজবংশ, (২) এটাওয়ার চৌহান রাজবংশ, (৩) আগ্রার সন্নিহিত ভদাওরের ভাদুরিয়া রাজপুত, (৪) গোয়ালিয়রে তোমর রাজপরিবার, (৫) বাঘেলখণ্ডের বাঘেল রাজবংশ এবং (৬) জৌনপুর ও অযোধ্যায় বাচগোতিবংশীয় রাজপুত জমিদারগণ। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি রাজবংশ সুলতান বহলুলের আমলেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

তোমররাজ মানসিংহ এবং ভাতা (ভাতগোরা) রাজ্যের বাঘেলরাজ বলভদ্র ও শালিবাহন দীর্ঘকাল সিকান্দরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গোয়ালিয়র-অধিপতি রাজা মানসিংহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার রাজধানীকে সুরক্ষিত করেন। সিকান্দর এই প্রান্তস্থ দুর্গগুলি যথা: ঢোলপুর, উৎগির, কবজ করিয়া গোয়ালিয়র জয়ের পথ সুগম করেন। ভাত-গোরার রাজা সুলতান হোছাইন শর্কীর সহিত মিতালি করিয়া সিকান্দর শাহকে শশব্যস্ত রাখেন, কিন্তু সিকান্দর ভাতগোরা রাজ্য বার বার আক্রমণ করিয়া বাঘেলদিগকে হতশ্রী করিয়া ফেলেন।

আগ্রানগরীর গোড়াপত্তন সিকান্দরের রাজত্বের অন্যতম প্রধান ঘটনা। গঙ্গাযমুনাবিধৌত দোয়াবের রাজপুত রাজগণ ও গোয়া-লিয়রের রাজাকে শায়েস্তা করিবার জন্যই এই নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। কালে এই নগরী আকবরাবাদ নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। নবজাগ্রত হিন্দু রাজশক্তির অপহ্নব ঘটাইয়া সিকান্দর আর্য্যাবর্ত্তে এক সার্ব্বভৌম মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা তাহার প্রধান কীর্ত্তি। সাম্প্রদায়িক আদর্শে অনুপ্রাণিত মধ্যযুগীয় মুসলিম ঐতিহাসিকগণের নিকট তিনি ইসলামের একজন বড় ভক্ত ও খেদমতগার। তাঁহাদের গ্রন্থে স্থানে স্থানে এমন বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে যে তাহাকে 'মুজাহিদ' আখ্যাও দেওয়া চলে।

মথুরা হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। এই স্থানটি হিন্দুর নিকট বেথেলহেমের ন্যায় পবিত্র। সিকান্দর এখানে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সরাইখানা নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুর স্নানযাত্রা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের ঘোর লাঞ্ছনা ও অবমাননা হয়। তাঁহারই আমলে (তাঁহার নির্দ্দেশে কিনা সঠিক বলা যায় না)

দ্রষ্টব্য: এই প্রবন্ধটি তিনটি মূল ফার্সী কিতাবের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে। একটি ওয়াকিয়াৎ-ই-মুস্তকী। সীতামৌর রাজকুমার ডক্টর রঘুবীর সিংহ ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে ফটোগ্রাফ করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছেন। ২। তারিখ-ই-দায়ুদী—আচার্য্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের হস্তলিখিত পুথি। ৩। তারিখ-ই-শাহী কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ আফগান অধিনায়ক মিঞা মহমুদ ফরমূলী কাংড়া বা নগরকোটে অভিযান করেন। পাহাড়ে ঘেরা অতি দুর্গম স্থান এই নগরকোট। দীর্ঘ বন্ধুর চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করিয়া এই দুর্ভেদ্য স্থানে প্রবেশ করা মুসলিম সওয়ারের পক্ষে সহজ ছিল না। মিঞা মহমুদ এই কঠিন কাজ অতি সহজে সম্পন্ন করেন এবং মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া ভারতীয় মুসলিম জহানে অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনার পরই তিনি 'কালা-পাহাড়'* খেতাব লাভ করেন। কাজেই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সিকান্দরের আমল ভারতীয় ইসলামের এক গৌরবময় যুগ। কিন্তু এই সময়ই আবার শাস্ত্রব্যবস্থা ও বিধির বিরুদ্ধে কেহ কেহ স্বীয় বিবেক ও বুদ্ধিপ্রসূত মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সিকান্দরের আমল এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্পেষণে মানুষ মৃতপ্রায় হইয়াছিল। মুমূর্ষু সমাজ এই সময় পুনর্জীবন লাভ করিল। অন্ধবিশ্বাসের যুগের অবসান ও যুক্তি-বিচারের যুগের সূচনা হইল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রকীন এবং লিনেকার অক্সফোর্ডে প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত করেন। ফলে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ সম্ভব হয়। আমাদের দেশে প্রথমেই আরম্ভ হয় ধর্ম্মসংস্কার। তারপর আকবরী আমলে জ্ঞানের আলো জ্বলিয়া উঠে। নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য এই ধর্ম্মান্দোলনের অগ্রদূত। তাঁহারা মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করেন। আর তাহারই ফলে যুক্তিবাদের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা সুলতান সিকান্দরের রাজসভার আলোচনার মধ্যে পাই।

সেখ ছাদুল্লার পুত্র সেখ রিজকুল্লা আফগান সুলতানদিগের ঘটনাবলী ও কাহিনী ওয়াকিয়াৎ-ই-মুস্তকী নামক একটি পুস্তকে সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য। কেবল ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামে দুইটি কপি রক্ষিত আছে। যুক্তির প্রতি সিকান্দর শাহের অনুরাগের কথা আমরা এই পুস্তক হইতে জানিতে পারি।

একদা সিকান্দর পাত্রমিত্রসহ রাজসভায় বসিয়া আছেন। নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। পাখীরা পরস্পরে কথোপকথন করিতে পারে কিনা এ বিষয়ে হঠাৎ তর্ক উঠিল। আলেম ফাজেলগণ অনেক বাক্যব্যয়ের পর সুলতানকে বলিলেন, "হাঁ পাখীরা যে ভাবপ্রকাশ করিতে পারে, এইরূপ কথা শাস্ত্রের ভাষ্যে লিখিত আছে।" এমন সময় আমীর খাজা সেখ হুইদ সাহেব রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সবাইকে এই শাস্ত্রোক্ত মতে অবিচলিত আস্থা রাখিতে অনুরোধ করিলেন। সিকান্দর শাহ তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়, শাস্ত্রীয় বাণীতে বিশ্বাস করিবার কারণ ত রহিয়াছে। তবে এ বিষয়ে আমি আপনার ব্যক্তিগত মত কি তাহা জানিতে চাই।" শাস্ত্রীয় বিবৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের এই যে ইঙ্গিত, ইহা সিকান্দরের রাজদরবারে একটি প্রধান ঘটনা। কারণ তাঁহার আমলে ইসলাম ধর্ম্মের পাণ্ডারা বড়ই গোঁড়া ও পরমত-অসহিষ্ণু ছিলেন। লক্ষ্ণৌ নগরীর সন্নিকটে কাটহের* নামক স্থানে বুধন নামক এক সন্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "ইসলাম সত্য ধর্ম্ম, তেমনি হিন্দু-ধর্ম্মও সত্য।" এই উক্তিতে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আলেমগণ জিগীর তোলেন—"ইসলাম বিপন্ন।" তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নামান্তর করিয়াছিলেন—কুফরী, অন্যথা নাপাক অর্থাৎ অপবিত্র। ইসলাম মানুষকে এক জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গলোকে লইয়া যায়, আর কুফরী মানুষকে এক তমসাচ্ছন্ন জাহান্নামে টানিয়া লয়। এইরূপই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। এই কুফরী বা হিন্দুর ধর্ম্ম যদি সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে স্বভাবতঃই তাহাদের কল্পিত ইসলামিক সৌধটির ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। তাই আলেমগণ এক বিশেষ সমাবর্ত্তনে মিলিত হইয়া সত্যানুরাগী সাধু ব্যক্তিটির শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁহাকে মত পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়, বিকল্পে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে এইরূপ ফতোয়া দেওয়া হয়। বুধন হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনাটিতেও বিশ্বাস এবং যুক্তিতে যে দ্বন্দ্ব তাহা দৃষ্ট হয়। ক্রমে এইরূপ সাধু ব্যক্তিদের আত্মদানের ফলে আকবরী আমলে যুক্তিবাদ সাফল্যমণ্ডিত হয়, এবং হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়া এক অভিনব ভারতীয় কৃষ্টি জন্মলাভ করে।

ফার্সী তাওয়ারিখগুলির ইলিয়ট ও ডাউসনকৃত ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া অনেকেরই এই ধারণা হইয়াছে যে, সিকান্দর বেহেশতের পথ সুগম করিবার জন্য হিন্দুর সমস্ত দেবমন্দির ভূমিসাৎ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত "ওয়াকিয়াৎ-ই-মুস্তকী" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিজিত স্থানগুলিতে হিন্দুর দেবমন্দির ও বিগ্রহ সংরক্ষিত ছিল।

মালবের উত্তর-পূর্ব্বে চম্বল নদীর তীরে অবস্থিত সেই যুগের চন্দেরী নগরী। সুলতান নাসিরুদ্দীন খিলজীর পুত্র মোবারিজ খান ওরফে দ্বিতীয় সুলতান মহমুদ তাহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। চন্দেরীতে তিনি তাঁহার ঘাটি স্থাপন করিয়া সুলতান সিকান্দরের সাহায্য ভিক্ষা করেন। সেই সময় দিল্লীর সৈন্যবাহিনী চন্দেরী আমন করে। চন্দেরী সরকারে বসোদ-পরগণায় উদয়পুর উপশহর অবস্থিত। চারুকলা ও ভাস্কর্য্যে শোভিত বহু মন্দির তখন সেখানে বিরাজমান ছিল। দিল্লী হইতে প্রেরিত সৈন্যগণ সেই মন্দিরগুলি অক্ষত রাখিল, এমনকি মন্দিরসংলগ্ন একটি অপহৃত প্রস্তরমূর্ত্তিও প্রত্যর্পণ করিল—ওয়াকিয়াৎ-ই-মুস্তকীর বর্ণিত বিবরণ হইতে এইরূপ আভাসও পাওয়া যায়।

* আফগান কুলে দুইটি কালাপাহাড় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়েই হিন্দু সংস্কৃতির উপর হামলা চালান। তন্মধ্যে মিঞা মহমুদ প্রথম। তিনি সুলতান বহলুলের ভাগিনের ছিলেন।

* ইলিয়ট ও ডাউসন সাহেবের অনুবাদ গ্রন্থে ইহাকে পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কাটিহার বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে।

একদা জনৈক সিপাহী উদয়পুরের মন্দিরগাত্রে একটি মূর্তি দেখিয়া বিমোহিত হয়। কিছুদিন পর মূর্তিটি যথাস্থান হইতে অন্তর্হিত হয়। মন্দিরের পুরোহিতগণের অভিযোগের ফলে জোর খানাতল্লাসী হইল। সিপাহীর নিকট মূর্তিটি পাওয়া গেলে তাহাকে কয়েদ করিয়া মূর্তিটি পুরোহিতগণকে ফেরত দেওয়া হয়। কিছুদিন পর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সিপাহীটির নিকট হইতে পুনরায় মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়, কিন্তু সিপাহী পূর্ব্ববৎ বলে যে, মূর্তিটি স্বেচ্ছায় দৈববলে তাহার নিকট চলিয়া আসে। বিচারক তখন একটি সিন্ধুকের ভিতর মূর্তিটিকে নিজ হেফাজতে রাখেন। পুনরায় মূর্তি অদৃশ্য হয় ও অভিযুক্ত লোকটির নিকট পাওয়া যায়।*

এই ঘটনাটি অলৌকিক ও অলীক, কিন্তু হিন্দুর মন্দির বা বিগ্রহ যে বিজয়ী মুসলিমের ক্রীড়াসামগ্রী ছিল না ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। আরও একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

গোয়ালিয়র দুর্গের দক্ষিণে উংগির কেল্লা ও শহর। সুলতান সিকান্দর এই দুর্গটি জয় করেন। মখজন-ই-আফগানী প্রণেতা নিয়ামতুল্লা ও তবকাৎ-ই-আকবরী রচয়িতা নিজামুদ্দীন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, সুলতান সিকান্দর এই স্থানের সমস্ত দেব-মন্দির ধূলিসাৎ করেন। অথচ এই ঘটনার আশী বৎসর পরে লিখিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উংগিরে পুরানো মন্দিরের কথা উল্লিখিত আছে। কাজেই মন্দির ভাঙ্গার কাহিনী ও কুফেরীর উচ্ছেদ অনেক স্থানেই মুসলিম ঐতিহাসিকগণের স্বকপোলকল্পিত মনে হয়—মন্দির ও মূর্তিবিধ্বংসী এবং হিন্দু-নিষ্পেষক বলিয়া সুলতান সিকান্দর যে কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাও অনেকটা অতিরঞ্জিত কাহিনী।

সিকান্দর আলেম ফাজেলগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বৃত্তি, জায়গীর, এবং রাজসভায় উচ্চ স্থানও দেন। নৈশভোজের সময় সতের জন খ্যাতনামা আলেম তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিতেন এবং নানা আলাপ-আলোচনা করিতেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বিলাসব্যসন, আমোদ-প্রমোদ বিসর্জ্জন দিয়া আলমগীরের ন্যায় এক 'জিন্দা পীর' হইবার স্বপ্নে বিভোর হন নাই।

সিকান্দরের গানবাজনায় বিশেষ সখ ছিল। আর আওরঙ্গজেব তাহা নিষিদ্ধ করিয়া রাজকীয় সঙ্গীতবিশারদগণের ভাতা ও বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তখন দিল্লীর সহস্র গায়ক সঙ্গীতকলার প্রতীক-রূপে বিশটি শবাধার সুসজ্জিত করিয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করেন। সিকান্দর পক্ষান্তরে প্রতি সন্ধ্যায় প্রাসাদে গান-বাজনার মজলিস বসাইতেন। দশ জন প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক উহাতে যোগদান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে চারি জন যথাক্রমে চুঙ্গী (সারেঙ্গী ?), কানুন, তম্বুর, এবং বীণা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেন ও সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেন। গভীর রাত্রিতে চুরনাই বা ক্লারিওনেট বাজানো হইত চারিটি বিভিন্ন সুরে যথা—১। মালিকুরা, ২। কল্যাণ, ৩। কানেড়া, ৪। হোছেইনী।*

এই ঐকতান বাদনে, সুরের মূর্চ্ছনায় ও গায়কদিগের রূপের ছটায় শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেরই বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। এমন কি "আসমানের তারকা জুহরা কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িত। বিহঙ্গম পক্ষ সঞ্চালন করিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাপুটি খাইত।" [তারিখ-ই-শাহী গ্রন্থ, কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৪৮।] সুলতান সিকান্দর মদিরা পান করিয়া সুখ-নিদ্রা যাইতেন, উপরোক্ত গ্রন্থকারগণ তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। তারিখ-ই-দায়ুদী প্রণেতা আবদুল্লা বেশ রহস্য করিয়া বলিয়াছেন, "সুলতান রাজকার্য্যে অশেষ মেহনত করিতেন। তাই তিনি গোপনে এমন একটি পানীয় গ্রহণ করিতেন, যাহাতে তাঁহার শ্রমের লাঘব হইত, মেজাজও শরীফ হইত।"

সুরাপান, গান-বাজনা এগুলি ইসলাম-ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ। কিন্তু মুসলিম রাজদরবারে ত ইহা হামেশাই চলিত। সিকান্দরের সমসাময়িক মালবাধিপতি সুলতান গিয়াসুদ্দিন শাহ আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন থাকিতেন। মহিলা তীরন্দাজ† পরিবৃত হইয়া তিনি মৃগয়ায় গমন করিতেন।

এই ধরণের আমোদ-প্রমোদে কোন কালেই উলেমাগণের শিরঃপীড়া হয় নাই। বস্তুতঃ বাগদাদের খলিফাদের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলিম রাজদরবারে কত নীতিবিরুদ্ধ গর্হিত কাজ হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গ্লানিকর কাজের বিরুদ্ধে উলেমাকুল কখনও ভ্রূক্ষেপ করিয়াছেন কি?

কিন্তু সিকান্দর লোদী তাহার একটি কার্য্যের দ্বারা ভারতীয় মুসলিম জহানে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দাড়ি রাখিতেন না। এই সংবাদ গুজরাটরাজ সুলতান মুজফ্ফর শাহের দরবারে পৌঁছিয়াছিল। একবার সুলতান সিকান্দর তাঁহার সভাসদ

---

* গোয়ালিয়র গেজেটিয়ারে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

* আচার্য্য যদুনাথ সরকারের গ্রন্থাগারের রক্ষিত "তারিখ-ই-দায়ুদী" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে এই চারিটি সুরের উল্লেখ আছে, কিন্তু শমছ-উল-উলেমা গোলাম হেদায়েৎ হোছাইন সাহেব যে তারিখ-ই-শাহী গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন তাহাতে ভিন্ন সুরের উল্লেখ আছে। আমার মনে হয় মূল গ্রন্থ-লেখক নকলের সময় নামগুলি বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন আর মরহুম হেদায়েত হোছায়েন সাহেব অনবধানতাবশতঃ তাহাই শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কারণ তারিখ-ই-শাহী গ্রন্থে আমি অনেক বিকৃত উক্তি দেখিতে পাইয়াছি।

† তারিখ-ই-মুহম্মদশাহী গ্রন্থে মস্তানী বিবি সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে: "She was a Kanchani (a dancing girl) skilled in riding and handling the sword and the spear. She always accompanied Baji Rao in his campaigns and rode stirrup to stirrup with him."

খাজা সুইদ সাহেবকে দূতরূপে গুজরাটে প্রেরণ করেন। তিনি "ছালাম আলাইকুম" বলিয়া মুজফর শাহকে অভিবাদন করেন এবং তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানা কোরাণ শরিফ তাঁহাকে উপহার দেন। সুলতান তাঁহাকে এইরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করেন, "সুলতানকে গুণাহের দায় হইতে মুক্তি দিবার জন্যই এরূপ করিয়াছেন। তিনি আলেম ব্যক্তি এবং রছুলের বংশধর। তাহার অবমাননা হইলে সুলতানকে খোদাতাল্লার নিকট জবাব-দিহি করিতে হইবে।" তাই কোরাণ শরীফ প্রদান করিয়া তিনি নিজের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার জবাবে প্রীত হইয়া সুলতান তাহার অনেক সাধুবাদ করেন এবং বলেন, "আচ্ছা, আপনাদের মত আলেম সিকান্দরের রাজসভায় আছেন, অথচ কি আশ্চর্য্য তিনি দাড়ি রাখেন না ?"

এই দাড়ি না রাখাই সিকান্দরের কাল হইয়াছিল। পাঠক হয়ত এরূপ ঘটনা বিশ্বাস করিবেন না। তাই তারিখ-ই-দায়ুদী মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। ওয়াকিয়াৎ-ই-মুস্তকী ও তারিখ-ই-শাহী গ্রন্থ দুইটিতে অবিকল একই কথা লিপি-বদ্ধ আছে :

"জীবনের স্থিরতা ও রাজ্যের স্থায়িত্ব নাই। তাই সুলতানের কঠিন পীড়া হইল। ইহার কারণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সুলতান রাজতক্তে বসিয়া আছেন এমন সময় তাঁহার রাজ্যের সেখ-উল-ইসলাম—হাজী আবদুল ওহাব সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, 'হুজুর, আপনি মুসলমানের বাদশাহ। আপনি দাড়ি রাখেন না। ইহা ইসলামী আদবের বিরোধী কাজ। সিকান্দর প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "দাড়ি রাখিবার ইচ্ছা আমার আছে।' হাজী সাহেব 'আল খায়েরো লাইওয়াখের' এই প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, 'তবে আর শুভ কাজে বিলম্ব কেন ?' সুলতান বলিয়া উঠিলেন, 'দেখুন, আমার দাড়ি বড় খোঁচা খোঁচা, এই দাড়ি রাখিলে আমাকে বড় কুৎসিত দেখাইবে···মুসলমানেরা আমাকে উপহাস করিয়া শাস্তি পাইবে এবং আমি এই অপরাধের দরুন পাপের ভাগী হইব।'

আবদুল ওহাব সাহেব বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি আপনার মুখে হাত বুলাইয়া দিব, আর আপনার মুখ সুন্দর দাড়িতে শোভিত হইবে।···

সিকান্দর শাহ এই কথায় চুপ করিয়া রহিলেন।

হাজী সাহেব বলিলেন, 'আপনি যে নিরুত্তর।'

সিকান্দর প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলেন, 'আমার পীর সাহেবের আজ্ঞানুসারে কাজ করিব।' হাজী সাহেব প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার পীর কোথায় থাকেন ?' 'তিনি জোনগাঁয়ের নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে থাকেন। মাঝে মাঝে আমাকে দর্শন দেন।'—সিকান্দর শাহ জবাব দিলেন। হাজী সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, তিনি কি দাড়ি রাখেন ?'

জবাব আসিল, 'না তিনি দাড়ি রাখেন না।'

হাজী সাহেব তখন বলিলেন, 'আচ্ছা তিনি যখন আবার আসিবেন, তাঁহাকেও দাড়ি রাখিতে বলিবেন। আর আপনি নিজেও এ বিষয়ে তৎপর হোন।'

এবার সুলতান হাজী সাহেবের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নীরব হইলেন। হাজী সাহেবও বিদায় লইয়া দরবারগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

সিকান্দর তখন বলিলেন, 'সেথ সাহেব কি মনে করেন যে, তাহারই বরকাতে সমস্ত লোক আমার পদচুম্বন ও খেদমত করে। তিনি কি ইহা বুঝিতে পারেন না যে আমি যে গোলামকেই দোলায় বসাই না কেন, আমীরগণ তাহাকেই কাঁধে করিয়া নাচিবে।' সৈয়দ আহমদ সাহেবের পুত্র সেখ জলিল তখন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুলতানের এই কটূক্তি হাজী সাহেবের কর্ণগোচর করিলেন। হাজী সাহেব সেখ জলিল সাহেবকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'আপনি ত রছুলের বংশধর। তিনি আমাদিগকে গোলাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, খোদার মরজি হইলে তাঁহার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইবে এবং তিনি যথোচিত শাস্তি পাইবেন।'

কিছুদিন পরই হাজী সাহেব সুলতানের বিনা অনুমতিতে আগ্রা হইতে দিল্লী চলিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সিকান্দরের গলায় ব্যথা সুরু হইল। দিনের পর দিন ব্যথা বাড়িয়া চলিল। অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজে ইমাম লাদন্ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি ত দাড়ি রাখি নাই, রোজা ও নামাজ ভাঙিয়াছি, মদ্যপান করিয়াছি, অপরাধীদের নাক-কান কাটিবার আদেশ দিয়াছি। এই সমস্ত অপরাধের কি ক্ষতিপূরণ হইতে পারে ?' ইহার পর কতবার এই সকল নিয়মভঙ্গ হইয়াছে, দৈনিক কার্য্যাবলীর ফিরিস্তি দেখিয়া তাহার একটি তালিকা প্রণয়ন করিবার জন্য ওয়াকিয়ানবিশকে আদেশ দিলেন। ইমাম লাদন সাহেব ও ওয়াকিয়ানবিশ উভয়ে মিলিয়া অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করিলেন। সুলতান এই টাকা আলেম উলেমাগণকে দিবার আদেশ দিলেন, কিন্তু উলেমাগণ ত রাজকোষের টাকা গ্রহণ করিতে পারেন না। তখন সুলতান সিকান্দর আমীরগণ প্রদত্ত অর্থ দ্বারা একটি পৃথক অর্থভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আলেমগণ শুদ্ধচিত্তে এই টাকা গ্রহণ করিলেন এবং সুলতানের দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সিকান্দরের রোগযন্ত্রণার উপশম হইল না, অল্পকালের মধ্যেই ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।"

সিকান্দরের ছিল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তাঁহার অকালমৃত্যুতে দিল্লীর রাজতক্ত শূন্য হইলে, অনেকেই ভাবিলেন বুঝি-বা সর্ব্বনাশ হইবে। ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই এই ছড়ায়,

> সিকান্দর শাহ ইকত কি শোয়ার ন মানদ।
> নমানদ কছ, চুন্ সিকান্দর ন মানদ।
> ওরে সাত মুলুকের রাজা সিকান্দর আর নাই।
> আর সিকান্দরই যদি লোকান্তরিত হয়, তবে আর বাঁচিবে কে?

ওয়ারীশ

শ্রীবাণী চট্টোপাধ্যায়

বোঁ—ওঁ—ওঁ—উত্তপ্ত ধরণীর গর্জ্জন, ধুলার কুণ্ডলী ছুটে চলে দুরন্ত বাতাসে। আকাশ ধূলিচ্ছন্ন, যেন মেঘে ঢাকা ধরণী। পত্রহীন বৃক্ষশাখায় সন্‌সনী শিহরণ! বাতাস নয় যেন আগুনের হলকা, গৃহচ্ছায়ায় তার উত্তপ্ত স্পর্শ থেকে নিস্তার নাই। দূরে ঐ উদ্ধত তালগাছে সুরু হয়েছে শকুন-দম্পতির কলহ। গ্রামের আনাচে-কানাচে শেয়ালেরা ঘুরে-ফেরে অসতর্ক ছাগ-শিশুর সন্ধানে। দুরন্ত ছেলেরা দল বেঁধে কচি আম খায়, শুকনো পাতা বস্তাবন্দী করে। চাতকের বুকফাটা চীৎকার ফটিক—জল, ফটিক—জল। বরিন্দের বুকে নেমে আসে গ্রীষ্মের তাণ্ডব।

ছোট পাড়াটার রাস্তার ধারে, ছোট খ'ড়ো ঘরের দাওয়ায় বসে, বুড়া 'বরকু' কেসে চলেছে খক্ খক্ খক্। হাতে খেলো হুকো, তামাক খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে 'ইস বাপরে, হা আল্লা মরণটা দেস না!' মৃদু আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জরাজীর্ণ দেহ; গায়ের চামড়া যেন পোড়া বেগুন। তবে দেহের বাঁধুনি দেখে বোঝা যায় এককালে বৃদ্ধের আর কিছু না থাক, স্বাস্থ্য-সম্পদ ছিল। পরনে লুঙ্গি একখানা, থুতনিতে সাদা ধবধবে একগোছা দাড়ি।

সোমারি আর বান্দি গাঁ-ফেরতা যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বান্দি বললে, সকাল করে ত ফিরলা আজ, চল ঐ বুড়ার কাছে যদি কিছু হয়।

বুড়া রোগযন্ত্রণায় বিড়বিড় করে কি যেন বকে চলেছে, গলাটা সাধ্যমত মিষ্টি করে ডাকল বান্দি—নানা—

—'কে'? বুড়া তাকিয়ে দেখল, একটু যেন বিস্মিত হ'ল। দুটি তরুণী, একজন শ্যামা, অপর গৌরাঙ্গী। বিচিত্র ঘাগরা পরনে। রোদের তাপে নিটোল যৌবন-লালিমা যেন আরও রাঙিয়ে উঠেছে। লম্বা বেণী দু'জনেরই কোমর ছাড়িয়ে হাঁটু ছুয়েছে সাপের মত এঁকে-বেঁকে। যাযাবর বাদিয়া এরা, গ্রামে গ্রামে নানা রকম ওষুধ বেচে, সাপের খেলা দেখায়, পুতুল নাচিয়ে বাজী দেখায়, বানরনাচ দেখায়, ভিক্ষাও করে আর নল দিয়ে পাখী শিকার করে। এটা এদের বৈশিষ্ট্য তাই গ্রামের লোক এদের বলে নলুয়া।

—তোমরাই বুঝি অইঠে ধুরা ফেলাইছো? আঙুল দিয়ে কাছের মাঠটায় সার সার তাঁবুগুলো নির্দ্দেশ করে বুড়া। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় দু'জনে।

—কি হয়েছে নানা তোমার? বান্দি শুধায়।

বুড়া ঝাঝিয়ে উঠল, কি আর হবি মাগে, মরণ না হলে যা হয়, আল্লা এত মানুষেক ন্যাচে, মোক দেখে না।

সোমারি বললে, এই শেষ বয়সে খুব কষ্ট বাবার! তা মা বুঝি নাই?

—মা?—ঐ। আঙুল দিয়ে উর্দ্ধাকাশ দেখিয়ে দেয় বুড়া।

দারুণ গরমে সামনে ছোট পেয়ারা গাছের ছায়াতেই বসতে যায় দু'জনে। বুড়া হাঁ হাঁ করে উঠে—এই রোদ ত মানুষ অইঠে বসবা পারে? তোমরা উঠি আসি পিড়াত বস বেটী।

এই আহ্বান ওরা সাদরেই গ্রহণ করে, উঠে গিয়ে বারান্দার উপরে পোঁটলা-বোঁচকা নামিয়ে বসে। বুড়া আবার দেখিয়ে দেয় —ঐ চটটা টানি নেও।—চটটা পেড়ে নিয়ে বেশ ছড়িয়ে বসে দু'জনে। একটা দুর্গন্ধময় গামছা পোঁটলা থেকে বের করে ঘুরিয়ে হাওয়া খেয়ে ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করে। বেশ হাঁপ ধরে গিয়েছে। বুড়া কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। অনেক রকম জড়ী-বড়ী থাকে ওদের কাছে, তার ব্যারামের কি ওষুধ নাই দুনিয়ায়?

বান্দি বলল, নানা একটু জল পাওয়া যাবে? রোদে বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

বুড়া হাঁক দেয়—এ পানসিয়া—

—কেন? ভিতর থেকে জবাব আসে।

—এক নোটা খাওয়ার পানি আন।

—কেবল খেয়ে একটু শুয়েছি, নবাবের মত হুকুম চালাচ্ছে—নিজে এসে নিয়ে যেতে পারে না—কথায় বেশ ঝাঁঝ বোঝা যায়।

—মুই যাবা পারলে তোকে ক্যান কহিমু, মোর মাথাটা আবার ধরিচে, একেবারে ছিড়ি ন্যাচে। ইঃ আল্লা! বুড়ার কাতরানি উঠে আবার।

—মানুষ আসিছে, নিয়ে আয়, তিষ্টার পানি চাহিলে দিবা হয় রে।

ভিতরে খুটখাট শব্দে, বোঝা যায় জল আসছে।

একটু পরেই এক লোটা জল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল পানসিয়া। তরুণী অতিথি দেখেই মুখের বিরক্তি কেটে গেল। মুগ্ধভাবে চেয়ে রইল ওদের যৌবনশ্রীর দিকে।

জলটা নিয়ে দু'জনে মুখ হাত ধুয়ে ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিল। আঃ! বলে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসও ফেলল দু'জনে।

পানসিয়া তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, ওরা সে সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু নির্লিপ্তভাব দেখায়।

—বাবার বুঝি মাথার ব্যারাম আছে? সোমারি শুধায়।

—হেঁ মাগে! কি যে মাথার ব্যাদনা হইচে, পত্তিদিন দুফরের পর মাথাটা ধরি উঠবে একেবারে ছিড়ি নেয়; কেউ চ্যাচালে কি কথা কহিলে মাথা যেন ফাটি যায়।

সোমারি তাড়াতাড়ি টোপলা খুলে ফেলে বহু রকম শিকড় জড়ী-বড়ীর মধ্যে আঙুল দিয়ে কি যেন খুঁজে নেয়। খুব লম্বা একটা পাখীর ঠোঁট, কয়েক টুকরা বিচিত্র গঠনের হাড় ছড়িয়ে যায়।

সামনে। তারপর উঠে যায় বুড়ার কাছে ; সামনে উবু হয়ে বসে দু'হাতে মাথাটা ধরে কি যেন তন্ময় হয়ে দেখে। মাথা নেড়ে বলে হু—অর্থাৎ হদিস সে পেয়েছে। এবার পানসিয়ার দিকে তাকিয়ে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলে, ভাই ঐ গাছ থেকে একটা ভালো কলাপাতা কেটে এনে দাও না। পানসিয়া তাড়াতাড়ি গিয়ে কলাপাতা আনল। বান্দিকে চোখের ইসারায় ডাক দেয় সোমারি।

বান্দি কাছে গিয়ে মাথাটা ধরে। সোমারি বাঁ হাতখানা দিয়ে চিবুকটা চেপে ধরে, বাবা একটু চোখ বোঁজ। বুড়া অজানা আশঙ্কায় চোখ বোঁজে। কেন, কি করবে এরা সেটুকু জানারও সুযোগ পায় না, তা ছাড়া বুকের মধ্যেই চেপে ধরেছে বুড়াকে। কোমল স্পর্শে হারানো যৌবনের কথা স্মরণ হয়, দেহটা আরও অবশ হয়ে আসে।

সোমারি নিপুণ হাতে লম্বা সূচের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে কপালের পাশে একটা জায়গা লক্ষ্য করে খোঁচা দেয়। ইঃ! বুড়া অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠে।

—নড়ো না, নড়ো না বাবা। চোখ বোঁজ, তাকিও না। আবার ডানদিকেও অনুরূপ খোঁচা দেয়। দর দর করে রক্ত পড়তে থাকে, নীচে কলাপাতাটা ধরল বান্দি। টপ টপ করে রাঙা উষ্ণ রক্ত সঞ্চিত হচ্ছে সেখানে।

বুড়া চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ইঃ গরম রক্ত যেন গাল বেয়ে ঝরছে। সোমারি এবার হাতের তেলো দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরেছে বুড়ার। নড়োনা বাপজান, এখনি মাথার বেদনা ভাল হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে বান্দিকে চোখের ইশারা করতেই কলাপাতাটা মাটিতে রেখে, ঝোলা থেকে মাটির গুড়োর মত কি যেন নিয়ে এল। হাতের তেলোয় একটু জল নিয়ে তর্জ্জনী দিয়ে গুলল ওষুধটা, তারপর লাগিয়ে দিল ক্ষতস্থানে। রক্ত ধীরে ধীরে থেমে এসেছে। এবার চোখ ছেড়ে দিল সোমারি।

—দেখ বাপজান দেখ। বুড়া চোখ খুলতেই সামনে কলাপাতায় কালো চাপ চাপ ফেনিল রক্ত দেখে শিউরে উঠল—হা আল্লা!

—এই দেখ, কালো জহর তোমার মাথায় ছিল, সেজন্য বেদনা। এখন মাথাটা একটু ঝাড়ো ত—।

বুড়া মাথাটা কয়েকবার ঝাড়ল। সত্যিই যেন বুড়ার মাথাব্যথাটা একটু কম মনে হচ্ছে। আগে এভাবে মাথা ঝাড়লে অসহ্য যন্ত্রণা হ'ত। মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠে ধীরে ধীরে।

সোমারি উঠে এসে আগের জায়গায় বসল, মুখখানা তৃপ্তির হাসিতে ঝলমল। পানসিয়ার দিকে চোখ ফেরাল এবার, হাঁ। দু'চোখে গিলছে তাকে। চোখের চাহনিতে অন্তরের ক্ষুধা প্রকট হয়ে উঠেছে। পুরুষের চোখের মামুলি কামনা। বহু পুরুষের চোখেই সে দেখেছে। কোন রকম অস্বস্তি বোধ করে না সে এর জন্য।

মুচকি হেসে বলে, সোনা দাদা খুব বিভোর হয়েছ না!

পানসিয়া প্রবল জোরে মাথা নেড়ে জানাল—না-না ... হব কেন?

—এই যে জল আনতে হ'ল, খেয়ে-দেয়ে একটু শুয়েছিলা—তা ভাউজী কোথায়?

বুড়া এবার জবাব দিল, আর কহেন না মাগে, সবই গেইছে। তিনকুড়ি টাকা মহাজন করি উসনে ব্যাটা বিহায়ু তা দুটা বছর ও ঘর করলি না, এই পুষ মাসে তাঁইও চলি গেল।

—আহা হা, তা হলে তোমাদের বড় কষ্ট বাপজান।

—কষ্ট বলি কষ্ট, হামার দুঃখে শিয়াল কুকুর কান্দে মাগে। বুড়ার চোখ ছল ছল করে উঠল।

—তা যে গিয়েছে সে ত ফিরবে না, আবার একটা দেখে শুনে নিয়ে এস। দাদার আমার যেমন গড়ন পিটন তেমনি শরীরের স্বাস্থ্য। যে দাদার ঘর করতে আসবে সে ভাগ্যবতী।

…হোঁ, শরীল আর স্বাস্থ্য কেউ দেখে না বেটি। টাকা না হলে কেউ বেটি দিবে না। এই তো চয়ক তলায় একটা বিধবা আছে ঘটকী পাঠায়ু, তা ছ'কুড়ি টাকা পণ নিবে, অত টাকা কুন্ঠি পামো? তা বেটাক কহছি, বাপু গরু জোড়া বিকাই দি। একটা বছ ঘরত আন, একটা বছর গিরস্থর বাড়ী কাম কর, তা শুন্ন করবি না। ঐ গরু জোড়াই অর জান। দিনরাত ঐ নিয়েই আছে, কোনদিন পরের বাড়ী খাটবা দেই নাই। মুই ও জোড় কম্মি করিবা পারছোঁ না, তা এমনি করি কতকাল চলবি? বাহির ভিতর দু'দিক একঠা মানুষ তাল দিবা পারে? মুই তো থাকেও নাই।—বুড়া সুখ দুঃখের শ্রোতা পেয়েছে। মনের দুঃখ উজাড় করে দিতে চায়।

ওদের আগমনবার্ত্তা পাড়াটাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। দেখা গেল দু'জন একজন করে স্ত্রীলোক দরজা খুলে উকি মেরে দেখছে। একজন দু'জন করে অনেক জন এসে ঘিরে ধরল তাদের।

সোমারী আবার বুড়াকে জিজ্ঞাসা করল, মাথার বেদনাটা কমেছে বাবা?

বাঁ হাতে মাথাটা টিপে একটু ঝাঁকিয়ে পরখ করে নিল বুড়া।

—হোঁ এনা কম ঠেকেছে!

—এ্যানা নয় অনেকখানি কমেছে।—বুড়া আপত্তি করল না কথাটায়।

বান্দি বলে উঠল, ও কমে যাবে কাল থেকে দেখ। তোমার বাতের বেদনা আছে, নয় নানা?

—বাত? বাতই তো মোক খাইছে। পায়ের হাঁটা দুটা আর কোমরে ব্যাদনা যখন বেশী হবি তখন—

—হ্যাঁ হাঁ ওটাও ভাল করে দিব বাবা। একটা চুস্কি দিলেই কমে যাবে। তারপর বাঘের তেল দিব মালিশ। সেবার সুন্দরবনের ধারে আমরা ধুরা ফেলেছিলাম, কি বাঘ সেখানে। এক একটা ঐ বড় গরুর সমান, আর তার ডাক? ওরে ব্যাপরে! গাঁক করে উঠলে ভয়ে বুক বেজে হয়। বাঁদরগুলো পাকা আমের মত ঝুপ ঝুপ করে নীচে পড়ে যায়। সেই বাঘ সেবার মারল কলকাতা থেকে সাহেব এসে। দুটো বাঘ। ছাল ছাড়াতে পারে না, আমরা ছাড়িয়ে দিলাম, চামড়া দুটো নিয়ে চলে গেল সাহেব

আর দেহগুলো আমরা নিলাম, কি চর্ব্বি রে বাবা! একেবারে থাকে থাকে সাজান, দুটো দেহ থেকে এক মণ চর্ব্বি পাওয়া গেল। সেই চর্ব্বি আরও কত অষুধ দিয়ে পাক করা আছে। সাতটা দিন মালিশ করলে বাত কেন বাতের বাপও পালাতে পথ পাবে না।

গ্রামের লোকেদের কাছে আজগুবি সত্য মিথ্যা গল্প বলে নিজেদের ওষুধ চালাতে চায় এরা।

একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তোমরা বাঘের গোস্ত খাও না?

—বাঘের গোস্ত? একেবারে যেন রসগোল্লার সিরা।—জিব দিয়ে টক্ করে একটা শব্দ করে মিষ্টত্বের পরিমাণটা জানায়।

—এ্যা মাগো! স্ত্রীলোক-মহলে ঘৃণাসূচক মুখভঙ্গী দেখা যায়।

সোমারি আবার আরম্ভ করে, এক ছটাক তেল দিই বাবা?

—কত করি দাম?

—দাম আর কত হবে। তিন টাকা ছটাক।

বুড়া দাম শুনে একটু চিন্তা করল। আচ্ছা আধ ছটাক নিম, আজ নয় টাকা পাইসা যোগাড় করি। তোমরা ত আছেন কাছেই।

—আহা হা বাছার মুখে কি হয়েছে বুলবুলি দিদি? আঙুল দিয়ে একটা তিন চার বছরের ছেলেকে নির্দ্দেশ করে বান্দি।—দাঁতে পোকা লেগে গালটা ফুলে গিয়েছে তার, কি একটা প্রলেপ দেওয়া আছে।

ছেলেটির মা বললে, দাঁতে পোকা ধরেছে, তাই ফুলে গিয়েছে, অষুধ আছে তোমার কাছে?

—আহা হা! সোনার মত মুখ বাছার আমার কেমন হয়ে গিয়েছে!—দরদে গলে পড়ে একেবারে, ত্রস্তে ঝোলা খুঁজে বাতাসার মত কি একটা বের করে। সন্তর্পণে একটু ভেঙে নিয়ে ডাক দেয় ছেলের মাকে।

—আয় নে বুন, এই অষুধটা ভাল করে ঘসে লাগিয়ে দিবি। দু'দিনে ফুলা শুকিয়ে যাবে। এটা সমুদ্রের ফেন।

মেয়েটির একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখা গেল। পার্শ্ববর্ত্তিনীরা কিন্তু ঠেলে দিল তাকে—

নে নে ভাল অষুধ, দু'দিনেই কমে যাবে।

মেয়েটি একটু সলজ্জ ভাবে বললে, কিন্তু হালুয়া ত বাড়ী নাই পয়সা দিবে কে?

বান্দি হেসে বললে, মরদ বাড়ী নাই বুঝি। তা তুই দু সাঁঝের চাল দিস দিদি।

মেয়েটির তাতেও আপত্তি বোঝা গেল। আচ্ছা থাক এখন, তোমরা ত আছই, বাড়ীর মানুষ বাড়ী আসুক, তখন যেয়ে আনবে।

—নে নে দিদি! না হয় এক সাঁঝেরই চাল দিবি। নে, আহা সোনার চাঁদের আমার কত কষ্ট হচ্ছে।

অগত্যা মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিল।

—ভাল করে ঘসে একটু গরম করে লাগিয়ে দিবি। বিষ বেদনা সব ভাল হয়ে যাবে।

মেয়েটি বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় চাল আনার জন্য।

—আর শোন দিদি, আমার বাড়ীতে ঐ রকম ছেলে আছে। সারাদিন খায় নাই দিদি। চারটা জলপানও আনিস দিদি। তোর ছেলে দুধে ভাতে থাকবে দিদি, সাত ব্যাটার মা হবি, স্বামীর বুক জুড়ায়ে থাকবি দিদি।

মেয়েটি ফিক করে হেসে উঠল, ছুটে পালাল সেখান থেকে।

সোমারি আরম্ভ করে এবার, ভাল সূতিকার তেল আছে দিদি, শিলাজুত কুমীরের দাঁত, ভালুকের রোম, জামের আরক, মৃগনাভি কস্তুরী একেবারে খাঁটি।

—আমাদের কিছু লাগবে না এখন, বুঝে সুঝে পরে দেখা যাবে।

—বাঁজার অষুধ আছে, যে দিদির ছেলে হয় না তার ভাল, তাবিজ আছে।—রহস্যময় চোখে আবার বলে, সোয়ামী-বশ-করা ভাল সুরমা আছে। যাদের স্বামী হ্যাক্‌রা, বজ্জাত কথা শোনে না, বেতালা চলে, তারা চোখে দিলে স্বামী একেবারে ভ্যাঁড়ার মত চোখের দিকে চেয়ে থাকবে।

একজন মুখ টিপে হেসে বললে ছিকো!

ইতিমধ্যে সেই মেয়েটি চাল আর চারটি মুড়ি এনে দিল।

বিনা বাক্যব্যয়ে সেগুলো ঝুলিতে ঢেলে নিল সোমারি, এবার বুড়াকে লক্ষ্য করে বলে, আমাদের যেতে হবে বাবা।

—হোঁ, তা তোরা কি চাহিস কহেক।

—পাঁচটা টাকা, দুই সাঁঝের খোরাক আর একখানা কাপড় নিব বাবা।

—অ্যাঁ, বুড়ার চোখ যেন ছানাবড়া হয়ে গেল।

পানসিয়া বলে উঠল, আচ্ছা বাপ সারুক তাই দিব। আজ শুধু দুই সাঁঝের চাল নিয়ে যা।

—সারবে দাদা সারবে।

—আচ্ছা দু'চারদিন দেখা যাক, ভাল যদি হয়, পাবা।

বুড়া বললে, একটা টাকা দিম, আর দু সাঁঝের চাল, আর দিবা পারমু না বেটি।

—একেবারে ভাল করে দিব বাবা, পাঁচটা টাকা নিব।

পানসিয়া বললে, আচ্ছা ক'দিন অষুধ দাও ভাল হউক যা চাচ্ছো দিব। বাড়ীর মধ্যে চলে গেল সে, একটু পরে ছোট ধামায় করে দু' সের চাল নিয়ে বের হয়ে এল।

—নে ধর।

চাল ক'টা ঝোলায় ঢেলে নিল বান্দি। চারটা মরিচ দে দাদা-ভাই, আর দুটা আলু সিদ্ধ করে খাব।

পানসিয়া কি একটু ভেবে ভিতরে গিয়ে আলু আর লঙ্কা নিয়ে

এল। ভাল করে বেঁধে নিয়ে এবার বুড়ার দিকে তাকিয়ে বলে, সোমারি বাবা টাকাটা—।

আজ টাকা পাইসা নাই, ভাল অষুধ পত্তর দি, চুল্লি দিবু কহিলু চুল্লি দি, ভাল হলে দিম। তোমরা ত আছেমই, ক'দিন দেখাশুনা কর।

সোমারি কি একটু ভাবল, তারপর সব গুটিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। যাবার সময় পানসিয়াকে ডেকে বললে, সন্ধ্যার পর বাবা কেমন থাকে খবর দিও। মাথা ঘুরলে ভয় কর না, মুচকি হেসে বলে—আবার সন্ধ্যার পর যেয়ো আমাদের ওখানে। চোখে রহস্যঘন প্রহেলিকা।

—তোর ধুরা কোনটা ?

—ঐ যে একেবারে পশ্চিম দিকেরটা।

পানসিয়া বললে, আচ্ছা।

সন্ধ্যার পরই পানসিয়ার খাওয়ার পাট মিটে গেল, বুড়া ঘুমুচ্ছে অঘোরে বাইরের ঘরটায়। একবার আস্তে ডাক দিল বাবা—কোন সাড়া পেল না, রান্নাঘরে এসে সানকীতে করে ভাত সাজাল, দিনে একটু ডাল ছিল ভাতের মধ্যে সেটা ঢেলে দিল, রাধা তরকারী একটু মাছপোড়া পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে চটকে মাখা। বুড়ার মাথার কাছে ডালি ঢাকা দিয়ে রাখল, ঘুম ভাঙলে খাবে। এবার যেতে হবে সেখানে, বুকের মধ্যে কি একটা উন্মাদনা জাগছে, বেদেনী নীরব চোখের ভাষায় কি বলল সারা বিকেল তারই সমাধান করার চেষ্টা করেছে। কেন মীমাংসা হয় নাই। এখন গেলে হয়ত ঠিক বোঝা যাবে। একটু সাজগোজ করার ইচ্ছা হ'ল, সিকায় ঝুলানো রঙীন মাটির বড় হাঁড়িটা নামাল, বের করল ভাল লুঙ্গিখানা আর ফতুয়াটা। সে দুটো পরে মাথাটা আঁচড়ে সিঁথিটা ঠিক করে নিল। মৃতা স্ত্রীর বাক্সটা খুলে ফেলল, প্রসাধনের কিছু থাকে যদি। স্ত্রীর স্মৃতি বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠলএকবার। সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর মুখ মিলিয়ে আবার সেখানে আসল বেদেনীর সেই হাসি। হাঁ, পাওয়া গেছে, সে-ই তো কিনে দিয়েছিল চরকের মেলা থেকে সাড়ে ছ'আনা দামের একটা গন্ধ। একটু ব্যবহারও করে নাই—আঙুলে করে নিয়ে মাখাল মাথার চুলে, গোঁফের প্রান্তে, গায়ের ফতুয়াটাতেও দু'এক ফোঁটা দিয়ে নিল। একটা পান ভাল করে খেয়ে নিয়ে চটি-জোড়া বের করে পায়ে দিল, টর্চলাইটটা টিপে দেখল জলছে না। হাঁ্যা ব্যাটারী অনেক দিন ফুরিয়েছে আর কেনা হয় নাই, কালই এক জোড়া ব্যাটারী নিতে হবে। লণ্ঠনটা হাতে করে নিল এবার, রওনা হতে হয়, রাত অনেকখানি হয়ে গিয়েছে। লণ্ঠনটা হাতে নিতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকছে। পাড়ার লোক দেখতে পাবে। নাঃ, অন্ধকারেই যাবে। জুতার শব্দ জোরে জোরে করলেই সাপটাপ সরে যাবে। তা ছাড়া অন্ধকারে চলাফেরার অভ্যাস তার ভালই আছে।

বেদেনী চোখের নীরব ভাষায় কি বলে গেল তাকে ? ধাঁধা ! স্ত্রীলোকের চোখ যেন এক ধাঁধা, না বুঝলে ও আবার [illegible] চোখে কি করুণ মিনতি, চোখাচোখি হলেই মুচকি হাসি। কিন্তু ধরা দেয় নাই তাকে। এরা চোখের ভাষায় আকুতি জানায় কিন্তু ধরা দিতে ভয় পায়।

অন্ধকারেই বেরিয়ে এসে বুড়ার কাছে একটু দাঁড়াল। বুড়া ঘুমুচ্ছে খুব। হাঁ্যা একটু আরাম হয়েছে বটে।

অন্ধকারে নিঃশব্দেই কিন্তু এগোতে লাগল সে। সব শুয়ে পড়েছে নাকি ? ঐ ত আলো দেখা যাচ্ছে, ঐ মানুষ চলাফেরা করছে, কিছু বলবে নাকি ওরা ? খুব বজ্জাত লোক ওরা, সবাই বলে। তা আমি ত রোগীর খবর নিয়ে যাচ্ছি, বিকেলে অতখানি রক্ত বের করে দিল, রোগী একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তাই এসেছি। আন্দাজে চড়া কথা বললে ত হবে না, মনে মনে জবাব ঠিক করে রাখে।

তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল পানসিয়া। পশ্চিমের ঐ ধুরাটাই হবে বোধ হয়। কাছাকাছি গিয়ে জোরে গলা হাঁকার দিল একটা। না কোন সাড়া নাই। ভেতর দিকে ঐ ত কয়জন লোক গোল হয়ে বসে গাঁজাই বোধ হয় খাচ্ছে। গন্ধ পাচ্ছে সে, একটু ইতস্ততঃ করল—তার পরেই সটান গিয়ে তাঁবুটার সামনে দাঁড়াল।

—কে আছে মানুষ ?

একজন স্ত্রীলোক পাশের তাঁবু থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল, তার পর একেবারে বেরিয়ে এল সামনে। মুচকি হেসে বলল, কার খোঁজ করছ ?

আর একজন স্ত্রীলোক এল পিছে পিছে, পানসিয়া চিনল, এই ত সঙ্গে ছিল। তাকে দেখেই সে চেঁচাতে লাগল—

সোমারী, এ সোমারী, আয় আয় তাড়াতাড়ি, কে এসেছে দেখ।

সোমারি তিন-চারটা তাঁবুর পরের তাঁবুটায় গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি ছুটে এল সেখানে। সোনাদাদা এসেছ ? এস এস বস। একটা মোড়া এনে দিল তাঁবুর সামনে। দুটো বিড়ি ধরিয়ে একটা পানসিয়াকে দিয়ে অন্যটা নিজে নিয়ে বসল আর একটা মোড়াতে পানসিয়ার মুখোমুখি।

টিমটিমে কুপীর আলোয় সোমারিকে মোহময়ী দেখাচ্ছে। রোদে পোড়া গৌরবর্ণে সিঁদুরের ছটা লেগেছে যেন,—পানসিয়া মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে।

বাপজান কেমন ?

ভালই আছে, খুব ঘুমুচ্ছে—

বেশ কমেছে তা হলে ?

হোঃ।

গল্প জমল না, সোমারি উদাস ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে বিড়িতে টান দিয়ে চলেছে। পানসিয়া কোন কথায় খেই খুঁজে পায় না, প্রথম শিহরণ থেমে এসেছে, অনেকটা সামলে নিয়েছে সে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা দেখছে এখন। এখানে-ওখানে লোক

চলাচল করছে, একটু ভয়-ভয়ও ঠেকছে। কি জানি! কিন্তু তাকায় আবার সোমারির দিকে। মোহিনীমূর্ত্তিতে বসে আছে সামনে। এখন যাওয়া দরকার বুঝেও যেন সম্মোহিত হয়ে বসে আছে। মনের ভিতরটা তো দেখতে পাচ্ছে না! কি জানি মনের ভাব কি?

—আমি এখন যাই তা হলে—

—এ্যা, বাড়ী যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন? বউ তো নাই—

—বউ না থাকলে যেতে হবে না? রাত হয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা যেও, আমি না হয় রেখে আসব। বস গল্প-সল্প কর।

—তোমার বাড়ীর মানুষ রাগ করবে না? ভয়ে ভয়ে কথাটা বলে ফেলল।

খিলখিল করে হেসে উঠল সোমারি—

—বাড়ীর মানুষ অই তো বসে।

—পানসিয়া ত্রস্তে চারিদিকে খোঁজে, কাউকে দেখা যায় না—

—দেখতে পাচ্ছ না?

সোমারি অতর্কিতে উঠে এসে পানসিয়ার গাল দুটো দু' হাতে ধরে মাথায় একটা দোলা দিয়ে বলে, এই যে ঘরের মানুষ।

এই আক্রমণের জন্য পানসিয়া প্রস্তুত ছিল না মোটেই। আত্মরক্ষার কোন শক্তিও ছিল না তার। হাঁ, অ্যা করে আনন্দের অভিব্যক্তিসূচক শব্দ কেবল বের হ'ল গলা দিয়ে। হাত দুটো ধরতে গিয়েই দেখে সোমারি আবার গিয়ে মোড়ায় বসে পড়েছে। গতি যেন বিদ্যুতের মত, চোখে রহস্যময় হাসি।

—এবার দেখতে পেয়েছ তো?

গা দিয়ে ঘাম ঝরছে পানসিয়ার। নিঃশ্বাসও জোরে জোরে বইছে। সমস্ত দাঁতগুলো বের করে হাসতে লাগল সে।

এবার গম্ভীর হয়েছে বেদেনী। আমার কেউ নেই ভাই, স্বামী অনেকদিন মারা গিয়েছে। আর কাউকে নেই নাই। একাই থাকি, খাই-দাই বেড়াই, তোমার মতই আর কি!—উঠে গিয়ে আবার দুটো বিড়ি আনে, ধরিয়ে আবার হাতে দেয় পানসিয়ার—টানো—

—তোমরা এখানে কতদিন থাকবে?

—এই তো কাল এসেছি! কতদিন থাকব ঠিক কি?

—আচ্ছা তোমার দেশ কোথায়?

—আমাদের দেশ গোটা দেশটাই। বাড়ীঘর তো সঙ্গের সাথী—

—বান্দি এসে সোমারির পাশে বসল। একটা ঠেলা দিয়ে বলল, সোনাভাইকে তো খুব পটিয়েছিস, একটু রসান দে।

সোমারি পানসিয়ার চোখে চোখ রেখে বললে, চলবে?

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে পানসিয়ার। বোকার মত তাকিয়ে আছে। প্রশ্নটা প্রহেলিকাময়।

বান্দি ফোড়ন দিয়ে বলল, দেখছিস না? গলা শুকিয়ে গিয়েছে, রা বেরুচ্ছে না।

সোমারি গিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল, একটু পরে বেরিয়ে এল এক হাতে বোতল অন্য হাতে ছোট একটা গেলাস। গেলাসটা ভর্ত্তি করে পানসিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পানসিয়া চমকে উঠল, সর্ব্বনাশ হারাম!

কোনদিকে গ্রাহ্য নাই সোমারির। নির্ব্বিকার ভাবে পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল—দেখব আমায় তুমি ভাল বেসেছ কিনা—বাঁ হাতে বেড় দিয়ে চিবুকটা বুকে চেপে ধরল এবার। গেলাসটা মুখে লাগিয়ে দিল। এখন হারাম তো কোন্ ছার বিষ দিলেও আপত্তি করার সাধ্য ছিল না পানসিয়ার। দু' ঢোক গিলেই তীব্র ঝাঝে মুখটা বিকৃত করে উঠল। সোমারি গেলাসটা মাটিতে রেখে ঘাগরার প্রান্ত দিয়ে মুখটা মুছে দিল। আবার গেলাসটা মুখে ধরল। আবার দু' ঢোক গিলে মুখ সরিয়ে নিল পানসিয়া। কিন্তু ধীরে ধীরে সবটাই গিলতে হ'ল তাকে। তীব্র হলাহলে উন্মাদনা জাগছে যেন। শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বসল একটু চুপ করে। এবার বোতল সুদ্ধই লাগিয়ে দিল নিজের মুখে। কয়েক ঢোক গিলে মোড়ায় গিয়ে বসল।

বরেন্দ্রভূমির নিস্তব্ধ রাত্রি। গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। সন্ সন্ শব্দ বাতাসের। রাত-চরা একটা পাখী মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। দূর সাওতালপল্লীতে মাদল বাজছে একটানা, মাথার উপর অসংখ্য নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলছে। সামনে পুকুরের জলে প্রতিফলিত হয়ে দুলছে ঢেউয়ের তালে তালে। সেই কম্পনের ছোয়া লেগেছে পানসিয়ার বুকে, মনে তার সাড়া জেগেছে। আর কোন সঙ্কোচ নাই, ভয় নাই, তার পৌরুষ জেগে উঠেছে, প্রচণ্ড ভাবে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু একি! সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে। সোমারির দিকে এগিয়ে যেতে টলতে টলতে চার-পাঁচ হাত দূরে টাল সামলে দাঁড়াল। সোমারি উঠে ধরল পেছন থেকে, বেশ কৌশলে, নিয়ে এসে বসিয়ে দিল মোড়ার উপর। ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তর তর করে টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল।

বান্দি বললে দেখছিস কি? নাগরকে এবার বাড়ী পৌঁছানোর ব্যবস্থা কর।—পানসিয়া এবার নিজের আসন্ন বিপর্যয় বুঝতে পেরেছে। জড়িত স্বরে বলল, আমাকে বাড়ী রেখে এসো।

সোমারি ডাক দিল—চল ভাই দু'জনে রেখে আসি। এই ত কাছেই।

হ্যাঁ চল। নাগরের আর দম নাই বেশী।

দু'জনে দু'বাহু ধরে নিয়ে চলল তাকে বাড়ীর দিকে, কাছে এসে জোরে কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, যেতে পারবে?

পারব, তোরা যা। টলতে টলতে পানসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। সোমারি আর বান্দি ফিরল তাঁবুর দিকে।

বান্দি বললে, খুব ত মাতাচ্ছ; বলি রসকস কেমন আছে? বাড়ীঘর দেখে ত মনে হয় না কিছু আছে।

—আরে যেথানে রসকস দেখাচ্ছে না পাওয়া যায় সেটাই ত মিষ্টি বেশী। দেখি কতখানি কি করতে পারি।

—খুব তাড়াতাড়ি যেন চলে পড়ল?

—কোনদিন পেটে পড়েনি বোধ হয়; তা ছাড়া একটু ওষুধও দিয়েছিলাম গ্লাসের মধ্যে; না হলে পারা যায় ওর সঙ্গে? প্রথম থেকে তাকাচ্ছে যেন একেবারে বুনো মোষ।

—দেখিস ভাই, বাদিয়া জাতের মান খোয়াস না। আমরা কেউটে নিয়ে খেলা করি কিন্তু কামড় খাই না কোনদিন।

সোমারি ঘুরে দাঁড়াল বান্দির সামনে—আমিও বাদিয়ার বাচ্চা। পুরুষ ঠিকই সাপের জাত। ওদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমার বড় ভাল লাগে। কামড়াতে এলে দাঁত ভেঙে দেব না!

নিঃশব্দে আস্তানায় ঢোকে দু'জনে।

পরের দিন সোমারি ইচ্ছা করেই গেল না। পানসিয়ার পরিণাম তার জানাই ছিল। দুপুর পর্যন্ত চাঁদকে আর উঠতে হবে না। গেল তার পরের দিন গ্রামফেরতা ঠিক দুপুরে, সঙ্গে বান্দি। বুড়ার গতিবিধি স্বল্পপরিসরের মধ্যে; বারান্দায় বসে তামাক টানছে; সোমারিকে দেখেই মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—আয় আয় বেটী বস।

সোমারি বারান্দায় গিয়ে বসল, বাপজান কেমন?

—কেবুল এ্যানা ভাল লাগোছে, মাথার ব্যাদনাটা আর বুঝবা পারোঁ নাই, এ্যানা বাতের চিকিৎসা করেক বেটী।

—করব করব, আরও দু'চার দিন যাক, পায়ে চুঙ্গি দিয়ে বাঘের তেল দিব; দেখবে সব ভাল হয়ে যাবে। আচ্ছা সোনা-ভাই বাড়ীতে আছে? পরশু সন্ধ্যায় মাথা ঘুরছিল নাকি?

হোঁ হোঁ, কাল দুফরতক বিছনাত পড়িছিল, এখন বুঝি আছে ভালই।

—যাই একটু খোঁজ নিয়ে আসি, বলেই ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে।—বান্দি বুড়ার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল।

পানসিয়া অবাধ্য উনুনকে চোঙা দিয়ে বাধ্য করার চেষ্টায় গলদঘর্ম, সোমারি একেবারে বারান্দার ধারে ডাক দিল—সোনা-দাদা কেমন?

পানসিয়া তার আগমনের আভাস আগেই পেয়েছিল বোধ হয়, গম্ভীরভাবে মুখ না ঘুরিয়েই বললে, বস।

সোমারি বুঝল বেশ রাগ হয়েছে। পুরুষের রাগ ভাঙানোর কৌশলও তার অজানা নয়। হেসে বলল, মাথা ধরেছে না?

একেবারে বারান্দায় উঠে পানসিয়ার পা ঘেঁসে বসে চোঙাটা কেড়ে নিল।—যাও যাও একটু ঠাণ্ডা হও।

নিজেই ফুঁ দিতে আরম্ভ করল সোমারি। পানসিয়া একটু পরে চোখ-মুখ মুছতে লাগল গামছা দিয়ে। উনুনটা জ্বলেই উঠেছে তাড়াতাড়ি নিভে জ্বলিয়ে তুলল, ভাতে এল আই ফুটে আসে যে—নিজেই পাশ থেকে ঘটিটা তুলে নিয়ে হড় হড় করে জল ঢেলে দিল ভাতের মধ্যে।

—ওটা কি হ'ল? বিস্ময়ের সঙ্গে পানসিয়া বলল—

—কেন—ভাতটা না হলে পুড়ে যেত না?

—কেউ দেখলে কি বলবে! দশের কানে গেলে জরিমানা হয়ে যাবে—

—জরিমানা হবে কেন?

—কেন তোরা কি বুঝবি।

—জাত যাবে নাকি?

—তা তোর ছোঁয়া খেলে জাতে ধরবে ত—

—মুসলমানের জাত যায়?

—জাত যায় না কিন্তু জরিমানা দিতে হয়। না দিলে দশে বন্ধ রাখে।

—এখানে কেউ দেখে নাই, তুমি চুপ করে থাক।

ওখান থেকে নেমে এসে সোমারি শোবার ঘরের বারান্দায় বসল। পানসিয়া গম্ভীর হয়ে আছে, রাগ পড়ে নাই।

—একটা বিড়ি খাওয়াবা না?

পানসিয়া গিয়ে ঘরে ঢুকল, বিড়ি দিয়াশলাই বের করে নিয়ে এসে হাতে দিল, তার পর উনুন থেকে ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে কাত করে ফেন ঝরতে দিয়ে, নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে আঙিনায় পায়চারি করতে লাগল। কি একটা সঙ্কল্প করছে সে, মনের উত্তেজনা মাঝে মাঝে বিড়িতে জোর টানে প্রকাশ পাচ্ছে।

—তা হলে আমি যাই কেমন? তুমি ত একটু হেসে কথাও বললে না।

মুহূর্তের মধ্যে তর্ তর্ করে বারান্দার উপর উঠে এল পানসিয়া, সোমারির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—সেদিন তুই আমার জাত মেরেছিস, আজ আমি তার শোধ তুলব। মেঝেতে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে দু'জনে, পানসিয়া হাঁফাচ্ছে, বেদেনীর মুখে মৃদু হাসি, পানসিয়ার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে স্থির ভাবে। কয়েক মুহূর্ত! মুক্ত ডান হাতখানা বাড়িয়ে পানসিয়ার বাঁ হাতখানা টেনে নিল বেদেনী, মৃদু চাপ দিল একটু, তার পর হঠাৎ জোরে টান দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে কি করল, পানসিয়া কিছু বোঝার আগেই দেখল মেঝের উপর ছিটকে পড়ে গেছে। তাকিয়ে দেখে বেদেনী দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে হাসছে খিল খিল করে।

এত বড় অপমানের সাক্ষী কেউ ছিল না, তাই রক্ষা! না হলে পানসিয়ার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। নীরবে উঠে দাঁড়াল; বেদেনীর শক্তিরও যেটুকু পরিচয় পেয়েছে তাতে বুঝেছে প্রাণজীবনের লজ্জাবতী লতা এ নয়। একবার ইচ্ছা হ'ল, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই করতে সাহস হ'ল না। যাবা সেই সময় সোমারির পাশ কাটিয়ে বের হয়ে এল সব

থেকে। রান্না ঘরের বারান্দায় গিয়ে বাটনা বাঁটতে লাগল সোমারির দিকে পেছন ফিরে।

সোমারিও নেমে এল, বারান্দার ধারে পানসিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল—

—ও সোনাদাদা—

—তুই আর আমার কাছে আসিস না, বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে—

সোমারি দাঁড়িয়ে সমানে ডেকে চলল—ও ময়না দাদা, ও চাঁদমুখো দাদা, ও রাঙা দাদা ও পাগলা দাদা, ও বউহারা দাদা, ও মনচোরা দাদা—

—তোর ঢঙের ডাক ভাল লাগে না, চলে যা বলছি—

—যাচ্ছি কিন্তু সন্ধেবেলা যেও কিন্তু।

পানসিয়া কোন সাড়া দিল না।

—আজ রাতে যেও—বলে বেরিয়ে গেল।

আজ কয়দিনই ওদিকে যাওয়া হয় নাই, পানসিয়াও আর আসে নাই, সোমারি বুঝেছে আর আসবে না। এত হাসি, চোখের ঠমক, উদ্দাম যৌবনের প্রলোভন, সবই একদিন ঘা খেয়েই মিইয়ে যাবে? এদের নিয়ে খেলতে বড় সুখ, এখনও রস নিংড়ানো হয় নাই। দুপুরে গাঁ কামিয়ে ফেরার পথে একাই হাজির হ'ল সেখানে। বুড়া বাইরে ঘরটায় ঘুমুচ্ছে ভিতরে কেউ আছে কিনা কিছুই বোঝা যায় না। নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল। আশ্চর্য্য হয়ে দেখল শোবার ঘরের বারান্দায় পানসিয়া পড়ে আছে একটা মাদুরের কিনারায়। ভাঁজ করা কাপড়ের বালিশ থেকে মাথাটা মাটিতে লুটাচ্ছে। একটা জলের ঘটি কাত হয়ে পড়ে আছে। মাদুরের খানিকটা ভিজে গিয়েছে। বারান্দার কিনারায় বমি, মাদুরে বমিতে মাখামাখি, গায়ে মুখে বমি শুকিয়ে চড় চড় করছে। একটা দুর্গন্ধ উঠছে সেখান থেকে। চেহারা কি বীভৎস করুণ। পেশীবহুল সুগঠিত বলিষ্ঠ মত দেহ আজ আর চেনা যায় না। গাল দুটো বসে গিয়েছে, দাঁতে ছ্যাতলা, চোখে কালিমা, সোমারি গিয়ে কপালে হাত দিল। প্রচণ্ড জ্বর, জ্ঞান আছে বলে বোঝা যায় না, বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে 'বাবা একটু জল' অস্ফুটে গোঙাচ্ছে। বেশ বোঝা যায় জল খেতে গিয়েই এই অবস্থা, সোমারি ঘটিটা তুলে নিয়ে তলানি জলটুকু মুখে ঢেলে দিল। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় জল গিলছে কিন্তু কয়েক ঢোক গিলেই হড় হড় করে বমি করে দিল। আবার নেতিয়ে পড়ল সে। সোমারি উঠে বারান্দায় কাপড়খানা ভাঁজ করে পাশে পেড়ে দিয়ে টেনে তাতে শুইয়ে দিল, কাপড়ের বালিশটা ঠিক করে মাথার নীচে দিয়ে দিল, নড়াচড়ায় পানসিয়া একবার শুধু তাকিয়ে—"তুই এসেছিস" বলে নিস্তেজ হয়ে পড়ল, দুপুর হয়ে গিয়েছে, এখন ফেরা দরকার—কিন্তু একে এ ভাবে ছেড়ে যেতে বাধবাধ ঠেকছে। দোটানায় পড়ে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। যদি না বাঁচে? মরুক গে কার কি আসে যায়? মাদুরটা গুটিয়ে আঙিনায় রেখে দিল, রান্নাঘরের কলসী থেকে জল এনে একখানা লুঙ্গি ভিজিয়ে মুখের, গায়ের বমিগুলো মুছিয়ে নিল। বারান্দার বমিটাও মুছে নিল। কপালে মুখে জল দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে ডাক দিল সোনাভাই—

—আঁ—একবার তাকিয়েই চোখ বুজল পানসিয়া।

এবার সে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। বুড়ার চলার শক্তি বিশেষ নাই জানে। পাশের বাড়ীর দুয়ারে হেঁকে বলল, ঐ বাড়ীর লোকটার খুব ব্যাবাম, তোমরা পাড়ার লোক একটু দেখ না?

কে যেন বলল, ব্যারাম বেশী হয়েছে নাকি? আচ্ছা আমরা দেখছি।

সোমারি আস্তানার দিকে পা বাড়াল।···

সোমারি বিকেলের দিকে পাশের গ্রামে গিয়েছিল, সঙ্গে বান্দি আর লছনী। ফেরার পথে পানসিয়ার বাড়ীর কাছ দিয়েই ফিরল। সারা বিকেল মনটা খচ খচ করছে। বারে বারে মনে ভেসে উঠেছে পানসিয়ার ব্যধিপীড়িত মুখখানা। মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে বারে বারে। কোথাকার কে? ওর মরা বাঁচায় তার কি আসে যায়? কিন্তু বারে বারে ঐ কথাই মনে হয়েছে। বাড়ীর কাছ দিয়ে যাবার সময় খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। বান্দি হঠাৎ টিপ্পনী কেটে উঠল।

—সোমারি তোর নাগরের খবর কিরে—

—কি করে জানব ভাই। আর কোন খবর নাই,—খোঁজ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছাটা মুখ ফুটে বলতে অহেতুক একটা লজ্জা তাকে থামিয়ে দিল। বাড়ীর কাছ দিয়ে নির্বিকার ভাবে এগিয়ে চলল নিজের তাঁবুর দিকে, একবার ফিরে চাইতেও পারল না। পুরুষ সম্বন্ধে লজ্জা তার জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করল। এতদিন পুরুষ-প্রসঙ্গ শুধু হাল্কা হাসি-পরিহাসে গুলজার করে তুলত।

রাতে সমস্ত তাঁবু নিঝুম হয়ে এলে সোমারি বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। তার চোখে ঘুম নাই, সামনে মাঠে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে হ'ল যাই একবার খোঁজ নিয়ে আসি পানসিয়ার। এখন গেলে কেউ দেখতে পাবে না, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলল পানসিয়ার বাড়ীর দিকে। নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কাছেই একপাল শেয়াল ডেকে উঠল, ঝিঝিপোকা একটানা ডেকে চলেছে, পুকুরপাড়ের তালগাছটা শুধু মাথা উচু করে পাহারা দিচ্ছে অতন্দ্র প্রহরীর মত, এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে জোনাকির ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠছে। এগিয়ে চলল সোমারি। পরিস্থিতিটা অনুকূল নয়, ধরা পড়লে বিপদ হবে এ সব চিন্তা তার মনেও এল না। বাড়ীর দরজা বন্ধ, বেড়ার টাটি অল্পক্ষণেই খুলে ফেলল, এ সব বাধাকে বাধাই মনে হয় না, এর চেয়ে কত বড় বড় বাধা অক্লেশে অতিক্রম করে গিয়েছে, তবে আজকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য রকম। আঙিনায় পা দিতেই বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। বারান্দায় উঠে ঝাঁপের ফোকরের ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো দেখা গেল। ভাল করে দেখেই

অন্ত লোক আছে বোঝা গেল না। দড়ির বাঁধনটা খুলতে লাগল আস্তে আস্তে। ভিতর থেকে ভীত জড়িত কণ্ঠে পানসিয়া চেঁচিয়ে উঠল—কে?

—আমি, আমি। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সোমারি।

বিস্ময়ে উঠে বসেছে পানসিয়া, তুই, তুই এত রাতে?

সোমারি কোন কথা না বলে প্রদীপের সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে পানসিয়ার বিছানার পাশে বসে পানসিয়াকে দু'হাতে শুইয়ে দিল, তুমি আগে শোও।

পানসিয়া শুতে কোন আপত্তি করল না। সোমারি গায়ে হাত দিয়েই বুঝল জ্বর কমে গিয়েছে, বুকের কাছে চেপে বসে কপালে একখানা হাত রেখে বলল, কি বলছিলে বল এবার।

—তুই এত রাতে কেন এলি তাই—

—কেন, আসতে কোন নিষেধ আছে? দুপুরে অজ্ঞান দেখে গিয়েছিলাম তাই একটু খোঁজ নিতে এলাম।

—আমি মলেই বা কি তোর, আর বাঁচলেই বা কি! আমি মরলে দুনিয়ায় কারও কিছু যায় আসবে না। তুই আমাকে নিয়ে খুব ভেল্কীবাজী খেলছিস, না?

ভেল্কীবাজী খেলেছি সত্যিই এতদিন, কিন্তু আজ এত রাতেও কি ভেল্কী দেখাতে এসেছি মনে কর?

—কে জানে! তোর মনের নাগাল পাওয়া কি আমার সাধ্য?

সোমারি কোন জবাব দিল না, নীরবে পানসিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। পানসিয়া মুগ্ধ ভাবে চেয়ে আছে তার মুখের পানে। হঠাৎ পানসিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে উঠে বসল, সোমারির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, তুই আমার হবি? আমাকে দেখা-শোনার কেউ নাই; তুই আমাকে নে।

সোমারি বসে আছে মৃন্ময়মূর্ত্তি যেন, পানসিয়ার উচ্ছ্বাসে বাধা দেওয়ার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়েছে তার। এত দিন বহু পুরুষের সংস্পর্শে সে এসেছে, বহু অভিনয়ও করেছে তাদের নিয়ে, এতটুকু রেখাপাত করে নাই। আজ যেন অকস্মাৎ নারীত্বের মণিকোঠা উন্মুক্ত হ'ল তার। নিজেকে আজ হারাতে চায় সে।

—তুমি আমাকে নিতে পারবা ঠিক? আমরা বাদিয়া, ছোট জাত।

—আমি নেব তোকে, কলমা পড়িয়ে নিব। দশে ধরলে জরিমানা দিলেই হয়ে যাবে। তুই বল আমাকে নিবি?

—আচ্ছা বুঝে দেখি, ঝট করে কথা দেওয়া ঠিক নয়।

পানসিয়া হাত দুটোয় একটু নাড়া দিয়ে আবার বলে চলল—আমার কেউ নাই—রোগে ব্যারামে আজ কেমন করে কেটেছে তা আল্লাই জানেন। মরে গেলেও কেউ একটু চোখের জল ফেলবে না, চোখ দুটো তার অশ্রু সজল হয়ে উঠল।

—তোমার যদি সাহস থাকে তাহলে, আমার কোন আপত্তি নাই।

—হাঁ, হাঁ, আমার জানা আছে, বিজলাহারের বড় মৌলবীর কাছে শোনা আছে—মুসলমান কলমা পড়িয়ে সবারই মেয়ে নিতে পারে, আমি ভাল হলেই—ওখান থেকে ফতোয়া নিয়ে আসব।

—আচ্ছা তুমি শোও। আমি লুকিয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি যেতে হয়।

আরও কয়েকটি নিশীথ রাতের আনাগোনায় দুটি হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়েছে। পানসিয়া বড় মৌলবীর কাছে বুঝে এসেছে চুপে চুপে।

—তুমি নিয়ে নাও হে, তার পর আমি আছি। ইছলাম কবুল করলেই হ'ল, তবে দশকে একটা জিয়াপোত দিতে হবে, সে ব্যবস্থা রেখ।...

সেদিন সোমারিরা বিকেলের দিকে এই রাস্তা দিয়েই ফিরছিল ভিন্ গাঁ থেকে, বুড়া ডাক দিল তাকে। সোমারি কাছে আসতেই ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার করে দিতে গেল।

—তোর পাউনিটা দেওয়া হয় নাই বেটী।

—না না ওটা আর দিতে হবে না। রাখ তোমার কাছে।

বুড়া যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল—পাঁচ টাকা ত দিবা পারমু না বেটী, এই এ্যাটা টাকা কত কষ্ট করি যোগাড় করমু, এ্যানা মিছরী খামু বলি বেটার কাছে কত করি চাহি নিমু।

সোমারি হেসে বলল, আচ্ছা দেও দেও।—হাত পেতে টাকাটা নিল। বুড়ার ইচ্ছা ছিল ওদের সঙ্গে দুটো গল্প করে, কিন্তু সোমারি কেন জানি বলল, না আজ থাক।—সঙ্গীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি আস্তানায় গেল।

সন্ধ্যাবেলা পানসিয়া দোস্ত কয়েকজনকে সব কথা বলে মতামত চেয়ে বসল। ফয়েজ চমকে উঠল।

—অঁ্যা সে কি কথা রে! তুই শালা ডুবে ডুবে খুব পানি খাচিস ত—নলুয়ার বেটী নিকা করবি?

—করলে দোষটা কি? আমরা না মোছলমান! আমরা সবারই মেয়ে নিতে পারি। বিজলাহারের বড় মৌলবীর সঙ্গে আমার বুঝকরা হয়ে গিয়েছে।

—বিজলাহার পর্য্যন্ত দৌড়িয়েছিস! তা দেখতে কেমন রে?

পানসিয়া সলজ্জ ভাবে বললে—যদি নিতে পারি ত দেখিস, গাঁয়ের উপর টেক্কা বউ হবে আমার।

—তা নে, দশে কিছু না বললেই হ'ল। গাঁয়ের মানুষের মতামতটাও নেওয়া দরকার।

—তুবা মোল্লার কাছে চল। তুই একটু আমার হয়ে বল, ঐ বুড়ার হুকুমটা পালে আর কাকেও মুই টেরাও না।

তুবা মোল্লা বড় গৃহস্থ, গাঁয়ের মধ্যে অবস্থাপন্ন, বয়সে বৃদ্ধ, তার উপর বুদ্ধিও পাকা। গ্রামের সব কাজে তাই তুবা মোল্লার মতামত প্রয়োজন হয়।

দু'জনে তুবা মোল্লার বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। বুড়া বাইরেই ছিল।

—নানার সাথে নিরিবিলি একটু কথা আছে ফয়েজ বললে।

—চল চল কোন দিকে যাবু।

সামনের মাঠের কিনারে গিয়ে বসল তিন জনে। ফয়েজই কথাটা তুলল। বুড়া প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারল না, বললে—পানসিয়া শেষকালে নলুয়ানীর পাল্লায় পড়িছে! অদের জাত আছে না কুল আছে? ভিখ করি খায়, সাপ ব্যাঙ বকচুর চামচিকা সব খায়। অর হাতে অঁয় খাবি কেমন করি?

—কিন্তু পানসিয়া পাগল হয়ে গিয়েছে নানা, না হলে দেশান্তরী হবে।

—হায় আল্লা! তোকগুণ করিছে! তা ছ্যাচা করি তোর ভাত খাবি ত রে? না ভুলকাই, ভালকাই তোর আতি পাঁতি যা আছে নিয়ে পালবি?

—পানসিয়া বলল, ও ঠিক আছে চাচা, শুধু তোমার হুকুমটা পেলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। পায়ের কাছে বসে মিনতিভরা কণ্ঠে কথাকয়টি বলে সে।

বুড়া বুঝল ব্যাপার অনেকটা গড়িয়েছে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তামাক টানল বুড়া, তার পর বলল, মুই মানা করলে তুই শুনবু না। চ্যাংড়া বয়স তোর, মাগী তোক ভেলকী করিছে। আদা খালে ঝালে বুঝবু। তা মোর কথায় ত দশের মুখ বন্ধ হবি না, দশক খিলাবা হবি। টাকার যোগাড় করবা পারবু?

ফয়েজ এবার পানসিয়াকে বলল, হুকুম ত হয়ে গিয়েছে, এখন টাকার যোগাড় ছাখ।···

দু'জনে চলে এল সেখান থেকে। বুড়া নিঃশব্দে তামাক টানল, তার পর বাড়ী ফিরল আস্তে আস্তে। আপন মনে দু'বার শুধু বললে, বিসমিল্লা, বিসমিল্লা!

সোহাগিকে নিতে হলে টাকার যোগাড় করতে হবে। টাকা সম্বন্ধে মোটামুটি ঠিক করেই রেখেছিল। কাল রবিবার, চাকলা-হারের হাট। সকালে উঠে গরুজোড়াকে ভাল করে স্নান করাল পানসিয়া। বেশ যত্ন করে খেতে দিল খড় ভুষি খৈল। নিজে আলু ভাতে সিদ্ধ করে সকাল সকাল খেয়ে নিল। বুড়ার জন্য সানকীতে করে ভাত বাইরের ঘরে এনে রেখে দিল। বুড়া বিস্মিত হয়েই গতিবিধি দেখছিল তার।

কুঠি যাবুরে—শুধাল।

পানসিয়া সে কথার কোন জবাব দিল না। বুড়াকে এখনও জানানো হয় নাই। বলতে একটু সঙ্কোচও হচ্ছিল। তা ছাড়া এসব ব্যাপারে বুড়ার মতামত নেওয়া কি দরকার? য'ন নিকা হবে তখনই ত জানবে। এখন জানালে যদি বেঁকে বসে ত মুশকিল!—বাড়ীর মধ্যে যেতে যেতে মনে মনে বললে।

—আমার আসতে একটু রাত হতে পারে। ঘর-দুয়ারগুলো দেখিস।

বুড়া এবার ফেটে পড়ল—শালা কোনঠে যাবা কোনঠে? একটু চুপ করে থেকে—সে কথা কহা যায় না? বাপ করি এ্যানা হুঁস নাই? মুইও বাপের বেটা ছিনুরে শালা। এই মতন বাপক হেলা ফেলা করি নাই কোনদিন। দিন দিন শালার আস্পর্দ্ধা বাড়ী যাচে।—রাগ হলে বুড়ার জ্ঞান থাকে না।

পানসিয়া কোন জবাব দিল না। একটু পরে ফতুয়া গায়ে দিয়ে, ভাল লুঙ্গিটা পরে বগলে বেতের লাঠিটা নিয়ে পান চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে এলো সে। হাসতে হাসতে মিষ্টিভাবেই বলল, গরুজোড়া নিয়ে চাকলাহারের হাটে যাচ্ছি বাবা, কেমন দাম বলে বুঝে আসি।

বুড়া বেশ বিস্মিত হ'ল। গরুজোড়াকে জানের চেয়ে ভালবাসে, সেই গরুর দাম যাচাই করতে যাচ্ছে। সে-ই ত কত বলেছে গরুজোড়া বিক্রী করতে, ঐ টাকা দিয়ে ঘরে বৌ আনার জন্য। কথা কানে নেয় নাই। একটু আগেই গালাগালি করেছে, পানসিয়া এভাবে মিষ্টি কথাও বিশেষ বলে না, বুড়ার মনটা বেশ নরম হ'ল। গরুজোড়ার যদি দাম হয় ত "বহু" আনতে কতক্ষণ! বুঝল ব্যাটার মন ঘুরেছে। বললে, যা তাই কর, দরটা বুঝি আয়, তার পর চরকতলা আবার ঘটকী পাঠাবো। একটা "বহু" না হলে কি ঘর সাজেরে বেটা! তোক কত কষ্ট করি, কত কোনা থাকি মানুষ করনু, তা আল্লা ঘর-সংসার গোছাই দিবা দিলি না। মুই কখন চোখ মোনজো কে জানে! একটা বছর পরের বাড়ী খাটি খা।—চোখ দুটো তার ছল ছল করে উঠল।

পানসিয়া ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তুই নক্ করি থাক্।—গরুজোড়া নিয়ে হাটের পথে বেরিয়ে গেল সে। বুড়া একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে।

বুড়া গুম হয়ে বসে ছিল কতক্ষণ খেয়াল নাই; তুবা মোল্লার ডাকে চমক ভাঙল।

—কি করছু রে বয়কু—

দুই বুড়াই সমবয়সী, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলে বেড়ে মানুষ হয়েছে।

—আয় আয় বোস। ঢের দিন পরে দেখা, মুই ত আর যাবাই পারি না কোনঠে। তামাক খা।—হুঁকা, কলকি, খড়ের বুদিতে আগুন সব হাতের কাছে থাকে বুড়ার। তামাক সাজতে লাগল সে। তুবা বারান্দায় পড়ে-থাকা চটটা টেনে নিয়ে বসল।

—তার পর ব্যাপার-স্যাপার কি রে। পানসিয়া কোঠে?

—ক্যান কি হইচে? পানসিয়া হাঠোত গেল। গরুজোড়ার কি মত দাম কহে এ্যানা যাচাই করবি। একটা বহু ছাড়া ত হামার চলে না ভাই। গরুজোড়া বেচি যদি একটা বছর পোণের টাকা যোগাড় হয়!

—সেক্তে চলে না রে কিন্তু ছোঁড়া এটা কি করলি?

বয়কু চমকে উঠল। ব্যগ্রভাবে সামনে ঝুঁকে পড়ল। কেন কি হইচে রে, কি হইচে?

—তুই জানিস না ? তোক কহে নাই ?

বরকু চেঁচিয়ে উঠল, না নারে, মুই ত কিছুই জানো না, কি হইচে কহেক ভাই। তোর পাঁও ধরি ভাই।

—তোক জানায় নি ছোড়া, গোটা গাঁ রটি গেইছে। অয় নিকা ঠিক করি ফেলাইছে।

—নিকা ঠিক করি ফেলাইছে ! কোঠে কে ঠিক করি দিল ?

—কে আবার দিবে, নিজেই করিছে, ঐ ঐঠে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বেদেদের আস্তানা।

বরকু ঠিক বুঝতে পারে না। সামনের মাঠটাকে দেখিয়ে পরিহাস করছে—ভাবে।

—তাম্‌সা খো ভাই ! কোঠে ঠিক করিছে কহেক। অইতনে গরু নিয়ে গেল বিকাবা।

—হেঁ। ঐ নলুয়াদের কোন ছুঁড়ির সাথে মজিছে ছোড়া।

—নলুয়ার ছুড়ি ? কি কহছিস রে। তুই জানলু কেমন করি ?

—কাল সাঁঝে মোর কাছে গেইছিল যে ছোড়া।

—তা তুই কি কহিলু ?

—কি কহিমু ! কয় নিবা পারিস নি।

—তুই কহিলু ! এটা কেমন হবি ? তুই মত দিলু ?

—না দিয়া কি করি, না হলে বেটা হামার দেশান্তরী হবি।

—কোন ছুড়ি নাম শুনিছু ?

—কিছুই জানি না। কয়েজ সাথে ছিল, খালি কহিলে নলুয়ার এক মাগী।

—মুই বুঝিছো ভাই ! ঐ ছুড়ি মোর মাথার কবরাজী করিছিল। অঁয়ই হবি।

—বুড়া একটু চিন্তা করল, তার পর বলল, তুষা ভাই, এ বিহা হামরা হবা দিম না। তুই থাকতে মোর বেটা নলুয়ানী নিয়ে ঘর করবি ? অরা ঘর-সংসারের কি জানে ? বকড়ুর চামচিকা খায় অর হাতে অঁয় খাবি কেমন করি ? দশের কাছে মুখ দেখাব পারবি ? এ বিহা কিছুতেই হবা দিম না। দেশে হামার বেটী নাই ?

—শোন শোনরে ভাই, অরা আজকালকার চ্যাংড়া, হামরা মানা করলে শুনবি ? জোড় করি করবি। খাম্‌কার হামার মান যাবি। তার থাকি করবা চাহোছে করুক। হামরা আর ক'দিন আছি ভাই ? অক নিয়ে যদি সুখ পায়, নেক, হামরা খালি দেখি যাই। তুই কিছু কহিস না। তুই মানা করবু বলে তোক কহেও নাই।

বুড়া দু'বার আল্লা আল্লা বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এত ঘোর প্যাঁচ অর ভিতর ! মুই এ্যানাও টের পাঁও নাই কিন্তু দশে ধরবি যে—

—অই তনেই ত গরু বিকাবা গেইছে। দেখা যাক ছোড়া-ছুড়ির দৌড় কতদুর।

সাজা কলকিতে আগুন দিতে ঢুকে গিয়েছিল বরকু, এবার বুদি থেকে খড়ের আগুন একমুঠো কলকির উপর চাপা দিয়ে তুষার হাতে দিয়ে, বলল, টান। তুষা মোল্লা হুকায় কয়েক টান দিয়ে হুকাটা ফেরত দিল।

—এবার মুই যাঁও। বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলল, অস্থির হস না, একটা তোর বেটা, কাজিয়া করিস না,—ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সে।

বরকু বারান্দায় বসে রইল যেন পাথর। অতীতের কত কথাই মনে ভেসে উঠছে।—চ্যাংড়া বাঁচে না। চারটা বেটা-বেটী আটগুটিয়া হই পাছাই গেল (মরে গেল)। তার পর ঐ পানসিয়া। যেন পানিত ভাসি আইলো। হাইরে সেবার পানি ! তিন দিন তিন রাত নিরবধি পানি। বাড়ীর মানুষ বার হবা পারে না। অর-মায়ের পেটের বেদনা উঠল। ঐ পানি ভাঙ্গি দেড় কোশ দূরে মজিলপুরে দাইয়ানি ডাকবা গেনু। সে কি মাগী আসবা চায় ! কত খোশামুদি ! আসি দেখি এত্তোকোনা চ্যাংড়া ট্যা ট্যা করি কান্দোছে। ও বাড়ীর ফুলনানী কহিলো বেটা তোর পানিত ভাসি আসিছে, ওর নাম থাক পানসিয়া। দুধ মেলে না ! টাকায় দু'সের করি দুধ তবু চ্যাংড়াকে কোনদিন সাবু খিলাই নাই। হাটবা এক সের করি মিছরী খাইছে। সেবার সান্নিপাতিক বিকার হ'ল, কেউ কহেনি যে বাঁচবি। দিন দু'বার করে বেহাল কবরাজের বাড়ী দৌড়াদৌড়ি ! অর মা চ্যাংড়ার দিকে দেখে আর কান্দি ভাসায়। অর কোলের আরও তিনটা বেটি বিহার যোগ্য হ'ল আর খোদায় নিয়া নিলি। এখন সবে ধন ঐ একটা। সেই চ্যাংড়া যুয়ান হইছে, চোখ পুরু হইছে।

—'আজু'। পাশের বাড়ীর ইদ্রিসের বৌ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, খবরটা গোটা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। ইদ্রিসের বৌয়ের চোখে কৌতূহল, মুখে হাসি, বুড়া তাকাল।

—নলুয়ানীকে দেখে দেওরা আমার মজে গিয়েছে আজু। বৌ বললে।

—মোর বেটা যা করুক মানষের তাতে কি ? বুড়া ঝন্ ঝন্ করে উঠল কাঁসার ভাঙা থালার মত। সব মজা দেখবা আইচে—

বৌটি মুখ ছোট করে চলে গেল সেখান থেকে। বুড়ার সঙ্গে একটু রঙ্গরস করার জন্য সে এসেছিল।

দুপুরে বুড়া কিছু খেল না, শুয়ে বসে হা-হুতাশ করে আর তামাক টেনে কাটাল। সন্ধ্যার আগে আগে বুড়া বসে ছিল, মনে অথই চিন্তা। হঠাৎ দেখল ধাগরা উড়িয়ে কে আসছে। একটু ঠাহর করে চিনল—এই তো ! এ ছাড়া আর কেউ নয়—মনটা বিষিয়ে উঠল, ওর দিকে পেছন ফিরে তামাক টানতে লাগল জোরে জোরে।

—বাবা ! বড় মধুর স্বরে ডাকল সোমাবি।

বুড়া মনে করল সাড়া দেবে না, কথা বলবে না কিন্তু ডাকটা যেন বড় মিষ্টি ঠেকল, বিরক্ত মুখখানা ঘুরিয়ে রুক্ষভাবে বলল—কি ?

সোমাবি কোন কথা বলল না, হাতের বড় কাগজে মোড়া কি একটা বারান্দার উপর রাখতেই কাগজটা খুলে গেল। দেখা গেল একটা বড় ঝিকমিক বদনা।

—ওটা কি হবে? বিস্মিত হয়ে বলে বুড়া—

এই বুড়া বয়সে যত্ন-আত্তি তো পাও না বাবা! তা এই বেটি তোমাকে একটু মিছরি খেতে দিচ্ছে।—বুড়ার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে এল, স্থিরভাবে চেয়ে রইল বেদেনীর দিকে। সত্যিই মেয়েটি সুন্দরী—নিটোল দেহশ্রী, চোখ দুটো বড় বড়, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। বুড়ার ক্ষোভ দুঃখ সব মুহূর্ত্তে জল হয়ে গেল। কথাগুলো দরদ-মাখা। তার ঘরণী মারা যাওয়ার পর এমন প্রাণঢালা কথা কেউ তাকে বলে নাই।

—বস মাগে বস।

সোমারি বুড়ার কাছেই বসল। আশেপাশের বাড়ী থেকে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ দেখল। বুঝল পাড়ার লোক জেনেছে, জানুক দু'দিন আগে আর পরে।

—তুই হামার বাড়ী আসবু মাগে?

সোমারি কোন কথা বলল না, মাথাটা নীচু করে বসে রইল। বুড়া তার সমস্ত দেহে চোখ বুলাচ্ছে। নাঃ ভালই হবে, চাই কি গাঁয়ের মধ্যে সেরা বউ হবে তার।

—মুই তো বুড়া অথবা, এ্যানা দেখাশুনা করবু ত বেটি?

—আশা তো করি বাবা।

—পানসিয়াক ঠিক মতন চালাবা হবি। অর আবার নানা নটঘট আছে। বিহানে উঠিই খাবা-দিবা হয়, দুফরে পাকের দেরি হলে চাচাই ভোগরাই বাড়ী মাথায় তুলবি। রাগ হলে মুখে মুখে জবাব দিবু না বেটি। মাষকলাইয়ের ডাল পুই শাক এলা খায় না, সব দেখিবা হবি। বুড়া এখন থেকেই তালিম দিতে আরম্ভ করে।

—আর তোমার বাবা?

—মোর? মুই তো অঠনঠিয়া বুড়া, দু'বেলা চারটা ভাত মধ্যে মধ্যে এ্যানা তামাকু সাজি দিবু; আর মায়ে বেটায় বসি বসি গল্প করমু।

সোমারির কি খেয়াল হ'ল, কলকেটা উঠিয়ে নিল। একটু তামাক সাজতে শিখি বাবা। কলকেতে তামাক দিল ঠিক মতই, দেখা গেল সোমারি তামাক সাজতে জানে ভালই! হুকার মাথায় কলকে বসিয়ে বুড়ার হাতে দিতেই বুড়া চট করে তার একখানা হাত জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠল। হামাক দেখিস মাগে কেউ নাই হামার, পানসিয়ার মা মরিছে, তুই অক দেখিস, তোর হাতে দিয়ে গেনু।—আবেগে হাত দুটোই জড়িয়ে ধরে তার। সোমারি তাড়াতাড়ি বলে—যাই বাবা রাত হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি চলে গেল সে। বুড়ার মনটা কেমন করে উঠল।

বিকেলের দিকে ফয়েজ, জঞ্জালু ভেলসা, গহর, কয়েক জন বেদেদের আস্তানার দিকে চলল, উদ্দেশ্য পানসিয়া যাকে দেখে ... সেরা।

ফয়েজ বললে—পানসিয়া বলছে, গাঁয়ের উপর সেরা বউ হবে রে—।

সকলের মুখে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ফুটে উঠল।

ভেলসা বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা আছে, বাদিয়ার ঘরে আর কত সুন্দর হবে। ওদের শুধু চামড়াটা একটু কটা এই যা—

—তা হামার বাঙালী ঘরের মতন হবা হবি না। অর যতই কেন কুদ্দুক (লাফাক)।—গহর বললে।

ফয়েজ বললে—না রে নলুয়ানীরা সত্যিই সুন্দর, আমি যাকে আঁচ করছি সেটা যদি হয় ত ওর ভাগ্যি ভাল।

—কিন্তু ওরা সাপ খায়, বাদুর ব্যাঙ সব খায়। ইঃ! থ্যাক্ করে থুতু ফেলে ঘৃণার পরিমাণটা প্রকাশ করে জঞ্জালু।

ভেলসা বললে—আমি ত ভাই ওদের ছুঁতেই পারব না, বাপরে গায়ের গন্ধ! নলুয়ানী আবার ঘর-সংসার করে! দেখিস তো দু'দিন পরেই যা আছে ওর নিয়ে পালাবে। পানসিয়াকে শেষ-কালে ভিক্ষা করে খেতে না হয়।

বেদেদের আস্তানাতেই এসে পড়েছে ওরা, সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিবেশটা লক্ষ্য করছে। সারি সারি তাঁবু মাদুরের। মাটির বুকে যেন ত্রিভুজ খাড়া হয়ে আছে। লোকজন কম, অধিকাংশই রোজগারের ধান্দায় বেড়িয়েছে। কয়েকটা মেয়েছেলে আছে। দুই-এক জনের দিকে তাকিয়ে সবারই মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। অস্পৃশ্য অখাদ্যখাদক বলে সান্ত্বনাটা মিইয়ে আসতে লাগল। ভেলসা ফয়েজের হাতে একটা চাপ দিয়ে দেখাল মাংসের মালা শুটকি হচ্ছে। কতকগুলো ঘোড়া, গাধা আশপাশে চড়ছে। বুড়া মত একটা লোক বেড়িয়ে এল তাঁবু থেকে। এমন দর্শক নূতন নয়, ওরা যেন অভ্যস্ত। বুড়া ডাক দিল আসেন আসেন মিঞা সাহেবেরা। ওরা যেতেই একটা মাদুর এনে বসতে দিল। বসল সবাই, লোকটা জানাল, সে-ই সর্দ্দার। সে কোনখানে যায় না বড়।

জঞ্জালু বলে উঠল—পানসিয়ার সঙ্গে তোমাদের যার নিকা হচ্ছে তাকে দেখতে এসেছি।

বুড়া আকাশ থেকে পড়ল। কে পানসিয়া আর কার সঙ্গেই বা নিকা হচ্ছে?

ভেলসা পানসিয়ার বাড়ীটা দেখিয়ে বলল, ঐ যে ঐ বাড়ীর লোকের সঙ্গে তোমাদের কোন মেয়ের নিকা ঠিক হয়েছে, সেই মেয়েটাকে আমরা দেখতে এসেছি।

সর্দ্দার একটু গুম হয়ে রইল, মানুষ চরিয়ে খাওয়াই ওদের পেশা, বুদ্ধি রাখে। ঘটনাটা জেনে নেওয়ার জন্ম বলল, ঠিক হয়ে গিয়েছে, তোমরা জান ভাল করে?

—বা আমরা জানব না! আমাদের গাঁয়ের লোক। মৌলবীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছে, গ্রামের লোকের সঙ্গে বুঝা হয়ে গিয়েছে, বিয়ের খরচের জন্যে গরু বেচতে গিয়েছে পানসিয়া—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি, তা সে মেয়ে ত ভিন্ গাঁয়ে গিয়েছে, কাল এস, দেখাব।

—সন্ধ্যায় আসবে না?

—না না কখন আসবে ঠিক কি। কাল এস। এখন যাও তোমরা।

সকলে মনঃক্ষুন্ন হয়েই গাঁয়ের দিকে ফিরল।

ওরা চলে যেতেই সর্দ্দার সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখে তার ব্যাঘ্রের হিংস্রতা। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। বাদিয়ার বেটি! বাদিয়ার বেটি হবে হালুয়া গৃহস্থের দাসী। তার যাট বছরের জীবনে এত বড় তাজ্জব কথা আর শোনে নাই। অনেক-ক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল সর্দ্দার। সন্ধ্যা হতেই মেয়ে পুরুষ সব ফিরতে লাগল। সর্দ্দার ডাক দিতেই এসে দাঁড়াল সকলে। তার মুখ দেখে সবাই বুঝল কিছু একটা হয়েছে। উৎসুক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

গম্ভীর গলায় সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করল—আমাদের কোন বেটি ঐ বাড়ীর পানসিয়া হালীর সঙ্গে নিকা বসছে?

সকলে তাজ্জব বনে গেল। কৈ আমরা ত কিছুই জানি না।

—কিন্তু আমি জানি, পাড়া থেকে খবর পেয়েছি ভালভাবে। কে সেই শয়তানী?

বান্দি বললে এবার—হ্যাঁ, হতে পারে, আমাদের সোমারি ঐ বাড়ীটায় খুব যাওয়া আসা করছিল, হলে সোমারি ছাড়া কেউ নয়।

—কোথায় সোমারি ডাক দাও, কিন্তু সোমারিকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও।

সোমারি! সোমারির এই মতলব? যুবক গিজলা রুখে উঠল। খু টাগাড়া গৃহস্থের আঙ্গিনা ঝাঁট দিবে সোমারি! ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিব।

বহুদিন থেকে সে সোমারির পেছনে ঘুরছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যানের বেদনাই তার মনে জমা হয়ে আছে; তাই তার রাগটা সবচেয়ে বেশী দেখা গেল।

সর্দ্দার বলল, কিন্তু সোমারি ত নাই! এত রাত পর্য্যন্ত দেখা নাই, ও নিশ্চয়ই ওখানে গিয়েছে।

কে একজন স্ত্রীলোক বলল, হ্যাঁ দূর থেকে সোমারির মতই কাকে যেন ঐ বাড়ীরই বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছে, ঠিক সন্ধ্যাবেলা।

গতিক বড় খারাপ, আর যদি না আসে?

গিজলা রুখে উঠে বলল, যদি না আসে ত সারা গাঁ জ্বালায়ে ছারখার করে দিব।

—তোরা সব শোন। এটা রাগ করার সময় নয়, এখন যেমন করে হোক ওকে দলে আনতে হবে। এখান থেকে সরে যেয়ে তারপর ব্যবস্থা, এখন খুব কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

এমন সময় কে যেন বলে উঠল—ঐ যে সোমারি দুয়ারে ঢুকল। দেখা গেল সোমারির তাঁবুতে আলো। এতক্ষণ অন্ধকার ছিল ওদিকটায়।

সর্দ্দার বলল, তোমরা কোন রকম গোলমাল করো না। আপন আপন ধুরায় চলে যাও। ভুখিলা, গিজলা আরও দু'চার জন জোয়ান থাকো এখানে। আমি গিয়ে আগে শুনি, ও কি বলে। বাদিয়ার বেটি গৃহস্থ ভুলানই ত পেশা আমাদের মেয়েদের, কিন্তু···কথাটা শেষ হ'ল না, দেখা গেল আর একটা পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে সোমারির তাঁবুর সামনে। বান্দি ছুটে এসে বলল, ঐ যে ঐ লোকটার সঙ্গেই ওর খুব মাখামাখি হচ্ছে। ঐ যে ঐ বাড়ীরই লোক।

—আচ্ছা তুই ধুরায় যা, হল্লা করিস না, আমরা বুঝি ব্যাপার কতদূর।

পানসিয়ার গরু বিক্রী হয়েছে বেশ ভাল দামেই, ও আশাই করে নি যে চৌদ্দ কুড়ি টাকায় বিক্রী হবে। বার কুড়ি হলেই দিয়ে দিত। মনটা খুব খুশী, সোমারির সাতটা ভাল। কপালী বউ হবে। সংসারের নিশ্চয়ই উন্নতি হবে, চাই কি খোদা করলে আসছে সনেই সে "মাখোটিয়া" মোষের হাল বইবে। তাড়াতাড়ি ফিরছে সে হাট থেকে। হিসাবমত দু' কুড়ি টাকা বেশীই পেয়েছে, তারই খানিকটা দিয়ে কিছু উপঢৌকন এনেছে সোমারির জন্যে। এখনও ওকে কিছু দেওয়া হয় নাই, আজকে দেবে বলে সোজা হাট থেকে সোমারির দুয়ারে এসে দাঁড়াল। সোমারি হেসে একটা মোড়া দিল বসতে। ঠিক দুয়ারের কাছে বসল পানসিয়া, সোমারির মুখোমুখি। সোমারি তাঁবুর ঠিক মুখটাতে বসে।

—হাতে ওটা কিসের পুটুলি? সোমারি শুধায়।

—তোর জন্যে নিয়ে এলাম। কিছু ত দিতে পারি নাই এত দিন।—বলেই খুলতে লাগল, সোমারি উজ্জ্বল চোখে চেয়ে রইল। পুটুলি খুলে বের করল একটা গন্ধদ্রব্য, ছিপিটা খুলে নিজের নাকে লাগিয়ে দিল একটু। সোমারির গায়ে একটু ছিটিয়ে দিয়ে বলল, ধর।—সোমারি হাত বাড়িয়ে নিয়ে দেখতে লাগল চমৎকার গন্ধ-দ্রব্যটি। এই নে, আরও ধর।—একটা সাবান বের করে হাতে দিল, একটা স্নো বের করে মুখটা খুলে নাকে একটুকে শুঁকে বললে, দেখ, কেমন খোশবু! এটা মুখে মাখতে হয়, জানিস?—সোমারি মুগ্ধভাবে মাথা নাড়ল।

দুটো চুলের ক্লিপ, গোলাপ-ফুল-বসানো লাল টুকটুক করছে। ধর, মাথায় সিঁথির দু'দিকে চুলে বসিয়ে দিবি। এমন সুন্দর দেখতে লাগবে কিনে—

একটু সরে আয়—বলে নিজেই উঠে গিয়ে ক্লিপ দুটো মাথায় আটকে দিল। বলল, আরশিতে দেখ কেমন মানিয়েছে।

এবার বার করল একটা শিশি, তরল আলতা। এটা আমাদের

মুসলমানরা পরে না, হিন্দুর বউয়েরা পায়ে পরে, খুব ভাল লাগে দেখতে। তুই এটা পরিস খুব মানাবে।

এইবার বার করল নীল কাগজে মোড়া একজোড়া খাড়ু। এদিকে আয় পরিয়ে দিই। সোমারি বলল, থাক এখন, পরে পরব। ওকে সর্দ্দার দূর থেকে লক্ষ্য করছে বুঝতে পেরেছে।

—না না—নিজেই উঠে গেল, হাতে পরাতে লাগল খাড়ু-জোড়া।

ব্যাপার অনেক দূর গড়ালেও সোমারি হালকাভাবেই নিয়েছিল এতদিন। আজ গুরুত্বটা যেন ঠিক বুঝতে পারছে। তার সমাজের কেউ জানে না, সর্দ্দার তাকে লক্ষ্য করছে। একটা অশুভ আশঙ্কায় মনটা তার ভারী হয়ে উঠল।

একটু ম্লানভাবে বলল, দিচ্ছ ত একেবারে উজাড় করে কিন্তু—থেমে গেল সে।

—কিন্তু কি ?

—আমাদের কাউকেই বলা হয় নাই। আমাদের দলের মতও ত নিতে হয়।

—ওরা অমত করবে ?

—বলা যায় না।

—তা হলে ?

—তা হলে কি তুমিই বল।

—তুই চলে আসবি আমার ঘরে।

—অগত্যা তাই।—একটু ভেবে বলল সোমারি।

—আজ রাতেই সর্দ্দারকে বলবি—

—হ্যাঁ, আজই বলাব বান্দিকে দিয়ে।

—হ্যাঁ, সর্দ্দারকে বলে, কি বলে জানাবি।

—আচ্ছা।

—তা হলে আমি যাই ?

—আচ্ছা যাও।

যাওয়ার সময় একখানা হাত ধরে বলল, আজ রাতে যাবি ত!

—যাবো

—তখন যেন খবরটা পাই।

—আচ্ছা

—যাবি ত ?

—যাব, যাব।

—ঠিক ?

—ঠিক।

—কথা যেন নড়চড় না হয়, বেরিয়ে গেল পানসিয়া।

পানসিয়া বেরিয়ে যেতেই সোমারির দুয়ারে এসে দাঁড়াল সর্দ্দার, ভুখিলা, গিজলা আরও কয়েকজন। ওদের মুখের দিকে তাকিয়েই সোমারির প্রাণ শুকিয়ে গেল, সর্দ্দার হাঁকল—

সোমারি এদিকে বাইরে আয়।

সোমারি এসে দাঁড়াল। গিজলার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল চোখ দুটো তার জ্বল জ্বল করছে হিংস্র শ্বাপদের মত।

—ঠিক করে বল, ভুঁইচাষী গৃহস্থের সঙ্গে নিকা বসছিস কিনা—

সোমারি কোন জবাব না দিতে পারল না; মাথা নীচু করে রইল।

—একথা সত্যি ?

—ঐ বাড়ীর লোকটা খুব ধরেছে তাই বলেছি সর্দ্দারের সঙ্গে বুঝে দেখি।

—অ—সর্দ্দারের সঙ্গে বুঝে দেখ! তোর তা হলে মন আছে ?

—আমার মন আর অ-মন কি। আমাদের সর্দ্দারের মন হলেই মন আর না হলেই না। একটু হেসে পরিস্থিতিটা হাল্কা করতে চায় সে।

—শয়তানী! তুই না বাদিয়ার বেটি ? হুঙ্কার ছাড়ল সর্দ্দার, ভুঁইচাষী গৃহস্থ! তার ঘরের দাসী হবি তুই ? গাছের মত জীবনটাই এক জায়গায় কাটাতে পারবি ? আমরা ঘুরি দেশ-দেশান্তরে, ঘর-সংসার আমাদের চলতি জীবনের সঙ্গী; কোন জায়গার মায়া, আমাদের বাঁধতে পারে নি কোন দিন। আমরা ভালবাসি রোদ বৃষ্টি আকাশ আর বাতাস। ঘর-সংসার করে ভেড়ার দল ঐ গৃহস্থরা, এক জায়গাতেই খুঁটা গেড়ে বাপ ঠাকুরদা গুষ্টির পর গুষ্টি জমি চাষ করে আর ঐ জমিতেই মরার পর চাপা পড়ে থাকে। তুই বাদিয়ার বেটী তাদের বাঁদী হতে চাস ? সমস্ত বাদিয়া জাতের মুখে কালি দিতে চাস তুই ? মনে রাখিস, গৃহস্থ চাষ করে জমি, আর আমরা বাদিয়া—চাষ করি গৃহস্থ।

—সে ঠিকই ত—সোমারি অস্ফুটে বলল।

—হ্যাঁ, তবে আর দেরি নয়, এখনই এখান থেকে যাওয়ার জন্য বাঁধা-ছাদা আরম্ভ কর। মাঝ রাতের মধ্যেই এই জায়গা ছেড়ে যাব। এত সহজে রেহাই দেওয়ার ইচ্ছা গিজলার ছিল না, কিন্তু ব্যাপারটা গড়াল না বেশীদূর, তবু একটু কামড় দেওয়ার ইচ্ছা সামলাতে পারল না—হাতের রূপোর খাড়জোড়া দেখিয়ে টিপ্পনী কাটল—আবার গয়না পরিয়েছে! রসবতী আমার! আহা-হা! এত ঢলাঢলি গলাগলি, প্রাণটা বুঝি ফাটল। ভুখিলা হেসে উঠল।

—হ্যাঁ বালা শুধু আমিই পরি। তোর ঘরের কেউ কোনদিন ঢলাঢলি করে নাই কারও সঙ্গে ? ঢলাঢলি না করলে পেট চলে কারও কোনদিন ? তবে রূপোর গয়না আদায় করতে তোর কেউ পারে নি পারবেও না কোনদিন। আমি বাদিয়ার বেটি গৃহস্থ চষে খাই জানিস ?

গিজলার বউ সুন্দর নয়, কটাক্ষটা সেখানেই। গিজলা দাঁত চেপে কি যেন বলতে গেল। সর্দ্দার ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল, ও নিয়ে আর কথা কাটাকাটির দরকার নাই, তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য ঠিকঠাক কর সবাই।

খাওয়া-দাওয়া সেরে পানসিয়া বাড়ীর ও ঘরের দরজা খোলা

রেখে শুয়ে পড়ল। সারাদিন সাংঘাতিক পরিশ্রম গিয়েছে, প্রচণ্ড রোদে ঘুরে হাত পা চোখ মুখ জ্বালা করছে, ঘুম আসে না। সোমারিও আসছে না—উঃ, এত দেরি কেন ? এখন ওর হাতে হাতটা রাখলেও সব জ্বালা তার শান্ত হয়। একবার উঠে চারিদিক দেখে এল, আবার শুলো। ভাবী বধূরূপে সোমারিকে কল্পনা করে মনটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, আবার উঠে বাইরে গেল—এখনও আসে না ? রাত ত দুপুর হ'ল, ধীরে ধীরে পা বাড়ায় ওদের আস্তানার দিকে। কাছে এসে মাথা ঘুরে গেল। সর্ব্বনাশ ! শুধু ধু ধু মাঠটা পড়ে আছে। মুহূর্তে বুঝল পালিয়েছে সব, কিন্তু সোমারি ? সেও কি পালাবে ? নিশ্চয়ই অন্য রাস্তায় তার বাড়ী গিয়েছে। ছুটে বাড়ী এল। নাঃ, ঘর খালি, আবার ছুটে গেল মাঠে। দূরে যেন মৃদুগুঞ্জন শোনা যায় মনুষ্যকণ্ঠের, ছুটল সেদিকে। কাছাকাছি গিয়ে দেখল ঠিক সার সার চলেছে গাধা ঘোড়া সব, অন্ধকারেও বেশ বোঝা যায়। মাথায় খুন চড়ে গেল তার। দূর দিয়ে ঘুরে পথ ছুটে একেবারে দলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বাহ্যজ্ঞান নাই, দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—থাম তোমরা।

দলটি থেমে গেল। সামনে এগিয়ে এল সর্দ্দার।

কি হয়েছে ভাইসাহেব ?

—সোমারি কৈ ? বেইমানি আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছে। আমার সব ফেরত দাও, না হলে এখনই হল্লা করে গাঁয়ের লোক জাগিয়ে দিব, যা আছে সব কেড়ে নিব।

—আরে ভাই রাগ কর কেন ? সোমারি কি করেছে বল, এখনই এনে হাজির করে দিচ্ছি তোমার সামনে। চল সামনে ঐ পুকুরপাড়ে। শুনি কি ব্যাপার। এখানে মাঠে ত আর এতগুলো লোক থামতে পারে না,—সর্দ্দার বিড়ি বের করল ট্যাক থেকে। পানসিয়ার হাতে দিয়ে বলল, ধরাও। নিজেও ধরাল একটা। একখানা হাত ধরে বলল চল ভাই।

সামনে বড় পুকুরপাড়ে এসে থামল সর্দ্দার। দলটির গতিও রুদ্ধ হ'ল। সর্দ্দার তাকে পাশে বসিয়ে ডাক দিল—সোমারি কোথায়, এদিকে আয়, পানসিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, ও আসুক, তোমার হাতে দিচ্ছি ভাইসাহেব, তুমি ওকে নিয়ে যা খুশী করো।

গিজলা, ভূখিলা, কাবারি তিন-চার জন এসে পানসিয়াকে ঘিরে বসল, গিজলা বসেছে পানসিয়ার গা ঘেষে।

সর্দ্দার বলল, সোমারি আসছে ?

হাঁ হাঁ আসছে, এখনই ভাইসাহেবের লেঙ্গুরে বেঁধে দিচ্ছি, খুব করে মজা লোট। বলেই ঘাড়ে হাত দিয়ে কি যেন ঢুকিয়ে দিল।

পানসিয়া ছিটকে লাফিয়ে উঠল, সর্দ্দারের হাতের টর্চ্চটা ঝলসে উঠল মুহূর্তে।

কালো একটা সাপ ঘাড়ে কামড়ে কাঁধের উপর দিয়ে বেণীর মত ঝুলছে—বুক ছাড়িয়ে হাঁটু পর্য্যন্ত।

একটা অব্যক্ত শব্দ করে হাত দিয়ে সাপটাকে টেনে ফেলে দিল পানসিয়া। ফেউটে কালনাগিনী ; ক্ষুধা তার হয়ত মেটে নাই, ক্ষোভে উদ্যত ফণায় মাটিতেই দু'বার মাথা ঠুকল।

কে যেন তাড়াতাড়ি সাপটাকে ধরে অ াচলে ভরল।

গিজলা ত্রস্তে হাতটা ধরে ফেলল পানসিয়ার। সর্দ্দার বলল, সাপে কামড়েছে বসাও, বসাও।

তিন-চার জন জোর করে হাত ধরে পানসিয়াকে বসিয়ে দিল।

সর্দ্দার বলল, কালসাপে কামড়েছে, ঝাড়া দাও। ঝাড়া দাও।

গিজলা মাথায় ফু দিতে লাগল—আহা-হা চাঁদ আমার ! সোনা আমার !

নিমেষে এদের চালাকি বুঝতে পারে পানসিয়া।

তোমরা মোক সাপের মুখে মারলেন ? জীবনের পুঞ্জীভূত হতাশা ফেটে পড়ল কথাটায়, কান্নায় গলাটা বুজে এল।

আসন্ন মৃত্যুর মুখে সমস্ত স্নায়ুগুলো প্রখর হয়ে উঠল। মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে এল তার। প্রাণপণে সবাইকে এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিয়ে বাড়ীমুখো ছুটল, বাবা ! বাবাগো !

গিজলা গিটকারি দিয়ে হেসে উঠল।

সর্দ্দার বলে উঠল, কামড় ঠিকমত হয়েছে তো ?

আজকারই টাটকা ধরা মাছুয়া আলাদ্, কতদূর যাবে বাছাধন যাক।—সাপের বিষ দৌড়ালে বিদ্যুতের মত কাজ করে সে তথ্য ওদের ভাল করেই জানা।

কিছু দূর যেয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ল পানসিয়া। সর্দ্দার, গিজলা সকলে এসে ঘিরে দাঁড়াল। কাবারী চিৎকার করে শুইয়ে দিল তাকে। হাত পা খিঁচছে মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে।

সোমারি ছুটে এল কোথা থেকে। মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে বসে দিয়াশলাইয়ের কাঠি একটা জ্বালল। মুহূর্তের আলোয় পানসিয়া দেখল সোমারিকে, কি যেন বলতে গেল কিন্তু কথাটা আর মুখ ফুটে বেরুল না, চোখ দিয়ে গল গল করে তা ঝরে পড়ল গাল বেয়ে। সোমারি হয়ত বুঝল কিম্বা বুঝল না—দু'ফোটা তপ্ত চোখের জল তারও গড়িয়ে পড়ল পানসিয়ার বুকের উপর।

সর্দ্দার বলল, শেষ হওয়ার আগেই লুঙ্গিটা খুলে নে।

গিজলা লুঙ্গিটা টেনে খুলে নিল। লুঙ্গির কোণে কি যেন বাঁধা।

সর্দ্দার টর্চ্চ ফেলল আবার, গিজলা খুলে ফেলল বাঁধনটা, সঙ্গে সঙ্গে ই-স্-স্-স্-স্-স্-স্-স্ একটা আনন্দের ধ্বনি মুখ দিয়ে বের হ'ল তার। একতাড়া নোট। সোমারি জ্বল জ্বল চোখে তাকিয়ে দেখল, অদ্ভুত লোলুপতা ফুটে উঠল মুখে। ছো মেরে নোটের তাড়াটা কেড়ে নিল।—এ টাকা আমার ! আমিই ওর ওয়ারীশ।

গিজলা লাফিয়ে হাত ধরতে যেতে সর্দ্দার ধমকে উঠল, এই খবরদার ! এ টাকার ভাগ কেউ পাবে না। সোমারিই ওর মালিক। আর আর সবাই সে কথার সমর্থন করল।

এইবার ভাল করে ঢুকিয়ে দে পুকুরের ঐ দামের তলায়। বেরিয়ে যেন না আসে।

পরদিন গ্রামে রটে গেল, বরকু মোল্লার বেটা পানসিয়া শেষ কালে বেদুয়ানীর সঙ্গে দেশান্তরী হ'ল ? ছিঃ। ছিঃ। ছিঃ।

শান্তিনিকেতনের "সংস্কার-ভবন"

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

অস্পৃশ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছিল বহু আগে থেকে। ১৩১৮ সনে লিখিত, 'সঞ্চয়' গ্রন্থের 'ধর্মের অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি লিখছেন, ছেলেদের মধ্যে অন্য কোনক্ষেত্রেই জাতিবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্ব নিয়ে কোন রকম ভেদবোধ জাগে না, কেবল আহারের ক্ষেত্রটি ছাড়া। "আহারকালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল—সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতেও অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতি অসহ্য মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান?" এ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, "আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে; বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি।" খাওয়াপরায় ও বসবাসের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই কেবল নয়, পূজা-অর্চনায়, এমনকি তথাকথিত ধর্মবোধের ক্ষেত্রেও মানুষের উপর কিভাবে উৎপীড়ন চলছে, তার উল্লেখ করে কবি বলছেন, "কত শত লোক পিতা-পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে—মন্ত্রে তোমাদের দরকার নাই, পূজায় তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই; তোমাদের কাছে ধর্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। তোমরা স্থূলকে লইয়াই থাক চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ওইখানেই নিচে পড়িয়া থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্মের ফল লাভ করিতে পারিবে।"

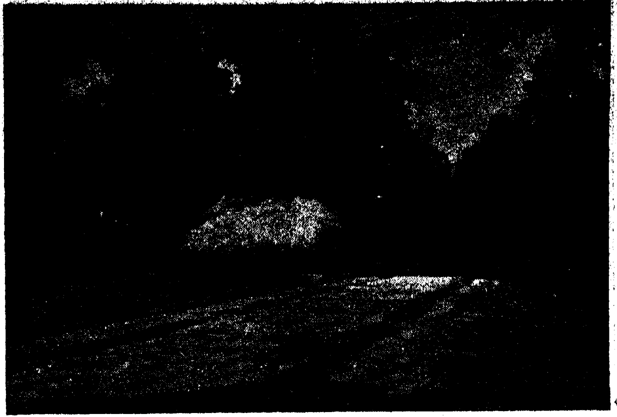
এর পরে কবি যে চিত্র এঁকেছেন তা আরও ভয়াবহ, আরও মর্মন্তুদ—কবির বাণীও হয়েছে তেমনি বজ্রকঠোর। মানুষের পরম সম্পদ ধর্ম। ধর্মের অধিকারে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতির চেয়েও নিদারুণ। সেই ক্ষতিগ্রস্ত "ভগ্ন মেরুদণ্ড নিষ্পেষিত-পৌরুষ নতমস্তক মানুষ" প্রশ্ন করতেও জানে না, প্রশ্ন করলেও 'তার উত্তর কোথাও নাই—"কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে" সে মানুষ চালিত হচ্ছে। চারদিক থেকেই তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে আকাশে তর্জনী উঠছে। কবি বলছেন—"নিষেধ জর্জরিত চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবার এত বড় সর্বদেশব্যাপী ভয়ঙ্কর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোন দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে?

দুর্গতি তো প্রত্যক্ষ, আর তো কোন যুক্তির প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, চোখ বুজিয়া কি কেবল তর্কই করিব?"

চোখ বুজে কেবল তর্ক না করে কবি কোন প্রণালীতে এ দুর্গতির প্রতিকার উদ্ভাবন করেছেন তা দেখা যাক। "ধর্মের অধিকার" প্রবন্ধেই তার হদিশ মিলে। তাঁর উক্তি থেকে এইটি প্রতিভাত হয়ে থাকে যে, মানুষকে বরাবরই ছোট হয়ে কাটাতে হয় যে সমাজ ব্যবস্থায়, তা অচিরেই পালটানো দরকার। সমাজে ছোট বড় থাকতে পারে, যেমন থাকে স্বাভাবিক ধারায় বয়সের দিক দিয়ে শিশু যুবা ও বৃদ্ধ। কিন্তু স্বাভাবিক ধারাতেই যেমন শিশু যুবা হয়, এবং যুবা থেকে বৃদ্ধ হওয়াও যেমন তার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক, তেমনি শিক্ষাদীক্ষার অভাব বা কুপরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় কোন এক সময়ে কেউ যদি একটা বিশেষ অনুন্নত অবস্থায় থাকেই বা, সেখান থেকে তার নিজের দিক থেকে উন্নতির চেষ্টা এবং একই কালে তার সঙ্গে সমাজের দিক থেকেও সেই উন্নতিসাধনের সহায়ক ব্যবস্থা দুই-ই বলবৎ থাকা চাই। আর, মানুষ সেই উন্নত অবস্থায় পৌছতে সক্ষম হলে সেই অবস্থার প্রাপ্য সম্মান সকল সময়ই সকলের পক্ষে সহজলভ্য হবে। পূর্বের স্তরের জাতি-বিচার পরবর্তীকালের পরিবর্তিত মানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারের পথে কোনক্রমেই কোথাও বাধা সৃষ্টি করবে না।

নিকৃষ্ট সংস্কার ও আচরণে যতক্ষণ কেউ জড়িত আছে,

ততক্ষণ সে উচ্চবর্ণের অন্তর্গত হলেও, উৎকৃষ্টের উচ্চাসন তাঁর প্রাপ্য নয়। চিন্তায় ও ব্যবহারে যিনি উৎকৃষ্ট-শ্রেণীর, জাতিতে তিনি যাই হোন না কেন, সর্ব্বোচ্চ সম্মান তাঁকেই দেয়। ভারতের উচ্চনীচ জাতিভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ঐতিহাসিক বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে বিপাকে পড়িয়া এইরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে।" কবির মতে, এর জন্যে কাউকে দায়ী করা চলে না। কিন্তু এই ঘটনা থেকে উদ্ভূত মানুষের উচ্চ মানের ধারণাটা মিথ্যা নয়। মানুষের মানকে চিরদিনই উচ্চ হতে উচ্চতর রেখেই চলতে হবে। অর্থাৎ, সমাজে উচ্চ আদর্শটা সর্বথাই অনুসরণীয়। যে বিষয়ে আমাদের এক্ষণে সচেতন হতে হবে সেটা এই যে, উচ্চ আদর্শটা জন্মগতভাবে জাতিবিশেষের কায়েমি জিনিস নয় মানবসাধারণেরই তা সুচির সম্পদ। সুতরাং এই আদর্শ-লাভের অধিকার মানুষ মাত্রেরই "ধর্মের অধিকার"।



শান্তিনিকেতনে সংস্কার-ভবনের স্মৃতি-অবশেষ

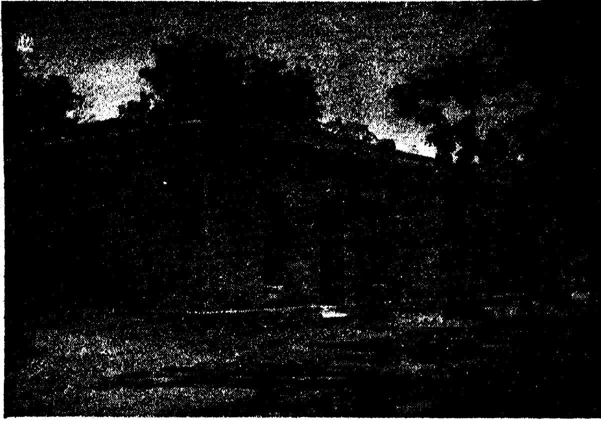
দুর্গত মানুষকে মানুষের সেই সনাতন "ধর্মের অধিকারে" প্রতিষ্ঠিত করতে হলেও মূলে সেই একই পন্থাই অনুসরণীয়। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্মের'-সাধনা-অনুকূল একটি পরিবেশ রচনা করে গেছেন তাঁর সমগ্র জীবনের তপস্যা দিয়ে। সকলেই জানেন সেই ক্ষেত্রটি হচ্ছে—'শান্তিনিকেতন', তথা 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়', তাহারই পরিণত রূপ আধুনিক-কালের সুপরিচিত 'বিশ্বভারতী'। এখানে দুর্গত মানুষেরও সংস্কারসাধনের কাজ বিশেষভাবে সুরু হয়েছিল এককালে একটি 'ভবনে'র মধ্যে। মহাত্মাজীর পুণা-উপবাস ঘটনাকে উপলক্ষ করে শান্তিনিকেতনে দুর্গত-সেবার যে আয়োজন হয়, তার বিবরণ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।* সেখানে 'সংস্কার সমিতি'র প্রসঙ্গে 'সংস্কার ভবন' নামক একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ, কবির প্রেরণাতেই সেদিনকার সেই সংস্কার সমিতির প্রতিষ্ঠা (১৯৩২) বিশ্ব-ভারতীতে সম্ভবপর হয়েছিল। বলা বাহুল্য, 'সংস্কার ভবনে'র পরিচালনার মূলেও ছিল তাঁরই ঐকান্তিক উৎসাহ। কবি তাঁর বিশেষ কোনো কর্মীকেও এ কাজে নিয়োজিত থাকতে দিয়েছেন এবং নানা সময়ে তার কাছ থেকে 'সংস্কার ভবনে'র খবর নিয়েছেন আগ্রহ সহকারে।

'সংস্কার সমিতি'র কর্মোদ্যম শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত আবাসিক প্রতিষ্ঠান 'সংস্কার ভবনে' এসেই কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য তাই বিবৃত করা প্রয়োজন। এ 'ভবন'টি একান্তভাবে হরিজনদের জন্য বা হরিজন-উন্নয়নের কাজের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না। পার্শ্ববর্তী ভুবনডাঙা গ্রাম থেকে হরিজন ছাত্রেরা এসে এখানে পড়ত, কেউ কেউ মাঝে মাঝে 'ভবনে'ও থাকত। কিন্তু এই আবাসিক বিভাগটির আদর্শ ছিল দুর্গত মানবসাধারণের সংস্কৃতি-সাধনায় ও সমুন্নত জীবনযাত্রা-ব্যবস্থায় সহায়তা করা। হরিজনশ্রেণী সেই মানবসাধারণের একটি অংশরূপে এ আবাসে গৃহীত হয়েছিল। 'হরিজন' শব্দের স্থলে 'দুর্গত' শব্দটি গুরুদেবের অধিকতর মনঃপূত ছিল। সংস্কার-সমিতির 'সর্বজনীন নিবেদন' বা অনুষ্ঠান-পত্রের মধ্যেও 'দুর্গত' শব্দেরই প্রয়োগ রয়েছে। (দ্রঃ—Mahatmaji & Depressed Humanity, Appendix)। সেখানে হরিজন শব্দটি কোথাও নেই। জন্মগত 'জাতি' বা অর্থগত 'শ্রেণী' হিসাবে মানুষকে দল-খণ্ডিত করে দেখা শান্তিনিকেতনের আদর্শসম্মত নয়। এখানে দেশ ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য অনুসারেই বিবিধ 'ভবনে'র ব্যবস্থা হয়েছে; মানুষের কৃত্রিম ভেদ স্বীকার করা হয় নি।

তখন এবং এখনও শান্তিনিকেতনে এবং অন্যত্রও প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিত এবং উচ্চবর্ণের অনেক উদ্যমশীল কিশোর ও যুবক আর্থিক দুর্গতি হেতু আপিসে, দোকানে, কারখানা প্রভৃতিতে পরিচারকের কাজে এসে নিযুক্ত হচ্ছে।

---

* ১। 'মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনে বিশ্বভারতী'—শ্রী[illegible]কুমার মুখোপাধ্যায় প্রবাসী, ১৩[illegible] শ্রাবণ
২। 'দুর্গত [illegible] রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী'—শ্রী[illegible] প্রবাসী, ১৩[illegible] শ্রাবণ।



শান্তিনিকেতনে 'সংস্কার-ভবনে'র স্মৃতি-অবশেষ—নাট্যঘর

সংস্কার-ভবনের নিজ নিজ খাওয়ার খরচ চালাত। কেউ কেউ বাড়ী থেকেও চাল-ডাল নিয়ে আসত। আশ্রমের অধ্যাপক এবং কর্মীদের মধ্যেও অনেকে সংস্কার-ভবনের পরিচালনায় নানাভাবে সহায়তা করেছেন। ভোজাগারের সদস্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই। ছাত্রছাত্রীরাও গ্রামের কাজ এবং 'ভবনে'র শিক্ষণ-কার্য্যে যোগ দিয়েছেন প্রথম-প্রথম বেশ উৎসাহ সহকারেই। কিন্তু স্থায়ী ব্যবস্থায় কাজ চালাবার যখন দরকার হ'ল, তখন থেকে সংস্কার-ভবনের স্বকীয় অর্থে নিজস্ব শিক্ষক এবং কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরা সকলেই এসেছিলেন বীরভূমের গ্রামাঞ্চল থেকে। তন্মধ্যে পাকুরহাঁস অঞ্চলের শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল ও শ্রীগতিরাম হাজরা ছিলেন দু'জন বিশেষ নিষ্ঠাবানকর্মী ও শিক্ষক পর্যায়ভুক্ত যুবক। ভুবনডাঙার গ্রামের ছাত্রদের মধ্যে শ্রীনেপাল প্রামাণিক, শ্রীসন্ন্যাসী প্রামাণিক, শ্রীরেণুপদ হাজরা, শ্রীদ্বিজপদ হাজরা, শ্রীশ্যামাপদ হাজরা ও শ্রীজগবন্ধু নন্দী প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

তাদের ভাবী আশাভরসার ঘটছে সমাধি। তারাও সকলে অবশেষে হয়ে দাঁড়াচ্ছে দুর্গত। সে দুর্গতির পীড়াও ভিতরে বাইরে কম নয়। জন্মগত অবস্থার বিচারে 'হরিজন' আখ্যা পেয়েছে একশ্রেণীর লোক। কিন্তু এই অর্থগত দুরবস্থার দিক দিয়ে বিচার করলে দুর্গত মানব সকল শ্রেণীতেই তখনো ছিল এখনো আছে। যাই হোক, এখন সংস্কার-ভবনের কথা বিশদভাবে বলি। মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন-ঘটনা থেকে বিশ্বভারতীতে হরিজন আন্দোলন অচিরেই এক ব্যাপক সংজ্ঞার দুর্গত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। আশ্রমে অনেক পরিচারক ছিল যারা বর্ণে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা মাহিষ্য। তারা অনেকে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে ম্যাট্রিক পাসের আগেই স্কুলের পড়া ছেড়ে এসেছিল। যেখানে সেখানে মাথা গুঁজে, তারা দিন কাটাত। এ ভাবের জীবনযাত্রার পরিবর্তে, বিদ্যার্থীর মর্যাদায় সুনিয়মিত দিনচর্যার মধ্যে থেকে পরিচারক এবং দুর্গত মাত্রেই যাতে একদিন উচ্চতম শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে পারে, সংস্কার-ভবনে সকল দিক দিয়ে তদুপযোগী ব্যবস্থারই চেষ্টা করা হচ্ছিল। কারো দানের বা অনুগ্রহের ছায়া তাদের স্পর্শ করবে না—এই লক্ষ্য থেকে শ্রমসাপেক্ষ নানা বৃত্তির প্রবর্তনকল্পে সংস্কার ভবনের ভোজনাগার এবং তার তরকারী, মাছ ও মিষ্টির বিভিন্ন বিক্রয়-বিভাগ খুলে তাদের উপার্জনের উপায় করে দিতে হয়েছে। সমবায় ও স্বাবলম্বনের নীতিতে তাদের অভ্যস্ত করে তোলা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আবার দিনে আপিসে চাকরি করত, দুপুরে ও রাত্রে 'ভবনে'র আবাসিক ছাত্ররূপে যথানির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণ করত। চাকরির বেতন থেকে তারা

প্রায় দু'বৎসরাধিক কাল এভাবে চলে আসার পর, ছাত্রসংখ্যা যখন ত্রিশে এসে দাঁড়াল, তখন তৎকালীন শিক্ষাভবন ও পাঠভবনের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেনের (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব) অধীনে 'সংস্কার-ভবন' একটা বিশেষ বিভাগরূপে বিশ্বভারতীর অন্তর্ভুক্ত হয়। বলা আবশ্যক, ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী থেকে সংস্কার-ভবনের স্থানসঙ্কুলনার্থে প্রাক্তন 'নাট্যগৃহ' ও 'বাগানবাড়ী' নামক ঘর দুখানি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশ্বভারতীরই প্রাক্তন ছাত্র তখন সদ্য বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ বীরভূমবাসী শ্রীজগবন্ধু ঘোষ প্রথমাবধি সংস্কারসমিতি ও সংস্কার-ভবনের নানাবিধ কাজে লিপ্ত ছিলেন। অধ্যক্ষ ধীরেনবাবু তাঁকে সংবাদ দিয়ে আনিয়ে তাঁরই হাতে 'সংস্কার-ভবনে'র পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। বিশ্বভারতীর শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে তখন থেকে 'সংস্কার ভবনের' কাজ চলতে লাগল। সেদিন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ 'সংস্কার-ভবনে'র পরিচালকদের সম্পূর্ণভাবেই তাঁদের উপর নির্ভর করবার ভরসা দিয়ে পূর্বের ব্যবস্থাপনায় ছেদ টানেন।

গুরুদেবের এবং 'মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনে বিশ্ব-ভারতী'র সেই ব্যাকুলতার দিনগুলি স্মরণ করে একটি জিজ্ঞাসা স্বতঃই মনে ঘুরপাক খায়,—সত্যই কি শান্তি-

নিকেতনে অবস্থিত সংস্কার সমিতির প্রতিষ্ঠিত সেই 'সংস্কার-ভবনে'র কাজের প্রয়োজন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে? গুরুদেব এবং মহাত্মাজী উভয়েই বিশ্বভারতীর একান্ত প্রিয়, পরম পুরোধা। এখানে উভয়ের প্রেরণা ওতপ্রোত হয়ে কর্মের রূপেও এককালে যুক্ত হয়েছিল। যে কোণটিতে এই অপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল, শান্তিনিকেতনের সেই 'বাগানবাড়ী' আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শালবীথিকায় ঘণ্টাবেদিকার কাছে একমাত্র নাট্যঘরের অংশটা মালগুদাম হয়ে আজও ইটকাঠের দেহ নিয়ে কোনো...ত খাড়া আছে। কিন্তু তার এই ইতিহাস বিলীন হতে চলেছে। এ প্রসঙ্গে একথা স্বতঃই মনে উদিত হয়—যে-শান্তিনিকেতনে সংস্কার-ভবনের উদ্ভব হয়েছিল, শান্তিনিকেতনের সীমানার মধ্যেই তার একটি চলমান বিভাগীয় সত্তা প্রতিষ্ঠিত থাকা একান্তই কি অসম্ভব? আর কিছু না হোক,—অন্তত লোকসংস্কৃতি-চর্চার উপযোগী একটি 'ভবন',—বর্তমানের সরকারী বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি পরিপূরকরূপে? 'সংস্কার-ভবন' নামটি অক্ষুণ্ণ রেখে পরিচারক ও হরিজন-ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় এবং তার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির নানা নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও পুঁথিপত্র-প্রবচন সহযোগে সাধারণ-লোকের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন ও বর্তমান ভাবধারার পরিচয় উদ্ধার; সংগীত, নৃত্য ও বিচিত্র শিল্পকৃতির প্রদর্শনী-অনুষ্ঠান; উন্নত-অনুন্নত দুই শ্রেণীর মধ্যেই সহজ মিলন-সাধনের নানা উপায় নির্ধারণ ও আয়োজন—ইত্যাদি বহুমুখী কর্মধারার সমাবেশযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ পুনঃ-প্রবর্তিত হলে তো কথাই নাই। পুণ্যস্মৃতির উপযুক্ত শোভন ও শুভকর কাজই সেটা হ'ত।

আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সপ্তনবতিতম জন্মোৎসব

গত ২৩শে অক্টোবর শনিবার আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের জন্মতিথি বাঁকুড়ার উপকণ্ঠস্থিত তাঁহার "স্বস্তিক" ভবনের আম্রকুঞ্জে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অপরাহ্ণকালে জন্মোৎসব সংসদের সভাপতি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আচার্য্যদেব পট্টবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক সভাস্থলে আগমন করিলে পর বালিকাগণ পুষ্পবর্ষণ ও ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে থাকে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভাপতি এবং আচার্য্যদেবকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করা হয়। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বস্তিবাচন পাঠ করিলে পর আচার্য্য-দেবকে পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয় এবং স্থানীয় কাংস্যশিল্পীদের প্রস্তুত একপ্রস্ত কাংস্য-বাসন ভক্তি-অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কতকগুলি অভিনন্দন পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মহাদেব রায় ব্যক্তিগতভাবে আচার্য্যদেবকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া স্বরচিত যে কবিতাটি পাঠ করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

জন্মদিনে

ষণ্নবতি বর্ষকাল অতিক্রান্ত যে পুণ্য প্রভাতে,
তারই দিবসান্তে তীর্থে—"স্বস্তিকে"র হেমন্ত-সভাতে
সমাগত অনুরাগী ভাবাকুল শত মুগ্ধ হিয়া
যোগ-দীপ্ত যোগেশের আহ্বান স্বস্তিক রচিয়া।
জ্যোতির্বিদ, হে জ্যোতিষ্ক, তমোনাশী জ্যোতিঃর শিখায়
ভেদ করি' অন্ধকার আকাশের শাব্দিক হিয়ায়
শব্দভেদী শিখাস্তরে স্বরূপে করিলে উদ্‌ঘাটন
বাণীর বিকাশ-মর্ম্ম। স্ব-ধর্ম্মে তোমার আমরণ
শব্দ গাথা-বেদমন্ত্রে জ্ঞান-লুব্ধ ধ্যানের নয়ন
লভি' যোগে অতন্দ্রিত মেধা-দীপ্ত শুদ্ধ আচরণ
বিকার-বিভ্রান্তি-নাশী বাগর্থেরে করিল বিস্তার—
লুপ্ত, গুপ্ত, সূক্ষ্ম, স্থূল আবিষ্কার সাক্ষী হ'ল তার।
সাধনার সিদ্ধি তব দিব্য-ভাতি তমসার পারে
নির্দ্দেশ করিল পথ এ প্রাচ্যের—তোমার দুয়ারে
আহ্বানিল জয়-রথে ভারতীর দিতে ক্রোড়ে স্থান
বিচ্ছুরিয়া স্মৃতি-সৌধে দ্যুতি তার শাশ্বত, অম্লান।
পদবী লভিতে তৃপ্তি আসে আজি দিতে জয়-টিকা—
শতেক পুরোধা-করে সায়াহ্নের আরতির শিখা।
দীনতায় অমলিন মহাধনে তব জন্মদিনে
রচি' অর্ঘ্য দেয় করে প্রতিবাসী নবীনে-প্রবীণে।*

অভিনন্দন, কবিতা পাঠ ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর আচার্য্যদেব ভাবগম্ভীরস্বরে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরিয়া এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার ভাষণে প্রধানতঃ তিনি

* কবি স্বয়ং এই কবিতাটি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। প্র.স.

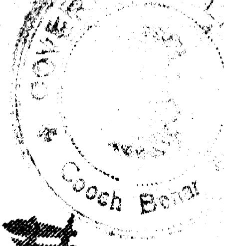
দুর্গাপূজার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ এখানে প্রদত্ত হইল :

"যিনি আমার কণ্ঠে ভাষা দিয়াছেন সেই দেবী সরস্বতীকে আমি নমস্কার করি। উপস্থিত সকলকে নমস্কার করি। সভাপতি ও ভদ্রা ভদ্রগণকে নমস্কার করি। আপনারা আমার জন্মদিন স্মরণ করেছেন ও আমাকে নানারকমে বহু মান অর্পণ করেছেন তা স্মরণ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যাঁরা উপস্থিত হতে পারেন নি তাঁরা পত্র লিখেছেন ; তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রতি এই মনোভাবের জন্য আমি ধন্য। ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং।

"দুর্গাপূজার তাৎপর্য্য কি। তাৎপর্য্য অর্থে, অভিপ্রায়। আমরা দুর্গাপূজা করি ও কেন করি, তার উত্তর চাই? আশ্বিন মাসেই বা করি কেন? আশ্বিন মাসে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। যাতে সেই বৎসর সুখে কাটে, সাফল্য লাভ হয়, সেইজন্য দেবীর পূজা করি। আশ্বিন মাসে যে নূতন বৎসর আরম্ভ হয় তা বহু লোকই ভুলে গেছে, কিন্তু বহু প্রাচীনকালে আশ্বিন মাসেই বৎসর আরম্ভ হয়। এই যে দুর্গাপূজা আসছে, আপামর জনসাধারণের মনে আনন্দ হচ্ছে, তার কারণ কি? দশমীর দিন নূতন বৎসর আরম্ভ হয়, আমরা নববস্ত্র পরিধান করি, ঘরদোর পরিষ্কার করি, উত্তম ভোজন করি, গৃহিণীরা হাঁড়ি ফেলেন, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব লইয়া আনন্দ করি। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে আশীর্ব্বাদ করেন, কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্ঠকে সম্মান প্রদান করেন। কয়েক সহস্র বৎসর চলে গেল, আর্য্যগণ যখন উত্তর প্রদেশে বাস করতেন, শীত ঋতুতে বৎসর গণনা করতেন, উত্তর পঞ্জাবে বরফ পড়ে, বরফের অপর নাম হিম, সেই হতে হিমালয় নাম হয়। শীত হতে শীত বৎসর গণনা হ'ত। ইংরেজীতে ১লা জানুয়ারীতে বৎসর গণনা হয় কিন্তু একটু ভুল হচ্ছে—২২শে ডিসেম্বর হতে বৎসর গণনা হওয়া উচিত। দোলযাত্রা উৎসব হিম বৎসর আরম্ভ হওয়ার স্মৃতি। এই সব উৎসবের উৎপত্তি এত পুরাতন যে অনেকে ভুলে গেছে তাই বুঝতে পারে না, আর্য্যগণ শরৎ ঋতু থেকে বৎসর আরম্ভ করতেন। শরৎ শব্দের অর্থ ঋতু, আর একটি অর্থ বৎসর 'জীবতু শরদং শতং'। সেই স্মৃতি আমরা দুর্গাপূজায় পালন করছি। উত্তরপ্রদেশে যেখানে দুর্গাপূজা নাই সেখানে নবরাত্রি পালন করা হয়। তবে ১লা বৈশাখ কি নূতন বৎসর নয়? বটে, তবে ১লা বৈশাখ কোন পূজা উৎসবও নেই, এক আছে শিবের গাজন। এ বৎসর কার্ত্তিক মাসে পূজা হচ্ছে, কেন হচ্ছে? কারণ আমরা দুই রকম বৎসর গণি, সৌর ও চান্দ্র। প্রাচীনকালে প্রাচীনগণ চন্দ্র দিয়ে দিন ও বৎসর গণনা করতেন, ১৫ দিন চন্দ্রের হ্রাস ও ১৫ দিন পূর্ণচন্দ্র, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দিয়ে মাস ও বৎসর গণনা হ'ত। পূজা পার্ব্বণ চন্দ্রের তিথি বলে বলা হয়, সূর্য্যের মাস নাই। আজ যে কার্ত্তিক কেমন করে জানব, পাঁজি দেখতে হবে? এখন চন্দ্রের ৬ তিথি এই ভাবে দেখতে হবে, এই চান্দ্র মাস আশ্বিনের ও কথা থাক।

দুর্গা সম্বন্ধে কিছু বলি। তবে ওকথাও সহজ নয়। দুর্গা কে? তিনি দেবী। কিন্তু দেবী কি? দেব বা দেবী শক্তি। শক্তি কি? না কর্ম্ম করার ক্ষমতা। এই যে আমি কথা কইছি কর্ম্ম করছি এই কর্ম্ম বিনা শক্তিতে হয় না। এই যে কথা বলছি এ হ'ল কথন-শক্তি—দেবী সরস্বতী। আপনারা শুনছেন—শ্রবণ শক্তি—দেখছেন—দর্শন শক্তি সবই দেবীর প্রতীক। কথন শক্তির নাম বাক্—তাই থেকে বাগ্দেবী। শ্রবণ শক্তি দেবতা বায়ু। ব্রহ্মা সৃষ্টির অধিপতি, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, মহেশ্বর সংহার কর্ত্তা। এই যে সব পরিবর্ত্তন হচ্ছে বিনা শক্তিতে কিছুতেই হতে পারে না—পরিবর্ত্তনেরও শক্তি চাই। প্রত্যেক দেবতার নিজ নিজ অধিকার আছে—ঠিক যেন গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ। একের কাজ অন্যে পারেন না। সরস্বতী ধন দিতে পারেন না। লক্ষ্মী বিদ্যা দিতে পারেন না। যেখানে কর্ম্ম আছে সেখানেই দেবতা আছেন। যিনি সর্ব্বশক্তির আধার, যিনি সর্ব্বদেবী তিনিই দুর্গা, তিনি সর্ব্বদেবীর সম্মিলন। এই কারণে বলা হয় তিনি বিশ্বশক্তি। বিশ্ব শব্দের অর্থ সমস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্ববিদ্যার সম্মেলন হয়েছে তাই বিশ্ববিদ্যালয়। দেবী দুর্গার দশ হাত কল্পনা করি—অনেকে বলেন, তিনি দশ হাতে দশ দিক পালন করছেন। তা ঠিক নয়। দশ হাতের এক এক হাতে এক এক রকমের অস্ত্র। এক এক অস্ত্র এক এক দেবতার প্রতীক। দেবতা অর্থে শক্তি, তিনি সর্ব্বশক্তির আধার। এই থেকে তিনি সর্ব্বশক্তিময়ী। যাঁরা বলেন তিনি দশ দিক রক্ষা করছেন দশ হাত দিয়ে একথা অলীক। তিনি কাকে রক্ষা করবেন? এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যার আদি নাই অন্ত নাই, উর্দ্ধ নাই অধঃ নাই—যিনি সমস্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এমন কিছু নাই যেখানে তিনি নাই। এই ভাবটি জানবার জন্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণে একটি উপাখ্যান আছে। শুম্ভ নিশুম্ভের উপাখ্যান। যেখানে দেবী মহিষমর্দ্দিনী হয়ে অসুর নাশ করেছেন। আমরা সেই মহিষমর্দ্দিনীর উপাসনা করি। চণ্ডীর উপাখ্যান—সকল দেবতার তেজ নির্গত হয়ে মিলিত হয়ে একীভূত হয়ে এক নারী আবির্ভূত হলেন। সেই নারী চণ্ডী। সেই চণ্ডী মহিষাসুর বধ করেন। তাই স্মরণ করবার জন্যে আমরা মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করি। যে দেবী সর্ব্বভূতে আছেন তাঁকে নমস্কার। তিনি শক্তিরূপে লজ্জারূপে মায়ারূপে দয়ারূপে আছেন তাঁকে নমস্কার। এই ভাবটি ঋগ্বেদেও আছে, কিন্তু সেখানে শক্তি নাই—অগ্নি। ঋষিরা অগ্নিকে পূজা করতেন। তিনি বলের প্রতীক—ইংরেজীতে Energy। অগ্নির আর এক নাম জাতবেদ অর্থাৎ তিনি সমস্ত জানেন। এই ভাব ভগবদ্‌গীতাতেও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ গানে এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। প্রথমে তিনি জড় মার রূপ দেখেছেন। কিন্তু পরে হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি বাহুতে তুমি মা শক্তি ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। তারপর আর কথা নাই। তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বত্র বিরাজমান—ইহা কামনা করা, ধ্যান করা চিন্তা করা কঠিন। আমরা সেই শক্তিকে মা রূপে দেখছি।"

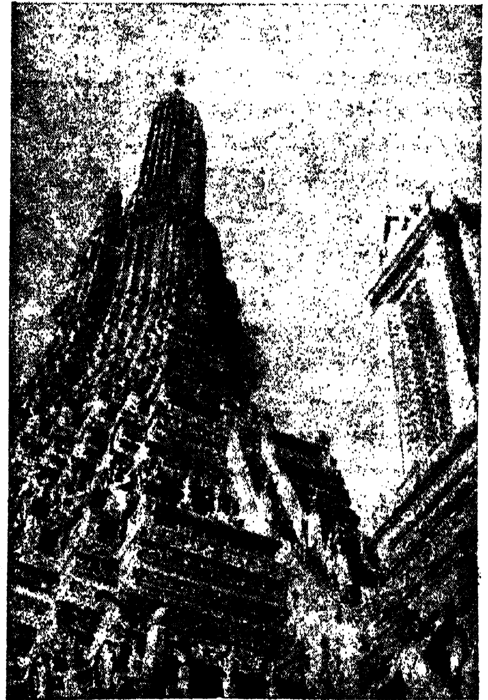




"হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশ"

বর্ত্তমান বৎসরে ইটালীয় সিনেমাশিল্প উৎপাদনের দিক দিয়া ইউরোপের সকল দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ইহার স্থান। যুদ্ধোত্তরকালে ইটালীতে এই বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠার মূলে, উক্ত শিল্প অনুরাগীদের কি ঐকান্তিক উৎসাহ যে নিহিত আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অধিকন্তু ইহাও বলা প্রয়োজন যে, ইটালীয় সিনেমাশিল্পের উৎপাদনও অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে "দি লষ্ট কণ্টিনেণ্ট" (হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশ) নামক ফিল্মে—যাহা বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ক্যানেসে অনুষ্ঠিত সিনেমাশিল্পের অষ্টম উৎসবে একটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। এই ফিল্মের চিত্ররূপায়ণ হয় ইন্দোনেশিয়ায় আবিষ্কারক লিওনার্দো বোসি, আর্ট ডিরেক্টর গিওর্জিও মোজার এবং এনরিকো গ্রাস, অপারেটার মারিও ক্রাভেরি এবং সঙ্গীতবিদ্ এ লাভাগনিনো কর্ত্তৃক। ইহাদের পারস্পারিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে বুদ্ধির আলোকে দীপ্ত, জীবন্ত এবং মর্ম্মস্পর্শী এমন একটি ফিল্ম সৃষ্টি হইয়াছে, বাস্তব ঘটনার নিখুঁত চিত্ররূপায়ণ হিসাবে যাহার জুড়ি নাই। এই ফিল্মের অভিধার একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। কেননা 'হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশ' পূর্ব্ব এশিয়ার একাংশের যে সকল দ্বীপ লইয়া গঠিত, সেগুলি জাতিগত বিশেষত্ব, ঐতিহ্য এবং ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দরুন পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়—এবং প্রশান্ত মহাসাগরে সম্প্রতি ইটালীয় বিজ্ঞানীগণ কর্ত্তৃক যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তদ্বারা এই অনুমান সমর্থিত হয় যে, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া দূর অতীতে এমন এক বিশাল মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল যাহা চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে—উহাই হয়ত পৌরাণিক লেমুরিয়া।

এই ফিল্ম উৎসর্গীকৃত হইয়াছে মার্কো পোলোকে। ১৯৫৪ সনে বোজি সদলবলে যে সকল স্থানে ভ্রমণ করেন, অতীতে চীনদেশ হইতে দীর্ঘ প্রত্যাবর্ত্তন-পথে মার্কো পোলো সেই সকল অঞ্চলের বহু স্থানেই পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সাত শতাব্দী পূর্ব্বেকার সেই মহান্ পর্য্যটকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনার্থে গোড়ায় চীনদেশের একটি ছবি দিয়া এই ফিল্ম আরম্ভ হইয়াছে—তাহাতে দেখানো হইয়াছে হংকঙের দৃশ্য। হংকং হইতে সমুদ্রপথে ভ্রমণের যে দৃশ্য দেখানো হয় তাহা আধুনিক জাহাজে নয়, ভারত মহাসাগরের পুরাকালের একটি সমুদ্রপোতে। টাকো নামক ধীবর-সম্প্রদায়ের এক বিবাহ-উৎসবের চমকপ্রদ চিত্র-রূপায়ণের পর দর্শকদের দেখানো হয় বলী এবং ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপের কতিপয় দৃশ্য। যেমন—অববাহিকার উপর অবস্থিত ধান্যক্ষেত্র, সদা বিস্ফোরণশীল আগ্নেয়গিরি, মন্দিরে এবং উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মীয় উৎসব, পবিত্র



"লষ্ট কণ্টিনেণ্ট" ফিল্মে গৃহীত মন্দিরের একটি দৃশ্য



"লষ্ট কন্টিনেণ্টের" একটি দৃশ্য

ছিলেন, যেখানে আমরা দেখিতে পাই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল অভিব্যক্তি, যেখানে মানুষ বাস করিতেছে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া।

"হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশ" প্রথম ইটালীয় সিনেমাটোস্কোপ এবং একথা বলা উচিত—যেভাবে ইহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে এই ফিল্ম সর্ব্বাংশে তাহার যোগ্য। আঙ্গিকের দিক দিয়া বিচার করিলে যে সকল চিত্র রূপায়িত হইয়াছে, সেগুলির সৌন্দর্য্য মনোমুগ্ধকর—আনুষঙ্গিক গীতভাষ্য সেগুলির ব্যঞ্জনাময়তার উৎকর্ষসাধন করিয়াছে।

ওরিও ভেংগানির কথাভাষ্যে একটি খুঁটিনাটিও বাদ পড়ে নাই, এবং এমনিভাবে যে সারল্যপূর্ণ জীবনের রূপ পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে উহাকে তৎসম্বন্ধে এক রম্য রচনা বলা যাইতে পারে। এই কবিত্বপূর্ণ ভাষা এই ফিল্মে সঞ্চারিত

নৃত্যসমূহ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর সংবর্দ্ধনার্থে উদযাপিত অনুষ্ঠানাবলী। এতদ্ব্যতীত, ষাড়ের দৌড় মোরগের লড়াই ইত্যাদিও দেখানো হয়। এমনি ভাবে গীতসম্বলিত খণ্ডচিত্রসমূহ চোখের সামনে যেন মায়াজাল বিস্তার করিতে থাকে। কিন্তু এই ফিল্ম সকল ক্ষেত্রে এবং সকল সময়ে যে জিনিষটি প্রাধান্যলাভ করে তাহা মানুষ কিংবা তাহার জীবন নয়, তাহা প্রকৃতি এবং তাহার রহস্যময় শক্তিনিচয়।

চীনা শিল্পকলার এটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, সেখানে বিশাল প্রাকৃতিক দৃশ্যপটই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে, মানুষ সেখানে অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। পশ্চিমে এই প্রকৃতিবোধ অধিকাংশ স্থলেই বিলুপ্ত, এবং দৃষ্টি সেখানে মানুষেরই চতুষ্পার্শ্বে মাত্রাতিরিক্তভাবে কেন্দ্রীভূত, এশিয়ায় কিন্তু মানুষ সেই বিরাট প্রকৃতির একটি অংশমাত্র যাহা তাহাকে বেষ্টন করিয়া এবং আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে।



ফিল্মে ইন্দোনেশীয় উপকথার রূপায়ণ

গেল বৎসর "গ্রীন ম্যাজিক" এবং সম্প্রতি "দি লষ্ট কন্টিনেণ্ট" চলচ্চিত্র-শিল্পীদের এমন একটি পন্থার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছে যাহা অনুসরণ করিলে সিনেমাশিল্প অভিনব সাফল্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। এই সকল ভ্রমণমূলক ছবি—দূর দেশের কথা, বৈদেশিক দৃশ্য, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ঘটনা যাহার উপজীব্য, জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে।

"হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশ" চিত্রনির্ম্মাতারা এই অধ্যাত্ম-রহস্য-সন্ধানে ভ্রমণকালে মালয় উপসাগরের সেই সকল দ্বীপে গিয়াকরিয়াছে তাহার আসল সৌরভ এবং চিত্রনির্ম্মাতাদের প্রকৃত অভিপ্রায় ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

এই চলচ্চিত্রে এমন সব দৃশ্য রূপায়িত হইয়াছে যাহা আমাদের মনকে এক নিরুপম সৌন্দর্য্যলোকে লইয়া যায়। দ্বীপবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিগূঢ় সম্পর্ক জীবন্তভাবে এই চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আন্তরিকতা ইহাদের জীবনের মূল সুর। দেবতার নিকট যে আন্তরিকতা সহকারে ইহারা প্রার্থনা করে, তেমনি আন্তরিকতাই অভিব্যক্ত হয় ইহাদের কৃষিকর্ম্মে, কিংবা ফসলের ফলন উৎকৃষ্ট হইলে। সেই

আন্তরিকতারই অভিব্যক্তি—তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে অথবা দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে নৃত্যানুষ্ঠানে ও মহিষের দৌড়ের প্রতিযোগিতায়।

এই চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্য দর্শকের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়া একেবারে আদিম সারল্যপূর্ণ জীবনের মর্ম্মমূলে লইয়া যায় এবং ইহাতে যাবতীয় শক্তিশালী নাটকীয় ঘটনাসমন্বিত প্রকৃতির জীবন্ত সত্তা অনুভব করা যায়। অনেকগুলি ঘটনাপরম্পরা যথা: দুই জন দেশীয় লোকের মধ্যে ভয়াবহ সংগ্রাম, কিংবা লাঙল-টানা ষাড়ের দৌড় প্রভৃতি দৃশ্য গতিশীল প্রাণময়তায় পরিপূর্ণ এবং ফিল্মে সেগুলির ছন্দোময় অনবদ্য রূপায়ণ দর্শকদের মুগ্ধ করে। আদিম জীবনের এই ছবিটি সম্পূর্ণ হইয়াছে বোর্ণওতে গৃহীত একটি ঘটনার সন্নিবেশ দ্বারা। সেখানে আমরা দেখি তথাকথিত নরমুণ্ড-শিকারী ডায়াকদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতির জীবন্ত ছবি—যাহা আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সমক্ষে সুপরিস্ফুট করিয়া তোলে মানব-জাতির শৈশবের একটি চিত্রকে। আদিম আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে এই চলচ্চিত্রের তথ্যসন্ধানীদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য আদিবাসীরা একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ইহাতে এই সমস্ত কৃষিজীবী এবং তাহাদের পুরোহিতদের স্বভাবসুলভ সরলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে।

কাজেই "লষ্ট কন্টিনেন্ট" এমন একটি চিত্র, দৃষ্ট ঘটনাসমূহও যাহাতে বিধৃত হইয়াছে এবং ইহার কাব্যমূল্যের মূলে রহিয়াছে এই প্রত্যক্ষদর্শন। এই ফিল্ম কেবলমাত্র সমুদ্রযাত্রার একটি বিবরণ-মাত্রই নয়, পরন্তু বাহ্য ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কারণসমূহও ইহাতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। ইহার আঙ্গিক ও রচনাশৈলী উভয়ই বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ, আলোকচিত্রে স্থানীয় আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে প্রতি-ফলিত হইয়াছে। ইহাতে সংযোজিত গীতবাদ্য প্রকৃতি ও আদিম মানুষের জীবনের এক মহামূল্যবান ভাষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।*

ন. ভ.

* "East and West" অবলম্বনে

নব নব জীবন-সংগ্রামে

শ্রীলীলাময় দে

হেমন্তের রাত্রির আকাশ,
কোলাহল নির্ব্বাপিত নিস্তব্ধ সুপ্তির মাঝে
ধরণীর লাগি'
অশ্রুজল ফেলিবার
পেল অবকাশ।
সুপবিত্র টল টল মুক্তাবিন্দুগুলি
ধরিত্রী কুড়ায়ে নিল সর্ব্ব অঙ্গে তার
অতীব যতনে।
খণে খণে
অশ্রুবিন্দুগুলি
চাঁদের আলোতে ওঠে ঝলমলি'
পদ্মপত্রোপরি
ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মত।

ধরিত্রীর অঙ্ক জুড়ে
লক্ষ কোটি জীব-চোখে
নিদ্রা ছিল যত
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেল
প্রভাত-আলোর ছোঁয়া লেগে।
থেকে থেকে চলে ডেকে ডেকে
অনন্তের স্রোতধারা নানা কলভাষে।
সঙ্কেত আভাসে
জেলে যায় জীবনের জাগরণ-শিখা।
ভালে লভি' অরুণের টিকা
চলে নব যাত্রীদল নব নব যৌবনের পথে
নব নব জীবন-সংগ্রামে
দিবসের শ্রেষ্ঠতম যামে।

ঢেউ

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবিমল সেন। নূতন এসেছেন ডেপুটি কমিশনার। তা নূতন মানে পাঁচ ছ' মাস স্বচ্ছন্দে হয়ে গেছে।

হাঁপাচ্ছিলেন হেড মাষ্টার তপগোপাল বাবু। এভাবে হুড়ো-হুড়ি ছুটোছুটি করতে হলে, অনেক জোয়ান মানুষকেও হিমসিম খেতে হবে। মানুষটিকে বেঁটে ছোটখাটো,—গোলগাল দেখে আর মাথার কালোচুলে সাদাটের অল্প সমাবেশে, ভদ্রলোকের বয়সের আন্দাজ করতে একটু অসুবিধেই হয়। তাই বলে বয়স কম হয় নি তপগোপালবাবুর। পঞ্চাশের এপারে আসতে বেশী আর দেরি নেই।

'খুবই ভাল লোক। কতই বা বয়স হবে? একেবারে ছোকরা। করকরে আই. এ. এস.। ওঁর স্ত্রী আরও ভাল। যেমন চার্মিং দেখতে, ঠিক তেমনি ব্যবহার আর কথাবার্ত্তা। গ্র্যাণ্ড লেডি'।

—প্রৌঢ় হেডমাষ্টারের এই বিহ্বলতা কৌতুককরই বটে। দু'চার জন মাষ্টার দৃষ্টিবিনিময় করে নিল, দু'চার জন মুখ টিপে মুচকি হাসল।

আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের দরকার কি তপগোপালবাবু? অশোক মুখ খুলল। আসল খবরটা ছাড়ুন দিকি। তিনি রাজী হয়েছেন প্রিসাইড করতে?

রাজী মানে রাজী, যাকে বলে ভেরি গ্ল্যাডলি। হেড মাষ্টার একগাল হাসলেন। তিনি এ ব্যাপারে ভারি ইন্টারেষ্টেড বলে মনে হ'ল। স্কুলটার আর্থিক অবস্থা কি রকম, পাসের হার কেমন, গবর্ণমেণ্ট কত গ্রাণ্ট দেয়, এই সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন। সবশেষে কি এল জানেন? চা আর কড়াইশুটির কচুরি।

আপনি দেখছি কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়েও বিরাট কাজ করে এসেছেন।—সব শুনে হাসতে হাসতে মন্তব্য করল অশোক।

শ্রীসুবিমল সেন সভাপতিত্ব করবেন। পারিতোষিক বিতরণ করবেন শ্রীমতী সেন। আমন্ত্রণপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হ'ল।

একটা চিঠি শঙ্কর সীতার হাতে গুজে দিয়ে ভাঙা ভাঙা শব্দে মিষ্টি করে বললে, 'মা, এটা তোমার।'

কে দিলেয়ে?

বারে, বাবাই ত।

চিঠিটা আগাগোড়া পড়ল সীতা। তার পর শুধাল অশোককে।

শ্রীমতী সেন কে গো?

পরিচয় চিঠিতেই রয়েছে।

তুমি দেখেছ ওঁকে?

উঁহু। তবে শুনলাম, ভাল নাকি খুব। হেড মাষ্টারমশাই দেখেছেন। শ্রীমতী ওঁকে কড়াইশুটির কচুরি খাইয়েছেন।

তাতে কি? খাওয়ালেই ভাল হয়ে গেল নাকি?

হ'ল না?

এত পেটুক ব্যাটাছেলেরা হয় কে জানত! হাসল সীতা ঠোঁটটাকে একটু বাঁকিয়ে।—আর ডেপুটি কমিশনারের বউ নিজে কচুরি তৈরি করে নাকি? কত চাকর-বামুন রয়েছে বাড়ীতে।

তা হবে, কি জানি। ডেপুটি কমিশনারের বউ কখনও দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না। তবে স্কুলমাষ্টারের বউ অনেক অনেক দেখেছি।

নিজের ঘরেই ত একজন রয়েছে। হাসল সীতা।

বয়স বাড়লেই নাকি মানুষের মধ্যে অকারণ ব্যস্ততা, অহেতুক উত্তেজনা, অতিশয় চঞ্চলতা ইত্যাদি কতকগুলো লক্ষণ বিশেষ ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। অন্ততঃ হেডমাষ্টার তপগোপালবাবুর সাম্প্রতিক হালচাল দেখে এ সন্দেহ করা যেতে পারে। স্কুলের বার্ষিক উৎসবের দিন এসে গেল বলে। সব কাজকর্ম্ম আর ব্যবস্থাই ঠিকমত এগোচ্ছে এখানে। তবু হেডমাষ্টার মশায়ের চীৎকার, দৌড়ঝাঁপের অন্ত নেই। একে বকছেন, ওকে ধরছেন, তাকে মারতে যাচ্ছেন।

সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় অনুষ্ঠান সুরু হবে। সভাপতি মহাশয় তারই মিনিট পাঁচেক আগে হাজির হবেন সস্ত্রীক। ওঁদের সংবর্দ্ধনা করবার জন্যে সেই বেলা চারটে থেকেই তপগোপালবাবু গেটে দাঁড়িয়ে হৈহল্লা জুড়েছেন। এই কাজে আরও দু'চার জন মাষ্টারকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। অশোকও তাঁদের মধ্যে ছিল। হেড মাষ্টারের অহেতুক ব্যস্ততায় বাকী মাষ্টারদেরও হিমসিম খেতে হচ্ছে।

ঠিক সময়েই ডেপুটি কমিশনারের গাড়ী এসে দাঁড়াল। সস্ত্রীক নামলেন সুবিমল সেন।

কিন্তু অভ্যর্থনার দলে মাষ্টারদের মধ্যে অশোককে খুঁজে পাওয়া গেল না। শ্রীমতী সেনকে একটা মুহূর্ত্তের জন্যে দেখেই, ও নিমেষে চলে এল ষ্টেজের সাজঘরে। এখানে এসে ও যেন বাঁচল। আর যে কেউ এই মেয়েকে চিনতে না পারুক বা চিনতে ভুল করুক, ও কেমন করে ভুল করবে? এমন একটা দুরন্ত দুঃসহ বিস্ময় আজকের সন্ধ্যেটার জন্যে অনেকদিন থেকে প্রতীক্ষা করছে, জানত কি সে একটিবারও!

সাড়া দিল না, আভাস দিল না—এসে পড়ল হুড়মুড় করে। এই ছোট্ট বেসরকারী হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক অশোক মজুমদারের রোজকার হাসি আর চঞ্চলতা, আজকের উৎসব-সন্ধ্যায় হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল।

অনুষ্ঠান-শেষে সুবিমল চলে গেলেন সস্ত্রীক। ডেপুটি কমিশনারের বিদায় অভ্যর্থনায় গাড়ী পর্য্যন্ত এলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও খুজে পাওয়া গেল না অশোককে। সারাক্ষণ ষ্টেজের কোণেই লুকিয়ে ছিল অশোক। এ ত লুকানো নয়, ভীরু আত্মগোপন।

কিন্তু অনুষ্ঠান খুবই ভাল লেগেছে সত্য-দম্পতির। তাঁরা বার বার প্রশংসা করেছেন সমস্ত কার্য্যসূচীর। এ রিপোর্ট পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে যারা ছিল সেই সব মাষ্টারদের মুখে।

এই যে অশোকবাবু, কোথায় ছিলেন মশাই? হেড মাষ্টার পাকড়াও করলেন ব্যস্ত হয়ে। তখন থেকে আমি খুজে খুজে হয়রান।

কেন, আমি ত ষ্টেজের ভেতরেই ছিলাম। তা ব্যাপার কি?

আরে, ওঁরা যে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। তা আপনাকে খুজেই পাওয়া গেল না।

কিন্তু কেন?

আজকের ফাংশান দেখে ওরা দু'জনেই খুব খুশী। একেবারে জেনুইন খুশী মশাই। জিজ্ঞেস করলেন, এসব অভিনয়, আবৃত্তির ট্রেনিং দিয়েছে কে? আপনার নাম করলাম। তাই আলাপ করতে চাইলেন।

ও। হাসল অশোক।

হাসি নয় অশোকবাবু, ফাংশান হয়েছে যাকে বলে, এ ওয়ান্। যাকগে, ওঁরা আমাদের আর্ট-এক্‌জিবিশন দেখতে আসবেন বলেছেন, তখন না হয় আলাপটা করিয়ে দোব।

আলাপ করা কি একান্তই দরকার?

নিশ্চই।

কিন্তু হবে কি তাতে?

আপনি মশাই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক একটা বেহুসের মত কথা বলেন যে কি বলব! আরে কিসেতে কি হয়, কেউ কি বলতে পারে অশোকবাবু? আপনি ইয়ং ম্যান, আপনার এনার্জি রয়েছে, ষ্ট্যামিনা রয়েছে আর সামনে রয়েছে ভাষ্ট ফিউচার।

আর একবার হাসল অশোক।

সত্যিই ভাল হয়েছে ছবিটা। মেয়েটির এলায়িত কালো চুল আর নীল চোখের উদাস চাওয়ায় এক দুঃসহ কমনীয়তা ছড়ানো রয়েছে। তন্ময় হয়েই তাকিয়েছিল অশোক। তন্ময়তা ভাঙল শঙ্করকে পাশে না পেয়ে। এই ত সঙ্গে ছিল ছেলেটা, গেল কোথায়? চারদিকে তাকাল অশোক। কোথাও ত নেই। পাশের ঘরে যায় নি ত? তাড়াতাড়ি সেইদিকেই পা বাড়াল অশোক।

একাই এসেছেন শ্রীমতী সেন। সুবিমল সেন টুরে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন হেডমাষ্টার তপগোপালবাবু। অনেকটা হাতজোড় করেই। মাঝে মাঝে বিনয়ে লুটিয়ে পড়ছিলেন।

হঠাৎ শাড়ীর আঁচলে টান পড়ল শ্রীমতী সেনের। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছোট্ট ছেলে, নীল চোখ দুটো, কোঁকড়ানো লালচে চুল।

বাঃ, লাভলি ছেলেটা ত। কার মাষ্টারমশাই?

আরে এ ত শঙ্কর। আমাদের অশোকবাবুর ছেলে।—বলে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গেই তপগোপালবাবু। কিন্তু মোটেই তিনি প্রীত হলেন না ছেলেটার ব্যবহারে। বরং মাননীয়া অতিথির অসুবিধা ও বিরক্তি ঘটাবার জন্যে ছেলেটা এবং অসাবধানী বাপের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিষম। নাঃ, এদের যদি একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

কিন্তু ততক্ষণে শঙ্করকে কোলে তুলে নিয়েছেন শ্রীমতী সেন।

ছেলেকে খুজতে পাশের ঘরে ঢুকে ঠিক এই সময়েই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল অশোকের শ্রীমতী সেনের সঙ্গে।

আরে এ কি, অশোক তুমি!

হঠাৎ খুশির আমেজ মাখানো দুরন্ত ঢেউ ছলকে উঠল শুধু একটুখানির জন্যে। আরো বিস্তার লাভ করবার আগেই কঠোর সংযমে থামিয়ে দিলেন শ্রীমতী সেন, চারপাশের পরিস্থিতি আর আবহাওয়ায় চোখ বুলিয়ে।

ইনিই অশোকবাবু, যার কথা সেদিন আপনাদের বলেছিলাম। আপনারা আলাপ করতেও চেয়েছিলেন।—তপগোপালবাবু দু'দিকে চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন।—কিন্তু আপনাদের পরিচয় আছে বলেই মনে হচ্ছে।

আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি যে। কিন্তু আপনার অশোকবাবু যে সেই অশোক, তা তখন কে জানত বলুন! একটা স্নিগ্ধ হাসি চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন শ্রীমতী সেন।

ছেলের দিকে তাকিয়ে অশোক ডাকল, নেমে আয় শঙ্কর।

থাক না।

না না, বড় কষ্ট হবে আপনার। আর হচ্ছেও ত।—বিচলিত তপগোপালবাবু এতক্ষণে মনের মত কিছু বলবার সুযোগ পেলেন। নামিয়ে দিন, নামিয়ে দিন।

হাসলেন শ্রীমতী সেন। এইটুকু কষ্ট সহ্য করতে না পারলে মেয়েদের জাতে জন্ম কেনই নিলাম মাষ্টারমশাই!

যাই হোক, নেমেই এল শঙ্কর।

আপনি একটু এর সঙ্গে থাকুন ত অশোকবাবু, আমি একবার আপিসটা ঘুরে আসছি। সেক্রেটারী মশাই এসেছেন।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল অশোক। একগাল হেসে, বিনয়ে বিগলিত হয়ে তপগোপালবাবু বিদায় নিলেন।

সত্যি, তোমার সঙ্গে এমনি করে হঠাৎ দেখা হবে আজ, ভাবতেই পারি নি। আর সত্যিই, ভাবতে কি পারা যায়? তুমিই বল না?

যায় না সত্যি।

এই স্কুলে তুমি মাষ্টারি কর নাকি ?

হ্যাঁ।

কৈ, সেদিনের ফাংশানে তোমাকে ত দেখতে পেলাম না। অনেক মাষ্টারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তার মধ্যে তুমিই শুধু গায়েব। অবশ্য তোমার খোঁজ পড়েছিল, কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় লুকিয়েছিলে ?

লুকোই নি। যারা খুঁজতে বেরিয়েছিল, তাদেরই খোঁজার দোষ।

আচ্ছা অশোক, সেদিন আমায় তুমি দেখেছিলে ?

তা দেখেছিলাম।

দেখতে পেয়েও দেখা করতে এলে না ? কেন অশোক ? দূর থেকে দেখে বুঝি সেই মেয়েই কিনা, সে সম্বন্ধে পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে পারছিলে না ?

হাসল একটু অশোক। এই হাসিতেই ও যা বোঝে বুঝুক। বলতে চেয়েছিল অশোক, দেখা করার দিন অনেকদিনই চলে গেছে, এখন হঠাৎ দেখা হওয়ার দিন।

কিন্তু বলতে যা চাওয়া যায়, বলতে তা পারা যায় না সব সময়।

মোটরের হর্ন শোনা গেল। গাড়ী এসে গেছে।

ইস, কদ্দিন বাদে দেখা হ'ল আবার ! কত কথা বলবার আছে। এসো না একদিন কোয়ার্টারে। আসবে ত ?

চেষ্টা করব।

চেষ্টা করবার কিছু নেই। বিরাট কোন কাজ দিচ্ছি না। তার পর শঙ্করের দিকে ফিরে তাকালেন নীচু হয়ে। ও তখন বাপের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। লাভলি হয়েছে তোমার ছেলেটা। এর জন্যেই তোমায় দেখাটা আজ হয়ে গেল। নইলে এটা আরো কতদিন মুলতুবী থাকত, কে জানে। হয়ত হ'তই না আর। এর মা কেমন গো, চুলগুলোও ভাল করে আঁচড়ে দিতে পারে নি ? শঙ্করের নরম তুলতুলে গালটা টিপে দিয়ে আদর করে, মোটরে উঠে পড়লেন শ্রীমতী সেন।

কাজ শেষ করে যখন আবার ফিরে এলেন তপগোপালবাবু, তখনও অশোক ছেলের হাত ধরে আগের মতই ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছে। একটু আগের দুরন্ত ঝড় ওকে যেন একটুও স্পর্শ করে নি।

উনি চলে গেছেন ?

হ্যাঁ, এই তো গেলেন।

এবার হেডমাষ্টার পাকড়াও করলেন অশোককে। আপনি তো ডেন্‌জারাস লোক মশাই।

কেন ? হাসতে হাসতে শুধাল অশোক।

আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ? মিসেস সেনের সঙ্গে আপনার এই ধরণের সম্বন্ধ, একদিনও তো ভুলেও জানান নি !

আমিই কি ভুলেও এই খবরটা জানতে পেরেছিলাম যে, ইনিই তিনি ! আবিষ্কারটা আজই এইমাত্র হ'ল।

যাক, আপনি মশাই বেজায় লাকি লোক। আর সেই সঙ্গে আমাদেরও ভাগ্য ফিরবে বলে মনে হচ্ছে।

ফিরলে খুশীই হব আমি, আমার না হোক—আপনাদের। কিন্তু তপগোপালবাবু, আকাশের স্বপ্ন দেখা ভালো, তাই বলে আকাশ-কুসুমের নয়।

এড়িয়েই গেল অশোক। ভয় নয়, দ্বিধাও নয়। লজ্জা কিংবা অভিমানও নয়। কি যে, নিজেই বলতে পারবে না অশোক। বাণীকে সে ভালোবাসত। ভালো লাগবে আজও। দেখতে ও আজ আরো ভালো হয়েছে। কালো ছুটো চোখের তন্দ্রালু তারায় আজ আরো নেমেছে আবেশ। দেহের কমনীয়তার খাজে খাজে আরো লাবণ্য জমে উঠেছে। কিন্তু ফেলে-আসা দিনের পুরোনো পাতাগুলোর ধুলো সরিয়ে, ভালো লাগার হিসেব করে কি হবে ?

কিন্তু একদিন সবুজ খামে চিঠি এল বাণীর। সবুজ রং দেখেই চিনতে পারল অশোক। বিয়ের পরেও দেখছি সবুজ রংকে ও ভুলতে পারে নি। কত খাম জমা হয়েছিল সেদিন এই সবুজ রঙের।

—এত দিনেও এক দিন আসবার সময় করে উঠতে পারলে না ? স্কুলের কাজ খুব বেড়েছে, বললে বিশ্বাস করব না। মনে হচ্ছে এড়িয়েই যেতে চাইছ। যাই হোক, কালকের সন্ধ্যায় আসবে ঠিক। না এলে অনেককিছুই মনে করব।

ছোট্ট চিঠি। ঠিক তেমনিই জড়িয়ে জড়িয়ে আঁকাবাঁকা হাতের লেখা বাণীর। লেখা কারও কি এত তাড়াতাড়ি বদলায় ? পড়ল দু'চার বার অশোক। তার পর মুড়ে রেখে দিলে পকেটে।...

দূরে হলেও, ডেপুটি কমিশনারের কোয়ার্টার খুঁজে বার করতে বেশী কষ্ট হ'ল না—এক জনকে জিজ্ঞেস করতে দেখিয়ে দিল। তারের বেড়া দেওয়া অনেকখানি কম্পাউণ্ড। ঘাস হয়েছিল, কারা যেন কেটে নিয়ে গেছে।

অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া পাওয়া গেল।—বলি, ব্যাপারটা কি ? ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে বলে উঠল বাণী।

কি আবার। নরম সোফার স্প্রিঙের গদীতে ডুবে-যাওয়া অশোক হাসবার চেষ্টা করল।

তার পর, তোমার খবর সব শোনাও। সামনের সোফাতে ও বসল এসে মুখোমুখি।

শোনাবার মতো খবর আমার কাছে কিছু নেই।

ওই বলেই এড়িয়ে যেতে চাও ? বেশ তো চালাক তুমি।

ঘরটা বেশ সাজানো। তকতকে ঝকঝকে। বেশী আসবাবের ভিড় নেই। দেয়ালে দু'চারটে চমৎকার ছবি, মেঝের দু'চারটে সোফা। ওদের সুন্দর রুচি-জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে।

চাইলেও সব সময় তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মৃদুকণ্ঠে জানাল অশোক।

বউ কেমন হয়েছে?

নিজের মুখে নিজের বউকে খারাপ বলতে কাউকে বড় একটা শুনি নি।

একটি ছেলেকে সেদিন দেখলাম। আর আছে নাকি?

আর নেই।—আপাততঃ। হেসে জানাল অশোক।

বিয়ে করলে, একটা খবরও দিলে না? বেশ যা হোক। চুল বাঁধে নি বাণী, পিঠে ছড়িয়ে এসেছে। সেদিন খুব চুল ছিল ওর। এখনো আছে।

—কলেজের পড়া শেষ হলে কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে, হারিয়ে যায় তার হিসেব একান্ত ইচ্ছে করলেও রাখা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

যাক, অত সব বলতে হবে না। আমার বিয়ের খবরও তো দিই নি তোমায়। তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি?

একটিও নয়—আপাততঃ। হাসল বাণী।

খাবার এল। দুটো প্লেটের একটায় মিষ্টি, অন্যটায় কচুরি। বেশ ভরতিই দুটো।

এসব কার?

কার আবার, তোমার।

ও বাবা, এ যে অনেক।

এই বয়সে এইটুকু খাবার দেখে ভয় করলে, পৃথিবীতে বড় বড় কাজ তুমি করবে কেমন করে অশোক?

কথায় তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।

খাওয়া শেষ হতে বাইরে মোটরের শব্দ এল। সুবিমল সেন ফিরেছেন। মেঝের বিছানো কার্পেটে জুতোর মচমচ শব্দ উঠল।

চেনো একে? স্বামীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল বাণী।

না চিনলেও আন্দাজ করতে পারছি। বাণীর পাশেই বসল সুবিমল।—আপনার নাম বাণীর মুখে অনেক বার শুনেছি। ও আপনার এক জন মস্ত এডমায়ারার।

শুনে সুখী হলাম। এ আমার সৌভাগ্য।

তোমরা ছেলেরা মাঝে মাঝে এমন বিনয়ই করতে পার! অশোককে লক্ষ্য করে বলে উঠল বাণী।

ওর কথা অশোকের কানে গেলেও বিশেষ গুরুত্ব দিল না, কিন্তু সুবিমল। অশোকের কথারই সূত্র ধরে বললে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য।

সে কি রকম?

স্ত্রীর মুখে পরপুরুষের তারিফ শোনা স্বামীর পক্ষে দুর্ভাগ্য বৈকি।

যাও, যত সব তোমার বাজে কথা। বাণীর গালদুটোয় গোলাপী ছোপ পড়ল।

আচ্ছা, কাজের কথাই বলছি। খাবার দাও আমাদের। ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

কিন্তু আমার খাওয়া তো এখখুনি হ'ল। অশোক বলে উঠল।

তাই নাকি? আচ্ছা তাতে কি, আবার না হয় খাবেন।

বলেন কি আবার? পরিণামটা ভাবতে হবে তো।

অশোকের আপত্তি ওরা শুনল না, আবার খাবার এল দ্বিতীয় পর্য্যায়ে। একটু কিছু মুখে দিতে হ'ল অশোককেও।

আপনাদের স্কুল চলছে কেমন?

মন্দ নয়।

সেদিনের ফাংশান আপনাদের খুব ভাল হয়েছিল।

আপনাদের ভাল লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

আজকাল তুমি ভারি বিনয়ী হয়েছ অশোক।—হেসে লুটিয়ে পড়ে বাণী।

হওয়া ত ভালই, ওটা মহৎ গুণ। সুবিমল সায় দিল।

তুমি থাম ত।

কিন্তু থামল না সুবিমল। আর সেদিনের ফাংশানের সব ক্রেডিট শুনলাম আপনার।

ওটা ভুল শুনেছেন। হাসল অশোক।

এই রকম ভুল শোনা কিন্তু ভাল অশোকবাবু।

টেবিলের উপর ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে। সেদিকে এবার চোখ পড়তে উসখুস করে উঠল অশোক।

এবার আমায় উঠতে হয়।

ওমা সে কি, এরই মধ্যে! আগে ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে, বলে উঠল বাণী। বউ ভাববে বুঝি?

ভাবতেও পারে, তবে ওর জন্যে নয়। আমাকে একবার লাইব্রেরীটা ঘুরে যেতে হবে। একটা বইয়ের বিশেষ দরকার।

নিয়ে এসো না ওকে একদিন।

আনব।

বিশ্বাস হচ্ছে না।

কেন?

এত তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেলে কিনা, তাই।

হাসল অশোক। না, সত্যিই আনব।

বিরাট কম্পাউণ্ড পেরিয়ে গেট অবধি পৌঁছে দিতে এল বাণী।

তুমি অনেক বদলে গেছ অশোক।

কে বললে?

কেউ না বললে আমি বুঝি জানতে পারব না?

এর পরের দিনগুলো একঘেয়ে। অশোক রোজকার মত স্কুলে যায়। ছেলেদের গল্প শোনায়—পুরোনো পৃথিবীর, আগামী পৃথিবীর। দূরের ডেপুটি কমিশনারের কোয়ার্টারের দুরন্ত ঢেউ এখানে থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু অশোক মাষ্টারের ছোট্ট কুঁড়েঘরের

কোনও সুরের রেশ, ওখানের দেয়ালে দেয়ালে কোনও গুঞ্জরণের পরশ বুলিয়ে দেয় কি ?

ছুটির পর বাড়ী ফিরতেই, খুশীতে ঝলমল করে ছুটে এল সীতা। আনন্দও যেন বইতে পারছে না।

ব্যাপার কি ?

ভীষণ ব্যাপার, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ডেন্‌জারাস ব্যাপার। শুনলে তুমি এমন অবাক হবে।

দেখি ত একটু অবাকের ধরণটা।

না, সত্যিই, ঠাট্টা করছি না।

আচ্ছা বলই ত শুনি।

বাণীকে চেন ?

বাণী, সীতার মুখে নামটা শুনে অশোক থমকে দাঁড়াল। এক-রাশ ভয় আর ভাবনা হঠাৎ চেপে ধরল চার পাশ থেকে।

কি, চেন ?

কোন বাণী ?

তোমার সঙ্গে বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছে গো।

ছিল এক জন।

সেই বাণীই এখানে আজ এসেছিল দুপুরে।

সে কি, এখানে ? কেন ? কোত্থেকে এল ? অভিনয় সুরু করল অশোক, এ ছাড়া আর কিই বা সে করতে পারে ?

ওইখানেই ত যত মজা, যত অবাক হওয়ার কথা, এসেছে এখানে সাত-আট মাস। ওই যে ডেপুটি কমিশনার আছে না সুবিমল সেন, ওরই সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আর তোমাদের স্কুলের ফাংশানে ওই-ই ত প্রাইজ দিলে। দেখ নি সেদিন ?

দিয়েছিল ত, কিন্তু আমি তেমন লক্ষ্য করি নি। ষ্টেজের মধ্যে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, কিছুই দেখতে পারি নি ওদিককার ব্যাপার।

কি যে তোমার কাজ মাথামুণ্ডু! যাকগে, শোন ত আজকের অবাক কাণ্ডটা। মস্ত মোটর এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। আমি ত ভয়ে কেঁপে মরি।

ভারি ভীতু তুমি।

আহা, ভয় করবে না বুঝি ? মোটরে করে আবার কে এলরে ? তারপর মেয়েটি নামল, এবার আমি থ' হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করলে, এটা অশোক মজুমদারের বাড়ী কিনা। এই বাড়ীই শুনে, আলাপ জুড়ে দিলে আমার সঙ্গে। চমৎকার মেয়ে। দু'ঘণ্টা ছিল, কিন্তু এমনভাবে গল্প জুড়ে দিলে যে, মনে হ'ল কত কালের আলাপ আমাদের। আর দেখতে কি সুন্দর, টকটক করছে গায়ের রঙ, নীল টানা টানা চোখ দুটো, আর মাথায় কি চুল। আমার জানো—ওর পাশে বসতে লজ্জাই করছিল।

হ্যাঁ, দেখতে ওকে চমৎকারই ছিল।

ছিল নয় গো, আজও আছে, দেখলে বলতে।

আচ্ছা, কথাবার্ত্তা কি হ'ল ?

একটা কথা নাকি, কত কথা, দু'ঘণ্টায় অন্ততঃ দু'লাখ কথা হয়েছে। জান আমার নাম সীতা শুনে হেসেই আকুল।

কেন ?

বললে, সীতা নামের সঙ্গে সাধারণতঃ দুঃখই জড়ানো থাকে। তুমি ত ভীষণ সুখী, তোমাকে এই দুঃখের নাম কে দিল ? আমি বললাম, কি করে জানলেন যে, আমি ভীষণ সুখী ? তার জবাবে ও বলল কি জান ? বলল, তোমাকে না জানি, অশোককে ত জানি। কাউকে কোনদিন দুঃখ ও দেবে না।

বিপুল পুলকে বুকটা ভরে উঠল অশোকের। সত্যি এ কথা বলল বাণী ?

হ্যাঁ গো।

আর কি কথা হ'ল ?

আরো কত কথা। দূর ছাই, সব কি মনে পড়ে! হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করল মাষ্টারিতে কত আয় হয় ? আমি বললাম, ঘোড়ার ডিম। তা বললে, এত ভালভাবে পাস করে শেষে ছোট্ট একটা স্কুলে মাষ্টারি করছে কেন ? এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছেলের চাকরির অভাব কি ?

তা তুমি কি বললে ?

যা বলবার, যা বলা উচিত। বললাম, তোমার পেছু লেগে লেগে আমি হয়রান হয়ে গেছি। কোন কথাতেই কান দাও না তুমি। এই যে এক স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছ, কার সাধ্যি ছাড়ায়। উনি বললেন, গবর্ণমেণ্টের কত নূতন স্কীম চালু হয়েছে। কত ভাল ভাল পোষ্ট তৈরী হচ্ছে আর হবে। অশোকের ত একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যেতে পারে।

তুমি অমনি হ্যাংলার মত ধরে বসলে ত ?

ধরব না ? বললাম, দেন না একটা সুবিধে করে। তা বাণী বললে, উনি বলে দিলে এখুনিই হয়ে যাবে। আর অশোকের কোয়ালিফিকেশান কি কম ? ওঁর বলারও দরকার হবে না। কিন্তু অশোক এসব নেবে না। আমি শুধালাম, কে বললে নেবে না ? ভাল চাকরি আর বেশী মাইনে পেলে কে না নেবে ? তার জবাবে ও কি বললে জান ? বললে, সবাইয়ের দলে ওকে ফেলো না। ওকে আমি তোমার চেয়ে বেশী জানি। ভাল আর বড় চাকরির লোভ ওর নেই। ওরা হ'ল আদর্শবাদী মানুষ। সেই আদর্শ আমাদের কাছে যতই হাস্যকর, যতই তুচ্ছ হোক, ওদের কাছে তা জীবনের চেয়ে বড়। আদর্শ আঁকড়ে ধরে ওদের মত মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। ওদের আদর্শ নিয়েই ওদের বাঁচতে দাও।

অবাক হয়ে শুনে যায় অশোক। এমনি করে বলে গেছে বাণী। এতো সুন্দর করে, এতো আবেগ ঝরিয়ে। এমনি করে বলতে ওরই মত মেয়েই ত পারবে। সবাই ত পারে না।

আরো কি বলল জান ? বলল, পৃথিবীতে এক জাতের মানুষ আছে, যারা শুধু দিতেই জানে, চাইতে জানে না। যারা পেলেও নেবে না, দিলেও নেবে না। এদের লোকে বলে বোকা, বলে

পাগল। কিন্তু মানুষ বলতে সত্যিকারের এরাই। আর তোমাকে ও এদেরই দলে ফেলেছে। ভারি ভাল মেয়েটা। একটুখানির জন্যে এসে এতখানি মায়া করে গেল যে, কি বলব! যাদু জানে গো মেয়েটা। মাত্র দুটি ঘণ্টার আলাপে এত ভাল কাউকে কোনদিন লাগে নি। কি মিষ্টি হাসি!

অশোক চুপ করেই থাকে। আলো আর খুশির দুরন্ত স্রোত কোথা থেকে হঠাৎ যেন ছাড়া পেয়েছে।

ভাবছ কি? যাও, দেখা করে এসো না। কত ভালবাসে তোমায়। কত খুটিয়ে খুটিয়ে তোমার খবর নিয়ে গেছে। বড়-লোকের বউ হয়েছে বলে একটুও দেমাক নেই। পুরনো দিনের বন্ধুকে ঠিক মনে রেখেছে।

যাব কাল।

কাল গিয়ে হবেটা কি? দেখা কি পাবে?

কেন?

কাল সকালেই তো ওরা চলে যাচ্ছে দু'মাসের ছুটিতে। তার পর কোথায় পোস্টিং হবে, তার কোন ঠিক আছে নাকি? তাই তো বলে গেল।

কালই? আর্তনাদের মতই শোনাল অশোকের কণ্ঠ।

হ্যাঁ। যেতে হয় আজই যাও। ভাবছ কি, যাও না।

ডেপুটি কমিশনারের কোয়ার্টারের মস্ত কম্পাউণ্ডে প্রচুর চাঁদের আলো পড়েছে। সামনের তেঁতুল গাছের লম্বা এলোমেলো ছায়া সে আলোয় ছবি এঁকেছে। গেটের সামনে মোটরের ভিড়। ডিস্ট্রিক্টের বড় বড় অফিসাররা দেখা করতে এসেছে নিশ্চয়ই। আসবেই তো। নানা কণ্ঠের কলহাসির ঢেউ এখানে দাঁড়িয়েও কানে আসছে। ওর মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি গলাটা কার? বাণীর? ওদের ভিড় ঠেলে অশোক যাবে কি? ওদের ভিড়ে অশোকের কি জায়গা হবে? সিরসিরে হাওয়া বইছে। একটুও মেঘ নেই আকাশে। শুধু তারাদের মেলা আর চাঁদ।

জেগে ছিল সীতা। ওকে ফিরতে দেখে শুধাল, কি দেখা হ'ল?

হুঁ।

কি কথা হ'ল?

অনেক কথা। কাল সব গল্প করব। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কাল শনিবার, সকালে স্কুল। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না?

কিন্তু কাল যখন জিজ্ঞেস করবে সীতা, কি বলবে সে? ওখানে গণ্যমান্যদের ভিড় ঠেলে এগোতে হয়তো পারত অশোক, জায়গাও একটা করে নিত। কিন্তু ওখানে পদমর্যাদা, মেকি আদব-কায়দা, মাপা কথা আর হিসেব-করা হাসির মধ্যে আজকের দুপুরের সীতার আশ্চর্য ভালো-লাগা সেই মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যেত কি?



বিনিময়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে—
যাহারা আছিল এক,
আজ ছাড়াছাড়ি—তাড়াতাড়ি তারা
কোথা চলে যায় দেখ।
প্রিয় সব তরুলতা,
তাদেরো মুখেতে কথা,
সাতপুরুষের বাস্তুভিটাই
করিয়া যেতেছে ত্যাগ।

২

কক্ষে কক্ষে, দাগ রেখে গেছে—
অতীতের উৎসব,
কত সুখ আর দুঃখের স্মৃতি,
জড়ানো রয়েছে সব।
প্রতিবেশী দাসদাসী—
কারো মুখে নাই হাসি,
খাঁ-খাঁ করিছে পথ-ঘাট গ্রাম
হত সব গৌরব।

৩

রুষ্ট মনের দুষ্ট সৃষ্টি—
দ্বিধা ভীতি সংশয়,
করেছে দারুণ কলুষিত মন
এ রোগ যাবার নয়।
জুড়াবো কেমনে কহ?
যাতনা দুর্ব্বিষহ,
যে দিকেতে চাই ভিতর বাহির
সকলি বেদনাময়।

৪

বলিছে আমার 'সখে'র 'বাগিচা'
বলিছে রাত্রি-দিন,
সারস যেতেছে শৃগালের গৃহে
শুধিতে সখের ঋণ।
বৈরাগী গাহে দ্বারে,
'তাইরে নাইরে নারে',
উট-পাখীদের নীড়ে রবে তোকা,
ভেবনা 'পেনগুইন'।

৫

বিধাতার নয়—মানুষের গড়া
সাধের বিড়ম্বনা,
পর হ'ল আজ সেই ঠাঁই? যার
সবাই আপন-জনা।
তবু ছেড়ে যেতে হবে,
চিহ্ন কিছু না রবে,
জাতির দাবি যে ছাতির খপর—
রাখে নাক' এককণা।

৬

তুমি কেঁদে এসো, আমি কেঁদে যাই,
ভিটা হোক বিনিময়,
রোদন দিয়েই রচা এ 'বোধন'
প্রাণ যে ব্যাকুল হয়।
অশ্রুসিক্ত পথে,
চলি কণ্টক-রথে
প্রভু তুমি চেনা, অচেনার সাথে
করে দাও পরিচয়।

পল্লীগ্রামের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত মহাপূজার সময় নিজের গ্রামে (হুগলী জেলার অন্তর্গত আঁটপুর) গিয়াছিলাম। গ্রামটি কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে, ময়দান ষ্টেশন হইতে মার্টিনের রেলে যাইতে হয়, প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে; সম্পূর্ণ পথ এখনও মোটরে অতিক্রম করা যায় না। গ্রামে ১৬।১৭ দিন ছিলাম।

আঁটপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী ২।১টি গ্রামে মোট সাতটি স্থানে পূজা হইয়াছিল; তন্মধ্যে আঁটপুর হাটতলায় একটি সার্ব-জনীন পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; অবশিষ্ট ছয়টি পারিবারিক পূজা। এই ছয়টির মধ্যে আঁটপুর মিত্রবাটির পূজা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; ২৫০ বৎসরের উপর। ইহার পর আঁটপুর ঘোষেদের বাড়ীর পূজা প্রাচীন। ঘোষেদের বাড়ী দুইটি পূজা হয়—বড় ঘোষেদের একটি এবং ছোট ঘোষেদের একটি; এই দুইটির মধ্যে ছোট ঘোষেদের পূজা প্রাচীন। বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ) বড় ঘোষেদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। আঁটপুর মিত্রবাটীতে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশান্তিরাম ঘোষ (৯১ বৎসর-বয়স্ক), যদিও এখন শয্যাশায়ী, কিন্তু পূজার পশ্চাতে তাঁহার প্রেরণা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দেশের পূজার প্রতিমাগুলি স্থানীয় ২।১ জন শিল্পীর দ্বারাই নির্মিত; বাল্যকালে অর্থাৎ ৫০।৫৫ বৎসর পূর্বে প্রতিমার যেমন রূপ দেখিয়াছি, মোটামুটি সেই রূপই বজায় আছে এবং এই রূপই আমাদের মত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

পূর্বকালে পূজার মণ্ডপে যে গাম্ভীর্য, পবিত্রতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আবহাওয়া লক্ষ্য করিয়াছি তাহা এখন অবলুপ্ত হইতেছে মনে হইল। আরতির সময় যে জনসমাগম দেখিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাইলাম না। আনন্দময়ীর আগমনের সময় পূর্বকালে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকার মধ্যে যে আনন্দ দেখিয়াছি তাহা যেন এখন ম্লান হইয়া গিয়াছে। দরিদ্রনারায়ণের সেবা বা প্রসাদ-বিতরণের যে কল্যাণপ্রসূ ব্যবস্থা ছিল তাহার অবশিষ্ট নাই বলিলেই চলে। মহাপূজা যে আমাদের অন্যতম জাতীয়-উৎসব তাহা বর্তমানের পূজার পদ্ধতি এবং আয়োজনের মধ্যে আর উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; কেবল ইহাই নহে, সাধারণ মানুষের মনে তখনকার স্বাভাবিক আনন্দ-উল্লাস এবং স্বতোৎসারিত ভক্তিপ্রবণতাও যেন ক্রমশঃ লোপ পাইতে সুরু হইয়াছে।

পূজার সময় ৩।৪ জন শ্রমিক আমার বাড়ীতে কাজ করিতেছিল, আমার বাড়ী হইতে আমাদের পারিবারিক পূজামণ্ডপ এক মিনিটের পথ; বলিদান এবং আরতির সময় পূজামণ্ডপে যাইতে বলা সত্ত্বেও তাহারা যায় নাই। এই বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে এক জন পনর-ষোল বৎসরের যুবকও ছিল। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যারতির সময় জনবিরল পূজামণ্ডপ দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে যদি ১০৲ টাকা খরচ করিয়া স্থানীয় 'কেষ্ট যাত্রা' বা 'তর্জাগান' দেওয়া হইত তাহা হইলে মণ্ডপে তিল-ধারণের স্থান থাকিত না এবং আমার ধারণা সত্যে পরিণত হইতে বিশেষ সময় লাগে নাই। পূজা শেষ হওয়ার অনতি-পরেই স্থানীয় বাজারে কোন এক সমিতি কর্তৃক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও রাত বারোটার সময় স্থানাভাবে বহু লোককে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

পূজার প্রতি অতীতের আকর্ষণ কমিয়া যাওয়ার কারণ খুঁজিতে গেলে একটি নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছানো অসম্ভব। অনেকের মতে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে আনন্দোৎসব করার অনুভূতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পূজাস্থানে ভিড়ের অভাব, কিন্তু অভিনয়-স্থানে তিল-ধারণের জায়গা নাই সেখানে অর্থ-নৈতিক দুরবস্থাকে মূল কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া সম্ভব নহে। তবে কি লঘু রসসর্বস্ব অগভীর শহরে আনন্দানুষ্ঠানের ঢেউয়ের আঘাতে সুস্থ আনন্দানুভূতি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ?

বিজয়া-উৎসব প্রীতি-শুভেচ্ছার উৎসব। এই দিনটি প্রাচীন-কাল হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পারস্পরিক শুভেচ্ছা আদান-প্রদানের মধ্যে উদযাপিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রাচীন উৎসব-আনন্দানুষ্ঠানের কেন্দ্রভূমি গ্রামে দেখিলাম পূর্ব্বকালের মত বিজয়ার উৎসবের মধ্যে আর উদার স্বতঃস্ফূর্ত্ততা নাই। অতি নিকট-জন অতিক্রম করিয়া বর্তমান প্রীতিবিনিময়-অনুষ্ঠান জাতিধর্মশ্রেণীনির্বিশেষে সকলের গৃহে আর পৌঁছে না।

পূর্বে পূজার প্রাক্কালে শহরবাসী গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ পূজাপলক্ষে গ্রামে যাইতেন। তাঁহারা আপনজনের জন্য ত বটেই, উপরন্তু গ্রামস্থ বহুপরিচিত দরিদ্রদের জন্য বস্ত্রাদি লইয়া যাইতেন। এবারে পূজায় ২।১ জন ধনী ব্যক্তি কলিকাতা হইতে "সেলুনে" করিয়া দেশে গিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও জন্য কিছু লইয়া যাওয়া ত দূরের কথা, গ্রামস্থ সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেলামেশাও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। শহুরে অহমিকায় নিজেদের গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গ্রামের অর্থ নৈতিক দুর্দশা পরপর দুই বৎসরের অনাবৃষ্টিতে চরম আকার ধারণ করিয়াছে। গত বৎসর প্রয়োজনানুযায়ী বৃষ্টি না হওয়ায় ধানের ফলন খুব কম হইয়াছিল; সাধারণ অবস্থায় যাঁহাদের গোলায় ২০০।৩০০ মণ ধান মজুদ থাকিত তাঁহাদের গোলা শূন্য। এ বৎসরও জলাভাবে কৃষি ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ডহরা, কোল কাঁচল এবং ডাঙ্গা জমিতে ধান চাষ হইয়া থাকে। ডহরা এবং কোল কাঁচল জমি অপেক্ষাকৃত নীচু হওয়ায় তথায় কিছু পরিমাণে ধানচাষ হইয়াছে, কিন্তু ডাঙ্গা জমিতে চাষ হয় নাই বলিলেই চলে। জলাভাবে পাট পচাইবারও খুব অসুবিধা হইয়াছে। পাটের বর্ত্তমান মূল্য প্রতি মণ ২৫।২৬৲ টাকা!

তাহার উপর পূজার অব্যবহিত পরে বৃষ্টির জন্য রবিশস্যের বিশেষতঃ আলু, মটর কলাই প্রভৃতির খুবই ক্ষতি হইয়াছে। স্থানে স্থানে ধানেরও ক্ষতি হইয়াছে।

বর্ত্তমানে দেশে শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক এক টাকা এবং ইহার সহিত জলপানি ৵০ এবং বিড়ি ৶১০। কিন্তু দেশে বর্ত্তমানে কাজের অভাব এবং ধানের ফসল কম হওয়ার জন্য ধান কাটিবার সময়ও শ্রমিকগণ পূর্ব্বের মত কাজ পাইবে না। সুতরাং ভূমিহীন শ্রমিকেরা নিদারুণ দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে।

দ্রব্যাদির মূল্য কিন্তু সেই তুলনায় অধিক। চালের মূল্য প্রতি মণ ১৯।২০৲ টাকা অর্থাৎ টাকায় /২ সের চাল। আমার বাড়ীতে একটি নিঃসন্তান শ্রমিকের (স্ত্রী-পুরুষের) দৈনিক পাঁচ পোয়া চালের প্রয়োজন; সুতরাং এক টাকা মজুরি হইতে সে ॥৵০ চালে ব্যয় করিয়া অন্ততপক্ষে পেট ভরাইয়া রাখে। কিন্তু অন্য একটি শ্রমিকের ৫।৬টি পোষ্য; সুতরাং তাহাকে অধিকাংশ দিন অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে থাকিতে হয়। ইহাদের সংখ্যা কম নহে; ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এইরূপ—আলু /১—॥৵০, বেগুন /১—॥০, তেল /১—১॥০, ডিম একটি ৵০, চিনি /১।—১।০, সুজি /১—৸০, ময়দা /১—॥১০, ছোলার ডাল /১।—॥১০ মুগ ডাল /১—॥৵১০, মুসুর ডাল /১।—॥৵০ এক বোতল কেরোসিন ৶১০, পোস্ত /১—২৲ এবং এক মণ কয়লা ১৸৵০।

দৈনিক এক টাকা আয়বিশিষ্ট শ্রমিক এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরিউক্ত মূল্যমান দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়—আমাদের সাধারণ মানুষের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে প্রকৃতির খেয়ালের সহিত গ্রামের মানুষের সুখসমৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং বিভিন্ন বৃহৎ এবং স্থানীয় নদীপরিকল্পনাসমূহের ত্বরিত রূপায়ণের দ্বারাই প্রকৃতির খেয়ালখুশি হইতে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো যাইতে পারে। বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল না হইয়া সেচ-পরিকল্পনার মুখাপেক্ষী হইলে হয়ত তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

রাস্তাঘাট, পানীয় জল প্রভৃতির অবস্থা প্রায়ই আগের মত; তবে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।



পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ

সেমিনারের বিবরণী

পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ পরিচালিত কল্যাণ সম্প্রসারণ রূপায়ণী সমিতিগুলির কার্যাক্রমের সংহতি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার জন্য পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৭শে আগষ্ট বেলা ১২টার সময় বাণী ভবন, ২৯৩।৪, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় নিম্নলিখিত কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির সভ্য ও কর্ম্মীদের নিয়ে প্রথম সেমিনারের উদ্বোধন হয়।

১। হাওড়া ৫। গাইঘাটা (২৪ পরগণা)
২। নদীয়া ৬। মধ্যমগ্রাম ”
৩। মুর্শিদাবাদ ৭। জোকা বিষ্ণুপুর ”
৪। মেদিনীপুর ৮। কালিকাপুর প্রতাপনগর ”

প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছিল—সেমিনার যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এবং যে উদ্দেশ্যে এই সমাবেশ তা যেন সফল হয়।

স্থান নির্ব্বাচিত হয়েছিল—বাণীভবনের প্রশস্ত হল-ঘর। বাণীভবনের কলাবিভাগের ছাত্রীরা প্রথম গেট থেকে আরম্ভ করে হল ঘর পর্য্যন্ত চমৎকার আল্পনা দিয়ে রূপসমৃদ্ধ ও ভাবগম্ভীর এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, ফুল ও ধূপ এই পরিবেশকে আরও শ্রীমণ্ডিত করে।

উদ্বোধনের সময় প্রত্যাসন্ন—সবাই আসতে আরম্ভ করলেন, হল-ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল শ্রীমণ্ডিত পরিবেশ দেখে, সবাই এসে উপস্থিত হলেন—বসে পড়লেন ঘরে পাতা সতরঞ্চির উপর।

প্রথমেই পর্ষদের চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলের সঙ্গে পর্ষদের সদস্যাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারপর প্রত্যেক পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির আহ্বায়ক নিজ নিজ সমিতির সভ্য ও কর্ম্মীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই সূক্ষ্ম সূত্রে যেন সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে গেল, দূর হয়ে গেল অপরিচয়ের ব্যবধান। সকলেই উৎসুক, সকলেই ভাবছেন কি করে সে কাজের—যে মহান্ সমাজকল্যাণ-কর্মের ভার তাঁরা নিয়েছেন, কিভাবে সেই কাজের উৎকর্ষবিধান করতে পারেন, কোন পন্থা অনুসরণ করলে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

প্রথমে ড. শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ কেন্দ্রীয় পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সংস্থার গোড়ার কথা ও কি উদ্দেশ্যে সরকার এই পর্ষদ স্থাপন করেছেন তার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন আর যাঁরা এ কাজে এগিয়ে এসেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের দায়িত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদের কাজের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) যে সমস্ত সংস্থা সামাজিক উন্নয়ন-কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছেন—তাদের আর্থিক সাহায্যের আবেদন গ্রহণ এবং বিচার-বিবেচনার পর কেন্দ্রীয় পর্ষদে তাদের অনুমোদন প্রেরণ করা।

(২) গ্রামাঞ্চলে—যেখানে এ ধরণের কোন সংস্থা এখনও স্থাপিত হয় নি—সেখানে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্য্যের ভিত্তিপত্তন এবং সেই কার্য্য পরিচালনা করা।

কাজেই দ্বিতীয় দফার কার্য্যে পর্ষদের দায়িত্ব পুরোপুরি। এই কার্য্যের সফলতায় পর্ষদের সাফল্য, অকৃতকার্য্যতায় পর্ষদের অকৃতকার্য্যতা।

এই কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য পর্ষদ প্রতি জেলায় কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতি নামে এক একটি (২৪ পরগণায় চারটি) সমিতি স্থাপন করেছেন। এই সমিতির সভ্যসংখ্যা ৯ জন, তার মধ্যে ৮জনই বেসরকারী সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি এবং একজন সরকারী প্রতিনিধি। এই সমিতি বর্ত্তমানে প্রতি জেলায় পাঁচটি করে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর শ্রীমতী গুহ—কি কি কাজ পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তার বিবরণ দেন। তিনি উপস্থিত সভ্য ও কর্ম্মীবৃন্দকে অনুরোধ জানান, তাঁরা কোন অসুবিধা বা বাধার সম্মুখীন হলে যেন পর্ষদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ

স্থাপন করেন। তিনি পর্ষদের তরফ থেকে সকলপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন।

শ্রীমতী গুহ আরও বলেন, কেন্দ্রীয় পর্ষদ স্থির করেছেন যে, আগামী ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৫৬ সনের পরে পর্ষদের অধীন এমন কোন কর্ম্মী থাকবেন না যিনি কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। এজন্য পর্ষদ গ্রাম-সেবিকা শিক্ষা এবং ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ইতি-মধ্যেই কস্তুরবা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট, বলরামপুর, মেদিনীপুর কেন্দ্রে ৫০ জন মেয়েকে গ্রামসেবিকা শিক্ষা-গ্রহণের জন্যে পাঠানো হয়েছে। তিনি কর্ম্মীবৃন্দকে এই শিক্ষা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

তারপর শ্রীবিলাস মুখার্জ্জি বলেন যে, ১৯৩৭ সন থেকে সরকার বয়স্ক-শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু মেয়েরা এযাবৎ এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন। আশা করা যাচ্ছে যে, এই পর্ষদ যখন এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন তখন অনেককিছুই করা সম্ভবপর হবে। এ বিষয়ে জোর দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বয়স্ক পুরুষকে শিক্ষা দেওয়ার মানে একজনকে শিক্ষিত করা। কিন্তু একজন বয়স্কা মহিলাকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ একটা সমগ্র পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত হস্তশিল্পকেন্দ্রের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরিচালকবৃন্দকে অনুরোধ করেন—তাঁরা যেন দেশের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের কাজ চালান। কারণ যাঁরা কাজে যোগদান করেছেন এবং কাজ শিখেছেন তাঁরা যদি সঙ্গে সঙ্গে আয়ের একটা পথ খুঁজে পান তো স্বভাবতঃই তাদের উৎসাহ এবং একাগ্রতা বাড়বে। এজন্য এমন সমস্ত জিনিষ প্রস্তুতি শিক্ষা দেওয়া দরকার, বাজারে যেগুলির চাহিদা আছে, মানে যা বাজারে বিক্রী হয়। গ্রামে এমন সব জিনিষ আছে যা খুবই সহজলভ্য এবং একটু কারিগরি বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই দৈনন্দিন সাংসারিক কাজে তার প্রচুর চাহিদা হয় আর বাজারেও বেশ দামে বিক্রী করা যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনি তালগাছের আঁশ থেকে কার্পেট বোনা, বাঁশের ঝুড়ি তৈরি, কাপড়ের ফুল তৈরি, পাটের সুতলী, গামছা, তোয়ালে তৈয়ার প্রভৃতি কাজের উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষ করে দর্জ্জির কাজের উপর জোর দিতে বলেন। কারণ এই কাজের মাধ্যমে যে আয় হয় সেকথা বাদ দিলেও, প্রতি সংসারের প্রয়োজনেও এই কাজ প্রত্যেকের শেখা দরকার এবং তাতে করে সংসারের অনেক খরচ বাঁচানো সম্ভব।

ডাঃ শ্রীসরজা ঘোষ মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তাদের পথ্যের উপর। তিনি বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার অভাববশতঃ সাধারণতঃ লোকে জানে না কি করে কোন জিনিষের ব্যবহার করতে হয়। তাই তিনি যে সকল শিক্ষিত ধাত্রী প্রত্যেক কেন্দ্রে এসব কাজ চালাচ্ছেন তাঁদের সকল বিষয় অবহিত হতে বলেন এবং অন্য কাজের সঙ্গে এটাকেও কর্ত্তব্যের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, গ্রামে যে সব জিনিষ পাওয়া যায় সে সব জিনিষ ব্যবহারের দিকেই লক্ষ্য রাখা দরকার। শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে হলে ফলমূল ইত্যাদি যোগাড় করতেই হবে এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কতগুলি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন, গ্রামের আর্থিক অবস্থাও এমন নয় যে, সবাই ফলমূল ইত্যাদির সংস্থান করতে পারবে। কাজেই গ্রামে যে সব জিনিষ সহজলভ্য সে সব জিনিষের ব্যবহার শিখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হবার জন্যে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি একথাও বলেন, অনেকেই জানে না কি করে সাবু বা বালি তৈরি করতে হয়, এসব শিক্ষা দেওয়ার উপরও লক্ষ্য রাখা উচিত।

মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের দায়িত্বের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তাঁদের উপরই নির্ভর করে ভাবী সুস্থ ও সবল জাতির উদ্ভব। একটু অবহেলায় অনেক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। কাজেই কর্ম্মীদের এই মহান্ কাজ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

গ্রামে এসব কাজের অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, কর্ম্মীরা যেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে, সুখে-দুঃখে জড়িয়ে তাদেরই একজন হয়ে যান, তা না হলে তাঁদের পক্ষে, কাজে আন্তরিকতা সত্ত্বেও কিছুই করা সম্ভবপর হবে না। কারণ অশিক্ষা ও কুসংস্কার আমাদের প্রগতির পথে মস্ত বড় বাধা—এ বাধা অতিক্রম করতে হলে চাই অকৃত্রিম ভালবাসা ও সমানধর্ম্মী হওয়া, নইলে এ কাজে সাফল্যলাভ দুরূহ।

শ্রীমতী রমলা সিন্‌হা কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কার্য্য পরিচালনা-প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রে কি কি কাজ চালানো হবে এবং কিভাবে তা পরিচালনা করা সম্ভব সেই পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম্মীনিয়োগের সময়ই কর্ম্মীর গুণাবলীর সম্যক্ বিচার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, হস্তশিল্প-শিক্ষকের হস্তশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রমাণপত্র থাকলেও সাধারণ কিছু লেখাপড়া জানা দরকার। তা হলে তাঁর পক্ষে হস্তশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক-শিক্ষা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া কষ্টসাধ্য হবে না। একজন

ধাত্রীর পক্ষেও বহুবিধ কাজ করা সম্ভব যদি তার কিছু লেখাপড়া জানা থাকে। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই সমিতির সদস্যাদের এগিয়ে এসে কর্ম্মীদের সাহায্য করা উচিত, তা হলেই কাজের সুষ্ঠু পরিচালনা অধিকতর সহজ হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতি জেলায় ৫টি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পর্ষদ গোড়া থেকেই কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কাজ যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তার দিকে নজর দিয়েছেন। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাগুলি যাতে আর্থিক দিক দিয়েও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তার ব্যবস্থার কথা কেন্দ্রীয় পর্ষদ বলছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়িত করতে হলে গ্রামবাসীদের সহানুভূতি, আর্থিক ও পারস্পরিক সাহায্যই প্রধান সম্বল। যেখানে গ্রামবাসীরা এগিয়ে না আসবেন সেখানে পরিকল্পনার কাজ চালানো সম্ভব নয়। এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি সমিতির সভ্যদের সম্যক্ অবহিত হতে এবং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তিনি অনুরোধ জানান।

পরিকল্পনা সমিতির বহু সভ্য কার্য্যপরিচালনা ব্যাপারে তাঁদের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেন। অতঃপর কর্ম্মীরা এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন একে একে। বিভিন্ন তাঁদের বয়স, বিভিন্ন তাঁদের সমস্যা, ভিন্ন ভিন্ন তাঁদের প্রকাশভঙ্গি, সবচেয়ে লক্ষণীয় তাদের সাবলীল স্বচ্ছন্দ আচরণ। বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে তাঁরা তাঁদের সমস্যার বিষয় বলে গেলেন। প্রায় ১২৫ জন সভ্য এবং কর্ম্মী উপস্থিত। সবাই শুনছেন মন দিয়ে। সবাই উৎসুক হয়ে আছেন এর সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে। তখন সেই হল-ঘরে—কর্ম্মীদের সেই মিলনক্ষেত্রে যে ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা সবাইকে করেছিল অভিভূত, সকলের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল আশা এবং আনন্দ।

যে সব সমস্যার কথা কর্ম্মীরা ব্যক্ত করলেন তার মধ্যে কতগুলি বাস্তবিকই অনুধাবনযোগ্য এবং সেগুলির যথাযোগ্য সমাধানও আশু প্রয়োজন।

একজন কর্ম্মী বললেন যে, তাঁর কেন্দ্রে শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমান এবং ৫০ ভাগ হিন্দু। মুসলমানরা হিন্দুর পাড়ায় আসবে না এবং হিন্দুরা মুসলমানপাড়ায় যাবে না।

অনেকে বললেন তাঁদের থাকার অসুবিধার কথা; আবার অনেকে বললেন, প্রতি কেন্দ্রে বহুমুখী কাজ চালানোর যে পরিকল্পনা পর্ষদ গ্রহণ করেছেন—তা এত অল্পসংখ্যক কর্ম্মী দ্বারা সম্ভব নয়। আবার কেউ বললেন, গ্রামে নিদারুণ জলাভাব এবং গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা এমন যে, ইচ্ছা থাকলেও সব সময় তাদের পক্ষে কেন্দ্রে আসা সম্ভবপর হয় না। আবার এক এক সময় রুগ্ন, শীর্ণ, বৃদ্ধ পুরুষরা এসে ঔষধ চায়।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার এ সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

স্বামীজী বলেন যে, ভারতীয় সংবিধানে দ্বিজাতিতত্ত্ব স্থান পায় নি, কাজেই কর্ম্মীদের যথেষ্ট তৎপরতা ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগপূর্ব্বক ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি করতে হবে। অসুবিধা মেনে নিয়ে কোন নূতন ব্যবস্থা করলে সাময়িক ভাবে হয়ত কিছু কাজ হবে, কিন্তু তা ভারতবর্ষের আসল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে এবং সামগ্রিক উন্নতির পরিপন্থী হবে।

এই বোর্ড স্থাপিত হয়েছে মহিলা ও শিশুদের মঙ্গলের জন্য। এখানে পুরুষদের প্রশ্ন ওঠে না। যেখানে বাঁধা-নিয়মের কড়াকড়ি সেখানে নূতন পন্থা অবলম্বনের সুযোগ কোথায়। কোন দুর্ঘটনার সময় কোন ব্যবস্থাই হবে না—যদিও সমস্ত ব্যবস্থাই আছে—এমনও হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীমতী হাকসার গ্রামবাসীদের এসব কাজে উদ্বুদ্ধ করা সম্পর্কে বলেন যে, যদি গ্রামবাসীরা এগিয়ে না আসেন তা হলে কাদের নিয়ে এসব কাজ সম্পন্ন হবে? যত অধিক-সংখ্যক গ্রামবাসীকে এ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারা যায় ততই মঙ্গল এবং তার উপরই সফলতা নির্ভর করে। তা হলে দেখা যাবে কর্ম্মীদের বাসস্থানের কোন সমস্যাই থাকবে না। গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে। যে সাহায্য তাদের কাছ থেকে আসবে পয়সার হিসাব করলেও তার দাম অনেক। তারপর তিনি বিশেষ করে প্রতি সমিতির সভ্যদের অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন কর্ম্মীদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করে দেন, কারণ এটা তাঁদের পক্ষেই সহজ এবং সাধ্যায়ত্ত।

চেয়ারম্যান সেমিনারের কার্য্যক্রম ও সভ্য এবং কর্ম্মীদের উৎসাহে আনন্দ প্রকাশ করেন।

প্রাদেশিক পর্ষদ কেন্দ্রীয় পর্ষদের অধীন। কেন্দ্রীয় পর্ষদের যে সব নির্দ্দেশ আসে, প্রাদেশিক পর্ষদকে তা মানতেই হয়। কাজেই তিনি প্রতিটি পরিকল্পনা সমিতির সভ্যদের অনুরোধ জানান—তারা যেন এ সমস্ত বিষয়ে অবহিত থাকেন এবং তাদের নিজ নিজ সমিতির মাধ্যমে যাতে সেই নির্দ্দেশাবলী অনুসৃত হয় তার ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় পর্ষদের নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি প্রতি কেন্দ্রের জন্য বাংলা ও হিন্দী সাইনবোর্ডের ব্যবস্থা করতে বলেন।

স্থানীয় সমস্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক

সমস্যার রূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। কাজেই কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য —প্রতি পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির সভায় বিশদভাবে আলোচনাপূর্ব্বক সমাধানের পন্থা নির্দ্ধারণ করা এবং এ সমস্ত সভায় পর্ষদের সদস্যারাও উপস্থিত থাকবেন।

কর্ম্মীর সংখ্যা বর্ত্তমানে বাড়ানো সম্ভব নয়, কারণ বৎসরের বাজেট পাস হয়ে গিয়েছে, কাজেই স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে, কি কি কাজ বর্ত্তমানে হাতে নেওয়া উচিত বা কোন কোন বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে তা ঠিক করতে হবে। তিনি বিশেষ করে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হতে কর্ম্মীদের বলেন।

রূপায়ণী সমিতির সভ্যগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা বা জলাভাব দূরীকরণের বন্দোবস্ত করা একটু চেষ্টা করলেই সম্ভবপর হতে পারে এবং এ বিষয়ে তিনি বোর্ডের সাহায্যের আশ্বাস দেন।

তারপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সেমিনারের কাজ শেষ হয়।

অশক্ত পোষক সভা

শ্রীরতনবাঈ চিত্তুর

১৯২৩ সনে বাঙ্গালোরের কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি সমাজ-কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'অশক্ত পোষক সভা' নামক একটি সংস্থা গড়িয়া তুলিলেন। নগরীর যে সকল বয়স্ক এবং নিঃস্ব লোক রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিত তাহাদের দুর্গতিমোচনই হইল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। প্রায় তিন বৎসর-কাল তাহাদের সেবামূলক কর্ম্ম শুধু মাঝে মাঝে দুঃস্থ লোক-দিগকে খাওয়ানো এবং বস্ত্র-বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২৬ সনে "মহীশূর সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন রেগুলেশন" অনুযায়ী এই সংস্থা রেজিষ্ট্রীকৃত হইল এবং ইহা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিল:

(১) অন্ধ, বিকলাঙ্গ, খোঁড়া এবং অন্যান্য অশক্ত, নিঃস্ব, নিঃসহায় লোকেদের জন্য আশ্রম (Home) প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান।

(২) এবংবিধ লোকেদের সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নকল্পে কাজ করা।

(৩) জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

(৪) কুড়াইয়া-পাওয়া শিশুদের জন্য আশ্রম (Home) প্রতিষ্ঠা।

রেজিষ্ট্রীকৃত হওয়ার পর হইতে উক্ত সংস্থা দুর্গত মানুষের দুঃখমোচনকল্পে চমৎকার কাজ করিয়া আসিতেছে।

নিয়মিত ভাবে 'সভা'র কাজের সূচনা হয় একটি ভাড়াটে বাড়ীতে এবং কর্তৃপক্ষ ইহার নিজস্ব ভবন নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ আরম্ভ করেন। ১৯৩১ সনে বর্ত্তমান রাজ-প্রমুখের পিতা পরলোকগত স্যর কান্তিরাভা নরসিংহ রাজা ওয়াড়িয়ার বাহাদুর কর্ত্তৃক নূতন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং দুই বৎসর পরে তদানীন্তন দেওয়ান স্যর মির্জ্জা এম. ইসমাইল ইহার উদ্বোধন করেন।

উপেক্ষিতের সেবাকার্য্য

এমনি ভাবে গোড়ায় যাহা ছিল ক্ষুদ্র একটি হিতকর অনুষ্ঠান, আজ তাহা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া প্রায় সত্তর জনকে—তন্মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আছে—আশ্রয় দিয়াছে। এই সংস্থার আবাসিকদের মধ্যে অনেকেরই বৃদ্ধবয়সে দেখাশুনা করিবার মত কেহ নাই, অথবা থাকিলেও তাহারা আত্মীয়পরিজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইবার জন্য ইহারা এই সংস্থায় আশ্রয় লওয়াই নিজেদের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিয়াছে। এই সকল আবাসিককে (inmate) রোজ একবার করিয়া স্নান করানো, খাওয়ানো ও কাপড়-চোপড় পরানো হয় এবং যথোচিত ভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। 'হোমে' নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় এবং আবাসিকদিগকে তাহাতে যোগদান করিতে হয়। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে কীর্ত্তনেরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। যাহাদের যে-কোন রকম পরিশ্রম করি-বার শক্তি আছে, কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য তাহাদিগকে সামর্থ্যানুযায়ী কোন না কোন কাজ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ভোজের (feast) দিনে কোন দাতার অর্থে তাহাদিগকে সন্দেশ এবং ফল খাওয়ানো হয়। কেহ মরিলে পর যদি কোন সাম্প্রদায়িক সংস্থা (communal organization) অথবা মৃতের আত্মীয়স্বজন শবদেহ সৎকারের দায়িত্ব লইতে

না আসে তবে সভা কর্ত্তৃকই তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জাতিনির্ব্বিশেষে এই সংস্থার দ্বার সকলের নিকটই অবারিত।

বালক বিভাগ

নিঃস্ব বিভাগ (Destitute Section) দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে পর সভা রেজিষ্ট্রীকরণের সময় ঘোষিত বিষয়সমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অনাথ বালকদের আশ্রয়-দানের ব্যবস্থাকল্পে তৎপর হইয়া উঠে। ১৯৩৫ সনে ৬ জন অনাথ বালক লইয়া অনাথ আশ্রমের সূচনা হয়। এখন ইহাতে ৩০ জন বালক অবস্থান করে, তাহাদের বয়ঃক্রম ছয় হইতে বারো বৎসরের মধ্যে। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অনাথ আশ্রমে রাখা হয় এবং তার পর তাহাদিগকে পাঠানো হয় বাহিরে। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন এবং যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাদিগকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। সভায় অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক প্রার্থনায় তাহারা যোগদান করে। তাহারা নিয়মিত ভাবে শারীরিক ব্যায়ামও করিয়া থাকে। সাধারণ শিক্ষায় যাহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না, তাহাদিগকে দর্জ্জির কাজ, মাদুরবোনা ইত্যাদি কোনো না কোন হাতের কাজ শিখানো হইয়া থাকে। তাহাদিগকে উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্ম সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়।

বালিকা বিভাগ

জনৈক মানবহিতৈষী ভদ্রলোকের প্রভূত দান এবং পৌর মিউনিসিপ্যালিটির আনুকূল্যে ১৯৪৩ সনে একটি পৃথক ভবনে বালিকাদের জন্মও একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়া উঠে। ইহাতে এখন কুড়ি জন বালিকা অবস্থান করে, বয়ঃক্রম তাহাদের পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে।

এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত সমাজকর্ম্মের আর একটি অঙ্গ সংযুক্ত হয়—সভার ভবনে দুগ্ধকেন্দ্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার দরুন। এখানে রোজ শিশুদিগকে খাঁটি দুধ বিতরণ এবং সন্তানসম্ভবা মায়েদের বিনামূল্যে চিকিৎসা-সম্পর্কিত উপদেশও প্রদান করা হয়।

দরিদ্রনারায়ণের মন্দির

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংস্থার উদ্ভব হইলেও আজ ইহা নিশ্চিতরূপেই 'দরিদ্র নারায়ণের মন্দিরে' পরিণত হইয়াছে—স্বয়ং সরোজিনী নাইডু ইহাকে "অনুকম্পাপূর্ণ সেবাতীর্থ" (Shrine of compassionate Service) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে যে সকল সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে সে সম্বন্ধে অনেকে প্রশংসামূলক মন্তব্য করিয়াছেন। ১৯৩৪ সনে বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে মহাত্মা গান্ধী সভা পরিদর্শন করিয়া এই মর্ম্মে লেখেন—"এই সংস্থা যেন দুর্ব্বলকে সবল করিবার জন্ম চেষ্টা করে।" স্বামী রামদাস বলিয়াছেন—"সভা বাস্তবিকই ভগবানের অভিপ্রেত কাজ করিতেছে এবং আদর্শ পন্থায় ইহা পরিচালিত হইতেছে।"

সভা মহীশূরের সমাজকল্যাণকর্ম্মে অগ্রণী সংস্থাসমূহের অন্যতম। ১৯৪৯ সনে সভার কৃত্যসমূহের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনকল্যাণকর্ম্মে এই ধরণের সাফল্যের জন্ম যে-কোন দেশ গর্ব্ববোধ করিতে পারে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এম. রামচন্দ্ররাও ও স্বামী ভাস্করানন্দজীর মত নিঃস্বার্থ কর্ম্মীদের উদ্যমশীলতা এবং নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও আরমইন-উল-ভিজারাথ, জনাব এ. কে. সৈয়দ তাজ পীরান সাজ্জাদ:—যিনি বিগত পনের বৎসর যাবৎ এই সংস্থার শীর্ষ-স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, এই দুই জনের সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যতিরেকে সংস্থার পক্ষে এ ধরণের সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইত না।

এই সংস্থায় একবার আশ্রয় লইবার পর আবাসিকদের কখনও মনে হয় না যে, তাহারা নিঃস্ব অথবা গৃহহারা। ইহার বেশী আর কিছু বলা যাইতে পারে না এবং বলিবার প্রয়োজনও নাই।

কলিকাতার একটি বয়স্ক-সেবা-প্রতিষ্ঠান

ইউরোপে Little Sisters (ক্ষুদ্র ভগিনীবৃন্দ) নামে একটি স্বেচ্ছামূলক সেবিকা-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সুদীর্ঘ-কাল পূর্ব্বে—এদের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে 'হোম' বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বয়স্ক দরিদ্রদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা। কলিকাতায় মিঃ আসফার নামে এই নগরীর জনৈক বিত্তশালী বণিকের উৎসাহে এবং আনুকূল্যে ভারতবর্ষে প্রথম এঁদের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সনে। মিঃ আসফার ইউরোপে "লিটল সিস্টার্স" দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর কথা অবগত ছিলেন এবং তিনি তাঁদের কাজের তারিফ করতেন। কিছুকাল তিনি মাণ্টায় অবস্থান করেন, তখন "লিটল সিস্টার্স"এর একটি দল মাণ্টায় আনীত হ'ল—এই ব্যাপারে মিঃ আসফারের হাত ছিল অনেকখানি। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি এই মহানগরীতে অনুরূপ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং একটি প্রতিষ্ঠান খুলবার

পরিকল্পনাও করে ফেললেন। অবশেষে তিনি এঁদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র মাতৃ-ভবনের (Mother House) সঙ্গে যে ব্যবস্থা করেন তদনুযায়ী সিস্টারদের একটি দল এদেশে প্রেরিত হয়। এই "ক্ষুদ্র ভগিনী"দের দলটি নবেম্বর মাসে কলিকাতায় এসে পৌঁছে—মিঃ আসফার এবং তাঁর পরিবারস্থ সকলে জাহাজে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। মিঃ আসফার এই সর্ত্ত করেন যে, সিস্টাররা জমানো কাপড়চোপড় ইত্যাদি আনতে পারবেন না, কেননা তাঁর ইচ্ছা যে, সংস্থা খুলবার সময় তাঁদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেন।

সূচনা থেকেই লিটল সিস্টাররা বাইরে থেকে অর্থ-সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হলেন। হোম বা আশ্রমগুলি সংরক্ষণের জন্য তাঁরা নির্ভর করেন ঈশ্বরের উপর। তাঁরা এই ভরসায় থাকেন যে, ভগবানের অনুগ্রহে দানশীল ব্যক্তিদের মনে এমন প্রেরণার সঞ্চার হবে যার দরুন তাঁরা তাঁদের অর্থসাহায্য করবেন—এবং সেই অর্থের দ্বারা তাঁরা সকল শ্রেণীর এবং সকল ধর্ম্মের বয়স্ক দরিদ্রদের অন্নবস্ত্রাদি সংস্থানের জন্য অনুষ্ঠিত এই অতিপ্রয়োজনীয় কল্যাণকর্ম্ম চালিয়ে যেতে পারবেন।

এঁদের প্রতিষ্ঠানে প্রথম আশ্রয়প্রাপ্ত হয় প্রায় অশক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। দিনের পর দিন এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়প্রার্থী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আজ ২নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত তাদের 'সেণ্ট যোসেপ্‌স হোম' ২০০ জন বয়স্ক লোকের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের জন্য আলাদা আলাদা গৃহ আছে। এই সকল বুড়োবুড়ীদের সব কাজ লিটল সিস্টাররাই করে থাকেন এবং কতিপয় ঝাড়ুদার ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন ভৃত্য নিযুক্ত করা হয় না। সিস্টাররা নিজেরাই খাবার তৈরি করেন, আবাসিকদের সাহায্য ছাড়া কাপড়চোপড় ধোলাই এবং ইস্ত্রি করেন, পীড়িত ও অশক্তদের দেখাশুনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের বাড়ী বলে মনে করতে বয়স্ক লোকেদের উৎসাহিত করা হয় এবং তাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা হয় যেন তারা সকলেই এক বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যারা কাজ করতে ইচ্ছুক এবং যাদের সামর্থ্য আছে তারা কুটনা কোটা, শয়নকক্ষ ফিটফাট রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের কাজে সিস্টারদের সাহায্য করে। সিস্টাররা তাদের খাদ্য পরিবেশন করেন এবং সেই খাদ্য যাতে তাদের রসনাতৃপ্তিকর এবং অভিলাষ অনুযায়ী হয় সেদিকে যতদুর সম্ভব চেষ্টা করেন। যে সব 'লিটল সিস্টার' ভগবৎপ্রেমবশতঃ বয়স্ক দরিদ্রদের তত্ত্বাবধান করবার উদ্দেশ্যে সবকিছু ছেড়ে এসেছেন। তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়প্রাপ্তদের প্রতি সসম্ভ্রম প্রীতিপূর্ণ আচরণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের বেলায় অপরের বিবেচনার অভাব সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এক্ষেত্রে আশ্রিতদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ দ্বারা তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে লাভ করেন সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ।

সেকেন্দ্রাবাদের 'হোম' খোলা হয় ১৯০৩ সনে, এতে বর্ত্তমানে আশ্রয়প্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা ১২৫, ব্যাঙ্গালোর হোমের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০০ সনে—বর্ত্তমানে এই আশ্রমের আবাসিক প্রায় ১৭০ জন। মাদ্রাজে সিস্টাররা ১৯৩৪ সনে একটি হোম প্রতিষ্ঠিত করেন—সেখানে প্রকৃতপক্ষে ১৮৫ জন বৃদ্ধ লোক অবস্থান করছে।

সুইডেনে শিশুকল্যাণ প্রচেষ্টা

শ্রীকৃষ্ণা হাতীসিং

সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোমে অবস্থানকালে সেখানকার কতকগুলো শিশুকল্যাণ সংস্থা পরিদর্শনের সুযোগ আমার হয়েছিল।

'নাইবোদা হোম' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আমি দেখতে যাই সেটি হচ্ছে শিশুদের "গ্রহণ" এবং "পর্য্যবেক্ষণে"র উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত, ষ্টকহোমের শিশুকল্যাণ পর্ষদের (Child Welfare Board) অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা।

আমরা যখন আমাদের দেশের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ যখন নারী এবং শিশুকল্যাণ কর্ম্মের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন তখন আমার মনে হয় যে, আমার অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসমূহ ভাবী পরিকল্পনার পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

নাইবোদা হোমের কাজ দ্বিবিধ। এর একটি কাজ হচ্ছে—বিভিন্ন কারণে যে সকল শিশুর সাময়িকভাবে তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন, তাদের 'গ্রহণ' করা; আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে—সেই সকল শিশু সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করা, প্রত্যক্ষভাবে যাদের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শাদির উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করা হয়। শেষোক্ত শিশুদিগকে পরে তাদের পিতামাতার নিকট অথবা তেমন কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া

হয় যেখানে তারা প্রয়োজনীয় যত্ন এবং সেবাশুশ্রূষা পেতে পারে।

ভর্ত্তি হওয়ার নিয়মাবলী

এই প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকেন শিশুকল্যাণ পর্ষদ। শিশুর পিতামাতা অথবা আত্মীয়স্বজন শিশুকল্যাণ পর্ষদের প্রশাসক (administrative) বুরোর নিকট সরাসরি আবেদন এবং ভর্ত্তির জন্য অনুরোধ করেন। নাইবোদা হোমে নিম্নোক্ত শ্রেণীর শিশুদের ভর্ত্তি করা হয়ে থাকে ঃ

(১) বিভিন্ন কারণে পিতামাতা অথবা আত্মীয়স্বজনের গৃহে যে সকল শিশুর রীতিমত তত্ত্বাবধান হয় না, পরিবারের লোকেদের অথবা বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ অনুরোধে তাদের নাইবোদা হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

(২) গৃহে যে সকল শিশুর শরীর ও মনের বিকাশের দিকটা উপেক্ষিত হয় এবং যাদের প্রতি বাড়ীতে দুর্ব্ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৩) যে সকল শিশুকে নিজেদের বাড়ীতে, পালক-পিতামাতার গৃহে অথবা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা দুষ্কর এবং যারা কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।

পর্ষদের চিকিৎসকের ডাক্তারী পরীক্ষায় মারাত্মক রকমের মন্দ আচরণের জন্য স্কুলে যাওয়ার বয়সী যে সকল শিশুর প্রতি আগে যথোচিত যত্ন লওয়া প্রয়োজন তাদের (সরাসরি) নাইবোদা হোমে ভর্ত্তি করা হয় না।

হোমে ২২৯ জন ছাত্রকে ভর্ত্তি করা যেতে পারে—এইটেই হচ্ছে এই সংস্থায় ভর্ত্তির সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা। ঠিকমত বলতে গেলে এটি একটিমাত্র হোম নয়, এ হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাযুক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভাগ-করে-দেওয়া কতকগুলো হোমের সমষ্টি।

এর বিভিন্ন বিভাগ হচ্ছে ঃ

(১) এক থেকে তিন বৎসর বয়সের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যায় ৩০ জন শিশুর জন্য পৃথকীকৃত বিভাগ।

(২) এক থেকে দুই বৎসর-বয়স্ক ৩০ জন শিশুর জন্য একটি হোম।

(৩) দুই থেকে তিন বৎসর-বয়স্ক ৩০ জন শিশুর জন্য একটি হোম।

(৪) চার থেকে ছয় বৎসর বয়সের ৩০ জন শিশুর জন্য একটি হোম।

(৫) স্কুলে যাওয়ার বয়সী (৭-১৬) বৎসর-বয়স্ক ৩০ জন বালকের জন্য একটি হোম।

(৬) স্কুলে যাওয়ার বয়সী (৭-১৬ বৎসর-বয়স্ক) ৩০ জন বালিকার জন্য একটি হোম।

(৭) ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় ত্রুটি (organic deficiency) যাদের আছে সেই ধরণের ১৫টি শিশুর জন্য একটি বিশেষ বিভাগ (সাময়িক)।

(৮) ১২টি শিশুর জন্য রোগোপশম সম্পর্কিত (Therapeutical) বিভাগ।

(৯) সংরক্ষিত বিভাগ (সাময়িক পৃথকীকৃত বিভাগ)—৩ থেকে চার বৎসর বয়স্ক সর্ব্বোচ্চসংখ্যক ২২টি শিশু এবং বিভিন্ন বয়সের যে সকল শিশুকে নাইবোদায় এক রাত্রি যাপন করতে হয়—উক্ত বিভাগটি তাদের জন্য।

(১০) প্রশাসন বিভাগ, কেন্দ্রীয় রন্ধনশালা, কর্ম্মচারী-দের ভোজন-কক্ষ, কর্ম্মচারীদের বাসস্থান এবং সাজসরঞ্জাম বিভাগ।

স্কুলে উপস্থিতি

শিশুরা হোমের পার্শ্ববর্ত্তী বিদ্যালয়সমূহে অথবা শেষ পর্য্যন্ত শহরের স্কুল দেখতে যেতে পারে। প্রয়োজন হলে যে-কোনো শিশুর জন্য ব্যক্তিগতভাবে (প্রাইভেট) শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে

হোমের কর্ম্মচারী সংসদ

নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ হোমের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

একজন ডাক্তার—শারীরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয়বিধ চিকিৎসার দায়িত্ব তাঁর।

একজন প্রধানা নার্স—তাঁর সাহায্যকারিণীরূপে আছেন আরো দু'জন নার্স।

পাঁচ জন অধ্যক্ষা (Manageresses)—এক এক বিভাগের জন্যে এক এক জন।

পাঁচ জন কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক।

মস্তিষ্কবিকৃতির চিকিৎসার জন্য একজন মেডিক্যাল জিমনাষ্টিক্‌স বিশেষজ্ঞ।

৬৬ জন নার্স এবং শিক্ষানবীশরূপে রোগী-শুশ্রূষাকারিণী (sick-nurse) দু'জন।

এতদ্ব্যতীত আছে সমাজসংস্থা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ১-৬ জন ছাত্র এবং শিক্ষানবীশরূপে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকবৃন্দ।

শারীরিক তত্ত্বাবধান

হোমে ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসক দ্বারা সরাসরি শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয়। রোগাক্রান্ত হলে পর শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো ছাড়াও, প্রতি দু'মাস অন্তর নিয়মিতভাবে চিকিৎসক দ্বারা তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো

বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন ভবনের স্বতন্ত্রীকরণ (isolation) ওয়ার্ডগুলিতে পীড়িত শিশুদের সেবাশুশ্রূষা করা হয়, পরে তাদের স্থানান্তরিত করা হয় হাসপাতালগুলিতে।

মানসিক তত্ত্বাবধান

প্রত্যেক বিভাগের শিশুদের মানসিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মুখ্যতঃ উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষার। তাঁর কাজ হচ্ছে শিশুদের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের আরাম এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যে চেষ্টা করা। কর্ম্মীসংসদের প্রত্যেককেই শিশুকল্যাণসম্পর্কিত উপদেশাবলী মেনে চলতে হয়—এই সকল লিখিত উপদেশ প্রত্যেক নূতন কর্ম্মচারীর হাতে দেওয়া হয়।

পর্য্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা

যে সকল শিশু আর পিতামাতার নিকট ফিরে যাবে না বলে ধরে নেওয়া হয় অথবা পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যাদের এই প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করা হয়েছে, শিশুকল্যাণ পর্ষদের নিকট চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রেরণের পূর্ব্বে তাদের বিশেষভাবে পরীক্ষা এবং তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়।

শিশুরা প্রথমে থাকে প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষদের পর্য্যবেক্ষণাধীনে, তিনি শিশুর আচরণ সম্পর্কে তাঁর পর্য্য-বেক্ষণের বিবরণ প্রত্যহ এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত একটি ডায়েরিতে লিখে রাখেন। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকেরাও পরীক্ষণ আরম্ভ করার পূর্ব্বে শিশুদের সঙ্গে উত্তমরূপে পরিচিত হন। বুদ্ধি পরীক্ষণ (Intelligence Tests) প্রয়োগ করা হয় হোমে ভর্ত্তি হওয়ার অন্ততঃপক্ষে তিন সপ্তাহ পরে। চিকিৎসকদিগকে এই সকল পর্য্যবেক্ষণের কথা জানানো হয়, ফলে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক শিশুর জন্যে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যে সকল ব্যক্তি শিশুদের সংস্পর্শে ছিলেন, পর্য্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসাকালের শেষে তাঁরা এক সম্মেলনে মিলিত হন, ডাক্তার সেখানে যেসকল 'কেস' সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত বিবৃতি দেন সেগুলি প্রেরিত হয় শিশুকল্যাণ পর্ষদের নিকট।

শিশুকল্যাণ পর্ষদের "চাইল্ড কেয়ার বুরো"র প্রতি বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর শিশুরা হোম থেকে ছাড়া পায়। তাদের সরান এবং স্থানান্তরে রাখার দায়িত্ব 'চাইল্ড কেয়ার বুরো'র। বেশীর ভাগ শিশুই ফিরে যায় তাদের পিতামাতার গৃহে। কাউকে কাউকে আবার সচরাচর পিতামাতার সম্মতিক্রমে—কখনও কখনও তাঁরা অসম্মত হওয়া সত্ত্বেও, রাখা হয় পালক-পিতামাতার গৃহে অথবা এমন সব প্রতিষ্ঠানে যেখানে তাদের যথোচিত যত্ন নেওয়া হয়।

শিশুরা সাধারণতঃ ছয় সপ্তাহ হোমে অবস্থান করে, কিন্তু যে সকল শিশুর ক্ষেত্রে অধিকতর পর্য্যবেক্ষণের দরকার তাদের আরও দীর্ঘকাল—গড়পড়তা তিন মাস রাখা হয়। হোমে শিশুদের তত্ত্বাবধানের দীর্ঘতম সময় হচ্ছে এক বৎসর, কিন্তু যে সকল শিশুর ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় ত্রুটি (organic deficiencies) আছে তাদের বৎসরাধিক কালও রাখা হয়।

নাইবোদা হোমের ব্যয়নির্ব্বাহ হয়ে থাকে ষ্টকহোম শহর কর্ত্তৃক। রাজ্যসরকার প্রদত্ত অর্থ, এমনকি শিশু ভাতা-সমূহের একাংশ পর্য্যন্ত শিশুকল্যাণ পর্ষদকে দেওয়া হয়ে থাকে।

শিশুকল্যাণ আইন

শিশুকল্যাণ পর্ষদকর্ত্তৃক নিম্নলিখিত শ্রেণীর শিশু ও বালকদের বেলায় আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা স্থিরীকৃত হয়েছে।

(ক) ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্ক যে সকল শিশু ও বালক পিতামাতার দুর্ব্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার দরুন—যেমন শারীরিক তেমনি মানসিক দিক দিয়ে বিপন্ন হয়।

(খ) পিতামাতার দুষ্প্রবৃত্তি, উপেক্ষা এবং শিক্ষাদানে অসামর্থ্য নিবন্ধন, উল্লিখিত বয়সের যে সকল শিশু ও বালকের নৈতিক অধঃপতন হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান।

(গ) আঠারো বৎসরের নিম্নবয়স্ক অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ যে সকল শিশু ও বালককে সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে পুনঃ শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন।

(ঘ) ১৮-২১ বৎসর-বয়স্ক যে সকল উচ্ছৃঙ্খল অলস, যুবককে এরূপ দুর্নীতিপূর্ণ জীবনযাপন এবং গুরুতর পাপকর্ম্ম করতে দেখা যায় যার দরুন সমাজের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

তের বৎসরের নিম্নবয়স্ক যে সকল শিশু বাড়ীতে থাকে—পিতামাতার অসুস্থতা, ঔদাসীন্য অথবা শিক্ষাদানে অসামর্থ্য-নিবন্ধন যদি তাদের দুঃখদুর্গতি ভোগ করতে হয় তা হলে শিশুকল্যাণ পর্ষদকে পিতামাতার সম্মতিক্রমে ঐ সকল শিশুর দায়িত্বভার অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু এবং বালকেরা শারীরিক অথবা মানসিক ব্যাধি, অপটুতা কিংবা দুর্ব্বলতায় ভুগছে এবং সেজন্যে তাদের এমন বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন যার ব্যবস্থা বাড়ীতে হওয়া সম্ভব নয়—এবং তার প্রতিকারের অন্য কোনো উপায়ও যদি খুঁজে না পাওয়া যায়—তা হলে পিতামাতার সম্মতিক্রমে শিশুকল্যাণ পর্ষদকে ঐ সকল শিশুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্ক যে সকল শিশু পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা পিতৃমাতৃহীন হওয়ার দরুন যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, শিশুকল্যাণ পর্ষদকে সেই সকল শিশুর দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

বৃক্ষরোপণ ও পল্লীর শোভাবর্দ্ধন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমাদের মনের সঙ্গে বনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সবুজ গাছপালার দিকে চাইলেই আনন্দে আমাদের মন ভরে উঠে। পৃথিবীর স্নিগ্ধ শ্যামলিমার মধ্যে এমন কিছু আছে যার সংস্পর্শে এলে মনে হয় নিজের চিরদিনের আবাসটিতে যেন ফিরে এলাম। তাই ত দেখতে পাই ফল ফুলের গাছ লাগানোর দিকে মানুষের এত ঝোঁক।

সে দিন কলিকাতার উত্তরে একটা খালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম মাঝে মাঝে বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট ফুলের বাগান। শাকসব্জীও আছে। মনে হ'ল সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের আত্মার অনুরাগ কি নিবিড় এবং অকৃত্রিম। একটু ফাঁকা জায়গা পেয়েছে কি মানুষ অমনি সেখানে গাছপালা লাগাতে আরম্ভ করেছে। শহরের পাষাণ-মরুতে একটানা থাকতে থাকতে তার মন যখন ক্লান্তিতে ভরে ওঠে ঐ সবুজ গাছপালাই ত তাকে নিমেষে আনন্দলোকে পৌঁছে দেয়। রংবেরঙের ফুলগুলির দিকে চেয়ে তার মনে হয় সে যেন তার নিজের ঘরটিতে ফিরে এল যেখানে তার ক্লান্তির অবসান, চিত্তের বিশ্রাম, আত্মার আরাম।

সুন্দরের মধ্যে আমাদের আত্মার একটি সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ আছে। সৌন্দর্য্যের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে আমাদের মনে আনন্দ থাকে না। মনে যদি আনন্দ না থাকে ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতা আমাদের চিত্তকে বিষিয়ে তোলে। এ যুগের একজন বড় মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'অবসর এবং প্রেম, সূর্য্যের আলো এবং সবুজ প্রান্তর—এরা আমাদিগকে সহজ আনন্দ পরিবেশন করে। যারা বহুলপরিমাণে এই সরল, সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে তাদের কাছ থেকে দৃষ্টির উদারতা এবং হৃদয়ের মহানুভবতা আশা করা দুরাশা।'

আমরা মনে করি মনীষী রাসেল যা বলেছেন তার মধ্যে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক আছে। আমরা আমাদের এই সভ্যতাকে ক্রমশঃই শহরমুখী করে ফেলছি। নর-নারী নিরবচ্ছিন্ন ধারায় গ্রাম থেকে চলে আসছে শহরে; বঞ্চিত হচ্ছে সবুজ মাঠের সৌন্দর্য্য থেকে, মাটির গন্ধ থেকে, সূর্য্যের আলো, তারার হাসি এবং বনের মর্ম্মরধ্বনি থেকে। সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের এই শোচনীয় বিচ্ছেদ শরীর এবং আত্মা—কারও পক্ষেই শুভ নয়। আনন্দের জন্যেই ত আমরা তৈরী হয়েছি আর আমাদিগকে আনন্দ দেবার জন্যেই ত ঘাস এমন সবুজ এবং আকাশ এমন নীল, বাতাস এমন মধুময় এবং পৃথিবী এত সুন্দরী। সহজলভ্য আনন্দের উৎসগুলি ছড়ানো রয়েছে উপরে এবং নীচে, দক্ষিণে এবং বামে—সর্ব্বত্র। যতই আমরা এই সভ্যতাকে শহরমুখী করে তুলছি ততই সহজ আনন্দের উৎসগুলি থেকে আমাদের জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। নিজের জীবনে যদি আনন্দ না থাকে অন্যের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করাই ত স্বাভাবিক।

হাজার হাজার মানুষের মন আজ পরশ্রীকাতরতায় সঙ্কুচিত হয়ে আছে। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর মনে কোন প্রীতির ভাব নেই। এই প্রীতির অভাব থেকে সমাজে নানারকমের জটিল সমস্যা দেখা দিচ্ছে। জোড়াতালির পথে এই সব সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য নয়। আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে। আনন্দের সহজ উৎসগুলির সঙ্গে যে যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে সেই ছিন্ন যোগ-সূত্রকে আবার গেঁথে তোলা দরকার। আমাদের এই সভ্যতাকে তাই গড়ে তুলতে হবে এমন একটা নূতনতর আবেষ্টনীর মধ্যে যেখানে সবুজ গাছপালায় পৃথিবী সুন্দরী, স্নিগ্ধ নীলিমায় আকাশ মনোরম।

বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে, বোধ হয়, একমাত্র গান্ধীই প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন আমাদের এই সভ্যতার শহরমুখী গতিকে গ্রামের দিকে ফেরাবার জন্যে। মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন:

'ভারতের গ্রামগুলি ভারতের মতই প্রাচীন; তার শহরগুলি তৈরী হয়েছে বৈদেশিক শাসনের আওতায়। গ্রামীণ ভারতবর্ষ আর শহুরে ভারতবর্ষ—এ দুটোর একটাকে আমাদের বেছে নিতে হবে।'

আমরা জানি গান্ধীজী গ্রামীণ ভারতবর্ষকেই বেছে নিয়েছিলেন। সেবাগ্রামের একটি পর্ণকুটীরে তিনি পেতেছিলেন তাঁর তপস্যার আসন। বেঁচে থাকতে কতবার আমাদিগকে তিনি শুনিয়েছেন—বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান ঘটলে শহরগুলির কাজ হবে গ্রামগুলিকে শোষণ না করে তাদের পরিচর্য্যা করা।

দীর্ঘকালের উপেক্ষায় এবং অনাদরে আমাদের বেশীর ভাগ পল্লীই আজ মনুষ্যবাসের প্রায় অযোগ্য হয়ে আছে। রাস্তাঘাট নোংরা; লোকে যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে; ঘর-বাড়ীর মধ্যে কোন শ্রী নেই। পল্লী ছেড়ে শহরে যে আশ্রয় নিয়েছে সে, তাই সহজে গ্রামের দিকে আর পা বাড়াতে চায় না।

কিন্তু গ্রামীণ ভারতবর্ষকে উপেক্ষা করে দেশকে ত আমরা কল্যাণের স্বর্গে কোন দিনই পৌঁছে দিতে পারব না। গ্রাম ভারতের চিরদিনই প্রাণ-কেন্দ্র ছিল, চিরদিনই সে ভারতের প্রাণ-কেন্দ্র হয়েই থাকবে। আমরা শতকরা পঁচাশী জন নরনারী গ্রামেই তো বাস করি। গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের কল্যাণ কোথায়?

আর একথা ঠিক যে ভারতবর্ষের গ্রামকে লোভনীয় লোকালয়ে রূপান্তরিত করা মোটেই অসাধ্য নয়। গ্রামের [illegible]

শিক্ষিত সম্প্রদায় শহরের দিকে পা বাড়িয়েছে, পল্লীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি। এরই ফলে পল্লীর অধিবাসীরা হারিয়ে ফেলেছে বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রাণোদ্যম, নেমে গেছে প্রায় জড়ের পর্য্যায়ে। জাতির জনক গান্ধীজী যেমন ক'রে শহর এবং গ্রাম—এ দুইয়ের মধ্যে গ্রামকেই বেছে নিয়েছিলেন আমাদের লেখাপড়া-শেখা সম্প্রদায় তেমনি করে গ্রামে গিয়ে যদি বসবাস আরম্ভ করে পল্লীর চেহারা নিশ্চয়ই বদলাতে আরম্ভ করবে। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতায় যা এখন অসুন্দর হয়ে আছে তা সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে। অজ্ঞতার দিগন্তপ্রসারী অন্ধকার দূর হয়ে যাবে জ্ঞানের শুভ্র আলোয়। দলাদলি চলে গিয়ে আসবে প্রীতি এবং সহযোগিতা। যা এখন মনুষ্যবাসের প্রায় অযোগ্য হয়ে আছে তার মধ্যে ফিরে আসবে শ্রী, সম্পদ, আনন্দ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। একথা সত্য যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নরনারীর প্রেরণা ব্যতিরেকে সমাজ-জীবন জড়তায় পঙ্গু হয়ে থাকে। কাঠের স্তূপ যত শুকনোই হোক, মশালের আগুনের সংস্পর্শে না এলে কখনোই জ্বলে উঠবে না। এই জন্যেই শিক্ষার আলো পেয়েছেন যাঁরা তাঁদের গ্রামে ফিরে আসার এত প্রয়োজন! জীবনের আলোর স্পর্শে জীবনের প্রদীপ-গুলি জ্বলে উঠবে। প্রাণ প্রাণকে জাগাবে।

তবে গ্রামকে বেছে নেবেন যাঁরা তাঁদের জীবন আরামের হবে—এমন আশা পোষণ না করাই ভাল। তাঁদের অনেকরকমের বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে। প্রবলতম বিঘ্ন হয়ে দেখা দেবে গ্রামবাসীদের নিজেদেরই মারাত্মক ঔদাসীন্য। যে পথে তাদের উন্নতির আশা আছে সে পথে কিছুতেই তারা পা বাড়াতে চায় না। রবীন্দ্রনাথ যাদের 'প্রবীণ' এবং 'পরম পাকা' বলেছেন, শরৎ চাটুজ্যের 'পল্লী সমাজ', 'পণ্ডিতমশাই' প্রভৃতি উপন্যাসে যে সব গোঁড়া গ্রামপ্রধানের ছবি দেখতে পাওয়া যায় তাদের আঘাত তো আছেই। কিন্তু দুঃখ-আঘাতকে এড়িয়ে গিয়ে কে কবে মহাসম্পদ লাভ করেছে? কত শহীদের জীবনবলির প্রয়োজন হ'ল স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করবার জন্যে। যদি বলি, জীবন্মৃত গ্রাম-গুলিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে তো সরকারই আছে, তার জন্যে আমাদের ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই, তবে প্রকৃতির একটা বড় নিয়মকে আমরা অস্বীকার করবো। সে নিয়ম হ'ল: জীবন আসে মৃত্যু থেকে। গমের দানা মাটির নীচে মরে গেলে তবেই সেই মৃত-বীজ মাঠে অনেক ফসল ফলাতে পারে। যদি দানা না মরতে চায়—সে একলাই থেকে যাবে। এতদিন গ্রামবাসীরা অনিচ্ছায় শহরের জন্যে মরেছে। এখন গ্রামবাসীদের জন্যে স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করবার আহ্বান এসেছে শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে। যুগের এই আহ্বানে সাহসের সঙ্গে সাড়া দিতে না পারলে গ্রামে প্রাণের বন্যা আসবে না।

এখন যে পল্লীগুলি শিক্ষিতসমাজের মনকে টানতে পারছে না—তার একটা প্রধান কারণ: পল্লীতে এখন সুষমা বলে কিছু নেই; সব শ্রীহীন, এলোমেলো, বিপর্য্যস্ত। এরও কারণ, পল্লী-বাসীদের মনের মধ্যে কল্যাণময় জীবনের কোন লোভনীয় ছবি নেই। এই ছবি তাদের মানসপটে এঁকে দেবার জন্য প্রয়োজন তাদের যাদের মনে আছে সৌন্দর্য্যবোধ। তারা গ্রামে এসে বসলে তাদের পরিবেশ আপনা থেকে লোভনীয় হয়ে উঠবে। সৌন্দর্য্যকে যারা ভালোবেসেছে তারা ত নোংরা পরিবেশের মধ্যে কখনও খুশী মনে বসবাস করতে পারবে না। আগাছা নিঃশেষ করে তারা ফল ফুলের গাছ লাগাবে; চারিদিকের চেহারা তারা বদলে দেবে। তাদের দেখাদেখি গ্রামবাসীরাও ফল-ফুলের গাছ লাগাতে শিখবে। গ্রামের চেহারায় যত পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকবে শহরের লোক ততই গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

গ্রামের চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটানোর ব্যাপারে বৃক্ষরোপণের একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা আছে। গাছপালা আমাদিগকে কেবল যে জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র তৈরীর উপাদান, ফল-ফুল এবং সুশীতল ছায়া জুগিয়ে তাদের কাজ শেষ করে, তা নয়। গাছ-পালায় বৃষ্টি আনে, ভূমিক্ষয় নিবারণ করে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় দান, তারা পৃথিবীর চেহারায় রূপান্তর আনে। পল্লীর শোভা-বর্দ্ধন করতে গাছপালার জুড়ি নেই। তাদের মধ্যে আমাদের নয়নের ও মনের গভীর আনন্দ।

বৃক্ষরোপণকে আমাদের দেশের হাজার হাজার নরনারী এখনও পুণ্য কাজের মধ্যে গণনা করে থাকে। এখনও দেখা যায় এ দেশের লাখো লাখো নারী ও পুরুষ স্নানান্তে ভক্তিভরে বনস্পতির মূলে জল ঢেলে দিচ্ছে। গাছের সঙ্গে এদেশের প্রাণের যোগ অনেকদিনের। সে জন্যে ভারতের নরনারীকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। দরকার শিক্ষিত সমাজের প্রেরণার। গ্রামে এসে তারা নেতৃত্ব গ্রহণ করলে বৃক্ষরোপণের কাজ দ্রুত আগিয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে পল্লীও সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে। বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান পল্লীর শোভাবর্দ্ধনে আগে থেকেই সহায়তা করছে।*

---

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে





ডাল্‌ডা আমার পক্ষে ভালো

সকলের পক্ষেই ভালো কারণ ইহা বিশুদ্ধ।

ডাল্‌ডা তৈরী করবার সময় হাত দিয়ে ছোঁয়া হয়না আর বিশুদ্ধ ও তাজা রাখবার জন্যে বায়ুরোধক শীলকরা টিনে প্যাক করা থাকে।

সকলের পক্ষেই ভালো কারণ ইহা পুষ্টিকর।

ডাল্‌ডা তৈরী ক'রতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার করা হয়—আর তাতে স্বাস্থ্যদায়ী 'এ' ও 'ডি' ভিটামিনও আছে।

সর্ব্বত্রই বুদ্ধিমতী মা'য়েরা ডাল্‌ডা বনস্পতি দিয়ে রান্না করেন, কারণ ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধি ও শক্তির জন্য যে তাজা ও পুষ্টিকর স্নেহপদার্থের দরকার হয় ডাল্‌ডাতে তা পাওয়া যায়। রান্নার যে কোনও সমস্যায় **বিনামূল্যে** উপদেশের জন্য লিখে দিন—দি ডাল্‌ডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস, ইণ্ডিয়া হাউস (জি, পি, ও'র সামনে) বোম্বাই ১।



১/২, ১, ২, ৫ ও ১০ পাউণ্ড টিনে ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ডাল্‌ডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো—

খরচ কম



HVM. 225-X52 BG

পুস্তক পরিচয়

ভারত প্রেমকথা—শ্রীসুবোধ ঘোষ। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ছয় টাকা।

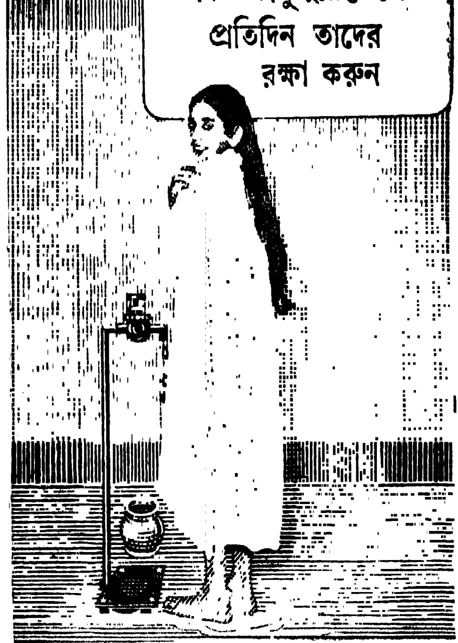
গতানুগতিকতার পথ হইতে মুক্ত নূতন কিছুর সাক্ষাৎলাভ করিলে মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আধুনিকতা যখন অত্যন্ত পুরানো হইয়া আসিয়াছে তখন পুরাণ এবং মহাভারতের মধ্য হইতে রত্ন আহরণ করিয়া বাঙালী পাঠকের নিকট বিতরণ করিয়া গ্রন্থকার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। নূতনভাবে কথিত মহাভারতের বিশটি উপাখ্যানে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা, রুরু ও প্রমদ্বরা, অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা, অতিরথ ও পিঙ্গলা, মন্দপাল ও লপিতা, উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী, সংবরণ ও তপতী, ভাস্কর ও পৃথা, অগ্নি ও স্বাহা, বসুরাজ ও গিরিকা, গালব ও মাধবী, রুরু ও প্রমদ্বরা, অনল ও ভাস্বতী, ভৃগু ও পুলোমা, চ্যবন ও সুকন্যা, জরৎকারু ও অস্তিকা, জনক ও সুলভা, দেবশর্মা ও রুচি, অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, ইন্দু ও শ্রুবাবতী—এই বিশটি গল্পই প্রেমোপাখ্যান। প্রেম চিরন্তন। পৌরাণিক এবং আধুনিক কালে প্রভেদ নাই। বিশটি মহাভারতীয় গল্পে প্রেমের বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য্য নব নব রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ হইতে উপকরণ লইয়া লেখা নূতন নয়। ভাস কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, বিদ্যাসাগর এবং সেদিনের যাত্রা ও রঙ্গালয়ের নাট্যকার পর্য্যন্ত এইরূপ উপকরণ ব্যবহার করিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ কাব্য ও নাটক আমরা যুগে যুগে পাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতীয় উপাখ্যান এতদিন ছোট গল্পে রূপায়িত হয় নাই। শ্রীসুবোধ ঘোষ খ্যাতনামা ছোটগল্পলেখক। ছোটগল্পের আঙ্গিক-প্রয়োগে উপাখ্যানগুলি নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। কোথাও অলৌকিকত্বের প্রয়োজন হয় নাই। মূলে যেথায় কিছু অলৌকিক আছে লেখক সুকৌশলে তাহা পরিহার করিয়া গল্পকে লৌকিক রূপ প্রদান করিয়াছেন।

মহাভারতীয় উপাখ্যান হইলেও গল্পগুলিকে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মনে করিলে ভুল করা হইবে। মূলের কাহিনীকে ব্যাহত না করিয়া আধুনিক মন এবং আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া গল্পের যে পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে তাহাতেই রসসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তনসহ বলিয়া পৌরাণিক কাহিনী চিরদিনের বস্তু, তাহা শুধু প্রাচীন কালের নয়, প্রাচীন সমাজেরও নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের কিছু পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন সে-সাহিত্যে প্রেম দেহহীন নয়। পৌরাণিক প্রেমের ত কথাই নাই। সে প্রেম তাই এমন আবেগশীল। উদ্বেলিত সাগরের ন্যায় তাহা সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই পৌরাণিক সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, যুগোপযোগী হইয়াও গল্পগুলি প্রাচীনের ছদ্মবেশে একান্ত আধুনিক হইতে পারে নাই। বিষয়বস্তুর অনুযায়ী রচনারীতি হৃদয়গ্রাহী। লেখক যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ ভাষারই প্রয়োজন। এই ভাষার মধ্যে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য দুই-ই আছে। মহাভারতের এই গল্পগুলি প্রেমের বেদনা দিয়া রচিত। ভাস্কর ও পৃথা, অগ্নি ও স্বাহা গল্পের কারুণ্য মনকে ব্যথিত করে। সকল উপাখ্যানই মনের উপর রেখাপাত করে বলিয়া বিশেষ কোন গল্পের নাম করিবার প্রয়োজন নাই। প্রেমের বিচিত্র লীলা প্রকাশে "ভারত প্রেমকথা" সার্থকতালাভ করিয়াছে।







লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে



ভারতে প্রস্তুত

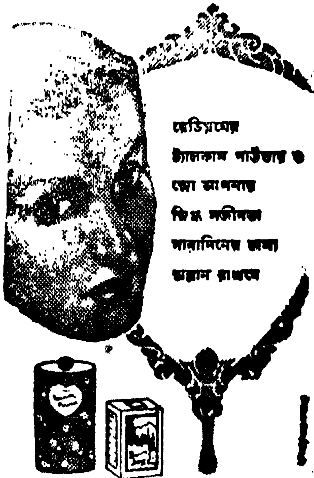
L. 258-X52 BG

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্ব-নির্ব্বাচিত গল্প —ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য চার টাকা।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যে কেবল কথা-সাহিত্যিক হিসাবেই খ্যাতনামা তাহা নয়, গল্প হোক্, উপন্যাস হোক্, রম্যরচনা হোক্, তাঁহার লেখার মধ্যে একটি স্বকীয় রীতি এবং বৈশিষ্ট্য আছে। এই লেখার গুণে তাঁহার রচনাই শুধু উপভোগ্য হয় না, রচয়িতা বিভূতিভূষণও আমাদের আপন জন হইয়া উঠেন। কঠিন বিচারক এবং নিরাসক্ত দর্শক হিসাবে তিনি নিজেকে দূরে রাখেন না, শিশু এবং বয়স্ক সকল চরিত্রের সঙ্গেই তাঁহার মনের সহানুভূতি মিশাইয়া থাকে। স্নিগ্ধহাস্যমণ্ডিত তাঁহার গল্পগুলি তাই আমাদের এত উপভোগ্য হয়। সাগরতল হয়ত অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর প্রাণী-সঙ্কুল। ইহাই কিন্তু সব নয়, বৈচিত্র্যেও সে অপরূপ। মনের অতলে ডুব দিলে যাঁহারা শুধু অন্ধকার ও বিভীষিকারই সাক্ষাৎ পান বিভূতিভূষণ সে দলের নন, তিনি সেখানকার স্নিগ্ধালোকিত সৌন্দর্য্য-সুষমার সহিত আমাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেন।

তাঁহার "স্ব-নির্বাচিত গল্প" উনিশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। রূপরঙ্গিনী, নারায়ণী সেনা, ঘটকিনী, শূন্য পুরাণ, ভাঁটু মোক্তারের নাতি, শ্বশুর-মন্দিরম্, ডফার ভয়ে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, আলট্রা, ওরা ও আমরা, গ্রাম-সংস্কার, ফীট-অফ-প্রিসেপ্টার, গড়ের বাড়ি, ভূত-তত্ত্ব, গোবিন্দ-মাসী, জালিয়াত, নোংরা, দন্তকাব্য, রেলে—বইখানিতে এই কয়টি গল্প আছে। অধিকাংশ লেখক তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনা হইতেই গল্প-নির্ব্বাচন করেন, বিভূতিভূষণ সে পথে যান নাই। এই গ্রন্থের অর্দ্ধেক গল্প নূতন, অর্দ্ধেক পুরাতন। পাঠক যেমন পরিচিত রচনা পাইয়া নূতন করিয়া তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিবেন, নূতন গল্পগুলিও তেমনি তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবে। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পই 'হিউমার'-ধর্ম্মী। শুধু রঙ্গে এবং রসে নয়, ব্যঙ্গেও তিনি দক্ষ, কিন্তু তাঁহার রসিকতা কোথাও নিষ্ঠুর নয়। চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি নিপুণ। 'হিউমারে'র খাতিরে তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ ব্যাহত হয় না। শুধু হাস্য-পরিহাসের সন্ধানেই হয়ত কেহ কেহ বিভূতিভূষণের রচনা পাঠ করেন। এই রসের অল্পতা অথবা আধিক্যই তাঁহার গল্প পরখ করিবার নিরিখ নয়। চরিত্রসৃষ্টির অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদার উপর তাঁহার ছোট গল্প সুপ্রতিষ্ঠিত। এই স্নিগ্ধ-মধুর স্ব-নির্বাচিত গল্পগুলি সকল শ্রেণীর পাঠকের চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করিবে

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা



বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম-এ, কর্তৃক সম্পাদিত ও সঙ্কলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য দশ টাকা।

বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক এক একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবি বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছেন। গায়ক-সম্প্রদায় নিজের রুচি ও সুযোগমত একাধিক কাব্যের অংশ সংকলন করিয়া পাঁচালি গান করিতেন। ফলে গায়েনদের লেখা পুথিতে এক এক অঞ্চলের বিভিন্ন কবির রচনার নমুনা পাওয়া যায়। তবে কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে সংকলিত না হওয়ায় তাহাদের মধ্যে কোন মঙ্গলকাব্যেরই সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। কোন কাব্য সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কবিদের রচনাসংকলনও বাংলা-সাহিত্যে দুর্লভ। খুবই আনন্দের কথা, এই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট হইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রচেষ্টার প্রথম নিদর্শন মনসামঙ্গলকাব্যের সংকলন-গ্রন্থ, আলোচ্য 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা'। ইহাতে হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, জীবন মৈত্র, বিষ্ণুপাল, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ষষ্ঠীবর—এই নয় জন কবির কাব্যাংশ গ্রথিত করিয়া মনসামঙ্গল কাব্যের একটি ব্যাপক চিত্র উপস্থাপিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যের অগণিত কবিদের মধ্যে ইহারাই অধিকতর প্রসিদ্ধ হইলেও ইহাদের সকলের কাব্য এখন পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুথি আলোচনা করিয়া বিভিন্ন অংশের পাঠ নিরূপিত হইয়াছে।

"কী মদির নতুন সুগন্ধ!"

মঞ্জু দে বলেন

"লাক্স টয়লেটের নতুন সুগন্ধ কতো তাজা ও ফুলের মতো আর ঘন্টার পর ঘন্টা এর রেশ চলে…"

কেবল চিত্র-তারকারাই নন সারা ভারতের সুন্দরী রমনীরা জানেন যে এই বিশুদ্ধ সাদা সাবানের সুগন্ধি সরের মতো ফেনা ত্বককে অতি সুন্দর মোলায়েম ও পরিস্কার রাখে।

বড় আকারেও পাওয়া যায়



ভারতে প্রস্তুত

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 450-X52 BG

কোন্ অংশ কোন্ পুথি বা কোন্ মুদ্রিত সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা উল্লিখিত না হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক একটু ক্ষুণ্ণ হইবেন। গ্রন্থের প্রথমে বিস্তৃত ভূমিকায় মনসাপূজার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে এবং গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত কবির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের ও তাঁহাদের কাব্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বহু অপ্রচলিত শব্দের অর্থনির্দেশ ও ভাষাতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা এবং গ্রন্থবাণত অনেক আচার অনুষ্ঠানের পরিচয় ও অন্যান্য স্থানের অনুরূপ আচার অনুষ্ঠানের সহিত উহাদের তুলনা গ্রন্থশেষে টীকায় স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ সম্পর্কে এই জাতীয় টীকা বিশেষ মূল্যবান্। এইরূপ আলোচনার অভাবে প্রাচীন সাহিত্যের অনেক অংশ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য দেবতার মঙ্গলকাব্যেরও এইরূপ সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কমিউনিজম ও কৃষক—শ্রীরামস্বরূপ প্রণীত ইংরেজী হইতে অমলেন্দু দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। প্রাচী প্রকাশন, ১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা-১। মূল্য [illegible], পৃষ্ঠা ২৪২।

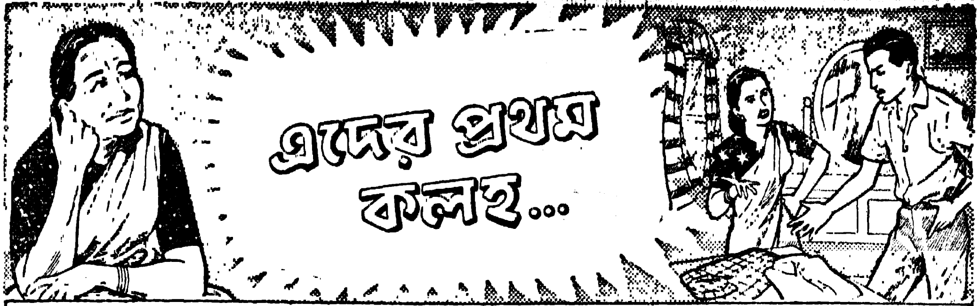
পুস্তকখানি চারি খণ্ডে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে মতবাদ. দ্বিতীয় খণ্ডে সোভিয়েট [illegible], তৃতীয় খণ্ডে সোভিয়েট আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি এবং চতুর্থ খণ্ডে ভারতের কৃষি-উন্নয়নের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রত্যেক অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়ের পরিসমাপ্তির পরে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে—ইহাতে পাঠক উপকৃত হইবেন। আবশ্যক বোধ করিলে পুস্তকের উদ্ধৃত অংশ মূল পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখা যাইবে। পুস্তকখানির প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে এই যে, বহু প্রচার সত্ত্বেও সোভিয়েটের কৃষি-উন্নতি দ্বারা কৃষকগণ উপকৃত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয় নাই বরং ইহার বিপরীতটাই প্রমাণিত হইয়াছে। "অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কৃষকেরা দাস হয়ে পড়েছে", "যৌথ খামার প্রবর্ত্তনের ফলে জমির (একর-প্রতি) উৎপাদন বাড়েনি, বেশীর ভাগ চাষীর ভাগেই সমৃদ্ধি আসেনি বা গ্রাম বা শহরে জীবনের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি।" "প্রকৃতপক্ষে দ্রুত শিল্পায়নের সুবিধার জন্যই রাশিয়ার যৌথ খামারের প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল। চাষীরা বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তাদের শোষণ করা অসুবিধা।" এই সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতে লেখকের মত সুস্পষ্ট। ট্রাক্টার সম্বন্ধে লেখক বলেন, "ট্রাক্টার প্রবর্ত্তনে রাশিয়ার কৃষি-ব্যয় বেড়েছে, জমিগুলি নষ্ট হয়েছে।"

মূলতঃ কম্যুনিজম-বিরোধী প্রচার-পুস্তক হইলেও ইহাতে এরূপ বিষয়সমূহ আছে যাহা পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক উপকৃত হইবেন। অনুবাদের ভাষা সরল ও সহজবোধ্য।

কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীদেবকুমার বসু কর্তৃক ৭-এ, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০, মূল্য ১৲ টাকা।

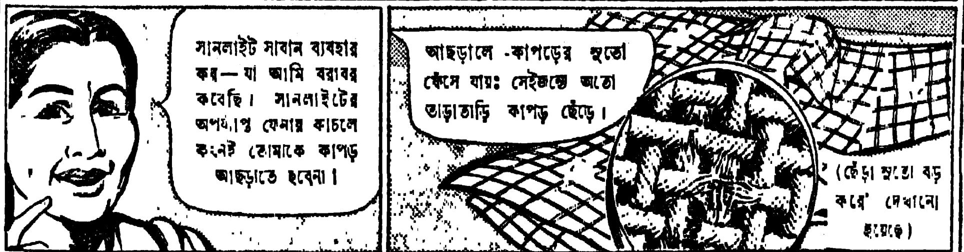
লেখকের পূর্ব্ব-প্রকাশিত "টাকাকড়ি" পাঠক-সমাজে আদৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি যে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে গৃহস্থ এবং ব্যবসায়ী বাঙালী উভয়েই আগ্রহশীল। বিশেষতঃ বহু বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পর ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালীর আগ্রহ ও আতঙ্ক দুই-ই বাড়িয়াছে। বাঙালী আজ স্বজাতীয় ব্যাঙ্ক দেখিলেই ভয় পায় এবং নির্ভয়ে অবাঙালী ও ইউরোপীয় ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। এই অবিশ্বাস দূর করিতে হইলে বাঙালীকে আজ ব্যাঙ্ক বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে। বর্ত্তমান পুস্তক ব্যাঙ্ক নির্ব্বাচন বিষয়ে কিছু সহায়ক হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক নিজে একজন ব্যাঙ্ক-কর্ম্মী এজন্য তাঁহার ইঙ্গিতগুলি মূল্যবান।

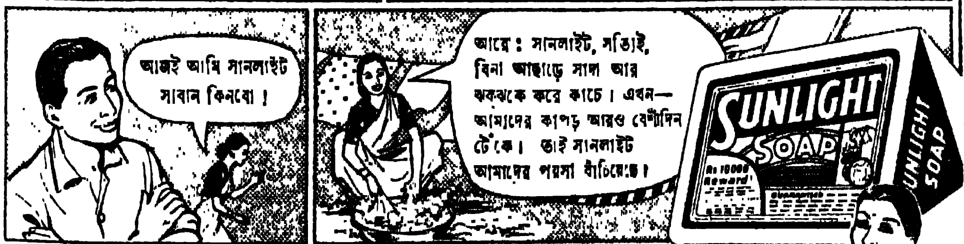
মহাপ্রাণ স্যার ডেনিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য। স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটন এষ্টেট, গোসাবা, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০। মূল্য আট আনা।


এদের প্রথম কলহ…


এরা নব-বিবাহিত, কিন্তু…
দেখো মা, এই ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আমায় ঘুরতে হয়, আর…
আমি ওঁর জন্যে যথাসাধ্য করি, তবুও…
ঝগড়া কোরো না। আমি বুঝেছি গলদ কোথায়।


লক্ষ্মী, তোমার কাপড় কাচার ধরণেই রয়েছে গলদ
কিন্তু, কাপড় কাচতে খাটুনি তো আমি কম করি না।
কিন্তু কাপড় তুমি আছড়ে কাচো যে!
এ ছাড়া পরিষ্কার করে কাচার উপায়ই বা কী?


সানলাইট সাবান ব্যবহার কর — যা আমি বরাবর করেছি। সানলাইটের অপর্যাপ্ত ফেনায় কাচলে কখনই তোমাকে কাপড় আছড়াতে হবেনা।
আছড়ালে -কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায়: সেইজন্তে অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে' দেখানো হয়েছে)


আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো!
আরে: সানলাইট, সত্যিই, বিনা আছাড়ে সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন— আমাদের কাপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমাদের পয়সা বাঁচিয়েছে।


SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
S. 135-X52 BG

কলিকাতার বিখ্যাত ম্যাকিনন মেকেঞ্জি কোম্পানীর বড় অংশীদার স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটন ইংরেজ আমলের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু কোটিপতি হইয়াও ভারতের দরিদ্র কৃষক এবং মধ্য ও স্বল্প-বিত্ত শ্রেণীর জন্য তাঁহার দরদ ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র সমবায়ের সাহায্যেই এই শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তিনি সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে সমবায়ের ভিত্তিতে দেশ ও সমাজের যে কল্যাণকর্মের পত্তন করিয়া গিয়াছেন এত দিনে তাহার সুফল ফলিতেছে। গোসাবা আজ ভারতের অন্যতম আদর্শ সমবায়কেন্দ্র। মানুষ হিসাবেও হ্যামিলটন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আদর্শস্থানীয় ছিলেন। গোসাবায় হ্যামিলটনের আদর্শ কি ভাবে রূপায়িত হইয়াছে লেখক এই পুস্তকে তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ক্রমোন্নতি পরিসংখ্যান সাহায্যে বর্ণনা করিলে উহা দ্বারা আরও উপকার হইত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বেহাগ—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। রূপায়ণী, ১৩।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাস ও ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে পাঠক-মহলে লেখক পরিচিতি-লাভ করিয়াছেন। সমালোচ্য উপন্যাসখানি নূতন ধরনের আঙ্গিকে লেখা এবং ইহাতে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন

"বেহাগ" একখানি ক্রাইম নভেল বা অপরাধমূলক উপন্যাস এবং ইহা চলচ্চিত্রের উপযোগী। ঘটনাটি মোটামুটি এই: নায়ক কমলেশের সঙ্গে নায়িকা মমতার প্রথম সাক্ষাৎ হইল সমুদ্রতীরে—কমলেশের অপূর্ব্ব সঙ্গীত তাহাকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিল। কমলেশ বহুমুখীপ্রতিভার অধিকারী—সে একাধারে চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যসাধক। কিন্তু অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার প্রতি তার কোন মোহ নাই তাই বন্ধনের মধ্যে সে ধরা দিল না। নিজের হাতে আঁকা মমতার অর্দ্ধসমাপ্ত প্রতিকৃতিখানি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইল কমলেশ। তাহার অন্তর্দ্ধানের অনতিকাল পরে মমতার বিবাহ হইল বিকাশ চৌধুরী নামে চা-বাগানের এক মালিকের সঙ্গে।

বিবাহের পর পাহাড়িয়া অঞ্চলে নির্জ্জন পরিবেশে মমতা অতীতকে ভুলিয়া গিয়া নিজেকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘটিল বিপর্য্যয়—পার্ব্বত্য পথে স্বামীর সঙ্গে মোটরে যাইতে যাইতে মমতার কানে ভাসিয়া আসিল অসময়ে বেহাগ সুরের গান। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তার বুকের মধ্যে ঝড় উঠিল। কাছে গিয়া দেখিল গায়ক আর কেহ নয় স্বয়ং কমলেশ—আর তাহার পাশে বসিয়া একটি পাহাড়ী মেয়ে, নাম আপাং—কমলেশের নবলব্ধ প্রণয়িনী। মমতার অন্তরে ঈর্ষ্যার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং 'অসভ্য বর্ব্বর মেয়েটার কবল' হইতে কমলেশকে উদ্ধার করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। শেষ পর্য্যন্ত এক প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহূর্ত্তে পিস্তলের গুলিতে মমতা কমলেশকে হত্যা করিয়া বসিল।

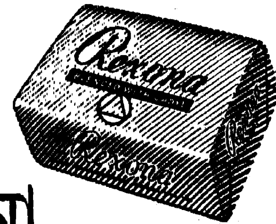
আরও মসৃণ, কমনীয় ত্বক্
দিনে দিনে...



ক্যাডিল্*যুক্ত রেক্সোনা'কে
আপনার অবগুণ্ঠিত রূপকে
উন্মোচন করতে দিন

রেক্সোনা'র ক্যাডিল্-সমৃদ্ধ ফেনা আপনার ত্বকে মোলায়েমভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, আপনার ত্বক্ দিনে দিনে মসৃণতর আর কোমল হয়ে' এক নতুন উজ্জ্বলতর কমনীয়তায় ভরে তুলেছে।

বড় সাইজেও
পাওয়া যায়



রেক্সোনা
ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান

* ত্বক্ পোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈল সমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।

R.P. 130-X52 BG.

রেক্সোনা প্রোপাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

রোমাঞ্চকর কাহিনী-বর্ণনা লেখক নিপুণভাবেই করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই ইহার একমাত্র আকর্ষণ নয়। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের, বিশেষতঃ মমতা, কমলেশ এবং বিকাশ এই তিন জনের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের বিশ্লেষণে লেখক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। কমলেশের চরিত্রটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে উচ্ছৃঙ্খল এবং সমাজবিধি-বহির্ভূত আচরণে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়। উপন্যাসের উপসংহারে করুণরসটি এমন নিবিড়ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করে। মৃত্যুতে কমলেশের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হইল, কিন্তু প্রকৃত ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইল বিকাশ আর মমতার জীবনে—তাহাদের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিল মৃত কমলেশ। বিচারে মমতা খালাস পাইল। বিকাশ ভাবিয়াছিল তাহারা উভয়ে মিলিয়া আবার রচনা করিবে সুখনীড়, কিন্তু তাহাদের জীবনে নামিয়া আসিল বিধাতার রুদ্র অভিশাপ। যোগেশ রায় যখন মমতাকে বলিলেন, "ঘরে চল মা।" তখন মমতার মুখ হইতে নিঃসৃত "ঘর" শব্দটি যেন আর্তনাদের মত শোনায় এবং তাহার ব্যর্থ জীবনের সকল বেদনা যেন ঐ একটি শব্দের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। লেখক মমতার জীবনের পরিণতির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা মৃত্যুর চেয়ে করুণ। এই ট্র্যাজেডির বেদনা পাঠকের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

চার দৃশ্য—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী এ্যাভিনু, কলিকাতা-২৯। মূল্য আড়াই টাকা।

'মা, বোন, ভাই', দুই মা, ভবিষ্যতের বাক্স ও চার দৃশ্য এই চারটি গল্প এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'মা, বোন, ভাই' ও 'দুই মা' বড় গল্প। চরিত্র-চিত্রণে ঘটনা-সংঘাতে গল্প দু'টি অপূর্ব হয়ে উঠেছে। বাকি দুটি ছোট গল্প। 'ভবিষ্যতের বাক্স' শুধু জমাট গল্পই নয়, আঙ্গিকের দিক থেকে রীতিমত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও 'চার দৃশ্য' কিন্তু গল্প হিসেবে জমাট বাঁধেনি, বাঁধুনি শেষ পর্যন্ত ঢিলেই থেকে গেছে। 'দুই মা' গল্পটি লেখকের সার্থকসৃষ্টি—এ ধরণের গল্প বাংলা সাহিত্যে বাস্তবিকই বিরল।

ভাঙ্গা বন্দর—শ্রীভবেশ দত্ত। দেবদত্ত এণ্ড কোং, ৪।৬৮ চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলিকাতা-৩২। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাসের ব্যাপকতর পটভূমিকা না থাকায় বইখানিকে একটি সার্থক বড় গল্প বলা চলে। ছোট রেল ষ্টেশনের কয়েকটি গণ্ডীবদ্ধ জীবনকে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়ে চলেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তুচ্ছতা-কলহ পাঠকের মনকে রীতিমত নাড়া দেয়। লেখক ছোট রেল ষ্টেশনের কয়েকটি বাসিন্দার স্বল্পপরিসর জীবন-যাত্রার ছবি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। রবিশঙ্করবাবু, অবিনাশবাবু, সুনন্দা দেবী, মনোরমা দেবী, চঞ্চল প্রভৃতি চরিত্র-চিত্রণ এত স্বাভাবিক হয়েছে যে, মনে হয় এরা সকলেই আমাদের অতিপরিচিত। অবিনাশবাবুর মেয়ে কুন্তলার বঞ্চিত হৃদয়ের দুঃখ পাঠক মাত্রকেই সমবেদনায় ব্যথিত করে তুলবে। বইখানির ভাষা সুন্দর, প্রচ্ছদপটে নূতনত্ব আছে।

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

(১) মিহি ও মোটা—ইন্দ্রনাথ।

(২) জ্যোতিষী—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য প্রত্যেকখানি ২৲।

"মিহি ও মোটা" এগারটি সরস প্রবন্ধ সমষ্টি। প্রত্যেকটি লেখা সুচিন্তিত ও সুলিখিত—গল্পের মতই মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক।

"জ্যোতিষী" সম্প্রতি ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত উপন্যাস। লেখক অত্যন্ত মিঠা একটি গল্প সুষ্ঠু ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ইহার গতিবেগ, কোথাও তিলমাত্র বাড়াবাড়ি নাই। এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিবার মত বই।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সঙ্গীতাচার্য্য জয়কৃষ্ণ সান্যালের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন

গত ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার সন্ধ্যায় ৪৩।২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সঙ্গীতশিল্পী জয়কৃষ্ণ সান্যালের ৪৩তম জন্মোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যথাক্রমে এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী ও অমিতা সান্যাল কর্ত্তৃক 'বন্দেমাতরম্' গীত হইবার পর উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধন-ভাষণে শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন—যে সমস্ত পরিবার প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সান্যাল পরিবার অন্যতম। জয়কৃষ্ণের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। সে পরিচয় সে নিজেই বহন করিতেছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া। আমি এই সঙ্গীত-সাধকের দীর্ঘজীবন ও সঙ্গীত-সাধনায় উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। জয়কৃষ্ণের জন্মোৎসবের উদ্যোক্তাদের আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সভাপতির ভাষণে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন—আজ জয়কৃষ্ণের জন্মদিন-অনুষ্ঠানে আসিয়া আমি খুব আনন্দিত হইয়াছি, তার মত সুকণ্ঠ গায়ক সচরাচর দেখা যায় না। জয়কৃষ্ণের ধ্রুপদ, রাগপ্রধান প্রভৃতি সঙ্গীত স্বর্গীয় জিনিষ। সে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে তা যেন সফল হয় আমি এই প্রার্থনা করি।



শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান.
(বাম হইতে) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ,
শ্রীহেমন্তকুমার বসু ও শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল

অতঃপর সভাপতির অনুরোধে জয়কৃষ্ণ সুললিত কণ্ঠে "নন্দ-কিশোর" গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। শ্রীহেমন্তকুমার বসু ও শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও সভায় বক্তৃতা দেন। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন—আমি সান্যাল পরিবারের দুই পুরুষের সঙ্গীত-সাধনা দেখিয়া গেলাম ইহা আমার নিকট আনন্দের বিষয়। কলিকাতার শিক্ষিত পরিবারগুলি সঙ্গীতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং আজও তাঁহারাই ইহার ধারা বহন করিয়া চলিয়াছেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতার পর শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ও জয়কৃষ্ণের অনুরাগী বন্ধু ও ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং "আলোছায়া", "অরুণিমা" এবং "সত্যিকথা" পত্রিকার পক্ষ হইতে জয়কৃষ্ণকে মাল্যভূষিত করা হয়। সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রসিদ্ধ ধ্রুপদগায়ক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ, বিখ্যাত গায়িকা মীরা চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল ও ঠুংরী, এবং মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারমোনিয়ম বাজনা সকলকে মুগ্ধ করে। সঙ্গতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীরাজীবলোচন দে, শ্রীমহানন্দ চক্রবর্তী, শ্রীমহারাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণীভূষণ চৌধুরী প্রভৃতি। শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত 'জয়তু জয়কৃষ্ণ' গীতটি কুমারী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সভায় গীত হয়। অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

গত কার্ত্তিক মাস হইতে প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "ইটালীতে এক বৎসর" নামক সচিত্র ভ্রমণকাহিনীর লেখক শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি ১৯৫৩ সনে যাদবপুর কলেজ হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিঙে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান। সেই বৎসরেই তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক ইটালীয় সরকারের বৃত্তির জন্য নির্ব্বাচিত হন। ইনি মিলানে এক বৎসর অবস্থান করিয়া যন্ত্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন।

শিশির কলাকেন্দ্রমে বিজয়া-সম্মেলন

গত ১৯শে কার্ত্তিক, রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় শিশির কলাকেন্দ্রমের উদ্যোগে, উহার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ বাগচীর ২৭, উল্টাডাঙ্গা মেন রোডস্থ ভবনে বিজয়া-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সভাপতি ও প্রধান অতিথি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅখিল নিয়োগীকে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সভার



শিশির কলাকেন্দ্রমে বিজয়া-সম্মেলন

(বাম হইতে) শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী রূপশ্রী বাগচী, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বাগচী শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে হেমেন্দ্রবাবু ও দক্ষিণাবাবু আসিয়া সভায় যোগদান করেন। শিশির কলাকেন্দ্রমের ছাত্রী শ্রীমতী দীপিকা মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীমতী রূপশ্রী বাগচীর কালকা-বিন্দ ঘরানার কথক নৃত্য ও ময়ুর নৃত্য, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বাগচীর 'অগ্নি নৃত্য' এবং লিপিকা ও রুণা মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীদীপালি ঘোষের গুজরাটী লোকনৃত্য সভাস্থ সকলের তৃপ্তিবিধান করে। রূপশ্রী ও মঞ্জুশ্রী বাগচী প্রভৃতি ছোট বালিকাদের অনুপম নৃত্য—বিচিত্র রূপসজ্জা, সুনিপুণ আঙ্গিক ও মুদ্রায় বিশেষ উপভোগ্য হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের ভাষণে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাফল্যে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। বিখ্যাত কলারসিক ও কবি শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় বালিকাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কলারসিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিশির কলাকেন্দ্রমের

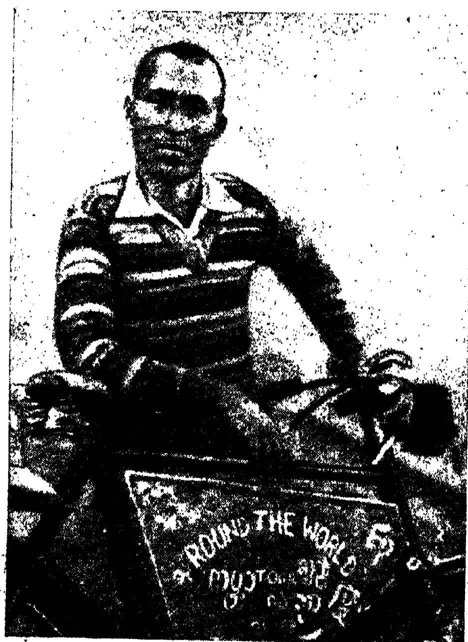
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ বাগচী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, আগামী বৎসরে তিনি শিশির কলাকেন্দ্রম কর্তৃক অনুষ্ঠিত দুইটি সাহায্য-রজনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাজ্যপাল বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে ও সাংবাদিক সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদান করিবেন।



গত ২০শে অক্টোবর, নিউ দিল্লীতে ইণ্টারনেশন্যাল সেমিনারের সদস্যদের নিকট এশিয়ায় সাধারণ গ্রন্থাগারের বিকাশ সম্পর্কে ভাষণদানরত পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু



হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
("বিবিধ প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য)



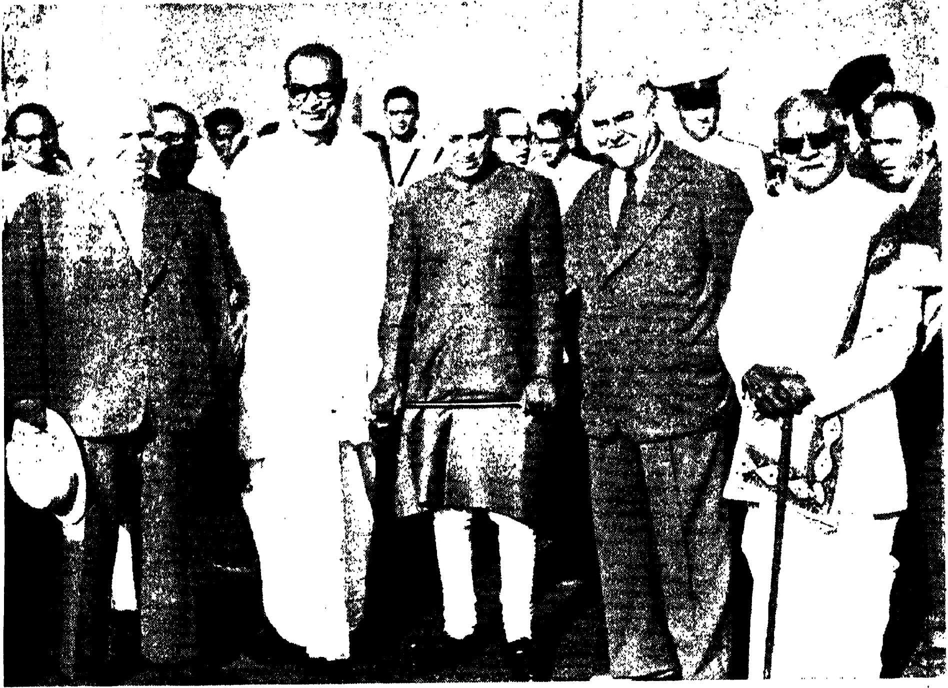
রামনাথ বিশ্বাস
("বিবিধ প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য)

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

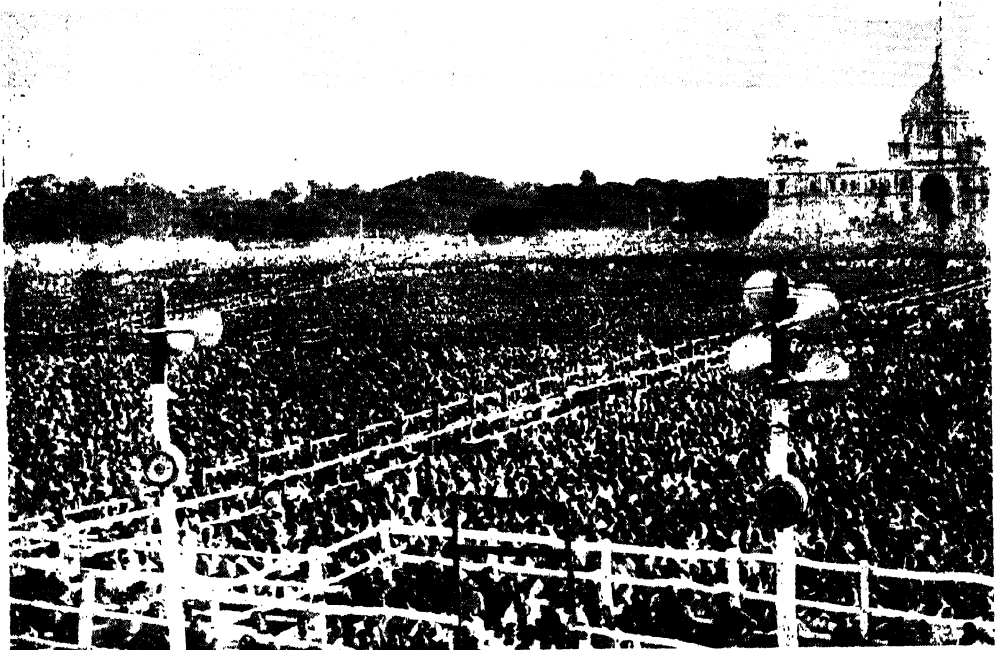


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

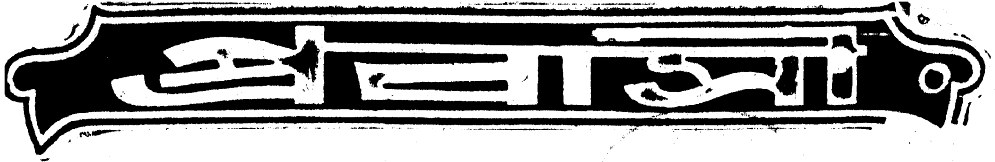
গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন
শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



দমদম বিমানঘাঁটিতে শ্রীজবাহরলাল নেহরু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ড. শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়সহ মিঃ এন. এ. বুলগানিন ও মিঃ এন. এস. ক্রুশ্চেভ



কলিকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের বিরাট জনসভায় ভাষণদানরত মিঃ এন. এস. ক্রুশ্চেভ



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৬২

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঘরে ও বাইরে

বিগত দুই মাসে বহু বিশিষ্ট অতিথির শুভাগমন হইয়াছে আমাদের ভারতে। কানাডা হইতে মিঃ পিয়ার্সন, ইন্দোনেশিয়ার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হাট্টা, রাণীসহ নেপালরাজ, বর্ম্মার প্রধানমন্ত্রী উ নু, সৌদি আরবাধীশ নৃপতি সাউদ এবং রুশ-সোভিয়েট রাষ্ট্রের উচ্চতম অধিকারীদ্বয় নিকোলাই বুলগানিন ও নিকিতা ক্রুশ্চেভ, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই আসিয়াছিলেন তাঁহাদের দেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী ও সখ্য বন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং এ দেশের লোক তাঁহাদের উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া সকলকেই স্বাগত জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী অভ্যর্থনা ও অতিথি সংকার করিয়াছেন।

ভারতের ন্যায় শান্তিকামী ও পঞ্চশীল অনুগামী দেশের সহিত এতগুলি দেশের সুহৃদ সম্বন্ধ স্থাপন. বিশ্বের কল্যাণপ্রসূ হইবে ইহাই তো স্বাভাবিক এবং ইহাই আমাদের কামনা ও আশা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সারা জগতের শক্তিপুঞ্জ এখন বিকারগ্রস্ত ও যুযুৎসু, সুতরাং যাহা স্বাভাবিক তার পরিবর্ত্তে, এই সকল অতিথির সাদর অভ্যর্থনা করার ফলে, ভারত অনেকগুলি দেশের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখানে অতিথি যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভারত ও ভারতের নানা সমস্যার কথা প্রকাশ্যে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি, বিশেষতঃ রুশ-রাষ্ট্রনেতৃদ্বয়ের মতামত, পশ্চিমে এক ছোটখাট ঝড়ের সৃষ্টি করিয়াছে। অতিথি সংকারের নিয়মানুযায়ী, আমরা তাঁহাদের কাহারও মতামত প্রকাশে বাধা দিই নাই, কিন্তু সেই সকল মতামত আমাদের কোনও অনুরোধ বা অনুযোগের কারণে ব্যক্ত হয় নাই। অথচ বিশ্বজগতের এমনই বিকারগ্রস্ত অবস্থা যে, উহার দরুন আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং আমাদের নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে ও তাঁহাদের প্রকাশিত মতামত সম্পর্কে অশেষ কটূক্তি চলিতেছে।

এই সকল কারণে আমরা এই সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মধ্যে সোভিয়েট নেতৃদ্বয়ের প্রকাশ্যে কথিত মতামতের ও তাঁহাদের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্তের একটি বিবরণ দিয়াছি। ঐ বিবরণ সাধারণতঃ যেরূপ সম্পাদকীয় আমরা প্রকাশ করি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক স্থান লইয়াছে, এবং উহাতে আমরা স্বভাবতঃই, কোনও মন্তব্য দিই নাই।

এই বিষয়টিতে আমাদের ঐরূপ গুরুত্ব স্থাপনের কারণ দুইটি। প্রথমতঃ রুশ নেতৃদ্বয়ের এই ভারত ভ্রমণের পর আন্তর্জ্জাতিক মান-দণ্ডে ভারতের ওজনের কিছু পরিবর্ত্তন সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ উহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের নিরপেক্ষতা রক্ষা কার্য্যে নূতন সমস্যা উদ্ভবেরও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং উহা ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা বলা চলে।

এই তো গেল বাইরের কথা। ঘরের কথায় বলিতে হয় যে, এই নূতন পরিবেশে বহির্জগতে আমাদের মান, স্থান, প্রতিপত্তি যাহাই নির্দ্ধারিত হউক না কেন, যদি দেশ ও দেশের লোকের আদর্শ ও নীতি স্থির থাকে তবে আমাদের প্রগতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না। অন্যদিকে যদি আমরা নীতিভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হইয়া যাই তবে বাহিরের বাহবায় দেশের উন্নয়নকার্য্য অগ্রসর হইবে না ব্যাহতই হইবে।

দেশ অন্তঃসারশূন্য হইলে অসংখ্য কলকারখানা, গগনভেদী বাঁধ ও সৌধমালায় আমাদের বাঁচাইতে পারিবে না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাত শত বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার সময়ে, সারা জগতে এক চীনদেশ ভিন্ন কোন দেশই সমৃদ্ধিতে, বিভবে, জীবনযাত্রার মানে, আমাদের সমকক্ষ ছিল না। দেশ যাহারা লুটিল, জাতিকে যাহারা দাসত্বে নিক্ষেপ করিল তাহারা অর্থসামর্থ্যে, জ্ঞানবুদ্ধিতে, সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শনে, আমাদের বহু নীচে ছিল!

আজ দেশের অবস্থা কি তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে যাচাই করিতে হইবে, দেশের লোকের শঙ্কাজনক নৈতিক অবনতির পরিমাণ ও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে তাহার কারণ।

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ভারত সফর

ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী-পরিষদের সভাপতি নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচ বুলগানিন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী ও সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নিকিতা সার্গিয়েভিচ ক্রুশ্চেভ ১৮ই নবেম্বর ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা প্রথম পর্য্যায়ে ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন এবং পরে ১লা ডিসেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উ নু'র আমন্ত্রণক্রমে ব্রহ্মদেশ পরিক্রমণ করেন। ৮ই ডিসেম্বর হইতে পুনরায় তাঁহারা ভারত পরিক্রমণ আরম্ভ করেন এবং ১৪ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লী ত্যাগ করিয়া আফগানিস্থান যাত্রা করেন। ভারত ও ব্রহ্ম পরিক্রমা শেষ করিয়া সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভারত ও ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের সহিত দুইটি স্বতন্ত্র যুক্ত বিবৃতি স্বাক্ষর করেন।

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভারতে ও ব্রহ্মদেশে যে অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন কোন বৈদেশিক প্রতিনিধিই কখনও তাহা পান নাই। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে তাঁহাদের সমাদর অভূতপূর্ব্ব হইয়াছে। কলিকাতায় সোভিয়েট নেতৃবৃন্দকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহাদের ভাষণ শুনিবার জন্য ময়দানে প্রায় কুড়ি লক্ষ (অন্য হিসাবে পঞ্চাশ লক্ষ) লোক সমবেত হইয়াছিল।

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভারতে এইরূপ সমাদর লাভ করায় পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং যাহা খুশী তাহাই বলিয়াছে। পশ্চিমী পত্রিকাগুলি ত প্রায় বিকারগ্রস্ত হইয়াই উঠিয়াছিল। কোন কোন পত্রিকা লিখিল যে, ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়া ব্রিটেন এক মহা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ কেহ এরূপ অভিমতও প্রকাশ করে যে, নেহরুকে কম্যুনিষ্টরা ভুলাইয়া ফেলিয়াছে। আবার কেহ-বা লিখিল যে, নেহরু মোটেই ভুলিবার পাত্র নহেন। মোট কথা, সোভিয়েট-ভারত মৈত্রীর সম্ভাবনায় পশ্চিমী গোষ্ঠীগুলি এত বিচলিত হইয়া পড়ে যে, তাহাদের কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারে সাধারণ সৌজন্যটুকু পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ভারত সরকার এবং উহার নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যেরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে,ঐ সকল সাংবাদিক এবং রাষ্ট্রনীতি ধুরন্ধরগণ মনেই করেন না যে, ভারত একটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মানুষ।

গোয়া এবং কাশ্মীরকে ভারতের অংশরূপে বর্ণনা করায় মার্কিনী অধিকারীবৃন্দ আত্মসংযম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস ত পর্তুগীজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কুনহার সহিত এক যুক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সকল বিশ্ববাসীই জানে গোয়া পর্তুগালের একটি প্রদেশ!

পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী চিরকাল এশিয়া ও এশিয়াবাসীকে নিজেদের উপনিবেশরূপেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ফলে তাহারা এশিয়ার নবজাগরণকে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। সেজন্যই কেহ বলিতেছে, ভারতকে স্বাধীনতা দান (!) ভুল হইয়াছে—ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের কোন চেষ্টাই করে নাই এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের কোন শক্তিই ছিল না, ব্রিটিশ প্রভুগণ অনুগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা বস্তুটি ভারতকে দিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে এই কারণে কাশ্মীর ও গোয়াকে ভারতের অংশ বলায় পাশ্চাত্ত্য মহলে উষ্মা জন্মিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য রাজনীতিকবর্গের এইরূপ হাস্যকর ব্যবহারের অসারতা আরও বেশি ফুটিয়া উঠে যদি স্মরণ রাখা যায় যে, পণ্ডিত নেহরু অথবা রুশ নেতৃবর্গ কেহই এদেশের কোনও ভাষণে বা মন্তব্যে কোন জোট বাঁধিবার পরামর্শ দেন নাই। ভারত ও সোভিয়েট উভয় দেশের নেতৃবৃন্দই পারস্পরিক সহ-অবস্থিতি নীতির উপর জোর দিয়াছেন। আণবিক যুদ্ধের দাবানলে মানবসমাজের ধ্বংস কামনা না করিলে বর্ত্তমান পটভূমিকায় অপর কোন্ নীতি ফলবতী হইতে পারিত তাহা বুঝা কঠিন।

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানাইতে দিল্লীর পালাম বিমানঘাটিতে পণ্ডিত নেহরু, সোভিয়েট হইতে আগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানাইয়া, রুশ-ভারত মৈত্রীর শক্তিসাধনের প্রয়োজন ও তাৎপর্য্যের উপর জোর দিয়া বলেন, "আমার বিশ্বাস আপনাদের ভারতে অবস্থান আমাদের উভয় দেশের পক্ষেই সুখকর ও ফলপ্রসূ হইবে এবং জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা ও শান্তির মহান্ আদর্শের সহায়ক হইবে।"

প্রত্যুত্তরে শ্রীবুলগানিন ভারত সরকার ও জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, "মহান্ মৌলিক সংস্কৃতির স্রষ্টা ভারতের প্রতিভাশালী ও শ্রমসহিষ্ণু অধিবাসীদের প্রতি সোভিয়েট জনগণের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের যে মনোভাব রহিয়াছে সেই সানন্দ হৃদয়াবেগ লইয়া আমরা সুপ্রাচীন ভারতভূমিতে উপস্থিত হইলাম। মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতবর্ষের শান্তিকামী অধিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ সব সময়েই সহৃদয় সহানুভূতি ও উপলব্ধি দিয়া দেখিয়াছে। এক সার্ব্বভৌম ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েট জনগণ পরম সন্তোষ ও আনন্দপ্রকাশ করিয়াছে।

"ভারতের অধিবাসীদের সৃজনী-ক্ষমতার প্রতি আমাদের জনগণের গভীর আস্থা রহিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার কাজে ভারতবর্ষের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি সাধনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়াস ও প্রয়াস সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন।

"সোভিয়েট ও ভারতীয় জনগণের অনেক অভিন্ন কর্ত্তব্য-কর্ম রহিয়াছে। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও উহা সুদৃঢ় করার জন্য এবং বিরোধমূলক আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাবলীকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় ও আপোষ-আলোচনা মারফত মীমাংসা করার জন্য ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট

যুক্তরাষ্ট্র অপরিসীম প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই প্রভূত পরিমাণে সুফল অর্জ্জিত হইয়াছে।

"বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সম্প্রসারণের জন্ত ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রচেষ্টা আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনা নিরসনের কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

"আমাদের ভারত সফরের সুযোগে আমরা ভারতের অধিবাসীদের সহিত, তাহাদের আচারপ্রথা ও ঐতিহ্যের সহিত, জাতীয় অর্থনৈতিক ও জাতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতি সাধনে তাহাদের প্রচেষ্টার ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিতে চাই।

"আমরা এই আশা পোষণ করি যে, ভারতবাসীদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ও ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের সহিত সংযোগের সম্প্রসারণ আমাদের উভয় দেশের পারস্পরিক ম[illegible]-জানাজানি ও বন্ধুত্বের ভাব আরও বৃদ্ধি করার কাজে সুফল প্রসব করিবে।

"আপনাদের সহৃদয় ও আন্তরিক সম্বর্দ্ধনার জন্ত আমি অকপট ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হউক।"

১৯শে নবেম্বর দিল্লীর রামলীলা ময়দানে পণ্ডিত নেহরুর পৌরোহিত্যে সোভিয়েট অতিথিবৃন্দকে এক নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দিল্লীর নাগরিকদিগের প্রদত্ত মানপত্রে বলা হয়:

"আমাদের গবর্ণমেণ্ট ও ভারতের অধিবাসীদের আমন্ত্রণে পৃথিবীর ইতিহাসের এই বর্ত্তমান অধ্যায়ে আপনাদের ভারতে আগমন এক বিশেষ তাৎপর্য্যের বিষয়। আপনাদের এই ভারত সফর ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বন্ধুত্বের বন্ধন অধিকতর ও নিবিড়তর করিবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই বন্ধুত্ব কেবল উভয় দেশের পক্ষেই কল্যাণকর নয়, ইহা আমাদের সকলেরই কাম্য, বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার আদর্শ বর্দ্ধিত করার কাজেও সহায়ক হইবে। আমাদের এই বন্ধুত্বের লক্ষ্য কোন দেশ বা কোন জাতির বিরুদ্ধে নয়। ভারতবর্ষ যে আদর্শ সামনে ধরিয়া রাখিয়াছে ও যে আদর্শ অনুযায়ী সে কাজ করিয়া আসিতেছে তাহা হইতেছে নীতিঘটিত মতান্তর সত্ত্বেও সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। আমরা বলিষ্ঠ ভরসার ভাব লইয়াই বলিতে পারি যে, ভারতের এই নীতি শান্তির আদর্শে ও পরস্পরকে চিনিবার ও জানিবার কাজে বেশ কিছু সহায়তা করিয়াছে।

"শান্তির আদর্শ জোরদার করার জন্ত এবং পৃথিবীর মাথার উপর ঘনায়মান উত্তেজনা ও ভীতির দুর্ভাগ্য কাটাইবার জন্ত আপনাদের সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবলম্বিত অনেক ব্যবস্থা ভারতের অধিবাসীরা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়াছে যদিও বহু কঠিন সমস্যা এখনও সমাধানের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু সকল চিন্তাশীল মানুষ আজ এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, মহাযুদ্ধের দ্বারা কোন সমাধান হয় না, বস্তুতঃ যুদ্ধ পরাভবেরই এক স্বীকৃতি; যুদ্ধ বর্ত্তমান সভ্যতার ধ্বংস ডাকিয়া আনিতে পারে। আমরা জানি রাশিয়ার জনগণ শান্তির অকুণ্ঠ সমর্থক। সোভিয়েট জনগণের প্রচেষ্টা নিয়োজিত তাহাদের বিশাল দেশকে গড়িয়া তোলার কাজে, যাহাতে তাহাদের কল্যাণ ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। প্রভূত আগ্রহ ও ভূয়সী প্রশংসার মনোভাব লইয়া আমরা এই গঠনমূলক প্রয়াসের সাফল্য লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। এই কর্ম্মকাণ্ডই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরোভাগে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।

"রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার দিক দিয়া আমাদের দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। তথাপি আমাদের মধ্যে বিস্তর মিলও আছে; উভয়ের লক্ষ্যের মধ্যে অভিন্নতা আছে; সহযোগিতার এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে। বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া আমরা সত্যই প্রীত।"

সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্রীবুলগানিন ভারতের প্রতি সোভিয়েট জনগণের চিরাচরিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করিবার পর বলেন: "বর্ত্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের প্রজাতন্ত্র স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর তাহাদের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেছে। এই ভিত্তি হইতেছে ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অনাক্রমণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতবাদঘটিত বা যে কোনরূপ অজুহাতে পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরতি, সমানাধিকার ও পারস্পরিক লাভ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল নীতিগুলি।

"সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ ও চীনের লোকায়ত প্রজাতন্ত্র কর্ত্তৃক বিঘোষিত এই পাঁচটি নীতি (যাহাকে আপনারা বলেন 'পঞ্চশীলা') এখন সমস্ত শান্তিকামী জনগণের সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং কয়েকটি দেশ কার্য্যতঃ এই নীতি সাফল্যের সহিত মানিয়া চলিতেছে।"

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ-ভারত সহযোগিতারও উল্লেখ শ্রীবুলগানিন করেন। তিনি বলেন যে, "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যে মিল তাহা হইতেছে এই যে, উভয়েই শান্তিকামী ও পরিশ্রমী জাতি, উভয়েরই প্রকৃতিতে জাতি-বৈষম্য ও উপনিবেশবাদের কলুষ নাই। উভয় দেশই শান্তিরক্ষা ও শান্তি সুদৃঢ় করার, সকল দেশের সহিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করার সমর্থক, জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব ও আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তার প্রচারক।"

শ্রীবুলগানিন তাঁহার ভাষণে ভারত-সোভিয়েট অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থারও উল্লেখ করেন।

দিল্লী হইতে মাননীয় অতিথিদ্বয় আগ্রা গমন করেন। আগ্রার দুর্গে অনুষ্ঠিত এক সভায় নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের প্রত্যুত্তরে শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন, "ভারতীয় জনগণের বন্ধুত্বের মনোভাব আমরা যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি···এবং আপনাদের আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, প্রতিদানে ভারতীয় জনগণের প্রতি আমাদের জনগণের অতীব আন্তরিক মৈত্রীর ভাব রহিয়াছে।"

তাজমহল ও আগ্রার দুর্গ পরিদর্শনের পরে উত্তর-প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী কে. এম. মুন্সী সোভিয়েট নেতৃদ্বয়কে এক মধ্যাহ্ন-ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং শ্রীবুলগানিন ও শ্রীক্রুশ্চেভকে উপহার প্রদান করেন। উপঢৌকনের মধ্য হইতে মর্ম্মরনির্ম্মিত তাজমহলের মডেলটি দেখাইয়া শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন: "এই অপূর্ব্ব উপহার ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের ও ভারতবাসীদের শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য। এই উপহার অমূল্য। আমরা যে উপহার আপনাদের দিয়াছি তাহার মধ্য দিয়া ভারতের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের মনোভাবই আমরা ঐক্যবদ্ধ করিয়াছি। আমরা আপনাদের বন্ধু কেবল এই মিষ্টি রৌদ্রের সুখকর ঋতুতেই নহে, যে কোনও ঋতুতেই আমাদের বন্ধুভাবে পাইবেন। ভারতের জনগণের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কোনও ঝড়ঝঞ্ঝা বা অনাবৃষ্টি যদি কখনও দেখা দেয়, তখন আমাদের স্মরণ করিবেন—আপনাদের কখনও আমরা ভুলিব না।"

২১শে নবেম্বর ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক ভাষণদান প্রসঙ্গে শ্রীবুলগানিন ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির ঐক্যের প্রতি জোর দিয়া বলেন, "ফলতঃ আমরা একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। অর্থাৎ আমরা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস করিতে চাই, শান্তিরক্ষা ও শান্তি সুদৃঢ় করিতে চাই, যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করিতে চাই, যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মানব জাতিকে রক্ষা করিতে চাই, সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ জীবনের আনন্দ সুনিশ্চিত করিতে চাই। ইহার অপেক্ষা মহত্তর কাজ আর কি হইতে পারে?"

"আমাদের উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের সম্মুখে যেসব দায়দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা সম্পাদনের ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে বিস্তর মিল রহিয়াছে। অক্টোবর বিপ্লবে জয়ী হইয়া আমাদের জনগণ তাহাদের নিজেদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল মাতৃভূমির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য, আমাদের দেশকে এক শিল্পোন্নত ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কর্ত্তব্যের ভার। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েট জনগণ সাফল্যের সহিত সেই ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে।

"আপনারা আপনাদের নিজস্ব পথ অনুসরণ করিতেছেন। চিরকালের জন্য ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া আপনাদের মাতৃভূমিকে এক উন্নত জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নীত জীবনযাত্রা মানের এক অগ্রগামী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য আপনাদেরও আছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য আপনাদের আয়াস ও প্রয়াসকে সোভিয়েট জনগণ সর্ব্বাঙ্গীণ উপলব্ধি করিয়াও অকপট সহানুভূতিসহকারে দেখে।

"আমাদের অভিমতে, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিয়েট-ভারত সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত করার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে রহিয়াছে।

"আমাদের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার অংশ আপনাদের দিতে আমরা প্রস্তুত। ইহা আমাদের জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সুসঙ্গত।"

শ্রীক্রুশ্চেভও পার্লামেণ্টে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "ভারতের রাষ্ট্রীয় সার্ব্বভৌমিকতা এবং জাতীয় স্বাধীনতালাভ ব্যাপারটির এক বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য আছে। ভারতের অধিজাতিসমূহ আজ তাহাদের সম্মুখে মুক্ত ও স্বাধীন ক্রমবিকাশের পথ খোলা পাইয়াছে দেখিয়া সোভিয়েট জনগণের আজ আনন্দের আর অবধি নাই। তাহারা আজ পরম পরিতৃপ্ত। নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনপূর্ব্বক তাহারা স্বদেশের কল্যাণ এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক উন্নতি সাধনে সাফল্য লাভ করিবে। এই সকল মহৎ কর্ত্তব্য পালন করা ভারতীয় জনগণের সামর্থ্যের অতীত নয়।

"ভারতীয় জনগণের স্থায়ী ও অটুট শান্তি বজায় রাখার কামনাকে সোভিয়েট জনগণ মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝে ও তারিফ করে। কারণ শান্তি বজায় থাকিলে তবেই ভারতের মানুষের পক্ষে উপরে উল্লিখিত কর্ত্তব্যসমূহ পালন করা সম্ভব।

"সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন দেশকে যদি প্রকৃত স্বাধীন হইতে হয় এবং জনতার কল্যাণ সাধন করিতে হয় তবে তাহার এমন এক নিজস্ব উন্নত স্তরের অর্থনীতি থাকা চাই যাহা বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভরশীল নহে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই দেখাইয়া দিতেছে যে, সাম্রাজ্যভোগীদের কোন অনুন্নত দেশকে দাবাইয়া রাখিবার কৌশল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করিতে পারে। ঐ সকল দেশে যাহাতে শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে, সেজন্য তাহারা যত রকমে সম্ভব চেষ্টা করে। কারণ তাহাদের ভয় হইল যে, ঐ দেশগুলি যদি নিজস্ব জাতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে, নিজস্ব বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী সৃষ্টি করিতে পারে এবং জনতার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলেই সেই আগেকার পরাধীন দেশগুলির পক্ষে বল সঞ্চয় করিয়া স্বাধীন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা হইবে।

"ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের অসামান্য অন্তর্দৃষ্টিকে আমরা প্রশংসা করিতেছি। ভারতের স্বাধীনতার বিপদ কোন দিক হইতে আসিতে পারে তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এবং সেই বিপদকে রুখিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন।"

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পররাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ খণ্ডন করিয়া শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন যে, সোভিয়েটের জনগণ লেনিন-প্রদর্শিত পথকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, "কিন্তু সমাজের পুনর্গঠন সম্পর্কে আমরা যে চিন্তাধারা পোষণ করি তাহা মানিয়া লইতে আমরা কোন দিন কাহাকেও বাধ্য করি নাই এবং এখনও তাহা করিতেছি না।" মহান লেনিনও সোভিয়েট জনগণকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারে অন্য রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করিতে না দিয়া নিজেদের ইচ্ছামত জীবন রচনা করিবার অধিকার প্রতিটি দেশের মানুষের আছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যাপ্রচারের

কারণ এবং রূপ বর্ণনা করিয়া ক্রুশ্চেভ বিপ্লবের পর সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণের নানারূপ গঠনমূলক কর্ম্মের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, কি ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েটের শত্রুরা সোভিয়েটকে ধ্বংস করিবার জন্য হিটলারী ফ্যাসিবাদকে লেলাইয়া দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েটের জনগণ যে যুদ্ধক্ষত সারাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে তিনি তাহাও বিবৃত করেন। শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন: "আমার এই সকল কথা শুনাইবার পিছনে আপনাদের উপর জোর করিয়া সোভিয়েট ক্রমবিকাশের ধারা চাপাইয়া দিবার উদ্দেশ্য নাই। আমাদের জনগণ যে বন্ধুর পন্থা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে তাহা আরও ভালভাবে উপলব্ধি করিতে আপনাদের সাহায্য করার অভিপ্রায় লইয়াই আমি এই সকল কথা বলিতেছি। সেই পন্থা মহৎ এবং তাহা গ্রহণ করার ফলে আমাদের দেশের জনগণ বিরাট সাফল্য ও জয়লাভ করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আর অর্থনীতি বা সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে আপনারা যদি আমাদের অভিজ্ঞতা কিছু পরিমাণে কাজে লাগাইতে চান আমরা ও বন্ধুরা যেরূপ সচরাচর করিয়া থাকে ঠিক সেইরূপ আগ্রহ লইয়া ও নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার ভাগ আপনাদের দিব এবং আপনাদের যথাসম্ভব সাহায্য করিব।"

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পরমাণবিক বোমার সাহায্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর চাপ দিবার যে চেষ্টা করে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক পরমাণবিক বোমা প্রস্তুত হইবার ফলে সেই চাপ কার্য্যকরী হয় নাই। "কিন্তু সেই অস্ত্র তৈয়ারি করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করি উহা যেন কখনও প্রয়োগ করা না হয়। শান্তিপূর্ণ গঠনকার্য্যে পরমাণবিক শক্তি ব্যবহারের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। আমরা পরমাণবিক ও উদযান অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব দাখিল করিয়াছি এবং আরও প্রস্তাব করিয়াছি যে, প্রতিটি সরকারের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে শপথ গ্রহণ করা হউক যে, তাঁহারা এই অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন না। কিন্তু অদ্যাবধি পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই প্রস্তাব মানিয়া লন নাই।"

শ্রীক্রুশ্চেভ তাঁহার ভাষণের উপসংহারে বলেন: "যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সাফল্যের আদান-প্রদানের জন্য আমরা সংস্কৃতি ও কলার ক্ষেত্রে ব্যাপক ও বহুমুখী বিনিময়ের পক্ষপাতী। সোভিয়েট জনগণ তাহাদের ভারতীয় বন্ধুদের আমাদের দেশের মাটিতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া খুশী হয়। আমরা পরস্পরকে যত ভাল করিয়া জানিতে পারিব, পরস্পরকে যত সাহায্য করিতে পারিব ততই আমাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হইবে এবং সারা দুনিয়ার শান্তিকামী শক্তিসমূহ ততই শক্তি সঞ্চয় করিবে···।"

২২শে নবেম্বর সোভিয়েট নেতৃদ্বয় পাঞ্জাবে ভাখরা-নাঙ্গাল পরিদর্শনে যান। সেখানে এক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন: "আমাদের উভয় দেশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা। আপনাদের আছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও নিজস্ব জীবনদর্শন। আমাদেরও সেইরূপ। কোন কোন বিষয়ে আমাদের পার্থক্য রহিয়াছে তাহা লইয়া এখনই সবিস্তারে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নাই। ইহাই গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, আমরা মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে, অর্থাৎ যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন সম্পর্কে একমত। এই প্রশ্ন মানুষের মনে আলোড়ন না তুলিয়া পারে না। প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিমাত্রই শান্তি কামনা করে, শান্তির জন্য সংগ্রাম করে।

"আসল কথা আমরা শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কোন্ দেশে কোন্ ধরনের রাষ্ট্রিক কাঠামো রহিয়াছে তাহা সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের প্রশ্ন। চিন্তাধারা সম্পর্কেও বলা যায়, তাহা প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করি না এবং অপরকেও হস্তক্ষেপ না করার কথাই বলি।"

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া শ্রীক্রুশ্চেভ আরও বলেন,"রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বলা বাহুল্য। আমাদের মতবাদ স্পষ্টভাবেই নির্দ্ধারিত, কিন্তু আমাদের মতবাদ অপরের উপর চাপাইয়া দিবার কোনরূপ অভিপ্রায় আমাদের নাই। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্ম্মকাণ্ড ও যন্ত্রকৌশলের প্রশ্নের কথা স্বতন্ত্র। এই বিষয় হইতেছে আন্তর্জাতিক প্রশ্ন। এন্, এ. বুলগানিন এখানে ঠিকই বলিয়াছেন যে, এই পাওয়ার ষ্টেশন নির্ম্মাণের কর্ম্ম-কাণ্ড দেখিয়া আমরা খুসী হইয়াছি। কিন্তু আমরা আরও বেশী খুসী হইয়াছি জনগণকে দেখিয়া, তাহাদের উজ্জ্বল চোখ ও তাহাদের কর্ম্মকাণ্ড দেখিয়া।"

ভাখরা-নাঙ্গাল পরিদর্শন কালে পাতিয়ালার মহারাজা স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত দুইখানি তরবারি বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভকে উপহার প্রদান করেন।

২৩শে নভেম্বর মাননীয় অতিথিদ্বয় বোম্বাই গমন করেন। সেখানে তাঁহাদিগকে এক নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় অভিনন্দিত করা হয়। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বহু যুদ্ধবাজও যে শান্তিকামীর ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন: "বর্ত্তমানে যাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহারা শান্তির পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও যদি বিনা যুদ্ধেই স্বার্থসিদ্ধি হইয়া যায় ত তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। যে শান্তির মধ্যে তাঁহারা এক জাতিকে অপর জাতির পদানত করিয়া রাখিতে পারিবেন সেই শান্তি তাঁহাদের মনোমত। জনগণ কিন্তু তাহা চাহে না। এইখানেই হইল সমস্ত বিষয়টির সারকথা এবং সমস্ত রকমের মতভেদের চাবি-কাঠি।"

২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যাকালে অতিথিদ্বয়ের সম্মানার্থে ভারত সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের বোম্বাই শাখা এক সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করে। উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন: "পৃথিবীতে এমন সব লোক আছে যাহারা প্রশ্ন করে: সহ-অবস্থান কি সম্ভবপর?

মনে হয় এই বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কেন না রাষ্ট্র-সমূহ কার্য্যতঃ সহ-অবস্থান করিতেছে। তবু কিনা সহ-অবস্থানের প্রশ্ন তোলা হয়।

"আপনাদের কাছে বলিতে চাই যে, শিশু জন্মগ্রহণ করিবে কিনা তাহা বাবা আর মায়ের উপরেই নির্ভর করে বটে; কিন্তু কোন্ দিন, ঠিক কোন্ সময় শিশু ভূমিষ্ঠ হইবে কিম্বা তাহারা যেমনটি চায় সে ঠিক তেমনটি হইবে কিনা তাহা তাহাদের উপর নির্ভর করে না।

"ইতিহাসের ক্রমবিকাশ বন্ধ করা ও নূতন সমাজ-ব্যবস্থার জন্ম প্রতিরোধ করা কেমন করিয়া সম্ভব? সূর্য্য যেমন প্রতিদিন উদিত হয়, তেমন জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার স্থানে দেখা দেয় নূতন ও আরও প্রগতিশীল কাঠামো।

"এই ভাবেই আমাদের সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বহারা রাষ্ট্র, শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের জন্মকালে অপরাপর রাষ্ট্রগুলি শঙ্খধ্বনি করে নাই।"

সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্মকাল হইতেই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি উহাকে টুটি চাপিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। এখনও ঐ সকল শক্তি আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা জীয়াইয়া রাখিতেছে। কিন্তু সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়াও সোভিয়েট ইউনিয়ন বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শ ও কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রগুলির সহ-অবস্থানের নীতির সমর্থন করে। কারণ, ক্রুশ্চেভ বলেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র জয়ী হইবে।

ক্রুশ্চেভ বলেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বড় পছন্দ করি না। আমি সহ-অবস্থানের কথা বলিতেছি এই কারণে নহে যে, পুঁজিবাদের অস্তিত্ব টিকিয়া থাকুক তাহা আমি চাই—বলিতেছি এই কারণে যে, এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি, এই ব্যবস্থার যে অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহা মানিয়া না লইয়া পারি না।

"অপর পক্ষ কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে চাহে না, যদিও কেবল আমরাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলি নাই, আরও বহু দেশও ঐ পথের আশ্রয় লইয়াছে।...

"ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতবর্ষও এই সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করিতেছে। ইহা আনন্দের বিষয়। অবশ্য আমাদের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা আলাদা। কিন্তু এরূপ ঘোষণা ও এরূপ মনোভাবকে আমরা অভিনন্দিত করি।

"সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং এই অস্তিত্বের জন্য কাহারও অনুমতি সে চায় না। আমাদের অস্তিত্ব আছে কেবল ইহাই নহে। এই অস্তিত্ব রক্ষা করিতেও আমরা সক্ষম।..."

শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন, "...আমরা এমন এক সহ-অবস্থান চাই যাহা জাতিসমূহের অগ্রগতির সহায়ক, সকল রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপোষক। আমরা বিশেষ ভাবে সকল দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে চাই। তাহারা আমাদের নিকট হইতে ক্রয় করুক, আমরা তাহাদের কাছ হইতে কিনিব।"

"আমরা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার সমর্থক। আমরা চাই পুঁজিবাদী দেশগুলি হইতে আরও বেশি লোক আমাদের দেশে আসুক এবং আমাদের দেশের লোকও ঐ সব দেশে যাক।"

উপসংহারে তিনি বলেন, "সহ-অবস্থান থাকিবেই। আমরা ইহার জন্য দাবী জানাই না, অনুরোধও করি না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদেরও অস্তিত্ব আছে, যেমন আছে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব। কেহ আমাদের মঙ্গলগ্রহে লইয়া বসাইয়া দিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা পর্য্যন্ত এইরকম উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। স্পষ্টতই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও নিজেদের মঙ্গলগ্রহে নিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে না। অর্থাৎ আমাদের সকলকে একই গ্রহে থাকিতে হইবে এবং এই থাকা মানেই সহ-অবস্থান।"

বোম্বাই হইতে শ্রীবুলগানিন ও শ্রীক্রুশ্চেভ দক্ষিণ-ভারতে বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজ হইয়া ২৯শে নবেম্বর কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছান। সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা ও নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ২৯শে নবেম্বর দমদম বিমানঘাঁটিতে অতিথিদ্বয় অবতরণ করিলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলাভাষায় এক বক্তৃতায় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিমানঘাঁটিতে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্রীবুলগানিন বলেন:

"প্রিয় বন্ধুগণ, পরম সন্তোষের সহিত আজ আমরা বাংলার মাটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ভারতের ইতিহাসে তাহার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং ভারতের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অগ্রগতিসাধনের কাজে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।...আমরা আনন্দিত এই ভাবিয়া যে, বাংলার অধিবাসীদের জীবন ও কাজের সহিত তাহাদের দান-অবদান ও সাফল্যের সহিত আমরা আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিব।"

৩০শে নবেম্বর কলিকাতার ময়দানে অনুষ্ঠিত নাগরিক সম্বর্দ্ধনা-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন: "পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী অপূর্ব্ব কলিকাতায় আমরা আসিয়াছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য যে কোন ভারতীয় রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার জনসাধারণ তাহাদের ভূমিকার সম্যক উপলব্ধির পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের অভিনন্দন জানাইতে পারিয়া আমরা সুখী। তাহাদের কাছে আমরা সানন্দে বহন করিয়া আনিয়াছি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রগাঢ় অভিনন্দন। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদের রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির কাজে আমরা সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।"

গোয়ার উল্লেখ করিয়া শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন: "পর্তুগাল গোয়া ছাড়িয়া যাইতে নারাজ, ভারতবর্ষের এই আইনসঙ্গত ভূখণ্ডকে তাহার শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে অস্বীকৃত। কিন্তু আজ

হউক কাল হউক সেদিন আসিবেই এবং বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া গোয়া প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইবে।

"এশিয়ার জাতিসমূহের সংহতি হইতেছে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উপর এক মারাত্মক আঘাত।"

ব্রহ্মদেশ সফর শেষ করিয়া রুশ নেতৃদ্বয় ৮ই ডিসেম্বর ভারতে ফিরিয়া আসেন। ৯ই ডিসেম্বর তাঁহারা কাশ্মীরে উপনীত হন। শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিতে শ্রীবুলগানিন বলেন, "আমাদের ভারত পরিক্রমা এখন সাঙ্গ করিয়াছি। এই সফর আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা অকপটে স্বীকার করিব যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল যৎসামান্য। আমাদের যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল সেই সুযোগের কল্যাণে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ও মধ্যভারত আমরা সফর করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর অংশ পরিদর্শন না করিলে ভারতবর্ষের একটি সমগ্র ধারণা করিতে আমরা সক্ষম হইতাম না। এই কারণেই কাশ্মীর ভ্রমণের জন্য সদর-ই-রিয়াসতের আমন্ত্রণ আমরা পরম আনন্দের সহিত গ্রহণ করি।..."

১০ই ডিসেম্বর কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্দ্ধনা-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীক্রুশ্চেভ বলেন: "কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। এই প্রশ্ন সম্পর্কে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সব সময়েই জানাইয়াছে যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিবে কাশ্মীরের জনগণ নিজেরাই এবং এই সমাধানের পন্থাই হইবে গণতন্ত্রের মূলনীতির সহিত সুসঙ্গত ও এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক সম্প্রসারিত হওয়ার পরিপোষক।"

"কাশ্মীরের জনসাধারণই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্যতম রাজ্য হিসাবে কাশ্মীরের প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছে।..."

রাজ্য সীমানা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

'হরিজন'-সম্পাদক স্বর্গগত মশরুওয়ালা মহাশয় মৃত্যুর ৩।৪ দিন পূর্ব্বে নিজ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সন) মন্তব্য করিয়াছেন:

"বিহার-সরকার যদি মানভূমকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে সুবিচার ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা ঐ জেলার বাংলা ভাষাভাষী জনগণের চিত্ত জয় করিতে হইবে। বিহার সরকারের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও জবরদস্তি নীতিই মানভূমে গোলযোগ সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ। কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যার সমাধান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কখনও বা গুণ্ডার হাতে আত্মসমর্পণের নামান্তর, কখনও বা আলোচ্য বিষয়কে যতদিন সম্ভব ধামাচাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা মাত্র।"

এই মন্তব্য কেবল মানভূমের সম্বন্ধে লিখিত হইলেও ইহা ধলভূম, সাঁওতাল পরগণার পূর্ব্বাঞ্চল ও পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে সমান ভাবেই প্রযোজ্য। মশরুওয়ালা মহাশয়ের অভিমতানুযায়ী সুবিচার ও সহৃদয়তা করিতে হইলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি করা সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

(ক) বাংলা ভাষা ও সাঁওতালী ভাষাকে, ধলভূমের ধানবাদের সাঁওতাল পরগণার মধ্যে সমগ্র জামতাড়া ও পাকুড় মহকুমা, দুমকার দক্ষিণাংশ এবং সাহেবগঞ্জ ব্যতীত অবশিষ্ট রাজমহল মহকুমা ও পূর্ণিয়ার পূর্ব্বভাগের, আঞ্চলিক ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

(খ) নিম্নলিখিত অপচেষ্টাগুলি এখনই বন্ধ করিতে হইবে:

(১) যে আদিবাসিগণ বাংলা ভাষা বলে (মাতৃভাষা স্বরূপেই হউক, বা দ্বিতীয় ভাষা স্বরূপে) তাহাদিগকে বাংলা ভাষা ত্যাগ করার প্ররোচনা,

(২) আদিবাসী ও অন্যান্য বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে এবং স্থানীয় কুর্মি ও অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভেদের সৃষ্টি,

(৩) যে সমস্ত স্থানীয় কথা, সেন্‌সাস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মতে মানভূম ও সাঁওতাল পরগণায় প্রচলিত সাধারণ রাঢ়ীবুলি হইতে পৃথক করা কঠিন ("Is not easy to distinguish from the western Rarhi form of Bengali which is spoken in Manbhum)" সেগুলিকে বিহারী ভাষার আঞ্চলিক রূপ বলিয়া অভিহিত করা।

যদি এই প্রকার ব্যবস্থা না করা হয়, ও যদি ধলভূম, ধানবাদ, পূর্ব্ব সাঁওতাল পরগণাকে পশ্চিমবঙ্গে সম্মিলিত না করা হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যে, এই সকল অঞ্চলের বাঙালী-দিগকে, অর্থনৈতিক চাপে বিভ্রান্ত হইয়া, বলিতে হইবে যে, জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম ও জন-গণ-মন-অধিনায়ক হিন্দী ভাষায় রচিত, বাংলা ভাষায় নহে, এগুলি রচনা করিয়াছিলেন বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নহে, বিহারীবাসী দুই জন সুধী, জামশেদ-পুরের ময়দানে যে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিকৃতি আছে তাহা প্রমথনাথ বসু নামধারী বাঙালীর নহে কোনও বিশিষ্ট বিহারীমহোদয়ের, এসব হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, ইতিপূর্ব্বেই অনেক কিছু হইয়া গিয়াছে। ওয়াই ডি শর্ম্মা নামক জনৈক পণ্ডিত ১৮ই মার্চ্চ ১৯৫১ সনের 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায়, জয়দেবের জন্মস্থান বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুলী গ্রামকে "বিহারী গ্রাম" বলিয়া বর্ণনা করেন; ২৪শে মার্চ্চ ১৯৪৯ তারিখে বিহারের বিধানসভায় পাকুড়-রাজমহলের প্রতিনিধি ব্রিজলাল দোকানিয়া মহাশয়, তাঁহার এলাকার হিন্দীভাষী কিষাণের বাক্য—এমন দারোগার মত অফিসারেরা আসে যে দেখে ভয় হয়"—এইটি উদ্ধৃত করেন। যে ভূমিজগণ ও দেশাওলী সাঁওতালগণের বহু পূর্ব্বপুরুষগণ কোল ভাষায় কথা কহিত ও যাহারা অন্ততঃ দেড়, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সেই কোলভাষা পরি-ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষাকে নিজেদের ভাষা করিয়া লইয়াছে, সেই সব ভূমিজ ও দেশাওলী সাঁওতালের দেশ বরাবাজার ও মানবাজার থানাতে অকারণ বহুসংখ্যক হিন্দী স্কুল জারী করিয়া তাহাদিগের ছেলেমেয়েগণকে বুঝান হইতেছে যে, তাহারা ঘরে যে ভাষায় কথা

কহে, তাহা রাঢ়ীবুলি বাংলারই ঠিক অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাহা বিহারীই বটে, বাংলা নহে। সেন্‌সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখিয়াছেন : পশ্চিমবঙ্গ সন্নিহিত অঞ্চলে বহুসংখ্যক হিন্দী স্কুল খোলায় হিন্দীকেই মাতৃভাষা বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে।

ভারতের অর্থনৈতিক চিত্র

বিগত ২রা নবেম্বর নয়াদিল্লীতে, ভারতের অর্থনৈতিক এবং তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্কে যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করিতে হইলে ইহা জানা প্রয়োজন :

"অর্থমন্ত্রী শ্রী সি, সি, দেশমুখ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতে বেকারের সমস্যা অন্ততঃ ৪০ লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, পাঁচ বৎসরে ৪০ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ নূতন চাকুরীর সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু কার্য্যে নিয়োগের যোগ্য শ্রমিকের সংখ্যা ৯০ লক্ষে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রথম পরিকল্পনা শেষ হইতে আর মাত্র ৫ মাস বাকী আছে : কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা আশা করি যে, পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টায় ২ হাজার কোটি টাকা বা মোট বনিয়োগযোগ্য অর্থের শতকরা ৮৭'৫ভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হইবে।

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টায় ২ হাজার কোটি টাকা বা মোট বিনিয়োগযোগ্য অর্থের শতকরা ৮৭'৫ ভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হইবে।

শ্রীদেশমুখ বলেন, কর তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য বিক্রয়কর প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে সংসদে একটি আইনের খসড়া পেশ করার কথা গবর্ণমেণ্টকে এখন চিন্তা করিতে হইবে। এ সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই, কিন্তু আমার মনে হয় যে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারী এবং ব্যবসায়ী মহলের এক বৃহৎ অংশই সুপারিশসমূহ সমর্থন করিবেন।

লবণ-কর প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন উহা চিরদিনের জন্য উঠিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি।

প্রথম পরিকল্পনার সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য সার্থকতা বর্ণনা করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, উহা জনসাধারণকে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে যে সহযোগিতা পাইয়াছি, অর্থের দিক হইতে বিচার করিলে, তাহা এইরূপ দাঁড়ায় :

সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা—দশ কোটি হইতে বারো কোটি টাকা ; জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা—দশ কোটি টাকা ; স্থানীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা—বারো কোটি টাকা এবং পল্লী অঞ্চলের সামাজিক কল্যাণ প্রচেষ্টা—বারো কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী বলেন, পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য সাফল্যের নিদর্শনরূপে আমি দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি, রেলপথ, বন্দর ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতিসাধন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃহত্তর প্রচেষ্টারও উল্লেখ করিতে চাই।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমার নিজের ধারণা হইতেছে এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাভুক্ত বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে মূলধন নিয়োগ করা হইবে, তাহার পরিমাণ হইবে প্রায় ৪৮০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনাটিকে কার্য্যে রূপদানের জন্য মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা।

আমার বিশ্বাস, উদ্বৃত্ত বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের দ্বারা ১০০ কোটি এবং বিদেশ হইতে সাহায্য বাবদ ৪০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। তৎসত্ত্বেও ৪০০ কোটি টাকার অভাব থাকিয়া যাইবে। পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের অভ্যন্তরে অর্থসংগ্রহের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, নূতন কর ধার্য্য করিয়া ১৫০ হইতে ২০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী থাকে বলিয়া যে মতবাদ প্রচার করা হইয়া থাকে, অর্থমন্ত্রী তাহা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন।

স্বল্প সঞ্চয় ও বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহের সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলিয়াই তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সম্পদ নিয়োজিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাহা টানিয়া লইবার ইচ্ছা সরকারের নাই।

বীমা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীকরণের যে প্রস্তাব উঠিয়াছে এ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রীকরণের ফলে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় হ্রাসেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। বীমার মারফত সঞ্চয়ের চেষ্টা বাড়াইয়া তুলিবারও যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। সে যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্ট এ সমস্ত বিষয়ই বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন।

শ্রীদেশমুখ বলেন, মাদক বর্জ্জন তদন্ত কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ গৃহীত হইলে আগামী পাঁচ বৎসরে জনসাধারণের হস্তে ১২৫ কোটি টাকা থাকিয়া যাইবে। ইহা জনসাধারণ তাহাদের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনেই ব্যয় করিবে এবং অতি সামান্যই কর হিসাবে গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবে।

অর্থমন্ত্রী ইহাও প্রকাশ করেন যে, মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিয়া ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের যে প্রস্তাব আসিয়াছে, সে সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট 'অনতিবিলম্বেই' একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

এ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আলোচনা শেষ হইয়াছে এবং এতৎসংক্রান্ত একটি দলিলও প্রস্তুত করা হইতেছে।

শ্রীদেশমুখ বলেন, এখানে যে অর্থ অর্জ্জিত হইবে, অন্য দেশের মুদ্রায় তাহা রূপান্তরে যাহাতে অসুবিধা দেখা না দেয় এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তি যাহাতে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভবপর না হয়, তাহাই মূলধন বিনিয়োগ বীমা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মানী, ইটালি, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, পাকিস্থান প্রভৃতি ২৬টি রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এ ধরনের পরিকল্পনায় যোগ দিয়াছে। আবার তুরস্ক ও ব্রিটেন, কেবলমাত্র প্রথমটির ক্ষেত্রে—অর্থাৎ মুদ্রা পরিবর্ত্তনে বাধা না থাকিবার—গ্যারান্টি দিয়াছে।

শ্রীদেশমুখ অতঃপর বলেন, রাষ্ট্রীকরণ করা হইলে ক্ষতিপূরণ দানের প্রশ্নেই আসল সমস্যা দেখা দিবে। এক্ষেত্রে চুক্তিটি যদি স্বাক্ষরিত হয়, প্রথম বীমাকারী দেশের গবর্ণমেণ্ট ও সেখানকার মূলধন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি বুঝাপড়া হইবে। সে বুঝাপড়া অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি ভারত সরকার ও মার্কিন সরকারের বিচার্য্য বিষয়রূপে গণ্য হইবে। অতঃপর ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়াইবে যে, মার্কিন বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগকারীর সহিত ভারত সরকারের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। মূলধন বিনিয়োগকারী তাহার নিজেদের দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে বিনিয়োগের জন্য আমেরিকা হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বেসরকারী প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইবে। অবশ্য দেশের পরিকল্পনা অনুসারে সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত শিল্পেই তাহা নিয়োগ করিতে হইবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, মার্কিন সরকারের সহিত মৈত্রী, বাণিজ্য ও নৌচলাচলসংক্রান্ত প্রস্তাবিত চুক্তিটি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এখনও 'তৎপরতার সহিত' চিন্তা করিতেছেন না।

অর্থমন্ত্রী প্রসঙ্গতঃ বলেন, কয়লাশিল্পের বেসরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আগামী ৫ বৎসরে উন্নয়নমূলক কার্য্যে অর্থ বিনিয়োগ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই শিল্পটি যদি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনা হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই পর্য্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ছয় কোটি টন কয়লা প্রয়োজন হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে উৎপন্ন হইতেছে মাত্র তিন কোটি ৮০ লক্ষ টন। বেসরকারী প্রয়াস যদি সম্প্রসারিত না হয়, তবে ছয় কোটি টন কয়লা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে।

অর্থমন্ত্রী প্রসঙ্গতঃ এ কথাও বলেন যে, চা-শিল্প রাষ্ট্রীকরণের কোন প্রস্তাব আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন নাই।

বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নবগঠিত আন্তর্জ্জাতিক অর্থসংস্থার ভূমিকা কিরূপ হইবে, অর্থমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে তাহা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, কয়েকটি দেশ এই সংস্থার সদস্য। সে সকল দেশের বেসরকারী প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়া তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করাই সংস্থার আদর্শ। এই সংস্থা কেবলমাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টাতেই অর্থ জোগাইবেন, কিন্তু তদ্দ্বারা একথা বুঝায় না যে, কোন প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ থাকিলে তাহা উক্ত সংস্থার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইবে। এই সংস্থার চাঁদা বাবদ ভারতবর্ষ ৪৪ লক্ষ ৩১ হাজার ডলার দিবে। আগামী জানুয়ারী মাসে সংস্থার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতবর্ষ নিজেই যখন অপরের নিকট ঋণপ্রার্থী, তখন ব্রহ্মদেশকে ঋণ দেওয়া হইল কেন, এ প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের অঙ্গীভূত একটি বিষয় হিসাবেই এই লেনদেন বিচার করিতে হইবে। আমার ত মনে হয়, ভারতের বর্ত্তমান মর্য্যাদা বা অর্থনৈতিক শক্তির দিক হইতে চিন্তা করিয়া কেহই একথা বলিবেন না যে, ভারতবর্ষ সর্ব্বক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতারূপে থাকুক এবং কোন ক্ষেত্রেই অপরকে ঋণ দান না করুক।

প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে যে অভাব রহিয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার সমস্তটাই পূরণ করিয়া দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া মার্কিন দূত যে বিবৃতি দিয়াছেন, তৎপ্রতি অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন, ঋণ হিসাবে গম দিবার অনুরোধ জানানো ছাড়া আমরা আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কোন সাহায্যের আবেদন জানাই নাই। খাদ্য পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা চিন্তা করিয়া মাত্র গমের ব্যাপারেই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভাবী পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য এ ধরনের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

আপাততঃ ঋণ লইবার কোন প্রয়োজন আমরা বোধ করিতেছি না। পরিকল্পনাকে কার্য্যে রূপদানকালে যদি কোন জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তখন সে সম্পর্কে আমরা চিন্তা করিব।

শ্রীদেশমুখ বলেন, আমার নিজের ধারণা, পরিকল্পনার মূল কাঠামোতে সরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ৪৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা থাকিলেও ৪৮০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে।

দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের কতটা অংশ এইজন্য পাওয়া যাইতে পারে, সে সম্পর্কে নূতন করিয়া কোন হিসাব করা হয় নাই। জাতীয় আয়ের উপর চলতি হারে কর বজায় রাখা হইলে মোট ৩৫০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু জাতীয় আয়ের কত অংশ বিনিয়োগের জন্য গ্রহণ করা হইবে, তাহার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। কোন কোন দেশে শতকরা ২০ হইতে শতকরা ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

বীমা রাষ্ট্রীকরণ বলিতে কেবল জীবনবীমা রাষ্ট্রীকরণই বুঝায় না, সাধারণ বীমার কথাও উঠে, এই প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমি শুধু ইহাই বলিতে চাহি যে, জীবন বীমা রাষ্ট্রীকরণে অনেক বেশী অসুবিধা রহিয়াছে।

ঋণ-কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া কোন কোন মহলে যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহার নিরসন ঘটাইয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, আমি যতটুকু বলিতে পারি তাহাতে আপনারা জানিয়া

রাখুন যে, লবণের উপর কর ধার্য্য করার কোন সম্ভাবনাই নাই। ভাবাবেগ-প্রণোদিত হইয়া আমি এই আশ্বাস দিতেছি না,—অর্থনৈতিক কারণেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রয়োজন।

এই কর যদি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়ও, তথাপি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থের যে অভাব থাকিবে, তাহা পূরণ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। বস্ত্রের উপর উৎপাদন শুল্ক রহিয়াছে এবং সকলেই উহার বাবদ কিছু দিতেছেন। সে দিক হইতে বলা যায়, উহা লবণ শুল্কের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

পুনরায় লবণ-কর প্রবর্ত্তনের কোন অর্থনৈতিক হেতু আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

শ্রীদেশমুখ বলেন, প্রথম পরিকল্পনাকালে এ পর্য্যন্ত বাজেটে ঘাটতি রাখিয়া দুই শত কোটি টাকা জোগাইতে হইয়াছে—পরিকল্পনার অবশিষ্টকালের মধ্যে আরও তিন শত কোটি টাকা প্রয়োজন হইতে পারে। দেশের পণ্যমূল্যের অবস্থা দেখিয়া ইহা বলা যায় যে, এই ঘাটতি উৎপাদন-বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই চলিয়াছে। জাতীয় আয়ও শতকরা তিন ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমরা যতদূর জানি, পরিকল্পনার অভ্যন্তরে বেসরকারী প্রচেষ্টাও আশানুরূপ হইয়াছে।

পরিকল্পনার যে সকল কাজ অসমাপ্ত রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু কিছু কাজ অসমাপ্ত রহিয়াছে, কেননা ব্যাপারটি নূতন। কোন কোন সরকারী শিল্পেরও কিছু অসমাপ্ত রহিয়াছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, যে সকল পণ্য আমাদের দেশের লোকেরা উৎপাদন করিতে পারে না, কেবলমাত্র সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রেই আমরা বিদেশী মূলধন ও বিদেশী 'কারিগরী জ্ঞান' পাইতে চাহি।"

ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন

১৯৫৪-৫৫ সনে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং ভূমি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসর খাদ্যশস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ হইয়াছে ৫.৫৩ কোটি টন, ১৯৪৯-৫০ সনের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় ৯৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হয়। ১৯৫০-৫১ সনে খাদ্যশস্যের কৃষিজমির পরিমাণ ছিল ১৯.৩৬ কোটি একর; ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০.৯০ কোটি একরে। এই কয় বৎসরে যদিও খাদ্যশস্যের কৃষিজমির পরিমাণ ৬.৯ শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ২০.২ শতাংশে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, জমির উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমবর্দ্ধনশীল।

১৯৫৪-৫৫ সনের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সনের খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৫.২৫ কোটি টন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে এই পরিকল্পিত পরিমাণের উপর ২৮ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছে। কৃষিজমির পরিমাণও প্রায় ১.২০ কোটি একর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সনে কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং ইহার কর্ষিত জমির পরিমাণ উভয়ই বর্ত্তমান বৎসরের চেয়ে অধিক ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সনে খাদ্যশস্যের কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল ২.১৫ একর এবং উৎপাদন হইয়াছিল ৫.৭৯ কোটি টন।

১৯৫৪-৫৫ সনে ৮৫ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হইয়াছে, এবং ইহা পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ধানের উৎপাদন কিছু পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সনে ২.৭৬ কোটি টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। আর বর্ত্তমান বৎসরে ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ২.৪২ কোটি টনে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে প্রধানতঃ ধানের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। এই দুইটি প্রদেশের উত্তরাংশে প্রবল বৃষ্টি, বন্যা এবং দক্ষিণাংশে অনাবৃষ্টি হওয়ার দরুন আমন ধান বপন এবং রোপণ ব্যাহত হইয়াছে। মোট যে ৩৪ লক্ষ টন কম উৎপাদন হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাংলা ও বিহারের উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ ৩১ লক্ষ টন।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জনসংখ্যার হিসাব ধরা হয় প্রায় ৩৭.৮০ কোটি, ১৯৫৪-৫৫ সনে ভারতবর্ষে মাথাপিছু গড়পড়তা দৈনিক খাদ্যশস্যের সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১৪.৪ আউন্স; পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সনে খাদ্যশস্য সরবরাহের মাথাপিছু পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৩.৭ আউন্স। অর্থাৎ, পরিকল্পিত মাথাপিছু সরবরাহের পরিমাণ পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সম্ভবপর হইয়াছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমদানী হ্রাস পাইয়াছে এবং ইহাতে ভারতের মূল্যবান বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় অনুকূল হইবে। ১৯৫১ সনে ভারতবর্ষ ৪৭ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করে এবং ইহার জন্য ২১৭ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়। ১৯৫৪ সনে আমদানী খাদ্যের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ টন এবং ইহার জন্য ৪৭ কোটি টাকা খরচ হয়। ঐ বৎসর ৫১ লক্ষ টাকার ৭ হাজার টন চাউল ভারতবর্ষ রপ্তানী করে। ১৯৫৫ সনে ২ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী করিবার জন্য ভারত সরকার অনুমতি দিয়াছেন। নিম্নে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল:

(লক্ষ টন)

খাদ্যশস্য	পরিকল্পনার প্রথম বৎসর (১৯৪৯-৫০)	১৯৫৩-৫৪ সন	১৯৫৪-৫৫ সন	১৯৫৫-৫৬ সনে পরিকল্পিত উৎপাদন
চাউল	২৩২	২৭৬	২৪২	২৭২
গম	৬৩	৭৯	৮৫	৮৩
অন্যান্য	১৬৫	২২৪	২২৬	১৭০
মোট	৪৬০	৫৭৯	৫৫৩	৫২৫

উন্নত সেচ-ব্যবস্থা, উন্নত বীজ-বিতরণ, অধিকতর পরিমাণে

ব্যবহার, ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। বিহার, পশ্চিম বাংলা ও উত্তরপ্রদেশে বন্যা এবং অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে এই সকল কারণে।

ভারতের রবার

ইদানীং ভারতের রবার-শিল্প যদিও দ্রুত হারে বর্দ্ধিত হইতেছে, তথাপি কাঁচা রবার উৎপাদনে এদেশ এখনও ঘাটতি দেশ। এদেশে কাঁচা রবার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। কাঁচা রবার উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু বৃদ্ধির হার অত্যল্প। ১৯৫৫ সনে ২২,০০০ টন কাঁচা রবার উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সনে ২১,৪৯৩ টন এবং ১৯৫৩ সনে ২১,১৩৬ টন কাঁচা রবার উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৫০ সনে রবার চাষের জমির পরিমাণ ছিল ১,০৪,৪৬০ একর, ১৯৫১ সনে ১,০৪,৫০৫ একর এবং ১৯৫২ সনে ছিল ১,১১,১১৭ একর।

ভারতবর্ষে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে সবচেয়ে বেশী রবার উৎপন্ন হয়; এদেশের রবার চাষের জমির ৮৫ শতাংশ আছে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে। মাদ্রাজ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, চাষ জমির ১২.৫ শতাংশ আছে এই প্রদেশে এবং মহীশূর ও কুর্গে সম্মিলিত ভাবে ২.৫ একর রবার চাষের জমি আছে। ভারতে কাঁচা রবার উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগেরও কম।

ভারতে কাঁচা রবারের প্রয়োজন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯৫৩ সনে ২২,৩৭৩ টন কাঁচা রবার ভারতীয় রবার-শিল্পের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল, ১৯৫৪ সনে এই প্রয়োজনের পরিমাণ ছিল ২৫,৪৮৭ টন এবং ১৯৫৫ সনে ২৬,৫০০ টন কাঁচা রবারের প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই বৎসর ৪,৫০০ টন কাঁচা রবার উৎপাদনে ঘাটতি হইবে। ভারতীয় রবার বোর্ড অনুমান করেন যে, ১৯৫৬ সনে প্রয়োজনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩০,০০০ টনে দাঁড়াইবে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ হইবে মোটে ২৩,৭০০ টন। আমদানী দ্বারা এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

ভারতবর্ষে রবার উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর, যদি রবার জমিগুলিতে উন্নততর গাছ লাগান হয়। উচ্চশ্রেণীর গাছে রবার উৎপাদন করিলে খরচও অনেক কম হইবে। বর্ত্তমানে রবার চাষের জমির মোট পরিমাণ ১৭৭,০০০ একর। দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম তীরে অন্ততঃপক্ষে আরও দশ লক্ষ একর জমি নূতন চাষের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান রবার চাষের জমির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অর্থাৎ বর্ত্তমান জমিতে রবার উৎপাদন ৪৭,০০০ টনে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। এই ব্যাপারে ভারতীয় রবার বোর্ডের উপর গুরু দায়িত্ব আরোপিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সনে ভারতীয় রবার আইন সংশোধনের দ্বারা রবার বোর্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে ভারতে রবার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এর্নাকুলামে যে অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে রবার বোর্ড এই ব্যাপারে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

আগামী ১০ বৎসরে ৭০,০০০ একর জমিতে নূতন করিয়া রবার গাছ লাগান হইবে। অর্থাৎ, বৎসরে ৭,০০০ একরে নূতন বৃক্ষ রোপণ করা হইবে। এই ব্যাপারে ২.২৬ কোটি টাকার সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইবে। বাৎসরিক কিস্তিবন্দীতে ছোট চাষীদের একর প্রতি ৪০০ টাকা করিয়া এবং বড় চাষীদের একর প্রতি ৩০০ টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা সাত বৎসর ধরিয়া চলিবে। নূতন জমিতে চাষ আরম্ভ করিবার জন্য বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয়-সরকারকে সাহায্যের আবেদন জানানো হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয় রবার-শিল্পের প্রধান অভাব অর্থ ও শিক্ষিত কর্ম্মী।

গবেষণা-কার্য্যের জন্য রবার বোর্ড কোট্টায়ামের নিকট ৭৭ একর জমি ক্রয় করিয়াছেন। এই স্থানে একটি গবেষণাগার এবং একটি পরীক্ষাশালা স্থাপিত হইবে। বর্ত্তমানে রবার গাছের খাদ্য ও সার হিসাবে তালতৈল দেওয়া হয়, ইহাতে খরচ বেশী পড়ে। নূতন ও পুরাতন গাছে অন্যান্য সস্তার তেল দিয়া পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা হইবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কিনা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কুটীরশিল্প

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটিরশিল্পের স্থান লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বেশ মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ কুটীরশিল্পের পক্ষপাতী, পারিলে তিনি বৃহদায়তন শিল্পগুলিকে বন্ধ করিয়া দেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষপাতী, তবে তিনি কুটীরশিল্পকে যথাযোগ্য স্থান দিতে রাজী। এই মতবিরোধ সম্প্রতি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে কার্ভে কমিটির রিপোর্ট লইয়া। কুটীরশিল্প সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্য প্ল্যানিং কমিশন কর্ত্তৃক কার্ভে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। কুটীরশিল্প ও স্বল্পায়তন শিল্পোন্নতির জন্য কার্ভে কমিটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৫৯.৬১ কোটি টাকা খরচার জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। কুটীরশিল্পের এই পরিকল্পনায় কার্ভে কমিটি আশা করেন যে, প্রায় ৪৫ লক্ষ লোক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

কার্ভে কমিটির সবচেয়ে আপত্তিজনক অনুমোদন এই যে, বৃহদায়তন শিল্পগুলিকে হ্রাস করিতে হইবে। যথা মিল বস্ত্রের উৎপাদন ৫০০ কোটি গজের (বর্ত্তমান উৎপাদন) উপর করিতে দেওয়া হইবে না; ইহার মধ্যে ১০০ কোটি রপ্তানী হইবে। শক্তিচালিত তাঁতগুলি ২০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিবে। হস্ত-চালিত তাঁতগুলি এখন ১৫৫ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতেছে; ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৯৬০-৬১ সনে হস্ত-চালিত তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩২০ কোটি গজে। তাঁতবস্ত্রের জন্য সূতার প্রয়োজন মিটাইবে বহুবিঘোষিত অম্বর চরখা।

কার্ভে কমিটির অভিমত সমর্থন করেন পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীনন্দ এবং অধ্যাপক মহলানবিশ। কিন্তু কার্ভে কমিটির অভিমত এই ব্যাপারে অত্যন্ত হাস্যকর। কমিটির মতে ৩২০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতে তাঁতশিল্পের অতিরিক্ত প্রয়োজন ২২·৫ কোটি পাউণ্ড সূতা এবং ইহা নাকি অম্বর চরখা দ্বারা উৎপাদিত হইবে। অম্বর চরখা "primitive" ও "crude"; তাই বাণিজ্য-মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, এই চরখার প্রচলন হইলে তাঁতশিল্প সূতার অভাবে ব্যাহত হইবে। তাঁহার মতে সুতা উৎপাদনের জন্য আরও কয়েকটি বৃহদায়তন মিল স্থাপন করা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, অম্বর চরখায় যে সূতা উৎপন্ন হইবে, মিল সূতার তুলনায় তাহার শতকরা ২৫০ গুণ মূল্য অধিক হইবে। অম্বর চরখা কি পরিমাণ এবং কি শ্রেণীর সূতা বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদন করিতে পারে তাহা এখনও যথোপযুক্ত ভাবে পরীক্ষিত ও নির্ণীত হয় নাই।

বর্ত্তমানে কুটীরশিল্পের নামে কামধেনুরূপ কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্ব্বতোভাবে দোহন করা হইতেছে, অন্য কথায় ইহা প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। খাদির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে লাখ লাখ টাকা দিয়াছেন এবং দিতেছেন তাহার হিসাব কোথায়? কাগজ খুলিলেই রোজ দেখি সরকারী টাকা দেওয়ার হিসাব, কিন্তু উৎপাদনের হিসাব দেখি না। একটি তাঁত বসাইলেই সরকারের নিকট হইতে ২০।২৫ হাজার টাকা পাওয়া যাইতেছে, উৎপাদন হউক আর না হউক। এই করিয়া কয়েকটি খাদি সংস্থানের মালিকেরা কয়েক লাখ টাকা করিয়া লইয়াছেন। তেলের ঘানি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠান কয়েক লাখ সরকারী টাকা পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের দোকানে বর্ত্তমানে একবিন্দু তেলও পাওয়া যায় না।

অম্বর চরখা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, ইহার প্রধান সমস্যা হইবে সংস্থাগত, অর্থাৎ কেমন করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে সূতা সংগ্রহ করা হইবে এবং সারা দেশবিস্তৃত হস্তচালিত তাঁতগুলিকে সূতা সরবরাহ করা হইবে। অধিকন্তু অম্বর চরখায় উৎপাদিত সূতার মূল্য যদি এত অধিক হয়, তাহা হইলে ইহা অযথা বস্ত্রমূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি করিবে এবং এই অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে। মিল-বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করার ফলে এই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহা ভারতের বৃহত্তম শিল্প। ইহার উৎপাদন হ্রাস করার ফলে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে মিল-বস্ত্রের রপ্তানী বর্ত্তমানে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, চা (১৪৭ কোটি টাকা) এবং পাটজাত দ্রব্যের (১২৪ কোটি টাকা) পরই মিল-বস্ত্রের রপ্তানী। গত বৎসর ৬৭ কোটি টাকার মিল-বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে। ইহার উৎপাদন হ্রাস করা জাতীয় স্বার্থবিরোধী।

আসামে সরকারী কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাচার

"অস্বস্তিকর ব্যাপার" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব গোবিন্দবল্লভ পন্থ মহাশয়ের সাম্প্রতিক আসাম সফরের সময় আসামের জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর ব্যবহারের সমালোচনা করিয়াছেন। বিগত ৪ঠা নবেম্বর পন্থজী শিলচর পরিদর্শনে আসিলে কাছাড়ের রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে ডেপুটি কমিশনার তাঁহাদিগকে পন্থজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন এবং বলেন যে, শিলং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দ্দেশ ব্যতীত তিনি সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অসমর্থ। শিলং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশের জন্য প্রতিনিধিবৃন্দ পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর আসে নাই। পরে আসাম সরকার এক প্রেসনোটে জানাইয়াছেন যে, শিলচরে পন্থজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দিবার জন্য ডেপুটি কমিশনারকে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন: "করিমগঞ্জ হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য মহাশয় দিল্লীস্থ ভারত-সরকারের জনৈক পদস্থ নেতার পত্র পাইয়া জানিতে পারেন যে, পন্থজীর সহিত কাছাড় সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা হইয়াছে এবং শ্রীআদিত্য যেন শিলচরে পন্থজীর সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করেন।" শিলচরে সাক্ষাৎ লাভে অসমর্থ হইয়া তিনি আগরতলায় যাইয়া অতি কষ্টে পন্থজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, পন্থজী তাঁহাকে জানান যে, দিল্লীতে তাঁহার জনৈক সহকর্ম্মীর সঙ্গে আলোচনা অনুযায়ী তিনি শিলচরে শ্রীআদিত্যের খবর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আগরতলার খবরে জানা যায়, কাছাড়ের প্রতিনিধিবৃন্দ যাঁহারা দিল্লী হইতে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রণালয়ের তার পাইয়া আগরতলায় পন্থজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ত্রিপুরার জঙ্গী চীফ কমিশনার হটাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নেহাত তাঁহারা হটিবার পাত্র নহেন, বলিয়াই বেপরোয়া হইয়া পন্থজীর সহিত আলোচনার সুযোগ করিয়া লন এবং সমস্ত জানিয়া পন্থজী দুঃখ প্রকাশ ও চীফ কমিশনারের আচরণের নিন্দা করেন।"

সরকারী অব্যবস্থায় কর্ম্মপ্রার্থীদের হয়রানি

১৮ই অগ্রহায়ণের "সেবক" পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ভ্রান্তিমূলক সরকারী বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইয়া ২৮ ও ২৯শে নবেম্বর বহু কর্ম্মপ্রার্থীকে হয়রান হইতে হয়। উক্ত তারিখে সশস্ত্র বাহিনী ও আসাম রেজিমেণ্টের জন্য লোক সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া কয়েক শত যুবক মফস্বল হইতে আগরতলা আসিয়া রিক্রুটিং-অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারে যে, কেবল নৌবাহিনীতে লোক গ্রহণ করা হইবে। পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে উক্ত অফিসার কিছুই জানেন না বলিয়া জানান।

উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, "বহু লোক পায়ে হাঁটিয়া আগরতলা আসে এবং প্রত্যেকেরই যথেষ্ট আর্থিক ও সময় ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া তাহারা অভিযোগ করে।

'রিক্রুটিং-অফিসারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়া [illegible]

যায় যে, নৌবাহিনী ছাড়া সেনাবিভাগের অন্য কোন শাখায় লোক নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে তিনি অবগত নহেন।

"পক্ষান্তরে ত্রিপুরা সরকারের প্রচার-বিভাগে সংবাদ লইয়া জানা যায় যে, শিলচরের রিক্রুটিং-অফিসারের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত অনুরোধপত্রানুযায়ী তাঁহারা যথারীতি প্রচার করিয়াছেন এবং উক্ত দপ্তর যাহা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই পত্রিকা মারফত প্রচার করা হইয়াছে।"

দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক পাকা ধান নষ্ট

মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক পাকা ধান নষ্ট করিবার ঘটনার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণ 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' লিখিতেছেন, "এই ভাবে পাকা ধান নষ্ট করার অভ্যাস কেবল একটি গ্রামের কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির একচেটিয়া অধিকার নহে। জেলার অধিকাংশ অঞ্চল হইতে এই ধরনের বহু অভিযোগ আমরা পাইয়া থাকি। বৎসর বৎসর এইরূপ বেপরোয়া-ভাবে ফসল নষ্ট করা হইতেছে। শুধু পাকা ধান নহে। ধান বা অন্যান্য ফসল রোপণ বা বপন করিবার পর যখন ছোট ছোট চারাগাছ গজাইয়া উঠে তখন হইতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকের অত্যাচার আরম্ভ হয়। শুনা যায় যে, ইহারা দলবদ্ধভাবে গরু-মহিষ শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেয়। নিরীহ পশুকুল কোন বাধা না পাইয়া মনের আনন্দে স্বচ্ছন্দে ক্ষেতের শস্যের সদ্ব্যবহার করে। অনেকে রাত্রিকালে গবাদি পশুর গলার দড়ি খুলিয়া দেয়। আর সারারাত ব্যাপকভাবে সমস্ত মাঠের উপর চলে ইহাদের অবাধ বিচরণ; মধ্যে মধ্যে এমন হয় যে, গোটা মাঠের ফসল একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। থানায় গেলে কোনই প্রতিকার হয় না।"...

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" জেলাশাসকের নিকট আবেদন করিয়াছেন যেন তিনি এই সমস্যা সমাধানের কোন উপায় উদ্ভাবন করেন। সমস্যার জটিলতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, গোচারণভূমির অভাবের ফলেই যে, এ ভাবে গরু দিয়া শস্যাদি খাওয়ান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য অপরের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করাকেও কেহ সমর্থন করিতে পারে না। পূর্ব্বে গ্রামাঞ্চলে যে সকল গোচারণভূমি ছিল কলিকাতাবাসী বিলাসী জমিদারগণ উচ্চ নজরানায় তাহা বিলি করিয়া দেয় এবং তাহার ফলেই গোচারণ ভূমির এত অভাব ঘটিয়াছে! যাহাদের গবাদি পশু রহিয়াছে তাহাদের সম্মুখে এখন গরু-মহিষের খাদ্য সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। "দেশের চাষ কাজের জন্য গরুও চাই, দুগ্ধের জন্য গাভী চাই। শুধু একপাল গরু-মহিষ পুষিলেই চলিবে না। তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং প্রচুর চারণভূমি সৃষ্টি করিতে হইবে, কেবল দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলির দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেই সব সমস্যার প্রতিকার হইবে না। বর্ত্তমানে জমিদারী-প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। সরকার স্বহস্তে সমস্ত জমিদারী গ্রহণ করিয়াছেন। পঁচাত্তর বিঘার অতিরিক্ত জমিও সরকার গ্রহণ করিবেন। তাই আমরা সরকারকে অনুরোধ করিব উদ্বৃত্ত জমিগুলি ভূমিহীন চাষীকে দিবার পূর্ব্বে যেন প্রত্যেক গ্রামের চারিদিকের মাঠে প্রচুর গোচরভূমি সংরক্ষণ করিয়া রাখেন। গোচরভূমির ব্যবস্থা না করিলে গো-মহিষদিগের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইবে না। গোচর-ভূমির ব্যবস্থাই বর্ত্তমানক্ষেত্রে ফসল রক্ষার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। এই দিকে আমাদের সুযোগ্য জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

জেলাবোর্ড নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী জুলুম

বাঁকুড়া জেলাবোর্ড নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিবার জন্য নানা প্রকারে চাপ দেওয়া হইতেছে বলিয়া ২০শে অগ্রহায়ণ "হিন্দুস্থানী" পত্রিকায় শ্রীদুর্মুখ কতকগুলি অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কয়েক স্থানে ভোটদাতা-দের কংগ্রেসকে ভোট দিবার জন্য শাসানো হইয়াছে। অনেক স্থলেই কংগ্রেসকে ভোট দানের জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখান হইয়াছে। "স্পেশাল কেডার শিক্ষকদের উপর অত্যাচার চলিতেছে সবচেয়ে বেশি। কোন কোন স্থলে তাহাদের পত্র দিয়া জানিতে চাওয়া হইয়াছে, কে কি রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করেন। প্রার্থীদিগকে চাকরী খতম করিবার বা চাকরী 'স্থায়ী' না করিবার ভয় দেখাইয়া তাহাদের ভোট ক্যানভাসের কাজে লাগাইতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সিলেকসন বোর্ডে থাকিয়া চাকরী করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা উহার প্রতিদানে কংগ্রেসের প্রচার চালাইবার জন্য চাপ দিতেছেন।

"এমন অভিযোগ আসিয়াছে কোন কোন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী পরোক্ষে জনসাধারণকে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিবার কথা বলিতেছেন।"

আসানসোল শহরের দুরবস্থা

আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। একদিকে ইস্পাত অন্য দিকে কাঁচ-কাপড়-অ্যালুমিনিয়ম, সাইকেল প্রভৃতি শিল্প আসানসোল শহরকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছে। তথায় ক্রমশঃ আরও নূতনতর কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আসান-সোল শহরটিরই কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিতেছে না।

আসানসোল শহরের নানাবিধ অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে ১৪ই অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতে-ছেন: "...ভাবিয়া বিস্মিত হইবেন স্থানীয় কলেজের অট্টালিকা এখনও প্ল্যানের নীল কাগজেই আবদ্ধ রহিয়াছে। কবে তাহা বাস্তবায়িত হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। আপনি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় আসানসোলে আসিয়া অপ্রস্তুত হইবেন। প্রচণ্ড জলাভাব। water supply নিরুপায়। এই ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টার কথা শুনা গিয়াছিল, কিন্তু এখন একেবারে চুপ! আবার গ্রীষ্ম আসিলেই পুরাতন ক্ষত মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। ইলেকট্রিক কোম্পানীর অবস্থাও তথৈবচ। বড়ই দুর্ব্বল। সবল ডি. ভি. সি. ইহার পিছনে থাকিতে এই দুর্ব্বলতা মানিয়া লইতে পারি না।"

"তার পর আপনি আরও অগ্রসর হউন। বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইবেন। বাস ষ্ট্যাণ্ডটি যেন জি. টি. রোডের উপর হুমড়ী খাইয়া পড়িয়াছে। শহরে এত পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ স্থান থাকিতে উল্লিখিত ষ্ট্যাণ্ডটিকে গড়িয়া তোলা যায় না কি? এ সব পতিত জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইচ্ছা করিলে সরকারী কর্ম্মচারী-দের জন্য অট্টালিকা তুলিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে বিরক্তি-কর গৃহ সমস্যারও সমাধান হয়।"

"এদিকে আপনি হয়ত শহরে একটি পার্কের আশা করিতে-ছেন। কিন্তু সে গুড়েও বালি। একটি ভাল খেলার মাঠ নাই, পার্ক ত দূরের কথা। ইহা ছাড়া বাজারের অবস্থা দেখিয়া আপনার চক্ষুদ্বয় ঊর্দ্ধমুখী হইবে। শহরে একটি ভাল পাবলিক লাইব্রেরীর অভাব জানিয়া আশঙ্কিত হইবেন। অথচ কল-কারখানার নীরসতা সত্ত্বেও শহরবাসীর সংস্কৃতিবোধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে শীঘ্রই এখানে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। কবে হইবে ভগবান জানেন আর জানেন কর্ম্মকর্ত্তারা)।

"সব শেষে আপনি শহরের রাস্তা ঘাটের নিন্দা করিবেন। বলিবেন, "মিউনিসিপ্যালিটি করে কি? শুধু ট্যাক্স নিয়াই খালাস?" অথচ এই আসানসোল নাকি একদিন কলিকাতার পরবর্তী শহর—কিম্বা পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় মহানগরীর রূপ ধারণ করিবে! আমরা বলি আসানসোল মহানগরীর বাতাস চাহে না, সে শুধু নগরীই হইয়া থাকুক। কিন্তু সার্থক নগরী।

"বিশেষ করিয়া এই শ্রমশিল্প-কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে যখন একটা কর্ম্মমুখরতা আর প্রাণচঞ্চলতার সামুদ্রিক ঢেউ বহিয়া যাইতেছে তখন শহরের তীরে একটা অস্বাস্থ্যকর এঁদো ডোবার কচুরীপানা আসিয়া লাগিবে ইহা কেমন বিসদৃশ লাগে না কি? আসানসোলের গুরুত্ব বুঝিয়া শিল্প-নগরীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আমরা আকর্ষণ করিতেছি।"

পূর্ব্ব পাকিস্থানে অরাজকতা

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, "জনশক্তি" পত্রিকা ১৪ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পূর্ব্ব পাকিস্থানে ক্রমবর্দ্ধমান অরাজকতার বিভীষিকা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন: "পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামাঞ্চলে একটি নূতন উপদ্রব আরম্ভ হইল কৃষকের গোয়াল হইতে গরু চুরি করিয়া লইয়া গোপন করিয়া রাখা ও পরে দূত মারফত সংবাদ দিয়া টাকা লইয়া গরু ছাড়িয়া দেওয়া। গ্রামে গ্রামে এই নূতন উৎপাতে গৃহস্থগণ সন্ত্রস্ত —কড়া পাহাড়া দিয়াও গরু রক্ষা করা যায় না। গরু-চোরের দলের উৎপাত আজও সমান ভাবেই চলিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর কৃষকই এই উৎপাতে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরীহ কৃষককুলের কাঁচা-পাকা ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া—বাধা দিতে গেলে ঠাট্টা-তামাসা করা —ভয় দেখান—একশ্রেণীর গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকের পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

সাধারণ চুরি-ডাকাতির ত কথাই নাই—সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। তদুপরি এইরূপ হামলা চলিতেছে। ডাকাতগণ দলবদ্ধ ভাবে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহস্থদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। সম্প্রতি চা-বাগানগুলিতেও চুরির হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। পুলিসে সংবাদ দিয়াও কোন লাভ হইতেছে না। "জনশক্তি" লিখিতেছেন, "শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ চা-বাগানের মালিক সাহেব-কোম্পানী—ম্যানেজারগণও ইউরোপীয়। রাজদরবারে তাঁহাদের খাতির বিশেষ কমিয়াছে বলিয়াও আমরা বুঝিতে পারি না। তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, ঘনবসতিপূর্ণ সুরক্ষিত ইউরোপীয় ম্যানেজারের অধীনস্থ বাগানগুলিকেও আজকাল চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে।"

দুর্বৃত্তদের দৌরাত্মের আরও দৃষ্টান্ত দিয়া "জনশক্তি" লিখিতে-ছেন: "আমরা উপরে যে বিভীষিকার চিত্র অঙ্কিত করিলাম এর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই কাহিনী পড়িয়া যদি কেহ বলে—দেশে একটা অরাজকতার বিভীষিকা চলিয়াছে তাহা হইলে পুলিস বিভাগ কিংবা শাসন কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন না। কিন্তু ভুক্তভোগী জনসাধারণ আজ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অরাজকতার এই বিভীষিকা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। অদূরভবিষ্যতেই দেশব্যাপী যে অন্নকষ্ট আসিয়া পড়িতেছে সেই সময়ে এই বিভীষিকার রাজত্ব আরও কি পরিমাণ ভয়াবহ হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া গৃহস্থেরা এখনই প্রমাদ গণিতেছেন।

"প্রধানমন্ত্রী জনাব আবুহোসেন সরকার সাহেব প্রদেশের নানা সমস্যায় বিব্রত—তৎসত্ত্বেও আমরা তাঁহার নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিব 'দেশের এই অরাজকতার অবস্থা সর্ব্বাগ্রে দূর করুন—অন্যথা দেশের উন্নতির সকল কর্ম্মপন্থাই ভস্মে ঘি ঢালার সমান হইবে'।"

পাকিস্থানী রীতিনীতি

১৮ই নবেম্বর "আশ্চর্য্যজনক নহে" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকা লিখিতেছেন, সাধারণভাবে যদিও একথা সত্য যে, নামে বিশেষ কিছু আসে যায় না, সিন্ধুর সাম্প্রতিক ঘটনা-বলীতে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, নামে নিশ্চয়ই আসে যায়। সিন্ধুতে বহু নামেরই আশ্চর্য্যজনক রূপান্তর ঘটিয়াছে। যে বাঁধটি এই কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "গোলাম মহম্মদ বাঁধ" নামে পরিচিত ছিল বর্ত্তমানে তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখা হইয়াছে "নিম্ন সিন্ধু বা কোত্রী বাঁধ"। হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ বর্ত্তমানে নাম পরিবর্ত্তনের ফলে বাঁধটির আসল নামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিল মাত্র। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন তাৎপর্য্যবিহীন নহে। অন্যান্য ঘটনাবলী হইতেও বুঝা যায় যে, কোন্ দিকে হাওয়া বহিতেছে।

কোত্রী বাঁধে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মহম্মদের

নামে যে প্রস্তরফলকটি ছিল তাহাও রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। ইহাই সব নহে। কোত্রী বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই সেই প্রস্তরফলকটি এতদিন পর্য্যন্ত খাজা নাজিমুদ্দীনের নামের স্বাক্ষর বহন করিতেছিল। সম্প্রতি কোনও অজ্ঞাত কারণে তাহারও অন্তর্ধান ঘটিয়াছে। লারকানা জেলায় "লিয়াকত আলী গেটে"র নূতন নামকরণ হইয়াছে "খুরো গেট"। সুক্কুরে জনৈক মানবহিতৈষী হিন্দুর নামে একটি পার্ক ছিল—তাহার বর্ত্তমান নাম "আয়ুবখুরো পার্ক"।

"বোম্বে ক্রনিকল" লিখিতেছেন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ইহা যদি পাগলামী হয় তবে সেই পাগলামীর মধ্যে সুচিন্তিত পদ্ধতি রহিয়াছে; কিন্তু ইহা পাগলামী নহে। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পাকিস্থানের রাজনৈতিক এবং জননেতাদের সৌভাগ্যের পরিবর্ত্তন প্রতিফলিত হইতেছে। খ্যাতনামা মনীষীবৃন্দের স্মৃতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য যে সকল নাম দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি বদলাইয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নামে সেগুলির নামকরণ হইতেছে—এই ঘটনাকে অদৃষ্টের পরিহাস ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। তবে পাকিস্থান-রাজনীতির চোরাবালিতে ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে নূতন সদস্য গ্রহণ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্তিত্বের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্ঘের নূতন সদস্য গ্রহণ লইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ সভায় ভোটাধিক্যের জোরে কেবলমাত্র নিজেদের মনোনীত রাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত না থাকার ফলেই প্রধানতঃ সদস্য গ্রহণ লইয়া সমস্যার উদ্ভব ঘটে। পরে আপোষমূলক প্রস্তাব হিসাবে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী কতকগুলি দেশকে একত্র প্রবেশাধিকার দানের প্রস্তাব আনয়ন করে। কিন্তু প্রথমে সোভিয়েট ইউনিয়ন সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। পরে সোভিয়েট ইউনিয়নই যখন সমবেতভাবে কতকগুলি রাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার দানের প্রস্তাব আনয়ন করে তখন পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী তাহাতে আপত্তি জানায়। অবশেষে বহু আলাপ-আলোচনার পর আঠারটি দেশকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দানের এক প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রমুখ সকল উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রই সম্মতি দান করে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে ফরমোসার প্রতিনিধির ভেটো প্রয়োগের ফলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবার উপক্রম হয়। যাহা হউক, পরে প্রধানতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের উদ্যোগে উক্ত আঠারটি দেশের মধ্যে ষোলটি দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যপদ লাভে সমর্থ হয়। এই ষোলটি দেশ হইতেছে আলবানিয়া, জর্ডান, আয়ার্লণ্ড, পর্তুগাল, হাঙ্গেরী, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া, বুলগারিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সিংহল, নেপাল, লিবিয়া, কাম্বোডিয়া, লাওস ও স্পেন। এই সকল নূতন সদস্য গ্রহণের ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বর্ত্তমান সদস্যসংখ্যা হইল ৭৬।

সদস্যপদের জন্য প্রস্তাবিত আঠারটি রাষ্ট্রের মধ্যে বহির্মঙ্গোলিয়া ও জাপান বাদ পড়ে। ফরমোসার কুয়োমিনটাঙ প্রতিনিধি বহির্মঙ্গোলিয়ার সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধসত্ত্বেও চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধি ভেটো প্রদানে বিরত থাকেন নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সামরিক জোট

পার্ল হারবারে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তিসংস্থার (সিয়াটো) অধীন সামরিক শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের এক সম্মেলনে উক্ত সংস্থার সদস্য শ্রেণীভুক্ত আটটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ করিয়া একটি খসড়া প্রস্তাব রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আগামী জানুয়ারী মাসে সামরিক উপদেষ্টাগণের মেলবোর্ণ সম্মেলনে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে। প্রস্তাবটিতে সুপারিশ করা হইয়াছে:

১। ঊর্দ্ধতন ও অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারীদের সম্মিলিতভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য সামরিক পর্য্যবেক্ষক বিনিময়ের জন্য দুই বা ততোধিক সদস্য-রাষ্ট্রের সামরিক শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমে শুধু বৈঠক হইবে পরে অবশ্য সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়কতায় স্থল, জল ও নৌবাহিনীর কুচকাওয়াজ হইতে পারে।

২। বিভিন্ন দেশে সামরিক শিক্ষাব্যাপারে যে পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে সে সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সম্ভব হইলে চুক্তিসংস্থার অধীন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র তাহারা যে কুচকাওয়াজ করিয়া থাকেন তাহা মিলিতভাবে করিতে পারেন।

৩। পরস্পরের সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ পরিকল্পনায় চুক্তিসংস্থার সদস্য কোন রাষ্ট্রের সামরিক কর্ম্মচারী অন্য কোন একটি সদস্যরাষ্ট্রে যাইয়া অতিরিক্ত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসম্পাদনে উৎসাহদান করা হইবে যাহাতে সম্মিলিত কুচকাওয়াজের সুবিধা হইতে পারে।

৯ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তিসংস্থা ভারতীয় সার্ব্বভৌমত্বের হানিকারক এবং উহা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীমেনন আরও বলেন যে, এই সকল যুদ্ধচুক্তি দ্বারা ভারতবর্ষ ভারতের চারিদিক হইতে কতকগুলি সশস্ত্র রাষ্ট্রদ্বারা পরিবেষ্টিত হইতেছে।

শ্রীমেনন বলেন যে, নির্দিষ্ট সীমারেখার অন্তর্গত সকল রাষ্ট্রের সংরক্ষণের ভার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা (সিয়াটো) নিজের উপর তুলিয়া লইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমত্বের

উপর আঘাত পড়িয়াছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের সংরক্ষণের ভার নিজ স্কন্ধে লইবার অপর কোন রাষ্ট্রের থাকিতে পারে না।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতের নৌবাহিনী এইরূপ শক্তিশালী নহে যে তাহা অন্যান্য রাষ্ট্রের নৌবাহিনীর সহিত পাল্লা দিতে পারে। তথাপি ভারতের উপকূলের একদিকে অষ্ট্রেলিয়া নৌবাহিনী এবং অপরদিকে মার্কিন নৌবাহিনী ঘিরিয়া রহিয়াছে। অবশ্য এ সকল রাষ্ট্রের কোনটিই বর্ত্তমানে ভারতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টাকে যুদ্ধাস্ত্রদ্বারা প্রভাবিত করিবার উহা একটি প্রচেষ্টা। ভারতের কর্তৃত্ব এবং আত্মসম্মানের পক্ষে এই যুদ্ধসজ্জা অবমাননাকর।

রুশ-যুগোশ্লাভ সম্পর্ক

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "প্রাভদা"য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের পথে যুগোশ্লাভিয়ার অগ্রগতিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণরাষ্ট্রগুলির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে, যে সকল মৌলিক অবস্থা যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিতে সাহায্য করিতেছে তাহাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হইল সোভিয়েট-যুগোশ্লাভ মৈত্রী।

যুগোশ্লাভিয়ার সরকারী মুখপত্র "বোরবা" সম্প্রতি "প্রাভদা"র উপরোক্ত মন্তব্যের উপর এক সংশোধনী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। "বোরবা" লিখিতেছেন যে, বিশ্বশান্তি রক্ষায় সোভিয়েট-যুগোশ্লাভ সহযোগিতার সৃজনমূলক অবদানের জন্য যুগোশ্লাভিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করে। রুশ-যুগোশ্লাভ সম্পর্কের উন্নতি এবং ঐ দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার বিকাশের মধ্যে ঐ মনোভাবেরই প্রতিফলন লক্ষিত হয়। কিন্তু কোন দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির ব্যাপারে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ উপাদানগুলিই যে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে সেই সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে "প্রাভদা"র বক্তব্য ভ্রান্তিমূলক।

টিটো-বুলগানিন ঘোষণায় যে অংশে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র-বিকাশের বিভিন্ন ধরন প্রভৃতিকে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া বলা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "বোরবা" লিখিতেছেন, উহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সোভিয়েট এবং যুগোশ্লাভ নেতৃবৃন্দ স্পষ্টতই স্বীকার করেন যে, কোন দেশের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিতে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে।"'প্রাভদা'র এই ভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি কারণ উহা টিটো-বুলগানিন ঘোষণা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।"

নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে গবেষণা

বড় বড় শহরে এমন অনেক লোক রহিয়াছে যাহারা সমাজে মিশিতে পারে না। অনেক সময়েই দেখা যায় পার্ক বা ময়দানের কোণে বহু লোক একা একা পৃথক ভাবে বসিয়া থাকে এবং স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন থাকে। লণ্ডনে এইরূপ লোকদের সম্পর্কে একটি গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডনের তেইশটি নারী প্রতিষ্ঠান একটি পরিকল্পনা করিয়া এই সকল নিঃসঙ্গ লোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এই অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন হইতে দুই বৎসর লাগিবে। নিঃসঙ্গ নাগরিকদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা ছাড়াও যুদ্ধোত্তর-কালে "পেন-ফ্রেণ্ড" এবং সঙ্গীর জন্য বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কেও পর্য্যালোচনা করা হইবে।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, ২৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই নিঃসঙ্গতার মনোভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। পেশাগত দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মী অপেক্ষা অফিস কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই এই মনোভাব অধিকতর প্রকট।

আকাশের মানচিত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সমিতি এবং পালোমার পর্য্যবেক্ষণাগার এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সনে আকাশের একটি মানচিত্র প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হয়। সম্প্রতি এই মানচিত্রের প্রথম অংশের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রকাশ যে, ১৯৫৭ সনের মধ্যে মানচিত্রটি সম্পূর্ণ হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়ায় অবস্থিত পালোমার পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে আকাশের যতটুকু অংশ (প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ) দেখা যায় মানচিত্রে তাহারই বর্ণনা থাকিবে।

ভারতীয় নারীদের সন্তানধারণ-ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় নারীদের সন্তানধারণ-ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, এমন কি জাপানের নারীদের অপেক্ষাও বেশী এবং তাহাদের সন্তানধারণ-ক্ষমতার একটি বিশেষ ধারা আছে—সমগ্র দেশে জন্ম-মৃত্যু হারের নমুনা পর্য্যবেক্ষণের পর ভারতের রেজিষ্ট্রার-জেনারেল উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। ১৯৫২ সনে গৃহীত এক পরিকল্পনা অনুযায়ী মহীশূর, হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ভূপাল এবং দিল্লী ব্যতীত ভারতের সকল রাজ্যের প্রায় ২৭ কোটি ৮৩ লক্ষ অথবা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭৮ শতাংশের লোকের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু হারের নমুনা সমীক্ষণ চালান হয়।

ভারতে ১৫-১৯ বৎসর বয়স্কাদের সন্তানধারণ-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম; ২০-২৪ বৎসর বয়স্কাদের মধ্যে সন্তানধারণ সংখ্যা সর্ব্বাধিক, ২৫-২৯ বৎসরের নারীদের মধ্যে সন্তানধারণ আর একটু বাড়ে, তারপরই কমিতে আরম্ভ করে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে ৪০-৪৪ বৎসরে এবং ৪৫-৪৯ বৎসরের নারীদের সন্তান হয় অনেক বেশী।

রাজ্যসীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন

শ্রীচুণীলাল রায়

প্রদেশসীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের অভিমতগুলি যে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার প্রতি অতিশয় অবিচার করিয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, সম্ভবতঃ বিহার ও আসামেও নাই, যদিও স্বার্থের খাতিরে বিহার ও আসাম মুখে অন্যরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন (প্যারাগ্রাফ ৬২৫) যে, পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া গেলে, ধলভূমের (ও ধলভূমান্তর্গত জামসেদপুরের) সহিত বিহারের সান্নিধ্য থাকে না; তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছেন (প্যারাগ্রাফ ৬৬৭) যে, ধলভূমে বাংলাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের মাতৃভাষা ও সরাইকেলা খরসাঁওয়া চাঁইবাসা অঞ্চলে, হোভাষা ও উড়িয়া ভাষারই প্রাধান্য, তথাপি তাঁহারা রায় দিয়াছেন যে, জামসেদপুর শহর ও ধলভূমের বক্রী ১১৫০ বর্গমাইলও বিহার রাজ্যেই থাকিবে এবং ইহা সম্ভবপর করিবার জন্য সরাইকেলা খারসাঁওয়া চাঁইবাসাকেও বিহারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। আদুরে গোপালকে ননী দিতেই হইবে, তাহাতে আর কাহারও উপর অন্যায় অবিচার হয় তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, এই নীতিই কমিশন মানিয়া লইয়াছেন।

ধলভূমের একটি মহল—পরিহাটি মহল—যে এখনও পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত, এ কথা সম্ভবতঃ কমিশনের জানা ছিল না। জানা থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয় বলিতেন যে, পরিহাটি মহলটিও পশ্চিমবঙ্গ হইতে কাটিয়া লইয়া বিহারে সংযুক্ত করা হউক। এ কথা না বলিবার অপর একটি কারণও থাকিতে পারে—এই পরিহাটী মহলের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহারা ত আর বলিতে পারিতেন না যে, বাংলার সহিত ধলভূমের সংযোগ অতিশয় tenuous বা আকস্মিক। পরিহাটীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কিন্তু tenuous এই বিশেষণটির যৌক্তিকতা কিছুমাত্রই নাই। আইন-ই-আকবরীতে ধলভূমের উল্লেখ আছে—সুবা বাংলার সরকার-মাদারণের অন্তর্গত চাকলা মেদিনীপুরের বলিয়াছে (জ্যারেটের অনুবাদ, ১৪১ পৃষ্ঠা)। ১৭৬০ সনে যখন বাংলার নবাব সুবা বাংলার অন্তর্গত চব্বিশ পরগণা, বর্দ্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই চারিটি জেলা ইংরেজকে দিলেন, তখন যে মেদিনীপুরের পশ্চিম সীমা একেবারে সিং রাজাদের রাজ্য (আধুনিক সরাইকেলা, খরসাঁওয়া, পোড়াহাট, যে রাজ্য ১৮১৮ সনের পূর্ব্বে কেহই অধিকার করিতে পারে নাই, মোগলরা পারে নাই, মহারাষ্ট্রীয়েরা পারে নাই) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং ধলভূম মেদিনীপুরের অন্তর্গতই ছিল, তাহা রেনেলের মানচিত্র দেখিলেই বুঝা যায়। আরও পরিষ্কার বুঝা যায় অন্য একটি মানচিত্রে—Map of the Acquisitions of British Territories in Bengal and the Burmese Provinces; এই মানচিত্রটি ১৮৬২ সনের এচিসন সাহেবের "Treaties, Engagements Sunudicds" নামক পুস্তকের মুখপত্র স্বরূপ ছিল।

যখন ধলভূমে চুয়াড় বিদ্রোহ হইল, তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার রিপোর্ট উপরওয়ালাদের নিকট দিতে লাগিলেন। ১৮৩৩ সনের ১৩নং রেগুলেশনে স্পষ্ট লেখা আছে—"মেদিনীপুর জেলা অন্তর্গত ধলভূম।" এই ১৮৩৩ সনে ধলভূমকে মানভূম জেলার সহিত সংযোজিত করা হইল। ১৭৬৫ সন হইতে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ধলভূম এ কথা যে সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহা একেবারেই অলীক কথা। ১৮৫৪ সনের পূর্ব্বে ছোটনাগপুর বলিলে কেবলমাত্র রাঁচীর মহারাজার রাজ্য বা জমিদারীই বুঝাইত। এই জমিদারী কেবলমাত্র রাঁচী ও পালামৌ জেলার অন্তর্ভুক্ত। ১৮৪৫-৪৬ সনে পুরুলিয়া আদালতে কার্য্যাধিক্যের জন্য ধলভূমকে পুরুলিয়া হইতে সরাইয়া সিং রাজাদের দেশের সহিত লাগাইয়া দেওয়া হইল ও সিংভূম নামটি ধলভূম পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ধলভূম এবং মানভূমের দেওয়ানী ও সেশন্স বিচার হইতে লাগিল বঙ্গদেশান্তর্গত বাঁকুড়া জেলার জজ-বাহাদুরের কাছে। এই বন্দোবস্ত বলবৎ ছিল ১৯১০ সন পর্য্যন্ত। এই সব সত্ত্বেও যদি বাংলার সঙ্গে ধলভূমের সংযোগ লাগাও (continuous) না হইয়া আকস্মিক (tenuous) হয়, তাহা হইলে আর কি বলা যায়। গায়ের জোরে যাহা কিছু বলা চলে, মানুষ মাথা নীচু করিয়া পা উপরে করিয়া হাঁটে, এ কথাও ত বলা চলে।

অন্যান্য যে সব অবিচার বাংলার উপর হইয়াছে তাহার বিস্তৃত ফিরিস্তি পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় গত কয়েক দিবসের অধিবেশনে হইয়া গিয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বিশেষ লাভ নাই; কেবলমাত্র যে কয়টি তথ্য খুব স্পষ্ট-ভাবে বিধানসভায় বিবৃত হয় নাই, তাহারই উল্লেখ করিব। এইগুলির মধ্যে প্রথম কথা—

১। পুরুলিয়াকে জামশেদপুর ও ধলভূম হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না

জামশেদপুর কারখানার কাজ চালাইবার জন্য যে পুরুলিয়ার অন্তর্গত বরবাজার থানার এক স্থান হইতে জল আসে সে কথা সম্ভবতঃ কমিশনের জানা ছিল না। জানা থাকিলে—

এই অঞ্চলও নিশ্চয়, চাষ থানারই মত, পুরুলিয়া হইতে ছাঁটিয়া বাহির করিবার অভিমত দিতেন। সিঙ্গাপুর ইংরেজের একটি অতি সুদৃঢ় ঘাটি বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু জলসরবরাহের বন্দোবস্ত ছিল প্রায় কুড়ি মাইল দূর হইতে, এই ছিদ্র পাইয়া জাপানীরা সিঙ্গাপুর দখল করিতে পারিয়াছিল চার পাঁচ দিনের মধ্যে। জামশেদপুরের উপর ও জামশেদপুরের জলসরবরাহের উপর দুইটি পৃথক রাজ্যের অধিকার একেবারেই সমীচীন নহে।

জামশেদপুর হইতে অন্নসংস্থান হয় পুরুলিয়ার ১০ হাজার লোকের (১৯৫১ আদম সুমারীর জন্মস্থান তালিকায় আছে ৯,৭৭১), ভারতবর্ষের আর কোন জেলা হইতে এত লোক জামশেদপুরে আসে না। জামশেদপুর-বহিঃস্থ ধলভূমেরও অন্ততঃ ২৫ হাজার লোকের অন্নসংস্থান হয় এই জামশেদপুর হইতে (জামশেদপুরে বাংলাভাষীর সংখ্যা ৫৫ হাজার, বঙ্গদেশ হইতে সিংভূমে আগতের সংখ্যা ২৭ হাজার)। পুরুলিয়া ও জামশেদপুর-বহিঃস্থ ধলভূমকে জামশেদপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে—এই ২৮ হাজার লোকের অন্ন মারিয়া দেওয়া। বিহারের নাম আছে কংগ্রেস-অনুগত রাজ্য বলিয়া, সেই জন্যই বোধ হয় কংগ্রেসের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিতে বিহারের কিছুমাত্র কুণ্ঠা নাই। ১৯৩৯ সনে বার্দ্দোলীতে যে কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীনে সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার অন্যতম নির্দ্দেশ ছিল যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মচারীরা কোন্ প্রদেশের অধিবাসী সে সম্বন্ধে প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না, কিন্তু বিহার সরকার ধানবাদের প্রত্যেক কয়লাখনির মালিককে বারে বারে চিঠি দিয়াছেন যে, বিহারী পাওয়া গেলে যেন অন্য প্রদেশের লোক রাখা না হয়, আর জামশেদপুরের উপর জোর দিয়া বিহারে একটি সার্ভিস কমিশন বসাইয়া দিয়াছেন, যাহার নীতি হইল :

"A Bihari with only minimum qualifications is preferable to any outsider with superior qualifications."

অর্থাৎ, নিম্নতম যোগ্যতা থাকিলেই বিহারীরা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন অ-বিহারীদের অপেক্ষা চাকরীর উপযুক্ত বিবেচিত হইবে।

বহু অ-বিহারী যে তবুও ধানবাদের কয়লাখনিতে ও জামশেদপুরের কারখানায় চাকরী পায়, তাহার একমাত্র কারণ যে, নিম্নতম যোগ্যতাসম্পন্ন বিহারীর সংখ্যাও অতি সামান্য।

জামশেদপুরের আর একটি বন্দোবস্তের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জামশেদপুর হইতে বিহার সরকারে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়, তাহাতে শ্রমিকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখাইতে হয়—এক শ্রেণী যথার্থ-বিহারের (Bihar proper), অন্য শ্রেণী যথার্থ-বিহারের বাহিরের অর্থাৎ ছোটনাগপুর বিভাগ ও সাঁওতাল পরগণার। এই পার্থক্য সর্ব্বদা কর্ত্তৃপক্ষের মনে থাকিলে যে পৃথক ঝাড়খণ্ডের দাবী হইতে থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বাংলা দেশ এইরূপ পার্থক্য করে না, বঙ্গের এক জেলা ও অন্য জেলার মধ্যে ত নয়ই, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাঙালী ও অবাঙালী কর্ম্মচারীর মধ্যেও নয়।

২। সরাইকেলা অন্তর্গত কাণ্ডরা থানা

সরাইকেলার ৪৪ হাজার বাঙালীর মধ্যে আন্দাজ ২০ হাজার একত্র হইয়া আছে উত্তরপূর্ব্ব কোণে, জামশেদপুরের অব্যবহিত পশ্চিমে, পুরুলিয়ার চাণ্ডিল থানার অব্যবহিত দক্ষিণে, গমহারিয়া কাণ্ডরা, সিনি এই তিনটি রেলষ্টেশনের ধারে, কাণ্ডরা নামক থানায়। এই থানায় অপর ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ১০ হাজার, এই কারণে এই অঞ্চলটুকুও ধলভূম, জামশেদপুরের সহিত পশ্চিমবঙ্গে আসা উচিত। সরাইকেলার এক রাজকুমার যে মেমোরাণ্ডাম দাখিল করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে, এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়া বিহারকে ধলভূমে প্রবেশ পথ দিয়া বক্রী সরাইকেলা উড়িষ্যাকে দেওয়া হউক। ইহার বিশেষভাবে প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। কাণ্ডরা থানা বিহারে থাকার কোন কারণ নাই, উড়িষ্যায় যাওয়ারও কোন যৌক্তিকতা নাই, ইহা বাংলারই প্রাপ্য। সরাইকেলার বক্রী অংশে বাংলাভাষী ছড়াইয়া আছে, উড়িয়াভাষীরই প্রাধান্য, হিন্দীভাষী অতি সামান্য—সমগ্র সরাইকেলা মহকুমায় ২৩,৬৩৩ (১৯৩০ আদমসুমারীতে ছিল ১০,২২১ মাত্র)। ইহা বিহারে থাকা উচিত নহে, উড়িষ্যায় যাওয়া উচিত।

৩। ধানবাদের পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ

ধানবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগেই ঝরিয়া কয়লাখনিগুলি অবস্থিত। এই কয়লাখনিতেই বহুসংখ্যক হিন্দী ভাষা-ভাষী লোক কাজ করিতে আসে। এই হিন্দীভাষী শ্রমিক[illegible] অধিকাংশই ভাসমান জাতীয় (floating population), তাহারা স্বদেশের সহিত নিবিড় সম্পর্ক রাখিয়া থাকে। [illegible]বাদের মধ্যে ঘরবাড়ী করিবার কোন চেষ্টা তাহাদের [illegible] কয়লাখাদের ধাওড়ায় বাস করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট। [illegible] ভাসমান লোকসংখ্যার জন্যই পশ্চিম ধানবাদ ও পূর্ব্ব ধান[illegible] বিশেষ প্রভেদ। পূর্ব্ব ধানবাদের একেবারে শেষ পূর্ব্ব [illegible]

কয়েকটি কয়লাখাদ আছে (রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের অন্তর্গত), কিন্তু সেগুলির শ্রমিকরা অধিকাংশই স্থানীয় লোক। তাহারা কয়লাখনির ধাওড়াতে বাস করে না, প্রত্যহ স্বগ্রামের বাসস্থান হইতে আসা-যাওয়া করে। ১৯৪৭ সনে আসামের চা-বাগানের 'কুলী'দিগকে "ভাসমান" বিধায় ভোট দিতে দেওয়া হয় নাই—এবারেও সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের সীমানা স্থির করিবার জন্য ভাসমানদের কথা ভাবার প্রয়োজন নাই স্থির করিয়াছেন (২৯৫ প্যারাগ্রাফ)। কিন্তু ধানবাদের ভাসমান হিন্দীভাষীর কথা তাঁহারা ত উড়াইলেন না, কর্ত্তৃপক্ষও যে উড়াইয়া দিতে রাজী হইবেন তাহা মনে হয় না। সেই জন্য এই "ভাসমান"গণকে ধানবাদেরই অধিবাসী ধরিয়া বিচার করার প্রয়োজনীয়তা মনে হইতেছে। ভাসমান বাদ দিলে কি সংখ্যা দাঁড়ায়, তাহারও কথা পরে বলা হইতেছে।

ধানবাদের পূর্ব্বতম থানা নিরশা (চিরকুণ্ডাসমেত) ও পূর্ব্বোত্তরতম থানা টুণ্ডি যে প্রধানতঃ বাংলাভাষী তাহা কর্ত্তৃপক্ষও স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই থানার সেটেলমেন্টের কাগজপত্র হিন্দীতে হইবে এই হুকুম জারী করিবার পরে সেই হুকুম নাকচ করিতে হইয়াছিল। এই দুই থানার মধ্যবর্ত্তী গোবিন্দপুর থানা এবং ঝরিয়া থানার সিন্দ্রী ও বালিয়াপুর ফাঁড়ি, এখানে কয়লা নাই বলিয়া এগুলিতেও বিদেশী আমদানী হয় নাই, এই কারণে নিরশা ও টুণ্ডির সঙ্গে গোবিন্দপুর, বালিয়াপুর ও সিন্দ্রির সেটেলমেণ্ট কাগজে হিন্দীর হুকুম নাকচ করা উচিত ছিল, কিন্তু গাজুরীতে তাহা করা হয় নাই। পরে দেখা গেল যে, হিন্দী কাগজপত্র কেহ বুঝিতেই পারিতেছে না। পশ্চিম ধানবাদেও প্রায় সেই রূপই অবস্থা। (১৯১৬-২৫ সেটেলমেণ্ট রিপোর্টের ৪৩ পৃষ্ঠা, ৭৯ প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য।)

"ভাসমানে"র সংখ্যা পশ্চিম ধানবাদেই অধিক, পূর্ব্ব ধানবাদে কম, সুতরাং পূর্ব্ব ধানবাদে বাংলা ভাষারই প্রাধান্য সম্ভব, ইহা বুঝিয়া বিহারের সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পৃথক করিয়া পূর্ব্ব ধানবাদ ও পশ্চিম ধানবাদের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সংখ্যা দিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী কাগজ হইতে সহজেই প্রমাণ করা যায় প্রভেদ কত অধিক। ধানবাদের অব্যবহিত দক্ষিণে সদর মহকুমার দুইটি থানা, পূর্ব্বদিকে রঘুনাথপুর (সাঁতুড়ী ও নেতুড়িয়া সংযুক্ত), পশ্চিমে চন্দনকেয়ারী সংযুক্ত চাষ থানা। এগুলির বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা পৃথক করিয়া এখানে দেওয়া হইল—

শতকরা	বাংলা	হিন্দী	সাঁওতালী
রঘুনাথপুর	৫৭·৩	২৩·৮	১৮·৭
চাষ	২২·৬	৭১·৪	৫·৬
প্রভেদ	৩৪·৭	৪৭·৬	১৩·১

পূর্ব্ব পুরুলিয়ার বাংলা যদি পশ্চিম পুরুলিয়া হইতে শতকরা ৩৪·৭ বেশী হয়, ও হিন্দী পশ্চিম পুরুলিয়ার হিন্দী অপেক্ষা ৪৭·৮ কম হয়, তাহা হইলে যে এইরূপই প্রভেদ পূর্ব্ব ধানবাদ ও পশ্চিম ধানবাদের মধ্যে থাকিবে, ইহাই কি যুক্তিযুক্ত নহে?

কাহার কি জীবিকা-উপার্জ্জনের বৃত্তি সে সম্বন্ধে যে সরকারী পরিসংখ্যান আছে, তাহাতেও ঐরূপই অনুমান করিতে হয়। কয়লাখনির ও রেলের কর্ম্মচারীরা "Production other than agriculture" বা "কৃষি-অতিরিক্ত উৎপাদন" শ্রেণীতে পড়িয়াছে। পশ্চিম ধানবাদের সমগ্র লোকসংখ্যা ৪,৩৭,১৬১-এর মধ্যে এই শ্রেণীতে পড়িয়াছে ২,০৯,৭৬৭ অর্থাৎ শতকরা ৪৮। পূর্ব্ব ধানবাদের ২,৯৪,৪৩৯-এর মধ্যে এই শ্রেণীতে মাত্র ৩৩,৫১৮ জন, শতকরা ১২ জনেরও কম। এই কয়লাখাদ ও রেলকর্ম্মচারী লইয়াই ত হিন্দীভাষী—হিন্দীভাষীর আতিশয্য যে পশ্চিম ধানবাদেই তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। পূর্ব্ব ধানবাদ ও পশ্চিম ধানবাদ উভয়ের একসঙ্গে হিসাব ধরিলে হিন্দীভাষী শতকরা ৬৫, বাংলাভাষী শতকরা ২৫। ইহা নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পশ্চিম ধানবাদে হিন্দীভাষী শতকরা অন্ততঃ ৮০।৮২ জন, পূর্ব্ব ধানবাদে ৩৫ জনের বেশী নহে। আর বাংলাভাষী পূর্ব্ব ধানবাদে ৪৫-৪৭ জনের কম নহে, পশ্চিম ধানবাদে মাত্র ১২।১৩ জন; সাঁওতাল পশ্চিমে ৫ জনের অধিক নহে, পূর্ব্বে ১৮ জনের কম নহে। আর এই সাঁওতালদের মধ্যে বহু লোক দ্বিভাষী, তাহারা সাঁওতালীও বলে, বাংলাও বলে। তাহাদের ধরিলে পূর্ব্ব ধানবাদে বাংলাভাষীর সংখ্যা শতকরা ৫০ জনের উপর। যদি "ভাসমান"দের হিসাব ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব ধানবাদে বাংলাভাষী অন্ততঃ ৬৫।৭০ দাঁড়াইবে, পশ্চিম ধানবাদে অন্ততঃ ৪৫।৫০; হিন্দীভাষী পূর্ব্ব ধানবাদে আন্দাজ ২০, পশ্চিম ধানবাদে আন্দাজ ৪০।৪৫। "ভাসমান"দের হিসাবে আনিলেও ত পূর্ব্ব ধানবাদকে বাংলা দেশে দেওয়া উচিত। যদি সদর মহকুমার চাষ থানা বাহির করিয়া লওয়া চলে, তাহা হইলে ধানবাদের পূর্ব্বভাগ কেন পৃথক করিয়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গে মিশাইয়া দিতে পারা যাইবে না?

ডি-ভি-সির দুইটি বাঁধের একটি করিয়া মুখ এই পূর্ব্ব ধানবাদের মধ্যে। মাইথনের দক্ষিণ মুখ পূর্ব্ব ধানবাদে, কিন্তু উত্তর মুখ বাংলার [illegible]

মুখ পূর্ব্ব ধানবাদে, দক্ষিণ মুখ রঘুনাথপুর থানায়, যাহা এখন বিহারের অন্তর্গত, কিন্তু এবারে আসিবে পশ্চিমবঙ্গে। একই বাঁধের দুই মুখ দুই প্রদেশে ইহা কি ভাল বন্দোবস্ত? এই কারণেও ত বাঙালীবহুল পূর্ব্ব ধানবাদকে পশ্চিমবঙ্গে দিয়া দেওয়া উচিত।

পশ্চিম ধানবাদের ভাসমান জনসংখ্যা যদি গণনাতে না লওয়া যায়, তাহা হইলে এখানেও যে বাংলা ভাষারই প্রাধান্য, তাহার বেশ প্রমাণ দেওয়া যায়, গ্রিয়ারসন সাহেবের উক্তিতে। গ্রাণ্ড কর্ড লাইন খুলিয়া যখন বিহার হইতে লোক অধিকসংখ্যায় আসিতে আরম্ভ করিল, তাহার ২।১ বৎসরের মধ্যেই গ্রিয়ারসন এই মর্ম্মে লিখিলেন:

"বাংলা ভাষার বিস্তার হাজারীবাগের ও রাঁচীর উপত্যকার সানুদেশ পর্য্যন্ত। ইহাও ঠিক যে, ঐ মালভূমি হইতে কিছু লোক আসিয়া এই নিম্নদেশে বাস করিতেছে। তাহারা একটা মিশ্রিত ভাষা বলে যাহা মূলতঃ বিহারী, কিন্তু একটু অদ্ভুতরকম বাংলা মিশ্রিত। এই মিশ্রিত ভাষা স্থানীয় ভাষা নহে, ইহা অজানা লোকের অজানা ভাষা (It is the voice of a strange people in a strange land)। এই আগন্তুকদিগের চতুষ্পার্শ্বে, এবং সাধারণতঃ তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায়, যথার্থ স্থানীয় লোকেরা বাস করে, যাহারা অনেকাংশে খাঁটি বাংলাই ব্যবহার করিয়া থাকে।"

ঐ অদ্ভুত ভাষাভাষীরা কিন্তু সাধারণতঃ ভাসমানজাতীয় ছিল না—তাহারা মালভূমি হইতে নামিয়া নিম্নভূমিতেই বসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরের ৫০ বৎসরে আসিয়াছে অধিকাংশই "ভাসমান"জাতীয়; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এত অধিক (২।৩ লক্ষেরও উপর) এবং তাহাদের সমর্থকও এত বেশী ও এত শক্তিশালী যে আর শুধু ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিম ধানবাদের উপর বাংলা দেশের দাবি টিঁকিবার আশা করা বৃথা।

কিন্তু ভাষার ভিত্তি ছাড়াও অন্য সমীচীন কারণ আছে, যাহার উপর নির্ভর করিতেছে শুধু বাংলা দেশের স্বার্থ নহে, সমগ্র ভারতের স্বার্থ। ভারতের এখনকার অবস্থায়, industrialisation বা শিল্পকরণের প্রয়োজন খুবই অধিক। এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে আজ কলিকাতাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিল্পাঞ্চল। শিল্প বজায় রাখিতে হইলে, কয়লার প্রয়োজন কলিকাতাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পশ্চিম বাংলার মধ্যে একমাত্র কয়লার জমি রাণীগঞ্জক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রেরও সামান্য অংশ বিহারে ঢুকিয়া গিয়াছে—পূর্ব্ব ধানবাদের নিরশা থানায়। রাণীগঞ্জক্ষেত্রের কয়লা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে; ঝরিয়াক্ষেত্র পশ্চিম বাংলার আয়ত্তে না থাকিলে, কলিকাতার শিল্প ও সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতের সমৃদ্ধির হানি হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। ঝরিয়াক্ষেত্র ছাড়িয়া দিলেও বিহারে যে কয়লাক্ষেত্র থাকিয়া যাইবে, প্রধানতঃ রাঁচী হাজারিবাগ ও পালামৌ জেলায়, তাহার পরিমাণ খুবই বেশী —১,১০০ কোটি টন। বিহারকে পুরাদস্তুর শিল্পাঞ্চল করিয়া ফেলিতে পারিলেও এই ১,১০০ কোটি টন ১০০ বৎসরেও নিঃশেষ হইবে না। ঝরিয়ার মাত্র ২৫০ কোটি টন (অথবা রাজমহলের যৎসামান্য, সম্ভবতঃ ১ কোটিরও অনধিক) ছাড়িয়া দিলে, বিহারের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে না। কয়েক-মাস পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত লোহা ও ইস্পাতের কারখানা খোলা প্রসঙ্গে বিহার সরকার বলিয়াছিলেন যে, কারখানা যদি সিন্দ্রিতে মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে ঝরিয়া-ক্ষেত্রের কয়লাতেই চলিবে; কিন্তু যদি বোকারোতে মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ঝরিয়ার কয়লার উপর নির্ভর করিতে হইবে না, হাজারীবাগ, রাঁচীর কয়লাতেই চলিবে। বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী আসিতেছে বোকারোতেই লৌহ-ইস্পাতের কারখানা খোলা সম্পর্কে। ফলে, বিহারের পক্ষে ঝরিয়াক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া যাইবে। ঝরিয়াক্ষেত্র ছাড়িয়া দিলে বিহারের ক্ষতি খুব বেশী হইবে না। এসব বিবেচনাতেও যদি বিহার এবং বিহারের সমর্থকগণ ও কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ঝরিয়াক্ষেত্র বিহার হইতে কোন প্রকারে ছাঁটা যাইবে না, তাহা হইলে পশ্চিম বাংলাকে বলিতে হইবে "পশ্চিম ধানবাদের দাবি ছাড়িয়া দিব, যদি বিহারের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়, কারণ ঝরিয়াক্ষেত্রের সহিত বিহারের সান্নিধ্য আছে।" আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, "জামশেদপুর ছাড়িব, যদি বিহারের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হয়।" আমি কিন্তু আমার ক্ষীণ কণ্ঠ উচ্চ করিয়া বলিব, "জামশেদপুর কিছুতেই ছাড়া চলে না, এবং সান্নিধ্য না থাকায় জামশেদপুরের উপর বিহারের দাবি চলিতে পারে না।" পশ্চিম ধানবাদ বিহারের প্রয়োজনের খাতিরে ছাড়িয়া দিলে, পশ্চিমবঙ্গ বহু কষ্টে কোনগতিকে চালাইয়া লইবে। জামসেদপুর বিহারে রাখিয়া, পুরুলিয়া ও গ্রাম্য ধলভূমকে পশ্চিমবঙ্গে ঠেলিয়া দেওয়ার অর্থ দাঁড়াইবে—পুরুলিয়া ও গ্রাম্য ধলভূমের গলা টিপিয়া মারা। ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্র ছাড়িয়াও বহু কষ্টেসৃষ্টে পুরুলিয়া টিকিতে পারে, কিন্তু জামশেদপুর ছাড়া অসম্ভব। পূর্ব্ব ধানবাদকে অবশ্য বঙ্গদেশে আনিতে হইবে।

৪। বাস্তুহারার পুনর্ব্বসতি সর্ব্বভারতীয় দায়িত্ব, কেবল পশ্চিমবঙ্গের নহে

আর একটি বড় কথা এই সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সেই বড় কথাটি এই যে, পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে বাস্তু

হীনদের বসবাসের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, অর্থাৎ সমগ্র ভারতের, কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ দাঁড়াইতেছে এই সর্ব্ব-ভারতীয় বোঝার প্রায় সমস্ত ভার (আন্দাজ ৪০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩৫ লক্ষের ভার) পশ্চিমবঙ্গকেই বহিতে হইতেছে। অন্যান্য রাজ্য মুখে খুব দরদ দেখাইতেছেন, কিন্তু কার্যাতঃ ত্রিপুরা ব্যতীত কেহই ৮, ১০, ২০, ৩০, ৩২ হাজার একরের অধিক জমি ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন, পশ্চিম-বঙ্গ ও ত্রিপুরা ব্যতীত সমগ্র রাষ্ট্র মিলাইয়া ৫।৭ লক্ষের অধিক লোক পশ্চিমবঙ্গের ঘাড় হইতে যাইবার কোন আশাই দেখা যাইতেছে না। এ অবস্থায় কি বলা উচিত যে, সর্ব্বভারতীয় শহর জামশেদপুর ও সর্ব্বভারতীয় ধানবাদের উপর পশ্চিমবঙ্গের দাবী হইতেই পারে না, যে কথা কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের ৬৫৯ প্যারাগ্রাফে বলিয়াছেন? সর্ব্ব-ভারতীয় শহর ও সর্ব্বভারতীয় কয়লাক্ষেত্রের সঙ্গে বাস্তুহীন পুনর্ব্বসতির সর্ব্বভারতীয় ভার কেন লাগাইয়া দিতেছেন না? যদি তাঁহারা বলিতেন যে, বিহার জামশেদপুর রাখিবে, সমগ্র ধানবাদও রাখিবে এবং সেই সঙ্গে বিহার ২৫ লক্ষ বাস্তুহীনের পুনর্ব্বসতির ভার লইবে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গকে চুপ করিয়া থাকিতে বলা সাজিত। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় ভার বহুক পশ্চিমবঙ্গ, সর্ব্বভারতীয় শহর ও সর্ব্বভারতীয় কয়লা-ক্ষেত্র বিধায় জামশেদপুর ও সমগ্র ধানবাদ উভয়ই বিহারের কুক্ষিগত থাকুক, ইহা অপেক্ষা অবিচারের কথা হইতে পারে না। এই অবিচার কিছুমাত্র লাঘব করা যায়, যদি অখণ্ডিত বিহারকে দ্বিভাষী বলিয়া ঘোষিত করা হয়, ধলভূমের, সমগ্র মানভূমের, পূর্ব্ব সাঁওতাল পরগণার, পূর্ব্ব পূর্ণিয়ার স্থানীয় ভাষা বাংলা বলিয়াই ঘোষিত হয়। কিন্তু এই সামান্য জিনিষটিও ত কমিশন সুপারিশ করেন নাই। যদি কর্ত্তৃপক্ষ এই সব অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করেন তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, ভারতে বাঙালীর বন্ধু এখন কেহ নাই। আরও একবার এইরূপ ভাব হইয়াছিল, ১৯০৫ সনে যখন বঙ্গদেশ বিদেশীবর্জ্জন পণ গ্রহণ করিতে সকল প্রদেশকে অনুরোধ করে। কোন প্রদেশ রাজী হয় নাই, বাঙালীও বিদেশীবর্জ্জন পণ ছাড়ে নাই। সেই বিদেশীবর্জ্জনের ফলে অন্যান্য প্রদেশ আজ কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, বাঙালী ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে ফল পাইয়াছে অতি সামান্য, কিন্তু এখনও মরে নাই। আজ পুনরায় যদি সমগ্র ভারত পশ্চিমবঙ্গের দুর্বহ ভার বহনে দরদ না দেখায়, যদি বাংলার দাবী অগ্রাহ্য করে, সেটা ধর্ম্মাচরণ হইবে না, কিন্তু বাঙালী মরিবে না। পুরুলিয়ার দুই কান কাটিয়া বাংলায় ঠেলিয়া দেওয়া—পশ্চিমবঙ্গের দাবী মানা নহে, কেবলমাত্র ভার বাড়ান আর উর্দ্দু বোঝা চাপানো পূর্ণিয়ার ক্ষুদ্রাংশ দেওয়াও অনেকটা সেইরূপ।

৫। সাঁওতাল পরগণার বহুস্থানের ১৯২২-১৯৩৫ সনের সেটেলমেণ্ট রেকর্ড বিহার সরকারই বাংলা ভাষায় প্রস্তুত করাইয়াছিলেন

কোন অঞ্চলের রেকর্ড কোন ভাষায় হইয়াছিল ও সেই অঞ্চলের পূর্ব্ব সেটেলমেণ্টে কি ভাষা ব্যবহার হইয়াছিল তাহা ১৯২২-৩৫ সেটেলমেণ্টের রিপোর্ট হইতে দেখান যাইতেছে:

	১৯২২-১৯৩৫	পূর্ব্ব সেটেলমেণ্ট
জামতাড়া	বাংলা	বাংলা
পাকুড়, জমিদারী ও দামিন	"	"
দক্ষিণ দুমকা	"	"
সাহেবগঞ্জ ব্যতীত রাজমহল মহকুমার জমিদারী ও দামিন	"	"
দেওঘরের করণ তালুক	"	"
দেওঘরের বক্রী অংশ	হিন্দী	"
উত্তর দুমকা	"	বাংলা ও হিন্দী
দুমকা দামিন	"	বাংলা
রাজমহলের সাহেবগঞ্জ থানা	"	"
গডডা মহকুমা সমগ্র	"	হিন্দী

রিপোর্টে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, দুমকা মহকুমার কেশ্‌বী তালুকের ও দেওঘর মহকুমার সালদহ তালুকের প্রজাবৃন্দ বাংলা ভাষাতেই রেকর্ড প্রস্তুতের প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা মঞ্জুর করা হয় নাই।

৬। পূর্ব্ব পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণার অদ্ভুত সুমারী

সীমানির্দ্ধারণ কমিশন নিজেদের অভিজ্ঞতায় জানিলেন যে, পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বতম অংশের ভাষা কিসনগঞ্জিয়া অথবা শিরিপুরিয়ার ঘনিষ্ঠ-সাদৃশ্য আছে বাংলা ভাষার সহিত (রিপোর্টের ৬৪৮ প্যারা); আর বিহারের সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখিয়াছেন, "এ অঞ্চলে খুব শিক্ষিত মুসলমানদের বাদ দিলে বলিতে হয় যে উর্দ্দু ভাষা একেবারে অজ্ঞাত (practically unkuown), এবং জনসাধারণ, মুসলমান ও অমুসলমান সকলেই মিশ্রিত মৈথিলী-বাংলা ভাষাই ব্যবহার করে।" ইহাতেই কমিশনের বুঝা উচিত ছিল যে, ১৯৫১ সনের সুমারী অতিশয় অবিশ্বাস্য, কারণ এই সুমারীতে দেখান হইয়াছে যে, কিসনগঞ্জের অধিকাংশ লোক উর্দ্দুভাষী, ও বাংলাভাষীর সংখ্যা মাত্র ১৭,০৮৮। এই সুমারী কথিত উর্দ্দুভাষীদের উর্দ্দু শিক্ষার কি বন্দোবস্ত বিহার সরকার করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কমিশন অনুসন্ধান না করিয়াই, পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে উর্দ্দু শিক্ষাদানের ভার চাপাইয়াছেন। বিহার উর্দ্দু শিক্ষাদানের যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সেইটাই

বজায় রাখার অতিরিক্ত কিছু পশ্চিম বাংলাকে কেন করিতে হইবে ?

১৯৫১ সুমারীর সংখ্যাগুলি কত পরিমাণে অবিশ্বাস্য, তাহা ১৯৩১ সুমারীর সহিত পাশাপাশি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ১৯৩১ সনে জনৈক সবডিভিসনাল অফিসারের ফতোয়া অনুসারে কিসনগঞ্জিয়া বা শিরিপুরিয়াকে হিন্দী বলিয়া দেখান হইয়াছিল, ইহা সত্ত্বেও কিসনগঞ্জ মহকুমার বাংলা ভাষীর সংখ্যা দেখান হইয়াছিল ৫৯,৩৯৮ ; আর ১৯৫১ সনে সেই সংখ্যা নামিয়া গেল ১৭,০৮৮তে। আর সুদূর পশ্চিম আরারিয়া মহকুমার (যে আরারিয়ার নাম, বহু বাঙালীর নিকট ততই অপরিচিত, যত অপরিচিত ছিল ১৯০৮-৯ সনে, জামশেদপুরের সাঁকচী, জুগশলাই, বিষ্ণুপুর কালিমাটির নাম বিহারবাসীদের পক্ষে) বাঙালীর সংখ্যা ১৯৩১ সনের ১,২১০ হইতে এক লাফে ১২ গুণের অধিক ফুলিয়া ১৫,২৫৬ হইয়া গেল। কমিশন বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যতই যাওয়া যায়, ততই বাংলার সাদৃশ্য কমে ও মৈথিলীর হিন্দীর সাদৃশ্য বাড়ে (প্যারাগ্রাফ ৬৪৮) ; এবং ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সুমারী দেখাইলেন, বাংলাভাষীর সংখ্যা পূর্ব্বাঞ্চলে শতকরা ৭০ কমিয়া গেল ও পশ্চিমাঞ্চলে ফুলিয়া ১২ গুণ হইল !

পূর্ণিয়া জেলার সুমারীর কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। এই অঞ্চলের অংশ কিছু কাটিয়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গে জুড়িয়া দিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে রাজাগোপালাচারী মহাশয় লোক-সভায় ১৯৫১ সনে যে বক্তৃতা করেন, তাহার অধিক কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। আর রাজাগোপালাচারীর উপদেশ মত কাজ করিলে, যে সামান্য টুকরাটুকু সীমানির্দ্ধারণ কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাকে বাড়াইতে হয় উত্তরে অন্ততঃ মেচী নদী পর্য্যন্ত, দক্ষিণে বারসোই হইয়া মণিহারী ঘাট পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সীমা হইতে, পশ্চিমে বিহারমুখী হইয়া যাইতে থাকিলে যে ভাষার সাদৃশ্য বাংলা হইতে কমিতে থাকা ও হিন্দীর সহিত বাড়িতে থাকা স্বাভাবিক, এই নীতি ধরিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে সমগ্র ৭০।৮০ মাইলের গড়পড়তা অনুপাত অতি পূর্ব্বাঞ্চলেও খাটিতে পারে না, পশ্চিমতম অঞ্চলেও খাটিতে পারে না। পূর্ব্বতম অংশে বাংলার আনুমানিক অনুপাত দ্বিগুণ, হিন্দীর আনুমানিক অনুপাত অর্দ্ধ ধরা যাইতে পারে, পশ্চিমতম অংশে হিন্দী দ্বিগুণ ও বাংলা অর্দ্ধ। এই হিসাবে ১৯৫১ সনের সংখ্যাতেও সমগ্র রাজমহলের শতকরা ৩৭ হিন্দী ও ১৬ বাংলা দাঁড়ায়, পূর্ব্বতম অংশে (শুধু যেটাতেই পশ্চিমবঙ্গ সন্তুষ্ট হইতে পারে), শতকরা হিন্দী ১৯ ও ৩২ বাংলা, অর্থাৎ বাংলারই প্রাধান্য। পাকুড়ের হিন্দী ৩৮ ও বাংলা ১৬ শতাংশ প্রায় কিসনগঞ্জেরই মত অবিশ্বাস্য। ১৯৩১ সনে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল ৬৮,৭৯২, কমিয়া দাঁড়াইল ১৯৫১ সনে মাত্র ৩২,১২০। জামতাড়ার অবস্থা ততোধিক, ১৯৩১ সালের ৭৩,০৯১ নামিয়া গেল একেবারে ১৯৫১ সালের ১৮,৮৭৭। আর পশ্চিমস্থ মহকুমা দেওঘরে বাংলাভাষীর সংখ্যা ফুলিয়া গেল, তবে আরারিয়ার মত অধিক নয়, কেবলমাত্র তিন গুণ, ১৩,৬০৯ হইতে ৩৯,২১৭ গ্রাম্য অঞ্চলে ; দেওঘরে ও মধুপুর শহরে সম্ভবতঃ আরও ৫।৭ হাজার। এই সব দেখিয়া সাঁওতাল পরগণার ১৯৫১ সনের সংখ্যা একেবারেই অগ্রাহ্য করা উচিত, ১৯৩১ সনের সংখ্যার উপর ও সেটেলমেন্ট রেকর্ডের ভাষার উপরেই জোর দিতে হয়। ১৯৩১ সনের সুমারীতে ছিল

	বাংলা	হিন্দী
পাকুড়	৬৮,৭৯২	৪৪,৪৫৪
জামতাড়া	৭৩,০৯১	৭০,৩৬২

উভয় মহকুমাতেই বাংলার প্রাধান্য ছিল সমগ্র মহকুমার হিসাব ধরিলেও ; কেবল পূর্ব্বতম অঞ্চলে ত আরও অধিক প্রাধান্য নিশ্চিত। উভয় অঞ্চলেরই সমগ্রভাগের সেটেলমেণ্ট রেকর্ড হইয়াছিল বাংলায়। দুমকার দক্ষিণাংশের সেটেলমেণ্ট রেকর্ড বাংলায়, আর এই অংশেই ময়ূরাক্ষী নদীর উৎপত্তি-স্থলের মশানজোড় বাঁধ, সুতরাং ইহাও পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য।

সাঁওতাল পরগণা সুমারীর আর দুটি কথা বলিয়াই শেষ করিব। ১৯৩১ সনে মল্‌টোভাষীর সংখ্যা ছিল ৬৭,০৪২, পুরুষ ও স্ত্রী প্রায় সমান সমান ; ১৯৫১ সনে দেখান হইয়াছে পুরুষ মাত্র ৫৭৬৬, নারী ১৮,০৩৬, মোট ২৩,৮৫২, এখন কি প্রতি পুরুষকে তিনটি করিয়া স্ত্রী বিবাহ করিতে হইবে ? জামতাড়ায় সাঁওতালের সংখ্যা ছিল ৯৯,১২৭, বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ১৯৫১ সনে ১,৬২,৪৭৮। সেই সঙ্গে অব্যবহিত দক্ষিণস্থ ধানবাদে সাঁওতালের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে ৭৩,৩৭৭ হইতে ৪৯,২০৫তে। মানুষ এদেশ-ওদেশ ঘুরিয়া বেড়ায় ইহাই পূর্ব্বে জানা ছিল ; এখন দেখা যাইতেছে, মানুষ না নড়িলেও সংখ্যা প্রয়োজনমত এদিক-ওদিক চলিতে শিখিয়াছে (অথবা চালিত হইতেছে)। সিংভূম জেলার পশ্চিমাংশই উড়িষ্যা দাবি করিয়াছে, সেখানের উড়িয়ার সংখ্যা কমিয়াছে ১,৭৮,৪৫৩ হইতে ১,৫৪,০৮৮তে। আর পূর্ব্বাংশ ধলভূম পশ্চিমবঙ্গ দাবি করিয়াছে, সেখানে উড়িয়াভাষীর সংখ্যা ৪৪,৬৪০ হইতে ১,২৮,৪৯২ প্রায় তিন গুণ বাড়িয়াছে। ধলভূমে ভূমিজভাষী ছিল ২২,৮২৮, এখন দাঁড়াইয়াছে শূন্যে, সমগ্র জেলায় ৯২২। মনে হয় তাহারা ধলভূমে উড়িয়াভাষী হইয়া গিয়াছে ; পশ্চিম সিংভূমে হিন্দী-ভাষী অথবা বাংলাভাষী। চাঁইবাসায় বাংলার সংখ্যা ৬,[illegible] হইতে ৩০,২৭০তে উঠিয়াছে।

বিস্মৃত বসন্ত

শ্রীঅরবিন্দ পালিত

চৈতালি-দ্বিপ্রহরের পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ যখন এক ঝলক তপ্ত বাতাস গায়ে এসে লাগে তখনই আমার মনে পড়ে যায় ভাইসরয়ের কথা। সায়ান্স কলেজের পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত লম্বা বারান্দার প্রান্তে প্রান্তে দক্ষিণা বাতাস প্রতিহত হয়ে ফেরে; কত ছাত্রের অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-মথিত দীর্ঘশ্বাস, আর কত গবেষকের দীর্ঘ পরিশ্রমজনিত ক্লান্ত চক্ষুর পরশ, ওর অণুতে অণুতে গুঞ্জরিত হয়ে চলে। অধ্যাপকদের গুরু-গম্ভীর পদক্ষেপে বারান্দা দিয়ে চলে-যাওয়া আবহাওয়াকে যেন আরও গম্ভীর থমথমে করে তোলে। আমিও যেন ধীর পদে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। পশ্চিমে মহানগরীর মাথায় রৌদ্র-ঝলসিত পিঙ্গল আকাশ; বাঁ দিকে সার্কুলার রোড নিস্তব্ধ, নিঝুম; অনেকখানি জায়গা জুড়ে খোলার-চালে-ছাওয়া রাজাবাজারের বস্তিগুলোতে যেন কোন প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। এক মৌন গম্ভীর আবহাওয়া যেন চেপে ধরে। নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে। পদক্ষেপ নিজের অজ্ঞাতেই হয়ে ওঠে সতর্ক। ঠিক এই সময়ে কানে ভেসে আসে, 'আপনাদের টিফিন কি হয়ে গেছে?' চমকে মুখ তুলে তাকালেই যেন দেখতে পাই, ভাইসরয়ের কালো করুণ চোখের উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি।

আগাগোড়া ঘটনাটাই আমার ডক্টর চক্রবর্ত্তীর কাছে শোনা। বাংলার বাইরে এক কলেজে কাজ করি। ডক্টর চক্রবর্ত্তী আমাদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক। সেবারে মার্চের শেষে কিসের একটা ছুটিতে দু'জনেই কলকাতায় এসেছি। সেই সময়েই পড়ল আমাদের প্রাক্তন-বর্ত্তমান ছাত্রসম্মেলন। সুতরাং মাষ্টারমশাই আর পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় উৎসাহিত হয়ে বেশ আগেভাগেই উৎসব সমিতিতে গিয়ে জমিয়ে বসলাম। খুব হৈচৈ করেই দিন কাটছিল। সেদিন দুপুরে কলেজের দক্ষিণের বারান্দার ধারে হল-ঘরটায় বসে আছি উৎসবের কাগজপত্র নিয়ে। একটু পরেই ডক্টর চক্রবর্ত্তীর আসবার কথা আছে। এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এক মহিলা। প্রথম দৃষ্টিতেই যা চোখে পড়ল তা তাঁর উগ্র প্রসাধন-পারিপাট্য; বোধ হয় বাজারের যাবতীয় প্রসাধন-প্রলেপেই বিমণ্ডিতা; মধ্যবয়স্কা, স্থূলকায়া, গৌরাঙ্গী—এককালে বেশ সুন্দরীই ছিলেন বোধ হয়। বড় বড় চোখ, কিন্তু কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আর তার ফাঁকে ফাঁকে কৌতুকের হাসি। বয়স আর সাজসজ্জার উগ্র অসামঞ্জস্য সায়ান্স কলেজে একটা বেমানান আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। ভদ্রমহিলা কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, আপনাদের টিফিন-পিরিয়ড কি শেষ হয়ে গেছে?"

একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, "না, এখনও শেষ হয় নি।"

"আপনি টিফিন খাবেন না?"

"হ্যাঁ, খাব।"

"আমিও তা হলে আপনার সঙ্গে টিফিন খাব।"

আমি ত অবাক! এ আবার কি! যাই হোক, বেয়ারাকে ডেকে চা ইত্যাদি আনতে বললাম। চা খেতে খেতে তিনি পরিচয় দিয়ে গেলেন, তিনি এখানকারই ছাত্রী। সম্মেলনের খবর পেয়ে আসছেন। আমি সম্মেলনে আগতদের পরিচয়-পত্র লেখবার একখানা কার্ড ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আপনার নাম-ঠিকানাটা একটু লিখে দিন।" নাম লিখলেন, মঞ্জুশ্রী বসু, কলকাতা। স্বামীর নাম-ঠিকানা লেখবার জায়গাটায় লিখলেন, বম্বের আই-সি-এস। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি পোষ্টে আছেন? উত্তরে বললেন, "বম্বের আই-সি-এস বললেই সবাই চিনবে। ঐ ত কাজ।" বলতে বলতে দেখি নিজের অকুপেশানের জায়গাটায় লিখতে সুরু করেছেন—'ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া'। আমার মনের মধ্যে একটা যে ক্ষীণ সন্দেহ দানা বাঁধছিল, সেটা সম্পর্কে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হেসে বলি, "কিন্তু ঐ পোষ্টটা যে এখন উঠে গেছে।"

"ওঃ, উঠে গেছে বুঝি!" ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বিরস-মুখে কার্ডটা উল্টে রাখলেন। আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেল যা হোক। এমন সময়ে ডক্টর চক্রবর্ত্তীকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "ডক্টর চক্রবর্ত্তীকে চেনেন নাকি? তিনি আসছেন।" "কে ডক্টর চক্রবর্ত্তী?" বলেই মহিলাটি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। ডক্টর চক্রবর্ত্তী সামনে এসে তাঁকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠলেন। ভদ্রমহিলা নীচু হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষনয়নে ডক্টর চক্রবর্ত্তীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝলাম ডাঃ চক্রবর্ত্তী অস্বস্তি বোধ করছেন। আমি বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই চোখ টিপে আমাকে

বসতে বললেন। তারপর মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল আছ ?" ভদ্রমহিলা নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

"তোমার বাবা ভাল আছেন ?"

অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

"কতদিন এখানে এসেছ ?"

"অনেক দিন।"

"বাড়ী ফিরবে ত ? চল তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

ভদ্রমহিলা নীরবে ডক্টর চক্রবর্ত্তীকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। একটু পরেই ডক্টর চক্রবর্ত্তী ফিরে এলেন।

"কি ব্যাপার দাদা ! ভদ্রমহিলাটি কে ?"

"এখানকার এক প্রাক্তন ছাত্রী। উপস্থিত মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে।"

"ভদ্রমহিলার স্বামী নাকি আই-সি-এস। বম্বেতে থাকেন ?"

"হ্যাঁ, তাই বটে। তারপর তোমার এদিকের খবর কি ? চাঁদা কি রকম উঠল ? ডক্টর সেনের কাছে গেছলে ?"

বুঝলাম, ডক্টর চক্রবর্ত্তী ও বিষয়ের আলোচনা করতে চান না। সুতরাং প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করলাম।

এর পর কয়েকটা দিন বেশ হৈচৈয়ের মধ্য দিয়ে কেটে গেছে। প্রাক্তন ছাত্রসম্মেলন বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেকের মধ্যে সেই ভদ্রমহিলাকেও আসতে দেখেছি। অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছেন, গল্প করেছেন। সকলেরই চোখে পড়েছে, তাঁর সাজসজ্জার বাহুল্য, কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি আর মুচকি হাসি। পঞ্চম ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা যে তাই নিয়ে আলোচনাও করেছে, একথাও কানে এসেছে। শুধু আমার চোখে পড়েছে, আগাগোড়া সম্মেলনটাতেই ডক্টর চক্রবর্ত্তী ভদ্রমহিলাকে এড়িয়ে গেছেন।

সম্মেলনের শেষে কর্ম্মমুখর মহানগরী থেকে বিদায় নিই। মফস্বলের সেই ছোট্ট শান্ত শহরটির কথা ভেবে কর্ম্ম-কোলাহলে উত্তেজিত মন ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে আসে। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে আমি আর ডক্টর চক্রবর্ত্তী।

"দাদা, কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

আমার বিনয়-ভঙ্গিমা দেখে চক্রবর্ত্তী হেসে ফেলেন। "আচ্ছা, জিজ্ঞেস কর। বুঝতে অবশ্য পারছি কি জিজ্ঞেস করবে।"

"ভাইসরয় কেন পাগল হয়ে গেল, আপনি কিছু জানেন ?"

"ভাইসরয় ? ভাইসরয় কে ?"

"ওঃ, আপনাকে বুঝি বলা হয় নি।"—বলে ভাইসরয় নামকরণের ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করলাম। ডক্টর চক্রবর্ত্তী স্মিতমুখেই শুনে যাচ্ছিলেন, শেষে একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বক্তব্য শেষ করে বললাম, "আর আপনি যে সম্মেলনে ওকে এড়িয়ে চলছিলেন, সেটাও আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।"

ডক্টর চক্রবর্ত্তী হাসতে হাসতে পিঠটা চাপড়ে বললেন, "তোমাদের এখন অল্প বয়স। সব ঘটনাকেই একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাও। হয় ত আমার মুখে ওর কাহিনী শুনে তার এমন একটা বিশ্লেষণ করে বসবে যে তোমার বৌদি তাই শুনে হয় ত বুড়োবয়সে আবার একটা দাম্পত্য কলহ বাধাবেন।"

দাদাকে আশ্বস্ত করে বললাম, "সেদিক থেকে নির্ভাবনায় থাকুন। আর আপনি গোড়া থেকেই যে রকম নিজেকে গার্ড করছেন, তাতে আর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী না এসে উপায় কি বলুন। যাক, কেবল ত আজেবাজে কথায় আসল কথাটাই ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনার কি করে আলাপ হ'ল সেইখান থেকেই সুরু করুন।"

"নেহাতই শুনতে চাও তা হলে ; আচ্ছা, বলছি শোন।" ডক্টর চক্রবর্ত্তী সুরু করেন—

"আমার ছেলেবেলার গল্প তুমি শুনেছ। জান নিশ্চয় আমাকে কি কষ্টের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখতে হয়। ফার্স্ট ক্লাস থেকে টিউশনি সুরু করি। ঐজন্য পড়াশুনায় কখনও রেগুলার থাকতে পারতাম না। আমার জীবনে আশীর্ব্বাদ হ'ল, আমার মাষ্টারমশাইদের স্নেহ—স্কুলে, কলেজে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই আমি তাঁদের কাছে স্নেহের এই সুবিধেটুকু ভোগ করেছি। ক্লাসের বাইরে তাঁরা আমাকে সাহায্য করতেন। যার ফলে আমার পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হ'ত।

ঠিক এই কারণেই যেতাম ডক্টর ঘোষের বাড়ী। নাম শুনেছ নিশ্চয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অত বড় অধ্যাপক এদেশে খুব কম ছিলেন। অত্যন্ত নিরহঙ্কার আর সরল মানুষটি ছিলেন এই ডক্টর ঘোষ। তাঁর কাছে বসে থাকলে আমি যেন অভিভূত হয়ে যেতাম ; তাঁর পাণ্ডিত্যে নয়, তাঁর সহৃদয়তায়। অত বড় একজন অধ্যাপক আর কত নগণ্য এক ছাত্র আমি ; কিন্তু কথাবার্ত্তায় মনে হ'ত যেন আমি তাঁর সহাধ্যায়ী। ডক্টর ঘোষের মেয়েই হ'ল মঞ্জুশ্রী ঘোষ অর্থাৎ—"

"ডক্টর ঘোষের মেয়ে।" আমি বিস্মিতকণ্ঠে বলি।

"আমি যখন ওদের বাড়ী যেতাম, ও তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে উঠেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় নাকি খুব ভাল

রেজাল্ট করে ফার্স্ট-গ্রেড স্কলারশিপ পেয়েছে। প্রায়ই দেখতে পেতাম ওকে। বাবার লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বইপত্র নিয়ে যেত মাঝে মাঝে। আমি অবশ্য বরাবর সসঙ্কোচ দূরত্ব বজায় রেখেই চলতাম। আমার মত ছেলে যে ডক্টর ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, এইটুকুই আমার ভাগ্য বলে মানতাম। বেশী ঘনিষ্ঠতা করবার সাহস এবং ইচ্ছা দুয়েরই অভাব ছিল। তবে বয়সধর্ম্ম ত—তোমরা ছেলেমানুষ, হেসো না—দূর থেকে একটু-আধটু দেখতাম। সে বর্ণনা দিলে আজকের মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে মোটেই মেলাতে পারবে না। শুভ্র, গৌর তনু, তন্বী নয়, স্বাস্থ্যবতী। আর মুখখানি ছিল এক কথায় কমনীয়। সব সময়েই একটা শান্ত, সুন্দর হাসি মুখে লেগে থাকত। মাঝে মাঝে অল্প দু'চারিটে কথা হ'ত। হয় ত ডক্টর ঘোষ বাড়ী নেই, বসতে বলল। কিংবা কোন বইয়ের রেফারেন্স। কোনদিন একটা বেশী কথা বলে নি। অথচ প্রতিটি কথাই ছিল এত আন্তরিক আর মিষ্টি হাসিতে ভরা যে মনে হ'ত আমরা কত দিনের পরিচিত। শান্ত চোখ দু'টো তুলে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে বসত, 'আচ্ছা, এত যে আপনি পড়েন, আপনার ভাল লাগে?' হয় ত সেই মুহূর্ত্তে ইচ্ছে হ'ত, হেসে হাল্‌কা একটা জবাব দিই। কিন্তু পারতাম না। লজ্জিত হয়ে বলতাম, 'কি যে বলেন, কোথায় আর পড়ি।'—কি এর মধ্যেই কিছু ভেবে নিলে নাকি। তোমরা যা চীজ—"

"ভয়ের কারণ নেই", মুচকি হেসে বলি। হেসে ডক্টর চক্রবর্ত্তী আবার আরম্ভ করেন—

"এম-এস্‌সি পাস করার পর তখন চাকরি করছি কলকাতার এক কলেজে। মাইনে খুবই অল্প। ডক্টর ঘোষ একদিন ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে রিসার্চে চলে এস।' বললাম, 'এখন যা হোক কিছু বাড়ীতে দিতে পারছি। কিন্তু চাকরি ছাড়লে—' বাধা দিয়ে উনি বললেন, 'কষ্টই যখন করেছ তখন আর দু'একটা বছর টিউশনি করে চালাও। আমি বরং চেষ্টা করব যাতে তুমি একটা স্কলারশিপ পেতে পার।' যাক; দিনকয়েক মানসিক দ্বন্দ্ব-দোলায় কাটবার পর দিলাম চাকরি ছেড়ে। আর আমার ভাগ্য এবং ডক্টর ঘোষের চেষ্টায় মাসকয়েক পর একটা স্কলারশিপও পেলাম। দীর্ঘদিন পর আবার ওদের বাড়ী যাতায়াত সুরু করলাম। মঞ্জুশ্রী তখন অনার্স নিয়ে পড়ছে। দেখা হতে ওকে অভিনন্দন জানালাম ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলের জন্য। ও একটু লজ্জিতভাবে হাসল।

রিসার্চের কাজে এর পর ওদের বাড়ী প্রায়ই যেতাম। দেখা হ'ত আগের মত অল্পই, তবে আলাপটা দেখা হলে দীর্ঘতর হ'ত। আমার রিসার্চের সাবজেক্ট সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিত। আমি ওর অনার্সের খবরাখবর নিতাম। তখন ওর পড়াশোনার খ্যাতি অধ্যাপক-মহলেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের ধারণা মঞ্জুশ্রী বাপের নাম রাখবে। মাঝে মাঝে আমিও ওর সম্বন্ধে এইসব ভাবতাম। কিন্তু তবুও আমার মনে হ'ত, বিজ্ঞানের রুক্ষ কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়ে, শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মরুভূমিতে ওর নারী-হৃদয় কি সার্থকতা খুঁজে পাবে!

রিসার্চের কাজের শেষে সায়েন্স কলেজেই একটা কাজ পেয়ে গেলাম। মঞ্জুশ্রী এই সময়ে এম-এসসি ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ল। অনার্সে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পায় নি, পেলে সেকেণ্ড ক্লাস। ডক্টর ঘোষের মুখে কোনদিন ওঁর মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথা শুনি নি। এই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, 'মেয়েটাকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না। পড়াশোনায় আর তেমন মন নেই। বিয়ে দিয়ে দেব কিনা ভাবছি। অথচ বললেই ত কান্নাকাটি সুরু করবে।' আমি আর কি বলব, চুপচাপ রইলাম। শেষটায় উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বল?'

তখন বললাম, 'পড়াশোনায় মন নেই কেমন করে বলছেন?'

'না না, আমি লক্ষ্য করেছি। তুমি ভেব না ও অনার্সে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে বলে আমি একথা বলছি। পড়াশোনায় ওর এত মন ছিল যে আমায় কোনদিন ওর সম্বন্ধে এতটুকু চিন্তা করতে হয় নি। আমার অন্য কোন ছেলে-মেয়ে নেই। ওকে ছোট্টটি রেখে ওর মা মারা যান। আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় যে মেয়েদের সম্বন্ধে একটু আলাদা করে চিন্তা করতে হয়, সেকথা কখনও মনে হয় নি। হায়ার ষ্টাডিতে এলে ওকে নিজের হাতে গড়ে তুলব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা হ'ল না। দেখছি, মেয়েদের মধ্যে যে চিরন্তন নারীত্ব আছে, ওর বৈজ্ঞানিক সত্তা তাকে অতিক্রম করতে পারছে না। আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, নারী-মনের অনেক অলিগলির খবর রাখি না। কিন্তু মানবিক বোধ আমারও আছে। ওকে হয় ত চেষ্টা করলে টেনে নিয়ে আসা যায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে; কিন্তু তাতে ওকে বোধ হয় প্রবঞ্চনাই করা হবে।'

ডক্টর ঘোষের মুখে কথাগুলো শুনে আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। মঞ্জুশ্রীর কথা ভেবে নয়, ডক্টর ঘোষের অনুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে।

এই সময়ে মঞ্জুশ্রী কিছুদিন আমার কাছে পড়েছিল। তুমি হয় ত প্রশ্ন করতে চাইছ, আমি মঞ্জুশ্রীর মধ্যে কিছু লক্ষ্য করেছি কিনা। সত্যি কথা বলতে কি, ছাত্রজীবনে স্পষ্ট সসঙ্কোচ ব্যবধান তখনও আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

বসতে বললেন। তারপর মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল আছ ?" ভদ্রমহিলা নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

"তোমার বাবা ভাল আছেন ?"

অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

"কতদিন এখানে এসেছ ?"

"অনেক দিন।"

"বাড়ী ফিরবে ত ? চল তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

ভদ্রমহিলা নীরবে ডক্টর চক্রবর্ত্তীকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। একটু পরেই ডক্টর চক্রবর্ত্তী ফিরে এলেন।

"কি ব্যাপার দাদা! ভদ্রমহিলাটি কে ?"

"এখানকার এক প্রাক্তন ছাত্রী। উপস্থিত মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে।"

"ভদ্রমহিলার স্বামী নাকি আই-সি-এস। বম্বেতে থাকেন ?"

"হাঁ, তাই বটে। তারপর তোমার এদিকের খবর কি ? চাঁদা কি রকম উঠল ? ডক্টর সেনের কাছে গেছলে ?"

বুঝলাম, ডক্টর চক্রবর্ত্তী ও বিষয়ের আলোচনা করতে চান না। সুতরাং প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করলাম।

এর পর কয়েকটা দিন বেশ হৈচৈয়ের মধ্য দিয়ে কেটে গেছে। প্রাক্তন ছাত্রসম্মেলন বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেকের মধ্যে সেই ভদ্রমহিলাকেও আসতে দেখেছি। অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছেন, গল্প করেছেন। সকলেরই চোখে পড়েছে, তাঁর সাজসজ্জার বাহুল্য, কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি আর মুচকি হাসি। পঞ্চম ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা যে তাই নিয়ে আলোচনাও করেছে, একথাও কানে এসেছে। শুধু আমার চোখে পড়েছে, আগাগোড়া সম্মেলনটাতেই ডক্টর চক্রবর্ত্তী ভদ্রমহিলাকে এড়িয়ে গেছেন।

সম্মেলনের শেষে কর্ম্মমুখর মহানগরী থেকে বিদায় নিই। মফস্বলের সেই ছোট্ট শান্ত শহরটির কথা ভেবে কর্ম্ম-কোলাহলে উত্তেজিত মন ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে আসে। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে আমি আর ডক্টর চক্রবর্ত্তী।

"দাদা, কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

আমার বিনয়-ভঙ্গিমা দেখে চক্রবর্ত্তী হেসে ফেললেন। "আচ্ছা, জিজ্ঞেস কর। বুঝতে অবশ্য পারছি কি জিজ্ঞেস করবে।"

"ভাইসরয় কেন পাগল হয়ে গেল, আপনি কিছু জানেন ?"

"ভাইসরয় ? ভাইসরয় কে ?"

"ওঃ, আপনাকে বুঝি বলা হয় নি।"—বলে ভাইসরয় নামকরণের ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করলাম। ডক্টর চক্রবর্ত্তী স্মিতমুখেই শুনে যাচ্ছিলেন, শেষে একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বক্তব্য শেষ করে বললাম, "আর আপনি যে সম্মেলনে ওকে এড়িয়ে চলছিলেন, সেটাও আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।"

ডক্টর চক্রবর্ত্তী হাসতে হাসতে পিঠটা চাপড়ে বললেন, "তোমাদের এখন অল্প বয়স। সব ঘটনাকেই একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাও। হয় ত আমার মুখে ওর কাহিনী শুনে তার এমন একটা বিশ্লেষণ করে বসবে যে তোমার বৌদি তাই শুনে হয় ত বুড়োবয়সে আবার একটা দাম্পত্য কলহ বাধাবেন।"

দাদাকে আশ্বস্ত করে বললাম, "সেদিক থেকে নির্ভাবনায় থাকুন। আর আপনি গোড়া থেকেই যে রকম নিজেকে গার্ড করছেন, তাতে আর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী না এসে উপায় কি বলুন। যাক, কেবল ত আজেবাজে কথায় আসল কথাটাই ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনার কি করে আলাপ হ'ল সেইখান থেকেই সুরু করুন।"

"নেহাতই শুনতে চাও তা হলে ; আচ্ছা, বলছি শোন।" ডক্টর চক্রবর্ত্তী সুরু করেন—

"আমার ছেলেবেলার গল্প তুমি শুনেছ। জান নিশ্চয় আমাকে কি কষ্টের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখতে হয়। ফার্স্ট ক্লাস থেকে টিউশনি সুরু করি। এজন্য পড়াশুনায় কখনও রেগুলার থাকতে পারতাম না। আমার জীবনে আশীর্ব্বাদ হ'ল, আমার মাষ্টারমশাইদের স্নেহ—স্কুলে, কলেজে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই আমি তাঁদের কাছে স্নেহের এই সুবিধেটুকু ভোগ করেছি। ক্লাসের বাইরে তাঁরা আমাকে সাহায্য করতেন। যার ফলে আমার পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হ'ত।

ঠিক এই কারণেই যেতাম ডক্টর ঘোষের বাড়ী। নাম শুনেছ নিশ্চয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অত বড় অধ্যাপক এদেশে খুব কম ছিলেন। অত্যন্ত নিরহঙ্কার আর সরল মানুষটি ছিলেন এই ডক্টর ঘোষ। তাঁর কাছে বসে থাকলে আমি যেন অভিভূত হয়ে যেতাম ; তাঁর পাণ্ডিত্যে নয়, তাঁর সহৃদয়তায়। অত বড় একজন অধ্যাপক আর কত নগণ্য এক ছাত্র আমি ; কিন্তু কথাবার্ত্তায় মনে হ'ত যেন আমি তাঁর সহাধ্যায়ী। ডক্টর ঘোষের মেয়েই হ'ল মঞ্জুশ্রী ঘোষ অর্থাৎ—"

"ডক্টর ঘোষের মেয়ে!" আমি বিস্মিতকণ্ঠে বলি।

"আমি যখন ওদের বাড়ী যেতাম, ও তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে উঠেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় নাকি খুব ভাল

রেজাল্ট করে ফার্স্ট-গ্রেড স্কলারশিপ পেয়েছে। প্রায়ই দেখতে পেতাম ওকে। বাবার লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বইপত্র নিয়ে যেত মাঝে মাঝে। আমি অবশ্য বরাবর সসঙ্কোচ দূরত্ব বজায় রেখেই চলতাম। আমার মত ছেলে যে ডক্টর ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, এইটুকুই আমার ভাগ্য বলে মানতাম। বেশী ঘনিষ্ঠতা করবার সাহস এবং ইচ্ছা দুয়েরই অভাব ছিল। তবে বয়সধর্ম ত—তোমরা ছেলেমানুষ, হেসো না—দূর থেকে একটু-আধটু দেখতাম। সে বর্ণনা দিলে আজকের মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে মোটেই মেলাতে পারবে না। শুভ্র, গৌর তনু, তন্বী নয়, স্বাস্থ্যবতী। আর মুখখানি ছিল এক কথায় কমনীয়। সব সময়েই একটা শান্ত, সুন্দর হাসি মুখে লেগে থাকত। মাঝে মাঝে অল্প উচাটন কথা হ'ত। হয় ত ডক্টর ঘোষ বাড়ী নেই, বসতে বলল। কিন্তু কোন বয়সের বেলারেশ। কোনদিন একটা বেশী কথা বলে নি। অথচ প্রতিটি কথাই ছিল এত আন্তরিক আর মিষ্টি হাসিতে ভরা যে মনে হ'ত আমরা কত দিনের পরিচিত। শান্ত চোখ দুটো তুলে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে বসত, 'আচ্ছা, এত যে আপনি পড়েন, আপনার ভাল লাগে?' হয় ত সেই মুহূর্তে ইচ্ছে হ'ত, হেসে হাল্কা একটা জবাব দিই। কিন্তু পারতাম না। লজ্জিত হয়ে বলতাম, 'কি যে বলেন, কোথায় আর পড়ি'—কি এর মধ্যেই কিছু ভেবে নিচ্ছ নাকি। তোমরা যা চাও—"

"ভয়ের কারণ নেই", মুচকি হেসে বলি। হেসে ডক্টর চক্রবর্তী আবার আরম্ভ করেন—

"এম-এস্‌সি পাস করার পর তখন চাকরি করছি কলকাতার এক কলেজে। মাইনে খুবই অল্প। ডক্টর ঘোষ একদিন ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে রিসার্চে চলে এস।' বললাম, 'এখন যা হোক কিছু বাড়ীতে দিতে পারছি। কিন্তু চাকরি ছাড়লে—' বাধা দিয়ে উনি বললেন, 'কষ্টই যখন করেছ তখন আর দু'একটা বছর টিউশনি করে চালাও। আমি বরং চেষ্টা করব যাতে তুমি একটা স্কলারশিপ পেতে পার।' যাক; দিনকয়েক মানসিক দ্বন্দ্ব-দোলায় কাটবার পর দিলাম চাকরি ছেড়ে। আর আমার ভাগ্য এবং ডক্টর ঘোষের চেষ্টায় মাসকয়েক পর একটা স্কলারশিপও পেলাম। দীর্ঘদিন পর আবার ওদের বাড়ী যাতায়াত সুরু করলাম। মঞ্জুশ্রী তখন অনার্স নিয়ে পড়ছে। দেখা হতে ওকে অভিনন্দন জানালাম ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলের জন্য। ও একটু লজ্জিতভাবে হাসল।

রিসার্চের কাজে এর পর ওদের বাড়ী প্রায়ই যেতাম। দেখা হ'ত আগের মত অল্পই, তবে আলাপটা দেখা হলে দীর্ঘতর হ'ত। আমার রিসার্চের সাবজেক্ট সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিত। আমি ওর অনার্সের খবরাখবর নিতাম। তখন ওর পড়াশোনার খ্যাতি অধ্যাপক মহলেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের ধারণা মঞ্জুশ্রী বাপের নাম রাখবে। মাঝে মাঝে আমিও ওর সম্বন্ধে এইসব ভাবতাম। কিন্তু তবুও আমার মনে হ'ত, বিজ্ঞানের রুক্ষ কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়ে, শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মরুভূমিতে ওর নারী-হৃদয় কি সার্থকতা খুঁজে পাবে!

রিসার্চের কাজের শেষে সায়েন্স কলেজেই একটা কাজ পেয়ে গেলাম। মঞ্জুশ্রী এই সময়ে এম-এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হ'ল। অনার্সে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পায় নি, পেলে সেকেণ্ড ক্লাস। ডক্টর ঘোষের মুখে কোনদিন ওঁর মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথা শুনি নি। এই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, 'মেয়েটাকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না। পড়াশোনায় আর তেমন মন নেই। বিয়ে দিয়ে দেব কিনা ভাবছি। অথচ বললেই ত কান্নাকাটি সুরু করবে।' আমি আর কি বলব, চুপচাপ রইলাম। শেষটায় উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বল?'

তখন বললাম, 'পড়াশোনায় মন নেই কেমন করে বলছেন?'

'না না, আমি লক্ষ্য করেছি। তুমি ভেব না ও অনার্সে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে বলে আমি একথা বলছি। পড়াশোনায় ওর এত মন ছিল যে আমায় কোনদিন ওর সম্বন্ধে এতটুকু চিন্তা করতে হয় নি। আমার অন্য কোন ছেলে-মেয়ে নেই। ওকে ছোট্টটি রেখে ওর মা মারা যান। আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় যে মেয়েদের সম্বন্ধে একটু আলাদা করে চিন্তা করতে হয়, সেকথা কখনও মনে হয় নি। আমার উচিত যে ওকে নিজের হাতে গড়ে তুলব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা হ'ল না। দেখছি, মেয়েদের মধ্যে যে চিরন্তন নারীত্ব আছে, ওর বৈজ্ঞানিক সত্তা তাকে অতিক্রম করতে পারছে না। আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, নারী মনের অনেক অলিগলির খবর রাখি না। কিন্তু মানবিক বোধ আমারও আছে। ওকে হয় ত চেষ্টা করলে টেনে নিয়ে আসা যায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে; কিন্তু তাতে ওকে বোধ হয় প্রবঞ্চনাই করা হবে।'

ডক্টর ঘোষের মুখে কথাগুলো শুনে আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। মঞ্জুশ্রীর কথা ভেবে নয়, ডক্টর ঘোষের অনুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে।

এই সময়ে মঞ্জুশ্রী কিছুদিন আমার কাছে পড়েছিল। তুমি হয় ত প্রশ্ন করতে চাইছ, আমি মঞ্জুশ্রীর মধ্যে কিছু লক্ষ্য করেছি কিনা। সত্যি কথা বলতে কি, ছাত্রজীবনে সৃষ্ট সসঙ্কোচ ব্যবধান তখনও আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

ওকে যেন একটু সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই দেখতাম। এসব বিষয়ে তাই কোনদিন কিছু লক্ষ্য করবার কথা মনেই হয় নি। তবে ওর বাবার কথা শুনে, কৌতূহলবশে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতাম ওকে। কিছুই তেমন দেখি নি। তবে এক-এক দিন কলেজের বারান্দায় ক্লাসের অপেক্ষায় চুপচাপ ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হয় ত মনে হয়েছে, ও কি এখন ইলেক্‌ট্রিসিটির কোন দুরূহ তত্ত্বে মগ্ন! না, ওর নারী-হৃদয়ের একটি কুসুম-কোমল কামনার নব কিশলয়ের দিকে তাকিয়ে আছে!

কিছুদিন পরেই বিদেশে চাকরি পেলাম। খবরটা দিতে গিয়েছিলাম ডক্টর ঘোষকে। সেইদিনই প্রথম মঞ্জুশ্রী পাঠ্য-জগতের বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করল।

'কি দরকার আপনার অত দূরে চাকরি করতে যাবার?'

'দরকার আছে বলেই ত যাচ্ছি।'

'বেশ ত কলকাতায় কি একটা কাজ পেতে পারতেন না?'

'পেতে পারতাম। তবে এত মাইনে পেতাম না। আর জানেন ত আমাদের বাড়ীর যা অবস্থা, তাতে এত মাইনের চাকরি ছাড়া যায় না।'

'বারে! তা বলে আপনি একলা বিদেশে পড়ে থাকবেন; আর আপনি একলাই-বা কেন চাকরি করবেন? বাড়ীতে কি আর কেউ নেই?' অনুযোগ করল ও। আমি হাসতে লাগলাম। সব কথা ত ওকে বোঝানো যায় না। শেষটায় ও বলল, 'চললেন তা হলে আমাদের ছেড়ে। আর তা হলে দেখা হচ্ছে না।'

মৃদু হেসে বলি, 'তা কেন, দেখা নিশ্চয় হবে।'

'আর হয়েছে দেখা। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে গিয়ে আমাদের হয় ত ভুলেই যাবেন।'

ভুলে যাই নি। তবে একদিক দিয়ে বিচার করলে ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। সেই মঞ্জুশ্রীকে আর আমি দেখি নি।

কিছুদিন পর ডক্টর ঘোষের চিঠি পেলাম। মঞ্জুশ্রীর বিয়ে; সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত এক আই-সি-এসের সঙ্গে। ভদ্রলোক নিজেই মঞ্জুশ্রীকে পছন্দ করেছেন। নতুন চাকরি বলে যেতে পারি নি। মনে মনে ভেবেছিলাম, নীড় বাঁধার স্বপ্ন ওর সার্থক হোক।

এর পর মাঝে মাঝে দু'একবার কলকাতায় গেছি। ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। তবে অনেকের মুখে খবর পেতাম। সেই স্নিগ্ধ লাবণ্যভরা মঞ্জুশ্রী নাকি তার প্রশান্ত কমনীয় মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটিয়ে পরিচিতকে কুশলপ্রশ্ন করে না। স্বামীর সামাজিক পরিবেশকে আপন করে নেবার জন্য ও হয়ে উঠেছে প্রাণবন্যায় ভরপুর। কথায়-বার্তায়, হাসিতে, আলাপে ও যেন উচ্ছল ঝর্ণাধারা। ওর স্নিগ্ধ আলোর পরিবর্তে এই দীপ্ত কিরণ যেন বড় বেশী চোখ ধাঁধায়। ওর জীবনের এই বিরাট পরিবর্তনটাকে ও কেমন করে মানিয়ে নিয়েছে, মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করতাম। কখনও কখনও ডক্টর ঘোষের চিঠি পেতাম। অন্যান্য অনেক কথার মাঝে দু'এক লাইন খবর হয় ত থাকত মঞ্জুশ্রীর। বৃদ্ধ অধ্যাপক লিখতেন, মেয়ে তাঁর সুখেই আছে। পড়াশোনা ছাড়িয়ে মেয়ের ঘর বেঁধে দিয়ে ভালই করেছেন।

মাঝখানে দীর্ঘদিন কোন সংযোগ ছিল না। ওর বিয়ের প্রায় দেড় বছর পর কলকাতায় এলাম। ডক্টর ঘোষের সঙ্গে দেখা হ'ল। নানা কথার পর মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করাতে, ম্লান একটু হেসে বললেন, 'ভালই আছে। কোয়েটায় বদলী হয়েছে।' মুখের ভাব লক্ষ্য করে আমি আর কিছু বলতে সাহস করলাম না। নিজে থেকেই উনি বললেন, 'মাস ছয়েক আগে চিঠি পেলাম, ও আমার কাছে আসতে চায়। ভাবলাম, বোধ হয় মা হতে চলেছে; লিখে দিলাম আসতে। আসবার পর ওকে দেখে ত অবাক। রোগা হয়ে গেছে খুব, চোখের তলায় কালি; কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে! রইল কিছুদিন; বুঝলাম আমার ধারণা ভুল। জামাইয়ের সঙ্গে বোধ হয় কিছু হয়েছিল। তাই রাগ করে চলে এসেছে। কিছুদিন থাকবার পর আবার জামাই এসে নিয়ে গেল।' আমি চুপ করে শুনছিলাম। শেষে বললেন, 'চক্রবর্ত্তী, আমার অঙ্ক কষার পদ্ধতিটা ঠিকই ছিল; কষবার সময় হিসাবে একটু ভুল হয়ে গেছে।'

সেইবারই হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তখনও ফিরি নি। খবর পেলাম মঞ্জুশ্রী এসেছে। শুনেই দেখা করতে গেলাম। সত্যিই অবাক হলাম ওকে দেখে। সেই মঞ্জুশ্রী—চলনে-বলনে, কথায়-বার্তায়, সাজে-পোশাকে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আভিজাত্য তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। অথচ চোখের কোণে বহু অশান্তিময় রাত্রির নিষ্ঠুর নিদর্শন; সেই শান্ত, স্মিত মুখে কেমন যেন একটা হতাশা আর জ্বালা। কলকণ্ঠে হেসে উঠে অভ্যর্থনা জানাল, আসুন। মনে হ'ল হাসির লহরী তুলে ও ওর ব্যথার প্রবাহকে ঢেকে রাখতে চায়। নানারকম কথাবার্ত্তা হ'ল, কেবল ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়া। শুধু চলে আসবার সময়ে বললে, 'যে ক'টা দিন আছেন, আসবেন।'

এর পর কয়েকটা দিন গিয়েছিলাম; এবং অল্পে অল্পে

ওর কাছ থেকে ওর জীবনের সামান্য কিছু কাহিনী সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

মিঃ বোস আই-সি-এস হয়ে এসে বিয়ে করে এদেশে ঘর বাঁধলেন। মঞ্জুশ্রীকে ভালও বাসতেন। মঞ্জুশ্রী কোন দিন সেকথা অস্বীকার করে নি। কিন্তু 'যাযাবর হাঁস বনহংসীর প্রেমে' ত চিরকালের তরে নীড় বাঁধে না। মিলনের প্রথম আবেশময় উচ্ছ্বাসপূর্ণ দিনগুলো কেটে গেলে দেখা গেল, মেয়েদের নিয়ে মিঃ বোসের ঘর বাঁধার চেয়ে লীলা-সঙ্গিনী করবার আগ্রহটাই বেশী। কোন এক বসন্ত সন্ধ্যায় হয় ত মঞ্জুশ্রী বৈকালিক প্রসাধনশেষে সামনের লনে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে; ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করছে; হয় ত ভাবছে আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় কি কথায় ওকে পরিতৃপ্ত করে তুলবে, কোন প্রসঙ্গে মধুময় করে তুলবে এই নির্জন বিশ্রম্ভালাপ—এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে বোস এসে হাজির।

'শ্রী, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আজ ক্লাবে একটা ফাংশান আছে। অষ্ট্রেলিয়া থেকে এক…'

'আচ্ছা, এখন থামো—' স্বামীর টাইটা খুলতে খুলতে মঞ্জুশ্রী বলে, 'আজ আর কোথাও যাওয়া নয়। শুধু এইখানে তুমি আর আমি—' বলতে বলতে স্বামীর বুকে মাথা রাখে। বোস একটু হেসে আদর করে। জামা-কাপড় ছেড়ে, তৈরী হয়ে বোস বলে, 'এ কি তুমি এখনও তৈরি হও নি!'

'বারে, তুমি সত্যি সত্যিই যাবে নাকি!'—অভিমানাহত মঞ্জুশ্রী।

'তুমি ত আচ্ছা ছেলেমানুষ। শুনছ ক্লাবে অত বড় ফাংশান। আর আমি বাড়ীতে তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করি।' চোখ ফেটে জল আসতে চায় মঞ্জুশ্রীর। ঠোঁটটা কামড়ে ধরে স্বামীর অনুগামিনী হয়।…

সেদিন মঞ্জুশ্রীর শরীরটা খারাপ। ঘরের মধ্যে খাটে আধশোয়া অবস্থায় ও একটা মাসিক পত্রিকা পড়ছিল। আপিস-ফেরত বোস ঘরে ঢুকে বলে, 'এ কি! তুমি ভুলে গেছ নাকি! আজ মিসেস্ খাতুন পার্টি দিচ্ছেন। আর তুমি এখনও তৈরি হও নি—'

'দেখ ত আমার জ্বর হয়েছে কিনা।' ওর হাতটা নিয়ে মঞ্জুশ্রী নিজের কপালে রাখল। বিরক্তি যত দূর সম্ভব দমন করে বোস কপালটা পরীক্ষা করে বলে, 'কৈ, কোথায় জ্বর!'

'আজ আমার শরীরটা বড় খারাপ। আজ তুমি নাই-বা গেলে—'

'হ্যাঁ, তা নইলে আমাকে অপদস্থ করা যায় কি করে! মতলব বার করেছ বেশ—'

'কি বললে! আমি মতলব করেছি তোমাকে অপমান করবার!'

'থাক হয়েছে!' হন্ হন্ করে ও স্নান করতে চলে যায়। মঞ্জুশ্রী বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত লুটিয়ে পড়ে শয্যার ওপর। কবরী-বন্ধের অশোকমঞ্জরী স্থানচ্যুত হয়ে লুটিয়ে পড়ে শ্রীনিকেতনী শয্যাবন্ধের ওপর।

কিন্তু এ জীবন ত ও চায় নি। শান্ত, সুন্দর পরিবেশে একটি গৃহ, সেই গৃহে সে গৃহলক্ষ্মী, একটি দু'টি দুরন্ত শিশু; বিকেলে আকাশের গায়ে মায়াময় আলো আর সেই মায়া চোখে নিয়ে ব্যাকুলহৃদয়ে একটি মানুষের প্রত্যাগমনের প্রত্যাশা; একজন বাঞ্ছিতের শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহকে সেবায়, শুশ্রূষায় ভরিয়ে তোলা; তার মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে নিজে তৃপ্ত হওয়া—কোন্ মেয়ে না কামনা করে তাদের জীবন-ভোর। কিন্তু গোধূলিবেলায় মঞ্জুশ্রীর ব্যাকুল প্রতীক্ষাকে মধুময় না করে মিঃ বোসের মোটর ধুলো উড়িয়ে চলে ক্লাবে, বারে, পার্টিতে। মঞ্জুশ্রী আর তার নাগাল পায় না। সুরু হয় স্নায়ু-সংঘাত। ছলায়, কলায়, অভিমানে পুরুষকে বশে আনতে অক্ষম মঞ্জুশ্রী তার স্বামীকে বাঁধতে চায় হৃদয়ের সহজ, সরল ভালবাসায়। কিন্তু বার বার ওর পরাজয় ঘটে। চোখের জল ফেলে কি হবে যে চোখের জলের মর্য্যাদা নেই স্বামীর হৃদয়ে। দুর্জয় অভিমানে কঠিন হয়ে থাকে মঞ্জুশ্রী। আর মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। ধীরে ধীরে ফাটলের গভীরতা বাড়তে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত থাকতে না পেরে চলে এসেছে কলকাতায়।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে থাকেন ডক্টর চক্রবর্ত্তী—সেবারে কলকাতা ছেড়ে চলে আসবার সময়ে ওকে কথা দিয়েছিলাম মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখব। মঞ্জুশ্রীও ওর খবর জানিয়ে চিঠি দেবে। কিন্তু চিঠিপত্র পাইনি মোটেই। বেশ কিছুদিন পর দিল্লী থেকে ওর একখানা চিঠি পেলাম। ও আবার ওর স্বামীর কাছে ফিরে গেছে। মিঃ বোস নিজে কলকাতায় এসে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে এবং ভালই আছে। আর বিশেষ কিছু লেখে নি। কিন্তু ওর ছোট্ট চিঠির ছত্রে ছত্রে যেন একটা খুশির আমেজ লুকিয়ে ছিল।

ওর কথা চাপা পড়ে যায় আমার মনে। দীর্ঘদিন কেটে যায়। এর মধ্যে অবশ্য আমার জীবনেও আসে বড় পরিবর্ত্তন। অর্থাৎ কিনা—"

"বৌদি এলেন এবং মনের দিগন্ত থেকে মঞ্জুশ্রীর অল্প একটু অস্তিত্বও আঁচলের বাতাসে উড়িয়ে দিলেন, কেমন এই ত?" আমি টিপ্পনী কাটি।

"আচ্ছা থাম। এখন যা বলছি শোন—

অনেক দিন পর খবর পেলাম মঞ্জুশ্রীর মেয়ে হয়েছে।

সেদিন সত্যিই একটা স্বস্তি পেয়েছিলাম মনে। ভেবেছিলাম ওর জীবনের বড় সমস্যাটারই সুন্দর সমাধান হ'ল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আগামী জীবনের সব বাধাবিপত্তি ওর কাছে সুসহ হয়ে যাবে। বিগত দিনের সব সংঘাত লুপ্ত হয়ে যাবে ওদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে, ওর সন্তানই রচনা করবে মিলন-সেতু।

তারপর এল মঞ্জুশ্রীর কাছ থেকে দ্বিতীয় এবং শেষ চিঠি। সে চিঠি আমার হারিয়ে গেছে। কিন্তু মনে তার কথাগুলো গাঁথা আছে উজ্জ্বল অক্ষরে, বারবার পড়ে কথাগুলি একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। চিঠিতে ছিল—'সৌরেনদা, কবি বলেছেন :

জীবনে অনেক ধন পাই নি
নাগালের বাইরে তারা
হারিয়েছি তার চেয়েও বেশী
হাত পাতি নি বলে।

আমার নাগালের মধ্যে জীবনের যে ধন-সম্পত্তি ছিল, তা আমি নিলাম না। যে সম্পদের জন্য হাত পাতলাম, তা পেলাম না। সুখ আর শান্তি বলে যাকে আঁকড়ে ধরতে গেলাম, দেখলাম, সেটা দুঃখের আর অশান্তির একটা ছদ্ম আবরণ মাত্র।

স্বামীর ভালবাসার আভরণ পরে একদিন ঘর বেঁধেছিলাম অনেক রঙীন কল্পনা নিয়ে। মেঘের বুকে গোধূলি-বেলার রং ফেরার মত তা মিলিয়ে যেতে দেরি হয় নি। রুক্ষ বাস্তবের কণ্টকাকীর্ণ পথে কেবল দিনের পর দিন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। তারপর আবার ভগবান বুঝি ছলনা করলেন।

সেবারে ওর কাছে ফিরে গিয়ে ওকে মনের মত করেই পেলাম। কেন জানি না, আমাকে স্নেহে, যত্নে, আদরে ভরিয়ে রেখেছিল। কিছুদিন পর খুকু এলো কোলে। আর তারপরই ও দ্রুত বদলে যেতে লাগল। কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। খুকুকে ও একদম দেখতে পারে না। আর আমি যতই খুকুকে বুকের কাছে টেনে নিই, ততই ওর সঙ্গে খিটিমিটি বাধে। সেদিন হ'ল কি সন্ধ্যাবেলায় ও এসে বললে, 'চল শ্রী, আজ ওখলার ধার থেকে বেরিয়ে আসি। ওর ডাকে হঠাৎ আমার বুকের কাছটা গুরুগুরু করে ওঠে, রক্তে দোলা লাগে। আবেশে চোখ বুঁজিয়ে ওর হাতটা ধরতে যাই! হঠাৎ খুকুর মুখখানা মনে পড়ে যায়। সেদিন খুকুর শরীরটা ভাল ছিল না। বললাম, আজ থাক খুকুর শরীরটা—! ও আমাকে থামিয়ে দিয়ে অধীর স্বরে বলল, কেন? আয়া ত আছে? আমি বললাম, আজকে থাক না। আর এক দিন—। বলতে গিয়ে দেখি ও ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বেরিয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে ও বাড়ী ফিরল এলকোহলের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে। মদ ও এর আগেও খেয়েছে। কিন্তু এ রকম অপ্রকৃতিস্থ আগে কখনও দেখি নি। এর পর থেকে সংঘাত প্রকাশ্য হয়ে উঠল। বাড়ী ফেলে ও আমাকে বাইরে টানতে চাইত। কিন্তু খুকুর জন্য আমি যেতে পারতাম না। অথচ ওর জন্য সত্যিই আমার—। বুঝতে পারতাম, ওর সঙ্গিনী হয়ে আমি আর চলতে পারছি না। আমি চাইতাম, আমার ঘরটুকুর মধ্যে ও আমার পাশে পাশে থাকুক। কিন্তু আমার আঙিনায় সীমানার বেড়া দিয়ে ওকে আমি আটকে রাখতে পারলাম না। আমি ওকে ভালবেসেছিলাম, ও আমাকে ভালবেসেছিল, কিন্তু আমার খুকু ত আমাদের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করল না। ও যেন এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। রাতে বাড়ী ফেরাও আর ওর হয়ে ওঠে না। আমার ভালবাসায় ওর মন উঠল না। বাইরে গেল তৃপ্তির খোঁজে। ওকে নিয়ে এখানে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠল। ধিক্কারে আমি বাড়ীর বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

শেষ পর্য্যন্ত আমি আর একবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওর তখন বোধ হয় মনোবিকার সুরু হয়েছে! তা নইলে আমাকে ও-কথা বলে। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় খুকুকে আয়ার কাছে দিয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম, চল, আজ তোমাদের পার্টিতে যাব। ও পরিষ্কার বললে, আমাদের পার্টি বলতে যা বোঝায়, তা হ'ল খানিকটা বেলেল্লাপনা। আজ মিস খাতুন আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি যদি যাও তা হলে তোমাকে আমার কোন বন্ধুর মনোরঞ্জন করতে হবে। নির্বিকারভাবে বলে গেল ও। কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপল না। স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। মোটরটা খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল। আমি ছুটে গিয়ে খুকুকে বুকে তুলে নিতেই কান্না আমার বাঁধ মানল না।

আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। সৌরেনদা, আমার কথা ভেবে আপনার কি খুব দুঃখ হচ্ছে? কিন্তু আমার বেজায় হাসি পাচ্ছে। কি জানি মনে হচ্ছে, কেন এই ত বেশ। খুব যে দুঃখিত, কৈ তা ত বুঝছি না। তবে হ্যাঁ, হাজার মাইল দূরে বসে আপনি যদি আমার জন্য একটুখানি ভাবেন আর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তা হলে উত্তর ভারতের প্রান্তবর্তিনী এই নগরীর বুকে অনেক ঝড়ো-হাওয়ার সঙ্গে তা আমার গায়ে এসে লাগবে। এই পৃথিবীর কোন কোণায় কেউ একজন তার নিজের কাজ থামিয়ে আমার জন্য একটু গভীরভাবে ভাবল—এটুকু ভাবতে আমার

ভারি ভাল লাগছে। তা বলে সত্যি যেন তা করবেন না, সৌরেনদা।

ও বোধ হয় শীগগিরই বম্বেতে বদলী হয়ে যাচ্ছে। আমি তখন খুকুকে নিয়ে কলকাতায় যাব। ওর শরীরটা এখানে ভাল হচ্ছে না। তখন বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে। প্রণাম রইল। ইতি—'

চিঠি পাওয়ার পর মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম। ভেবেছিলাম, কলকাতায় ফিরেই ও আমায় চিঠি লিখবে। অনেকগুলো দিন কেটে গেল। কিন্তু কোন খবর নেই। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই রইলাম। বেশ কয়েক মাস পর কলেজের একটা জরুরি কাজে কলকাতায় গেছি। ভাবলাম ডক্টর ঘোষের কাছ থেকে মঞ্জুশ্রীর খবরটা নিয়ে আসি। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে অবাক! বাইরের ঘরে মঞ্জুশ্রী বসে বই পড়ছে। 'কবে এলেন?' জিজ্ঞেস করি।

'কে আপনি? কাকে চান? হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন যে?' মঞ্জুশ্রী চীৎকার করে ওঠে। আমি ত হতভম্ব? গোলমাল শুনে ডক্টর ঘোষ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখেই মঞ্জুশ্রীর হাতটা ধরে বললেন, 'ভেতরে চল ত মা।'

মঞ্জুশ্রী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলে, 'না, আমি দেখব; কে ও না বলে—'

'আচ্ছা সে আমি দেখছি। তুমি ভেতরে চল।'

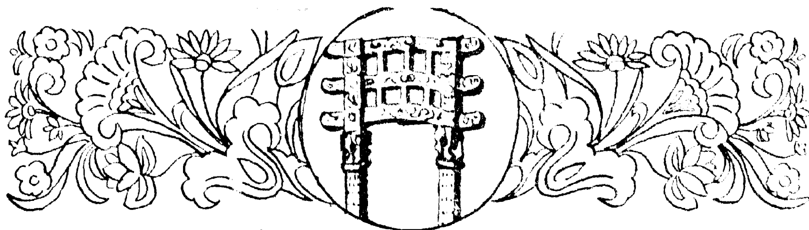
ডক্টর ঘোষ ওকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে যান। আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পরেই ডক্টর ঘোষ বেরিয়ে আসেন।

'কি দেখছ চক্রবর্তী? এ হল একটা ফাণ্ডামেণ্টাল মিস্টেক; আমার গোড়ায় গলদ। বুঝলে না বোধ হয়। বাচ্চাটাকে কোলে পেয়ে ওর অশান্তির মাত্রা বেড়েছিল বৈ কমে নি। ওদের বম্বে যাবার দিনকয়েক আগে বাচ্চাটা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। জামাই ত যাবার তোড়-জোড়েই ব্যস্ত। মঞ্জুর কথা কানেই তুলল না। বাচ্চাটা কয়েক দিন ভুগে একরকম বিনা চিকিৎসাতেই মারা গেল। সে ধাক্কা মঞ্জু সামলাতে পারল না। জামাইয়ের সঙ্গে কয়েক দিন ভীষণ ঝগড়াঝাঁটি করল; কান্নাকাটি করতে লাগল। তারপর একদিন চেঁচামেচি করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান ফিরল বটে, কিন্তু মঞ্জু আর ফিরল না। মাঝে মাঝে লোক চিনতে পারে; আবার একটুতেই হঠাৎ রেগে যায়। সম্পূর্ণ উন্মাদ এখনও হয় নি। তবে ডাক্তাররা আশঙ্কা করেন একটু একটু করে—' চুপ করে যান ডক্টর ঘোষ।

একটু পরে মঞ্জু আবার বেরিয়ে আসে। 'মঞ্জু, চক্রবর্তী এসেছে, চিনতে পার?' মঞ্জু কেমন একরকম ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এগিয়ে এসে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে আমাকে প্রণাম করে; আস্তে আস্তে বলে, 'ভাল আছেন? আমার খুকু নেই, আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি কি নিয়ে থাকব সৌরেনদা?' ফুঁপ্ ফুঁপ্ করে ও কেঁদে ফেলে। ডক্টর ঘোষ আবার ওকে নিয়ে ভেতরে চলে যান। আমি এই ফাঁকে বেরিয়ে আসি।

সাত-আট বছর কেটে গেছে। মঞ্জুশ্রীর পাগলামিও আর ভাল হয় নি। ওর স্বামীও আর ওর খোঁজখবর নেয় না। তবে আমাকে দেখলে এখনও ঠিক চিনতে পারে। পুরনো কথা সব ওর মনে পড়ে। কান্নাকাটি করে, তাই ওকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলি।"

ডক্টর চক্রবর্তী চুপ করলেন। দিগন্তের শ্যামল বনানী পেছনে ফেলে ট্রেন ছুটে চলে রুক্ষ ধূসর রেল-পথের উপর দিয়ে।



ভারতীয় শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি

শ্রীসুধীরচন্দ্র খাস্তগীর

স্বরাজ হবার পর ভারতীয় শিল্পকলার উন্নতি কি অবনতি ঘটেছে, অবনতি যদি না ঘটে থাকে তবে ঠিক পথে চলছে কিনা—এই ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই আজকাল কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে থাকেন। অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা সমীচীন মনে করি। আমি একজন শিল্পী মাত্র। আমার অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব নয়—আমার শিক্ষা এবং দীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

স্বরাজ হবার আগে ভারতীয় শিল্পকলা কি ছিল, এবং কোন্ পথে চলছিল সে বিষয় কিছু জানা দরকার। স্বরাজ লাভের পর বেশী দিন অতীত হয় নাই—সুতরাং স্বরাজ হবার মুখে ভারতীয় শিল্পকলা কি অবস্থায় ছিল প্রথমে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা যাক।

ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টা স্বরাজ হবার অনেক আগেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পাচার্য্যগণের দ্বারা সুরু হয়েছিল এবং তা এমন ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছিল, যা স্বরাজ না হলেও হয়ত কিছুমাত্র ব্যাহত হ'ত না। স্বাধীনতার আগেই ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে কারও কারও নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব ফুটে উঠেছিল। অতি-আধুনিক হবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাও অনেককে অতি-আধুনিক চৈনিক, জাপানী বা ফরাসী শিল্পীদের অনুকরণে প্রণোদিত করেছিল। স্বরাজ হবার পর আমাদের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন যে, ভারতীয় শিল্পের মধ্যে ভারতীয় ভাবটাই প্রাধান্য পাবে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে কার্য্যতঃ তা হয় নি।



প্রতিকৃতি (পোড়ামাটি)

আজকাল কারুর কারুর বিশ্বাস—পরাধীন দেশে ভারতীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার যে ঐকান্তিক ইচ্ছা শিল্পীদের মনে জেগেছিল, তার পিছনে ছিল "ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্‌স"। তাঁদের মতে—এই পুনরুজ্জীবন-প্রয়াসের মধ্যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, ছিল উগ্র স্বদেশপ্রীতি সেই কারণেই নাকি ভাল হোক, মন্দ হোক বিদেশী সবকিছু আমরা বর্জ্জনীয় মনে করেছিলাম।

স্বাধীনতার পর সম্প্রতি এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। ইদানীং কিন্তু কুফল দেখা দিয়েছে অন্য দিক

দিয়ে। আমরা বিদেশী শিল্পের মধ্যে ভালমন্দ সবই যে বাছাই করে নিচ্ছি তা নয়, নির্ব্বিচারে অনুকরণ করে চলেছি।—আগে অনুকরণে যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল সেইটুকু অপহৃত হয়েছে মাত্র। ফল যে খুব ভাল দাঁড়িয়েছে তা নয়। তবে এক্ষেত্রে স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেছে সন্দেহ নাই!

স্বাধীনতার আগেও বহু শিল্পী বিদেশে গিয়ে শিল্পশিক্ষা অর্জ্জন করে—কিংবা ঘুরে ফিরে বিদেশের শিল্পের প্রগতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। কিন্তু তখনও তাঁদের কাজের মধ্যে যে সংযম ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি ছিল এখন আর তা বিদ্যমান নেই! দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব্বে সাহেবী 'কোট প্যান্ট' অনেকের আপিসে যাবার পোশাক মাত্র ছিল—কিন্তু এখন ত দেখি বহুক্ষেত্রে তা শুধু আপিসের পোশাক নয়, ঘরোয়া পোশাকও হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই উপেক্ষা এবং পরানুকরণস্পৃহা বাস্তবিকই দুঃখজনক। তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হবার কারণ নেই। স্বাধীনতার প্রথম তরঙ্গাভিঘাতের ধাক্কা সামলাতে অল্পবিস্তর সময় লাগবে—তারপর শিল্পকলার ক্ষেত্রে আপনা থেকেই সংযম ও স্বকীয়ত্ব ফিরে আসবে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ এটা দেখতে পাচ্ছি যাঁরা ভারতীয় শিল্পকলার কর্ণধার তাঁরা স্বাধীনতার পর বিভ্রান্তকারী রশ্মিচ্ছটায় বিচলিত হন নি বা সংযম হারান নি। চটুকো খ্যাতির আশায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন নি। তাঁরাই অদূর ভবিষ্যতে দেশের শিল্পের মর্য্যাদারক্ষা করবেন এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।



মনে পড়ে (তৈলচিত্র)

দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পীরা শুধু ছবি এঁকে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারতেন না—এখনও পারেন না। তখন যেমন শিল্পীদের শিল্পশিক্ষকের কাজ কিংবা বিজ্ঞাপন আঁকার কাজ বা অন্য কিছু করতেই হ'ত, এখনও অবস্থা সেই রকমই আছে। খুব বেশী তফাৎ নেই। আগে রাজা-মহারাজা ছিলেন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক এবং ক্রেতা। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে শিল্পকলার জন্যে আগেকার মত অর্থব্যয় করা তাঁদের পক্ষে হয় ত সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে অনেকের মনে চিত্র বা ভাস্কর্য্যশিল্প সংগ্রহের স্পৃহা জাগরিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পীরা যদি আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে ছবি ও মূর্ত্তির দাম যাতে সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা-বহির্ভূত না হয় সেদিকে অবহিত হন তা হলে তাদের মধ্যে সংগ্রহস্পৃহা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

আজকাল স্কুল-কলেজে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং শহরে শহরে শিল্পপ্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিশু-শিল্পের প্রদর্শনী সম্পর্কেও একটু বাড়াবাড়ির লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাচ্ছে। এ সব যুগোপযোগী এবং স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়াই ভাল। সাময়িক পত্রপত্রিকাতেও শিল্পকলা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং প্রদর্শনীর দীর্ঘ কিংবা নাতিদীর্ঘ সমালোচনাও আজকাল প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের মতামত—ভালো ও খারাপের বিচার সব সময় যে সুযুক্তিপূর্ণ



কালবৈশাখী (তৈলচিত্র)

আতসবাজী নয়! আজকাল ভুঁইফেড়া শিল্পী বহু হয়েছেন যাঁরা অতি আধুনিকতার নকলনবিশী করে দু'দিন জ্বলে ওঠেন এবং দু'দিনেই মিলিয়ে যান। যাঁরা বহুদিন শিল্পসাধনায় মগ্ন থেকে দেশকে ও দেশের শিল্পকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছেন, ভাল বেসেছেন—তাঁদের ধ্যান-সংযমী তুলিকায় যা ফুটে ওঠে তা চিরন্তন সৃষ্টি। তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে ধীর নিবিষ্ট চিত্তে। উগ্র নূতনত্বের মোহ নিকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি যা হচ্ছে তার বিনাশ হবে অদূর ভবিষ্যতে সে বিষয় সন্দেহ নেই।

শিল্পীদের যেমন কঠোর সাধনার দরকার—তেমনই শিল্প সমালোচকদের শুধু শিল্পবোধ ও সাধনা থাকলেই চলবে না, দায়িত্ববোধও চাই। স্বাধীন ভারতে প্রকৃত শিল্প-সমালোচকেরও অত্যন্ত অভাব বলে মনে হয়। দেশের শিল্প-আলোচনার ভার যখন বিদেশী শিল্প-সমালোচকের হাতে পড়ে তখন তার মত দুঃখের কথা আর কি হতে পারে। ভারতের সংস্কৃতির মূলমন্ত্র বুঝবার সামর্থ্য এঁদের নেই! বিদেশী শিল্পের অনুকারী শিল্পীদের স্বভাবতঃই তাঁরা উচ্চাসনে বসাবেন সে বিষয় আর সন্দেহ কি? আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশী শিল্প-সমালোচক—যাঁরা আমাদের শিল্প-সমালোচকদের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বসেছেন, তাঁদের অনুকরণ করে দেশীয় শিল্প-সমালোচকরা আজ পথভ্রষ্ট, বিদেশী শিল্প-সমালোচকদের বই পড়ে তাঁরা নূতনত্ব দেখাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। সেই কারণেই বোধ করি স্বাধীন ভারতে শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্প-সমালোচকেরা আসর জাঁকিয়ে বসেছেন।

স্বাধীন ভারতে শিল্পের কদর বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু শিল্পকলার উৎকর্ষসাধন-প্রচেষ্টা এখনও দানা বাঁধে নাই। পূর্বেই বলেছি তার জন্য ভাবিত হবার কিছুই নেই—এত দিনের সংস্কৃতি অত সহজে বিনষ্ট হবার নয়। শিল্প সাধনার পাদপীঠ ভারতবর্ষে মহান্ এবং সমুন্নত শিল্প ও সংস্কৃতির পূর্ণ পরিণতি ঘটবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হয় তাও নয়! একদল শিল্পীর মধ্যে যেমন আজকাল অতি-আধুনিকতার প্রতি উৎকট অনুরাগ দৃষ্ট হয়, একদল শিল্প-সমালোচকও তেমনি প্রচণ্ড উৎসাহে ভাল-মন্দ বিচার সম্পর্কে নিজেদের মতামতকেই চূড়ান্ত মনে করে নির্বিচারে লেখনী পরিচালনা করছেন।

শিল্প-প্রদর্শনীতে ছবি বা মূর্ত্তি দেখবার সময় শিল্প-সমালোচকদের মতবাদ দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত না হয়ে ভাল-মন্দ বিচারের ভার খানিকটা নিজের উপর রাখাই সমীচীন।

ছবি বা মূর্ত্তি দেখবার সময় জিনিসটা কার আঁকা বা কার গড়া—তার সম্বন্ধেও খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার। শিল্প সাধনার বস্তু। সাধনা ছাড়া শিল্পসৃষ্টি হয় না। শিল্প



নবম পরিচ্ছেদ

চিন্তার আর অবধি ছিল না চন্দ্রভূষণবাবুর। ব্রজবিহারী বাবু কি তবে—? মানুষের মনের অন্তঃস্থলে আর একটি সত্তা আছে, যে সত্তা সব যুক্তিতর্ক শিক্ষাসংস্কার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধির বাইরে, যা হয় অবুঝ, নয় সকল বুঝের উপরে, চন্দ্র-ভূষণ বাবুর মনের সেই সত্তা এ সন্দেহে বার বার প্রতিবাদ করে ওঠে। না—না—না; এ হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেই তিরস্কার করে ওঠে। কিন্তু তবুও আশ্বস্ত হতে পারেন না। এতগুলি ছেলের ভালমন্দ যে তাঁদের হাতে। এ সংসারে নিজের দেশকে কে না ভালবাসে? কে না স্বাধীনতা চায়? তার উপর কিশোর কচি মন। কে কোথায় কি বলবে—সে শুধু মুখের কথা—হয় ত বুকের কথাই, কিন্তু তবু সে কথাই, কোন কাজ নয়; দেশকে ভাল বাসি বললেই সে বোমা তৈরি করে পিস্তল সংগ্রহ করে, যুদ্ধ করতে তৈরী হয় তা নয়। সেই মুখের কথার অপরাধে যদি একটি ছাত্রেরও ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় তবে সে ত শুধু আক্ষেপের কথাই হবে না, সে হবে চিরজীবনের গ্লানির কথা, তা থেকে আর নিষ্কৃতি থাকবে না।

রামজয় বলে—পাপ। পাপ ঠিক রামজয় যেভাবে মানে সেভাবে তিনি মানেন না, তবে অবিস্মরণীয় গ্লানিকর কর্ম্মকে যদি পাপ বলে তবে তিনি পাপ মানেন; যে কর্ম্মকে লোকে পুরুষানুক্রমে নিন্দা করবে তাকে পাপ বললে পাপকে তিনি মানেন। এও ঠিক সেই ধরণের কর্ম্ম।

নিজের বাসার বাইরের ঘরে ঠিক দরজার সামনে বসে তিনি তামাক খেতে খেতে কথাগুলি ভাবছিলেন। নতুন বাসাতে তিনি এসেছেন। বোর্ডিং কম্পাউণ্ডের ফটকের পাশের ঘরখানিও এখনও তাঁরই আছে। সেখানি এখন বোর্ডিঙের আপিস হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে বসেন চন্দ্রবাবু। গ্রামের বা বাইরের ভদ্র লোকজন এলে সেখানেই বসানো হয়, গল্পগুজব আলোচনা চলে সেই আগেকার কালের মত।

বাসার ভিতর দিকের দরজার মুখে এসে দাঁড়াল চন্দ্র-বাবুর মেয়ে দশ বছর বয়সের বঙ্গবালা। উনিশ শ' ছয় সনে বঙ্গভঙ্গের বছরে ফাল্গুন মাসে ওর জন্ম বলে চন্দ্রবাবু নাম রেখেছিলেন বঙ্গবালা। চন্দ্রবাবুর স্ত্রী ওকে বেঙী বলে ডাকেন। চন্দ্রবাবু রাগ করেন, বোঝাতে চেষ্টা করেন—কত বড় অপরাধ হয় এতে। কিন্তু চন্দ্রবাবুর স্ত্রী হাসেন; বলেন—বেঙী তো ডাকনাম। বেঙী নামে ডাকলেও বঙ্গবালা বঙ্গবালাই থাকবে। আমি বাপু এত বড় নাম বলতে পারিনে। তবে বাইরে লোকের সামনে বঙ্গবালাই বলব।

বঙ্গবালা বাবাকে ভয় করে। যা দাড়ি-গোঁফ, যা গম্ভীর মানুষ, যা কথাবার্ত্তা বলেন! এখানে, অর্থাৎ ইস্কুলের বাসায় এসে সে ভয় আরও বেড়ে গিয়েছে। ইস্কুলের ছেলেদের কি ভয়!

চন্দ্রবাবু বললেন—কি?

বঙ্গবালা বললে—চুপি চুপি বললে—মা তোমাকে ডাকছে।

—কেন?

—জানি না। বললে, চুপি চুপি বলে আয় আমি ডাকছি।

—যাও, মাকে এখানেই ডেকে দাও।

—মা আসবে এখানে? ওদিকের দরজাটা খোলা রয়েছে —বন্ধ করে দেব?

অর্থাৎ চন্দ্রবাবুর সামনের খোলা দরজাটা।

—না।

বঙ্গবালা বিস্মিত হয়ে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দরজা খোলা থাকবে—অথচ মা এসে বাবার সঙ্গে কথা বলবে! সামনের খোলা জায়গাটায় টিফিনের সময় ছেলেরা ছুটোছুটি করছে; তারা দেখবে যে!

চন্দ্রভূষণ বাবু আবার বললেন—ডাক তোমার মাকে।

বঙ্গবালা চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই চন্দ্রবাবুর স্ত্রী আবক্ষ ঘোমটা টেনে বাড়ীর ভিতর দিকের দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন এবং ফিস ফিস করে কি বললেন।

চন্দ্রবাবু বললেন—কি বলছ শুনতে পাচ্ছি না। এতখানি ঘোমটা কেন? ঘোমটা খুলে কথা বল না।

সত্যবতী অল্প খানিকটা ঘোমটা সরিয়ে বললেন—একটু জোরেই ফিস ফিস করে বললেন—বাইরের ঘরে কি দিনের বেলা কথা বলা হয়? ভিতরে এস।

—আঃ, এখানেই বল না বাপু। কি হয়েছে এখানে বলতে?

—সামনে রাজ্যের ছেলেরা রয়েছে।

—থাকলেই বা। ওরাও ত তোমার ছেলে। ওদের সামনে কথা বলতে লজ্জা কি?

—না, সে আমি পারব না। ভিতরে এস তুমি।

বলেই চলে গেলেন সত্যবতী। দরজার ওপাশে গিয়েই তাঁর কণ্ঠস্বর সহজ এবং উচ্চ হয়ে উঠল; যেন এতক্ষণ বোতলে ছিপি এঁটে বন্ধ ছিল—ছিপিটা খুলে গেল। তাঁর সে কণ্ঠস্বর এখন বাসাবাড়ীর সীমানা গণ্ডী পার হয়ে ইস্কুল বোর্ডিং কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, ওদিকে ইস্কুল বিল্ডিংয়ের দেওয়ালের গায়ে ঠেকে মৃদু প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে। তিনি বলছেন—বাসার সুখে আমার কাজ নাই; এই বয়সে আর লজ্জাসরম ঘুচিয়ে হাল-ফেশানী হতে পারব না। হ্যাঁ!

গভীর চিন্তার গুমোটের মধ্যে কৌতুকবোধের বাতাসের একটি ঝলক বয়ে গেল যেন অকস্মাৎ। চন্দ্রবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি হুঁকো হাতেই উঠে বাড়ীর ভিতরে এলেন—বললেন—এই ত বেশ গলা খুলে গেল। গোটা বোর্ডিংময় শোনা যাচ্ছে।

—যাচ্ছে যাচ্ছে, তাতে আমার কি?

—ছেলেরা বলবে কি?

—কি বলবে? আমি ত দশের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছি না। চারিপাশে পাঁচিলের আড়াল; লোকে কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে?

হেসে চন্দ্রবাবু বললেন—যাক, এত দিনে বুঝলাম ভেড়ারা শেয়াল কি নেকড়ে দেখলে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে কেন।

সত্যবতী হেসে ফেললেন। রাগ করলেন না। রাগ করবার মত মানুষ তিনি নন। বিশেষ করে স্বামীর কথায়। চন্দ্রবাবু তাঁর কাছে সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আর কি গভীর ভালবাসা তাঁর। সত্যবতীর জীবনে এতটুকু অভি-যোগ অনুযোগ রাখবার স্থান তিনি রাখেন নি। চন্দ্রবাবুর গ্রামের বাড়ীতে বাইরের বাড়ীর উঠানে শিরীষ গাছে একটি মধুমালতীর লতা জড়িয়ে উঠেছে। ঝড়-ঝাপটায় শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে পড়ে, পাতা ছিঁড়ে উড়ে যায়—কিন্তু মালতীলতার ডাল কি পাতা ছিঁড়ে পড়তে কখনও সত্যবতী দেখেন নি। রক্ষা করে ওই শিরীষ। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে উঠে লতাটি মাথা তুলে আলো-বাতাস ভোগ করে, শিরীষগাছটি যেন তাঁর স্বামীর মতই সস্নেহে হেসে তাকে ধরে রাখে, উঁচু করে ধরে রাখে। শুধু তাই নয়—এ অঞ্চলের মানুষেরা যে শ্রদ্ধা তাঁকে করে—তাঁর সম্পর্ক ধরে তাঁকেও যে শ্রদ্ধা-সম্মান করে যায় সে শ্রদ্ধা-সম্মান রাণী-মহারাণীরাও পায় না। তাঁরা কায়স্থ, বামুনের ছেলেরাও এসে তাকে প্রণাম করে। প্রথম প্রথম সত্যবতী শিউরে উঠতেন—মনে মনে অকল্যাণ আশঙ্কা করে শঙ্কিত হতেন; এখন ক্রমে সেসব সয়ে গিয়েছে। তিনি গুরুমা, এ বোধ তাঁর এসে গিয়েছে মনের মধ্যে। আর চন্দ্রবাবুর কি সুন্দর কথাগুলি! সে কথার যে কত দাম—সে বোধ হয় এক সত্যবতী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। ছেলেরা তাঁর পড়ানোর দাম বোঝে, পড়ানোর কথা আর চন্দ্রবাবুর নিজের কথায় তফাৎ অনেক। কত কথা যে সত্যবতীর মনে গাঁথা হয়ে আছে সে এক সত্যবতীই জানেন। ছোট ছোট ঘটনায়—কাজে মনে পড়ে যায়। সত্যবতীর মনের মধ্যে গৃহস্থবাড়ীর লক্ষ্মীর ঘরের মত একটি পবিত্র ঘর আছে, সেই ঘরে মণিমুক্তার মত থরে থরে স্বামীর কথাগুলি সাজানো আছে। সুখ হোক দুঃখ হোক—কোনকিছু ঘটলেই সে ঘরের দরজা আপনি খুলে যায় এবং চন্দ্রবাবুর কথাগুলি যেন দৈববাণীর মত বেজে ওঠে।

এই ত সেদিন—এ বাসায় এসে প্রথম দিনই বঙ্গবালা আনন্দের আতিশয্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে উঁচু চৌকাঠে হুঁচোট খেয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা তুলে ফেলে-

ছিল ; ইস্কুলের চাকর কেষ্ট অত্যন্ত রাগ করেছিল ছুতোরের উপর ;—এই চৌকাঠ ? এর নাম গড়ন ? ঠিকের কাজ, ইস্কুলের কাজ ! কে দেখে, কে শোনে ? এই এত মোটা চৌকাঠে হুঁচোট লাগবে না ?

বকাবকি করেই কেষ্ট ক্ষান্ত হয় নি, পরের দিন সকালেই একজন ছুতোরমিস্ত্রী এনে হাজির করেছিল, সমস্ত চৌকাঠ-গুলো কেটে চেঁছেছুলে যথাসম্ভব নিচু করে দিতে বলে-ছিল।

সত্যবতী বলেছিলেন—থাক। বেশ আছে।

—থাকবে ? বেশ আছে ? কেষ্টর বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না।

চন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সত্যবতীর। অনেক দিন আগের কথা। সত্যবতীর সঙ্গে চন্দ্রবাবুর বিয়ের পরই। অষ্টমঙ্গলার সময়কার কথা। সত্যবতীর বাপের বাড়ীর একটা দরজা খুব ছোট, সত্যবতী মেয়েছেলে, মাথায় একটু খাটোই বলতে হয়, দরজাটা সত্যবতীর মাথার চেয়ে মাত্র আঙুল-দুই উঁচু। চন্দ্রবাবু লম্বা মানুষ ; সত্যবতীর বোনেরা বাসর-ঘরে ঠাট্টা করে বলেছিল—তালবৃক্ষ।

সত্যবতীর এক রসিকা ঠাকুমা ছড়া বাঁধতে পারতেন—মজার মজার ছড়া ; তিনি ছড়া বেঁধেছিলেন। প্রথমে বলে-ছিলেন—উঁহু, নিম—নিম। তাল নয়। লম্বা নিম।

"নিম আর বেগুনে—
মজবে ভাল ফাগুনে।"

নাতনীরা বলেছিল—নিমে বেগুনে মজাবার জন্যে, ছড়ায় মেলাবার জন্যে নিম বললে শুনব না। উনি তালবৃক্ষ। পার ত তালের সঙ্গে মেলাও। নইলে ও ছড়া তোমার নাকচ ঠাকুমা।

ঠাকুমা বলেছিল—বেশ তালই সই। নাতজামাই তাল —নাতনী আমার তিল।

তালের পাশে তিলের চারা,
ভাদ্র মাসে চড়বে কড়া—
তিলের তেলে তালের বড়া
আসিস খেতে ছুঁড়ি ছোঁড়া।

এমনি এক এক মুহূর্তে জীবনের সরস মুহূর্তগুলি মনে পড়ে সত্যবতীর। সে কথা যাক। চন্দ্রবাবু অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে ওই ছোট দরজাটিতে মাথায় ঠোক্কর খেয়েছিলেন ; সে ঠোক্কর বেশ একটু কঠিন ঠোক্কর ; এখন চন্দ্রবাবুর মাথায় টাক পড়েছে তখন টাক পড়ে নি, বেশ একমাথা কোঁকড়ানো চুল ছিল ; ছিল তাই রক্ষা ; তবুও মাথা একটু কেটে গিয়েছিল ; রক্ত একটু পড়েছিল। সত্যবতীর মা স্বামীকে যে বকুনিটা সুরু করেছিলেন—তাতে সত্যবতী লজ্জা পেয়েছিলেন। জামাইয়ের সামনে মা কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে ? মা অবশ্য মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দরজাটাকে পাল্টাতে বলতেন, বাবাও বলতেন—'পাল্টাব'—কিন্তু পাল্টান নি। সেদিন চন্দ্রবাবুই সকলের ক্ষোভ মিটিয়ে শুধু শান্তই করেন নি, ওই ছোট দরজাটাকে পাল্টাবার কথাও চিরদিনের মতই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'না—না—না। ও দরজা কখনও পাল্টাবেন না। মাথা নিচু করে চলা ত সহজ শিক্ষা নয়, সেই শিক্ষা দেয় ওই দরজাটি। ছেলেরা মাথা নিচু করে চলতে শিখবে। বড়র কাছে মাথা নিচু করে সবাই, ছোটর কাছে মাথা নিচু করতেই শিখতে হয় ; সেই ত আসল বিনয়। আমার বাড়ীতে এমনি একটি ছোট দরজা করব আমি।'

মিথ্যে সান্ত্বনার জন্য বলেন নি, সত্যসত্যই বাড়ীতে একটি ছোট দরজা করেছেন তিনি।

সেই কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল সত্যবতীর। কেষ্টর আনা ছুতোরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। থাকুক উঁচু চৌকাঠ আহ্লাদে আটখানা হয়ে চোখ-না-চেয়ে ছুটে চলার ধিঙ্গিপনা থেকে বাঁচবে মেয়েটা—পথ চেয়ে ধীর গমনে চলতে শিখবে। এমন কত কথা।

স্বামীর কথায় রাগ না করে হেসে সত্যবতী বললেন—আমাকে ভেড়া বললে তুমি নিজেও ভেড়া। মেয়ে-ভেড়ার স্বামী পুরুষ-ভেড়া। বড়জোর লড়ুইয়ে ভেড়া হতে পারে। তা মনে রেখো।

হেসে চন্দ্রবাবু বললেন—উঁহু। ও যুক্তি এখানে খাটে না।

—কেন ?

—বড় বড় প্রতাপশালী রাজা-জমিদারের নাম শুনেছ ত ? শুনেছ ত তাঁর দাপটে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায় ? শুনেছ ত ?

—তা শুনেছি।

—এও তাই। বিয়েকে বলে বিধাতার লিখন। তিনি ত সব প্রতাপশালীর সেরা প্রতাপশালী ? তাঁর দাপটে ভেড়া-বুদ্ধি মানুষ—আর মানুষবুদ্ধি মানুষে একসঙ্গে ঘর করে। আর মানুষ কি ভেড়ায় হয় ? বুদ্ধিগুণে লোকে কয়। কেউ বা ভেড়া কেউ বা বাঘ, কেউ বা সাপ কেউ বা মানুষ, যার যেমন বুদ্ধি, যার যেমন হুঁস। এ সত্যি যদি ছেলে পড়াতে ত বুঝতে পারতে। ওঃ এক-একটা ছেলে গাধারও অধম। কেউ বা উল্লুক, কেউ বা বাঁদর ; কেউ বা মোষ। যাক, এখন বলছিলে কি ?

—বলছিলাম, এই শনিবারে পূর্ণিমে। প্রথম বাসা—

সত্যিনারাণ করবার কথা বলে রেখেছি তোমাকে। তা —শুভ কাজে দেরি করে কি হবে ? এই শনিবারে হোক না ? মাষ্টারদিগে খাওয়াবে বলছিলে,—খাওয়ানো হয়ে যাবে।

—না। তা হবে না। সিন্নী দিয়ে সারলে চলবে না।

—ভাল করে সিন্নী কর। লুচি, সুজির পায়েস, মিষ্টি—পাঁচ রকম কর।

—পাঁচ রকমই কর আর দশ-বিশ রকমই কর, আসল রকম সিন্নীতে বাদ। মাছ নইলে এ আমলে খাওয়া—খাওয়াই নয়। তা হোক সত্যনারায়ণ শনিবার দিন ; সিন্নী ভাল করেই কর, লুচি, সুজির পায়েস, মিষ্টি, ফলমূল। বোর্ডিংএর ছেলেরা আছে, মাষ্টারমশায়রা আছেন, সকলকে দিতে হবে। তার ফর্দ্দ কর। গ্রামেরও দু'চার জনকে বলতে হবে।

একটু থেমে বললেন—সকলের আগে রামজয়কে জিজ্ঞাসা করি দাঁড়াও। তার আবার খোলসা থাকা চাই। সত্যনারায়ণের পূজা চাই ত। সে ত রামজয় ছাড়া হবে না।

—তাঁকে আমি আগেই খবর পাঠিয়েছি। তিনি এসেছিলেন।

—ওরে বাপরে। সেসব হয়ে গিয়েছে ? কি বলেছে সে ? পারবে ? কৈ আমাকে ত কিছু বলে নি।

—তিনি বললেন—চন্দ্রকে বলুন, সে বললেই আমি পারব। আমি বললাম—আপনি টিফিনের সময় তা হলে আসবেন। তা তিনি বললেন—সেটা ঠিক হবে না, হাজার হলেও চন্দ্র হেডমাষ্টার আমি হেড হলেও পণ্ডিত।

—তাই বলেছে—রামজয় ?

—তাই ত বললেন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চন্দ্রবাবু। রামজয় এই কথা বলেছে ?

—তুমি রাগ করলে না কি তার ওপর ?

—নাঃ।

—তবে ? এমন করে চুপ করে রয়েছ ?

—নাঃ। এবার হেসেই উত্তর দিলেন চন্দ্রবাবু।—নাঃ, রাগ করি নি। রাগের কথা ত নয়। একটু চুপ করে থেকে বললেন—রামজয় আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সে এই কথা বললে, একটু দুঃখ হ'ল।

—তোমাকে দেখে যে ভয় লাগে গো। বাড়ীতে যখন ছিলাম তখন তোমাকে এত ভয় লাগত না, বাসায় এসে—বেশী ভয় লাগছে। তুমি যেন চব্বিশ ঘণ্টাই হেড মাষ্টার।

বাইরে কে গলার সাড়া দিল। বাইরে কেউ এসেছে।

—কে ? যাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চন্দ্রবাবু বাইরের ঘরে বেরিয়ে এলেন।

ফোর্থমাষ্টার কেষ্টবাবু।

কেষ্টবাবু একখানা চটি বই—তাঁর হাতে দিলেন—দেখুন।

—কি এখানা ? 'শান্তি' ! বাংলা ম্যাগাজিন ?

—হ্যাঁ। আমাদের শিবনাথ কবিতা লিখেছে !

—শিবনাথ ! কেমন লিখেছে ? বাংলা কবিতা ত আপনি ভাল বোঝেন।

—লিখেছে ভাল। হাত ওর ভালই বটে। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে—এবার যদি কবিতা নিয়ে মাতে ত ও আর পাস করতেই পারবে না। ওকে একটু সাবধান করে দেবেন আপনি। পড়াশুনা ত ভাল করছে না আজকাল।

—ঠিক বলেছেন। আজই সাবধান করে দেব। কিন্তু—। একটু চুপ করে থেকে বললেন—পড়াশুনা ভাল করছে না ?

—হয় ত আপনার ক্লাসের পড়াশোনা ভালই করে, কিন্তু জিয়োগ্রাফী ভাল পড়ে না।

—থার্ডমাষ্টার ভূতনাথবাবু বাড়ীতে থাকেন অথচ পড়ছে না ? ভূতনাথবাবুকে বলেছেন ?

—না। বলি নি। নতুন লোক, কি মনে করবেন তা ত জানি না। বলতে পারি নি।

নতুন থার্ডমাষ্টার ভূতনাথবাবু। ভূতনাথবাবু আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিল্বগ্রামের অন্যতম অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র শিবনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। থার্ডমাষ্টার ভূতনাথবাবুই স্কুলের খেলাধুলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক—গেম্‌স্ টিচার।

—কথাটা আপনার কানে তুলতাম না হয় ত কিন্তু আর একটা ঘটনা ঘটেছে।

—কি হ'ল ?

—আমাদের পবিত্রবাবুর সাহিত্যসভার কথা জানেন ত। আমিও ওঁদের মধ্যে আছি। এখন এ মাসে একটা কবিতা দিয়েছে শিবনাথ; কবিতাটি ঠিক সিডিসান্ না হলেও —খুব এক্সাইটিং। আমার ত ভাল লাগছে না। কবিতাটি ভূতনাথবাবু দেখে দিয়েছেন মনে হচ্ছে। শুনলাম—ভূতনাথবাবুই বলছিলেন—আমাদের এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার মশায়ও তারিফ করেছেন খুব।

চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

—স্যর ! এসে দাঁড়াল ধ্রুব ঘোষ ; ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয়। কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মূর্তির মত দেহ। বয়স ষোল বছরেরও কম। মাথায় খাটো ছেলেটি দেখতে সুশ্রী নয়—কিন্তু শরীরের গঠনসৌষ্ঠবে এবং পেশীর দৃঢ়তায় বৃন্দাবনের

রাখালগোষ্ঠীর একটি রাখাল বলে মনে হয়। চাষী সদ্‌গোপের ছেলে, ইস্কুলের চাকর কেষ্ট ঘোষদের জ্ঞাতিঘরের ছেলে; মাইনরে বৃত্তি পেয়ে চৈতন্য ইনষ্টিটুশনে ভর্তি হয়েছিল চার বছর আগে। প্রতি ক্লাসে প্রতি বিষয়ে ধ্রুব ফার্স্ট হয়েছে। রেকর্ড মার্ক পায়। কেবল ইংরিজীতে সে অন্য বিষয়ের তুলনায় একটু নরম। ইস্কুলে ফ্রি, বোডিংয়েও ফ্রি। নির্ভীক প্রাণবন্ত ছেলে। তবে মাষ্টারদের দু'একজন বলেন —আর একটু বিনয় থাকলে সোনায় সোহাগা হ'ত। ধ্রুব উদ্ধত নয়, কিন্তু যে বিনয়ে ওর চরিত্রের শোভা ও মহত্ত্ব বাড়ত তার অভাব আছে। কোন বিষয়ে ও কারুর কাছে পিছিয়ে থাকবে না। পড়াশুনা থেকে আরম্ভ করে খেলাধুলা পর্যন্ত। ফুটবল খেলা ধ্রুবর ঠিক আসে না, কিন্তু তাও সে ছাড়ে নি। আয়ত্ত করেছে একরকম করে। কৌশল এবং খেলায় চাতুর্যের অভাব পূরণ করেছে দৈহিক শক্তিতে ও দৃঢ়তায়। বল মারে আঙুলের ডগা দিয়ে, আর ছুটতে পারে তীরের মত, বল ঠিক গোলে পৌঁছয় না, তবে এ মাথায় বল ধরে সেটা নিয়ে তীরবেগে ছুটে ও মাথায় বাউণ্ডারী লাইন পার করে দিয়ে ছাড়ে।

চন্দ্রবাবু বললেন—কি ?

—ফুটবল ম্যাচ হবে সার, প্লেয়ার সিলেকশন হচ্ছে—তা আমাকে নিচ্ছেন না। আমি কারুর চেয়ে খারাপ খেলি না।

ফুটবল ম্যাচ! হ্যাঁ, রামপুরহাট ইস্কুল থেকে একখানা চিঠি এসেছে বটে। কিন্তু এখনও ত 'খেলা হবেই' এমন ত স্থির হয় নি। তিনি ম্যাচ-ট্যাচ পছন্দ করেন না। আদৌ পছন্দ করেন না। খেলাধুলা, ব্যায়ামচর্চা মন্দ জিনিস এমন তিনি বলেন না, কিন্তু ছাত্রজীবনে ওটির প্রভাব ঠিক ভাল করে না। না, করে না; এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলবেন। তাঁর এই বারো-তের বৎসরের শিক্ষক-জীবনে যতগুলি ওই ধরণের ছেলেকে দেখলেন—তাদের একটি-দুটি ছাড়া আর সবগুলিই লেখাপড়ায় ব্যর্থ হয়েছে; শুধু তাই নয়—কেমন যেন উদ্ধত হয়ে ওঠে। তিনিই স্পষ্টই বলেন—গুণ্ডা হয়ে যায়। শাসন করবার সময় দেখেছেন তিনি, তারা গোঁয়ারের মত তাকায়, গোঁয়ারের মত দাঁতে দাঁত টিপে মার খেয়ে যায়, 'আর করব না' একথা কিছুতেই বলে না, এক-একটা ছেলে আবার যেন মাষ্টারদের দৈহিক শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সুরু করে দেয়, চুল ধরে টানলে ঘাড়টা শক্ত কাঠের মত অনমনীয় করে রাখে, নোয়াবে না, মাথা নোয়াবে না তারা! এর উপর ফুটবল খেলার একটা নেশা আছে। আশ্চর্য্য নেশা! খেলে যেন আশ মেটে না। এ পর্যন্ত রবিবার বা ছুটিছাটার দিন বরাবরই বাড়ী গিয়েছেন—বোডিংয়ে থাকেন নি, কিন্তু তিনি জানেন—যে ছেলেগুলো ভাল ফুটবল খেলে তারা ছুটির দিন সকাল থেকে ফুটবল বের করে পিটতে থাকে। সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত পিটে তবে ক্ষান্ত। সেও আলোর অভাবে। অন্য দিন, চারটে বাজবার আগে থেকেই চুলবুল করে; খেলোয়াড়দের মধ্যে ইসারা চলে। ছুটি হওয়ামাত্র ছুটতে থাকে, বাড়ী বা বোডিংয়ে গিয়ে বইগুলো ধপ করে ফেলে—দুটো মুড়ি জল দিয়ে ভিজিয়ে গোগ্রাসে গিলে মাঠে ছোটে। পৌনে পাঁচটা-পাঁচটা থেকে আরম্ভ করে সাড়ে ছ'টা-সাতটা পর্য্যন্ত মরণবাচন জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে, বল পিটে গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি করে, পা মচকে বা আছাড় খেয়ে হাঁটু ছিঁড়ে, নখ তুলে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরেই ঢক ঢক করে আকণ্ঠ পুরে জল খাবে। তারপর পড়তে বসেই ঢুলতে থাকবে। ওই খেলার মাঠেই ভাল ছেলে মন্দ হয়; সিগারেট খেতে ধরে, অশ্লীল রসিকতা করতে শেখে।

ওই শিবনাথ ছেলেটা! ওটারও এই নেশা আছে। কবিতা নেশার উপর আবার এই নেশা। অবশ্য ছেলেটির বাড়ীর শাসন তরিবৎ ভাল, আর ছেলেটার মেটালও ভাল—তাই সিগারেট খায় না, অশ্লীল রসিকতা ইত্যাদির দিকেও যায় না, কিন্তু লেখাপড়ার দিকটা নষ্ট হতে বসেছে। ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত ফার্স্ট হয়েছে। থার্ড ক্লাসে থার্ড, সেকেণ্ড ক্লাসে ফিফথ, এবার ম্যাট্রিকের বছর, এবারও ওর হুঁস নাই। একবার তাঁকে না জানিয়ে ও বিল্বগ্রামের ভিলেজ টিম থেকে বাইরের ফুটবল দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলেছিল বলে তিনি তাঁর পাঁচ টাকা জরিমানা করেছিলেন।

ফুটবল খেলা তিনি পছন্দ করেন না। না, করেন না। ওর ফল ভাল নয়। আর ওকি ডাল-ভাত-খেকো বাঙালীর ছেলের খেলা? ইংরেজরা খেলে, ওরা শীতপ্রধান দেশের লোক, ওদের দেশে দুরন্ত শীতে এমনি ছুটোছুটি ভিন্ন রক্ত গরম হয় না, ওরা ষাঁড়ের ডালনা খায়, মদ খায়; এ খেলা ওদের! উপায় নাই, দেশে চলন হয়েছে, ফুটবল টিম রাখা কর্ত্তৃপক্ষ পছন্দ করেন—তাই রাখতে হয়েছে। এর উপর আবার ম্যাচ কেন? তাও অন্য জায়গার ছেলেদের সঙ্গে!

চন্দ্রবাবু বললেন—যাও। যাও। খেলে কেউ রাজা হয় না। আর ও ম্যাচ হবে না।

—থার্ডমাষ্টার মশাই যে চ্যালেঞ্জ এ্যাক্‌সেপ্ট করেছেন!

—যাও। যাও। সে ক্যানসেল হয়ে যাবে।

ধ্রুব চলে গেল।

চন্দ্রবাবু বললেন খেলা ত বন্ধ করতে হবে কেষ্টবাবু।

রামজয় এসে উপস্থিত হলেন—কেষ্টবাবু রয়েছেন না কি?

(ক্রমশঃ)

বিনোবা

(জীবন-কর্ম্ম)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

"স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। এখন সাম্যযোগের আদর্শপ্রাপ্তির জন্য আমাদের কাজ করতে হবে"—এই ছিল তখন বিনোবার ধ্যান, বিনোবার জ্ঞান। তিনি গণ-সংযোগের পথ, জনগণকে সচেতন, জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ করার পথ খুঁজিতেছিলেন।

ঐ সময়ে (ডিসেম্বর ১৯৪৯) ভারতে বিশ্বশান্তিবাদীদের দুইটি অধিবেশন হয়—প্রথমে শান্তিনিকেতনে, পরে সেবাগ্রাম আশ্রমে, গান্ধীকুটিরে। প্রথম অধিবেশনে বিনোবা যোগ দিতে পারেন নাই। অসুস্থ ছিলেন। বার্ত্তা পাঠান। তাহা হইতে বিনোবার চিন্তার আভাস পাওয়া যায়:

"রাজশক্তির কাছ থেকে আমাদের বেশী প্রত্যাশা না করাই ভাল। তার মানে এ নয় যে, তারা বিশ্বশান্তি চায় না। কিন্তু তারা সকলে এক কু-চক্রে পাক খাচ্ছে। একে অন্যের সঙ্গে তারা লড়াই করে, একে অন্যকে ভয় করে। আমাদের কাজ জনসাধারণের মধ্যে। আমাদের যেতে হবে কৃষক-মজুর, ছাত্র-শিক্ষক শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে, তাদের অহিংসার শিক্ষা দিতে হবে। শেষটায় শ্রমিকদেরই হত্যাকারী বনতে হয়; শাস্ত্রজ্ঞ তাদের সহায়তা করে, শিক্ষক-ছাত্র তাদের সমর্থন করে আর সরল-স্বভাব জনসাধারণ মনে করে এতেই তাদের কল্যাণ। এদের সকলের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে আর সেবার ভিতর দিয়েই তা হতে পারে। সেবার ভিতর দিয়ে যদি আমরা জীবন শুদ্ধ করে চলি তবে ভগবৎ প্রকাশের (তেজের) বাহক আমরা হতে পারব। কাজ তো তিনিই করবেন। আমরা তাঁর হাতে নিমিত্ত মাত্র, হাতিয়ার মাত্র। কিন্তু তাঁর হাতের হাতিয়ার হতে হলে আমাদের পূর্ণ নিরহঙ্কার হতে হবে। নিজেদের শূন্যবৎ হতে হবে। এ যুগে সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু অহিংসার চূড়ান্ত প্রকাশ (বিকাশ) কেবল সংস্থা-প্রতিষ্ঠা দ্বারা হবার নয়। তার বিকাশ হবে জীবনশুদ্ধি থেকে; আর একবার বিকাশ হয়েছে তো নিজ অন্তঃশক্তিতে কাজ করে যাবে।"

সেবাগ্রাম আশ্রমে গান্ধীকুটিরে বিশ্বশান্তিবাদীদের অভ্যর্থনাকালে বিনোবা যেকথা বলেন তাহা হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন-কর্ম্মের স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে:

"বিনাশের কাজে সহায়তা না করা অহিংসা নয়। অহিংসা মানে গঠনকর্ম্মে, মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করা। আশপাশের গরীবদের সঙ্গে "একরস" হওয়া ছাড়া অহিংসা কোথায়?"

২

গণ-সংযোগের, মানবসেবার, গরীবদের সহিত "সমরস" হওয়ার, একরূপ হওয়ার সাধনা সিদ্ধ হইল। বিনোবার বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সাম্যযোগের আদর্শপ্রাপ্তির পথ—অহিংসার পথে জনগণের বন্ধন-মুক্তির পথ—তাঁহার সামনে খুলিয়া গেল।

নেতা সময়োপযোগী কাজ খোঁজেন, কাজ খোঁজে যুগোপযোগী নেতা। আর বিপ্লব অনুকূল সময় বাছিয়া লয়। এই তিনের যখন সমন্বয় হয় তখন বিপ্লব পূর্ণাঙ্গ হয়, সাফল্যের দিকে সহজ গতিতে অগ্রসর হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রধান প্রধান রাষ্ট্র (অপ্রধান রাষ্ট্রের কথা তো উঠেই না) বুঝিয়াছে যে, যে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা ধ্বংসলীলায় মাতিয়া উঠিয়াছে, একদিন সেই মারণাস্ত্র তাহাদের নিজেদেরই সর্ব্বনাশসাধন করিবে। বিশ্ব আজ হিংসার হাত হইতে বাঁচিতে চায়। কিন্তু পথ সে পাইতেছে না। এটম ও হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারের পরে ঐ ভয় মহা আতঙ্কে পরিণত হইয়াছে। কাজেই এখন বিকল্প পথের—অহিংস বিপ্লবের—অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, একথা বলা যায়।

দুই—ভূমি-সমস্যা দিন দিন জটিল আকার ধারণ করিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থা সঙ্গীন। যাহারা চিয়াংকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিল সেই চাষীদের চিয়াং জমি দিলেন না। খাজানাও তাদের কমিল না। ফলে চাষীরা কম্যুনিষ্টদের কথায় কান দিল, চিয়াংকে বিদায় লইতে হইল। ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন উত্তর ইন্দোচীনে কম্যুনিজমের প্রসার হইয়াছে। দক্ষিণ ইন্দোচীন ভূবিতে বসিয়াছে। যে পথে তাহারা বাঁচিতে পারে সে পথে 'দিম দিয়ে' সরকার আগাইতেছেন না—চাষীদের জমি বিলি করিয়া দিতেছেন না।

'বুভুক্ষমানঃ রুদ্ররূপেণ অবতিষ্ঠতে।' অন্নহীন লোক রুদ্রের অবতার। অন্নের প্রতিশ্রুতি যাহারা দেয় অন্নহীন লোকে তাহাদের পিছনে চলে। ভারতের অগণিত লোক অন্নহীন। এক দিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, আর এক দিকে চরম ভোগবিলাস। ভারত রুদ্রাবতারের অনুকূল-ভূমি।

রুদ্রাবতারকে শান্ত করার উপায় অন্নাভাব দূর করা, আর্থিক বৈষম্যের অবসান ঘটানো। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন। অতএব অন্নাভাব দূর করিতে চাই তো চাষীকে ভূমির মালিক করিতে হইবে। আর তাহা অচিরে হওয়া আবশ্যক। জমি চাষীর হস্তগত* হইলে

* জমি চাষীর হস্তগত হওয়া নয়, আসলে জমির মালিকানা মিটাইয়া দেওয়া। জমি হইবে গ্রামের সম্পত্তি। আর গ্রাম হইবে এক বৃহৎ পরিবার।

অন্য সব ক্ষেত্রের আর্থিক অসমতা আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে।*

জমির ন্যায্য বণ্টন ভারতের জরুরির সমস্যা তো বটেই। দুনিয়ার অন্যত্রও আজ না হউক কাল ভূমি-সমস্যা মুখ্য সমস্যা হইবে। কোন দেশে লোকের মাথা রাখার ঠাঁই নাই, আবার কোন দেশে দিগন্তবিস্তৃত জমি পড়িয়া আছে—জনমানব নাই বলিলেই হয়। কিন্তু সেখানে অন্য দেশের লোকের প্রবেশ নাই। অতএব ভূমির ন্যায্য বণ্টন আজ যুগের দাবি।

তিন—আর নায়ক? অহিংস বিপ্লবের নায়ক যেমন হওয়া চাই ঠিক তদ্রূপ—শূন্য, রিক্ত, অনিকেত, বাসনা-রহিত। অথবা যাহার একমাত্র বাসনা ভগবানের অধরোষ্ঠে বেণু হওয়া, একেবারে ফাঁপা যেন তাহা হইতে তিনি যেমন ইচ্ছা সুর বাহির করিতে পারেন।

আর নেতা সে, যে জানে কখন, কোথায় আর কি ভাবে আঘাত হানিতে হইবে। গান্ধী জানিতেন। বিনোবা জানেন।

অতএব বলা যাইতে পারে যে, বিপ্লবের তিন অনুকূল স্থিতির—উপযুক্ত সময়, যুগোপযোগী কাজ ও যোগ্য নেতার—সমন্বয় ঘটিয়াছে।

৫

বর্তমান যুগের মূলীভূত প্রশ্ন ভূমি-সমস্যার কথা গান্ধী কি ভাবেন নাই? নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন:

"পঞ্চাশখানা মোটরের, এমনকি দশ বিঘা জমির মালিক যদি কেহ থাকে তো আমার অভিপ্রেত আর্থিক সমতা আসবে না, একথাও কি আমায় বলতে হবে! তার জন্যে আমাকে দরিদ্রতমের সমান হতে হবে।"

ইহার নয় বছর আগে ১৩৩৭ সালে গান্ধী লেখেন:

"যথার্থ সমাজবাদের কথা আমাদের পূর্বজগণ আমাদের বলে গিয়েছেন, 'সভী ভূমি গোপাল কী' এ শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছেন। তবে আর জমির সীমারেখা কোথায়? সে সীমারেখা টেনেছে মানুষ। মানুষ তা মুছেও ফেলতে পারে।"

ইহাই না ভূদানের তত্ত্বকথা!

১৯৪০ সনে গান্ধী নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন:

"মানুষের মত বেঁচে থাকতে যতটা জমি চাই তার বেশী কারও থাকবে না। জনসাধারণের হাতে জমি নাই। আর তা হচ্ছে তাদের নিদারুণ দারিদ্র্যের হেতু।"

আর ১৯৪২ সনে লুই ফিশারকে বলেন:

"জমি কৃষকেরা কেড়ে নেবে।"

ফিসার—"খেসারত দেয়া হবে কি?"

গান্ধী—"অসম্ভব। সে অর্থসঙ্গতি কোথায়।"

ভূমি-সমস্যা সম্পর্কে বিনোবাও পূর্বে ভাবিয়া থাকিবেন। জগতে হঠাৎ কিছু ঘটে না। ভাবিয়াছিলেন তো তাহা কি? সানে গুরুজীকৃত 'বিনোবাজী ভাবে' নামক মরাঠী পুস্তিকায় দেখিতে পাই:

"গাঁয়ের জমি দিন দিন মহাজন ও জমিদারদের হাতে চলে যাচ্ছে দেখে বিনোবা একদিন বলেন, 'আমি এক সীমা নির্দেশ করে দেব। প্রত্যেকে কতটা জমি রাখতে পাবে তা বেঁধে দেওয়া হবে। তা হবে বিশ বা ত্রিশ একর। অতিরিক্ত জমি কেড়ে নেওয়া হবে আর যাদের জমি কম বা আদৌ নেই তাদের বেঁটে দেওয়া হবে।'"

বিনোবার এই উক্তিতে তেমন কিছু বিশেষত্ব নাই। যখন তিনি একথা বলিয়াছিলেন তখন অপর কেহ কেহও অনুরূপ কথা ভাবিয়া থাকিবেন। তবে একথা পরিষ্কার যে, ভূমির অন্যায্য বণ্টনের প্রতিকার-চিন্তা সতত তাঁহার মনে ছিল। একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয় বিনোবার এমন একটি উক্তির উল্লেখ করা যাইতেছে। তাহা হইতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাইবে:

"স্বরাজ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ঋণ-সমস্যার ঠিক সমাধান হবার নয়। স্বরাজ হলে সকলের হিসাব পরীক্ষা করা হবে। যে মহাজন মূলধনের পরিমাণ সুদ পেয়ে গিয়েছে, তার কর্জ শোধ হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণা করা হবে। যে মূলধন ফেরত পায় নি, তৎ-পরিমাণ সুদও পায় নি, তার সঙ্গে মিটমাট করা হবে। নিরপেক্ষ পঞ্চায়েতের বিচারে (তদন্তের পরে) যা উচিত মনে হবে, করা হবে। তত দিন যেসব উপায়ের কথা বলেছি তা অবলম্বন করবে আর মহাজনদের কাছ থেকে যতটা পার দূরে থাকতে চেষ্টা করবে। কিন্তু দেখবে, কর্জ চুকাতে গিয়ে যেন ছেলেপিলেদের উপেক্ষা না কর। তাদের দুধ-ঘি দেবে। পেট ভরে খেতে দেবে। ছেলেপিলে গোটা সমাজের*। আমি হলে মহাজনদের বলতাম, নিজ সন্তানদের একটু দুধ-ঘি দিচ্ছি। দুধে তাদের প্রয়োজন।

---

* কারণ ভারতের বার্ষিক জাতীয় আয় ৬২৫০ কোটি টাকার মধ্যে একমাত্র কৃষি হইতে ৪৮০০ কোটি টাকা আসে, ৯০০ কোটি আসে ক্ষুদ্র ও পল্লী-শিল্প হইতে আর ৫৫০ কোটি আসে বৃহৎ শিল্প হইতে। শতাংশের হিসাব ধরিলে ভারতের বার্ষিক জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৬·৮ ভাগ আসে কৃষি হইতে, ১৪·৪ ভাগ আসে ক্ষুদ্র শিল্প ও পল্লীশিল্প হইতে আর ৮·৮ ভাগ আসে বৃহৎ শিল্প হইতে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্ষুদ্র শিল্প ও পল্লী-শিল্প আর্থিক সমতার অন্তরায় নহে, বরং আর্থিক সমতার তাহা সহায়ক। কারণ তাহা অর্থ বহু হাতে ছড়াইয়া দেয়। অতএব জমি গ্রামের সম্পত্তিতে পরিণত হইলে জাতীয় আয়ের ৭৬·৮ + ১৪·৪ (পল্লী-শিল্প) = ৯১·২ শতাংশ সুসম বণ্টিত হইবে। তখন বাকী ৮·৮ শতাংশকে বাঁচার তাগিদেই ৯১·২ শতাংশের অনুসরণ করিতে হইবে।

* এই কথা বিনোবা পাদপরিক্রমায় অহরহ বলিয়া থাকেন।

শিশু যতটা আমার ততটা মহাজনেরও। তারা সকলে দেশের। বাচ্চাদের দিচ্ছি ত মহাজন তোমাকেই দিচ্ছি। তাই প্রথমে পেট ভরে খাও, 'বালবাচ্চা'দের খাওয়াও। ঘরের প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু বাঁচে ত দিয়ে আসবে। কর্জ্জ ত শোধ করতেই হবে। খাওয়া-দাওয়ার পরে। ভোগ-বিলাসের পরে নয়। মহাজনকে বলে দেবে, 'কিছু বাঁচে ত নিজেই দিয়ে যাব।'

—'মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম' হইতে

ভূদানের বীজের সন্ধান পাওয়া যাইবে এই কথা হইতে :

"এ বিষয়ে* ভাবতে ভাবতে এই ভূদানের কথা আমার মনে হয়। এ ত সহজে এসে গিয়েছে। কিন্তু ও বিষয়ে বহু বর্ষ ধরে আমি ভেবে এসেছি। সংক্ষেপে সে ইতিহাস এখানে বলছি। গান্ধীজীর প্রয়াণের পরে বাস্তুহারা ও মেওদের সেবার নিমিত্ত আমি দিল্লী যাই। সেখানে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হয়। পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে অনেক হরিজনও ছিল। হরিজনেরা জমি চায়। তাদের জমি দেওয়া দরকার, এ বিষয়ে কিছু আলোচনাও হয়। তাদের দাবি মঞ্জুর করা হচ্ছিল না। অবশেষে পঞ্জাব সরকার আশ্বাস দেন যে, হরিজনদের লাখখানেক একর জমি দেওয়া হবে। ঐ আশ্বাস রাজেন্দ্রবাবু ও অপর জনকয়েক ভদ্রলোকের সামনে দেওয়া হয়। আমিও সেখানে ছিলাম। সেদিন শুক্রবার ছিল। প্রার্থনার জন্য সেখান থেকে আমি রাজঘাটে যাই। সেখানে আমি ঘোষণা করি যে, আনন্দের সহিত আপনাদের জানাচ্ছি—পঞ্জাবসরকার হরিজনদের জমি দেবেন স্বীকার করেছেন। একথা বলে পঞ্জাব সরকারকে অভিনন্দন জানাই। এর মাসেক বা দু' মাস পরে অন্য কথা শুনতে পেলাম—শুনতে পেলাম জমি দেওয়া যাবে না। নানা কারণ হয় ত তার ছিল। কিন্তু তাতে হরিজনেরা অত্যন্ত দুঃখিত হ'ল। রামেশ্বরী নেহরুর তীব্র দুঃখ হ'ল। আমাকে এসে তিনি জানালেন যে, হরিজনেরা সত্যাগ্রহ করতে চায়। করবে কি? জমি না দেওয়ার কারণ-স্বরূপ বলা হয়েছিল যে, পাকিস্থানে যাদের জমি ছিল না তাদের জমি দেওয়া যাবে না। যে অবস্থায় তথায় তারা ছিল সে অবস্থায় এখানে তারা থাকতে পারে, এমনি ত এখানে জমি কম। তাই ওখানে যাদের জমি ছিল তাদেরও পুরো জমি দেওয়া যাবে না, কিছু কম পাবে। অতএব ওখানে যে সব হরিজনের আদৌ জমি ছিল না তাদের জমি দেওয়া অন্যায় হবে। পুরানো ছকেই আমরা চলতে পারি, এই ছিল তাদের যুক্তি। ঐ যুক্তি সঙ্গত কি অসঙ্গত ছিল সে কথায় আমি যাব না। একথাই কেবল বলব যে, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কথা দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করা হয় নি। আমি ভাবনায় পড়লাম। হরিজনদের আমি বললাম দেশের আজকার পরিস্থিতিতে আপনাদের আমি সত্যাগ্রহ করতে বলতে পারি না। আপনাদের এ ব্যাপারে আমি এখনই সহায়তা করতে পারছি না, এ জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু কথাটা আমার মনে ছিল। এক চিন্তা আমায় পেয়ে বসে আর ভাবতে থাকি কি উপায়ে ভূমিহীনদের জমি দেওয়া যাবে। ভাবনা মনে সুপ্ত ছিল। তেলেঙ্গানায় সুযোগ এল। আর এক আন্দোলন সুরু হ'ল।"

* "এ বিষয়ে" অর্থাৎ বিজ্ঞান ও হিংসা এ দুইয়ের পূজা এক সঙ্গে চলিতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রগতি বন্ধ করার কথা ওঠে না। দরকারও মনে করি না। তাকে রাখতে হবে নৈতিক শক্তির পথপ্রদর্শনাধীনে। বিজ্ঞান এক শক্তিমাত্র, তাতে বুদ্ধি নেই। শক্তির বুদ্ধির অধীনে থাকা চাই। এ ব্যবস্থাধীনে বিজ্ঞান যত বাড়ে বাড়ুক, ভয় নেই, উল্টো লাভই হবে। তাই আমি অহিংসা চাই।· ·যে-কোন অবস্থায় বিজ্ঞানের উন্নতি হবেই। হিংসা বন্ধ করলে তা লাভের হবে, নয় ত হবে সর্ব্বনাশের হেতু।

"তাই ত বার বার বলি নৈতিক শক্তি আমাদের বাড়াতে হবে, সেদিকে কাজ করতে হবে ···কাজ তখনই হবে যখন আমাদের যা বড় বড় সমস্যা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যার সমাধান ব্যতীত মানবের উন্নতি হবার নয়, সেই সকল সমস্যার সমাধান আমরা শান্তির পথে, প্রেমের পথে, অহিংসার পথে করব।"

৪

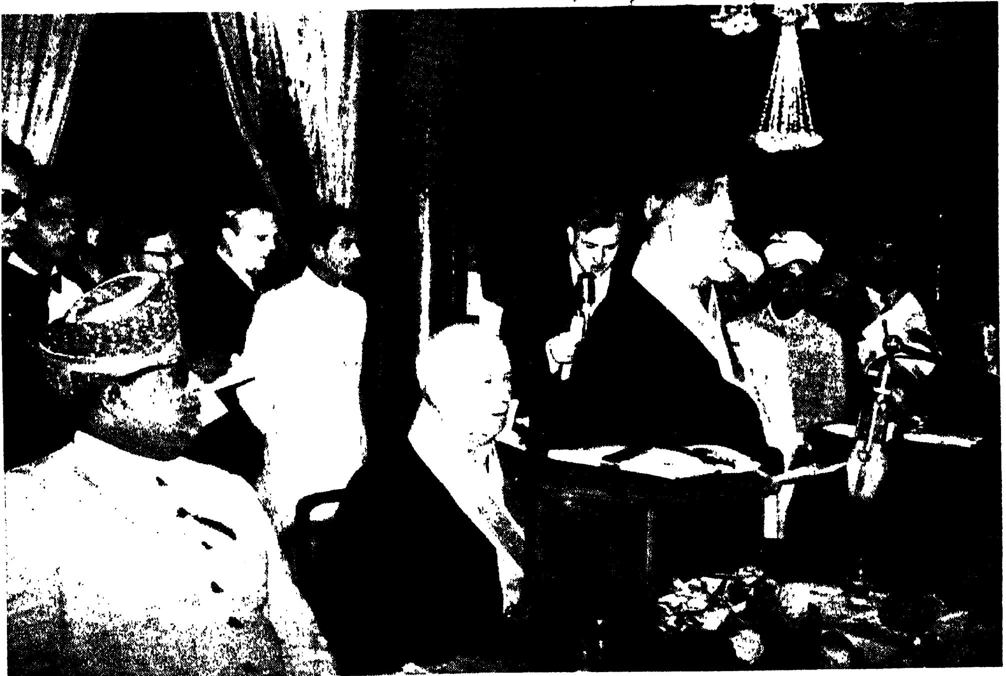
বিনোবা ইতিপূর্ব্বে কোন সর্ব্বোদয় মেলায় যান নাই। গান্ধীর অনুগামীদের মনে হইতেছিল এ যেন শিবহীন যজ্ঞ। ১৯৫১ সন। মার্চ মাসে সেবাগ্রাম আশ্রমে নয়ী-তালিম কর্ম্মীদের এক সম্মেলন বসে। বিনোবা সম্মেলনে যোগ দেন। আর কার্য্যশেষে পওনারে ফিরিয়া যান। কর্ম্মীরা পওনারে তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—হায়দরাবাদের শিবরামপল্লীতে যে সর্ব্বোদয় সম্মেলন হইবে সে সম্মেলনে তাঁহাকে যাইতে হইবে। বিনোবা বলিলেন, 'পায়ে হেঁটে যাব'। কর্ম্মীরা ফাঁপরে পড়িলেন। যদি বলেন, আচ্ছা তাই, তবে বিনোবাকে ৩৫০ মাইল পথ কষ্ট করিয়া পায়ে চলিতে হইবে, আর যদি বলেন গিয়া কাজ নাই ত তাঁহার পথ-নির্দ্দেশ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া স্থির হইল। আয়োজন চলিল।

৮ই মার্চ্চ—উষা। বিনোবা 'পদযাত্রা'য় রওনা হইলেন। তালিমী সঙ্ঘের ছাত্রেরা 'নির্ব্বলের বল রাম' ভজন গাহিয়া বিদায়-অভিনন্দন জানাইল। ওয়ার্দ্ধায় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে অভ্যর্থনার আয়োজন ছিল। সেখান হইতে বিদায়-কালে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল —'কে জানে আপনাদের সহিত এই সাক্ষাৎ শেষ সাক্ষাৎ কিনা।"

শিবরামপল্লী সম্মেলন শেষ হইয়াছে। ১৫ই এপ্রিল, রাম নবমী তিথি, বিনোবা অনুগামীদের এক সঙ্কল্পের কথা বলিলেন—তেলেঙ্গানায় 'পদযাত্রা' করিবেন। সেইদিন জেলে যাইয়া কম্যুনিষ্টদের সহিত দেখা করিলেন। পর দিন তেলেঙ্গানার পথে অগ্রসর



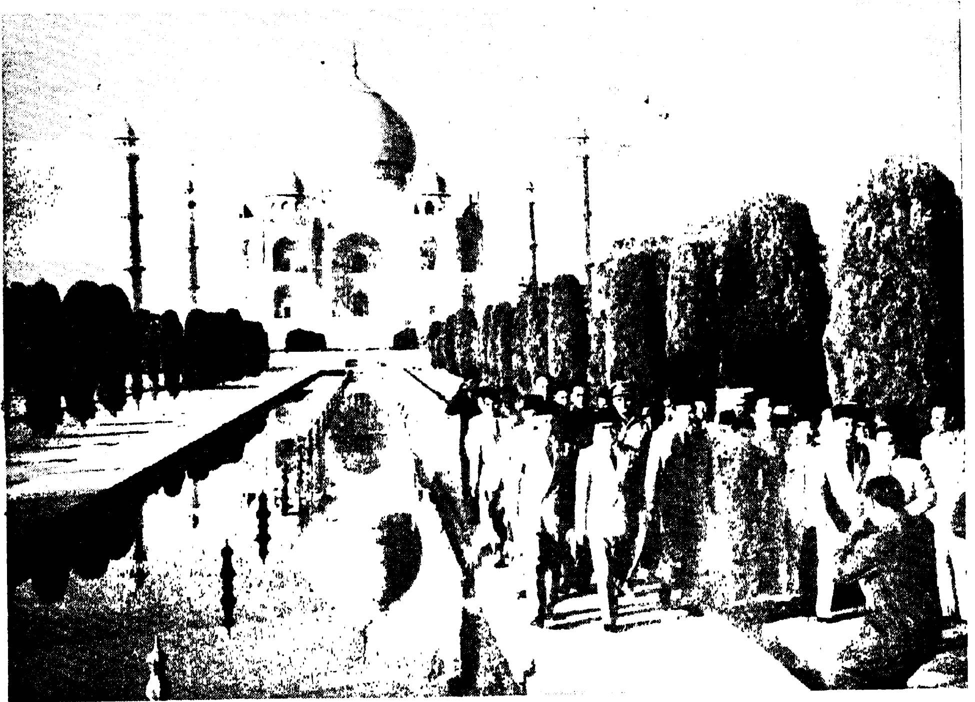
বাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে' মিঃ বুলগানিন এবং মিঃ ক্রুশ্চেভ



বাঙ্গালোরে 'স্টেট ডিনারে' বক্তৃতারত মিঃ বুলগানিন



নাঙ্গালে নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এক দল শিল্পীসহ মিঃ বুলগানিন ও মিঃ ক্রুশ্চেভ



আগ্রার তাজমহলে ইন্দোনেশিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. মহম্মদ হাতা

হইলেন। আর্ত্ত ও নিপীড়িতদের অভয়দানার্থে সাম্যযোগের ঋষির পদপরিক্রমা সুরু হইল।

॥

বরঙ্গল ও নলগোণ্ডা এই দুই জিলা ছিল কম্যুনিষ্টদের সুদৃঢ় ঘাঁটি। লোকে সেখানে যাইতে সাহস পাইত না। সৈনিকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাইত। কিন্তু লোকের অন্তরে প্রবেশ করা, তাদের মন পাওয়া যে সিপাহীদের কাজ নয়! এই অবস্থায় শান্তিসৈনিকের কর্ত্তব্য কি? কি করা যায় তাহা দেখিবার জন্য বিনোবা বাহির হইয়া পড়িলেন। যাত্রাকালে বিনোবা বলিলেন, "যারা ভীরু পরমেশ্বরও তাদের রক্ষা করতে পারেন না। ধনীরা জেনে রাখুক যে, গরীবদের জন্য তারা যদি নিজ ধন, বুদ্ধি ও শক্তি ব্যয় না করে তবে তাদের ভয় আছে।" আর সর্ব্বোদয় কর্মীদের জন্য—'অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, শ্রম, শান্তি, সমর্পণ'—এই পঞ্চ কার্য্যক্রমের নির্দ্দেশ দিলেন।

১৮ই এপ্রেল। সেদিন বিনোবার 'পড়াও' (অবস্থান-স্থল) ছিল পোচমপল্লী নামক গ্রাম। হরিজনেরা আসিয়া নিজেদের দুঃখের কথা জানাইল, বলিল কিছু জমি (একর আশী) হইলে তাহাদের অভাব ঘুচিতে পারে। বিনোবা শুনিলেন, কিছু বলিলেন না। উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিকালে প্রার্থনা-প্রবচনে অমনি বলিয়া ফেলিলেন, "হরিজনেরা আমার কাছে আশী একর জমি চেয়েছে। এমন কেউ এখানে আছেন যিনি এ পরিমাণ জমি দেবেন?" এক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন—শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডী। হরিজনদের দেওয়ার জন্য এক শত একর দান তিনি বিনোবাকে সমর্পণ করিলেন। চাওয়াটা যেমন আকস্মিক, পাওয়াটাও তেমন অপ্রত্যাশিত। বিনোবা স্তম্ভিত হইলেন। অব্যক্তের ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন। 'বিনা রক্তপাতে কি জমি পাওয়া যায়?' কম্যুনিষ্টদের একথার উত্তর বিনোবা পাইলেন। ভূদান-গঙ্গোত্রী উৎসারিত হইল।

বাবিলাপল্লী 'পড়াও'য়ে বিনোবা বলিলেন:

"আমি বামনতার (রূপ)* নিয়েছি, জমি চাইতে সুরু করেছি। পরমেশ্বর আমার কথায় কি এক শক্তি ভরে দিয়েছেন। ভূদানের কাজ বিপ্লবের কাজ। এ কাজ যে সরকারের শক্তির বাইরে তা লোকে বুঝতে পেরেছে। শান্তি ফিরিয়ে আনার নিমিত্ত সরকার যে সৈনিক পাঠিয়েছেন তার জন্য বছরে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। বাঘ-শিকার মাত্র যেখানে প্রশ্ন সেখানে সৈনিক দিয়ে কাজ হতে পারে। কিন্তু যেখানে কোন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে সেখানে পাল্টা বিচার উপস্থিত করলেই না কাজ হতে পারে। তেলেঙ্গানায় কম্যুনিষ্টদের যে সাফল্যলাভ হয়েছে সে বিষয়ে চিন্তা করতে করতে এ সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছি যে, আজিকার মুখ্য প্রশ্ন হচ্ছে ভূমির প্রশ্ন। আজ তেলেঙ্গানায় যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কাল সারা ভারতে সে প্রশ্ন দেখা দেবেই, অন্যথা হবার নয়। আমাদের সকলের তার সম্মুখীন হতে হবে। আর তাই এর প্রতিকারার্থে অহিংস পন্থার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি। প্রশ্ন যদি কিছু লোকের দুঃখমোচনের, সঙ্কটত্রাণের হ'ত তবে আমি দান চাইতাম আর লোকে কিছু দিয়ে নিস্তার পেতে পারত। কিন্তু এ ত এক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন, যার সমাধান করতে হবে। যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রান্তি সংসাধন করতে হবে সেখানে মূল মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনসাধন করা দরকার।"

প্রায় দুই মাসে মোটামুটি সাড়ে ছয় শত লোকের কাছ হইতে বিনোবা তের হাজার একর জমি পাইলেন। ২৬শে জুন তিনি

---

* "কোন জীবিত ব্যক্তিতে অবতার-কল্পনা আমি কদাপি করি না। যাঁকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি এমন যে জ্ঞানদেবসদৃশ বিভূতি তাঁদের পর্য্যন্ত অবতার বলে আমি মানি না···

"বামন-অবতার ব্যক্তিগত ভাষা নয়। ভূদান-যজ্ঞের বর্ণনা: ভূদান যজ্ঞ রূপে বামনের মত ছোট। কিন্তু বামন যেমন বিরাট হয়েছিল, এ থেকেও তেমন অহিংস ক্রান্তির সৃষ্টি হবে। মনে হয় বামন ভিক্ষা করেছিল; তা নয়, সে বলীকে দীক্ষা দিয়েছিল। সবটা রূপক বুঝে নেওয়া দরকার। এরূপ উল্লেখ আমার এড়াবার উপায় নেই। কারণ আমাদের সমাজ ও আমি এ সংস্কারে 'সিক্ত' হয়ে গিয়েছি। কেবল বামন-অবতারের কথাই বলি তা নয়। প্রজাসূয়-যজ্ঞ, ভূদানের অশ্ব, নূতন ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন—এসব কিছু ছোট দাবি নয়। কিন্তু এসব দাবি আপনাদের সহায়তার ভরসায় আমি করেছি। আপনারা ছোট নন, মহান্—এটাই আপনাদের আমার শেখাতে হবে। 'আমাতে' যে 'আমি' রয়েছে তা ব্যক্তিগত 'আমি' নয়। গোটা সর্ব্বোদয় সমাজকে উদরে ধরে কথা বলার এ-ভাষা।"

বামনের তিন পদক্ষেপ—

"আমরা যখন সমাজকে সবকিছু অর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব তখন এরূপ সরকার গঠন করব যে, তাকে পয়সার জন্য আমেরিকার কাছে হাত পাততে বা নাসিকের ছাপাখানার সহায়তা নিতে হবে না। ভারতের প্রতি ঘর তার ব্যাঙ্ক হবে। সরকার যা চাইবেন লোকে অবিলম্বে তা পূরণ করে দেবে। লোকে সমাজের ওপর সবকিছু সঁপে দিয়ে নিজেরা চিন্তামুক্ত হবে। কিন্তু আজ সমাজ ও ব্যক্তি কেউ তার জন্য প্রস্তুত নয়। তাই তো আজ আমি কেবল ষষ্ঠ ভাগ চাইছি। দেড় বছর আগেই আমি বলেছি যে আমি বামন হয়ে এসেছি। আমার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভূমি-দান, দ্বিতীয় হচ্ছে সম্পত্তি-দান। আর তৃতীয় পবিত্র পদক্ষেপের সামনে আপনাদের শির নত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই তৃতীয় পদক্ষেপ কি? সেই তৃতীয় পদক্ষেপে গরীবের সেবার জন্য আপনাদের সবাইকে গরীব হতে হবে। সমগ্র জগৎ তখন ভারতের অনুকরণ করবে।"

ওয়ার্দ্ধায় ফিরিয়া আসেন, এবং পরদিন ২৭শে পরমধামে যান। পরমধামে তিনি বলেন :

"এখানে আশ্রমে সাম্যযোগ-সমাজগঠনের, কাঞ্চন-মুক্তির যে পরীক্ষা করেছি, যে তপস্যা করেছি তার গুরুত্ব অনেক। তা থেকে সেখানে আমি বল পেয়েছি। জীবনের বহু বর্ষ অহিংসার খোঁজে আমার কেটেছে। আমার সকল প্রযত্ন ঐ এক দিকে পরিচালিত হয়েছে। আমার প্রিয় আশ্রম থেকে যে বেরিয়ে পড়ি তাও ঐ অহিংসার সাধনারই জন্য। আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যেসব ত্রুটি রয়েছে, অহিংসা দ্বারা সেসব কিভাবে দূর করা যায় সে খোঁজই আমার জীবনের মুখ্য কর্ম আর তার জন্যই আমি তেলেঙ্গানায় গিয়েছিলাম। যদি না যেতাম তবে অহিংসার খোঁজ ও শান্তিসেনার কাজ করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে প্রতিজ্ঞা হতে বিচ্যুত হতাম।"

বিনোবা জমি পাইলেন, কিন্তু কিছু লোকে বলিতে লাগিল, "লোকে প্রেমে দেয় নাই, দিয়েছে কম্যুনিষ্টদের গুঁতোর ভয়ে। যান না তিনি অন্যত্র। দেখা যাবে কত জমি পান।" কথাটা যে অসার তার প্রমাণ তখন সেই তেলেঙ্গানাতেই ছিল। অদিলাবাদ তেলেঙ্গানারই একটি জেলা। সেখানে কম্যুনিজমের ভয়ের নামগন্ধও ছিল না। বিনোবা অদিলাবাদ জেলায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জমি পান।

বিনোবা আশ্রমে আছেন। কাঞ্চনমুক্তির সাধনা চলিতেছে। 'নেশন্যাল প্ল্যানিং কমিশন' তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। দিল্লীতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। ওয়ার্দ্ধা হইতে দিল্লী ৭৯৫ মাইল। বিনোবা হাঁটিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর রওনা হইলেন। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিন্ধ্যপ্রদেশ হইয়া দুই মাসে তিনি দিল্লী পৌঁছিলেন। এই তিন প্রদেশে বিনোবা অনেক জমি পাইলেন। কম্যুনিষ্ট-সন্ত্রাসিত তেলেঙ্গানায় গড়ে প্রতিদিন পাইয়াছিলেন দুই শত একর। দিল্লীর পথে গড়ে পাইলেন প্রতিদিন তিন শত একর।

দিল্লীর কার্য্যশেষে রওনা হইবেন। জ্বর আসিল। লোকে বলিল, "দুটা দিন থেকে যান, বিশ্রাম নিন।" বিনোবা কি সে কথা শুনিবার লোক! বলিলেন, কার্য্য সমাপনের আগে বিশ্রাম কোথায়? "রামকাজ সাধে বিনা মোহী কহাঁ বিশ্রাম।"

আর সেই দিন হইতে আজ চারি বছরের উপর সূর্য্যের মত অক্লান্তগতিতে তাঁহার পদপরিক্রমা চলিতেছে। রোদ নাই, বৃষ্টি নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, জল নাই, ঝড় নাই, বিনোবা অবিরাম পথ চলিতেছেন, জমি সংগ্রহ করিতেছেন—জমির মালিক ব্যক্তি-বিশেষ নহে, জমির মালিক গ্রাম—লোককে দিতেছেন এই আদর্শে দীক্ষা। বিনোবা লোকশক্তি সংগঠন করিতেছেন, আত্মশক্তি ছাড়া কাহারও উদ্ধার নাই—জনগণের মনে এই বোধের সঞ্চার করিতেছেন। বিনোবা কর্তৃত্ব-বিভাজনের মন্ত্র লোকের কানে জপিতেছেন। নূতন জাতি গঠন করিতেছেন।

১৯৫২ সনে এগারই সেপ্টেম্বর জন্মতিথিতে কাশী-বিদ্যাপীঠে বিনোবা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভূমি-সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ আশ্রম পরমধামে ফিরিবেন না। বিনোবা একাগ্রতার মূর্ত্ত বিগ্রহ। বিনোবা দৃঢ়সংকল্পের প্রতিমূর্ত্তি।

বিনোবার অব্যক্ত অতীতকে উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস করা গেল। বিনোবার মহান্ বর্ত্তমান লোক-চক্ষুর সামনে উন্মুক্ত। বিনোবার বর্ত্তমান মহান্। অতীতও গরীয়ান্। ভূদানের পরিণতি ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে তার উজ্জ্বল আভাস ঊষা-দ্যুতির মত পাওয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে রামায়ণের চর্চ্চা চলে। তেমনি গ্রামে গ্রামে আজ গ্রামায়ণের চর্চ্চা চলিতেছে!

বিনোবা বলেন, ভূদানের প্রেরণা তাঁহার মায়ের প্রসাদ :

"আমার মা বলতেন, যে দেয় সে দেব, আর যে রাখে সে দানব। কেহ কিছু চেয়েছে আর তাতে যদি তার প্রয়োজন তো দেওয়া চাই। ভূদান-যজ্ঞের এই যে প্রেরণা তা আমার মায়েরই দান। তিনি যদি আমায় স্বার্থ শেখাতেন তবে এ কাজ আমি আরম্ভ করতে পারতাম না।"



সুন্দরবনে

শ্রীসুরপতি ঘোষ

১০ই অক্টোবর থেকে জঙ্গলে আমাদের শিকার-লাইসেন্সের মেয়াদ সুরু হবে। ক্যানিং থেকে মোটরলঞ্চে আমাদের যেতে হবে। লঞ্চ ধরতে হলে ভোর পাঁচটার ট্রেনে যাত্রা করা চাই। ভোর পাঁচটা শুনে অনেকের চোখ কপালে উঠল। আমাদের নেতা সুন্দরবন অঞ্চলের প্রখ্যাত জমিদার ও লাটদার। পুরুষানুক্রমে আরামে বাস করে তিনি তাঁর মেদবহুল দেহখানি গড়ে তুলেছেন। বেলা নয়টায় তিনি শয্যা ত্যাগ করেন। ভোর পাঁচটা তাঁর নিকট মধ্যরাত্রি। অস্বস্তিতে তিনি একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। পাঁচটার ট্রেন ধরতে হলে রাত চারটায় শয্যাত্যাগ করা চাই। সারারাত আধো-ঘুমের ঘোরে কাটালাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ঐ ট্রেন পালাল, আর ধড়মড় করে উঠে বসছি। শেষে রাত তিনটায় বিরক্ত হয়ে শয্যাত্যাগ করলাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম নেতা অনেক আগে এসে গেছেন। তিনি বললেন, "ভাই কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে আমার শরীর, মন বিকল হয়ে পড়ে। রাত্তিরটা আর শুইনি। আমি একেবারে ট্রেনে চেপে একটা লম্বা ঘুম দেব।"

লঞ্চে গোসাবা এসে, গোসাবা থেকে রাত্রে নৌকাযোগে আমরা যাত্রা করলাম। কখন জঙ্গলে পৌঁছেছি জানি না। প্রভাতে গুরুগম্ভীর বাঘের ডাক জঙ্গলের অভ্যন্তর থেকে ভেসে এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। এখন আমরা বিদ্যাধরী নদীর উপর রয়েছি। আমাদের আড়পার সজনেখালি জঙ্গল। ফরেষ্ট আপিস জঙ্গলের এক অংশে নদীর উপর অবস্থিত। ফরেষ্ট আপিসে লাইসেন্স দেখিয়ে আমাদের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে হবে।

বিদ্যাধরী এখানে ক্ষুরধার স্রোতে বয়ে চলেছে। নদীর এই পাড়ের মাটি স্রোতের টানে ভেঙে পড়ছে। জঙ্গলের গাছপালা ঐ মাটিকে তাদের বুকে আগলে রাখবার জন্য শতসহস্র শেকড়ে মাটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু নদীর স্রোত—সে প্রখর জোয়ারে আসে, প্রখর ভাটায় চলে যায়। যেখানে যেখানে সে শেকড়ের বুক থেকে মাটিকে ছিনিয়ে নিয়েছে, মৃত-বৎসা জননীর মত গাছগুলি জলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ভোরের আবছা অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বোটের মধ্যে চা-সেবীদের কেউ কেউ "চা চা" করে হাঁকছেন আর হাই তুলছেন। "চা"য়ে কি আফিমের নেশা হয়? কে জানে! নেতা চোখ না মেলেই পাচককে তাগিদ দিলেন, "ওরে চা বসা"। ফরেষ্ট আপিসে ভিড়তে হলে আমাদের কতকটা উজানে বেয়ে যেতে হবে। দাঁড়মুখে প্রবল বেত ঠেলে বোট এগোচ্ছে। দাঁড়ের আঘাতে তরল রূপার মত ঠিকরে উঠে জল অসংখ্য বুদ্বুদের সৃষ্টি করছে। বুদ্বুদগুলি বেগবতী স্রোতস্বতীর কাঁধে চড়ে তীব্রবেগে চোখের উপর থেকে সরে সরে যাচ্ছে।

ফরেষ্ট আপিস ত্যাগ করে এখন আমরা এগোচ্ছি। দূরে নদী বেঁকে গেছে; মনে হয় ঐখানেই নদীর শেষ। ভরা জোয়ারে জেলেরা ঐ নদীর বাঁকে জঙ্গল ঘিরে জাল পেতে রেখেছিল; ভাঁটায় জল নেমে আসছে আর মাছ জালে আটকা পড়ছে। বাঁক ঘুরতেই দেখলাম নদীর বিস্তার সেখানে বেশ বেড়ে গেছে। ভাঁটার টানে নৌকা ভেসে চলেছে। জল এখন অনেক নেমে যাওয়ায় নদীর মাঝে কোথাও কোথাও চর দেখা যায়। চরের উপর কোথাও কোথাও কুমীর শুয়ে আছে; বোটের ক্ষীণতম শব্দ কানে পৌঁছতেই তারা টুপ করে জলের মধ্যে নেমে যায়। তাদের একটাকেও আমরা বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাচ্ছি না।

নদীর এইখান থেকে একটা শাখা নদী জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এই শাখানদী ধরে একখানা ডিঙ্গি চার জন লোককে নিয়ে জঙ্গলের অভ্যন্তরে ঢুকে যায়। সারা জঙ্গল জুড়ে মৌমাছিরা ডালে ডালে চাক বেঁধেছে। নিরস্ত্র এই চারিটি মানুষ চাকের মৌমাছি বিতাড়িত করে মধু সংগ্রহ করবে। এক মরশুমেই পঁয়ত্রিশ জন মধুসংগ্রহকারীকে বাঘের পেটে যেতে হয়েছে। প্রতি-বৎসরই এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য পতঙ্গ যেমন ধেয়ে আসে, এই সব নিরস্ত্র লোক বারে বারে প্রকৃতির এই সাজানো বাগানে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে।

একটা জ্বালানি কাঠের নৌকা কাঠ বোঝাই করে জঙ্গল থেকে শাখানদী ধরে বেরিয়ে আসে। নদী এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। এবারের বাঁক ঘুরে আমরা দূরে একপাল বিগড়ি হাঁস জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে দেখলাম। একটা হাঁস চীৎকার করে আকাশে উড়ে গেল। বোধ হয় হাঙ্গরে তাকে ধরতে এসেছিল। সে আত্মরক্ষা করে দলের আর সবাইকে সাবধানী চীৎকার শোনায়। নিমেষের মধ্যে সমস্ত দলটি জল ছেড়ে আকাশে উড়তে থাকে। তারা দূরে আর এক জায়গায় বসল। যতই আমরা এগোচ্ছি, ততই নদীর বিস্তার বৃহৎ হতে বৃহত্তর হচ্ছে। এইবার আমাদের বোট ওপারের এক শাখানদী লক্ষ্য করে পাড়ি দেয়। কথায় আছে, "আড়ে নদী বিশ ক্রোশ"। প্রায় এক ঘণ্টায় আমরা নদীর মাঝবরাবর পৌঁছেছি। এক ঝাঁক পাখী নদীর এক পারের জঙ্গল থেকে উড়ে গিয়ে আর এক পারের জঙ্গলে বসল। তারা আমাদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। সূর্য্য এখন প্রায় মধ্যগগনে। পাচকের কাছ থেকে খাওয়ার আহ্বান এল। ভোজনান্তে যখন আমরা নৌকার বাইরে এলাম, বোট তখন পাড়ি শেষ করে এনেছে। জোয়ারের টানে ভেসে আমাদের বোট নিঃশব্দে শাখানদী ধরে এগোতে থাকে। নিকটে বাঁকের

আড়ালে, নদীর বালুচরে একটা হরিণ চরছে দেখা যায়। স্রোতে ভেসে আসা ফল, পাতা সে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাচ্ছে। এখন আমরা বোট থেকে নিঃশব্দে অবতরণ করি। নদীর দুই পারে সবুজের সারি, সবুজের নীচে গভীর কালো। কত যেন ভয় ঐ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে। মাঝে ঐ যে নদী একেবেঁকে বয়ে চলেছে, তার সাদা বালিতে রোদ প্রতিফলিত হয়ে সাদা পাড়কে আরও সাদা করে তুলছে। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। মনে হয় ওই কালোর মধ্যে যে কালো হাত বেষ্টন করবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে, এই সাদায় এলে সে মিলিয়ে যাবে। আর ঐ যে হরিণ নদীর সাদা বালুচরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফল পাতা খাচ্ছে, ও যেন প্রকৃতির দুষ্ট শিশু। এই গভীর মধ্যাহ্নে, চারিদিকে যখন খালি অচলেরই সারি তখন ওই একমাত্র সচল প্রাণী, মার কোল থেকে পালিয়ে এসে নদীর বালুচরে খেলে বেড়াচ্ছে। চর ছেড়ে জঙ্গল সুরু হয়েছে। চর থেকে জঙ্গলের ব্যবধান প্রায় এক শত গজ। হঠাৎ বাঘ এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার ভয় নেই। হরিণকে কতকটা নিঃশঙ্কচিত্ত বলে মনে হচ্ছে। লাইসেন্সের সর্ত অনুযায়ী বাঘ-শিকারে আমাদের অধিকার আছে। হরিণ-শিকার নিষিদ্ধ। আমরা হরিণটাকে ক্যামেরায় ধরতে এগিয়ে গেলাম।

২

যাত্রার সুরু থেকে প্রায় তেত্রিশ ঘণ্টার পরে আমরা শিকারের জায়গায় পৌঁছলাম। শিকারের বেশে সজ্জিত হয়ে এখন আমরা জঙ্গলপরিক্রমায় বের হই। সাঁড়াশির মত দুইটি নদী জঙ্গলটিকে চেপে ধরে আছে, পূবে বিদ্যাধরী, পশ্চিমে মাতলা নদী। কয়েকটি শাখানদী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গিয়ে জঙ্গলটিকে ফালি ফালি করে কেটেছে। নদীর ধারে কেওড়া গাছ ও হেঁতালের জঙ্গল, অভ্যন্তরভাগে সুন্দরীগাছের সারি, ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপরের ডালপালা, পাতার চাঁদোয়া জঙ্গলটিকে আলো-আঁধারি করে রেখেছে। ভরা কোটালে নদী উপচে জল জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে। এই জল প্রখর স্রোতে সমস্ত জঙ্গলের আবর্জনা টেনে নিয়ে জঙ্গলকে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। দূরে বঙ্গোপসাগরের কোল লাল হয়ে উঠেছে। চিরপরিচিত পশ্চিমাকাশের অস্তগামী অগ্নিগোলককে উচ্চ রবে বিদায়-সম্ভাষণ জানায় বন্য কুক্কুট। জঙ্গলের কোন্ কোলে কিংবা কোথায় কোন শাখানদীর বাঁকে জেলেনৌকা, কাঠের নৌকা কিম্বা মধুর নৌকা ভেসে আছে, তাদের একটাও চোখে পড়ে না। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নৌকার মাঝিমাল্লারা শঙ্খধ্বনি করে সন্ধ্যাকে আবাহন জানায়। বহুদূরাগত সেই ধ্বনি নদীর জলে প্রতিধ্বনি তুলে এই বার্ত্তা বহন করে আনে যে, এই নিরালা কানন একান্ত নিরালা নয়। রাতের শিকারের প্রতীক্ষায় আমরা একটা গাছের উপর চড়ে বসি। সূর্য্য যতই জলের তলায় নেমে যেতে থাকে জঙ্গলের প্রাণচাঞ্চল্য ততই পরিস্ফুট হয়ে উঠে; ক্রমে দিনান্তে সন্ধ্যা নামে, মেটে জ্যোৎস্না মায়ার জাল সৃষ্টি করে, হরিণেরা দল বেঁধে খুশির আবেগে ছুটে চলে, তারই মধ্যে কখন কখন ভয়ার্ত্ত চীৎকার ভেসে আসে, সঙ্গে বাঘের গর্জ্জন, বাঘ শিকার ধরেছে। একটা হরিণ "টাউ", "টাউ" সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে আমাদের গাছের তলা দিয়ে ছুটে চলে গেল, বানরের পাল সোরগোল তুলে বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে পালাচ্ছে, বাঘ এদের তাড়া করেছে। গুরুগম্ভীর বাঘের ডাক ভেসে এল। বাঘ জোড়কে ডাকছে। নদীর একটানা কল কল ধ্বনি, দূর হতে বঙ্গোপসাগরের গর্জ্জন কানে আসছে, তাতে বাঘের ডাক মিশে একটা গভীর শব্দতরঙ্গ প্রতিধ্বনিত হতে হতে দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

গত বৎসর এই জঙ্গলে ঘের হয়। জঙ্গলের পূর্ণবয়স্ক সমস্ত গাছ কেটে ফেলাকে ঘের হওয়া বলে। অনেক জানোয়ার বিদ্যাধরী পার হয়ে ওপারের জঙ্গলে চলে যায়। এক বাঘিনী তার দুই নাবালক সন্তান নিয়ে এই জঙ্গলে বাস করে। সন্তানদের নিরাপদ করে সে সারাদিন শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এমন এক ঝোপে সে সন্তানদের লুকিয়ে রাখে যেখানে প্রখর মধ্যাহ্নে, রাতের অন্ধকার বিরাজ করে। বাচ্চাদের নিয়ে এত বড় নদী পার হওয়া বাঘিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু জানোয়ার যে জঙ্গলে আর বড় একটা দেখা যায় না। বাঘিনী কি তা হলে উপোস করে শুকিয়ে মরবে! সে সুন্দরবনের বাঘ, সিংহ যদি পশুরাজ হয়, তবে সে পশুসম্রাট। তার সাম্রাজ্যে সে কোন জানোয়ারকেই ভয় করে না। কিন্তু মানুষ —মানুষের কথা আলাদা। মানুষ তার বন্দুক ছুঁড়েছে জঙ্গলে বহু বার। এই বন্দুকের শব্দ বাঘ খুব চেনে। মানুষকে সে সব সময় এড়িয়ে চলে। ক্ষুধার তাড়নায় বাঘিনী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জঙ্গলের গাছ কেটে লোকগুলি ফিরছিল। বাঘিনী নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করে চলল। অলক্ষ্যে পিছনের লোকটির উপর পড়ে চক্ষের নিমেষে তাকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল। বাঘিনী বুঝল মানুষ-শিকারই সব চেয়ে সোজা; এখন থেকে সে মানুষ মেরেই খাবে। একমাস আগে একখানা বোট কয়েক জন লোক নিয়ে এই শাখানদী ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিল। বাঘিনী বোটটাকে অনুসরণ করে চলল। আমরা যেখানে রয়েছি তারও কিছুদূরে এগিয়ে গিয়ে বোটটা নোঙ্গর করল। সূর্য্য তখন মধ্যগগনে। প্রখর মধ্যাহ্নে বনভূমি ক্লান্ত। যতদূর দৃষ্টি যায়—মনে হয়, একটা সবুজ গালিচার মত বিছানো বনভূমি মৃদু বাতাসে হিল্লোলিত হচ্ছে। নদীতে এক একটা মাছ ঘাই দিচ্ছে। বোটের লোকেরা তাদের রান্নার কাজে ব্যস্ত। বাঘিনী সকলের অলক্ষ্যে কখন বোটের নিকটবর্ত্তী হয়েছে। এক লাফে বোটে উঠে একজন লোককে মুখে করে সে জঙ্গলে চলে গেল। বাঘিনী এখন নিঃসঙ্কোচে মানুষ মারে। সে বোধ হয় মনে করে যে, এতদিন সে বৃথাই মানুষকে ভয় করে এসেছে। মানুষথেকো বাঘিনীর নাগাল পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। সেইজন্য প্রথমেই আমরা এই জঙ্গলে পদার্পণ

করলাম। আমাদের উপস্থিতি বাঘকে জানাবার জন্য বোটের লোকেরা জোরে কথাবার্তা বলছেন। তাঁদের কথাবার্তা জঙ্গলের মধ্যে আমাদের কানে পর্যাপ্ত পৌঁছচ্ছে।

মধ্যাহ্নে যে নিস্তব্ধতা জঙ্গলের সর্ব্ব অঙ্গ ব্যেপে বিরাজ করছিল সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্হিত হয়েছে। হরিণ, বরাহ, বাঘ, বানর, সকল প্রকার জানোয়ারেরই সাড়া আমরা পাচ্ছি। যতই রাত্রি বেড়ে চলেছে, শুক্লপক্ষের খণ্ড চাঁদ ততই পশ্চিম গগনে হেলে পড়ছে। চাঁদ যখন অনেকখানি ঢলে পড়ল, তখন গাছের ছায়ায় একটা গভীর কালো পরদা আমাদের চোখের সম্মুখে বিছিয়ে গেল। জঙ্গলের কোনও জিনিষই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বিচিত্র শব্দ জঙ্গলের অভ্যন্তরের বিভিন্ন দিক থেকে ভেসে এসে বহুক্ষণ আমাদের জাগিয়ে রাখল; তারপরে একসময় আমরা গাছের উপরই ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রভাতে গাছ থেকে নেমে নীচের মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম, রাতের আঁধারে কখন বাঘ এসেছে এবং চলে গেছে আমরা গাছের উপর থেকে তা নজর করতে পারি নি। আমাদের লাইসেন্সের মেয়াদ দশ দিনের। এই দশ দিনের মধ্যে আমরা সুন্দরবনের বিভিন্ন জঙ্গল পরিদর্শন করব। এই জঙ্গল আমরা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলাম। নদীর পাড় থেকে কিছু সুকল পাখী মেরে নিয়ে আমরা নৌকায় চড়ে বসলাম। গতকাল বিকালে আমাদের দাড়ি-মাঝিরা নদীতে জাল ফেলে প্রচুর মাছ ধরেছিল। মাছ ও মাংস নৌকার মধ্যে মজুত করে আমরা বোট ছাড়লাম। এখন আমাদের গন্তব্য স্থান বিজিয়াড় দ্বীপ।

৩

এখন আমরা বিজিয়াড়ি দ্বীপের দিকে এগোচ্ছি। দূর থেকে জঙ্গলটিকে একটা বিন্দুর মত মনে হয়। তরী ভাসিয়ে কাছে এলে তাকে ধোঁয়াটে মেঘের মত দেখায়। নীল সাগরের মাঝে দাঁড়িয়ে সে অভিযাত্রীকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, মূক ভাষায় যেন বলে, "নীল জল ডিঙ্গিয়ে তুমি আমার কাছে এস, আমি তোমার মন ভরে দেব।" আরও কাছে এসে গেলে জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জঙ্গল ঘিরে জলের উপর পাখীর ঝাঁক ভেসে বেড়ায়, বালির উপর ছুটে বেড়ায় হরিণের পাল। লতায় পাতায় হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দের ঐকতান কানে আসে। অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় আমরা এই জঙ্গলে নামি। সূর্য্য সারাদিন একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার বিদায় নিতে এখন দুই তিন ঘণ্টা বাকি। আমরা জঙ্গল পরিক্রমায় বের হই।

মাড়ানো পথ কয়েকটা জঙ্গলের ভিতর থেকে সমুদ্রের বালুচর পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। জানোয়ারেরা এই পথে যাতায়াত করে। এই রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে বালির উপর বাঘের টাটকা থাবার নিদর্শন চোখে পড়ল। বাঘটা শিকারের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে বসে ঝোপ প্রদক্ষিণ করছে। আমাদের আসতে দেখে কাছাকাছি কোথাও সরে গেছে। নীল আকাশে শরতের মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে; বর্ষাশেষের মেঘ, গায় ছুটির আমেজ মাখানো। সমুদ্রের মধ্য হতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ উঠতে থাকে। বোটের মাঝিমাল্লা এবং সমুদ্রের পাখী এই শব্দের অর্থ বোঝে। পাখীরা জল ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে তৎপর হয়। হঠাৎ হাওয়ার প্রবাহ থেমে যায়, চারিদিকে থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। আমরা আমাদের পরিক্রমা অসম্পূর্ণ রেখে বোটে ফিরি। দূরে আকাশের গায় একটা কালো মেঘ ভেসে ওঠে। ক্রমশঃ সেই মেঘ সমস্ত আকাশকে ছেয়ে ফেলে। এইবার সাত শত রাক্ষসীর বেগ নিয়ে, সাত শত রাক্ষসীর মিলিত আর্ত্তনাদ মাথায় বয়ে আসে মহাঝড়। ঝড়ের বেগে সমস্ত জঙ্গল কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। সারা জঙ্গলকে মথিত করে রাত্রিশেষে ঝড় থামে।

দুঃখের রাত্রির স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে বন্য কুক্কুট। ভোরের আলো-কে উচ্চরবে সে অভিনন্দন জানায়। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কালকের দেখে আসা বাঘের নিদর্শন লক্ষ্য রেখে গাছের উপর চড়ে বসলাম। একটা হরিণ ছুটে চলে গেল, মনে হ'ল বাঘে তাকে তাড়া করেছে। ঝড়ে ভেঙ্গে-পড়া ডালপালা খেতে খেতে একপাল হরিণ বন থেকে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ বন্য বরাহের ভয়ার্ত্ত চীৎকার শোনা যায়, সঙ্গে বাঘের গর্জ্জন। হরিণের পাল সচকিত হয়ে ওঠে, "টাউ", "টাউ" সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে তারা তীব্রবেগে ছুটে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে থাকে। বরাহ প্রাণভয়ে ছুটেছে। আমাদের বন্দুকের পাল্লার বাইরে চরের বালুরাশির উপরকার ছোট ছোট ঝোপের আড়ালে ফাঁকে ফাঁকে বরাহ কখনও কখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ছে। বাঘ বরাহের উপর লাফিয়ে পড়ল। প্রবল ঝাঁকানিতে নিজকে মুক্ত করে আহত বরাহ ফিরে দাঁড়ায়—সে গোঁভরে মাথা নীচু করে বাঘের পেট লক্ষ্য করে তেড়ে আসে। সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে বাঘের পেট চিরে দেবে। বাঘ পাশ কাটিয়ে আত্মরক্ষা করে। বরাহ এইবার ছুটেছে—এই তার সুযোগ বাঁচবার। বাঘ হুঙ্কার দিয়ে তাকে অনুসরণ করে। দুই শক্তিমান জানোয়ারের লড়াই, জঙ্গলকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। পাখীরা আকাশে ডানা মেলে, বন্য কুক্কুট তার ছানাদের নিয়ে বৃক্ষকোটরে লুকায়; বানরেরা বৃক্ষশাখা আলোড়িত করে শাখা হতে শাখান্তরে পালায়। বাঘের গর্জ্জন ও বরাহের আর্ত্তনাদ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায়।

এখন প্রখর মধ্যাহ্ন। সূর্য্যোদয়ে যে প্রাণচাঞ্চল্য জঙ্গলের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে খেলা করছিল তা এখন স্তিমিত। হরিণের পাল গাছের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করছে। জঙ্গলের অনেকটা ভিতরের দিকে একটা কাক গাছের ডালে বসে মাটির দিকে চেয়ে অস্থির ভাবে "কা" "কা" রবে ডেকে চলেছে। বোধ হয়, বাঘ ঐ গভীরতর জঙ্গলে গিয়ে বরাহটাকে খাচ্ছে; কাক প্রসাদ পেতে চায়। আমরা বাঘের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে বাঘ শিকার করতে চাই। বাঘের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঘকে হত্যা করতে যে আত্মবিশ্বাস ও স্নায়ুর দৃঢ়তার প্রয়োজন হয় তা খুব কম শিকারীর

মধ্যেই পাওয়া যায়। সমুদ্রের ফাঁকা বালুচর ধরে হেঁটে আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য বোটে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমাদের বোট একটা শাখানদীর মুখে নোঙ্গর করে রয়েছে। নদী থেকে মাছ, কাঁকড়া ধরিয়ে, সমুদ্রের বালুচর থেকে পাখী শিকার করে যে ভোজের আয়োজন নেতা করে রেখেছেন, তা তাঁকে তাঁর নেতৃত্বের গদিতে কায়েম করে রাখবে।

রাতের খাবার সঙ্গে নিয়ে, অপরাহ্নে আবার আমরা রওনা হলাম। নদীর কাছবরাবর আধ মাইলের মত রাস্তা হেঁটে গিয়ে একটি উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করে গাছের উপর চড়ে বসলাম। দিনের আলো নিভে আসছে। সূর্য্য যতই সমুদ্রের তলায় চলে যায়, শুক্লপক্ষের চাঁদ ততই পূর্ব্বগগনে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। চাঁদের আলো জঙ্গলে মায়াজাল বিছিয়ে দেয়। রাতের পাখী ডেকেই চলেছে। একপাল হরিণ ছুটে চলে গেল কিসের নেশায় কে জানে? জোয়ারের জলে নদীর চর ঢেকে গেছে। নদীর পাড়ে, কেওড়া গাছের সারি, হেঁতালের জঙ্গল। কেওড়া গাছের ডাল নদীর উপর ঝুঁকে পড়ে, নদীর ধারকে আলো-আঁধারি করছে। কেওড়া ফল হরিণের প্রিয় খাদ্য। আমাদের কাছ থেকে দূরে, বন্দুকের পাল্লার বাইরে একটা হরিণ নুয়ে-পড়া ডাল থেকে মুখ বাড়িয়ে ফল খাচ্ছে। একটা গাছের ঝাঁকড়া ডালকে ওপার থেকে নদী পার হয়ে আসতে দেখা গেল। হরিণের দৃষ্টির অন্তরালে এসে ডালটি তীরে লাগল। ডালের আড়াল থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসে বাঘ। কৌশলে বাঘ হরিণের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েছে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কয়েকটি ঝোপ প্রদক্ষিণ করে বাঘ হরিণের নিকটবর্ত্তী হয়। চাঁদের আলো চোখে মায়াকাজল পরিয়ে হরিণকে আনমনা করে দিয়েছে। বাঘের গায়ের উগ্র গন্ধও তাকে সচেতন করতে পারে না। গর্জ্জনে জঙ্গল প্রকম্পিত করে বাঘ হরিণের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। মৃত্যুকালীন একটা আর্ত্তনাদ হরিণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বাঘের গর্জ্জন ও হরিণের আর্ত্তনাদ রাতের পাখীর একটানা চীৎকারের সঙ্গে মিশে প্রতিধ্বনিত হতে হতে দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে। আগের রাতের মতই একটা গাছের ছায়ার কালো পরদা আমাদের চোখের সম্মুখে বিছিয়ে গেল। তলায় অন্ধকার, গাছের মাথায় এখন চাঁদের আলো রয়েছে। অনভিজ্ঞ মন এই দৃশ্যের মধ্যে কত বিভীষিকা কল্পনা করে। কিছু আগে গাছের সারি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল; তারা এখন মিলিয়ে গেছে। এখন খালি চারিদিকে ছায়ারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ওই যে ছায়ার সারি ওরা কি গাছ না অশরীরী কিছু? গাছের মধ্য থেকে এক একটা শব্দ উঠে আর সে ফিরে তাকায়, ডাইনে, বামে, পিছনে, নীচে। মৃদু হাওয়ায় গাছ দুলে উঠলে যখন পাশের গাছের ডাল এসে তার দেহ স্পর্শ করে, তখন সে তাকে অশরীরী কল্পনা করে জ্ঞান হারায়। এই সব গাছের সঙ্গে আমাদের অনেক রাতের পরিচয়। পুরানো বন্ধুদের তারা চিনতে পারে নি, তাই তারা নড়ে চড়ে, খট খট, মট মট শব্দ করে আমাদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করছে। আমরা একদৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে আছি আর মনে মনে হাসছি—কখন যে ঘুম এসে আমাদের চোখের পাতা বুজিয়ে দিয়ে গেল, আমরা জানতেই পারি নি। প্রত্যুষে কুক্কুটের উচ্চরবে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। পরিষ্কার দিনের আলোয় আমরা গাছ থেকে অবতরণ করলাম। বোটে ফিরে স্থির করলাম মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করে আমরা নিকটবর্ত্তী জঙ্গল বুড়োশকুনের উদ্দেশে যাত্রা করব।

৪

রাতের আঁধার কেটে যেতেই বোট আমাদিগকে বুড়োশকুন জঙ্গলে নামিয়ে দিল। আমরা উপযুক্ত জায়গার খোঁজে বালিয়াড়ি বরাবর হাঁটতে লাগলাম। একটা সামুদ্রিক নদী বুড়োশকুনের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। সমুদ্র আর এই নদীর সঙ্গমস্থলে, নদীর কোল ঘেঁসে একটা উচ্চ বালিয়াড়ি রয়েছে। বালিয়াড়ির মাথায় ছোট ঝোপ; স্থানটি আমাদের খুব পছন্দ হ'ল। ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আমরা বসে গেলাম। এখান থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়।

বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁসে চলে গেছে এই বালিয়াড়ির স্তর। এই স্তর পেরিয়ে জঙ্গল সুরু হয়েছে। এখানে সমুদ্র ধীর স্থির। প্রকৃতি যখন শান্ত থাকে, সমুদ্র তার মৃদু কল্লোলধ্বনির একটানা সুর জঙ্গলের কানে ঢেলে দেয়। বালিয়াড়ির মাঝে স্থানে স্থানে কিছু কিছু গরাণের জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা হরিণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অদূরবর্ত্তী একটা ছোট জঙ্গলের নীচে চরতে লাগল। এখান থেকে বেশ দূরে, বালিয়াড়ির আড়াল থেকে একটা বাঘ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে হরিণগুলিকে উঁকি মেরে দেখছে। দেওয়ালে পোকা ধরতে গিয়ে টিকটিকি যেমন করে তার লেজ আন্দোলিত করে, বাঘের লেজও কতকটা সেইরূপ ভাবে তার সর্ব্ব অঙ্গে আছড়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ নীচু করে কি যেন সে ভাবছে। নদীর ওপারে একই সমুদ্রের কোলে বিশাল জঙ্গল। বাঘ মাঝে মাঝে ওপারের দিকে তাকায়। ওপারের মায়া তাকে আনমনা করে দেয়। আরও কয়েকটা হরিণ মাড়ানো পথে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে হরিণের দলটিকে পুষ্ট করল। পালের কয়েকটা হরিণ বিশ্রাম করছে; কয়েকটা গাছের ডাল থেকে কচি পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা তাদের পটল-চেরা চোখে পাশের দিকে তাকায়। যে মায়ার জাল তাদের চোখের তারায় জড়ানো আছে, তা তারা কোথায় বিছাতে চায় কে জানে! দূরে জঙ্গলের মধ্যে একপাল বানর ভীষণ মারামারি সুরু করেছে। তাদের কিচির-মিচির শব্দে জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে। বৃক্ষশাখা ত্যাগ করে বানরের পাল মাটিতে নেমে আসে। বাঘ দৃষ্টি ফেরায়। হরিণগুলির অলক্ষ্যে তাদের নিকটবর্ত্তী হওয়া বাঘের পক্ষে সম্ভব নয়। দূর থেকে তাকে

দেখলেই হরিণের পাল উধাও হয়ে যাবে। বালিয়াড়ির আড়ালে আড়ালে বাঘ জঙ্গলের দিকে এগোয়। জঙ্গলের কোল ঘেঁষে যে সকল বন্য কুক্কুট চরে বেড়াচ্ছিল, বাঘকে তারা পথ ছেড়ে দেয়। আর্তরব তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তারা বৃক্ষ-শাখায় চড়ে বসে—ক্রোধোন্মত্ত বানরের দল। কুক্কুটের ভয়ার্ত রব তাদের কর্ণে প্রবেশ করলেও মর্ম স্পর্শ করতে পারে না। বাঘ একটা ছোট ঝোপের আড়ালে এসে নিষ্প্রাণ স্থাণুর মত দাঁড়ায়।

পাশের সামুদ্রিক নদীতে জোয়ারের টান ধরেছে। জলের টানের সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় মাছ নদীতে ঢুকছে। এখানে, ওখানে তাদের ঘাইয়ের শব্দ কানে আসে। মাঝে মাঝে এক একটা কুমীরের বৃহৎ ঘাই নদীর জলকে আলোড়িত করছে। কুমীরেরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা মাছের পিছু পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ধরে খাচ্ছে। নদীর কিনারা ছাপিয়ে জল জঙ্গলে ঢুকবে। কিনারা বরাবর জানোয়ারেরা জঙ্গলের অভ্যন্তরভাগে সরে আসছে। বাঘের উপর দৃষ্টি পড়তেই তারা দিক পরিবর্তন করে। বানরেরা লড়াই করতে করতে একেবারে বাঘের পাশে এসে যায়। বাঘ হালুম করে তাদের ঘাড়ের উপর পড়ল। একটা বানরকে মুখের মধ্যে ধরে আর একটাকে থাবার আঘাতে ধরাশায়ী করল। মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ সোরগোল তুলে বানরের পাল গাছের উপর চড়ে বসে। শাখা আলোড়িত করতে করতে তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়। বাঘ এখন তার শিকার দুইটি নিয়ে খেলাচ্ছে। চলৎশক্তিহীন বানর দুটিকে সম্মুখে রেখে সে উদাসভাবে বসে থাকে। একটা বানরী ফিরে এসেছে। সে মর্মভেদী চীৎকার করতে করতে শাখা হতে শাখান্তরে লাফালাফি করছে। বাঘ উপরে তাকায়। বানরী ও বাঘের চোখের মিলন ঘটে। বাঘের চোখের মধ্যে বানরী জঙ্গলের ছায়া দেখে; তার নিজের ছায়াও সেখানে প্রতিফলিত রয়েছে দেখে, কিন্তু করুণার বিন্দুমাত্রও প্রতিচ্ছবি সেখানে খুঁজে পায় না।

জোয়ারের জল এখন নদীর কিনারা ছাপিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছে। নদীর ধারে গাছের মাথায় পাখীর 'আলা'। জোয়ারে গাছের নীচের দিক জলের তলায় চলে গেছে। কোন কোন জানোয়ার গাছের উপর মাথা রেখে ভেসে আছে। ঝপাং ঝপাং শব্দ কানে আসে। জানোয়ারেরা ডাঙা থেকে জলের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ছে। ছপ, ছপ ছুটে পালাবার শব্দ কানে আসে। কখন বাঘের তাড়ায়, কখন বা প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাভূত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর তাড়ায় হরিণ এমনি করে জলের উপর দিয়ে ছুটে পালায়। একটা গোখুরা সাপ জলে ভেসে এসে গাছের ডালে আশ্রয় নিল। গাছের উপরের পাখীর বাসা তাকে প্রলুব্ধ করে। মাটি থেকে খাড়াই গাছ বেয়ে গাছে চড়া গোখুরার পক্ষে সম্ভব নয়। জলে ভেসে গাছের ডাল পর্যন্ত সে পৌঁছেছে, এখন ডালে ডালে সে পাখীর বাসা পর্যন্ত পৌঁছবে। ভয়ার্ত চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে পাখীর ঝাঁক আকাশে উড়তে থাকে। পাখীর ছানা ও পাখীর ডিম খাওয়ার দুর্বার লোভে গোখুরা গাছের মাথায় পৌঁছতে চেষ্টা করে। শত শত পাখীর ডানার মিলিত সোঁ সোঁ শব্দ তাকে ভীত করতে পারে না। একেবারে গাছের মাথায় চড়ে একটি পক্ষী-শাবককে সে গলাধঃকরণ করতে চেষ্টা করল। দূরে সুন্দরবনের জটায়ু মদনটাট পাখী বসে ছিল। সে এইবার সাপটিকে দেখতে পায়। রামায়ণের যুগের জটায়ু বোধ হয় এই কলিযুগে মদনটাট পাখী হয়ে সুন্দরবনে বাস করছে। জটায়ুর মতই তার বিশাল অবয়ব। যে-কোন সাপের সে যম। দর্শন-মাত্রই মদনটাট শূন্যে উড়তে থাকে। ছোঁ মেরে সাপকে মুখে নিয়ে সে নীল আকাশে উড়ে যায়।

৫

বোটে ফিরে স্নান আহারাদি সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। বুড়োশকুনের লাগোয়া জঙ্গল ভুবনেশ্বর। আমরা রাতে গিয়ে প্রভাতে জঙ্গলে নামতে মনস্থ করলাম। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নৌকা ভাসিয়ে চলেছি। এই যে জঙ্গলের কোলে নদী তর তর বেগে বয়ে চলেছে, এর মধ্যে কত কালই না লুকিয়ে আছে! একবার যদি কোনক্রমে বোট থেকে চ্যুত হয়ে নদীর মধ্যে পড়ি, নদী আমাকে চক্ষের নিমেষে কোন্ অতলে তলিয়ে দেবে আমার হদিসই কেউ আর খুঁজে পাবে না। ইচ্ছে হয়, বোট এমনি চলতেই থাকুক, আমি নদীর জলে পা ডুবিয়ে চাঁদের আলো দেখি—যাই না জলে পা ডুবিয়েছি মাঝি হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'অমন কাজটি করবেন না বাবু। হাঙরেরা বোটের সঙ্গে সঙ্গে চলে। মানুষের মাংস তাদের প্রিয় খাদ্য'।—বিষকুম্ভম্ পয়োমুখম্—এই জঙ্গলে এলে যেমন চোখে পড়ে তেমনটি আর কোথাও নয়। গুরুগম্ভীর বাঘের ডাকে দেহমনে পুলক-শিহরণ জাগায়; গোখুরার উদ্যত ফণা মনোমুগ্ধকর; নদীর স্রোত কল-কল, ছল-ছল শব্দে বয়ে গিয়ে মনে ঝঙ্কার তোলে। দ্বীপের অদূরে এসে বোট নোঙ্গর করল।

প্রভাতে জঙ্গলে নেমে দেখলাম জঙ্গলটি অত্যন্ত কর্দমাক্ত। গাছের গোড়ার শূল কর্দমের মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। শূলগুলির উপর পা পড়লে গুরুতররূপে আহত হওয়ার সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ ঘুরে দেখে আমরা বোটে প্রত্যাবর্তন করলাম। জঙ্গলটি আমাদের ভাল লাগল না। এই সকল কর্দমাক্ত জঙ্গলে অত্যন্ত মশা হয়। মশার কামড়ে শিকারীর পক্ষে স্থির হয়ে বসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখন ঠিক হ'ল আমরা আবার নীল সাগর পাড়ি দেব। দূরে ঐ যে কালো রেখার মত দেখা যায়, ঐটি বকখালি জঙ্গল। ঐ বকখালির কোলে লথিয়ান দ্বীপ বা তমলুকের চর। বর্তমানে এই তমলুকের চরকে পশু-সংরক্ষণ-কেন্দ্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভাঁটায় নেমে গিয়ে আবার জোয়ারে উঠে এসে আমাদের জঙ্গলে পৌঁছতে হবে। জঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছতে দিন শেষ হয়ে গেল। পরের দিন সকালে পরিষ্কার দিবালোকে আমরা জঙ্গলে নামলাম। দ্বীপটির অভ্যন্তরভাগ অতিক্রম করে আমরা জঙ্গলের অপর ধার পর্যন্ত

পৌঁছলাম। হরিণ, বরাহ প্রভৃতির পদচিহ্ন আমাদের চোখে পড়ল, কিন্তু বাঘের কোনও চিহ্ন দেখলাম না। অপরাহ্নে জঙ্গলের অন্য এক প্রান্তে বোট নিয়ে পুনরায় আমরা বাঘের পদচিহ্নের খোঁজে বার হলাম। কিন্তু এখানেও আমাদের নিরাশ হতে হ'ল। পরিশেষে, ঐ জঙ্গলে কোন বাঘ নেই এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হলাম। অপরাহ্নে দাঁড়ি মাঝিরা জঙ্গলের মধ্যেকার শাখানদী থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরেছে। নদীর কোল থেকে অনেক পাখীও মারা হয়েছে। অতএব সন্ধ্যাটা ভোজনানন্দে কাটল। এখন স্থির হ'ল আমরা পরের দিন গাজিখালি জঙ্গলে যাব। সারারাত বোট চালিয়ে পরের দিন দুপুরে আমরা গাজিখালি পৌঁছই। পথে আমরা মাতলা নদী অতিক্রম করি। যেখানে আমরা মতালা পার হই সেখানকার বিস্তার ছয় মাইলের কম নয়।

এই গাজিখালি জঙ্গলের মধ্যে নদীগুলি যেন হারিয়ে গেছে। দুই পাশে দুই বড় নদী, পূর্ব্বে বিদ্যাধরী, পশ্চিমে মাতলা নদী। বড় নদী থেকে বেরিয়ে শাখানদীগুলি অসংখ্য প্রশাখায় গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে। নূতন অভিযাত্রীর সাধ্য কি এক রাস্তায় ঢুকে সেই একই রাস্তায় বেরিয়ে আসে। শাখানদীগুলির দুই পাশে দিগন্তবিস্তৃত নিবিড় জঙ্গল। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা! মৃদু শীতের আমেজ অঙ্গে মধুর স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। বর্ষার বৃষ্টি এবং ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে জঙ্গল এখন প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেছে। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশ আলো করে রূপার থালার মত চাঁদ দেখা দিল। বনদেবী শুভ্রবসনা হয়ে জ্যোৎস্নাসায়রে স্নান করছেন। পাখীরা ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে আকাশে উড়ছে। তারা রাতকে দিন বলে ভুল করছে। মৃগয়ার সেরা দিন এই কোজাগরী পূর্ণিমা। আমরা দুপুরে জঙ্গলে নেমে স্থান নির্ব্বাচন করে এসেছি; সন্ধ্যা না হতেই নির্ব্বাচিত স্থান লক্ষ্য রেখে বন্দুকে গুলি ভরে গাছের উপর চড়ে বসলাম। মাঝ রাতে একটা ডালপালা-সমন্বিত শিংওয়ালা হরিণ জঙ্গলের ভিতর থেকে তীরের বেগে বেরিয়ে আসছে দেখা গেল। হরিণটি দলভ্রষ্ট হয়ে প্রাণপণে নদীর ফাঁকা চর লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, হরিণের পিছনে বাঘ আছে। হরিণের ডালপালাযুক্ত শিং জঙ্গলের ডালপালায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে তার গতি শ্লথ করে দিচ্ছে। একবার যদি সে নদীর ফাঁকা চরে পৌঁছতে পারে তবে বাঘকে পিছনে ফেলে সে উধাও হয়ে যাবে। গাছের ছায়ায় ধাবমান বাঘকে আন্দাজ করে আমরা গুলি ছুড়লাম। আমাদের গুলির শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। বন্দুকের শব্দ বনের জানোয়ারেরা খুব চেনে। হরিণটা ছুটে চলে গেল, কিন্তু বাঘের কোন সাড়াই আর আমরা পাচ্ছি না। দ্রুতগতিতে ধাবমান বাঘের উপর লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব হয় নি; আমরা তার উপস্থিতি আন্দাজ করে গুলি ছুড়েছি। বাঘটা হয় ঐ ঝোপের কোথাও থমকে দাঁড়িয়েছে, নতুবা আহত হয়ে ওর মধ্যে পড়ে গেছে। একপাল হরিণ 'টাউ' 'টাউ' সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে ঝোপটার পাশ দিয়ে চলে গেল। নাগালের মধ্যে বদ্ধ জানোয়ার পেলে বাঘের চোখ চক্ চক্ করতে থাকে; তখন তার চোখের আয়নায় জঙ্গলের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠে শিকারের ঘাড়ের উপর পড়বার জন্য সে পেশীগুলিকে শক্ত করে খাড়া হয়ে উঠে। দুই-এক মিনিট পরেই দূরের আর এক ঝোপের মধ্যে আমরা বাঘের সাড়া পেলাম; কিন্তু সে সাড়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জনও নয়, জোড়কে ডাকার গুরুগম্ভীর স্বরও নয়। পশুসম্রাট এখন নিয়মুখ, তার চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ; আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে আত্মগোপন করতে সে সচেষ্ট। সাধারণ শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে হরিণের সঙ্গে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে। হরিণের সঙ্গে সঙ্গে সেও তার নিজের ভাষায় সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে গভীরতর জঙ্গলে ঢুকে যেতে থাকে।

বন্দুকের শব্দে সেই যে জানোয়ারেরা আমাদের মহল্লা ত্যাগ করে চলে গেল, সারারাত তারা কেউ এদিক আর মাড়ায় নি। শেষরাতে নদীতে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হ'ল। অন্ধকার কেটে গেলে দেখা গেল, জল নদীর অনেক তলায় চলে গেছে। কিছু দূরে কাদায় লুটোপুটি খেয়ে, অনড় চোখে নিষ্প্রাণ কাঠের মত শুয়ে আছে একটা কুমীর। কাদার মধ্যে কিছু কিছু জল আটকে আছে। এই ভোরেই জলচর পাখীরা কাদার মধ্যে থেকে মাছ, কাঁকড়া, প্রভৃতি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। কুমীরটাকে গুলি করবার মতলবে আমরা গাছের আড়ালে আড়ালে তার নিকটবর্ত্তী হওয়ার মতলব করলাম, কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে এখন বেশ অন্ধকার। আর একটু পরিষ্কার না হলে, ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। জঙ্গলে প্রশান্তি বিরাজ করছে। একটা বাঘ মাছ খেতে কাদার মধ্যে এসে নামল। বাঘ আর পাখীতে প্রাতঃকালীন ভোজসভা বসিয়ে দেয়। বাঘকে দেখে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়ে কুমীরের নিকটবর্ত্তী হওয়ার বাসনা আমাদের ত্যাগ করতে হ'ল। বাঘকে চোখের সম্মুখে দেখে এখন আর আমরা গাছের উপরের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে নীচে নামতে পারি না। এতক্ষণে প্রাতঃকালীন রৌদ্র গাছের পাতার শিশিরের উপর পড়ে হীরক-দ্যুতি বিকিরণ করছে। চোখে দেখা না গেলেও একটা প্রাণের স্পন্দন জঙ্গলের শিরায় শিরায় খেলা করে বেড়াচ্ছে, তা অনুভব করা যায়। কুমীরটাকে বাঘ এতক্ষণ বুঝতে পারে নি; হঠাৎ কুমীরটা নড়ে উঠল। বাঘ হালুম করে এসে কুমীরকে ধরে। যে থাবার আঘাতে হাতীর শিরদাঁড়া ভেঙে যায়, কুমীরের পিঠের চামড়া সে ভেদ করতে পারল না। বাঘ রাগে হুঙ্কার দিয়ে উঠে। যে অখণ্ড শান্তি জঙ্গলের সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে ছিল, তা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে। পাখীর ঝাক মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যায়। জঙ্গলের অভ্যন্তরে ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণীরা ছুটে পালাচ্ছে, বাইরে তার সাড়া পৌঁছয়। ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে

জঙ্গল কাঁপিয়ে, বাঘ কুমীরকে চিৎ করে ফেলতে চেষ্টা করে। তার নরম পেটে থাবা বসিয়ে, বাঘ কুমীরকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে।

কুমীর এতক্ষণে বাঘের পা কামড়ে ধরেছে। তার লেজের ঝাপটা বাঘের গায়ের উপর পড়ে পিছলে যাচ্ছে। প্রাণপণে সে বাঘকে জলের দিকে টানতে চেষ্টা করে। দূরে নৌকা আসার শব্দ হ'ল। উভয়েই ক্ষণকালের জন্য কান খাড়া করল। এইসব সৃতি নদীতে জেলেরা অনেক সময় মাছ ধরতে আসে। ডিঙ্গি আসার শব্দ হচ্ছে মানে, ডিঙ্গির মধ্যে উভয়েরই দুশমন্ মানুষ আছে, তা উভয়েই বোঝে। ডিঙ্গি আসার শব্দ স্পষ্ট হয়; এখন তু'জনেই লড়াইয়ের তীব্রতা কমায়। শব্দ স্পষ্টতর হতেই তারা লড়াই থামিয়ে দেয়। পরম বন্ধুর মত তারা পরস্পরকে ত্যাগ করে। বাঘ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কুমীর জলের তলায় চলে যায়।

কিছুক্ষণ যায়; বোটটি এখন চোখের অন্তরালে চলে গেছে। পিছনের পা টানতে টানতে কুমীর আবার ডাঙ্গায় উঠে আসে। বাঘ তার পিছনের পা বিশেষভাবে জখম করেছে। পাখীর ঝাঁকও ফিরে এসেছে। জোয়ার এসে সমস্ত মাছকে মুক্তি দেবে, তার আগে মাছগুলিকে খেয়ে ফেলা চাই। কুমীর অনড় চোখে হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে শুয়ে থাকে; একটা পাখী এসে কুমীরের হাঁর মধ্যে ঢুকে, তার দাঁতের ফাকে আটকে যাওয়া মাংসের কুচি খুঁটে খুঁটে খায়। নদীতে জোয়ারের টান ধরতেই আমাদের নৌকা আসার শব্দ পেলাম। আমরা যখন বোটে চড়লাম, তখন সকাল আটটা।

সারারাত্রি জেগে কাটিয়েছি। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। লাইসেন্সের মেয়াদও শেষ হয়ে এল। মেয়াদ শেষ হলে সজনেখালি ফরেষ্ট আপিসে দর্শন দিয়ে তবে আমাদের জঙ্গল ত্যাগ করতে হবে। রাতে বোট ছাড়লে কাল সকালে ফরেষ্ট আপিসে পৌছব। বোটের লোকেরা সারা দিন মাছ ধরে এবং পাখী শিকার করে বেড়ালেন, আমরা ঘুমিয়ে কাটালাম। পরের দিন সকালে চোখ মেলেই সম্মুখে সজনেখালি ফরেষ্ট আপিস চোখে পড়ল। সজনেখালি জঙ্গল ত্যাগ করে দুপুরে আমরা শিয়ালফুলি জঙ্গলে পৌছলাম। এইখানেই জঙ্গলের শেষ। শিয়ালফুলির অর্দ্ধেক পরিমাণ জায়গায় সরকারী সংরক্ষিত জঙ্গল এবং বাকি অর্দ্ধেকটিতে মাছের চাষ হয়েছে। আমরা জঙ্গল ঘুরে দেখলাম। এখানে বাঘ যথেষ্ট আছে বলে মনে হ'ল। জঙ্গলপরিক্রমা শেষ করে, সন্ধ্যার দিকে আমরা বোটে চড়লাম। এইখানেই আমাদের যাত্রা শেষ হ'ল।

হেমন্তের কবিতা

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

কবিতা তোমার জন্য একান্তে লিখেছি প্রিয়তম
কাল রাতে। চন্দ্রনীল স্বপ্নিল আকাশে অনুপম
দেখেছি তোমাকে যেন, চিন্তার দিগন্তে বার বার
উঠেছে কত না কথা, কত ভাব আবেগ সঞ্চার
শিরায় শিরায় রক্তে। তবু যেন তবু মনে হয়
তুমি স্বপ্ন, কুয়াশায় পরিম্লান। একটি বিস্ময়
আমার জগতে আর এই তরু, উদাস সন্ধ্যায়
লতার বিন্যাসে, বুকে, প্রাণবন্ত এই মৃত্তিকায়
হিমেল হেমন্তে। একা বাতায়ন খুলেছি দুয়ার
নিস্তব্ধ বিজন রাত। জাগি আমি—জাগে বুঝি আর
অতন্দ্র বিরহী কোন, তুষারের শুভ্র নীরবতা
ভাঙিবে কখন? বলো, বুকে জমে আছে কত কথা
কত মিঠে কথা বন্ধু, কত রঙ মনের পরতে,
তিলে তিলে ভরে যায় সবুজে ও শ্রাবণে শরতে
সূর্যরশ্মি মস্তকের। সে রঙ সে কথা দিয়ে কবে
তোমাকে করিব তৃপ্ত, সেদিনের সৌভাগ্য-গৌরবে
আমার সফল স্বপ্ন। ভোরে উঠে দেখি নিবেদন
আমার কবিতা ব্যর্থ। সারা রাত সেফালির বন
লিখেছে কবিতা তৃণে সংখ্যাহীন ফুলের অক্ষরে,
প্রভাত শিশিরে সিক্ত অনিন্দিত তোমার উত্তরে।

হালিসহরের আশেপাশে

শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

হালিসহরের ইতিবৃত্ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, কীর্ত্তি-কলাপ এবং স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম।* এবার তন্নিকটবর্ত্তী আরও কতকগুলি স্থান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে লিখিত হইল।

হালিসহর অতিক্রম করিলেই কাঁচড়াপাড়া রেল ষ্টেশন। এই ষ্টেশনটি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত, কিন্তু অবশিষ্ট গ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় এই গ্রাম বৃহৎ কুমারহট্টের অর্থাৎ হাবেলীসহর পরগণার অংশ ছিল। কুমারহট্টের অর্থাৎ হালিসহরের পণ্ডিতেরাই এই পল্লীর নাম দেন কাঞ্চনপল্লী, যাহা শেষ পর্য্যন্ত কাঁচড়াপাড়াতে পরিণত হইয়াছে। কাঞ্চনপল্লী নাম হইবার পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম ছিল নরহট্টগ্রাম। এখান হইতে বৈদ্যদের নরহট্টিয় সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাপ্রভু এই গ্রামের শিবানন্দের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেন তখন প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় বহু গৌড়দেশীয় ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। সেন শিবানন্দ এই সব ভক্তদের পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র পুরীদাস বা পরমানন্দ সেন সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক', 'চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য' এবং 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাকবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন। স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহাকে কবিকর্ণপূর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আনুমানিক ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

'অজ্ঞান তিমিরনাশক' প্রণেতা বৈদ্যনাথ আচার্য্য, 'জ্ঞানার্ণব' গ্রন্থরচয়িতা প্রেমচাঁদ কবিরত্ন, 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও তুলসীদাসের রামায়ণের অনুবাদক হরিমোহন সেনগুপ্ত, বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রুতিধর নিমচাঁদ শিরোমণিও এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

সেন শিবানন্দ নিজগুরু শ্রীনাথ আচার্য্যের নামে কৃষ্ণরাইজীউ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাইজীউ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত কচুরায়ের কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করায় তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিগ্রহের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করান এবং নিত্যসেবা নির্ব্বাহের জন্য একটি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। কালক্রমে পুরাতন গ্রামের কিয়দংশ এবং তৎসহ কচুরায়-নির্ম্মিত মন্দিরও ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক বহু অর্থ ব্যয়ে বর্ত্তমান শ্রীমন্দির আবার নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণদেব বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের এবং রাধিকাদেবীর বিগ্রহ অষ্টধাতু-নির্ম্মিত। অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের জন্য বিগ্রহ দুইটি প্রসিদ্ধ।

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে কুলিয়া গ্রাম। এখানে দেবানন্দ ঠাকুরের অপরাধভঞ্জন হইয়াছিল, এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাএকাদশী তিথিতে এখানে এক মেলা বসে। মহাপ্রভু বৈষ্ণবনিন্দুক দেবানন্দের বৈষ্ণব-বিরোধী-কার্য্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। এখানে একটি সুন্দর মন্দিরে গৌরনিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। পূর্ব্বে কুলিয়া যাইবার ভাল রাস্তা ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চাঁদমারীতে (এখন সেখানে নূতন শহর কল্যাণী নির্ম্মিত হইয়াছে) আমেরিকান সৈন্যদের যে ঘাটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহারই দৌলতে কাঁচড়াপড়া হইতে কুলিয়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি পীচ ঢালিয়া সুগম করা হইয়াছে। এই রাস্তা দিয়া এখন বাস, সাইকেল, রিক্সা এবং ঘোড়ার গাড়ী চলাচল করিয়া থাকে, কাজেই মেলায় যাইবার আর কোন অসুবিধা নাই। মেলা প্রায় একমাস থাকে।

কাচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে এবং নব-নির্ম্মিত উপনগর কল্যাণী হইতে দুই মাইল গেলেই ঘোষপাড়া গ্রাম। ইহা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। আউলচাঁদ নামে একজন সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কর্ত্তাভজাগণ বলেন, আউলচাঁদ শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার। মহাপ্রভু পুরীধামে অপ্রকট হইবার বহুকাল পরে পুনরায় আউলচাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া "গুরুসত্য" এই মহামন্ত্র প্রচার করেন। ফকিরবেশে তিনি ঘোলাদুবলী, উলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে বেজড়া গ্রামে আসিয়া বাইশ জনকে দীক্ষিত করেন। এই বাইশ জনের মধ্যে ঘোষপাড়া-নিবাসী রামশরণ পাল এবং কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী গোপজাতীয় কানাই ঘোষের নাম বিখ্যাত। কর্ত্তাভজাদের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটি শাখা বলা যাইতে পারে। নিজ ধর্ম্মকে ইঁহারা "সত্যধর্ম্ম" বা "সহজধর্ম্ম" বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে কর্ত্তা বা ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই সম্প্রদায়ের গুরুগণ 'মহাশয়' ও শিষ্যগণ 'বরাতি' নামে অভিহিত হন। ইঁহাদের সাধন-বিষয়ে কতকগুলি গুহ্য রহস্য আছে, সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ উহা জানিতে পারে না। দিনে পাঁচ বার ইঁহাদের মন্ত্র জপ করা বিধি। ইঁহারা শুক্রবারকে পবিত্র দিবস জ্ঞান করিয়া উপবাসে ও ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করেন। মদ্য ও মাংস ইঁহারা নিষিদ্ধ দ্রব্য বলিয়া মনে করেন। সাধনক্ষেত্রে ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই বটে, তবে ব্যবহারিক জীবনে ইঁহারা জাতিভেদ মানিয়া চলেন।

রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে

* প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬১

'সতীমা' বলিয়া ডাকিতেন। কথিত আছে যে, একবার রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলে আউলচাঁদ নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে কিছু মৃত্তিকা লইয়া তাঁহার দেহে মাখাইয়া তাঁহাকে তখনই রোগ-মুক্ত ও সুস্থ করিয়া দেন। আউলচাঁদ তাঁহার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। পাল মহাশয়ের পুত্র মহাসাধক দুলালচাঁদ, যিনি 'লালশশী' নামে খ্যাত—তিনিই নাকি আউলচাঁদ, এইরূপ প্রবাদ। 'সতীমা'র সমাধিস্থান ডালিমতলা ঘোষপাড়ায় একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। আর একটি দর্শনীয় স্থান হইতেছে হিমসাগর দীঘি। অনেকের বিশ্বাস ইহার জলের রোগ আরোগ্য করিবার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। শুনা যায়, ইহার জল চোখে দিয়া একজন অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। রথ ও দোলের সময় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। ঘোষপাড়ায় দোলের মেলা খুবই প্রসিদ্ধ। মেলা সপ্তাহকাল স্থায়ী হয় এবং ইহাতে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হয়।

কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী সুবর্ণপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ 'আর্য্যদর্শন' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত", "ম্যাটসিনির জীবনচরিত" ও "জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিত" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এক সময় বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছিল। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম যুগে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সহস্র সহস্র যুবকের প্রাণে উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। বাংলায় জাতীয়ভাব উদ্দীপনে তাঁহার দান সামান্য নহে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সংবাদপত্র "প্রভাকর"-সম্পাদক ও বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ মনীষিগণের সাহিত্যগুরু সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়া এই গ্রাম কাঁচড়াপাড়াকে (শহর কাঁচড়াপাড়া নহে) ধন্য করিয়াছিলেন। ইংরেজী-প্রভাব-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ বাংলার ধরনে যাঁহারা কবিতা লিখিতেন ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষ কবি। তাঁহার জন্মস্থান হিসাবে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রামটি দ্রষ্টব্য স্থান। হাস্যরসের কবিতায় তাঁহার সমকক্ষ বিরল। খাঁটি বাংলার আচার ব্যবহার এবং তদানীন্তন বাংলার প্রকৃত অবস্থা তাঁহার মতহৃদয়গ্রাহী করিয়া খুব কম লেখকই লিখতে সক্ষম হইয়াছেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার মমত্ব ছিল অসাধারণ। গুপ্ত কবির তিরোভাবের (১২৬৫ বঙ্গাব্দ) বহু বৎসর পরে তাঁহার জন্মস্থানে একটি স্মৃতিফলক স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে:

"তোমা তরে কাঁদি আজ হে কবীন্দ্র রসরাজ
হাস্যোজ্জ্বল সদামুক্ত প্রাণ।
ব্যঙ্গ কবিতার রঙ্গে একদিন এই বঙ্গে
তুলেছিলে আনন্দ-তুফান
সুধন্য কাঞ্চনপল্লী শ্যামতরু তৃণবল্লী
তব জন্মে ধন্য হেথা মানি।
নহ গুপ্ত হে ঈশ্বর, ব্যক্ত তুমি চরাচর
যুগে যুগে সত্য তব বাণী॥"

পুরাতন চাঁদমারী—যেখানে আমেরিকান সৈন্যদের ঘাটি বসিয়াছিল, তাহার নামকরণ হইয়াছিল রুজভেল্ট নগর। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় নয় হাজার একর জমির উপর "কল্যাণী" নামে এক নূতন উপনগর গড়িয়া তুলিতেছেন। ভারতের জাতীয় মহাসভার ৫৯তম অধিবেশন এখানেই হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হরিণঘাটার দুগ্ধ-সরবরাহ-কেন্দ্র (ডেয়ারী) ও সরকারী যক্ষ্মা চিকিৎসালয় এই অঞ্চলে অবস্থিত। অদূর ভবিষ্যতে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়" নামে পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে স্থাপনের এক পরিকল্পনা সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজের জন্যও এখানে জমি লওয়া হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে (১৯৫৪) প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহেরু এখানে বিড়লা কৃষি কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই কলেজের প্রধানতম অংশটি নির্ম্মাণ করিতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে তন্মধ্যে বিখ্যাত শিল্পপতি বিড়লা-পরিবারের দান ২০ লক্ষ টাকা। টালিগঞ্জের সরকারী কৃষি কলেজটি এখানেই উঠিয়া আসিবে। এই হরিণঘাটায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আদি পৈতৃক নিবাস। ভবিষ্যতে কাঁচড়াপাড়া ও নিকটস্থ স্থানসমূহের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এখনকার শহর কাঁচড়াপাড়া অতীতের বীজপুর গ্রাম। পূর্ব্বের বর্দ্ধিষ্ণু কাঁচড়াপাড়া গ্রাম বর্ত্তমানের কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। স্থানীয় প্রবীণ লোকেরা এখনও বীজপুর ষ্টেশন নামেই ইহাকে অভিহিত করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বিস্তৃত এলাকার কোন অংশই কাঁচড়াপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত নয়। উহার আয়তন সাড়ে তিন বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১৯৫১ সনের গণনানুসারে ৫৬,৫৩৮। বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা ইহার উপর আরও দশ-বারো হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক বাস্তুহারাও আছেন। চারিটি কলোনীও পৌরসভার আওতার মধ্যে আছে যদিও ইহাদের অধিবাসীরা এখনও করদাতারূপে গণ্য নন।

হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া এবং বর্ত্তমান কল্যাণীর বিপরীত দিকে, গঙ্গার অপর তীরে ত্রিবেণী ও বংশবাটী। এইসব স্থানও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ত্রিবেণীর অপর নাম মুক্তবেণী। প্রয়াগের গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একধারায় মিলিত হইয়া এখানে আসিয়া আবার পৃথক ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। এখানে গঙ্গাস্নান হিন্দুমাত্রেরই কাম্য। মুসলমান আমলে এই স্থানের নাম "তিরপানি" ও "ফিরোজাবাদী" ছিল। বঙ্গেশ্বর ফিরোজশাহ এখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। এখানে জাফর খাঁর মসজিদ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। মোগলদের সময় ত্রিবেণী প্রসিদ্ধ বন্দর ও শহর ছিল। এখানকার বেণীমাধবের মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

ত্রিবেণীও এক সময় সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন।

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা কে না জানে? ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ বাঘাটি গ্রাম বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষের পৈতৃক বাসস্থান।

বংশবাটী, যাহার চলিত নাম বাঁশবেড়ে, সপ্তগ্রামের অন্যতম প্রধান গ্রাম। রায় মহাশয়েরা এখানকার প্রাচীন জমিদার। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এই বংশোদ্ভূত। তিনি ভারতে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। 'গ্রন্থাগার' ও 'দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার' নামে দুইটি গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা' এবং 'কায়স্থ' পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকা, ইংরেজী দৈনিক 'ইষ্টার্ণ ভয়েস' এবং ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি ইউনাইটেড বেঙ্গল' তিনি বহুকাল যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ২০শে নবেম্বর ১৯৪৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রায় মহাশয়দের গড়বেষ্টিত বাড়ী এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। এই গড়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের অনুরূপ মন্দির বাংলা দেশে আর একটিও নাই। এই মন্দিরটি বারাণসীর স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শে নির্মিত। ইহার গঠন-প্রণালীতে যৌগিক ষটচক্রভেদের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মন্দির নির্মাণ করিতে সেযুগেই আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। হংসেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ নিমকাঠের দ্বারা প্রস্তুত। দেবীর বর্ণ নীল, শবরূপী শিবের নাভিপদ্মের উপর দেবী উপবিষ্ট। এক সময়ে এখানে খুব সংস্কৃতচর্চা হইত এবং বহু পণ্ডিত এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে পূর্ব্বে নীলের চাষ হইত। পরলোকগত প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানকার বাসিন্দা ছিলেন। বহুপূর্ব্বে এখানে একটি গীর্জ্জা ছিল। উহার আচার্য্য ছিলেন ইংরেজী, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষাবিদ্ তারাচাঁদ নামে এক দেশীয় ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যদিও তাঁহার আদি নিবাস হালিসহরে। তাঁহার পিতা রেভারেণ্ড পি. কে. ব্যানার্জ্জি উক্ত গীর্জ্জার পাদ্রী ছিলেন। অনেকের ধারণা এই গীর্জ্জাটিই বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রথম গীর্জ্জা।

হালিসহর অতিক্রম করিয়া কলিকাতার দিকে আসিতে গরিফা (গৌরীপুর) গ্রাম। ইহা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৈতৃক বাসভূমি। হালিসহরে কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেনের একটি বাগান-বাড়ী (country seat) ছিল। সেখানে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকিতেন। কেশবচন্দ্রের ও প্রতাপচন্দ্রের বাল্যজীবন গরিফাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহারা দুই জনেই বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ভাষাজননীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার জন্য সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মমন্দিরে যাইতেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী "আচার্য্যের উপদেশ", "জীবনবেদ" প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর ও শব্দালঙ্কারসম্পন্ন। তিনি 'আশীষ' নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রামের বলরাম সেন মনস্তত্ত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের বন্ধু বিহারীলাল গুপ্ত, আই-সি-এস'এর আদি নিবাস এই গরিফাতেই। তাঁহারা তিন জনে একত্রে আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে বিলাতে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান শ্রীযুত রঞ্জিৎকুমার গুপ্ত আই-সি-এস'এরও পৈতৃক নিবাস এই গ্রামে। শ্রীযুত গুপ্ত এক সময়ে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

গরিফা অতিক্রম করিলে আমরা নৈহাটি পাইব। নৈহাটি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহার পুরাতন নাম ছিল নরহট্ট, তাহা হইতে নৈহাটি হইয়াছে। আবার অনেকের মতে 'নটির হাট' হইতে নৈহাটি নামের উৎপত্তি। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মতে হালিসহর-নৈহাটি-কাঁচড়াপাড়া অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলার তথাকথিত নিম্নজাতি ধীবর, মাঝি, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণীর বসবাস ছিল। তারপর বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের কৌম সংস্কৃতির নানারূপ লৌকিক রূপান্তর ঘটে। ইংরেজ যুগের গোড়ার দিকে ক্রমে যখন হুগলী হইতে কলিকাতায় ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে তখন কলিকাতার সংলগ্ন গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই অঞ্চলেরও দ্রুত রূপান্তর ঘটে। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব অঞ্চলে একাধিক শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার দরুন দিন দিন জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং এগুলি অবাঙালী-প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে এখানেও বহু সংস্কৃত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অত্রস্থ কাঁটালপাড়া পল্লী "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। এই স্থানকে বাংলার সাহিত্যিক-তীর্থ বলা যাইতে পারে। যে কক্ষটিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাদি লিখিতেন তাহা এখনও বিদ্যমান। তাঁহার কুলদেবতা ৺বিজয় রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রায় বিশেষ সমারোহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর কাঁটালপাড়ায় সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন হয়। উহা "বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলন" নামে পরিচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও ভাষাজননীকে গৌরবান্বিতা করিয়াছেন। তাঁহার "পালামৌ" ও "জাল প্রতাপচাঁদ" শিষ্ট ভাষার আদর্শস্বরূপ আদৃত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিত উপন্যাস "শৈশব-সহচরী" ও ছোট গল্প "মধুমতী" একদা বাঙালী পাঠকদের আনন্দদান করিয়াছিল। এখানকার সাহিত্যিক পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীও 'প্রাচীন চিত্র', 'বঙ্কিম চিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে কাঁচড়াপাড়া-হালিসহর নৈহাটি অঞ্চল বাংলার আধুনিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুদের বাল্য জীবনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৮৫৩ সনের ৬ই ডিসেম্বর নৈহাটির প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশে খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ নিজ গ্রাম—যশোহর (এখন খুলনা) জেলার কুমিরা ত্যাগ করিয়া নৈহাটিতে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। পূর্ব্বদেশ হইতে নৈহাটিতে আসিয়া টোল খোলার কথা শুনিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "পরগণে হাবেলীসহর" নৈহাটিতে অনেকখানি ব্রহ্মোত্তর জমি দান করেন। মাণিক্যের পৌত্র পণ্ডিত রামকমল ন্যায়রত্নই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা। শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বঙ্গদর্শনে' প্রাচীনকালের 'ভারত-মহিলা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং মহারাজ হোলকার প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তারপর বঙ্গদর্শনে "কাঞ্চনমালা" নামে এক উপন্যাসও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার লিখিত "বাল্মীকির জয়" বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার ন্যায় অনুসন্ধানী ঐতিহাসিক বিরল। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, পিএইচ-ডি ভারতবর্ষে বৌদ্ধমূর্ত্তি-তত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। বরোদার "ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটে"র পরিচালকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার বহুদিন পরে বাংলা দেশে আসিয়া তিনি বর্ত্তমানে নৈহাটিতেই বাস করিতেছেন। তিনি "Indian Buddhist Iconography" (1924) নামক গ্রন্থের লেখক। শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তিনি অকালে মারা যান। এখানকার অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঐতিহাসিক গবেষণায় এবং প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

এবার ভাটপাড়ার কথা বলিব। ষ্টেশনের নাম কাঁকিনাড়া কিন্তু ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লীই ইহার পুরাতন নাম। ভাটপাড়ার পৌর সীমানা সুবিস্তীর্ণ। কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, আতপুর এবং শ্যামনগর লইয়া ভাটপাড়া পৌরসভা গঠিত। ৪,০৬২ বর্গমাইল বিস্তৃত এই বিরাট এলাকায় ১৯৫১ সনের আদমসুমারী অনুসারে, ১,৩৩,৭৬২ লোকের বাস। হাওড়ার পর ভাটপাড়া মফস্বলে ঘনসন্নিবিষ্ট পৌরসভা। অতীতে ইহা বাংলা দেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ভট্টপল্লীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চব্বিশ পরগণার গেজেটীয়ারে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ভাটপাড়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

রাজা আদিশূর কনৌজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে আনাইয়াছিলেন তন্মধ্যে 'ছান্দড়' নামধারী ব্রাহ্মণ হইতে ভাটপাড়ার বংশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ছান্দড়ের বিংশতিতম পুরুষ শ্রীচুর্ল ভানন্দ সম্রাট আকবরের আমলে মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে ভাটপাড়া ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন অঞ্চল জায়গীররূপে লাভ করিয়াছিলেন। এই দুর্ল ভানন্দের সময় হইতেই ভাটপাড়া বৈদিক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণদের স্থায়ী বাসস্থান হইয়া উঠে। সংস্কৃত-শিক্ষার পীঠস্থান হইলেও ভাটপাড়ায় বাংলা ভাষার চর্চ্চা উপেক্ষিত নহে। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বাংলা ভাষার খ্যাতনামা লেখক। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন বহু শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণও সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। 'শাক্যসিংহ', 'মণিভদ্র' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের পুত্র স্বর্গত হরকুমার শাস্ত্রী 'শঙ্করাচার্য্য' নামে একটি নাটক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার লিখিত 'অদ্বৈতবাদ খণ্ডন' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ তিনিই করিয়াছিলেন। আরও কয়েকখানি নাটক লিখিয়া তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। পরলোকগত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি প্রাচীনপন্থী হইলেও বাংলার আলোচনায় বিরত ছিলেন না। তাঁহার কৃষ্ণবিষয়ক পাঁচালী বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার বংশধর পণ্ডিত ভবভূতি বিদ্যাভূষণও বাংলা ভাষার সেবা করিয়া থাকেন। অত্রস্থ প্রসিদ্ধ রায় বংশের ৺মহেন্দ্রচন্দ্র রায় অনেকগুলি বাংলা পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং সেই বংশেরই পরলোকগত ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া বাংলা ভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন।

এখানে অনেকগুলি কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় ইহার স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা নষ্ট হইতেছে। চারিদিকেই অবাঙালী শ্রমিকের ভিড়, মনে হয় যেন পশ্চিম প্রদেশের কোন ছোট শহরে আসিয়াছি।

ভাটপাড়ার পর মূলাযোড় বা শ্যামনগর। মূলাযোড়ের প্রসিদ্ধ কালীবাড়ী ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একটি সুন্দর উদ্যানমধ্যে ব্রহ্মময়ীর মন্দির স্থাপিত। এখানে আনন্দশঙ্কর, গোপীশঙ্কর ও হরশঙ্কর নামে তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। গোপীমোহন ঠাকুরের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হয়। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই মন্দির। মন্দিরে এখনও রীতিমত ভোগ, আরতি হয়। প্রত্যেক মাসের অমাবস্যায়, রটন্তী চতুর্দ্দশীতে ও কালীপূজার সময় বিশেষ সমারোহ হয় এবং সমগ্র পৌষ মাস ধরিয়া এখানে একটি মেলা বসে। এখানে একটি অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সংস্কৃত টোল আছে। এগুলিও গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম এক সময় এই টোলের অধ্যক্ষ ছিলেন। টোলটি এখনও কোন প্রকারে Sanskrit Board of Education-এর অধীনে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে পণ্ডিত তারানাথ তর্কতীর্থ ইহার অধ্যক্ষ।

রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে

ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়া মূলাযোড়ে বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবন এখানেই অতিবাহিত হয়। এখন তাঁহার সেই বাসস্থানের কোন চিহ্নই নাই।

মূলাযোড়ের নিকটবর্ত্তী কাউগাছি গ্রামে একটি পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে এটি একটি পুরাতন নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ, আবার কেহ কেহ বলেন, বঙ্গে মরাঠীবর্গীদের উপদ্রবের সময় বর্দ্ধমানের তৎকালীন নাবালক মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী এখানে একটি গড়বেষ্টিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বিপদের সময় এখানে আসিয়া বাস করিতেন। এখন গ্রাম্য দেবী হিসাবে এখানে শীতলা প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

কাউগাছির অনতিদূরে রাহুতা গ্রাম। এখানে পরলোকগত সুসাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের জন্মস্থান। রঙ্গলাল প্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ" গ্রন্থের সূচনা করিয়া বাংলা ভাষায় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহার মাত্র দুই খণ্ড প্রকাশ করিয়া অর্থাভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পরে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বিশ্বকোষে"র সম্পাদনভার লইয়া এই বিরাট কোষগ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় 'শরৎশশী', 'বিজ্ঞানদশক', 'চিত্তচৈতন্য উদয়' এবং 'বৈরাগ্যবিপিন-বিহার' ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রঙ্গলাল বাবুর মধ্যম সহোদর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। তাঁহার প্রণীত 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর' ও 'মুক্তামালা' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন পাইবার যোগ্য। এগুলি ছাড়াও কৃষিশিল্পের উন্নতি কল্পে ইংরেজী ও বাংলায় অনেকগুলি পুস্তক এবং প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ও 'মুকুটোদ্ধার কাব্য', 'অদৃষ্ট বিজয়' নামে কাব্য এবং 'জীবন সঙ্গীত', 'প্রণয় প্রতিমা' ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তখনকার সংবাদপত্রে এই বইগুলি বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে মূলাজোড় পর্য্যন্ত 'হাবেলীসহর' পরগণার বিস্তৃতি ছিল। হালিসহর সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সমস্ত স্থানের কথাও বলা আবশ্যক।

প্রাণী

শ্রীবিনয়ভূষণ রায়

বেশ বোঝা যাচ্ছিল একটু চাঞ্চল্যের রেশ। নব জীবনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে অখ্যাত স্থানটি—ডাঃ অনিল সেনের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে। বৃদ্ধ-মহলে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস, নতুন লোক পাওয়ার আনন্দ অল্পবয়স্কদের মহলে। আর মেয়েমহল চেষ্টা করছে—ডাক্তার সাহেবকে আদর আপ্যায়নে আপন করে নেবে বলে। অসুখবিসুখ ত সংসারে লেগেই থাকে। তবু ডাক্তার একটু বল-ভরসা। আমি কিন্তু দেখেছিলাম ওর ভিতর এক রাশ নগ্ন আলো আর মিহিরকে বলেছিলাম—এ যেন একটা প্রাণীরই কায়া, প্রকৃতির একটা দিক।

কিন্নর রায় হাসপাতাল উদ্বোধনের দিনও এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ভরপুর আনন্দ-রব এই প্রান্ত জুড়ে। উদ্বোধনের দিন এল উদ্দীপনার বাণী নিয়ে। আমাকে অবশ্য কিছুদিন থাকতে হয়েছিল কোন এক কার্য্যসূত্রে। বিশিষ্ট নেতৃবর্গ আমন্ত্রিত। এগিয়ে এলেন জমিদার কিন্নর রায়। লাল ফিতা কেঁটে উদ্বোধন করলেন তিনি। তার পর নিজের চেয়ারের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এল এক গম্ভীর মূর্ত্তি। গিলে-করা ধুতির একটি আচল পকেটে। একটু বক্তৃতা করলেন,—মৃদু সুরে বললেন—'আজ আমাদের বড় আনন্দের কথা। ব্যক্তিগত স্বার্থের কিছুটা হানি করেও যদি সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে ঝোক দি' তা হলেই হবে আমাদের দেশের উন্নতি। গরীব বড়লোকের ভিতর অনেক প্রভেদ রয়েছে। কোন 'ইজম' দ্বারাই এর সমাধান হয় না। পরস্পর পরস্পরের মন বুঝে ঐশ্বর্য্য ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে। আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে আজকালকার সমাজ-জীবনের বিভিন্নতা বা তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার জন্য বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। অবশ্য দেখা যায় যে, কতক বায়োলজিক্যাল ফেনোমেনা সমাজকে নরম করে দিচ্ছে। প্রাণচাঞ্চল্য চাই—তাই উৎসাহী প্রাণীর মত ব্যবহার।'

বেশ বললেন। এর পর একটি গান হবে। কে এগিয়ে এল না! সুনীল রায়ের মেয়ে অনীতা। বেশ গলা। হাততালিতে মুখরিত হ'ল সভাকক্ষ। অনিল সেনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন—কিন্নর রায়। জয়ধ্বনির মধ্যে প্রবেশ করলেন সকলে এই আরোগ্য নিকেতনে। এখানে অনিচ্ছা থাকলেও আসতে হয়েছে সবাইকেই। এখানে প্রথম আলো জ্বালল অনিল জমিদারকে সঙ্গে নিয়ে। ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় অনীতাকে। বেশ অপরূপ লাগছিল,

ওকে—এলো চুলে। রূপ আর যৌবনের ডালা ভরে উঠেছে ওর সর্ব্বাঙ্গে। উদাসীন ও, চমক লাগার ছাপ ওর মুখে। একে জানি না মনোবিজ্ঞানে কি বলে, বা ডাক্তার তার বিধানে কিছু পাবে কিনা?

শেষের দিকটা চা পানীয় ইত্যাদি। ব্যস্তবাগীশের অভাব নেই। একটু চেঁচিয়ে উঠছিল। থামিয়ে দিয়ে অনিল বলে, 'ডাক্তার হিসেবেই বলছি অতটা নয়'। কক্ষ মুখরিত হ'ল হাসিতে। ডাক্তারের চোখে অনীতার হাসিটুকুও এড়ায় নি।

আরোগ্য-নিকেতন এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতির পথে। সবাই চলেছে শোভাযাত্রা করে—শান্তির আশ্রয়—বাঁচবার আকুল কামনা বুকে নিয়ে। আর আমি যেতাম বন্ধুস্থান বলে। বেশ পরিচয় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ধারণটাও দৃঢ়মূল হয়েছে এতদিনে। বায়োলজিরই মানুষ—ওর ভিতর আছে কাজের আকুল আগ্রহ আর শক্তি। প্রাণতত্ত্বকে জানার—রহস্য ভেদ করবার সাধনা। শূন্য স্থান পূরণ করতে এ রকম লোকই চাই।

হাসপাতালের একদিকে একটা কাঁচের ঘর করে নিয়েছে ডাঃ সেন। বিভিন্ন প্রাণীর মিলিত নিঃশ্বাসে আবদ্ধ হয়ে আসে সব। চলে মাইক্রোসকোপ নিয়ে গবেষণা। কিন্নর রায় হাসপাতালের এই জীবালয় পড়ে সবার চোখে এর বিচিত্র ঐশ্বর্য্যগুণে। আবদ্ধ থাকে এক ধ্যানমূর্ত্তি জোক সাপ ব্যাঙ আর রংবেরঙের জীবজন্তুর মাঝখানে। ওরা আহ্বান করে ওদের সবরকম তমঃ আর জৈবধর্ম্ম নিয়ে। প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে যায় আর একটি প্রাণী—অনিল সেন।

পাশেই অপারেশন থিয়েটার। থিয়েটারই বটে! ওখানে দেখা যায় ওকে ছুরিকাঁচির ওস্তাদ রূপে। মনে হ'ত সাপ, ব্যাঙ, কেঁচোর মতই মানুষকে নিয়ে খেলছে ও এক আসুরিক খেলা। এতে ওর কত আনন্দ! জানি না কি তফাং রেখেছে এ দুয়ের মাঝে—বায়োলজিষ্ট সেন। তবে মিহির ধরে নিয়েছিল একে নেহাতই জৈবধর্ম্মী বলে। রক্ত মাংস নিয়েই ব্যস্ত। ঐ প্রভাবটা যেন একটু কম থাকা উচিত ছিল।...

জ্যোৎস্না উছলে পড়ছে এক রাত্রিতে। সব স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। নানা বোয়েমের মাঝখানে—ওকেও মনে হ'ত একটা কাঁচের পাত্র। তবে ওর ভিতর আছে প্রাণের চাঞ্চল্য—পোটেন্‌শিয়াল এনার্জী। এখন এক টুকরা কাঁচ বৈকি?

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যায়তনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে অনীতা। জ্বরে ভুগছিল কিছুদিন ধরে। এখন একটু ভালোর দিকে। অবশ্য সবটাই অনিলের চেষ্টায়।

কিন্নর রায় তার রুটিনমাফিক পরিদর্শন করছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সঙ্গে। আস্তে সিগারেটটি নামিয়ে হাত ধুয়ে মুছতে মুছতে ঢুকল ডাঃ সেন। যেন এসব নিছকই হবে বলে। যেখানে অনিলবাবু সেখানে আবার পরিদর্শন কেন? সোনার পুতুলটির মত সব ধুয়ে মুছে রাখে নিজ হাতে এই ডাক্তার।

একটু শুষ্ক হেসে কিন্নর রায় বলেন, 'ডাক্তার, সত্যিই কৃতিত্ব আছে বটে আপনার।' অনিলের মুখ যেন একটু বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ম্যাজিষ্ট্রেটের আমন্ত্রণ আর অভিনন্দন তাকে টলাতে পারে কৈ? একটি কথা কি ভাবে যে বলেছিল—'ডাক্তার দেখবেন গরীব ধনীর মধ্যে যেন কোন প্রভেদ না আসে।' অনিল শুধু তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। একটু কটাক্ষ করেই বলেছিল—'অত বড়মানুষ বোধ হয় হতে পারি নি। সাধারণ মানুষের মতই পাবেন সবকিছু আমার কাছে।' অনেকে অনেক কথাই বলেছিল—সত্যই বড্ড ডেমোক্র্যাট এই কিন্নর রায়। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার জমিদার কিন্নর রায়—ডেমোক্র্যাসীর যথেষ্ট দাম দেয় যে। কেউ কেউ বলেছিল এ রকম স্যোশাল চেঞ্জ হলেই রিভোলিউশ্যন এড়ানো যাবে। কিন্তু ভুবনেশ্বর মিশ্র মন্তব্য করেছিল—'ও সব ভণ্ডামি, ডেমোক্র্যাসি না হাতী। গরীবশোষণের আর একটা পথ।'

মহাবিদ্যায়তনে প্রথম বর্ষে ভর্ত্তি হয়েছে অনীতা। ডাক্তারি পড়বে। এবার আরও অনেক অনুরোধ পেয়েছেন অধ্যক্ষ মশায়। তাই ডাঃ সেনকেই অনুরোধ করেছিলেন তিনি—এক ঘণ্টার জন্য। রাজী হয় অনিল। মেয়ের বায়োলজী পড়ার উৎসাহ দেখে সুনীল রায় একটু হেসেছিল মাত্র।

সব মহলেই যেন অনিল সেনের নামটা একটু ছড়িয়ে পড়েছে। আদর আপ্যায়ন বাদ দিয়ে বায়োলজির সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলো বোঝাতে বোঝাতে তন্ময় হয়ে যায় সে। কাঁচঘরের প্রত্যেকটি প্রাণী সম্বন্ধে বলে ডাক্তার। চায় ওদের রহস্য-সমাধান। দলের মধ্যে অনীতাও ওকেই চিনত বেশী করে। ওর দিকে লক্ষ্য করেই বোঝাতে লেগে যায় 'সেল'-এর ডেভেলপমেণ্ট—নানারকম ব্রিডের তত্ত্বগুলো। মাথা নীচু করে থাকত সে। বাইরের মানুষের সঙ্গে জন্ম, ডেভেলপমেণ্ট, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনায় অভ্যস্ত নয় সে। এক একবার বুঝতে পারত অনিল ওদের দুর্ব্বলতা। প্রথম প্রথম ত চোখ রাঙা করে ধমকও দিয়েছে। ইদানীং তবু একটু লজ্জা ভেঙেছে। সেদিন বিকেলে অনীতা এসেছিল একটু বেড়াতে। ডাক্তারের খেয়াল হয়, বলে—'এই যে অনীতা, তোমাকে আজ এনাটমিটা বুঝিয়ে দেব। নতুন একটা বইয়ে বেশ লিখেছে কিন্তু।' —একটানা বক্তৃতা। ঝিমুচ্ছে অনীতা।

—এই যে তুমি ত কিছুই শুনছ না অনীতা। চল এগিয়ে দিয়ে আসি তোমায়।

থতমত খেয়ে দাঁড়ায় অনীতা। সেন বলে, চল এগিয়ে দিয়ে আসি। চুপচাপ। রাস্তার নীরবতা ভঙ্গ করে একটি প্রশ্ন, 'কি রকম লাগছে আমার ক্লাস অনীতা?'

অন্ধকারে মুখ দেখতে পায় না অনিল। কাঁধের উপর একটা হাত রাখে অনিল, হেসে বলে—'ভয় হচ্ছে, দু'একজন বান্ধবীকেও সঙ্গে নিতে পার কিন্তু।'

চুপ করে যাচ্ছে অনীতা। স্বল্পপরিচিত পুরুষের স্পর্শ

অনভ্যস্ত মনে একটা বিরাট আলোড়ন তোলে। তখন নিজের চেহারাটা দেখতে পেলে বোধ হয় ঘাবড়ে যেত সে। কি করে যে হেঁটে এসেছে পথটা।···

না গাটা যেন কি রকম বিশ্রী ঘিন ঘিন করছে। গাটা ধুয়ে আসে সে। মাথার চুল থেকে শেষ বারিবিন্দুটি নিংড়ে নিয়ে নিজেকে দেখল আয়নার সামনে এক অদ্ভুত রূপে। অত মন দিয়ে কোন দিন দেখে নি নিজেকে। মা পই পই করে শরীরের একটু যত্ন নিতে বলে। মেয়েছেলে, পড়াশুনা ত উপরি। বিয়ের বাজারে ত রূপের কাঠামো চাই। কিন্তু আজ যেন সত্যি নতুন মনে হয় তাকে। অবিন্যস্ত বেশভূষা। কাপড়টা লুটিয়ে পড়ছে কোমরে। প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে আন্দোলিত দেহটা—কে যেন টান দিয়েছে হৃৎপিণ্ডটাকে সজোরে।

না এই রূপের দিকে লক্ষ্য করে নি সে। তারপর আস্তে আস্তে পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নেয় মুখে আর ঐ অশান্ত বুকে। সাবান দিয়ে স্নান করায় চুলগুলোও যেন ফেঁপে উঠেছে। এরা যেন ষড়যন্ত্র করছে তার চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধে। মনে পড়ল অনিলের কথা। বড় চমৎকার সুন্দর, না কি রকম তাল-গোল পাকিয়ে যায় তার। আর বেশী দেরি করে নি, বেরিয়ে পড়ে অনীতা।

---'মা তোমায় ডাকছে অনীতাদি।' টুনু খবর দেয়। 'যাই' বলে ঘরে ঢুকে অনীতা।

মহাবিদ্যায়তনের বায়োলজির গবেষণা-গৃহ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্নর রায় হাসপাতালের কাঁচঘর। জ্যান্ত, মৃত জীবজন্তুর বোঝা বাড়িয়ে আরও ঐশ্বর্য্যময় মনে হচ্ছে এই কাঁচঘর। সব আটকা পড়ে গেছে কাঁচের বোয়েমে আর অনিলের মনের মণিকোঠায়। সাপ, ব্যাঙ, হাত বাড়িয়ে জিহ্বা মেলে অভিনন্দন জানায় তাকে। মাই-ক্রোস্কোপ হাতে অনিল সাড়া দেয় ওদের আহ্বানে। কয়েকটা বিলিতী গাছের চারাও লাগিয়েছে ওর মধ্যে। অবশ্য সবই কৃত্রিম—টবে করে। চমৎকার মানিয়েছে এবার, পরিবেশের ভিতর খাপ খেয়ে গেছে জীবজন্তুগুলো।

অনীতা বলেছিল, 'এবার আপনার একটা ছবি রাখুন।'

—'ও বলতে চাও আমি একটা জন্তু জানোয়ার। আচ্ছা রাখব'খন।'

সবার মুখেই হাসি। রক্তিম হয়ে উঠেছিল সমস্ত মুখখানা। —'না, আমি কি তাই বলেছি।' কি রকম খাপছাড়াভাবে জবাব দেয় অনীতা। কি রকম লাগছে তার, আর দেখা গেল অনিলের একটা ফটো ওখানে।···

দূর গ্রাম থেকে একদিন পরে ফিরেছে ডাক্তার। কি রকম একটা আগোছালো ভাব। সবচেয়ে দোষী বুঝি বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডারটি। ওর উপর চিরকালের রাগ তার, জড়সড় হয়ে বসে থাকে। ওর ভিতর যেন প্রাণ নেই। সেবাই ধর্ম্ম যাদের তাদের কি এরকম হয়।

তারপর কাজকর্ম্মহীন এক শান্ত বিকেলে ওর কাছে বসেছি। কোন পরিবর্ত্তন নেই যেন। সেই একই নিয়মে চলেছে কিন্নর রায় আরোগ্য-নিকেতন। কোথায় একসূত্রে সব বাঁধা—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে ওর কাঁচঘর। কোণার সাপটা তার অফুরন্ত বিষ নিয়ে তেড়ে আসতে চায় তাকে। গাছগুলো টানতে চায় তাকে, এখানে ওর মায়াপুরী। মাছ, ব্যাঙ, জোক, কেঁচো কে নেই। দলে দলে বন্দীরা শোভাযাত্রা করে তেড়ে আসতে চায়। এরা তুলে ধরেছে আলেয়া-রাজ্য—বায়োলজিষ্টের খোরাক—ওদের মায়া-মমতা সুখ-দুঃখ বংশ-নির্দ্দেশ করাই যার ব্যবসা। আর মনটা—জানি না কি করে ও মনটাকে। ও দেখে রক্ত মাংস, পিণ্ডময় দেহটাকে।

অপর দিকে অপারেশন থিয়েটার। নির্ব্বাকভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছে জীব—জন্ম মৃত্যু। এখানে আছে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার অদ্ভুত ইতিহাস। প্রস্তুত হচ্ছে তিল তিল করে—চলছে তার যোগ্য প্রতীক্ষা। কবে মহাকাল উড়িয়ে নিয়ে যাবে তারই জন্য দিন গোনা। নিজেই প্রত্যক্ষ করতে চায় সব—এ এক ইতিহাস—দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। মানুষ আর ইতর প্রাণীর জন্মাবার ইতিহাস। কামনা, বাসনা, মায়াময় ভোগের লিপ্সা দেখেই হাসে অনিল। মায়াই তার রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নানা আকারে—শেষ হয়েছে তার অবিদ্যা নিয়ে। নূতনকিছুর সন্ধানে এগিয়ে যাচ্ছে তার বিজ্ঞানী মন—প্রাণী-বিজ্ঞানী অনিল দেখছে সব। সমস্ত বাস্তব ভিড় করছে এখানে—আসছে নিজ নিজ পরিচয় নিয়ে এই আরোগ্যশালায়। কোথায় ভ্রম তাদের, তারই আকুল আবেদন, তার খতিয়ান নিয়ে, কিন্তু কে বোঝে? মুখের কথা কে শোনে?

হৃদয় স্পন্দনহীন নির্ব্বাক হয়ে আসে, এই প্রাণীবিজ্ঞানী মরা সাপের মতই অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আবার না-পাওয়াকে পাওয়ার আনন্দে দেখা যায় রজঃগুণের প্রাবল্য। চোখ চালিয়ে দিয়ে সাপের মত গজরায় কতক্ষণ। মাথায় রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে। আরও চিন্তামগ্ন প্রাণীবিজ্ঞানী। ওর প্রতি সহানুভূতিতে ভরে ওঠে যেন মনটা। মিহির বলত,'প্রাণী-বিজ্ঞানী কেবল প্রাণীর দেহ বোঝে। এর ভিতর আছে প্রকৃতির কায়া আর মায়ার দ্বন্দ্ব। একটা বিশেষ ধরন।' দিনের বেলা একদল চড়ুই এসে ঠুকরে যেত ওর কাঁচঘর। চেহারা দেখে ভয়েরই হয় অভিব্যক্তি। না ত বিস্ময়। অনুভূতির শিহরণ আসত আমার প্রতিটি লোমকূপে। এগিয়ে যেতাম। কত বোঝাতে চাইত।

প্রাণীবিজ্ঞান-তত্ত্বের কিছুই বুঝি না। বুঝতে যাওয়াও নিরর্থক আমার পক্ষে। চিংড়ি খেতে ঘৃণা, মাংস খেতে মনে হবে—ছাগলের বাচ্চা ছাড়ছে পেটে। জন্মমৃত্যুর রহস্য খুজতে গিয়ে নিজেকে নিয়েই ভাবব। এ সব কে চায়?

মাস দুয়েক পরে সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে ফিরব ফিরব ভাবছি। মাঠের দিকে যখন এলাম, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একট আড্ডা

দিতে ক্ষতি কি? কিন্তু এ কি? লজ্জায় আমার কর্ণমূল গরম হয়ে আসে। হ্যাঁ অনীতাই ত বটে, একটি ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে অনীতা। আর ওখানে নয়। চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কি একটা কানাঘুষোর যেন হারানো খেই পেলুম। চুপচাপ সব। জানি না ডাক্তার কোন তথ্যের সন্ধানে রত। কোন সম্পদের সন্ধান সে পেয়েছে। উদ্দেশ্যই বা কি, কি তার পথ? তবু এ হয়ত গবেষণারই একটা ধারা। মনটাকে তৈরি করলাম ভাল দেখবার জন্য—ডাক্তার অনীতাকে ভালবাসে। সহানুভূতিতে ভরে ওঠে মন ডাক্তার সেনের জন্য। মিহির তো বিশ্বাসইকরতে চায় না। পরে মন্তব্য করে এ নেহাতই বায়োলজিক্যাল ফেনোমেনা একটা।

কয়েক মাস পরের কথা। ডাক্তারি পড়া হয় নি অনীতার। পাস করে ঘরেই বসেছিল। যোগ্য মেয়েকে আর পড়ানোর ব্যবস্থাটাও হয় নি এতদিনে। ডাক্তার সেন বায়োলজির একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছে। ফলাও করে ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। প্রশংসায় পঞ্চমুখ সব। অনীতা যে সন্তুষ্ট হয় নি তা নয়। কিন্তু তার ভিতরে ছিল একটা ক্ষোভ। তার পূর্ব্বেই পেয়েছে অনিলের বিবাহের তোড়জোড়ের আভাস। সামনেই বিয়ে। কিন্নর রায় এখন বড় দরদ দেখাচ্ছে। তার বাড়ীতেই হাজির হবে ডাক্তার নবোঢ়াকে নিয়ে। কি রকম আশঙ্কায় ভরে উঠল মন। এ কিরকম ব্যাপার। শেষে অনীতা নয়! জানি না সেদিন কিছু ভুল হয়েছিল কি না? হয়ত সমস্ত স্নায়বিক কেন্দ্রগুলো কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিকল হয়েছিল। কিংবা রজ্জুতে সর্পভ্রম আমার।

ওর বিয়েতে আমার যাওয়া হয় নি। অনীতাকেও দেখি নি দু'দিন। পরের দিন এসেছে অনিল বৌ নিয়ে। মিহির এসেছে খবর নিয়ে বৌ খুব সুন্দর, তবে একেবারেই আধুনিকা। এমনা আধুনিকার কথা শুনবার মত মনের অবস্থা ছিল কিনা জানি না, তবে মনে হয়েছিল অনীতার খবরটা একটু নিই। ও বাড়ীতে অনীত যায় নি, আর কেন যায় নি, তাও একটা অসম্ভাব্য কিছু নয়। বক্ষের কাঁপুনিকে বুঝি বশে আনতে পারে নি সে। ওর ভিতর রয়েছে আকাশের স্তব্ধতা আর তার নীলিমা। ওর ভিতর বুঝি কিছু বিদ্যুতেরও দরকার ছিল! ওদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কেন ঠিক বুঝি না। ওকে হয়ত বোঝাব। নিজের স্বার্থ নয় বন্ধুর স্বার্থে, তাও যেন কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। মিহির আমার সঙ্গে। জঙ্গল থেকে একটা পাখী লেজ নাড়িয়ে উড়ে গেল আকাশের দিকে। কতক্ষণ চেয়ে রইলাম। চললাম এগিয়ে। রজনীগন্ধা ফুটে আছে পথের ধারে। দূর থেকে দেখি এক ঝাক চড়ুই গেল উড়ে। শেষ সূর্য্যরশ্মিটুকু বুঝি কাচঘর থেকে ছুটি নিয়ে পালাল। কিন্নর রায় হাসপাতাল আজ মৌন। ওখানে প্রাণ নেই —নিষ্পন্দ—প্রাণের দেবতাহীন এই আরোগ্য-নিকেতন। কাচঘর —না ওখানেও আজ কেউ নেই। কি রকম ফাঁকা! শুধু পড়ে আছে গাছ আর জীবের রঙ্গভূমিটুকু।

অনীতাদের ঘরে তালা বন্ধ। পুরানো পথে পা বাড়ালাম। বেশ ফুলের গন্ধ আসছে ভেসে। এই বাগানটি অনীতার নিজস্ব সৃষ্টি। ও কেন যে লতা হয় নি তাই ভাবছি। তুলে নেই একটা শ্বেত-গোলাপ—কারুর উদ্দেশ্যে? আশ্চর্য্য কাণ্ড। গাছের পূজারী কি যেন জড়িয়ে ধরে আছে বাগানে। আর একটু এগিয়ে যাই শান্ত পদক্ষেপে, অনীতা জড়িয়ে ধরে আছে একটা ফটো— অনিলের। আকুল ভাবে ধরে রেখেছে তার বুকে। অনীতা অনিলকে ভালবাসে। কিন্তু কেন তবে অসহায়ভাবে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিল নিজেকে। বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ—ঠিক মাধবীলতারই মত, তাই এই পরিণতি। দু'একটা শিউলি ঝরে পড়ছে ওর গায়ে, মাথায় সেই মৃদু হাওয়ায়। অসংবৃত্ত কেশ বাস, কোন এক দেব-মূর্ত্তিকে যেন নিবেদন করছে প্রাণের অর্ঘ্য। তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে ও যেন এক ঘুমের দেশের সুন্দরী রাজকন্যা। ভেঙে পড়া কেশের স্তবক ওর সারা পিঠে। মালাজড়ানো মূর্ত্তিকে যেন জাগিয়ে রেখেছে গভীর চুম্বনে—স্পন্দনহীন নির্ব্বাক লতা, নিজের করে নেওয়ার তীব্র আসক্তি ওর। নিঝুম বাগানের হৃৎস্পন্দন এখনও থেমে যায় নি।

আর নয়। পেছনে পা বাড়ালাম। কিন্তু সেই চিত্রার্পিত মূর্ত্তি যেন চোখেরই সামনে। হৈছল্লোড় মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। আনন্দকে আপন জিনিস ভেবে নিতে পারি না, ট্রাজেডি ভালবাসি বলে নয়,—তার উপকরণের অভাব। আর সেইখানে মনে হচ্ছে অনিলকে—একটা জোকের মত, রক্ত শুষে নিচ্ছে তিলে তিলে।...

কি রকম যেন একটু গা বাঁচিয়ে চলার ইচ্ছাই হয়েছিল। হঠাৎ অনিলের সঙ্গে দেখা। ওর একটা কথা—মাথার একটা কোষকে জোর করে ভেঙে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু স্থৈর্য্য এনে দিল মিহিরের একটা শান্ত খোঁচা।

কয়েকটা আবিষ্ট মুহূর্ত্ত। অসংলগ্ন মুহূর্ত্তে অসতর্ক মনে ঐ খোঁচাটাই কাজ করেছে।

অনিলের প্রশ্ন—'অনীতারই দেখা নেই শুধু!' মিহির উত্তর করে—'জানই তো ডাক্তার ও হচ্ছে লজ্জাবতী লতা! এগোতে পারে নি। রাত্রির অন্ধকার ছাড়া ওর স্থান কোথায়? তাই মুখ লুকিয়ে আছে। দেখা মিললে অন্তর ভরে দেখে নেবে।'

একটু জোর করেই হেসে নেয় মিহির।

'ওর আর একটু বেশী প্রাণ থাকা উচিত ছিল মিহিরবাবু!' জবাব দেয় ডাক্তার সেন।

আমি উপরে তাকিয়ে আলোচনা বাদ দেবার একটা অছিলা খুঁজি। আকাশ থেকে একটা তারকা খসে যায় ওধারে। জানি এটা একটা অমঙ্গল নয় প্রাণীবিজ্ঞানী অনিল সেনের কাছে। ওর যেন কিছু বাদ পড়ে গেছে। প্রাণকে খুঁজতে গিয়ে মনকে চিনতে পারে নি। তবু মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেল আমার।

—'বায়োলজির উর্দ্ধে মন পৌঁছে নি কিন্তু আপনার অনিলবাবু!

—'সত্যি মিঃ রায়, প্রাণকে জানতে গিয়ে মনের পাতাটা একেবারেই বাদ গেছে। না হলে এমন হয়।'

জানি না ওর মন অতদূর পৌঁছাল কিনা।

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

তিন

২৩শে ডিসেম্বর '৫৩। সকালেই কাষ্টমস-এর দরজায় ধরনা দিলাম। বাড়ীতে একটা খেলনার বাক্স পাঠাব।

চারিদিকে ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াসা। দূরে রেলওয়ে সাইডিং-এ কয়েকটা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি ছোট বড় অনেক প্যাকেট ছড়ানো। রাস্তায় লোক নেই, ভিতরে আপিসে দাঁড়াবার জায়গা নেই। বহু লোক, স্তুপাকার পার্শেল, দড়ি, কাগজ—চেঁচামেচি।



বরফে ঢাকা বৃক্ষ, মিলান

টের পেলাম, দু'দিন পর ক্রিসমাস। কোন রকমে এক টুকরো রসিদ ছিনিয়ে এনে পথে পা দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পোষ্ট আপিসে জটিলতর ব্যাপার। কেরাণী-মেয়েদের মুখে আর দু'হাতে মেশিন চলেছে যেন। পেছনে বিরাট পার্শেল-স্তূপ। লম্বা অপেক্ষমান লাইনে চীনা দেওয়ালের দৈর্ঘ্য, বোধ হয় প্রস্থও। টেবিলময় ছেড়া ফরম, ডাকটিকিট, কালি-কলম, আর ক্লান্ত দু'খানা হাত।

বিদেশের নামে সুযোগ মিলল বে-লাইনে। পেছনে চাইলাম —সামনেও। 'ও দাদা!' বলে আপত্তি জানাল না কেউ। গোটা তিন-চার শূন্য ফরমে কাগাবগা আঁকলাম। কিছু 'হুগো' দেখে, কিছু মন থেকে, কিছু কেরাণীর চোখের ইশারায়।

আমি ঘেমে উঠলাম।

একটা দীর্ঘশ্বাসে শ্রান্তি ঝরাল কেরাণী। নূতন কাজের কৃত্রিম জটিলতায় নিজেকে অবসর দিল ক্ষণকাল। অবসর পেল হাত, মুখ, হয়ত মনও।

কাজ সেরে চলে এলাম। ট্রামটা চলে গেল তীরবেগে। ওভারকোটের কোণ ছুঁয়ে, ঘন্টি নেড়ে।

সন্ধ্যায় ঘরে বসেছিলাম পড়াশুনা করব ভেবে, পারলাম না। অবুঝ মন আর অশান্ত পা দুটো আমাকে টেনে নিয়ে গেল কোর্সো বুয়েনস আইরেসে, বনেদী দোকানপাটের রোশনাই-ধাধায়। ক্রিসমাস-বাজারের জনতা-সমুদ্রে।

পরশু ক্রিসমাস, বৎসরের সেরা উৎসব। সেরা উপলক্ষ, মেলা ও মেশার, দেওয়া ও নেওয়ার। পথে পথে আলোড়িত জন-সমুদ্রের তরঙ্গ দোলায়—আনন্দের ফেনা।

আমার পাশেই এক শীর্ণ বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে দেখছিল—এক জোড়া দস্তানা।

আমাকেই পাশে পেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—দাম কত?

বললাম, দশ টাকা।

বৃদ্ধের দু'চোখে বিস্ময় দেখলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দোকানের সিঁড়িতে পা দিল। আজ কিনবেই, এমনি করে কত শীত এসেছে, চলে গেছে। এক জোড়া দস্তানা আজও হাত দুটোকে গরম করে নি।

বৃদ্ধের পোশাক জীর্ণ, ততোধিক জীর্ণ জুতো। মুখ শুকনো, নীল ঠোঁট, হয়ত গরীব উপোসী। ওকে 'মেরি ক্রিসমাস' পাঠাবে না কেউ। কেউ ডাকবে না ওকে উৎসবের সমারোহ দেখতে। হাত ধরে কেউ বসাবে না টার্কি ও শাম্পেনের ক্রিসমাস-ডিনার-টেবিলে। কেউ না। কেউ না। কিন্তু আমি ভুল করেছি! একজন আছে। ঐ ত বৃদ্ধের হাত ধরে নামাচ্ছে। মুখের ভাজে, চুলের সাদায় বার্দ্ধক্যের চিহ্ন।

আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। মনটা হাল্কা হ'ল অস্বস্তির বোঝা নামিয়ে।

২৫শে ডিসেম্বর '৫৩। আজ আমরা মেতেছি রান্নার খেয়ালে। আমরা হলাম দশ জন। জর্ডানের মোহাম্মদ, সিলোনের ফারনাণ্ডো, অষ্ট্রেলিয়া থেকে টমাস, বলিভিয়া থেকে গুসমান, ফিলিপিনের ওরেলিও, ইটালীর রোদলফো, আর ভারতীয় আমরা···ইন্দ্র, সহদেব, যশোবন্ত ও আমি।

ফারনাণ্ডোর ঘরেই আমরা জটলা পাকিয়ে আসছি বরাবর। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সকালের ঘণ্টাতিনেক প্রস্তুতিতেই কেটে গেল। আমার তত্ত্বাবধানে যশোবন্তের ক্ষুদে হীটারে রান্না চাপল দশটায়।

রোদলফো হীটারের পাশে বসে রইল ভারতীয় রান্নার রীতি-অনুধাবনের উদ্দেশ্যে। ইন্দ্র বাজার করেছিল, সহদেব রান্না চাখল। টমাস, ওরেস্তিও ও গুসমান ঘরোয়া বৈঠক পেতে 'ছাপে'র কথায় সময় কাটাল। মোহাম্মদ ও ফারনাণ্ডো করবার মত কিছু না পেয়ে কাঁচা টোম্যাটোগুলো খেল, একটা কাপ ও দুটো প্লেট ভাঙল, দুটোতে মিলে তাণ্ডব ফক্সট্রট নেচে নীচে থেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আমাদের ঘরের দরজায় এনে হাজির করল। ওই অগ্নি-চক্ষুর সামনে আমরা দশ জন সার দিয়ে দাঁড়ালাম। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ব্যাক্-গ্রাউণ্ডের রান্নার সরঞ্জামগুলোকে আড়াল করে দাঁড়াতে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে কেঠো হাসি হাসলাম, যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইলাম।

এত কিছু করতে হ'ল হোষ্টেলের ঘরে রান্না নিষেধ বলেই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বুঝলেন সবই। ভাব দেখালেন, পায়েসের কামিনী আতপের গন্ধও উনি পাচ্ছেন না। সুযোগ বুঝে আমরা ওঁকে 'মেরি ক্রিসমাস' জানিয়ে দিলাম।

উনি পেছন ফিরে পা বাড়াতেই ফারনাণ্ডো ওঁর মাথায় বক দেখাল।

ছিল রেডিমেড কাজু, আচার ও রসগোল্লা। তৈরি হ'ল মেড-টু-অর্ডার ঘি-ভাত, মুরগীর ঝোল, টোম্যাটোর চাটনী, আলু-ছোলে, পায়েস ও বড়ি-ভাজা। বলাবাহুল্য আচার, রসগোল্লা, কামিনী আতপ, বড়ি, ইত্যাদি ভারত থেকেই পাঠানো।

রাত আটটায় হ'ল গ্র্যাণ্ড ফিষ্ট। ইউ-পি-র আলু-ছোলে লেবুতে লঙ্কা-গুঁড়োয় বেশ জমেছিল। আর বাংলার পায়েস সুগন্ধ আতপ, কিসমিস ও পাটালির আকর্ষণে সকলকে বার বার চেয়ে নিতে বাধ্য করল।

আলু-ছোলে ও পায়েসের ইণ্টারভ্যালে করমচার আচারটা 'গোরে গোরে'র কাজ করল। আর মুখে মুখে বড়ি-ভাজার নানারকম শব্দ 'সিগারেট আইসক্রীমে'র হাঁকডাক মনে করিয়ে দিল। পরিশেষে আলো নিভলে দেখা গেল, ঘরে ফিরে যাবারও ক্ষমতা নেই কারও। ফারনাণ্ডোর একক খাটে পেটে পায়ে মাথা রেখে ওরা গড়াল অনেকক্ষণ।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এই প্রথম একদিন স্বাদ কাকে বলে রসনায় অনুভব করলাম।

রাত এগারটায় ফলে ও কেকে হোল সাপার। তারপর একটু রেডিও মিউজিক।

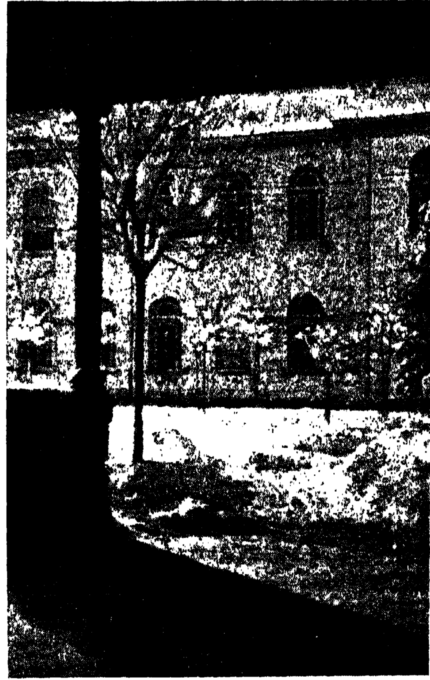
সহদেব বলল—এবার কি হবে? ঘুম-ঘুম খেলা?

ইন্দ্রের উৎসাহের অবধি নেই। বলল, চল, হাঁটি। যেদিকে দু' চোখ যায়।

আমরা বেরুলাম। পায়ে পায়ে, কথায় কথায় গেলাম অনেক দূর। ট্রেনের পথ ডিঙিয়ে শহরের বাইরে। মাঝে মাঝে বস্তি। আলো নেই। জলে কাদায় নোংরা রাস্তা। জনশূন্য, নিস্তব্ধ।

আমিই সবার আগে থেমে বললাম, লাভ কি এমন হেঁটে? তার চেয়ে চল পিয়াত্সা দুয়োমোয় যাই, যেখানে আজ এতক্ষণ ফূর্তির জোয়ার এসেছে। ফিরে যাওয়া যাক।

ইন্দ্র একটু হাসল। বলল, ইতনা জলদি!



মিলানে তুষার পাত

বললাম, তোমার প্রাণ যদি চায় তো আমার আপত্তি নেই। চল।

আবার হাঁটতে সুরু করলাম। ঘড়ি দেখলাম, আড়াইটে বাজে। খানিক পরে তিন জনের মত হ'ল ফিরে যাওয়ায়। শেষে একে একে সকলেই সায় দিল ফিরতি পথে পা বাড়াতে।

আমি বললাম, এখনি ফিরবে কি? এত সুন্দর পরিবেশ! এমন হাঁটলে হয়ত ভেনিসেই পৌঁছে যেতে পারি।

অগত্যা আবার সবাই হাঁটতে সুরু করল। আমি অলক্ষ্যে হাসলাম। শেষে এক সময় আমিও মত দিলাম। হোষ্টেলে ফিরে এলাম সবাই। ইন্দ্র ভোরের প্রথম বাসটার খোঁজ নিতেও ছাড়ে নি। কিন্তু তখনও সময় হয় নি।

ঘরে ফিরে অবশ পা দুটোকে বিশ্রাম দিয়ে ইন্দ্র বলল, এখন কি প্রোগ্রাম?

ফারনাণ্ডো বগল, ধূমায়িত সিলোন-চা। শুধু চুমুক। কোন কথা নয়।

তারপর হ'ল সাত জনের সাতটা গল্প। ভূতুড়ে নয়, বানানো নয়, মনের কথা।



দণ্ডায়মান (বাঁদিকে) মিলানে প্রবাসী ভারতীয়গণ—সহদেব, ওরেসিও, টমাস, গুসম্যান, ইন্দ্র
উপবিষ্ট : রোদেন্সেন, যশোবন্ত, লেখক, মোহাম্মদ, ফারনাণ্ডো

ভোর পাঁচটায় বিছানায় এসে চোখ বুজলাম।

পরদিন দুপুরে আবার জুটেছি সবাই। কালকের বেঁচে যাওয়া খানিকটা মুরগীর লোভে লোভে। ওরই সঙ্গে রুটি ও মাখনে লাঞ্চ হ'ল শেষ।

সন্ধ্যায় স্নান সেরে এলাম।

'সঞ্চয়িতা' বুকে নিয়ে বিছানায় শুয়েছিল সহদেব। পড়ছিল—

"তুমি জান মোর মনের বাসনা
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা—দিবস নিশি।"

সহদেব শান্তিনিকেতনে ছিল চার বৎসর। ছবি আঁকতে শিখেছে। আরও শিখেছে আনুষঙ্গিক অনিবার্য্যগুলো। বাংলা ভাষা তার মধ্যে একটি। সহদেবকে ধন্যবাদ। ও বিহারী, এনেছে সঞ্চয়িতা, এনেছে গীতাঞ্জলি। আর বাঙালী আমি বয়ে এনেছি ভারী মোটা মোটা বই, যন্ত্রবিজ্ঞান। নানা আঁকজোকে, যন্ত্রপাতির নক্সা-ছবিতে বোঝাই।

২৯শে ডিসেম্বর '৫৩। ওরা এসেছে পরশু। ঘরে বসে শুনেছি।

গোয়া, দিল্লী, দেরাদুনের চার জন ভারতীয়। এসেছে—ষ্টুটগার্ট থেকে ছুটিতে বেড়াতে মোটরে।

ওদের হাতে হাত মেলাবার আমার সময় ছিল না। একটা মোটা বইয়ের অনুবাদে ব্যস্ত ছিলাম ক'দিন। আজও তারই জের চলেছে। তাই ওদের পরিচয়টুকু নেওয়া হয় নি। আমারটাও দেওয়া হয় নি।

—আজ শুনলাম, ওরা চলে যাবে। এই বিকেলে ভেনিসে। ভাবলাম, যাবার বেলায় মুখগুলো চিনে নেওয়া ভাল। হয়ত কখনও কোনদিন আবার দেখা হবে। নীচে রাস্তায় নেমে এলাম। ওদের মোটর গোছানো ব্যস্ততার মাঝে। ওদের দেখলাম। পকেটে অজস্র অর্থ, মুখে অশেষ অশ্লীল ভাষা। গাড়ীতে অনেক মদের বোতল, তার চেয়েও বেশী জার্ম্মান ক্যামেরা। বোধ হয় কেনাবেচার ব্যবসায়ে নেমেছে।

হঠাৎ একজন কন্টাফ্লেক্স বাগিয়ে ধরল। আমাদের দিকেই। একটা তসবীর খিঁচবে। একই দেশের মানুষ আমরা। ওদের প্রাণে উল্লাস এসেছে। ইন্দ্র, যশোবন্ত ও সহদেব নানান পোজে হেলে দুলে দাঁড়াল। আমি রোমাঞ্চিত হই নি ওদের মত। ফটোগ্রাফারের জড়তায় মনে হ'ল হাত কাঁচা। ক্যামেরাটাও আনকোরা নতুন।

আমাদের অতিথিরা একটা সোরগোল তুলল। হঠাৎ একজন ছুটে গেল। ধরে নিয়ে এল দুটো মেয়েকে। পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হয়ত কোন কাজে। হয়ত এমনিই। মেয়ে দুটোও যেন মেতে গেল। ওরা বিভিন্ন ভঙ্গীতে, কাঁধে হাত রেখে, কোমর জড়িয়ে, মাডগার্ডে বসিয়ে স্পুল শেষ করল।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছিলাম। এমনটি কখনও ভাবতে পারিনি। মেয়েগুলোও সমান বেহায়া। সম্মান বোধ বলে কিছু ওদের অভিধানে নেই বোধ হয়। ওরাও হাসছিল উদ্দাম। যেন কত দিনের পুরানো পরিচয়, যেন কত বন্ধুত্ব।

আমি হতবাক হলাম। ভারতীয়দের 'অস্কার' পাবার মত এই ছোট্ট একাঙ্কিকায়।

আমি লজ্জিত হলাম আমারই স্বদেশবাসীদের আচরণ দেখে, ভাবছিলাম, পশ্চিমে এরাই ভারতের মর্য্যাদাহানি করছে।

কিন্তু আমি ভুলি না এক মুহূর্ত্তের জন্যও—আমি এসেছি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের দেশ থেকে, আমি পেয়েছি সে সভ্যতা, শুনেছি বেদ ও গীতার বাণী। ভুলি না কখনও অশোক, আকবর ও বুদ্ধকে। ভুলি না আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্যকে, আমাদের সংস্কৃতির গৌরবকে।

৪ঠা জানুয়ারী '৫৪। কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ'ল, অনেক উঁচু থেকে যেন কিসের ওপর জল পড়ছে টপ টপ করে। খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলাম। বুঝলাম, জানলার বাইরে। রাতে-জলা টেবল-ক্লকটায় দেখলাম পাঁচটা। অবাক হলাম। আরও অবাক হলাম জানলার খড়খড়িটা তুলে। সমস্ত উঠানটা একেবারে সাদা। কেমন যেন শুভ্র জ্যোৎস্নার মত। আকাশে তখনও আলো ফোটেনি। আরও ভাল করে তাকালাম একটা কালো ব্যাকগ্রাউণ্ডে। বরফ পড়ছে।

পড়েছে আজ সারাদিন। কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত। কখনও

উড়ে উড়ে তুলোর মত। সাদা সুন্দর বরফ। ভারতবর্ষে বরফ দেখার সুযোগ কৈ? শীতকালে উঁচু পাহাড়ে যেতে পারি নি। আজ বহুবার বাইরে গেছি, এসেছি প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে। গুনেছি রাস্তার লোক। সামান্য কমেছে। বেড়েছে ছোট ছেলে-মেয়েদের ছুটোছুটি—বরফের ওপর। কেউ মেতেছে স্নো বলে, কেউ বরফ দিয়ে গড়ছে মূর্তি। ওদের ফুর্তির সীমা নাই।

দুপুরে পলিটেকনিকে গেছি বেড়াতে। আমাদের ভাগ্য ভাল, ক্ষণিকের জন্য রোদ উঠল একবার—বিকেলের মুখে। বরফের ওপর ঐ ঝিকিমিকি রোদ আশ মিটিয়ে দেখছি সহদেব ত কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে গেল ওর পরের ক্যানভাসটার জন্য একটা স্কেচ করে নিতে।

বিকেলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা।

সাদা বরফঢাকা রাস্তার বুকে দাগ টেনেছে চলতি ট্রামগুলো। ছোট বড় গাছ, সবাই আপন আপন সৌন্দর্য প্রকাশে ব্যস্ত। আমাদের উল্লসিত দৃষ্টি বার বার বন্দী হ'ল গাছের ডালে, পাতায়। চোখ ফেরানো যায় না। পাতা ছিল শুধু পাইন-আকৃতির ঝাউ গাছে। অন্যগুলোয় পাতাশূন্য ডাল। আর তার উপর বরফের প্রলেপ।



তুষারপাতের আর একটি দৃশ্য

ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে একটা গাড়ী গেল। অবসন্ন ঘোড়াটানা গাড়ী। ঘোড়াটা চলেছে পা টেনে টেনে। হয়ত সাপ্তাহিক হাটের ভিড়ে। গাড়ীভর্তি সবুজ শাকসব্জির বেসাত। সেগুলো দুর্মূল্য হয়ে উঠবে আগামী বরফ-ঝরা দিনগুলোয়—আবার আসবে ওরা শহরের পাঁচঢালা পথে যখন বরফ গলবে। রাত-জাগা চাকার পাখিতে আবার অবসাদের আর্তনাদ বাজবে। আর নির্লিপ্ততায় 'ফিল্মী' সুরে শিস দেবে গাড়ীর চালক।

দূরে মিলিয়ে যাওয়া গাড়ীটাকে অনুসরণ করে চোখ দুটো হঠাৎ থেমে গেল। দ্রুত পায়ে একটি মেয়ে আসছিল বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে। হয়ত ভাবছিল, রবিবার বাড়ী গেলেই ওর সোমবার সুরু হয় দেরিতে, শেষ হয় আরও দেরিতে। তার চেয়ে কোন মার্কিন বন্ধু জুটিয়ে উইক-এণ্ড করাই ভাল। আজ আবার কারখানার হাজিরা-প্রহরী সুযোগ নিয়েছে। এই শনিবারের নাচে যাওয়ার স্বীকৃতি আদায় করেছে ও। আজকের বরফপড়া ঠাণ্ডায় বারের কাচ-দরজায় চোখ লাগিয়ে আর একজন যে অপেক্ষা করছে, তা হলে তার জন্যে এই সপ্তাহে রইল কি?

না, ভুল আমারই হয়েছে। মেয়েটি কাছে এলে বুঝলাম। ভুরুতে কুঞ্চন নেই। কপালে চিন্তা-রেখা নিশ্চিহ্ন। কুমীর-চামড়ার ব্যাগে, হিল-তোলা জুতোয় আর বড় বড় মাকড়ীতে শোভিত হয়ে কারখানা থেকে আসছে না নিশ্চয়ই, আসছে বাড়ী থেকেই। বুঝলাম না, এত দ্রুততা কেন।

ষ্টেশনগামী বাসের পাদানিতে এক রাশ লোকের মাঝে হারিয়ে গেল মেয়েটি।

আজ সারাটা দিন যেন ডানা মেলে উড়ে গেল।

রাত্রে আমি বললাম, চল না, কুঁড়েঘরের নেবানো আলোয় বরফকে কেমন দেখায় দেখে আসি। শহরের বাইরে।

মোহাম্মদ রাজী হ'ল। হ'ল না আর কেউ। ইন্দ্র, সহদেব ওরা যৌবনেই প্রৌঢ় হয়েছে। ওরা পাই-পয়সার হিসেব জানে অনাহূত উপদেশ দেয় অনেক। রোমান্সকে ওরা মুছে দিয়েছে জীবনের পাতা থেকে। নকল রোমান্সকে ওরা আঁকড়ে পরে আছে 'অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।'

১০ই জানুয়ারী '৫৪। দরজায় আঙুলের টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই নূতন কেউ। পরিচিত যারা, তারা আহ্বানের অপেক্ষা করে না।

বলে উঠলাম—আভান্তি (ভেতরে আসুন)!

ভাবলাম, রাত ন'টায় আবার কে এল জ্বালাতে! বেশ আয়েস করছিলাম বিছানায় শুয়ে থাকার আমেজে। এয়ার-মেলে-পাঠানো রবিবারের যুগান্তরখানা হাতে করে। 'এ-সপ্তাহ কেমন যাবে' পড়ছিলাম। আর মেলাচ্ছিলাম গত সপ্তাহটা কেমন গেছে। ঠিক তখনই দরজায় অতিথি এল।

—ও, মিঃ চৌধুরী!

—I am sorry· Are you busy with your cooking? (আমি দুঃখিত, আপনি কি রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত আছেন?)

—না, না। মোটেই না. দিনে দু'বার করে রুচির গলা টিপে

ঐ কদর্য্য মাংস খাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু মেছো বাঙালীর পেটে সয় না। তাই রাত্রে অন্ততঃ পছন্দমত কিছু করে নি আর কি!

মিঃ চৌধুরী বললেন, তখন বার'এ ক্ষণিক দেখা হ'ল বটে, কিন্তু ভাল করে আলাপ হ'ল না। তাই এলাম আপনাকে একটু বিরক্ত করতে।

—এ ত আমার সৌভাগ্য! বসুন, বসুন, আপনি ত পাভিয়াতে জেনেটিক্‌স পড়ছেন, না?

—হ্যাঁ।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, মাপ করবেন, কোন স্কলারশিপ পেয়েছেন কি?

—প্রথম দু'বছর আসাম গবর্ণমেণ্ট কিছু দিয়েছিল। কিন্তু এই তৃতীয় ও শেষ বৎসরটায় নিজেরই অনেক খসল।

—আপনি কোন্ ইউনিভার্সিটি থেকে আসছেন?

—ক্যালকাটা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তা হলে বলুন, আপনি কলকাতার বাসিন্দা!

—নিশ্চয়ই, নইলে বাংলাটা আর শিখব কোথায়!

—শুধু শিখেছেন নয়, পুরোপুরি হজম করেছেন।

মিঃ চৌধুরী সিগারেট ধরালেন। আমি সিগারেট খাই না শুনে বললেন, আপনি মশাই ফ্ল্যাট করে দিলেন আমায়। বলেন কি? সিগারেটও খান না?

—এত লোক অফার করে, আর আমি খাই না শুনে সবাই এমন করুণ মুখভঙ্গী করে যে শুধু ঐ "আনহ্যাপি সীনটা"কে এড়াবার জন্যেই এখন থেকে হয়তো খেতে সুরু করতে হবে। আপনিও ত প্রায় আঁতকে উঠেছেন!

—প্রায় কি, আঁতকেই তো উঠেছি।

—কোলকাতার কোন্ মহলে আপনার আস্তানা ছিল?

—আস্তানা? বুঝলাম না।

—মানে থাকতেন কোথায়?

—ও! বালিগঞ্জে।

—কোন্ রাস্তায়?

—লেক রোডে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, বলেন কি! কত নম্বর?

মিঃ চৌধুরী বেশ গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন—আটত্রিশ। Thirty-eight.

আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম এতক্ষণ। এইবার গালে হাত দিয়ে খাটে বসে পড়লাম।

মিঃ চৌধুরী মৌজ করে ফুঁকছেন।

আমি বললাম, আরে মশাই, আমিও ত আটত্রিশ নম্বর থেকেই আসছি। একতলা থেকে।

চৌধুরী মশাই চোখের মণি নাচিয়ে বললেন, কুণ্ডু, নয়? এইবার মনে পড়েছে।

মনে পড়বে কি? আপনি ত আমাকে চিনতেনই না। আমিও আপনাকে কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আপনি তাহলে মিঃ নবিসের···

—মিসেস নবিসের ভাই।

—এতক্ষণে বোধগম্য হ'ল।

আমি ততক্ষণে হাসতে সুরু করেছি অল্প অল্প। মিঃ চৌধুরীও হাসতে সুরু করেছেন। ক্রমে পর্দা চড়তে লাগল। শেষে দুজনে খাটে গড়াগড়ি দিয়ে, জড়াজড়ি করে, মুখ চোখ লাল করে, দম আটকে হাসতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, এমন ভাবে হেসেছিলাম জাহাজে অক্ষয়বাবুর লক্ষ্ণৌ-রসিকতায়। মাঝখানের প্রায় তিনটে মাস সহজভাবে হাসতে যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

চৌধুরী বললেন, কি আশ্চর্য্য! একই বাড়ীর লোক আমরা, ছ'হাজার মাইল দূরে এসে পরস্পরকে চিনলাম। পৃথিবীটা সত্যিই খুব ছোট।

আমি বললাম—উঁহু। পৃথিবীটা যথেষ্টই বিরাট। আসল ব্যাপার হ'ল, কলকাতায় ওপর-নীচের বাসিন্দারা ত কৌরব আর পাণ্ডব। আদা-কাঁচকলার সম্বন্ধ। জল নিয়ে, তরকারির চোঁচা নিয়ে ভোরবেলাই ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। দুপুরে মেথর নিয়ে, ড্রেন নিয়ে ঝগড়ার কার্ভ পীকে পৌঁছয়। পরস্পরকে চেনবার সুযোগ কোথায়? বরং মুখদেখাদেখি বন্ধ। তাছাড়া অন্ধকারে ঢিল মেরে মাথা ফাটাবার জন্যেও জুৎসই এঙ্গল খুঁজে বেড়াতে হয়।

যা বলেছেন! Cent per cent true! (সবটাই সত্য)।



দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

শ্রীবেল্লিকোৎ রঘুনাথ শেনোয়
অনুবাদক—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ঘাটতি ব্যয় নির্ব্বাহের সংজ্ঞা

পাশ্চাত্ত্য দেশে 'ঘাটতি পূরণ' যে অর্থে ব্যবহৃত হয় ভারতে সে অর্থে ব্যবহার করা হয় না। আমাদের দেশে যখন সরকারের মোট ব্যয়—মোট রাজস্বের আয় এবং মূলধন খাতে সরকারের ঋণপত্র বিক্রয় হইতে অর্থ সংগ্রহের অঙ্ক ছাড়াইয়া যায় তখনই আমরা বাজেটে ঘাটতি হইয়াছে বলিয়া জানি। সমগ্র আয়ের তুলনায় ব্যয়কে ধরিয়া লইয়া আমরা ঘাটতি নির্দ্ধারণ করি। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যখন মূলধন খাতের ব্যয় এবং সরকারের সাধারণ ব্যয় উভয়ে মিলিয়া রাজস্বের আয় অপেক্ষা অধিক হয় তখনই তাহাকে বলা হয় 'ঘাটতি'। সরকারী ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বাজারে ঋণপত্র ছাড়িয়া কর্জ্জ লইলে তাহাকে ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ বা Deficit Financing বলা হয় না। আমাদের দেশে সমগ্র বাজেটের (মূলধন ও রাজস্ব-খাতের) আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ধার লইলেই হয় ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি বা সম্প্রসারণ দ্বারাই ঘাটতি মিটাইবার এই ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

'ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ' এই কথাটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন আর্থিক ফলাফল বুঝাইবার জন্য এক স্থানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র উহার অর্থ না বদলাইয়া বা সংশোধন না করিয়া ব্যবহার করা চলে না। যখন পাশ্চাত্য লেখকগণ বলেন যে, বেসরকারী মূলধন কম নিয়োগ হইলে তজ্জনিত মন্দা সরকারী ব্যয় বৃদ্ধিদ্বারা সংশোধিত বা দূর হয়—তখন উহা দ্বারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থাই বুঝায়, ভারতের রাজস্বের ঘাটতি মিটাইবার জন্য ব্যয় বুঝায় না। ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ কথাটার অর্থের এইরূপ বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন না থাকার দরুনই এ দেশের অনেকে ভারতের আর্থিক উন্নয়নের জন্য মুদ্রা সম্প্রসারণ দ্বারা ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ খুবই আবশ্যক এরূপ ওকালতি করিয়া থাকেন। যে সঞ্চয়ের মূলধন অকেজো ভাবে পড়িয়া ছিল তাহা হইতে কর্জ্জ লইয়া বাজেটের ঘাটতি পূরণ দ্বারা আর্থিক উন্নয়ন করা চলে—সরাসরি এই যুক্তিতে যেখানে আসলে সঞ্চয়ের ঘাটতি, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রা-সম্প্রসারণ দ্বারা ঘাটতি পূরণ করার সমর্থন করা চলে না।

শিল্পে অগ্রসর ও অনগ্রসর দেশের মধ্যে তুলনা

শিল্পে অগ্রসর দেশসমূহের বেকার-সমস্যা এবং শিল্পে অনগ্রসর দেশের অল্পসংখ্যক লোকের কর্ম্মে নিয়োগের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। উভয় দেশের সমস্যাকে সমান ধরিয়া লওয়ার দরুন অস্পষ্ট চিন্তার সৃষ্টি ও অনুন্নত দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে ভ্রান্ত পন্থার অনুসরণ করা হইয়াছে। উভয় সমস্যাই মূলতঃ বিভিন্ন। শিল্পোন্নত দেশে বেকার-সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার উপর নির্ভরশীল অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্রেও বেকার-সমস্যা দেখা দিবে। সঞ্চয়ী মূলধন খাটানো যাইবে না, মূলধন সম্পর্কীয় উৎপাদনের অঙ্গগুলি কম খাটাইতে হইবে বা উৎপাদন একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় হইবে না এবং ক্রেতার অভাবে মাল ফাঁপিয়া উঠিবে। বাজার হইতে কর্জ্জ লইলে বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রা-সম্প্রসারণ-সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ পরিস্থিতিতে সরকারী রাস্তাঘাট নির্ম্মাণকার্য্য কিংবা অন্যান্য ভাবে মূলধনের প্রয়োগ-ক্ষেত্র বাড়াইলে শ্রমনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং কর্ম্মহীন শ্রমিক বা বেকার উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সহায়তা করিতে পারেন। অর্থাৎ, এ ভাবে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব।

অপরপক্ষে অনুন্নত দেশের সমস্যা হইতেছে, আর্থিক উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, জন-সাধারণের সঞ্চয় হইতে তাহা মেটানো সম্ভব নহে, সেখানে সঞ্চয়ের অর্থ এমন ভাবে পড়িয়া নাই অথবা যাহা কাজে খাটানো যায় এরূপ সম্পদ (মূলধন) অকেজো হইয়া পড়িয়া নাই। অনুন্নত দেশের বিরাট সম্পদ হইতেছে অকুশলী শ্রমশক্তি যাহা কাজে লাগিতেছে না। যদিও এখানে উন্নয়নের ক্ষেত্র খুবই বিরাট, কিন্তু কেবল শ্রমশক্তি দ্বারা উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব নহে। এমনকি নদীর বাঁধ, রাস্তা নির্ম্মাণ, সামান্য সেচকার্য্যেও কিছু মূলধনের প্রয়োজন হয়। যে সকল লোক নিছক 'শ্রম-দান' করিবে, তাহারা নিজেদের শ্রম বিনামূল্যে দিবে, হয়ত নিজেদের খাদ্যও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে, খোলা মাঠেই ঘুমাইয়া কাটাইবে, কিন্তু তাহাদেরও, যতই সহজ সরল হউক কিছু যন্ত্রপাতি দরকার; ইঞ্জিনীয়ার, ফোরম্যান, দলপতিগণের পরিকল্পনা, সংগঠন

ও কার্য্য পরিদর্শন করিবার সকল সুবিধা দান করিতে হইবে। উৎপাদনের কোন-না-কোন স্তরে কিছু গাঁথুনি. সিমেণ্ট, কাঠ বা লোহার কাজের দরকার হইবেই। এই সকল কুশলী কর্ম্মী, কলকব্জা এবং কাঁচামাল অপর কোন প্রকার সঞ্চয় হইতে, যথা—অপর কোন উৎপাদনক্ষেত্র হইতে—যেখানে ইহার হয়ত প্রয়োগের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত কম সেখান হইতে কিংবা ভোগ-ব্যবহার (consumption) কমাইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। পূর্ব্বাহ্নে সঞ্চয় না করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার কথা কল্পনা করা যায় না। অনুন্নত দেশের বড় সমস্যাই হইতেছে এই সঞ্চয়ের অপ্রাচুর্য্য। ক্রেডিট সৃষ্টি করিয়া এই সঞ্চয় সক্রিয় করা বা না করা উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। তবে নিছক ক্রেডিট দ্বারা সঞ্চয় বাড়ে না। উদ্বৃত্ত রাজস্ব, কর্জ্জগ্রহণ, মুনাফা পুনরায় উৎপাদনে খাটানোর মত মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা ঘাটতি পূরণ ও সঞ্চয়কে সক্রিয় করিবার অপর একটা উপায় মাত্র। কিন্তু এই দুই প্রকারের সমস্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা ঘাটতি পূরণের সূত্র

শিল্পে অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা ঘাটতি পূরণ সম্পর্কীয় অনেক উদ্ভট মতবাদের প্রচলন হইয়াছে। বিখ্যাত 'বম্বে পরিকল্পনা'র রচয়িতারা এরূপ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন—"দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং ঘাটতি পূরণজনিত মুদ্রাস্ফীতি আপনা হইতেই থাপ খাইয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পনর বৎসর পরে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইবে যে, দ্রব্যমূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইবে।" এজন্য পরিকল্পনার মোট ব্যয় ১০,০০০ কোটি টাকার শতকরা ৩৫ অংশ ঘাটতি ব্যয় মুদ্রা সম্প্রসারণ দ্বারা মিটাইবার সুপারিশ করা হইয়াছিল। এই মত সমর্থন করিতে গিয়া অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিল মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা ঘাটতি পূরণকে যুদ্ধকালীন ঘাটতি পূরণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে ভোগ্য উৎপাদন-সামগ্রী বৃদ্ধি পায় না এজন্য মুদ্রামূল্য হ্রাস পায় বা দ্রব্যমূল্য বাড়ে, কিন্তু উৎপাদন-বৃদ্ধি-পরিকল্পনায় যে মুদ্রার সম্প্রসারণ করা হয় তাহা দ্বারা ভোগ্যবস্তুর বৃদ্ধির দরুন মুদ্রামূল্য হ্রাসের কারণ দূর হয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত উৎপাদন না বাড়িবে ততদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবেই। কিন্তু যুদ্ধের সময় নিয়ন্ত্রণ বা কণ্ট্রোল ব্যবস্থা দ্বারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা হইয়া থাকে। পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি তথা মূল্যবৃদ্ধি এড়াইয়া যাইতে চান এবং এই জন্য দ্রব্যমূল্য কণ্ট্রোল দ্বারা রোধ করিতে পিছপাও নহেন—যাহাতে জীবনধারণের খরচের সংখ্যাসূচী না বাড়ে সেদিকে তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। উৎপাদিত দ্রব্যাদি বৃদ্ধি পাইয়া বাজারে আসিলে মুদ্রাস্ফীতির দরুন আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকিবে না। এই মতের সমর্থকের সংখ্যাই এখন বেশী দেখা যায়।

মূলধন নিয়োগ করিয়া কূপখনন, বাঁধনির্ম্মাণ, কারখানা তৈয়ার এবং ইহার ফলস্বরূপ উৎপাদিত দ্রব্যাদির বৃদ্ধি উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান আছে। সমস্যার বড় কথা এবং প্রধান বিবেচ্য বিষয়ই হইতেছে এই সময়টুকু। শ্রমিকের মজুরি দিতে হয় সপ্তাহে-সপ্তাহে বা মাসে-মাসে—ভোগ্যবস্তুর দাম এজন্য মূলধন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে থাকে, আর একবার বাড়িলে বাড়তি দাম কমিতে চায় না। এইরূপে সমস্ত বাজারে ভোগ্য-সামগ্রীর দাম বাড়ে এবং বাজার জুড়িয়া মূল্যবৃদ্ধির স্তর এক ধাপ উপরে দানা বাঁধে আর ইহার সহিত শ্রমের মজুরি ও কাঁচা মালের উৎপাদন মূল্যের সমন্বয় হইয়া যায়। মুদ্রাপরিমাণ-তত্ত্বের স্থূল এবং ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এক অবাস্তব আর্থিক অবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া অনুমান করা হয় যে, যখন বাজারে নূতন উৎপাদিত দ্রব্যাদি আসিবে তখন দাম কমিয়া যাইবে। যদি প্রকৃতই দাম কমে তবে তাহার ফল মারাত্মক হইবার কথা—কারণ অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইয়াছে। আর্থিক আয় স্বভাবতঃই বাড়িয়া চলিবে—দ্রব্যের পরিমাণ—দ্রব্যের চাহিদা—দ্রব্যের দাম সমস্তই অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে। বাস্তব জগতে দ্রব্যমূল্য আবার পূর্ব্বেকার স্বল্পমূল্যের স্তরে নামিয়া আসিতে দেখা যায় না। দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস পাইবে—এই যুক্তি অবাস্তব অনুমান মাত্র। মুদ্রাস্ফীতিজনিত অর্থ একটি পৃথক্ ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে না এবং উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করিবার জন্য বাহির হইয়া আসে না। মুদ্রাস্ফীতির টাকা উহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আর্থিক জীবনের সামিল হইয়া যায়—মজুরি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং নূতন উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যেও উহার প্রতিক্রিয়া হয়।

মুদ্রাসম্প্রসারণ দ্বারা আর্থিক উন্নয়ন করিতে গেলে উহার ফল উল্টা হয়, ইহা বার বার দেখা গিয়াছে। যখন দ্রব্যমূল্য বাড়ে তখন পরিকল্পনার পুরাতন আয়ব্যয়ের বরাদ্দ বাতিল হইয়া যায়। তখন অর্দ্ধপথে পরিকল্পনার কার্য্য পরিত্যাগ করা যায় না, সুতরাং আরও মুদ্রাসম্প্রসারণ দ্বারা ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি বেশ বাড়িয়া যায়। অনতিবিলম্বে পরিকল্পনার বাহিরে এবং ইহার পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ নানা দ্রব্যের চাহিদার জন্য সঞ্চয়ী

মূলধনের উপর টান পড়ে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের দরুন অনাবশ্যক ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং ঐ সকল দ্রব্য অতিরিক্ত-মাত্রায় প্রস্তুত হইতে থাকে। সঞ্চয়কারিগণ প্রতি দিন টাকার মূল্য কমিতেছে দেখিয়া নিজেদের সঞ্চিত অর্থকে এরূপ সঙ্কটে—উৎপাদনের পক্ষে অনাবশ্যক—শহরের সম্পত্তি, স্বর্ণ বা বিদেশী মুদ্রায় নিয়োগ করে। যাহাদের বিদেশী মুদ্রায় আমদানী দ্রব্যের মূল্য দিতে হয় তাহারা খুবই অসুবিধায় পড়ে, বিশেষতঃ যদি মুদ্রাবিনিময়-হার অপরিবর্তিত থাকে। ইহা দ্বারা ভোগ্যবস্তুর আমদানী বাধা পাইবে এবং রপ্তানীও ব্যাহত হইবে। লোকে চলতি খরচ বাঁচাইয়া সঞ্চয় করিতেও উৎসাহ পাইবে না—এদেশে অস্বাভাবিক ভাবে সুদের হার যেরূপ কমাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা করিলে এরূপ অবস্থায় পরিকল্পনায় যে অর্থসঞ্চয়ের আশা করা গিয়াছিল তাহা পূরণ হইবে না এবং সর্ব্বাত্মক আর্থিক উন্নয়ন বাধা পাইবে।

এই সকল অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া (মূল্যবৃদ্ধি) নিয়ন্ত্রণ দ্বারা রোধ করা যাইবে এ আশা নিরর্থক। অভাব-গ্রস্ত লোকের হাতে একবার টাকা পড়িলে তাহা স্ব-ইচ্ছায় কিংবা ভয় দেখাইলেও তাহারা খরচ না করিয়া পারিবে না। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ বা কণ্ট্রোল কার্য্যকরী হয় না। অবশ্য যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে কণ্ট্রোল অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ সে দেশের আর্থিক কাঠামো সুব্যবস্থিত—সেরূপ কিছু ভারতে আশা করা যায় না। কণ্ট্রোল কতকটা সফল হইলেও তাহার পশ্চাতে মুদ্রাস্ফীতির অবরুদ্ধ বেগ থাকিয়া যাইবে। কণ্ট্রোল দ্বারা বিপদকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে, দূর করা যাইবে না। তবে পরিকল্পনা সম্পর্কীয় আলোচনায় মূল্যনিয়ন্ত্রণ বড় কথা নহে, কতকটা অবান্তর। কারণ পরিকল্পনার বড় কথা হইতেছে সঞ্চয়ের (প্রকৃত মূলধনের) অপ্রাচুর্য্য। নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সঞ্চয় বাড়ানো যায় না। নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল যে সকল দ্রব্য অপ্রচুর, ন্যায্য মূল্যে ন্যায্য ভাবে তাহা সকলের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

মুদ্রাস্ফীতি এড়াইয়া ঘাটতি ব্যয়ের সম্ভাব্যতা

মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা ঘাটতি ব্যয় পোষাইয়া লওয়া একেবারেই অনুচিত একথা বলা চলে না। প্রকৃতই খানিকদূর পর্য্যন্ত ঘাটতি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা নির্ব্বাহ সম্ভব। ইহাতে এক দিকে যেরূপ আর্থিক উন্নয়ন-ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব থাকিবে, অন্য দিকে দ্রব্যমূল্য না বাড়িলেও উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়তা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়নিরোধের জন্য মুদ্রাসম্প্রসারণের আশ্রয় না লইলে মুদ্রা-সঙ্কোচন এবং বেকারসমস্যা দেখা দিতে পারে। মুদ্রাসম্প্রসারণ হইবে অথচ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে না, ইহা এই ভাবে হইতে পারে—

গবর্ণমেণ্ট নিজের গচ্ছিত টাকা দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে স্টার্লিং মুদ্রা ক্রয় করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা সরকারী প্রচেষ্টার বরাদ্দ অংশের কলকব্জা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে পারেন। ইহাতে বাজারের চলতি মুদ্রার পরিমাণ সমান থাকিবে—কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে—ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের নিকট যে পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে এবং গবর্ণমেণ্টের নগদ জমা হ্রাস পাওয়ায় সেই পরিমাণে ব্যাঙ্কের দায় কমিবে। যদি সাময়িক ভাবে সৃষ্ট (এড হক) ট্রেজারী বিলের পরিবর্ত্তে স্টার্লিং কেনা হয় (যেরূপ ১৯৪৮ সনের জুলাই মাসে কেনা হইয়াছিল) তাহা হইলেও বাজারের চলতি টাকার উপর একই প্রতিক্রিয়া হইবে—ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। ঘাটতি ব্যয়—মজুত তহবিল হইতে টাকা লইয়া যাহা করা হইল এবং ঘাটতি আয়—যাহা মজুত স্টার্লিং তহবিল হইতে পূরণ করা হইল—পরস্পরের পরিপূরক হইবে।

যখন মুদ্রার সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে টাকা লইয়া বেসরকারী প্রচেষ্টায় খরচ হইবে তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপরোক্ত ভাবে ঘাটতি ব্যয়ের পন্থা গ্রহণ সম্ভব নহে। যখন বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং তাহাদের উদ্বৃত্ত হইতে মূল্য দিবার সামর্থ্য থাকে, মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে তাহা পাইতে পারিবে—হয়ত এই জন্য আমদানী কমানো হইয়াছে বা উদ্বৃত্তের পরিপূরক হিসাবে বেশী রপ্তানী করা হইয়াছে। কিন্তু যদি বেসরকারী প্রচেষ্টার কোন চলতি খাতায় অতিরিক্ত সঞ্চিত না থাকে অথচ বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সংরক্ষিত ভাণ্ডার—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলা আবশ্যক হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি এই ক্ষেত্রে অর্থ যোগাইবার জন্য ক্রেডিট সৃষ্টি করে। এইরূপ অবস্থায় ঘাটতি মিটাইবার জন্য রাষ্ট্র মুদ্রা-সম্প্রসারণ দ্বারা ব্যয়নির্ব্বাহ করিলে তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে, কারণ অন্যান্য ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই অনুরূপ ক্রেডিট সম্প্রসারণ করিয়াছে।

কাজে কাজেই কতটা পর্য্যন্ত ঘাটতি ব্যয় মুদ্রা-সম্প্রসারণ দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে করা যাইতে পারে তাহার কোন সূত্র দেওয়া যায় না। ঘাটতি কি কারণে দেখা দিয়াছে তাহার উপরেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে কিনা তাহা নির্ভর করে। ঘাটতি ব্যয় ব্যবস্থা দ্বারা বা ক্রেডিটের সৃষ্টি দ্বারা যে

সম্পদ প্রকৃতই নাই তাহা সৃষ্টি করা যায় না। বাস্তব সম্পদ আয়ত্তে আনার জন্য এই সকল ব্যবস্থা অপকৌশল মাত্র।

মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীত ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহের কথা বার্ণষ্টীন ফাণ্ড মিশন রিপোর্ট* হইতে জানা যায়—ইহা সাধারণের গচ্ছিত তহবিল সম্পর্কিত। ব্যক্তিমাত্রেই চলতি উৎপাদনের দ্রব্য এবং সাধারণের উদ্বৃত্ত তহবিল কাজে লাগায়। চলতি উৎপাদনের কতকটা তাহার ভোগে লাগে, কিছুটা উৎপাদনে প্রযুক্ত হয়, আর উদ্বৃত্তের শেষভাগে জমার পরিমাণ বাড়ায়। খরচ বাদে যাহা বাকি থাকে তাহা চলতি হিসাবে কিছু জমা পড়ে। ইহা ছাড়াও যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহা যেখানেই থাকুক প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধি করে। অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের জন্য ব্যক্তির চলতি খরচের চাহিদা সম্পূর্ণ ভাবে মেটা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ অর্থসংগ্রহের জন্য সে অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে চাহিলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবে। যেসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে নগদ টাকা যোগাইবে তাহারাই বাস্তব সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদি এই সকল সম্পদ ব্যক্তির প্রচেষ্টা-ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের ক্রেডিট সৃষ্টি করিতে হইবে, আর সরকারের প্রচেষ্টায় লাগিলে ঘাটতি ব্যয়নীতির অনুসরণ দরকার হইবে। কি পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়নীতি চালাইতে হইবে বা ক্রেডিট সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা ব্যক্তির গচ্ছিত জমা তহবিলের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই জমা তহবিল আবার উৎপাদনবৃদ্ধি বা দেশের সিকা কিংবা টাকার উপর সর্ব্বসাধারণের কিরূপ আস্থা আছে তাহার উপর নির্ভর করে।

নিরাপদে ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ

অবশ্য দুই প্রকারের ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব—যাহাতে হয়ত মুদ্রাস্ফীতি হইবে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে কি পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ নির্ব্বিঘ্নে হইতে পারে তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। বিষয়টা খুবই বিচারসাপেক্ষ। মুদ্রা যোগানো দ্বারা ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় ভুলভ্রান্তি হইতে—অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে। তবে মোটামুটি ঘাটতি ব্যয়ের একটা পরিমাণ যে নির্দ্ধারণ করা যায় না তাহা নহে। বার্ণষ্টীন ফাণ্ড মিশন দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ ব্যক্তি এবং ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত ক্রেডিট সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রথম পরিকল্পনার শেষ তিন বৎসর বার্ষিক প্রায় সাড়ে তেত্রিশ কোটি টাকার স্ফীতি নিরাপদ এরূপ অনুমান করিয়াছেন। দ্রব্যমূল্য অপরিবর্ত্তিত থাকিবে ধরিয়া লইয়া এরূপ মুদ্রাস্ফীতি বার্ষিক ৩৫—৪০ কোটি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ১৭৫—২০০ কোটি টাকার হইবে অনুমান করিতে পারি। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র ধরিয়া লইতেছি, এতটা মুদ্রাস্ফীতি বা ক্রেডিট সম্প্রসারণ নিরাপদ।

ইহার সঙ্গে স্টার্লিং তহবিলের সম্পর্কিত ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ এবং ক্রেডিট সৃষ্টির অঙ্ক যোগ দিলে—যাহা পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ১০০—১৫০ কোটি ধরা হইয়াছে—মোট ঘাটতি ব্যয় ও ক্রেডিট বৃদ্ধি ২৭৫—৩৫০ কোটি হইবে। যদি জমার টাকা তহবিল ও ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত স্টার্লিং মুদ্রাকে সরকারী প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা দুই অংশে ভাগ করিয়া ইহার অনুপাত দুই এবং এক ধরিয়া লই তাহা হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১৮৫—২৩৫ কোটি বা বার্ষিক ৩৭—৪৭ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় নিরাপদ বলিয়া মনে হয়।

প্রকৃত ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে চারিটি পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার উপর—(১) জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধির হারের উপর, (২) কারেন্সি (সিকা) রিজার্ভ হইতে কি পরিমাণ অর্থ তোলা হইল তাহার উপর, (৩) সর্ব্বসাধারণ উদ্বৃত্ত অর্থের কতটা ব্যাঙ্কে নগদ জমা থাকিবে তাহার উপর এবং (৪) উপরোক্ত ২ ও ৩এ উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্পর্কিত সত্যকার সম্পদগুলি সরকারী ও ব্যক্তির প্রচেষ্টা-ক্ষেত্রে কি হারে বণ্টিত হইয়াছে তাহার উপর। যে দেশের আর্থিক অবস্থা এবং উন্নতি আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল সেখানে ২ এবং ৩এ উল্লিখিত অবস্থাগুলিও খুবই পরিবর্ত্তনশীল আর ৩এ উল্লিখিত অবস্থাও টাকার মূল্য সম্পর্কে সাধারণের আস্থা আছে কিনা তাহার উপর নির্ভর করে। সুতরাং এরূপ অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ভুলভ্রান্তি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতেই নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। কোন সাবধানী অর্থসচিবেরই পূর্ব্বের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ব্যতীত ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ বিষয়ে কোন মত দেওয়া সমীচীন নহে। যখন প্রকৃতই কোন দিকে ঘাটতি দেখা দেয়, অপর উপায়ে তাহা মিটাইবার সম্ভাবনা থাকে না তখনই এই ভাবে মুদ্রাসম্প্রসারণ দ্বারা ব্যয়নির্ব্বাহ করা উচিত, নতুবা নহে।

পরিকল্পনার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১০০০-১২০০ কোটি টাকা, যাহা অবশ্য বিড়ালের খোরাক হইতেও অল্প, এই ভাবে সংগ্রহের সুপারিশ করা হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে এই অঙ্ক পাওয়া গেল তাহা বলা হয় নাই। প্রথমে এক দল বলিলেন যে, ২৪০০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। দ্বিতীয় দল আরও গবেষণা করিয়া ঘাটতি ১০০০-১২০০ কোটিতে নামাইলেন এবং এই পরিমাণ অর্থের ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে কাগজী মুদ্রার সম্প্রসারণ দ্বারা—এরূপ মত দিলেন।

যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে চলতি মুদ্রার তিন ভাগের এক ভাগ

* Economic Development with stability, Ministry of Finance, Government of India. New Delhi, 1954.

পরিমাণ টাকা ঘাটতি ব্যয় পূরণের জন্য বাজারে ছাড়া হয়। এই টাকায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তহবিল পুষ্ট হয় ও উহার ভিত্তিতে ঐ সকল ব্যাঙ্ক আবার উক্ত জমার সাত-আট গুণ পরিমাণ ক্রেডিট সৃষ্টি করে তাহা হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে চলতি মুদ্রার পরিমাণ পরিকল্পনার প্রথমে চলতি মুদ্রার যে পরিমাণ ছিল তাহার দ্বিগুণ দাঁড়াইবে। যদি জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি শতকরা ২৫ হইতে ২৭ ধরা যায় তাহা হইলেও এই পরিমাণ মুদ্রাবৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই। ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহ-সম্পর্কে মুদ্রা-সম্প্রসারণে এতটা বাড়াবাড়ি করিলে মুদ্রাস্ফীতি তথা মূল্যবৃদ্ধি হইয়া আর্থিক উন্নয়ন বানচাল হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়াছে তাহা ধরিলে স্বাধীনতালাভের পর হইতে বৎসরে ৫০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় হইয়াছে। এই সামান্য ঘাটতি ব্যয়েই যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, সাবধানতার সহিত ঘাটতি ব্যয় পরিচালন করিতে হইলে উহার পরিমাণ কতটা রাখিতে হইবে।

ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় না লইলে যে আর্থিক উন্নয়ন হয় না তাহা নহে। কথা হইতেছে ঘাটতি ব্যয়নির্ব্বাহের আশ্রয় লইয়া দ্রুত গতিতে উন্নয়নের চেষ্টা করা উচিত কিনা। উহার আশ্রয় না লইয়াই স্বাভাবিক গতিতে অর্থাৎ স্বল্পগতিতে উন্নয়ন করা উচিত। আমরা রক্ষণশীল মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি অনুসরণ করিয়া সর্ব্বোচ্চ আর্থিক উন্নয়ন চাহিব বা মুদ্রাস্ফীতি এবং ঘাটতি ব্যয়জনিত অনিশ্চিত উন্নতি কামনা করিব? যদি আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিজের দেশের সম্পদ অপ্রচুর হয় তাহা হইতে অভাবপূরণের জন্য অপর সম্পদশালী দেশের প্রচুর সঞ্চয়ী মূলধন হইতে কর্জ্জ লওয়া সুবিধাজনক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আর্থিক উন্নতি এইরূপে বিদেশ হইতে কর্জ্জ করিয়াই হইয়াছিল—আজ সমস্ত পৃথিবী সাহায্যের জন্য তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাদের দেশের পরিকল্পনায় বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ খুবই কম ধরা হইয়াছে। আরও বহু পরিমাণ বিদেশী কর্জ্জের পরিমাণ বাড়ানো যায়। ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রে মূলধন সংগ্রহের আরও চেষ্টা হওয়া উচিত। এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থা লাভজনক এবং অর্থনীতির দিক হইতে দেশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক। অনুন্নত দেশের পক্ষে দ্রুত এবং স্থায়ী আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণই ছিল একমাত্র পন্থা।

বৈরাগিণী গান গেয়ে ফেরে

শ্রীকরুণাময় বসু

স্মরণের বৈরাগিণী পথে পথে গান গেয়ে ফেরে,
সুর বাঁধা একতারা, পদ্মের পাপড়িগুলি ছেড়ে,
আর বলে, এলে নাকি হিম ভেজা রোদ ওঠা ভোরে,
যে পথে ফুলের লেখা, জন্মান্তের খেয়াঘাট ধরে।

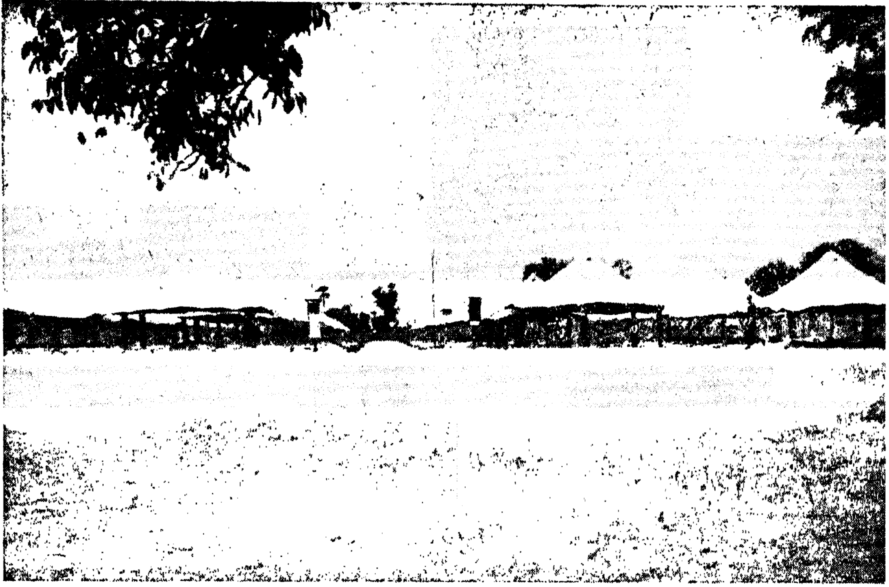
অভ্যাসের বৃত্ত আঁকা সংকীর্ণ চেতনা সীমানায়
ক্ষুদ্র তুচ্ছ জাল ফেলি, ছায়াময় মনের কানায়
শ্যাওলার ছোট ফুল; হাসে দূরে আকাশের চাঁদ,
আর বলে এই বুঝি বৃহত্তর জীবন আস্বাদ?

তবু জানি এক দিন বৈরাগিণী গান গেয়ে ওঠে,
জীবনের মরাডালে ভুস করে ফুলগুলি ফোটে:
হেমন্তের ভিজে ঘাসে প্রজাপতি করে ঝিলমিল,
সেই দিক চেয়ে সে কি খোঁজে মানে, খোঁজে কিছু মিল।

আপিসে প্যাঁচার মতো গণ্ড ঘরে বসে থাকি আমি
উদ্ধত গাম্ভীর্য্য লয়ে; ভাবি মনে আমি খুব নামী
দামী পোষাকেতে মোড়া; দূরে কাঁপে ফুলের ফাল্গুন,
মন্থর মধ্যাহ্ন দিনে মৌমাছিরা করে গুন্ গুন্।

হঠাৎ জানালা খোলে, হাসিমুখে তাকাল আকাশ,
সোনালি রৌদ্রের রঙে দূরান্তের আভার আভাস
অশ্রু ছলো ছলো ছায়া দিগন্তের নীলাঞ্জন পটে
মায়াচ্ছবি এঁকে দিলো; দূর এলো মনের নিকটে।

মনের খাঁচার পাখি মুক্তি খোঁজে, তাই এলে তুমি,
নিয়ে এলে অবারিত আকাশের দূর পটভূমি;
স্মরণের বৈরাগিণী নেচে নেচে গান গেয়ে ওঠে,
ব্যাকুল বাঁশীর ডাক এলো বুঝি জীবনের গোঠে।



শক্তিগড়ে পশ্চিমবঙ্গে এন-সি-সি ও সমাজসেবা শিবির

সমাজসেবায় সমর-শিক্ষার্থী

'ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর' হচ্ছে সামরিক শিক্ষার তরুণ ছাত্রবাহিনী। সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমাজসেবারও ব্রত নিয়েছে। মাঝে মাঝে জনকল্যাণের কাজে পল্লী-অঞ্চলের এক-একটা জায়গায় তাদের শিবির পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে এরকম কাজে এ পর্যন্ত এই তরুণ সামরিক বাহিনীর যত শিবির পড়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শিবির স্থাপিত হয়েছিল এ বছর মে মাসে বর্ধমানে শক্তিগড়ে। এই শিবির-সন্নিবেশ করেছিল সদর কেন্দ্রের চতুর্থ মণ্ডলীর সমর-শিক্ষার্থীরা। এ শিবিরে ছিল ৮৫৯ জন শিক্ষার্থী। পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন নিয়মিত সামরিক বাহিনীর দশ জন এবং 'ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর'-এর একুশ জন আধিকারিক। শিবিরের অধিনায়ক ছিলেন লেফটেনাণ্ট কর্নেল জে. এস. কামা।

এখানে সাত মাইল লম্বা, আঠার ফুট চওড়া আর দু' পাশের জমির সমতল থেকে গড়ে আড়াই ফুট উঁচু এক কাঁচা রাস্তা তৈয়ারির ভার নিয়েছিল এই সমর-শিক্ষার্থীর দল। শক্তিগড়ে সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার অধীন যে অঞ্চলটি রয়েছে, সেখান থেকে সুরু করে তোতপুর আর অমরা গ্রামের ভেতর দিয়ে এ রাস্তা পড়ছে গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে।

ভোর চারটায় সামরিক তূর্যনাদে ছেলেরা জেগে উঠত। পৌনে পাঁচটায় সামরিক কুচকাওয়াজের সুশৃঙ্খল ছন্দিত পদক্ষেপে তারা বেরিয়ে পড়ত রাস্তা তৈরির কাজে। কাজ সুরু হ'ত সাড়ে পাঁচটায় আর শেষ হ'ত বেলা সাড়ে দশটায়—মাঝখানে আধ ঘণ্টা ছুটি থাকত প্রাতরাশের জন্য। শিক্ষার্থীদের কতকগুলো দলে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাস্তার এক-একটা অংশের কাজ সম্পূর্ণ করার ভার দেওয়া হয়েছিল এক-একটি দলের উপর। এ কাজে কুড়ি দিনের মধ্যে মাটি কাটা হয়েছে মোট প্রায় সাত লক্ষ ঘনফুট।

দৈহিক শ্রমের এ কাজে ছেলেরা ব্রতী হয়েছিল গভীর আন্তরিকতায়, এবং বিপুল উদ্দীপিত আনন্দের মধ্যে এ কাজ তারা সম্পাদন করেছে। বিশেষ করে কাজের সময়ে

আধিকারিকদের উপস্থিতি তাদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

এ শ্রমসাধ্য কাজের ভার নিয়েছিল বলে তাদের নিয়মিত সামরিক শিক্ষা কিন্তু বন্ধ থাকে নি। রোজ বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তাদের সামরিক শিক্ষা চলত। তা ছাড়া তারা খেলাধুলাও করত, আর এক দিন অন্তর একদিন সিনেমা অথবা 'ক্যাম্প-ফায়ার'-এ আমোদ-প্রমোদ করত।



দিবসের কার্য্যের পর হাস্যপরিহাস-রত পুরুষ ক্যাডেটগণ

নারী-বিভাগেরও সমাবেশ হয়েছিল। 'পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর'-এর উচ্চতর বিভাগের মেয়েরা ছিল তাতে এবং তাদের পরিচালনা করেছেন এ বিভাগের নারী-আধিকারিকেরা। তাদেরও শিবির পড়েছিল সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীন শক্তিগড় অঞ্চলে।

এই তরুণ সমর-শিক্ষার্থিনীদের কাজ ছিল স্থানীয় নারীদের স্বাস্থ্যবিধি পালন ও স্বাস্থ্যনীতিসম্মত ব্যবস্থাদি, শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাদের পরিচর্যার পদ্ধতি, গ্রামের ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীলোকদের পোশাক কাটছাঁট ও সেলাই করা, জলশোধক গর্ত এবং ধূমবিহীন চুল্লী তৈরি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া এবং বক্তৃতার সাহায্যে এ সব বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। ঘরোয়া বাগান কি ভাবে করতে হয়, ক্যাডেট-মেয়েরা গ্রামের গৃহিণীদের তা নিজেরা করে দেখিয়ে দেয়। এর কয়েকটি বাগানে ইতিমধ্যেই গাছও লাগানো হয়েছে। চারটি মেয়ে-ক্যাডেট চিকিৎসা-দলের সঙ্গে থেকে যারা অসুস্থ হয়ে পড়ছিল তাদের সেবা ও পরিচর্যা করেছে।



উচ্চতর বিভাগের নারী ক্যাডেটগণ কর্তৃক পল্লী বাসিনীদের সেলাই শিক্ষাদান

তা ছাড়া তারা আশপাশের এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে বয়স্কদের শিক্ষাদানের কাজেও সাহায্য করেছে।

শিবিরের অনতিদূরেই যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, গ্রামবাসীদের বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছিল সেটি। পত্তনের সময় থেকেই রোজ শতখানেক করে লোকের চিকিৎসা হয়েছে সেখানে। তা ছাড়া এ কেন্দ্র থেকে প্রায় ১,২০০ লোকের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয় এবং প্রায় ১৭০৫ জন গ্রামবাসীকে কলেরা, বসন্ত আর টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হয়।

এই শিবিরে থাকাকালে এই তরুণ সামরিক-শিক্ষার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু, বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজ্য কৃষি-বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীআবদুস সত্তার, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের সহকারী অধিকর্তা লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল তারাচাঁদ, অনেক জেলা-আধিকারিক, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে পেয়েছিল।

কলিকাতা-কেন্দ্রের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার গুরুকৃপাল সিং শিবির-পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশেষ দক্ষতা-প্রদর্শনের জন্য বাহিনীর নিম্নলিখিত সংস্থা-গুলিকে তিনি পুরস্কার দেন :

সবচেয়ে ভাল খননকার্যের জন্য—ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট ৪, বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ;

সবচেয়ে ভাল খননকার্যের জন্য—টেকনিকাল ইউনিট ৬ বেঙ্গল ব্যাটারি ;

সবচেয়ে ভাল সমাপন-কার্যের জন্য—ই-এম-ই সেকশন, আই-আর-টি-এস, চিত্তরঞ্জন ;

সংস্থা হিসাবে সবচেয়ে ভাল শিবির-শৃঙ্খলা পালনের জন্য—বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ;

সবচেয়ে বেশি মাটি কাটার জন্য—দ্বিতীয় বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন।

এ ছাড়া মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল শিবির-শৃঙ্খলা পালনের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন আণ্ডার-অফিসার শাকিনা খাতুন।

আবেশ

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

আশ্চর্য্য মানুষ আমার বন্ধু হরেকৃষ্ণ! যে এক দিন ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানত না, সেই এক দিন ভজনানন্দ নামীয় কোনও সাধুর আশ্রমে ঢুকে ভক্তির আতিশয্যে খোল-করতাল পিটতে সুরু করবে, এ আমি কল্পনাই করি নি…

খবরটা শুনলাম বন্ধুবর শিবেনের কাছে। সেও সেই ঠাকুরের শিষ্য। স্বামী ভজনানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে শিবেন শেষে শিবনেত্র হয়ে গেল।

বলল, এবারে কঠিন পাল্লায় পড়েছে হরেকেষ্ট। ঠাকুর টেনে নিলেন তাঁর বুকে। আহা করুণাময় তিনি।…

বুঝলাম ব্যাপারটা। শিবেনের প্রচার-শক্তির জোর আছে আর সেই সঙ্গে মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছে হরেকেষ্টর অত্যুগ্র খেয়াল।…

ফ্যাসাদ হ'ল শেষে হরেকেষ্টর বাবাকে নিয়ে। তিনি মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, আমায় ডেকে বললেন, কি ব্যাপার বল ত! এ সব খেয়াল ওর মাথায় ঢোকালে কে?

বললাম, তা ত ঠিক জানি না।

তিনি বললেন, খোঁজ-খবর নাও। যেমন করে পার ওকে ফিরিয়ে আন। ওই আমার ব্যবসাপত্তর ভাল দেখে। আর সব ছেলেদের তেমন গা নেই। যাও তুমি লেগে পড়।

হরেকৃষ্ণের পিতা ঘনশ্যামবাবু এক জন নামকরা কাঠের ব্যবসায়ী। আসামে বড় বড় জঙ্গল ইজারা নেওয়া আছে। সেখান থেকে কাঠ আসে।…

হরেকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখা কি পাওয়া যায় সহজে! যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে জপতপ নিয়ে থাকে। বিকেলে আশ্রমে যায় আসে রাত দশটা-এগারটায়।

দেখা হতেই হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল—ভাই রে, ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজি নিত্য ধন, হরিনামে পূর্ণ করি সমস্ত জীবন।

বললাম, বেশ, ভালই কর দেখছি। তোমার আশ্রমে আমায় নিয়ে যেতে পার একবার। আমার জীবনটাও একটু ধন্য করে নিতে পারি।

হরেকৃষ্ণর চোখ দুটি ভাবের আতিশয্যে ছল ছল করে উঠল। বলল, যাবি ভাই সেখানে? দেখবি আমাদের করুণাময় ঠাকুরকে?

বললাম, আজই নিয়ে চ' আমায়। আমি বিকেলে আসব তোর কাছে।

সে রাজী হ'ল। দেখলাম তাকে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাকেও ভক্ত সেজে আশ্রমে ঢুকতে হবে। তারপর? বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।…

হরেকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের আশ্রমে এলাম। এক প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ীতে আশ্রম। বহু ভক্ত শিষ্য-শিষ্যা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে আশ্রমের চারিদিকে।

শুনলাম আর একটু পরেই স্বামীজী টাটে অর্থাৎ বেদীতে বসবেন, তখন সাক্ষাৎ হবে। এখনও তিনি গম্ভীরায় অর্থাৎ তাঁর সাধন-কক্ষে বিরাজ করছেন।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল ঠাকুর টাটে বসেছেন। বাস, আর যায় কোথায়! পিল্ পিল্ করে সব ভক্তের দল আশ্রম-বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল। আমিও হরেকৃষ্ণের সঙ্গে দোতলার একটি বড় হল-ঘরে এসে হাজির হলাম। ঘরটি আগাগোড়া কার্পেট দিয়ে মোড়া, পূর্ব্বদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি মখমলের গদী-দেওয়া বেদী, তার উপর স্বামীজী সমাসীন।

পরিপুষ্ট গৌরবর্ণ চেহারা, মুণ্ডিত মস্তক, গলায় মালা আর সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ।

হলের এক পাশে মেয়েদের বসবার জায়গা আর এক পাশে পুরুষদের। খোল-করতাল আর হারমোনিয়ম নিয়ে মাল্যধারী মুণ্ডিতমস্তক এক দল শিষ্য বসে আছে, এরা সব আশ্রমবাসী।

হরেকৃষ্ণের কাছে সব খবর একে একে জেনে নিলাম।

সকলের আগে হরেকৃষ্ণ আমাকে ঠাকুরের সামনে নিয়ে গিয়ে বসাল। প্রণামান্তে আমার পরিচয় দিয়ে সে বলল, এ আপনার বাণী শ্রবণ করবার জন্যে ছুটে এসেছে।

ঠাকুর আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি নাম ?

বললাম, শ্রীগদাধরচন্দ্র বসু।

আর যায় কোথায়! নাম শুনেই ঠাকুর কেঁদে ফেললেন। তার পর আমার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেই বললেন, কি বললে—গদাধর! ওরে আজ আমাদের কি সৌভাগ্য রে! আমাদের উদ্ধার করতে স্বয়ং গদাধরচন্দ্র এসেছেন।

চোখের জলে তাঁর গাল দুটি ভিজে বেশ চক্‌চকে হয়ে উঠেছে। তিনি আমার হাত দুটি ধরে গেয়ে উঠলেন—ওরে গদাধরের প্রাণ-বধুয়া গৌরাঙ্গ হে!

আমি ত মহা বিব্রত হয়ে পড়লাম। এ দেখছি আচ্ছা বিপদে পড়া গেল। ঠাকুর কি ভুল করলেন নাকি। আমাকে হরেকৃষ্ণর মত বড়লোক বলে ঠাউরালেন নাকি, কে জানে। আমার জঙ্গলও নেই জমিদারীও নেই। আমার এ ফ্যাসাদ কেন?

সে সব কথা ঠাকুরকে বলবার অবকাশই বা কোথায়! এদিকে খোল-করতাল বাজতে সুরু হয়েছে। ঠাকুর আমার হাত ধরে গাইছেন আর সবাই ঠাকুরের সঙ্গে তারস্বরে গাইতে সুরু করেছে—

গদাধরের প্রাণবঁধুয়া গৌরাঙ্গ হে!
গদাধরের প্রাণপুতলী গৌরাঙ্গ হে!

এমন বিপদে মানুষেও পড়ে। এ জানলে কে আসত বাবা এখানে। আমি যত বিপন্ন হয়ে উঠছি ভক্তমণ্ডলীর গান ততই সপ্তমে চড়ে উঠছে।

আমার বারটা বাজিয়ে তবে ঠাকুর আমায় ছাড়লেন। বললেন, আপনার চরণধূলি এখানে পড়া চাই। আমরা দীন বৈষ্ণব, আমাদের প্রতি কৃপালু হবেন।

মনে মনে বললাম, নিশ্চয় হব বাবা, এখন বের হতে পারলে বাঁচি।

কোনও রকমে বিদায় নিয়ে হরেকৃষ্ণকে নিয়ে বাইরে আসি।

হরেকৃষ্ণ আমার দিকে তাকিয়ে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললে, তুই কে ভাই! তোকে আমরা এত দিন চিনতে পারি নি ভাই। ঠাকুরই আমাদের চিনিয়ে দিলেন তোকে।

পায়ে প্রবল একটা চাপ অনুভব করে তাকিয়ে দেখি বন্ধু শিবেন আমার পা দুটি চেপে ধরেছে।

শিবেনের এবংবিধ ব্যাপারে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। বন্ধু হয়ে একি ব্যবহার!

শিবেন ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল, আর ছলনা করো না ভাই। আর কি তোমাকে চিনতে বাকি আমাদের। আসলে তুমি যে পরশপাথর একথা আজকে বুঝেছি ভাই, 'সোনা আছে পাশে ভুলে গিয়ে মোরা দু'হাতে কেবল ঘেঁটেছি ছাই'।

তাজ্জব ব্যাপার! হরেকৃষ্ণ কাঁদতে আরম্ভ করেছে। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠল, তুই কে তা তুই জানিস। দ্যাখ, তোর পাদস্পর্শে শিবেনের মুখ দিয়ে পদাবলী বেরুচ্ছে।

সত্যিই ত। এতক্ষণ এটা লক্ষ্যই করি নি। শিবেন তখনও পদাবলী গেয়ে চলেছে। সে অল্প অল্প সুর করে বলছে—

তোমারে ভজন করিলে পুণ্য
জীবন ধন্য সারাৎসার
তোমারি কৃপায় কৃতার্থ হয়ে
পার হয়ে যাব এ সংসার।

সর্ব্বনাশ করেছে। এ যে দেখছি আমাকে রাতারাতি অবতার না বানিয়ে এরা ছাড়বে না।

বললাম, দোহাই তোমাদের, আজ ছাড় আমায়। নিশ্চয় কৃপা করব তোমাদের।

মনে মনে বললাম, এই ভূত তোমাদের ঘাড় থেকে নামাব আর ভজনানন্দকে এখান থেকে তাড়াব তবে আমার নাম গদাধর।

কোনও রকমে সেদিন ভক্ত বন্ধুদ্বয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বাড়ী এলাম।

বাড়ীতে এসে মহা চিন্তায় পড়লাম। কিছুক্ষণ পর হরেকৃষ্ণের দাদা আর বৌদি আমার বাড়ীতে এলেন। তাঁদের সব কথা খুলে বললাম। শুনে তাঁরা ত হেসেই অস্থির।

হরেকৃষ্ণের বৌদি বললেন, সে কি ঠাকুরপো, শেষে আপনিও ভক্তি-মার্গে আটকে গেলেন। এখন আবার আপনাকে কে উদ্ধার করে তাই ভাবছি।

বললাম, আমি চট করে উদ্ধার পাব। যখনই স্বামীজী শুনবেন যে আমি শাসালো নই তখনই তিনি গলাধাক্কা দিয়ে আমাকে ভক্তিমার্গ থেকে একেবারে রাজমার্গে নামিয়ে দেবেন।

হরেকৃষ্ণের দাদা বললেন, তা ঠিক কথাই বলছে গদাধর। ওদের কারবার শুধু শাসালো লোক নিয়ে, দরিদ্র অভাজনদের নিয়ে নয়।

আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে তাঁরা বললেন—যাতে হরেকৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনা যায়। এই বলে তাঁরা চলে গেলেন।

এর পর থেকে আমি রোজই স্বামীজীর আশ্রমে যেতে লাগলাম। প্রতিদিন দেখি এক এক জন ভক্তকে উপলক্ষ্য করে ঠাকুরের অতি-অদ্ভুত লীলা।

শুনলাম এখানে ঠাকুর ও ভক্তদের নানা রকম আবেশ হয়।... কখনও মহাদেব কখনও গৌরীর এ ছাড়া নানা দেব-দেবীর। মাঝে মাঝে দেবদেবীর বাহন নানা জীবজন্তুর আবেশও হয় এদের।

একদিন শুনলাম জগদ্ধাত্রী পূজার দিন স্বামীজীর আশ্রমে পূজা হবে। স্বামীজীর মধ্যেই জগদ্ধাত্রীর আবেশ হবে আর ভক্তেরা তাঁকে পূজা করবে।

এ কি রকম ব্যাপার ! আগে থাকতে বলে-কয়ে নোটিশ দিয়ে আবেশের কথা জানিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন করতে শিবেন বলল, ঠাকুর আমাদের বাঞ্ছাকল্পতরু। আমরা যা ইচ্ছে করব ঠাকুর তাই হবেন।

—এক ছিন্নমস্তা ছাড়া সব আবেশই ঠাকুরের মধ্যে হয়। ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে ওই রূপ পরিগ্রহ করতে ঠাকুর বিরত থাকেন। তা না হলে আমরা ঠাকুরকে হারাব।

এই কথা বলেই ভক্তির আবেগে হরেকৃষ্ণ হাঁপাতে লাগল।

মনে মনে ভাবি, একদিন ঠাকুরকে ছিন্নমস্তা করে ছাড়ব।

জগদ্ধাত্রী পূজার দিন আমি একাই ঠাকুরের আশ্রমে গেলাম। শিবেন ও হরেকৃষ্ণ আগেই চলে গিয়েছে।

সোজা দোতলার হল-ঘরে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। দেখলাম, আমার প্রিয় বন্ধু হরেকৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে আছে আর তার পিঠের উপর স্বামীজী একখানি লাল বেনারসী শাড়ী পরে নানারূপ সাজসজ্জা নিয়ে জগদ্ধাত্রী সেজে বসে আছেন।

সমবেত ভক্তবৃন্দ হাতজোড় করে "মা মা" বলে আকুলভাবে ক্রন্দন করছে। শুনলাম ঠাকুরের জগদ্ধাত্রীর আবেশ হয়েছে আর হরেকৃষ্ণর হয়েছে তাঁর বাহন সিংহের আবেশ।

এই অবস্থায় পূজা, কীর্তন, প্রার্থনা ও সবশেষে ঠাকুরের আশীর্ব্বাণী বর্ষিত হ'ল। সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী নাকি কথা বলছেন, যদিও পুরুষের গলা তবু ভক্তেরা ভাবের আবেগে 'হাউ হাউ' করে কেঁদে উঠল। মেয়েদের মধ্যেও কয়েকজন ঘোমটার ফাঁকে ফ্যাচ-ফোঁচ করে কান্নার পালা শেষ করে নিলেন। শুনলাম এরূপ আবেশে কান্নাটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি কাঁদলাম না দেখে শিবেন যেন কিছু ক্ষুণ্ণ বলে মনে হ'ল।

কিছুক্ষণ পর স্বামীজীর প্রধান শিষ্য 'বাবা বাবা' বলে ঠাকুরের গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে তাঁর আবেশ কেটে গেল। তিনি দ্রুতপদে গম্ভীরায় চলে গেলেন।

কিন্তু এ কি ব্যাপার ! হরেকৃষ্ণ তখনও হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে। যত গঙ্গাজল ছিটানো হয় ততই সে মজবুতভাবে হামাগুড়ি দিয়ে থাকে। ওর আবেশ আর কাটে না।

মহা মুশকিলে পড়লাম। আমাকেই ত বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। এখন উপায় ? বিপদে মধুসূদন, অগত্যা তাঁকে স্মরণ করে হরেকৃষ্ণর কাছে যাই। সে সিংহের মত 'হুম-হাম' আওয়াজ করে তেড়ে আসে।

কত নাম ধরে ডাকি, কিছুতেই উত্তর দেয় না শুধু বিকট গর্জ্জন করে।

অগত্যা ট্যাক্সি আনিয়ে আমি দু'তিন জন ভক্তের সাহায্যে তদবস্থাতেই হরেকৃষ্ণকে গাড়ীতে তুলি এবং তার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

তাদের বাড়ীতে হুলস্থূল ব্যাপার পড়ে গেল। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সকলেই স্তম্ভিত। হরেকৃষ্ণর আবেশ তখনও কাটে নি।

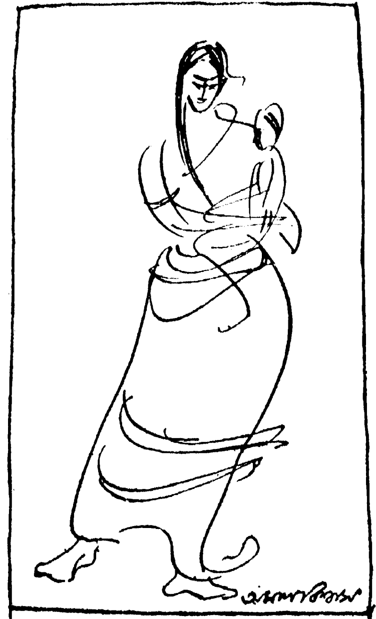
সেই অবস্থায়ই তাকে বিছানায় এনে স্থাপন করা হ'ল। বৌদি কাছে এসে বলেন, ও ঠাকুরপো, কি হ'ল তোমার ?

উত্তরে হরেকৃষ্ণ 'হুম-হাম' গর্জ্জন করে শুধু। মাঝে মাঝে যেন থাবা তুলে ধরে।

হরেকৃষ্ণর পিতা ঘনশ্যামবাবু সব শুনে ও ব্যাপার দেখে বললেন, কাল সকালেই ওকে আসামের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেব। সেইটেই ওর এখন ঠিক জায়গা হবে, আর আবেশ কেটে গেলে ওখানকার কাজকর্ম্ম দেখবে।

একথা শুনে হরেকৃষ্ণর বৌদি বললেন, তাই দিন বাবা, আর আনবেন না এখানে। আজ ঠাকুরপো সিংহ হয়েছে, কাল বাঘ হবে, পরশু ভাল্লুক হবে, তার পর কোন দিন বাড়ীসুদ্ধ লোকের ঘাড় ভাঙবে। জঙ্গলই ওর ভাল।

পরদিন হরেকৃষ্ণকে তাদের ব্যবসায়-কেন্দ্র আসামের জঙ্গলে পাঠান হবে স্থির হ'ল, কিন্তু আশ্চর্য্য আসামের জঙ্গলের কথা শুনেই তার আবেশের লেশমাত্র রইল না। শেষে নাকি তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, স্বামীজী বাবাজীদের নাম পর্য্যন্ত করত না, শুনলে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে যেত।



মা

শ্রীঅমল বিশ্বাস

ভারতের উদ্যান

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কলিকাতা ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন যুক্তরাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমের মধ্যে ব্যবধান সার্দ্ধ পনর শত মাইল। রাজধানী হইতে তিপ্পান্ন মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে, দক্ষিণাপথ-ত্রিভুজের শীর্ষদেশে কন্যাবালা দেবীর মন্দির। কুমারী কন্যা দেবীর নাম হইতে অগস্তিশ্বরম্‌ তালুকের ক্ষুদ্র পল্লীটির নাম হইয়াছে কুমারিকা। ৮°৪´ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত ভারতভূমির শেষ এই কুমারিকা হইতে ১০°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নূতন সংযুক্তরাজ্য ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বিস্তৃত। আরব সাগর ও সহ্যাদ্রি দ্বারা সীমান্বিত এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ মাইল। নূতন যুক্তরাজ্য স্থূলমধ্য; উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃতি মাত্র বিশ মাইল, মধ্যভাগের প্রস্থ পঁচাত্তর মাইল। মাদ্রাজ রাজ্যের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিটমহলের বিনিময়ের পর এই সংযুক্তরাজ্যের আয়তন দাঁড়াইয়াছে ৯,১৪৪ বর্গমাইল। পশ্চিমবঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ হইতে বীরভূম জেলার আয়তন বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের সমান হইবে। ভারতের সোয়া বার লক্ষ বর্গ-মাইল ভূমির অতি নগণ্য অংশ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের এই নয় হাজার বর্গমাইল। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও নানা কারণে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ভারতের ইতিহাসে এবং ভারতরাষ্ট্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারতের সর্ব্ব দক্ষিণ-পশ্চিমে এই রাজ্যের অবস্থিতি। প্রাচীন কাল হইতে মাদ্রাজের মালাবার জেলা ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন মালাবার উপকূল নামে একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক অঞ্চলরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই ভূভাগের প্রাকৃতিক গঠন, জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ভারতের মুসলমান প্রভাবমুক্ত প্রাচীনতম রাজ্য। খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই চের বা কেরল রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম শতকে সমগ্র মালাবার উপকূলে চের রাজ্য বিস্তারলাভ করে। দিল্লীতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, বাংলায় যখন দেবপাল রাজত্ব করিতেন তখন চের রাজ্যের শেষ রাজা চেরমন পেরুমল রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করিবার পর সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মক্কায় চলিয়া যান। তদবধি ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবার স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। সহস্রাধিক বৎসর তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন পুনরায় সংযুক্ত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে কত রাজবংশের উত্থান ও পতন, কত বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ, কত লুণ্ঠন ও রক্তপাত ঘটিয়াছে! ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ভারতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ছিল এক-মাত্র শান্তবলয়। ভারতের ইতিহাসে ইহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

ভিন্সেণ্ট এ. স্মিথের মতে কালের বিধ্বংসী শক্তির কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ভারতের প্রাচীন জাতি, ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের যাহা কিছু এখনও টিকিয়া রহিয়াছে তাহার প্রায় সবই এই অঞ্চলে সংরক্ষিত। অবিকৃত অতীত আর সংস্কারশীল বর্ত্তমান এখানে পাশাপাশি রহিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মীয় ও সামাজিক সংস্থা সম্বন্ধে গবেষণা উত্তর ভারতে সুরু না করিয়া দক্ষিণ ভারতে আরম্ভ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। হরপ্পা ও মোহেন্‌-জো-দাড়োর আবিষ্কারের মধ্যে স্মিথের অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। জাতিভেদের অচলায়তন এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাতৃধারায় উত্তরাধিকার মালয়ালমের বৈশিষ্ট্য। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের একান্নবর্ত্তী জ্ঞাতিসংঘ 'ইল্লম' ও নায়ারদের অনুরূপ সংস্থা 'তাড়োয়ার' ভারতের অন্যত্র ছিল না। নৃত্য, গীত, ছন্দ ও গতির সমাবেশে সৃষ্ট শিল্পের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তির নিদর্শন 'কথাকলি' মালাবারের জনমানসের সাংস্কৃতিক প্রকাশ। উত্তর-ভারতীয় নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণগণ ছিলেন আর্য্য-সংস্কৃতির ধারক। তাহাদের মাধ্যমে সংস্কৃত শব্দ মালয়ালম ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়া উহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে; সংস্কৃত সাহিত্যের রূপ, ছন্দ ও ভাব মালয়ালম সাহিত্যের রূপ গঠনে সাহায্য করিয়া উহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। ঐ ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা প্রভৃতির অনুবাদ হইয়াছে। উচ্চ স্তরের জনগণের মনোরাজ্যে উত্তর ভারতীয় ভাবধারা প্রবাহিত হইলেও দ্রাবিড়ী সমাজব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত ছিল। এ যেন দ্রাবিড়ী সভ্যতার উপর আর্য্য-সংস্কৃতির তবক মোড়া। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে দ্রাবিড়ী সমাজে ভাঙন ধরিয়াছে। প্রাচীন তাহার স্থান ছাড়িয়া দিতেছে নবীনকে। মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে দ্রাবিড়ী সভ্যতার এই পশ্চাদপসরণ সমাজ-বিজ্ঞানীদের কৌতূহল জাগ্রত করিয়াছে।

মালাবার উপকূল যেমন পুরাতনকে বহন করিয়া আনিয়াছে বর্ত্তমান কাল অবধি, তেমনই নবযুগকে ভারতে আবাহন করিয়াছে সকলের আগে। পশ্চিম এশিয়া তুর্কী সম্রাটের অধিকারভুক্ত হইবার পর ইউরোপের রাজ-রাজড়াদের ভোজন-গৃহে দেখা দিল মশলার অভাব আর নারীদের বেশভূষায় মণিমুক্তা ও চীনাংশুকের অভাব। এই সকল বিলাসোপকরণ মালাবার হইতে ইউরোপে পৌঁছাইত। কলম্বাস মালাবারের সন্ধানে বাহির হইয়া আবিষ্কার করিলেন আমেরিকা। বহু বৎসরের অধ্যবসায়ের পর

পর্ত্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামা মালাবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এই দুই অভিযানের মূলে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছিল না, ছিল বহুবিশ্রুত ভারত তথা মালাবারের অনুসন্ধান। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রেরণা মালাবার দান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের জলপথ আবিষ্কারের চারি বৎসরের মধ্যে, কোচিনরাজের অনুমতিক্রমে, কোচিন শহরে পর্ত্তুগীজ বসতি স্থাপিত হয়। পর বৎসর তাহারা কোচিনে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ভারতে ইহাই ইউরোপীয়দের প্রথম দুর্গ। ইহা প্রথম পানিপথ যুদ্ধের বাইশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। পর্ত্তুগীজদের ধর্ম্মোন্মাদনার বহু কুফলের মধ্যে কোচিনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহ ভারতের প্রথম ইউরোপীয় শিক্ষা-কেন্দ্র। সাক্ষরের হারে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সহিত প্রথম পরিচয় হয়ত তাহার প্রধান কারণ। কোচিনে বিদ্যালয় স্থাপনের তিন শত বৎসর পর কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বকালে, ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতীয় ভাষায় প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয় কোচিনে। দেশীয় হরফে ইহাই ভারতের প্রথম মুদ্রণ। ত্রিবাঙ্কুরের তদানীন্তন রাজধানী কুইলনের উপকণ্ঠে পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে।

মালাবার উপকূলের বহির্বাণিজ্য যে কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। প্রথম যুগের রোমক সম্রাটদের স্বর্ণমুদ্রা 'অরি' (aurei) ও অন্যান্য মুদ্রা খননের ফলে ত্রিবাঙ্কুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ন তাঁহার গ্রন্থে মালাবার উপ-কূলের পণ্যের এক তালিকা দিয়াছেন। তাঁহার তালিকা হইতে জানা যায়—খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে মালাবার উপকূলের রপ্তানী দ্রব্য ছিল গোলমরিচ, মণি, মুক্তা, গজদন্ত, চীনবাস ও কচ্ছপের খোল। এ সকলের বিনিময়ে মালাবারে আসিত স্বর্ণ, সাধারণ বস্ত্র, ফুলদার পোষাক, তাম্র, কাচ, প্রবাল প্রভৃতি। আরিয়নের সময় হইতে দুই হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও মালাবারের গোলমরিচ এখনও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডলার উপার্জ্জক পণ্য। কোচিন ও কালিকটের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী কুইলন ছিল মালাবার উপকূলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রথম যুগের পর্য্যটকদের মতে কুইলন ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরসমূহের অন্যতম। ভারতে কুইলনের বাজার ছিল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মরক্কো দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পর্য্যটক ইবন বতুতা মুহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার দেখা পাঁচটি শ্রেষ্ঠ বন্দরের মধ্যে কুইলন একটি। পশ্চিমঘাটের পর্ব্বত-প্রাচীর ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন আর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিলেও আরব সাগরের বুকের উপর দিয়া শত শত বাণিজ্য-তরী পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব্ব উপকূলের সহিত মালাবার উপকূলের সংযোগ রক্ষা করিত। ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের বন্দরে বন্দরে ভারতীয় বাণিজ্যপোত দেখিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের বহির্দ্বার তাম্রলিপ্ত এখন ঐতিহাসিকের বিশেষ গবেষণার বিষয়। দ্বীপময় ভারত এবং ব্রহ্মদেশ হইতে চীন পর্য্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও ভারতের মধ্যে যে যাত্রী এবং পণ্যবাহী অর্ণব-পোত যাতায়াত করিত তাহা এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে জানিতে পারি মাত্র। মালাবার উপকূলের বাণিজ্যের ধারা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। ভারতের প্রাচীনতম বন্দরের অন্যতম কুইলন আজিও উন্নতিশীল শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিও গিয়াছিল। পশ্চিম উপকূলে ঘটিয়াছে তাহার বিপরীত। বাণিজ্যের সূত্র অবলম্বন করিয়া পশ্চিম এশিয়ার তিনটি প্রধান ধর্ম্ম ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবারে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। জাতিভেদের কঠোরতায় নিষ্পিষ্ট ভারতের নিম্নবর্ণের শ্রেণীহীন ধর্ম্ম ও সমাজে প্রবেশ লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় ইহুদি, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম্ম মালাবার উপ-কূলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মালয়ালম ভাষার প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যায় নবম শতকে ইহুদি ও খ্রীষ্টানদিগকে ভূমি দানের দান-পত্রের তাম্রলিপিতে। কুইলন জেলার কায়ামকুলম শহরের খ্রীষ্টান গীর্জ্জা ৮২৯ শতকে স্থাপিত। ইহার পূর্ব্বে সেণ্ট টমাস ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। ত্রয়োদশ শতকে মার্কোপোলো পশ্চিম উপকূলে খ্রীষ্টান দেখিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে রোমের পোপ কুইলনে এক জন বিশপ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এখন রাজ্যের প্রতি দশ জন লোকের মধ্যে এক জন খ্রীষ্টান। এত খ্রীষ্টান অপর কোন রাজ্যে নাই। শিল্প, বাণিজ্য ও সম্পদে ইহারা অগ্রণী।

নয়া দিল্লীতে রাজধানী থাকায় দিল্লী রাজ্যে জনসমাগম অত্যধিক। বসতির ঘনতায় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন দিল্লী রাজ্য ব্যতীত ভারতের অপর সকল রাজ্যকে অতিক্রম করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এবং অবাঙালী বহিরাগতসহ পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ৮০৬; পশ্চিমবঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের ঘনতা ৯৩৬। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১,০১৫। বসতিহীন বনাঞ্চল বাদ দিয়া হিসাব করিলে বর্গমাইলের ঘনতা দাঁড়ায় ১,৮০০। পৃথিবীর অপর কোন ভূভাগে, প্রধানত কৃষি অঞ্চলে, বর্গমাইল প্রতি এত অধিক লোক বাস করে না। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানে এত অধিক লোকের সমাবেশ এই রাজ্যের প্রধান সমস্যা। পঞ্চাশ বৎসরে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০১ সনের আড়াই গুণ দাঁড়াইয়াছে। ফিলিপাইন ব্যতীত এত লোকবৃদ্ধি আর কোথাও হয় নাই।

প্রাকৃতিক শোভায় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন দাক্ষিণাত্যে অদ্বিতীয়,

উত্তর ভারতেও উহার সমকক্ষ বিরল। লর্ড কার্জ্জনের মতে 'ত্রিবাঙ্কুরের বনভূমি ও উপহ্রদের ছবির চেয়ে অধিকতর মনোহর' পরীর দেশের দৃশ্য আর হয় না। গ্রান্ট ডাফ বলেন, 'এশিয়ার সুন্দরতম ও সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় দেশসমূহের অন্যতম'। সর স্যামুয়েল হোর বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর সুন্দরতম ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশসমূহের একটি ত্রিবাঙ্কুর। দেশের যেমন শোভা, তেমন তার সম্পদ; ইহা জলপথ ও স্থলপথে সমৃদ্ধ; বাস্তবিক ত্রিবাঙ্কুর এমন একটি দেশ যাহার উপর জল ও স্থলের মধুর হাসি ছড়ানো রহিয়াছে।' প্রখ্যাত বস্তুনিষ্ঠ ভূগোল-বিজ্ঞানী ষ্ট্যাম্প দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'দীর্ঘকাল যাঁহারা ভারতে আছেন তাঁহাদের অনেকে এই মনোরম অঞ্চলের অতি অল্পই সংবাদ রাখেন'। জনৈক পর্য্যটক ত্রিবাঙ্কুরকে 'ভারতের উদ্যান' আখ্যা দিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাইব যে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ভারতের উদ্যানই বটে।

প্রাকৃতিক গঠন: পালঘাট গিরিপথের দক্ষিণে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের নাম আনামালাই বা হাতীর পাহাড় আর কার্দ্দামাম বা এলাচি পাহাড়। আনামালাইয়ের শেষ সীমায় আনামুদি গিরিশৃঙ্গ (৮,৮৩৭ ফুট)। ইহা হিমালয়ের দক্ষিণের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ। আনামুদি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের পর্ব্বত। আনামুদির দক্ষিণ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত কার্দ্দামাম বিস্তৃত। সাত হাজার ফুটের অধিক উচ্চ এই আনামালাই ও কার্দ্দামাম ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। রাজ্যের পশ্চিমে আরব সাগর। সাগর ও পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ প্রস্থে বিশ হইতে পঁচাত্তর মাইল। অন্যভাবে বলা যায় সর্ব্বাধিক প্রস্থ কলিকাতা হইতে সাগর দ্বীপের দূরত্বের সমান এবং সর্ব্বনিম্ন প্রস্থ কলিকাতা ও চন্দননগরের দূরত্বের সমতুল। এই সঙ্কীর্ণ রাজ্য তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ উত্তর-দক্ষিণে বিলম্বিত। পূর্ব্ব ভাগে উষ্ণমণ্ডলীয় মৌসুমি অঞ্চলের নিবিড় বনাচ্ছাদিত বিজন পর্ব্বতমালা। পশ্চিমে সমুদ্র-তীরে অতি উর্ব্বর জনবহুল সমতলক্ষেত্র। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল—লাল শিলায় গঠিত তরঙ্গায়িত অনুচ্চ পাহাড় ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে উৎপন্ন শত শত নদী ও ঝোরা লাল পাহাড় খণ্ডিত করিয়া আঁকাবাঁকা পথে আরব সাগরের দিকে ছুটিয়াছে বটে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। মৌসুমি-বায়ু-তাড়িত আরব সাগর বেলাভূমির অদূরে বালির বাঁধ সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ষায় কোন কোন বাঁধ ডিঙাইয়া সাগরের জল ভিতরে প্রবেশ করে, কোথাও বা পারে না। এই সকল বালির বাঁধ অতিক্রম করিয়া সাগরে প্রবেশ করিবার শক্তি নাতিদীর্ঘ ক্ষুদ্র নদীর নাই। তাহাদের বহিয়া আনা জল কাজেই উপকূলের নিম্নাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এই জলভাগের ইংরেজী নাম back water বা lagoon, বাংলায় পারিভাষিক উপহ্রদ, চলিত কথায় হ্রদ, যেমন চিল্কা হ্রদ। এই হ্রদের মালা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনকে অপরূপ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। মালাবার ও কঙ্কণ উপকূলের সর্ব্বত্র এই প্রকৃতির মায়া। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের তটভূমি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত বলিয়া হ্রদ এখানে বড় ও সুন্দর। তটের কোন কোন স্থানে হ্রদের পরিবর্ত্তে জলাভূমি গঠিত হইয়াছে। এই সকল জলাভূমিতে গরান গাছের বন। আরব সাগরের গড়া বালির বাঁধের উপর তাল ও নারিকেল বৃক্ষের সারি। শুধু ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের আড়াই শত মাইল নহে, মালাবার জেলার দেড় শত মাইল জুড়িয়াও উন্নতশীর্ষ তাল-নারিকেলের বেড়া। হ্রদের চারিধারেও তাল এবং নারিকেল।

ধান ও নারিকেলের সবুজে ঢাকা তটভূমির সমতল অতিক্রম করিবার পর দেখা যায় ক্রমোন্নত ল্যাটারাইটের পাহাড় ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। এই অঞ্চল বৃক্ষ-বিরল। পাহাড়ে অঞ্চলের বন্ধুরতা অতি বিচিত্র। পাহাড়ের মাথায় তরঙ্গায়িত মালভূমি আর পাদদেশে অসংখ্য উপত্যকা। চিত্রবৎ নিরালা সঙ্কীর্ণ উপত্যকাসমূহের উভয় পার্শ্বে সর্ব্বত্র সুপারি ও নারিকেল বৃক্ষ। অগণিত নদী ও ঝোরার জলস্রোতের আঁকাবাঁকা পথ অনুসরণ করিয়া উহাদের ধারে ধারে সর্ব্বত্র গড়িয়া উঠিয়াছে ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্র। এই পাহাড়পুঞ্জ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্ব প্রান্তে উত্থিত হইয়াছে নিবিড় বনাকীর্ণ পর্ব্বত-প্রাচীর। এই ক্ষুদ্র দেশে, প্রকৃতির খেলাঘরে কত না বৈচিত্র্য! সত্যই বলা হইয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কুরের মত স্বল্প পরিসরের মধ্যে এত অধিক, এত বিচিত্র ও এত মূল্যবান্ প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী দ্বিতীয় একটি দেশের নাম করা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের একটি অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আলেপ্পি পোতাশ্রয়ের অদূরে বেলাভূমির লম্বালম্বি কয়েকটি কাদা মাটির মগ্ন চড়া আছে। সমুদ্রের দিকে ইহারা কয়েক মাইল বিস্তৃত। চড়াগুলি স্থিতিশীল নহে; আলেপ্পির ১২ হইতে ১৫ মাইল উপকূল ধরিয়া ইহারা গতিশীল হইয়া থাকে। মৌসুমী বায়ুর তাড়নায় সাগরবক্ষে যখন তাণ্ডব নৃত্য চলিতে থাকে তখন এই সকল চড়ার উপরের জল থাকে নিস্তরঙ্গ। ঝড়ের সময় এখানকার শান্ত জলে সমুদ্রপোত নোঙর করিবার স্থান পাওয়া যায়। এই অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করা হয় যে, আলেপ্পি পুরাকড় উপকূলের পশ্চাতের নদী ও হ্রদ এবং সমুদ্রের মধ্যে তটের তলদেশে এক সংযোগ পথ আছে। বর্ষায় নদী ও হ্রদের জলের চাপে হ্রদের নীচের তৈলাক্ত পলি সুড়ঙ্গ পথে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া চলমান চড়া গঠন করে। তরঙ্গাঘাতে তৈলসিক্ত কাদা সমুদ্র জলে মিশিয়া যায়। ফুটন্ত তরল পদার্থে তৈল নিক্ষেপ করিলে ক্ষণকালের জন্য উহার টগবগানি থামে। সেই নিয়মে কাদা মিশ্রিত তৈলের সংস্পর্শে সমুদ্র তরঙ্গ বন্ধ হইয়া যায়। হ্রদ হইতে পলিমাটি অবিরাম আসিতেছে বলিয়া সমুদ্রের নিস্তরঙ্গতা বর্ষাকালে স্থায়ী হইয়া থাকে। এই নোঙর-স্থানের আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, উপকূলের প্রবল বারিপাত ও নদীবাহিত জলের পরিমাণ অধিক বলিয়া সমুদ্রের ভারী নোনা জলের উপর হাল্কা স্বাদু জলের এক পুরু স্তর ভাসিয়া থাকে। নাবিকগণ জাহাজ হইতে

বাসভি কোলয়া সমুদ্রের উপরের এই মিঠা পানীয় জল সংগ্রহ করিতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদ—খনিজ: ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে চীনামাটির বিপুল সঞ্চয় আছে। উৎকৃষ্ট মাটি বাসনাদির জন্য এবং অবিশুদ্ধ মাটি টালি ও ইট প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তাপ ও বিদ্যুতের অন্তরক (insulator) রূপে ব্যবহারের উপযোগী তামাটে অভ্র দক্ষিণ-ত্রিবাঙ্কুরে আছে অল্প পরিমাণে। কিছুকাল পূর্ব্বেও ত্রিবাঙ্কুর গ্রাফাইট উৎপাদনের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। খনির গভীরতা অধিক হওয়াতে গ্রাফাইট উত্তোলন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মধ্য-ত্রিবাঙ্কুরে তামাটে অভ্র বার্ষিক ৫০০ হইতে ১০০০ টন উৎপন্ন হয়। কুইলন হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ১০০ মাইল দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতে টাইটেনিয়াম ধাতুর দুইটি যৌগিক (compound), ইলমেনাইট ও রাটাইল কাল বালির আকারে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। এই স্থানে মোনাজাইট বালিও রহিয়াছে। জিরকন বা গোমেদ, গার্ণেট বা তামা ও সিলিমেনাইট এই বালির সহিত মিশ্রিত আছে। ইলমেনাইট প্রধানতঃ সাদা রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লোহার খাদরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। টাইটেনিয়াম ধাতু নানা গুণের আধার। ইহা ভাবীকালের বহু প্রয়োজনীয় ধাতুরূপে গণ্য হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন। ইলমেনাইট হইতে টাইটেনিয়াম ডায়ক্সাইড প্রস্তুতের একটি কারখানা ত্রিবান্দ্রমে স্থাপিত হইয়াছে। মোনাজাইট কয়েকটি দুর্লভ মৃত্তিকার ফসফেট বিশেষ। ভাস্বর (incandescent) বাতির ম্যান্টল ও ফিলামেণ্ট প্রস্তুতের জন্য ইহার প্রয়োজন। সমুদ্র সৈকতের মোনাজাইট এটম শক্তির একটি উৎস। মোনাজাইট হইতে সিরিয়াম ও থোরিয়াম যৌগিক উৎপাদনের জন্য আলোয়াই শহরে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯১৮ সনে ভারতবর্ষ হইতে নয় লক্ষ টাকা মূল্যের একুশ শত টন মোনাজাইট বালি রপ্তানী হইয়াছিল। মোনাজাইট রপ্তানী এখন ভারত-সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। জিরকন ও গার্ণেট জহরতে ব্যবহারের যোগ্য মূল্যবান প্রস্তর। কাঁচ ও চীনামাটির বাসন-কোসন প্রস্তুত করিতে সিলিমেনাইট আবশ্যক। এ রাজ্যে লোহা, কয়লা অথবা খনিজ-তৈল নাই। বলা হইয়া থাকে যে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ জল। বিপুল পরিমাণে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী নদীর বহু অবতরণ স্থল এখানে রহিয়াছে। ১৯৫১-৫২ সনে রাজ্যে ১৬০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল।

বনজ-সম্পদ: রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে ৪,১৩৫ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া আছে পর্ব্বত ও অরণ্য। সংরক্ষিত অরণ্যের পরিমাণ ২,৪৫৬ বর্গমাইল। আয়তনে এই রাজ্যের তিন গুণের অধিক পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী সর্ব্বপ্রকার বনের পরিমাণ (১৯৫১) ৫,১৭৩ বর্গমাইল। উহার ২,৬৭৪ বর্গমাইল সংরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গে নামী এবং দামী কাঠের অভাব বলিয়া গৃহ ও আসবাব নির্মাণের কাঠের জন্য ব্রহ্মদেশ, মধ্যপ্রদেশ অথবা আন্দামানের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের অরণ্যে প্রায় ৬০০ রকমের কাঠ রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে সেগুন ও কাল কাঠ শ্রেষ্ঠ। কোন কোন স্থানে চন্দন ও আবলুস দেখিতে পাওয়া যায়। চায়ের বাক্স, প্যাকিং কেস, প্লাই-উড ও দিয়াশলাইর উপযোগী নরম কাঠ আছে অফুরন্ত। অন্যান্য রকমারি শ্রেণী গাছ-গাছড়ার ৩,৬০০। তন্মধ্যে বাঁশ ও খাগড়া বিশেষ মূল্যবান। বৎসরে ২৫,০০০ টন খাগড়া সংগৃহীত হইতে পারে।

জলজ-সম্পদ: এই রাজ্যে জলপূর্ণ পুকুর, নদী ও খাল, নদীর মোহনা বা হ্রদ এবং আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর মৎস্যের নিকেতন। ওয়েজ ব্যাঙ্ক (Wadge bank)—ভারত মহাসাগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৎস্যাঞ্চল—ত্রিবাঙ্কুরের অধিকারভুক্ত। সামুদ্রিক মৎস্যাঞ্চলের আয়তন ৮,০০০ বর্গমাইল, কিন্তু বর্ত্তমানে মাত্র ১,২০০ বর্গমাইল স্থানে মৎস্য শিকার করা হইতেছে। রাজ্যে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ এক বৎসরে এক লক্ষ টন বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। মৎস্য এই রাজ্যের অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাইয়া শুষ্ক মৎস্য বিদেশে, প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশে, রপ্তানী করা হয়। ১৯৪০ সনের হিসাব অনুসারে বার্ষিক ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ৪০,০০০ টন এবং উহার মূল্য ছিল ১,২৫ লক্ষ টাকা।

জলবায়ু: কোন কোন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের জলবায়ুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সংযুক্তরাজ্য উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত, আসানসোলের দক্ষিণস্থ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গও উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উভয় অঞ্চলই উষ্ণ। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সাগর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের দুই দিকে সাগর। দুইটিই বৃষ্টিবহুল রাজ্য। এজন্য বায়ু থাকে জলীয় বাষ্পে ভরপুর। দুই রাজ্যেই জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। নিরক্ষরেখার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলেও পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে উষ্ণতা কম, কিন্তু বিশেষত্ব এই যে সারা বৎসর ধরিয়াই গরম প্রায় সমভাবে চলিতে থাকে। এজন্য লর্ড কার্জ্জন ত্রিবাঙ্কুরকে বলিয়াছিলেন চির-গ্রীষ্মের দেশ। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনের রাত্রিতে বেশ উপভোগ্য শীত। এই তিন মাসের নিম্নতম গড় উষ্ণতা ৭৪° এবং চরম উষ্ণতা ৮৭°। পৌষ ও মাঘে কলিকাতার গড় উচ্চতম উষ্ণতা ৮০° এবং নিম্নতম গড় ৫৫°। চৈত্র-বৈশাখ মাসে চরম উষ্ণতার গড় কলিকাতায় ৯৭°, মেদিনীপুরে ১০১°, বর্দ্ধমানে ১০০° এবং আসানসোলে ১০২°। ত্রিবান্দ্রমে তখন গড় চরম উষ্ণতা ৮৯°; কস্মিনকালেও উহা ৯৩° অতিক্রম করে নাই।

মৌসুমী বৃষ্টি উভয় রাজ্যে প্রায় একই সময়ে আরম্ভ ও শেষ হয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন উভয় মৌসুমী বায়ুর সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বারিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উভয় রাজ্যে প্রায় সমান। ত্রিবান্দ্রমে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় প্রায় ৬৭ ইঞ্চি, কলিকাতায় উহা ৬২ ইঞ্চি। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বোচ্চ বারিপাত হয় জলপাইগুড়ি

জেলার বক্সায়, ২১০ ইঞ্চি। কার্দামাম পর্ব্বতের ২০০ ইঞ্চি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের সর্ব্বোচ্চ বৃষ্টিপাত।

দুই মৌসুমী বায়ু হইতে বৃষ্টি পায় বলিয়া ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে বৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব কখনও ঘটে না। সুতরাং দুর্ভিক্ষের সহিত এই রাজ্যের লোকের পরিচয় নাই। তিস্তা, দামোদর, কাঁসাই ও রূপনারায়ণের বন্যার মত বন্যা এখানে অসম্ভব। কালবৈশাখী ও আশ্বিনী ঝড় থাকিলেও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে অজ্ঞাত।

ফল-শস্য: ধান, পাট, চা ও মালদহের আমের নাম করিলে পশ্চিমবঙ্গের ফল ও শস্যের তালিকা প্রায় শেষ হইয়া আসে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের শস্য ও ফলের দীর্ঘ ফর্দ্দ ও রকমারি বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মতই তাহার উৎপাদন-বৈচিত্র্য। তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগের মৃত্তিকা, উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত একরূপ নহে। পরিবেশের উপযোগী বিভিন্ন ফল ও শস্য বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মে। উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল আয়তনে ১,৬৪৮ বর্গমাইল, বীরভূম জেলা অপেক্ষা ১০০ বর্গমাইল ছোট। ইহার গড় প্রস্থ মাত্র ছয় মাইল, এই সঙ্কীর্ণ ভূভাগ আধুনিক সঞ্চিত বালি ও পলিময়। ইহা অতি নিম্ন, কোন কোন স্থানে জলাভূমি—বর্ষায় ডুবিয়া যায়। বৃষ্টিপাত দক্ষিণে ৩৫ ইঞ্চি হইতে উত্তরে ১১০ ইঞ্চি। মৃত্তিকা ধান ও নারিকেল উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। সনাতন পদ্ধতিতে জনগণের প্রধান খাদ্য এখানে উৎপন্ন করা হয়। সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা অনুসারে চারি অঞ্চলে কৃষিকর্ম্মে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে। রাজ্যের মধ্যাঞ্চলের সঙ্কীর্ণ উপত্যকাসমূহেও ধান জন্মে, কিন্তু ইহাতে রাজ্যের ধানের অভাব মিটে না। লোকের উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি নাই। স্থানের অভাব আবশ্যক ধান উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কুইলন জেলার কৃষকগণ গত এক শত বৎসর যাবৎ ভেম্বানাদ হ্রদের জল বাঁধের পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখিয়া পাঞ্জা প্রথায় ধান চাষ করিয়া আসিতেছে। তাহাদের উদ্যম হল্যাণ্ডের জনগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হল্যাণ্ডের লোক সমুদ্র হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে; যে বাঁধ সমুদ্রকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে তাহা রক্ষার জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। ত্রিবাঙ্কুরের জনগণ প্রতি বৎসর ধান কাটিবার পর বাঁধ কাটিয়া জলের পথ করিয়া দেয়। হ্রদের জল ভূমির উপর পলির প্রলেপ দিয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। বর্ষার অন্তে আবার জল সরাইয়া ধানের চাষ করা হয়।

এখানে চাউলের অভাব পূরণে সাহায্য করে টেপিয়োকা, ক্যাসাভা বা শিমুল আলু। মধ্যাঞ্চলে শিমুল আলুর বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। গাছকে বলা হয় শিমুল গাছের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ডগা ভাঙিয়া গাছ খর্ব্ব করিয়া রাখা হয়, রোপণের এক বৎসর পর গাছের মূল হইতে আলু সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নূতন গাছ লাগান নিয়ম। যে কোন মাটিতে টেপিয়োকা জন্মে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা পোকায় কোন ক্ষতি করে না। গাছের ডাল গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য। শিমুল আলুর ছাল ছাড়াইয়া কাঁচা বা রাঁধিয়া খাওয়া যায়। শটির মত ইহার পালো করা হইয়া থাকে। এই পালো হইতে নকল সাগু করিয়া রোগীর পথ্যরূপে বিক্রয় করা হয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে শিমুল আলু ও তাহার পালো স্থানীয় লোকের খাদ্য। বাজারে যে টেপিয়োকা বা নকল সাগু দেখা যায় তাহা আসে মাদ্রাজের সালেম জেলা হইতে। সেখানে প্রতি বৎসর ৩০,০০০ টন টেপিয়োকা প্রস্তুত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বার্লি ও এরারুটের ভেজাল শিমুল আলুর পালো। অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে বাংলা দেশে ক্যাসাভা-উৎপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

নারিকেল গাছ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের কল্পতরু। ঘরের খুঁটি, চালের কাঠামো ও ছাউনি নারিকেল গাছ যোগায়। ফলে হয় তেল, খাদ্য, কাতা, পাপোশ, মাদুর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য। রাজ্যের কর্ষিত ভূমির শতকরা ২৫ ভাগে আছে নারিকেল গাছ। রপ্তানী পণ্যের শতকরা ৩০ ভাগ নারিকেল হইতে উৎপন্ন। ভূমি রাজস্বের শতকরা ২৫ ভাগ এবং শুল্কের শতকরা ৫০ ভাগ নারিকেল বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত।

তালীবর্গীয় বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল ব্যতীত তাল ও সুপারি প্রধান। তালের রসে তাড়ির পরিবর্ত্তে এখন গুড় তৈরি হইতেছে। রাজ্যের উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ দিকে তাল গাছ বেশী। সুপারিবাগ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে অনেক। রাজ্যের প্রয়োজন মিটাবার পর বিস্তর সুপারি রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাজু-বাদাম (cashow-nut) এই রাজ্যের অপর একটি ফল। পশ্চিমবঙ্গে হিজলিতে কাজু-বাদামের চাষ হয়। ছোট গাছে ছোট আমের মত ফল ধরে। বিশেষত্ব এই যে আটি ফলের নীচের দিকে বাহির হইয়া থাকে। এই আটির শাস কাজু-বাদাম। বাদাম ভাজিয়া না নিলে কষের জন্য উহা অখাদ্য হয়। কুইলন শহরে কাজু-বাদাম খাদ্যোপযোগী করিয়া টিনের কৌটায় ভর্ত্তি ও রপ্তানির জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে গোলমরিচের জন্য প্রাচীন কাল হইতে ত্রিবাঙ্কুর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা উৎপন্ন হয় রাজ্যের মধ্যাঞ্চলে। পান জাতীয় লতায় বৎসরে একবার ফল ধরে, আদা এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের ঢালে রবার বৃক্ষের বাগান, প্রায় এক লক্ষ একর ভূমিতে রবার উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্ব-ভাগের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ৭৭,০০০ একরে চা-বাগান, ৩০,০০০ একরে এলাচি-বাগান এবং ১২,০০০ একরে গন্ধতৃণ (lemon grass)। সুগন্ধিদ্রব্যে ব্যবহারের জন্য গন্ধতৃণ হইতে তেল নিষ্কাশন করা হয়। ভারতে গন্ধতৃণ হইতে তেল একমাত্র ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীর ছোট এলাচির শতকরা ৮০ ভাগ এই রাজ্যে জন্মে। দার্জিলিং জেলা

অপেক্ষা ১৫ হাজার একর অধিক জমিতে চা-বাগান আছে, এ রাজ্যের চা উৎকৃষ্ট। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে কফি উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরিমাণ অল্প।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন কৃষি-প্রধান রাজ্য হইলেও সাম্প্রতিককালে কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। নারিকেলের ছোবড়ার আঁশের দ্রব্যাদি প্রস্তুত, নারিকেল তেল নিষ্কাশন, বস্ত্র বয়ন, কৃত্রিম রেশম বয়ন, রবার, কাগজ, কাঁচ, সাবান, চীনামাটির বাসনাদি, এলুমিনিয়াম, দিয়াশলাই, প্লাই-উড, রাসায়নিক দ্রব্য, সার ও বিলাতি মাটি প্রস্তুতির কারখানা শিল্পের মধ্যে প্রধান। এই সকল কারখানায় প্রায় এক লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। ছোবড়ার আঁশ বাহির করা, কাতা প্রস্তুত করা, তাঁত-শিল্প, মাদুর ও ঝুড়ি প্রস্তুত, তালের গুড়, লেস, কাপড়ে বুটা তোলা, কাঠ ও হাতীর দাঁতের কাজ, মাটি ও ধাতুর বাসন-শিল্প, নারিকেলের তেল বাহির করা ও চর্ম্ম-শিল্পে বহু লোক নিযুক্ত থাকে।

কুইলনের কাজু-বাদামের কারখানা নূতন হইলেও বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। উহার সহযোগীরূপে টিনের কৌটার কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বাদাম প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালান হয়।

যাতায়াত ব্যবস্থা : রাজ্যের পশ্চিম-প্রান্তের হ্রদসমূহ খালের দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। ত্রিবান্দ্রম হইতে কালিকট পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ মাইল খোলা সমুদ্রে প্রবেশ না করিয়া হ্রদ ও খালের জলপথে যাতায়াত করা যায়। কোন কোন নদী মোহনা হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নাব্য। রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং উপকূলের প্রত্যেক বন্দরে জলপথে স্বল্পতম ব্যয়ে যাত্রী ও মাল বহনের সুব্যবস্থা রহিয়াছে। রেলপথ আছে দুই শত মাইলের অধিক। রেলপথ মাদ্রাজ রাজ্যের সহিত ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের যোগসাধন করিয়াছে। রাজ্যে স্থলপথে যাতায়াতের উন্নত ধরণের ব্যবস্থা বর্ত্তমান। বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া সড়ক নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় সকল নদীর উপর সেতুর বাঁধ। সড়কের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭,৫০০ মাইল। আমরা দেখিয়াছি পশ্চিমবঙ্গ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের তিন গুণ অপেক্ষা বড়। ১৯৫০ সনে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ১২,১৫৪ মাইল। রাজ্যের আয়তনের প্রতি বর্গমাইলে রাস্তার দৈর্ঘ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক মাইল, গ্রেট ব্রিটেনে ১·৯ মাইল, সমগ্র ভারতে ০·১৯, পশ্চিমবঙ্গে ০·৪১ কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ১·৫ মাইল। পার্ব্বত্য অঞ্চলেও কয়েকটি ভাল ভাল রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান স্থানের মধ্যে সরকারী পরিবহন বিভাগের বাস যাতায়াত করিয়া থাকে। বেসরকারী বাসও চলে। কোচিন ও ত্রিবান্দ্রমে বিমানঘাটি আছে, ইহারা নিয়মিত যাত্রিবাহী বিমানের অবতরণ-স্থল।

বন্দর : কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বন্দর। এই রাজ্যে প্রধান বন্দর কোচিন ব্যতীত আরও পাঁচটি বন্দর আছে। বোম্বাইয়ের দক্ষিণে কোচিনের পোতাশ্রয়ই সর্ব্বোত্তম।

—

হারাবার নয় কিছু

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হে অনাদি অনুদ্বেল মৌন মহা-কবি,
কল্পান্তের অফুরন্ত বর্ণহীন ছবি
অনন্ত আকাশে তব বাঁধিয়াছে নীড়।
অতল অপার সেই শূন্য-বারিধির
নিরুদ্দেশ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া আসে মহা-স্তব্ধতার স্রোতে
মুক্তির আনন্দখানি।
হৃদয়ের তলে তাই আজ মোর করে কানাকানি
শব্দাতীত সুর,
অলক্ষ্য সুদূর।

ক্ষণে ক্ষণে মনে শুধু হয়,
ক্ষণিকের যত সব নিষ্ফল সঞ্চয়
কোনোকালে কিছু তার হারাবার নয় ;
ব্যর্থতার অপরূপ অমরতা লভি'
তোমার আকাশে ঠাঁই পায় তারা সবি।

আমরা ও তাহারা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমেরিকায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্ম্মাণও অতি দ্রুতগতিতে চলিতেছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটন এলাকায় ২০টি বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও সঙ্কুলান হইতেছে না, ভাড়া ও অস্থায়ী বাড়ীতে, লাইব্রেরী-গৃহে, বক্তৃতা-মণ্ডপে, এমন কি "আহার-ঘরেও" শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ওয়াশিংটন এলাকায় যাহা ঘটিতেছে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্রই অবস্থা একই রকমের, এমন কি জটিলতর।

বর্ত্তমানে কেবল শিক্ষাদানের প্রশ্নই একমাত্র প্রশ্ন নহে, ইহার সুষ্ঠু পরিচালনার প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত আছে; সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদ্‌গণ চিন্তান্বিত। তাঁহাদের আশঙ্কা হইতেছে, ছাত্রবহুল বিদ্যালয়সমূহে সুষ্ঠু শিক্ষাদান হইতেই পারে না, ছাত্র-ছাত্রীগণের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। ইহা জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে অতি অনিষ্টকর।

গত এগারো বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৯,৮০,০০০। আগামী বৎসরে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪২,০০,০০০ এবং আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ইহার সংখ্যা হইবে ৫২,০০,০০০।

সমস্যা একটি নহে, বহু—আর্থিক সমস্যাও অন্যতম প্রধান সমস্যা। গত ৫ বৎসরে শিক্ষা-কর দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু ইহার দ্বারাও আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য হইতেছে না। আরও সমস্যা হইতেছে—শিক্ষকের অভাবের মতই বিদ্যালয়সমূহে স্থানের অভাব জটিল। ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। ফলে শিক্ষকগণকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। প্রয়োজন অনুসারে ১৪০,০০০ শিক্ষক কম। আমাদের দেশের মতই সেখানকার সমস্যা হইতেছে—অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারিগণের বেতনের তুলনায় শিক্ষকগণের বেতন কম এবং এই কারণে শিক্ষাদান-বৃত্তি অবলম্বন করিবার উৎসাহও কম।

সমস্যাসমূহ সমাধান সম্পর্কে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বহু আলোচনা, পরামর্শ, তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। অনেক শিক্ষাবিদের মত এই যে, রাষ্ট্রের সাহায্য একান্ত আবশ্যক, সমস্যাকে স্থানীয় সমস্যা আর বলা যায় না, রাষ্ট্রের সমস্যা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষাব্যাপারে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি দেখা যাইতেছে। ইহাতে "শিক্ষাদান-স্বাধীনতা" (academic freedom) লুপ্ত হইবে এবং উহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে। অনেকের অভিমত এই যে, শিক্ষাদান সম্পর্কে স্থানীয় শাসনই নাগরিকগণের জন্ম-অধিকার।

আসল সমস্যা হইতেছে—কি উদ্দেশ্যে কি ধরনের শিক্ষা দেশের পক্ষে উপযোগী হইবে? বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রণালী বিভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেক দেশ উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক হইতে উর্দ্ধতম শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করেন। আমেরিকার শিক্ষাবিদগণ এই মত পোষণ করেন যে, এই সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, আমরা কি ধরনের মানুষ গঠন করিতে চাই তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা। ইহাও খুব কঠিন বিষয়। আগে হইতে নির্দ্ধারণ করা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যতে কি ধরনের পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে। যাহা হউক, কতকগুলি চারিত্রিক মূল বিষয় আছে যাহার দ্বারা যে-কোন রকম পৃথিবীতে বাস করা সম্ভবপর হইবে। গণতান্ত্রিক যুগে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মূল বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক এবং তাহাদের অনুশীলনের প্রয়োজন। প্রথমতঃ ছাত্র-ছাত্রীদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য উপযোগী করিতে ভবিষ্যতের কাজের জন্য তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আনয়ন করিতে হইবে। প্রত্যেকের আত্মজ্ঞান (egs) সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন; নিজের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার। আমি কে, কোথায় আমি যাইতেছি? এই সকল প্রশ্ন শিশু বয়সেই মনের মধ্যে উদয় হয় এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রশ্ন তীক্ষ্ণ হয়, এবং এই সকল প্রশ্নের সরল মীমাংসা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। বয়স্কদের পরিবেশের মধ্যেই আত্মজ্ঞান বলবতী হয়; তবে বয়স্কদেরও মধ্যে আত্মজ্ঞান ও নিশ্চয়তা সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। মাতা-পিতাই এ বিষয়ে প্রধান পরিচালক ও শিক্ষক। পরিবারের মধ্যে, নাগরিকগণের মধ্যে, শিক্ষকদিগের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি থাকা আবশ্যক যাহাদের চারিত্রিক মূল বিষয়গুলি সুদৃঢ় এবং যাহাদের অহং অথবা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা অতি পরিষ্কার এবং যাহাদের নিজ নিজ আদর্শ আছে। বিদ্যালয়গৃহের পরিবেশের মূল্য খুবই বেশী। আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষার প্রধান স্থান হইতেছে—আমাদের বিদ্যালয়সমূহ যে স্তরের শিক্ষাতেই ছাত্র-ছাত্রীরা পৌঁছাক না কেন, ইহার সঙ্গে তাহাদের শক্তি, শক্তি ও সামর্থ্যে বিশ্বাস অর্জ্জন করা দরকার। শিক্ষকদের দায়িত্ব হইতেছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাসের সৃষ্টি করা—এইরূপ বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে জন্মাইতে হইবে যে, তাহারা জীবনে সফল হইবেই হইবে।

ছাত্র-ছাত্রীরা যে পৃথিবীতে যে পরিবেশে বাস করে সেই পৃথিবীকে সেই পরিবেশকে তাহাদের চিনিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। নিজের উপর বিশ্বাস সৃষ্টি করিবার জন্য ইহা বিশেষ

আবশুক। জ্ঞানই শক্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের এই জ্ঞানের মাধ্যমেই শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে, কতকগুলো বই মুখস্থ করাইলেই ছাত্র-ছাত্রীদিগকে জ্ঞান অর্জ্জনে সাহায্য করা হইবে না, উপরন্তু তাহাদের ক্ষতি করা হইবে। এই সম্পর্কে শিক্ষকগণের দায়িত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; পৃথিবীকে—পরিবেশকে ভালভাবে জানিবার, চিনিবার, বুঝিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করাই শিক্ষকদের প্রধান কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাহারাই চিন্তা ও বুদ্ধির উদ্রেক করিতে পারে যদি তাহাদের নিজেদের স্পষ্ট চিন্তাধারা ও বুদ্ধি থাকে এবং যদি তাহাদের এমন সৎসাহস থাকে যাহার দ্বারা তাহারা স্বীকার করিতে পারে তাহারা সকল প্রশ্নের সকল সমস্যার উত্তর দিতে সক্ষম নয়।

চারিদিকের লোকদিগকে বিশ্বাস করা উচিত—এই শিক্ষাও ছাত্র-ছাত্রীগণকে দিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে বন্ধুভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। বন্ধুত্বপূর্ণভাব এবং বিশ্বাস ব্যক্তিত্বের সহায়ক। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া হইল এবং বাপ-মা যাইয়া উপস্থিত হইল এবং যে যার নিজের ছেলের পক্ষ অবলম্বন করিল এই নীতি খুবই ক্ষতিকর।

এই সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

হিমাদ্রি-জাগরণ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

জাগো হিমাদ্রি জাগো!
যুগ-যুগান্তর কার রূপস্বপ্নে
চির-হিম-চুম্বন মাগো!
তাণ্ডব-নর্ত্তন-ক্লান্ত মহেশ্বর
ডমরু রাখিল তব বক্ষে,
ধ্বংসেরি বেদনায় বহ্নি নিভিয়া যায়,
রুদ্র চাহিল স্নেহ-চক্ষে!
অচেতন শিলা তাই লভিল কি সংজ্ঞা,
অশ্রুর বন্যায় উছলিল গঙ্গা,
যমুনা-শিপ্রা-রেবা ফেনিল তরঙ্গা
নামিল কি হেমঝারি কক্ষে?

জাগো হিমাদ্রি জাগো!
যুগ-যুগান্তর কার রূপস্বপ্নে
চির-হিম-চুম্বন মাগো!
কোন্ চির-সুন্দরে হিমশিলাবেদী 'পরে
পূজিতেছ রূপ-রস-গন্ধে,
তুষারের ঝঞ্ঝায় ওঙ্কার প্রাণ পায়
তোমারি ও বন্দনা-ছন্দে!
ছায়াপথ ছায়া করে নীহারিকা ছত্রে,
মন্ত্রের ধ্বনি জাগে নভোজ্যোতি-সত্রে,
বিদ্যুৎ আবাহন রচে মেঘপত্রে,
দিগবধূ কর যুড়ি বন্দে!

জাগো হিমাদ্রি জাগো!
যুগ-যুগান্তর কার রূপস্বপ্নে
চির-হিম-চুম্বন মাগো!
সীমাহীন নীলিমায় তব শির শোভা পায়
দীপ্ত-দিগন্তর-বৃন্তে,
নামে সুর-অপ্সরী পূজারিণীরূপ ধরি
হিম-কণা-উজ্জ্বল নৃত্যে।
ঝিকমিক্ নিশিদিন জাগে তাই চঞ্চল,
কঙ্কন রিনরিন্ তোলে সুর উচ্ছল,
দোলে সানুতটলীন রামধনু-অঞ্চল,
—প্রণমে ভকতি-নত চিত্তে!

জাগো হিমাদ্রি জাগো!
যুগ-যুগান্তর কার রূপস্বপ্নে
চির-হিম-চুম্বন মাগো!
তপন-উদয়-রথ প্রথম পরশে তব
তুঙ্গ শিখর নভোবর্ত্মে,
বিগত, আগত আর অনাগত যুগ লয়ে
তুমিই মিশাও কালাবর্ত্তে!
ধ্যানময় হে তাপস, চাহ যোগভঙ্গে,
শিব-সুন্দরে বর তব উৎসঙ্গে,
দেবতা-আশিস্-ধারা ধরি তব অঙ্গে
স্বর্গ-বারতা দাও মর্ত্ত্যে!

সমাজ-বিজ্ঞান সভার কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠা এবং ইহার প্রথম দিককার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে* কিছু আলোচনা করিয়াছি। শুধু বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতের সমাজ-সম্পৃক্ত সমস্যাসমূহের বিষয় সভার বিভিন্ন অধিবেশনে নানা সারগর্ভ প্রবন্ধের মধ্যে বিবৃত হইত। এই সকল বিষয় লইয়া সভার গুণীমানী সদস্যগণ আলোচনা করিতেন এবং রাষ্ট্রের আইন-কানুন এবং শাসনপ্রণালীও ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইত।

১৮৬৮ সনে সভার বিভিন্ন অধিবেশনে যে-সব প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। এ বৎসর সভার বৈষয়িক কার্য্যাদিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ২১৮ জনে, দশ জন হইলেন আজীবন সদস্য। ইঁহারা সকলেই ছিলেন বোম্বাইয়ের অধিবাসী। অধ্যক্ষসভার অন্যতম প্রধান সদস্য মাণকজী রুস্তমজীর চেষ্টা উদ্যোগেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। এ বৎসরে মজঃফরপুরে সভার একটি শাখা-সমিতি স্থাপিত হয়। সেখানকার গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তিরা ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। উক্ত শাখাসমিতি পরিচালনার জন্য একটি কর্ম্ম-কর্ত্তৃসভাও গঠিত হয়। মূল সভা বৎসরের মধ্যভাগে নীলমণি দে-কে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। সভার আর একটি প্রচেষ্টাও এখানে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা-বিভাগের সম্পাদক কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এইচ. এইচ. লক এবং চন্দ্রনাথ বসু স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রশ্নপত্র রচনা করেন। তাঁহার এই প্রশ্নপত্র সভার সভ্য ও সভ্যব্যতিরেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, শিক্ষা-ব্রতী, মনীষী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট এ সম্পর্কে তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত চাহিয়া পাঠাইলেন। প্রাপ্ত অভিমতগুলি একটি প্রবন্ধাকারে গ্রথিত করিয়া সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয়। একটু পরেই এ সম্বন্ধে বলিতেছি।

সমাজ-বিজ্ঞান সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় কলিকাতা টাউন হলে ১৮৬৯ সনের ৭ই জানুয়ারী। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সভার স্থায়ী সভাপতি জন বাড ফিয়ার। পূর্ব্ববারের মত এবারেও সভাপতি একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভার সম্বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহাদের অধিকতর কর্ম্মতৎপর হইতে অনুরোধ জানান। ইহার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইল পরবর্ত্তী ১৯শে হইতে ২২শে জানুয়ারী। এবারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বিভাগে অতি-প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া কয়েকটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। প্রথম বিভাগে ডাঃ এফ. জে. মৌএট অপরাধ, অপরাধী এবং কারাগারের নিয়ম-



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শৃঙ্খলা সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তখন 'ইন্‌সপেক্টর-জেনারাল অফ প্রিজন্‌স' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাজেই প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বহু তথ্য ও ঘটনার সমাবেশ করিতে সমর্থ হন। পরবর্ত্তী কালের অপরাধী ও কারাগার-সংক্রান্ত সংস্কারের ইহা দিগ্‌দর্শনস্বরূপ হইয়াছিল। আবদুল লতিফ খাঁ মুসলমানদের বিবাহ-আইন এবং পণপ্রথা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়, অর্থাৎ শিক্ষা-বিভাগে পঠিত দুইটি প্রবন্ধ বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই বিভাগের সম্পাদকদ্বয় কর্ত্তৃক স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বৎসর মধ্যে একটি প্রশ্নপত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার যে সকল উত্তর পাওয়া যায় তাহার সার একটি প্রবন্ধাকারে পাঠ করা হয় ২০শে জানুয়ারী (১৮৬৯) তারিখে। স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী, ধরন-ধারণ, কতখানি প্রসার হইয়াছে, এবং দ্রুত প্রসারের উপায় কি এই সব কথা উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রশ্ন তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের

* প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৬২

মনে অত্যন্ত দোলা দিতেছিল। কাজেই এ বিষয়ক আলোচনা বড়ই সময়োপযোগী হয়। উক্ত প্রবন্ধটি পাঠান্তে যে আলোচনা সুরু হয় তাহাতে যোগ দেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। শশিপদ তখনই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে বিবিধ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই বিভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"Compulsory Education in Bengal", অর্থাৎ, বঙ্গে বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক শিক্ষা। প্রবন্ধের রচয়িতা সেযুগের সুবিদ্বান্‌, শিক্ষাব্রতী এবং গ্রন্থকার রেভাঃ লালবিহারী দে। প্রায় নব্বই বৎসর পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা এবং এই উদ্দেশ্যে কার্য্যকর উপায়গুলি সম্বন্ধে কোন কোন মনীষী কিরূপ গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে এই প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন চন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষাবিস্তারে 'filtration theory' অর্থাৎ, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন দ্বারা জনসাধারণের শিক্ষার সুরাহা করা— তখনও সরকারী শিক্ষা-কর্ত্তাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছিল।



ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

চতুর্থ বিভাগেও একাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। পাদ্রি লঙ মুসলমান সম্প্রদায়ের তাৎকালিক অবস্থা এবং তাহার প্রতিকার সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি খুবই চিন্তার খোরাক যোগায়। সভার অন্যতর সম্পাদক সিবিলিয়ান এইচ. বিভালি একটি প্রবন্ধে ভারতের জনসংখ্যা নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভারতের 'সেন্সাস' প্রথম গৃহীত হয় ইহার দুই বৎসর পরে। বিভালির এই প্রবন্ধটি সরকারকে ঐ কর্ম্মে যে কথঞ্চিৎ প্রণোদিত করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই বিভাগের তৃতীয় প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ইহার সম্ভাব্য ভবিষ্য, রচয়িতা চন্দ্রনাথ বসু। এবারে সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "Origin of Hindu Festivals" বা হিন্দু পাল-পার্ব্বণের উৎপত্তি শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন ২১শে জানুয়ারী ১৮৬৯ তারিখে। বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক এই প্রবন্ধটি।

২

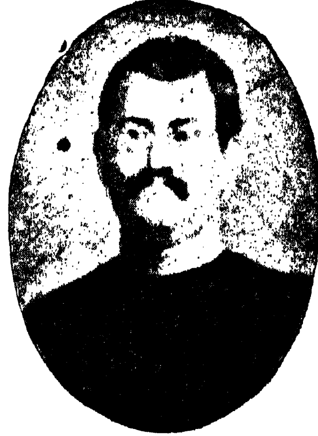
দেখিতে দেখিতে আমরা তৃতীয় বৎসরে উপনীত হইলাম। ১৮৬৯ সনে মূল সভা ও শাখা সভাদ্বয়ের সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইল ২১৮ জন হইতে ২৫৭ জনে। সভার কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটে। বিচারপতি ফিয়ার এতদিন সভাপতি থাকিয়া সভার কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করিয়াছেন। বৎসর মধ্যে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে ডাঃ নর্ম্যান চেভার্স সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। সভার কর্তৃপক্ষ ফিয়ারের কার্য্যকলাপে এত প্রীত ছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করিলেন। ফিয়ারও মানপত্রের যথাযোগ্য উত্তর দিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সময়ে শিক্ষা-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন—এইচ. ব্লকম্যান এবং চন্দ্রনাথ বসু। এ বৎসরে এই বিভাগে বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে নিম্নের বিষয়সমূহের তথ্যাদি ও মতামত আহ্বান করা হয়, যথা—(১) দেশীয় পাঠশালা, (২) বাংলা ও ইংরেজী স্কুল, (৩) কৃষক এবং শিল্পিকদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়, (৪) আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক শিক্ষা, (৫) অর্থের সংস্থান এবং (৬) বিবিধ। ভারতবর্ষে বেনামি সম্পত্তি-বিষয়ক অনুসন্ধানের জন্য অধ্যক্ষ-সভা একটি কমিটি স্থাপন করেন। তাহাতে সদস্য ছিলেন বিচারপতি ফিয়ার, এইচ. বিভালি এবং শ্যামাচরণ সরকার। পরবর্ত্তী ত্রৈমাসিক অধিবেশনে ইহা পেশ করিবার কথা থাকে।

সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইল ১৮৭০ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী। এই দিনে নূতন সভাপতি চেভার্স সমাজ-বিজ্ঞান সভার কার্য্য সম্পর্কে একটি বিশদ ভাষণ দিলেন। কর্তৃপক্ষ এই অধিবেশনে একটি নূতন নিয়ম ধার্য্য করিলেন। সাব্যস্ত হইল, সাধারণ এবং আজীবন সদস্য বাদে কয়েকজন 'অনারারি' বা 'সম্মানিত' সদস্যও সভা মনোনীত করিতে পারিবেন। নিয়ম গ্রহণের পর এবারেই তিন জন সম্মানিত সদস্য নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা যথাক্রমে—মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, মিস মেরী কার্পেন্টার এবং প্রাক্তন সভাপতি জন বাড ফিয়ার। শেষোক্ত দুই জনের কথা

আমরা জানিতে পারিয়াছি। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম জানেন না এরূপ লোক আজকাল খুব কমই দেখা যায়। নাইটিঙ্গেল ১৮৫৬ সনে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইংরেজ কবি টেনিসন 'Lady with the Lamp' ('আলো হস্তে মহিলা) কবিতায় এই বিষয়টি স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার পর মিস নাইটিঙ্গেল স্বদেশে বসিয়াই নানা ভাবে সমাজ তথা মানব-সেবায় রত হন। ভারতবর্ষের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সম্মানিত সদস্যপদে নির্ব্বাচনের সংবাদে তিনি সমাজ-বিজ্ঞান সভাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার মানব-প্রীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। পরে আমরা এই পত্রের বিষয় উল্লেখ করিব।

সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয় ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের কয়েক দিবসে। ১১ই ফেব্রুয়ারী ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই দুই দিনে আইন-বিভাগের প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। চন্দ্রনাথ বসু একটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন—'Registration of Insurance'—অর্থাৎ, বীমা রেজেষ্ট্রী করা সম্পর্কে। বেনামী প্রথা বিষয়ক রিপোর্ট পূর্ব্বোক্ত তিন জন সদস্যের স্বাক্ষরে বিভাগীয় আলোচনার জন্য যথারীতি পেশ করা হইল ২৮শে ফেব্রুয়ারী। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলিল। শিক্ষা-বিভাগে তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রথমটি ছিল 'ন্যাশনাল এডুকেশন লীগ' শীর্ষে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে। লেখক—আর্থার পি. হাওয়েল। এই প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী সাহায্য এবং সরকারের করণীয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর সভায় তর্কের ঝড় উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আলোচনায় যোগদান করিলেন—ডাঃ চেভার্স, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নীলমণি কোঙার, বিচারপতি ফিয়ার, ডি. মারে মিচেল এবং পাদ্রী ষ্টিভেনসন। অন্য দুইটি প্রবন্ধের লেখক ছিলেন যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 'Popular Literature for Bengal' বা বাংলার জনসাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা এবং ইহার উন্নতি ও প্রচারের যথাযথ উপায় নির্দ্দেশ করিলেন এই রচনাটির মধ্যে। কৃষ্ণমোহন পাঠ করিলেন ভারতের লোক ও স্থানের নাম কিরূপে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করিয়া লেখা যায় সেই সম্পর্কে। এই বিষয়টি যুগে যুগে ভারতীয় মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ভারতবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বরাবর তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। জ্বর-মহামারীতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল তখন উজাড় হইতে বসিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেশব্যাপী। কি কি কারণে সুস্বাস্থ্যপূর্ণ অঞ্চলগুলি ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া দাঁড়ায় সেজন্য সরকারী ও বেসরকারী ভাবে অনুসন্ধান চলিয়াছিল। দুর্গতদের দুঃখ, নিবারণের যে চেষ্টা হয় তাহা নিতান্তই সাময়িক। নাইটিঙ্গেল লিখিতে বসিয়া সরকারী বেসরকারী অনুসন্ধানের ফলাফল এবং বিভিন্ন আইনজ্ঞদের মতামত অনুধাবন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জলা, জঙ্গল প্রভৃতিই ম্যালেরিয়ার আকর। ইহা অপসারণের উপায় সম্বন্ধে তিনি কর্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান। তাঁহার এই অনুমান ও জিজ্ঞাসার সারমর্ম তিনি একটি প্রবন্ধের আকারে সমাজ-



কেশবচন্দ্র সেন

বিজ্ঞান সভাকে প্রেরণ করেন। ইহা সভার 'Transactions'-এ On Indian Sanitation' শীর্ষে মুদ্রিতও হইল এই রচনাটির বিষয়বস্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্যোগ করিলেন সভার কর্তৃপক্ষ। সভার পক্ষে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগে পঠিত হয় তিনটি প্রবন্ধ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার রায়তদের অবস্থা', পাদরি লঙের 'সমাজের বিভিন্ন দিক হইতে কলিকাতা ও বোম্বাই' এবং দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গয়া এবং গয়ালি'। এ তিনটির মধ্যেও বিভিন্ন সমস্যার বিষয় আলোচিত হয়। ইহার বেতনভোগী সহ-সম্পাদক নীলমণি দে রচনাটির বঙ্গানুবাদ করেন। উক্ত উদ্দেশ্যে মারাঠীতেও উহার অনুবাদ হইয়াছিল।

৩

দেখিতে দেখিতে আমরা সভার চতুর্থ বৎসরে উপনীত হইলাম। পূর্ব্ব বৎসরে (১৮৭০) সদস্য-সংখ্যা ছিল ২১৯ জন। ইহাদের মধ্যে চারি জন আজীবন সদস্য নূতন হন। তিন জন 'অনারারী মেম্বার' বা সম্মানিত সদস্য-নির্ব্বাচনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহাদিগকেও উক্ত সদস্য সংখ্যার মধ্যে ধরা হয়। সভার নিমিত্ত মিস নাইটিঙ্গেলের নিকট হইতে শতাধিক টাকা সাহায্য-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল। মিস কার্পেন্টারও সভাকে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি দান করেন। ডাঃ চেভার্স বৎসরের মধ্যে সভাপতির পদত্যাগ করায় ডাঃ জোসেফ এওয়ার্ট উক্ত পদে বৃত হইলেন। যুগ্ম-সম্পাদক বিভার্লি পদত্যাগ

করায় তাঁহার স্থলে ক্রমান্বয়ে দুই জন উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এবারকার বার্ষিক অধিবেশন হইল ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ দিবসে। সভাপতি এওয়ার্ট যথারীতি একটি সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। নূতন অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল। অধ্যক্ষ-সভায় যে সকল নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। বিভাগীয় সমিতিগুলিতেও কিছু কিছু রদবদল হইল। শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই সময় জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পেও তিনি কার্য্যকর পন্থা অবলম্বন করেন। আর এই বিষয়গুলি তৎপ্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভার প্রধান অঙ্গ করা হইয়াছিল। এবারে শিক্ষা-বিভাগের সম্পাদক হইলেন—চন্দ্রনাথ বসু এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। প্রতাপচন্দ্র প্রতিটি কার্য্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনাদিতেও একটি নূতন সুর ধ্বনিত হইল।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি, সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনগুলি আর তিন মাস অন্তর অন্তর হয় নাই। বার্ষিক সভার সঙ্গে কি ইহার প্রায় কাছাকাছি সময়ে প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা হইত। এই অধিবেশনগুলিকেই ত্রৈমাসিক অধিবেশন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এবারেও (১৮৭১) আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থ ও বাণিজ্য এই চারি বিভাগে কয়েকটি সুচিন্তিত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইল। সভার সাময়িক পুস্তকে (Transactions) যেসব পঠিত প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে তাহাই আমাদের পুঁজি। অমুদ্রিত অথচ পঠিত কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের জানা নাই। বার্ষিক বিবরণেও পঠিত প্রবন্ধাদির সম্পূর্ণ ফিরিস্তি না থাকায় আমাদের কিছু বলা সম্ভব হইতেছে না।

আইন-বিভাগে পঠিত মাত্র একটি প্রবন্ধ আমরা সাময়িক পুস্তকে পাই। প্রবন্ধটির বিষয়—মফস্বল আদালতে সাক্ষীদের জেরা; লেখক উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা-শাখায় দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়: (১) ভারতের নারীজাতির উন্নতি—কেশবচন্দ্র সেন কৃত (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭১) এবং (২) শারীর-শিক্ষা—ক্যাপটেন আর, জি. গোচ লিখিত (১৮৭১)। প্রবন্ধ দুইটি সম্বন্ধে এখানে একটু বিশদ করিয়া বলিতে হয়। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতিকল্পে কেশবচন্দ্রের কোন কোন উদ্যোগের আভাস দিয়াছি। নারীজাতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট করণীয় রহিয়াছে। আধুনিক ধরনের শিক্ষা বিস্তারের কিছু কিছু প্রয়াস ঐ সময়ে হইলেও তাহা সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করে নাই। এই জন্য তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন আবশ্যক হইয়াছিল। আবার নারীদিগকে গৃহমধ্যে নিয়ত আবদ্ধ না রাখিয়া বহির্জ্জগতের সঙ্গেও তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ সভাসমিতিতে যোগদান, দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধে উক্তরূপ যেসব নির্দ্দেশ ছিল, সদস্যগণ আলোচনায় যোগ দিয়া তাহা মোটামুটি সমর্থন করিলেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ, ডাঃ নর্ম্ম্যান চেভার্স এবং পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনায় যোগ দিয়া নিজ নিজ অভিমতও ব্যক্ত করিলেন। শারীর শিক্ষা সম্বন্ধেও তখন বেশ উদ্যোগ চলিতেছিল। নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার আনুকূল্যে জাতীয় ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন। বেথুন সোসাইটিতে ইতিপূর্ব্বে যুবকদের শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। প্রথমে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় শিশিরকুমার ঘোষ এবং পরে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শারীর চর্চ্চা সম্পর্কে লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। সমাজ-বিজ্ঞান সভায় পঠিত 'শারীর-শিক্ষা' প্রবন্ধটিও বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছিল।

স্বাস্থ্য-বিভাগে একটি এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য-বিভাগে চারিটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনীয়ার ডবলিউ. ক্লার্ক 'কলিকাতায় পয়ঃপ্রণালী' শীর্ষক প্রবন্ধটি স্বাস্থ্য-বিভাগে ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের অধিবেশনে পাঠ করিলেন। তখন কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী লইয়া বিশেষ আলোচনা চলিতেছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার সাধন একান্ত আবশ্যক। ১৮৫২ সনের ৮ই জানুয়ারী বেথুন সোসাইটির প্রথম সভায় সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী কলিকাতার পৌর-স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় একটি প্রবন্ধে এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর চলিয়া যায়, কিন্তু কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী সমস্যায় তখনও তেমন সুরাহা হয় নাই। প্রবন্ধটি এতই দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিশেষ দিন ধার্য্য হয় ১৮৭১ সনের ২৫শে মার্চ্চ। প্রবন্ধটির আলোচনাও হইল সুদীর্ঘ। আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন—সমাজ-বিজ্ঞান সভার সভাপতি ডাঃ এওয়ার্ট, ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী, কেনেথ ম্যাকলাউড, জে. বি. রবার্টস, ডাঃ ডি. বি. স্মিথ এবং সভার অন্যতম সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র।

অর্থ ও বাণিজ্য বিভাগে পঠিত চারিটি প্রবন্ধের মধ্যে তিনটিই ছিল সরকারী রাজস্ব-সংক্রান্ত। যথা—(১) ভারতীয় রাজস্ব বিকেন্দ্রীকরণ—আর নাইট কৃত (২২শে এপ্রিল ১৮৭১), (২) ভারতবর্ষের কর—টি. জে. চিচেলি প্লাউডেন (ঐ) এবং রাজস্বের বিকেন্দ্রীকরণ—টি. জে. সি. গ্রান্ট। ভারতীয় রাজস্ব ব্যয়ের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল, কিন্তু ইহা করা হইত বিলাতস্থ ভারত-সচিবের নির্দ্দেশে। ভারতীয় বাজেট প্রতি বৎসর পার্লামেণ্টে

পাস করাইয়া লইতে হইত। এই সময় এক দিকে ভারত-সরকারের উপর রাজস্ব ব্যয়ের সম্পূর্ণ ভার দেওয়ায় যেমন আন্দোলন চলে, অন্য দিকে তেমনি ভারত-সরকারকে বিভিন্ন প্রদেশের উপর এই ভার অর্পণেরও প্রস্তাব হয়। বড়লাট লর্ড মেওর আমলে এই রাজস্ব বিকেন্দ্রীকরণ সুরু হইয়াছিল। সমাজ-বিজ্ঞান সভার উক্ত দুইটি প্রবন্ধেই এ বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়। বিভিন্ন কল্যাণকর্ম্মে রাজস্ব ব্যয়ের ভার এই সময় হইতে ক্রমশঃ ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে আসিতে থাকে। 'কর' সম্বন্ধীয় রচনাটিও এই পর্য্যায়ে পড়ে। এই তিনটি ব্যতীত অপর প্রবন্ধ ছিল সামাজিক উন্নতি বিষয়ে। লেখক জে. বেমফ্রি ২২শে এপ্রিল তারিখে ইহা পাঠ করেন।

৪

সমাজ-বিজ্ঞান সভা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল। ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয় ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭২ তারিখে। পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল। এবারে দেখিতেছি, সভার সদস্য-সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে যে লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবারের বার্ষিক সভায় বিস্তর গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। ভারতের বড়লাট, প্যাতিয়ালার মহারাজা, বাংলার ছোটলাট প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া সভা-কর্তৃপক্ষকে সবিশেষ উৎসাহিত করেন। সভাপতি ডাঃ এওয়াট যথারীতি তাঁহার ভাষণ দিলেন। নূতন অধ্যক্ষ-সভা প্রায় আগের মতই ছিল। শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি রহিলেন এবারেও কেশবচন্দ্র সেন; সম্পাদকদ্বয়ও দেখিতেছি পূর্ব্ববৎ।

বার্ষিক অধিবেশনের পর সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন। আইন-বিভাগে মাত্র একটি প্রবন্ধ পড়া হয়। বিচারপতি ফিয়ার 'বঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন'—এই নামীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহার আলোচনায় যোগ দিলেন বাংলার ছোটলাট সর্ জর্জ্জ ক্যামবেল এবং শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, সর জর্জ্জ ক্যামবেল বঙ্গদেশে স্থিত হইবার বহু পূর্ব্বে, সভার প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিভাগেও মাত্র একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। শিক্ষা-বিভাগের অন্যতর সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন। চন্দ্রনাথ শিক্ষা-বিভাগের উদ্যোগী সম্পাদক, সভা-প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই সম্পাদকরূপে বাংলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধেও তিনি ইতিপূর্ব্বে সভার একটি অধিবেশনে আলোচনা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি 'Examining Body' (পরীক্ষা-পরিচালকসভা) স্বরূপ গণ্য করা হইলেও দেশের উচ্চশিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে ইহার দায়িত্বও সামান্য নহে। বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক এবং পঠিতব্য বিষয়াদি নির্ব্বাচনের মধ্যে ভারতবাসীর শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা উদ্রেকের যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে অমনোযোগী হইলে বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইবেন। এ বিষয়ক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরাকরণের নিমিত্ত তিনি প্রবন্ধে বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলেন।



সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী

অর্থ ও বাণিজ্য বিভাগে দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনীয়ার ডবলিউ ক্লার্ক লিখিত; বিষয়—কলিকাতার বদ্ধ খিলান (Tied Arch) সম্পর্কে। সাময়িকী পুস্তকে প্রবন্ধটির পরিশিষ্ট-স্বরূপ কলিকাতার ঘরবাড়ীর রকমারি খিলানের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। কলিকাতার পুরানো গৃহাদি নির্ম্মাণ-কৌশল সম্পর্কে যাঁহারা অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে এই সচিত্র প্রবন্ধটি অপরিহার্য্য। এই বিভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। সভার অন্যতম উদ্যোগী-সদস্য পাদ্রী লঙ "ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার গ্রাম-সংস্থা" (Village Communitis in India and Russia) শীর্ষক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি দুই দেশের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। লঙ ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটিতে শুধু বঙ্গদেশ নহে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ সকল অঞ্চলেরই গ্রাম-সংস্থা, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-ব্যবস্থা, পাল-পার্ব্বণ, ভাষা, শাসন-পদ্ধতি, শিল্প-কৃষি প্রভৃতি

জীবিকার উপায়সমূহ—সকলই কমবেশী আলোচনা করিয়াছেন। লণ্ড রাশিয়ায় দুই বার গমন করেন—প্রবন্ধ পাঠের (১৮৭২) পূর্ব্বে এবং পরে। পূর্ব্ব বারেই তিনি কিরূপ গভীরভাবে রাশিয়ার জনগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং বিবিধ গ্রন্থাদি পাঠে প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞান বিবর্দ্ধনে যত্নপর ছিলেন, আলোচ্য প্রবন্ধটি হইতে তাহাও আমরা সবিশেষ জানিতে পারি। দুইটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তুলনা করিয়া সেই যুগেই নানা বিষয়ে উভয় মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তর সামঞ্জস্য তিনি লক্ষ্য করেন। প্রবন্ধে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। লণ্ড প্রবাদ-সংগ্রহে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত ছিলেন। প্রবাদের মধ্যে মানুষের রীতি-নীতি ধরন-ধারণ বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয়। রাশিয়ান প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়াও তিনি উভয় সমাজের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। আজিকার দিনে এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব সমধিক।

৫

মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের একখানি পত্রের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পত্রখানি তিনি সমাজ-বিজ্ঞান সভার কর্তৃপক্ষকে লেখেন ইহার 'সম্মানিত সদস্য' নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রাপ্তির পর। এখানি নানা কারণে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ইহার মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল:

লণ্ডন, মে ২৫, ১৮৭০

ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা যে আমাকে 'সম্মানিত সদস্য' পদে বৃত করিয়াছেন সেজন্য আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন এবং বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করুন।

আপনারা বিশ্বাস করুন, আপনাদের মর্য্যাদা-দান গভীরভাবে আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে; আমি ভাষায় ইহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। কেননা আমি অশক্তা নারী, কার্য্য আর ব্যাধি দুইয়ে মিলিয়া আমাকে যেন পরাভূত করিয়াছে।

গত এগার বৎসর যাবৎ আমি ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দ ও প্রবাসী ইউরোপীয়দের অবস্থার উন্নতির জন্য যৎসামান্য কি করিতে পারিব ইহাই আমার অহোরাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিশ্বনিয়ন্তা এই অবস্থার উৎকর্ষের উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আমার পক্ষে এই সব প্রয়াস সত্যসত্যই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যদি ঈশ্বরানুগ্রহে এই সকল প্রয়াস কতকটা কাজে আসিয়া থাকে এবং আপনারাও যদি ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আমার গভীর আনন্দের কারণ হইবে। আপনারা এজন্য অনেক বেশী কিছু করিতেছেন এবং আমরা ইংলণ্ডে বসিয়াও প্রশংসা ও ধিক্কারের সঙ্গেই উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতবাসীরা কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতিকর্ম্মে আমাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

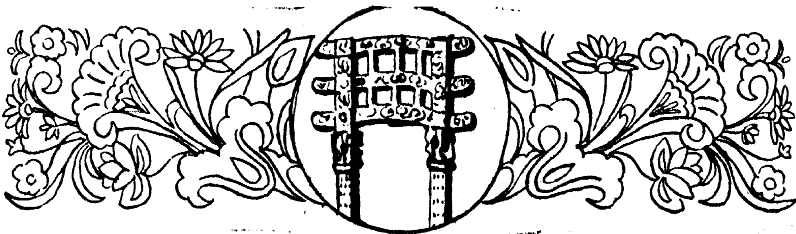
ভারতবর্ষের সম্মুখে যেসব সমস্যা রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিরাট। কিন্তু মানুষ ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর কর্ম্ম করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এখানে একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন ধরুন, সমুদ্রবক্ষ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত কলেরার বীজাণুযুক্ত বিরাট ভূখণ্ডের পয়ঃপ্রণালী ও চাষ-আবাদ সম্পর্ক্ত বিষয়। এই ভূখণ্ডের উপর দিয়া ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং মহানদী প্রবাহিত। এখান হইতে কলেরা ব্যাধি জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। হয়ত আপনারা বলিবেন—বেশ কথা, তবে জগতের চারিদিকে একটি বেষ্টনী লাগাইয়া দিন। কিন্তু ইতিমধ্যেই সমুদ্রাভ্যন্তরস্থ বৈদ্যুতিক লাইন দ্বারা জগৎ পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে। আর এমন দিনও হয়ত আসিবে যখন আপনারা এই বিরাট ভূখণ্ডের জলরাশিকে নিয়ন্ত্রণা-ধীনে আনিতে পারিবেন, যখন আপনারা জল পরিষ্কার করিয়া উর্ব্বর অঞ্চলগুলিতে চাষ-আবাদ পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবেন, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর আবাসভূমি শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিবেন। এ সব যদি বীরশ্রেষ্ঠদের কাব্য বলিয়া গণ্য হয়, তবে আপনারা এই পদবাচ্য হইবার আশা নিশ্চয়ই করিবেন।

সভার সাময়িক পুস্তকগুলি পাইয়াই আপনাদিগকে কয়েকখানি পুস্তকও পাঠাইলাম। এরূপ গৌরবময় সদস্যপদের দক্ষিণাস্বরূপ এক শত টাকা পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেন।

আপনাদের সতত বিশ্বস্ত সেবক,
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

পুনশ্চ—আপনাদের সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। পরে বিস্তারিত ভাবে আরও লিখিবার বাসনা আছে। কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া এই মেলেই আপনাদিগকে ধন্যবাদসূচক এই পত্রখানি পাঠাইলাম।

এফ. এন্,



সম্ভাষণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

উজ্জ্বল করি' সংস্কৃতির সকল দিক
এস হে শিল্পী, এস কবি, এস সাহিত্যিক,
এস জ্ঞানী, এস বিজ্ঞানী ! নাই স্বর্ণাসন,
লও এ কবির শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্ভাষণ।

দীনের ভবন আয়োজনহীন—কি পাব কোথা ?
হৃদয়ের প্রীতি আছে শুধু, আর মিষ্ট কথা।
তোমাদের মত বিশিষ্ট সব শিষ্ট জনে,
জানি—রাখিবে না অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিরে মনে।

মহাকবি আর মহামানবের জন্মভূমি,
আমার পল্লী* আমারে করেছ ধন্য তুমি !
এর মায়াময় ধূলিকণাগুলি স্বপ্ন আনে,
সমীরণ অনুরণিত এখনো রবির গানে।

আকাশে রয়েছে অস্ত-রবির রক্ত রাগ,
এর পথে পথে পড়েছে কত-না স্মৃতির দাগ।
বিবেকানন্দ-পদরেণুপূত পল্লী এই,
প্রণম্য ভূমি—পবিত্র, এর তুলনা নেই।

পুণ্যকীর্ত্তি কালী সিংহের হেথা নিবাস,
জন্মিল হেথা 'পেট্রিয়টে'র কৃষ্ণদাস।
উদার তারক প্রামাণিক, সেই পুণ্যশ্লোক,
আজো হেথা তার দানের মহিমা ভোলে নি লোক।

দেশাত্মবোধে বিদ্যুন্ময় আকাশ হেথা,
রাষ্ট্রনীতির প্রথম চেতনা জাগিল যেথা।
মহাসমিতির প্রথম সভার নায়ক যিনি,
যাঁর নামে পথ, বন্দ্য উমেশচন্দ্র তিনি।

দত্তকুলের—বঙ্গভূমির—অলঙ্কার,
রমেশচন্দ্র এ পল্লীতেই জন্ম তাঁর।
যুগসন্ধির 'সন্ধ্যা' আনিল উপাধ্যায়,
অরবিন্দের স্বপ্ন সফল হ'ল হেথায়।
সেদিন বঙ্গে যাহারা আনিল যুগান্তর
ভয়হীন-চিতে, ছিল যে এখানে তাদের ঘর।

এখানে একদা বঙ্কিম-গুরু গুপ্ত-কবি,
অশ্রু ও হাসি মিশায়ে আঁকিল রসের ছবি।
এই ত সেদিন অক্ষয় কবি আপন মনে
বাজায়ে 'শঙ্খ' গেল কি 'এষা'র অন্বেষণে ?
ফুটিল 'অশোক গুচ্ছ,' রাঙিল ব্রজের রেণু,
দেবেন সেনের মধুর প্রেমের বাজিল বেণু।

রবি-বাসরের এই আসরের একটি কোণে
বসিয়া—তাদের কথা যে বন্ধু পড়িল মনে,
যারা চ'লে গেছে, যারা আজ নাই, তাদের কথা।
কোথা জলধর ? আজ সে শরৎচন্দ্র কোথা ?
কোথা অমূল্য ? রামানন্দ সে কোথায় ভাই ?
প্রফুল্লমুখ প্রফুল্ল আজ হেথায় নাই।

আরো যে বন্ধু অনেকে গিয়েছে অনেক দূরে,
শূন্য আসন, তাদের জন্য নয়ন ঝুরে।
বন্ধু আমার, জীবন এমনি আসা ও যাওয়া,
পথপানে চাওয়া, এমনি হারানো, এমনি পাওয়া।
তারা গেছে, তবু বেঁচে আছে আজো, সেই ত আশা,
তাদের স্নেহ যে, তাদের মধুর সে ভালবাসা।

এসেছ বন্ধু, রহ তবে আজ ক্ষণেক কাল,
মধুর সঙ্গ রচুক না কিছু ইন্দ্রজাল।
হয়—তা বন্ধু, বাড়ী যেতে কিছু হোক না দেরী,
সব দিন ঘোরে একটি দিনের স্মৃতিরে ঘেরি।

---

* কলিকাতার ছয়ের পল্লী—সিমলা-জোড়াসাঁকো অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসী লেখকের ভবনে অনুষ্ঠিত 'রবিবাসরে'র এক অধিবেশনে কবিতাটি পঠিত। রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্য-সভার অধিনায়ক ছিলেন। জলধর সেন ছিলেন সর্ব্বাধ্যক্ষ। স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার এবং পরলোকগত আরও অনে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন ইহার সদস্য।

এসেছিলে মোর দ্বারে

সুমিত্রা

এসেছিলে মোর দ্বারে—
রুদ্ধ আমার দুয়ারে আঘাত
হেনেছিলে বারে বারে।
বধির আমি যে ছিলেম তখন
মত্ত অহঙ্কারে,
ছিলেম যে কোন্ স্বপ্নবিতানে
তব আহ্বান পশে নাই কানে,
অচেনার ভাব দেখে মোর মনে
ফিরে গেলে ব্যথা ভরে।

স্বপ্ন ভাঙিল যবে,
তোমার সে সুর শুনিলাম যেন
বিহঙ্গ কলরবে,
স্মরণপত্রে খুঁজিয়া দেখিনু—
এসেছিলে তুমি কবে!
বাহির হইনু চঞ্চল প্রাণে
তোমার খবর কেহ নাহি জানে
শুধালে, কেন যে মোর মুখপানে
হাসিয়া তাকায় সবে!

শেষে বহুদিন পরে,
ক্লান্ত চরণে নিরাশার বোঝা
বহিয়া ফিরিনু ঘরে,
অদর্শনের বেদনায় মোর
হৃদয় কাঁদিয়া মরে।
এমন সময় হেরিনু চমকি
সমুখে দাঁড়ায়ে হাসিতেছ একি—
আমার ব্যথার মালাখানি দেখি
দুলিছে বক্ষোপরে।

আমার ঈশ্বর

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সুখের স্বরগে সদা থাকে তোমাদের
যেই ভগবান,
বাইবেল-কোরাণ-বেদ পায়নাকো খুঁজে
যাহার সন্ধান—
আমি তারে ফুটপাথে
দেখেছি শীতের রাতে
রোগে আর অনাহারে
কণ্ঠাগত প্রাণ!

গিয়েছি তাহার কাছে, ডেকে তারে আমি
কহিয়াছি কথা,
ছিন্ন কন্থাতলে তার শুনেছি ক্রন্দন—
ক্ষীণ কণ্ঠে কথা।
চিরদুঃখী অসহায়
নমি আমি তার পায়—
তার ম্লান মুখে আঁকা
মুক্তির বারতা!

ঘটা ভরে ধূপ-দীপে পূজে নাকো কেহ
আমার ঈশ্বরে,
নবযুগ-অরুণের অভ্যুদয় তার
চিতাভস্ম 'পরে!
চন্দন চর্চ্চিত নয়—
কুষ্ঠ তার অঙ্গময়,
ভিখারী শঙ্কর সে যে
ভিক্ষাবৃত্তি করে।

কত যে মুরতি তার—ভিক্ষুক-বেকার,
মুটে-গাড়োয়ান,
লাঞ্ছিত কেরানী বেশে পিষিছে কলম
মোর ভগবান!
বস্তির আঁধার ঘরে
বসি' শূন্য শয্যা 'পরে
আধ পোড়া বিড়ি টানে
মুদি' দু'নয়ান!

অন্তরায়

শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

সিঁড়ি ধরে দু'জনের উঠতে নামতে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা।

—তুমি!

—তুমি!

একজনের গলার স্বরের প্রতিধ্বনি আর একজনের গলায়। দু'জনেরই চোখে বিস্ময়, বহুদিন পর হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার আচমকা ভঙ্গী দু'জনেরই। সিঁড়ি দিয়ে হোটেল ওঠা-নামার পথটুকু যে তারা অহেতুক আগলে দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষণিকের জন্যে যেন ভুলে যায়। শীলার এক পা নীচে নামার মুখে, সুখেন্দুর এক পা ওপরে উঠার দিকে—কাঁধে ষ্ট্রাপ ঝোলানো ব্যাগ।

—এখানে হঠাৎ? প্রশ্নটি যেন ফস করে বেরিয়ে যায় শীলার মুখ দিয়ে। একটা বিস্মৃত অতীত সহসা আজ এখানে এভাবে হোটেলের সিঁড়ির মুখে যে প্রকাশ হয়ে উঠবে, সে কল্পনা করে নি।

সুখেন্দুও আশা করে নি পাঁচ বছর আগেকার সেই দাম্ভিক আত্মম্ভরী মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে কখনও। কথা বলার স্পৃহা ছিল না, তবু বললে—কাজ আছে, কয়েকটা দিন আস্তানা গাড়তে হবে হোটেলে।

—ও, যাও—টেনে বলল শীলা। আর কিছু বলার নেই, বলার কোন সুযোগ রাখে নি শীলা নিজেই। পাঁচ বছর আগের এক সান্ধ্য-মুহূর্তের সব সম্পর্ক সে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে নিজে থেকেই। সুখেন্দু বলে এখন সে কাউকে জানে না, চেনে না।

এক পা এক পা করে কয়েকটি সিঁড়ি নেমে গিয়ে হঠাৎ গ্রীবা বাঁকিয়ে শীলা প্রশ্ন করলে—কত নম্বরে উঠছ? আমি আছি চার নম্বরে।

সুখেন্দু পা বাড়িয়েছিল, এই অনধিকার-প্রশ্নে একটু অপ্রসন্ন ভঙ্গী নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—কেন, বিশেষ দরকার আছে কি?

আচমকা যেন আঘাত পেল শীলা। সত্যিই দরকার থাকবার ত কথা নয়! দৃষ্টি নিমেষে জ্বলে উঠল শীলার। আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করে সশব্দে নেমে গেল নীচে।

পথ চলতে চলতে শীলা ভাবল সুখেন্দুর মুখ থেকে ঐ ভর্ৎসনা-ব্যঞ্জক কথাগুলো শোনার সুযোগ তাকে না দিলেই পারত। পাঁচ বছর আগে শীলার মনে যে ভাঙন ধরেছে, ভাঙতে ভাঙতে আজ যে পর্য্যায়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে, তার কোন আঁচ পেয়েছে নাকি সুখেন্দু? আঁচ পেয়েই ওভাবে ভর্ৎসনা করার সাহস পেল নাকি সে? পরিবর্ত্তন হয়ত হয়েছে শীলার। সেদিনের সেই বাড়ী গাড়ি, বিরাট জমিদারী আর জমিদার-পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হিসেবে তার যা কিছু প্রতিপত্তি ছিল, সে সবের হয়ত কিছু নেই আজ। পিতৃবিয়োগের পর ধীরে ধীরে সেসব কোথায় উবে গিয়ে হয়ত আজ সে সামান্য জীবিকা অর্জ্জনের প্রত্যাশী হয়েই পথে পথে ঘুরছে—তবু সেদিনের শীলা আজ একেবারে মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। সেদিনকার যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সে সুখেন্দুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছিল তার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নি, তার জন্যে আজও মনে কোন গ্লানি নেই, কোন খেদ নেই শীলার।

সেদিনের কথাগুলি আজও স্পষ্ট মনে আছে। অজানা কলেজের অচেনা দরিদ্র এক সহপাঠীর সঙ্গে প্রণয়ের ভাব-বিলাস—হ্যাঁ, আজও প্রণয়ের ভাব-বিলাসই বলবে শীলা—তাকে কেন্দ্র করেই জীবন-গ্রন্থির বন্ধন স্বীকার করেছিল। হৃদয়ের সম্পর্ক যেখানে খাঁটি, পারিপার্শ্বিক অসাম্য সেখানে বড় কথা নয়। এ ধরনের চিন্তার বশবর্ত্তী হয়েই একদিন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল সুখেন্দু, শীলার পাশে দাঁড়িয়ে তার বাবাকে প্রণাম করেছিল। এমনকি ঘরজামাই হয়ে থাকার সর্তটিও বড় করে দেখে নি। শীলার বাবার কাছে এ সর্তটি সে সহজেই মেনে নিয়েছিল। মেনে নিয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই আর মেনে চলতে পারে নি। সেই বিরাট পাষাণপুরীর মত বাড়ীটি প্রতি মুহূর্ত্তে নাকি নিষ্পেষিত করছিল তাকে; পরোপজীবী হওয়ার একটা তীব্র জ্বালায় জ্বলে মরছিল সে। শীলার এসব দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পায় নি সে। স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায়, রুক্ষ উদাসভাবে সুখেন্দুর পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর বিরুদ্ধেও সে কিছু বলতে পারে নি।

সুখেন্দুর এসব পরিবর্ত্তন শীলার বাবার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। সামলাতে চেয়েছেন তাকে। বড় বড় লোকের নামে সুপারিশ করা চিঠি হাতে দিয়ে অনেক সময় চাকরির জন্য পাঠিয়েছেন সুখেন্দুকে। প্রথম প্রথম গিয়েছে সুখেন্দু, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ না দেখিয়েই ফিরে এসেছে। কারণটি অবশ্য কয়েকদিন পরেই জানতে পারলেন শীলার বাবা। আর একটি সুপারিশপত্র একদিন হাতে দিতেই, সুখেন্দু সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়ে জানিয়েছিল, অন্য কারুর পরিচয় নিয়ে সে জীবনের যাত্রার সূচনা করতে চায় না।

কথা শুনে অবাক হন নি শীলার বাবা। সুখেন্দুর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে রেখে তিনি প্রস্তুতই হয়ে উঠেছিলেন এ ধরনের কথা একদিন শোনার জন্য। কিন্তু একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি মর্ম্মাহত হয়েছিলেন, ভর্ৎসনা করেছিলেন শীলার অপরিণত মস্তিষ্কের এসব খেয়ালীপনাকে। বলেছিলেন—ভেবে

জলে মিশ খায় না মা। কোথাকার এক গরীব হাঘরের ছেলে, তাকে তুমি আপন করতে চেয়েছিলে।

সুখেন্দুর ভাবান্তর দেখে ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল শীলা। বাবার অপমানটা তাতে আরও ইন্ধন যুগিয়েছিল। বিত্তশালী সম্রান্ত বংশের রক্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। রুক্ষ বিবর্ণ মুখে সুখেন্দুকে একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ঢুকতে দেখেই তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সোজা প্রশ্ন করেছিল—বাবার পরিচয়ে তুমি পরিচিত হতে চাও না?

—তুমি কি আমার কাছে কৈফিয়ত চাও শীলা?—একটু অবাক হয়েই শান্তভাবে প্রশ্ন করেছিল সুখেন্দু।

—হ্যাঁ কৈফিয়তই চাই, আমার বাবাকে অপমান করার সাহস তোমার হ'ল কোথা থেকে?

মৃদু হেসে সুখেন্দু বলেছিল—তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছ শীলা। তোমার বাবাকে অপমান করার মত তেমন কিছু বলি নি আমি। এত সামান্য ব্যাপারে তোমার রাগ করা উচিত ছিল না। মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত, স্বাধীন বৃত্তি এ সবের কি কোন মূল্য নেই তোমার কাছে?

—না নেই, অন্ততঃ তোমার মত লোকের কাছে এসবের কোন মূল্য নেই। আর তা ছাড়া এসব জেনে শুনেই কি তুমি এগিয়ে আস নি?

স্থির অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়েছিল সুখেন্দু, তারপর একটু হেসে বলেছিল—এগিয়ে ঠিক আসি নি, নেমে গিয়েছিলাম অনেকটা। আবার উঠে আসার চেষ্টা করছিলাম মাত্র।

—নেমে গিয়েছিলে? স্ফুলিঙ্গ ঝরছিল শীলার চোখে। তারপর বলেছিল—বাবা ঠিক বলেছেন, তেলে জলে মিশ খায় না। আগাগোড়াই সব ভুল হয়ে গেছে দেখছি।

সুখেন্দু কিছুক্ষণ স্তব্ধ নির্ব্বাক। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরটা আরও অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আলো জ্বালবার কথাটুকুও মনে নেই কারুর। ধীরে ধীরে সুখেন্দু এক সময় বললে—ঠিকই বলেছেন তোমার বাবা। প্রবীণ লোক মিথ্যে বলবেন কেন? ওঁর কথা স্বীকার করে নেওয়ার যেটুকু দ্বিধা ছিল, তোমার মুখে শোনার পর আর সেটুকু রইল না। ভুল হয়েছে বৈকি। একটা বিরাট অসাম্যের মধ্যে আমরা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম—আর শুধু ভুলই হয় নি, এ ভুলের হয়ত কোন চারা নেই।

দৃঢ়স্বরে শীলা বলেছিল—আছে।

অন্ধকারে সুখেন্দুর মুখটা আর দেখা যায় নি, শুধু তার কথাগুলো কানে শোনা গিয়েছিল—যদি থাকে, তার ব্যবস্থা তুমি করে নিও শীলা, আমার আপত্তির কোন কারণ হবে না।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সুখেন্দু আবার বলেছিল, আমি যাবার পর ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দিতে ভুলে যেও না শীলা। আমি থাকাতে তোমাদের বাড়ীটা বড় বেশী যেন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

নিজের দৃঢ়তাটা বজায় রেখেছিল শীলা। একটি রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটকে ভিত্তি করে ওদের জীবনের যে গ্রন্থি রচিত হয়েছিল, সেটুকু ছিন্ন করে দিতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নি।...

তারপর পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি বিত্তশালী প্রাচীন জমিদারবংশ কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তার কোন হদিস রইল না। জমিদারী 'এবোলিশনে' জমি বাজেয়াপ্ত হ'ল, রইল শুধু সেই বিরাট বাড়ী আর তার জাকজমক। বৃদ্ধ নায়েবমশাই হিসেব বুঝিয়ে দিতে এসে একদিন সাশ্রুনয়নে বিদায় চাইলেন। শীলা দেখল বাবার রেখে যাওয়া দেনার দায়ে সবকিছুই যেতে বসেছে, একতাড়া উকিলের নোটিশ শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

তারপর নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব হয়ে সোজা পথে বেরিয়ে আসতে কোন সঙ্কোচ করে নি শীলা। একটা কঠিন বাস্তব সত্যকে সহজে স্বীকার করে নিয়ে এখানে সেখানে মাষ্টারী করেছে, চাকরি করেছে। এই ভাবেই কেটে গেছে একটা বছর। একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান থেকে ইণ্টারভিয়ুর ডাক পেয়ে আজ এসেছে এখানে—কাল দশটায় তার নির্দ্দিষ্ট সময়।

হোটেল ম্যানেজারের দেওয়া চাবি হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে নিজের ঘর খুলতে গিয়ে হঠাৎ তার নম্বরটার দিকে নজর পড়ে গেল সুখেন্দুর। আশ্চর্য্য চার নম্বরের পাশেই পাঁচ নম্বরে তার এই ক্ষণিকের আস্তানা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। জীবনাদর্শের যাচাই বাছাই নিয়ে শীলা ও তার মধ্যে যে তুফান সৃষ্টি হয়েছিল, সে তুফানের প্রচণ্ড বেগে একদিন গ্রন্থিচ্যুত নৌকা দুটো ছিটকে পড়েছিল, আজ আবার কোন ভাগ্যবিড়ম্বনায় একঘাটে এসে তারা ভিড়েছে কে জানে। মনে মনে হাসল সুখেন্দু—বাত্যাহত নৌকার মতই যেন চেহারা হয়েছে শীলার। একটা বিরাট বিপর্য্যয়ের সঙ্কেত ওর সর্ব্বাঙ্গে। সিঁড়ির মুখে তাকে দেখেই সেটুকুর আন্দাজ পেয়েছে সুখেন্দু। স্বাভাবিক কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটুকু দমন করে নিতে হয়েছে। যে বস্তুর একদিন শেষ ঘোষিত হয়েছে, তাকে নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।

সন্ধ্যার কিছু পরে কয়েকটি কাজ সেরে ফিরল শীলা। পাঁচ নম্বর অতিক্রম করে চার নম্বরে এগিয়ে যেতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল। খোলা হা করা দরজাটার অদূরে ক্যাম্পখাটে নিদ্রিত সুখেন্দুকে হঠাৎ নজরে পড়ে গেল। ওর কতটা পরিবর্ত্তন হয়েছে একবার চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হ'ল। একটু যেন বুড়ো হয়ে গেছে সুখেন্দু, রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলগুলোয় কত দিন তেল পড়ে নি কে জানে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারা মুখে। মোটা ময়লা একটা জামার রন্ধ্রপথ থেকে তার শরীরের শুভ্র অংশগুলো দেখা যায়—একমাত্র সম্বল সেই ষ্ট্রাপ দেওয়া ঝোলাটা ঝুলছে র‍্যাকে। ওর নিদ্রিত ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ওদের একত্রে থাকার শেষ কয়েকটা দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল শীলার। সারাদিন

চাকরির জন্তে ছুটোছুটি করে রাত্রে এসে এই ভাবেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত সুখেন্দু—কিছু না বলে অপলকে শুধ্ চেয়ে থাকত শীলা। চেয়ে চেয়ে শুধু জানবার চেষ্টা করত, ও কি হতে চায়, ও কি পেতে চায়! সেদিন যা চেষ্টা করেও বোঝে নি, আজ যেন অতি সহজেই বুঝল শীলা। সুখেন্দুর সেদিনের সেই অটুট মুখভঙ্গীর এতটুকু পরিবর্তন হয় নি আজও—সেদিনের সংগ্রাম আজও বুঝি শেষ হয় নি—ক্লান্ত সৈনিক ক্ষণিক বিশ্রাম করে নিচ্ছে মাত্র।

তার পরের দিন সকালে ওদের দেখা হ'ল বারকয়েক। ঘরে ঢুকতে, বের হতে চোখে চোখ পড়ল, কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। পরস্পরের সম্বন্ধে যা প্রশ্ন জেগেছে দু'জনেই চেপে গেছে। সম্পূর্ণ দুটি অপরিচিত লোক যেন। এর আগে কখন দেখা হয়েছে, বা কোন পরিচয় ছিল, তা বোঝার উপায় নেই।

একই সময়, অর্থাৎ দশটা নাগাদ হস্ত-দন্ত হয়ে আগুপিছু বের হ'ল দু'জনে। একজনের পদধ্বনির আভাস অপর জনে পেল। রাস্তায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একই বাসে উঠে বসল দু'জনে। এবার যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এ আশ্চর্য্য ভাবটুকু অবশ্য অল্পক্ষণ পরেই কেটে গেল। একই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আপিসে পৌঁছে অপেক্ষমাণ মেয়ে-পুরুষদের সারিতে পৃথক পৃথক বসল দু'জনে। মেয়েদের সারিতে শীলা, পুরুষদের সুখেন্দু। অনেকটা যেন মুখোমুখিই। এবার চোখা-চোখি হতেই হেসে ফেলল দু'জনে। আশ্চর্য্য যোগাযোগ—একই ষ্টেনোগ্রাফারের পোষ্টের জন্তে দু'জনেই প্রার্থী। ঐ উদ্দেশ্যেই একই হোটেলে ওঠা, অথচ কারুর কিছু জানা ছিল না।

কমপিটিশনের পরীক্ষা দিয়ে এক সময় বেরিয়ে এল তারা। ফলাফল ঘোষিত হবে কাল।

আপিস ছেড়ে রাস্তার ধারে একে একে এসে দাঁড়াল দু'জনে। সুখেন্দু কি ভেবে পাশে তাকিয়ে বললে, হোটেলেই যাবে ত?

—হুঁ, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল শীলা।

তারপর জনাকীর্ণ পথে ফুটপাথের ধার ঘেসে ঘেসে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে লাগল তারা। কাছের একটা বাস ষ্টপেজে এসে বাস দাঁড়াতেই হঠাৎ সুখেন্দুর চমক ভাঙল। শীলাকে পাশে দেখে বলল, বাসে যাবে নাকি?

শীলা বললে, না থাক, কাল ত আবার আসতে হবে বাসে। তুমি যাবে ত যাও।

জবাব দিল না সুখেন্দু। হাঁটতে হাঁটতে একবার আপাদমস্তক চেয়ে দেখল শীলার। জীর্ণ মলিন শাড়ীর প্রান্তভাগে, ওর শুভ্র-নিটোল পায়ে তালি দেওয়া চটিজুতা যেন একেবারে বেখাপ্পা বেমানান। বাসে না গিয়ে দুটো পয়সা বাঁচাবার মত অবস্থায়ই এসে পৌঁছেছে যেন শীলা। একরাশ কৌতূহল ভিড় করে উঠছিল মনে, কিন্তু সে সব প্রকাশ করার কোন সার্থকতা খুঁজে পেল না সুখেন্দু।

বহুক্ষণ নীরবে পথ চলল দু'জনে। এক সময় হঠাৎ সুখেন্দু প্রশ্ন করলে—ষ্টেনোগ্রাফি শিখেছ দেখছি, স্পীড কত?

শীলা অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল—প্রায় হান্‌ড্রেড টোয়েনটি হবে, তোমার কত?

সুখেন্দু হেসে বললে—আমার আবার স্পীড? ষ্ট্রাপ ঝুলিয়ে এখানে সেখানে পেটেণ্ট ওষুধের ক্যানভ্যাসারি করে বেড়াই—স্পীড যা ছিল ঐ করেই গেছে। পুঁজি শুধ্ কয়েক জায়গায় এ ধরনের চাকরি করার অভিজ্ঞতা।

শীলা গম্ভীর ভাবে বললে—ওটাও কম কথা নয়।

আবার কিছুক্ষণ হাঁটার পর সুখেন্দু প্রশ্ন করলে—থাক কোথায়?

—বিধবা এক পিসীমার কাছে, এখান থেকে দূর এক গ্রামে।

—কেন, বাবা—?

—বাবা নেই।

—নেই?

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুখেন্দু। মনের কৌতূহলগুলো কখন নিজের পথ করে নিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, অত খেয়াল ছিল না। কিন্তু একি কথা বলল শীলা! বাবা নেই!

—না নেই, সঙ্গে সঙ্গে আর সবকিছুই নেই।

বাকি সব কথাটুকু শীলা বলে গেল হাঁটতে হাঁটতে। একটা সহজ সাধারণ পরিণতির বর্ণনা যে ভাবে দিতে হয়, সেই ভাবেই আনুপূর্বিক সব বলে গেল। গলার স্বরে কোন পরিবর্তন ঘটে নি, ঘটার কোন কারণ খুঁজে পায় নি শীলা। জীবন-সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকারণে ভেঙে না পড়ার আত্মপ্রত্যয় তার কোনদিন ব্যাহত হয় নি। পরিহাসচ্ছলে হেসে হেসে সব কথাটুকু বলে গেল। কথা শেষ করে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে বললে—রাজপ্রাসাদ থেকে ছিটকে পড়েছি গ্রাম্য কুটিরে, আকাশ থেকে মাটিতে। আর কিছু না হোক, এবার তোমার সমান সমান হতে পেরেছি, না?

ওর উচ্ছল হাসির স্রোতের সঙ্গে যোগ দিতে পারল না সুখেন্দু! বাকি পথটুকু একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে নীরব হয়ে রইল।

পরের দিন আপিসে টাঙানো নোটিশ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আবার একবার হাসল দু'জনে। বিশ জনের মধ্যে ছ'টাই করে নাম টাঙানো হয়েছে দু'জনের, শীলা ও সুখেন্দুর। বিকেল পাঁচটায় আর একটি পরীক্ষায় ওদের মধ্যে একজনকে বাছাই করে নেওয়া হবে।

পাঁচটায় সময় আবার জড়ো হ'ল দু'জনে, কিন্তু সুখেন্দু যেন বড় ব্যস্ত। এসেই অনাহূতভাবে ঢুকে পড়ল ম্যানেজারের ঘরে। পরক্ষণেই বেরিয়ে এল সেইভাবে। বেরিয়ে আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে চলে গেল হনহনিয়ে।

শীলা কিছু ভেবে দেখবার আগেই ডাক পড়ল ম্যানেজারের ঘরে। সামনে যেতে ম্যানেজার মশাই বললেন—পরীক্ষার আর প্রয়োজন নেই, আপনি কাল থেকে কাজে যোগ দেবেন।

আশ্চর্য্য হয়ে শীলা বললে—সুখেন্দুবাবু না কে তার সঙ্গে আমার আর একটা পরীক্ষা হবার কথা ছিল না ?

ম্যানেজার মশাই বললেন—সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী এখুনি জানিয়ে গেলেন, বিশেষ কারণে তাঁর পরীক্ষায় যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না।

ঝড়ের মত বেরিয়ে এল শীলা। এ কি করেছে সুখেন্দু? নিজের প্রয়োজনের চেয়ে শীলার প্রয়োজনটা বড় করে দেখেছে নাকি? শীলার এ কষ্ট, এ অবস্থা বুঝি সহ্য হয় নি তার? আগের সবকিছুই যদি মন থেকে মুছে গিয়ে থাকে তবে এসব কেন? একের জন্যে অপরের হৃদয় কাঁদা কেন? সুখেন্দুর ঐ রুক্ষ পাগলের মত চেহারা প্রথম দেখে শীলারও বুকটা বুঝি কেঁপে ওঠে নি! ওর সমপর্য্যায়ে নেমে আসার জন্য বুঝি আত্মগৌরব বোধ করে নি সে?

ঝাপসা চোখে পথ দেখে দেখে হোটেলের দিকে ছুটল শীলা। ট্রাপ কাঁধে নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে সুখেন্দু। সিঁড়ির মুখে শীলাকে দেখে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল নীচে। তার পরেই দ্রুত পায়ে হাঁটতে সুরু করে দিল। শীলা ফিরে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই পিছু নিল তার।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, একটা পার্কের কাছাকাছি এসে প্রায় ধরে ফেলল সুখেন্দুকে—দাঁড়াও।

সুখেন্দু আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে দাঁড়াতেই হাঁপাতে হাঁপাতে পাশে এসে দাঁড়াল শীলা। বললে—তোমার সঙ্গে কথা আছে। পার্কের এক নিরিবিলি বেঞ্চিতে হাত ধরে টেনে বসাল সুখেন্দুকে। একটা উদ্গত আবেগ সামলে নিয়ে বললে—তোমার অমন দান-করা চাকরি চাই না আমার।

সুখেন্দু পলকে বুঝলে ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে মৃদু হেসে বললে—আমার ত তবু একটা কিছু আছে, তোমার ত কিছু নেই। এমন চাকরিটা তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না শীলা।

শীলা বললে, তোমার যে কতটা কি আছে, তোমার চেয়ে আমার জানা আছে বেশী। নিজের চেহারাটার দিকে চেয়ে দেখলে নিজেই সেটুকু টের পেতে। আমার দৈন্যটাকে এভাবে তোমার উপহাস না করলেও চলত। আমি যে কতদূর নীচে নেমে গেছি সেটুকু এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলেও হ'ত! আমার—।

শীলা বড় বেশী যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। সুখেন্দু তাকে ব্যস্ত হয়ে থামিয়ে দিয়ে বললে, না না ওসব কিছু নয়। নীচে নেমে আসবে কেন? যুগবিবর্ত্তনের ধাপে ধাপে সবাই একে একে একদিন উঠে আসবে এমনি ভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেখানে সত্যিকারের, সেখানে যত সব অলীক অসঙ্গত ব্যবধানগুলো এমনি করেই একদিন খসে পড়বে। ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় আজ যে সত্যি সত্যিই বড় হতে পেরেছে, তাকে উপহাস করতে যাব কোন্ সাহসে।

অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমশঃ। স্থির অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল তারা। হঠাৎ পার্কের সব বাতিগুলো জ্বলে উঠল একে একে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে হ'ল, আজকের এই সান্ধ্য-মুহূর্ত্তটি আরও যেন মহিমময় হয়ে উঠেছে আর একদিনের এক সান্ধ্য-বিচ্ছেদের জন্য।

এক সময় সুখেন্দুর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে শীলা অস্ফুটস্বরে বললে, তবে আর কোন ব্যবধান নেই বল?

—না নেই।

সুখেন্দুর হাতের মধ্যে শীলার হাতটি একবার শুধু কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।

—

উত্তরবঙ্গের চটকা গান

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

চটকা গান হ'ল ভাওয়াইয়া গানেরই একটি শাখা।

ভাওয়াইয়া গান ভাবের গান। এতে তত্ত্বকথার সন্ধান মেলে। বাউদিয়া সম্প্রদায়ই হ'ল এর গায়ক। এরা অনেকটা বাউলদের মতই, তবে পার্থক্য হ'ল বাউলদের মত এরা সব সময় গৈরিক বসন পরিধান করে না। এ সম্প্রদায়ের ভিতর হিন্দু-মুসলমানে বিশেষ কোন ভেদ-বৈষম্য নেই। কারণ তাদের উপাস্য দেবতা কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে আবদ্ধ নন। বিবাগী বা বাউরা কথা থেকেই বাউদিয়া কথার উৎপত্তি বলে ধরে নেওয়া চলে। এই বাউদিয়ারাই এক নাগাড়ে ভাবের গান—অধ্যাত্ম-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, শোনাতে শোনাতে—মাঝে মাঝে মনটা একটু হাল্কা করবার প্রয়োজন বোধ করলে কিংবা শ্রোতৃবৃন্দের মন থেকে একঘেয়েমি ভাবটা দূর করে দেবার জন্য একটু লঘু রস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে যে গান গেয়ে থাকে তাকেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে চটকা বলে।

ভাওয়াইয়া গানের প্রসার একদিকে কুচবিহার, অন্যদিকে দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ির কোন কোন জায়গায়। কুচবিহারে অবশ্য গ্রামের নিরক্ষর চাষীরাই এর গায়ক। কিন্তু দিনাজপুর, রংপুরের চটকা আর ভাওয়াইয়া অধিকাংশ সময় বাউ-দিয়ারাই গেয়ে থাকে।

পরকীয়া প্রেম ভাওয়াইয়া গানের মূল সুর। তাই তাদের গানে পরকীয়া প্রেমের ভাবটাই সব চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রাধান্যলাভ করেছে। ভগবানকে পেতে হলে সংসারের সব-কিছুকে পরিত্যাগ করে শুধু একমনে তাঁরই ধ্যান করতে হবে। ভগবানকে মনে করতে হবে প্রণয়ীরূপে। তাই সংসারের সকল কাজকর্ম একদিকে ফেলে রেখে দিয়ে তাঁরই শরণ নিতে হবে। তা না হলে ত তাঁকে পাবার কোন সম্ভাবনাই নাই। এজন্যে সাংসারিক জীবনে দুঃখ আসবে, কষ্ট আসবে, অদৃষ্টে নিন্দা-অপবাদও জুটবে কম নয়। কিন্তু তা বলে ত পিছপা হলে চলবে না। কুসুমাস্তীর্ণ পথে বিচরণ করে তাঁকে তো পাওয়া যাবে না, দুর্গম পথে কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে। এই হ'ল বাউদিয়া সম্প্রদায়ের মূলগত মর্ম্মকথা। এই মূল সুরটি এই শ্রেণীর প্রত্যেকটি গানের উপরই কতকটা ছায়াপাত করতে সক্ষম হয়েছে, শুধু চটকা গানে নয়, এই শ্রেণীর অন্তর্গত গাড়োয়ালী, মৈষাল গানেও এই ভাবটি পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

তবে গাড়োয়ালী বা মৈষাল গানে চটকা গানের মত হাল্কা রসের খোরাক মিলবে না। আগেই বলেছি চটকা হ'ল চুটকি অর্থাৎ লঘু রসের পরিবেশন। তত্ত্বকথা, গভীর ভাবের কথা শুনতে শুনতে মন-প্রাণ যখন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখনই এই ধরনের লঘু রসের গান আসরে শ্রোতাদের অনেকটা চিত্ত বিনোদন করে বৈ কি?

বেশীর ভাগ চটকা গানের বিষয়বস্তু সংসারের সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান ইত্যাদি। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রমও যে পরিলক্ষিত না হয় তেমন নয়। তবে তা খুবই সামান্য।

একটি গানের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই:

একটি বড়লোকের মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে এসেছে স্বামীর ঘর করতে। তার মনে দেমাক সে বড়ঘরের কন্যা, সে হ'ল মোড়লের মেয়ে, সে ত আর পাঁচ জনের মত দাসী-বাঁদীর ন্যায় গোয়াল নিকোতে, থালা মাজতে, ভাত রাঁধতে পারে না। তাই শাশুড়ীকে বলছে, দেখ, আমি হলাম মোড়লের মেয়ে, আমার দ্বারা ওসব ছোট কাজকর্ম্ম করানো চলবে না। যদি ভাত খেতে হয় তা হলে তোমাকেই থালা মাজতে হবে, গোয়াল নিকোতে হবে, তা নইলে এখানে ভাত জুটবে না:

"ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই ভাত রান্ধিবার
মুই ত' মোড়লের বিটি
ভাত রান্ধিবার না জানি
ভাত খাও ত ধর আন্ধুনী।

ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই গোবর ফ্যালাইবার
গোবর ফ্যালাইলে হাত গোন্ধাই
খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়
ঝাটামারি মুই গরুর কপালে।"

এ ত গেল শুধু শাশুড়ীর প্রতি বৌয়ের ব্যবহার। এই রকম জবরদস্ত বউয়েরা যে স্বামীকেও একেবারে অনুগত করে রাখবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই চিত্রও পল্লী-কবিদের তুলিকায় অঙ্কিত হয়েছে। লোক-কবিরা নিরক্ষর বটে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ নয়। তাই তারা হালফ্যাশানের কোন কর্ত্তা-গিন্নীর হাবভাব দেখে নিয়ে অনায়াসেই বলতে সক্ষম হয়:

"আমার বাঙলায় করে মন ফাঁপর
চল যাই কইলকাত্তা শহর।
শহরে ভাড়া করলাম ঘর
দোতালার উপর।
দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফাপর।

গিন্নীর ভ্যানিটিব্যাগ, সোনার গয়না গায়
ও গিন্নী বাইনতে বলে লেকে ঘর।

ও গিন্নীর ডুরে শাড়ী, রেশমী চুড়ি
তবু তার মন না রয়।"

লোক-কবিরা কিন্তু একদিকের কথা বলেই নিরস্ত হয় নি। তাদের রচিত সঙ্গীতে শুধু বধূকর্ত্তৃক শাশুড়ীনির্যাতনের কথাই ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, কোন কোন গানে এর বিপরীত দিকটাও ফুটে উঠেছে। কি ভাবে একটি বৌ তার শ্বশুরবাড়ী এসে একদিকে শ্বশুর-শাশুড়ী, অন্যদিকে ননদ-ভাজ-ভাশুরের গঞ্জনা—সর্ব্বোপরি স্বামীরও অত্যাচার সহ্য করছে, তা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত গানটিতে:

আমার শ্বশুর করে ঘুশুর ঘুশুর
ভাশুর করে গোঁসা,
নিদয় হেন স্বামী আস্যা
ধরল চুলের খোপা।

আমার শাশুড়ী আছে ননদী আছে
আছে ভাইগনা বউ
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল
আউগাইল না কেউ।"

অবশ্য বৌটি যদি আর একটু সেয়ানা হ'ত তা হলে কুচবিহারের কৃষাণীদের মত নিশ্চয়ই স্বামীকে সে মুখের উপর শুনিয়ে দিত:

"তখনে না কছিশ তুইরে
হাল চারখান, গরু পাঁচ খান
ছেউটি গরু নেকাই জোকাই নাই,
বাড়ী আসিয়া দেখমু মুই
চাতুরালী করলু তুই
ঘরোৎ তোর ছাউনি দিবার নাই।

তখনে না কছিস তুইরে
মোটা চাউল খাই না,
সরু চাউলের নেকাই জোকাই নাই,
বাড়ী আসিয়া দেখমু মুই,
চাতুরালী করলু তুই,
ঘরোৎ না তোর কাউনের গুড়াও নাই ॥"

কিন্তু চটকাই হোক আর গাড়োয়ালী কিংবা মৈষালই হোক ভাওয়াই শ্রেণীভুক্ত সকল গানের উপরেই পরকীয়া প্রেমমূলক ভাবধারা প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা পরোক্ষ ভাবে এসে পড়বেই। একটি গানের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই :—একটি লোক চলেছে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা করতে। যখন বাড়ী থেকে সে বেরুচ্ছে তখন তার স্ত্রী নিষেধ করছে, 'দেখ কোথায় যাচ্ছ। আজ কালো মুরগীটা ডিম পাড়তে বসেছে। এমন দিনে কোথাও যাত্রা করা উচিত নয়'।*

কৃষাণ ত তার স্ত্রীর কথা কানেই তুলল না। তার মন পড়ে আছে প্রণয়িনীর কাছে। সে এগিয়ে চলল তার গৃহাভিমুখে। কিন্তু নিষেধ না মানার ফল পেতে হ'ল তাকে হাতে হাতে। প্রণয়িণীর শ্বশুরবাড়ীর দিকে গিয়ে প্রথমবার ত তাকে পালিয়ে আসতে হ'ল বাড়ী-ভর্ত্তি লোকজন দেখে। পরে সন্ধ্যা নামলে গিয়ে লুকিয়ে রইল বৌটির রান্নাঘরের পিছনে কলার ঝোপের ভিতর। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! বৌটি না জেনে শুনে ভাতের গরম ফেনটা দিল তার গায় ঢেলে। বেচারীর সারা গায় পড়ল বড় বড় ফোস্কা। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ফিরে এসে ক্ষতস্থানে সে তেল মালিশ করতে সুরু করল।

"আবার বাড়ী ছাড়িয়া কোথা যান
দোহাই আল্লাটে মোর মাথা খান
কাল মুরগীটা ওসন বইস্তাছে।
কণ্ণা আশা দিলি ভরসা দিলি
কলার মোথাত মোক্ বসাইয়া থুলি
সারা রাইত মোক মশা কামড়াইছে।
কণ্ণা আগুম নিগুমটা না বুঝিয়া
ভাতের উতালটা দিলু ঢালিয়া
সোনার অঙ্গে মোর ফোসা পইয়্যাছে।"

কিন্তু পরকীয়া প্রেমের অবস্থা সব জায়গায়ই সমান। রংপুরের এক চটকা গানে অল্পবয়স্ক 'বন্ধু'র জন্য জনৈকা নারীর অন্তরের আকুল আকুতি বড় মর্ম্মস্পর্শীভাবে ফুটে উঠেছে। বেচারী তার প্রিয়তমের মনোরঞ্জন করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। অথচ সে তার ভালবাসা, তার প্রীতির কোন মর্য্যাদা না দিয়েই তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এ কি কম দুঃখের কথা!

"চ্যাংড়া বন্ধুরে,
আমারে ছাড়িয়া যাবিরে কোথায়।
তোমার জন্তে ভেইব্যে ভেইব্যে
হইলাম রে গাছের বাকল
চ্যাংড়া বন্ধু তুই মোর নয়নের কাজল।

তোমার জন্তে কিনিয়া আনলাম
বালুরঘাটের মটর খান
চ্যাংড়া বন্ধু চড়িয়া বেড়ান
তবু ক্যান আমায় ছেড়ে যান।"

লোক-কবিরা নিরক্ষর সন্দেহ নাই। কিন্তু তারা জাত-কবি। তাই তাদের কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই নিঃসৃত হয়েছে অধ্যাত্ম, লৌকিক, সামাজিক—সকল ভাবের, সকল রসের সঙ্গীত। লোক-কবির এই অধ্যাত্ম-সঙ্গীত যেমন অক্ষরজ্ঞানহীন সরল পল্লীবাসীদের ভাবনার খোরাক জোগায়, তাদের মনকে উর্দ্ধমুখী করে, তেমনি তাদের চটকা গানের মাধ্যমে এরা শোনে রঙ্গরসের কথা। এ গান তাদের জীবনের একঘেয়েমি ভাব দূর করে। অন্ততঃ ক্ষণেকের তরেও খুশিতে ভরে উঠে তাদের মন। তারা হৃষ্ট মনে বেঁচে থাকার খোরাক পায়। এমনি ভাবেই ত তারা এগিয়ে চলে জীবনের পথে। শহরের কৃত্রিম বিলাসিতা-বর্জ্জিত তাদের জীবনের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে অব্যাহতভাবে।

---

* রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নিরক্ষর চাষী সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ মুসলমানশ্রেণীর মধ্যে একটা সংস্কার আছে, যেদিন তাদের বাড়ীর কালো মুরগী ডিম পাড়তে বসে সেদিন বাড়ীর পুরুষদের কোথাও যাত্রা করা নিষিদ্ধ।

আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

গ্রাম হইতে নূতন শহরে আসিয়াছি—বড় রাস্তার পাশেই বাস—সুতরাং দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটিত রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া। কত গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, হৈ-হুল্লোড়। যাহা দেখিতাম সবকিছুতেই বিস্ময় লাগিত; কিন্তু এই সকল বিস্ময়ের মধ্যে একটি জিনিস দু'চারি দিনের মধ্যেই আমার কাছে পরম বিস্ময়রূপে দেখা দিল, তাহা হইল একটি মানুষ। রাস্তার সহস্র লোকের ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিবার উপায় নাই, অবিরল জনস্রোতের মধ্যে তিনি অব্যর্থরূপে একক। প্রথম দিন দূর হইতে দেখিয়া সত্যই মনে হইয়াছে—'এমন রূপ হেরি নাই নয়নে!' ষাটের উপরে বয়স, অপূর্ব্ব গৌর দেহ, শুভ্র শ্মশ্রু, আয়ত ললাট, ধীর গমন—সমগ্র মুখমণ্ডলে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি। প্রথম কয়েক দিন আকস্মিকভাবে চোখে পড়িয়াছে—তাহার পরে প্রত্যহ অনন্ত কৌতূহল এবং অজ্ঞাত শ্রদ্ধা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম, দেখিতে পাইলে রাস্তার কাছে আসিয়া তাঁহার দেহ, তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ, তাঁহার চলন, ভাষণ, প্রতিটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম। দেখিতাম তাঁহার মাথায় ছাতা, হাতে লাঠি, পরনে শুভ্র ধুতি, গায়ে শুভ্র একটি কোট, শুভ্র একখানা চাদর জড়ানো, পায়ে পরিষ্কার একজোড়া চটি, প্রতিবার যখন পা ফেলিতেন, তখন প্রতি চাপে পায়ের গৌরবর্ণ গোড়ালিটি ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিত। খানিকক্ষণ হাঁটিলেই ভিড়ের ভিতর হইতে কেহ না কেহ ভিড় কাটাইয়া পাশে সরিয়া রাস্তার উপরেই তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিত; তিনি তাঁহার দক্ষিণ পদ্মহস্ত (যথার্থই পদ্মহস্ত) তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, অভয় দান করিতেন, শান্তস্বরে একটি-দুটি কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তাহার পরে আবার রাস্তার পাশ দিয়া ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া যাইতেন।

একজন শিক্ষকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিতে পারিলাম, এই লোকটি হইলেন আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়।

আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের নাম গ্রামে বসিয়াই বহুভাবে শুনিয়া আসিয়াছিলাম। প্রথম শুনি আমাদের এক ইংরেজীর ক্লাসে—দুইটি ইংরেজী বাক্য-রচনা প্রসঙ্গে। 'By far the best' এবং 'pious' এই দুইটিকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষক মহাশয় দুইটি বাক্য রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; একটি হইল "Of all the Headmasters Jagadish Mukhopadhyay is by far the best"; দ্বিতীয়টি হইল "Jagadish Mukhopadhyay is a pious man"। ইহার পরে নানা প্রসঙ্গে আচার্য্য জগদীশের নাম শুনিয়াছিলাম, বিশেষ করিয়া বরিশালের প্রাণ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রসঙ্গে। ছেলেবেলায় আমরা অশ্বিনীকুমারের 'প্রেম', 'ভক্তিযোগ' প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়াছি; সেই প্রসঙ্গে জানিতাম, এ সব গ্রন্থ আচার্য্য জগদীশ কর্ত্তৃকই সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। ইহা ছাড়া অশ্বিনীকুমার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কথা না জানিতেন তখনকার দিনে এমন শিক্ষিত লোক বরিশাল জেলায় কেহ ছিলেন না; আমরা জানিতাম আচার্য্য জগদীশ শুধু আদর্শ শিক্ষায়তন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রাণ এবং সেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে অবলম্বন করিয়া তিনিই ছিলেন তখনকার দিনে বরিশালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ। বড় প্রতিষ্ঠান যেখানে যাহা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে—একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, তাহার বনিয়াদ—আর বনিয়াদের উপরে নির্ম্মিত বিশাল বিস্তার—সকলের মূলেই থাকে বিরাট ব্যক্তিত্ব; সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের বিচিত্র বহিঃপ্রকাশই হইল সার্থক প্রতিষ্ঠান।

আমি যখন বরিশালের জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে স্থান গ্রহণ করিয়াছি, আচার্য্য জগদীশ তখন ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি দিনে একবার মাত্র যাইতেন, উপরের দিকের এক-আধটা ক্লাস করিয়া চলিয়া আসিতেন। বিদ্যালয়ে যাইবার পথেই আমি তাঁহাকে রাস্তায় দেখিতে পাইতাম। তাঁহার পরিচয় জানিতে পাইয়া আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। তিনি রাস্তা দিয়া যাইবার সময়ে রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—কোন দিক হইতে আসেন, কোন দিকে যান। দেখিলাম, খুব কাছেই থাকেন। ঔৎসুক্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। এক দিন একজন বয়স্ক লোক সহায় করিয়া তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঢুকিতেই একখানি ঠাকুরঘর, তাহার পাশাপাশি দুখানি ছাত্রাবাসের ঘর, ছাত্রদের প্রকাণ্ড খাবার-ঘর—আগাইয়া গেলেই একখানি খড়ের ঘর, তাহারই ভিতরে খাটে বসিয়া আছেন আচার্য্য জগদীশ। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে, আমার গায়ে ছাপানো লতা-পাতার পাড়ওয়ালা একখানা খদ্দরের চাদর; চাদরখানা দেখিতে বেশ সুন্দর ছিল—অনেকেই সুন্দর বলিত, সে বয়সে বিষয়টা আমার বেশ গর্ব্বের ছিল। আমি আচার্য্য জগদীশের যে ঋষিরূপের কথা এত দিন শুনিয়া আসিয়াছি এবং দূর হইতে স্বচক্ষে তাঁহার যে সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার পরে তাঁহার ঘরে ঢুকিতে ভয়ে সঙ্কোচে কেমন আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিতেই তিনি শিশুর মতন হাসিয়া বলিলেন, 'এমন সুন্দর একখানি গায়ের কাপড় গায়ে দিতে আমারও বড় সখ ছিল, কিন্তু কেউ কোনও দিন দিল না।'

তিনি রসিকতা করিয়া কথাটি বলিলেও আমার মনের উপরে উহা দুই কারণে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, প্রথম কারণ ঐ চাদরের প্রসঙ্গে আমার একটা গর্ব্ববোধ, দ্বিতীয় কারণ তাঁহার মুখে সেই শিশুসুলভ হাসি—অতলস্পর্শ সমুদ্রের বুকে সেই হাসির লহর।

অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, একথা বহু-জনবিদিত, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি সত্য বোধ হয় অনুরূপভাবে সুপরিজ্ঞাত নয় যে, এই গড়িয়া তোলার কাজে আচার্য্য জগদীশ ছিলেন এক দিক হইতে অশ্বিনীকুমারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। অশ্বিনী-কুমারেরও ধর্ম্মজীবন ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনেই তাঁহার প্রসিদ্ধি; কিন্তু আচার্য্য জগদীশের কোনও রাজনৈতিক জীবন ছিল না। রাজনীতিকে তিনি সযত্নে এড়াইয়া চলিতেন, নিজেকে নৈতিক জীবনে, ধর্ম্ম-জীবনে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা এবং যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসেন তাঁহাদের নৈতিক জীবন এবং ধর্ম্ম জীবনকে গড়িয়া তোলার প্রেরণাদানই ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত। বরিশালের জীবনকে সামগ্রিকভাবে গড়িয়া তুলিতে অশ্বিনীকুমারের সহিত আচার্য্য জগদীশের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ। বাংলায় যাহাকে স্বদেশী আন্দোলন বলা হয় তাহা বাংলার জাতীয় জীবনে নিছক একটা রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, তখনকার বাঙালীর যে জাগৃতির ইতিহাস তাহার একটা সামগ্রিক রূপ ছিল। তখনকার রাজনীতি বাঙালীর ব্যাপক জীবন-নীতির সহিত যুক্ত ছিল, তাই ধর্ম্ম ও রাজনীতি তখনকার দিনে কোনও স্পষ্ট ভেদরেখা দ্বারা বিভক্ত বা চিহ্নিত ছিল না। আমাদের কৈশোরে আমরা যখন রাজনীতির সহিত যুক্ত হই তখনও আমরা স্বদেশীযুগের একটা রেশ দেখিতে পাইয়াছি। আমরাও আমাদের ছেলেবেলায় জানিতাম, স্বদেশী করিতে হইলে প্রথমে দীর্ঘদিনের একটা প্রস্তুতি চাই, সেই প্রস্তুতির ভিতরে শেষরাত্রে ওঠা, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, স্বাধ্যায়, উপাসনা প্রভৃতি অবশ্যকরণীয় ছিল। মোটামুটি ভাবে আমরাও আমাদের অগ্রজদের নিকট হইতে এই ধারণাই পাইয়া আসিয়াছিলাম, চরিত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে দেশ-সেবার অধিকারই জন্মে না, আর দেশের মুক্তি-কল্পে যে সাধনা আর নিজের মুক্তির জন্য যে সাধনা তাহা দুই নয় —মূলে তাহারা একই। বহু কর্ম্মীকেই আমরা দেশের কাজকে একটা আত্মশুদ্ধির উপায় রূপেই গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। এই জন্যই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি—বিংশ শতকের প্রথম পাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস তাহা নানাভাবে আমাদের ধর্ম্মবোধের সহিত যুক্ত হইয়াই আবর্ত্তিত। দেশ-মাতাকেও এই কারণেই আমরা নানাভাবে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে জগন্মাতার সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি।

এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে, আচার্য্য জগদীশের সহিত কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও বরিশালের রাজনৈতিক ইতিহাসও আচার্য্য জগদীশকে বাদ দিয়া সম্পূর্ণ নহে। বরিশালের যুব-সমাজের উপরে দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন তাহাই রাজনৈতিক জীবনকেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কলেজীয় বিদ্যায় তিনি ছিলেন বি-এ পাস। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁহার কাজ ছিল উপরের দুই-একটি ক্লাসে ইংরেজী পড়ানো। কিন্তু আমরা বড় হইয়া যখন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি তখন দেখিয়াছি, তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগীয় বিদ্যার একটি অপূর্ব্ব সমন্বয় ছিল। কোনও বিষয়েই তাঁহার পল্লবগ্রাহিতা ছিল না—যাহাই জানিতেন গভীরভাবে জানিতেন, স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন রূপে জানিতেন। উত্তরকালে তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যাতারূপেই সর্ব্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধি এবং সর্ব্বজনীন শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু দর্শন এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অধিকার সত্য সত্যই অগাধ ছিল, কিন্তু তাহার পাশেই আমরা দেখিতে পাইয়াছি, স্থানীয় কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপকগণ আসিয়া শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁহার পাশে বসিতেন, সাহিত্যের মধ্যে কত গভীর ভাবে প্রবেশ করা সম্ভব তাহাই আলাপে-আলোচনায় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য। দর্শনের প্রবীণ অধ্যাপকগণকে দেখিয়াছি, সসম্ভ্রমে এক পাশে বসিয়া তাঁহারা নিবেদন করিতেন তাঁহাদের অমীমাংসিত প্রশ্নসকল। আবার প্রবীণ গণিতের অধ্যাপক—গণিতের অধ্যাপক হিসাবে যাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাঁহাকেও দেখিয়াছি জ্যোতিষের অমীমাংসিত অঙ্ক লইয়া আচার্য্যদেবেরই শরণাপন্ন হইতে। আমরা দেখিবার সুযোগ লাভ করি নাই—প্রত্যক্ষদর্শিগণের নিকট শুনিয়াছি, রাতের পর রাত তাঁহার কাটিয়া যাইত উন্মুক্ত আকাশ-তলে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং সঙ্গে কাগজ-কলম লইয়া। একখানি খড়ের কুটীরের মধ্যে দেখিয়াছি আচার্য্য জগদীশের পদপ্রান্তে সর্ব্ব-প্রকারের মনীষা-সম্মেলন।

ধর্ম্মের দিকটা বাদ দিয়াও আদর্শ শিক্ষকরূপেই আচার্য্য জগদীশ আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় বলিয়া মনে হয়। আমাদের আধুনিক যুগে বিদ্যার বিশেষ বিশেষ দিকে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিবার (specialisation) একটা ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে—বিদ্যার বিভিন্ন দিকগুলিকে বিভিন্ন ছকে পৃথককরণের যেন একটা পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য জগদীশের ন্যায় শিক্ষক যে আজ বাংলা দেশে একান্তভাবেই দুর্লভ সে জিনিসটা যথার্থই ভাল কি মন্দ তাহা এই প্রসঙ্গে আর একবার ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে।

অথচ আশ্চর্য্য এই, আচার্য্য জগদীশের কোথাও কোনও আড়ম্বর ছিল না—আস্ফালন ছিল না, ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও নয়; সর্ব্বত্রই একটা গভীর প্রশান্তি। সর্ব্বক্ষেত্রে একটা অটল অপ্রমত্ততাই ছিল তাঁহার এই সর্ব্বপ্রকার প্রশান্তির মূলে।

কথা বলিতেন সকল সময়েই ধীরে—মিষ্ট-ভাষায়। কখনও কাহারও উপরে রাগ করিলে দূর হইতে কণ্ঠস্বরে বা বাচন-ভঙ্গীতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না, শব্দার্থকে লক্ষ্য করিয়া তবে তাহা বুঝিয়া লইতে হইত।

আচার্য্য জগদীশের গৃহই ছিল একটি আশ্রম। আমরা কলেজে পড়িবার সময় যখন তাঁহার বাড়ীতে থাকিতাম, তখন তিনি আমাদের বার বার ঠিকানা বলিয়া দিতেন জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী, আমরা বরাবরই সংক্ষেপে ঠিকানা লিখিতাম, 'জগদীশ-আশ্রম।' এই আশ্রমের এক দিকে ছিল ঠাকুর-ঘর, তাহারই সংলগ্ন কীর্ত্তন-পাঠের সভাগৃহ, অন্য দিকে ছিল কয়েকটি ঘর, তাহাতে বাস করিত স্কুল-কলেজের কিছু ছাত্র—শিক্ষক এবং কখনও কখনও অধ্যাপকগণও থাকিতেন। ইঁহাদের সব লইয়াই ছিল তাঁহার বৃহৎ পরিবার, নিজে তিনি ছিলেন অকৃতদার। ঠাকুর-ঘরে নিত্য দুপুরে ঠাকুর-পূজা হইত, সে পূজার পূজারী ছিল জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আশ্রমের ছাত্ররাই, পূজার মন্ত্র ছিল সম্পূর্ণরূপেই পূজারীদের মনে মনে। সন্ধ্যায় ছাত্ররাই সমবেতভাবে সন্ধ্যারতি ও স্তোত্রপাঠ করিত। এই বাড়ীর কাছেই ছিল শ্মশানের উপরে কালীশ পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত আতুরাশ্রম, রাস্তায় পড়িয়া থাকিত যত নিরাশ্রয় ব্যাধিগ্রস্ত তাহাদের আশ্রয়ই ছিল এই আতুরাশ্রম, ইহার সব ভারও ছিল ছাত্রদের উপরেই।

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পূজা-পাঠ-কীর্ত্তনাদিসহ যে সব উৎসবের ব্যবস্থা ছিল তাহা ব্যতীত প্রতি রবিবার সকালে কীর্ত্তন এবং পাঠের ব্যবস্থা ছিল। পাঠ সাধারণতঃ আচার্য্য জগদীশ নিজে করিতেন। ব্যাকুল আগ্রহে বরিশালের অগণিত নর-নারী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ভিড় করিয়াছে আচার্য্যদেবের গৃহ-প্রাঙ্গণে। সমবেত নর-নারীর মধ্যে যেমন শহরের জ্ঞানী-গুণীদের তেমনই সাধারণ নর-নারীর ভিড়ও দেখিতে পাইতাম, তাহার কারণ, আচার্য্যদেবের পাঠ ছিল সকলেরই জন্য। তাহা একদিকে যেমন জ্ঞানীর জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিত, অন্য দিকে তেমনই অজ্ঞানী ধর্ম্মপিপাসু নর-নারীর তপ্ত হৃদয়েও শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে পারিত। এই কারণেই আচার্য্য জগদীশের শাস্ত্রব্যাখ্যার একটি অমোঘ আকর্ষণ ছিল। জ্ঞান ও প্রেম গঙ্গা-যমুনার মত মিশিয়া গিয়া অপূর্ব্ব তীর্থ-সলিল রচনা করিয়াছিল—যাহার মধ্যে অবগাহনে কাহারই কোনও বাধা ছিল না। শাস্ত্রকে এই ভাবে সর্ব্বজন-উপযোগী করিয়া যে পরিবেশন, আচার্য্য জগদীশের ক্ষেত্রে তাহাতে কোনও সচেতন কৌশল ছিল না, তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানও যেমন ছিল অগাধ, অনুভূতিও ছিল তেমনই গভীর, জ্ঞানকে তিনি অনুভূতি দ্বারা প্রাণবন্ত এবং স্নিগ্ধ করিয়া লইতেন, শাস্ত্রবচনে তিনি চেতনা সঞ্চার করিতেন, প্রেম-ভক্তির সরসতা দান করিতেন, এই ভাবেই তাহা সর্ব্বজন-উপভোগ্য হইয়া উঠিত।

সঙ্গীত এবং পাঠের ভিতরেও তাঁহার সেই শান্ত-সমাহিত ভাবের কোনও দিন কোনও ব্যত্যয় দেখি নাই। ভাবস্থ হইয়া তিনি আরও অতলস্পর্শ হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ঠাকুর-ঘর সংলগ্ন সভা-



আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়

গৃহে কত রকমের কত লোক দেখিয়াছি, সঙ্গীত আরম্ভ হইলে ভাব-বিকারে কাহাকেও সশব্দে হাসিতে দেখিয়াছি, বিবিধ প্রকারে কাঁদিতে দেখিয়াছি, বিচিত্র প্রকারের শব্দ ও অঙ্গ-ভঙ্গি করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে কোনও দিন বিন্দুমাত্র চঞ্চল দেখিতে পাই নাই। একটি নির্দ্দিষ্ট আসনে একখানি চাদর গায় দিয়া নিশ্চল বসিয়া থাকিতেন, প্রবল ভাবাবেগে তাঁহার গৌর-তনু মাঝে মাঝে রক্তবর্ণ হইয়া যাইতে দেখিয়াছি, মাঝে মাঝে দেখিয়াছি, নিমীলিত-নেত্রের দুই প্রান্তে হয়ত দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াছে—কপোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি হাত দিয়া তাহা আস্তে মুছিয়া লইতেন। সঙ্গীতের পরে পাঠের জন্য যখন প্রথম চোখ খুলিয়া চাহিতেন, মনে হইত, কোন দেশ হইতে যেন সহসা ফিরিয়া আসিলেন! লোক দেখাইয়া ধর্ম্মের ভড়ং তিনি কোনও দিনই করিতেন না, সাধন-ভজন করিতেন শেষ রাত্রে—করিয়া আবার বিছানায়ই শুইয়া থাকিতেন।

তাঁহার কাছ হইতে আমরা উপদেশ লাভ করিয়াছি খুব কম—প্রেরণা লাভ করিয়াছি প্রচুর। যেটুকু উপদেশ লাভ করিয়াছি তাহাও ঘটনা-প্রসঙ্গে কথার ফাঁকে ফাঁকে, উপদেশ যে দিতেছেন

তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি নাই। একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। শহরে কোথাও কোনও বাড়ী বিশেষে অসুখ-বিসুখ থাকিলে ছাত্রদের তরফ হইতে পালা করিয়া সেবার ভার লইবার ব্যবস্থা ছিল। এক বাড়ীতে তিনটি টাইফয়েডের রোগী; সেই রাত্রে সেবার ভার পড়িল আমার উপরে এবং কলেজের অন্য দুইটি ছাত্রের উপরে। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনটি রোগীরই খুব সঙ্গীন অবস্থা—বাড়ীতে সেবা শুশ্রূষা করিবার তেমন কেহই নাই—ওদিকে অন্য ছাত্র দুইটিও আসে নাই। সারাটি রাত্র সেই তিনটি রোগী লইয়া আমি নাস্তা-নাবুদের একশেষ। একজনের মাথায় জল দিতেছি, অপরে পিপাসায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—অপরটি পায়খানার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। সারা রাত ইহাদের পরিচর্য্যা করিয়া প্রভাতে যখন বাড়ী ফিরিয়াছি তখন অনিদ্রায় এবং শ্রমে আমার মুখ শুষ্ক, চোখ বসিয়া গিয়াছে। যখন বাড়ী পৌঁছিয়াছি আচার্য্যদেব (আমরা এবং শহরের সকলেই তাঁহাকে স্যার বলিয়া ডাকিতাম) বিছানা হইতে উঠিয়া কেবল ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া কাছে ডাকিলেন, রাত্রের সব খবর জানিলেন—আমার জামাভরা টাইফয়েড রোগীর মল দেখিতে পাইলেন; কোনও উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া শান্তকণ্ঠে আমাকে বলিলেন, 'তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি সারারাত জেগে ভগবানেরই পূজা করে এসেছ, যে নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের পূজা করে ভগবান কিছুতেই তাঁর কোনও অমঙ্গল হতে দিতে পারেন না—এতে তোমার শরীর ও মন আরও ভাল হবে।' সেই প্রভাতে সেই কয়েকটি কথা এমন ভাবেই শুনিলাম—সমস্ত দেহ-মন দিয়া এমন ভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিলাম যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগের সকল যুক্তিতর্ককে হার মানাইয়াও আমার ভিতরে এই একটা একটা দৃঢ় সংস্কার গঠিত হইয়া গিয়াছে যে, যে মানুষ নিঃস্বার্থভাবে ব্যাধিত আর্ত্তের সেবা করে সেই সেবাকার্য্যের দ্বারা তাহার কোনও দিন অমঙ্গল হইতে পারে না।

আমি আই-এ পড়িবার সময় যখন তাঁহার বাড়ীতে থাকি, তখন দেখিতাম তাঁহার বহু অনুরাগী ভক্তের বাড়ী হইতে মহিলারা নানা রকমের সুস্বাদু খাবার নিজেরা রান্না করিয়া তাঁহার খাবার সময় উপস্থিত হইতেন। তিনি এ সব খাদ্য বিশেষ খাইতেন না, কেহ প্রত্যাখ্যাত হইয়া মনে বেদনা না পায় এই জন্য খাইবার সময় সামান্য কিছু খাইয়া বাদ-বাকি কাছাকাছি যাহারা খাইতে বসিত তাহাদের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। সাধারণতঃ খাবার-ঘরে সকল ছাত্রের খাওয়া হইয়া যাইবার পরেই তিনি খাইতে আসিতেন, সুতরাং দুই-চারিজন ভাগ্যবানের কপালেই তাঁহার এই প্রসাদ জুটিত। ঠাকুর-পূজার ভার অনেক সময় আমার উপরে থাকিত, অনেকক্ষণ বসিয়া ঠাকুর-পূজা করিতাম, লোকে আমাকে সেহেতু ভক্তিমান বলিয়া জানিত। কিন্তু এখন অকপটে স্বীকার করিতেছি, ঐ বয়সে লোভ-রিপুকে বশে আনিতে পারি নাই—হয়ত সম্ভবও ছিল না, সুতরাং ঠাকুরঘরে যে দীর্ঘকাল ধ্যান ধরিয়া বসিয়া থাকিতাম তখন ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি এবং আচার্য্যদেবের শ্রীপ্রসাদ কতখানি মিলিয়া মিশিয়া থাকিত তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারি না। যাক, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পাকেচক্রে আচার্য্যদেবের প্রসাদের একটা বিশেষ অংশ আমার কপালে মাঝে মাঝে বেশ জুটিয়া যাইত। একদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন একেবারে—'আর কেউ ছিল না—শুধু সে ছিল আর আমি একা!' আচার্য্যদেব আমাকে আমার থালাখানা লইয়া আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিতে বলিলেন। আমার ত পোয়াবারো! তিনি ভাল ভাল জিনিস প্রায় কিছুই রাখিলেন না, আমার থালায় তুলিয়া দিতে লাগিলেন। উচ্ছ্বাস-প্রাবল্যে আমি আমার মনের অনেক দিনের একটা চাপা প্রশ্ন আর প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না, বলিলাম, 'স্যর, আপনি এ সব খাবার খাইতে চান না, ভালও বাসেন না, তবু এঁরা সব আপনার জন্যই খাবার আনেন কেন? আমরা ত খেয়ে কত খুশী—তবু আমাদের জন্য কেহ একদিনও একটু খাবার আনে না কেন?' তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া স্মিত হাসিলেন—তার পরে বলিলেন, 'ঐটাই জগতের নিয়ম। আমি বেশী কিছু না খেয়ে ফিরিয়ে দিলেও এদের আমার জন্যে কিছু করে শান্তি—সে শান্তি হ'ল জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সংযমকে শ্রদ্ধা জানাবার শান্তি। নিজের বেলায় লোভকে মানুষ হয়ত সংযত করতে পারে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোলুপতার প্রতি তার একটা অশ্রদ্ধা আছে, তাই তোমার লোলুপতা দেখে দয়া বা সহানুভূতিতে তোমাকে হয়ত একদিন আদর করে ডেকে খাওয়াতে পারে—কিন্তু তাতে মানুষের গভীর তৃপ্তি বা শান্তি নাই।'

এমনি স্নিগ্ধ হাস্যে অল্প কথাতেই ছিল তাঁহার উপদেশ। একদিন আমার এক আত্মীয় আসিয়া জগদীশ আশ্রমে আমার কাছে উপস্থিত। প্রয়োজন তাঁহার আমার কাছে নয়, আচার্য্যদেবের কাছে, কিন্তু সরাসরি তাঁহার কাছে যাইতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াই আমার কাছে আসিয়াছেন। শৈশবে বসন্ত রোগ হইয়া তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। একটু বয়স হইবার পর হইতেই তিনি পূজা-আর্চ্চা সাধন-ভজন লইয়াই আছেন। তিনি বলিলেন, এক সাধক তাঁহাকে ললাটদেশে ভ্রূমধ্যে মনস্থির করিয়া জপ-ধ্যানাদি করিতে বলিয়াছেন, তাহা করিয়া কিছুদিন যাবৎ তিনি খুব একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, ইহার প্রতিবিধান কি। আমি তাঁহার বার্ত্তাবহ হইয়া আচার্য্যদেবের নিকট গেলাম, তাঁহাকে একাকী পাইয়া বিনা ভূমিকায়ই কথাটা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি শুনিয়া একটু সময় চুপ করিয়া বলিলেন, 'ওকে গিয়ে বল, আর যেন ভ্রূমধ্যে মনস্থির না করে বুকে মন রেখে ধ্যান-জপ করে—তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' আমি ফস করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা ত স্যর নিয়ম নয়।' তিনি হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, 'তবে কি নিয়ম?' আমি বলিলাম, 'আপনি গীতা পাঠ করবার সময় ত একদিন বলেছেন—দুই ভ্রূর মধ্যে প্রাণকে

সম্যকভাবে স্থির করে।' উত্তরে তিনি কথা না বলিয়া আরও হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, 'ঠিকই বলেছ, তবে সেকথা আমার নয়, গীতার কথা—বলেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—আর বলেছেন অর্জ্জুনের কাছে—তাই অনেকখানি উঁচুতে—একেবারে মাথায়; আর আজকে বলছি আমি—আর বলছি তোমার কাছে—তাই অতখানি উঁচু করে কি আর বলা যায়—একটু নীচু করে বুকে বলছি!' আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তাঁহার আরও একদিনের উপদেশ আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। জন্মাষ্টমী ও দোল উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে খুব বড় উৎসব হইত। জন্মাষ্টমীর দিনে তিনি 'ভাগবত' পাঠ করিতেন। বহু জনসমাগম হইত—সারাদিন পূজা, কীর্ত্তন ও প্রসাদবিতরণ হইত। একবার জন্মাষ্টমীর কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ, জন্মাষ্টমীর দিন পড়িবে।' আমি ত হাতে আকাশের চাঁদ পাইলাম। আচার্য্যদেবের পাঠ শুনিতে শহরের অধ্যাপক, গণ্যমান্য রাজকর্ম্মচারী, উকিল-মোক্তার সবাই আসেন—তাঁহাদের সকলের সামনে দাঁড়াইয়া প্রবন্ধপাঠের কল্পনা আমাকে উৎসাহে এবং আনন্দে রীতিমত স্ফীত করিয়া তুলিল। আমি আদেশমাত্রই শ্রীকৃষ্ণ এবং জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে পড়ায় লাগিয়া গেলাম এবং অচিরে অজীর্ণ তর্কতত্ত্বের একটি স্তূপ করিয়া তুলিলাম। সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া গুরুগম্ভীর এক প্রবন্ধ রচনা করিলাম এবং যথারীতি তাহা পাঠ করিলাম। উপস্থিত সকলেই অতিমাত্রায় তারিফ করিলেন, গণ্যমান্য দুই-একজনে আমার নিকট হইতে লেখাটি চাহিয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, কেহ কেহ পরে পড়িবেন বলিয়া আমার কাছে লেখাটি চাহিয়া রাখিলেন, আমি অপ্রত্যাশিত সাফল্যের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সারাদিন লোকজনের মধ্যে চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম? আচার্য্যদেব সেদিন আমাকে কিছুই বলিলেন না।

চারি-পাঁচ দিন পরে আমি একটা ঘরের দোতলা কাঠে পাটাতনের উপরে বসিয়া পড়িতেছি। বেলা সাড়ে দশটা বাজে। অনেক ছেলেই কলেজে চলিয়া গিয়াছে; আমার সেদিন দেরীতে ক্লাস বলিয়া আমি তখনও বই পড়িতেছিলাম। হঠাৎ আচার্য্যদেবের কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া উঠিলাম। জানালা দিয়া মুখ গলাইয়া দেখিলাম, আচার্য্যদেব গায়ে তেল মাখিয়া গামছা কাপড় লইয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত। আমাকে বলিলেন, 'রামকৃষ্ণ-মিশনে নূতন পুকুর হয়েছে—ভাল ঘাটলা হয়েছে, শুনেছি খুব ভাল জল, আমার সঙ্গে স্নান করতে যাবে?' আমি 'যাব' বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গায়ে মাথায় খানিকটা তেল ঘষিয়া প্রায় লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। পথে চলিতে চলিতে আমার কেমন একটু আশ্চর্য্য লাগিতেছিল। নিজের বাসগৃহের ভিতরেই আচার্য্যদেবের স্নানঘর ছিল—তিনি বরাবরই সেইখানেই স্নান করিতেন—স্নানের জন্য তাঁহাকে কখনও বাহিরে যাইতে দেখি নাই, আজ তবে ব্যাপার কি। পথে তিনি নীরবে হাঁটিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার পাশে পাশে নীরবে চলিলাম। ঘাটে গিয়া তিনি নীরবে এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি করিয়া জলে নামিতে লাগিলেন, আমাকেও এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি করিয়া জলে নামিতে বলিলেন। আমি নামিতে লাগিলাম, নামিতে নামিতে একটা সিঁড়িতে গিয়া বলিলাম, 'আর থই পাব না—আর নামিলে ডুবে যাব।' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ওখানে কত জল হবে?' আমি বলিলাম, 'কত আর হবে, বড় জোর হাত তিনেক।' তিনি বলিলেন, 'তা হলে হাত তিনেক জল হলেই এখন তুমি বেশ ডুবতে পার?' আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বলিলেন, 'তবে আর এখনই অত অসীম—অনন্ত অপার—ঐ অত সব বড় বড় কথায় তোমায় দরকার কি? এখন যেটুকু দরকার আগে দেখ সেইটুকুকেই ঠিক পাচ্ছ কি না—তা পাবার মতন নিজেকে ঠিক তৈরি করে নিতে পারছ কি না; তার পরে যখন বড় হবে—দরকার হবে—বড় বড় সব কথা তখন হবে—কি বল?' বলিয়া আবার হাসিলেন—সেই সৌম্যমূর্ত্তির সেই স্নিগ্ধ হাসি! আমি বুঝিতে পারিলাম, আজিকার সমস্ত আয়োজন এবং কথা সেই সেদিনকার অতটুকু ছোট মুখে অতগুলি বড় বড় কথারই প্রতিষেধক। আর সেই পুকুরের শীতল জলে স্নানটাও কি জীবনের সর্ব্বপ্রকার প্রমত্ততা হইতে মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য?



শ্রীচৈতন্যায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কীর্ত্তন

প্রেমে গড়া তনু প্রেমে গড়া মন যার,
প্রেমে গড়া প্রাণ, নয়নে প্রেমের ধার,
আঁখিতে প্রেমের আলো (১) সবারে বাসিয়া ভালো
যে-তুমি চেতনা জ্বালো বেদনায় বসুধার ঃ
সে-তোমারে করি বন্ধু নমস্কার ॥

আঁখর

(১) আলো জ্বেলেছ···প্রভু তুমি আলো এনেছ···
মহাপ্রভু, ভালবেসেছ···
অপ্রেমের অবনীর অমায় এসে তুমি আলো হেসেছ।

কে বলে ধরণী কুরূপ অন্ধকার,
যেথা রূপ ধরো তুমি নাথ করুণার ?
যে-তুমি সবার কাছে (২) এসে বলো ঃ "ওরে আছে
আছে সে হৃদয় মাঝে—প্রেমে মিলে দেখা তার" ঃ
সে-তোমারে করি বন্ধু, নমস্কার ॥

আঁখর

(২) আছে সে কাছে···দূরে নয় বুকের মাঝে···কাছেই আছে···
ডাকলেই দিতে সাড়া—দরদী কে এমন আছে !···
নয় নয় নয় সে অচিন—এমন আপন কে আর আছে ?

জীবন গরল নয়—সে অমৃতসার,
জানি—যবে বরি চরণধূলি তোমার।
যে তুমি বাজায়ে বাঁশি (৩) যুগে যুগে ফিরে আসি'
দীনতমে ভালবাসি পরালে কণ্ঠহার
সে-তোমারে করি বন্ধু নমস্কার ॥

(৩) প্রিয়তম···প্রেমময় নিরুপম···প্রেমে কে তোমার সম ?···
যুগে যুগে বুকে বুকে রাজো প্রভু, নমো নমো ॥

দাদরা

II সা পা পা | পা পা পা I পা ধা র্সা | ণর্সণা ধা ণা I ণধা পা ধা | ধপা মা পা I
প্রে মে গ ড়া ত নু প্রে মে গ ড়া ম ন ষা - - - - -

মপমা গা -া | -া -া -া I মা মা মা | মা রমা পধা I পগা গা পা | মা মা পা I
- - - - - র প্রে মে গ ড়া প্রা ণ ন য় নে প্রে মে র

মপমা গা মা | গমগা রা গা I রগরা সা -া | -া -া -া I া া পা | পা পা পা I
ধা - - - - - - - - - - র ০ ০ আঁ খি তে প্রে

পা ধা ধা | ধা না র্সনা I ধা পা পা | না ধনা ধা I ধা পা পা | পা পা -া I
মে - র আ লো - - - স বা রে বা সি - য়া ভা লো -

পা পা ধা | ধা না -া I -া -া র্সা | র্সা না ধনা I পা পা ধা | ধা না -া I
আ লো জ্বে লে ছ - - - প্র ভু তু মি আ লো এ নে ছ -

-া -া র্সা | র্সা না ধনা I পা পা ধা | ধা না -া I র্সা -া র্রা | র্সর্র র্গর্মা র্গা I
০ ০ ম হা প্র ভু ভা লো বে সে ছ - অ - প্রে মে র্ অ

র্রা র্গা র্রর্গর্রা | র্সা র্সা র্রর্সা I না -া না | র্সা নর্সনা ধনা I পা পা ধা | ধা না -া I
ব - নীর্ অ মা - - য় এ সে তু মি আ লো হে সে ছ -

-া -া পা | পা পা পা I পা ধা ধা | ধা না র্সনা I ধা পা পা | না ধনা ধা I
০ ০ আঁ খি তে প্রে মে - র আ লো - - - স বা রে বা

ধা পা পা | পা পা -া I -া -া র্সা | র্রা র্রা র্র্সা | র্সা -া র্গা | র্রা র্সা র্র্সা I
সি - য়া ভা লো - ০ ০ যে তু মি চে ত - না জা লো -

না -া র্সা | না ধা না | পা ধা পধা | নর্রা র্সা -া I না না র্রা | র্সা র্সা র্রা I
- - বে দ না য় ব সু ধা - - র্ সে তো মা রে ক রি

না -া র্রা | র্সা র্সা র্র্সা I না র্সা নর্সনা | ধা না ধনধা I পধা পা -া | -া -া -া II
ব ন্ ধু ন ম স্ কা - - - - - - - - - - র্

তালফের—কার্ফা

সা পা পা পা | পা -া পা পা | পা ধা -া র্সা | ণা ধা ধা ণা I ণা ধা পা ধা | ধা পা মা পা I
কে - বা লে ধ - র নী কু রূ - প অ ন্ - ধ কা - - - - - - -

মা পা গা -া | -া -া -া -া I সা মা -া মা | -া মা মা মা | মা মা ধা পা | মা মা মা পা I
- - - - - - - র যে প - রূ - প ধ রো তু মি - না - থ ক রু

পা মা গা মা | মা গা রা গা I রা গা সা -া | -া -া -া -া I
- - - - - - - - - - - - - - - র

দাদরায় প্রত্যাবর্তন

-া -া পা | পা পা পা I পা ধা ধা | ধা না র্সনা I ধা পা পা | না ধনা ধা I
০ ০ যে তু মি স বা - র কা ছে - - - এ সে ব লো

ধা পা পা | পা পা -া I (পা পা ধা | ধা না -া I -া -া র্সা | না ধা না I
ও - রে আ ছে - আ ছে সে কা ছে - - - দূ রে ন য়

পা পা ধা | ধা না -া I পা পা র্রা | র্রা র্সা -া I ৷ ৷ র্সা | র্রা র্রা -া I
বু কে র্ মা ঝে - কা ছে ই আ ছে - ০ ০ ডা ক্ লে ই

র্সা র্মা র্গর্মর্গা | র্রা র্সা র্রর্সা I না -া র্সা | নর্সনা ধা না I পা পা ধা | ধা না -া I
দি - তে সা ড়া - - - দ র দী - কে এ মন্ আ ছে -

৷ ৷ সা | রা গা মা I পা -া ধা | না র্সনা ধপা I ৷ ৷ গা | মা পা ধা I
০ ০ ন য় ন য় ন - সে অ চি ন ০ ০ এ মন্ আ পন্

না নর্সা র্রর্গা | র্রা র্সা -া I)} -া -া র্সা | র্রা র্রা র্সা I র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা র্রর্সা I
কে আ র আ ছে - ০ ০ আ ছে সে - হৃ দ য় মা ঝে -

না -া র্সা | র্সা না ধনা I পা ধা পধা | নর্রা র্সা -া I না না র্রা | র্সা র্সা র্রা I
- - প্রে মে মি লে দে খা তা - - র সে তো মা রে ক রি

না -া র্রা | র্সা র্সা র্রর্সা I না র্সা নর্সনা | ধা না ধনধা I পধা পা -া | -া -া -া I
ব ন্ ধু ন ম স্ কা - - - - - - - - - - র্

তালফের—তেওড়া

সা পা পা | পা -া | পা পা I পা ধা র্সা | ণা ধা | ধা ণা I ধা পা ধা | পা মা | মা পা I
জী ব ন গ - র ল ন য় সে অ - মৃ ত সা - - - - - -

মা পা গা | -া -া | -া -া I সা মা মা | মা মা | মা মা I মা মা ধা | পা -া | মা পা I
- - - - - - র জা - নি য বে ব রি চ র ণ ধূ - লি তো

দাদরায় প্রত্যাবর্তন

পা মা গা | মা গা | রা গা I রা গা সা | -া -া | -া -া I
মা - - - - - - - - - - - - র

া া পা | পা পা পা I পা ধা ধা | ধা না সা́না I ধা পা পা | না ধনা ধা I
০ ০ যে তু মি বা জা - য়ে বাঁ শি - - - যু গে যু গে

ধা পা পা | পা পা -া I া া সা́ | রা́ রা́ রসা́ I সা́ -া গা́ | রা́ সা́ রসা́ I
ফি - রে আ সি - ০ ০ দী ন ত মে ভা - লো বা সি -

না -া সা́ | না ধা না I পা -া ধা | পধা নরা́ সা́ I না না রা́ | সা́ সা́ রা́ I
- - প রা লে - ক ণ্ ঠ হা - র সে তো মা রে ক রি

না -া রা́ | সা́ সা́ রসা́ I না সা́ নসা́না | ধা না ধানধা I পধা পা -া | -া -া -া II
ব ন্ ধু ন ম স্ কা - - - - - - - - - - র

-া -া না | ধা না পা I -া -া রা́ | সা́ না ধা I না পা না | ধা না পা I
০ ০ প্রি য় ত ম - - প্রে ম ম - - য় নি রু প ম

-া -া সা́ | রা́ রা́ সা́ I সা́ সা́ গা́ | রা́ সা́ -া I না সা́ গা́ | রা́ সা́ না I
০ ০ প্রে মে কে - তো মা র স ম - যু গে - যু গে -

ধা না রা́ | সা́ না ধা I া পা গা | মা পা ধা I না সা́ রা́ | গা́ রসা́ -া I
বু কে - বু কে - - - রা জো প্র ভু ন - মো ন মো -

গান্ধীজী ও সমাজসেবা

ডাঃ সুশীলা নায়ার

সমাজকর্ম্মী তৈরি করিবার জন্য গান্ধীজীর অনুসৃত পদ্ধতিটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন অন্যান্য বহুক্ষেত্রে, তেমনি এক্ষেত্রেও তাঁহার দান মৌলিক এবং সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় পূর্ণ। সকল মানবীয় প্রচেষ্টার চরম লক্ষ্যই হইতেছে সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান। কাজেই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই দাঁড়ায় যে, আমাদের যাবতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা সমাজ-কর্ম্মের মাধ্যমে নিয়োজিত হইবে সমাজের সেবায়। গান্ধীজী সমাজসেবাকেই তাঁহার সমুদয় কর্ম্মপ্রচেষ্টার—রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টারও—ভিত্তি এবং চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর কর্ম্মকৌশল (technique) এবং মতবাদের সহিত যিনি পরিচিত নহেন, তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, ধর্ম্মীয় সহনশীলতা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, মদ্যপান এবং অন্যান্য নেশার বিরুদ্ধে অভিযান, সুতাকাটা ও খদ্দরপ্রচার প্রভৃতি কর্ম্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের সুদূরতম সম্পর্কও দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু গান্ধীজী সকলের নিকটেই ইহা সুপরিস্ফুট করিয়া তোলেন যে, কেবলমাত্র এই সকলের মাধ্যমেই তাঁহারা স্বাধীনতালাভ করিতে সক্ষম হইবেন। স্ত্রীপুরুষকে তিনি 'বীর' করিয়া তুলিয়াছিলেন—তাহাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়া সমাজসেবা-কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া এবং যাহাকে তিনি "গঠনমূলক কর্ম্মতালিকা" বলিতেন, ধৈর্য্য সহকারে তাহা অভ্যাস করাইয়া। বিহারের চম্পারণ জেলায় ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামই ভারতে গান্ধীজীর প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক সংগ্রাম। যখন গান্ধীজী স্বয়ং এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তৎকালে অধ্যাপনাকার্য্যে বৃত কৃপালনী প্রমুখ তাঁহার সহকর্ম্মীরা চাষীদের তরফে নথিপত্র (brief) তৈরি করায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন গান্ধীজীই তাঁহার সহধর্ম্মিণী কস্তুরবা এবং সহকর্ম্মীদের পত্নীদিগকে শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় পরিচালনা, লোকেদের স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রাথমিক নীতিসমূহ শিক্ষাদান, পীড়িত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা-বিষয়ক সাহায্যদান ইত্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। তাঁহারা এমন সেবামূলক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন যাহা হয়ত কুশলী (skill d) পেশাদার কর্ম্মীদের দ্বারা সম্ভবপর হইয়া উঠিত না, উপরন্তু কোন ক্ষেত্রেই শেষোক্তদিগকে পাওয়া যায় নাই। সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের করুণা এবং ব্যক্তিগত সংস্পর্শ—যা দুর্গতের দুঃখমোচনে বহুল পরিমাণে কার্যকরী হয়—এ দুটিই নিহিত ছিল কস্তুরবা এবং তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মিণীদের সাফল্য লাভের মূলে। যদি প্রেম ও সহানুভূতি থাকে এবং যদি থাকে সেবার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ তাহা হইলে সমাজকর্ম্মীর পক্ষে যথোপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন এবং কর্ম্মকৌশল আয়ত্ত করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে না; কিন্তু যদি প্রেম, সহানুভূতি এবং ত্যাগের আদর্শের অভাব হয় তবে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে তাহার জ্ঞান এবং কর্ম্মকৌশল।

সমাজসেবার প্রতি গান্ধীজীর অনুরাগ এত প্রবল ছিল এবং কর্ম্মীদের শিক্ষণক্ষেত্র (training ground) রূপে গঠনমূলক কর্ম্মের উপযোগিতায় তাঁহার আস্থা এরূপ সুদৃঢ় ছিল যে, তিনি তাঁহার গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার তালিকায় একটির পর আর একটি দফা সংযোজন করিয়া চলিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষ তালিকা—যাহা আবার উদাহরণাত্মক (illustrative) চূড়ান্ত (exhaustive) নয়, ২১টি দফায় সম্পূর্ণ। যথা:—স্বাস্থ্যবিধি (sanitation) বয়স্ক-শিক্ষা, নারীজাতির সেবা, আদিবাসীদের সেবা, ঠিক পথে ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠন, কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবাশুশ্রূষা, খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি। সত্য এবং অহিংসার

কঠোর অনুশাসন হইতে যখনই জনসাধারণের বিচ্যুতি অথবা পতন ঘটিয়াছে, গান্ধীজী তখনই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং জাতিকে অনুরোধ করিয়াছেন গঠনমূলক কর্ম্মের উপর মনোনিবেশ করিতে, জনগণের মধ্যে অহিংস নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সংগঠন ব্যাপকতর এবং দৃঢ়তর করিতে।

রাজকোট সত্যাগ্রহের কালে রাজকোটের কর্ম্মীরা গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে আসেন এবং ঐ রাজ্যে রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজীর নির্দ্দেশ-প্রার্থনা করেন। গান্ধীজী তাহাদের 'ষ্টেট পিপলস এসোসিয়েশন'কে সাময়িকভাবে সুতাকাটা সঙ্ঘে (Spinnres' Association) পরিণত করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। গান্ধীজীর জবাব শুনিয়া তাহার অপ্রতিভ হইলেন। শ্রীঢেবরভাই ছিলেন ইঁহাদেরই অন্যতম—গান্ধীজীর ঐ উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য সেদিন অপেক্ষা আজ অনেক ভাল করিয়া তিনি উপলব্ধি করিতেছেন।

পীড়িতের জননী

সাবিত্রী আম্মা

আমাদের 'যোগ্যতা' সম্পর্কে এখানে দু'একটি কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজকের দিনে যখন যেকোন কর্ম্মের শাখার শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীরা কাজ করে থাকেন তখন যে সকল যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্ম্মী অথবা স্বাস্থ্য পরিদর্শক (Health Visitor) নিজেদের কাজের কৌশল সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল আছেন তাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের সমিতির অসুবিধা বিস্তর। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সমাজকর্ম্মীরা এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হতে পারেন, তৎ-সত্ত্বেও কিন্তু তাঁরা সেবা করতে ইচ্ছুক এমন সব কর্ম্মী যাঁদের নিকট ব্যাধি-দারিদ্র্য এবং সমাজ-সমস্যার মানবতার দিকটার আবেদন গভীর। সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়, কোন হাসপাতালের নিম্নতন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর নিকট থেকে পর্য্যন্ত শিখবার আকাঙ্ক্ষা, নম্রতা, সবকিছুর সমালোচনা না করবার মনোভাব, এবং সর্ব্বোপরি যে সকল আদর্শ আমাদের কর্ম্ম-প্রেরণার উৎস সেগুলির নিত্য স্মরণ এবং যে পুণ্যবতী জননীর নাম আমাদের সঙ্ঘ সগৌরবে বহন করছে, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ—এই হ'ল এমন কতকগুলো জিনিষ যাকে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের 'যোগ্যতা' বলে অভিহিত করতে পারি।

আমাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র সীমাহীন এবং কোন কর্ম্মী স্বল্পপরিমাণ কল্পনা প্রয়োগ করে প্রচুর প্রয়োজনীয় সেবাকর্ম্ম দ্বারা আর্ত্ত ও পীড়িত মানবের অদৃষ্টে আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করতে পারে। কেননা তারা যে কেবল শারীরিক দিক দিয়েই কষ্ট পায় তা নয়, একটুখানি ভালবাসা, দয়া এবং সাহচর্য্যের অভাবে তারা আত্মিক দুর্গতিও ভোগ করে। হাসপাতালের ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে কেবলমাত্র চিকিৎসক অথবা শল্যবৈদ্যেরই (Surgeon) নয়, মায়েদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং বোনেদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কিত সকল প্রকারের সমস্যা বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—কুমারী মাতার অথবা যে অতিবৃদ্ধা স্ত্রী-লোকের সংসারে আপনার বলতে কেহ নাই (এবং ভারতে এমন কর্ম্মসংস্থা কোথায় আছে যেখানে তাকে নেওয়া হয়?) তাদের সমস্যার কথা। পুরাতন দুরারোগ্য ক্যান্সার অথবা হাড়ের যক্ষায় আক্রান্ত সেই সকল রোগিণীর কথাও বলা যেতে পারে, কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে যার গৃহ এবং যার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে পুনর্ব্বিবাহ করেছে। হাসপাতালের মেয়াদ শেষ হলে যখন তাকে বাইরে পাঠানো হয়—আর স্বভাবতঃই একদিন না একদিন তাকে হাসপাতাল ছাড়তেই হয় তখন অশ্রুপূর্ণনয়নে সে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাব আমি"?

প্রায়শঃই আমাদের এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ওখানে আছে একটি গরীব ছোট্ট মেয়ে। বেচারী লুকিয়ে লুকিয়ে তার চুল চিবোয় এবং গিলে। হাঁ, এটা

কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়। চিকিৎসকেরা তাকে কেবল শাসাতেই পারেন, এ ছাড়া তাঁদের কি আর করবার আছে? সে শুধু তার বিছানা থেকে আপনার পানে তাকিয়ে মৃদুভাবে হাসে। এর চিকিৎসা হচ্ছে মনোবিকল্পবিদের কার্য্য।

"বহেনজী" হঠাৎ আপনার হাতে টান পড়ল এবং একটি বর্ষীয়সী মহিলা আপনাকে টেনে নিয়ে গেলেন অপর একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের শয্যাপার্শ্বে আর আপনাকে অনুরোধ করা হ'ল তাঁর প্রয়াণোন্মুখ আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে। বেচারী চলে গেল সেখানে যেখানে কোন মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না এবং আমাদের জনৈক কর্ম্মী কর্তৃক উচ্চারিত গায়ত্রীমন্ত্র পর্য্যন্ত মৃতার শ্রুতিগোচর হ'ল না।

জনৈকা যুবতী স্ত্রীলোক মুক্তি পেল হাসপাতাল থেকে, কিন্তু হায় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাড়ী থেকে কেহ এল না। রোহতাক জেলার একটি গ্রামে তার ঘর, বাহেনজী চিঠি লিখলেন তার বাড়ীর লোকদের নিকট কিন্তু তারা আসে নি। সে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে, তার আরও একটা সমস্যা হচ্ছে যে, যখন বিকেলবেলা তার কাছ থেকে হাসপাতালের সকল কাপড়চোপড় ফিরিয়ে নেওয়া হবে, তখন সে কি পরবে? আপনাকে তখন করতে হয় কি, না বাড়ী গিয়ে তার জন্যে আনতে হয় এক প্রস্ত পুরনো কাপড়জামা, এবং গাড়ী করে তাকে নিয়ে যেতে হয় 'বাস ষ্টপে'। তার পর একখানা টিকিট কেটে দিয়ে তাকে সঁপে দিতে হয় ড্রাইভারের জিম্মায়। শেষে আপনি যখন তাকে ছেড়ে আসেন তখন সে আপনার হাত দু'খানি আঁকড়ে ধরে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বর্ষণ করতে থাকে।

বেচারী চম্পা হচ্ছে একটি স্বজন-পরিত্যক্ত ছোট্ট আদরের মেয়ে। যখন সে শুনতে পেলে যে, জন্মাষ্টমী আসন্ন তখন জেদ করতে লাগল সে ব্রত উদ্‌যাপন করবে—কেন না তা হলে কৃষণজী তাকে রোগমুক্ত করবেন। আমরা তাকে মুরলীধর কৃষ্ণের যে ছবিখানা দিয়েছি, এমন ভক্তির সঙ্গে সে সেখানা আঁকড়ে ধরে রইল যে দেখলে চিত্ত বিগলিত হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্লাষ্টার লাগানো সকল বয়সের শিশুদের দেখলে ব্যথায় আপনার হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠবে। যখন তাদের এখানে-সেখানে ছুটোছুটি এবং খেলাধূলো করবার কথা তখন তাদের অদৃষ্টলিপি হচ্ছে সারাদিন বিছানায় আটক থাকা। আমাদের কর্ম্মীরা এই সকল রোগীর জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করেন—তাঁরা পড়া, লেখা এবং আঁক কষা শেখান, তাদের সঙ্গে খেলাধূলো করেন এবং তাদের জন্যে খেলনা ইত্যাদি নিয়ে আসেন।

সুতরাং বলতে পারা যায় যে, আমরা কাজ করি এবং একই সময়ে কাজ করতেও শিখি। হাসপাতাল হচ্ছে আমাদের পক্ষে এক বিরাট শিক্ষাক্ষেত্র এবং আমরা কতকগুলি জিনিষ শিখেছি অভিজ্ঞতা দ্বারা। কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম রোগীদের প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে সমসূত্রে বাঁধা এবং তাদের যে পরিমাণ সাহায্য করতে আমরা সক্ষম হই তা বিস্ময়কর।

যারা সাক্ষর নয় তাদের ভক্তিমূলক গ্রন্থ পাঠ করে শুনানো—বেশীর ভাগই কেবলমাত্র ঐ ধরনের গল্পই পছন্দ করে—নখ কাটা, চুল আঁচড়ানো এবং উকুনের লোশন প্রয়োগ, অশক্ত রোগীদের খাওয়ানো, শিশুদের লিখতে এবং পড়তে শেখানো। বুড়োদের ভজন গেয়ে শুনানো, সাবান, তেল, চিনি, টুথ পাউডার, পুরনো কাপড়চোপড়, চামচ, গ্লাস ইত্যাদি প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় যে সকল দ্রব্য রোগীরা চায় সেগুলো বিতরণ করা ইত্যাদি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সমাজকর্ম্মীর কাজের আওতায় পড়ে। সময় সময় এমন সব দুর্মূল্য ঔষধের প্রয়োজন হয়, কর্তৃপক্ষ যা সরবরাহ করেন না এবং যাদের কেনবার সঙ্গতি নাই তাদের এগুলো বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

যে সকল রোগীর দেহে প্লাষ্টার লাগানো থাকে তাদের অনেককে কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখবার জন্যে আমরা এক উপায় উদ্ভাবন করেছি। একে বলা যেতে পারে বৃত্তিমূলক (occupational therapy) আরোগ্যবিধি। এর দ্বারা বালিকারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছে এবং তারা সুন্দর সুন্দর দ্রব্য, ডল ইত্যাদি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তারা যে সকল সূচীকর্ম্ম করে থাকে সেগুলোও উঁচু দরের এবং প্রতি বৎসর তাদের তৈরি জিনিষ কিছু কিছু বিক্রয়েরও আয়োজন করা হয়, বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয়িত হয় রোগীদের উপকারার্থে। রোগমুক্ত বলে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন একজন যুবতী স্ত্রীলোক, আমাদের সদস্যগণ এবং তাদের বন্ধুদের ব্যবস্থায় কাজ করে এখনো পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ৩৫৲ টাকা রোজগার করে।

দেওয়ালী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যে সকল উৎসব—গীতবাদ্য, মিষ্টদ্রব্য বিতরণ, ক্রীড়াকৌতুক এবং প্রচুর আমোদপ্রমোদ সংযোগে আমাদের দ্বারা ওয়ার্ডগুলিতে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলির কথা উল্লেখ করতেও আমি ভুলব না। এমনি ভাবে প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং শুক্রবারে ১-৩০ থেকে ৪-৩০ মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের কাজে যাই। ওয়ার্ডগুলিতে গিয়ে রোজ আমরা উপঢৌকন হিসেবে একই জিনিস বিতরণ করি, একই ধরনের উৎসাহ বাণী উচ্চারণ করি, একই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি এবং সেই একই অতি

প্রিয় গল্পগুলি বলে থাকি ; ওয়ার্ডে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই এত প্রীতির সঙ্গে তারা আমাদের স্বাগত করে যে, আমরা এই ভেবে লজ্জিত হই—আমরা কেন তাদের আরও ভালবাসি না। আমাদের প্রত্যেককে তারা জানে, আমাদের প্রত্যেকের নাম তারা মনে রাখে—এবং যখন আমরা তাদের দেখতে যাই না তখন এই জিনিষটি থেকে আমরা বঞ্চিত হই। এদের এই যে ভালবাসা, এও হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত পুরস্কার।

হাতের তৈরী শিল্পকর্ম্ম এবং গ্রামীণ স্ত্রীলোক

আমাদের অনেকগুলি গ্রামে পারিবারিক মান উন্নয়নের মূল সূত্র হইতেছে হাতের তৈরী শিল্পকর্ম্মের মাধ্যমে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের আয় বৃদ্ধির সহায়তা করা। যদি পরিবারের ক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে শিশু ও বয়স্ক লোকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং স্ত্রীলোকেরা বিশেষ ভাবে পরিবারের যথোচিত পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয়।

ইহা উপলব্ধি করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার আহ্বায়কগণ এমন সব প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম্ম নির্ব্বাচনের চেষ্টা করিতেছেন যাহা গ্রামীণ স্ত্রীলোকদিগকে অনায়াসে হাতে-কলমে শিখান যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় তাহা দ্বিবিধ। সহজতর এবং হয়ত শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হইতেছে মাদুর বোনা, বাস্কেট তৈরি প্রভৃতি যে সকল শিল্পকর্ম্ম ইতিপূর্ব্বেই গ্রামে জানা ছিল সেগুলি নির্ব্বাচন এবং কেন্দ্রসমূহে নারীদিগকে শিক্ষাদানের জন্য স্থানীয় শিক্ষক পাইবার ব্যবস্থা করা। এই প্রণালীতে যে সকল দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেগুলির জন্য প্রায়শঃই তৈরী বাজার পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে একটি সম্পূর্ণ নূতন অর্থকরী বিদ্যা শেখান। ইহার জন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন কিঞ্চিৎ অধ্যবসায় ও প্রযত্ন। প্রায়শঃই সাজসরঞ্জামের নিমিত্ত ইহাতে কিছু অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক হয়। স্ত্রীলোকদের রোজগার হইতে পরে এই টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

হাতের তৈরী শিল্পকর্ম্মের কথা বলিতে গিয়া দুইটি গ্রামের কথা উল্লেখ করা যায়। একটি মোরাদাবাদ প্রোজেক্টের (উত্তর প্রদেশ) মুখিয়া কেন্দ্র নামে পরিচিত। সেখানে স্থানীয় নাগরিকদের সহায়তায় জনৈকা নিরতিশয় বুদ্ধিমতী গ্রামসেবিকা, তাঁহার কেন্দ্রে সমাগত স্ত্রীলোকদিগকে উৎকৃষ্ট বাস্কেট এবং নেওয়ারের ফিতা তৈরি করা শিখাইতেন—স্থানীয় বাজারগুলিতে এ সকলের চাহিদা ছিল। উত্তর প্রদেশের দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল বানারস প্রোজেক্টের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে স্ত্রীলোকদের বহুকাল ধরিয়া 'টিক্‌লি' (বিন্দি) তৈরির ঐতিহ্য আছে। যে পদ্ধতিতে টিকলি নির্ম্মিত হয় তাহা পরিশ্রমসাধ্য—স্ত্রীলোকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া কাঁচের সরু পাত কাটিতে হয়। এই আয়াসসাধ্য কাজে কিন্তু তাহাদের মাসে তিন-চার টাকার বেশী রোজগার হয় না। গ্রামের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়, কেননা এখানকার বাসিন্দারা কৃষি শ্রমিক—জমির মালিক নয়। নারী এবং শিশু উভয়েরই মধ্যে স্পষ্টই অপুষ্টির লক্ষণ দেখা যাইত। বানারস প্রোজেক্টের কনভীনার ইহার প্রতিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং হাতে চাল পিষিবার একটি সাধাসিধা মেশিন অর্ডার দিয়া আনাইলেন। তাহার সঙ্কল্প হইল ইহার সাহায্যে গ্রামে একটি নূতন এবং অধিকতর লাভজনক গৃহশিল্পের (হোম ইনডাষ্ট্রি) প্রবর্ত্তন করা।

সময় সময় স্থানীয় শিল্পীদের তৈরী মৃৎপাত্রসমূহকে চিত্রিত নক্সা দ্বারা অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। তাহাতে আরও ভাল 'তৈরি বাজার' পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাখা, খেলনা এবং সাধারণ ব্যবহারোপযোগী ছোট ছোট হরেক রকমের জিনিষও উৎপাদিত হইতে পারে। দক্ষিণে কোনও এলাকায় একটি প্রোজেক্টের জনৈক উদ্যমশীল কনভীনার স্থানীয় মোহান্তদের সঙ্গে মন্দিরে পাতার ঠোঙা (লিফ প্লেটস) যোগান দিবার ব্যবস্থা করেন। কিঞ্চিৎ বুদ্ধি-কৌশল এবং তদপেক্ষাও যে জিনিষটি অধিকতর আবশ্যক—স্থানীয়

বাজারের হালচাল কতকটা বুঝা এই দুইয়ের দৌলতে অনেক উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে। দোকানদাররা যদি পল্লীর পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রতি অনুরক্ত হয় তাহা হইলে প্রায়ই তাহারা টাকা ধার দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। কিন্তু একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে—যে গ্রাম-সেবিকার নিজেরই শিক্ষা ভাসা ভাসা ধরনের তাহার মাধ্যমে হাতের তৈরী শিল্পকর্মের নামে, যে সকল গ্রামীণ বৃত্তি অর্থকরী নহে তৎসমুদয় যেন শিক্ষাদান করা না হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনও কোনও কেন্দ্রে অত্যন্ত সাধাসিধা ধরনের, স্থূল যদি নাও-বা হয়—সূচীশিল্প এবং কাপড়-জামা কাট-ছাঁট ইত্যাদির কাজ শেখান হইয়া থাকে। শিল্প-কলার বাস্তব উপযোগিতা এবং ব্যবসায় সকল দিক দিয়াই এগুলির মূল্য খুব কম।

দর্জির কাজ উপার্জ্জন এবং খরচ বাঁচান এই দুয়ের অন্যতম পন্থা হিসাবে নারীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে—অবশ্য যদি গ্রামে যথেষ্ট মেশিন থাকে বা যদি কেন্দ্রে মেশিন ধার লইবার কিংবা ব্যবহার করিবার প্রচুর সুযোগ মেয়েদের থাকে। কিন্তু সম্বল যদি একটিমাত্র মেশিন, তাহা হইলে দর্জির কাজ অর্থকরী শিল্প বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

দেশের সর্ব্বত্র বহু খাদী কর্ম্মী ইতিমধ্যেই সুতা কাটার ক্লাস খোলায় আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কেন্দ্রের স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহারা চরকা, 'কটন সিলভার' ইত্যাদি দিয়া থাকেন। সুতা কাটা হইলে পর তাঁহারা লইয়া যান এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে হাতে বোনা কাপড় দেন। এই সম্পর্কে টিনেভেল্লি প্রোজেক্টের শিবশেলেম কেন্দ্রে যে পরীক্ষণ চালান হইয়াছিল তাহা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সেখানে একদল স্ত্রীলোক সারা সপ্তাহ ব্যাপিয়া সুতা কাটে, সপ্তাহান্তে তাহারা তাহাদের চরকায় কাটা সুতা একত্রে জমা করে। ইহার বিনিময়ে তাহাদের যে পরিমাণ খাদি দেওয়া হয় তদ্দ্বারা একটি সাড়ী, একটি পেটিকোট এবং একটি ব্লাউজ তৈরি হইতে পারে। সুতা কাটনীদের মধ্যে ঐ 'মহার্ঘ' বস্তুটি (খাদি) কে পাইবে, লটারি দ্বারা তাহা স্থির করা হয় এবং যে উৎসাহের সঙ্গে গোটা ক্লাস সুতা কাটায় আসক্ত হইয়াছে কেবলমাত্র তাহার সঙ্গেই এই সাপ্তাহিক লটারির উত্তেজনার তুলনা করা যাইতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা যায় যে, কেবলমাত্র হাতের কাজের মাধ্যমেই যে-কোন কেন্দ্রের নারীদেরই অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা তেমন নহে। লক্ষ্ণৌয়ে নারী সেবা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি কেন্দ্রের কর্ম্মীরা দেখেন যে, অনেক গ্রামবাসীরই গরু আছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা যথোচিত মূল্য দেয় না বলিয়া দুধ বিক্রি করিয়া তাহাদের খুব স্বল্প আয় হয়। ইহার প্রতিকারার্থে সমাজ-কল্যাণ কর্ম্মীদের সহায়তায় একটি দুগ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ঐ দুধ রোজ সাইকেলে করিয়া নিকটবর্ত্তী শহরে লইয়া গিয়া ভাল দরে বিক্রি করা হয় এবং ইহাতে সের প্রতি তাহাদের দুই আনা করিয়া লাভ থাকে। এই লাভ আংশিক ভাবে পায় দুগ্ধ উৎপাদক এবং 'ব্যয়' নির্ব্বাহের জন্য কেন্দ্র অংশবিশেষ পাইয়া থাকে।

এই ধরনের কাজে পরিণামে সাফল্য লাভের উপায় হইতেছে সর্ব্বদা চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাজারে বিক্রয়-যোগ্য মানের দ্রব্যাদি উৎপাদন।

ভারতের শিশুরক্ষণ সমিতি

(Society for the Protection of Children in India)

একটি কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে—"ভারতের শিশুরক্ষণ সমিতি (S. P. C. I) বস্তুতঃ কি করিয়া থাকে ?"

এখন ধৈর্য্য ও বিনয়ের সঙ্গে, এই ধরনের প্রশ্নের এবং বিশেষভাবে যে রকম ভঙ্গীতে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় তাহার উত্তর কি ভাবে দিতে হয় তাহা সমাজকর্ম্মে ব্যাপৃত যে-কোন ব্যক্তিরই প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়। স্কুলের ছেলের মত, "'রক্ষণ' শব্দটির দ্বারা কি বুঝায় আপনার মনে হয়" —এই ধরনের প্রতিপ্রশ্ন করাও তাহার পক্ষে সমীচীন হইবে না। কেননা এই বাক্যগুলি অত্যন্ত রূঢ় শোনায়।

উপরন্তু 'রক্ষণ' এমন একটি শব্দ যাহার প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক—এত ব্যাপক যে তাহা অনেকের বিশেষতঃ ভারতের অধিকাংশ লোকের কল্পনার বহির্ভূত।

এস. পি. সি. আইয়ের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ইহার 'মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনে' যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা কতকটা নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে :

ভারতের শিশুদের রক্ষণ এই সমিতির লক্ষ্য

বর্ত্তমানে শিশুদের প্রতি যে সকল গর্হিত আচরণ করা হয় ভারতের বিভিন্ন জাতির লোকদের এবং ভারতের সকল হিতৈষীর সমক্ষে তাহা উপস্থাপিত করা ইহার লক্ষ্য। ইহা অনাথ আশ্রম এবং শিশুদের গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সংস্থাসমূহের মানের উন্নয়ন করিতে চায় ; ইহা এই ধরনের আরও অধিকসংখ্যক এবং উৎকৃষ্টতর সংস্থা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান করে।

ইহা পীড়িত ও ক্লিষ্ট শিশুদের সাহায্য করিতে চায় এবং মারাত্মকরকম বিকলাঙ্গ ও মানসিক জড়তাগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষণ (training), লেখাপড়া শেখানো তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্তসংখ্যক হাসপাতাল এবং প্রতিষ্ঠানের অভাবের কথা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে চায়।

যে সকল শিশুর প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়, ইহা তাহাদিগকে উদ্ধার করে।

যে সকল অসহায় শিশু আদালতে অভিযুক্ত হয় ইহা তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে।

ইহা অল্পবয়স্ক অপরাধপ্রবণ বালকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সাহায্য করিয়া থাকে।

ইহা শিশুদিগকে আপন হেফাজতে গ্রহণ এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করে।

উইল অথবা অন্যান্য সূত্রে লব্ধ শিশুর উত্তরাধিকার কিংবা অন্যান্য স্বার্থের ব্যাপারে ইহা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী (executor) অথবা অছি (trustee) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

ইহা সেই সকল অসহায় শিশুদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে অন্যথায় সম্পর্কঘটিত অধিকার হইতে যাহারা বঞ্চিত হইত।

শিশুদের সম্পর্কে যাহারা ইহার পরামর্শ প্রার্থনা করে এই সংস্থা তাহাদিগকে পরামর্শ দান করে।

এই দেশের যে সকল শিশুর ইহার রক্ষণাধীনে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা তাহাদের রক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

এবং ইহা দ্বারা কেবল যে এই সকল কাজই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা নয়, যাহা যাহা ইহার করণীয় তৎসমুদয়ই এই সংস্থা নিজের সামর্থ্যানুযায়ী একান্ত বিশ্বস্তভাবে করিয়া থাকে।

কিন্তু আমার মনে আমাদের পরিচিত প্রশ্নকর্তা আমরা কতটুকু করি তদপেক্ষা আমরা কি ভাবে তাহা করি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই জানিতে চাহেন।

এখনো সমিতির কতকগুলি বাস্তব ঘটনার বর্ণনা করিয়া আমরা কি করি এবং কি ভাবে তাহা করি সে বিষয়ে আলোকপাত করিবার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

পীড়িত এবং ক্লিষ্ট শিশুদের সাহায্য দান সম্পর্কে নিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

একবার আমাদের নিকট খবর আসিল যে, একটি সাত বছরের ছোট খ্রীষ্টান মেয়ের পিতামাতা আমাদের সাহায্য এবং পরামর্শ প্রার্থনা করে—তাহাদের মেয়েটি জন্ম হইতেই ইনফ্যাণ্টাইল প্যারালাইসিস বা শিশু পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিল। তাহারা ছিল অত্যন্ত গরীব, পিতা দীর্ঘকাল যাবৎ বেকার, এমতাবস্থায় চিকিৎসার জন্য কিছু ব্যয় করা, এমন কি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। হাসপাতালের সাহায্য প্রার্থনা করা এবং সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি ইহার ফলাফল সম্পর্কে পিতামাতার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। রোগীর টিকিটে রোগের যে নাম লেখা ছিল (Infantile hemiplegia) তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তাহা আসল উৎকট ইনফ্যাণ্টাইল প্যারালাইসিস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের।

সময় সময় ইনফ্যাণ্টাইল হেমিপ্লেজিয়ার সৃষ্টি হয় জন্মকালে কোনো আঘাতের দরুন এবং কোনপ্রকার চিকিৎসার সাহায্যব্যতিরেকেও ইহা সারিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই আমরা বালিকাটির পিতামাতাকে আশার কথা বলিতে সক্ষম হইলাম এবং তাহাদের বেচারী ছোট্ট মেয়েটির সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে আরোগ্য হওয়ার সম্পূর্ণ আশা আছে এই আশ্বাসে সুখী হইয়া তাহারা চলিয়া গেল। সমিতি যখন পিতাকে এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করিতে সক্ষম হইল যে, ইতিমধ্যে তাহার জন্য কর্ম্মের সংস্থান করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবে তখন তাহারা ইহাই উপলব্ধি করিল

যে, ভাগ্য তাহাদিগকে একেবারে অসহায় অবস্থায় বিপদে ফেলে নাই।

দুর্ব্যবহারের হাত হইতে শিশুদের উদ্ধার প্রচেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে এই :

একটি ছোট্ট নেপালী মেয়েকে তাহার পিতামাতা এক জন বয়স্কা স্ত্রীলোকের নিকট বিক্রি করে। বালিকাটি যখন সেই বয়সে পা দিল যখন তাহাকে কোন পরিবারের পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে তখন সে তাহাকে একটি পরিবারে দিয়া দিল, সেখানে তাহাকে রাখা হইল পরিবারের দাসী হিসাবে। তাহাকে কোন মাহিনা দেওয়া হইত না, যতটুকু না হইলে নিতান্তই চলে মাত্র ততটুকুই—যেমন একখানা বা দুখানা কাপড় তাহাকে দেওয়া হইত। অবশেষে সে পলাইয়া গেল এক দয়ালু প্রতিবেশীর নিকটে। তিনি প্রায়ই তার কান্না শুনিতে পাইতেন। ঐ ভদ্রলোক সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন, তখন দেখা গেল যে তাহার দেহের নানা স্থানে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ছ্যাঁকা দেওয়া। তাহার শরীরে এমন মারাত্মক পোড়া ঘায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, দীর্ঘকাল তাহাকে হাসপাতালের চিকিৎসাধীনে থাকিতে হয়। সমিতি এই বিষয়ে মোকদ্দমা চালানোর ভার গ্রহণ করিলেন। ফলে অপরাধিগণ অভিযুক্ত এবং দণ্ডপ্রাপ্ত হইল। শিশুটিকে সমিতির সাহায্যদান কিন্তু সেখানেই শেষ হইয়া গেল না। সমিতি তাহার ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রীতিকর পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা করিল, সেখানে সে তাহার নবজীবনের যাত্রা সুরু করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শোষণ

একদা এক পুলিস সদর রাস্তার উপর ভিক্ষায় রত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাহার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি অধিকতর পরিমাণে উদ্রিক্ত হইবার কারণ ছিল কতকগুলি শিশু—যাহাদের বয়স কয়েক সপ্তাহ অথবা এক মাস কিংবা দুই মাস মাত্র। লোকটি ঐ সকল শিশুকে রোদ এবং ধূলা-বালির মধ্যে এবড়োখেবড়ো চাকাওয়ালা একটি কাঠের বাক্স অথবা প্যাকিং কেসের মধ্যে বসাইয়া ভিক্ষা করিতেছিল। শিশুদের সর্বাঙ্গে ঘা—তাহাদের অবস্থা ছিল রীতিমত শোচনীয়। তখন গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড সূর্য্য তখন যথারীতি আকাশের উচ্চ স্থানে উঠিয়া আগুনের হলকা বর্ষণ করিতেছে। এ ক্ষেত্রে আবার সমিতির সাহায্য প্রার্থনা করা হইল এবং ইহার প্রতিনিধিগণ অতিদ্রুত অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের প্রথম করণীয় হইল শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—সেজন্য তাহাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। দুষ্ট লোকের পরামর্শে কতকগুলি শিশুকে সমিতির হেফাজত এবং হাসপাতালের চিকিৎসা হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা আংশিক ভাবে সফল হইল। কিন্তু হায়! এমনি ভাবে যে সকল শিশুকে লইয়া যাওয়া হইল, তাহারা সকলেই মারা গেল। কিন্তু সমিতি যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা সযত্ন তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত সুখী শিশুতে পরিণত হইয়াছে। যে লোকটি তাহাদের অসহায়তার সুযোগ লইয়া এমনি ভাবে তাহাদিগকে শোষণ করিতেছিল অপরাধী সাব্যস্ত হওয়াতে সে অভিযুক্ত হইয়াছে।

রাজদ্বারে অভিযুক্ত অসহায় শিশুদের পক্ষসমর্থন

একটি বালক ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে তাহার বিধবা এবং বর্ষীয়সী মাতামহীর সঙ্গে বাস করিত। জনৈক বয়স্ক দোকানদারকে ছোরা মারিয়াছে এই বলিয়া তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। কেস চলিতেছিল কলিকাতা শহরের বাহিরে। পুলিস যে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা, ব্যাপারটা যাহারা তলাইয়া না দেখিবে তাহাদের নিকট যথেষ্ট ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইবারই কথা। বালকটির রোজগার ছিল নিতান্ত সামান্য, সুতরাং তাহার পক্ষে আত্মপক্ষসমর্থনের যথোচিত ব্যবস্থা করা কখনও সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। এই কেসের সঙ্গে সমিতির যোগাযোগ ঘটিবার কারণ এই যে, বালকটি আটক ছিল লোয়ার সারকুলার রোডস্থ সেন্ট্রাল চিলড্রেনস কোর্টের সন্নিহিত 'হাউস অব ডিটেনশনে'র বা কয়েদখানার হাজতে। সমিতি বালকটির তরফ হইতে ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলেন এবং বালকটিকে শাস্তির কবল হইতে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বিশেষ জুরির সমক্ষে যথারীতি তাহার বিচার আরম্ভ হইল। সমিতি তাহার পক্ষে দুই জন প্রধান উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বালকটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুধু যে অসমর্থিতই হইল তাহা নয়, সগৌরবে অপ্রমাণীকৃতও হইল। জুরীগণ সর্বসম্মতিক্রমে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া রায় দিলেন এবং বিচারকও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন, ফলে বালকটি বেকসুর খালাস হইল। অবস্থা যে রকম দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে বালকটি যে অপরাধ কখনও করে নাই তাহার জন্য তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত

হইতে হইত, কিন্তু এমনি ভাবে সমিতির হস্তক্ষেপের দরুন সে বাঁচিয়া গেল।

অপরাধপ্রবণদের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য

নিতান্ত ছোট একটি বালক বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আপ এবং ডাউন গাড়ীতে সওদাগরের কাপড়চোপড় বিক্রেতা হিসাবে সে ছিল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপরিচিত। সমিতির প্রতিনিধিগণের নিকট সে একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চমৎকার টাইপের শিশু বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহার এমন কতকগুলি প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল যাহার বিকাশের জন্য প্রয়োজন সহানুভূতি এবং উৎকৃষ্টতর সুযোগ-সুবিধা। সমিতি তাহার জরিমানা শোধ করিয়া তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন—তাঁহারা কিন্তু তাহার গ্রেপ্তারের কথা শোনেন নাই। তাহারা বালকটির অবস্থা সম্বন্ধে সমিতিকে ওয়াকিবহাল রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

সমিতি জানিতে পারেন যে, একই পরিবারের কতকগুলি শিশু—তন্মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই আছে, কেবল যে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, তাহারা বড় বিদ্যা চুরিতেও অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শিশুদের এই অপরাধের জন্য আসলে পরিবারের বড়রাই দায়ী। শিশুদের কেবল যে চুরি করিতে শিক্ষা দেওয়াই হইত তাহা নহে, সুপরিকল্পিত উপায়ে তাহারা হইত এই চুরির মালের ভাগীদার। সমিতি সক্রিয় ভাবে ইহাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই ঐরূপ এক দল শিশু ধৃত হইয়া কোর্টে অভিযুক্ত হয়। এখন অবশ্য তাহারা সমিতির নিরন্তর সতর্ক দৃষ্টি এবং সযত্ন তত্ত্বাবধানে আছে এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, যখন তাহারা বড় হইবে, তখন সমিতি তাহাদের জন্য কেবল যে সৎ জীবিকার ব্যবস্থাই করিতে সক্ষম হইবেন তেমন নয়, সহৃদয়তা এবং সহানুভূতিপূর্ণ গার্হস্থ্য পরিবেশেরও সৃষ্টি করিতে পারিবেন। অন্যান্য শিশুদের বেলায় কিন্তু দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করানো সম্ভবপর হইয়াছিল। সমিতি নিজেকে ইহাদের জিম্মাদার বলিয়া দাবি করিলেন এবং হাইকোর্টও সমিতির প্রচেষ্টা শিশুদের পক্ষে নিরতিশয় কল্যাণপ্রদ বলিয়া এই দাবি সমর্থন করিলেন। শিশুরা এখন সৎ ভাবেই থাকিতেছে এবং এই অনুকূল ধারণা জন্মাইয়া দিতেছে যে, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী উভয় দিকেরই উন্নতি বিধানে তাহারা অপারগ নহে।

সম্পত্তি সম্পর্কে অসহায় শিশুদের স্বার্থরক্ষা

সমিতির তত্ত্বাবধানাধীন একটি শিশু হিন্দু আইন অনুযায়ী তাহার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। এই সম্পত্তি তাহার পিতার স্বোপার্জ্জিত বলিয়া ইহার উপর যৌথ পরিবারের কোন অধিকার ছিল না।

শিশুটিকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে মৃতের এক আত্মীয় একটি জালকরা উইল আদালতে উপস্থাপিত করে। বিষয়টি সে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখে। সমিতি কিন্তু অন্যান্য সূত্রে এই চক্রান্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন ও সহসা শিশুটির পক্ষসমর্থন করেন এবং তাহার অভিভাবক-স্থানীয় বলিয়া অনুমতি দিবার জন্য আদালতের নিকট দরখাস্ত করেন। এইরূপে যে জাল উইলকে সরকারী ভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা বাতিল হইয়া যায়।

এই দেশের সকল শিশুকেই রক্ষণের আশ্বাস এই সমিতি দিয়া থাকে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে ব্যাপকতর রূপে। আজ হয়ত এগুলি বাস্তব সত্য ততটা নয়, যতটা স্বপ্ন। কিন্তু এই সকল উৎকৃষ্ট স্বপ্ন মোটেই কষ্টকল্পিত হইবে না যদি প্রত্যেকে সেই প্রতিষ্ঠানটির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে যাহা দ্বারা এই সকল প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। এবং একথা উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেকেরই উচিত এই সকল স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়া তোলায় সহায়তা করা।



চীনের লাক্ষার কাজ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

চীনের লাক্ষা-শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে যদিও নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় না, তথাপি অনুমান হয় যে, লাক্ষা প্রথমে কাষ্ঠাধার-সমূহের আবরক হিসাবে ব্যবহৃত হইত। হান ফেই জু—যিনি ২৩০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে পরলোকগমন করেন—লিখিয়াছেন যে, সম্রাট শুন-এর রাজত্বকালে প্রথম ভোজন-পাত্রসমূহে লাক্ষার কাজ করা হয় এবং তাঁহার অধস্তন পুরুষ যুর সময়ে উৎসবাদিতে ব্যবহৃত পাত্র-সমূহ লাল এবং কালো রঙের লাক্ষাদ্বারা মণ্ডিত করা হয়।

লাক্ষার কাজের প্রাচীনতম নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সম্ভবতঃ চতুর্থ বা তৃতীয় খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে। এই সময়ে ঘরগৃহস্থালীর এবং পূজাপার্ব্বণের কাঠের বাসন-কোসন, কাস্কেট, তলোয়ারের খাপ ইত্যাদিতে লাক্ষার কাজ করা হইত। সম্প্রতি চাংশায় খনন-কার্য্যের ফলে লাক্ষার কাজ করা একটি চাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তখনকার দিনে মাটির বাসন-কোসনেও লাক্ষা প্রয়োগ করা হইত, লাক্ষার কাজ করা কতকগুলি ব্রোঞ্জের দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে। চাউ আমলে এবং তাহার কিছু পরবর্ত্তীকালে লেখার জন্যও লাক্ষা ব্যবহৃত হইত এবং দর্পণ কারুখচিত ব্রোঞ্জমূর্ত্তিসমূহ, বিভিন্ন প্রাণী ও জ্যামিতিক চিত্রসম্বলিত লাক্ষার কাজ দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইত (চিত্র ১)। কাঠ খোদাই করিয়া তাহর উপর লাক্ষা প্রয়োগ কদাচিৎ হইত। তবে খোদাই করা কাষ্ঠে লাক্ষার কাজের একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে (চিত্র ২)। কালো, লাল, হলদে, বাদামী এই সকল রং প্রায়শঃই ব্যবহৃত হইত। কোন কোন লাক্ষার কাজের নমুনার উপর ঘন নীল রং দেখা যায়, কিন্তু মূলতঃ এসকল হলদে রঙের ছিল বলিয়াই মনে হয়। বহুক্ষেত্রে কালো রং ফিকা হইয়া অবশেষে বাদামীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

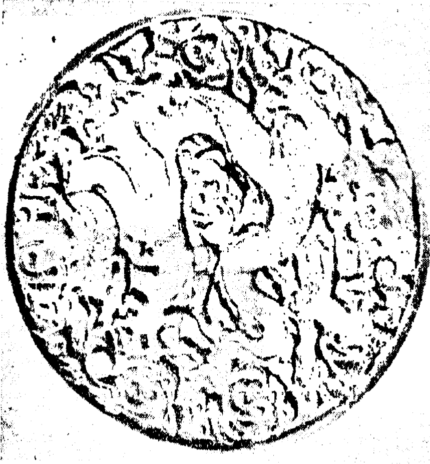
চাউ এবং হান আমলের লাক্ষার কাজ করা জিনিষপত্রের অধিকাংশই চাংশাতে খনন কার্য্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে। চাংশার



১নং চিত্র

বেশীর ভাগ নিদর্শনের উপর আছে অত্যন্ত পাতলা লাক্ষার আবরণ যাহা সরাসরি প্রয়োগ করা হইত কাঠের উপরে।

উত্তর কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের খননকার্য্যের ফলে হান আমলের লক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল অলঙ্করণের প্রিয় আঙ্গিক (technique) ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। এগুলিকে জাপানীরা বলে হেইদাংসু বা হিয়মন। সময় সময় শুক্তি, কচ্ছপের খোল এবং অন্যান্য উপকরণ দ্বারা লাক্ষার কাজকে খচিত করা হইত। ৪নং চিত্রে সোনা এবং রূপার খচিত



(চিত্র ২)



চিত্র ক

হওয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়ার নইন উলা এবং বেগ্রামেও কয়েকটি কাজের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল কিন্তু উত্তর কোরিয়ার লো লাঙ। চাংশায় প্রাপ্ত কতকগুলো লাক্ষার কাজ হান আমলের বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি অপেক্ষা এগুলি প্রাচীনতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনে হয় যে, কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ায় প্রাপ্ত অলঙ্করণযুক্ত নিদর্শনসমূহের অধিকাংশই খ্রীষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকের। লাক্ষার কাজে মূর্ত্তি-অলঙ্করণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে লো লাঙে প্রাপ্ত বিখ্যাত "চিত্রিত ঝুড়ি" (painted basket)। ইহা হান আমলের একেবারে শেষের দিকে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

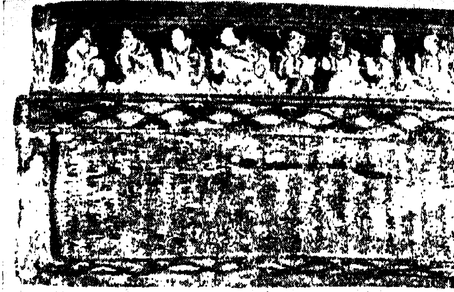
কোরিয়ায় খননকার্য্যের ফলে লাক্ষার কাজ করা একটি মুখোশ এবং অন্য কতকগুলো নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। লাক্ষার উপর পাতলা সোনার তবক লাগানো কতকগুলি দর্পণও এই হান আমলের পরবর্ত্তী সময়ের জিনিষ।

নারার শোশোইনের রাজকীয় সংরক্ষণাগারে যে বহুসংখ্যক নমুনা সংরক্ষিত আছে সেগুলি হইতে টাং আমলের লাক্ষার কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে পারা যায়। শোশোইনের লাক্ষার কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—বাক্স, তলোয়ারের খাপ, লোহার রেকাব, ব্রোঞ্জের আয়না এবং বিবিধ প্রকারের বাদ্যযন্ত্র সোনা এবং রূপার খচিত কালো লাক্ষার কাজই "কীন" নামক বাদ্যযন্ত্রের যে উপরার্দ্ধ দেখা যাইতেছে তাহা সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র অলঙ্করণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

চীনে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভাস্কর্য্য এবং চিত্র ছাড়া খুব কম দ্রব্যই মাটির উপরে সংরক্ষিত করা হইত। সুং আমলের লাক্ষার কাজের মধ্যে যে অল্প কয়টির কথা জানা যায় সেগুলি পাওয়া যায় চুলুশিয়েনে। সেগুলি হইতেছে ডিশ, বাটি (চিত্র ৫) এবং কালো, বাদামী অথবা লাল রঙের লাক্ষার কাজ করা বাক্স—সবগুলিই অলঙ্করণ বর্জ্জিত। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত পুস্তকসমূহে সোনা এবং রূপায় খচিত চমৎকার সুং লাক্ষার কাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই একই পুস্তকে ওয়ান আমলের শেষের দিকে জীবিত চাং চেঙ এবং ইয়াং মাও নামক দুই জন বিখ্যাত লাক্ষা-শিল্পীর কথা আছে। চাং চেঙের নামাঙ্কিত কতগুলো প্লেট এবং বাক্স বিদ্যমান, কিন্তু সেগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয়েরও অবকাশ রহিয়া গিয়াছে।

'মিং' লাক্ষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ব্যাপকতর। অনেকগুলি নিদর্শনের উপর যে আমলে তৎসমুদয় প্রস্তুত সেই রাজত্বকালের চিহ্ন বিশ্বাসযোগ্যভাবে অঙ্কিত আছে—এগুলির অধিকাংশই রাজকীয় কারখানায় নির্ম্মিত। মাঝে মাঝে বেসরকারী নির্ম্মাতাদের প্রস্তুত নিদর্শনসমূহেও বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল নমুনা পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতে কালজ্ঞাপক নিম্নোক্ত নিদর্শন চিহ্নসমূহ উৎকীর্ণ আছে :—

ইয়ুং লো (১৪০৩-১৪২৪), হুসান-টে (১৪২৬-১৪৩৫) হুং চি (১৪৮৮-১৫০৫), চিয়া-চিং (১৫২২-১৫৬৬), লুংচিং (১৫৬৭-১৫৭২), ওয়ান-লি (১৫৭৩-১৬১৯) এবং চুং-চেং, (১৬২৮-১৬৪৪)



৩নং চিত্র

খোদাইয়ের কাজ ছিল রাজকীয় কারখানাসমূহের প্রিয় আঙ্গিক। খোদাইয়ের কাজের উপর অনেকগুলি পাতলা লাক্ষার পরত প্রয়োগ করা হইত। তাহা বেশ একটু পুরু হইলে পর লাক্ষার উপরে অলঙ্করণ করা হইত। খোদাইয়ের কাজের প্রযুক্ত লাক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল লাল রঙের, কিন্তু কালো, হলদে এবং সবুজ রংও ব্যবহৃত হইত। রাজকীয় কারখানায় ব্যবহৃত আর একটি আঙ্গিক জাপানী জোনেশীর অনুরূপ। ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইবে ৬নং চিত্রে।

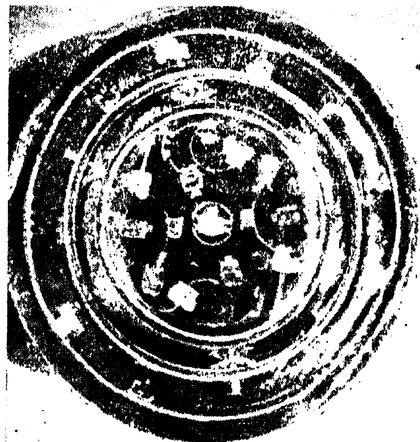


৪নং চিত্র



৫নং চিত্র

বেসরকারী নির্মাতাদের কাজের মধ্যে আঙ্গিক এবং উৎকৃষ্টের দিক দিয়া বিভিন্নতা আছে। লাক্ষার কাজকে খচিত করিবার জন্য তাহারা শুক্তি, কাচ এবং ধাতু ব্যবহার করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাজকীয় কারখানায় লাক্ষার কাজ করা যে সকল পাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল সেগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়া অতুলনীয়। অলঙ্করণের



৬নং চিত্র

বলিষ্ঠ পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু রূপায়ণ নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে। অলঙ্করণের মূল উপকরণের দিক দিয়া এইগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ক—পুষ্প এবং পত্রসম্ভার

খ—মূর্তিসম্বলিত দৃশ্য

গ—ড্রাগন এবং ফিনিক্স

ষোড়শ শতাব্দীর পরিকল্পনাগুলিতে কিন্তু এ ধরনের বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় না এবং সেগুলিতে অলঙ্করণের অতি বাহুল্য কলারসিকের দৃষ্টিকে পীড়িত করে।

চিং বংশের প্রথম দিকের লাক্ষার কাজ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। কাংশি অথবা ইয়ুং-চেঙের নিদর্শনযুক্ত রাজকীয় লাক্ষার কাজের নমুনা আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে বেসরকারী ভাবে যে তখনো লাক্ষার কাজ হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাংশি আমলের তারিখযুক্ত লাক্ষার কাজ করা কতকগুলি পর্দার কথা জানিতে পারা গিয়াছে। কোপেনহেগেনের ন্যাশনাল মিউজিয়মে এমন কতকগুলি লাক্ষার কাজ আছে যাহা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ডেনমার্কে পৌঁছে। চিকাগোর ফিল্ড-মিউজিয়মে ইয়ুং চেং-এর নিদর্শনযুক্ত একটি লাক্ষার কাজকরা বাক্স আছে। লাক্ষার কাজ করা দ্রব্যাদি সম্রাট চিয়েন লুং-এর খুব প্রিয় ছিল এবং তাঁহার রাজত্বকালে লাক্ষার খোদাই-এর কাজের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাঝে মাঝে অলঙ্কারবর্জ্জিত সাধাসিধা পাত্র নির্ম্মিত হইত। কিন্তু ঐ সময়কার অলঙ্করণযুক্ত লাক্ষার কাজের নিদর্শনসমূহ স্থূল এবং মোটেই চিত্তাকর্ষক নহে।

East and West অবলম্বনে




ডালডা
আমার
পক্ষে
ভালো


DALDA
ডালডা

পুস্তক পরিচয়

বাংলার মহাপুরুষ—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ১৷০ টাকা।

বাংলার অন্যতম মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এটি। স্বদেশী যুগে বাংলার অবদান ভারতবর্ষের গৌরবের বস্তু। সেই অবদানের মূলে ছিল যাঁর অদম্য কর্ম্মশক্তি ও প্রবল দেশানুরাগ তাঁর নাম অনেকে জানেন, কিন্তু সেই কর্ম্মশক্তির মূল উৎসটি কোথায়—এ সংবাদ অনেকে হয়ত রাখেন না। আজীবন বিদেশ বাস করিয়া ও বিদেশী রীতি-নীতিতে পরিপুষ্ট হইয়া দেশপ্রেমের বীজ কেমন করিয়া সে হৃদয়ে উপ্ত হইল—সে বড় আশ্চর্য্য কাহিনী। অতঃপর স্বদেশপ্রেমের খাত বাহিয়া সেই জীবন-নদী দুরন্তবেগে সাধন-সমুদ্র মোহনায় পৌঁছিল, সে কাহিনী আরও বিচিত্র। এই বিচিত্র জীবন-প্রবাহের ধারাটি পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন লেখক।

সাত বৎসর বয়সে বাল্য পর্ব্ব শেষ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বিলাত-প্রবাসী হন। সেখানে কাটে চৌদ্দ বৎসর। অতঃপর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তের বৎসর কাটে বরোদায়। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ও পরিপুষ্টি ওইখানে। তারপর চার বৎসর বাংলা দেশে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার। শেষের চল্লিশ বৎসর পণ্ডিচেরীতে দিব্য-জীবনের সাধনা। সাধন মার্গের তত্ত্বগুলি অত্যন্ত দুরূহ; এগুলি বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবি রাখিলেও সুন্দরভাবে গুছাইয়া বলিবার গুণে—শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ছাপ পাঠক মনে রাখিয়া দেয়। বইখানি কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও—বয়স্করাও ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন বয়সের ছবিগুলি বইখানির অন্যতম আকর্ষণ।

ঠিক-ঠিকানা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য ২৲ টাকা।

শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়ের কিছু পরে লেখার বিশিষ্ট একটি সুর লইয়া বাংলা কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন শৈলজানন্দ। কয়লা খনির কুলী-জীবন ছিল তাঁর গল্পের উপজীব্য এবং সে চিত্রগুলি যথাযথ অঙ্কনের গুণে পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, এই শক্তিমান কথা-সাহিত্যিকের হাতে অবহেলিত মানুষগুলি যথোচিত মর্য্যাদা পাইবে। দুঃখের বিষয়, সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এই শক্তিমানের সাধনার পালা অর্দ্ধ পথেই শেষ হইয়া যায়, সাহিত্যের পথ ছাড়িয়া পথান্তরে সুরু হয় তাঁর যাত্রা। বাংলা-সাহিত্যের পক্ষে ইহা ক্ষতির কারণই হইয়াছে।

ইহার পর চিত্র-জগতের শৈলজানন্দ সাহিত্য-জগতে যখনই কিছু সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে সাহিত্য-বেদীমূলে উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার অমনোযোগিতাই ধরা পড়িয়াছে তাহার মধ্যে। গল্পের গঠনটা চিত্র-নাট্যের ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। চিত্র-রূপায়ণে সেটি সার্থক হইলেও সাহিত্য-জগতে সমাদর পায় নাই।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে তেমনই একটি গল্প পাওয়া যায়—যার বিন্যাসটা শিথিল, ঘটনা-স্রোত দ্রুত এবং চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ। গল্প দানা বাঁধিতে না বাঁধিতে মিলাইয়া যায়। যে সময়ের কলিকাতার কথা লইয়া গল্পের আরম্ভ—সেই কালটিও নিখুঁত ধরা পড়ে নাই। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর পুনর্মুদ্রণে ত্রুটি সংশোধনের যে সুযোগ ছিল তাহারও সদ্ব্যবহার করা হয় নাই।

১। **আফ্রিকার চিত্র**—শ্রীসুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। **লাইবেরিয়ার উপকথা**—শ্রীসুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা—১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য প্রত্যেকটি ১৷০ টাকা।

আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ধারণা খুব পরিষ্কার নহে, খানিকটা গালগল্পের মারফৎ—খানিকটা যা বিদেশী চিত্রের মাধ্যমে ওই অন্ধকার দেশটির কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাই। এই ধরনের হাত-ফেরৎ তথ্য দেশকে ভাল ভাবে জানিবার অবকাশ দেয় না।

আলোচ্য প্রথম গ্রন্থখানিতে লেখিকা আফ্রিকা সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা-প্রসূত অনেক কথা জানাইয়াছেন। প্রবন্ধ কয়টিতে আফ্রিকার ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র-জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এগুলি লেখিকার ভুয়ো দর্শনে সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয় বইখানি ওদেশের উপকথার সংগ্রহ। ইহাতে মোট তেরটি উপকথা আছে। উপকথার ধারা অনুসরণ করিয়া মানব-সংস্কৃতির চিন্তাধারার মূলে পৌঁছানো সহজ। বিভিন্ন দেশের উপকথার মধ্যে বিভিন্ন জাতির প্রকৃতিগত একটা সাদৃশ্য আছে। আদিকালে প্রকৃতি পূজার রূপটিও সব দেশে প্রায় সমান। ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে উপকথার মূল্য এই হিসাবে অকিঞ্চিৎকর নহে। এই সংগ্রহের মধ্যে লেখিকার শ্রম ও যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম বইটি সম্বন্ধে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন—"ইহা বাঙালী পাঠকের পক্ষে আধুনিক আফ্রিকাকে বুঝিতে সহায়ক হইবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ডাকের কাহিনী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য ॥০ আনা।

আমাদের সকলেরই 'ডাকে'র সঙ্গে সম্পর্ক আছে, কিন্তু কয়জন ডাক-ঘরের ইতিহাস বা ডাক-ঘরের বিভিন্ন কার্য্যের খবর রাখি? লেখক ডাক-ঘরের সুদীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া ডাক-ঘর সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি ৫৮ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে আমাদের দেশের ডাক-ঘরের জন্ম-কথা ও ইতিহাস, ডাকের বাহন—যেমন ডাক-হরকরা, ঘোড়-সওয়ার, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, রেল, ষ্টীমার, আকাশযান, ডাকটিকিটের কথা, ডাক-বিভাগের কর্ম্ম-কাহিনী—চিঠি বিলি, অচল চিঠি ডেড-লেটার আপিস হইতে যথাস্থানে বা প্রেরকের নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা, পার্শেল, ভি, পি, পার্শেল, মণিঅর্ডার, সেভিংস ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট প্রভৃতি মেয়াদী আমানত, ডাক-ঘরের জীবন বীমা ও ডাক-ঘরে ঔষধ বিক্রয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ অল্প কথায় প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া শুধু যে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছেন তাহা নহে, আমাদিগকে যথেষ্ট জ্ঞানদানও করিয়াছেন। আমরা আশা করি, লেখক এই বিষয়ে আর একখানি বড় পুস্তক লিখিয়া বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—১ম খণ্ড: অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৬৲ টাকা।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। এ থেকে মনে হয়, সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে বাঙালীর আগ্রহ বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার প্রসার, এ বিষয়ে সহায়তা করছে সন্দেহ নেই। তবু, তাই একমাত্র কারণ নয়। সাধারণ পাঠকের মধ্যেও আজ এ বিষয়ে কিছুটা ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছে।

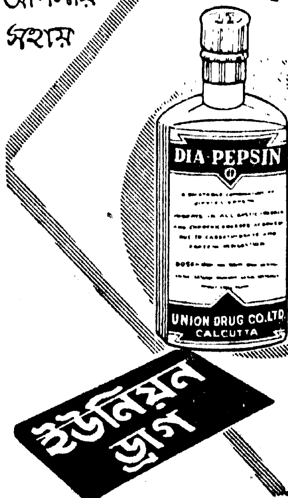
আলোচ্য গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে আছে বৈষ্ণব কবি ও কাব্যের আলোচনা: বিদ্যাপতি, বড় চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, শেখর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাহিত্যকৃতির পরিচয়। তাঁদের সাংসারিক জীবনবৃত্তান্ত এতে নেই, শুধু কাব্যবিচার আছে। প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে প্রধান-অপ্রধান বহু কবির কথা এক সঙ্গে রয়েছে; তাঁদের বিষয়ে কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক তথ্য সমস্তই উল্লিখিত হয়েছে। তা থেকে শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্য সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন। এ গ্রন্থ সে বিষয়ে সহায়তা করবে।

লেখকের বিচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমীচীন। তাঁর ভাষা গম্ভীর, সাধারণতঃ ভাবোজ্জ্বল, দু'এক জায়গায় একটু কঠোর মনে হয়েছে। হয়ত তার অন্যতম কারণ, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বাগ্‌ভঙ্গীর অনুসরণ (যেমন: "তাহা যদি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রতিস্পর্ধী মহাকবির হয়, তাহা হইলে ঐ ক্ষেত্রে রূপ ও রস, শব্দ ও অর্থ, অপৃথগ্‌ যত্নে হরগৌরীর মত পরস্পরের রূপবিভোর হইয়া পড়ে।") বইখানি সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে লেখক কেবল গতানুগতিক মন্তব্য করে বা পদ্যের গদ্যরূপান্তর করে যান নি, স্বকীয় কাব্য-বোধের ও রসাস্বাদনশক্তির প্রমাণ দিয়েছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়—শ্রীশচীন সেন, এম্-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি। ৩য় সংস্করণ। রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য ৭৲

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিরাট, বিচিত্র, তাই তার রসভোক্তা ও রসবিচারীদের আলোচনাও ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে চলেছে। শচীনবাবু শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায় সহকারে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিকের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। প্রধানতঃ কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের পরিচয়। সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধের কিছু কিছু উল্লেখ আছে রবীন্দ্রনাথের 'চিন্তাপ্রবাহ' ও 'সাহিত্য-জিজ্ঞাসা' নিবন্ধ দু'টিতে। কাব্য সমালোচনা—প্রতি গ্রন্থ ধরে লেখক করেন নি, রবীন্দ্র-কাব্যের কয়েকটি মূলসূত্র ধরিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ হ'ল, তাতে প্রমাণিত হয়, পাঠক-সমাজে এর সমাদর হয়েছে কবিগুরু গ্রন্থকারকে লিখেছিলেন: "তোমার এই গ্রন্থে কবিকে বহু যত্নে ও সন্ধানে বিচিত্র করে দেখেছ।" এই সন্ধানের দৃষ্টান্ত মেলে বহু স্থলে। তবে মনে হয়, তত্ত্বের দিকে লেখকের ঝোঁক একটু বেশী। 'ক্ষণিকা'র 'কল্যাণী' এবং 'অতিথি'কে জীবনদেবতা বলে ধরে নেওয়া কি অপরিহার্য?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



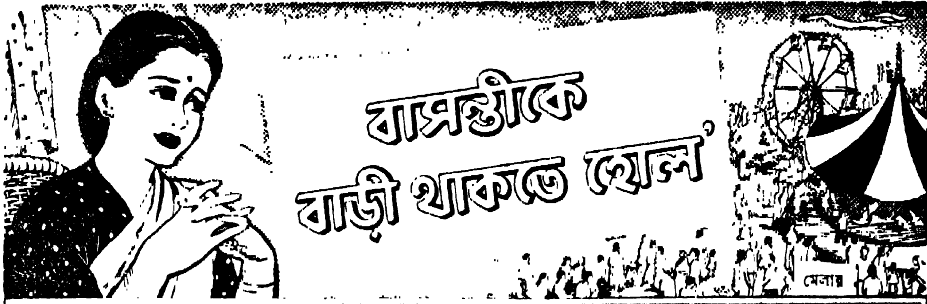
জলাঙ্গী মঠ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

সমালোচ্য উপন্যাসখানির আখ্যানবস্তু সামন্তরাজকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজা, রাণী, অমাত্যবর্গ এবং বিশেষ করিয়া দেবদাসীকে লইয়া লেখক যে অভিনব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা উপভোগ্য হইয়াছে। রোজই সন্ধ্যাবেলা দেবমন্দিরে নৃত্যগীত করে সপর্ণা। নর্ম্মদা আর সেখানে যায় না তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে সপর্ণা। কিন্তু চিন্তামণির স্থানটি এখনও রহিয়াছে অনধিকৃত। আগেকার মতই সারেঙ্গ বাজায় সে। অপূর্ব্ব অদ্ভুত পটায়েতের জীবন-কথা। সপর্ণা তাহার জীবনের এই কাহিনীটি মঞ্জুশ্রীর কাছে আগাগোড়া খুলিয়া বলিয়াছিল। মঞ্জুশ্রীকে গান শুনাইতে সে যাইত রাজান্তঃপুরে। সেখানে দুইজনের বিশ্বস্ত কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া যে ছবিটি তাহাদের মনে ফুটিয়া উঠিত সে ছিল অপরূপ। দু'জনেই আঁকিয়াছে সেটি বুকের রক্ত দিয়া। সমাজ তাহাদের স্বতন্ত্র, পরিবেশ ও ভিন্ন, জীবনের ধারা কিন্তু তাহাদের একই ব্যর্থতার সাগর-সঙ্গমে গিয়া মিশিয়াছে।

জলাঙ্গীর মঠকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র কাহিনীটি লেখকের তুলিকায় নিপুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জলাঙ্গীর মঠে গেল মঞ্জুশ্রী, তারপর পটায়েত। সেই রুক্ষ কঠিন পাষাণ প্রাচীর-ঘেরা মঠের আঙ্গিনায় কত জীবনই ত অতীতকে সমাধি দিয়াছে। ভুলিবার মত অতীত আছে অনেকেরই—কিন্তু মঠ তাহাদের সকলকে টানিয়া আনে না তাহার শূন্য গহ্বরের ভিতর সমাধিক্ষেত্রে। এই অভিনব পরিবেশে উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষা ঝরঝরে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসখানিতে ইহার রচয়িতার বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

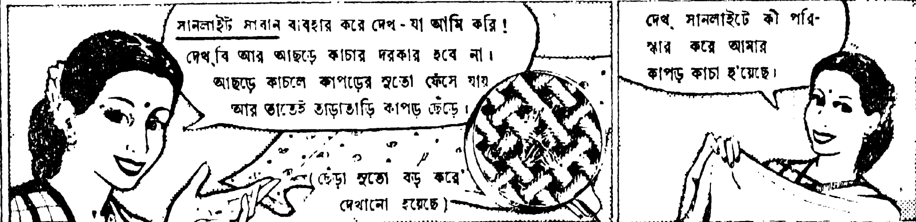
প্রাচীন কবির কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য— ॥০

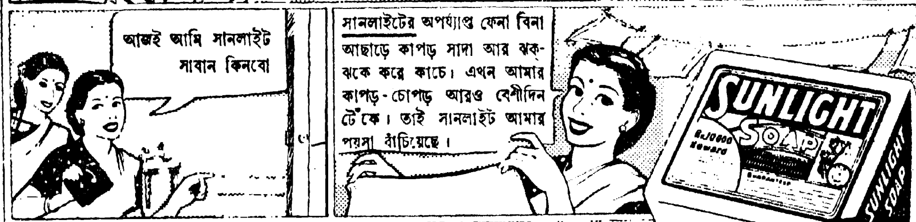
কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল যুগেরই কবিদের জীবন কথা জানিবার জন্য পাঠকদের আগ্রহের অন্ত নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের প্রাচীনকালের অধিকাংশ কবিরই কোনও প্রামাণ্য জীবনী না থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁহাদের জীবন-কথা অবগত হওয়া দুষ্কর। লেখক জয়দেব, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, কাশীদাস, ষষ্ঠীবর দত্ত, কৃষ্ণরাম, গঙ্গারাম, বংশীদাস, ভারতচন্দ্র রায়, গুণাকর, রামপ্রসাদ প্রমুখ প্রাচীন কবিদের রচিত কাব্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন এবং ইঁহাদের জীবন সম্বন্ধে আধুনিককালে রচিত নানা গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণসমূহ আহরণপূর্ব্বক, বিশেষভাবে অল্পবয়স্ক পাঠকদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে এক দিকে যেমন কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রদত্ত হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি কোনও কোনও কাব্যের কাহিনীও বর্ণিত এবং কাব্যের মূল উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই দুরূহ কার্য্যে লেখক সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কঠিন বিষয়বস্তুকে তিনি গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—কাহিনীর গতি কোথাও ব্যাহত হয় নাই। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ছেলেমেয়েরা যেমন প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের জীবন ও কবিকৃতির সহিত মোটামুটি











সানলাইট সাবান

কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।

ভারতে প্রস্তুত

S 236-X 52 BG

ভাবে পরিচিত হইবে, তেমনি বয়স্ক পাঠকেরাও ইহা হইতে বিমল আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

ডক্টর কালিদাস নাগ একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় এই পুস্তকের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কবিতায় শতশ্লোকী গীতা—শ্রীপুষ্প দেবী। ১, ডাঃ শ্যামাদাস রো। মূল্য ২্।

কবিতায় শতশ্লোকী গীতা পড়লাম। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা খুব চমৎকার হয়েছে। এরূপ সুন্দর সর্বজনপ্রিয় অনুবাদ দেখি নি। বইখানি ভক্তিমতী গৃহিণীগণের পরম আদরের বস্তু হবে। এর বহুল প্রচার কামনা করি। সমাজকে শুচি, পবিত্র ও পুণ্য করিতে এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিত। আমার খুবই ভাল লেগেছে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যে দীপ দিল না আলো—শ্রীমিনতী নাথ। নাথস ব্রাস-অয়্যার ফ্যাক্টরী, ৮।২ হসপিটাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। পৃষ্ঠা ৭২, মূল্য ২্ টাকা।

পুস্তকখানি একটি ছোট উপন্যাস। লেখিকা অল্পবয়স্কা, মূলতঃ কবি, তাই তাঁহার ভাষা কাব্যধর্মী। কাহিনীর উপজীব্য প্রেম। চন্দ্রা, ছন্দা ও মঞ্জু তিন বোন ভালবাসে তিনটি তরুণকে, নাম তাদের যথাক্রমে কমল, সমীর ও সুমিত। চন্দ্রা বিয়ের পর সুখী হ'ল না। একদিনে মুহূর্তের একটু অবিবেচনায় ছন্দা সমীরকে হারাল, সমীর হ'ল উদাসী। মঞ্জুর সঙ্গে সুমিতের বিয়ের পর দেখা গেল সে মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল। তিন বোনেরই প্রেমের দীপ আলো দিল না। কাহিনীটি মোটামুটি এই।

দিন কাল—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃ. ২০৮, মূল্য ৪্।

বাংলার জমিদার একদিন ছিলেন কৃষককুলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপে চাষী-প্রজারা টুঁ শব্দ করতে পারত না। কিন্তু কালের বিবর্তনে সে অবস্থা আর নেই। হিন্দু আইনের বিভাগ-বিখণ্ডন নীতি এবং বহুবর্ষব্যাপী আলস্য ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপনের ফলে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি এখন অবলুপ্ত প্রায়। এ দিকে আবার জাতীয় অগ্রগতির দিনে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষক সম্প্রদায়ের 'লাঙ্গল যার জমি তার'—আন্দোলন। এই আন্দোলনের আঘাতে পতনোন্মুখ জমিদার সম্প্রদায়ের যে দশা হয়েছে তারই একটি করুণ চিত্র এই উপন্যাসে আঁকতে চেষ্টা করেছেন লেখক—তাঁর সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে।

উদয়পুরের জমিদার গোষ্ঠী এবং কৃষকসমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র চিত্রণে লেখক যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা বিশেষ প্রশংসনীয়।

যে আন্দোলন নিয়ে কাহিনী রচিত তাতে নারীর স্থান এখনও গৌণ। তাই এতে নারী চরিত্রের বিরলতা পরিলক্ষিত হয়। এতে পাঠকচিত্তে কিছু অতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু বেশী নারী চরিত্র সৃষ্টি না করে লেখক বাস্তব-বোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।

মার্কিনে চারি মাস—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। যুগযাত্রী প্রকাশক লিঃ, ৪১এ, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য ২্।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল যে কেবল চিন্তাশীল দার্শনিক, সুবক্তা এবং দেশপ্রেমিকই ছিলেন না—সুলেখকও বটে, তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে আলোচ্য এই গ্রন্থখানিতে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউ ইয়র্কের জাতীয় মাদক-নিবারণী সভার আমন্ত্রণে বিপিনচন্দ্র ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় যান। সেখানে তিনি অবস্থান করেন মাত্র চার মাস। আমেরিকার মত দেশকে ভাল করে জানবার জন্য এই স্বল্প সময়টুকু অবশ্য যথেষ্ট নয়, তবু এই স্বল্প সময়ে তিনি ঐ দেশকে যতটা দেখেছেন, যেমন করে দেখেছেন তা চিন্তা করলে—এবং মনোজ্ঞ ভাষায় তার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনুধাবন করলে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। ওখানকার বিভিন্ন সভায় তাঁকে যেসব বক্তৃতা দিতে হয়েছিল তারও কিছু কিছু বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ আছে। বক্তৃতাগুলি তাঁর ভারতীয় দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য, আত্মোপলব্ধি, তেজস্বিতা ও স্বাজাত্যাভিমানের দ্যোতক।

ভ্রমণকাহিনীর রস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থখানি চিন্তাশীল পাঠকেরও মনের খোরাক যোগাবে।

শ্রীতারাপদ রাহা

লিখন—শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বসু। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ৩৫এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা ৬। মূল্য ১৸০।

তৃতীয় অঙ্কে শেষ হলেও এখানাকে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা চলে। কাহিনী গতানুগতিক, কিন্তু তাতে প্রচুর নাটকীয় উপাদান রয়েছে। লক্ষপতি ব্যবসায়ী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। পুত্র অজয় ডাক্তারী পাশ করবে এটুকু মাত্র ভরসা। অজয়

স্ত্রী নয়নতারাকে ফেলে পতিতা অলকার প্রেমে মশগুল হয়ে রইল। ডাক্তারী পরীক্ষায় সে পাশ করতে পারল না। চন্দ্রশেখর স্ত্রী হৈমবতী, অনূঢ় কন্যা কমলা, পুত্রবধূ নয়নতারা ও নাতনী মীনুকে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে গেলেন। এদিকে চন্দ্রশেখরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দে সরকার কোং-এর বড় সাহেব মিঃ সরকার অজয়কে চাকরী দিলেন। অজয় মাতা-পিতা, স্ত্রী-কন্যার খবরও নিল না, অলকার পেছনে টাকা ঢালতে লাগল। এরপর একটানা দুঃখ-দারিদ্র্যের বর্ণনার ভেতর দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। কাহিনী এখানে ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও নাটকীয় সংঘাতে পূর্ণ। দুঃখ-দারিদ্র্যের ভেতর মীনু মারা গেল, চন্দ্রশেখর মারা গেলেন। পরিবারের ভার নিলে চন্দ্রশেখরের পুরাতন। ভৃত্য কেষ্ট, কলিকাতায় এক বস্তিতে এসে উঠল, পরিবার প্রতিপালন করতে লাগল রিক্সা টেনে। এ দিকে অজয় দে সরকার কোম্পানীর তহবিল তছরূপ করে অলকার চক্রান্তে মামলায় পড়ল। শেষ পর্য্যন্ত মিঃ সরকারের চেষ্টায় অজয় শুধু যে জেল থেকে বাঁচল তা নয়, তার পরিবর্তনও হ'ল। তারপর মিলনান্তে নাটকের পরিসমাপ্তি।

সংলাপ স্থানে স্থানে দীর্ঘ এবং দুর্ব্বল হলেও নাটকখানি শেষ পর্য্যন্ত দর্শকদের কৌতুহলকে উদ্দীপ্ত করে রাখবে।

ঠাকুর-মায়ের গল্প—শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরণজিৎ-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মূল্য এক টাকা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মা-সারদামণির নানা গল্প ছেলেদের উপযোগী করে লেখা। ঠাকুর ও মায়ের গল্প বর্ণনাচ্ছলে সহজ সাবলীল ভাষায় ছেলেদের সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেওয়া হয়েছে বইখানি আসলে ছেলেদের জন্যে লেখা হলেও বড়দেরও ভাল লাগবে। বইখানা যে ছেলেদের ভাল লেগেছে চার মাসের মধ্যে এর দ্বিতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

দেশ-বিদেশের কথা

ব্রিটিশ গায়েনার প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বর্দ্ধনা

বালিগঞ্জে রাজা শ্রীনাথ সভাগৃহে ভারত সেবাশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় ব্রিটিশ গায়েনা হইতে আগত তথাকার ১২ জন প্রবাসী ভারতীয় সদস্যদের একটি শুভেচ্ছা মিশনকে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ব্রিটিশ গায়েনার বিধান-পরিষদের মনোনীত সদস্য শ্রীসুগ্রীম সিং সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের প্রসঙ্গে বলেন, শতাধিক বৎসর বৈদেশিক শাসনে থাকিবার দরুন তাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা যাহাতে সেখানে ভারতীয় জীবনধারার অনুবর্ত্তন ও সামাজিক রীতিনীতি বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন সেজন্য স্বাধীন ভারতের তরফ হইতে ব্রিটিশ গায়েনায় ব্যাপকভাবে ভারতীয়



ব্রিটিশ গায়েনার প্রবাসী ভারতীয়গণের সংবর্দ্ধনা সভায় ভাষণদান-রত ডাঃ সুগ্রীম সিং

সংস্কৃতি প্রচারের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সেই আদর্শ প্রচারের জন্য ব্রিটিশ গায়েনায় প্রচারক প্রেরণ করিয়া আমাদের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন।

মিশনের অন্যতম সদস্য শ্রী সি. রামশরণ বলেন যে, ব্রিটিশ গায়েনার ভারতীয় অধিবাসিগণ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আগাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু সংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহারা ভারতের নিকট আরও অধিকতর সহায়তা পাইতে চাহেন। তাঁহারা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নিকট সে বিষয়ে সাহায্য লাভ করিতেছেন।

সভাপতি শ্রীসুধাংশুকুমার বসু বলেন, ভারতের বাহিরে অবস্থানকারী ভারতীয় ভাইবোনদের কথা তাঁহারা ভুলেন নাই। ভারত ও ব্রিটিশ গায়েনার অধিবাসিগণের মধ্যে সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছার বিনিময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ভারত-সরকার ব্রিটিশ গায়েনার অধিবাসিগণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হইবেন বলিয়াও শ্রীযুক্ত বসু মন্তব্য করেন।



পশ্চিমবঙ্গের যক্ষ্মারোগীদের উপকারার্থ আমেরিকান সিনামাইড কোম্পানী কর্তৃক বিনামূল্যে প্রদত্ত ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন গ্রহণ-রত রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র প্রধান প্রুফ-রীডার সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বিগত ৮ই অক্টোবর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর হইয়াছিল। তিনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মুংলী গ্রামে ১৩০৮ সালের ২১শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল ও কলেজের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রবাসী-কার্য্যালয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বত্রিশ বৎসর যাবৎ বিশেষ দক্ষতা



সহকারে নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রবাসী কার্য্যালয়ের কর্ম্মই তাঁহার সম্যক পরিচয় নহে। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাংলা রচনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ অনুভব করিতেছি।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



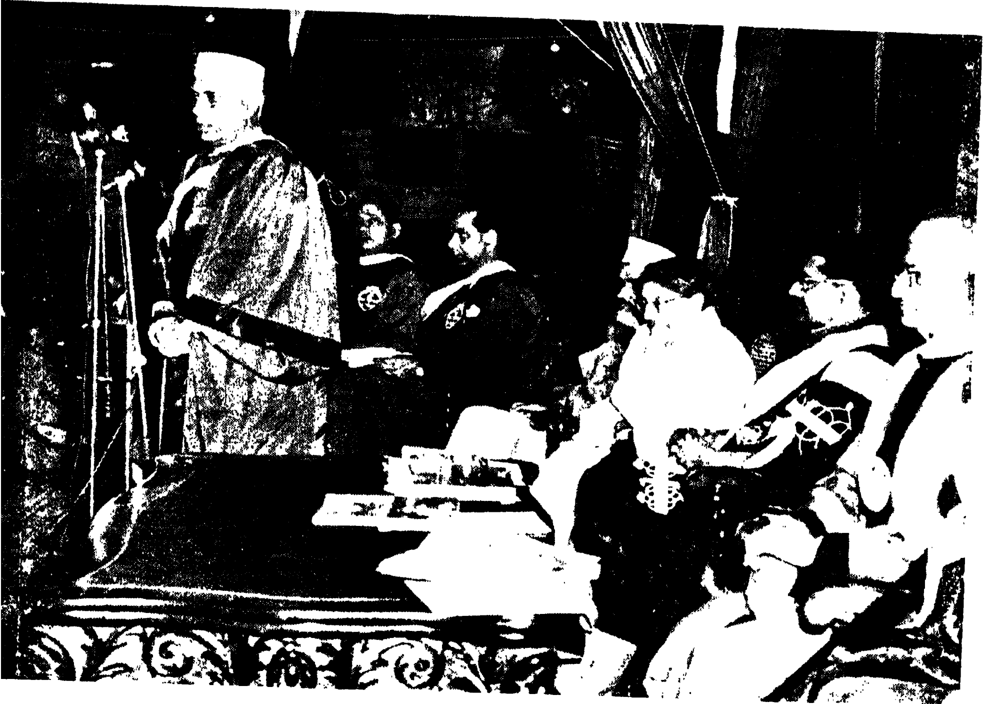
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পল্লীশ্রী

শ্রীঅসিতরঞ্জন বসু



নয়াদিল্লী রাষ্ট্রপতি ভবনে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ইটালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী গায়েতানো মার্তিনো



আগ্রায় ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণদান-রত পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৬২

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

কথায় বলে, "কারও বা পৌষ মাস কারও বা সর্ব্বনাশ।" বিগত পৌষ মাসে বাঙালীর সর্ব্বনাশের লক্ষণ পুরাপুরিই দেখা দিয়াছে। রাজ্যসীমা নির্দ্ধারণে বাঙালীর উপর অবিচার ত হইয়াছিলই, উপরন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে বাঙালী আর মাথা তুলিতে না পারে তাহারও কিছু ব্যবস্থার আভাষ দেওয়া হইয়াছিল। বাঙালী ঐ অবিচারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ইহা সকলেই বুঝিল, সেই সঙ্গে একথাও রটিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটি বাঙালীর সপক্ষে আরও হয়ত কিছু ব্যবস্থা করিবেন।

কিন্তু "উল্টা বুঝলি রাম" দেখা গেল। নূতন ত কিছুই দেওয়া হইলই না, উপরন্তু রাজ্যসীমা নির্দ্ধারণ কমিশন যাহা দিয়াছিল তাহারও কতকটা বাদ গেল। দেখা গেল, সুবিচার অর্থে বাঙালীর উপর আরও অবিচার, ইহাই আমাদের কর্ণধারদিগের সিদ্ধান্ত। "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" ইহা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল।

আমাদের এক বন্ধু বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী গিয়াছিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে। সেখানে পার্লামেন্টের লবিতে তাঁহার সহিত পূর্ব্ব-পরিচিত এবং অন্তরঙ্গ এক বিহারী বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে হাসিয়া বলেন, "আপনারা আরও কিছু পাইবেন আশা করেন? আমি বলিতেছি শুধু চাষ থানা নহে চাণ্ডিল ও বরাভূমের কিছুও বাদ যাইবে পুরুলিয়া হইতে। এখানে সবকিছু চিন্তা মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব লইয়া, কেননা ঐখান হইতেই সেরা শ্রমিক ও সৈন্য পাওয়া যায়। বাঙালীর কি আছে যে তার জন্য মাথা ঘামাইবার দরকার হইবে?"

আমাদের বন্ধু ফিরিয়া আসিয়া একথা সকলকেই বলেন। কিন্তু কেহই বিশেষ বিশ্বাস করে নাই। এখন দেখা যাইতেছে তিনি ঠিকই শুনিয়াছিলেন।

এরূপ যে হইবে আমাদের বুঝা উচিত ছিল। ইহা অন্যায়, অবিচার এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে "নিশ্চল-নির্বীর্য্যবাহু কর্ম্মশক্তিহীনে" সকলেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে এবং তাহার সকল দাবীই অবহেলিত হয় এটা অতি কঠোর সত্য। সুতরাং আমাদের বরং খুশী হওয়া উচিত যে, এতো অল্পের উপর দিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরের কিছু অংশ ত আমাদের নিজস্ব সরকার প্রায় দিয়াই দিয়াছিলেন এবং বর্দ্ধমান ডিভিশনের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সংস্থানের অজুহাতে বিহারকে দেওয়ার প্রস্তাব হয় নাই ইহা আমাদের কপালের জোর।

পুরুলিয়ার যেটুকু গিয়াছে, সে ত বিহারীদের খুশী করার জন্য। যাহা এখনও আমাদের দিবার কথা আছে তাহা যদি আমরা পাই সে কেবলমাত্র পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘের অদম্য প্রয়াসের ও নিদারুণ অত্যাচার সত্ত্বেও দৃঢ়সঙ্কল্পে অহিংস সংগ্রাম চালাইবার ফলে। সুতরাং আমাদের বা যাঁহাদের আমরা কর্ত্তাব্যক্তির আসনে বসাইয়াছি তাঁহাদের কি বলিবার আছে?

লোকসেবক সঙ্ঘ আজও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নের বিষয়ে আমরা ছিলাম অসাড়, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক। "প্রবাসী"তে আমরা যতদূর পারিয়াছি লিখিয়াছি, আবেদনও করিয়াছি, কিন্তু তাহা এখানে অরণ্যে রোদন হইয়াছে। আজ এই অবিচারের ফলে দেশে ক্ষোভ জাগিয়াছে তাই উত্তেজনার হাটে গরম মাল বেচেন যাঁহারা তাঁহারা সজাগ। এতদিন তাঁহারা ছিলেন কোথায়, যখন পুরুলিয়ায় শাসনের নামে স্বৈরাচারের বন্যা বহাইয়াছিল বিহারের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীর দল?

পুনর্ব্বার বলি, আমাদের উপর অন্যায় ও চূড়ান্ত অবিচার হইয়াছে; কিন্তু বলহীনের অধিকার কি আছে? ঋষি-বাক্যে ত "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" কথিত আছে। সুতরাং গত-গৌরব হৃত-আসন বাঙালী কি করিয়া আশা করিতে পারে যে, তাহার দাবি তাহার প্রবল বিপক্ষ দল স্বীকার করিবে? নিষ্ক্রিয়, দিবাস্বপ্ন-বিলাসী, কর্ম্মবিমুখ জনের "লাভে-ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং" ছাড়া আর কিছু হয় না।

গত ২৮শে পৌষ কলিকাতায়, পৌর-সভার অধিবেশনে, মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ "চরম বিষাদাচ্ছন্ন দিন" বলিয়া বক্তৃতা দিয়া,

অধিবেশন মুলতুবী রাখেন। আমরা "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে তাঁহার ভাষণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"মেয়র তাঁহার বক্তব্যের ভূমিকায় এই দিনটিকে 'চরম বিষাদাচ্ছন্ন' দিন বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন, 'আমরা মারাত্মক সংবাদটি শুনিয়াছি এবং এই সংবাদ সমগ্র বাংলাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বিবরণীই আমাদের কাছে যথেষ্ট খারাপ ছিল এবং সমগ্র বাংলার জনসাধারণ দলমতনির্বিশেষে একবাক্যে ইহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এই সম্পর্কে আদৌ কোন মতভেদ নাই। আমরা এক অখণ্ড সত্তার মতো দাঁড়াইয়াছিলাম। আমরা কেবলমাত্র সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমরা কোন আবদার জানাই নাই বা বিশেষ আনুকূল্য চাহি নাই। আমরা শুধু চাহিয়াছিলাম—আমরা, বঙ্গভাষাভাষীরা, একসঙ্গে থাকিয়া নির্বিঘ্নে আমাদের সংস্কৃতির উন্নতি-সাধন করিব।'

অধ্যাপক ঘোষ দেশ বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'আমরা এমন একটি আইনবলে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, যাহাতে আমাদের হাত ছিল না এবং পশ্চিম বাংলার এক অংশ হইতে অপর অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও ইহার মাঝখানে পাকিস্থান বর্ত্তমান।'

"অধ্যাপক ঘোষ বলেন, 'আপনারা সংবাদপত্রে দেখিয়াছেন যে, পাকিস্থানকে ঐস্লামিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইহার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা তাঁহার সহকারী অমুসলমান হইতে পারিবেন না। আমরা (এমনই পাকিস্থান দ্বারা) বিচ্ছিন্ন দুইটি অংশের সংযোগসাধনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনে একখণ্ড সংযোজক ভূমি চাহিয়াছিলাম। ইহা তাঁহারা দেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বিহারের প্রয়োজনে বিহারকে ধানবাদ ও জামসেদপুরের মধ্যে সংযোজক ভূখণ্ড দিয়াছেন। বাংলার বেলায় তাহা দেন নাই।'

"অধ্যাপক ঘোষ বলেন,'বাংলা বহু কষ্ট সহিয়াছে—সব চাইতে বেশী কষ্ট সহিয়াছে। এখন, সুবিচারের অভাবে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তাহা দ্বারা এই অন্যায় প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।'

'আজ কি এমন কেহ নাই, যিনি সাহসে ভর করিয়া বাংলার কথা বলিতে পারেন এবং এই আশ্বাস দিতে পারেন সুবিচার হইবেই ?'

অধ্যাপক ঘোষ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ। তাঁহার ভাষণের শেষে যে প্রশ্ন তাহার উত্তর কি মিলিবে তাহা জানি না। দেশবাসী নিজের বুদ্ধিতে যাঁহাদের মুখপাত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছে তাঁহারা লোকসভায় ও কংগ্রেস কমিটিতে প্রায় নির্ব্বাক থাকেন, সেখানে বা অন্যত্র তাঁহাদের কোনও ওজনের পরিচয় আমরা পাই না। অন্য যাঁহারা তাঁহারা নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থে এতই ব্যস্ত যে দেশের কথা ভাবিবারও সময় তাঁহাদের নাই। ইহার বাহিরে যাঁহারা আছেন তাঁহারা যদিই বা কিছু বলেন বা লিখেন ত তাহা ছাপিবে কে পড়িবে কে ?

দেশের লোক ত এখন পড়ে যাহা দিবাস্বপ্ন বা যৌনবৃ অনুযায়ী। সংবাদ হিসাবে উত্তেজক মাদক সেবনে যে অভ্যস্ত, কঠোর সত্য কি করিয়া সে গলাধঃকরণ করিবে ? সুতরাং যদি কেহ সাহসে ভর করিয়া বাংলার কথা বলে, তাহাতে ফল হইবে কি ?

কথায় যদি সিদ্ধিলাভ হইত তবে ত আমরা দিগ্বীজয়ী হইতাম। কিন্তু কথায় তো চিড়ে ভিজিল না, কার্য্যসিদ্ধি ত হইলই না। বাস্তবপক্ষে এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে কথার মূল্য খুবই কম, এমনকি পদীপিসির বচন—যাহা আজিকার বাঙালী বহুদিন পরে আবার মানিয়া চলিতেছে। সুতরাং কাহার ক্ষমতা আছে আমাদের আশ্বাস দিবার, যে, সুবিচার হইবেই ?

বস্তুতঃপক্ষে আমরা কি সুবিচার চাহিয়াছি ? আমরা তো কেবলমাত্র উদ্বাস্তুদিগের নাম করিয়া ভিক্ষামাত্র চাহিয়াছি। আমাদের পিতৃপুরুষদত্ত জন্মস্বত্ব যাহা, অধিকার যাহা, তাহা তো ইংরেজ আমাদের হাত হইতে ছিনাইয়া, বঞ্চিত করিয়া, বিহারকে দেয় নিজ স্বার্থে। মানভূম, সিংহভূম, ছোটনাগপুর ও সাওতাল-পরগণার খনিজ এবং অরণ্যসম্পদ বিহারকে ঠকাইয়া দাবাইয়া ইংরেজ সহজে লইতে পারিবে ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। বাঙালী তখন বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে নিস্তেজ ও ক্লান্ত হওয়ায় সেই অপহৃত সম্পদ উদ্ধার করিতে পারে নাই। আজ কি আমরা সে কথা বলিষ্ঠভাবে প্রকট করিয়া সুবিচারের দাবি করিয়াছি ? আজও তো এই ব্যাপারে যাহা বাংলার কংগ্রেস বলিতেছে তাহা (আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে) এইরূপ :

"দুই দিনব্যাপী দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের সমাপ্তি দিবস রবিবার সকাল বেলা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে 'রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের' সমস্যাকে 'সর্ব্ব-ভারতীয় সমস্যা' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন উত্থাপিত উক্ত প্রস্তাবে এই আশা ব্যক্ত করা হয় যে, 'রাজ্য সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণে প্রধানতঃ ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয় নিরাপত্তা, প্রশাসন, আর্থিক অব্যবস্থা এবং পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তিযুক্ত এবং সমীচীন ব্যবস্থা অবশ্যই অনতিবিলম্বে গ্রহণ করিবেন।'

প্রস্তাবে বলা হয়, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিশিষ্ট দান ও স্বাধীন ভারত সংগঠনে দেশ-বিভাগজনিত ক্রমবর্দ্ধমান উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে সীমান্ত রাজ্য জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন ব্যবস্থায় যে সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে এবং যে অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণকল্পে যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে সুবিচার করা হয় নাই। রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সর্ব্বভারতীয় সমস্যা, বিহার বা আসামের নিকট হইতে কিছু ভূমি লাভের সমস্যা মাত্র নহে।'

উদ্বাস্তু সম্পর্কিত অপর একটি প্রস্তাবের প্রসঙ্গ তুলিয়া সম্মেলনের

সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন, অনিশ্চিতসংখ্যক উদ্বাস্তুর অবিরাম সমাগম ঘটিতে থাকিলে পৃথিবীতে কোন দেশের পক্ষেই পরিকল্পনা-মত তাহাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। তাঁহার মতে কেন্দ্রীয় সরকারের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে (পূর্ব্ববঙ্গে) সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপদে বসবাস করিতে পারে।

শ্রীঘোষ সম্মেলনের সভাপতিরূপে তাঁহার সমাপ্তি-ভাষণ দিতেছিলেন। তিনি 'নিরর্থক প্রস্তাব গ্রহণের ভাববিলাসের' নিন্দা করিয়া এই সমস্যাটিকে আরও গভীরভাবে সকলকে তলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করেন।"

আরম্ভে জাতীয় নিরাপত্তা, প্রশাসন, আর্থিক অব্যবস্থা, পাঁচসালা পরিকল্পনার গৌরচন্দ্রিকায়, সেই একই কথা বলা হইয়াছে "ওগো কে আছ, ভিক্ষা দাও, না হইলে উদ্বাস্তু সঙ্কট হইতে আমাদের উদ্ধার নাই।"

ইহার উত্তর ত পণ্ডিত নেহরু হইতে রাজ্যসীমা কমিশন পর্য্যন্ত সকলেই এক কথায় দিয়াছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা কেন্দ্রীয় ব্যাপার। অর্থ সাহায্য ভূমি ব্যবস্থা সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকার করিতেছেন ও করিবেন, সুতরাং ইহার সহিত বাংলার সীমা-বৃদ্ধির সম্পর্ক কোথায়? অন্য দিকে দেখুন লোকসেবক সঙ্ঘের বিবৃতি ('মুক্তি' হইতে উদ্ধৃত) কিরূপ:

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গ-ভঙ্গের চক্রান্ত করিয়াছিল। কার্জ্জনের সেই নীতি দিল্লীর মসনদ-ধারীদের বরাবর বিশেষ লক্ষ্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কালে ব্রিটিশ তার শেষ কামড় হিসাবে বাংলা দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূতরূপে বাংলাকে চরম মূল্য দিতে হইল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই সনাতন নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের স্বরাজী কার্জ্জনেরা দিল্লী প্রাসাদে লোকচক্ষুর অন্তরালে খণ্ড বিখণ্ডিত বঙ্গদেশের উপর মৃত্যু-শেল হানিবার গভীর চক্রান্তে লিপ্ত। সমগ্র ভারতে হিন্দীপন্থীদের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপনের উন্মাদ উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন রূপদান করিয়াছে। ন্যায় বিচারের নামে নেহরু-পন্থ সরকার হিন্দী-পন্থীদের জোট আরও সুদৃঢ় করিবার অপচেষ্টায় কমিশনের রিপোর্ট সংশোধন করিতে বসিয়াছেন। সীমা কমিশন ঘোর অন্যায় ও অবিচার করিয়াও বাংলাভাষী মানভূম ও কিষণগঞ্জের যে একফালি জমি বাংলার সহিত যুক্ত করার সুপারিশ করিয়াছিলেন নেহেরু সরকারের তাহা সহ্য হইতেছে না। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদকে অটুট রাখিবার জন্য নেহেরু সরকার হিন্দী জোটভুক্ত বিহারের স্বার্থে বাংলাকে সেই কৃপণ বিচার হইতেও বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া অন্তরালবর্ত্তী সংবাদের আকস্মিক উদ্‌ঘাটনের ভিতর দিয়া জানা যাইতেছে।

সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ করিলে এই অনুমান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে যে, মানভূম তথা বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিতে সরকারী দমন ও দুর্নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে আচরিত হইয়া আসিতেছে। বাংলাভাষাকে দমন করিবার জন্য বিহারে ও আসামে যে উগ্র অভিযান চলিয়াছে তাহার পশ্চাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয় বা সমর্থন না থাকিলে প্রাদেশিক সরকারের বেপরোয়া ভাবে অন্যায় করিবার সাহস বা স্পর্দ্ধা হইত না। গত সেন্সাসের সময় বাংলাভাষীর সংখ্যা হ্রাসের কারসাজী সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসাজসে হইয়াছে বলিয়া অনুমান করাও অন্যায় হইবে না।"

উদ্বাস্তু সমস্যা অতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদে তাহার গুরুত্ব পূর্ণরূপেই দেখা যায়:

"পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে অত্যধিক সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমন করায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সমস্যা এক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সি. সি. বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই গুরুতর সমস্যার পর্য্যালোচনা করেন।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম ১৫ দিনে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় ৯,৯৫৬ উদ্বাস্তু দেশান্তরী সার্টিফিকেট লইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বের এক পক্ষকাল ৭,০৭৯ জন উদ্বাস্তু দেশত্যাগী হইয়া ভারতে আসেন।

ইহা ছাড়া আসাম, ত্রিপুরা এবং মণিপুরেও বহু উদ্বাস্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে বর্ত্তমানে ২ লক্ষ ৩২ হাজার উদ্বাস্তু বসবাস করিতেছেন।"

কিন্তু উদ্বাস্তুর নামে ভিক্ষায় কোন কিছুই ফল হইবে না। চাই সক্রিয় বলিষ্ঠ নির্দ্দেশ। ষ্ট্রাইক বা শ্লোগানে কিছুই হইবে না, কেন-না কাজ আমরা এতই কম করি যে, একেবারে বন্ধ করিলেও নিজেদের ছাড়া আর কাহারও ক্ষতি হইবে না।

সেইজন্যই আমরা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হরতালের পক্ষ-পাতি আদৌ নহি। হরতাল ও ঝটিতি ষ্ট্রাইক ত কলিকাতায় নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার। সুতরাং ইহাতে "চ্যাংড়া" ছেলে ক্ষেপাইয়া ঘরের লোককে বিব্রত করিয়া, অযোগ্য নেতৃত্বের ক্ষমতা জাহির করাই হয়। কাজ কিছুই হয় না কর্ম্ম-বিরতিতে, ইহা বলা বাহুল্য।

এখন প্রয়োজন সক্রিয় কর্ম্মসূচী, কর্ম্ম-বিরতি নহে। ষ্ট্রাইক করাইয়া ত বাংলার ও বাঙালীর অধঃপতন প্রায় চৌদ্দ আনা পুরা হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে কলকারখানার শ্রমিকের কাজ, সবকিছুই ত ভিন্ন প্রদেশীয় লোকে লইয়াছে আমাদের কর্ম্ম-বিমুখতার কারণে, তবে আর কেন?

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৪,৮০০ কোটি টাকা খরচ হইবে এবং বেসরকারী পরিকল্পনা ক্ষেত্রে খরচ হইবে ২,৩০০ কোটি টাকা। সরকারী খাতে খরচ তোলা হইবে এই-ভাবে—চলতি রাজস্ব হইতে ৩৫০ কোটি টাকা; অতিরিক্ত কর-ধার্য্য দ্বারা ৪৫০ কোটি টাকা; রেল-রাজস্ব হইতে আসিবে ১৫০ কোটি টাকা; প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড হইতে ২৫০ কোটি টাকা; সরকারী ঋণ এবং স্বল্প জমা হইতে ১,২০০ কোটি টাকা; ৩০০ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য; ঘাটতি খরচের দ্বারা ১,২০০ কোটি টাকা উঠিবে। অবশিষ্ট খরচ হয় অতিরিক্ত করধার্য্য দ্বারা তোলা হইবে, না হয় ত বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিকার্য্য ব্যতীতও অন্যান্য শিল্পে প্রায় ৮০ লক্ষ লোককে কার্য্য দেওয়া হইবে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৫,৫০,০০০। শিল্পের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হইবে, বুনিয়াদী শিল্পের জন্য ৭০০ কোটি টাকা খরচ ধার্য্য করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৪০০ কোটি টাকা খরচ হইবে রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের কারখানার জন্য।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর-রাজস্বের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৮০০ কোটি টাকার মত; কিন্তু এই অর্থের পরিমাণ বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত থাকে না বলিলেই চলে; কেন্দ্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ যৎসামান্য; প্রদেশ-গুলিতে রাজস্ব ঘাটতি স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকন্তু, প্রত্যক্ষ করের হার প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছিয়াছে; তাই রাজস্ব বৃদ্ধি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হইলেও, পরোক্ষ করের উপর অধিকতরভাবে নির্ভর করিতে হইবে। দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় এমনিই অত্যধিক; ইহার উপর পরোক্ষ করজাল আরও ব্যাপকতর ভাবে বিস্তার করিলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় পড়িবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটিরশিল্প ও স্বল্পায়তন-শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে, ইহাতে উৎপাদন খরচ তথা দ্রব্যমূল্য অবশ্যম্ভাবী রূপে বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে জীবনমান-মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ১,২০০ কোটি টাকার সরকারী ঋণের পরিমাণ অত্যধিক এবং জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ইহার পরিণাম শুভ হইবে না। জাতীয় ঋণের অর্থ সমাজের এক শ্রেণীর অর্থে অন্য শ্রেণীকে পুষ্ট করা; ১,২০০ কোটি টাকার উপর শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে বাৎসরিক সুদের পরিমাণ হইবে ৪৮,০০,০০০ লক্ষ টাকা (শতকরা ৪৲ টাকাই এখন সরকারী ঋণের সুদের হার)। এই টাকা আসিবে কোথা হইতে? অবশ্য করধার্য্য দ্বারা ইহার আওতায় পড়িবে মূলতঃ গরীব ও মধ্যবিত্ত। ভারতে সরকারী ঋণের মালিক মুষ্টিমেয় ধনী এবং সরকারী ঋণের দ্বারা প্রধানতঃ তাঁহারাই উপকৃত হইবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে। এত টাকা বাজার হইতে সরকারী ঋণ হিসাবে তুলিয়া লইলে, টাকার বাজার সঙ্কীর্ণ হইতে বাধ্য। ইহাতে বেসরকারী পরি-কল্পনার ক্ষেত্রে অর্থসম্পদের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩০০ শত কোটি টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ একই ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৫০ শত কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে; এই সাহায্যের মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ, কলম্বো প্ল্যান দেশগুলি হইতে সাহায্যপ্রাপ্তি এবং আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ ও সাহায্য। কলম্বো প্ল্যান ১৯৫৭ সনের এপ্রিলে শেষ হইয়া যাইবে; আমেরিকার নিকট হইতে বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাহায্য গ্রহণ করা অনুচিত। বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণপ্রাপ্তি অনিশ্চিত এবং তাহার পরিমাণও সীমাবদ্ধ। আর এই ঋণের উপর সুদের হার অত্যধিক; বৎসরে প্রায় পাঁচ শতাংশেরও অধিক।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১,২০০ শত কোটি টাকার ঘাটতি খরচ হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫০০ কোটি টাকায়, মোট ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ। বাজেট ঘাটতির মাধ্যমে ঘাটতি ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয় এবং ইহার দ্বারা মোট জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধিলাভ করে। এই অতিরিক্ত ব্যয় বাজেটের রাজস্ব ঘাটতি কিংবা মূলধন ঘাটতির খাতে হইতে পারে।

রাজস্ব দুই প্রকারের—কর রাজস্ব ও অন্যান্য। কর রাজস্ব, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে আয়, সরকারী ঋণ, রাষ্ট্রের নিকট জন-সাধারণের জমা টাকা প্রভৃতি সমস্তই রাষ্ট্রের রাজস্বের মধ্যে পড়ে। ইহার বাহিরে অতিরিক্ত যাহা কিছু ব্যয় তাহা হয় সরকারী জমা টাকা হইতে ব্যয় করা হয় অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাষ্ট্রীয় ঋণ গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত ব্যয় মিটান হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যে অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করা হয় তাহাই প্রধানতঃ ভারতে ঘাটতি ব্যয় বলিয়া অভিহিত হয়। এই ঋণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অতিরিক্ত নোট ছাপাইতে হয় এবং সেই নোটের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি হুণ্ডী ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিত্ত জমা রাখা হয় না। সোজা কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণপত্রের বিরুদ্ধে যে অতিরিক্ত নোট ছাপানো হয় তাহাই ঘাটতি ব্যয় বলিয়া অভিহিত।

ভারতবর্ষে নোট ছাপানো প্রথা আনুপাতিক জমার উপর নির্ভর-শীল বলিয়া ঘাটতি ব্যয় বাস্তবক্ষেত্রে নিছক সরকারী ঋণপত্রের বিরুদ্ধে শুধু নোট ছাপাইয়া নির্ব্বাহ হয় না; এই অতিরিক্ত নোটের পরিমাণের ৪০ শতাংশ স্বর্ণ কিংবা বিদেশী সরকারী কাগজ (যাহা সোনার সমমূল্য) জমা হিসাবে রাখিতে হয়। সুতরাং মোট ঘাটতি ব্যয়ের ৪০ শতাংশ স্বর্ণ কিংবা বিদেশে সরকারের জমা তহবিলের বিরুদ্ধে মজুত রাখিতে হয়। এই কারণে ভারতবর্ষে ঘাটতি ব্যয়ের জন্য যথেচ্ছ পরিমাণে নোট বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়; আনুপাতিক জমার পরিমাণ এই ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে।

ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহা মুদ্রাস্ফীতির সহায়ক, অতিরিক্ত পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়। এই যুক্তির পিছনে কিছু পরিমাণ সত্য আছে ঠিকই, কিন্তু এই যুক্তি প্রধানতঃ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোয় প্রযোজ্য, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ইহার ফলাফল ভিন্ন রকম, বিশেষতঃ শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিতে। ভারতবর্ষ অবশ্য একটি অনুন্নত দেশ, এখানে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যদিও এই দেশ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য এবং উন্নতির সম্ভাবনায় পূর্ণ।

পরিকল্পিত অর্থনীতির ব্যয় নির্ব্বাহ সাধারণ রাজস্ব আয় দ্বারা সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে যেখানে গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয় যৎসামান্য। বেসরকারী শিল্পপতিদের উপর এই পরিকল্পনার অর্থের জন্য নির্ভর করা যায় না, কারণ তাহাদের বিত্তসঞ্চয় সীমাবদ্ধ, এবং তাহাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে তাহাকেও তাহারা কার্য্যকরীভাবে নূতন শিল্পে প্রয়োগ করিতে কিছু পরিমাণ নারাজ এবং কিছু পরিমাণ অপারগ। সরকারী সাধারণ রাজস্বের দ্বারা পরিকল্পনা পরিচালিত করিতে গেলে আর যাহাই হউক তাহা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইবে না। এইরূপ অবস্থায় পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে গেলে ঘাটতি ব্যয় অবশ্যম্ভাবী। বেকার সমস্যা সমাধানের প্রধান দায়িত্ব বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের উপর; বেকারসমস্যা অবশ্য সমাধান করিতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে দেশকে অল্প সময়ে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্য অতি অবশ্যভাবেই লইতে হইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৩০০ শত কোটি টাকার, কিন্তু ইহার বাস্তব পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫০০ শত কোটি টাকায়। সেই রকম দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ১,৭০০।১,৮০০ কোটি টাকায় যদিও ইহার প্রাথমিক পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকায় নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে এবং ইহার ফলে অধিকসংখ্যক লোক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। ঘাটতি ব্যয়ের কুফল নিবারণ করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারিক দ্রব্য (consumer goods) উৎপাদন ও বাজারে সরবরাহের প্রয়োজন, যাহাতে চাহিদার সঙ্গে দ্রব্য-সরবরাহ সমতা রক্ষা করিতে পারে। ইহাতে মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি পাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের হার অত্যধিক পরিমাণে ধার্য্য থাকিলে, ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা যে মুদ্রাস্ফীতি হইবে তাহা নিবারিত হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় ৫০০ শত টাকার ঘাটতি ব্যয় হইলেও দেশের মূল্যমান বৃদ্ধি পায় নাই; বরং ইহার গতি নিম্নাভিমুখী। পরোক্ষ করও অবশ্য আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যদি মূল্যমান বাড়তির দিকে গতি রাখে।

তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক রেট উচ্চহারে রাখিতে হইবে। ইহার ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে চলতি বাজারে ফাটকা কিংবা speculation-এর সুবিধা হইবে না। সেই কারণে দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পাইবে না।

চা-শিল্পে মন্দা

কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের চা রপ্তানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু হঠাৎ মন্দার বাজার সুরু হইয়াছে। ভারতীয় চায়ের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী আজ সিংহলের চা ও আফ্রিকার চা। অষ্ট্রেলিয়ার চায়ের বাজার হইতে ভারতবর্ষ হটিয়া গিয়াছে; তাহার স্থান দখল করিয়াছে সিংহল ও আফ্রিকা। সিংহলের চা ভারতের চা হইতে উচ্চশ্রেণীর এবং নিয়মিতভাবে চা রপ্তানী করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে জাহাজ পাঁচ-ছয় মাসে একবার চা লইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায়। আমেরিকাতেও ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে, যদিও চা রপ্তানী ব্যাপারে আমেরিকা ভারতীয় চায়ের বড় ক্রেতা। আমেরিকায় চা রপ্তানীতে এত দিন সিংহল প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ছিল। কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহাতে উৎফুল্ল হইবার মত কিছু নাই, কারণ ১৯৫৩-৫৪ সনের তুলনায় ১৯৫৪-৫৫ সনে আমেরিকাতে ভারতীয় চা রপ্তানীর মোট পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সনে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ৪.৩১ কোটি পাউণ্ড চা আমদানী করে; কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ৩.৬৩ কোটি পাউণ্ডে। তবে ১৯৫৩-৫৪ সনে আমেরিকায় মোট চা আমদানীর মধ্যে ৩৪.৬ শতাংশ ছিল ভারতীয় চা; আর ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭.৫ শতাংশে। এ কথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, ব্রিটেন ভারতীয় চায়ের বৃহত্তম ক্রেতা।

চায়ের মন্দা বাজারের কারণ পৃথিবীর চা সরবরাহ ও চাহিদার পরিস্থিতি। ১৯৫৪ সনে চায়ের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় ছিল অতিরিক্ত। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড চা অতিরিক্ত হইয়াছে; কম করিয়া ধরিলে অন্ততঃপক্ষে ৪ কোটি পাউণ্ড বাড়তি চা গত বৎসরে থাকিয়া গিয়াছে। ১৯৫৫ সনের প্রথমে চীন, জাপান ও ফরমোসার উৎপাদন বাদ দিয়া পৃথিবীর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২১ কোটি পাউণ্ড। চায়ের মূল্য বৃদ্ধির ফলে গত বৎসরের তুলনায় ভারত ও সিংহলে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫ সনে প্রায় ১২২.৫ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার সঙ্গে চান, জাপান ও ফরমোসার উৎপাদন প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড যোগ দিলে পৃথিবীর মোট উৎপাদন হইবে ১৩২.৫ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু চায়ের মূল্য অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় চায়ের চাহিদা ক্রমহ্রাসমান। এই বৎসরে ইউরোপ ও আমেরিকায় চায়ের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ইহা অনুমান করা হয়াছে যে, ১৯৫৫ সনে চায়ের চাহিদা ১২৮.৮ কোটি পাউণ্ডের বেশী হইবে না। সুতরাং ১৯৫৫ সনেও ৪ কোটি পাউণ্ড চা অতিরিক্ত থাকিয়া যাইবে; ইহার সঙ্গে গত বৎসরের ৪ কোটি

পাউণ্ড উদ্বৃত্ত যোগ দিতে হইবে। ১৯৫৬ সনের প্রথমে মোট ৮ কোটি পাউণ্ড চা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক চায়ের বাজার বর্ত্তমানে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। ভারতের চা দিন দিন নিকৃষ্টতর হইতেছে, ইহার ফলে সিংহলের উৎকৃষ্ট চায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। সেদিন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন যে, ইদানীং ভারতীয় মালিকদের হাতে চা বাগানগুলি আসিয়া যাইতেছে এবং ইহারা ব্যবসায়ের নীতির দিকে নজর না দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির দিকে বেশী নজর দিতেছে, ইহার ফলে নিকৃষ্টতর চা উৎপাদন হইতেছে। এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই রকম অবিবেচক, স্বার্থপর এবং ব্যবসায়িক নীতিজ্ঞানবিবর্জ্জিত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ভারতের অন্য ব্যবসা (যাহাতে ভারতবর্ষ একদিন ছিল প্রধান রপ্তানীকারক) অচল হইয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরায় শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে এক বিস্তৃত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সেবক' পত্রিকা লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরা ক্রমাগতই একটি শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। ত্রিপুরার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা সম্পর্কে পত্রিকাটি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুলিসসহ ত্রিপুরায় প্রায় সাত হাজার সরকারী কর্ম্মচারী অর্থাৎ প্রতি এক শত জন অধিবাসীর মাথাপিছু একজন করিয়া সরকারী কর্ম্মচারী রহিয়াছেন। তথাপি সরকারী কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই অরাজকতা বিদ্যমান। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল; কিন্তু তন্মধ্যে প্রথম চারি বৎসরে মাত্র ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সরকার আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে বাকী ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যদিও তাহাতে সফল হইবার আশা কম। উপরন্তু "টাকা ব্যয় করার দিকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করায় প্রথম শ্রেণীর কাজের টাকা দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর কাজ আদায় করিয়া সরকারকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে বলিয়া বিভিন্ন মহলে সন্দেহ পোষণ করা হইতেছে।"

সরকারী কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম যথাযথ সম্পন্ন করেন কিনা তাহা দেখিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। "আবার যাহারা নিজের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সজাগ এবং জনসাধারণের জন্য কিছু কাজ করিবার ইচ্ছা রাখে তাহারা সরকারের লালফিতার মহিমায় ও নানাবিধ সৃষ্ট বাধাবিঘ্নের চাপে কাজের উৎসাহ ত হারাইয়াছেই এমনকি নিজদিগকেও নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে করিতেছে।"

সরকারী শাসনব্যবস্থার প্রতি স্তরেই অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করা হইতেছে অথচ হয় গৃহের অভাবে নতুবা ছাত্রের অভাবে শিক্ষকগণ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হইলেও বৎসরে চার-পাঁচ মাসের বেশী উহা আদিবাসী অঞ্চলে থাকে না। ইহার উপর যদি হাসপাতালের গাড়ীখানা বিকল হইয়া পড়ে তবে ত কথাই নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে, দুই-তিন বৎসর ঘোরাঘুরি করিবার পরও পাওনাদারগণ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

"ষ্টাইপেণ্ড পাইয়া ত্রিপুরায় এবং ত্রিপুরার বাহিরে ট্রেনিঙে গেলে দেখা গিয়াছে প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত ষ্টাইপেণ্ড পাওয়া যায় না। ষ্টাইপেণ্ড-প্রাপ্ত প্রায় দুই শত শিক্ষানবীশ আজ বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষানবীশ সময়মত ষ্টাইপেণ্ডের টাকা পায় না বলিয়া নানাবিধ অসুবিধায় দিন কাটায়। কোন গেজেটেড অফিসার নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিলে কিংবা ট্রেনিঙে গেলে বেতন পান না এমন অনেক নজীরও আছে। দুই কিংবা বড়-জোর তিন কিস্তিতে বৎসরের বেতন পাইয়া থাকেন এমন অফিসারও নাকি রাজ্য সরকারের অধীনে চাকুরী করিতেছেন। টি-এ বিলও নাকি বৎসরে একবার আদায় হওয়ারই নিয়ম হইয়া গিয়াছে। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও নিস্তার নাই। কারণ পেন্সন আদায় করিতে প্রাণান্ত হইতে হয়। অবসর গ্রহণ করার দুই-চারি বৎসর না গেলে সাধারণতঃ পেন্সনের টাকা দেওয়া হয় না। বেতন মণিঅর্ডার করিয়া মফস্বলে কর্ম্মচারীদের নিকট প্রেরণ করার কোন ধারাবাহিক নিয়ম নাই। ফলে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া, সরকারী কাজে ফাঁকি দিয়া বিনা টি-এতে বহু কর্ম্মচারীকে দুর্ভোগ ভুগিয়া বেতন গ্রহণ করিতে হয়।"

১৪ই জানুয়ারী ত্রিপুরার শাসনতান্ত্রিক গলদসম্পর্কিত অপর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকা বিভিন্ন কর্ম্মচারীদের প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন:

"এস-ডি-ওদের উপর যথেষ্ট দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে অথচ তাহাদিগকে অন্যান্য রাজ্যের সমপর্য্যায়ে বেতন দেওয়া হয় না। এমনকি তাহাদের টি-এ পর্য্যন্ত বহু বিলম্বে দেওয়া হয়। এখানকার একজন পুলিস ইনস্পেক্টরকে যে হারে বেতন দেওয়া হয় তাহা ত্রিপুরার একজন এস-ডি-ও হইতে অনেক বেশী।"

পদমর্য্যাদার ঠাট বজায় রাখিতে গিয়া অনেক এস-ডি-ওর পক্ষেই সংসার চালানো কষ্টকর হয়। উপরন্তু "মহকুমার শাসন-দায়িত্বে যাহারা অধিষ্ঠিত তাহাদিগকে তিন-চার মাসের কিস্তিতে নিয়োগ করা হয় বলিয়া প্রতি তিন-চার মাস অন্তর দুই-তিন মাসের বেতন আটকা পড়ে।..."

ত্রিপুরা বাংলাভাষী এলাকা। ইদানীংকালে বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ অফিসার নিয়োগের ফলে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উপসংহারে "সেবক" লিখিতেছেন, "এক কথায় বলিতে গেলে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা চাকুরী করিতেছিলেন কিংবা ইদানীংকালে ত্রিপুরা সরকার যাঁহাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উপযুক্ত হারে বেতন দেওয়া হয় না। অথচ কাজ সম্বন্ধে ধারণা থাকুক বা না থাকুক অন্য রাজ্য হইতে আসিলে দ্বিগুণ হারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। (টেকনিকাল অফিসার সম্পর্কে অবশ্য আমরা অন্য মত পোষণ করি।) সাদৃশ্যহীন বেতনের হার নির্দ্ধারণ করিয়া সরকার অফিসার-সমাজে এক বিরাট ফাটল ধরাইবার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।"

কলিকাতার বাস জাতীয়করণে অগ্রগতি

কলিকাতা নগরীতে যে সকল যাত্রীবাহী বাস এখনও ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে রহিয়াছে সেগুলি জাতীয়করণ করিবার পরিকল্পনা সরকার সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। স্থির হইয়াছে, ১৯৫৫-৫৬ হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার সকল বেসরকারী বাস রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে। প্রথম বৎসরে ৪টি রুটের ১১৪টি বাসের পরিচালনা ভার সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বৎসরে ৫টি রুটের ১২০টি, তৃতীয় বৎসরে ৫টি রুটের ১১৬টি, চতুর্থ বৎসরে ৮টি রুটের ১১০টি এবং পঞ্চম বৎসরে ৫টি রুটের ৯২টি বেসরকারী বাস অপসারিত করিয়া সেই স্থলে সরকারী বাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে।

রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বিভাগের ৩২৫টি বাসের মধ্যে দৈনিক প্রায় ২৮৫টি বাস রাস্তায় বাহির হয়। বাসগুলি কলিকাতার প্রধান ১২টি রুটে দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বিভাগে বর্ত্তমানে বিভিন্ন কার্য্যে প্রায় ৩,০০০ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। কর্ম্মীদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় পরিবহণ বিভাগ সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে ৩১০টি বাস ক্রয় করা হইবে।

হরিণঘাটার সরকারী দুগ্ধকেন্দ্র

সাত বৎসর পূর্ব্বে হরিণঘাটায় গো-পালন ও গবেষণা-কেন্দ্রটি সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪-৫৫ সনের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, কেন্দ্রটির কার্য্য ক্রমশই ব্যাপকতর রূপ গ্রহণ করিতেছে। বর্ত্তমানে ডেয়ারী ফ্যাক্টরীতে দৈনিক ২৭৮ মণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। যে যন্ত্রটি রহিয়াছে তাহাতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া সম্ভবপর নহে, সেজন্য কারখানার প্রসারের ব্যবস্থা চলিতেছে।

উক্ত কেন্দ্র হইতে বিতরিত দুগ্ধের চাহিদা বৃদ্ধির সহিত মাখন ও ঘিয়ের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৫ সনের ৩১শে মার্চ্চ হরিণঘাটা কেন্দ্রে গরু ও মহিষের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩০০ বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৮৬টিতে দাঁড়ায়—উহাদের মধ্যে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের সংখ্যা ছিল ৫৮৪টি। ছাগলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ কেন্দ্রে ১৭৩টি ছাগল ছিল—১৯৫৫ সনের ৩১শে মার্চ্চ সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৯-এ দাঁড়ায়।

কাঁথিতে খাদ্যাভাব

২৮শে অগ্রহায়ণ 'দুর্ভিক্ষের ছায়া' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কাঁথি হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশপ্রাণ' লিখিতেছেন যে, গত বৎসর যথোপযুক্ত ফসল উৎপাদন না হওয়ায় জনসাধারণ বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল এবং সরকার কর্ত্তৃক টেষ্ট রিলিফ, ড্রাই ডোল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, বলিয়াই কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, 'সরকার ব্যাপকভাবে রিলিফের ব্যবস্থা না করিলে গরীবের আর রক্ষা নাই।'

আমরা দেখিতেছি যে, মেদিনীপুরের কয়েকটি অঞ্চল ক্রমাগত খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার প্রতিকার রিলিফ মাত্রে হয় না। রিলিফ প্রতি বৎসর যে লইবে তাহার দেহমনের অবনতি হইবেই এবং সে পেশাদার কাঙ্গাল হইয়া যাইবে। প্রকৃত ব্যবস্থায় তাহার খাদ্যাভাবের স্বাভাবিক কারণ যাহা তাহার প্রতিকার প্রয়োজন।

মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড

মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড বর্ত্তমানে যে অচলাবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে সাপ্তাহিক 'ভারতী' ১৩ই পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। জেলা বোর্ড কোনও সময়েই জনসাধারণের প্রকৃত প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান অতীতে যে সামান্য জনহিতকর কার্য্য করিত বর্ত্তমানে তাহাও বন্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে জেলা বোর্ড একটি ব্যয়বহুল অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। প্রতি মাসে ২২,০০০ টাকা ব্যয়ে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানকে অহেতুক জীয়াইয়া রাখিবার প্রয়োজন কি—সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সেই প্রশ্ন করা হইয়াছে।

জেলা বোর্ডের বর্ত্তমান অচলাবস্থার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, দেশ বিভাগের পর পদ্মার খেয়াঘাটগুলির গুরুত্ব কমিয়া যাওয়ায় আর্থিক দিক হইতে জেলা বোর্ডের বিশেষ ক্ষতি হয়। লালগোলার রাধার ঘাটটি সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার টাকাও জেলা বোর্ড নিয়মিত পায় না। "এই ভাবে জেলা বোর্ডের নিজস্ব মোটা আয়ের পথগুলি একে একে রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় এখন সাধারণ ভাবে পথকর বাবদ আদায়ী টাকার একটি অংশ সরকারের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া বোর্ডকে কোনরকমে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইতেছে।..."

গত মার্চ্চ মাসে জেলা বোর্ড বার্ষিক বাজেটে 'সিভিল ওয়ার্কস' খাতে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করে এবং সরকারের নিকট হইতে তাহা প্রার্থনা করে। কিন্তু সরকার হইতে ঐ টাকা দেওয়া

হয় নাই। "ফলে সম্প্রতি বোর্ড নাকি এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, টাকা অভাবে বোর্ড যদি কোন কার্য্যই না করিতে পারে তবে এইরূপ একটি দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধন করাই সমীচীন।"

'ভারতী' বোর্ডের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া লিখিতে-ছেন যে, বাজেট করিয়া যদি কোনও কাজই না করা গেল তবে প্রতি বৎসর বাজেট করিয়া লাভ কি! পল্লী-অঞ্চলের কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা জেলা বোর্ড হইতে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য পাইত কিন্তু বিগত দুই বৎসর যাবৎ উহারা বোর্ডের নিকট হইতে ঐ সাহায্যটুকুও পায় নাই।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির উপসংহারে বলা হইয়াছে : "আমাদের কথা এই যে, যে কারণে একদিন লোকাল বোর্ড বাতিল করা হইয়া-ছিল সেরূপ আজিকার পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যদি জেলা বোর্ডগুলিও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় তবে অবিলম্বে তাহার বিলোপ-সাধন করা প্রয়োজন। আর যদি ইহাদের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে এগুলি ঠিকমত যাহাতে সচল ও সক্রিয় হইয়া টিকিয়া থাকে তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। জনসাধারণ দীর্ঘ দিন এইরূপ একটি জীর্ণ অচল কাঠামো রক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবে না বা এই বিপুল অপচয় সহ্য করিবে না, ইহা সরকার যেন অবহিত থাকেন।

জনসাধারণ চেষ্টিত হইলে এইরূপ অবস্থার সংশোধন অসম্ভব নহে। জেলা বোর্ডের আয়ব্যয়ের সমতা রাখিতে হইলে আয়-বৃদ্ধির দিক দেখা প্রয়োজন এবং জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে দিকে চেষ্টা করিলে তাহাদের দাবী সবল হয়। শুধু দাবী ও সমালোচনায় কি কাজ হইতে পারে?

অসমীয়া সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও আসাম সরকার

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে গৌহাটিতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দোয়ারার সভাপতিত্বে আসাম সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদোয়ারা সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী ভাষার উন্নতির সহিত আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নতিবিধানের উপর জোর দিয়া বলেন যে, স্বাধীনতার পরের যুগে অসমীয়া ভাষা যদি সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন সাধনে অক্ষম হয় তবে অসমীয়া ভাষা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে।

"যুগশক্তি"র বিবরণে প্রকাশ, "অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিচারপতি শ্রীহোলিরাম ডেকা বাংলা ভাষা সম্পর্কে কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া বলেন যে, বিগত শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসকগণ আসামে বাংলা ভাষা চাপাইয়া অসমীয়া ভাষার উন্নতি ব্যাহত করিয়াছেন উহা সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও অনুরূপ অন্যান্য ভাষা অসমীয়া ভাষা ও কৃষ্টির সমৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। রবীন্দ্র-নাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ বিখ্যাত বাঙালী লেখকদের গ্রন্থাবলী অসমীয়া কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিক-দের মনে প্রেরণা দিয়াছে ও জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।"

বিচারপতি ডেকা অসমীয়া বর্ণমালার পরিবর্ত্তে দেবনাগরী বর্ণমালা প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, উহাতে অসমীয়া ভাষার দুর্ব্বলতাই প্রমাণ হইবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিচারপতি শ্রীহোলিরাম ডেকার উপরোক্ত বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে, অসমীয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখনও অনেকে অপ্রিয় সত্য বলিবার সাহস রাখেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যিকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও দমন করা আসামের সরকারী নীতি। সম্প্রতি রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আসাম বিধান পরিষদে যে বিতর্ক হয় সে উপলক্ষে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে করিমগঞ্জের প্রতিনিধি শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস (প্রজাসমাজতন্ত্র) আসামে বাংলা বা অন্যান্য অসমীয়া ভাষা দমনের জন্য আসাম সরকার যে সকল বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন।

১৯৫০ সনে গৃহীত আসাম রাজ্য বিধান সভার বিধানে বলা আছে যে, যদি কোন সদস্য অসমীয়া ভাষায় বক্তৃতা করিতে অপারগ হন তবে তিনি বাংলা, ইংরেজী অথবা হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারিবেন। ১৯৫৩ সনে উক্ত বিধানের সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, পরিষদের কাজ ইংরেজী অথবা অসমীয়া ভাষায় চলিবে, তবে প্রয়োজনবোধে স্পীকার অন্যান্য ভাষাভাষী সদস্যকে মাতৃভাষায় বলিবার সুযোগ দিতে পারেন। শ্রীদাস বলেন, "যদিও আসামের এক-তৃতীয়াংশ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তবু ইহার দ্বারা বাংলা ভাষায় বক্তৃতার অধিকার হরণ করিয়া স্পীকারের অনুমতি-সাপেক্ষ করা হইয়াছে।"

আসামের সকল রেল ষ্টেশন হইতে বাংলা নাম মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। কাছাড় জেলাতেও সমস্ত রেল ষ্টেশনের নাম অসমীয়া ভাষায় লিখিত হয়। রেল টিকিটেও ষ্টেশনগুলির নাম অসমীয়া ভাষায় লেখা হয়। এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর দেন যে, আসাম সরকারের নির্দ্দেশেই নাকি উহা করা হইয়াছে।

আসাম সরকার বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যদান সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা না হইলে কোন বিদ্যালয়কেই সাহায্য দেওয়া হয় না। এই নীতির ফলে ১৯৪৭-৪৮ সনে গোয়ালপাড়ায় যে স্থলে ২৫৩ বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৯৫০-৫১ সনে তাহা হ্রাস পাইয়া মাত্র তিনটিতে দাঁড়ায়। আসাম মধ্যস্কুল পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের উপদেশাবলী অসমীয়া ভাষায় মুদ্রিত হয়—কাছাড় জেলায়ও তাহাই প্রেরিত হইতেছে।

কাছাড় জেলা বাংলাভাষাভাষী ; কিন্তু সেখানেও কাঁচা পাট্টা, জমাবন্দী, সমন, অধিক খাদ্য উৎপাদনের প্রচারপত্র, কম্যুনিটি প্রজেক্ট, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতির প্রচারপত্র-আদি অসমীয়া ভাষায় পাঠান হয়। সরকারকে প্রশ্ন করা হইলে সরকারপক্ষ বলেন যে, ভুল করিয়া অসমীয়া ভাষায় লিখিত প্রচারপত্র কাছাড়ে পাঠান

হইয়াছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, ঐরূপ "ভুল" প্রায়ই হইতেছে।

জমিদারী উচ্ছেদ আইন

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী স্বত্ব-লোপ আইন মতে "বি" ফর্মের রিটার্ন দেওয়া প্রয়োজন।

"বি" ফর্মের রিটার্ন দাখিল বাবদ মূল আইন সন্নিবিষ্ট ফর্ম পরিবর্ত্তন করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে সংবাদপত্রে নূতন ফর্মের খসড়া বিজ্ঞাপিত হয়। পুনরায় গত অক্টোবর-নবেম্বর মাসে পরিবর্ত্তিত ফর্ম বাতিল করিয়া সংশোধিত ফর্ম সংবাদপত্র মারফত প্রচারিত হয়। উহাতে ১৪.১.৫৬ তারিখের মধ্যে দাখিলের চূড়ান্ত দিন নির্দিষ্ট হয় ও ফর্ম সরকারী দপ্তর হইতে পাওয়া যাইবে জানান হয়।

প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, কাহাকেও তাঁহার প্রয়োজনমত ফর্ম না দিয়া দুই-তিনখানি মাত্র দিবার ব্যবস্থা থাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নানারূপ আবেদন-নিবেদন ও অভিযোগ করায় সেটেলমেণ্ট অফিসার গত ১০.১.৫৬ তারিখে ঐ ফর্ম বাহির হইতে ছাপাইয়া পূরণান্তে দাখিল করিলে গ্রাহ্য হইবে বলিয়া মৌখিক নির্দ্দেশ দেন।

অতঃপর অধিকাংশ লোকই বাহির হইতে ফর্ম ছাপাইয়া অত্যধিক পরিশ্রম ও অসুবিধা ভোগ করিয়া ১৪.১.৫৬ তারিখে দাখিল করিতে গেলে জানান হয় যে ১৪.৪.৫৬ পর্য্যন্ত দাখিলি মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

১০.১.৫৬ তারিখেও দাখিলি দিনের পরিবর্ত্তন জানাইলে, সাধারণের খরচা, অসুবিধা ও হয়রানি হইত না।

উক্ত আইনের ৫৭ ধারা মতে নিম্নস্বত্ববিষয়ক রিটার্ন দেয়।

নিম্নস্বত্বভোগীদের ১৫.১২.৫৫ তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের নির্দ্দেশ থাকে। কেহ কেহ আরও সময় ও নোটিশে লিখিত প্রশ্নগুলির জটিল সমস্যার সমাধান চাহিয়া দরখাস্ত করেন। উহাদের জ্ঞাতব্যের কোনও উত্তর না দিয়া প্রায় সকলকেই ১৫.১.৫৬ তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ সব আদেশপত্র ১৬.১.৫৬ তারিখে অনেকের হস্তগত হইয়াছে।

ইহাই কি স্বাধীনতার নিদর্শন?

ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলটির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের দ্বিধাবিভক্তিতে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অবশ্য কোন্ দলের শক্তি কত দূর তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদলের সহিত আচার্য্য কৃপালনীর কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির মিলনের পর হইতেই প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের নীতিতে দুইটি ধারা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা এবং সরকার ও বিরোধী-দলের মধ্যে সম্পর্কের উপরই এই প্রভেদ সর্ব্বপ্রথম সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। সম্প্রতি গয়াতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রজাসমাজতন্ত্রী-দল যে কর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে দলের রাজনৈতিক চিন্তাধারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। ঠিক প্রায় একই সময়ে হায়দ্রাবাদে ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে প্রজাসমাজতন্ত্রী-দলের বিরোধী সভ্যদের এক সম্মেলনে ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। (কমিউনিজম হইতে স্বতন্ত্র) সমাজতন্ত্র বিশেষতঃ সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার পন্থা সম্পর্কে, দুইটি দলের নীতিগত পার্থক্য বা ঐক্য বিচার করিবার পক্ষে দুই দলের কর্ম্মনীতির আলোচনা স্বভাবতঃই বিশেষ সাহায্য করিবে। সেই উদ্দেশ্যে বিনা মন্তব্যে দুই দলের কর্ম্মনীতির সারাংশ নীচে দেওয়া হইল :—

গয়া সম্মেলনে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল আচার্য্য নরেন্দ্র দেব কর্ত্তৃক লিখিত কর্ম্মনীতিসংক্রান্ত বিবৃতিটি গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত বিবৃতির উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে যে, বিদেশী শাসনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন যেভাবে অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক শাসনের যুগে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রশ্ন সেইরূপ অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে।

উক্ত কর্ম্মনীতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবন ব্যুরোক্র্যাসী, স্বৈরাচার, দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের চাপে জর্জ্জরিত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পার্টি (কংগ্রেস) জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার না করিয়া নির্বিচারে তাহা দলন করিতেছে। রাষ্ট্রকে সরকারের সহিত এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পার্টিকে সরকারের সহিত এক করিয়া দেখা হইতেছে। এই ভাবে দলগত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাষ্ট্র এবং সরকারের সকল সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে অসাম্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠী ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মাধ্যমে জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে। সরকার একচেটিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিবার কোনই চেষ্টা করেন নাই।

পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্পর্কে বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক রূপ ধারণ করিতে বাধ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর সমালোচনাতে বলা হইয়াছে—উহা প্রকৃতপক্ষে কোন পরিকল্পনাই নহে কারণ সরকারের কতকগুলি পূর্ব্বগৃহীত স্কীমকে পরিকল্পনার মধ্যে ঢুকাইয়া একটি পরিকল্পনার রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা পুঁজিপতিদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে কোন পরিকল্পনার চেষ্টাও করা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়েকটি শিল্পে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিবর্ত্তে রাষ্ট্র-পরিকল্পিত অর্থনীতি স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নাই।

যদিও সরকার জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করিয়াছেন তথাপি সেই প্রচেষ্টাতেও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে। জমি হইতে প্রজা উচ্ছেদ গত আট বৎসরে যে সংখ্যায় ঘটিয়াছে, গত একশত

বৎসরেও তাহা হয় নাই। কংগ্রেস সরকার কৃষকদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কিছুই করেন নাই।

ভূদান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইয়া উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, উহা অসীম ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে একটি আঘাত।

"সমাজতন্ত্রে পরিবর্ত্তন" (Transition to Socialism) শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, আমাদের দেশের উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেই শ্রেণী-সংগ্রামের বীজ নিহিত হইয়াছে। কোন দেশেই ধনিকগোষ্ঠী বিনা বাধায় কেবলমাত্র নৈতিক আবেদনে সাড়া দিয়া নিজেদের প্রভুত্ব নষ্ট হইতে দেয় নাই। ভারতীয় ধনপতিগণ অনুরূপ ব্যবহার করিবেন তাহা আশা করা বৃথা।

তবে প্রজা সমাজতন্ত্রীরা বলপূর্ব্বক ক্ষমতা দখলের বিরোধী।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না করিতে পারিলে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল সরকার গঠন করিবে না। তবে জাতীয় বিপর্যায়ের মুখে উক্ত দল কেন্দ্রীয় সরকারে অপরাপর দলের সহিত মিলিত হইতে পারিবে।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট অথবা কোন সাম্প্রদায়িক দলের সহিত তাঁহারা মৈত্রীস্থাপন করিবেন না।

ঔপনিবেশিক নীতিতে পশ্চিমী সমাজতন্ত্রীদের ব্যর্থতার সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঔপনিবেশিক জনগণের স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করিয়া লইতে পশ্চিমী সমাজতন্ত্রীদের অক্ষমতা লোকচক্ষে গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাকেই সাহায্য করিয়াছে।

সোশ্যালিষ্টগণ অগ্রসর দেশ হইতে সরকারীভাবে সাহায্য গ্রহণে আপত্তি করিবে না যদি অবশ্য ঐরূপ সাহায্যের পিছনে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি না থাকে। তবে বেসরকারী বিদেশী মূলধন বিনিয়োগকে সমাজতন্ত্রী দল বিশেষ অনুমোদন করিতে পারেন না। সমাজতন্ত্রী দলের অভিমতে সকল বৈদেশিক সাহায্যই জাতিপুঞ্জের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মারফত আসা উচিত।

কম্যুনিজমের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ নিশ্চিতরূপে কম্যুনিজমের বিরোধী। ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের যন্ত্র (tool) বিশেষ। সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তনের সহিত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পাটিরও নীতির পরিবর্ত্তন ঘটে।

উক্ত বিবৃতিতে ভারতের কমনওয়েলথ ত্যাগেরও দাবি জানান হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া কর্তৃক নবগঠিত ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাজনৈতিক বিবৃতিতে সাত বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথম বৎসরে পাটি পাঁচ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করিবে; দ্বিতীয় বৎসরে করিবে দশ লক্ষ এবং এইরূপ সাত বৎসরের শেষে পাটির সভ্যসংখ্যা দাঁড়াইবে ৩০ লক্ষ। ৩০,০০০ কমিটির মারফত এই বিরাট সদস্যসংখ্যাকে কর্ম্মঠ করা হইবে।

স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান দল ইতিমধ্যেই ডাঃ লোহিয়ার দলের সহিত মিলিত হইয়াছে। আরও দু'একটি দলের সহিত মিলনের আলোচনা চলিতেছে।

ক্ষমতালাভের জন্য সমাজতন্ত্রী দল পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতেও কাজ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমেও কাজ করিবেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাটি "তৃতীয় শিবিরে" বিশ্বাসী। পাটির মতে ধনতন্ত্র এবং সাম্যবাদ দুই-ই নিরর্থক। ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে—সকল বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্ক এবং অন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণের প্রয়োজন বলিয়া পাটি মনে করেন।

পাটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ হইতে ভারতের সম্পর্কচ্ছেদেরও দাবি করিয়াছেন।

সম্পত্তি দখলের জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি পাটি স্বীকার করেন না, তবে পুনর্ব্বাসনের জন্য ক্ষতিপূরণ-দানের নীতি পাটি অনুমোদন করেন।

পাটির মতে পাঁচ জনের একটি পরিবার ভাড়া-করা শ্রমিকের সাহায্য ব্যতিরেকে যে পরিমাণ জমি চাষ করিতে পারে কোন ব্যক্তিকেই তদপেক্ষা পাঁচ গুণের অতিরিক্ত পরিমাণ জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখিতে দেওয়া উচিত নহে।

নির্ব্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইলে সমাজতন্ত্রী দল সরকার গঠন করিবেন না তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহারা মনোমত কোন সরকারকে "সহ্য" করিয়া চলিবেন।

স্বাধীন রাষ্ট্র সুদান

৫৬ বৎসর যাবৎ ইঙ্গ-মিশরীয় যুক্ত-শাসন ব্যবস্থার অধীনে থাকিবার পর ইংরেজী নববর্ষে সুদান পৃথিবীর অপরাপর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

সুদান আফ্রিকার বৃহত্তম দেশগুলির অন্যতম—উহার আয়তন প্রায় ব্রিটেন, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ইটালীর সম্মিলিত আয়তনের সমান তবে লোকসংখ্যা খুবই কম, মাত্র ৯০ লক্ষ। সুদানের উত্তরাংশে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণ বাস করে, দক্ষিণাংশে বাস করে, আফ্রিকান ভাষাভাষী জাতিসমূহ।

দেশটি প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান, তবে প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ—সুদানে সোনা, তামা এবং লোহা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে যদিও উত্তোলন-কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

সুদানের প্রধান আয়ের পথ তুলা উৎপাদন। তুলা রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৬০ হইতে ৭০ ভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং উহার অধিকাংশই ব্রিটেনে রপ্তানী হয়।

১৮৯৯ সন হইতে সুদান ব্রিটেন ও মিশরের যুক্ত শাসন-ব্যবস্থার অধীনে ছিল। অবশ্য মিশর নামে মাত্র শাসক ছিল কারণ আসল ক্ষমতা সবটাই ছিল ব্রিটেনের হাতে এবং মিশরের স্বাধীনতাও বহু দিক হইতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুদানের জনসাধারণ

এই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করিয়াছেন। ১৯৫১ সনে মিশর ১৯৩৬ সনের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিবার পর উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটেনের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়। ১৯৫৩ সনে ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে সুদানের স্বাধীনতার দাবি স্বীকৃত হয় এবং স্থির হয় যে, তিন বৎসর পর সুদানকে পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইবে। ঐ চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৩ সনের শরৎকালে সুদানে যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ইসমাইল অল্ আজহারীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল ইউনিয়নিষ্ট পার্টি অধিকাংশ আসন লাভ করে এবং মন্ত্রীসভা গঠন করে।

১৯৫৫ সনের ১৬ই আগষ্ট সুদান ইঙ্গ-মিশরীয় যুক্ত-শাসনের অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নবেম্বর মাসের মধ্যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হইলেও ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল সর্ নক্স হেল্ম রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন, কিন্তু ১২ই ডিসেম্বর জনসাধারণের দাবিতে তিনিও পদত্যাগ করেন। ১৯শে ডিসেম্বর সুদান পার্লামেন্ট সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুদানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সনের ১লা জানুয়ারী সরকারীভাবে সুদানকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ব্রিটেন ও মিশর তাহা স্বীকার করিয়া লয়।

যতদিন পর্য্যন্ত সুদানের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত না হইতেছেন ততদিন পর্য্যন্ত পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পাঁচ জনের এক কমিটি রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

সুদানের স্বাধীনতা ঘোষণা উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সুদানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক শুভেচ্ছা বাণী পাঠাইয়াছেন।

ভারত-ইন্দোনেশিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি

১৯৫৫ সনে অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলনের ঘোষণায় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়া বলা হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান পর্য্যায়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিই সর্ব্বাধিক ফলপ্রসূ হইতে পারে। সেই অনুযায়ী ২৯শে ডিসেম্বর নয়া দিল্লীতে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এক সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া যে বন্ধুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমান চুক্তি সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

চুক্তিটিতে ১২টি ধারা আছে এবং উহার মেয়াদকাল দশ বৎসর। দশ বৎসরের মধ্যে ছয় মাসের নোটিশে যে কোন পক্ষ উহা বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবেন। নতুবা যতদিন পর্য্যন্ত না কোন পক্ষ উহা বাতিলের জন্য নোটিশ দিবেন চুক্তিটি ততদিনই বলবৎ থাকিবে।

চুক্তিতে উভয় দেশের সরকার বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং ললিত-কলার সকল ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ ও সুযোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক, বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য শিল্পীরা যাহাতে এক দেশ হইতে অপর দেশে যাইয়া বক্তৃতাদি দিতে পারেন তাহার সুযোগ করিয়া দিতে উভয় সরকারই চেষ্টা করিবেন। যাহাতে এক দেশের ছাত্র অপর দেশে যাইয়া সেই দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, এবং সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারে সেজন্য উভয় দেশের সরকারই বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। উভয় দেশের সরকারই নিজের সাধ্যমত অপর দেশের সরকারী কর্ম্মচারী বা সরকার-মনোনীত অন্যান্য নাগরিকগণকে তাহার শিল্প-গবেষণাগার এবং বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দিবেন। প্রত্যেক সরকারই জাতীয় আইন অনুযায়ী তাহার শাসনাধীন এলাকায় অপর দেশের সাংস্কৃতিক ভবন-সমূহের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন। সাংস্কৃতিক ভবন (cultural institutes) অর্থে শিক্ষাকেন্দ্র, পাঠাগার, শিক্ষামূলক বিজ্ঞান-ভবন এবং ললিতকলার উন্নতিমূলক ভবনগুলিই বুঝাইবে।

আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী উভয় সরকার প্রদর্শনী, বক্তৃতামালা এবং ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময় ও অন্যান্য অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উন্নয়নে সাহায্য করিবেন। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও উভয় সরকার দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবেন। প্রত্যেক সরকার যথাসম্ভব নজর রাখিবেন যেন কোন পাঠ্য পুস্তকে অপর দেশ সম্পর্কে কোনরূপ ভ্রান্ত বা বিকৃত সংবাদ না থাকে। উভয় দেশের সরকার উভয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী স্বীকার করিয়া লইবেন।

প্রয়োজন হইলে উভয় সরকার একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উক্ত কমিশনে থাকিবেন—ভারতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং ভারতস্থিত ইন্দোনেশীয় দূতাবাসের নেতা; এবং ইন্দোনেশিয়াতে—সেখানকার শিক্ষামন্ত্রী ও ইন্দোনেশিয়াস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের নেতা। উক্ত কমিশন বর্ত্তমান চুক্তি কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইতেছে তাহা তদারক করিবেন এবং চুক্তির বাস্তব-প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট সরকারকে পরামর্শ দিবেন। তাঁহারা শিক্ষক ও ছাত্র বিনিয়োগ ব্যাপারে নির্ব্বাচন সম্পর্কে এবং চুক্তি কার্য্যকরী করার ব্যাপারে অন্যান্য পরামর্শ দিবেন।

প্রতি তিন বৎসর উভয় সরকার যুক্ত-বৈঠকে চুক্তি কার্য্যকরী করা সম্পর্কে ব্যবস্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন।

উভয় সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদনের ১৫ দিনের মধ্যেই এই চুক্তি কার্য্যকরী হইবে।

চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ এবং ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে ভারতস্থিত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত ডাঃ এল. এন. পালার।

সাংবাদিক সম্মেলনে রুশ-নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা

১৪ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীবুলগানিন ও শ্রীক্রুশ্চেভ একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। উক্ত বিবৃতিতে সোভিয়েট নেতৃদ্বয় তাঁহাদের ভারত-সফরের অভিজ্ঞতা ও

তাৎপর্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রেরিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

রুশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, ঐ বিষয়গুলি এখনও দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে আলোচনাধীন রহিয়াছে এবং "এই কথাবার্ত্তার প্রথম সুফল··· ভারত-সোভিয়েট অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যুক্ত ভারত-সোভিয়েট বিবৃতি হইতেই"—প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, "পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও লাভের ভিত্তিতে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধনের এক পাকাপোক্ত ভিত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।"

সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে হইলে ভারতকে অপরাপর দেশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে বলিয়া বহু অভারতীয় সাংবাদিক যে "সুচিন্তিত উদ্বেগ" প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উত্তরে রুশনেতৃদ্বয় বলেন, "এই ধরনের প্রশ্ন কেবল তাঁহারাই করিতে পারেন যাঁহারা ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করার জন্য আগ্রহশীল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও আর একবার পুনরাবৃত্তি করিতেছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ সমস্ত দেশেরই সহিত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব আমরা চাই। ভারত-সোভিয়েট বন্ধুত্ব—অন্যান্য দেশের সহিত ভারত ও সোভিয়েট দেশের সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে, এরূপ স্পষ্টতঃ অহেতুক ভিত্তির কোন অর্থই হয় না।"

দূর-প্রাচ্যের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য জেনেভাতে অনুষ্ঠিত বৃহৎ চতুঃশক্তি সম্মেলনের অনুরূপ একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাইয়া রুশ নেতৃদ্বয় বলেন যে, "এইরূপ সম্মেলন হইতে সুফল পাওয়া যাইতে পারে একমাত্র এই সর্ত্তে যে, সম্মেলনে যোগদানকারী সকলে এই সব সমস্যার আলোচনা করিবেন —কুখ্যাত 'শক্তির ভিত্তির উপর হইতে' নীতি পরিত্যক্ত হইবার পরে।"

"কমিনফর্ম্ম" ভাঙিয়া দেওয়া সম্পর্কে প্রশ্নগুলির উত্তরে তাঁহারা বলেন, কমিনফর্ম্ম একটি তথ্যবিনিময় সংস্থা। ইউরোপের কয়েকটি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি উহার সভ্য। "এই সংগঠনের কার্য্যকলাপ সেই সব লোকেরই কাছে বাধা ও অসুবিধার সৃষ্টি করে যাহারা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের পুরাতন অকেজো ব্যবস্থাটাকে চিরকাল বজায় রাখিতে চায়।" "কমিনফর্ম্ম" ভাঙিয়া ফেলিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া তাঁহারা বলেন, "অকপটে কথা বলিলে বলিতেই হয় যে, কি কারণে ও কিসের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি আন্তর্জ্জাতিক সংযোগ ও সহযোগিতায় সাধারণভাবে গৃহীত কাঠামোটিকে ত্যাগ করিবে? কেনই বা কমিনফর্ম্মের উচ্ছেদের প্রশ্ন উত্থাপনকারীরা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগঠন সোশ্যালিষ্ট ইন্টারনেশনালের কার্য্যকলাপে কোন আপত্তি তুলেন না।"

তাঁহারা বলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী হইলেও তাঁহারা "বিপ্লব রপ্তানীর" নীতিতে বিশ্বাসী নহেন।

সোভিয়েট ভারত অর্থ নৈতিক সম্পর্ক

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ভারত সফর অন্তে নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সহিত তাঁহারা যে যুক্ত বিবৃতি স্বাক্ষর করেন, তাহাতে উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে যে বিষয়গুলিকে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৫৬-৫৯ এই তিন বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত বিক্রয় করিবে এবং ভারত তাহা ক্রয় করিবে। তদ্ব্যতীত তৈল উৎপাদন, খনির কাজকর্ম্ম ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম, উভয় দেশের সম্মতিক্রমে অন্যান্য জিনিষপত্রও সোভিয়েট দেশ বিক্রয় করিবে এবং ভারতবর্ষ তাহা ক্রয় করিবে। ভারতবর্ষ হইতে কাঁচামাল ও তৈয়ারী মাল ক্রয়ের পরিমাণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিবে। নিজ নিজ আইন অনুযায়ী উভয় দেশের সরকারই দুই দেশের মধ্যে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সহায়তা করিবে এবং দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিবে। দুই দেশের মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময়েরও ব্যবস্থা করিতে দুই দেশের সরকার স্বীকৃত হইয়াছেন।

ফরাসী নির্ব্বাচন

সম্প্রতি ফ্রান্সে জাতীয় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাতন জাতীয় পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ব্বেই জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়ার ফলে উক্ত নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান ঘটে। ফরাসী রিপাবলিকের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্টের আদেশে জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়া হইল।

ফরাসী রাজনৈতিক পটভূমিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে জাতীয় পরিষদে কোন দলেরই নির্ব্বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। ১৯৫১ সনে দক্ষিণপন্থী সরকার কম্যুনিষ্ট এবং বামপন্থীদিগকে নির্ব্বাচনে কোণঠাসা করিবার জন্য নির্ব্বাচনী আইনের সংশোধন করেন। সেই সংশোধন অনুযায়ী কোন ডিপার্টমেণ্টে (প্রদেশের) নির্ব্বাচনে কোন দল যদি প্রদত্ত ভোটের শতকরা পঞ্চদশ ভাগের উপর একটি ভোটও বেশী পায় তবে সেই ডিপার্টমেণ্টের সকল আসন ঐ দলই পাইবে। নির্ব্বাচনী আইনের এই সংশোধনে মধ্য এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলির বিশেষ লাভ হয় এবং কম্যুনিষ্টদের বিশেষ ক্ষতি হয়। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনও উক্ত ১৯৫১ সনের আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৫ সনের ২৫শে অক্টোবর ফ্রান্সের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডগার ফরে ডিসেম্বর মাসে জাতীয় নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া দিবার জন্য পরিষদে একটি বিল আনয়ন করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ছয় মাস পূর্ব্বে জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থনে মঃ ফরে বলেন, সরকার কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে জনমতের সিদ্ধান্ত জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

সরকার পক্ষের উপরোক্ত যুক্তিতে অবশ্য অসময়ে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন সরকারী বিবৃতি হইতে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সরকারকে শীঘ্রই কতকগুলি অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। ট্যাক্স বৃদ্ধি প্রভৃতি অপ্রিয় কাজের পর নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে সরকারী পক্ষ সুবিধা করিতে পারিবেন না বলিয়াই তাঁহারা যথাশীঘ্র নির্ব্বাচন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিশেষ ব্যগ্র—ওয়াকিবহাল মহলের উহাই ছিল অভিমত।

কিন্তু নির্ব্বাচনসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বেই জাতীয় পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ২৯শে নবেম্বর ৩১৮-২১৮ ভোটে ফরে সরকারের পতন ঘটে। ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদেঁস ফ্রাঁস সরকারের পতন হয়। নবেম্বরে ফরে সরকারের পতনের ফলে এক বৎসরের মধ্যে দুই বার জাতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনাস্থা প্রদর্শিত হয়।

ফরাসী সংবিধানের ৫১ ধারাতে বলা হইয়াছে যে, যদি এক বৎসরের মধ্যে জাতীয় পরিষদ দুই বার গঠনতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (৩১২ ভোট) সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেন তবে সরকার জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া দিতে পারিবেন। দশ মাসের ব্যবধানে গঠনতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুণ ফরে ও মেদেঁস ফ্রাঁস সরকারের পতন হওয়ায় সংবিধানদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ফরাসী প্রেসিডেণ্ট গত ২রা ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া দেন। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়ার অন্ততঃ ২০ দিন পরে অথচ ৩০ দিনের মধ্যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। তদনুযায়ী ১৯৫৬ সনের ২রা জানুয়ারী নির্ব্বাচনের দিন স্থির হয়।

নির্ব্বাচনের প্রকাশিত (অসম্পূর্ণ) ফলাফল এইরূপ :

কম্যুনিষ্ট—১৫১টি আসন
সমাজতন্ত্রী—৯৩টি
নিয়ার র‍্যাডিকাল—৭
অরথোডক্স র‍্যাডিকাল—৫৩
ডিসিডেণ্ট র‍্যাডিকাল—১৩
পপুলার রিপাবলিকান—৬৮
রক্ষণশীল—৯৬
সোশ্যাল রিপাবলিকান—১৬
পুজাদিষ্ট—৪৯
চরম দক্ষিণপন্থী—৩
অন্যান্য—৪

'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্যারিস-স্থিত সংবাদদাতা শ্রীহ্যারল্ড ক্যালেন্ডার লিখিতেছেন, নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিয়া অনেকেই এই শীঘ্র নির্ব্বাচনের জন্য ফরে মন্ত্রীসভাকে দোষ দিতেছেন। পরে যখন স্বাভাবিকভাবে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, তখন নির্ব্বাচন হইলে কিরূপ ফলাফল হইত সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল এখন বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন যে, জুন মাসে নির্ব্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা আরও বেশী আসন লাভ করিত, আবার কাহারও মতে তত দিনে "পপুলার ফ্রণ্ট" গঠনের জন্য কম্যুনিষ্টদের আহ্বান সমাজতন্ত্রীদের মনে বিশেষ সাড়া জাগাইত। আরও এক মহলের অভিমত এই যে, পরে নির্ব্বাচন হইলে মেদেঁস ফ্রাঁস এবং সমাজতন্ত্রী গাই মলেটের মধ্যে নির্ব্বাচন দানা বাঁধিবার সুযোগ পাইলে তাঁহারা কম্যুনিষ্টদের কিছু ভোট কমাইতে পারিতেন। তবে জানুয়ারী নির্ব্বাচনের ফলাফলে তাহাদের এইরূপ সামর্থ্য বিশেষ প্রকাশ পায় নাই।

ক্যালেণ্ডার তাঁহার মন্তব্যে বলিতেছেন, এই নির্ব্বাচনে দলগত রাজনীতিতে নূতন কোন বিভেদ দেখা দেয় নাই, পুরাতন পার্থক্যগুলিই সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে। পুজাদের অনুগামীদিগের সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন, ইহাদের সাফল্যকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদিগকে ফাসিষ্ট বলিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইবেন তবে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ফাসিবাদীদের প্রধান জোগান আসিয়াছিল এইরূপ ছোটখাট দোকানদার এবং বেকার যুবকদের মধ্য হইতেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় কমিটির আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সাব-কমিটির সভাপতি জেমস ও. ঈষ্টল্যাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র জগতে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইতেছেন। ইতিমধ্যেই এই সাব-কমিটি 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার কয়েকজন কর্ম্মীকে ডাকিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছেন। 'টাইমস' পত্রিকা এই সকল কর্ম্মীর অনেককে বরখাস্ত করিয়াছেন।

সংবাদপত্রজগতে এইরূপ হস্তক্ষেপের সমালোচনা করিয়া 'ওয়াশিংটন পোষ্ট এবং টাইমস হেরাল্ড' লিখিতেছেন, "এই বিষয়ে সিনেটর ঈষ্টল্যাণ্ড যাহাই বলুন না কেন এই অনুসন্ধান এমন এক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছে, "সংবিধান অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই···। সংবাদপত্রজগতে কংগ্রেসের এই প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আমেরিকার সমগ্র ঐতিহ্য উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ জানাইতেছে···।"

'নিউ ইয়র্ক টাইমস' লিখিতেছেন, স্পষ্টতঃই ঈষ্টল্যাণ্ড সাব-কমিটির কোপ বিশেষভাবে 'টাইমস' পত্রিকার উপরই পড়িয়াছে। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার কর্ম্মীদের উপর যে হারে সপিনা পড়িতেছে তাহাতেই উহা স্পষ্ট হইয়াছে। "টাইমসে"র উপর এই আক্রমণের কারণ মিঃ ঈষ্টল্যাণ্ড এবং তাঁহার সহযোগী মিঃ জেনার প্রভৃতির আচরণের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

'টাইমস' পত্রিকার ১৮জন কর্মীকে সাক্ষ্যের জন্য সাব-কমিটির সম্মুখে ডাকা হয়। তন্মধ্যে চারি জন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর ভিত্তিতে এক বা একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হন। কয়েকজনের সাক্ষ্যের সারমর্ম এইরূপ :

'নিউ ইয়র্ক ডেলী নিউজ' পত্রিকার রিপোর্টার উইলিয়ম এ. প্রাইস কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হন এই কারণে যে, এইরূপ প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার সাব-কমিটির নাই। উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন।

'নিউ ইয়র্ক ডেলী মিরর' পত্রিকার ডান ম্যাহনী বলেন যে, তিনি বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য নহেন। অতীতে কোন কম্যুনিষ্টের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল কিনা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর ভিত্তিতে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তরদানে অস্বীকৃত হন। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার কর্মী রবার্ট শেলটন কম্যুনিষ্ট কিনা বা অতীতে কম্যুনিষ্ট ছিলেন কিনা এইরূপ সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে অস্বীকৃত হন এই কারণে যে, সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে তাঁহার যে সকল মৌলিক অধিকার রহিয়াছে সাব-কমিটির প্রশ্নাবলী তাহার বিরোধী।

১৯৫২ সন হইতে 'টাইমস' পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের কর্মী সীমুর পেক বলেন যে, তিনি ১৯৩৫ হইতে ১৯৪৯ সন পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। অন্যান্যদের সম্পর্কে তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হন এই বলিয়া যে. সাব-কমিটির ঐরূপ প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার নাই।

'টাইমস' পত্রিকার শিক্ষা-সম্পাদক বেঞ্জামিন ফাইন বলেন, তিনি এক বৎসরের জন্য ১৯৩৫-৩৬ সনে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে সকল প্রশ্নের খোলাখুলি উত্তর দেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্ম-শতবার্ষিকী

বর্ত্তমান বৎসরে বরিশালের জননেতা স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। শতবর্ষ পূর্ব্বে ১২৬২ সালের ১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী ১৮৫৬) অশ্বিনীকুমার বরিশাল জেলার পটুয়াখালি মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তখন তাঁহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত মুন্সেফ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন স্থলে বদলী হইতে হয় বলিয়া অশ্বিনীকুমারের বাল্য ও কৈশোর বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে কাটিয়াছিল। শেষে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ও কৃষ্ণনগর কলেজে মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে সময়কার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু এবং ব্রাহ্মনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে। আবার, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গলাভ করিতেও তিনি সক্ষম হন। স্বামী বিবেকানন্দ অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি তাঁহাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন 'নরেন' বলিয়া। কৈশোরে ও যৌবনে এত বিভিন্নপন্থী মনীষী এবং মহাপুরুষের সংস্পর্শে ও সঙ্গলাভে তিনি যেমন কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার ভিতরে মানব-প্রীতি ও মানব-সেবার বীজও উপ্ত হইতে পারিয়াছিল। রাজনৈতিক নেতা বলিয়া সমধিক পরিচিতি লাভ করিলেও শিক্ষার মাধ্যমেই জাতি তথা জাতীয় চরিত্র গঠনে অশ্বিনীকুমার তৎপর হন। তাঁহার ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের মূলমন্ত্র ছিল—সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা। তিনি যে 'ভক্তিযোগ' বিষয়ক বক্তৃতা দেন, ও পরে যাহা উক্ত নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তাহারও আসল উদ্দেশ্য ছিল যুবক-বাংলার চরিত্র-গঠন। 'পূর্ব্ববঙ্গের কেশবচন্দ্র সেন' নামে গত শতাব্দীতেই তাঁহাকে আখ্যাত হইতে দেখি। শেষ দিন পর্য্যন্ত নানা কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যেও জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত হন নাই। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুনাম অশ্বিনীকুমারের পরিচালনা ও শিক্ষাগুণে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার যে সত্যিকার 'জননেতা' ছিলেন তাহার পরিচয় মিলে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে (মাদ্রাজ, ডিসেম্বর ১৮৮৭)। তিনি বাখরগঞ্জ জেলার চল্লিশ হাজার অধিবাসী-স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র কংগ্রেসে উপস্থাপিত করেন—তাহাতে ভারতবর্ষে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার দাবির কথাই উত্থাপিত হয়। তিনি বরাবর কংগ্রেসে অগ্রসর-পন্থীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ), লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নিখিল-ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমার বরিশালকেই ইহার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন, বরিশাল ও অশ্বিনী দত্ত—তিনটি কথা যেন তখন সমার্থবাচক হইয়া উঠে। ১৯০৬ সনে বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্স সরকারী রোষে ভাঙিয়া যায়। ইহার পরে আন্দোলন আরও গভীর এবং ব্যাপক হইয়া উঠে। এই সময় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশসেবক সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার আর সম্পাদক সতীশচন্দ্র। সমগ্র জেলায় স্বদেশী ভাবনা যে এত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহার মূলে ছিলেন এই সমিতি ও ইহার পরিচালকবর্গ। বঙ্গে বিপ্লব আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়া উঠিলে অন্যান্য সমিতির মত এই স্বদেশসেবক সমিতিও বেআইনী ঘোষিত হয়, এবং সভাপতি অশ্বিনীকুমার ও সম্পাদক সতীশচন্দ্র অন্য সাত জনের সঙ্গে ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ১৮১৮—তিন আইন বলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাসিত হন। দীর্ঘ চৌদ্দ মাস পরে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। ১৯১৩ সনে অশ্বিনীকুমার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯২২ সনে মনীষী

বিপিনচন্দ্র পালের পৌরোহিত্যে বরিশালে যে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-পদের গুরু দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন। পর বৎসরই, ১৯২৩ সনে কালীপূজার দিনে অশ্বিনীকুমার পরলোকগমন করেন।

অশ্বিনীকুমার বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। যে চৌদ্দ মাস নির্ব্বাসনে ছিলেন সেই সময়ে তিনি গুরুমুখী শিখিয়া মূল গ্রন্থসাহেব পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহার শয়নকক্ষের এক প্রান্তে এই গ্রন্থখানি দেখাইয়া এবং ইহার কথা বলিয়া তিনি কতই আনন্দ অনুভব করিতেন। অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ,' 'প্রেম', 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ একদিকে যেমন বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক, অন্যদিকে ইহার সাহিত্যিক গুণও রহিয়াছে যথেষ্ট। জটিল বিষয় নানা গল্প, কাহিনী ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অনন্যসাধারণ।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু যে সকল মনীষী ও মহানুভব ব্যক্তিদের সেবায়, ত্যাগে ও নিষ্ঠায় জাতি সংহত, সুগঠিত এবং শক্তিমান্ হইয়াছে তাঁহারা শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ত স্মরণীয়। শতবার্ষিকী বৎসরে অশ্বিনীকুমারের জীবনাদর্শ বিবৃত করিতে গিয়া আমরা যেন উহার মূল কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করি।

পাকিস্থানের নূতন সংবিধান

সংবাদপত্রে নিম্নস্থ অপরূপ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। পাকিস্থান যে এখনও পশ্চাদগতিশীল তাহাই ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে:

"করাচী, ৮ই জানুয়ারী—পাকিস্থান উহার নূতন খসড়া সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্থান ইসলামিক সাধারণতন্ত্র ("ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্থান") নামে অভিহিত হইবে এবং কেবলমাত্র একজন মুসলমান রাষ্ট্রের প্রধান হইতে পারিবেন।

আজ উক্ত খসড়া সংবিধান প্রকাশার্থ দেওয়া হইয়াছে। নূতন সংবিধানে বিহিত হইয়াছে যে, পাকিস্থানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকিবেন এবং তিন শত সদস্য বিশিষ্ট এক জাতীয় পরিষদে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবেন। মন্ত্রীসভা জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

উহাতে আরও বিহিত হইয়াছে যে, পবিত্র কোরাণ ও সুন্নার নির্দ্দেশের বিরোধী কোন আইন প্রণীত হইতে পারিবে না।

ঐস্লামিক নির্দ্দেশসমূহ বিধিবদ্ধ করা বিষয়ে রিপোর্ট দিবার জন্য কমিশন গঠিত হইবে। উহার রিপোর্ট পার্লামেন্টের হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অনুচ্ছেদ কার্য্যকর হইবে না।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কিত প্রশ্ন নূতন সংবিধান অনুযায়ী নির্ব্বাচিত পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

সংবিধান চালু হওয়ার কুড়ি বৎসর পর উর্দ্দু ও বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে। এই সময়ে ইংরেজী বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে চালু থাকিবে।

লবী মণ্ডল বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান খসড়া সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তের ফল নহে? কোয়ালিশন পার্টির অ-মুসলমান সদস্যগণ কোন কোন অনুচ্ছেদে আপত্তি করিয়াছেন।

ভারতে মাদাম সান ইয়াৎ সেন

বিগত মাসে আরও একজন বিশিষ্ট অতিথি ভারতে আগমন করেন। তিনি সুদূর প্রাচ্যে স্বাধীনতা ও জনচেতনার প্রথম পূজারী সান ইয়াৎ সেনের সহধর্ম্মিণী মাদাম সুং চিয়াং-লিং। দিল্লীতে তাঁহার নাগরিক সম্বর্দ্ধনার সংবাদ নিম্নরূপ:

"নয়াদিল্লী, ১৮ই ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ এখানে বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনকে গ্রহণ না করা এক মারাত্মক ভ্রম হইয়াছে। উহাতে চীনের কোনই ক্ষতি হয় নাই। যে চীন দেশে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে, কয়েকটি শক্তি সেই নূতন চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহাতে ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উহাতে রাষ্ট্রপুঞ্জেরও ক্ষতি হইয়াছে। কারণ চীনের মত একটি শক্তিশালী দেশকে স্বীকৃতি দানে অসম্মত হওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্ত্তৃত্বও হ্রাস পাইয়াছে।

আজ সন্ধ্যায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লালকেল্লার দেওয়ান-ই-খাসে চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মিসেস সুং চিয়াং-লিং বা মাদাম সান ইয়াৎ সেনকে যে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, সেই উপলক্ষে শ্রীনেহরু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, চীনকে যদি স্বীকৃতি দিয়া তাহাকে রাষ্ট্রপুঞ্জে একটি আসন দেওয়া হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত।

শ্রীনেহরু বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানে চীনকে যদি গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে এশিয়ায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির সম্পূর্ণ মীমাংসা হইত।'

নাগরিক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে মহাচীনের মহীয়সী নেত্রী মাদাম সান ইয়াৎ সেন বলেন, ভারতীয় জনগণ তাইওয়ানের প্রশ্ন সম্পর্কে চীনের জনগণকে সমর্থন করিয়াছে। সেইরূপভাবে চীনের জনগণও গোয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে ভারতীয় জনগণকে সমর্থন করিয়াছে। গোয়ার প্রশ্ন একটি স্বাধীন দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘনের আর একটা নিকৃষ্ট উদাহরণ।

এই সমস্ত সমস্যা ও পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য বিরোধিতার সমস্যা সমাধানে চীন ও ভারত যে একযোগে কার্য্য করিয়া যাইবে, সে সম্পর্কে তিনি দৃঢ়বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন।"

শান্তিনিকেতনে সমাবর্ত্তন

বিশ্বভারতীর এই বৎসরের সমাবর্ত্তন উপলক্ষে ডক্টর পানিক্কর যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার নানারূপ সমালোচনা হইতেছে। তাহার চুম্বক আমরা নিম্নে দিলাম। ডঃ পানিকরের মতামত আরও মৃদুভাবে বলা চলিত। তবে উহার মূল কথা প্রণিধানযোগ্য:

"শান্তিনিকেতন, ২৪শে ডিসেম্বর—তপোবনের আদর্শে আর ভারতকে পুনর্গঠিত করা যাইবে না। নূতন ভারতের ভিত্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এই উভয় ভাবধারার সমন্বয়ের উপর স্থাপিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ভাবধারারই পূজারী ছিলেন। ডঃ কে. এম.

পানিকর আজ এখানে বিশ্বভারতী সমাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহার ভাষণে উক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। দারিদ্র্য ও আত্মত্যাগকে বরণ করিয়া এবং আধুনিক জীবনের সর্ব্বরকম উন্নতিমূলক প্রচেষ্টাকে জড়বাদী বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়া যাঁহারা দেশ গঠনের পক্ষপাতী ড. পানিকর তাঁহাদিগকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেন।

ড. পানিকর বলেন, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ ব্যক্তির জীবনে হয়ত বড় জিনিষ, কিন্তু জাতীয় আদর্শ হিসাবে ইহার মত অবাস্তব আর কিছু হইতে পারে না। ভারত যে নূতন সভ্যতার পত্তন করিতে যাইতেছে, তাহা সামাজিক পরিবেশের ক্রমাগত উন্নয়ন, পরিবর্দ্ধিত সংস্কৃতি অনুসারে সমাজের কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং এই কাঠামোর মধ্যে মানুষের উন্নতির সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দান—এই তিনটি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর স্নাতকদিগকে উদ্দেশ করিয়া ড. পানিকর বলেন, তাঁহারা যেন এই আদর্শকে নিজের জীবনে সফল করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট

বিগত ৬ই ও ৮ই জানুয়ারী ব্যাঙ্কে যে ধর্ম্মঘট চলে তাহার সংবাদ নিম্নরূপ :

"৫ই জানুয়ারী—শুক্রবার সমগ্র ভারতে দুই দিবসব্যাপী ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইতেছে। প্রকাশ, ভারত সরকার সকল রাজ্য সরকারকে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যদিও রাজ্য সরকারের, তথাপি প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘটে দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইবার গুরুতর আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ভারত সরকার উল্লিখিত নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন।

এইরূপ নির্দ্দেশ জারীর তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, ভারত সরকার বিরোধের আপোষ মীমাংসার জন্য উদগ্রীব নহেন। বস্তুতঃপক্ষে এই চরম মুহূর্ত্তেও সরকার যে-কোন ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব বিবেচনা করিতে প্রস্তুত।"

"বেতন ও মাগগীভাতা হ্রাসের প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের ঘোষণা মত ভারতব্যাপী প্রতীক ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় দিবস শনিবার ৮ই জানুয়ারী কলিকাতায় ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের সর্ব্বাত্মক ধর্ম্মঘট হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অফিসার শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা অবশ্য যথারীতি কার্য্যে যোগদান করেন।

কিন্তু ঐ প্রতীক ধর্ম্মঘটের অবসানে সোমবার হইতে ব্যাঙ্কের কাজকারবার স্বাভাবিক হইবার এবং ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ সুরুর পথ সুগম হইবার সম্ভাবনা শনিবারের অবস্থা পর্য্যালোচনায় বিশেষ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয় নাই। কারণ এক দিকে গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক পরিচালন কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং জগতে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মানুবর্ত্তিতা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প, অপর দিকে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীরাও তাঁহাদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর।"

ধর্ম্মঘটের দরুন যে ব্যাপক ক্ষতি জনসাধারণের হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার তুলনায় ধর্ম্মঘটকারীদের স্বার্থ কতটুকু ইহার বিচার কে করিবে?

ট্রামে প্রতীক ধর্ম্মঘট

ট্রাম শ্রমিকদের একদিনের প্রতীক ধর্ম্মঘটের দরুন অধিকাংশ ট্রাম-শ্রমিক কাজে যোগদান না করায় বুধবার ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতা ও হাওড়ায় ট্রাম চলাচল ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। হাওড়ায় সারাদিন ট্রাম চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। কলিকাতায়ও সকাল ৮টা পর্য্যন্ত কোন লাইনেই ট্রাম চলে নাই; আবার সন্ধ্যার পরও সমস্ত লাইনে ট্রাম চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কলিকাতায় এক শ্রেণীর ট্রাম-শ্রমিক কাজে যোগদান করায় এইদিন সকাল ৮টার পর হইতে অপরাহ্ণ ২টা পর্য্যন্ত এককালে সর্ব্বাধিক ৮৭ খানি ট্রাম রাস্তায় বাহির হয়।

স্বাভাবিক সময়ে দৈনিক প্রায় চারি শত ট্রাম রাস্তায় (কলিকাতা ও হাওড়া মিলাইয়া) চলাচল করিয়া থাকে এবং ঐগুলিতে প্রায় ১০ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করিয়া থাকে।

এই প্রতীক ধর্ম্মঘট শুধুমাত্র নেতৃত্বের শক্তি-পরীক্ষা। ইহার ন্যায় বা ধর্ম্মসঙ্গত কোনও কারণ ছিল না।

ফাট্‌কাবাজের স্বরূপ

কলিকাতা যে জুয়াচোরদিগের লীলাভূমি তাহার আরও একটি নূতন প্রমাণ বিগত ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর পাওয়া যায়।

গত শুক্রবার-শনিবার ক্লাইভ রো অঞ্চলে পাটের ফাটকাবাজারে বেআইনী ফাটকাবাজীর অভিযোগে তল্লাসী করিতে গিয়া কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিস উহারই আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত যে ২৫০টি টেলিফোন যন্ত্র আটক করিয়াছে, পুলিস মনে করে যে, সেগুলি সবই বেআইনীভাবে রক্ষিত এবং ব্যবহৃত হইতেছিল। সেক্ষেত্রে পুলিস মহলের এক হিসাবে এইরূপ অনুমিত হয় যে, ঐ সব বেআইনী টেলিফোন ব্যবহার করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং ডাক ও তার বিভাগকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিয়া আসিতেছিল।

দেশের অবস্থা

কলিকাতায় দুর্নীতি ও দুরাচার কতদূর পৌঁছিয়াছে তাহার নিদর্শনরূপে নিম্নের সংবাদটি উল্লেখযোগ্য :

সান্ত্রীগণ কর্ত্তৃক দিনরাত্রি কঠোর সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, গত মঙ্গলবার ব্যারাকপুর সাব-ট্রেজারী সংলগ্ন একটি কক্ষে লোহার সিন্দুক হইতে সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগের দরুন রক্ষিত ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা উধাও হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এই দিন সকালে ক্যাশিয়ার ক্যাশ বাহির করিতে গিয়া দেখেন যে, ঐ টাকার থলিয়াটি নাই। ৩০শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারীর সকাল পর্য্যন্ত যে ১২জন সান্ত্রী দিন-রাত পর্য্যায়ক্রমে পাহারায় নিযুক্ত ছিল তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

দীপালী

শ্রীসুখময় সরকার

আমরা কেবল দেবতার পূজা করি না, প্রিয়জনেরও পূজা করি। বস্তুতঃ দেব-পূজা প্রিয়-পূজারই রূপান্তর মাত্র। সংসারে পিতামাতার তুল্য প্রিয়জন আর কে আছে? আবার, তাঁহাদের পিতামাতাও আমাদের নিকট অল্প প্রিয় নহেন। শৈশব ও যৌবনের এই স্থূল যবনিকা উত্তোলন করিয়া যখন আমরা দেখিতে পাই, পিতামহ হুঁকাটি নামাইয়া জরাগ্রস্ত শিথিল হস্তে আমায় বক্ষে চাপিয়া আদর করিতে করিতে তৃপ্তির হাসি হাসিতেছেন, অথবা স্নেহময়ী পিতামহী তাঁহার একান্ত নিরাপদ ক্রোড়ে আমায় শয়ন করাইয়া অপরূপ ভঙ্গিমায় রূপকথার জাল বুনিতে বুনিতে মৃদু হস্ত-সঞ্চালনে নিদ্রাকর্ষণ করিতেছেন, তখন কি তাঁহাদের বিয়োগের বেদনাময় স্মৃতিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে না? তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে কে না ইচ্ছা করে? পরলোকগত প্রিয়জন তখন আমার নিকট দেবতা হইয়া যান। মনে হয়, মানুষ দেবার্চনা অপেক্ষা প্রিয়জনের অর্চনা বহু পূর্বে আরম্ভ করিয়াছে। যখন বলি 'মা দুর্গা', 'বাবা বিশ্বেশ্বর', তখন ত দেবতাতে মাতৃত্ব-পিতৃত্ব আরোপ করি। ইহাতেই প্রমাণ, মাতাপিতা প্রভৃতি প্রিয়জন অগ্রে, দেবতা পরে। শিশুর চিত্ত বিশ্লেষণ করুন। সে মাতা জানে, পিতা জানে, অপর প্রিয়জনকে জানে, কিন্তু দেবতাকে তেমন অন্তরঙ্গভাবে জানে না।

পরলোকগত প্রিয়জনকে আমরা ভুলিতে চাহি না, ভুলিতে পারি না। ভুলিলে আমাদেরও অস্তিত্বের কোনও অর্থ হয় না, সুতরাং ভুলিবার উপায় নাই। অনন্তকাল চলিয়াছে—তাহার পর্বে পর্বে আমরা পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করিতেছি, তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। এই অনুষ্ঠানের নাম শ্রাদ্ধ। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় চন্দ্র-সূর্য কালকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করিয়া দিতেছেন, আর আমরা সেই সকল পর্বে পিতৃপিতামহগণের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধ করিতেছি, তর্পণ করিতেছি। 'স্মৃতি'তে যদিও প্রত্যেক অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, তথাপি শ্রাদ্ধের দুইটি বিশেষ দিন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। একটি মহালয়া, অপরটি দীপালী। আশ্বিন অমাবস্যার নাম মহালয়া, কার্তিকী অমাবস্যার নাম দীপালী।*

বঙ্গদেশে কার্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ [illegible]ওয়ার রীতি আছে। একটি দীর্ঘ বংশ-দণ্ডের শীর্ষে বিচিত্র-বর্ণের ফানুস ঝুলিতে থাকে, তাহার অভ্যন্তরে একটি তৈলপূর্ণ মৃৎ-প্রদীপ সমস্ত রাত্রি মিটমিট করিয়া জ্বলিতে থাকে। বঙ্গদেশে সৌরমাস গণনা প্রচলিত থাকায় সৌর কার্তিকের প্রথম হইতে শেষ দিবস পর্যন্ত আকাশ-প্রদীপ দানের রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু মহালয়া হইতে দীপালীর দিন পর্যন্ত এই প্রদীপ দেওয়ার কথা। ইহাই স্মৃতির বিধান। কেন এই প্রদীপ দিতে হয়? বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি।" আকাশ-প্রদীপ কিন্তু দেবতার উদ্দেশে নয়, পর-লোকগত প্রিয়জনের উদ্দেশে প্রদত্ত হয়।

প্রাচীন রীতি অনুসারে কার্তিকী অমাবস্যায় আকাশ প্রদীপ দান শেষ করিয়া উক্ত দিবসে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। দীপালী-দিনের শ্রাদ্ধের বিশেষত্ব এই, ইহাতে উল্কাদান ও দীপদান করিতে হয়। উল্কাদানের মন্ত্র হইতে ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইবে:

শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।†
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোম-বহ্নিনা॥
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্তু পরমাং গতিম্॥
যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।‡
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তু ব্রজন্তু তে॥

---

* ইহা গৌণচান্দ্র গণনা। মুখ্য চান্দ্র ধরিলে ভাদ্র অমাবস্যায় মহালয়া, আশ্বিন অমাবস্যায় দীপালী। ইহাতে মাসের নামের পার্থক্য হয় মাত্র, দিনের পার্থক্য হয় না।

† ভূতদর্শয়োঃ=ভূতে চ দর্শে চ। ভূতে=ভূতচতুর্দ্দশীতে। দীপালীর পূর্বদিন ভূতচতুর্দ্দশী। এই দিনে চতুর্দ্দশ দীপদান ও চতুর্দ্দশ শাকভক্ষণ বিধেয়। দর্শে=অমাবস্যায়।

‡ মহালয়ে=বিষ্ণুলোকে।

ভাবার্থ—আমার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে যাঁহাদের অস্ত্রাঘাতে অপমৃত্যু হইয়াছিল, আমি ভূতচতুর্দশী ও অমাবস্যায় তাঁহাদের উদ্দেশে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় উল্কাদান করিতেছি। ইহার অগ্নিতে তাঁহাদের দেহ দগ্ধ হউক। আমার বংশে যাঁহাদের মৃতদেহ কোনও কারণে সৎকার করা হয় নাই, অর্ধদগ্ধ বা অদগ্ধ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল, অদ্য আমি তাঁহাদের উদ্দেশে এই জ্বলন্ত উল্কাদান করিতেছি। ইহার অগ্নিতে তাঁহাদের দেহ দগ্ধীভূত হউক, তাঁহারা পরমা গতি লাভ করুন। তাঁহারা হয় ত সকলেই বিষ্ণুলোকে স্থান পাইবার উপযুক্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, অনেকেই যমলোকে আবদ্ধ আছেন। অদ্য তাঁহারা যমপুরী পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রদত্ত এই উজ্জ্বল উল্কার আলোকে 'পথ' দেখিয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করুন।

যুক্তিবাদী বলিবেন, কোন্ কালে কাহার মৃতদেহ অর্ধদগ্ধ বা অদগ্ধ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল, আজ এতকাল পরে তাঁহাদের উদ্দেশে অগ্নিপ্রদান করিলে কি ফল হইবে? কোথায় যমলোক? কোথায় বিষ্ণুলোক? সে দুই লোকে গমনাগমনের পথই বা কোথায়? আর আমরা এই ভূলোক হইতে আলো দেখাইলে সে পথ আলোকিত হইয়া পিতৃ-পুরুষগণের যাত্রা সুগম করিবে, ইহাও কি সম্ভবপর? এ সকল প্রশ্নের প্রত্যক্ষ কোনও উত্তর নাই। কিন্তু বুঝা উচিত, মানুষের ধর্মবিশ্বাস কেবল যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া, পূর্বেই বলিয়াছি, এ সকল অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা পূর্বপুরুষগণকে বলিতে চাহিতেছি, "আমরা তোমাদিগকে ভুলি নাই। আমরা তোমাদের ঋণ চিরকাল স্বীকার করিব এবং চিরকাল তাহা পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব।" ঋণ-শোধের উপায়টা যেমনই হউক, ঋণ-স্বীকারে ও ঋণ-পরিশোধে একটা আত্মতৃপ্তি আছে।

দীপালীর দিন প্রদোষে এতদঞ্চলের প্রায় সর্বত্র বালক-বালিকারা প্যাঁকাটির গুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করিয়া উল্লাসের সহিত বহ্ন্যুৎসব করে। বাঁকুড়ায় এই উৎসবের নাম 'ইঁজোল-পিঁজোল'। কথাটা বোধ হয় 'ইন্ধন-পুঞ্জ' শব্দের অপভ্রংশ। 'ইঁজোল-পিঁজোল' করিতে করিতে বালক-বালিকারা একটা ছড়া বলে। উল্কাদানের মন্ত্রে যে ভাব ব্যক্ত হয়, এই ছড়াতেও অবিকল সেই ভাব আছে। বলা বাহুল্য, লোকমুখে ছড়ার উৎপত্তিই অগ্রে হইয়াছিল, পরে পণ্ডিতেরা সে ভাব অবলম্বনে শ্লোকে মন্ত্র রচিয়াছিলেন। ছড়াটি এই:

ইঁজোলে পিঁজোলে।
বুড়া বাপা আঁধারে॥
আঁধার হতে আলোয় যা।
গুয়া নারকেল খেয়ে যা॥*

অর্থাৎ, ইন্ধনপুঞ্জ জ্বলিতেছে। বৃদ্ধ পিতামহগণ অন্ধকারে যমলোকে রহিয়াছেন। হে পিতৃগণ। এই ইন্ধন-পুঞ্জের আলো দেখিয়া অন্ধকারময় যমলোক হইতে জ্যোতির্ময় বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করুন। যাত্রাকালে শ্রাদ্ধে প্রদত্ত আমাদের গুবাক ও নারিকেল ভক্ষণ করিয়া যান।

বহ্ন্যুৎসব সমাপ্ত হইলে জ্বলন্ত প্যাঁকাটির গুচ্ছ হইতে কয়েকটি লইয়া দেউল-প্রাঙ্গণে, বাস্তুভিটায়, গোশালায়, গোময়-কুণ্ডে ও শস্যক্ষেত্রে পুঁতিয়া দেওয়া যায়। অবশিষ্ট প্যাঁকাটির অগ্নিতে একপ্রকার পিষ্টক দগ্ধ করা হয়। চাউল বাটিয়া ১০৮টি লবণহীন পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া এক খণ্ড দারু-পট্টে সাজাইয়া রাখা হয়। ইহাদের মধ্যে একটি পিষ্টক বৃহৎ ও সুদৃশ্য। তাহাতে তৈলসিক্ত সলিতা দিয়া প্রদীপের মত জ্বালিয়া দেওয়া হয়। এই পিষ্টকের নাম 'ধুন্দুল পিঠা'। বৃহৎ ধুন্দুলটি গৃহের চাল উল্লঙ্ঘন করাইয়া উত্তরাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার নাম 'শুক দেখানো'। অন্য ধুন্দুলগুলি বালক-বালিকারা প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করে। ধুন্দুল নিশ্চয় পিতৃ-গণের উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড। অনেক স্থানে ধ্রুবতারাকে ভুল করিয়া 'শুকতারা' বলে। 'শুক দেখানো' প্রকৃত পক্ষে ধ্রুব-লোক-প্রদর্শন। ধ্রুব বহু তপস্যায় উত্তর আকাশে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি তিনি তারকারূপে বিরাজ করিতেছেন। বহুকাল যমলোকে আবদ্ধ থাকিয়া পাছে আমাদের পিতৃগণ ধ্রুবলোক চিনিতে না পারেন, তাই তাঁহাদের আমরা তাহা সুকৌশলে চিনাইয়া দিতেছি।

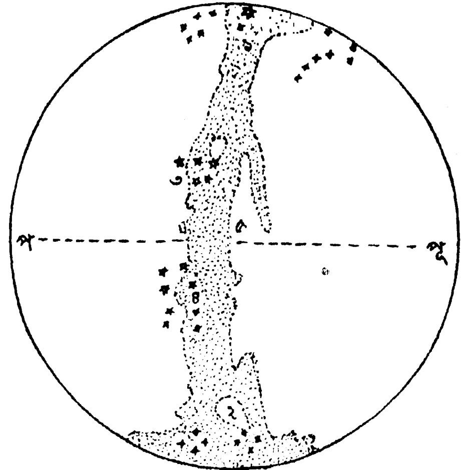
গোধূলি অতিক্রান্ত হইলে গৃহদ্বারে, বাতায়নে, দেবালয়ে, স্তম্ভ-তোরণে, তুলসীমঞ্চে, সৌধচূড়ায় প্রদীপমালা জ্বলিয়া উঠে। কেন এই আলোকসজ্জা? উল্কাদানের মন্ত্রেই তাহার উল্লেখ আছে। যমরাজ কার্ত্তিকী অমাবস্যার রাত্রিতে যম-পুরীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। যে সকল পিতৃপুরুষ যম-পুরীতে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ মুক্তির জন্য বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন, কি করিবেন স্থির করিতে পারেন না। অমাবস্যার রাত্রি, পথ অন্ধকার। আমরা তাই উল্কা ও প্রদীপমালার আলোকে আকাশ আলোকিত করিয়া বলিতেছি, "হে পিতৃগণ, এই আলোক

* এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ছড়ার আধুনিক ভাষা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ব্যাপারটাও নিতান্ত আধুনিক। প্রাচীন বিষয় অর্বাচীন ভাষায় অভিব্যক্ত হইতে পারে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

দখিয়া পথ নির্ণয় করিয়া যমকে ফাঁকি দিয়া আনন্দময় বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করুন।" পরলোকগত প্রিয়জনের জন্যও আমরা কত মমতা অনুভব করি! তাঁহাদের বন্ধনে আমরা বেদনা পাই, তাঁহাদের মুক্তিতে আমাদের আনন্দ হয়।

দীপালী উৎসব কেন হয়? অমাবস্যার তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে দীপালী উৎসব। এই হেতু কেহ কেহ বলেন, ইহা আলোকদ্বারা অন্ধকার বিজয়, পুণ্যদ্বারা পাপ বিজয়। ইহা দার্শনিক ব্যাখ্যা। কেহ বা ইহার মধ্যে 'বিজ্ঞান' অনুসন্ধান করেন। কার্ত্তিক মাস, ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ। অগণিত কীট শস্য নষ্ট করিতে আসে। আকাশ-প্রদীপ, দীপাবলী ও উল্কার আগুনে তাহারা পুড়িয়া মরে; শস্য ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই সকল ব্যাখ্যা ধরিতে গেলে পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলির কোনও অর্থ হয় না। পুরাতন স্মৃতিকে অস্বীকার করিয়া কল্পিত ব্যাখ্যার আত্যন্তিক মূল্য কিছু থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ দীপালী উৎসবে দর্শন নাই, বিজ্ঞানও নাই। আছে ইতিহাস, ভারত-সংস্কৃতির অতি প্রাচীন ইতিহাস। এখানে সেই ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেছি।

বৎসরে এত এত দিন থাকিতে কার্ত্তিকী অমাবস্যাই দীপান্বিতা হইল কেন? প্রাচীনেরা এই দিনে পিতৃপূজা করিতেন, আমরাও করিতেছি। প্রাচীনেরা এই দিনে উল্কা ও প্রদীপের আলোকে পরলোকগত পিতৃগণকে বিষ্ণুলোকের পথ দেখাইতেন; আমরাও দেখাইতেছি। কিন্তু কোথায় সে পথ? প্রাচীনেরা নিশ্চয় সে পথ দেখিতে পাইতেন, আমরাও দেখিতে পাই। কার্ত্তিকী অমাবস্যার দিন সন্ধ্যাকালে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন, প্রায় মধ্য-গগনে একটা দুগ্ধফেননিভ বিস্তৃত পথ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সংযুক্ত করিতেছে। বৈদিক সাহিত্যে ইহাই স্বর্গের নদী সরস্বতী, পুরাণে ইহাই মন্দাকিনী। মহাকবি কালিদাস ইহার নাম রাখিয়াছিলেন "ছায়াপথ"। ছায়া শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ, ছায়াপথ জ্যোতির্ময় পথ। অথবা ছায়া শব্দের অর্থ প্রেত; ছায়াপথ প্রেতগণের যাতায়াতের পথ। ইংরেজীতে ইহার নাম 'Milky way'। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বহুদূরস্থিত নক্ষত্ররাজির আলোকে এই বর্ত্মাকার বা সরিদাকার ছায়াপথের সৃষ্টি। ছায়াপথ প্রকৃতপক্ষে বলয়াকার। এককালে বলয়ের অর্ধাংশ দৃশ্যমান হয়, অপরার্ধ নিম্নের আকাশে লুক্কায়িত থাকে। নক্ষত্রের উদয়াস্তের কাল যেমন নির্দিষ্ট আছে, ছায়াপথের উদয়াস্ত-কালও সেইরূপ নির্দিষ্ট। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ছায়াপথকে আকাশের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিক মাসে সন্ধ্যা-কালে ইহাকে মাথার উপরে দেখা যায়। অতি প্রাচীন কালেও ঠিক এইরূপ দেখা যাইত এবং চিরকাল এইরূপ দেখা যাইবে। এই সময়ে ছায়াপথের যে অংশ আকাশে দৃষ্ট হয়, তাহার পশ্চিম দিকে একটি শাখা বাহির হইয়াছে। এই শাখার নিকটে ছায়াপথের গায়ে শ্রবণা নক্ষত্র। আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় "বেদের দেবতা ও কৃষ্টি-কাল" গ্রন্থে ছায়াপথের এই অংশের নাম রাখিয়াছেন 'বিষ্ণুগঙ্গা'। পুরাণে বিষ্ণুগঙ্গার দক্ষিণাংশের নাম বৈতরণী। বৈতরণী যমপুরীর পার্শ্ব দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যমপুরীতে প্রবেশ করা অথবা সেখান হইতে বাহির হওয়া সহজ কর্ম নহে। দ্বারে চারি চক্ষুবিশিষ্ট দুইটি কুক্কুর নিয়ত প্রহরায় নিযুক্ত আছে। এই দুই কুক্কুরকে দক্ষিণ দিগন্তের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক তারাপটে ইহাদের নাম Crux ও Musca (চিত্র পশ্য)।



১—বিষ্ণুলোক, ২—যমলোক, ৩—শ্যেনপক্ষী, ৪—গন্ধর্ব, ৫—পিতৃযান

দেখা যাইতেছে, ছায়াপথের অংশবিশেষ এককালে পিতৃগণের গমনাগমনের পথ অর্থাৎ পিতৃযান কল্পিত হইয়াছিল। এই পিতৃযানের উত্তরকাষ্ঠায় বিষ্ণুলোক, দক্ষিণ কাষ্ঠায় যমলোক। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন, পিতৃগণ এই পথে যমলোক হইতে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যেমন দেবযানের নিমিত্ত উত্তরায়ণের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ পিতৃযানের নিমিত্ত দক্ষিণায়ন অবশ্য চাই। ইহা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বলিতে পারি, এককালে কার্ত্তিকী অমবস্যার সন্ধ্যায় মধ্যগগনে ছায়াপথ দেখিয়া দক্ষিণায়ন দিন অনুমিত হইত। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আরও দুই একটি যুক্তি আছে। গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে দীপালীর দিন নববর্ষ ধরা হয়। বঙ্গ-

দেশে দুর্গাপূজায় যেরূপ মহোৎসব হয়, সে সকল দেশে দীপালীতে সেইরূপ সমারোহ হয়। বাঁকুড়া জেলাতেও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই দিনে নববস্ত্র পরিধান করে; পিতৃপুরুষগণকে নূতন ধান্যের অন্ন নিবেদন করিয়া নিজেরা গ্রহণ করে। এই সকল অনুষ্ঠান নববর্ষের লক্ষণ। যে-সে দিন নববর্ষ ধরা যাইতে পারে না, নববর্ষের জন্য অয়ন দিন অথবা বিষুব দিন অবশ্য চাই। অতএব কার্ত্তিকী অমাবস্যায় নিশ্চয় এইরূপ একটা জ্যোতিষিক যোগ ঘটিয়াছিল।

আশ্বিন পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। লক্ষ্মী-প্রতিমায় লক্ষ্মীরূপা ধরিত্রীকে চারি দিকহস্তী শুণ্ডদ্বারা বারি-সেচন করিয়া স্নান করাইতেছে। ইহাতে দক্ষিণায়ন দিনের স্মৃতি রক্ষিত আছে। আশ্বিন পূর্ণিমায় এককালে নববর্ষ ধরা হইত। কোজাগরী রজনীতে রাত্রিজাগরণ ও দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া আমরা তৎকালের নববর্ষের স্মৃতি অদ্যাপি রক্ষা করিতেছি। দীপালীর রাত্রিতেও লক্ষ্মীপূজা ও রাত্রি-জাগরণ এবং পরদিন দ্যূতপ্রতিপদে দ্যূতক্রীড়া বিহিত হইয়াছে। এই সকল সাদৃশ্য দ্বারা বুঝিতেছি, যেমন আশ্বিন পূর্ণিমায় এককালে রবির দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইত, কার্ত্তিকী অমাবস্যাতেও সেইরূপ আর এককালে রবির দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইত।*

আরও আছে। ঋগ্‌বেদে ও মহাভারতে সুপর্ণ উপাখ্যান অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। একদা গন্ধর্বগণ সোমকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। দেবগণের অনুরোধে গায়ত্রী শ্যেন-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া গন্ধর্বদের নিকট হইতে সোম আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন। এক গন্ধর্ব ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া তাঁহাকে তীরদ্বারা বিদ্ধ করিল। ইহাতে শ্যেন-রূপিণী গায়ত্রীর একটি পালক (অথবা নখর) খসিয়া পড়িল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই উপাখ্যানের শ্যেনপক্ষী শ্রবণা নক্ষত্র। গায়ত্রীচ্ছন্দের ২৪ মাত্রা শ্যেনের ২৪টি পক্ষ (পালক), অথবা বর্ষরূপ পক্ষীর ২৪টি পক্ষ (মাসার্ধ)। বেদে বহু স্থানে বৎসরকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কারণ বৎসর পক্ষীর মত উড়িয়া চলিতেছে। শ্রবণার দক্ষিণে পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। এই দুই নক্ষত্রের তারাগুলি যোগ করিলে এক ধনুর্বাণধারী নরাশ্বমূর্তি পাওয়া যায়। ইহারই অপর নাম ধনুরাশি (Sagittarius), ইহাই উপাখ্যানের গন্ধর্ব (চিত্র পশু)। সোম চন্দ্র। গন্ধর্বেরা সোমকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, অর্থাৎ, সেদিন চন্দ্র অদৃশ্য হইয়াছিলেন, অমাবস্যা হইয়াছিল। শ্যেনপক্ষীর সোম আনয়ন প্রকৃত পক্ষে বৃষ্টি আনয়ন। উপাখ্যানটির ফলিতার্থ এই যে, এক অমাবস্যায় শ্রবণা নক্ষত্র ও ধনুরাশিকে সন্ধ্যাকালে মধ্যগগনে দেখিয়া বর্ষাঋতুর আগমন অনুমিত হইত এবং সেদিন নববর্ষ ধরা হইত। কার্ত্তিকী অমাবস্যাতেই এইরূপ যোগ সম্ভবপর। এক্ষণে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, যেকালে কার্ত্তিকী অমাবস্যায় রবির দক্ষিণায়ন হইত, দীপালী উৎসবে সেই কালের স্মৃতি রক্ষিত আছে।

সে কোন্ কালের কথা? সামান্য জ্যোতির্গণিতের সাহায্যে সেই কাল নির্ণয় করিতেছি। অয়ন চলন (precession of the Equinoxes) হেতু কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে (২১৬০ বৎসরে) অয়ন দিন এক মাস করিয়া পশ্চাদ্‌গত হইতেছে। বর্তমানকালে ৭।৮ই আষাঢ় রবির দক্ষিণায়ন হয়, অম্বুবাচী হয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ৭।৮ই শ্রাবণ, চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ৭।৮ই ভাদ্র রবির দক্ষিণায়ন হইত। কার্ত্তিকী অমাবস্যা সৌর কার্ত্তিকের মাঝামাঝি ধরিতে পারা যায় (অবশ্য এ বৎসর, ১৩৬২ সালে কার্ত্তিকী অমাবস্যা কার্ত্তিকের শেষ দিকে পড়িয়াছিল, কারণ ভাদ্রমাসটি মলমাস ছিল)। ৭।৮ই আষাঢ় হইতে কার্ত্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৪½ মাস।

আষাঢ়ের	২৩।২৪ দিন	= ¾ মাস
শ্রাবণ	৩১।৩২ দিন	= ১ মাস
ভাদ্র	৩১ দিন	= ১ মাস
আশ্বিন	৩০ দিন	= ১ মাস
কার্ত্তিকের	১৫।১৬দিন	= ½ মাস
	একুনে	৪¼ মাস

অয়ন দিন এক মাস পশ্চাদ্‌গত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে। অতএব ৪¼ বৎসর পশ্চাদ্‌গত হইতে ২১৬০ × ৪¼ = ৯১৮০ বৎসর, স্থূলতঃ ৯০০০ বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং অদ্য হইতে ৯০০০ বৎসর পূর্বে খ্রীঃ-পূঃ ৭০০০ অব্দের নিকটবর্তী কালে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। দীপান্বিতা অমাবস্যায় এতকাল ধরিয়া আমরা সেই স্মৃতি বহন করিতেছি।

'ধর্মের গাজনে' (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৬২) খ্রীঃ-পূঃ ৫৫০০ অব্দ পাইয়াছি। দীপালীতে আরও প্রাচীন কালের ইঙ্গিত পাইলাম। পশ্চিমদেশের বেদবিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন, ভারতে

---

* এখানে উল্লেখযোগ্য, কার্ত্তিকী অমাবস্যায় শ্যামাপূজা হইয়া থাকে। শ্যামাপূজার সহিত কিন্তু দীপালীর কোনও সংস্রব নাই। দুইটি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথক; একান্ত আকস্মিক ভাবে একই দিনে হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ যে-কালে দীপালী-উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার বহু কাল পরে শ্যামাপূজা প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্যামাপূজা আমাদের আলোচ্য নহে।

আর্যকৃষ্টির বয়স চারি সহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। ঋগ্‌বেদের ভাষা দেখিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু কাল-নির্ণয়ের জন্য ভাষার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে গেলে সিদ্ধান্ত কখনও নির্ভুল হইতে পারে না, বরং পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা। কাল-নির্ণয়ের জন্য চাই জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বেদ-চক্ষুঃ। ষড়বেদাঙ্গের মধ্যে ইহাই দর্শনেন্দ্রিয় স্বরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই যে ভ্রান্তিপূর্ণ তাহা এতদ্‌বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধে জ্যোতিষের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছি। এই প্রবন্ধের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি—দীপালী সুদূর অতীতকালের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

সাধন-পথে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রয়াগে একদা মেঘাচ্ছন্ন মাঘের প্রাতে—
ধর্ম্মশালায় সাক্ষাৎ এক যোগীর সাথে।
সাদা ছাই ঢাকা, গনগনে তার ধুনির আঁচে
ঝুলি কাঁথা সাথে, খাতা হাতে সাধু বসিয়া আছে।
বাঙালী বটেন, হাসিয়া বলিনু খাতায় ও কি ?
সাধু বলিলেন 'ছবি আঁকি আমি কবিতা লিখি'।
বৃষ্টি পড়িছে, বাহিরে যাওয়া তো কঠিন জানি
শুনিতে লাগিনু অগত্যা তাই সাধুর বাণী।

২

বলিলেন তিনি 'গীত রচি গাহি, কণ্ঠ সাধি,
ভাষা, ভাব, সুর একেবারে ঠিক রামপ্রসাদী।
বেছে বেছে কথা বসায়েছি বহু ভাবিয়া নিজে,
তবু জমিল না, রয়ে গেছে খুঁত কোথায় কি যে।
রামধনু আমি এঁকেছি, নাহিক প্রভেদ অণু,—
অসীমের সেই লাবণ্য কই পেলে না ধনু ?
অনিন্দ্য এক গোপাল গড়েছি তাহাও বৃথা,
লাড়ু খায় নাকো, নাক্ টিপিলেও কহে না কথা।'

৩

সব সাধনার গতিপথ এক—রসিক বোঝে,
সবাই সুধার সন্ধানী—সবে সিদ্ধি খোঁজে।
বহু রাম নাম করেছি—বড়াই কত বা কব—
বাল্মীকি হওয়া ছিল না মোটেই অসম্ভব ও।
ছিনু ধ্যানরত এত অহিংস উদারমনা,
হয় ত বা ছিল বুদ্ধ হবার সম্ভাবনা।
কিছুই হ'ল না, কোথা খুঁত ভাবি দিবস যামী,
পরশ-পাথর না হয়ে—পাথর হলাম আমি।

৪

চণ্ডীদাসের মতো পদাবলী লিখেছি দেখো,
ধ্বনি মিলিয়াছে—চিন্তামণি তো মিলিল না কো।
প্রাণ প্রতিষ্ঠা শিখিনি—করেছি গর্ব্ব জমা—
গড়া গেল নাকো তিল তিল রূপে তিলোত্তমা।
সাধনায় মোর সিদ্ধি এলো না—স্পর্দ্ধা ভাবো—
রামপ্রসাদের প্রসাদ পাইনে—দেবীকে পাবো ?
শ্মশানে মা বলে রজনী গোঙানু, কাঁদিনু এতো,
ক্ষেপাই হলাম—বামাক্ষেপা কই হলাম না তো ?

৫

তাতল সাগর-সৈকতে পুড়ে ঝিনুক মলো,
স্বাতীর বিন্দু বারি বিনা সব বিফল হ'ল।
রূপ ও রসের দধি পাতি নিতি বুঝলে কিনা
কিছুতেই দধি জমে না কৃপার সাজনা বিনা।
জড় জড়ই থাকে, ভাব আসে নাকো বস্তু হয়ে,
রূপে অপরূপ প্রকাশ পায় না, কি হবে লয়ে ?
সর্ব্বসিত সে শিব আসিল না তুষারে শীতে,
সুদূর সুরভি এলো না আমার কস্তুরীতে।

৬

তবু তপ করি, কেন আঁকি লিখি, শুনিবে গুণী ?
গঙ্গা আসেনি—আমি পাই তাঁর কলধ্বনি।
শ্যামা না আসুন, চন্দ্রভালীর চাঁদের আলো—
চঞ্চল এই তাপিত সুতের চোখ জুড়ালো।
তরণী ডাঙায়, আছি জোয়ারের প্রতীক্ষাতে,
হাল ঠিক রাখি দাঁড় বাঁধি, পাই শান্তি তাতে।
পরিপূর্ণতা আসিছে, চলুক এ টানা বোনা
মন বলে তোর কাঠের 'সেঁউতি' হবেই সোনা।

রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ভারতের অতীত

আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, কোম্পানীর আমল শেষ হয় হয় এমন সময়, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশে যে নবজাগরণ আসিয়াছিল, তাহার প্রথম ফল হইল চিন্তার স্বাধীনতা। কিন্তু সেই সঙ্গে পুরাতন সুনীতি দুর্নীতি সকলেরই বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল; স্বেচ্ছাচার, অদম্য ভোগবাসনা এবং নকল সাহেবিয়ানার মোহ আমাদের ধনবান শিক্ষিত সমাজকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু সেই আরম্ভের পর একপুরুষ সময় কাটিয়া যাইতেই অর্থাৎ ১৮৫৭-৫৯ সনের সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হইবামাত্র স্বদেশপ্রেম জন্মিয়া এক নব অমৃতধারায় ভারতীয় শিক্ষিত জনগণের হৃদয় ভরিয়া দিল; আমরা বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পাইলাম। মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সনে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই দেশ-আত্মবোধ ফুটিয়া বাহির হইল রঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্যে (১৮৫৮) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকে (১৮৭৪)। কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রথম ফল হইল স্বদেশী মেলা স্থাপনে (১৮৬৭)। আর, যুবক শিক্ষিত বাবুরা যে বিদেশী নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ হইতে মূর্খ চাষীদের উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন, এই নিঃস্বার্থ ত্যাগস্পৃহাকে কি "ফলিত দেশপ্রেম" বলিব না?

এই নবজাগ্রত দেশপ্রেমের অন্তরে একটি গভীর মর্ম-বেদনা লুকান ছিল; তাহাকে মাথা তুলিতে হইয়াছিল বিষাদ ও লজ্জার পাথরচাপা ঠেলিয়া। পরাধীন ভারতের বর্ত্তমান ও "নিকট অতীত" বড়ই লাঞ্ছনার, হতাশার কাহিনী, কাজেই ভারতের এই সুদূর-বিস্মৃত সত্যযুগের দিকে আমাদের প্রথম নেতাদের তাকাইতে হইল। প্রথম যুগের স্বদেশ-সঙ্গীতের সুর হইল ক্রন্দন:

> সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
> পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে।

অথবা,

> আর্য্যাবর্ত জয়ী পুরুষ যাহারা
> সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?

এই বীজ হইতে আমাদের মধ্যে প্রকৃত ভারত-ইতিহাস চর্চার (পুরাণ পাঠের নহে) উৎপত্তি। এবং সাহিত্য-প্রাঙ্গণে ইহার পুণ্যসমীরণ এক নবজীবন-রস ঢালিয়া দিল।

ঠাকুরবাড়ীতে ইহার চতুর্ম্মুখী বিকাশ দেখা দিল, কারণ তাঁহারাই নবীন ও পুরাতন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুটি জগতের মধ্যে অতি স্বাভাবিক অথচ পূর্ণাঙ্গ সংযোগ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান, আবার অপর ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় ন্যাশানালিষ্ট নাটক লিখিলেন। মাইকেলের কৃষ্ণ-কুমারী (১৮৬১) প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হইলেও তাহা ট্রাজেডী মাত্র, ন্যাশানালিষ্ট নহে। সে পদ পুরুবিক্রমেরই।

ঠাকুরবাড়ীর বক্ষে পালিত ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া এই স্বদেশী ঢেউ কাটাইবেন? তাই ষোল বৎসর বয়সে তিনি যে কিছু সামান্য আধার-গ্রন্থ হাতের কাছে পাওয়া গেল তাহা সংগ্রহ করিয়া ঝান্সীর রাণীর ইতিহাস লিখিবার ব্রত মনে মনে গ্রহণ করিলেন। ১৮৭৭ সনের 'ভারতী'তে তাঁহার "ঝান্সীর রাণী" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধশেষে তিনি বলিয়াছেন, "ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী (পুস্তকাকারে দশ পৃষ্ঠা) সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।"

সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই, রবীন্দ্রনাথ আর কোন ইতিহাস-কাহিনী লেখেন নাই। কিন্তু ইতিহাস কাহিনীতেই শেষ নহে, ভারতের অতীত কথার গভীর মর্ম্ম, ইতিহাসের মধ্যে আমরা কি চাই, ইতিহাস-গ্রন্থ কিরূপ হওয়া চাই, এই সব বিষয়ে তিনি অনেকগুলি গভীর চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র ও সমস্যা সম্বন্ধে অতি মূল্যবান বিচার লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আজীবন ইতিহাস-সংসৃষ্ট বিষয়ে যতগুলি বিক্ষিপ্ত লেখা আছে, তাহা একত্র করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় "ইতিহাস" বাহির করিয়াছেন।

কবিগুরু ভারতের অতীতকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই সংগ্রহে অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কাহিনী অর্থাৎ ঘটনা বর্ণনা এবং বাহ্য তথ্য নির্দ্ধারণ নাই; আছে "philosophy of history", এবং সেই জন্য যখন (১৯১৩ সনে) আমি তাঁহার প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ করি, তখন ইহার যথার্থ নাম দিয়াছিলাম, "My Interpretation of Indian History." এই সংগ্রহগ্রন্থে কোন ঐতিহাসিক তথ্য অথবা ইতিহাস-শাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতি (methodology) সম্বন্ধে নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে না, কিন্তু পাঠক রবীন্দ্রনাথকে

আরও একান্তভাবে চিনিতে এবং কবির হৃদয় স্পষ্টতর দেখিতে পারিবেন।

এই বইখানি* ছোট হইলেও রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার জন্য ব্যাকুল ভক্তদের চিরসঙ্গী হইয়া থাকিবে। আর, পেশাদার ঐতিহাসিকগণও ইহার মধ্য হইতে অনেক অমূল্য চিন্তারত্ন আত্মসাৎ করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমানে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রধান ঐতিহাসিক জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ন বলেন যে, জাতির ক্রমবিকাশ, সামাজিক জীবনের ও ভাবের অভিব্যক্তিই একমাত্র সার ইতিহাস—যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি তাহার বাহিরের খোসা মাত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের "Social History" লেখা এখনও বাকী আছে; সে কার্য্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পথ দেখাইয়া দিবে।

তিনি কি চক্ষে ভারতের অতীতকে দেখিতেন তাহা এই গ্রন্থে এবং অসংখ্য অন্য স্থানে বলিয়া গিয়াছেন। কথাটা অতি সহজ; লিখিয়া প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র ভবিষ্যতের কোন কালা আদমী গিবনের পক্ষেই সম্ভব হইবে। তাঁহার লেখাই উদ্ধৃত করিতেছি:

"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী? একথার এই উত্তরকে ভারতবর্ষের ইতিহাস সমর্থন করিবে:—ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

"পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।"

এই হইল তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক ঐতিহাসিকের প্রতি তাঁহার উপদেশ। আমরা পেশাদার ঐতিহাসিকগণ যেন তাঁহার আর একটি কথা (১৫৯ পৃষ্ঠা) না ভুলি। ১৯০৫ সনে তিনি লেখেন:

"ইতিহাসকে কেবল জ্ঞান নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবে তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিত আছে। আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে, স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক।" এই বীজের সুপক্ব ফল তাঁহার পদ্যে 'কথা ও কাহিনী" নয় কি?

এ বইখানি সুন্দর ছাপা হইয়াছে। একটি মাত্র ভুল দেখিলাম, ১০৫ পৃষ্ঠায় ক্লাইভের নামে ভ-স্থানে ড হইবে—Clyde,

এই বিভাগের রবীন্দ্র চিন্তাগুচ্ছ পাইয়া একটি কথা আর মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তাঁহার অমূল্য গানগুলি—অন্ততঃ ব্রহ্মসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীতগুলি—সব একত্র করিয়া এক সস্তা পুস্তকের আকারে ছাপান হয় না কেন? যদি তাহা করা যাইত তবে পলগ্রেভের গোল্‌ডেন ট্রেজারির মত ছোট মোটা অথচ সস্তা (দু' শিলিং) এই গান-সংগ্রহ দশ সহস্র বাঙ্গালীর পকেটে ঘুরিত, জনগণমনে অমৃত-ধারা ঢালিয়া দিতে থাকিত। প্রায় ৪০ বৎসর আগে তাঁহার "গান" নামক একখানি বই পাওয়া যাইত, ৪২০ পৃষ্ঠা, দাম আড়াই টাকা—তাহাতে বিবিধ সঙ্গীত (১—২১৫ পৃষ্ঠা), জাতীয় সঙ্গীত (২১৬—২৪৯ পৃষ্ঠা), ব্রহ্মসঙ্গীত (২৫০—৪০০ পৃষ্ঠা), অনুষ্ঠান সঙ্গীত (৪০১—৪০৫ পৃষ্ঠা) এবং ১৪ পৃষ্ঠা সূচীপত্র ছিল।

আর এখন? অজস্র টাকা খরচ করিয়া স্বরলিপি সংযুক্ত কুড়ি-বাইশটা গানের দুর্ম্মূল্য সংগ্রহ মাত্র, বিশ-পঁচিশ খণ্ড কিনিলেও তাঁহার গানসমষ্টি একত্র করা যায় না। বর্ত্তমান কপিরাইট-অধিকারীরা কি রবির কিরণকে কুবেরের আঁধার-কোঠায় বদ্ধ রাখিতে চান?

সংযোজন

এই প্রবন্ধ ছাপা হইবার সময় সংবাদ পাইলাম যে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান রচনা (প্রায় দুই হাজার) একত্র করিয়া "গীতবিতান" নাম দিয়া তিন খণ্ডে, একুন সাড়ে বারো টাকা দামে, প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহা এখনও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থস্ফীতির কারণ "আগে অনেক গান বাল্যরচনা বলিয়া তিনি ছাপিতেন না, এবং শেষ জীবনে লিখিত কতকগুলি গান পুস্তকাকারে পূর্ব্বে ছাপা হয় নাই", সে সমস্ত এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই বিরাট সমুদ্রকে গোল্‌ডেন্ ট্রেজারি বলা যায় না। সেরূপ অতি-বাঞ্ছনীয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে যদি তাঁহার 'ব্রহ্মসঙ্গীত" ও "জাতীয় সঙ্গীত" (সব) এবং নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ বিবিধ সঙ্গীত মাত্র এক ভলুমে (কাগজে মোড়া আড়াই টাকা, কাপড়ে বাঁধাই তিন টাকা দামে) এখন বাহির করা হয়। তাহার ছাপার খরচ অতি শীঘ্র উঠিবে।

* ইতিহাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আড়াই টাকা।



দশম পরিচ্ছেদ

রামজয় পণ্ডিত বললেন—যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে—হরে মুরারে।—ফুটবল ম্যাচের কথায় বললেন কথাটা। অর্থাৎ ওটা বন্ধ করা যাবে না। তারপর হেসে বললেন—শুধু ওটাই কেন, আরও অনেক কিছু রোধ করা যাবে না।

চন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে রইলেন। রামজয়ের মনোভাব তিনি জানেন, বোঝেন। সে সব তিনি বিশ্বাস করেন না। রামজয় মানুষ ভাল কিন্তু শিক্ষায় দীক্ষায় সেকেলে লোক। শিক্ষা-দীক্ষাকে আয়ত্ত করে যাঁরা তার ঊর্দ্ধে উঠে চিরকালের শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারেন—তাঁরা ছাড়া সবাই আপন আপন কালের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে—বদ্ধ জলার জীব। কারও জলা বড় কারও ছোট। তিনিও তাই। তিনি এ সত্যটা বোঝেন, কিন্তু চিরকালের শিক্ষা বা সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না। রামজয়ের কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়, কিন্তু যা নতুন আসছে তা যে শুধুই মন্দর জন্য তা তিনি মনে করেন না। কিন্তু এই যে খেলার ব্যাপারে ছেলেদের মাতানো—এটা নিশ্চয় ভাল নয়। রামজয় যে সব ইঙ্গিত দিয়েছে তার মধ্যে শনিবারে ডিবেটিং ক্লাবের কথা রয়েছে। ছেলেদের সাহিত্য-সভায় যোগ দিতে অধিকার দেওয়ার কথা রয়েছে। এবং বোর্ডিঙে খাওয়ার জায়গায়—জাতিভেদের কড়াকড়ি তুলে দিয়ে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এক সঙ্গে খেতে বসার রেওয়াজ প্রবর্ত্তনের কথাটা বিশেষ করে রয়েছে। এ তিনটি নতুন প্রবর্ত্তনের প্রথমটি এবং শেষটি—দুটির প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা তাঁর অনেক দিনের। ডিবেটিং ক্লাব ছিল, কিন্তু সেটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এক রকম ধর্ম্মসভায়। কি ভাবে তাঁর মনে নেই—তবে পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে বিতর্কই বিতর্কসভার একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি নিজে শনিবার দিন বাড়ী যেতেন; ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হতে হ'ত তাঁকে; সভা আরম্ভ করে দিয়ে—কোন দিন মৃগাঙ্কবাবুকে, কোন দিন রতন বাবুকে, কোন দিন রামজয়কে সভাপতির আসনে বসিয়ে দিতেন। এই জন্যই পুরাণ বা ধর্ম্মের গণ্ডীর বাইরে যেতে সাহস করতেন না। একবার ঠেকেই তাঁর শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। সে প্রথম আমলের কথা। প্রাণবান পুরুষ অমরবাবু হঠাৎ একদিন শনিবার দিন বিশ্বগ্রামে এসে ইস্কুল ভিজিট করেছিলেন। তিনি 'জমিদারী প্রথা' সম্পর্কে ডিবেট সুরু করিয়ে দিয়েছিলেন। জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধ-পক্ষে যারা বলেছিল—তারা জমিদারীর নিন্দা করতে গিয়ে এখানকার জমিদারদের গালাগাল করেছিল। এখানে কেউ বড় জমিদার নেই, সকলেই মধ্যবিত্ত লোক; ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবু জমিদারী কিনেছেন কিন্তু আসলে তিনি ব্যবসায়ী। ওই নামেই তিনি খুশী হন। বক্তাদের কেউ কেউ অবান্তর ভাবে জমিদারীর নিন্দা করতে গিয়ে ব্যবসায় পেশার প্রশংসাও করেছিল। ফলে বিশ্বগ্রামে আন্দোলনের আর বাকী ছিল না। উপরে দরখাস্তও হয়েছিল। সেই কারণেই পুরাণের বুড়ী ছুঁয়ে থাকাটাই নিরাপদ মনে হয়েছিল। অবশ্য এর একটা ভালর দিকও আছে। পুরাণের মহিমান্বিত চরিত্রগুলি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে চারিত্রিক মহিমার একটা প্রভাব পড়ে ছেলেদের মনে।

ব্রজবিহারী বাবু এসে বিতর্কসভায় নতুন ধারা প্রবর্ত্তন

করেছেন। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, অস্পৃশ্যতা এমনকি নতুন করে জমিদারী প্রথা নিয়েও বিতর্ক করিয়েছেন। তাঁর পরিচালনার যোগ্যতা অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্যের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, সেকালের ছেলেদের চেয়ে এ কালের ছেলেদের যোগ্যতাও অনেক বেড়েছে; আরও লক্ষ্য করেছেন যে, কালটাও পাল্‌টেছে। এ কালে জমিদারীর এবং জমিদারের নিন্দা করলে বিশ্বগ্রামের জমিদারেরা তাকে গায়ে পড়ে তাঁদের গালাগাল বলে ধরে নেন নি। তিনি নিজে এতে খুশী হয়েছেন। খুব খুশী হয়েছেন। কিন্তু রামজয় খুশী হন নি। তিনি বলেছেন—এই হ'ল—এই বার একদিন 'ঈশ্বর আছেন কি নাই' বিষয় দিয়ে দেন, ষোলকলা পূর্ণ হয়ে চৌষট্টি কলার গোড়াপত্তন হোক। বাস্! চার পো কলি পূর্ণ হোক; ষণ্ডরূপী ধর্ম্মের কলিতে একটি পা, সে পা-খানি যাক; মুখ থুবড়ে পড়ুক।

ব্রজবিহারী হেসে বলেছিলেন—তাও দোব। কিন্তু আপনি এত দমে যাচ্ছেন কেন? আমাদের পুরাকালেও তো নাস্তিক ছিলেন। কপিলের—

—দোহাই ব্রজবাবু, তাঁর নাম করবেন না, তাঁর দোহাই দেবেন না।

—কেন?

—তবে একটা গল্প বলি শুনুন। দেশে আমাদের চলতি গল্প অবশ্য। আপনাদের হিষ্টিরি না কি বলে—তা সে হিষ্টিরিতে এ কথা আছে কি না জানি না। তবে শঙ্করাচার্য্যের কথা তো আছে আপনাদের হিষ্টিরিতে,সেই শঙ্করাচার্য্যের গল্প। শুনেছি—শঙ্কর একদিন দাক্ষিণাত্য থেকে যাচ্ছেন কেদার-বদরীতে; সঙ্গে একদল শিষ্য। তা শঙ্কর বললেন, দেখ বাপু সকল—আমি তো তোমাদের সঙ্গে পদব্রজে যেতে পারব না, আমি যোগবলে আকাশমার্গে রওনা হলাম; তোমরা পদব্রজে এস। তবে তোমাদের সুবিধার জন্য মধ্যে মধ্যে পথে নামব, নিশানা রেখে যাব। তোমরা সেই পথ ধরে এস। বলে—বসলেন তিনি যোগাসনে এবং দেখতে দেখতে আকাশমার্গে উঠে গেলেন। এখন শিষ্যরা পদব্রজে রওনা হ'ল এবং কয়েক মাস পরে কেদার মঠে এসে পৌঁছুল। গুরুকে প্রণাম করতেই শঙ্কর তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন—পথ ভুল হয় নি? কোন কষ্ট হয় নি? একদল বললে—না প্রভু কোন কষ্ট হয় নি। আর একদল চুপ করে রইল। শঙ্কর বললেন—কি ব্যাপার বল তো? একই পথে তোমরা এসেছ অথচ একদল বলছ কোন কষ্ট হয় নি, আর একদল চুপ করে রয়েছ। কেন? কারণ কি? উত্তরে যারা কোন কষ্ট হয় নি বলেছিল তারাই বললে—প্রভু, ওরা আপনার মত গুরুকেও সম্পূর্ণরূপে মানতে দ্বিধা করেছে, মানে নি—তাই তারা কষ্ট পেয়েছে। এ ক্লেশ ওদের কর্ম্মফল। আমরা পদব্রজে রওনা হয়ে—দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পথ চলে—পথের ধারে এক নিষাদ-পল্লী পাই, সেখানে প্রশ্ন করি তারা আপনাকে দেখেছে কি না; কারণ সেই সময়টাই ছিল মধ্যাহ্ন, আপনি বলেছিলেন যেখানে তোমাদের মধ্যাহ্ন হবে—সেইখানে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য পদচিহ্ন রেখে যাব। তারা বললে—হ্যাঁ। এক তেজঃপুঞ্জ গোঁসাই এসেছিলেন। এসে আমাদের বললেন—আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে খেতে দাও। আমরা তাকে মাংস রান্না করে খেতে দিলাম। খেয়ে আবার ঠাকুর আকাশে উঠে গেলেন। আমরা তখন সেই নিষাদের ঘরে প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মাংস আহার করলাম। কিন্তু ওরা তা খেলে না। এই ভাবে প্রায় সমস্ত পথটাতে আমরা এই সব আরণ্য জাতির সংখ্যা অধিক পেয়েছি। এবং যেখানে যেখানে প্রভু যে আহার গ্রহণ করেছেন—তাই আমরা গ্রহণ করেছি। ওরা তা করে নি। মধ্যে মধ্যে দু' এক স্থলে প্রভু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের গৃহে বা তপস্বীর কুটীরে যেখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সেখান ছাড়া আহার গ্রহণ না করার ফলে—ওরা কষ্ট পেয়েছে অনেক। কিন্তু এ হ'ল গুরুপদাঙ্ক অবহেলার ফল। আমরা কষ্ট পাই নি—এইটুকু বললেই সব হবে না প্রভু; আমরা সংস্কারবর্জ্জিত হয়ে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে মাংসাহারের গুণে দেহে প্রভূত পরিমাণে বল পেয়েছি। অনুভব করছি যেন আমরা অমৃতের আস্বাদ এবং সন্ধান পেয়েছি। যেহেতু এই মাংস আমাদের কাছে সুস্বাদু মনে হয়েছে এবং সেই নিষাদ-অধ্যুষিত পল্লীর মধ্যেও আমরা স্বর্গসুখ অনুভব করেছি। শঙ্কর হাসলেন, হেসে বললেন – তোমাদের সিদ্ধি তা হলে তো আসন্ন। বলে ওই দেহে-দুর্ব্বল শিষ্যগুলির পরিচর্য্যায় মন দিলেন। কয়েকদিন পর ঐ প্রথম দল অর্থাৎ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী শিষ্যদের বললেন—এস তোমাদের সিদ্ধি আর কতদূর দেখে আসি। বলে চলতে সুরু করলেন। পার্ব্বত্য পথের ধারে ধারে ছোট ছোট গ্রাম! এমনি একটি গ্রামপ্রান্তে পথের ধারে একটি কামারের কর্ম্মশাল। কর্ম্মকার হাপরে লোহাকে গরম করে সাঁড়াশী ধরে তুলে নেয়াইয়ের উপর রেখে কি কি যন্ত্র গড়ছে। শঙ্কর সেই কর্ম্মশালায় ঢুকে পড়লেন—এবং বললেন—কর্ম্মকার—আমি হলাম আচার্য্য শঙ্কর। আমি ক্ষুধার্ত্ত। তুমি আমাকে অতিথি সৎকার কর। কর্ম্মকার স্তম্ভিত হয়ে গেল প্রথমটা, তারপর মহোল্লাসে উঠে ছুটে বাড়ীর দিকে যেতে উদ্যত হ'ল। গাই দুইয়ে আন—গাই দুইয়ে আন, ফল আহরণ করে আন। ওরে ওরে।

শঙ্কর তাঁর হাত চেপে ধরলেন। না। প্রয়োজন নাই। ওই বস্তু আমাকে দাও।

—কোন্ বস্তু প্রভু?

—ওই যে। প্রভাতসূর্য্যের মত বর্ণ—নবনীতের মত কোমল হয়েছে।

তবু বুঝতে পারলে না কর্ম্মকার। তখন শঙ্কর নিজেই সেই গলন্ত প্রায় লোহার দণ্ডটা তুলে নিয়ে—মহাকালের মত তার খানিকটা গ্রাস করলেন। এবং বললেন, তৃপ্তোঽহং। এই তো সাক্ষাৎ অমৃত।

তারপর শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন—বৎসগণ, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ কর। এই অমৃত ভক্ষণ করলেই তোমরা সিদ্ধি ফল পাবে। নাও-নাও-নাও।

তখন শিষ্যদের অবস্থা বুঝতে পারছেন? চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে গোলকে পরিণত হয়েছে। একেবারে গোল, কেষ্টবাবুর পৃথিবীর মত উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা নয়। একেবারে ড্রয়িং মাষ্টারের কম্পাসে আঁকা গোলের মত গোলালো।

শঙ্কর তখন হেসে বললেন—বৎসগণ সাধককে সর্ব্বপ্রথম সাধনায় সিদ্ধি অর্জ্জন করতে হয়, তারপর সিদ্ধ সাধকের জীবনাচরণে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিদূরিত হয়। এবং এই সাধনার কাল—মহা কৃচ্ছ্র সাধনের কাল। সিদ্ধ সাধক শঙ্কর শুধু নিষাদের ঘরে মাংস ভক্ষণ করতেই পারেন না, তিনি এই জ্বলন্ত লৌহখণ্ডও ভক্ষণ করতে পারেন।

রামজয় হেসে বলেছিলেন—দোহাই মাষ্টার মশাই, আগে-ভাগেই ওদের নিষাদের ঘরে মাংস খাওয়ার অধিকার দেবেন না। তাতে ওরা খাঁটি নিষাদে পরিণত হবে, শঙ্করত্ব ভূত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে। কপিল—আগে ঋষিত্ব অর্জ্জন করেছিলেন—তারপর নাস্তিক হয়েছিলেন।

ব্রজবিহারী বিচিত্র মানুষ। মোটা কর্কশ কণ্ঠে হো-হো করে হেসে ঘরখানাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ভয় কি, ওই বেটারা যদি নিষাদই হয় তো তখন সেই মুনির মত করা যাবে। যিনি না কি নেংটি ইঁদুরের ছানাকে বাঘ করেছিলেন—এবং তাঁরই ঘাড় ভাঙতে উদ্যত দেখে যিনি নাকি 'পুনর্মূষিকোভব' বলে ফের নেংটি ইঁদুর বানিয়ে দিয়েছিলেন। বেটাদের ফের আস্তিক করে তোলা যাবে। দেখাই যাক না, ওদের দৌড় কতটা। একেবারে ইঁদুর। অন্ততঃ বেড়ালটা হতে দিন।

সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনবাবু একটু হেসে বলেছিলেন—কিন্তু তখন ওরা মুনির তোয়াক্কা নাও রাখতে পারে, কি বলেন পণ্ডিত মশায়। ইঁদুর একবার বেড়াল হবার আস্বাদ পেলে মুনির কৃপার ভরসা না রেখে নিজেরা ব্যাঘ্রত্বসাভের তপস্যা জুড়ে দিতে পারে। অন্ততঃ নখ দাঁত শানিয়ে বনবেড়াল সহজেই হতে পারে। বেড়াল বন্য হলেই বনবেড়াল, মানুষের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় ভাঙতে না পারুক, আঁচড়ে কামড়ে সহজেই ঘায়েল করে দিতে পারে। তবে ভরসা রাখতে পারেন ব্রজবাবুর উপর, উনি মুনি না হোন, পাক্কা জানোয়ার শাসনকারী বটেন।

চন্দ্রবাবু দু'পক্ষের কথা উপভোগ করেছিলেন। আশঙ্কা তাঁর ছিল না তা নয়, কিন্তু আশঙ্কার সঙ্গে আশাও ছিল তাঁর। এবং অভিপ্রায় বলতে গেলে—এ অভিপ্রায় তাঁর অনেক দিনের। ব্রজবিহারী বাবু প্রথম অধিবেশনেই আশ্চর্য্য ভাবে সফল করে তুলেছিলেন নূতন উদ্যোগটিকে। চন্দ্রবাবু নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন ছেলেগুলির নূতন চেহারা দেখে। পুরাণের চরিত্র নিয়ে আলোচনায় এ চেহারা দেখা যায় নি। সে আলোচনায় দেখা যেত ছেলেদের কে কেমন পুরাণ পড়েছে বুঝেছে সেইটুকু। এতে দেখতে পেলেন ছেলেগুলি মনে মনে কি ভাবে তাই। প্রথম দিনই ছিল জাতিভেদ; জাতিভেদের বিপক্ষে বলেছিল এই ধ্রুব। ধ্রুব তীব্র আক্রমণ করেছিল—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে এবং ব্রাহ্মণদের। তারাই এটার প্রচলন করেছে—তারাই অন্য সকল বর্ণকে দাবিয়ে রেখেছে, জোর করে সকলের ঘাড়ের উপর সিন্ধবাদের নাবিকের মত চেপে আছে। তারা লোভী, চাল-কলাতেও পর্য্যন্ত তাদের লোভ।

জাতিভেদের পক্ষে বলতে বলা হয়েছিল শিবনাথকে। শিবনাথের মনের চেহারা দেখে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু মনের চেহারাই নয়, ওর বলবার ভঙ্গী, বলবার শক্তি আশ্চর্য্য। অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে। শিবনাথের কথাগুলি কানের পাশে এখনও যেন বাজছে। সুরুতেই চমকে উঠেছিলেন। বললে—পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ আছে। সেই তাপই তার জীবন। মধ্যে মধ্যে নানা বিচিত্র কারণে সেই তাপ যখন সমতা হারিয়ে কোথাও কম কোথাও বেশী হয়, তখন স্থানে স্থানে অগ্ন্যুদ্গার ঘটে। তার ফলে স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হয়, যেখানে ভূমিকম্প হয় সেখানে বাড়ীঘর ভাঙে, বিপর্য্যয় হয় কিছুটা। তারপর আবার সমতা ফিরে আসে। আবার বাড়ী ঘর গড়ে উঠে। আমার বন্ধু ধ্রুব ঘোষের আজকের আগুনের মত গরম বক্তৃতা সেই ধরণের একটি অগ্ন্যুদ্গার। এ নূতন নয়। কর্ম্ম অনুসারে বর্ণাশ্রমের যে জাতিভেদ প্রথা—তা ওই পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপের মত মানুষের সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা। এ থাকবেই। তবে মধ্যে মধ্যে উত্তাপের কমি-

বেশী হওয়ায় যে অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটে তা হ'ল বিকৃতি। বিকৃত অবস্থার সমালোচনা—সহজ সুস্থ অবস্থাকে স্পর্শ করে না। মূল কর্ম্ম অনুসারে জাতিভেদ আর বিকৃত জাতিভেদ এক নয়। বিকৃতিকে দূর করতে হবে। তার প্রতিকারে আমার বন্ধুবর ডাক্তাররূপে অগ্রসর হলে আমি কম্পাউণ্ডার হয়ে সঙ্গে যাব, ইঞ্জিনীয়াররূপে অগ্রসর হলে রাজমজুর হয়ে সঙ্গে থাকব, কিন্তু সমূলে ধ্বংস করতে—কৈলাস উৎপাটনকারী রাবণের মত অগ্রসর হলে—শিবভৃত্য নন্দীর মত আমি পথরোধ করব এবং বলব তা তিনি পারবেন না, পারবেন না, পারবেন না। তাঁকে বিশ্বামিত্রের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি; তিনি কৃষিজীবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও অসাধারণ বুদ্ধি অধিকারী, বিদ্যা তিনি সহজেই আয়ত্ত করেছেন। করবেনও। আমার মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের চেয়েও বেশী বিদ্যা আয়ত্ত করবেন, কিন্তু তিনি এই মন নিয়ে ব্রাহ্মণত্ব দাবি করলে আমি বশিষ্ঠের মত বলব—বিদ্যা সত্ত্বেও আপনাকে আমি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করব না। এবং ব্রাহ্মণ তিনি হবেন না। আমি বিদ্যাহীন পাচক বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে পাচকই বলি, বিদ্বান বণিকবৃত্তি-ধারী ব্রাহ্মণকে বণিক বলি, কয়লাওয়ালাকে কয়লাওয়ালা বলি, চামড়াওয়ালাকে চামড়ায়াওলা বলি, ব্রাহ্মণ বলি না। আমার বন্ধু বিদ্যায় এবং মনে যেদিন ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করবেন সেদিন তিনি ব্রাহ্মণই হবেন। সেদিন জন্মসূত্রে তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠী তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবেন, কোনক্রমেই এক থাকবেন না। তাঁর সহোদর যদি কৃষিজীবী থেকে যান তবে একসঙ্গে আহার এবং একসঙ্গে বাস করেও একজাতি থাকবেন না এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা স্বতন্ত্র হয়ে যাবেন এ ধ্রুব সত্য। কারণ কর্ম্মভেদে জাতিভেদ মানব জীবনে স্বাভাবিক, এ নইলে মানুষের সমাজ এবং জীবন অচল, সামাজিক কোঠায়—উপরতলা নিচের তলা থাকবেই। মাষ্টার এবং ছাত্রের মত, ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডারের মত, ইঞ্জিনীয়ার এবং রাজমজুরের মত বুদ্ধিজীবী এবং কৃষিজীবীর মত, দুধওয়ালা, তেলওয়ালা, মাছওয়ালার মত জাতিভেদ থাকবেই এবং কর্ম্মভেদে প্রকৃতির, বুদ্ধির, বাক্যের, সমাজ প্রতিষ্ঠার তারতম্য হবেই।"

ঠিক এমন ভাবে গুছিয়ে বলতে পারে নি, জায়গায় জায়গায় ভাষার দোষ ঘটেছে, শিবনাথ একটু আধটু ধেঁধিয়েছে. সেগুলি তিনি মনে মনে সংশোধন করে নিয়ে স্মরণ করলেন। সেদিন মনে মনে আশ্চর্য্য উল্লাস অনুভব করেছিলেন তিনি। অহঙ্কার হয়েছিল তাঁর।

রামজয় খুশী হন নি। বলেছিলেন—ছোঁড়াটা চালাক বটে। ওর ঠাকুরদা উকীল ছিল। পড়লে শুনলে ভাল উকীল হবে। ধ্রুবকে বাকচাতুরীতে ঠকালে বটে, কিন্তু আসলে তো ও জাতিভেদকে মানে না বললে। ব্রাহ্মণকুলে না জন্মালে ব্রাহ্মণ হয় না। জাতি জন্মগত—সেদিক মাড়ালে না। আমি তো বলেছি, এ যা হয়েছে তাতে এগোলেও নির্ব্বংশের বেটা, পিছুলেও নির্ব্বংশের বেটা; এ সেই দক্ষিণদ্বার খুলে দেওয়া হ'ল। যেটুকু আছে অবশিষ্ট সব শেষ করবে। কলিশেষে একাকার, দামোদরের বাঁধ ভাঙল।

এর কিছুদিন পরেই বোধ করি কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যেই বোর্ডিঙে রেওয়াজ হয়ে গেল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তৈলিক, বৈরাগী, উগ্রক্ষত্রিয় সব একসঙ্গে পংক্তিতে বসে খাবে। যারা অবশ্য গোঁড়া—তারা আলাদা খেতে পারে। তেমন ছেলে দেখা গেল আঙুলে গোনা যায়, জন পাঁচেক বামুনের ছেলে, জন আষ্টেক অন্য জাতের ছেলে—তাদের মধ্যে নীচের দিকের জাতের ছেলেই বেশী। তারা অপরাধ হবে ভয়ে এগিয়ে আসে নি। প্রথম দিন শিবনাথ সখ করে বসে গেল ওই-জগন্নাথ ক্ষেত্রে। বিশ্বগ্রামেরই ছেলে, বাড়ী থেকে খেয়ে ইস্কুল আসে, সেদিন ইস্কুলে এসে ওই নতুন ব্যবস্থা দেখে বসে গেল পাতা পেড়ে, আর একবার খাবে।

রামজয় বলেছিলেন—হুঁ হুঁ আমি জানতাম। ও ছেলে মুষল। কুলনাশ ওর ধর্ম্ম। ওই ছেলেই একদিন ধর্ম্মরূপী ষণ্ডের একটিমাত্র পা-খানি ছাড়িয়ে বিলাতের হোটেলে বসে ডিনার ভক্ষণ করবে। আমি জানি যে।

তাতেও চন্দ্রবাবু হেসেছিলেন। রামজয়কে তিনি ভালবাসেন; তার এই ধরনের কথাগুলি শুনে তিনি হাসেন; বেচারী রামজয় চারিদিকেই সর্ব্বনাশ দেখছে।

আজ ম্যাচের কথায় বললেন—যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে!

কথাটি শুনে আজ আর চন্দ্রবাবু হাসলেন না। চুপ করে রইলেন। ব্রজবিহারী বাবু সম্পর্কে তিনি সত্যই চিন্তিত হয়েছেন। ব্রজবাবু যা করছেন—তাতে ইস্কুলের উন্নতিও হবে। অবনতিও কিছুটা হবে। ভালো আর মন্দ, আলো আর অন্ধকার নিয়েই সৃষ্টি, সব জিনিষের সব ব্যবস্থার দুটো দিক আছে, সে স্বভাবের নিয়ম; কিন্তু পয়োমুখ বিষকুম্ভ কৃত্রিম; সে প্রবঞ্চনা, সে সর্ব্বনাশ!

কেষ্টবাবুকে কথাটা বলি-বলি করেও বলতে পারলেন না। রামজয় এসে গেল। রামজয় তাঁর পরম বন্ধু, কিন্তু স্থূলোদর এই ব্রাহ্মণটি অত্যন্ত অসতর্ক, এদিক দিয়ে একটু অগভীর বললেও অন্যায় হবে না। কোথায় যে কখন কি বলে ফেলবেন তার কোন স্থিরতা নেই।

রামজয় থার্ড মাষ্টার কেষ্ট বাবুকে ডেকে নিয়ে গেল,

তিনি বসে রইলেন। তাকে সত্যনারাণ করবার কথাটা বলতেও ভুলে গেলেন। তাঁরা চলে যাবার পর কথাটা মনে পড়ল। ওদিকে টিফিনের পর ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ে গেল।

ইস্কুল বসবার পর প্রথম ঘণ্টা এবং টিফিনের পরও প্রথম ঘণ্টা এই দু' ঘণ্টা চন্দ্রবাবুর ক্লাস থাকে না। এ দু' ঘণ্টা তাঁর বিশ্রাম নয়, ইস্কুলের আপিস ওয়াক এবং ক্লাস ইন্সপেকশনে কাটে এ দু' ঘণ্টা। টিফিনের পরের ঘণ্টাটায় চিঠিপত্রের উত্তর লিখে থাকেন। এ ঘণ্টাটায় ব্রজবাবুরও ক্লাস নেই। দু' জনেই বসে আলোচনা করে উত্তরের খসড়া করেন। ব্রজবাবু একবার গোটা ইস্কুলটা ঘুরে আসেন।

মাষ্টারেরাও একবার এ সময়টায় আপিস-রুমে সমবেত হন এবং পরে যে যার ক্লাসে বই, চক ইত্যাদি নিয়ে চলে যান।

চন্দ্রবাবু টেবিলে কনুই রেখে হাতের উপর কপাল ধরে বসে একখানা চিঠি লিখছিলেন। এটা ওঁর একটা বিশেষ ভঙ্গি। খুব চিন্তিত হয়েছেন তিনি এই কথাটা সহজেই বুঝতে পারে সকলে। হাতের আড়াল থেকেই বারেকের জন্য চোখ তুলে চন্দ্রবাবু বললেন—থার্ড মাষ্টার মশাই, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

থার্ড মাষ্টার একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। অন্য সকলে চলে যেতেই চন্দ্রবাবু ক্লার্ক গোপালকে বললেন—ফাষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের এটেণ্ড্যান্সটা একবার চেক করে এস তো গোপাল! এডিশনাল সাবজেক্টের ক্লাসগুলোও চেক করে আসবে। এডিশনাল ক্লাসগুলি ঠিক মত হচ্ছে কিনা তাও দেখে আসবে। ছেলেদের জনকয়েক ক্লাস ঠিক এটেণ্ড করে না। ঘর নেই, বোর্ডিঙের বারান্দায় ক্লাস হয়। ঠিক হচ্ছে না।

গোপালবাবু চলে যেতেই, চন্দ্রবাবু মুখ তুললেন—ভূতনাথ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ইট ইজ এবাউট শিবনাথ। সে নাকি কি কবিতা লিখেছে, এণ্ড দেয়ার ইজ এ স্মেল অব সিডিশন ইন ইট? আপনি তার খুব প্রশংসা করেছেন?

—সিডিশন? না-না! তবে হ্যাঁ পেট্রিয়টিজম বটে।

ব্রজবিহারী বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাসিতে ঘরখানা ভরে দিলেন।—রজ্জুতে সর্পভ্রম! কে রিপোর্ট করলে আপনার কাছে? আমি তো ছিলাম সভায়। হাইলি ইমোশনাল দেশপ্রেমের সে প্রায় দধিকর্দ্দম। রাজদ্রোহ দূরের কথা রাজার নামগন্ধ নেই। কে বললে আপনাকে? কেষ্টবাবু।

—না। অন্যত্র থেকে সংবাদ পেয়েছি। দেন ইজ ইট নট ট্রু?

—না-না-না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে বন্দে-মাতরম্ শব্দটাকেও যদি সিডিশন বলে ধরেন তা হলে বলতে পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা বলি মাষ্টার মশাই—সাহিত্যসভার কর্ণধার হলেন আমাদের পবিত্রবাবু। তিনি অত্যন্ত রাজভক্ত লোক। আপনি কি বলবেন জানি না আমার মতে মাত্রাটা যেন একটু বেশী। তিনি থাকতে সিডিশন হবে সাহিত্যসভায়? সে সব কিছু নয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

একটু চুপ করে থেকে চন্দ্রবাবু বললেন—ওকে একটু ভাল করে পড়াশুনা করান ভূতনাথবাবু। ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত দ্যাট বয় ষ্টুড ফাষ্ট ইন এভরি এগ্‌জামিনেশন। ফোর্থ ক্লাস থেকে ওর পতন সুরু হয়েছে—প্রত্যেক ক্লাসে এক এক ধাপ নামছে। আই এক্সপেক্ট মাচ—কিন্তু—।

আবার একটু চুপ করে রইলেন। ঠিক কথাটায় আসতে পারছেন না চন্দ্রবাবু। যেন আটকে যাচ্ছে।

—ওয়েল, কবিতা লেখে—হি রাইটস গুড পোয়েমস; আমি দেখেছি। দ্যাট্‌স গুড। বলবার কিছু নাই। কিন্তু পড়বার সময় পড়তে হবে। আমার ইচ্ছে ও কবিতা লেখা ছেড়ে দেয় এখন কিছুদিন। এণ্ড হি ইজ ভেরী মাচ ফণ্ড অব ফুটবল প্লেয়িং। আপনারা জানেন না একবার আমি ওর পাঁচ টাকা ফাইন করেছিলাম। তখন গ্রামে ওদের একটা ভিলেজ টিম ছিল। আমাকে না জানিয়ে ও ম্যাচে চ্যালেঞ্জ করেছিল—বাইরের টিমকে। আমি এর বিপক্ষে। ডেডলি এগেনষ্ট দিস থিং। দিজ ম্যাচেস।

একটু চুপ করলেন। দু' জনের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। ব্রজবাবুর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। চন্দ্রবাবু তা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন—ইয়েস, ইয়েস আমি ভুলেই গিয়েছিলাম—কোথা থেকে যেন একটা চ্যালেঞ্জ লেটার এসেছিল? ভূতনাথ বাবুকে দিয়েছিলাম চিঠিখানা।

ভূতনাথবাবু বললেন—রামপুরহাট থেকে।

—এণ্ড উই হ্যাভ এ্যাক্‌সেপ্টেড ইট, আমি লিখে দিয়েছি চিঠি। ব্রজবিহারী বাবু বলে উঠলেন।

—ইউ ডিড নট আস্ক মি এনিথিং?

—ইউ ডোণ্ট লাইক ইট? এটা আমি বুঝতে পারি নি।

—নো। আই ডোণ্ট লাইক দিজ ফুটবল ম্যাচেস। আই ডোণ্ট।

ব্রজবাবু তাঁর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন—আই এ্যাম রাইটিং টু দেম টু এক্‌সকিউজ আস। উই আর আনএবেল টু গো। আওয়ার হেড মাষ্টার ডাজ নট লাইক ইট। তাঁর অনুমতি আমরা পাচ্ছি না।

কাগজ টেনে নিলেন ব্রজবাবু।

চন্দ্রবাবুও চুপ করে বসে রইলেন মিনিট খানেক। তারপর বললেন—যা লিখবার আমি লিখে দিচ্ছি ব্রজবাবু।

বলে কাগজ টেনে লিখতে সুরু করলেন। লেখা শেষ করে চিঠিখানা ব্রজবাবুর হাতে দিলেন। ব্রজবাবু দেখলেন চন্দ্রবাবু লিখেছেন—রামপুরহাটের হেড মাষ্টারকে। তিনি খেলা বন্ধ করতে চান নি। লিখেছেন—খেলাটা এখানকার মাঠে হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। রামপুরহাটে অনেক ফুটবল ম্যাচ হয়, এখানে হয় না। এখানকার মাষ্টারেরা ও লোকেরা দেখতে পেলে খুশী হবে।

—আপনি এ্যাক্সেপ্ট করেছেন। খেলা মন্দ জিনিষ বলব না। কিন্তু ছেলেদের বাইরে যেতে আমি দেব না। আপনি যান ভূতনাথবাবু।

ভূতনাথবাবু চলে গেলেন। চন্দ্রবাবু ব্রজবাবুকে বললেন—আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে ব্রজবাবু।

—বলুন।

—এখন নয়। পরে। ইস্কুল আওয়ার্সের পরে।

—বেশ।

হঠাৎ চন্দ্রবাবু বললেন—এ ইস্কুল অনেক কষ্টে গড়ে তুলেছি ব্রজবাবু। অনেক যত্নে। অনেক আশা নিয়ে।

চন্দ্রবাবুর চোখে জল টলমল করছে।

ব্রজবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। [ক্রমশঃ

পাখী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি সেথা নিস্তব্ধ নির্জন।
বিজন অরণ্য মাঝে ভয়-ভীরু যাযাবর পাখী
যেমন লুকায়ে থাকে পাতার আড়ালে,
কান পেতে শব্দ শোনে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে,
শুষ্ক পাতা ঝরে গেলে যে মৃদু কম্পন
শাখায় শাখায় লাগে,
সে কম্পনে শীতশিহরণ
জাগে সর্বদেহে তার ;
সন্ত্রস্ত ডানায়
উড়িবার চঞ্চলতা ক্লান্তিতে ঝিমায়,
প্রভাত আলোর লাগি' তবু তার সতৃষ্ণ নয়ন
জেগে থাকে রাত্রির আঁধারে।

আমি সেই যাযাবর পাখী ;
উড়ে এসে নিয়েছি আশ্রয়
নিষ্কম্প নিঃশব্দ এই শাখার আড়ালে।
কদাচ কখনো শুনি পদশব্দ পথিক জনের,
লোকালয় বহু দূরে দিগন্তে বিলীন ;
সন্ধ্যায় মন্দিরতলে দীপশিখা জ্বলে কিনা জ্বলে,
নদীজলে স্নানশেষে জনপদবধূ
কলস লইয়া কাঁখে পথে যেতে যেতে
থমকি দাঁড়ায় কিনা প্রিয়জনে হেরি'
অর্ধ অবগুণ্ঠনের অকুণ্ঠিত বঙ্কিম লজ্জায়
মনের গোপন কথা ওষ্ঠপুটে ফুটে কিনা ফুটে—
কিছুই পড়ে না চোখে এত দূর হতে ;
ধেনুচরা মাঠে মাঠে রাখাল বালক
বাঁশের বাঁশরী লয়ে নব নব সুরে
বাতাসে জাগায় কিনা সে অপূর্ব ব্যথার আস্বাদ
কিছুই বুঝি না শুধু এই মাত্র সান্ত্বনা আমার
ব্যাধের অব্যর্থ লক্ষ্য করেছি বিফল।

কিন্তু তবু সমাধির এ স্তব্ধতা লাগে নাক' ভাল,
ভাল ত লাগে না মোর যাযাবর জীবনে শূন্যতা
নির্লিপ্ত এ অবকাশ, আকাশের ঔদাস্য ধূসর
আদিগন্ত মরুভূর অবিরাম উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

আবার সে কোন্ দেশে যাত্রা হবে সুরু ?
কোন্ সে অরণ্য মাঝে প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়
আমারে খুঁজিতে হবে নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্ত নিলয় ?
বল বল হে পৃথিবী—
কোলাহল তিরোহিত কোন্ গ্রামাঞ্চলে
আবার শুনিতে পাব রাখালের বাঁশি
নৈঃশব্দ্যের মাঝে কোথা অনাহত সঙ্গীতের সুর
জড়ে ও জীবনে নিত্য রচিতেছে মিলনের সেতু !

কালিদাস-সাহিত্যে ক্রীড়াকৌতুক

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের সময়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কি লইয়া খেলাধুলা করিত, জনসাধারণ, সম্ভ্রান্তঘরের নরনারী এবং রাজারাণীরাই বা কি ভাবে আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, কৌতুক করিতেন এসব সম্বন্ধে তাঁহার সাহিত্য হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, এখানে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

'কুমার সম্ভব' কাব্যে মহাকবি পার্ব্বতীর বাল্যাবস্থায় তিনি তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে লইয়া কি ভাবে খেলাধুলা করিতেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পার্ব্বতী তাঁহার সঙ্গিনীদের সহিত নদীর তীরে গিয়া সেখানে বালির বেদী তৈয়ারি করিয়া খেলা করিতে ভালবাসিতেন, কখন কখন তাঁহারা বল লইয়াও খেলা করিতেন, এবং এখন যেমন ছোট ছোট মেয়েরা পুতুলকে ছেলে করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া শোয়াইয়া জামাকাপড় পরাইয়া খেলা করে, তাঁহারাও তেমনি 'কৃত্রিম পুত্রক' অর্থাৎ পুতুল লইয়া (কু—১।২৯) সেই ভাবে খেলা করিতেন।

নদীর ধারে বালি লইয়া মেয়েদের খেলা করার বিবরণ 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকেও পাওয়া যায়। 'বিক্রমোর্ব্বশী'র চতুর্থ অঙ্কে পাই, একদিন বিদ্যাধরদের কয়েকটি যুবতী মেয়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতে মন্দাকিনী নদীর তীরে বালির পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করিতেছিলেন। বল লইয়া যে কেবল পার্ব্বতীই খেলা করিতেন তাহা নহে, 'রঘুবংশে' পাওয়া যায় সর্পদের রাজা কুমুদনাগের ভগিনী কুমুদ্বতী তাঁহাদের হ্রদের জলের নিম্নস্থ পুরীতে বল লইয়া খেলা করিতেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র চতুর্থ অঙ্কে পাওয়া যায়, বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের অল্পবয়স্কা কন্যা বসুলক্ষ্মী বল লইয়া খেলা করিতে করিতে বলের পিছনে দৌড়াইতে গিয়া বানরদের খাঁচার অতি নিকটে আসিয়া পড়ে, এবং খাঁচার মধ্যস্থ পিঙ্গল নামে একটা বানর তাহাকে এমন ভয় দেখায় যে, সে ভয়ে কাঁপিতে থাকে, এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিতে রাজারাণীদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। বলখেলা তখনকার দিনে ছিল বটে, তবে এখনকার মত প্রশস্ত মাঠের উপর দুই পক্ষে দল বাঁধিয়া 'গোল' করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করা যে তখনকার দিনে ছিল না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

'কুমার সম্ভবে'র একাদশ সর্গে শিশু কার্ত্তিকের ক্রীড়া-কৌতুকের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলিয়াছেন, তিনি কখন শিবের বাহন ষাঁড়ের শৃঙ্গে হাত দিয়া, কখন জগন্মাতার সিংহের কেশর টানিয়া এবং কখনও বা ভৃঙ্গীর পিছনে আসিয়া তাহার সূক্ষ্ম শিখায় টান দিয়া পিতামাতার আনন্দ বৃদ্ধি করিতেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' পাওয়া যায়, শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনকে আশ্রমের তাপসীরা খেলিবার জন্য একটা রং-করা মাটির ময়ূর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন।

কিশোরবয়স্ক ছেলেদের 'বিচার খেলা'র গল্প 'বিক্রমার্ক চরিতে' পাওয়া যায়। একদল কিশোর নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে বিচারপতি সাজাইয়া, তাহাকে এক উচ্চ মঞ্চের উপর বসাইয়া দিয়া অপর দুই জনে দুই বিবদমান পক্ষ সাজিয়া বিচারপতির সম্মুখে একে অন্যের নামে নালিশ করিতেছে, এবং বিচারপতির অভিনয়কারী ছেলেটি তাহাদের বিবাদের কারণগুলি শুনিয়া গম্ভীর ভাবে রায় দিতেছে—এইরূপ এক খেলার বিবরণ পাওয়া যায়।

'মেঘদূতে' যক্ষদের মেয়েদের একপ্রকার খেলার বিবরণ মহাকবি দিয়াছেন। মন্দাকিনী নদীর তীরে গিয়া কিশোরী মেয়েরা দুই দলে বিভক্ত হইত এবং একদল কতকগুলি মণি সুবর্ণের বালুকা চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিত, অপর দলের কাজ হইত সেই লুক্কায়িত মণিগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনা।

'লুকোচুরি' যেমন এখনকার, কেবল এখনকার কেন বহুকাল ধরিয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে কৌতুককর খেলা বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, তেমনই দেড় হাজার বা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও লুকোচুরি কৌতুকের ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে পাওয়া যায়—রাণী ইরাবতী বসন্তোৎসবের দিনে দোলাগৃহে দোল খাইতে আসিয়া, তাঁহার প্রমোদ-সঙ্গী পতি অগ্নিমিত্রকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া রাজার এখনও না আসার কারণ পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিয়াছিল, নিশ্চয় প্রভু আপনার সহিত রহস্য করার জন্য এখানে কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছেন। পিছনে দাঁড়াইয়া হাত দিয়া প্রিয়জনের চোখ—তাহাকে জানিতে না দিয়া, চাপিয়া ধরা তখনকার দিনেও মহা কৌতুককর ব্যাপার বলিয়া সকলে মনে করিত (বিক্রমোর্ব্বশী)।

ধনীর ঘরের মেয়েরা পোষা ময়ূর নাচাইয়া আমোদ করিতে ভালবাসিতেন। 'মেঘদূতে' পাওয়া যায়, যক্ষদের স্ত্রীরা স্ফটিকের দণ্ডের উপর সোনার দাঁড়ে ময়ূর উঠাইয়া নিজেরা তাহার তলায় বসিয়া মৃদু মৃদু হাততালি দিতেন, তাঁহাদের হাতের চুড়িগুলি সে সময় পরস্পরে ঠোকাঠুকি করিয়া

বাজিতে থাকিত, আর ময়ূরও সেই হাততালির শব্দে নাচিয়া উঠিত। তাঁহাদের যখন কাজকর্ম্ম থাকিত না তখন খাঁচার ভিতরে পোষা শুক-সারীর সহিত কথা কহিয়াও তাহাদিগকে কথা কহাইয়া তাঁহারা অবসরবিনোদন করিতেন।

বিদুষী নারীদের মুখ হইতে গল্প শুনিয়া রাণীরা যে সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। রাণী ধারিণী যখন অসুস্থ শরীরে 'প্রবাত শয়নে' অর্থাৎ বারান্দায় শুইয়া হাওয়া খাইতেন তখন পণ্ডিতা কৌশিকী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে নানাবিধ মনোহর গল্প বলিয়া সুখী করার চেষ্টা করিতেন।

মৃগয়া করা রাজাদের খুব আমোদজনক ব্যাপার ছিল, মহাকবি একাধিক রাজার মৃগয়ার বিবরণ এমন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে,পড়িলে মনে হয় বুঝি তিনি স্বয়ং কোনও রাজার মৃগয়া দেখিবার আগ্রহে অরণ্যে তাঁহার শিবিরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

পাশাখেলা, গানবাজনা করা, নিজের হাতে ছবি আঁকা এই সমস্ত ব্যাপার লইয়াও সেকালের রাজারা অবসর সময় যাপন করিতেন। তাহা ছাড়া প্রায় সব রাজাদের এক একটি বিদূষক বা ভাঁড় থাকিত, সেই সমস্ত বিদূষকের সহিত রহস্যালাপ করা ও তাহাদের রসিকতা শোনা রাজাদের সময় কাটানোর এক অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। তবে তখনকার দিনে দেশে সবচেয়ে বড় আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার হইত 'বসন্তোৎসবে'র দিনগুলিতে। বসন্তোৎসবের সময় প্রথমে ঋতুরাজ বসন্তের পূজা হইত এবং সারাদেশ কয়েকদিন ধরিয়া আমোদ-আহ্লাদে মাতিয়া থাকিত। বসন্তোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল মেয়ে-পুরুষে দোলার উপর বসিয়া দোল খাওয়া। স্বামী-স্ত্রী দোলার উপর পাশাপাশি বসিতেন, আর অন্যান্য মেয়ে বা পুরুষ পিছন হইতে দোলনায় হাত দিয়া দোলা চালু করিতে থাকিতেন। দোলায় দোল খাওয়ার একটা মজার চিত্র মহাকবির 'রঘুবংশে'র নবম সর্গের ৪৬তম শ্লোকে পাওয়া যায়। এই শ্লোকটিতে কালিদাস বলিতেছেন, 'ঋতু-উৎসব' সমাপন করার জন্য নূতন দোলায় বসিয়া তরুণী ভার্য্যা—যদিও তিনি দোল খাওয়ায় নিপুণা তবু একবার প্রিয় পতির কণ্ঠ আলিঙ্গন করার লোভে ভান করিলেন যেন পড়িয়া যাইবেন, পাছে পড়িয়া যান তাই দোলার রজ্জু ছাড়িয়া দিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

বসন্তোৎসবের আরও একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল অশোক বৃক্ষের 'দোহদ' সঞ্চার করানো। কোনও অশোকবৃক্ষে যথাসময়ে পুষ্পোদ্‌গম না হইলে, যদি সেটি রাজোদ্যানের বৃক্ষ হইত, তবে রাজপ্রাসাদের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে পুষ্পের আভরণে সাজাইয়া তরুর মূলে তাঁহার বাম পদ স্পর্শ করানো হইত, সাধারণতঃ প্রধানা মহিষীকে এ কাজের ভার লইতে হইত, সাধারণের উদ্যানের হইলে পরিবারের বা গ্রামের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে দিয়া 'দোহদ' সঞ্চার করানো হইত। যদি এইরূপ পাদস্পর্শ করানোর পর পাঁচ দিনের মধ্যে গাছে ফুল ফুটিত তাহা হইলে সকলের আর আনন্দের সীমা থাকিত না।

উৎসবের আসরে বাইজীদের নাচেরও তখন প্রচলন ছিল। 'রঘুবংশে'র তৃতীয় সর্গে পাওয়া যায়, রাজার প্রথম পুত্র হওয়ায় রাজপ্রাসাদের উৎসবের আসরে বাইজীদের প্রমোদ নৃত্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 'বিক্রমার্ক-চরিতে'রও কয়েকটি গল্পে নর্ত্তকীদের নৃত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। নৃত্য-কলা যে কেবল 'বারযোষিতেরা'ই শিক্ষা করিতেন তাহা নহে, সম্ভ্রান্তঘরেরও কোন কোন মেয়ে যে নৃত্যশিল্পে নিপুণতা দেখাইতেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ মহাকবির সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। রাণীদের মধ্যেও কেহ কেহ নৃত্য, এমনকি অভিনয়ও শিক্ষা করিতেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের রাণী ইরাবতী যে নৃত্যকলা এবং অভিনয়বিদ্যা শিখিয়াছিলেন তাহা প্রাসাদের পরিচারিকাদের আলোচনা হইতে জানা যায়। 'বিক্রমার্কচরিতে'র বহুশ্রুতোপাখ্যানে মহাকবি নৃত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়—সে সময় ভারতে অন্যান্য সুকুমার কলার মত নৃত্যকলাও কি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল! মন্দিরের প্রাঙ্গণে দেবতার পূজা-পার্ব্বণের উৎসবে যে নৃত্যাদির ব্যবস্থা হইত, দেবালয়ের 'রঙ্গমণ্ডপ' শব্দটি তাহা জানাইয়া দেয়। মন্দিরের ভিতরে দেবতার বিগ্রহের সম্মুখে দেবদাসীদের হাত দোলাইয়া বিচিত্র ভঙ্গীর নৃত্যের বর্ণনাও 'মেঘদূতে' পাওয়া যায়।

সভামধ্যে বিদ্বান পুরুষগণের সমক্ষে তাঁহাদের পরিতুষ্টির জন্য নাটকের অভিনয় দেখানো হইতেছে, এরূপ কথা মহা-কবি একাধিকবার লিখিয়াছেন। আনন্দোৎসবের দিনেও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইত। 'কুমারসম্ভবে' পাওয়া যায়, শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ-রাত্রিতে বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপন হইবার পর অপ্সরারা নবদম্পতির মনোরঞ্জনের নিমিত্ত হিমালয়ের ভবনে নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, এবং সে নাটক যে সুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছিল এবং তাহাতে যে নানাপ্রকার রসের অবতারণা করা হইয়াছিল, তাহাও কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায়। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' পাওয়া যায়—রাজা অগ্নিমিত্রের সভায় তাঁহার দুই বেতনভোগী নাট্যাচার্য্যের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য মহিলা-কবি শর্ম্মিষ্ঠার 'ছলিক' নামক নাটকের কিয়দংশ নাট্যাচার্য্যদের শিষ্যারা অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। 'বিক্রমোর্ব্বশীতে' পাওয়া যায়,

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবী সরস্বতী রচিত 'লক্ষ্মীস্বয়ংবরা' নামক যে নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে দেবতারা ও উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাশাখেলা যে কেবল রাজাদের একচেটিয়া আমোদ-জনক ক্রীড়া ছিল তাহা নহে, সাধারণের মধ্যেও যে পাশা-খেলা দেখাইয়া জীবিকা-অর্জ্জন করিতে পারা যাইত তাহা 'বিক্রমার্ক চরিতের' সপ্তবিংশ উপাখ্যানের এক দ্যূতকারের কাহিনী হইতে জানা যায়। এই দ্যূতকার যে কেবল ভাল পাশা খেলিতে,পারিতেন তাহা নহে, পাশাখেলা ছিল তাঁহার পেশা, তাই তিনি রাজাকে বলিতেছেন যে, পাশা খেলিয়া তিনি জীবিকা অর্জ্জন করেন। তবে মহাকবি যে পাশাখেলা পছন্দকরিতেন না, তাহা তাঁহার পাশাক্রীড়ার নিন্দা হইতে জানিতে পারা যায়।

'ইন্দ্রজাল বিদ্যায়' অর্থাৎ 'ম্যাজিক-খেলায়' পারদর্শিতা দেখানো তখনকার দিনেও আমোদের ব্যাপার ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় বহু সদস্যের সম্মুখে এক ঐন্দ্রজালিক আসিয়া তাঁহার কসরত দেখাইয়া সভাসুদ্ধ সকলকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন—'বিক্রমার্ক-চরিতে'র ত্রিংশৎ উপাখ্যানে এরূপ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে।

দল বাঁধিয়া জলে নামিয়া আনন্দ করিতে করিতে স্নান করার ও সাঁতার কাটার বিবরণ 'রঘুবংশে' পাওয়া যায়। মহারাজ কুশের প্রাসাদের পুরমহিলারা সরযূ নদীর জলে নামিয়া যখন দল বাঁধিয়া স্নানের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, মহাকবি তাঁহাদের তখনকার জল-ক্রীড়ার বিবরণ শ্লোকের পর শ্লোকে দিয়া গিয়াছেন, সে বর্ণনা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া গেল। 'অবগাহন স্নানের সময় জল তাঁহাদের চোখের কাজল মুছিয়া লইয়াছিল বটে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে চোখে রক্তিম আভা দান করিয়া তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের হানি করিল না'; 'যাঁহারা সাঁতার দিতে জানিতেন তাঁহারা কোনওরূপে সাঁতার দিতে লাগিলেন, কেহ বা মিষ্টস্বরে গান গাহিতে গাহিতে জলের উপর এমন মৃদুভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন যে, জল হইতে মৃদঙ্গের ধ্বনির মত মধুর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, আর সেই শব্দ শুনিয়া তীরস্থিত ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল', 'নারীরা পরস্পরের প্রতি জল নিক্ষেপ করিয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন'।

অন্য ধ্যানে : অন্য প্রেমে

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

এ গৃহ ছাড়ায়ে যেন অন্য কোনো গৃহের সন্ধানে
আমার বেদনা-হংস সীমান্তে বিলীন হ'তে চায়।
পেরিয়ে মেদুর নভ ভেদ ক'রে ঝটিকা-বলয়
চলে যেতে চায় যেন নির্মেঘ স্তরের কোনোখানে,
এক ধ্যান হ'তে অন্য ধ্যানে।

এ স্নেহ ছাড়ায়ে যেন অন্য কোনো স্নেহের আশায়
মানস-বলাকা মোর উড়ে চলে তীর্থ-হিমাচলে।
অনেক তুষার-নদী পরিক্রমা করে অবসান
নিজেরে হারাতে চায় শুভ্রতার আলোক-সঙ্গমে,
এক প্রেম হতে অন্য প্রেমে।

মোনালিসা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

ওষ্ঠপুটে মৃত্যুহীন রহস্যের হাসি
নারীত্বের—মাতৃত্বের বিষামৃতে মিশা ;—
বিস্মিত বিমুগ্ধ বিশ্ব নাহি পায় দিশা ;
শিল্প-মূর্ত্তি সর্ব্ব সত্তা রাখে যে উদ্ভাসি'।
উর্ব্বশী—রাধিকা—মেরী একাধারে আসি'
একটি হাসিতে যেন তৃপ্তি আর তৃষা
মিশায়েছে। বিমোহিনী অয়ি 'মোনালিসা',
অমেয়—অবাক্-করা এ কি রূপরাশি!

'দাভিঞ্চিরে' গর্ব্বে ধরি' দীর্ঘ কয় মাস
অবকাশ দিলে বুঝি সৃজিতে তোমারে!
শাশ্বত রমণী-মূর্ত্তি উদার—উদাস—
প্রগল্ভ—বিষণ্ণ—মুগ্ধ কে ধরিতে পারে
সাধিয়া ধরা না দিলে? ব্যাপি' শিল্পাকাশ
হাসিছ—গরল সুধা বহিছে সংসারে।



লেনিন্‌গ্রাড ষ্টেশন সন্নিকটস্থ 'নেভা' নদীতীরে লেনিনের প্রতিমূর্তি

লৌহ-যবনিকার অন্তরালে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১

এবার বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন বসেছিল ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংকী শহরে। ভারতীয় প্রতিনিধি যাঁরা এই শান্তি-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সোভিয়েট দেশ ও চেকোস্লোভাকিয়া দেখে আসবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

সম্মেলন শেষে সোভিয়েট রাশিয়া একখানি স্পেশাল ট্রেন পাঠিয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সেখানে নিয়ে গেলেন। ট্রেনখানি ভারি চমৎকার। প্রত্যেক কামরাটি 'ডিল্যাক্স' সেলুন-কারের মতো সুসজ্জিত ও আরামপ্রদ। কামরার সঙ্গে সংলগ্ন স্নানাগার। আমরা একটি 'ক্যুপে' কামরা পেয়েছিলাম। কামরার মধ্যে দুটি শয্যা এবং টেবিল-চেয়ার, টেবিল-ল্যাম্প, এ্যাশ-ট্রে, রেডিয়ো, কাট-গ্লাসের সৌখিন ডিকান্টার জাতীয় জলের কুঁজো, গ্লাস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অনেক কিছু ছিল। অবশ্য ইউরোপের যে কোন কন্টিনেন্টাল ট্রেনেই এসব ব্যবস্থা থাকে।

করিডর ট্রেন। গাড়ীর সঙ্গেই ভোজনাগার। তা ছাড়া যাত্রীদের প্রয়োজনমত চা ও কফি দেবার জন্য প্রত্যেক বগীতেই পৃথক ব্যবস্থা আছে। বিছানা পেতে দিয়ে যাবার ও কামরা পরিষ্কার করবার লোকও মোতায়েন। যাত্রীদের যাবতীয় সুবিধা অসুবিধা দেখবার জন্য ট্রেনে পরিদর্শক আছেন।

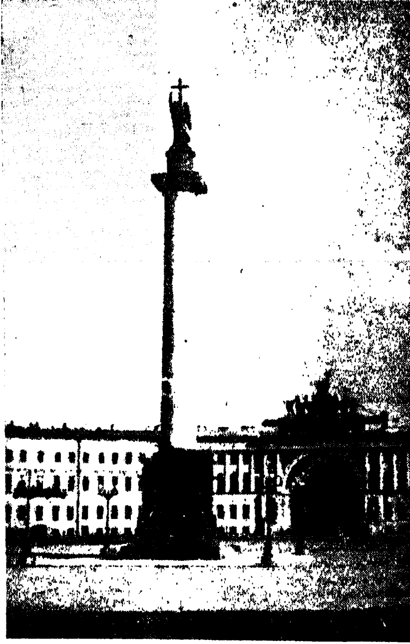
রাত্রি প্রায় ৯টায় আমরা হেলসিংকী ছেড়ে লেনিনগ্রাড অভিমুখে রওনা হলাম। হেলসিংকীতে পক্ষকাল যাপনের ফলে এখানকার কবি ও শিল্পী যাঁদের সঙ্গে আমাদের বেশ একটু অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল তাঁরা কেউ কেউ আমাদের ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন।

বেলা দশটা নাগাদ স্পেশাল ট্রেন এসে থামল সোভিয়েট রাশিয়ার ভীবোর্গ ষ্টেশনে। ভীবোর্গ ষ্টেশনটি অতি চমৎকার। যেন কোন বড়লোকের বাড়ীর নাচঘর,—সুসজ্জিত ও প্রকাণ্ড। ভীবোর্গের অধিবাসীরা দলে দলে ছুটে এলেন ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে আমাদের অভ্যর্থনা করতে। ঘন ঘন আনন্দ করতালির মধ্যে পুষ্পস্তবকের সঙ্গে তাঁরা আমাদের প্রত্যেককে ভীবোর্গের নানা দ্রষ্টব্য স্থানের চিত্র উপহার দিলেন। শান্তির জয়ধ্বনি তুলে আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানালেন। সোভিয়েট রাশিয়ার আতিথেয়তা এখান থেকেই সুরু হয়ে গেল।

অতি সুস্বাদু ও সুরুচিকর প্রাতরাশে তাঁরা আমাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করলেন। রাশিয়ার রান্না অনেকটা আমাদের দেশের মতই। এরা মশলা দিয়ে রাঁধেন। ঘণ্টাখানেক পরেই ট্রেন আবার চলল আমাদের নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নগর লেনিনগ্রাড অভিমুখে।

বেলা দুটো বাজে প্রায়। ট্রেন এসে লেনিনগ্রাড ষ্টেশনে প্রবেশ করল। ষ্টেশনের প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম্ম লোকে লোকারণ্য! বালক বৃদ্ধ, শিশু যুবা, তরুণ তরুণী শান্তিসম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিপুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। হর্ষোৎফুল্ল সহস্র কণ্ঠের কলধ্বনি ও শান্তির সঘন জয়রবে মুখরিত হয়ে উঠল লেনিনগ্রাডের রেল ষ্টেশন। গাড়ী থেকে

নামতে না নামতে সৌহার্দ্দপূর্ণ করমর্দ্দন ও প্রীতি-আলিঙ্গন সুরু হ'ল।



লেনিন্‌গ্রাডের তোরণদ্বার ও জয়স্তম্ভ

লেনিনগ্রাডের সমস্ত সংবাদপত্রে নাকি সে দিন সকালে ঘোষিত হয়েছিল শান্তি-সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে 'স্পেশাল ট্রেন' অমুক সময়ে ষ্টেশনে এসে পৌঁছবে। শহরের লোক ভেঙে পড়েছিল আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে। সমবেত সকলের সানন্দ করতালি ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁদের দেওয়া সেই ফুলের বোঝা হাতে নিয়ে এগিয়ে চললাম ষ্টেশনের বাইরে। নেভা নদী-তীরে লেনিনের এক বিরাট প্রতিমূর্ত্তি। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে এই মূর্ত্তির পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নবীন রাশিয়ার স্রষ্টাকে অভিবাদন জানানো হ'ল। ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দের পুষ্পার্ঘ্যে লেনিনের প্রতিমূর্ত্তির পাষাণ বেদীতল কুসুমাকীর্ণ হয়ে উঠল।

নেভা নদীর প্রশস্ত তটভূমি আর দেখা যাচ্ছিল না। বিরাট স্থান জুড়ে লোকারণ্য। হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়েছে সেখানে ভারতীয়দের স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্য। সিটি সোভিয়েটের কর্ম্মকর্ত্তারা সেই জনসভায় আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা অবশ্য রুশ ভাষাতেই হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে দোভাষীরা সেটা হিন্দীতে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। ভারতের শান্তি-প্রচেষ্টা, নেহেরুর পঞ্চশীল, সবকিছুই তার মধ্যে ছিল।

ফিনল্যাণ্ডে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন পুনার অধ্যাপক কৌশাম্বী। কিন্তু আণবিক শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কীয় এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য জরুরী আমন্ত্রণে আহূত হয়ে তিনি বিমানপথে আগেই মস্কো চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন বাংলার প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের চীন পরিদর্শ[illegible]ল তিনি তাঁদের নেতা ছিলেন বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে রুশ পরিদর্শন কালে তিনিও সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃ-পদে বৃত হলেন। লেনিনগ্রাডের সিটি সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষগণের অভ্যর্থনার উত্তরদানের জন্য তিনি 'যুগান্তর'-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করলেন।

শ্রীমান বিবেকানন্দ ভায়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী বাংলা ভাষায় লেনিনগ্রাডবাসীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে একটি দীর্ঘ সুন্দর ভাষণ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দোভাষীদের দ্বারা বাংলা থেকে রুশ ভাষায় তাঁর বক্তৃতা অনুবাদ করে সমবেত জনতাকে শোনানো হ'ল। শুনতে শুনতে তাঁরা ঘন ঘন উচ্চ করতালি দিয়ে তাঁদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিচ্ছিলেন।

সভার ভীড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ কড়া রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমরা লেনিনের প্রতিমূর্ত্তির চারিধারে যে মনোরম পুষ্পোদ্যান ছিল তারই মধ্যে পাতা একটি গার্ডেন-বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। রাশিয়ান ছেলেমেয়েরা আমাদের ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে যারা ইংরেজী জানে তারা আলাপ জুড়ে দিলে। কথায় কথায় জানা গেল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তারা অনেক খবরই রাখে। আমরা যাবার দু'দিন আগে পণ্ডিত নেহরু সেখানে এসেছিলেন। নেহরুর কথা তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাদের বলতে সুরু করলে। তার পরই রাজকাপুর ও নার্গিসের নাম এবং 'আওয়ারা' চলচ্চিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

হঠাৎ একটি নারীকণ্ঠের মধুর ধ্বনি কানে এল। "নমস্কার! আপনারা নিশ্চয় বাংলা দেশের মানুষ। আমাদের দেশে আপনারা পদার্পণ করায় আমরা বড়ই আনন্দ অনুভব করছি। পথে আপনাদের কোনও কষ্ট হয় নি ত?"

সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি একটি সুদর্শনা রুশ মহিলা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন! পরিচয়ে জানতে পারলাম তিনি লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপিকা। তাঁর নাম শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা!

সুদূর সোভিয়েট রাশিয়ায় এসে একজন রুশ মহিলার মুখে যে বাংলা শুনব এ অপ্রত্যাশিত। আমরা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। অনেক কথা হ'ল তাঁর সঙ্গে। ইতোমধ্যে অভ্যর্থনা সভার কাজও শেষ হ'ল। আমাদের হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য অনেকগুলি বড় বড় বাস অপেক্ষা করছিল। ডাক পড়ল প্রতিনিধিদের বাসে ওঠবার। শ্রীযুক্তা নভিকোভা বললেন, "আপনারা গাড়ীতে গিয়ে উঠুন। আমি এখন যাই। আবার দেখা হবে। নমস্কার!"

আমরা তাঁকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বাসে গিয়ে উঠলাম। বাসগুলি ভাল। সীটগুলি বিমান-আসনের অনুকরণে বেশ আরামপ্রদ।

বাস আমাদের লেনিনগ্রাডের প্রসিদ্ধ পান্থনিবাস 'হোটেল এ্যাস্তোরিয়ায়' এনে নামিয়ে দিলে। বিরাট হোটেল। সুসজ্জিত সাত তলা বাড়ী। এক সময় কেবলমাত্র অভিজাতদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আজ এখানে সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। ক্ষণকাল বিশ্রামের পরই লাঞ্চ খাবার ডাক পড়ল। আহারান্তে আমরা নগর পরিদর্শনে বেরুলাম। প্রত্যেক বাসে দোভাষী ও পথপ্রদর্শকরা এলেন। এরা হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী ও উর্দ্দু চার ভাষায় কথা বলতে পারেন। নেভানদী-তীরে স্থাপিত এই লেনিনগ্রাড একটি বহু প্রাচীন শহর। পীটার দি গ্রেট এই নগর নির্ম্মাণ করেছিলেন। তখন এর নাম ছিল সেন্টপীটার্সবার্গ। পরে বিপ্লবীরা এর নাম পরিবর্তন করে 'পেট্রোগ্রাড' রেখেছিলেন। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিপূজার জন্য আবার এর নাম পরিবর্তন করে লেনিনগ্রাড রাখা হয়েছে। এই নাম পরিবর্তনগুলি মাত্র এক পুরুষের মধ্যেই, অর্থাৎ তিরিশ বছরের ব্যবধানেই সাধিত হয়। রাশিয়ানরা রসিক লোক। লেনিনগ্রাড সম্বন্ধে এখানে সুন্দর একটি পরিহাস প্রচলিত আছে। এক ভদ্রলোক তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসিত হয়ে হেসে বলছেন, "I was born at St. Petersburg, educated at Petrograd nnd now employed at Leningrad !" অর্থাৎ, সেণ্ট পীটার্সবার্গে আমার জন্ম, আমি লেখাপড়া শিখেছি পেট্রোগ্রাডে; উপস্থিত চাকরি করছি লেনিনগ্রাডে।



লেনিন্‌গ্রাড স্কোয়ায়ে পীটার দি গ্রেটের প্রতিমূর্ত্তি

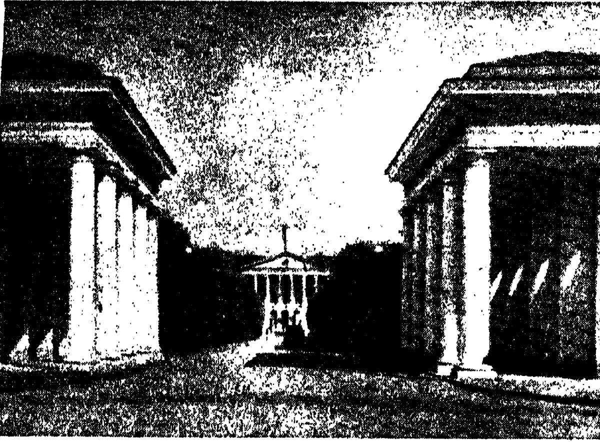


লেনিন্‌গ্রাডের রাজপথ

শহর সবটা দেখা হয়ে উঠল না। 'অপেরা' দেখার সময় উৎরে যায়! আবার কাল সকালে শহর দেখতে যাওয়া হবে। সাতটায় হোটেলে ফিরে পোশাক বদলে আমরা লেনিনগ্রাডের 'অপেরা' দেখতে গেলাম। নৈশ-ভোজ হবে অপেরা থেকে ফিরে রাত বারোটা নাগাদ।

'অপেরা' আমরা লণ্ডনে, এডিনবরায়, প্যারিসে, ভিয়েনায় বহুবার দেখেছি। রোমের ইটালীয়ান অপেরাও ভারি চমৎকার। রাশিয়ান অপেরা এই প্রথম দেখলাম। বিরাট রঙ্গালয়। প্যারিসের গ্রাণ্ড অপেরার অনুকরণেই তৈরি। বিশাল অভিনয়মঞ্চ ও বিশালতর প্রেক্ষাগার। পাঁচতলা উঁচু। প্রত্যেক তলাতেই দর্শকদের বসবার অশ্বখুরাকৃতি আসনশ্রেণী। একতলার মাঝের হলটিতে বসবার আসনগুলিকে এরাও বলেন 'ষ্টল'। এই ষ্টলের টিকিটের দাম সবচেয়ে বেশী। আমাদের যে আসনে বসানো হয়েছিল, শুনলাম ষ্টলের সেই পুরোভাগের আসনশ্রেণীর দক্ষিণা প্রত্যেকটির পঁচিশ রুবল! সমস্ত আসনই নরম মখমলের গদীমোড়া। প্রায় দু'হাজার দর্শকের স্থান হতে পারে।

প্রেক্ষাগারের সামনেই প্রশস্ত 'লাউঞ্জ'। এখানে বুকষ্টল আছে। অভিনীত নাটক, নাটকাভিনয়ের প্রোগ্রাম, অভিনয়ের দৃশ্যপটের ছবি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আলোকচিত্র, আগামী সপ্তাহের আকর্ষণের বিজ্ঞপ্তি, সমস্তই পাওয়া যায়। তার পর ওয়েটিং হল; এখানে রেন কোট, ওভার কোট, হাতের ছাতা ছড়ি বা দোকান



'স্মল্নী' রুশ বিপ্লবীদের প্রথম আস্তানা

সমাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য পল্লী, বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র, সৈন্য-শিবির, কত আর তালিকা দেব ? প্রত্যেকটি দৃশ্যপট এরা যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে তোলবার চেষ্টা করেন। যবনিকা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটে চোখ পড়লেই হঠাৎ যেন একটা চমক লাগে। অবশ্য যাঁরা প্যারিস ও ভিয়েনায় অপেরা হাউসের অভিনয় দেখে এসেছেন বা বার্লিনের রাইনহার্ট থিয়েটার কি সিগমুণ্ড অপেরায় গিয়েছেন তাঁদের কাছে এ সব বাহবা পেলেও বিস্ময়কর বলে মনে হবে না। তিন চারশ' অভিনেতা-অভিনেত্রী একত্রে এক-একটি দৃশ্যে অবতীর্ণ হন। অশ্বারোহী সৈন্যদল, রাজার দেহরক্ষিগণ, রাণীর রাজকীয় তাঞ্জাম সবই আসে ষ্টেজের উপর।

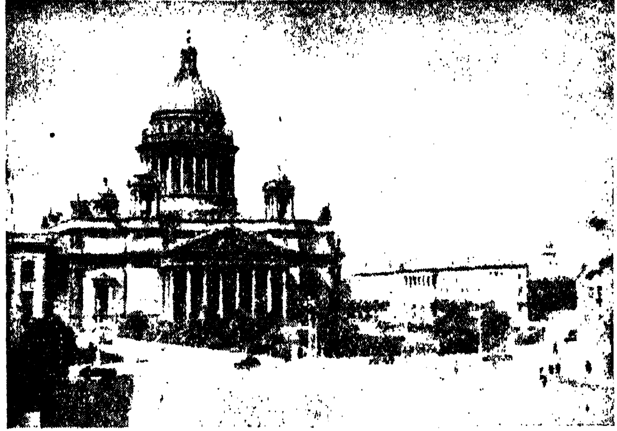
থেকে কেনা কোনও কিছু জিনিষের প্যাকেট জমা রেখে যাবার জন্ম 'ক্লোক রুম' আছে। এ দেশের রঙ্গালয়েও 'ধূমপান নিষেধ'। বিলেতে এটা নেই। এখানে প্রেক্ষাগৃহ সংলগ্ন করিডরে ধূমপায়ী-দের জন্ম স্মোকারস কর্ণার আছে। প্রত্যেক রঙ্গালয়ের মধ্যেই বার ও রিফ্রেসমেণ্ট হল আছে। সবই বেশ বৃহৎ আকারের, আগাগোড়া মার্ব্বেল মোজাইক মোড়া। ঝকঝক তকতক করছে। প্রেক্ষাগারের চন্দ্রাতপ থেকে সুরু করে চারপাশই মূল্যবান সোনালী কারুকার্য্য খচিত। প্রত্যেক প্রবেশ-পথে ভারী ভারী ভেলভেটের পর্দ্দা ঝোলান। দামী দামী ঝাড়লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরিতে বিজলী-বাতি জ্বলছে। ওয়েটিং হল পার হলেই প্রবেশ দ্বারের সম্মুখভাগে এক প্রশস্ত করিডর বা গলিপথ আছে। এখানে চারিদিকের প্রাচীর-গাত্রে এই রঙ্গমঞ্চে এ পর্য্যন্ত যে সব বিখ্যাত নটনটী অভিনয় করে গেছেন তাঁদের প্রত্যেকের রঙীন আলোকচিত্র ঝোলান রয়েছে।

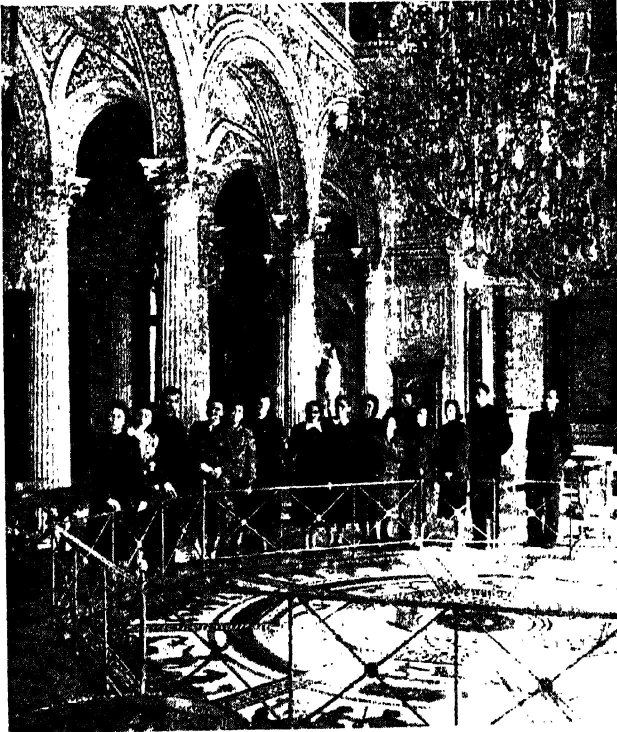
রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট এঁদের একেবারে বাস্তব ঘেঁষা হলেও বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। যথাসম্ভব স্বাভাবিক পটভূমি সৃষ্টির প্রচেষ্টায় এঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে মনে হ'ল। বীচি-বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গতাড়িত তরণী, ঝড়ের বেগে তার পাল ঝাপটা মেরে মাস্তুল ভেঙ্গে ফেলছে, ঘন অরণ্য পরিবেষ্টিত শৈলমালা, খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী বা ঝরণা, সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ, দুর্ভেদ্য দুর্গ; গগনস্পর্শী গম্বুজ-শোভিত ভজনালয়, বিশাল বন্দর, নগরের সবচেয়ে বড় বাজার, বজ্র বিদ্যুৎ-বিকীর্ণ ঝড়ের রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত। মাটির বুকে নৈশ আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নির্ম্মল নীলাকাশে এক একটি করে তারা ফুটছে, চাঁদ উঠছে জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে, বসন্তের পাখীর কলকাকলীভরা পুষ্পিত কুঞ্জবন, শীতের শুভ্র তুষারে ঢাকা কুহেলিকা-

অপেরা থেকে ফিরে এসে প্রায় মধ্য রাত্রে নৈশ-ভোজ সমাধা হ'ল। এই ভোজসভায় যে আমাদের জন্ম এক প্রচণ্ড বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, তা আমরা জানতাম না। আমাদের নিমন্ত্রণ-কর্ত্তারা অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষমতাপন্ন সরকারী প্রতিনিধিগণ আমাদের কাছে জানতে চাইলেন—আমরা এ শহরের কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ অংশে যেতে চাই, কি কি দেখতে চাই, কোন্ কোন বিষয় জানতে ও বুঝতে চাই, রাশিয়ার কোন দিকটার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বেশী, কি দেখলে আমরা খুশী হব।

বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি ? আমরা দেশে বসে বসে শুনে এসেছি যাঁরা রাশিয়ায় আসেন তাঁদের সবকিছু দেখতে দেওয়া হয় না। তাঁদের নাকি কনডাকটেড ট্যুর মারফত কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়; যা দেখানো নিরাপদ তা ভিন্ন আর কিছু দেখবার সুযোগ দেওয়া হয় না। শুধু কি তাই, আমরা এ পর্য্যন্ত শুনে এসেছি রাশিয়ার জনসাধারণ কমিউনিষ্ট শাসনের যান্ত্রিক চাপে ও রেজিমেণ্টেশনের ঠ্যালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে সুযোগ-সুবিধা পেলেই দেশ ছেড়ে সোজা আমেরিকায় পালাচ্ছে! সোভিয়েট রাশিয়ায় 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' বলে কিছু নেই। ও একটা অভিশপ্ত দেশ, যেখানে প্রত্যেক মানুষকে রাখা হয়েছে এক দুর্ভেদ্য লৌহ-যবনিকার অন্তরালে। ওখানে সবাই বড় অসুখী—দিবারাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তাদের অন্নসংস্থান করতে হয়। ধর্ম্ম-কর্ম্মকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। বিবাহ তুলে দিয়ে নরনারীর স্বেচ্ছা-মিলন ও যথেচ্ছ বিচ্ছেদ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এই মিলনের ফলে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করলে তারা অনাথ আশ্রমে স্থান পায়। সরকার সে সব শিশুর লালনপালনের ভার নেন। ওখানে কারুর জীবনেই সাংসারিক সুখ নেই, গৃহে শান্তি নেই। সংবাদপত্রগুলি সমস্তই সরকারের পরিচালিত। স্বাধীন মতামত প্রকাশের বা

সরকারের কাজের সমালোচনা করবার অধিকার নেই কারুর। সোভিয়েট দেশের লেখকরাও সেখানে সরকারী স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোনও গ্রন্থ রচনা করতে পারেন না বা প্রকাশ করতেও পারেন না। কুলী-মজুরদের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোন প্রভেদ নেই—অর্থাৎ মুড়ি মিছরীর এক দর। ওখানকার পুলিশ ও মিলিটারীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং উৎপীড়নে সর্ব্বদা সকলে সন্ত্রস্ত! 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে'র নাম শুনলেংলোকে আঁতকে ওঠে! গোয়েন্দা আপিসে ডাক পড়লেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ওখানকার কলকারখানার মজুররা যেন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী, বন্দীশালায় আটক রেখে তাদের দিবারাত্র খাটান হয়। এই রকম বহু ভয়াবহ ছবি রাশিয়া সম্বন্ধে আমাদের


লেনিনগ্রাডের একটি গীর্জ্জা


লেনিনগ্রাডে 'হার্মিটেজ' প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ একটি হল (বর্ত্তমানে 'মিউজিয়ম')

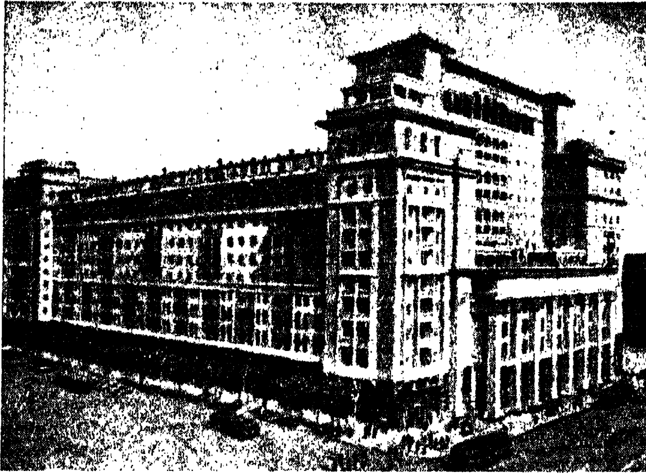
সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বাকীটুকু সত্যের বিকৃতি মাত্র। আয়রন 'কার্টেন' বা লৌহ-যবনিকা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব সেখানে নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে তারা কিছু করে কিনা সন্ধান করেও আমরা তা আবিষ্কার করতে পারিনি। অবশ্য উরাল পর্ব্বতের আড়ালে দুর্গম সাইবেরিয়ার তুষারাচ্ছন্ন বুকে কি হচ্ছে আমরা দেখতে যাই নি। হয় ত আমার কমিউনিষ্ট-বিরোধী বন্ধুরা একথা শুনে এখনি বলবেন—ওই ত! সাইবেরেয়ায় গেলে না, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প দেখে এলে না। তবে আর রাশিয়ার আসল রূপটা দেখলে কি?

হয় ত তা দেখিনি। তবে যেটুকু দেখেছি, তাইতেই আমরা খুশী। দেখেছি সোভিয়েট রাশিয়ার নরনারী সবাই বেশ সুস্থ সবল ও আনন্দোজ্জ্বল, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর তারা। তাদের মধ্যে বেকার কেউ নেই। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক বলে নীরেট মূর্খ একজনও খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা চিকিৎসার দায় সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। চিকিৎসাও বিনামূল্যে, ডাক্তার খরচ লাগে না। বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণ তাদের সরকারী শাসন-ব্যবস্থার অধীনে এতটুকুও

তুলে ধরা হয়েছে। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে যা কিছু বিরুদ্ধ প্রচার রাশিয়া সম্বন্ধে শুনেছিলাম বাইশ দিন রাশিয়ার সর্ব্বত্র ইচ্ছামত ঘুরে বেড়িয়ে বুঝেছি তার অধিকাংশই

কেউ অসুখী নয়। শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার মত কোন ত্রুটিও তারা খুঁজে পায় না।

একটা কথা এখানে বিশেষ ভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে



মস্কো হোটেল

প্রতি দু'হাজার লোকের বা দশ হাজার লোকের, অর্থাৎ যে অঞ্চলে যে রকম লোক-সংখ্যা তদনুসারে এক-একটি সোভিয়েট ইউনিট স্থাপিত হয়। সোভিয়েট অর্থে 'পঞ্চায়েৎ' বোঝায়। ষোলটি স্বয়ং-শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ইউ. এস. এস আর বা 'ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ সোভিয়েট রাশিয়া' গঠিত হয়েছে। এই ষোলটি স্বয়ং-শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাম :

রাশিয়ান ফেডারেশন, যুক্রেন, বেলো রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, মোলদাভিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, কারেলো-ফিনিশ, কির্ঘিজিয়া, জর্জিয়া, আজর বৈজান, আর্মেনিয়া, তুর্কোমেনিয়া, কাজাকস্তান, উজবেগিস্তান ও তাজিকিস্তান।

প্রত্যেকটি একাধিক সোভিয়েট বা ছোট ছোট পঞ্চায়েতে বিভক্ত। এদেরই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার 'সিটি সোভিয়েট' গঠিত হয়। আবার, 'সিটি সোভিয়েট'গুলির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে 'সুপ্রীম সোভিয়েট' গড়া হয়, যাদের শাসন বিভাগের বড়কর্ত্তা বলা চলে। কারণ ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করেন এঁরাই।

সুতরাং বুঝতে পারছেন বোধ হয় কেন সোভিয়েট রাশিয়ায় 'সরকার বিরোধীদল' বলে কিছু নেই। কারণ কারুর ব্যক্তিগত স্বার্থ সেখানে বড় নয়। দেশের ও দশের কল্যাণই তাদের সর্ব্ব-লোকের লক্ষ্য। সুরু থেকে সেরা পদে জনসাধারণেরই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নিয়োজিত। সমগ্র দেশটা যেন এক পরিবার হয়ে উঠেছে। সকলের একই উদ্দেশ্য—একই লক্ষ্য—সে লক্ষ্য হ'ল কিসে সর্ব্বসাধারণের উন্নতি হয়, কল্যাণ হয়। কিসে সকলে সুখে থাকে, কেমন করে সকলের অভাব-অভিযোগ দূর করতে পারা যায়, সবারই সেই ভাবনা! সুতরাং বিরুদ্ধ দল ভূমিষ্ঠ হবার কোনও সুযোগ নেই সেখানে। চোর নেই, প্রতারক নেই, বিশ্বাস-ঘাতক নেই! কারণ অভাব নেই!

নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যদি কেউ তাঁর দায়িত্বপূর্ণ পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাঁকে তৎক্ষণাৎ 'সিটি সোভিয়েট' থেকে 'সুপ্রীম সোভিয়েট' মারফত হয় কোনও নিম্নপদে সরিয়ে দেওয়া হয়, নয় ত বরখাস্ত করা হয়। কাজেই শাসন কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করবার কোনও অবকাশই পায় না সংবাদপত্রগুলি।

সংবাদপত্রগুলি কার? 'ষ্টেটে'র। অর্থাৎ, প্রত্যেক সংবাদপত্রের মালিক জনসাধারণ। কারণ এখানে ষ্টেটই জনসাধারণের প্রতিভূ-প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছুই নেই এদেশে। ব্যবসা হিসাবে সংবাদপত্রের মালিক হয়ে ধনীগোষ্ঠীর তক্ত-তাউসে গিয়ে বসবার সুযোগ নেই কারুর। সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য, কলকার-

যে, ইংরেজদের আমল থেকেই আমরা শাসক ও শাসিতের যে দুটি পরস্পর-বিরোধী পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলাম, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদেরই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে এই কংগ্রেস-সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তাকে নিজেদের সরকার বলে আমরা আজও মানতে শিখি নি। ইংরেজ আমলের ভেদবুদ্ধির ঐতিহ্যের সংস্কার আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। এখনও নিজেদের নির্ব্বাচিত শাসক সম্প্রদায়কে আমরা আত্মীয় না ভেবে শত্রু বলেই মনে করি এবং প্রতিপদে তাঁদের কল্যাণ কর্ম্মে বাধা সৃষ্টি করাটাই দেশের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থা বুঝতে হলে এ মনোবৃত্তি নিয়ে অগ্রসর হলে চলবে না। প্রথমেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সে দেশে দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি-বর্জ্জিত এমন কোনও পুঁজিবাদী ব্যবসাদার ও কলকারখানার ধনী মালিক নেই যারা গরীব মজুরদের রক্ত শোষণ করে ফেঁপে ওঠে বা খাদ্য ও ঔষধের ন্যায় জীবন-মরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষেও ভেজাল দিয়ে দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করে বড়লোক হবার ঘৃণিত চেষ্টায় ব্যাপৃত।

আরো মনে রাখতে হবে রাশিয়া থেকে ধনী অভিজাত-বংশ আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পিতৃপুরুষের অর্জিত ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে সেখানে বিলাস-ব্যসনে অলস জীবন যাপন করবার উপায় নেই কারুর। সকলকেই খেটে খেতে হবে। তবে এও সত্য যে, রেল-গাড়ী থেকে ফার্ষ্ট ক্লাস তুলে দিলেই থার্ডের যাত্রীশ্রেণী যেমন নির্ম্মূল হয় না, রাশিয়াতেও তা হয় নি। রাশিয়ার সরকার কোনও দেশ ছাড়া সমাজ ছাড়া বিরুদ্ধ দলের হাতে নেই। জনসাধারণেরই মনোনীত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশবাসীর সাহায্যে ও সহ-যোগিতায় শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন।

থানা ষ্টেটের—অর্থাৎ, জনসাধারণের। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, যদু আমরাই তার মালিক।

দেশের শ্রমিকদের গঠিত 'ট্রেড ইউনিয়ন'প্রতিষ্ঠান প্রায় প্রত্যেক কলকারখানা ও শিল্প-বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে। এদের কাজ বিশেষ করে শ্রমিকদের স্বার্থ ও সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা। অনেকটা 'গবর্ণমেণ্ট উইদিন গবর্ণমেণ্ট' বলা যেতে পারে! কিন্তু ষ্টেটের সঙ্গে এখানে ট্রেড ইউনিয়নের কোনও বিরোধ নেই। বরং শ্রমিকদের স্বার্থ, কল্যাণ, তাদের সুখ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সম্পর্কে ষ্টেটের সঙ্গে এ রা সহযোগিতাই করে থাকেন। ফলে সরকারের গুরু কর্ত্তব্য-ভার ট্রেড ইউনিয়নগুলি অনেকটা হাল্কা করে দেন। ট্রেড ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের দুঃসময়ের বন্ধু। আপদে বিপদে এরাই অর্থে ও সামর্থ্যে বুক দিয়ে পড়ে তাদের বাঁচায়।

শ্রমিকদের চাঁদায় ট্রেড ইউনিয়নের ধনভাণ্ডার পুষ্ট হলেও কল-কারখানার আয় থেকেও মোটা সাহায্য নিয়মিত পাওয়া যায়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরুদ্ধ রাজ-নৈতিক মতবাদের বালাই না থাকায় এদের জাতীয় ঐক্য যেমন সংহত হবার সুযোগ পেয়েছে তেমনি ট্রেড ইউনিয়নগুলিও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবার অবকাশ পায় নি।

এখানে আমরা এমন কোনও লোকের দেখা পাই নি যাঁর 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' নেই। যাঁর যে ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস তিনি ইচ্ছামত সেই ধর্ম্ম পালন করতে পারেন, তাঁকে কেউ বাধা দেবে না। জাতটার মধ্যে রেজিমেণ্টেশনের কোনও লক্ষণই চোখে পড়ল না। যার যা খুশী খাও, যার যা খুশী পর। যার যেখানে ইচ্ছা যাও। নেশা করতে চাও বাধা দেবে না কেউ। যে কোনও বিষয়ের উপর লেখা বই কিনতে পার, পছন্দসই যে কোনও জিনিস সওদা করতে পার। যে কোনও খবরের কাগজ পড়তে পার। কোথাও নেই এখানে 'রেজিমেণ্টেশনের' বালাই বা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা'র অভাব।

'বিবাহ' আইন অনুসারে রেজিষ্টারী না হলে গ্রাহ্য হয় না। গীর্জ্জায় গিয়ে সেই পুরাতন সমারোহে বিবাহ করা এখানে নিষিদ্ধ নয় বটে, তবে সাধারণতঃ লোকে রেজিষ্টারী আপিসে গিয়ে বিবাহ করে আসাই পছন্দ করে বেশী! 'Companionship Marriage' বলে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ১৯৫৫ সনে সেখানে দেখি নি। শুনেছি আগে নাকি ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদ উভয়ের সম্মতি ছাড়া হয় না।

ছোট ছেলেমেয়েদের ভার অনেকটা ষ্টেটের হাতেই আছে। কেননা তারাই যে জাতির ভবিষ্যৎ! তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র ও মানসিক গঠন ছেলেবেলা থেকে যদি উন্নত করে না তোলা হয় তা হলে বড় হলে তারা দেশের গৌরবস্বরূপ হয়ে উঠবে কেমন করে? তাই, নার্সারী স্কুল থেকে কিণ্ডারগার্টেন, তারপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা সর্ব্ব ব্যাপারেই ছেলেমেয়েদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের সঙ্গে সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা ও সহায়তা থাকে। অমুক ছেলেটা বা মেয়েটার অমুক কোনও বিষয়ে একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে বা সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেল, এ আক্ষেপের সুযোগ নেই সেখানে।



'গর্কী কাল্‌চারাল পার্ক', মস্কৌ

পাঁচ দিন আমরা লেনিনগ্রাডে ছিলাম। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত বিশ্রাম ছিল না একটুও। সর্ব্বত্র আমাদের অবারিত গতি। আমরা যে যা দেখতে চেয়েছি, যেখানে যেতে চেয়েছি তাঁরা সমাদরে নিয়ে গেছেন। যা কিছু জানতে চেয়েছি অসঙ্কোচে জানিয়েছেন। আমাদের নানা সঙ্গত, অসঙ্গত এমনকি অদ্ভুত ও আপত্তিকর প্রশ্নেরও তাঁরা হাসিমুখে জবাব দিয়েছেন। আমাদের পথপ্রদর্শক ও দোভাষীরূপে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। এদের এক জনের নাম লেনা স্মির্নোভা এবং অপরের নাম ইরা খেতোভিদোভা। এরা দু'জনেই

লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেন। চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। তাঁদের কাছেই শিখলাম 'স্মির্নোভা' শব্দের বাংলা অর্থ 'শান্তিময়ী' আর 'খেভোভিদোভা'র অর্থ 'শ্বেতদর্শনা'।

আমরা লেনিনগ্রাডে লেনিন ও ষ্টালিন প্রভৃতি বিপ্লবীদের প্রথম আড্ডা বা আস্তানা 'স্মলনি' ভবন এবং প্রথম বিদ্রোহী রণ-তরী 'অরোরা'—যে যুদ্ধ জাহাজ থেকে জারের প্রাসাদে প্রথম বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে গোলা বর্ষণ করা হয়, এগুলি দেখতে যাই। বিপ্লবের ইতিহাস এখানে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে। লেনিন ও ষ্টালিনের ঘর, তাঁদের টেবিল, চেয়ার, দপ্তর, তাঁদের হাতের লেখা চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, আদেশনামা ও আক্রমণের প্ল্যান প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাগজপত্র এখানে মিউজিয়মে রাখা মূল্যবান সম্পত্তির মত আছে। জারেদের 'উইণ্টার প্যালেস', 'সামার প্যালেস' এখন জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত; এগুলি সাধারণের দ্রষ্টব্য যাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে। লেনিনগ্রাডের চিত্রশালা, কলাভবন, বিশ্ব-বিদ্যালয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, লৌহ, ইস্পাত ও সূতিবস্ত্রের কার-খানা, মোটরকার ফ্যাক্টরী, যৌথ ক্ষেতখামার, চাষীদের ঘর-বাড়ী, কুলিমজুরদের বাসগৃহ, শিশুদের নার্শারী, কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, উচ্চ-শিক্ষার বিদ্যালয়, পাইয়োনীয়ার ক্যাম্প, কালচারাল পার্ক, রোগীদের হাসপাতাল, বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্যদের শেষ জীবনের আবাসস্থল, সিটি-সোভিয়েট গৃহ, খেলোয়াড়দের বিরাট ষ্টেডিয়াম, লেখক-লেখিকাদের সভাগৃহ, প্রাচীন দুর্গ, উপাসনা-মন্দির, সেনা-নিবাস, বিমানঘাটি, বড় বড় দোকানঘর, হাট-বাজার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস, সার্কাস, টেলিভিশন, সিনেমা সবকিছুই তাঁরা দেখিয়েছেন। রোজই রাত্রে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল নৃত্যগীত, অভিনয়, ব্যালেডান্স অপেরা প্রভৃতি একটা-না-একটা দেখতে যাওয়া। এক এক রাত্রে এক এক রকম। শ্রীমতী নভিকোভা প্রায় প্রত্যহই হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা করে যেতেন। খুব ভাল লাগত তাঁর সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে।

এদেশে আমরাও যত ঘুরেছি, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গাইড ও দোভাষীরাও তত ঘুরেছেন। ষ্টেটের মোটরগাড়ী ও বাস আমাদের জন্ম হামেহাল হাজির থাকত! পাঁচ দিন পরে আমরা লেনিনগ্রাড ছেড়ে মস্কো রওনা হলাম। নবলব্ধ বন্ধুরা অনেকেই ষ্টেশনে এসে আমাদের তুলে দিয়ে গেলেন। রাশিয়ার নরনারী সহজ সুন্দর মানুষ —সরল,অমায়িক, ভদ্র ও উদার। আন্তরিকতাপূর্ণ তাঁদের প্রত্যেকটি ব্যবহার। ছল, চাতুরি, কপটতার ধার ধারেন না তাঁরা। যাদের সঙ্গে মেশেন, অন্তরঙ্গভাবেই মেশেন এবং অকৃত্রিম ভালবাসায় আপ্লুত করে দেন। লেনিনগ্রাড ছেড়ে যে দিন চলে আসি সে কি করুণ দৃশ্য! সবার চোখে উদ্গত অশ্রু। ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসে গাড়ীতে তুলে দিয়ে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিদায় নিলেন। যার যা সাধ্য, হয়ত কেউ অসাধ্যও কিছু সংগ্রহ করে এনে আমাদের বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ উপহার দিয়ে গেলেন। আমাদের সঙ্গে কিছুই ছিল না দেবার মত। দেশে গিয়ে পাঠিয়ে দেব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম। আজও সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারি নি।

লেনিনগ্রাডের সূতাবস্ত্রের কারখানা যে দিন দেখতে যাই আমাদের সঙ্গের জনৈক অবাঙালী প্রতিনিধি কারখানার ম্যানেজারকে সভ্যতা-বিরুদ্ধ এক প্রশ্ন করে বসলেন—আপনি কত মাইনে পান? অবশ্য, তিনি আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। তার মাঝখানে এ প্রশ্নটাও এসে পড়েছিল। এই উপলক্ষে ম্যানেজারের সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছিল তাতে জানা গেল যে, একজন সুদক্ষ কারিগর মাসে দু'তিন হাজার টাকা রোজগার করে। আনাড়ি কারিগর মাসে পাঁচ শত থেকে হাজার টাকা পায়। ম্যানেজার পান মাসে চার হাজার টাকা। এ ছাড়া বছরে বার দুই-তিন বোনাস পায় মজুররা তাদের নির্দিষ্ট কাজের চেয়ে বেশী কাজ তুলে দিতে পারলে। বছরের শেষে এক মাসের সবেতন ছুটি; এই ছুটিটা যদি সে মজুর-পরিবার কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে কাটাতে চায় ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিনা খরচে সেই কারখানার 'রেষ্ট হাউস' বা 'বিশ্রাম ভবনে' তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তারা বার মাসই বিনা খরচে ডাক্তারী চিকিৎসার সুযোগ পায় তাদের ছেলেমেয়েরা বিনা খরচে লেখা-পড়া শেখার সুবিধা পায়। সামান্য মাত্র ভাড়ায় তারা থাকবার ভাল ঘর পায়। অল্প খরচে কারখানার ভোজনাগারে দুপুরের খাওয়াটাও পায়। কারখানার সমবায় ভাণ্ডার থেকে সস্তায় সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পায়। তা হলেও তারা বড়লোক হয়ে উঠবার সুযোগ পায় না। মজুররা মাসে অনেক টাকা রোজগার করলে কি হবে, সেই অনুপাতে তাদের যা খরচ করতে হয় তাতে মনে হয় আমাদের দেশের কুলি-মজুররা নেহাৎ খারাপ নেই। ওখানে এক জোড়া জুতা কিনতে হবে আড়াই শ' টাকায়। এক প্রস্থ স্যুট নেবে দেড় হাজার থেকে আঠার শ' টাকা। এক প্যাকেট সিগারেটের দাম পাঁচ রুবল। এক রুবল আমাদের এক টাকা তিন আনা। এই রুবল আবার রাশিয়ার বাইরে কোথাও গিয়ে বদলে নেওয়া চলে না। কারণ রাশিয়ার বাইরে এর কোনও দাম নেই। পাউণ্ড দিয়ে বা ডলার দিয়ে রুবল পাওয়া যাবে, কিন্তু রুবল দিয়ে কিছু পাবে না। সুতরাং লৌহ-যবনিকা যদি কিছু সত্যিই থাকে তবে সে এই রুবলের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা!

মজুরদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে তারা কাজে যাবার সময় কারখানারই পরিচালিত নার্শারি বা কিণ্ডারগার্টেনে দিয়ে যায়। সেখানে তাদের সব রকম যত্ন নেওয়া হয়। কাজের শেষে বাড়ী ফেরার মুখে তারা আবার যে যার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। যাঁরা ছেলেমেয়ের ঝামেলা পোয়াতে পারেন না, তাঁরা অনেক সময় সেখানেই বড় না হওয়া পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের রেখে দেন। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য মাথাপিছু মাসে এক শত টাকা হিসাবে খরচ দিতে হয়।

(আগামী বারে সমাপ্ত)

পর্য্যটন

শ্রীশিবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

দুপুরের রোদ্দুর-মাখানো আকাশটা হঠাৎ যেন ঝলমল করে উঠল।...

শান্ত স্নিগ্ধ নীলের সীমাহীন সমারোহ, তার মাঝে হাঁসের পালকের মত শুভ্র হাল্কা মেঘের টুকরোগুলো অলস মন্থর গতিতে বাতাসের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে চলেছিল। জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে আষাঢ়ের কয়েকটা দিন সবেমাত্র কেটেছে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যের তেজ এতটুকুও কমে নি।

কোলের ছেলেটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে অনীতা এতক্ষণ একটু চোখ বোজবার চেষ্টা করছিল। সংসারের কাজকর্ম্ম সারা হয়ে গেলে দুপুরে তার এটাই একমাত্র নিত্যকার প্রয়াস। তাই আজকেও ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মায়ের হাতের স্নেহকোমল স্পর্শে ছেলেটির চোখে ঘুম নেমে এল এক সময়। অনীতা তাকে অতি সন্তর্পণে শুইয়ে দিয়ে উঠে এল পশ্চিমমুখো ভাঙা জানালাটার কাছে। আগুনের মত রোদ এসে পড়ে এটা দিয়ে। বিরক্তিভরে ভাঙা পাল্লা দুটোকে যোগ করতে গিয়ে অনীতার দৃষ্টি হঠাৎ বাইরের আকাশে গিয়ে ঠিক্‌রে পড়ল। ভারি দুরন্ত আকাশ তো! প্রাণভরা হাসিতে যেন দশ দিক ভাসিয়ে দিয়েছে। জানালাটা আর বন্ধ করা হ'ল না। রোদের তীক্ষ্ণ ফলাগুলো এসে তার ঘুমন্ত ছেলের চোখে মুখে বিঁধতে লাগল। কেন জানি অনীতার সেদিকে আর হুঁস রইল না।

আজকের দুপুরটা হঠাৎ তার চোখে নূতন হয়ে ঠেকল। উত্তর-দক্ষিণ-চাপা বাড়ীর এই পশ্চিমমুখো জানালাটা দিয়ে যে একফালি আকাশ রোজই দেখা যেত, তা অনীতার মনে তো কোনদিনই এমন কল্পনার রং ধরাতে পারে নি। অবাক হ'ল অনীতা। ঐ উদার আকাশের নীচে ঘর বেঁধেই সে কিনা এতকাল সংসারের নামে প্রহসন করে এসেছে। স্বামী নীলকান্তের বিবর্ণ মুখটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। কিন্তু অনীতার নারীত্ব তাকে তো প্রবঞ্চনা করে নি। হৃদয়ের কাঙালপনার স্বাক্ষর রয়েছে ঐ হাড়-পাঁজরা বার-করা ছেলেমেয়েগুলো। তাকে বিয়ে করে নীলকান্ত যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। তবু অনীতার শীর্ণ ঠোঁটের উপর একটা বিচিত্র হাসির রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তবে আনন্দে নয়, ধিক্কারে। জীবনের সাধ আজ তার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।...

অসংযত ভাবনা-চিন্তাগুলো আজকাল সুযোগ পেলেই অনীতাকে কেমন যেন পেয়ে বসে। অতীতের ধুয়ে-যাওয়া লেখাগুলো তার মন থেকে কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায় অনীতা। মুহূর্ত্তের মধ্যেই উদ্‌ভ্রান্ত মনের রাশ টেনে ধরে, আনমনে তাকায় আবার আকাশের দিকে। সুনিবিড় স্বচ্ছ নীলের মাঝে সাদা মেঘের খেলা আজ বিরামহীন। অস্পষ্ট কালো বিন্দুর মত চিলগুলোকে আর উড়ন্ত বলে মনে হয় না। বিনা আয়াসে যেন ওরা হাল্কা মেঘের টানে স্থির নিষ্কম্প অলস পাখার হাল ধরে ভেসে চলেছে। বহুযুগের বিস্মৃতির পর অনীতা আজ নূতন করে আত্মসচেতন হয়ে উঠল। কিন্তু এ অনুভূতি কি তার শতছিন্ন সংসারের তাল্পিমারা দৈন্যের মাঝে লুকিয়ে ছিল! অনীতা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে ওঠে। পাশের বারান্দার রেলিঙে বসে একটা কাক হঠাৎ ডেকে উঠল। দুপুরের অলস প্রহরের মাঝে সে রব প্রতিধ্বনিত হ'ল মনকে উদাস করে দিয়ে। বর্ণহীন নির্জ্জনতা—আশেপাশে চারিদিকে নেশার আমেজের মত একটা মিষ্টি আবেশ ছড়িয়ে দিল। অনীতার চোখে নেমে আসে দুপুরের স্বপ্ন, ধীরে ধীরে অপ-স্রিয়মাণ হয়ে যায় দূরের নীল দিগন্ত। বিস্মৃতির ওপারে অস্পষ্ট চোখে পড়ছে আর এক জীবনের ছবি। যৌবনের প্রথম ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছে অনীতা তার নিশীথের স্বপ্নকানন থেকে। জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলিকে খুঁজে পেতে গিয়ে অনীতার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল এক বিলীয়মান অপরাহ্ণ-বেলার উদাস করুণ ছবি।...

যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে তখন। ডাক্তার রায় ইতিপূর্ব্বেই তাঁর অন্তিম ঘোষণা জানিয়ে দিয়েছেন। একটা নিদারুণ কান্নার আবেগ অনীতার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। এ রোগের ভয়াবহ স্মৃতি তার মনে দাগ কেটে রয়েছে। সংসার থেকে এরই মধ্যে দু'জন বিদায় নিয়েছে,—বড়দা, সমর আর ছোট ভাই বীরেশ। পিতা বেণীমাধবের শেষ জীবনের আশাটুকু একেবারে চিরকালের জন্য নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ তাদের সমস্ত সংসারের উপরই আঁধারের যবনিকা টেনে দিয়ে যিনি সেই পথেই পা বাড়াতে চলেছেন তিনি স্বয়ং বেণীমাধব। ডাক্তার রায়ের শেষ উক্তি-গুলি অনীতার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিষাক্ত তীরের মতই বিঁধে গিয়েছিল। তখন সে বারান্দার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

বিমলের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার রায় বলে উঠলেন,—ডাক্তার হয়ে এর পরে আমি আর ভাল কিছু আশা করতে পারি না। এখন অদৃষ্টের কাছে হার মানা ছাড়া উপায় নেই কোন।

বিমল মৌন হয়ে গেল। মাথাটাও সেই সঙ্গে একেবারে নীচু হয়ে এল। তার সুন্দর মুখখানি বিষাদের পাণ্ডুর প্রলেপে কেমন যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগোতে এগোতে সে পকেটে হাত দিয়ে টাকা ক'টাকে শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরল।

বিদায় নেবার জন্য ডাক্তার রায় এবার তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখে-মুখে স্নিগ্ধ হাসির ক্ষীণ একটা রেশ ফুটিয়ে বললেন,—এবারে আসি ভাই। কোনকিছুর প্রয়োজন হলে খবর দিতে সঙ্কোচ করবেন না যেন।

বিমল ইতস্ততঃ করছিল এতক্ষণ ধরে। হঠাৎ টাকাগুলোকে বার করে বলে উঠল—আপনার এই টাকাটা।

ডাঃ রায়ের চোখেমুখে এবারে গভীর আন্তরিকতার ছাপ ফুটে উঠল। সহজ কণ্ঠে বললেন তিনি—আমিও মানুষ ভাই। এত বড় পরাজয়ের পর এই সামান্য গ্লানিটুকু কুড়িয়ে নেবার জন্য আর অনুরোধ করো না আমাকে।

ডাঃ রায় আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা ক্ষণিক বিহ্বলতায় তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর এক সময় বিদায় নিলেন ধীরে ধীরে। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে বিমলের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল। পারিশ্রমিক ত নিলেনই না, উপরন্তু এই পরিবারের অসহায়তার কথা চিন্তা করে ওষুধপত্রের দামটাও ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

রুদ্ধশ্বাসে অনীতা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার রায় বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। আর পারল না সে, বারান্দার রেলিংটার উপর মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ফিরে যাবার পথে চমকে উঠল বিমল। কান্নার স্বর শুনে অন্ধকারের মধ্যে অনীতাকে খুঁজে পেতে দেরি হ'ল না তার। মনের সুগভীর তলদেশ থেকে একটা নিবিড় সহানুভূতি উঠে এসে তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অনীতার এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলির উপর হাত বুলাতে বুলাতে কি যেন বলতে গেল সে। কিন্তু তার মৌন সমবেদনার স্পর্শ পেয়ে অনীতা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। তার বুকের উপর আছড়ে পড়ে নিদারুণ কান্নায় ভেঙে পড়ল। আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল—কি হবে বিমলদা ?

বিমল ভেবে ঠিক করতে পারল না আসন্ন পিতৃবিয়োগ-বিধুরা এই মেয়েটিকে সে কি বলে সান্ত্বনা দেবে। চোখের কোণ দুটো তার সুতীব্র বেদনায় জ্বালা করে উঠল। তবু শোক, দুঃখ, মৃত্যুর এই অভিশপ্ত মুহূর্ত্তের মাঝে সে হঠাৎ আবিষ্কার করলে, অনীতা তাকে একান্ত আপনার জন বলেই মনে করে।

সন্ধ্যার সেই দুঃসহ মুহূর্ত্তগুলি সকরুণ বেদনায় মুখভার করে বিদায় নিল। এল এক মর্ম্মান্তিক রাত্রি। বেণীমাধবের মৃত্যুশয্যার পাশে বসে সকলেই তখন তাঁর জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তের নির্ম্মমতাকে প্রত্যক্ষ করছিল।

বেণীমাধবের নিষ্প্রভ চোখ দুটো বারকয়েক কেঁপে উঠল, যেন কাকে তিনি খুঁজছেন। পরক্ষণেই ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন তিনি—অনু, এদিকে আয় ত মা!

চোখের জল ধরে রাখতে পারছিল না অনীতা। সিক্ত আঁচলের প্রান্তভাগ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে পিতার একান্ত কাছে এসে বসল সে।

বেণীমাধবের শীর্ণ হাতটা তার কপাল স্পর্শ করবার জন্য কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। শরীরের শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। অনীতা পিতার শিথিল হাতখানাকে বিছানার উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে বলল—আমাকে কিছু বলবে তুমি ?

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বেণীমাধব বলে উঠলেন—হাঁ মা, বলব বৈ কি। এখন না বললে আর ত সময় হবে না।

অনীতার দুই গাল বেয়ে নির্ঝরিণীর মত নেমে এল তপ্ত চোখের জল। কান্নার রুদ্ধ আবেগকে দমন করে সে বলে উঠল—তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন বল ত।

বেণীমাধবের নির্জীব কণ্ঠস্বর শোনা গেল—খুব অস্থির হয়েছি না মা ? কিন্তু তুই-ই বা কেন কাঁদছিস বল্ ত ? বুঝি মা সবই বুঝি। আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে, আর বেশী দেরি নেই। কিন্তু মা তোর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে এতটুকু ত শান্তি পাচ্ছি না। কথাগুলি একনিশ্বাসে বলে বেণীমাধব রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর বুকের পাঁজর থেকে বেরিয়ে এল একটা কম্পিত দীর্ঘনিশ্বাস। পরক্ষণেই কিন্তু তিনি আবার বলে উঠলেন—জীবনে আমার অভিশাপ ছিল মা, অভিশাপ ছিল। আমার মায়ের অভিশাপ। তাঁকে একদিন কাঁদিয়েছিলাম কিনা, তাই আজ নিজেকেও কেঁদে যেতে হচ্ছে।

অশ্রুর বন্যাকে রোধ করা অনীতার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল সে—তুমি একটু চুপ কর ত বাবা। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

মেয়ের কথায় বেণীমাধব হঠাৎ হেসে উঠলেন—মৃত্যুর বিবর্ণতার শীর্ণ হাসি। বললেন—আর নকল ঘুমের প্রয়োজন হবে না মা। এবার আসল ঘুমের জন্যই ডাক এসেছে। কিন্তু তার আগে যদি তোদের একটু নিশ্চিন্ত করে যেতে পারতাম। একটুও শান্তি পাচ্ছি না মা, একটুও শান্তি পাচ্ছি না। একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বেণীমাধব পাশ ফিরলেন।···

অতীত স্মৃতির ব্যথায় কয়েক ফোঁটা টলটলে চোখের জল অনীতার দুই গাল বেয়ে নেমে এল। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনার স্তূপ হতে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল কয়েকটা ভারী দীর্ঘশ্বাস। তার জীবনটাই যেন দুঃস্বপ্নের প্রতিরূপ।

···শেষ পর্যন্ত বেণীমাধবকে নিয়ে নিয়তির নিষ্ঠুর খেলার অবসান হ'ল। তাঁর চিতার আগুনের সঙ্গে সঙ্গে তিল তিল করে গড়া সংসারের শেষ খুঁটিটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যের শেষ সোপানে এসে দাঁড়াল অনীতা ও তার বিধবা মা কিরণময়ী। অমন কুটিল কালো দিন মানুষের জীবনে বোধ হয় কখনও আসে না।···

বিস্মৃতির ধূসরতার মাঝে কি যেন হাতড়াতে গিয়ে অনীতা হঠাৎ চমকে উঠল। চেয়ে দেখল, দুপুরের সেই মনভোলানো নীল আকাশটা এরই মধ্যে কখন একেবারে কালো হয়ে গেছে। কোথাও শুভ্রতার চিহ্নমাত্র নেই। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ অভিশপ্ত বেদনার মত সমস্ত সীমাহীনতাকে ছেয়ে ফেলেছে। অবাক হ'ল অনীতা। দিগন্তপ্রসারী ঐ বহুরূপী আকাশ, আর অনন্ত স্বপ্ন-দেখা তার জীবন—দুটোই যেন আজ আশ্চর্য্য ভাবে মিলে গেছে। একটা শূন্যতা—আর একটা রিক্ততা।

···সম্পূর্ণ রিক্ত ও নিঃস্ব হয়েই কিরণময়ী সেদিন তার মেয়েকে নিয়ে অকূলে ভাসলেন। কিন্তু কূল পেলেন অচিরেই। বিমলের এত দিনের প্রতীক্ষা যেন সার্থক হ'ল। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মাঝে নতুন করে অঙ্কুরিত হ'ল আগামী সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি।

কিরণময়ীও নিজের মনে এতদিন ধরে যে আশা পোষণ করে এসেছিলেন, এবার তার সার্থকতার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তনটা সবচেয়ে বেশী করে ধরা পড়ল অনীতার চোখে। প্রথমে একটু অবাক হয়েছিল সে, কিন্তু এর মূল সূত্রটা খুঁজে পেতে দেরি হ'ল না তার।···

অনীতার চোখে ভেসে উঠল সেই দুটো পথ। অতীতে যেমন করে দেখেছিল, আজও ঠিক তেমনি ভাবেই সে চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু সেদিন ছিল সে সূচনার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে—আর আজ পথ দুটো গেছে অনেকখানি এগিয়ে। সেদিনের অনাগত ভবিষ্যৎ আজ হয়েছে প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। একটা পথ ধরে সে গতির মুখে পড়েছে, কিন্তু একটা পথের স্মৃতি আজও তো সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি।

···বিমল আর অনীতাকে কেন্দ্র করে কিরণময়ী তাদের ভবিষ্যৎ দিনগুলোর একটা ছবি মনে মনে এঁকে ফেলেছিলেন। অতীতে তিনি কতখানি হারিয়ে এসেছেন তার হিসাব না করে দেখতে লাগলেন আগামী দিনগুলোর মাঝে কতটুকু পাবেন। কিন্তু নিজের মধ্যে আর দ্বন্দ্বটাকে বাড়তে দিল না অনীতা। মনের অলিগলির রুদ্ধ দ্বারগুলো খুলে দিয়ে মায়ের কাছে সে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল। পরিষ্কার করেই বলল সে—এ তোমার অন্যায় আশা মা। বিমলদা আমাদের জন্য যা করেছে তাই কি যথেষ্ট নয়?

কিরণময়ী মেয়ের কথায় অবাক না হয়ে পারলেন না; বললেন—কি বলছিস্ তুই অনু? বিমল যে তোকে—

মায়ের বক্তব্যকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই অনীতা বলে উঠল—সেটা তার ভুল মা। আমরা সবকিছু জেনে শুনে তার এই ভুলটাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। তা ছাড়া এই ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা যখন কেটে যাবে, তখন তাকে আমি কি বলে কৈফিয়ত দেব বল ত?

—কৈফিয়ত দিবি মানে! এসব কি তুই আবোল-তাবোল বলছিস্ অনু?

—আবোল-তাবোল নয় মা। বিমলদার একটা আলাদা ভবিষ্যৎ আছে, তাকে আমি নিজের সঙ্গে জড়াতে চাই না। যা হবার নয়, তা নিয়ে তুমি মিথ্যে আশা করো না।

কিরণময়ী এবারে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন এনে বললেন—মিথ্যে আশা শুধু আমি করেছি? তা হলে আমাদের বিমলের আশ্রয়ে এসে ওঠার কি মানে হতে পারে। এটা কি অপরের অনুগ্রহ নেওয়া নয়?

—বিমলদা যে আমাদের পর সে কথা তোমায় কে বললে মা? এরই মধ্যে ভুলে গেলে কি আমাদের এই সংসারের পেছনে তার কতখানি আত্মত্যাগ রয়েছে?

মেয়ের কথায় কিরণময়ী হঠাৎ যেন নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন। তাই পরক্ষণেই শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—কিছুই আমি ভুলি নি। বিমলের মনের কথা আমি জানি বলেই একথা তুলেছিলাম।

—বিমলদার মনের খবর আমারও অজানা নয়। কিন্তু তার পাশে দাঁড়াবার মত যোগ্যতা আমার কতটুকু আছে

বলত। আমি পারব না মা, ও আমি পারব না।—নিদারুণ অভিমানে অনীতার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। একটা দুঃসহ বেদনা তার বুকের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগল।

চমকে উঠলেন কিরণময়ী। মেয়ের মুখে এমন কথা তিনি কখনও শোনেন নি। অনীতার মনের তন্ত্রীগুলো কেন যে বেসুরো হয়ে উঠেছে, এবারে তিনি তা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করলেন।

কিন্তু মা ও মেয়ের এই নিভৃত আলোচনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল বিমল নিজেই। অন্তরাল থেকে সবকিছুই তার কানে এসেছিল। তাই আশ্চর্য্য না হয়ে পারল না সে। যে বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে অনীতাকে সে এতদিন যাচাই করে এসেছিল, তার সবকিছুই এলোমেলো করে দিয়ে অনীতা যে এমন স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে দাঁড়াবে একথা সে ভাবতেই পারে নি। কিন্তু বাইরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে মনের ভাবনাকে সে এক সম্পূর্ণ নূতন দিকে চালনা করল। কিন্তু অলক্ষ্যে হাসলেন একজন।...

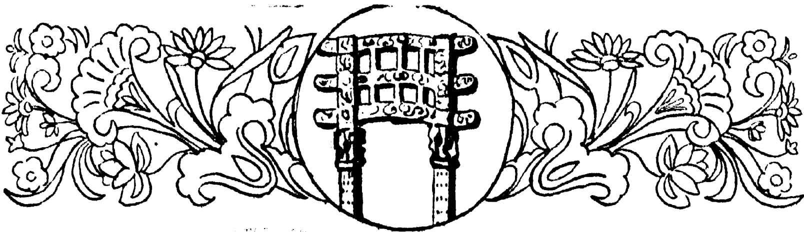
দীর্ঘকাল পরে অনীতা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পেরেছে সেই নিষ্ঠুর সত্যকে। এই সংসার, এই ছেলেমেয়েদের হাসিকান্নার স্পন্দন, এর মাঝে কোনদিনই ত নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দিতে পারে নি সে। যখনই বা মনকে জোর করে বশ করতে গিয়েছে, তখনই মনে পড়েছে আর একজনের অস্তিত্ব। তাই অনীতার ঘরবাঁধাও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি কখনও। সমস্ত অতীতের মাঝে পর্য্যটন করে অনীতার মন ফিরে এল স্থূল বাস্তব-ভূমিতে। সংসার, স্বামী-পুত্র সবই চেয়েছিল সে একদিন। কিন্তু পেয়েছে এই নিদারুণ দীনতার বোঝা।

অতীতের পূর্ণ ছবিটার সমস্ত রং অনীতার চোখের সামনে হঠাৎ মিশে একাকার হয়ে গেল। হারিয়ে গেল কিরণময়ী, হারিয়ে গেল তার একান্ত আপনার বিমল। শুধু কালস্রোতের সেই মৃদু কল্লোলধ্বনি তার মনের গহনে জেগে রইল।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। হঠাৎ সুরু হ'ল প্রচণ্ড বর্ষণ। বাতাসের গতিও সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম হয়ে উঠল। আষাঢ়ের প্রচণ্ড বর্ষণ, কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের কুটিল চাহনি অমন সুন্দর রোদ-মাখানো দুপুরটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিপর্য্যস্ত করে তুলল। একটা নিবিড় অনুভূতি নিয়ে অনীতা প্রকৃতির এই নির্ম্মমতাকে প্রত্যক্ষ করছিল। দূরে কোথায় যেন একটা বাজ পড়ল ; নিষ্ঠুর আর্ত্তধ্বনি টুকুরো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিছানার উপর ঘুমন্ত ছেলেটাও কেঁদে উঠল সেই সঙ্গে। প্রকৃতির এই দুরন্ত উল্লাস অনীতার এতক্ষণ বেশ লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ সে যেন ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। বিদ্যুতের সর্পিল রেখাগুলি তখন আকাশের বুকে কতকগুলি তীব্র ফাটলের সৃষ্টি করেছে। সেদিকে তাকিয়ে ভয় পেল অনীতা। না না, সে বাঁচতে চায় ; সে চায় আবার নূতন করে জীবন সুরু করতে। ছেলেটার আর্ত্ত কান্নার স্বর অনীতার কানে গেল। যেন তারই জীবনের করুণ হাহাকারের প্রতিধ্বনি। আর পারল না অনীতা। ছুটে গিয়ে ছেলেটার কচি মুখখানা তার বৃষ্টিসিক্ত বুকের মাঝে চেপে ধরল। না, সে আবার নূতন করেই বাঁচবে। এই ছেলেমেয়েদের শুকনো বুকের মাঝে, এই জীর্ণ সংসারের শেষ ফোঁটা চোখের জলের মাঝে, সে আবার নূতন করেই জীবনের সন্ধান করবে।

অনীতার হৃদয়ের নিরুদ্ধ আবেগ চোখের দু'কোণ বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল। ছেলের মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়ে তুলল সে। যেন এত দিন পরে সার্থক হয়েছে তার সমস্ত জীবনের কান্না।

বাইরে বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশের পুঞ্জীভূত বেদনা তখনও গলে গলে পড়ছিল।

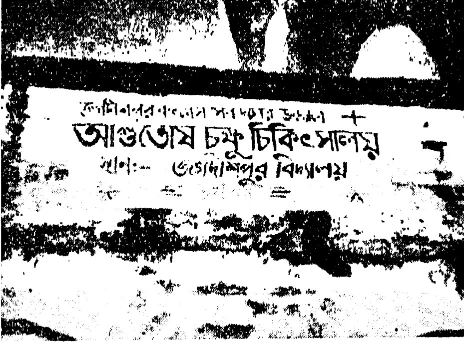


জগদীশপুরে

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

আহ্বান আসিয়াছে, জগদীশপুরে যাইতে হইবে। সেখানে সাময়িক ভাবে একটি চক্ষু-হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। শুনিলাম কয়েক-



জন রোগীর ছানি কাটাও হইয়াছে। তখন একটি কথা স্বতঃই মনে হইল। কৈশোরে ও যৌবনে যখন পল্লীগ্রামের বাড়ীতে ছিলাম, তখনও এইরূপ গ্রামে বসিয়া ছানি কাটার কথা শুনিতাম। একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক কোন কোন বৎসর পূজার ছুটিতে গ্রামের বাড়ীতে যাইতেন। চক্ষু-চিকিৎসক বলিয়া তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি। ও অঞ্চল নদী নালার দেশ। পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূর হইতে লোকে নৌকায় করিয়া ছানি কাটাইবার জন্য সেই পল্লীতে আসিতেন। রোগীদের মুখে শুনি ছানি কাটা বড় সোজা, চিকিৎসাও সাধারণ, গ্রামের পরিবেশে বিনা আড়ম্বরে ডাক্তারবাবু ছানি কাটিয়া দিতেন। রোগীরা চাল চিঁড়া লইয়া যাইত। কয়েক দিন পরে সঙ্গীদের লইয়া চক্ষুষ্মান হইয়া ফিরিয়া আসিত। সেই চিকিৎসক আজ আর ইহজগতে নাই। এখান হইতেই তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিদান করার গৌরব কি কম কথা!

কিছুকাল হইতে শুনিতেছি, এই পত্রিকায়ও খানিকটা বিবরণ বাহির হইয়াছে যে, হাওড়া-হুগলীর পল্লী-অঞ্চলে বিশেষতঃ শীত-কালে এইরূপ সামান্য সাজসজ্জায় ও গ্রাম্য পরিবেশে সাময়িক ভাবে চক্ষু-চিকিৎসালয় খুলিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ছানি কাটানোর ব্যবস্থা হইতেছে। আর এইরূপ আয়োজনের সূচনা হইয়াছে বহু বৎসর পূর্ব্বে একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্ম্মী দেশহিতব্রতী ডাঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক। আশুতোষ সরকারী চিকিৎসা-বিভাগে পদস্থ কর্ম্মী ছিলেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কারাবরণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কারাবরণ করাই তাঁহার দেশসেবার একমাত্র পন্থা ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর রচনাত্মক কর্ম্মধারায় তিনি ছিলেন একান্ত আস্থাবান। কারাগার হইতে বাহির হইয়া পল্লীর পরি-বেশকেই তিনি সেবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র করিয়া লইলেন, আর যে বিদ্যায় তিনি পারঙ্গম তাহাকেই সেবার অন্যতম বাহন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর



ডাঃ আশুতোষ দাস

হইলেন। কত দীন দুঃখী আতুর যে তাঁহার সুচিকিৎসায় নিখরচায় আরোগ্যলাভ করিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিয়াছে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। আশুতোষ ছিলেন বহুদর্শী চক্ষু-চিকিৎসক। গ্রামাঞ্চলে চক্ষুচিকিৎসার কোন আয়োজন নাই। উপরে যে দৃষ্টান্ত দিলাম, কচিৎ-কদাচিৎ কোন সহৃদয় ডাক্তার গ্রামে আসিয়া স্বেচ্ছায় বিনা-দক্ষিণায় এইরূপ চিকিৎসায় রত হইতেন। আশুতোষ এই অভাব পূরণে অগ্রণী হইলেন।

কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে সহায় হইবেন কে? এখানে আশু-তোষের আর একটু পরিচয় দি'। সেদিন এক বন্ধু বলিলেন, 'যখনই দেশ-সেবার কথা মনে হয় তখনই আশুতোষ মানসপটে উদিত হন, আশু-দাকে কখনও ভুলিতে পারি না।' আশুতোষের দরদী প্রাণ শুধু পল্লীজনকেই বিমোহিত করে নাই, যে-সব কর্ম্মী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রাণভরা ভালবাসায় এতই আকৃষ্ট হইতেন যে, ঈপ্সিত কার্য্যে আত্মনিয়োগ দ্বারা তাঁহারই

তৃপ্তিসাধনে তৎপর হইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। এমনই ছিলেন—তাঁহার কনিষ্ঠদের 'আশু-দা', আর গ্রামবাসীর 'আশু-ডাক্তার'। আমি ডাক্তার আশুতোষ দাসকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যদিচ কোন সভা-সমিতিতে দেখিয়া থাকি তো আদৌ স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু আশুতোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত যে সকল দেশকর্ম্মীকে আজ দেখিতেছি তাহাতে খানিকটা উপলব্ধি হয়—ডঃ আশুতোষ দাস কত 'বড়' ছিলেন। সেণ্ট পল নিপীড়িত ত্যাগী দুর্জ্জয় খ্রীষ্টভক্তদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"Ye are the salt of the Earth"—তোমরা



ছানিকাটা হইবার পর

জগতের লবণ। অর্থাৎ, নুন ব্যতিরেকে যেমন তরকারীর স্বাদ হয় না, তোমরা না থাকিলেও এ জগৎটা সেইরকম বিস্বাদ—বাসের অযোগ্য হইয়া যাইত। ডাঃ আশুতোষ এবং তাঁর মত ব্যক্তিরা জগতের—সমাজের 'লবণ'। তাঁহারা ছিলেন এবং আছেন বলিয়াই তো আজ জগৎ বা দেশ বাসের যোগ্য।

প্রীতি, ত্যাগ ও সেবা দ্বারা আশুতোষ জনসাধারণের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীরা যে তাঁহার দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। আশুতোষের উদ্যোগকে তাঁহারা গত দশ-বার বৎসর ধরিয়া সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই কর্ম্মীদলের শীর্ষে রহিয়াছেন গান্ধীপন্থী সেবাব্রত শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়। গত সাত-আট বৎসরের মধ্যে হাওড়া ও হুগলী জেলার পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি সাময়িক চক্ষু-হাসপাতাল খোলা হইয়াছে এবং তাহাতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কত লোকের ছানি কাটিয়া দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছেন। শত শত রোগীর চক্ষুতে অস্ত্রোপচার হইয়াছে এবং তাহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, আর তাহা একেবারে নিখরচায়। একটি প্রশ্ন উঠিবে—চিকিৎসক, ঔষধ, পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা, শয্যা প্রভৃতির তো ব্যয় আছে, ইহা সঙ্কুলান হয় কেমন করিয়া? প্রধানতঃ যে কেন্দ্রে চক্ষু-হাসপাতাল খোলা হয়, তাহার অধিবাসীদের উদ্যোগে চাঁদা তুলিয়া; আর তাঁহাদেরই কায়িক পরিশ্রমে, সেবা-যত্নে এমনটি সম্ভব হইয়াছে। রোগী নিজে যৎসামান্য বিছানা লইয়া আসেন। পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া তাহার উপর বিছানা পাতা হয়। রোগী তাহাতে শয়ন করেন; বাড়ী নিকটে হইলে পথ্যাদির ব্যবস্থা নিজ হইতেই হয়। দূরের রোগীদের পথ্যাদির ব্যবস্থা স্থানীয় চাঁদা দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। ঔষধের ব্যয়ও চাঁদা হইতে দেওয়া হয়। সামান্য রাহা-খরচ বাদে চিকিৎসক কোন দর্শনী বা দক্ষিণা লন না। এইরকম করিয়াই হাসপাতালের কার্য্য এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইতেছে। পল্লীর তরুণরা পালা করিয়া শুশ্রূষা-কার্য্য করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে স্বাবলম্বন গুণটির সুফল বলিয়া শেষ করা যায় না। পল্লীবাসীদের মধ্যে কর্ম্মৈষণা, সেবা-প্রবৃত্তি, আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করাইবার সুযোগ দিতেছে এই চক্ষু-হাসপাতাল। ইহা অপেক্ষা বড়কথা বা কাজ কি হইতে পারে? গত দুই বৎসর যাবৎ রেডক্রশ হইতে ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বদেশী সরকারের দৃষ্টি এখনও এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাকর্ম্মের উপর পড়িল না, বড়ই আশ্চর্য্য কথা, আক্ষেপের কথাও বটে। সরকার কি এদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না?

২

এখন, জগদীশপুরের কথা কিছু বলি। এখানকার নরনারী পশুপক্ষী তরুলতা সব মিলিয়া একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে, আর অভ্যাগত আমরা, আমাদের যেন আপন করিয়া লইয়াছে। হাওড়া জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত বালী থানার অধীনে এই গ্রাম অবস্থিত। হাওড়া শহর হইতে এ গ্রামখানির দূরত্ব মাত্র আট মাইল। কিন্তু একমাত্র মার্টিন কোম্পানীর রেল-গাড়ী ছাড়া যানবাহনের কোন ব্যবস্থা নাই। এইজন্য কলিকাতা হইতে এত নিকটে থাকিয়াও মহানগরীর 'আলো' এখানে প্রবেশের সুযোগ অতি অল্পই ঘটিয়াছে। তাই গ্রামের খাঁটি পরিবেশ এখনও লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের আয়তন চারি বর্গ মাইল। শেষ আদম-সুমারী অনুযায়ী ইহার জনসংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। হিন্দু মুসলমান দুই-ই এ অঞ্চলে বাস করেন। গ্রাম ছয়টি পাড়ায় বিভক্ত—তাঁতী-পাড়া, মুসলমানপাড়া, দাসপাড়া, কয়ালপাড়া, কামারপাড়া ও মাঝের-হাট। অন্ততঃ কয়েকটি পাড়ার নাম হইতে গ্রামবাসীর উপজীবিকার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। তাঁতীপাড়ায় বিস্তর তাঁতীর বাস ছিল। এখানকার তাঁত-শিল্প একসময় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। বহু লোক তাঁত-ব্যবসায়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেন। কিন্তু অন্যান্য কুটীর-শিল্পের মত ইহারও আজ অত্যন্ত হীন দশা। বহু তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া অন্যত্র অর্থের অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। তবু এখনও যাঁহারা এই ব্যবসাটি আগলাইয়া আছেন তাঁহারা অতি দুরবস্থায় কাল কাটাইতেছেন। মুসলমানদের প্রধান উপজীবিকা দর্জ্জির কাজ। কিন্তু এই শিল্প অন্যেরা গ্রহণ করায় তাঁহাদের আয়ের পথও আজ সঙ্কুচিত।

গ্রামের শিক্ষিতের হারও নগণ্য। পূর্ব্বে এইরূপ জনবহুল গ্রামে একটি মাত্র নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল। সম্প্রতি সরকারের অনুগ্রহে এখানে কয়েকটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণের চাঁদায় ও সরকারী সাহায্যে শেষোক্ত বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। এ বিদ্যালয়টি যাহাতে শীঘ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় সেজন্য গ্রামবাসীরা বিশেষ আগ্রহান্বিত। তাঁহাদের উদ্যোগে এখানে একটি সাধারণ গ্রন্থাগারও স্থাপিত হইয়াছে। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়। এ কারণ, যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা তথা হাওড়ার এত নিকটে থাকিয়াও এ গ্রাম নিতান্ত 'গ্রাম'ই রহিয়া গিয়াছে। বিখ্যাত অহল্যাবাঈ সড়ক (Old Benaras Road) এই গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে ইহা যানবাহন চলাচলের একেবারে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বিধানসভার স্থানীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় যুব-কর্ম্মীদের চেষ্টা-উদ্যোগে এই সুপ্রাচীন রাস্তাটির সংস্কার-কার্য্য সুরু হইয়াছে। এই রাস্তার সংস্কার সাধিত হইলে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের যানবাহনের ভিড় অনেকটা কমিয়া যাইবে।

পূর্ব্বে জগদীশপুরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া সরস্বতী নদী বহমান ছিল, এখন নদী বলিতে এক রকম কিছুই অবশিষ্ট নাই। খরস্রোতা সরস্বতী বর্ত্তমানে একটি সরু নালায় পরিণত হইয়াছে। ইহা আবার কচুরীপানায় পূর্ণ। শুনা যায়, পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বেও সরস্বতী নদীতে বিস্তর বড় বড় নৌকা মালপত্র লইয়া স্থানান্তরে যাতায়াত করিত। রেল লাইন হইবার আগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ইহাই ছিল একমাত্র উপায়। পার্শ্ববর্ত্তী বাইগাছি গ্রামের নিকট দিয়া একটি খাল প্রবাহিত ছিল, বালীখালের সঙ্গে ইহা মিলিত হয়। কলিকাতায় ক্রীত মালপত্র এ পথেও নৌকাযোগে আনা-নেওয়া চলিত। নদী-নালা হাজিয়া-মজিয়া যাওয়ায় জগদীশপুর অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ স্বতঃই বাড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে সরকার প্রদত্ত ডি-ডি-টি'র দৌলতে ম্যালেরিয়া প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এখানে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ একটি কেন্দ্র খুলিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করেন। সপ্তাহে তিন দিন কেন্দ্রটি খোলা থাকে এবং এক শত সোয়া শত রোগী বিনামূল্যে ঔষধপত্র প্রাপ্ত হয়। পানীয় জলের অভাব বেশ অনুভূত হয়। তিনটি মাত্র নলকূপ এই অভাব নিরাকরণে একেবারেই অ-যথেষ্ট। আরও অধিক নলকূপের প্রয়োজন এখানে রহিয়াছে। এ অঞ্চলের যুবক ও তরুণদের জনকল্যাণে আগ্রহ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

৩

যে জন্যে আমরা গিয়াছি, এখন সেই কথায় আসা যাক্। জগদীশপুরে এই শীতকালে চক্ষু-হাসপাতালের কাজ চলিতেছে আজ চার বৎসর। প্রতিবারেই রোগীর সংখ্যা কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে। এবারে উনিশ জন রোগীর ছানি কাটানো হইয়াছে। ষ্টেশনের পিছনেই স্কুল। এই স্কুলের দুইটি প্রকোষ্ঠ জুড়িয়া এই সকল 'বেড'। সাত জন পুরুষ ও বার জন নারী রোগী। জগদীশপুর ইউনিয়ন এবং আশপাশের গ্রামসমূহ হইতেই অধিকাংশ আসিয়াছেন। তবে ১০।১২ মাইল দূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতেও কেহ কেহ আসিয়াছেন। কলিকাতার সন্নিকট দমদম হইতে একজন আসিয়া চোখ কাটাইয়াছেন শুনিলাম। পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, খড়-বিচালি পুরু করিয়া তাহার উপর বিছানা পাতা। এবারে শীতের প্রকোপ অন্য বারের চেয়ে অনেকটা বেশী। হাসপাতাল-কর্ত্তৃপক্ষ উদ্যোগী হইয়া রেড ক্রশ হইতে উনিশ জন রোগীর জন্য বাইশখানা কম্বল সংগ্রহ করিয়াছেন। ঔষধেরও ব্যবস্থা অনেকটা রেড ক্রশ হইতেই হইয়াছে। হৃদয়বান ডাঃ শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য অন্য অন্য বৎসরের মত এবারও বিশেষ যত্ন সহকারে ছানি কাটিয়াছেন, এবং প্রত্যেকেরই অবস্থা ভাল জানিলাম। আমরা প্রত্যেকটি রোগীর কাছে গিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। রোগীরা বেশ সুস্থ। বোর্ডে কখন কার ডিউটি বা শুশ্রূষার সময়, এবং কে 'ডিউটি' দিবেন প্রত্যহ সকালে বা বিকালে তাহা ইহার উপরে লিখিয়া রাখা হয়। আমরাও এইরূপ লেখা দেখিলাম। সকালে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে রোগীদের পথ্যাদিরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে। কাহারও বাড়ী হইতে খাবার আসে, দূরের রোগীদের এখান হইতেই পরিবেশন করা হয়।

অস্ত্রোপচার সুযোগ্য চিকিৎসক অনাদিবাবু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন করিয়াছেন। এখানে মনে স্বতঃই আবার একটি প্রশ্ন জাগে। কলিকাতার হাসপাতালে, বা বাড়ীতে অথবা কোন ডাক্তারের নিজস্ব চেম্বারে চক্ষুর ছানি কাটাইতে দেখি কি বিরাট আয়োজন। দাঁত পাটিকে পাটি তুলিতে হইবে, প্রস্রাব পরীক্ষার হাঙ্গামা আছে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিতে হয়। আরও কত কি? একজন রোগীর ছানি কাটাইতে হইলে কত রকমের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কতখানি হায়রানি তার অন্তঅবধি নাই। একজন এতাদৃশ বিপদগ্রস্ত রোগী আমাদের সঙ্গী ছিলেন। চোখের ছানি কাটাইতে গিয়া চার মাস ঘর-হাসপাতাল করিতে হয়; ইহার পর তিনি সুস্থ ও সক্রিয় হইয়াছেন। চোখের ছানি কাটা সহজ শুনিতে পাই। কিন্তু উপরোক্ত উদ্যোগ-আয়োজন-প্রক্রিয়াদি সত্ত্বেও আমার দুই জন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছানি কাটাইতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তাঁহাদের একজন পরলোকে, দ্বিতীয় এখনও স্বল্পদৃষ্টি লইয়া কোনক্রমে কালযাপন করিতেছেন। কিন্তু পল্লীর পরিবেশে প্রতি বৎসর এই যে বহুসংখ্যক রোগীর চক্ষুর ছানি কাটাইয়া পুরাপুরি সাফল্যলাভ করা গিয়াছে তাহাতে এই কথাই কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না—উক্তরূপ উদ্যোগ-আয়োজনের ও কড়াকড়ির সার্থকতা কতটুকু? অথবা সার্থকতা আদৌ আছে কি? অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট হইতে ইহার যথাযথ উত্তর পাইলে একটি জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-কার্য্যও সহজ এবং দ্রুত গতিতে চলিতে পারে।

অপরাহ্নে একটি সভার আয়োজন হইল। ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সভাপতি এবং শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এল-এ, প্রধান অতিথি। পল্লীর নর-নারী-শিশু সমবেত হইয়াছিলেন। জগদীশপুরের সাধারণ অবস্থা, পরিবেশ এবং বিশেষ করিয়া চক্ষু-হাসপাতালের কার্য্য সম্বন্ধে হাসপাতাল কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত



ডাঃ শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য

যতীন্দ্রনাথ দাস একটি বিবৃতি দিলেন। হাসপাতাল-সম্পৃক্ত কথার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। সভায় দুইটি বৃদ্ধা মহিলা আসিয়াছিলেন, এক জনের বয়স চুরাশি এবং অন্য জনের পঁচাত্তর। তাঁহারা উভয়েই জগদীশপুর অস্থায়ী চক্ষু-হাসপাতালে পূর্ব্বে ছানি কাটাইয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। ইঁহাদের এক জনের আরোগ্যলাভের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। পূর্ব্বে তিন বার শহরের বড় হাসপাতালে তাঁহার চোখে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল, কিন্তু আরোগ্যলাভ করেন নাই। চতুর্থ বারে একরূপ জোর করিয়াই জগদীশপুরের অস্থায়ী হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়া চোখের ছানি কাটান। এবারে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন, দৃষ্টিশক্তি তাঁহার আয়ত্তে। তিনি আমাদের নিকট নিজ কাহিনী ব্যক্ত করিলেন।

সভায় যথারীতি সঙ্গীত, ভাষণাদি হইল। ব্রতচারী নৃত্য ভাল লাগিল। তবে বিভিন্ন ভাষণের মধ্যে একটি কথাই বার বার অনুরণিত হইতেছিল, ডাঃ আশুতোষ দাসের দরদী সেবাপরায়ণতা। আমাদেরই মহাপ্রভুর কথা—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'। ডাঃ আশুতোষ দাস নিজ আচরণ দ্বারা পল্লী-অঞ্চলে সেবাপরায়ণতার যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা উপ্ত হইয়া খানিকটা লোকচক্ষুর গোচরে আসিয়াছে। সেই কচি সেবা-তরুকে যথাযথ জলসেচন দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্যে সহায় পল্লীবাসীরা—বিশেষতঃ উদ্যোগী তরুণেরা, 'আশু-দা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত সেবাদল, আর জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলি। 'জনকল্যাণ-ব্রতী' সরকারকেও আমরা বাদ দিতে পারি না। তাঁহারা আগাইয়া আসিলেই হয়। সভাশেষে একটি বালিকা 'রাজপুত্রের জন্য ভানুমতী অপেক্ষমাণা' এই মর্ম্মের গান গাহিলেন। শহরের 'রাজপুত্র' কি পল্লীবালিকার কণ্ঠনিঃসৃত 'ভানুমতী'র আহ্বান শুনিবে না?



ভারতের উদ্যান

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

২

পল্লী-অঞ্চল : মালাবার উপকূলের পল্লীশ্রী ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পল্লী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ত্রিবাংকুর-কোচিনের পল্লীদৃশ্য অপূর্ব্ব সুন্দর। ভারতের অন্যত্র সুবিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলের মাঝে মাঝে ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয় গ্রাম বা মৌজা নামে পরিচিত। দস্যু-তস্করের উপদ্রব এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা পল্লীর জনগণকে পরস্পরের নিকটে বাস করিতে বাধ্য করিত। ইহাতে আপৎকালে আত্মরক্ষার সুবিধা হইয়া থাকে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের পল্লীতে ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ী কোথাও নাই। পার্ব্বত্য অঞ্চল ব্যতীত রাজ্যের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে নিঃসঙ্গ জন-নিবাস। প্রচুর বারিপাত ও ভূপৃষ্ঠের অসমতার ফলে স্বাভাবিক জলসরবরাহ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে, স্থল ও জলপথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য লোকের বাড়ী দূরে দূরে থাকা সম্ভব হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত বাস্তুভিটা এই রাজ্যের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নিয়মিত হউক অথবা অনিয়মিত হউক, বাড়ী কখনও পথের ধারে নির্ম্মাণ করা হয় না; কোন নিয়ম না মানিয়া বাড়ীগুলি এলোমেলো ভাবে পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বত্র ছড়ানো রহিয়াছে ছবির মত। প্রতিটি বাড়ী, দীনতম কুটীর পর্য্যন্ত, মূল্যবান গাছগাছড়ায় পরিবেষ্টিত স্বীয় হাতার মধ্যে অবস্থিত।

শাসন বিভাগ : এই রাজ্য ত্রিবান্দ্রম, কুইলন, কোট্টায়াম ও ত্রিচুড় এই চার জেলায় বিভক্ত। ইহারা দক্ষিণ হইতে উত্তরে পর পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। রাজ্যের তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগ প্রত্যেক জেলাতেই রহিয়াছে। কিন্তু উপকূলের সমভূমি, পাহাড় অঞ্চল, ও পার্ব্বত্য ভূমির পরিমাণ সকল জেলায় সমান নহে। ত্রিবান্দ্রম জেলা আমাদের নদীয়া জেলার সমান। বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমার সমান ত্রিচুড়। কুইলন বর্দ্ধমান জেলার সমান। বৃহত্তম জেলা কোট্টায়ামের আয়তন চব্বিশ পরগণার অর্দ্ধেক। জেলা ও জেলার সদরের নাম অভিন্ন। প্রত্যেক জেলা কয়েকটি তালুকে বিভক্ত। তালুক আমাদের মহকুমার অনুরূপ রাজস্ব ও শাসন বিভাগ। কুইলনে তালুকের সংখ্যা ১২, অপর তিন জেলায় ৮টি করিয়া তালুক।

জন-পরিচয় : ১৯৫১ সনের লোকগণনা অনুসারে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের লোকসংখ্যা ৯২,৮০,৪২৫। আয়তন হিসাবে ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে এই রাজ্যের স্থান আঠারটি রাজ্যের পর, কিন্তু জনসংখ্যায় ইহার স্থান একাদশ। বসতির ঘনতায় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের স্থান প্রথম। রাজ্যের ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১,০১৫, পশ্চিমবঙ্গের ঘনতা হইতে ২০৯ বেশী। ভারতের গড় ঘনতা ২৮১। দিল্লী রাজ্যের ঘনতা যদিও ৩,০১৭, তথাপি উহার সহিত অন্য রাজ্যের তুলনা করা ঠিক হইবে না। কারণ দিল্লী রাজ্য প্রধানতঃ রাজধানী দিল্লীর পৌর অঞ্চল লইয়া গঠিত। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের প্রতিবেশী মাদ্রাজ রাজ্যের ঘনতা মাত্র ৪৪৬। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে জনসমাবেশের নিবিড়তা উপলব্ধি করা যায় ভারতের জনবহুল অঞ্চল ও ভারতের বাহিরের ঘন-বসতি দেশের সহিত তুলনায়। বৃহত্তর বোম্বাইয়ের শিল্পাঞ্চলের ঘনতা ১৩,৪৫৬, পশ্চিম-বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের ঘনতা ৯৩৬, উত্তরপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের সমতল ক্ষেত্রে ঘনতা ৮৫০, উত্তর বিহারের সমতল ক্ষেত্রে ৮৩৯। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ঘনতা ৭৫৪, বেলজিয়ামে ৭৩৩ এবং জাপানে ৫৩০। এই রাজ্যের রক্ষিত বনাঞ্চল বাদ দিয়া হিসাব করিলে ঘনতা দাঁড়ায় প্রতি বর্গমাইলে ১,৮০০।

জনবিন্যাস ও ঘনতা : এই রাজ্যের ভূসংস্থান বৈচিত্র্যময় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার। ইহার ফলে জন-বিন্যাস ও ঘনতায় বিস্তর প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছে।

রাজ্যটি নিম্নভূমি, মধ্যভূমি ও উচ্চভূমি, এই তিন ভাগে বিভক্ত। রাজ্যের আয়তনের ১৮ শতাংশ নিম্নভূমি কিন্তু সেখানে জনসংখ্যার ৪৩·৫ শতাংশ লোকের বাস। এই নিম্নাঞ্চলের ঘনতা ২,৪৪৮। মধ্যাঞ্চলে ভূমির পরিমাণ নিম্নভূমির দ্বিগুণ, লোক রাজ্যের জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ, ঘনতা ১,৩৮১। উচ্চভূমি রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া আছে, সেখানে ৬·৫ শতাংশ লোক বাস করে এবং ঘনতা মাত্র ১৪৭।

নিম্নভূমিতে জন-বহুলতার কারণ সহজেই অনুমেয়। উহার জলবায়ু সমভাবাপন্ন, ভূমি অনায়াসে কর্ষণযোগ্য এবং জল মৎস্যপূর্ণ। নারিকেল বাগান ও নারিকেল গাছ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য এবং মৎস্যাঞ্চল বহু লোকের কর্ম্মসংস্থান করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে জল ও স্থলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা সকল সময়েই উত্তম। জলবায়ুর প্রভেদ যেখানে অজ্ঞাত, জীবনযাত্রা সহজ, অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, যেখানে শিল্পালয়ের অবস্থান এবং যাতায়াতের সুবিধা বর্ত্তমান সেই অঞ্চলে লোক গিসগিস করিবে বৈকি।

মধ্যভাগের ভূমি উর্ব্বরা হইলেও জনগণের প্রধান খাদ্য ধান কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় উৎপাদন করা সম্ভব। টেপিয়োকা এখানে প্রচুর জন্মে বটে, কিন্তু উহা লোকের সাধারণ খাদ্যের পরি-পূরক মাত্র। খাদ্য সমস্যা এ অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা সীমায়িত করিয়া রাখিয়াছে। এখানে রাজ্যের অর্দ্ধেক লোক থাকিবার কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের রকমারি ও প্রাচুর্য্য। এখানকার মৃত্তিকা ও জলবায়ু বাণিজ্যিক শস্য গোলমরিচ, আদা, কাজুবাদাম, গন্ধতৃণ ও নারিকেল চাষের উপযোগী। সাম্প্রতিক কালে এই অঞ্চলের

রাস্তাঘাটেরও উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। গমনাগমনের সুবিধা নিম্নাঞ্চল হইতে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় লোক আকর্ষণ করিতেছে।

উচ্চ ভূমির অধিকাংশ নিবিড় অরণ্যাবৃত। মাত্র বার শতাংশ ভূমি কর্ষণাধীন। উহার বেশীর ভাগে চা, এলাচি প্রভৃতি বাগান। সুতরাং এখানকার জনসংখ্যা অল্প হওয়া স্বাভাবিক।

দেখা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে রাজ্যের জনবিন্যাসে বৈষম্য বিস্তর। নিম্নভূমিতে লোকের চাপ অত্যন্ত অধিক। গড় ঘনতা ২,৪৪৮; কিন্তু কোন কোন তালুকের ঘনতা ২,৫০০ হইতেও বেশী। এই অঞ্চলে কোন তালুকের ঘনতা ২,০০০-এর কম নাই। এরূপ জনবহুল পল্লী-অঞ্চল ভারতের অন্যত্র অথবা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

লোকবৃদ্ধির হার: পঞ্চাশ বৎসরে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের লোক প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বৃদ্ধি ইহা অপেক্ষা অধিক। ১৯৪১-১৯৫১ দশকে এই রাজ্যের বৃদ্ধির হার ছিল ২৩·৭৪ শতাংশ; সুতরাং বার্ষিক বৃদ্ধি ২·১২ শতাংশ। দিল্লী বাদে ভারতে মহীশূর ও বোম্বাইয়ের লোকবৃদ্ধির হার প্রায় এই রাজ্যের সমান। উদ্বাস্তু ও ভারতীয় বহিরাগতের প্রবল চাপ সত্ত্বেও পঞ্চাশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৫৮·৭ শতাংশ অর্থাৎ দেড় গুণের কিছু বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে উদ্বাস্তুর ভিড় নাই; রাজ্যের লোকের বহির্গমন ও বাহিরের লোকের আগমন প্রায় সমান। সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরে এই রাজ্যে লোকের আড়াই গুণ বৃদ্ধি স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি কৃত্রিম। ১৯৫১ সনে যে দশক শেষ হইয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের লোক বাড়িয়াছে ১৩·৬ শতাংশ, বার্ষিক বৃদ্ধি ১·৩ শতাংশ; পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনগণের বৃদ্ধি এক-শতাংশেরও কম।

বৃদ্ধির কারণ: ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ক্রমাগত মাত্রাতিরিক্ত লোকবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ডাঃ নায়ার কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের সম্পদ সীমাবদ্ধ; কয়েকটি অঞ্চলে অতি অল্পকাল পূর্ব্বে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে; কৃষিই জনগণের প্রধান অবলম্বন, কিন্তু জনপ্রতি ভূমির পরিমাণ অল্প এবং ক্রমশঃ উহা হ্রাস পাইতেছে। অলাভজনক জোত, ঋণের বোঝা, স্বল্প পুঁজি জনবৃদ্ধির অনুকূল আর্থিক স্বচ্ছলতার ভাব হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারে না। এরূপ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে লোকবৃদ্ধির অন্তরায়। বৃদ্ধির কারণ তবে কি? ডাঃ নায়ার বলেন, 'দীর্ঘকাল ধরিয়া লোক যে উচ্চ হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার কারণ মনে হয়—(১) নারীদের মাতৃত্বের উচ্চ হার; (২) অধিক সন্তানধারণক্ষম বয়সে বিবাহিতা নারীর সংখ্যাধিক্য; (৩) জনগণের সুবিদিত পরিচ্ছন্নতা; (৪) জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্রমাগত উন্নতি এবং (৫) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।'

১৫ হইতে ৪৪ বৎসর বয়স্কা ১,০০০ নারীর শিশু (৫ ও তাহার নীচে) সন্তানের সংখ্যা এই রাজ্যে ৬৪৭, জাপানে ৫৭৭, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮৭, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স ৩৯০। নারীদের সন্তানধারণের এরূপ উচ্চ ক্ষমতা রাজ্যের লোকবৃদ্ধির সূচক। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা মাতৃত্বের হার এখানে ঢের বেশী উচ্চ।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের জননীদের শতকরা ৫৬ জন প্রথম মা হইয়াছেন ২০ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে; শতকরা ৯৪ জন মা হইয়াছিলেন ২৫ বৎসরের মধ্যে; ৩০ বৎসর বয়স না হইতে মা হইয়াছেন শতকরা ৯৯ জন।

এই রাজ্যে নিঃসন্তানা নারী বিরল। ৪৫ ও ততোধিক বৎসরের নারীদের শতকরা মাত্র তিন জন নিঃসন্তানা। অনূঢ়া নারীও বিরল; ৪৫ বৎসর বয়সে অনূঢ়াদের সংখ্যা শতকরা মাত্র তিন জন।

এই সকল তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মাতৃত্বের উচ্চ হার, যৌবনের সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই বিবাহিতা নারীদের বহু সন্তানের জননী হওয়া এবং অনূঢ়া ও নিঃসন্তানা নারীদের সংখ্যাল্পতা এই রাজ্যে দ্রুত লোকবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

মৃত্যুর উচ্চ হার লোকবৃদ্ধির পরিপন্থী। মৃত্যুর আধিক্যের দরুন ১৯২০ সন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে জন্মের অনুপাতে লোকবৃদ্ধি হইতে পারে নাই। মৃত্যুর হার, বিশেষতঃ শিশুমৃত্যুর হার, হ্রাসের জন্য ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজসরকার বহুকাল যাবৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। স্বাস্থ্যনীতির প্রচার, ভ্রাম্যমাণ শুশ্রূষাকারিণী নিয়োগ, ম্যালেরিয়া-নিবারণ প্রচেষ্টা, শিশুমঙ্গল ও দুগ্ধ-বিতরণকেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যালয়ে খাদ্যব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পল্লীতে জল-সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে প্রচুর সাহায্য করিতেছে। সম্প্রতি হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচলনের ফলে শিশুচর্য্যার উন্নতি ঘটিয়াছে। সরকারের ক্রমাগত চেষ্টায় শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল বয়সেই মৃত্যুর হার কমিয়া গিয়াছে।

এই রাজ্যে বাড়ী মিলিয়া পাড়া গড়িয়া উঠে না। দুই বাস্তুভিটার মাঝে থাকে ফলের বাগান ও খামার। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষার সহায়ক। সংক্রামক ব্যাধির দ্রুত প্রসারের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীর দূরত্ব ও মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষবাটিকা। বাড়ীর আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা মালয়ালীদের অভ্যাস। প্রত্যহ অন্ততঃ একবার স্নান আর ঘন ঘন কাপড়কাচা ইহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। পরিচ্ছন্নতা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি পালন এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক মহামারী এই রাজ্যে দেখা দেয় না। দুর্ভিক্ষের অভাবের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। লোকবৃদ্ধির প্রধান বাধা দুইটি এখানে নাই, কোন সময় ছিলও না।

পুরাতন সংস্কার এবং সনাতন প্রথা ও আচার হইতে উদ্ভূত সামাজিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি এই রাজ্যের লোকবৃদ্ধির অনুকূল।

জন্ম-মৃত্যুর মত বিবাহও যেন অপরিহার্য। বিবাহ ও সন্তানের লালনপালন প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দায়িত্ব পালনে আর্থিক সক্ষমতা বা অক্ষমতার প্রশ্ন বিবাহের বেলা একেবারেই উঠে না। বন্ধ্যাত্ব নিন্দনীয়, মাতৃত্ব প্রশংসনীয়। জীবনযাত্রায় দৈব প্রভাবের প্রাধান্য স্বীকার এক শোচনীয় ব্যাপার। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ দৈবাধীন, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। এই জীবনদর্শন অনুসারে 'মুখ দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।' সুতরাং সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে পিতা-মাতার ভাবনা নাই। এই প্রাচীন মত যাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা এখনও নগণ্য।

বর্ত্তমান হারে যদি অবাধে লোকবৃদ্ধি হইতে থাকে তবে ১৯৬১ সনে রাজ্যের লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ১,১১,৩৩,০০০ জন। রাজ্যের শতকরা ৮৪ জন পল্লীবাসী। একে চাষের জমির অনটন, তাহার উপর উচ্চ হারে লোকবৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার মান নিম্নাভিমুখী হইতে হইতে সাধারণ মানের নীচে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বহু উচ্চশিক্ষিত যুবককে এখন ঘোর দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পৌরাঞ্চলে কর্ম্মহীনতার সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় অনুপার্জ্জকদের শতকরা ২০ জন কর্ম্মের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ১৫ হইতে ২৪ বৎসর এবং শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত। পৌরাঞ্চলের কর্ম্মাভাব এই রাজ্যেই সর্ব্বাধিক। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া যুবকদিগকে উপার্জ্জনের নূতন পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও বিপদের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

কালক্ষেপ না করিয়া জন্মশাসনের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ডাঃ নায়ারের মতে সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জোর প্রচার চালানো হইবে প্রথম কাজ। নৈতিক প্রশ্নের তর্কবিতর্কে যোগ না দিয়া একথা বলা যায় যে, দারিদ্র্য ও পরিবারে আব্রুর অভাব জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণাদি ব্যবহারের প্রধান বাধা। ব্রহ্মচর্য্য পালনে যে আত্মসংযম প্রয়োজন অনেকেরই তাহা নাই। সুতরাং জন্মনিরোধ বা ব্রহ্মচর্য্য লোকনিয়ন্ত্রণের কার্য্যকর পন্থা নহে।

জনগণনার প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের জননীদের শতকরা ৯৪ জন মা হইয়াছেন তাঁহাদের ২৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে। শিশুদের শতকরা ৯৫ জন এই সকল মায়ের সন্তান। বিশ বৎসর বয়সের পরে প্রথম মা হইয়াছেন জননীদের শতকরা ৪৪ জন। মোট শিশুর শতকরা ৪০ জন এই জননীদের সন্তান। পঁচিশের কম বয়সে অধিকাংশ নারীর জননী হওয়া উচ্চ-হারে লোকবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং নারীদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ২০ ধার্য্য হইলে লোকবৃদ্ধিতে ফলপ্রদ বাধার সৃষ্টি হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে যে সকল নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে ডাঃ নায়ার তাহাদের উল্লেখ করিয়া সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জনগণের অধিকাংশ কৃষিজীবী। তাহাদের খামারের গড় আয়তন লাভজনক নহে। জীবিকানির্ব্বাহের নিম্নতম মানের নীচে তাহাদের জীবনযাত্রার মান। কৃষির উন্নতিদ্বারা মুশকিলের অনেকটা আসান করা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, মৃত্তিকা ও শস্যের উপযোগী সার এবং উন্নত ধরনের বীজ ফসল বৃদ্ধি করিতে পারে। জল-সেচের সুব্যবস্থায় এক-ফসলী জমি দো-ফসলী বা তিন-ফসলী জমিতে পরিণত করা সম্ভব। বর্ত্তমান শিল্পের উন্নতিসাধন ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা কর্ম্মসংস্থানের প্রধান উপায়। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হইবে। সমস্যা ভারতের সর্ব্বত্র এক হইলেও উচ্চ-হারে লোকবৃদ্ধি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে।

উপজীবিকার ধারা: মোট জনগণের শতকরা ৫৫ জন কৃষি-জীবী ও ৪৫ জন অকৃষিজীবী। ভারতে ইহাই কৃষিজীবীর নিম্নতম এবং অকৃষিজীবীর উচ্চতম হার। শিল্পবহুল পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী শতকরা ৫৭ ও অকৃষিজীবী ৪৩ জন। এই হার হইতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন শিল্পে অগ্রণী। প্রকৃত কথা এই, রাজ্যের অতি অল্পসংখ্যক লোক সুসংবদ্ধ শিল্পালয়ে কর্ম্মরত আছে। শতকরা ৪৫ জন অকৃষিজীবীর ২১ শতাংশ কৃষি ব্যতীত অন্য উৎপাদনে, ৭ শতাংশ ব্যবসায়ে, ৩ শতাংশ পরিবহণে এবং অবশিষ্ট ১৪ শতাংশ শিল্প, ব্যবসায় ও পরিবহন ব্যতীত অন্যান্য চাকরি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। শিল্পজীবিগণ সাধারণতঃ শহরের অধিবাসী। এই রাজ্যে শহরের বাসিন্দা শতকরা মাত্র ১৬ জন এবং পল্লীবাসী ৮৪ জন। এই ৮৪ জনের ৬১ জন কৃষিজীবী ও ৩৯ জন অকৃষিজীবী। কৃষিজীবীদের ৩৭ শতাংশ কৃষিমজুর। ইহারা সম্পূর্ণ ভূমিহীন নহে, কিন্তু ভূমির পরিমাণ অল্প বলিয়া ভূমির আয় অপেক্ষা মজুরিতে উপার্জ্জন অধিক। কৃষিমজুরের হারও এই রাজ্যে সর্ব্বাধিক।

গ্রামবাসী অকৃষিজীবীদের অর্দ্ধাংশ কৃষি ব্যতীত অন্যপ্রকার উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত। চা, কফি, রবার, এলাচি, কাজুবাদাম, তাল, সুপারি ও নারিকেল প্রভৃতির বাগানের কাজ এই উৎপাদন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল প্রাথমিক শিল্পে নিযুক্ত লোক ও মৎস্যজীবীদের দ্বারা এই রাজ্যের অকৃষিজীবীর হার স্ফীত হইয়াছে।

কৃষি: মোট ভূমির ৪৮ শতাংশ কর্ষণাধীন। প্রতি লোকের ভাগে পড়ে ৩০·৪ শতাংশ জমি। এক পরিবারের লোকসংখ্যা গড়ে সাড়ে পাঁচ জন। সুতরাং প্রতি পরিবারের জমি ১ একর ৬৭ শতাংশ।

কর্ষণাধীন ভূমির ভাগ দুইটি, ধানের জমি আর বাগানের জমি। দো-ফসলী জমির হিসাব ধরিয়া প্রতি পরিবারের জমির পরিমাণ ৬১ শতাংশ ধানের জমি ও ১ একর ১৯ শতাংশ বাগানবাড়ি।

কর্ষণাধীন ভূমির শতকরা ৩৩·৬ ভাগে ধান, ৩·১ ভাগে অন্য খাদ্যবীজ, ২৯·৫ ভাগে বীজ ব্যতীত অন্য খাদ্যশস্য, তৈলবীজ ২৩ ভাগে, পশুর খাদ্য ১·৫, চা, কফি ইত্যাদি ৮·৫ ও অন্যান্য ০·৮।

এক-তৃতীয়াংশে ধান, অন্য খাদ্যশস্যের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং তৈল বীজ, চা ইত্যাদির জন্য অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ কর্ষিত হয়। খাদ্য-শস্য হিসাবে টেপিয়োকার স্থান দ্বিতীয়। দরিদ্র জনগণ ইহার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। চুবড়ি আলু, মিঠা আলু ও অন্যান্য কন্দ সর্ব্বত্র জন্মে। নিম্নাঞ্চলে ও মধ্যাঞ্চলের উপত্যকায় প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয়। নানাবিধ কলা, আম, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস প্রভৃতি ফল রাজ্যের সকল অঞ্চলেই প্রচুর। ধানের জমি ছাড়া অন্য জমিতে পাঁচমিশালি ফসল উৎপন্ন করা হইয়া থাকে।

একর প্রতি ধান ১৪-১৫ মণ, নারিকেল সাড়ে পাঁচ হাজার এবং টেপিয়োকা প্রায় ৮০ মণ জন্মে। গড়ে প্রতি পরিবারের আয় ধানে ১৪৫৲, নারিকেলে ৮৫৬৲ ও টেপিয়োকায় ৩০০৲। ধানের মণ ১৫৲, নারিকেলের শ' ১৬৲ এবং টেপিয়োকার মণ ৪৲ ধরিয়া উপরের হিসাব করা হইয়াছে। চাষের ব্যয় ও রাজস্ব বাদে প্রতি পরিবারের আয় দাঁড়ায় ৪০০৲ হইতে ৯০০৲ টাকার মধ্যে। কৃষিজীবী পরিবারের গড় আয় ৬০০৲ ধরাই সঙ্গত। অতি কষ্টে সংসার চলে। ঋণের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। সার, ভাল বীজ, ও হালের গরুর টাকার অভাব। সুতরাং কৃষি অতি নিম্ন স্তরে নামিয়া আসিয়াছে।

পরিবার ও বাড়ী : পূর্ব্বে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ও নায়ারদের সম্পত্তি অবিভাজ্য ছিল। বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করা ছিল সাধারণ নিয়ম। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সম্পত্তি বণ্টন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর হইতে বাড়ীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৯৫১ সনে প্রতি বর্গমাইলে ২৩২টি বাড়ী ছিল।

পৌরাঞ্চলে প্রতি বাড়ীর চারধারে আছে গড়ে ৮৪ শতাংশ জমি। ত্রিবান্দ্রম জেলার গ্রামাঞ্চলে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গড়ে ৭৬ শতাংশ, কুইলনে ৯৭ শতাংশ, কোট্টায়াম জেলায় ১ একর ২৬ শতাংশ এবং ত্রিচুরে ৫৬ শতাংশ ভূমি রহিয়াছে। লোক যে পৃথক ভূমিতে বাড়ী করিয়া বাস করিতে ভালবাসে এই হিসাবে তাহারই প্রমাণ মিলে।

সাত জনের অধিক লোক লইয়া গঠিত পরিবার ৩১ শতাংশ এবং এই সকল পরিবারে ৪৮ শতাংশ লোক বাস করিয়া থাকে। শহরে বড় পরিবার আরও বেশী। পূর্ব্বযুগের একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙা এখনও শেষ হয় নাই।

নারী ও পুরুষ : গণচিত্রে নারী ও পুরুষের হার একটি প্রধান বিষয়। সামাজিক এবং আর্থিক সমস্যার উপর উহার প্রত্যক্ষ প্রভাব। জন্মমৃত্যুর হার, বিবাহের হার এবং লোক গমনাগমনের পরিমাণ ও দিক স্ত্রীপুরুষের হার প্রভাবিত করে এবং উহারা আবার ঐ হারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। তুলনায় পুরুষ অনেক বেশী হইলে বুঝিতে হইবে বিবাহের হার নিম্ন এবং বাহিরের শ্রমিকের আমদানি অধিক। নারী বেশী হইলে তাহাদের বিবাহের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। মেয়েদের মৃত্যুর হার কম বলিয়া যেখানে নারী অধিক সেই সমাজে মৃত্যুর হার নিম্ন। প্রতি হাজার পুরুষে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে নারী ১,০০৮। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও কচ্ছে এই রাজ্যের মত পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক।

শিক্ষা : শিক্ষায় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ভারতে অগ্রণী। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে রাজ্য সরকার শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। প্রথমে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ইহাতে বালক-বালিকাগণ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে থাকে।

সরকারের উদার ও প্রগতিশীল নীতির ফলে প্রতি বৎসর বহু-সংখ্যক সরকারী ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ১৯৫১ সনে মোট জনসংখ্যার ৪৫·৮ শতাংশ চিঠিপত্র লিখিতে-পড়িতে পারিত। পাঁচ বৎসরের অধিক বয়সের লোকদের ৫৩·৮ শতাংশ লেখাপড়া জানিত। পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের হার শতকরা ২৪·৫ জন। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে লিখিতে-পড়িতে জানে ১৭·৭ শতাংশ। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ঐ হার ৪৪·৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের পৌরাঞ্চলে লেখাপড়া-জানা লোক ৪৫·২ শতাংশ; ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ৫১·৩ শতাংশ।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের সাক্ষরদের মধ্যে পুরুষের ৯৩ শতাংশ এবং নারীর ৯৬ শতাংশ শুধু লিখিতে-পড়িতেই সক্ষম। পুরুষদের অবশিষ্ট ৭ শতাংশের ৫ শতাংশ স্কুলের মধ্যমান পর্য্যন্ত শিক্ষা, ১ শতাংশ কলেজের শিক্ষা এবং ১ শতাংশ বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। শিক্ষিতের হার উচ্চ বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উর্দ্ধে উঠিয়াছে অতি সামান্য অংশ। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে শিক্ষা শহরে সীমাবদ্ধ নহে; পল্লী ও পৌরাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষিতের হারের প্রভেদ মাত্র ৬ আর পশ্চিমবঙ্গে ঐ প্রভেদ ২৮। ধনের মত বিদ্যাও পশ্চিমবঙ্গের শহরেই কেন্দ্রীভূত।

আধুনিক শিক্ষায় নারীগণ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। নানা বৃত্তি ও জনসেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদিগকে দেখা যায়।

কুইলন জেলা পর্ব্বত ও অরণ্যসহ আয়তনে বর্দ্ধমান জেলার সমান, কিন্তু লোক বর্দ্ধমান জেলা অপেক্ষা সোয়া আট লক্ষ অধিক। সেখানে সর্ব্বপ্রকারের "স্কুলের সংখ্যা ১৮,৫০ এবং বিদ্যার্থীর সংখ্যা ৫,১৬,০০০ অর্থাৎ জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ। জেলার তিনটি কলেজে ছাত্র-ছাত্রী মোট তিন হাজারের কিছু বেশী। এই জেলায় শিক্ষিতের হার—পুরুষদের ৬৮, নারীর ৪৬। বর্দ্ধমানের ছয়টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ৭,৫৭৩; ১,৬০৯টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ১১৭,৪৩৮ এবং শিক্ষিতের হার গ্রামে ১৭·৪৭, শহরে ৩৮·৯৮।

কুইলন জেলায় মুদ্রণালয়ের সংখ্যা ১০৯। প্রাত্যহিক কাগজ ২, সাপ্তাহিক কাগজ ১৩ এবং মাসিক পত্র ৩২ এই জেলায় প্রকাশিত হইতেছে। সকল পত্র ও পত্রিকাই চলতি রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ ও আলোচনার জন্য অধিক স্থান দিয়া থাকে। শিক্ষার হারের উচ্চতা এবং সংবাদপত্র পাঠের প্রায় সর্ব্বজনীন অভ্যাসের জন্য এক জেলায় ৪৭টি কাগজ থাকা সম্ভব হইয়াছে।

রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন বেশ জোরালো। কুইলন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৬৯টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুইলন শহরে একটি জেলা লাইব্রেরী এবং দুইটি তালুকে লাইব্রেরী আছে। সরকার সাহায্য দান করিয়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিয়া থাকেন। কুইলনের বিবরণ হইতে রাজ্যের শিক্ষার রূপ ও প্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রিবান্দ্রমে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাষা : রাজ্যের প্রায় ৮৮ শতাংশ লোকের ভাষা মালয়ালম। তাহার পর যথাক্রমে তামিল, কঙ্কনী, তেলুগু, কানাড়ি প্রভৃতি ভাষার স্থান। মালয়ালম মালাবার উপকূলের প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের ভাষা। তামিল অপেক্ষা মালয়ালমে সংস্কৃতের প্রভাব অধিক।

ধর্ম : ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে হিন্দু শতকরা ৬১, খ্রীষ্টান ৩০ ও মুসলমান ৭।

নগর ও শহর : নগর ও শহরের সংখ্যা মোট ১০৩, তন্মধ্যে ত্রিবান্দ্রম ও আলেপ্পি নগর। অন্য ২৩টি শহরে পৌর প্রতিষ্ঠান আছে। রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম। বৃহত্তম শহররূপে ইহার প্রাধান্য প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শাসন-কেন্দ্র বলিয়া ইহার ক্রমাগত উন্নতিতে কোন দিন ছেদ পড়ে নাই। ১৯০১ সনে ত্রিবান্দ্রমের আয়তন ৯'৮৯ বর্গমাইল ও ঘনতা ৫,৮৩৫ হইতে ১৯৫১ সনে আয়তন ১৬'৯৮ বর্গমাইল এবং ঘনতা ১১,০০৯-এ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরে আয়তন ৭২ শতাংশ এবং লোক ২২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহরে বাসগৃহের সংখ্যা ১৯০১ সনে ছিল ৯,৮৪৬; ১৯৫১ সনে ২৫,২৩২। প্রতি বাড়ীতে ১৯০১ সনে বাস করিত গড়ে ৫'৮৮ জন লোক, ১৯৫১ সনে ঐ সংখ্যা হইয়াছে ৭'৪১। দেখা যায় আয়তন বাড়িয়াছে, লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে বাসগৃহ বাড়ে নাই।

জনবহুলতা সত্ত্বেও ত্রিবান্দ্রম উচ্চাঙ্গের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা একটি অতিশয় স্বাস্থ্যকর অঞ্চল। পর পর কয়েকটি পাহাড় ও উপত্যকা ঘিরিয়া নগরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। বার মাসই জলবায়ু মনোরম। জলের ব্যবস্থা উত্তম, চব্বিশ ঘণ্টা কলের জল পাওয়া যায়। বিজলি বাতি ও ধুলিমুক্ত পথ নগরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে।

ত্রিবান্দ্রম আবাসিক শহর, শিল্প-প্রাধান্য ইহার নাই। নগরের উপকণ্ঠে রবার, টাইটেনিয়াম, বস্ত্র শিল্পালয় প্রভৃতি কয়েকটি কারখানা আছে বটে, কিন্তু শিল্পায়নের পীড়াদায়ক উপসর্গসমূহের একটিও এখানে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজ রাজধানীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

দ্বিতীয় নগর আলেপ্পি প্রধানতঃ শিল্প শহর। সমুদ্রোপকূল অরণ্যমুক্ত করিয়া করিয়া রাজা কেশবদাস ইহার পত্তন করেন ১৭৬২ সনের কাছাকাছি। অদূরবর্তী কাদামাটির চলমান চড়ার উপরের শান্ত জলের সুবিধার জন্য আলেপ্পি বারমেসে বন্দর। ইহাকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভেনিস বলা হইয়া থাকে। নগরটি হ্রদ ও সাগরে প্রায় পরিবেষ্টিত। বহু খাল ইহাকে খণ্ডিত করিয়াছে। বন্দরের বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,০০০ ফুট। এখানকার বাতিঘরের আলো ১৬ মাইল দূর হইতে দেখা যায়। ১৯০১ সনে সাড়ে তিন বর্গমাইল হইতে ১৯৫১ সনে আয়তন হইয়াছে সাড়ে বার বর্গমাইল। লোকবৃদ্ধির পরিমাণ ১০৭ শতাংশ এবং ঘনতা ৯,৩০১। আলেপ্পির প্রধান শিল্প নারিকেলের ছোবড়ার আঁশের দ্রব্যাদি ও নারিকেল তৈল। ছোবড়ার সুতলি ও আঁশের দ্রব্য রপ্তানীর ব্যাপারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দর আলেপ্পি। এখানে একটি ক্ষুদ্র জৈন মন্দির আছে। আলেপ্পির ৮ মাইল দক্ষিণে আম্পালা পুঝার শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটিকে বলা হয় দাক্ষিণাত্যের দ্বারকা।

কুইলন মালাবার উপকূলের প্রাচীনতম বন্দরসমূহের অন্যতম। ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে মালয়ালম প্রবাদে, 'একবার যে দেখেছে কুইলন, দেশে ফিরতে চায় না তার মন।' বন্দরে চড়া পড়ায় আর কোচিন ও কালিকটের অভ্যুত্থানের ফলে পর্তুগীজদের আগমনের পূর্ব্বেই কুইলনের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা একটি কর্ম্মচঞ্চল শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

উৎসব : মালয়ালীদের জাতীয় উৎসব ও-নাম ভাদ্র-আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বলি ও বামনের পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া মালাবার উপকূলের জাতীয় উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাবলী নামক রাজার আমলে কেরল ছিল ধনধান্যপূর্ণ রামরাজ্য। বামনরূপী বিষ্ণু যখন রাজা মহাবলীকে পাতালে গমনের আদেশ দেন, তখন মহাবলী বৎসরে এক দিন তাহার প্রিয় কেরালা দেখিয়া যাইবার বর লাভ করেন। রাজার শুভাগমন উপলক্ষে এক মাস ব্যাপী উৎসব চলে মালয়ালীদের মধ্যে। বৈশাখে নববর্ষের বিষুব উৎসব। কার্ত্তিকের দীপালী প্রধানতঃ তামিলীদের দীপোৎসব। হিন্দুদের থিরুবাথিরা উৎসব পৌষ মাসে। মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের পর্ব্বদিনে তাহাদের উৎসব অনুষ্ঠীত হয়। ইহা ছাড়া মন্দির ও গীর্জ্জার বিশেষ বিশেষ উৎসব স্থানীয় জনগণের জীবন আনন্দমুখর করিয়া তোলে।

কিংসলি ডেভিস ভারতের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে গেলে শুধু 'তম' প্রত্যয় ব্যবহার করিতে হয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের বেলায়ও এই কথা খাটে। ভারতের দক্ষিণতম ভূভাগ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য। দক্ষিণাপথের সুন্দরতম অঞ্চল ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রচার এখানে হইয়াছিল। অর্থলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী জাতির প্রথম আস্তানা হয় এই রাজ্যে। ভারতীয় ভাষায় প্রথম পুস্তক এখানে মুদ্রিত হয়। কৃষি ভূমিতে সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন-ক্ষমতা এখানে, অথচ কৃষিজীবীর হার নিম্নতম। সুসংবদ্ধ শিল্প কম হইলেও ভারতের মধ্যে অকৃষিজীবীর হার সর্ব্বোচ্চ। উচ্চতম জন্মের হার এবং উচ্চতম শিক্ষার হার ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে।

যদুর শাশুড়ী

শ্রীসুভাষ সমাজদার

হরি বল—হরি বল, চারডা ভিক্ষা পাই মা—ভাঙা গলার একটা চীৎকার শোনা গেল শ্রীনাথ সরকারের উঠানের এক কোণে। প্রত্যেক সোমবারে সকালে যেমন আসে, তেমনি ভিক্ষে নিতে এসেছে যদুর শাশুড়ী। তার ছোট ছোট দুটো চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শীর্ণ মুখখানায় অজস্র রেখা পড়েছে। ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে গলার চামড়া। আবার উঁচু গলায় হেঁকে বলল—চারডা ভিক্ষা পাই মা। কৈ কোন জনমনিষ্যি নাই নাকি?—দুটো চোখের সুতীব্র দৃষ্টিটা সন্ধানী আলোর দীর্ঘ রশ্মির মত ঘুরিয়ে নিল রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, শোবার ঘরের বারান্দায়। ত্রস্ত পায়ে সে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে এল। সতর্ক চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। ঝাঁ ঝাঁ করছে বৈশাখের দুপুর। দূরে আমগাছের মাথায় একটা ক্লান্ত কাক ককিয়ে মরছে। চোখের পলকে ধাঁ করে একটা পদ্মফুলি কাঁসার বাটি তুলে নিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথার তৈরী ভিক্ষের ঝুলিতে ভরে ফেলল। জোর-পায়ে আবার উঠানে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভক্তিতে গদগদ কণ্ঠে বলল—হরি বল—হরি বল, সবই গোপালের ইচ্ছা—চারডা ভিক্ষা পাই মা। কৈ কেউ নাই নাকি?

—এ কি, তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ? তা তোমার কি বাপু ভিক্ষের সময় অসময় নেই?—স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁঝিয়ে বলল শ্রীনাথের মেয়ে সৈরভী—একটু সকাল সকাল আসলেই পার—

হা আমার কপাল—কপালে একটা চাপড় দিয়ে বলল যদুর শাশুড়ী—এ কি তোমাগো এউক্কা বাড়ী মা? সব বাড়ীতেই ত যাইতে হইবো—

—আচ্ছা, যদুর শাশুড়ী, তোমার জামাই যদু এস. ডি. ও-র চাপরাশী। ভাল মাইনের সরকারী চাকরি। কিন্তু তার শাশুড়ী হয়ে তুমি ভিক্ষে কর কেন বল ত?

—সে দুঃখের কথা, আর কি কমু মা! যদু কি আমারে ছাখে! আমার মাইয়ার ত ঠ্যাকারে মাটিতে পা-ই পড়ে না। যদু আমারে চিনবার পর্য্যন্ত পারে না মা—যদুর শাশুড়ীর চোখদুটো জলে ভরে এল। কিসমিসের মত মস্ত একটা আঁচিল-বসানো নাকটা একটু কুঁচকে নিয়ে সে বলল—আমি ভিক্ষা কইরাই প্যাট চালাই মা। আমার গোপালরে খাওয়াই—

—গোপালটা কে আবার? নিজে পায় না খেতে, আবার ডাকে শঙ্করাকে—

—ঐ নাটু বোরাগীর মা-মরা ছেলেটা আমার বড় স্তাওটা। ওকে আমিই মানুষ করি মা—যদুর শাশুড়ীর বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। সৈরভী বুঝতে পারে নি ত? ভাঁড়ারঘর থেকে এক মুঠো চাল নিয়ে এল সৈরভী।

—না, না মা চাল নয়। তোমাগো ক্ষ্যাতের ত অনেক পটল ছাখতেছি, ঐ দুগা দাও—

—আ মাগী, জ্বালালে দেখছি—বলে বিরক্ত হয়ে কয়েকটা পটল, দুটো আলু তার হাতে দিল সৈরভী। চোখের পলকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল যদুর শাশুড়ী।

চকভবানীর খোয়া-ওঠা রাস্তা দুপুরের রোদে তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে দমকা হাওয়ায় লাল ধুলোর ঘূর্ণি প্রেত-ছায়ার মত অবয়ব নিয়ে উঠতে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই আগুন-ঝরা রোদ মাথায় করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে যদুর শাশুড়ী। তার কালো কালো অজস্র দাগ-ধরা ফাটা-ফাটা পায়ের গোড়ালি দুটো ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে রাস্তার মুখ-উঁচু হয়ে-ওঠা খোয়াগুলো।

—এই দেখ, মাগী কি রকম ফোঁটা-তিলক কেটেছে রে—নসা বিশ্বাসের বাড়ীর আমগাছের নীচে পাড়ার জনকয়েক ছেলেছোকরা বিড়ি ফুঁকছিল। তাদের ভেতরে গুঞ্জন উঠল।

—একদম পয়লা নম্বরের চোর বুড়ী, কিন্তু মুখে সব সময় হরি বলো, হরি বলো—

—হ্যাঁ, ওর চোখের সামনে যা পড়বে, ঘটি, বাটি, থালা, এমন কি খড়ের আটি কি গরুর দড়ি পর্য্যন্ত থাকলে ছোঁ মেরে তুলে নেবে—

—এই চোর—এই—গোরুর দড়ি চোর—তাদের মধ্যে একজন উৎসাহী ছোকরা হেঁকে বলে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে বুনো মোষের মত লাল চোখ করে ঘুরে দাঁড়াল যদুর শাশুড়ী। রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। পুরুষের মত করে ছাঁটা খাড়া খাড়া চুলগুলো বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল—আমি যদি চোর হই, তবে হে ভগমান আমার মুখে যেন পোকা পড়ে। আমি যেন কানা হইয়া যাই—থুথু জমে উঠল তার ঠোঁটের কোণে কোণে। হো হো করে হেসে উঠল ছেলের দল। টিপ্পনী কেটে কে যেন বলে উঠল—আহা কি সতী সাবিত্রী রে—

—তোগো মুখে পোকা পড়বো, হাতে কুড়িকুষ্ঠি হইবো। এত মিছা কথা বলস না—নিরুদ্ধ ক্রোধে, অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল যদুর শাশুড়ী—থাম যদুকে কইলা, হাকিমকে দিয়া তোগো হাজত খাটাইমু—

আবার একটা হাসির হর্‌রা ছুটল ছোকরাদের ভেতরে। মাথার

কাপড়টা টেনে দিয়ে বিড় বিড় করে বকতে বকতে দুঃখহরণের বাড়ীর মোড়ে মিলিয়ে গেল ষষ্ঠুর শাশুড়ী।

এ সব গা-সওয়া হয়ে গেছে ষষ্ঠুর শাশুড়ীর। শহরের সবাই জানে তার হাতটানের দোষ আছে। ও ভিক্ষে করতে কোন বাড়ীতে এলেই গৃহস্থের বৌঝিদের চোখেমুখে আতঙ্কের কালো ছায়া পড়ে। নসা বিশ্বাসের মুখরা বৌটা ত সেদিন মুখের ওপর বলেই দিল—তুমি ভিক্ষে কর কেন গা? তুমি ত হাতসাফাই করেই খেতে পার—নসার বৌয়ের সেই তীব্র শ্লেষভরা কথা তার কানের কাছে বাজতে লাগল। হঠাৎ তার মনের কোণে কঠিন একটা ধিক্কার তাল তাল কাদার মত জমা হ'ল। নিজের বলতে ত তার কেউ নেই। এক পয়সাও সঞ্চয় নেই তার। কিন্তু গোপালকে একটু ভালমন্দ খাওয়াতে মন চায়। কেন, সেই পরের ছেলেকে ভাল করে দুটো খাওয়ানোর জন্য এই অপবাদের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া? ঐ নাটু বৈরাগীর ছেলে বড় হলে তাকে কি দেখবে, না তার শেষ সময়ে মুখে জল দেবে? গোপালের কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ তার বুকের শিরাউপশিরায় টান পড়ে। মনে হয় শরীরটা টলছে। না, না কেউ জানে না, নাটু বৈরাগীর ছেলে ত নয়, ও যে তার গোপাল। ওর সেবা মানেই দয়াল হরির সেবা। তা না করলে তার যে চলবে না—অকস্মাৎ মনের কোণের তীব্র বেদনা ফোটা ফোটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল তার দু'চোখ বেয়ে।

কৈ রে গোপাল—অ গোপাল বাবা আমার কোনে গেলি রে—মালোপাড়ার ধারে ঠেকা-দেওয়া নড়বড়ে ছোট্ট কুঁড়েঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে ডাকল ষষ্ঠুর শাশুড়ী তার গোপালকে। কিন্তু গোপালের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু—অমর মোক্তারের বিশাল পটলক্ষেতের বাঁশচিতার বেড়ার ওপার থেকে দুপুরের নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে দিয়ে ডাহুক ডেকে উঠল।—আর পারি না বাপু! হয় ত ছোড়া নিশ্চয় কৈবর্ত্তপাড়ার ছোড়াগো সাথে ডাংগুটি খেলায় মাইতা গ্যাছে—ক্লান্ত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ষষ্ঠুর শাশুড়ী ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ল। কাঁধ থেকে ভিক্ষার ঝুলিটা নামিয়ে বারান্দার ওপর উপুড় করে ফেলল। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল ভিক্ষে-করা চাল, তিন-চারটে ডাঁশা পেয়ারা, গোটাতিনেক কাঁচা আম আর সেই পদ্মফুলি কাঁসার বাটিটা। হঠাৎ চকিত চঞ্চল চোখে চারিদিকে তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে গেল। জানালাহীন সে ঘরখানায় দিনের বেলাতেও ঘন অন্ধকার। ত্রস্ত হাতে আঁচলে বাঁধা কি একটা জিনিস খুলে ঘরের এক কোণে মুগের ডালে ভর্ত্তি ঘটির ভেতরে রেখে দিল। থর থর কাঁপছে তার সর্ব্বাঙ্গ। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল কপালে। তার বুকের ওপর দিয়ে যেন রেলগাড়ীর চাকা চলে যাচ্ছে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে।

—দিদিমা, ও রাঙাদিদি—দুপুরের আগুনের হল্কার মত হাওয়ায় ভেসে উঠল কচি গলার একটা ডাক। উঠানে এসে দাঁড়াল নাটু বৈরাগীর সাত আট বছরের ছেলে কানু। ষষ্ঠুর শাশুড়ীর বড় আদরের গোপাল। একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল। বড় বড় দুটো কালো চোখে অস্থির চঞ্চলতা। অধৈর্য্য হয়ে আবার চীৎকার করে উঠল কানু—ও রাঙাদিদি, কোথায় গেলি?

—কৈ আয়, আয়, আইছিস—ষষ্ঠুর শাশুড়ী দু' বাহু বাড়িয়ে ব্যাকুল উল্লাসে ছুটে গেল তার দিকে। কানুর একতাল ননীর মত কোমল দেহটা সে বুকে চেপে ধরল। গভীর মমতাভরা গলায় অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, ওরে আমার গোপাল রে! তোরে এক-দণ্ড না দেখলে আমার বুকের ভিতরডা ফাইটা যায়—

—তা ফাটুক—আদরের চোটে ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে কানু বলল, এখন ছেড়ে দে রাঙাদিদি। পেয়ারা আম খাই—তার দৃষ্টিটা আটকে গেছে কাঁচা আমের দিকে। চোখ দুটো লোভের আভায় ঝকমক করছে।

—ছাইড়া দিমু, কিন্তু একটা চুমা দে আগে গোপাল, আব্দারের মত বলল, ষষ্ঠুর শাশুড়ী। কানু গাল পেতে দিল। শুকনো বেগুনী ঠোঁট দুটো অধীর আবেগে তার গালে চেপে ধরে দীর্ঘ চুম্বন করল ষষ্ঠুর শাশুড়ী। আদরভরা কণ্ঠে বলল, গোপাল বড় হইলে, আমারে ছাইড়া চইলা যাবি না তো?

—না যাবো আবার কোথায়? আমাকে তোর মত লিচু, আম, দুধ কে খাওয়াবে? তুই কত ভাল দিদি—

—আমি খাওয়াই বইলাই বুঝি ভাল?

—যারা খাওয়ায় না তারা কখনও ভাল হয়—বলল কানু। তার দুটো ডাগর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। সে আবার বলল, এই আম, পেয়ারা কে দিয়েছে দিদি?

—ঐ ঘোষপাড়ার নিবারণের মেয়ে বকুল।

—দিয়েছে না চুরি করে নিয়ে এসেছিস—পেয়ারা খেতে খেতে বলল কানু—কৈবর্ত্তপাড়ার ফৈনা কিন্তু বলছিল, তোর দিদিমা একটা মাস্তুম চোর—

—তুই খাইতেছস খা, তোর অত দরকারডা কি শুনি?—বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ষষ্ঠুর শাশুড়ী। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে হঠাৎ রুখে উঠে চীৎকার করে বলল, ঐ ফৈনার মা চোর, ওর বাপ চোর, চোদ্দগুষ্টি চোর—রাগে দুপদাপ করে পা আছড়ে উঠোনের বাঁশের উপর থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে স্নান করতে গেল ষষ্ঠুর শাশুড়ী।

জব্বর একটা ছবি এসেছে মাইরি—চার পয়সার একটা স্পেশাল মিষ্টি পান মুখে দিয়ে আবেশে চোখদুটো আধবোজা করে যদু বলছিল যুধিষ্ঠির ঠাকুরকে—ঠাকুর যাও, যাও, দেখে এস। চিরটা কাল ত পয়সা গুনেই মরলে—

কালো কুচকুচে গোঁফের ডান দিকটায় একটু পাক দিয়ে যুধিষ্ঠির ঠাকুর বলল, কে আছে, পত্রলেখা না লহনা দেবী?—তার চন্দনের ছোপ-দেওয়া কপালটা অকারণে একটু কুঁচকে উঠল। যদু কিন্তু পানের দোকানের বড় আয়নাটায় নিজের প্রতিকৃতিটা দেখছিল মনোযোগ দিয়ে। পরনে তার হাকিমের ব্যবহার-করা পুরানো একটা জীর্ণ ফুলপ্যান্ট, গায়ে সবজেটে রঙের খাকী জামা। প্যান্টটা

তার মোটেই 'ফিট' করে নি। কেমন বেমানান, বেঢপ দেখা যাচ্ছে ওকে। পায়ে পুরানো টায়ার-কাটা স্যাণ্ডেল। আয়নার গায়ে ফুটে উঠেছে তার গর্ব্বিত জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। সে হাকিমের চাপরাশী বলেই শহরের সব দোকানদারের সঙ্গে ভারিক্কি চালে কথা বলে। কম দামে জিনিস আদায় করে। নিজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। মোটা থ্যাবড়া নাকটা কুঁচকে বলে, শালারা সব স্যাষ্টিক্। এমন নোংরা থাকে সব ইষ্টপিডের দল! কোঁচকানো চোখে আরও কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল যদু—কি জানি বাবু, কোন্‌টা তোমার পত্রলেখা আর কোন্‌টা লহনা। টকির সুন্দরীদের সবাইকেই ত আমার ভাল লাগে। যেন আশমান থেকে খসে পড়েছে এক-একটা তারা—লোমহীন ভ্রূ-দুটো নাচিয়ে দাঁত মেলে হেসে যদু আবার বলল, আমি হাকিমের 'ফ্রিরি' পাসে দেখি কি না, এই জন্যেই বেশী যাই না। নিত্যি নিত্যি মাংনা টকি দেখলে 'পেসটিস' থাকে না বুঝলে ঠাকুর—

—যদু! রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাইকেল থেকে পা নামিয়ে সেকেণ্ড নাজির সুনীল ডাকল—এ দিকে একটু শোন ত শীগগির—

কে নাজিরবাবু? মুহূর্ত্তে যেন একেবারে বদলে গেল যদু। ভয়ে, বিনয়ে, শ্রদ্ধায় সে যেন ভেঙে পড়ল। ঘেঁডিয়ে ঘেঁডিয়ে হেসে বলল, কি খবর বাবু এত রাত্রে? কোন বিপদ-আপদ হয় নি ত?

দেওয়ানী আদালতের মাঠের এক কোণে নিরালায় দাঁড়িয়ে চাপা কাতর গলায় বলল সুনীল নাজির—যদু, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! আপিসে তুমি ত আমার কাছে অনেক উপকার পেয়েছ। এবার তুমি আমাকে—

কি হয়েছে খুলেই বলুন না বাবু। আপনার কথায় আমি মাঘ মাসের রাত-দুপুরে একগলা জলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি—

—আমার ছোট মেয়েটার বালা চুরি হয়েছে যদু। আমার স্ত্রী বলছিল, তোমার শাশুড়ী অফিসার-ব্যারাকে ভিক্ষে করতে গিয়েছিল আজ সকালে। সেই সময় টুনি ব্যারাকের মাঠে খেলছিল। আমার স্ত্রীর ধারণা, তোমার শাশুড়ীই তার হাত থেকে বালা খুলে নিয়েছে। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখবে যদু?

কি? আমি চেষ্টা করব না, বলেন কি! যদি ও মাগী নিয়ে থাকে তবে বালা আপনি ঠিক পাবেন বাবু—হিংস্রতায় দপ দপ করে উঠল যদুর লাল চোখ দুটো। দাঁতে দাঁত ঘষে আবার বলল, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু ওর হাতটানের দোষ গেল না। ও আমার একটা 'পেসটিজ' নষ্ট করে দিল বাবু। আসুন আমার সঙ্গে।

ঘন অন্ধকারে চকভকানীর রাস্তার দু'ধারে অজস্র ঝাপড়া আম-কাঁঠাল গাছগুলি আরও এক ছোপ নিকষকালোর ইঙ্গিত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাঢ় নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারিদিক। যদু আর সুনীল ভারী জুতোর খট খট শব্দ তুলে জোর পায়ে চলেছে বুড়ীর বাড়ীর দিকে। হঠাৎ যদু বলল, কথা কি জানেন বাবু, বুড়ী লোক খারাপ নয়। ঐ নাটু বোষ্টমের ব্যাটাটার জন্যই চুরি-টুরি করে। ঐ বাচ্চাটা বুড়ীর চোখের মণি। নাটু ত দিব্যি গাঁজা-ভাঙ খেয়ে পাড়ায় পাড়ায় কীর্ত্তন গেয়ে বেড়ায়। ছেলে পালার দায় থেকে বেঁচে গিয়ে সে খুব আনন্দেই আছে—

বুড়ীর বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল তারা। এ কি? তারা এ কাকে দেখছে? যদুর শাশুড়ী না আর কেউ? বারান্দার এক কোণে একটা কুপি জ্বলছে। তার সামনে দেবীমূর্ত্তির মত জোড় আসনে বসে আছে যদুর শাশুড়ী। ফটফটে ফরসা থান কাপড় তার পরনে। কপালে, গলার খাজে চন্দনের তিলক। ডান হাতের দু'আঙলের ফাঁকে ধীরে ধীরে চক্রাকারে ঘুরছে জপের মালা। যদু আর স্থির থাকতে পারল না, জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে দাঁত কড়-মড় করে চাপা গলায় বলল, সব বুজরুকি, বুড়ীর হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি—টায়ারের চটি ফট-ফট করে ঝোলাঝাপ্পা প্যাণ্ট-পরা যদু হঠাৎ একটা যমদূতের মত বুড়ীর সামনে দাঁড়াল। চীৎকার করে উঠল বুড়ী—তুমি কিয়ের লাইগা আইছ অসময়ে—

শোন—কঠিন পাথরের মত গলায় বলল যদু—তুমি আমাদের নাজিরবাবুর মেয়ের বালা চুরি করেছ। ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও বলছি। না হলে তোমাকে—

—তোর মুখ খইসা পড়বো। তোর পিঠে পাঁচমুখো ঘা হইবো মুখপোড়া—আকাশ কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠে দাঁড়াল বুড়ী। আগুন ঝরছে তার দুটো চোখে। মাথার কাপড় খসে গেছে। শুকনো দেহ থর থর করে কাঁপছে।

—'নাজিরবাবু' হাকিমের মত শান্ত ভরাট গলায় যদু বলল, 'আপনার টর্চ্চ বাতিটা নিয়ে এ দিকে আসুন ত—'

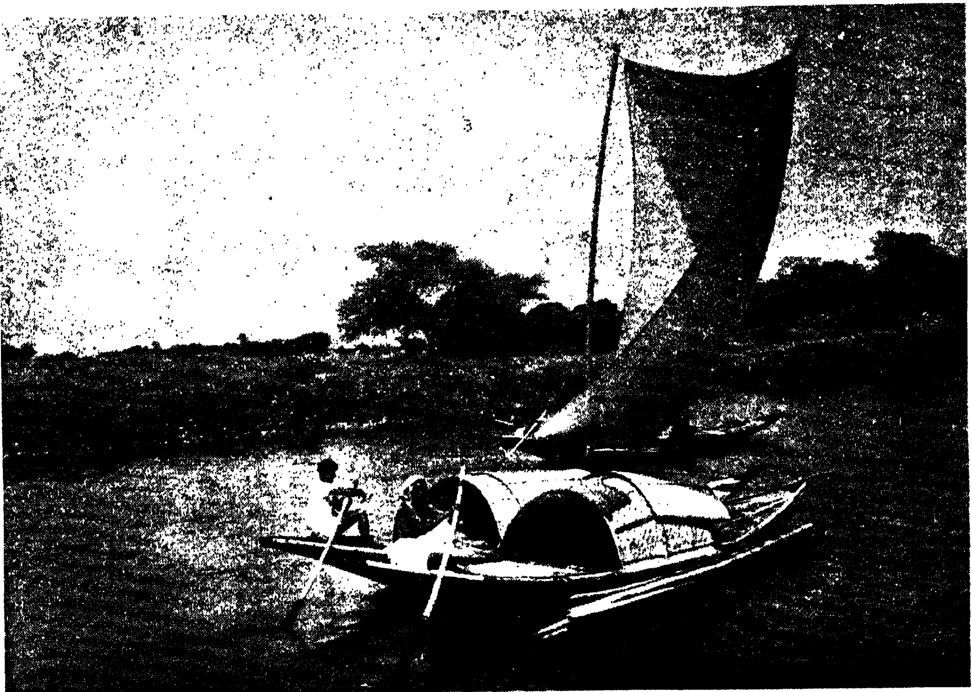
যদু বুড়ীর অন্ধিসন্ধি সবই জানে। টর্চ্চের আলোয় ঝলসে উঠল ঘরের এক কোণে একটা পেতলের ঘটি। ঘটিটা উপুড় করে ফেলল যদু। সেই রাশি রাশি ভাজা মুগের স্তূপের ভেতরে চক্ চক্ করে উঠল দুটো সোনার বালা। সেকেণ্ড নাজির সুনীল মনে মনে শহরের জাগ্রত বুড়াকালীকে প্রণাম করল। হিংস্র বাঘের মত লাফিয়ে এসে যদু বুড়ীর ঘাড়টা ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে বলল, এই বুড়ী বল, তোর গোপালকে ওর বাপের কাছে ফিরিয়ে দিবি, না ওরই জন্য ছোটলোকের মত চুরি-চামারি করে বেড়াবি?

সুনীলের পায়ের কাছে কাটা গাছের মত আছড়ে পড়ে যদুর শাশুড়ী বলল, এবারের মত মাপ কইরা দাও বাবু। আর চুরি করুম না—সে সুনীলের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বারান্দার আর এক ধারে যেখানে মাটির উপরেই কানু ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। কান্নাভরা গলায় বলল, ওর গোল গোল নরম হাতে ঐ বালা বেশ মানাইবো। তাই তোমার মাইয়ার হাতের থাইকা খুল্যা লইছিলাম বাবু—সুনীল স্থির চোখে বুড়ীর দিকে তাকাল। আশ্চর্য্য! ওর জলভরা দুটো চোখে গভীর মমতা। কিন্তু—

যদুর পাথুরে মুখে কঠিন নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। সে আবার রাগে



ভাকরা-নাঙ্গাল প্রোজেক্টের উপত্যকার (জলাধার এলাকার) একটি দৃশ্য



জলপথে

[ফোটো—শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়



মাদাম সান ইয়াৎ-সেন (সুং চিং লিং)



আগ্রাদুর্গের মোতী মসজিদে সৌদি আরবের রাজা ইবন সৌদ

দের গর করতে করতে বলল, ওর গোপালকে না সরালে, ও আবার চুরি করবে নাজিরবাবু।—ঘুমন্ত কানুকে চিলের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বলল, আপনি বাড়ী যান। আমি ওকে ওর বাপের কাছে দিয়ে আসি। এরই জন্য ও চুরি করবে। আর আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে—ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল যত্ন। দু' হাতে বুক চেপে ধরে চীৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠল বুড়ী, ওরে তুই আমারে মাইরা ফ্যাল। আমার গোপালরে নিস না—সেই তীব্র কান্নার দীর্ঘ করুণ শব্দে নিস্তব্ধ রাত্রিটা যেন আড়ষ্ট ব্যাথায় চমকে উঠল। আকাশের অসংখ্য অপলক চোখের মত তারার দিকে তাকিয়ে বুড়ী মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে নিদারুণ অভিশাপ দিতে লাগল যত্নকে, সেকেণ্ড নাজির সুনীলকে।

একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল যত্নর শাশুড়ী। তার দুটো ঘোলা চোখে সেই চঞ্চল-চকিত দৃষ্টি নেই। ছয়-সাত মাস হ'ল, শহরের কেউ শোনে নি, যত্নর শাশুড়ী চুরি করেছে। সপ্তাহে একবার ভিক্ষে করতে বাইরে যায়। যে যা দেয়, তাই নিয়ে সে বাড়ী আসে। দুঃখে বেদনায় যেন পাথর হয়ে গেছে বুড়ী। তীব্র তীক্ষ্ণ অসহ্য একটা যন্ত্রণার পীড়নে জ্বলে যায় তার মনের ভেতরটা। কানুর সেই একরাশ ফুলের মত নরম দেহটা তেমনি করে বুকে চেপে ধরার একটা আকুল আগ্রহে সে অধীর উন্মত্ত হয়ে উঠে। তার শুধু বুক নয়, শূন্য কোলটাও হাহাকার করে উঠে। রাত্রে তার ঘুম আসে না। এক এক দিন জ্বরের ঘোরে, গায়ের ব্যাথায় ছটফট করে বুড়ী। ঘরের কালো নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে চেয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠে। নিশীথ রাত্রির বাতাসে ছড়িয়ে যায় তার করুণ বুকফাটা আর্ত্তস্বর—গোপাল রে আমার গোপাল···

যত্নর শাশুড়ীর গোপাল আবার ফিরে এল। কানু নয়, কৈবর্ত্ত-পাড়ার দক্ষ সরকারের পাঁচ বছরের ছেলে নিতাই। হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা গেল দক্ষর বৌ। বৌয়ের দুঃখকেও ছাপিয়ে নিদারুণ একটা দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল তার মন। সে একলা মানুষ। ষোল মাইল দূরে তপনে তার কর্ম্মস্থল। বৌ মরলে বৌ পাওয়া যায়, কিন্তু চাকরি একবার গেলে আর পাওয়া যায় না। ছেলেটাকে কার কাছে রেখে সে তপনে যাবে? হঠাৎ যত্নর শাশুড়ী এসে উপস্থিত হ'ল তার বাড়ীতে। ফোক্‌লা দাঁতের হাসি হেসে সে দক্ষকে বলল, তুমি চিন্তা কইরো না দক্ষ। তোমার পোলা আমার কাছে থাকবো। ইচ্ছা হইলে দু'এউক্কা টাকা পাঠাইতে পার। না পারলে, লাগব না—

সোমবারে ভিক্ষা দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট দিনে চকভবানীপাড়ার দরজায় দরজায় আবার শোনা গেল যত্নর শাশুড়ীর ভরাট গলার আওয়াজ—হরি, হরি বল, চারডা ভিক্ষা পাই মা—ফোটা তিলক কেটে কাঁধে ছেঁড়া কাঁথার ঝুলি ঝুলিয়ে সে আবার শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে প্রত্যেকটি বাড়ীতে ভিক্ষে করতে সুরু করল। তার চলৎশক্তিহীন দুর্ব্বল শরীরটায় আবার যেন কোন্ অদৃশ্য দৃঢ়তার প্রলেপ লেগেছে। তার চোখের তারায় তারায় সেই খর চাউনি দেখা গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার পাড়ার লোক তার ছুটকো ছাটকা চুরির জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল। তার পরেই একদিন পাড়ার লোক শুনতে পেল, কুঞ্জ উকিলের হেঁড়ে গলার চীৎকার—ঐ বুড়ীর বিরুদ্ধে আমি 'থেপ্ট কেস' করব। আমি ছাড়বার পাত্তর নই। ঐ বুড়ীই আমার বক্‌রি চুরি করেছে···

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আত্রাই নদীর ওপারে বাঁশবনের আড়ালে পশ্চিম আকাশে কে যেন আবির ছিটিয়ে দিয়েছে। নদীর তীরে ঝিরঝিরে বাতাসে সেকেণ্ড নাজির সুনীল হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছিল। টিলার ওপরে ননী মোক্তারের বাড়ীর দিকে পা বাড়াবে, এমন সময়ে কে যেন বলে উঠল—নাজিরবাবু, আর চাকরি থাকল না—তাকিয়ে দেখে, পেছন থেকে হাত তুলে চীৎকার করে বলছে যত্ন—জানেন বাবু, বুড়ী আবার কুঞ্জ উকিলের বক্‌রি চুরি করেছে। থানায় ডায়েরী করেছে কুঞ্জ উকিল। আর ভাল লাগে না বাবু। শালার এ সংসার ছেড়ে দেব—

—কেন, বুড়ী ত বহুদিন আর চুরিটুরি করে না—

—ও জানেন না বুঝি? ওর গোপাল যে আবার ফিরে এসেছে। দক্ষ সরকারের ছেলেটাকে পালছে। তাকে দুধ খাইয়ে মোটা করতে হবে ত? তাই বক্‌রি চুরি করেছে—

—আচ্ছা দেখ যত্ন—সুনীল বলল—তোমার শাশুড়ীর ছোট ছোট ছেলের ওপর এত মায়া কেন? ও ত একজনের মা, এক-জনের শাশুড়ী। তার সাধ-আহ্লাদ ত ভগবান পূর্ণ করেছেন—

—না বাবু—আসন্ন রাত্রির রঙে কালো বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণকণ্ঠে যত্ন বলল—বিধাতা তাকে কিছুই দেন নি। দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ওর। বিধবা হ'ল কুড়ি বছরে। একটিও ছেলেপুলে হয় নি। ও বাঁজা মেয়েলোক বাবু—

—সে কি? তা হলে তোমার বৌ?

—আমার বৌও এক জেলের মেয়ে। ছোটকালেই ওর মা-বাবা মারা গিয়েছিল। ঐ বুড়ীই তাকে মানুষ করেছিল বাবু—

নদীর ওপর দিয়ে বয়ে-আসা একটা দমকা হাওয়ার ঝলকে টিলার ওপরে শিমুল গাছটার পাতায় পাতায় সাঁ সাঁ করে কান্নার মত শব্দ বাজল। কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল বাসায় ফিরে-আসা কাকের দল। তীব্র ব্যথায় সুনীলের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তার কানের কাছে বাজতে লাগল, ঘুমন্ত একটা শিশুকে বুকে চেপে ধরে যত্নর শাশুড়ীর সেই বুকফাটা করুণ আর্ত্তনাদ। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল—ফোটা-তিলক-কাটা ভণ্ড, ছিঁচকে চোর যত্নর শাশুড়ীর আড়ালে সন্তানকামনাতুরা এক নারীর কান্নাভরা দুটো সজল চোখ।

"ঐ মহামানব আসে"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ব্রিটিশের বেয়নেটের ছায়ায় ভারতবর্ষ পড়ে আছে—একটা অতিকায় শব। বিদেশী বণিকদের অর্থগৃধ্নুতা দেশের কুটীরশিল্পগুলিকে সমর্পণ করেছে চিতাগ্নিতে। দিগন্তপ্রসারী দারিদ্র্যের গাঢ়তম অন্ধকার। অন্ধকারে বুভুক্ষু এবং অৰ্দ্ধ-উলঙ্গ যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা মানুষ, না চলন্ত নরকঙ্কাল? নিষ্প্রভ চোখে কি অন্তহীন নৈরাশ্য! অজ্ঞানের আকাশ-জোড়া ঘনকৃষ্ণ মেঘের ছায়ায় অতীতের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারকে আঁকড়ে আছে জড়পিণ্ডবৎ নরনারী। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কাছে জীবন একটা দুর্ব্বহ অভিশাপ, অস্তিত্ব অন্তহীন দুঃস্বপ্ন। ভারতবর্ষ জ্বলন্ত জতুগৃহের মতই দাউ দাউ করে জ্বলছে! লেলিহান অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হয়ে যায় জাতির স্বাস্থ্য, সম্পদ, সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব—সবকিছু! এই কি সেই সোনার ভারতবর্ষ যার অপূর্ব্ব শিল্পসম্পদ একদা রপ্তানী হ'ত সমুদ্র-পারের দেশে দেশে? এই কি সেই পুণ্যভূমি যার তপোবনের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সত্য-দ্রষ্টা ঋষিদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'ল উপনিষদের মৃত্যুহীন বাণী? এই কি সেই দেবভূমি যেখানে সুখ-সম্পদ-মায়া-মমতার বন্ধন ছিঁড়ে রাজপুত্র নেমে এসেছিলেন পথের ধুলায় মানুষকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে?

পশুর পর্য্যায়ে নেমে গেছে আর্য্য ঋষিদের বংশধরেরা। আগুনে পুড়ে যায় ভারতবর্ষ আর মনের আনন্দে বাঁশী বাজায় সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর নীরোর দল! কোথায় সেই মহামানব যিনি জীবন্মৃত জাতির কর্ণে মেঘমন্দ্রস্বরে উচ্চারণ করবেন 'উত্তিষ্ঠত', 'জাগ্রত' আর সেই মহামন্ত্র শুনে নূতন প্রাণের চঞ্চলতা আসবে তার মজ্জায়, প্রতিটি রক্তবিন্দুতে? কোথায় সেই পুরুষসিংহ যিনি নিরস্ত্র এবং নির্বীর্য্য দেশকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তার বাঁধনছেঁড়ার স্বপ্নকে করবেন ফলবান? নরসমাজে তার গ্লানি মোচন করে তাকে গৌরবের শিখরে করবেন অধিষ্ঠিত? শৃঙ্খলিত মহাজাতির নিপীড়িত আত্মার ক্রন্দনে সাড়া দিলেন করুণাময় বিধাতা। স্বর্গের বহ্নিশিখা রক্তমাংসের দেহ নিয়ে নেমে এল মাটির পৃথিবীতে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর পোরবন্দরে মাতা পুতুলীবাঈয়ের ক্রোড়ে আবির্ভূত হলেন যুগমানব গান্ধী। জাতির যুগযুগান্তের সংস্কৃতির মূর্ত্ত প্রতীক, তার আত্মার জীবন্ত বিগ্রহ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অবতীর্ণ হলেন জন্মভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত এবং রণক্লান্ত পৃথিবীকে শান্তির ও সৌভ্রাত্রের অমৃতবাণী শোনাবার জন্যে।

উনিশ বৎসর বয়সে গান্ধী বিলাতযাত্রা করলেন ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য। বিলাতের ম্লেচ্ছ আবহাওয়ার মধ্যে পাছে পুত্র চরিত্রভ্রষ্ট হয় তাই মাতার কাছে তাঁকে প্রতিজ্ঞা করতে হ'ল প্রবাসে মদ্য, মাংস এবং নারী তিনি স্পর্শ করবেন না। সত্যানুরাগী গান্ধী প্রতিজ্ঞা ভাঙেন নি। বিলাতে আইন পড়বার সময়ে ভগবদ্গীতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হ'ল। জীবনের দিগন্তে একটা নূতনতর জগতের তোরণদ্বার খুলে গেল। যে আলোর সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে এতদিন তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন গীতার মধ্যে খুঁজে পেলেন সেই বহুবাঞ্ছিত আলো। সংশয়ের অন্ধকারে ফিরে এল বিশ্বাস। গীতার মধ্যে রয়েছে তাঁর পথের আলো, জীবনের আশ্রয়, আত্মার পরম সান্ত্বনা। মুক্তির পথকে এতদিন কোথায় তিনি অন্বেষণ করছিলেন?

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধী ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে এলেন। বোম্বাইয়ে সুরু হ'ল ব্যারিষ্টারী। পশার তেমন জমল না। ইতি-মধ্যে ঘটে গেল এমন একটা ঘটনা যার কালো স্মৃতি কাঁটার মতো বিঁধে রইল তাঁর বুকে। অগ্রজ লক্ষ্মীদাসের জন্য তদ্বির করতে গিয়ে পোরবন্দরের শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের দ্বারা অপমানিত হলেন তিনি। সাহেবের চাপরাশি কামরা থেকে তাঁকে বার করে দিল। ইংরেজের এ মূর্ত্তির সঙ্গে তাঁর কোন দিন পরিচয় ছিল না। বিলাতের ইংরেজ ভারতে এলে সে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে। গোলামির বিষাক্ত আবহাওয়ায় গান্ধীর দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। আর কোথাও যেতে পারলে তিনি বেঁচে যান। মনের এই অবস্থায় অতি অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক এল আফ্রিকা যাওয়ার। প্রস্তাব তিনি লুফে নিলেন। গান্ধীকে নিয়ে জাহাজ একদিন ভিড়ল দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে। যুবক গান্ধী তখন স্বপ্ন দেখছেন—বৎসরান্তে দেশে ফিরে কস্তুরীবাঈকে নিয়ে নীড় বাঁধার স্বপ্ন। অন্তরীক্ষে বিধাতা হাসলেন। গান্ধী তখনও জানেন না, যে দেশে তিনি পদার্পণ করলেন সেখানে একুশ বৎসর তাঁকে কাটাতে হবে নিদারুণ সংগ্রামের ঝটিকার মধ্যে। ঘরের কোণে আরামে জীবন-যাপনের জন্য তাঁর জন্ম হয় নি—এ সত্য তাঁর কাছে তখনও আবৃত রয়েছে অজানার অন্ধকারে।

আফ্রিকায় উপনীত হবার কিছুদিনের মধ্যেই শ্বেতাঙ্গের হাতে গান্ধীকে দ্বিতীয় বার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ল। ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ায় চলেছেন মামলার কাজে। সঙ্গে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট। মাঝপথে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিস কালা আদমী বলে গাড়ী থেকে জোর করে নামিয়ে দিল তাঁকে। গান্ধী থার্ড ক্লাসে যেতে পারতেন, কিন্তু গেলেন না। ষ্টেশনের যাত্রীশালায় সমস্ত রাত বসে কাটিয়ে দিলেন। পাহাড়ের কনকনে শীত। চোখে ঘুম এল না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা আনাগোনা করতে

গেল। অপমান সহ্য করে তিনি আফ্রিকায় থাকবেন, না ভারতে ফিরে যাবেন? সেই রাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতায় গান্ধীর জীবনের ধারা একেবারে বদলে গেল। সেই রাত্রেই মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন: বর্ণবৈষম্যের অতিকায় দানবটাকে ধরাশায়ী করতে তাঁকে যদি আমরণ সংগ্রাম করতে হয় তাতে তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না। বিপদ দেখে গান্ধী কখনও পলায়ন করেন নি। তামসিক নিষ্ক্রিয়তা ত ক্লীবের ধর্ম্ম। বীরের আনন্দ দুঃখের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে, বাধাবিপত্তির সঙ্গে অকুতোভয়ে লড়াই করে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। বিপদ এবং দুঃখ গান্ধীর প্রাণে চিরদিন বাঁশী বাজিয়েছে।

এর পরে সুদীর্ঘ একুশ বৎসর ধরে বর্ণবৈষম্যের অসুরটার সঙ্গে চলল ঘোরতর সংগ্রাম। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় যেন-তেন-প্রকারেণ ভারতবাসীকে আফ্রিকা থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। রাতারাতি আইন তৈরি হয়ে গেল। প্রত্যেক ভারতবাসীকে মাথাপিছু ট্যাক্স দিতে হবে তিন পাউণ্ড। এত বড় অন্যায়কে নতশিরে স্বীকার করে নিতে ভারতবাসীদের রক্ত বিদ্রোহ করে উঠল। বর্ণবৈষম্যের দানবের সঙ্গে সুরু হ'ল অভিযান। অভিযানের পুরোভাগে গান্ধী। ওদিকে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের জাঁদরেল দলপতি জেনারেল স্মাটস। যেমন গান্ধী, তেমনি স্মাটস। বুনো তেঁতুল, বাঘা ওল। দু'জনে সমান একরোখা। বিদ্রোহকে দমিয়ে দেবার জন্যে স্মাটস বদ্ধপরিকর। হাজার হাজার সত্যাগ্রহী নিক্ষিপ্ত হ'ল কারাগারে। কিন্তু এত অত্যাচারেও গান্ধী নতিস্বীকার করলেন না। সত্যাগ্রহীরা ভীতির কোন লক্ষণই দেখাল না। হাজার হাজার নরনারী একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণায় যেখানে চরম দুঃখকে বরণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছে বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে, সেখানে কার সাধ্য তাদের পদানত করে রাখে?

ললাটে জয়-তিলক পরে গান্ধী ফিরে এলেন স্বদেশে। এতদিনে তিনি আপনার সত্য পরিচয় লাভ করেছেন। মনের মধ্যে আর কোন ভয় নেই, সংশয় নেই। সত্যাগ্রহের অনুপম অস্ত্রকে তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন সমুদ্রপারে দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসে। দক্ষিণ আফ্রিকায় একুশ বৎসরব্যাপী সংগ্রাম তাঁকে দান করেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁর আত্মবিশ্বাসকে করেছে সুদৃঢ়, তাঁর নৈতিক শক্তিকে করেছে অপরাজেয়, তাঁর চরিত্রকে করেছে মহিমময়। বহু তপস্যায় তিনি অর্জ্জন করেছেন একটা বিরাট জাতির নেতৃত্ব করবার অধিকার। সেই অধিকারে আজ তিনি প্রাণ খুলে বলতে পারেন তাঁর স্বদেশকে আহ্বান করে:

> "তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
> গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
> আমার জীবনে লভিয়া জীবন
> জাগোরে সকল দেশ।"

ভারতবর্ষে ফিরে এসে দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে গান্ধী গোখলের উপদেশমত বৎসরেক কাল ট্রেনের থার্ড ক্লাসে সারা দেশ পরিভ্রমণ করলেন। জীবনের ভাণ্ডারে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হ'ল। উত্তরকালে জাতিকে যিনি স্বাধীনতার দুর্গম পথে পরিচালিত করবেন—দেশকে সর্ব্বতোভাবে জানা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল। এর পরে চম্পারণে তাঁর ডাক পড়ল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বিহারের চাষীরা তখন জর্জ্জরিত। গান্ধী ছাড়া কে তাদের উদ্ধার করবে? দরিদ্র-নারায়ণের আহ্বানে গান্ধী বিহারে এলেন, ব্রিটিশের হুকুমের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করলেন এবং সংগ্রামে বিজয়ী হলেন। এতকালের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে চাষীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তখনও ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণতায় গান্ধীর বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ। কিন্তু সে বিশ্বাস অচিরে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ারের নৃশংস বর্ব্বরতায়। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তধারায় জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি রাঙা হয়ে গেল। সেই রক্তস্নান গান্ধীর দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় আনল আমূল পরিবর্ত্তন। তাঁর রুদ্রবীণায় বেজে উঠল অহিংস অসহযোগের সংগ্রাম-গান। সেই আহ্বানে নূতন ভারতবর্ষ যুগযুগসঞ্চিত ভীরুতাকে বর্জ্জন করে বেরিয়ে এল রাজদ্রোহের বিঘ্নসঙ্কুল পথে। গান্ধীর কাছে মৃত্যুর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জাতি তার চলা সুরু করল সেই পথে যে-পথে কালবৈশাখীর ঝড় এবং 'শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ।'

১৯৩০ সনে গান্ধী আরম্ভ করলেন ঐতিহাসিক লবণ-সত্যাগ্রহ। পদব্রজে চব্বিশ দিন ধরে চলল দুই শত বিয়াল্লিশ মাইল পরিক্রমা। পুরোভাগে গান্ধী। পিছনে সারা ভারতের আশী জন বাছা বাছা সত্যাগ্রহী। সমুদ্রতীরে ৬ই এপ্রিল ভোরে গান্ধী সুরু করলেন লবণ-আইন ভঙ্গের যুগান্তকারী অধ্যায়। আসমুদ্রহিমাচল ভূমিকম্পে যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। দূরদূরান্ত থেকে অখ্যাতনামা নরনারী এসে দলে দলে করছে কারাবরণ। আত্মবলির সে কি গরিমাময় দৃশ্য! হাজার হাজার মানুষের কাছে জীবন-মৃত্যু যেন পায়ের ভৃত্য! ইংরেজ-শাসনের বর্ব্বরতা সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করে চরমে গিয়ে পৌঁছাল। নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের মাথায় পুলিসের লাঠি পড়তে লাগল যেন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা! গান্ধী একটা নিরস্ত্র নির্বীর্য জাতির রক্তধারায় এনে দিয়েছেন পাগলামির দুরন্ত ঝড়। সেই ঝড়ে উড়ে যায় শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ভীরুতা।

১৯৪২-এর আগষ্টে স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুরু হ'ল। 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে দিগন্তরে। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয়ে গেলে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের আর থাকে কি? সাম্রাজ্যরক্ষায় কে তাকে যোগাবে লোকবল আর ধনবল? কেশর ঝাড়া দিয়ে ব্রিটিশ-সিংহ গর্জ্জন করে উঠল। ১৯৪২-এর ১০ই নবেম্বর উইনষ্টন চার্চ্চিল সদম্ভে ঘোষণা করলেন: "বৃটিশ-সাম্রাজ্যকে দেউলে করে দেবার জন্য সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীর পদ আমি গ্রহণ করি নি।" চার্চ্চিলের সর্ব্বগ্রাসী চিন্তা—বৃটেনকে

গৌরবের চূড়ায় কেমন করে সমাসীন রাখা যায়; গান্ধীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভারতের গরিমাময় ভবিষ্যৎ। ক্ষমতার মদিরাপানে উন্মত্ত চার্চ্চিল গান্ধীকে কারারুদ্ধ করলেন। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—গান্ধীর এই বাণীকে জীবনের মূলমন্ত্র করে সারা ভারতের জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপ্লবের কূলপ্লাবিনী বন্যায়। শত শত শহীদের রক্তধারায় রাঙা হয়ে গেল দেশের মাটি। সেই রক্তরাঙা পথে আবির্ভূত হ'ল স্বাধীনতার দেবতা।

স্বাধীনতা যখন নাগালের মধ্যে তখন বৃহত্তম সমস্যা হয়ে দেখা দিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। 'হয় পাকিস্থান নয় গৃহযুদ্ধ'—এই ধ্বনি তুললেন জিন্না। দিকে দিকে জ্বলে উঠল ভ্রাতৃবিরোধের সর্ব্বনেশে দাবানল। নোয়াখালি, বিহার, দিল্লী পঞ্জাব, কলিকাতা—সর্ব্বত্র সুরু হয়ে গেল নরমেধ যজ্ঞ, দিকে দিকে বইতে আরম্ভ করল রক্তের নদী।

ভ্রাতৃবিরোধের দিগন্ত-বিস্তীর্ণ দাবানল নির্ব্বাপিত করবার জন্য গান্ধী চারিদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। ভারতের অঙ্গচ্ছেদ কি কিছুতেই রোধ করা যায় না? অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন কি অবশেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে? কিন্তু ব্যর্থ হ'ল তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা। সারা জীবনের প্রিয়তম সহকর্ম্মীরা শেষ মুহূর্ত্তে ভারত-বিভাগে সম্মতি দিলেন সবাই। গান্ধী এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। দিগন্তে আলো কোথায়? আশা কোথায়? আশ্রয় কোথায়? জীবনের নিবিড়তম তমিস্রার মধ্যে প্রার্থনাই তাঁকে শক্তি দিয়েছে, আলো দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। গান্ধীর বিদীর্ণ হৃদয়ের দুঃসহ বেদনা থেকে বেরিয়ে আসে আকুল প্রার্থনা।

জীবনের এত কালের সাধনার এ কি মর্ম্মন্তুদ পরিণতি? অখণ্ড ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে দিয়ে ইংরেজ সমুদ্রপারে চলে গেল। দিকে দিকে আগুন জ্বলছে। ভ্রাতৃবিরোধের সর্ব্বনাশা আগুন। মহাশ্মশানে গান্ধী একা একা চলেছেন শ্মশানচারী মহেশ্বরের মত। সমস্ত দেশের বেদনার কালকূট পান করে গান্ধী এখন নীলকণ্ঠ। জীবনব্যাপী সাধনার ভগ্নস্তূপের মধ্যে গান্ধীর অপরাজেয় আত্মায় মানুষের প্রতি বিশ্বাস এখনও অনির্ব্বাণ। মাঝে মাঝে মনে হয়—বেঁচে আর লাভ কি? কিন্তু সে নৈরাশ্য এবং অবসাদ ক্ষণিকের। পরমুহূর্ত্তে ফিরে আসে উৎসাহের বন্যা, কর্ম্মে উন্মাদনা। কর্ম্মযোগীর কাছে জয় এবং পরাজয়, দুঃখ এবং সুখ, লাভ এবং ক্ষতি সবই সমান। ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হয়ে সে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের কল্যাণের জন্যে অকুতোভয়ে কাজ করে যাবে। সারাজীবন ধরে যিনি সংগ্রাম করে এসেছেন পর্ব্বত-প্রমাণ বাধার পর বাধার বিরুদ্ধে—পরাজয়কে কেমন করে নত শিরে তিনি স্বীকার করে নেবেন? তাই দেখি নোয়াখালিতে পরিব্রাজকের দণ্ড-হাতে গান্ধী চলেছেন একা একা দিকে দিকে শান্তির বাণী পরিবেশন করতে করতে। অন্ধতম তমিস্রার পটভূমিকায় অপরাজেয় মানবাত্মার এ কি জ্যোতির্ম্ময় রূপ! জীবনের প্রান্তে এসে গান্ধী যখন সবচেয়ে নিঃসঙ্গ তখনই শক্তির চরম শিখরে পরম মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর গরিমাময় ব্যক্তিত্ব। লুই ফিশার ঠিকই লিখেছেন:

"Gandhi now rose to supreme height."

গান্ধী আজ শুধু ভারতবর্ষের নয়, আজ তিনি সমগ্র মানব-সমাজের। পৃথিবীর দেশে দেশে বহু নরনারীর হৃদয়মন্দিরে আজ তাঁর আসন। গান্ধীর জীবনই তাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভ। কি দুর্জ্জয় সাহস! কি অপরিমেয় সত্যানুরাগ! কি অন্তহীন প্রেম! "সত্যানুরাগ, প্রেম এবং মহাবীর্য্যের" দ্বারা অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করে গেছেন! তাঁর অভিধানে ব্যর্থতা বলে কোন শব্দ ছিল না। "I am a born fighter who does not know failure"। জীবদ্দশায় এই কথাই আমাদিগকে তিনি শুনিয়েছিলেন। জীবনকে তিনি জানতেন একটা অন্তহীন সংগ্রাম বলে, সেখানে আরামের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাই দেখতে পাই সারাজীবনের স্বপ্ন যখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আকাশের প্রভাতী তারার মত যখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ তখনও তিনি সংগ্রাম করে চলেছেন অন্ধকারের শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে। নিজের উপরে বিশ্বাস হারান নি, মানুষের উপরেও নয়। মানবতা সমুদ্রের মত। সাগরের কয়েক ফোঁটা জল নোংরা হলে কি সমুদ্র তার নির্ম্মলতা হারিয়ে ফেলে? তাঁর জীবনের পানপাত্র বেদনার গরলে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। কিন্তু ক্লৈব্য তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি। দুঃখের নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে তিনি আমাদিগকে শুনিয়ে গেছেন অপরাজেয় আশার বাণী: নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।



কাশ্মীরের রাষ্ট্র-সাধনা

(১৮৭৭-১৯৩৯)

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

১৮৪৬ সনে প্রথম শিখ যুদ্ধের পর কাশ্মীরের ডোগ্‌রা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। লাহোর দরবারের সামন্ত গুলাব সিং এই রাজবংশের আদিপুরুষ। কিছুদিনের মধ্যেই ডোগরা রাজগণের অত্যাচারে কাশ্মীরবাসীর জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। ১৮৮৭ সনে কাশ্মীরের প্রথম সেটেলমেণ্ট কমিশনারের একটি মন্তব্যে দেখি যে, জল এবং বাতাস ভিন্ন অন্য সমস্ত জিনিসের জন্যই কাশ্মীরবাসীকে কর দিতে হয়। নিদারুণ করভার এবং প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈব কাশ্মীরবাসীর দুঃখ-দুর্গতির ষোলকলা পূর্ণ করিয়াছিল। ১৮৮৫, ১৮৮৮, ১৮৯২-৯৩, ১৯০০-৪, ১৯০৬-৭ এবং ১৯১০ সনে বার বার বন্যা, মহামারী এবং ভূমিকম্পের ফলে সমগ্র কাশ্মীর বিধ্বস্ত হইয়া যায়। দেশবাসীর দেহ-মন এবং সংস্কৃতির উপর এই বিপর্য্যয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে কাশ্মীরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৮৭৭ সনে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কাশ্মীরী বড়লাট লর্ড লিটনের নিকট কাশ্মীররাজ রণবীর সিংহের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। এই অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ এবং অভিযোগকারীদিগের নাম আজও অজ্ঞাত। একাধিক ইংরেজ লেখক এই সমস্ত অভিযোগের কোন কোনটি স্ব-স্ব গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। একটি অভিযোগ এই যে, মহারাজা রণবীর সিংহের আদেশে দুর্ভিক্ষের সময় বহু মুসলমান প্রজাকে উলার হ্রদের জলে ডুবাইয়া মারা হইয়াছে। এই সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ভারত সরকার এক কমিশন বসাইলেন। কিন্তু কাশ্মীরবাসী হিন্দু, মুসলমান কেহই কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে সাহস করিল না। ফলে কোন তদন্তই হইতে পারিল না।

উনবিংশ শতক শেষ হইয়া বিংশ শতক আসিল। কাশ্মীরবাসীর অবস্থা আরও শোচনীয়, আরও করুণ হইয়া উঠিল। রাজ সরকারের সমস্ত বড় বড় চাকুরি বিদেশীর একচেটিয়া। ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবীর সংখ্যাই বেশী। না রাজা, না রাজপুরুষ, কেহই জনসাধারণের সুখ-দুঃখের জন্য মাথা ঘামান্ না, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর রাখেন না।

সাধারণ মানুষ দুর্ব্বহ করভার, শোচনীয় দারিদ্র্য এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের হৃদয়হীন শোষণ ও নির্ম্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবেদন-নিবেদনে অবশেষে ভারত সরকারের টনক নড়িল। ভারত সরকার হুকুম দিলেন যে, কাশ্মীরের সরকারী চাকরিতে কাশ্মীরবাসীর দাবি অগ্রগণ্য হইবে। কিন্তু এই আদেশ বহুদিন পর্য্যন্ত সরকারী মহাফেজখানায় ফাইল-চাপা পড়িয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাশ্মীরে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাবিস্তারের সূচনা হয়। ১৯০৫ সনে স্বনামধন্যা এনি বেসাণ্ট এবং বালাকৌলের চেষ্টা ও উদ্যোগে রাজধানী শ্রীনগরে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজই এখন শ্রীপ্রতাপ কলেজ নামে পরিচিত। একই সময়ে জম্মুতেও একটি সরকারী কলেজ স্থাপিত হয়। এই দুইটি কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কাশ্মীরী তরুণগণ কাশ্মীরে আধুনিক ভাবধারা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। জাগ্রত কাশ্মীরের ইঁহারাই অগ্রদূত। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার আন্দোলনে বাংলার যুবশক্তির কার্য্যকলাপের কাহিনী এবং মিশর, তুরস্ক ও আয়ার্লণ্ডের তরুণ সম্প্রদায় স্ব-স্ব দেশের জাতীয় আন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস কাশ্মীরী তরুণ-সমাজের মনে অভিনব চেতনা সঞ্চার করিয়াছিল। এই চেতনাই কাশ্মীরের জাগরণ ঘটাইয়াছে।

জাগরণের জোয়ার সমাজের কোন এক বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই জোয়ারের স্বধর্ম্ম। তাই দেখি যে, কাশ্মীরের জাগরণের যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ও নূতন চেতনায় জাগিয়া উঠিতেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই জাগরণ প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রথমতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে সুযোগ-সুবিধা দিবার জন্য ডোগরা সরকারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সরকার প্রথম প্রথম এই অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে ১৯১৬ সনে ভারত সরকারের 'এডুকেশন কমিশনার' শার্প সাহেব কাশ্মীর সরকারের অনুরোধে সরেজমিন তদন্ত করিয়া কাশ্মীরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন। সরকার এই রিপোর্টের একটি সুপারিশও কার্য্যে পরিণত করেন নাই।

এদিকে কাশ্মীরী 'পণ্ডিত'সম্প্রদায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন। রাজসরকারের অধস্তন পদগুলিতে ধীরে ধীরে শিক্ষিত 'পণ্ডিত'গণের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নতির ব্যবস্থার জন্য রাজসরকারকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। অবশেষে ১৯২৪ সনে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন মুসলমান বড়লাট লর্ড রিডিঙের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিলেন। স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত দাবিগুলি জানানো হইয়াছিল:

১। কৃষককে জমির মালিকানা স্বত্ব দিতে হইবে।

২। মুসলমানদিগকে আরও বেশী সরকারী চাকরি দিতে হইবে।

৩। মুসলমানদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

৪। বেগার প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে।

৫। সরকারী সমবায় বিভাগের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া তাহার কার্য্যকলাপ বাড়াইতে হইবে।

৬। যে সমস্ত মসজিদ সরকারের হাতে আছে, সেগুলি মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

স্মারকলিপিতে কাশ্মীর সরকারের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগও উপস্থিত করা হইয়াছিল।

১৯২৪ সনের গ্রীষ্মকালে শ্রীনগর সরকারী রেশম কারখানার শ্রমিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শহরের আরও দু'চার জায়গায় গোলমাল হয়। সরকার কঠোর হস্তে এই সমস্ত বিক্ষোভ দমন করেন। ইহার পর উল্লিখিত স্মারকলিপিতে যে সমস্ত অভিযোগের কথা বলা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একটা লোক-দেখানো সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করা হইল। তদন্ত কমিটি অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। স্মারকলিপিতে দস্তখতকারীদিগের মধ্যে কয়েকজনকে কাশ্মীর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল।

১৯২৫ সনে মহারাজা প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরি সিং কাশ্মীরের রাজা হইলেন। তাঁহার শাসনকালে কাশ্মীরবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলের অবস্থাই পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ১৯২৯ সনের গোড়াতেই কাশ্মীরের দিকে দিকে তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সর এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় কাশ্মীর সরকারের অন্যতম মন্ত্রী। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট একটি বিবৃতিতে তিনি কাশ্মীরবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করেন। উপসংহারে তিনি বলেন যে, অবিলম্বে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন একান্তই প্রয়োজন।* কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'।

উনবিংশ শতাব্দীতে রণজিৎ সিং কর্ত্তৃক কাশ্মীরবিজয়ের পর কাশ্মীরবাসী হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও সৈন্যদলে গ্রহণ করা হইত না। ডোগরা শাসনেও এই ব্যবস্থার নড়-চড় হয় নাই। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের পথ বন্ধ। শাসনবিভাগের উচ্চতর পদগুলি মহারাজা প্রতাপ সিংহের রাজত্বকালে (১৮৮৫-১৯২৫ খ্রীঃ অঃ) পঞ্জাবী বহিরাগতগণ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী জম্মু-কাশ্মীরের শেষ রাজা হরি সিংহের রাজত্বকালে ডোগরা রাজপুতগণ প্রায় একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছিল বলিলেও চলে। মোট কথা, কাশ্মীরবাসী 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'তে পরিণত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৭৮ জনই মুসলমান। কাশ্মীর উপত্যকায় ইহাদের সংখ্যা প্রতি শতে ৯৪ জন।

শিক্ষা-দীক্ষায় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বেশ উন্নত। ইহাদিগকে পণ্ডিত বলা হয়। প্রথমতঃ পঞ্জাবী এবং পরে ডোগরা রাজপুতদিগের জন্য ইহাদের পক্ষে সরকারী চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৯২৫-৩১ সনে শিক্ষিত 'পণ্ডিত'গণ 'কাশ্মীরবাসীর জন্য কাশ্মীর' আন্দোলন নামে একটি আন্দোলনের সাহায্যে সরকারী চাকরিতে নিজেদের অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই আন্দোলন একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ইহারই ফলে সরকার 'কাশ্মীরবাসী'র সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৪৬ সনে মহারাজা গুলাব সিংহের রাজ্যলাভের পূর্ব্বে যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কাশ্মীরে বাস করিত এবং যে সমস্ত বহিরাগতের পূর্ব্ব-পুরুষ ১৮৮৫ সন বা তাহারও পূর্ব্ব হইতে কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে, আইনের দৃষ্টিতে তাহারাই 'মুল্‌কি' অর্থাৎ কাশ্মীরবাসী বলিয়া গণ্য হইল। ভবিষ্যতে 'মুল্‌কি' ব্যতীত অপর কাহাকেও সরকারী চাকরি দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পণ্ডিত সম্প্রদায়ের আন্দোলনের ফলেই সরকার এই আইন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই আইনে কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইল না। আইন পাস হওয়ার পূর্ব্বেই ডোগরা রাজপুতগণ প্রায় সমস্ত বড় বড় পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই আইনে তাহাদের আরও সুবিধা হইল।

উপরে বিংশ শতকের প্রারম্ভে কাশ্মীরের মুসলমান-জাগরণের উল্লেখ করিয়াছি। পঞ্জাবী মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রচার ও আন্দোলন এই জাগরণের প্রত্যক্ষ কারণ। মুসলিম জাগরণে সংখ্যালঘু পণ্ডিতগণ ভয় পাইলেন। সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার গরজে তাঁহারা ক্রমেই রাজসরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া উঠিলেন। ১৯৩১ সনের প্রথম দিক হইতে লাহোরের মুসলিম খবরের কাগজগুলি অনবরত সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গার করিয়া কাশ্মীরী মুসলমানদিগকে হিন্দুরাজা এবং তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। এই সমস্ত কাগজে মুসলমানদিগকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে আহ্বান করা হইল। ক্রমে মুসলমানগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক দল গঠন করিল। পণ্ডিত সম্প্রদায়ও পিছনে পড়িয়া রহিল না। এই যুগে গঠিত দলগুলির মধ্যে মুসলমানদিগের 'রিডিং রুম পার্টি' এবং পণ্ডিত সম্প্রদায়ের 'যুবক-সভা'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম নেতারা মসজিদে মসজিদে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়া হিন্দুবিদ্বেষের বিষ-বীজ ছড়াইতে লাগিলেন। কাঠ-মোল্লার দল তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ১৯৩১ সনের ২১শে জুন শ্রীনগরের খানাকা-ই-মৌলা-তে একটি মুসলমান জনসমাবেশ হয়। মহারাজার নিকট মুসলমান সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ পেশ করিবার

---

* এসোসিয়েটেড প্রেসের লাহোরস্থ আপিসের প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত বিবৃতি (১৫ই মার্চ, ১৯২৯)। সর এলবিয়ন এই বিবৃতিদানের পূর্ব্বেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

জন্য মুখপাত্র নির্ব্বাচনই এই জমায়েতের উদ্দেশ্য ছিল। নির্ব্বাচন হইয়া গেল। কিন্তু নির্ব্বাচনের পরই অনর্থের সূত্রপাত হইল। আবদুল কাদির নামে একজন বিদেশী মুসলমান—বাবুর্চিগিরি তাহার পেশা—একটি বক্তৃতা করিয়া হিন্দুদিগকে হত্যা করিবার জন্য মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিল। এই ঘটনা পূর্ব্ব-পরিকল্পিত কিনা জানা যায় না। তবে ইহা হয়ত একেবারে আকস্মিক অবাঞ্ছিত ঘটনা মাত্র নয়। ২২শে জুন পুলিস আবদুল কাদিরকে গ্রেপ্তার করে। ১৩ই জুলাই শ্রীনগর জেলখানায় তাহার বিচারের দিন স্থির হয়। নির্দিষ্ট দিনে বিচার আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই মুসলমানেরা দলে দলে জেলখানার চারি পাশে সমবেত হইতে থাকে। বিচার হইবার মুখে জনতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। জনতার মধ্যে কেহ কেহ বাহিরের প্রাচীর টপকাইয়া জেলখানার সীমানার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাহার আদেশে জনতার মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। জনতা ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি করিতে থাকে। জনতার মধ্য হইতে উপস্থিত পুলিস এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হয়। উন্মত্ত জনতা টেলিফোনের তার কাটিয়া দেয় এবং জেলখানা-সংলগ্ন পুলিস লাইনে অগ্নি-সংযোগের চেষ্টা করে। কেহ কেহ পুলিস লাইনের মধ্যে ঢুকিয়া জিনিসপত্র তছনছ করে। পুলিস গুলী চালাইয়া এই উচ্ছৃঙ্খলতার জবাব দিল। ইহার পর শ্রীনগরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়া গেল। বহু হিন্দুর বাস-গৃহ এবং দোকান-পাট লুণ্ঠিত হইল। এই দাঙ্গায় তিন জন হিন্দু নিহত এবং ১৬৩ জন হিন্দু আহত হয়।

১৯৩১ সনের ১৩ই জুলাই আধুনিক কাশ্মীরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন কাশ্মীরে গণ-সংগ্রামের সূচনা হয়। কাশ্মীরের জনসাধারণের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আন্দোলনই পরে বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। তবে আজও ইহা সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে কিনা বলা শক্ত।

১৩ই জুলাই সঙ্ঘটিত ঘটনাবলীর পর সরকার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিলেন। মুসলিম জনসাধারণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ব্যাপক হরতাল পালন করিয়া এবং জনসভা আহ্বান করিয়া সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ জানানো হইল। জুলাই মাসের শেষভাগে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হইল। মুসলমানগণ সরকারের এই নতিস্বীকারে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পঞ্জাবে গঠিত এবং পঞ্জাবেই অবস্থিত 'কাশ্মীর কমিটি' নামক একটি সংস্থা এই সময় কাশ্মীরের মুসলিম আন্দোলন পরিচালনা করিত। ইহারই নির্দেশে ১৪ই জুলাই (১৯৩১) জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানগণ 'কাশ্মীর দিবস' প্রতিপালন করিয়াছিল।

মুসলিম নেতৃবৃন্দের মুক্তির পর সরকার মুসলমানদিগের সহিত আপোসের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবার পর তরুণ মুসলিম জননায়ক শেখ আবদুল্লা এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিস ইহার পর শ্রীনগর জামা-মসজিদে সমবেত মুসলিম জনতার উপর গুলী চালায়। মুসলমান সম্প্রদায় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত সশস্ত্র মুসলিম জনতা শ্রীনগরের পথে টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে কাশ্মীরের সর্ব্বত্র সরকার-বিরোধী আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে কাশ্মীরী এবং ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর সহায়তায় এই আন্দোলন দমন করা হয়।

১৯৩১ সনের ১২ই নবেম্বর মহারাজা হরি সিং ভারত সরকারের পররাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক দফতরের গ্ল্যান্সি সাহেবের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে শ্রীপ্রেমনাথ বাজাজ প্রভৃতি অল্প কয়েক জন ব্যতীত কেহই এই কমিশনের কাজে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। বাজাজ প্রভৃতির নীতি কাশ্মীরী হিন্দু সম্প্রদায়কে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্ব্বল করিয়া দিল।

ছয় মাস পর ১৯৩২ সনের মে মাসে গ্ল্যান্সি কমিশন রিপোর্ট পেশ করিলেন। এই রিপোর্টে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়, তাহার মধ্যে কাশ্মীরে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকারের সুপারিশ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। জুলাই মাসে শ্রীনগরের চশমাশাহিবাগে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক মিলিত বৈঠকে সম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়। এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক জীবনে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

গ্ল্যান্সি কমিশনের রিপোর্ট হিন্দুগণের মনঃপূত হয় নাই। তাহারা ভয় পাইয়া গেল এবং সভা-সমিতি করিয়া নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হইল। শ্রীনগরে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গেল।

প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং মুসলিম স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে এই সময় নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম কন্‌ফারেন্স স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সনের ১৫-১৭ই অক্টোবর শ্রীনগরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ইহা মূলতঃ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদিগের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। জনসাধারণকে ভাঁওতা দিবার উদ্দেশ্যেই নেতৃবৃন্দ সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জিগীর তুলিয়াছিলেন।

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের প্রথম সংবাদপত্র 'The Daily Vitasta' প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াপন্থী 'পণ্ডিত'গণের বিরোধিতায় জন্যই কাগজখানি বেশীদিন চলিতে পারে নাই। দৈনিক বিতস্তার নির্ভীক, নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মতামত মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ১৯৩৩ সালে মুসলিম কন্‌ফারেন্সের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যস্থাপনের জন্য একটি সাবকমিটি গঠন করে।

১৯৩৪ সনের শেষভাগে মুসলিম কনফারেন্সের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে এক আন্দোলনের সূচনা হয়। গ্ল্যান্সি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তন না করা এবং সরকারী চাকুরিতে মুসলমানদিগের প্রতি অবিচার—এই ছিল আন্দোলন-কারীদিগের অভিযোগ। গোলাম আব্বাস এই আন্দোলনের নিয়ামক (Dictator) মনোনীত হইলেন। মুসলিম কনফারেন্স এই সময় সরকারের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। লিপিতে যৌথনির্ব্বাচনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠনের দাবি জানানো হইয়াছিল। শেখ আবদুল্লা এবং মুসলিম কনফারেন্সের অপরাপর বহু কর্ম্মী সরকারের আদেশে আবার কারারুদ্ধ হইলেন। ইহার পর শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। শাসন-সংস্কারে একটি নির্ব্বাচিত বিধান পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৯৩৫ সনের ১লা আগষ্ট শ্রীনগর হইতে 'হামদারদ' নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতে থাকে। এখানি উর্দু কাগজ। গণতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়া হামদারদ অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত কাশ্মীরী দেশপ্রেমিকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৯৩৬ সনের ৮ই মে মুসলিম কনফারেন্সের নির্দ্দেশে কাশ্মীরের সর্ব্বত্র 'দায়িত্বশীল শাসন দিবস' (Responsible Government day) প্রতিপালিত হয়। এই বৎসরই 'যুব-সঙ্ঘ কাশ্মীর ইউথ লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘ কাশ্মীরের রাষ্ট্র-সাধনাকে সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত করিয়া রাজনৈতিক রূপদানে সচেষ্ট হইল। সঙ্ঘের এই প্রয়াস একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ১৯৩৮ সনের ২৩শে মার্চ মুসলিম কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনে শেখ আবদুল্লা কনফারেন্সের নাম এবং গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বহু বাদানুবাদের পর কনফারেন্সের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে কাশ্মীরের বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী আফজল বেগের নাম উল্লেখযোগ্য। আফজল বেগ বর্ত্তমান 'কাশ্মীর প্লেবিসাইট ফ্রন্ট' দলের নেতা।

গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এই সময় কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার আদেশে রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগের উপর নানা প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইল। ২৯শে আগষ্ট (১৯৩৮) বারো জন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নেতার স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। 'ন্যাশনাল ডিমাণ্ড' আখ্যায় অভিহিত এই বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইল যে, কাশ্মীরবাসীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া মহারাজার কর্ত্তৃত্বাধীন দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনই কাশ্মীরের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য। এই বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর সরকার রাজনৈতিক নেতা এবং কর্ম্মীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া জাতীয় আন্দোলন ধ্বংস করিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কেবলমাত্র রুদ্রনীতির সাহায্যেই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠরোধ করা যায় না। কাশ্মীর-সরকারের কর্ণধারগণও অল্পদিনের মধ্যেই নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন। ১৯৩৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই কারারুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা এবং কর্ম্মিগণ মুক্তিলাভ করিলেন। ১০ই জুন শ্রীনগরে মুসলিম কনফারেন্সের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে পূর্ব্ববৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে গৃহীত শেখ আবদুল্লার প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিম কনফারেন্সের নূতন নামকরণ করা হইল। মুসলিম কনফারেন্স ইহার পর হইতে ন্যাশনাল কনফারেন্স আখ্যায় অভিহিত হইল। হিন্দু, শিখ, মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত কাশ্মীরবাসীর ইহার সদস্য হইবার অধিকার স্বীকৃত হইল।

কাশ্মীরের রাষ্ট্র-সাধনার ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইল।



ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

চার

১৮ই জানুয়ারী '৫৪। নীচে ভোরে-জাগানোর খাতায় নাম লিখিয়ে এসেছি কাল রাত্রে। শেষ রাত্রেই যখন হোটেল-পরিচারিকার সকাল হয়, আমি বলেছি ঠিক তখনই আমার দরজায় টোকা দিতে। তবু মানুষ এক, যন্ত্র আর। তাই শিয়রের ঘড়িটাতেও এলার্ম দিতে ভুলি নি।

আটটায় ট্রেন ধরতে হবে। মার্সেই যাব।

'উঠব উঠব' ভাবটা ঘুমন্ত মনকে নাড়া দিল অনেকবার। জাগিয়ে দিল তিনবার। এলার্মকেও বিশ্বাস নেই, হয়ত বাজলই না। দেখব, বিছানায় শুয়েই আটটা বেজেছে, তখনও আকাশ কালো থাকে।

এলার্ম ঠিকই বাজল। হাত বাড়িয়ে বোতামটা টিপে 'উঠছি' ভেবে পাশ ফিরেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় জেগে দেখি সাতটা বাজে। কম্বলের ভেতর থেকে ছিটকে বেরোলাম।

আমি উঠেছি, ট্রেনটা ছেড়েছে—কি ট্রেন ছেড়েছে, আমি উঠেছি; ঠিক মনে করতে পারছি না। কারণ, তখন দৌড়তে দৌড়তে যে ট্রেনটায় পা দিচ্ছিলাম, ভাবছিলাম ওটাই মার্সেই যাবে কিনা। প্ল্যাটফরম বদল হয়ে থাকলে পাঁচের বা প্যাঁচার মত মুখ করে পরের ষ্টেশনে নেমে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।



সান রেমো

কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। আমার সুটকেসটা নিজের হাতে নিয়ে আমাকে কোন রকমে টেনে তুলে একজন কণ্ডাক্টর জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাবেন?

বললাম, মার্সেই।

—তিনটে দরজা বাদ দিয়ে চতুর্থটায় ঢুকুন। জায়গা আছে।

আমি একটা সেলাম জানিয়ে বললাম, ধন্যবাদ।

ট্রেনে অনেক লোক ও যথারীতি ইটালীয়-সুলভ গুঞ্জন। এই ইটালীয়ানরা কথা বলে অবিরাম—জোরে জোরে এবং সুরু করে হঠাৎ, যেন কত পরিচিত। এটা ওদের একটা বিশেষত্ব।

এইবার যাত্রী-পর্য্যবেক্ষণে মন দিলাম।

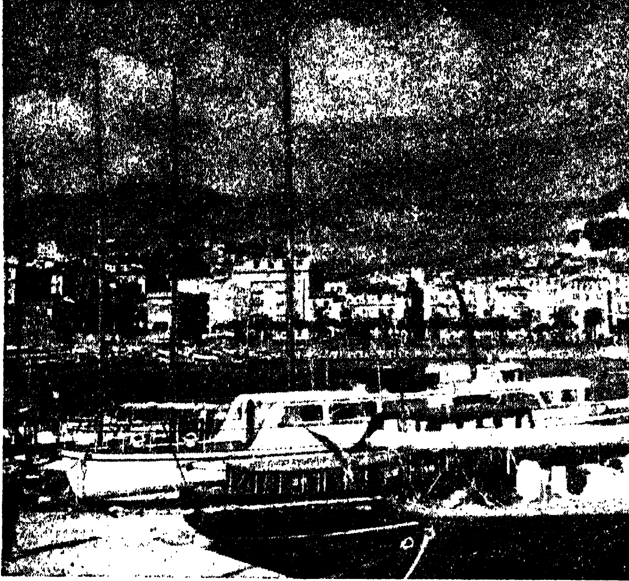
এক বুড়ী যাচ্ছে ফ্রান্সে ছেলেমেয়েদের দেখতে। অনেক দিন দেখে নি। বাইশ বছরের বড় ছেলেটা তুলুঁতে চাকরি করে। নিজের এ পোড়া দেশে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। তাই ঐ কচি ছেলেটাকে সেই দুধের বয়স থেকেই শিক্ষানবিশী করে আজ মানুষের মত বাঁচতে শিখতে হয়েছে। তাও কি তেমন করে বাঁচা! যে-ক'টা দিন বেঁচে আছে, কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে তারই চড়াই উতরাই পার হওয়া।

বুড়ী অনেক হা-হুতাশ করে অবশেষে দড়ির গিঁট খুলে সুট-কেসের ডালাটা মেলে ধরল। এক বোতল 'চিন্‌ত্সানো' আর 'মত্তা'র একটা প্লাম-কেক নিয়ে যাচ্ছে ওর ছেলের জন্যে। ও দুটো জিনিস ওর অতি প্রিয়। বলতে বলতে বুড়ীর চোখ দুটো খুশীতে চক চক করে উঠল, বুঝি আমারও।

এক স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছে জেনোয়াতে। কেন এখনও জানতে পারি নি। মহিলাটি বার-চারেক দেখলাম, হাতের ম্যাগাজিনটা খুললেন, পাতা উল্টালেন, বন্ধ করলেন।

ভদ্রলোকটি ভদ্রমহিলার কাঁধে মাথা রেখে শরীরটাকে বৃত্তচাপ বানিয়ে চোখ পিট পিট করছেন, খুব ঘুম পাচ্ছে বোধ হয়। কি জানি, হয়ত গাড়ী না ছাড়লে ওঁর ঘুম হয় না, তাই আগে থেকেই তৈরি হচ্ছেন। অ্যাস্কটের মাঠে রাণীর ঘোড়াও ত তৈরি হয়। সঙ্কেত শুনলেই খুরের তলায় ধুলো উড়িয়ে ছোটে। কিন্তু আজ তাজ্জব বনে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলাম, গার্ডের বাঁশি বাজতেই ভদ্রলোকের চোখ পিটপিটুনি ব্রেক কষল। গাড়ী যখন পুরোদমে ছুটছে, তখন উনি মাথাটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে একেবারে নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছেন।

এইবার ভদ্রমহিলাটি ম্যাগাজিন খুললেন। বেশ মনে পড়েছে,



সান রেমোর আর একটি দৃশ্য

ঘণ্টাচারেক পর ট্রেনটা জেনোয়াতে থামলে মহিলাটি পত্রিকা বন্ধ করে ভদ্রলোকের পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে নেমে গেলেন। ভদ্রলোক প্রায় মিনিট পাঁচেক পর চোখ মুছে হাই তুলে হেলে-দুলে ধীরে সুস্থে করিডোরের দিকে পা বাড়ালেন। ভঙ্গী যেন, চার্টার্ড ট্রেনটা ওঁর জন্যেই এখানে স্পেশাল ষ্টপ পেয়েছে। আমি জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকিও দিয়েছিলাম, ভদ্রলোক প্ল্যাটফরমের বেঞ্চেই শুয়ে পড়েন কিনা দেখতে। পড়েন নি, বোধ হয় কনুইয়ের গুঁতোর ভয় ছিল।

যাক, আবার ট্রেনের কথায়ই ফিরে যাই।

একটি মেয়ে যাচ্ছে সার্ডেনিয়াতে, বাবা মার কাছে। মিলানে এসেছিল বেড়াতে। ভাই এসে তুলে দিয়ে গেল, দিয়ে গেল সকালের কাগজ আর কাগজে-মোড়া ব্রেকফাষ্ট।

স্বল্প সময়ের এক মুহূর্তও অপচয় না করে বুড়ী আর মেয়েটি কথাবার্তার 'গ্লসিতে বন্টুষ্ট' ফোটাল। স্বামী-স্ত্রী ত এসে অবধিই 'আউট-অফ-ফোকাস' হয়ে আছে। অবশিষ্ট ও শিষ্ট আমি কান দুটোকে ট্রেনের কামরায় প্রহরায় রেখে চোখ দুটো দিয়ে জানলার ফ্রেমে নগর-উপকণ্ঠের গরিবী স্যুরেরীয়ালিজম্ উপভোগ করলাম।

ওদের ঘর-গৃহস্থালির উপকথা শেষ হ'ল। ভাবলাম, এবার নটেগাছটি মুড়োবে। কিন্তু বুড়ী প্রশ্ন করল, তোমার বয়স কত?

মেয়েটি চকচকে চোখ মেলে একটু হেসে বলল, বলুন ত!

আমার মনে হ'ল, উনিশ-কুড়ির কম নয়। কিছুতেই না।

বুড়ী বলল, সতের।

—না। পনের।

পি.সি. সরকারের থট রিডিং দেখেও এত বড় হাঁ হয় নি, পনের শুনে যা হ'ল। চিবুক ঝুলে পড়ল।

বুড়ী আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার ভাই কি করে?

—একটা বড় রেস্তোরার ওয়েটার। আপাততঃ মাসখানেকের ছুটি নিয়েছে। মেয়ে খুঁজছে, বিয়ে করবে।

—তোর কেমনটি পছন্দ?

—সমান সমান। বিদ্যায়, রূপে, গুণে। বয়সে বছর-খানেকের বড় হলেই ভাল।

—কেন, একেবারে সমান সমান কেন?

—দরকার হলে আমিও হুকুম করব, উপদেশ দেব, বকব।

আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, মাত্র পনের বছর!

বুড়ী হঠাৎ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওকে পছন্দ হয়?

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মাপ করবেন।

ততক্ষণে আমার কান দুটোয় জামশেদপুরী গ্রীষ্মের তাপ উঠেছে। কয়েক ঢেউ রাজস্থানের মরু-বাতাস ঝাঁ ঝাঁ করে বইল। আমি ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়ে এক ঝিলিক হাসির ইশারা জানিয়ে বুড়ীকে মাপ করে দিলাম। আর চোখের মণিকে 'জেট'-তাড়িত করে আলগোছে একবার পঞ্চদশীকে দেখে নিলাম।

মুখের রক্তিম আভা গোপন করতে গিয়ে ওর মুখটা আরও বেশী লাল হয়ে উঠল। অকারণেই ব্রেকফাষ্টের মোড়কটা কয়েকবার নাড়াচাড়া করল। যেন বুড়ীর প্রশ্নের জবাব ওর ভেতরেই আছে।

হঠাৎ এক সময় কাগজের ভাঁজ খুলে মেয়েটি আমার দিকে এক শ্লাইস কেক বাড়িয়ে ধরল—এই নিন।

কি জানি, 'ফার্ষ্ট ষ্টেপ টু দা অন্টার'-এর মোক্ষম চাল নয় ত!

আমি সঙ্কোচ দেখাবারও সময় পেলাম না। বুড়ী অনুরোধের বেড়া ডিঙিয়ে ঠানদি-সুলভ হুকুম জারি করল—নিয়ে নিন।

অম্লানবদনে সলজ্জ হাতটি এগিয়ে দিয়ে বিনয়ের চাটিটুকুও পরিবেশন করলাম, এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না। ও খাবারটা ত আপনার একলারই, বেশী ত নেই।

—তা ত নেই-ই। আমার দাদা ত জানতেন না, আমি আপনাকেও আমার ব্রেকফাষ্টের ভাগ দেব। আপনি সদ্যপরিচিত হলেও সহযাত্রী ত বটেনই। আপনাকে বাদ দিয়েই কি করে এখন কেক চিবোই? অথচ খিদে সওয়া আমার পোষায় না। তার চেয়ে দিয়ে থুয়ে যা পাওয়া যায় তাই ভাল। আপনি কি বলেন?

ওরে বাবা, এ মরুভূমিতে বিনয়ের বীজ ছিটিয়ে লাভ কি!

এখানে চাই কাঁটা-ওয়ালা ক্যাক্‌টাস। তা হলে আর বাধা কি?

আমি বললাম, আপনার খিদে পায় নি।

তারপর বুড়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, আপনি ওঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান নি, তাই ব্রেকফাষ্টের মোড়ক খুলে ওটিকে চাপা দিলেন।

—ও-প্রশ্নটিও যেমনি অবান্তর, উত্তর দেবারও তেমনি প্রয়োজন দেখি নি।

—ওঃ।

আমি কেকে কামড় দিয়ে চুপ করে গেলাম।

কি একটা ষ্টেশন এল।

—শুনছেন!

প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে চোখ ফিরিয়ে আনতে হ'ল।

—আপনি কিন্তু ঠিকই বলেছেন। সত্যিই আমি উত্তর খুঁজে পাই নি।



মার্সেই

আমি বললাম—পাওয়ার তো কথাও নয়। মুহূর্ত্তের চোখের দেখায়, কি মাত্র দু'একটা মিষ্টি কথায় একে অপরকে পছন্দ করেছে, এমন নজির রোমিও জুলিয়েট ছাড়া আর বড় একটা নেই।

এর পর আর কোন কথা হয় নি। মাঝে মাঝে দেখছিলাম, বুড়ী আর মেয়েটি ব্রেকফাষ্ট-শেষে সমানেই বক বক করে চলেছে। তবে একটু গলা নামিয়ে—নরম সুরে।

জেনোয়ার অল্প আগে দেখা গেল ছোট্ট এক টুকরো গ্রাম। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। পেছনের ধূসরাভ পাহাড়ে সাদা বরফ চুড়ো। সামনের সমতল জমিতে অবাধে বেড়ে-ওঠা গাছপালা, সরু সরু পথ। আর একটি শীর্ণকায়া নদী। আরও আছে। আছে পথচারিণীর মিষ্টি হাসির মত সমস্ত বাতাস জুড়ে ঝলমলে রোদের জোয়ার।

ছুটির দিন কাটানোর এমন পরিবেশ আমার স্বর্গ—আলসেমিতে, ক্ষণিক লেখায় অথবা পড়ায়, আর কিছু বেড়ানোয়। নির্ভাবনার দিনগুলো। যখন ভাল লাগবে না শহরের জন-সান্নিধ্য, ভাল লাগবে না অবিরাম বেড়ে-চলা কাজের ব্যস্ততা, থাকবে না আলো ও আলেয়ার নেশা, খুঁজে নেব তখন ঐ নির্জ্জন নাম-না-জানা গ্রামটি।

জেনোয়ায় নেমে গেল পঞ্চদশী—আবার দেখা হবে বলে। নিয়ে গেল এই সঙ্গীবিহীন একঘেয়ে রেল-ভ্রমণের একমাত্র আকর্ষণটুকু সঙ্গে করে।

তবু রিভিয়েরার সুরু যেন মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করল। করিডোরের জানলায় কনুই রেখে দাঁড়ালাম।

ভূমধ্যসাগরের প্রান্ত ছুঁয়ে ট্রেন ছুটেছে। পার হ'ল অগণিত টানেল ও ছোট-বড় অনেক সমুদ্র-শহর। আলবেংগা, আল্লাসসিও, সানরেমোয় মিনিট কয়েক থেমে এগিয়ে এল। ভেন্তিমিলিয়ায় শেষ হ'ল ইটালীর রিভিয়েরা, সুরু হ'ল ফ্রান্সের।

চোখ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলাম রিভিয়েরার রঙীন রূপের 'ব্রেইল'। অনুভূতির গভীরতা মাপব, এমন যন্ত্র ত এখনো বেরোয় নি। আর লিপে প্রকাশ করব, অনুভূতি আর লেখনীতে তেমন মিতালিও ত দানা বাঁধে নি। হয় তো শুধু রঙের কথা কিছু বলতে পারি।

রিভিয়েরার রূপ রঙের জন্যেই। আলিপুরের হর্টিকালচারাল 'ফ্লাওয়ার-শো'-কে হার মানাতে না পারলেও জানাতে পারে দৃপ্ত চ্যালেঞ্জ। প্রতিযোগীকে হার মানিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে আত্মপ্রসাদের রেখা টানায় জয়ের গর্ব্ব আছে, নেই পৌরুষের পরিচয়। প্রতিযোগিতায় আহ্বান করাতেই আছে আত্মবিশ্বাস। আত্মসুখও। রিভিয়েরা সে আহ্বান জানাতে পারে। এমন কি প্রজাপতি-রাণীদের হারেমকেও।

ঐ দূরে, রিভিয়েরার আকাশে আকাশে নীলের বন্যা। মাঝে মাঝে কামিনী-গুচ্ছের মত সাদা মেঘের বাঁধ। তবু সে কি বাঁধা যায়! ঐ নীলই ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের প্রতিটি জলকণায়। ও-নীল আরও ঘন—আরও বেশী উতলা করে দেয় মনকে। তীরে, সমুদ্র-ফেনার স্বচ্ছতার নীচে বালিতে ও পাথরে ফিকে-খয়েরির আভাস। প্রসাধিত পথের ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ সবুজ পাম, কমলা-লেবুর ফলন্ত গাছ আর রং-বেরঙের ফ্লাওয়ার-বেড। কৃত্রিম বলেই হয়তো কিছু বেমানান, তবু শহরের ক্রীম-রঙের বাড়ীগুলো আর নানান পোশাকের ভিড় জিয়র রিভিয়েরার রঙের দলে নাম লিখিয়েছে ত বটেই। আর এই সবকিছুর পেছনে ঐ যে সবুজ-খয়েরি পাহাড়ের সারি, ও যেন এই রং-আসরের মূল গায়েন। রঙে রঙে মনের ক্যানভাসটুকু রাঙা হয়ে গেল। ভরে গেল কল্পনার

জমাখাতা বহুবিচিত্র রেখায়। সঞ্চয় হ'ল অনেক, ভবিষ্যতের অলস মুহূর্ত্তগুলোর জন্যে।

পার হ'ল রিভিয়েরার মণি-মুক্তো, মণ্টে কার্লো, নীস। অবশেষে মার্সেইয়ের ষ্টেশনে পা দিলাম।

১৯শে জানুয়ারী '৫৪। সিন্দিকাত দিনিশিয়াটিভ তখনো খোলে নি। কী'র চারধারে ঘুরে বেড়ালাম। খুললে খবর নিয়ে কাপ জানেতে পৌঁছলাম প্রায় ন'টা নাগাদ। ষ্টীমারে তার অনেক আগেই এসে গেছে।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে জাহাজ-ঘাটে গিয়ে দেখি প্রকাশ, মণীশ ও চন্দ্র বড়ুয়া দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় আমারই অপেক্ষায়।

ওরা যাচ্ছে জার্ম্মানীতে হাতে-কলমে কাজ শিখতে।

প্রকাশ এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বলল—আমরা ভাবছিলাম, তুই আর বোধ হয় এলি না।

আমি বললাম—তোরা যে শেষরাত্রেই তীরে জাহাজ ভিড়িয়ে 'নাববো নাববো' করে ছটফট করবি, তা কি জানতাম। আর তা ছাড়া এ তো আমাদের কলকাতা নয় যে ট্রামের বিজ্ঞাপন, বাসের মালিকদের নামও মুখস্থ হয়ে আছে! এখানে রীতিমত গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে তবে গোলকধামে পৌঁছতে হয়।

—তুই কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোঁদল করবি, না প্রথম দিনটায় আমাদের একটু কন্টিনেণ্টাল তালিম দিয়ে দিবি?

মণীশের চোখমুখ দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ওর ধৈর্য্যের বাঁধ বিশেষ নেই। তাই অবাকও হলাম না ওর অস্থিরতায়।

মণীশের দিকে তাকিয়ে বললাম—চল্, কোথায় যাবি বল্। জাহাজে ব্রেকফাষ্ট নিস নি বুঝি! তা আগে বলতে হয়!

আমরা চার জন পাশাপাশি হাঁটতে সুরু করলাম। সারাটা দিন যেন এলোমেলো কেটে গেল।

সত্যিই সস্তার যে তিন অবস্থা হয়, দুপুরে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

ছোটখাটো, সাইনবোর্ড নেই, বাইরে মেনু-টাঙানো, অন্ততঃ পটলার তেলে-ভাজা দোকানের মতও ছিমছাম, এই ধরণের একটি রেস্তোরা গরু-খোজা করলাম। মিললও গলিতে।

আমরা সুরুতেই এক গামলা স্যুপ শেষ করে দিলাম দেখে কাউণ্টারের বুড়োর চোখ দুটো যেন শক্তিশেলের মত ছুটে এল। আমরা তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বুঝাতে চাইলাম—ঘাট হয়েছে। এবারের মত গোস্তাকি মাপ করে দাও। দ্বিতীয় দফায়, স্যুপের চামচ চুষতে চুষতে দেখি ওয়েটারের বদলে ওয়েট্রেস এসেছে। মণীশ আর বড়ুয়া ওয়েট্রেসকে অন্য টেবিল এটেণ্ড করার সুযোগই দিল না। ঘন ঘন হুকুম দিয়ে মেনুর প্রায় সবকিছুই আনিয়ে ফেলল। প্লেটে, কাঁটায়, চামচে টেবিল উপচে উঠল। স্থানাভাবে আরও দুটো ডিশ হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল ওয়েট্রেস। উপসংহারে আমাদের গাঁটটি কেটে বুড়োর হাতে দিয়ে আসতে হ'ল।

দু'তিন প্লেট মাংস চিবোনোর ফলে খাবার পরও রাস্তায় বেরিয়ে দাঁত দু'পাটি খটখট করতে লাগল। যেন তখনো মাংস চিবিয়ে চলেছি। 'ইনার্শিয়া' কথাটার অর্থ কলেজের ক্লাসরুমে জেনিঙ্গার জোন্‌স আর নন্দলাল বোসের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তেমন তরল হতে পারে নি। আজ দাঁতের খটখটানিতে বাষ্পবৎ মালুম হ'ল। মাংসের কি মহিমা! যে কথা মাষ্টার মশাই বোর্ডে গোটা বাক্সের চক ঘষে তারস্বরে চীৎকার করেও আমাদের সমঝাতে পারেন নি, আজ ঐ সামান্য মাংসের টুকরো সেই কথাটাই কত সহজে দাঁতের মর্ম্মে মর্ম্মে নাচিয়ে দিল!

আর সস্তা-মুখো নয়! রেস্তোরার বাইরে এসেই চার জন হাত মিলিয়ে শপথ নিলাম।

ওরা চলে গেল সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেনে ষ্ট্রাসবুর্গে, জার্ম্মানীর পথে। দু'এক দিন থেমে গিয়ে সময় নষ্ট করায় ওদের আপত্তি ছিল না বিন্দুমাত্র। কিন্তু অর্থের ঘনত্ব কিছু কমে যাওয়ায় ভারসমতা বজায় ছিল না। মনের দুর্ব্বলতাকে হেসেও উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়ে দুর্ব্বল পকেট নিয়ে না চড়া যায় ট্রেনে, না চলা যায় পথে। তখন মহাশূন্যের সমুদ্রে বিনি পয়সার ডিঙি ভাসিয়ে খড়কুটো হাতড়ে বেড়াতে হয়।

আমি আমার বটুয়াটি জমা দিয়ে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুমের দরজায় এলাম। আমার মিলানে ফেরার গাড়ী ভোর ছ'টায়। একটা নূতন অভিজ্ঞতার মোহে গোটা রাতটাই এই ওয়েটিং রুমের জেটিতে নোঙর ফেলব ভাবলাম।

হঠাৎ অনেকগুলো কুৎসিত শিস শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একটি মেয়ে দরজা ঠেলে বাইরে এল। সুটকেস নামিয়ে বাইরের বেঞ্চিতে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

গোলমালের ছায়া মাড়ানোর কৌতূহল আমার নেই। ঐ শিস-ওয়ালাদের মনে মনে শ্রাদ্ধ করে, সেকেণ্ড ক্লাসের ওয়েটিং রুমেই ঢুকে পড়লাম।

লুই ফিশারের 'লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী' সবে খুলে বসেছি, একজন ভারতীয় এলেন। রাত আটটা নাগাদ। পুলকিত হলাম, সঙ্গলাভের আশায়।

উনি জেনেভাতে ডবলিউ. এইচ. ও-তে কাজ করেন। কথা-বার্ত্তা সুরু হ'ল, নেহাত মামুলি। কবে, কেন, কেমন করে ইটালীতে এলাম, মার্সেইয়েই বা কেন, এই ধরণের প্রশ্ন ও যথাযথ সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মিঃ সুদ হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞেস করলেন—ইটালীয়ানদের কেমন লাগছে?

বললাম—ভাল না।

বেশ জোর দিয়েই বললাম।

—কেন?

—দেখুন, এ কেনর উত্তর অত সহজেই দেওয়া যায় না। কারণ ত আর একটা নয়, অনেক।

—অনেকই ত জানতে চাইছি। আমারও ত গাড়ী রাত একটায়, সময়টুকু কাটবেও ভাল।

মিঃ সুদ প্রায় আধখানা পোড়া সিগারেট ফেলে দিয়ে কেস থেকে নূতন একটা ধরালেন, সিগারেট-বিলাসী বলা চলে অনায়াসেই। সুদমশাই প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছেছেন।

আমি সুরু করলাম—যেহেতু ছাত্রদের সঙ্গেই মিশতে হচ্ছে এবং হবেও, তাই আগে ওদের কথাই বলা ভাল। ওরা মোটেই বন্ধু-ভাবাপন্ন নয়। তবে আমার মনে হয়, তার জন্তে দায়ী আমার গায়ের বাদামি রং। ওদের ঐ বিশ্রী অবাক-অবাক চাহনি আমার মোটেই ভাল লাগে না।

—আচ্ছা, শোন। মিলান একটা বড় ট্যুরিষ্ট-এট্রাক্‌শন্‌ নয়। কাজেই আমরা, মানে ব্রাউনস্কিনরা, মিলানে দু'একদিন থেমে যাওয়ার কোন কারণ দেখি না। আমাদের ভিড় ভেনিসে, রোমে। আর তোমার মত মিলান-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র দু'একজনই আছে বোধ হয়। তা হলেই দেখ, বাদামি রঙের চামড়া দেখে দেখে চোখ পাকাবার সুযোগ পেল কৈ মিলানের ছাত্রেরা? তাই কাছে ঘেঁষতে ওরা একটু ইতস্ততঃ করছে। লণ্ডনের ছাত্রেরা অমন অবাক হয়ে তাকাবে না কখনও। কালো নেটিভ রঙের সঙ্গে ওদের দু'শ বছরের পরিচয়।

আমার কথার জের টেনে আমি বললাম—দ্বিতীয়তঃ, বড় বেশী কথা বলে ওরা, সর্ব্বত্র। সিনেমায়, ট্রামে, বাসে, রেস্তোরায় ক্লাসেও এবং জোরে জোরেই। এমনকি, মাঝে মাঝে পাশের লোকের উপস্থিতিও ভুলে গিয়ে।

—দেখ, কথা বলাটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। তুমি নিশ্চয়ই তোমার নিজের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করে ওদের বেশী কথা বলাটাকে বাড়াবাড়ি বলে ধরছ। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি ক্লাসে অথবা রেস্তোরায়, কোথাও চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে অভ্যস্ত নও। তুমি তোমার শিষ্টতা ও গাম্ভীর্য্যকে বজায় রাখতে চাও। কিন্তু আমি বলব, এই ইটালীয়ান ছাত্রেরা যে সব সময়ই গল্পগুজব করে, এটা সত্যিই ওদের সুস্থ ও হাসিখুশী মনের একটা সাবলীল প্রকাশ। ইংলণ্ডে একই বাসে চড়ে কোন এক ভদ্রলোকের পাশে বসে যদি প্রতিদিন দু'তিন বছর ধরেও যাতায়াত কর, তা হলেও উনি তোমার নামটাও জিজ্ঞেস করবেন না। একে তুমি সভ্যতা বলতে পার, কিন্তু ভব্যতা কিছুতেই নয়। আচ্ছা, তুমি ত কলকাতার লোক, না?

আমি রীতিমত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি করে বুঝলেন?

মিঃ সুদ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—বাঙালী দেখলেই আমি চিনতে পারি। কিন্তু, একটা কথা। কাফে রেস্তোরায় আড্ডা দেওয়ার জন্তে কলকাতার ছাত্ররাও ত খ্যাত। কিন্তু তুমি···

—আমার দুর্ভাগ্য, আমি এখনও ওদের দলে নাম লেখাতে পারিনি। ও কথা যাক, আর একটা কারণ শুনুন।

—বল।

—মিলানের যে-কোন ছাত্রই বেশ ভালভাবে চেষ্টা করলে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সেই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী পেতে পারে। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য, ওরা ইচ্ছে করেই দু'তিন বছর ফেল করে। আঠাশ বছরের আগে ওরা ইঞ্জিনীয়ারই হতে পারে না।

সুদ মশাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—সে ত ছাত্রজীবনটাকে আরও বাড়িয়ে নেয় ওরা। জীবনের এই সময়টুকু যে মধু-সময়, সে সব দেশেই সত্যি।

—হ্যাঁ, সেকথা আমিও মানি। কিন্তু নিছক আমোদ-প্রমোদেই যে সময়টা কেটে যাবে, সেটা ত আর ফিরে আসবে না। বর্ত্তমানের ব্যস্ততার দিনে সময়ের এ অপচয় অন্ততঃ আমার প্রাণে সত্যিই বাজে। আর তাও যদি কোন একটি বিশেষ প্রচেষ্টার জন্ম নষ্ট হ'ত, ক্ষতি ছিল না। যেমন ধরুন, কারও হয়ত চিত্রশিল্পে ঝোঁক আছে, কারও বা ফটোগ্রাফির নেশা থাকতে পারে। কিন্তু ওদের নেশা হ'ল, অন্য রকম।

আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলল এ প্রসঙ্গ নিয়েই।

সুদমশাই আবার সিগারেট-কেস বের করলেন।

ওয়েটিংরুমে কত লোক এল, বসল হয়ত কেউ পাঁচ-দশ মিনিট। কেউ হয়ত ঘণ্টা দু'তিন। চলেও গেল অনেকে গাড়ীর সময় বুঝে। আবার দু'চার জন এল। আমরা ঠিক বসেই আছি।

রাত-পুলিস মাঝে মাঝে টহল দিচ্ছে—নির্দ্ধারিত বিরতি দিয়ে। আমাদের দেশী পুলিসের চেহারাটা হঠাৎ কেন জানি মনে এল।

ফায়ার-প্লেসে কয়লা ঢেলে দিয়ে গেল। লম্বা চিমনিটা সোজা ছাদ ফুটো করে উঠে গেছে। চুল্লীর ভেতর থেকে লাল আভা জীর্ণ ফাঁকগুলো দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

মিঃ সুদ জিজ্ঞেস করলেন, ইটালীর সাধারণ লোকদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

—আমি এখনও একটা ধারণা করার মত ঘনিষ্ঠভাবে সাধারণের মধ্যে মিশি নি। কাজেই বলা মুশকিল, হ্যাঁ, একটা কথা বাকি আছে। নেপল্‌সে প্রথম দিনই গাইড ও কুলিদের জুলুমে অনেক টাকা হারালাম। ইউরোপে ঠিক এই ধরণের জুলুম আমি আশা করি নি।

—তোমার এ অভিযোগও অকাট্য হ'ল না, ঐ জুলুম ত সর্ব্বত্রই। এই মার্সেই থেকে জেনেভা পর্য্যন্ত আমি বহুবার যাতায়াত করেছি। ফ্রেঞ্চ আমি ভালই বলতে পারি, কিন্তু তবুও ত আজ সন্ধ্যায়, আমার সুটকেসগুলো পোর্ট থেকে ষ্টেশনে নিয়ে আসার জন্তে গাইডকে পাঁচ গুণ অর্থ দিলাম। নেহাত মালপত্তর টানা-হ্যাঁচড়ার ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্তেই ত! কাশীতে ও পুরীতে পাণ্ডারা যেভাবে টাকা আদায় করে, সেটাও গুণ্ডামি এবং

জুলুমবাজিরই নজির। তাই বলে কি ভারতবাসীকে তুমি ভালবাস না? কোন দেশেই মন্দ লোকের অভাব নেই। কখনও চোখে পড়ে, কখনও পড়ে না। কিন্তু আমি তোমাকে এখনই বলে রাখছি, ফিরতি জাহাজে চড়ে দেশের দিকে পাড়ি জমাবার সময় তোমার নিশ্চয়ই মনে হবে, ইউরোপে ইটালীয়ানরাই সবচেয়ে অতিথি-পরায়ণ ও বন্ধুভাবাপন্ন, এবং একথা খাঁটি। ওদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা কর, ওদের ভেতর ঢুকে ওদেরই এক জন হয়ে যাও, তখন বুঝবে তফাৎটুকু।

সুদমশাই থামলেন, আবার সিগারেট ধরালেন, বেশ লাগছিল। আশ্চর্য্য হলাম, ভদ্রলোকের ক্লান্তি নেই।

ওধারের বেঞ্চে একজন দিব্যি ঘুমোচ্ছে। বোধ হয় আমারই মত ওরও সকালে ট্রেন।

—এবার আমার যাওয়া দরকার। ট্রেন ছাড়বার সময় হ'ল। খুব আগ্রহের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বললাম, আপনার সঙ্গ পেয়ে খুবই খুশী হলাম, জানলামও অনেককিছু, অশেষ ধন্যবাদ।

—হয়ত আমি অনেককিছু আপত্তিকরও বলে থাকতে পারি। তার জন্যে কিছু মনে করো না। গুড লাক, চিয়ারিও!

দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম—যতদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল মিঃ সুদকে। উনি পেছন ফিরে হাত নাড়লেন।

ঘরে ফিরে এসে বসলাম। দেখলাম, একটি কোণে দুজনে বসে আছে ঘেঁষাঘেঁষি। হয়ত একজন যাবে অনেক দূরে, অনেক দিনের জন্য। আর নয়ত পথের শীতকে ফাঁকি দিয়ে এই ওয়েটিংরুমের কোণে এসে বসেছে দুজনে, ক্ষণিক আলাপের জন্যে, মিষ্টি উষ্ণ চুল্লীর নেশায়।

'লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী' খুললাম।

উত্তরায়ণের মেলা

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

৩০শে জানুয়ারী, পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। পরের দিন স্কুলের ছুটি ছিল। খেয়াল হ'ল একবার—কৃষ্ণরায়ের মেলা দেখে আসা যাক। কৃষ্ণনগর থেকে সাতাশ মাইল দূরে একখানি গ্রাম, নাম তেহট্ট। এখানে কৃষ্ণরায়ের মন্দির আছে। তাঁর স্মৃতিকে উপলক্ষ করে এখানে জলাঙ্গী নদীর ধারে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে মেলা বসে। মেলা প্রায় এক মাস স্থায়ী হয়। সুতরাং রওনা হওয়া গেল মেলায় একবার ঘুরে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে। একাই চললাম, কারণ মেলায় পৌঁছলে বহু সঙ্গী পাব।

যখন আমি মেলায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা। নদীর ধারে মেলার পথে একজন পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে দেখা। তাঁর পিছনে পিছনে চলেছে পাঁচ-সাতটি ছেলে। বগলে তাদের বই আর শ্লেট। পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার স্কুলে ছেলে কত? তিনি জানালেন, পৌনে দুই শত। ক'জন পণ্ডিত আছেন জানতে চেয়ে উত্তর পেলাম চার জন। যাই হোক, ঢুকে পড়লাম মেলার মধ্যে।

ঠেলাঠেলির বালাই নেই। গায়ে বেশ হাওয়া লাগিয়ে একটু ঘুরে নিলাম আর সাজানো দোকানগুলোর ছবি মনের মধ্যে এঁকে নিলাম। দর্শকের সংখ্যা খুব কম। তা ত হবেই, সবাই কি আর ভর দুপুরবেলায় মেলায় এসে ভিড় জমাবে।

ঘুরে ফিরে দেখে যা বুঝতে পারা যায় তাতে মনে হয়, মেলা-ক্ষেত্রটা ১৫।২০ বিঘা জমির উপর। পশ্চিম দিক দিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে খড়ে নদী অতীতের স্মৃতি বুকে করে। চড়া পড়েছে কিছু জায়গায়। গাঁয়ের বধূরা কলসীতে জল ভরে নিয়ে বাড়ী ফিরে চলেছে, ক্ষিপ্রপদে। কলসী-ভরা জলরাশি যেন নদীর বিচ্ছেদ-ব্যথায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে তার অন্তরের দুঃখ শোনাচ্ছে।

দোকানীরা তখন নিজেদের খাবার-দাবার প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। এক ময়রার দোকানে দেখা গেল, এক-একখানা সদ্যভাজা আধসেরী ছানার জিলাপীকে রসের মধ্যে হাবুডুবু-খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জিলাপীর বাদামী রঙটা বেশ লাগল চোখে।

ডুগী-তবলার দোকানে দোকানী বসে তবলা বাঁধছে। দরজা-জানালা ইত্যাদির দোকানে সূত্রধর 'বাইশে'র সাহায্যে একখানি গাড়ীর চাকার রূপদান করছে।

মুচি বসে গেছে তার কাজে। টুকিটাকি কাজ করছে সে। কাপড়ের দোকানগুলো তখনও অগোছালো। এক দোকানে, তার মালিক খাসা আরামে গড়গড়ায় তামাক সেবন করছেন। শুভ্র উপবীত নদীর হাওয়ার সঙ্গে তখন মাতামাতি সুরু করেছে।

এসব ছাড়াও চা-মিষ্টি, মুদিখানা, মনোহারী, জুতা, মাদুর, শাক-সব্জীর দোকান ত আছে যথেষ্টই।

এক দোকানীর কাছে এবারকার মেলার তত্ত্বাবধায়ক মশায়ের সংবাদ নিলাম। কিন্তু তাঁর আস্তানায় গিয়ে তাঁকে পেলাম না। পরে দু'একখানা ফোটো তুলছি, এমন সময় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এসে হাজির হলেন তিনি। মেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি গেলেন ভড়কে। বললেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন মশাই, 'ইনকামট্যাক্স আপিস থেকে নয় ত?' আমার উত্তরে তাঁর সন্দেহ দূর হ'ল; তখন তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে বসিয়ে

চা-চপের সদ্ব্যবহার করালেন। তাঁর কাছে যা জানতে পারলাম তা হচ্ছে এই—

এ মেলা বহু দিনের। এখানে আগে কলকাতা প্রভৃতি স্থান থেকে বহু দোকানপাট আসত। কিন্তু কয়েক বৎসর মেলা বন্ধ থাকায় এবার মেলা ভাল জমে নি, কিন্তু দোকানপাট এসেছে প্রচুরই বলতে হবে। একটা ভ্রাম্যমাণ সিনেমাও আছে।



কৃষ্ণরায়ের জোড়ামন্দির—দক্ষিণে, ঠাকুরের ভোগমন্দির

এ জায়গার জমিদার নফর পাল চৌধুরী। মেলা 'ডাক' হয়। ডাকাডাকিতে ৩০০্ টাকা থেকে ৪০০্ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু ডাক উঠেছে এবার মাত্র এক শত পর্য্যন্ত। ইজারাদার দোকানীদের জমি বিলি করেন এবং নদীয়া জেলা-বোর্ডের কাছ থেকে ইজারাদারকে লাইসেন্স নিতে হয়। বোর্ডও কিছু ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ছড়াবার ব্যবস্থা করেন। এখানে প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবারে হাট বসে। এই দুই হাটবারে লোকসমাগম খুব বেশী হয় এবং কেনাবেচাও হয় প্রচুর।

কৃষ্ণরায় রাজবাড়ীর বিগ্রহ। ১৬০০ শকে এক রাত্রে তাঁর জোড়ামন্দির তৈরী হয় বলে প্রবাদ আছে এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। রাজাদের দেওয়া ঠাকুরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে অনেক। তারই আয় থেকে তাঁর সেবার কাজ চলে।

একটি জোড়াবাংলা মন্দির আছে। পিছন দিকে মন্দিরের অংশ ভাঙা। সামনের মন্দিরে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ আছেন। ভাঙা অংশ আজ পর্য্যন্ত কোন রাজ-মজুর জোড়া দিয়ে মেরামত করতে সক্ষম হয় নি বলে প্রবাদ আছে। মন্দিরের পিছনদিকে আছে একটা মস্ত দীঘি। আরও একটি পুরানো দীঘি ছিল ; সেটা কিছু দূরে। এখন সেটা প্রায় মজে এসেছে।

প্রায় বছর ত্রিশেক আগে মন্দির থেকে কৃষ্ণরায়কে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে যায়। মন্দিরের পিছনে দীঘির পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে মূর্ত্তির দেহের এক অংশ পাওয়া যায়, আর মাথা পাওয়া যায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম হাসপুখুরিয়ার মোকামতলার কাঁচা ইটের স্তূপের ওপর।



কৃষ্ণরায়ের মন্দিরের সম্মুখে হরিসঙ্কীর্তন

সেকথা যাক, মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র কৃষ্ণরায়ের মূর্ত্তি তৈরি করিয়ে এনে আবার প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে। মন্দির জোড়াবাংলা দো-চালা ধরনের এবং খিলানের উপর অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে বহু প্রকার কারুকার্য্যখচিত ; এগুলি ইটের উপরই যেন ছাঁচে তৈরী। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলার আখ্যান-বস্তু এই সকল চিত্রে পরিস্ফুট। কোথাও নন্দ ঘোষ দই নিয়ে যাচ্ছে ; কোথাও শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন ; কোথাও রাধা অভিসারে বেরিয়েছেন সখীদের সঙ্গে, কোথাও গোপীদের বস্ত্রহরণের ছবি ; কোথাও কীচকবধ ইত্যাদি। এত কারুকার্য্য-করা ইটের তৈরী মন্দির বর্ত্তমানে বাংলার খুব কম জায়গায়ই দেখা যায়। মন্দিরটি ইদানীং ধ্বংসের মুখে। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক মন্দিরটির সংস্কার করার চেষ্টায় আছেন। তাঁদের মুখে শোনা গেল, তাঁরা কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী কয়েকবার গেছেন এবং মহারাজকুমারকে এর সংস্কারের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর অনুমতি পেলেই তাঁরা জাগ্রত দেবতা কৃষ্ণরায়ের মন্দিরের সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করতে পারেন—জনসাধারণের কাছে চাঁদা তুলে। কোন ইঞ্জিনীয়ার নাকি মন্দির দেখে বলেছেন, ৫০,০০০ টাকা ব্যয়েও আজ আর এমন মন্দির হবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে হাজার দু'তিন টাকা ব্যয় করতে পারলেই আবার কিছুকাল মন্দিরটি টিকে যায়।

কৃষ্ণরায়ের কাছে অনেকে অনেককিছু মানত করেন এবং তার ফলও নাকি তাঁরা পান। মানতকারীরা মনোবাসনা পূর্ণ হলে তাঁকে নানা উপচারে পূজা করে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন। মানতকারীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে। হিন্দু ত পূজা দেয়ই ; মুসলমানেরাও পূজা দিয়ে থাকে। কোন গাছে যথাসময়ে ফল না ধরলে গাছের মালিক মানত করে কৃষ্ণরায়ের কাছে। প্রথম বারের প্রথম ফল তারা দিয়ে যায় ঠাকুরের নিকট তাঁর ভোগের জন্য।

মন্দিরের গায়ে লেখা আছে—"১৬০০ শকে শ্রীশূণ্যনভঃ

বড়িদগণেতে মেঘগতে ভাস্করে শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ নিরতঃ। শ্রীরামদেব মহান্ লক্ষ্মী-বন্ধ পদারবিন্দ সেবনবিধৌ ব্যাপার সম্পাদিন তস্য শ্রীপুরুষোত্তমস্যচ গৃহং যযত শকাব্দাং স্বয়ং।"

পূর্ব্বে কৃষ্ণরায়কে জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে আনা হ'ত, আর এখানে তিনি থাকতেন চৈত্র মাসের বারোদোলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। বারোদোলের পূর্ব্বে আবার তিনি আসতেন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে। কিন্তু বর্ত্তমানে রাজবাড়ীতে রথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি রথের পরে এখানে আসেন আর বারোদোলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থাকেন।

বর্ত্তমান বর্ষে এই গ্রামের অধিবাসী শ্রীদ্বিজপদ ঘোষ, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅজিতকুমার মল্লিক প্রভৃতি এবং গ্রামের জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে কৃষ্ণরায়কে প্রায় সাত-আট বছর পরে আবার তাঁর মন্দিরে নিয়ে এসেছেন। ঠাকুরের প্রচুর গহনা আছে; কিন্তু মন্দিরের অবস্থা খুবই খারাপ বলে বা চুরি যাবার ভয়ে প্রায় সব গহনাই রাজবাড়ীতে আছে জানতে পারা গেল।

এবার গ্রহণ উপলক্ষে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হতেও দেখা গেল। গিয়ে দেখি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের কীর্ত্তনের দল এখানে এসে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রায় ২৫০ বছরের পুরাতন তমাল গাছকে প্রদক্ষিণ করে কীর্ত্তন করছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণও বহু নর-নারীর আগমনে কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে!

কয়েক বছর পরে কৃষ্ণরায়কে পেয়ে গ্রামবাসীরা সকলেই উৎফুল্ল। তাঁর আগমনে ভক্তেরা খুব ধুমধামের আয়োজনও করেছিলেন। দশ রাত্রি ধরে মন্দির-সম্মুখে ভাগবতপাঠ ও নামসংকীর্ত্তন হয়।

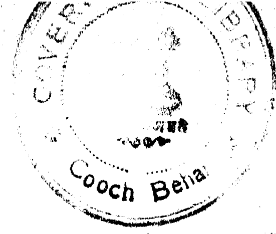
পাশের কোন গ্রামে নূতন কোন যাত্রা বা থিয়েটার-দল গঠিত হলে বা কোন দল নূতন কোন বই নামাতে থাকলে কিংবা নূতন বৎসরে কাজ আরম্ভ করার সময় প্রথমে গান হয়—কৃষ্ণরায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণে। পরে তাঁদের অভিনয়াদি হয় অন্যত্র।

যে বিগ্রহকে উপলক্ষ করে এই মেলার ও আমোদপ্রমোদের আয়োজন হয়, জনসাধারণের ও সরকারের চেষ্টায় যাতে তাঁর মন্দিরটির সংস্কার-সাধন হয় আশু সে ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত।

প্রেমের প্রথম ভাগ

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

"জানি জানি বন্ধু তোমার মধুর ছলনা
ক্ষণিক ভুলে মনের কথা খুলেই বলনা"
বললে বুলু হেসে।
একটি পাতা খসিয়ে দিল দেবদারু তার কেশে।
আমি বললেম, "তুমি আমার নিত্য নিরুদ্দেশ,
তোমার মাঝে হারিয়ে গেল আমার ক্ষুদ্র শেষ।
আমি বাঁশের বাঁশী,
মোর নিমেষের ঘুম ভাঙালে সুর-আকাশী আসি।
যখন আমার চোখে ঝরে তোমার চোখের আলো
ভুবন ভরে মোহন জাগে সবারে বাসি ভালো।
রঙের সর্ব্বনাশে
বসন্ত যে ধূলির ধূসর মঞ্চে নেচে আসে।
তোমায় যখন ডাকি আমি, একটি একটি করে
আমার মুখে তোমার নামটি রাতের বুকটি ভরে
তারায় তারায় জ্বলে,
সাড়া তোমার চেরাপুঞ্জীর তিমির কুঞ্জতলে।
বনের পথে নদীর ধারে, মরুভূমির পারে
তোমায় খুঁজে মরেছি যে গুহার দ্বারে দ্বারে;
শুনে সে মোর ডাক
অরোরাতে স্বপ্ন বুনে মেরুরা নির্ব্বাক।
তেপান্তরের ঘাসে ঘাসে সেই ইতিহাস হারা
মাটি খুঁড়ে পাণ্ডুলিপি হঠাৎ পেল যারা
বুঝতে পারে না যে
তোমায় বলা সেই কথাটি বিজন দ্বীপের মাঝে।
অনেক ফুল আর অনেক পাতা, চাঁদের রাতের গীতি,
ছায়ানিবিড় মায়ায় মেশা ফাগুন নেশার বীথি,
ঝরা চোখের জল,
একটু হাসি, একটু চাওয়া, স্মৃতির শতদল।
এই যে মাটি, এই যে তৃণ ঐ যে নীল ঢেউ,
এই যে তুমি, এই যে আমি, হঠাৎ তো নেই কেউ।
এই মাহেন্দ্রক্ষণ
লেকের জলে তমাল ছায়া, বেঞ্চি বৃন্দাবন।"
দেবদারুদের পাতায় পাতায় শিউরে মর মর।
বুলু বললে, "আহা তুমি পাগলামি কি কর!
অনুরাগের রাগ
জানায়, সখা, তোমার প্রেমের এ যে প্রথম ভাগ।"



সর্ব্বজ্ঞ

সমারসেট মম্

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

পরিচয় হবার আগে থেকেই ম্যাক্স কেলাডাকে আমার ভাল লাগে নি। সবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সমুদ্রগামী জাহাজে যাত্রীর চাপ বেড়েছে,—নিতান্তই স্থানাভাব। এজেন্টরা দয়া করে যা জুটিয়ে দেয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। একটি কেবিন সম্পূর্ণ নিজে দখল করব, সে আশা নেই। এ অবস্থায় মাত্র দু'বার্থওলা একটি কেবিন পেয়ে খুশী হলাম, কিন্তু আমার সহযাত্রীর নাম শুনেই মনটা দমে গেল। অনুমান করতে অসুবিধা হ'ল না যে, সদাসর্ব্বদা জানালা বন্ধ রাখতে হবে, রাত্রের খোলা বাতাস পাবারও উপায় থাকবে না। সানফ্রান্সিস্কো থেকে ইয়োকোহামা—চৌদ্দ দিনের এই দীর্ঘ পথ কারও সঙ্গে এক কেবিনে কাটানো এমনিতেই কত কঠিন, তবু সহযাত্রীর নাম স্মিথ বা ব্রাউন হলে ততটা ভয় পেতাম না।

জাহাজে উঠেই দেখলাম মিঃ কেলাডার মালপত্র ইতিমধ্যে নামানো হয়ে গেছে—সেদিকে চাইতেও ভালো লাগল না। সুটকেসগুলির ওপর রাজ্যের লেবেল সাটা, কাপড়ের ট্রাঙ্কটিও প্রকাণ্ড। তিনি প্রসাধনের জিনিষপত্র খুলেছেন; দেখলাম ভদ্রলোক মঁশিয়ে কোটির একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক—তাঁরই সেণ্ট, শ্যাম্পু আর ট্রিলিয়ান্টাইন দেখা গেল।

মিঃ কেলাডার মাথায় কালো ব্রাশে সোনালী মনোগ্রাম আঁকা—গা-ঘষা ব্রাশ হলেই বোধ হয় সেটা বেশী মানাত। মিঃ কেলাডাকে মোটেই ভাল লাগল না, আমি ধূমপানের ঘরে গিয়ে এক বাক্স তাস নিয়ে 'ধৈর্য্যের' খেলা খেলতে লাগলাম। সবে তাস সুরু করেছি, এক ভদ্রলোক আমার নাম করে জানতে চাইলেন আমিই সেই লোক কিনা।

"আমি মিঃ কেলাডা।" ভদ্রলোক হাসির সঙ্গে এক সারি ঝক্‌ঝকে দাঁত বিকশিত করে বসে পড়লেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে হয় আমরা এক কেবিনেই যাচ্ছি।"

"সৌভাগ্য বলতে হবে। কখন কার সঙ্গে যেতে হয় কেউ জানে না। যখন শুনলাম আপনিও ইংরেজ, খুশী হয়েছিলাম। দেখুন, বিদেশে বেরিয়ে সব ইংরেজ এক জায়গায় থাকাই আমি ভালবাসি,—আমার কথা বুঝেছেন বোধ হয়।

আমি চোখের ইশারা করলাম।

"আপনিও কি ইংরেজ?"—বোধ হয় বোকার মত জিজ্ঞাসা করলাম।

"তাই ত মনে হয়। আপনি কি আমায় আমেরিকান ঠাউরে-ছিলেন। আমার মজ্জা পর্য্যন্ত খাঁটি ব্রিটিশ।"

প্রমাণ করবার জন্ম ভদ্রলোক পকেট থেকে পাসপোর্ট বার করে সগর্ব্বে আমার নাকের ওপর দোলাতে লাগলেন।

রাজা জর্জ্জের অনেক বিচিত্র প্রজা আছেন। মিঃ কেলাডার বলিষ্ঠ খর্ব্ব গঠন, বর্ণ শ্যাম, দাড়ি-গোঁফ কামানো, স্থূল বক্র নাসা এবং উজ্জ্বল একজোড়া তরল চোখ। মাথার দীর্ঘ চিকণ কালো চুলগুলি কোঁকড়ানো। তাঁর দ্রুত বাক্যবিন্যাসে ইংরেজত্বের কোন আভাস নেই, ভাবভঙ্গীও উচ্ছাসবহুল। আমার স্থির বিশ্বাস মিঃ কেলাডার পাসপোর্টখানি খুটিয়ে দেখলে ঠিক ধরা পড়ত তিনি কোন গভীরতর নীল আকাশের তলায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমন আকাশ অন্ততঃ ইংলণ্ডে নেই।

"কি খাবেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলাম। সুরাপানের ওপর কড়া নিষেধ বলবৎ আছে, জাহাজের হাড় পর্য্যন্ত বোধ হয় শুকিয়ে আছে। পিপাসা না থাকলে নিজেই বলতে পারি না কিসে আমার বেশী অরুচি—জিঞ্জার এল্ না লেমন স্কোয়াশ। মিঃ কেলাডা আমার পানে চেয়ে তাঁর রহস্যময় প্রাচ্য হাসি হাসলেন।

"হুইস্কি সোডা না শুকনো মার্টিনি? আপনি বললেই হ'ল একবার।"

তিনি জঙ্ঘার দু'দিকের পকেট থেকে একটি করে বোতল বার করে সামনের টেবিলের ওপর রাখলেন, আমি মার্টিনি বেছে নিলাম। তিনি এবার ষ্টুয়ার্ডকে ডেকে দুটো খালি গ্লাস আর এক টাম্বলার বরফ আনতে বললেন।

"ককটেলটি কিন্তু ভারি চমৎকার"—আমি বললাম।

"ঢের আছে এখনও। জাহাজে আপনার কোন বন্ধু থাকলে তাঁকে জানাতে পারেন পৃথিবীর সব জাতের মদ আছে আমার কাছে।"

মিঃ কিলাডা এবার মুখর হয়ে উঠলেন: নিউ ইয়র্ক এবং সানফ্রান্সিস্কোর কথা বললেন, সিনেমা, থিয়েটার, এমনকি রাজ-নীতির আলোচনাও বাদ পড়ল না। তিনি দেশভক্ত হয়ে উঠলেন। ইউনিয়ন জ্যাক একখানি সুদৃশ্য বস্ত্রখণ্ড সন্দেহ নেই, কিন্তু আলেক-জান্দ্রিয়া কিংবা বেইরুটের কোন ভদ্রলোকের হাতে সেটা সদর্পে উড্ডীন হতে থাকলে তার যে কতকটা সম্মানহানি হয়, তা না ভেবে পারি না। মিঃ কেলাডা ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছেন। দম্ভ না করেও বলা যায় কোন অপরিচিত লোকের মুখে আমার নামের আগে 'মিষ্টার' কথাটা ব্যবহার করাই বোধ হয় বেশী শোভন হ'ত, কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টায় মিঃ কেলাডা আমার প্রতি সে রকম কোন

সম্ভ্রম প্রকাশ করলেন না। আমার তা ভাল লাগে নি। তিনি আসন গ্রহণ করবার পর তাস সরিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু প্রথম আলাপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে ভেবে আবার খেলতে লাগলাম।

"চায়ের ওপর তিন"—মিঃ কেলাডা বললেন, সময় কাটাবার জন্য তাস খেলতে বসে, কার্ড উল্টে কোথায় রাখতে হবে নিজে বিচার করবার আগেই যদি আর কেউ সেটা বলে দেয় তার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই।

"আসছে—এল বলে"—তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন,—"গোলামের ওপর দশ।"

রাগ ও ঘৃণায় আমি খেলা বন্ধ করে দিলাম। তিনি তাস উঠিয়ে নিলেন।

"তাসের খেলা দেখবেন ?"

"না। আমি তাসের খেলা ঘৃণা করি"—জবাব দিলাম।

"কেবল এই একটা খেলা দেখাব আপনাকে।"

তিনি আমায় তিনটি খেলা দেখালেন। জানালাম, এবার নীচে গিয়ে আমায় খাবারের জায়গা দখল করতে হবে।

"ঠিক বলেছেন"—তিনি বললেন, "আমি আগেই আপনার জন্য জায়গা ঠিক করে রেখেছি। ভাবলাম, যখন এক কামরাতেই থাকি, খাওয়াও এক টেবিলে হওয়া উচিত।"

মিঃ কেলাডাকে আমার ভাল লাগে নি। আমি যে কেবল তাঁর সঙ্গে এক কেবিনে থাকতাম এবং এক টেবিলে বসেই দিনে তিন বার খানা খেতাম তাই নয়, তাঁকে বাদ দিয়ে ডেকের ওপর একা বেড়াবারও আমার উপায় ছিল না। তাঁকে লজ্জা দেওয়া অসম্ভব—তাঁর মাথাতেই ঢুকত না যে, কেউ চায় না তাঁকে। তাঁর বিশ্বাস তিনি যেমন আপনাকে দেখে খুশী হন, আপনিও বুঝি তাই হবেন। আপনি যদি তাঁকে নিজের বাড়ী থেকে ঠেলে নীচে নামিয়ে দিয়ে দরজাটা তাঁর মুখের ওপরই বন্ধ করে দিতেন, তাও বোধ হয় তিনি সন্দেহ করতেন না যে, তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

তা হলেও ভদ্রলোক খুব মিশুক—তিন দিনের মধ্যে জাহাজের সবাইকে চিনে ফেললেন। তিনিই সব চালাতেন: ঝাড়ু দেওয়া তদারক করছেন, নীলাম ডাকাচ্ছেন, খেলার প্রাইজের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করছেন, ডিস্ক-থো, এবং গল্‌ফ খেলার আয়োজন করছেন, কনসার্ট ও ফ্যান্সি ড্রেস বলনাচের বন্দোবস্তও তিনিই করবেন। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করছেন। অবশ্যই তিনি জাহাজের সব চেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি। আমরা তাঁর নাম রেখেছিলাম 'সবজান্তা' বাবু, এমনকি তাঁর সামনেই বলতাম। তিনি কিন্তু সেটা গৌরব বলে ধরতেন। খাবার সময় তাঁকে আর বরদাস্ত করা যেত না—এক ঘণ্টার বেশী সময় আমাদের তখন তাঁরই দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হ'ত। ভদ্রলোক যেমন বাচাল, তেমনি তাঁর রঙ্গরস এবং তার্কিক স্বভাব। সবকিছু তিনিই সকলের চেয়ে বেশী বোঝেন। তাঁর সঙ্গে একমত না হওয়ার মানে তাঁর আত্মশ্লাঘার অপমান করা। যত নগণ্য বিষয়ই হোক, নিজের মতে না আনা পর্য্যন্ত তিনি কাউকে অব্যাহতি দেবেন না। তিনিও যে ভুল করতে পারেন, সে কথা তাঁর মনেই হ'ত না।

আমরা ডাক্তারের টেবিলে খানা খেতে বসেছি। ডাক্তারটি স্বভাব-অলস, আমিও নিতান্ত উদাসীন, এ অবস্থায় মিঃ কেলাডা বোধ হয় একাই আসর জাকিয়ে বসতেন, কিন্তু র‍্যামজে বলে আর এক ভদ্রলোকের জন্য তা পারলেন না। ইনিও তাঁর মতই জেদি এবং মিঃ কেলাডা নিজের সিদ্ধান্ত নির্ভুল প্রমাণ করতে চাইলেই তিনি ক্ষেপে উঠতেন। দু'জনে একবার তর্ক বাধলে আর শেষ হ'ত না এবং ক্রমেই তা তিক্ত হয়ে উঠত।

র‍্যামজে আমেরিকান দৌত্য বিভাগের চাকরি নিয়ে কোব-এ বসবাস করতেন। বিশাল দেহ ভদ্রলোকের, আদিনিবাস আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম প্রান্তে; টান চামড়ার নীচে থলথলে চর্ব্বিভরা বপুখানি রেডিমেড পোশাকের ভেতর দিয়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তাঁর স্ত্রী বছরখানেকের জন্য দেশে গিয়েছিলেন, তাঁকেই আনবার জন্য ভদ্রলোক উড়ো জাহাজে করে নিউইয়র্কে গিয়ে এবার সস্ত্রীক চাকুরিস্থলে ফিরে যাচ্ছেন।

মহিলা ভারি সুন্দরী—মিষ্টি ব্যবহার, স্বভাবেও রসবোধ আছে। দৌত্য বিভাগের চাকুরিতে তেমন পয়সা নেই, কাজেই র‍্যামজে গৃহিণী সাদামাটা পোশাকই পরে থাকতেন, কিন্তু পোশাক পরবার ধরন জানেন তিনি—বেশ একটি সরল, সংযত আভিজাত্যের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন। তাঁর দিকে হয়ত আমার নজরই পড়ত না, কিন্তু তাঁর ভেতর এমন একটি বিশেষ গুণ ছিল যা নারীর স্বভাবসুলভ হলেও আজকাল আর বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর সলজ্জ ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। কোটে যেমন ফুল, তেমনি এটাও তাঁর স্বভাবের শোভা ছিল।

এক দিন নৈশ আহারের সময় প্রসঙ্গতঃ মুক্তার আলোচনা উঠল। কুশলী জাপানীদের তৈরী কালচার মুক্তা নিয়ে খবরের কাগজে বেশ লেখালেখি চলছে। ডাক্তার বললেন, এর পর আর আসল মুক্তার ইজ্জত থাকবে না। মুক্তাগুলো ইতিমধ্যেই যা সুন্দর হয়েছে, আর কিছুদিন পরে একেবারে নিখুঁত হয়ে উঠবে।

মিঃ কেলেডা তাঁর স্বভাবমত অমনি তর্কে অবতীর্ণ হলেন এবং মুক্তার বিষয়ে যা কিছু জানবার ছিল আমাদের জানিয়ে দিলেন। আমার বিশ্বাস র‍্যামজে মুক্তার বিষয় কিছুই জানতেন না, কিন্তু তা হলে কি হয়—'সবজান্তা'কে খোঁচাবার এমন সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হতে দেখে তিনিও লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। ফলে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে উঠল। আগেও আমি মিঃ কেলেডার তর্ক এবং উষ্মা দেখেছি, কিন্তু এমন দেখি নি কখনও। অবশেষে র‍্যামজে কি বলে তাঁকে আঘাত করতেই ভদ্রলোক টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

"আজ্ঞে, বক্তব্য বুঝেই কথা বলছি। আমি জাপানীদের এই মুক্তোর ব্যবসা দেখতেই যাচ্ছি সেখানে। যারা কারবারী তারা জানে

আমি যা বলে দেব তার আর কখনও নড়চড় হবে না। পৃথিবীর সব সেরা মুক্তোই জানি আমি, যা জানি নি তা জানবার যোগ্যও নয়।

আমরা এবার কিছু সংবাদ পেলাম। কারণ মিঃ কেলেডা অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু ঠিক কি কারবার করেন আগে তা কাউকে বলেন নি। আমরা কেবল অনুমানে এটুকু বুঝেছিলাম যে, তিনি কোনও ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে জাপানে যাচ্ছেন।

"এমন কোনও ঝুটা মুক্তো তৈরি হয় নি যা আমার মত বিশেষজ্ঞ একনজরে না বলে দিতে পারে।" তিনি মিসেস র‍্যামজের গলার হারের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করলেন। "মিসেস র‍্যামজে, আপনি আমার কাছে জেনে রাখুন, যে হারটা আপনি এখন পরে আছেন, কোন দিন তার দাম এক সেণ্টও কমবে না।"

মিসেস র‍্যামজে একেই লাজুক মানুষ—তিনি এবার সামান্য রাঙা হয়ে হারটি পোশাকের ভেতরে ঢেকে নিলেন।

র‍্যামজে সামনে ঝুঁকে বসলেন এবং চোখে হাসির ঝিলিক্ টেনে আমাদের দিকে তাকালেন।

"মিসেস র‍্যামেজের হারটি ভারি সুন্দর, তাই না?"

"আমি আগেই তা লক্ষ্য করেছিলাম,"—মিঃ কেলাডা জবাব দেন—"তখনই ভেবেছিলাম ওগুলো আসল মুক্তো।"

"আমি অবশ্য নিজে কিনি নি, তবু আপনি এর কত দাম ধার্য্য করেন জানবার আগ্রহ হচ্ছে।"

"তা বাজারদর পনর হাজার ডলারের কাছাকাছি হবে, তবে যদি ফিফথ এভিনিউতে কেনা হয়ে থাকে ত্রিশ হাজার বললেও আশ্চর্য্য হব না।"

র‍্যামজে নিষ্ঠুরের মত হাসলেন।

"আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যেদিন আমরা নিউইয়র্ক ত্যাগ করি সেই দিনই আমার স্ত্রী একটি 'বিভাগীয়' বিপণি থেকে মাত্র আঠার ডলারে ওটা কিনেছিলেন।"

লজ্জায় মিঃ কেলাডার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

"বাজে কথা। মুক্তোগুলো শুধু খাঁটিই নয়, ঐ আকারের একছড়া মুক্তোর হার এর আগে দেখি নি কখনও।"

"বাজি রাখবেন? এক শত ডলার বাজি রেখে বলছি, ওটা নকল।"

"বেশ, তাই রইল।"

"আঃ এলমার, সত্যি কথার উপর তুমি বাজি রাখতে পার না,"—মিসেস র‍্যামজে বললেন। তাঁর অধরে সামান্য হাসি ফুটে উঠল, কণ্ঠস্বরে নিষেধের মৃদু মিনতি।

"নয় কেন? এত সহজে টাকা পেলে না নেওয়াই বোকামি হবে।"

"কিন্তু প্রমাণ হবে কি করে"—মহিলা বলতে লাগলেন; "আমার কথাটাই কেবল মিঃ কেলাডার বিরুদ্ধে যাচ্ছে।"

"হারটা দেখি একবার—নকল হলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেব। এক শত ডলার হারতে রাজী আছি।"—মিঃ কেলাডা বললেন।

"খুলে দাও ত গো, যত ইচ্ছা দেখুন ভদ্রলোক।" মিসেস র‍্যামজে মুহূর্তকাল দ্বিধা করলেন, তারপর হারের ক্লাসের দিকে হাত বাড়ালেন।

"আমি খুলতে পারছি না"—মহিলা বললেন, "মিঃ কেলাডাকে আমার কথাই মেনে নিতে হবে।"

সহসা আমার কেমন সন্দেহ হ'ল—হয়ত এখনই অপ্রিয় একটা কিছু ঘটবে, তবু বলার মত কিছু খুঁজে পেলাম না।

র‍্যামজে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"আমি খুলে দিচ্ছি।"

হারটি মিঃ কেলাডার হাতে দিতে, মধ্যপ্রাচী-নিবাসী ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি আতশী কাচ বার করে সেটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর মাজা শ্যাম মুখের উপর বিজয়ের হাসি ছড়িয়ে গেল। কিছু বলতে যাবেন, সহসা তাঁর নজর পড়ল মিসেস র‍্যামজের মুখের উপর, মহিলার মুখখানা এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মনে হ'ল বুঝি বা মূর্চ্ছা যাবেন। ভয়-বিস্ফারিত চোখে মহিলাও তাকিয়ে আছেন মিঃ কেলাডার দিকে। তাঁর চোখে এক সকরুণ আবেদন—এতই স্পষ্ট, অথচ তাঁর স্বামীর নজরে তা পড়ল না দেখে আশ্চর্য্য হলাম।

মিঃ কেলেডা মুখ খুলে চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখখানা গাঢ় লাল হয়ে উঠেছে,—কি কঠোর চেষ্টায় যে নিজেকে দমন করছেন মুখ দেখলেই স্পষ্ট ধরা যায়।

"আমারই ভুল" বললেন তিনি।—"একেবারে নিখুঁত নকল, তবে কাচ দিয়ে দেখেই ধরে ফেলেছি। আমারও মনে হয় এই বাজে জিনিসের দাম আঠার ডলারই হবে।"

পকেট থেকে একখানি এক শত ডলারের নোট বার করে তিনি নীরবে সেটা র‍্যামজের হাতে দিলেন।

"আশা করি এতেই আপনার শিক্ষা হবে, এবং ভবিষ্যতে নিজের বিচার নিয়ে আর কখনও দম্ভ করবেন না"—র‍্যামজে নোটখানি হাতে নেবার সময় বললেন—লক্ষ্য করলাম মিঃ কেলাডার হাতখানা থর থর করে কাঁপছে।

গল্পের মতই খবরটা সারা জাহাজে রাষ্ট্র হয়ে গেল এবং সেদিন সন্ধ্যায় মিঃ কেলাডাকে বেশ খানিক দুর্ভোগ সইতে হ'ল। সবজান্তাবাবু এবার ধরা পড়েছেন বলে সবাই খুব তামাশা লাগিয়েছে, মিসেস র‍্যামজে মাথাব্যথার অজুহাতে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠে দাড়ি কামাচ্ছি, মিঃ কেলাডা তখনও বিছানায় শুয়ে একটি সিগারেট টানছেন। সহসা একটা খস খস শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি কে যেন একটা চিঠি দরজার নীচ দিয়ে ঠেলে দিলে। উঠে এসে দরজা খুলে চারিদিকে চাইলাম, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম গোটা গোটা ব্লক-হরফে মিঃ কেলাডার নাম লেখা। সেটা তাঁকেই দিলাম।

"কার কাছ থেকে এল?"—তিনি সেটা খুললেন। "আচ্ছা।"

খাম খুলে চিঠির বদলে তিনি একখানি এক শত ডলারের নোট

টেনে বার করলেন। তিনি আমার দিকে চাইলেন—মুখখানা তাঁর আবার লাল হয়ে গেল। খামখানা কুচিয়ে টুক্‌রোগুলো আমার হাতে দিয়ে বললেন, "পোর্টহোল দিয়ে বাইরে ফেলে দেবেন?"

আমি তাঁর কথামত কাজ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলাম একটু।

"অত লোকের সামনে বেকুব বানালে কেউ তা সইতে পারে না।"

"মুক্তোগুলো কি তা হলে আসল ছিল?"

"মশায়, আমার অমন সুরূপা স্ত্রী থাকলে সারা বছর তাকে নিউইয়র্কে রেখে নিজে কোব-এ পড়ে থাকতাম না"—তিনি বললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ কেলাডাকে আমার তত খারাপ লাগল না। তিনি এবার পকেট-বই বার করে এক শত ডলারের নোটখানি সযত্নে তুলে রাখলেন।

কবীর-বাণী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

("নৈহর সে জিয়রা ফট রে"—বাণীর অনুবাদ)

আকুল হয়েছে অন্তর মোর
প্রিয়ের ভবন লাগি,
স্বামীগৃহ যার গিয়াছে হারায়ে
ঘর পথ তার একই।
তবু মন মোর হয়েছে উছল
সুখ নাহি মনোমাঝে,
সে ভবনে দেখি লক্ষ দুয়ার
সমুখে সাগর রাজে।
বল সখি বল কেমনে আমি যে
উতরিব সেই পথ,
অতল সাগর পারায়ে আমার
পুরিবে কি মনোরথ?

অপরূপ রূপে রচিত সে বীণা
উঠে যবে ঝঙ্কার,
মন প্রাণ মোর উথলি উঠিয়া
লুটায় যে বার বার,
তন্ত্রী যখন টুটি যায় হায়
শুধায় না কেহ আর!

হাসিয়া হাসিয়া পিতা ও মাতায়
যখন শুধাই আমি,
প্রভাত হইলে আমি ত হইব
স্বামীর ভবন-গামী।
"যাহা খুশি তব তাহাই করিবে
স্বামী কি এতই বশ?—
স্নান সমাপনে চলে সোহাগিনী
লভিতে অরূপ রস!"

অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরায়ো
হে মোর জীবন-সাথী,
হৃদয় আমার উঠেছে ভরিয়া
আজি যে সোহাগ-রাতি!
কহিছে কবীর, শুন হে সাধু ভাই—
অধীর মিলন রাতে,
ঘুম নাই আজ আঁখিপাতে মোর
স্মরণ করিও প্রাতে!



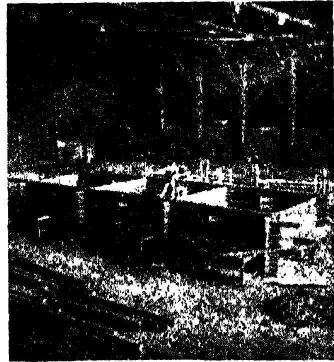
প্রশান্ত-উপকূলে নবনির্ম্মিত নকল গড়

[দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক প্রথম কাঠের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। সম্প্রতি ফিনল্যাণ্ডের কালভিয়া নামক স্থানের অধিবাসী ওলাভি হিটাহারজু এবং ভালিও রটিও নামক দুই ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই দুর্গটির একটি প্রতিরূপ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। ওলাভি হিটাহারজু তাঁহার মাতৃভূমি হইতে আমেরিকায় নবাগত, কাঠের এবং কুঠারের কাজে সুদক্ষ একজন 'ফিন'। দুর্গনির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করেন ভালিও রটিও।]

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে। সমুদ্র হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী কলম্বিয়া নদীর যে ক্ষুদ্র উপনদীটি সাম্প্রতিক কালে "লিউইস এণ্ড ক্লার্ক" নামে অভিহিত, তাহার তীরে কাঠের গুঁড়ি দিয়া এই দুর্গটি নির্ম্মিত হয়। এক শতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ এই দুর্গের কথা বিলীন হইয়া ছিল বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। কিন্তু অবশেষে, লিউইস এবং ক্লার্ক অভিযাত্রীদলের প্রশান্ত মহাসাগরে উপস্থিতির সার্দ্ধ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইহার একটি অনুকৃতি-পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।



লিউইস এবং ক্লার্ক নদীর তীরে নবনির্ম্মিত কাঠের দুর্গ —'ক্লাটসপ'



এষ্টোরিয়া বিমানঘাঁটিতে নবনির্ম্মিত দুর্গ—এখানেই প্রথম একটি 'হ্যাঙ্গারে' দুর্গটির সমগ্র অংশের একত্রীকরণ হয়

আমেরিকার ইতিহাসের গোড়ার দিকে, ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেলাওয়ার নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত সুইডিশ উপনিবেশে বহিরাগতগণ (emigrants) কর্ত্তৃক কাঠের গুঁড়ি দ্বারা ঘর নির্ম্মাণের রেওয়াজ হয়। ক্রমে ইহা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

মূলতঃ উপরোক্ত দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৪ এবং ১৮০৫ সনের সেই ঐতিহাসিক লিউইস এবং ক্লার্ক অভিযাত্রীদল কর্ত্তৃক, যাহা সাকা জাওইয়া নামক জনৈকা রেড ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোকের নেতৃত্বে আমেরিকার আরণ্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া উপনীত হইয়াছিল

কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে কুঠার এবং করাতের কাজে কুশলী কারিগর একজনও ছিল না। এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইত যদি না ওলাভি হিটাহারজু—যিনি রাশিয়ার সঙ্গে ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—বলিতেন যে, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে অভিযাত্রী সৈন্যদল যে ধরনের

দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল তিনিও অবিকল তাহার অনুরূপ নকল গড় তৈরি করিতে সমর্থ হইবেন।

হিটাহারজু মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে উপনীত হইয়াছিলেন পূর্ব্বেকার দুর্গের অবস্থান-স্থলের মাইলকয়েক দূরবর্ত্তী ওরগোনের এষ্টোরিয়া নামক স্থানে। সহকারীরূপে তিনি পাইলেন কাঠের কাজে দক্ষ ভালিও রটিওকে। তিনিও সদ্য ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে আমেরিকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।



দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য পুরানো পদ্ধতিতে হাতের সাহায্যে কর্ত্তিত গাছগুলিকে একটি ঘোড়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গাছের ছাল ছাড়ানো হইতেছে একটি সাধারণ কোদালের সাহায্যে

দুর্গ গড়িয়া তোলার ভার অর্পিত হইল হিটাহারজু এবং রটিওর উপর। ইঁহারা উভয়ে পূর্ণোদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তৈরী (finished) কাঠগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য দুই বার এই দুর্গের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। দুর্গটিকে প্রথম গড়িয়া তোলা হয় টি টমেন্ট, প্লাণ্টে, পরে স্থানান্তরিত করা হয় লিউইস এণ্ড ক্লার্ক নদীর তটভূমিতে।

কাঠের উপর দুই জন ফিনে'র কুঠার চালানোর কৌশল দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া বহু লোক সেখানে আসিয়া সমবেত হইত। এই কাজের প্রতি তাহাদের আকৃষ্ট হইবার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, দূর পাশ্চাত্যের যে অঞ্চলে বৃহৎ বাহাদুরি কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে কুঠারের সাহায্যে কাঠের কাজ লোপ পাইয়া যাইতেছে। কাঠের গুঁড়ি কাটার কাজ যাহারা করে, তাহাদের মধ্যে এখন আর হাত-করাত (hand-saw) এবং কুঠার ব্যবহারের রেওয়াজ নাই। ইদানীং বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহারা বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত করাতের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঠের গুঁড়ি কাটিয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কুঠার, করাত ইত্যাদির সাহায্যে 'নকল গড়' নির্ম্মাণের জন্য যখন লোক চাওয়া হইল তখন এই দু'জন বহুমানাস্পদ কুঠারী (axeman) কোন্ ঘটনাসূত্রে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সে বিষয়ে তাঁহারা নিজেরা যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এখানে দেওয়া হইল।

এই প্রসঙ্গে ওলাভি হিটাহারজু বলেন :—

"এখন আমার বয়স বত্রিশ বৎসর। কালভিয়াতে আমার জন্ম হয়, আমি পরিবারের চতুর্থ সন্তান। উন্নততর জীবিকার সন্ধানে আমার পিতা যখন জন্মভূমি ছাড়িয়া কানাডায় চলিয়া আসেন, আমি তখন মাত্র ছয় মাসের শিশু। দুই বৎসরেরও অনধিককালের মধ্যে তিনি আবার স্ব-গৃহে ফিরিয়া আসেন। বড় হইবার পর যখন আরও একটু বেশী বুঝিবার ক্ষমতা আমার জন্মিল তখন বাবার মুখে তাঁহার ভ্রমণ-কথা শুনিতাম, বিদেশের যে অঞ্চলে তিনি গিয়াছিলেন সেখানকার জীবন-যাত্রা সম্পর্কেও তিনি গল্প করিতেন। হয়ত সেই সূত্রেই আমেরিকা সম্বন্ধে আমার যেন একটা ব্যক্তিকের সৃষ্টি হইয়াছিল। তরুণ বয়সেই আমি আমেরিকা যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম, কেননা আমার কাছে আমেরিকা ছিল ভগবানের আশ্বাস-দেওয়া সেই দেশ যেখানে অনেকে তাঁহাদের ভাগ্যপরীক্ষা করিয়াছেন।

আমার বয়স যখন উনিশ বৎসর তখন এক সৈন্যদলসহ আমি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হই। যথোচিত সাজসরঞ্জাম লইয়াই আমি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলাম—শৈশবকাল হইতেই আমি করাত, কুঠার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া আর সেগুলি দ্বারা টুকিটাকি কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

১৯৪৪ সনের ১লা জুলাই তারিখে প্রচণ্ড যুদ্ধে আমি আহত হই। একটি কামানের গোলার আঘাতে আমার মাথায় দুই ইঞ্চি গভীর একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়—শেষে অবশ্য ইহার কোন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয় নাই।

যুদ্ধকালীন কার্য্য হইতে মুক্তি পাইবার পর আমি বৎসরকয়েক ফিন্‌ল্যাণ্ডের উত্তর ভাগের বনাঞ্চলে কাজ করি। তার পর আমি হইলাম আসবাব এবং হাল্কা কাঠের কাজের ছুতার মিস্ত্রী (joiner)। এই সময় আমি কাঠের গুঁড়ির কতকগুলি ঘর তৈরি করি এবং অন্য পদ্ধতির গৃহনির্ম্মাণের কাজেও প্রবৃত্ত হই।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে আমার কাজের শেষ তিন বৎসর আমি এক বৃত্তাকার করাত ব্যবহার করিতাম। বিস্তর গৃহহারা কারেলিয়ানদের বাসগৃহের জন্য কাঠের গুঁড়ি, কড়িকাঠ, কাঠের বরগা ইত্যাদি তৈরির কাজে আমি ব্যাপৃত থাকিতাম।

অবশেষে আমার আমেরিকা যাত্রার সময় আসন্ন হইল এবং সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে আমি একেবারে

ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সেই দিনটি আসিল ১৯৫১ সনের জানুয়ারী মাসে এবং আমি ওরগোনের এষ্টোরিয়ায় পৌঁছিয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করিলাম। দুই বৎসরের মধ্যে কিন্তু আমি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। অপরিচিত স্থানে আমি ছিলাম এক বিমূঢ় যুবক, এমনকি ও-দেশের ভাষায় আমি কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলিতে পারিতাম না। আমি স্থির করিলাম যে, আমাকে একটা-কিছু করিতে হইবেই। সকল সময়েই আমাকে এ কথা বলা হইত যে, আমেরিকা এমন একটি স্বাধীন দেশ যেখানে প্রত্যেকেই নিজের অভিলাষ অনুযায়ী কাজ করিতে পারে, আমিই বা তবে পারিব না কেন? স্থির করিলাম যে, আমি স্কুলে যাইব এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডে যে ক্লাস হইতে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ক্লাস হইতে আবার বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিব।

বিদেশী ভাষায় কাজ চালানো এবং বিদ্যা অর্জ্জন করা আমার নিকট বড়ই দুরূহ কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল, কিন্তু ফিনদের প্রকৃতিগত 'সিসু' (প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়লাভের ইচ্ছা) আমার কৃতকার্য্যতা-লাভের পথে সহায়ক হইল।

এমনিভাবে মাসপাঁচেক চলিল বেশ, শেষে আমার চোখের পীড়ার সৃষ্টি হইল—চোখ দুটি বেদনায় এরূপ টনটন করিত যে, আমি আর পড়িতে পারিতাম না। তখন জনৈক চক্ষুচিকিৎসকের কাছে গিয়া ইহার প্রতিকারের পন্থা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না।

কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা আমাকে দমাইতে পারিল না। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পূর্ব্বে আমাকে আরও দুই বৎসর 'হাই' স্কুলে যাইতে হইবে। তার পর কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে দন্তচিকিৎসক হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনকে পাইয়া বসিল—নবীন উৎসাহে আমি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিব না।

হঠাৎ ঘটিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!

আমার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গত বসন্ত-ঋতুর কার্য্যকালের শেষভাগে একদিন 'হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটি'র কতিপয় সদস্য আমার নিকটে আসিয়া ক্লাটসপ দুর্গটির একটি প্রতিরূপ নির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায়তা করবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। আমি সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলাম।

আমাদিগকে প্রায়ই একথা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমেরিকা আমাদের কেমন লাগে? আমার জবাব হইতেছে এই যে, আমেরিকা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ, জীবনে সাফল্যলাভের অনেক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান এই প্রগতিশীল মহাদেশে। এই দেশের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সুগভীর। অবশ্য 'পদকের আর একটি দিক'ও আছে (ফিন্‌ল্যাণ্ডে এটি আমাদের একটি বড় প্রিয় উক্তি)। আপনি যদি বিদেশে জাত এবং লালিতপালিত হন তাহা হইলে মাতৃভূমির জন্য সর্ব্বদাই আপনি একটি গভীর আকর্ষণ অনুভব করিবেন। আমার জন্ম বিদেশে, বিদ্যার্জ্জনও আমার বিদেশেই হইয়াছে এবং এখনও আমি বিদেশেই আছি; কিন্তু শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যে দিনগুলি আমার কাটিয়াছিল মাতৃভূমির স্নেহক্রোড়ে তাহার স্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না—বিশেষতঃ, শৈশব-স্মৃতিকে কি ভোলা যায়? সব সময় খুব জোরালো না হইতে পারে, কিন্তু মানসলোকে তাহারা ফিরিয়া আসে বার বার। একদিন নিশ্চয়ই আমি আবার ফিরিয়া যাইব ফিনল্যাণ্ডে—শত সুখস্মৃতিবিজড়িত আমার আপন-গৃহে। ফিনল্যাণ্ড এবং তাহার স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমি নিবেদন করি আমার ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আবার আমি দেখিতে চাই—ফিনল্যাণ্ডের বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য্য ও সমারোহ। বসন্তঋতুর এমন অত্যাশ্চর্য্য রূপমাধুর্য্য ত আর কোথাও নাই। শীতের জীর্ণ আবরণ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি আর কোথাও বুঝি খুশিতে এমন ঝলমল করিয়া উঠে না।



৪০৮টি কাঠের গুঁড়ি দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গের রক্ষণ-সহায়ক কাষ্ঠাবরণ। চূড়ান্ত রূপদানের পর দুর্গটির আকার দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখিবার উদ্দেশ্যে কাঠের আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়

বস্তুতঃ আমেরিকাপ্রবাসী সকল ফিনই আমারই মত দেশের কথা ভাবিয়া থাকে, যদিও খুব কম লোকেই ইহা স্বীকার করিবে। এই সুযোগে আমি আমার মাতৃভূমিকে পাঠাইতেছি—আমার প্রীতি-উদ্বেলিত হৃদয়ের আন্তরিক অভিনন্দন।"

ভালিও রটিওর কথা:

"চাষ-আবাদ এবং জমিজমা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য বরাবরই আমার প্রধান উপজীবিকা, কিন্তু আমার অবসর সময়ের কাজ হইতেছে—গৃহনির্ম্মাণ, সূত্রধরের কাজ এবং দেরাজ ইত্যাদি তৈয়ারি করা। 'ট্রেডস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে' আমি দেরাজ নির্ম্মাণের কোর্স,



যথাস্থানে কাষ্ঠোত্তোলনরত ওলাভি হিটাহারজু এবং ভালিও রটিও (সাদা টুপী পরিহিত)

"সারফেস ট্রিটমেন্ট" এবং পালিশের কাজের (polishing) বিশেষ কোর্স শেষ করিয়াছিলাম।

১৯৫৫ সনের ১৬ই জানুয়ারী আমি আমেরিকায় পৌঁছি। আমার স্ত্রী এবং তিনটি কন্যা আছে। কনিষ্ঠতমাটির বয়স মাত্র তিন মাস। এখানকার জীবন বাস্তবিকই আমাদের নিকট খুবই উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়।

'জয়েনারি' এবং ছুতারমিস্ত্রীর কাজে পাকা হইতে হইলে অবশ্যই খুব অল্প বয়সে কাজ শেখা আরম্ভ করিতে হইবে। এই কাজের সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম হইতেছে—যন্ত্রপাতিকে সর্ব্বদা উত্তমরূপে মেরামত করিয়া রাখা। নিজের কাঠের গুণাগুণ জানা খুবই ভাল এবং পরম্পরাগত যে সকল নক্সার কাজ শিক্ষা করা হইয়াছে সেগুলি কখনো ভুলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে—এগুলিকে প্রায়শঃই আধুনিক রুচির উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আমেরিকার জয়েনাররা কাঠের গুড়ি দ্বারা গৃহ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বড় একটা কিছু জানে বলিয়া মনে হয় না, অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও থাকিতে পারে। কিন্তু এই কাজ কি ভাবে করা হয় তাহা দেখিতে তাহাদিগকে খুব আগ্রহান্বিত বলিয়া বোধ হয়।"

ন. ভ.

"Finlaudia Pictorial" অবলম্বনে



বিনোবা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

বিনোবা আজ মাটির মানুষ। তাঁহার সান্নিধ্যলাভ কঠিন নয়। কাজ থাকে ত গেলেই হইল। বিনোবা এখন লোকের সহিত কথা বলেন, লোকের সহিত মিশেন। তখন বিনোবা যেন ছিলেন আর এক ব্যক্তি—রুক্ষ, শুষ্ক, 'ভাগানেবালা'—অর্থাৎ যিনি লোকের সংস্রব পরিহার করিবার নিমিত্ত দূরে সরিয়া থাকেন।

বৎসর কয়েক আগেকার কথা, সম্ভবতঃ ১৯৪৯ সন হইবে। এক যুবক বন্ধু আসিলেন, একেবারে মারমুখো। বলিলেন, 'ধেৎ, এ আবার মানুষ! এত নাম শুনেছি, দেখতে গিয়েছিলাম আমি আর অমুক। কথাটা পর্য্যন্ত বললেন না।'

বন্ধু তখন সবে ওয়ার্দ্ধা হইতে ফিরিয়াছিলেন। আমার তখনও বিনোবার দর্শনলাভ হয় নাই। বিনোবার লেখা এবং বক্তৃতা সাগ্রহে পড়িতাম। 'হরিজন পত্রিকা'র জন্য অনুবাদ করিতে হইত। বাছিয়া বিনোবার ভাষণ চাহিয়া লইতাম, ভাল লাগিত। বন্ধুর কথা চুপটি করিয়া শুনিলাম। বিস্ময় বোধ হইল। বন্ধু ত গান্ধীর সংস্রবে কিছুদিন ছিলেন!

সেবাপুরীতে প্রথম বিনোবাকে দেখিলাম, ভাষণ শুনিলাম। প্রতীতি হইল—বিনোবা নম্রতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু বলিতে গেলে তখন ত তাঁহার আর এক জীবন আরম্ভ হইয়াছে। তিনি পথে বাহির হইয়াছেন—যদিও ১৯১৬ সন হইতেই বিনোবা অনিকেত।

সেবাপুরী সর্ব্বোদয় সম্মেলনে তুকড়েজী* মহারাজ যে ভাষণ দেন তাহা হইতে বিনোবার তখনকার জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন:

"মানুষ তিন শ্রেণীর—পশু, মানুষ, ভগবান। পশু সে যে অন্যের ভাল করে না। মানুষ সে যে নিজের ভাল করে, কিন্তু অপরের কথাও ভাবে। আর ভগবান সে যে কেবল অন্যের হিতের জন্যই জীবন ধারণ করে। বাপু ভগবান ছিলেন না ত কি? পূজ্য বিনোবাজী আজ ভগবান, এ বিনোবা বরাবর এমনটি ছিলেন না। তিনি তখন বড় 'তুসড়া'† ছিলেন—না মিশতেন কারও সঙ্গে, না বলতেন কথা। বাপু থাকতেন ত এঁকে কি এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেতেন? সোজাসুজি কথা তিনি বলতেন না, কিন্তু আজ তিনি বুঝেছেন লোকদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকলে কাজ চলে না। এখন লোককে বাবা-দাদা বলে বোঝান, বলেন, 'আমাকে নিজ ভাই বলে গণ্য কর, পুত্র বলে মনে কর'। কে বলবে এ বিনোবা সে বিনোবা। বাবা মরে গেছেন, ছেলের উপর সব দায়িত্ব বর্ত্তেছে। আমাদের পক্ষে বাপুর স্থান এখন বিনোবা নিয়েছেন। গান্ধীর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁরই মত প্রেমপূর্ণ হয়েছেন। গান্ধীজীর তিনি 'নকীব'।"

বিনোবা নম্র। ভাষণের শেষে তিনি সবাইকে করজোড়ে প্রণাম করেন। ছোট-বড় সবাইকে পত্রের অন্তে 'বিনোবাকে পরণাম' বলিয়া অভিবাদন জানান। তাহা হইলেও কঠোরতার একটু রেশ আজও বুঝি তাঁহাতে আছে। ক্রমবর্দ্ধমান জনগণের সংস্পর্শে আসার ফলে কালে তাহা দূর হইয়া যাইবে আর তার স্থলে দেখা দিবে কোমলতা, যে ধরনের কোমলতা গান্ধীতে দেখা যাইত।

একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা। ১৯৪৫ সন, গান্ধী ডায়মণ্ডহারবার হইতে নদী পার হইয়া মেদিনীপুরে যাইবেন। ঘাটে ষ্টীমার বাঁধা, সভার শেষে গান্ধী ষ্টীমারে উঠিয়া বসিয়াছেন। খাদি-মন্দিরের কর্ম্মীরা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার কাছ হইতে কেহ কেহ একটু দূরে বসিয়াছেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া গান্ধী বলিলেন, "দূরে বসেছেন কেন? এগিয়ে আসুন। বিহারের কর্ম্মীরা আমার গা ঘেঁষে বসে।"

লোককে আপন করিয়া লওয়ার এরূপ আগ্রহ এক দিন নিশ্চয় বিনোবাতেও দেখা যাইবে।

অথবা যাকে কঠোরতার রেশ বলিতেছি তাহা তাঁহার পূর্ব্বেকার দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যের জেরও হইতে পারে। আর গাম্ভীর্য্যের ঐ অবশেষকে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছাড়া অন্য লোকের পক্ষে কঠোরতা মনে করা অস্বাভাবিকও ছিল না। নিম্ন-উক্তি তার সাক্ষ্য। ১৯১৭ সনে মহাদেব দেশাই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছিলেন:

"দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে থেকেও হয়ত তাঁকে আপনি আদৌ চিনতে পারেন নি। আর যখন চিনেছেন ত সবে চিনতে সুরু করেছেন। তাঁর গাম্ভীর্য্য দুর্ভেদ্য, সহজে সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। কথা তিনি বড় একটা বলেন না, নিজের সম্বন্ধে ত প্রায় নয়ই। কিন্তু তাঁর অতল তলে প্রবেশ করতে পেরেছেন ত বিস্ময়ে আপনি বলবেন, 'এমন রত্নের খনি ত কোথাও কোন দিন দেখি নাই।'"

অথবা গান্ধীর কথায় বলিলে বলা যাইবে—

"এ কঠোরতা নয়, সাধনার উৎকটতা।"

আসলে ভিতরে বিনোবা কোমল, বাহিরে রুক্ষ। গান্ধী কোমল ছিলেন, তাঁহার কোমলতায় ভাবাবেশ ছিল না। এ বিষয়ে গান্ধী ছিলেন পুরা পাশ্চাত্ত্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন। জনসভায় বা বৈঠকে

* তুকড়েজী মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ ভজন-গায়ক। তাঁহার ভজন শুনিতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়।

† তুসড়া—শব্দটি মরাঠী। হিন্দী প্রতিশব্দ চিড়চিড়া, ইংরেজী crabbed—churlish, তুকড়েজী মহারাজ মরাঠী 'তুসড়ে'র অর্থ হিন্দীতে করিয়াছিলেন, 'লোগোঁ সে দূর ভাগনেবালে'।

তাঁহাকে কেহ কখনও অভিভূত হইতে, আবেগে রুদ্ধবাক্ হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া জানি না।"বিনোবার কোমলতায় প্রাচ্য-চরিত্র-সুলভ ভাবাবেশ দৃষ্ট হয়।

নবেম্বর মাস, ১৯৫১। ৭৯৫ মাইল পায়ে হাঁটিয়া বিনোবা দিল্লী পৌঁছিয়াছেন। সে অবস্থায় আর তখনই গান্ধীর সমাধি-সকাশে গেলেন। পরিক্রমা করিলেন, পরিক্রমা শেষে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিলেন। কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন, ঠোঁট কাঁপিল, কথা ফুটিল না। অবশেষে অন্তরের কথা অশ্রুজলে প্রকাশ পাইল।

১৯৫২ সন, ৩০শে জানুয়ারী, গান্ধীর তিরোধান-দিবস। পদ-পরিক্রমার পথে বিনোবা সেদিন এটোয়ায় ছিলেন। প্রার্থনা-প্রবচনের সময়ে তাঁহার কণ্ঠ বার বার রুদ্ধ হইতেছিল, চক্ষু দিয়া ধারা বহিতেছিল। প্রার্থনার পরে আবাসস্থলে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন, "আপনি বলে থাকেন যে শোক করতে নাই। আপনি নিজে ত আজ বিহ্বল হয়েছিলেন। এ কি রকম হ'ল?" তার উত্তরে বিনোবা বলিয়াছিলেন, "গুণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আর শোক করা এক কথা নয়।"

বলরামপুর আশ্রম (মেদিনীপুর)। সাহিত্যিকদের সম্মুখে বিনোবা কথা বলিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে 'গীতাঈ' রচনার কথায় আসিয়া গেলেন। 'গীতাঈ' রচনার মূলে রহিয়াছে তাঁহার মায়ের প্রেরণা—একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। নিমীলিত চক্ষু-প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। বিনোবা সমাধিস্থ।

গান্ধীর কোমলতা সর্বজনবিদিত, তার একটু পরিচয় কাকা কালেলকরের কথায় দিই:

"বাপুর ভালবাসা সেবাময়, যে-কোন লোকের সুখদুঃখ উপলব্ধি করার প্রবণতা তাঁর স্বাভাবিক।

"আমার ক্ষয়রোগ হয়েছিল, স্বাস্থ্য-লাভের নিমিত্ত পুণার নিকটবর্তী সিংহগড়ে গিয়েছিলাম। স্বাস্থ্যলাভ হলে আশ্রমে ফিরে এলাম। ডাক্তারদের নির্দেশ ছিল মাসকয়েক বিশ্রাম নিতে হবে।

"আমার আশ্রমে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরে একটি মেয়ে থালা-ভরতি সুন্দর সুন্দর ফুল নিয়ে হাজির। বলল, 'বাপু এগুলি আপনাকে পাঠিয়েছেন।' আমার চক্ষে জল এল। মেয়েটি আরও বলল, 'বাপু আমায় বলেছেন, কাকাকে এভাবে প্রত্যহ ফুল দিয়ে আসবে, ফুল কাকা বড় ভালবাসেন।'

"যখনই হোক সময় করে বাপু নিজেও প্রতিদিন একবার না একবার আমার কাছে আসতেন।

"ঠিক এমনই আর একটি কথা। আশ্রমের বালকেরা এসে এক দিন বাপুকে খবর দিল, 'বাপুজী, প্রোফেসর আয়্যা ছে'—আশ্রমে শ্রীজীবতরাম কৃপালনীকে প্রোফেসর বলা হ'ত। শুনেই বাপু দেবদাসকে বললেন, 'দেবা, বার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, দৈ আছে কিনা, দৈ ত প্রোফেসরের চাই-ই, না থাকে, কোথাও হতে যোগাড় সংগ্রহ করবে। আর কোথাও না পেলে কাকার কাছে নিশ্চয় পাবে।"—বাপু-দর্শন, ৮৯ নম্বর আখ্যায়িকা।

আর একটি কাহিনী:

"আশ্রম-হাসপাতাল (সবরমতী)। শত কাজের মধ্যেও হাসপাতালে রোগীদের কাছে যেতে গান্ধীজীর কখনও ভুল হ'ত না। প্রত্যেক রোগীর শয্যা-পার্শ্বে একটু দাঁড়াতেন, দুই একটি কথা বলতেন। রোগীরা হাতে স্বর্গ পেত। আশ্রমে একটা কথা চলতি হয়ে গিয়েছিল। পরিহাস করে একে অন্যকে বলত, 'বাপুর সান্নিধ্যলাভ করবে ত হাসপাতালে যাও'। হাসপাতাল বিভীষিকা, কিন্তু আশ্রম-হাসপাতাল ছিল আকাঙ্ক্ষিত স্থান। এক দিনের কথা, হাসপাতালে দক্ষিণ-ভারতের এক কিশোর আমাশয়ে ভুগে উঠেছে। শরীর সারাবার জন্য তখনও সে হাসপাতালে। গান্ধীজী তার শয্যা-পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রুচি ফিরে এসেছে ত, বেশ ক্ষুধা হচ্ছে না? কি খেতে ইচ্ছে হয়?' কিশোরটি নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেলল, 'এক পেয়ালা কফি যদি হ'ত।' 'আঃ, পুরানো পাপী', গান্ধী বললেন, 'তা, কফির সঙ্গে কি চাই? উপমা বা ধোসে হলে ভাল হ'ত। তৈরি করতেও জানি, তবে এখন হয়ে উঠবে না, কফির সঙ্গে টোষ্ট দেব, কি বল।' কি আর সে বলবে! কথাটা বলে সে বেকুব বনে গেছে। গান্ধী চলে গেলেন—খট খট খট খড়মের শব্দ। কিশোর আকাশপাতাল ভাবছে, মন তার আশা-নিরাশার দোলায় দোল খাচ্ছে, একবার ভাবছে, বাপু বলেছেন তাঁর কথার ত খেলাপ হতে পারে না। আবার ভাবছে, দূর ছাই, আশ্রমে কি কফি আছে যে দেবেন। পরক্ষণে ভাবে, বাপুকে আমি কাজ দিচ্ছি; তিনি নিজেই হয়ত তৈরি করেছেন। আবার সেই খট খট খট শব্দ—ক্রম অগ্রসরমাণ। ধপধপে পরিষ্কার খাদির তোয়ালে দিয়ে ঢাকা ট্রে হাতে গান্ধীজী কিশোরের কাছে এসে হাজির, কফি দিয়ে বললেন, এই নাও।—কিশোর অভিভূত। গান্ধীজী আস্তে বললেন—'ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও, আমি যাচ্ছি, ট্রে কেউ এসে নিয়ে যাবে'।"*—গান্ধীর চরিত্রের কোমলতার এরূপ শত কাহিনী আছে।

বিনোবার জীবনেও এরূপ ঘটনা অবশ্যই আছে। আর লোকে ক্রমে তাহা আমাদের কাছে ধরিবে। দুই-একটির উল্লেখ করা যাইতেছে। সানে গুরুজী এক জায়গায় বলিয়াছেন:

"আমি প্রকৃতিতে একটু লাজুক। দূরে দূরে থাকা আমার অভ্যাস। এক সময়ে বিনোবাজীর কাছে ছিলাম। ভোরের প্রার্থনা শেষ হয়েছে। ভয়ানক শীত। গৃহকর্তা জ্বলন্ত কয়লা-ভর্তি অগ্নি-পাত্র বিনোবাজীর সামনে রেখে গেলেন। বিনোবাজী আগুন পোয়াতে লাগলেন। আমি দূরে এক কোণে বসেছিলাম, কাছে যাচ্ছি না দেখে আগুনের মালসা তুলে নিয়ে আমার কাছে এলেন। পর্বত মহম্মদের কাছে না গেলে, মহম্মদকেই পর্বতের কাছে আসতে হয়' বলে হাসলেন। আমি লজ্জিত হলাম।"

---

* কাহিনীটি 'গান্ধী-উপাখ্যান' হইতে উদ্ধৃত। গান্ধী-উপাখ্যান রামচন্দ্রনের "A Sheaf of Gandhi Anecdotes"-এর বঙ্গানুবাদ।

আর একটি চিত্র :

"এক দিন পাবনারে তাঁর কাছে গিয়েছি। পাবনার ওয়ার্ধার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। রাতে নিজ কম্বল পেতে শুয়ে পড়েছি, ইতিমধ্যে বিনোবাজী এলেন। 'গুরুজী উঠুন, কম্বলের ওপর চাদর পেতে দি' বলে নিজ হাতে তা পেতে দিলেন—চাদর মানে ছোট কাপড়।"

ফৈজপুর কংগ্রেস-অধিবেশনের সংগঠন-ভার বিনোবার উপর ছিল, সেখানে থাকেন, কর্ম্মীদের উৎসাহ দেন। সে সময়কার একটি ঘটনা :

"বর্ষাকাল। খবর পেলেন সুভান বাড়ী এসে জ্বরে পড়েছে। ধুলিয়া জেলে সে ছিল। বিনোবাজীর সঙ্গে সেখানে পরিচয়। সুভান তেজস্বী যুবক, তাই বিনোবাজীর প্রিয়, সুভানের বাড়ী যাবেন বলে বেরিয়ে পড়লেন। ভাদলী ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়, বেশ খানিকটা পথ, খান্দেশের কালো মাটি, ক্ষেতের ওপর দিয়ে রাস্তা, একহাঁটু কাদা, এখানে-সেখানে বাবলাকাঁটা, অবিরাম বৃষ্টির ধারা, ভ্রূক্ষেপ নেই। বিনোবাজী সুভানদের ছোট কুটীরে গিয়ে উপস্থিত, লোকে অবাক, কৃতজ্ঞতায় সুভানের মায়ের আঁখি ছলছল। দুই দিন তিনি সুভানদের বাড়ী থাকলেন, চলে আসার সময় বললেন, এবার ভাল হয়ে যাচ্ছ, তোমার জ্বর আমি নিয়ে নিচ্ছি।"

হৃদয় যাহার এমন স্নেহে আর্দ্র তিনি কঠোর!

উপরে বলা হইয়াছে বিনোবা নম্রতার মূর্ত্তি, তার পরিচয় সানে গুরুজীর কথায় দিই :

"এক দিন ওয়ার্ধা আশ্রমে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু এসেছেন। সেই ভব্য, ত্যাগময় মূর্ত্তি দেখে বিনোবাজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন।"

"মহাত্মাজী যখন ওয়ার্ধা আশ্রমে আসতেন তখন বিনোবাজী বলতেন : আপনি যেখানে সেখানে আমি কেউ নই। এখানে থাকাকালে আপনি চালক, আপনি ব্যবস্থাপক।"

উপরের এই চিত্র হইতে বিনোবার নম্রতার বাহ্য নিদর্শন মিলিবে। কিন্তু বিনোবার নম্রতা-দর্শনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে তাঁহার গীতা-প্রবচনে :

"আমাদের অন্তঃকরণে এক দিকে সদ্‌গুণ, অপর দিকে দুর্গুণ দণ্ডায়মান। নিজ নিজ ব্যূহ ওরা দৃঢ়ভাবে রচনা করছে। সৈন্যের যেরূপ সেনাপতি চাই, এখানেও তদ্রূপ সদ্‌গুণনিচয় এক সেনাপতি নিযুক্ত করে। এ সেনাপতির নাম 'অভয়'। এ অধ্যায়ে অভয়কে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। তা কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয়। ভেবে চিন্তেই অভয় শব্দকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। অভয় ছাড়া কোন গুণের বৃদ্ধি হয় না, সততা বিনা সদগুণের কোন মূল্য নেই, সততার জন্য নির্ভয়তা দরকার। ভীতিপূর্ণ পরিবেশে সদ্‌গুণের বিকাশ হয় না। তাহাতে সদ্‌গুণও দুর্গুণ হয়, সৎ-প্রবৃত্তিও দুর্ব্বল হয়। নির্ভয়তা যাবতীয় সদ্‌গুণের মুখ্য 'নায়ক', সম্মুখ-পশ্চাৎ দুদিকই সেনাদের রক্ষা করতে হয়, সোজা আক্রমণ সম্মুখ থেকে হয়। কিন্তু পশ্চাৎ হতেও চোরা আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সদগুণের সামনে 'নির্ভয়তা' তাল ঠুকে দাঁড়ায় আর পিছন রক্ষা করে 'নম্রতা'। এরূপে অতি সুন্দর ব্যূহ রচিত হয়। মোট ছাব্বিশটি গুণের কথা এখানে বলা হয়েছে, এই গুণনিচয়ের পঁচিশটিও যদি আয়ত্ত হয় আর তৎসম্বন্ধে মনে কথঞ্চিৎ অহঙ্কার জন্মে, তবে পশ্চাৎ থেকে আকস্মিক আক্রমণে সবকিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই পশ্চাদ্‌ভাগে 'নম্রতা'রূপ সদগুণ মোতায়েন করা হয়েছে। নম্রতার অভাবে জয় যে কখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হবে তা টেরও পাওয়া যাবে না। এ ভাবে সামনে 'নির্ভয়তা' আর পিছনে 'নম্রতা' মোতায়েন করে সকল সদগুণের বিকাশ করা যেতে পারে। এ দুইটি গুণের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে চব্বিশটি গুণ তা বহুলাংশে অহিংসার পর্য্যায়ভুক্ত, এরূপ বলা চলে। ভূত-দয়া, মার্দ্দব, ক্ষমা, শান্তি, অক্রোধ, অহিংসা, অদ্রোহ, এ সবই স্বতন্ত্র ভাবে অহিংসা-পর্য্যায়ের শব্দ। অহিংসা ও সত্য এ দুই গুণে সব এসে যায়। সব গুণের সার-সংক্ষেপ করলে শেষটায় বাকী থাকবে সত্য ও অহিংসা এই দুই গুণ, অন্য সব গুণ এ দুয়ের কুক্ষিগত। কিন্তু নির্ভয়তা ও নম্রতার* কথা স্বতন্ত্র। নির্ভয়তা প্রগতির সহায় আর নম্রতা রক্ষক। নির্ভয়তা সত্যের ও নম্রতা অহিংসার প্রতীক।···ভুল পদক্ষেপ না করে এজন্য সতত নম্রতা সহকারে চলা চাই, তা হলে বিপদ থাকবে না···তাৎপর্য্য, সত্য ও অহিংসার বিকাশ নির্ভয়তা এবং নম্রতা দ্বারা হয়ে থাকে"—গীতা প্রবচন, ষোড়শ অধ্যায়, ৮৯নং।

বিনোবার হৃদয়ে প্রেমের নিরন্তর ঝরণা বহে, নাই বা বহিবে কেন? বিনোবা অদ্বৈতী, অভেদদর্শী, তাঁহার অদ্বৈত শুষ্ক নহে। ভক্তির আর্দ্রতায় তাহা সিক্ত। বিনোবা সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করেন। গীতা-প্রবচনে তিনি বলিতেছেন :

"ঈশপ সর্ব্বত্র ঈশ্বর দেখতেন, আমার প্রিয় গ্রন্থের তালিকায় সর্ব্বাগ্রে ঈশপস ফেবল্‌সের নাম আমি করব, এতে আমার ভুল হবে না, ঈশপের রাজ্যে কেবল দু হাত, দু পা বিশিষ্ট মানুষ-জীবই আছে তা নয়, সেখানে শেয়াল-কুকুর, হরিণ-খরগোস, কাক-কচ্ছপ ইত্যাদি সব রকম প্রাণী আছে। সকলেই কথা বলে, হাসে। সে এক মহাসম্মেলন বটে। সমস্ত চরাচর ঈশপের সঙ্গে কথা বলে। দিব্য-দর্শন তিনি লাভ করেছেন। রামায়ণও এই তত্ত্বের উপর, এই দৃষ্টি হতে রচিত। তুলসীদাস রামের বাল্যলীলার বর্ণনা করেছেন। উঠানে রাম খেলছে, সামনেই কাক, রাম আস্তে আস্তে তাকে ধরতে যায়, কাক একটু দূরে সরে, অবশেষে রাম ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু একটা উপায় রামের মাথায় খেলে, হাতে পেড়ার টুকরো নিয়ে সে কাকের কাছে যায়। টুকরোটা রাম একটু আগিয়ে ধরে। কাক

---

* সবরমতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকালে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নম্রতাকে আশ্রমের অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে লেখেন। তদুত্তরে গান্ধী লিখিয়াছিলেন যে, নম্রতা অহিংসারই অঙ্গ। বিনোবা নম্রতাকে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা দেখিয়াছেন। নম্রতাকে অহিংসার প্রতীক বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, নম্রতার দ্বারা অহিংসার বিকাশ হইয়া থাকে। গান্ধী যেন ঠিক সেকথাই বলিয়াছেন—"Ahimsa is the farthest limit of humility—"Selections from Gandhi" by N. K. Basu, p. 8.

একটু নিকটে আসে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এরূপ বর্ণনায় তুলসীদাস ভরতি করেছেন। কারণ এই কাক পরমেশ্বর। রামের মূর্ত্তিতে যে অংশ কাকেও সে অংশই বিদ্যমান। রাম ও কাককে এক দৃষ্টিতে দেখা মানে পরমাত্মা দ্বারা পরমাত্মার দর্শন লাভ করা।"

বিনোবা পরমাত্মাকে পরমাত্মা দ্বারা দর্শন-প্রয়াসী। আশেপাশে চতুর্দ্দিকে, সবকিছুতেই তিনি জনার্দ্দন দেখেন। সানে গুরুজী এক জায়গায় লিখিয়াছেন :

"কোন সময়ে আমি তাঁকে (বিনোবাকে) লিখেছিলাম, সময় সময় ভাবি দেবদর্শনের নিমিত্ত কোথাও গিয়ে বসব।" তার উত্তরে তিনি লেখেন, 'যাবেন কোথা? তীর্থে সেই পবিত্রতা নেই, আর ঈশ্বর কি আশেপাশে নেই? আমার আশেপাশে যারা রয়েছে তারা ভগবান—এ ভাব যদি আমার না থাকত তবে কোন কালে হিমালয়ে† চলে যেতাম।"

সমস্ত সৃষ্টির সহিত সমরস হওয়া আর তদুপরি মানুষমাত্রের সহিত সমরূপ হওয়া যাঁহার জীবন-সাধনা, নম্রতার মূর্ত্তি সেই বিনোবা কঠোর হইতে পারেন না। নম্রতার সহিত কঠোরতার সমাবেশ হয় না। তবু লোকে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছে। তার এক কারণ তাঁহার দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্য। আর দ্বিতীয় কারণ হইতেছে প্রেমের সহিত জ্ঞানের সঙ্ঘাত। প্রেম বাহিরে উপচাইয়া পড়িতে চায়, জ্ঞান তাহা ভিতরে গুটাইয়া লয়। সানে গুরুজীকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে তাহা দেখা যাইবে।

"শ্রীগুরুজী,

পবনার, তা. ১২. ১২. ৪১

আপনারা অনেকে আজও মন্দিরে‡ রয়েছেন। আমাদের সম্প্রতি ধাক্কা মেরে মন্দির থেকে বের করে দিয়েছে। দেখি, আর তারা কি করে। আপনাদের কথা যে কত সময় আর কি তীব্রভাবে মনে হয় তা কথায় ব্যক্ত কিরূপে করব? আর তার প্রয়োজনই বা কি? আমার কথায় সে শক্তিই বা কোথা? আপনার আমার হৃদয় এক-রূপ। বহু জন্মের আমরা সাথী, কোন ভেদই—ভাব, কাল বা স্থানের—আমাদের পৃথক করতে পারবে না। তবে আর সাক্ষাতের জন্য আকুলি-ব্যাকুলি কেন? তবুও সময় সময় হয়ত ভাল, আর এটাই ত আমার মানবতা। দুর্ব্বল কিন্তু সবল, প্রেমপূর্ণ ও নির্ম্মল।

কিন্তু এ দুর্ব্বলতার ভাব আমি ছিন্ন করতে চাই, পুষে রাখতে চাই না। তাই অন্তরবৃত্তিতে অবশ্য তখন আপনার কাছে গিয়ে হাজির হই আর বাহ্য সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা সংবরণ করি।

আমি এই আশা পোষণ করি, এক সময় আসবে যখন আপনার এবং আমার বাহ্য বৃত্তিও একরূপ হবে। সৃষ্টি মিথ্যা—শঙ্করাদি তত্ত্ববেত্তাদের এ উক্তিতে আজকাল কিছু লোকে রাগ করে। কিন্তু আমার কাছে সে বস্তু একেবারে স্বচ্ছ। এই বাইরের জগৎ—দেহসমেত একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে, গলে পড়ছে। কেবল আমি, একা অন্তরে-বাহিরে আসছি যাচ্ছি, এরূপ মনে হয়।

তবে কেন এ বৃথা ছুটোপাটি। থাকল পরিচয়।

—বিনোবার সাদর প্রণাম"।

প্রেমের আকুলতায় ও জ্ঞানের বিমুখতায় দ্বন্দ্ব চলে। দেবতা (সৃষ্টিময় বিনোবার দেবতা) কি হতাদরে ফিরিয়া যাইবেন? জ্ঞানে ভক্তির† পুট পড়ে। জ্ঞানী বিনোবা প্রেমী বিনোবা হন, পাক পূর্ণ হয়।

বিনোবা সমদৃষ্টি, সুগন্ধ ফুলেও তিনি ঈশ্বর দর্শন করেন, কাঁটার খোঁচায়ও তিনি ঈশ্বরের স্পর্শলাভ করেন।

একটি ক্ষুদ্র কাহিনী। ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশে পদ-যাত্রার সময়ে :

"তাঁর (বিনোবার) সঙ্গীরা সকলে খেতে গিয়েছে (সঙ্গীদের আবাসস্থল থেকে একটু দূরেই যেতে হয়)। সে অবসরে এক গুণ্ডা আসে আর গালাগালি করে তাঁকে (বিনোবাকে) বলে: 'দেশ বিভাগ করে গান্ধীকে সাজা ভুগতে হয়েছে, তদ্রূপ জমি টুকরো করছ বলে তোমাকেও দণ্ড পেতে হবে, একথা ভাল করে জেনে রাখ। সে ইঙ্গিত দিতে এসেছিলাম—এই প্রথম, এই শেষ। ফের যখন আসব, পিস্তল হাতে আসব।' একথা বলে সে বেরিয়ে গেল, পরে তার মনে হয়ে থাকবে, কি জানি কেউ যদি শুনে থাকে, যদি ধরে ফেলে। লোকটি দৌড়তে লাগল। দৌড়চ্ছে দেখে বিনোবা তাকে বললেন, 'একটু থামুন। আপনাতে আমার রামকে দেখা হয় নি। তাঁকে প্রণাম করে নিই।—" (নারায়ণ দেশাই, মরাঠী সাপ্তাহিক 'সাধনা')।

এই ত বিনোবা। আবার তাঁহার নিজ কথা দিয়াই উপসংহার করি :

"এটাই ত আমার মানবতা, দুর্ব্বল কিন্তু সবল, প্রেমপূর্ণ, নির্ম্মল।"

---

‡ গান্ধী ঠিক এরূপ কথাই বলিয়াছেন :

"যদি নিঃসংশয়ে বুঝতাম হিমালয়-কন্দরে গেলে তাঁর দর্শন মিলবে তবে তৎক্ষণাৎ তথায় চলে যেতাম, কিন্তু আমি জানি মানুষকে এড়িয়ে তাঁকে পাওয়ার জো নাই।"

"If I could persuade myself that I should find Him in a Himalayan Cave, I would proceed there immediately. But I know I can't find Him apart from humanity."—*Selections from Gandhi* by N. K. Basu, p. 26.

† জেল

† এক সময়ে জ্ঞানের উপর বিনোবা বেশী জোর দিতেন, পরে দেখিতে পান, জ্ঞানে ভক্তির আর্দ্রতা থাকা চাই।

ক্ষুধার্ত্ত যীসাস

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন লোকটির ক্ষতবিক্ষত পায়ে লাগেনি এতটুকু সবুজ ঘাসের ছোঁয়া। দুস্তর পথ ভেঙে লোকটি প্যালেষ্টাইনের "অশ্রুবর্ষণ প্রাচীরের" সামনে এসে থামল। প্রাচীরের কোল ঘেঁসে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করছে আপামর ইহুদী নরনারী—ক্রুশবিদ্ধ যীসাসের মৃত্যু-বেদনা স্মরণ করে।

লোকটির শুক্‌নো ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটল।

তুরস্কের পথে এগিয়ে গেল সে।

তুরস্কের এফেসাস নগরীর উপকণ্ঠে ধু-ধু মাটির বুকচেরা উষর বিস্তৃতি। এবারও থমকে দাঁড়াল লোকটি। কাজ করছে কয়েক শ' শ্রমিক ও কুলিকামিন। মাটি খুঁড়ে শ বিংশতাব্দীর আলোয় টেনে বার করছে লুপ্ত সভ্যতার অস্থিচূর্ণ। অদূরে দুর্ব্বোধ্য অক্ষর-চিহ্নিত একটা প্রাগৈতিকহাসিক পাথরের ওপর বিশ্রামরত খনন-তদারককারী প্রত্নতাত্ত্বিক বড় সাহেব তারস্বরে মাঝে মাঝে হুকুম জারী করছেন শ্রমিকদের—হাত চালাও, ফুর্ত্তিসে হাত চালাও···

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য্যাস্তের রক্ত আভায় বীভৎস-সুন্দর দেখাচ্ছে হাঁ-করা মাটির গভীর গর্ত্তগুলি। ছুটির আভাসে শ্রান্ত শ্রমিকেরা যে-যার নিজের কাজ গুটিয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় ওদিককার গর্ত্ত থেকে একটা উল্লসিত আনন্দ-চীৎকার ভেসে এল—

—ম্যাডোনা, ম্যাডোনা···

ঠিক এমনই একটি অপ্রত্যাশিতের প্রতীক্ষায় উন্মুখ অধীর হয়ে উঠেছিলেন বড় সাহেব। বিদ্যুদ্বেগে হাতের চুরুট ফেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রায় ক্ষিপ্তের মতই ছুটে গিয়ে শ্রমিকের হাত থেকে ম্যাডোনা মূর্ত্তিটি ছিনিয়ে নিলেন। চোখ দুটি দূরবীক্ষণ-কাচের মত ঝকঝক করে উঠল। ব্যর্থ হবে না তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান। এই মৃত্তিকা-গর্ভেই হয় ত পাওয়া যাবে লুপ্ত সভ্যতার অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য। ম্যাডোনা! হ্যাঁ—মাতৃক্রোড়ে শিশুসভ্যতা।

তখন নবাগত সেই ঘরছাড়া শীর্ণদেহ লোকটির পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠেছে।

বড় সাহেব সন্ধ্যার অন্ধকারে মন্থর পদবিক্ষেপে এগোলেন অপর প্রান্তের তাঁবুর দিকে। লক্ষ্য করলেন না, আর একটি লোক ছায়া-মূর্ত্তির মত তাঁকে অনুসরণ করছে। তাঁবুর ভেতর ঢুকে মুখ ফেরাতেই অবাক হলেন তিনি।

তিক্তকণ্ঠে বললেন, কি চাই তোমার?

লোকটি বলল, খাবার। অনেকদিন কিছুই খাইনি।

বড় সাহেব বললেন, তুমি কি কুলিদের কেউ? আগে ত দেখিনি?

লোকটি বলল, আমি মুসাফির, বড় ক্ষুধার্ত্ত।

বড় সাহেব বললেন, তা এখানে কেন মরতে এসেছ? ভাগো হিঁয়াসে।

বড় সাহেবের ধারণা, ধমক খেয়ে ভিখারী লোকটা নিশ্চয়ই ভেগে পড়েছে। তাই নিশ্চিন্ত মনে ম্যাডোনা মূর্ত্তিটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখলেন তেপায়াটির ওপর। খানসামা এসে খাবার প্লেট এগিয়ে দিল—মাখন রুটি, ভেড়ার মাংসের চপ, স্যামন মাছ, আর বেশ খানিকটা হুইস্কি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলেন তিনি, তার পর চোখ বুজেই ভায়োলিনে সুন্দর একটি সুর বাজাতে লাগলেন। যখন চোখ খুললেন, সেই মূর্ত্তিমান ব্যাঘাতটি তখনও দাঁড়িয়ে।

এবার লোকটি খাবারের কথা বলল না।

শুধু বলল, কি বাজাচ্ছেন?

বড় সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তার পর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন ম্যাডোনা-মূর্ত্তি।

গর্ব্বভরে বললেন, "মেসায়া। হ্যাণ্ডেলের সীমফনি মেসায়া"—আবার যীসাস আসবেন।

লোকটি এগিয়ে এল। শুনবেন যীসাসের এক অদ্ভুত কাহিনী। এফেসাস নগরীর এই প্রান্তেই বাস করতেন ব্যাপ্টিষ্ট জন। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার সময় যীসাস এই 'জনে'র আশ্রয়েই তাঁর জননী মেরীকে রেখে যান। হয় ত সেই সূত্রেই ম্যাডোনা-মূর্ত্তিটি···

বড় সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, "যীসাসের কথা বল"।

লোকটি তাঁবুর আরও ভেতরে এসে দাঁড়াল। বললে, আশ্চর্য্য কথাটি এই যে, যীসাস এই পথ দিয়েই হিন্দুস্থানে গিয়েছিলেন।

আঁতকে উঠলেন বড় সাহেব—হিন্দুস্থানে?

হ্যাঁ, হিন্দুস্থানে। এ খবর আপনারা রাখেন না। তা ছাড়া তখনকার আরও অনেক খবরই জানা দরকার। উড়িষ্যার রাজকুমার রাবণ বাণিজ্যব্যপদেশে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যেতেন দেশবিদেশে। তখন ইউরোপের নাম ছিল "হরিযুপিয়া" বা "হরির দেশ"। গ্রীকদের, হিন্দুরা বলত যবন। গ্রীক পণ্ডিত এ্যানাক্সি-মিণ্ডার, এমপিডকল্‌স, এ্যানাক্সিগোরাস, ডিমোক্রিটাস, হেরোডোটাস —এমনি অনেক পণ্ডিত হিন্দুস্থানে গিয়েছিলেন নিঃশ্রেয়স প্রমা-জ্ঞানের তৃষ্ণায়।

হেরোডোটাস হিন্দুস্থান ভ্রমণ শেষ করে ফিরে গিয়ে লিখে বসলেন এক উদ্ভট ইতিহাস। উদ্ভট বৈকি! হিন্দুস্থান-আফগানিস্থানের সীমান্ত নাকি স্বর্ণ-বালুকাময়। সেখানে থাকে এক দল পি পড়ে যা আকারে শেয়ালের চেয়েও বড়। বিদেশীরা কেউ যখন সেই সীমান্তে হানা দিত স্বর্ণলুণ্ঠন লোভে, তখন বিপুল বিক্রমে বাধা দিত নাকি সেই পি পড়েগুলো।"

বড় সাহেব উদাসকণ্ঠে বললেন, "থাক পিপড়ে-পুরাণ। যীসাসের কথা বল।"

লোকটি বলল, "তাই ত বলছি। কিন্তু যীসাসের আবির্ভাবের আগেকার যুগের অবস্থাটাও ভাবুন। একদিকে যেমন, পারস্য-সম্রাট দারায়ুস কর্তৃক গ্রীস আক্রমণ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে হিন্দু সৈনিকেরা, অন্য দিকে তেমনি পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই—জুডিয়া, সিরিয়া, ব্যাবিলন, বিশেষ করে প্যালেষ্টাইনের "এসেনীস"-দের মধ্যে বদ্ধমূল হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। এসেনীসরা বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বকে বলত 'বোদ্সাপ্'...

"তার পর দেখুন ওদিকে তখন জ্ঞানগরিমাদীপ্ত গ্রীক সাম্রাজ্য ও বাহুবলদৃপ্ত রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বিকৃত হেলেনীয় রূপলালসার ব্যভিচারে আর আসুরিক "ভ্যাটিক্যানাম" মদ্যপান-মত্ততার পঙ্কে ইউরোপের আপামর সাধারণকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়, ঋষি এলাইজার পুণ্য নাম স্মরণে অনন্ত জীবনের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসে এক অপূর্ব্ব ঐশ্বরিক প্রেরণায় সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল ইহুদীরা...

বড় সাহেব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "কি বলতে চাও? ইহুদী তুমি!"

লোকটি মাটির দিকেই চোখ রেখে বলে চলল, "ঠিক ঐ রকম যখন সারা দেশের অবস্থা—সেই সময় উড়িষ্যার রাজকুমার আবার বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়েছেন নবোদ্যমে। সিংহলের নীলকান্তমণির বদলে গ্রহণ করলেন পারস্য-উপসাগরের মুক্তা, নীলগিরির নীল দিলেন মিশরের মৃতদেহ 'মমি'র রহস্যাবরণের রঙের জন্য আর তার বদলে নিলেন মিশরের আবলুস কাঠ। রোমানদের উপহার দিলেন কয়েক শত ময়ূর-ময়ূরী, পরিবর্ত্তে পেলেন ইটালীর সেরা দ্রাক্ষাসুরার স্ফটিকভাণ্ড; হিন্দুস্থানের গজদন্ত আর রক্তচন্দনের বদলে ইরাণ থেকে আনলেন জড়োয়া নক্সা কার্পেট। এই ভাবে বাণিজ্য-বিজয় সমাপন করে প্যালেষ্টাইনের ভেতর দিয়েই স্বদেশে ফিরছিলেন উড়িষ্যার রাজকুমার—নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি প্যালেষ্ট্যাইনের এক ভোজসভায়..."

"—কি সব বাজে বকছ...অবান্তর গল্প বানিয়ে ভেবেছ এখানে ভোজ পাবে তুমি? আমি যীসাসের কথা শুনতে চাই। যীসাস।"

লোকটি মৃদু হাসল, "সেই ভোজসভায় রাজকুমারের নজরে পড়ল এক অনিন্দ্যকান্তি কিশোর-কুমার ঘুরে ঘুরে আপন মনে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করছেন। বুঝতেই পারছেন, সেই কিশোর-কুমারই হলেন যীসাস। রাজকুমার তাঁকে একান্তে পেয়ে আমন্ত্রণ জানালেন হিন্দুস্থানে যাবার জন্য। অবশেষে একদিন জননী মেরীকে কাঁদিয়ে যীসাস সত্যি সত্যি উটের পিঠে চড়ে বসলেন। শুধু বললেন, "ভয় কি মা। যাচ্ছি রূপকথার দেশে। ঈশ্বর আর ...গাব্রিয়েল আমার সহায়।"

হিন্দুস্থান অভিমুখে পাশাপাশি চলেছেন দু'জন। দুস্তর পথ যেন আর শেষ হয় না...রাজকুমার পঞ্চনদীর তীরে এসে বললেন, "এই আমার হিন্দুস্থান!"

কিশোর যীসাস বললেন, "শুনেছি, আমরা, ইহুদীরা একে বলি—হণ্ডু।"

তার পর অকারণ আনন্দে রৌদ্রদীপ্ত সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি সুন্দর!"

রাজকুমার কিংখাবের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "হিন্দুস্থান শুধু সুন্দরেরই দেশ নয়, সত্য এবং শিবের দেশও!"

যীসাস তির্য্যক দৃষ্টি হানলেন, "তুমি জেনেছ সত্যকে?"

লজ্জায় মরে গেলেন যেন রাজকুমার—"আমি যে সওদাগর। সত্যকে জানেন আমাদের ঋষিরা।"

তৃষ্ণার্ত্ত বোধ করায় উটের গায়ে ঝোলানো ভিস্তি থেকে জলপান করলেন রাজকুমার। তার পর হঠাৎ বলে উঠলেন, "কি আশ্চর্য্য যীসাস! এতটা সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে এলাম, কিন্তু কৈ সূর্য্যের উত্তাপ ত গায়ে লাগল না। একটা বিরাট সাদা মেঘ সারাক্ষণ সূর্য্যকে ঢেকে রয়েছে..."

যীসাস মেঘখণ্ডের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন—

"ও মেঘ নয় রাজকুমার, গাব্রিয়েল।"

রাজপুতানার জৈনদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নীলাচল, জগন্নাথের মন্দিরাভিমুখে চলেছেন যীসাস। পাটলিপুত্র থেকে গঙ্গা-বক্ষে তাম্রলিপ্ত পর্য্যটনের অবসরে যীসাসকে শোনালেন রাজকুমার হিন্দুস্থানের কীর্ত্তিকাহিনী। যীসাস শুনলেন—পঞ্জাব-বিজয়ী গ্রীক-রাজা ব্যাকট্রিয়ান মিনান্দারের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কাহিনী। শুনলেন "পিয়দসী" অশোকের অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষার কাহিনী। বৈদিক ও বৌদ্ধমতের সংমিশ্রণে হিন্দুস্থানে এখন "মহাযান" মত অঙ্কুরিত হচ্ছে এই তথ্য রাজকুমারের কাছেই অবগত হলেন যীসাস।

কিশোর যীসাসের মনে গভীর একটি আলোকতরঙ্গ দুলে উঠল।

নীলাচল জগন্নাথের মন্দিরে এসে নামলেন রাজকুমার ও যীসাস। 'নয়' জন ব্রাহ্মণদ্বারা বেদমন্ত্রপূত গঙ্গাজলনিষেকে যীসাস অভিসিঞ্চিত হলেন।

—ওঁ শান্তি। হোমযজ্ঞে "পুরোডাশ" আহুতি দিলেন। ওদিকে জনকয়েক নবাগত দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ সোমরসাপ্লুত "শূলগাবঃ" গোমাংস আহার করছেন। এদের কাছেই যীসাস শিখলেন বেদস্তোত্র ও মনুসংহিতা। কিন্তু একদিন জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখে যীসাস শুধালেন, "আপনারা বুঝি পৌত্তলিক?"

দেবশর্ম্মা হেসে ফেললেন, "হ্যাঁ। শুধু মৃন্ময় প্রতিমা নয়, মৃন্ময় পৃথিবীই আমাদের প্রতিমা—বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

যীসাসের সপ্রতিভ প্রশ্ন—"তবে চণ্ডালের ছায়া মাড়ালে পাপ হয় কেন? কেনই-বা শূদ্রদের "সোঽহং" মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার দেওয়া হয় নি।

দেবশর্ম্মা নিরুত্তর রইলেন। ম্লান হাসলেন একটু।

প্রসঙ্গপরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে দুটি অরণিকাষ্ঠ ঘষে জ্বাললেন আগুন। আর বলে উঠলেন—এই যে অরণি—এর থেকেই পরিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণের চক্র—এই চক্র শান্তি ও প্রগতিকামী সভ্যতার স্বস্তিক-চিহ্ন।

তরুণ যীসাস বললেন, "শুনেছি, বৌদ্ধদেরও আছে এমনই ধর্ম্মচক্র।"

ক্রমান্বয়ে চার বছর যীসাস জগন্নাথের মন্দিরেই রয়ে গেলেন। তার পর, পরম জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতায় অরণ্যপর্ব্বতসঙ্কুল হিন্দুস্থানের গহন গভীরে সুরু করলেন তীর্থপরিক্রমা নির্ভীক পদক্ষেপে। এমনি পরিক্রমার পথে একদিন হিন্দুস্থান ও তিব্বতের সঙ্গম-শৈলের নিভৃতে দেখা পেলেন এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর। নির্ব্বাণসাধনায় মগ্ন সেই ভিক্ষুর কাছ থেকেই যীসাস শিখলেন "কসিন" সাধনার মর্ম্ম। "ধম্মপদে"র উপদেশ ও "বৌদ্ধজাতকে"র কাহিনীতে যীসাস খুঁজে পেলেন তার ইষ্টসিদ্ধির উদয়দিগন্ত। "বোদ্‌সাপ"-এর প্রেম ও অহিংসা তাঁর মনে উন্মোচিত করল প্রথম স্বর্গরাজ্যের প্রথম স্বর্ণ-তোরণ।

বুদ্ধের দশম শীল—যীসাসের মনে মনে রূপায়িত হয়ে উঠল "টেন্ কম্যাণ্ডমেণ্টস"; বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—যীসাসের মনে মনে তখন মূর্ত্ত ত্রি-নীতি—ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র, হোলি গোষ্ট—; বুদ্ধদেবের ছিল প্রথম বার জন শিষ্য—যুবক যীসাসের অন্ততঃ বার জন শিষ্যই চাই। কিন্তু কে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে? বৌদ্ধবিহার বা হিন্দু-মন্দিরের মত যীসাসের চার্চও কি কোনদিন মাথা তুলবে না?

এমনি ভাবতে ভাবতে যীসাস এসে পড়লেন বারাণসীতে।

মহর্ষি উদ্রকের দেবদারুশোভিত আশ্রম।

উদ্রক, যীসাসের অনিন্দ্য কষিতকনককান্তি দেখে মুগ্ধ হলেন।

"যীসাস! তুমি অমৃতের পুত্র!"

যীসাস নবলব্ধ বেদান্তবাণী আবৃত্তি করলেন "ত্বমেব বিদিত্বা-তিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কিন্তু অমৃত আমি চাইনে।"

"কি চাও তবে?"

"ভালবাসতে চাই। চাই স্বর্গরাজ্য নেমে আসুক এই পৃথিবীতে। সব দুঃখ দূর হোক।"

"দুঃখ দূর তুমি করতে পারবে যীসাস। কিন্তু তার পুরস্কার-স্বরূপ তোমার জীবনে মহত্তম দুঃখ ডেকে আনবে তুমি?"

"আপনি ভবিষ্যৎ গণনাও জানেন?"

"তা—একথা অন্ততঃ বলতে পারি, বুদ্ধদেব ও তুমি—দু'জনেরই জন্ম পুষ্যা নক্ষত্রে। বুদ্ধদেবের আদর্শের প্রতীক সোনার এই ধর্ম্মচক্র, তাই আমি তোমার কণ্ঠে পরিয়ে দিচ্ছি যীসাস।"

অবাক বিস্ময়ে যীসাস বললেন, "বুদ্ধদেবের প্রতি আপনার এত প্রেম?"

ব্রাহ্মণ মহর্ষি উদ্রক বললেন, "বুদ্ধের প্রেমের তুলনায় আমরা কতটুকু!"

মহর্ষি উদ্রকের আশ্রমে যীসাসের দিন কাটতে লাগল একে একে।

এক দিন এক মুমূর্ষু কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এল সেখানে। উদ্রক রোগীর কাতর মিনতিতে বিগলিত হয়ে সমস্ত কুষ্ঠব্যাধি গ্রহণ করলেন নিজের শরীরে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ যীসাস ভাবলেন, মানুষের সব দুঃখ যদি এভাবে একান্ত নিজের বলে গ্রহণ করা যেত?

কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত উদ্রকের অনুরোধেই একদিন আশ্রম ছেড়ে যেতে হ'ল যীসাসকে। যীসাস বরাবর চলে এলেন বিন্ধ্যাচলে। বিন্ধ্যাচলে তাঁর রূপগুণমুগ্ধ বেশ কয়েকজন শিষ্যও জুটে গেল। এক জনের নাম অজেনিন।

একদিন অজেনিনকে যীসাস শোনাচ্ছেন—জ্ঞানাশ্রয়ী বেদান্ত ও প্রেমাশ্রয়ী বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণজাত উদার বিশ্বপ্রেমগাথা—এমন সময়—

সুদূর প্যালেষ্টাইন থেকে উষ্ট্রবাহিনীর সঙ্গে আগত লোকেদের মুখে মুখে সংবাদ পেলেন—যীসাসের পিতা—যোসেফ দেহত্যাগ করেছেন···

দীর্ঘ আঠার বছর পর···

দীর্ঘ আঠার বছর পরে অশ্রুমুখী মাতা মেরীর কথা মনে পড়ল যীসাসের। মা! মা আমার!

উষ্ট্রবাহিনীর সঙ্গে আগত লোকেদের ফেরার পথে তাদের সঙ্গ নিলেন যীসাস। করুণ কান্নার দেশ হিন্দুস্থান পেছনে পড়ে রইল।

উটের পিঠে বসে চোখের জল মুছতে মুছতে যীসাস ফিরে চলে-ছেন স্বদেশের স্নেহ-অঙ্কে; আর বার বার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে উড়িষ্যার রাজকুমারের কথা। মাতা মেরীর কথা। বার বার মনে পড়ছে—সেই অরণিকাষ্ঠের আগুন, সেই স্বস্তিক-চিহ্ন, শ্রীকৃষ্ণের চক্র, গোতম বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র। নিজের কণ্ঠমাল্য—মহর্ষি উদ্রকের দেওয়া সেই স্বর্ণচক্রটি দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরলেন যীসাস!

জর্ডন নদীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে যীসাস বললেন, "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট।"

বললেন, "ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়। তিনি সকলের পিতা।"

বললেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন।"

বললেন, "যে ব্যক্তি নিজে যীসাস ক্রাইষ্ট হবে না, সে খাঁটি খ্রীষ্টানও হতে পারবে না কোন দিন।"

যীসাসের এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনীটি শেষ করে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত কাঁপতে লাগল সেই জীর্ণদেহ লোকটি। এমন নূতন ধরনের ভিখারী এর আগে কখনও দেখেন নি বড়সাহেব। এক এক মুঠো টাটকা আঙুরের রস লেহন করছেন তিনি। রসলেহনের শেষে শ্লেষতিক্ত কৌতুকের সঙ্গে বলে উঠলেন—

"বাই জোভ! গল্প তোমার অদ্ভুত বটে, আরও অদ্ভুত তোমার ভিক্ষের এই পদ্ধতি! সৃষ্টিছাড়া লোকালয়ের বাইরে এসে কেন এই ক্ষ্যাপামি! এমন গল্পে মজে ভিক্ষে তা বলে কিন্তু কেউ দেবে না—

লোকটি নিভে-আসা ছুটি চোখ তুলে উদাস কণ্ঠে বলল, "আমি এসেছিলাম মা মেরীকে দেখতে। ওঃ বড় ক্ষুধার্ত্ত আমি, পিপাসায় কাতর।"

বড়সাহেব আঙুরের একটি গুচ্ছ এগিয়ে ধরলেন ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালসার লোকটির মুখের ওপর।

"কিন্তু কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ? কেমন করে? তুমি কি ইহুদী? হিন্দুস্থানী? তবে? কেন তুমি এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ ছন্নছাড়ার মত? ভিক্ষে পাচ্ছ না কেন? কি তোমার অপরাধ?"

এতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে গড়গড় করে আউড়ে গেলেন বড় সাহেব। একটা দুর্বোধ্য রহস্যে আচ্ছন্ন, উত্তেজিত তিনি।

লোকটির মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল—"অপরাধ? যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত দেশে দেশে নগ্নপদে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। নালিশ জানিয়েছি, আমারই নামের নামাবলীর আড়ালে—যুদ্ধের নামে নরহত্যার বিরুদ্ধে। বলেছি—বাঁচ, আর বাঁচতে দাও। ভালবাস, আর ভালবাসতে দাও···সাহেব, আমাকেও কি কম ভালবাস তুমি? ···নইলে রুটির বদলে কখনও এগিয়ে দিতে পার ঐ আঙুর···ওঃ খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে···অন্ধকার দেখছি···"

"বদ্ধ পাগল আর কি! আর খাবার নেই, গেট আউট ইউ ড্যামনেড বেগার!"

ক্ষুধার্ত্ত লোকটির থর থর করে কেঁপে-ওঠা, জলভরা ছুটি বড় বড় চোখে নিরুৎসব মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এল···স্বপ্নঘোরে বলল, বেশ—তবে ঐ ম্যাডোনা-মূর্ত্তিটি দিন, চলে যাই···"

"ওঃ ম্যাডোনা-মূর্ত্তি নিয়ে ভিক্ষে করার মতলব? চমৎকার!"

"তবে আর একবার, দয়া করে আর একবার বাজান ভায়োলিনে "মেসায়া" সীমফনি—আবার যীসাস আসবেন···"

"হাউ ক্রেজি! সীম্‌ফনির কি বোঝ তুমি? কে তুমি অশিক্ষিত বর্ব্বর?"

লোকটি এবার নিদারুণ বেদনামর ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তাঁবুর ভেতরেই, তার পর খোলা দরজা দিয়ে স্তিমিত দৃষ্টি প্রসারিত করল অস্তদিগন্তের বুকে ঝিকিমিকি-উজ্জ্বল পুষ্যা নক্ষত্রের দিকে। "হে স্বর্গস্থ পিতঃ!" ছুটি হাত ক্রুশের ভঙ্গীতে নিবদ্ধ করল নিজের নির্লোম সাদা বুকের ওপর।

অভূতপূর্ব্ব ভিখারীর অশ্রুতপূর্ব্ব ভণিতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বড় সাহেব। "কে তুমি?"

ক্ষমা-সুন্দর স্বর্গীয় হাসি ফুটল লোকটির হিমনীল ঠোঁটে।

"আমি যীসাস!"

"যীসাস"! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বড় সাহেব। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। "যীসাস"? কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই দাঁত বার করে হো হো শব্দে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

ক্ষুধার্ত্ত লোকটি বলে চলেছে:—"আমিই যীসাস। আমার মা মেরী, 'জনে'র আশ্রয়ে এই এফেসাস নগরীতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন···তাই মা-মেরীকে একটু চোখের দেখা দেখতে এসেছিলাম···"

তেপায়ার ওপরে রাখা ম্যাডোনা-মূর্ত্তিটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন বড় সাহেব। তার পরেই আবার বিকট অট্টহাস্য করে উঠলেন। কিন্তু অট্টহাসি থেমে গেল···

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে লোকটি।



ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ

শ্রীএস. ডি. খুনগর

দৃঢ় পদক্ষেপে ভারত সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভাকরা বাঁধটি নির্মাণ উহারই আর একটি নিদর্শন।

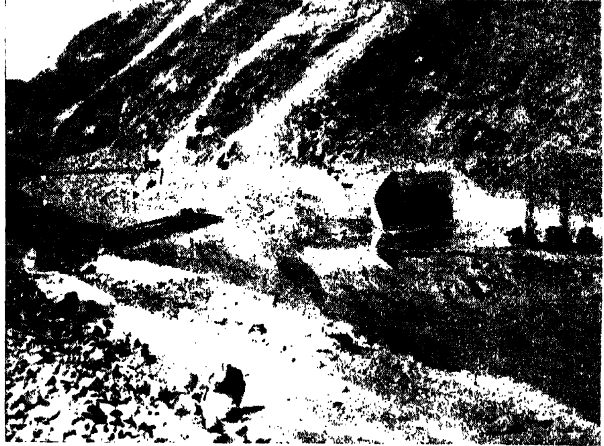
পঞ্জাব, পেপসু ও রাজস্থানের বিশুষ্ক ভূখণ্ডে কিছুদিন পূর্বেও তৃষ্ণার্তের মর্মভেদী আর্তনাদ আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হইত। অনাবৃষ্টি ও অজন্মা ছিল এই অঞ্চলের নিয়মিত ব্যাপার। কিন্তু মানুষ আজ প্রকৃতিকে বশ করিতে শিখিয়াছে। তাই শতদ্রু নদীর শক্তিকে স্থানীয় অধিবাসীদের কল্যাণে নিয়োগ করিবার জন্য ভাকরা বাঁধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতেই ইহা এক নবজীবনের সঞ্চার করিবে।

বন্যার জল সঞ্চয়ের জন্য বাঁধের উপর একটি জলাধার নির্মিত হইবে। তাহা হইতে সমস্ত বৎসর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে। তাহা ছাড়া জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে তাহা দ্বারা ঐ অঞ্চলে দ্রুত শিল্পায়ন সহজ হইবে। ফলে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হইবে।

৬৮০ ফুট উচ্চ ভাকরা বাঁধটির তলদেশ ১,৩১০ ফুট দীর্ঘ। ইহা নির্মাণ করিতে প্রায় এক লক্ষ ঘন গজ কংক্রীটের প্রয়োজন হইবে। আট লক্ষ টন সিমেণ্ট, ৬৮ লক্ষ টন এগ্রিগেট এবং ১৭ লক্ষ টন বালুকা এই কাজে ব্যবহার করা হইবে। নির্মাণ-কার্যে ৪০ হাজার টন ইস্পাত প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটির দ্রুত রূপায়ণের জন্য যন্ত্রের সাহায্যেই কংক্রীট ঢালাইয়ের কাজ হইবে। এই কার্যের সহায়তার জন্য চার মাইল দীর্ঘ একটি কংক্রীট প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ফতেহাল এবং নেইলা হইতে সংগৃহীত বালুকা ও এগ্রিগেট্ 'কনভেয়ার বেল্টে'র সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ৭৫০ টন করিয়া কার্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিবে। বালুকা ও এগ্রিগেট ১১৫ ফুট উচ্চ একটি বাছাই যন্ত্রের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইবে। সেখানে ধোলাই ও বাছাইয়ের পরে যন্ত্রের সাহায্যে পুনরায় সেগুলিকে চারিটি বিভিন্ন স্থানে জমা করা হইবে।

এগ্রিগেটগুলিকে তখন অপর কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে খুব ঠাণ্ডা জল ভর্তি একটা বিরাট জলাধারের ভিতর জমা করা হইবে এবং সেখানে কিছুক্ষণ রাখিবার পরে সেগুলিকে সিমেণ্ট প্রভৃতির সহিত মিশাইবার জন্য একটি যন্ত্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত করিয়া বাঁধটিকে নির্মাণ করা হইবে।

এই কার্য পরিচালনার জন্য একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। ইহাতে বাঁধনির্মাণ, যন্ত্র এবং বাঁধের ডিজাইন নির্ধারণের জন্য তিন জন ডাইরেক্টার, ৩৮০ জন ইঞ্জিনীয়ার, দুই হাজার কারিগর ও সাধারণ কর্মী এবং সাত হাজার দক্ষ সাধারণ শ্রমিক নিযুক্ত আছেন। বাঁধটি নির্মাণের জন্য ধার্য মোট ব্যয় ৬৫ কোটি টাকার মধ্যে ভিত্তিনির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যে ইতিমধ্যেই ৩১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।



ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধের পঞ্চাশ ফুট ব্যাস (diameter) বিশিষ্ট সুড়ঙ্গ। শতদ্রু নদী এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবহমাণ

যাতায়াত-ব্যবস্থা

রূপার হইতে নাঙ্গাল পর্যন্ত নূতন রেল লাইন স্থাপন করা হইয়াছে। বাঁধ অঞ্চল হইতে নাঙ্গাল উপনগর পর্যন্ত আরও একটি রেল লাইন নির্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে। দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই উপনগরে পনর হাজার লোকের বসবাসের জন্য গৃহ এবং রেস্ট হাউস, ফিল্ড হোস্টেল, হাসপাতাল, গবেষণাগৃহ, আপিস, বিদ্যালয়, কল্যাণ-কেন্দ্র,

শ্রমিকদের প্রমোদ-কেন্দ্র, ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন আপিস, বাজার, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে। এখানে যে কারখানা হইয়াছে তাহাতে নূতন যন্ত্র-পাতি তৈয়ারি ও মেরামত করা হইতেছে। সেখানে ইতি-মধ্যে ছয় হাজার টন ইস্পাত তৈয়ারি করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নাঙ্গালে পাঁচ হাজার কিলোওয়াটের বাষ্পচালিত যন্ত্র, পাঁচ শত কিলোওয়াটের দুইটি টার্বো সেট ও ডিজেল-চালিত যন্ত্র এবং ভাকরাতে দুই হাজার চারি শত কিলোওয়াটের ডিজেল-চালিত পাওয়ার-হাউস স্থাপিত হইয়াছে। গাঙ্গুয়াল বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র হইতেও অতিরিক্ত বিদ্যুৎ লওয়া হইতেছে।

শতদ্রু নদের প্রবাহের দিকপরিবর্তন করিবার জন্য পাহাড় কাটিয়া পঞ্চাশ ফুট ব্যাসযুক্ত এবং অর্ধ মাইল দীর্ঘ দুইটি গুহাপথ নির্মাণ করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর ধরিয়া কাজ করিয়া এবং তিন কোটি ছত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজ শেষ হইয়াছে। পৃথিবীর দীর্ঘতম এই সুড়ঙ্গপথ দুইটি বাঁধনির্মাণের পরে আর কোন কাজে লাগিবে না। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শতদ্রু নদের স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে দুইটি ছোট বাঁধের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে।

নদীর তলদেশ হইতে আরও ১৮০ ফুট গভীরে কংক্রীট ঢালাই করিয়া মূল বাঁধটির ভিত্তি রচনা করা হইয়াছে। আশা করা যায়, ১৯৫৯-৬০ সনেই কংক্রীটের কাজ শেষ হইবে। বাঁধের বাম দিকে পাঁচটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে। ভবিষ্যতে ডান দিকে আরও চারটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সন হইতে জল সঞ্চয় করা আরম্ভ হইবে।

পৃথিবীর যে কোন বৃহৎ পরিকল্পনার সহিত তুলনাযোগ্য এই বিরাট পরিকল্পনাটি দ্বারা ইতিমধ্যেই জনকল্যাণ সাধিত হইতেছে। এই কার্যে নিযুক্ত এবং সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও শ্রমিকগণ কঠোর পরিশ্রম এবং কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। যদিও এই কার্য উল্লেখ-যোগ্য ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তথাপি এখনও অনেককিছু করিবার রহিয়াছে।

আমরা ও তাহারা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সাধারণতঃ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা 'বাহিরের পৃথিবীকে' খুব অল্পই চেনে এবং জানে, তাহারা নিজেদের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব, তর্কবিতর্ক, হাসিঠাট্টার অন্ত নাই, কিন্তু গণ্ডীর বাহিরে গেলেই মুখে আর কথা সরে না, হাসি কোথায় চলিয়া যায়, একেবারে যেন 'মুখচোরা' হইয়া বসিয়া থাকে। এই জড়তা অতিক্রম করিতে হইলে 'বাহিরের জগতে'র সঙ্গে মিশিতেই হইবে।

শিশুরা যখন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখনও তাহারা সমবয়স্ক সঙ্গীর অনুসন্ধান করে এবং সমবয়স্ক সঙ্গী পাইলেই 'আহার নিদ্রা' ভুলিয়া তাহাদের সহিত নানা রকমের খেলা ধূলা করে, এমনকি মায়ের ডাকেও সাড়া দেয় না—তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তাহাদের বিশ্বাস করে, তাহাদের ছাড়িতে চায় না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের এই ভাব দূর হয় না বরং বর্দ্ধিত হয় এবং তখনও তাহারা সমবয়স্ক সঙ্গী খোঁজে ; এই সময়েই সঙ্গী সম্বন্ধে পিতামাতা ও অভিভাবক-দিগকে শিশুদের প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমেই শিশুদের, বালকবালিকা-দের মনে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ভাব, ভালবাসার এবং ঘৃণার ভাব, সহানুভূতির ও সহানুভূতিশূন্যতার উদ্রেক হয়। এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, যে সকল শিশু, যে সকল বালকবালিকা নিজেদের গৃহে সকলের নিকট হইতে আদর-যত্ন, স্নেহপ্রীতি ও ভালবাসা পায় তাহারাই সমবয়স্ক অন্যান্যদের সঙ্গে সহজে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে। যে সকল শিশু, বালকবালিকা প্রতিবেশী শিশু ও বালকবালিকাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তাহারা যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন নূতন পরিবেশের মধ্যে তাহাদের তেমন কোন সঙ্কোচের ভাব থাকে না—তাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অতি সহজে মেলামেশা

করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কোন জড়তাও দেখা যায় না। এমনকি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাহারা বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে। এই ভাবে ক্রমশঃ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অপরিচিত ব্যক্তিদেরও বুঝিতে পারে এবং তাঁহাদের সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয়।

যে সকল শিশুর বা বালকবালিকার নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না অর্থাৎ যাহারা নিজেদের গৃহের সকলের নিকট হইতে স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা পায় না তাহাদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, চতুর্দ্দিকের লোক কাহারও কোন খোঁজ লয় না, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব আদৌ নাই, সকলেই স্বার্থপর ; ইহার ফলে অবিশ্বাসের ভাব, বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি প্রভৃতির উদ্রেক হয়। প্রথম হইতেই এই সকল শিশুর, বালকবালিকার মনে এই ধারণা জন্মে যে, তাহারা তাহাদের প্রাপ্য অংশ পাইবে না এবং কারণে বা বিনা কারণে ইহারা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিদ্যালয়-গৃহে উপযুক্ত শিক্ষকগণের সাহায্যেই এইরূপ মনোভাববিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের এইরূপ মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতে পারে। বিদ্যালয়-গৃহে এইরূপ ছাত্রছাত্রীরাই আবার শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা নষ্ট করে, ভবিষ্যতে ইহারাই আবার সমাজের এবং রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহারাই সমাজদ্রোহী এবং রাষ্ট্রদ্রোহীর রূপ ধারণ করিয়া রাষ্ট্রবিরোধী বা সমাজবিরোধী বহু আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহারাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরল ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের উত্তেজিত করিতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপরেই প্রধানতঃ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকসৃষ্টি প্রধানতঃ বিদ্যালয়-গৃহেই হইয়া থাকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান বিদ্যালয়ের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের মনে সঞ্চারিত করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতেই ছাত্রছাত্রীদের এমন জ্ঞান অর্জ্জন করা দরকার, যাহার সাহায্যে তাহারা বুঝিতে পারে রাষ্ট্রের শাসন-ভার কাহাদের উপর অর্পিত হয় ; তাঁহারা কি ভাবে কাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন চালাইতে সক্ষম কিনা। বালক-বালিকাদের বুঝাইতে হইবে তাহারা আগামীকালের নাগরিক এবং তাহাদের উপরেই এই নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত হইবে।

ছাত্রছাত্রীদের ইহাও শিখাইতে হইবে যে, মানুষের মর্য্যাদায় বিশ্বাস রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিখাইতে হইবে—ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা, অনুসন্ধান প্রভৃতির প্রতি সম্মান, সমষ্টির কল্যাণের জন্য সমবায় প্রণালীর সাহায্যে সর্ব্ব-প্রকার প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা একান্ত দরকার।

শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের মনে জীবনের উপরোক্ত মূল সূত্রগুলি সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতের পুরুষ ও নারী যদি নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের মূল সূত্রগুলি স্থির করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিতে পারে "আমি ইহা বিশ্বাস করি" (This I do believe), তবেই আমরা দেশের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিব। তখনই আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত রূপ ধারণ করিবে যখন শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা আমাদের বালকবালিকাদের মনে আত্ম-নির্ভরতা, আত্ম-বিশ্বাস, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, কৌতূহল, পৃথিবীকে জানিবার, চিনিবার আগ্রহ, রাষ্ট্রীয় দর্শন এবং গণতন্ত্রের মূল সূত্রগুলি উদ্দীপিত করিতে পারিব।

শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমেরিকার সর্ব্বসাধারণ উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বহু চিন্তা, বহু সময় নিয়োজিত করিতেছেন, আর আমরা কি করিতেছি ? আমাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাজনীতি প্রবেশ করিয়াছে ; সকল স্তরের শিক্ষাদান সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নাই, দলাদলির অভাব নাই। দলীয় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। অতীব দুঃখের কথা এই যে, বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদের (Managing Committees) মধ্যেও দলাদলি গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত শিক্ষকদেরও পূর্ণ সহযোগিতা নাই। ইহার ফলে বিদ্যালয়সমূহও "রাজনীতির মঞ্চে" পরিণত হইয়াছে। কয়েকটি বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি, এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই এই কথা বলিতেছি।



সাহিত্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াস সহজেই রহস্যে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু রহস্য-সৃষ্টি সহজে শিল্পের মর্য্যাদা পায় না। অথচ দৈনন্দিন জীবনে এই দুইটিরই প্রয়োজন। জীবজগতে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী হাসিতে পারে কিনা জানা নাই—দুঃখের মাত্রা অত্যধিক বলিয়াই হয় ত মানুষ এই গুণটি পাইয়াছে। আদিকাল হইতেই বাক্য, আকার কণ্ঠস্বর ও ইঙ্গিতে হাস্য রসের সূচনা—আর ইহার রংটিও সাদা। কৌমুদী ও বরবর্ণিনীর দন্তরুচির সহিত হাসির উপমা। হাসি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের অন্যতম উপায়, হাসিলে জগৎ তোমার সহিত হাসিবে, কাঁদিলে তুমি একাই কাঁদিয়া মরিবে—কবিদের কথা।

এই অতিরঞ্জনের দেশে হাস্যরসের এই প্রধান উপাদানটি একান্ত সুলভ—আর একটি উপকরণ পরপীড়ন, তাহাও দুর্লভ নহে। অন্যতম প্রধান উপকরণ সহানুভূতি—ইহাই দুর্লভ। বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায়ে satire একটা শিল্প—বাগবৈদগ্ধপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্। রহস্য ও কৌতুক সাধারণতঃ Satire-এর অঙ্গবিশেষ।

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে রাজাদের বেতনভুক বিদূষক (বি + দুষ্ + ণক্) = নিন্দক, বয়স্য, সখা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল—এখন এ প্রথাটি অচল।

'কৃষ্ণকুমারী'তে ধনদাস রাজসহচর, 'শর্ম্মিষ্ঠা'য় যযাতির বিদূষক মাধব্য, 'পদ্মাবতী'তে রাজা ইন্দ্রনীলের বিদূষক মানবক, 'নলদময়ন্তী'তে সখা ইত্যাদি রচনাগুলির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

রহস্যের প্রধানতঃ দুইটি দিক আছে—নিছক আমোদ দান ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার। উভয় কার্য্যেই প্রয়োগকুশলতা চাই, যদিও প্রথমটি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর ও দ্বিতীয়টি উত্তম শ্রেণীর অন্তর্গত।

ধনীজনের সান্নিধ্যে এই দুই ধরনের বেতনভুক্ ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাহিত্যেও এই দুই শ্রেণীর প্রচলন আছে। ভাঁড়, দালাল, clown, buffoon, hosturers, প্রভৃতি নিম্নস্তরের (ইহাদিগকে ভাড়া পাওয়া যাইত); বিদূষক, বয়স্য, সখা, Jester, Courtfool, Fool প্রভৃতি উচ্চ স্তরের।

'জেস্টার'দের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত, সহৃদয় ও সুচতুর ছিলেন। রাজা অষ্টম হেনরী ও রাণী মেরীর জন হেউড নামে 'জেস্টার' এবং রাণী এলিজাবেথের টার্লটন নামে এক অভিনেতার কথা শোনা যায়। রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের প্রিয় বয়স্য অক্সফোর্ডে শিক্ষিত স্লোগ্যান নামে সুবিখ্যাত 'কোর্ট জেস্টারে'র গল্প প্রচলিত আছে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইঁহাদের সকলের না থাকিলেও উপস্থিতবুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সহানুভূতিশীল মনের জন্য ইঁহারা যথেষ্ট সমাদৃত হইতেন। মনিবের দুর্ব্বলতাকে আক্রমণ করার স্বাধীনতা, গোপন তথ্য বা প্রেমসঞ্চার লইয়া হাসি তামাসা, অন্তরঙ্গতার সুযোগে বিদ্রূপ ও লঘুভাষণ ইঁহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আপত্তিজনক চপলতা ও শ্লেষাত্মক ইঙ্গিতের পশ্চাতে থাকিত প্রকৃত সহৃদয়তা ও শুভবুদ্ধি।

লীয়রের 'ফুল' (Fool) মূর্ত্তিমান সহানুভূতি, অন্ধকারে দীপশিখা, বেদনায় প্রলেপ, শোকে সান্ত্বনা। এই 'ফুল' অবশ্য কাল্পনিক, কিন্তু ইহাকে বাদ দিলে নাটকটির রসহানি হয়। 'ফলস্টাফ' ও 'ফেস্ট'-এর সেই অবস্থা। এই সব সৃষ্টিই রচয়িতার বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। প্রধান কারণ রহস্য এখানে শিল্পের মহিমা পাইয়াছে। উদ্দেশ্য বা সংস্কারমূলক রহস্যসৃষ্টির বিপদ আছে।

এই জাতীয় রচনায় যেখানে বিদ্রূপ বিদ্বেষের স্তরে নামিয়া অবিশ্বাস ও ঘৃণার উদ্রেক করে, যেখানে কষাঘাত তীব্র হইয়া বক্তৃতার বর্ণ ধারণ করে, যেখানে প্রীতির পরিবর্ত্তে আক্রমণাত্মক মনের গ্লানি প্রকাশ পায়—সেখানেই হয় রসভঙ্গ, সত্য ও সুন্দর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া রসিকতা বা ব্যঙ্গ আর্টের ত্রিসীমানায় পৌঁছিতে পারে না।

সহানুভূতির পরশ থাকিলে সাধারণ পরিহাসও রসশ্রেণীভুক্ত হয় এবং করুণ ও বেদনামূলক ঘটনার পরিবেশেও উৎকৃষ্ট হাস্যরস ধ্বংস না হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। 'নীলদর্পণ' ইহার উদাহরণ।

উদ্দেশ্য সাধু বা সংস্কারমূলক হইলেও রহস্যরসের আতিশয্য ভাল নয়, তাই পরিহাসের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম জাগাইবার চেষ্টায় জাতির পাইকারি নিন্দা হাস্যরসের পরিবর্ত্তে বীভৎস গালিগালাজে পরিণত হয়। এই নিন্দার অপর নাম বাগ্‌দণ্ড। কবি গোবিন্দদাস (ভাওয়াল) কয়েকটি কবিতায় এই দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন—রসিকতা ব্যর্থ হইয়াছে।

বঙ্কিমবাবু 'আগেকার রসিক'দিগকে মাথা ফাটান লাঠিয়ালের সহিত তুলনা করিয়াছেন—যাঁহারা 'সরু' কাজ (বা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ) জানিতেন না। কঠোর সমালোচনায় রসসৃষ্টির কল্পনা আহত হইলে রসরচনা সম্ভব হয় না। বীরবল পরিষ্কার বলিয়াছেন :

"সুরুচি সুনীতি যুগল চেড়ী
কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ী।"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগল চেড়ীর প্রভাব ও সমাজের ভয় বৃদ্ধি পায়, তাই অধিকাংশ রসিকসুজন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছিবার আগেই অবদান শেষ করেন। অবশ্য প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র—তাহার ব্যতিক্রম ত আছেই—'বুড়াবয়সে রঙ্গরস' শুকাইয়া উঠিলেও তাহার গুঁড়াটুকু থাকেই।

অতর্কিত প্রচ্ছন্ন শ্লেষ সুকল্পিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অপেক্ষা কার্য্যকরী ; ছোট ছোট কথার টুকরো (বা 'চুটকি' যেমন 'লালিমা পাল পুং') বড় বড় বাক্যবিন্যাস অপেক্ষা মনোজ্ঞ ও স্থায়ী। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যে রসরচনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অভিজ্ঞতায় যাহা পুষ্ট, সংযম, শালীনতা ও আন্তরিকতায় যাহা সুবাসিত, নিশির শিশিরের মত যাহা শুভ্র, শান্ত ও কোমল—যাহার অন্তস্তল সহানুভূতি ও বেদনায় কম্পমান, বহিরঙ্গ হীরকখণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ সেই রসাবদানই আর্ট, নিজের আনন্দের বা শ্রোতা (পাঠক)কে আমোদ দিবার জন্য উত্তম রসরচনাও রহস্যসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, জীবনকে বুঝিবার ও বুঝাইবার অভিপ্রায় থাকিলে তাহার সার্থকতা। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, বীরবল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র রহস্যের কুয়াশায়, হাসির পালিশে মর্ম্মবেদনা ঢাকিয়াছেন।

মোলিয়ার অতুলনীয় রসসৃষ্টির দ্বারা সমাজকে আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন জীবিকাবলম্বী মানুষের স্বভাবকে বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করিয়া সংস্কারের উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের নিকট উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনা ঋণী। সুইফট (gloomy Dean), এডিসন, ষ্টীল, সীবার, র‍্যাবেলেঁ, ভল্‌টেয়ার, সার্ভানিন, ডি'কুইন্সি, ডিকেন্স, বার্নার্ড শ' প্রভৃতি ও সর্ব্বোপরি ল্যাম্-এর রসানুভূতি বাঙালীর চিত্তকে সরস করিয়া নূতন আনন্দের সন্ধান দিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বসূরীগণের স্বীকরণ-শক্তি আজ কোথায় গেল ?

সে যুগে ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ সনে 'নববাবুবিলাস' লিখিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্রের গোড়াপত্তন করিলে ফ্রেণ্ড, অব ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্র ও শিক্ষিতসমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রশংসা করেন এবং পাদ্রী লঙ সাহেব ১৮৫৫ সনে এই পুস্তকটির বিষয় বলেন :

"One of the ablest satires on the Calcutta Baboo as he was 30 years ago."

'কলিকাতা কমলালয়', 'নববিবিবিলাস', 'দূতীবিলাস' প্রভৃতি এই পর্য্যায়ের রচনা।

ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩১ সনে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করিয়া তাঁহার চুটকি কবিতায় নূতন ধরনের রসসৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার করিলেন। কবিওয়ালা, তর্জ্জাকার প্রভৃতির অ-শালীন রহস্যপঙ্ক হইতে মুক্তি পাইয়া হাসির স্রোতে বাংলা সাহিত্য চলিতে লাগিল। কেদারনাথে এই স্রোত বহুধাবিভক্ত হইয়া বহু উপলখণ্ড অতিক্রম করিয়া রাজশেখরে তরঙ্গায়িত হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ সরস ব্যঙ্গের জন্য একদা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন :

"আমি satire বা ব্যঙ্গকে বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ফরাসী satiristদিগের বহি পড়িয়া আমার এই সাধটা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গালার গাছ মরীচ মিলাইয়া কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত বঙ্কিমবাবুর জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী আমদানী satire বা ব্যঙ্গ আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে। কোনটাই বাঙ্গালায় টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল Humourist বটে, পরন্তু বেজায় emotional ; নির্ব্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে দেখাইতে পারে না ; একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কষাঘাতও যখন উহার পিঠে পড়িবে তখন তাহার এই অপূর্ব্ব এবং নির্ম্মল তটিনী-কল্লোল একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এই নূতন আমদানীর মাল বর্ত্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না।"

এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় কি কারণে ইন্দ্রনাথের রঙ্গরস তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিশুষ্ক হইয়াছিল। কমলাকান্ত আজও আছে—থাকিবে। দ্বিজেন্দ্রলালও তাই। সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রের বনস্থলীতে তখনও রবিকর পশে নাই।

রসিকতার সংক্ষেপে তিনটি বিভাগ করা যায় : উপস্থিত-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে Wit, Humour সম্ভব হয় গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে, এবং Fun সঞ্জাত হয় দেহমনের তারুণ্য হইতে। রসগ্রহণ করিবার শক্তি না থাকিলে রসদাতার সমূহ দুর্ভোগ—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্, শিরসি মা লিখ, মা লিখ।' রসিকতা বেসামাল হইলে আইনের আমলে আসিতে পারে। Cartoon, Caricature, Sarcasm, Sketch, Parody, Lampoon, Farce (প্রহসন), উদ্ভট কবিতা, সমস্যা পূরণ

প্রভৃতি রসিকতার বাহন সব সময়ে বিশ্বস্ত নয়, অনেক সময় ভরাডুবি ঘটাইতে পারে। রসিকতা বা Satire-এর উদ্দেশ্য কেবল হাস্যসৃষ্টি নয়, আক্রান্ত পক্ষকে বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করাই মুখ্য অভিপ্রায়। আইন পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে অনুসন্ধান করে, এইপ্রকার অভিপ্রায় ঈর্ষাপ্রণোদিত কিনা। দেবতা ও দেবদেউল বা তথাকথিত ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে রহস্যালোচনায় সাবধানতা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের সম্পাদক এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করেন। ফোটোগ্রাফ জঘন্যভাবে প্রকাশিত হওয়ায় মানহানির মোকদ্দমায় বিচার্য্য বিষয় ছিল, ইচ্ছাকৃত ঈর্ষামূলক রসিকতা না অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক ঔদাসীন্য। "পাঞ্চ"-এর রসসিঞ্চিত মন্তব্যের জন্য ব্যয়বাহুল্যের কথা শোনা যায়। রসোত্তীর্ণ টুকিটাকি ভোটযুদ্ধে বিশেষ কাজে লাগে। মার্ক টোয়েন তাঁহার মৌলিক হাস্যরস পরিবেশনে আধুনিক যুগের রসতৃষ্ণার বিভিন্ন রূপের পরিচয় দিয়াছেন। রসিকসুজনের অবলম্বন bonhomile অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি। ইহাই দীর্ঘজীবন লাভ ও নীরোগে থাকিবার উপায় বলিয়া মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। 'পঞ্চভূতে'র ডায়েরী আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কৌতুকহাস্যের কারণ কি হইতে পারে তাহার আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'পারস্যপ্রসূনে' রহস্যের অবতারণায় ভাঁড় ও দালালগণের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু 'যাজ্ঞসেনী'তে ভাঁড়কে বাক্‌জীব বলিয়াছেন, আর 'ভাঁড় ফুটো'—এই কথাটিতে গভীর বেদনার সঙ্গে রসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। গোপালভাঁড়ের কার্য্যকলাপ অনেকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সার্কাস থিয়েটারে 'ক্লাউন'রাও 'রস' পরিবেশন করে, তাহা রস নহে। রসের সংজ্ঞা পবিত্র—ব্রহ্মাস্বাদের মত অনির্ব্বচনীয় ভাবে মধুর। মন ক্রমে ক্রমে স্থির হইলে ধীরে ধীরে ভাবসমাহিত হয়—হাস্য-করুণ পরস্পর আপাতবিরোধী রস হইলেও সৃষ্টির নৈপুণ্যে উপভোগ্য হয়। চঞ্চলচিত্তে কোন ভাবই সুস্থির হইতে অবসর পায় না—তাই রসের সঞ্চার মর্ম্মের মাঝখানে অনুভূত হয় না। কবিরা নির্জ্জনতাকে রসানুভূতির সহায়ক বলিয়াছেন; মৌমাছি নিভৃতে মধু সঞ্চয় করে; চিন্তার রাজ্যে কোলাহল সমস্তই বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। কবি তাই ভাবের গভীরে ডুবিয়া রসোত্তীর্ণ হইতে পারেন।

শিশু-শিল্প

শ্রীবিশ্বমোহন সেন

শিশু-শিল্পের গোড়ার কথাই হচ্ছে—কাগজ, রং, তুলি, কাঠ, কাদা, কাপড়, চক, পেন্সিল ইত্যাদি বস্তুর ভেতর দিয়ে শিশুর কল্পনা ও চিন্তার রূপায়ণে সাহায্য এবং তার সৃজনী প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকৃতপক্ষে সেজন্য শত শত বিভিন্ন বস্তু এবং বহু বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তা নির্ভর করবে শিল্প-শিক্ষকের জ্ঞান ও কল্পনার প্রসারের উপর। উৎসাহী শিক্ষক তার নিজের রুচি, প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তার বস্তু সংগ্রহ করবেন। শিশু-চিত্ত সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা যেমন প্রয়োজন তেমনি শিশুদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি-সম্পন্নও হওয়া চাই, তবেই তিনি সত্যকার শিক্ষা দিতে পারবেন। তাঁর কাজ—সমস্ত বস্তু সংগ্রহ এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে ছেলেরা তাদের পছন্দমত বস্তুর সাহায্যে নিজ নিজ শিল্পবোধ ও সৃষ্টি-প্রেরণার বিকাশসাধন করতে পারে। শিক্ষক যদি এই ভাবে ক্ষেত্র তৈরি করে রাখেন তা হলে শিশু যে খুশীমনে কত সুন্দর এবং কত অভিনব বস্তু ও শিল্পসৃষ্টি করে থাকে তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। শিশু যখন কাজ করবে তখন তার কাজের ভুল-ত্রুটি যত কম দেখানো যায় ততই ভাল। কারণ একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, সে বয়স্ক লোকেদের মত পরিণতবুদ্ধি নয়, এবং সে তৈরী শিল্পীও নয়, আর তা হওয়া সম্ভবপরও নয়। তা ছাড়াও শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকবেই। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, তার কাজের সংশোধন করতেই হবে না। কথা হচ্ছে এই, সংশোধন খুব ধীরেসুস্থে এবং যথোচিত বিচার-বিবেচনা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হওয়া চাই, কারণ সংশোধনের মাত্রা বেশী হয়ে পড়লে শিশুর উৎসাহ কমে যায়, যাতে করে কাজ এগোয় না। শিশু যখন প্রথম ভাষা শেখে তখন সে ব্যাকরণ শেখে না, তা তাকে শেষে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করতে হয়। এও ঠিক তেমনি, কাজ এগোবার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধতা আপনা থেকেই আসবে। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, শিশুরা এমন বস্তু সৃষ্টি করেছে যা কোন বয়স্ক ব্যক্তি পারতেন না বা সাহসই করতেন না। তার কারণ বয়স্ক ব্যক্তি তাঁর অবাধ কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, অপর পক্ষে সমালোচকের বিচারের ভয়ও তাঁর আছে। কিন্তু শিশুর কল্পনা যেমন অবারিত, সমালোচকের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয় থেকেও তেমনি সে মুক্ত।

মাঝে মাঝে এ রকম ছেলে দেখতে পাওয়া যায়, যার কল্পনা, রসবোধ, কি ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির বালাই নেই, কিন্তু সে যে-কোন

একটা ড্রয়িঙের চমৎকার নকল করতে পারে। প্রায় স্কুলেই দু'একজন এ রকম ছাত্র থাকে। তারা শিক্ষকদের কাছ থেকে বেশ প্রশংসাও পায়। কিন্তু এ প্রশংসার মূল্য কতটুকুই বা! শিল্পকলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, ঐ অনুকরণপটু ছেলেরা কখনও প্রকৃত আর্টিষ্ট হতে পারবে না, কেননা আত্ম-বিকাশের (Self-expression) প্রেরণাই এদের মধ্যে নেই। যে-সব ছাত্র একেবারে শিশু নয়, একটু বড়—যারা ইতিপূর্ব্বে কিছু 'ড্রয়িং' শিক্ষা করেছে, তাদের আবার নূতন করে তৈরি করা বেশ কঠিন। তবু ধৈর্য্য ধরলে এবং ঠিকভাবে চালাতে পারলে তাও সম্ভবপর হতে পারে।

যিনি শিশুর প্রতি একান্ত সহানুভূতি-শীল, শিশু-মনস্তত্ত্বে যাঁর কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, যিনি কতকটা শিল্প-জ্ঞানসম্পন্ন এরূপ ব্যক্তি শিশু-শিল্প-শিক্ষণের প্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। সত্য কথা বলতে কি, আর্ট স্কুলের পাস করা গতানুগতিক পদ্ধতির অনুসরণকারী অনেক আর্টিষ্টের চেয়ে শিল্প-শিক্ষাদানের যোগ্যতা তাঁর কম না হওয়াই সম্ভব। অবশ্য যদি তাঁর হাতেকলমে কাজ করবার একটু শক্তি থাকে। যাঁর সে শক্তি ও কল্পনা দুই-ই রয়েছে তাঁর শিক্ষাদানই হবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উৎকৃষ্ট। যখন একটা কিছু এঁকে দেখাবার প্রয়োজন হয় আর শিক্ষক তা করে দেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের মনে একটা নূতন পুলকের সঞ্চার হয়।

প্রথমেই বলা হয়েছে, শত শত বস্তুর সাহায্যে শিল্প-শিক্ষা দেওয়া যায়। সত্যই অসংখ্য বস্তু ব্যবহার করা যেতে পারে যার প্রয়োগ নির্ভর করবে সেই শিক্ষকের জ্ঞান ও শিক্ষণ-পদ্ধতির উপর। তবে মোটামুটি কয়েকটি অতি সাধারণ বস্তু হচ্ছে—সাধারণ গুঁড়ো রং যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সাধারণ গঁদ বা আঠা, তাও বাজারে পাওয়া যায়। কিছু নানা আকারের তেল-রং ও জল-রঙের তুলি, দুটো-একটা বড় চ্যাপটা দরজা-জানালা রং করবার ব্রাশ, সাধারণ হলুদ রঙের পাতলা (খুব পাতলা নয়) পেষ্ট-বোর্ড, সস্তা দামের কাগজ, প্যাষ্টেল, রঙীন চক, স্কুলের ছেলেদের জন্য তৈরী সাধারণ জল-রঙের বাক্স, নরম সরু-মোটা শীষের পেন্সিল, ইণ্ডিয়ান-ইঙ্কের বোতল, নানা আকারের কলম, (রেডিং নিবকে ছেনি দিয়ে কেটে তৈরি করে নেওয়া যায়, একটু তেরছা করে কাটতে হয়), উনানের বা উনানে জ্বালাবার কাঠ-কয়লা, কাদা ইত্যাদি। রং যাই হোক না কেন, তুলি মোটামুটি রকমের ভাল হওয়া চাই। যে-কোন রং দিয়েই যে-কোন কাগজের উপরে ছবি আঁকা চলে, কিন্তু তুলি খারাপ হলে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে হয় না। কারণ, তুলি যদি স্বচ্ছন্দ গতিতে না চলে তা হলে তা দিয়ে ভাল কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রথমে গুঁড়ো রঙে আঠা মিলিয়ে দরজা রং করবার বড় ব্রাশ দিয়ে পেষ্ট-বোর্ডের উপরে আগাগোড়া যে-কোন রঙের একটি প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। তার পর তা ছেলেদের দিতে হয়। সে প্রলেপ হলদে, লাল, কালো, খয়েরী, সবুজ, ফিকে নীল যে-কোন রঙেরই হতে পারে। রঙীন কাগজের কথা বলা হ'ল দুটি কারণে। প্রথমতঃ, একটি সাদা কাগজের উপরে ছেলেরা কিছু একটা কাজ করতে সাহস পায় না কাগজটা নষ্ট হবে এই আশঙ্কায়, ফলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভঙ্গিমা বিকাশলাভ করে না। আর দ্বিতীয়তঃ, ছেলেরা যখন ছবি আঁকে তখন সব সময় সমস্ত জায়গা রং দিয়ে ভরাট করতে পারে না। কাগজের এই রং সেখানে ফাঁক পূরণের সাহায্য করে। এই ধরনে তৈরী কাগজে ঐ একই রং ব্যবহার করতে হয়।

মাটির হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, বাটি, ধূপদান ইত্যাদির উপরে চমৎকার নক্সা করা যেতে পারে। তাতেও রঙের ব্যবহার আঁঠা দিয়ে করতে হয়। জলের সংস্পর্শে আসে এমন কোন কাজে সে জিনিস ব্যবহার করা যায় না। সাধারণভাবে টুকিটাকি জিনিস রাখবার পক্ষে তা উপযোগী বটে, কিন্তু তার প্রধান মূল্য ঘর সাজাবার প্রয়োজনে। বিভিন্ন রকমের এবং সুরুচি-সম্মত গড়নের বাসন না পাওয়া গেলে নিজের পছন্দমত পরিকল্পনা অনুযায়ী কুমোরের কাছ থেকে ফরমায়েশি জিনিস তৈরি করিয়েও নেওয়া যেতে পারে। তাতে নিজের এবং কুমোরের উভয়েরই উপকার হয়।

রং গুলবার এবং ছবি আঁকবার সময় জল রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় মাটির পাত্র মজুত থাকা দরকার। মাটির পাত্র এ বিষয়ে খুব উপযোগী, কারণ তা সস্তা, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ ভারতীয়।

কাদায় কাজ করবার জন্য ভাল কাদা না হলেও চলে, সাধারণ ভাবে স্কুলের বাগান বা মাঠ থেকেই মাটি তুলে নেওয়া যেতে পারে। তবে সে মাটিকে প্রথমে একটু তৈরি করে নিতে হয়। কাঠকুটো, ইট, পাথর, গাছের শিকড় খোলার কুচি এসব বার করে ফেলে দেওয়া দরকার। তার জন্য আবশ্যক হয় দুটো বড় বড় মাটির জালা ও একটা চালুনি। প্রথমে সবটা মাটি একটা জালায় বেশ জল দিয়ে গুলে চালুনি দিয়ে অন্য জালায় ছেঁকে ফেলতে হয়। মাটিকে খুব বেশী পরিষ্কার (fine) করবার প্রয়োজন নেই। কারণ খুব পরিষ্কার মাটি শুকোলে ভয়ানক ফেটে যায়, একটু বালি মেশানো থাকলে ফাটে খুব কম। সেইজন্য একটু বড় ফুটোর চালুনি নেওয়া দরকার। চালুনি সহজেই তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। যে-কোন একটা টিনের বাক্স বা পেটি অথবা কেরোসিন তেলের কানেস্তারার নীচে পেরেক দিয়ে অনেকগুলো ফুটো করে নিলেই খুব ভাল চালুনির কাজ চলে। মাটি ছাঁকা হয়ে যাবার কিছুক্ষণ বাদে যখন মাটিটা নীচে জমে যায়, তখন উপর থেকে আলগা জলটা ফেলে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় কাদা ঠিক প্রয়োজনানুরূপ অবস্থায় এলে তা দিয়ে ভাস্কর্য্যশিল্পের অনুকরণে সকল শ্রেণীর দ্রব্য নির্ম্মাণ করাই সম্ভবপর হয়। মাটির কাজ নানা রকমেই করা যায় বটে—তবে দুটি অত্যন্ত সাধারণ ধারা হচ্ছে এই: প্রথমতঃ মাটি নিয়ে একটু একটু করে জুড়ে জুড়ে কোন বস্তু তৈরি করা, আর দ্বিতীয়তঃ একতাল কাদা নিয়ে টিপে টিপে তাকে প্রয়োজনমত

আকৃতি দেওয়া—দু'রকম পদ্ধতিই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন, এদের উপযোগিতা বিভিন্ন ধরনের।

প্রথমোক্ত প্রণালীতে এমন অনেক সূক্ষ্ম কাজ করা যায় যা শেষোক্ত উপায়ে সম্ভবপর হয়ে উঠে না, আবার শেষোক্ত পদ্ধতিতে যে কাজ করা হয়, তার ভিতরে কোন জোড়া না থাকাতে শুকোলে খুব জমাট হয়—প্রথমোক্ত উপায়ে কিন্তু এটা সম্ভবপর নয়। দু'রকম কাজেই প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি বা 'ক্লে মডেলিং টুল' ব্যবহার করা চলে। ছাঁচে ঢেলেও ছেলেরা মাটির নানা রকম জিনিষ তৈরি করতে পারে। ছাঁচ কিনতে পাওয়া যায়—নিজেরাও তৈরি করে নিতে পারে। প্রথম নির্দেশ পাওয়ার জন্য দু' একটা কেনা চলে, কিন্তু যতদূর সম্ভব নিজেদেরই ছাঁচ তৈরি করা উচিত। তাতে শিল্পকলার আর একটা নূতন দিক বপ্ত হয় এবং নিজে নিজের শিল্পোপকরণের ব্যবস্থা করতে পারলে তাতে আনন্দের মাত্রা বেশী বৈ কম হয় না

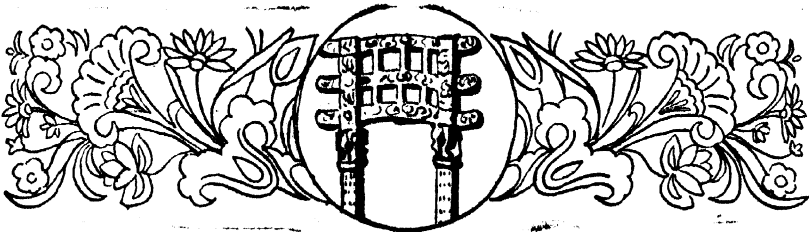
মাটির জিনিষকে দুটি অতি সহজ উপায়ে স্থায়িত্বদান করা যায়। এক, তাকে একেবারে পুড়িয়ে নেওয়া। সেজন্য ঘুঁটে খুব সুবিধাজনক। আষ্টেপৃষ্ঠে, উপরে নীচে, ঘুঁটে দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হয়। আর দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে, কাগজ দিয়ে সমস্তটা মুড়ে দেওয়া অনেকটা ব্যাণ্ডেজের মত। ছোট ছোট টুকরো কাগজ কেটে নিয়ে তাতে আঠা মেখে আগাগোড়া সেঁটে লাগিয়ে দিতে হয়। দু' তিন, চার, পাঁচ বা ইচ্ছামত যতখুশী পলেস্তারা দেওয়া চলে। তার পর শুকিয়ে গেলে তাতে নানা রকম রং দেওয়া যায়। ব্রোঞ্জের রং দিলে যে-কোন ক্লে মডেলিঙের মতই মনে হয়। রং সাধারণ আঠা দিয়েও দেওয়া যেতে পারে, তবে শিরীষের আঠা দিলে বেশী স্থায়ী ও দেখতে উৎকৃষ্টতর হয়।

এই কাগজের পলেস্তারাতে কাজের সূক্ষ্মতা একটু নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাতে কাজের মর্য্যাদাহানি হয় না। পলেস্তারা দেওয়ার পর কতখানি সূক্ষ্মতা নষ্ট হবে তার বিচার-বোধ জন্মালে শিল্পী তার গোড়ার কাজেই সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। তাতে শিশু মস্তিষ্কচালনারও পথ পায়। লাগাবার আগে কাগজ একটু জলে ভিজিয়ে নরম করে নিলে, সযত্নে টিপে টিপে অনেকটা সূক্ষ্মতা বজায় রাখা যায়।

এখানে গুটিকতক পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হ'ল যা যে-কোন স্কুলে, সামান্য খরচে এবং অল্পায়াসেই প্রবর্ত্তিত হতে পারে। যা সত্যকার প্রয়োজন তা হচ্ছে কাজ করবার ধারা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং ছাত্রদের শিক্ষাদানে এর প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে সজাগ অনুভূতি। কাঁচামাল যতদূর সম্ভব সস্তায় পাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত, কারণ ব্যয় বেশী হলে শেষে তা চিন্তার এবং আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে, যার জন্য কাজ ব্যাহত হয়।

এমনকি প্রথম ড্রয়িং করবার জন্য সাধারণ সংবাদপত্র বা দোকানের পোটলা-বাঁধা বালির কাগজও ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতেও অনেক ছেলে এত সুন্দর ড্রয়িং করেছে যা যাদুঘরের সংগ্রহে রেখে দেবার যোগ্য। এই ব্যয়ভার বিদ্যালয়েরই বহন করা উচিত। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ বিদ্যালয়কেই করতে হবে, ছাত্রদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। তার জন্য বৎসরের প্রথমে তাঁরা একটা 'আর্ট মেটিরিয়্যাল ফিজ' বলে প্রত্যেক ছাত্রদের নিকট থেকে সমান হারে কিঞ্চিৎ মাহিনা দাবি করতে পারেন।

শিশু-শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে দুটি স্বতন্ত্র ঘর দরকার। একটি ক্লাস, কারখানা বা ষ্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এবং অপরটি হবে প্রদর্শনীগৃহ। ছাত্রেরা যাতে নিরন্তর তাদের শিল্পকর্ম্ম দেখবার সুযোগ পেতে পারে সেজন্য এই প্রদর্শনীগৃহে তাদের বাছা বাছা সব কাজ স্থায়ীভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিতে হবে এবং বাইরের লোককেও মাঝে মাঝে তা দেখাতে হবে। লোকের তারিফ শিশু-মনে বৃহত্তর প্রেরণা যোগায়। প্রদর্শনীগৃহ অপরিহার্য্য, কিন্তু দুটি ঘরের ব্যবস্থা না করা গেলে একটি ঘরেই সব কাজ চালাতে হবে। অপর পক্ষে, দুটি ঘরের ব্যবস্থা করতে পারলেও ক্লাসরুমেও কিছু কাজ সাজিয়ে রাখা দরকার—ছেলেদের কাজে প্রেরণা সঞ্চার ও নির্দেশপ্রদানের জন্য। প্রদর্শনীতে এমন একটি পরিবেশ এবং ক্রমে ক্রমে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করতে হবে—যা হবে ছেলেদের কাজের অগ্রগতির সহায়ক, নইলে প্রকৃত উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।



সর্ব্বভুক

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

গ্রীষ্মকাল। সূর্য্য উঠতেই লাফুড্ডির শক্ত মাটি তেতে উঠে। প্রান্তরের বুকে ইতস্ততঃ ছড়ানো কালো পাথরের গা থেকে বেরিয়ে আসে তপ্ত নিঃশ্বাস। পলাশ জঙ্গলের পাতায় পরশ লেগে ম্লান হয়ে উঠে বনানীর শ্যামলিমা। ধুধু-করা প্রান্তরের পানে তাকালে মনে হয় যেন লাফুড্ডির এই অংশটুকু পরেছে ভৈরবীর পরিধান। আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়—রুদ্রের সামনে যেন সমস্ত পরিবেশ হয়ে উঠেছে ক্রোধান্বিত।

তবু এর প্রভাত মনোরম। কুড়চি ফুলের গন্ধ নিয়ে বয়ে যায় সমীরণ, ঘুম ভাঙিয়ে দেয় লাফুড্ডির সাওতালদের। প্রাণ-চাঞ্চল্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি চঞ্চল হয়ে উঠে। সতেজ মানুষের সঙ্গে এবার যেন সুরু হবে রুদ্রের দ্বৈরথ সমর!

ভোর হতেই উঠে এসেছে নিমা মাঝি। বর্ষা নামবার আগেই ক্ষেতগুলিকে তৈরি করে রাখবার এই সময়। বর্ষা নামতে আর বড় বিলম্বও নাই। আর মাত্র পনেরটা দিন—তার পরেই বর্ষা নামবে হুড়মুড় করে। 'বীর গাড়া'য় (বনের নদী) ডাকবে ঘর-ছাড়ানো গান। সে গানের সুর পলাশের পাতায় পাতায় করবে আঘাত। মাছরাঙা পাখী এসে বসবে বীর গাডার তীরে। ছোট ছোট মাছগুলি স্রোতের টানে উজানের দিকে যাবে এগিয়ে, উর্দ্ধ-পানে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবে লজ্জাবতী লতা। শালুক ফুলের কুঁড়ি—শৈশব ছাড়িয়ে যৌবনের সীমানায় করবে পদার্পণ—সূর্য্যের সঙ্গে করবে দৃষ্টি বিনিময়।

আগামী দিনের কথা ভাবতে ভাবতে আপনার ক্ষেতের আলের উপর এসে দাঁড়াল নিমা মাঝি। ক্ষেতটায় একবার হাল ঘুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মাটিটা এখনো গুড়ো হয় নি। চিটাল মাটি লাফুড্ডির—হাতে করে না ভাঙলে ভাঙা যাবে না। আর ভাল ভাবে না গুড়ো হলে কাদা হবে না—ধান রুইতে কষ্ট হবে মেঝানদের।

নিমা একটা কুড়ুলের উল্টো দিক দিয়ে তাই মাটির ঢেলা-গুলিকে ভেঙে দিচ্ছিল এক মনে। এমনি সময় একটা শব্দে চমকে উঠল নিমা।

—হুম্ হুম্ হুম্—

চমকে উঠল নিমা। হাতের কুড়ুলটা হাতেই থাকল ধরা। কান দুটোর সঙ্গে চেতনাটিকে সম্পূর্ণ রাখল মিশিয়ে।

—হুম দাম হুম—

একটানা একটা শব্দ। উৎকট, পীড়াদায়ক!

আজব জায়গা, চুপি চুপি কিছু করবার উপায় নাই। একটু শিস দিলেও এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়। কোকিলের ডাক, ঘুঘুর আওয়াজ, এমনকি টিয়ার শব্দটুকুও—বাড়ীতে বসেই শুনতে পাওয়া যায়।

ঐ অদ্ভুত শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ আপনার অজ্ঞাতেই, এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল নিমা মাঝি। বীর গাডার প্রস্তর-চত্বরটা অতিক্রম করে ওপারের উচু জায়গাটায় গিয়ে উঠতেই নজরে পড়ল একটা অতিকায় ট্রাক্, আর কতকগুলো অচেনা মুখ। ব্যাপারটা বুঝতে বাকী রইল না নিমার। জমীদার বনটা হয়ত বিক্রী করে দিয়েছে। কালেভদ্রে সে বনটা বন্দোবস্ত দিয়ে দেয় জমিদার। একবার সমস্ত জঙ্গলটি একজন লা ব্যবসায়ীকে জমায় দিয়ে দিয়েছিল জমিদার, তখন কারও আর পাতাটি তুলবার উপায় ছিল না।

কুড়ুলের নিষ্ঠুর আঘাতে এক একটা গাছ ধড় মড় করে পড়ে যাচ্ছে। যে গাছের পর্দা এতকাল লাফুড্ডিকে আড়াল করে রেখে-ছিল তাই হয় ত অবারিত হয়ে যাচ্ছে। এখন তিন মাইল দূরের ষ্টেশনটিও স্পষ্ট দেখা যায়। লাল ইটের ঘর। মাথায় এসবেষ্টস শীট, পাশে 'তার খুটি' (টেলিগ্রাফের পোষ্ট)। অদ্ভুত! থাম-গুলোর গায়ে কান লাগিয়ে থাকলে একটা সো সো আওয়াজ বেরয়, যেন ঝড় বইছে! টুকুন মাঝি বলে, 'কুল্‌অমাদায়' (খবর যায়); এক কুড়ি হু'কুড়ি খবর। সব এক সঙ্গে মিশে অমনি আওয়াজ হয়।

—তা হলে উয়াও কথা কইলে সে কথা ত নিশানায় যায় টুকুন?' জিজ্ঞেস করেছিল নিমা মাঝি।

—অড়ে চালাও স্যা গি (নিশ্চয় যাবে)।

চোখ দুটাকে বড় বড় করে উত্তর দিয়েছিল টুকুন।

তার পর একদিন রাত থাকতে উঠে গিয়েছিল নিমা মাঝি, কেউ জানে না। সোজা চলে এসেছিল ইষ্টিশনে। তার ছেলেটা চলে গিয়েছে—সেই যে বছর টাকায় হ'ল এক সের চাল। তাও যেত না পাওয়া। মানুষগুলি পেট খাবড়ে থাকত পড়ে। ক্ষিদে লাগলে বীর গাডার জলই ছিল খাদ্য। অনেক জায়গায় খুজেছিল নিমা মাঝি—লেদিয়াম, ভরতপুর, বৈরাগীকাটা, ভাদাসপুর—যেখানে যেখানে কুটুম আছে, সব জায়গাতেই সন্ধান নিয়েছে নিমা, কিন্তু কেউ কোন হদিস দিতে পারে নি, তাই এক দিন ইষ্টিশনে এসে পোষ্টগুলির গায়ে মুখ রেখে আকুতিভরে বলেছিল, রুড় গাদা হজুসে, (ফিরে আয়), কিন্তু কোন ফল হয় নি। হয় ত শক্ত আবরণ ভেদ করে তার কথাটি ভিতরে প্রবেশ করে নি।

তাই আসেনি বিষণ, নয় ত সংবাদ পেয়েও ফিরে আসেনি ও। অকৃতজ্ঞ! বুঝল না পর্য্যন্ত—বাপকে দুঃখ দিলে কি সুখ হয় কখনও? বৌটাই পাজি,—অমনি করে ইনিয়ে বিনিয়ে যদি

অভাবের কথাগুলি না জানাত তুলি, তবে হয় ত এমন বেদনা তাকে পেতে হ'ত না। বদমায়েস সবাই সমান। তাই সবারই উপর তার রাগ হয়। যদি আসতে মন না চায়, আসবে না—তাই বলে একটা খবরও দেবে না, এ কি রকম আচরণ?

পর পর কয়েক দিনই ইষ্টিশনে গিয়ে টেলিগ্রাফ পোষ্টের গায়ে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিমা, যদি কোন সংবাদ পাঠায় বিষণ! আজও মাঝে মাঝে যায় নিমা। অমনি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পোষ্টের গায়ে কান রেখে।

ঐ টেলিগ্রাফের পোষ্টের গা ছুঁয়েই চলে এসেছে একটা সড়ক। বড় বড় পাথর ফেলে, তার উপর মোরাম দিয়ে রোলার চালিয়ে শক্ত করে নিয়েছে পথটা। ঠিকাদারের কীর্ত্তি। সড়কটা এসে মিশেছে এই পলাশ-জঙ্গলটার পায়ে-চলা সরু পথটির সঙ্গে। সে বছর 'উড়া কলে'র কোন এক আস্তানা তৈরি করবার প্রয়োজনে দিগম্বরের কলিজা থেকে টেনে নিয়ে এল রক্ত-মাংস। পড়ে থাকল বিধ্বস্ত একটুখানি জমি। দেখলে চেনাই যায় না! এই রাস্তার উপর দিয়েই এসেছে ট্রাকটা—আর মানুষগুলো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল নিমা। এক একটা করে গাছ কাটে—আর গাছটা ডালপালাগুলি নিয়ে আর্ত্তনাদ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে, তার পর ছোট ছোট ডালগুলিকে ছেটে দিয়ে মোটা মোটা ডালগুলি নিয়ে যায় ট্রাকে করে। পূর্ব্ব পাশে গিয়ে জমা করে রাখে।

—ও মাঝি উঠ্যানে কি ভালছিস (দেখছিস)।

মংলী মাথায় আর কাঁকে দুটো কলসী আর এক হাতে কতকগুলি বাসন নিয়ে এল বীরগাডায়। জল শুকিয়ে গেছে। 'চুয়া' খুড়ে জল নিয়ে যাবে কেলচায়। সারা দিনের খরচ। উঃ কি ধরনই করেছে এ বছর। আকাশে মেঘের চিহ্নও নেই। তবু প্রশংসা করতে হয় বীরগাডার। কাউকে বিমুখ করে না। বীরগাডার দানেই চলে ওদের।

—উয়ারা কারা মংলী? কারা বন কাটছে, জানিস?

—কি করে জানব হে।

—আর দেখি, দেখবি।

মংলী চিনলে চিনতেও পারে।

মংলা ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মংলীকে, প্রলোভন দেখিয়েছিল—অর্থের, গহনার। তাই সে বছর যখন ঠিকাদার এসেছিল দিগম্বর পাহাড়টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, তখন ভবিষ্যতের এক মনোরম দিনের ছবিকে সামনে রেখে খাটতে গিয়েছিল মংলী। তার পর প্রায় বছর দেড়েক পর ওরা ফিরেছে গ্রামে। কেউ সেদিন তাদের ডাকেনি। ওরা অন্যায় করেছে—সমাজে দিয়েছে কালি, ওদের ছুলেও পাপ—এই ছিল সামাজিক কর্ত্তাদের বক্তব্য। নিমা মাঝিই ডেকে নিয়ে গিয়েছিল আপনার বাড়ীতে, তার পর সামাজিক রীতি অনুযায়ী তাদের দিয়েছিল বিয়ে। মংলী বলেছিল, ভাগ্যি তুই ছিলি বুড়া মাঝি, তা না হৈলে ফিরে যাত্যা হৈত আমাদিকে।

—এখন আর যাবি নাই ত?—হাসতে হাসতে জিগ্যেস করেছিল নিমা।

—ইঠ্যানে আম্যাদের একট খাওয়া পরবার হিল্লা কৈরে দে বুড়া মাঝি।

—বেঁশ।

নিশ্চয়ই জমীদারের কাছ থেকে বিঘেখানিক ডাঙা বন্দোবস্ত নিয়ে জোত করে দিয়েছে। সারা বছর চলে না ফসল থেকে। মাস তিন যায়, বাকী দিনগুলোর জন্য নির্ভর করতে হয় বনটার উপর। নিমা মাঝিও সাহায্য করে কখনও কখনও।

বুড়া মাঝির কথা অমান্য করতে পারে না মংলী। বাপের মতন মানুষ। এ ক্ষেত্রেও পারল না। কলসী দুটোকে প্রস্তর-চত্বরটায় উপুড় করে রেখে দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল নিমার পাশে।

খানিক তাকিয়ে থাকতেই একটা লোককে দেখে চমকে উঠল মংলী। সেই লোকটার মতই—অবিকল। গোল গোল চোখ; ভ্রু দুটো এত ঘন এবং এত বড় যে তা চোখের প্রায় অর্দ্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে। এই 'দিগম্বর পাহাড়' কাটার সময় ঐ লোকটাই তাদের প্রত্যেক দিনের হাজরীও বটে।

—মংলা—এক টাকা দশ আনা।

—রাধা নায়—এক টাকা।

পুরুষদের হাজরি নেওয়া হয়ে গেলে মেয়েরা গিয়ে দাঁড়াত সারিবদ্ধ ভাবে।

—শুকার মা—দশ আনা।

—মংলী সেমান—দেড় টাকা।

টাকাটা নেবার সময় হাত পেতে দাঁড়াত কামিনরা। শয়তানটা এক একটি করে পয়সা গুনে মেয়েদের হাতে গুঁজে দিত! মংলীর হাতের চেটোয় একটা চাপ দিয়ে মৃদু হেসে বলত, এই নে তোর মজুরি, মালিককে খুশী রাখতে পারলে আরও বেশী পাবি! চোখের চাউনিটা ছিল কুটিলতায় ভরা।

—উ মাঝি ইয়ারা যে ঠিকাদারের লোক হে!

বলল মংলী। চোখ দুটো দূরের ঐ মানুষগুলোর মুখের উপর।

—ঠিকাদার?

—হুঁ, বনটা কিনে লিয়েছে বোধ হয়।

তাই হবে।

—কি করবেক রে মংলী?

—কি কৈরে জানব বল?

বনের দিকে তাকালেই বুকটা ছ্যাং করে উঠে নিমা মাঝির। হু হু করে জলে উঠে মন। যেন কোনও আত্মীয়বিয়োগ হয়েছে নিমা মাঝির। কিছুদিন মাঠে যাওয়া ছেড়েই দিল নিমা। সারাটি ক্ষণ ঘরে বসে থাকত, আর ভাবত ঐ বনটিকে কেন্দ্র করে অতীতের কত ছোট বড় ঘটনার ইতিকথা।

একদিন নিমা মাঝির স্ত্রী বলল, এমনি কৈরে বসে থাকলে কি পেট ভরবেক? রোহিণী আসছে বীচ (বীজ) ফেলতে হবেক

ইবারে। আকোরা ক্ষেত-ট ত দেখে আইস একবার। কে না কে বন কাটছে তাতে তুমার কি ?

সত্যিই ত তাতে তার কি ? তারা কাটুক বন। মংলী ওদের চেনে। ঠিকাদার সন্ধান পেয়েছে লাফুডিয়র ভূগর্ভস্থ সম্পদের। এখানের মাটির সঙ্গে মিশে আছে অর্থ। তাই লুঠে নিয়ে যেতে দল বেঁধে এসেছে ঠিকাদার। এখানকার সম্পদকে বাইরে টেনে এনে চালান দিবে বাইরে। ইষ্টিশন থেকে একটা লাইন আসবে। সেই লাইনের উপর হুস হুস করতে করতে—ঘরের মত গাড়ী-গুলোকে টেনে এনে রাখবে এক পাশে, আর তাতেই অভ্র ভর্ত্তি করে বাইরে চালান দেবে ঠিকাদার।

দিক, ওদের পাশে নিমাও চালান দিবে তার ফসল। আরও ডাঙা বন্দোবস্ত নেবে নিমা। এখনও গতর আছে তার—অনায়াসে মাটি কেটে ক্ষেত বানাতে পারবে।

চিন্তা করতে করতে কোন সময় তার ভাঙা মনে আত্ম-প্রত্যয়ের শক্তি প্রবেশ করল। সে স্ত্রীর কথার জবাবে বলল, আমার আর কি ? আমি কি উয়াদিকে ডরে যাই নাই নাকি ? শরীলটার জুৎ ছিল নাই, তাথেই ঘরে বৈসেছিলুম, কালকেই যাবো।

তারপর দিন মাঠে গেল নিমা। অন্য দিনের তুলনায় সেদিন মাঠে একটু বেশী সময় খাটল সে। ফেরবার সময় একবার দেখে এল বড় ডাঙাটা। এই খানেই জমি নেবে সে—কম জমা। জলের অভাব একটু হবে ধরনের দিনে—তা হোক। দেবতা মুখ তুলে চাইলে সব হবে।

কয়েকটা দিন পর আজ পরিশ্রম করেছে নিমা। দরদ করছে পায়ের গোছায়—পিঠের শিরদাঁড়ায়। যখন কাজ করছিল, তখন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল যেন কোনও চেতনাই ছিল না তার। এখন বুঝতে পারছে, বেশী পরিশ্রম করা তার সামর্থ্যে কুলোবে না।

—আজ টুক্‌চা হাত-পা-ট টিপে দিস বহু—বলল, নিমা।

এটা নূতন কথা নয়, যখনই গায়ে দরদ করত, তখনই নিমা বৌকে দিয়ে টিপিয়ে নিত দেহটা। আরাম পেত নিমা। দরদ চলে যেত, পরদিন আবার নূতন শক্তি নিয়ে কাজে যেত সে।

নিমার স্ত্রী কোন কথা না বলে, চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল নিমার দিকে। মুখে সরমের হাসি।

—বুড়া মাঝি ঘরে আছ হে ?

ছোট্ট পাঁচিলঘেরা নিমার আঙিনা। বাইরে থেকে ভিতরটা দেখা যায় না বটে, তবে একটু উঁচু করে দাঁড়ালেই ভিতরের সব অংশটাই দৃষ্টিগোচর হয়। পাঁচিলের গায়ে লাগাও একটা দরজা। চৌকাঠ নেই, দু'পাশে দুটো মোটা পলাশ-কাঠ পুঁতে—তারই এক পাশে লাগিয়ে দিয়েছে দুটো হাঁসকল, আর তারই উপর ভর করে লাগানো আছে একটি টিনের পাত। বৈকালে যখন গরুবাছুরগুলি মাঠ থেকে ফিরে আসে, মুরগীগুলি বাইরের বনবাদাড়ে খাদ্য-সংগ্রহের পালা সাঙ্গ করে ঘরে এসে কিচির-মিচির করে, তখন দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিমার স্ত্রী—নিমার জন্ত ভাত চাপায়।

মংলী পাঁচিলের পাশ দিয়ে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

—আছি, আয়।

ঘরে ঢুকল মংলী।

বুড়া মাঝি শাল পাতার একটা চুটি পাকিয়ে, তাই দাঁতে টিপে ধরে বলল, ই সময় আলি যে।

—তুমার সাথে কথা আছে মাঝি।

—বেশ বল।

মংলী কাছে এসে বসল, একবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল :

—চল, দেখবে জাহির থানে বাইশী বসেছে।

—কি বললি ?

—জাহির থানে বাইশী বসেছে।

বাইশী বসেছে! মনে মনে বারকয়েক আবৃত্তি করল কথাটা। এ গাঁয়ের সে মাতব্বর, কয়াল (পুরোহিত) সে। এতকাল এ গাঁয়ের শুভাশুভ সব দেখে এসেছে নিমা মাঝি। বিয়েতে, শ্রাদ্ধে সে থেকেছে উপস্থিত। অসুখ-বিসুখ হলে সে থেকে ওষুধ নিয়ে এসে নিজের হাতে খাইয়ে রোগমুক্ত করেছে কত জনকে। মহামারী দেখা দিলে—বঙা-বন্তীর থানে নিজের হাতে মুর্গী বলি দিয়ে দেবতাকে করেছে সন্তুষ্ট। আর আজ কিনা তাকে না জানিয়েই বাইশী বসেছে জাহির থানে। অবাক হবার কথা বৈকি!

—কে বাইশী ডাকাচ্ছে মংলী ?

গলার স্বর ক্ষুব্ধতায় ভরা। বেদনামিশ্রিত, কিন্তু দৃঢ়।

—ঐ তুমার কোটাল মাঝি।

টুকুন মাঝি জমিদারের কোটাল। জমিদারের জমি দেখা-শোনা করে। খাজনা আদায়ের সময় গোমস্তা যখন আসে তখন মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করে কাছারী-ঘরে। আর তার পরিবর্তে খানিকটা জমি ভোগ করে টুকুন।

—ক্যানে ? জিজ্ঞেস করল নিমা মাঝি।

—তুমি শুনবে চল।

—কে কে গেইছে ?

—সুবাই, গাঁয়ে মরদ লোক নাই হে মাঝি। এক-টও মরদ লোক নাই।

—মংলাও গেইছে নাকি ?

—হুঁ।

চুটিটা আর ভাল লাগল না নিমার। ফেলে দিল। কলকেটায় তামাক দিয়ে তাই ডাবু হুঁকোটার মাথায় গুঁজে বারকতক টানল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেল জায়গাটা, তীব্র নেশা জাগানো একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

—চল মংলী!

স্বামীর কোন কাজেই কোন দিন বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি নিমার স্ত্রী, তাই আজও কিছু বলল না। শুধু নিমাকে জলদি ফেরবার জন্ত অনুরোধ করল।

গাঁয়ের মাথায় একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। গাছের গোড়াটা মাটি আর পাথর দিয়ে বাঁধানো। বাইশী বসবার উপযুক্ত জায়গা।

নিমা মাঝি গিয়ে দাঁড়াতেই একটা চাঞ্চল্য এল সভায়। নড়ে বসল টুকুন—তারপর কি মনে হতে নিমার কাছে গিয়ে বলল, এই যে মাঝি আস্যাছিস। দু'বার তুকে ডাকতে পাঠালুম—তা খবর আইলো—'ঘরে নাই', শুনলুম বিরাণো গাঁ গেইছিস। তা ভালই হৈল—আলি। নিমা মাঝি না থাকলে কি আর বাইশী জমে। চল তুর সাথে আলাপ করাঞ দি বাবুর।

নিমা মাঝি কোন জবাবই দিল না। সন্ধানী-চোখের দৃষ্টি শুধু চরকির মত ঘুরে বেড়াল। এরা সবাই চেনা—সবাইকে জানে সে, এদের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। অভাবে মানুষগুলোর জ্ঞানবুদ্ধিও লোপ পেয়ে গেছে, নইলে প্রলোভনের বন্ধনে এমন করে জড়িয়ে পড়বার জন্য এগিয়ে আসবে কেন? কিন্তু সে যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—এ পথে মঙ্গল নেই—শান্তি নেই—অভাবের পরিসমাপ্তি নেই।

—তুই দাঁড়াঞ রইবি নাকি মাঝি—দে রে দে মাঝির ঠাঁই করে দে।

—না, থাক। গম্ভীর ভাবে বলল নিমা।

—তাই কি হয়—তুই হলি গাঁয়ের মড়ল—চল ঐ বাবু-টর কাছেই বসবি।

একরূপ টানতে টানতেই নিয়ে গেল টুকুন। বাবুর কাছে বসিয়ে দিল।

—কিসের লাইগ্যা ই বাইশী ডাক্যাছিস টুকুন?

আপনার পদমর্য্যাদা—সম্মান রেখেই জিজ্ঞেস করল নিমা।

—সব শুনবে—তোমাদের শুনাতেই ত আমরা আস্যাছি। বাবুটি হাসতে হাসতে বলল। সাপের মুখে যেমন করে ক্ষণে ক্ষণে জিহ্বাটি সঞ্চালিত হয়। তেমনি গতি কথার।

মানুষটাকে সেদিন দেখেছে নিমা মাঝি। বনের গাছগুলো ও-ই তদারক করে কাটাচ্ছিল।

কই কইলি নাই টুকুন?

—কইছি, এই বাবুরা আস্যাছে। ঐ 'বীর-গণ্ডার' বনের ধারে খাদ হবেক। আমাদের আর কিছুর অভাব থাকবেক নাই মাঝি। দেড় টাকা, দু' টাকা হাজরী—

—না না, তা কেন যেমন মাল তুলবি, তেমনি হাজিরা বাড়বেক। বাবুটি সংশোধন করে দিল টুকুনের কথা।

হঁ হঁ—দেখলে কেমন ভোল হয়্যা গেইছিল, তুই-ই ক বাপু! আমরা এই বস্যা রইলুম, তুই-ক।

এবার বাবুটি দাঁড়িয়ে বলল সব কথা। এক মনোরম ছবি তুলে ধরল লাফুড়িডর সাঁওতালদের সামনে। তাদের অভাব মিটবে—তারা সুখে শান্তিতে থাকবে—তারা মানুষ হবে।

শুনতে ভালই লাগল। সবাই হয়ত সন্তুষ্টও হ'ল, খুশী হতে পারল না শুধু নিমা মাঝি। যেদিন দিগম্বর পাহাড়টা কাটবার প্রয়োজন হয়েছিল সেদিনও ঠিক এমনি কথাই বলেছিল জমিদারের গোমস্তা। তার স্বার্থ ছিল—স্বার্থ ছিল জমিদারের। জনপিছু জমীদার টাকা আদায় করেছে ঠিকাদারের কাছে। আজকার এই মতলবের পিছনেও জমিদারের হাত যে নেই—তা বলা যায় না। সেদিন দিগম্বরে খাটতে গিয়ে বিষণা মাঝি মরেছে রক্ত উঠে। মতির মায়ের ভিটায় চরছে গোরু—আজ আবার কার সর্ব্বনাশ করবার জন্য পলাশবনের উপর পড়ল আঘাত। তাই বলল সে—ইয়াতে ভাল হবেক নাই টুকুন। আমাদের চাষই ভাল।

এই সময় একটা দমকা হাওয়ায় নড়ে উঠল অশ্বত্থ বৃক্ষটি। ঝরে পড়ল কতকগুলি শুকনো পাতা।

উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল টুকুন; চাষে কি আর পেট ভরে, না ব্যাটা বিটির কমরে কাপড় দেওয়া যায়? কি বুলিস তুরা?

সকলেই টুকুনের কথায় সম্মতি জানাল।

—তুরা কি সুবাই সাপের ঘাড়ে পা দিবি? মংলা তুই?

—স্বরে আছে ক্ষোভ, আছে বেদনা—আর আছে ক্রোধ!

—বৈসে থাক্যা যে শুকাই মৈরব মাঝি।

—তা হৈলে যাবি ত।

এর আর জবাব দিলে না মংলা।

যাবে—মংলাও যাবে। যার উপর সবার চেয়ে ভরসা ছিল তার সেও যাবে। পা দুটো কেমন টলতে লাগল তার। শরীরটা তপ্ত মনে হ'ল—মনে পড়ল বৃদ্ধ শিকারী বাঘটার কথা। বৃদ্ধ হয়ে গেছে—

একরূপ চলতে চলতেই ফিরে এল নিমা মাঝি। আজ ধরা পড়ল—ভিতরে ভিতরে সে কত দুর্ব্বল হয়ে গেছে। মুখের সামনে সবাই বলে উঠল, তারা নিমা মাঝির কথা শুনে শুকিয়ে মরতে প্রস্তুত নয়। আজ যদি ছেলেটা কাছে থাকত—হয়ত সেও বলত এমনি কথা। নেই ভাল হয়েছে।

স্ত্রী ভাত বেড়ে দিয়ে খেতে বলল। যন্ত্রচালিতের মত বসল নিমা, কিন্তু একটা ভাতও রুচল না। শরীরটা ভাল নেই অজুহাতে উঠে এসে শুল শুধু খাটিয়াটায়। তামাক সেজে এনে দিল স্ত্রী, কিন্তু সেদিকেও নজর নেই নিমার। কলকের আগুনটা সমস্ত তামাকটাকে পুড়িয়ে দিয়ে নিভে গেল।

খাদ হবে। গাঁয়ের মানুষ কোদাল ফেলে হাতে নিয়েছে গাঁইতি। ঐ ঠিকাদার বাবুই দিয়েছে। কাজের সময় গুনে নেয় আবার কাজ শেষ হলেই গুনে ফিরে দিয়ে আসে। সকাল থেকেই গাঁ-টা খাঁ খাঁ করে। ওপাশে বীরগণ্ডার বন হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন। দেখতে দেখতে নানা ধরণের বাড়ী উঠে। একটা হৈহুল্লুড়ে ভাব।

ঘর থেকে আজকাল বড় একটা বেরোয় না নিমা মাঝি।

হয়ত রাস্তায় কেউ কোদাল ঘাড়ে নিয়ে ক্ষেতে যেতে দেখলে হাসবে—দিনের আলোয় সবাইকার সামনে বেরুতে লজ্জা হয় তার। কারো বাড়ী যায় না। আসেও না কেউ। নিমাই যেন পতিত হয়েছে সমাজ থেকে। মাঝে মাঝে মংলী আসত, কিন্তু আজকাল তারও আসা বন্ধ হয়েছে। মংলা আসতে দেয় না। দিন যায়—রাত্রি আসে। আবার দিন হয়—রাত্রি হয়।

নিমার চোখ থেকে ঘুম বিদায় নিয়েছে যেন চিরতরে। গভীর রাতে শুয়ে থাকতে থাকতে চমকে উঠে। মনে হয় বীরগণ্ডা হয়ত ডাকছে তাকে।

এক দিন গভীর রাত্রে সে শুনল—কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। বড় ভীতিমেশানো! বড় সংশয়বদ্ধ!

—বুড়া মাঝি! বুড়া মাঝি!

—কে রে? কে বটিস?

—আমি, একবার আগুড়-ট খুলবে?

খাটিয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল নিমা মাঝি। মানুষ ভুত দেখলে যেমন চমকে উঠে, তেমনি চমকে উঠল নিমা। তার সামনে একটি নারীমূর্ত্তি!

—আমি মংলী!

—মংলী? এত রাতে?

—হুঁ।

ছম্ ছম্ করছে রাত। সে নিস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে একটানা একটা শব্দ ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ কান পেতে থাকলে বোঝা যায় এটা যান্ত্রিক। পলাশ-জঙ্গলের ধারে—বীরগণ্ডার জলটা টেনে নেওয়ার জন্য যে পাম্প বসিয়েছে, তারই বয়লারের শব্দ।

—আয়?

সারাদিন খাদে মাটি টেনেও ভূতের মতন ঘুমাছে মানুষ-ট। তাই এখন আসছি।

ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল নিমা মাঝি—মংলীকে।

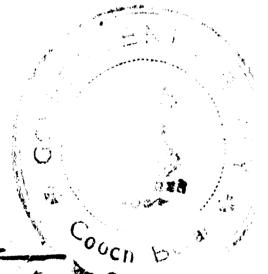
মংলী এবার চুপি চুপি বলল, জানিস মাঝি, ই গাঁ-ট উয়ারা কিনে লিয়েছে।

—তা হৈলে গাঁয়ের মানুষগুলা যাবেক কুথাকে শুনি?

উয়ারা ধাওড়া বানাছে—সেই ঠ্যানে যায়্যাই উঠবেক।

কথাটি সরল ভাবে নিতে পারল না নিমা। কিন্তু এমনি যে একটা অঘটন কিছু ঘটবে—তারই আশঙ্কা করছিল নিমা। কিন্তু তার শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকা যেন হয়ে উঠল বিদ্রোহী। সে চীৎকার করে উঠল—ই অন্যায়। সে চীৎকার ওপাশের বয়লারটার গায়ে গিয়ে করল আঘাত। ফিরে এল সে আর্ত্ত চীৎকার। আর থাকতে পারল না নিমা। গন্ গন্ করতে করতে বেরিয়ে গেল নিমা। রাত্রির একটা পাখী ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে উড়ে গেল ইষ্টিশনের দিকে, কতদূর কে জানে!

আতঙ্কিতা হয়ে উঠল মংলী। পাগল হয়ে গেল নাকি বুড়া মাঝি! সেও পিছনে পিছনে গেল। কিন্তু খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নিমা। কোত্থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ প্রবেশ করল কানে। শব্দকে অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল—তারার মত একটা তীব্র আলো ইষ্টিশনে বিরাজ করছে। ইঞ্জিনের আলো।





রূপের তাপস তুমি

শ্রীউমা দেবী

১

রূপের তাপস তুমি রূপচর্য্যা স্বধর্ম্ম তোমার
নব নব রূপে তাই ভাঙো গড়ো আপনার রূপ,
সৃষ্টি-প্রেরণায় তার স্থির নীল-নভ-পারাবার,
সৃষ্টির আনন্দ-ভোজে লোলাঞ্চলা ধরণী লোলুপ।
নব প্রতিমার সৃষ্টি শেষ হলে পুরানো বিগ্রহ
ছুঁড়ে ফেলে দাও দূরে নৈঃশব্দ্যের অশ্রু-নদী-তটে,
কখনো কর না তুমি বিস্মৃতকে স্মৃতির নিগ্রহ
বিসর্জ্জন পূজাশেষে পুতুলকে রাখ না নিকটে।
রজনী গভীর হলে আমি সেই অশ্রু-নদী-তটে
হারাণো প্রতিমাগুলি ফিরে ফিরে করি অন্বেষণ,
ভুলে যাওয়া নামগুলি রক্ত দিয়ে লিখি বক্ষপটে
আপনার প্রাণ দিয়ে করি নব-প্রাণ-আবাহন।
—যদি বা নূতন ডোরে পুরানোকে গেঁথে নিতে পারি,
রূপের তাপস তুমি—আমি রূপকারের পূজারী।

২

পঞ্চনরী হার এনে মালাকর পরাও গলায়—
প্রথম লহরে গাঁথ রক্তবর্ণ দেহের উৎপল,
সুধা ফেলে সুরা ঢেলে আকাশের চাঁদের কলায়
যখন অরণ্যে হবে আরণ্যক আশারা চঞ্চল।
দ্বিতীয় লহরে আন শুভ্রদ্যুতি মুক্তার বাহার
বেদনা ও আনন্দের ভাঙা-ওঠা অশ্রুর গাঁথনি,
নিরন্তর ঢেউ লেগে উদ্বেলিত প্রাণ-পারাবার
যেখানে নিষ্ফল ক্রোধে আজো হানে তটের গাঁথনি।
তৃতীয় লহরে দাও তারাদের আলোর কণিকা
উষার কবরী থেকে খসে গেছে যে নীলাভ দ্যুতি,
নিরুদ্দেশ নভতলে সে কি হবে চাঁদের মণিকা
মানস-প্রয়াণে যার নাই আজো বিন্দুমাত্র চ্যুতি।
চতুর্থ-লহর ছিঁড়ে ফেলে দেব নগণ্য স্মৃতির,
পঞ্চম লহর সুরে গেঁথে নিও অলোক-গীতির।

৩

রূপে যে অরূপ এত, দেহে এত বিদেহ আকুতি,
আশায় নিবৃত্তি এত, স্নেহে এত অনাসক্ত দ্যুতি,
স্বপ্ন যে জাগ্রত এত, প্রেম এত হৃত-অধিকার—
তোমাকে জেনেছে যারা তারা ছাড়া কে জেনেছে আর?
বিস্মৃত বিমুক্ত এত, অবদ্ধ যে হৃদয়-বিশ্রুতি,
সঙ্গ যে নিস্পৃহ এত, আসঙ্গ যে এত নির্ব্বিকার,
সঙ্গীত-আনন্দময় হৃদয়ের অবিরত রুতি—
তোমাকে জেনেছে যারা তারা ছাড়া কে জেনেছে আর?
তোমাকে জেনেছে যারা তারা জানে কত যে সহজ—
সহজ কত যে তুমি প্রভাতের আলোকের মত,
সহজে যেমন ফোটে সে আলোয় প্রথম পঙ্কজ,
সহজে যেমন করে গুঞ্জরণ ভ্রমর সতত,
সে সহজ গুঞ্জরণে জীবনের সহজ প্রসার—
তোমাকে জেনেছে যারা তারা ছাড়া কে জেনেছে আর?

৪

তোমার স্নেহের দানে আমি জ্বলি আপন শিখায়
তোমার অক্ষর নিয়ে আমি গাই আপনার গান,
তোমার সাক্ষর পেলে যে ঐশ্বর্য ভুবনে বিকায়
সে ঐশ্বর্য্যে যত দীপ্তি, আমি জানি সে তোমারি দান।
আপন হৃদয়স্রোতে আপনি যে করি ধারাস্নান,
সে স্রোতের গুহামুখে তুমি গোন তরঙ্গ-লহরী
পুষ্পিত বিলাস-রঙ্গে যে আসব নিত্য করি পান
সে পুষ্প-উদ্যানে আজো তুমি শুধু সতর্ক প্রহরী।
কত মধু পান কর হে পুরুষ! হে স্বপ্নসম্ভব!
কত প্রাণরক্ত চাও? হে কিতব! ঈর্ষায় মহান্,
যাকে ভালবাসি তারো ভালবাসা কর অসম্ভব
মধ্যপথে কেড়ে নাও হৃদয়ের উপভোগ্য দান!
অবরুদ্ধ অশ্রু যত হয় করো মুক্তার আকর,
এ যে কোন বিড়ম্বনা—প্রেমিককে কর মালাকর।

৫

কি এক আলোক যেন জ্বেলে রাখ আপন হৃদয়ে
কোমল উত্তাপে তার তপ্ত করি অবসন্ন নিশা,
পূর্ব-পরাজয়গুলি দৃপ্ত হয় উত্তর-বিজয়ে
অপর্য্যাপ্ত সুধাপানে তৃপ্ত হয় কুণ্ঠিতের তৃষা।
সেই প্রদীপের শিখা জ্বেলে নিই নিজেরও হৃদয়ে
পুরাতন লিপিগুলি পাঠ করি নূতন আলোকে,
মুখর বিজয় যত ধন্য হয় মূক পরাজয়ে
সফেন খুশির ধারা ঢালি তত নির্ব্বাপিত শোকে।
কি এক আলোক তুমি জ্বেলে রাখ এ বিশ্ব-ভুবনে,
তার কাছে তারা-চন্দ্র-সূর্য এসে স্বচ্ছন্দে ঘুমায়,
উষাও চঞ্চল হয়ে জেগে ওঠে ভোরের পবনে
রাত্রির শীতল গায়ে তারাদের সোনালি চুমায়।
পুরানো বাসনাগুলি একে একে ছিঁড়ি অন্যমনে—
তোমার আলোর কোলে তারা পায় নিশ্চিন্ত কুলায়।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ও তাঁহার কাব্যবিচার

শ্রীসুশান্ত সিংহ

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গ প্রদেশে। কথিত আছে যে, তিনি তৈলঙ্গ প্রদেশ হইতে জয়পুরে আসিয়া তথায় একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। যৌবনে আশ্রয়লাভেচ্ছায় তিনি দিল্লীশ্বর শাজাহানের সভায় আগমন করেন এবং নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানে সম্রাটকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'পণ্ডিতরাজ' উপাধি লাভ করেন। প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত তিনি শাজাহানের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে, সম্রাটের মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ বয়সে তিনি কাশীতে গমন করেন। তথায় তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি হয়। শাজাহান ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুত্র ঔরঙ্গজেব কর্তৃক কারারুদ্ধ হন এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, জগন্নাথের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ।

অলঙ্কার এবং ব্যাকরণ উভয়বিধ গ্রন্থপ্রণয়নেই জগন্নাথ তুল্য পারদর্শী ছিলেন। যদিও ভাবিনীবিলাস, চিত্রমীমাংসা খণ্ডন, মনোরমাকুচমর্দ্দন প্রভৃতি পণ্ডিতরাজের সকল পুস্তকেরই সমধিক সমাদর আছে তথাপি তাঁহার অলঙ্কার-গ্রন্থ 'রসগঙ্গাধর'ই বিদ্বৎসমাজে সুপ্রচলিত ও প্রশংসিত। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাই অসম্পূর্ণ অবস্থায়। ইহা কি গ্রন্থকর্ত্তার ইচ্ছাকৃত অথবা কোনও দৈবদুর্বিপাক বশতঃ তিনি পুস্তকটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই তাহা জানিবার আজ কোনও উপায় নাই।

রসগঙ্গাধরে নব্যন্যায়ের পরিভাষা বহুল পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে এবং পদার্থবিচারে নব্যন্যায়ের শৈলীবৃত্ত সমধিক অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। ফলে একদিকে যেমন ইহা রচনাটিকে দুরবগাহ করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ইহার গাঢ়বদ্ধ রচনার বিচার ও বিশ্লেষণশক্তির নৈপুণ্যে সুধীপাঠকের চিত্ত জয় করিয়াছে। এই ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করার পক্ষে আরও একটি যুক্তি আছে। লক্ষণের অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ—লক্ষ্যে লক্ষণ না যাইলে অব্যাপ্তি দোষ হয়। যেমন, যখন মানুষের লক্ষণ করা হয় 'শৃঙ্গীপ্রাণী' বলিয়া। আবার লক্ষ্য ভিন্ন স্থলেও লক্ষণ যাইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। যেমন, যদি মানুষের লক্ষণ করা হয় কেবল 'প্রাণী' বলিয়া। ইংরেজীতে প্রথম দোষটি 'fallacy of too narrow definition' এবং দ্বিতীয় দোষটি 'fallacy of too wide definition' নামে পরিচিত। পরিহারের জন্য এই রচনা-শৈলীর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্যগতি নাই এবং তখন ইহাই পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইত।

জগন্নাথ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের আলঙ্কারিক। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রধান প্রধান প্রস্থানগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত ছিল। জগন্নাথ এই প্রস্থানগুলি (ধ্বনি-প্রস্থান, রসপ্রস্থান প্রভৃতি) গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যার দুর্ব্বলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্বমত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাহিত্যে রসের প্রাধান্যই স্বীকার করেন। তাঁহার প্রদত্ত যুক্তিগুলি সুচিন্তিত, বলিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি কেবল তীক্ষ্ণধী আলঙ্কারিকই ছিলেন না, সুকবিও ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি উদাহরণস্বরূপ যতগুলি পদ্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটিই তাঁহার স্বরচিত। ইহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে গ্রন্থের ভূমিকায় গর্ব্ব করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "নির্ম্মায় নূতনমুদাহরণানুরূপং কাব্যং ময়াত্র নিহিতং ন পরস্য কিঞ্চিৎ। কিং সেব্যতে সুমনসাং মনসাপি গন্ধঃ কস্তূরিকা-জনন-শক্তিভৃতা মৃগেণ॥" অর্থাৎ, "এই গ্রন্থে যে সকল নূতন উদাহরণানুরূপ কবিতা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সে সকলই আমার রচিত। কস্তূরীমৃগ মনে মনেও কখন কি পুষ্পে গন্ধ আঘ্রাণ করে?"

গ্রন্থের প্রথমেই পণ্ডিতরাজ প্রাচীন প্রথানুযায়ী দেবতাদির বন্দনা করিয়া স্বীয় কুলের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহার পর তিনি কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, 'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।' সাধারণভাবে সূত্রটির অর্থ এই যে, যে সকল শব্দের উচ্চারণে সহৃদয় মানসে কোনও মনোহর অর্থের উদয় হয় সে সকল শব্দকেই কাব্য বলা যাইতে পারে।—এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রাচীন আলঙ্কারিক মম্মট প্রভৃতির অনুসরণে জগন্নাথ শব্দ ও অর্থ উভয়কেই কাব্যে তুল্য প্রাধান্য দিলেন না। কাব্যত্ব শব্দ ও অর্থ এই উভয়ানুগত ধর্ম্ম—এই মম্মট-সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া কেবল শব্দেরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য দণ্ডীকে অনুসরণ করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। কারণ দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শ গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, 'শরীরং তাবৎ ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী'। ইষ্টার্থযুক্ত অর্থাৎ অলৌকিক আহ্লাদ-জনক পদসমষ্টিই কাব্যের শরীর।—এ সম্বন্ধে জগন্নাথের মত পরে আলোচিত হইতেছে।

লক্ষণটি পরিষ্কার করিবার পূর্ব্বে আমাদের একটি কথা জানিতে হইবে। ভাষার লাঘব নৈয়ায়িক মতে একটি মহৎ গুণ। সুতরাং আলোচ্য কাব্যের লক্ষণে পণ্ডিতরাজ যে কয়টি পদ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটির সার্থকতা বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, লক্ষণে 'শব্দ' এই পদটি দিবার সার্থকতা কি? ইহা ব্যতীতও ত "রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ কাব্যম্" এই ভাবে কাব্যের লক্ষণ করা যাইতে পারিত। অর্থাৎ, যাহা কিছুই আমাদের মনে কোনও রমণীয় অর্থের প্রতীতি করায় তাহাকেই কাব্য বলা যাইতে পারে। এইরূপ লক্ষণ করিলে নায়কের প্রতি

নায়িকার কটাক্ষ প্রভৃতিতেও কাব্যের প্রাপ্তি হইয়া যায়। কারণ কটাক্ষাদির দ্বারাও ত নায়কের মনে রমণীয়ভাবী মিলনরূপ অর্থের প্রতীতি হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, লক্ষণ সূত্রে 'প্রতিপাদক' এই পদটি ব্যবহার না করিয়া সংক্ষিপ্ত 'বাচক' পদটি ব্যবহার করিলেই ত চলিত? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, 'বাচক' পদটি ব্যবহার করিলে কাব্যের অভিপ্রেত রমণীয় অর্থ যে কাব্যে ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশিত হয় (মুখ্যতঃ শব্দের সাহায্যে প্রকাশ পায় না) সেইরূপ ব্যঙ্গ-কাব্যে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় বলিয়া 'প্রতিপাদক' পদটি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

এখন লক্ষণটি পরিষ্কার করা যাইতেছে। লক্ষণে 'রমণীয়' পদটি ব্যবহার করা হইয়াছে। এই রমণীয়তা যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ বলিতেছেন, যে জ্ঞান বা ভাবনা হইতে অলৌকিক আনন্দ জন্মায় তাহার বিষয়ীভূত হওয়াই রমণীয়তা। অর্থাৎ, রমণীয়ার্থ বলিলে সেই কাব্যার্থকেই বুঝাইবে যাহার জ্ঞান হইতে সহৃদয় হৃদয়ে এক অলৌকিক আনন্দের উদয় হয়। এই আনন্দের ভিতর যে চমৎকারিতা আছে তাহাই কাব্যের অলৌকিকত্ব বা লোকোত্তরত্ব। এই আনন্দ কোনও বিশেষ ব্যক্তির সসীম আনন্দ নহে, ইহা সর্ব্বজনীন। যে আনন্দে এই সর্ব্বজনীনত্বের অভাব থাকে তাহা কখনও কাব্যের বিষয় হইতে পারে না, নতুবা কোনও ব্যক্তিকে তাহার পুত্র-জন্মের সংবাদ দিলে সেই ব্যক্তির যে আনন্দ তাহাও 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' কাব্যানন্দই হইয়া যাইত। জগন্নাথের লোকোত্তরাহ্লাদকেই বিশ্বনাথ তাঁহার 'সাহিত্য-দর্পণ' গ্রন্থে সহৃদয় হৃদয়ের চমৎকারিকতা ও রসের প্রাণ বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে ধর্ম্মদত্তের একটি কারিকা তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।" রসের সারবস্তু এই যে চমৎকার, ইহা সকল প্রকার রসেই অনুভূত হয়।

ইহার পর জগন্নাথ মম্মটভট্টের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন। মম্মটের মতে "অদোষৌ সগুণৌ সালঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্।" অর্থাৎ, দোষরহিত এবং গুণ ও অলঙ্কারবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থ উভয়ই কাব্য।—জগন্নাথ এই স্থলে আপত্তি তুলিয়া বলিতেছেন যে, শব্দ এবং অর্থ উভয়ই যে কাব্য সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, বরং "কাব্যটি পাঠ করিলাম, কিন্তু অর্থবোধ হইল না", "কাব্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয়" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, কেবল শব্দই কাব্য। কারণ প্রথম কথাটিতে যখন অর্থের বোধ না হওয়াতেও কাব্য পঠিত হইয়াছে তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কাব্য অর্থ হইতে বি-লক্ষণ কোনও বস্তু অর্থাৎ শব্দমাত্র। দ্বিতীয় উদাহরণ হইতেও শব্দই যে কাব্য তাহা প্রতীয়মান হয়। কারণ উচ্চৈঃস্বরে শব্দকেই পাঠ করা যায়, অর্থকে নহে। অতএব কেবলমাত্র শব্দই যে কাব্য তাহা উপরের উদাহরণগুলি হইতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়। কাব্যের লক্ষণ করিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখিয়া লক্ষণ করিতে হইবে, স্বকপোলকল্পিত অন্য কোনও কাব্যপদার্থের লক্ষণ করিলে তাহা ঠিক হইবে না।

কেহ কেহ বলেন, কাব্য পদার্থের মুখ্য অর্থের (primary sense) দ্বারা শব্দ ও অর্থ উভয়কেই বুঝায় এবং পরে লাক্ষণিক অর্থে (secondary sense) কেবল শব্দকেই বুঝায় (অর্থকে নহে)। এই মন্তব্যের উত্তরে জগন্নাথ বলেন যে, কাব্যপদের মুখ্য অর্থের দ্বারা শব্দ ও অর্থ উভয়কেই যে বুঝায় সে সম্বন্ধে যদি কোনও দৃঢ় প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে এরূপ লক্ষণা করিতে কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (যখন কোন শব্দের মুখ্যার্থের দ্বারা তাহার অর্থসঙ্গতি হয় না তখন প্রসিদ্ধি অথবা প্রয়োজনবশতঃ ঐ মুখ্যার্থের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধযুক্ত দ্বিতীয় যে একটি অর্থের দ্বারা অর্থসঙ্গতি করা হয়, সেই অর্থটিকেই বলে লাক্ষণিক অর্থ। যেমন যদি বলা যায়, 'গঙ্গায় ঘোষপল্লী রহিয়াছে।' এ স্থলে গঙ্গা শব্দের জলপ্রবাহরূপ মুখ্য অর্থের দ্বারা ঘোষপল্লীর গঙ্গায় অবস্থিতিরূপ অর্থসঙ্গতি করা যায় না। কারণ গঙ্গাজলের ভিতর ঘোষপল্লী থাকা অসম্ভব। কাজেই অর্থসঙ্গতি করিবার প্রয়োজনবশতঃ গঙ্গার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট গঙ্গাতীরে গঙ্গাপদের লক্ষণা করিতে হইবে।)

রসের আস্বাদনের উদ্বোধন করাই কাব্যের ধর্ম্ম এবং শব্দ ও অর্থ অভিন্নভাবেই রসাস্বাদের উদ্বোধন করে—এই যুক্তিরও কোন মূল্য নাই। কারণ তাহা হইলে রাগরাগিণী প্রভৃতিতেও কাব্যত্বের প্রাপ্তি হইয়া যায়, যেহেতু ধ্বনিকার প্রভৃতির মতে রাগরাগিণীতেও রসোদ্বোধকত্ব রহিয়াছে। এমনকি অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি নাট্যাঙ্গে রসোদ্বোধকত্ব থাকায় তাহারাও কাব্যপদবাচ্য হইয়া যায়।

এখন দেখা যাক্‌, কাব্যশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত (connotation) অর্থাৎ কাব্যত্ব ধর্ম্মটি শব্দ ও অর্থ উভয়কে মিলিতভাবে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে অথবা উহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে আশ্রয় করিয়া আছে। কাব্য বলিতে শব্দ ও অর্থ উভয়কে মিলিতভাবে বুঝায় অথবা পৃথকভাবে? (শব্দ ও অর্থ উভয়কে মিলিতভাবে কাব্য বলিলে কাব্যশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত উহাদের ভিতর ব্যাসজ্য বৃত্তিতে (collectively) রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে ভিন্নভাবে কাব্য বলিলে প্রত্যেকে পর্য্যাপ্তভাবে (individually) রহিয়াছে বলিতে হইবে।) প্রথম মতটি গ্রহণ করিলে 'শব্দ কাব্য নয়,' 'অর্থ কাব্য নয়' এইরূপ ব্যবহার প্রাপ্তি হইয়া যায়। কারণ যে ধর্ম্ম দুইটি ধর্ম্মীতে মিলিতভাবে বর্ত্তমান তাহা পৃথকভাবে উহাদের একটিতে থাকিতে পারে না। যদি দ্বিতীয় মতটিকে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে শব্দ ও অর্থ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাব্য হইয়া একই পদ্যে দুইটি কাব্যের প্রাপ্তি দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। সুতরাং বুঝা গেল যে, শব্দ ও অর্থ উভয়েই মুখ্যভাবে কাব্য হইতে পারে না। কাব্যে শব্দই মুখ্য, অর্থ উহার বিশেষণ মাত্র। জগন্নাথ 'রসগঙ্গাধরে' এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেল

ফ্রেডা বেদী

"অতি শৈশবকাল থেকেই ইতরপ্রাণীদের দুঃখকষ্টের কথা আমি অনুভব করে আসছি তীব্রভাবে। এখন আমি যখন পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েছি তখন আমাদের দেশের সমস্ত ইতরপ্রাণীই যাতে সহৃদয় ব্যবহার পেতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবার সুযোগ আমার উপস্থিত হয়েছে এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমি করছি।"

রুক্মিণী দেবীর চুলে এখন পাক ধরেছে সত্য, কিন্তু তাঁর মধ্যে আছে প্রকৃত নৃত্যশিল্পীর লাবণ্য—বয়োধর্ম্মে যা বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ভদ্রতা এবং মাধুর্য্য এ দুটি তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত অবিচ্ছেদ্যভাবে এবং এটা যথাযোগ্য বলেই আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছিল যে, আধুনিককালে বিশুদ্ধ ভরত-নাট্যমের পুনরুজ্জীবনে নেতৃত্ব করে তিনি যে শুধু ভারতের মহান্ সাংস্কৃতিক অগ্রদূতগণের অন্যতম বলেই গণ্য হয়েছেন তা নয়, ব্যাপকতম অর্থে সমাজকল্যাণ-কর্ম্মের অগ্রদূতও তাঁকে বলা যেতে পারে।

"ইতরপ্রাণীর কল্যাণ সমাজকল্যাণেরই অংশবিশেষ" তিনি বলে চললেন—"ভারতে প্রাচীনকাল থেকে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ থেকে ইতরপ্রাণীদের কল্যাণ-সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার রেওয়াজ ছিল না। ১৯৫৩ সনে পার্লামেণ্টে উত্থাপিত পশুক্লেশ নিবারণ বিলটিতে (Prevention of Cruelty to Animals Bill) সন্নিবিষ্ট উহার উদ্দেশ্য এবং কারণসমূহ-সম্পর্কিত বিবৃতিটি দেখুন। অতি প্রাচীনকাল থেকে অহিংসার শিক্ষা উদ্বুদ্ধ করেছে ভারতের মানুষের জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারাকে... আমাদের জাতীয় পতাকায় প্রতীকস্বরূপ যাঁর ধর্ম্মচক্র আমরা গ্রহণ করেছি, সেই রাজা অশোকের রাজত্বকালে ইতর-প্রাণীদের কল্যাণবিধানের জন্য ব্যাপক আইনসমূহ প্রচলিত ছিল। গান্ধীজীর মতে আজকের দিনে পর্য্যন্ত "বেঁচে থাকার মূল্য যদি হয় অনুভূতিশক্তিসম্পন্ন প্রাণীদের উপর উৎপীড়ন তা হলে আমরা বেঁচে থাকতেই অস্বীকার করতে সমর্থ হব।"

এই কথাগুলো আলোড়িত করে তুলল আমার নিজের স্মৃতিকে। ব্রহ্ম সরকারকে সমাজসেবা পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের যে 'সোশ্যাল সার্ভিসেস মিশন' ব্রহ্মদেশে গিয়েছিল তার সঙ্গে আমি রেঙ্গুনের সমাজ-কল্যাণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করছিলাম। অনাথ বালক-বালিকা, নিঃস্ব স্ত্রীপুরুষ, দৈহিক অপটুতাবিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষ এবং মারাত্মক রোগাক্রান্ত নরনারী সবকিছুই আমরা দেখলাম। এ যেন আর্ত্ত ও পীড়িতের এক শোভাযাত্রা। একে সেই সকল সমাজকর্ম্মীদের শোভাযাত্রাও বলা চলে, এই অবস্থার প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কারের সাহস এবং ব্যাপক দৃষ্টি যাঁদের ছিল। একদিন এক মধ্যবয়সী হাসিখুশী এক ব্যক্তিকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হ'ল আমার সঙ্গে। "ইতরপ্রাণীদের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত আমার 'সদনে' (home) আমি আপনাদের অবশ্যই নিয়ে যাব।" তিনি বললেন, "দুর্গত ইতরপ্রাণীদের রক্ষাকল্পে একটি সদন প্রতিষ্ঠা কেন আপনাদের সমাজকল্যাণ-পরিকল্পনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয় না?" সদনটি না দেখেই কিন্তু আমি তাঁর কথায় সায় দিলাম, কিন্তু যখন আমি বুভুক্ষু বিড়াল, অতিরিক্ত খাটুনির দরুন শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত অশ্ব এবং উপেক্ষিত গোমহিষসমূহের দশা দেখলাম তখন ইতরপ্রাণীদেরও সমাজ-কল্যাণ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারকে আমিও আমার 'ধর্ম্ম' বলে মেনে নিলাম।

ইতরপ্রাণীদের সম্বন্ধে সারা জীবন ধরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন রুক্মিণী দেবী। ইতরপ্রাণীদের কল্যাণ সম্পর্কে যাঁর অনুরাগ গভীর আমাদের সেই প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই বিষয়ে অধিকতর তথ্যসংগ্রহের নির্দেশ দেন এবং ড. কৃষ্ণ মেননের অধীনে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন—

ফলে যে সমিতি সংগঠিত হয়, রুক্মিণী দেবী হচ্ছেন তার ভাইস-চেয়ারম্যান। "আমরা পনের শতেরও অধিক প্রশ্ন-মালা তৈরি করে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং এখন আমরা সেগুলোর জবাব সংগ্রহ করছি। এই সকল তথ্যের নিষ্ঠুর যুক্তিকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্য কারুর নেই।"

বানরের বেদনা

"বানরদের কথাই ধরা যাক। বিমানে লণ্ডন যাত্রাকালে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে ৩৯৮টি বানরের মৃত্যু এবং মাত্র তেষট্টিটি বানরের বেঁচে থাকার খবরে সারা পৃথিবী চমকে উঠেছিল। এই সকল অমানুষিক অবস্থার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। মানুষের সঙ্গে বানরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, সেজন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকল্পে তাদের পোষণ করা হয়। স্বার্থের লোভে এই সমস্ত লক্ষ লক্ষ সংবেদনশীল প্রাণীকে বিজ্ঞানের নিপীড়ন-কক্ষে (torture chamber) আমরা বিক্রী করে থাকি।"

তাঁর হাতে ছিল কতকগুলো ছবি। বানরের ছোট ছোট মুখগুলির উপরে দুঃসহ যাতনার ছাপ। কুৎসিত ব্যাধির ইঞ্জেকশন-দেওয়া একটি শিম্পাঞ্জী—সর্ব্বাঙ্গে তার ক্ষত, একটি বুভুক্ষু কুকুর—পরীক্ষণের জন্য ওকে রাখা হয়েছে অনাহারে। আমার মনে পড়ল গান্ধীজীর কথাগুলো। এই মূল্যের বিনিময়ে যে প্রগতি হচ্ছে তার যুক্তিযুক্ততা কতটুকু! কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত এমন লোক কি যথেষ্টসংখ্যক নেই যাদের উপর চালানো যেতে পারে যুক্তি-সঙ্গত পরীক্ষামূলক চিকিৎসা? যে পরীক্ষণের ফল পুরুষ এবং নারীর পক্ষে কার্য্যকরী নাও হতে পারে তার জন্যে নিরীহ প্রাণিকুলকে আমরা কি দেব আধুনিক সভ্যতার কোন একটি কুৎসিত ব্যাধি।

ভারত সরকারের উপর অবিলম্বে দম-বন্ধ-হয়ে-মারা-যাওয়া বানরদের শোচনীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাদের রপ্তানির বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। দিনকতক পরে ··সেগুলো ছিল পশুপ্রেমীদের পক্ষে শান্তিময় দিন···যে সকল বৈজ্ঞানিক কর্ম্মী পোলিও এবং ক্যান্সার-সম্পর্কিত গবেষণা অব্যাহতভাবে চালাতে ইচ্ছুক ছিলেন তাঁদের প্রতিনিধিত্বের দরুন এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। যাই হোক, এই সকল ইতরপ্রাণীর এটুকু সুবিধা হয়েছে যে, এখন অন্ততঃ তাদের ভ্রমণের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দিতে হয় এবং বিমান-পথে কোন ইতরপ্রাণীকেই পাঠানো যায় না।

যে বিলটি পাস হওয়া প্রয়োজন

ইতরপ্রাণীদের সম্পর্কে এই বিলটি পাস হতে এখনো বাকি আছে। "আমার ইচ্ছা যে, পশুক্লেশ-নিবারণ সম্পর্কিত আমার এই বিলটি (Bill for the Prevention of Cruelty to Animals) পাস করানোই হবে ভারতের বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা। এটা আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনও হবে। কসাইখানার জীবন্ত নরকগুলির সকল জঞ্জাল আমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। একান্তই যদি পশুবধ করতে হয় ত পশুহত্যার সহৃদয়তাপূর্ণ পদ্ধতির উপর জোর দিতে হবে—খাটিয়ে ইতরপ্রাণীদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করতে হবে। সার্কাসগুলি পরিদর্শন, শিকার-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ শবব্যবচ্ছেদ বন্ধ করা ইত্যাদিও হবে ইতরপ্রাণীদের প্রতি আমাদের কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। বনের পাখীদের খাঁচায় বন্দী করে রাখা যেমন সমীচীন হবে না, তেমনি সঙ্গত হবে না উৎসবানুষ্ঠানে পশুবলি অথবা ধর্ম্মের নামে তাদের বিকলাঙ্গ করা। এমনি কত উপায়েই না আমরা পশুদের অপকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎসম্বন্ধে সচেতন নই আমরা। ইতরপ্রাণীদের যে সকল ক্ষতি আমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তদ্বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে এবং চিরকালের মত তার অবসান করতে হবে।

ইতরপ্রাণীদের কল্যাণ-প্রসঙ্গে আবার ফিরে এলাম আমরা। এই সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করবার জন্য একটি স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই সংস্থা অনায়াসেই কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের অধীনে আসতে পারে। নারী অথবা পুরুষ, বিকলাঙ্গ অথবা অন্ধ, সকল শ্রেণীর অসহায় মানুষ যে করুণা এবং সেবাযত্ন পায়, সেই সেবাযত্নকে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে অনুভূতিশীল যাবতীয় দুর্গত প্রাণীর পরিচর্য্যার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। গোশালা-বাড়ীর পশুদের উন্নয়নের ভার আমরা ছেড়ে দিতে পারি কৃষি-মন্ত্রণালয়ের উপর। কিন্তু এটা কি আমরা আশা করতে পারি যে, তাঁরা সেই সকল লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবেন যারা সার্কাস-প্রদর্শনীতে পয়সা কামাবার জন্য ইতরপ্রাণীদের নিপীড়িত করে নির্ম্মমভাবে। অথবা সেই সকল চাষী অথবা টাঙ্গাওয়ালা—যারা অংশতঃ, জীবিকার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না বলেই রুগ্ন পশুদের অতিরিক্ত খাটিয়ে নেয়, তাদের সম্বন্ধেই বা তাঁরা কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন?"

শিশুদের প্রসঙ্গে

সাময়িক ভাবে ইতরপ্রাণীদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে তিনি সুরু করলেন শিশুদের প্রসঙ্গ—"গোটা শিশুটির স্বরূপ দেখা যেতে পারে তার শৈশব-ক্রীড়ার মধ্যে। পিতামাতার উপলব্ধির বহু আগেই আমি বলে দিতে পারি, তাঁদের শিশুর

কি বিশেষ প্রকৃতিদত্ত শক্তি (gift) আছে, ভবিষ্যতে সে কি হবে—ইঞ্জিনীয়ার, লেখক অথবা একজন বিদ্বান। শিশুদের এত ভালবাসি বলে বুঝি এটা উপলব্ধি করবার একটা বিশেষ শক্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন।"

যে রুক্মিণী দেবীকে আমরা সকলে জানি আবার তিনি ফিরে এলেন সেই নৃত্যশিল্পী রুক্মিণী দেবীর প্রসঙ্গে। ডক্টর এনি বেসান্টের স্মৃতির উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত আড়িয়ার কলাক্ষেত্রের প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, শ্রীমতী বেসান্ট তরুণী বধূরূপে তাঁকে স্বাগত করেছিলেন মহান্ দক্ষিণী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। প্যাভলোভা প্রথম কি ভাবে আবিষ্কার করলেন তাঁর ভিতরকার নৃত্যশিল্পী'কে, মীনাক্ষী সুন্দরম্ পিল্লাই কি প্রণালীতে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁকে—এ সকল কথাও তিনি বর্ণনা করলেন বিশদভাবে।...এ হ'ল ভরতনাট্যমের এবং পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের কুরুচিপূর্ণ শোষণের হাত থেকে এই নৃত্যকলার মুক্তির এক মহাকাব্যিক কাহিনী।

পরিশেষে এই সত্য আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম, যে, শিশু রুক্মিণীর সত্তায় একদা যা ছিল সুপ্ত, তাই রূপ পরিগ্রহ করেছিল আমার সম্মুখে উপবিষ্টা এই পরিণতবয়স্কা মহিলার মধ্যে। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত বালিকাটির পরিণতি হ'ল নৃত্যশিল্পীতে। যে বালিকাটি শিশুদের ভালবাসত, সে বড় হয়ে হ'ল শত শত শিশুর একটি স্কুলের ডিরেক্টর। পোষা পশুপক্ষীর জন্য যাতনা অনুভব করত যে শিশুটি সে হ'ল পার্লামেন্টের সদস্যা—তাদের দুর্গতিমোচন করা হ'ল তাঁর পরিণত বয়সের অন্যতম 'মিশন' বা ব্রত।

শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের ভাষণ

বৎসরখানেক হইল রাজ্য কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের এমনই এক কনফারেন্সে আমরা মিলিত হইয়াছিলাম, এবং সম্মেলনের এই অধিবেশনে আপনাদিগকে স্বাগত করিতে পারিয়া আমি আনন্দানুভব করিতেছি।

আমি ইহাকে এমন একটি উপলক্ষ বলিয়া মনে করি যেখানে আমি গত বৎসর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কাজের প্রগতির পর্য্যালোচনা করিতে এবং আগামী কয় বৎসরের মধ্যে পর্ষদ কোন্ কোন্ দিকে তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্প্রসারণের উদ্যোগ করিতেছে তাহার নির্দ্দেশ দিতে পারি। গত বৎসর স্বেচ্ছামূলক কল্যাণসংস্থাসমূহকে অর্থসাহায্য-দান প্রোগ্রামের সবিশেষ উন্নতি এবং কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনাগুলির ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কল্যাণব্রতী কর্ম্মচারীদের (welfare personnel) শিক্ষণ সুরু হইয়া গিয়াছে, নগরাঞ্চলে পরিবার-উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্প্রসারণও আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে যেমন ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও রাজ্য সরকারসমূহের সঙ্গে, অন্যদিকে তেমনি স্বেচ্ছামূলক সংস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্কও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৫৩ সনের আগষ্ট মাসে পর্ষদ প্রতিষ্ঠাকালে ভারত সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবে বিবৃত ইহার মুখ্য কৃত্যসমূহের উল্লেখ, পর্ষদের কার্য্যের পর্য্যালোচনার সহায়ক হইবে। এই সমস্ত কৃত্য হইতেছে:

সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের প্রয়োজন এবং চাহিদাগুলি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান।

সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্সিগুলির প্রোগ্রাম এবং পরিকল্পনাসমূহের মূল্যনির্দ্ধারণ।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাজকল্যাণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার জন্য প্রদত্ত সাহায্যের একীকরণ।

সেই সকল স্থানে সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা যেখানে ঐ ধরনের সংস্থার অস্তিত্ব নাই। এবং প্রয়োজনীয় স্থলে, পর্ষদের নির্দ্ধারিত সর্ত্তে যোগ্য সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

কল্যাণ-সংস্থাসমূহকে সাহায্যদান

পর্ষদের করণীয় কার্য্যসমূহের মধ্যে সর্ব্বশেষোক্ত কৃত্যটি হইতেছে সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম। কাজেই ঐ দিকে কি কি কাজ সম্পন্ন হইয়াছে তাহার একটি ফিরিস্তি দিয়াই আমি আমার বক্তব্য সুরু করিব। ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, ভারতবর্ষ শাসনতন্ত্রের অধীনে কল্যাণরাষ্ট্র না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজকল্যাণক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নিকট হইতে সামান্যমাত্রই স্বীকৃতিলাভ করিতে পারিয়াছিল। দেশে এ ধরনের কয়েক হাজার

প্রতিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পুরানো (এত পুরানো যে তাদের বয়স প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী), কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কতকগুলি আনকোরা ও সবেমাত্র স্বকীয় ভিত্তি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিজ নিজ নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রে সততার সঙ্গে অনাড়ম্বর সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছিল, নিজেদের আর্থিক সংস্থানের উপরই তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হইত, যদিও তাহা সকল সময় চাহিদার অনুযায়ী বা যথেষ্ট ছিল না। তাহারা এমন একটি দায়িত্ব প্রতিপালন করিতেছিল যাহা সম্পন্ন করিবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা তখন আর ছিল না।

সুতরাং পর্ষদ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহার প্রথম কাজ হইল স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে তাহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে সমর্থ হয় সেজন্য একটি সহায়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যেখানে সম্ভবপর সেখানে তাহার সম্প্রসারণ। এতদুদ্দেশ্যে পর্ষদ প্রথমে উপদেষ্টা প্যানেলের মাধ্যমে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ এবং দৈহিক অপটু ও অপরাধপ্রবণদের কল্যাণ-ক্ষেত্রে কর্ম্মরত কয়েক শত স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিল—উপদেষ্টা প্যানেল বিশেষ-ভাবে এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহা সারা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া রিপোর্ট প্রদান করে। এই সকল রিপোর্ট অনুসরণান্তে পর্ষদ কর্ত্তৃক এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের প্রোগ্রাম তৈয়ারি করা হয়।

সাহায্যদানের সর্ত্ত

আর্থিক সাহায্য অনুমোদনকল্পে অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত্তের উপর পর্ষদ সঙ্গতভাবে ক্রমাগত জোর দিতেছে তাহা হইতেছে এই যে, সংস্থাগুলিকে তাহাদের কাজ চালাইবার জন্য যেখানে যথারীতি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নিযুক্ত হয় নাই সেখানে শিক্ষিত কর্মচারীদের নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য প্রদানের পূর্ব্বে সাধারণতঃ এই একটি সর্ত করা হয় যে, সেগুলিকে রেজিষ্ট্রী-কৃত হইতে হইবে। এই বিষয়ে অন্যান্য সর্ত্তাবলী হইতেছে—যথারীতি সংগঠিত একটি ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা সেগুলির কার্য্য পরিচালিত হইবে এবং পর্ষদের সাহায্য সম্পর্কিত হিসাব তাহাদিগকে নিয়মিতভাবে রাখিতে হইবে। রাজ্য কল্যাণ পর্ষদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের পরে ইহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, সাহায্যের জন্য আবেদনকারী প্রত্যেক সংস্থাকে তাহাদের আবেদনপত্র পাঠাইতে হইবে রাজ্য পর্ষদের মাধ্যমে এবং রাজ্য পর্ষদ কর্ত্তৃক ইহা অনুমোদনের পূর্ব্বে তাঁহাদের কোন একজন সদস্য উক্ত সংস্থা পরিদর্শন করিয়া উহা যাবতীয় নির্দ্ধারিত সর্ত্ত প্রতিপালন করিতেছে কি না সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইবেন। ১৯৫৫ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত প্রদত্ত সাহায্যের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৪৩৬, সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের মোট সংখ্যা ১৮৫৬ এবং সহায়ক-দান (Grants-in-aid) হিসাবে বণ্টিত মোট অর্থের পরিমাণ ৬৮·৬৬ লক্ষ টাকা।

সংস্থাসমূহ পরিদর্শন

ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য-দানের পর সেই অর্থ কি প্রণালীতে ব্যয়িত হইতেছে তাহা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় পর্ষদ কর্ত্তৃক এবং রাজ্যসমূহেও এই উদ্দেশ্যে হিসাবপত্র পরীক্ষার কাজে (audit and accounts) প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি পরিদর্শকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। ইন্‌সপেক্টরগণ নিয়মিত-ভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করিয়া সেগুলির কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করেন এবং যেখানেই প্রয়োজন হয় সেখানেই হিসাবপত্র রাখা বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন।

নূতন সেবামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টা

সেবামূলক কার্য্যের বিশেষ বিশেষ গণ্ডীতে কর্ম্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ নূতন এমন কয়েকটি সেবামূলক কর্ম্মকে আমাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার দরুন যাহার প্রয়োজনীতা জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। এগুলির মধ্যে আছে—শ্রমোপজীবিনী মায়েদের শিশুদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ, সংশোধনা-গার হইতে মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রতি আরোগ্যোত্তর কৃত্য সম্পাদন, আরোগ্যোত্তর তত্ত্বাবধানের (after-care services) হোষ্টেলের আকারে আরোগ্যমূলক অথবা সংস্কারমূলক সংস্থা গঠন, আরোগ্যোত্তর কারখানা এবং পুনর্বসতি গৃহের ব্যবস্থা, যে সকল শিক্ষানবীশের গৃহ নাই অথবা যাহাদের গৃহ অপ্রচুর তাহাদের জন্য হোষ্টেলের ব্যবস্থা, যে সকল শিশুর বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন তাহাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, অভাবগ্রস্ত শিশুদের জন্য সংস্থা এবং বৃদ্ধ ও অশক্তদের জন্য হোম বা সদন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

উপদেষ্টা পর্ষদের কাজ

পর্ষদ কর্তৃক উপরোক্ত সমস্যাসমূহের কতকগুলির মূল্য-নির্দ্ধারণকল্পে নিযুক্ত দুইটি উপদেষ্টা সমিতি—একটির উদ্দেশ্য আরোগ্যোত্তর সেবাকার্য্য, অপরটির নৈতিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যার সমাধান—সম্প্রতি যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন তাহা এখন আছে পর্ষদের সক্রিয় বিবেচনাধীনে। অদূর ভবিষ্যতে এই কমিটিদ্বয়ের অনুমোদনসমূহ আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত যাবতীয় বিষয়সহ বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে এবং পর্ষদের আর্থিক ও অন্যবিধ সংস্থানের সাহায্যে তন্মধ্যে যতগুলির রূপায়ণ সম্ভবপর তদুদ্দেশ্যে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

সংহতিবিধানের প্রোগ্রাম

দুই বৎসরের শেষে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছে সেই নিরিখে পর্ষদ স্থির করিয়াছেন যে, স্বেচ্ছামূলক কল্যাণকর্ম্মকে সাহায্যদানের ক্ষেত্র এ পর্য্যন্ত যতদূর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানকার্য্য পরিচালিত হইবে। বস্তুতঃ সমস্যা হইল—কোন বিশেষ এলাকায় অপরিহার্য্য কল্যাণকর্ম্মে রত স্বেচ্ছামূলক সংস্থাগুলি স্ব-স্ব কার্য্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে, কি ভাবে প্রকৃষ্টতম উপায়ে অন্যান্য যে সকল অঞ্চলে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাব আছে সেগুলিতে অনুরূপ কর্ম্মপ্রচেষ্টার সম্প্রসারণ দ্বারা নিজেদের কাজের সংহতি-বিধানে সমর্থ হইতে পারে। আরও একটি সমস্যা হইতেছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া এমন একটি মূল ভিত্তি স্থির করা যাহার উপর কতিপয় সংস্থাকে পৌনঃপুনিক ক্রম-অনুসারে কয়েক বৎসরের জন্য সাহায্যদান করা যাইতে পারে—উক্ত সাহায্যদানের উদ্দেশ্য হইবে ঐ সকল সংস্থার দৃঢ়তা-সম্পাদন এবং স্থায়িত্ব-বিধান। কাজেই ইহা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পর্ষদের সক্রিয় বিবেচনাধীনে আছে।

নূতন সেবা-সংস্থা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও সাহায্যদান

পর্ষদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃত্য হইতেছে, যে সকল স্থানে এখনও পর্য্যন্ত কোন সেবা-সংস্থা বিদ্যমান নাই সেগুলিতে নূতন সেবা-সংস্থা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও সাহায্যদান। যে সকল গ্রামীণ অঞ্চল নারী শিশু দৈহিক অপটু এবং অপরাধ-প্রবণদের কল্যাণার্থে মূলগত সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছে (অথচ যাহার প্রতি অন্যান্য পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই) সেইগুলির জন্য পর্ষদ একটি কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বেসরকারী প্রচেষ্টা

সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত যে সকল কর্ম্মতালিকার সামগ্রিক রূপায়ণে হাত দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসমূহ অন্যান্য পরিকল্পনা হইতে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক ধরনের। বিভিন্ন স্তরে প্রোজেক্টগুলির পরিকল্পনা এবং সেগুলিতে কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী এবং স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টাসমূহের। প্রোজেক্টগুলি সরাসরি ভাবে যাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে সেই সকল রাজ্য কল্যাণ পর্ষদের উপর কেন্দ্রীয় পর্ষদ এই নির্দেশ জারী করিয়াছেন যে, ঐ প্রোজেক্টসমূহের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিবার কালে এমন সব উপযুক্ত এলাকা নির্ব্বাচনের জন্য যত্নবান হইতে হইবে যাহা ইতিমধ্যে অন্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। প্রোজেক্ট-কেন্দ্রসমূহে ক্ষেত্র-কর্ম্ম-তালিকাগুলির (field programmes) রূপায়ণের ভার মুখ্যতঃ সেই সকল প্রোজেক্ট কমিটির হাতে যেগুলি প্রধানতঃ স্থানীয় বেসরকারী নারী-কল্যাণ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি।

বিভিন্ন কল্যাণ-সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের প্রায় ২০০ নারী-সমাজকর্ম্মী আছেন। তাঁহারা ২৮টি রাজ্য পর্ষদের সদস্যা এবং কল্যাণ-কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তাঁহারা তাঁহাদের সময়, মনোযোগ এবং শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন। অনুরূপ ভাবে ক্ষেত্র-কর্ম্মের (field-work) জন্য সংগঠিত প্রোজেক্ট কমিটিসমূহে আমাদের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত নারীকর্ম্মীর সংখ্যা ২,৫০০। পর্ষদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় যথারীতি নিয়োজিত এই ২,৭০০ স্বতঃপ্রণোদিত নারীকর্ম্মী ছাড়া আমাদের মোট আরও ২,৫০০ নারীকর্ম্মী আছেন যাঁহারা প্রোজেক্টসমূহে গ্রাম্যসেবিকা, ধাত্রী (Midwives), দাই এবং কারুশিল্পের কার্য্যে সহকারিণীরূপে নিযুক্তা আছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রোজেক্টসমূহের চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে পর্ষদ মোট ২৫,০০০ স্ত্রীলোককে ধাত্রী, দাই, গ্রামসেবিকা রূপে ঐ সকল প্রোজেক্টে শিক্ষাদানের এক প্রোগ্রামের প্রবর্ত্তন ইতিমধ্যেই করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আমরা ১,২০০টি কেন্দ্র খুলিয়াছি। ৫০ লক্ষ লোক-অধ্যুষিত ছয় হাজার গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত।

নারীদের মধ্যে বয়স্ক-শিক্ষা প্রসার

নারীকল্যাণ কর্ম্মতালিকায় বয়স্কা নারীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার এবং তাহাদিগকে কোন কারু-শিল্প শিক্ষাদানকে—

যাহা তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে—উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের জন্য দুগ্ধ বিতরণ স্কীম এবং "বালওয়াদি"সমূহ শিশুকল্যাণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ

পর্ষদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৃত্য হইতেছে—কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়সমূহ এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকার কর্তৃক সাহায্যীকৃত সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টায় নিরত প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন। আমি সানন্দে বলিতেছি যে, পর্ষদ কর্তৃক কাজের এই দিকটা উৎসাহ এবং সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, অর্থ ভারত সরকারের এই চারিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় এবং কতকগুলি নিখিল-ভারত কল্যাণ-সংস্থার সঙ্গে পর্ষদের যোগাযোগ দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যাবতীয় প্রোগ্রাম এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উপরোক্ত অন্য তিনটি মন্ত্রণালয়ও পর্ষদের সহিত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিতেছেন। প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গেও কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ একেবারে সূচনা হইতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 'গ্রামসেবিকা'দের শিক্ষণ-কোর্সে'র পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে প্ল্যানিং কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে। নাগরিক পরিবার কল্যাণ-পরিকল্পনার (Urban Family Welfare Scheme) রূপায়ণে শিল্প এবং বাণিজ্য (Industry and Commerce) মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও পর্ষদ নিজেদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সমন্বয়সাধন করিয়া আসিতেছেন।

নিখিল-ভারতীয় সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ

পর্ষদ যে সকল নিখিল ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তন্মধ্যে কস্তুরবা গান্ধী ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, দি এসোসিয়েশন ফর মর‍্যাল এণ্ড সোশ্যাল হাইজীন ইন ইণ্ডিয়া, ভারতীয় শিশুকল্যাণ পরিষদ (The Indian Council of Child Welfare), রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবক সমাজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংগঠনের দিক দিয়া এই সমস্ত পর্ষদ প্রধানতঃ বেসরকারী এবং আটাশটি রাজ্য পর্ষদেরই চেয়ারম্যান ঐ সমস্ত রাজ্যের প্রখ্যাত নারী-সমাজ-কর্ম্মী। রাজ্য পর্ষদসমূহও স্ব স্ব রাজ্য সরকারের ও তাহার প্রশাসন-বিভাগের সহিত হৃদ্য এবং সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণ পর্ষদ

গত কয়েক মাস যাবৎ কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও ইহার ভাবী কর্ম্মতালিকা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। উক্ত কর্ম্মতালিকাসমূহ এই প্রতিশ্রুতির উপর পরিকল্পিত হইতেছে যে, পরবর্ত্তী পরিকল্পনা-কালের মধ্যে সমাজকল্যাণ স্কীমের জন্য পনের কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। ১৯৫৫ সনের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্ল্যানিং কমিশনের এক সভায় পর্ষদের এই সকল প্রোগ্রামের খসড়া সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাতে উক্ত পনের কোটি টাকার মধ্যে ৯·৩ কোটি টাকা কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কার্য্যকরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় পর্ষদের দান বলিয়া ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পরিকল্পনা-কালের মধ্যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত ৩৫২টি প্রোজেক্টের অতিরিক্ত আরও ৯৯০টি প্রোজেক্ট প্রবর্ত্তনের এবং ৫,০০০ স্বেচ্ছামূলক সংস্থাকে অর্থসাহায্যদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে চার কোটি টাকা "বিশেষ প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে বলিয়া চিহ্নিত করিয়া" রাখা হইয়াছে। ৮,০০০ গ্রামসেবিকা, ১,৬০০ ধাত্রী এবং ৬,০০০ দাইয়ের শিক্ষণ-পরিকল্পনায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের চরম লক্ষ্য

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ভারতে সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টাসমূহের চরম লক্ষ্য কি? কি সেই আদর্শ যাহাকে সামগ্রিকভাবে রূপায়িত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ কাজ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত নারী শিশু প্রভৃতির কল্যাণ-প্রচেষ্টার কর্ম্মতালিকা দ্বারা মাত্র ৬,০০০ গ্রাম উপকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কল্যাণ-সম্প্রসারণ প্রোজেক্টের তিন গুণ সংখ্যাবৃদ্ধির যে পরিকল্পনা আমাদের আছে যদি তাহা কার্য্যকরী হয় তবে আরও চল্লিশ হাজার গ্রামে সেবামূলক কার্য্যের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের তুলনায় এই সংখ্যা কিছুই নহে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের প্রতিটি গ্রামে যে পর্য্যন্ত না এই ধরনের ন্যূনতম সেবামূলক কর্ম্মের সূচনা হয় ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত 'কল্যাণ রাষ্ট্রে'র আদর্শ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে না।

এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে ন্যূনতম সংখ্যায় যত জন পল্লী-কর্ম্মী, ধাত্রী, দাই এবং কারুশিল্প-শিক্ষকের প্রয়োজন তাহাও কত দিনে পাওয়া যাইবে, এই প্রোগ্রামের সামগ্রিক রূপায়ণে কতদিন লাগিবে এখন তৎসম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কিন্তু একথা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, পর্ষদের যাবতীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপায়ণ বহুলাংশে নির্ভর করে সমাজকল্যাণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার জন্য আর্থিক সাহায্য, দ্রুত কল্যাণ-কর্ম্মীদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা এবং কল্যাণ-প্রচেষ্টায় জনগণের সাড়া দেওয়ার উপরে। জনসাধারণ যদি কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে যত সত্বর সম্ভব আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে সমর্থ হইব।

অস্পৃশ্যতা সমস্যা

শ্রীএল. এন. গোপালস্বামী

সম্পাদক—হরিজন সেবক-সঙ্ঘ, মাদ্রাজ

হরিজন-উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমতঃ শিক্ষা এবং দ্বিতীয়তঃ জীবনযাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক দ্রব্যাদির নিমিত্ত সাহায্যদানের রূপ পরিগ্রহ করে। এই তথাকথিত শিক্ষা বাস্তবিকই হরিজনদের সহায়ক হইবে কিনা সেই প্রশ্নের মধ্যে না গেলেও, এমনকি ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হইবে একথা ধরিয়া লইলেও কেবলমাত্র শিক্ষা স্বয়ং অস্পৃশ্যতা-সমস্যা সমাধানে সমর্থ কিনা, আমাদের নিজদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অবান্তর বলিয়া মনে হয়। এই কল্যাণকার্য্যে যাঁহারা উৎসাহী কর্ম্মী, যাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য এই ক্ষয়কারী রোগের বিদূরণ, তাঁহাদের নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে, শুধু শিক্ষা দ্বারা সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যদিও শিক্ষা হরিজনদিগকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থানলাভের ব্যাপারে কতকটা সাহায্য করিতে পারে, তথাপি অস্পৃশ্যতার প্রকৃত দূরীকরণ ইহা দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না।

আট বৎসর হইল আমরা স্বাধীনতালাভ করিয়াছি। যে সকল কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার অপলাপ না করিয়া স্বাধীনতার পূর্ব্বে ও পরে অনুষ্ঠিত হরিজন উন্নয়ন-কার্য্যের হিসাব-নিকাশ যদি আমরা করি তাহা হইলে আমাদিগকে অকপট ভাবে একথা স্বীকার করিতে হইবে, যে-মাত্রায় এখন কাজ চলিতেছে তাহাতে অনেককিছু করিবার রহিয়া গিয়াছে। এই সামাজিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধ অপসারিত করণোদ্দেশ্যে রাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি আইন পাস করিয়াছেন, সমাজ-সংস্থাসমূহও এ ব্যাপারে তাহাদের যথাসাধ্য করিয়াছে। এই সকল প্রচেষ্টার মূল্যনির্দ্ধারণ যদি যথোচিতভাবে করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে সুফললাভ করা গিয়াছে তাহা এই উদ্দেশ্যে কষ্ট স্বীকার এবং অর্থব্যয়ের সমানানুপাতিক নহে।

স্বাধীনতার পূর্ব্বে গান্ধীর প্রাণবন্ত নেতৃত্বাধীনে হিন্দুর সামাজিক কাঠামো হইতে অস্পৃশ্যতা বিদূরণ ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ। এই মানবতার আহ্বানের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃ লোকেরা কাজের দিক দিয়া একে অপরকে ছাড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এখন কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রথাগত—অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হয় সরকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এবং সেগুলির পিছনে থাকে কোন-না-কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। অর্থাভাবে বেসরকারী কর্ম্মীর কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। যে উৎসাহ ঐরূপ বিপুল-পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এখন তাহার যথোচিত ব্যবহার হইতেছে না। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, আজ যখন তথা-কথিত অস্পৃশ্যদের উপর বিপুল কৃপা বর্ষিত হইতেছে তখন তাহাদের অশক্তি (disability) দূরীকরণের প্রশ্নটাকে কিন্তু রাখা হইতেছে আড়ালে। বর্ত্তমান মনোভাব অধিক হইতে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি করিবে এবং হয়ত ইহা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ব্যাপারে পর্য্যন্ত প্রতিবন্ধস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

এই কাজ স্বভাবতঃই অত্যন্ত দুরূহ এবং যে মুহূর্ত্তে

রাজনীতির মত বাদাই ইহাতে আসিয়া জোটে, লক্ষ্য তখন চলিয়া যায় দৃষ্টির বাহিরে। 'অস্পৃশ্যতা' নির্মূল করিবার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহের পরস্পরের সহযোগিতা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন কেবল এইটুকু যে, ইহা সমাজকর্ম্মীকে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিবে। আর্থিক দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত সরকারের গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পরিকল্পনা এবং কর্ম্মপদ্ধতির ভার পুরাপুরি দিতে হইবে সমাজ-সংস্থাগুলিকে, কেননা লোকেদের হৃদয়-পরিবর্ত্তনের এই কাজ সরকারী পরিকল্পনাসমূহ দ্বারা সহজে সাধিত হয় না। অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ কর্ম্মীদের এখনও পাওয়া যায় এবং তাহাদের সেবার প্রবৃত্তিকে কাজে লাগানো যাইতে পারে। নিখিল-ভারত খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পপর্ষদের (The All-India Khadi and Village Industries Board) ধরনে এক অস্পৃশ্যতা বিদূরণ পর্ষদ স্থাপিত হইতে পারে। পরিকল্পনা কার্য্যকরীকরণ ও বিভিন্ন স্কীমকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবার ভার ন্যস্ত হইবে এই পর্ষদের উপর।

স্বাধীনতার পর হইতে হরিজনদের যে সকল উপকারসাধন করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দু'একটি মন্তব্য করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ধরনের প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র হরিজনদের শিক্ষার জন্য সাধারণ রাজস্ববিভাগ হইতে এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় তাহা সমীচীন কিনা এবং এই ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি—যাহা সার্ব্বিকভাবে নিন্দিত হইয়াছে—তাহা আদৌ হরিজনদের দেওয়া হইবে কি না? ইহার সরাসরি উত্তর হইবে—শিক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কারণে তাহাদের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ই ব্যয়িত হোক না কেন তাহা তথাকথিত উচ্চবর্ণসমূহ কর্ত্তৃক তাহাদের উপর যে অবিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার যথোচিত ক্ষতিপূরণে সক্ষম হইবে না।

শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও এই কথা বলা যায় যে, যে পর্য্যন্ত না সাধারণ লোকের জন্য (হরিজনরাও যাহার অন্তর্ভুক্ত) এমন একটি শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হয় যাহা তাহাকে আশু উত্তম এবং সৎ নাগরিকে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত 'প্রচলিত পদ্ধতি খারাপ এবং হরিজনদিগকে এই শিক্ষাদান করা অনুচিত' কেবলমাত্র এই ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার করা নিরর্থক। এই বিষয়ে আলোচনাকারীরা এমন সব লোক যাহারা এই শিক্ষাই পাইয়াছে এবং এবংবিধ শিক্ষালাভ করা সমীচীন কিনা তৎসম্বন্ধে ঐ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা কিছু বলিবার অধিকারী নহে। কিন্তু তাহার মানে এই নয় যে, হরিজনদের শিক্ষার নিমিত্ত অর্থের অপব্যয় করা হইবে। যে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে সাধারণ রাজস্বের অর্থ হরিজনদের জন্য অজস্রভাবে ব্যয়িত হইতেছে তাহা রোধ করিবার জন্য এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা সম্পূর্ণ আবশ্যক। এই সমস্ত যাবতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে যে ফললাভ হইয়াছে তাহা ব্যয়িত বিপুল অর্থের সমানানুপাতিক নহে। হরিজন উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য আমাদের ব্যগ্রতাবশতঃ—পড়াশুনা চালাইতে ইচ্ছুক সকল ছাত্রের জন্যই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, যথা—বোর্ডিং, বাসস্থান, বৃত্তি, পকেট-খরচ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা হইয়া থাকে। অনেকে কিন্তু ঐ সকল বিষয় অধ্যয়নের মোটেই উপযুক্ত নহে। ইহার অভিনবত্ব এবং অনায়াস-লভ্যতার জন্য গোড়ার দিকে এরূপ হওয়া অনিবার্য্য, কিন্তু কালানুক্রমে এই বিষয় সম্পর্কে সযত্নে অনুসন্ধান করিয়া যাহারা ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে এবং সাফল্যের সহিত এই কোর্স শেষ করিতে সক্ষম কেবলমাত্র তাহাদিগকেই সাহায্য করা সমীচীন হইবে। মোটের উপর বর্ত্তমানে যে ধরনের শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহা তাহাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবার একটি উপায়মাত্র। কোন যোগ্য হরিজন ছেলে অথবা মেয়ে যাহাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, নির্ব্বিচারে অর্থের অপচয় কোন দিক দিয়াই তাহাদের বা সরকারের উপকারসাধন করিতে সক্ষম হইবে না। উচ্চ শিক্ষালাভের প্রতি যে সকল বালকের মানসিক প্রবণতা নাই তাহারা যাহাতে পরবর্ত্তী জীবনে প্রকৃতপক্ষেই উপকৃত হইতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। এই মন্তব্য কেবলমাত্র হরিজনদের প্রতিই নহে, সরকারী ব্যয়ে যাহাকে শিক্ষাদান করিতে হইবে তেমন প্রত্যেক ছেলে অথবা মেয়ের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। প্রথম উৎসাহের বাড়াবাড়ি যখন উবিয়া যাইবে, আমরা আশা করি তখন স্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেমঙ্করী রায়

সারাজীবন যাঁদের স্নেহভালবাসা উপভোগ করে ধন্য হয়েছি, আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁদের সেই ভালবাসার স্মৃতিকে জীবনের পাথেয় বলে মনে করছি। তাঁদের কেউ কেউ আজ এ জগতে নাই, কিন্তু তাঁদের স্নেহের ঋণ কতকটা পরিশোধ করবার জন্য আজ আমার এই প্রয়াস। বিশ্বাস করি বিদেহী হলেও আজ আমার এই শ্রদ্ধার দান তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করবেন। জ্যেষ্ঠা-ভগিনীতুল্যা স্নেহময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।

বেথুন কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন স্বর্গত হেমচন্দ্র দে; তিনি আমার দাদার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁরই আগ্রহ ও চেষ্টায় ১৯০৫ সনে নয় বৎসর বয়সে ভাদ্র মাসে লক্ষ্মীপূজার দিন (তারিখটা সঠিক মনে নাই) মা বেথুন বোর্ডিংএ দিয়ে এলেন। সকলের ছোট আমি, অজানা জায়গায় মাকে ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হবে, মা তাই সকল শিক্ষয়িত্রীকে ডেকে বলে এলেন, "এটি আপনাদের একটি ছোট বোন, এর দোষত্রুটি সব ক্ষমা করে নেবেন, আপনাদের হাতে এর শিক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।"

তখন সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের বেথুনে পড়া দুঃসাধ্য ছিল। চলা-ফেরায় হাবভাবে সবেতেই ইংরেজী কায়দাদুরস্ত হতে হ'ত। টেবিলে কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে হ'ত। পেট ভরতো না। হল-ঘরে বেথুন সাহেবের পাথরের মূর্ত্তির পাশে বসে রোজ কেঁদেছি সন্ধ্যার অন্ধকারে। তবুও কি করে অন্য মেয়েরা দেখে ফেলে এবং সুপারিটেণ্ডেণ্ট হেমপ্রভা বসুর (সর জগদীশচন্দ্র বসুর সহোদরা ভগ্নী) কাছে গিয়ে বলে, "নতুন মেয়েটি রোজ সন্ধ্যায় খুব কাঁদে"।

হেমপ্রভাদি একদিন কাছে ডেকে সস্নেহে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; উত্তর পেলেন না কিছুতেই। তিনি পিঠ চাপড়ে আদর করবার পর বলে ফেলি—"কাঁটা চামচে খেয়ে আমার পেট ভরে না।" হুকুম হয়ে গেল হাতে খাবার। টেবিলে সকলের শনি-রবিবার কাঁটা চামচ ছাড়া খাবার অনুমতি করিয়েও নিলাম।

ক্রমশঃ সকল শিক্ষয়িত্রীর প্রিয় হয়ে উঠলাম। তখন সপ্তম শ্রেণীতে (7th Class) পড়ি। আমাদের ক্লাসের সামনে দিয়ে কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রী যাওয়া-আসা করতেন—দু'জন ইহুদী (হেনা ও মোজেল), বর্ত্তমান রাজ্যপালের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বঙ্গবালা দেবী, স্বর্গতা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, হিরণ্ময়ী সেন, কমলা সেন, বিভাবতী বসু প্রভৃতি আরও অনেকে। এঁদের সকলকেই খুব ভাল লাগত। এঁরা ছিলেন আমার আদর্শ। কলেজে পড়বার উদ্দীপনা এঁরাই জাগাতেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু দূরে দূরেই থাকতাম কতকটা ভয়ে ও কতকটা সঙ্কোচে? তাই আলাপের তখনও সুবিধা হয় নি।

যখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠি (4th Class) তখন তিনি বিএ পাস করে এলেন আমাদের ইংরেজী পড়াতে। বাড়ী থেকে রোজ আসেন যান। ১০-৪৫এ আমাদের ক্লাস বসত। ১০-৩০ থেকে আমরা কয়জন চাতালের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতাম তাঁর আসার প্রতীক্ষায়। একটা সাদা ঘোড়ার পাল্কী-গাড়ী এসে দাঁড়াত। একজন প্রবীণা মহিলা জ্যোতির্ম্ময়ীকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতেন। এই মহিলাটি এককালে যে অপূর্ব্বসুন্দরী ছিলেন তা চেহারা দেখে বেশ বুঝতে পারতাম। বেশ লম্বা চওড়া, আঁট-সাঁট গড়নটি, অথচ চেহারাটি খুব তেজোদীপ্ত। পরনে সাদা থান তাতে সাদা লেসের পাড় বসানো। তাঁকে দেখতে খুব ভাল লাগত। গাড়ীর কাছে ভিড় করলে আমাদের একটা স্নেহের ধমক দিতেন।

মহিলাটি কে জানবার খুবই কৌতূহল হ'ল এবং আবিষ্কার করলাম ইনিই সেই কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট ও একমাত্র মহিলা যিনি ছেলেদের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাস করে সর্ব্বপ্রথম মহিলা-চিকিৎসক হয়েছেন।

ক্রমশঃ জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। বেথুন কলেজের দর্শনের অধ্যাপক হেমচন্দ্র দে জ্যোতির্ম্ময়ীর শিক্ষাগুরু ছিলেন। গাঙ্গুলী-পরিবারে যাওয়া-আসা, বন্ধুত্বও ছিল। একদিন জ্যোতির্ম্ময়ী আমায় সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, "হেমবাবু তোমার দেখাশুনা করবার জন্য আমায় বলেছেন; তোমার কি দরকার নিঃসঙ্কোচে আমায় বলবে ত?" শুনে খুব আনন্দ হ'ল। ইংরেজী পড়া বেশ দেরিতেই আরম্ভ করেছিলাম, সেইজন্য ইংরেজীতে কাঁচা ছিলাম; তিনি আমায় ইংরেজী পড়াবার ভার নিলেন।

সেবার বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজীতে ভাল নম্বর পেয়েছি লোক-মুখে শুনলাম। কিন্তু বিশ্বাস হ'ল না। এই সময় তাঁকে একটু ভুল বুঝে তাঁর প্রতি অন্যায় করেছিলাম। মনে হয়েছিল তিনি উপহাস করে বলেছেন আমি নাকি ইংরেজীতে খুব ভাল নম্বর পেয়েছি। আপিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম ২০০র মধ্যে ১৬০ পেয়েছি। তখন তাঁর প্রতি যে অন্যায় করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইতে গেলাম। তিনি আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন, "এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি কত উন্নতি করেছ, বাস্তবিকই আমি খুব সুখী হয়েছি।" আমি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

এর পর থেকে তাঁর সঙ্গে বড় ও ছোট বোনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। আদর আবদার সবই চলত।

যখন তৃতীয় শ্রেণীতে (third class) পড়ি তখন তাঁর প্রচুর স্নেহ পেয়েছি, তিনি তখনও ইংরেজী পড়াতেন। স্নেহের দাবিতে তাঁর সঙ্গে অনেক দুষ্টামিও করেছি। কলিকের ব্যথায় তিনি খুব কষ্ট পেতেন, অনেকদিন দেখেছি ক্লাসেই ব্যথা উঠেছে, সর্ব্বাঙ্গ আমবাতে ভরে গিয়েছে, যন্ত্রণায় মুখখানি রক্তিমবর্ণ হয়ে উঠেছে তবুও ক্লাস নিচ্ছেন—নিতান্ত অসহ্য হলে উঠে যেতেন, কিন্তু কখনও মুখে যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক কোনও শব্দ উচ্চারণ করেন নি। এই কারণে ক্লাসে আসতে কখনও কখনও দেরি হলে আমরা টেবিলের এক কোণে 'late' লিখে রাখতাম, সেটা দেখে কখনও বিরক্ত হন নি, মৃদু হেসেছেন মাত্র। ১১ই মাঘ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা ক্লাসে সকলে মিলে একখানা "Imitation of Christ" তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম. কত খুশী হয়েছিলেন এই সামান্য উপহারে। সেই সময়ে গুরুশিষ্যে কি যে মধুর সম্বন্ধ ছিল এখন তা কল্পনা করতে পারি না। এই সময়ে অর্থাভাবে আমার পড়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়, আমি তাঁর কাছে কেঁদেছিলাম; তিনি বলেছিলেন, 'পড়া কেন তোমার বন্ধ হবে?' একটা বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন; নিজের উপার্জ্জিত টাকা থেকেও কিছু সাহায্য করতেন আমার এখনও সেই বিশ্বাস। কিন্তু কখনও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কোনও উত্তর পাই নি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতেও (সেকেণ্ড ক্লাসে) তিনি ইংরেজী পড়াতেন। ইংরেজীতে তাঁর খুব দখল ছিল। এই সময় আরও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সঙ্কোচ একেবারেই কেটে যায়। বিদ্যালয়ের সকলেই তাঁর ডাক-নাম চামেলী থেকে 'চামিদি' বলেই ডাকত। একদিন তাঁকে বলেছিলাম, নাম ধরে দিদি বলতে আমার ভাল লাগে না। ছোট-বেলায় আমরা মার কাছ থেকে বড়দিদিমণি, মেজদিদিমণি বলে ডাকতে শিখেছিলাম। তখন তিনি কথার কোনও উত্তর দিলেন না। পরে আমার জন্মদিনে চিঠি লিখেছিলেন আশীর্ব্বাদ জানিয়ে, "স্নেহের দিদিমণি।" এ চিঠি পেয়ে আমার আনন্দ আর ধরে না।

যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠলাম তখন তিনি কটকে র‍্যাভেনশ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা হয়ে চলে যান। তিনি প্রাইভেট ছাত্রী ছিলেন, ইতিহাসে এম-এ পাস করেছেন। পরে আমরা তাঁকে আবার পাই বেথুনের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ইতিহাসের অধ্যাপিকা রূপে। আবার পূর্ব্বের স্নেহ পেয়ে কৃতার্থ হলাম। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর টেষ্ট পরীক্ষা দেবার পর এত অসুস্থ হয়ে পড়ি যে, পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। স্বাস্থ্যলাভের জন্য ডাক্তারের আদেশে দেওঘর, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়। জ্যোতির্ম্ময়ী সিংহলে চলে যান। কিন্তু আমায় ভোলেন নি। আমায় সেখানে শিশু বিভাগে শিক্ষয়িত্রী করে নেবার জন্য বার বার আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু অতদূরে পাঠাবার ইচ্ছা আমার মায়ের ছিল না। সেখানে তিনি কলিকের যন্ত্রণায় ভীষণ ভুগতে থাকেন এবং চলে আসতে বাধ্য হন।

১৯২১ সনে স্বর্গতা লেডী অবলা বসুর আহ্বানে তিনি ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ের প্রিন্সিপ্যাল রূপে আসেন। ঐ সনে আমিও সিনিয়র ট্রেনিং পাস করি। শ্রদ্ধেয়া লেডী বসু মহোদয়া আমাকে ঐ স্কুলেই কিণ্ডারগার্টেন ডিপার্টমেন্টের ভার দিলেন। গুরুশিষ্যার মিলন হ'ল আবার একই কর্ম্মক্ষেত্রে।

জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যালয়ের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে লাগলেন। ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলল। বাল্যকাল থেকেই তিনি মনে প্রাণে দেশকে ভালবাসতেন। দেশপ্রেমের এই বীজ তিনি ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিদ্যালয়ে নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন।

চামিদি ও আমরা তিন জন শিক্ষয়িত্রী বোর্ডিঙে থাকতাম। আমাদের পৃথক ঘর থাকা সত্ত্বেও তাঁর ঘরে আমরা একসঙ্গে থেকেছি। একত্রে খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, হাসি, গল্প, গান, সেলাই, কবিতা আবৃত্তি ও ঠাট্টা-তামাশা সকলই চলত। দিনগুলি কি আনন্দেই না কেটেছে; এর স্মৃতি আজও হৃদয়কে দোলা দেয়।

জ্যোতির্ম্ময়ী ছিলেন নিরহঙ্কার, অধ্যক্ষা হয়েও তিনি আমাদের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে মিশতেন। আমাদেরও কোন সঙ্কোচ ছিল না তাঁর সহিত অবাধ মেলামেশায়।

ইংরেজী ১৯২৩ সনে আমার কঠিন অসুখ হয়। ছুটি নিতে বাধ্য হই। বাড়ীতে মায়ের কাছে চলে যাই (বাগবাজারে)। জ্যোতির্ম্ময়ী ছুটির পর প্রায়ই আমায় দেখতে যেতেন এবং যাতে পুরা মাহিনা পাই তার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আরোগ্য লাভ করে আবার কাজে যোগ দিলাম।

তখন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় শনিবার বন্ধ থাকত। আমরা শুক্রবার ক্লাস করে বোর্ডিঙে ডিউটি না থাকলে বাড়ী যেতাম, সোমবার সকালে ফিরতাম। ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, ১৯২৩ চামিদি বাড়ী যান ও সোমবার ৩রা অক্টোবর, ১৯২৩ সকালে বাড়ী থেকে ফিরে এসে রীতিমত আপিসের কাজ করছেন, ইতিমধ্যে খবর এল অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁর মাতৃদেবী মারা গেছেন। শিক্ষালয়ের চারুদির নিকট দরোয়ান এই দুঃসংবাদ দেয়। চারুদি আমাদের ডেকে এই বিপদের কথা বলেন, সকলে পরামর্শ করে তখনই জ্যোতির্ম্ময়ীকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়।

জ্যোতির্ম্ময়ী ছিলেন ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। সকালে যে স্নেহময়ী মায়ের পায়ের ধূলি ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেছেন, বাড়ী এসে তাঁকে মৃতা দেখে কাতর বা বিচলিত হলেন না। "মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক" বলে প্রার্থনা করলেন। দশটি দিন খুব শান্ত সংযত ভাবে অশৌচ পালন করে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করলেন। প্রতি বৎসরই মাতাপিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বাড়ীর ঝি-চাকরকে যত্ন করে খাওয়াতেন ও নূতন কাপড় দিতেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীর পারিবারিক পরিচয় কারও অবিদিত নাই। ঢাকা-বিক্রমপুর নিবাসী স্বর্গত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোতির্ম্ময়ীর পিতৃদেব। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক, সাহিত্যিক ও অতি তেজস্বী ব্রাহ্ম ছিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর জ্যোতির্ম্ময়ীর পুরাতন রোগ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। স্বর্গত ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র পরীক্ষা করে Appendicitis বলেন ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেন। শুনে আমরা আশঙ্কায় অস্থির হই। কিন্তু চামিদির বাড়ীতেই নির্ব্বিঘ্নে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। অস্ত্রোপচারের পর তিনি বিদ্যালয় থেকে ছুটি নেন। পরে বিদ্যালয় হতেও তাঁকে বিদায় নিতে হয়।

এর পর তিনি মাড়োয়ারী বালিকা বিদ্যালয়, মতিঝিল, টাঙ্গাইল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ও অধ্যাপিকার কাজ করেন। কিন্তু আমাকে বিস্মৃত হন নাই। সর্ব্বদাই তিনি আমাদের বাড়ী আসতেন। ঘরে যা থাকত দিলে কত আনন্দের সঙ্গে খেতেন। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভেঙেই পড়ে। হাঁপানিতে খুব কষ্ট পেতেন। কতরাত্রি তাঁর রোগশয্যার পাশে কাটিয়েছি। তিনি অনর্থক কাউকেও কষ্ট দিতে চাইতেন না। কিন্তু আমি কাছে থাকলে সুখ ও আরাম পেতেন। জ্যোতির্ম্ময়ী ছিলেন সুসাহিত্যিক। রোগশয্যায় পড়েও লেখবার অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই।

১৯৩০ সনে মহাত্মাজীর আহ্বান এল নারীজাতির নিকটে। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই আহ্বানে, তাঁর প্রিয় শিষ্যাকে সঙ্গে নিতে ভোলেন নি। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনিই আমায় হাত ধরে নামালেন।



লবণ আইন ভঙ্গ প্রথম হ'ল মহিষবাথানে। তার পর একত্র চললাম পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমায়—তমলুক, কাঁথি, মেদিনীপুর, বালুরঘাট, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে। তাঁরই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ন্যূনপক্ষে তিন-চারি হাজার নরনারীর সম্মুখে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলাম নরঘাটে। রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য সকলেই ছিল লালায়িত, সেই জন্য অপরকে হিংসা করে দাবিয়ে রাখতে চাইত অনেকেই। চামিদি কিন্তু নেতৃত্বের দিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না।

সমগ্র চারের পল্লীর তিনি ছিলেন স্নেহময়ী ছোড়দি—প্রেসিডেণ্ট। আমাকেও কার্য্যকরী সমিতির সভ্যা করে নেন।

ক্রমে সকল প্রতিষ্ঠান, সকল সভাসমিতি, মিছিল প্রভৃতি নিষিদ্ধ ও বেআইনী বলে ঘোষণা করা হ'ল। কংগ্রেস আপিসে তালা পড়ল।

তথাপি দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবসে (২রা আষাঢ়) কলকাতার বক্ষের উপর অন্ততঃ পাঁচশ' সম্ভ্রান্ত মহিলার একটি মিছিল বার করা হ'ল ১৪৪ ধারা অমান্য করে। গন্তব্য স্থান কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার; সেখানে মিটিং করারই সঙ্কল্প ছিল। কার্য্যেও তা করা হ'ল অনেক বাধা-বিপদ সত্ত্বেও।

এর পর শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, মোহিনী দেবীর সঙ্গে আমাদের দিদি জ্যোতির্ম্ময়ীও গ্রেপ্তার হন আইনভঙ্গের অপরাধে।

বিচারে (বঙ্গবাজার কোর্টে) এই দেশপ্রেমিকা মহীয়সী মহিলাদের কারাদণ্ড হয়।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ অবস্থায় আবার রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আজ নিষিদ্ধ সভায় সভাপতিত্ব, কাল মিছিলে নেতৃত্ব এইরূপ চলতেই লাগল। সুভাষচন্দ্র বসু যখন মেয়র, তখন এক নিষিদ্ধ মিছিলে জ্যোতির্ম্ময়ী উপস্থিত থেকে সুভাষচন্দ্রকে পুলিসের লাঠির আঘাত হতে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হন। ঘোড়-সওয়ার পুলিসের (mounted police) ঘোড়া তাঁর ডান হাতের আঙুল চিবিয়ে দেয়। এ যাত্রায় তিনি তাঁর এই অযোগ্যা শিষ্যাকেও নিজের পাশে রাখতে ভুলেন নি।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম মন্ত্রের যে কি অপূর্ব্ব শক্তি তা সেই সময়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম মনেপ্রাণে। মন্ত্রটি উচ্চারণ করবামাত্র যেন তড়িৎপ্রবাহ ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হ'ত। দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের ক্ষীণশক্তিটুকু প্রয়োগে যে কি অপার আনন্দ তা দেখেছিলাম সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ গ্রাম্য নারীদের মুখে। মেয়র সে যাত্রা লাঠির আঘাত থেকে রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু তাঁকে কারাবরণ করতে হ'ল।

"পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে ঘৃণা করো না"—তাঁর জীবনের অপর একটি মন্ত্র ছিল। এই সময়ে পতিতারাও মহাত্মাজীর কাজে যোগ দিয়ে ধন্য হতে চায়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মহিলারা তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তারা সভাসমিতি, মিছিলে যোগদান করতে পারত না। সেজন্য তারা অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করে। এ কথা শুনে জ্যোতির্ম্ময়ী আমাকে সঙ্গে নিয়ে এক একদিন এক এক বস্তীতে যেতেন এবং আমায় তিনি চরখায় সুতাকাটা শেখাতে বলতেন। ঘরে বসেও তারা যে দেশসেবা করতে পারে তা তাদের মিষ্টবাক্যে বুঝাতেন। আমাদের চলে আসার সময় অধিকাংশ নারীই গহনা ও প্রচুর অর্থ দিয়ে দেশসেবার সহায়তা করত। তিনি কাউকেও ঘৃণা করতেন না।

"সবার উপরে মানুষ সত্য"—তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, সেইজন্য অযোগ্য ব্যক্তির (কি নর, কি নারী) মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। যে পশ্চাৎপদ তাকে অগ্রগণ্য করে তুলে ধরতেন।

সমাজ-সেবা ছিল জ্যোতির্ম্ময়ীর আর একটি প্রধান কাজ। দরিদ্র ছাত্র অথবা ছাত্রীর বেতন ও বই সংগ্রহ করে দেওয়া, বাল-বিধবার বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন ও মহিলা সমিতি গঠন, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে প্রাণপণ চেষ্টা, গ্রাম্য মাতাদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে উপদেশদান প্রভৃতি দ্বারা তিনি সমাজের কল্যাণসাধন করতেন।

মাতা শিক্ষিতা হলে নিজ-হাতে গড়া যোগ্য সন্তান দেশকে উপহার দিয়ে কৃতার্থ হতে পারেন, এই বিশ্বাস প্রত্যেক মাতার প্রাণে জাগিয়ে তোলা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অনেক দরিদ্র ছাত্রছাত্রী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও কৃতী হয়েছেন তাঁর সাহায্যে। সেইজন্য তাঁর ঋণ তাঁরা আজও স্বীকার করেন।

সাম্প্রদায়িকতাবোধ কখনও তাঁর হৃদয়ের বিশালতাকে খণ্ডিত করতে পারে নি। তাই তিনি ঘরে বাইরে, সমাজে, রাষ্ট্রে সকল সম্প্রদায়ের ছিলেন স্নেহময়ী মাতা ও শ্রদ্ধেয়া ভগিনী। তাঁর চরিত্র চামেলী ফুলের মতই মৃদু অথচ মনোহর সুগন্ধপূর্ণ ছিল। আজ তা দিগবিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময় সময় নিজকে অসহায় বোধ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে কার্য্যে অক্ষম হয়ে শয্যাশায়িনী হলে পর-মুখাপেক্ষী হতে হবে এই ভাবনা তখন তাঁকে ব্যথিত করত। একদিন তিনি কবির কথায় বলেছিলেন,

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহান দুঃখ, সহিবারে দাও ভকতি।"

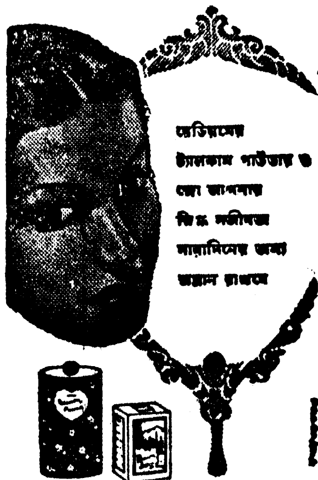
"এই দুই লাইন আমি মূলমন্ত্র করে সব দুঃখ মাথা পেতে নিয়েছি।"—তাই ভগবান তাঁর অন্তরের ডাক শুনলেন, কারও সেবার অধীন না হয়ে, কোনরূপ যন্ত্রণার অনুভূতি না পেয়ে পূর্ণ গৌরবে গৌরবান্বিতা হয়ে অমৃতের ক্রোড়ে চলে গেলেন। শেষ দিনের ঘটনা বড়ই মর্ম্মন্তুদ, তার আর পুনরুক্তি করব না। ১৯৪৫, ২২শে নবেম্বর জ্যোতির্ম্ময়ীর ইহলীলার পরিসমাপ্তি হয়।

পুস্তক-পরিচয়

সপ্তপদী—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। ৪৫।১ বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪৲ টাকা।

এখানি কাব্যগ্রন্থ। দ্বিশতাধিক গীতি-কবিতার সমষ্টি। শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সাত-আটখানি গাথা, কাহিনী ও গীতি-কাব্য রচনা করিয়া কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রকাশের মধ্যে সাহিত্যের সার্থকতা। গীতিকাব্য অন্তরের ছন্দোময় প্রকাশ। যে গভীর অনুভূতি কবির মনকে আলোড়িত করে ছন্দে তাহাকে রূপদান করিতে পারিলে গীতিকবিতা সার্থক হয়। "সপ্তপদী"র অধিকাংশ গীতিকবিতাই প্রীতি-কবিতা। হৃদয়ের প্রবলতম অনুভূতি—প্রেম। তাই সকল কবিই প্রেমিক। প্রেমিক কখনো রূপ, কখনো বা রূপাতীতের পূজারী। "সপ্তপদী"র কবিতা বহুক্ষেত্রে রূপের অর্চনা।

মোর কাব্যে তুমি রূপায়িত,
ওই রূপ চাহি আমি রূপাতীত-রসকামী,
নহি বুদ্ধ প্রজ্ঞা-পরিমিত।



'তিলোত্তমা'য় আছে,

ফাগুনের হালকা হাওয়ায়
ঢেউ বয়ে যায়
গন্ধে গানে।

'সরল কথা'য় শুনি,

চৈতালি গান বৈতালিকের
বসন্তেরি পাগল অলি
গুঞ্জরিয়া তুলবে কানে
প্রিয়া তোমায় আপন বলি।

কেনন',

উৎসবেরি উৎস তুমি,
কল্পনারি কল্পলেখা।

'দৃষ্টি' মনকে সঞ্জীবিত করে,

দৃষ্টিখানি মিষ্টি বড় কতই সুধা বৃষ্টি করে,
দগ্ধ হিয়া মর্ম্মরিয়া তাইতো সখি উঠলো ভ'রে।

কবি বলেন,

আদি-পুরুষের অনাদি রসের উদ্ভব সেথা জানি।
সে আদি-রসের নিঝ'রে ভরি'
অধরে আমার তুলিয়াছ ধরি'—
এই মিটে, এই মিটে না পিপাসা, হে মোর রাজেন্দ্রানি!

'যৌবন' কবিতায় পাই,

গেল যৌবন, দখিনা পবন মৌমাছি নাহি থাকে,
মক্ষিরাণীর পক্ষপাতের মিথ্যা আলেয়া আশা।

উৎসর্গে কবি হাসি ও অশ্রু নিবেদন করিয়াছেন। ভূমিকায় বলিতেছেন, 'অশ্রুর নৈবেদ্য অসম্পূর্ণ রহিল। কিছু ইচ্ছাকৃত গোপনও রহিল।' তাই শুনিতে পাই,

মনে হয় অয়ি ত্রিদিব-বন্দ্যা
লীলাভরে কর খেলা,
আমার জীবনে ঘনায় সন্ধ্যা
ফুরাইয়া যায় বেলা।

'বাসা-বদলে' আছে,

সেই স্মরণের শেষ শৃঙ্খল এই গৃহে এনু রাখি
প্রথম মিলন বাঁধন বিধুর হলুদ বরণ পাখী।

'আছে কি আশা?'—মনে মনে প্রশ্ন উঠে,

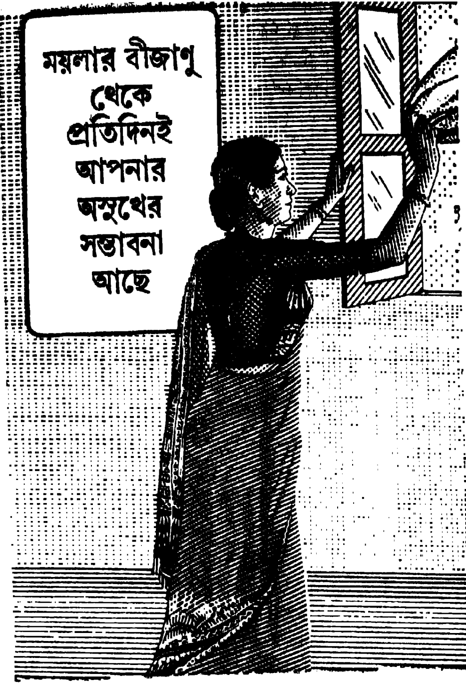
দিবসে তারে যায় না পাওয়া,
সাঁঝে কি পাবো খুঁজি?

'মশালচী' সপ্তপদীর শেষ কবিতা।—

অজানা দেশের অচেনা মানব সুদূর প্রবাসে বাঁধিল বাসা,
সন্ধান যার শুধালে মেলে না, পরিচয় দিতে নাহিক ভাষা,
চলে মুসাফির অলক্ষ্য-পথে।...

কবি ছন্দ-নিপুণ। নানাবিধ ছন্দের প্রয়োগ কবিতাগুলিকে সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। "সপ্তপদী" কাব্যরসিক পাঠকের আনন্দ-বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

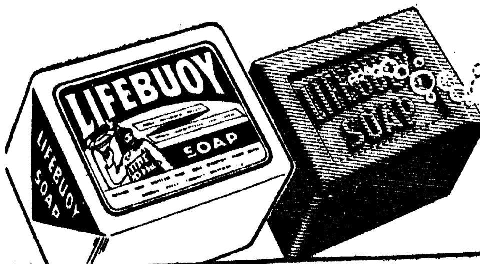




লা ই ফ ব য়
সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু
থেকে আপনাকে রক্ষা করে





ভারতে প্রস্তুত

L. 254-X52 BG

রাজনারায়ণ বসু—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য ১৲ টাকা।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ঋষিতুল্য পুরুষ। উনবিংশ শতাব্দীর দিক্‌পাল মনীষীদের পুরোভাগে তাঁহার আসন। তাঁহাকে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে বাংলা, তথা সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তার অগ্রদূত। অনাবিল স্বদেশপ্রেমে তাঁহার হৃদয় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ এবং তারই প্রেরণায় তিনি পাশ্চাত্ত্য আদর্শে বিভ্রান্ত, তদানীন্তন নব্য-শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়কে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। যে জাতীয়তার বীজ কালে মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, তাহা বাংলা দেশে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল ঋষি রাজনারায়ণের সযত্ন-সলিল-সিঞ্চনে। এই কৃতী পুরুষের জীবন-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই জন্যই বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন—"তাঁহার Grandfather of Indian Nationalism আখ্যা সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়াছিল।" রাজনারায়ণের মধ্যে স্বদেশপ্রেম এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছিল। নিজে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াও সে যুগে তিনি শুধু যে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে "অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া" মাতৃভাষার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিবার জন্যও তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত' 'সে কাল ও এ কাল' প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

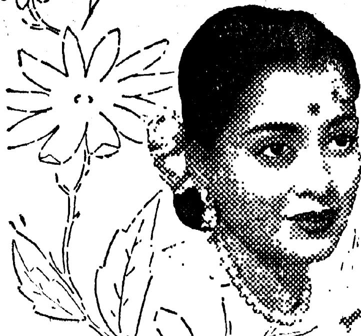
জাতীয়তা-মন্ত্রের উদ্গাতা এই মনীষী এবং সাহিত্য-সাধকের চরিতকথা রচনায় প্রথিতযশা ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল যে তথ্যানুসন্ধিৎসা ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। ইহাতে এমন কতকগুলি তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা শুধু রাজনারায়ণের জীবন এবং কৃতির সঙ্গে নহে, উনবিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণ মহিমায় জাগ্রত বাংলা-দেশের জাতীয়তার মূল উৎসের সহিতও পরিচিত হইবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক বলিয়া গণ্য হইবে। বাংলার জাতীয়তার উন্মেষের ক্ষেত্রে নবগোপাল মিত্র প্রবর্ত্তিত হিন্দুমেলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু এই হিন্দুমেলার ভাব নবগোপালের মনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল রাজনারায়ণ প্রণীত, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিয়া। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও রাজনারায়ণ মনে-প্রাণে ছিলেন হিন্দু। হিন্দুজাতি হইতে তিনি নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করিতেন না এবং মনশ্চক্ষে হিন্দু জাতির কি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন রাজনারায়ণ দেখিতেন তাহা সমালোচ্য পুস্তকে উদ্ধৃত তাঁহার 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'র ভূমিকা পাঠ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

মাতৃভাষার প্রতি কি প্রগাঢ় অনুরাগ রাজনারায়ণের ছিল, সমালোচ্য পুস্তকের "বাংলা ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে বক্তৃতা" নামক অধ্যায়টি অনুধাবন করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। মাতৃভাষার উন্নতি এবং মাতৃভূমির উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—এই সত্য যে তিনি শতাব্দী-কাল পূর্ব্বেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ১৮৪৮ সালের ১লা জুন হেয়ার স্মৃতিসভায় স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন বিষয়ে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা। ঐ বক্তৃতাটি শতবর্ষ যাবৎ তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়াছিল। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে ইহার মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া লেখক রাজ-নারায়ণের লেখনীপ্রসূত এক অমূল্য রত্নের সহিত আধুনিক কালের পাঠকদের পরিচিত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান পুস্তকে স্বল্প পরিসরের মধ্যে ধর্ম্মব্যাখ্যাতা, দেশপ্রেমিক, সাহিত্য-সাধক, শিক্ষাব্রতী রাজনারায়ণের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের কথা নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির উন্নতি, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি কিরূপ আগাম চিন্তা করিয়াছিলেন, সুনির্ব্বাচিত তাঁহার 'রচনার নিদর্শন'গুলি হইতে সেই পরিচয় পাইয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন।

যক্ষ্মারোগ ও রোগী—ডাঃ শ্রীসুবলচরণ সাহা। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।

সম্প্রতি দেশে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। এমতাবস্থায় যক্ষ্মারোগের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে সকলেরই মোটামুটি জ্ঞান থাকা উচিত। এই পুস্তকখানিতে যক্ষ্মা-রোগীর জ্ঞাতব্য বিষয়, যক্ষ্মারোগীর সম্পর্কে নার্সদের কি কি বিষয় জানা প্রয়োজন, ব্যায়াম ও বিশ্রাম, ক্ষয়রোগ চিকিৎসায় রৌদ্রের স্থান, যক্ষ্মারোগীর খাদ্য, যক্ষ্মাবীজাণু কি ভাবে নষ্ট করা যায়, যক্ষ্মা নিবারণে বি. সি. জি. টিকা ইত্যাদি ঐ ব্যাধি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যাহা "রোগী এবং তার বাড়ীর লোকের জানা কর্ত্তব্য" বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, সময়মত যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যক্ষ্মাও সারিয়া যায়—ইহা আরোগ্য হয় না বলিয়া অনেকের মনে যে বদ্ধমূল ধারণা আছে তাহা ভ্রান্ত। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন আমাদের দেশের অধিকাংশ যক্ষ্মারোগীরই চিকিৎসার ব্যবস্থা বাড়ীতে করা ছাড়া উপায় নাই। যক্ষ্মারোগী সম্পর্কে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে লেখক তাহা এমন সহজ সরল ভাষায় গুছাইয়া বলিয়াছেন যে, অল্পবল্প লেখাপড়া জানা মেয়েদের পর্য্যন্ত বুঝিতে কষ্ট হইবে না।






Rexona
BLENDED WITH CADYL

পুস্তকে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলি যক্ষ্মা-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। পুস্তকখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে প্রদত্ত একটি মানচিত্রে বাংলা দেশের যক্ষ্মা হাসপাতাল, স্যানাটোরিয়াম, ক্লিনিক প্রভৃতির অবস্থান ও সংখ্যা দেখানো হইয়াছে, এগুলির একটি তালিকাও পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। মোটের উপর বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য লেখক যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই এবং তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আমার পৃথিবী ভ্রমণ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯২ সি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩৲ টাকা।

আকাশযানের প্রসাদে বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর পরিধি সঙ্কীর্ণ হইয়াছে—দূর-দূরান্তরের দেশগুলি পাশাপাশি গ্রামের মতই মনে হয়। যদিও ছয় দণ্ডে ছ'মাসের পথ উত্তরণের সুবিধা কম নহে, তথাপি দেশে পৌছানো আর দেশ দেখা এ দু'য়ে অনেকটা প্রভেদ। পায়ে-চলা পথের মধ্যে একটু একটু করিয়া যে দেশ আমরা পাই—দ্রুতগতি যানে ভ্রমণের মধ্যে সেই পূর্ণাঙ্গ দেশ নাই। দেশকে ভালভাবে দেখিতে হইলে মন্দগতিযান অথবা পদযানই সর্ব্বোত্তম। এ ছাড়া পথে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ প্রভৃতি না ঘটিলে ভ্রমণটাই বিস্বাদ মনে হয়।

সুখের বিষয়, আলোচ্য ভ্রমণ-কাহিনীটি ছয় দণ্ডে ছ'মাসের পথ শেষ করার কাহিনী নহে। লেখক পায়ে হাঁটিয়া এবং দ্বিচক্রযানের সাহায্যে প্রায় সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন। যে সমস্ত স্থানে জলযান, মোটর-বাস বা ট্রেন প্রভৃতি অপরিহার্য্য হইয়াছে—শুধু সেই সকল জায়গায় সেগুলির সুবিধা লইয়াছেন—কিন্তু সুদীর্ঘ পথের তুলনায় সে সামান্যই। ভ্রমণের প্রথম পর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে আকিয়াব, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, বলিদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্ব্বে—ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার কথা আছে। সংক্ষেপে এই সব দেশের ভৌগোলিক পরিচয় ও মানুষের আচার-আচরণের তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন লেখক।

ভ্রমণকালে লেখক তরুণ ও নিঃসঙ্গ ছিলেন এবং সামান্যমাত্র অর্থ তাঁহার সম্বল ছিল। পথের দুঃখদুর্গতিও তাঁহাকে কম ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু দেশভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা সব বাধাকে ঠেলিয়া তাঁহাকে সাফল্যের কূলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এই কাহিনী তরুণ চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গানের মালা—১ম স্তবক। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৷৷০।

একশ'টি গান। ভূমিকায় শ্রীপ্রণব রায় বলেছেন, "এ গানের মালা হীরা-মোতি-পান্নার নয়, আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য যুই, বেল, চামেলি দিয়ে গাঁথা। ব্যক্তিগতভাবে তাই আমার ভাল লেগেছে।" সত্যই রচনায় একটি সরল মাধুর্য্য আছে।

উত্তম রহস্য—শ্রীমা। অনুবাদক: শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ১৲।

ছ'জন বিশ্ববিখ্যাত লোক জাহাজে করে চলেছিলেন 'মানব প্রগতি' বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে। মাঝ-সমুদ্রে জাহাজডুবি হওয়ায় জুটলেন একত্রে একখানি রক্ষী-নৌকায়।...পানীয় জল প্রায় নিঃশেষ।...দিগন্তে আশার চিহ্নও নেই। দুর্দ্দশা ভুলবার জন্য প্রত্যেকে সুরু করে দিলেন নিজের নিজের জীবনকথা বলতে।" লোক ছ'জন (সম্ভবতঃ কল্পিত) হলেন—রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, লেখক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, ব্যবসায়ী ও ব্যায়ামবিদ্। আর, নৌকায় ছিলেন এক 'অপরিচিত ব্যক্তি'। তাঁদের অভিলাষ ও আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে কবিত্বপূর্ণ ভাষায়। দার্শনিক ভাবে কতকটা রূপক-আভাস লেগেছে।

মালিকা—শ্রীমালিনী বসু। ৫ লাভলক প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯। মূল্য ১৷৷০।

ভূমিকা থেকে জানা গেল, লেখিকা বালিকা। সে-হিসাবে রচনা প্রশংসনীয়। উৎসাহ দেওয়া ভাল; কিন্তু বই ছাপিয়ে দিয়ে অতিরিক্ত প্রশংসা করায় অনেক সময়ে ছোটদের সাধনার পথ রুদ্ধ হয়।

আচারাঙ্গ সূত্র (১ম স্কন্ধ)—শ্রীহীরাকুমারী, ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অনূদিত। শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা। ৩ পর্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য অনুল্লিখিত।

জৈন আগম গ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ। বাঙালী পাঠক এর সাহায্যে জৈনধর্মের মূল কথাগুলি জানতে পারবেন। ইতঃপূর্ব্বে এ গ্রন্থের কোনও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নি।

হিন্দু সাহিত্যে প্রেম—বিনয়কুমার সরকারের 'লভ ইন্ হিন্দু লিটারেচার' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক: শ্রীপ্রমথনাথ পাল। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩৲।

ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, বিদ্যাপতি, রমণী হৃদয়ের রূপক, প্রেমের চরম পর্য্যায়, যৌন-মর্য্যাদা ও পরিশিষ্ট—এই কয় অংশে গ্রন্থখানি বিভক্ত। কাব্যের মধ্য দিয়ে লেখক আপন মনোমত বাস্তব জীবনের একটি আদর্শ খুঁজছেন। চীনা ও ইংরেজী কবিতার দৃষ্টান্ত তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়নের প্রমাণ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পান্নাদ্বীপ—শ্রীশেফালী নন্দী। নয়া প্রকাশনী, ১০৯।৫ সদার শঙ্কর রোড, কলিকাতা—২৯। পৃঃ ৬০, মূল্য ১৲।

ছেলেমেয়েরা দেশ-বিদেশের কথা শুনতে ভালবাসে। লেখিকা এই বইখানিতে গল্পচ্ছলে পান্নাদ্বীপ অর্থাৎ আয়ার্লণ্ডের কথা তাদের শুনিয়েছেন। এই দেশের প্রাচীন ইতিহাস, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, প্রকৃতি ও মানুষ—সবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখিকার নিপুণ লেখনীস্পর্শে। শেষ অধ্যায়ে কুহুলানের কাহিনীটি ছোটদের যে শুধু মনোরঞ্জন করবে তা নয়, তাদের মনে দেশপ্রীতিরও প্রেরণা যোগাবে। বইখানির প্রচ্ছদপট সুন্দর।

ত্রিবেণী—শ্রীঅনুরূপা দেবী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। পৃষ্ঠা ৪৩৮। মূল্য ৫৲

বাংলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে অনুরূপা দেবী বিশ্রুতকীর্ত্তি। ত্রিবেণী তাঁর একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

জনগণ-নির্ব্বাচিত গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত পালবংশ বহুবর্ষ ধরে পরম গৌরবের সঙ্গে এদেশে রাজত্ব করে। রাজা বিগ্রহপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীপাল বাল্যে অত্যধিক প্রশ্রয় পেয়ে হয়ে উঠলেন পালবংশের কলঙ্কস্বরূপ। তিনি উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী, প্রজাপীড়ক, স্বার্থপর এবং অতীব নির্ম্মম। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মাহিষ্য-সমাজ যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহীপাল যুদ্ধে নিহত হন এবং বরেন্দ্রীরাজ্য মাহিষ্য-দলপতি ভীমের হস্তগত হয়।

এদিকে মহীপালের কনিষ্ঠ, দেবোপম-চরিত্র মহাবীর রামপাল জননীসমা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ পট্টমহাদেবী লজ্জাদেবীর নিকট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রাজকোপে অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যুদ্ধে মহীপালের মৃত্যুর পর রাজ্য মাহিষ্য সমাজের হস্তগত হয়েছে শুনে তিনি বিভিন্ন রাজ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে মাহিষ্য-রাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করলেন।

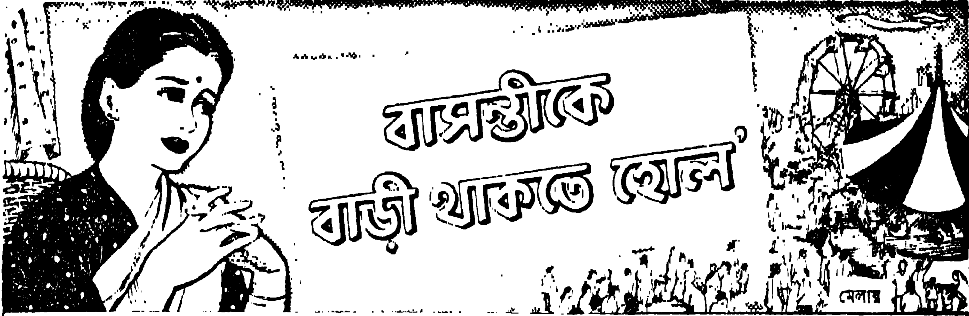
উপন্যাসের ঐতিহাসিক কাহিনীটি মোটামুটি এই। চরিত্র অঙ্কন ও পাত্র-পাত্রীদের হৃদয়াবেগ প্রকাশে লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পট্টমহাদেবী লজ্জাদেবীর দেবরবাৎসল্য ও সতীত্ব, রামপাল-মহিষী সন্ধ্যাদেবীর সারল্য ও পতিপ্রেম, মন্দারের রাজদুহিতা মদনিকা এবং রাজনর্ত্তকী চারুশীলার রামপালের প্রতি অপার্থিব নিষ্কাম প্রেম অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। ভাষা জলদগম্ভীর মৃদঙ্গতালে গীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মত শ্রুতিমধুর

নিসর্গ-বর্ণনার বাহুল্যে স্থানে স্থানে পাঠকের একটু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া আর সব দিক দিয়েই উপন্যাসখানি সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম।

শ্রীতারাপদ রাহা

বঙ্গদেশ ও মালয় এশিয়া—শ্রীচুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায় গাঙ্গুলি গ্রন্থাগার, ৬ বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা—১৪। মূল্য ১৲।

প্রাচীন বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা—মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি জননী—ইহাই আলোচ্য পুস্তিকাখানির প্রতিপাদ্য বিষয়।



বাসন্তীকে বাড়ী থাকতে হোল'
মেলায়



নীনা ! বাসন্তী কই !



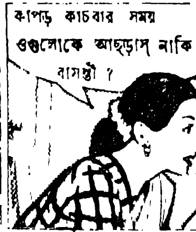
দেখি বাসন্তীর বাড়ী গিয়ে



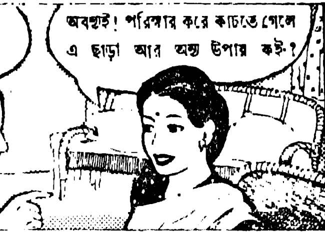
বাসন্তী ! বাড়ী বসে করছিস্ কী?
মেলায় যাই কী করে ভাই। আমার কাপড় যে বড্ড ছিঁড়ে গেছে।



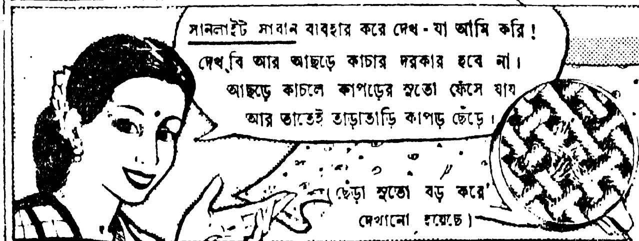
বুঝেছি এ বিষয়ে তোর সঙ্গে কথা কইবো ভেবেছিলুম ...



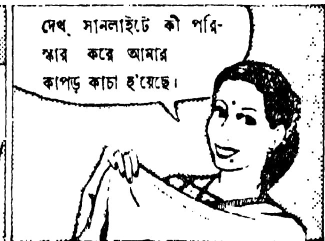
কাপড় কাচবার সময় ওগুলোকে আছড়াস্ নাকি বাসন্তী ?



অবশ্যই! পরিস্কার করে কাচতে গেলে এ ছাড়া আর অন্য উপায় কই?



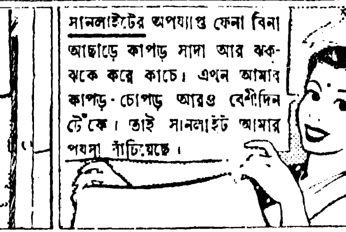
সানলাইট সাবান ব্যবহার করে দেখ - যা আমি করি! দেখ্‌বি আর আছড়ে কাচার দরকার হবে না। আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায় আর তাতেই তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে দেখানো হয়েছে)



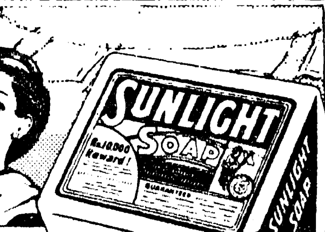
দেখ্‌ সানলাইটে কী পরিস্কার করে আমার কাপড় কাচা হ'য়েছে।



আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো



সানলাইটের অপর্যাপ্ত ফেনা বিনা আছাড়ে কাপড় সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন আমার কাপড়-চোপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমার পয়সা বাঁচিয়েছে।



SUNLIGHT SOAP
GUARANTEED
SUNLIGHT SOAP

প্রথমেই মালয় এশিয়ার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন যে, মালয় উপদ্বীপ এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া মালয় এশিয়া গঠিত। জিজ্ঞাস্য এই যে, মালয় দ্বীপপুঞ্জ কোথায়? পুস্তকে ভাষা এবং বানানের ভুল পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়।

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা। পি-৯২ লেক রোড, কলিকাতা-২৯, হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০।

খ্রীঃ-পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনধর্ম্মের সর্ব্বশেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর আবির্ভূত হন। বেদোক্ত ধর্ম্ম এই সময় প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান মাত্রে পরিণত হইয়াছিল। মহাবীরের সাধনা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন প্রেরণা দান করেন। সেই জন্যই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাকে ভগবানের অন্যতম অবতার রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার অল্প কথায় সহজ ভাষায় মহাবীরের বাণী ও জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠক পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

তারাপীঠ ভৈরব—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বামদেব সংঘ, ৮নং প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর কলিকাতা—৩৬। ২৭০+৬ পৃঃ। মূল্য পাঁচ টাকা।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সিদ্ধপীঠ বীরভূম জেলার সুবিখ্যাত তারাপীঠে আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতা-বঞ্চিত পাড়াগাঁয়ের চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কঠোর সাধনা দ্বারা কিভাবে 'শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা-তারাপীঠ ভৈরব' নামে প্রসিদ্ধি ও জনমনে অক্ষয় শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১২৪৪ সনের ফাল্গুনী শিবচতুর্দ্দশীতে আবির্ভাব হইতে ১৩১৮ সনের শ্রাবণী ধারাস্নাত ২রা তারিখের মহানিশায় তিরোভাব পর্য্যন্ত আবাল্য ব্রহ্মচারী তারাপীঠ ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপার তান্ত্রিক বীরভাবের অনুপম সাধনার প্রতি স্তরের পরিচয় বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক এবং শিক্ষা, বংশ ও পারিবারিক দৈন্যের দিক দিয়া সমপর্য্যায়ের এই মহাপুরুষের স্বরচিত অমৃত সঙ্গীত-লহরী অতুলনীয়। বেদ-উপনিষদ, তন্ত্র-পুরাণাদি-অলঙ্কৃত কত শাস্ত্রবাক্যাবলী যে উপদেশ-কথনচ্ছলে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই। বহু উচ্চশিক্ষাভিমানী তাঁহার কাছে আসিয়া নিজেদের জ্ঞানের অসারতা এবং এই মহাপুরুষের দূরদৃষ্টিপূর্ণ জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। রামকৃষ্ণের কালী-সাধনা গঙ্গাতীরে এবং বামাক্ষেপার তারাসাধনা দ্বারকাতীরে যুগপৎ চলিয়া সিদ্ধির পরমাগতি লাভ করিয়াছিল। সাধারণের ধারণা ও সংস্কার এই যে, ভৈরবী ছাড়া তান্ত্রিক বীরাচারের সাধনা হয় না এবং এই জন্য তারাপীঠ ভৈরবেরও মানবী-ভৈরবী ছিলেন এই ধরণের কথা গ্রন্থবিশেষে প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচ্য পুস্তকের লেখক স্পষ্টাক্ষরে এই ভ্রান্তি নিরসন করিয়া অতীব প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন।

তারাপীঠ ভৈরবের এই জীবনালেখ্য পড়িতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ইহা যেমন ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, তেমনই ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট সাতটি ছবি এবং মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপট ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তন্ত্রকথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সংখ্যা ১০৩। বিশ্বভারতী। মূল্য ।৹ আনা।

এই গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়-গৌরবে সুমহান্। গ্রন্থকার তাঁহার জীবনব্যাপী গবেষণার ফল ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া অতিসংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—এক বিরাট গ্রন্থোপযোগী তথ্যরাশি পিণ্ডাকারে পরিবেশিত হইয়া প্রত্যেক গ্রাসে অপরিহার্য্য কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে। কেবলই দুঃখ হয়, গ্রন্থকারের লেখনী অফুরন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিল না। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত-সমাজে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে—উড্রফ সাহেব প্রভৃতির চেষ্টা ভ্রান্তিনিরাসে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, বলা যায় না। সর্ব্বজনসুলভ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ না পড়িয়া আশা করি, অতঃপর আর কোন শিক্ষিত বাঙালী তন্ত্র ও তান্ত্রিকের সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে অগ্রসর হইবেন না। গ্রন্থকারের সহিত আমরা সর্ব্বত্র একমত না হইলেও তাঁহার জ্ঞানের পরিসরকে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দন করি। "তন্ত্র ও বাঙ্গালী" পরিচ্ছেদে রসিকমোহনের (রসিকলাল নহে) সহিত উড্রফের নামোল্লেখ শোভন হইত। সাধক সর্ব্বানন্দের মূর্খতা-প্রবাদ "অমূলক" (পৃঃ ৪৮) নহে—ইহা চিরপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বানন্দের পুত্র শিবনাথ কর্ত্তৃক স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত। শিবনাথ 'সর্ব্বোল্লাস' তন্ত্রেরও বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহার রচয়িতা অপর কোন সর্ব্বানন্দ নহেন। সর্ব্বোল্লাসের একটি বচনও কিন্তু সর্ব্বানন্দের স্বরচিত নহে—সমস্তই আগম-নিগম হইতে উদ্ধৃত। তন্মধ্যে রাধাতন্ত্র ও 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উদ্ধৃতি লক্ষণীয়। গোসাই ভট্টাচার্য্যের পর দুই তিন শতাব্দীর ব্যবধানে একেবারে বামাক্ষেপার নামোল্লেখ কিছুটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেশ-বিদেশের কথা

"যুগান্তর সব পেয়েছির আসর"

গত ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৫ হইতে ১লা জানুয়ারী ১৯৫৬—এই চারি দিন ধরিয়া "যুগান্তর সব পেয়েছির আসরে"র দশম বার্ষিক শিশু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সহিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে শিশুদের হাতের কাজের একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়াছিল। ২৯শে ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়। তিনি শিশুদের প্রতি উপদেশমূলক একটি সরস বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ, মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখ সুধীবৃন্দ বক্তৃতা দ্বারা শিশুদের আনন্দবিধান করেন।



যুগান্তর সব পেয়েছির আসরের দশম বার্ষিক উৎসবে শিশু-সম্মেলন

ফটো—শ্রীভগবতী দে

শিশুদের এই মহাসম্মেলনে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, নৃত্য-প্রতিযোগিতা, গান, অভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ নাটকের অভিনয় করিয়া ছোটদের মনোরঞ্জন করেন। শিশির কলাকেন্দ্রমের সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ বাগচী তাঁর লোকান্তরিতা সহধর্ম্মিণী শিশিরাঙ্গিণী বাগচীর নামে নৃত্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারিণী একটি বালিকাকে স্বর্ণপদক দান করিয়াছেন।

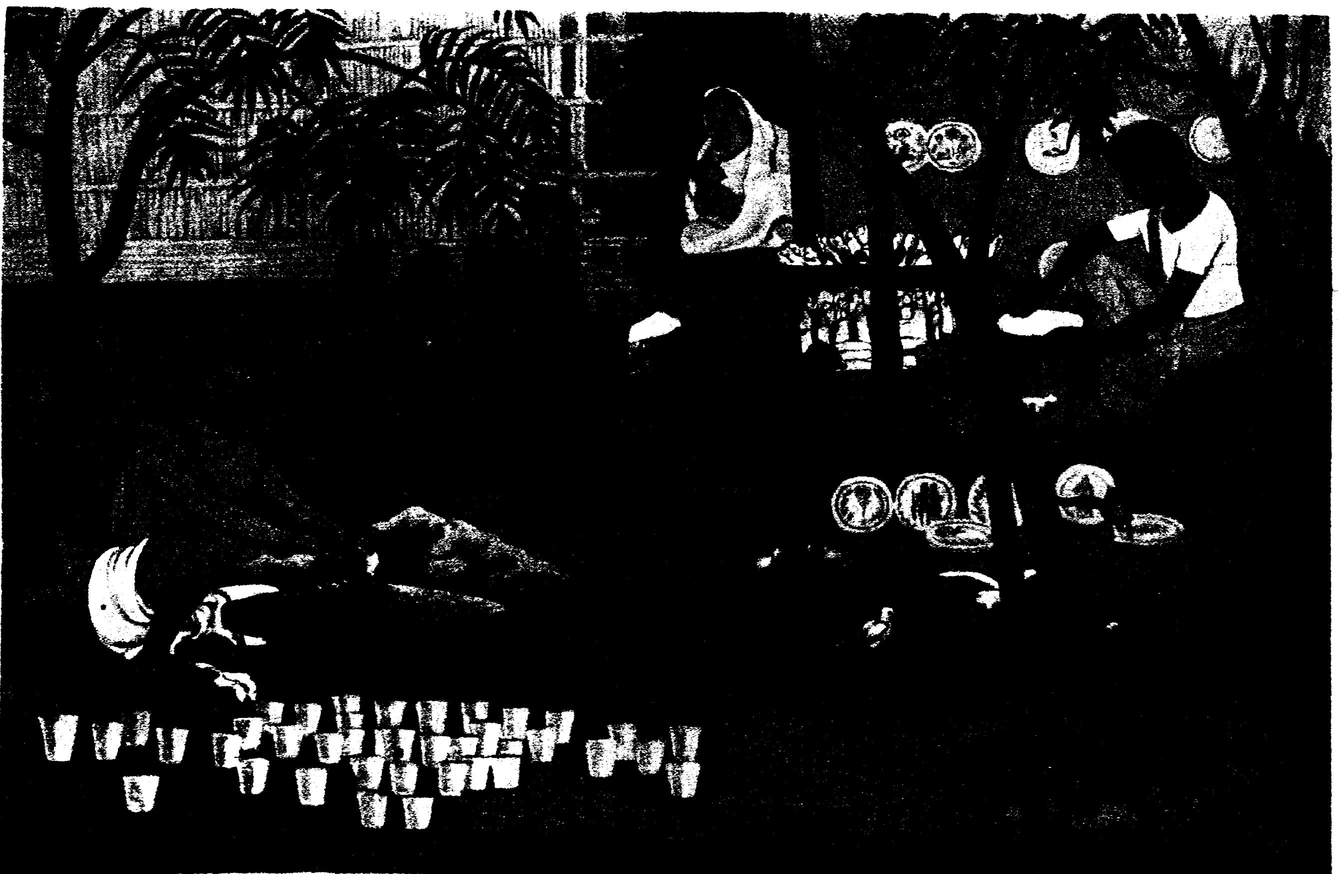
এই সম্মেলনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিশু-সাহিত্য-সম্রাট শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংবর্দ্ধনা। শিশুরা এই সংবর্দ্ধনায় অংশগ্রহণ করে।

কৌস্তুভকান্তি করণ

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য কৌস্তুভকান্তি করণ গত ১২ই ডিসেম্বর মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে মেনিন্‌জাইটিস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার ভাঙ্গনমারি গ্রামে ১৯১৯ সনের ১২ই এপ্রিল কৌস্তুভকান্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন। ছাত্রজীবনে কৌস্তুভকান্তি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। ১৯৪১ সনে রিপন কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ হইতে বি-এল ডিগ্রি অর্জ্জন করেন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি স্বদেশ ও সমাজসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪০ সনে তিনি খেজুরীর তরুণ-সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় 'হিজলী তরুণ সংঘে'র প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লীসংগঠন-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। আগষ্ট আন্দোলনের সময় হিজলী তরুণ সঙ্ঘ তাঁহার নেতৃত্বে কাঁথি মহকুমার স্বাধীনতা-সংগ্রামে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ঐ সময় হিজলী তরুণ সঙ্ঘ বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং করণ মহাশয়ের গ্রেপ্তারের জন্য পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়া বাহির হয়। ঐ সময়েই বন্যা ও পুলিসের অত্যাচারের ফলে তাঁহার গৃহ এবং মূল্যবান ইতিহাস-সম্বন্ধীয় পুস্তকে পূর্ণ গ্রন্থাগার বিনষ্ট ও ভস্মীভূত হয়। ১৯৫০ সনে কৌস্তুভকান্তি আলিপুর মুন্সেফ আদালতে আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ইহার এক বৎসর পরেই তিনি মেদিনীপুর জেলার খেজুরী কেন্দ্র হইতে সর্ব্বোচ্চসংখ্যক ভোটে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি কংগ্রেসপক্ষের সদস্য হইলেও দলনির্ব্বিশেষে সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ভূমিসংস্কার বিলের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে এই তরুণ সদস্যের পরিণত বিচারবুদ্ধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং প্রেসিডেন্সী জেনারাল হাসপাতালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ চিকিৎসাধীনে থাকেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

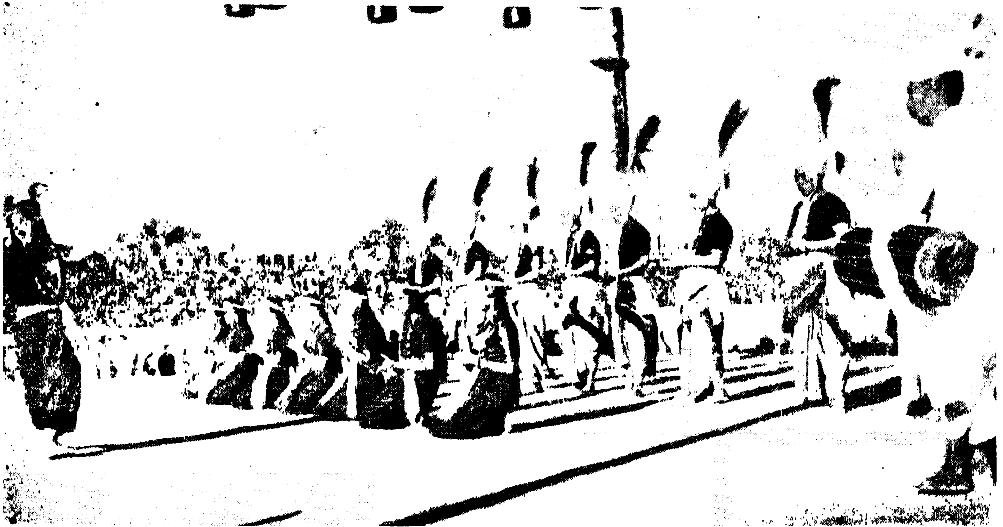


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কুম্ভকার
শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত



উজবেক নৃত্যশিল্পীদের লোক-নৃত্যানুষ্ঠান



প্রজাতন্ত্র দিবসে মণিপুরী লোকনৃত্য শিল্পীদের 'লাইপৌ চংবা' নৃত্য-প্রদর্শন

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৬২ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গ-বিহার সংযোগ সমস্যা

বাঙালী জাতির অস্তিত্বের পথে অনেক সমস্যাই আছে। এক ত জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাপারের শ্রেষ্ঠ দুই পথ বাণিজ্য ও কৃষি—এই দুয়েতেই আমাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বাণিজ্যে ত হটিয়াই যাইতেছি, কৃষিতেও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও অভাব-পীড়িত চাষীর অবস্থা এতদিন নিতান্তই শোচনীয় ছিল। সেচ, সার ও মশক নিবারণে কর্তৃপক্ষ চেষ্টিত হওয়ায় কিছু আশার আলো দেখা দিয়াছে। তবে সে পথে আমাদের বেশী অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই, কেননা কৃষি-ভূমি আমাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে খুবই কম। বাকী রহিল রাজকার্য্য ও ভিক্ষা—যদিও শেষটায় প্রাচীনগণ বলিয়াছেন "নৈব নৈব চ"।

এইরূপ যে অবস্থা তাহা আরও বিষম প্রতিকূল হইয়াছে বেকার-সমস্যায়। বেকার যাহারা তাহাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম্মের সংস্থানও করিতে হইবে এই অল্পপরিসর পশ্চিম বাংলার মধ্যে। ভিন্ন প্রদেশেও ঐ সমস্যা রহিয়াছে, সুতরাং তাহারা সহজে অন্য প্রান্তীয় লোক লইতে চাহে না, বিশেষ বাঙালীকে একেবারেই চাহে না কয়েকটি প্রদেশ। উপরন্তু, বাঙালী আজ ঘরমুখো হওয়ায় তাহার সে আগেকার উদ্যম বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে।

তাহার পর রহিয়াছে উদ্বাস্তু-সমস্যা। তাহারাও কয়েকটি দলের প্ররোচনায় বাংলার বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক—এমনকি কলিকাতা ছাড়িতে অনিচ্ছুক।

সমস্যা আরও অনেক আছে এবং প্রত্যেকটিই বাঙালীকে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবসাদে মগ্ন করিতেছে।

এই সকলের মধ্যে আবার নূতন এক প্রশ্ন জাগিয়াছে। তাহার উৎপত্তি বাংলা ও বিহারের একীকরণের প্রস্তাবে, যাহা ঐ দুই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় আনিয়াছেন।

সকল প্রশ্নেরই দুইটা দিক আছে—পক্ষে ও বিপক্ষে। এই প্রস্তাবেরও পক্ষে ও বিরুদ্ধে অনেক যুক্তির, অনেক তর্কের অবকাশ আছে। বিপক্ষে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষে কংগ্রেস এখনও শুধু নীতিকথাই বলিয়াছেন। কিন্তু দুই দিকের সম্যক ও নিরপেক্ষ বিচারের চেষ্টা—যেটা নিতান্তই প্রয়োজন—এখনও বিশেষ হয় নাই। আমরা এইখানেই বলি যে, আমাদের মতে বিনা বিচারে, শুধু মাত্র নীতি বা স্তোকবাক্যের মোহে, এই প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জ্জন কোনটাই উচিত নয়। আমাদের অবস্থা এতই সঙ্গীন যে কূপমণ্ডুক নীতি গ্রহণ করিলে আমরা এই বাংলার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ধ্বংস হইব। অন্য দিকে দুই মুখ্যমন্ত্রী সমস্যা পূরণের যে পথ দেখাইতেছেন তাহা বিনা বিচারে গ্রহণ করা যায় না।

আমাদের এই সংখ্যায় আমরা একীকরণের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি তাহা একটি প্রবন্ধে দিয়াছি। কর্তৃপক্ষ ঐ সকল যুক্তির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেই একীকরণ সম্ভব। শুধুমাত্র বিধান পরিষদে ভোটের জোরে প্রস্তাব মঞ্জুর করিলে সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

আমরা যাহা বুঝি তাহাতে এই সংযোগের পথে প্রধান অন্তরায় পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। বাঙালী হিন্দুর তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে লীগের আমলে ভোটের জোরে অবিচারের ও অন্যায় পক্ষপাতিত্বের। সুতরাং একীকরণের ফলে ঐরূপে বাঙালী পুনরায় প্রতারিত না হয়, তাহার কি ব্যবস্থা, কি প্রতিকারের পথ তাঁহারা স্থির করিয়াছেন ইহা কর্তৃপক্ষের জানানো প্রয়োজন। মাত্র ধর্ম্মের মুখ চাহিলে এই অধর্ম্মের যুগে বিপদের অন্ত থাকে না তাহা সকল ভুক্তভোগী সৎ লোকেই জানেন। সংখ্যালঘুর সংখ্যাগুরু হইতে ভয়ের কারণ যাহা তাহা এই যুগে অতি বাস্তব। তাহাকে অবহেলা করা যায় না।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের যাহা মূলতঃ বা গৌণতঃ অসার তাহা আমরা দেখাইব না। কেননা তাহার ভার কর্তৃপক্ষের। তবে আমরা আনন্দবাজার পত্রিকায় ষ্টাফ রিপোর্টারের সংবাদে দেখিয়াছি যে বিহারের মৈথিলী ও ঝাড়খণ্ডী সভ্যেরা এই প্রস্তাবে আনন্দিত। কিন্তু ঐরূপ যুক্তির মধ্যে অনেক কিছু আছে যাহার ফলে বাঙালীর পরাজিত মনোবৃত্তি, নৈরাশ্যের ভাব, আজ এই জাতির প্রগতির প্রধান অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪২ সনে শুনিয়াছিলাম, "কাজ কারবার ছাড়িয়া পালাও, বোমায় সবকিছু যাবে।" ১৯৪৬-৪৭ সনে শুনিয়াছিলাম, "গেল, গেল সব গেল, কলিকাতা পাকিস্থানে যাবেই।" আজও শুনিতেছি, "সকল ব্যবস্থাই খারাপ, সংস্কৃতি যাইবে, বাঙালী অতলে তলাইয়া যাইবে।" একই সুর, একই গান, যাহার জ্বালায় কবি আক্ষেপ করিয়াছিলেন :

> "ছায়াভয়চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে
> জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।"

জীবনবীমা জাতীয়করণ

গত ১৯শে জানুয়ারী হইতে ভারতের সমস্ত জীবনবীমা ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসিয়াছে। জীবনবীমা জাতীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের সঞ্চয়কে অধিকতর কার্যকরীভাবে উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। গ্রাম্য অঞ্চলে ব্যাঙ্ক বিস্তারের পরের কার্যক্রম জীবনবীমা জাতীয়করণ, এই দুইটি পন্থার উদ্দেশ্য জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি। ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা প্রসার দ্বারা গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক বিস্তার দ্রুত সম্পন্ন হইবে, ইহাতে জনসাধারণের সঞ্চয়ের সুবিধা হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতির হার বৃদ্ধির কল্পনা আছে এবং সেই কারণে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষ জীবনবীমার পলিসি আছে, যাহার মূল্য প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু গড়পড়তা জীবনবীমার পরিমাণ মাত্র ২৫৲ টাকা। বৎসরে ৫৫ কোটি টাকার মত প্রিমিয়াম আয় হয় এবং জীবনবীমা কোম্পানীগুলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৮০ কোটি টাকা। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জীবনবীমার গড়পড়তা পরিমাণ অতি নগণ্য। ইহা অনুমিত হয় যে, চেষ্টা করিলে অদূরভবিষ্যতে ভারতবর্ষের জীবন-বীমার মোট পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা হইতে ৮,০০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

জাতীয়করণের বিরুদ্ধে অবশ্য আপত্তি তোলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র-পরিচালিত বীমা কোম্পানীগুলিতে যোগ্যতার অভাব পরি-লক্ষিত হয়; এই যুক্তিতে সত্য কিছু পরিমাণে থাকিলেও, ইহার সবটাই সত্য নহে। বেসরকারী বীমা ব্যবসায়ে অযোগ্যতা এবং অসাধুতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গত দশ বৎসরে প্রায় ২৫টি জীবনবীমা কোম্পানী লিকুইডেশনে গিয়াছে এবং অন্য ২৫টি কোম্পানীর সম্পত্তি এমনভাবে নষ্ট করা হয় যে, সেগুলিকে অন্য কোম্পানীর সহিত একত্রিত করিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে যাহারা বীমা করিয়াছে তাহাদেরই ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী হইতে দুই কোটি টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা হইয়াছিল। জীবনবীমা জাতীয়করণের পরও অসাধু-তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনবীমা কোম্পানী-গুলির পরিচালকবর্গ অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের অর্থে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ ও শিল্প বৃদ্ধির প্রয়াস করিয়াছেন, ইহাতে ক্ষতি হইয়াছে পলিসি-হোল্ডারদের। অনেক বীমা কোম্পানী অবশ্য সাধুতা ও বিচক্ষণতার সহিত তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা বর্তমানে জাতীয় গর্বের পরিচায়ক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের খাতিরে জীবনবীমার জাতীয়করণ জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইয়াছে।

জাতীয়করণ দ্বারা জনসাধারণের বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। জীবনবীমা কোম্পানীগুলির প্রায় তিন শত আশী কোটি টাকার মত সম্পত্তি সরকারী ঋণপত্রে নিয়োগ করিলে দ্বিতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার খরচের সুবিধা হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে খসড়া সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোট খরচের পরিমাণ ধরা হইয়াছে সাত হাজার এক শত কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে খরচ হইবে চারি হাজার আট শত কোটি টাকা, বাকী খরচ হইবে বেসরকারী ক্ষেত্রে। আগামী পাঁচ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় পঁচিশ শতাংশে বৃদ্ধি পাইবে, বৃদ্ধির বাৎসরিক হার পাঁচ শতাংশ। এই খসড়ার কয়েকটি অনুমান সম্বন্ধে আমরা কিছু মন্তব্য করিতে চাই।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় আট শত কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। এই টাকা বিদেশ হইতে আগত শিল্প-মূলধনের অতিরিক্ত, অর্থাৎ বিদেশী মূলধনের মধ্যে এই টাকা ধরা হয় নাই। ভারতের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং ব্যালান্স হইতে যে প্রায় দুই শত কোটি টাকা খরচ হইবে তাহাও এই আট শত কোটি টাকার হিসাবের বাহিরে। প্রধানতঃ, ভারতের উদ্বৃত্ত বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে এই টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ অনুমান করিতেছেন, কিন্তু এই অনুমানের ভিত্তি অযৌক্তিক। চলতি রপ্তানীতে উদ্বৃত্তের পরিমাণের উপর কর্তৃপক্ষ আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চলতি রপ্তানি দেশের মোট আন্ত-র্জাতিক লেনদেনের পরিচায়ক নহে। গত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া ভারতের বহির্বাণিজ্যে চলতি রপ্তানিতে উদ্বৃত্ত থাকিতেছে না, রপ্তানির চেয়ে আমদানী বেশী হইতেছে এবং এই ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে বৈদেশিক ঋণ ও দান দ্বারা। সুতরাং চলতি বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের ভিত্তি বৈদেশিক ঋণ ও দান, দানের পরিমাণ অনিশ্চিত এবং ঋণের পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধমান। ১৯৫৫ সনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ঐ বৎসর মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৯৫ কোটি টাকার এবং আমদানীর পরিমাণ ছিল ছয় শত একত্রিশ কোটি টাকার, মোট ঘাটতির পরিমাণ ছত্রিশ কোটি টাকার। ১৯৫৪ সনে আমাদানী ও রপ্তানীর মূল্য ছিল যথাক্রমে পাঁচ শত সাতাশী কোটি ও পাঁচ শত তেষট্টি কোটি টাকা এবং চব্বিশ কোটি টাকার ঘাটতি হইয়াছিল। ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ঘাটতি প্রায় নিয়মমাফিক হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুতরাং এহেন অবস্থায় আগামী পাঁচ বৎসরে যে প্রতি বৎসরে উদ্বৃত্ত থাকিবে সে হিসাবের ভিত্তি কি? ইহা নিছক কল্পনাপ্রসূত। মশলা, বস্ত্র, ম্যাঙ্গানিজ, কাঁচা চামড়া প্রভৃতির রপ্তানি ক্রমনিম্নগামী। অন্য দিকে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাঁচা পাট, কাঁচা তুলা প্রভৃতির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের বাজারে সঠিক করিয়া কিছু বলা কিংবা অনুমান করা উচিত নহে। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হইয়াছে প্রায় আট শত কোটি টাকার মত।

১৯৫১ সনের মার্চ হইতে ১৯৫৫ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত ২৬৮ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভারতবর্ষ পাইয়াছে, ইহার মধ্যে ১৪৪ কোটি টাকার সাহায্য ভারতবর্ষ কাজে লাগাইয়াছে। নিম্নলিখিত সাহায্যগুলি ভারতবর্ষ পাইয়াছে—অষ্ট্রেলিয়া ৯৬ লক্ষ পাউণ্ড; কানাডা—৫'৫ কোটি ডলার; নিউ-জিল্যাণ্ড—১৬ লক্ষ পাউণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—২৪'৪ কোটি ডলার; ফোর্ড ফাউণ্ডেশন—৮০ লক্ষ ডলার; নরওয়ে—২ কোটি ক্রোনার; আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক—৯'৫২ কোটি ডলার।

বৈদেশিক শিল্প-মূলধনের আমদানীও আশাপ্রদ নহে। ১৯৪৮ সনের জুন মাস হইতে ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট ১৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মূলধন আমদানী হইয়াছে, তবে ইহার মধ্যে ৪০ শতাংশ এ দেশের বিদেশী শিল্পগুলি হইতে উদ্বৃত্ত মুনাফা পুনর্ব্বার নিয়োজিত হইয়াছে। ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বরের পর প্রায় ২৮'৭৬ কোটি টাকার বিদেশী মূলধন তৈলশোধন শিল্পে নিয়োজিত হইয়াছে এবং এই শিল্পে আরও ১৩'৯৭ কোটি টাকার বিদেশী মূলধন নিয়োগ করা হইবে। ঔষধ নির্ম্মাণ ও রং-শিল্পেও কিছু পরিমাণ বিদেশী মূলধন আমদানী হইয়াছে।

বিদেশী মূলধন আমদানী হয় প্রধানতঃ সেই সকল দেশ হইতে যাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ, সুতরাং বৈদেশিক মূলধন এ দেশে আসিতে দ্বিধাবোধ করে। সংযুক্ত বাণিজ্য সমিতির বাৎসরিক সভায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বৈদেশিক মূলধন ও সাহায্যের বিরোধী। বিদেশের দ্বারে অর্থভিক্ষা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। বৈদেশিক সাহায্যের পিছনে সাধারণতঃ রাজনৈতিক সর্ত্ত থাকে, এই কারণে বৈদেশিক সাহায্য অবাঞ্ছনীয়। তবে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণে আপত্তি থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিতে হইবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য। বৈদেশিক মূলধন আমদানীর সর্ত্ত ভারত সরকার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এই ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাব আসিবার সম্ভাবনা নাই। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার নিজের সর্ত্তে বিদেশী শিল্প-মূলধন আমদানী করিবে, সেখানে ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা বিদেশী শিল্প-মূলধন আমদানীর পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক আদর্শ বিদেশী মূলধনের আগমনে নিঃসন্দেহে বাধার সৃষ্টি করিবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন দ্বারা শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ আদালতের ক্ষমতার বহির্ভূত করিয়া দেওয়ায় বিদেশী মূলধনের পক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। যদিও পণ্ডিত নেহরু এবং অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই সংশোধন ভারতীয়দের শিল্পের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য, বিদেশী মূলধন-চালিত শিল্পের বিরুদ্ধে নহে, তবে এই আশ্বাসের আইন-সঙ্গত ভিত্তি কিছু নাই, কারণ, এই আশ্বাস ব্যক্তিগত মাত্র, সংবিধানে এই আশ্বাস কোথাও উল্লেখ করা নাই। ভবিষ্যতে কংগ্রেস দলের পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোনও দল শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিবার ক্ষমতা পায় তাহা হইলে এই আশ্বাসকে তাহারা নাও অনুসরণ করিতে পারে। অধিকন্তু এখন বিদেশী মূলধন ভারতীয়দের সহযোগিতায় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেছে; যেখানে যুক্তপ্রচেষ্টা সেখানে সংবিধানের সংশোধন শুধু ভারতীয় শিল্পের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য, একথা বলা অযৌক্তিক। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় আয়করের নূতন ধারা ২৩ক (যাহা ১৯৫৫ সনে সন্নিবেশিত হইয়াছে) বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-মূলধন সৃষ্টির পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির নূতন ব্যাখ্যা প্রয়োজন, কারণ কর্ত্তৃপক্ষ যদিও প্রায়ই ঘোষণা করিতেছেন যে, তাঁহারা ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতিকে অনুসরণ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও তাহাই করিবেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারতের খনিজ-শিল্পের মালিক হইবে রাষ্ট্র এবং খনিজসম্পদ খনন করিবার অধিকার থাকিবে রাষ্ট্রের। ইহা ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতির ব্যতিক্রম সূচনা করে। সেই ঘোষণায় শুধু ছিল যে ভবিষ্যতে খনিজ তৈল-শিল্পের মালিক হইবে রাষ্ট্র, কিন্তু অন্যান্য খনিজসম্পদ (কয়লা ব্যতীত) বেসরকারী শিল্পের মধ্যে থাকিবে। আর একটি ব্যতিক্রম এই যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বুনিয়াদী উৎপাদকযন্ত্র-উৎপাদনকারী কারখানাগুলির মালিক হইবে রাষ্ট্র এবং এইগুলি রাষ্ট্রকর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতি প্রস্তাবে শুধু কয়লা, খনিজতৈল, জাহাজ-নির্ম্মাণ, ইস্পাত-শিল্প, এরোপ্লেন নির্ম্মাণ এবং টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে বলা হইয়াছিল।

অন্যান্য যে সকল বেসরকারী শিল্পে ভারত সরকার অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, সেই সকল শিল্পের কিছু পরিমাণ মূলধনের মালিক হইবেন সরকার। যদিও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে, তথাপি রাষ্ট্রের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই অনুপাতে বেসরকারী শিল্প-প্রচেষ্টা সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। বেসরকারী এবং সরকারী শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ব্যক্তিগত শিল্পের আদর্শ মুনাফা লাভ এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পের উদ্দেশ্য সামাজিক কল্যাণ-বৃদ্ধি; লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন সেখানে উঠে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত আয়ের সর্ব্বোচ্চ সীমারেখা টানার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কর বাদ দিয়া কাহারও বাৎসরিক আয় ৫০,০০০ হাজার টাকার বেশী হইতে পারিবে না। ভারতীয় সংবিধান সভার পরিকল্পনা উপদেশ কমিটি এই মত অনুমোদন করেন। আয়কর অনুসন্ধান কমিশন ব্যক্তিগত আয়ের সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করেন। কমিশনের মতে প্রতি পরিবারের গড়পড়তা বাৎসরিক আয়ের ত্রিশ গুণের অধিক ব্যক্তিগত আয় হইতে পারিবে না। ইহা অবশ্য স্থিরীকৃত ব্যবস্থা কিছু নয়, জীবন-

মানের উন্নতি ও অবনতির সহিত এই নীতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। আয়ের সর্ব্বোচ্চ সীমারেখা নির্দ্ধারিত হইলেও, কর বাদ দিয়া মাসিক আয়ের পরিমাণ থাকিবে ৩,৫০০ হাজার টাকা, এবং ইহা নিতান্ত কম নহে। ব্যক্তিগত আয়ের উচ্চ সীমারেখা শুধু করধার্য্য দ্বারা সম্ভবপর হইবে না; নিম্নস্তরের জীবন-মান উন্নতিরও প্রয়োজন আছে।

শহীদনগরে কংগ্রেস অধিবেশন

কংগ্রেসের ৬১তম অধিবেশনে যে সকল ভাষণ ও ঘোষণা হয় তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাহা সেগুলি এই সঙ্গে পরে পরে দেওয়া গেল :—

"শহীদনগর, ১২ই ফেব্রুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, রাজ্য পুনর্গঠনের প্রশ্নে হিংসাত্মক আন্দোলনের দ্বারা দেশের যে সকল ক্ষত সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা দূর করিয়া দেওয়া আজ প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্ত্তব্য। রাজ্য পুনর্গঠনের প্রশ্নে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার সমর্থনে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই অর্থহীন বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারা মানুষের মনে যে একটা অস্বস্তি দেখা দিয়াছে—অতি সত্বর তাহা দূর করিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী জানান যে, রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি কোন ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হয় তাহা হইলে পরেও তাহা পরিবর্ত্তন করা চলিতে পারিবে। কিন্তু এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া দূর ও ভ্রান্ত পথ পরিত্যক্ত না হইলে কিছুই করা সম্ভবপর নয়। এইজন্য সকল স্থানে হাঙ্গামা দমন করিতে হইবে, সকল লোকের মধ্যে সদ্ভাব ফিরাইয়া আনিয়া হিংসার পথ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

বোম্বাই নগরীকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জোর করিয়া গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে কয়েকটি দল সত্যাগ্রহ করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, 'এ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।' এই সকল দল সত্যাগ্রহের নামে যে কি করিবে তাহা আমি জানি না। তাহারা যাহাই করুক না কেন তাহারা এমন এক সময়ে ঐসব করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, যখন বোম্বাই নগরী ও তাহার আশেপাশে যে আঘাত হানা হইয়াছে তাহা নিরাময় করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

যদি কোন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয় তাহা হইলে এইসব ক্ষত আরও গভীর হইবে। ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত। আমি ইহাকে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাপার বলিয়া মনে করি। শ্রীনেহরু বলেন যে, যখন কোন জাতি তাহার নিজ দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে তখন উহা নিরাময় করা অতি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে যখন কতক লোক আবার জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য মাথিয়া উঠে তখন তাহারা সম্মানিত হইলেও আমি এ কথা না বলিয়া পারি না যে, ঐরূপ করা একেবারেই ভুল। ইহাতে শান্ত অবস্থা কোন মতেই আনা যাইবে না। ইহারা শুধু হাঙ্গামা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিতেই চাহে। আমাদের এই বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। উত্তেজিত না হইয়া এবং যাহাতে কেহ ঠেলিয়া ফেলিয়া না দেয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলের মৈত্রী এবং সদিচ্ছা অর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে বলেন, এ কথা ভাবিয়া তিনি বিস্মিত যে, আজিকার দিনেও বলিতে হইতেছে, ভারত একটি অবিভাজ্য দেশ, ভারতের সকল লোককে পরস্পরের সহিত বন্ধুভাব লইয়া বাস করিতে হইবে।

আমি নিশ্চিতরূপে এ কথা বলিতে পারিব যে, দশ-পনর বৎসর পরে লোকেরা যখন এই কংগ্রেস অধিবেশনের কথা স্মরণ করিবে তখন তাহারা রাজ্য পুনর্গঠন প্রশ্নে এই বিতণ্ডার কথা ভাবিয়া নিশ্চয়ই গভীর বিস্ময় বোধ করিবে। আমি ও আপনি এবং আমরা সকলে এইরূপ অর্থহীন ব্যাপারে এত সময় নষ্ট করিয়াছি ভাবিয়া অবাক হইব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভাষাভিত্তিক সর্ব্বপ্রকার যুক্তির কথা তিনি বিবেচনা করিতে রাজী। আমি সকল ভাষাকে সম্মান করি এবং আমাদের দেশের সকল ভাষার উন্নতির প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সকল ভাষার সহিত জাতির জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সকল ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য আমি আমার সকল শক্তি নিয়োগে প্রস্তুত। কিন্তু সকল ভাষার মধ্যে যখন রাজনৈতিক এবং এমনকি সীমানার প্রশ্ন টানিয়া আনা হয় তখন আমি উহাকে খুবই ভুল বলিয়া মনে করি।

ভারত জাতীয়তাবাদের পর্য্যায় ছাড়াইয়া সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই দুই পর্য্যায়ের মধ্যে কোন সংঘাত নাই। জাতীয়তাবাদ ভাল কিন্তু যখন উহা সঙ্কীর্ণ হইয়া দেশে বিভেদের বীজ বপন করে এবং দেশকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলে তখনই উহার ভ্রান্তি ধরা পড়ে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ঢেবর তাঁহার ভাষণে সমগ্র জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং দুর্নীতিমুক্ত কর্ম্মপ্রেরণা লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি তাঁহার ভাষণে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসকর্ম্মীরা যখনই জাতীয় স্বার্থকে প্রাদেশিক স্বার্থের উপরে স্থাপন করিয়াছেন, তখনই জনসাধারণ তাঁহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জাতীয় এবং প্রাদেশিক স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কংগ্রেসকর্ম্মীদের দেশকে ঠিক পথে পরিচালিত করা উচিত।

শ্রীঢেবর বলেন, ভারতবর্ষ সকলেরই বন্ধু—পশ্চিমের ব্রিটেন

ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হউক বা রাশিয়া ও প্রজাতন্ত্রী চীনই হউক, ভারতবর্ষ সকলেরই বন্ধু। তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি ঘটিতেছে, তাহা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতেছি না, বা তাহাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেও আমরা চাহি না।

রাজ্য পুনর্গঠনের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীডেবর বলেন, প্রদেশসমূহের ভাষাগত ভিত্তির সহিত সর্বজনের সমান নাগরিক অধিকারের উপরও কংগ্রেস গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কথাটির অর্থ হইতেছে এই যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যেখানেরই বাসিন্দা হউক না কেন, অন্যান্য রাজ্যেও তাহার সমান অধিকার থাকিবে এবং নিজ রাজ্যে রহিয়াছে বলিয়া কেহই কোন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার ভোগ করিবে না।

শ্রীডেবর বলেন, কংগ্রেস কর্ম্মিগণ আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রাদেশিক ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে যে সংঘাত দেখা দিয়াছে, উহাতে দেশকে ঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে রাজ্য কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহারা যেন ঠিক পথ হইতে বিচ্যুত না হন।

কংগ্রেস সমগ্র জাতির মধ্যে ঐক্য রক্ষার এক বিরাট শক্তিরূপে কাজ করিতেছে। আজ যদি উহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই বিরাট দেহের প্রতিটি অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, যেখানেই কংগ্রেস-কর্ম্মীরা প্রাদেশিক স্বার্থের ঊর্দ্ধে জাতীয় স্বার্থকে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানেই জনগণ তাঁহাদের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। মধ্যভারত, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও বিন্ধ্য প্রদেশে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে।

সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা ও 'উদার মন'—এই দুইটিই জনসাধারণ কামনা করিতেছে। জনসাধারণকে যদি সঠিকভাবে পরিচালিত করা না হয়, তবে ভুলত্রুটির জন্য তাহাদিগকে দায়ী করা চলে না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবেন যে, এভাবে সেভাবে পণ্ডিত নেহরুর উপর চাপ দিয়া তাঁহাদের দাবি আদায় করা সম্ভবপর হইতে পারে। এজন্য তাঁহারা এমন কয়েকটি দলের সহিত মিলিত হইতেছেন যাঁহারা, এমনকি, মহাত্মা গান্ধীর নামে দুর্নাম রটাইতেও দ্বিধা করে নাই। এ সকল দল কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিবার জন্য কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে কাজে লাগাইতেছে। আমাদিগকে এ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে।"

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা

নূতন পরিকল্পনার রূপ কিরকম হইবে এবং তাহার মূলে কি নীতি আছে সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর অভিমত ও এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল :

"১০ই ফেব্রুয়ারী—পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে জাতীয় উন্নয়নের সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে (১৯৫৬–১৯৬১) উন্নয়ন বাবদ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ৪,৮০০ কোটি টাকা। বেসরকারী উদ্যোগেও এই সময়ে ২,৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইবে—জনগণের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা, দ্রুত শিল্পায়ন—তবে মূল ও বৃহৎ শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, কর্ম্মসংস্থানে বিরাট সম্প্রসারণ, সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকতর সুসম বণ্টন। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-গঠনই হইবে এই পরিকল্পনার একমাত্র আদর্শ।

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নয়নকে সর্ব্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হইবে। কারণ ইহার ফলে ভবিষ্যতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সহজ হইবে। পরিকল্পনা কোটি কোটি দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিবে; আবার দারিদ্র্য মোচন এবং জীবনধারণের মান উন্নয়নের জাতীয় উদ্যোগে দেশবাসী প্রত্যেকের সম্মুখেই সেবার এক মহান সুযোগ আনিয়া দিবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী বিনিয়োগের শতকরা ৪৮ ভাগ পরিবহন ও যোগাযোগ সহ শিল্প ও খনিজ সম্পদ খাতে, ১৮ ভাগ সেচ ও বিদ্যুৎ খাতে, ১২ ভাগ সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয়-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সহ কৃষি খাতে এবং ২০ ভাগ গৃহ-নির্ম্মাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সহ সমাজ-সেবা খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জনসাধারণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্য লইয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়ার সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করা হইতেছে। সকলের মতামত পরিপূর্ণরূপে বিচার-বিবেচনা করিয়া পরে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাটি প্রকাশ করা হইবে।

সংক্ষিপ্ত খসড়াটিতে ১৪টি পরিচ্ছেদ এবং মোট দুই শতাধিক পৃষ্ঠা আছে। দেশের চিন্তানায়কগণের ও প্রতি অংশের মতামত লইয়া কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারসমূহের বিভিন্ন স্তরের বহু কর্ম্মীর পরিশ্রমে এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন সমাজের সর্ব্ব স্তরের নরনারীর সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন। পরিকল্পনা রচনাকালে যে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ এবং ব্যাপক সহযোগিতা লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহাই ইহার সার্থক রূপায়ণের শুভ ইঙ্গিত।

"শহীদ নগর, ১২ই ফেব্রুয়ারী—আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিবসের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে বৈষয়িক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, ভারত তাহার শিল্প-বিপ্লব সাধনে বিশ্বের সমক্ষে 'এক নূতন পথে'র সন্ধান দিতেছে। এই পদ্ধতি ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন —'আমরা সমাজবাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে এবং শান্তিপূর্ণ পথে দ্রুততার সহিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছি।'

'প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের কম্যুনিষ্ট এবং কিছুসংখ্যক সমাজতন্ত্রীরা এই নূতন পথের তাৎপর্য্য এখনও পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই, কারণ তাহারা তাহাদের সঙ্কীর্ণ ছকে-বাঁধা চিন্তাজালে বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের এই চিন্তাধারার সহিত বর্ত্তমানে ভারতের বাস্তব অবস্থার আদৌ কোন সামঞ্জস্য নাই।

প্রধানমন্ত্রী এক ঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা করেন। ভারতের শিল্প-বিপ্লব সাধনে যে 'নূতন পথে'র কথা তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যাতেই তাঁহার অধিক সময় কাটে। তিনি বলেন— 'ইঙ্গ-মার্কিণ পদ্ধতি অথবা রুশ পদ্ধতির সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এই পদ্ধতিগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। শিল্প ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনের জন্য প্রত্যেক দেশকেই শেষ পর্য্যন্ত তাহার নিজস্ব পথই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী এক পথ অনুসরণ করে। এই পথ হইতেছে এক শত বা দেড় শত বৎসরে শিল্প-বিপ্লব সাধনের পথ। সোভিয়েট পদ্ধতি স্বতন্ত্র। রাশিয়া কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসরে শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করিয়াছে, কিন্তু ইহা করিবার জন্য রাশিয়াকে প্রচুর জোরজবরদস্তি করিতে হইয়াছে এবং যে সরকার এই জোরজবরদস্তি করে, সে সরকার হইতেছে প্রভুবাদী সরকার। সোভিয়েট জনগণকেও এজন্য প্রচুর মূল্য দিতে হইয়াছে। আমি কোন পদ্ধতিরই সমালোচনা করিতেছি না। আমি শুধু ইহাই দেখাইতে চাই যে, ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ এই দুই পদ্ধতির কোনটিই আমাদের দেশের অবস্থা ও পরিবেশের পক্ষে যোগ্য নয়।

'ইহা স্পষ্ট যে ভারত দেড় শত বৎসর ধরিয়া শিল্প-বিপ্লব সাধনের চেষ্টা করিতে পারে না। এই পথ ধরা হইলে আমাদের বংশধরদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হইবে। কাজেই ইহা অসম্ভব। সমস্যা যখন আমাদের বুকে বোঝার মত চাপিয়া বসিয়া আছে, তখন উহা সমাধানে বিলম্বের পথ ধরা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদিগকে দ্রুত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।'

রুশ-বিপ্লবের প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন—'রুশ-বিপ্লবের বিষয় আলোচনার সময়ে আমাদিগকে তখনকার ইউরোপ ও রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার কথা স্মরণে রাখিতে হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় সোভিয়েট বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপও তখন চলিতেছিল। বৈদেশিক শক্তিগুলি যদি তখন নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিযান না চালাইত, তবে হয় ত সোভিয়েট সরকারের নীতি ও পদ্ধতি ভিন্ন রূপ ধারণ করিত। কিন্তু ভারতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অভিযান বলিয়া কোন বস্তু নাই। ইহা ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ সরকারের পতনও হয়। কাজেই রাশিয়ার দৃষ্টান্তের সহিত ভারতের অবস্থার কোনও সামঞ্জস্য নাই।'

শ্রীনেহরু বলেন—'ভারত ও রুশ সরকারের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। গণতন্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, রাশিয়ায় তাহার যে কোনও অস্তিত্ব নাই, তাহা সকলেরই জানা আছে। রাশিয়ার গণতন্ত্র ভিন্ন ধরণের। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, রুশ গণতন্ত্রের সমালোচনা আমি করিতেছি না।

রাশিয়ার শিল্প-বিপ্লব যে রকম দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে ভারতও সেইরূপ দ্রুততার সহিতই উহা করিতে চায়, তবে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উহা করা ভারতের কাম্য। এই পরীক্ষায় অপর কোন দেশ এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হয় নাই। বিনা রক্তপাতে এবং কোনও প্রকার জবরদস্তি না করিয়া শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্রুততালে দেশের অগ্রগতি শুধু আমাদের দিক হইতেই নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বের দিক হইতে একটা আশ্চর্য ঘটনা হইবে না কি? বর্ত্তমান সময়ে এই উদ্দেশ্য সাধনে রক্তপাত ঠিক নিছক মূঢ়তা নয়?

'এই সব কারণে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার গুরুত্ব আমাদের দিক হইতে খুবই বেশী। বিশ্ববাসীর দৃষ্টিও তাই আজ আমাদের উপরেই নিবদ্ধ।' "

ভারতে স্বাস্থ্যোন্নয়ন

এতদিন দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল, এবং সেই কারণে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবনতি বিনা প্রতিরোধে নিম্ন পথে দ্রুত চলিয়াছে। স্বাস্থ্যের দিকে এত দিনে নজর পড়িয়াছে মনে হয়। জানি না শিক্ষার দিকে কর্তৃপক্ষ কবে অবহিত হইবেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর স্বাস্থ্যোন্নয়ন সম্পর্কে সরকারী কার্য্যসূচীর যে বিবরণ প্রদান করেন তাহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল: (১) হেলথ সার্ভিস সংগঠনকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধার সংস্থান; (২) চিকিৎসা-কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা; (৩) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ; (৪) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস; (৫) জন্মশাসন ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কার্য্যে সহায়তা।

রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হইবে। সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা এলাকাসমূহে ১১২০টি এবং জাতীয় উন্নয়ন ব্লকগুলিতে ২,৫০০টি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। ১৯৬০-৬১ সনের শেষে চিকিৎসা সংস্থা এবং শয্যা সংখ্যা যথাক্রমে ১২,৫০০ এবং ১,৪৩,০০০ দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অতঃপর বলেন, দেশে আরও অধিকসংখ্যক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইবে এবং বর্ত্তমানে যে সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাতে শিক্ষাদানের উন্নততর ব্যবস্থা করা হইবে। নার্স, ধাত্রী এবং স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদের শিক্ষাদানেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধি নিবারণ এবং চিকিৎসার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাহার উল্লেখ করেন। ভারতে স্বাস্থ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টায় যে সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা সহায়তা করিতেছে তিনি তাহাদের ধন্যবাদ জানান।

উদ্বাস্তু সমস্যা

উদ্বাস্তু সমস্যা ত ক্রমেই নিদারুণ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ভবিষ্যতে যে তাহা কমিবে সেকথা কেহ এখনও ভাবিতে পারে না। বরং খবর যাহা পাওয়া যায়, যথা নিম্নে প্রদত্ত সংবাদে—তাহাতে মনে হয় ইহা দ্রুত জটিলতর হইবে।

"ঢাকা, ৬ই ফেব্রুয়ারী—গত ৩১শে জানুয়ারী যে পক্ষ শেষ হইয়াছে, উহাতে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক বাস্তুত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ২৪৯২২।

ভারতীয় চীফ ভিসা অফিসার শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেনগুপ্ত অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে সাংবাদিকদের নিকট সরকারী পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার আশঙ্কা হয় যে, বাস্তুত্যাগের এই ভিড় আরও বৃদ্ধি পাইবে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে প্রত্যহ গড়ে দুই হাজার পাঁচ শতের অধিক লোক বাস্তুত্যাগ করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এমনকি পার্শীও আছে।

গত বৎসর ১৬ই হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক পক্ষ সময়ে প্রতিদিন গড়ে ১৬৩৯৬ জন লোক বাস্তুত্যাগ করিয়াছে।

শ্রী সেনগুপ্ত আরও বলেন যে, এখানে ভারতীয় ভিসা আফিস ১৯৫২ সনের অক্টোবর মাসে খোলা হয়। তাঁহার মনে হয়, পৃথিবীতে ইহাই বৃহত্তম ভিসা অফিস।

ভিসা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে বাস্তুত্যাগের প্রথম পর্য্যায়ে বর্ণ-হিন্দুগণ ভারতে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রধানতঃ তপশীলভুক্ত জাতির লোকগণ বাস্তুত্যাগ করিতেছে। ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক বাস্তুত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীহট্ট, ঢাকা ও খুলনা জেলা হইতেও যথেষ্টসংখ্যক লোক বাস্তুত্যাগ করিতেছে।

ভিসা আপিস যদিও দরখাস্তকারীদিগকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তথাপি বাস্তুত্যাগ বৃদ্ধির কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। পি. টি. আই বাস্তুত্যাগীদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, বাস্তুত্যাগের বহু কারণের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক।

শ্রী সেনগুপ্ত বলেন, বাস্তুত্যাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিসার জন্য দরখাস্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, গত ৩১শে জানুয়ারী যে পক্ষ শেষ হইয়াছে উহাতে ১৭০৬১ দরখাস্ত সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হয়, তন্মধ্যে ১৬৭১৪টি দরখাস্তে ভিসা মঞ্জুর করা হয়; অবশিষ্ট ৩৪৭টি দরখাস্ত ত্রুটির জন্য নামঞ্জুর করা হয়। 'খ' শ্রেণীর ভিসার জন্য (এক বৎসর মেয়াদের) ঐ সমস্ত দরখাস্ত করা হইয়াছিল।

একীকরণ প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় একীকরণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার সারাংশ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা দ্রষ্টব্য যে, বিহারের মৈথিলী (উত্তর বিহার) সভ্যগণ ও ঝাড়-খণ্ডের সভ্যগণ এই প্রস্তাবে আনন্দিত।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ৩১শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একীকরণ প্রস্তাব সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, "উভয় অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ বিধি-ব্যবস্থা এখন যেরূপ আছে সেরূপই থাকিবে, ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।"

ডাঃ রায় বলেন যে, ভূমি-ব্যবস্থা, প্রজাস্বত্ব আইন, কর-নির্দ্ধারণ পদ্ধতি, রাজস্বসংগ্রহ এবং সমাজ-সেবামূলক বিধিবিধান সম্বন্ধে উভয় রাজ্যই নিজ নিজ স্বকীয়তা রক্ষা করিবে। কারণ, উভয় রাজ্যই একটি বিশেষ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া এই সকল বিষয়ে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। এজন্য উভয়ের সম্মতি ব্যতীত এ সকল বিষয়ে এখনই কোন অদলবদল করা সমীচীন হইবে না।

ডাঃ রায় বলেন, বঙ্গ-বিহার একীকরণ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়গুলি থাকিবে :

প্রথমতঃ, সম্মিলিত রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার যুক্ত-রাজ্য' রাখা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে। যুক্তরাজ্যে সরকারী ভাষা দুইটি থাকিবে—বাংলা ও হিন্দী।

তৃতীয়তঃ, এক মন্ত্রীসভা ও এক বিধানমণ্ডলী থাকিবে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও একজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী থাকা বাঞ্ছনীয় হইবে; মুখ্যমন্ত্রী এক অঞ্চলের ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী অপর অঞ্চলের লোক হইবেন। মুখ্যমন্ত্রীকে পর্য্যায়ক্রমে উভয় অঞ্চল হইতেই নির্ব্বাচন করার একটি প্রথাও চালু হইতে পারে।

চতুর্থতঃ এই যুক্তরাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকিবেন এবং পাব্লিক সার্ভিস কমিশনও একটিই থাকিবে।

পঞ্চমতঃ, যে অঞ্চলে যে ভাষা প্রধান, সেই অঞ্চলের জন্য একটি করিয়া মোট দুইটি আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে। যে অঞ্চল হইতে যাঁহারা বিধানমণ্ডলীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতেই সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গ্রহণ করা হইবে।

ষষ্ঠতঃ, রাজ্যের মুখ্য রাজধানী কলিকাতাতেই করিতে হইবে। পাটনা দ্বিতীয় রাজধানী হইতে পারে এবং বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন উভয় স্থানেই হইতে পারে। উভয় রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার একই বিভাগের হাতে থাকিবে।

৩১শে জানুয়ারী—বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আর. আর. দিবাকর অদ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের একীকরণের প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

"তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্য মন্ত্রিদ্বয়ের প্রশংসা করিয়া বলেন, যখন রাজ্যসমূহের পুনর্গঠনের সম্বন্ধে বাদানুবাদ চরমে উঠিয়াছিল এবং মনে হইয়াছিল যে, দুই রাজ্যের মধ্যে মনোমালিন্য বহুপুরুষ যাবৎ তাহাদের সম্পর্ক বিষাক্ত করিবে তখন দুই মুখ্যমন্ত্রী দুই রাজ্যের পুনর্মিলনের মহান্ আদর্শ উপলব্ধি করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

তিনি সদস্যগণকে শান্তভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বিরাট প্রশ্ন অনুধাবন করিতে এবং সময় আসিলে রাজ্যের অধিবাসীদের স্থায়ী স্বার্থ ও সর্ব্বোপরি ভারতের ঐক্য ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ও বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের সুবিবেচিত অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন।

রাজ্যপালের বক্তৃতার পর সদস্যগণ লবীতে সমবেত হইলে একমাত্র দুই রাজ্যের একীকরণের প্রশ্ন তাঁহাদের মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। মিথিলার (উত্তর বিহারের) সদস্যগণ একীকরণ প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁহারা মুসলমানদের সহিত উচ্চ কণ্ঠে প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু পাটনা, সাহাবাদ, মুঙ্গের গয়া ও ভাগলপুরের সদস্যগণ এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, দুই রাজ্যের একীকরণ হইলে তাঁহারা শাসনযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব হারাইতে পারেন।

আঞ্চলিক হিসাবে বলিতে গেলে মিথিলা একীকরণের সম্ভাবনায় আনন্দিত হইলেও মুসলমান সদস্যগণ ব্যতীত মগধ এই বিষয়ে নিরুৎসাহ ও আশঙ্কাগ্রস্ত। ঝাড়খণ্ড দলের সদস্যগণও একীকরণ প্রস্তাবে আনন্দিত।

সংযুক্ত প্রদেশ গঠন সম্পর্কে জনমত

২৩শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তি সাধন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানান। প্রস্তাবটি ইতিপূর্ব্বেই শ্রীনেহরুর সমর্থন লাভ করিয়াছিল, অন্যতম কংগ্রেসেও প্রস্তাবটি সমর্থিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব প্রকাশের পর বিভিন্ন স্থান হইতে অন্যান্য দ্বিভাষিক রাজ্যগঠন সম্পর্কেও নানারূপ প্রস্তাব উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সাধারণ ভাবে সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে দুইটি দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে প্রস্তাবটি সম্পর্কে সর্ব্বভারতীয় মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। কংগ্রেস প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি উহার বিরোধিতা করিয়াছে। অপরাপর দলগুলি সর্ব্বভারতীয় ভাবে কোন মতামত প্রকাশ করে নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে একই দলের বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দ পরস্পরবিরোধী মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক প্রস্তাবটিকে সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিয়াছেন। আচার্য্য কৃপালনী প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিয়াছেন। জনসঙ্ঘের সর্ব্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী) দলের বোম্বাই কমিটি প্রস্তাবটিকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কমিটি উহার বিরোধিতা করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও কলিকাতা হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশন সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকগণের প্রতিষ্ঠানও প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন।

ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আলোচিত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

মহারাষ্ট্র কংগ্রেস ও হাইকম্যাণ্ড

২৩শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি রাজ্য সীমানা পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিরোধ উপলক্ষে যে সকল কংগ্রেসী মন্ত্রী বা আইনসভার সদস্য পদত্যাগ করেন তাহাদিগকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য নির্দ্দেশ দেন।

২৮শে জানুয়ারী মহারাষ্ট্র রাজ্য কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি এক প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে তাহাদের উক্ত নির্দ্দেশ সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন।

মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ২রা ফেব্রুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "হিতবাদ" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, উহার ফলে একটি অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে পারেন নাই। সত্য, পদত্যাগ প্রেরণ গণতান্ত্রিক কর্ম্মপদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানাইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় এবং বোম্বাইয়ে হাঙ্গামার সূত্রপাতে মহারাষ্ট্র নেতৃবৃন্দ পদত্যাগ করিলে আরও ভাল হইত। কিন্তু প্রকৃত

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যদি কেহ কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে অক্ষম হন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ হইল ঐ দলের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছেদ করিয়া নূতন দল বা গ্রুপ গঠন করা। এই ভিত্তিতেই বিলাতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির সৃষ্টি হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া কাহারও পক্ষে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকা সম্ভব নহে। যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দ্দেশ মানিতে পারিতেছেন না তাঁহারা দলত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ এইরূপেই গণতান্ত্রিক জনমত সৃষ্ট হয়। এইরূপ পদত্যাগকারীরা তাঁহাদের নিষ্ঠার জন্য স্বতঃই জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঢেবর পদত্যাগপত্রগুলি ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শিক্ষিত বেকার

পরিকল্পনা কমিশন কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়া দুই কমিটি গঠন করিয়াছিলেন: একটি কমিটির কাজ ছিল শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা নিরূপণ করা ও ঐরূপ বেকার অবস্থা ঘুচাইবার জন্য উপায় নির্দ্দেশ করা; আর দ্বিতীয় কমিটির কাজ ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং বিশেষজ্ঞ কিরূপ লাগিবে তাহার হিসাব করা। সম্প্রতি ঐ দুই কমিটি পরিকল্পনা কমিশনের নিকট তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন।

শিক্ষিত বেকার সম্পর্কিত কমিটি হিসাব করিয়াছেন যে, ভারতে ম্যাট্রিক ও তদূর্দ্ধ পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় আরও সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ শিক্ষিত লোক কর্ম্মপ্রার্থীরূপে দেখা দিবে। অনুমান করা হইয়াছে যে, এই কুড়ি লক্ষ লোকের তিন-চতুর্থাংশকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন বিভাগে কাজ দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আরও প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি শিক্ষিত লোক বেকার থাকিয়া যাইবে। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইবে না, কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে পরিমাণ নূতন কর্ম্মের সংস্থান ঘটিবে, পরিকল্পনার সময়ে যে নূতন শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর সৃষ্টি হইবে তাহাদের কর্ম্মসংস্থান করিতেই তাহা নিঃশেষ হইবে। এই কারণে শিক্ষিত বেকারদিগের কর্ম্মসংস্থানের জন্য বিশেষ কতকগুলি স্কীমে ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিবার নিমিত্ত উক্ত কমিটির রিপোর্টে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ছোটখাট শিল্পে ৮৪ কোটি টাকা নিয়োজিত করিলে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে।

শিক্ষিত বেকার সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষ কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন নাগপুরের ইংরেজী দৈনিক "হিতবাদ" ৫ই ফেব্রুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন, যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত সঠিক এবং কমিটি নির্দ্দেশিত স্কীমগুলিতে বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কোন উপায়ে ১৩০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তথাপি কয়েকটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ শিক্ষিত বেকারগণ কি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে ইচ্ছুক বা সক্ষম হইবেন? বিশেষ কমিটি যে সকল স্কীমের সুপারিশ করিয়াছেন সে সবগুলিতেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে শিক্ষিত বেকারগণ হাতের কাজ করিতে অগ্রসর হইবেন এবং শারীরিক পরিশ্রম করিবেন। বিভিন্ন রাজ্যে বেকারসমস্যা সম্পর্কিত যে সকল সমীক্ষা চালান হইয়াছে তাহার ফলাফল হইতে দেখা যায় যে আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকারগণ এইরূপ শারীরিক পরিশ্রমে মোটেই আগ্রহান্বিত নহে, যোগ্যও নহে। নাগপুরে অনুষ্ঠিত সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে বেকার সংখ্যার শতকরা ৮৬ ভাগ কেরাণীর চাকুরীপ্রার্থী, মাত্র শতকরা এক ভাগ গ্রামাঞ্চলে কর্ম্মগ্রহণে স্বীকৃত। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকার সম্পর্কে সমীক্ষার ফলে দেখা যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন এলাকায় অবস্থিত ম্যাট্রিক পাশ যুবকদের শতকরা ৭৩ ভাগ কায়িক পরিশ্রম করিতে অসম্মত। বিহার বেকার কমিটি আবিষ্কার করেন যে, কর্ম্মপ্রার্থীদের মধ্যে ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট এবং গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীর সংখ্যা কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ প্রার্থীসংখ্যার প্রায় চার গুণ।

"হিতবাদ" লিখিতেছেন, "আমরা এই সকল ফলাফলের কথা উল্লেখ করিতেছি ইহা দেখাইবার জন্য যে, যে সকল স্কীমে কেরাণীর বা "হোয়াইট কলার" কাজ না দেওয়া যাইবে—এবং ভবিষ্যতে এইরূপ কাজ খুব বেশী থাকিবে না—তাহাতে শিক্ষিত বেকারদিগকে খাপ খাওয়ান সম্ভব হইবে না।"

তবে বিশেষ কমিটির সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, কমিটি ঠিকই বলিয়াছেন—অতীতে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন একটি বিশেষ খাতে শিক্ষাধারা প্রবাহিত হইবার ফলেই বর্ত্তমান দুর্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় হইল শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনা, উৎপাদন-কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা এবং অল্পবয়স্কদিগকে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা, ইত্যাদি।

"হিতবাদ" লিখিতেছেন, দুর্গতির কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে সুপারিশগুলি বিশেষ সমীচীন। অবিলম্বে যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজা যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিদ্যালয়গুলি হইতে আমাদের যুবকগণ এইরূপ শিক্ষালাভ করে যে শিক্ষা জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। আমাদের প্রয়োজন ডাক্তার, নার্স, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, দক্ষ কারিগর, সার্ভেয়ার; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র "হোয়াইট কলার" কর্ম্মী সৃষ্টি করিতেছে। জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় কোন পরিকল্পনায় কিরূপে সেই সকল লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব যাহারা কারিগরী শিক্ষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, শারীরিক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ; যাহারা কোনরূপ পেশাদারী শিক্ষাই পায় নাই

নাই এবং শহর হইতে বাহিরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ?

"হিতবাদ" বলিতেছেন, "এই সমস্যার শীঘ্র সমাধান অসম্ভব।" স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে উহার সমাধানের চেষ্টা করিলেও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পুনর্বিন্যাস ব্যতীত কখনই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইতে পারে না।

আমাদের ধারণা যে, যন্ত্রচালিত অন্ন উৎপাদনের কারখানা ইত্যাদিতে শিক্ষিত যুবক কারিগরী কাজ করিতে সক্ষম হইবে। এবং যাহারা কেবলমাত্র কেরাণীর কাজ করিতে চাহে তাহাদের কিছু সংস্থান ঐরূপ কারখানায় হইতে পারে। তবে শিক্ষা মানেই কেরাণী বা শিক্ষক যদি হয় তবে বেকার সমস্যার সমাধান নাই।

অসামাজিক বর্ব্বরতা

গত ১লা ফেব্রুয়ারী আসানসোল শহরের বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রী যখন বিদ্যালয় হইতে একাকী গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিল তখন দুই জন মুসলমান যুবক নাকি অসদুদ্দেশ্যে তাহার হাত ধরিয়া টানে কিন্তু ছাত্রীটির চীৎকারে লোকজন আসিলে তাহারা পলায়ন করে। ঘটনাটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ এই সম্পর্কে তিন জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়াও সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন।

নারীদের প্রতি এই শ্রেণীর দুর্ব্যবহার পৃথিবীর কোন সভ্য রাষ্ট্রেই সহজে ঘটিতে পারে না। ভারতে অধুনালুপ্ত ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক কারণে এইরূপ বর্ব্বরতাকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিত। এক শ্রেণীর লোক কিন্তু এখনও নির্ব্বিকারে এই বর্ব্বর আচরণ করিয়া যাইতেছে। মফঃস্বল অঞ্চল হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে প্রায়ই এই ধরনের সংবাদ থাকে।

"বঙ্গবাণী"তে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, আসানসোলের মত শহরেও মেয়েদের পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে রাস্তায় বাহির হওয়া বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই ব্যাপারে সরকারের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যাহারা প্রকৃত অপরাধী তাহাদের অপরাধ প্রমাণিত হইলে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত যাহা দেখিয়া ভবিষ্যতে কোন দুর্ব্বৃত্ত আর কখনও কোন মহিলার সম্ভ্রমহানির কথা মনেও আনিতে সাহস পাইবে না।

কলিকাতায় এইরূপ অপরাধ মাঝে খুবই সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল। বহু যুবক ও তরুণকে পুলিসে ধরায় এখন এই সামাজিক ব্যাধির কতকটা উপশম হইয়াছে। মফঃস্বলেও ঐরূপ ব্যবস্থা স্থানে স্থানে করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি।

বাগদাদ চুক্তি

অমৃতসরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬১তম অধিবেশনে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার পর ১১ই ফেব্রুয়ারী এক বক্তৃতায় শ্রীজবাহরলাল নেহরু বলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং বাগদাদ চুক্তির ন্যায় সামরিক চুক্তির সম্পর্কে ভারত উদাসীন থাকিতে পারে না, কারণ ঐ সব চুক্তি এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিবেই।

"যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে : "শ্রীনেহরু এইরূপ সামরিক চুক্তির নিন্দা করিয়া বলেন যে, এই চুক্তিগুলি যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিবে এবং ভারতের নিরাপত্তা ও এই নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিবে। এই জন্যই ভারত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এই চুক্তি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বায়ু বিষাক্ত করিয়াছে এবং এই অঞ্চলে আরও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। বাগদাদ চুক্তিও এই ধরনের। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি অপেক্ষা বাগদাদ চুক্তির সহিত তাঁহাদের অধিকতর সম্পর্ক রহিয়াছে। আজ না হইলেও আগামীকাল অথবা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের উপর ইহার অধিকতর প্রভাব পড়িবে—এইরূপ পরিস্থিতিতে সেই জন্যই তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিতে হয়। এই সকল চুক্তির ফলে তাঁহাদের ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতে হয়। তাঁহাদের আরও সতর্ক হইতে এবং নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

"শ্রীনেহরু বলেন, এই সকল চুক্তির প্রণেতারা বলিয়া থাকেন যে, শান্তিরক্ষার জন্যই তাঁহারা এইরূপ করিতেছেন। তিনি ইহার অর্থ বুঝেন না। একজন যখন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে অথবা যুদ্ধের পথ অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছে তখন সে শান্তির পথ অনুসরণ করিতেছে বলিয়া কিরূপে ঘোষণা করে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না।"

মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতিতে বাগদাদ চুক্তির ভূমিকা যে কতদূর ক্ষতিকর তাহার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্স এই চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়াছে।

অপর পক্ষে, সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ইডেন-আইসেনহাওয়ার আলোচনার শেষে প্রধানমন্ত্রী স্যর্ এন্টনী ইডেন ও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত যে যুক্ত-বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহাতে মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদ চুক্তি এবং দূরপ্রাচ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

বেকার সমস্যা—শিক্ষক ও শিক্ষা

বর্দ্ধমান জেলায় বিশেষ পর্য্যায়ের বহু প্রাথমিক শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়া তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বেকার রহিয়াছেন। যদিও বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র অনুপাতে সরকারী হিসাবমতও শিক্ষক-সংখ্যা কম রহিয়াছে তথাপি তালিকাভুক্ত শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করা হইতেছে না। সরকারের এই মনোভাবের কারণ সম্পর্কে "দামোদর" পত্রিকা ২০শে মাঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে :

"এই পরিকল্পনা মত সরকার ৩০ জন ছাত্রপিছু মাত্র একজন

শিক্ষক দিতেছেন, ইহাতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, এ কথা তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন। আমরা জানি একটি রাখালের পক্ষেও ৩০টি গরু বা ছাগল চরানো সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আগলাইতেই একটি শিক্ষকের প্রাণান্ত হইতে হয়—তাহার পর তিনি শিক্ষা দিবেন কখন? সরকার অবশ্য বলিতে পারেন, এই পরিকল্পনা ত শিক্ষার জন্য নহে—ইহা বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য। যদি তাহাই হয়, তবে অন্ততঃ ২০ জন পিছু একজন শিক্ষক দিলেও অনেক সমস্যার সমাধান হয়। আমরা এই 'বিশেষ পর্য্যায়' বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করি।"

উদ্বাস্তু ছাত্র ও সরকার

২০শে মাঘ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন : "যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী দেশ-বিভাগের ফলে ভারতে চাকুরী করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন সরকার তাহাদের সন্তানসন্ততিদের পড়াশুনার জন্য কোনপ্রকার সাহায্য প্রদান না করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন জানিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের প্রায় সকলেই পাকিস্থানের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়াছেন এবং ভারতকেই নিজেদের স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং অন্য উদ্বাস্তুদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সরকার দিতেছেন, তাহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।..."

মন্তব্যের উপসংহারে ভারত সরকারকে বিষয়টি পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, উদ্বাস্তুদিগকে সকল প্রকারে পুনর্ব্বসতির সাহায্য করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্নও জাগে যে, এইভাবে সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে ঐরূপ উদ্বাস্তু—অর্থাৎ যাঁহাদের পিতা বা অভিভাবক সরকারী চাকুরী পাইয়াছেন—কোনও দিন আত্মনির্ভরশীল হইবেন কিনা। যাঁহারা সরকারী চাকুরে তাঁহাদের অন্য উদ্বাস্তুর সঙ্গে এক পর্য্যায়ে ফেলিলে তাঁহাদের যোগ্যতার হানি হওয়া সম্ভব।

নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

নেপালের রাজা মহেন্দ্রের আমন্ত্রণে প্রজাপরিষদ দলের নেতা শ্রীটঙ্কপ্রসাদ আচার্য্য ২৭শে জানুয়ারী সাত জনকে লইয়া একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৫১ সনে রাণাতন্ত্রের উচ্ছেদের পর ইহাই হইল পঞ্চম মন্ত্রীসভা। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দেওয়া হয় ২রা মার্চ্চ, ১৯৫৫। কৈরালা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কলহ এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের ফলে শাসনব্যবস্থা অচল হইবার উপক্রম হওয়াতেই তখন শ্রীমাতৃকা-প্রসাদ কৈরালার মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ইহার অল্পদিন পরেই ১০ই জুন ৯৯ জন সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

মন্ত্রীসভায় প্রজাপরিষদ দলের চার জন সদস্য রহিয়াছেন, যথা : শ্রীটঙ্কপ্রসাদ (প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থা); শ্রীচূড়া-প্রসাদ শর্ম্মা (বৈদেশিক, কৃষি এবং খাদ্য); শ্রীবালচন্দ্র শর্ম্মা (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) এবং শ্রীপশুপতিনাথ ঘোষ (পূর্ত্ত, যানবাহন এবং যোগাযোগ)। অপর তিন জন মন্ত্রী হইলেন ভূতপূর্ব্ব উপদেষ্টা শ্রীগুঞ্জমান সিং (অর্থ ও পরিকল্পনা); শ্রীপুরেন্দ্রবিক্রম শাহ (প্রতিরক্ষা) এবং শ্রীঅনুবিধপ্রসাদ সিং (আইন এবং পার্লামেণ্টারী ব্যাপার)।

প্রধানমন্ত্রীরূপে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম বক্তৃতায় শ্রীটঙ্কপ্রসাদ বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেপাল সকলের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিবে। অবশ্যই নেপাল শান্তিপ্রচেষ্টায় সক্রিয় সাহায্যও করিবে। সকল বন্ধু-রাষ্ট্র হইতেই নেপাল সাহায্য গ্রহণ করিবে।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাঁহার দল নেপালের গণজাগরণকে সম্মান করিবেন এবং সর্ব্বদাই জন-সাধারণের সহিত থাকিবেন। সরকার এক "নূতন সমাজব্যবস্থা" প্রবর্ত্তন করিবেন। সরকার রাজা মহেন্দ্রর প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে বাস্তবরূপ দিতে সচেষ্ট থাকিবেন। নেপালের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সরকার সকল দল এবং ব্যক্তিবিশেষেরই সহযোগিতা কামনা করেন। সামন্তপ্রথার উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক সামাজিক সমানা-ধিকার ও ন্যায়ের ভিত্তিস্থাপন করাই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে।

৩০শে জানুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কলিকাতার "ষ্টেটসম্যান" নেপালের নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন, রাজা মহেন্দ্র মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে বহু শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ, নেপালী কংগ্রেস—শ্রীসুবর্ণ শমসের এখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনিই ১৯৫০ সনে রাণাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব আরম্ভ করেন। এক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি রাজনৈতিক কারণে সত্যাগ্রহ করেন। নেপালী কংগ্রেস ব্যতীত আরও যে সকল প্রভাবশালী দল বাদ পড়িয়াছে তাহারা হইল শ্রীবেগমীর নেপালী জাতীয় কংগ্রেস এবং গুর্খা পরিষদ। প্রভাব-শালী ব্যক্তিদের মধ্যে রহিয়াছেন ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা এবং ডাঃ কে. আই. সিংহ। নেপালী কংগ্রেস অবশ্য মন্ত্রীসভাকে সমর্থন জানাইয়াছে।

১৯৫৭ সনের অক্টোবর মাসে নেপালে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

পাকিস্থানের খসড়া সংবিধান

পাকিস্থানের খসড়া সংবিধানে ২৪৫টি ধারা এবং পাঁচটি তালিকা রহিয়াছে। বলা হইয়াছে, পাকিস্থান একটি স্বাধীন, সার্ব্বভৌম "ইসলামিক প্রজাতন্ত্র" হইবে। পাকিস্থান একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federation) হইবে—উহার দুইটি অংশ থাকিবে, যথা—পূর্ব্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থান।

রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সর্ব্বদাই মুসলমান হইবেন। তাঁহার বয়স অনূন ৪০ বৎসর (ভারতে ৩৫ বৎসর) হইতে হইবে। উপরাষ্ট্রপতিকেও মুসলমান হইতে হইবে এবং প্রেসিডেন্টরূপে নির্ব্বাচিত হইবার সকল যোগ্যতা থাকিতে হইবে। প্রেসিডেন্টকে নির্ব্বাচন করিবেন জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক বিধানসভার সভাবৃন্দ। প্রেসিডেন্ট পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তবে কেহ দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। প্রেসিডেন্ট সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি থাকিবেন। জরুরী ক্ষমতা বলে প্রেসিডেন্ট যে কোন প্রদেশে শাসনতান্ত্রিক সরকার বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন, তবে ছয় মাসের বেশী এই আদেশ বলবৎ থাকিবে না।

দেশের সর্ব্বোচ্চ আইনসভা হইল জাতীয় পরিষদ। জাতীয় পরিষদের তিন শত সদস্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান হইতে সমসংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রথম দশ বৎসরের জন্য দশ জন—পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে পাঁচ জন এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে পাঁচ জন—মহিলা সদস্য অতিরিক্ত থাকিবেন। যদি জাতীয় পরিষদ অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না করে তবে বৎসরে অন্ততঃ একটি অধিবেশন ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের তিন মাসের মধ্যেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। জাতীয় পরিষদের মেয়াদ সাধারণভাবে পাঁচ বৎসর।

জাতীয় পরিষদের সদস্যদের আস্থাভাজন কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করিবেন। প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করিবেন। মন্ত্রীসভা যুক্তভাবে জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

প্রদেশের গবর্ণরগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার খুশির উপর তাঁহাদের কার্য্যকাল নির্ভর করিবে। কোন গবর্ণর জাতীয় পরিষদ অথবা প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। কর্ত্তব্য পালনে গবর্ণর প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিবেন।

প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতেও তিন শত জন করিয়া সদস্য থাকিবে এবং প্রথম দশ বৎসরের জন্য অতিরিক্ত দশ জন নারী সদস্য থাকিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন তিন ভাগে করা হইয়াছে। (ক) কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; (খ) কতকগুলি রহিয়াছে প্রাদেশিক সরকারের হাতে এবং (গ) আবার কতকগুলি কেন্দ্র ও প্রদেশের যুক্ত কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, পাকিস্থানে রেলপথ পরিচালনার ভার প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে না জানাইয়া কোন প্রাদেশিক সরকার রেল লাইন বন্ধ করিয়া দিতে পারে না।

একুশ বৎসর ও তদূর্দ্ধ সকলেরই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভোটদানের অধিকার থাকিবে।

পবিত্র কোরান ও সুন্নাহের বিরোধী কোন নূতন আইন পাস করা যাইবে না এবং তদনুযায়ী প্রচলিত আইনগুলির সংস্কার সাধন করা হইবে। মুসলিম ধর্ম্মের অনুশাসন অনুযায়ী ইসলামিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য পরামর্শ দিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রপতি ইসলামিক গবেষণাকেন্দ্র নামক একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিবেন। সংবিধান প্রচলনের এক বৎসরের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন গঠন করিবেন। এই কমিশন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির অবগতির জন্য সম্ভবমতে ইসলামের নির্দ্দেশগুলি আইনে পরিণত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। অমুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

রাষ্ট্রপতি একটি জাতীয় অর্থনীতি পরিষদও গঠন করিবেন। প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতি থাকিবেন। কমিটিতে আর যাহারা থাকিবেন তাঁহারা হইলেন: চার জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য এবং প্রত্যেক প্রদেশ হইতে তিন জন করিয়া মন্ত্রী।

বাংলা ও উর্দু পাকিস্থানের সরকারী ভাষা হইবে। সংবিধান চালু হইবার পর কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত অবশ্য ইংরেজীই সরকারী ভাষা হিসাবে থাকিবে। প্রথম দশ বৎসর পর ইংরেজী ভাষাকে অপসারিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে উর্দু ও বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠিত হইবে। তবে কুড়ি বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেও প্রাদেশিক সরকারগুলি ইংরেজীর পরিবর্ত্তে অপর কোন ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারে।

পাকিস্থানের খসড়া সংবিধানের ধারাগুলি আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "হিতবাদ" লিখিতেছেন যে, গত আট বৎসরের মধ্যে পাকিস্থানে সংবিধান প্রণয়নের ইহা চতুর্থ চেষ্টা। ইহার পূর্ব্বে সংবিধান প্রণয়নের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে অন্ততঃ অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠদের ব্যাপারে, নূতন খসড়া সংবিধানের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচেষ্টাগুলির কোনই পার্থক্য দেখা যায় নাই। খসড়া সংবিধানের উপর মোল্লাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কিত ধারাগুলির সমালোচনা করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহার ফলে অমুসলমানগণ 'দ্বিতীয় শ্রেণী'র নাগরিকে পরিণত হইবেন। পবিত্র কোরান ও সুন্নাহের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল আইন প্রণীত হইবে বলিয়া সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহার ফলে হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইবে। কোরানে অর্থলগ্নীর বিনিময়ে সুদগ্রহণ নিষিদ্ধ, সুতরাং সংবিধানের ধারাগুলি মানিয়া চলিতে হইলে সুদগ্রহণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

১৪ই জানুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভিজিল" লিখিতেছেন, পাকিস্থানের সংবিধান প্রণয়নে বিলম্ব দেখিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, হয়ত পরিণামে "ইসলামিক রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার অবাস্তব চিন্তা পরিত্যক্ত হইবে, কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে।

এই ব্যর্থতা আর, বেশী গভীর হইয়াছে এই জন্য যে, পাকিস্থানের রাজনীতিতে মুসলীম লীগের প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনেকেই ধারণা পোষণ করিতেন।

"ভিজিল" লিখিতেছেন, পাকিস্থানের প্রস্তাবিত সংবিধানের ইসলামিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে কেবলমাত্র পকিস্থানের অমুসলমানদের প্রকাশ্য অপমান তাহা নহে, এই সকল ধারা গৃহীত হইলে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য সম্পর্কে বিপজ্জনক সতর্কতা অবলম্বিত হইবে। কারণ সংজ্ঞানুযায়ী "ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের" প্রতি অমুসলমানগণ কখনই একাত্ম হইতে পারিবে না। অতএব সংবিধান প্রণেতারা যদি সকল অমুসলমান নাগরিকদিগকে পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত করিতে না চাহেন তবে তাঁহারা ঐ নাগরিকদিগকে চিরকালের মত আধ্যাত্মিক দিক দিয়া রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে চান। ইহাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য।

"ভিজিল" লিখিতেছেন, ইসলামিক বৈশিষ্ট্যগুলির উদ্দেশ্য মুসলমানদিগকেও ধোকা দেওয়া। কোরান ও সুন্নাহ-এর বিরোধী কোন আইন পাস করা হইবে না বলিয়া যে ধারাগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি কার্য্যকরী করা হইবে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ বর্ত্তমানকালে ঐরূপ স্বীকৃতির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই কাজ চালানো সম্ভবপর নহে। পাকিস্থানের গোঁড়া শাসকগণ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়া কোন আশা নাই। যাহাতে মুসলমান জনসাধারণের মনোযোগ তাহাদের বর্ত্তমান দুর্গতির বিষয় হইতে অন্যত্র সরিয়া যায় সেইজন্যই "ইসলামিক" রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিগীর তোলা হইয়াছে।

উপসংহারে "ভিজিল" লিখিতেছেন, পাকিস্থানকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রহিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে অবিলম্বে সৎ এবং নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের অধীনে এক ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। গণতন্ত্রবাদীদের সম্মুখে ইহাই শেষ বড় সুযোগ। তাঁহারা যদি নিজেদের প্রভাব বাড়াইতে পারেন তবে মঙ্গল।

মস্কোতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রদিবস উৎসব

২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় রিপাবলিক দিবস উদ্‌যাপনের জন্য মস্কোতে একটি উৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সমিতি, বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনোদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সমিতি ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লেখক-সঙ্ঘ।

সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক বিভাগীয় মন্ত্রী এন. এ. মিখাইলফ বলেন, "লোহিতাক্ষরে চিহ্নিত এই দিনটি আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত পালন করি, কারণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের সম্পর্কে ভারতের সহিত জড়িত। দেশের জাতীয় স্বাধীনতাকে দৃঢ় করিবার যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় জনগণ মনে মনে পোষণ করেন তাহার জন্য সোভিয়েট জনসাধারণ ভারতীয়দের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল। যে ভারতীয় জনগণ আজ নবজীবন গঠনে রত হইয়াছে, বহু জাতি সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র সোভিয়েট জনসাধারণ আজকের দিনে সেই ভারতীয় জনগণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভ্রাতৃভাবপূর্ণ অভিনন্দন ও শ্রেষ্ঠ শুভেচ্ছা জানাইতেছে।"

লেনিনগ্রাড, কিয়েভ, বাকু, আলমা আতা, তাসকেন্ত ও ষ্টালিনগ্রাডেও অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গান্ধীজী সম্পর্কে সোভিয়েট পুনর্ব্বিচার

গান্ধীজী সম্পর্কে সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। মস্কো হইতে দশটি ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক "নিউ টাইমস" পত্রিকার ২রা ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত এক চিঠিতে ভারত সম্পর্কে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদিগের অগ্রণী ওয়াই, জুকভ ভারতীয় জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের এই পরিবর্ত্তিত চিন্তাধারারই সাক্ষ্য বহন করে।

জুকভ লিখিতেছেন, অতীতে ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবের ফলে বহু সোভিয়েট চিন্তাজীবীই গান্ধীজীর ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে জুকভ তাঁহার নিজের ভুলও স্বীকার করিয়াছেন।

সামগ্রিক বিচারে অতীতে সোভিয়েট সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ গান্ধীজীর ভূমিকাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। জুকভ লিখিতেছেন যে, ঐ সিদ্ধান্ত সঠিক হয় নাই। বস্তুতঃ ভারতের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজী মূলতঃ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেনিয়া ও ব্রিটিশ গণতন্ত্র

কেনিয়ার আফ্রিকান জনসাধারণকে ভোটাধিকার দানের ব্যাপারে সুপারিশ করিবার জন্য মিঃ ডব্লু. এফ. কুটস-এর উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল। কুটস-এর রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টটিতে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে এবং সে সম্পর্কে কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া ১১ই ফেব্রুয়ারী "ভিজিল" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে লিখিতেছেন যে, কুটস রিপোর্টের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের মনোভাব দেখিয়া তাঁহার এই সন্দেহ হইয়াছে যে, শ্বেতাঙ্গগণ কখনই বোধ হয় নিজদিগকে আফ্রিকান জনসাধারণের সহিত খাপ খাওয়াইতে সক্ষম হইবে না।

সরকারী হিসাবমত শতকরা ৪০ জন পুরুষ ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। ব্রকওয়ের হিসাবমত শতকরা ৫০ ভাগের মাত্র ভোটাধিকার থাকিবে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় কেহই ভোটাধিকার লাভ করিবে না। কিন্তু ভোটাধিকার যে কেবল আংশিক হইবে তাহাই নহে, কাহারও দুইটি এমনকি তিনটি

ভোটও থাকিবে। বলা বাহুল্য, ধনী ব্যক্তিদেরই একাধিক ভোটদানের অধিকার থাকিবে। যে আফ্রিকান বৎসরে ১২০ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে পারিবে অথবা যাহার ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি আছে তাহারই একাধিক ভোটদানের অধিকার থাকিবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, আফ্রিকানদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ৫ পাউণ্ড ১৮ শিলিং। অতি অল্পসংখ্যক আফ্রিকানই বৎসরে ১২০ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে পারে। পাঁচ শত পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী কোন আফ্রিকান অধিবাসীর সন্ধান করা আর খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা প্রায় একই কথা।

নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে হইলে আফ্রিকানদিগকে আরও কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। প্রার্থীদিগকে নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরে ২৫০ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে হইবে অথবা সাত শত পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হইতে হইবে। সকলকেই লিখিতে ও পড়িতে জানিতে হইবে। ব্রকওয়ে মন্তব্য করিতেছেন যে, ঐরূপ গুণসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা এতই নগণ্য যে, নির্ব্বাচনে কোনই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে পারিবে না।

কিন্তু গণতন্ত্রকে অস্বীকার করিবার প্রচেষ্টা ঐখানেই থামে নাই। কেনিয়ায় ষাট লক্ষ আফ্রিকান অধিবাসী রহিয়াছে—তাহারা মাত্র ছয় জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে, অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য এক জন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন।

এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এশীয় অধিবাসীও ছয় জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবে, অর্থাৎ প্রতি ২৩,০০০ এশীয় অধিবাসী একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে।

অপর পক্ষে মুষ্টিমেয় ৪০,০০০ ইউরোপীয় অধিবাসী ১৪ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবে, অর্থাৎ প্রতি তিন হাজার ইউরোপীয় অধিবাসীর জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন।

মিঃ ব্রকওয়ে লিখিতেছেন: "এই ধরণের গণতন্ত্রই আমরা আফ্রিকান জনসাধারণকে শিক্ষা দিতেছি।"

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার বিষয় হইতেছে এই যে, কেনিয়ার ইউরোপীয় অধিবাসিবৃন্দ এইরূপ অসম্পূর্ণ নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধতা করিতেছে।

এক ব্যক্তিকে একাধিক ভোটাধিকার দানের কারণ কি? বিধান সভার ২৮ জন নির্ব্বাচিত সদস্যের মধ্যে আফ্রিকান সদস্যের সংখ্যা মাত্র ছয় জন। আফ্রিকান অধিবাসিবৃন্দ কেবলমাত্র আফ্রিকান সদস্য-নির্ব্বাচনেই ভোট দিতে পারিবেন। তথাপি আফ্রিকানদের মধ্যেও ভোটাধিকারের ঐরূপ বৈষম্য রাখা হইয়াছে কেন? কারণ ইউরোপীয় অধিবাসীবৃন্দ ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, সংযুক্ত ভোটার-তালিকা প্রণয়ন অবশ্যম্ভাবী। যাহাতে ঐ দিনে তাহারা একাধিক ভোটাধিকার লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমানে একজনের একাধিক ভোটের অধিকার সম্পর্কিত নীতি এখন হইতে স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে।

এইরূপ অসম ও অন্যায় ব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যতে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া ব্রকওয়ে লিখিতেছেন যে, ভবিষ্যতে বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্মুখীন হইতে না চাহিলে অবিলম্বেই আফ্রিকান অধিবাসীদিগকে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার দিতে হইবে এবং জাতি ও বর্ণগত প্রভুত্বের অবসান ঘটাইতে হইবে।

ব্লাড ব্যাঙ্ক

রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা বহু রোগীর জীবনরক্ষা হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা, রক্তক্ষয় প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলিতে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় রক্ত সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত বড় বড় অস্ত্রোপচার এবং রক্তশূন্যতা রোগের চিকিৎসার জন্যও রক্তের প্রয়োজন হয়। মানুষের শরীরে পশুর রক্ত ব্যবহার করা যায় না, সেজন্য ঐ সকল চিকিৎসার জন্য মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। আমাদের দেশের হাসপাতালগুলিতে সঞ্চিত রক্তের পরিমাণ নিতান্তই কম, সেজন্য গৃহে এবং হাসপাতালে চিকিৎসার সময় বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। অপরাপর সভ্য দেশে নাগরিকগণ সমাজ-সচেতন, সেজন্য তথায় রোগীর চিকিৎসার জন্য রক্তের অভাব ঘটে না। কিন্তু আমাদের দেশের অনেকেরই মনে রক্তদান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থাকার ফলে চিকিৎসার জন্য সাধারণ ভাবে রক্ত পাওয়া বিশেষ দুষ্কর। একজন স্বাভাবিক লোকের শরীরে ৫০০০ সি, সি, রক্ত থাকে। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান করিলে একবারে তাহার শরীর হইতে মাত্র ২৫০ সি, সি, রক্ত লওয়া হয়। ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়াছেন।

রক্তসংগ্রহের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক একটি নূতন ব্যবস্থা চালু করিয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক রক্তদাতাকে নগদ দশ টাকা এবং এক টাকা মূল্যের খাদ্য দেওয়া হইবে। আশা করা যায় যে, এই নূতন ব্যবস্থায় অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তি রক্তদান করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

অসবর্ণ বিবাহের জন্য বৃত্তি

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যাহারা অসবর্ণ বিবাহ করিবে তাহাদিগকে দুইটি বৃত্তি দিবার জন্য বিহারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীসহায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে আট হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। একটি বৃত্তির সর্ত্ত হিসাবে বলা হইয়াছে যে, রাজপুত ভূমিয়ার, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য যাদব বা কয়রী বর্ণের কোন গ্রাজুয়েট ছাত্র (বালক বা বালিকা) যদি উপরোক্ত গ্রুপের অন্য কোন বর্ণে বিবাহ করে তবে তাহাকে প্রথম বারে দুই হাজার টাকা দেওয়া হইবে এবং প্রথম সন্তান জন্মের সময় আরও এক হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

২রা ফেব্রুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকা লিখিতেছেন, জাতিবৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই বৃত্তি-

দানের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় বহন করে। বর্ত্তমান সমাজে বর্ণবৈষম্য অপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সেদিক হইতে বিচার করিলে বর্ণবৈষম্য লোপের সকল প্রচেষ্টাই সমর্থন-যোগ্য। বৃত্তিপ্রদানের সর্ত্তাবলীর মধ্যে স্ত্রীপুরুষের ভিতরে কোন ভেদাভেদ না করায় উহার ক্ষেত্র ব্যাপকতর হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি বক্তব্য থাকিয়া যায়। কারণ, বৃত্তিটি ছাত্রদের দেওয়া হইবে এবং ছাত্রদিগকে বিবাহ করিতে উৎসাহদানের ব্যাপারে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণকালে এক হাজার টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া যে সর্ত্তটি রহিয়াছে, তাহার সমালোচনাপূর্ব্বক পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, উহা বিশেষ বিবেচনাপ্রসূত নহে, কারণ এই এক হাজার টাকার লোভে নববিবাহিত দম্পতি প্রথম সন্তান লাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় বৃত্তির সর্ত্তে বলা হইয়াছে, উপরোক্ত বর্ণগোষ্ঠীর কোন গ্রাজুয়েট ছাত্র বা ছাত্রী যদি উপজাতিশ্রেণীর কাহাকেও বিবাহ করে তবে তাহাকে প্রথম কিস্তিতে তিন হাজার টাকা এবং প্রথম সন্তান জন্মের সময় আরও দুই হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

উপসংহারে "বোম্বে ক্রনিকল" লিখিতেছেন, ইহাকে বৃত্তি না বলিয়া অসবর্ণ বিবাহে আর্থিক সাহায্য বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

হেনরি হেরাস

বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেস্যুট সম্প্রদায়ভুক্ত ফাদার ড. হেনরি হেরাস গত ১৫ই ডিসেম্বর আটষট্টি বৎসর বয়সে বোম্বাইয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জাতি-সংগঠ-নাদির কথা যাঁহারা জানিতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে ড. হেরাসের রচনাবলী অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন. শৈশবের শিক্ষাও হয় সেখানে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তেত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি স্পেনের একটি কলেজে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ভারতীয় আদর্শ কৈশোর হইতেই তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তারের অবকাশ পায়। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী দয়ানন্দের জীবন ও কর্ম্মদ্বারা তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করেন। তিনি খ্রীষ্টান রোম্যান ক্যাথলিকদের মধ্যে জেস্যুট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ১৯২২ সনে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেন। সেখানকার জেস্যুট কলেজে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক হন। ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জাতিগঠনতত্ত্ব প্রভৃতির দিকে স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা তাঁহাকে ইহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি হইতে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য উদ্ধারে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হেরাস বোম্বাইয়ে একটি ইতিহাসের গবেষণালয় ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠা করেন। এই গবেষণালয় একদিকে যেমন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত পুস্তকে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে মোহেন-জো-দরো, হরাপ্পা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বহু নিদর্শন-সমন্বিত একটি মিউজিয়ামও ইহাকে ইতিহাসসেবীদের আকর্ষণীয় স্থল করিয়া তুলিয়াছে। হেরাসের নেতৃত্বে একদল গবেষক ভারতীয় ইতিহাসের তথ্যাদি অনুসন্ধানে ও তাহা প্রকাশে রত রহিয়াছেন। হেরাস নিজে বহু গবেষণামূলক পুস্তক, পুস্তিকা, প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন রচনা বিদগ্ধ সমাজের প্রচলিত ধারণাকে পরি-বর্জ্জিত এবং সংশোধিত করিতেও সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার "Studies in Proto-Indo-Mediterranean Culture" সর্ব্বজন-পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন, ইউরোপ ও এশিয়ায় আর্য্যদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতি এই দুই মহাদেশে প্রচলিত ছিল, আর্য্যেরা আসিয়া ইহার অনেকটা উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে দ্রাবিড়, আর্য্য ও আদিবাসী সংমিশ্রণ এত অধিক হইয়াছে যে, আর্য্য বলিয়া কাহাকেও নির্দ্দিষ্ট করা এখন আর সম্ভবপর নয়। হেরাস ভারতবর্ষের এবং বিদেশের প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্রসমূহ হইতে প্রচুর সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুকালেও তিনি তৎপ্রতিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের হিষ্ট্রিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কর্ণধার ছিলেন। ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার উপদেশে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল।

হরিদাস ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য গত ২০শে জানুয়ারী কলিকাতা—বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছেষট্টি বৎসর হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি ছিলেন সুবক্তা। তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। বিভিন্ন দেশের দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এই সব বক্তৃতার মধ্যে ধরা পড়িত। দুরূহ বিষয়ে তাঁহার সহজ সরল ইংরেজী-বাংলা ব্যাখ্যান এখনও যেন আমাদের কর্ণে অনুরণিত হইতেছে। তিনি আমাদের বিশেষ বান্ধব ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য দীর্ঘকাল যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপক, জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট এবং 'ফ্যাকাল্টি অফ দি আর্টসে'র ডীনের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনা এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখনই দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করার পরে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়েও কিছুকাল দর্শনের প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত হইয়া-ছিলেন। তিনি নিখিল-ভারত দর্শন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়া-ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফেল্স নির্ম্মলেন্দু অধ্যাপক পদও তিনি লাভ করেন। হরিদাস বাবু পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ উপদেষ্টা সভারও সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আই-এ

এস পরীক্ষার্থীদের জন্য যে শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করেন তিনি ছিলেন তাঁহার সেক্রেটারী। তিনি রামকৃষ্ণ ইন্‌ষ্টিটিউ অফ কাল্‌চারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এখান হইতে প্রকাশিত "কালচারাল হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া" অতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সুধী ও বিদগ্ধ সমাজ একজন জ্ঞানী গুণী দার্শনিক হারাইলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি একজন একনিষ্ঠ সেবক হইতে বঞ্চিত হইল। তাঁহার অভাব পূরণে দীর্ঘ সময় লাগিবে।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

"বিশ্বভারতী" বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী গত ১৯শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। চীন-ভারত, মধ্য-এশিয়া ও ভারতবর্ষের যোগাযোগ এবং ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশদ ভাবে মৌলিক গবেষণা করিয়া প্রবোধচন্দ্র প্রাচ্য-বিদ্যা গবেষকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ড. বাগচী ১৮৯৮ সনে যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাইশ বৎসর বয়সে, ১৯২০ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "Ancient History and Culture" বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস-সংস্কৃতির গবেষণায় প্রথম হইতেই ড. বাগচীর মনোযোগ দেখিয়া স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে এই বিভাগে লেক্‌চারার পদে নিযুক্ত করেন। বিশ্বভারতীতে প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্ সিলভ্যাঁ লেভী আসিলে তিনি সেখানে গিয়া ১৯২১-২২ সনে তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চীন, জাপান এবং ইন্দোচীনেও গিয়াছিলেন। ১৯২৬ সনে বাগচী মহাশয় প্যারিসে যান। সেখানেও এই বিষয়ক গবেষণায় সিলভ্যাঁ লেভীর সহায়তা লাভ করেন। তিনি চীনা-সংস্কৃত অভিধান সংকলন করিয়া ঐ সময়েই সুধীসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে তিনি উক্ত বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা ও অনুসন্ধানান্তর কয়েকখানি মূল্যবান্ পুস্তক রচনা করিতে সমর্থ হন। ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোচীন, মধ্য-এশিয়া সংক্রান্ত গবেষণা পুস্তক শুধু ইংরেজীতে লিখিয়াই তিনি নিরস্ত হন নাই, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেও তিনি ইহার কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকগুলি সুললিত ভাষা-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া গৌড়জনের হৃদয়গ্রাহ্য হইয়া আছে।

প্রবোধচন্দ্র ১৯৪৫ সনে বিশ্বভারতীতে চীনা-ভবনের অধ্যাপক হইয়া শান্তিনিকেতনে যান। ১৯৫১ সনে বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইলে ড. বাগচী তথাকার বিদ্যা-ভবনের অধ্যক্ষ হন। ১৯৫২ সনে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক মিশন চীনে গমন করেন তিনি তাঁহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৫ সনের মে মাসে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

গত ৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬) খ্যাতনামা সমাজ-সেবী, সংগঠনকর্ম্মী ও রাজনীতিক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। জ্ঞানাঞ্জন বাবুকে না জানিতেন, আধুনিককালে এমন লোক খুব কমই ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের 'জ্ঞান-দা'। অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত ওয়ার্কিং মেন্‌স ইন্‌ষ্টিটিউট নামক শ্রমিক বিদ্যালয়ে বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্রমিক বিদ্যালয়ে ভারতরাষ্ট্রের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম প্রথম জীবনে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল ছেষট্টি বৎসর। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে তিনি বয়সে এতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। আমরা ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার স্নেহ-প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। গয়ায় জ্ঞানাঞ্জনের জন্ম হয়। কিন্তু শৈশবকাল হইতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সংস্রবে আসেন তাঁহার পৈতৃক আবাসে পাটনা নগরীতে। ১৯০৫ সনে কিশোর বয়সেই জ্ঞানাঞ্জন স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা" শীর্ষক বইয়ের আদর্শে লিখিত বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক তথ্য-সম্বলিত তাঁহার 'দেশের ডাক' পুস্তকখানি সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। তিনি ১৯২৩ সনে আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে তাঁহার বক্তৃতাদানের সুযোগ হয় এই সময়। দেশে ফিরিয়া পুনরায় সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি ছিল অসাধারণ। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা তিনি স্বদেশবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে একদিকে যেমন কৌতূহল উদ্রেক করিতেন অন্যদিকে তেমনি তাহাদিগকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতেও সক্ষম হইতেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্সিয়াল মিউজিয়ম তিনিই সংগঠন করেন। তিনি বহু বৎসর ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্ত্তী রাজনৈতিক আন্দোলনেও জ্ঞানাঞ্জন লিপ্ত হন এবং একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৮ সনে স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই কলিকাতায় যে বিরাট নিখিল-ভারত প্রদর্শনী হয় তাহার মূল কর্ণধার ছিলেন নিয়োগী মহাশয়। তাঁহার বিয়োগে আমরা একজন বন্ধু হারাইয়াছি, দেশমাতাও একজন একনিষ্ঠ সেবক হারাইলেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একীকরণ প্রস্তাব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

গত ২২শে জানুয়ারী ১৯৫৬ সন প্রথম শুনা গেল যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এই দুইটি রাজ্যকে একই রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য এই দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় স্বীকৃত হইয়াছেন। পরদিন সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ড. শ্রীকৃষ্ণ সিংহের উভয়ের একত্রিত স্বাক্ষরিত বিবৃতি ছাপা হইল। সকলেই এই অপ্রত্যাশিত ও অভিনব প্রস্তাবে চমকাইয়া গেল। কেহ কেহ ভাল বলিল ও কেহ কেহ নিন্দা করিল। এক্ষণে দেখা যাক, প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করিয়া বাঙালীর পক্ষে হিতকর কি না।

কেন একীকরণ ?

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, হঠাৎ আজ এইদু ই রাজ্যের একীকরণের কথা উঠিতেছে কেন ? মুঘল যুগ হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা একইভাবে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ইংরেজ আমলে ১৯১২ সন পর্য্যন্ত একই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। বরং মুঘল আমলে সুবেদার বা নবাব-নাজিম এক হইলেও সুবে বাংলা ও সুবে বিহার আলাদা ছিল; কিন্তু ইংরেজ আমলে বাংলা ও বিহার একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একই শাসকের দ্বারা শাসিত হইত। বিহারই সর্ব্বপ্রথম বাংলা হইতে আলাদা হইবার জন্য দাবি জানায়।* ১৯১২ সনে বঙ্গভঙ্গ রদের সময় ইংরেজ সরকার কর্তৃক এই দাবি স্বীকৃত হয়। ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা বা উড়িষ্যা তৎকালে এইরূপ কোন দাবি করে নাই। কিন্তু ইংরেজ বাঙালীকে জব্দ করিবার জন্য সুবে বাংলার বাঙালী-অধ্যুষিত খানিকটা অংশ ও উড়িষ্যা বাংলা হইতে আলাদা করিয়া বিহারের সঙ্গে একত্রিত করিয়া বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ গঠন করেন। ১৯১৬ সনে হাইকোর্ট বিভক্ত হইল; পাটনায় নূতন হাইকোর্ট হইল। উড়িষ্যাবাসীকে মামলা-মোকদ্দমা করিতে হইলে কলিকাতা হইয়া পাটনায় যাইতে হইবে—এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কটকে পাটনা হাইকোর্টের দুই জন জজ মধ্যে মধ্যে বিচার করিতে আসিতেন। ১৯১৮ সনে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়—উদ্দেশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিহার থাকিবে না; শিক্ষার বিস্তার নয়। কারণ তৎকালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র পরীক্ষা লইত। তখন বিহারে মাত্র ছয়টি কলেজ ছিল। শিখাইবার ভার পূর্ব্বেও যেমন ছিল তেমনই রহিল। একটিও নূতন কলেজ স্থাপিত হইল না।

১৯২১ সনে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড প্রবর্ত্তিত নূতন শাসন-সংস্কারে লর্ড সিংহ বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে কোনও ভারতবাসী গবর্ণর নিযুক্ত হন নাই—তথাপি লর্ড সিংহ বাঙালী বলিয়া বিহার তাদৃশ আনন্দিত হন নাই। অন্য সব প্রদেশে প্রাদেশিক একজিকিউটিভ কাউন্সিলে সমানসংখ্যক ইংরেজ ও ভারতীয় নিযুক্ত হইল। কিন্তু বিহারে দুই জন ইংরেজ ও এক জন ভারতীয় নিযুক্ত হইল। বিহার ইহাতেও কোন আপত্তি জানাইল না।

১৯২১ সন হইতে ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যা একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিহার ধনবলে ও লোকবলে উড়িষ্যা অপেক্ষা বড়। মন্ত্রীমণ্ডলীতে কয়েক মাসের জন্য কটকের মধুসূদন দাস মহাশয় ব্যতীত সুদীর্ঘ ষোল বৎসরের মধ্যে অপর কোন উড়িষ্যাবাসী নিযুক্ত হইলেন না। সমস্ত মন্ত্রীর পদ বিহারবাসীরা লইল।

১৯৩৭ সনে উড়িষ্যা আলাদা হইল। অন্যান্য উড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চল উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হইল; কিন্তু সিংভূম জেলার কোলহান অঞ্চল উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হইল না। ওডোনেল কমিটি অজুহাত দেখাইলেন যে, সিংভূম উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন; মধ্যে উড়িয়া ভাষাভাষী বহু দেশীয় রাজ্য আছে।

১৯৪৭ সনে ইংরেজ ভারত পরিত্যাগ করিল; ১৯৫০ সনে ভারতের নূতন সংবিধান হইল। পূর্ব্বের বিহার প্রদেশ—মায় আদিবাসী-অধ্যুষিত ছোটনাগপুর বিভাগ ও বাঙালী-অধ্যুষিত সুবে বাংলার খানিক অংশ বিহার রাজ্য হইল।

বিহার বাংলা হইতে আলাদা হইবার পর হইতেই বিহারে বাঙালীদের বহু অসুবিধা সৃষ্টি হইতে লাগিল। "বিহারে বাঙালী" কথাটির কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করি। বাংলা দেশের, অর্থাৎ ইংরেজ আমলের অখণ্ড বাংলার অধিবাসী বিহারে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিলেও তিনি বাঙালীই রহিয়া গেলেন। আর যে সকল বাঙালী বহুকাল

---

* ১৯০৫ সনে যখন লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশ অত্যন্ত বড়, শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর তখন মহারাজা সর্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়া ঘাটার প্রাসাদে এক কনফারেন্সে ড. সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রমুখ বিহারী নেতারা বলেন যে, বাংলা প্রদেশ যদি ভাগই করিতে হয় তাহা হইলে বিহারকে আলাহিদা করিয়া দেওয়া হউক।

বহু পুরুষ ধরিয়া বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহে বসবাস করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাও বাঙালী রহিয়া গেলেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারা যায়, ভাগলপুর জেলার উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণ। ইঁহারা সম্রাট আকবরের রাজস্বসচিব রাজা টোডরমল্লের তকসীম জমা তৈয়ারি করিবার জন্য সরকার মুঙ্গেরে বসবাস আরম্ভ করেন।

ভাগলপুর কালেক্টরীর মহাফেজখানায় এখনও ফার্সী ভাষায় লিখিত শ্রীকণ্ঠ দত্তের ওরফে থাকো দত্তের বাংলায় সহিকৃত মূল আসল জমা তুমার ডবল চাবির ভিতর রক্ষিত আছে। তাঁহারা পোশাকে ও ভাষায় স্থানীয় লোকেদের সামিল হইয়া গিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ময়ূরাক্ষীর তীরবর্ত্তী বালিয়া পরগণা হইতে বহু পুরুষ পূর্ব্বে আগত যদুনাথ সিংহ তুলার মেরজাই গায়ে ও মাথায় পাগড়ি দিয়া সাক্ষ্য দিতেছেন:—"হামার নাম জদ্দনাথ সিং, বেলের সিং অছি; পরদাদা সাদির সময় মুলুক গিছলো, হামাদের দয়ভাগ হোবে।" ইঁহারাও বাঙালী রহিয়া গেলেন—চাকুরী ইত্যাদি পাইতে বা স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইলে ইঁহাদের বিহারবাসী বলিয়া গণ্য করা হয় না। পক্ষান্তরে সর্ ফজল আলি বারাণসী বিভাগের লোক হইলেও বিহারী বলিয়া গণ্য হন ও পাটনা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইলে বিহারীরা একজন বিহারী এই উচ্চপদ পাইয়াছেন বলিয়া আনন্দিত হন।

রামকৃষ্ণ মিশনকে দেওঘরে এক শত বিঘা জমি কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ দিবেন। স্থানীয় নিয়মে ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি লইতে হয়। এই অনুমতি চার বৎসরে পাওয়া যায় নাই। তৎপরে লেডী লিটন বিহারের লাটকে অনুরোধ করিলে এই অনুমতি দেওয়া হয়। যেন-তেন-প্রকারেণ বাঙালীকে অসুবিধায় ফেলা। জাষ্টিস গোপেন দাস দেওঘরে বাড়ী করিতেছেন। বিহারী ছাত্রেরা বলাবলি করিতেছে আবার 'শালা বাঙ্গালী' বাড়ি করিতেছে। ইহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, আমরাও শুনিয়াছি। এই ত মনোবৃত্তি।

বাঙালীর—তা তিনি বিহারের বাঙালী হইলেও, কোনও সরকারী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাইতে হইলে, স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইলে, বৃত্তি পাইতে হইলে ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে। আর এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাওয়া যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা সকলেই জানেন। বাংলার বাঙালীকে উত্তরপ্রদেশে বা মাদ্রাজে কিংবা বোম্বাইয়ে এইরূপ চাকুরী পাইতে হইলে কিন্তু তত্তদ্ প্রদেশের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাইতে হয় না। কংগ্রেসেও আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু বিহারে হইত ও এখনও হয়—নামে না হইলেও কাজে হয়। এ বিষয়ে অনেক আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট তখন তিনি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এই বিষয়ের ভার দেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় সর্ব্বভারতীয় নেতাও প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাকে এই বিষয়ে অনুযোগ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "I love Bengal, but I love Bihar still more."

অথচ বিহারের শ্রমিকদের বাংলায় ভাগীরথী তীরে চটকলে কাজ করিবার কোনও বাধা নাই। ১৯২১ সনের সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লিখিয়াছেন:

"Both among skilled and unskilled the province of Bihar and Orissa supplies very many more operatives than does Bengal itself."

এখন "সর্দ্দারী" প্রথা থাকায় আরও বিহারী আসিয়াছে।

বিহারে কি করিয়া বাঙালী বিতাড়ন করা হইয়াছে তাহার একটা উদাহরণ দিই। কোন কোম্পানী বিহার সরকারকে টাইপরাইটার যোগাইত ও ভাঙিয়া গেলে সারাইয়া দিত। তাঁহাদের বহু বাঙালী কর্ম্মচারী ছিল। বিহার সরকারের একজন মন্ত্রী এই কোম্পানীর ম্যানেজারকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তোমরা যদি বিহারী কেরাণী না রাখ তাহা হইলে তোমাদের কল লইব না বা তোমাদের উপর কল মেরামতের ভার দিব না। ম্যানেজার বলিলেন যে, এইবার হইতে বিহারী কেরাণী লইব। মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তাহা হইবে না—বাঙালী কেরাণী ছাড়াইয়া তাহাদের স্থলে বিহারী কেরাণী লউন। ম্যানেজারকে ব্যবসা রাখিতে এই উপদেশ বা আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইল।

বিহারের কোন জেলায় সরকারী উকীল বাঙালী। কোন ফৌজদারী দায়রা মোকদ্দমায় ইংরেজ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিদ করিয়া আসামীকে সাজা দিবার জন্য পুলিসী মিথ্যা সাক্ষ্য দেন। হাইকোর্টে আসামী খালাস পায়। বিহার বিধান সভায় কেন বাঙালী উকীল এইরূপ মামলা চালান বলিয়া প্রশ্ন করা হয়? পরে তাঁহাকে এই পদ হইতে অপসারিত করা হয়। কিন্তু ইংরেজ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বেলায় উচ্চবাচ্য করা বিহারীরা উচিত মনে করে নাই।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহারে আসিলে বিহারীরা মায় বিহারের সরকার পর্য্যন্ত বাঙালীদের উপর কিরূপ অত্যাচার করিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিহারের মন্ত্রী চিঠি লিখিলেন যে, যদি তোমরা বাঙালীকে জমি বন্দোবস্ত কর তাহা হইলে তোমাদের সরকারী জঙ্গলে যে সুযোগ-সুবিধা আছে তাহা দিব না। বিহার পশ্চিমবঙ্গকে এক ইঞ্চি

ভূমি দিবে না—ইহাই তাহার পণ। কিষণগঞ্জে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতেছে এখনও।

এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিহারের সহিত একীকরণের কথা উঠে কেন? হইলে কি পশ্চিমবঙ্গের কোনওরূপ হিত হইবে? আমরা মুসলমানদের কুৎসিত মনোবৃত্তির জন্য বাংলা বিভাগ করিয়া পাকিস্থান মানিয়া লইয়াছি কিন্তু সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্যের খাতিরে শরৎচন্দ্র বসুর "স্বাধীন বাংলা" স্বীকার করি নাই। এখন কি জন্য এই একীকরণ মানিয়া লইব?

সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্যের আদর্শ—কে অনুসরণ করে?

আমরা সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্যের কথা এবং সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্যের দোহাই প্রায়ই শুনিতে পাই। ঐক্য ভাল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ঐক্য যদি শুধু বাক্যেই আবদ্ধ থাকে ত ফল ভাল হয় না। ঐক্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার বা সত্যের স্বীকৃতি দেখিতে পাই না—দেখি কেবল বড় বড় বুলি বা শ্লোগান। বাঙালীর 'বাঙালীপনা' নাকি দোষের। কিন্তু বিহারে যখন দেখি বাভন, রাজপুত, লালা ও "ত্রিবেণী সঙ্ঘে"র (আহির, কাহার ও কুর্ম্মী লইয়া গঠিত) দলাদলি ও তাহার ফলে রাজ্য সরকারের চাকুরী, কণ্ট্রাক্ট হইতে কংগ্রেসের 'ভুয়া' সদস্য সংগ্রহ পর্য্যন্ত ভাগাভাগি তখন ত বড়কর্ত্তাদের মুখের বুলি ছাড়া আর কোনও কার্য্য করিতে দেখি না।

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলে পনের জনের মধ্যে একমাত্র "একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি" বাঙালী চারুচন্দ্র বিশ্বাস। তোমরা বাঙালীরা হিস্যার বেশী দাবি করিও না—করিলে পাইবে না। তোমাদের মধ্যে যোগ্য লোকের নাকি অভাব। আর উত্তরপ্রদেশের বেলায়? ও প্রশ্ন করিও না—উহাতে সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা উপরোক্ত হিসাবে ক্যাবিনেট পদমর্য্যাদার মন্ত্রী কিন্তু ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন এইরূপ পাঁচ জন মন্ত্রীদের ধরি নাই। ইঁহাদের ধরিলে অনুপাত শতকরা পাঁচ জনে দাঁড়ায়।

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীতে একজন হিন্দীভাষী মন্ত্রী আছেন। বিহারে আছেন এক জন উপমন্ত্রী যিনি বাঙালী। যিনি উপমন্ত্রী তিনি ওকালতি করিবার সময় ড. শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সিনিয়র ছিলেন। এই ত বাঙালীর সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে দর।

মন্ত্রিমণ্ডলীতে বাঙালীর স্থান সম্বন্ধে আপাত্ত উঠিতে পারে যে, মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে হইলে প্রথমেই তাঁহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (বর্ত্তমানে কংগ্রেসের) লোক হওয়া চাই; তাহার পর তাঁহার যোগ্যতা থাকা চাই; তাহার পর দল রাখিতে হইলে নানা বিষয়ে ভাবিতে হইবে ইত্যাদি।

এইবার সাধারণ লোকের মধ্যে সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের আদর্শ কিরূপ স্থান লাভ করিয়াছে দেখা যাক। কংগ্রেস একটি সর্ব্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান; জাতীয় ঐক্যের ধারক, বাহক ও প্রচারক। যে যে স্থান হইতে কংগ্রেসী প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেই সেই স্থানে জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসী সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্যের ভাব প্রবল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ভাটপাড়া, টিটাগড়, কলিকাতার বড়বাজার ও জোড়াবাগান এলাকায় হিন্দী ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালী সংখ্যায় কম ও প্রতিপত্তিতে হীনবল। এই চারি স্থানে গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী কর্ত্তারা—যাঁহাদের মধ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধানতম, কোনও বাঙালীকে কংগ্রেসী ছাপ দিতে সাহস করেন নাই, ছাপ দিয়াছেন হিন্দী ভাষাভাষীদের। কারণ তাঁহারা জানিতেন বাঙালীকে কংগ্রেসী ছাপ দিলেও হিন্দী ভাষাভাষীরা সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্যের খাতিরে ভোট দিবেন না—কংগ্রেসের পরাজয় হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ ভাটপাড়ার কথা ধরা যাক।

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
লোকসংখ্যা	৮৮,০২৫	৪৬,৮৭৬	১,৩৪,৯০১
বাংলা ভাষাভাষী	২১,৭২৬	১৯,৬৮১	৪১,৪০৭
হিন্দী "	৫৪,৪৫১	২০,২৪২	৭৪,৬৯৩
উর্দ্দু "	৬,৯৭৮	৫,৫৮৫	১২,৫৬৩
মোট হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাভাষী	৬১,৪২৯	২৫,৮২৭	৮৭,২৫৬

সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩০·৭ জন বাঙালী; হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাভাষীরা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬৪·৭ জন। বাঙালীরা স্থায়ী অধিবাসী বলিয়া স্ত্রীলোকের অনুপাত তাহাদের মধ্যে বেশী। প্রতি ১,০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের অনুপাত ৯০৭ জন করিয়া। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাভাষীরা স্থানীয় কলকারখানার শ্রমিক, স্থায়ী বাসিন্দা নহে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া সকলে বাস করেন না, এজন্য তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত কম; প্রতি ১,০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের অনুপাত ৪২১ জন করিয়া।

হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাভাষীদের মধ্যে বালক-বালিকাদের সংখ্যা খুব কম। তাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে রোজগার করিতে এদেশে আসেন না। এজন্য ২১ বৎসরের অধিক বয়স্ক ভোটারদের মধ্যে তাঁহাদের অনুপাত ৬৪·৭-এর ঢের বেশী। আর বাঙালীদের মধ্যে অনুপাত ৩০·৭-এর অনেক কম; ২০এর কাছাকাছি।

অন্যান্য নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অনুরূপ তথ্য দিতে পারিলাম না, যেহেতু সেন্সাসে এইরূপ তথ্য দেওয়া নাই।

যত দূর পারি একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

টিটাগড় নির্ব্বাচন-কেন্দ্র টিটাগড় ও ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া গঠিত। এই দুই মিউনিসিপ্যালিটির জনসংখ্যা যথাক্রমে এইরূপ :

টিটাগড়	৭১,৬২২
ব্যারাকপুর	৪২,৬৩৯
মোট	১,১৪,২৬১

কিন্তু হিন্দী ও উর্দু ভাষাভাষীদের সংখ্যা যেখানে দেওয়া আছে সেখানে টিটাগড়ের সহিত দূরবর্ত্তী হালিসহর ও নৈহাটির যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর ব্যারাকপুরের সহিত গাড়ুলিয়া, উত্তর ব্যারাকপুর ও ইছাপুর যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টিটাগড় মিউনিসিপ্যালিটিতে সরকারী মনোনয়ন-প্রথা তুলিয়া দিবার পর হইতে হিন্দী ভাষাভাষী চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইতেছেন। ইহার কারণ হিন্দীভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই দুই মিউনিসিপ্যালিটির ভোটার তালিকা দেখিলে দেখা যায় শতকরা ৬০ জন অবাঙালী।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বড়বাজার এবং জোড়াসাঁকো ওয়ার্ড লইয়া বড়বাজার ও জোড়াসাঁকো নির্ব্বাচন-কেন্দ্র। কিন্তু নির্ব্বাচন-কেন্দ্র ওয়ার্ড অনুসারে গঠিত নহে। বড়বাজার নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে জোড়াসাঁকোর কতকটা অংশ লওয়া হইয়াছে। এজন্য এই দুইটি ওয়ার্ডকে একত্রে লইয়া তথ্যাদি দিব :

	লোকসংখ্যা		হিন্দী ও উর্দু ভাষীদের সংখ্যা
	১৯৫১	১৯৩১	১৯৩১
বড়বাজার	৫৩,৮৪৬	৩৮,৬৯০	১২,৯৮২
জোড়াসাঁকো	১১৯,০৭০	৪৬,১১৬	১০,৪০৮

১৯৩১ সনে সমগ্র কলিকাতায় হিন্দী ও উর্দু ভাষাভাষীদের সংখ্যা ছিল ৪৩৬,১২৩ জন ; ১৯৫১ সনে হইয়াছে ৬৮৮,২৯২। ২৫২,১৬৯ জন হিন্দী ও উর্দু ভাষাভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই দুই ওয়ার্ডে ২০ বৎসরে (১৯৩১-৫১) লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ১০৮,১১০। ইহার খুব বড় রকম একটা অংশ হিন্দী ও উর্দু ভাষাভাষীদের জন্য। কলিকাতা কর্পোরেশনের যে ফ্রি প্রাইমারী স্কুল আছে বড়বাজারে তাহার সব কয়টিতে হিন্দী পড়ান হয়। জোড়াসাঁকোয় অর্দ্ধেকগুলিতে হিন্দী ও উর্দু পড়ান হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হিন্দী ও উর্দু ভাষাভাষীদের অনুপাত আরও বেশী—কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া বাস করেন না। ইহা হইতে বুঝা যাইবে এই দুই অঞ্চলে হিন্দী ও উর্দু ভাষাভাষীদের প্রাধান্য কিরূপ। প্রতিপত্তির কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

মুসলমানদের মধ্যেও অনুরূপ মনোবৃত্তি আছে। ২৪-পরগণা জেলার স্বরূপনগর ও দেগঙ্গা নির্ব্বাচন-কেন্দ্র বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর ও দেগঙ্গা থানা লইয়া গঠিত। এই তিন থানায় মুসলমানদের শতকরা অনুপাত নিম্নে দেওয়া হইল :

১৯৪১ সনে

	শতকরা
স্বরূপনগর দেগঙ্গা বাদুড়িয়া	৬১·৩

এই দুই নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে দুই জন মুসলমান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৫১ সনের অঙ্ক পাওয়া যায় নাই বলিয়া দেওয়া গেল না।

গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া গার্ডেনরীচ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র। মুসলমানেরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। গার্ডেনরীচ কমিটির মতে ১৯৩৩ সনে তাঁহারা শতকরা ৫৩ জন ছিলেন। তখন লোকসংখ্যা ছিল ৫৬,০০০। আর এখন হইয়াছে ১০৯০০০ মুসলমানদের অনুপাত বাড়িয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস একজন মুসলমানকে দাঁড় করাইয়াছেন—যদিও তাঁহার অযোগ্যতার জন্য তাঁহার চেয়ারম্যান থাকাকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটিতে এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করিয়াছেন। আরও উদাহরণ আছে।

বাঙালী হিন্দুর কিন্তু এইরূপ মনোবৃত্তি নাই। বীরভূম জেলার নান্নুর নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে শ্রীবসন্তলাল মুরারকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ব্যারাকপুর নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে বাঙালী ভোটারের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের আত্মীয় রামানন্দ দাসকে দিল্লীর এম-পি নির্ব্বাচিত করিয়াছে। আরও উদাহরণ দেওয়া যায়।

বাঙালী সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের খাতিরে বরং বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হউক, তথাপি শরৎচন্দ্র বসু ও সুরাবর্দী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত স্বাধীন সার্ব্বভৌম অখণ্ড বাংলা চাহে নাই।

সংযুক্ত রাজ্যে বাঙালীর অবস্থা

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৪০২,২৫,৯৪৭ ও ২৪৮,৬০,২১৭ জন করিয়া। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারের লিখন-পঠনক্ষমদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯,২১,৬৩৪ ও ৬১,১৯,০৪৯। শতকরা হিসাবে বিহারে লিখন-পঠনক্ষমদের

অনুপাত ১১·৯ ; আর পশ্চিমবঙ্গে ২৪·৬। এই সংখ্যা হইতে যাঁহারা কেবলমাত্র লিখন-পঠনক্ষম ও যাঁহারা মধ্য-স্কুল অবধি পড়িয়াছেন তাঁহাদের বাদ দিলে অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেট ও তদূর্দ্ধ যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা যথাক্রমে বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ :

বিহারে— ২,৬৩,৬২৫ জন।
পঃ বঙ্গে—৬,০০,৭৪৯ জন।

ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গ্রাজুয়েট বা তদূর্দ্ধে পড়িয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা বিহারে ৫২,১৩৭ জন ; আর পশ্চিমবঙ্গে ১৩৫,৯৪৮ জন ; অর্থাৎ বিহারের আড়াই গুণ।

এই দুইটি রাজ্য একত্রিত হইলে বিধানসভায় বিহারের সভ্যরা বরাবর সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবেন। তাঁহারা যদি দাবী করেন যে, লোকসংখ্যার অনুপাতে এই সব শিক্ষিতদের মধ্যে সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে (যেমন কলিকাতা কর্পোরেশনে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে) চাকুরী দিতে হইবে, তাহা হইলে কি যুক্তি দিয়া এই দাবী ঠেকানো যাইবে ? অখণ্ড বঙ্গে মুসলমানেরা শতকরা ৫৪ জন ছিলেন ; তাঁহারা যখন এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকারী চাকুরী, সরকারী কণ্ট্রাক্ট, সরকারী পারমিটে দাবী করিতেন, তখন আমরা বাঙালী হিন্দুরা কি করিয়াছিলাম ? পশ্চিমবঙ্গের বিহার ভুক্তির পরে হিন্দী ভাষাভাষীরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬·৬ হইবেন ; আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা হইব শতকরা ৩৫·২ জন। এই শতকরা ৩৫·২ জনের মধ্যে আছেন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান—ইঁহাদের অনুপাত হইবে শতকরা ৭·০ জন করিয়া। চাকুরী বণ্টনের সময় মুসলমানদের দাবীর ন্যায় হিন্দী ভাষাভাষীরা দাবী তুলিলে আমরা কি করিব ?

একেই ত আমাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী ; আর এই সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। তাহার উপর রাজ্য একীকরণের ফলে চাকুরীতে যদি অর্দ্ধেকের উপর বিহারীদের ভাগ দিতে হয় তাহা হইলে আমরা যাইব কোথায় ? আমাদের ছেলেরা খাইবে কি ?

প্রস্তাবিত একীকরণের একটি বিশদ ব্যাখ্যা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৬ তারিখে সাংবাদিক মহলে দিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, উভয় রাজ্যের একজন রাজ্যপাল ও একটি বিধানসভা থাকিবে। আমাদের ভারতরাষ্ট্র একটি গণতন্ত্র, সুতরাং যাহার ভোটের জোর তিনিই দেশ শাসন করিবেন। নিম্নে আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের লোকসংখ্যা, হিন্দী ভাষাভাষী ও বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা দিলাম :

পঃ বঙ্গ (চন্দননগরসহ)		বিহার
২৪৮,৬০,২১৭	মোট লোকসংখ্যা	৪০২,২৫,৯৪৭
২০,৩৮,৭০৫	হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাভাষী	৩৪৮,১৭,১৩৩
২১০,৩৯,৬০১	বাংলা ভাষাভাষী	১৭,৫৯,৭১৯

সংযুক্ত রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা হইবে ৬৫০,৮৬,০০০ হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাভাষীদের সংখ্যা হইবে ৩৬৮,৫৬,০০০ আর বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা হইবে ২,২৮,০০০,০০। শতকরা হিসাবে সমগ্র জনসংখ্যার ৫৬·৬ জন হইবে হিন্দী ভাষাভাষী ; আর বাংলা ভাষাভাষী হইবে ৩৫·২ জন। হিন্দী ভাষাভাষীরা বাঙালীদের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী হইবেন ১,৪০,৫৬,০০০ জন। ইহা হইল ১৯৫১ সনের সেন্সাসের হিসাব। বিহারের সেন্সাসে বহু বাংলা ভাষাভাষীকে জোর করিয়া হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া দেখান হইয়াছে। ধরিয়া লইলাম বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা বিহারে অর্দ্ধেক দেখান হইয়াছে। তথাপি হিন্দী ভাষাভাষীরা বাংলা ভাষাভাষীদের অপেক্ষা ১০৬ লক্ষ বেশী হইবেন।

ভোটের ক্ষেত্রে এই অনুপাত আরও বাড়িবে। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ২১ বৎসর বয়স্ক লোক ভোটাধিকার পাইয়াছে। সেন্সাস রিপোর্টে যে বয়স বিভাগ দেওয়া আছে তাহাতে ২১ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক লোকের হিসাব পাওয়া যায় না ; তাঁহারা ১৫ হইতে ২৪-পর্য্যন্ত বয়সের লোকের একত্রিত হিসাব দিয়াছেন। যাহারা ২৪এর উপর তাঁহাদের অনুপাত পশ্চিমবঙ্গে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৪৪·৯ ; আর বিহারে ৪৫·৮। এই হিসাব হইতে বলা যায় যে, ভোটারদের মধ্যে বিহারীদের অনুপাত বাঙালীদের অনুপাত অপেক্ষা শতকরা দুই জন করিয়া বেশী হইবে।

অখণ্ড বঙ্গে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে নাবালকের সংখ্যা ও অনুপাত বেশী ছিল। ফলে সাবালক ধরিলে হিন্দুর সঙ্গে সংখ্যায় সমান হয়। এজন্য ১৯৩০ ও ১৯৩১ সনের গোলটেবিল বৈঠকের সময় লেখক স্বর্গীয় ড. বালকৃষ্ণ সদাশিব মুঞ্জেকে একটি স্মারকলিপি পাঠান। তিনি এই স্মারকলিপিটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, উদারনৈতিক দলের আইজাক ফুট প্রভৃতিকে দেন। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনাকালে আইজাক ফুট মুসলমানদের সম্বন্ধে বলেন যে, তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাবালকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, এবং র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাহা স্বীকার করেন। (গোলটেবিল বৈঠকের মাইনরিটি কমিটির প্রোসিডিংস দ্রষ্টব্য)। বাংলার মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে বেশী আসন-সংখ্যা লাভ করেন। আমরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি

যে, তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাবালক লইয়া। ক্ষমতা আমাদের অনুকূল না থাকিলেও যুক্তি ছিল আমাদের পক্ষে।

কিন্তু বিহারীদের বিরুদ্ধে আমাদের না থাকিবে ক্ষমতা না থাকিবে যুক্তি। বিষয়টি ভাবিবার।

সংযুক্ত বিধানসভায় বাঙালীদের আসন শতকরা ৩৫·২এর কম হইবে আরও একটি কারণে। প্রত্যেক ১ লক্ষ লোকের জন্য একটি করিয়া আসন। কিন্তু বিহারে বাঙালীরা একমাত্র মানভূম, বালভূম ও সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ বাদে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছেন। কোন নির্ব্বাচন কেন্দ্রেই তাঁহারা ৫০,০০০ নহেন। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী ভাষাভাষীরা অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচটি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে একত্রীভূত হইয়া আছেন—তাঁহাদের সংখ্যা ৫০,০০০-এর উপর। পশ্চিমবঙ্গের দার্জ্জিলিং জেলায় বাঙালীরা ছড়াইয়া আছেন; জলপাইগুড়ির দুই-একটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে তাঁহাদের সংখ্যা এমন নহে যে, তাঁহারা বিধানসভায় আসন নিশ্চিতই পাইবেন।

বিহারের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। "Bihar: Facts and Figures" নামক বিহার সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে লিখিত আছে:

"Since 1921, Bihar's population has gone up by 110 lakhs.

..

"Bihar's population was growing at the average rate of roughly 1 per cent in five years between 1881 and 1920; it has grown at the rate of 1.6 per cent per annum since 1921. This does not take into consideration about 1.5 million persons who have been lost to us due to migration."

অর্থাৎ, ১৯২১ সন হইতে বিহারের জনসংখ্যা ১১০ লক্ষ বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে ১৮৮১ হইতে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত প্রতি পাঁচ বৎসরে গড়ে জনসংখ্যা বাড়িত মোটামুটি শতকরা ১ করিয়া। ১৯২১ সন হইতে প্রতি বৎসরে শতকরা ১·৬ করিয়া বাড়িতেছে। এই হিসাবের ভিতর যে ১৫ লক্ষ বিহারী প্রদেশের বাহিরে গিয়াছে তাহাদের ধরা হয় নাই।

আর পশ্চিমবঙ্গে ১৯২১ সন হইতে উদ্বাস্তু ধরিয়া লোক বাড়িয়াছে ৮৪ লক্ষ। উদ্বাস্তু বাদ দিলে লোক বাড়িয়াছে ৬৩ লক্ষ। ইহার মধ্যে যাঁহারা বাংলার বাহির হইতে আসিয়াছেন এইরূপ ১৯ লক্ষ লোক আছেন। ইঁহাদের বাদ দিলে লোক বাড়িয়াছে ৪৪ লক্ষ—অর্থাৎ প্রতি বৎসরে শতকরা ·৯ করিয়া। বিহারের বৃদ্ধি অপেক্ষা ইহা অনেক কম।

এই হারে বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে লোক বাড়িতে থাকিলে সংযুক্ত রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করিয়া বাঙালীর মূল্য আরও কমিয়া যাইবে। ১৯৫১ সনে পশ্চিমবঙ্গের মূল্য যদি ৩৮·১ হয় ১৯৬১ সনে হইবে ৩৬·৩। বাঙালীর মূল্য আরও কম। বাঙালীরা শিক্ষিত, বেকার—এজন্য ভারত সরকার প্রবর্ত্তিত জন্মনিরোধ ব্যবস্থা তাহারা অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছে। বাঙালীর মূল্য দ্রুততর তালে কমিয়া যাইবে। আগামী ২৫ বৎসরে এই সংখ্যা ৩৫ হইতে ২৫-এ নামিয়া আসাও বিচিত্র নয়। গত ৩০ বৎসরে বাঙালীর বিবাহের বয়স ১০ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে; বিহারে সামান্য বাড়িয়াছে। গড়ে বাঙালীদের মধ্যে সন্তান সংখ্যা কম; বিহারে বেশী।

কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে হিন্দুরা ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছেন। কালক্রমে সকল হিন্দুই পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভারতরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবেন। তখন আমাদের বাঙালীদের সংখ্যা হিন্দী ভাষাভাষীদের অপেক্ষা বেশী না হইলেও সমান সমান হইবে। পাকিস্থান সেন্সাস রিপোর্ট নং ২ হইতে জানা যায় যে, ১৯৫১ সনে সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্থানে তপসীলী সমেত বর্ণহিন্দুর সংখ্যা হইতেছে ৯২ লক্ষ ৩৯ হাজার। এই ৯২ লক্ষ লোক সকলেই যদি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন তাহা হইলেও কেবলমাত্র হিন্দী ভাষাভাষীরা বাঙালীদের অপেক্ষা অন্ততঃ পক্ষে ১৪ লক্ষ বেশী থাকিবেন।

সংযুক্ত রাজ্যে হিন্দী ভাষাভাষীরা শতকরা ৫৬·৬ জন। তাঁহারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপর সকলে মিলিয়াও শতকরা ৪৩·৪ জন। বাংলা ভাষাভাষীরা মাত্র শতকরা ৩৫·২ জন। আদিবাসীরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইব না। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে গুর্খা লীগ দার্জ্জিলিং জেলা যাহাতে বিহারভুক্ত হয় তাহার জন্য আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। সংযুক্ত রাজ্যে তাঁহারা বিহারীদের সঙ্গে যোগ দিলে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে।

মুসলমানরা কি করিবে?

এইবার মুসলমানদের কথা আলোচনা করা যাক। বিহারে মুসলমানদের সংখ্যা ৪৫,৬৪,৪৬৬ জন। মুসলমানেরা বিহারের লোকসংখ্যার শতকরা ১১·৩ জন। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা ৪৯,২৭,২৮৭ জন। এখানে মুসলমানেরা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ১৯·৮ ভাগ। সংযুক্ত রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ও অনুপাত হইবে ৯৪,৯১,৭৫৩ জন ও শতকরা ১৪·৪।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমানগণ দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে ৪০ বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছেন। শেষ দশ বৎসর অখণ্ড বঙ্গে তাঁহারা ছিলেন "রাজার নন্দিনী প্যারী যা কর তা শোভা পায়।"

১৯৪৬ সনের তাৎপর্য্যপূর্ণ নির্ব্বাচনে তাঁহারা পাকিস্থানের স্বপ্নে বিভোর হইয়া মুসলিম লীগকে ভোট দিয়াছিলেন। দেশ বিভাগের ফলে তাঁহাদের সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেলেও ভারতরাষ্ট্রের প্রতি ষোল আনা আনুগত্য নাই। তাঁহাদের অনেকেরই আত্মীয়স্বজন পূর্ব্ব পাকিস্থানে বাস করেন, আবার অনেকের বাড়ীঘর পশ্চিমবঙ্গে থাকিলেও পাকিস্থানে চাকুরী করেন। তাঁহাদের প্রকৃত মনোভাব যে কি তাহা কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজার আলিগড়ের বক্তৃতা হইতেই বুঝা যায়।

তাঁহারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য বাঙালী-বিহারীর প্রভেদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন; কখনও এ দলে কখনও ও দলে যোগ দিবেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী হিন্দু সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে পারিবে না। তাঁহারা ভারতরাষ্ট্রের ক্ষতি করিবার মানসে বাঙালী ও বিহারীর মধ্যে যে ভেদ আছে বা হইবে তাহা উস্কাইয়া দিতেও পারেন। আর এই আশঙ্কা অসঙ্গতও নয়। ভারতরাষ্ট্রের মুসলমান মেজর-জেনারেল সরকারী চাকুরী হইতে অল্পবয়সে পেনসন লইয়া পাকিস্থান সেনা-বিভাগে যোগদান করিলেন। দেরাডুন জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমীর ছাত্রদের খাদ্যে মুসলমান বাবুর্চ্চি বিষ মিশাইয়া দিল—ফলে বহু ছাত্রের অসুখ ত করিলই কয়েকজন মারা গেল। স্বাধীনতা দিবসে ভারতের স্থানে স্থানে পাকিস্থানী ঝাণ্ডা উঠিল। এমনকি নিজাম বাহাদুর—যিনি তিন কোটি টাকা করিয়া বার্ষিক ভাতা পাইতেছেন ও হায়দ্রাবাদের রাজপ্রমুখ হিসাবে ভারতরাষ্ট্রের আনুগত্য শপথ করিয়াছেন—একটি দেশদ্রোহকর উর্দ্দু কবিতা লিখিলেন। হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে যেদিন ভারত সরকার সৈন্য অভিযান করেন সেই দিন বিহারের মুসলমান পুলিস ইনসপেক্টর-জেনারেলের ঘর হইতে একটি শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার অপহৃত হয়—চোর এ যাবৎ ধরা পড়ে নাই।

মৈথিলীরা কোন্ পক্ষে ?

বিহারে যে হিন্দী বলা হয় তাহার তিনটি শাখা। এ কথাও বলা চলে যে, তিনটি ভাষাকে একত্রিত করিয়া বিহারে তাহাকে হিন্দী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভাষা-তত্ত্বের খুঁটিনাটি বিচার করিবার দরকার নাই; এই তিনটি ভাষা হইতেছে মৈথিলী বা তিরহুটিয়া, মাগধী বা মঘাই, এবং ভোজপুরী। রাঁচি, পালামৌ, সাহাবাদ, সারণ ও চম্পারণ জেলার লোক ভোজপুরী বলে। হাজারীবাগ, গয়া, পাটনা, দক্ষিণ মুঙ্গের ও সাঁওতাল পরগণায় মঘাইয়ের চলন। মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও উত্তর মুঙ্গেরে মৈথিলীর চল। ড. গ্রিয়ারসন বিহারে এই তিন ভাষার হিসাব এইরূপ করিয়াছেন:

		শতকরা
মৈথিলী	—৯২ লক্ষ	৩৯.২
মঘাই	—৭১ „	৩০.৪
ভোজপুরী	৭১ „	৩০.৪
মোট	২৩৪ „	

ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের কথা বটে, কিন্তু মৈথিলী, মঘাই ও ভোজপুরীর পারস্পরিক অনুপাত উপরোক্ত রূপই থাকিবে—বিশেষ তারতম্য হইবে না।

বর্ত্তমানে হিন্দীভাষীরা বিহারের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮৬.৬ ভাগ। আর ইহাদের মধ্যে মৈথিলীরা শতকরা ৪০ ভাগ; অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৪ বা ৩৫।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট মৈথিলীদের মধ্যে কেহ কেহ মিথিলা রাজ্য হউক বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন ও স্মারক-লিপি পেশ করিয়াছিলেন। মিথিলার তথা গঙ্গার উত্তর পারের লোকেদের গঙ্গার দক্ষিণ পারের বিহারীরা তাদৃশ কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি শিক্ষা-বিষয়ক সুযোগ সুবিধা দেন না। এজন্য মিথিলাবাসীরা বিহার মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর, বিশেষ করিয়া এক কথায় বলিতে গেলে মাগধী বিহারীদের উপর সন্তুষ্ট নহেন। ইহাই হইল তাঁহা-দের আলাদা মিথিলা রাজ্য দাবীর হেতু।

সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙালী ও কয়েক জন বড় ব্যারিষ্টারকে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য একীকরণ হইলে হিন্দী ভাষাভাষীরা এই সংযুক্ত রাজ্যে প্রাধান্য লাভ করিবেন না; কারণ মৈথিলীরা আমা-দের দলে আসিবেন। তাঁহারা আমাদের দলে আসিলে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইব। মৈথিলী অক্ষর বাংলা অক্ষরের ন্যায়—সহজেই আমাদের মিল হইবে। বাংলা ও অসমীয়ার একই অক্ষর—এক পেটকাটা 'ব' ছাড়া, তথাপি অসমীয়ারা আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছে।

প্রথম কথা, মৈথিলীদের অপর বিহারীদের উপর ক্ষোভ বা রাগ থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা আমা-দের—বাঙালীদের সঙ্গে সর্ব্বদাই যোগ দিবেন কেন? আমরা যাহারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা পূর্ব্ববঙ্গের বাঙালীদের "বাঙাল" বলিয়া ঠাট্টা করি, বেশী চাকুরী পাইলে রাগ করি; কিন্তু তাই বলিয়া কি যখন তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে চলিয়া আসিতেছেন তখন তাঁহাদের আশ্রয় দিতেছি না বা তাঁহাদের কথা ভাবিতেছি না? সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে; শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের যে সব সুযোগ দেওয়া হইতেছে

তাহাও পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচিত সদস্যরা তথা মন্ত্রিমণ্ডলীই দিতেছেন। মৈথিলীদের যত ক্ষোভ বা রাগ অপর বিহারীদের উপর থাকুক না কেন, তাঁহারা হিন্দী ভাষাভাষী। অপর বিহারীদের সহিত হাত মিলাইয়া আমাদের—বাঙালীদের কোণঠাসা করা কি তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইবে না? অপর বিহারীরা যদি তাঁহাদের বলেন যে, বাঙালীকে কোণঠাসা করিয়া আমরা যে সব সুযোগ-সুবিধা পাইব তাহার একটি "সিংহ ভাগ" (lion's share) তোমাদিগকে দিব, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন?

গত ৪০।৪৫ বৎসর মৈথিলীগণ বাংলা হইতে আলাদা হইয়াছেন এবং অপর বিহারীগণের সহিত একত্রে কাজ করিতেছেন। তাহার উপর আছে ভাষাগত, কৃষ্টিগত ও সামাজিক সম্বন্ধ। এ ক্ষেত্রে মৈথিলীদের বাঙালীদের সহিত হাত মেলানো বেশী সম্ভব, না অপর বিহারীদের সহিত?

দ্বিতীয় কথা, বিহারের বিহারীদের মধ্যে এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া বাঙালীদের যোগদান করা উচিত হইবে না। ইহাতে ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হইবে; আর অবশেষে আমাদের বাঙালীদের পশুপক্ষীর ঝগড়ায় বাদুড়ের যে দশা হইয়াছিল সেই দশা হইবে। আমরা যদি এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যোগদান করি, তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বিহারীরাও আমাদের ঘর ভাঙাইবে, মুসলমানদের ক্ষেপাইবে; গুর্খা-লীগকে ক্ষেপাইবে; উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গে ভেদ আনাইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, সকল বিহারীই 'বঙ্গালি মছলী খোর' অর্থাৎ মৎস্যাশী বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করে।

তৃতীয় কথা ও বড় কথা, মৈথিলীদের হাতে রাখিতে হইলে তাঁহাদের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে হইবে। ফাইনান্স কমিশনের হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত ট্যাক্সের পরিমাণ এইরূপ ঃ

	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	গড়
বিহার	৩·৬ টাকা	৩·৮ টাকা	৩·৭ টাকা
পঃ বঙ্গ	৯·৪ "	৯·১ "	৯·৩ "

মিথিলা অনুন্নত অঞ্চল। নেপাল হইতে যে সব নদী মিথিলার মধ্য দিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে তাহাতে প্রায়ই বন্যা হয়; শিক্ষায়ও অনগ্রসর। সমগ্র বিহার সায় আদিবাসী ধরিয়া লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির অনুপাত ১১·৯, আর মিথিলায় ৯·৯। মৈথিলীদের দলে রাখিতে হইলে তাঁহাদের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। বিহার বলিল, মিথিলার জন্য এক টাকা ব্যয় হউক, আমাদের বলিতে হইবে এক টাকা চার আনা হউক, বিহারীরা বলিবে ব্যয় হয় হউক তোমরা বাঙালীরা টাকা দাও। ফলে আমরা ট্যাক্স দিব বেশী, ফল পাইব কম।

কে বেশী রাজস্ব দেয়?

আমরা মাথাপিছু ৯·৩ টাকা ট্যাক্স দিই। আড়াই কোটি লোকে আমরা দিব সওয়া তেইশ কোটি টাকা, আর বিহার দিবে চার কোটি লোকে পনের কোটি টাকা। ইহা ছাড়া আমরা আরও বেশী টাকা রাজস্ব দিই। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বাজেটে গত কয়েক বৎসরের রাজস্ব এইরূপ ঃ

কোটি টাকায়

	১৯৪৯-৫০	৫০-৫১	৫১-৫২	৫২-৫৩	৫৩-৫৪	৫৪-৫৫
পঃ বঙ্গ	৩৪·৭	৩৩·৯	৪০·১	৩৭·৫	৩৮·৮	৩৯·৯
বিহার	২৬·৫	২৬·৩	৩৪·২	৩৬·২	৩৬·৬	৩২·১
পঃ বঙ্গ বেশী দেয়	৮·২	৭·৬	৫·৯	১·৩	২·২	৭·৮

রাজ্য দুইটি একীকরণ হইলে সব টাকা একই ভাঁড়ে পড়িবে। খরচের বেলায় যাহার ভোট যত সে পাইবে তত, যাহার লোকসংখ্যা বেশী তাহার দরকার তত বেশী বলিয়া দাবি উঠিবে। খরচও করিতে হইবে। কারণ আমাদের Welfare State—to each according to his need, ব্যবস্থা হইবে এইরূপ ঃ—"যে আইল চ'সে, সে রহিল ব'সে; নেপোয় মারলে দই।" ডাঃ রায় ত বলিয়াছেন, কোনরূপ রক্ষাকবচ সংযুক্ত শাসন-পদ্ধতিতে থাকিবে না। বাঙালীদের সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হইবে।

রাজধানী কোথায় হইবে?

আমাদের ভারতরাষ্ট্রের সংবিধানে রাজধানী কোথায় হইবে তাহার ব্যবস্থা নাই। দিল্লীতে রাজধানী আছে, রহিয়া গেল। আজ যদি পার্লামেণ্ট বলেন যে, রাজধানী দিল্লী হইতে উঠিয়া অন্যত্র যাইবে—কোনও বাধা নাই। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় আছে, কলিকাতায় রহিল। সরকার যদি খরচ মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারেন রাজধানী দার্জ্জিলিঙে চলিয়া যাইতে পারে। অনেক সময় বিধানসভা বা বিধান পরিষদের আইনের সিলেক্ট কমিটির সভা হয় দার্জ্জিলিঙে—বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়ের ইচ্ছায়।

একীকরণের পর সংযুক্ত রাজ্যের রাজধানী কোথায় হইবে? কলিকাতায় না পাটনায়? প্রথম প্রথম দুই জায়গায় থাকিবে, বিধানসভার অধিবেশন একবার কলিকাতায় ও একবার পাটনায় হইবে। তৎপরে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছায়-

যায়ী স্থানে হইবে। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী পূর্ব্বে এলাহাবাদে ছিল, এইরূপে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্ণৌতে সরিয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট নামে এলাহাবাদ হাইকোর্ট—বিচার হয় এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে। আমাদের রাষ্ট্র ও রাজ্যগুলি 'কল্যাণ' (welfare) রাষ্ট্র বলিয়া গর্ব্ব করি। সরকারী কার্য্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে ও যাইবে। ফলে বহুবিধ নূতন নূতন সরকারী কার্য্যালয় ও মন্ত্রণালয় খুলিতে হইবে। এই নূতন নূতন কার্য্যালয় বা মন্ত্রণালয় কোথায় হইবে? সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছানুযায়ী হইবে। কলিকাতায় স্থাপিত না হইবার একটি প্রধান কারণ হইবে কলিকাতায় জমির দর বেশী—পাটনায় অনেক কম। সুতরাং বহুব্যয়ে আর নূতন তের তলা বাড়ী না করিয়া (যাহার লিফ্‌টের খরচ বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকা) পাটনায় করা হউক। খরচ কম পড়িবে—ইহার বিরুদ্ধে বাঙালীর বলিবার কি আছে? আর বলিলেও ধুয়া উঠিবে বাঙালীরা প্রাদেশিকতায় অন্ধ বলিয়া এইরূপ আপত্তি করিতেছে। পাটনায় এই সব নূতন কার্য্যালয় স্থাপিত হইলে পিয়নের কার্য্য করিবার জন্য ষাট টাকায় ম্যাটিকুলেসন পাস বাঙালীর ছেলে আসিবে না, আসিবে গালপাট্টাওয়ালা লগুড়ধারী ভোজপুরী। বিহারে অনেক জঙ্গল ও বনভূমি আছে। উত্তরবঙ্গের জঙ্গল ও বনভূমি পাটনা হইতে সহজে যাওয়া যায়—এক সুন্দরবন কিছুদূরে পড়িবে, বনবিভাগের মন্ত্রণালয় এক স্থানে পাটনায় থাকিলে শাসন-সংরক্ষণের ব্যয় কম ও বহু সুবিধা হইবে। অতএব ইহা পাটনায় স্থানান্তরিত হউক। ইহার বিরুদ্ধে কি যুক্তি থাকিতে পারে? আপত্তি করিলেই বাঙালীর সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতির কথা দিল্লীর হিন্দীওয়ালারা ও কংগ্রেসের বড়কর্ত্তারা বলিবেন। আর আমাদের নির্ব্বিবাদে পরিপাক করিতে হইবে ও পাটনায় যাহাতে বন-বিভাগের মন্ত্রণালয় উঠিয়া যায় তাহাতে সম্মতি দিতে হইবে। সুন্দরবনের মধু-সংগ্রহের লাইসেন্স যোগাড় করিতে পাটনায় তদ্বির করিতে হইবে। আর যদি মধু সংগ্রহের লাইসেন্স রামটহল সিং পায় ত আপত্তি করিবার কি আছে? তিনিও ত একই রাজ্যের অধিবাসী।

তাহার পর বাঙালী শ্রম-বিমুখ, গাছে চড়িতে পারে না প্রভৃতি অপবাদও শুনিতে হইবে। যেমন শুনিতে হইতেছে পাটকলে বাঙালী শ্রমিক নাই বলিয়া। রিষড়ায় বাংলার প্রথম চটকল বেণীমাধব সেন বার্কমায়ার সাহেবের সাহায্য লইয়া স্থাপন করেন। বাঙালী শ্রমিকরাই কাজ করিত। বরাহনগর প্রভৃতি স্থানের চটকলেও বাঙালী শ্রমিকরাই কাজ করিত। বাংলা দেশে তখন ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপ—বাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যে কামাই হইত। এজন্য চটকলের সাহেবরা প্রথমে বিহার হইতে মুসলমান আমদানী করেন। ইহাতেও সুবিধা না হওয়ায় তাঁহারা "সর্দ্দার"দের সহিত শ্রমিক আনাইবার চুক্তি করেন। সর্দ্দাররা নিজের দেশের, নিজের গ্রামের লোক ছাড়া অন্য স্থানের লোক লইতেন না, এখনও লন না। কিছুদিন আগে টিটাগড় অঞ্চলে মাদ্রাজী শ্রমিকরা অল্প বেতনে কাজ করিতে লাগিল। সর্দ্দাররা অনেকেই মুসলমান; ইহারা ১৯০৭-৮ সনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাইয়া মাদ্রাজী শ্রমিকদের তাড়াইল। ১৯২৯ সনে যখন চটকলের কাজ কম হইত, তখন সর্দ্দাররা চট্ কলের সাহেবদের বলিয়া মাদ্রাজী শ্রমিক, বাঙালী শ্রমিক ছাঁটাই করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কলে ষ্ট্রাইক্ হয়—সর্দ্দাররা বিহারী মুদীদের বলিয়া অ-বিহারী শ্রমিকদের ধারে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। অনেক মাদ্রাজী শ্রমিক দেশে চলিয়া গেল—ফিরিয়া আসিলেও কাজ পাইল না। শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়টি জানেন। তাঁহার দপ্তরেও কিছু কিছু কাগজপত্র আছে। প্রকাশ করিবেন কিনা জানি না।

বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের জীবনমরণ সমস্যা। এ বিষয়ে ব্যক্তি-বিশেষের তা তিনি প্রধানমন্ত্রীই হউন বা মুখ্যমন্ত্রীই হউন—দলবিশেষের মতের উপর নির্ভর না করিয়া জনমতকে দেশের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের সুযোগ দেওয়া উচিত। বিধানবাবু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মত লইবেন বলিয়াছেন। বিধান সভায় কংগ্রেসের দল ভারী—আর কংগ্রেসী সদস্যরা 'যো হুকুমে'র দল। বিধানসভা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল ১৯৫১-৫২ সনের শীতকালে পাঁচ বৎসরের জন্য। তাহার মধ্যে চার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের সম্মুখে তখন এই বিষয়টি উপস্থিত করা হয়ই নাই—এইরূপ বিষয় যে কস্মিন্ কালে উপস্থিত হইতে পারে তাহাও জনসাধারণ জানিত না। বিধানসভার ২৩৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে ১৫০টি আসন—মোট আসনের শতকরা ৬৩ ভাগ। অথচ ৭৪,৪২,৬৯৭টি ভোটের মধ্যে তাঁহারা পাইয়াছেন ২৮,৯৭,৮৮৭টি ভোট মাত্র; শতকরা ৩৮·৯টি ভোট পাইয়াছেন। বহু দল ও বহু ব্যক্তি প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে নামিয়াছিলেন—সেজন্য কংগ্রেসের পক্ষে কম ভোট পাইয়াও বেশী আসন লাভ সম্ভব হইয়াছে। আর বিধানবাবু এতই জনপ্রিয় যে, তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর এগার জনের মধ্যে ছয় জন ভোটে পরাজিত হন ও এক জন ভোটে দাঁড়ান নাই। কংগ্রেস ২৩৮টি আসনের মধ্যে ২৩৩টি আসনের জন্য ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একথা বলা চলে না যে কম ভোটের কারণ কম আসনের জন্য তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া।

আমাদের মনে হয় যেমন চন্দননগরের ভারতভুক্তি গণ-ভোট হইয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গের বিহারভুক্তি সম্বন্ধে তেমনই গণভোট লওয়া উচিত। কিন্তু কে শুনিবে আমাদের কথা? দলের স্বার্থ দেশের স্বার্থ অপেক্ষা যে বড়।

প্রভাত-পবন-স্রোতে

শ্রীউমা দেবী

১

প্রভাত-পবন-স্রোতে এল কণ্ঠস্বরের তরঙ্গ,
তখনও নিশার রেশে আছে ক্লান্ত নয়নে প্রসুপ্তি,
সুর-তাল-অঙ্গ-মাঝে আছে গুপ্ত যে রাগ অনঙ্গ
সেই বুঝি অকস্মাৎ দিল বদ্ধ জীবনকে মুক্তি!
আহা স্বর-তরঙ্গের কত দীপ্তি ভাঙে মেঘবক্ষে,
শত-তান-বিভঙ্গের কত রঙ্গ লাগে এসে চিত্তে,
নিবিড় মিড়ের রেশে যত স্বপ্ন নামে দুই চক্ষে
তত যেন লাগে দোলা সুরমত্ত শোণিতের নৃত্যে।
যাই যাই ডুবে যাই শত লক্ষ তানের তরঙ্গে
যদি পাই—যদি পাই—মণিদীপ্ত অতলের শান্তি,
জানি না কিসের ক্ষোভে এ অভীপ্সা মরণ-প্রসঙ্গে,
জানি না কিসের লোভে প্রাণবৃন্তে চাই ফুলকান্তি!
যেন কোন সম্ভাবনা-পরিপূর্ণ বেপথু এ অঙ্গ—
প্রভাত-পবন-স্রোতে এল কণ্ঠস্বরের তরঙ্গ!

২

অনেক সংশয় ছিল নিরাধার স্খলিত জীবনে,
অনেক সন্দেহে বিদ্ধ হয়েছিল বেদনার্ত্ত মন,
নিদ্রাহীন রাত্রিশেষে কে যেন বা একান্ত বিজনে
ধীরে ধীরে করে গেল কার যেন নাম উচ্চারণ।
নামে কতটুকু আছে? গুটিকত দরিদ্র অক্ষর
নিরর্থক অর্থলোভে গুটিকত রেখায় প্রয়াস,
বধির শ্রবণদ্বারে বর্ণহীন ধ্বনির মর্ম্মর,
অনেক জনের দেহ দ্যোতনায় রিক্ত—হতাশ্বাস!
তবুও তোমার নাম-উচ্চারণে সমস্ত ভুবন
আমার হৃদয়ে এসে গলে গেল সহস্র ধারায়,
সহস্র স্পর্শের সুখে সৃষ্ট হ'ল একক চুম্বন,
সহস্র তারার দ্যুতি নিভে গেল নয়ন তারায়।
ধমনীর তারে তারে সেই নাম-মন্ত্র সুষমায়
জীবন-পাত্রটি তার ভরে নিল কানায় কানায়।

৩

নাম ধরে ডেকেছিলে বুঝি আজ ভোরবেলা এসে,
সে মেঘের সুর শুনে মেঘে মেঘে শীতল আকাশ
রঙের গভীর শত সুষমায় গাঢ় ভালবেসে
হৃদয়াবেগের তাপে রেখেছিল শোণিত আভাস।
নাম ধরে ডেকেছিলে ভোরবেলা শীতল হাওয়ায়,
সে ডাকের সুর শুনে ভরেছিল ফুলেদের বুক,
নিশীথ নিবিড় হ'লে তারাদের অতল চাওয়ায়
বাতাসে গভীর হয়ে এল ক্রমে সুরভির সুখ,
নাম ধরে ডেকেছিলে—বুঝি আমি ঘুমিয়ে ছিলাম,
তোমার সে ডাক তবু জমা ছিল মেঘময় রাগে,
ঘুম ভেঙে গিয়ে যত সে আলোর পরশ নিলাম
সুরভি হাওয়ার ঢেউ তত যেন মনে এসে লাগে।
সবটুকু সুর-সুধা এ ভুবন নিতে যে পারে না,
আমার হৃদয়ে তাই ফিরে ফিরে শোধ করে দেনা।

৪

যত কাছে আসি তত যেন কার আভাস পাওয়াও,
যতই নয়নে চাই তত দেখি অচেনা স্বপন,
বনফুল-গন্ধে যেন উচাটন ঘরের হাওয়াও—
কাছের আলোর যেন ধরা দেয় দূরের তপন।
যত কাছে টান তত ঘন বনে যেন বা হারাই
সিক্ত অরণির শত সৌরভে কে করেছে উন্মাদ,
যত দূরে ফেল তত বাহু পাশে যেন-বা জড়াই
খুশির আসব-পানে ত্রিদিবের সুধার আস্বাদ।
তোমার নয়নপথে জলে যায় পথের দীপিকা,
তারি কি আভাস তুমি দিয়ে যাও ক্ষণেক চাওয়ায়?
নিজ হাতে জেলে যাও যতগুলি হৃদয়ের শিখা,
তারা কি উজ্জ্বল তত নিশীথের উধাও হাওয়ায়?
বসন্ত রাতের দীপ কেন আর জলে অকারণ?
তারা কি দেখেছে নভ-চত্বরের নক্ষত্র স্বপন?

সঞ্চয় সমিতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রায় প্রত্যেক মানুষই বেশী হউক কম হউক আয় করে থাকেন; কিন্তু যাঁরা আয় করেন তাঁরা সকলেই কি সঞ্চয় করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বলতেই হবে সকলে সঞ্চয় করেন না। আয় করার চেয়ে সঞ্চয় করার অভ্যাসটা অর্জ্জন করা একান্ত দরকার। অনেকে হয়ত বলবেন আমরা যা আয় করি তাতেই আমাদের খরচ কুলায় না, ধার করে সংসার চালাতে হয়, সঞ্চয় করব কি করে? কিন্তু যে বুদ্ধিমান সে আয় অনুসারেই ব্যয় করে, এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু না কিছু সঞ্চয় করে। একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলেছিলেন যে, যার এক টাকা আয় সে যদি ৸৶১০ আনা খরচ করে এবং ৶১০ পয়সা সঞ্চয় করে তাকেই আমি বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলব, আর সে যদি ১৶১০ পয়সা খরচ করে তাকে আমি নির্ব্বোধ ও অবিবেচক বলব। আমরা যদি একটু ভেবে দেখি তা হলে অনায়াসেই বুঝতে পারব যে, অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অবিবেচনার জন্যে অপচয় হয়, এবং আমরা যদি সেই অপচয় নিবারণ করতে পারি সেটা আমাদের সঞ্চয়ে পরিণত হয়। এই কথার সমর্থনে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

যাহা হউক, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় প্রাণী মাত্রেরই সহজাত প্রবৃত্তি; ছোট ছোট পিঁপড়েরাও ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। আর আমরা মানুষ প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ জীব—আমরা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করব না এ হতে পারে না। সঞ্চয় আমাদের করতেই হবে।

ব্যক্তিগতভাবেও সঞ্চয় করা যায় আবার সমষ্টিগতভাবেও সঞ্চয় করা যায়; এই দুই প্রকার সঞ্চয়েরই আবশ্যকতা ও উপকারিতা আছে। আবার ব্যক্তিগত ভাবে সঞ্চয় না করলে সমষ্টিগত ভাবে সঞ্চয় করা যায় না। কেবল অর্থ নয় অপরাপর অনেক জিনিষই সঞ্চয় করা যায়। অন্যান্য অনেক জিনিষের মধ্যে প্রধান হচ্ছে খাদ্য-শস্য—ধান; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের প্রাচীনকালের ধর্ম্মগোলা।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নানা ভাবে সঞ্চয় করে। বিভিন্ন পরিমাণ অর্থের সাহায্যে নানা প্রকারের সঞ্চয় সমিতি স্থাপিত করতে পারেন; প্রত্যেক প্রকার সমিতির পরিচালনার জন্য বিধি-ব্যবস্থা আছে। পরস্পরের উপকারই সঞ্চয় সমিতির মূল উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। সমবায়ের মূলনীতি হচ্ছে "সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে কোন প্রকারের সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য সার্থক হবে না।

মানুষের ব্যক্তিগত আয় সীমাবদ্ধ; সুতরাং তার পুঁজিও সীমাবদ্ধ; অনেক ক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যদি মানুষের সঞ্চয় করার প্রবৃত্তিকে সজাগ করে তোলা যায়, তা হলে তার ব্যক্তিগত পুঁজি বেড়ে যাবেই; কিন্তু এই ব্যক্তিগত পুঁজির দ্বারা সে খুব বেশী উপকৃত বা লাভবান হবে না; তার ব্যক্তিগত পুঁজিকে সমষ্টিগত পুঁজিতে পরিণত করতে পারলে তার নিজের ত বেশী উপকার হবেই, অন্যেরও উপকার হবে; দেশের ও সমাজেরও উপকার হবে। একটা উদাহরণ দ্বারা এ কথাটা অতি সহজেই বোঝা যাবে। একজন হয়ত মাসে দশ টাকা বাঁচাতে পারেন, এই হারে বৎসরে তাঁর এক শত কুড়ি টাকা বাঁচে; এই এক শত কুড়ি টাকা থেকে তাঁর আয় খুব বেশী হবে না, কিন্তু যদি পঞ্চাশ জন এক সঙ্গে মিলে মিশে একটা সঞ্চয় সমিতি স্থাপন করেন, তা হলে এই পঞ্চাশ জনের বৎসরের সঞ্চয় দাঁড়ায় ছয় হাজার টাকা। এই ছয় হাজার টাকায় এমন একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, যার ফলে সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতারা এবং অংশীদারেরা ত অধিকতর লাভবান হবেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে অপর দু' দশ জনেরও কাজ জুটবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলতেন, একজন চাকরী করে যদি মাসিক চার হাজার টাকা উপায় করেন তাতে দেশের বিশেষ কিছুই উপকার হয় না; কিন্তু একটা সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাসিক আয় যদি চার হাজার টাকা হয় তাতে দেশের খুব বেশী উপকার হয়, কারণ এই রকম সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্ম পরিচালনায় জন্য অনেক লোককে নিযুক্ত করতে হবে; এবং এর ফলে তাদের অন্নসংস্থানের উপায় হবে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের দ্বারাই এই রকম সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়।

সঞ্চয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে একটা খুব ছোট উদাহারণ দিচ্ছি। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। কয়েকজন বন্ধু প্রতিজ্ঞা করল যে, তারা প্রত্যেকে ছয় মাসের মধ্যে একশত টাকা করে জমাবে; তারপর সেই টাকা দিয়ে একটা ছোট রকমের যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে; এর ফলে ছয় মাসের পর এই কলিকাতা শহরেই একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সৃষ্টি হ'ল। বর্ত্তমানে সেই মিষ্টান্ন ভাণ্ডার খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর একটা ছোট উদাহারণ দিচ্ছি: অল্প মাহিনার কয়েকজন চাকুরিয়ার মাঝে মাঝে কিছু ঋণের প্রয়োজন হ'ত; তাঁরা নিজেদের অল্প পুঁজি জমিয়ে একটি যৌথ তহবিলের সৃষ্টি করেছিলেন। নিজেদের প্রয়োজনের সময় সেই তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। এর জন্য তাঁরা নিয়ম-কানুন তৈরি করেছিলেন এবং সেই সব নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন। সেই তহবিলের অঙ্ক এখন বেশ মোটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরস্পরের উপকারের জন্যই এই যৌথ তহবিলের সৃষ্টি হয়েছিল। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। কলিকাতায় এমন দুই তিনটি "সিনেমা" আছে, যাদের পত্তন হয়েছে কয়েকজনের "পকেট মণি" জমিয়ে।

আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরেই, প্রত্যেক কাজে-কর্ম্মেই সমবায়ের প্রয়োজন; এই কথাটা আমরা যদি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি এবং সমবায়ের প্রবর্ত্তন করতে পারি, তা হলে আমাদের নিজেদের, সমাজের এবং দেশের প্রভূত উন্নতিসাধন হয়।

পঞ্চবাণ

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

—তাই নাকি? আমি তা হলে তোমাদের কাছে রীতিমত একটা হেঁয়ালি বল?

আমি বললাম, অনেকটা তাই। কত রকমের আজগুবি উড়োখবর যে কানে এসে পৌঁছত। ছোড়দাও ত স্পষ্ট কোন কথা বলত না।

লিপিকার মুখে ফুটে উঠল হাসির মৃদু রেখা। স্বচ্ছ পাতলা হাসি। ফাল্গুনের হাওয়া লেগে ফুলের দলে যে হাসি কেঁপে ওঠে। ভারি মিষ্টি।

এই লিপিকাকে দেখবার আগে ওর সম্বন্ধে মনের মাঝে একটা কালো সংশয় আর ভয়-মেশানো উদ্ভট সব ধারণা জট পাকিয়ে ছিল। ওকে দেখবার, চেনবার ও জানবার একটা অস্বস্তিকর ছটফটানি আমায় অস্থির করে তুলত। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হবার আগেই কিন্তু মন হতে সে অস্বস্তিকর ভাবটা কেটে গেল। ওর সুন্দর মুখ আমায় প্রবল ভাবে আকর্ষণ করল, আমার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দিয়ে গেল। আমার বিসদৃশ কল্পনার সঙ্গে যে ওর কোন মিল নেই! ওর মুখে একটা জাদু আছে। রূপের যেমন ভার আছে, ধারও আছে তেমনি। ও অত্যন্ত স্পষ্ট। স্পর্শ দিয়ে যেন অনুভব করা চলে। অন্তরের আলো ওর মুখে ছড়িয়ে আছে—নির্মল সত্যের আলো। মানুষের শ্রদ্ধা কেড়ে নেয় জোর করে।

লিপিকা ছোড়দার বউ। ছোড়দা কারুকে কিছু না জানিয়ে সম্প্রতি দিল্লীতে ওকে বিয়ে করে। বাড়ীতে খবর এল ছোড়দা এক পঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করেছে। ওদের বিয়ের খবর আমাদের আত্মীয়পরিজনদের মনে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি করল। কত রকমের জনশ্রুতি এল হাওয়ায় ভেসে। যত সব কুৎসিত, অকথ্য রটনা। আমাদের লজ্জায় অপমানে মাথা হেঁট হয়ে গেল। রাগ হ'ল ছোড়দার উপর। পবিত্র পিতৃকুলের পারিবারিক মর্য্যাদা ডুবিয়ে দিলে।

ছোড়দার উপর সংসারের কেউ খুশী ছিল না। না শিখল ভালো করে লেখাপড়া, না লাগল সংসারের কোন উপকারে। ফুটবল, ক্রিকেট আর বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানো—এই নিয়েই ওর জীবন। চির ভবঘুরে। তার উপর এই বিপর্য্যয় ঘটাল—কারুকে কিছু না জানিয়ে, কারুর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে। দাদারা রেগে আগুন। তারা সরকারী বড় চাকুরে। একজন হাইকোর্টের, আর একজন জেলাকোর্টের জজ। তাঁদের মর্য্যাদায় আঘাত লাগবারই কথা।

পঞ্জাবীই হোক আর ছোড়দার চেয়ে বয়সে বড়ই হোক, বিয়ের সবচেয়ে বড় খবর হ'ল মেয়েটি নাকি উঁচুদরের বিদুষী, ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ; এবং সরকারী কলেজের নামজাদা অধ্যাপিকা। তা ছাড়া তার নাকি অনেক টাকা। সে মেয়ে ছোড়দার মত ভবঘুরেকে জেনে-শুনে কি দেখে বিয়ে করলে, কেন করলে? আশ্চর্য্য হবার কথা বৈ কি। সমস্ত ব্যাপারটার মাঝে একটা ঘোরালো রহস্যের গন্ধ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

লিপিকা হাসতে হাসতে বলল, ও তোমার ভাই। তুমি বুদ্ধিমতী। আমার চেয়ে তুমি ভালো জান, ভাই তোমার কি দরের মানুষ। আমার চেয়ে তুমি ওকে ভালো করে জানবার বোঝবার অখণ্ড অবসর পেয়েছ। তুমি কি বল? আমি কি ভুল করেছি? ডিড আই ব্যাক এ রং হর্স?

একটু থেমে আবার বলল, আমার বাবা-মা ছিলেন না। নিজেই নিজেকে গড়ে তুলতে হয়েছে। নিজের সব সমস্যার সমাধান আমাকেই করতে হয়েছে। খাঁটি বাঙালীর মেয়ে হলেও জন্মেছি এবং মানুষ হয়েছি পঞ্জাবের রুক্ষ মাটিতে। মনটা এদেশের মেয়েদের চেয়ে শক্ত। বিচার করে, যাচাই করে নেবার শক্তি ও বাসনা আমার প্রবল। আমি কি না যাচাই করেই ওকে সারা জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছি? একটা সম্পত্তি কিনতে হলে কেউ তার টাইটেল রীতিমত যাচাই না করে কেনে কি?

"আমার কিন্তু সবচেয়ে শক্ত মনে হয়েছে এই বিয়ের সমস্যাটা। বিচার করতে গিয়ে আমি প্রচণ্ড ঘা খেয়েছি, এক-বার নয়—বার বার। কিন্তু বিচার না করে উপায় কি? মেয়ে-দের জীবনের এই হ'ল সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, মেয়েরা যার কাছে নিজেকে বিকিয়ে বিলিয়ে দেবে সারা জীবনের জন্য—পৃথক সত্তা থাকবে না, পৃথক পরিচয় থাকবে না—তার সম্বন্ধে কতটুকু তারা জানে। মোটামুটি সাধারণ মেয়েরা কিছুই জানে না, কোন খবরই

রাখে না। চোখে ভালো লাগার পর্ব্বটা কেটে গেলেই তাই বাকি জীবনটা কাটে একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

"আমি সেই দিকটা সম্বন্ধে চিরদিন অত্যন্ত সচেতন। বহু লোকের সঙ্গে জীবনের পথে মেলামেশা করেছি, কিন্তু তাদের মাঝে একজনও খুঁজে পাই নি যার সঙ্গে আমার আদর্শ খাপ খায়। মনে মনে আমার একটা অহঙ্কার ছিল বরং আজীবন কুমারী থাকব তবু অপাত্রে জীবনের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করব না। এর জন্য অনেকের সঙ্গে আমায় দুবিনীত ব্যবহার করতে হয়েছে। নিজেকেও অনেক সময় দুঃখ পেতে হয়েছে, তবু আমার আদর্শকে খাটো হতে দিই নি কোন দিন।

"তুমি ভাবছ হয় ত আমার আদর্শের চেহারাটা কি রকম? শিবের ধ্যান করে অবশ্য শিবকে পতি কামনা করি নি মানুষকেই কামনা করেছি। সব মেয়েরই মনের মাঝে স্বামী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা বাসা বেঁধে থাকে—সেই স্বয়ম্বরের যুগ থেকে; আমারও ছিল। সেই আদর্শেরই মিল খুঁজতে গিয়ে কোথাও হতাশ হয়েছি, কোথাও প্রতারিত হয়েছি। পুরুষরা এক অদ্ভুত জীব, সকলেই নিজেকে কন্দর্প ভাবে। প্রথম থেকেই তারা তীর মেরে মেয়েদের জর্জ্জরিত করে তুলতে চায়। মেয়েরা চির দুর্ব্বল, ভাবপ্রবণ, এই তাদের চিরন্তন ধারণা। কিন্তু সে তীর যে সবার অন্তরে পৌঁছয় না, এ কথা তারা ভাবে না। শক্ত মাটিতে জল ঢেলে নরম করে তবে সেখানে চাষ করতে হয়, একথা তারা বোঝে না কেন? এসেই নরম মাটির সন্ধান করে। তাদের কাঙালপনায় লজ্জা পেতে হয়।

"হাসছ? হাসবারই কথা। তবে সব কথাই খুলে বলি শোন। পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে এই আটাশ বছর জীবনের দীর্ঘ পথ হতে সঞ্চয় করেছি তিক্ত অভিজ্ঞতা। আমার জীবনে প্রথম আবির্ভাব হ'ল কলেজের এক তরুণ প্রফেসরের। তখন আমি সবে এম-এ পাস করেছি। ভদ্রলোক বিলেতফেরত, সুপণ্ডিত। চমৎকার মিষ্টি কথাবার্ত্তা, দেখতেও ভাল। সাহিত্যে তার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যেতাম। আমার ভাল লাগত তার সান্নিধ্য, ভাল লাগত তার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতে; তার কাছে জানতে, শিখতে। হঠাৎ একদিন তেমনি আলোচনার মধ্যে ভদ্রলোক কি জানি কি ভেবে আমাকে প্রণয়নিবেদন করল এবং বিয়ের প্রস্তাব করল। এত আকস্মিক যে, আমি অপমান বোধ করলাম। ঘুম আসবার আগেই ঘুম গেল ভেঙে। আমি তাকে বিদায় দিলাম গভীর মর্ম্মবেদনায়। পুরুষেরা কি ভাবে? মেয়েদের আন্তরিকতার মধ্যে কি তারা শুধু আসক্তির গন্ধ পায়? অতবড় একজন শিক্ষিত লোক। এত অধৈর্য্য! মায়া জাগবার আগেই গেল মিথ্যে হয়ে।

"তার পর যিনি এলেন, তিনি সাক্ষাৎ কলি। নলরাজার বেশ ধরে দময়ন্তীকে ছলনা করার মতই তিনি আমার জীবনে প্রবেশ-পথ খুঁজলেন। সদর রাস্তা দিয়ে নয়, অন্ধকার গলিপথে। তার বিবাহিতা পত্নী তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। ভদ্রলোক এসেই আমার মনোহরণের পালা সুরু করলেন এবং ফুলশর হানতে লাগলেন। শুনলাম মেয়েদের প্রতি মমত্ববোধ তাঁর অগাধ. তাঁর আসল স্বরূপ কিন্তু আমার বুঝতে বাকি রইল না। তা ছাড়া ওঁর সম্বন্ধে যে সব খবর আমার কানে এসে পৌঁছল তাতে বন্ধুত্বে ছেদ টেনে দিতে হ'ল; আমি হতাশ হলাম।

"অতঃপর তৃতীয় যিনি, তিনি একেবারে তৃতীয় নয়নের মতই আমার ললাটে স্থান করে নিতে চাইলেন। ভূমিকার বালাই নেই। একেবারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ঘটকের মত হাজির হ'ল পাত্রের এক আত্মীয়া—আমাদের কলেজের এক অধ্যাপিকা। পাত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। ভদ্রতার খাতিরে তাকে আহ্বান অভ্যর্থনা জানাতে হ'ল বৈকি। অসাধারণ না হলেও সুপাত্র নিঃসন্দেহ। সরকারের বড় অফিসার। দিল্লী শহরে তাঁর প্রচুর খ্যাতি-প্রতিপত্তি—বিশেষ বাঙালী মহলে। এমন কোন বাঙালী প্রতিষ্ঠান নাই যার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। ক্লাবে ককটেল পার্টির খদ্দের, আবার দুর্গাবাড়ীতে কীর্ত্তনেও যোগদান করেন। সজ্জন মানুষ, সম্প্রতি পত্নীবিয়োগ হয়েছে, নিঃসন্তান। বয়স এমন কিছু বেশী নয়—পঞ্চাশের ধারে।

"এর কোর্টশিপের ভঙ্গীটি কিন্তু নতুন ধরনের। বিনীত প্রার্থনার সুর, পত্নীবিয়োগের মর্ম্মন্তুদ ব্যথা, বড় একা নিঃসঙ্গ। আতুর শরীর মনের নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্যই একটু ভালবাসার আশ্রয়, একটু নিভৃত বিশ্রাম প্রয়োজন। হাসি পেত, দুঃখও হ'ত। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ভদ্রলোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।"

আমি অবাক হয়ে লিপিকার মুখের পানে চেয়ে ছিলাম। তার মুখখানি কেমন হাসিখুশী। যত দেখছি ততই ভাল লাগছে। দেহ যেন একটি পুষ্পিত লতা। একহারা ছিপ-ছিপে, পঞ্জাবী মেয়ের মতই দীঘল, মজবুত। সর্ব্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের বন্যা, যৌবনের উচ্ছ্বাস; চোখ দুটি টানা টানা, গাঢ় কালো—প্রতিভার আলো ঠিকরে পড়ছে। ছোড়দার সঙ্গে কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে, ছোড়দার পছন্দ ভালো, কিন্তু ছোড়দাকে এ পছন্দ করল কোন্ চোখে?

আদ্‌ত্তো হাসিতে মুখ ভরে লিপিকা বলল, তুমি অধৈর্য্য হয়ে উঠছ তোমার ছোড়দাকে জয় করলাম কি ভাবে তাই শোনবার জন্তে। না ?

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, ঠিক উল্টা। ছোড়দা তোমাকে জয় করল কেমন করে।

দাঁতের চাপে ঠোঁট কামড়ে সেও হাসল। ওর হাসিতে শব্দ নেই—রং আছে, শোভা আছে।

লিপিকা বললে, সেই কথাই বলব। এটা তারই পট-ভূমিকা। তোমাকে বলব না ত বলব কাকে ? এমন মিষ্টি সম্পর্ক আর কারুর সঙ্গে আছে নাকি, না ছিল ? বোন ত আমার নেই। হ্যাঁ, তিন নম্বর ত হয়ে গেল।

আমি কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলাম, ছোড়দা ক' নম্বর ?

বাঁকা চোখে বিদ্যুৎ হেনে লিপিকা বলল, পাঁচ। পাঁচে পঞ্চবাণ। সবাই বাণ মেরে আমায় ধরাশায়ী করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিরোধ করেছি নিজের ক্ষমতা দিয়ে। হার মানলাম তোমার ভাইটির কাছে। তার লক্ষ্য নির্ভুল, অব্যর্থ সন্ধান।

"মুখ টিপে হাসতে হাসতে লিপিকা বলল, গরমের ছুটিতে বাঙ্গালোর গিয়েছিলাম। সেখান থেকে গেলাম উতকামণ্ডে। আমার এক বান্ধবী পরিচয় করিয়ে দিলে এক রাজকুমারের সঙ্গে। আমরা একই হোটেলের বাসিন্দা, দু'বেলাই কুমারের সঙ্গে দেখা হ'ত। আলাপ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। কুমার তরুণ, তারুণ্যের উদারতা তার আচারে ব্যবহারে ; মুখে প্রসন্ন প্রশান্তি। ভাল লাগত তার সঙ্গে আলাপ করতে। কুমার মাঝে মাঝে শিকারে যেত, পাখী-পাখালি শিকার করে আনত। আমি রাইফেল ক্লাবের অল ইণ্ডিয়া প্রতি-যোগিতায় সে বছর ফার্স্ট হয়েছি জানতে পেরে কুমার আমায় তার সঙ্গে শিকারে যাবার নেমন্তন্ন জানালে। আমি চির দিনই নির্ভীক, খানিকটা দুঃসাহসী ও দাম্ভিক বলতে পার। আর মন যখন নিঃসঙ্কোচ তখন আর দ্বিধা কিসের ? আমি রাজী হলাম।

"কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে সারাদিন পাখী-পখালি শিকার করলাম। গাইড বলল, বিকেলের দিকে নদীর ধারে হরিণ আসে জল খেতে। হরিণ শিকার করবার লোভে আমরা জঙ্গলের গভীরে পাহাড়ী নদীর দিকে এগিয়ে চললাম। পা চলেছে মন্থর গতিতে, আপন অভ্যাসে। আর সব চেতনা নিথর ও মুহ্যমান অরণ্যের ছায়া-নিবিড় শীতল স্তব্ধতায়। সাড়া-শব্দ নেই। পায়ের নিচে পাতার মর্ম্মর ঘুমন্ত মেয়ের সাড়ির খসখসানির মত। আমাদের অনধিকার অতিক্রম যেন তার নিভৃত তন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে চন্দনের আর অজানা বনফুলের সুগন্ধ। অভিসারিণী যেন চন্দনগোলা জলে গা ধুয়ে সদ্যফোটা ফুলের মালা ছুলিয়েছে কণ্ঠে আর কবরীতে। এসেছে তার কল্পবৃন্দাবনে আত্ম-নিবেদনের অর্ঘ্য নিয়ে। সূর্য্য ঢলে পড়েছে। নিবিড় পাতার ফাঁকে আকাশের রক্তিমা। সবুজে রাঙায় মেশামেশি, স্তব্ধতার ইন্দ্রজাল বিছিয়ে দিয়েছে শূন্যে। পায়ের নিচের মাটিটুকু ছাড়া আর পথ নেই, পথ ফুরিয়ে গেছে। পৃথিবীও যেন এইখানে শেষ হয়ে গেছে। কে যেন কোথায় আবেশে কাঁপছে। একটা অনাবিল ভাবালুতা আমায় পেয়ে বসে-ছিল। আমি যেন স্বপ্নে-পাওয়া মানুষের মত ঘুমের ঘোরে উদ্দেশহারা পথে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আর সব চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে সৌন্দর্য্যের বন্যায়।

"আচমকা রূঢ় বাস্তবের নির্ম্মম আঘাতে আমার স্বপ্ন গেল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে। কুমার আমার একখানা হাত ধরেছে। আমি চমকে উঠলাম তার তপ্ত স্পর্শে। শুধু ঘৃণা নয়, অপমানও বোধ করলাম। আমি মুখ তুলে সোজা তার মুখের পানে চাইলাম। চোখে আমার কি ছিল জানি না, তার হাত শিথিল হয়ে খসে পড়ল আমার হাতখানাকে মুক্তি দিয়ে। আমি অবাক হয়ে গেলাম তার মুখের পানে চেয়ে। মুখে উদ্ধত কামনা। ক্ষুধিত চোখের নির্লজ্জ উজ্জ্বলতায় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। আমি ভেতরে শিউরে উঠলাম, বাইরে প্রতিরোধের শক্তি সংগ্রহ করলাম। বিস্তারিত বিবরণ নাই বা বললাম ; কুমার জানাল, সে আমায় ভালবাসে। আমার জন্তে সে উন্মাদ—আমার করুণা-ভিখারী। বেশ কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে প্রতিশ্রুতি দিলে, সে আমায় বিবাহ করবে যদি আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হই।

" 'না'। আমার উত্তরটা তার মর্ম্মে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল। জীবনে সেরকম বিস্ময়াহত মুখের ভাব আমি দেখি নি। সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না যে, কোন মেয়ে এত বড় সৌভাগ্যকে এমন ভাবে উপেক্ষা করতে পারে। তার ঐশ্বর্য্য, তার পদমর্য্যাদা, তার আভিজাত্য হয় ত উপেক্ষার জিনিষ নয়। কিন্তু সব মেয়ে ত একই জাতের নয়।

"সে অপেক্ষা করতে চাইল—আমাকে বোঝবার সময় দিয়ে। কিন্তু আমার ত তার প্রয়োজন ছিল না। আমার নিজের মন আমি জানি। সময় পারবে না তার ঢেউ বদলাতে, তার গতি ফেরাতে। কুমার হতবাক্। মুখ ফিরিয়ে কি ভাবতে লাগল। আমিও অন্তরের আতঙ্ক চেপে নিজেকে খাড়া রাখবার চেষ্টা করলাম। অরণ্যের স্তব্ধতা আরও গভীর হয়ে এল, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। শীর্ণ পাহাড়ী নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলে আলো-আঁধারের লুকোচুরি।

মাথার উপর দূর আকাশে গা ভাসিয়ে দিয়ে নেমে আসছে নিঃশব্দচারী চিল শকুনির দল। হয় ত কোথাও কোন জন্তু মরেছে কিংবা রাতের আশ্রয়ে ফিরছে। আমরা ঘন জঙ্গলের সামনে নদীর কিনারায় একটা ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম—স্তব্ধ প্রতীক্ষায় যেন দু'জনে দু'জনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে।

"কুমার হঠাৎ একটা নাটকের অবতারণা করলে। নাটক না বলে প্রহসন বললেই সমীচীন হবে। কুমার নিজের রাইফেলটা তুলে ধরে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে, এই যদি তোমার শেষ কথা হয় লিপিকা, তা হলে এইখানে এই মুহূর্তে এই বিয়োগান্ত পালার পরিসমাপ্তি হোক। তোমারই উৎসাহে তোমারই প্রীতি-ব্যঞ্জনায় দু'জনের মাঝে রচিত হয়েছিল এক নিরুপম কল্পলোক।

"আমি প্রতিবাদ করে বললাম, মিথ্যা কথা। উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, আজ এখানে আসার আগে আমি কল্পনা করতেও পারি নি আপনার এই আশ্চর্য্য মনোভাব।—কুমার অবিচলিত দৃঢ়কণ্ঠে বলল, তোমাকে হারিয়ে আমি বাঁচতে পারব না, বাঁচতে চাই না।—সঙ্গে সঙ্গে নিজের রাইফেলটা উঁচিয়ে তুলে ধরল গলার কাছে। ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর হিম হয়ে গেল। পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠল। মনে হ'ল মাথা ঘুরে পড়ে যাব। কি যে করব, কি যে করা উচিত বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তাকে আমি বাধা দিলাম না। সান্ত্বনার কোন কথা বলে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলাম না। ও কি আমাকে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে আমার কাছে প্রণয়ের স্বীকৃতি আদায় করতে চায়? অসহায়, নিঃসঙ্গ জেনে পীড়ন করে আমাকে নতি স্বীকার করাতে চায়? একটা অপরিসীম ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীরমন সঙ্কুচিত হয়ে এল। আমি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালাম; যা ঘটে ঘটুক।

"কিন্তু এ কে?

"জীবিত লোকের নিশ্বাসের শব্দে আমি চমকে উঠলাম। সেই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে প্রাণস্পন্দনহীন জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যে কি আরামের বলে বোঝানো যায় না। সে যে কোথা হতে এল, কেমন করে এল বা কেন এল, কিছুই তখন ভাবতে পারলাম না। শুধু মনে প্রাণে উপলব্ধি করলাম, আমি একা নই। এ যাত্রা আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম।

"সিগারেট মুখে দিয়ে আবিষ্টের মত আমাদের পানে চেয়ে আছে এক তরুণ শিকারী। কুমার তাকে দেখে 'এটেন্-শনে'র ভঙ্গীতে রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শিকারী সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে আমায় অভিবাদন জানালে। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলে, কি শিকার করতে আপনারা এই ঘন জঙ্গলে ঢুকেছেন? আমি বললাম, এমনি ছোটখাটো শিকার।—কুমার বলে উঠল, স্পটেড ডীয়ার কিংবা সম্বর।

"শিকারী বলল, দিস্ ইজ নো প্লেস ফর ছাট। দিস্ ইজ এ প্লেস ফর্ বীগ গেম্‌স। তা ছাড়া বনের অন্ধকার নেমে আসে অকস্মাৎ কোন নোটিস বা ওয়ার্নিং না দিয়ে। অন্ধকার হতে আর বেশী দেরি নেই, বেরুবেন কেমন করে এই গোলকধাঁধা থেকে। সঙ্গে মহিলা, শিকার করতে এসে শিকার হওয়া ত বাঞ্ছনীয় নয়।

"শিকারী হাসতে হাসতে বললে, এখানে ম্যান-ঈটারের উপদ্রব চলছে। কাল রাত্রে সদর রাস্তা থেকে একজন রাহীকে তুলে এনেছে। এখনও তার আধখানা দেহ ঐ নদীর ঝোঁপের মধ্যে পড়ে রয়েছে।—আমি জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তার মুখের পানে তাকতেই সে বললে, হ্যাঁ, আমি একটা চান্স নিতেই এসেছি। সেই 'কিলে'র কাছেই আমার মাচান তৈরী হচ্ছে।

"আমি বিস্ময়ভরা চোখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চাইলাম, দু'জনে চোখাচোখি হ'ল। সে চোখে কি ছিল জানি না, তবে আকস্মিক অপ্রীতিকর ঘটনার উত্তেজনা ও অস্বস্তিটা যেন জুড়িয়ে গেল। শরীরে নামল একটা আরামের আবেশ।

"বলতে হবে না বোধ হয় এ শিকারীটি কে?"

—কে ছোড়দা?

লিপিকা মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

—সত্যি?

—তোমার ছোড়দা। আমার পরম গুরু।

দু'জনে খুব খানিক হাসলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার পর?

"বন হতে আমাদের বের করে পথে পৌঁছে দিয়ে যখন সে আমাদের কাছে বিদায় চাইলে তখন নিঃশব্দে আমি তার মুখের পানে তাকালাম। সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরে মৃদু হাসল—বুঝলে যে আমি কুমারের সঙ্গে ফিরতে চাই না। সেই ব্যবস্থাই হ'ল, আমি কুমারের সঙ্গে ফিরলাম না। ও যেখানে উঠেছে সেই ইন্‌স্পেকশন বাংলোয় আমি রাত কাটালাম। আমার থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে ও জঙ্গলে চলে গেল মাচানে বসতে।

"আমি সারারাত ঘুমোতে পারলাম না, ঠিক ওকে না হলেও ওরই কথা ভাবলাম বৈ কি। কি ভাবলাম কে জানে, কেন ভাবলাম তাও বুঝলাম না; পরিচয়লেশহীন এক যুবকের চিন্তায় নিযুক্ত রাত্রির প্রহর গণনা করা নিজেরই

ধ্যানধারণার অতীত, তবু ঘটল তাই। কি অস্বস্তিকর প্রতীক্ষা! একটা উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বেগের মধ্য দিয়ে রাত পোহাল। তখনও বুঝতে পারি নি সে-ই আমার অনন্ত-কালের ছবি। সকালে যখন সে ফিরে এল তখন আমি বাংলোর বাইরে তার আশাপথ চেয়ে বসে আছি। নিজের প্রতীক্ষার লজ্জা লুকোবার জন্যেই বললাম, শুধু হাতে যে? আমি বাঘটা দেখবার আশায় পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তিভরা চোখে আমার পানে চেয়ে সে মৃদু হাসল। বললে, ভাগ্যে থাকলে নিশ্চয় দেখবেন।...পথের মাঝেই সে আমার পানে চেয়ে প্রশ্ন করল, সারারাত কি ঘুমোন্ নি নাকি? মুখ চোখ যে বসে গেছে। লজ্জায় আমার ভিতরটা নেতিয়ে পড়ল। মুখ তুলে চাইতে পারলাম না। আশ্চর্য্য মানুষ! মুখ দেখে ও যেন মনের কথা বুঝতে পারে। ওকে লুকিয়ে কোন কিছু ভাববার উপায় নাই।

"ঠিক হ'ল ও যে ক'দিন না ফেরে আমি বাংলোতেই থাকব। অমত করলে না, হয় ত একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। আমি ওকে অনেক সাহায্য করতাম, শুধু মাচায় বসতে দিত না। বলত, মেয়েদের স্নায়ু সহ্য করতে পারবে না সে দুরন্ত উত্তেজনা। আমি ওর একাগ্রতা আর ধৈর্য্য দেখে অবাক হয়ে যেতাম। কি গভীর নিষ্ঠা! বেলা দুটোয় মাচায় উঠেছে। সারারাত কেটে গেছে নিঃশব্দে পঙ্গুর মত বসে। কফি দিয়েছি ফ্লাস্ক ভরে। খাদ্যের মধ্যে স্যাণ্ডউইচ আর বিস্কুট। ভাল লাগত ওর কাজ করতে। জীবনে যেন আলো জেলে দিয়ে যেত, দিয়ে যেত প্রতীক্ষার ভার। ভাল লাগত স্তব্ধতার সেই ভার বইতে, ভাল লাগত চুপচাপ বসে ওকে ভাবতে। ওর মাঝে প্রতিশ্রুতি আছে। আমার আদর্শের সঙ্গে মিল আছে। এক এক সময় ভাবতাম এই প্রতীক্ষার মধ্যে ডুবিয়ে ও আমার ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার কৌতুহলকে অধীর করে তুলছে। আমার অনুরাগে রং ধরিয়ে দিচ্ছে।

"এক হপ্তা পরে এক দিন ভোরে রীতিমত সমারোহ করে বিরাট এক বাঘিনী শিকার করে ও ফিরে এল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরমাত্মীয়ের মত ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও শুধু অবাক হয়ে আমার মুখের পানে নিঃশব্দে তাকাল, আমি লজ্জা পেলাম। বাঘ মারার খবর শুনে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপার এবং আরও অনেক বড় অফিসার এলেন ওকে অভিনন্দন জানাতে।...

"আমরা একসঙ্গে দিল্লী ফিরে গেলাম।

"আমার চোখের সামনে নূতন দিগন্ত। আমি সেই দিকে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। মন আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। পরিসমাপ্তির পানে এগিয়ে যেতে চায়। দিগন্ত কিন্তু সরে সরে যায়।

"খেলা আর শিকারের নেশায় ভাইটি তোমার পাগল। মাঝে মাঝে কোথায় যে উধাও হয়ে যেত আমি কূলকিনারা পেতাম না, অধীর হয়ে উঠতাম প্রতীক্ষার ব্যাকুলতায়।

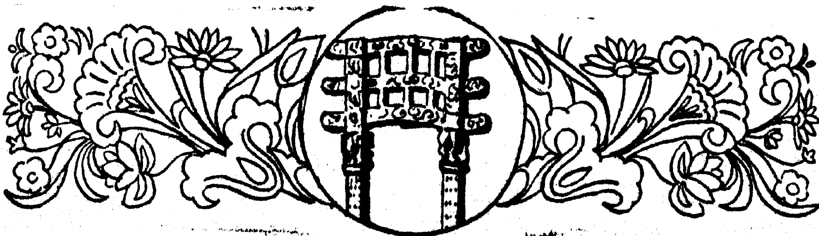
"দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর ক্লান্তিকর বিরহ দিয়ে ওকে আমি আবিষ্কার করেছি, ও আমাকে জয় করেছে—আমি ওকে পরীক্ষা করেছি, ও আমাকে সহিষ্ণু করে তুলেছে। ও খাঁটি স্পোর্টসম্যান। মন ওর অবারিত আকাশের মত উদার। ওর মাঝে হীনতা নেই, দীনতা নেই, কপটতার লেশ নেই। সংযম, ধৈর্য্য আর সহনশীলতা ওর রক্তে। এখনও আশ্চর্য্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, যে-মানুষ আমাকে এত ভালবাসত তার মাঝে এতটুকু চাঞ্চল্যের সাড়া পেলাম না একদিনও। একদিনও নিজে হতে জানালে না তার মনের কথা, চাইল না মুখ ফুটে। পাষাণ-দেবতার মত শুধু পূজাই নিলে, বর দিলে না যতক্ষণ না মাথা কুটে মুখ ফুটে চাইলাম।"

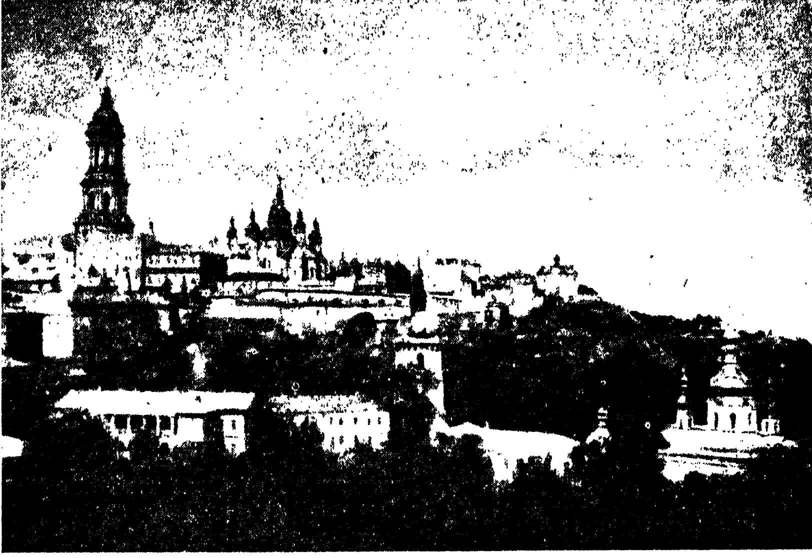
—দিলে ত? দু'দিন আগে, না হয় দু'দিন পরে।

বাইরে থেকে আমার স্বামী আর ছোড়দা এসে ঘরে ঢুকল।

আমরা দু'জনে হেসে উঠলাম।

লিপিকা হাসতে হাসতে বলল, নিজে হতে দিলে কৈ? ভক্তির জোরে কেড়ে নিলাম।





কীয়েভ শহর—ইউক্রেন

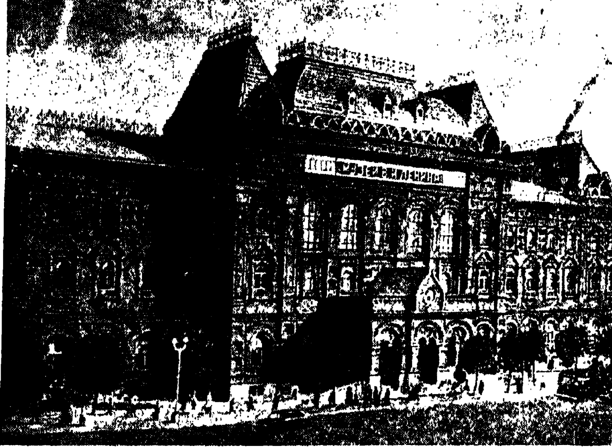
লৌহযবনিকার অন্তরালে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

২

স্কুলে পড়ে যে সব ছেলেমেয়ে তারাও বাপ-মার তত্ত্বাবধানেই থাকে। কারণ প্রত্যেক স্কুলেই 'গার্জেনস' বা 'পেরেন্টস কমিটি' আছে। তাঁদের নিয়মিত স্কুলে যেতে হয়। শিক্ষকদের সঙ্গে মিলে মিশে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় জনমজুরদের কাজ যারা করে তারা অন্য দেশের মত অবজ্ঞার বা অনুকম্পার পাত্র নয়। মেহনতের একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা হয়েছে সেদেশে—যেটা সবচেয়ে বেশী করে আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে! যাঁরা দৈহিক পরিশ্রম করে খেটে খায় সোভিয়েট সমাজে কেউ তাদের হেয়জ্ঞান করেন না। Superiority বা inferiority complex-এর কোনও অবকাশ নেই সেখানে। অর্থমূল্যে সেখানে মানমর্য্যাদার যাচাই হয় না। গুণ ও বিদ্যার কৌলিন্যই সেখানে বড়। যদিও বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা সেদেশে শ্রমজীবিদের চেয়ে অনেক ভাল, কারণ একজন প্রসিদ্ধ জনপ্রিয় লেখক, বা কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন অধ্যাপক, বা কোনও যশস্বী চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার অথবা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সেখানে মাসে পনের থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করেন। তাঁর নিজস্ব বাড়ী আছে, মোটরগাড়ী আছে, দাসদাসীও আছে। তিনি মূল্যবান পোশাকও পরেন, দামী সিগারেটও খান। কিন্তু, তিনি কোনদিনও ভোলেন না যে, ঐ কারখানার মজুরটি বা মোটর-গাড়ীর মিস্ত্রীটি, ঐ ট্রেনের ড্রাইভারটি বা সুতাকলের ফোরম্যানটির দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা বা মর্য্যাদা তাঁদের কারুর চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। উপার্জ্জন কম বেশী হতে পারে, অবস্থারও তারতম্য স্বাভাবিক, কিন্তু সেজন্য মানমর্য্যাদার দিক থেকে সে লোক কারু কাছে খাটো নয়। দিকপাল প্রফেসারকে তাঁর মোটর ড্রাইভারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে দেখেছি। বিশ্ববরেণ্য লেখককে দেখেছি তাঁর ভৃত্যের মুখের সিগারেট ধরিয়ে দিতে। সোভিয়েট দেশের সমাজব্যবস্থার এই যে স্বাস্থ্যকর দিকটা যেখানে সকল মানুষের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সমান, এ আদর্শ আমার মনে হয়, বিশ্বের অনুকরণীয়। পৃথিবীর অনেক অশান্তি এতে দূর হবে। এ ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ থেকে গেলেও—শ্রেণী-বিদ্বেষ আসতে পারে না।

নরনারী উভয়েই সেখানে সকল বিষয়ে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন দেখেছি। সোভিয়েট মেয়েরা কেবলমাত্র মেয়ে বলে কোনও অধিকার থেকেই বঞ্চিত নন। সমাজের কোনও ব্যাপারে কোনও স্তরেই তাঁরা অবজ্ঞাত নন। কোনও কাজের পথেই তাঁরা অনুপযুক্ত বলে গণ্য হন না। আমরা দেখেছি অনেক মেয়ে রেল লাইনে, ইস্পাতের কারখানায়, গৃহনির্ম্মাণে এমন সব কঠিন পরিশ্রমের কাজ করছেন যা অন্যদেশে কেবলমাত্র পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুর উপযোগী বলে গণ্য হয়েছে। সোভিয়েট দেশের



লেনিন মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী—মস্কো

উপর লেখবার সরঞ্জাম। বাথরুমে সাবান, তোয়ালে, ঝাড়ন কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। ইউরোপের সব ভাল হোটেলেই এই রকম ব্যবস্থা দেখেছি। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখলাম না।

এখানেও কর্ত্তৃপক্ষ আমাদেরই কাছে জানতে চাইলেন আমরা কি কি দেখতে চাই, কোথায় কোথায় যেতে চাই, কোন কোন বিষয় জানতে চাই? লেনিনগ্রাডে আমাদের যে বিপদ হয়েছিল—এখানেও হ'ল তার পুনরাবৃত্তি। ভারতীয় প্রতিনিধি যারা এসেছিলেন তাঁরা নানা প্রদেশে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত লোক; কাজেই, তাঁদের রুচিও বিভিন্ন প্রকারের। এখানে এসেও ডাক্তাররা চাইলেন হাসপাতালে যেতে; আইন-ব্যবসায়ীরা চাইলে আদালতে যেতে; যাঁরা ইঞ্জিনীয়ার তাঁরা পূর্ত্তবিভাগের কাজ দেখতে চাইলেন; গান্ধী সেবাশ্রমের প্রতিনিধিরা গ্রামের গোশালা দেখতে চাইলেন। বিনোবাজী ভাবের ভূদানযজ্ঞের কর্ম্মীরা চাইলেন কৃষকদের ভূমিবণ্টন ও যৌথ ক্ষেতখামার দেখতে। ব্যবসায়ীরা চাইলেন কলকারখানা দেখতে। অধ্যাপকেরা চাইলেন বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। সিনেমার প্রযোজকেরা চাইলেন ফিলম ষ্টুডিও দেখতে। সঙ্গীত ও সুরশিল্পীরা যেতে চাইলেন গানবাজনার আসরে। চিত্র-শিল্পীরা চাইলেন আর্ট স্কুলে যেতে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা চাইলেন প্রাভদা প্রেস ও অন্যান্য সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলি দেখতে। লেখকরা চাইলেন গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও লেখকদের সঙ্গে আলাপ করতে। বৈজ্ঞানিকেরা চাইলেন আণবিক শক্তির অনুশীলনাগার দেখতে; এই আণবিক শক্তির অনুশীলনাগার হ'ল বিশেষভাবে নিষিদ্ধ স্থানের অন্যতম—যাকে বলে ইংরেজীতে Top-Secret বা অত্যন্ত গোপনীয়! কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না যখন তাঁরা হাসিমুখে বৈজ্ঞানিকদের এ আব্দারও মেনে নিলেন।

মেয়েরা সেই সব ভারী কাজও আশ্চর্য্যরকম দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করছেন। এখানে আমরা সর্ব্বত্র লক্ষ্য করলাম—অধিকাংশই নারী শ্রমিক। পুরুষের সংখ্যা নগণ্য।

রাত্রি এগারটার পর আমরা লেনিনগ্রাড ছেড়ে মস্কো অভিমুখে রওনা হই। লেনিনগ্রাড থেকে মস্কো আসতে রেলপথে মাত্র আট ঘণ্টা লেগেছিল। সকাল আটটা নাগাদ আমরা মস্কো শহরে এসে নামলাম। এখানেও সেই একই দৃশ্য! রেল ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। মস্কোবাসী ছেলে-বুড়ো সবাই ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখি—বিরাট অভ্যর্থনা-সভা। সিটি সোভিয়েটের কর্ম্ম-কর্ত্তারা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন।

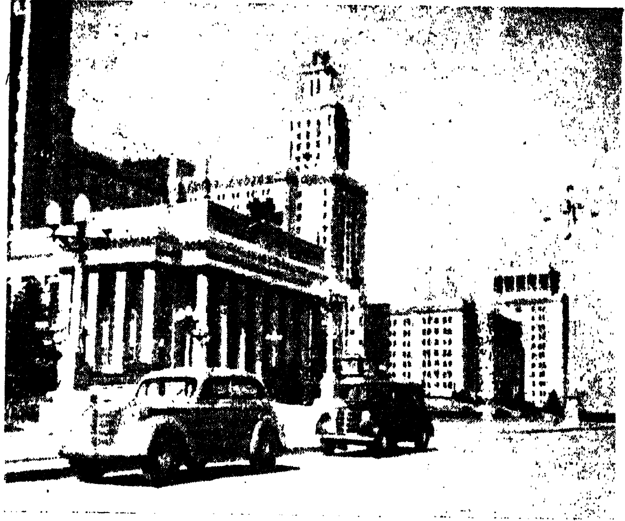
এখান থেকেও মোটরবাসে তুলে আমাদের থাকবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হোটেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

মস্কোবা নদীতীরে বিরাট শহর মস্কো। একদা প্রাচীন রুশের রাজধানী ছিল এখানে। তার পর যায় সেন্ট পীটার্সবার্গে। এখানে "হোটেল ইউরোপা" নামে একটি প্রসিদ্ধ বড় হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানকার প্রত্যেক হোটেলই পাঁচ-সাত তলা বিরাট বাড়ী। সাত-আটশ' সুসজ্জিত বড় বড় ঘর আছে। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের রাজোচিত ব্যবস্থা! বৈদ্যুতিক লিফট আছে। ওঠা-নামায় কিছুমাত্র অসুবিধা নাই। লেনিন-গ্রাডের হোটেল-এ্যাস্তোরার মত মস্কোয়ের হোটেল য়ুরোপাতেও আমরা সুন্দর একখানি বসবার ও তৎসংলগ্ন একখানি শোবার ঘর পেয়েছিলাম। ঘরের সঙ্গেই সংযুক্ত প্রশস্ত বাথরুম। বসবার ঘরে টেবিল, চেয়ার, আরাম-কেদারা, রেডিয়ো, টেলিফোন। পোষাকের আলমারি, ক্যাবিনেট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। টেবিলের

সবকিছুই সযত্নে দেখালেন তাঁরা আমাদের। এখানেও প্রতি-দিন রাত্রে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল—হয় "বলশই থিয়েটার" নয় ত 'মস্কো আর্ট থিয়েটার'। সেই নাট্যাভিনয়, অপেরা, ব্যালে, পাপেট ডান্স, ওপেন এয়ার থিয়েটার, সিনেমা, সার্কাস। লেনিনগ্রাড ও মস্কো শহরের এই সব আমোদপ্রমোদ দেখে আমাদের বারবার এই কথাই মনে হচ্ছিল যে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপের কোন দেশের চেয়ে পিছিয়ে নাই! বরং এদের ব্যালে ডান্স ও পাপেট ডান্সের তুলনা মেলে না কোথাও!

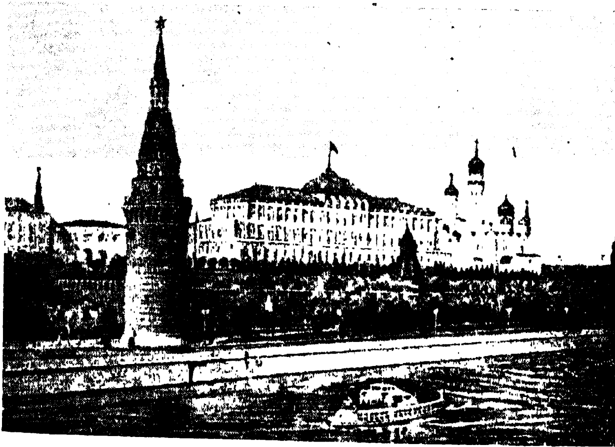
মহিলারা অধিকাংশই বিস্মিত হয়েছিলেন মেয়েদের জন্য এখানে কোন পৃথক প্রতিষ্ঠান নাই শুনে! কিন্তু তাঁরা আশাতীত খুশী হয়ে উঠলেন যখন দেখলেন এখানে তাঁরা সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রায়

সর্ব্বেসর্ব্বা ! যে কোনও ফ্যাক্টরীতে গিয়ে দেখেন ১২।১৩ হাজার শ্রমিকের মধ্যে দশ হাজারই মেয়ে। হাসপাতালের প্রধান কর্ত্রী এবং বড় বড় সার্জ্জন ও চিকিৎসকরা অধিকাংশই মেয়ে! নার্সরা তো বটেই। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মেয়েদেরই প্রাধান্য। ডাক, তার, রেল প্রভৃতিতে মেয়েরাই কাজ করছেন বেশী! সমস্ত নার্সারী, কিণ্ডার গার্টেন ও অনাথ আশ্রম পরিচালনা করছেন মেয়েরা। লাইব্রেরিগুলি, মিউজিয়ম ও শিল্প-কলা বিভাগেও মেয়েরাই কর্ত্তা। সোভিয়েট রাশিয়াকে এক কথায় বলা যায় প্রমীলার রাজ্য। এর কারণ অনুমানে মনে হয় গত যুদ্ধে রাশিয়ার পুরুষেরা এত বেশী প্রাণ হারিয়েছেন যে, আজ মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হয়েছে পুরুষের কাজে। নিন্দুকেরা বলেন, পুরুষদের মিলিটারী শিবিরে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই মেয়েদের স্কন্ধে এই গুরুভার এসে পড়েছে!



বিশ্ববিদ্যালয়—মস্কৌ

এদেশের মেয়েদের বিশেষত্ব দেখলাম এরা কোনও প্রসাধন ও বিলাসসজ্জা করেন না। লিপষ্টিক, নেল পলিশ, আইব্রাউ পেন্সিলের ধার ধারেন না। কোনও কৃত্রিম বেশে সাজা পুতুল হয়ে থাকেন না। সহজ সারল্যে স্বাভাবিকরূপে এদের অনেক বেশী সুন্দর মনে হ'ল। অনুসন্ধানে জানা গেল এদের সমাজে আর গণিকাবৃত্তি নাই।



ক্রেমলীন প্রাসাদ—মস্কৌ

মস্কৌ শহরপ্রান্তের কৃষিশিল্প-প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে আমাদের অনেকেরই সোভিয়েট রাশিয়ার এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলি দেখে আসবার বাসনা হয়েছিল। ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্র তার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু মস্কৌ শহর তখনো খুঁটিয়ে দেখা হয় নাই। আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তা আশ্বাস দিলেন—কোন চিন্তা নেই। এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলি দেখে আবার আপনারা মস্কৌ নগরে ফিরে আসবেন। সব তখন, যা-যা দেখতে বাকী আছে সেগুলি দেখে নেবেন। স্থির হ'ল পরদিন সকালে আমরা কাজাকস্তানে যাব। সেখান থেকে উজবেগীস্তান এবং উজবেগীস্তান থেকে তাজিকীস্তান দেখে মস্কৌয় ফিরে আসব। "জর্জ্জিয়া", "আর্মেনিয়া", আজার বাজান এগুলি আর দেখবার সুযোগ হবে না। কারণ সময় কম, আমাদের ভিসা ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের।

মস্কৌ শহরপ্রান্তের কৃষিশিল্প-প্রদর্শনী দেখে মনে হ'ল পৃথিবীর এ এক নবম আশ্চর্য্য! দেড় বৎসর ধরে এই প্রদর্শনী চলছে শুনলাম। সোভিয়েট রাশিয়ায় ষোলটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন। মাইলের পর মাইল জুড়ে বিশাল অথচ সুবিন্যস্ত এই প্রদর্শনী-ক্ষেত্র। ষোলটি রিপাবলিকের প্রত্যেকটি যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাদের স্ব স্ব প্রদেশের স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এক-একটি বিরাট "প্যাভিলিয়ন" তৈরি করেছেন। প্রত্যেকটিই গঠন-পারিপাট্যে অপূর্ব্ব! সমগ্র প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের উপর সবুজ তরুবীথি-সজ্জিত, সুদৃশ্য আলোক স্তম্ভে পরিবেষ্টিত মসৃণ পথ। পথের দু'ধারে ফুলের

ফোয়ারা করা, মাঝে মাঝে সুগঠিত সুন্দর ফোয়ারা, রঙীন আলোক-সম্পাতে এই উৎসধারা বিচিত্র ও রমণীয় হয়ে ওঠে। ভাস্কর্য-শিল্পের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ অসংখ্য সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি চারিদিকে স্থাপিত। রাত্রে দীপাবলী সমুজ্জ্বল এই প্রদর্শনী যেন রূপকথার এক মায়াময় স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়।



"বলশয়" থিয়েটার—মস্কো

ষোলটি রিপাবলিকের যা কিছু সম্পদ—কৃষি, শিল্প, যন্ত্রপাতি, রম্যকলা, বয়নশিল্প, মর্ম্মর ও স্ফটিক শিল্প, কিছু কিছু ধাতু ও দারুশিল্প সুকৌশলে সবই এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। তার সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে তাদের খামারের ঈর্ষা করবার মত ঐশ্বর্য্য, ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগী, তাদের বাচ্চা, তাদের ডিম। প্রদর্শনীতে এনে দেখাবার মতই বটে, প্রত্যেকটি সুস্থ সবল নধর জীব। ডিমগুলি বেশ পরিপুষ্ট এবং আকারে বড়। এই প্রদর্শনীতে সবচেয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল জর্জ্জিয়া, উজবেগীস্তান, আর্মেনিয়া, তাজিকিস্তান ও আজারবাইজান দেশের প্যাভিলিয়নগুলি।

অল্প সময়ে দেখা যাবে বলে এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলিতে বিমানপথে যাওয়াই স্থির হ'ল। পরের দিন সকালে যাত্রা করতে হবে, আজ আমরা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। নবনির্ম্মিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সোভিয়েট রাশিয়ার এক অদ্ভুত কীর্ত্তি বলা চলে। বত্রিশতলা উঁচু এক বিরাট প্রাসাদ; দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবার ব্যবস্থা আছে এবং কুড়ি হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে দৈনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগ, অনুশীলনাগার, পরীক্ষাগার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির জন্য বিশাল প্রেক্ষাগার আগাগোড়া মার্ব্বেল মোজাইকে মোড়া। আড়াই টন ওজনের এক-একটি ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে! কত যে মূর্ত্তি, কত যে চিত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশ্বর্য্য ও সমারোহ দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক! এ যেন বিংশ শতাব্দীর তৈরি আর এক "ক্রেমলীন প্রাসাদ।" লেনিন পাহাড়ের উপত্যকার উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেই বাল্টিক সমুদ্রতীরে লেনিন পাহাড়ের চূড়াকে সমভূমি করে নিয়ে তার গর্ভে তৈরি হয়েছে লক্ষাধিক লোকের একত্রে বসে খেলা দেখবার উপযোগী এক বিশাল ষ্টেডিয়াম। এরও চারিদিকে উদ্যান ও পুষ্পতরু কুঞ্জকলাসম্মত ভাবে সাজানো। ভারি মনোরম লাগল এ স্থানটি। এখান থেকে মস্কো শহর অতি চমৎকার দেখায়।

বিমানপথে উড়তে উড়তে একে একে আমরা কাজাকস্তান থেকে উজবেগীস্তান এবং সেখান থেকে তাজিকীস্তান পর্য্যন্ত দু'চারদিন করে নেমে নেমে দেখে নিলাম। মোট প্রায় পাঁচ হাজার মাইল বেড়িয়ে আসা হ'ল। সর্ব্বত্র আমাদের সে কি বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর! আমরা যাবার ঠিক দু'এক দিন আগেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এ সব অঞ্চল ঘুরে গিয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও অভাবনীয় জনপ্রিয়তা ভারতবাসী-মাত্রকেই যেন সোভিয়েট রাশিয়ার পরমাত্মীয় করে তুলেছিল। লেনিনগ্রাড ও মস্কো শহরের সর্ব্বত্র যে কি অকৃত্রিম আদর যত্ন পেয়েছি তা বলে শেষ করতে পারব না। সবারই মুখ যেন নেহরুর কথা বলতে বলতে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল! নেহরু যেন এদের কাছে সাক্ষাৎ বিশ্ব-শান্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ! শান্তির এই দেবতার প্রায় পিছু পিছু ওখানে গিয়ে পড়ায় সৌভাগ্যক্রমে আমরা এদের এই সদ্যজাগ্রত নেহরু-প্রীতির পূর্ণ সুযোগটুকু পেয়েছিলাম।

এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলি দেখে আমাদের যেন বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কিছুদিন আগেও যারা দীর্ঘ পরাধীনতার দুঃসহ চাপে সর্ব্বহারা হয়ে নিরক্ষর, বর্ব্বর এবং জংলী পাহাড়ীর দল রূপে পরিচিত ছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতি-বিমুখ এক অলস, কর্ম্মহীন, মেরুদণ্ড-ভাঙা জাত বলে যারা অখ্যাতি কুড়িয়েছিল, আজ দেখি তারাও সব মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠেছে। এ যেন সোভিয়েট দেশের বিপ্লবী কুমারদের বলিষ্ঠ হাতের সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে এশিয়ার এ অঞ্চলের ঘুমন্ত কুমারীরা সহসা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদের তাশকান্ত, সামারখাণ্ড, ষ্টালিনাবাদ প্রভৃতি শহরগুলি দেখে আমরা সত্যিই অবাক হয়েছি। অতি-আধুনিক যানবাহন ও তদুপযোগী তরুবীথি ও দীপস্তম্ভ পরিশোভিত পথঘাট, দু'ধারে বড় বড় অট্টালিকা পৃথিবীর অপর সকল অগ্রসর জাতির সঙ্গে তারা প্রায় সমপর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, থিয়েটার, সিনেমা, লেকচার-হল, কল-কারখানা কিছুর অভাব নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-প্রণালী ও জাতিগঠন পদ্ধতির সুনিয়ন্ত্রণের গুণে হাজার বছরের অবহেলিত, অবজ্ঞাত ও অধঃপতিত মানুষেরা আজ শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, সমৃদ্ধ ও সুসভ্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য একদিন

এই 'আভিসেনা', 'ফার্‌দৌসী', এলবুকার্কের দেশে শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার বড় কম ছিল না। কিন্তু ঘন ঘন বৈদেশিক আক্রমণ, বিভিন্ন জাতির উৎপীড়ন, অত্যাচার ও শোষণ এবং দীর্ঘ পরাধীনতার অভিশাপে এরা সব হারিয়ে অমানুষ হয়ে পড়েছিল। আজ তারা আবার তাদের সে অপহৃত মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছে। দশ-বর্ষাত্মজের পদস্পর্শে যেন পাষাণী অহল্যার মুক্তি ঘটেছে।

দেখতে দেখতে রুক্ষ মরুভূমি যেন কোন যাদুমন্ত্রে শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। মৃতপ্রায় শুষ্কতরু ফুলে-ফলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। পাহাড় পোষ মেনেছে, অরণ্য মাথা নুইয়েছে। হাজামজা নদীগুলো হয়ে উঠেছে যেন পুণ্য পীযূষধারা। এ দিকের অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু সূর্য্যের আলোকে যেমন রাত্রির ঘন অন্ধকারও দূর হয়ে চারিদিক দীপ্ত হয়ে উঠে তেমনি শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল দীপরশ্মি আজ এখানে তার শুভ্র শুভ কিরণ বিকীর্ণ করে দীর্ঘসঞ্চিত সকল মালিন্য দূর করে দিয়েছে। মেয়েরা তাঁদের এত কালের অভ্যস্ত 'বোরখা' ফেলে দিয়ে পুরুষের সঙ্গে আজ হাত ধরাধরি করে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। হু হু করে দেশ এগিয়ে চলেছে। ভাঙা মেটে দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি কুঁড়েঘর একে একে অদৃশ্য হয়ে প্রাসাদে পরিণত হচ্ছে। জল-বিদ্যুতের কারখানা দিচ্ছে বিজলী শক্তি ও আলো। যৌথ ক্ষেত-খামার আজ তাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভরে দিয়েছে।

আমরা যেন এসেছি এ'দের কত দিনের আপন জন! বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। আজ হঠাৎ ঘটে গেছে যেন অপ্রত্যাশিত এই আত্মীয়-মিলন! এমনিতরই আন্তরিক আদর যত্ন সেবা ও পরিচর্য্যার মধ্যে আনন্দে কেটে গেল আমাদের দিনগুলি এই এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলির মধ্যে। এখানেও আমাদের সকলকে নৃত্যগীত ও পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত করবার একটা প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গিয়েছিল যেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে। এ'দের যা কিছু প্রাচীন সম্পদ ও যা কিছু নবলব্ধ ঐশ্বর্য্য তার প্রত্যেকটি আমাদের নিয়ে গিয়ে দেখালেন। দশ-বারখানি বড় বড় ষ্টালিন ও মলোটভ কারখানায় তৈরি আরামদায়ক মোটরকারে আমাদের নিয়ে তাঁদের দেশের চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এলেন, তাজকীস্তানের সীমান্ত থেকে ভারতবর্ষ মাত্র দেড় হাজার মাইল। বিমানে কয়েক ঘণ্টার পথ। এখানে এসে প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম 'তাজ-মহল' কারা এসে তৈরি করেছিল। জুম্মা মসজিদ, এৎমৎদৌলা, দেওয়ানীখাস, দেওয়ানী আম কোন্ শিল্পীদের হাতে গড়া। সেই সব কারিগরের বংশধরেরা আজও এখানে আছে। তাশখন্দের নব-নির্ম্মিত নাট্যশালায় ঢুকেই প্রথম চমক লাগে—এ কি! এ যে তাজমহলে এসে পড়েছি! সোমনাথবুরুজ, আদিল ঝরোকা প্রভৃতির জন্য আমরা যে নিশ্চিত সামারখন্দের শিল্পীদের কাছে ঋণী এ কথা জোর করে বলা যায়। এদের নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্রও বারবার আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে ভারতীয় কয়েকটি নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃত পরিমাণে এ'দেরই দ্বারা প্রভাবিত।

সপ্তাহকাল পরমানন্দে এই সব অঞ্চলে ঘুরে তাজিকীস্তানের ফুলদার টুপি ও রঙীন আলখাল্লা উপহার নিয়ে আবার আমরা বিমানযোগে মস্কো ফিরে এলাম।

এবার মস্কো ফিরে এসে আমরা প্রথমই দেখতে গেলাম বিশ্ববিশ্রুত 'ক্রেমলীন প্রাসাদ'। ক্রেমলীন প্রাসাদের বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্ভার দেখে বিস্ময়াভিভূত বিবেকানন্দ ভায়া বললেন, দাদা! এ যে সেই আরব্য উপন্যাসে পড়া সুলতান হারুন-উল রসিদের রত্নখচিত বাদশাহী রঙমহলে এসে পড়লাম! আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ না পেলে কি এমন স্বর্ণচূড়া বিরাট রাজপ্রসাদ গড়া যায়? কথাটা মিথ্যা নয়। দেখেছি আর অবাক হয়ে ভেবেছি এত অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ও অমিত সম্পদ এরা কোথায় পেয়েছিল যাতে এত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত এক প্রাসাদ খাড়া করতে পেরেছে! কোটি কোটি প্রজার রক্ত শোষণের ও পররাজ্য লুণ্ঠনের পরিচয় বহন করছে এ প্রাসাদ। ক্রেমলীন প্রাসাদ বোধ করি পৃথিবীর সকল রাজপ্রাসাদকে লজ্জা দিতে পারে। বিশদ বিবরণ দিতে গেলে ক্রেমলীন প্রাসাদ নিয়েই একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হয়ে যাবে।

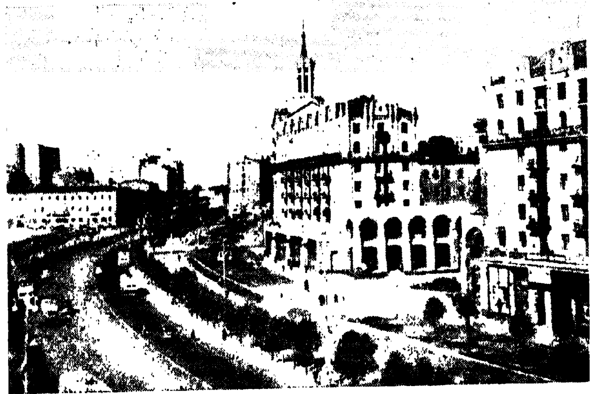
বিকেলের দিকে যাওয়া হ'ল বিখ্যাত রেডস্কোয়ারের অভ্যন্তরে রক্ষিত মহামতি লেনিন ও ষ্টালিনের অপূর্ব্ব সমাধিমন্দির দর্শনে। মৃত্তিকার অতল গভীরে নির্ম্মিত মূল্যবান রক্তিমবর্ণ গ্র্যানাইট শিলায় গ্রথিত এই সমাধি-ভবনের মধ্যে প্রবেশ করবার সময় নব মানব-সমাজের স্বপ্ন-দ্রষ্টা ও যুগস্রষ্টা লেনিনের ও তাঁর সহকারী দুঃসাহসী যোদ্ধা ষ্টালিনের নানা কীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তি মনে পড়ছিল। সমাধি-গর্ভে উচ্চ বেদীর উপর দুটি দীর্ঘ স্ফটিক আধারে পাশাপাশি শায়িত রয়েছে দুই অক্লান্ত কর্ম্মীর প্রাণহীন দেহ। এমন এক বিজ্ঞানলব্ধ গূঢ় রাসায়নিক প্রণালীতে এ'দের নিষ্প্রাণ দেহ দুটি সুরক্ষিত যে, দেখে মনে হয় এঁরা যেন বিপ্লবের কঠিন ক্লান্তিকর কর্ম্মান্তে এইমাত্র ক্ষণ বিশ্রামের অবকাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন! পরম শান্তিতে পাশাপাশি দুজনে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। পরিধানে তাঁদের পদোচিত পোশাক। নীরব শ্রদ্ধায় আমরা পা টিপেটিপে সেই সমাধি-বেদীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করে এলাম। ভয় হয়, বুঝি বা আমাদের পদশব্দে এখনি এই দুই কর্ম্মবীর ঘুম ভেঙে জেগে উঠবেন। ভারতের পক্ষ থেকে এই দেশপ্রেমিক বীর নায়কদ্বয়ের স্মৃতিপূজার অর্ঘ্যস্বরূপ একটি বিরাট 'পুষ্প-ফলক' বা ঢাল (shield of flowers) আমরা তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করে দিয়ে এলাম।

সোভিয়েট রাশিয়ার নিপীড়িত জনগণের মুক্তিদাতা, নবমানব-সমাজের সংগঠক এই দুই মহাপুরুষকে দেখবার জন্য বেলা দুটো থেকেই কাতারে কাতারে লোক এসে জড় হয়। বেলা পাঁচটায় সমাধি-মন্দিরের দ্বার খুলবে—অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সবাই অপেক্ষা করছে। রোদ-বৃষ্টি গ্রাহ্য নাই তাদের। যেন তীর্থ যাত্রীর দল দেব-দর্শনে এসেছে। দু'জন দু'জন করে 'কিউ' দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! সাতটায় মন্দির দ্বার বন্ধ হবে। সেই ফাঁকে একবার মুহূর্ত্তের জন্য ঝাঁকি দর্শন করে কৃতার্থ হবে তারা!

পরের দিন আমরা জনকয়েক সাহিত্য-সেবী যেতে চাইলাম ঋষি টলষ্টয়ের আশ্রমে। মস্কো থেকে টলষ্টয়ের এই আবাস ১২৫ মাইল দূরে ইয়াস্নায়া পোলিয়ানা গ্রামে। এঁরা তৎক্ষণাৎ সে ব্যবস্থা করে দিলেন। মলোটভ কারখানায় তৈরি তুখানি বড় বড় 'জিস' মোটরকার আমাদের নিয়ে চলল। এক একখানিতে সাত জন আরোহী স্বচ্ছন্দ আরামে যেতে পারে। কিন্তু আমরা ছিলাম মাত্র আট জন। এ ছাড়া তুখানি গাড়ীতে ছ'জন পথপ্রদর্শক ও দোভাষী ছিলেন—মিঃ এ্যাণ্ড্রে ও মিঃ য়ুরা। 'জিস' মোটরকার চার ঘণ্টার মধ্যে আমাদের টলষ্টয়ের আশ্রমে এনে পৌঁছে দিল। আমরা প্রাতরাশের পরই যাত্রা করেছিলাম। বেলা তখন ১০টা হবে। পৌঁছতে দুটো বেজে গেল। সারাটা পথ দু'ধারে রাশিয়ার গ্রাম, ক্ষেত আর চাষী-মজুরদের বাড়ী দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন আমাদেরই দেশের পল্লী-অঞ্চল। সেই কুঁড়েঘর। মাটির দেওয়াল। খড়ের চাল। কারও বা আগাগোড়াই কাঠের তৈরি ঘর। ভেঙে পড়েছে। রং নাই, মেরামত নাই। চাষী আর চাষী-বউ অধিকাংশই খালি পায়ে খালি গায়ে ক্ষেতে কাজ করছে। এ সময়টা ওখানে গরম কাল। মেয়েদের গায়ে জামা আছে, মাথায় রুমাল বাঁধা। শহরের মেয়েরাও এখানে টুপী পরেন না, খালি মাথায় থাকেন বেশী। কেউ কেউ রুমাল বাঁধেন।

টলষ্টয় মিউজিয়ামের সেক্রেটারী ও প্রেসিডেণ্ট এগিয়ে এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এ দলের মধ্যে আমিই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম বলে আমাকেই মুখপাত্র হয়ে টলষ্টয় মিউজিয়ামের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও আলাপ-আলোচনান্তে তাঁরা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিয়ে গেলেন একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর রেস্তোরাঁয়। এখানে টেবিল সাজানো হয়েছিল এমন কলাকুশলতার সঙ্গে যে দেখলেই মনটি প্রফুল্ল হয়ে ওঠে! আহার্য্য দ্রব্যও ছিল সুস্বাদু ও সুরুচিকর।

খেয়ে উঠতে চারটে বেজে গেল। প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী দু'জনেই বয়োবৃদ্ধ। এঁরা দীর্ঘকাল টলষ্টয়ের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট টলষ্টয়ের শেষবয়সে তাঁর ব্যক্তিগত কর্ম্মসচিব ছিলেন। টলষ্টয়ের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে খেতে খেতে কত গল্প তাঁরা করছিলেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। সময় যে কত দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে সেদিকে আমাদের খেয়াল ছিল না। সেক্রেটারী ঘড়ি দেখে বললেন এইবার আমাদের উঠতে হয়, চারটে বেজে গেছে। পাঁচটায় মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে।



কীয়েভের রাজপথ

হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। টলষ্টয় মিউজিয়াম ভবনের নীচের তলায় আপিস এবং প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটরীর ঘর। দর্শকদের বিশ্রামকক্ষ, গবেষকদের অনুশীলনাগার প্রভৃতি রয়েছে। উপর তলায় মিউজিয়াম। এখানে টলষ্টয় সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র এবং গ্রন্থাবলীর নানা সংস্করণ, পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, নানা ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলীর অনুবাদ, তাঁর হাতের লেখা কাগজপত্র, নানা বয়সের আলোকচিত্র



"কীয়েভের অশ্রুকুঞ্জে"

প্রভৃতি সম্বন্ধে রক্ষিত। মহাত্মা গান্ধীর লেখা চিঠিগুলিও আছে।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা মনীষী টলষ্টয়ের বাসগৃহ দেখতে গেলাম। এও পাঁচটার পর বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর কৃপায় পাঁচটা বেজে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা বিশেষ অনুমতির বলে সেখানে প্রবেশাধিকার পেলাম। ঋষি টলষ্টয়ের বাড়ী। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গেই আমরা তার প্রবেশদ্বার অতিক্রম করলাম। ঘন তরু সমাচ্ছন্ন বিশাল উদ্যান পরিবেষ্টিত সে বাড়ী। বাগানের পথ পার হতে হতে তাঁরা দেখালেন এই 'রিং' দোলনায় তিনি দোল খেতেন, এই প্যারালাল বারে তিনি ব্যায়াম করতেন। এইখানি তাঁদের বাড়ীর Foundation Stone, এই গাছের তলায় যে সব বেঞ্চি পাতা দেখছেন কৃষক সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা এসে এখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করত। তিনি এসে তাদের প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ শুনে তার প্রতিকার করতেন। 'লাঙল যার জমি তার'—এ ঋষি টলষ্টয়ের বাণী। তিনি নিজের জমিদারীর সমস্ত কৃষি-জমি চাষীদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন এবং নিজে অভিজাত বংশের একজন কাউন্ট হয়েও জমিতে নিজের হাতে লাঙল দিতে লজ্জা বোধ করতেন না।



শেভচেংকো স্মৃতিমন্দিরে—কীয়েভ

এইবার আমরা তাঁর বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। তাঁরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করবার Reception Hall বা অভ্যর্থনা কক্ষ, তাঁর লাইব্রেরি, বসবার ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর, লেখাপড়ার ঘর, বিশ্রাম-কক্ষ,অতিথিদের ঘর, Drawing Room, Bath-Room, তাঁর স্ত্রীর শয়নকক্ষ, একে একে সমস্তগুলি দেখালেন এবং তাঁর ইতিহাস শোনালেন। যেমনটি ছিল তাঁর জীবদ্দশায় ঠিক তেমনি করেই সব রাখা হয়েছে। সমস্ত দেখে শেষ করতে রাত্রি আটটা বেজে গেল। মস্কো ফিরলাম আমরা রাত্রি বারটায়।

পরের দিন রাত্রে আমাদের মস্কো ছেড়ে য়ুক্রেন যাবার ব্যবস্থা ছিল। সকালে লেনিন লাইব্রেরি দেখতে গেলাম। মস্কো শহরের এই লেনিন লাইব্রেরি সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি। এখানে ৮০ লক্ষ বই সংগৃহীত আছে এবং প্রতি বৎসরই পুস্তকের সংখ্যা বাড়ছে। এই গ্রন্থাগারে বিশ্বের নানা ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ রাখা হয়েছে। হাতের লেখা পুথি ও পাণ্ডুলিপিও অসংখ্য রয়েছে। 'ওরিয়েণ্ট্যাল রিসার্চ্চ সেকশন' বলে এই লাইব্রেরির পৃথক একটি বিভাগ আছে। এখানে এশিয়ার সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ বই স্থান পেয়েছে। সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, উর্দ্দু, হিন্দী, ফার্সি, হিব্রু, আরব, চীন, বর্ম্মী, তিব্বতী এমনকি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকও অসংখ্য রয়েছে দেখলাম। তার মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এমনকি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বইও রয়েছে। মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অসংখ্য সাময়িকপত্র-পত্রিকাও সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। বাংলা বইয়ের সংগ্রহ দেখে মনটা বেশ খুশী হয়ে উঠল।

মস্কো শহরের ভূগর্ভস্থ রেলপথের প্রশংসা ইতিপূর্ব্বে অনেকের মুখে শুনেছিলাম। আজ মস্কো ছেড়ে চলে যাব, তাই দুপুরের দিকে মেট্রো-ইলেকট্রিক ট্রেনে একটু ঘুরে আসতে গেলাম। লণ্ডন ও প্যারিসের ভূগর্ভস্থ রেলপথে বেড়িয়ে এসেছি। এবার মস্কো শহরের পাতালে প্রবেশ করা গেল এদের 'মেট্রো' সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। দেখলাম আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা একটুও অতিরঞ্জন নয়। লণ্ডনের ইলেকট্রিক টিউব ট্রেন ও প্যারিসের মেট্রো মস্কো শহরের মেট্রোর তুলনায় একেবারেই নিষ্প্রভ! এ ঠিক ভূগর্ভস্থ রেলপথ নয়, যেন পাতালে বলিরাজার দৈত্য-প্রাসাদে প্রবেশ করেছি! আগাগোড়া ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে মার্ব্বেল পাথর ও মোজাইকে মোড়া মেট্রো ষ্টেশনগুলি যেন বাদশাহী দরবার হলের মত প্রশস্ত ও সুসজ্জিত। আশেপাশে ও মাথার উপর বৈদ্যুতিক ঝাড়লণ্ঠন ভূগর্ভের অন্ধকারকে দিনের আলোর চেয়ে উজ্জ্বল করে রেখেছে। লণ্ডন ও প্যারিসের মতই বৈদ্যুতিক এস্কেলেটার বা এলিভেটার, অর্থাৎ স্বয়ং-চালিত সোপান-শ্রেণী এই রেল-ষ্টেশনগুলিতে যাত্রীদের বিনা আয়াসেই পাতালে নামিয়ে দেয় আবার তুলেও আনে। প্রথম ধাপে পা দিয়ে দাঁড়ালেই মড় মড় করে সেই স্বয়ং-চালিত সোপান মেট্রো যাত্রীদের পাতালে নামিয়ে দেবে অথবা উপরে তুলে আনবে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে কত বিচিত্র কারুকার্য্য, রঙীন চিত্র ও অলঙ্করণ তার শোভা বৃদ্ধি করেছে। বড় বড় সব প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি ষ্টেশনের বিস্তীর্ণ চত্বরে স্থাপিত হয়ে

রাশিয়ার ভাস্কর্য্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সৌন্দর্য্যে, গঠন-পারিপাট্যে, পরিচ্ছন্নতায় ও প্রশস্ত পরিসরের স্বাচ্ছন্দ্যগুণে মস্কো শহরের ভূগর্ভস্থ 'মেট্রো' ভুবনে অদ্বিতীয় বলা যায়। কিন্তু, দীপের নিচের যেমন অন্ধকার তেমনি মস্কোর ঐশ্বর্য্যের পাশাপাশি দারিদ্র্যও প্রকট দেখলাম। সোভিয়েট রাশিয়া আজও সবরকমে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নি। এখনও মস্কোর বুকের উপর কলঙ্ক পঙ্কের মতো বস্তী বা দুঃখীর পাড়া রয়েছে। ভাঙাচোরা কুঁড়ে ঘর। মস্কোর রাজপথে এমন অনেক পথিক চোখে পড়ে যাদের বেশভূষায় দৈন্যের চাপ সুস্পষ্ট। সোভিয়েট রাশিয়া আজও দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারে নি। শ্রেণী সংঘর্ষ না থাকলেও শ্রেণীভেদ রয়েছে।



সমরখন্দের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে

আবার সেই স্পেশ্যাল ট্রেন। ডি-লুক্স সেলুনকার। চলেছি মস্কো ছেড়ে যুক্রেনের দিকে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শস্যভাণ্ডার হ'ল এই য়ুক্রেইন রিপাবলিক। য়ুক্রেনের প্রধান শহর কীয়েভে এসে যখন নামলাম তখন বেলা প্রায় চারটে। খাওয়াদাওয়া ট্রেনের রিফ্রেসমেণ্ট কারেই হয়েছিল। এখানেও সেই একই দৃশ্য। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে বিপুল জনতার সমাবেশ হয়েছে।

অভিনন্দনের উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর পরস্পরের সঙ্গে করমর্দ্দন ও প্রীতিবিনিময়ান্তে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল কীয়েভের এক বিরাট হোটেলে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা শহর পরিদর্শনে বেরুলাম। নীপার নদীতীরের এই সমৃদ্ধ শহর পুনঃ পুনঃ জার্ম্মাণ আক্রমণে নাকি গত যুদ্ধে অর্দ্ধেকের উপর সমভূমি হয়ে গিয়েছিল। বহুলাংশ পুনর্গঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। কীয়েভের যে বিখ্যাত পুরাতন স্বর্ণচূড়া ক্যাথেড্রাল তা আজও ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে। শীঘ্রই পুনর্গঠিত হবে মালমশলা এসে জড় হচ্ছে দেখে এলাম। নীপার নদীর উপর যে বিরাট সেতু ছিল জার্ম্মাণ কামানের গোলা তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়া সেখান থেকে সরে এসে আবার একটি নূতন সেতু নির্ম্মাণ করেছে। এর গঠন পরিপাট্য ভারি সুন্দর। শোনা গেল সেতুটি দৈর্ঘ্যে দু'মাইলের উপর। এঁরা বলেন পৃথিবীর মধ্যে এইটিই নাকি দীর্ঘতম সেতু! আমরা জানতাম ভারতের "শোন ব্রীজ"ই এ দাবি করতে পারে। যাই হোক, শহরের চারিদিক ঘুরে একাধিক পার্ক, মিউজিয়াম, শেভচেংকো স্মৃতিমন্দির প্রভৃতি দেখে এসে রাত্রে এখানেও শেভচেংকো রঙ্গালয়ে অপেরা দেখা হ'ল। শুনলাম অভিনেতৃ সম্প্রদায় নাকি সাইবেরিয়া থেকে তাঁদের ট্রুপ নিয়ে এসেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার নানা নগরে এরা অভিনয় দেখিয়ে যাবেন। অপূর্ব্ব অভিনয় করলেন এই সাইবেরিয়ার নট-নটীরা। মুগ্ধ হয়ে আমরা তাঁদের নাট্যকলা দেখছিলাম। কখন যে যবনিকা এসে পড়ল! যেন ঘুমভাঙা হারানো স্বপ্নের মতো চমকে উঠলাম। ঘড়িতে দেখি রাত্রি ১২টা বেজে গেছে।

পরের দিনটিও য়ুক্রেন ভ্রমণে কেটে গেল আমাদের। কীয়েভ শহর বেশ সমৃদ্ধ বলে মনে হ'ল। লেনিনগ্রাড বা মস্কোর তুলনায় কীয়েভকে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন বলা চলে। এরা ভাল ভাল পোষাক পরেন। এদের ছেলেমেয়েরা নানা ফ্যাশানের দামী পেরামবুলেটার চড়ে বেড়ায়। মস্কোয়ের বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়েকে কোলে-কাঁখে নিয়েই ঘোরেন। পেরামবুলেটার কিনতে পারেন না। এখানকার খাওয়াদাওয়াও মস্কোয়ের চেয়ে অনেক ভাল। হোটেলের ঐশ্বর্য্যও তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। সারা সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বত্র যেমন লেনিন ও ষ্টালিনের প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতির ছড়াছড়ি এখানেও লেনিন-ষ্টালিন বিরাজমান বটে, কিন্তু কৃতজ্ঞ কীয়েভ-বাসীরা য়ুক্রেনের বীরপুত্র শেভচেংকোকে ভুলতে পারে নি। শেভ-চেংকো একদা পোলাণ্ডের দুঃসহ অধীনতা পাশ থেকে য়ুক্রেনকে মুক্ত করেছিলেন। তাই য়ুক্রেনিয়ানরা আজও সসম্ভ্রমে তাঁর পূজা করে। শেভচেংকোর বিরাট প্রতিমূর্ত্তির অনতিদূরে কীয়েভের প্রসিদ্ধ "অশ্রুকুঞ্জ" বা Weeping Park। আমরা কীয়েভ ছাড়বার দিন সারা অপরাহ্ণকালটা এই অপূর্ব্ব সুন্দর পার্কটিতে ঘুরে ঘুরে কাটালাম। যে সব অগণিত য়ুক্রেনের বীর যুবক গতযুদ্ধে কীয়েভ রক্ষা করতে গিয়ে জার্ম্মাণকামানের মুখে প্রাণ দিয়েছে তাদের অসংখ্য সুসজ্জিত ফুলের সমাধি দেখে সত্যিই চোখের জল রাখা যায় না।

যুদ্ধের পর দীর্ঘ দশটি বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও কত পুত্রশোকাতুরা জননী, পতিহারা প্রিয়তমা সেই সমাধির পাশে এসে নিঃশব্দে বসেন। তাঁদের অজ্ঞাতসারেই দুই চোখ বেয়ে অশ্রু-অঞ্জলি ঝরে ঝরে পড়ছে দেখি! রাত্রি ১২টার ট্রেনে আমরা কীয়েভ ছেড়ে রাশিয়ার কাছে বিদায় নিলাম।



১১

ফুটবল ম্যাচ শেষ পর্য্যন্ত চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের মাঠেই খেলা হ'ল। রামপুরহাটের দল এর আগে অনেক ম্যাচ খেলেছে। ওখানে অনেক দিন থেকেই একজন জিমন্যাষ্টিক টিচার আছেন, তিনি পাকা ফুটবল খেলোয়াড়। ছেলেদের হয়ে তিনি ওদিকের ফুলব্যাক হয়ে খেললেন; ভূতনাথবাবুও চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের হয়ে গোলে খেললেন। রেফারী হলেন ব্রজবিহারী বাবু। খেলার দিন দুপুরবেলা থেকেই ঘনঘটা করে মেঘ করে এসেছিল, খেলার স্বুরু থেকেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। সকলেই ভেবেছিল—রামপুর চার-পাঁচ গোলে বিল্বগ্রামকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ছেলেরা গোড়া থেকেই চমৎকার খেলতে লাগল। বিশেষ করে দোনো ভাইয়ের খেলায় রামপুরহাট বিব্রত হয়ে পড়ল। দোনো ভাই—উমাপদ আর গৌরীপদ, দুই সহোদর, ওরা অবশ্য চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের তৈরী খেলোয়াড় নয়, ওরা দু'জনেই ম্যাট্রিক ফেল করে নতুন সেশনে অর্থাৎ মাসতিনেক আগে এসে ভর্ত্তি হয়েছে। তবে ওদের পৈতৃক বাসভূমি এই বিল্বগ্রামেই। ওদের বাপ উকীল, এই জেলারই চৌকি আদালতে প্র্যাকটিস করেন, ওরা সেখানেই পড়ত এবং সেইখানেই খেলা শিখেছে। দুই ভাই —দু'দিকের ইনম্যান হিসেবে খেলছিল। উইংসম্যান খেলছিল—বাঁদিকে শিবনাথ, ডান দিকে ধ্রুব। ধ্রুবর দাবি শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন ভূতনাথবাবু। তবে দু'ভাই ছাড়া ফরওয়ার্ড লাইনে সবাই বাহুল্য হয়ে উঠেছিল। এ বল ধরে ওকে দেয়, ও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে ফের ওকে দেয়—একেবারে উঁচু করে সকলের মাথা পার করে এবং নির্ঘাত গোলের মুখে ফেলে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেণ্টার ফরওয়ার্ডের পায়ের কাছে বল ফেলে দিতেই সে দিলে গোলে ঢুকিয়ে। রামপুরহাটের গেমস্ টিচার পাকা লোক, দুই আর দুই আঙুল গুণে চার হিসেব করতে হয় না তাঁকে খেলার বিষয়ে, চারে উপনীত হন তিনি মুহূর্ত্তে, সেণ্টার ফরওয়ার্ডের পায়ের কাছে বলটা পড়তেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতখানা তুলে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—অ—ফ সা—ই—ড।

তাঁর মতলব ছিল দুটো। একটা—চীৎকার শুনে সেণ্টার ফরওয়ার্ড বালকটি ভড়কে যাবে। দ্বিতীয়—রেফারী বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বালকটি ভড়কাল না; হুইসিলও পড়ল গোলের সঙ্গে সঙ্গেই। চীৎকার এবং গোল দুটোই এক সঙ্গে হয়ে গেল। গেমস্ টিচার তখনও হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি, ব্রজবাবুর চোখে হাই-পাওয়ার চশমা, জল পড়ে সব ঝাপসা হয়ে গেছে তাঁর। তিনি ছুটে এলেন গোলের কাছে, গেমস্ টিচার আবার চীৎকার করে উঠলেন—অ-ফ-সা-ই-ড।

ব্রজবাবুই ভড়কে গেলেন। এবং গোল না দিয়ে দিলেন অফসাইড ফ্রি-কিক। ওদিকে তার প্রতিবাদ করতে ভূতনাথবাবু এলেন গোল ছেড়ে এগিয়ে।—নট অফসাইড। নট অফসাইড। কিন্তু তখন রামপুরহাটের গেমস্ টিচার ফ্রি-কিক মেরে দিয়েছেন। বলটা গিয়ে পড়ল প্রায় এ-পাশের গোলের কাছে। এবং বিস্মিত চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ছেলেরা সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠতে-না-উঠতে গোল হয়ে গেল।

এর পর আর গোল হ'ল না কোন পক্ষেই। চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশন দমে গিয়ে সুরুতে যে উৎসাহে আরম্ভ করেছিল, সে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে আর খেলতে পারলে না।

চন্দ্রবাবু মনে মনে খুশী হলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর ছেলেরা প্রথম গোল দিতেই চমকে উঠেছিলেন তিনি। গুড গড! হ'ল কি? এ বেটারা করলে কি? গোল দিয়ে জিতে গেল? সর্ব্বনাশ! এর পর এদের আটকানো যে দায় হবে! ভাবতে ভাবতেই পাল্টা গোল! তিনি বাঁচলেন। মনের মধ্যে দুঃখও হ'ল। একেবারে দুঃখ হ'ল না বললে আত্মপ্রতারণা করা হবে। বিশেষ করে জিতে হেরে যাওয়া হ'ল যে। ফোর্থ মাস্টার কেষ্টবাবু এবং হেডপণ্ডিত তাঁর পাশেই বসেছিলেন—তাঁরা মনের আবেগে বলে উঠলেন—এটা কি হ'ল? ছি—ছি—ছি! ব্রজবাবু এটা কি করলেন?

রামজয় বললেন—কি হ'ল?

চন্দ্রবাবু বললেন—আমাদের ছেলেরা হারল।

—অস্যার্থ? মিনিংটা কি? ওই বংশখণ্ড দুটির মাঝখান দিয়ে বলটা প্রবেশ করাতে পারলেই গোল, ইতি প্রবাদ। না কি গো কেষ্টবাবু?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তবে? আমাদের ছেলেরা ত প্রথম বলটি ওদের গোলে ঢুকিয়ে দিলে। তারপর ত ওরা ঢোকালে। তবে আমরা হারলাম কেন?

—আমাদের ছেলেদের গোলটা গ্রাহ্য হ'ল না।

—কেন? এ ত বিচিত্র ন্যায়শাস্ত্র! বলটা বাঁশদুটোর মধ্য দিয়ে ঢুকে রশিখানেক বেরিয়ে চলে গেল; সকলেই গোল গোল করে সোরগোল তুললে—সেটা কি তা হলে বলছেন—মায়া?

—মায়া নয়;—অফসাইড হয়েছে।

—অফসাইড? সেটা কি?

—সেটা হ'ল—গোলটা বেআইনী হয়েছে। যেমন ধরুন, বল পায়ে মারতে হয়, হাতে মারলে বেআইনী হয়, হ্যাণ্ডবল হয়; তেমনি হয়েছে।

—কি বিপদ, তেমনটা কেমন তাই বলুন।

—ঠিক জানি না—তবে শুনেছি যখন বলটা গোলে মারলে আমাদের গোবর্দ্ধন—তখন ওর সামনে ওই গোলকিপার সমেত তিন জন রক্ষক থাকা উচিত ছিল, তিন জনের কম হলেই তখন অফসাইড হবে।

—অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়মভঙ্গ হ'ল; নিরস্ত্র অরাতির প্রতি আক্রমণ গোছের! কিন্তু তিন জনই ত ছিল। আমি ত স্পষ্ট দেখেছি।

—রেফারী দেখতে পান নি।

—ব্রজবাবু!

—হ্যাঁ।

—একে হ্রস্বদৃষ্টি, তার উপর চশমায় জল পড়ছে। ওঁর চোখে ত সব ধোঁয়া।

—তা হলে কি হবে। ওঁর ওই ধোঁয়া দেখাই সত্য।

চন্দ্রবাবু হেসে বললেন—তা বেশ হয়েছে। ওরা ভিজিটর্স্। ওদের একটু সম্মান করা ভালই হয়েছে। আমাদের ছেলেরা গোল ত করেছে। সেটা গ্রাহ্য হোক আর না-হোক। তা ছাড়া—।

চুপি চুপি বললেন—ভাল হয়েছে। জিতলে ওরা আর বাগ মানত না। ধরে বসত আরও ম্যাচ খেলব। এখানে যাব, ওখানে যাব। ব্রজবাবুও এতে দমবেন খানিকটা। ভাল হয়েছে।

রাত্রে সেদিন রামপুরহাটের ছেলেরা রইল এবং এখানকার ছেলেদের সঙ্গে প্রায় একটা পর্য্যন্ত হৈচৈ করলে। চন্দ্রবাবু তাঁর বাসার বারান্দায় বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং সজাগ কান পেতে বসে রইলেন। এসব মেলামেশার এই উচ্ছ্বাস-উল্লাসের ভিতরের চেহারা তিনি জানেন। সিদ্ধির নেশা থেকে অনেককিছু কদর্য্যতা এই উল্লাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি এসব ভালবাসেন না। তিনি এসব ভালবাসেন না।

অন্ধকারে বসেছিলেন তিনি। কেষ্ট আলো দিতে এসেছিল, কিন্তু তিনি সেটা সরিয়ে নিতে বলেছিলেন।

ব্রজবিহারী বাবুর ঘরে মজলিস বসেছে রামপুরহাটের গেমস্ টিচারকে নিয়ে। গেমস্ টিচারটির নাম এ জেলায় ছেলেদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। ছেলেরা খুব ভালবাসে লোকটিকে। লোকটির অবশ্য সদ্‌গুণ আছে তা স্বীকার করতেই হবে। তিনি অকৃতদার। ঘরবাড়ী আছে, বাপ-মা আছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ খুব নিবিড় নয়। মাইনে যা পান তার অধিকাংশটাই খরচ করেন ছেলেদের জন্যে। ছেলেদের ইস্কুলের মাইনে দেন, জামাকাপড় কিনে দেন, অসুখবিসুখে, চিকিৎসায় খরচ করেন। নিজে একটা মেস করেছেন—নাম দিয়েছেন—রোজভিলা মেস। সেখানে নিজের প্রিয় ছেলেদের নিয়ে থাকেন। যত দুর্দ্দান্ত ছেলে ওঁর প্রিয়। পড়াশুনার চেয়ে—ডাম্বেল, মুগুর, বারবেল এই সবের সমারোহ বেশী। লোকটি আশ্চর্য্য, এই দিকে আশ্চর্য্য যে, দুর্দ্দান্ত ছেলের সঙ্গে কতকগুলি ভাল ছেলেও ওর মেসে থাকে। যাদের পৈতৃক অবস্থা ভাল, যারা বেশী টাকাকড়ি

খরচ করে তারাও থাকে, আবার খুব গরীবের ছেলেও থাকে। খুব দুর্দ্দান্ত ক্রীড়াপ্রিয় গুণ্ডাগোছের ছেলেরা, থাকে আবার খুব ভাল ছেলেও থাকে। গরীব যারা তারা মেসের কাজকর্ম্ম করে দেয়, কেউ খাতা রাখে, কেউ বাজার করে, কেউ কিছু কেউ কিছু, এতেই তাদের মেসচার্জ্জ হয়ে যায়। আরও কতকগুলি খেয়ালী কাণ্ড আছে ওর—মধ্যে মধ্যে দু'তিন দিন ছুটি পেলেই ছেলেদের নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়েন,—সাইকেল নিয়ে ডুমকা নয় ত নলহাটি নয় ত তারাপীঠ কি বীরচন্দ্রপুর কি দ্বারকা নদীর ধারে ধারে অনেক দূর ঘুরে আসেন। রামপুরহাটে কারুর বাড়ীতে কঠিন রোগ হলে ছেলেদের নার্সিং করতে পাঠান। কোথাও কোন মেলা হলে ছেলেদের ভল্যান্টিয়ারি করতে পাঠান। তাতে মধ্যে মধ্যে মারপিটও হয়। এর কিছু ভাল, কিছু মন্দ। চন্দ্রবাবু মনে করেন মন্দটাই বেশী। অধিকারভেদ বোধটা এ যুগে উঠে যাচ্ছে। ছেলেরা ছেলে; আগে তাদের ভালত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—তার পরে তাদের ভাল কাজে নিয়োগ করতে হবে। তার আগে ভাল কাজ করতে দিলে তারা যদি ভাল কাজকে মন্দ করে ফেলে তবে সে দোষ অর্শাবে তোমাকে।

রাত্রি একটার সময় চন্দ্রবাবু আর থাকতে পারলেন না। ছেলেরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত্রি যত বাড়ছে ততই যেন ওদের উল্লাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লাস নয় উচ্ছৃঙ্খলতা। বারোটার পর থেকে এখানে-ওখানে সিগারেট বিড়ির আগুন জ্বলতে দেখতে পাচ্ছেন। ওরা ভেবেছে—মাষ্টারেরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে ত ভেবেছেই এ কথা। জীবনে কয়েক দিন ছাড়া দশটার বেশী তিনি জেগে থাকেন নি। ওরা জানে তাঁর খুব ভয়। তিনি ভীতু লোক। ওরা বলে ভূতের ভয় তাঁর। ওরা জানে না, ভূতের ভয় তাঁর নেই। সেই যে বাল্যকালে তাঁর বাবা তাঁকে এই বিল্বগ্রামের মাইনর ইস্কুলে ভর্ত্তি করে মিত্রকৃষ্ণপুরে বুড়ো মিত্তির-বাড়ীতে দু' বেলা ভাতের জন্ম রেখেছিলেন, সেই সময় থেকে ভূতের ভয় তাঁর কেটে গেছে। যে ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরের পাশে ছিল মস্ত বটগাছ, লোকে বলত—ভূত আছে; প্রথম প্রথম সামান্য ভয়ে হৃৎকম্প হ'ত তাঁর। সারারাত্রি জেগে বসে থাকতেন। তা থেকেই ভূতের ভয় কেটে গেছে। ভূতের ভয় তাঁর নেই। তবে ভয় তাঁর আছে। ভয়—দুর্দ্দান্ত ছেলেকে ভয়। এখানকার—এই বিল্বগ্রামের পড়ন্ত জমিদারবংশের দুর্দ্দান্ত ছেলেদের নিয়ে প্রথম জীবনে তাঁকে কারবার করতে হয়েছে। সে সব ছেলে মারাত্মক ছেলে। প্রথম বছরকয়েক সে অনেক দৈত্যের দুরন্তপনা থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। তখন তিনি গরমের সময়েও ঘরের জানালা বন্ধ করে শুতেন। কারণ ভয় হ'ত—কোন পাষণ্ড ছাত্র হয় ত জানালা দিয়ে খোঁচা মেরে দিয়ে যাবে। সেই ভয়টাই জীবনে বাসা বেঁধে রয়ে গেল। ছেলেদের মধ্যে তাঁর ভয়ের কথাটা প্রবাদের মত বছরের পর বছর পুরনো ছাত্রের কাছ থেকে নূতন ছাত্রদের কাছে প্রচারিত হচ্ছে।

—বাবা। ঘরের ভিতর থেকে বঙ্গবালা ডাকলে।

—কি বলছ?

—রাত্রি যে অনেক হ'ল বাবা। মা বলছে—।

—চুপ কর।

বঙ্গবালা মায়ের নাম করতেই চন্দ্রবাবু লজ্জা পেলেন। এদের মনে থাকে না এটা নিজের গ্রাম নয়, বাড়ী নয়। এটা ইস্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে বাসাবাড়ী। ছি! ছি! ছি! বঙ্গবালা এইটুকুতেই চুপ করে গেল। কিন্তু ভিতর থেকে দরজার শিকলনাড়ার শব্দ উঠতে লাগল। বঙ্গবালার মা ইশারা জানিয়ে ডাকছে। রুষ্ট ভাবে গলা ঝেড়ে ইশারায় অসন্তোষ জানিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। ছেলেদের আর সাবধান না করলে নয়। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ সহ্য করেছেন শুধু ওই আগন্তুকদের জন্য। ওরা অন্য ইস্কুলের ছেলে। ওদের সঙ্গে ওদের শিক্ষক রয়েছে। তিনি হয় ত অপমান বলে মনে করতে পারেন। বারান্দা থেকে নেমে চন্দ্রবাবু উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—কেষ্ট! কেষ্ট!

তারপরই ডাকলেন—নকুলবাবু।

বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নকুলবাবু। ছেলেরা যাঁকে বলে—ডেভিড হেয়ার।

সাড়া কারুরই পাওয়া গেল না। তবে বোর্ডিং-প্রাঙ্গণের এখানে-ওখানে যে সব সিগারেট বিড়ির আগুন জোনাকির মত জ্বলছিল সেগুলি নিভে গেল। কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। চন্দ্রবাবু এবার ডেকে বললেন—ওয়েল—বয়েজ; অনেক রাত্রি হয়েছে। ওয়ান ও' ক্লক। নো মোর ফান্ প্লীজ! যাও, যাও সব শুয়ে পড়! শুয়ে পড়।

—মাষ্টার মশাই!

ব্রজবিহারী বাবুর কণ্ঠস্বর। ব্রজবিহারী বাবু এখনও জেগে রয়েছেন? আপনার বারান্দা থেকে নেমে এলেন দীর্ঘাকৃতি ব্রজবিহারী। তাঁর সঙ্গে ও কে? ও! রামপুরহাটের গেমস্ টিচার।

—আপনি জেগে আছেন? আমি দেখলাম—ছেলেরা একটু বেশী রকম মেতেছে। এখানে-ওখানে সিগারেট-বিড়ির আগুন জ্বলছে। সেই জন্যে—

—আজ ওরা একটু বেশী করবে। যে হয় ত সিগারেট খায় না, সেও হয় ত খেয়ে বসবে। বললেন রামপুরহাটের গেমস্ টিচার।

—থ্যাটস ব্যাড!

—যাক না, মনের মধ্যে শাসন করে বেঁধে রাখা মন্দ প্রবৃত্তিগুলো এক রাত্রির উল্লাসের মধ্যে খানিকটা বেরিয়ে যাক না।

চন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কি বলছেন ইনি? মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন তিনি, তার পর বললেন— ডু ইউ রিয়্যালি মীন ইট?

তার উত্তরে রামপুরহাটের গেমস্ টিচার যে কথা বললেন তাতে চন্দ্রবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। ভদ্রলোক বললেন—যারা সিগারেট খাচ্ছে তারা বেশীর ভাগ আমার ওখানকার ছেলে। ওরা খায় আমি জানি। আমি বারণ করে দিয়েছি ওদের—ওরা যেন আপনার ছেলেদের সিগারেট বিড়ি খেতে অনুরোধ না করে। তবে আপনাদের যারা খায় তাদের সম্পর্কে কি করবে তারা? তারা ঘরে দরজা বন্ধ করে খেত, আজ বাইরে খাচ্ছে। সরস্বতীপূজোর মত।

ব্রজবাবু বললেন—আমি ওদের শুয়ে পড়তে বলছি।—লম্বা পা ফেলে অগ্রসর হলেন ব্রজবিহারী বাবু।

—দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি। ব্রজ!

চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু। 'দাঁড়াও, ব্রজ?' পরস্পরের পরিচিত এঁরা? না আজই এক দিনের আলাপে 'তুমি তুমি' হয়ে গেল পরস্পরের কাছে?

তিনি আর দাঁড়ালেন না। সে কথা ব্রজবাবুকে জিজ্ঞাসা করবার সময় এ নয়। এসে বাসার দরজায় কড়া নেড়ে ডাকলেন—বঙ্গ! বঙ্গবালা।

দরজা খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই স্ত্রী বললেন—আমাদের ছেলেরা ভাল খেলেও হেরে গেল; সবাই বলছে, ব্রজবাবু ভুল করে হারিয়ে দিয়েছে। তোমার খুব দুঃখ হয়েছে নয়?

রূঢ় ভাবে চন্দ্রবাবু বললেন—না। একবিন্দু দুঃখ হয় নি আমার!

—তবে সন্ধ্যেবেলা থেকে এমন করে চুপচাপ অন্ধকারে বসে আছ?

—সে তুমি বুঝবে না। বলবার কথাও নয়।

বলেই তিনি শুয়ে পড়ে পাতলা চাদরখানা গায়ে টেনে নিলেন। সন্ধ্যেবেলা পর্য্যন্ত প্রবল বর্ষণের পর মেঘ কেটেছে কিন্তু হাওয়া বইছে। শেষ রাত্রির আর দেরি কোথায়? দেড়টা বাজে। ছ'টার আগেই ভোর হবে। রাত্রি তিনটেয় রামপুরহাটের দল রওনা হবে।

দিনকয়েক পরের কথা। এক সপ্তাহও পার হয় নি ম্যাচের পর। বুধবার দিন ম্যাচ খেলা হয়েছে তার পর—সোমবার বেলা সাড়ে দশটা। ব্রজবিহারী বাবু শনিবার দিন বাড়ী গেছেন। দশটার মধ্যেই এসে পড়বেন। ষ্টেশনেই তাঁর বাই-সাইকেলটা থাকে, ট্রেন থেকে নেমে বাই-সাইকেলে এসে—একেবারে ইস্কুলে ঢোকেন। ইস্কুল বসার ঘণ্টা পড়ছে। ছেলেরা বোর্ডিঙের উঠানে দাঁড়িয়ে স্তোত্রপাঠ করছে—

ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

চন্দ্রবাবু দাঁড়িয়ে আছেন—ইস্কুলের সিঁড়ির উপর তাঁর নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে। এখানকার ইস্কুলে যেদিন থেকে তিনি হেডমাষ্টার হয়েছেন সেইদিন থেকেই তিনি ওই স্থানটিতেই দাঁড়িয়ে আসছেন। কিন্তু মুখখানা তাঁর অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। থমথম করছে যেন।

সব মাষ্টারেরাই সেটা লক্ষ্য করলেন। এবং বিস্মিত হয়েই পরস্পরের দিকে তাকালেন। ব্যাপার কি? কেষ্টবাবু ইশারায় হেডপণ্ডিতমশায়কে বললেন—দেখেছেন? ঘাড় নাড়লেন রামজয় পণ্ডিত—দেখেছি। একটু সরে এসে কেষ্ট বাবু বললেন—জিজ্ঞাসা করুন না।

—না। বন্ধু হলেও পদ মেনে চলা ভাল। মেজাজ আমার ভাল ঠেকছে না। সেকেণ্ড মাষ্টারকে বলুন। সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনবাবু সুপুরুষ তরুণ, কিন্তু তরুণ হলেও হাল্কা মানুষ নয়। ওজন আছে। মাখনবাবুও লক্ষ্য করেছিলেন চন্দ্রবাবুর ভাবান্তর। তিনি বললেন—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? উনি দরকার হলে নিজেই বলবেন! না বলেন, বুঝতে হবে ব্যাপারটা ওর পার্সন্যাল।

ইস্কুল যথারীতি বসল; আপিস-রুমে মাষ্টারমশায়রা হাজিরা বইয়ে সই করে আপন আপন প্রয়োজনীয় বই, খাতা চক নিয়ে ক্লাসে চলে গেলেন; চন্দ্রবাবু কাউকেই কিছু বললেন না, গম্ভীর ভাবে বসে রইলেন।

ঠিক এই সময়টিতেই সশব্দে বাই-সাইকেলের বেল বাজিয়ে ব্রজবাবু এসে ঢুকলেন ইস্কুল কম্পাউণ্ডে। একেবারে এসে নামলেন আপিস-রুমের সিঁড়িতে।

—গাড়ীটা আজ লেট ছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন ব্রজবিহারী বাবু।

চন্দ্রবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার জন্যে

অপেক্ষা করে আমি বসে আছি। ভেরী এ্যাংসাস্‌লি ওয়েটিং ফর ইউ।

উৎকণ্ঠিত হলেন ব্রজবিহারী বাবু।—কি ব্যাপার? এনি ব্যাড নিউজ?

—ইয়েস। আপনি স্নান করে খেয়ে আসুন।

ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল ব্রজবাবুর। বললেন—টিফিনের পরের পিরিয়ডে আমার ক্লাস নেই। স্নান খাওয়া তখন করব। ব্যস্ত নই তার জন্য।

চন্দ্রবাবু বিনা ভূমিকায় বললেন—আমি এই সব ম্যাচ খেলার বিরোধী চিরদিন। ছেলেদের ডিসিপ্লিন নষ্ট করে দেয়। মোর দ্যান দ্যাট। সি দ্য রেজাল্ট।

একখানা খামের পত্র তাঁর চাপকানের পকেট থেকে বের করে ফেলে দিলেন। চমৎকার একখানি রঙীন খাম। একটু সুবাসিতও বটে। খামের উপরে নাম লেখা রয়েছে কমলেশ মুখোপাধ্যায়ের। কমলেশ সেকেণ্ড ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবুর দৌহিত্র। গিন্নীমায়ের খুব আদরের নাতি। ব্রজবাবুর প্রাইভেট ষ্টুডেণ্টও বটে কমলেশ।

ব্রজবাবু চিঠিখানা বের করলেন। বের করবার সময় একবার তাকালেন চন্দ্রবাবুর দিকে। চন্দ্রবাবু বললেন—আমি খুলেছি। আমার সন্দেহ হয়েছিল।

রামপুরহাটের একটি ছেলে কমলেশকে পত্র লিখেছে। ছেলেটি এখানে খেলতে এসেছিল। কমলেশের সঙ্গে আলাপ করে গেছে। তার পর এই চিঠি। চিঠিখানা প্রায় একখানি গীতিকাব্যের একটি অধ্যায়। প্রিয়তম সম্বোধন করে, বালকটি তার হৃদয়োচ্ছ্বাস ঢেলে পৃষ্ঠা ছয়েক এমন এক পত্র লিখেছে যাকে প্রেমপত্র বলা চলে। সে নাকি এখান থেকে যাওয়ার পর থেকে জীবনে দেউলিয়া হয়ে গেছে। তার সুখ হারিয়েছে, জিহ্বার স্বাদ হারিয়েছে, নয়নের নিদ্রা হারিয়েছে, আরও অনেককিছু হারিয়েছে, বুকে তার অনন্ত হাহাকার; সে—"উত্তাল তরঙ্গমালা—অনন্ত হাহাকার,—হু-হু করা বালুবেলাভূমি"—ইত্যাদি অনেক বাছাই বাছাই সুন্দর শব্দ সাজিয়ে পত্র রচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যের সে-কালের খুব নামকরা গদ্যকাব্য "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র সেই মুখ-খানির মতই উচ্ছ্বাসময়।

ব্রজবাবু খিলখিল করে হেসে উঠলেন চিঠিখানা পড়ে। চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—আপনি হাসছেন ব্রজবাবু? আপনি হাসছেন?

ব্রজবাবু অপ্রস্তুত হলেন একটু। হাসি সম্বরণ করে বললেন—হাসব না ত কি করব বলুন? এডোলেসেন্সের পাগলামি—

—আপনি পাগলামি বলছেন?

—তা ছাড়া কি বলব? এর আর কি অর্থ হতে পারে?

হঠাৎ চন্দ্রবাবু চীৎকার করে উঠলেন—ইম্‌মর‍্যাল। দিস ইজ ইম্‌মর‍্যাল।

চন্দ্রবাবুর এমন আকস্মিক চীৎকারে ব্রজবাবু চমকে উঠে গম্ভীর হয়ে উঠলেন এক মুহূর্ত্তে। এবং গম্ভীর অথচ মৃদু কণ্ঠে বললেন—আপনি আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ মাষ্টার মশাই। আপনার প্রথম এণ্ট্রান্সের ছাত্ররা আমার চেয়ে সিনিয়র, আপনি আমার থেকে অনেক বেশী দেখেছেন। ছেলেবয়সের এই রোমাণ্টিসিজম একি নতুন? না—চিরকাল আছে? আমি শুনেছি—চৈতন্যবাবুর বাড়ীরই একটি ছেলেকে এই ধরনের রোমাণ্টিসিজমের জন্য ইস্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। বাট্—ওই রোমাণ্টিসিজমের জন্যই তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে যায় নি। তিনি কৃতবিদ্য হয়েছেন, আমাদের ইস্কুলের একজন মেম্বার তিনি। ইজ ইট নট?

চন্দ্রবাবু যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলেন—এগুলিকে এত হাল্কা করে দেখছেন আপনি?

—না। হাল্কা নিশ্চয়ই করতে চাই না।

—করছেন। ব্রজবিহারী বাবু আপনি বুঝতে পারছেন না, বেশী বৈজ্ঞানিক, বেশী প্র্যাকটিক্যাল হতে গিয়ে তাই করছেন। যা ইম্‌মর‍্যাল তা চিরকাল ইম্‌মর‍্যাল—তার কোন কৈফিয়ত নাই।

—নিশ্চয়ই নাই। আপনি ইঙ্গিতে যা বলছেন তা আমি বুঝেছি। প্রথম থেকেই বুঝেছি। তাকে ইম্‌মর‍্যাল কেন—তাকে আমি পাপ বলি, ভাইস্ বলি। কিন্তু এই পাপ, এই ভাইস্ আপনার ইস্কুলে কি এই নতুন না এই একটি-মাত্র? জীবনের আদিকাল থেকে—বোধ করি পৃথিবীর প্রথম ছাত্রাবাস থেকে এ পাপের জের চলে আসছে। এ পাপকে দূর করবার চেষ্টাও হয়ে আসছে। কিন্তু দূর করা যায় নি। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পাপ আছে মাষ্টারমশাই, সেই পাপের সঙ্গে যুদ্ধ অনেক হয়েছে। পাপকে মারলে মরে না। তাকে গলাতে হয়।

আপিস-রুমের দরজায় গলার সাড়া পাওয়া গেল। রামজয় পণ্ডিতের গলার সাড়া। পণ্ডিত এসে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—আমি আর থাকতে পারলাম না মাষ্টারমশাই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। এই পাশের ঘরেই সেকেণ্ড কেলাসে পড়াচ্ছিলাম। বন্ধ জানালার ওপাশ থেকেও কথা-গুলো শুনতে পেয়েছি। যে পাপের কথা বলছেন সে পাপ সংস্কৃত শিক্ষার আমলে ছিল না। টোলে এখনও এ পাপ

নাই। এ পাপকে সহ্য করলে সর্ব্বনাশ হবে। পুরাণের ব্রহ্মচারী ছাত্রদের কথা পড়েও আপনি এই মন্তব্য করলেন —তারই প্রতিবাদ করছি আমি।

ব্রজবাবু মুচকে মুচকে হাসছিলেন। রামজয় পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—আপনি নাস্তিক!

ব্রজবাবু এবার একটু সশব্দে হেসে উঠলেন, বললেন—নাস্তিক ঠিক নই পণ্ডিতমশাই, তবে আপনার মত আস্তিক নই। সংস্কৃত শিক্ষার আমলে পুরাণের আমলে—ওই পুরাণে যাদের কথা আছে তাদের কথাগুলিকে সার্ব্বজনীন নজীর ধরে নিয়ে যদি বলেন—এ পাপ ছিল না তবে মানব না। যাঁদের কথা আছে তাঁরা নমস্য, তাঁদের মধ্যে পাপ ছিল না এ মানি। এঁরা ত কয়েক জন মাত্র। কত কোটি কোটি ছাত্রের কথা লেখা নেই। তারা সবাই এ পাপে পাপী ছিল তাও বলব না। তবে একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে যে ছিল এতে সন্দেহ নেই। একালে আপনার ওই পুরাণের পুণ্য-শ্লোক ছাত্রদের মত ছাত্র কি নেই? নিশ্চয় আছে। আমি দেখেছি।

চন্দ্রবাবু এক বিচিত্র মন নিয়ে ব্রজবিহারী বাবুর কথা শুনছিলেন।

ব্রজবিহারী বাবু বললেন—আমি চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জনকে দেখেছি। তারা আপনার পুরাণের উতঙ্কের চেয়ে কম পবিত্র ব্রহ্মচারী নয়। কম তেজস্বী নয়।

রামজয় প্রশ্ন করলেন—কে তারা? এ সব কি বলছেন আপনি?

—ঠিক বলছি। বালেশ্বরে ইংরেজের পুলিসের সঙ্গে যারা বাঘা যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে মরল তাদের আমি দেখেছি।

তার পর একটু হেসে বললেন—আর এক জনকে সেদিন দেখেছেন। এসেছিলেন। রামপুরহাটের ওই গেমস্ টিচারটি—

—উনি—

—যা ভাবছেন বা ভয় করেছেন তা ঠিক নয়। ওদের দলের লোক ঠিক নন, তবে একেবারেই যে সংস্রব নেই তাও নয়। জানাশুনো আছে। ভাল ছেলে পেলে তেমন মতি দেখলে ওদের সঙ্গে যোগাযোগও করে দেন। তবে ওঁর মিশন হ'ল—যাদের আমরা মন্দ ছেলে বলি—তাদের ঠেলে না-ফেলে কাছে টেনে নিয়ে ভাল করে তোলা। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল অনেক দিন আগে। দীর্ঘদিন পর দেখা হ'ল। দেখা হওয়ার পর পরস্পরকে চিনতে পারলাম।

রামজয় পণ্ডিত হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন, শুধু বলে গেলেন—চললাম মাষ্টারমশাই। কেলাসে বাপধনেরা চালকহীন জন্তুর মত গুঁতোগুঁতি করছে। জানালার ধারে সব ভিড় করে এসে শুনছে কান পেতে।

ব্রজবিহারী বাবু বললেন—রাগ করলেন আমার উপর।

—উঁহু। তবে শক্ত কথা বলেছেন, পরিপাক না করে এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে বেকুব হয়ে যাব। শক্ত কথা বলেছেন।

রামজয় চলে যেতেই ব্রজবাবু বললেন—জীবনবাবুর কাছে শুনলাম এমনি ছেলে একটি আপনার এখানে বার কয়েক এসেছিল। আপনার ইস্কুল খুঁজে গিয়েছে। তার নাম নলিনী বাগচী। এই সেদিন সে ঢাকায় মারা গেছে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। উণ্ডেড হয়ে হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা বেঁচেছিল, পুলিস নানা প্রলোভন দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল- তোমার নামটা বল। ভারতবর্ষ ত স্বাধীন হবে, তোমার নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। সে শুধু বলেছিল—ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি প্লীজ। লেট মি ডাই ইন পীস। লেট মি ডাই।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন চন্দ্রবাবু।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—ব্রজবাবু আপনিও কি—

—না। সে সাধ্য কোথা? তবে শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি এই পর্য্যন্ত।

—আমার একটা সন্দেহ ছিল—

—জানি। সেটা অবশ্য স্পাই বলে।

চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু।—কি করে জানলেন আপনি।

—আমাকে রতনবাবুই বলেছেন। কেষ্টবাবুদের বাড়ী গিয়েছিলাম তাকে দেখতে। পরিচয় হতেই পরস্পরের জানা এমন লোকের নাম বেরিয়ে পড়ল যে পরস্পরের অন্তরঙ্গ হতে বিলম্ব হ'ল না। তিনিই বললেন—অজান্তে হয় ত আপনাদের অনিষ্ট করে এসেছি ব্রজবাবু। চন্দ্রবাবুকে আমি বলে এসেছি এই সব কথা।

হাসতে লাগলেন তিনি।

প্রসন্ন হাসিতে চন্দ্রবাবুর মুখ ভরে উঠল। তাঁর বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল। একটু পর হঠাৎ বললেন—আপনি বলছেন এ নিয়ে কমলেশকে কিছু বলব না? বলা উচিত নয়?

—আপনি যদি বলেন—তবে আমি তাকে বলব। কমলেশ লেখাপড়ায় ভাল ছেলে—তার মধ্যে ভাল অনেক কিছু আছে। সেই জন্যেই প্রকাশ্যে তাকে আমি শাসন করে তাকে লজ্জিত করতে চাই না। তাতে ফল খারাপ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। নইলে আপনি ত জানেন—

আমার বেতমারা ত দেখেছেন। ছেলে যেখানে পচে গেছে বা জানব যে নিশ্চয় পচবে—সেখানে আমি নির্দ্দয়। এই ত সেদিন মুরলীকে যে ভাবে কথা বলেছি সিগারেট খাওয়ার জন্য—শুনেছেন, দেখেছেন।

—বেশ আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম।

উঠলেন চন্দ্রবাবু এতক্ষণে। সহজ প্রসন্ন মুখে ক্লাস থেকে ক্লাসে ঘুরতে লাগলেন। ইস্কুলে কিন্তু এর মধ্যেই একটা গুঞ্জন উঠেছে। ক্রমশঃ

ভারতীয় শিল্পমেলা

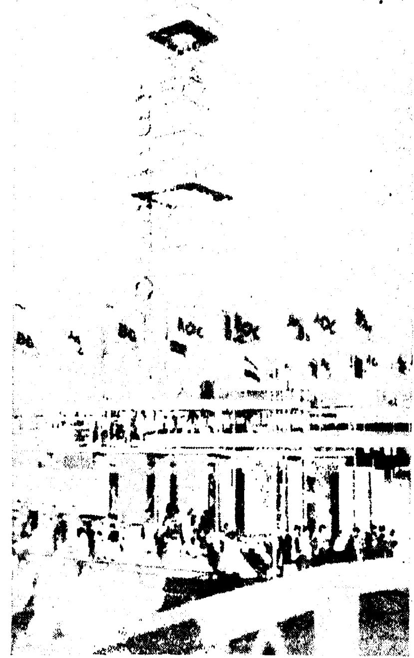
শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৯৫৫ সনের শেষের দিকে দিল্লীতে এক বিরাট শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে অগণিত নর-নারী শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামা-শহুরে, বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিক সবাই গিয়েছেন, দেখেছেন, প্রশ্ন করেছেন, বিভিন্ন জিনিষ দেখে অবাক্ বিস্ময়ে গৃহে ফিরেছেন। এর মাধ্যমে জনসাধারণকে শিল্প-প্রচেষ্টার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতির রূপ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জাতীয় জীবনের সর্ব্বাত্মক উদ্যোগে সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। সেই দিক থেকে ভারতীয় শিল্পমেলার আয়োজন সার্থক প্রয়াস বলতে হয়। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৫ই ডিসেম্বরের পরিবর্ত্তে ১৯৫৬ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত মেলার দ্বার খোলা রাখার ব্যবস্থা হয়।

অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রহ্মদেশ, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব্ব-জার্ম্মানী, পশ্চিম-জার্ম্মানী, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, ইরাক, ইরাণ, ইটালী, জাপান, নেদারল্যাণ্ডস, পাকিস্থান, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি একুশটি দেশ এই মেলায় যোগ দেয়। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ এই মেলায় এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। আমরা শিল্পায়নের কোন্ পর্য্যায়ে পৌঁচেছি, জনসাধারণ তার একটা ছবি দেখতে পেয়েছে এই মেলায়। চীনদেশের সংগঠনাত্মক উদ্যোগের গতি-প্রকৃতি ভারতবাসীকে দ্বিগুণ অনুপ্রাণিত করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উৎকর্ষের দিক থেকে চীনা প্যাভি-লিয়নটি হয়ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত নয়, তবু আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য চীনবাসীর অদম্য প্রয়াস জনসাধারণকে উৎসাহিত করে থাকবে নিশ্চয়। চীনা প্রদর্শনীগৃহটি তৈরী হয়েছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির নিদর্শন রূপে। গৃহটি বিরাট, তার মধ্যে চীনারা সহস্র সহস্র দ্রষ্টব্য পুরাতন ঐতিহ্যপূর্ণ জিনিষ থেকে সুরু করে আধুনিক উদ্যোগগুলির প্রতীক পর্য্যন্ত, সব জিনিষ নিয়ে এসেছে দেখাবার জন্য। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেই চোখে পড়ত সাদা মাটির বিরাট মূর্ত্তি—মাও-সে-তুং, বিশাল চীনের অধিনায়ক।

বর্ত্তমানে কৃষি ও শিল্প-প্রচেষ্টার একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে সরকারী এবং আধাসরকারী প্রয়াস। এ দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। আরম্ভেই প্রতিযোগিতা দেখা দিলে উদ্যোগের অপচয় ঘটবে আর তা হবে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এ বিষয়ে নিজ নিজ সীমা নির্দ্ধারণ সহজ হয়েছে এই মেলার মাধ্যমে তা বলাই বাহুল্য।

সামরিক অস্ত্র বাদ দিয়ে এমন একটি জিনিষের নাম করা মুশকিল যা এই মেলায় প্রদর্শিত হয় নাই। আর এর অধিকাংশই যে প্রথম শ্রেণীর সেকথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এর মধ্যেও কতকগুলি



আসাম অয়েল কোম্পানির প্যাভিলিয়ন

চটকদার জিনিষ অনায়াসে লোকের মনোরঞ্জন করেছে। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে আমেরিকার খ্যাতি খুবই। কিন্তু ওদের নবতম 'শান্তির জন্য আণবিক শক্তি' (atom for peace) সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মনোরম অট্টালিকার উপরে সজ্জিত আণবিক প্রতীক। ঘরের মধ্যে বিরাট দেওয়াল জুড়ে আণবিক শক্তির প্রক্রিয়া বোঝাবার অতিকায় প্রাচীর-চিত্র নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। ঠিক এর সামনেই রয়েছে দুটি 'যাদু-হাত' ছোটখাটো একটি কাঁচের ঘরের মধ্যে। বাইরে থেকে কলের সাহায্যে এই হাত দুটিকে দিয়ে রাসায়নিক গবেষণাগারে

যাবতীয় 'হাতের কাজ' করানো যায়। পরীক্ষাকালে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে না আসতে হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

টেলিভিশন বস্তুটি এখনও আমাদের কাছে রূপকথার রাজ্যের মত রহস্যময়। কিন্তু ফিলিপস কোম্পানী এবং রাশিয়ার কল্যাণে অগণিত লোক দেখতে পেয়েছে রূপালি পর্দায় অন্তরালবর্ত্তীকে। আপামর সাধারণকে সর্বাপেক্ষা এই বস্তুটি অধিক আকৃষ্ট করেছিল।

পূর্ব-জার্মান চত্বরে কাচের মানুষ (Glass man) লোকে অবাক হয়ে দেখেছে, সুকোমল চামড়ার নীচে দেহের সূক্ষ্ম যন্ত্রের সংস্থান প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। শুনতে পাওয়া গেছে যে, এই মানুষটিকে ওরা ভারতীয় জনস্বাস্থ্য-বিভাগের হাতে উপহার রূপে দিয়ে যাচ্ছে।

নানান রকম খেলনা ও বিলাসসামগ্রীর পরিবেশন-চাতুর্য্যে সকলের মনোরঞ্জন করেছে হাঙ্গেরীয়ানরা। দর্শকদের মন্তব্যের জন্য রাখা মোটা খাতাটা খুললেই আপনার চোখে পড়বে অগণিত আখর যার অর্থ এই দাঁড়ায়, "বড়ই দুঃখের বিষয় আপনাদের জিনিষগুলি বিক্রয়ের জন্য নয়"; "যে যাই বলুক না কেন, আপনাদেরটাই সবচেয়ে ভাল।" এই খাতা দেখার আগে আমরাও এমনিধারা আলোচনা করেছি।

রুশ প্রদর্শনীগৃহের প্রবেশদ্বারের আশেপাশে বড় বড় ফোটো রুশ-নেতাদের সঙ্গে শ্রীনেহরুর করমর্দ্দনের—হিন্দী-রুশী-ভাই-ভাই-এর প্রতীকরূপে। একটু ভিতরেই লেনিনের বিরাট মূর্ত্তি সাদা মাটির। মাত্র তিন দশকের মধ্যে ওরা যে শিল্পোন্নতি করেছে তা বিস্ময়কর। শান্তি-প্রচেষ্টায় আণবিক শক্তি ব্যবহারের একটি প্রদর্শনী ওরা দিল্লীতে আলাদা করে দেখিয়েছে। সুতরাং এখানে ওদের এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। নানা কৃষিজাত দ্রব্য সুন্দর সুন্দর কাচের পাত্রে এবং খোলা অবস্থায় রাখা। লোকে নেড়ে চেড়ে দেখেছে আর ভেবেছে আমরাও নিশ্চয় পারব এমনি উৎকৃষ্ট দ্রব্য তৈরি করতে। কৃষির উন্নতিকল্পে যন্ত্রের প্রভাব কতখানি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে লোকে। চীনামাটির পুতুল ও বাসনের উপর কারুকার্য্য দেখে বোঝবার উপায় নাই যে, ওগুলি চীনদেশ থেকে আমদানী করা হয় নাই।

ভারতীয় চত্বর বিদেশী চত্বরের তুলনায় চটকদার না হলেও এর বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়েছে। দেখতে দেখতে মনে হয়—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' এ কথার তাৎপর্য্য আমাদের জাতীয় জীবনে আরও অনেক দিন পর্য্যন্ত বলবৎ রাখতে হবে। নইলে, পরের চটকদার জিনিষে ভুলে গেলে আমাদের প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ভারতীয় বিভাগের প্রদর্শনী দু'ভাগে বিভক্ত—সরকারী ও বেসরকারী। সরকারী প্রদর্শনীগৃহ মেলার মধ্যে সবচেয়ে জমকালো। প্রায় ছ'লাখ টাকা ব্যয়ে এটি তৈরী হয়েছে। শোনা গেল, এখানেই আগামী বৎসর বুদ্ধ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এখানে দেখা গেল সমর বিভাগের যন্ত্রপাতি যা আমরা আর বিদেশ থেকে আমদানী করছি না; আর দেখতে পাওয়া গেল, নানাবিধ রেখাচিত্র ও পরিসংখ্যান-সম্বলিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি বিশদ ছবি।

বেসরকারী তরফে নানাবিধ কুটীরশিল্পের উৎকর্ষ দেখে আপনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন আর এটাও বুঝতে পারবেন যে, বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে কুটীরশিল্পের কোন বিরোধও নেই বরং একটি অপরটির পরিপূরক এবং এ দু'য়ের উন্নতি আমাদের জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনবে। তা ছাড়া কলকব্জার দিক থেকে আমরা অনেক পিছনে পড়ে থাকলেও নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই—যদি জাতীয় স্বার্থই আমাদের কর্ম্মজীবনের মূল সূত্র হয়।

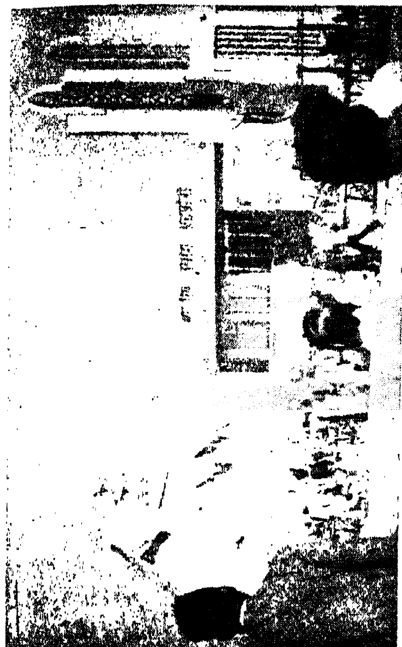
বাইরে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পাবেন আসাম তেল কোম্পানীর উদ্যোগ আয়োজন। তেল তোলা থেকে সুরু করে সাফ করা পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া আপনাকে সুচারুরূপে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। ইম্পিরিয়্যাল টোব্যাকো কোম্পানী আপনাকে সুদৃশ্য চিত্রে তাম্রকূটের ইতিহাসের নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক ছবি দেখিয়ে আনন্দ দান করবে, আর দেখতে পাবেন আপনার চোখের সামনে সিগারেট তৈরি থেকে প্যাকেটে ভর্ত্তি হওয়ার সর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়া।

সাইকেল কোম্পানীগুলি তাদের দোকান সাজাতে গিয়ে যে দুটি মডেল তৈরি করে রেখেছে—একটি ঘরের মধ্যে, অপরটি ছাদের উপরে, তা হঠাৎ দেখলে আসল বলে ভুল করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এমনি করেই মেলার চত্বর সাজানো মন-ভোলানো রূপসজ্জায়। মনে ভাববেন না, মাত্র এই ক'টি প্রতিষ্ঠান আর অল্প একটু স্থান জুড়ে আছে মেলার প্রাঙ্গণ। মেলার বিস্তৃতি তেয়াত্তর একরের মত জায়গা জুড়ে। দেশী-বিদেশী মিলে প্রায় নয় শ' প্রতিষ্ঠান এতে যোগ দিয়েছে। প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই মেলার আয়োজন করতে। মেলা সবটা ঘুরে দেখতে হলে কতটা পথ হাঁটতে হবে তারও হিসাব উৎসাহী অঙ্কবিদ্‌রা বার করে রেখেছেন। তাদের কথা মানতে হলে নিদেনপক্ষে সাড়ে এগার মাইল হাঁটা-পথ।

এত বড় বিরাট ব্যাপার, কিন্তু রূপসজ্জা ও বিন্যাসের মধ্যে সর্ব্বত্র রুচির বিকাশ রয়েছে। মনোরম প্রবেশ-তোরণের সামনে নর-নারীর একটি যুগলমূর্ত্তি পদক্ষেপের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের অগ্রগতির প্রতীকরূপে—মেলায় আগত অগণিত মানুষকে যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে। ভারতের জীবন নানা ধারায় রূপায়িত হয়েছে প্রাচীর-চিত্রে।

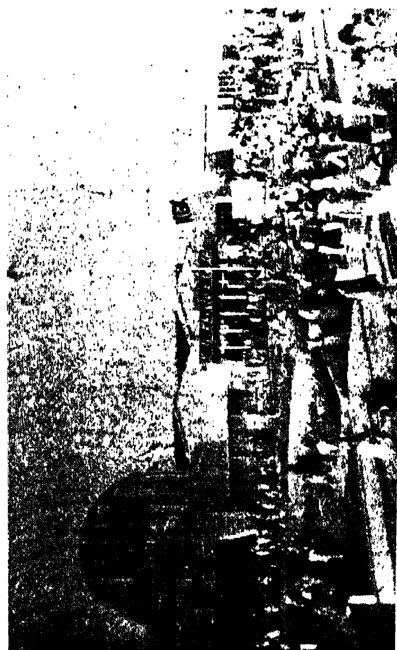
ভাল জিনিষও অনেকক্ষণ ধরে ক্রমাগত দেখলে মনে ক্লান্তি আসে। তাই অগণিত চা, কফি, মিষ্টির দোকান বাদেও আছে একটি ক্ষুদে লেক নৌকাবিহারের জন্য। তার সামনেই রয়েছে ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধের নমুনা। আমোদ-প্রমোদ পার্ক বলে আছে আর একটি মনভোলানো ব্যবস্থা। ওখানে রাধাচক্র থেকে সুরু করে নানা রকম সার্কাসি খেলা আপনাকে, আপনার স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে আনন্দমুখর করে তুলবে।



দিল্লী, ভারতীয় শিল্প (উদ্যোগ) প্রদর্শনীর প্রধান তোরণ



চীনা মাটির পাত্র ও 'জগ'



প্রদর্শনীর ভিতরকার একটি দৃশ্য



ভাকরা-নাঙ্গাল প্রোজেক্টের মডেল

অশ্বিনীকুমার দত্ত

শ্রীগুণদাচরণ সেন

১৮৮৭ সনে আমার তের বৎসর বয়স হইতে ১৯২৩ সনে অশ্বিনীকুমার দত্তের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম, নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আজ তাহার প্রধান সূত্রটি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

'সত্য, প্রেম, পবিত্রতা' মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে অশ্বিনীকুমার তাঁহার দেহ-মনের শক্তি নিঃশেষে দান করিয়া গিয়াছেন। 'প্রেম' এই মন্ত্রের মধ্যবিন্দু। ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি—সকল ক্ষেত্রেই নিজ জীবনের প্রতি কার্য্যে তিনি প্রেমেরই লীলা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সান্ধ্য-সমিতিতে উপাসনা করিতে বসিয়া অতি অল্প সময়েই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইত—প্রিয়তম দেবতাকে বুকে লইয়া কত কি



অশ্বিনীকুমার দত্ত

বলিতে চাহিতেন। ছাত্রকে সমগ্র হৃদয়ের প্রেম দিয়া শিক্ষক কেবল যে অধ্যেতব্য বিষয় শিখাইবেন তাহা নহে, তাহার আত্মিক কল্যাণেরও ভার লইবেন—এই ছিল তাঁহার জীবন-ব্রত। কৃষক ও শ্রমজীবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, নিজআসনে বসাইয়া তাহারই আপন ভাষায় তাহাকে রাজনীতির মূল কথাগুলি বুঝাইতে হইবে, তাহার সকল সুখদুঃখে সাধ্যমত ভাগ লইতে হইবে, কংগ্রেসের তিন দিনের তামাশা চলিবে না, এই কথা ঐ মহাসভায় দাঁড়াইয়া নির্ভীক কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন এবং তদনুসারে শহরে ও গ্রামে কংগ্রেসের কাজ করিয়া গিয়াছেন। 'বরিশাল দুর্ভিক্ষে'র সময় অন্নের প্রতি কণায়, বস্ত্রের প্রতি তন্তুতে, তিনি এই প্রেমই হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে বিলাইয়াছিলেন। কাশীতে স্বামী ভাস্করানন্দ তাঁহাকে দেখিয়াই নিজ হাঁটুর কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এই প্রেমের সুরু হইল, ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে।" কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারের পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট গলিত কুষ্ঠীকে দেখিয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর এ কি মূর্ত্তি ধরিয়া এখানে বসিয়া আছেন!" নিজ গৃহে গোপাল মেথরকে সহসা পিছন হইতে একদিন জড়াইয়া ধরিলেন। এক অর্দ্ধনগ্নদেহ বৃদ্ধ হরিজনকে বুকে লইয়া নিজের পার্শ্বে বিছানার উপর বসাইয়া পাখার হাওয়া করিতে লাগিলেন। কুস্থান হইতে সদ্য-প্রত্যাগত কোন যুবককে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া 'সোনার মানুষে' পরিণত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পায়ের ধূলা আমরা ত লইতেই পারি নাই, সব সময় লওয়াও কঠিন ছিল, আগেই জড়াইয়া ধরিতেন। তিনি দিতেন ও চাহিতেন—কেবল আলিঙ্গন। স্ফূর্ত্তি বা আনন্দ তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল, তাঁহাকে আমি কখনও বিষণ্ণ দেখি নাই। এক থালায় তাঁর সঙ্গে খাইয়াছি, কত রাত্রিতে এক বিছানায় একই বালিশে মাথা দিয়া শুইয়াছি। শেষযাত্রার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, "আমাকে তোরা মেঝেয় নামাইয়া দে, আমি একটু নাচিয়া লই।" 'তুমিও মধু, আমিও মধু' তাঁহার প্রসিদ্ধ 'মধুগীতি'র শেষের দিককার একটি পদ।

বরিশাল শহরে এমন দিনও গিয়াছে যে, পরীক্ষার সুবিস্তৃত হলে একটি গার্ডও রাখিতে হয় নাই। অগ্নিদাহে নিঃস্ব গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় পাইয়াছে। কোনও দুঃস্থ রোগী সেবা না পাইয়া মরে নাই, রাস্তায় ঘোড়া গরু কুকুরও অত্যাচারিত হইতে পারে নাই। স্বদেশীর আমলে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও একটু বিলাতী জিনিস কিনিতে পারেন নাই। বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে বন্দুক উদ্যত করিয়া পুলিস যাহা করিতে পারে নাই, অশ্বিনীকুমারের একটি মাত্র আদেশ মুহূর্ত্তে তাহা করিয়াছে। সমগ্র জেলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক কথা, এক কাজ, এক সূত্রে হিন্দু-মুসলমান, ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ সকল জাতি গাঁথা—ইহাই হইল অশ্বিনীকুমারের বরিশালের চিত্র।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় শিক্ষক যে পরিমাণ প্রাণ ঢালিয়া প্রেম দিতে পারিবেন, শিক্ষা সেই পরিমাণে সফল হইবে—ইহাই অশ্বিনীকুমারের শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি ছিল। ধর্ম্মে ত কথাই নাই, রাজনীতিতেও ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। এই আদর্শে আমাদের সমগ্র সমাজকে, বিশেষতঃ শিক্ষক ও ছাত্রসম্প্রদায়কে, উদ্বুদ্ধ করার কোনও প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপায়িত করা যায় কিনা, অশ্বিনীকুমারের বিদেহী আত্মা হয় ত আজ রাজনীতির নানা বিক্ষোভের মধ্যেও আমাদিগকে তাহাই ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছেন।

সিঁড়ি

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয় রোজ। নইলে ওপরে ওঠা যায় না। তিন তলায় আপিস। আর কারুর ভাল লাগে কিনা জানি না, কিন্তু এ ভাবে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে বেশ ভালই লাগে পরমেশের। স্কুলে অঙ্কের ক্লাস ছিল দোতলায়। সেখানেও অনেকগুলো সিঁড়ি উঠতে হ'ত। দোতলার সিঁড়ি চড়তে হ'ত কলেজের ক্লাস করতেও। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলোতেও সিঁড়ি ভেঙে হলে ঢুকতে হয়েছে। এক এক সময় তাই আশ্চর্য্য লাগে পরমেশের। ওর জীবন যেন সিঁড়ি ভাঙারই জীবন—যে সিঁড়ি শুধু ওপরেই ওঠায়। কিন্তু সিড়ি শুধু ওঠবারই নয়,নামবারও —তবে আশ্চর্য্য, নামবার সময় সিড়িকে কখনই মনে পড়ে না পরমেশের। কেন, কে জানে। হয় ত ওর মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সিড়ি ওঠা আর নামা দুটোরই হলেও—সিড়িগুলো চিরকাল উঠিয়েই থাকে ওকে, নামাবে না কখনও।

সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠে একদিন অবাক হ'ল পরমেশ এক কোণে নূতন একজনকে দেখে—একটি মেয়েকে। কোণের টেবিলে ফ্যানের হাওয়ায় উদ্ধত সবুজ সাড়ী, তাকাল পরমেশ, অনেকক্ষণ তাকাল। চোখের কালো কাজলে, ভিজে ভিজে গোলাপী ঠোঁটে, নরম ফোলা ফোলা গালে কেমন যেন মমতার ছবি। দেখল পরমেশ, সেদিনই শুধু নয়, পরের দিনও। তারও পরের দিন, রোজ। ফ্যানের হাওয়ায় উদ্ধত সবুজ সাড়ী, কখনও নীল, কখনও অনেক রঙের। তাকাতে তাকাতে মনে হ'ত—হয়ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে শালীনতার।

একদিন দেখা হ'ল সিড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার মুখেই। ছিপ-ছিপে উচ্ছল। দেহে দোলার ছন্দ তুলিয়ে যাচ্ছিল সে।

একটু শুনবেন, পরমেশ ডাকল। না ডেকে পারল না হয়ত।

দুটো সিড়ি এগিয়ে গেল পরমেশ, দুটো সিড়ি এগিয়ে থেমে গেল শকুন্তলা। যেন একটা মিষ্টি সুরের বাজনা থমকে গেল।

আমায় বলছেন ?

হাঁা, আপনাকেই। একটু দম নিল পরমেশ, রোজই ভাবি আলাপ করব আপনার সঙ্গে, হয় না।

হয় না, না পারেন না ? হাসির একটা ছোট্ট টুকরো ছড়াল।

অনেকটা তাই।—এর পর আর অস্বীকার করা যায় না। চেষ্টাও তাই করল না পরমেশ।

কিন্তু কেন ?

কি জানি।—একটু হাসল শুধু।

ভয় নয় ত ?

নয়তই বা একেবারে বলি কি করে ? একটু আধটু ত নিশ্চয়ই।

ভয় কেন যে আমাকে বুঝতে পারছি না। বাঘ ভাল্লুক ত নই।

নন বলেই ত ভয়। বাঘ ভাল্লুক হলে সোজা বন্দুক হাতে লাফিয়ে পড়তাম। এত ভাবনা চিন্তার দরকারই থাকত না। ওদের সঙ্গে ত ভাব করতে ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে করে শিকার করতে।

ভারি মজার কথা বলেন ত আপনি। খিল খিল করে হেসে উঠল শকুন্তলা সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে।

দেখা হয়েছিল ঘরে—কোণের টেবিলে ফ্যানের তলায়। উদ্ধত নীল সাড়ীর আড়ালে উন্নত বুকের ওঠা-নামা। দেখাই শুধু হয়েছিল। আলাপ হয় নি, হ'ল সিড়িতে উঠতে উঠতে। কথা হ'ল সিড়িতে নামতে নামতেও।

এখন যাবেন কোথায় ? শুধাল পরমেশই আবার।

সোজা বাড়ীতে।

তারপর ?

তারপর আর কি। হাত মুখ ধোব, কাপড় ছাড়ব, খাবার খাব।

তারপর ?

তারপর আবার কি। একটা গল্পের বই নিয়ে বসব। কিংবা একটা চেয়ার জানলার কাছে ঠেলে বাইরে তাকিয়ে থাকব।

বিকেলে বেড়াতে বেরুবেন না ?

না।

চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকবেন ?

হু।

ভাল লাগবে ?

খুব।

মিথ্যে বলছেন।

সত্যি বললেই বা করবেনটা কি আপনি ? দুটো সিড়ি এক সঙ্গে ভাঙল শকুন্তলা।

সাহস পেল পরমেশ। সাহস পেয়েই বলে ফেলল, বলেন ত আসতে পারি। আমার সঙ্গে বেড়াতে পারেন। বিকেলটায় বেড়াতে সত্যি বলছি ভারি ভাল লাগবে আপনার।

শুনে গেল শকুন্তলা, কথাগুলো শুনে গেল। সাড়া দিল। এক সঙ্গে দু' দুটো সিড়ি ভেঙে নেমে এল নীচে।

আচ্ছা, চলি তা হলে। কাল আবার দেখা হবে। নমস্কার। —যাবার আগে আর একটা মিষ্টি হাসির টুকরো ছড়িয়ে দিল শকুন্তলা, আপনার ট্রাম ওদিকে, আমার এদিকে।

পরমেশের ট্রাম ওদিকে, তবু কিন্তু ওদিকে গেল না সে। এ-দিকে, শকুন্তলার ট্রামের দিকেই পা বাড়াল।

কাল আবার দেখা হবে বললেন। অত জোর করে কিছু বলতে নেই।

কেন, কাল ত দেখা হবেই।

নাও হতে পারে।

কেন, হবে না কেন? হাতের টকটকে লাল ভ্যানিটি ব্যাগটা ঘোরাতে থাকে শকুন্তলা।

কাল বেঁচে থাকব কিনা, কে বলতে পারে?

আমি বলতে পারি, থাকবেন।

কি করে জানলেন?

মরার কথা যারা ভাবে, তাদের পরমায়ু অনেক হয়। হাসির মিষ্টি রঙীন বুদ্‌বুদ ছড়িয়ে হারিয়ে গেল শকুন্তলা।

ষ্টপেজে তারপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পরমেশ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল শকুন্তলার কথা। আর চলন্ত ট্রামে শকুন্তলার ভাবনা জুড়ে রইল পরমেশ। এ আপিসে চাকরি খুব বেশী দিন হয় নি শকুন্তলার। বেশী দিন কি, দুটো হপ্তাও কাটে নি। কোণের টেবিল থেকে মাঝখানে-বসা কর্ম্মব্যস্ত পরমেশকে ও প্রথম দিন থেকেই দেখেছে—দু' হপ্তার প্রত্যেকটি কাজের দিনই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কারণে অকারণে তার দিকে তাকাতেও দেখেছে পরমেশকে। দেখে ভালই শুধু নয়, বেশ মজাও লেগেছিল শকুন্তলার। কেন, কে জানে। তাকানো দেখে ভালই শুধু লাগে নি আলাপ করতেও খুব ইচ্ছে হয়েছিল শকুন্তলার। আর, আজ ও নিজের থেকে আলাপ না করলে শকুন্তলাই নিজে এগিয়ে এসে কথা বলত। হয়ত সেটা ভাল দেখাত না। না দেখাক। পৃথিবীর ভালমন্দের বেড়ার বাইরে পা অনেক দিন আগেই ফেলেছে শকুন্তলা। যেদিন ঘর ভেঙেছে, নীড় ভেঙেছে। যেদিন রাজধানীর জনারণ্যে হতভাগাদের ভিড়ে শেষ স্বপ্নের সুর ভেঙেছে। সেদিন থেকেই।

ভাব হ'ল আজ, এই ত খানিক আগে। কয়েকটা ঘণ্টা হয়েছে শুধু, কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে এত ভাল এর আগে কাউকে কখনও লাগে নি শকুন্তলার। না, কাউকে নয়, শুধু ভাল লাগাই নয়, এত কম আলাপে এত কাছে এভাবে এগিয়ে আসতে এর আগে কাউকে দেখে নি শকুন্তলা। ও কথা বলল দুটো, কিন্তু এগিয়ে এল দু' শ' পা। আশ্চর্য্য নয়! তবু এত ভাল লাগার মত কিছু সত্যিই ওর মধ্যে নেই। চেহারার মধ্যেও আভিজাত্য নেই তেমন কিছু। তবু ওকে ভাল লাগল শকুন্তলার। ভাল লাগল ওকে ওর সাবলীলতায়, কাছে আসার ওর স্বচ্ছন্দ গতিবেগে, কথা বলার অন্তরঙ্গতার সুরে। এক প্রচ্ছন্ন পরিবেশে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেটি।

সারা ট্রামই শুধু নয়, ট্রাম থেকে নেমেও পরমেশের চিন্তাকে আঁকড়ে থাকে শকুন্তলা। অনেকক্ষণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল পরমেশ। সিঁড়ি ভাঙতে বেশ লাগে পরমেশের, আজ কিন্তু আরও ভাল লাগল। খুব ভাল, খুব ভাল লাগল সিঁড়ি ভাঙতে শকুন্তলারও আজ। তিনটে ভাড়াটের সিঁড়ি এই একটাই। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। উপরেই সকলের ঘর, সিঁড়িগুলোকে নীচে ফেলে এল শকুন্তলা। আজ মনে হ'ল, ক'টাই বা। আশ্চর্য্য, আগে ত মনে হ'ত না।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দুমদাম করে ঠেলা দিল শকুন্তলা। আশ্চর্য্য, রোজ ত ও কত আস্তে দরজা ঠেলে।

কে বড়দি?

হু, দরজা খোল।

দরজা খুলে দিল সতী, ভেতরে ঢুকে হাতের টকটকে লাল ব্যাগটা ছুড়ে দিল টেবিলের উপর।

খাটে শুয়ে কাসছিলেন প্রিয়নাথ। কাসি থামতে উঠে বসলেন। অত জোরে দরজা ঠেলছিলি কেন রে?

কেন, কি হয়েছে তাতে।

কি হয়েছে, মানে? ভেঙে যেত যে দরজাটা।

যেত যেত।

ভাঙলে, বাড়ীওয়ালা এসে দাঁড়াত যখন, তখন পয়সা ভরত কে হতভাগা? তুই?

হ্যাঁ, আমিই ভরতাম।

তা কেন ভরবি না। এখন যে তুই উপায় করছিস, পয়সা চিনতে শিখেছিস। আমাদের সবাইকে যে তোর দয়ার উপরই থাকতে হচ্ছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়ে কাসিটা আবার চাড়া দিয়ে উঠল প্রিয়নাথের, মুখ লাল হয়ে এল কাসতে কাসতে।

জবাব দিল না, চুপ করে রইল শকুন্তলা। ঝগড়া ও চায় না। ঝগড়া করতে ওর কোন দিনই ভাল লাগে না। তবু রোজই ঝগড়া হয়ে যায়। হয়ত দোষ ওর, হয়ত বাবার, হয়ত কারুরই নয়, দোষ ভগবানের। যে ভগবান ওদের ঘর ভাঙল, পদ্মা-পারের আশ্চর্য্য পৃথিবী ভাঙল। রাজধানীর জনারণ্যে জনতার দুস্তর মিছিলে যে ভগবান ওদের ঝরিয়ে দিল ঝড়ের ঝরাফুলের মত। তাই কি? ভাবে শকুন্তলা এক এক সময়। এখানে দুঃসহ জীবনে, ক্লেদ ক্লান্তি আর দৈন্যের মাঝে নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলোতে এক এক সময় সেই অপরাধী ভগবানের কথাই ভাবে শকুন্তলা। দোষ কি সত্যিই ভগবানের?

কাসিটা কমতেই আবার প্রিয়নাথ চেঁচিয়ে উঠলেন। দরজা ভাঙবি না কেন, যা খুশী হবে তোর, তাই করবি তুই। আমাদের সবাইকে না খাইয়েও মারতে পারিস তুই।

কিন্তু সব সময় দরজা বন্ধ করে রাখবার দরকারটাই বা কি? বাবা ওকে রাগাবেই।

বন্ধ করে রাখব না ত কি। চোরে সব লুটেপুটে নিক।

লুটেপুটে নেবার বাড়ীতে আছে কি ঘোড়ার ডিম? সব ত খুইয়ে এসেছ সেখানে।

ক্ষেপে উঠলেন প্রিয়নাথ। টাকা উপায় করছিস বলে কি

সাপের পাঁচ পা দেখেছিস নাকি ? যা মুখে আসবে, তাই বলবি নাকি তুই ?

সত্যি কথাই ত বলেছি।

চাই না তোর সত্যি কথা শুনতে। কেউ তোকে সত্যি কথা শোনাতে বলে নি। বেরো তুই এ বাড়ী থেকে, বেরো বেরো।

বেরুল না শকুন্তলা। পাশের ঘরে গেল। শোনাতে চায় না এ সব কথা। শোনাতে চায় না শকুন্তলা। শুনতে বাবার ভাল যে লাগবে না, ও কি তা জানে না। শোনাতে কি শকুন্তলার ভাল লাগে ? একটুও না। রান্নাঘরে ব্যস্ত পিসীমা। ওকে সাহায্য করছে সতী। বঁটিটা টেনে কুটনো কুটছে অলকাও। ও কি পারবে ?

এই, হাত কাটবি রে।

নারে বড়দি, ও পারে। সতী বলল।

তাই নাকি ? গুড। ওর নরম গালটা টিপে দিল শকুন্তলা।

বিমল আর শীলা বই নিয়ে বসেছে। লণ্ঠনের আলোটা টিম-টিম্ করছে। ও আলোতে কি দেখতে পাচ্ছে ওরা ? ও আলোতে কি দেখা যায় ? কি যে পড়ছে ঘোড়ার ডিম।

ওদের পাশে গিয়ে বসে পড়ল শকুন্তলা।

কি বই পড়ছিস রে ?

বাংলা, শীলা বলল।

দেখি, কোন গল্পটা।

নেতাজীর গল্পরে দিদি।

বইটা টেনে নিল শকুন্তলা। জ্বলজ্বল করছে নেতাজীর ছবি। অনেকক্ষণ তাকাল শকুন্তলা। নেতাজীর ছবি কতই না দেখেছে ! এখন কিন্তু ভারি ভাল লাগছে দেখতে।

নেতাজী এখনো বেঁচে আছে নাকি রে ? জিজ্ঞেস করল শীলা।

কি জানি।

বিমল বলে উঠল, নেতাজীর মত লোকেরা মরে নাকি ? ওরা ত অমর। তাই না রে বড়দি ?

ম্লান একটু হাসল শকুন্তলা। বিমলের রুক্ষ চুলগুলোর এলো-মেলো কালোয় একটু আদরের হাত বুলিয়ে দিল। বলল, তাই।

ওদের কাছ থেকে উঠে এল শকুন্তলা। উঠে এল জানলার কাছে। টেনে আনল চেয়ারটা। ঝিরঝিরে হাওয়া একটু একটু এলোমেলো আসছে। পদ্মার হাওয়া নয়। হারিয়ে-আসা কাশবনেরও নিঃশ্বাস নয়। ধানক্ষেতের দোলাও নয়। তবে কি খুশির হাওয়া ? জানালার ধারে অনেকক্ষণ একলা বসে রোজকার মত সব হারাবার ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কান্নার বুদবুদ-গোনা সন্ধ্যায় হঠাৎ এক সময় মনে পড়ল আবার পরমেশকে। আশ্চর্য্য, এতক্ষণ ও যেন হারিয়েই ছিল। না কান্নার কোণের অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল ইচ্ছে করেই ?

বাঃ, বেশ আপনি ? কাল বিকেলে ত এলেন না ? কতক্ষণ বসে বসে ভাবলাম, হয়ত আসবেন।

অবাক হবার কথা পরমেশের। আর অবাক হ'লই। কিন্তু আপনি ত কিছু বললেন না ?

বললাম না বলেই কি আসতে নেই ?—মিষ্টি করে হাসল শকুন্তলা। এলে কি অপমান করে তাড়িয়ে দিতাম ?

আচ্ছা, আজ বিকেলে ঠিক আসবো।

যাক্‌গে।

বা রে, কি হ'ল ? এই ত বললেন।

মেয়েরা কত কি-ই ত বলে। মিষ্টি হাসিটা আরও মিষ্টি করল শকুন্তলা।

বলুক না, ক্ষতি কি, দোষের কিছু ত নেই বেশী কথা বলায়।

মেয়েদের সব কথা রাখতে পারবেন না। কোন ছেলেই পারে না। যান, কাজ করতে যান।

কাজ করতে টেবিলে ফিরে এল পরমেশ। কিন্তু মন কি বসতে চায় কাজে ? আজেবাজে ভাবনার এলোমেলো ঢেউ শুধু।

ছুটির পর দু'জনে এক সঙ্গেই ভাঙতে থাকে নামবার সিঁড়ি।

এখন কোথায় যাবেন ?

বাড়ী, আর কোথায় ? আবার মিষ্টি হাসল শকুন্তলা।

তার চেয়ে চলুন না, নীচের ঐ হোটেলটায়। খেতে খেতে বেশ অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে।

কি খাওয়াবেন ?

যা খেতে চাইবেন।

আমার খাওয়া কিন্তু ভীষণ।

দেখাই যাক। এবার হাসল পরমেশ।

মিছিমিছি এত টাকা খরচা করবেন কেন ?

মিছিমিছি কে বললে ?

আমি বলছি।

করলামই না একদিন। চলুন না।

চলুন। হাতের টকটকে লাল ব্যাগটা ঘোরাতে থাকে শকুন্তলা।

সত্যি বলছেন ?

হাঁা। তবে মিথ্যে বলতেও মেয়েদের জুড়ি নেই।

হোটেলের পর্দা-ঢাকা কক্ষে মুখোমুখি বসে খেতে খেতে ওরা অনেকক্ষণ অনেক গল্প করল। অনর্গল কথা বলে গেল পরমেশ একলাই। সব কথার মানে হয় না। সব কথার মানে করাও যায় না। শুনতে তবু ভারি ভালই লাগছিল শকুন্তলার। হিসেব করে মেপে মেপে যারা কথা বলে, সেই সব ছেলের দল থেকে আশ্চর্য্যরকম আলাদা পরমেশ। ও কথা বলে, বলতে হবে বলে নয়, না বলে পারে না বলেই।

থামল পরমেশ, যখন খেয়াল হ'ল যে ও নিজে একলাই তখন থেকে কথা বলে চলেছে।

দেখুন দিকি, তখন থেকে আমিই কথা কয়ে চলেছি, আপনাকে কিছু বলতে দিচ্ছি না।

না না, তাতে কি হয়েছে। বেশ ত কথা বলছেন, ভারি ভাল লাগছে শুনতে।

তবু আপনিও কিছু বলুন, আমিই শুধু কথা বলে যাব, তাই কি হয়?

হয়। হাসল শকুন্তলা, জানেন না, মেয়েরা কথা বলে কম।

তাই বলে কিছুই বলবেন না? একেবারে বোবা হয়ে থাকবেন?

বোবা হওয়াই ত ভাল। হাসিটা দীর্ঘায়িত করল শকুন্তলা। বোবার ত শত্রু নেই।

আজ তোর রাত হ'ল রে বড়দি। দরজাটা খুলে পাশে দাঁড়াল সতী।

হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেল একটু। শকুন্তলা দরজা পেরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ভেতরে।

বুকের ব্যথাটা একটু কমেছে প্রিয়নাথের। কাসিটা এখনও লেগে রয়েছে।

খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। লণ্ঠনের আলো দপদপ করছে, তেল নাই নাকি?

রাত পর্য্যন্ত আপিস হচ্ছে নাকি আজকাল? কাগজ থেকে মুখ তুললেন প্রিয়নাথ।

রাত পর্য্যন্ত আপিস কেন হবে। আমার একটু কাজ ছিল।

আপিসের পর কি কাজ তোর?

ছিল।

তা থাকবে না কেন, এদিকে আমরা যে ভেবে ভেবে মরি।

তোমাদের ভাববার কি আছে? কচি খুকি ত নই যে হারিয়ে যাব।

তোর আর কি, কিন্তু একটা কিছু হলে তোর বাপ আর ভাই বোনদের যে উপোস করতে হবে।

জানে, শকুন্তলা জানে। আজ যেমন করে জানছে, এমন করে এর আগে জানে নি কখনও। এ জানার মধ্যে একটুও আনন্দ নেই। একরাশ কান্নাই শুধু। দেশ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে এ ভাবে ঘরহারাদের ভিড়ে চলে না এলে, এ জানার হয়ত দরকারই পড়ত না কোন দিন। তাই আস্তে একটু মাথা নেড়ে জানাল শকুন্তলা, জানি।

কত যে জানিস তুই, তা ত বেশ বোঝাই যাচ্ছে। চেঁচিয়েই উঠলেন প্রিয়নাথ, জেনে তুই একেবারে উল্টে যাচ্ছিস।

জবাব দিল না, চুপ করেই রইল শকুন্তলা, জবাব সে দিতে পারত, কিন্তু দিল না। দেশ ছেড়ে রাজধানীতে আসবার পর প্রত্যেকটি দিনই বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে শকুন্তলার, তবু আজ আর ইচ্ছে করল না। জানে বাবা—কত খাটছে শকুন্তলা, এত বড় সংসারটা ও একলাই নিয়েছে ঘাড়ে। জানে বাবা। তবু রোজ ঝগড়া করবে। অকারণেই চেঁচাবে। সে বাবা যেন আর নেই। সেই শান্ত মানুষটি, ধীর অথচ শক্ত প্রিয়নাথ, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে চিরকালের মত। নেই সেই হাসি, জীবনকে ভালবাসবার বলিষ্ঠ সুর, উদার মন। প্রিয়নাথের সেই সর্ব্বজয়ী হাসি কি হারিয়ে গেল সব হারাবার কান্নায় চিরকালের মত? আজকাল কেমন ঝগড়াটে হয়ে গেছে বাবা, কেমন খিটখিটে। এমন বিশ্রী স্বভাব ত কোন কালেই ছিল না বাবার। বাবাকে আজকাল একটুও ভাল লাগে না শকুন্তলার। একটুও না, তাই সব সময় ও ঝগড়া করে বাবার সঙ্গে, কথা কাটাকাটি করে,—এমন ঝগড়াটে স্বভাব শকুন্তলারও ত ছিল না কোন দিন।

তবু আজ কোন কথাই বলল না। ঝগড়াও করল না শকুন্তলা। সরে এল আস্তে আস্তে ঘর থেকে। রান্নাঘরে রান্না করছে পিসীমা, ওকে সাহায্য করছে সতী। ভারি শান্ত মেয়েটা। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না, খালি হাসে, আনন্দেও, দুঃখেতেও। অমনি শান্ত একদিন শকুন্তলাও ত ছিল।

পড়া করছে বিমল আর শীলা, ওদের দেখে মনে পড়ে গেল শকুন্তলার। টফি এনেছে, কতদিন ওরা চেয়েছে, আনতে পারে নি। মিথ্যেই বলতে হয়েছে, ভুলে গেছি। ওরা ভেবেছে, কি ভুলো মন বড়দির, দোষ কি ওদের।

বিমল, শীলা, আস্তে ডাকল শকুন্তলা।

কি রে বড়দি? বই থেকে মুখ তুলল।

তোদের জন্যে আজ টফি এনেছি রে।

সত্যি? দু'জোড়া ছোট্ট চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল হঠাৎ।

চেয়ারটা টেনে আনল জানালার কাছে। একটু ফাঁক দিয়ে তারাভরা আকাশের ছোট্ট টুকরো দেখা যাচ্ছে। ঝিরঝিরে হাওয়ার একটু একটু ছোঁয়া, পদ্মার হাওয়া নয়, ভিজে পলাশ-বনের গন্ধ-জাগানো হাওয়াও নয়। এখানকার রুক্ষ কান্নার পৃথিবীর আমেজ-জমানো নিঃশ্বাস। একগাদা ভাবনার ঢেউ এলোমেলো ভিড় করে। দোষ নেই বাবার, দোষ হয়ত তারও নয়। তবে কার দোষ? দোষ কি তবে ভগবানের? হয়ত তাঁরই। শকুন্তলাও ত বদলে গেছে অনেক, অস্বীকার করবার যো নাই। অস্বীকার সে করতে পারবে না। দেশ ছেড়ে এখানে চলে এসে ওর কিছুই ভাল লাগত না। কোনকিছুতেই আনন্দ খুঁজে পেত না। কেন, কে জানে, ছেড়ে-আসা সেই আশ্চর্য্য দেশেই সে ফেলে এসেছে তার ভাল-লাগা মন। এখানে আসবার পর এই প্রথম সত্যিকারের ভাল লাগল পরমেশকে। পরমেশ, ওর কথা মনে আসতে মনটা খুশিতে ভরে উঠল শকুন্তলার—এখানকার সবহারা কান্নার সন্ধ্যাগুলোতেও। পরমেশের অনেক কাছে এসে শকুন্তলার মনে পড়ে বসন্তকে। বসন্ত, ওখানকার সেই দুরন্ত তরুণ। খুঁজে খুঁজে বার করল এলবামটা শকুন্তলা। অনেকগুলো ফোটো আছে বসন্তর। একলা আছে, শকুন্তলার সঙ্গে আছে,—লণ্ঠনটা কাছে টেনে আলোটা বাড়িয়ে দিল।

জানো, তোমাকে অনেকটা বসন্তর মত দেখতে, শুধু চেহারাই
নয়, ওর মনের সঙ্গেও তোমার মনের ভারি মিল আছে।

ওর কালো চোখ দুটোর দিকে তাকাল পরমেশ। বসন্ত কে?

ঐ অঞ্চলের এক দুরন্ত ছেলে, ওকে ভাল না বেসে খুব কম
মেয়েই থাকতে পারবে।

তারপর?

বিয়ে ঠিক হয়েছিল আমাদের, হ'ল না।

কেন?

বিপর্যায় দেখা দিল, তারপর হঠাৎ একদিন খুন হ'ল বসন্ত।

চুপ করল শকুন্তলা. চুপ করল পরমেশ।

ভালবেসে মানুষ সবচেয়ে বেশী দুঃখই পায়। একটু বাদে আস্তে
আস্তে বলল শকুন্তলা।

আমরা কিন্তু পাব না।

কি জানি, ম্লান হাসি ছড়াল শকুন্তলা।

তুমি না জান, আমি জানি।

রান্নাঘরে ব্যস্ত পিসীমা, ওকে সাহায্য করছে সতী। কুটনো
কুটছে অলকা, লেখাপড়া করছে শীলা আর বিমল। প্রিয়নাথ
কাসছেন তখন থেকে, আবার বেড়েছে কাসিটা। সেদিন সন্ধ্যায়
জানালার কাছে একলা বসে অনেকক্ষণ ভাবল শকুন্তলা। ভাবল
পরমেশের এই জানাই যেন সত্যি হয়?......

ভয় করছিল, তবু ভালও লাগছিল শকুন্তলার পরমেশের সঙ্গে
ওর বাড়ী যেতে।

একবার বললে, আমার কিন্তু ভয় করছে।

হাসল পরমেশ, বা রে, ভয় কিসের।

তোমাদের বাড়ীর কাউকে যে চিনি না।

আমাকে ত চেন, তা হলেই হবে। এস।

এগোল, ভাল লাগছে, ভয়ও করছে। এত ভাল লাগার এত
ভয়—এমন আর কখনও হয় নি শকুন্তলার।

সি ড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দাঁড়িয়ে গেল শকুন্তলা।

কি হ'ল?

আমার তবু ভয় করছে।

দুর, ভারি ভীতু তুমি।

মেয়েরা ভীতুই হয়।

সত্যি বলছি, ভয় করবার কিছু নেই এখানে। মার কথা
বলছ? মাকে আবার কেউ ভয় করে নাকি?

হাসল শকুন্তলা, তোমার মাকে আমার ভাল লাগবেই
তোমার মা বলেই শুধু নয়, তুমি বলছ বলেই শুধু নয়—আমারও
মা নেই কি না।

চল।

নামবার সি ড়িতে ভয় একটুও নেই, খুশিতে ভরে উঠল মন।
ভয় ভাঙল।

হু।

কেমন দেখলে মাকে?

বোকার মত প্রশ্ন কর কেন? মা কখনও দেখতে খারাপ হয়
না কি।

ভালবেসেছে পরমেশকে, ভালবেসেছে শকুন্তলা।...সেই
হারিয়ে-আসা মন আবার সে ফিরে পেয়েছে। সে মন ওকে
ফিরিয়ে দিল পরমেশই। কাউকে সে বলে নি বাড়ীতে পরমেশের
কথা। কি হবে বলে? হারাবার বেলাভূমিতে বসে পাওয়ার
গান শুনতে কারই বা ভাল লাগবে? ভাববে সবাই মাথা খারাপ
হয়ে গেছে শকুন্তলার। ওখানের কান্নার অন্ধকারে কি হবে হাসির
আলো জ্বেলে?

আপিসের কাজ করে ক'টা হাত বেরচ্ছে শুনি? প্রিয়নাথ
চীৎকার করেন। কত টাকাই মাইনে দেয় ওরা?

যাই দিক, ঘরে ত আসছে কিছু টাকা, শকুন্তলা বলল।

ওই ক'টি টাকায় কি হবে? এত বড় সংসার কি চলতে
পারে? জোরে চেঁচাতে গিয়ে কাসিতে দম আটকে যায় প্রিয়নাথের।

তা আমি করব কি? কোন ভাল জায়গায় চাকরিতে এর চেয়ে
বেশী মাইনে পাওয়া যাবে না।

না যাবে না? ভারি জানিস তুই, ক'টা আপিস দেখেছিস?
কি দেখেছিস পৃথিবীর? চীৎকার করে উঠেন প্রিয়নাথ।

এ চীৎকারের কোন মানে হয় না, জানে শকুন্তলা। বাবাও
কি জানে না? তবু চেঁচায়, ঝগড়া শকুন্তলাও করতে পারে। কিন্তু
কি হবে? এতে অশান্তিই বাড়বে শুধু, আর কিছু নয়। এ
চাকরিটা নিজের [illegible] করেছে শকুন্তলা, মাইনে বেশী
নয়। তা হোক, এখানে শান্তি আছে, [illegible] ম্যাট্রিক পাসকে কতই
বা মাইনে দেবে?

সতী বলল, গ্রাজুয়েটদের মাইনে ভালই দেয়, না রে বড়দি?

তা দেয়।

[illegible] থাকলে কত ভাল হ'ত।

তা [illegible] চড়ালেন
পাস করলি না কেন? [illegible]
প্রিয়নাথ।

তোমরাই, গলা চড়ালে শকুন্তলাও। পড়তে আমি চেয়েছিলাম,
তোমরাই ত দিলে না।

বি-এ অবধি পড়াতে এক কাঁড়ি টাকা লাগে, মাগনায় হয় না।

[illegible] তুই, মারবি
নাকি?

বলুক বাবা, হাজার বারই বলুক, ও আর কিছু বলবে না,
ঝগড়াও করবে না বাবার সঙ্গে, কি হবে ঝগড়া করে? কর্কশ
চীৎকারে অশান্তিরই ঢেউ ছড়ানো হবে শুধু। ম্যাট্রিক পাসকে
এর বেশী মাইনে কোথাও দেবে না, জানে শকুন্তলা, বাবাও কি

জানে না? বাবা একথাও জানে যে, টাকা উপায়ের জন্তে শকুন্তলা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তবু বাবা চেঁচাবে, ঝগড়া করবে, খিটখিট করবে। জানে শকুন্তলা, এ মাইনেতে কুলোয় না। এত বড় সংসার চলতে পারে না। তবু কি সে করবে? কি সে করতেই বা পারে? বাবা কি এসব বোঝে না? না, বুঝেও বুঝতে চায় না? কেমন যেন বদলে গেছে বাবা, কেমন বিশ্রী মেজাজ হয়ে গেছে, এমন বদমেজাজী বাবা ত কোন কালেই ছিল না। উন্নতমনা সেই উদার মানুষ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ঝগড়া করে শকুন্তলা, কথা কাটাকাটিও করে—তবু রাগ হয় না বাবার উপর। ও জানে, দোষ নেই বাবার। ঘর ছেড়ে, সবহারাদের দলে যারা নাম লেখাতে বাধ্য হ'ল, কিই বা আছে তাদের? কিই বা তাদের থাকতে পারে? তবু ত বাবা পাগল হয়ে যায় নি, এ অবস্থায় কত লোক ত পাগলও হয়ে যায়। বাবার জন্ম কষ্টই হয় শকুন্তলার। বাবার সত্যিকারের চেহারা এ নয়, এ এক কর্মঠ মানুষের অসহায় হয়ে পড়ে থাকার নিষ্ফল আস্ফালন। জানে শকুন্তলা, জানে সকলেই। এ ভাবে বিছানায় পড়ে থাকার মানুষ বাবা নয়। ঘরের চার দেয়ালে নিজেকে বন্দী রাখবার মানুষ বাবা নয়। জানে না কি শকুন্তলা? বসন্ত চলে গেল, বাবা চুপ করে রইল, মা মারা গেল, তবুও বাবা চুপ করে রইল। বড়দা মারা গেল, সেদিনও বাবা আশ্চর্য নীরব। এ কি সেই বাবা? এখানে এসে হোটেল খুলল বাবা, চলল না, কাজের খোঁজে বেরুল। সব টাকাই ত ফেলে আসতে হয়েছে। যে ক'টা টাকা আনতে পেরেছে, সে আর ক'দিন? কাজের খোঁজে বেরল। কাজ পেলও, একদিন হাঁটতে হাঁটতে পড়ে গেল হঠাৎ, বুকটায় লাগল, বিছানায় শুতে হ'ল, বুকের ব্যথা আর গেল না। সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ল শরীর আর মন দুটোই, যে মন অত আঘাতেও ভাঙেনি। হয়ত ভেতরে ভেতরে অনেকদিন থেকেই ক্ষয় হতে সুরু করেছে, জানে না কেউ। অমন শক্ত মানুষের মনের ভেতরটা কি সহজে দেখা যায়?

রান্নাঘরে রোজকার মত ব্যস্ত পিসীমা, সতী ওকে সাহায্য করছে। কোণে কুটনো কুটছে অলকা, পড়াশুনা করছে শীলা আর বিমল। কবে বিমল বড়দার মত বড় হবে? টাকা রোজগার করবে? জানালা দিয়ে সিরসিরে হাওয়া আসছে, নদীর জোলো হাওয়া কি?

সিঁড়িতে দেখা। হাসল পরমেশ। সুখবর আছে।

কি খবর?

তোমাকে মার খুব ভাল লেগেছে।

মিথ্যে কথা।

মায়েরা কখনও মিথ্যে বলে নাকি।

তুমিই মিথ্যে বলছ।

একটু না, বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস করে এস মাকে।

আর কিছু বলল না শকুন্তলা, একটু হেসে দুটো সিঁড়ি এগিয়ে গেল।

বা রে, কিছু বললে না যে!

বাকী সিঁড়িগুলো হুড়মুড় করে পার হয়ে গেল শকুন্তলা।

নামবার সময় আবার দেখা, ডাকল পরমেশ, শোনো।

কি?

এখন কোথায় যাচ্ছ, বাড়ী?

হুঁ, ঘাড় নাড়ল শকুন্তলা।

চল না, একটু বেড়াই।

না।

কেন?

তুমি বড্ড ভাল।

তাতে কি?

অত ভাল হতে নেই। দুষ্ট ছেলে না হলে মেয়েরা পছন্দ করে না, জান না।

বাকী সিঁড়িগুলো তর তর করে নেমে গেল শকুন্তলা।...

তারপর একদিন সিঁড়িতে আওয়াজ নতুন পায়ের। দরজা খুলে দাঁড়াল সতী। নতুন, অচেনা মুখ, ঝকঝকে।

কাকে চাই?

শকুন্তলাকে। থাকে না এখানে? ভয়ে ভয়ে তাকাল পরমেশ।

পরমেশের গলা পেয়ে অবাক হয়ে ছুটে এল শকুন্তলা। আরে, কি আশ্চর্য, তুমি?

চলে এলাম, একলা একলা ভাল লাগছিল না। হাসল পরমেশ।

হাসল শকুন্তলাও, বেশ করেছ, এসো।

তাকাল অবাক হয়ে সতী, তাকালেন প্রিয়নাথও খাটে উঠে বসে, বই ফেলে চেয়ে রইল শীলা আর বিমল। বাইরের লোক বলতে এ বাড়ীতে বড় কেউ আসে না।

নীচে অবধি পৌঁছে সিঁড়ি বেয়ে ফিরে এল শকুন্তলা, দরজাটা বন্ধ করে দিল।...

ছেলেটা কে? শুধালেন প্রিয়নাথ।

ওর নাম পরমেশ, পরমেশ রায়।

তোর সঙ্গে সম্পর্কটা কি?

সম্পর্ক আর কি, আমরা একই আপিসে কাজ করি।

এখানে এসেছিল কেন?

এমনিই, এতে অত জেরা করবার কি আছে? হেসে উঠল শকুন্তলা, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু দেখা করতে আসবে না? বা রে!

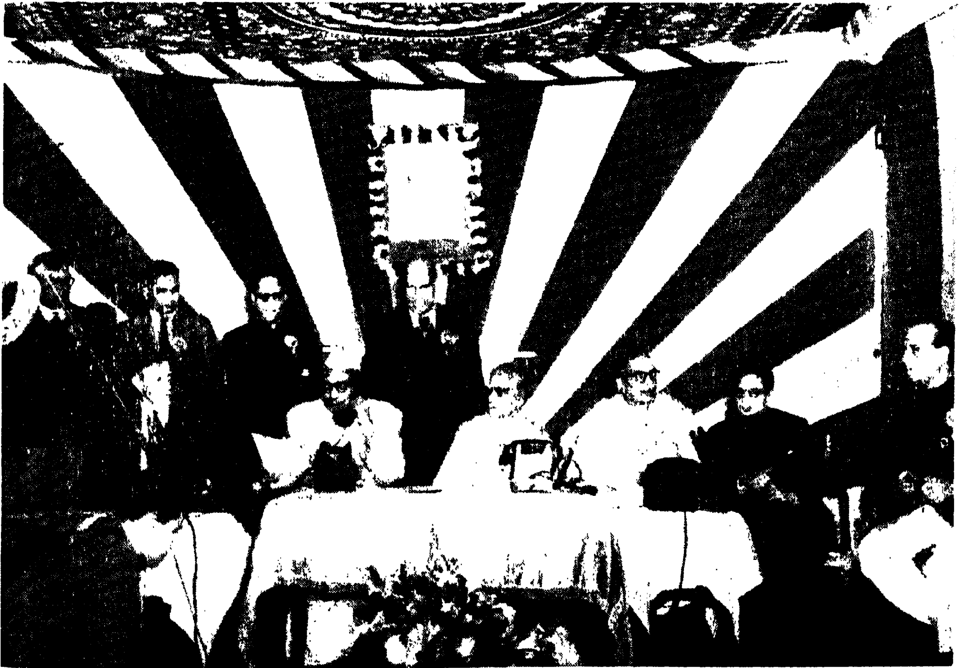
ক'দিন থেকে এ বন্ধুত্ব?

অনেকদিন থেকেই, আপিসে ঢোকবার পরেই ওর সঙ্গে ভাব হয়েছে।

ও, তাই ফিরতে প্রায়ই রাত হয়, আমরা ভেবে ভেবে মরি আর উনি টো টো করে বেড়াচ্ছেন।

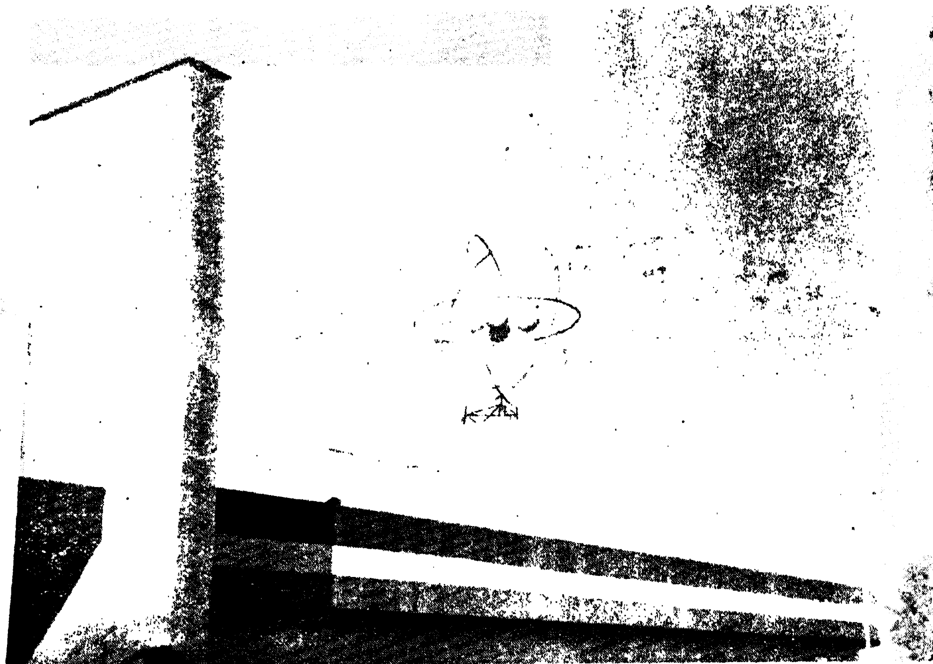


প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লীর রাজপথে লোকনৃত্য শিল্পীবৃন্দ



হাতিকান্দায় কলিকাতা-লণ্ডন রেডিও টেলিফোন সার্ভিসের উদ্বোধনরত শ্রীজগজীবন রাম। তাঁহার বামদিকে ড. শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রী ডি. সি. দাস

ভারতীয় শিল্পমেলা, দিল্লী—



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "এটম ফর পীস", প্যাভিলিয়ন



চীনা প্যাভিলিয়নের প্রবেশপথ

ভাবতে ত তোমাদের কেউ বলে নি।

না, তা কেউ বলবে কেন, গর্জেই উঠলেন প্রিয়নাথ, টাকার চিন্তায় রাতভোর আমার চোখে ঘুম নেই, অভাব আমাদের চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে—আর উনি দিব্যি হেসে খেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, লজ্জা করে না তোর?

এর জবাব ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারত, তবু দিল শকুন্তলা, বলল, না।

তা কেন করবে? ফেটে পড়লেন প্রিয়নাথ, এখন যে তুই লায়েক হয়েছিস, চাক্‌রো-হয়েছিস, আমাদের সবাইকে খাওয়াচ্ছিস পরাচ্ছিস, এখন এ সব করতে লজ্জা করবে কেন? করবে না। কাসবার জন্য দম নিলেন কিছুক্ষণ। তারপর একেবারে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, ওকে তুই ভালবাসিস?

জবাব দিল না শকুন্তলা, দিল না ইচ্ছে করেই। ভালবাসে কিনা, কি হবে সে কথা শুনে?, কিই বা সে করবে শুনিয়ে?

ওকে তুই বিয়ে করবি, তারপর চলে যাবি ওর সঙ্গে, আমরা এখানে মরি কি বাঁচি, তাতে তোর কি আসে যায়, কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। আমরা এখানে উপোস করে মরি তাই কি তুই চাস?

চায় না, চায় না শকুন্তলা, জানে না কি বাবা? তবু এ সব কথা বলবেই। কেন কেন? অভিমান কি শকুন্তলা করতে জানে না? রাগও কি করতে পারে না? স্নেহ-ভালবাসায় কাউকে ত কোন দিনই আঘাত দেয় নি বাবা। প্রতিবাদের কঠিন পাঁচিল তুলে ভালবাসার সুবাসিত বনপথ কখনও ত বিষাক্ত করে দেয় নি। জানে শকুন্তলা, বাবাও কি জানে না? দেশের সেই দুরন্ত ছেলে বসন্তকে ভালবেসেছিল শকুন্তলা। জানত বাবা, তবু ত কিছু বলে নি। বসন্ত বলেছিল বাবাকে, শকুন্তলাকে বিয়ে করব। সামাজিক বিধানে বিয়ে ওদের হয় না। তবু বাধা দেয় নি বাবা, বরং বাধা ভাঙবার সাহসই দিয়েছিল বসন্তকে। তারপর যেদিন খুন হ'ল বসন্ত —বেশ মনে আছে শকুন্তলার, বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে কতক্ষণ সে কেঁদেছিল। এই কি সেই বাবা?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলো প্রিয়নাথ—

কত মাইনে পায় ছেলেটা?

জানি না।

তা জানবে কেন? প্রিয়নাথ খেঁকিয়ে উঠলেন, কতই বা পাবে, কিই বা মাইনে দেয় আপিসে, দেড়শ'র ত বেশী নয়। দেড়শ' টাকায় নিজেই খাবে কি আর খাওয়াবেই বা কি।

সে দেখবার কাজ বাবার নয়, সে দেখবে পরমেশ। কিছু বলল না শকুন্তলা, চুপ করেই রইল। সেদিন বসন্তই বা কি চাকরি করত? কিছুই নয়, তবু ওর চাকরির কথা কোন দিনই ত তোলে নি বাবা। বসন্তের মধ্যে ছিল ছাইচাপা আগুন, সেই আগুনের অনেকখানি নিয়ে এসেছে পরমেশ। শুধু বসন্তর চাকরিই নয়, টাকার কথাও বাবার মুখে কোন দিনই শোনে নি শকুন্তলা। টাকার উপর বাবার চিরকালই ছিল উদাসীনতা। মনে পড়ে, কত দিন শুনেছে ও বাবার মুখে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মানুষই যে। সেই বাবা আজ কোথায় গেল?

জানালার কাছে আস্তে আস্তে সরে এল শকুন্তলা। হাওয়া বইছে ভিজে শীতের চুমু নিয়ে, দোষ কি ভালবাসায়? এই সংসারে চিরকাল সে কি খেটেই মরবে? টাকা রোজগার করবে সবাইকে বাঁচাবার জন্যে? কিন্তু এ কাজ ত মেয়েদের নয়, এ কাজ ছেলেদের। মেয়েরা জন্মেছে পরের ঘরে যাবার জন্য, পরের ঘরে নীড় বাঁধবার জন্য, তবে কেন সে ভালবাসবে না? কেন বাঁধবে না ঘর? স্বার্থের পৃথিবীতে এমন নিঃস্বার্থ বেঁচে থাকার কি কোন মানে হয়?

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দেখা। হাসল পরমেশ, বাড়ীতে এসে কাল কেমন অবাক করে দিয়েছি।

একটুও না।

বাজে কথা বলো না।

মেয়েদের অবাক করা অত সোজা নয় মশাই, হাসল শকুন্তলাও।

পরমেশের পাশে ওদের বাড়ীর সিঁড়ি উঠতে উঠতে আর এক দিন ভারি ভাল লাগল শকুন্তলার।

জান, পরমেশ বললে, সিঁড়িতে উঠতে আমার খুব ভাল লাগে। এই সিঁড়ির সারি সব সময় আমাকে উপরেই নিয়ে যায়। যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর তারা সব উপরেই থাকে কিনা। স্কুলে সিঁড়ি ছিল, কলেজে সিঁড়ি ছিল, আপিসেও সিঁড়ি। আমার বাড়ীতে সিঁড়ি, তোমারও বাড়ীতে সিঁড়ি। নয় কি?

হাসল শকুন্তলা একটু শুধু।

তোমার ভাল লাগে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে?

উঁহু।

কেন?

পা ব্যথা করে যে।

তুমি বড্ড উইক, হাসল পরমেশ। একটুও জোর নেই।

সিঁড়ি ভেঙে জোর দেখাবার দরকার নেই আমার, রক্ষে কর। খিল খিল করে হেসে উঠল শকুন্তলা।

দুটো সিঁড়ি উঠবার পর মুখ ফেরাল, কিন্তু সিঁড়ি ত শুধু উঠবারই নয়, নামবারও—তা জান?

জানি।

ঘোড়ার ডিম জান, সব সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠবারই কথা বল শুধু, নামবার কথা ত কখনও বলতে শুনি না।

কারণ, সিঁড়ি আমায় নামায় নি কখনও, নামাবেও না।

যদি নামায়?

কোথায় নামাবে, নরকে?

ধর তাই।

নরকে যদি নামতেই হয়, সিঁড়ির দরকার কি? লাফিয়েই নামব। তারপর ঘন হয়ে এল ওর খুব কাছে পরমেশ। কাল বিকেলে আসছি তোমাদের বাড়ীতে।

কেন ?

সে খোঁজে তোমার দরকার নেই। তোমার বাবার সঙ্গে কিছু কথা বলতে হবে।

কি কথা ?

সে শুনেও তোমার দরকার নেই।

আহা, বলই না।

উঁহু, টপ সিক্রেট, তারপর পরমেশ নিজের মুখ ওর মুখের একেবারে কাছে নিয়ে এল, মেয়েরা ত শুনেছি খুব চালাক হয়, তবে তুমি এত বোকা কেন ?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, পরমেশ আসছে। ওর সিঁড়ি উঠার সাড়া চেনে শকুন্তলা, চেনে বৈ কি। কি বলতে আসছে ও? হারিয়ে-যাওয়া দেশের সেই আগুনের ছেলেটার মত ও কি আজ বলতে এল বাবাকে ? বলতে এল, শকুন্তলাকে দেবেন কি? আশ্চর্য্য উত্তেজনা আর পুলকে কাঁপছে শকুন্তলা। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, পরমেশ উঠছে, তবু উঠল না শকুন্তলা। দরজার কাছে এগিয়ে গেল না অভ্যর্থনায়, বসেই রইল ঘরে।

শকুন্তলা আছে কি ? পরমেশের গলা। পাশের ঘর থেকে শুনল শকুন্তলা।

আছে, প্রিয়নাথ বললেন।

ওকে ডেকে দিন না।

ডেকে দিলেন না প্রিয়নাথ, বললেন, শোন।

বলুন।

ওর কাছে তুমি আস কেন ?

ও আমার বন্ধু, তাই।

আর কিছু ?

আর কিছু কি ? কি বলতে চায় বাবা ? পাশের ঘর থেকে অধীর চঞ্চলতায় কান পেতে থাকে শকুন্তলা। আর কিছু বলে কি জানতে চায় বাবা ? বন্ধুত্বের চেয়েও আরও কিছু বড়, আরও কিছু বেশী, তাই কি ? জিজ্ঞেস কেন করছে না পরমেশ ?

জিজ্ঞেস করতে হ'ল না, আবার প্রশ্ন করলেন প্রিয়নাথ। শকুন্তলাকে তুমি ভালবাস ? ওকে বিয়ে করতে চাও ?

এ ঘরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাঁপতে থাকে শকুন্তলা, ভয় আর ভাবনার মিলিত ঢেউয়ের ভিড় বুকের অশান্ত কম্পনে। কিছু বলছে না কেন পরমেশ ? কেন চুপ করে রয়েছে ? এতক্ষণ ভাবছে কি ? এতে ভাবনার কিছু নেই, কিছু নেই, বল পরমেশ, বল, বল না। অধীর উত্তেজনায় কান পাতল শকুন্তলা, কিছু বলছে না কেন পরমেশ ?

বলল পরমেশ, শুনল শকুন্তলা। বলল, হ্যাঁ।

বলবেই ত, বলবে না ? ওর মাঝে খুঁজে পেয়েছে শকুন্তলা সেই আশ্চর্য্য ছেলেটার অনেকখানি আগুন, সেই আগুন কি কখনও মিথ্যে হতে পারে ?

বাবা বলল, স্পষ্ট শুনল শকুন্তলা, বাবা বলল, ও তোমায় কিন্তু পছন্দ করে না।

বাজ পড়ল— বাজ নয়, কান্নার বোমা। এক প্রচণ্ড কাঁপুনিতে যেন কেঁপে উঠল পুরো ঘরটাই, থর থর করে। এ কি বলল বাবা ? কি করে পারল বলতে এত বড় মিথ্যে ? ভয় হ'ল না একটুও, কষ্ট হ'ল না একটুও ? কিন্তু চুপ করে রয়েছে কেন পরমেশ ? কিছু বলছে না কেন ? কেন প্রতিবাদ করছে না ? সে কি জানে না, এ সত্যি নয়, এ মিথ্যে। এত দিন কাছে পেয়েও কি জানতে পারল না পরমেশ, চিনতে পারল না পরমেশ ?

শুনল শকুন্তলা, ওর মনের কথারই যেন প্রতিধ্বনি করল পরমেশ। না না, সত্যি নয়, সত্যি নয়।

সত্যিই। বললেন প্রিয়নাথ, গম্ভীর হয়েই বললেন তিনি। আমার মেয়েকে কি আমি জানি না, এ রকম ব্যাপার এর আগেও ওর জীবনে হয়েছে, তাই ত বলছি।

না না, এ সত্যি নয়, আমি বিশ্বাস করি না।

চেঁচিয়ে উঠল পরমেশ, ওর কণ্ঠস্বরে কিন্তু সেই উদাত্ত সুর নেই। কেমন যেন ভিজে ভিজে সুর, কান্নারই জলে ভিজে কি ? আর এ ঘরে পাথর হয়ে গেছে শকুন্তলা।

বিশ্বাস কর বা না কর, তোমার ইচ্ছে।

আমি আপনার মেয়ের মুখ থেকেই শুনতে চাই, ওকে ডাকুন।

ডাকতে হ'ল না, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল শকুন্তলা, আস্তে আস্তে, আলগা পায়ে।

বল শকুন্তলা, এ কি সত্যি, বল।

তাকাল শকুন্তলা পরমেশের দিকে, দ্রুত নিঃশ্বাসে সারাটা শরীর কাঁপছে ওর, ভয় পেয়েছে ও। কালো চোখ দুটোয় বিহ্বলতার কাজল। স্বাস্থ্যভরা যৌবনপুষ্ট দেহের চঞ্চলতায় বিভ্রান্তির ছবি। ভয় পেয়েছে আগুনের ছেলে পরমেশ, তাকাল শকুন্তলা প্রিয়নাথের দিকেও। বাবার মুখেও ভয়ের ছায়া, কিসের ভয় ? মেয়ে যদি প্রতিবাদ করে ? যদি বলে, এ সত্যি নয়, মিথ্যে ? তাই কি ?

বল শকুন্তলা, বল, চুপ করে থেক না লক্ষ্মীটি। আকুল আকুতি আবার পরমেশের।

তাকাল আবার ওর দিকে শকুন্তলা, ভয় পেয়েছে পরমেশ। ভারি ভাল ওকে দেখতে, সুগঠিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে যৌবনের প্রাচুর্য্য, তাকাল বাবার দিকে আবার, সেখানেও ভয়, এই কি সেদিনের সেই নির্ভীক সত্যবাদী বাবা ? এই বাবাই কি শোনাত একদিন শকুন্তলাকে সত্যিকারের বেঁচে থাকবার জীবনের গান ?

মুখ খুলল বোবা শকুন্তলা, বলল, হ্যাঁ।

অবাক হয়ে তাকাল পরমেশ, অবাক হয়ে তাকালেন প্রিয়নাথ। ইচ্ছে করলেই ও ত বলতে পারত—না। পরমেশের হাত ধরে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ও নেমে যেতে পারত। বাবা কি দিতে পারতেন তিনি ? পথ কি রোধ করতে পারতেন ওর ? হুড়মুড় করে নেমে এল পরমেশ, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে যেন মাতালের

মত টলতে টলতে, এই প্রথম ওর মনে হ'ল, সিড়ি শুধু উঠবারই নয়, নামবারও।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শকুন্তলা, চুপ করে। ও যেন পাথর হয়ে গেছে। এক গাদা বোবাহাওয়া ঘর হাতড়াচ্ছে অন্ধ হয়ে। তাকালেন প্রিয়নাথ মেয়ের দিকে, ওকে ডাকতে গেলেন, পারলেন না, কি যেন বলতে গেলেন, পারলেন না,—এ কি ভয়? বুকের কমে আসা ব্যথাটায় হঠাৎ যেন চাপ লাগল।

ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল শকুন্তলা পাশের ঘরে, সেই জানালাটার কাছে। খোলা জানালা দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। এখনও যেন সিড়িটা কাঁপছে, কত জোরে নেমেছিল পরমেশ? কত জোরে?

কে যেন কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। কে রে? ফিরে তাকাল শকুন্তলা, বিমল।

কি রে?

এমনিই রে বড়দি।

পড়াশুনা হয়ে গেছে?

হুঁ, ঘাড় নাড়ল বিমল, তারপর শুধাল, তুই কাঁদছিস বড়দি?

চমকে উঠল শকুন্তলা, অন্ধকারেও দেখতে পায় নাকি ছেলেটা? তাড়াতাড়ি বলে উঠল, দূর বোকা, কাঁদব কেন, কি হয়েছে আমার। আর কিছু বলল না বিমল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বড়দিকে। ওর মাথার রুক্ষ চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে শকুন্তলা, কবে বড়দার মত বড় হবে বিমল? কবে রোজগার করবে?

—

চিরন্তন

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

অজানার প্রান্ত হতে অজানা প্রান্তরে প্রসারিত দীর্ঘ পথ,
অগণিত যাত্রী আসে সেই পথ ধরে, চঞ্চল মুখর তারা,
নির্ঝরের উৎস হতে অবিরল ঝরে-পড়া যেন জল-ধারা,
কল্লোলিয়া ছুটে চলে নটিনীর মত আনন্দে উন্মত্তবৎ।

কোথা হতে কেন আসে, কেন চলে যায়, কেহ তাহা নাহি জানে;
কেন ফুটে ওঠে ফুল, কেন ঝরে যায়, ভাবিবার অবসর
মেলে না ক্ষণেক তবু। কেহ আছে প্রভু, কেহ আছে কি ঈশ্বর?
আকাশে বাতাসে তার মেলে না উত্তর, মেলে না তটিনী-পানে।

চেয়ে দেখি ঊর্দ্ধপানে কাননে কান্তারে সাগর-তরঙ্গ-দোলে,
কাহারে পাই না খুঁজি, কেহ নাই নাই, কাহারো পাই না সাড়া;
ঊষর মরুর প্রান্তে রৌদ্র-দগ্ধ উষ্ণ বায়ু ছোটে পথ-হারা;
আঁধারে প্রদীপ জ্বালি সাজায় দীপালি কারা আকাশের কোলে।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি, অনন্ত সুন্দর সেথা ব্যাপ্ত হয়ে আছে;
তৃণে পত্রে শষ্পে পুষ্পে শাখায় শাখায় বৃক্ষ-শিরে ধূলিতলে
কাননের অন্তরালে হিমাদ্রি-চূড়ায় অন্তরীক্ষে জলে স্থলে
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতরে বিপুলে বিশালে তার বৈভব বিরাজে।

সংশয় জাগিয়া ওঠে, মনে হয় কোথা হতে ডাকিছে সুদূর,
সে ডাকে দিয়েছি সাড়া আমার অজানা এক বিস্মৃত জীবনে,
আজো তার হাতছানি ছুটে আসে বুঝি তাই পিছনে পিছনে
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে। ভ্রান্তি হ'তে জাগি যবে শুনি সেই সুর।

জীবনের তুচ্ছ যত মান-অভিমান আর কর্ম্ম-কোলাহল
আড়াল করিয়া রাখে, দিবস রজনী শুধু ভুলায় ভুলায়,
মায়া দিয়ে মোহ দিয়ে সুতোর বাহুদণ্ড অন্তরে ধুলায়,
অমৃতের উৎস হতে টেনে নিয়ে মুখে ধরে পাত্র হলাহল।

সত্য আছে, মিথ্যা আছে, ক্ষমা আছে, ঈর্ষা আছে, আছে কুৎসিত,
অন্ধ-করা আলো আছে, আলেয়ার পিছে-ছোটা পথভ্রান্ত মন,
সংগোপনে ব্রীড়া আছে, সৃষ্টির বেদনা নিয়ে সুন্দর যৌবন;
সবকিছু ভেঙে চুরে জরা এসে জীর্ণ করে হিত ও অহিত।

কালের এ চক্রজালে চিরকাল ঘুরে মরি তুমি আর আমি,
ভাস্বর দীপ্তিতে ভরা আজ যাহা আছে, তাহা কাল আর নাই
কোন দিন হেথা হতে কিছুতে চাহি না যেতে তবু চলে যাই,
অসীমের রন্ধ্রগত চিরন্তন সুর শুধু যায় নাক' থামি।

তামিলনাদে সংস্কৃতচর্চা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ

গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে নিখিল-ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের অষ্টাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তামিলনাদের প্রসিদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্র অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া এবং সেই প্রসঙ্গে তামিলনাদের কয়েকটি তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া বর্তমান তামিলনাদে সংস্কৃতচর্চা সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছে তাহাই এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ভারতের প্রাচীন ভাষা সাহিত্য ধর্ম দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান এবং ভারতের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ইরাণী আরবী ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক পদ্ধতিসম্মত বৈজ্ঞানিক আলোচনার উদ্দেশ্যে দুই বৎসর অন্তর এক এক স্থানে নিখিল-ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা মুখ্যতঃ সংস্কৃত ব্যবসায়ীদের মিলনকেন্দ্র। ইহার বিভিন্ন অধিবেশনে একাধিক সংস্কৃত নাটক অভিনীত হইয়াছে—প্রাচীন ধরণে সংস্কৃত পণ্ডিতদের শাস্ত্রবিচার বা শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠিত হইয়াছে—সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থাও এই সম্মেলনে প্রায়শই হইয়া থাকে। সংস্কৃতচর্চার বিভিন্ন দিক্ লইয়া এই সম্মেলনের অধিবেশনে কোথাও কোথাও বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই সম্মেলনে সংস্কৃত সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল মন্তব্য বা আচরণ স্বভাবতই সভ্যদের চরম ক্ষোভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ অন্নমালাই নগরের অধিবেশনে নানা কারণে এই শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। স্বয়ং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ তাঁহার অভিভাষণে সংস্কৃত সম্পর্কে যে উক্তি করিলেন তাহা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতের অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল না—বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে তাহা সংস্কৃত বিষয়ে আধুনিক তামিলনাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের সুস্পষ্ট আভাস বলিয়া মনে হইল।

কিছুদিন পূর্বে তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত সংস্কৃত বিশ্বপরিষদের এক অধিবেশনে আমাদের স্কুল-কলেজে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার এই অভিভাষণে সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এই প্রস্তাব তামিলনাদের পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী, যেহেতু তামিলভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের কোনও যোগাযোগ নাই। এই কারণে তামিল বা তাহার সহযোগী ভাষার শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই অধিকতর সুফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তামিল ও সংস্কৃত ভাষার তুলনা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় তামিলের উৎকর্ষ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সংস্কৃত ও তামিল এই দুই স্বতন্ত্র ভাষা হইতে উদ্ভূত; তবে সংস্কৃত এখন আর কথ্যভাষা নহে, তামিলভাষা কিন্তু এখনও তামিলনাদের কথ্যভাষা এবং ইহার ধারা প্রাচীনকাল হইতে অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

সভাপতি মহাশয়ের এই সব উক্তির যৌক্তিকতা বিচারের এই স্থান নহে। তবে তাঁহার অভিভাষণে এসকল কতটা প্রাসঙ্গিক তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হিসাবে তামিলনাদ ও তাহার সংস্কৃতির গৌরব খ্যাপন তাঁহার অভিভাষণে আদৌ অপ্রাসঙ্গিক নহে। তবে সেই প্রসঙ্গে সংস্কৃত ও তামিলের তুলনা এবং সংস্কৃতচর্চা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করিলেই ভাল হইত।

অবশ্য এই জাতীয় মতবাদ একেবারে নূতন নহে—এই মনোভাব ব্যক্তিগত নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রী কে. অপ্পাদুরাই ভারতের ভাষাসমস্যা সম্পর্কে ইংরেজিতে লিখিত একখানি পুস্তকে তামিলকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া ভাষাসমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে তামিলই আদর্শ কেন্দ্রীয় ভাষা—ইহাই ভারতের মূল ভাষা। তামিল বা দ্রাবিড় ভাষার সহিত যে ভাষার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং সংস্কৃতের সহিত যাহার সম্বন্ধ যত দূরবর্তী তাহাই তত প্রাচীন ও সুন্দর।

এই মনোবৃত্তি কার্যক্ষেত্রে দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথম, প্রাদেশিক সাহিত্য প্রচার এবং দ্বিতীয়, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আপেক্ষিক অবহেলা। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে প্রাদেশিক সাহিত্য প্রচারের ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখিয়া আনন্দ হয়। এইরূপ প্রচেষ্টা অন্য প্রদেশের অনুকরণের যোগ্য। অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই হইল—তামিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরবময় ফল সমস্ত বিশ্ববাসীকে দান করা। এই উদ্দেশ্যসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তামিল ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন উপলক্ষ্যে তামিলীয় গবেষণার জন্য নির্মিত একটি স্বতন্ত্র গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ সরকার,

তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রাদেশিক সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতি-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই এই কার্যে আনন্দ বোধ করিবেন। এই কার্যে আরও উৎসাহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন একটি বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইয়াছেন যাহাতে তাঁহারা ইংরেজি অনুবাদ-সমেত তামিল সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির শোভন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সুধীসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বস্তুতঃ এ জাতীয় প্রচেষ্টার সহিত কাহারও কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে ইহার কোনও সংঘর্ষ বাধিবার কারণ নাই।

দীর্ঘকাল সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্য পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তামিল ভাষাও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মত সংস্কৃত ভাষা হইতে সাগ্রহে শব্দ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত তামিলের মিশ্রণে 'মণিপ্রবালম্' নামে এক অভিনব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। রামায়ণের কাহিনী লইয়া রচিত কম্বরামায়ণ তামিল সাহিত্যের একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। সম্প্রতি একজন সংস্কৃত কবি এই গ্রন্থের অংশ-বিশেষের সংস্কৃতানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন তামিলনাদে সংস্কৃতচর্চার ইতিহাসও কম গৌরবজনক নহে সংস্কৃত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তামিল বর্ণমালার সংস্কার করিয়া গ্রন্থাক্ষরের সৃষ্টি হয়। এই অক্ষরে লেখা বহু গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপি এখনও নানা গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তামিলনাদের সংস্কৃত পণ্ডিত-দের লেখা সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে। অনেক ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের রামানুজ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ও গ্রন্থকার ভাস্কর রায় এখানকারই লোক। তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরীর সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থের সংগ্রহ বিশ্বের সংস্কৃত রসিকসমাজে সুপরিচিত। মহারাজ সাফোজী নানা স্থান হইতে বহু অর্থব্যয়ে ও প্রচুর যত্নে অনেক পাণ্ডু-লিপি সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। কাঞ্চী, কুম্ভকোণম্, মদুরা বা দক্ষিণ মথুরা, চিদম্বরম্ প্রভৃতি কেবল তীর্থক্ষেত্র হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থান সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র হিসাবেও বিখ্যাত। এখনও তামিলনাদে সংস্কৃতের অনুশীলন অপ্রচলিত বা বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও প্রাচীন ধরণের সংস্কৃত কলেজে ও আধুনিক স্কুলকলেজে সংস্কৃতের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে।

তবে সংস্কৃতের প্রতি পূর্বকালের সেই শ্রদ্ধা ও আগ্রহ আজ মন্দীভূত। এই অবস্থা ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতের সহিত উত্তর-ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহেরও যোগাযোগ কেহ কেহ এখন আর তেমন স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তামিলনাদে এই ভাবটা যেন অপেক্ষাকৃত একটু উগ্র—সংস্কৃতকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিবার একটা চেষ্টা যেন সুস্পষ্ট। তাই এখানকার প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের বিবিধ অনুষ্ঠানেও সংস্কৃতের স্থান যেন নিতান্ত গৌণ। তাই সম্মেলনে প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের সমাবেশ ত দূরের কথা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও সঙ্গীত অভিনয় প্রভৃতি ব্যাপারেও সংস্কৃতের যথাযোগ্য স্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। মেয়েদের সাহায্যে বৈদিকগানের নমুনা পরিবেশনের চেষ্টা কতকটা নিয়মরক্ষার মতই হইয়াছিল। তামিলই সমস্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল পরিধির মধ্যে কোথাও দেবনাগর অক্ষরের সহিত সাক্ষাৎকার হইল না—'স্বাগতম্' কথা পর্যন্ত কোথাও দেখা গেল না—অবশ্য ইংরেজি ও তামিল ভাষায় আবাহনসূচক শব্দসমূহের অভাব ছিল না। তীর্থক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় একই রূপ। ইংরেজিই এ সব স্থলে অন্য প্রদেশের লোকের পরম অবলম্বন। মন্দিরে মন্দিরে ইংরেজি বিজ্ঞপ্তি—হাটে-বাজারে ইংরেজি বিজ্ঞাপন—অতি সাধারণ লোকেরও ভাঙ্গা ইংরেজির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় অন্য প্রদেশের শিক্ষিত লোকের সকল বিষয়ে একটা ধারণা লাভ ও কাজ চালানর পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

ইংরেজি যেদিন আমাদের মধ্যে ক্রমশ অপরিচিত হইয়া পড়িবে সে দিন এই সব স্থানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের সূত্র কি হইবে ভাবিবার বিষয়। সংস্কৃত ভাষা না হউক অন্ততঃ দেবনাগরী বর্ণমালাও এই অবস্থায় বিশেষ উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি যে কাজ করি-তেছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সর্বভারত-প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে সেই কাজ আরও অনায়াসে হইতে পারে। সংস্কৃতকে বর্জন বা উপেক্ষা করিয়া আমরা সমগ্র ভারতের বন্ধনসূত্রকে শিথিল করিয়া ফেলিতেছি কিনা তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা দরকার। নূতন কিছু করি বা না করি বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত রহিয়াছে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের সঙ্গে ব্যবহারের সময় যদি সেগুলির উপর জোর দেওয়া হয়—যদি দেবমন্দিরাদিতে নাগরীলিপিতে স্থান ও মূর্তিগুলির নাম নির্দেশ করা হয় তাহা হইলে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হয়। যদি সাধারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে মোটামুটি সংস্কৃতের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের অনেক সুবিধা হয়। সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাধারণ জ্ঞান—

সংস্কৃত পুরাণকাহিনীর সহিত সাধারণ পরিচয় থাকিলেই যে সুবিধা হয় অন্য কোন ভাষার সাহায্যে তাহা হইবার উপায় নাই। সংস্কৃত আজ আর কথ্যভাষা নয় সত্য—সংস্কৃতকে আজ আর কথ্য বা রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টাও কার্যকারিতার দিক্ হইতে সফল হইবে মনে করা চলে না। সে হিসাবে সংস্কৃত মৃত ভাষা হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় ভাষাসমূহের শক্তি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির দিক্ হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত চিরজীবী—বিভিন্ন ভাষা ইহাকে আশ্রয় করিয়া ইহার সাহায্যে শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া আজও পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। তাই অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত একটি ইংরেজি উক্তির অনুকরণ করিয়া বলা যায়—সংস্কৃত মৃত কিন্তু সংস্কৃত চিরজীবী হউক। বর্তমান যুগে সংস্কৃত-চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বিচার করিবার সময় সংস্কৃত ভাষার এই ব্যাবহারিক উপযোগিতার দিকটা চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। আমার মনে হয়, আমরা সে দিকে সকল সময় তেমন দৃষ্টি না দেওয়ার ফলেই সংস্কৃতবর্জনের একটা ইচ্ছা—সংস্কৃতের প্রতি একটা ঔদাসীন্য ও অশ্রদ্ধা নানা স্থানে দেখা যাইতেছে। তামিলনাদে ইহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে সংস্কৃতানুরাগী মাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তবে শুনিয়া সুখী হইলাম দক্ষিণ ভারতের অন্য স্থানে, বিশেষ করিয়া অন্ধ্রে বা কেরলে, সংস্কৃতের প্রতি এইরূপ বিরূপতা নাই। সেখানে সংস্কৃতচর্চা অপেক্ষাকৃত বেশী—সেখানকার ভাষার সঙ্গেও সংস্কৃতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর —সে যোগসূত্রকে অস্বীকার বা ছিন্ন করিবার আগ্রহ বা চেষ্টা সেখানে নাই।

ভিটামিন বি কমপ্লেক্স

শ্রীশরদিন্দু চৌধুরী

ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের নাম শুনেন নি, শিক্ষিতদের মধ্যে এমন লোক বোধ হয় আজ খুব কমই আছেন। আজকাল কথায় কথায় চিকিৎসকেরা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাবার উপদেশ দেন। খাদ্যাল্পতা ও ভেজাল খাদ্য গ্রহণের দরুন পুষ্টির অভাব হয়ে আমাদের নানা রোগ জন্মে। খাদ্যে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের ক্রমাগত অভাব হেতু অধিকাংশ রোগ হয়। বেরিবেরি, বদহজম, কোষ্ঠবদ্ধতা, চর্ম্মরোগ, রক্তাল্পতা, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ভিটামিন বি বা খাদ্যপ্রাণ 'খ' সম্বন্ধে আলোচনা করব।

যে জৈব উপাদান (organic compound) সমস্ত জীবকোষে কাজের সহায়তা করে এবং উচ্চশ্রেণীর জীবের পুষ্টির জন্য যা একান্ত অপরিহার্য্য তাকেই খাদ্যপ্রাণ 'খ' বা ভিটামিন 'বি' বলে। ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা 'ভিটামিন বি'-কে একই রূপ উপাদান বলে ধরতেন। এই বৎসর স্মিথ এবং হেনড্রিকের গবেষণার ফলে প্রথম জানা যায়—'ভিটামিন বি' দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এ দুটি উপাদানকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করলেন। ইংলণ্ডে এদের নাম দেওয়া হ'ল "ভিটামিন বি১" ও "ভিটামিন বি২"। বাংলায় আমরা খাদ্যপ্রাণ খ১ ও খাদ্যপ্রাণ খ২ নাম দিতে পারি। 'খাদ্যপ্রাণ খ'তে দুটো উপাদান আবিষ্কৃত হবার পর বৈজ্ঞানিকেরা উৎসাহিত হয়ে আরও গবেষণা করতে লাগলেন—নূতন কোন উপাদান পাওয়া যায় কি না। তারপর কয়েক বৎসরের অবিরাম গবেষণার ফলে খাদ্যপ্রাণ খ'তে অনেকগুলো উপাদান আবিষ্কৃত হ'ল। তখন খাদ্যপ্রাণ খ'কে আর সহজ সরল খাদ্যপ্রাণ খ বলে ধরা চলল না। বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিলেন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বা জটিল খাদ্যপ্রাণ খ। যে কয়টি উপাদান দিয়ে জটিল খাদ্যপ্রাণ 'খ' গঠিত তাদের নাম হচ্ছে—(১) খাদ্যপ্রাণ খ১—এনিউরিন বা থায়ামিন, (২) খাদ্যপ্রাণ খ২ বা রিবোফ্ল্যাবিন, (৩) নিকোটিনিক এসিড, (৪) খাদ্যপ্রাণ খ৬, (৫) প্যান্টোথেনিক এসিড, (৬) বায়োটিন, (৭) ফলিক এসিড, (৮) খাদ্যপ্রাণ খ১২, (৯) ফলিনিক এসিড বা সাইট্রোভোরাম অংশ। এই নয়টি উপাদান ছাড়া আরও পাঁচটি উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পাঁচটি উপাদানকেও অনেকে খাদ্যপ্রাণ খ-এর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। তবে এ সম্বন্ধে এখনও মতানৈক্য রয়েছে। এই পাঁচটি উপাদানের নাম হচ্ছে—(১) ইনোসিটল, (২) কোলিন, (৩) প্যারা এমিনো বেনজয়িক এসিড, (৪) খাদ্যপ্রাণ খ১৩ ও (৫) খাদ্যপ্রাণ খ১৪। এই বিভিন্ন উপাদানগুলো নিয়ে পৃথকভাবে সংক্ষেপে কিছু বলি।

খাদ্যপ্রাণ খ১—এনিউরিন বা থায়ামিন : উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন প্রথম কলে-ছাটা চাল খাওয়া সুরু করে, তখন থেকে 'বেরিবেরি' নামে অভিনব রোগের সূত্রপাত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে থাকেন। শেষে প্রমাণিত হয়, কলে-ছাটা চাল খাওয়ার জন্যেই এ রোগ হয়। ঢেঁকি-ছাটা চাল খেলে এ রোগ হয় না। এই আবিষ্কারের পর সকলেরই জানবার কৌতূহল হ'ল ঢেঁকি-ছাটা চালে এমন কি আছে, যার জন্য তা খেলে বেরিবেরি হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে গবেষণা সুরু করলেন। ১৯২৬ সনে জ্যানসেন ও ডোনাথ তিন কিলোগ্রাম তুষ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম এনিউরিন বিশুদ্ধ অবস্থায় তৈরি করলেন। প্রায় একই সময়ে স্মিথ ও হেনড্রিক ঘোষণা করলেন

যে, খাদ্যপ্রাণ খ দুটো উপাদানে গঠিত—খাদ্যপ্রাণ খ১ ও খাদ্যপ্রাণ খ২। তাঁরা আরও বলেন যে, খাদ্যপ্রাণ খ১ উত্তাপে ক্ষণস্থায়ী আর খাদ্যপ্রাণ খ২ উত্তাপে অধিকক্ষণ স্থায়ী। ১৯৩৫-এ জ্যানসেন খাদ্যপ্রাণ খ১-এর নামকরণ করলেন এনিউরিন। এনিউরিন মানে হচ্ছে স্নায়বিক রোগ-প্রতিষেধক। আমেরিকার উইলিয়ামস এর নাম দিলেন থায়ামিন। ১৯৩২ সন হতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত ক্রমাগত গবেষণা করে জার্মানীর উইনডস, শেছে, গ্র এবং আমেরিকার উইলিয়ামস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এনিউরিনের পরীক্ষামূলক রাসায়নিক সংকেত (emperical formula) ও আণবিক সজ্জা (molecular structure) নির্ণয় করেন। অবশেষে উইলিয়ামস কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে এনিউরিন তৈয়ারি হওয়াতে এ বিষয়ের উপর যবনিকাপাত হ'ল।

এনিউরিন এক প্রকার বর্ণহীন স্ফটিক। এই স্ফটিকের সঙ্গে একটি জল-অণু সংযুক্ত থাকে। ২৪৮-২৫০° সেন্টিগ্রেড তাপে এটা গলে। শুষ্ক অবস্থায় রাখলে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপেও নষ্ট হয় না। সময়, তাপ, অন্যান্য কতিপয় দ্রব্যের সহ-অবস্থিতি এবং আরও কয়েকটি কারণের উপর এর সহনশীলতা নির্ভর করে। সেজন্য রান্না করবার সময় নুন দেওয়ায় এবং অতিরিক্ত সিদ্ধ করলে খাদ্যপ্রাণ খ১ বা এনিউরিন নষ্ট হয়।

রান্না-না-করা খাদ্যে এই খাদ্যপ্রাণ থাকে। গোটা শস্য, ডাল, দারুকাণ্ড জাতীয় ছত্রাক (yeast) ও বরাহ-মাংসে এই খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। কলে-ছাটা চাল ও ময়দায় তুষ অংশ থাকে না বলে, এদের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ খ১ খুব সামান্য পরিমাণে থাকে। তা ছাড়া সুপারি-জাতীয় ফল, ডিম ও প্রাণীর যকৃতনিঃসৃত রসে এই খাদ্যপ্রাণ প্রচুর থাকে। তবে দারুকাণ্ড জাতীয় ছত্রাকেই এই খাদ্যপ্রাণ সবচেয়ে বেশী থাকে। দুধে এই খাদ্যপ্রাণ কম থাকে।

এনিউরিন শর্করা-জাতীয় খাদ্য হজম করায় সহায়তা করে। প্রাণীর খাদ্যে যদি এনিউরিন কম অথচ শর্করা বেশী থাকে তবে শরীরে স্নায়ুরোগ প্রতিষেধকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বমি, বদহজম, পাকস্থলীর ক্ষত ইত্যাদি রোগের দরুন এনিউরিন গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়। দেহে এনিউরিন বেশী দিন সঞ্চয় করে রাখা যায় না। একজন হৃষ্টপুষ্ট লোকের দেহে প্রায় ২৫ মিলিগ্রাম এনিউরিন থাকে। হৃৎপিণ্ডে, মাথায়, কিডনী ও যকৃতে এনিউরিন সবচেয়ে বেশী থাকে। শরীরের অতিরিক্ত এনিউরিন প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কাউগিল বলেন যে, একজন সুস্থ সবল কর্মঠ লোক যদি দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরি খাদ্য খায়, তবে সে খাদ্যে তার অন্ততঃপক্ষে ০·৯ মিলিগ্রাম এনিউরিন থাকা প্রয়োজন। তবে অনেকে তাঁর এই মতবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না।

এনিউরিনের অভাবে অনেকগুলো কঠিন কঠিন রোগ হয়। বেরিবেরি এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও এনিউরিনের অভাবে হয়ে থাকে। তা ছাড়া হৃৎপিণ্ডের ক্ষত, বমনেচ্ছা, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগও এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে হয়। জরায়ুর ক্যান্সারের প্রতিষেধক হিসেবে অনেকে আগে থেকে এনিউরিন ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। খেলোয়াড় ও শ্রমজীবীদের খাদ্যের সঙ্গে এনিউরিন গ্রহণ করা খুবই সমীচীন।

খাদ্যপ্রাণ খ১ নিয়ে বহু ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য, তবে সুস্থ লোকের দেহে এর ঘাটতি মেটাবার জন্য এই খাদ্যপ্রাণযুক্ত খাদ্য গ্রহণই শ্রেয়স্কর। ঢেঁকি-ছাটা চাল ও জাতাপেষা আটা খেলে এই খাদ্যপ্রাণের অভাব হয় না। তবে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের নির্দ্দেশ নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এনিউরিন খুবই ব্যবহৃত হয়। বেরিবেরির ত ইহা প্রধান ঔষধ। ফয়হস ও ক্রেমার বলেন, গিঁটবাতের বেদনায় এনিউরিন ব্যবহারে বেদনার উপশম হয়। অনেক চিকিৎসক গলগ্রন্থি রোগে এনিউরিন ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স একসঙ্গে ব্যবহার করবার নির্দ্দেশ দেন। বহুমূত্র রোগেও এনিউরিন ব্যবহার করে শর্করা-খাদ্য সহ্য করবার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। গর্ভবতী স্ত্রীলোককে স্বাস্থ্যরক্ষার্থ অনেকে এনিউরিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণের নির্দ্দেশ দেন। অনেক চিকিৎসক রক্তশূন্যতায় ও অন্যান্য ঔষধের সহিত এনিউরিন ব্যবহার করে থাকেন।

রিবোফ্ল্যাবিন: ১৯৩২ সনে ভারবুর্গ এবং ক্রিশ্চিয়ান নিম্ন ছত্রাক থেকে এক প্রকার নতুন হলদে পাচকরস বের করেন। পরে আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর নাম দেন রিবোফ্ল্যাবিন।

ডিম, দুধ, যকৃৎ, কিডনী, মূত্র, ঘাস, মাছের চোখ, বার্লি এবং ছত্রাকে রিবোফ্ল্যাবিন পাওয়া যায়। শাকপাতা যত সবুজ ও টাটকা হবে তত বেশী রিবোফ্ল্যাবিন তাতে পাওয়া যাবে। মাংসে রিবোফ্ল্যাবিন মোটামুটি মন্দ নাই। তবে মাছে এই খাদ্যপ্রাণ কম থাকে।

রিবোফ্ল্যাবিন সূচ্যাকৃতি স্ফটিকরূপে পাওয়া যায়। এর বর্ণ হলুদ ও বাদামীর মাঝামাঝি। এটা জলে কম দ্রাব্য, চর্বিতে মোটেই দ্রাব্য নয়—ক্ষারঘটিত দ্রবাণীতে (alkaline solution) খুব বেশী দ্রাব্য। অম্ল-দ্রবাণীতে (acidic solution) এটা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। আলোকে এই খাদ্যপ্রাণ বেশীক্ষণ টেকে না। সেজন্য কালো কাগজে ঢাকা নলে এই খাদ্যপ্রাণ রাখা হয়। রিবোফ্ল্যাবিন একটি জটিল জৈব পদার্থ (complex organic compound)। এর আণবিক-সজ্জা স্থিরীকৃত হয়েছে।

রিবোফ্ল্যাবিন উত্তাপে স্থায়ী হয়, সেজন্য সাধারণভাবে রান্না করলে, এটা খুব বেশী নষ্ট হয় না। তবে রান্নায় ক্ষার বেশী দিলে নষ্ট হতে পারে। দুধের বোতল অনেকক্ষণ রোদে রাখলে রিবোফ্ল্যাবিন নষ্ট হয়। দুধ পাস্তুরের পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করলে রিবোফ্ল্যাবিন নষ্ট হয় না। কষিয়ে রান্না করলেও মাংসের রিবোফ্ল্যাবিন বেশী নষ্ট হয় না। জীবন্ত ছত্রাক থেকে রিবোফ্ল্যাবিন

পৃথক করা সম্ভব নয়। ছত্রাককে সিদ্ধ করে তারপর তা থেকে রিবোফ্লাবিন সংগ্রহ করা হয়।

রিবোফ্লাবিনের অভাবে অনেক রোগ হয়। অধিক দিন খাদ্যে রিবোফ্লাবিনের অভাব হতে থাকলে চক্ষুরোগ হতে পারে। এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে রক্তাল্পতা রোগ হয় কি না, তা এখনও নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নি। মানুষ যত বেশী প্রোটিন খাদ্য খায়, তার দেহ হতে তত কম রিবোফ্লাবিন নির্গত হয়। দেহে রিবোফ্লাবিনের ক্রিয়া অন্যান্য খাদ্যপ্রাণের উপস্থিতিতে অধিকতর ভাল হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যক্ষ্মারোগীর শরীরে রিবোফ্লাবিন ও নিকোটিনিক এসিডের অভাব থাকে। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ লোকেরই এই খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত কুফল ভুগতে হয়। এর অভাবে ওষ্ঠ, জিবে বা মুখে ঘা হতে পারে।

স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে মানুষের শরীরে দৈনিক কতটা রিবোফ্লাবিন প্রয়োজন তা নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে। বয়স, পরিশ্রমের অনুপাত, খাদ্যগ্রহণক্ষমতা অনুসারে রিবোফ্লাবিনের দৈনিক আবশ্যকতার পরিমাণ বাড়ে কমে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বেলায় দৈনিক খাদ্যে রিবোফ্লাবিন বেশী থাকা দরকার। সাধারণতঃ বয়স ও অবস্থার তারতম্য অনুসারে মানুষের দৈনিক ০'৬ মিলিগ্রাম থেকে ২'১ মিলিগ্রাম পর্য্যন্ত রিবোফ্লাবিন প্রয়োজন হয়।

নিকোটিনিক এসিড: যদিও ১৮৬৭ সনে নিকোটিনিক এসিড প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তথাপি ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত শরীররক্ষায় এর আদৌ কোন আবশ্যকতা আছে কিনা, তা নিয়ে গবেষণা হয় নি। ঐ সনে ভারবুর্গ এবং তাঁর সহকর্ম্মিগণ প্রমাণ করলেন, নিকোটিন-এমাইড কো-ডি-হাইড্রোজেনের সক্রিয় অংশ। সেই সময় কুন এবং ক্যেটার প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মাংসল অংশ থেকে নিকোটিন-এমাইড তৈরি করলেন। তার পর বিজ্ঞানীদের জানবার কৌতূহল হ'ল—যে পদার্থ হৃৎপিণ্ডে পাওয়া গেল শরীর-রক্ষায় তার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। এ নিয়ে গবেষণা করতে করতে ফ্রষ্ট ও এলভেজেম এবং অন্যান্য কতিপয় বিজ্ঞানী দেখলেন, পুষ্টিকার্য্যের সহায়তার জন্য নিকোটিনিক এমাইডের আবশ্যকতা আছে—বিশেষ করে কতিপয় জীবাণুর বেলায় ত এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য।

কুকুরের 'কৃষ্ণ-জিভ' (black tongue) নামক রোগে নিকোটিনিক এসিড ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেল। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে, কুকুরের গায়ে গুটি বের হয়, পেট খারাপ হয় এবং চামড়া ফেটে গিয়ে সারা গায়ে ঘা হয়। মানুষের চামড়া ফেটে যে 'পেলাগ্রা' (Pellagra) নামক রোগ হয়, তাকে কুকুরের কৃষ্ণ-জিভের অনুরূপ রোগ মনে করে বিজ্ঞানীরা এই আশা পোষণ করলেন যে, নিকোটিনিক এসিড মানুষের পক্ষেও কার্য্যকরী হবে। পরে অবশ্য প্রমাণিত হ'ল, কেবল নিকোটিনিক এসিডের অভাবেই পেলাগ্রা হয় না, অন্যান্য খাদ্যপ্রাণের অভাবও এর জন্য দায়ী। পেলাগ্রা প্রতি-রোধে সক্ষম হবে এই আশায় বৈজ্ঞানিকেরা নিকোটিনিক এসিডের নাম দিয়েছিলেন, PP বা Pellagra Preventing factor, অর্থাৎ পেলাগ্রা-প্রতিষেধক। ১৯৪২ সনে আমেরিকার খাদ্য ও পুষ্টি পরিষদ নিকোটিনিক এসিডের নামকরণ করেন নিয়াসিন। সেই অনুসারে নিকোটিনিক এসিড এমাইডের নাম হয় নিয়াসিন এমাইড।

নিকোটিনিক এসিড এক প্রকার সাদা স্ফটিকাকার দ্রব্য। এটা ২২৮-২২৯° সেন্টিগ্রেড তাপে গলে। এই এসিড জল ও সুরাতে দ্রাব্য। সাধারণ রান্নায় এ বেশী নষ্ট হয় না।

সমস্ত জীবন্ত কোষেই নিকোটিনিক এসিড পাওয়া যায়। প্রাণীর যকৃৎ ও কিড্‌নীতে, শরীরের কতিপয় গ্রন্থিতে, ছত্রাক এবং গোটা শস্যে, মাংস ব্যাঙের ছাতা ও কড়াইশুটিতে এই খাদ্যপ্রাণ খুব বেশী থাকে। কলে-ছাটা চাল ও কলে-ভাঙা ময়দায় নিকোটিনিক এসিড নেই বললেই চলে। ফল, শাকসব্জী ও দুধে এই খাদ্যপ্রাণ খুব সামান্য থাকে। মাংসনিঃসৃত রসে নিকোটিনিক এসিড প্রচুর পরিমাণে থাকে। জীবিত কোষে এই খাদ্যপ্রাণ নিকোটিনিক এসিড হিসাবে না থেকে এমাইড রূপে বা পাচকরসের সহিত রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে জটিল দ্রব্য সৃষ্টি করে থাকে। আমেরিকায় পাউ-রুটিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নিকোটিনিক এসিড যোগ করে একে পুষ্টিকর করা হয়। ইংলণ্ডে প্রতি ১০০ গ্রাম পাউরুটিতে ১'৬ মিলিগ্রাম নিকোটিনিক এসিড দেবার রীতি আছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, নিকোটিনিক এসিড শরীরে নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকতে পারে না—দেহে জটিল রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ারি করে। বৈজ্ঞানিকেরা এই জটিল পদার্থের নাম দিয়েছেন, DPN (অর্থাৎ Di-phospho-pyridine nucleotide) এবং TPN (অর্থাৎ Tri-phospho-pyridine nucleotide)। এই দুটি জটিল পদার্থ কো-ডি-হাইড্রোজেনেসের দুটো রূপ।

পেলাগ্রা একটি কঠিন অসুখ। এ রোগে রোগীর চামড়া ফেটে ঘা হয়, তার সঙ্গে বদহজম, পেটের অসুখ ইত্যাদি হয়। রোগী আলো সহ্য করতে পারে না। নিকোটিনিক এসিডের অভাবের সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে এ রোগ হয়।

শর্করাজাতীয় খাদ্য হজমের জন্য যে DPN ও TPN একান্ত প্রয়োজনীয় এ সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ এখন একমত। পেলাগ্রার চিকিৎসায় শুধু নিকোটিনিক এসিডে কাজ না হলেও, নিকোটিনিক এসিড যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর দ্বিমত নাই। কতকগুলো জীবাণুবৃদ্ধির জন্য নিকোটিনিক এসিড প্রয়োজন। এর অভাবে জিভ ফেটে ঘা হতে পারে। বহুমূত্র রোগী খাদ্য সম্বন্ধে নানা বাধানিষেধ মেনে চলতে চলতে শেষ পর্য্যন্ত চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয়। রুডিয়ার্ড ও. হফম্যান বলেন, নিকোটিনিক এসিডের অভাব ঘটায় এরূপ হয়। তাঁরা এরূপ রোগীকে নিকোটিনিক এসিড এমাইড দিয়ে চিকিৎসা করে নাকি ভাল ফল পেয়েছেন। হাঁপানি রোগীর চিকিৎসায় কয়েকজন চিকিৎসক নিকোটিনিক এসিড ব্যবহার করেছিলেন। তবে এ সম্বন্ধে উপকারিতার কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, নিকোটিনিক এসিড হাঁপানি রোগীর

প্রকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। সেজন্তে নিকোটিনিক এসিড ব্যবহার করে বধিরতা কমাবার চেষ্টা করেছিলেন। গলজিহার ও পপকিন প্রায় ১০০টি মারাত্মক মাথাধরা রোগীকে নিকোটিনিক এসিড দিয়ে চিকিৎসা করে ভাল ফল পেয়েছেন বলে দাবি করেন।

খাদ্যপ্রাণ খ৬ : ১৯৩৪ সনে গি-অর্মেগি এই খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। ১৯৩৯ সনে কয়েকজন বিজ্ঞানী এই খাদ্যপ্রাণ পৃথক করেন। সেই বৎসরই এর রাসায়নিক সঙ্কেতও স্থিরীকৃত হয়। এ একটি জটিল জৈব পদার্থ। এর রাসায়নিক সঙ্কেত হচ্ছে ২-মিথাইল—৩-হাইড্রোক্সি—৪ : ৫ ডায়-হাইড্রোক্সি মিথাইল পিরিডিন। ১৯৩৯ সনে আমেরিকায় হ্যারিস এবং ফোকারস পৃথক ভাবে এই পদার্থ তৈয়ারি করেন। সেই বৎসর কোন সাহেবও ইহা আলাদাভাবে তৈরি করেন। পিরিডক্সিন, পিরিডক্সাল এবং পিরিডক্সামিনের 'ধর্ম্ম' একই রূপ বলে এই তিনটিকেই খাদ্যপ্রাণ খ৬ গোষ্ঠীর বলা হয়। ১৯৩৮ সনে কুন এর নামকরণ করেন এডারমিন। পর বৎসর গি-অর্মেগি এবং একহার্ট এর নাম দেন পায়োরিডক্সিন। ১৯৪০ সনে আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এই নাম গ্রহণ করেন।

অনেক খাদ্যেই খাদ্যপ্রাণ খ৬ আছে। উদ্ভিজ্জ-জাতীয় খাদ্যে পিরিডক্সাল ও পিরিডক্সামিনের সঙ্গে পিরিডক্সিনও থাকে। ছত্রাক, যকৃৎ, শস্যের ছাট, শস্য ও ডালে এই খাদ্যপ্রাণ বেশী থাকে। অঙ্কুরিত ছোলা ও শস্যে এই খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শাকসব্জী ও দুধে ইহা যথেষ্ট থাকে।

মুয়েলার এবং ফিলটার খাদ্যপ্রাণ খ৬-শূন্য খাদ্য খাইয়ে আট জন লোকের উপর তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেন। এর ফলে দেখা গেল তাদের চোখ, নাক এবং মুখের চারিদিকে চর্ম্মক্ষত হয়েছে। খাদ্যপ্রাণ খ৬ ব্যবহারে সে রোগ সেরে গেল। অনেকে স্নায়ুরোগে খাদ্যপ্রাণ খ৬-এর উপকারিতার কথা বলে থাকেন।

প্যান্টোথেনিক এসিড : ১৯০১ সনে বিজ্ঞানীরা বায়োস নামে একটি জৈব পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান করেন। পরে জানা যায়, ছত্রাকের বংশবিস্তৃতির জন্ত এর আবশ্যকতা আছে। ১৯৩০ সনে যকৃৎ এবং যকৃৎ-নিঃসৃত রস ব্যবহার করে মুরগী-ছানার পেলাগ্রা রোগ সারানো হয়। ১৯৩৯ সনে উইলিয়ামস প্যান্টোথেনিক এসিড পৃথক রূপে তৈরি করেন। পর বৎসর এর অণু-সজ্জা স্থিরীকৃত হয়। তিনিই এর নামকরন করেন প্যান্টোথেনিক এসিড। তিনি বলেন, এ ছত্রাকের বংশবৃদ্ধির সহায়তা করে। পরে দেখা যায়, যকৃৎ-নিঃসৃত তরল অংশে (filtrate factor) প্যান্টোথেনিক থাকে। এ ব্যবহার করে ইঁদুরের গায়ের পাকা পশম কালো করা যায়।

ছত্রাক, যকৃৎ, কিডনী, আটার ভুষি এবং মটরে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে প্যান্টোথেনিক এসিড থাকে। শস্যে প্রচুর পরিমাণে প্যান্টোথেনিক এসিড থাকলেও কল-ভাঙা আটায় প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ এসিড নষ্ট হয়ে যায়। অঙ্কুরিত শস্যে এই খাদ্যপ্রাণ বেশী থাকে। মাংস রাঁধবার সময় এই খাদ্যপ্রাণের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যায়।

প্যান্টোথেনিক এসিড ব্যবহার করে ইঁদুরের পাকা পশম কালো হয় দেখে অনেক বিজ্ঞানী আশা করেন, হয়ত মানুষের পাকা চুল কালো করতেও এ উপযোগী হবে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা বিফলমনোরথ হন।

বায়োটিন : ইঁদুরকে ডিমের শ্বেতাংশ ক্রমাগত বহুদিন খেতে দিলে তার উপর একটি বিষময় ক্রিয়া (toxic effect) লক্ষিত হয়। এর প্রতিকারের জন্ত ছত্রাক, যকৃৎ ইত্যাদি থেকে একপ্রকার নূতন খাদ্যপ্রাণ তৈয়ারি করে ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করা হ'ল। তাতে এই বিষময় ক্রিয়ার হাত থেকে ইঁদুর নিষ্কৃতি লাভ করল। এর পর ছত্রাকের 'বায়োস' নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। কোয়েগল এবং টয়েনিস ডিমের কুসুম থেকে বায়োটিন স্ফটিকাকারে পৃথক করেন। তাঁরা এক-চতুর্থাংশ টন কুসুম থেকে মাত্র ১ মিলিগ্রাম বায়োটিন তৈরি করেন। বিজ্ঞানীরা আরও গবেষণা করে দেখলেন যে, যবক্ষারজানসংগ্রাহক-জীবাণুর (nitrogen fixing bacteria) বংশবৃদ্ধির জন্ত কো-এনজাইম-আর (C -enzyme R) নামে যে খাদ্যপ্রাণ দরকার হয় তাও বায়োটিন। যকৃৎ থেকেও বায়োটিন তৈরি করা হয়। ১৯৪৩-এ হ্যারিস ও তাঁর সহকর্মীরা মার্ক লেবরেটরিতে বায়োটিন তৈরি করেন। কয়েগল বলেন, বায়োটিন দু'প্রকার—Biotin D এবং Biotin B।

বায়োটিন জল ও সুরাতে দ্রাব্য, কিন্তু চর্বিতে ও তৈলে অপেক্ষাকৃত কম দ্রাব্য। এর স্ফটিক সরু সরু সূচের মত।

ছত্রাক, যকৃৎ, কিডনী, মুরগীর মাংস, ডিম, মটর, কোকো এবং শস্যে বায়োটিন পাওয়া যায়। অঙ্কুরিত শস্যে বায়োটিন বেশী থাকে। রান্না করায় বায়োটিনের শতকরা ২৩ ভাগ নষ্ট হতে পারে।

বহুদিন ধরে খাদ্যে বায়োটিনের অভাব ঘটতে থাকলে চর্ম্মক্ষত হতে পারে। তবে বায়োটিনের অভাব মানুষের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর হয়, সে সম্বন্ধে এখনও মতানৈক্য আছে।

ফলিক এসিড : মিচেল, স্নেল এবং উইলিয়ামস পরীক্ষা করে পালং শাকে এক প্রকার অম্লজ পদার্থ আবিষ্কার করেন। তাঁরা এর নাম দিলেন ফলিক এসিড। জীবকোষের পুষ্টির জন্তে এই অম্ল আবশ্যক। স্টল্যাণ্ড সাহেব যকৃৎ থেকে এই অম্ল তৈয়ারি করেন। ১৯৪৪ সনে মিচেল, স্নেল এবং উইলিয়ামস পালং শাক থেকে ঘনীভূত ফলিক এসিড (folic acid of high concentration) উদ্ধার করেন। আবার কয়েকজন বিজ্ঞানী স্ফটিকাকারে ফলিক এসিড তৈরি করেন। ১৯৪৫-এ আমেরিকার লেডারলে লেবরেটরিতে বাণিজ্যিক চাহিদা অনুযায়ী ফলিক এসিড প্রস্তুত করবার জন্ত অনেক গবেষণা হয়। এই লেবরেটরি শেষ পর্য্যন্ত বেশী করে ফলিক এসিড তৈয়ারি করতে সক্ষম হয়।

ফলিক এসিড একটি জটিল রাসায়নিক জৈব পদার্থ। কাঁচা

গাঢ় সবুজ বর্ণের শাক এবং যকৃতের মধ্যে ফলিক এসিড সবচেয়ে বেশী থাকে। পালং শাকেই সবচেয়ে বেশী ফলিক এসিড থাকে। গমে মাঝারি পরিমাণ ফলিক এসিড থাকে। শাকসব্জীর মূল, টম্যাটো, শশা, ঈষৎ সবুজ শাক, কলা, শূকরের মাংস, ভেড়ার মাংস, পনির, দুধ, শস্য এবং চালে ফলিক এসিড বেশী থাকে না।

রান্না করায় ফলিক এসিড বেশী নষ্ট হয়। সাধারণ তাপে ফলিক এসিড বেশীক্ষণ রাখলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডায় রাখলে এ বেশী নষ্ট হয় না। গাউউড বলেন, রান্নার দরুন ০·৬ মিলিগ্রাম ফলিক এসিড কমে গিয়ে ০·১৬ মিলিগ্রামে দাঁড়ায়।

ফলিক এসিড শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক হলেও অনেক সময় এর অতিরিক্ত ক্রিয়া বন্ধ করবারও আবশ্যকতা হয়ে থাকে। সেজন্য ফলিক এসিডের কতকগুলো শত্রুও নির্দ্ধারিত হয়েছে। ফলিক এসিড জীবকোষে বিভাজন-ক্রিয়া ঘটায়। সেজন্যে ক্যান্সার ও লিউকেমিয়াতে ফলিক এসিডের শত্রু-গোষ্ঠী ব্যবহৃত হয়।

ফলিক এসিড আবিষ্কারের পর, অনেকে রক্তাল্পতা রোগে এর ব্যাপক ব্যবহার সুরু করলেন। প্রথম প্রথম সকলেরই মনে হয়েছিল, মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগে (Pernicious anaemia) ফলিক এসিড খুব কার্য্যকরী হবে। কিন্তু শীঘ্রই সে ধারণা দূর হয়। দেখা গেল, প্রথম প্রথম ফলিক এসিড ব্যবহার করে রোগের খানিকটা উপশম হলেও রোগ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। আজকাল মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগে ফলিক এসিড ব্যবহার করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয় না। আবার লৌহঘটিত পদার্থের অভাবে বা লিউ-কেমিয়া রোগজনিত যে রক্তাল্পতা হয়, তাতেও ফলিক এসিড বিশেষ কার্য্যকরী নয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের রক্তাল্পতায় ফলিক এসিড ব্যবহার করে অনেকে ভাল ফল পেয়েছেন বলে দাবি করেন। রক্তাল্পতা হলে চিকিৎসকেরাই নির্দ্ধারণ করবেন ফলিক এসিড বা খাদ্যপ্রাণ খ১২.কোনটি কার্য্যকরী হবে।

খাদ্যপ্রাণ খ১২ : ১৯২৬ সনে মিনো ও মারফি মারাত্মক রক্তাল্পতায় যকৃৎ ব্যবহার করে সুফললাভ করেন। কিন্তু যকৃতের যে পদার্থের জন্য এই রক্তাল্পতা দূর হয় তা পৃথকভাবে তৈয়ারি করবার জন্য গবেষণা চলতে থাকে। ১৯৪৮ সনে আমেরিকার রিকেস ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ এবং ইংলণ্ডের লিসটার স্মিথ পৃথকভাবে গবেষণা করে যকৃৎ থেকে খাদ্যপ্রাণ খ১২ তৈয়ারি করলেন। ওয়েষ্ট ও উঙ্গলে পরীক্ষা করে দেখলেন, খাদ্যপ্রাণ খ১২ মারাত্মক রক্তাল্পতার পুনরাক্রমণ প্রতিরোধ ত করেই, তা ছাড়া রক্তাল্পতা-সহ গ্রন্থির ক্ষয় নিবারণেও ইহা সবিশেষ কার্য্যকরী। প্রথম অবস্থায় যকৃৎ থেকে এই খাদ্যপ্রাণ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পরে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রস্তুতিকালে যে পরিত্যক্ত দ্রব্য পাওয়া যায়, তা থেকে বাণিজ্যিক চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ খ১২ তৈয়ারি করবার উপায় আবিষ্কৃত হয়।

খাদ্যপ্রাণ খ১২ গাঢ় লাল ক্ষুদ্র সূচ্যাকৃতি স্ফটিক। একটি অণুর *সঙ্গে কোবল্ট ধাতু জটিল যৌগিক দ্রব্য তৈয়ারি করে থাকে। এর সায়ানাইড গোষ্ঠীও কোবল্টের সহিত জটিল অবস্থায় থাকে।*

খাদ্যপ্রাণ খ১২—যকৃৎ কিডনী এবং ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াসের পুষ্টিকর মাধ্যমে বেশী পাওয়া যায়। মাংস, দুধ, পনির, ডিম এবং মাছেও খাদ্যপ্রাণ খ১২ থাকে। শস্য ও ছত্রাকে খাদ্যপ্রাণ খ১২ বেশী থাকে না। প্রাণীর বিষ্ঠা ও পেশীতেও এই খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। খাদ্যপ্রাণ খ১২ মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগ সারায়। আমিষ-জাতীয় উপাদান হজম করাবার জন্যও এই খাদ্যপ্রাণের আবশ্যকতা আছে। অনেক চিকিৎসক স্প্রু রোগে এই খাদ্যপ্রাণ ব্যবহার করে ভাল ফল পেয়েছেন। শিশুদের বৃদ্ধির সময় খাদ্যপ্রাণ খ১২ খুবই আবশ্যক।

ফলিনিক এসিড : ১৯৪৮-এ সবারলিক ও বউম্যান বলেন, যকৃৎ ও যকৃৎ-নিঃসৃত রস এবং অন্যান্য যে সব খাদ্য মারাত্মক রক্তাল্পতা প্রতিকারে কার্য্যকরী, তার মধ্যে লিউকোনষ্টক সাইট্রোভোরাম নামে জীবাণুর বৃদ্ধির সহায়ক এক প্রকার উপাদান আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এটি ফলিক এসিড বা খাদ্যপ্রাণ খ১২-এর কোনটিই নয়। তাঁরা অনেক চেষ্টা করে ঘনীভূত আকারে এই উপাদান পৃথক করেন। পরে অবিশোধিত যকৃৎ-রস থেকেও এই উপাদান তৈয়ারি করা হয়। গঠন ও গুণে ফলিক এসিডের সঙ্গে এই উপাদানের খানিকটা মিল আছে বলে এর নাম দেওয়া হয় ফলিনিক এসিড। মানব-শরীরে এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলছে।

ইনোসিটল : ১৯৪০ সনে উলি সাহেব পরীক্ষা করে বলেন, ইনোসিটল ব্যবহার করে ইঁদুরের লোম বৃদ্ধি হয়। প্রায় সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদের মাংসতন্তুতে, ফলে ও শস্যে ইনোসিটল থাকে। মানব-শরীরে ইনোসিটলের আবশ্যকতা কি, তা এখনও গবেষণাধীন। খাদ্যপ্রাণ খ-এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য উপাদানের মত পাচক-রসে এই খাদ্যপ্রাণ দৃষ্ট হয় না, তবে প্রাণীর মাংসতন্তুতেই (Tissue) এ থাকে।

কোলিন : 'কোলিন'-কে খাদ্যপ্রাণ খ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করায় মতভেদ আছে। কোলিন পুষ্টির সহায়ক—মাংসতন্তু গঠনে সাহায্য করে। এর অভাবে শরীর অসুস্থ হয়। এসপারগাস, যব, রুটি, মাখন, বাঁধাকপি, গাঁজর, পনির, ডিম, কিডনী ও যকৃতে কোলিন পাওয়া যায়। বেষ্ট বলেন, কোলিনযুক্ত খাদ্য খাইয়ে ইঁদুরের যকৃতের অতিরিক্ত চর্বি কমানো যায়। সেজন্য কোলিনকে লিপোট্রোপিক ফ্যাক্টর বলে। কোলিনের অভাবে ইঁদুরের রক্তের উচ্চ চাপও প্রশমিত হয়। মানুষের যকৃতের পীড়ায় কোলিন ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

প্যারা এমিনো বেনজয়িক এসিড : প্যারা এমিনো বেনজয়িক এসিডকে সংক্ষেপে পাবা (PABA) বলে। পাবা ফলিক এসিডের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের পুষ্টির জন্যে এটি অত্যাবশ্যক। তবে পুষ্টিসাধনে এর সঠিক ক্রিয়া এখনও গবেষণার বিষয়। অনেকে

পাবাকে খাদ্যপ্রাণের প্রাণকেন্দ্র বলে থাকেন। ১৮৬৩ সনে কিশার প্রথমে পাবা আবিষ্কার করেন। ১৯৪০ সনে একে খাদ্যপ্রাণ 'খ'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যে যে দ্রব্যে ফলিক এসিড পাওয়া যায়, পাবাও তাতে আছে। কেননা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, পাবা ফলিক এসিডের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাবা প্রখর সূর্য্যালোক থেকে চামড়াকে রক্ষা করে। সেজন্যে অনেকে পাবার প্রলেপ গায়ে মেখে রোদে বের হবার উপদেশ দিয়ে থাকেন। কয়েকটি চর্ম্মরোগ নাকি পাবা ব্যবহারে আরোগ্য হয়েছে। কয়েকজন চিকিৎসক লিউকেমিয়া রোগে পাবা ব্যবহার করে দেখেছেন। রকি মাউণ্টেন এবং স্পটেড ফিভার নামক অসুখে পাবা ব্যবহার করে কতিপয় চিকিৎসক নাকি সুফল লাভ করেছেন।

খাদ্যপ্রাণ খ১৩ ও খাদ্যপ্রাণ খ১৪ : এই দুটি খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে এখনও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নি। ১৯৪৮ সনে নোভাক ও হেগে ভাটিখানার শুষ্ক দ্রাব্য পদার্থ থেকে (Dried solubles of distillery) সর্ব্বপ্রথম খাদ্যপ্রাণ খ১৩ তৈয়ারি করা হয়। ইঁদুরের উপর এই খাদ্যপ্রাণ ব্যবহার করে দেখা যায়, ইহা ইঁদুরের বৃদ্ধির সহায়তা করে।

খাদ্যপ্রাণ খ১৪ মূত্র থেকে পাওয়া যায়। ইহা স্ফটিকাকার। ইহা অস্থি-মজ্জার নূতন কোষের পুষ্টিতে সাহায্য করে।

পূর্ব্বে মানুষ টাটকা ফলমূল, শাকসব্জী, দুধ ও মাছ-মাংস প্রচুর পরিমাণে খেত। গরীব লোকেরা কষ্টেসৃষ্টে অন্ততঃ কিছু ঢেঁকি-ছাটা লাল মোটা চাল ও টাটকা শাকসব্জি যোগাড় করে নিত। সেজন্যে তখন মানুষের আহার্য্যে খাদ্যপ্রাণের অভাব খুব কমই হ'ত। তাই রোগও বেশী হ'ত না। আধুনিককালে কলে-ছাটা চাল, কলে-ভাঙা ময়দা, ভেজাল তেল-ঘি ও দালদা, বহুদিনের সংরক্ষিত ফলমূল, শাকসব্জী ও মাছ-মাংস আমরা দৈনন্দিন খাদ্যরূপে গ্রহণ করে থাকি। এসব খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ খুব কম থাকে। কাজেই এখন দিনের পর দিন মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতিই হচ্ছে।

বাসন্তিকা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার বসন্ত-স্বপ্ন আমারে বিবশ করে রাণী।
হৃদয়ের এই কানাকানি
সে ত নহে কভু ভুলিবার,
যে বিচিত্র তুলিকার
সন্ধান দিয়াছ তুমি, যে বর্ণাঢ্য চিত্রশালা,
প্রণয়ের পরিচ্ছন্ন যত বর্ণমালা
তব দেহ দেহলীতে বাঁধিয়াছে বাসা
কিছু তার দেখে নিই এই শুধু আশা।
অন্য ঋতু আসে ফাঁকা ফাঁকা।
তখন তুমি ত থাক কুহেলিতে ঢাকা।
শুধু বসন্তের দিনে তনু তীরে তীরে
উড়ে যায় আবরণ উদাসী সমীরে।
রক্তাভ আপেলকুঞ্জে জাগে উন্মাদনা।
চেনারের ছায়ে ছায়ে উদ্বেল কামনা।
পামীরের পথে পথে নেচে উঠে মন।
তোমার আপন
সে-দিন ছড়ায়ে পড়ে গিরি নদী যত।
তনুর পরশ লাগি অতনু উদ্যত।
মনের গুহায় ছিল সে সাধ লুকানো
চোখে মুখে তুমি তার প্রতিচ্ছবি আনো।
রজনীগন্ধার বুকে সে কাঁপন জাগে,
শঙ্খমালা মেঘে মেঘে যে আলোক লাগে,
দিয়ে যায় ওরা যেন কিসের ইশারা।
উপোসী মনের মূলে তীব্রতম নাড়া।
হয়ে যায় কোনখনে অনুরাগ লিখা
ওগো বাসন্তিকা।
তাই ও বসন্ত দিনে তোমাকেই জানি।
রাণী, ওগো রাণী।

মেহনতী মেয়ে

শ্রীঅবনীদেব মুখোপাধ্যায়

আবলুস কালো গায়ের রং। স্বাস্থ্য ও যৌবন-প্রাচুর্য্যে নিরেট, যেন পাথরে খোদাই-করা।

সুর করে টুসুর ছড়া বলে—

কালো দেখে নামলাম জলে জল হ'ল গো একগলা।
হে প্রাণনাথ ছেঁকে তোল রং দেখিবার নয় বেলা॥

কালো মাঝি আরও কাছে আসে। মিলনী ছুটে পালায়।

ছুটে-যাওয়া মিলনীর দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে কালো। মিলিয়ে-আসা সুরের শেষ টানটা যেন তখনও কালোর কানে বাজে।

মনিব অক্ষয় সামন্ত আসে থামারে,

—তোর মেঝেন কোথায় গেল রে মাঝি?

—উ আমার মেঝেন লয়।—কালো নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়।

—না হোক, পাটা কামাই করে সে গেল কোথায়?—অক্ষয় জিজ্ঞাসা করে।

—হেঁও গেইছে—আঙুল বাড়ায় কালো।

—হেঁও গেইছে কিরে? ধানঝাড়ার কাজ!—অক্ষয়ের কণ্ঠস্বরে অসন্তুষ্টি-মাখানো বিস্ময়।

একগাছা ঝাঁটা হাতে মিলনী ফিরে আসে।

অক্ষয় কৈফিয়ত চায়,—কোথায় গেসলি মেঝেন?

—তুদের ঘরকে, ঝাঁটা লিয়ে এলাম।—নিঃসঙ্কোচে উত্তর দেয় মিলনী ধানের রাশের ওপর অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে ঝাঁটা বুলায়। ঝাটা বুলানো শেষ হলে কালো ও মিলনী দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়ায়, আবার ধান ঝাড়তে সুরু করে।

ধানঝাড়ার একটানা শব্দ ওঠে, ঝুপ ঝাপ, ঝুপ ঝাপ।

ধানকাটার দিন। কাজে এসেছে একদল আদিবাসী। কয়েক পুরুষ আগেই মানভূমের বাংলাভাষীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে আদিবাসীদের এমনই একটা দল। এখন এরা নিজেদের মধ্যেও বাংলায় কথা বলে, ছেলেমেয়েদের বাংলায় নাম রাখে। নিজেদের বলে এরা দেশালী মাঝি।

ভিন্‌দেশের মেহনতী মানুষ ধানকাটার কাজে এসেছে বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে। দলের সর্দ্দার মনিবদের কাজে মাঝি ও মেঝেনদের ভাগ করে দিয়েছে। অক্ষয়ের ভাগে পড়েছে মিলনী ও কালো।

সন্ধ্যার একটু আগে এরা কাজ ছাড়ল।

অক্ষয়ের বাড়ীর ভেতরে যায় ওরা, খোরাকি চাল-ডাল নেয়, নিজেদের ডেরার দিকে চলতে থাকে।

পৌষের গোধুলি। বিদায়ী দিনমণি কয়েক কালি লাল আলোর ব্যথাতুর দৃষ্টি দিয়ে গোধূলির ধূলি-ধূসরিত ধরিত্রীর দিকে তাকায়। ধুলোয় আলোয় মিশে কেমন একটা মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করে।

মাথার উপর আকাশে উড়ে চলেছে বাসায়-ফেরা পাখীর ঝাঁক একটার পর একটা, দূরে মাঝিদের আড্ডায় ধোঁয়া উড়ে।

শীতের ঘন বাতাসের চাপে ধোঁয়া লতিয়ে চলে, মাঝিদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলোর মাথায় মাথায় যেন একটা নীল আস্তরণ বিছায়।

মাঝে মাঝে মাঝিপাড়ায় দুই একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়, —ঘেউ, উ-উ-উ, ঘেউ, উ-উ-উ।

কালো জিজ্ঞাসা করে,—মোটকু মাঝি তুকে কেনে ছাড়লেক মিলন?

—উ থাকলো নাই, বললেক আমার গাঁ'কে চ'।—মিলনী উত্তর দেয়।

—তু' গেলি নাই ক্যানে? আবার প্রশ্ন করে কালো।

—বুঢ়া বাপটোকে ছেড়্যা ক্যামনে যাই!—মিলনী একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মাঝিপাড়া থেকে ভেসে আসে সাওতালী সারেঙের একটা এক-টানা উদাস সুর।

কালো সেই সুরে সুর দেয়, নিজের মনেই গুন্ গুন্ করতে থাকে।

ভদ্রপল্লী থেকে খানিকটা দূরে মাঝিপাড়া। একটা মজা দীঘির পাড়—লম্বা-চওড়ায় অনেকখানি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এমনি ধান-কাটার কাজে মানভূম থেকে এসেছিল এদেরই কয়েকজন। নাবাল দেশের উর্ব্বরা মাটির টানে তারা আটকে গেল। আর দেশে ফেরে নি, পুকুরের পাড়ে এই মাঝিপাড়াটি গড়েছে।

শুকনো খটখটে ছোট ছোট কুঁড়েঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—কোথাও এতটুকু নোংরামি নেই। দেয়ালের বাইরের পিঠগুলোয় রাঙা মাটির প্রলেপ দিয়ে নানান রকমের নক্সা তোলা। কোনটায় সার দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের ঢেউ, কোনটায় বন্য জানোয়ারের ছবি, কোন কোনটায় বিভিন্ন ফুল-ফলের গাছ,—যেন জীবন্ত। বেশ শিল্প-কুশলতার পরিচয় মেলে।

এক মাঝির একটা বাঁশের চালায় নবাগত মাঝিরা বাসা নিয়েছে। এরা সারাদিন মাঠে কাজ করে, সন্ধ্যায় ফেরে, বাসায় রাঁধাবাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় তৎপর হয়। সকলের খাওয়া শেষ হলে মেয়ে ও পুরুষেরা দু'জায়গায় দুটো পৃথক আগুন জ্বালায়, অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বৃত্তাকারে বসে,শীত নিবারণের আড্ডা জমায়।

পুরুষদের আড্ডায় বাজে বাঁশের বাঁশী, সাঁওতালী সারেঙ। মেয়েরা একসুরে টুসুর গান গায়।

কালো ও মিলনী মাঝিপাড়ায় ঢুকল। পথে সর্দ্দারের শালী ছুবির সঙ্গে মিলনীর দেখা হয়। ছুবির মাথায় একটা জলভরা কলস, পুকুরে জল নিতে এসেছিল।

মিলনী আটকে গেল। কালো বাসায় চলে যায়।

—আজ এত রাত লাগালি কেনে মিলন?—ছুবি জিজ্ঞাসা করে।

—রাত কুথা লাগালম, খেয়াল দেখছিস নিকিন?—মিলনী বিস্ময়ের স্বরে বলল।

—খেয়াল আমি দেখলম না তু দেখলি—ছুবি হাসে—

মিলনী কিছু বলে না।

—আজ কালো মাঝি কেমন খাটলেক? ছুবি জিজ্ঞাসা করে।

—ভালই। মিলনী ছোট্ট উত্তর দেয়।

—মনে ধরে তুর?—আবার প্রশ্ন করে ছুবি, হাসে।

মিলনী মৃদু হাসে, ছুবির গায়ে একটা চিমটি কাটে।

ছুবি মাথার কলসে একটা সাবধানী হাত দেয়।

—কালোরও ত মাগ নাই।

মিলনী হাসে,—তু' উয়ার একটো মাগ জোটাই দে কেনে।

—আমাকে জোটাতে হবেক নাই, কতজনা জুটবেক।

দু'জনেই হাসে।

বাসায় আসে ওরা। সর্দ্দারের স্ত্রী কুলদা বাসায় রান্না করে। ছুবি ও মিলনী কুলদাকে রান্নার কাজে সাহায্য করতে যায়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। প্রতিদিনের মত আজও অগ্নিকুণ্ডের ধারে আড্ডা বসে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা ক্রমশঃই ফাঁকা হয়ে আসে। মাঝি ও মেঝেনরা একে একে নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

মিলনী ও ছুবি তখনও টুসুর গান গায়—

পুরুল্যার ও মিহি চাদর উড়ে গেলে ধরব না।
যার সঙ্গে বিচ্ছ্যাদের কথা প্রাণ গেলে যা কাড়ব না।
মাথা ঘসে বইলাম বসে আর আমাদের ক্যা আছে।
বঁধু গেছে দূর দেশে গো প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
আর পুরুল্যা যায় পুরুল্যা পুরুল্যায় তোর ক্যা আছে।
পুরুল্যার সেই বাংলা ঘরে পান খিলি গোঁজা আছে।
বারে বারে বারণ করি অমন করে ডেক না।
একে আমার ভাঙ্গা লসিব কলঙ্ক ঘটাইও না।
বঁধু দিলেক একটি মিঠাই ভেঙ্গে হ'ল এক কাঁসা।
এ মিঠাই কি খাবার বটে ভালবাসার মন রাখা।

শীতের রাত। প্রকৃতির কেমন যেন একটা আড়ষ্ট আচ্ছন্ন ভাব। এই আচ্ছন্ন ভাবটাকে কাটিয়ে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ স্বর পার্শ্ববর্তী প্রান্তরে কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনিত হয়—যেন আরও একটা নূতন সুরস্রোতের সৃষ্টি করে। নির্ব্বাক প্রান্তরও বুঝি এদের মর্ম্মবেদনায় বিরহের রাত-জাগানিয়া গান গায়।

চুপচাপ শুয়েছিল কালো, ঘুমায় নি—আড়মোড়া ভাঙে, একটু শুকনো কাসে।

ছুবি মিলনীর গায়ে ধাক্কা দেয়, আরও সুর দিয়ে গায়—

টুসুকে তু' নিতে এলি কি বলে,
বাসক ফুলের মালা দিব তোর গলে।
ধিক জীবন কচি কদম, তু'লে গলায় দড়ি,
টুসু আমার ইলশে মাছের কুলপরী।

কুলদা উঠে এল—তুরা সারারাত টুসু গাইবি লিকিন?

ছুবি বিদ্রূপের স্বরে বলল, তুর কি ত্যাল-বাতি পুড়ছেক, সর্দ্দারকে ছেড়্যা তু' কেনে উঠে আলি?

কুলদা ঝাঁঝালো গলায় বলে, ত্যাল-বাতি পুড়ে বৈ কি, রাত জেগে সারা রাত টুসুর গান গাইবি, তা মনিবের খামারে সারাদিন কাজ করবি ক্যামনে?

—আমাদের ভাবনা তুর নাই। শু'গা তু', সর্দ্দারকে ভাল কর‍্যা জড়াই ধরবি, জাড় লাগবেক নাই।—ছুবি হাসে।

কুলদা কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করে—মরণ নাই তুর।

ছুবি বলে, মরণ থাকলে কি এই জাড়ে মরদ ছেড়্যা তুদের সাথে মরতে আসি!

—মরদ ছেড়্যা আলি কেনে?—প্রশ্ন করে কুলদা।

—তুদের টানে টানে এলম।—ছুবি উত্তর দেয়।

এর পর কণ্ঠস্বরে একটু মিনতি মাখিয়ে কুলদা বলে, শু'গা ছুবি, কত রাত হইছে। ম্যাঘের তারাগুলো কত কট কট কর‍্যা চাইছেক দেখ।

ছুবি তার দিদির কথা আর উপেক্ষা করতে পারে না, উঠে দাঁড়ায়, মিলনীর সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে পড়ে, দু'জনে একখানা খেজুর চাটাই গায়ে ঢাকা দেয়।

পরের দিন। কালো ও মিলনী অক্ষয়ের কাজে এল। আজকের কাজ খামারে নয়, ক্ষেতে। আজ তারা কাটা ধানগাছের আঁটি বাঁধে।

কালো বলে,—কাল সারারাত তুরা কত টুসুর গান গাইলি, আমার ঘুম তখনও পুরা ধরে নাই। কুলদা তু'দিকে উঠাই দিলেক।

মিলনী লজ্জিত হয়, মৃদু হাসে, কিছু বলে না, কাজ করে।

কিছুক্ষণ পর কালো কাজ বন্ধ করে, একফালি শালপাতার ভেতরে কিছু তামাকপাতা দিয়ে বিড়ির আকারে পাকায়, চুটি বানায়।

মিলনীর দিকে তাকাল কালো—তুর জন্তে একটা চুটি পাকাব লিকিন?

—থাম এখন, খানিক কাজ করি—মিলনী বলে।

কালো চুটিতে আগুন দেয়, টানতে থাকে। নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে। ধোঁয়ার দিকে কালো তাকায়, তু' কাল ছুটে পালালি যে বড়!

মিলনী কিছু বলে না।

কালো আবার বলে, যা কাঙ্ছিস নাই যে !

এবারে মিলনী বলে, এখন কেনে তু গায়ে হাত দিবি ?

—তুকে যদি আমি সাঙা করি ?

—যখন করবি তখন—মিলনী মুখ ফিরিয়ে নেয় ।

কালো চুটি-মুখে আধখানা করে বলে, করব বই কি, করব নাই ত কি অমনি বলছি ।

দূরে দিকচক্ররেখা কুয়াশার আধিক্যে ধোঁয়া ধোঁয়া মত দেখায় ।

মিলনী সেই দিকে তাকায়—সাঙা করিস ত বুঝে-সুঝে করবি, মোটকুর মতন দাগাবাজি করিস না । বুড়া বাপকে ছেড়্যা আমি কুথাও থাকব নাই ।

কালো এ কথার কোন উত্তর দেয় না, কাজ করে ।

অক্ষয়ের মুনিব গদাই বাগ্দী মাঠে গরুর গাড়ী নিয়ে এল—এঃ মেঝেন, এরই মধ্যে অনেক ধান আঁটি বেঁধে ফেলেছিস !

—না ত তুদের মতন ফাঁকি দিব লিকিন ?—মিলনী হাসে ।

গদাইও একটু হাসল—বুড়ো হয়ে গেইছি মেঝেন নইলে তোদের বয়েসে পাহাড় উল্টিয়ে দিইছি ।

মিলনী বলে, হুঁ হুঁ বকিস না, তুদের ই জাতের কিরষেণ কেউ পাহাড় উল্টাতে লারবেক ।

গদাই এ কথার প্রতিবাদ করে না, হাসে । নিটোলদেহা কর্ম্মঠ এই জংলী মেয়েটির দিকে সমীহের চোখে তাকায় ।

যত স্বাস্থ্য তত যৌবন-লাবণ্য, কেমন একটা বেপরোয়া স্বচ্ছন্দ ভাব ।

গদাই বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ।

—তাঁকাই তাঁকাই কি দেখছিস তু ?—মিলনী হাসে ।

গদাই বেশ একটু অপ্রতিভ হয়—তোকে দেখার আর বয়েস নাই মেঝেন, নইলে দেখার মত মেয়ে তু বটিস ।

মিলনী লজ্জায় আড়ষ্ট হয়, কিছু বলে না ।

কালো বিরক্ত হয়—উ সব রং রাখ বুড়া, তাড়াতাড়ি গাড়ীটো বোঝ কর‍্যা লে ।

চমক ভাঙ্গে গদাইয়ের, গাড়ী থেকে ধান বোঝাই করার দড়ি এবং বাঁশ নামায় ।

ধান বোঝাই করা গাড়ী নিয়ে গদাই চলে গেল ।

ক্রমশঃ রোদ বাড়ে, আঁটি বাঁধার কাজ আর চলে না । মিলনী ও কালো খামারের দিকে চলল ।

মিলনী বলে, তুদের গাঁকে আমি কখনও যাই নাই । আমাদের গাঁ থেকে কতটা দূর হবেক ?

—আকটু দূর হবেক, খুব বেশী লয়—কালো উত্তর দেয় !

—তুর শ্বশুরঘর কুথা ছিল ?—মিলনী প্রশ্ন করে ।

—গাঁয়েই ছিল ।—উত্তর দেয় কালো ।

—তুর মেঝেন মলো ক্যামনে ?

—তিন দিনের জ্বরে মর‍্যা গেঁলো । ভাল ভাল রোজা দেখলেক, কিছু করতে লারলেক । উকে দয়ে ধরলেক জরের রোজা, আর ছাড়ালেক নাই ।

মিলনী ব্যথিত হয়, কিছু বলে না ।

কালো আবার বলে, ত্যালপাতা কর‍্যা রোজা দেখলেক, জরের রোজার খুব গোঁসা উর উপর ।

—এত গোঁসা কেনে করলেক ?—মিলনী কৌতূহল-মিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে ।

একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলল কালো—কখন কুন গোঁসা হয়, বাও বাতাসের কাজ !

মিলনী আর কিছু বলে না ।···

কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা খামারে আসে, ধান ঝাড়তে সুরু করে ।

খানিকটা কাজ কিছুটা বিরাম—এই ভাবে সারাদিন কাজ চলল ।

কাজ ছাড়ার একটু আগে কালো জিজ্ঞাসা করে—তুর বাপকে দেখার আর কেউ নাই লয় ?

—ক্যা আর থাকবেক, মা নাই, ভাই বুন আর কেউ নাই আমার ।

—মিলনী হতাশার স্বরে বলে ।

কালো আর কিছু বলে না ।

মিলনী বলে, আমি খেট্যা আমার বাপকে খাওয়াতোম ; মোটকুর কামাই আমার বাপকে খেত্যা লাগতোক নাই ।

এবারেও কালো কোন মন্তব্য করে না, চুপ-চাপ কাজ করে ।

সন্ধ্যার একটু আগে দু'জনে কাজ ছাড়ে, অক্ষয়ের বাড়ীর ভেতরে আসে ।

অক্ষয়ের স্ত্রী জয়ন্তী চাল-ডাল এনে দেয়—তোরা আলাদা আলাদা চাল-ডাল কেন নিস মেঝেন, তোর মাঝির চাল-ডাল তোর সঙ্গেই ত নিতে পারিস ?

মিলনী ম্লান হাসে—উ আমার মাঝি লয় ।

—তোর মাঝি লয় ?—গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে জয়ন্তী ।

মিলনী আর কিছু বলে না, মাঝিপাড়ার দিকে পা বাড়ায় ।

কালোও মিলনীর সঙ্গে চলে ।

আজ মাঝিপাড়া থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেসে আসে বাঁশের বাঁশী এবং মাদলের শব্দ ।

—আজ এত মাদল কেনে বজেছেক মিলন ?—জিজ্ঞাসা করে কালো ।

—পচা মাঝির বেটিকে আজ দেখতে আসবেক ।—মিলনী উত্তর দেয় ।

মাঝিপাড়া উৎসবমুখর, পচা মাঝির উঠানে আজ বহু মাঝি ও মেঝেনের ভিড় । একটা পুরুষদের ও একটা মেয়েদের—দু'দিকে দুটো পচুই মদের আড্ডা বসেছে । পুরুষদের আড্ডায় মাদলিয়া মাদল বাজায়—ধা ধিন্ ধিন্, ধা ধিন্ ধিন্ । তার সঙ্গে বাজে বাঁশের বাঁশী ও সাঁওতালী সারেঙ ।

মেয়েরা একসুরে গান গায়—

তোর নাকি লো গাঁয়ে শ্বশুরঘর।
তোদের একটি কথায় জল উপর।
তোর নাকি লো গাঁয়ে শ্বশুরঘর।

পচাইয়ের নিমন্ত্রণে নবাগত মাঝি এবং মেঝেনরাও মদের আড্ডায় বসল। কালো পুরুষদের আড্ডায় যায়। মিলনী মেয়েদের আড্ডায় ছুবির পাশেই বসে।

কিছুক্ষণ পর মিলনীকে নিয়ে ছুবি উঠে আসে, বাসায় এসে একটা খেজুর চাটাই বিছিয়ে, বসে। তাদের মাথার ভেতর দিয়ে তখন উষ্ণ রক্তস্রোত বইছে। দেহে আর একটুও কর্ম্মক্লান্তির অবসাদ নেই।

—তু আর মরদ করবি নাই মিলন?—ছুবি জিজ্ঞাসা করে।

—পা'লে করবো। বাপকে ছেড়্যা কুথাও যাব নাই।—মিলনী উত্তর দেয়।

—কালোকে মনে ধরে তুর?—ছুবি আবার প্রশ্ন করে।

মিলনী বলল, ধরবেক কেনে নাই, কম জোয়ান লয় উ। আমার বাপকে লিবেক না লিবেক এখনও কিছু বললেক নাই।

ছুবি আর কিছু বলে না, উপরে আকাশের দিকে তাকায়।

পশ্চিম আকাশে কাস্তের মত একফালি চাঁদ, তারাভরা আকাশের বুক চিরে চলে গেছে সাদা ধবধবে ছায়াপথ।

ছুবি জোরগলায় টুসুর গান গাইতে সুরু করে, মিলনীও যোগ দেয়।

—রাজা দিল নৈতন সড়ক রাণী দিল হাটখোলা।
টুসু দিল ফুলের বাগান হাওয়া খাবার গাছতলা।
সরিষা ফুল থুপি থুপি হলুদ বলে বেঁটেছি।
ও শাশুড়ী গাল দিও না হলুদ চিনতে লেরেছি।
ফুল তুলো ফুল তুলো টুসু বেছে তুলো ভাবরী।
মিনি সুতোর হার গেঁথেছি লোকে বলে হাঁসুলী।

কালো এসে দাঁড়ায়, জড়িত কণ্ঠে গানের শেষটা আবৃত্তি করে—মিনি সুতোর হার গেঁথেছি লোকে বলে হাঁসুলী।

—তু কেনে আলি এখন? মিলনী ঝাঝালো গলায় প্রশ্ন করে।

—তু'কে মাইরি ভারি ভাল লাগে আমার।

কালো টলতে টলতে মিলনীর দিকে এগিয়ে যায়।

ছুবি মেয়েদের আড্ডায় চলে গেল।

মিলনী কালোর কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়—পালিয়ে যা বলছি, নইলে সর্দ্দারকে বল্যা দিব।

—বল্যা কেনে দিবি, আমি যদি তু'কে সাঙা করি—কালো মিলনীর একটা হাত চেপে ধরে।

মিলনী গর্জ্জে উঠে—সি কথা এখন লয়, হাত ছাড় বলছি, ই কাজ ভাল লয়!

—ক্যালো কেনে লয়, মরদ চাই না তুর? কালো মিলনীকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতে যায়।

মিলনী তাকে ধাক্কা দেয়, নিজেকে মুক্ত করে, মেয়েদের মজলিশে চলে আসে।...

মিলনীকে জিজ্ঞাসা করে ছুবি—মাঝি তুকে কি বললেক?

মিলনী ঝাঝালো উত্তর দেয়—কি বলবেক আমাকে, আমি খানকি লিকিন?

ছুবি আর কিছু বলে না। মিলনী একটা কাঁসার বাটিতে এক বাটি পানীয় নেয়, এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ করে দেয়। যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে।

অন্যান্য মেঝেনরা তখন জোর গান চালিয়েছে—

কলের জলে সখের তরকারী।
বড়কা গেছে কাছারী
সখের তরকারী।

গভীর রাত্রে আড্ডা ভাঙল। আজ আর নবাগত মাঝিদের অগ্নিকুণ্ডের আড্ডা জমল না। সকলেই নেশায় বেহুঁস, যে যেখানে পারে শুয়ে পড়ে।

মিলনী ও ছুবি অন্য দিনের মত আগুন জ্বালায়, অগ্নিকুণ্ডের পারে বসে।

—কালো তুকে কি বললেক বল কেনে।—ছুবি জিজ্ঞাসা করে।

মিলনী কোন কথা বলে না।

মিলনীকে জড়িয়ে ধরল ছুবি—রা কাড়ছিস নাই যে বড়!

মিলনী বলে, তু উ' কথা বললে আমি পালাই যাব।

মিলনীকে ছুবি আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে, টুসুর গান গায়—

ভোমর এল থাতা থাতা, ও টুসু তু সই পাতা।
এমন করে সই পাতাবি যেমন দেখায় কোলকাতা।
কোঠাঘরে চটাই বাসা তাও কি তোমরা জান না?
চিরদিনের ভালবাসা আজ কেনে রা কাড়োনা।

ছুবির আলিঙ্গনে নিজেকে এলিয়ে দেয় মিলনী, তার সুরে সুর দেয়।

একটা নিশাচর পাখী বিকট চীৎকার করতে করতে উড়ে যায়।

ছুবি ভয় পায়—মিলন উঠ, ঐ শুন ভূত রা কাড়ছে।

দু'দিন পরের কথা। কালো ও মিলনী আজও অক্ষয়ের খামারেই কাজ করে।

কাজের ফাঁকে মিলনীকে একবার ডাকল জয়ন্তী—

—মেঝেন আয়, একটু শুনে যা!

মিলনী বাড়ীর ভেতরে আসে—যাব নাই, তুর মরদ এখুনি যেলা কাজ খুঁজবেক।

—আচ্ছা সে আমি বলবো'খন। হাঁরে মেঝেন, তোর স্বামী নাই? জিজ্ঞাসা করে জয়ন্তী।

—না।—মিলনী ছোট্ট উত্তর দেয়।

—তুই তা হলে বিধবা?

—না।

—তবে কি?—জয়ন্তী মিলনীর দিকে বিস্ময়-মাখানো জিজ্ঞাসার চোখে তাকায়।

—আমার মরদ পালাইছে—মিলনী আবেগহীন স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দেয়।

—এমন মেয়ে তুই, তোকে ছেড়ে দিয়ে পালাল? জয়ন্তীর বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পায়।

—হঁ, আমার বুঢ়া বাপকে উ লিলেক নাই। আমি বাপকে কুথা ছাড়ি বল।

এর পর জয়ন্তী ব্যাপারটা বুঝতে পারে, ব্যথিত হয়।

—তুই তা হলে বাপকে নিয়ে একাই আছিস? তা বুড়ো বাপকে আর কোথায় ফেলবি বাছা! জয়ন্তী সমবেদনার স্বরে বলল।

হঁ ত, খাটি খাই, কুনো খালভরার ধার ধারি না—মিলনী বেপরোয়া ভাব দেখায়।

—তা বেশ আছিস, তবুও যতই হোক মেয়েছেলে ত! জয়ন্তী অসহায় দৃষ্টিতে মিলনীর দিকে তাকায়।

এবার মিলনী বেশ ঝাঁঝালো গলায় প্রতিবাদ করে, মেয়্যা মানুষ বুঝি মানুষ লয়! কুনো খচ্চর কুনো খারাপ কথা বলতে লারবেক। বললে তাকে ডাণ্ড দেখাই দিব।

জয়ন্তী আর কিছু বলে না, মৃদু হাসে, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মিলনীর দিকে তাকায়। এই মেহনতী মেয়েটির স্পর্দ্ধিত উক্তির সঙ্গে তার বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে অনেকখানি সামঞ্জস্য আছে তাই-ই নিষ্পলক চোখে দেখে বুঝি।

মিলনী বলে, আমার মরদের কামাই আমার বাপকে খেত্যা লাগতোক নাই। আমি একাঁই দুনো কামাই কোরতম। নিজে খেতম বাপকে খাওয়াতম।—একটা আত্মপ্রত্যয়ের অঙ্গভঙ্গী করে।

একটু পরে আবার বলে, আমার বুঢ়া বাপকে যি ভালবাসবেক নাই সি খালভরা আমার মরদই লয়।

খামার থেকে কালো ডাক দেয়, মিলন কুথা গেলি রে!

মিলনী খামারে আসে, মুনিব গিন্নীর সঙ্গে কথা কঁইছিলম। বলে তুর মরদ কেনে লেয় না। তা আমি বোললম আমার বুঢ়া বাপকে যি ভালবাসবেক নাই সি আমার মরদই লয়।

কালো এ কথার প্রতিবাদ করে, উ কথা কথাই লয়। তু জোয়ান মেয়্যা—তুকে ভালবাসবেক, তুর বুঢ়া বাপকে ভালবাসবেক কেনে?

—বুঢ়া বাপকে ছেড়্যা দিঁয়ে আমি মরদ লিয়ে ঘর করব লয়? মিলনী রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—করবি না করবি সি তু' বুঝ। কালো উত্তর দেয়।

—বুঝবো বৈ কি, বুঝবো বলেই তো মরদ কোরলম নাই।

—ভালই করলি। তুর দায়ে তুর বুঢ়া বাপকে কেউ লিবেক নাই।

—না লেয় না লিবেক। আমি কুনো খালভরার লেগ্যে বস্যা নাই।—বেশ কড়া করে বলে মিলনী। ধানের গাদা থেকে এক আঁটি ধান টেনে নেয়, পাটায় আছাড় দিতে সুরু করে।

কালোও আর কিছু বলে না, ধান ঝাড়তে থাকে।

ধানঝাড়ার একটানা শব্দ ওঠে, ঝুপ ঝাপ, ঝুপ ঝাপ।

পরের দিন সকাল। আজ কাজে যাওয়ার আগে সর্দ্দারকে বলল মিলনী, আমার সঙ্গে একটা মেয়্যা লোক দে, আমি উর সঙ্গে কাজে যাব নাই।

—কি হ'ল কি তুর?—সর্দ্দার জিজ্ঞাসু চোখে মিলনীর দিকে তাকায়।

—হয় নাই কিছু, আমি যদি উর সঙ্গে কাজে না যাই।

সর্দ্দার কি যেন ভাবে, কিছু বলে না।

কিছুক্ষণ পর বলল সর্দ্দার—কি হবেক রে কালো, মিলনী আজ তুর সঙ্গে কাজে যেতে খুঁজছেক নাই।

—সি উর খুশি, উ যদি না যায়,—কালো হতাশার স্বরে বলে।

—তবে সর্দ্দারনীকে লিয়ে যা মিলন, সর্দ্দার বলল।

ছুবি বলল, না, দিদি তুর সঙ্গে যাক। আমি মিলনীর সঙ্গে যাব।

মিলনী খুশী হয়।

দু'জনে এক সঙ্গে অক্ষয়ের খামারে আসে।

—কালোকে মনে ধরল নাই তুর? ছুবি জিজ্ঞাসা করে।

—মনে কেনে ধরবেক নাই, মরদের লেগ্যা বাপ ছাড়ব নিকিন? মিলনী উত্তর দেয়।

—মরদ চাই না তুর?

—না, বুঢ়া বাপকে ছেড়্যা মরদ আমার চাই না। গতর খাটাই খাই, মরদ না রইল ত বঁয়েই গেল।

অক্ষয় আসে—আজ যে দু'টই মেয়েন রে! মাঝি কোথায় গেল?

—মাঝি যমের বাড়ী গেঁইছে, তুর কাজ কম হবেক ত বলবি, মিলনী কড়া উত্তর দেয়।

অক্ষয় মৃদু হাসে, চলে যায়।

আকাশে গোঁ গোঁ শব্দ ওঠে, একখানা প্লেন উড়ে যায়।

ছুবি প্লেনের দিকে তাকায়, সুর করে বলে—

'জার্ম্মানী কল উড়োজাহাজে
মিলন চাপলো কালোর বিচ্ছেদে।
জার্ম্মানী কল উড়োজাহাজে।

মিলনী মুখ বাঁকায়, কালোর মুখ আমি পোড়াই!

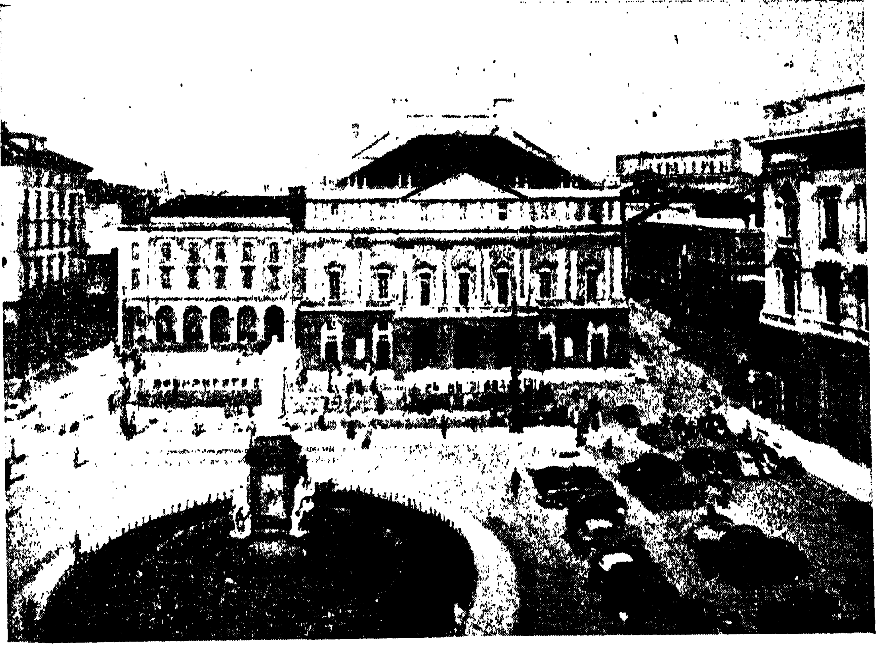
ধানের গাদা থেকে ধান টেনে নেয় মিলনী, পাটার ওপর অস্বাভাবিক জোরে আছাড় দেয়।

ঝুপ শব্দ উঠল একটা, কয়েকটা ধানের শিষ দূরে ছিটকে পড়ল।

ছুবিও এক আঁটি ধান টেনে নেয়, পাটায় আছাড় দিতে সুরু করে।

আজও সেই একটানা ধান ঝাড়ার শব্দ—ঝুপ ঝাপ, ঝুপ ঝাপ।

ধানঝাড়ার গতি কিন্তু আজ দ্রুততর।



'স্কালা'র বাহিরে—মিলান

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

পাঁচ

২৪শে জানুয়ারী '৫৪। রাত আটটায় টেলিফোন পেলাম রাম-নারায়ণ শর্ম্মার কাছ থেকে। রাম মৃদু কম্যুনিষ্ট-পন্থী। আপাততঃ এসেছে লণ্ডন থেকে ইটালীয়ান শিখতে ও আইন-সংক্রান্ত বইপত্র ঘাটতে? সামনেই নাকি পরীক্ষা। গ্রে'জ ইন্-এর ছাত্র রাম।

আমার মনে হয়, ওসব ছাড়াও অন্য কারণ আছে। নইলে ছ' বছরে ও মিলানে চার বার আসত না। অবশ্য আমার মত তৃতীয় ব্যক্তির একটি পরস্মৈপদী ব্যক্তিগত ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাই উচিত।

টেলিফোনে অনভ্যস্ত কানে যেটুকু শুনলাম তার সারমর্ম্ম হ'ল এই, রাম ক্রিভেল্লীর বাড়ীতে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে জটিল আড্ডা ফেঁদেছে।

ছোট ভাই ভিত্তরিও ক্রিভেল্লীর পেশা যদিও ওকালতি, কিন্তু তার আগ্রহ অনেক বেশী কৃষিতে। তাই কৃষিতে এম. এসসি.। যশোবন্তের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে খুবই উৎসুক। এ ছাড়া আর সবাই ভারতীয় সমাজ-জীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে চায়। অতএব যশোবন্ত ও আমি যদি কোথাও এন্‌গেজড না থাকি তো রাত ন'টা নাগাদ যেন অমুক ঠিকানায় নিশ্চয়ই যাই।

আমি বেশ একটু ইতস্ততঃ করে বললাম—আচ্ছা, যেতে চেষ্টা করছি।

ইতস্ততঃ করার কারণ হ'ল উপরে হিটারে রান্না চড়িয়ে এসেছি।

তারপর মাত্র আধ ঘণ্টায় রান্না নামালাম, খেলাম, প্যান, চামচ, প্লেট ধুয়ে মুছে তুলে রাখলাম। কোট চাপিয়ে যশোবন্তের দরজায় যখন হানা দিলাম, তখন ঠিক সাড়ে আটটাই বাজে।

মনে পড়ল যাদবপুর কলেজের কথা। রোজ প্রথম পিরিয়ডের পার্সেণ্টেজ যে কি করে হারাতাম, তাই ভাবছিলাম। বছরের শেষে মাথা চুলকে গিয়ে দাঁড়াতাম। বলতাম—স্যার আপনার ক্লাসে রোজই এসেছি, কিন্তু⋯।

যশোবন্তের ঘরে পা দিয়েই বললাম—দেখ, ভারতীয়দের সময়ের জ্ঞান নেই, 'পাংচুয়্যালিটি' কথাটা মগজেই ঢোকে না, একথা

দেশে বহুলপ্রচলিত। ওটি আর অন্য দেশে নাই-বা প্রচার করলে।

যশোবন্ত বেশ গম্ভীরভাবে বলল—কেন আমার তো হয়ে গেছে।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—তোমার হয়ে গেছে। এই ত সবে সন্ধ্যে।

যশোবন্ত তখন গাজর ও বাঁধাকপির পাতা কুচোচ্ছে। বলল—

—ও তো কাঁচাই ট্যাক্সিতে বসে চিবোব।

—সে তুমি ক্রিভেল্লীর বাড়ীতেই চিবিয়ো. কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে ট্যাক্সি!

—সময় কৈ?

—তবে এতক্ষণ করলে কি? তোমাকে তো আমি বলে গেছি কত আগে!

—বলে গেলেই তো আর প্যান্টে দু'দুটো বোতাম সেটে যায়, না। রীতিমত সুচে সুতো পরিয়ে ফোঁড় তুলে তুলে সেলাই করতে হয়।

—অ!

—হ্যাঁ। তোমাদের সামনে না হয় প্যান্ট নেবে নেবে যায়, টেনে টেনে তুলি। কিন্তু ওখানে করব কি? তাই বাকলসের জন্য দুটো বোতাম আটতেই হ'ল। পরীক্ষা একেবারে দরজায় এসে না পড়লে বইয়ের ধুলোই ঝাড়া হয় না, সে তো জানই। একটু চুপটি করে বসো, ঠিক দু'মিনিট।

—তুমিই চুপ কর, দয়া করে। আমি একটু ঠাণ্ডা হই। নইলে কখন 'বো বো অলসন' হয়ে যাব, মেঝেয় শুয়ে পড়বে। দশও গুণবে না কেউ, তোয়ালে জল নিয়েও ছুটে আসবে না কেউ।

এই হ'ল আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার ধাচ। রাগারাগি হলে গলাকেও মুদারা থেকে তারায় তুলতে হয়। ভাব খুব ঘন হলে রাত্রে আমি ওকে আমার ঘরে খেতে ডাকি, কিংবা ও ডাকে আমায়।

অবশেষে যশোবন্তের ট্যাক্সি-লিফটেই ক্রিভেল্লীর বাড়ী পৌঁছলাম। দেরি হয় নি। আড্ডা জটিলই বটে। ছেলে ও মেয়ে প্রায় কুড়ি জন এবং আধাআধি, আর ছিলেন ক্রিভেল্লী-পরিবারের কর্ত্রী—এনরিকো ও ভিত্তরিওর মা। এনরিকো বড় ছেলে, ভিত্তরিও ছোট।

একটি নিরিবিলি কোণে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে রাম এনরিকোর বোনের সঙ্গে আলাপনে মত্ত ছিল। যশোবন্ত আর আমাকে বিশেষ আমলই দিল না।

আর এক দিকে চার জনের একটা দল দাবা জাতীয় কি একটা খেলায় মশগুল হয়ে ছিল। ওরা ভারতীয় সমাজ-জীবন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। প্রথমে একবার ফিক করে দাঁত বের করে মাথা নুইয়েই আবার জমে গেল। ক্লাইম্যাক্স বোধ হয় এসে গেছে।

মিসেস ক্রিভেল্লী আমাদের বসালেন। পানীয় দিলেন, কুশল-প্রশ্নাদি করলেন। একেবারে বুড়ী না হলেও বার্দ্ধক্যের বুড়ী-ছোব-ছোব হয়েছেন, আঁচ করলাম।

ওঁরই অনুরোধে এক টুকরো কাগজে আমায় নাম লিখতে হ'ল বাংলায়। 'শ্রী' জুড়ে দিয়ে, 'আ'কারে 'ই'কারে টানটোন দিয়ে বেশ বাঁকিয়ে লিখে দিলাম।

—কি সুন্দর! অদ্ভুত, ঠিক যেন সেলাইয়ের ডিজাইন। লতাপাতার মত। খুব সুন্দর!

বুড়ী ক্রিভেল্লী চোখেমুখে খুশি ফুটিয়ে অনেক বার তারিফ করলেন। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি চলে গেলেন—বোধ হয় ছেলেমেয়েগুলোর হুল্লোড়ের সুযোগ করে দিয়ে।

ভিত্তরিও গদের আঠার মত যশোবন্তের চেয়ারের পাশে সেই যে এটে গেছে, এক সুতাও এদিক ওদিক নড়ে নি। সামনে মোটা মোটা বইয়ের মিনিয়েচার পিরামিড খাড়া করেছে। যশোবন্ত ওপারে অদৃশ্য। আমি ঘাবড়ে গেলাম। একে তো ও ইংরেজীতে ইটালীয়ানে খিচুড়ি পাকাবে। তার উপর প্রথম দিনই ভিত্তরিও কৃষি-সমুদ্রে ডুব দিয়ে ঝিনুক কুড়োতে আরম্ভ করেছে। মুক্তো মিললে হয়!

বুঝলাম, বেশী দেরি নেই। ঘামব শীঘ্রই। ছেলেমেয়ে-গুলো যেমন করে করে আমায় ঘিরে ধরেছে তাতে কালের টেম্পারেচার যে মেল্টিং পয়েন্টে পৌঁছবে না, তারই বা ঠিক কি? অগত্যা দান্তেকে স্মরণ করে ওদের অবিশ্রান্ত প্রশ্নের দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম—ভাষা-অজ্ঞতার প্যারাসুটে।

প্রথমেই কে একজন প্রশ্ন করে বসল—আগা খাঁ তো ভারতের ধর্ম্মীয় নেতা. না?

আমার তো চক্ষুস্থির! এই ধরনের প্রশ্ন আর গোটা দু'তিন করলেই তো চোখে সরষেফুল দেখব আর মাথায় কার্নিভ্যালের মেরী-গো-রাউণ্ড চলবে! কি সর্ব্বনাশ!

বললাম—কস্মিন্‌কালেও নয়। আগা খাঁ মুসলমানদের সম্প্রদায়-বিশেষের নেতা মাত্র।

—আচ্ছা, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তো পৃথিবী-বিখ্যাত। আপনি দেখেছেন কখনো? কলকাতার খুব কাছেই তো দেখা যায়?

একরাশ ঘন কালো চুল মেয়েটির মাথায়। জায়গা না পেয়ে মেঝের কার্পেটের উপরই বসে পড়েছিল হাঁটু গেড়ে।

বললাম—চিড়িয়াখানায় ও সার্কাসপার্টিতে মৃতপ্রায় আধা-বিড়াল আধা-বাঘ দেখেছি বটে। কিন্তু আসল স্বাধীন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আমার বাপ-ঠাকুরদাও দেখেন নি। কলকাতার আশী-নব্বই মাইল দক্ষিণে সুন্দরবনের জঙ্গলে এখনও অবশ্য বাঘ দেখা যায়। কিন্তু চেষ্টা করার সুযোগ পাই নি।

মিসেস ক্রিভেল্লী এলেন একজন ওয়েট্রেসকে সঙ্গে করে। আর এল চা—'টা' অল্প একটু বিনম্র হাসি। ছোট্ট কাপে এক চুমুকের

বেশী ছিল না। ইংলণ্ডের চা, অর্থাৎ ভারতীয় চা। ইংরেজ ভারতীয় চা কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে খুবই চড়া দামে সন্দেহ নেই। অতএব এখানে কাপের মাপ যে এক দাগ মিক্‌শ্চারের সমান, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই।

পুরু কাঁচের চশমা-চোখে একটি ছেলে এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। বেশ পড়ুয়া-পড়ুয়া ভাব চোখেমুখে।

প্রশ্ন করল—ইন্‌ডাষ্ট্রি রদিক দিয়ে ভারত যে এখনও পশ্চিমের তুলনায় পিছিয়ে আছে, তার প্রধান কারণ কি?

এর উত্তর খুবই সহজ এবং স্পষ্ট। একমাত্র কারণ হ'ল আমাদের দু'শ বছরের পরাধীনতা। আর মূলতঃ তার জন্যে দায়ী শোষক ইংরেজ।



'স্কালা'র ভিতরের দৃশ্য—মিলান

—আর একটু খুলে বললে হ'ত না?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বলতেই তো এসেছি। কয়েক হাজার বছর আগে ইউরোপের লোকেরা যখন কাঁচা ফলমূল ও পোড়া মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত, তখনই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সুরু হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিরাট ও তথ্যবহুল গ্রন্থ এবং শাস্ত্র রচনা করলেন—দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, ভেষজবিদ্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ে। বেদ, উপনিষদ, গীতা ও মহাভারতে ভারতের জীবন-সাধনার রূপ প্রকাশ পেল। আমাদের পর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যেও বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল···

—দেখুন, এ ধরনের আলোচনা ক্রমেই জটিল হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে অন্য কিছু শোনা যাক। আপনি কি বলেন?

বলল সেই মেয়েটি যে এতক্ষণ কাউকেই পাত্তা না দিয়ে এখানে-ওখানে লাট্টুর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল। হঠাৎ দু'এক-বার এ-দলে ও-দলে মাথা গলাচ্ছিল, আবার একটু পরেই শরীর দুলিয়ে মাথার চুলে ঝাকুনি দিয়ে খানিকটা টহল দিল। মনে মনে বলেছিলাম—তেজ আছে বলতেই হবে।

মেয়েটি সুন্দরী এবং গর্ব্বিতা। আমি সব সময় লক্ষ্য করছিলাম ওকে। প্রথমে একবার সেই চার-ইয়ারী দাবা খেলোয়াড়দের সঙ্গে জুটেছিল। কিন্তু হঠাৎ কখন যে আমারই চেয়ারের হাতলে এসে বসেছিল, জানি না। এখন লক্ষ্য করে অবাক্ হলাম।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। আমি তো তৈরীই আছি। প্রশ্নের সিগন্যাল হলেই ইঞ্জিন ছুটিয়ে দেব। জিজ্ঞেস করুন না, যা খুশি।

—মেয়েরা ওখানে কি ধরনের সাজসজ্জা করে?

—এই সেরেছে! বলে বোঝানো মুশকিল। কাগজ পেন্সিল পেলে সহজ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজ এল, কলম এল। কিন্তু আঙুলের ডগায় বেশভূষার রূপ ফুটল না। কোন রকমে হিজিবিজি এঁকে বাঙালী ঈভকে সাড়ি পরালাম, লম্বা চুলে খোঁপা বাঁধালাম—কপালে টিপ বসালাম। কানে রিং ও গলায় লকেটবিহীন সরু হারও ঝোলানো হ'ল।

অমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, কে আগে দেখবে। আমি চট করে কাগজটুকু গর্ব্বিতা মেয়েটির হাতে তুলে দিলাম। অন্য সবাই আমার দিকে আড়চোখে তাকাল।

মেয়েটি আবার বলল—ওখানে মেয়েরা লিপষ্টিক্, নেইল-পলিশ ব্যবহার করে না?

—করে। যাদের সুন্দরী হওয়ার উৎকট প্রয়াস, শুধু তারাই ওগুলো ব্যবহার করে। আর যাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য আছে, তারা ওসবের ধার ধারে না।

নানা প্রসঙ্গে কাটল আরো কিছুক্ষণ।

ঘড়িতে দেখলাম, বারটা কুড়ি। সর্ব্বনাশ! সাড়ে বারটায় শেষ ট্রাম ঘন্টি নেড়ে চলে যাবে!

বিরতি হ'ল কিছুক্ষণ। তারপর ভিড় পাতলা করে দিয়ে সবাই সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

বিরতির ঐ মিনিট পাঁচেক আমার সঙ্গে আলাপ করল একটি বেশ শান্ত, নরম ও সাদাসিধে মেয়ে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার ধৈর্য্যও ওর ছিল না, সরাসরি চেয়ারের হাতলে এসে বসবার চাপল্যও ছিল না। তাই এতক্ষণ বোধ হয় সুযোগই খুঁজছিল।

মেয়েটি বছর পাঁচেক ধরে বাণিজ্যিক ইংরেজী শিখেছে। কোন

এক সওদাগরী আপিসে কাজ করে। যদিও ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ ছিল, তবুও আমার শংছিন্ন ইটালীয়ানে আর একটি তালি জুড়বার জন্যে ইটালীয়ানেই চালিয়ে গেলাম।

—কত দিন হ'ল ইটালীতে এসেছেন ?

নরম গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

—এই দু'মাস হ'ল।

—মাত্র দু'মাস! আগে কখনও ইটালীয়ান শেখেন নি ?

—জাহাজেই গ্রামার পড়তে পড়তে এসেছি। আর তা ছাড়া সুযোগ পেলাম কৈ ? দু'সপ্তাহের নোটিশে পাসপোর্ট ভিসা যোগাড় করে পোঁটলা বেঁধে জাহাজে চড়লাম। এমনকি চেনা-জানা কত জনের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলারও অবসর পাই নি। ওরা ত রাগ করে চিঠির উত্তরই দিচ্ছে না!

—কিন্তু ইটালীয়ান বেশ বলতে শিখেছেন।

—এটুকু ত আপনারাই বলাতে বাধ্য করেছেন। নইলে আরও কত দিন যে উপোস দিতে হ'ত ঠিক কি! দোকানে ইংরেজীতে বোঝাতে গিয়ে কত দিন নাকের বদলে নরুন পেয়েছি। শেষে আবার ডিক্‌শনারি ঘেঁটে ঘেঁটে কলার বদলে গাজর নিয়ে ফিরেছি।

—দেখুন, আর একটি অবান্তর প্রশ্ন করছি। মাপ করবেন। কৌতূহল বড় বিশ্রী।

—আপনি বলুন।

—আচ্ছা, মুরগী, বীফ, এ-সব খাওয়া বোধ হয় হিন্দুদের নিষেধ।

—হাঁ।

—তা হলে এখানে আপনি খাচ্ছেন কি ?

—যা জুটছে, তাই। অবশ্য ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস আছে, গোঁড়ামি নেই। এখানে মুরগীও দেখছি রীতিমত অভিজাত। কলকাতার দু'টাকার মুরগীর দাম এখানে দশ টাকা। একদিন মুরগী খেলে পরের দু'দিন দুধ পাঁউরুটি খেয়ে কাটাতে হয় আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে।

—তা হলে বলুন, আপনার এখানে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

মৌন থেকে সায় দিলাম। সহানুভূতি কুড়ানো আমার প্রকৃতিগত দোষ। অথচ বিনয়ের মুখোশ এঁটে, কষ্ট হচ্ছে না, এই মিথ্যেটাও বলা আমার ধাতে সয় না।

বিরতির পরও ঘণ্টাখানেক আলাপ-আলোচনা চলেছিল। কিন্তু ক্রমেই এত একঘেয়ে হয়ে উঠছিল যে, আমার নিজেরই আর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ধৈর্য্য ছিল না। কাজেই সেগুলোর উল্লেখ আর করলাম না।

এনরিকো হঠাৎ কোথা থেকে ঝড়ের মত এসে উপস্থিত হ'ল। রামকে একটা ডাক দিয়ে আমার হাতে টান মেরে বলল, চল, চল। অনেক রাত হয়ে গেছে। আমাদের ষ্টেশন ওয়াগনটায় গাদাগাদি করে জন দশেককে পাড়ি দেওয়াতে পারব।

যাক্! রাত দেড়টায় তা হলে আর হেঁটে বাড়ী ফিরতে হবে না। ভিভা এনরিকো!

গাড়ীতে একেবারে 'প্রিংক্‌ফিট' হয়ে গেলাম। দু'জনের গায়ের মাঝে এক হাজার এলাওয়েন্সও রইল না।

মাঝ রাস্তায় এনরিকো গানের ধুয়ো তুলল—লা লা! লা—আ! লা লা লা—আ!

সবাই স্বর সপ্তমে চড়িয়ে শেষটা গেয়ে দিল।

আমাদের হোষ্টেলের সামনে গাড়ী থামিয়ে এনরিকো বলল, ভারতীয় বন্ধুরা এখনও বেঁচে আছে কি ?

বললাম, নিশ্চয়ই। এ ত পক্ষিরাজে চড়ে এলাম।

—জায়গা কম ছিল। কষ্ট হ'ল আপনাদের।

করমর্দ্দন করে বললাম, আফসোস রইল, আপনার কথায় সায় দিতে পারলাম না।—শুভরাত্রি।

—শুভরাত্রি।

২০শে ফেব্রুয়ারী '৫৪। কম্‌প্লিট স্যুট ত মাত্র একটিই। অন্যটি কম্‌বিনেশন্। কম্‌বিনেশন্ পরে কলেজে, কারখানায়, কি ক্লাবের ঘরোয়া পার্টিতেও চোখ কান বুজে যাওয়া চলে। তা বলে স্কালা থিয়েটারে অপেরা দেখতে যাওয়া চলে না।

ভিয়েনার অপেরা না হোক, মোৎসার্টের সুর ত আছে এ অপেরায়। প্রিমা বাল্লেরিনা নাই-বা হ'ল পাভলোভা, এ অপেরার সেরা নাচিয়েও ত কিছু কম যায় না এদিককার জগতে।

মিলানের স্কালা থিয়েটারের নামডাকও যথেষ্ট আছে ইউরোপে। নইলে আমেরিকান ও জার্ম্মান টুরিষ্টরা হোষ্টেলের সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই 'স্কালা স্কালা' করে অমন আকুলি-বিকুলি করে উঠে কেন ? আর আমরাই বা দু'মাস তাক করে, ওৎ পেতে থেকেও তিনখানা পুরো টিকিট যোগাড় করতে পারি নি কেন ? আড়াইখানা পেয়েছিলাম কাউন্টারে হাতাহাতি করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের মালিককে আমাদের অর্দ্ধেকও দিয়ে দিতে হ'ল। ভদ্রলোকের বাবা মা দু'জনেই নাকি বয়সের বোঝা বয়ে চলাফেরা করতে পারেন না ঠিকমত। লাঠিতে ভর দিলেও পা কাঁপে। হয়ত আজ আছেন, কাল নেই। ওঁদের অন্ততঃ একটিবার স্কালায় যেতে দেওয়া উচিত। অতএব···।

এ হেন অপেরায় যেতে হলে সবচেয়ে আগে চাই একটি জেল্লাদার ইভনিং স্যুট। ক্রীম-চকচকে চুলে গোটা তিনেক ঢেউ। জুতোয় আয়না-পালিশ। বুক-পকেটের সাদা রুমালের কোণ থেকে ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ বেরোবার দরকার নেই, বেরুলে ক্ষতিও নেই।

আমার স্যুটটি রঙে ম্লান খয়েরি। তাতে আবার মিহি ও মোটা ষ্ট্রাইপ। ট্রাউজারের চেহারা দেখলে মনে হয়, বুঝি বা ক্লিয়োপ্যাট্রার যুগে একবার ইস্ত্রি করা হয়েছিল। চুলে হেয়ার-ক্রীমের সমুদ্র বইয়ে দিলাম, ঢেউ উঠল না একটিও। জুতোয়

কিউই ঘসে বাইসেপস অবশ হয়ে এল, কিন্তু রিসোল-করা জুতোর শেষ বয়সের কুঞ্চিত চামড়ায় জেল্লা ফুটল না একতিলও। বুক-পকেটে সাদা রুমালের পুচ্ছ নাচানোয় আমার হাতেখড়ি হয় নি এখনও। ঐ কেতাটুকু এপ্রিলের ইভনিং ইন প্যারিসের জন্মেই তোলা থাকুক। আর বান্ধবীর কথা তুলে আপনাদের লজ্জা দিই কেন। বান্ধব জোটাতেও আমি যে অপারগ, এ জন্যে কথাটা ভাবী বান্ধবীরা এক পলকেই বুঝে নেন।

চেহারায় ঝড়ো কাকের লেবেল এঁটে ফোস্তো, সাহেব সহদেব আর আমি ট্রামে পা দিলাম শনিবারের ব্যস্ত সান্ধ্য-জনতার মাঝে। তখন রাত আটটা।

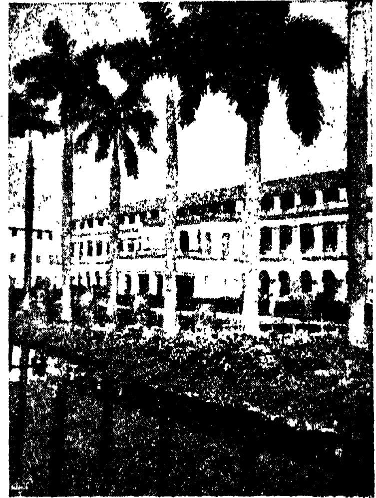
স্কালার সামনে নেমে কোন্ দিক দিয়ে ঢুকব বুঝতেই পারলাম না। আলোর ঝলসানি নেই। আভিজাত্য নেই উর্দি তকমায়। বাইরের সামান্যতম স্থাপত্যে পুরোপুরিই সংশয় জাগে এটাই স্কালা থিয়েটার কিনা।

ছয় টাকার টিকিটে ছ'তলায় উঠে হাঁপ ছাড়লাম। আমাদের পেছনেই দাঁড়িয়ে দেখার লাইন। সেখানেও দু'জনের মাঝে পাশ কাটাবার ফাঁক রাখে নি। ভাবলাম, ওদের পেছনে বেঞ্চে দাঁড় করাবার ব্যবস্থা করে নি কেন? হয় ত অনেকে স্কুল-জীবনের শাস্তি এখানে মানতে চাইবে না।

সব দিকে চোখ বুলিয়ে বুঝলাম, অপেরাটা না দেখেও যদি চলে যাই, তবুও টাকাগুলো দণ্ড দেওয়া সার্থক হয়েছে বলতে হবে। চেয়ারে, পর্দায়, দেওয়ালে দেওয়ালে মেরুন ও ক্রিম রঙের ভেলভেট, সিল্কের অপূর্ব্ব সাজ। ব্যালকনির গায়ে গায়ে, ছাদের ভিতর পিঠে বাঁকানো নক্সা-সজ্জা। 'জাঁকজমক' কথাটার অর্থ এত দিন তত স্পষ্ট করে বুঝি নি, আজ জলের মত বুঝলাম।

ভেতরের আবহাওয়াটাও কেমন যেন অদ্ভুত। মিলানে যে এমন দর্শক মেলে আমার ধারণা ছিল না। প্রত্যক্ষ করে অবাক হলাম। সিনেমা-হলের মত শালীনতার মাথা খেয়ে প্রণয়ালাপ নেই। ইটালীয়ানদের স্বরে সেই উচ্চরোল নেই। স্বরও এখানে যেন মধুঢালা। ওদের কথাবার্ত্তাতেও সেই স্বভাবসুলভ এক্সেন্ট নেই, নেই এক্সেন্টের আনুষঙ্গিক অঙ্গভঙ্গী। সিগারেটের ধোঁয়ার কুয়াশা নেই। আইসক্রীমওয়ালাদের কণ্ঠনিঃসৃত শব্দের ঢেউ কানের পর্দায় ঘা মারছে না। বাইরের ব্যস্ত কোলাহল-কণ্টকিত ঘণ্টাগুলো আর এখানকার এই প্রায়-স্তব্ধ ভব্য মুহূর্ত্তগুলোর মধ্যে গরমিলটুকু নিমেষেই অনুভূত হ'ল। বেশ একটা সংবেদন-সুখে মনটা হাল্কা লাগছিল।

মেয়েরা এসেছে ফিকে গোলাপী ও নীল রঙের বিরাট ঘেরওয়ালা মধ্যযুগীয় পোশাকে। শুধু বুক ও পিঠের শূন্য স্থান বেড়েছে। তাপমাত্রা অবশ্য শূন্যের অল্প ওপরেই চলছে। ওরা মাঝে মাঝে অপেরা-ট্র্যাডিশান অপেরা-গ্লাস চোখে ধরে এদিক-ওদিক চাহনি হানছে। অনেকে চিত্রিত জাপানী পাখা মেলে মুখাংশ ঢাকছে।



কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি, যাদবপুর

আর ঐ যে কয়েকটা সীট পরেই একদল আমেরিকান বসে আছে, ওরা যেন বৈঠকখানায় ঘরোয়া আড্ডা জমিয়েছে। পরি-পাটী সান্ধ্য 'বো' কারুর কলারে নেই। কয়েক জনের অবশ্য টাই আছে। দু'জনের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট। মেয়েদের অনেকেরই স্কার্টে বড় বড় চেক। ওরা অপেরার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত নয় মোটেই। তার চেয়ে জ্যাজ, কাবারে-নাচ কি ট্যাপ-ড্যান্সিং ওদের কাছে অনেক প্রিয়। তাই ওদের চঞ্চলতায় অবাক হলাম না। অনবরত বকবক করাতেও ওদের বাচাল ভাবলাম না। পর্দা না ওঠা পর্য্যন্ত ওরা শান্ত হবে না।

শেষে পর্দা উঠল। মোৎসার্টের সঙ্গীত-সুরে কনসার্ট সুরু হ'ল। অপেরা ছিল 'লে নৎসে দি ফিগারো', "ফিগারো'র পরিণয়"। একটি স্প্যানিস উপকথা। অপেরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, দুটো একটা অধিকতর উচ্চাঙ্গের নাচ, তার উপর গানের দুর্ব্বোধ্য ইটালো-কাব্যিক ভাষা, সব মিলে কান দুটোকে অর্দ্ধ-নিষ্ক্রিয় করে রাখল আর চোখে চাঞ্চল্য ফুটিয়ে চোখ দুটোকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়াল। প্রতিটি দৃশ্য-শেষে হাত দুটোও সকলের প্রচণ্ড করতালিতে আপনা থেকেই যোগ দিচ্ছিল।



জাতীয় পোশাকে সুসজ্জিত উৎসব-রত তিব্বতী মেয়েরা

তিব্বতী নববর্ষ—‘লোসার’ উৎসব

অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ ফুট উপরে সু-উচ্চ পর্ব্বতবেষ্টিত তিব্বত। বহুকাল ধরে এই রহস্যাবৃত দেশের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল বিদেশীদের নিকট—কিন্তু দ্বার খুলে গেলেও ৬৫১,৭০০ বর্গমাইল ব্যাপী তুষার-শৈত্য-জর্জ্জরিত, রুক্ষ, ধূসর, ঝড়-ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই উপত্যকা-ভূমি আজও আমাদের চোখে বিস্ময়কর পরিবেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে বিস্তারলাভ করে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য ভিক্ষু, সন্ন্যাসী ও লামা। এই বৌদ্ধধর্ম্মের রূপ অন্যান্য দেশে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের চেয়ে অনেকটা পৃথক। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেছেন পদ্মসম্ভব, সোন্‌গাপা প্রচার করেন অন্য শাখা। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের লোহিত ও পীত—এই দুই শাখার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে তিব্বতে—এর ফলে গড়ে উঠেছিল অভিনব এক সভ্যতা—বিচিত্র জাতির বিচিত্রতর সামাজিক ও ধর্ম্মীয় অনুশাসন এবং রীতিপদ্ধতি—একে বলা হয়েছে লামা-সভ্যতা। তিব্বতীদের নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েও তাদের এই সভ্যতার বেশ পরিচয় মেলে।

তিব্বতী বর্ষপঞ্জী

তিব্বতী নববর্ষের প্রথম দিনটি এবার পড়েছে ১২ই ফেব্রুয়ারী, নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর বর্ণনার আগে এদের বর্ষপঞ্জী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন। তিব্বতী পঞ্জিকা অতি অদ্ভুত। কালচক্রের আবর্ত্তনে নাকি সৃষ্টি হয়েছে বছর। তিব্বতের প্রথম বছর গণনা সুরু হয়েছিল নাকি ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এ পাঁজিতে বছর ঠিক করা হয় বিভিন্ন নাম দিয়ে, সংখ্যা দিয়ে নয়। যেমন আমাদের একটা বছর ১৯৩১ সাল, ১, ৯, ৩, ১ এই সংখ্যাগুলো বছরটিকে নির্দিষ্ট করল, কিন্তু তিব্বতী পঞ্জীতে এর নামকরণ হবে পশুপক্ষীর নাম দিয়ে, অর্থাৎ সেই বছরটির তিব্বতী নাম হবে—লৌহ-মেষ বছর। সবশুদ্ধ এই রকম বারটা বছর আছে, এর মধ্যে ছ'টা বছরকে ধরা হয় পুরুষ এবং আর ছয়টাকে নারী। এই বছর-গুলোর নামের সঙ্গে কতকগুলো জড় পদার্থের নামও সংযোগ করা হয়। এই জড় পদার্থগুলোকে তিব্বতীরা বলে মৌলিক পদার্থ: মৃত্তিকা, লৌহ, জল, কাষ্ঠ এবং অগ্নি। এই এক একটি মৌলিক পদার্থের নামের সঙ্গে এক একটি পশু পক্ষীর নাম যোগ করা হয়। এই রকম বারটি পশু পক্ষী হ'ল: কুকুর, শূকর, ইঁদুর, ষাঁড়, ব্যাঘ্র, খরগোশ, ড্রাগন, সর্প, অশ্ব, মেষ, বাঁদর এবং পক্ষী। প্রত্যেকটি জড় পদার্থ বা ভূতের নাম আসে দু'বার করে, প্রথম বার ব্যবহার হয় পুরুষ রূপে, দ্বিতীয় বার স্ত্রী রূপে—এদের সঙ্গে যুক্ত এক একটি পশু পক্ষীর নাম, যথাক্রমে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায়। যেমন:

মৃত্তিকা-পুরুষ-ড্রাগন বছর, মৃত্তিকা-স্ত্রী-পক্ষী বছর ইত্যাদি। বছরের নামের সঙ্গে 'স্ত্রী' বা 'পুরুষ' শব্দ বাদ দিলেও গণনায় কোন গোলমাল হয় না। কারণ প্রতি বৎসরই ত পশু পক্ষীর নামের পরিবর্তন হয়। দশ বছর পর্যান্ত ক্রমান্বয়ে এসে জড় পদার্থের নামগুলো শেষ হয়ে যায়, যেহেতু পর পর দু'বছর একই জড় পদার্থের নাম থাকে—এই ভাবে বার বছরে বারটা পশুপক্ষীর নাম আসে। এমনি করে বারটা পশুপক্ষীর নাম ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়, দ্বিতীয় নামের সঙ্গেও আবার বারটা পশুপক্ষীর নাম মৌলিক পদার্থের যোগ হয়ে বছরের পর বছর তৈরী হবে। কাজেই একটি নামের বছর আবার ফিরে আসতে লাগবে ষাট বৎসর।



দার্জ্জিলিং মহাকাল পাহাড়ে 'লোসার' উৎসবে নৃত্যরত একদল তিব্বতী পুরুষ। 'এভারেষ্ট-বিজয়ী' তেনজিং নোরকেও এই নৃত্যে যোগদান করেন (ডানদিক থেকে চতুর্থ)।

তিব্বতী বৎসরের মাসগুলোর নামের বেশ ছন্দ উচ্চারণে আছে। বছরের প্রথম মাসের নাম: 'দাওয়া টাংবু'। পরবর্তী মাসগুলোর নাম: 'দাওয়া নিপা', 'দাওয়া সুম্বা', 'দাওয়া ছিবা', 'দাওয়া নাবা', 'দাওয়া টুপ্পা', 'দাওয়া টিঙ্গপা', 'দাওয়া কেপা', 'দাওয়া কুবা', 'দাওয়া চুবা', 'দাওয়া চুকচিপা' এবং 'দাওয়া চুনিপ্পা'। সবগুলোর সঙ্গেই "দাওয়া" শব্দ যোগ করা হয়। এদের প্রত্যেক মাসেই ত্রিশ দিন। বাংলা ও ইংরেজী পঞ্জিকার মত কোন মাস ২৯, কোন মাস ৩০ বা কোন মাস ৩১ দিন নয়। এই তারিখগুলোর নামের উচ্চারণও শুনতে বেশ, যথা: পয়লার নাম ছেপাচিক্, দোসরার নাম 'ছেপানি', তেসরার নাম 'ছেপাসুম্ব', এই ভাবে 'ছেপাশি', 'ছেপানা' ইত্যাদি। আমাদের নববর্ষের প্রথম প্রভাত যেমন পয়লা বৈশাখ, তেমনি তিব্বতীদের নববর্ষের প্রথম দিন হচ্ছে 'দাওয়া টাংবু' মাসের 'ছেপাচিক' তারিখ।

তিব্বতে নববর্ষ উৎসব

ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণতঃ তিব্বতীদের নূতন বছর সুরু হয়। এই বছর তাদের নববর্ষের প্রথম দিন পড়েছে ১২ই ফেব্রুয়ারী। তিব্বতী বৎসর-চক্রের অগ্নি-বায়ুর বছর এটা। আমাদের নববর্ষ উৎসব শুধু একদিন, অর্থাৎ কেবল মাত্র ১লা বৈশাখেই হয়ে থাকে। কিন্তু তিব্বতীদের নববর্ষ উৎসবের সমাপ্তি বছরের প্রথম দিনটিতেই নয়। প্রথম দিন থেকে সুরু হয়ে এই উৎসব চলে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে—পূর্ণিমা পর্য্যন্ত। তিব্বতীরা এই উৎসবকে বলে 'লো-সার-লো'। মানে বৎসর এবং 'গ্সার' মানে নূতন। তিব্বতীদের এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব বা 'মোলাম'। একে বলা হয় 'মহান্ প্রার্থনা-উৎসব'। ভগবানের জয়গান ও প্রার্থনাতে অতিবাহিত হয় এই উৎসবের দিনগুলো। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ত এই প্রার্থনা। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরী উৎসব-আনন্দে মুখরিত থাকে বৎসরের প্রথম দিন থেকে দশম দিন পর্য্যন্ত। সে সময় তিব্বতের ধর্ম্মগুরু দলাই লামা তাঁর প্রাসাদ 'পোতালা' ছেড়ে চলে আসেন লাসার সবচেয়ে বড় বৌদ্ধমন্দির 'লাব্রাং'-এ। এখানেই নববর্ষ উৎসবের সবচেয়ে বেশী সমারোহ। এই উৎসবের দিনগুলোতে মন্দির-চত্বরে সভার আয়োজন হয়। দলাই লামা তাঁর সিংহাসনে বসে এই সভায় জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ—লোকের কল্যাণের জন্ত উচ্চারণ করেন প্রার্থনা-মন্ত্র। এই উৎসবে যোগদানের জন্ত তিব্বতের সমস্ত অঞ্চল থেকে লামা সন্ন্যাসীদের লাসা নগরীতে আহ্বান করা হয়। তিব্বতের রাজা ও দলাই লামা দু'জনেই লাসায় সমবেত সন্ন্যাসীদের খাদ্য পানীয় এবং উপহার বিতরণ করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠগুলোতে তাঁরা 'ভিক্ষা' প্রেরণ করেন—যাতে সেখানেও নববর্ষ-উৎসব উপযুক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে পারে। স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান রেশমবস্ত্র, চাদর বা 'স্কার্ফ', রঙীন রেশমের রুমাল, প্রচুর পরিমাণে চা, মাখন, ময়দা, তামাক, ইত্যাদি পাঠানো হয় ভিক্ষা রূপে তিব্বতের সব মঠগুলোতে। নববর্ষের দ্বিতীয় দিন 'বাৎসরিক অভ্যর্থনা দিবস'—এই দিন দলাই লামা দেশের প্রধান ব্যক্তি, উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী ও লামা সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করেন—পান ভোজন অনুষ্ঠিত হয় সেই অভ্যর্থনা সভায়—বিদেশী কেউ সহরে উপস্থিত থাকলে তিনিও বাদ যান না এই নিমন্ত্রণ থেকে।

নববর্ষ উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ হ'ল "রহস্যময় খেলা"—অনেক ইউরোপীয় যাকে অবহেলাভরে অভিহিত করেছেন 'Devil dance' বা ভূত-নৃত্য বলে। কিন্তু তিব্বতীদের নিকট এই নৃত্য তাদের ধর্ম্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটা প্রধান অংশ। দেখা প্রত্যেক মঠেই এই নাচের জন্ত একদল পারদর্শী লামা বা অনেক রকম পোশাক-পরিচ্ছদও মজুত থাকে। বড় বড় মঠে শ'কয় নাচকে বলে



মহাকালে নৃত্যরত তিব্বতী-নারীদের একটি দল, পুরুষ-নর্ত্তকদের মুখোমুখি হয়ে এরা নৃত্য করছে।

নৃত্যে যোগ দেন। প্রাচীন চৈনিক রেশমের ব্রোকেড, এমব্রয়ডারী-করা রেশমের পরিচ্ছদ—পীত ও লোহিত—এ দুটি পবিত্র রঙের ঘাগরা, অদ্ভুত আকারের মখমল, পশম এবং পশুলোম নির্ম্মিত টুপী ইত্যাদি জবরজঙ্গ পোশাকে সজ্জিত হয়ে লামারা এই নৃত্য প্রদর্শন করেন। নানা রকম দেব ও দানবের মুখোশ পরেও এই নৃত্য করা হয়। দৈত্য-দানবের প্রতিকৃতি 'টুরমা' তৈরি করে অগ্নিদগ্ধ করা হয়—দেশ থেকে অমঙ্গল দূর করার জন্য। 'রহস্যময়খেলা বা নাচে'র (Mystery Play) বিভিন্ন রূপ আছে। তাদের ধর্ম্মের, সমাজের বিভিন্ন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এই সব নৃত্যের রচনা—ঠিক আমাদের নৃত্যনাট্যের মত। গল্পের বিভিন্ন অধ্যায় বা ঘটনাগুলো তারা বিভিন্ন প্রকার ও ভঙ্গীর নাচের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, হাড়ের তৈরী মালা, জীবজন্তু, দৈত্য-দানবের মুখোশ ইত্যাদি এই সব নাচের অঙ্গসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। উন্মুক্ত প্রান্তরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে এই সব নাচ। মন্দির-প্রাঙ্গণে অবিরাম বাদ্যযন্ত্র বাজে এই নাচের সঙ্গে।

'দাওয়া টাংবু' বা নববর্ষ উৎসবের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হ'ল ধর্ম্ম-শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা দিয়েই উৎসব শেষ হয়। লাসায় দলাই লামার বাসভবন "পোতালা" প্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে 'লাব্রাং' বৌদ্ধমন্দির পর্য্যন্ত যায়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে রেশমের বস্ত্রপরিহিত 'জুনরা' বা নিম্নস্তরের সন্ন্যাসীরা—হাতে তাদের ধর্ম্মস্তোত্র-লিখিত নিশান, লাব্রাং মঠের ঐশ্বর্য্য-চিত্রিত ফলক। তারপর "গেলঙ্গ" ও 'রাবজাম্পা' শ্রেণীর [illegible]রা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আসে। এদের পরিচ্ছদ চীন-ব্রোকেডে তৈরী। এর পরে আসে 'কাসঙ্গসিয়া' বা রাজ-পারিষদবর্গ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্ত্তৃগণ—

নববর্ষের বিভিন্ন

সবাই কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে। অশ্বপৃষ্ঠে এদের অনুসরণ করে নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত পতাকাধারী উচ্চপদস্থ লামাগণ এবং দলাই লামার মন্ত্রীবর্গ। অশ্ববাহিত হয়ে বড় বড় পূজোর ঘট, মূল্যবান কারুকার্য্যখচিত ঘড়া, পাত্র, ধূপদানি ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে চলে, এর পরই মূল্যবান পাল্কীতে সমাসীন ধর্ম্মগুরু দলাই লামা ধূপধুনোর সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। পেছনে আসেন অশ্বপৃষ্ঠারূঢ় তিব্বতের রাজা উচ্চপদস্থ সভাসদ-পরিবৃত হয়ে। এই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বাদ্য ঢাক ঢোল কানাড়া শিঙ্গা প্রভৃতি উচ্চরোলে উৎসবের আনন্দ ঘোষণা করতে করতে অগ্রসর হয়। রাজপথের দু'ধারে বাড়ীর ছাদে, গবাক্ষে উৎসববেশে সজ্জিত জনমণ্ডলীর সমাবেশ। দলাই লামার পাল্কী যখন তাদের অতিক্রম করে যায় তখন তারা উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা-সঙ্গীত গেয়ে ওঠে, ধূপধুনোর আরতি দিয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরুকে অভিবাদন জানায়।

লাব্রাং মন্দিরে পৌঁছে শোভাযাত্রা শেষ হয়। সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ীতে নৃত্যগীতাদি হয়ে থাকে, পান-ভোজন এবং উপহার বিতরণও এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের অঙ্গ। নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠানের গুরুত্বের দিক থেকে লাসার 'পোতালা' প্রাসাদের পরই টাসিলানপু বৌদ্ধমন্দিরের স্থান। লাসার পশ্চিমে সাংপো নদীর তীরে এই মঠ। নববর্ষ উৎসবে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক এই মঠে জমায়েত হয়। উৎসব উপলক্ষে শহরে একপক্ষকালব্যাপী ছুটি ঘোষণা করা হয়।

দার্জ্জিলিঙে 'লোসার' উৎসব

তিব্বতের বাইরে ভারত, সিকিম, ভুটান, নেপাল এবং চীনদেশে সর্ব্বত্র তিব্বতীরা এই নববর্ষ উৎসব পালন করে থাকে। শুধু লামা বা সন্ন্যাসীরা নয়, তিব্বতী জনগণও এই উৎসব পালন করে। সিকিমে নববর্ষের দিন সিকিমের মহারাজ তাঁর গ্যাংটকস্থিত রাজ-ভবনে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করেন। পান-ভোজনের পর প্রত্যেক বিশিষ্ট অতিথিকে একটি করে চাদর বা স্কার্ফ উপহার প্রদান করা হয়। দার্জ্জিলিঙে তিব্বতীর সংখ্যা কম নয়, এখানেও দুটি বৌদ্ধমঠ আছে এবং 'ঘুমে' আছে আর একটি। নূতন বছর আসার আগে থেকেই এই উৎসব পালনের আয়োজন চলে। বৎসরের প্রথম দিন থেকেই তিব্বতীরা ঘরে ঘরে পূজাপার্ব্বণ করে। গোম্ফা বা ছোট ছোট মঠ থেকে লামা কিংবা পুরোহিত প্রতি গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে পূজা করে আসে। এক এক জন লামা এক এক দিন সকালবেলায় এক গৃহস্থের বাড়ী যায়, পূজা সেরে ফেরে সন্ধ্যার সময়; পরদিন আবার যায় অন্য গৃহস্থের বাড়ী।

অনেক সময় দু'চার জন লামাও একসঙ্গে একই বাড়ীতে পূজো করতে যায়। বুদ্ধ ভগবান, লক্ষ্মী বা 'চেন্দাসি', মহাদেব "গুরুরমুচি" প্রভৃতি দেবতার পূজো হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ "ছেরূপ", "ক্যাংনাহাঙসাং" প্রভৃতি থেকে তাঁরা মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের সম্মুখে ঘি, চর্ব্বি, বনস্পতি বা নারকেল তেলের প্রদীপ জ্বলে।

এই সময় তিব্বতীরা সারাদিন চা পান করে থাকে। এই চা আমাদের চায়ের মত নয়, একে সাধারণ ভাষায় বলে 'ভোটে চা' তিব্বতীরা বলে 'পোচা' বা 'সিয়া'। তারা পিণ্ডের মত করে শুকিয়ে রাখে এই চা। এই শুকনো মণ্ড প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে, তার সঙ্গে 'পুটিয়া' নামক একপ্রকার লবণজাতীয় জিনিষ মিশিয়ে গরম করলে চায়ের রং লাল হয়।



উৎসব উপলক্ষে নির্ম্মিত একটি সুসজ্জিত তাঁবু

অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ হবার পর ছেঁকে নিয়ে আর একটু জল মিশিয়ে আবার গরম করা হয়। সবশেষে এর সঙ্গে টাটকা হলদে মাখন বা ঘি একটু নুন মিশিয়ে নিতে হয়, অনেকে আবার বেশ খানিকটা দুধও মেশায়।

নববর্ষ উৎসবের আর একটি পানীয় হচ্ছে সুরা—এরা একে বলে 'ছাং' বা 'সিয়াং'। সুরার সঙ্গে জল এবং কিছু ঘি মিশিয়ে এরা পান করে। মেয়েরা অনেকটা জল মিশিয়ে এই 'ছাং' পান করে। কিন্তু লামা বা সন্ন্যাসীদের সুরাপান বারণ।



কামালহং মহাকাল পাহাড়ে উৎসব-রত তিব্বতী নরনারী

দার্জ্জিলিঙে 'লোসার' উৎসব পালনের জন্য স্থানীয় তিব্বতী সমিতি চাঁদা সংগ্রহ করে। মাননীয় মন্ত্রী টি. ওয়াংদি এই সমিতির সভাপতি। মহাকাল পাহাড়ের চূড়ায়, মন্দিরের উন্মুক্ত চত্বরে এই উৎসবের জন্য তিব্বতীরা সমবেত হয়ে থাকে। মেলার মত জনসমাবেশ হয় সেদিন। এই মেলা সাধারণতঃ উৎসবের শেষ দিনে হয়ে থাকে। মহাকাল পাহাড়ের উপর সারি সারি তাঁবুর মত ঘর তৈরি করা হয়। মূল্যবান বস্ত্র, রেশমী ঝালর ইত্যাদিতে সুসজ্জিত করা হয় সেই সব তাঁবুগুলোকে। মন্দিরের চারিদিকে নূতন নূতন খুঁটিতে বা বাঁশের গায়ে নিশানের মত কাপড়ে আঁকা প্রার্থনা-মন্ত্র পত পত করে উড়তে থাকে—আকাশে-বাতাসে উচ্চারিত হয় "ওঁ মনিপদ্মে হুঁ"। জাতীয় পোশাকে, অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে তিব্বতী নরনারী উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। তাঁবুর মত ছোট ছোট কাপড়ের ঘরে খাদ্যসামগ্রী সাজিয়ে গল্পগুজবে মত্ত হয়ে থাকে এক একটি পরিবারের লোকেরা। চোখে পড়ে বৃহদাকার কচুরি ও নিমকির মত ময়দায় তৈরী খাবার স্তরে স্তরে সাজানো। এই খাবারের নাম 'খাবসে' ও 'ছেপপা'। ঠিক ময়দা নয়, 'জাম্বা' বা বার্লির তৈরী ময়দা দিয়ে এগুলো তৈরী। অনেক সময় ময়দার সঙ্গে ভুট্টার গুঁড়োও মিশিয়ে নেওয়া হয়। তেলে ভেজে এই খাবার তৈরি করা হয়।

এক এক জায়গায় নৃত্যগীত সুরু হয় দল বেঁধে—এক সারিতে নাচে মেয়েরা, অন্য সারিতে পুরুষেরা—কালো-পোশাক গায়ে, মাথায় টুপী, গলায় সাদা স্কার্ফ; তারা নৃত্য করে হাত ধরাধরি করে মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে। মাঝখানে থাকে পানীয়। সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা গ্লাস ভর্ত্তি করে নৃত্যরত পুরুষ এবং মেয়েদের হাতে তুলে দেয়। ১৯৫৪ সনের উৎসবে এই নৃত্যগীতে যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল এভারেষ্টবিজয়ী তেনজিং নোরকেকে। আরো অনেক রকম নাচ হয়ে থাকে এই নববর্ষ উৎসবকালে। একরকম নাচকে বলে

'মোম্বা' নাচ—এই নাচে সাত-আট জন পুরুষ যোগদান করে, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচে সবাই। একজন গান সুরু করে, তার পর সবাই একসঙ্গে গেয়ে উঠে :

"নাং যো কাক্সা চিক্‌পাইং
ইয়াক্‌পু ছাং বি হিং"···ইত্যাদি

অর্থাৎ, "আমরা ভগবানের দেশ থেকে এসেছি, ঈশ্বর আমাদের পাঠিয়েছেন, তাই আমরা এসেছি গান গাইতে। আমরা নাচব, তোমরা সবাই দেখ। আমরা ভগবানের গান গাই। আজকের দিনে আমরা সবাই এক, কোন ভেদাভেদ নেই।"

অতি অদ্ভুত একটানা সুরে গান গেয়ে সবাই নাচে, ভারি সুন্দর লাগে এই সুর। আর এক ধরনের নাচ হয়ে থাকে এই সময়—এর নাম 'হাম্‌' নাচ। মুখোশ বা 'মুবিবা' পরে এই নাচ হয়। "টিমেকুত্তিন" "থাস্ত সামুও", ''সে-টে ঞ্চেটুঞ্জু" প্রভৃতি তিব্বতী বই থেকে ঘটনা ও গান অবলম্বন করে এই সব নাচ হয়ে থাকে। 'টিমেকুত্তিনে' হাতীর নাচ, শিকার-খেলা, ঘোড়ার খেলা, মাছধরা, হরিণের খেলা, ইয়াকনাচ ও সিঙ্গিনাচ ইত্যাদি নাচের কথা আছে। সিঙ্গিনাচ সাধারণতঃ রাত্রিতে হয়ে থাকে, নর্ত্তকেরা সিংহের মুখোশ ও আচ্ছাদন পরে এই নাচ দেখায়। নাচের শেষে সমবেত দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ নর্ত্তকদের বকশিশ দেয়। মেয়েরা এই সব নাচে যোগদান করে না।

নাচগানের ভিতর দিয়ে এই ভাবে তিব্বতী নববর্ষ উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। দার্জ্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি পাহাড়ী শহরের এই 'লোসার' উৎসব একটা সত্যিকার দর্শনীয় বস্তু।

শশী পণ্ডিত

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

বয়স তখন বছর তেরোর বেশী নয়। মাইনর স্কুলের ক্লাস সিক্স-এর ছাত্র। তখন থেকেই শশী পণ্ডিতকে একান্তভাবে ভালবেসেছিলাম। সে ভালবাসার মূল যে কত গভীর ছিল আজ তা বেশ বুঝতে পারছি। মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার যোগেন সাহাকে নিয়ে ব্যাপারটার সূত্রপাত। সেকেণ্ড মাষ্টার যেমনি ছিলেন বদরাগী তেমনি ছিল তাঁর মারের হাত। একগাছা সরু লকলকে বেত সব সময় তাঁর হাতে থাকত। ক্লাসে ঢোকবার আগে সেই বেত-গাছা একবার শূন্যে আস্ফালন করে ঘরে ঢুকতেন। হাবভাব দেখেই ভীতু ছেলেদের হয়ে যেত। ক্ষিতীশ ছিল ক্লাসের পাকা ছেলে। আমাদের চাইতে সে কমপক্ষে বছর পাঁচেকের বড় হবে। আমার বড়দার সঙ্গে পড়েছে, মেজদার সঙ্গে পড়েছে—তখন আমার সঙ্গে পড়ছিল। একবার সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন—সর্ব্বপ্রধান মানে কি ক্ষিতীশ? কালবিলম্ব না করে জবাব দিল—আজ্ঞে স্যার সকলের বড় ধান।

আর যায় কোথা! মুখে অবশ্য বললেন—কয় হাত করে হবে রে—হাত তিনেক করে এক একটা। তারপর এলোপাথারি সে কি বেত পড়তে লাগল তার পিঠে! নিতান্ত ক্ষিতীশ বলেই সেদিন কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেল—আমরা হলে তো গিয়েছিলাম আর কি?

সেই থেকে ক্ষিতীশ জামার নিচে বর্ম্ম এঁটে স্কুলে আসত—মোটা বস্তা কেটে দিব্যি ফতুয়ার মত করে নিয়েছিল—গেঞ্জির উপরে তাই পরে, তারপরে জামা চাপিয়ে দিত।

এই ক্ষিতীশ ছিল নাটের গুরু। আমরা ভয়ে ভক্তিতে তাকে গুরুর মতই মানতাম। একদিন ভবেশদের পুকুরপাড়ে আমরা জন চারেক বসে আছি। হঠাৎ ক্ষিতীশের মাথায় এক বুদ্ধি গজাল—বললে— আয় আজ কালীপূজো করি।—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। ফুল, বেলপাতা, ফল, বাতাসা এক এক জন এনে হাজির করল। ভবেশদের পুকুর পাড়ের খানিকটা জায়গা চেঁচে নিয়ে পূজার জায়গা হ'ল। ক্ষিতীশ কলার ডেগো কেটে কালী প্রতিমা তৈরি করল। সমস্ত আয়োজন শেষ হলে ক্ষিতীশ যখন পূজায় বসবে, তখন তার মনে হ'ল—তাই তো পূজায় বলি তো দিতে হবে। সে কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করে নিয়ে বলল—রসো ঠিক হয়েছে—আজ মা কালীর কাছে মহাবলি হবে।

সবাই আমরা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—মহাবলি কি? ক্ষিতীশ বিজ্ঞের মত হেসে বলল—"সবুর কর, সব বুঝতে পারবি।"

তারপর কলার ডেগো কেটে একটা মানুষের মত তৈরি করে জল দিয়ে ভুসো কালি গুলে তার উপরে লিখল "সেকেণ্ড মাষ্টার।" আমরা সবাই হেসে লুটোপুটি—মহা খুশী সবাই। ভাবলাম—ক্ষিতীশের কি মাথা! পূজা-শেষে বলি হবে। ক্ষিতীশ বললে কি দিয়ে বলি দেওয়া যায়—খাঁড়া চাই ত! ভবেশের উপরে হুকুম হ'ল ভাল একখানা দা আনবার। কিছুক্ষণ পরে ভবেশ একখানা ছোট কুড়ুল হাতে করে এসে বললে—দা খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্ষিতিশ বললে—বেশ কুড়ুলই সই। আমি নিজ হাতে বলি দেব। এই যা ত তুই ব্যাটাকে হাড়িকাঠে ফেলে ধর। যতীন কলার ডেগোরূপী মাষ্টারকে হাঁড়িকাঠে ফেলে চেপে

ধরল। তারপর সে এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার—কুড়ুল ঘাড়ে পড়তে না পড়তেই যতীন চীৎকার করে উঠল—চেয়ে দেখি যতীনের ডান হাতের তর্জ্জনীর দুটি গেরো কেটে একেবারে মাটিতে পড়ে গেছে—তীরবেগে রক্ত ছুটছে। চীৎকার শুনে বড়রা সব ছুটে এল। আমরা বনবাদাড় ভেঙে দে ছুট।

শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াল। ক্ষিতীশ সেই যে মাইল পাঁচেক দূরে মামার বাড়ী গিয়ে উঠল—আর মাস দুইয়ের ভিতর এ মুখো হ'ল না। স্কুলে সে আর কোন দিন আসে নাই—মা সরস্বতীর সঙ্গে সেখান থেকেই তার ছাড়াছাড়ি। আমরা—আমি, ভবেশ, পরেশ আর শৈলেন—পরের দিন অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ক্লাসে গিয়ে বসলাম। বলা বাহুল্য, ঘটনাটির পরই পাড়াময় একেবারে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা পড়লে আমাদের লাইব্রেরী-ঘরে ডাক পড়ল। আমরা চার জন সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। হেড মাষ্টার মশাইয়ের জেরায় একে একে সমস্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, ক্ষিতীশের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে আমরা মস্ত বড় এক বিবৃতি দিয়ে গেলাম—মায় সেকেণ্ড মাষ্টার ঘটিত ব্যাপারটি পর্য্যন্ত।

হেড মাষ্টার মশাই অনেক বিচার-বিবেচনার পর রায় দিলেন—ক্ষিতীশ এক নম্বর আসামী, আমি দুই নম্বর। সুতরাং এক নম্বরের অনুপস্থিতিতে দুই নম্বরের পিঠেই উভয়ের প্রাপ্য বর্ষিত হ'ল। ক্লাসে যখন ফিরে এলাম তখন চোখে সরষের ফুল দেখছি। এক কোণে বসে সারাবেলা ঝিমুতে লাগলাম। বাড়ীতে জ্যাঠা-মশায় একবার নির্ব্বিচারে ঠেঙিয়েছিলেন—স্কুলে এসেও যা সুবিচার পেলাম তাতে সারাটা মন রাগে দুঃখে রি রি করতে লাগল।

স্থির করলাম, আর বাড়ী ফিরব না। একটা ভয়ানক কিছু করে ফেলবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সেদিন ছিল শনিবার, সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল। স্কুলের কাছেই রাজ-কাছারী—কাছারীবাড়ীর সামনে ফুলবাগান। সকলের অলক্ষ্যে করবীফুলের গাছ থেকে দুই ছড়া বীজ তুলে নিলাম। স্কুল থেকে একটু এগিয়েই যে মেঠো পথটি সোজা নদীর দিকে গিয়েছে তারই এক পাশে একটি বড় বটগাছ ছিল। স্থানটি নির্জ্জন—কদাচিৎ কেউ এ পথে আসত। সেখানে এসে বসলাম।

সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছিল মনের ভিতর। কয়েকটা করবীফুলের বীজ চিবিয়ে খেলেই ত সব শেষ হয়ে যায়। যাক না ; কি হবে বেঁচে থেকে ? পরমুহূর্ত্তেই দারুণ ভয়ে সারা দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিল। মৃত্যু ! বাপ ! কি ভীষণ অবস্থা সে। কয়েক ঘণ্টা এই দ্বন্দ্বে কেটে গেল।

—"কেরে, যোগেন না ?"

পিছন ফিরে দেখি শশী পণ্ডিত। তাড়াতাড়ি করবীফুলের বীজের ছড়া দুটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কিছুই শশী পণ্ডিতের চোখ এড়াল না—সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটি তিনি বুঝে ফেললেন। কাছে এসে সস্নেহে পিঠে হাত রেখে বললেন—"যোগেন, এ কি সর্ব্বনাশা কাজ তুই করতে গেছলি বল্ ত ? আত্মহত্যা—মহাপাপ—মহাপাপ ! আমি যে বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না যোগেন !" বলতে বলতে তিনি আমাকে নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলেন। আমি শশী পণ্ডিতের কোলের ভিতরে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম। শশী পণ্ডিতও কেঁদে ফেলেছিলেন। ধরা গলায় বলতে লাগলেন, "যোগেন এখন থেকে তুই ভাল হ'। ওসব বুদ্ধি ছেড়ে দে। আমি তোকে বুকে করে রাখব—তোকে ঘিরে থাকব—কেউ তোকে কিছু বলতে পারবে না। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললাম, "আমি কিছু করি নি পণ্ডিত মশাই—যা করেছে ক্ষিতীশ।" শশী পণ্ডিত জামার নীচে হাত দিয়ে পিঠের বেতের দাগগুলোর উপরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ইস, এমনি করে মারে ! হেড মাষ্টার মশাইয়ের আজ বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল। তুই আমার সঙ্গে বাড়ী চল্ যোগেন—আমাদের বাড়ীতেই থাকবি। আজকের কথা কাউকে আমি বলব না। এখন থেকে যা ভাববি —যা করবি সব আমাকে বলবি, প্রতিজ্ঞা কর।" আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। মনে আছে সেবার সাতটা দিন শশী পণ্ডিতের বাড়ী ছিলাম, তাঁর সঙ্গে স্কুলে যেতাম, তাঁর সঙ্গে ফিরে আসতাম—রাত্রে এক সঙ্গে শুতাম।

তারপর যত দিন যেতে লাগল, ততই শশী পণ্ডিতের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে লাগলাম। তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন, বরাবর আমি বাংলায় ভাল ছিলাম। একদিন আমার স্কুলের খাতার ভিতর থেকে একটা কবিতা আবিষ্কার করে বললেন, "তুই লিখেছিস, যোগেন ?" আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। বললেন, "এতটুকু বয়সের কবিতা হিসেবে বেশ হয়েছে। কিন্তু শেষের লাইনটা যে চুরি করেছিস রে ? তোদের বইয়ের 'নিদাঘ' কবিতাটা থেকে নিয়েছিস।" মাথা নীচু করেই বললাম, "ওটা কিছুতেই মেলাতে পারলাম না পণ্ডিত মশাই।"—"তাই বলে চুরি করবি ? ও কখনও করিস না—তা হলে ভাল লেখক হতে পারবি না। তোর হাত আছে—লেখ লেখ—লিখে আমাকে দেখাবি, সংশোধন করে দেব।"

সোনাপুর পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তিনি। বেছে বেছে ভাল ভাল বই পড়তে দিতেন। আমার সেদিনের কিশোর-মনের ভেতর সাহিত্যপ্রীতির যে অঙ্কুরটি সবেমাত্র গজিয়ে উঠেছিল—তাকেই সযত্নে লালন করে, বড় করে তুলেছিলেন শশী পণ্ডিত।...তারপর কত দিন গেল—কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করে এসে মহকুমা শহরে প্র্যাকটিস করতে বসেছি। ডাক্তারীর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সাধনাও চলছিল—দুই-একটি মাসিকে সাপ্তাহিকে আমার লেখা মাঝে মাঝে ছাপা হচ্ছে, কিন্তু যা-ই লিখি সর্ব্বাগ্রে

শশী পণ্ডিতকে দেখানো চাই—তাঁর মতামতের মূল্য আমার জীবনে এতদিনেও কমে যায় নি।

২

কিছুকাল পরে কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার কি ঠিক আছে! আমি নদীয়া জেলার একপ্রান্তে এসে ডাক্তারি পসার জমাতে প্রাণপণে লেগে গেছি। আজ পাঁচ বৎসর ধরে সে কি কঠোর সংগ্রাম চলছে। শুধু নিজের আর পরিবারবর্গের অন্ন-বস্ত্রের জন্য যে সর্বক্ষণ এমনি করে নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে হয়—নিজের প্রাণরসটুকু নিঃশেষে এরই জন্য ঢেলে দিতে হয়, এ কি কোন দিন স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? খাটতে হবে, পয়সা রোজগার করতে হবে, খেতে হবে খাওয়াতে হবে—এই ত সংসার! এ না পার বনে যাও। তোমার ভদ্রতার বুলি, সৎকথার বুলি শিকেয় তুলে রাখ—কাণাকড়িও ওর মূল্য নেই, যদি না টাকা ঘরে আনতে পার। সুতরাং যে প্রাণরসের ধারায় একদিন সঞ্জীবিত ছিলাম সে অনেক দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। দিন দিন মানুষের উপরে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছি। এই ডামাডোলের ভিতর শশী পণ্ডিতও মন থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ এক দিন শশী পণ্ডিতের একখানা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, "যোগেন, আজ পাঁচ বৎসর তোমার সঙ্গে দেখা হয় না। বয়স ত ষাটের কোঠা ছাড়িয়ে চলল, শরীরও ভেঙে আসছে। তোমাকে একবার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হয়। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে। যদি তোমার মনের কোণে আমার জন্য এতটুকু স্থান থাকে, তবে একবার এস।"

হঠাৎ যেন চোখের সম্মুখ থেকে একখানা যবনিকা উঠে গেল—ফুটে উঠল বিগত জীবনের অনেকগুলো অধ্যায়। সে দেশ নেই, কাল নেই, পাত্র নেই, সমস্ত নিঃশেষে শেষ করে দিয়ে এসেছি। সারা অন্তর ব্যথায় টন্ টন্ করতে লাগল। একবার দেশে যাব ঠিক করলাম। আমার নিজেরও প্রয়োজন ছিল, ফেলে-আসা কিছু বিষয়-সম্পত্তির গোলযোগ রয়েছে—তা ছাড়া ছোট কাকু এখনও দেশে রয়েছেন, কিছুদিন ধরে তাঁর অসুখ চলছে, একবার দেখে আসা উচিত।

সীমান্তের ধাক্কা সামলে, অবশেষে আমি যখন বাড়ী পৌঁছলাম, তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার পর শশী পণ্ডিতের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। আমাদের বাড়ী থেকে অল্প দূরে তাঁর বাড়ী। কিন্তু এ কি হ'ল—নিজের গ্রামের সমস্ত পথ-ঘাট আমার অচেনা হয়ে গেল নাকি? চারিপাশের বন-জঙ্গলে পথের রেখাটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ঘুটঘুটি অন্ধকার যেন আমাকে চেপে ধরেছে। সেই বনবাদাড়ের উপরে টর্চের আলো ফেলে কতকক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দে দুই কান ঝিম ঝিম করছিল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর মূল রাস্তা ছেড়ে কোথাও বা বাগানের ভিতর দিয়ে, কখনও বা কোন বাড়ীর আনাচ-কানাচ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের এ পাড়াটায় খুব ঘন বসতি ছিল—পঞ্চাসনের হাঙ্গামার পর কে কোথায় উঠে গেল, সে খবর আর কেউ রাখল না।

আমার সাড়া পেয়ে শশী পণ্ডিত বললেন, কে, যোগেন? এস, এস!—সারাটা রাত তাঁর ওখানেই কাটাতে হ'ল। রাত্রি বারটা একটা পর্যন্ত চলল নানা আলোচনা। এরই মাঝে এক সময় বললেন, কি যে অবস্থায় আছি যোগেন—তোমাকে কি বলব। একখানা খবরের কাগজ নেই—একখানা মাসিক কি সাপ্তাহিক নেই। বাইরের সমস্ত খবরের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কবিহীন হয়ে, মড়ার মত পড়ে আছি। জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি একটা গভীর ভালবাসা ছিল আমার। কোথায় কোন্ লেখাটি বেরুল—তা আমার চোখ বড় একটা এড়িয়ে যেত না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দেখ এখন আর সাহিত্যের কোন খবর রাখতে পারি না। এ যেন কারাগারে পড়ে আছি।

আমি বললাম—মোহ যখন ভেঙেছে তখন এবার দেশ ছাড়ুন। শশী পণ্ডিত প্রতিবাদের সুরে মাথা নেড়ে বললেন—না, তা আমি যাব না—যে কয়টা দিন বাঁচি এই কারাগারেই কাটিয়ে যাব। তোমাকে এখনও আমার আসল কথা বলা হয় নি। অনেক রাত হয়েছে—ঘুমোও, কাল সব বলব।

৩

ভোর রাত্রের দিকে, ঘুম ভাল করে চেপে এসেছিল—উঠতে দেরি হ'ল। জেগেই শুনি শশী পণ্ডিতের বাইরের ঘরটা ছেলেদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে। হাতমুখ ধুয়ে বাইরে এসে দেখি রীতিমত স্কুল বসে গেছে। গুটি দশ-বার ছেলে, শশী পণ্ডিত তাদের লক্ষ্য করে একমনে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। চুপ করে তাঁর পাশে এসে বসলাম। বুঝলাম ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে, বক্তৃতার বিষয় ছত্রপতি শিবাজী। বক্তৃতা যে ধারায় চলছিল—এত অল্পবয়সী ছেলেদের তা উপযোগীও নয়, তাদেরও সেদিকে যে বিশেষ মনোযোগ আছে তাও মনে হ'ল না। এমনি পনর-কুড়ি মিনিট চলার পর বক্তৃতা শেষ হ'ল। এতক্ষণে আমার দিকে ফিরে বললেন কতক্ষণ উঠেছ—রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি বুঝি?

তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন—যাও, আজ তোমাদের ছুটি। আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই বললেন—বাড়ীতে একটা ছোট ক্লাস খুলেছি। স্কুলে আর কাজ করি নে।

আমি বললাম—স্কুল ছাড়লেন কেন?

—বলছি শোন, অবিনাশবাবু কাজ ছেড়ে চলে যাবার পর সেকেণ্ড মাষ্টার রমেশ সাহা হেডমাষ্টার হন। তিনি গত বৎসর চলে গেছেন। এখন হেডমাষ্টার হচ্ছে মৈনুদ্দিন মণ্ডলের ছেলে ইয়াসিন। ইয়াসিনকে চেন বোধ হয়—আমাদেরই স্কুলের ছেলে। বৎসর দুই আগে বি-এ ফেল করে বসেছিল। মাস পাঁচ-ছয় আগের কথা—সেদিন ক্লাস সিক্স-এ ইতিহাস পড়াচ্ছিলাম—

বিষয় ছিল রাণা প্রতাপসিংহ। ক্লাস সেরে লাইব্রেরীতে গেলে, ইয়াসিন আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—"ক্লাসে আপনি বড় বেশী বাজে কথা বলেন পণ্ডিতমশাই। পাঠ্য পুস্তকে যা আছে তাই পড়াবেন—তার বাইরে যেন কখনও না যান।

আমি বললাম—আমি তো মিথ্যে কিছু পড়াই নি।

ইয়াসিন অসহিষ্ণু হয়ে বলল—সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে নীতি নিয়ে—এই নীতিতেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে।

আমার কোন কথার আর অপেক্ষা না রেখে ইয়াসিন অন্য কাজে মন দিল। অনেক ভেবে দেখলাম—এদের সঙ্গে আমার মিলবে না। শুধু শুধু আর ঝগড়া করে লাভ কি? পরের দিনই পদত্যাগ-পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলাম।

পাঠ্য পুস্তকগুলির যে এখানে কি দশা হয়েছে তুমি তো দেখনি যোগেন। আমি বললাম—কিছু কিছু শুনেছি।

—সারাটা জীবন ধরে তো শিক্ষকতাই করলাম। এখন ভেবেছি দেশ ছেড়ে আর যাব না। যে কয়টা দিন বাঁচি ছেলেদের ভিতরে সত্যই প্রচার করে যাব। এরা যারা আমার কাছে পড়ে সবাই স্কুলের ছাত্র। সকালবেলা তাদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সত্যিকারের ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদির কথা বুঝিয়ে দেই। দিন-কয়েক এবার দেশে থেকে যাও যোগেন। সারাটা গ্রাম তোমাকে ঘুরে দেখাব, বুঝবে কত অসহায় এরা।

৪

মেজ কাকা বলছিলেন—শশী পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতে তিনি বললেন—তা না হলে কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে যায়? ঝগড়া করে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিল। এখন বাড়ীতে সব ছেলেপেলে নিয়ে হৈচৈ করে। পথে-ঘাটে কাউকে দেখলেই পাদ্রী সাহেবদের মত বক্তৃতা সুরু করে দেয়। মাস দুই আগে হরি জেলের উপর কতকগুলি দুষ্ট লোক উৎপীড়ন করেছিল। শশী পণ্ডিত তার পক্ষসমর্থন করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনল। বুড়ো মানুষ সব ঝক্কিতেই তোমার কাঠি দেবার দরকারটা কি শুনি?

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, কৈ শুনিনি ত ঘটনাটা।...

পরের দিন শশী পণ্ডিতকে ব্যাপারটি জিজ্ঞাসা করতেই তিনি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

বললাম, কিন্তু এই বয়সে আপনি কেন এ নিয়ে এত ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে যান—গাঁয়ে কি আর মানুষ নেই?

—মানুষ? মানুষ একটাও আমি খুঁজে পাই নি যোগেন। মানুষ যে আজ কোন্ স্তরে নেমে এসেছে, যদি জানতে! আর বয়সের কথা বলছ—বয়সকে আমি কোন কাজের বাধা বলে মানি নে।

সবিস্ময়ে শশী পণ্ডিতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম—এত তেজ, এত সাহস শশী পণ্ডিতের মাঝে কোথায় লুকিয়ে ছিল জানতাম না ত। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল।

গ্রামে এখন মোটে ঘর চল্লিশেক লোকের বাস। সারাটা গ্রাম সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। এই চল্লিশ ঘরের ভেতর বার-চৌদ্দটা বাড়ীতে শুধু মাত্র দু'এক জন করে বিধবা বাস করেন। কয়েকটি পরিবারের পুরুষরা রোগে ভুগে অক্ষম হয়ে পড়েছে। শশী পণ্ডিত প্রতিদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এদের খোঁজ খবর নেন। দরকার হলে হাট-বাজার থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ করে দেন। বাগ্দী ও জেলেদের পাড়ায় সন্ধ্যাবেলা গিয়ে কীর্ত্তনে যোগ দেন।...

বিষয়-সম্পত্তির কাজ শেষ করতে বেশ কয়েকটা দিন বিলম্ব হয়ে গেল। সেদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ছোট কাকু এসে খবর দিলেন—সে দিন তোমায় বলিনি যোগেন যে, শশী পণ্ডিতের এবার নিস্তার নাই। শেষ রাত্রি তাঁর বাড়ীর চারপাশে পুলিশে ঘিরে ছিল—সারা বাড়ীখানা তল্লাসী করেছে—শশী পণ্ডিতকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে উঠে, ছুটে বাইরে যাচ্ছিলাম—ছোট কাকু হাত চেপে ধরে বললেন, এই সব হাঙ্গাম হুজ্জতের মধ্যে তোর গিয়ে কাজ নেই যোগেন!

আমি বিরক্ত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, কাজ আছে বলেই ত যাচ্ছি—না থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম না।

শশী পণ্ডিতের বাড়ী পৌঁছে দেখি ছোট কাকু মিথ্যে বলেন নি। পুলিশ শশী পণ্ডিতের কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছে। পায়ের ধুলো নিতেই শশী পণ্ডিত একেবারে জড়িয়ে ধরে বললেন—এসেছিস যোগেন। তোর উপরে ভার রইল—দেশের যারা প্রাণ তাদের কথা তুই তোর সাহিত্য-রসে সঞ্জীবিত করে ছড়িয়ে দিবি দেশময়—এরা যে কত বড় অসহায় সেইটে ফুটিয়ে তুলবি তোর কলমে।

কিন্তু হায় শশী পণ্ডিত ত জানতেন না—একদিন যে কিশোরটির অন্তরে সাহিত্যরসের অঙ্কুর তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন—আজ নানা বিরুদ্ধ ঘটনার উত্তাপে সে একেবারে ছাই হয়ে গেছে। তবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। পুলিশ তাঁকে ঘিরে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ শুধু নির্ব্বাক হয়ে সেই পরিত্যক্ত প্রাঙ্গণে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।



অনন্তদাস অবশেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইলেন, শ্রীরাধা হইলেন রস-পসারিণী।

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল
পরিমল বকুল রসাল।
রূপের পসার পসারল রসবতি
গাহক মদন গোপাল॥

চণ্ডীদাস প্রধানতঃ বিরহ বিপ্রলম্ভের কবি। তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধা খেদ করিতেছেন :

'সখি রে, বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল, ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি কোকিলা কুহরে, গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা॥

এ হেন কালে প্রেমময় নায়ক যদি অন্তরিত রহিলেন তাহা হইলে ত নায়িকার 'জীবন যৌবন কাচের সমান ভেল।'

বিদ্যাপতি বলিতেছেন :

'ফুটল কুসুম নবকুঞ্জকুটীরবন কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম-শিখরে সিধারল পিয়া নিজ দেশ ন আওইরে॥
চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপহু উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রই দূরদেশে জানলু বিহি প্রতিকুল॥

সেই কান্তকে অভিসার-সঙ্কেত দিয়া শ্রীমতী বাসক-সজ্জা, সখীরা তাঁহার জন্য শয্যা রচনা করিতেছেন, 'মল্লিকা মালতী আর জাতী যুথী সাজাইছে থরে থরে।' দীর্ঘ বিরহ বিচ্ছেদের পরে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভাবসম্মেলন হইয়াছে, রাধা বলিতেছেন :

'এখন, কোকিল আসিয়া করুক গান, ভ্রমর ধরুক তাহার তান।
মলয় পবন বহুক মন্দ, গগনে উদয় হউক চন্দ॥"

আজ নব-বসন্তে শ্রীমতী রাধা হারানো রতন ফিরিয়া পাইয়াছেন।

বড়ই বিদগ্ধ কবি বিদ্যাপতি, তাই তাঁহারই কথায় বার বার ফিরিয়া আসিতে হয়। তিনি রাধাকৃষ্ণকে মিলাইলেন নব বসন্তে :

'নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল মাতঙ্গ নব অলিকুল।'

আবার,

'নবীন রসাল মকুল মধু মাতিয়া গায় নব কোকিলকুল।'

তখন,

'মধু ঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥'

তথায়,

'ঋতুপতি রাতি রসিক বরসাজ।
রসময়রাস রভস রসরাজ॥
রসবতী রমনী রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই॥"

সেই রাসনৃত্যে :

'বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল সারিগম পধ নিসা বহুবিধ ভাব।
ঘেটতা ঘেটতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি চঞ্চল স্বরমণ্ডল একুরাব॥
শ্রমভরে চলিত, গলিত কবরীযুত, মালতীমাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাসরস বর্ণনে বিদ্যাপতিমতি ক্ষোভিত অতি॥'

তাই বিদ্যাপতির রাধা বলিতেছেন :

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু,
দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দা॥
'সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় হউ চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥'
'দারুণ ঋতুপতি যতদুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সবদুখ গেল॥'

তাই ত শ্রীরাধা বলিলেন :

'আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥'

গোস্বামী রূপ প্রভুর কর্তৃক সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী' হইতে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী কর্তৃক 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি পরম রমণীয় চৈত্ররজনী স্মৃতির উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

কোনও নায়িকার উক্তি :

'যঃ কৌমারহরঃ সএব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা,
স্তে চোন্মীলিত মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি, তথাপি তত্র সুরতঃব্যাপারে লীলাবিধৌ,
রেবা রোধসি বেতসি-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥'

"যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই (ভাগ্যবশে) আমার বর হইয়াছেন, তিনি আজ এখানে উপস্থিত, সেদিনের মতই এই সব চৈত্ররজনী, তেমনই প্রস্ফুটিত মালতী পুষ্পের সুগন্ধে পরিপূর্ণ প্রগল্ভ কদম্ব-বনবাহী দক্ষিণ সমীরণ, আমিও ত সেদিনের সেই নায়িকা, কিন্তু তথাপি রেবা-নদীতীরে বেতসী-কুঞ্জে সেই রাত্রির প্রেমলীলার কথা স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

বৈষ্ণব কবির কাব্যে ঋতুপ্রকৃতি জীবন্ত, অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য্য।

বেমভূপাল-চরিত

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্যের সংখ্যা অল্প। সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরী, দশকুমার-চরিত প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট গদ্যকাব্য বাদ দিলে আর উল্লেখযোগ্য গদ্যকাব্য বিশেষ কিছুই থাকে না। তজ্জন্য অভিনব বাণভট্টের বেমভূপাল-চরিত গদ্যকাব্যকে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

অভিনব ভট্টবাণ এ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা বেম ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাজেই কোনও সন্দেহ নেই যে, বর্ত্তমান গ্রন্থ উক্ত সময়ের কিছুকাল পরে বিরচিত হয়েছিল এ গ্রন্থে বেমভূপালের বিজয়কাহিনী বর্ণিত আছে এবং যেভাবে গ্রন্থ শেষ হয়েছে, তাতে বেমরাজের প্রৌঢ়ত্ব প্রকাশ পায় না। কাজেই বলা যেতে পারে—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে নিশ্চিত এ গ্রন্থ বিরচিত হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হয় আরো এক প্রমাণ থেকে। বেমভূপাল তাঁর শব্দচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে বলেছেন—

বিদ্যারণ্যগুরূন্ সার্ব্বভৌমাদ্যখিলসৎকবীন্
নমস্কৃত্যাথ বাণেন ক্রিয়তে শব্দচন্দ্রিকা।

বিদ্যারণ্য বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন এবং সংস্কৃতশিক্ষা-সংপ্রসারণে দত্তপ্রাণ ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতভূমি স্বীয় জন্মপরিগ্রহে ধন্য করেছিলেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর শিষ্য অভিনববাণভট্ট খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বেম-ভূপাল-চরিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বামনভট্ট বাণ নলাভ্যুদয়, রঘুনাথ-চরিত(১) বাণাসুর-বিজয়(২) ও হংসদূত নামক কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। নলাভ্যুদয়-গ্রন্থ আংশিক প্রকাশিত হয়েছে এবং হংসদূত গ্রন্থও আমাদের সংস্কৃত দূতকাব্যসংগ্রহ গ্রন্থমালিকার চতুর্থ পুষ্পরূপে প্রকাশিত করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য দুটি গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নি। তাঁর রচিত নাটক পার্ব্বতীপরিণয় প্রকাশিত হয়েছে, কনকলেখা ও শৃঙ্গারভূষণ-ভাণ এখনও প্রকাশিত হয় নি। তাঁর অভিধান-গ্রন্থ শব্দচন্দ্রিকা(৩) ও শব্দ-রত্নাকর(৪) এখনও মুদ্রিত হয় নি।

বেমভূপালচরিতের বিষয়বস্তু

ত্রিলিঙ্গদেশান্তর্গত অদঙ্কী নামক নগরীর শূদ্রবংশজাত রাজা কামের বংশে উত্তরকালে প্রোল্ল নামক এক রাজা জন্মপরিগ্রহ করেন। বসন্তকালে একদিন মৃগয়ার্থ নির্গত হয়ে রাজা প্রোল্ল একটি হরিণীর পশ্চাৎধাবন করেন এবং কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সহকার বৃক্ষে দোলানো একটি দোলায় বিহাররতা এক সুন্দরীকে দেখে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। অকস্মাৎ এক রাক্ষস তাঁর বিদূষককে আক্রমণ করলে বিদূষকের করুণ চীৎকারে রাজা তার উদ্ধারের জন্য ছুটে যান, কিন্তু পুনরায় সেই উদ্যানে ফিরে এসে হিন্দোলান্দোলনরতা কমলনয়নীর আর সন্ধান পেলেন না। পরদিন নৃপতি প্রোল্ল পুনরায় তাঁর সন্ধানে নির্গত হলেন এবং কমল-সরোবরের তীরে বিচরণ করতে করতে একটি লতামণ্ডপের মধ্যে কোনও একটি রমণীর রমণীয় শয্যার পাশে তাঁর একটি প্রতিকৃতি দেখতে পেলেন। দৈবাৎ ঐ রমণীর একজন সখী ঐ ছবি নেওয়ার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলে রাজা তাঁর নিকট থেকে ঐ রমণীর ও প্রেমবিহ্বলতার বিষয়ে জানতে পারলেন। রাজা সখীর মারফতে স্বীয় হৃদয়ের বাণী দাক্ষিণাত্যের বিক্রমসিংহনগরীর রাজা ভুকথার-ঘট্টের কন্যা অনন্তার নিকট প্রেরণ করেন। কালক্রমে উভয়ের মিলন হ'ল এবং তাঁদের মাচ, বেম, দোড্ড, অল্ল ও মল্ল নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মাচের বেড্ড প্রোতভূপ, পেদ্দ কোমটীন্দ্র, ও নাগয়েন্দ্র নামক তিন পুত্র। পেদ্দকোমটীন্দ্র বিবাহ করেন অনন্তাম্বাকে। তাঁদের দুই পুত্র বেম ও মাচ—দু'জনে পাঁচ বৎসরের বড় ছোট। কালক্রমে বেমভূপাল পিতার সিংহাসনে আরূঢ় হলেন।

অতঃপর বেমভূপালের দিগ্বিজয় যাত্রা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের এই অংশ অতিশয়োক্তিদুষ্ট। এতে বলা আছে যে, বেমভূপাল কলিঙ্গ, উৎকল, অঙ্গ, বঙ্গ, ভঙ্গাল প্রথমে জয় করে সমুদ্র-তীর ধরে অগ্রসর হয়ে দ্রাবিড়, কাঞ্চী, পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশ জয় করলেন। অতঃপর গুর্জ্জর ও সৌরাষ্ট্র। সৌরাষ্ট্রে তিনি সোমনাথ দর্শন করলেন। তারপর এমন কি, পারসীক, সিন্ধু, হূণ, কম্বোজ প্রভৃতি দেশ জয় করে হিমালয়ে গেলেন। তৎপর বিন্ধ্যাচলে চণ্ডিকাপূজা সমাপ্ত করে স্বপুরীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব রাজসুখ ভোগ করতে লাগলেন।

গ্রন্থগৌরব

গ্রন্থবস্তু, বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখতে গেলে গ্রন্থটি যেন কাদম্বরীর কাহিনীর অনুরূপ। গ্রন্থের নায়কের একজন শিশু-

(১) ত্রিশ সর্গে সমাপ্ত। পুঁথি Adyar এবং তাঞ্জোর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

(২) পুঁথি নং আর. ৫২২৩

(৩) Triennial Catalogue, Madras, III. 3380; Mysore Cat. 609 এবং Tanjore Cat. Vol. IX, No. 5050

(৪) Adyar Library II. 16; Tanjore Cat, Vol. IX, Mss. 5058-61.

পুরুষের জীবনের ঘটনা নিয়ে গ্রন্থের চার উচ্ছ্বাসের মধ্যে তিন উচ্ছ্বাস রচিত হ'ল। চতুর্থ উচ্ছ্বাসে কবি কেবল বেমভূপালের দিগ্বিজয় বর্ণনা করেই গ্রন্থ সমাপ্ত করলেন। এই গ্রন্থকার কি বেমভূপালের বিবাহাদিও উল্লেখযোগ্য মনে করলেন না ?

আর দিগ্বিজয়-বর্ণনাটি তো একেবারেই রঘুর দিগ্বিজয়ের অনুকরণ। কালিদাসের মার্গ-ই কবি সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছেন এবং এ অনুকরণের প্রয়াসের ফলে কবি দিক ভুল করেছেন।

বেমভূপালচরিতের রচয়িতা কবি বামনভট্ট বাণ নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন—

বাণাদন্যে কবয়ঃ কাণাঃ খলু সরসগদ্যসরণীষু।
ইতি জগতি রূঢ়মযশো বামনবাণোঽপমার্ষ্টি বৎসকুলঃ॥

অর্থাৎ সরস গদ্য-রচন-পদ্ধতিতে বাণই কেবল সিদ্ধহস্ত, অন্য কবি নয়—এই প্রথিত উক্তিকে পরাহত করার জন্যই তাঁর উদ্যম! তার পরবর্তী কবিতাতেও তিনি নিজের সম্বন্ধে দম্ভোক্তি করেছেন। গ্রন্থের শেষভাগে পুনরায় কবি বলছেন—

প্রতিকবিভেদনবাণঃ কবিতাতরুগহনবিহরণময়ূরঃ।
সহৃদয়লোকসুবন্ধুর্জয়তি শ্রীভট্টবাণকবিরাজঃ॥
জয়তি কবিভট্টবাণে দধতি কবিম্মন্যভাবমন্যেপি।
প্রদ্যোতয়তি রবৌ দ্যাং খদ্যোতাখ্যা ন কিং নু কীটমণেঃ॥

এই দুই শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকে বাণ, ময়ূর ও সুবন্ধু শ্লেষমুখে আত্মতুলনা এবং দ্বিতীয় শ্লোকে নিজে কবি হিসাবে বিরাজমান থাকতে অন্য কবিরা সকলেই জ্যোতিঃবিহীন, দিশাহারা হয়ে থাকবেন—এই যে উক্তি, শীলবিশিষ্ট কবিরা পক্ষে তা অত্যন্ত অশোভন।

এত স্পর্দ্ধা ও আস্ফালন প্রকাশ করা সত্ত্বেও অভিনব বাণভট্ট সেই বাণভট্টেরই বহুধা অনুকরণ করেছেন—বাক্যবিন্যাসে ও ভাব-প্রকাশে; অন্যান্য কবির কাছেও তাঁর ঋণের ভার কম নয়। অভিনব বাণভট্টের মহোরস্কো, বৃষস্কন্ধো, সালপ্রাংশু, পুণ্ডরীকাতপত্রমলঙ্কৃত ইত্যাদি পদ একেবারে রঘুবংশের অনুরূপ; 'মানুষীষু স্থিতিষু কথমিয়-মুপপদ্যতে রূপসংপত্তিঃ' একেবারে অভিজ্ঞানশকুন্তলের 'মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সংভবঃ" প্রভৃতি শকুন্তলারূপবর্ণনের পূর্ণ অনুকরণ, সন্দেহ নাই। এই ভাবে এই কাব্যের বহু স্থলে কাদম্বরী, হর্ষচরিত, উত্তররাম চরিত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাবপ্রকাশে অনুকরণের দিক থেকে দু'একটি মাত্র উদাহরণ প্রদান করছি। বেমভূপাল-চরিতে আছে "প্রোল্লরাজ মৃগয়ার্থ গহন বনে প্রবেশ করলেন। অতিক্রমণগামী একটি হরিণের অনুসরণক্রমে তিনি বহু দূরে গিয়ে পড়লেন। তিনি সেখানে অনাঘ্রাত রমণীদেহগন্ধী বায়ুর আঘ্রাণ পেলেন এবং মধুর হিন্দোলগান শ্রবণ করলেন। গীত শব্দের অনুসরণপূর্ব্বক তিনি এক স্থানে গৌরাঙ্গী বিশ্ববিমোহিনী এক রমণীর দর্শন লাভ করলেন।" এই ঘটনার সঙ্গে কাদম্বরীর মৃগয়াসক্ত চন্দ্রাপীড়ের কিন্নরমিথুনের পশ্চাদ্ধাবন, দিব্যপ্রাণীর বিচরণযোগ্য অলৌকিক স্থান দর্শন, অলৌকিক গীতশ্রবণ ও মানুষদুর্লভ রূপের অধিকারিণী রমণীর দর্শন—এই সব ঘটনার পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এ ছাড়া বেমভূপাল-চরিতে কমলসরোবরের এবং আহবকোলাহল নামক গজহস্তীর বর্ণনা, কাদম্বরীর অচ্ছোদসরোবরের এবং গন্ধমাদন নামক হস্তীর বর্ণনার অনুরূপ। চন্দ্রাপীড়ের দিগ্বিজয় যাত্রাকালে ব্যবহৃত "একমহাভূতময়মিব" কথাটি বেমভূপালের বিজয়যাত্রায়ও অবিকল ব্যবহৃত হয়েছে। কাদম্বরীর বিন্ধ্যাটবী চণ্ডিকালয় বেম-ভূপাল-চরিতেও আছে; কেবল শাল্মলীতরুটি বটবৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। বেমভূপাল-চরিতের "অভিষেকজলপ্রবাহৈরিব সততমুপযান্তি জাড্যম্। প্রতাপানলধূমোপরুদ্ধদৃষ্টয় ইব ন দীর্ঘং পশ্যন্তি" প্রভৃতি বাক্য-বিন্যাস সুপ্রসিদ্ধ শুকনাসোপদেশের প্রতিচ্ছবিমাত্র।

এ সব সত্ত্বেও আমাদের হৃদয়ে সত্যই আনন্দের সঞ্চার হয় যখন আমরা ভাবি যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্দু-শাসিত ভারতের কোনও বিশিষ্ট অংশের এক প্রোৎসাহী কবি সুদীর্ঘকাল পরে সংস্কৃত গদ্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। স্বীয় রচনার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাসুরিদের ছায়া পড়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়, ক্ষতিজনক ও নয়। স্বীয় ভাব ও ভাষায় স্বচ্ছ-গতিতে কোথাও যদি বাধা না পড়ে, পূর্ব্ববর্ত্তী মহামনীষীদের ভাব পরবর্ত্তী রচনায় রেখাপাত করলে কি ক্ষতি হতে পারে ? পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের ভাবের টুকরাগুলি দানা বেঁধে যদি সার্থক আত্মপ্রকাশে ধন্য হয়, কবি ত তাতে সার্থককামই হবেন, সন্দেহ নাই। এমনি ধরণের সার্থক রচনা এই বেমভূপাল-চরিত। কবির সুললিত ভাষা ভাবের প্রাচুর্য্যে কি সুন্দর অগ্রসর হচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত রচনায়—

"তস্যাং চ পুরি নিবসন্, পুরন্দরপ্রতিমঃ, পূরিতার্থিজনকামঃ, কামনৃপতিবেকনগম্যনির্ব্বিশেষমশিষদশেষমতনিচক্রম্।

তস্মাচ্চ মার্ত্তণ্ডাদিব মানবো বংশঃ, চন্দ্রমস ইব পৌরবঃ সন্তানঃ-প্রবর্দ্ধমানঃ, মন্দাকিনীপ্রবাহ ইব মধুমথনচরণপ্রবৃত্তঃ, মহার্ণব ইব অনেকবাহিনীকলকলসনাথঃ, মন্দর ইব শ্রীসমুত্থানহেতুঃ, চন্দ্র ইব পরমেশ্বরশিরোলালিতঃ, প্রসসার মহীতলে মহান্ বংশঃ।"

এ ভাবে কবি কত জায়গায় কত মধুর ভাব সন্নিবিষ্ট করেছেন, ভাষা প্রয়োগ করেছেন। একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থে কত সরসতা, নবীনতা প্রকটিত হয়েছে!

তদুপরি এ গ্রন্থে বামনভট্টবাণ জ্যোতিষ, তন্ত্র, বেদ, ব্যাকরণ, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে, এমনকি, নাস্তিক দর্শনাদিতেও স্বীয় ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন। চতুর্থ উচ্ছ্বাসে তান্ত্রিক "চক্রে"র বা স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত উপাসনাপদ্ধতির একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা সংযোজিত করেছেন। ত্রিলিঙ্গদেশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রদত্ত শস্যাদির নামের তালিকা অতি বিস্তৃত এবং উল্লেখযোগ্য।

বহুকালের তন্দ্রাভঙ্গের পরে ভারতবর্ষ আজ চোখ খুলে পুনরায় বিশ্বের দিকে তাকাচ্ছে। দিকে দিকে উন্নতির সাড়া পড়ে গেছে।

নিখিল বিশ্ব কত দ্রুত তালে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় প্রায় সর্ব্ব-ভাষার জননী বা মাতামহী সংস্কৃত এখনও ভারতের খণ্ড-বিখণ্ড শক্তিকে আপনার শক্তিতে সংহত, সুসংবত করে রেখেছে। ভাষার এই একমাত্র অনন্তশক্তি যোগসূত্র, ভারতের অন্য সব যোগসূত্র অপেক্ষা প্রবল। অতীতের সমস্ত চিন্তাশক্তি, কার্য্যশক্তিও এর মধ্যে ভাবগূঢ় এবং অন্তর্লীন হয়ে আছে। এই শাশ্বত ভারতীয় শক্তির পুনরুদ্বোধন আজকের দিনে একান্তই কাম্য।

সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শত শত রত্নরাজি আহরণে ভারতবর্ষ কোনও দিন পশ্চাৎপদ হয় নি। আজ কালক্রমে যে বাচনভঙ্গি, জ্ঞানবিভা ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে, তারি আদর্শে নব নব রত্ন সংস্কৃত-সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে সংস্থাপিত করা হউক না কেন? বিংশ শতাব্দীর ভারতবাসীরা শাশ্বত ভারতীয় ভাষার সম্পদ বিধানের জন্য কি করতে পারে, তার প্রমাণ প্রদর্শন করার দিন আজ এসেছে। সংস্কৃতজননীর চিরোন্নত শিরঃ বীর-পুত্রবিভবে উন্নততর হউক।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে অন্য সব ভাষায় সংরক্ষিত মণিমাণিক্য কালের করালগ্রাসে হৃতগৌরব হবে; সংস্কৃত-সাহিত্যের মণিমাণিক্যই চিরদিন থাকবে প্রোজ্জ্বল। কত দেশীয় ভাষার নব নব উন্মেষমধুর লহরী সংস্কৃতসমুদ্রের চিরস্থির নীরে বিলীন হয়ে গেল—"তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত সাগরলহরী সমানা।" চিরস্থায়ী এ ভাষার সম্পদ বর্দ্ধন করে ভারতের চিরকালের জাতীয় সম্পদ বিবর্দ্ধনের জন্য বঙ্গবাসীরাই অগ্রণী হন না কেন?

নবতমা সখী

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

অনেক বয়স পার হয়ে গেল, চুল দাড়ি পাকলেই হয়। এমন সময় কি খেয়াল কে জানে, পড়ন্তি বয়সে বিয়ে করে বসল পঞ্চানন। সেটা একটা দাঁও তার পক্ষে। রূপার জন্য নয়, রূপের দিক থেকে। একেবারে কচি মেয়ে, রঙ দুধে আলতায় গোলা। মিষ্টি ছোট্ট মুখখানা, তাকিয়ে খুশী হতেই হবে—স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক না কেন সবাইকেই? পঞ্চাননের এতকাল কর্ম্ম ছিল আপিস আর বাড়ী, বাজার আর ঘর। একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল জীবন-প্রবাহ। মাঝে মধ্যে সেতারাটা নিয়ে বসত, ভোরে ভাঁইরো এবং রাত্রে মাল-কোষ, কেদারা বেহাগের সঙ্গত জমাবার চেষ্টা করত। জমবে কেন? জীবন-মধ্যাহ্নে সঙ্গীহীন একলা জীবন, সুর-ঝঙ্কারে অনু-রণিত হয়ে ওঠে না। সে প্রথম যৌবনের কথা। সুরের উন্মাদনায় কিনেছিল সেতার, ওটাকে বগলদাবা করে এখানে ওখানে যেত শিখতে। কখনও প্রেমে পড়ে নি পঞ্চানন। মনের ইচ্ছাটা সযত্নে লালন করেছে। বিশ্বাস ছিল, সেতার শুনে মোহিতা একদিন না একদিন কেউ হবেই। ওদের মধ্য হতে নির্ব্বাচন করবে জীবন-সঙ্গিনী। কিন্তু ঠাকুরের জীবনে ভাল করে পরিচয়ই হ'ল না রাগরাগিণীর সঙ্গে। উদাস অপরাহ্নে বা তামসী নিশীথিনীর বুকে উন্মুক্ত ছাদে অথবা প্রাঙ্গণে বসে বসে যত সুর-ঝঙ্কার আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিল তা পৌঁছল না কারও কানে, উদ্বেল করে তুলল না একটি হৃদয়কেও। সকাল-সন্ধ্যা বাড়ী-বাড়ী রেডিওর মর্ম্মভেদী চিৎকার শোনাই হয়েছে আধুনিক ফ্যাশান। অনভ্যস্ত হস্তের আলাপও শোনবার কেউ নেই। প্রথম দর্শনেই পূর্ব্বরাগ জন্মানোর যুগ আজ অবলুপ্ত। সুতরাং পঞ্চানন বিরক্ত হয়ে সেতার তুলে রাখল কোঠায়। ধুলা জমে জমে তারগুলো ঢাকা পড়ে গেল ক্রমশঃ। ভুলেই গেল সেটাকে পঞ্চানন। সব সখ শুকিয়ে জীবনের রঙও বোধ হয় পাণ্ডুর হয়ে এসেছিল। তবু উঠে পড়ে লেগে বিয়ে করে ফেলল সহসা।

এবার আসে পঞ্চাননের জীবনে একটা পরিবর্ত্তন। উদাসী যুবক ঘরকন্না গোছাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। এল ভাল ভাল ফুলের চারা, ছাদে টব উঠল রজনীগন্ধা, গোলাপের। জানালা দরজায় ঝুলল চীনে হাঁস, লেগহর্ণ মোরগ, লোটন পায়রা—আঁকা চিত্র-বিচিত্র পর্দা। ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, ছবি, শুচ্ছের জড়ো করবার তালে পঞ্চানন টাকাকড়ি দেনা করে বেড়ায় চারিদিকে।

পঞ্চাননের নব-পরিণীতা হীরালেখা একেবারে নাবালিকা। দুনিয়ার হাটে কত কি যে কেনাবেচা চলে তা বেচারা জানে না। পঞ্চানন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বৌকে মানুষ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। বিকালে আপিস থেকে ফিরে সাজাত হীরালেখাকে, সে কি যেমন তেমন—এক এক দিন কত বৈচিত্র্যের ঘটা। ছোট্ট একটি ফুলপরী সাজিয়ে তুলত ঘণ্টাখানেক খেটে। তখন হীরাকে দেখে মনে হ'ত বাস্তব ধূলিমলিন দুনিয়া তার জন্য নয়, আলো ঝল-মলে 'শো-কেসে' তুলে রাখলেই মানায় ভাল—কিংবা ডল পুতুল বলে কোন "এগজিবিশনে" দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য একথা পঞ্চাননকে জানানো হয় নি। জানালে খেয়ে ফেলবে হয় ত। স্ত্রীকে এত ভালবাসে, যে-কোন মুহূর্ত্তে প্রাণ দিয়ে ফেলাও আশ্চর্য্য নয়। ঝলমলে সৌন্দর্য্যের রঙীন প্রজাপতি হীরালেখা। সন্ধ্যায় বের হয় পঞ্চাননের সঙ্গে, মাথায় নেই কাপড়, সিঁদুর নেই সিঁথিতে—পাড়ার রসিককুল গা টেপাটিপি করেন—বর্ষীয়সীরা করেন কানাকানি। পঞ্চানন আমার বয়স্য। সুতরাং হীরালেখা আমার নবতমা সখী। আমি রাস্তায় এসে দাঁড়াই, দোতালার জানলায় চন্দ্রবদনীর সাক্ষাৎ মেলে। পঞ্চাননের ভয়, মুখে কোন মন্তব্য না করলেও কাগজ-কলমে ঠিক চালিয়ে দেব। তাই 'আলটিমেটাম' দিয়ে রেখেছে; আমাদের নামে কিছু লিখলেই 'কেস' করব। বললাম, দাঁড়াও সখা! সখীসহ পত্রের ব্যাবে ফেঁসে মর আগে, তার পর 'কেস' করো।

গল্প ফাঁদলাম। একটা কিছু ঘটাতে হবে ত আমার নায়ক-নায়িকা দুটিকে নিয়ে। লিখলাম, 'পঞ্চাননকে লেখার পছন্দ নয়। ওর এত আদর, উৎপীড়ন, মুখ বুজে সহ্য করে, কিন্তু মন যেন সাড়া দেয় না। বড্ড গম্ভীর পঞ্চানন, বড্ড বৈষয়িক, হাল্কা আমোদ, ঠাট্টা-তামাশাকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয় না। প্রত্যেক দিন জানলার নীচে এসে দাঁড়িয়ে থাকে জয়কৃষ্ণ। লেখা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। খুব ভাল লাগে···ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত দেখালাম—লেখার গর্হিত আচরণে পঞ্চানন মনোবেদনায় কুৎসিত কাণ্ড করে বসল।' গল্পটার নাম দিলাম 'অসতী'।

এ গল্পটা খুব মনঃপূত হ'ল না আমার। আর একটা লিখলাম ওদের নিয়ে, ভাবটা এবার উল্টো।

···"প্রতি দিনই দেখা হয়। হাসি, ঠাট্টা-তামাশা করি। লেখা ভারি খুশী হয়, লক্ষ্য করে দেখেছি, আমি এলেই গোটা বাড়ীটা যেন আনন্দে হেসে ওঠে। লেখাকে চাই—ভাবতে ভাবতে পাগল হবার দাখিল। ওদিকে পঞ্চাননের মুখে অপ্রসন্নতার রেশ, আমাকে দেখলে তার ঈর্ষা হয় বুঝি, কিন্তু আমি কি করব, জোর করে ত লেখার হৃদয় কাড়ি নি। সে যদি স্বেচ্ছায় দিয়ে থাকে। একদিন ভুল ভাঙল অতি নির্ম্মমভাবে। পঞ্চানন কোথায় যেন গেছে। বললাম গিয়ে, 'চল সখি, আজ আমার সঙ্গে, নূতন বই আছে সিনেমায়।' ভারি চালাক মনে হ'ল সেদিন তাকে। কত যে ছলনার অবতারণা করল তার ইয়ত্তা নেই। বুঝলাম, সম্পূর্ণরূপে ওর হৃদয়টাকে জয় করতে পারি নি। তাই আস্থা স্থাপন করতে পারছে না। পুনরায় বুদ্ধির মহড়া চলতে লাগল—ছলা, কলা, বাক্যের ছটা, হাসির ফোয়ারা। একদিন ধীরালেখার হাবভাবে স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, আসক্তির চিহ্ন। মাথায় আগুন জ্বলল। দুপুরে আপিস পালালাম পঞ্চানন তখন অনুপস্থিত। ডাকাডাকি করায় ধীরালেখা জানালা থেকে উদ্বিগ্নভাবে মুখ বাড়াল, ব্যাপার কি বলুন দেখি?

দরজাটা কি খুলবে সখি!

দরকার কি বলুন না!

দরকার?···একটু হেসে বললাম, এই সখীর হাতে এক কাপ চা খেয়ে যাব আর কি!

কিন্তু উনি ত নেই। দরজা ত খুলতে পারব না। বিকেলে এসে যত খুশি চা খেয়ে যাবেন।

অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু। কি ভাবে ওর মনস্তুষ্টির কথা বলব খুঁজে পাই না। বলি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে, তা'হলে চলি!

ধীরালেখা বলল কঠিন কণ্ঠে, মাপ করবেন, একটা কথা বলি—এরকম ভাবে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে আর আসবার চেষ্টা করবেন না। আপনার আচরণে আজকাল যা লক্ষ্য করছি তা মোটেই প্রশংসাজনক নয়, একটু সংযত হবার চেষ্টা করবেন।

জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল ধীরালেখা আমার মুখের সামনে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল অগ্নিদাহ নেমে আসে দুপুরের রৌদ্রদগ্ধ রাজপথে···"

এই গল্পটার নাম দিয়েছিলাম "সতী"।

পঞ্চাননকে বললাম, তাই গল্প লিখেছি দুটো। তোমরা দুজনে বসে এক সময় বল, পড়ে শোনাই। 'কেস' করব—তা লেখালেও লিখেই ভয়ে ভয়ে ছিল পঞ্চানন। তার নবপরিণীতাকে কি রূপ-দান করি সেটা দেখবার বাসনা কম নয়। আমার সঙ্গে সখী-সম্পর্ক হলেও পঞ্চানন একেবারে ধীরালেখার সামনে যেতে দেয় না আমাকে। ওর চেহারাটাকে তার বিশাল বপু দিয়ে আবৃত করে দাঁড়ায়; আর কথাবার্ত্তায় তাড়াতাড়ি ছেদ টেনে বাইরের পানে হাঁটতে হাঁটতে আমাকে এগিয়ে দেয়। গল্পটা শুনতে গেলে একটু উদার হতে হবে তাকে। আমার চুক্তি, সস্ত্রীক শুনতে হবে। নইলে পড়ব না। একেবারে ছাপিয়ে ফেলব।

কথক ঠাকুরের মত মেঝের উপর জাঁকিয়ে বসলাম, পঞ্চানন আর ধীরা আমার সামনে বসে পাশাপাশি। দেখলাম, কৌতুকে সখীর চোখদুটি নাচছে। রক্ত অধর-কিশলয়ে শশিলেখার মত হাসির বাঁকা রেখা। বললাম, সখি! নিছক গল্প এগুলো। সিরিয়াসলি নেবেন না কিন্তু। শুনুন—গল্পের নাম সতী, বলে কাহিনীটা গড়গড় করে পড়ে গেলাম। মাঝে মুখ তুলে দেখি পঞ্চানন দাঁত বের করে হাসছে আর সখার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, মুখ শুকিয়ে আমসী।

গল্পটা শেষ হতেই পঞ্চানন বলল, বাঃ চমৎকার হয়েছে।

সখীর কি মত? জিজ্ঞাসা করি। ধরা গলায় ধীরা বলল, ধন্যি আপনার কল্পনা!

তা হলে দ্বিতীয় কল্পনাটুকু শুনে ধন্য হন! গল্পটার নাম 'অসতী'। ওটার বিপরীত ভাব!

পঞ্চানন সোল্লাসে বলে, তাতে কি হয়েছে! চালাও!

প্রবল উৎসাহে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম গল্পটা। শেষ হতে না হতেই ধীরালেখা উৎকট চিৎকার করে উঠল—না না, এ হতে পারে না···

সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে মূর্চ্ছা গেল সে। আমি স্তম্ভিত। বোকা মেয়েটা সামান্য গল্পের রহস্যও বুঝল না। পঞ্চানন 'কেস' করব বলে ভয় দেখিয়েছিল কিন্তু সে বেচারা স্ত্রীর অবস্থা দেখে নার্ভাস হয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টার পরে জ্ঞান ফিরে এল লেখার। কিন্তু ঐ প্রলাপ-বকুনি থামল না;···এ হতে পারে না···এ হতে পারে না···

অপরাধীর মত সঙ্কুচিত মন নিয়ে ফিরে এসে গল্প দুটোতে অগ্নি-সংযোগ করলাম তৎক্ষণাৎ। পঞ্চানন ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে স্ত্রীকে সুস্থ করেছিল বটে, কিন্তু তার মানসিক ভীতিটাকে একেবারে তাড়াতে পারে নি! থেকে থেকে মূর্চ্ছা যেত। বিশেষতঃ আমাকে দেখতে যদি পেত জানালা থেকে, দূরে হেঁটে যাচ্ছি তৎক্ষণাৎ, 'এ হতে পারে না, হতে পারে না' বলে মূর্চ্ছা যেত ধীরালেখা। পঞ্চানন মুখ-দেখাদেখি বন্ধ করল, তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে সে বাড়ী ছেড়ে পাড়া বদল করল। কি পুরুষ, কি মেয়ে কাউকে আজকাল স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয় না।

একটা বানানো গল্পের জন্ম আমার প্রকৃত সখীকে হারালাম।

নবজাগ্রত শ্রমিক ও শ্রমমূল্য

শ্রীবেঙ্কিকোৎ শেনোয়

অনুবাদক—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১

শ্রমের বিনিময়ে যে আয় হয় তাহাই মজুরী। কিন্তু কাজের বিনিময়ে সকল আয়ই মজুরী নহে। 'মিলের এজেন্ট' তাঁহার শ্রমের জন্য যে আয় করে তাহাকে মজুরী বলা চলে না। আর মিলের ম্যানেজার যে উপার্জ্জন করে তাহার আয় এক ধরনের মজুরী। কোন নিয়োগকর্ত্তা বা মালিকের আজ্ঞাধীন থাকিয়া তাহার জন্য কাজ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে যখন কোন আয় হইবে তখন তাহাকে মজুরী বলিব। সহজ কথায় ইহা শ্রমিকের কর্ম্মশক্তি-বুদ্ধি ও হাতের কাজ—ভাড়ায় খাটানো। বিষয়টির মূলে 'চুক্তি' এবং 'মালিকের তত্ত্বাবধান' সুস্পষ্ট। প্রত্যেক 'শ্রমিক-মালিক' সমস্যায় এই দুইটি সর্ত্ত দেখা যায়। যদি কোন শ্রমিক যে কাজ পূর্ব্বে মালিকের অধীনে করিত তাহা স্বাধীনভাবে নিজে করিয়া কোন আয় করে তবে সেই আয়কে মজুরী বলে না। এরূপ স্বাধীন কর্ম্মীর সমস্যা উকীল, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের সমস্যার মত।

২

শ্রমিক দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধি ও গুণগত উৎকর্ষের দিকেই মালিকের নজর, আর শ্রমিকের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিবদ্ধ মজুরী বৃদ্ধির দিকে সমাজতন্ত্রকে অনেকে উপহাস করিয়া বলেন যে, ইহা সমাজের বেশী মজুরী ও অল্প কাজের অবস্থা। সমাজতন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা করা বাস্তবের বিকৃতি। বুদ্ধিমান শ্রমিকেরা কখনও কাজ এড়াইতে চায় না। তাহারা কঠিন পরিশ্রম করিয়া বেশী আয় করিতে চায়। যুক্তরাজ্যে আজ "পূর্ণ শ্রম-নিয়োগ" (full employment) বর্ত্তমান। সেখানে মালিকের কারখানায় কিংবা অবসর সময়ে অপরের অধীনে অতিরিক্ত খাটিয়া শ্রমিকেরা বাড়তি আয় করে, অবসর সময় কাজ না করিয়া কাটায় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার বিপরীত দেখা যায়—সেখানে শ্রমিকেরা অবসর ভোগ করে। অবসর সময়ে কাজ করা মোটেই পছন্দ করে না। অনেক দেশেই সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহে ছুটির পরিমাণ দুই দিন। ইহার একটি কারণ হয়ত এই যে, আমেরিকার শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান খুব উচ্চ, অথবা শ্রমিক একাদিক্রমে পাঁচ দিন কাজে ব্যস্ত থাকায় তাহার গৃহের কাজ এত জমিয়া যায় যে সপ্তাহশেষে তাহা পরিষ্কার করিতে দুই দিন লাগে।

৩

সাম্রাজ্যতন্ত্র ও উপনিবেশতন্ত্রের দিন আজ প্রায় ফুরাইয়াছে, গণতন্ত্রে ভোটদাতারা আইনতঃ ও কার্য্যতঃ রাজ্যশাসনের অধিকারী হইয়াছে—আজ শ্রমিক-মালিকের সমস্যা নূতন করিয়া ভাবিতে হয়। কেবল মজুরী বৃদ্ধির দিকে নহে, অন্যান্য সুবিধা, চিকিৎসার সুযোগ দান, বোনাস ও লাভের অংশীদারী, এমন কি পরিচালন-বিষয়ে শ্রমিকের অংশগ্রহণ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচালক। জীবন্ত গণতন্ত্রে জাতীয় উৎপাদিত সম্পদের অংশ হইতে শ্রমিককে বেশীদিন বঞ্চিত রাখা যায় না। শ্রমিকগণ অন্যান্য ভোটদাতাদের সহিত যোগাযোগে যদি নূতন একদলকে 'সরকারের' পদে স্থাপিত করিতে পারে বা পুরাতন সরকারকে হটাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে নিজেদের কার্য্যের অবস্থা ও মজুরী প্রভৃতির সংশোধন বা পরিবর্ত্তন, এমনকি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য ঐ সকলের উপর কতকটা কর্ত্তৃত্ব স্থাপন মোটেই অস্বাভাবিক নহে—কারণ এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরূপে যে আয় হয় তাহা দ্বারাই তাহাদের নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ বা এক কথায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ইংলণ্ডে রক্ষণশীল সরকারই প্রথমে সমাজ-হিতসাধন সম্পর্কীয় আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ইহা একটি বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা নহে। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমানেও যে তাহারা সমাজতন্ত্রী সরকারের মতই কাজ করিয়াছে ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা সময়োপযোগী কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে বা করিতেছে।

৪

অনেক দেশেই শ্রমিকসঙ্ঘের নেতা এবং মালিকগণের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের পর মজুরী নির্দ্ধারিত হয়। ভারতবর্ষে মাত্র কয়েকটি শিল্পে এরূপ হয়, যথ—কাপড়ের কলে। ভারতে দরকষাকষি করিয়া মজুরী নির্দ্ধারণ অন্যান্য শিল্পেও বাড়িতেছে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে শ্রমিক-সঙ্ঘ একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। যেখানে বেকার-সমস্যা বর্ত্তমান সেখানে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শ্রমিকই দরকষাকষির ব্যাপারে অসহায়। শ্রমিকেরা বাজারদরের খবর রাখে না। মালিকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মজুরী দাবাইয়া রাখিতে পারে। শ্রমিকসঙ্ঘ মালিকগণের জোটের বিরুদ্ধে লড়িয়া শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে এবং প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরী আদায় করিতে সমর্থ হয়।

৫

শ্রমিকসঙ্ঘ মজুরীর হার সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু করিতে পারে না। অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরী হইতে অতিরিক্ত মজুরী আদায় করিলে তাহা অল্পকালস্থায়ী হয়। এরূপ একশ্রেণীর শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধিতে সেই শিল্পে নিযুক্ত সহকর্ম্মিগণ

যদি ক্ষতিগ্রস্ত নাও হয় তাহা হইলে বাহিরে অপর একদল শ্রমিক অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শ্রমিকগণের সংখ্যা (সরবরাহ) কমাইয়া মজুরী বৃদ্ধি করা সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে যে সকল শিল্পকে বিদেশী ও দেশীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, সেই সকল শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। ১৯২১ সনের ধর্ম্মঘটের সময় ইংলণ্ডের কয়লাখনির মজুরগণ এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। এই ধর্ম্মঘটে প্রত্যেক খনি-মজুর যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু ইউরোপের (কন্টিনেন্ট) খনি-মজুর পুরাদমে কাজ চালাইয়াছিল, ফলে ব্রিটিশ কয়লার ব্যবসায় ও ইংরেজ কয়লা-শ্রমিকের ক্ষতি হইয়াছিল।

৬

সামগ্রিকভাবে শ্রমিকসঙ্ঘ শ্রমিক সরবরাহ বিষয়ে কর্তৃত্ব করিতে পারে। কিন্তু এই উপায়ে প্রতিযোগিতার দ্বারা যতটা মজুরী পাওয়া যাইবে তাহা অপেক্ষা বেশী মজুরী স্থায়ীভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে উহার (চাহিদা কমিবার দরুন) উৎপাদন কমাইতে হইবে এবং নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইবে। একদল লোক বাড়তি মজুরিতে নিযুক্ত থাকিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একদল বেকার হইয়া পড়িবে। এই বেকারের সংখ্যাই যথাসময়ে বাড়তি মজুরী নিয়োগ করিবে। যদি উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কোনরূপ সঙ্কুচিত না হয় (inelastic demand) তাহা হইলে অবশ্য নির্দিষ্ট একচেটিয়া কারবারে মজুরীবৃদ্ধি সত্ত্বেও বেকার-সমস্যা দেখা দিবে না। কিন্তু এই মজুরী বৃদ্ধির দরুন দুইটি বিপদ দেখা দিবে। উচ্চ মজুরী নূতন শ্রমিকগণকে আকর্ষণ করিবে এবং এই নবাগতরাই শ্রমিকসঙ্ঘের একচেটিয়া শ্রমিক সরবরাহের অবসান ঘটাইবে। শিল্পমালিকগণ স্বল্প ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য শ্রমিক-নিয়োগ কমাইয়া উন্নত কলকব্জার ব্যবহার করিতে থাকিবে। আবার বিশেষ শিল্পে মুনাফার পরিমাণ কম হইলে যে শিল্পে লাভ বেশী এবং যেখানে শ্রমিকসংগঠন অল্প শক্তিশালী সে স্থানে মূলধন স্থানান্তরিত হইবে। এই সকল শক্তির যোগাযোগে ও প্রতিক্রিয়ায় মজুরীর হার স্বাভাবিক স্থানে নামিয়া আসিবার সম্ভাবনা।

৭

উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিকসঙ্ঘ কদাচিৎ কখনো প্রতিযোগিতায় যে মজুরী হওয়া উচিত তাহার বেশী মজুরী আদায় করিতে পারে—অভিজ্ঞতাও ইহাই সাক্ষ্য দেয়। এই বিষয়ে অধ্যাপক লিওনাল রবিন্স বলেন—"এখানে সেখানে দুই-একটি ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হইলেও ইংলণ্ডের মজুরীর ইতিহাসে অবাধ প্রতিযোগিতা আর্থিক মজুরী ছাড়াইয়া কোথাও মজুরী স্থায়ীভাবে বিশেষ বাড়িয়াছে—ইহাঁ দেখা যায় না।" যুক্তরাজ্যের গৃহনির্ম্মাণ শিল্পে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইংলণ্ডের বিল্ডিং শ্রমিকসঙ্ঘ—বহুদিন শিক্ষানবিশী করিয়া যাহারা সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা ব্যতীত আর কাহাকেও এই শিল্পে নিযুক্ত হইতে দেয় নাই। ইহাতে একদিকে সাধারণ শ্রমিকের, অন্যদিকে সমাজের অপর সকলের ক্ষতি হইয়াছে। ইহার দরুন একদিকে যেমন গৃহের মূল্য অস্বাভাবিকরূপ বাড়িয়াছিল, অপর দিকে তেমনই অন্যান্য শিল্পগুলিতে শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত বেশী ভিড় জমাইয়াছিল।

৮

এই যুক্তি অনুসারে সহজ কথায় ইহাই বুঝা যায় যে, কোন একদল শ্রমিক যদি জাতীয় আয় হইতে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য মজুরী অপেক্ষা বেশী আদায় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাদের সহকর্ম্মী আর একদল শ্রমিক সেই অনুপাতে নিজেদের ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত হইবে। অতিরিক্ত মজুরী মূলধন হইতে আসিবে না। সামগ্রিকভাবে উচ্চ মজুরী মুনাফার উপর ভাগ বসাইতে পারে মাত্র। কিন্তু মূলধনের স্বাধীনভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে উহা ধীরে ধীরে অপর শিল্পে নিয়োগ হইতে থাকিবে অথবা শ্রমিক নিয়োগের পরিবর্ত্তে ভাল কলকব্জার ব্যবহার আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ডের গৃহ-নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে যে এত বেশী কলকব্জার প্রয়োগ তাহার অন্যতম কারণ বিল্ডিং শ্রমিকসঙ্ঘের তৎপরতা। যে দিক দিয়াই বিচার করা যাক, দেখা যায় শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রমিকসঙ্ঘগুলি সফলতা অর্জ্জন করুক আর না করুক, ন্যায্য অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী ন্যায়তঃ যে মজুরী হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা বেশী মজুরী আদায়ের জন্য তাহাদের সংগ্রাম ও সংঘাতের বিরাম নাই এবং এই সংগ্রামের যে ফল (ভাল বা মন্দ) তাহা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকসঙ্ঘের সভ্যগণ বা অপর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা ভোগ করে। যাহারা উৎপাদিত দ্রব্যের ভোক্তা (খরিদ্দার) তাহাদিগকেও মজুরী বৃদ্ধির বোঝা বহিতে হয়। সর্ব্বশেষে—অনেক পরে আঘাত লাগে মূলধনের গায়ে। কাজে কাজেই শ্রমিকের সংগ্রাম নিছক মূলধনের সঙ্গে নহে। পরোক্ষভাবে শ্রমিকেরা নিজেদের ক্ষতি করে, শ্রমিকসাধারণের ক্ষতি করে, দ্রব্যের ক্রেতা, এমনকি জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করিয়া থাকে।

৯

এই দিক দিয়া বিচার করিলে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃগণের দায়িত্ব খুবই গুরুতর। যে মজুরী প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে প্রাপ্য এবং অর্থনীতিসম্মত সেইরূপ মজুরীর নীতিই অনুসরণ করা উচিত। এই সীমার উর্দ্ধে মজুরী না বাড়াইবার চেষ্টাই সুবুদ্ধির কার্য্য। জাতি কর্তৃক বৃহত্তম উৎপাদনের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য সমাজে পূর্ণ নিয়োগ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু শিল্পের উপরে অতিরিক্ত মজুরীর বোঝা চাপাইলে এই আদর্শে পৌঁছানো সম্ভব নহে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের নেতৃবর্গের সকল সময়ই সভ্যগণের দূর ভবিষ্যতের মঙ্গল, অন্যান্য শ্রমিক-স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের কথা স্মরণ রাখা উচিত। আজ শ্রমিক খুবই জাগ্রত এবং মারমুখো, সুতরাং বিষয়টা

খুবই গুরুতরভাবে চিন্তনীয়। আর্থিক সীমার ঊর্দ্ধে মজুরীর দাবি মিটানো সম্ভব নহে। উৎপাদন-বৃদ্ধির দ্বারাই মজুরী বাড়ানো এবং বাড়তি মজুরী রক্ষা করা সম্ভব। গণ-আন্দোলন করিয়াও হাতের তাঁতির মজুরী তাঁতকলের শ্রমিকের মজুরীর সমান করা যাইবে না। শ্রমিকসঙ্ঘ থাকুক আর নাই থাকুক, এদেশের কলের মজুর যে মাত্র দুইখানি তাঁত চালায় তাহার মজুরী আমেরিকার যে শ্রমিক ৩২ হইতে ৭৮খানি স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালায় তাহার মজুরীর সমান হইবে না।

১০

এই পর্য্যায়ে যুক্তিসিদ্ধ পুনঃসংগঠন (Rationalisation) বা কাপড়ের কলের কিংবা উহার কাজ সঙ্কোচনের প্রশ্নটা আসিয়া পড়ে। যুক্তিসিদ্ধ পুনঃসংগঠন দ্বারা কোন শিল্প পুনর্গঠিত হইলে ভবিষ্যতে কেবল সেইগুলিতেই শ্রমিকের মজুরী বাড়ে না, পরোক্ষভাবে অন্যান্য শিল্পেও মজুরী বৃদ্ধি পায়। শিল্প পুনর্গঠন দ্বারা প্রত্যেক শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সুতরাং জাতীয় উৎপাদন তথা আয় বাড়ে। জাতীয় আয় হইতেই শ্রমিকের মজুরী আসে, সুতরাং যাহাতে জাতীয় আয় বাড়ায় তাহাতেই মজুরীও বাড়ায়। তবে যুক্তিসিদ্ধ পুনঃসংগঠন দ্বারা যে কতকটা বেকার অবস্থার সৃষ্টি তাহা হয় নিতান্তই সাময়িক। এইরূপ বেকার অবস্থার প্রতিকারের জন্য শিল্প পুনঃসংগঠন কাজে বাধা দেওয়া অদূরদৃষ্টির কাজ।

১১

কাপড়ের কলের প্রসার রোধ করিলে তাহাতে কলের কর্ম্মিগণের স্বার্থের হানি হয়। এরূপ করিলে শিল্পে শ্রমিক সম্পর্কিত মোট চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং প্রত্যেক শ্রমিকের আরও আয় বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বাঁধাধরা সীমার মধ্যে উৎপাদন ও শ্রমনিয়োগ পরস্পরের প্রতি ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা উভয়ের ক্ষতি করিবে। অবশ্য কলের কাপড়ের উৎপাদনের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য—হস্তচালিত তাঁতশিল্পের প্রসার সাধন। কিন্তু এরূপ কার্য্যের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে মিল এজেন্ট, কাপড়ের কলের অংশীদারগণ লাভবান হয়, কলের কাপড়ের খরিদ্দারগণ শাস্তি পায় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির পথ সঙ্কুচিত করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা বা খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়িয়ে মিলের কাপড়ের দাম বাড়িবে। খরিদ্দার মিহি কলের কাপড় পছন্দ করে, এজন্য তাঁতের কাপড়ের বদলে বেশী দামে মিলের কাপড় কেনে। যে সকল শিল্পে উৎপাদনের যোগ্যতা খুবই কম তাহাদের সাহায্যের জন্য যোগ্যতর শিল্পের উৎপাদন সঙ্কুচিত করিলে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কিংবা জাতির কোন মঙ্গল হয় না। যদি ম্রিয়মাণ হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে অম্লজান প্রয়োগদ্বারা বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে কলে উৎপন্ন কাপড়ের ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের উপর কর চাপানোই ঠিক, কাপড়ের কল শিল্পের প্রসার রোধ করিবার জন্য ক্লোরোফর্ম প্রয়োগদ্বারা তাহাকে নিস্তেজ করা উচিত নহে।

১২

প্রবন্ধের উপসংহারের পূর্ব্বে সম্প্রতি ব্লকপোর্টে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন বা কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিব। পূর্ণ শ্রমনিয়োগ এবং তৎসঙ্গে উচ্চ মজুরীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রাসম্প্রসারণের সঙ্কটের দরুন দেশের মধ্যে ভোক্তার (consumers) চাহিদা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় মঙ্গল ব্যাহত হওয়ায় ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী এসময় বিপদ এড়াইবার জন্য খুবই তৎপর ছিলেন। ব্লকপোর্টের সম্মেলন শ্রমিকগণকে এরূপ পরিস্থিতিতে "বেতন বৃদ্ধির" দাবি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন। যদি কখনও কোন বিপদ উপস্থিত হয় তখন মালিকগণের সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্য সম্মেলন জেনারেল কাউন্সিলকে পূর্ণ ক্ষমতা দেন। এই নির্দ্দেশের বলে কাউন্সিল অবৈধ ধর্ম্মঘট বন্ধ করিতে পারিবে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ শ্রমিক-নেতৃত্ব ও শ্রমিকগণের সুবুদ্ধিরই পরিচয় দেয়।

১৩

নিমজ্জমান তরীকে বাঁচাইবার কোন নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা হইতে পারে না। ব্যক্তি বা কোন সঙ্ঘের স্বার্থ অপেক্ষা সমগ্র জাতির স্বার্থ বড়। জাতির স্বার্থ রক্ষিত হইলে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিসঙ্ঘের স্বার্থ বজায় থাকে। আমাদের জাতীয় আদর্শ "সত্যমেব জয়তি"—জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও খুবই সত্য একথা ভুলিলে চলিবে না।*

---

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আমেদাবাদ বেতার-কেন্দ্র হইতে ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণ হইতে। রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে অনূদিত।



মীরাবাঈ

শ্রীবসন্ত মুখোপাধ্যায়

রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে চিতোরদুর্গের অভ্যন্তরে শান্ত পার্ব্বত্য পরিবেশে একটি নির্জ্জন দেবালয়। এই দেবালয়ে চৌহানবংশীয়া একটি রাজকুমারী তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভজন-রাগ সঙ্গীত গেয়ে বেড়াতেন। রাজকুমারীর সুমিষ্ট কণ্ঠ সেদিন কত প্রভাতকে জানাত অভিনন্দন, কত সন্ধ্যাকে করত মুখরিত। তখন দিল্লীতে বাদশাহ আকবরের রাজত্বকাল।

মন্দিরের সোপানে দাঁড়ালে দেখা যায়, মহাকাল এখানে তার বিশেষ কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি। তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রবি দিগন্তে তার যে রঙীন আলো বিকীরণ করত, প্রভাতের যে অরুণালোক এখানে শত সুবর্ণ রেখায় প্রবেশ করত, আজও ঠিক তেমনি প্রবেশ করছে। কেবল যে কণ্ঠ অনুক্ষণ জগৎপিতার চরণে মুক্তির জন্য আকুল নিবেদন জানাত, তা নীরব।

বাতাসে ঢেউ খেলানো মাড়োয়ারের রুক্ষ প্রান্তরে ক্ষুদ্র গ্রাম কুর্খী। সেই গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীতে সেপ্টেম্বর মাসের এক প্রভাতে উৎসব-বেশে সজ্জিত কারণ রাজপুত-সর্দ্দার রতন সিংহের একটি অতি সুলক্ষণা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সেই কন্যাই মীরাবাঈ।

সর্দ্দারের বিশাল প্রাসাদে জাঁকজমকের সঙ্গে অতি আদরে তিনি লালিতপালিত হতে লাগলেন। তাঁকে সেবা করবার জন্য দাসদাসী নিযুক্ত করা হ'ল। তারা সারাদিন তাঁর দেহ লেপন করে চন্দনপঙ্কে সুশোভিত করে তাঁকে নানা বস্ত্রালঙ্কারে ও পরিচ্ছদে, ঘুম পাড়ায় দোলায় চাপিয়ে এবং দোল দেয় ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে।

ক্রমে তিনি শশিকলার মত দিন দিন বড় হতে লাগলেন এবং কথা বলতে শিখলেন অনর্গল। ঘরময় ছুটোছুটি করে প্রাসাদ আলো করে বেড়াতে লাগলেন পরম উল্লাসে

একদিন রসুনচৌকির রাগালাপের সুমিষ্ট স্বরলহরীতে যখন আকাশ-বাতাস-মুখর, বালিকার মন তখন আনন্দে নৃত্য করে উঠল। দৌড়ে তিনি বিবাহবেশে সজ্জিতা কনেকে দেখিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মা এ কে? কবে আমি এমনি করে যাব?" জননী জনস্রোতের দিকে চেয়ে বললেন, "ও বিয়ের কনে।" কিন্তু বালিকাকে নিরস্ত করা যায় না। কেবলই বলেন, তিনি দেখতে যাবেন। তখন মাতা গৃহবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে তার ঔৎসুক্য নিবারণের চেষ্টা পেলেন। বললেন, "উনিই তোমার বর।" তিনি তখন জানতেও পারলেন না যে যেখানে যাঁকে তিনি খেলাচ্ছলে আজ গৃহবিগ্রহ দেখিয়ে দিলেন সেখান থেকেই হ'ল তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের উৎপত্তি। কারণ জগতে এমনি ধারাই হয়।

দিন যায়। নিদাঘ আসে তার ফলফুলভার নিয়ে, বর্ষা আনে ঘনঘটা। শরতের সুনীল আকাশে ওড়ে বলাকার সারি, হেমন্ত আনে কুহেলী। শীত আনে হতাশ্বাস, বসন্ত আনে উৎসব-রজনী। চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয় ষড়ঋতু এবং বালিকা মীরা হন কিশোরী।

পিতামাতার মনে কিন্তু সুখ নেই, কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মীরা বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গান করেন, হাসেন, কাঁদেন। তবে কি তিনি পাগল হয়ে যাবেন?

পিতামাতা অনেক ভেবে তাঁদের অপরূপ রূপসী কন্যার বিবাহ স্থির করলেন—চিতোরের রাণা সঙ্গের পুত্র রাণা কুম্ভের সঙ্গে। বিয়ের পর মীরা চলে গেলেন স্বামীগৃহে

রাণা কুম্ভ স্ত্রীকে স্নেহ করতেন এবং শীঘ্রই আবিষ্কার করলেন যে এই বয়সেই তাঁর মনে বৈরাগ্য এসেছে। তখন বর্ষীয়সী শ্বশ্রূ-মাতা এবং অন্যান্য পুরমহিলাগণ চেষ্টা করলেন যাতে তাঁর মন সংসারে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু…

রাগ—তিলককামোদ,

রাণাজী হে গোবিন্দকী কি গুণ গাস্যাঁ।

চরণামৃত কো নেম হঁমরে নিত উঠি দরশন পাস্যাঁ।

(মীরাবাঈ)

গোবিন্দ তাঁর মন অধিকার করেছেন। তিনি তাঁকে ভালবেসে জগতের সমস্ত সাধারণ মানুষকে ভালবেসেছেন কাজেই তিনি পৃথিবীর অতীত অতিমানবীর ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন।

ব্যর্থমনোরথ হয়ে রাণা কুম্ভের ভগ্নী রাজকুমারী উদা ভ্রাতার কানে তোলেন তাঁর সম্বন্ধে নানা কুৎসা। ক্রুদ্ধ রাণা একদিন গভীর নিশীথে যখন সমস্ত পুরী নিদ্রিত তখন তরবারি-হস্তে পত্নীর জীবনান্ত করবার জন্যে ছুটলেন। কিন্তু মীরাবাঈ সেখানে নেই। তিনি দেবালয়ে। ঝড়ের মত সেখানে পৌঁছে রাণা দেখেন তিনি মূর্ত্তির সামনে নিস্পন্দ বসে। তিনি একবার কেবল চেয়ে দেখলেন। পরক্ষণেই মৃত্যুভয়হীনা মীরাবাঈ ধ্যানে পুনরায় নিমগ্ন হলেন। রাণা ভাবলেন এ কি!

কিন্তু এ জগৎ বড়ই কঠিন। দুষ্ট লোকের রসনা তাঁকে কলঙ্কিনী বলে চিহ্নিত করতে লাগল। রাণা কুম্ভ অনেক ভেবে তাঁকে একটি মন্দির তৈরি করে দিলেন—যেখানে তিনি ভজন-পূজন নিয়ে শান্তিতে দিন কাটাতে পারেন।

মীরাবাঈয়ের অপরূপ কাহিনী বাদশাহ আকবরের কানে গিয়ে পৌঁছাল। তাঁর দরবারে তখন গোয়ালিয়রের ধ্রুবপদ গায়ক তানসেন বিরাজমান। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ভিক্ষুকের বেশে মীরাবাঈয়ের মন্দিরে উপস্থিত হলেন।

চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত চিতোরদুর্গে সম্পূর্ণ অরক্ষিত ভাবে উপস্থিত হওয়া বাদশাহের পক্ষে তখন অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত মেবারের রাজপুতগণ যেমন দুর্দ্ধর্ষ তেমনি মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও স্থায়িত্বের পক্ষে ভীষণ বিঘ্নস্বরূপ। বাদশাহ কিন্তু এ সব গ্রাহ্য করেন না। মীরাবাঈয়ের অপূর্ব্ব ভজন এবং নৃত্য তিনি দেখেন। মুগ্ধ হন তাঁর মুখের স্বর্গীয় জ্যোতি অবলোকন করে।

অবশেষে তিনি বহুমূল্যবান রাজকণ্ঠের মালা ভক্ত মীরাবাঈয়ের নিষেধ সত্ত্বেও বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আসেন।

পরদিন কিন্তু হৈ-হৈ কাণ্ড। দাবানলের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল যে, মোগল সম্রাট রাত্রে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। রাণা ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করলেন এবং চৌহান্‌ রাজপুতগণ ফুলতে লাগলেন এইকারণে যে মীরাবাঈ তাঁদের বংশ কলঙ্কিত করেছে!

রাণা তাঁর পত্নীকে খবর পাঠালেন যেন তিনি জহর খেয়ে হোক, নদীতে ডুবে হোক বা যে প্রকারেই হোক মৃত্যুবরণ করেন। কারণ তিনি সমস্ত রাজপুতানাকে দুরপনেয় কলঙ্ক পঙ্কে নিমজ্জিত করেছেন। মোগলকে তিনি দেব-দেউলে প্রবেশ করতে দিয়েছেন।

বিগ্রহ বুকে নিয়ে ভজন গাইতে গাইতে মীরা নির্ভিকচিত্তে চলেন সেই নদীতীরে যেখানে তাঁকে বিষ খেয়ে ডুবে মরে যেতে হবে। তিনি "পীলু"র সুরে তাঁরই রচিত গান গাইলেন :

ঘুঁঘুরু বাঁধ মীরা নাচীরে পগ ঘুঁঘুরু,
লোগ কহে মীরা হো গঁাই বাবরী শাঁস কহে কুলনাশীরে,
জহরকো পেয়ালা রাণাজী নে ভেজা পীবত মীরা হাঁসিরে,
মৈঁতো আপনে নারায়ণকী হো গাই আপহি দাসীরে
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর বেগী মিলা অবিনাসী রে॥

(মীরাবাঈ)

তখন দিগন্তে সূর্য্য অস্ত যায় যায়। গোধূলির রক্তিমচ্ছটা নদীতীরে এবং আরাবল্লী পর্ব্বতের চূড়ায় অপরূপ সমারোহের সৃষ্টি করেছে। সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যখন তিনি ডুবে যেতে লাগলেন, তখন কোন এক অদৃশ্য হস্ত তাঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল; কে যেন তাঁকে বললেন, "মীরা, স্বামীর সঙ্গে তোমার জীবন যাপনের পালা শেষ হয়েছে। তুমি এবার আমার নিকটে এস।"

প্রাচীন ব্রজধাম বৃন্দাবন। নিধুবনে স্বামী হরিদাস তাঁর নিভৃত কুটীরে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ রাগসঙ্গীত গায়ক, সুরকার, কবি, "সুরদাসীমলহার" বা "সুরমলহা"র রচয়িতা সাধক সুরদাসকে তালিম দেন। মীরাবাঈ এখানে এসে তাঁর সঙ্গীত-শিষ্যা হয়েছেন। তিনি তাঁর নিকট রাগসঙ্গীত শিক্ষা করেন আর বঙ্কুবিহারী (বাঁকেবিহারী) মন্দিরে ভজন গান করেন। ভক্তগণ শীঘ্রই তাঁকে ঘিরে ধরল। চিতোর থেকে রাজপুতগণ এসে তাঁকে পুনরায় নিজ মন্দিরে ফিরে যেতে অনুরোধ করতে লাগল। একদিন ভিক্ষুকের বেশে মহারাণাও এসে তাঁর নিকট ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু কি আছে তাঁর? কি তিনি দিতে পারেন?

ভোগবিলাস, প্রভুত্ব-স্পৃহা স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে এসেছেন মীরাবাঈ। গৈরিক বসন, রুদ্রাক্ষ-মালা এবং ভিক্ষাপাত্রই তাঁর একমাত্র সম্বল। রাণা মার্জ্জনা চেয়ে তাঁকে চিতোরে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। তিনি রাজী হলেন।

চিতোরে তিনি আবার ফিরে এলেন। তাঁর আগমনে পুরবাসিগণ আনন্দে নিমগ্ন হ'ল। মন্দিরে তাঁর কণ্ঠধ্বনি আবার শুনা যেতে লাগল। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তগণ আসতে লাগল তাঁকে দেখতে—তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে।

কিন্তু রাণার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে এবং একদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণবায়ুও অনন্তে মিশে গেল।

মীরাবাঈ এখন থেকে দিনরাতই মন্দিরে পড়ে থাকেন। জপতপ নিয়েই তাঁর দিন কাটে। বাইরে কোথায় কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি কোন খোঁজই রাখেন না। এদিকে চিতোরে নূতন রাণা এসেছেন। নাম তাঁর রতন সিং। তিনি নাকি অত্যন্ত ভীরু, কাপুরুষ এবং নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর কুশাসনে দেশে হাহাকার পড়ে গেল। মীরাবাঈর কানে ক্রমে সবই পৌঁছাল। কিন্তু কি করতে পারেন তিনি?

রতন সিং বহু বার মীরাবাঈকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থকাম হন। ক্রমে মীরাবাঈর নিকট দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠল। তিনি আবার চিতোর ত্যাগ করেন।

এবার বৃন্দাবনে এসে তিনি প্রেমধর্ম্ম প্রচার করতে লাগলেন। ক্রমে সকলেই তাঁকে পরমাত্মীয় মনে করতে লাগল। পরম ভক্ত মীরাবাঈর নিকট বৃন্দাবনের ধূলিকণা অবধি প্রিয় বস্তু হয়ে পড়ল।

অবশেষে একদিন যখন তাঁর জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল তখন তাঁর পবিত্র আত্মা অমৃতলোকে প্রয়াণ করল।

যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি জগতের জন্য রেখে গেছেন তা আজও লক্ষ লক্ষ লোককে আনন্দে নিমগ্ন করে। তা গৃহীকে দেয় সান্ত্বনা, শোকার্ত্তের মনে এনে দেয় শান্তি এবং বঞ্চিতকে দেয় প্রেরণা।

চিতোরদুর্গের অভ্যন্তরে গুল্মরাজি-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপরে যে মন্দিরে মীরা ভজন গেয়ে বেড়াতেন তা আজও বিদ্যমান। মন্দিরের সোপান, প্রাচীর, পাষাণ-চত্বরে মহাকাল তাঁর কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি। সেখানে আজ কদাচিৎ কারুর চরণচিহ্ন পড়ে। পথিকেরা আজকাল কালেভদ্রে সেখানে আসে। স্মরণ করে তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

কবি সুরকার ও ভক্ত মীরাবাঈ যে সকল কবিতা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য, সরল এবং নিরলঙ্কৃত ভাষায় লিখে রেখে গেছেন আজও তা কালজয়ী হয়ে বিদ্যমান। তাঁর রচিত রাগসঙ্গীতের সুর আজও ভারতের নগর থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম অবধি কোথাও না কোথাও শোনা যায়।

উচ্চাঙ্গ "খেয়াল" গায়কগণ নিজেরা যে নীতিতে তাঁদের গানের

কথা লেখেন তিনিও তাঁর কবিতা রচনায় ঠিক সেই রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। অপ্রয়োজনীয় নিরর্থক শব্দ বা কথা, অনুপ্রাস-অলঙ্কার ইত্যাদি বর্জ্জন করে কয়েকটি সরল, সহজ কথায় মনোভাব প্রকাশ করতেন।

তাঁর কবিতায় তিনি রাগসঙ্গীতের সুর দিয়াছিলেন এই কারণে যেন নিত্য নূতন "স্বর" টুক্‌রা-টুক্‌রা এবং "মুকীর" লাবণ্যময় বিলাসে তাঁর ভজন দেশের লোকের নিকট চিরনূতন এবং অমর হয়ে বেঁচে থাকে।

তাঁর রচিত "মীরাবাঈ কি মল্‌হার" বা "মীরা-মল্‌হার" আজ ভারতবর্ষের বহু স্থানে শুনতে পাওয়া যায়।

রবি ও মাটির প্রদীপ

শ্রীকালিদাস রায়

"কে লইবে মোর কার্য্য কহে সন্ধ্যারবি,
শুনিয়া জগৎ রয় নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

যে দীপের কথা তুমি বলেছিলে রবি,
আমি সে মাটির দীপ ক্ষীণবল কবি।
কুটীরে কুটীরে জ্বলি, সামান্য সম্বল,
হয় তায় ঘন তম একটু তরল।
এ আলোক নয় দেব বহুজন তরে,
এই বিদ্যুতের যুগে কে চায় নগরে?
কাঁপে শিখা দ্বিধাভয়ে বায়ুর প্রভাবে
দিন দিন ক্ষীণদশা স্নেহের অভাবে।
তালপাতা পুঁথি পড়া চলে এ আলোকে,
প্রিয়জন মুখ শুধু দেখা যায় চোখে।
এ আলোক সঙ্গী নয় কভু রাজপথে।
দুঃস্থা গৃহিণীর কাজ চলে কোনমতে।
বাংলার মাটিতে গড়া এ দেহ আমার
বাংলার মাটিতে শীঘ্র মিশিবে আবার।
আমি যে মাটির দীপ যাই নাই ভুলি,
পিতলেরো দীপ নই কে রাখিবে তুলি?
তবু জ্বলি দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ধূমজালে,
তুমি যে আশিস টিকা পরাইলে ভালে।

মৌ-ভাণ্ডারে

(ঘাটশিলা)

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আজ যদি চাঁদ ওঠে পাহাড়ের পাশে ওই বনটায়,
আচম্‌কা নেশা লাগে ফাঁকা ফাঁকা উদাসী এ মনটায়,
একখানি ফালি মেঘ চায় যদি কেড়ে নিতে ও-চাঁদে,
সারা বন চোখ মেলে জেগে থাকে তা'রি উৎকণ্ঠায়।

আরো বেড়ে যায় রাত, আধ ঘুমে বন হয় ঢুল্ ঢুল্,
ডানা নেড়ে নড়ে' চড়ে' তিতিরেরা করে গাছে চুল্‌বুল্,
পাথরের বুক চিরে' চুপি চুপি বয়ে আসা ঝরণার
দুই পারে জেগে থাকে মাঝ্‌ রাতে ঘুমহারা মৌ ফুল।

সেই পথে আন্‌মনে হরিণেরা দল বেঁধে যায় ঠিক,
ঘষা শিংয়ে ভাঙ্গা-চাঁদ থেকে থেকে করে' ওঠে ঝিক্‌মিক্,
শিস্ দিয়ে বন-টিয়ে সুর তোলে থেকে থেকে রাতভোর,
কুয়াসার রূপাঝরা মায়াঘেরা থম্‌থমে চারদিক।

মনে হয় আমি যেন গেছি কোন্ রূপলোকে হারিয়ে
শালফুলফোটা রাতে চুপিসাড়ে এ পৃথিবী ছাড়িয়ে।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর শেষ জীবন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গত শতাব্দীতে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকগণ সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি নানা বিষয়ে প্রগতিমূলক আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহারা ঐ সময়ে 'নব্যবঙ্গ' নামে অভিহিত হন। এই 'নব্যবঙ্গে'র নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী অন্যতম। আবার, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা এক হিসাবে অধিকতর ভাগ্যবানও ছিলেন। কারণ তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ সংস্রবে আসেন এবং স্বদেশের উন্নতিমূলক বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত হন। তাঁহার স্বদেশহিতকর কার্য্যাবলীর মূলে রামমোহন রায়ের প্রেরণাও ছিল যথেষ্ট। আমি তারাচাঁদ সম্পর্কে অন্যত্র* বিশদ আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার শেষ জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তখন বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। এই বিষয়ক দুইটি তথ্য এখানে পরিবেশন করিতেছি।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ১৮৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসেও বর্দ্ধমান রাজসরকারে 'সর্ব্বাধ্যক্ষ' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৫৬ দিবসীয় 'সংবাদ প্রভাকরে' এই সংবাদটি বাহির হয়:

"বর্দ্ধমান। শনিবার ৭ই পৌষ [২০শে ডিসেম্বর] ১২৬৩। ...বর্দ্ধমান ধাম দিন দিন স্বর্গধাম হইয়া উঠিতেছে। সুবিখ্যাত সদ্বিদ্বান মহামান্য ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই বর্দ্ধমানে 'উইল বাটীতে' অবস্থান পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে সর্ব্বাধ্যক্ষের কার্য্য সুসম্পাদন করিতেছেন, তাঁহার তুল্য সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ্য নির্দ্দোষ স্বাধীনচিত্ত পুরুষ প্রায় দেখা যায় না, আমি বহু কালের পর তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে এবং অকপট স্নেহযুক্ত কৃপাপূরিত সুধাময় সুসম্ভাষণে যে পর্য্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি আমার অন্তঃকরণ কেবল একমাত্র তাহার সাক্ষী রহিয়াছে।...ভ্রমণকারী সম্পাদক।"

পর বৎসর, ১৮৫৭ সনের আগষ্ট মাসের মধ্যে তাঁরাচাঁদের মৃত্যু হইয়াছিল। সঠিক তারিখ এখনও জানা না গেলেও ১৮৫৬, ২৩শে ডিসেম্বরের পর হইতে ১৮৫৭ সনের আগষ্ট মাসের মধ্যে যে তিনি মারা যান এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। ২৬শে আগষ্ট ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' "বর্দ্ধমান। ৫ই ভাদ্র (২০ আগষ্ট) ৬৪।" শীর্ষক সংবাদে অন্যান্য কথার মধ্যে পাই:

"পুরাতন প্রধান মেম্বর সর্ব্বজানিত ও সর্ব্বাগ্রগণ্য ৺তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন এবং তত্তুল্য সর্ব্বগুণশালী শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব মেম্বার পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংপ্রতি কলিকাতা অবস্থান করিতেছেন।..."

এই সংবাদটির ধরন হইতে বুঝা যায়, তারাচাঁদ ১৮৫৭ সনের আগষ্ট মাসের মধ্যে বা ইহার কাছাকাছি সময়েই পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

* উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা: "তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী", পৃ. ১৪০-৬১।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল / আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার

অনন্ত সমুদ্রবৎ জ্ঞানের বিস্তার
একদা দেখিয়াছিনু মর্ম্মমাঝে যাঁর,
ব্রজেন্দ্র তাঁহার নাম, বহু শাস্ত্রবিদ্;
কাটাইল আজীবন আহরি' সমিধ।
আপনা ভুলিল ধ্যানে, বিনয়-বিনত;
বঙ্গের গৌরবচূড়া, প্রকাশ-বিরত।

জ্ঞানের বিবিধ ধারা তব মাঝে লভিল সঙ্গম,
হেন শাস্ত্র হেরি নাই যাহে তুমি নহ পারঙ্গম।
শতাব্দীর প্রান্তে এলে, দেহযন্ত্র তবু শক্তিমান,
তোমার প্রতিভারশ্মি আজো তাই তেমনি অম্লান।



জার্ম্মানীর প্রদর্শনী ও মেলা

১৯৫৩ সনে বার্লিনে অনুষ্ঠিত জার্ম্মান শিল্প-প্রদর্শনী (Industrial Exhibition) এবং মেলাসমূহে ভারতের যোগদান বর্ত্তমান কালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক এবং মানবিক সম্পর্ক স্থাপন জার্ম্মান শিল্প-প্রদর্শনী কর্ত্তৃক সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রদর্শনীক্ষেত্রে জার্ম্মান-ভারতীয় সহযোগিতায় যে সূচনা হয়, তাহা আজ প্রথম সুফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

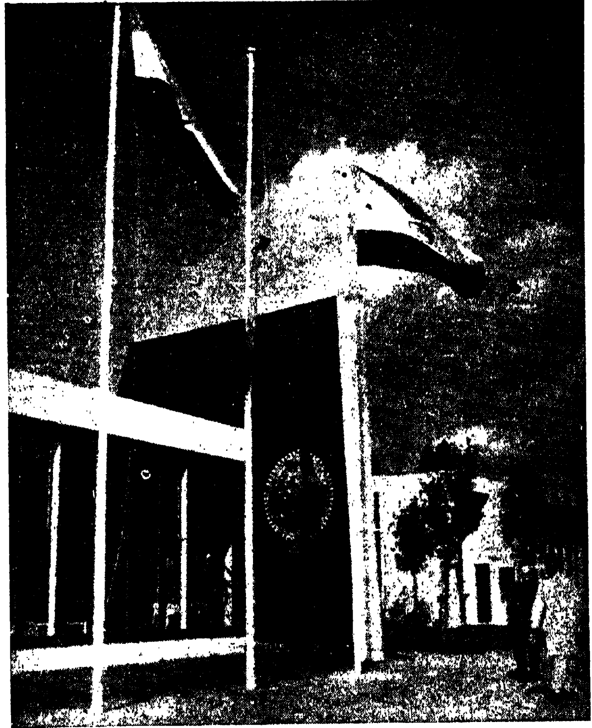


বার্লিন প্রদর্শনীক্ষেত্রে "প্লাজ দার নেশনেন" (platz der Nationen) এবং উদ্যানসমূহের দৃশ্য

১৯৫০ সন হইতে জার্ম্মানীর এই শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের সূত্রপাত, সম্প্রতি ইহার ষষ্ঠ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইল। বর্ত্তমান বৎসরের প্রদর্শনীতে যে সকল ব্যবসায়ী, ভবিষ্যৎ ক্রেতা এবং সাধারণ লোক সমাগত হয়, তাহাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি। শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ লোক আসিয়াছিল জার্ম্মানীর সোভিয়েট-অধিকৃত অঞ্চল হইতে, সুতরাং এই বার্লিন প্রদর্শনী পূর্ব্বাঞ্চলের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপনের পটভূমিকাও রচনা করিয়াছে। ফেডারাল জার্ম্মান প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক থিওডোর হিউসের (Heuss) পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই মহামেলাসদৃশ প্রদর্শনীতে গড়পড়তা বিভিন্ন পঁচিশটি দেশের ১২০০টি ফার্ম্ম যোগদান করে। জার্ম্মান শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে নিম্নলিখিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী উদ্যোগসমূহ: কোল-মাইনিং, আয়রণ এণ্ড ষ্টীল, কেমিক্যালস, লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতু (তামা এবং এলুমিনিয়ামও ইহার অন্তর্ভুক্ত), রেডিও, টেলিভিশন এবং রেকর্ডিং সহ ইলেক্ট্রো টেকনিকস, সাধারণ এবং বিশেষ শিল্পের যন্ত্রপাতি, লৌহ, শীট আয়রণ এবং ধাতব পাত্র, ফটোগ্রাফি, পোর্সিলেন, কাচ, গ্যাস এবং জল ও কাঠের কাজ। এই প্রদর্শিত দ্রব্যসামগ্রী হইতে জার্ম্মান-শিল্পের উৎপাদন এবং মালসরবরাহ-ক্ষমতার একটি সামগ্রিক পরিচয় নিশ্চিতরূপেই পাওয়া যায়।

অাঁক কষিয়া একটি প্রদর্শনী অথবা মেলার গুরুত্ব বুঝানো দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু ১৯৫২ হইতে '৫৪ সনের—অর্থাৎ জার্ম্মান শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতের প্রথম অংশগ্রহণের সময়কার—বার্লিনের রপ্তানি সম্পর্কিত যে পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৫২ সনে ভারতে বার্লিনের মোট রপ্তানী-দ্রব্যের মূল্য ছিল ৪.১ লক্ষ মার্ক, ১৯৫৩ সনে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৭.৫ লক্ষ মার্কে দাঁড়ায় এবং ১৯৫৪ সনে শতকরা আরও ২৩ ভাগ বাড়িয়া ৯.২ লক্ষ মার্কে দাঁড়ায়। এই হিসাব অনুযায়ী বার্লিনের বৈদেশিক ক্রেতাদের মধ্যে ভারত ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইলেক্ট্রো টেকনিক্যাল রপ্তানির পরিমাণবৃদ্ধিই বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ১৯৫২ সনে দুই লক্ষ টাকা মূল্যের ঐ দ্রব্য রপ্তানি হয়। পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে এই অঙ্ক দ্বিগুণ অপেক্ষাও বাড়িয়া যায় এবং

শেষে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ মার্কে গিয়া দাঁড়ায়। অন্যান্য বিপুল পরিমাণ রপ্তানীদ্রব্য হইতেছে—'প্রিসিশন মেকানিকস', 'অপটিকস', রাসায়নিক দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে রপ্তানীদ্রব্যের জন্য বার্লিনের সন্তোষজনক অর্থপ্রাপ্তি হইবে। আমদানীর দিক দিয়াও অনুরূপ ফললাভের আশা দেখা যাইতেছে। অবশ্য এই হিসাব আলাদা ভাবে বার্লিনের জন্য করা যাইবে না, কেননা পরিসংখ্যানগুলি পশ্চিম-জার্ম্মানীর সহিত একত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, ভারত হইতে আমদানী দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভারতের ব্যাপক প্রচারেই ইহার মূল কারণ। বার্লিন প্রদর্শনীর প্রোগ্রাম কিন্তু জার্ম্মান শিল্পপ্রদর্শনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বিশেষভাবে কৃষি এবং যন্ত্রশিল্পের সম্ভাব্য প্রগতির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে বার্ষিক "গ্রীন উইক" এবং অন্যান্য বিশেষ মেলাসমূহ ত অনুষ্ঠিত হইতেছেই, তা ছাড়া ১৯৫৭ সনে আন্তর্জ্জাতিক গৃহনির্ম্মাণ প্রদর্শনী (International Building Exhibition) অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজনে বার্লিনে এখন হইতেই কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা বর্ত্তমান শতাব্দীর বৃহত্তম প্রদর্শনী-অনুষ্ঠান হইবে এরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান। যুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত একটি গোটা জেলা ৫২ জন বিখ্যাত জার্ম্মান এবং বৈদেশিক স্থপতি কর্ত্তৃক এক বিরাটায়তন প্রদর্শনী-রূপে পুনর্নির্ম্মিত হইবে—ইহাতে নগর-পরিকল্পনার অতিআধুনিক প্রবণতা প্রদর্শিত হইবে।


বার্লিন প্রদর্শনীক্ষেত্রে ভারতীয় প্যাভিলিয়নের সম্মুখে জাতীয় পতাকা

বিখ্যাত বৈদেশিক প্রতিনিধিরাও এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। বার্লিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায়, ১৯৫৭ সনে যে ইণ্টারন্যাশনাল বিল্ডিং এগজিবিশন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার উৎকর্ষসাধন, শিল্প ও ব্যবসায়গত নূতন সম্পর্কস্থাপন এবং যেগুলি যথারীতি বিদ্যমান তাহাদের দৃঢ়ীকরণের কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

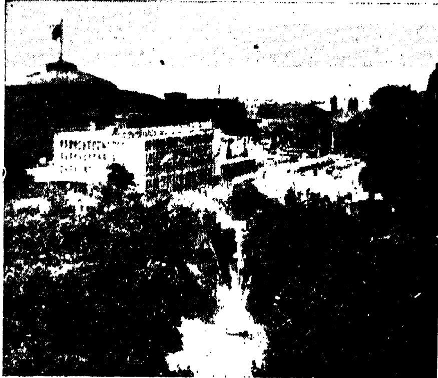
আন্তর্জাতিক ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলা

মেইন নদীতীরস্থ ফ্রাঙ্কফুর্ট নগরীর বাণিজ্যিক ও শিল্পগত ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন হওয়ায় ইহা ইউরোপের বৃহৎ এবং প্রধান নগরীসমূহের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। যে বিপুল পুনর্গঠন-কার্য্য এখানে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা দেখিয়া সকল দর্শকই অভিভূত হন। ফ্রাঙ্কফুর্টে আজ অনেকগুলি প্রধান অর্থনৈতিক সংস্থা, বৃহৎ ব্যবসায়িক এক অর্থনৈতিক প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত—ইহা জার্ম্মান ফেডারাল রেলওয়েজ ইত্যাদির হেড কোয়ার্টার্স। নগরীর সন্নিহিত রাইন-মেইন বিমানঘাঁটি ইউরোপের বৃহত্তম বিমানঘাঁটিসমূহের অন্যতম, ইহাকে বলা যাইতে পারে মধ্য-ইউরোপের প্রবেশ-তোরণ।

জার্ম্মানীর নগরীসমূহের মধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মেইন মেলা অনুষ্ঠানের প্রাচীনতম সনন্দের অধিকারী বলিয়া যথার্থই দাবি করিতে পারে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে—১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এই নগরীকে মেলা অনুষ্ঠানের প্রথম সুযোগ প্রদান করেন। আজিকার দিনে আন্তর্জাতিক ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলাসমূহ বৎসরে দুই বার—একবার বসন্তে এবং আর একবার শরতে (মার্চ্চ ও সেপ্টেম্বর), অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলা কেবল যে জার্ম্মান ফেডারাল রিপাব্লিকের তৈরী (finished) মাল এবং ভোগব্যবহারের দ্রব্যের (consumer goods) সার্ব্বিক বাজার তাহা নহে, ইহাতে অনেকগুলি বৈদেশিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানও তাহাদের রপ্তানী-দ্রব্য প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। বৈদেশিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগদানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইউরোপের যাবতীয় মেলার মধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলাই মুখ্য স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

মেলায় অনেকগুলি দেশ তাহাদের নিজস্ব জাতীয় প্যাভিলিয়ন

খুলিয়া থাকে। ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার দরুন ইহার প্রতি আকৃষ্ট দর্শকের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে।



আন্তর্জাতিক ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলার প্রধান প্রবেশদ্বারের দৃশ্য

১৯৫৪ সনের শরৎকালে ভারতবর্ষ প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলায় অংশগ্রহণ করে—জার্ম্মানীর মেলায় নিজস্ব প্যাভিলিয়ন খুলিবার ইহাই তাহার প্রথম প্রয়াস।

ইহাতে প্রদর্শিত ভারতীয় শিল্পজাত এবং পণ্যদ্রব্যসমূহ সকলের কৌতূহল সবিশেষ উদ্রিক্ত করে—উক্ত মেলায় ভারতের যোগদানের ফলে ভারত এবং পশ্চিম জার্ম্মানীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হইয়াছে। আশা করা যায় যে, পরবর্ত্তী কোন একটি আন্তর্জাতিক ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলায় ভারতীয় ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবে। বহুসংখ্যক ভারতীয় বণিক মেলাসমূহের নিয়মিত দর্শকশ্রেণীভুক্ত।

বিদেশ হইতে জার্ম্মানীতে আগত দর্শকগণ, ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মেইন হইতে যাত্রা সুরু করিয়া দ্রুত পরিবহন-ব্যবস্থার কল্যাণে জার্ম্মানীর সকল প্রধান স্থানে পৌঁছিতে পারেন। জার্ম্মানীতে ভ্রমণ আরম্ভ করার পক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্ট একটি আদর্শ স্থান এবং সাময়িকভাবে অবস্থানের হেড কোয়াটার্স এটিকেই করা যাইতে পারে। বৃহৎ এবং প্রাণবন্ত নগরীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক যাবতীয় জিনিষের সঙ্গে অসংখ্য দ্রষ্টব্য স্থান এবং রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ের দরুন এই নগরীটি বাস্তবিকই ভ্রমণকারীর স্বর্গ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

কলোন মেলা

আন্তর্জাতিক কলোন মেলা ফেডারাল রিপাবলিকে অনুষ্ঠিত তিনটি বড় মেলার একটি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই মেলা যেখানে অনুষ্ঠিত হয় তাহা জার্ম্মানীর প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহের অন্যতম। এই মেলা ইহার ভৌগোলিক অবস্থানের ঐতিহ্যগত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। রুর ও রাইন নদীর তীরবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে একীভূত এই মেলার বাজার নিরতিশয় চিত্তাকর্ষক এবং ইহার পণ্যদ্রব্যসমূহ সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত। এই মেলা আজ গৃহে ব্যবহার্য্য এবং তৈরী ধাতব দ্রব্যের



আন্তর্জাতিক ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলায় 'প্যাভিলিয়নে অব ইণ্ডিয়া'তে ভারতীয় এবং জার্ম্মান দর্শকবৃন্দ

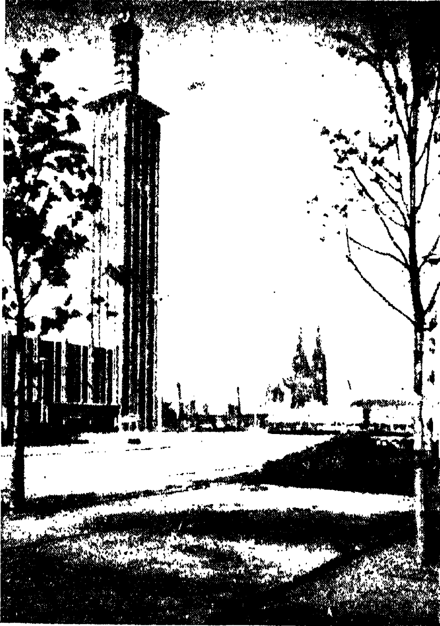
স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (recognised) ইউরোপীয় বাজার রূপে প্রসিদ্ধ এবং ইহা ইউরোপের আসবাবপত্র ক্রয়কেন্দ্রও বটে। জার্ম্মানীতে প্রস্তুত যাবতীয় ধাতব দ্রব্য এবং আসবাবপত্রের পাশাপাশি কতিপয় বিভিন্ন দেশে তৈয়ারী উচ্চশ্রেণীর পণ্যসামগ্রীও এই মেলায় একত্রিত করা হইয়া থাকে।

কলোন মেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইতেছে—এক এক বৎসর পর পর ইহার সঙ্গে সংযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীসমূহ। আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফিক এবং সিনেমাটোগ্রাফিক প্রদর্শনী, 'ফোটোকিনা' ও সাধারণ খাদ্যবস্তু প্রস্তুতকারকদের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী 'আনুগা' গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের নিকট এগুলি যে পরম চিত্তাকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। মেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্রেতাদের সঙ্গে সামগ্রিক ক্যামেরা এবং ফোটোগ্রাফিক সাজসরঞ্জাম শিল্পের প্রতিনিধিগণের মোলাকাৎ হয়। ইহা পৃথিবীর সকল অংশ হইতে আগত সখের (amateur) ফোটো-গ্রাফারদের মিলনক্ষেত্রও বটে।

অক্টোবরের একেবারে গোড়াকার দিক হইতে অনুষ্ঠিত আনুগা-১৯৫৬ সম্প্রতি এবারকার মত পাততাড়ি গুটাইয়াছে। ১৯৫৫ সনের আনুগা অপ্রত্যাশিত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিক বাজার হিসাবে প্রদর্শক এবং পরিদর্শক উভয়ের নিকট হইতে প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

হানোভার—জার্ম্মান শিল্পের ব্যবসায়িক মেলা-কেন্দ্র

১৯৫৫ সনের জার্ম্মান শিল্পমেলা 'হানোভার'-এর যে রঙীন ফিল্ম তোলা হইয়াছে তাহাতে জার্ম্মান ফেডারাল রিপাবলিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক মেলার কর্ম্মপ্রচেষ্টা চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভিক দৃশ্যে উত্তর-ভারতের ভাকরা-নাঙ্গাল বিরাট পরিকল্পনার চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উদ্বোধন-দৃশ্যে যুক্তিযুক্ত ভাবেই হানোভার মেলার কৃত্যসমূহ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত এই মেলায় জার্ম্মান শিল্পজাত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ১৯৫৬ সনের মেলার তোড়জোড় এখন হইতেই সুরু হইয়াছে।



কলোন মেলার বুরুজ—পটভূমিকায় গীর্জ্জা

'হানোভার ট্রেড ফেয়ার' খুবই চিত্তাকর্ষক এবং ভারতবর্ষকেও ইহা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিবে। বহির্বিশ্বে যে সকল শ্রেষ্ঠ জার্ম্মান ফার্ম্ম বৃহৎ শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা, বাঁধ নির্ম্মাণ, রেলওয়ে নির্ম্মাণ, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন প্রভৃতি কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে সেগুলি এই বাণিজ্যিক মেলায় অংশ গ্রহণ করিবে। বিশ্ববিখ্যাত ফার্ম্মসমূহ মেলায় ইঞ্জিনীয়ারিঙের যাবতীয় বৃহৎ শাখার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে: ষ্টীল ওয়ার্কস এণ্ড রলিং মিল ইরেকশন, খনির সাজসরঞ্জাম (mine equipment), বৈদ্যুতিক শক্তি-গৃহ নির্ম্মাণ, (Power Station Building) সেতু নির্ম্মাণ, রেলরাস্তা নির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, পোতাশ্রয়ের কাজ এবং বন্দরের সাজসরঞ্জাম, সিমেণ্ট শিল্প, শর্করা শিল্প ও বেতারগ্রাহক যন্ত্রের সাজসরঞ্জাম, স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি। অন্যান্য প্রদর্শিতব্য শিল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—রাসায়নিক শিল্প, চক্ষুচিকিৎসা, শল্যবিদ্যা (surgery) এবং চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রশিল্প, রবার এবং এসবেষ্টস শিল্প।



হানোভার মেলাক্ষেত্রের প্রধান প্রবেশদ্বার

হানোভার শিল্পমেলা-প্রাঙ্গণ যখন খোলা হয় তখন তাহা সক্রিয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম (apparatus) সমন্বিত এক বিরাট ফ্যাক্টরির মত দেখায়। এক বর্গকিলোমিটার পরিমিত স্থানে ২০টি প্রকাণ্ড হলে—তন্মধ্যে কোন কোনটি কয়েক তলা উঁচু, শিল্পজাত প্রদর্শিত হয়। আবেষ্টনীযুক্ত প্রদর্শনীক্ষেত্রের আয়তন ২২০০০০ বর্গমিটার এবং খোলা মেলাপ্রাঙ্গণের আয়তন ৮০০০০ বর্গমিটার। ভোগ-ব্যবহারের দ্রব্য এবং বিশেষ রপ্তানিযোগ্য

শিল্পসমূহ যথা—সিরামিক, কাচ, জুয়েলারি, রৌপ্যপাত্র, ঘড়ি ইত্যাদিও মেলায় দেখানো হইয়া থাকে।

নিকট অথবা দূর হইতে আগত সকল শ্রেণীর দর্শকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এই মেলায় করা হইয়া থাকে। সংবাদ সরবরাহ এবং দর্শকদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি ইনফরমেশন আপিস খোলা হইয়াছে। দোভাষীদের সাহায্যও পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে-কোন অংশ হইতে বিমানে মেলায় পৌছানো যায়।

জার্মানীর যাবতীয় মেলার মধ্যে বৃহত্তম এই মেলার অনুষ্ঠানের জন্য জার্মান শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ চূড়ান্তরকমের আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে। ১৯৫৬ সনেও এই বাণিজ্যিক মেলা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে যেখানে পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মূল্যবান প্রদর্শনীয় দ্রব্যসমূহের এবং দর্শকবৃন্দের একত্র সমাবেশ ঘটিবে।*

ন. ভ.

* "India Magazine" (A German Review for India) অবলম্বনে।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীঝর্ণা ভট্টাচার্য্য

ডাক্তার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী ঝর্ণা বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ইতিমধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহামায়া স্বর্ণ পদক, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী স্বর্ণ পদক ও ৺শ্রীশ্রীগৌরী মাতা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গভাষায় প্রথম স্থান ও বি-এ অনার্স পরীক্ষায় সংস্কৃতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বেথুন কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি বেথুন কলেজ-পত্রিকার সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী ঝর্ণা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন।



শ্রীঝর্ণা ভট্টাচার্য্য

'সার্ভিস সিভিল ইণ্টারনেশন্যাল'ও ভারতবর্ষ

আলফ্রেড ক্রাউস

[সার্ভিস সিভিল ইণ্টারনেশন্যালের কর্ম্মীরূপে (হেড-কোয়ার্টাস মেহরাউলি নিউ দিল্লী) কাজ করবার জন্য ক্রাউস এসেছেন ভারতবর্ষে। তিনি জার্ম্মানীর লোক হলেও চমৎকার ইংরেজী লিখতে পারেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাঁর মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত।]

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রথম একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখি। এ হচ্ছে সেই সময়কার কথা যখন এস. সি. আই-এর (সার্ভিস সিভিল ইণ্টারনেশন্যাল) অন্তর্ভুক্ত আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদল ওয়ারোরার (চান্দা জেলা) নিকটবর্ত্তী আনন্দাভানের কুষ্ঠ উপনিবেশে তিনটি গৃহনির্ম্মাণ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়।

বস্তুতঃ আমি যা দেখেছি তার চেয়ে অধিকতর শোচনীয় কিছু দেখবার প্রত্যাশা করেছিলাম। ইউরোপে যে সকল ভ্রান্তিপূর্ণ এবং নিরতিশয় ভীতিপ্রদ রিপোর্ট আমি শুনেছিলাম তা-ই হচ্ছে এর কারণ। যারা কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে খুব কম ওয়াকিবহাল তাদের প্রত্যেকের কাছেই কুষ্ঠ কথাটা একটা মারাত্মক কথা। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে কুষ্ঠরোগীর দেহে এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পায় যা দেখতে প্রীতিকর নয়, কিন্তু সাধারণতঃ একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখে ভীত হবার মত কোন কারণ নেই। এই ব্যাধি যক্ষ্মারোগের চেয়ে কম সংক্রামক। এই সকল দুর্গতদের জন্য আমি সর্ব্বদাই দুঃখানুভব করতাম। কেবলমাত্র তাদের রোগের জন্যই নয়, উপরন্তু কুষ্ঠব্যাধি-সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে লোকের অত্যন্ত স্বল্প জ্ঞানের কথা ভেবেও আমার বড়ই কষ্ট হ'ত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ওয়ারোরা মহারোগী সেবা সমিতির কথা ওখানকার কুষ্ঠ উপনিবেশের পরিচালক মিঃ এম. ডি. আমতেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য মজুর সংগ্রহ করতে গিয়ে যাবতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রোগসংক্রমণের ভয়ে তারা ভীত হয়ে পড়েছিল এবং কেবলমাত্র উচ্চতর মজুরির বিনিময়েই তারা কাজ করতে রাজী হ'ত। অবশেষে এস. সি. আই-এর আন্তর্জাতিক 'গ্রুপ' রোগীদের সহযোগিতায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াতে সুরাহা হ'ল।

তখন রোগীর সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তারা বাস করত তিনটি কুটীরে—এ ছাড়া ছিল আরও দুটি কুটীর, একটি সাধারণ রন্ধনশালা এবং অপরটি হাসপাতালরূপে ব্যবহারের জন্য। সবকিছুই ছিল একেবারে অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায়। এরূপ পরিবেশে ওখানে সাহায্য করার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কাজ আর কিছুই আমরা করতে পারতাম না। সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার উন্নতিবিধানের জন্য আমাদের সাহায্য-দানের কথাই শুধু নয়, একথাও আমরা ভাবলাম যে, আমাদের কাজ সর্ব্বসাধারণের মনে ঘা দিয়ে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে এবং আমাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হ'ল। চতুষ্পার্শ্বস্থ সমগ্র অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেবকগণ সাহায্যার্থ এগিয়ে এলেন, ফলে কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল উন্নতির পথে। তিন মাসের মধ্যে আমরা রোগীদের অবস্থান এবং ক্লিনিক বা রোগশয্যার নিমিত্ত তিনটি পাকা ঘর নির্ম্মাণ এবং একটি কূপ খনন করলাম।

সম্প্রতি আমি যখন পাঁচটি পাকা-ঘরওয়ালা এই প্রতিষ্ঠানে ফিরে এলাম তখন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে ৯২ জনে, পঞ্চাশ একর বনভূমির এক বৃহৎ অংশ আনা হয়েছে কৃষির আওতায় এবং উনত্রিশটি গরু (মাত্র তিন বৎসর ধরে) রোগীদের দুধ যোগাচ্ছে। ঘাসের দাম এবং গবাদি সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য এই দুধের কিয়দংশ শহরেও বিক্রি করা হয়ে থাকে।

কিন্তু যে কাজ করা হয়েছে এবং এখনও করতে হবে তৎসম্পর্কে এখনও পর্য্যন্ত অত্যন্ত অল্প সাড়াই পাওয়া গেছে। অবশ্য শ্রীআমতে ও শ্রীমতী আমতে এবং আনন্দাভানের

ক্ষুদ্র কর্ম্মীসংসদ রোগীদের নিয়ে সারাদিন কাজে নিরতিশয় ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু আরও সাহায্যের প্রয়োজন।

আমি যা বলতে চাচ্ছি—তা অর্থ সম্বন্ধে ততটা নয়, যতটা সেবাকর্ম্ম সম্পর্কে। অবশ্য আর্থিক দিকটার গুরুত্ব আছে (নাগপুরের মিঃ যোগকে ধন্যবাদ যিনি নাগপুরের নিকটে, সরকার-প্রদত্ত পঞ্চাশ একর জমির উপর একটি নূতন উপনিবেশ স্থাপনার্থে প্রচুর অর্থ দান করেছেন)। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—অপরকে সাহায্য করার কার্য্যে যারা নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে চায় তাদের নিঃস্বার্থ সেবাকর্ম্ম। কুষ্ঠরোগী নিজেকে অপাংক্তেয় বলে মনে করবে না, নিজেকে সে ভাববে মনুষ্য-সমাজের আর দশজনের সমস্তরের এমন একজন রূপে—এখনও যে নিজের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সমর্থ এবং সামাজিক যাবতীয় অধিকারের ষোল আনা স্বত্ব যার আছে।

আমার মনে হয় যে, একজন সমাজকর্ম্মীর নিকট এই সকল নিঃস্ব এবং নিঃসহায়কে সাহায্য করার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সেবাকার্য্য আর কিছুই নাই। এই ধরনের কলোনিতে বহুবিধ উপায়ে সমাজসেবা-কর্ম্ম করা যেতে পারে। যেমন: রোগীর পরিচর্য্যা (Nursing), সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গবেষণাগারের কার্য্য, কৃষিসম্পর্কিত কার্য্য, চতুষ্পার্শ্বের রোগীদের দেখাশুনা করা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের নিকট কুষ্ঠব্যাধির তথ্যাদি সম্পর্কে বক্তৃতাও দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের সেবাকার্য্যকে ব্যক্তিগত লাভজনক কার্য্য হিসাবে গ্রহণ করা সমীচীন হবে না, একে মনে করতে হবে জীবনের ব্রত। কুষ্ঠরোগীর প্রয়োজন প্রচুর ভালবাসা ও সহানুভূতি, এবং কলোনি হবে তার নিকট প্রকৃতই নিজের বাড়ীর মত। আন্দাভানে আমার তিন মাসব্যাপী কার্য্যকালে এটা আমি গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম যে, আমরা যে তাদের এক সঙ্গে বাস করেছি, এক সঙ্গে কাজ করেছি এবং অপরাহ্নকালে একত্রে বসে গল্পগুজব করে, গান গেয়ে এবং খেলাধুলো করে সময় কাটিয়েছি তাতে এই সকল লোক কত সুখী হ'ত। সেখানে ছিল উচ্চ হাসির রোল, ছিল প্রফুল্লতা। মিঃ আমতে যে তাঁর নাম এবং কাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা পছন্দ করেন না, এটা আমার জানা আছে। কিন্তু তাঁর প্রাত্যহিক কাজের কথা—যা আরম্ভ হয় চুটোর সময় এবং শেষ হয় রাত্রে—গোপন করবার কোনো হেতু আমি খুঁজে পাই না। যদিও তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়, তথাপি তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। আর তাঁর স্ত্রী—তিনি রোজ নিয়মিত ভাবে দুগ্ধ দোহন করেন, নিজের ছেলেপেলেদের দেখাশুনা করার কাজ ত আছেই। ১৯৫৫ সনে জনৈকা কুষ্ঠ-রোগিণীর গর্ভজাত এক সুস্থ শিশুকে তিনি নিয়ে গেছেন তাঁর নিজ পরিবারে। যখন দেখা গেল যে, ঐ স্ত্রীলোকটি কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে তখন—১৯৫৪ সনের অক্টোবর মাসে, তার স্বামী তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ এমন একটি ট্রাজেডি যা জগতের বড় বড় ঘটনার স্তূপের নীচে তলিয়ে যায় নি—সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আমতে-দম্পতি উভয়েই ভবিষ্যতের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা করছেন। আরও একটি গৃহ, কর্ম্মীদের জন্য কতকগুলি কোয়ার্টার, তা ছাড়া একটি সাধারণ রান্নাঘর এবং গরু-মহিষের কতকগুলি আস্তানাও নির্ম্মিত হবে। কুষ্ঠাশ্রমের সঙ্গে ওয়ারোরা-চিমুর রোডের সংযোগস্থাপনকারী একটি পাকা ধাতব রাস্তা নির্ম্মাণ করতে হবে। এই বৎসরের শেষের দিকে খোলা হবে নাগ-পুরের নূতন ক্লিনিক এবং আশা করা যায় যে, সমিতি এর ভিতরে ১০০ জন রোগীর স্থানসঙ্কুলান করতে সমর্থ হবে। আন্দাভানের চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ মাইল পরিধির মধ্যে ১১৮টি গ্রাম সার্ভে করার একটি পরিকল্পনাকে রূপদান করা হচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত এমন ৩০টি গ্রাম সার্ভে করা হয়েছে যেগুলিতে কুষ্ঠ-ব্যাধির হার খুব বেশী।

শ্রীআমতে আশাবাদী। ১৯৫১ সনের ২১শে জুন শ্রীবিনোবা ভাবে কর্ত্তৃক উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর কাজের যে প্রগতি হয়েছে তারপর আশাবাদী হওয়ার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে।

ট্রেনে ওয়ার্দ্ধা এবং চান্দার মধ্যবর্ত্তী ওয়ারোরা অতিক্রম-কালে ষ্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে যদি কতকগুলি লাল ছাদের চকচকে রং আপনার নজরে পড়ে তা হলে মনে রাখবেন সেগুলোতে এমন এক শ' জন লোক বাস করে যাদের প্রয়োজন শুধু আপনাদের মৌখিক দুঃখপ্রকাশ নয়, যারা চায় আপনাদের সক্রিয় সাহায্য এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ।

জেরিনা করিমভয়

শ্রীআম্মু কৃষ্ণস্বামী

"আমরা বড় বেশী খাই, আমাদের মধ্যে যাদের রোজ একাধিকবার খাবার মত সংস্থান আছে তারা সকলেই অত্যন্ত বেশী আহার করে থাকে।" এক চামচে মাত্র ভাত খেতে খেতে কথাগুলি বললেন শ্রীমতী জেরিনা করিমভয়।

"এমনি ভাবে কি সার্ব্বজনীন লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান আপনি এবং এই একটি গ্রাস মাত্র খাদ্য কি কোন মতেই যথেষ্ট বলে গণ্য হতে পারে?"—আমি সাহস করে একথা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

"পুষ্টির উদ্দেশ্যে এ হচ্ছে যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক। এতে খাদ্যের উপাদেয়তা উপভোগ করবার সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু লালসাবশতঃ অধিকতর খাদ্য গ্রহণ করে যদি পেট বোঝাই করা হয় তা হলে অতিভোজনজনিত অরুচি এবং বিরক্তির উদ্রেক হয়ে থাকে।"—জবাব দিলেন জেরিনা করিমভয়।

হ্যাঁ, আমি একজন শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি বটে। রং-তুলি নিয়ে তিনি ভাসাভাসা ভাবে কাজ করেন কিনা তার কোন প্রমাণ আমি পেলাম না, এমনকি তাও ছিল অনাবশ্যক। এখানে এমন একজনের সংস্পর্শে আমি এসেছি যিনি সৌন্দর্য্যের সেই সূক্ষ্মতম কণাসমূহের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম, জীবন প্রতি পদে যা আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করে এবং উপেক্ষাবশতঃ প্রায়শই যার পানে আমরা ফিরে তাকাই না।

জেরিনা করিমভয় কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সদস্যা। একহারা গড়নের এই মহিলাটি অপরিসীম উদ্যমশীলা, তাঁর চেহারায় বেশ একটা হাসিখুশী ভাব, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর দ্রুত রসবোধ। সেই জন্যে তাঁর সান্নিধ্যে গেলে একটা প্রীতিকর, লঘু, হৃদ্য পরিবেশের স্পর্শ পাওয়া যায়। মৃদুভাষিণী তিনি, তাঁর কথাবার্ত্তায় আছে সজীবতা এবং সরসতা। তাঁর আয়ত্তে আছে সাহিত্যের আনন্দ এবং দর্শনের সান্ত্বনা। জীবনের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক হিসেবে তাঁর স্বামী এ দুটি বিষয়েই তাঁকে শিক্ষাদান করেছিলেন—সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ। বোম্বাইয়ে সারাজীবন কাটানোর দরুন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার প্রকাশ সুসংস্কৃত ও নাগরিক।

মাত্র তের বৎসর বয়সে জেরিনা করিমভয়ের বিবাহ হয় এবং তাঁর শিক্ষালাভ হয় স্বামীগৃহেই। বিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে যখন তিনি বিভিন্ন বিষয়ে, বরোয়া কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হলেন—তখন পারিবারিক জীবনের গণ্ডীর বাইরে চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃহত্তর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করলেন। আরও জনকয়েক তরুণ-বয়সী কর্ম্মীর সঙ্গে কারখানার শ্রমিকদের, বিশেষতঃ নারী শ্রমিকদের জীবনযাপনের অবস্থা সম্পর্কে তিনি প্রণালীবদ্ধ ভাবে তথ্যানুসন্ধানকার্য্য পরিচালনা করেন। সক্রিয় শ্রম আইন এবং পৌর আইন সাফল্যের সঙ্গে কার্য্যকরী হবার পূর্ব্বে, এককক্ষবিশিষ্ট ভাড়াবাড়ীতে শ্রমিকদের অবস্থানের অসুবিধা এবং দুঃখকষ্ট প্রভৃতি ছিল এমন সব সমস্যা যা জেরিনা করিমভয়ের নিকট অত্যন্ত বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের অবস্থানের জন্য অধিকতর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টির নিমিত্ত যতই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন ততই নারীদের অভাব-অভিযোগ বিশেষতঃ, একক জীবনযাপনকারিণী, বিধবা অথবা স্বামীপরিত্যক্তাদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাধীন হবার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব ততই অধিকতর রূপে উপলব্ধি করতে তিনি সক্ষম হলেন। কোন স্ত্রীলোক ভিক্ষা করছে—এই দৃশ্য নৈতিক মূল্য সম্পর্কে জেরিনা বেনের বদ্ধমূল ধারণার বিরোধী।

বোম্বাইয়ের মত বিরাট নগরীর প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে জেরিনা বেন শিল্পায়িত নাগরিক সমস্যা-সমূহের অন্যতম মুখ্য সমস্যার জবাব খুঁজে পেয়েছেন। সেটি হচ্ছে—হাজার হাজার বিদ্যালয়ের শিশু, আপিস এবং কারখানার কর্ম্মীদের মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা-সম্পর্কিত। সারা শহর জুড়ে—বিশেষতঃ যে সকল অঞ্চলে বিদ্যালয়, কারখানা এবং ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহ অবস্থিত সেগুলিতে এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রসমূহ নির্ব্বাচিত হয়েছে। নারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিশু এবং বয়স্কদের উপযোগী খাদ্যের তত্ত্বাবধান এবং রান্না করতে ও সেগুলো প্যাক করে স্থানান্তরে পাঠাতে। পরিচ্ছন্নতা এবং পরিপাটি-রূপে কাজ করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

এইভাবে একদিকে নারী যেমন নিজের জীবিকা নির্বাহের একটি নিশ্চিত পথ খুঁজে পেয়েছে, অন্য দিকে তেমনি সর্বসাধারণের পক্ষেও উত্তম, স্বাস্থ্যকর এবং পরিচ্ছন্ন খাদ্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়েছে। এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা ক্রম-

বর্দ্ধমান এবং এই সাফল্যের মূলে রয়েছে জেরিনা বেন ও তাঁর কর্ম্মীসংসদের অবিজ্ঞাপিত কর্ম্মপ্রচেষ্টা।

এ ত গেল জেরিনা বেনের বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রের কথা—ঘরে তিনি তিনটি সন্তানের জননী। তিনি একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, মানুষের কৌতূহল এবং বৃত্তির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা উচিত। তিনি যেমন স্নেহাতুরা জননী তেমনি নিষ্ঠাবতী সহধর্ম্মিণী। তাঁর জীবনে প্রথম তিনি প্রায় একমাস পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করেন—গত বৎসর যখন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সদস্যারূপে তিনি দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন। সমাজকর্ম্মের ক্ষেত্রে তাঁর সেবাকার্য্য ভারত সরকারের স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং গত বৎসর তাঁকে দেওয়া হয়েছে "পদ্মশ্রী"। তিনি কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি, এটাই যে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তি নন, পুরস্কার লাভ করে যিনি প্রতিনিবৃত্ত হবেন তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টা থেকে। তিনি এটা অনুভব করেন যে, করবার যথেষ্ট কাজ রয়েছে—তাঁর কাজ তিনি করে চলবেনই এবং সাধারণের প্রশস্তির চেয়ে আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদই হবে তাঁর প্রকৃত পুরস্কার।

অমৃতসরের পিঙ্গলওয়ারা হোম

ডি. পাল চৌধুরী

অমৃতসরে পঞ্জাবের বৃহত্তম হাসপাতাল অবস্থিত এবং সেখানে অনেকগুলি দাতব্য সংস্থা ভিখারী ও নিঃস্বদের বিনামূল্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহ হইতে অধিকাংশ রোগী এবং দীনদরিদ্র ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া এই নগরীতে আসে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে সমর্থ হয় না।

সেই জন্যই শারীরিক দিক দিয়া যাহারা অসহায় অর্থাৎ অশক্ত, অকেজো বলিয়া পরিত্যক্ত, দুর্ব্বল, বয়স্ক এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত তাহাদের আশ্রয় ও বিশ্রামের জন্য একটি হোম বা সদন প্রতিষ্ঠা—এবং স্থানীয় সরকারী হাসপাতালগুলি হইতে চিকিৎসাবিষয়ক সাহায্যলাভের আশায় যাহারা শহরে আসিয়া থাকে তাহাদের জন্য একটি বোর্ডিং হোমের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ভগৎপূরণ সিং ১৯৪৭ সনে অমৃতসরে পিঙ্গলওয়ারা সদন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে এই হোমের তিনটি শাখায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ২০৩ জন অবস্থান করিতেছে :

বয়স্ক ও দুর্ব্বল	২৫
যক্ষ্মারোগী	৫৪
মানসিক জড়তাগ্রস্ত	৩৫
ওরথোপেডিক কেস	১৯
মেডিক্যাল	৪০
সদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন শিশু	৫
বিকলাঙ্গ	১০
	২০৩

এর মধ্যে ৭০ জন স্ত্রীলোক এবং ৫০ জন শিশু।

ইহা সুপরিজ্ঞাত বিষয় যে, আমাদের দেশে চিকিৎসা-কার্য্যের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, পীড়িত লোকদের সংখ্যার তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। যে-ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে প্রত্যেক এক হাজার রোগীর জন্য একজন চিকিৎসক আছেন, সেখানে ভারতে ৬৩,০০০ জন লোকের জন্য চিকিৎসক পাওয়া যায় মাত্র এক জন। আমাদের চিকিৎসাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহে রোগীদের শয্যার আনুপাতিক হার হইতেছে—৩,১৩৫ জন রোগীর জন্য একটি শয্যা।

অনুরূপ ভাবে সক্রিয় যক্ষ্মাব্যাধিতে ভুগিতেছে আড়াই কোটি লোক, কিন্তু যক্ষ্মা হাসপাতালে, স্যানাটোরিয়াম প্রভৃতিতে প্রাপ্তব্য শয্যার মোট সংখ্যা ১০,০০০।

ইহার মানে এই যে, চাহিদা এবং তাহা মিটানোর ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকায় ভারতে হাজার হাজার লোক কোন চিকিৎসক অথবা হাসপাতালের সাহায্য না পাওয়াতে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও এই বিপুলায়তন সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারী এবং বে-সরকারী সংস্থাসমূহ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে, তথাপি অবস্থা যে রকম তাহাতে এ কাজে যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানো বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইবে। আমাদের অধিকাংশ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমাজকর্ম্মীরা এই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করেন নাই।

হোমের কর্ম্মিবৃন্দ আবাসিক রোগীদের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা ত করিয়া থাকেনই, তা ছাড়া হাসপাতালে

যত দিন না আহাদের জন্য শয্যা পাওয়া যায় তত দিন পর্য্যন্ত প্রায় রোজই তাহাদিগকে সাইকেল ট্রলিতে করিয়া বিভিন্ন হাসপাতালের আউট-ডোর বিভাগের বিশেষজ্ঞদের নিকট লইয়া যান। এতদ্ব্যতীত নৈরাশ্যগ্রস্ত, পুরাতন এবং দুরারোগ্য রোগীদের ভার ও হোম গ্রহণ করিয়া থাকে।

একজন ডাইরেক্টর, একজন ম্যানেজার, একজন কম্পাউণ্ডার এবং একজন একাউন্ট্যান্ট লইয়া হোমের কর্ম্মী-সংসদ গঠিত—ইঁহারা নিষ্ঠার সহিত হোমের কার্য্যে নিরত আছেন। বস্তুতঃ, পঞ্চাশৎ বর্ষবয়স্ক চিরকুমার ভগৎ পূরণ সিংহের—যিনি আমাদের সমাজের এই সকল চূড়ান্ত রকমের হতভাগ্যদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—ব্যক্তিগত চেষ্টার দরুনই এই হোমের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। ভগৎ পূরণ সিংকে বাস্তবিকই বলা চলে একজন ফকির—তাঁহার জীবনযাত্রা অত্যন্ত সাদাসিধা ধরনের, তিনি বিশুদ্ধ খাদি পরেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত অভাব-অনটনও খুবই সীমাবদ্ধ। থাকিবার মত নিজস্ব একখানা ঘরও তাঁহার নাই। তাঁহার রোগীরা যে ঘরে থাকে তাহারই বারান্দায় তিনি খাওয়া-দাওয়া ও কাজকর্ম্ম করেন এবং সেখানেই শয়ন করেন। তিনি পঞ্জাব রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের একজন সদস্য এবং সমাজকর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেশবিভাগের পূর্ব্বে লাহোরের কতকগুলি গুরুদ্বারায় বিকলাঙ্গ শিশুদের পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহার সমাজ-সেবা-কর্ম্মের সূচনা।

হোমের বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ষাট হাজারের কাছাকাছি। হোমের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অর্থের সংস্থান হয়—কারখানার কর্ম্মী, পুলিস বিভাগের লোক, কেরানী, পিওন ইত্যাদির নিকট হইতে স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহ, বদান্য ব্যক্তিদের দান এবং টি-বি ওয়ার্ডের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটির অর্থসাহায্য ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র হইতে। সম্প্রতি সমাজকল্যাণ পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

পিঙ্গলওয়ারা হোমের কর্ম্মপ্রচেষ্টা, কাজেই, চিকিৎসা-সম্পৃক্ত সমাজকর্ম্মের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহা এমন একটি নূতন আদর্শ যাহাকে কর্ম্মে রূপায়িত করিয়াছেন 'আমাদের অজানা সৈনিক' ভগৎ পূরণ সিং। অর্থাৎ, ব্যাধির সূচনা এবং ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ না আসা পর্য্যন্ত যে ফাঁক তাহা পূরণ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, অন্যান্য সমাজ-কর্ম্মীরাও এই ধরনের 'সদন'সমূহের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইবেন এবং এই পুণ্য কৃত্যই হইবে আর্ত্ত মানবতার প্রতি শ্রেষ্ঠতম সেবাধর্ম্ম।

স্বেচ্ছামূলক কল্যাণ-সংস্থাসমূহের সমস্যা

ভেলমা মেল্লের

"শিশুরাই জাতির সম্পদ"—এটা যখন একটা অত্যন্ত প্রচলিত কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন কোন সমাজ, কোন সরকারই এই সত্যকে এড়াইয়া যাইতে পারে না। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহার যথোচিত প্রয়োগ হইতে এখনও আমরা অনেক দূরে রহিয়া গিয়াছি।

এখনও যে সকল কৃত্য বাকী রহিয়া গিয়াছে, কে তাহা সম্পন্ন করিবে? আমি বিশ্বাস করি, শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকর্ত্তৃক তাহা সম্পন্ন হইবে। প্রত্যেক আধুনিক রাষ্ট্রই কতকগুলি চিরাচরিত কল্যাণ-কর্ম্মপ্রচেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই যে, হাসপাতাল অথবা বিদ্যালয়সমূহ রাষ্ট্রেরই কার্য ক্ষেত্র। বর্ত্তমানে আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছি, রাষ্ট্র এখনও পুরাপুরি ভাবে যাবতীয় কল্যাণকর্ম্মের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। প্রতীতি হয়, ভারত সরকার ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, অনাগত আরও কিছুকাল স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহকে কাজে লাগাইতে এবং কিয়ৎপরিমাণে সরকারী অর্থসাহায্য দান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদসমূহসহ কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় সেই সকল মুখ্য সমস্যা কি কি যাহার সম্মুখীন এই ধরনের সংস্থাগুলিকে হইতে হয়? সংক্ষেপে আমি ইহার একটি তালিকা দিতে পারি—অবশ্য এই তালিকা গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী নয়।

১। অভিজ্ঞ পরিচালনা
২। শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিবৃন্দ
৩। যথোপযুক্ত গৃহ
৪। সাজসরঞ্জামের অর্থভাণ্ডার
৫। পৌনঃপুনিক ব্যয়নির্ব্বাহের অর্থসংস্থান।

ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না যে, প্রথমোক্তটি ব্যতীত আর সকলগুলিই অর্থনৈতিক সমস্যা। অভিজ্ঞ পরিচালনা যেমন অপরিহার্য্য তেমনি ইহা পাওয়াও দুষ্কর। প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের বৈতনিক ভিত্তিতে নিয়োগ করা স্বেচ্ছা-মূলক সংস্থাসমূহের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব হইতে পারে। কাজেই ইহাকে আমি অর্থনীতি-নিরপেক্ষ সমস্যা বলিয়া অভিহিত করিতেছি—কেননা, এই ধরনের পরিচালনা এবং নির্দ্দেশ কার্য্যতঃ কেনা যাইতে পারে না, কেবলমাত্র বিনা-মূল্যে প্রদত্ত হইতে পারে। ইহাই কিন্তু সর্ব্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ—বিশেষতঃ সংস্থাটি যদি দরিদ্র হয়। শুভেচ্ছা এবং সমাজকর্ম্ম করার আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয়, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা এই দুইটি হইতেছে অপরিহার্য্য, বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ অর্থ-সংস্থান দ্বারা যদি শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিতে হয়।

শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীও দুর্লভ। এই দুষ্প্রাপ্যতা এমন একটি সমস্যা উপস্থাপিত করে যাহার সমাধান ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও পক্ষে করা সম্ভবপর নয়। এ ক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি যে, স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রের নিকট হইতে ন্যায্য ভাবেই শিক্ষণের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা, শিক্ষণবৃত্তি অথবা অর্থসাহায্যের আকারে আনুকূল্য প্রত্যাশা করিতে পারে। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে যখন পাওয়া যাইবে তখন তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য উচ্চহারে বেতন দিতে হইবে। শিশু-দের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত অ-শিক্ষিত লোকদিগকে এই কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিতে হইবে। তাহাদের নিয়োগের ফলে কাজের মানের অবনতিই শুধু নয়, অযথোচিত ভাবে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের এবং বহু আয়াসলব্ধ অর্থেরও অপচয় হয়। উপরন্তু ইহার দরুন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কেও অখ্যাতি রটনা হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অযোগ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত নার্শারি স্কুল কেবল যে নার্শারি শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সাধারণের মনে আস্থা উৎপাদনে অসমর্থ হইবে তাহা নয়, উপরন্তু কোন কোন লোককে নিজ নিজ শিশুদের আদৌ যে-কোন নার্শারি স্কুলে পাঠাইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে।

যথোপযুক্ত গৃহের সমস্যা

পরবর্ত্তী সমস্যা হইতেছে গৃহসম্পর্কিত সমস্যা। কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠাকালে ইহাই অবশ্য প্রাথমিক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। প্রথমতঃ, উপযুক্ত এবং যথেষ্ট স্থানের অভাবে কোন সংস্থাই ঠিকমত চালু হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সামগ্রিক পরিবেশ শিশুর উপরে যে প্রভাব বিস্তার করে তাহা এতই গভীর যে, গৃহের ব্যবস্থার নিমিত্ত যতই আয়াস স্বীকার করা হোক না কেন, তাহা কখনই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, এই বিষয়টির গুরুত্ব সকল সময়ে যথাযথ ভাবে উপলব্ধ হয় না। আমি এমন কতিপয় লোকের কথা জানি যাঁহারা এই মত পোষণ করেন যে, প্রাক্-বিদ্যালয় সংস্থা এবং বিদ্যালয়সমূহের পরিবেশ গৃহের পরিবেশ অপেক্ষা খুব পৃথক ধরনের বা উচ্চস্তরের হওয়া সমীচীন নয়। ইহা একটি অজ্ঞতাপ্রসূত এবং মারাত্মক মত। প্রথমতঃ—কোন প্রতিষ্ঠান গৃহ নয়, কিন্তু হাসপাতালের ন্যায় ইহাও একটি বিশেষ আবেষ্টন। আপনি যদি বিজ্ঞানসম্মত নীতিসমূহের ভিত্তিতে ইহাকে পরিচালিত করিতে চান—এবং অন্য কোন পন্থা হইবে অন্যায় এবং অপচয়কারী—তাহা হইলে আপনাকে এমন কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে, একটি সাধারণ পরিবারে যাহা অনাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ—আমাদের গৃহসম্পর্কিত ব্যবস্থা যে রকম (সেগুলি সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল) তাহাতে একথা বলা চলে যে, সংস্থাগুলি যে সকল গৃহে স্থাপিত হয় সেগুলির দশা যেমন শোচনীয়, স্বাস্থ্যনীতির দিক দিয়াও তেমনি প্রশংসনীয় নহে। আমি কি একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, আমরা কি এই সকল শিশুকে অতীতে ফিরিয়া যাইবার, না উন্নততর ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রদান করিব? একথা নিশ্চিত, যদি তাহাদের পরিচ্ছন্নতা, পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যনীতি শিখিতে এবং সৌন্দর্য্যবোধ অর্জ্জন করিতে হয় তো বিদ্যালয় অথবা অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য—শিশুরা নিজ নিজ দরিদ্র পরিবারে জীবনযাত্রার যে মানের সঙ্গে পরিচিত তাহাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানের ব্যবস্থা করা।

সুতরাং যথোপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা করাই সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন এবং স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহের প্রগতির পথে ইহাই প্রবলতম প্রতিবন্ধ। একটি উপযোগী গৃহ, এমনকি কক্ষসমূহের ব্যবস্থা করার মানেই হইতেছে অত্যধিক ভাড়া, অর্থাৎ পৌনঃপুনিক ব্যয়ের সঙ্গে বিরাট সংযোজন। "পাটনা মাছুয়াটুলি বস্তি স্কুল" প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারসমূহের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহ দ্বারা গৃহসমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

সাজসরঞ্জামের 'ফণ্ড'

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে সাজসরঞ্জামের নিমিত্ত ফণ্ড সম্পর্কিত। অন্যগুলির তুলনায় এটি সহজতম। ইহা একটি প্রাথমিক বিরাট 'ভিক্ষা অভিযান' এবং একবার সংস্থা চালু হইবার পর দরখাস্ত লিখিবার একটি উৎসাহপূর্ণ পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ এবং অন্যান্য এজেন্সীগুলিকে ধন্যবাদ যে, দরখাস্তগুলি কখনও কখনও যথানিয়মে ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

পৌনঃপুনিক ব্যয়

পৌনঃপুনিক ব্যয় হইতেছে স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহের সর্বশেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ধরিয়া লওয়া হয় যে, স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহ নিজেদের চেষ্টা দ্বারাই এই অর্থ সংগ্রহ করিবে। মনে হয়, সকল কর্তৃপক্ষই পৌনঃপুনিক ভিত্তিতে অর্থসাহায্য দান করিতে অনিচ্ছুক। যে মাছুয়াটুলি বিদ্যালয়ের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই কারণেই ছয়-সাত বৎসর যাবৎ জীবন্মৃত অবস্থায় আছে। ইহা অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে নার্শারি শিক্ষা এবং নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে; এই প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রই এমন সব শিশু, অন্যথায় যাহাদিগকে আদৌ বিদ্যালয়ে পাঠানো হইত না বরং তাহারা শহরের নোংরা বস্তিতে খেলা করিয়া বেড়াইত এবং পরিণামে হয়ত ভিক্ষাবৃত্তি অথবা অপরাধমূলক কার্য্যে রত হইত। এই পাটনা শহরেরই বুকে বাস করিয়াও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, চূড়ান্ত রকমের নোংরা পরিবেশের মধ্যে থাকে এবং তাহারা সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষিত। এখন উন্নয়ন বিভাগ (Welfare Department) হইতে এই প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রদত্ত (recurrent) যে অর্থসাহায্য পাইত তাহার পরিমাণ ষাট টাকা মাত্র, অথচ খুব কাটছাঁট করিয়া বাজেট করিলেও ইহার মাসিক ব্যয় দাঁড়ায় তিন শত টাকার কাছাকাছি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য ইহা অপেক্ষা ভাল হইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে একথা সত্য যে, পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্ব্বাহের সমস্যাটি চাপাইয়া দেওয়া হয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্মীদের ঘাড়েই।

ফলে ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে 'ভিক্ষুক সমিতি'তে পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকে। কর্ম্মীরা অত্যন্ত কম মাহিনা পায় এবং তাঁহাদের চাকুরির স্থায়িত্ব সম্পর্কেও নিশ্চয়তা থাকে না। যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহারা অভিলাষানুযায়ী কাজ করিতে পারে না, ফলে কাজের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অর্থসংগ্রাহকগণও মানুষ ত বটে, কিছুকাল কাজে লাগিয়া থাকিবার পর তাহাদেরও অনুরাগ কমিয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মানবীয় প্রচেষ্টার অপচয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত দেখিতেছি।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যেখানে মাথাপিছু গড়পড়তা আয় অত্যন্ত অল্প সেখানে টাকা আসিবে কোথা হইতে? বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণের নিকট হইতে কি পরিমাণ দান আশা করা যাইতে পারে? ইহা এমন একটি প্রশ্ন যাহার জবাব দিতে পারেন হয়ত কোন অর্থনীতিবিদ্। এই বিষয়টি আমি তাঁহাদের উপরেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এখন কথা হইতেছে উপরে এই সমস্যা সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম সেগুলির জবাব কি? আমি শিশু-কল্যাণকামীদের বিবেচনার্থ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করিতেছি:

১। কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদের সহযোগিতায় রাজ্য সরকারের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইবে। ইহা এলাকাওয়ারি যে সকল সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৎসমুদয় প্রতিষ্ঠিত করিবে।

২। সরকার, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ এবং অন্যান্য এজেন্সীসমূহ কর্তৃক অর্থসাহায্য সেই সকল নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইবে যেগুলি উপরোক্ত পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত সর্তসমূহ সর্ব্বাধিক মানিয়া চলিবে। এই সমস্ত অর্থসাহায্য হইবে উদারভিত্তিক, স্থানীয় প্রয়োজনের সমানানুপাতিক এবং পৌনঃপুনিক ব্যয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। গৃহাদি নির্ম্মাণ ব্যাপারে নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের সমবেত ও সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে।

৪। প্রয়োজনসমূহের যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণের পর উপরোক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিক্ষণ-বৃত্তি মঞ্জুর করিতে হইবে।

৫। রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদের কর্ম্মচারী-সংসদ গঠিত হইবে কল্যাণকর্ম্মের সহিত সক্রিয় ভাবে সংশ্লিষ্ট লোকেদের লইয়া এবং অন্ততঃ এই ধরনের কাজের কোন বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোককে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৬। রাজ্যে শিশু-তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মীদের এমন একটি সংসদ গঠন করিতে হইবে যাহা স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহকে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ উপদেশ প্রদান করিবে, শিশুকল্যাণ এবং শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচার করিবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে জনমত সৃষ্টি করিবে।

এগুলি পরীক্ষামূলক প্রস্তাব মাত্র। আমি এই আশায় এগুলি উপস্থাপিত করিতেছি যে, অপর কেহ উৎকৃষ্টতর সমাধানের পন্থা নির্দ্দেশ করিবেন।

কলিকাতায় প্রথম নাগরিক স্বাস্থ্য 'ইউনিট'

আশা করা যায় যে, কলিকাতায় ভারতের প্রথম নাগরিক স্বাস্থ্য ইউনিটের (urban health unit) কার্য্যের সূচনা বর্ত্তমান বৎসরেই হইবে। ভারত সরকার, ইউনিসেফ, (Unicef) হু (WHO), পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলিকাতা করপোরেশন মিলিতভাবে 'হেলথ ইউনিট' প্রতিষ্ঠার এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনায় ব্যয় পড়িবে ১৫ লক্ষ টাকা এবং পৌনঃপুনিক বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ আট লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কলিকাতা করপোরেশন ও কলিকাতাস্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং নিউ দিল্লীস্থ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রভৃতির মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া পরিকল্পনাটির রূপায়ণ হইয়াছে। ক্লিনিক, গবেষণাগার, আপিসমূহ এবং কর্ম্মী-সংসদের সদস্যদের বাসগৃহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য পাকা-বাড়ীসমূহের নির্ম্মাণকার্য্যও সমাপ্তপ্রায়।

বর্ত্তমানে গ্রামীণ ভারতে (Rural India) এ ধরণের বহুসংখ্যক সক্রিয় হেলথ ইউনিট আছে এবং জনগণের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে এগুলির জনপ্রিয়তা, উপযোগিতা এবং কার্য্যকরিতা ক্রমে ক্রমে অধিকতররূপে প্রমাণিত হইতেছে। কোন নাগরিক অঞ্চলে কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন 'হেলথ ইউনিট' প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভারতে ইহাই হইবে এই ধরণের প্রথম সংস্থা।

কলিকাতা করপোরেশনের ২৪নং ওয়ার্ডে—যাহা চেতলা অঞ্চল নামে পরিচিত—এই 'হেলথ ইউনিট' প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ১৩,০০০ পরিবারের প্রায় ৬৮,০০০ লোক (ইহাই এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা) এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হইবে।

এই সংস্থা কর্ত্তৃক আদর্শ স্বাস্থ্য এবং কল্যাণমূলক কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইবে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্ম্মিবৃন্দ, সন্তানসম্ভবা জননী, শিশুবৃন্দ, যৌনব্যাধি এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদান সম্পর্কিত একটি প্রোগ্রামের দায়িত্ব সংস্থা গ্রহণ করিবেন।

শিশু এবং মাতৃমঙ্গল সম্পর্কিত এক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে হেলথ ইউনিট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া অচিরেই একটি আধুনিক মাতৃনীতি সদন (Maternity home) প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক এবং উপরোক্ত পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ইহা অপরিহার্য্য। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার 'হেলথ ইউনিটের' সন্নিহিত একটি অঞ্চল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। এই মেটার্নিটি হোমে ত্রিশটি শয্যা এবং যাবতীয় সাজসরঞ্জামযুক্ত একটি মার্শারি থাকিবে।

"অভ্যাসক্ষেত্র" (Practice field)

চেতলার লোকেদের জন্য আদর্শ স্বাস্থ্যনীতিসম্মত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত হেলথ ইউনিট 'কলিকাতা, অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজীন এণ্ড পাবলিক হেলথ' নামক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণাধীন ছাত্রদের নিকট প্রদর্শনকেন্দ্র (Demonstration centre) এবং অভ্যাসক্ষেত্র (practice field রূপেও কাজ করিবে। মেডিক্যাল ছাত্রদের শিক্ষণে হাসপাতালের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, পাবলিক হেলথ ছাত্রদের শিক্ষণসম্পর্কিত প্রোগ্রামে "Practice field"-এর মাধ্যমে অনুরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

হেলথ ইউনিটের কর্ম্মসূচী কলিকাতা, অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজীন এণ্ড পাবলিক হেলথ এবং কলিকাতা করপোরেশন এই উভয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক যুক্তভাবে পরিচালিত হইবে। রুটিনমাফিক স্বাস্থ্যনীতি-সংক্রান্ত কর্ম্ম বর্ত্তমানে যেমন চালু আছে, করপোরেশন এই এলাকায় তেমনি ভাবে তাহা চালাইয়া যাইবেন এবং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যে অতিরিক্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে উক্ত সংস্থা কর্ত্তৃক। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাদান, প্রদর্শন (demonstration) এবং গবেষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা সংস্থাই করিবেন। উক্ত এলাকার স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ক কর্ম্মপ্রচেষ্টা-সমূহের সমন্বয়সাধন, কর্ম্মবিধি, ব্যয় এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে উপদেশ প্রদানের জন্য পনর জন সদস্য সম্বলিত একটি টেকনিক্যাল উপদেষ্টা সমিতি (Technical Advisory Board) গঠিত হইতেছে। এই সমিতিতে থাকিবেন ভারত সরকার পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং কলিকাতা করপোরেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চিকিৎসাবৃত্তিজীবী, কল্যাণসংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া একটি স্বাস্থ্য পরিষদও (Health Council) গঠিত হইবে। পরিষদ জনসাধারণের নিকট ইউনিটের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ব্যাখ্যা করিবেন এবং পরিপূর্ণ মাত্রায় তাহাদের সহযোগিতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইবেন। পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য—সামাজিক পুনর্গঠনকার্য্য পরিচালনায় হেলথ ইউনিটকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা। ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি স্থানীয় লোকদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়া আলোচনা এবং যৌথভাবে কাজ করিবেন।

পুস্তক-পরিচয়

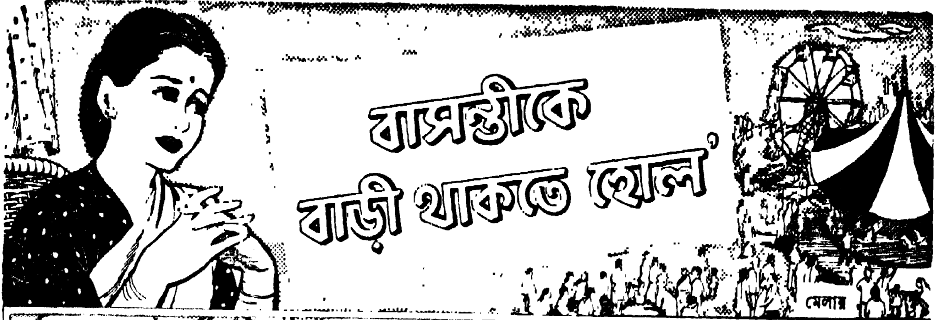
নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল। যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ৪১-এ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ছয় টাকা।

আজিকার দিনে বিপিনচন্দ্র পালের নাম না জানেন এমন লোক বিরল। একদিন ছিল যখন স্বদেশী বক্তা হিসাবে বাংলার ঘরে ঘরে তাঁহার নাম পরিকীর্তিত হইত। স্বদেশী আন্দোলনকালে 'লাল বাল পাল' এই তিনটি শব্দ একসঙ্গে লোকে উচ্চারণ করিত। তিন জন মহামান্য নেতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই শব্দত্রয়ের মধ্যে। তাঁহারা ছিলেন—লালা লজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল। কিন্তু একটি দিকে বিপিনচন্দ্র ছিলেন অনন্যসাধারণ—অরবিন্দ ঘোষের (শ্রীঅরবিন্দ) ভাষায়—"Philosopher of Nationaliam", জাতীয়তার দার্শনিক ব্যাখ্যাতা। বিপিনচন্দ্রের এই দার্শনিক মনস্বিতা যেমন তাঁহার বক্তৃতায় প্রকটিত হইত, তেমনি তাঁহার রচনাবলীতেও বিধৃত হইয়া আছে। এই সকল রচনা ক্রমশঃ পুস্তকাকারে প্রকাশ করায় "যুগযাত্রী" বাস্তবিকই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থে একটি পরিশিষ্ট সমেত বিপিনচন্দ্রের ষোলটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধাবলী "বাংলার নবযুগের কথা" নামে বঙ্গবাণীতে ১৩২৮-'৩১ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি বিপিনচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনা, এবং পরিপক্ব অভিজ্ঞতার ফল। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ পূর্ববর্তী পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে জাতীয়তাবোধে কতখানি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, বিপিনচন্দ্র তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহারও আগেকার পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনাপরম্পরা যাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না, তাহাও অধ্যয়ন এবং মনন দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এবংবিধ অধ্যয়ন, অনুশীলন, প্রত্যক্ষীকরণ এবং পর্য্যালোচনার ফল হইল আলোচ্য প্রবন্ধাবলী। কাজেই আমাদের জাতীয় জীবনের সম্যক্ পরিচয়-লাভে এগুলি যে কত প্রয়োজন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গ্রন্থে এক একটি 'কথা'র আকারে অধ্যায় ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম 'কথা' 'বাংলার বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে। বর্তমানে একটি কথা বড়ই শোনা যায়—"বৈশিষ্ট্য লইয়া তোমরা মাতামাতি করিও না; ইহাতে প্রাদেশিকতার গন্ধ তো আছেই, পরন্তু ইহা সামগ্রিক ঐক্যের পরিপন্থী।" মনস্বী বিপিনচন্দ্র দেখাইয়াছেন, বাংলার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া লইলেই তবে সামগ্রিক বা ভারতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ ও সার্থক হইবে। ঐ মতবাদীদের এই নিবন্ধটি বিশেষভাবে অনুধ্যান করিতে বলি। দ্বিতীয় হইতে সপ্তম 'কথা'য় রামমোহন হইতে কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ধর্মগত ও সমাজগত বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় সুব্যক্ত। রামমোহন কি কি কারণে 'যুগ-প্রবর্তক' তাহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যান পাই দ্বিতীয় কথা 'যুগ-প্রবর্তক রামমোহনে'। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম কথা—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোচনা রহিয়াছে তৃতীয় কথায়। চতুর্থ হইতে সপ্তম কথায় ব্রাহ্মসমাজ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্রাহ্মসমাজের কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিপিনচন্দ্র। পরবর্তী কালের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের কুরীতির নাগপাশ হইতে মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলন কিরূপে রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহারও অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ শেষোক্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম কথার মধ্যে আমরা পাই।

স্বদেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে যে জাতীয় মনোভাব এতদিন পরিপুষ্টিলাভ করিতেছিল তাহা রাজনারায়ণ বসুর মনস্বিতা এবং নবগোপাল মিত্রের কর্ম্মিষ্ঠতার মণিকাঞ্চন সংযোগে হিন্দু মেলায় অপূর্ব্ব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। অষ্টম ও নবম কথায় এই বিষয়টি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। স্মৃতি হইতে বলায় শেষোক্ত 'কথা'য় বিপিনচন্দ্র একটি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। টালার বদনচাঁদের বাগানের অধিবেশনই হিন্দু মেলার শেষ নয়; ইহার পরেও এই মেলা বহু বৎসর চলিয়াছিল। তবে তখন ইহার জৌলুস ততটা ছিল না। বিপিনচন্দ্র বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বর্তমান পুস্তকে এবিষয়ে চারিটি কথা (দশম-ত্রয়োদশ) সংযোজিত আছে। বঙ্কিম-সাহিত্যের মূল কথার এমন নিপুণ ও নিখুঁত বিশ্লেষণ কচিৎ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া উপন্যাস, প্রবন্ধ,



বাসন্তীকে
বাড়ী থাকতে হোল'
মেলায়



নীনা ! বাসন্তী কই !



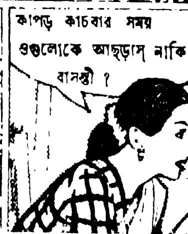
দেখি বাসন্তীর বাড়ী গিয়ে



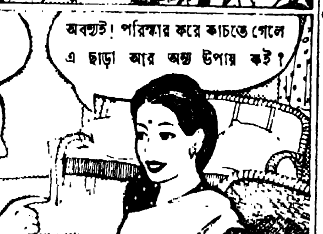
বাসন্তী ! বাড়ী বসে করছিস্ কী !
মেলায় যাই কী করে ভাই। আমার কাপড় যে বড্ড ছিঁড়ে গেছে।



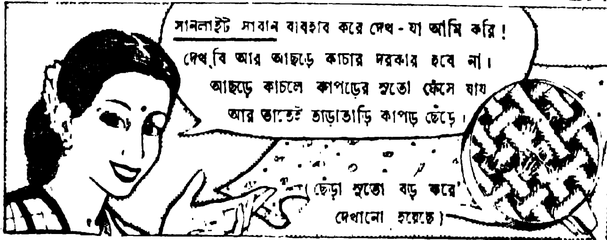
বুঝেছি - এ বিষয়ে তোর সঙ্গে কথা কইবো ভেবেছিলুম ...



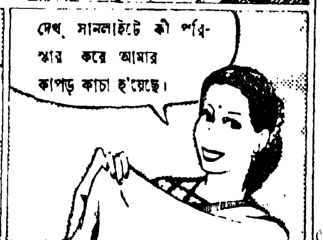
কাপড় কাচবার সময় ওগুলোকে আছড়াস্ নাকি বাসন্তী ?



অবশ্যই! পরিস্কার করে কাচতে গেলে এ ছাড়া আর অন্য উপায় কই ?



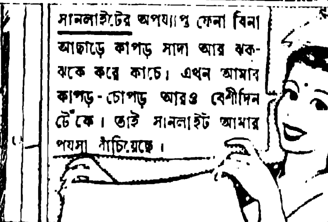
সানলাইট সাবান ব্যবহার করে দেখ - যা আমি করি !
দেখ্‌বি আর আছড়ে কাচার দরকার হবে না। আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ফেঁসে যায় আর তাতেই তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে।
(ছেঁড়া সুতো বড় করে দেখানো হয়েছে)



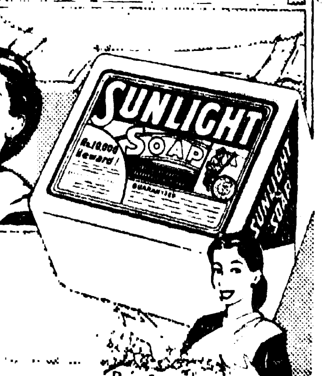
দেখ্‌ সানলাইটে কী পরিস্কার করে আমার কাপড় কাচা হ'য়েছে।



আজই আমি সানলাইট সাবান কিনবো



সানলাইটের অপর্যাপ্ত ফেনা বিনা আছাড়ে কাপড় সাদা আর ঝকঝকে করে কাচে। এখন আমার কাপড়-চোপড় আরও বেশীদিন টেঁকে। তাই সানলাইট আমার পয়সা বাঁচিয়েছে।



SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT SOAP

ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সব বিষয়ই এই চারিটি নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র বঙ্কিম-সাহিত্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) উপন্যাস, (২) ধর্ম্মতত্ত্ব এবং (৩) রাষ্ট্রনীতি; আর এই তিনটি দিক হইতেই যথাযথ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এই রচনা চতুষ্টয়ে। "নাট্যকলা ও রঙ্গালয়ে নবযুগ" (চতুর্দ্দশ কথা) এবং "বাংলার নবযুগের নাট্যকথা এবং নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র" (পরিশিষ্ট—অসম্পূর্ণ রচনা) নাট্যকলা এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধেও লেখকের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

পুস্তকের পঞ্চদশ কথা 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সুরেন্দ্রনাথ' সম্পর্কে এবং ষোড়শ কথা 'সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনে'র উপর। আজকাল 'জাতির জনক' কথাটির খুবই চল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আদি গুরু বা প্রধান আচার্য্য বলিয়া যদি কাহাকেও আখ্যাত করিতে হয়, আর সেই অর্থে যদি 'জাতির জনক' কথাটি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর কাহাকে তাহা বলা যাইতে পারে? বিপিনচন্দ্রের রচনার মধ্যে এই প্রশ্নের জবাব মিলিবে। জাতীয় জীবনের নবোন্মেষ-কাল—এক শতাব্দীর চমৎকার ভাব ও কর্ম্ম-ব্যাখ্যান সম্বলিত এই পুস্তকখানি বাংলাভাষী মাত্রেরই আদরণীয় হইবে।

যুগস্রষ্টা কেশবচন্দ্র—শ্রীকমলা ঘোষ। বি, সিংহ ব্রাদার্স, ৩৮ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃ, ৮০। মূল্য চৌদ্দ আনা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব মহাপুরুষ এবং মনস্বী ব্যক্তি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কেশবচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। কেশবচন্দ্রকে লোকে সাধারণতঃ ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই জানে; তিনি যে সমাজসংস্কারক ছিলেন একথাও হয়ত তাহাদের কতকটা জানা। কিন্তু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা অন্য নানাদিকেও প্রযুক্ত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, কারিগরি শিক্ষা প্রচলনে, সংবাদপত্র সেবায়, বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে, এবং বিভিন্ন সঙ্ঘবদ্ধ কল্যাণব্রতে তাঁহার অপরিসীম কৃতিত্ব আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কেশবচন্দ্রের সঙ্গলাভে সে যুগে একদল যুবক যেমন ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা ভাষণে জনসাধারণ তেমনি নব নব ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি কিশোরদেরও বন্ধু ছিলেন। 'বালকবন্ধু' প্রকাশের মধ্যেই ইহার উৎকৃষ্ট পরিচয়। আলোচ্য পুস্তকখানি মুখ্যতঃ কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও মোটামুটি কেশব-জীবনের ঐ সকল দিক সম্পর্কেই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কেশবচন্দ্রের উপদেশ ও বাংলা রচনার কিছু কিছু নিদর্শনও পাঠক পাইবেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—ড. শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন। "অশ্বিনীকুমার জন্ম শতবার্ষিকী", ২৭ ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা। পৃ. ৬৮। মূল্য এক টাকা।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্মশতবার্ষিকী বিগত ২৭শে জানুয়ারী একটি সভানুষ্ঠান দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে 'বরিশালের নেতা' বলিয়া আখ্যাত করে এইজন্য যে, তিনি বরিশালকেই জীবনের কর্ম্মকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ছিলেন নিখিল ভারতীয় প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের একজন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ জননায়কদের সমস্তরের, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট বন্ধু। তবে তিনি এই কৃতিত্ব বা গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহার অকুণ্ঠ একনিষ্ঠ দেশ ও জনসেবার দ্বারা। শিক্ষাব্রত, ধর্ম্মালোচনা, চারিত্রিক উৎকর্ষ, সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি দ্বারা তিনি স্বদেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি যুব-চিত্তের উপরে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আলোচ্য পুস্তকখানি অশ্বিনীকুমারের ধারাবাহিক জীবনী নহে। তবে যে সব গুণে তিনি গুণী, যে সকল ঘটনা-প্রবাহের মাধ্যমে তাঁহার চরিত্রোৎকর্ষ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই একটি যথাযথ নির্য্যাস এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রণ। লেখক ইহার স্বত্ব "অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্মশতবার্ষিকী"কে দান করিয়াছেন।

সংসদ বাঙলা অভিধান—শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত এবং ড. শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত। সাহিত্য সংসদ। ৩২-এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

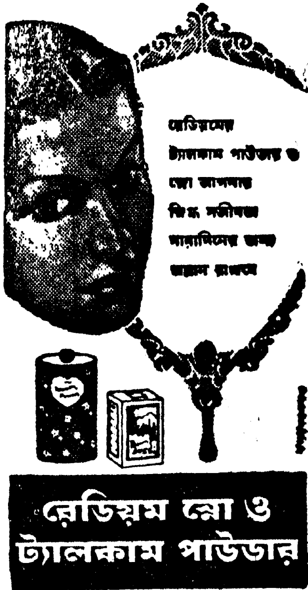
গত দুই-তিন বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার কয়েকখানি অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে। কোন সাহিত্য সজীব এবং অগ্রগামী হইলে এমনটি না হইয়া যায় না। বাংলা-সাহিত্য যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ করিতেছে, বিভিন্ন ধরনের অভিধান প্রকাশ তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একারণ যখনই কোন অভিধান নূতন প্রকাশিত হয় তখনই আমাদের মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। বর্তমান অভিধানখানিকেও আমরা সাদরে গ্রহণ করিতেছি।

আলোচ্য অভিধানখানিতে আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের প্রায় চল্লিশ হাজার শব্দ—পদ, অর্থ, প্রয়োগের উদাহরণ, ব্যুৎপত্তি এবং সমাস সমেত প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ষোল হাজারের

উপর বিশিষ্টার্থ প্রকাশক শব্দসমষ্টির ব্যাখ্যা এবং তৎসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পারিভাষিক শব্দাবলীর বিস্তৃত তালিকাও অভিধানখানিতে আছে। অভিধানের বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক ভূমিকায় ইহার ব্যবহারের কতকগুলি নির্দেশ ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীরা পাইতে পারিবেন। শব্দনির্ব্বাচন, শব্দবিন্যাসপ্রণালী, বর্ণানুক্রম, শব্দের অর্থ, পর্য্যায়শব্দ (synonyms.), শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সমাস, শব্দের পদনাম, ক্রিয়াপদের রূপ, শব্দের বানান, হস্-চিহ্নের ব্যবহার এবং শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধি বিষয়ে ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। শব্দের বানানে দ্বিত্ব বর্জ্জন এবং 'ম্ব', 'ঙ্ক', 'ঙ্গ' স্থলে 'ং ব', 'ং ক' এবং 'ং গ' প্রভৃতির ক্ষেত্রে ধাতুগত অর্থ বা ব্যাকরণের দিকে পাঠক ও লেখকসাধারণের বড় একটা নজর থাকে না। এবিষয়ক আলোচনাটি বড়ই মনোজ্ঞ ও উপকারক হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্তে 'কার্ত্তিক' শব্দটির উল্লেখ করা হইয়াছে। 'কৃত্তিকা' হইতে 'কার্ত্তিকে'র উৎপত্তি, কাজেই এখানে দ্বিত্ব বর্জ্জন ভ্রমাত্মক। অথচ দ্বিত্ব বর্জ্জনের আতিশয্যে অনেকে অহরহ এরূপ করিয়া থাকেন।

অভিধানখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা নয় শত। কিন্তু পাতলা মজবুত কাগজে মুদ্রিত হওয়ায় আকারে ছোট এবং সর্ব্বদা ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। এরূপ পরিসরের মধ্যে আধুনিক ও প্রাচীন শব্দ, তদ্ভব ও তৎসম শব্দসমষ্টি সমেত সন্নিবেশিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও লেখক মাত্রেরই বিশেষ কাজে আসিবে। এরূপ অভিধানের বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল



কোমা গরদিয়েফ—ম্যাক্সিম গর্কি। অনুবাদ: সত্য গুপ্ত। সংস্কৃতি ভবন। ১১৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখক হিসাবে গর্কির খ্যাতি যখন সবে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সেই সময়ের রচনা কোমা গরদিয়েফ। এই উপন্যাসে রুশ পুঁজিবাদের সমাজ-অস্বাস্থ্যকর ক্রিয়াকে সাহসী যুবক কোমার চিন্তা ও কার্য্যধারার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন গর্কি। কোমা ব্যবসায়ীর ছেলে—পুঁজিবাদের যত্নে লালিত আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট। নারী, সুরা এবং বিলাসব্যসনের অপব্যয় তাহার রক্তধারায় সহজভাবেই প্রবাহিত, অথচ এই ভোগ-বিলাসের ফাঁকে ফাঁকে শ্রম-চৈতন্যের ক্ষণ-দীপ্তি তাহার চিন্তা-জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া যায়। পরিবর্ত্তনের পটভূমিতে এই চৈতন্য স্থায়িত্বলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কোমা তথাকথিত অভিজাত-সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। পুঁজিবাদের সৌধ হইতে গণজীবনের প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ নিপুণ কথাকারের তুলিকায় অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে। যদিও কোমার ব্যক্তিগত বিদ্রোহ সেদিন সার্থক হয় নাই, সমাজ-সচেতন লেখকের বাণী-স্বাক্ষর কিন্তু গল্পটির মধ্যে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। গর্কি-প্রতিভার মূল সূত্রটি এই কাহিনীর মধ্যে গ্রথিত। এই কারণে কোমা গরদিয়েফের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয়-সাধনের প্রয়োজন ছিল। অনুবাদক এই অভাবটি পূরণ করিয়াছেন।

পলাতক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার। জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নানা অসংবদ্ধ ঘটনা, কার্য্যকারণহীন মনস্তত্ত্ব এবং নানা দলীয় নীতির প্রভাব বিদ্যমান। ইহার মধ্যে মানবতাবোধের মহৎ আদর্শকে দাঁড় করাইবার চেষ্টাও আছে। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন দ্রুতগতি ঘটনার প্রবাহে সেটি দানা বাঁধিতে পারে নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাওয়ালা—শ্রীগোপালক মজুমদার। প্রকাশক—শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগর। পৃষ্ঠা ২৬৩। মূল্য তিন টাকা বার আনা।

গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অন্ত ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মাড়োয়ার এবং মেওয়ারের রাজদরবার ও অন্তঃপুরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসখানি রচিত। ঐতিহাসিক পটভূমিতে নানা নাটকীয় ঘটনার সমাবেশে কাহিনীটি চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। কয়েকটি চরিত্র জীবন্ত ও সার্থক সৃষ্টি। গ্রন্থের ভাষা শ্রীসম্পন্ন এবং স্থানে স্থানে উজ্জ্বল। কিন্তু কাহিনীটির সহসা সমাপ্তি পাঠককে ক্ষুণ্ণ করে। যাহা হউক, ভাল ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর চিরদিনই আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিকে মন্দ বলা যায় না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শিশুমনের সহজ কথা—শ্রীদীপিকা পাল। প্রকাশক—শ্রীপ্রবীর পাল, ২ রঙ্গলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৩। পৃষ্ঠা ১০৩। মূল্য দুই টাকা।

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে যাওয়ার পূর্ব্বে এ বিষয়ে বড়দেরও অনেককিছু শিখিবার আছে। শিশু-মনের স্বরূপ না জানিলে তাহার শিক্ষাদানকার্য্য ঠিকমত হইতে পারে না। এজন্য শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যেক পিতামাতারই কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিশুর প্রথম শিক্ষা পিতামাতার নিকট—বিশেষভাবে মাতৃক্রোড়ে।

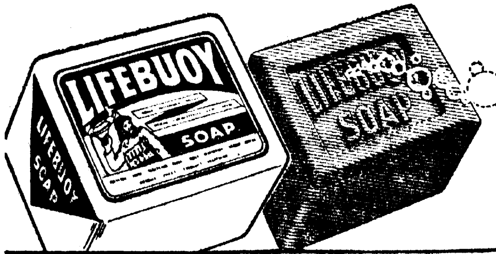
লেখিকা শিশু-মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলি এই পুস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পনরটি অধ্যায়ে সুন্দর সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান নাম শুনিয়া পাঠকের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই। অধ্যায়গুলির নামকরণ হইতে আলোচ্য বিষয়গুলি পরিস্ফুট হইবে। যথা—পিতামাতার





লা ই ফ ব য়
সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু
থেকে আপনাকে রক্ষা করে





ভারতে প্রস্তুত

L. 254-X52 BG

আশা ও সন্তানের ভবিষ্যৎ বংশগতি, পরিবেশ, ছোটদের শাসননীতি ও শাস্তিদান, শিশুর শিক্ষা, বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, আদর-আব্দার, খেলাধূলা, কান্না, অবাধ্যতা, ঈর্ষা, ভয়, মিথ্যাকথা এবং অপরাধ। পুস্তকখানি পড়িলে পিতামাতা বুঝিতে পারিবেন যে, সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব কত গুরুতর। একমাত্র মনস্তাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া শিশুর শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইলেই যতদূর সম্ভব সুফল পাওয়া যায়—তাহার অনেক সদ্‌গুণ ফুটাইয়া তোলা যায়, নানা কু-অভ্যাস শৈশবেই বিনষ্ট করা চলে। স্বভাবতঃ অপরাধপ্রবণ শিশু যে নাই তাহা নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। চেষ্টা করিলে ইহাদেরও সংশোধন বহু ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুহৃদকুমার মিত্র এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহিত একমত হইয়া আমরাও বলি—লেখিকা এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সমাজের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকের বহুল প্রচার হউক, লেখিকার শ্রম সার্থক হউক।

শিক্ষক আন্দোলনের কয়েক দিন—শ্রীঅবনীকুমার রায়, এম-এ। প্রকাশক—শ্রীগঙ্গাধর সিংহরায়। রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। পৃষ্ঠা ৮০। মূল্য এক টাকা।

১৯৫৪ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বাংলার শিক্ষকগণ যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেই সময়কার ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। কলিকাতা রাজভবনের নিকটে রাস্তায় কয়েকদিন পর্য্যন্ত দিবারাত্র শিক্ষকগণের অবস্থান, ধর্ম্মঘট, পুলিস কর্ত্তৃক শিক্ষকগণের গ্রেপ্তার হওয়া, তাঁহাদের কয়েক দিন জেলখানায় বাস, জেলের মধ্যে শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সভা-অনুষ্ঠান—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক শিক্ষকগণের দাবি আংশিকভাবে মঞ্জুর, শিক্ষকগণের জেল হইতে মুক্তিলাভ—এসকল খুবই অল্প দিনের ঘটনা। কিন্তু জনসাধারণের স্মৃতি-শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়া ইতিমধ্যে তাহা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার সেই বিখ্যাত দিন কয়টির স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। শিক্ষকগণের এই আন্দোলনের ভাল ও মন্দ উভয় দিকই আছে, লেখক নিজে শিক্ষক হইয়াও শিক্ষক আন্দোলনের দোষত্রুটি অক্ষমতা ইত্যাদির কথা খুব স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনের দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষকগণের মধ্যে এবং বাহিরের যে সকল সুবিধাবাদী এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল, এমন কি কারাবরণ পর্য্যন্ত করিয়াছিল তাহাদের কথাও এই পুস্তকে বাদ পড়ে নাই।

ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনকার্য্যের ভার যাঁহাদের উপরে ন্যস্ত, সেই অভাব-অনটনক্লিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণের এক করুণ আলেখ্য এই পুস্তকে দেখিয়া পাঠক স্বতঃই তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইবেন।

প্রাচীন রাজ্যশাসন-পদ্ধতি—ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ১২৬। মূল্য আড়াই টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডক্টর বসাক কর্ত্তৃক অনূদিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যশাসন-পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শাসন-পদ্ধতি জানা কষ্টসাধ্য, এজন্য গ্রন্থকার বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

এই পুস্তকে মোট চতুর্দ্দশটি পরিচ্ছেদ আছে। রাজ্যের অঙ্গ, আমাত্য-নিয়োগ, মন্ত্রীপরিষদের সংখ্যা, গুপ্তচর, রাজার প্রাত্যহিক কার্য্যাবলী, শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষ নিয়োগ, শুল্কবিধি, দেওয়ানী ব্যবহারবিধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রাচীন ভারত খুবই অগ্রসর ছিল। একই সময়ে ভারতের নানা স্থানে গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। চাণক্যের 'রাজা' যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, তাঁহাকে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শমত কাজ করিতে হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রগণকে মনুষ্যসমাজের ক্রমবিকাশের

"আমার প্রিয় সুগন্ধি"

গীতা সিংহ বলেন

"লাক্স টয়লেট সাবানের নতুন সুগন্ধ সত্যিই অপূর্ব— বহুক্ষণ গা'য়ে লেগে থাকে।"

বিশুদ্ধ শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের অপূর্ব সুরভিত ফেনা দুনিয়ার কমনীয়া সুন্দরীদের ত্বক্ তাজা, মোলায়েম ও রূপোজ্জ্বল করে রেখেছে।



আপনার দৈনিক সৌন্দর্য্যস্নান বড় সাইজের সাবান মেখে উপভোগ করুন।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য-সাবান

LTS. 408-X52 BG

ইতিহাস পাঠ করিতে হয়। প্রাচীন ভারত রাষ্ট্রীয় বিকাশে ও চিন্তায় তৎকালীন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতি হইতে যে অনগ্রসর ছিল না কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিন্তাধারায় প্রাচীন মনীষীদের দান সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অবহিত হওয়া একান্ত কর্তব্য। ডক্টর বসাকের বর্তমান গ্রন্থ এই বিষয়ে খুবই সহায়ক হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। পৃষ্ঠা ৫৮। মূল্য আট আনা।

হীরকের কথা—শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ৪৩। মূল্য আট আনা।

উভয় গ্রন্থই বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম পুস্তিকায় লেখক ইংরেজ-পূর্ব এবং ইংরেজ আমলের জনবিন্যাসের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য এই বিষয়ে লেখককে সমকালীন সংশ্লিষ্ট দলিল ও তথ্যাদি হইতে নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষতঃ দেশবিভাগের পরে, পশ্চিমবঙ্গের ঘন জনবিন্যাস আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করিয়াছে এবং এই জনসমষ্টির পক্ষে শুধু কৃষির সাহায্যে খাদ্য-বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। এজন্য শিল্পপ্রসারের ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার হিসাব, অর্থনৈতিক বিন্যাস, বয়স ও স্ত্রীপুরুষের অনুপাত, লোকচলাচল ও বহিরাগত প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক ১৯৫১ সনের সেন্সাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই প্রদেশের অধিবাসীদের ক্রমনিম্নগামী আর্থিক অবস্থার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সমস্যা ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে এবং বহিরাগত শ্রমিক প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালী জীবনযুদ্ধে হটিয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকার অবশ্য একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু ইহা মোটেই সহজসাধ্য নহে। লেখক এই পুস্তিকায় সমস্যার সমাধানের বিষয় আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে বা প্রবন্ধে এই বিষয় অবশ্য আলোচিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের অপর এক খণ্ডে এই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

দ্বিতীয় পুস্তকে হীরক সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে। অনেক বিখ্যাত হীরকখণ্ডের ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। হীরক বিষাক্ত পদার্থ—এই ধারণা ভ্রান্ত। আবার সকল প্রকারের হীরক খুব মূল্যবানও নহে। হীরক নানা শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এককালে ভারত হীরকের জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু বর্তমানে হীরক-উৎপাদক দেশ হিসাবে ভারতের স্থান নগণ্য। সংক্ষেপে হীরক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পুস্তকখানি অবশ্যপাঠ্য।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

স্বপনবুড়োর শৈশব—স্বপনবুড়ো। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীঅখিল নিয়োগী শিশুদের আসরে স্বপনবুড়ো নামে পরিচিত। এই ছদ্মনামে তিনি তাঁহার শৈশব-কাহিনী রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি তাঁহার বাল্যকালের কথা এমন সুনিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা শিশুদের ত বটেই, বড়দের পর্য্যন্ত ভাল লাগিবে। গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী শিশুদের মনোরঞ্জক।

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

প্রতীক্ষা—শ্রীসমীরণ রুদ্র। রুদ্র এণ্ড কোং লিঃ, ৭২ মদন মিত্র লেন। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাস। বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্যহীন, সংলাপ ভাবৈখচ। পড়িতে পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

ভগ্নতরী—শ্রীরমেন গুপ্ত। তারা লাইব্রেরী, ১৪।১ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য—২৷০।

উপন্যাস। কাহিনীর সূচনা কেকার জন্মদিন হইতে। গোড়াতেই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় জয়ন্ত, পাকড়াশী, কেকার মা, ডাক্তার চৌধুরী এবং আরও অনেকের। কেকা স্বপ্ন দেখে জয়ন্তকে কেন্দ্র করিয়া। পাকড়াশী মৃদু গুঞ্জন করিয়া ফেরে কেকার আশেপাশে, কিন্তু আমল পায় না। পাকড়াশী ধনী। জয়ন্তর প্রতি কেকার মনকে বিরূপ করিয়া তুলিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইল—জয়ন্তর জন্মরহস্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া। সুশিক্ষিত, আদর্শ-চরিত্র ডাক্তার জয়ন্ত সব হারাইল শুধুমাত্র পিতৃপরিচয়ের অভাবে। কেকা বংশমর্য্যাদাকে অবহেলা করিতে পারিল না। জয়ন্ত দূরে চলিয়া গেল—পাকড়াশী কেকার কাছে আগাইয়া আসিল।

কিন্তু পাকড়াশীর সংস্পর্শে আসিবার পর কেকার জীবনে দেখা দিল বিপর্য্যয়। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু কেকাকে জয়ন্তের আশ্রয়প্রার্থী হইতে হইল এবং জয়ন্তও তাহাকে আশ্রয় দিল। মোটামুটি কাহিনীটি এইরূপ। কাহিনী-বর্ণনার মাধ্যমে আজিকার সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করিয়া তুলিবার প্রয়াসও লেখক পাইয়াছেন।

পুস্তকের ভাষা চলনসই। চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও বর্ণনার সংযম প্রশংসনীয়।

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। এ মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

দেশদেশান্তরে ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ভারতের মর্ম্মবাণীকে কি ভাবে বিশ্ববাসীর নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিলেন, এই পুস্তকখানিতে লেখক সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-জীবনের নানা দিকের গভীর পরিচয় পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়। লেখক বহু পরিশ্রমে এই তথ্যবহুল পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দেশ-বিদেশের কথা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

বিষ্ণুপুর শাখার সমাবর্ত্তন উৎসব

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার পঞ্চম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উপলক্ষে গত ২৯শে জানুয়ারী রবিবার স্থানীয় রামশরণ মিউজিক কলেজে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীভূপতিনাথ সরকারের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। শ্রীফকির কর্ম্মকার কর্তৃক বিষ্ণুপুর "কীর্ত্তিগাথা" গীত হইবার পর বিষ্ণুপুর শাখার সম্পাদক শ্রীমাণিকলাল সিংহ সভায় গত পাঁচ বৎসরের বিবরণী পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূদেবচন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীভূপতিনাথ সরকার।

ঐ দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় মহকুমা-শাসক শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর গুপ্ত রায়ের সভাপতিত্বে মিউজিক কলেজে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ড. শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ড. দাশগুপ্ত তাঁহার ভাষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার কার্য্যাবলীর প্রশংসা করেন এবং ছাত্র ও যুবকগণকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বিষ্ণুপুর সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহশালার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে ড. দাশগুপ্ত বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রগতি সম্পর্কেও সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার উপর নূতন আলোকপাত করেন।

অপরাহ্ণের অধিবেশনে শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ কর, শ্রীভূপতিনাথ সরকার, কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীরামনলিনী চক্রবর্ত্তী, শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীঅনাবন্ধু দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন এবং আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কর্তৃক প্রেরিত একটি বাণী সভায় পঠিত হয়।

বক্তৃতাদির পর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সুললিত যন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। সভাপতির বক্তৃতার পর অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা মহানগরীর পৌর-অধিকর্ত্তা শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

দেশের জনগণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিয়া তোলার জন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনে বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হয়। গত আট বৎসর যাবৎ নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া পরিষদ বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসাধ্য কাজ করিয়া চলিয়াছে। পরিষদের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থমালার মাধ্যমে মাতৃভাষায় রচিত বিজ্ঞানের প্রতি দেশের পাঠক-সাধারণ ক্রমেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে। পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা নবম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। 'লোক-বিজ্ঞান'ও 'বিজ্ঞান-প্রবেশ' নামক দুটি গ্রন্থমালায় এ পর্য্যন্ত মোট বার খানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে পরিষদ এই বাবদে ২,৫০০৲ টাকা আর্থিক সাহায্য পাইয়াছেন।

স্থানাভাব পরিষদের একটি প্রধান সমস্যা। ইহার সমাধানকল্পে নবনির্ম্মিত কেন্তারেশন হলে পরিষদের কার্য্যালয় সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে পরিষদের মোটামুটি ৬৫০ জন সভ্য আছেন। আলোচ্য বৎসরে পরিষদের মোট আয় ২৬,৮০০৲ টাকা এবং মোট ব্যয় প্রায় ২৭,৫০০৲ টাকা। একমাত্র পত্রিকা প্রকাশ বাবদ পরিষদের বার্ষিক প্রায় ১৮,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

উত্তমাশ্রম

স্বামী উত্তমানন্দ মহারাজ তাঁহার দুই সন্ন্যাসী-শিষ্য ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ (আচার্য্য) ও শ্রীস্বামী মহিমানন্দ মহারাজকে লইয়া ৪৫-৪৬ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলা ডুমুরদহ গ্রামে ভাগীরথীতীরে "উত্তমাশ্রম" স্থাপন করেন।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে স্বামী উত্তমানন্দ এই আশ্রমেই দেহত্যাগ করেন। তার পর স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ আচার্য্য পদে বৃত হন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে শ্রীমৎ স্বামী মহিমানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য শিষ্যগণ আশ্রমের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হন।

১৩২৮ সালে স্বামী ধ্রুবানন্দজীর অনুমতিক্রমে একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে শাখা-আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহিমানন্দ মহারাজজী শ্রীমৎ বিজ্ঞানান্দকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে ভাতুল (বাঁকুড়া) গ্রামে রাধিকাপ্রসাদ সিংহের বাড়ীতে যান, পরে কাপিষ্টা গ্রামের অধিবাসীদের সহায়তায়, কর পাহাড়ের দুটি চালাঘর নির্ম্মাণপূর্ব্বক আশ্রম স্থাপন করা হয়। আশ্রমের নামকরণ হয় "তপোবন পাহাড়, উত্তমাশ্রম"। ক্রমে ক্রমে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ঘরবাড়ী গড়িয়া উঠে। ১৩৩৪ সালে মহিমানন্দজী পুরীধামে দেহত্যাগ করিলে পর স্বামীজী মহারাজ এই শাখা-আশ্রম পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ ২০শে কার্ত্তিক ১৩৫১ সালে হুগলী ডুমুরদহস্থ উত্তমাশ্রমে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার দেহান্তের পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আশ্রমের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন।

১৩২৯ সালে কর পাহাড়ে আশ্রম স্থাপনের পর মহিমানন্দজী এখানে পার্ব্বতীদেবীর অষ্টভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তির অস্তিত্বের কথা জানিতে পারেন এবং পাহাড়ের চূড়ায় ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি পূর্ণিমায় দেবীর পূজা-অর্চ্চনার সূচনা করেন।

১৩৫৯ সাল হইতে আশ্রমাচার্য্য স্বামী বিজ্ঞানান্দজী এবং স্বামী পূর্ণানন্দজী আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন। মহিমানন্দজীর ইচ্ছানুসারে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তদীয় শিষ্য কোন্নগর নিবাসী শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মারফতে কাশীধাম হইতে অষ্টভুজা সিংহবাহিনীর শ্বেতপাথরের প্রতিমূর্ত্তি আনাইয়া ১৩৬০ সালের ১৪ই ভাদ্র আশ্রম-গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এখন আশ্রমে দেবীর নিত্য পূজা চলিতেছে। বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল

ঢোল মহাশয় ১৩৬১ সালের ১৩ই মাঘ সপ্তমী তিথিতে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় মায়ের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। মাতৃ-মন্দিরের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন কুলটি, আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন লিমিটেডের ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিতে খরচ হইবে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। মাত্র দশ হাজার টাকা এ পর্য্যন্ত আশ্রমের ভক্ত, শিষ্য ও সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। হিন্দুস্থান কন্‌ট্রাকপনের জেনারেল ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত শিববরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্দেশ্যে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন এবং মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই আশ্রমটি এক শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। ৯০ ফুট গভীর একটি ইঁদারা খননকার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। আশ্রমের জীর্ণসংস্কার ও ইঁদারা খননের জন্য প্রায় দশ-বার হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

স্বামী উত্তমানন্দজীর প্রধান শিষ্য স্বামী ধ্রুবানন্দজী এই আশ্রমের আচার্য্য থাকাকালীন মেদিনীপুর জেলায় কাঁথপাই গ্রামে, তাঁর জন্মভিটায় ধ্রুবমন্দির উত্তমাশ্রম নামে এক শাখা-আশ্রম স্থাপিত হয়। মগরায় (হুগলী) শ্রীকরুণাময়ী সিদ্ধাশ্রম উত্তমাশ্রম নামে আর একটি শাখা-আশ্রম স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানে রাধাকুণ্ডবিহারী উত্তমাশ্রম ও কঙ্কালকালী উত্তমাশ্রম, ডুমুরদহস্থ শ্রীশ্রীগোপালজীর আখড়া এই কয়টি উত্তমাশ্রমের অনুমোদিত শাখা আছে।

মাতৃমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য নিম্ন-ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

১। শ্রীস্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, প্রেসিডেন্ট, উত্তমাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী।

অথবা—

২। স্বামী পূর্ণানন্দ গিরি মহারাজ, তপোবন পাহাড়, উত্তমাশ্রম, পোঃ কাপিষ্টা, বাঁকুড়া।

শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত

গত ৩১শে জানুয়ারী সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ফণিভূষণ গুপ্ত সাতান্ন বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শিশু-সাহিত্য চিত্রণে তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর তিনি একনিষ্ঠ ভাবে শিশু-সাহিত্যের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। সে সকল পুস্তকের সংখ্যা হাজারের কম হইবে না। ইহার মধ্যে কুলদারঞ্জন রায়ের "ছোটদের গল্প" (তিন খণ্ড), শিবরতন মিত্রের "গ্রামের কথা", যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "যাঁরা ছিল দিগ্বিজয়ী", অশ্বিনীকুমার শর্মার "জাতকের গল্প", দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের "নিমাই পণ্ডিতের গল্প" ও "ঠগী কাহিনী", বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "মহাভারতের গল্প", খগেন্দ্রনাথ মিত্রের "ভোম্বল সর্দার", ও কার্ত্তিক দাশগুপ্তের "ঝুনুঝুনু" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।



ফণিভূষণ গুপ্ত

বিবিধ শিশু-মাসিক, বিশেষতঃ 'শিশু-সাথী', 'রামধনু' ও 'বার্ষিক শিশু-সাথী' তিনি একাই কুড়ি-পঁচিশ বৎসর চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও রেখাচিত্রের মাধ্যমে সর্ব্বপ্রথম একক শিল্পী হিসাবে তাঁহার নাম করা যায়। খুব ছোট আকারের ছবিতেও তিনি অতি সুন্দর ভাবে বহু চরিত্রের সমাবেশ দেখাইতে পারিতেন। গুরুতর পরিশ্রমে গত কয় বৎসর যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সদাহাস্যময় ও বন্ধুবৎসল লোক বিরল।

যামিনীকান্ত সোমের সংবর্দ্ধনা

সম্প্রতি ৫।১ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়ায় শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযামিনীকান্ত সোম মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কথা-সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক শ্রীঅবনীনাথ রায়। সভার প্রারম্ভে ডাঃ শম্ভুচরণ পাল সংবর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে যামিনীকান্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মানপত্র পাঠ করেন সমিতির সম্পাদক শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ ভারতী, ডক্টর শ্রীনিমাইসাধন বসু, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত, প্রশান্ত মিত্র প্রভৃতি যামিনীকান্তের সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া আলোচনা করেন। সমিতির পক্ষ হইতে 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'দেবতাত্মা হিমালয়', ও শ্রীরাজশেখর বসু প্রণীত 'মহাভারত' শ্রীযুক্ত সোমকে উপহার দেওয়া হয়।

সাহিত্য 'কর্ম্মশালা'

শ্রীঅমরনাথ রায়

বয়স্ক সদ্য-সাক্ষরদের শিক্ষা দেওয়া আজকের দিনে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী শাসকদের অধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার রূপ ছিল অন্য রকম। শিক্ষার সার্ব্বজনীনতা ছিল না। তখনকার দিনে প্রচুরসংখ্যক কেরানী তৈরি করাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। তাই সরকারপক্ষ থেকে দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করা হয় নি বললেই চলে। ফলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর হয়ে ছিল।

আজ দেশ স্বাধীন হওয়ায় পর নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সদ্য-সাক্ষরদের শিক্ষা-সমস্যার কথা ভাববার সময় এসেছে। আপাত-দৃষ্টিতে এ অতি তুচ্ছ সমস্যা বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। অনেককিছু ভাববার আছে এদের বিষয়। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে এরা বয়স্ক। মনোবিদ্‌দের মতে একজন পূর্ণবয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তির মতই এদের বুদ্ধিবৃত্তি, কোন অংশেই কম নয়। একমাত্র পার্থক্য—এরা শিক্ষিত আর ওঁরা নিরক্ষর বা সদ্য-সাক্ষর।

স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা-

সমস্যা সমাধানের কাজে ব্রতী হয়েছেন। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হয়েছে নৈশ বিদ্যালয়। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বর্ণপরিচয়ের বইয়ের অভাব নেই। অভাব হ'ল সন্ত-সাক্ষর বয়স্কদের উপযোগী শিক্ষামূলক বইয়ের। এ বইগুলি পাঠ্য তালিকাভুক্ত বই নয়—এগুলি অনেকটা সহপাঠ্য বইয়ের মত। গ্রামের পাঠাগারে বা গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে থাকবে এ সব বই। অবসর সময়ে তাঁরা এ বই পড়ে রস আস্বাদন করবেন— জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা দূর করবেন। এ ধরনের কিছু কিছু বই বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে বটে, তবে সবগুলিই নিখুঁত নয়। প্রতিটি বইয়ের মধ্যেই কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। তা ছাড়া এ জাতীয় বইয়ের সংখ্যা বয়স্ক সন্ত-সাক্ষরদের তুলনায় খুব কম। তাই সরকার উদ্যোগী হয়ে গত বৎসর থেকে এ ধরনের বই বের করার চেষ্টা করছেন।

আমাদের দেশে বয়স্ক সন্ত-সাক্ষরদের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। এই গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, বয়স্ক সন্ত-সাক্ষরদের যে-কোন বিষয়ই জানবার ও শিখবার ইচ্ছা আছে। তাঁরা জানতে চান দেশ-বিদেশের খবর, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-তত্ত্ব এবং এমনি আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে এ সব শিক্ষা দিতে হলে সে সাহিত্যকে করতে হবে সহজ ও সরল।

এমন সব বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে হবে যা এই সন্ত-সাক্ষরদের হৃদয়গ্রাহী হয়। তাই নীরস বিষয়বস্তুকেও বেশ সরস করে যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় পরিবেশন করতে হবে। বক্তব্য বিষয়কে গল্প, নাটক প্রভৃতির মধ্যমে পরিবেশন করলে তা হৃদয়গ্রাহী হবে। বয়স্ক সন্ত-সাক্ষরেরা যে পরিবেশের মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত সেই পরিবেশের পটভূমিকায় সাহিত্য-রচনা করা উচিত। রচনার প্রতিটি ছত্রেই বক্তব্য বিষয় যেন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সাধু বা চলিত—যে-কোন ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করা চলবে, তবে আঞ্চলিক কথা ভাষা বর্জ্জন করতে হবে। রচনার মধ্যে এমন সব শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা উচ্চারণ করতে বা যার অর্থ বুঝতে সন্ত-সাক্ষরদের বেগ পেতে না হয়। তাই এ সাহিত্যে শব্দবিন্যাসের দিকেও বিশেষ নজর রাখা দরকার।

এই ত গেল বিষয়বস্তু, ভাষা আর শব্দ বিন্যাসের কথা। এবার মুদ্রিত বইয়ের কথায় আসা যাক। বইগুলি এমনভাবে ছাপতে হবে যেন তার মধ্যে বেশ সুরুচির পরিচয় থাকে। বেশ বড় বড় অক্ষরে ছাপতে হবে যাতে সন্ত-সাক্ষরদের পড়তে কষ্ট না হয়। বাক্যগুলি হবে খুব ছোট ছোট। কোন কঠিন বিষয় বোঝাতে হলে তাকে সরল ভাষায় লিখে সহজবোধ্য করে দিতে হবে। বইয়ের কলেবর বড় হবে না। মাত্র পনের-বোল পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বিষয়বস্তুকে ভালভাবে বোঝাবার জন্যে কিছু কিছু ছবি সন্নিবেশিত করতে হবে। ছবির সঙ্গে বিষয়বস্তুর যেন সঙ্গতি থাকে। সর্ব্বোপরি বইয়ের দাম হবে সামান্য যাতে করে দরিদ্র সন্ত-সাক্ষরদের ঘরে ঘরে এ সব বই স্থান পায়। দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকে লক্ষ্য রেখে যত কম দামে বই বিক্রী করা যায় ততই মঙ্গল।

সন্ত-সাক্ষরদের উপযোগী বই লেখার জন্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের টাকায় ভারত সরকার একটি সাহিত্য 'কর্ম্মশালা' স্থাপন করেছেন। প্রথম কর্ম্মশালাটি স্থাপিত হয় শান্তিনিকেতনে—মাত্র এক মাসের জন্যে। গত বৎসরের সাহিত্য কর্ম্মশালায় বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য-সেবীরা উপস্থিত থেকে তাঁদের প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করে গেছেন। সে সব বইয়ের মাত্র কয়েকখানি ছাপা হয়েছে—অধিকাংশই পড়ে রয়েছে।

এ বছর এ রাজ্যের সাহিত্য কর্ম্মশালা স্থাপিত হয়েছে বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে। এ কর্ম্মশালার মেয়াদ মাত্র দেড় মাস। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হাবড়া-বাইগাছি—বর্ত্তমান বাণীপুর বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে এই কর্ম্মশালা স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে কুড়ি জন তরুণ সাহিত্যসেবী এসেছেন এখানে। এই কুড়ি জন লেখক-লেখিকা এখানে বিভিন্ন বিষয়ে সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের জন্য কুড়িখানি বই লেখার কাজে ব্যাপৃত আছেন। তাঁদের সঙ্গে আছেন দু'জন শিল্পী। বইগুলির শ্রী ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব সম্পাদনের কাজে শিল্পী দু'জন নিযুক্ত রয়েছেন। এই কর্ম্মশালার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য—বাংলা দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। সহকারী পরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর—বাংলার একজন খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক। এ ছাড়াও আছেন সহযোগী পরিচালক শ্রীসুধাংশু সাহা—বাণীপুর উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। পশ্চিম বাংলা শিক্ষা অধিকার থেকে সাহিত্যসেবীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

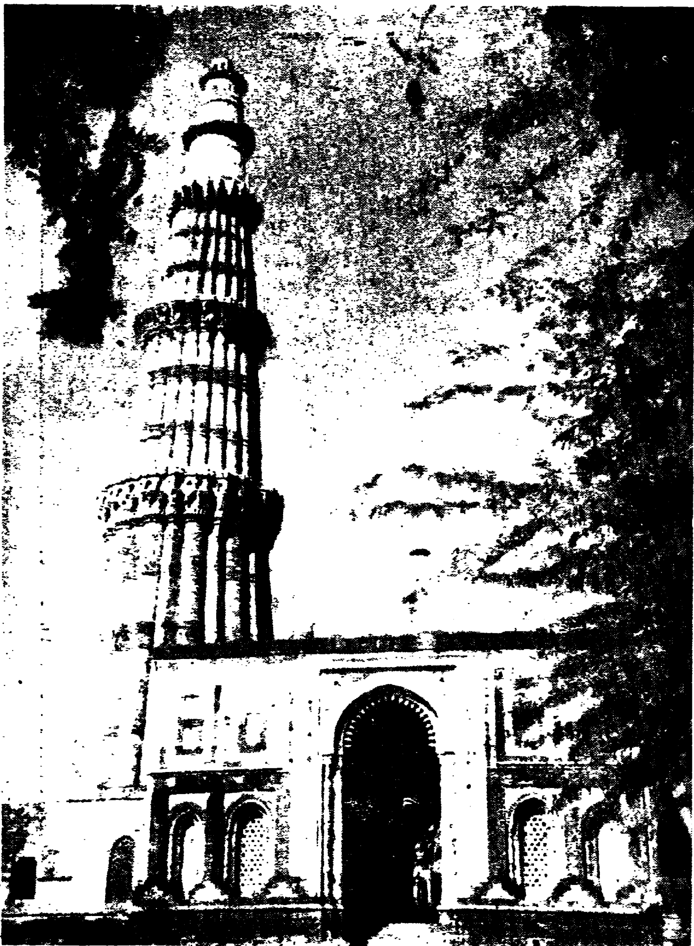
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

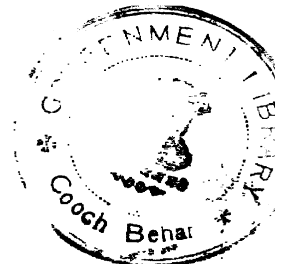
ওপারের ডাক

শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

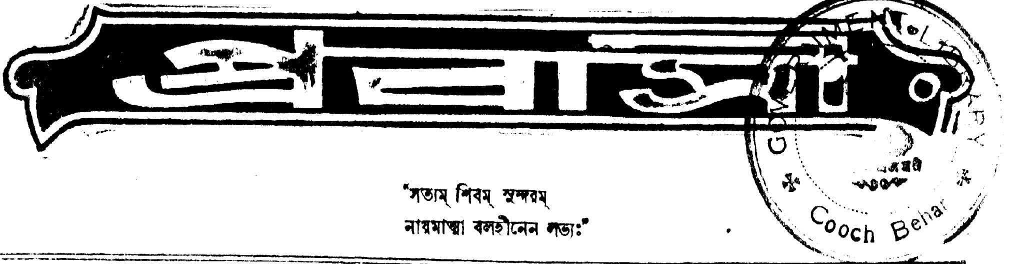


কুতুব মিনার [ফোটো : শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়





"রাখাল" [ফোটো : শ্রীবিনয়ভূষণ দাস



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৫শ ভাগ ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৬২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সংযুক্তি সমস্যা

আমাদের পশ্চিম বাংলায় সমস্যার অন্ত নাই। বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বাঙালী মধ্যবিত্ত আজ প্রায় ধ্বংস হইতে চলিল। পূর্ব্ববঙ্গের যাঁহারা, তাঁহাদের তো বিপদের অন্ত নাই, কিন্তু তবুও সরকারী কিছু ব্যবস্থা আছে যাহাতে সে বিপদের কতকটা অবসান ঘটে। বাস্তুঘুঘু ও যাযাবর বৃত্তির পরিপোষক যে দুর্বৃত্তেরা তাঁহাদের নামে লুঠ করিয়া খাইতেছে ও তাঁহাদের দুর্দ্দশার সুযোগে সমস্ত বাস্তুহারাদিগকে নৈতিক ও দৈহিক অবনতির চরমে লইয়া যাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে এই বাস্তুহারা সমস্যারও খানিকটা সমাধান হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগতদিগের বিপদেরও কিছু উপশম হয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সন্তান আসলে যাহারা তাহাদের অভিভাবক, রক্ষক, প্রতিপালক কেহই নাই। নামে একটি মন্ত্রিসভা আছে যাহাতে একজন মুখ্যমন্ত্রী আছেন এবং তাঁহার আশেপাশে আছেন সমর্থক ও "যো-হুকুম" কথকের দল। তাঁহাদেরই মধ্যে দুই-চারি জন, যাঁহারা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে চাহেন, তাঁহারা প্রায় মূকবধির তুল্য, নির্ব্বাক-নিস্পন্দ। চাটুকারদিগের "হেঁ হেঁ, তাই হোক" সকল সময় তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন না, আবার প্রতিবাদ করিলে বা কোন বিষয়ে সমালোচনাত্মক বিচার বা পরামর্শ করিলেও বিপদ, সুতরাং তাঁহারা দিনগত পাপক্ষয় করিয়াই কাটাইতেছেন। সে কারণে চাকরী পাওয়ায়, কণ্ট্রাক্ট জোটানোয় পশ্চিম বাংলার লোকের কোনও উপায়ই হয় না, অবশ্য ছাঁটাইয়ে শতকরা ৯৯ জন উহাদেরই মধ্য হইতে যায়।

এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সন্তানের পরিনির্ব্বাণ ভিন্ন অন্য গতি নাই। তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা হয়ত মানস-সরোবর পার হইয়া কৈলাসে পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু লালদীঘির ওপারের গদীতে তাহার কোনই সাড়া পাওয়া যাইবে না। এই রকম অবস্থায় তাহাদের আক্রোশ ও অভিসম্পাত জমানো থাকে জন-আন্দোলন, গণ-বিক্ষোভ ইত্যাদির সুযোগের জন্য। সরকার থাকিলে তাহাদের লাভ কিছুই নাই, যখন তখন ঐ পথই তাহারা শ্রেয় মনে করে। কাজেই কোনও একটা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে বা হরতালে ঝঞ্চাট বাধাইতে লোকের অভাব হয় না। অবশ্য নিষ্ক্রিয় ও হতাশ হইয়া বসিয়া থাকে হাজারে ৯৯৫ জন। তাহাদের কোনও স্পৃহা থাকে না সরকারকে সমর্থন করার, সুতরাং গায়ে পড়িয়া বিপদ ডাকিয়া আনার—অর্থাৎ আন্দোলনের প্রতিবাদ বা প্রতিকার করার—কোনও কারণ তাহারা দেখে না।

যাহারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করে তাহাদের অধিকাংশই "বাস্তুহারা" কিংবা বেকার। ইহাদের সঙ্গে একদল অপরিণত-মস্তিষ্ক ছাত্রও জুটিয়া যায় বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীদের অগ্রগামী ও অগ্রদূত হিসাবে।

সুতরাং দেখাই যাইতেছে যে, কলিকাতায় যে-কোন দল, যতই ছোট বা বিক্ষিপ্ত হউক না কেন, যে-কোন ব্যাপারে আন্দোলনের সুযোগ পাইলেই তাহাতে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি সরকার-বিরোধী কার্য্যের ব্যবস্থা অনায়াসেই করিতে পারে।

এই ত অবস্থা! উপরন্তু পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল লালদীঘির গণ্ডীর বাহিরে যাহা কিছু ঘটে বা ঘটিতে পারে সে বিষয়ে শুধু নিরুদ্বেগ নহে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় থাকেন। কোন ব্যাপারের কি ফলাফল ঘটিতে পারে সে বিষয়ে মুখ্য (ও একমাত্র) মন্ত্রীকে কেহ কিছু বলিতে বা পরামর্শ দিতে পারে না, এবং তিনিও কোন বিষয়েই পরামর্শ লইতে অনিচ্ছুক। সুতরাং অঘটন কিছু ঘটিলে তাহা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত সদৃশ হয়, সরকারী দল হতভম্ব হইয়া যায়, বুঝিতে পারে না কিসে কি হইল।

এইরূপ পরিবেশে, কিছু অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই, ডাক্তার রায় বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন। শুধু প্রকাশ করিলেন না, সেইসঙ্গে তাহা বঙ্গ-বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত একথাও জানাইলেন, এবং আমাদের সংবাদপত্রগুলি জানাইল যে বহু অবাঙালী সজ্জন ঐ প্রস্তাবের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়াছেন। অমৃতসরে কংগ্রেসও হুজুরের নির্দ্দেশে বাহবা দিল।

পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের কেহই বাহবা দিল না। কেননা দুই দিক বিচার করিয়া যাহারা মতামত প্রকাশ করে, তাহারা ডাক্তার

রায়ের ঘোষণায় বিচারের মালমশলা বিশেষ কিছুই পাইল না, এবং সে বিষয়ে খোঁজ করার অবকাশও তাহারা পাইল না, কেননা সরকার-বিরোধী দল আন্দোলন ও বিক্ষোভের সুযোগ পাইয়া উল্লাসে গগন ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"গেল-গেল দেশ, সামাল সামাল"। সঙ্গে সঙ্গে হরতাল ও বিক্ষোভ-মিছিল, প্রতিবাদ-সভা ইত্যাদি সুরু হইয়া গেল। সরকার—অর্থাৎ ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়—বলিলেন, 'বাংলার সমস্ত সমস্যার সমাধান এই সংযুক্তিতে' ; বিপক্ষ দল বলিল, "সমাধান নয়—গঙ্গাপ্রাপ্তি, বাঙালীর আর অস্তিত্বও থাকিবে না।"

বাংলা দেশ ভাবপ্রধান দেশ। সুতরাং কিমাশ্চর্য্যম্ যে, ভাবুকজন এই সন্দেশ লাভে বিচলিত হইয়া বেচাল হইয়া পড়িলেন! বিচক্ষণ যাঁহারা তাঁহারা অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া মোহ-মুদ্গর পাঠে মনোনিবেশ করিলেন!

ডাক্তার রায় আজ যে সকল কথা বলিতেছেন, বা তাঁহার সপক্ষে যে কয়জন সক্রিয় ভাবে আছেন তাঁহারা যাহা লিখিতেছেন বা করিতেছেন, সে সকল পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল একথা বলা বাহুল্য। ঘোষণার পূর্ব্বে চাটুকারমণ্ডলীর বাহিরের দুই-দশ জন বিবেচক লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া ঘোষণা অন্যরূপে করিলে দেশের লোকে অবস্থা-ব্যবস্থা দুই-ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত এবং সে অবস্থায় লোকে এইভাবে বিভ্রান্তও হইত না।

প্রস্তাবের বিপক্ষে দুইটি কারণ গ্রাহ্য, যতদিন না প্রতিষেধক ব্যবস্থা হয়। প্রথমতঃ, সংযুক্ত বিধান-পরিষদে ভোটাধিক্যের অপব্যবহারের আশঙ্কা। মুসলিম লীগ এ বিষয়ে আমাদের ঘর-পোড়া গরুর অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে। এই আশঙ্কার প্রতিকার কি সে বিষয়ে ডাক্তার রায় কোনও সন্তোষজনক উত্তর দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, সংযুক্তির পরে কোনও সময়ে যদি পুনর্ব্বিচ্ছেদ অনিবার্য্য রূপে ঘটে তবে ভাষাভিত্তিক দাবির কি হইবে? এ বিষয়ে সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। অথচ যদি সংযুক্তির ফলে সকল দাবি-দাওয়া বাতিল হইয়া যায় তবে ত ভবিষ্যতে একটা ভয়ের কারণ রহিল। কেননা বিচ্ছেদ অসম্ভব নহে।

এই দুই বিষয়ের সম্যক বিচার এবং সমীচীন ও সন্তোষজনক প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতান্তই প্রয়োজন। সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে মনে হয় না।

বিপক্ষ দল সংযুক্তির বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি যে সকল দর্শাইয়াছেন আমরা বহু চেষ্টায়ও তাহার মধ্যে সারপদার্থ কিছুই পাই নাই। বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য এই সংযুক্তিতে নষ্ট বা লুপ্ত হইবে এই যুক্তি অতি অসার। পাঠান ও মোগলের আমলে যাহা হইল না—বরঞ্চ উন্নতি হইল—এবং মেকলের ভারতীয় ভাষা-বিরোধী ব্যাপক ব্যবস্থার পর যাহার প্রগতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল, বিহারের সংস্পর্শে তাহার ধ্বংস হইবে, একথা কোনও বিচারে দাঁড়ায় না। অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বৃত্তিগত কার্য্যে, যথা, চিকিৎসা, ব্যবহারজীবিকা ও শিক্ষকবৃত্তি, সংযুক্তির বিরুদ্ধে কোনও কারণ নাই, বরং সপক্ষে অনেক কিছুই আছে।

ডাক্তার রায়ের বেতার ভাষণ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সংযুক্তি সম্পর্কে বাংলা বেতার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ এইরূপ :

"পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণ, যে সময় বাংলার সকল বাসিন্দা ষ্টেট রিঅরগানাইজেশন কমিশন হইতে কতখানি পাওয়া যাইবে এই ভাবনায় নিযুক্ত ছিল সেই সময় আমি এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ (বিহারের মুখ্যমন্ত্রী) আপনাদের কাছে একটি নূতন প্রস্তাব আনিয়া ফেলিলাম। এ প্রস্তাবে চাঞ্চল্য স্বাভাবিক, কিন্তু উত্তেজনার কোন কারণ নাই। এটি একটি আকস্মিক প্রস্তাব এবং অনেকের মনে এ প্রস্তাবমূলক বহু প্রকারের প্রশ্ন ও সন্দেহ আসিতে পারে। অতীতে বাংলা দেশে উপরি উপরি খণ্ডন ব্যবস্থা স্মরণ করিয়া দেশবাসীর মন স্বভাবতঃই উতলা ছিল। তাঁহারা ভরসা করিয়াছিলেন যে, হয়ত বা এইবার কিছু বেশী জমি পাওয়া যাইবে, হয়ত তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন বাংলা দেশের এইবার কিছু লাভের অবকাশ হইল। সেই মানসিক অবস্থায় অনেক দেশবাসীর এইটাই মনে হইল যে, এই বঙ্গ-বিহার মিলনের ফলে, আমরা যাহা পাইতাম তাহাও বুঝি হারাইলাম। ইহাতে অনেকের মনে উদ্বেগের সূচনা হইল।

"আমি জানি যে, বাংলা দেশে একদল লোক আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন, ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠন হওয়া উচিত। তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন প্রদেশসমূহকে পুনর্গঠন করাই আমাদের লক্ষ্য নয়, পরন্তু এই গঠনের ভিতর দিয়া সকল প্রদেশের ও ভারতের উন্নয়ন সাফল্যমণ্ডিত করা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অতীতে যখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা ছিল না, তখন মানুষ ছোট ছোট গণ্ডীর ভিতরে জীবনযাপন করিত এবং সেই গণ্ডীর ভিতরেই এক মত এক ভাষার ভিত্তিতেই তাঁহারা সমাজ গঠন করিতেন। আজিকার ভারতের যে অবস্থা তাহাতে আমাদের ভারত সংবিধানের নিয়মানুসারেই হউক অথবা অন্য প্রকারেই হউক বিভিন্ন প্রদেশের লোক এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহজে যাতায়াত করে এবং করিবে। সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতি এই যাতায়াতের সুবিধার উপর নির্ভর করে। আজ বাংলা দেশে যতগুলি কলকারখানা আছে তাহাতে বেশীর ভাগ কর্ম্মী অবাঙালী। অপর পক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাঙালীরা তাঁহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়া বিভিন্ন প্রদেশের বাসিন্দা হিসাবে জীবনযাপন করিতেছেন। অতএব আজিকার দিনে শুধুই ভাষার ভিত্তিতে কোন এলাকাকে নূতন করিয়া গঠন করা অসম্ভব এবং বোধ করি অপ্রয়োজনীয় অথবা অসমীচীন। আমাদের দেশকে অন্যান্য দেশের সম্মুখে বহু প্রকারের উন্নয়নের ভিতর দিয়া প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লইয়াই আমরা বাঁচিতে পারি না, এই দেশ বাঁচিতে পারে না। এই দেশকে বাঁচাইতে হইলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই স্বাধীনতাকে স্থাপিত করিতে হইবে।

অপর পক্ষে যদি এই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করা যায় তাহা হইলে উত্তেজনা এবং আলোড়নের সৃষ্টি হইবে। বোম্বাই এবং উড়িষ্যার ঘটনাবলী স্মরণ করিলে সকলেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন নিশ্চয়ই! অনেকে যাঁহারা বিভিন্ন মতবাদ অনুসরণ করেন তাঁহারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা এই ভাষার ভিত্তিতে দেশ পুনর্গঠন প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে যাইয়া দেশের এই চাঞ্চল্যকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অথচ, আমি দেখিতে পাই যে, এই রকম মনোভাবসম্পন্ন দলগুলি যখন শোভাযাত্রা করিয়া পথে বাহির হন তখন চীৎকার করিয়া বলেন—'বিহারী-বাঙালী ভাই ভাই' অথচ আসলে চান যে, বাংলা-বিহারের মিলন না হয়। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের সময় এক ধ্বনি শুনিয়াছিলাম—'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই' আর আজ শুনিতেছি 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—ভেদ চাই ভেদ চাই'; নহিলে বিরোধ মিটিবে না। আমি জানি না এই রাজনৈতিক দলগুলি বঙ্গ-বিহার মিলনের সম্বন্ধে বেশী মনোযোগ দেন অথবা আশু ভবিষ্যতের নির্ব্বাচনের জন্য একটি প্রস্তুতির ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেছেন।

"কিন্তু আমার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বোধ করি অনেকে আছেন যাঁহারা সত্যই দেশে শান্তি চান, দেশের উন্নতির জন্য ব্যস্ত। তাঁহাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই আছেন যাঁহারা এই নূতন প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মনের মধ্যে গুটিকতক প্রশ্ন রহিয়াছে। আমি আজকে তাঁহাদেরই বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিতে চাই। একথা সত্য যে, মানুষের মন সহজে হঠাৎ এক পথ হইতে অন্য পথে যাইতে চায় না। যে ধারণা লইয়া সে থাকে তাহার পরিবর্ত্তন করা সময়সাপেক্ষ। আমি নিজে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের পক্ষে, বাংলার প্রগতির জন্য এমন মিলনাত্মক পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে পশ্চিমবঙ্গ অধিবাসীর পক্ষে উন্নয়নের পথে যাওয়া অসম্ভব। বাঙালীকে বাঁচিতে হইবে—তাহার খাদ্য চাই, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার চাই, পরিধানের কাপড় চাই, তাহার জীবনধারণের জন্য সঙ্গতি চাই। সীমানা কমিশনের প্রদত্ত ৩ হাজার ৫ শত বর্গমাইল ভূমি পাইয়াও বাংলা দেশের এই চাহিদা মিটিবে না। অতএব ভাষার সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার গণ্ডী হইতে আমাদের বাহির হইতেই হইবে।

"এই সংযুক্তির প্রস্তাবে অনেকের মনে অনেক প্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা কাহারও ইচ্ছা নয় যে, বাংলা দেশের উপর কোন প্রকারের ব্যবস্থা জোর করিয়া চাপান হয়। আমি আজ তাই বাংলার অধিবাসীদের বলিতে চাই যে, তাঁহারা এই মিলন প্রস্তাবটি খুব সাবধানে বিচার করুন। এই সন্দেহগুলি মিটাইবার জন্য আমি নিজ হইতে গুটিকতক প্রস্তাব করিয়াছি। সেগুলি আপনাদের বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। আমার কর্ত্তব্য—যেখানে সংশয় থাকে সেগুলি অপনোদন করিবার চেষ্টা করা। আপনারা ভাবাবেগকে সংযত করিয়া যুক্তি প্রয়োগে দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার করুন। এই প্রসঙ্গে গুটিকতক বিরোধী যুক্তি আপনাদের সম্মুখে উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

"প্রথম যুক্তি—এই সংযুক্তির ফলে বাংলা দেশের নাম কি বিলোপ হইবে? আপনারা জানেন যে, ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে নবাবী আমল হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলা শাসন হিসাবে এক প্রদেশ ছিল তথাপি এই তিন প্রদেশের নাম বিলোপ হয় নাই। যদি বঙ্গ-বিহার যুক্ত হয় তাহা হইলে সেই প্রদেশের নাম যদি বঙ্গবাসী চান বঙ্গ-বিহার হইতে পারে।

"দ্বিতীয় যুক্তি—বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও কৃষ্টি কি বিলোপ হইবে? আমার বিশ্বাস যে, যতদিন বাঙালী জাতি জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আমি জানি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বাঙালীর বড় প্রিয়। আমি জানি যে, ইহাদের সহিত জাতির উন্নতি জড়িত থাকে। একটি যুক্তি উঠিয়াছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিহার প্রদেশের ভাষার চাপে সংখ্যালঘিষ্ঠ বাংলাভাষা পরাজিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, এই সংযুক্তির বিলের ভিতর এইরকম ব্যবস্থা থাকিবে যে, এক পক্ষে যেমন বাংলা এবং বিহার এই উভয় প্রদেশেই বাংলা এবং হিন্দী সরকারী ভাষা হইবে, অপর পক্ষে বাংলা দেশে যেমন বাংলাভাষার প্রাধান্য থাকিবে কিন্তু হিন্দীও বাধ্যতামূলক ভাষা হইবে তেমনি বিহারেও বাংলাভাষা বাধ্যতামূলক হইবে। ইতিহাসে তাহার অনেক নজীর আছে। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লোকসংখ্যা আদৌ বড় কথা নয়। রোমের অধিবাসীরা গ্রীস জয় করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে গ্রীক ভাষা ও সভ্যতার কোন হানি হয় নাই। রোমের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রীক সাহিত্য ও সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল মাত্র। বাংলা দেশের ভাষা দুর্ব্বল নহে, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে সবল। সমগ্র ভারতবর্ষে তাহার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব সর্ব্বজনস্বীকৃত। তাহার উপরে এই মিলনের সর্ত্ত হিসাবে যে ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে বাংলা শুধু বাংলা দেশের গণ্ডীর মধ্যে প্রধান ভাষা থাকিবে তাহা নহে, সমগ্র বিহারে তাহা দ্বিতীয় মৌলিক ভাষা হিসাবে বিস্তার লাভ করিবে। সংবিধান হিসাবে আমাদের হিন্দী ভাষা শিখিতেই হইবে। কিন্তু উপরোক্ত এই নিয়ম থাকিলে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ছায়াচিত্র অভূতপূর্ব্ব প্রসারলাভ করিবে তাহা আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

"তৃতীয় যুক্তি—শুনিতে পাই যে, বিহারের হিন্দী জনসমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পশ্চিমবঙ্গ বলহীন হইবে। যে কোন প্রশ্ন আসে বিধানসভায় তাহা বিভিন্ন দলের নীতির ভিত্তিতে আলোচিত হয়। রাজনৈতিক দল গঠিত হয় দলীয় কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে নয়। নূতন সংযুক্ত প্রদেশটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকিবে। সেই সকল দল গঠন হইবে অর্থনৈতিক অথবা আদর্শগত ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে নয়। আমাদের বিধানসভায়ও কংগ্রেসের বিভিন্ন ভাষাভাষী সদস্য আছেন তেমনি অন্যান্য দলের ভিতরেও আছেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই নিজেদের কর্ম্মসূচীর দ্বারাই পরিচালিত হন।'

"চতুর্থ যুক্তি—পরবর্ত্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যে ব্যবস্থা আছে কিংবা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যাহা ব্যয়-বরাদ্দ আছে সেগুলি বিহারের সহিত যুক্ত হইলে তাহার কিয়দংশ বিহারে খরচ হইবার সম্ভাবনা কিনা? আমি আমার পূর্ব্ব বিবৃতিতে বলিয়াছি যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অথবা আগামী ৫ বছরের শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ অথবা তাহার জন্য যাহা সঙ্গতি যোগাড় হইবে সেগুলি বাংলার নিজস্ব। প্ল্যানিং কমিশনের সহিত চুক্তি এই যে, বাংলার যাহা বরাদ্দ অথবা যাহা পরিকল্পনা তাহা বাংলার দায়িত্ব। যদি কোন পরিকল্পনা উভয় প্রদেশ একমত হইয়া গ্রহণ করে সে ভিন্ন কথা।

"পঞ্চম যুক্তি—প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, আঞ্চলিক আইন ইত্যাদি অথবা সমাজ-সংগঠনের কার্য্যকলাপের ব্যাপারে বাংলা দেশের স্বাতন্ত্র্য থাকিবে কিনা? যত দিন পর্য্যন্ত উভয় প্রদেশের জনমত কোন বিষয়ে মিলিত না হয় তত দিন এই নিয়মকানুন, ব্যবস্থা, নীতি ইত্যাদি পৃথক থাকা অবশ্যম্ভাবী।

"ষষ্ঠ প্রশ্ন—এই নবগঠিত রাজ্যের রাজধানী হইবে কোথায়? আমার মনে হয় ইহা কলিকাতায় হইবে, তবে ইহাও সম্ভব পাটনা দ্বিতীয় রাজধানী হইতে পারে।

"এই উভয় প্রদেশের জন্য একটি যুক্ত বিধানসভা ও মন্ত্রিসভা থাকিবে। উভয় প্রদেশের বিভিন্ন ঘটনার বিচার ইঁহারা করিবেন। কিন্তু এই উভয় প্রদেশের পৃথক বিধানসভা চালু থাকিবে এবং ইহার নাম হইবে রিজিওনাল কাউন্সিল। এই রিজিওনাল কাউন্সিলের মারফতে প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কার্য্যক্রম চলিতে থাকিবে। রিজিওনাল কাউন্সিল যুক্ত প্রদেশের ক্যাবিনেটকে স্ব স্ব প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। সাধারণতঃ সেই পরামর্শ ক্যাবিনেট গ্রহণ করিবেন। যদি কোন কারণে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে রিজিওনাল কাউন্সিলের ক্ষমতা থাকিবে যে অন্য কোন অপর ব্যক্তিকে সালিশী করিবার ভার দিতে পারিবেন।

"আসল কথা এই যে, বাংলার বিষয়ে যে কোন শাসনব্যবস্থার কথা ভাবুন না কেন মিলন ছাড়া আমাদের কোন গতি নাই। যদি একটি প্রদেশ এবং অপর প্রদেশের মধ্যে বিরোধ থাকে তাহা হইলে তাহার উভয়ের উন্নতির সম্ভাবনা নাই এবং দেশের সম্যক বিপদ। কংগ্রেস আবাদী সেসনে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে দেশকে গঠন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দেশের সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন সমাজতান্ত্রিক নিয়মে হইবে। তাহা করিতে হইলে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়াইতে হইবে। এই উৎপাদনশক্তি বাড়াইতে হইলে মিলনের প্রয়োজন। বাংলা এবং বিহার এই যুক্ত প্রদেশের মধ্যে অনেক প্রকার খনিজ সম্পদ আছে যেগুলিকে কাজে লাগাইতে পারিলে উভয় প্রদেশ তো বটেই ভারতবর্ষও সমৃদ্ধিশালী হইবে, যাহাতে দেশের প্রত্যেক লোকেরই আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। এই সমাজ-তান্ত্রিক প্রস্তাবের দ্বিতীয় ধারা এই যে, যাহা কিছু উৎপাদন হইবে তাহা কেবল গুটিকতক বিত্তশালীদের মারফতে হইবে তাহা নহে। ইহা অনেকগুলি সাধারণ লোকের মাধ্যমে হইবে যাহাতে জনসাধারণও লাভবান হইবেন। অভাবের দ্বারা পীড়িত যে লোক তাহার যদি সম্পদ বাড়ে এবং তাহার যদি আর্থিক উন্নতি হয় তাহা হইলেই ধনী-নির্ধনের যে তারতম্য তাহা অনেক কমিয়া যাইবে। এই সমাজতন্ত্রের তৃতীয় পন্থা এই যে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশই পিছাইয়া পড়িয়া না থাকে, যত শীঘ্র সম্ভব উন্নতি সকল প্রদেশের হওয়া উচিত যাহার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের ভিতরে কোন উন্নতির মাপকাঠিতে তারতম্য না থাকে। তাহা করিতে হইলে বিহার এবং উড়িষ্যার যেসব অঞ্চলে এখনও পর্য্যন্ত অনেক অব্যবহৃত খনিজ সম্পদ আছে সেগুলির যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

"আমি মনে করি সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশের উন্নতির জন্য একটা আগ্রহ আছে। সেই হিসাবে আমি তাঁহাদের আজ এই কথাই বলিব যে, যদি দেশের নিম্ন স্তরের লোকেদের উন্নতি করিতে হয় অথবা যদি দেশের মধ্যে কংগ্রেসের উপরোক্ত লক্ষ্যকে রূপায়িত করিতে হয় তাহা হইলে বাংলা বিহার একত্র হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

"এই প্রসঙ্গে আমি ইহাই বলিতে চাই যে, যদি বিহার এবং বাংলা দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতি হয় তাহা হইলে আমাদের মধ্যে বেকার-সমস্যারও সমাধানের সুবিধা হইবে এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদেরও একটা জীবিকানির্ব্বাহের পথ আবিষ্কার হইবে।

"এখন প্রশ্ন এই যে, আমরা রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে যে তিন হাজার পাঁচ শত বর্গ মাইল জমি পাইবার সম্ভাবনা আছে সেইটুকু লইয়াই বঙ্গদেশ গঠিত করিয়া প্রদেশের উন্নতি করিব অথবা বিহারের সঙ্গে মিলিত ও যুক্ত হইয়া খনিজ সম্পদ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইব।

"কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যখন বাংলা দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দলের প্রাধান্য ক্রমশঃ অগ্রগামী ছিল সেই অবস্থায় আমি আমার সংযুক্ত প্রস্তাব আনিয়া দেশের মধ্যে চাঞ্চল্যের সূচনা কেন করিলাম। আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাই যে, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য দেশের উন্নয়ন করা। যাঁহারা মনে করেন, আমরা কেবল অতীত গৌরবের উপর নির্ভর করিয়াই রাজনীতিক্ষেত্রে সম্মান পাইব অথবা জয়ী হইব তাঁহারা বিষম ভুল করিতেছেন। কোন দলই আধমরা থাকিতে পারে না। নূতন নূতন প্রেরণা যদি আমাদের ভিতর না আসে এবং তাহার দ্বারা যদি আমরা অনুপ্রাণিত না হই তাহা হইলে এই শত বৎসরের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা, অন্ধকার, গ্লানি দেশ হইতে কি করিয়া দূর করিবেন। আমাদের মতে দেশের কোন কার্য্যই সত্য এবং মিলন ভিন্ন হইতে পারে না। ইহাই আমাদের নেতা গান্ধীজীর উপদেশ ছিল। এই ভিত্তিতেই তিনি দেশের মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন কিন্তু এই মর্য্যাদা যদি সুরক্ষিত করিতে হয় তাহা হইলে এই নূতন পথে অগ্রসর হইতেই হইবে। আমি আজ তাই দেশকে, দেশবাসীকে এবং আমার সহকর্ম্মীদের অনুরোধ করিব যে, তাঁহারা এই মিলনমন্ত্র গ্রহণ করুন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অপসারিত হইবে, সকল সন্দেহের অবসান হইবে, দেশের কল্যাণ হইবে। বন্দে মাতরম্।"

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ঘাটতি স্বাভাবিক নিয়মে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহার অন্যথায় ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিতে হইবে। ১৯৫৬-৫৭ সনের বাজেট হিসাব অনুসারে ১৬'৮৯ কোটি টাকার ঘাটতি হইবে; ইহার মধ্যে চলতি রাজস্ব খাতে ১৪'১৯ কোটি টাকার ঘাটতি হইবে এবং উন্নয়ন খাতে মূলধনী বাজেট খাতে ২'৭০ কোটি টাকার ঘাটতি হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সনে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫'০৯ কোটি টাকায়। আগামী বৎসরের বাজেটে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪৯'৩৬ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬৩'৫৫ কোটি টাকায় অনুমিত হয়েছে। গত তিন বছরের পশ্চিমবঙ্গের আয়ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল (কোটি টাকায়):

	১৯৫৬-৫৭ (বাজেট)	১৯৫৫-৫৬ (সংশোধিত)	১৯৫৫-৫৬ (বাজেট)	১৯৫৪-৫৫ (বাজেট)
ব্যয়	৬৩·৫৫	৬৫·৭৮	৬২·৮৮	৪৯·১৫
রাজস্ব	৪৯·৩৬	৫০·৬৯	৪৫·৭৬	৪২·৬৫
ঘাটতি	১৪·১৯	১৫·০৯	১৭·১২	৬·৫০

মোট ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষার জন্য খরচ হইবে ৯'১৬ কোটি টাকা, পুলিশবাহিনীর জন্য ৭'১৫ কোটি টাকা এবং চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ৬'৫০ কোটি টাকা। মূলধনী বাজেটে খরচের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২৫'৬২ কোটি টাকা; গত বছরের তুলনায় ইহা ১১'২০ কোটি টাকা অধিক। ইহার অধিকাংশই ব্যয় হইবে দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনার জন্য, যথা, ১১·৬৭ কোটি টাকা। বাড়ী তৈয়ারী ও উদ্বাস্তুদের জন্য কলোনী স্থাপন বাবদ খরচ হইবে ২'৭০ কোটি টাকা; দুর্গাপুরের বিদ্যুৎ কারখানার জন্য ২'২৮ কোটি টাকা এবং জমিদারদের ক্ষতিপূরণের জন্য খরচ হইবে ৭৪ লক্ষ টাকা। দামোদর পরিকল্পনার জন্য পশ্চিম বাংলার ব্যয়ের অংশ সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দামোদর ভ্যালীর জন্য পশ্চিম বাংলাকে ১৫ কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় যে, যদিও পশ্চিম বাংলার ব্যয়ের দায়িত্ব আছে, কিন্তু ইহার জন্য অধিকার বলিয়া কিছু নাই বলিলেই চলে। পশ্চিম বাংলার নিজস্ব পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হইবে ১৩৮ কোটি টাকা এবং এই ব্যয়ের জন্য পশ্চিম বাংলা আভ্যন্তরিক সম্পদ ২৯'৫ কোটি টাকার মত তুলিতে পারিবে। অবশিষ্ট ১০৮'৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সম্পদের অংশ হিসাবে পাইবে।

অন্যান্য প্রদেশে বাজেটে অতিরিক্ত আয় ধরা হয়, বাংলা দেশে কিন্তু ঘাটতি নিয়মসঙ্গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা হয় যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির খরচের জন্য পশ্চিম বাংলা বিব্রত। কিন্তু পুনর্বসতি বাবদ সমস্ত খরচের টাকাই আসে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে, ইহার জন্য পশ্চিম বাংলাকে কোন খরচ করিতে হয় না। আজ পর্য্যন্ত ৬৭ কোটি টাকা এই পুনর্বসতির জন্য খরচ হইয়াছে। পুনর্বসতি ব্যবস্থার মধ্যে অনেকখানিই প্রহসন ও অপচয় আছে। যাহারা বাস্তবিক ভাবে দুঃস্থ তাহারা বস্তীতে বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। আর যাহারা বড় বড় চাকুরী করিতেছে, এমনকি ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত, তাহাদের জন্য যাদবপুর এবং দমদম এলাকায় ৩,০০০৲ টাকা কাঠার জমি সরকারী ব্যয়ে ৩০০৲ টাকা কাঠায় ক্রয় করিয়া বিলি করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে দুঃস্থ উদ্বাস্তু কেহই নহে, সবাই অবস্থাপন্ন। আর যাহারা বাস্তবিক দুঃস্থ তাহাদের পুনর্বসতি ব্যাপার প্রহসন মাত্র।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আগামী বৎসরে মোট ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, ইহার মধ্যে ১৮ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া যাইবে এবং বাকী পাঁচ কোটি টাকা আভ্যন্তরিক ঋণ তোলা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১৩৬'৬৫ কোটি টাকার ঋণ আছে এবং ১৯৫৫-৫৬ সনের শেষে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৬২'৮৬ কোটি টাকায়। বর্ত্তমানে আভ্যন্তরিক ঋণের পরিমাণ ১৪'৯৪ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে আরও পাঁচ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। কলিকাতায় চা প্রবেশের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে এবং অতিরিক্ত কয়েকটি জিনিষের উপর বিক্রয়কর ধার্য্য করা হইবে। ইহাতে জীবনধারণ দুর্মূল্য হইবে এবং চায়ের উপর কর ধার্য্য দ্বারা চায়ের রপ্তানী মূল্য চড়িয়া যাইবে, ফলে রপ্তানী ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা আছে। ইদানীং ভারতের চায়ের রপ্তানী ক্রমহ্রাসমান, রপ্তানী বৃদ্ধি করিবার মানসে কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানীশুল্ক তুলিয়া লইয়াছেন, কিন্তু প্রবেশ-করের দ্বারা চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা আরও ১২ কোটি টাকা বৎসরে তোলা হইবে, ইহা অবশ্য পরোক্ষ কর দ্বারা।

কেন্দ্রীয় জাহাজ-নীতি

কেন্দ্রীয় সংবিধান-সভায় জাহাজ-নিয়ন্ত্রণ বিলটি পরিচালনাকালে কর্ত্তৃপক্ষ দুইটি নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, পূর্ব্ব জাহাজ সমিতির সমস্ত অংশ সরকার ক্রয় করিয়া লইবেন, দ্বিতীয়তঃ, শীঘ্রই সরকার আর একটি জাহাজ সমিতি স্থাপন করিবেন। পূর্ব্ব জাহাজ সমিতি জাতীয়করণ ব্যাপারে কেহ যেন মনে না করেন যে, জাহাজ ব্যবসায়ে সরকার ব্যক্তিগত অধিকারের বিরুদ্ধে। জাহাজ-পরিচালনা ব্যবসায়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলি অসুবিধা ভোগ করিতেছে সেই সকল ক্ষেত্রে সরকার তাহাদের সাহায্যার্থে জাতীয়করণ করিয়া লইবেন। ইহাতে অবশ্য অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে। ব্যক্তিগত জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলি কতখানি কার্য্যকরী ভাবে জাহাজী ব্যবসায় পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় তাহার উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

পূর্ব্ব জাহাজী সমিতি ১৯৫০ সনে ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সমিতিবদ্ধ হয়, ইহার অংশীদার ছিল ভারত সরকার ও সিন্ধিয়া কোম্পানী। ইহার অনুমোদিত মূলধন ছিল ১০ কোটি

টাকা এবং প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ভারত সরকার দিয়াছেন ৪'০৭ কোটি টাকা এবং সিন্ধিয়া কোম্পানী দিয়াছে ১'৪৩ কোটি টাকা। সিন্ধিয়া কোম্পানী ছিল ম্যানেজিং এজেন্ট। গত বৎসর পূর্ব্ব জাহাজী সমিতির প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার ঘাটতি হয়, অর্থাৎ ক্ষতি হয়। অন্যান্য বৎসরে সমিতির লাভ হইয়াছে ৪০'৫ লক্ষ টাকা এবং তাহার মধ্যে সরকারের লভ্যাংশ ছিল ৭'৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব চুক্তি অনুসারে, এই সমিতির সমস্ত ক্ষতির পরিমাণ ভারত-সরকারকে বহন করিতে হইবে। লাভ হইলে সিন্ধিয়া তাহার ভাগ পাইবে, আর ক্ষতির সমস্ত দায়িত্বই ভারত-সরকারের। এইরূপ চুক্তি জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী এবং ইহার অবসান বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের জাহাজের মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে ৯ লক্ষ টনে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতের জাহাজের পরিমাণ ছিল ৩৯০,৭০৭ টন এবং প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৬ লক্ষ টন। প্রথম পরিকল্পনার শেষে জাহাজের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টন। জাহাজশিল্পকে জাতীয়করণ করা হইবে না বলিয়া রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছে, সুতরাং বেসরকারী শিল্পের দায়িত্ব ভারতের জাহাজনির্ম্মাণের হার বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতের বহির্বাণিজ্যের অন্ততঃ ১৫ শতাংশ ভারতীয় জাহাজ দ্বারা পরিবাহিত হইবে।

দ্বিতীয় যে জাহাজ সমিতি স্থাপিত হইবে তাহার মূলধন হইবে ১০ কোটি টাকা। এই সমিতি স্থাপনের মূলে দুইটি উদ্দেশ্য আছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-পরিচালনা ভারতীয় জাহাজের দ্বারা সম্পন্ন করিলে সুবিধা এবং লাভ হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে সকল পথে লাভ হয় না সেই সকল পথ হইতে বেসরকারী জাহাজগুলি সরাইয়া লওয়া হয়; ইহাতে জাতীয় বাণিজ্যের বিঘ্ন হয়। বোম্বাই হইতে ওডেসা পর্য্যন্ত একটি জাহাজপথ প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা ভারত-সরকারের আছে। বোম্বাই-হ্যামবুর্গ লাইনকে বিস্তৃত করিয়া ব্যাল্টিক সমুদ্রের বন্দর ও রাশিয়ার বন্দর-গুলিকে সংযোগ করিবার মানসে সোভিয়েট রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী-বিভাগ হইতে প্রতিনিধি আসিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা সুরু করিবে। দ্বিতীয় জাহাজ সমিতি স্থাপন দ্বারা রাশিয়া ও নিকটপ্রাচ্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের সুবিধা হইবে।

সিয়াটো ও কাশ্মীর

সম্প্রতি করাচীতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার সামরিক চুক্তি-সংস্থার একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিন, পাকিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এই সংস্থার সভ্য। ভারতবর্ষ সিয়াটো ও বাগদাদ প্যাক্টের বিরোধী, তাহার মতে এই সকল সন্ধিসংস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতির বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ এই সকল সন্ধিসংস্থার দ্বারা আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভারসাম্য বজায় থাকে না। পাকিস্থান সিয়াটোর (S. E. A. T. O.) সভ্য হওয়ায় তাহা ভারতের স্বার্থ-বিরোধী হইয়াছে। পাকিস্থান বর্ত্তমানে আমেরিকার নিকট হইতে সামরিক সাহায্য পাইতেছে। ইহাতে ভারতবর্ষ যদিও যথেষ্ট আপত্তি জানাইয়াছে ও জানাইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

কাশ্মীর লইয়া আজ ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে বিবাদ। সিয়াটোর অধিবেশনে কাশ্মীর-সমস্যা যাহাতে সত্বর শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা হয় সে সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষ অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তাহা খুবই স্বাভাবিক। সিয়াটো অধিবেশনের কয়েক দিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী ভারতবর্ষে আসেন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে, সিয়াটোর পক্ষে কাশ্মীর বিষয় আলোচনা করা অযৌক্তিক হইবে, কারণ ইহা তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সিয়াটোর তিন দিনের অধিবেশনের মধ্যে দুই দিন কাশ্মীর লইয়া আলোচনা হইয়াছে এবং শেষকালে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

ইহার পর আমেরিকার বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ ডালেস ভারতবর্ষে আসেন এবং এই ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি বিব্রতবোধ করেন। মিঃ ডালেস এই ব্যাপারে কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, ও কিছু নয়, এই প্রস্তাব শুধু পাকিস্থানের অনুরোধে গ্রহণ করা হয়। সিয়াটোর অধিবেশনে প্রত্যেক সভ্যকে কাশ্মীর ব্যাপারে তাহার অভিমত প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রত্যেকেই অভিমত দেয় যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব অনুসারে শান্তিপূর্ণভাবে ইহার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তখন তাহাদের বলা হয় যে, এই অভিমতকে প্রস্তাবরূপে গ্রহণ করা হউক, এবং তাহাই করা হয়। ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ পিনো বলেন যে, অধিকাংশ সভ্যই কাশ্মীর আলোচনার বিরোধী ছিল। ইহাতে পাকিস্থান হুমকী দেয় যে, তাহা হইলে সে সিয়াটোর অধিবেশনে যোগ দিবে না।

সম্প্রতি পাকিস্থানী পুলিশের ও সৈন্যদলের ভারতের এলাকায় গুলি ছোঁড়া বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে অবশ্য হতাহতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহাতে আমেরিকার উস্কানি আছে, ভারতকে তাহার নিরপেক্ষতার জন্য "একটু শিক্ষা" দেওয়া হইতেছে। মিঃ ডালেস অবশ্য এই অপবাদ অস্বীকার করিয়াছেন (এবং তাহা খুবই স্বাভাবিক) এবং তিনি বলিয়াছেন যে, যদি পাকিস্থান আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে তাহা হইলে আমেরিকা ভারতবর্ষের পক্ষ হইয়া পাকিস্থানকে বাধা দিবে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ এই কথায় আশ্বস্ত হইতে পারে নাই।

মিঃ ডালেস রাশিয়া আতঙ্কে আক্রান্ত, রাশিয়া যা কিছু করে তাহার বিপরীত মিঃ ডালেসকে করিতেই হইবে। রাশিয়ার নেতারা ভারতবর্ষে আসিয়া বলিলেন যে, গোয়া ভারতবর্ষের অংশ; ডালেস তাহার প্রতিবাদ করিলেন—গোয়া পর্তুগালের প্রাচ্যস্থিত প্রদেশ। রাশিয়ার নেতারা কাশ্মীরকে ভারতের অংশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন,

মিঃ ডালেস ইহার প্রতিবাদের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, এবং সে সুযোগ আসিল সিয়াটোর অধিবেশনের মাধ্যমে। কাশ্মীর সম্বন্ধে সিয়াটোর সঙ্কল্প মিঃ ডালেস পাকিস্থানের আব্দার বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহা নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত এই যে, কাশ্মীর ভারতের অংশ নহে! সিয়াটোর কাশ্মীর-সঙ্কল্প সোভিয়েট নেতাদের কাশ্মীর সম্বন্ধে ঘোষণার প্রতিবাদ সূচনা করে।

সিয়াটোর ব্যাপারে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধভাব আমেরিকায় সবাই জানে, সেখানে রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচন আগতপ্রায়। কাশ্মীর এবং গোয়ার ব্যাপারে মিঃ ডালেসের নির্বুদ্ধিতা আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক দল আগামী নির্ব্বাচনে কার্যে লাগাইবে। সেই কারণে মিঃ ডালেস দিল্লীতে আসিয়াছিলেন সাফাই গাহিতে ও পণ্ডিত নেহরুকে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানাইতে। রিপাবলিকান দল ইহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চায় যে, ভারতের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সৌহৃদ্য অক্ষুণ্ণ আছে।

সিয়াটো সন্ধিসংস্থা ও বাগদাদ প্যাক্ট প্রধানতঃ কম্যুনিষ্ট সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে চালিত, কিন্তু এইরূপ কোন অভিযানের সম্ভাবনা বর্ত্তমানে নাই। কাশ্মীর এবং প্যালেষ্টাইন সমস্যার সহজ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের বিরোধিতা করিয়া এংলো-আমেরিকান শক্তিবর্গ সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট অভিযানের বিরুদ্ধে সংহতি সৃষ্টি করিতেছে না; বরং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে। পাকিস্থানকে অস্ত্রসাহায্যে ভারতবর্ষ নিজের বিপদ দেখিতে পাইতেছে; সেইরূপ ইরাককে মিত্রশক্তিবর্গ যে অস্ত্র সাহায্য করিতেছে তাহাতে প্যালেষ্টাইন নিজের সমূহ বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত। পাশ্চাত্য নেতারা প্রাচ্যে আসেন সামরিক চুক্তি-কর্ত্তা হিসাবে; ইহাতে কিন্তু তাঁহারা প্রাচ্যের সদিচ্ছা লাভ করেন না। তাঁহারা বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়া যান এবং কম্যুনিজমকে ব্যাহত করিতে যাইয়া তাহাকে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এশিয়া সম্পর্কে অতি অনভিজ্ঞ ছিল। পূর্ব্বেকার ডেমোক্র্যাটিক দল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় কিছু শিক্ষালাভ করে। রিপাবলিকান দল অভিজ্ঞ লোক সরাইয়া দলস্থ নূতন লোককে বসাইয়া সে শিক্ষার ফল নষ্ট করিয়াছে।

সিয়াটো ও ভারতের নিরাপত্তা

৮ই মার্চ লোকসভায় এক বিবৃতি দিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, সিয়াটো সম্মেলনে কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা একটি গুরুতর ব্যাপার।

কাশ্মীর সম্পর্কে সিয়াটো জোটের করাচী বৈঠক হইতে যে ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রভাবশালী মহল (ভারতীয় নহে) হইতে বলা হইয়াছে যে, "ইহা ভারতের উপর পরোক্ষভাবে চাপ দেওয়ার একটা কৌশলপূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

সিয়াটো বৈঠক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার শ্রীপ্রেম ভাটিয়া লিখিতেছেন যে, সম্মেলনে এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির নানাবিধ আলোচনা হয় সত্য কিন্তু বৈঠকের গুরুত্ব সম্পর্কে ঐ সকল আলোচনা কোন আলোকপাত করিতে পারে না। বৈঠকে গৃহীত প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলির আসল গুরুত্ব প্রধানতঃ সামরিক।

করাচী বৈঠকের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিরাট মতপার্থক্য রহিয়াছে। মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডালেস সামরিক ব্যবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী প্রস্তাবক। তাঁহার অন্যতম সমর্থক ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে মিঃ কেসী। ফরাসী প্রতিনিধি পিনোর বিবৃতি স্পষ্টতঃই সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিলেও চলে। শ্রী ভাটিয়া লিখিতেছেন যে, যদিও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল সংখ্যাগুরু ছিল তথাপি করাচী বৈঠকে তাহারা পিছনের সারিতেই ছিল। প্রকৃতপক্ষে, করাচী বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানই মঞ্চ মাতাইয়া রাখিয়াছে।

করাচীতে সিয়াটো সম্মেলনের সমাপ্তির পর ক্রমে ক্রমে মার্কিন ও ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিবদ্বয় নয়াদিল্লীতে আসেন। মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডালেস ভারতকে এইরূপ স্তোকবাক্য দিয়া আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করেন যে, পাকিস্থান যদি মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভারতকে আক্রমণ করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে পরিত্যাগ করিবে। গোয়া ও কাশ্মীর সম্পর্কে মিঃ ডালেস তাঁহার বিবৃতির সাফাইস্বরূপ বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোয়া ও কাশ্মীরের গুণাগুণ বিচার করিয়া সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে নাই।

মিঃ ডালেস নয়াদিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গোয়া বা কাশ্মীর সম্পর্কে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই, শুধু পাকিস্থানকে খুশী করার জন্য এবং পর্তুগালকে না চটাইবার জন্য মার্কিন বৈদেশিক দপ্তর ঐরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমাদের বৈদেশিক দপ্তরের, ও আমাদের মার্কিন ও অন্য ইঙ্গ-মার্কিন সঙ্ঘের দেশস্থ রাষ্ট্রদূতগণের, কার্য্যকারিতা ও যোগ্যতার নিদারুণ অভাবের বিষয়েও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। বিদেশে আমাদের কথা বলিবার কোনও ব্যবস্থাই নাই।

সিয়াটো-চক্রের কাশ্মীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সমর্থনের জন্য ডালেসের ব্যর্থ প্রয়াসের অনুসরণ না করিয়া ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি স্বীকার করেন যে, কাশ্মীর আলোচনা সিয়াটো বৈঠকের আওতায় পড়ে না। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সহিত আলোচনা সম্পর্কে মিঃ পিনো বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্য-সঙ্কট সম্পর্কে তাঁহার ও শ্রীনেহরুর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মতৈক্য হইয়াছে। "যুগান্তরে"র সংবাদ অনুযায়ী মিঃ পিনো "বাগদাদ চুক্তি সম্পর্কে তাঁহার মতামত স্পষ্ট করিয়া পুনরায় ব্যক্ত করিতে অস্বীকার করিলেও এই প্রসঙ্গে তিনি যে ভাবে কথা বলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদ চুক্তির দ্বারা যে উত্তেজনার পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে মিঃ পিনো তাহার একান্ত বিরোধী।"

মাউণ্টব্যাটেন-সম্বর্দ্ধনা

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নৌবাহিনী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও ভারতের প্রাক্তন গবর্ণর-জেনারাল আাডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন সস্ত্রীক ভারত পরিভ্রমণে আসিলে তাঁহাকে ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপ্রধানের মর্য্যাদা দান করিয়া অভিনন্দিত করা হয়। নয়াদিল্লীতে তাঁহাকে একটি নাগরিক সম্বর্দ্ধনাও জ্ঞাপন করা হয়।

ভারত-সরকার মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনারাল হিসাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন সত্য, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবেই এশিয়া পরিভ্রমণে আসেন। মাউণ্টব্যাটেনকে যেরূপ সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে কোন দেশের কোন সাধারণ মন্ত্রীকে এরূপ সম্বর্দ্ধনা করা হয় না।

কোন ব্যক্তির বর্ত্তমান পদ অপেক্ষা ভূতপূর্ব্ব পদকে অধিকতর গুরুত্ব দান করা চলে না। মিঃ চার্চ্চিল যখন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি যদি আইসেনহাওয়ারের সহিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একজন প্রাক্তন জেনারালের ন্যায় ব্যবহার করিতেন তবে তাহা কেহই সমর্থন করিতেন না—অবশ্য ব্রিটিশ সরকার এইরূপ উদ্ভট ব্যবহার করিবার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন কখনও হইবেন না। ভারত-সরকার মাউণ্টব্যাটেনের সহিত যে আচরণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতঃই সমান উদ্ভট। একজন ব্রিটিশ মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্য্যাদা দান করায় ভারত-সরকার রাজনৈতিক শিশুসুলভ মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছেন।

ষ্ট্যালিন ও বর্ত্তমান রাশিয়া

ফেব্রুয়ারী মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে মার্শাল ষ্ট্যালিনের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার উপর যে রূপে সরকারী আক্রমণ চালান হইয়াছে তাহাতে বিশ্বের জনসাধারণ চমৎকৃত হইয়াছে। বিগত তিন দশক যাবৎ যাহাকে সোভিয়েট রাষ্ট্র, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এক সুপ্রভাতে তাঁহার সকল কৃতিত্বকেই সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করিয়া বসিলেন। কেবলমাত্র চীনের নেতা মাও-সে-তুং এবং ফরাসী কম্যুনিষ্ট নেতা মরিস থোরেই সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা হিসাবে ষ্ট্যালিনের অবদানের উল্লেখ করেন।

৫ই মার্চ্চ ভিয়েনা হইতে প্রেরিত "মার্কিনবার্ত্তা"র এক সংবাদে প্রকাশ:

"সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার বহু বিশিষ্ট নেতা এবং এশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশের নেতারাও এ পর্য্যন্ত উহাতে সায় দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেও ষ্ট্যালিনের যে শিক্ষা ও নীতিকে অক্ষয় ও অবিনশ্বর করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন যে সত্যই সেই নীতিকে বর্জ্জন করিতে চাহেন, এ বিষয়ে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মনে এখনও সন্দেহ রহিয়াছে।"

ষ্ট্যালিনের উপর আক্রমণ সম্পর্কে চীনের মনোভাব কি তাহা উক্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান লিখিতেছেন:

"সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ষ্ট্যালিন কর্ত্তৃক লিখিত শর্ট কোর্স অব দি হিষ্ট্রী অব দি কম্যুনিষ্ট পার্টি অব দি ইউ. এস. এস. আর."-এর সমালোচনা করিবার আট দিন পরে এবং অ্যানাস্তাস মিকোয়ান ষ্ট্যালিনের নামে তীব্র সমালোচনা করার পাঁচ দিন পরে পিকিং বেতার হইতে মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্পর্কে সতর্কতার সহিত রচিত একটি বক্তৃতা প্রচারিত হইয়াছে। বক্তৃতাটি ষ্ট্যালিনের "শর্ট কোর্সে"র ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেতার শ্রোতাদের ষ্ট্যালিন কর্ত্তৃক লিখিত এই ইতিহাসখানি এবং অন্য আর একটি পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান হইয়াছে।

পিপিং বেতারে প্রচারিত এই বক্তৃতাটির দ্বারা ষ্ট্যালিন সম্পর্কে মস্কোনীতি প্রায় অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনের যে পদমর্য্যাদা ছিল, কম্যুনিষ্ট চীনে মাও সে-তুঙের মর্য্যাদাও সেইরূপ। ফেব্রুয়ারী মাসে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে মাও-সে-তুংকে 'চীনা জনগণের মহান্ নেতা ও শিক্ষক' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।"

পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের আচরণের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ৪ঠা মার্চ্চের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ইউরোপের কোন নেতা ষ্ট্যালিনের প্রকাশ্য সমালোচনা করেন নাই। পূর্ব্ব-জার্মানীর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টি (কম্যুনিষ্ট)-র সম্পাদক হের ওয়াল্টার উলব্রিকট পূর্ব্ব-জার্মানীর কম্যুনিষ্ট মুখপত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিন কম্যুনিজমের উল্লেখযোগ্য সেবা করিলেও তাঁহাকে মার্কসবাদের অন্যতম প্রবক্তারূপে গণ্য করা যায় না।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি

বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্য্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতীতে জারশাসিত রাশিয়া কোন কোন সময় মধ্যপ্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেও নভেম্বর বিপ্লবের পর বহুদিন যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের কোন চেষ্টা সোভিয়েট রাষ্ট্র করে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি কোন বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। এইরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তির সুযোগে ব্রিটিশ সরকার ইরাক, ইরাণ,

মিশর, জর্ডান প্রভৃতি রাষ্ট্রের উপর নিজেদের মনোমত চুক্তি চাপাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এই সকল চুক্তির সর্ত কোনটিই স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণের সহায়ক হয় নাই।

কিন্তু চতুর্থ দশক হইতেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, স্থানীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রখরতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তদনুপাতে সাম্রাজ্যবাদেরও শক্তিহানি ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেওয়ায় তাহাতেও ঔপনিবেশিকবাদের শক্তি দুর্ব্বল হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ায়, ব্রিটেনের সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় মধ্যপ্রাচ্যেও ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। ইঙ্গ-মার্কিন-বিরোধিতার ফলে কয়েক বৎসর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি এক বিশেষ অনিশ্চয় অবস্থার সম্মুখীন হয়।

সাম্প্রতিককালে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতিতে পুনরায় আলোড়ন দেখা দেয়। প্রধানতঃ ইঙ্গ-মার্কিন জোটের উস্কানিতেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিশর, সৌদী আরব, সিরিয়া, জর্ডান প্রভৃতি রাজ্য নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই এই আক্রমণাত্মক সামরিক চুক্তিতে যোগদানে অস্বীকৃত হয়। ফলে চিরাচরিত প্রথা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি মধ্য-প্রাচ্যের স্বাধীন দেশগুলির উপর নানাভাবে চাপ দিতে আরম্ভ করে —যাহাতে তাহারা বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইরূপ অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জর্ডানের জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে, জর্ডানের সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে জনসাধারণের উপর গুলি ছোঁড়া হয়। জর্ডান সরকার এমনও অভিযোগ করেন যে, তাঁহাদের বিরোধিতা-সত্ত্বেও ব্রিটিশ মালিকানায় পরিচালিত জর্ডান রেডিও হইতে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার চলিতেছে।

গত ২রা মার্চ্চ জর্ডান সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অধিনায়ক জন ব্যাগট গ্লাবকে ২০ বৎসর বয়স্ক রাজা হুসেন পদচ্যুত করেন। গ্লাবের সহিত আরও যাহাদের পদচ্যুত করা হয় তাহারা হইতেছে—আরব লিজিয়নের গোয়েন্দা বিভাগের অধ্যক্ষ স্যর প্যাট্রিক কুগ হিল এবং গ্লাবের চীফ অব ষ্টাফ ব্রিগেডিয়ার হাটন। ইহা ব্যতীত ব্রিটিশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন আরব লিজিয়নের তিনজন জর্ডানিয়ান অফিসারকেও ছাটাই করা হয়।

গ্লাবের পদচ্যুতিতে পশ্চিমী মহলে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রায় কুড়ি বৎসর যাবত প্রকৃতপক্ষে গ্লাবই জর্ডানের শাসক ছিলেন। তাঁহার এইরূপ আকস্মিক পদচ্যুতির কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

যদিও জন গ্লাব একজন সাধারণ ইংরেজ হিসাবেই জর্ডানে কাজ করিতেছিলেন তথাপি তাঁহার পদচ্যুতিতে ব্রিটিশ সরকার এতই বিচলিত হইয়া পড়েন যে, প্রধানমন্ত্রী সর এণ্টনী ইডেন তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। গ্লাব ব্রিটেনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাণী তাহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবার জন্য কে. সি. বি. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

সাইপ্রাসের সংগ্রাম

সাইপ্রাসের জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবি ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। ঔপনিবেশিক জনসাধারণের সহিত চিরাচরিত প্রথায় ব্রিটিশ সরকার সাইপ্রাস স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা আর্চ্চবিশপ ম্যাকারিয়সকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ম্যাকারিয়সের সহিত আরও তিন জন নেতা বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

সাইপ্রাসের অধিকাংশ অধিবাসীই গ্রীক বংশোদ্ভূত। তবে সেখানে তুর্কী জাতীয় অধিবাসীও প্রায় এক-চতুর্থাংশ। সাই-প্রাসের জনগণের প্রধান দাবি—পূর্ণ স্বাধীনতা ও গ্রীসের সহিত পুন-র্মিলন। চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি অনুসরণ করিয়া ব্রিটেন সাইপ্রাসের গ্রীক ও তুর্কী অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ জীয়াইয়া রাখিয়া সাইপ্রাসের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দাবাইয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অনিবার্য্য ভাবেই স্বাধীনতা-আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রণনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই ব্রিটেন সাইপ্রাস ছাড়িতে সম্মত নহে। মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক ব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্র সাই-প্রাস। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষরূপে তিনটি শক্তি সাইপ্রাস সম্পর্কে আগ্রহান্বিত। সেই শক্তিগুলি যথাক্রমে ব্রিটেন, গ্রীস ও তুরস্ক। গ্রীস ও তুরস্ক বলকান চুক্তির অংশীদার এবং তিনটি রাষ্ট্রই আক্রমণাত্মক উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থার সভ্য। কিন্তু তথাপি সাইপ্রাসের প্রশ্নে এই ত্রিশক্তির মতৈক্য নাই। সাইপ্রাস জনসাধারণের স্বাধীনতা ও গ্রীসের সহিত পুনর্মিলনের আন্দোলনের প্রতি গ্রীস সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। তুরস্কের অভিমত হইল যে, যেহেতু সাইপ্রাসের সার্ব্বভৌমত্ব ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন সেই হেতু ব্রিটেন সাইপ্রাস ছাড়িলে ন্যায়তঃ সাইপ্রাস তুরস্কের হাতেই ফিরাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং সাই-প্রাস দ্বীপ তুর্কী দেশ হইতে ৭৫ মাইল দূরে ও গ্রীস হইতে ৩০০ মাইলের উপর তফাতে। ফলে, ব্রিটেন তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে মত-বিরোধের অজুহাত দেখাইয়াছে।

গ্রীক সরকার সাইপ্রাসের প্রশ্নটি দুই বার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে আলোচনার চেষ্টা করেন। আর্চ্চবিশপ ম্যাকারিয়সের নির্ব্বাসন উপলক্ষে গ্রীস পুনরায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের বর্ত্তমান বার্ষিক অধি-বেশনের খসড়া কার্য্যবিবরণীতে সাইপ্রাস প্রশ্নটি পুনঃ সংশোধিত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে।

আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সের বহিষ্কার উপলক্ষে সাইপ্রাস সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়া নাগপুরের "হিতবাদ" লিখিতেছেন যে, এই ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা ব্রিটেন মহা ভুল করিয়াছে। নরমপন্থী সাইপ্রাস নাগরিকগণ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়িবেন এবং তদনুপাতে চরমপন্থীদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইবে। তদুপরি ইহা আরও নিশ্চিত যে, আর্চবিশপের নির্বাসন সকল জাতীয়তাবাদীদিগকে ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা অনুসরণের সহায়তা করিবে। মরক্কো হইতে সুলতান বেন ইউসুফকে নির্বাসিত করিয়া ফরাসীরা যে ভুল করিয়াছিল, আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সকে নির্বাসন দিয়া ইংরেজরাও ঐ একই ভুল করিয়াছে বলিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে।

সাইপ্রাসের জনমতের বিরুদ্ধে সাইপ্রাসকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিলে তাহার কতদূর কার্য্যকারিতা থাকিবে সে সম্পর্কে ব্রিটেনও নিশ্চয় সম্পূর্ণরূপে অনবহিত থাকিতে পারে না। আর্চবিশপের নির্বাসনে সেই জনমত আরও বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। "হিতবাদ" লিখিতেছেন, কেবলমাত্র একটি উপায়েই সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব এবং তাহাতে সম্ভবতঃ সামরিক ঘাটিও বজায় রাখা যাইতে পারে। সেই উপায় হইল অবিলম্বে সাইপ্রাসের জনসাধারণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দান করা।

ইন্দোচীনের পরিস্থিতি

১৯৫৪ সনের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সহিত ইহাও স্থির হয় যে, ১৯৫৬ সনের জুলাই মাসে সমগ্র ভিয়েৎনামে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্ব্বাচনের পর যে সরকার গঠিত হইবে তাহারই উপর সমগ্র ভিয়েৎনামের শাসনভার ও সার্ব্বভৌমত্ব ন্যস্ত হইবে। নির্ব্বাচনের সময় পর্য্যন্ত উভয়পক্ষ যাহাতে যুদ্ধবিরতির সর্ত্তগুলি লঙ্ঘন না করে সেজন্য ভারতের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরতি তদারক কমিশনও গঠন করা হয়। ১৯৫৬ সনের জুলাই মাস আসিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। কিন্তু ভিয়েৎনামে নির্ব্বাচন-অনুষ্ঠানের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

নির্ব্বাচন-অনুষ্ঠানের পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইতেছে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কর্ণধারগণের মনোভাব। বাওদাই-এর অপসারণের পর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ক্ষমতা এখন ডিয়েম চক্রের হাতে রহিয়াছে। ডিয়েম সরকার মার্কিন প্ররোচনায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, যেহেতু তাঁহারা জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন না সেই হেতু জেনেভা চুক্তি কার্য্যকরী করিবার কোন প্রকার বাধ্য-বাধকতা তাঁহারা স্বীকার করেন না, উপরন্তু আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরতি তদারক কমিশনের কাজেও তাহারা নানারূপ বাধাসৃষ্টির প্রয়াসী হইয়াছে। এইরূপ নেতিবাচক ও বিরোধী নীতির অনুসরণ করিয়া ১৯৫৫ সনের ২০শে জুলাই সায়গনে প্রধানতঃ সরকারী প্ররোচনাতেই আন্তর্জাতিক কমিশনের উপর এক সুপরিকল্পিত আক্রমণ চালানো হয়।

ডাঃ হো চি মিনের নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার বারংবার সমগ্র ভিয়েৎনামে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই। এই অবস্থায় কোরিয়া ও জার্ম্মানীর মত ভিয়েৎনোমেরও দ্বিধাবিভক্ত হইয়া থাকিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

ইন্দোচীনের বর্ত্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া যুক্তভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের নিকট একপত্রে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফাম ভান ডঙ ইন্দোচীনসংক্রান্ত জেনেভা চুক্তি কার্য্যকরী করিবার জন্য আর একটি নূতন জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে আণবিক বোমার পরীক্ষা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছে যে, শীঘ্রই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আণবিক বোমার আর একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হইবে। ইতিপূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক আণবিক বোমা বিস্ফোরণের যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে কয়েকজন জাপানী মৎস্যজীবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবারের বিস্ফোরণের অস্ত্রটি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। সেজন্য প্রশান্ত মহাসাগরে আসন্ন মার্কিনী পরীক্ষার সংবাদে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট ভারত সরকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই উদ্বেগের কথা জানাইয়া প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। জাপানের মৎস্যজীবী-সঙ্ঘ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট একপত্রে এই অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে।

আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন, পরীক্ষা ও ব্যবহার নিষেধের জন্য পৃথিবীর জনসাধারণের দাবির প্রতি বৃহৎ শক্তিগুলি ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না দেখা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আণবিক বিস্ফোরণের ফলে জাপানী ধীবরদের প্রাণনাশ ও আঘাতের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জোরালো প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় নূতন ভাবে অস্ত্র-পরীক্ষার আয়োজন চলিতেছে। এই পরীক্ষা আটলাণ্টিক মহাসাগরেও চলিতে পারিত যদিও তাহাও সমর্থনযোগ্য হইত না। কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কমিউনিজমের "বিভীষিকা"র বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হইল এশিয়ার জাতিগুলির উপর নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বজায় রাখা। সেই নীতিরই উপর ভিত্তি করিয়া পশ্চিমী শক্তিগুলি আত্মরক্ষার নামে, অনিচ্ছুক রাষ্ট্রগুলির উপর তাহাদের স্বপরিকল্পিত "প্রতিরক্ষা" ব্যবস্থা চাপাইবার জন্য "সিয়াটো", "মেটো" প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছে এবং এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে ভীত আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার জন্য প্রশান্ত

মহাসাগর অঞ্চলে সর্ব্বধ্বংসী আণবিক অস্ত্রের নূতন নূতন পরীক্ষা চালাইতেছে।

মরিশাসের নূতন শাসনব্যবস্থা

ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আফ্রিকা মহাদেশের সন্নিকটবর্ত্তী মরিশাস দ্বীপের অধিবাসীরা অধিকাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভব। মরিশাসের ভারতীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং দিনমজুর বা ক্ষেতমজুরের কাজ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে।

সম্প্রতি মরিশাসের শাসনব্যবস্থার কতকগুলি পরিবর্ত্তনের কথা ঘোষিত হইয়াছে। ১৩ই মার্চ্চ বিলাতের কমন্স সভায় ব্রিটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ এলান লেন্নকসবয়েড যে বিবৃতি দেন তাহাতে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনগুলির উল্লেখ করা হয়।

দ্বীপের আইনসভার সদস্যসংখ্যা ১৯ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫ করা হইবে—তন্মধ্যে বার জনই হইবেন সরকারের মনোনীত। আইনসভার এক জন স্পীকারও নিয়োগ করা হইবে। স্থির হইয়াছে যে, ১৯৫৮ সনে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং তাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীই ভোটদানের অধিকার পাইবেন।

দ্বীপের গবর্ণরের অধীন যে কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ রহিয়াছে তাহার সদস্যসংখ্যা তিনজন বৃদ্ধি করিয়া বারো জন করা হইবে। তন্মধ্যে সাত জন হইবেন আইনসভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, দুই জন গবর্ণরের মনোনীত বেসরকারী সদস্য এবং তিন জন সরকারী সদস্য। অবশ্য কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের কাজ হইল কেবলমাত্র উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া। গবর্ণর খুশিমত সেই পরামর্শ গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও পারেন। উপরন্তু কয়েকটি ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে গবর্ণরের হাতে সংরক্ষিত থাকিবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের যানবাহন সমস্যা

কেন্দ্রশাসিত ত্রিপুরা রাজ্যের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার একমাত্র উপায় মোটরযান। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোটরে ভ্রমণ করা জনসাধারণের পক্ষে বিশেষভাবে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যে মোটর দুর্ঘটনার ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই যাত্রীসাধারণের জীবনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে ধারণা হইবে। সম্প্রতি স্থানীয় "সেবক" পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই ব্যাপারে বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হইয়াছে।

"সেবকে"র মতে দুর্ঘটনার কারণ, খারাপ গাড়ী, অযোগ্য ড্রাইভার এবং খারাপ রাস্তা। এই সকল অবস্থার জন্য গাড়ীর মালিক ও ত্রিপুরা সরকার উভয়কেই দায়ী করা যায়। "আমাদের মতে ত্রিপুরা সরকারই বিশেষ ভাবে দায়ী। কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে মোটেই তৎপর নহেন, বরং অধিকাংশ বিষয়ে কর্ত্তব্যপালনে হয় তাঁহারা অসমর্থ বা উদাসীন। যে সমস্ত জীপ, ট্রাক ও বাস রাজ্যের জঘন্যতম রাস্তা দিয়া চলে, উহাদের অধিকাংশ পারমিট পাওয়ার অনুপযুক্ত। বেপরোয়া ভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্সও দেওয়া হইতেছে। ড্রাইভিংয়ের অ আ জানে না এমন অসংখ্য ড্রাইভারকেও লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা বহু অভিযোগ পাইয়াছি।"

রাস্তা খারাপ বলিয়া অনেক গাড়ীর মালিকই নূতন গাড়ী ক্রয়ে তত বেশী উৎসুক নহেন। আবার অনেক মালিকেরই নূতন গাড়ী কিনিবার সঙ্গতি নাই। এইরূপে কেবলমাত্র খারাপ গাড়ীই জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু খারাপ বলিয়া বর্ত্তমান গাড়ীগুলি সরাইয়া লইলে জনসাধারণের দুর্দ্দশা আরও ঘনীভূত হইবে এইমাত্র।

উপযুক্ত রাস্তা নির্ম্মাণের দায়িত্ব সরকারের। সরকার যদি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় উৎকৃষ্ট পথ নির্ম্মাণ করেন তবে তাঁহারা ন্যায়তঃ অর্থবান মোটর মালিকদিগকে নূতন মোটর ক্রয়ের জন্য চাপ দিতে পারিবেন। স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীন মোটর মালিকদিগকে সমবায় প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য উৎসাহ দিয়া সরকার ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মারফত ঋণদান করিলে তাঁহারাও নূতন গাড়ী ক্রয়ে সমর্থ হইবেন। তদুপরি, সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ যদি সততার সহিত ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া কেবলমাত্র উপযুক্ত গাড়ীগুলিকেই রাস্তায় বাহির হইবার অনুমতি দেন তবে ত্রিপুরার এই বিশেষ জরুরি যানবাহন-সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া "সেবক" লিখিতেছেন।

সরকারী দলিলে জাতি সম্পর্কিত উল্লেখ

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষই সরকারী দলিলপত্রে জাতি সম্পর্কিত উল্লেখের অবসানকল্পে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। লোকসভায় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন কংগ্রেসদলের শ্রীএস. সি. সামন্ত এবং রাজ্যসভায় শ্রীপি. টি. লিওভা।

রাজ্যসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীলিওভা বলেন যে, সরকারী দলিলপত্রে জাতি উল্লেখ করিবার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার বিলোপসাধন করিলে তাহা দেশ হইতে জাতিভেদ-প্রথার বিষ দূর করিবার পক্ষে মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হইবে। রাজ্যসভায় বিতর্ককালে অধিকাংশ সদস্যই বিলটিকে আন্তরিক সমর্থন জানান বলিয়া পি-টি-আই'এর সংবাদে প্রকাশ।

সরকার পক্ষ হইতে আইন বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীএইচ. ভি. পটাসকর প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানান। শ্রীপটাসকর বলেন যে, যদিও বিলটি অসম্পূর্ণ তথাপি কোন ব্যক্তি দলিলে জাতি উল্লেখ করিতে অসম্মত হইলে তাহাকে যাহাতে অসুবিধা সহ্য করিতে না হয় সেজন্য বিলটিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলটির ধারা অন্যান্য আইনে সম্প্রসারণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া শ্রীপটাসকর বলেন যে, তাহাতে নানাবিধ অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কারণ, সংবিধানে কয়েকটি জাতিকে বিশেষ সংরক্ষণদানের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে।

বিলটির বিরোধীদের যুক্তির প্রত্যুত্তরে মন্ত্রীমহোদয় বলেন যে, বিলটি গৃহীত হইলে তাহাতে কি অসুবিধা দেখা দিতে পারে তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ড. পি. ভি. কানে বলেন যে, বর্ত্তমান বিলটির ন্যায় "হঠকারী" প্রস্তাব গ্রহণের ফলে কেবল গোলমালেরই সৃষ্টি হইবে। তিনি বলেন যে, বরং ১৯০৮ সনের রেজিষ্ট্রেশন আইনটি এইভাবে পরিবর্ত্তিত করা হউক যেন কেহ জাতির উল্লেখে অসম্মত হইলে কেবলমাত্র ঐ কারণে রেজিষ্ট্রার রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার না করেন।

বিহারের কংগ্রেসী সদস্য ডঃ পি. সি. মিত্র বলেন যে, বিলটি গৃহীত হইলে বিহারে আদিবাসীদের সমস্যা দেখা দিবে। কারণ, ছোটনাগপুরে দুইটি বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর করার ব্যাপারে নানারূপ বিধিনিষেধ রহিয়াছে।

বেসরকারী সদস্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিলগুলির মধ্যে পার্লামেণ্ট যে কয়টি বিল পাস করেন ইহা তাহাদের দ্বিতীয়। প্রথম যে বিলটি পাস হয় তাহা ওয়াকৃফ সম্পর্কিত।

পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক জাতির উল্লেখসংক্রান্ত উক্ত বিলটি পাস করা সম্পর্কে সমালোচনা করিয়া মান্দ্রাজের ইংরাজী দৈনিক "হিন্দু" লিখিতেছেন যে, আধুনিক পার্লামেণ্টে বেসরকারী সদস্যদের কোন প্রস্তাব পাস হইবার আশা নিতান্তই কম, সেই অবস্থায় যদি কোন বেসরকারী বিল পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় তাহাতে উল্লসিত হইবারই কথা। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ঐরূপ বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইবার ফলে দেশের সমস্যাবলীর সমাধান না হইয়া উহা বিভিন্ন আইনের প্রয়োগকে ব্যাহত করে তবে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রস্তাবকে লাভজনক মনে করিবেন না। রাজ্যসভা কর্ত্তৃক গৃহীত বিলটি এই পর্য্যায়েই পড়ে। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদের পথে ইহাকে একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলিয়া অনেকে বলিতেছেন, কিন্তু সরকারী দলিলপত্রে জাতির উল্লেখের সহিত সামাজিক ভাবাদর্শের (ideologies) কোনই সম্পর্ক নাই। দলিলে উল্লিখিত বিষয়গুলি কোন ব্যক্তির পরিচয় স্থাপনে সাহায্য করে এইমাত্র।

নথিপত্রে জাতির উল্লেখ না থাকিলে যে সকল অসুবিধা দেখা দিতে পারে তাহার উল্লেখের পর "হিন্দু" লিখিতেছেন: পার্লামেণ্টের মূল্যবান সময় এবং অর্থ এই সকল সৌখীন আইন প্রণয়নে ব্যয়িত হইতেছে যাহাতে বাস্তবে কাহারও কোন উপকার হইবে না। "আদর্শগত ক্ষেত্রে গোঁজামিল (ideological window-dressing) বা ব্যক্তিগত অহমিকার (individual egoism) চরিতার্থতা এই দুইয়ের কোনটিই আইনপ্রণয়নের বিধিসম্মত উদ্দেশ্য হইতে পারে না।"

পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত বিলটি গ্রহণের সমালোচনা করিয়া বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক "ইকনমিক উইকলি" লিখিতেছেন—জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করিতে না চাহিলেই উহার উচ্ছেদ হইবে না। অনুন্নত জাতি ও সম্প্রদায়ের উন্নতির যে-কোন চেষ্টার প্রথম সোপান হইল সেই সম্প্রদায়ের সংখ্যা নিরূপণ করা। সুতরাং অনুন্নত জাতিদের উন্নতি কামনা করিলে, অনুন্নত জাতিদের পরিচায়ক লেবেল তুলিয়া লইলে সুবিধার পরিবর্ত্তে অসুবিধাই বেশী হইবে। সর্দ্দার প্যাটেলের নির্দ্দেশে ১৯৫১ সনে লোকগণনার সময় জাতি সম্পর্কিত বিবরণী না সংগৃহীত হওয়ার ফলে যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে সেই সম্পর্কে সকলেই এখন সচেতন হইয়াছেন।

"মুখে জাতিভেদ প্রথা বিলোপের সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সুন্দর সুন্দর প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং কার্য্যতঃ নিষ্ক্রিয় থাকা"—কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান কনফারেন্স অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (Indian Conference on social work) সংগঠিত সেমিনারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেমিনারের ডিরেক্টর অধ্যাপক শ্রীনিবাস দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বর্ত্তমান আচরণের বর্ণনা হিসাবে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। মহীশূরের অবস্থা বিবৃত করিয়া অধ্যাপক শ্রীনিবাস বলেন যে, মহীশূরের প্রথম গণতান্ত্রিক মন্ত্রিসভায় যে কেবল মন্ত্রিবর্গই জাতির ভিত্তিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, উপরন্তু প্রত্যেক মন্ত্রী নিজস্ব সেক্রেটারী হিসাবেও স্বজাতীয় লোককেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত সকল সরকারী কার্য্যে লোক-নিয়োগের ব্যাপারেই যে কেবল ঐ নীতি অনুসৃত হইতেছে তাহা নহে, এমন কি কলেজ ও স্কুলে ভর্ত্তির ব্যাপারেও জাতিবিচার করা হইতেছে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

এক বৎসর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার পর ১১ই মার্চ্চ ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা রাজপ্রমুখের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। মন্ত্রিসভার পদত্যাগের কারণ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলি। মুখ্যমন্ত্রী পনমপল্লী গোবিন্দ মেননের সহিত মতানৈক্য হওয়ার ফলে ছয় জন কংগ্রেসী সদস্য বিধানসভার কংগ্রেসী দল হইতে পদত্যাগ করায় ১১৭ জনের বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য-সংখ্যা ৫৫ জনে নামিয়া আসে। অথণ্ড কেরালা প্রদেশ গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি অর্জ্জনে সরকারের অক্ষমতার নিমিত্ত বিরোধী কংগ্রেসী সদস্যগণ দলত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের যে চারিটি তামিল ভাষাভাষী তালুক রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টে মাদ্রাজকে দেওয়া হইয়াছে বিরোধী কংগ্রেস সদস্যদের মতে তাহাও কেরালা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তাহা না হওয়াতেই তাঁহারা দলত্যাগ করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের এই সর্ব্বশেষ মন্ত্রিত্ব-সঙ্কটের আলোচনা করিয়া "ইকনমিক উইকলি"র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, রাজ্যে যেরূপ ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাতে রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনের দুরবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ দ্রুত মন্ত্রিত্ব পরিবর্ত্তনের কারণ সম্পর্কে ধীরমস্তিষ্কে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে,

প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল রাজ্য হিসাবে ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের লোকসংখ্যা বিপজ্জনক গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। কোন রাজনৈতিক দলই এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করে নাই। রাজ্যের শিল্পায়নের পথে অনেক বাধা। বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের এখানে বিশেষ অভাব। শিক্ষা বিষয়ে যদিও রাজ্যটি অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর তথাপি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপকতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কেবলমাত্র "হোয়াইটকলার" কাজের উপযুক্ত লোকই তৈয়ার হয়—জনসাধারণ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের কোনই সুযোগ পায় না। "হোয়াইটকলার" কাজের সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ ফলে সকলের মধ্যেই নৈরাশ্য ও অবিশ্বাসের ভাব রহিয়াছে। এই অবস্থায় যুবকদের অধিকাংশই যে নিরাশাবাদী এবং কংগ্রেস বিরোধী হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

কোন রাজনৈতিক দলেরই জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যাবলীর সমাধান বা শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনা নাই।

বর্তমান মন্ত্রিত্ব-সঙ্কটের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে "ইকনমিক উইকলি" লিখিতেছেন যে, মন্ত্রিসভার বিরোধী কংগ্রেসী সদস্যদের আচরণকে সমর্থন করা দুঃসাধ্য। যদি মন্ত্রীদিগকে প্রত্যেক সদস্যের নিকট নিয়োগ, বদলী বা পদোন্নতি সাধনের জন্য কৈফিয়ত দিতে হয় তবে কোন মন্ত্রিসভাই বেশী দিন কাজ চালাইতে পারে না। বিরোধী সদস্যদের অধিকাংশ অভিযোগই এই ধরনের। রাজ্য-পুনর্গঠন ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাকেই রাজনৈতিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব খুবই কম।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের বর্তমান মন্ত্রিত্ব-সঙ্কট উপলক্ষ্যে যাঁহারা রাজ্যে প্রেসিডেন্টের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন, সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে তাহার বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়াছে, রাজ্যের শাসনকার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করার দায়িত্ব রাজ্যের জনসাধারণের। নয়াদিল্লী হইতে পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপের ফলে রাজ্যের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই হইবে না।

সংস্কৃত কমিশন

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ড. মনমোহন দাস লোকসভায় শ্রীডাভির এক প্রশ্নের উত্তরে ১২ই মার্চ্চ বলেন যে, সরকার একটি সংস্কৃত কমিশন গঠন করার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। কমিশন অন্যান্য কাজের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের কি ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিবেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনের উপায় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান মানের সমতা-বিধানের জন্যও সুপারিশ করিবেন।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থী

বাঁকুড়া কেন্দ্রে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীদিগকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল সেই সম্পর্কে পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় "শ্রীদুর্মুখ" এক আলোচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ ছাত্রদিগের বসিবার স্থান নির্দ্ধারণ ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছিল। একটি কেন্দ্রে ছাত্রদিগকে এরূপ একটি ঘরে পরীক্ষা দিবার জন্য বসিতে দেওয়া হইয়াছিল যাহার দরজা ও জানালা ছিল না, উপরন্তু ছাতটি ছিল করোগেটের। ফলে ছাত্রদিগকে গরমে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হয়। অঙ্ক পরীক্ষার দিন ঝড়ে ধূলা, বালি, সিমেণ্ট উড়িয়া এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

"শ্রীদুর্মুখ" লিখিতেছেন: "আমরা যতদূর শুনিয়াছি, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সহিত এবার কোন পরামর্শ না করিয়া পরীক্ষার্থীদিগের 'সীট'এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অন্যথায় ঐরূপ অনুপযুক্ত ঘরগুলি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন হইত না।"

"পরীক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হইল শহরে থাকিবার অসুবিধা। হোটেলগুলিতে অত্যন্ত অসুবিধাজনক পরিবেশে ছাত্রেরা থাকিতে বাধ্য হয়। স্যানিটেশন ব্যবস্থাও অ-পর্য্যাপ্ত। এবার মহকুমা শিক্ষক সমিতি কেন্দুয়াডিহি ও রাজগ্রাম স্কুলে দুই-তিন শত ছাত্রকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই স্কুলগুলি কতকটা দূরে থাকায় বাসের ব্যবস্থা করিতে পারিলে কোন অসুবিধা হইত না। কর্তৃপক্ষকে বাসের ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তাঁহারা কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ফলে, এই ব্যবস্থা বাতিল করিতে হয়। অথচ এই একটু ব্যবস্থা করিয়া দিলে ছাত্রদের বহু উপকার হইত।"

কাছাড়ের যানবাহন সমস্যা

কাছাড় অঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপ্রতুলতা ও মূল্যবৃদ্ধি এবং তজ্জনিত সাধারণের দুর্গতি সম্পর্কে ১৮ই ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় আলোচনায় সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "এই পরিস্থিতির অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, একমাত্র পরিবহণ-ব্যবস্থার গোলমালের জন্যই বাজারে জিনিস নাই। যেখানে সপ্তাহে দুই-তিনটা ভেসপাচ ও সমসংখ্যক ফ্ল্যাটে প্রায় ৩০।৪০ হাজার মণ জিনিস করিমগঞ্জে শুধু ষ্টীমারেই আমদানী হইত, সেইস্থলে বর্তমানে ছোট ছোট বার্জ বা ভেসেলে দৈনিক মাত্র ৪০০।৫০০ মণ আসিতেছে। ষ্টীমার কোম্পানী জানাইতেছেন যে, একমাত্র ভগবানের সাহায্য ব্যতীত অর্থাৎ নদীতে জলবৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহারা কোন অবস্থায়ই বেশী মাল বহন করিতে অক্ষম। রেলের অবস্থা না বলাই ভাল।"

কাছাড়ের পরিবহণ-ব্যবস্থার এই শোচনীয় অবস্থার অপর একটি দিকের উল্লেখ করিয়া সম্পাদকীয় আলোচনায় বলা হইয়াছে, আসামের সমতলবর্তী বৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্রগুলি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত থাকায় সারা বৎসরই তাহারা ষ্টীমারে মাল আনয়নের সুবিধা পায়। উপরন্তু নদীতে একাধিক ষ্টীমার কোম্পানীর জাহাজ থাকায় ব্যবসায়ীরা ভাড়ার প্রতিযোগিতায়ও আংশিক সুবিধা পায়।

তদুপরি, তাহারা রেলেরও সুবিধা পায়। অপরপক্ষে কাছাড়ে কুশিয়ারা নদীতে সারা বৎসর ষ্টীমার চলে না, এবং যখন ষ্টীমার চলে তখন কেবল একটি ষ্টীমার কোম্পানীরই জাহাজ চলে। ঐ অঞ্চলে রেলের সুবিধাও সীমাবদ্ধ এবং বর্ষাকালে ধ্বস নামিলে আসাম হইতে মাল আমদানীও বন্ধ হইয়া যায়।

সম্প্রতি পাকিস্থানের মধ্য দিয়া বহু অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মাল আনয়নের জন্য ব্যবসায়ীরা যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও উপযুক্ত-সংখ্যক গাড়ীর অভাবে ব্যাহত হইতেছে। গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া সমস্ত লাইনে বুকিং বন্ধ। ষ্টীমারে স্থানাভাবহেতু বর্ত্তমানে সমস্ত লবণ গাড়ীতে আনিতে হয়। কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায়ী-সংস্থা হইতে বহু লেখাপড়ার পর যে কয়খানি গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা লবণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতেও নিতান্তই অপ্রতুল।

যানবাহনের অভাবজনিত এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি ও দ্রব্যাদির অপ্রতুলতা যে কেবল করিমগঞ্জের জনগণের পক্ষেই অসুবিধার কারণ হইয়াছে তাহা নয়, যেহেতু করিমগঞ্জ বাজারের উপর সমস্ত কাছাড় জেলা, মিজো জেলা, উত্তর কাছাড় জেলা, অন্যান্য জেলার অংশ বিশেষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এক বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, তাই করিমগঞ্জে জিনিষের অপ্রতুলতা এই সব স্থানের অধিবাসীদেরও সমূহ অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে।

উপসংহারে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "কাছাড়ের জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট এবং কাছাড়ের জনপ্রতিনিধিগণ যদি বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে প্রতি বৎসরই হেমন্তকালে কাছাড়ের এই অবস্থা হইবেই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে এই অভাব দূরীকরণের আপাততঃ কোন পন্থা দেখা যাইতেছে না। এই গুরুতর অবস্থার প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ ও অন্য সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

চাউলের দর বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতেই চাউলের দর বৃদ্ধি সংবাদ আসিতেছে। স্বাভাবিক বৎসরে আহরণের অব্যবহিত পরে চাউলের দরের যে নিম্নগতি কিছুদিন দেখা যায় এ বৎসর তাহা দেখা যায় নাই। চাউলের দর কোথাও কমে নাই বলিলেও চলে। চাউলের দর বৃদ্ধি দেখিয়া ভারত-সরকার বিদেশে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি দর কমে নাই।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে চাউলের দর বৃদ্ধি সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "ভারতী" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, হঠাৎ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করায় জনগণ বিব্রত বোধ করিতেছে। রপ্তানী বন্ধ করার আদেশের পরও স্থানীয় বাজারে চাউলের মূল্যমানের ইতরবিশেষ হয় নাই। "কলিকাতায় বাংলা দেশের তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে চাউল আমদানী হইয়া থাকে। রপ্তানী নিষিদ্ধ করণের ফলে কলিকাতা যে পরিমাণে উপকৃত হইবে আমাদের এই মফস্বল অঞ্চল সেই দিক হইতে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ উপকৃত হইবে না। এ অঞ্চলে চাউলের দর নামাইতে আর এক ছিদ্রপথে অর্থাৎ পাকিস্থানে চাউল পাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি জঙ্গীপুরের বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল দিয়া বিভিন্ন পথে চাউল পাকিস্থানে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে।"

আসানসোল শহরে জলাভাব

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শহরগুলিতেই গ্রীষ্মকালে জলাভাব একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। জলাভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ স্থানেই জল-সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রাচীন এবং ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে অসমর্থ। তদুপরি জলসরবরাহ যন্ত্রগুলি অত্যধিক পুরাতন হওয়ায় প্রায়শঃই সেগুলি বিকল হইয়া পড়ে। মফস্বলের শহরগুলির কোন পৌরপ্রতিষ্ঠানের হাতেই নূতন যন্ত্র বসাইবার মত প্রয়োজনীয় অর্থ নাই। জলাভাবের এই সকল মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করিবার মত ক্ষমতা, বিশেষতঃ আর্থিক সঙ্গতি, পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির হাতে না থাকায় বহু আলোচনা সত্ত্বেও সমস্যাটির সমাধান আর হইতে পারিতেছে না। ইহা ব্যতীত পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির দুর্নীতিও এই সমস্যাকে আংশিকভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে জনসাধারণের অবস্থা ক্রমশঃই অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে।

আসানসোল শহরে জল সরবরাহের অব্যবস্থা এবং সেই সম্পর্কে স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়া ১৬ই ফাল্গুন স্থানীয় সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, "শীত শেষ না হইতেই আসানসোলের কলের-জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্মুখে গ্রীষ্মের রুদ্রমূর্ত্তি এবং আসানসোলের কলের জলের ক্রম-বর্দ্ধমান স্বল্পতা স্মরণ করিলে মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই ইহার ব্যবস্থা করিয়া রাখুন, নহিলে আসানসোলের গরমে খাইবার জল না পাইয়া লোকে যখন পরিত্রাহি চীৎকার করিতে থাকিবে তখন অক্ষমতার কৈফিয়ত শুনিবার মত লোকের মানসিক অবস্থা থাকিবে না।"

উল্লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি সরকারী কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত করার ব্যবস্থা যখন প্রায় ঠিকঠাক "তখন হঠাৎ পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল এবং কংগ্রেসী দল মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলেন।" অবশ্য নানাবিধ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের কোনরূপ প্রতীকার হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে একজন একজিকিউটিভ অফিসারও নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু ঐ অফিসারের ক্ষমতা কেবলমাত্র কর আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। এইরূপ সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন একজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করিবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে "বঙ্গবাণী" প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

মেঘনাদ সাহা

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক এবং সমাজসেবী ডক্টর মেঘনাদ সাহা গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী (৩রা ফাল্গুন) দিল্লীতে বাষট্টি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যে উক্ত আপিসে রওনা হইয়া পথিমধ্যেই অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং হাসপাতালে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই তাঁহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং সকলেই শোকে মুহ্যমান হন। তাঁহার শবদেহ ঐদিনই বিমানযোগে কলিকাতায় আনয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মেঘনাদ ঢাকা জেলার একটি অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবধি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝিয়া, নিজ কৃতিত্বগুণে বৃত্তি ও সাহায্যাদি দ্বারা উচ্চতম বিদ্যাশিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা অবধি তিনি ঢাকায় অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এসসি শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি যেমন এক দল উৎকৃষ্ট ছাত্রকে সতীর্থরূপে পান তেমনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাব্রতীরও সংস্পর্শে আসেন। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে তিনি বাঘা যতীন প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত বিপ্লবীদের দ্বারাও বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। অতীব কৃতিত্বের সহিত এম-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যপ্রবর্ত্তিত পোষ্টগ্রাজুয়েট সায়ান্স বিভাগে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে অধ্যাপকপদে ব্রতী হন। ফলিত গণিতে উচ্চতম শিক্ষালাভ করিলেও, পদার্থবিদ্যাকেই মেঘনাদ প্রিয় বিষয়রূপে গ্রহণ করেন এবং ইহাতে কয়েক বৎসর গবেষণা পরিচালনার পর তিনি ১৯১৮ সনে ডি-এসসি হন। পর বৎসর তিনি প্রেমচাদ রায়চাদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ইহার পর দুই বৎসর ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানাগার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ড. সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজে পদার্থবিদ্যায় খয়রা অধ্যাপক পদ লাভ করেন। এখান হইতে ১৯২৩ সনে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক হইয়া যান। সেখানে একাদিক্রমে পনর বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে কার্য্য করিয়া, পুনরায় কলিকাতা সায়ান্স কলেজে পদার্থবিদ্যার পালিত-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। এই পদেও তিনি অনূন পনর বৎসর কাল নিয়োজিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর ঘটে এবং ভারতবর্ষে ও বহির্জগতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নূতন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কলিকাতা সায়ান্স কলেজেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং তদানীন্তন সরকারের আনুকুল্যে এই সকল ধারা প্রবর্ত্তনে অগ্রসর হন। এখানকার 'ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' ড. সাহার একটি প্রধান কীর্ত্তি বলা যায়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত সায়ান্স এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার কার্য্যেও তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন এবং ইহার আমূল সংস্কারসাধন করেন। এই সভা বৌবাজারের সঙ্কীর্ণ ভবন হইতে কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে নীত হইয়া, বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার একটি প্রকৃষ্ট পীঠস্থান রূপে গণ্য হইয়াছে। ড. সাহার কৃতিত্ব এক্ষেত্রে অপরিসীম। মৃত্যুকালে তিনি বিজ্ঞান-সভার 'ডিরেক্টর' বা অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ড. সাহার গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ গণিত-জ্যোতিষ-ভিত্তিক পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার "থিওরি অফ থার্ম্মাল ফিজিকস" গেলিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হইতে গত চারি শত বৎসরের মধ্যে যে দশটি জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার সংঘটিত হইয়াছে তাহার ভিতরে একটি বলিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে পরিকীর্ত্তিত। আমরা এ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় অন্যত্র একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলাম। ড. সাহা স্বীয় মৌলিক গবেষণার ফলে জগতের বিভিন্ন বিজ্ঞান-সভায়ও সম্মানিত সদস্যের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২৭ সনে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো বা সদস্যপদে বৃত হন। ফরাসী এষ্ট্রোনমিক্যাল একাডেমি এবং বোষ্টনের একাডেমি অফ সায়ান্সেজ-এর সম্মানিত সদস্য হন।

ড. সাহা পরীক্ষণাগারে বিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কার করিয়াই নিজ কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, স্বদেশের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কেও তিনি সর্ব্বদা সজাগ ছিলেন। ১৯৩৪ সনে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট এবং প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আন্তরিক আবেদন জানান। তাঁহার আবেদনের ফলে উহার অব্যবহিত পরে 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়ান্সেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গের নদী-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সম্পর্কেও তিনি প্রায় ঐ সময় হইতে আলোচনা সুরু করেন। এই সব আলোচনা, এবং ড. সাহা প্রমুখ বৈজ্ঞানিকবৃন্দের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালী কর্তৃপক্ষের ফলপ্রদ কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের ফলে ভারতবর্ষের নদনদী-নিয়ন্ত্রণের এত আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। 'সায়ান্স এণ্ড কালচার' নামক মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক আলোচনারও তিনি সুযোগ করিয়া দেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি রূপে ড. সাহা ইহাকে পুনর্গঠিত করায় সহায়তা করেন। ভারত-সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালেণ্ডার রিফর্ম কমিটি'রও তিনি ছিলেন সভাপতি। তিনি এই বিষয়ে বহু পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন।

বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত সেবাকর্ম্মেও ড. সাহার বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যম ছিল। তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য রূপে নানা সমাজ-হিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ছিন্নমূল অধিবাসীদের পুনর্ব্বাসনকল্পে তাঁহার আন্তরিক প্রয়াস দেশবাসীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যুগপৎ একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং নিষ্ঠাবান্ সমাজসেবী হারাইলাম।

গণেশ বাসুদেব মবলঙ্কর

ভারতরাষ্ট্রের লোকসভার 'স্পীকার' বা সভাপতি গণেশ বাসুদেব

মবলঙ্কর দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৪ই ফাল্গুন) আহমদাবাদে আটষট্টি বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি আহমদাবাদে ব্যবহারাজীব রূপে জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু সমাজসেবাই তাঁহার জীবনের মুখ্য আদর্শ ছিল। তিনি ঐ অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষালয় স্থাপন, আর্ত্তসেবা প্রভৃতি কার্য্যে প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করেন। শেষ-জীবনে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯১৭ সনে গুজরাট সভার সদস্যরূপে তিনি রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসেন। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত স্বাধীনতা আন্দোলন-সমূহেও তিনি যোগদান করেন এবং দেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ কারাগারেও একাধিক বার প্রেরিত হন। ১৯৩৫ সনের নূতন ভারত আইনবলে বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস পক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে মবলঙ্কর বোম্বাইয়ের আইনসভার সদস্য হন এবং ইহার 'স্পীকার' বা সভাপতির পদ লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পূর্ব্বকৃতিগুণে তিনি কেন্দ্রীয় আইন-সভারও 'স্পীকার' নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি এই পদে বৃত ছিলেন। ভারতরাষ্ট্রের নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে পার্লামেণ্ট গঠিত হইলে, তিনি ইহার প্রথম 'স্পীকার' হইয়াছিলেন। মৃত্যু-কালেও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মবলঙ্কর আইন-সভার কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনের জন্য বরাবর আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের পার্লামেণ্টসমূহ পর্য্য-বেক্ষণ করিবার জন্য ঐসব দেশে গমন করেন। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভার অধ্যক্ষদের লইয়া সম্মেলন আহ্বান করিতেন এবং সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত উপায়াদি নির্দ্ধারণে ও অবলম্বনে সকলকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি আইন-সভার অধ্যক্ষগণ এবং প্রতিনিধিদের সম্মুখে একটি উচ্চ আদর্শ স্থাপনে সমর্থ হন।

বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়

বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা একজন বিখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক হারাইলাম। তিনি ১৮৯১ সনে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তিনি সামান্য ব্যবহারাজীব হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ফেডারাল কোর্টের এবং ভারতীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরে সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি হইয়া দিল্লী গমন করেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অসুস্থতাহেতু তিনি বর্ত্তমান বর্ষের জানুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদে এক সময়ে বৃত হন। "Hindu Law of Religious and Charitable Trust" নামীয় আইন গ্রন্থখানি তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা সাহিত্য প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ...

এসোসিয়েশনের বিশেষ সংস্কার সাধন করেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির বর্ত্তমান উন্নতির মধ্যে তাঁহার মঙ্গল হস্ত লক্ষ্য করি।

সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত

গত ১৩ই মার্চ্চ (২৯শে ফাল্গুন) স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্যের প্রাক্তন লেক্‌চারার এবং বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম চিন্তা-শীল গ্রন্থকার ড. সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্তের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। প্রথম জীবনে তিনি বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং বি-এ পরীক্ষান্তে বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দীর্ঘকাল অন্তরীণ-জীবন যাপন করেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি একান্ত ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। পরে তিনি কৃতিত্বের সহিত বাংলা-সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ১৯২৯ সনে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিশ্লেষণমূলক 'কাব্যালোক' গ্রন্থখানি রচনা করিয়া তিনি ১৯৪৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা, তন্মধ্যে 'কাব্যশ্রী', 'রচনাশ্রী', 'আমাদের পরিচয়', 'উপনিষদের গল্প' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি-পরিষদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের আলোচনামূলক তাঁহার মনোজ্ঞ বক্তৃতা আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন যথার্থ শিক্ষাব্রতী, মনীষী ও সাহিত্যসেবী হারাইল।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা সন ১৩৬২ সালে প্রবাসীর গ্রাহক আছেন আশা করি, আগামী ১৩৬৩ সালেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য ১২৲ বারো টাকা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে অসুবিধা হয় এবং তিনি নূতন বা পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা যেন তাঁহারা গ্রাহক নম্বরসহ টাকা পাঠান, অন্যথায় পূর্ব্ব গ্রাহক নম্বরে ভি-পি যাইতে পারে; তাহা ফেরত দিবেন।

যাঁহারা আগামী ২৮শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না তাঁহাদের নামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে।

যাঁহারা অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিবেন।

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনো কখনো বিলম্ব ঘটে, সুতরাং প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

পদ্য আর গদ্য

আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার

হাঙ্গেরী দেশের আদিকবি ভোরোস্‌মার্তির গুণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টাইমস্‌ পত্রিকা একটা চির সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—"এই মহাকবি তাঁহার ভাব ও চিন্তাগুলিকে এক অভূতপূর্ব যাদুকরী সৌন্দর্যের ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শব্দচয়ন আমাদের বিশ্লেষণ-শক্তিকে পরাস্ত করে। তাঁহার কবিতাগুলি পড়িয়া সেই পুরাতন প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে—'কবির মহত্ত্ব কতটা তাঁহার ভাষার উপর নির্ভর করে? কেন এমন ঘটে যে অতি একঘেয়ে মামুলী চিন্তাকেও অমর সৌন্দর্যপূর্ণ পদগুলিতে দেহবদ্ধ করা যায়, শুধু যদি অমুক অমুক বাক্যগুলি ব্যবহার করি, অর্থাৎ সেই সেই শব্দের অন্য প্রতিশব্দ ঐখানে বসাইলে অর্থ ঠিক থাকিবে বটে কিন্তু কাব্যরস একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে?' "*

সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পদ্যের ভাষাকে 'Music distilled into words' বলা হয়; তাহার শব্দগুলি ধ্বনি দিতে থাকে। শুনিলে মনে হয় যেন সঙ্গীতের নির্যাস বাহির করিয়া তাহাকে বাক্যের আকারে ছন্দের শিশির মধ্যে পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইংরেজী সাহিত্য হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কবি শেলী ইটালী দেশে এক পাহাড়ের উপরে বসিয়া দূরে ভিনিস নগর দেখিতেছেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

> *Sun-girt* city, thou hast been
> Ocean's nurseling, then his queen.

এখানে প্রথম পদটি পদ্যের ভাষা, এই বিশেষণটি পড়িবা মাত্র সহৃদয় পাঠক যেন চক্ষে দেখিতে পান দূরদিগন্তে শহরটি প্রভাতসূর্যের কিরণে প্লাবিত! ভিনিস্‌ সমুদ্রের জলের উপরে নির্ম্মিত, সুতরাং যদি উহাকে sea-girt city বলা হইত, সে বিশেষণটিও সত্য হইত, কিন্তু তাহা গদ্যের ভাষা।

তেমনি, কবি কীটস্‌ একটি অমামুলী বিশেষণ ব্যবহার করিয়া গদ্যকে পদ্যে পরিণত করিয়াছেন, যথা—

> Or gazing on the new *soft-fallen mask*
> Of snow upon the mountain and the moor.

এখানে soft-fallen হইল পদ্যের ভাষা, কিন্তু new-fallen গদ্যের ভাষা অর্থাৎ মামুলী হইত।

নবীন সেন তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধে" প্রথমে লেখেন (২য় সর্গ, ১১ গুচ্ছ):

> "ধন্য আশা কুহকিনি!...
> দুর্ব্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
> যদি না সৃজিত বিধি,...হায়! ..
> উন্মাদ শার্দ্দল তাহে করিত নিবাস।"

এই পদগুলি স্কুলপাঠ্য কবিতাসংগ্রহে স্থান পাইবার পর পণ্ডিতগণ আপত্তি তুলিলেন যে শেষ লাইনটি ব্যাকরণ-দুষ্ট, তাহাকে সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে—

> "উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।"

শুনিয়াছি যে শেষের সংস্করণগুলিতে এই পরিবর্তন ছাপা হইয়াছে। কিন্তু নবীনের প্রথম লেখা "উন্মাদ শার্দ্দূল" পদ্য, আর পণ্ডিতদের সংশোধিত "উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে" ঘোর গদ্যের ভাষা, একথা পাঠক একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এইরূপ কোনও

> —এক বৈয়াকরণ
> ধূলি-বিভূষিত লইয়া চরণ

কি রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়াছিলেন? কবিগুরুর কয়েকটি স্বকৃত "সংশোধন", আমার বর্ণিত কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া পরীক্ষা করা যাক।

প্রথম সংস্করণের পাঠ:

> (১) নৃপতি বিম্বিসার
> নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া "লইলা"
> পাদ-নখ-কণা তাঁর।

পরের সংস্করণে "লইলা"কে "লইল" করা হইয়াছে।

> (২) সেথা হতে ফিরি গেল চলি "ধীরি"
> বধূ অমিতার ঘরে।
> সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর,...
> আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর,
> "সিঁথির সীমার" পরে।

* "How much of the greatness of a poet is due to his language? How and why is it that tiresome platitudes can be turned into lines of immortal beauty just by using certain words and not their synonyms?"

পরের সংস্করণে "ধীরি" হইয়াছে "ধীরে" এবং শেষ লাইনটা হইয়াছে—

সীমন্ত সীমা-'পরে।

উপরের দৃষ্টান্তে যে শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথের কলম হইতে প্রথম বাহির হয় তাহা ব্যাকরণ-দুষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটি খাঁটি পদ্য, আর সংশোধিত শেষ সংস্করণের ছাপা ঐ ঐ স্থানের প্রতিশব্দ ঘোর গদ্যাত্মক। এই পদ্যেই কবি "রচিলা যতনে" বদলাইয়া "রচিল যতনে" করেন নাই।

পাঠক যদি একথা না মানেন; তবে বলি ঐ ঐ লাইন-গুলি দু'তিনবার আবৃত্তি করিবার পর চোখ বুঁজিয়া ভাবিতে থাকুন, দেখিবেন কোন্‌টা পদ্যের ভাষা আর কোন্‌টা তাহা নয়। পদ্যের পরিচয় ঝংকার ও সুরে, ব্যাকরণে নহে।

পরিশিষ্ট

প্রথম সংস্করণ "কথা"র, পূজারিণী কবিতায় কপির দোষে ভুল ছাপা হয়—

জলে অগণ্য তারা।

পরে তাহার উচিত সংশোধন ছাপা হইয়াছে—

তারা অগণ্য জলে।

কিন্তু প্রথম সংস্করণ "গান—ব্রহ্মসঙ্গীত" ৩৪০ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছিল—

বল দাও, মোরে বল দাও,
সরল সুপথে ভ্রমিতে,
"সকল" অপরাধ ক্ষমিতে
সকল গর্ব্ব দমিতে।

এখানে শুদ্ধ পাঠ হইবে "সব" অপরাধ ক্ষমিতে, তাহাতে যতিঃপতন দোষ দূর হয়। এই সংশোধন কেন করা হয় নাই?

দুঃখমুক্তির ডাক

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দুর্দশাতে পারবে না কেউ করতে মোদের খর্ব মন
চিত্তে মোদের বিদ্যুৎ আছে দীপ্তিমান,
চিত্তেরি সেই বিদ্যুতে ভাই বন্ধ দুয়ার ঝনাৎঝন
খুলব আবার করব জাতির পরিত্রাণ।
ঈশ্বরেরি পুত্র হয়ে মোদের যে আজ দুঃখ ঘোর
শির পেতে নিই রুদ্র ইহাই আশীর্বাদ,
দুঃখেরি এই অগ্নি মাখি' করব মোরা রাত্রিভোর
সূর্যোদয়ের আনব আবার সুসংবাদ।
অগ্নিতে আজ দগ্ধ হয়ে জপব ইহাই মন্ত্র ভাই
বিশ্বে নবীন জন্ম নেব দুঃখহীন,
নিয়ে থেকে আবার সবার উর্দ্ধে উঠার প্রতীক্ষায়
উন্মাদনার ছন্দে বাজাই দীপ্ত বীণ।
অগ্নিবীণার ছন্দে ইহাই গাইব রে ভাই অগ্নিগান
দুঃখজয়ের আমরা সবাই দুঃখীবীর।
মিথ্যা ভাঙার সত্য দিয়ে আনতে হবে পরিত্রাণ
বিঘ্ন বাধায় টলবে না এই উচ্চ শির।
বজ্র সমান রুদ্র হবে মন্ত্র মোদের সত্যবাক্
করতে হবে মিথ্যারি সব বিস্মরণ,
সর্বপাপের ধ্বংসে দেব সমাজটাকে ঘূর্ণিপাক্
ভাঙতে হবে সর্বভীতির দুঃস্বপন।

লক্ষ বুকে সত্য যেদিন উঠবে জেগে মূর্ত্তিমান
তখ্‌খনি যে ঘুচবে সকল দুঃখ ভাই,
ঈশ্বরেরি দীপ্ত তেজে সবাই হলে মূর্ত্তিমান
থাকবে না আর মর্ত্ত্যে কোনই যন্ত্রণাই।
মৃত্যুপতি যমরাজা ভাই হবেন সেদিন হাস্যমুখ
অমৃতেরি খুলবে আবার মহাদ্বার,
বক্ষে বেঁধে সত্যধনে দুঃখকে আয় দিই চুমুক
একটি দিনও চলবে না আর প্রতীক্ষার।
সত্য লাগি দুঃখবরণ ককখ্‌নো তা দুঃখ নয়
বক্ষেরি সে লক্ষ সুখের লালকমল,
অগ্নিসম জলবি তোরা দুঃখজয়ী বীরতনয়
মৃত্যুজয়ের গান গেয়ে সব চল্‌বি চল্।
সর্বলোকের অমঙ্গল আজ মোদের হউক স্বর্গপুর
সঙ্গী মোদের অন্ধকারের সন্ধ্যাঘোর,
সর্পভূষা বাঘছালেরি সঙ্গী মোদের শিবঠাকুর
আসন্ন ঐ দুঃখেরি ভাই রাত্রিভোর।
কালবোশেখী গর্জে উঠুক মত্ত হাওয়ার নৃত্যতাল
বাজনা বাজাক্ ঝঞ্ঝায় উড়ুক জয়নিশান,
সর্বজয়ের যোদ্ধারা সব বজ্রে ফাটা মেঘদুলাল
সর্বজনের আনবি রে চল্ পরিত্রাণ।

প্রাচীন ভারতে মাহিষ্মতী

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

মাহিষ্মতী বা মাহিষ্মতীপুর ভারতের একটি প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান ইন্দোর রাজ্যের প্রান্তদেশে নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরে অবাস্থত মান্ধাতা অথবা মহেশ কিংবা মহেশ্বর নগর এবং প্রাচীন মাহিষ্মতী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কাহারও কাহারও মতে মাহিষ্মতী ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে প্রায় চাল্লশ মাইল দূরে অবস্থিত। মহারাজ সুবন্ধুর বারওয়ানী তাম্র-ফলকে মাহিষ্মতীর উল্লেখ আছে। মহেশ্বরপুর ও চেদিগণের রাজধানী মাহিষ্মতীপুর একই নগর বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে মাহিষ্মতী ও অবন্তী দুইটি পৃথক স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে১। পরবর্ত্তীকালে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন মাহিষ্মতী অবন্তীর অন্তর্গত ছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বৈদর্ভ ও কাঞ্চীপুরের সহিত মাহিষ্মতীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্জিটার সাহেবের মতে ওঙ্কার মান্ধাতা হইতে অভিন্ন মাহিষ্মতী মধ্যপ্রদেশের নিমাদ জেলার সংলগ্ন একটি দ্বীপে অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, মাহিষ্মতী এবং মহীশূর অভিন্ন। তবে সাধারণের মত এই যে, ইন্দোর রাজ্যের নিমাদ জেলায় নর্মদার উত্তর তীরে অবস্থিত মহেশ্বর নগর মাহিষ্মতী নামে পরিচিত। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, মাহিষ্মতীতে সূর্য্যোদয় আর উজ্জয়িনীতে সূর্য্যাস্ত হইত। ইহা হইতে মনে হয় যে, এই দুই স্থানের দূরত্ব অনেকখানি।

মান্ধাতা বিন্ধ্যের দক্ষিণে নহে, ইহা বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যে অবস্থিত। মান্ধাতা একটি দেশের রাজধানী ছিল। ঐ দেশটি বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তরে স্থিত মধ্যভারতের একাংশ।

মাহিষ্মতী প্রাচীন তিব্বতীয়গণের নিকট ম-হে-ল্দন নামে পরিচিত ছিল। পরে ইহা গোনর্দ নামে খ্যাত হয়। ইহা উজ্জয়িনীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা অবন্তীর দক্ষিণ দিকস্থ নগর এবং এই স্থান হইতেই আর্য্যগণ বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। মাহিষ্মতী বাবরির আশ্রম হইতে শ্রাবস্তীর পথে অবস্থিত।

সাঁচীর অনুশাসনগুলিতে মাহিষ্মতীর উল্লেখ আছে। মাহিষ্মতী হইতে বহু দর্শক সাঁচীর স্তূপ দেখিতে আসিত। পরমারদিগের রাজা দেবপালের মান্ধাতা অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাহিষ্মতী নগরে অবস্থিতিকালে রাজা নর্মদা নদীতে স্নান করিয়া এই দানপত্রের ব্যবস্থা করেন। পার্জিটার সাহেব বলিয়াছেন, নর্মদা-মাহাত্ম্যে মাহিষ্মতীর উল্লেখ নাই কারণ তখন মাহিষ্মতী ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রধান দ্বারপালিকা ইন্দুমতীর পাণিপ্রার্থী বিভিন্ন নরপতির পরিচয় দিয়া কার্তবীর্যের বংশধর অনূপদেশের রাজা প্রতীপের নিকট আসিয়াছিল। দ্বারপালিকা ইন্দুমতীকে বলিয়াছিল যে, বিশালবাহু রাজা প্রতীপের প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়া মাহিষ্মতীর প্রাকারবেষ্টনী রেবা দৃষ্টিগোচর হয়।

কালিদাসের রঘুবংশে (৬ষ্ঠ সর্গ, ৪৩ শ্লোক)২ বর্ণিত হইয়াছে যে, নর্মদা বা রেবা নদীর তীরে বহু প্রাসাদশোভিত মাহিষ্মতী একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

হরিবংশের৩ মতে নর্মদা নদী মাহিষ্মতীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। মাহিষ্মতী বিন্ধ্য ও ঋক্ষ পর্বতের মধ্যে নর্মদা তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয় এবং বর্তমান মান্ধাতা প্রদেশ হইতে ইহা অভিন্ন। রামায়ণে (কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে) বর্ণিত আছে যে, এই মান্ধাতা প্রদেশে মহিষিকা নদী প্রবাহিত হইত। পশ্চিম বিন্ধ্য পর্বত বা পারিপাত্র পর্বতের দক্ষিণে মান্ধাতা অবস্থিত ছিল। কিন্তু মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে মাহিষ্মতী বিন্ধ্য ও ঋক্ষ পর্বতের মধ্যে অর্থাৎ বিন্ধ্যের উত্তরে এবং ঋক্ষের দক্ষিণে বিদ্যমান

১। ততস্তেনৈব সহিতো নর্ম্মদামভিতো যযৌ।
বিন্দ্যানুবিন্দ্যা বাবন্ত্যৌ সৈন্যেন মহতাবৃতৌ।
জিগায় সমরে বীরাবাশ্বিনেয়ঃ প্রতাপবান্।
ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীম্ মাহিষ্মতীম্ যযৌ।
তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধম্ নরর্ষভঃ।
(মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২. ৩১. ১০ ; ২. ৩১. ২১.)

২। অস্যাঙ্কলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহো মাহিষ্মতীবপ্রনিতম্বকাঞ্চীম্।
প্রাসাদজালৈর্জ্জলবেণিরম্যাম্ রেবাম্ যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ।
(রঘুবংশ, ৬. ৪৩)

৩। মহাশ্মসঙ্ঘাতবতী—রক্ষবস্তুমুপাশ্রিতা।
মাহিষ্মতী নাম পুরী প্রকাশমুপযাস্যতি।
(হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৩৮. ১৯)

ছিল। ঋক্ষ পর্বতের নাম মধ্য-নর্মদা অঞ্চলের সহিত জড়িত ছিল এবং এখানে মাহিষ্মতী সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। হরিবংশের মতে ঋক্ষ পর্বত মাহিষ্মতীর অধিবাসিগণের আয়ত্তে ছিল।

কাহারও কাহারও মতে মাহিষ্মতী মাহিষক দেশের রাজধানী। মহাভারতে (অশ্বমেধপর্ব) বর্ণিত মাহিষ্মকগণ মাহিষক নামে পরিচিত ছিল। হরিবংশ হইতে জানা যায় যে, মহিষ মাহিষ্মতীর একটি দেশবিশেষ। ফ্লিট সাহেবের মতে সিংহলের পালিবংশ সাহিত্যে উক্ত মহিষমণ্ডল মহিষ ও মাহিষ্মতী অভিন্ন। মহাভারত এবং মৎস্যপুরাণে বর্ণিত মাহিষিক এবং নর্মদা তীরস্থ মাহিষ্মতী একই নগর ছিল। পার্জিটার ও ফ্লীট উভয়েই বলেন যে, মান্ধাতা নামে নর্মদার একটি দ্বীপে মাহিষ্মতী অবস্থিত। তাঁহারা আরও বলেন যে, মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলার খাণ্ডব তহশীলের মধ্যবর্তী ইহা একটি দ্বীপস্থ গ্রাম।

প্রাচীনকালে নর্মদা উপত্যকায় মাহিষ্মতী একটি বিশাল রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং কুরুক্ষেত্রে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাল পর্যন্ত ইহা এইরূপ ছিল।

মাহিষ্মতী অবন্তী—দক্ষিণাপথ নামে অবন্তী রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসার মতে দক্ষিণাপথ মাহিষ্মতীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। অর্জুন কার্তবীর্যের রাজ্য হৈহয় বা অনূপ-দেশের রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী। পরশুরাম অর্জুন কার্তবীর্যকে নিধন করেন। কলচুরীগণের সময়ে ইহা চেদীগণের রাজধানী ছিল।

মাহিষ্মতীর প্রতিষ্ঠাতা মান্ধাতৃর পুত্র মুচুকুন্দ ইহাকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন। কথিত আছে, হৈহয় বংশের চতুর্থ বংশধর মহিষ্মত এই নগরের নির্মাতা। হরিবংশের মতে সাহনজের পুত্র মহিষ্মত এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায় যে, মহিষ এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। যদুবংশের রাজন্যবর্গের দ্বারা মাহিষ্মতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরাণ হইতে জানা যায়, মহিষ্মান এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রঘুবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, অনূপদেশের রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী। ইহা সুরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত। মনে হয় অনূপগণ নর্মদা তীরস্থ মাহিষ্মতীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সুরাষ্ট্রের দক্ষিণে বাস করিত। এই সম্বন্ধে শিলালিপি হইতে নিদর্শন পাওয়া যায়। হরিবংশ হইতে জানা যায় যে, মাহিষ্মতী রাজ্যে পুরিকা নামে একটি নগর ছিল। খুব সম্ভবতঃ পুরিকা পৌরিকগণের অধীনে ছিল।

উত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বণিকগণ নৌকা ও গোযানে বাণিজ্যে যাওয়ার কালে মাহিষ্মতীতে বিশ্রাম করিত। পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) হইতে শ্রাবস্তী যাওয়ার পথে মাহিষ্মতী-পুর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল বলিয়া বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত আছে। উজ্জয়িনী ও মাহিষ্মতী দক্ষিণের উচ্চ রাজপথের উপর অবস্থিত ছিল। এই পথ রাজগৃহ হইতে বৈশালী, কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী এবং কৌশাম্বী হইয়া প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাহিষ্মতীর মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠান, উজ্জয়িনী, বিদিশা প্রভৃতি রাজ্যের মধ্যে গমনাগমনের পথ ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর এক অনুশাসনে দেখা যায় যে, কুন্তল দেশের রাজধানী মাহিষ্মতী নগরে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্পাসজাত বস্ত্র উৎপন্ন হইত। উত্তর মহীশূর এবং পশ্চিম দক্ষিণাপথ কুন্তল দেশের অন্তর্গত। ফ্লীট সাহেবের মতে মাহিষ্মতী বোম্বাই বিভাগের দক্ষিণাংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যশ মাহিষ্মতী পরিদর্শন করেন এবং মাননীয় সম্ভূত এখানে বাস করিতেন। রাণী বসুন্ধরা রাজপুত্র কন্যাসহ মাহিষ্মতী নগরে গমন করিয়া মিত্রবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মোগ্‌গলীপুত্ত তিস্‌স একদল বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারককে মহিষমণ্ডলে প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ মহিষমণ্ডল মহিষকদের দেশ, মহিষমণ্ড নামে পরিচিত ছিল। নর্মদাতীরস্থ মাহিষ্মতী মহিষকদিগের রাজধানী রূপে বিদিত ছিল।

বুদ্ধের সমসাময়িক ও কোশলরাজ প্রসেনজিতের শিক্ষক বাবরির আদেশ শুনিয়া তাঁহার শিষ্যগণ সর্বলোকে (সমস্ত জগতে) খ্যাতিলাভ করে। ইহারা ধ্যানরত ও ধীর ছিল এবং গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিত। তাহারা প্রতিষ্ঠানের পর মাহিষ্মতী পরিদর্শন করে। ভাণ্ডারকর বলেন যে, বাবরির শিষ্যগণ মাহিষ্মতীর মধ্য দিয়া গমন করে অর্থাৎ বিদর্ভদেশের মধ্য দিয়া বিন্ধ্য পর্বতের অপর দিকে গিয়াছিল।

মণ্ডনমিশ্র যিনি পরে বিশ্বরূপ নামে খ্যাত হন, তিনি মাহিষ্মতী নগরে বাস করিতেন। মাধবাচার্যের শঙ্কর দিগ্‌-বিজয়ের মতে এইখানে তিনি শঙ্করাচার্যের নিকট তর্কে পরাজিত হন।

যখন পরাক্রমশালী বিদেহরাজ রেণুর রাজ্য তাঁহার ব্রাহ্মণ পুরোহিত মহাগোবিন্দ দ্বারা সাতটি সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন অবন্তী রাজ্য বৈশ্বভুর অংশগত হয়। ভরত বংশের সাত জন সমসাময়িক রাজার মধ্যে বৈশ্বভু (পালি বেস্‌সভু) ছিল এক জন। মাহিষ্মতী অবন্তীদিগের নগর ছিল। মহাবীর এবং বুদ্ধের সময়ে অবন্তীর রাজা প্রদ্যোতের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন, অবন্তী দেশ দুইটি রাজ্যে বিভক্ত হয়। একটি দক্ষিণাপথের অন্তর্গত যাহার রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী, অপরটি উত্তর

রাজ্যের অন্তর্গত যাহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। ভাণ্ডারকরের এই মত এখনও পর্যন্ত খণ্ডিত হয় নাই।

মাহিষ্মতীর প্রথম রাজবংশ ছিল হৈহয়। মহাভারতে মাহিষ্মতী নগরস্থিত হৈহয় রাজ্যের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হৈহয়গণ নর্মদা অঞ্চলের নাগদিগকে পরাজিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। হৈহয় এবং তাহাদের বংশধরগণ যথা, অবন্তী, ভোজ প্রভৃতি মূলতঃ সাত্বত বংশসম্ভূত ছিল।

পাণ্ডব যুবরাজ সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য দক্ষিণদেশগুলি জয় করিতে গিয়া মাহিষ্মতীতে গমন করেন এবং সেখানে নীলকে পরাজিত করেন।

অর্জুন কার্তবীর্য হৈহয় রাজবংশের গৌরবান্বিত নরপতি ছিলেন। নল ও অর্জুন কার্তবীর্য অনূপদেশের রাজা বলিয়া খ্যাত। নর্মদার মোহনা হইতে হিমালয় পর্যন্ত দেশগুলি তিনি জয় করেন। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে অনূপনিবৃৎ মাহিষ্মতী অঞ্চল ও অন্যান্য দেশের উপর তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তারিত ছিল। মৎস্যপুরাণের মতে হৈহয়দিগের পাঁচটি শাখা ছিল। যথা—বিতিহোত্র, ভোজ, অবন্তী, কুণ্ডিকের বা তুণ্ডিকের এবং তালজঙ্ঘ। পার্জিটার সাহেব বলেন যে, বিতিহোত্র, শর্য্যাত, ভোজ, অবন্তী এবং তুণ্ডিকের সকলেই তালজঙ্ঘ নামে পরিচিত এবং পাঁচটি হৈহয় বংশসম্ভূত।

হৈহয়গণ প্রাচীন ভারতের একটি ক্ষত্রিয় রাজবংশসম্ভূত। কাশীরাজ প্রতর্দন ইহাদের শক্তি চূর্ণ করেন। হৈহয় যাদব নামে পরিচিত। হৈহয় এবং যাদব বলিতে সমগ্র জাতিসঙ্ঘকে বুঝায়। বিতিহোত্রগণ হৈহয়দিগের একটি শাখা। বিতিহোত্র ও অশ্মকগণ পশ্চিম মালবের অবন্তীগণের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। হৈহয়, অশ্মক এবং বিতিহোত্রগণ যদুর সন্তানগণের বংশসম্ভূত ছিল। যদুর বংশধরগণ উত্তরে চম্বল নদী এবং দক্ষিণে নর্মদার তীরবর্তী দেশগুলি অধিকার করিয়াছিল। বায়ু, মৎস্য এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দ হৈহয় এবং অপরাপর ক্ষত্রিয় বংশের নিধন করেন।

মাহিষ্মতী নগরীতে কার্তবীর্যের রাজ্যে বহু ভার্গব ছিল। কার্তবীর্যের মৃত্যুর পর তাহার ধনসম্পদ লইয়া ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পার্জিটার সাহেব বলেন যে মাহিষ্মতীর রাজা যখন শক্তিশালী ছিল, তখন নিম্ন নর্মদার উপত্যকা এবং অনূপদেশ তাহাদের হস্তগত হয়। কথিত আছে, হৈহয় বংশের রাজা ভদ্রশ্রেণ্যের চতুর্থ উত্তরাধিকারী মাহিষ্মতীর রাজা অর্জুন কার্তবীর্য সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করেন[১]। রাজা সগর হৈহয় রাজ্য ধ্বংস করেন এবং তাহার রাজধানী মাহিষ্মতী নগরকে বিধ্বস্ত করেন। যখন অর্জুন কার্তবীর্য রাবণকে ধৃত করিয়া মাহিষ্মতীতে কারারুদ্ধ করেন, তখন পুলস্ত্যের অনুরোধে অর্জুন রাবণকে মুক্তি দেন। দশাশ্ব মাহিষ্মতীতে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার বংশধরদিগের উল্লেখ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে পাওয়া যায়। কার্তবীর্যের পুত্র কর্কোটক নাগদিগের নিকট হইতে মাহিষ্মতী জয় করিয়া লন এবং এইখানে তাঁহার দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপিত হয়। মাহিষ্মতীর রাজা ও মধ্যদেশের অবন্তীগণ কুরুদিগের মিত্র ছিলেন। বিন্ধ্যপর্বত এবং সাগরের মধ্যস্থিত দেশের রাজা প্রথম চোড় মাহিষ্মতীর অধিপতি এই উপাধি লাভ করেন, কারণ তিনি অর্জুন কার্তবীর্যের বংশসম্ভূত ছিলেন।*

১। কদাচিত্ত তথৈবাস্য বিনিষ্ক্রান্তাঃ সুতাঃ প্রভো।
অথানূপপতি বীরঃ কার্তবীর্য্যোভ্যবর্ত্তত ॥
(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৬, ১৯)

* এই প্রবন্ধ প্রণয়ন কালে যে সকল পুস্তক হইতে আমরা সাহায্য পাইয়াছি তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব ১৯. ২৩-২৪, ১৬৬. ৪ ; অনুশাসন পর্ব্ব ২. ৬. ১১ ; সভা পর্ব্ব ২. ৩১. ১০-১১ ; ২. ৩০. ১১২৪-৬৩ ; (বঙ্গবাসী সংস্করণ) আদিপর্ব্ব ১৭৮. ১১-১৮ ; বনপর্ব্ব ১১৬. ১৯ ; ৩, ১১৬, ১১০৮৯ ; ৩, ১১৭. ১০২০৯ ; ভীষ্মপর্ব্ব, অধ্যায় ৯.

রঘুবংশ ৬. ৩৮-৪০ ; ৪৩ ; দশকুমার চরিত, পৃঃ ১৯৪ ; হরিবংশ ২. ৩৮. ৭-১৯ ; ৯৫, ৫২১৮ ; ৩৩. ১৮৭৬-৭৮.

ব্রহ্মপুরাণ, ১৩. ১৭৬-৭৮ ; বায়ুপুরাণ, ৯৪. ২৬, ৯৫. ৩৫ ; ৯৮. ২৮.

পদ্মপুরাণ, আদিকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৫. ১২, ১৩০-৩২ ; মৎস্যপুরাণ, ৪৩. ১০-৩১ ; ৯৪. ৫-২৬ ; বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ১১, ৯. ১৯ ; (উইলসন কৃত অনুবাদ) ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৫৪ ; (Pargiter) মার্কণ্ডেয়পুরাণ (অনুবাদ) পৃঃ, ৩৭১ (পাদটীকা), ৩১০, ৩৪৪ (পাদটীকা) ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩. ৬৯. ৩৫-৩৭ ; ভাগবতপুরাণ ৯. ১৫. ২২ ; ১০. ৭৯ ; ৯. ১৫ ; ৯. ১৫. ২২ ; দীঘনিকায়, পৃঃ ২৩৫-৩৬ ; মহাবংশ, ১২. ৩ ; মহাবোধিবংস, ১১৪ ; থূপবংস, ৭২-৭৩ ; দীপবংস, ৮ ; সুত্তনিপাত, ১০০৬-১৩ ; সুত্তনিপাত টীকা, ২. পৃঃ ৫৮৩ ; Pargiter—"Ancient Indian Historical Tradition," পৃঃ ১০২, ১৫৬, ২৫৭, পাদটীকা নং ৬ ; Pargiter মার্কণ্ডেয় পুরাণ (অনুবাদ) পৃঃ ৩৩৩ ; "Imperial Gazetteers of India," XVII পৃঃ ৯, X, পৃঃ ৩২৯ ; Cunningham, "Ancient Geography," ১৯২৪. পৃঃ ৭২৫-৭২৬ ; "Epigraphia India", XIX, পৃঃ ১৫৫,২৬২ ; ২.১০৯, নং ৩ ; ৩৮৯,

নং ৩১৩, ৩১৪, ৩১৭ ; ৯. ১০৮; P. V. Kane "History of Dharmasastra", Vol, IV (1953), পৃঃ ৭৭৭ ; "JRAS", ১৯০৮, পৃঃ ৩১৩ ; ১৯১০, পৃঃ ৪২৯, ৪৪৪-৪৪৬,৪৪৭, ৮৬৭-৬৮ ; D. R. Bhandarkar, "Carmichael Lectures" ১৯১৮, পৃঃ ৪-৫ ; ৪৫, ৫৪ ; R. G. Bhandarkar, "Early History of the Dekkan," Sec. iii ; Raychaudhuri, "Political History of Ancient India", ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১২২-২৩,১৮৮ ; "Studies in Indian Antiquities",১৯৩২ পৃঃ ১২৮ ; Rhys Davids, "Buddhist India." পৃঃ ১০৩ ; Rockhill, "Life of the Buddha," পৃঃ ১৭৬ ; "Cambridge History of India," 1. পৃঃ ২৭৪, ৩১৬, ৫৩১, ৬৭৩ ।

সাধু সন্ত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাধুদি'কে কাজে লাগাইতে হবে—সাধু কি অসাধু এ মতিগতি ?
দেশ জাতি নয়—এতে হতে পারে, জগৎ এবং জীবের ক্ষতি ।
কয়লা-খনিতে জন্মেছে বলে, হীরাকে পুড়িতে পোড়াতে হবে,
সপ্ত রঙের রঙ্গমঞ্চে গেরুয়া কেন বা সরিয়া রবে ?
চন্দনে হবে ইন্ধন হতে—কর্ম্মক্ষেত্রে স্বনলবলে,—
পদ্মকে হতে হবে ফুলকপি—রাঙাপদে থাকা আর কি চলে ?
অক্ষয় বট, বোধিদ্রুমের, তরু-দেবতার মূল্য নাহি,
ভাবরাজ্যে কি ছায়ালোকে নয়, কাঠ কুটরায় মিশানো চাহি ।
হোমের 'হব'র নাহি প্রয়োজন—হবেনাক' হোম ভবিষ্যতে
ঘৃত এইবার মলম হইয়া প্রলেপ লাগাক দেহের ক্ষতে ।

২

যারা নিষ্কাম, অফলাকাঙ্ক্ষী, যাহারা চাহেনা মোক্ষফলও,
শুধু শ্রীহরির প্রীতিকামীগণে বাজে কোন কাজে লাগাবে বল ?
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগীরে কাজ দিতে করে শাস্ত্রে মানা—
এ হবে ময়ূরপঙ্খী চালাতে, গরুড় পক্ষী টানিয়া আনা ।
দধীচি গড়িবে ইস্পাত নাকি ? কপিল তৈয়ারি করিবে বোমা ?
ভরতকে দিয়ে ভার বহাইলে—করিবেন নাক' হরি যে ক্ষমা ?
ওরা অগস্ত্য, ভৃগু, শৃঙ্গী, দুর্ব্বাসা যার অশেষ খ্যাতি,
ওরা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র ভৃগুর জ্ঞাতি ।
ও সব বামন ভিখারী হউক—সহসা চাহে যে ত্রিপাদ ভূমি,
গর্ব্ব খর্ব্ব করাই কর্ম্ম—ও'দি'কে তুচ্ছ করোনা তুমি ।

৩

উহারা অকেজো ? কেজো তবে কারা ? জাতিকে ঊর্দ্ধে তুলে কে রাখে ?
জীবের জন্য অমৃতভাণ্ড সঞ্চিত করি, কে সবে ডাকে ?
কাজ যাহা, তাহা তারাই তো করে—যোগ রাখে ভগবানের সাথে,
তাহারাই শুধু এক করে দেখে জগৎ এবং জগন্নাথে ।
করা জপ, তপ, হোম, আরাধনা—পরমানন্দময়ীরে ডাকা,
এসব কর্ম্ম—কর্ম্ম কি নয় ? যা বিনা জীবন জগৎ ফাঁকা ।
দিবসে রাত্রে হরিনাম করে—নামের লাগিয়া করে না কিছু,
তাদের প্রভাব বুঝিয়া বুঝিনে—হয়ে আছি সবে এতই নীচু !
অকর্ম্মণ্য ধন্য তাহারা—পুণ্যের পরিবেশন করে,
চুম্বক গিরি—লৌহকণিকা পতিতে উঠারে বক্ষে ধরে ।

৪

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা চেয়ে, তারা আলো দেয় অতন্দ্রিত,
করে অলক্ষ্যে পতনোত্থান জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত,
চিদাকাশে তারা রচে ছায়াপথ, যত অমৃত যাত্রী লাগি—
ভুবন যখন ঘুমাইয়া থাকে, তারাই তখন রহে যে জাগি ।
ভাব গড়িয়াছে, ভাব গড়িতেছে বিপুল প্রেরণা শক্তি ভরা,
অনাগত এক দিব্য ভুবন, কর্ম্ম তাদের তাহাই গড়া ।
মানুষের মাঝে অক্ষয় যাহা, সৃষ্টি করিছে তারা যে সবি—
ধর্ম্মরাজ্যে কর্ম্মী তাহারা, শিল্পী ভাবুক ভক্ত কবি ।
তারা জীবন্ত তীর্থক্ষেত্র, প্রেমে বিরাজিছে সর্ব্বঘটে,
যন্ত্রস্রষ্টা না হোক তাহারা মন্ত্রদ্রষ্টা স্রষ্টা বটে ।

৫

অপার্থিবের তারা কারবারী অকথিত বাণী তারাই কহে,
পঞ্চতপার আদেশ পালিতে পঞ্চ ভূতেরা দাঁড়ায়ে রহে ।
কি করিতে পারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্ববিজয়ী শিল্পপতি ?
একটা অমন অকেজো মানুষ ফিরাইয়া দেয় যুগের গতি ।
এটম বোমার চেয়ে বহুগুণে পদরেণু তার শক্তিশালী—
সে কোটি প্রাণীকে প্রেতত্ব নয়—দেবত্ব দিতে পারে যে খালি
সাধুরাই শুধু এ ভুবন নয় পারে ত্রিভুবনে তৃপ্তি দিতে,
ভূমি জল বায়ু অন্তরীক্ষ পুণ্য করিছে অলক্ষিতে ।
তাদের ভজন, তাদের সাধন সব আচরণ সৃষ্টিছাড়া,
সব শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে—ডঙ্কামারা ও শঙ্কাহারা ।

৬

সাধুর মধ্যে অসাধুও আছে—আগাছাও আছে শালের কাছে,
কুসুমের সাথে কাঁটা রহে যায়—ভস্ম বৈশ্বানরের আঁচে ।
মন না রঙায়ে, বসন রাঙায়ে, অনুরাগে যারা ভবন ছাড়ে,
তাহারাও দেখি হরি-করুণার আলোকের ভাগ পেতে যে পারে ।
ওরা কস্তুরী মৃগের বংশ বুঝিতে পারিনে কেন যে আসে,
সুবাসিত করে দেবমন্দির, প্রসাদী সে মৃগনাভির বাসে ।
সাধুর সঙ্ঘে সকলেই দাদূ, কবীর, কি উপগুপ্ত নহে—
কিন্তু জান কি ? কত বামাক্ষেপা তাঁদের মধ্যে লুকায়ে রহে ?
যাঁহার কাষ্ঠপাদুকা বহাও রাজপদ চেয়ে শ্লাঘ্যতর—
কি বিরাটত্ব লুকাইয়া থাকে—বোঝ না, বোঝার চেষ্টা কর ।



১২

কমলেশের শাস্তিটা কিন্তু চাপাই পড়ে রইল কয়েক দিন। ব্রজবাবুই তার ভার নিয়েছেন। ইতিমধ্যে এসে পড়ল পূর্ণিমা। পূর্ণিমায় চন্দ্রবাবুর বাসায় সত্যনারায়ণ সেবা হ'ল।

সমারোহ করেই সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন চন্দ্রবাবু। নতুন বাসায় প্রথম একটি সামাজিক আয়োজন। একটু ভাল করে না করলে হবে কেন? তাঁর চেয়েও উৎসাহ বেশী সত্যবতীর। তাঁর জীবনে বাসায় বাস করার কল্পনা তিনি করেন নি কোনদিন। ছোট্ট পল্লীগ্রামটির মধ্যে একঘেয়ে জীবন চলে যাচ্ছিল একটি শীর্ণকায়া নদীর মত, তাতে তাঁর আক্ষেপও অবশ্য ছিল না। বাসা যখন হ'ল তখন প্রথমটায় শঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাসায় এসে উৎসাহিত হয়েছেন প্রথম দিন থেকেই। এখানকার তিনি যেন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সে কর্তৃত্ব করবার পথ তিনি আবিষ্কার করলেন রামজয় পণ্ডিতের দেওয়া পরামর্শের মধ্যে। সব মাষ্টারেরা আসবেন, মাষ্টারদের মধ্যে যাঁরা এখানকার লোক তাঁদের স্ত্রীরা আসবেন, ছেলেরা সব আসবে, তাঁর আঙিনায় আনন্দ করবে, প্রসাদ নেবে, তাঁকে মা বলে ডেকে যাবে; প্রণাম সবাই করতে আসবে কিন্তু ব্রাহ্মণ বৈদ্য ছেলেদের প্রণাম তিনি নেবেন না, বাকী কায়স্থ থেকে সুরু করে আর সকলেরই প্রণাম তিনি নেবেন, আশীর্ব্বাদ করবেন। সেই উৎসাহে চন্দ্রবাবুর আয়োজনের ফর্দ্দ তিনি বাড়িয়ে দিলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও বেড়ে বেড়ে শেষ পর্য্যন্ত দেড় শ' ছাড়িয়ে গেল। আমের সময় চলে গেছে, কাঁঠালটা তখনও আছে; চন্দ্রবাবুর গ্রাম অঞ্চলে কাঁঠাল বেশ ভালই হয়, ভাল খাজা কাঁঠাল আনালেন, তার সঙ্গে দুধ কলা, মিষ্টি এবং ময়দা গুলে উপাদেয় আটার প্রসাদ তৈরি হ'ল। তার সঙ্গে লুচি, সুজির পায়েস, তালের বড়া এবং এর উপর একটা করে খাস বালুসাই আর ছানাবড়া।

বোর্ডিঙে ছেলের সংখ্যা আশীর উপর, মাষ্টারমশায়েরা এগার জন, এ ছাড়া বিশ্বগ্রামের যে সব ছেলে ইস্কুলে পড়ে, বোর্ডিঙে থাকে না, তারাও তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন; গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোককেও বলা হয়েছিল।

রামজয় স্ত্রী এবং কন্যাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছেন। রামজয়ের স্ত্রী এবং কন্যা সত্যবতীর পরিচিত। পাশাপাশি গ্রামের লোক, এবং চন্দ্রভূষণ ও রামজয় বাল্যবন্ধু। তবে রামজয় অনেককাল আগে থেকেই বিশ্বগ্রামে বাসা করে রয়েছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, বোর্ডিঙের এই জগন্নাথ-ক্ষেত্রে আহার তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়, নিজেই বা হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাবেন কত? রামজয় বরাবরই বলেন—'যিনি খান চিনি তার চিনি যোগান চিন্তামণি'। ওই চিন্তামণিই তাঁর ব্যবস্থা করেছিলেন, চৈতন্যবাবু তাঁকে বাসা দিয়েছিলেন গ্রামের মধ্যে। তাঁর বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্মে নিত্যই যে রামজয়কে তাঁর গৃহিণীর প্রয়োজন। রামজয়ের স্ত্রী বিশ্বগ্রামের ভদ্রসমাজে খুবই পরিচিত, বলতে গেলে ওঁদেরই একজন হয়ে গেছেন; মেয়ে বীণা বিশ্বগ্রামের পাড়াবেড়ানো মেয়েদের সর্দ্দারনী। আট দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত লোকে বলত পণ্ডিতমশায়ের মেয়েটা দজ্জালের একশেষ। কেউ

কেউ বলত—গেছো মেয়ে। বীণা সত্যিই গাছে চড়ে পেয়ারা আম জাম খেয়ে বেড়াত সে সময়। এখন অবশ্য বীণা বড় হয়েছে। শুধু বড়ই নয়, এঁরই মধ্যে ওর জীবনের চার অঙ্ক শেষ হয়ে এক অতি সুদীর্ঘ শেষ অঙ্কটির যবনিকা সদ্য উত্তোলিত হয়েছে। রামজয় বীণার বিয়ে দিয়েছিলেন বার বছর বয়সে। পনের বছরে একটি সন্তান গর্ভে নিয়ে বীণা বিধবা হয়ে রামজয়ের বাড়ী ফিরে এসেছে। বীণার বয়স এখন মাত্র সতের।

সত্যনারায়ণ পূজার আসরে বীণাই সত্যবতীর প্রতিনিধির কাজ করলে। সত্যবতীর উৎসাহ অনেক—এই ছেলেদের এবং মাষ্টারদের সামনে বের হবেন, নিজে প্রসাদ বিতরণ করবেন,কথা বলবেন, কিন্তু কাজের বেলা এতকালের অভ্যাস-করা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনখানি খাটো করতে পারলেন না, চাপা গলার কণ্ঠস্বর এতটুকু উঁচুতে তুলে স্পষ্ট করতে পারলেন না। প্রথমটায় চেষ্টা করলেন ; রামজয় যখন শালগ্রাম শিলা নিয়ে এলেন তখন আসন পাতা, গঙ্গাজল ছিটানো থেকে উচ্চ কণ্ঠে বঙ্গবালা এবং কেষ্টকে কয়েকটা বরাতও করে-ছিলেন। রামজয়কে পিছনে রেখে তাঁর স্ত্রী হরিমতীকে এবং বীণাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বেশ সরস কৌতুকও করে-ছিলেন কয়েকটা। বলেছিলেন—

—ধন্যি বাবা। খুব যা হোক ! বামুনের মেয়ে বামুনের গিন্নী কিনা, বিনা নেমন্তন্নে আসতে পারলে না। ভাগ্যে সত্যিনারাণ সেবা করালাম—তাই ত এলে !

বীণা বাপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—বাবাকে বল খুড়ীমা। আমি সেই প্রথম দিনই আসতে চেয়েছিলাম। তা বাবা বলেছিল—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব কাল। নিত্যি কালের মরণ নাই, বাবার সে কাল আর হ'ল না। বেলগাঁয়ে আমার সঙ্গে আবার লোক লাগে ! মা বলে—লাগে। মেয়েরা নাকি অবলা অসহায় ; কেউ কোন কথা বললে মরে যাবি। হরিবোল, হরিবোল ! বীণা অবলা, বীণা অসহায়। আমাকে কথা বলবে লোকে ? খপ করে চুলের মুঠো ধরে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় লাগিয়ে দোব না ? কিন্তু কি করব, বাবার কথা ত অমান্যি করতে পারি না !

ঠিক এই সময়েই এসে ঢুকলেন চন্দ্রবাবুর সঙ্গে ব্রজবাবু, মাখনবাবু আর কেষ্টবাবু। ব্রজবাবুই ভারী গলায় বললেন—কি ? কতদূর কি হ'ল পণ্ডিতমশায় ? সওদাগরী নৌকো ভাসিয়ে দিন শীগগির করে। সফর সেরে সত্যনারায়ণ প্রভুর মহিমা প্রকট হতে হতে তালের বড়াগুলি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মাখনবাবু সায় দিলেন—হ্যাঁ ; গন্ধ যা ছুটেছে !

কেষ্টবাবু বললেন—তেলটি বড় ভাল। চমৎকার গন্ধটা ওই তেলের।

এরই মধ্যে সত্যবতীর সব সাহস, সব সঙ্কল্প ভেসে গেল। ওরা ঘরে ঢুকতেই ঘোমটাটা খানিকটা বাড়িয়েছিলেন—তার পর আবার খানিকটা আবার খানিকটা করে ঘোমটাটাকে পুরো এক হাত করে টেনে ফিস্ ফিস্ করে বীণাকে বললেন—বল পুজোর জন্যে তাড়া দিতে হবে না, যথাসময়ে হবে। সুস্থির হয়ে বসতে বল। ভোগের জন্যে বড়া তুলে রেখে—ওদের জন্যে ভেজে দিচ্ছে।

বলেই গিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং সমস্ত কাজ চুকে না-যাওয়া পর্য্যন্ত আর বাইরে বের হলেন না। গ্রামের বাসিন্দা কয়েক জন মহিলা এসেছিলেন—তাঁদের সঙ্গেই পূজার আটনের সামনে গলায় আঁচল জড়িয়ে হাত জোড় করে বসে রইলেন। যা করবার—সে সবই করলে বীণা আর বঙ্গবালা। তাদের সঙ্গে বোর্ডিঙের ঠাকুর আর জনকয়েক ছেলে।

সত্যনারায়ণ পূজা এবং পাঁচালীপাঠ প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় কেষ্ট একখানা চিঠি এনে চন্দ্রবাবুর হাতে দিলে। চিঠিখানা পড়ে চন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ; তার পর চিঠিখানা ব্রজবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—পড়ুন।

মৌলভী জিয়াউদ্দিনের চিঠি। জিয়াউদ্দিন সাহেব লিখেছেন—বোর্ডিঙের ছাত্রদের অর্থাৎ মুসলমান বোর্ডিঙের ছাত্রদের মধ্যে সন্ধ্যা থেকেই একটা ফিসফিসানি সুরু হয়েছে। তার দু'এক টুকরো তাঁর কানে এসেছে। হিন্দু হেডমাষ্টারের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা-সেবায় গিয়ে সিন্নী প্রসাদ খেলে তারা মৌলভীকে নিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকাবে বলে ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই তিনি না-আসাই স্থির করেছেন। এর জন্য চন্দ্রভাই যেন কিছু মনে না করে। তবে কাল টিফিনের সময় তিনি চন্দ্রভাইয়ের বাসায় নিশ্চয় আসবেন এবং তালের বড়া ও মিষ্টান্ন সহযোগে টিফিন করবেন।

সমস্ত চুকে গেলে চন্দ্রবাবু হেসে সত্যবতীকে বললেন—চমৎকার হ'ল। এমন সুন্দর হবে আমি আশা করি নি। তালের বড়া ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে।

সত্যবতী মুখ টিপে হেসে বললেন—হবে না ? কেষ্টকে পাঠিয়ে তেলিবাড়ী থেকে তিল পিড়িয়ে এনেছি।

—তিলের তেল ?

—হুঁ। তালের পাশে তিলের চারা
ভাদ্র মাসে চড়বে কড়া
তিলের তেলে তালে বড়া
মজবে খেয়ে ছুঁড়ি ছোঁড়া

এত তালের বড়া ভাজা হবে, ঘি অনেক লাগবে, মনে মনে ভাবছিলাম। হঠাৎ ঠাকুমায়ের বাসরঘরের ছড়াটা মনে পড়ে গেল। বাড়ী থেকে আসবার সময় আধ মণ তিল এনেছিলাম। বর্ষার সময়—কে জানে—তরকারিপাতির অভাব-টভাব পড়ে। তিলটা পড়েই ছিল। কেষ্টকে পাঠিয়ে দিলাম তিল দিয়ে, বললাম দাঁড়িয়ে থেকে ঘানি পিড়িয়ে আনতে। সেই তেল। কাস্টোঁ কেলাস হবে না?

চন্দ্রবাবু হাসতে লাগলেন মৃদু মৃদু।

সত্যবতী বললেন—একটু ভাল করেই হাস বাপু। কি রকম মানুষ তুমি, চব্বিশ ঘণ্টাই গম্ভীর।

কথাটা সত্যবতী মিথ্যে বলেন নি। অল্পবয়স থেকে হেডমাষ্টারি করে চন্দ্রবাবু সশব্দে হাসতেই যেন ভুলে গেছেন। দাড়িতে হাত দিলেন চন্দ্রবাবু। দাড়ি রেখেছেনও এই হেডমাষ্টারী করবার জন্ত। শীর্ণ দীর্ঘকায় মানুষটি তরুণ বয়সে যতবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখতেন ততবারই ভাবতেন—বড় হাল্‌কা দেখাচ্ছে। দাড়ির ওজন বাটখারায় ধরা পড়ে না কিন্তু আয়নায় ধরা পড়েছিল তাঁর কাছে। ভেবে চিন্তে দাড়ি রেখেছিলেন।

সস্নেহে সত্যবতীর পিঠে হাতখানি রেখে চন্দ্রবাবু সমাদর জানিয়ে বললেন—কথাটা মিথ্যে বল নি তুমি; সত্য সত্যই হাসতে যেন ভুলেই গিয়েছি।

বঙ্গবালা অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মেয়েটা আজ খুব খেটেছে। চন্দ্রবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি ভাবতাম বঙ্গু কাজকর্ম্মে খুব পোক্ত হবে না। যে তোমার আদর! কিন্তু বঙ্গু ত খুব কাজ করতে পারে! চরকির মত ঘুরল সারা সন্ধ্যেটা।

—খেটেছে পণ্ডিত বটঠাকুরের মেয়ে বীণা। খুব কাজের মেয়ে। কি বন্দোবস্ত! অনেক জিনিষ বেঁচেছে। তো করলে কি জান? বড় ডালায় ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে রেখে গেল, বলে গেল—কাল সকালে এসে জনকয়েক ছেলেকে দিয়ে বাড়ী বাড়ী পেসাদ পাঠিয়ে দোব। তা গিন্নীমায়ের বাড়ী পাঠাব কিনা বল ত? ঠিক হবে?

—গিন্নীমায়ের বাড়ী? দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভেবে নিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন—তা ক্ষতি কি? তবে বাসি লুচি মিষ্টি না পাঠিয়ে কিছু কাঁচা মিষ্টি কিছু গোটা ফল পাঠিয়ে দিও বরং।

—বঙ্গুকে সঙ্গে নিয়ে বীণা নিজেই নিয়ে যাবে বলেছে।

—সেই ভাল।

—বীণাকে নাকি গিন্নীমা খুব ভালবাসেন।

—তা বাসেন। হাসলেন চন্দ্রবাবু। হেসেই কথার জের টেনে বললেন—ছেলেবেলায় বীণা গিন্নীমায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করত। রামজয় এখানে যখন এল, অনেক বলে কয়ে আমিই আনলাম, টোলের চাকরি ইস্কুলের চাকরি—ওদের বাড়ীর পূজাপার্ব্বণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করবে, ওঁরা ওঁদের ঠাকুরবাড়ীর কাছাকাছি ওদের বাসা দিলেন, বাড়ীটার উঠানে একটা ভাল কলমের আমগাছ ছিল। গাছটি খোদ কর্ত্তার হাতের লাগানো। আমের সময় গিন্নীমা নিজে দেখতে যেতেন। নিজে দাঁড়িয়ে আম পাড়াতেন। বীণা তখন ছেলেমানুষ, পাঁচ সাত বছরের মেয়ে। সে একটা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়াত; যুক্তি হ'ল, আমরা এ বাড়ীতে আছি বাড়ী আমাদের, গাছ বাড়ীতে আছে আমরা জল দি,গাছ আমাদের আমও আমাদের। কিছুতেই দোব না। মাথা ফাটিয়ে দোব। গিন্নীমা যে গিন্নীমা তিনি থ' মেরে গিয়েছিলেন, রামজয় বাড়ী ছিল না, রামজয়ের স্ত্রী ভালমানুষ লোক, তার উপর গিন্নীমায়ের সামনেও ঘোমটা দিয়ে থাকত তখন, কথা কইত না, সে বেচারা ভয়ে লজ্জায় ঘেমে সারা। গিন্নীমা অবাক! ও বাবা, পণ্ডিতের এ মেয়ে যে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার! সওয়াল করে দেখ! শুধু ব্যারিষ্টার নয় তার উপরে গোরা পল্টন। লাঠি হাতে লড়াই করবে। তুই ত খুব পণ্ডিতের মেয়ে দেখি।

বীণা বলেছিল—ও তুমি ত খুব বড়লোক—খুব গিন্নীমা দেখি! জোর করে আমাদের আমগুলো পেড়ে নেবে। আর পণ্ডিতের মেয়ে বলে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখব। শেষ পর্য্যন্ত গিন্নীমা ফিরে গেলেন। রামজয়ের স্ত্রী মেয়েকে খুব তিরস্কার, শেষ প্রহার। রামজয় বাড়ী ফিরে সমস্ত শুনে মহাবিব্রত। বীণাকে ঘুম পাড়িয়ে আম পেড়ে গিন্নীমায়ের বাড়ী দিয়ে আসে। গিন্নীমা একখানা আম দিয়েছিলেন। বীণা ঘুম থেকে উঠে গাছে আম না-দেখে কাউকে কিছু না-বলে গিন্নীমা'র বাড়ীতে গিয়ে হাজির। বলে—তুমি আমার আম পাড়িয়ে এনেছ। ঘর খানাতল্লাস করব আমি। সে এক মহাকাণ্ড। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তার কানে উঠল। কর্ত্তা বললেন—গাছ তোমারই হ'ল মা। তুমি যতদিন বাড়ীতে থাকবে ততদিন তোমার। গিন্নীমা ওর নাম দিয়েছিলেন পণ্ডিতের সেপাই। বলতেন—শাশুড়ীর নাক কাটবি তুই। বীণা বলত—তা কাটব কেন? আমার শাশুড়ীর নাক কেন কাটব আমি? তোমার শাশুড়ীর নাক কাটব। গিন্নীমা মধ্যে মধ্যে রামজয়ের বাড়ী যেতেন—বীণার সঙ্গে ঝগড়া করতে। বলতেন—কৈ পণ্ডিতের সেপাই কৈ? তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে এলাম। কৈ একটু ঝগড়া কর দেখি। বীণা বলত—কিছু কেড়ি কর তবে ত ঝগড়া করব। শুধু কি ঝগড়া হয়! বলেই বলত—তুমি ভারি কুঁদুলী, কোন্দল ছাড়া থাকতে পার না! বাড়ী বয়ে আমার সঙ্গে কোন্দল

করতে এসেছ। বাড়ী যাও। নইলে পরমের সময় সাত কুঁড়ুলীর নাম করবার সময় তোমার নামটি প্রথম করব আর বলব—'সাত কুঁড়ুলীর মাথা খেয়ে বাতাস দে রে ফুরফুরিয়ে'। বড়লোক বলে খাতির করব না। হ্যাঁ।

আজকের এই সামাজিক অনুষ্ঠানটির সার্থকতা যে আনন্দ এবং উল্লাস তাদের নতুন সংসারে সঞ্চারিত করেছে, তাই উপলক্ষ করে চন্দ্রবাবুর জীবনে সরসতার ছোঁয়াচ লেগেছে। অনেককাল চন্দ্রবাবু এমন ভাবে সত্যবতীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন নি। সত্যবতীও এমন ভাবে অনেক কাল মুখর হয়ে উঠবার অবকাশ পান নি।

চন্দ্রবাবু আবার বললেন—পিসীমায়ের বাড়ী পাঠাবার সময় বঙ্কুকে যেন একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ো।

—তা দেব। কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি?

—সাজানো ত শুধু হয় না। ওর আছে কি, কি দিয়ে সাজাব?

—এই দেখ। সে সাজানো আমি বলি নি। বেশ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিও—একখানা ফরসা শাড়ী-টাড়ী পরিও। এই আর কি।

—শাড়ী! শাড়ীই কি একখানা ভাল আছে নাকি?

—তোমার একখানা কালাপাড় ফরাসডাঙ্গা শাড়ী পরিয়ে দিও। বঙ্কু ত তোমার মত বেঁটেখাটো নয়, এরই মধ্যে তোমার মাথার সমান সমান হয়েছে। দিব্যি হবে তোমার শাড়ী।

—হ্যাঁ তা হবে। তবে অন্য দিকেও যে নোটিশ দিয়েছে। বিয়ের ভাবনা ভাব।

—বিয়ের? দূর দূর। এর মধ্যে বিয়ে কি?

—নিজেই ত বললে—মাথায় আমার সমান হয়েছে।

—তাতে কি হয়েছে? বিয়ের বয়স হোক তার পর। তা ছাড়া—

—কি? তা ছাড়া আবার কি?

—আমার ইচ্ছে আছে ওকে লেখাপড়া শেখাব।

—লেখাপড়া শেখাবে? মানে পাস করাবে? বি-এ, এম-এ?

—ক্ষতি কি? সে যদি পারে তবে ত সে আমার ভাগ্য বলে মানব।

—না বাপু। সে ভাল নয়। মেয়েছেলে—সময়ে বিয়ে হবে, শ্বশুরবাড়ী যাবে, ঘরকন্না করবে, ছেলেপুলে হবে। রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেওর, কৌশল্যার মত শাশুড়ী হবে—সীতার মত সতী হবে। এই ত জানি। সীতা যদি বি-এ, এম-এ পাস করত তবে হ'ত রামায়ণ? না না, ও সব বুদ্ধি ভাল নয়।

কি বলবেন চন্দ্রবাবু? সত্যবতীকে একথা বোঝানো সোজা নয় সে তিনি জানেন। সত্যবতীকে পড়াতে কি তিনি কম চেষ্টা করেছেন? কিন্তু হয় নি। অবশ্য তার কারণ আছে। সত্যবতীর সঙ্গে সপ্তাহে দেখা হ'ত—শনিবারের রাত্রি, বারো ঘণ্টা, রবিবার দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা মোট ছত্রিশ ঘণ্টা, দেড় দিন। মাসে ছ'দিন মাত্র। এর মধ্যেও চন্দ্রবাবুকে জমিজমা চাষবাস দেখতে হ'ত, গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভদ্রজনদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হ'ত; তার মধ্যে আর সত্যবতীকে পড়ান সম্ভবপর হয় নি। ইস্কুলের এই নবকলেবর, নতুন ব্যবস্থা হওয়ার আগে পর্য্যন্ত বঙ্কবালা সম্পর্কেও এমন চিন্তা করতে পারেন নি। ওখানকার পাঠশালায় বঙ্কুকে পড়তে দিয়েছিলেন; ইস্কুলের এই নতুন ব্যবস্থায় বোর্ডিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে এই কোয়ার্টারে বাসা না করতে হলে ওখানেই বঙ্কুর পড়া শেষ করতে হ'ত। কোথাও কোন বোর্ডিঙে রেখে মেয়েকে পড়াবার কল্পনা তিনি করতে পারেন নি। এখানে বাসা হওয়ার পর থেকেই কথাটা মনের মধ্যে উঁকি মারতে সুরু করেছে। চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশন স্থাপনের সময় যুবক ছিলেন তিনি; অমরবাবুর সঙ্গে সেকালে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গত দশ বৎসরে সে স্বপ্ন স্তিমিত হয়েই আসছিল। নতুন ইস্কুলের বাড়ীঘর বছরে বছরে পুরনো হয়ে আসছিল; স্থানীয় জনসাধারণের মনেও খুব বেশী শিক্ষার আগ্রহ জাগে নি, তাঁদের নিজেদের উৎসাহে ভাঁটা না পড়ুক, জীবনে যেন ক্লান্তি আসছিল; বিশেষ করে উনিশ শ' চৌদ্দ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে বাস্তব সংসার জীবনকে চারিদিক থেকে নিষ্ঠুর পেষণ সুরু করেছিল। পঁয়তাল্লিশ টাকায় হেডমাষ্টারি আরম্ভ করেছিলেন —কয়েক মাস অর্থাৎ এই নবপর্য্যায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেড়ে হয়েছিল ষাট টাকা; অর্থাৎ দশ বছরে পনের টাকা, বছরে দেড় টাকা মাইনে বেড়েছিল। এ থেকেই বহু কষ্টে তিল তিল করে সঞ্চয় করে পৈতৃক ঋণ শোধ করেছেন। বাপের আমলে কুঠিয়ালদের অত্যাচারে যে জমিগুলি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল সেগুলির কিছু কিছু ফিরিয়েছেন। একখানি কোঠাঘর তৈরি করিয়েছেন। বাস করবার মত ঘর পর্য্যন্ত ছিল না। এর মধ্যে বঙ্কবালাকে পড়িয়ে বি-এ এম-এ পাস করাবার কল্পনা করতে পারেন নি। বরং তার বিয়ের কথাই ভেবেছিলেন। উনিশ শ' এগার সালে বাড়ীখানা তৈরি করার পর বঙ্কবালার বিয়ের জন্য পোষ্ট আপিসে একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলেছেন; তাতে মাসে পাঁচ টাকা

হিসেবে জমা রেখে আসছেন। বছরে ষাট টাকা হিসেবে আজ ছ' বছরে প্রায় শ' চারেক টাকা জমেছেও। উনিশ শ' চৌদ্দ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে মাসে এই পাঁচ টাকা জমা দিতেও যে কষ্ট পেতে হয়েছে তাঁকে সে শুধু তিনিই জানেন; সত্যবতীও জানেন না। কিন্তু ইস্কুলের এই নতুন আমল হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে কল্পনাটা উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে।

তাঁর আয় এখন মাসে দেড় শ' টাকা। অবশ্য সংসার-খরচ কিছু বেড়েছে। গ্রামে সত্যবতী বঙ্গবালাকে নিয়ে যে ভাবে থাকতেন বা থাকতে পারতেন এখানে ঠিক সে ভাবে থাকা যায় না। কাপড়-চোপড় থেকে চালে চলনে সব দিক দিয়েই খরচ বেড়েছে। চাল আলু তরিতরকারি অবশ্য তিনি বাড়ী থেকেই আনছেন, তবুও পঞ্চাশটা টাকা খরচ। জমার দিক এখন ভারী। অন্ততঃপক্ষে আশী টাকা বাঁচাতে তিনি পারবেন। এ ছাড়া বাড়ীর ধান চাল চাষের ফসল থেকে যা জমবার তা জমবে। সব নিয়ে এক শ' সোয়া শ' টাকা বটে। আজ মনে হচ্ছে বঙ্কুকে পড়ানো অসম্ভব নয়। বঙ্কু তাঁর একমাত্র মেয়েই নয়, একমাত্র সন্তান। তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে একজন মানুষের মত মানুষ করতে তাঁর বড় সাধ। সত্যবতীর কাছে কথাটা প্রকাশ করেন না, পাছে তিনি মনে দুঃখ পান। এই এত সব ছেলে তাঁর কাছে থেকে পড়ছে, মানুষ হচ্ছে, পাস যারা করছে, চলে যাচ্ছে; যাবার সময় প্রণাম করে সম্বন্ধ চুকিয়ে চলে যায়, তিনি বিদায় তাদের হাসিমুখেই দেন, কিন্তু চলে যাওয়ার পর বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। ভাবেন এরা কেউ বি-এ পাস করবে এম-এ পাস করবে, উকীল হবে, ডাক্তার হবে, ডেপুটি হবে, মুনসেফ হবে—তাঁকে দেখলে গুরু শিক্ষক হিসেবে প্রণাম-নমস্কার অবশ্যই করবে, তিনিও অহঙ্কার করে বলবেন—আমার ছাত্র। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। ওরা নমস্কার করে শ্রদ্ধাভক্তিও যেমন দেখাবে তেমনি কত স্থানে কত জনের কাছে তাঁর কত ভুল কত ত্রুটির উল্লেখ করবে, সমালোচনা করবে, হয়ত-বা কটু কথাও বলবে; কিন্তু যে সন্তান—যে পুত্র—যে আত্মজ তাঁর ভুল ত্রুটি তার মনকে স্পর্শই করবে না। শুধু তাঁর স্নেহের কথা, তাঁর গৌরবের কথাগুলিই স্মরণ করবে, নিজের ছেলেদের কাছে বলবে।

এরা শুধু ছাত্র, এদের কৃতী জীবনের উপর তাঁর কতটুকু অধিকার? শুধু মুখের কথায় অধিকার। একটা নমস্কার শুধু পাওনা। ছেলের উপর অধিকার সে যে পৃথিবীর উপর ভগবানের অধিকার, সৃষ্টির উপর স্রষ্টার অধিকার। তার দেহের উপর অধিকার—তার মনের উপর অধিকার, তার গৌরবে ষোল আনা অধিকার, তার উপার্জ্জনে ষোল আনা অধিকার। তার গৌরবে তাঁর বৈকুণ্ঠের সুখ, তার কৃতিত্বের পুণ্যে তিনি পাবেন স্বর্গ-সিংহাসন।

বঙ্কুর বিয়ে দিলে—তার ছেলে হবে—সে হবে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; সে শাস্ত্রমত পিণ্ড দিলে তা তিনি পাবেন। কিন্তু তার গৌরব—সে হবে তার পিতার পিতা-মহের। কিন্তু বঙ্কু যদি নিজে বি-এ, এম-এ পাস করে, তবে সে গৌরব হবে তাঁর নিজস্ব। ওই ছেলের গৌরবের মতই নিজস্ব। কিন্তু তার গুরুত্ব হবে অনেক বেশী। গৌরব করবার মত ছেলে অনেকের আছে, অনেকের হয়েছে। সতী মেয়ের গৌরব, সহনশীলা গুণবতী মেয়ের গৌরবও অনেকের হয়েছে কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ের গৌরব কার আছে এ অঞ্চলে? এ জেলায়? তাই তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে, মনের মধ্যে মাটির তলায় অঙ্কুরিত বীজের মত জাগছে—বঙ্কুকে তিনি পড়াবেন।

রামজয়ের মেয়েটার দিকে চেয়ে ভাবেন—বঙ্কু যদি এমনি অকালে বিধবা হয়? কিন্তু বিপদও আছে। বোর্ডিঙে এই এত সব ছেলের মধ্যে বঙ্কুকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তোলা সহজ কথা নয়। মনে পড়ল কমলেশের পত্রের কথা। মনে পড়ল সেদিনের কথা। ব্রজবিহারী বাবুর সঙ্গে ইস্কুলের পর ওই কমলেশের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ওই আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্রজবাবু অনেক পুরনো কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—"এটাকে কিশোর বয়সের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ রঙীন বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী ভাবছেন কেন? অন্ততঃ এখনও ভাববার কারণ ঘটে নি। এ সব চিরকাল ঘটে। ভেবে দেখুন না, কালে কালে কত অধ্যাপক-কন্যা কত পিতৃ-শিষ্যের প্রেমে পড়েছে। বিবাহ হয়েছে, বিবাহ হয় নি; এমন ঘটনা অসংখ্য। আরে মশায়, কচ-দেবযানীর কথা ভাবুন না। ওটা না ঘটালে মহাভারতই অন্য রকম হ'ত।" ছেলেদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। বঙ্কুই যদি কাউকে ভালবেসে ফেলে!

—কি ভাবছ তুমি? সত্যবতী প্রশ্ন করলেন। অবাক হয়ে তিনি স্বামীর স্তব্ধ চিন্তাকুল মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন।

—নাঃ। কিছু না। একটু হাসলেন চন্দ্রবাবু।

—কিছু না? বলবে না তাই বল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে মানুষ যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেল।

—বলব, পরে বলব। বলেই তিনি উঠে পড়লেন। আজ সন্ধ্যা থেকে বোর্ডিং ঘুরে দেখা হয় নি। একবার ঘুরে আসতে হবে। কে এখনও ঘুমোয় নি, হয় ত শরীর খারাপ হয়েছে, হয় ত বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে, হয় ত লুকিয়ে নভেল পড়ছে, কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা জ্ঞানপিপাসায় রাত্রির গভীরতা ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ছে। তাদের

ডেকে বলতে হবে—ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে পড়, রাত্রি হয়েছে। শেষের ধরনের ছেলে খুব কম। এ ধরনের ছেলে দু'চারটের বেশী হয় না। ওই একটা আছে ধ্রুব আর আছে শম্ভু মণ্ডল—এই দুটো। সব ক্লাসের ফার্স্ট-সেকেণ্ড ছেলেরা খানিকটা খানিকটা এই ধরনেরই বটে—তারা কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু ধ্রুব ঘোষের মত ছেলে দুর্লভ। আরও একটা-দুটো ছেলে থাকে যারা অনর্গল পড়ে, ধ্রুব ঘোষের মতই পরিশ্রম করে, কিন্তু আশ্চর্য্য তাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। রাত্রে পড়ে, সকালে ভুলে যায়। কেউ বলে মস্তিষ্কের দোষ, বুদ্ধি কম, ধারণশক্তির অভাব। উঁহু, উঁহু! চন্দ্রবাবু আপন মনেই ঘাড় নাড়লেন। এরা মন দিয়ে পড়ে না, এরা মুখে পড়ে, মনে মনে অন্য কথা ভাবে। আশ্চর্য্য ভাবে এই ধরনের দুমুখী একটা শক্তি জন্মে যায়। এরা চেঁচিয়ে পাড়া জানিয়ে পড়ে; মনে মনে ভাবে। আরও একটা কারণ আছে, এদের গোড়া কাঁচা হয়। গোড়া কাঁচা হলেই সর্ব্বনাশ। কমলেশের সঙ্গে পড়ে নিত্যকৃষ্ণ, ঠিক এই ধরনের ছেলে। হ্যাঁ নিত্যকৃষ্ণ এখনও পড়ছে, গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু কি পড়ছে একবিন্দু বোঝা যাচ্ছে না; একটা লাইনই পনের মিনিট ধরে ব্যাড়র ব্যাড়র করে অস্পষ্ট উচ্চারণে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। মনে মনে হিসেব করছে কার কাছে কত পাবে, কত সুদ হয়েছে। নিত্যকৃষ্ণ বাপের পাঠানো খরচের টাকা বাঁচিয়ে বোর্ডিঙে ছেলেদের চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। বাপ বড়লোক নয়, মধ্যবিত্ত চাষী গৃহস্থ, টাকা অল্পই পাঠায়, মাসে দশ বারো টাকা মাত্র। নিত্যকৃষ্ণ ও থেকেই মাসে এক টাকা থেকে দু টাকা পর্য্যন্ত বাঁচাবেই এবং টাকায় চার পয়সা সুদে ছেলেদের ধার দেবে। গরীব ছেলেদের দেয় না, বাবুদের ছেলেদের দেয়। এখানে আজ বছরচারেক সে পড়ছে, এর মধ্যেই সে প্রায় দেড় শ' টাকা পোষ্টাপিসে জমিয়ে ফেলেছে।

—মাষ্টার মশাই?

—ব্রজবিহারী বাবু?

ওদিক থেকে ব্রজবিহারী বাবু এগিয়ে আসছেন।

—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম আমি।

—আমার কাছে? কেন?

—একটু গণ্ডগোল হয়েছে।

—গণ্ডগোল? কি গণ্ডগোল?

—শম্ভু মণ্ডল সেকেণ্ড ক্লাসের, সিদ্ধি খেয়ে বেশ একটু ঘায়েল হয়ে পড়েছে।

—ঘায়েল হয়ে পড়েছে? শম্ভু মণ্ডল? সেকেণ্ড ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ধ্রুব ঘোষের পরই যে ইস্কুলের ভরসাস্থল? শান্ত শিষ্ট শম্ভু মণ্ডল।

—হ্যাঁ। আবোলতাবোল বকছে। গান করছে। চীৎকার করছে। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো মনে হচ্ছে।

—ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে।

—হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু রয়েছেন। আপনাকে খবর দেওয়া দরকার মনে করলাম। মানে সিদ্ধির সঙ্গে আরও কিছু খেয়েছে বোধ হচ্ছে। ডাক্তার বলছেন—জটিল দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা।

ব্যাপারটা সত্যই জটিল।

বোর্ডিঙের ঘর থেকে শম্ভুকে সরিয়ে এনে ইস্কুলের একটা ঘরে রাখা হয়েছে। ছেলেপিলের ভিড় থেকে বাঁচাবার জন্যও বটে, প্রশস্ত স্থানের জন্যও বটে। শম্ভুকে ডাক্তার ইতিমধ্যে বমিও কয়েক বার করিয়েছেন। সমস্ত ঘরটা জলে ভিজে গেছে। মাথায় জলও ঢালা হয়েছে অনেক। সদ্য বমি করে শম্ভু শুয়েছিল তখন, ধ্রুবই ওর মাথায় বাতাস দিচ্ছে। শম্ভু জানালার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনে আঙুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে। চন্দ্রবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। হতভাগা ছেলে, শয়তান কোথাকার! উঃ। অথচ ছেলেটার উপর কত বড় ভরসা তাঁর! মা-বাপের কত বড় আশার আশ্রয় ও। গরীব তৈলব্যবসায়ীর ঘরের ছেলে, ছাত্রবৃত্তিতে বৃত্তি পেয়েছিল, ওই বৃত্তির উপর নির্ভর করে হুগলীতে গিয়েছিল নর্ম্যাল ইস্কুলে পড়তে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে এখানে এসে ভর্ত্তি হয়েছে ফোর্থ ক্লাসে। অঙ্ক, সংস্কৃত, বাংলা এ সবে সে ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলেদের চেয়ে ভাল। শুধু জানত না ইংরিজী। তাও এই তিন বছরে সে চমৎকার আয়ত্ত করেছে। তাঁদের সকলের আশা শম্ভু কম্পিট করে পাস করবে ম্যাট্রিকুলেশন। এমন হয়েছে অনেকবার যে, নীচের ক্লাসে কোন পণ্ডিতমশায় আসেন নি, ছেলেরা গোলমাল করছে, তিনি শম্ভুকে ডেকে বলেছেন—ক্লাসটায় তুমি গিয়ে পড়িয়ে এস। সেই ছেলে—! চন্দ্রবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, ক্রুদ্ধস্বরে ডাকলেন—ইউ—শম্ভু! ইউ!

শম্ভু চমকে উঠল, আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়েই হি-হি করে হাসতে সুরু করে দিলে। হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি। তার পর হঠাৎ নিজেই নিজের মুখটা চেপে ধরলে। কিন্তু তার মধ্য থেকেও অদম্য অবাধ্য হাসি মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসছিল—হি-হি-হি।

চন্দ্রবাবু ধমক দিয়ে বললেন—হোয়াই ডু ইউ লাফ? হোয়াট্স দি ম্যাটার?

শম্ভু মুখের হাত ছেড়ে দিয়ে জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে—দ্যাট লিট্‌ল্ ব্রাইট স্টার। ওই নীল-উজ্জ্বল তারাটি, স্যার।

—হোয়াট ?

—টুইঙ্কল্ টুইঙ্কল্ লিট্‌ল্ স্টার। তারপরই সে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল।

ডাক্তার এসে চন্দ্রবাবুর বাহুস্পর্শ করে মৃদু স্বরে বললে—বাইরে চলুন। ওকে এখন ত উত্তেজিত করে লাভ নেই। ও ত এখন প্রায় বদ্ধ পাগল।

বদ্ধ পাগল।

—তা বৈ কি। শুনলাম ও সিদ্ধির সঙ্গে অনেক রকম জিনিষ মিশিয়ে খেয়েছে। ওদের একটা দল আছে, তারা সিদ্ধি প্রায় নিয়মিতই খায়। ছেলে বয়সের একটা ব্র্যাভেডো আছে—খেয়ে নেশা হয় না বলা। তা ছাড়া বেশী দিন কোন নেশা করলেই তাতে আর নেশা হয় না। শম্ভুও তাই বলত। আজ আপনার বাসায় সত্যনারায়ণ সেবা গেল, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল। সিদ্ধি-টিদ্ধির নেশায় একটা ফল্‌স এপিটাইট অনুভব করা যায়। বেশী করে খাবার জন্যে আজ নানা রকম জিনিস মিশিয়ে তরিবৎ করে সিদ্ধি খেয়েছে। শম্ভুর এই অবস্থা। বাকী সব প্রায় অজ্ঞানের মত বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে।

—বলেন কি ? এরা সুস্থ হবে কতক্ষণে ?

—বলতে পারি নে। দু'তিন দিন ত লাগবেই। সিদ্ধির নেশার তুল্য এই দিক দিয়ে পাজী নেশা আর নেই। তবে, শম্ভুর সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।

—আশঙ্কা ? আর আশঙ্কা কি ? হার্ট টার্ট—

—না। ওর মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

—মাথা খারাপ ? ইউ মীন—পাগল ?

—বিচিত্র নয়।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন চন্দ্রবাবু। তাঁর চীৎকার করতে ইচ্ছে করছে—তার চেয়ে শম্ভু মরে যাক। শম্ভুর সম্পর্কে তিনি কল্পনা করেন—শম্ভু অধ্যাপক হয়েছে, শম্ভু হাইকোর্টের জজ হয়েছে। সেই শম্ভু গায়ে ধুলো মেখে—কাদা মেখে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াবে—।

শম্ভু ভিতরে আবার হাসতে সুরু করেছে।—হি-হি-হি। হি-হি-হি। হি-হি-হি। হি-হি-হি।

দ্যাট লিট্‌ল্ ব্রাইট ব্লু স্টার! ওই নীল উজ্জ্বল তারাটি।

হি-হি-হি। হি-হি-হি। হি-হি-হি।

ওই হাসির মধ্যে শম্ভু হারিয়ে যাচ্ছে। ওঃ, শম্ভু তার চেয়ে মরে যাক। মরে যাক। চোখ থেকে তাঁর জল গড়িয়ে এসেছে।

ব্রজবিহারী বাবু বুঝতে পেরেছেন তাঁর মনের আবেগের কথা। তিনি বললেন—চলুন আপনি। গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি রয়েছি। ভাববেন না আপনি। যা করবার আমি করব।

সত্যই শম্ভুর মাথা খারাপ হয়ে গেল। দু'দিন দু'রাত্রির পর ডাক্তার বললেন—মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন। সেবা-শুশ্রূষা যাতে ভাল হয় সেটা প্রয়োজন, আর বিশ্রাম। কমপ্লিট রেষ্ট চাই।

শম্ভু এখনও আকাশে খুঁজছে—নীল উজ্জ্বল তারাটি। হাসিটা কম পড়েছে। বোর্ডিংয়ের চার জন শক্ত সবল ছেলে শম্ভুকে নিয়ে রওনা হ'ল শম্ভুর গ্রামের দিকে।

ক্রমশঃ



ভূদান

আচার্য্য—জে. বি. কৃপালনী

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

শ্রীবিনোবা ভাবে যিনি ভূদান-আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া ভূমিহীনদের জন্ম ভূমি সংগ্রহে প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার যৌবনে (২০।২৫ বৎসর বয়সে) সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে ছিলেন। গীতা উপনিষদের তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ পাঠক, একনিষ্ঠ সাধক। কিন্তু তাহা তাঁহাকে আশ্রমের শারীর-শ্রমের কাজে বিমুখ করে নাই। নিখুঁত ভাবে তাহা তিনি করিতেন। তাহা সত্বেও, তিনি নিভৃত জীবনযাপনই পছন্দ করিতেন। ইতিমধ্যে ওয়ার্দ্ধায় সবরমতী ধরনের আর একটি আশ্রম গড়িয়া উঠিল। যমুনালাল বাজাজের অনুরোধে তিনি সবরমতী হইতে ওয়ার্দ্ধায় যান এবং এই ওয়ার্দ্ধা আশ্রমেও তিনি পূর্ব্ববৎ কাজ করিতে লাগিলেন।

প্রায় প্রত্যেক সত্যাগ্রহ আন্দোলনেই তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কখনও লোক-চক্ষুর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তাঁহার নৈষ্ঠিক জীবনচর্য্যা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও গঠনকর্ম্মের প্রতি অচল নিষ্ঠার স্বরূপ কেবলমাত্র তাঁহারাই জানিতেন যাঁহারা আশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। এমনকি, গান্ধীজীও তাঁহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ঠিক এই কারণেই ১৯৪০ সনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রথম সত্যাগ্রহী রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন বিনোবা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবাসীদের স্বাধীন ও প্রকাশ্য মতামত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ঐ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জাতির নিকট বিনোবার পরিচয়স্বরূপ গান্ধীজী বলিলেন, "আশ্রমের ময়লা সাফ করা হইতে রান্না করা পর্য্যন্ত সকল ছোটখাটো কাজেই বিনোবা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণশক্তি বিস্ময়কর। স্বভাবতঃ তিনি অধ্যয়নশীল। তাহা হইলেও অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করিয়াছেন সূতাকাটার কাজে। নিখুঁত সুতাকাটার ব্যাপারে সম্ভবতঃ সারা ভারতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী। অস্পৃশ্যতাকে নিঃশেষে অন্তর হইতে তিনি ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্যে আমারই ন্যায় তিনিও দৃঢ় বিশ্বাসী।...কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, গঠনমূলক কার্য্যক্রম ব্যতীত গ্রামবাসীদের প্রকৃত স্বরাজ আসা অসম্ভব। এবং ইহাতেও তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী যে, গঠনমূলক কর্ম্মধারার ও উহার আচরণে অন্তর হইতে আস্থা না থাকিলে অহিংস প্রতিরোধও অসম্ভব।"

১৯৪২ সনে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত বিনোবাও ধৃত হইলেন। মুক্তি পাইলেন ১৯৪৫ সনের মাঝামাঝি। কারামুক্তির পর রাজনৈতিক মঞ্চ হইতে বিদায় লইয়া তিনি তাঁহার আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া গ্রামসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

গান্ধীজীর পরে

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর গুরুর অসমাপ্ত কর্ম্মযজ্ঞের আহ্বানই তাঁহাকে প্রেরণা যোগাইল। ইতিমধ্যে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর চিন্তাধারা, কর্ম্মপদ্ধতি ও পরিকল্পনা হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিনোবা উত্তরপ্রদেশ পরিক্রমার সময় এক প্রার্থনা-সভায় বলিলেন, "আমি জানি, জাতির নিকট কোন কার্য্যক্রম বাতলাবার অধিকার আমার নাই। আমি কোন নেতাও নই।...গান্ধীজী আজ বেঁচে থাকলে আমি কখনই লোকসমক্ষে হাজির হতাম না, বরং পল্লী অঞ্চলের পথেঘাটে ঝাড়ুদারের কাজে এবং কৃষির মাধ্যমে 'কাঞ্চন-মুক্তি'র* পরীক্ষায় আমার সকল শক্তি নিয়োগ করতাম। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই আমাকে বাইরে আসতে বাধ্য করেছে এবং এই মহাযজ্ঞের হোতা হবার দুঃসাহস যুগিয়েছে।"

পাকিস্থান-প্রত্যাগত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন-সমস্যাই ছিল তখন সর্ব্বাপেক্ষা জরুরি। এই কাজে বিনোবা অখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘের সভাপতি বাজুজীর (পরলোকগত কৃষ্ণদাস বাজু) সঙ্গে দিল্লী আসিলেন, কিন্তু সরকারী আমলাতন্ত্রের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম খুব বেশী কিছু করিতে সক্ষম না হওয়ায় তিনি উদ্বাস্তু খেয়ো উপজাতির পুনর্বাসনে ব্রতী হইলেন।

---

* পোচমপল্লী সর্ব্বোদয় সম্মেলনে যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার পাওনার আশ্রমে বিনোবা কতিপয় যুবক সহচরকে সাথী করিয়া 'কাঞ্চন-মুক্তি'র সাধনায় রত ছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে মুদ্রার (টাকা, পয়সা) প্রতিষ্ঠা কমাইয়া ও শ্রমের প্রতিষ্ঠা বাড়াইয়া সমাজের বৈষম্য দূর করাই হইল ইহার লক্ষ্য। মুদ্রা (পুঁজি) কেন্দ্রিক সমাজের বদলে শ্রমকেন্দ্রিক ব্যবস্থাই হইবে শোষণহীন অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য্য। বিনোবা বলেন, "পরমধাম পাওনারে সাম্যযোগের যে সাধনা চলিতেছে, তাহা যদি সিদ্ধ হয় তবে এই সমস্যা সমাধানের পথ পাওয়া যাইবে। তেলেঙ্গানা যাত্রার পূর্ব্বেও আমার এই পরীক্ষা চলিতেছিল। ভূদান-যজ্ঞে এতাবৎ যে সাফল্য লাভ হইয়াছে তাহা এই 'কাঞ্চন-মুক্তি তথা সাম্যযোগের' সাধনার ফল।"—অনুবাদক।

ভূদানের সূত্রপাত

অতঃপর ওয়ার্ধার নিকট পাওনারে তাঁহার আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া অধ্যয়ন ও গ্রামসেবার কাজ করিতে করিতে সকল সময়েই তিনি চিন্তা করিতে থাকেন কি করিয়া গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদর্শকে সুষ্ঠুরূপে ভারতের পুনর্গঠন কাজে প্রয়োগ করা যায়। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত সর্ব্বোদয় সমাজের বার্ষিক সম্মেলন ১৯৫১ সনে হায়দরাবাদের নিকটে অনুষ্ঠিত হইল। সে বৎসরে এই সম্মেলনে যোগ দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু বন্ধুবর্গের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যাইতে রাজী হন। পাওনার আশ্রম হইতে শিবরামপল্লী সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য তিনি পদব্রজে যাত্রা করিলেন। সে সময়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কম্যুনিষ্টরা কেমনভাবে দরিদ্র কৃষক-প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়া হিংসাত্মক বিদ্রোহ সুরু করিয়াছিল, তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। অন্য দিকে, প্রভূত হিংসা ও দমননীতির বলে সরকার কম্যুনিষ্টদের এই ক্ষুদে বিদ্রোহ আয়ত্তে আনিলেন। সম্মেলন শেষ হইবার পর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বিনোবা পুনরায় উপদ্রুত অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণ সুরু করিলেন। এক সান্ধ্য প্রার্থনা-সভায় তিনি বলিলেন, "শান্তির বাণী প্রচার করার জন্যই শান্তিসেনারূপে আমি তেলেঙ্গানা ভ্রমণে ইচ্ছুক হয়েছিলাম।" সেখানে প্রথম গ্রামটিতে পৌঁছিয়া অস্পৃশ্যদের শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে?" উত্তরে তাহারা জানাইল, 'কেবল-মাত্র চাষ করার জন্য জমি পেলেই তাদের আর্থিক দুরবস্থার অবসান হয়।" ঐ দিনের প্রার্থনা-সভায় তিনি বলিলেন, "এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৩,০০০ ও কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩০,০০০ একর। কিন্তু কেবলমাত্র ৯০টি পরিবারই সকল জমির মালিক। বাকী ৬০০ পরিবার ভূমিহীন। কাজেই কি ভাবে এই ভূমিহীন হরিজনেরা চাষের জন্য জমি পেতে পারে?" এক জন ভূস্বামী বিনোবার এই আবেদনে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিহীন হরিজনদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার ১০০ একর ভূমি দান করিতে চাহিলেন। ভূদান আন্দোলনের ইহাই প্রথম অঙ্কুরোদ্গম।

তেলেঙ্গানা পরিক্রমার সকল স্থানেই বিনোবাজী ভূমির জন্য জমিদারদের নিকট আবেদন জানাইলেন। তাঁহার এই আবেদনে তিনি আশাতীত ভূমি দান-স্বরূপ পাইলেন। এইভাবে সাম্যবাদীদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ কিংবা সরকারের প্রতিহিংসাত্মক দমননীতি ব্যতীত শান্তিপূর্ণ উপায়েই তেলেঙ্গানার অবস্থা শান্ত হইল। তেলেঙ্গানার এই অভিজ্ঞতায় বিনোবার ধারণা হইল,ভারতের ভূমি-সমস্যার সমাধান অহিংস পন্থায় সম্ভব। তেলেঙ্গানার পর তিনি মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, এবং বিহার হইয়া (পঁচিশ দিন বাংলায় থাকিয়া—অনুবাদক) এখন উড়িষ্যায় রহিয়াছেন (বর্ত্তমানে অন্ধ্রদেশে পরিক্রমা চলিতেছে—অনুঃ)। তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে ঘুরিতেছেন এবং ভূমিদান চাহিতেছেন।

কোনরূপ হিংসা বা আইনের সাহায্য ছাড়াই ইহাতে ভারতে ভূমিসমস্যার সমাধান সাময়িক ভাবে হইলেও হইতে পারে, তথাপি সমাজ-বিজ্ঞানে তাহা কোন অভিনব এবং বৈপ্লবিক পরীক্ষারূপে পরিগণিত হইবে না। দানস্বরূপ ভূমি পাওয়া গেলেও তাহা কোন নূতন জিনিষ নহে। অনেকে তো এক হাতে দান করিয়া অন্য হাতে আবার শোষণের মাধ্যমে তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ তুলিয়া লন। স্ব স্ব বিবেকের কশাঘাত হইতে অব্যাহতি পাইবার বা সমাজের চক্ষে নিজেদের সম্মান, মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহারা তাঁহাদের এই পাপের ধনের একাংশ দান করেন। আবার কোন সময় বা বাকী অংশ সুখে শান্তিতে ভোগ করিবার মানসে তাঁহারা সম্পত্তির একাংশ দান করেন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত, নাম ও ইহার আশু উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, বিনোবাজী পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, ইহার ব্যাপক তাৎপর্য্য রহিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামবাসী যাহাতে স্বাধীন ও পূর্ণ জীবন যাপন করিবার সমান বা প্রায় সমান সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারে, সেই ভাবে ভারতের গ্রামগুলিকে পুনর্গঠিত করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

বিনোবা প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকে পাঁচ একর ভূমি দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রশ্ন করা যায়, ইহাতেই কি গ্রাম-বাসীরা স্বাধীন ও পূর্ণ জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইবে? ধরা যাক, বর্ত্তমানে এইরূপ সুযোগ মিলিল। কিন্তু তাহাদের বংশধরেরাও কি এইরূপ সুযোগ পাইবে? পরের পুরুষে ত জমি কমিয়া পরিবার-পিছু এক একরে আসিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু কোন রকম অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার ফলেও ভূমির পরিমাণ যদি পাঁচ একরেই থাকিয়া যায়, তবে ইহাতেও কি গ্রামবাসীরা স্বাধীন, পূর্ণ ও সভ্য জীবনযাপনের সুযোগ পাইবে?

গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠন

ইতিহাসের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, কোন উন্নত সভ্যতাই কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। খাদ্যদ্রব্য ছাড়া বস্ত্র, গৃহ, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সকল সভ্য মানুষের প্রয়োজন, তজ্জন্য শিল্পের আবশ্যক হয়। শিক্ষার অর্থ বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও চারুকলা। এগুলি সবই আবার শিল্পের উপর নির্ভরশীল। এমনকি, উন্নত পর্য্যায়ের কৃষিতেও শিল্পের প্রয়োজন আছে। মানুষ সমাজে বাস করে। মানুষ একত্রে বাঁচিবার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে, সেগুলিও শিল্পের উপর নির্ভরশীল। সেই জন্য বিনোবা যদিও বর্ত্তমানে ভূমির উপরই গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার মনে ইহা অপেক্ষা ব্যাপকতর কল্পনা রহিয়াছে। একথা তিনি হামেশাই বলেন, ভূদান কেবল-মাত্র ভূমিসংগ্রহ ও ইহার ন্যায্য পুনর্বণ্টনের কর্ম্মপন্থাই নহে; ইহা একটি সমাজ-বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ যাহা ভারতের গ্রাম-গুলিকে পুনর্গঠন করিয়া সমতার ভিত্তিতে সমগ্র ভারতীয় সমাজকে নিম্নস্তর হইতে গড়িয়া তুলিবে। ভূদান-আন্দোলনের প্রকৃত মূল্য

নিরূপণ করিতে হইলে, আমাদিগকে ইহার উদ্দেশ্যের এই ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা করিতে হইবে।

দ্বিবিধ কার্য্যপন্থা

সামান্য কিছু দয়াদাক্ষিণ্য করা, "দান" শব্দের এই সাধারণ অর্থ না করিয়া বিনোবা প্রাচীন শাস্ত্রানুযায়ী "দানম্ সংবিভাগঃ" অর্থাৎ সমবিভাজন এই অর্থই করিয়াছেন। তিনি প্রায়ই ভূমিদাতাদের উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা কোন রকম দয়াদাক্ষিণ্য করিতেছেন না, বরং প্রায়শ্চিত্তই করিতেছেন। সুতরাং এই বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখিলে, গান্ধীজী যাহাকে তাঁহার 'সর্ব্বোদয় পরিকল্পনা' (সকলের উদয়, সকলের উত্থান, কাহারও পতন নহে) বলিয়াছেন, এই আন্দোলনও বাস্তবিক পক্ষে তাহাই। এই জন্য তাঁহার গুরুর পথেই বিনোবাজীও একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ সংস্কার সাধন করিতে চান। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন- 'নিজেকে সংস্কৃত কর, তাহা হইলে জগৎও সংস্কৃত হইবে।' গান্ধীজী বলিয়াছেন, "জগতের সংস্কারসাধনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সংস্কার কর।' এই দ্বিবিধ কার্য্যক্রম একই সঙ্গে চলিবে। একে অপরকে সাহায্য করিবে; ইহা ব্যক্তি ও সমাজের সংস্কারসাধনের এক অখণ্ড আন্দোলন। সমাজকে যে রূপেই গড়িবার সঙ্কল্প করুন না কেন, প্রথমে হৃদয়-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সুরু করিয়া পরে উপযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা তাহা মনের অভ্যাসে পরিণত করিতে হইবে। সত্যাগ্রহের মাধ্যমে প্রবর্ত্তিত ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে গান্ধীজী সর্ব্বদাই আত্মশুদ্ধির আন্দোলন বলিতেন। বিনোবাজীর চিন্তাধারাও ইহাই। গান্ধীজীর ন্যায় বিনোবাজীও চাহিতেছেন, সত্য ও সর্ব্বজনীন প্রেম—এই নৈতিক বিচারের ভিত্তিতে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন একই সঙ্গে মিশিয়া যাক।

পুরাতন মূল্যের নূতন নিরূপণ

এই বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখিলে ভূদান একটি বিপ্লবাত্মক আন্দোলন। মূলতঃ ও মুখ্যতঃ বিপ্লব কথাটির অর্থ হইতেছে পুরানো মূল্যের নয়া মূল্য নিরূপণ; জনগণের ধারণায় ভালমন্দ, পাপপুণ্য, প্রেয়-অপ্রেয় অসাধারণ-সাধারণ, সুন্দর-কুৎসিত ইত্যাদি সম্বন্ধে লোক-বিচারের পরিবর্ত্তনকেই বিপ্লব বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু বিপ্লবাত্মক সমাজে এই নূতন মূল্যমানকে পরিবর্ত্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা এবং সংস্কার প্রয়োজনও মিটাইতে হইবে। সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম্মীয় যে-কোন বিপ্লবই হউক না কেন, তাহা নয়া মূল্যমান স্থির করার সঙ্গে তাহারই উপর ব্যক্তি ও যৌথ জীবনকে পরিবর্ত্তনের পথে রূপায়িত করার চেষ্টা করে।

গান্ধীজীর চিন্তাধারায় অনুবর্ত্তী হইয়া বিনোবাজী আজ যে পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হিংসা বা রাষ্ট্রশক্তি কোনটির মাধ্যমেই ফলবতী হইবে না। বিনোবাজী শ্রেণীসংঘর্ষ, ঘৃণা, হিংসা, মারামারি, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ অথবা বিশ্বযুদ্ধ এমনকি রাষ্ট্রের আইন-গত ক্ষমতা এ সকলের কোনটির মাধ্যমেই তাঁহার এই ব্যাপক সমাজ-বিপ্লবের রূপায়ণ চান না। পরন্তু জনমত জাগ্রত করিয়া এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম ও পারস্পরিক সহযোগিতা—মানুষের এই সহজাত বৃত্তিগুলির যথাযথ ব্যবহারের দ্বারাই তিনি তাহা সফল করিতে চান।

প্রতিবেশীর প্রতি সক্রিয় প্রেমভাব লইয়া (এই জগতে সবাই ত প্রতিবেশী) সত্য ও অহিংসারূপ নৈতিক মূল্য আজ সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সামাজিক বিচারে সক্রিয় ভালবাসার অর্থ হইতেছে—দেশের অভ্যন্তরে সর্ব্বসাধারণের সমান নাগরিক অধিকার, এবং জাতি, ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে পক্ষপাতশূন্য আচরণ করা। আর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানব-জাতি এক—তাহা জাতি বা দেশগত সকল পার্থক্যের উর্দ্ধে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে, তাঁহার গুরুর ন্যায় বিনোবাজীও ভারতীয় গ্রামের পুনর্জ্জীবন চান; কিন্তু কেবলমাত্র কৃষির মাধ্যমেই এই পুনর্জ্জীবন-লাভ হইবে না, কৃষির সহিত শিল্পের সমবায়ে তাহা হইবে। ইতি-পূর্ব্বে অন্ততঃ পক্ষে পাশ্চাত্যদেশে 'শিল্পায়ন' বলিতে প্রধানতঃ বড় বড় শহর গড়িয়া তোলাকেই বুঝাইয়াছে। সভ্য আচার-ব্যবহার বলিতে শহুরে, মার্জ্জিত ব্যবহারই বুঝায়। গ্রামীণ বা গেঁয়ো অর্থে সাধারণতঃ অসভ্য আচরণকেই বুঝায়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই ধারণার সংশোধন সর্ব্বোদয়ের দ্বারা করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। গ্রামবাসীরা তাহাদের স্ব স্ব গ্রামে থাকিয়াই যাহাতে সভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনযাপনের সকল সুবিধাই পাইতে পারে—ইহাই হইতেছে বিনোবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

এক নূতন ধরনের শিল্প-বিপ্লব

গ্রামবাসীদিগকে এই সকল সুবিধা দিতে হইলে, গ্রাম কেবলমাত্র নিজের খাদ্যদ্রব্যই উৎপন্ন করিবে না, বরং ইহা এমন ভাবে শিল্পায়িত হইবে যাহাতে গ্রামীণ জীবনের অভ্যন্তরে ও তাহার চতুপার্শ্বস্থ অঞ্চলে জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহও উৎপাদিত হইবে। পাশ্চাত্য যাহাকে 'শিল্প-বিপ্লব' আখ্যা দিয়াছে, আধুনিক মানুষ শিল্পায়ন বলিতে কেবলমাত্র তাহাই বুঝে। ইহার অর্থ ছিল, মুষ্টিমেয় বেসরকারী লোকের পরিচালনায় কেন্দ্রীভূত ও যন্ত্রচালিত কলকারখানার দ্বারা শহর-কেন্দ্রিক শিল্পায়ন। পাশ্চাত্ত্যের সমাজবাদ ও সাম্যবাদের সহিত ইহার কেবলমাত্র এইটুকু পার্থক্য যে, তাহারা রাষ্ট্রশক্তিকে বেসরকারী পুঁজিপতির স্থলাভিষিক্ত করিতে চায়। উভয় ক্ষেত্রে শিল্পায়নের রূপরেখা বা ধারণা মোটামুটি একই। অথচ, সর্ব্বোদয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের এই ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রামীণ শিল্পগুলি এমন ভাবেই বিকেন্দ্রীকৃত হইবে যাহাতে ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কাহারও পুঁজিপতিরূপে আবির্ভাবের প্রয়োজন হইবে না। প্রত্যেক কারিগরই হইবে তাহার উৎপাদনের সাধারণ যন্ত্র-

পাতির মালিক। গ্রামের প্রত্যেক গৃহই হইবে এক একটি কারখানা; সেখানে এমন যন্ত্রশক্তির ব্যবহার হইবে যাহা সুবিধামত কর্ম্মীকে সাহায্য করিয়া তাহার ক্লান্তি দূর করিবে; এবং প্রয়োজন হইলে অধিক উৎপাদনের জন্যও তাহা কাজে লাগানো যাইবে। ইহাই যদি করিতে হয়, তবে গ্রামবাসী কেবলমাত্র সেই প্রকারের যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার করিবে যাহা এই সকল প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম। বিদ্যুৎ হইতেছে এমন এক শক্তি যাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে ভাগ করিয়া দূরদূরান্তেও সরবরাহ করা যায়। অপর যে সকল শিল্পকে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের তাগিদেই ভাগ করা বা বিকেন্দ্রীকৃত করা যায় না সেগুলির সমাজীকরণ করা হইবে এবং সেগুলির মালিক হইবে শ্রমিক, ব্যবস্থাপক, ব্যবহারকারী জনসাধারণ এবং সরকার—ইহাদের সকলের প্রতিনিধিমূলক স্বাধীন, স্বতন্ত্র এক সঙ্ঘ। ইহাই হইবে এক নূতন ধরনের শিল্প-বিপ্লব যাহা অতিমাত্রায় যান্ত্রিকতা, কেন্দ্রীকরণ এবং শহরমুখী অভিযানের কুফল এড়াইয়া চলিবে।

রাজনীতিতেও ইহা বিপ্লবধর্ম্মী

দেশের আর্থিক কাঠামোর ভিতর বিপ্লব আনিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বোদয় রাজনীতিতেও বিপ্লবাত্মক পরিণতির সূচনা করিবে। কেন্দ্রীকরণের দিকে প্রতি পদক্ষেপের অর্থই হইতেছে এই যে, বিশেষজ্ঞ ও আমলাদের হস্তক্ষেপের জ্বালায় ব্যক্তি তাহার নিজস্ব কর্ম্মপরিচালনার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা উঁহাদের নিকট সঁপিয়া দিতে বাধ্য হয়। রাজনীতিতে কেন্দ্রীকরণের এই ঢেউ—এমনকি গণতান্ত্রিক দেশেও এত দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, রাষ্ট্রশক্তি তখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। গণতন্ত্রে যাহাকে আমরা প্রভুর সিংহাসনে বসাইয়া থাকি সেই সাধারণ নির্ব্বাচকের ক্ষমতা আজ রাষ্ট্রশক্তির তুলনায় লক্ষ ভাগের এক ভাগে আসিয়া নামিয়াছে। আধুনিক গণতন্ত্রের তথাকথিত সাধারণ নাগরিকেরা চার কিংবা পাঁচ বৎসর অন্তর সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় এই হ্রাসপ্রাপ্ত ক্ষমতা ভোগ করে। এমনকি তখনও তাহাকে দুইটি কি তিনটি শাসকগোষ্ঠীর মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া লইবার অধিকার দেওয়া হয়। নির্ব্বাচনও শেষ হয় আর একনায়ক রাষ্ট্রের নাগরিকের ন্যায় কেন্দ্রিত গণতন্ত্রের নাগরিকও প্রায় সমান ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। জনগণ নিজেরাই তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্ম পরিচালনা করিবে, গণতন্ত্রকে এই অর্থে বাঁচিতে হইলে রাষ্ট্রের এই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বকে বিকেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে নতুবা তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। লর্ড এক্টনের এই মন্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত যে, 'ক্ষমতাই মানুষকে কলুষিত করার পথে ঠেলিয়া দেয়, আর একচ্ছত্র ক্ষমতা তাহাকে সর্ব্বাংশে কলুষিত করিয়া ফেলে।' মানব-সম্প্রদায়কে সহজপাচ্য মাত্রায় ক্ষমতা পাইতে হইবে, গান্ধীজীর ন্যায় বিনোবার কল্পনা অনুযায়ীও স্বাধীন ভারতের রূপ হইবে—কতকগুলি প্রায়স্বাধীন গ্রামীণ গণতন্ত্র—যেগুলি শিক্ষা, পুলিশ, ন্যায় বিচার ইত্যাদি সকল স্থানীয় ব্যাপারের পরিচালনা নিজেরাই করিবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ ঐক্য ও সমৃদ্ধির দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে। এরূপ চিন্তা করা ভুল যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বুঝি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে। বরং শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনই কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গান্ধীজী প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার ধ্যানের ভারতে রাজধানী থাকিবে প্রতিটি গ্রামে, দিল্লীতে নহে। অর্থাৎ, সভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন জীবনযাপনের জন্য দিল্লীর ন্যায় প্রত্যেক গ্রামেই পূর্ণ সুযোগ থাকিবে। অতএব ভূদানের চিন্তাধারা গান্ধীজীর সর্ব্বোদয় চিন্তাধারারই প্রতীক; তবে সাময়িক ভাবে ভূদান-আন্দোলনে ভূমির ন্যায্য পুনর্বণ্টনের উপরেই জোর দেওয়া হইতেছে। পরিণামে অবশ্য সমস্ত ভূমিই প্রাচীনকালের ন্যায় ধীরে ধীরে গ্রাম-সমাজের অধিকারে আসিয়া তথায় সমবায় চাষ আবাদ হইবে। এই কারণে বিনোবাকে যেখানেই সমগ্র গ্রামটিকে দানস্বরূপ দিবার প্রস্তাব করা হয়, তিনি তাহা গ্রহণ করেন। লক্ষ্য তাঁহার রহিয়াছে যৌথ কৃষির দিকে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় ইহা যেমন বলপূর্ব্বক গ্রামগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার বদলে এখানে হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। ইহার ফলে সর্ব্বোদয়-পরিকল্পিত সমাজ-পুনর্গঠনের নূতন চিন্তাধারাকে এই সকল গ্রামে রূপায়িত করার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

সুতরাং, ভূদান-আন্দোলন ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে পরীক্ষিত সত্য-অহিংসার এই নূতন মূল্যমান প্রতিষ্ঠার দিকেই কেবলমাত্র অঙ্গুলিসঙ্কেত করে না, পরন্তু এই নূতন মূল্যমান ও নূতন ভাবকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য তাহা উপযুক্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেরও নির্দ্দেশ দেয়। কেবলমাত্র এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভূদান-আন্দোলন সমাজ-পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটনে ইহার লক্ষ্য ও কর্ম্মপন্থায় বিপ্লবাত্মক।



সমাজ-বিজ্ঞান সভার শেষ পর্ব্ব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা বা Bengal Social Science Association-এর কথা ইতিপূর্ব্বে দুইটি প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি।* ১৮৭২ সনের ১৪ই মার্চ্চ সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের বিষয়ও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে এখানে আরও কিছু বলা আবশ্যক। সভার সভাপতি এবারে যে ভাষণ দেন তাহা ছিল "Physical Sciences" বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অনুশীলন সম্পর্কে। শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি কেশবচন্দ্র সেন "Reconstruction of Native Society", অর্থাৎ দেশীয় সমাজ পুনর্গঠন সম্পর্কে উপস্থিতমত (extempore) একটি বক্তৃতা করিলেন। সভার প্রবন্ধ-পুস্তকে এটি আদৌ স্থান পায় নাই। লিখিত বক্তৃতা ছিল না বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

১৮৭২ সনে সভার একটি মাত্র ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয় ১৮৭২, ২৬শে মার্চ্চ তারিখে। ইহার পর দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতায় ডেঙ্গু-জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, এজন্য আর কোনও অধিবেশন হইতে পারে নাই। ঐ দিনের দুইটি প্রবন্ধ পাঠের কথাও বলা হইয়াছিল। পাদ্রী লঙ রচিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ ("Village Communities in India and Russia") এখানে পঠিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না, কেননা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া উক্ত ২৬শে মার্চ্চের অধিবেশনে সভা-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিতরিত হয়। এই দিনের সভায় আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। লঙের কলিকাতা-ত্যাগের কথা এই মাত্র বলিলাম। তিনি ভারতের সেবায় বহু বর্ষ নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, আর ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই। তথাপি বিলাতে অবস্থান-কালে তিনি বরাবর প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চ্চায় এবং ভারতবাসীর হিতসাধনে লিপ্ত থাকেন। ব্রিটেনের সমাজ-বিজ্ঞান সভার আদর্শে বঙ্গদেশে সমাজ-তত্ত্ব আলোচনার্থ একটি সুনিয়ন্ত্রিত সভা প্রতিষ্ঠার কথা ১৮৬৬ সনে লঙই প্রথম উত্থাপিত করেন। একথা আমরা পূর্ব্বে জানিয়াছি। প্রতিষ্ঠা অবধি তিনি নানা ভাবে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লঙ অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন ১৮৬৭, '৬৮, '৬৯ ও '৭১ সনে। তাঁহাকে শিক্ষা-শাখার সভাপদেও দেখিতে পাই প্রথম তিন বৎসর। ১৮৭০ সনে তিনি শিক্ষা-শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার ভারত-ত্যাগে স্বতঃই সভার বিশেষ ক্ষতি হইল। লঙের গুণপনা এবং সহায়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া ২৬শে মার্চ্চের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে নিম্নের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

"That this meeting desires to record its high sense of the valuable services rendered to the Association by the Rev. J. Long, who took an active part in its foundation and has always manifested the warmest interest in its affairs. The Rev. J. Long who has just left Calcutta for Europe in consequence of failing health, after prolonged devotion to the welfare of the people of India, carries with him the best wishes of the Association for the restoration of his health and the continuance of his philanthropic labours, by which he has laid this country under the deepest obligations."



কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭২ সনের ভিতরেই অধ্যক্ষ-সভার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। ডাঃ জোসেফ এওয়ার্ট দুই বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে কার্য্য করিয়া সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই পদ পরবর্ত্তী দেড় বৎসর যাবৎ শূন্য ছিল। ১৮৭২ সনে সভার অন্যতর সম্পাদক

* প্রবাসী—কার্ত্তিক ও পৌষ ১৩৬২

টি. জে. চিচেল প্লাউডেনও পদত্যাগ করিলেন। উভয়কেই তাঁহাদের কার্য্যের জন্ত সাধুবাদ করা হয়।

২

১৮৭৩ সন হইতে সমাজ-বিজ্ঞান সভার বার্ষিক বা ত্রৈমাসিক অধিবেশন নিয়মিত হয় নাই। বিভিন্ন শাখার অস্তিত্বও লোপ পাইয়াছিল, মাঝে মাঝে যেসব প্রবন্ধ পঠিত হয় তাহাতে কিন্তু কখনও কখনও শাখা-নির্দ্দেশ করা হইত। ১৮৭৩ সনে বার্ষিক অধিবেশন হইল না। তবে এ বৎসরে দুইটি ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয়—যথাক্রমে ২৫শে মার্চ্চ এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর দিবসে। প্রথম অধিবেশনে জে. জিওঘেগান, সি. এস., "Indian Cooly Emigration" ('ভারতীয় শ্রমজীবী বিদেশে প্রেরণ') শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত হয় "Some Features of Litigation In Bengal" ('বঙ্গে মামলা-মোকদ্দমার কয়েকটি দিক') নামক একটি প্রবন্ধ। ইহার রচয়িতা—বিচারপতি জন বাড ফিয়ার। দুইটি প্রবন্ধ লইয়াই যথারীতি আলোচনা হইয়াছিল। এ অধিবেশনে বাংলার ছোটলাট সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল এবং সরকারী পদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৩ই সেপ্টেম্বর) পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "Some Social Problems" ('কয়েকটি সামাজিক সমস্যা') নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর ইহার বিষয়বস্তু লইয়া এদিন জোর আলোচনা ও বিতর্ক হইয়াছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পাদ্রী কৃষ্ণমোহনও বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮৬৯ সন বাদে প্রতিষ্ঠাবধি (১৮৬৭) ১৮৭৮ সন পর্য্যন্ত তিনি অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। শিক্ষা-শাখা যতদিন চালু ছিল ততদিন, ঐ ১৮৬৯ সন বাদে, উহারও তিনি সভ্য-পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছিলেন (১৮৬৭, '৬৮ এবং ১৮৭০-৭২)।

এই দুইটি অধিবেশনের বিবরণের সঙ্গে সভার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া যাইতেছে। এ বৎসরে সভার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন তিন জন, আজীবন সদস্য পনর জন এবং সাধারণ সভ্য একশত সাতাশী জন। শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে কোন্নগর ও মজঃফরপুর শাখাদ্বয়ের পঁচিশ জন সভ্যকেও ধরা হয়। এই বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, বঙ্গের ছোটলাট সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল (১৮৭১-৭৪) বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মতি দান করিয়াছেন।

সমাজ-বিজ্ঞান সভার পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশন হইল ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৪। সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত দুই বৎসরের বিবরণ হিসাব-নিকাশ সমেত সভায় পেশ করা হইল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়: সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল—সভাপতি; ডাঃ জোসেফ এওয়ার্ট, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—সহ-সভাপতি; প্যারীচাঁদ মিত্র, এইচ. জে. এস. কটন—সম্পাদক; মৌলবী আবদুল লতিফ, মুন্সী আমীর, কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী, জে. জিওগেঘান, ডবলিউ. এল্. হীলি, জি. ডবলিউ কেলনার, রেভাঃ জি. কেরি, আর. নাইট, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, জে. বি. ফিয়ার, মাণকজী রুস্তমজী, কেশবচন্দ্র সেন, শ্যামাচরণ সরকার—সদস্য।



মৌলবী আবদুল লতিফ

লক্ষণীয় যে, বার্ষিক অধিবেশনে কোন বিভাগীয় সভা গঠিত হয় নাই। বৎসরের মধ্যে কোন ত্রৈমাসিক অধিবেশনও হইল না। ক্যামবেল সভাপতির ভাষণে সে সময়কার কতকগুলি বিশেষ সমস্যার প্রতি সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন বঙ্গপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ ভীষণ আকারে দেখা দেয়। কাজেই তাঁহার বক্তৃতায় খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ছিল। ভূমিব্যবস্থার সংস্কার যে আশু প্রয়োজন এ বিষয় তিনি বক্তৃতায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক সমস্যার কথাও এই বক্তৃতায় আলোচিত হয়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নির্দ্দেশক একটি ইকনমিক মিউজিয়ম কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ের আলোচনা পরেও আমরা পাইব।

৩

পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশন হইতেও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৭৫ সনে বার্ষিক অধিবেশন হইল না। তবে অধ্যক্ষ-সভায় একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র পদত্যাগ করায় মৌলবী আবদুল লতিফ সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

এই বৎসরের মধ্যে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার চতুর্থ বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই বারেই তাঁহার শেষ ভারত-আগমন।

কলিকাতায় আসিলে, সভা-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে দিয়া একটি বক্তৃতার আয়োজন করিলেন ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৭৫ তারিখে। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—"Prison Discipline and Reformatory Schools", অর্থাৎ কারাগারের শাসন-শৃঙ্খলা ও সংশোধন-বিদ্যালয় বিষয়ে। কুমারী কার্পেণ্টার পূর্ব্ববর্তী পঁচিশ বৎসর যাবৎ কারাগার-সংস্কার ও অপরাধীদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৫৭ সনে ব্রিটেনে সমাজ-বিজ্ঞান সভা স্থাপিত হইলে সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন পরিচালনার সুবিধা হয়। তথাকার গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আইন পাস করাইতেও বাধ্য হন। ১৮৭২ সনে লণ্ডনে যে 'প্রিজন-কংগ্রেস' হয় তাহাতে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ব্রিটেনে অপরাধীদের সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে. কারাগারে অপরাধীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, শিল্প-শিক্ষা-দান, বন্দীদশার অন্তে তাহাদিগকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য অর্থ ও অন্যবিধ সাহায্য প্রভৃতি দ্বারা অপরাধীদের মনে ভাবান্তর ঘটিয়াছে। আবার অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের নিমিত্ত বিশেষ কারাগারে উপযুক্ত সাধারণ এবং শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও সংগঠন সম্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষের কারাগারগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজন; বিশেষতঃ শিশু ও কিশোর অপরাধীদের জন্য সহৃদয়তাপূর্ণ সুষ্ঠু সংশোধন-ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে "Reformatory Schools" বা সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠার জন্য মিস কার্পেণ্টার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান।

দুই বৎসর পরে পুনরায় সভার বার্ষিক অধিবেশন হইল ১৮৭৭ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। এসময়কার কার্য্যবিবরণ হিসাব-পত্রসহ অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হইল। অধ্যক্ষ-সভা নূতন করিয়া গঠিত হয়। এবারে সভাপতি হইলেন বঙ্গের ছোটলাট সর্ রিচার্ড টেম্পল। সহকারী সভাপতি হইলেন সর্ ডবলিউ, ম্যুয়ির ও ডাঃ জোসেফ এওয়ার্ট। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব আমীর আলী খাঁ, প্যারীচাঁদ মিত্র, এইচ. বিভার্লি, জে. বি. ফিয়ার, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ চৌদ্দ জন দেশী-বিদেশী প্রধান ব্যক্তি। সম্পাদক হন—মৌলবী আবদুল লতিফ ও সি. পি. মেকলে। সর্ রিচার্ড টেম্পল ক্যামবেলের কলিকাতা ত্যাগের পরেই সভাপতির পদে বৃত হইয়া থাকিবেন। কেননা বাৎসরিক সভায় তিনি যথারীতি একটি মনোজ্ঞ তথ্যপূর্ণ এবং ভাবী কর্ম্ম-নির্দ্দেশক ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভাষণটি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা আবশ্যক। সর্ রিচার্ড বিগত দুর্ভিক্ষের সময় 'রিলিফ-কমিশনার' রূপে বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করিয়া জনসাধারণের মৌলিক অভাব-অভিযোগের কথা বিশেষ ভাবে জানিতে পারেন। এবংবিধ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি সরকারী ব্যবস্থার কতকগুলি অনিয়ম ও অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারই আভাস আমরা এই বক্তৃতার মধ্যে পাই।

বাংলার কৃষক তথা জনসাধারণের ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন আশু প্রয়োজন। কৃষকদের সমস্যা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্ব্বে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। পাবনা-সিরাজগঞ্জ "প্রজা-বিদ্রোহ" কালে ১৮৭৪ সনে রমেশচন্দ্র দত্ত "Arcyde" ছদ্মনামে রেভাঃ লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এইগুলিতে তিনি ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে রচনাত্মক আলোচনা করেন। সভাপতি টেম্পল ভূমিব্যবস্থার কথা বিবৃত করিয়া, কৃষকদের সমস্যার আশু সমাধানকল্পে সমাজ-বিজ্ঞান সভার করণীয় রূপে কতকগুলি প্রারম্ভিক কার্য্যের উপর জোর দেন। তিনি প্রস্তাব করেন—কৃষি, কৃষক, গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যমূলক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিতে হইবে। বঙ্গপ্রদেশে উৎপন্ন ফল-শস্যাদি লইয়া কলিকাতায় একটি 'ইকনমিক মিউজিয়ম' ইতিমধ্যেই গঠিত হইয়াছিল। টেম্পল কলিকাতাস্থ উক্ত 'ইকনমিক মিউজিয়মে'র উন্নতিকল্পে সকলকেই উদ্যোগী হইতে বলেন। বর্ত্তমানে 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে' যে 'ইকনমিক মিউজিয়াম' শাখা সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহার মূল পাই এই সব আয়োজনের মধ্যে। স্ত্রীশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, সমাজের ধর্ম্মগত বিবর্ত্তন প্রভৃতির আলোচনার জন্যও তিনি সভার কর্ত্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করেন।

এ বৎসর বার্ষিক অধিবেশন বাদে সভার আর একটি অধিবেশন হয় ২৪শে জুলাই ১৮৭৬ তারিখে। এ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সর্ রিচার্ড টেম্পল। বিচারপতি ফিয়ার "The Calcutta Economic Museum" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পদ্রব্য সংগ্রহান্তর কলিকাতায় তাহার একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা। এ বিষয়ে টেম্পলের আগ্রহের কথা একটু আগেই বলিয়াছি। এই সারগর্ভ সমাজহিতকর প্রবন্ধটির আলোচনায় যোগ দেন হেনরি বেল, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং সভাপতি স্বয়ং।

৪

সভার পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশন হয় ২৫শে জুলাই ১৮৭৭ দিবসে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন হেনরি বেল। অধ্যক্ষ-সভা নূতন করিয়া গঠিত হইল বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। সহকারী সভাপতি ছিলেন পূর্ব্ববৎ। সম্পাদক মাত্র একজন—মৌলবী আবদুল লতিফ। অধ্যক্ষ-সভায় ইঁহারা ছাড়া সদস্য ছিলেন ত্রিশ জন। তাঁহাদের মধ্যে ইউরোপীয় দেখিতেছি মাত্র চার জন। এই সময়, 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী' প্রভৃতি জনহিতকর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ইউ-রোপীয়ের সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইতেছিল। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভায়ও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। ভারতীয় সদস্যগণের মধ্যে প্রাচীনদের সঙ্গে কয়েক জন নবীন সদস্যেরও নাম পাই,

যেমন—আনন্দমোহন বসু, ডাঃ কানাইলাল দে, কালীমোহন দাশ, যোগেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি।

সমাজ-বিজ্ঞান সভার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় আর নিয়মিত ভাবে পরিচালিত না হওয়ায়, হেনরি বেল সভাপতির ভাষণে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি সভার উপকারিতা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি সভার কতকগুলি জনকল্যাণ-নির্দ্দেশক কর্ম্মের উল্লেখ করিলেন। তাঁহারই ভাষায়ঃ

"You will find, gentlemen, if you will refer to the earlier years of the proceedings of this Association, some most important and thoughtful papers upon questions affecting the Mahomedan portion of the community. I particularly allude to two papers on Mahomedan education; one delivered in 1868 by Moulvi Abdool Luteef, and the other in 1869 by the Rev. J. Long. These papers called forth at the time a considerable amount of discussion, and eventually led to those measures which Government afterwards adopted with the view of improving the system of Mahomedan education. I might also particularise another paper on Mahomedan marriage and divorce. That paper and the discussion upon it were productive of the best results; for they brought to the notice of Government the necessity of re-appointing Kazis in all the districts of Bengal. I would also allude to two other very able papers which were delivered by my friend Babu Keshub Chunder Sen on the important question of female education. I have no hesitation in saying that these two papers have treated the subject of female education in a manner in which it has seldom been treated elsewhere, and they have exercised a great influence upon the subsequent treatment of that most important subject."

সভায় পঠিত ও আলোচিত কোন কোন প্রবন্ধ হইতে সরকারী নীতি কিরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, সভাপতি বেলের ভাষণের উদ্ধৃতাংশ হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। তিনি বিশেষ করিয়া মৌলবী আবদুল লতিফ, পাদ্রী লঙ এবং কেশবচন্দ্র সেনের প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করিলেন। ইহা ব্যতীত আরও বহু আলোচনা-প্রবন্ধ হইতে গবর্ণমেণ্ট নানা বিষয় হদিস পান। উক্ত অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র "A few facts concerning village life" 'গ্রাম-জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য') নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীনাথ ঘোষ, নবীনচন্দ্র বড়াল এবং সভাপতি ইহার আলোচনায় যোগ দিলেন।

এই দিনের সভায় কয়েকটি বৈষয়িক বিষয়েও প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার সভ্য-সংখ্যা খুবই হ্রাস পাইয়াছিল, অর্থ-ভাণ্ডারও ফুরাইয়া আসিতেছিল। এহেতু ১৮৭৬ সন পর্য্যন্ত যাঁহাদের চাঁদা শোধ করা ছিল, ১৮৭৭ সনের দেয় চাঁদা তাঁহাদিগকে মকুব করিয়া দেওয়া হইল। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার উদ্যোক্তা এবং দরদী বন্ধু কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ১৮৭৭, ১৫ই জুন তারিখে ব্রিষ্টলে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন এই প্রস্তাবটি ঐ দিনের সভায় উত্থাপন করিলেনঃ

"That this meeting desires to record its deep sense of the loss sustained by the Bengal Social Science Association by the death of Miss Mary Carpenter, who was one of the original promoters of the Association."

কুমারী কার্পেণ্টারের বিভিন্নমুখী প্রতিভা, কর্ম্মশক্তি এবং গুণ-পনার উল্লেখ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।



সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল

কুমারী কার্পেণ্টার ছিলেন ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। ভারতবর্ষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি চারি বার এদেশে আগমন করেন। ভারতবর্ষের নারী-জাতির উন্নতি এবং অধঃপতিত মানুষের সংশোধনাদি ব্যাপারে তাঁহার প্রয়াসসমূহ সর্ব্বদা স্মরণীয়। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক ফাদার ঈ. লাফোঁ উক্ত প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেন।

এদিনকার সভায় আরও দুইটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। একটি হইল—হাইকোর্টের বিচারপতি জে, বি, ফিয়ারের উপরে। তিনি ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সমাজবিজ্ঞান সভার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি যুক্ত ছিলেন, এবং প্রায় প্রথম অবধি তিন বৎসর যাবৎ ইহার সভাপতি পদে বৃত থাকেন। ১৮৭০ সনে মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও মিস কার্পেণ্টারের সঙ্গে তিনি সভার বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত হন, ফিয়ার সভার বিভাগীয় সমিতিতে বিভিন্ন অধিবেশনে এবং সভা-নিযুক্ত কমিটিতে তথ্যসংগ্রহ, প্রবন্ধ পাঠ এবং কার্য্য পরিচালনায় সোৎসাহে ও অকপট ভাবে যোগ দিতেন।

তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও বিশেষ সহায়তা করেন। সদস্য ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবে এবং কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভাঃ সি. কে. ড্যাল, কালীমোহন দাশ প্রভৃতির সমর্থনে ফিয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।



সর্ রিচার্ড টেম্পল

সর্ রিচার্ড টেম্পলও এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে বঙ্গপ্রদেশের শাসন-ভার ত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ের গবর্ণর হইয়া যান। বাংলায় অবস্থানকালে (এপ্রিল ১৮৭৪—জানুয়ারী ১৮৭৭) তিনিও সভার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। সভাপতি রূপে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে ইহার সঙ্গে লিপ্ত থাকিতেও হইয়াছে। ভারতবাসীদের হিতকর নানা বিষয়ে তাঁহার খুব প্রযত্ন ছিল। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এহেন হিতৈষী বান্ধবকে সভার বিশিষ্ট সদস্য রূপে গ্রহণ করা হইল।

৫

দেখিতে দেখিতে সভা যুগ-প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। ১৮৭৮ সনে প্রথমার্দ্ধে ইহার তিনটি সাধারণ অধিবেশন হইল। মৌলবী আবদুল লতিফই সম্পাদক রহিলেন, নূতন অধ্যক্ষ-সভাও আর গঠিত হয় নাই। বেল সহ-সভাপতির পদ ত্যাগ করিলে সে পদে স্থান হইল এইচ. বিভার্লি মহোদয়ের। ১৮৭৮, ২৩শে এপ্রিল সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনকে বার্ষিক সভারও মর্য্যাদা দেওয়া যায়। কারণ এখানে পূর্ব্ববৎ সভাপতির ভাষণ দেন মিঃ বিভার্লি। তিনিও গত বৎসরে হেনরি বেলের মত সমাজ-বিজ্ঞান সভার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিলেন। এই দিনের অধিবেশনে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "The Origin and Development of Caste' ('জাতি বিভাগের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ') সম্বন্ধে বেদ, মহাভারত, পুরাণাদি হইতে শাস্ত্র ও উদ্ধৃত প্রমাণ সহ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লইয়া সভায় খুবই আলোচনা ও বিতর্ক হইল। ইহাতে যোগদান করেন কে, ম্যাকলিয়ড, নবগোপাল মিত্র, কালীমোহন দাশ, হেনরি বেল এবং সহ-সভাপতি বিভার্লি।

পরবর্ত্তী অধিবেশনদ্বয়ে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। প্রথমটি ছিল—

"On Reformatory Schools and the proper classes of Juvenile Criminals to be subjected to reformatory treatment";

লেখক—সহ-সভাপতি এইচ. বিভার্লি।

২৩শে মে'র অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইল। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর মূলে ছিল ১৮৭৬ সনের পঞ্চম আইন—"The Reformatory Schools Act"। শিশু ও কিশোর অপরাধীদের জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। সমাজ-বিজ্ঞান সভার সদস্য মিঃ হীলি এই আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। ইহার কিছু রদবদল হইবার পর আইনটি পাস হইয়াছিল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা দীর্ঘ কারাবাসের যোগ্য অপরাধে অপরাধী হইলেও ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্ক কিশোরদের ম্যাজিষ্ট্রেট এই 'রিফর্মেটারি স্কুল' বা সংশোধনালয়ে পাঠাইবেন, আইনে এরূপ নির্দ্দেশ থাকে। দুই হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই ধরনের স্কুলে এক এক জনকে রাখিবার কথা হয়। আঠার বৎসরের উর্দ্ধ-বয়স্ক কাহাকেও এখানে থাকিতে দেওয়া হইত না। বিভার্লি উক্ত প্রবন্ধে আইনটির ব্যাখ্যা করিয়া, প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ইহা কতটা কার্য্যকরী হইয়াছে তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবৃতি দেন। ইহার আলোচনায় যোগ দেন এই দিনকার সভাপতি ডাঃ কেনেথ ম্যাকলিয়ড, শ্রীনাথ ঘোষ, জে. বি. নাইট এবং আশুতোষ বিশ্বাস।

তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধটি ছিল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ কেনেথ ম্যাকলিয়ড এই প্রবন্ধের রচয়িতা। এটি ছিল ভারতবর্ষে আত্মহত্যার হেতু এবং পরিসংখ্যান ("On the Cencus and Statistics of Suicide in India") সম্পর্কে। ডাঃ ম্যাকলিয়ড বিশেষ পরিশ্রম সহকারে এই বিষয়ে বিস্তর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া বক্তব্য প্রমাণার্থে প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করেন। এগুলি এ যুগেও বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে। প্রবন্ধের আলোচনায় যোগ দিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেনরি বেল,এইচ. বিভার্লি প্রভৃতি।

ইহার পর সমাজ-বিজ্ঞান সভার কোন রিপোর্ট বা রিপোর্ট-সম্বলিত ট্র্যান্‌জ্যাকশন্‌স পাই নাই। শেষ রিপোর্টটির তারিখ ২৯শে জুন ১৮৭৮। সমাজের বিবরণ ও প্রবন্ধসমূহ সাতটি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে যেসব তথ্যপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে তৎসম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাই পর পর করা হইল। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এবং সতসন্ধ নিষ্ঠাবান গবেষক এইগুলির মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ যুগের ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিতে সক্ষম হইবেন।



কারখানার সন্নিহিত পারিবারিক গীর্জ্জাঘর

হেলসিঙ্কিতে নিখিল বিশ্বশান্তি-সংসদের অধিবেশন

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী", ত্রেতাযুগে দুর্য্যোধনের এই সদম্ভ উক্তি ও অনমনীয় মনোভাবের ফলে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্রে যে মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠেছিল তার ফলে যুধ্যমান্ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে যুদ্ধশেষে মুষ্টিমেয় কয়জন রক্ষা পেয়েছিল, অর্থাৎ বিজয়ী পাণ্ডব কিংবা বিজিত কৌরব, দু'পক্ষেরই সর্ব্বনাশ ঘটেছিল। একই ভাবে হিটলারের আত্মম্ভরিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর ইউরোপের ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের বারুদের স্তূপে যে আগুন লাগিয়েছিল তারই বিশ্বব্যাপী লেলিহান শিখায় শুধু যে হিটলার-মুসোলিনীকেই আত্মাহুতি দিতে হ'ল এমন নয়—কত রাজা অতলে তলিয়ে গেল, কত সাম্রাজ্য ও রাজ্য ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল, কত লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধের অনলে পতঙ্গের মত পুড়ে মরল কিংবা দুর্ভিক্ষে এবং অনাহারে মরে মরণেরও অধিক যন্ত্রণার হাত এড়াল, কত মাতা পুত্রশোকে, কত পত্নী স্বামীশোকে হাহাকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল, কত শিশু অনাথ হ'ল, এমনকি যুদ্ধে বিজয়ী যারা তাদেরও ক্ষমতার সৌধ ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল! তবু ত ক্ষমতালোভীদের হুঁস নেই, এখনও তারা তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের ভয় দেখিয়ে প্রতিনিয়ত উন্নত, উন্নততর, এমনকি উন্নততম মারণাস্ত্রের আবিষ্কারের সাধনায় নিজেদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে 'ঠাণ্ডা লড়াই'য়ের মহড়ায় ব্যস্ত। কিন্তু এই ক্ষমতালিপ্স উদ্ধত মুষ্টিমেয় ক'টি লোকের চারিদিকে আছে অগণিত শান্তিকামী ও শান্তিপ্রয়াসী নরনারী, যারা যুদ্ধের নাম শুনলে আতঙ্কে শিউরে উঠে, যারা সত্যি সত্যিই মনে করে "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—তারা চায় বেঁচে থাকতে, বাঁচার মত বাঁচতে শুধু নিজেই নয়, সকলকে নিয়ে। স্বৈরাচারী বা যুদ্ধলিপ্সু—সে রাজাই হোক বা ডিক্টেটারই হোক, গণশক্তির কাছে চিরদিনই পরাজিত হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস, ফরাসীদেশের ষোড়শ লুই বা রুশদেশের দ্বিতীয় নিকোলাসের মুকুটশোভিত মস্তক যে ভাবে ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে, ঠিক সে ভাবেই নেপোলিয়ান, কাইজার উইলহেলম ও হিটলার-মুসোলিনীকে অপদস্থ এবং পর্য্যুদস্থ হতে হয়েছে জনগণের সংহত শক্তির পদতলে। তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন একদিকে চলছে ক্ষমতার উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আরও ক্ষমতালোভীদের নূতন মারণযজ্ঞের পাঁয়তারা, তখনই তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে দেশ-ধর্ম্ম-জাতিনির্ব্বিশেষে কোটি কোটি নর-নারীর সমবেত কণ্ঠে গগনভেদী চীৎকার—"শান্তি চাই, বিশ্বের শান্তি চাই, শান্তি চিরজীবী হোক।"

হেলসিঙ্কিতে বিশ্বশান্তি-সংসদের অধিবেশন—সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি নর-নারীর জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যের অভিব্যক্তিমাত্র। তাই সুদূরের ডাক যখন এল, শান্তিকামী অন্তর তখন সাড়া না দিয়ে থাকতে পারল না। যেতে হবে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি 'সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার' হয়ে হেলসিঙ্কিতে। যতদূর মনে

পড়ে হেলসিঙ্কির কথা খবরের কাগজে পড়েছি মাত্র তিনটি বার, একবার—বিধ্বস্ত রুশ সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন নতুন দেশরূপে ফিনল্যাণ্ডের জন্ম হ'ল তখন তার রাজধানী হ'ল হেলসিংফোর্ডস বা হেলসিঙ্কিতে। দ্বিতীয় বার—দ্বিতীয় মহাসমরের প্রথম অবস্থায় যখন ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্যারেলিয়ান প্রদেশ নিয়ে সোভিয়েটের ঝগড়া হ'ল তখন, আর তৃতীয় বার—যখন হেলিসিঙ্কিতে হ'ল অলিম্পিক ক্রীড়া সেই সময়। সেই দূর-দুরান্তরের দেশ হতে যখন



বিশ্বশান্তি-সংসদের প্রতীক্ শান্তকপোত'সহ পোষ্টার

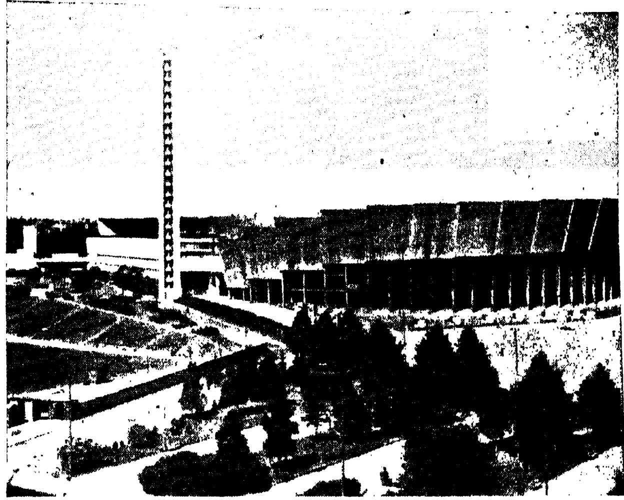
ডাক এল, রূপকথাচ্ছলে ঠাকুমা'রা যেমন দুরন্ত নাতিটিকে দৈত্য-দানব-মায়াবী প্রভৃতির ভয় দেখিয়ে 'সৌম্য-শান্ত' করে তুলতে চান, তেমনি শুভানুধ্যায়ীরা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে গম্ভীর ভাবে বললেন "যেয়ো না—যেয়ো না—ওটা জুজুবুড়ীর দেশ, ওরা মায়া জানে, শান্তির ছল করে ডেকে নিয়ে তোমাকে একেবারে লালে-লাল করে দেবে, না হয় একেবারে ভেড়া বানিয়ে তবে ছাড়বে।" কিন্তু দামাল ছেলেকে যেমন নিষেধের গণ্ডী দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না, কাল্পনিক জুজুবুড়ী বা লোহার মুখোশপরা দৈত্যদানবের ভয়ও আমাকে আটকে রাখতে পারে নি। আমি একটু হেসে তাদের কথার জবাব দিলাম "অচিন দেশের অজানা পথে পক্ষিরাজে চড়ে গিয়েই দেখি না, মানবন্তারূপ রাজকন্যা সেদেশে লৌহ-যবনিকার আড়ালে সত্যিই ঘুমিয়ে আছে, না বাঁধন ছিঁড়ে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের সুষমায় ও নৃত্য গানে সকলকে আনন্দ বিলিয়ে দিচ্ছে।"

ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় একশ'। সে যেন ছোট-খাটো একটি ভারতবর্ষ। ধুতিচাদর-পরা বাঙালী, শেরওয়ানী-পরা উত্তর ও মধ্যপ্রদেশবাসী, গোঁফদাড়িসহ বিশাল পাগড়ী-পরা শিখ, পাঞ্জাবীর উপর জহরকোট গায়ে গুজরাটী ও রাজস্থানী, ফোটা-তিলক-কাটা পাগড়ী-পরা এবং চাদর গায়ে মান্দ্রাজী, আবার টাই কলার-সুট-পরা ইউরোপীয় সাজেও অনেক, অর্থাৎ পরিধানের রকমারি; বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কেনারীজ, মরাঠী, গুজরাটী, গুরুমুখী সব ভাষাভাষী; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল ধর্ম্মাবলম্বী; কেউ বা নিরামিষাশী আবার কেউ বা সর্ব্বভুক, কেউ বা স্নান করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ না করে কিছুই খান না, আবার কারও কারও ধর্ম্মের কোন গোঁড়ামিই নেই —অর্থাৎ এক কথায় আসমুদ্র হিমাচলের সকল প্রদেশের সব রকম লোকের একত্র সমাবেশ। মহিলাদের সংখ্যাও দশ জন অর্থাৎ প্রায় এক-দশমাংশ। বাকী পুরুষ-প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ বিজ্ঞানী, কেউ ডাক্তার, কেউ লেখক, কেউ সাংবাদিক, কেউ চিত্রকর, কেউ গাইয়ে, কেউ বাদক, কেউ সমাজ-সেবক, কেউ অধ্যাপক, কেউ আলোক-চিত্রশিল্পী, কেউ ট্রেড ইউনিয়ন-প্রতিনিধি বা এম-পি, কেউ বা এম-এল-এ, আবার কেউ লেজিসলেটিভ এসেমব্লির স্পীকার, কেউ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ কংগ্রেসী, কেউ বামপন্থী, কেউ বা কম্যুনিষ্ট এমনি কত কিছু। এক কথায় আমাদের প্রতিনিধিদল শুধু সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র্যে ও অন্যান্য সকল রকমেই ছিল আমাদের বিরাট দেশের সম্পূর্ণ প্রতীক।

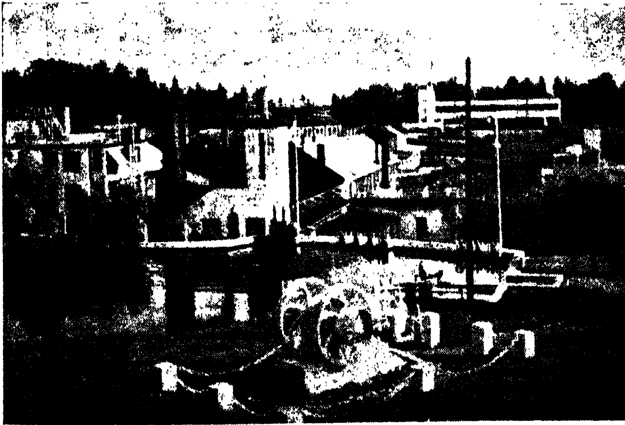
গোটা ভারতে সব বিষয়েই বাংলা দেশের যেমন বিশিষ্ট স্থান, এই ক্ষুদে ভারত অর্থাৎ প্রতিনিধিদলেও বাংলা দেশের অনেক খ্যাত-নামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কবি-দম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার নারায়ণ রায়, পশ্চিম বঙ্গীয় শান্তি কমিটির সম্পাদক কল্যাণ দত্ত, গায়ক ক্ষিতীশ বসু, ট্রেড ইউনিয়নের মহম্মদ ইলিয়াস, নীহার মুখুজ্জে প্রভৃতি। সুতরাং ডেলিগেশনে বাঙালীদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। আবার সর্ব্বভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য দলপতি অধ্যাপক কৌশাম্বী, মেজর জেনারেল সোখে, চল-চ্চিত্র ডিরেক্টর আব্রেয়ী (বোম্বাই), সর্ব্বভারতীয় শান্তি কমিটির সম্পাদক রমেশচন্দ্র ও তদীয় পত্নী, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বিধান সভার স্পীকার গোবিন্দ মেনন, মান্দ্রাজের ডাক্তার কৃষ্ণ পিল্লে এবং মধ্য-প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ভারুকা; আর মহিলা-প্রতিনিধিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বোম্বাইয়ের কপিলাবেন মেহতা, মঙ্গলা ভাগবত, সৌরাষ্ট্রের ডাক্তার মিসেস ভিগনে ও কানপুরের মিসেস কাপুর।

প্রতিনিধিদের সংখ্যার অনুপাতে আমাদের স্থান ছিল তৃতীয়।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে অধিবেশন, কাজেই সেখানকার প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল আমাদের তিন গুণ এবং তার পরে বিজ্ঞানী জোলিও কুরীর নেতৃত্বে ফরাসী প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল আমাদের দ্বিগুণ। ইটালী ও ফেডার্যাল জার্মান রিপাব্লিকের প্রতিনিধি-সংখ্যাও অনেকটা আমাদের কাছাকাছিই ছিল। তার পরে কানাডা, জাপান ও সুইডেনের প্রতিনিধিরা সংখ্যায় ছিলেন পঞ্চাশ হতে পঁচাত্তর জন এবং ত্রিশ থেকে পঞ্চাশসংখ্যক প্রতিনিধি এসেছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, ভিয়েৎনাম, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, আর্জেণ্টাইন, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, ব্রেজিল, গ্রেট ব্রিটেন, হল্যাণ্ড ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। দশ হতে কুড়ি জন করে প্রতিনিধি এসেছিলেন বৈষুব আফ্রিকা, আলজিরিয়া, বুলগেরিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, কোরিয়া, হাঙ্গেরী, ইন্দোনেশিয়া, ইস্রাইল, লেবানন, মেক্সিকো, মোঙ্গোলিয়া ও



বিশ্বশান্তি-সংসদের কার্য্যালয়। বাঁদিকে অলিম্পিক টাওয়ার



কোলোকোস্কি কারখানার বাহিরের দৃশ্য

সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হতে এবং এলবানিয়া, কিউবা, মিশর, পর্ত্তুগাল ও দক্ষিণ আফ্রিকা হতে এসেছিলেন পাঁচ হতে দশ জন। করে। আটষট্টিটি দেশ যোগদান করেছিল ঐ বিরাট সম্মেলনে। অতি বিসদৃশ ভাবেই কিন্তু সকলের চোখে প্রকট হয়ে উঠেছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্থান, তুরস্ক, ফিলিপাইন, শ্যাম ও সিংহল প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতি।

ভারতবর্ষ হতে ফিন্‌ল্যাণ্ড, এত দূরের পথ বলেই আমরা প্রায় যাট জন হেলসিঙ্কিতে বিমানযোগে পৌঁছেছিলাম ১৬ই জুন বিকেল-বেলা, অর্থাৎ সম্মেলনের পাঁচ দিন আগে। সে দিনটা ছিল মেঘলা এবং সমস্ত হেলসিঙ্কি ছিল ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, সেজন্য নামবার সময়ে আমাদের খুবই বেগ পেতে হয়েছিল এবং ক্রমাগত অবতরণের চেষ্টায় হেলসিঙ্কির এরোড্রোমের উপর ঘুরপাক খেতে খেতে আমাদের দলের অনেকেই কাবু হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমাদের শিখ ক্যাপ্টেনটি ছিলেন খুবই দক্ষ এবং তাঁরই কুশলতায় আমরা নিরাপদে অবতরণ করতে পেরেছিলাম সেদিন। প্রথমেই আমাদের সদলবলে 'বাসে' করে নিয়ে যাওয়া হ'ল বিশ্বশান্তি-সংসদের কার্য্যালয়ে। সেবারে যেখানে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়েছিল, সেই বিরাট ষ্টেডিয়ামের নীচে আপিস। সেখানেই আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান হ'ল ও চা-পানে পরিতুষ্ট করে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান, হেলসিঙ্কির প্রত্যন্তস্থিত অটানেমি স্থানে।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ত্রিতল তিনটি বড় বড় অট্টালিকা, সম্পূর্ণ নতুন তৈরী। এদেরই মাঝখানে যেটি, তাতে ভারতীয় ডেলিগেশনের বাসস্থানের বন্দোবস্ত হ'ল। হেলসিঙ্কিতে ছাত্রদের উপযুক্ত বাসস্থানের খুব অভাব ছিল, তাই টেক্‌নোলজির ছাত্রদের অধ্যবসায় ও চেষ্টায়ই নাকি ঐ হোষ্টেল ভবনগুলি সম্প্রতি নির্ম্মিত হয়েছে। দুটিতে অবিবাহিত ছেলেরা থাকে, আর একটিতে পত্নীসহ বিবাহিত ছেলেরা। গ্রীষ্মের ছুটির জন্য দুটি বাড়ী খালি ছিল, তাই



ফিনিশ রূপসীদের দেওয়া ফুলের তোড়া ও বেলুন হাতে শান্তিসংসদের প্রতিনিধিবৃন্দ

শুয়ে পড়তে হয়। হেলসিঙ্কিতে প্রথম রাত্রি ত মেঘলা ছিল; দ্বিতীয় রাত্রিতে শুয়েছি রাত বারটায়, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখি ঘরে বেশ খানিকটা রোদ এসে পড়েছে। মনে হ'ল, হয় ত বা সকাল আটটা, তাই এত রোদ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও ঠিক চারটে বাজে নি। সন্দেহ হ'ল হয়ত বা দম না দেওয়াতে ঘড়ী বন্ধ হয়ে গেছে—কিন্তু তাকিয়ে দেখি যে, সেকেণ্ডের কাঁটা ঠিক ঘুরে ঘুরেই চলেছে। প্রোফেসার সাহারও ঘুম ভেঙে গেছে, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "ক'টা বাজে?" যখন উত্তর পেলাম চারটে বাজতে তখনও পাঁচ মিনিট বাকী, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পাশ ফিরে অসমাপ্ত নিদ্রাকে চোখের উপর টেনে নিলাম।

১৭ই জুন হেলসিঙ্কি হোটেলে আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানকার খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মিলিত হলেন। সেদিন বোম্বাইয়ের প্রোফেসার কোশাম্বী সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমাদের নেতা নির্ব্বাচিত হলেন এবং নয় জন প্রেসিডিয়ামের জন্য মনোনীত হলেন। আবার বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমতের খসড়া তৈরির জন্য আমরা নিজেদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার কাজেও নিজেদের নিয়োজিত করলাম। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছবামাত্রই তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যও আমাদের কয়েকজন নিযুক্ত হলেন। ১৮ই তারিখে ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিরা আমাদের আমন্ত্রণে আমাদের শিবিরে এসে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে তাঁদের সমস্যা ও প্রস্তাবগুলি আমাদের জানিয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লো ভ্যান হাক্ (থাইমিওর স্বায়ত্ত-শাসন পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট) এবং ন্যাশনাল এসেমব্লির সভ্য লে দীন থাম ও লে হুই ভ্যান। তা ছাড়া ছিলেন একজন অল্পবয়স্কা মহিলা, যিনি দ্যা বিয়েন ফুর যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই ভদ্রমহিলাটি সর্ব্বদা যেভাবে তাঁদের জাতীয় জবড়জং পোশাক ও অলঙ্কার পরে বের হতেন, তাতে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

সেখানেই হয়েছিল আমাদের থাকবার ব্যবস্থা। আমাদের আগেই কানাডার ডেলিগেশন এসে একাংশে ছিলেন, তার পর দু' এক-দিনের মধ্যে এসে উঠলেন চীন, ভিয়েৎনাম, জাপান, কোরিয়া ও জার্মান প্রতিনিধিদল। ছোট ঘরগুলিতে দু'জনের থাকার ব্যবস্থা, আর বড়গুলিতে চার জনের। তা সত্ত্বেও একটি বড় ঘরেই প্রফেসার সাহা ও আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হ'ল, সে ঘরে বাকী দুটি শয্যা খালি পড়ে রইল।

হোস্টেলগুলি হতে কিছু দূরে একটু উঁচু স্থানে ছেলেদের যে ভোজনালয় (Canteen) ছিল, তাতে কুপন-বিনিময়ে আমাদের তিন বেলায় 'বুফে' প্রথায় খাওয়ার ব্যবস্থা; অর্থাৎ বড় ট্রে করে থরে থরে সাজানো খাবার-ভরতি পাত্র হতে ইচ্ছামত জিনিস তুলে নিয়ে অদূরবর্ত্তী টেবিলে বসে খেতে হবে; টেবিলে ঘুরে ঘুরে পরিবেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। খাদ্যের মধ্যে রুটি, ডিম, দুগ্ধজাত খাদ্য, যেমন ঠাণ্ডা দুধ, মাখন, পনির, দই ও ঠাণ্ডা মাংসেরই প্রাচুর্য্য। আলু, শশা আর টম্যাটো ছাড়া কোন তরিতরকারি নেই, ভাত ও মাছ কালে-ভদ্রে মেলে; ফল একেবারেই নেই। পানীয় রূপে জলের বদলে মনারেল ওয়াটার, লেমনেড, ফলের রস কিংবা দুধ, সাদামাটা জল-পানের কোন রেওয়াজ বা বন্দোবস্ত নেই। সকালবেলা সাতটা থেকে নয়টা পর্য্যন্ত প্রাতরাশের, অপরাহ্ণে বারটা হতে দুটা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন-ভোজন ও সন্ধ্যা ছয়টা হতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত সান্ধ্য ভোজনের সময়। সান্ধ্য ভোজন যদিও তার নাম, তবু সন্ধ্যার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, কেননা জুন মাসে হেলসিঙ্কিতে সন্ধ্যা বা রাত্রি কিছুই হয় না। রাত্রি বারোটাতেও রোদ থাকে। আর ভোর চারটাতেও রোদ খাঁ খাঁ করে। বড় বড় কাচের জানালার উপর পুরু পর্দ্দা টেনে দিয়ে রাত্রি মনে করে বিছানায়

সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার আগে ক'দিনই আমাদের নিকট ফিন্-ল্যাণ্ডের নানা স্থান হতে সাদর আহ্বান আসছিল বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্ত্তার জন্য। আমরা প্রায়ই দু'তিন জন একত্র হয়ে হেলসিঙ্কির কাছে বা দূরে, কখনও চাষী-দের কাছে, কখনও শ্রমিকদের কাছে, আবার কখনও-বা হাস-পাতাল কিংবা স্কুলে জনসাধারণের সভায় বক্তৃতা করতে যেতাম। অবশ্য সে দেশের ভাষা না জানাতে, দোভাষীর সাহায্যেই আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হ'ত। ফিন্ল্যাণ্ডবাসীরা সর্ব্বত্রই আমাদের

প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাত এবং আমাদের দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে অনেককিছু জানতে চাইত। তার পর খাইয়ে-দাইয়ে, নাচ-গানে আমাদের তুষ্টিবিধান করে এবং সময়ে সময়ে আমাদের এটা সেটা উপহার দিয়েও আমাদের প্রতি হৃদ্যতা ও সৌজন্য দেখাত। এমনি আহ্বান পেয়ে একদিন আকোলার ডাক্তার শা, সৌরাষ্ট্রের লেডী ডাক্তার মিসেস ভিগনে ও আমাকে যেতে হয় হেলসিঙ্কি হতে প্রায় বাট মাইল দূরে। বেলা প্রায় এগারটায় এক জন দোভাষিণী মহিলাসহ আমরা তিন জন রওনা হয়ে প্রথমে গিয়ে পৌঁছলাম পাগলদের একটি হাসপাতালে। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড ও ফুলের বাগানে-ঘেরা প্রাসাদোপম তিনতলা বিরাট হাসপাতালটি, তাতে প্রায় ছ'শ রোগীর জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে—বাগান হতে আরম্ভ করে, হাসপাতালের ঘরগুলির মেঝে, দেওয়াল, ছাদ, শয্যা, আসবাবপত্র সবকিছুই। আর রোগীদের চিকিৎসা শোয়া-বসা, খেলাধুলা, কাজকর্ম সবকিছুরই কি সুবন্দোবস্ত! হাঁ, পাগলেরও খেলাধুলা এবং কাজকর্মের বন্দোবস্ত আছে বৈ কি? আমাদের দেশে পাগলাগারদে যেমন তাদের আটকে রাখতে হয়, সেখানে তেমন পাগল কাউকে দেখতে পেলাম না—বরং দেখলাম সকলেই কিছু না কিছু করছে। কেউ সেলাইয়ের কাজ করছে, কেউ তাঁতে কাপড় বুনছে, কেউ ছবি আঁকছে, কেউ-বা খেলাধুলা করছে; এমনি কত কিছু! দুপুরবেলা হাসপাতালের অধ্যক্ষের বাড়ীতে আমাদের সম্মানার্থে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল, তাতে হাসপাতালের সকল ডাক্তার, সিষ্টার এবং নার্সদেরও নিমন্ত্রণ ছিল। তার পর যখন আমরা বিদায় নিলাম তখন হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের পাগল রোগীদের দ্বারা তাঁতের তৈরী ক'খানি টেবিলের ঢাকনি পর্য্যন্ত আমাদের উপহার দিয়ে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন।

সেখান হতে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম কেলোকোস্কি নামক স্থানে একটি পিতল ও লোহার দরজার হাতল, কব্জা প্রভৃতির কারখানায়। কারখানার মালিক, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর-বয়স্ক ভদ্রলোক, আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখালেন—ওগুলি তৈরির প্রথম স্তর হতে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত, ইলেকট্রোপ্লেট হয়ে ঝকঝকে হওয়ার স্তর পর্য্যন্ত। মালিক যখন আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তখন কারখানার কর্ম্মীরা সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে, আর ভদ্রলোকটি তাদের অনেকের সঙ্গেই হৃদ্যতার সহিত কথা বলছেন। কখনও তাদের নিজেদের সম্বন্ধে, আবার কখনও-বা তাদের ছেলেপুলের কুশলপ্রশ্নও জিজ্ঞেস করছেন। আমাদের দেশে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এ রকম হৃদ্যতার সম্পর্ক বিরল। আমরা ওখানে থাকতে থাকতেই কারখানা বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল; এক মুহূর্ত্তে অত বড় শব্দমুখর বিরাট কারখানা যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে একেবারে চুপ হয়ে গেল। কর্ম্মীরা একে একে বেরিয়ে যেতে যেতে আবার মালিকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে হাসিমুখে দিনের শেষে বিদায় নিলেন। তখন তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁদের পারিবারিক ছোট গীর্জ্জায় এবং সেখানে সান্ধ্য (?) উপাসনা সেরে দর্শকদের নামের বড় খাতায় আমাদের নাম সই করিয়ে তার পর নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে। সেখানে তার প্রকাণ্ড বাগান, মৌমাছির চাষ প্রভৃতি দেখালেন এবং বাগানে নানারকম অবস্থায় আমাদের ছবি নিলেন। তার পর চা-যোগ পর্ব্ব! বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আমাদের



অধিবেশন-কালে সম্মেলন-মণ্ডপে উপবিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ

উপহার দিলেন একটি করে ছোট পিতলের হামানদিস্তা আর এক কৌটা করে নিজের মৌমাছির চাকের মধু। আর অবিভক্ত ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র বের করে স্মারক চিহ্নরূপে তার নীচে কিছু লিখে দিতে যখন অনুরোধ করলেন, তখন আমি দ্বিজেন্দ্রলালের অমর কবিতার চারটি পংক্তি বাংলাতে লিখে দিলাম।

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,
বন্দিল সবে জয় মা জননী, জগজ্জননী-জগদ্ধাত্রী।"

তার পরে আমরা গেলাম ঐ কারখানারই কয়েকজন শ্রমিকের আমন্ত্রণে তাদের বাড়ীতে। একটু আগে যারা সারা অঙ্গে কালিঝুলি মেখে কারখানায় কাজ করছিল, তাদের আর তখন চেনবার জো নেই, কারণ তখন তারা স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ-বা খেলাধুলা করছে। তাদের বাসস্থানগুলিও চমৎকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো গুছানো। শয়নঘর, ড্রয়িংরুম, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর সবই

তকতকে ঝকঝকে ও পরিপাটি ভাবে সাজানো—আমাদের দেশের তথাকথিত বড়লোকদের বাড়ীতেও এরকম পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা অনেক সময় দেখা যায় না। আমরা ফিনল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র সাধারণ গৃহস্থ এবং চাষীদের ঘরেও ঐরূপ পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য দেখেছি। তার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল শ্রমিকদের থিয়েটার হলে প্রায় তিন শ' লোকের এক সভায়। সেখানে তাদের ইউনিয়নের নেতা আমাদের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে ছোটখাটো বক্তৃতায়



সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ

আমাদের সাদর সংবর্দ্ধনা জানালেন—আর আমাকেও প্রতিনিধিদের পক্ষ হতে তার যথাযোগ্য উত্তর দিতে হ'ল। তার পর অনেকেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলে এবং আমরাও তার জবাব দিলাম। শেষে ষ্টেজের উপর স্থানীয় গণ-নৃত্য ও সঙ্গীত প্রায় দেড় ঘণ্টা উপভোগ করে আমরা তাদের নিকট বিদায় নিয়ে মোটরে উঠলাম। এ ভাবেই প্রতিদিন নানা স্থানে ফিনল্যাণ্ডবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আমাদের হয়েছিল।

২২শে জুন সকালবেলা দশটায় সম্মেলন আরম্ভ হবে। ষ্টেডিয়ামের অনতিদূরবর্ত্তী ম্যানারহিম্ ষ্ট্রাসের উপর মেস্সুহাল্লির বিরাট প্রদর্শনী-কক্ষে অধিবেশন। আমরা সেখানে যেতে যেতে দেখলাম—সারা ম্যানারহিম রাস্তাটিতে, পৃথিবীর যত জাতির জাতীয় পতাকা আছে সেগুলোর একত্র সমাবেশ—রাস্তার একপাশে পর পর তিনটি তিনটি একত্র জড়াজড়ি করে সগর্ব্বে আকাশে উড়ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম—সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ ও ফিনল্যাণ্ডের পতাকা একে অন্যকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করছে! তার পর বেলা প্রায় সাড়ে নয়টায় অধিবেশন-গৃহে ঢুকে দেখি বিরাট জনসমুদ্র—সম্মেলনের এ রকম বিরাটত্ব কল্পনাও করতে পারি নি। প্রবেশদ্বারের উল্টোদিকে সুউচ্চ প্রেসিডিয়ামের গ্যালারি, তাতে দু'শ প্রতিনিধির বসবার স্থান; পশ্চাতে নীল পর্দ্দার উপর "বিশ্বশান্তি-সম্মেলন" সাদা অক্ষরে লেখা; আর শেষ সারির কাছে একটি উঁচু পাইনগাছ (শান্তির প্রতীক) সমূলে উপড়ানো অবস্থায় ওখানে রোপিত হয়েছে। সম্মুখে চার সারিতে দু'হাজার প্রতিনিধির বসবার স্থান। সকলের বাঁয়ের সারিতে প্রথমেই চীন এবং তার পরেই ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর স্থান। আমাদের ডান সারিতে প্রথমে সোভিয়েট এবং তার পেছনের অংশ জাপানের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। এক একটি খণ্ড সারিতে দশ দশটি করে আসন—আর তার সামনে ডেস্কে কানে লাগাবার যন্ত্র, যার প্লাগ যথাযথ সকেটে বসালে, ফিনিশ, রাশিয়ান, ইংরেজী, চীনা, জাপানী কিংবা ফরাসী যে-কোন ভাষায় বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যায়। মণ্ডপগৃহের উপরে এবং চারদিকের দেয়ালে বসানো আছে মাইকের বাক্স, আর ছাদ হতে ঝুলছে অসংখ্য উড়ন্ত কাগজের শান্তি-কপোত। দেয়ালের গায়ে লাল শালুর উপর নানা দেশের ভাষায় বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা আছে "বিশ্বশান্তি-সম্মেলন।"

"নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্"—সেই মহামিলনের দৃশ্যই দেখছি পৃথিবীর শান্তিকামী জনগণের এই সম্মেলনে। কারও কারও অতি জবড়জং বেশ—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট দেশের দু'জন ধর্ম্মযাজক, আরবের প্রতিনিধিগণ, ভিয়েৎনামের কয়েকজন মহিলা, বুলগেরিয়ার কয়েকজন কৃষক প্রতিনিধি। আর রকমারিতে ভারতীয় প্রতিনিধিরাই বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী; শুধু ভারতীয় মহিলাদের রঙীন শাড়ীর বাহারই নয়, রাজেন্দ্র সিং-এর দাড়ি ও পাগড়ী, রামকৃষ্ণ রাওয়ের সাদা পাগড়ী, আর্টিষ্ট হোসেনের দাড়ি, মুক্তিলাল মোদী, সুশীল রায় ও গুজরাটী পণ্ডিতের ধুতিসহ ভারতীয় পোশাক—কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব? চোখে দেখা যাচ্ছে বিরাট জনতার সমাবেশ, কানে ভেসে আসছে নানা ভাষার মৃদু গুঞ্জন, আর এখানে ওখানে প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে জাতীয় পোশাকে সুবেশা পরিচারিকারা, এমনি সময়ে ঠিক বেলা দশটার সময়ে সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হ'ল। প্রেসিডেণ্ট জোলিয়ো কুরী অসুস্থ শরীরে, চিকিৎসকের নিষেধসত্ত্বেও হেলসিঙ্কিতে ছুটে এসেছিলেন। তাঁরই সভাপতিত্বে প্রথম দিনের কার্য্য আরম্ভ হ'ল।

প্রথমেই সম্মেলনের সেক্রেটারী মশিয়ে জঁ লাফিত সমবেত প্রতিনিধিদের সংবর্দ্ধনা জানালেন একটি ছোটখাটো বক্তৃতায় এবং ফিনল্যাণ্ডের পক্ষ হতে উসিমার প্রদেশের গবর্ণর মঁশিয়ে ভাইনো মেলতিও প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে সম্মেলনের সাফল্য-কামনা করলেন। তারপর বিশিষ্ট ব্যক্তি—যাঁরা আসতে পারেন নি, তাদের বাণী পড়া হ'ল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেলজিয়মের রাণী এলিজাবেথ, গ্রেট ব্রিটেনের মনীষী লর্ড রাসেল, ভারতের রামেশ্বরী নেহরু, ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হেরিয়ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেভারেণ্ড ওয়ালটার মিচেল প্রভৃতি। তার পরই সভাপতি জোলিয়ো কুরী তার জোরালো অভিভাষণে, তৃতীয় বিশ্বসমরে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগে পৃথিবীর বুকে কি দারুণ দুর্দ্দৈব নেমে আসতে পারে তার ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে এখনই সময় থাকতে পৃথিবীর শান্তিকামী জনমতকে সংগঠিত করে পৃথিবী ও বর্ত্তমান সভ্যতাকে রক্ষার

জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। সেদিন ঐ পর্য্যন্ত হয়েই মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য অধিবেশনের বিরতি হ'ল।

অপরাহ্ণে আর একজন সভাপতি হলেন এবং নানা দেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ একে একে শান্তির আবশ্যকতা ও কিভাবে তা সম্ভবপর হবে সে সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করতে লাগলেন। শান্তি-প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতের, বিশেষতঃ আমাদের প্রধান-মন্ত্রীর প্রশংসা সকলের মুখে ধ্বনিত হতে লাগল—আর ঐ প্রচেষ্টায় চৌ-এন্-লাই ও নেহরুর 'পঞ্চশীল' যে একটি অতি নির্ভরযোগ্য উপায় সকলেই একবাক্যে তা বলতে লাগলেন—ঐ সঙ্গে নেহরু-বুলগানিন চুক্তির উল্লেখেও বার বার সম্মেলনের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত করতালিধ্বনিতে আলোড়িত হতে লাগল। সোভিয়েট, চীন, জাপান, কোরিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইস্রাইল, মেক্সিকো, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, সিরিয়া, আলবেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর বহু দেশের প্রতিনিধিদের মুখে শান্তির জন্য ভারতের প্রচেষ্টার অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনে আনন্দে ও গর্ব্বে আমাদের বুক ফুলে উঠছিল! আমাদের নেতা প্রফেসার কৌশাম্বীও সেদিন অপরাহ্ণে বক্তৃতা করলেন।

পরদিন সকালবেলার অধিবেশনে আমাদেরই মেজর জেনারেল সোখে ছিলেন সভাপতি। এমনি ভাবে সম্মেলনের কার্য্য এগিয়ে চলতে লাগল। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নানা দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে হতে লাগল হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন ও ভাবের আদান-প্রদান। প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট স্থান বলে আর কিছু রইল না। গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতীর সঙ্গমে যেমন প্রয়াগ মহাতীর্থ তেমনি কিছু তৈরী হ'ল, যখন নানা দেশের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করে মিশে গেলেন অন্যান্য দেশের প্রতিনিধির দলে। শুধু ভাবের আদান-প্রদান নয়, বাস্তব জিনিষের উপহারও চলল সঙ্গে সঙ্গে। কবির কথায় 'দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না ফিরে', হেলসিঙ্কির মহামানবের সাগরতীরে অধিবেশনের ক'দিনই তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল!

ডাক্তার, লেখক, বিজ্ঞানী, শিল্পী প্রভৃতির মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের ভাবের ও সখ্যের আদান-প্রদান ত চলছিলই, তারও মাঝে মাঝে আবার চলছিল ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পে প্রতিনিধিদের পারস্পরিক সাদর আমন্ত্রণ। একদিন রাত্রিতে কোরিয়ার প্রতিনিধিদল এসেছিলেন আমাদের শিবিরে, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চলল গানবাজনা। আর একদিন অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের ক্যাম্পে ছিল সুদূর প্রাচ্যের সকল দেশের, অর্থাৎ কোরিয়া, চীন, জাপান, ভিয়েৎনাম, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া সহ আমাদেরও নিমন্ত্রণ। সেখানে চা খাওয়ার পর সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে চক্রাকারে হাতে হাত মিলিয়ে নাচ ও গানের পর হ'ল মিতালির শেষ। একদিন জার্ম্মান দূতাবাসে ছিল আমাদের নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ। আর সকলের চেয়ে মনে করে রাখবার মত—পঞ্চশীলের বাৎসরিক স্মরণোৎসব দিনে চীনা প্রতিনিধিদের দ্বারা আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজে আপ্যায়ন। তাদের অন্তরঙ্গতার বিনিময়ে আমরাও সেদিন তাদের সকলের গলায় প্রীতির মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলাম।

ফিনল্যাণ্ডবাসীরাও প্রীতিনিবেদনে পিছিয়ে ছিল না। ২৪শে জুন ছিল তাদের জাতীয় উৎসবের দিন। রাত্রি বারটার সময়—তখনও দিনের আলো, পার্কে পার্কে বহ্নি-উৎসব, আকাশে ছোড়া হ'ল আতশবাজি, নাচ গান হ'ল সারারাত্রি ধরে। প্রতিনিধিরাও তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। ২৭শে তারিখ সন্ধ্যায় অধিবেশনের



ভারত এবং চীনের, তথা বিশ্বের মৈত্রী ও শান্তির প্রতীক্ 'পঞ্চশীল'

পর হেসপেরিয়া পার্কে হ'ল সম্মেলনের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার জন্য ফিনল্যাণ্ডবাসীদের উৎসব। সমস্ত পার্কটি লোকে লোকারণ্য, মনে হ'ল লাখখানেক লোক জড়ো হয়েছে সেখানে! প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট সরু পথ, তার চারদিকে জনতা, কিন্তু মোটেই বিশৃঙ্খল নয়—চিত্রার্পিতের মত সবাই দাঁড়িয়ে। এক একটি প্রতিনিধিদল যাচ্ছে আর দু'লাখ হাতের করতালি তাদের সংবর্দ্ধনা জানাচ্ছে! পার্কের মধ্যে একদিকের গ্যালারিতে প্রতিনিধিদের বসবার স্থান; অন্যদিকে জাতীয় পোশাকে সজ্জিতা হয়ে, হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে বসে আছে অসংখ্য সুবেশা বালিকা ও যুবতী। ঠিক আটটার সময় হেলসিঙ্কির মেয়র আমাদের স্বাগত করলেন। তার পরেই হ'ল জাতীয় সঙ্গীত—এক লাখ লোক সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠল সে গান, আর সে সুর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গান শেষে হ'ল রাশীয়

ধ্বনি আর একসঙ্গে ওদিক হতে সুবেশাগ্না হাতে ফুলের তোড়া, ও রঙীন বেলুন নিয়ে ছুটে এল প্রতিনিধিদের গ্যালারীর দিকে। মুহূর্ত্তে তাদের হাতের ফুলের গুচ্ছ ও বেলুনগুলি স্থান পরিবর্ত্তন করলে আমাদের হাতে, আর রিক্ত হাতে খুশীমনে তারা ফিরে গেল নিজেদের স্থানে। তার পর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলল গান-বাজনা। সে অভ্যর্থনার দৃশ্য এখনও আমাদের স্মৃতিপটে জীবন্ত হয়ে আছে। তার পর আমাদের অটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য সে দেশীয় বালক-বালিকাদের কি ভিড়—সকলের হাতেই খাতা আর পেন্সিল; প্রতিযোগিতা চলছে কার খাতায় কত বেশী স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে তা নিয়ে।



টোরষ্টেন কার্লেণ্ডারের ভবনে লেখক (বাঁদিকে)

এখন, সম্মেলনের কার্যসূচীতে ফিরে আসা যাক। ২৪শে তারিখ সকালবেলায়ই আমরা ভাগ হয়ে গেলাম সাতটি শাখায়—যথা: (১) সমর প্রস্তুতি হ্রাস ও আণবিক অস্ত্র, (২) সামরিক জোট ও নিরাপত্তা, (৩) পরনিরপেক্ষ স্বাধীনতা ও শান্তি, (৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা, (৫) সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, (৬) শিক্ষা ও যৌব সমস্যা এবং (৭) শান্তি-প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতি, ধর্ম্ম ও রাজনীতি নির্ব্বিশেষে সকলের সহযোগিতা। ঐ দিনই ফরাসী দেশের জাতীয় সম্মেলনের অবৈতনিক সভাপতি মশিয়ে এডোয়ার্ড হেরিয়ট সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বিশ্বশান্তি-সংসদের পরবর্ত্তী অবৈতনিক সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন।

প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বনবিভাগের হলগুলিতে শাখা অধিবেশনগুলি হ'ত। প্রথম শাখায় আমারই প্রস্তাবক্রমে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। প্রথম দিন মূল সভাপতি জোলিও কুরীও সে অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এ শাখার অধিবেশনেই জাপানী প্রতিনিধিগণ, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ফলে এবং বিকিনি দ্বীপের কাছাকাছি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের দরুন মৎস্যশিকারী জেলেদের যে ভয়াবহ অবস্থা ঘটেছে, তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ পেশ করে আণবিক অস্ত্র যাতে নিষিদ্ধ হয় তার জন্য বহু তথ্যপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করলেন। এ আলোচনাকালে এক জন জাপানী বিজ্ঞানীর সঙ্গে রুমানিয়ার এক জন প্রতিনিধির কিছু কথাকাটাকাটি হলেও তা মিটে যায় অন্যদের মধ্যস্থতায় তাদের সাদর করমর্দ্দনে। আবার লর্ড রাসেলের হয়ে ওকালতি করার জন্য একজন সুইডিশ প্রতিনিধির কথার জবাবে বিশিষ্ট রুশ প্রতিনিধি, ইউক্রেনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও বিখ্যাত নাট্যকার কর্নিচুক, ধীর ও গম্ভীর ভাবে যে দৃঢ় অথচ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন, এখনও তা কানে বাজছে। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কর্নিচুক বলেন, "অথচ আমরা ভুলে গেছি যে, এই লর্ড রাসেলই কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডের লর্ড সভায় বলেছিলেন যে মস্কোর উপর এটম বোমা ফেলা হোক। তবু আমরা সেকথা মনে রাখি নি, কেননা আজ তিনি তার মত পরিবর্ত্তন করেছেন, এটাই আমাদের আনন্দের কথা!" সমগ্র অধিবেশনে সোভিয়েট প্রতিনিধিরাই কথা বলেছেন সবচেয়ে কম, অথচ তাঁদের মধ্যে একাডেমী অব সায়ান্সের প্রেসিডেণ্টসহ একাডেমীর কয়েক জন সভ্য, বড় বড় রাজনীতিক, লেখক প্রভৃতি ছিলেন। আবশ্যক না হলে কথা না বলাই ছিল তাঁদের বিশেষত্ব। পারমাণবিক অস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে, গ্রেট ব্রিটেনের আণবিক বিজ্ঞানী বার্নাল, আর্ণট প্রভৃতির সঙ্গে আমাদেরও একটু মতভেদ ঘটেছিল। অধ্যাপক সাহার অনুরোধে আমাকেই প্রকাশ্য অধিবেশনে খসড়া প্রস্তাবের মোলায়েম ভাষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে হয়। এ নিয়ে বাদপ্রতিবাদের ঝড় ওঠাতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছিল বলে প্রস্তাবটির ভাষার একটু আধটু অদলবদলে রূপান্তরের পর, শেষে প্রস্তাবটির খসড়া এ ভাবে হয়: "এই বিশ্বশান্তি-সংসদ পৃথিবীর সকল দেশকে অনুরোধ করছে যে তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ক্রমশঃ সমরসজ্জা হ্রাস ও পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে প্রস্তুত—এরূপ ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে পারমাণবিক তথ্যসমূহ পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানীদের নিকটও প্রকাশ করা হোক।" এ ভাবেই প্রকাশ্য অধিবেশনেও প্রস্তাবটি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এ ছাড়া শাখাগুলির দ্বারা রচিত বিভিন্ন প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। সময়াভাবে শেষের কয়েকদিন সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশন অহোরাত্র চালাতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে লোকের ক্লান্তিবোধ বা উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি। ২৯শে তারিখ সন্ধ্যায় সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ঐ দিনই দুপুরবেলায় সোভিয়েট একাডেমী অব সায়ান্সের বিশেষ আমন্ত্রণে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মস্কোতে যে পারমাণবিক শক্তি-সম্মেলন হবে, তারই ডেলিগেট রূপে অধ্যাপক সাহা ও আমাকে বিমানযোগে হেলসিঙ্কি থেকে মস্কো যাত্রা করতে হয়েছিল। সুতরাং শেষ মুহূর্ত্তে মর্ম্মস্পর্শী বিদায়ের ক্ষণে আমরা উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম।

হেলসিঙ্কিতে বিশ্বশান্তি-সম্মেলনের প্রভাব ও সাফল্য কতটুকু তা আমরা ঐ দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েই বুঝিলাম—যখন দেখতে পেলাম, শান্তিপ্রিয় ও শান্তিকামী সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ মাত্র কয়েক

দিনের ব্যবধানে আমাদের সামনে হেলসিঙ্কির প্রস্তাব অনুসারে পারমাণবিক তথ্যের সকল গোপনীয়তার রুদ্ধ দ্বার খুলে ধরলেন। জেনেভার চতুঃশক্তি সম্মেলনে আপোষমূলক মনোভাবের মূলেও যে হেলসিঙ্কির বিশ্বজনমতের প্রভাব নেই, এমন বলা যায় না। তার পরই জেনেভার পারমাণবিক শক্তি সম্মেলনে শুধু সোভিয়েট নয়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এমনকি আমেরিকার পর্যন্ত শান্তিমূলক উন্নয়ন-কার্যে পারমাণবিক শক্তির নিয়োগে ঐক্যমত্যের মূলেও যে হেলসিঙ্কির বিরাট সম্মেলনের প্রভাব রয়েছে, তাও নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাই বিশ্বজন-কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি, "বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, বিশ্ব-শান্তি চিরঞ্জীবী হোক।"

শস্য-বপন

এপ্রিল মাস

(চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আউশ ধান—(রোয়া) দোআঁশ ও এঁটেল দোআশ মাটিতে জন্মে, ৬ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল হয় ; একরপ্রতি ১২।১৫ সের বীজ লাগে ; একরপ্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

আউশ ধান—(বোনা) দোআঁশ ও এঁটেল দোআশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়। একরপ্রতি ১ মণ বীজ লাগে ; একরপ্রতি ১৫ ২০ মণ ফলন হয়।

আমন ধান—(বোনা) এটেল দোআশ ও এটেল মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে ফলন হয়, একরপ্রতি ২৫।৩৫ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ২০।৩০ মণ ফলন হয়।

ভুট্টা বা জনার—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দোআশ মাটিতে জন্মে—১৮ ইঞ্চি অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ১৮ ইঞ্চি অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফলন হয় ; একরপ্রতি ৬ ৯ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৬।৯ মণ ফলন হয়।

জোয়ার—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দোআশ মাটিতে জন্মে। বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় ; ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফলন হয়। একরপ্রতি ৬।৯ সের বীজ লাগে ; একরপ্রতি ৫।৯ মণ ফলন হয়।

কাওন—উচু বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে। বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় ; ২৷-৩ মাস পর ফলন হয়। একর প্রতি ৩ ৫ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৪।৬ মণ ফলন হয় ; ইহার খড় গরুকে খাওয়াইতে পারা যায়।

ঢেড়শ—দোআশ মাটিতে জন্মে। ২ ফুট হইতে ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফলন হয়, একরপ্রতি ৩-৪৷৷০ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ৬০।৮০ মণ ফলন হয়।

সয়াবীন বা গৌরীকলাই—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে। বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি হইতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ১০।১২ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ১০।১২ মণ ফলন হয়।

বরবটি—এটেল ও দোআশ মাটিতে জন্মে। বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল হয়। একরপ্রতি ১৮।২০ সের বীজ লাগে ; একরপ্রতি ৮।১০ মণ ফলন হয়। পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

বেগুন—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দোআশ মাটিতে জন্মে। আশুজাতীয়ের চারা চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ৩ ফুট অন্তর লাইনে ২৷৷০ ফুট রোপণ করিতে হয়। শ্রাবণ মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ইহার ফলন হয়। একরপ্রতি ৪।৬ ছটাক বীজ লাগে ; একরপ্রতি ১০০ ১৫০ মণ ফলন হয়।

কুমড়া—দোআশ মাটিতে জন্মে ; ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, ৩.৪ মাস পরে ফসল হয়। একরপ্রতি ৵৷৷০-৵৷০ সের বীজ লাগে ; একরপ্রতি ১০০।১৫০ মণ ফলন হয়।

চিচিঙ্গা—দোআশ মাটিতে জন্মে ; ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। ৩।৪ মাস পরে ফসল হয় ; একরপ্রতি ১-১৷৷০ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ৯০।১০০ মণ ফলন হয়।

চালকুমড়া—দোআশ মাটিতে জন্মে ; ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। ৩।৪ মাস পরে ফসল হয় ; একরপ্রতি ১-১৷৷০ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ১০০।১৫০ মণ ফলন হয়।

করলা—দোআশ মাটিতে জন্মে : ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয় ; ৩ মাস পরে ফসল হয়। একরপ্রতি ৵৵-১ সের বীজ লাগে : একরপ্রতি ৯০।১০০ মণ ফলন হয়।

কাঁকরোল—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে। ইহা সাধারণতঃ কন্দ হইতে জন্মায় ; ৩।৪ মাস পরে ফসল হয়। একরপ্রতি ৯০।১০০ মণ ফলন হয়।

ঝিঙ্গা—(পালা) বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে. ৪।৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। ২।৩ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ১৷-২ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ১০০।১৫০ মণ ফলন হয়।

কাঁকড়ি—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে ; ৪.৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বর্ষায় ফসল হয়। একরপ্রতি ৮।১২ ছটাক বীজ লাগে। একরপ্রতি ৮০।১০০ মণ ফলন হয়।

চুকারী—দোআশ মাটিতে জন্মে। ৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। ৫ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৩।৪ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ৪৫।৫০ মণ ফলন হয়।

মেটে আলু বা চুবড়ি আলু—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে। ৪।৫ ফুট অন্তর গর্ত্তের মধ্যে বীজ আলু রোপণ করিতে হয়। ৮।৯ মাস পরে ফসল, একরপ্রতি ১০।১৫ মণ বীজ লাগে। একরপ্রতি ১০০।১৫০ মণ ফলন হয়।

মূলা—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে। বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ২ মাস পরে ফসল হয়। একরপ্রতি ২।৪ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ১২৫।১৫০ মণ ফলন হয়।

শিমুল আলু—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে। ৫ ফুট অন্তর লাইন করিয়া এক ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া ও ৫-৬ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ডগা বসাইতে হয়। ৮।৯ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬ হাজার ডগা লাগে। একরপ্রতি ৩০০ মণ ফলন হয়।

কচু—বেলে দোআশ ও দোআশ মাটিতে জন্মে; ১।-২ ফুট অন্তর মুখী রোপণ করিতে হয়, ভাদ্র-কার্ত্তিক মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪।-৬ মণ মুখী লাগে; একরপ্রতি ১৮০.২০০ মণ ফলন হয়।

মানকচু—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; ৩ ফুট অন্তর মূল বসাইতে হয়; পৌষ ফাল্গুন মাসে ফসল হয়; একরপ্রতি ৫.৬ হাজার মূল লাগে; একরপ্রতি ১২০ ১৮০ মণ ফলন হয়।

টেপারি—দোআশ মাটিতে জন্মে; ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। ৪।৫ মাস পরে ফসল ফলে; একরপ্রতি ৬ ৮ ছটাক বীজ লাগে।

উচ্ছে—দোআশ মাটিতে জন্মে; ৩।৪ ফুট অন্তর বীজ রোপণ করিতে হয়; ১।১। মাস পরে ফসল হয়; একরপ্রতি ১২।১৩ ছটাক বীজ লাগে।

হলুদ—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; ২। ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ৯ ইঞ্চি অন্তর "মোথা বা দড়ি" বসাইতে হয়; অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল তুলিতে হয়। একরপ্রতি ২।৩ মণ হলুদ লাগে। একরপ্রতি ১৫।২০ মণ শুষ্ক হলুদ হয়।

আদা—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; ২। ফিট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ৯ ইঞ্চি অন্তর "মোথা বা দড়ি" বসাইতে হয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল তুলিতে হয়; একরপ্রতি ২.৩ মণ মূল লাগে; একরপ্রতি ৬০।১০০ মণ ফলন হয়।

লঙ্কা—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; চারা ৬ ইঞ্চি বড় হইলে ১।×২ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়; পৌষ-ফাল্গুন মাসে ফসল হয়; একরপ্রতি ২ ৪ ছটাক বীজ লাগে; একরপ্রতি ২০।৩০ মণ ফলন হয়।

চীনাবাদাম—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; ইহার জাতি অনুযায়ী লাইন করিয়া ২।২। ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল হয়। একরপ্রতি ১৮।২৫ সের (খোসা সমেত) বীজ লাগে; একরপ্রতি ১৮।২০ মণ ফলন হয়।

কলা—উঁচু দোআশ এবং এটেল দোআশ মাটিতে জন্মে; তেউড়গুলি ২ ফিট চওড়া ও ১। ফুট গভীর গর্ত্তে ১২ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়; তেউড় বসাইবার ১০।১২ মাস পরে ফলন হয়। একরপ্রতি ৩০০ ৪০০ তেউড় লাগে; একরপ্রতি ৩০০।৪০০ কাঁদি কলা হয়। সবরী ও চিনিচাম্পা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

শশা—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; ৫.৬ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। ৩ মাস পরে ফসল হয়। একরপ্রতি ৬।৮ তোলা বীজ লাগে; একর প্রতি ১০০।১২০ মণ ফলন হয়।

ভুট্টা—(পশুখাদ্য) দোআশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ২।-৩ মাস পরে কাটা যায়; একরপ্রতি ৩০।৪০ সের বীজ লাগে; একরপ্রতি ২৫০.৩০০ মণ (কাঁচা) পশুখাদ্য হয়।

জোয়ার—(পশুখাদ্য) দোআশ জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ২। ৩ মাস পরে ফসল ফলে; একরপ্রতি ২৪ ৩০ সের বীজ বুনিতে হয়; একরপ্রতি ৩০০ ৫০০ মণ ফলন হয়।

বাজরা (পশুখাদ্য)—বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ২।২। মাস পরে ফসল হয়; একর প্রতি ১৮.২০ সের বীজ লাগে; একরপ্রতি ১০০।১৫০ মণ (কাঁচা) ফলন হয়।

পাট—দোআশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, আষাঢ়-ভাদ্র মাসে পাট কাটিতে হয়; একরপ্রতি ৩।৪। সের বীজ লাগে; একর প্রতি ১৫.২০ মণ ফলন হয়।

শণ—এটেল ও দোআশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি কাটিতে হয়; একরপ্রতি ৩০.৪০ সের বীজ লাগে; একরপ্রতি ১০.১৫ মণ ফলন হয়।

রিয়া—দোআশ ও এটেল মাটিতে জন্মে। ২ ফুট×২ ফুট অন্তর "কাটিং" লাগাইতে হয়; শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি ফসল হয়; একরপ্রতি ২ ৩ মণ ফলন হয়।

কার্পাস—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু সারবান জমিতে জন্মায়; ২। ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২। ফুট অন্তর ১।২ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ২.৩টি বীজ বুনিতে হয়; ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হইতে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ফসল হয়। একরপ্রতি ৬.৮ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ১।.২ মণ ফলন হয়।

রেড়ি—উঁচু দোআশ মাটিতে জন্মে; ৩ ৪। ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়; ৭।৯ মাস পরে ফসল হয়; একরপ্রতি ৪। ৬ সের (জাতি হিসাবে) বীজ লাগে; একরপ্রতি ৮।১০ মণ ফসল হয়।

অম্বালিকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ছোট রেল-কলোনী। নানা জাতির লোকের বাস। পশ্চিম রাঢ় থেকে আরম্ভ করে চট্টগ্রামের পূর্ব্ব-প্রান্ত পর্যান্ত পাশাপাশি বাস করছে, কিন্তু সামান্য ঘোঁট আর পরচর্চ্চা ছাড়া তেমন কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই। ভালমন্দ সব কাজেই রেলের একতা নাকি প্রবাদের মত।

পদ্মার পাড়-বরাবর এমনি একটি সামান্য পল্লীতে অম্বালিকা মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। পল্লীটি ছোট, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। পশ্চিমে লাল-ইটের অনেকগুলো কোয়ার্টার, লোকে বলে বাবু-পাড়া। দু'একটি অফিসারের বাংলো ছাড়া বাকি তিন দিক ঘিরে দূরে দূরে খালাসী-লাইন। স্বয়ং বড় সাহেব খাস ইংরেজ—বারো মাস লঞ্চ-ফ্ল্যাটে ভাসমান।

কলোনীর মাঝে ছোট-বড় দুটি ইমারত। একটি ইন্‌সটিটুট, অপরটি আপিস-বাড়ী।

রোজদিন একটা হাট বসে। দুধ-ঘি, তরিতরকারি প্রচুর। মাছের মধ্যে পদ্মার ইলিশই প্রধান। কলকাতার অর্দ্ধেক ইলিশ চালান আসত এখান থেকেই।

ছেলেদের কাজ-চলা গোছের একটা হাই স্কুল আছে, অসুবিধা মেয়েদের নিয়ে। সেকালে অষ্টম বর্ষেই মেয়েদের বিবাহের বয়স পার হয়ে যেত, কানাঘুষা উঠে পড়ত। ফলে কোন দিনই মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুলের-পরিকল্পনার অবকাশ ঘটে নি। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস ছেলেরা দিনে, আর মেয়েরা সেই স্কুলেই সকালে ক্লাস করত। ফ্রক-পরা মেয়ের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু সাড়ি-পরা—ক্লাসে গুটি-কয়েকের বেশী মেয়ে নেই। সংখ্যায় কম বলেই বোধ হয় তাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাটা কিছু বেশী। তা ছাড়া আর এক কারণ ছিল। প্রায় সব ক'টিই 'উৎসর্গ' করা, কবে কার ছাদনা-তলায় ডাক পড়ে ঠিক নেই।

এমন অন্তরঙ্গ সখীদের মধ্যেও কিন্তু একবার মনোমালিন্য ঘটে গেল। অম্বালিকা ভাবতেই পারে নি কেউ তাকে ঈর্ষা করবে। ঈর্ষার মত তার যে কিছুই নেই! রূপ-লাবণ্য, বিষয়-বৈভব, কোনটাই না। সে সামান্য কেরানীর অতি সাধারণ কালো মেয়ে।

অনেকে অবশ্য বলত, তার শ্যামতনু ঘিরে অপরূপ একটি সুষমা আছে; মাথার কালো চুলে পিঠ ভেসে যায়, হরিণেরও বুঝি তার মত একজোড়া চোখ নেই, আরো কত কি!

তাদের প্রশংসার অতিরঞ্জনে অম্বালিকা শুধু লজ্জায় লাল হয়ে উঠত, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস জাগত না। কেবলই মনে হ'ত, এ শুধু স্নেহের অপলাপ, জগতে এর কোন মূল্য নেই।

রূপ অর্থে শুকাশ্রিত যে সংস্কার আবহমানকাল থেকে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেটিই কিছু বেশীমাত্রায় দেখা দিয়েছিল অম্বালিকার মনে। ফলে কুণ্ঠার আধিক্যে সে নিজেকে আরও সঙ্কুচিত করে মনের নিভৃত কোণে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকত। কিন্তু লোকে তার কতটুকু বোঝে? অম্বালিকার সংযত, বিনয়নম্র ব্যবহারের প্রশংসাই তাদের মুখে মুখে।

এ সব অনেকদিন তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এমনকি সম্প্রতি সে তার অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ-ঘোষণার জন্য মনকে প্রস্তুত করে তুলেছিল, কিন্তু সহসা কোথা দিয়ে কি একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল অম্বালিকা বুঝে উঠতে পারলে না।

ইস্কুলে যেতেই এক বান্ধবী জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ রে অম্বা, তোর নাকি বিয়ে? কৈ আমায় তো বলিস নি কিছু?

কথাগুলো অম্বালিকার কানে যেন আকস্মিক বজ্রের মত আঘাত করল। তবে কি যা সে ভয় করছিল, তাই হ'ল শেষ পর্যন্ত।

চকিত-বিহ্বল ভাবটা কোন মতে দমন করে দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলে, 'বিয়ে করলে তো'?

অভিমানে বান্ধবীর মুখখানা ভারী হয়ে উঠল। তবু বাহু দুটো তার গলায় দৃঢ়বদ্ধ করে অনুনয় করলে, 'আর কেন লুকনো বাপু—পাড়াময় জানাজানি, আর তুই জানিস নে?'

অম্বালিকা এবার সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সজোরে তার বাহু-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দৃপ্ত শ্লেষ হানলে, 'এতই যখন জানিস, আমার কাছে কেন তবে? আমি বিয়ে করবও না, খোঁজও রাখি নে।'

অম্বালিকা সত্যি জানত না। ফলে পীড়াপীড়িতে লাভ হ'ল না কিছু। বান্ধবী ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। অম্বালিকা উৎকণ্ঠা দমন করতে বেঞ্চির এক কোণ আশ্রয় করে বইয়ে মুখ ঢাকলে। বুকখানা সীসের মত ভারী। চিন্তাগুলো ক্রমেই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

অম্বালিকা বড় স্পর্দ্ধার সঙ্গে এইমাত্র বলে এল, সে বিয়ে করবে না। কিন্তু সে জানে, তার মত মেয়ের স্পর্দ্ধা কেউ মানবে না—থাকবে না তা। সে তত অবুঝ নয়। মনের গোপনে যে অব্যক্ত আশঙ্কা সে এতদিন সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল, অকস্মাৎ রাহাজানির ভয়ে আজ তাই যেন স্পর্দ্ধা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল নইলে সে কি সত্যি স্বামী চায় না? কেন চাইবে না? সে যে শিশু-বয়স থেকে দেখে আসছে মেয়েরা বড় হয়, বিয়ে করে, স্বামী নিয়ে কেমন সুখে ঘর-সংসার করে। পুতুলখেলার মধ্যেও যে তাদের সেই একই স্বপ্ন। তবে?

এতদূর চিন্তা করেই অম্বালিকা আবার একটা ধাক্কা খেল। তবু বান্ধবীর কথাগুলো তাকে যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে,

কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। আশা আর আশঙ্কা ত'ধারে রেখে সামান্য পথ করে নিলে। কল্পনাপ্রবণ মনের তুলি দিয়ে আঁকতে লাগল তার মনের মানুষটিকে যাকে সে কোনদিন দেখে নি—দেখতে পাবে না। দূরের সে, হয়ত চিরদিনই এমনি দূরেই থেকে যাবে।

দিদিমণির প্রশ্নে সহসা তার ধ্যানভঙ্গ হ'ল। বললে, হ্যাঁ, মাথাটা বড্ড ধরেছে আজ।

ক্লাস চলতেই লাগল। অম্বালিকা বই বন্ধ করে টলতে টলতে কলের দিকে এগিয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে চোখ তুলতেই দেখলে, সামনে লীলা দাঁড়িয়ে। দেখামাত্র অম্বালিকার সমস্ত মন তার ওপর বিরূপ হয়ে গেল। দু'জনেই ভুল করে ভুল বুঝলে। কোন কথা হ'ল না। অম্বালিকা পাশ কাটিয়ে আবার ক্লাসে এসে বসল। আগ্রহভরে কতক্ষণ কান পেতেও রইল, কিন্তু পড়ার একটি কথাও আজ তার কানে যাচ্ছে না। কেবলই মনে হতে লাগল, লীলার কাছে তাকে পরাস্ত হতেই হবে। যে গুণে পুরুষ নারীকে ভালবাসে, সবই আছে তার। বিধাতার ওপর মনে অভিমান জাগে, কিন্তু মানুষ যে আরও নিষ্ঠুর, আরও হৃদয়হীন!

সহসা মনে পড়ল, লীলাই ক'দিন থেকে কথা বন্ধ করেছে; হয়ত সেটুকু আশার, নইলে লীলা তাকে ঈর্ষা করবে কেন? ভাবতেও ভাল লাগে। কিন্তু আশঙ্কাটুকু তবু যায় না।

কেমন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দু'জনে। কারণ কেউ কারুকে বললে না, জানতেও চাইলে না কেউ।

অম্বালিকার বিবাহই আগে হ'ল। কন্যাদানের অক্লান্ত চেষ্টায় তার বাবা প্রায় নিরাশ হয়ে এসেছেন, এমন সময় দূর পশ্চিমের এক প্রবাসী পাত্রের সঙ্গে তিন দিনে বিবাহ স্থির হয়ে গেল। সাত দিনের মাথায় বিবাহ।

বরযাত্রীদের জন্য ক'খানা বাড়ীর পরেই একটি খালি কোয়ার্টার নেওয়া হ'ল। বর এল বিবাহের আগের দিন গভীর রাত্রে। ষ্টেশন থেকে একটা খালাসী ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা আগাম দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীময় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। অম্বালিকা অনেকক্ষণ থেকে নিঃসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল—শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় বুকখানা ধড়াস করে উঠল এবার। শীতের রাতেও তার ললাটে ঘাম ফুটে উঠেছে। মনে কেবলই এক প্রশ্ন: না জানি কেমন দেখতে তাকে। একটু ইঙ্গিতও যদি পেত তার।

কিন্তু দূর প্রবাসের মানুষটিকে কেই বা আগে দেখেছে যে বলবে? যারা ষ্টেশন থেকে বর নিয়ে এল তারাও ক্লান্ত, নিদ্রাতুর। বড় মাসীমা একবার জানতে গিয়েছিলেন, ছোট পিসীমা এক ধমকে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিলেন: 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ', তার আবার অত বাছাবাছি কিসের?'

সুতরাং দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে অম্বালিকা সারা রাত বিছানার ওপর ছটফট করতে লাগল। মনের গ্লানিতে এক সময় সঙ্কল্প স্থির করে ফেললে, তেমন যদি হয়, বিয়ের আগেই বিষ খাবে। লীলার কাছে কোনমতেই মাথা হেঁট করতে পারবে না। সে যে দূর থেকে মুখ টিপে টিপে হাসবে, তা অসহ্য।

তার রূপ আছে, আমার ভালবাসা নেই?—অম্বালিকা যেন স্বগতোক্তি করলে। ক্লান্তিতে সে আবার অবশ হয়ে শুয়ে পড়ল। বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়েছিল।

ভোররাতে দধি-মঙ্গলের যোগাড়ে মেয়েরা আবার একচোট হৈ চৈ সুরু করলে। বুড়ী দিদিমা ঘটিতে গরম জল নিয়ে এলেন নাতনীর মুখ ধোয়াতে। নাতনীর হাঁড়িমুখ দেখে দিদিমা ফোক্‌লা দাঁতে সেই বাসি-মুখেই কিছু সরস রসিকতা করলেন। অম্বালিকার সে রসিকতায় রুচি ছিল না। রাগতভাবে দিদিমাকে এড়িয়েই সে বাথরুমের দিকে উঠে গেল।

সকাল হতেই পাড়ার মেয়েরা দু'বাড়ী মন্থন করে ফিরতে লাগল। সবার মুখে চাপা হাসি। অম্বালিকা ভয়ে কারুর মুখের দিকে চাইতে সাহস করছে না,—কাউকে বিশ্বাস হচ্ছে না তার। এমনই উৎকণ্ঠায় সময় কাটছে। সহসা কানে এল, কে যেন তাকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে: 'মেয়ের তপস্যার জোর আছে কিন্তু।'

অম্বালিকা এটুকুরই অপেক্ষা করছিল। এবার সে সাহস করে মুখ তুললে। তাচ্ছিল্যের স্বরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেপে গেল। অযথা কাউকে আঘাত করতে সহসা আজ তার মন উঠল না—মিথ্যে করেও নয়।

অল্প পরেই অম্বালিকা অপরূপ এক লীলায়িত ভঙ্গিতে উঠে পাশের ঘরে পোশাক বদলাতে চলে গেল। যাবার আগে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে লীলা এসেছে কিনা।

ক্রমে জানা গেল, লীলা ও-বাড়ীতে একবার এসেছিল, কিন্তু ভেতরে ঢোকে নি। জানালা দিয়ে দেখেই ফিরে গেছে। বাকিটুকু অম্বালিকা সহজেই অনুমান করে নিলে।

বিবাহ-বাসর। ছাদনাতলায় গ্যাসের আলো। আলো-আঁধারের সে এক মায়া-মরীচিকা। শুভদৃষ্টির সময় অনেক সাহস সঞ্চয় করে অম্বালিকা একবার তার মুখের দিকে চাইলে, কিন্তু হায় অদৃষ্ট! চোখ যদি বা খুলল, আলো ছলনা করলে। লজ্জায় চোখ আপনি মাটিতে নেমে গেল, মনে হ'ল, সে যেন তার পায়ের কাছে একজোড়া শঙ্খ দেখলে। মুহূর্ত্তে অম্বালিকার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল, তার অসহায় মন-প্রাণ যেন পুলকে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

হর্ষ-বিস্ময়ে অম্বালিকা যেন আর চোখ ফেরাতে পারছে না। যতক্ষণ পারলে, ভীরু দৃষ্টি নিয়ে সে দিকেই চেয়ে রইল।

যথাসময়ে শুভকর্ম্ম শেষ হ'ল। অম্বালিকা সত্যি ধন্য হয়ে গেছে। এমন স্বামী তার কোন বোন বা বান্ধবী পায় নি। রূপে গুণে বিনয়নম্র ব্যবহারে আশ্চর্য্য মানুষ—অম্বালিকা যেন একেবারে তাঁর চরণে মিশে গেছে।

অম্বালিকা শ্বশুরঘর করতে এল আলমোড়ায়। ভাইয়েরা এসে স্বচক্ষে তার সংসার দেখে গেছে। বাহুল্য নেই, কিন্তু অভাবও নেই কিছুর।

দীর্ঘ দশ বছর পর লীলার সঙ্গে আবার দেখা কলকাতায়। বাবা মারা গেছেন ক'বছর আগে। ভাইয়েরা কলকাতায় এসে এখন ভাল কাজকারবার করছে। ক'বছর পরে কলকাতায় বেড়াতে এসে অম্বালিকা শুনলে, লীলার শ্বশুরবাড়ী কলকাতায়ই। তার স্বামী নাকি মোটা মাইনে পায়—ইঞ্জিনীয়ার—তবে দেখতে তেমন সুবিধের নয়।

অম্বালিকা লীলাকে দেখতে যাবে কি না জিজ্ঞেস করা হ'ল। সহসা তার নিজের বিবাহের দিনটা মনে পড়ে গেল। ভাবলে, তারা বড়লোক, রূপবান্ বরও পায় নি লীলা। তা ছাড়া, ঈর্ষা করেই লীলা তার বিয়েতে যোগ দেয় নি। এখন গেলে যদি অপমান করে? না, সেধে তার ওখানে যাবে না।

কিন্তু খবর পেয়ে লীলাই একদিন নিজের মোটরে করে দেখা করতে এল। সঙ্গে অম্বালিকার ছোট ভাই নীরেন।

বান্ধবীকে সামনে পেয়েই লীলা একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলে, 'কি রে, তুই বলে আমার উপর রাগ করেছিস? আর আমায় ছাখ, ছেলেবেলার কথা মনে করে আমিই আগে ছুটে এলাম দেখা করতে।'

লীলার কথাগুলো এমনি আন্তরিকতায় ভরা যে, অম্বালিকার সব তুচ্ছ রাগ অভিমান ধুয়ে মুছে গেল। সে সংযতস্বভাব, তবু আনন্দের আবেশে লীলার গাল ছুটো টিপে দিয়ে বললে, 'তাতো বুঝলাম, খুব উদার হয়েছিস, কিন্তু সে মানুষটিকে সঙ্গে আনতে কি হয়েছিল?'

'দেখতে চাস চল। কিন্তু দেখবার মত নয়, পথে-ঘাটে অমন কত দেখেছিস।' লীলা বিরস মুখে অম্বালিকার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। কিন্তু অম্বালিকা সে হাসিতে যোগ দিলে না। মৃদু ভর্ৎসনা মিশিয়ে বললে, 'ছিঃ লীলা, এমন কথা তোর মুখে আশা করি নি।'

'যা সত্যি তাই বললাম, কি রে নীরেন, ঠিক কি না?'

লীলা নীরেনকে সাক্ষী মানলে।

'নীরেন তুই যা ত।' বলে অম্বালিকা। এবার তার দেহের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, তোর চেহারা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে। ব্যাপার কি?

'যাক, তবু তুই বললি এটুকু।' লীলা বিষণ্ণ মুখে উত্তর দিলে, 'আর সবাই ত ছ'বেলাই খুঁড়ছে, নাকি বসে বসে কুমড়ো হয়ে উঠেছি?'

মুহূর্তকাল নীরব থেকে লীলা জিজ্ঞেস করলে, 'তোর বরকে দেখছি নে'?

'দেশে গেছেন হুগলীতে'। অম্বালিকা বললে, 'রোববারে তারও ফেরার কথা, নইলে ঠিক নিয়ে যেতাম একদিন। তুই বরং সেদিন তোর বরকে নিয়ে আয় না—তারপর রাতে খেয়ে দেয়ে,···বুঝলি ত, নেমন্তন্ন রইল।'

ঠিক মত দিতে পারলে না লীলা। তার সঙ্কোচ দেখে অম্বালিকা আবার বললে, 'আচ্ছা গো বড়লোকের গিন্নী, না হয় নীরেনকেই পাঠাবো 'খন তাঁর মান রাখতে'।

লীলা আর কোন আপত্তি করলে না। খুশী হয়ে এবার সে বাড়ীময় ঘুরে সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলে, তারপর ছুই বান্ধবীতে শোবার ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নীচু গলায় লীলা বললে, 'একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি রে, বাপ মা কেন যে বড়ঘর খোঁজে, ভেবে পাই নি। তারা শুধু কর্তব্যই দেখে, মেয়ের সুখ দেখে না। একে ত শাশুড়ী আর ননদের কথার জ্বালা, তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে উনিও যোগ দেন। পরের মেয়ের আর জোর কি বল? দয়া করে আমায় উদ্ধার করেছেন, তাই সব খোঁটা একা আমাকেই সইতে হবে। এক এক সময় ইচ্ছে হয়'—।

লীলা একটা কিছু ভয়ানক কথা বলতে যাচ্ছিল, অম্বালিকা বাধা দিয়ে বললে, 'মেয়েদের ভাগ্যে অমন অনেক অশান্তি আসে, তাই বলে অল্পে অধীর হলে চলে? ছাড় ও কথা।···ছেলেপুলে হয় নি একেবারে?'

লীলার মুখখানা সহসা বিবর্ণ হয়ে গেল। কোনমতে মনের লজ্জা গোপন করে বললে, 'সেই ত হয়েছে আর এক জ্বালা। শাশুড়ী থেকে থেকে ভয় দেখায়, আবার বিয়ে দেবে। আচ্ছা তুই-ই বল, আজকাল এক বৌ বেঁচে থাকতে আবার কেউ'—?

'বিয়ে দেবে না, ছাই।' লীলার কথার মাঝেই অম্বালিকা বলে উঠল, 'মগের মুল্লুক আর কি। তা ছাড়া লেখাপড়া-জানা মানুষ, বললেই বা বিয়ে করবে কেন?'

'তা বলিস নি ভাই,' মনের জ্বালায় লীলা বলে উঠল, 'বড়-লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। ওরা সব পারে। আমার এক পিসতুতো বোনের সত্যি তাই হয়েছে। রাজরাজড়ার দত্তক দিয়ে কাজ চলছে, ওঁদের পাঁচ ছটাক জমি ছেলে অভাবে যেন লাটে উঠত। যত সব আদিখ্যেতা।'

ঘৃণায়, উষ্মায় লীলার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা ক্ষণিকের জন্য নীল হয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার মুখে প্রসন্ন হাসি টেনে জিজ্ঞেস করলে, 'তোর ছেলেদের দেখছি না?'

'এখুনি আসবে হয়ত, দাদার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। দাদাকে জানিসই, ছেলে-পুলে পেলে ছাড়তে চায় না। ওরাও তেমনি চিনেছে, দিনভর টো-টো করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

লীলা এবার প্রসঙ্গান্তরে গেল—'তোর বরের কথা কিন্তু একটিও বললি নি।'

এমন আকস্মিক অন্তরঙ্গ প্রশ্নে অম্বালিকা সহসা লজ্জা পেয়ে গেল। কেন যেন স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলে সে আজও লজ্জা পায়। মুচকি হেসে বললে, 'কোন কথা জানিস না তুই, প্রায়ই ত আসিস এখানে'!

'পরের মুখে ঝাল খেয়ে আশ মেটে? আচ্ছা, ঝগড়াঝাঁটি হয় না?'

'কেন হবে না ? রোজই বুঝি হাসতে পারে কেউ ?'

অম্বালিকার কথাগুলো যেন লীলার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিলে। লীলা তবু ওপরে হাসি টেনে এবার তার দুর্ব্বলতা ধরে প্রশ্ন করল, 'ভালবাসে কেমন তোকে, ঠিক বলবি কিন্তু—।'

অম্বালিকা চিমটি কেটে খাটো গলায় বললে, 'আর ছেলে দুটো কোত্থেকে এল শুনি ?'

'পাগলেরও ত ছেলে হয় রে।'

'মুখপুড়ী মর তুই।' অম্বালিকা আবার তার বাহুতে একটা শক্ত চিমটি কাটলে।

'উঃ' বলে বাহু ঘষতে ঘষতে লীলা যেন হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। সে হাসির রুক্ষতা বড়ই স্পষ্ট, বড় মর্ম্মান্তিক।

রবিবার।

পরেশ ফিরে এসে অম্বালিকার মুখে তার বান্ধবীর কথা প্রথম শুনল। চিনতে পারলে না। বলল, 'বেশ ত, বিকেলেই যখন আসছেন, দেখা হবে।'

লীলা এল ঠিক সময়ে, স্বামীর পাশে মোটরে বসে। পরেশ বাইরের ঘরে কি একখানা পত্রিকা দেখছিল। তাকে দেখেই লীলা বলে উঠল, 'কি মশাই, চিনতে পারেন ?'

পরেশ ত্রস্তভাবে উঠে প্রতিনমস্কার করলে। 'এমন আর কি মুশকিল—মানে, আমরা ত সকাল থেকে আপনারই—'

পরেশ ক'পা এগিয়ে অম্বাকে ডাকতে যাবে, লীলা তার আগেই সর্ব্বাঙ্গে লহর তুলে ছুটে ভেতরে চলে গেল। গাড়ী ঘুরিয়ে লীলার স্বামী এলেন কিছু পরে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই হিমাংশু থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর চোখেমুখে সংহত বিস্ময়।—'পরেশ না ?'

মুহূর্ত্তে যেন কামরার প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। দিনের বেলাতেও দেয়াল-ঘড়ির 'টিক টিক' শব্দটা কানে বাজছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে পরেশ উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, হিমাংশুদা আমিই।'

হিমাংশু সহসা কোন কথা খুঁজে পেলেন না। অথচ পরেশের বিব্রতভাব লক্ষ্য করে বেশীক্ষণ নীরব থাকাও সম্ভব হ'ল না।

একখানা নীচু আসনের উপর বসে, বললেন, 'ভাবতে পারি নি, এত দিন পরে এমন আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাবে। তুমিই নীরেনের ভগ্নীপতি, তাও খোঁজ করি নি কোন দিন।'

'আমিও জানতাম না।'

পরেশের কণ্ঠস্বর শেষের দিকে কেমন কেঁপে গেল। মেরুদণ্ডে সরীসৃপের মত একটা হিম সিরসিরানি অনুভব করলে। পরেশ নীরবে বসে রইল। অতীতের ছিটকে-পড়া ক্ষণিক স্পর্শ যেন তাকে নিস্পন্দ, নিঃসাড় করে দিয়েছে।

'সে থাক।' ঘনায়মান স্তব্ধতা কাটিয়ে হিমাংশুই বললেন আবার, 'সে থাক, তুমি সুখেই আছ মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ পড়াটা ছেড়ে দিয়ে ভাল কর নি।'

অনেক কথা যেন একসঙ্গে গলার কাছে ঠেলে এল। তবু উদ্গাত আবেগ দমন করে পরেশ উত্তর দিলে, 'পুরনো কথায় আজ কোন লাভ নেই, হিমাংশুদা।'

হিমাংশু জানেন তা। তবু একটা প্রতিঘাতস্পৃহা দমন করতে পারলেন না। বললেন, 'তুমি বোধ হয় জান না, নন্দার স্বামী মারা গেছে।'

ক্ষণিকের জন্য বোধ হয় পরেশের অন্তরের পশুটা একবার প্রতি-হিংসার তৃপ্তিতে অস্থির হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মানুষের সেই চির-স্পর্শকাতর আত্মা হাহাকার করে বললে, 'না-না, এ আমি কখনও শুনতে চাই নি।' ক্ষণিকের জন্য তার নিজের বিবাহিত জীবনও কণ্টকিত মনে হ'ল। পরেশ আপন মনেই স্বগতোক্তি করলে, 'নন্দা, বিধবা!' হিমাংশু তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে সব দেখলেন। এক সময়ে তার ডান কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে গভীর বেদনাসিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'মানুষের জীবনে নিয়তিই যখন প্রবল, মনে আর কোন খেদ রেখ না পরেশ। এত দিন পরে তুলতাম না এ কথা, কিন্তু এমনই আকস্মিক ভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল যে, একটা জবাবদিহিরও সুযোগ হয় নি। বাবার জেদ শুধু তোমার নয়, আমাদের অনেকেরই চিরদুঃখের কারণ হয়ে রইল। নন্দার এতে কোন দোষ ছিল না, তাকে যেন অন্ততঃ তুমি ক্ষমা কর।'

পরেশের চোখ দুটো এক অব্যক্ত বেদনায় কাতর হয়ে উঠল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অম্বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে লীলা এসে পড়ায় পরেশ মুখ ঘুরিয়ে ভাব গোপন করল, কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের পরিচয় করানোর একটা মিথ্যা অভিনয় চলল, কিন্তু দুটি নারীর একজনও এদের মনের খোঁজ পেল না।

হিমাংশু তখন রুড়কীতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে। পরেশও ভর্ত্তি হ'ল। হিমাংশুর বাবা দু'জনেরই শিক্ষাগুরু। সেই সূত্রে অল্প দিনেই ওদের পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। পরেশ হিমাংশুকে দাদা বলত, কারণ সে নন্দার দাদা—কলেজেও তার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র।

প্রবাসের ক'টা বছর পরেশ বাড়ীর মতই আনন্দে কাটিয়ে দিলে। পড়া শেষ হতে আর একটা বছর বাকি আছে, সহসা নন্দার বিবাহের প্রস্তাব উঠল।

ঠিক একই সময়ে পরেশও নন্দাকে নিয়ে একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'ল। বাধ্য হ'ল তাকে নিজে গ্রহণ করার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হতে।

হিমাংশু পরেশকে সত্যি বড় স্নেহ করত। সেও চেয়েছিল পরেশের সঙ্গেই নন্দার বিবাহ হয়, সেটা সুখের এবং শ্লাঘার হ'ত। কিন্তু তার পিতা কঠোর রক্ষণশীল মানুষ। বিবাহ ব্যাপারে এমন স্বেচ্ছাচার তাঁর নীতিবোধে কঠিন আঘাত হানল। অপমান বোধ

করে নন্দার বিবাহে তিনি পুত্র বা কন্যা, কাহারও মতামতের অপেক্ষা করলেন না। যথাশীঘ্র নন্দাকে পাত্রস্থ করে, একসঙ্গে তাদের দু'জনকেই মন থেকে চির নির্বাসন দিলেন। কিন্তু বিচিত্র বিধির বিধান, দু'বছর না যেতেই নিঃসন্তানা নন্দা আবার পিতার আশ্রয়ে ফিরে এল। হিমাংশু তাকে গভীর স্নেহে আবদ্ধ না করলে, এ অপমান, এ ব্যর্থতা নন্দা আজও সইতে পারত কি না সন্দেহ।

পরেশ সেই থেকে পড়া ছেড়ে আলমোড়ায় এসে চাকরি করছে। নন্দার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পরেশ আর কাউকেই বিবাহ করবে না গোড়ায় এমনি স্থির করেছিল। অসহ্য মর্ম্মবেদনা আর প্রতীক্ষা নিয়ে অপেক্ষাও করেছিল কয় মাস। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন নন্দার বিবাহ হয়েই গেল তখন তার পৌরুষে কঠিন আঘাত লেগেছিল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরেশ আশা করেছিল, নন্দা এ অন্যায় কিছুতেই সহ্য করবে না, তাকেও রক্ষা করবে এ অপমানের গ্লানি থেকে। কিন্তু তা হ'ল না। নন্দার বিবাহ হয়ে গেল। যেন অভিমানের জ্বালাতেই পরেশও স্থির করলে সে বিবাহ করবে এবং অকস্মাৎ একদিন বিবাহ করে আনলে অম্বালিকাকে—এক আত্মীয়ের দুটো প্রশংসার কথায়। বিবাহই যেখানে বড়, প্রশংসার কথা ওঠে না সেখানে। পরেশ এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

অম্বালিকাকে প্রথম দেখে পরেশ যেন একটা ধাক্কা খেল। পাশাপাশি দুখানা মুখে যেন অনন্তের ব্যবধান! কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটু মায়া, একটু উদার অনুরাগ এসে পড়ল এই অসহায় কালো মেয়েটির 'পরে। কিন্তু পরেশ সত্যি মুগ্ধ হ'ল আরও পরে, তার ব্যবহারে, তার ভালবাসা দেবার ক্ষমতায়। ক্রমে পরেশের সব অভিমান শান্ত হয়ে গেল। প্রেম মনে হ'ল ক্ষণিক উন্মাদনা—নিছক সঙ্গসুখের মাদকতা।

দশ বছর পরে সেদিন কলকাতায় জীবনটাকে হঠাৎ পেছনে পাক খেতে দেখে, পরেশ যেন ক্ষণিকের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সহসা আবিষ্কার করেছিল জীবনের প্রথম অনুরাগ দেহ ও কালের সীমা অতিক্রম করে দুর্ব্বার বেগে তার দিকেই ছুটে চলেছে যে তার প্রেমকে মর্য্যাদা দিতে পারে নি, অপমান করেছে বিস্তর।

কিন্তু সেই সঙ্গে অম্বালিকার জন্যও তার ভয় হ'ল—কেমন এক অন্ধকার শূন্যতা এসে দাঁড়াল দু'জনকে আড়াল করে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে, পরেশ অম্বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে সহসা আলমোড়ায় ফিরে এল। পুরনো একটি আঘাত নতুন করে পেয়ে সে যেন অম্বালিকাকে আরও কাছে টেনে নিলে, তাদের দাম্পত্য-প্রেম আরও গভীর হ'ল, নিবিড়তর হ'ল।

বিস্মিতা অম্বালিকা স্বামীর উন্মাদ আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেও বাধা দেয়, 'ছিঃ, কি করছ, ছাড়।'

আবার পরক্ষণেই কখন তার চোখের পল্লবদুটি অকারণে আপনিই ভারী হয়ে ওঠে। স্বামীর আয়ত চোখের ওপর নিজের স্থির দুটি তারা মেলে নিজের মনেই বলতে থাকে, 'আচ্ছা বল ত, এত সুখ কি সইবে আমার?'

এমনি করেই কত সুখে, কত মধু নিশা এসেছে, গেছে, কেউ খেয়াল করে নি। সহসা একদিন লীলার চিঠি এল। বহুদিন পরে বান্ধবীর চিঠি পেয়ে অম্বালিকা এক নিঃশ্বাসে আগাগোড়া পড়ে গেল। ঠিক বুঝতে পারলে না, কি জানাতে চায় লীলা। আবার পড়ল। মাথাটা এবার শূন্য বোধ হতে লাগল, অক্ষরগুলো মনে হ'ল, চোখের পেছনে কোথাও পোকার মত কিলবিল করছে।

কোন মতে নিজেকে সামলে অম্বালিকা দাঁতে দাঁত চেপে চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিলে।

কালক্রমে অম্বালিকা চিঠিটার কথা আবার ভুলে গেল। কিন্তু আরও কি যেন হারিয়ে ফেললে সেই সঙ্গে।

স্বামী আগের মতই সোহাগ করেন, আজও টেনে নেন বুকের মাঝখানে, তবু মনে হয় সে যেন সরে গেছে কত দূরে।

এডাম মিকিউইজ

১৭৯৮-১৮৫৫

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পোল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম কবি এডাম মিকিউইজ একশত বৎসর পূর্ব্বে বসফরাসের তীরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণ তাঁহাকে সেক্সপীয়র, বায়রন এবং গ্যেটের সহিত তুলনা করিতেন। অথচ তিনি কেবলমাত্র কবিই ছিলেন না—তিনি চাহিয়াছিলেন পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা—সমগ্র পোলজাতি তাঁহার জলন্ত দেশভক্তি ও বাগ্মিতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

তিনি এরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যখন জনসাধারণ যে সকল নেতাকে ঈশ্বরানুপ্রাণিত মনে করিত তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইত। অসাধারণ বাগ্মী, আদর্শবাদী লিরিক কবি মিকিউইজ ছিলেন এরূপ একজন নেতা।

তাঁহার দেশের ইতিহাস ছিল মর্ম্মন্তুদ—বার বার সে দেশকে প্রুশিয়া, রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া

লইয়াছিল—কিন্তু পোল্যাণ্ড পুনরুজ্জীবনের বিশ্বাস কখনও হারায় নাই। সৈনিকগণকে দেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মিক বলে বলীয়ান করিতে মিকিউইজের মত আর কেহ অনুপ্রাণিত করে নাই।

অতিমাত্রায় দেশভক্ত হইলেও মিকিউইজ ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক—তাঁহার জীবনে দুইটি ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন পোল্যাণ্ড কেবল নিজেকে নহে—সকল শ্লাভজাতিকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবে। তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা ফরাসী দেশ পোল্যাণ্ডকে এই মুক্তিসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিবে।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অস্পষ্ট হইলেও ইহা ছিল খুবই বিরাট—জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুদ্ধ-কলহের ঐতিহ্যের স্থলে ফ্রান্স-পোল্যাণ্ডের সমবেত চেষ্টায় শান্তি আসিবে। গসপেলের জয় হইবে—ঈশার চরম ও শেষ নির্দ্দেশ "পরস্পরকে ভালবাস" এই বাণী সার্থক হইবে।

মিকিউইজ তাঁহার স্বপ্ন কেবল কবিতা রচনায় আবদ্ধ রাখিয়াই খুশী হইতেন না, প্যারিসের কলেজ দ্য ফ্রান্সে শ্লাভ সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তিনি তাঁহার অধ্যাপনা-কক্ষ রাজনৈতিক আলোচনা-সভায় পরিণত করিতেন এবং ইহার প্রতিক্রিয়াও হইত ভয়ানক ভাবে। মিকিউইজের অসাধারণ বাগ্মিতা শ্রোতাদের মধ্যে পোল্যাণ্ডের শহীদগণের জন্য গভীর সহানুভূতির উদ্রেক করিত। এই সময় কলেজ দ্য ফ্রান্সে আরও দুই জন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন—ঐতিহাসিক মিচলেট এবং লেখক এডগার কুইনে। ইহারা রাজনীতি ক্ষেত্রেও খুবই তৎপর ছিলেন। সাধারণের চোখে এই তিন জন একজোটে ছিলেন তৎকালীন রাজা লুই ফিলিপ ও তাঁহার মন্ত্রী গীজোর স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী। তাঁহাদের বক্তৃতা অনেক সময় এত উৎসাহ জাগাইত যে হাঙ্গামার সৃষ্টি করিত। ১৮৪৮ সনের ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে এই বক্তৃতা দান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইঁহারা তিন জন ছিলেন তৎকালীন ইউরোপের চিন্তাধারার প্রতীক। প্রগাঢ় বন্ধুত্বের জন্যই মিচলেট নিজে এবং তাঁহার দুই সহকর্ম্মীকে তিন ভ্রাতা এবং বন্ধু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ফরাসী ও পোল্যাণ্ডের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের মধ্যে—বহু বিদেশী ইটালীয়ান, হাঙ্গারীয়ান এবং জার্মান মনীষী পরিবেষ্টিত হইয়া আমি আমার বুকে আত্মার সন্ধান পাই—এ আত্মা ইউরোপের আত্মা।

সে সময় লোকে বিশ্বাস করিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলন হইলেই শান্তি আসিবে। এই তিন জন শিক্ষাব্রতী ছিলেন এই নূতন আশার প্রচারক—কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না যে সংখ্যালঘুগণের মুক্তি ব্যতীতই জাতি সকলের মধ্যে মিলন সম্ভব। সংখ্যালঘুর মুক্তিমূল্য পণেই শান্তি ক্রয় করা সম্ভব ইহা ছিল তাহাদের বাণী। তাঁহারা ইহাও স্পষ্টভাবেই বলিতেন, স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ প্রয়োজনীয়।

মিকিউইজের কবিতায় আছে—

"স্বাধীনতা, কাব্য আর সংগ্রাম এই তিন ভগ্নীর চাই মিলন অত্যাচারীর শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে"।

তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এই বিভিন্নমুখী শক্তিকে এক করিয়াছিল। সে সময় রক্তপাত হইয়াছিল প্রচুর এবং সংখ্যালঘুগণের মনে আসিয়াছিল গভীর নিরাশা। সেদিন তাহারা অস্ত্রবলে পরাজিত হইলেও কাব্যে তাহারা বিজয়ী হইয়াছিল।

১৮৪৮ সনে যখন প্যারিস বিপ্লব রাজতন্ত্রের পতন ঘটাইল তখন মিকিউইজ রুশীয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রোম নগরে পোলিস সৈন্যবাহিনী গঠন করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৫ সনে যখন ফরাসী ও ইংরেজ ক্রিমিয়ায় রুশীয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেছে তখন মিকিউইজ একটি পোলিস সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া ফরাসী ইংরেজ দলের সহায়তার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় বারের চেষ্টার সময় তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া কনষ্টান্টিনোপলে ২৬শে নভেম্বর (১৮৫৫) প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্বদেশকে স্বাধীন করিবার স্বপ্ন সার্থক হইল না। কিন্তু ইতিহাসে তিনি দেশভক্ত ও কবিরূপে অমর হইয়া রহিলেন। হাঙ্গেরী তখন কোসুথকে (Kossuth) এবং ইটালী ম্যাটসিনীকে স্বদেশপ্রেমের জন্য সম্মান দেখাইতেছিল—সকলেই কোসুথ ম্যাটসিনীর সহিত মিকিউজের নাম করিত—কারণ এই তিন জনই ছিলেন লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী সংগ্রামশীল জাতিসমূহের প্রতিনিধি এবং প্রতীক।

১৮৯০ সনে মিকিউইজের দেহাবশেষ পোল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত করিয়া ক্রাকোর (cracow) ওয়াওয়েলের রাজকীয় দুর্গে সমাধিস্থ করা হয়। ১৯২৯ সনে ভাস্কর বুর্দ্দেল (Bourdelle) কর্ত্তৃক তৈয়ারি একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ প্যারিসে প্লেস-দ্য'-আলমায় স্থাপিত হয়। তাঁহার স্মৃতি ফরাসী দেশের সহিত মৃত্যুহীন মিলনে যুক্ত হইয়া আছে, কারণ তিনি ফ্রান্সকে তাঁহার স্বদেশ পোল্যাণ্ডের মতই ভালবাসিয়াছিলেন। (ইউনেস্কো)

দুই মহাকবির দৃষ্টিতে বসন্ত

শ্রীরঘুমণি ভট্টাচার্য

অর্জুনকে নিজের দিব্য বিভূতির কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ঋতূনাং কুসুমাকরঃ—অর্থাৎ ছয়টি ঋতুর মধ্যে যদি কোথাও আমার পরম-প্রকাশ ঘটে থাকে তবে তা একমাত্র বসন্ত ঋতুতেই। রুদ্রমূর্তি নিদাঘ, ঘনযৌবনা বর্ষা, স্নিগ্ধচ্ছবি শরৎ, হিমে-উদাস হেমন্ত আর জড়দেহ শীত—প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। গীতায় যে এদের সবার উর্ধ্বে বসন্তের স্থানই কেন নির্দেশ করা হ'ল, মহাভারতকার মহর্ষি ব্যাসদেব স্পষ্ট করে তা বলেন নি। তিনি কেবল সূত্র রচনা করে গেলেন আর সেই সূত্রের ভাষ্য রচনা করলেন তাঁর বহু যুগ পরে তাঁরই সমানধর্মা দুই কবি—এক মহাকবি কালিদাস, আর দ্বিতীয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এঁদের উভয়েরই কাব্যে বসন্ত হয়েছে নববর, আর ধরণী যেন নববধূ। কালিদাস বললেন—

> সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি
> রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ॥ ঋ—১৯

বসন্তের আবির্ভাবে ধরণী মুগ্ধা নববধূর রূপ ধারণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—

> হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যানভরা ধন
> বৎসরের শেষে
> শুধু একবার তুমি মূর্তি ধর ভুবনমোহন
> নববরবেশে।

বসন্তের সমাগম প্রার্থনা করে কৃচ্ছ্রসাধনায়, দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন থাকে ধরণী সারাটি বছর ধরে। এই তপস্যা পিনাকপাণিকে পতিরূপে পাওয়ার কামনায় পার্বতীর তপস্যার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কালিদাস তপোনিমগ্না পার্বতীর রূপবর্ণনা করতে গিয়ে বললেন—

> অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ
> সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্।
> কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়া মিতাক্ষরং
> চিরব্যবস্থাপিত বাগভাষত॥ কু—৫ম-৬৩

অঙ্গুলিগুলিকে পুষ্পকলিকার মত মুদ্রিত করে করাগ্রভাগে স্ফটিকাক্ষমালা স্থাপন করতে করতে অদ্রিতনয়া বহু কষ্টে মুখে কথা এনে পরিমিত ভাষায় নিজের উচ্চাভিলাষের কথা ব্রহ্মচারীবেশী শিবকে ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই ভাবই প্রকাশ করলেন ভাষার ছন্দে নব রূপে—

> আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ করে আরাধন
> দিন গুণে গুণে।
> সার্থক হ'ল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
> মধুর ফাল্গুনে।

বিরহের কৃচ্ছ্র সাধনের পরই ত আসে মিলনের প্রসাধনের পর্যায়। তাই বসন্তের 'বোধনে' কবি বললেন—

> দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
> হোক প্রগল্ভ রক্তিম রাগে
> মাধবিকা হোক সুরভি-সোহাগে
> মধুপের মনোহরা।

অন্যত্র মধুমত্ত ভ্রমরের দ্বারা চুম্বিত মাধবীলতাকে দেখে কালিদাস বললেন—

> মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা
> মন্দানিলাকুলিতনম্রমৃদুপ্রবালাঃ।
> কুর্বন্তি কামিমনসঃ সহসোৎসুকত্বম্
> বালাতিমুক্তলতিকাঃ সমবেক্ষ্যমানাঃ॥ ঋ—১৭

বসন্তের মৃদু বায়ুভরে কম্পিত কিশলয়শোভিত অভিনব মাধবীলতার মনোরম পুষ্পগুলিকে মত্ত ভ্রমরেরা চুম্বন করছে আর তাই দেখে কামীদের চিত্ত হচ্ছে উৎকণ্ঠিত।

ইষ্ট-কল্যাণ কামনা করে যজ্ঞের অনল রচনা করতে হয় তাই বাঞ্ছিতের মিলনাকাঙ্ক্ষায় ধরণীও জ্বালিয়ে রাখে হোমের পুণ্য অগ্নি—

> 'মিলনমাঙ্গল্যহোম প্রজ্বলিত পলাশে পলাশে'

কালিদাসের দৃষ্টিতে কিন্তু জ্বলন্ত বহ্নির মত এই পলাশ যেন নববধূরূপিণী ধরণীর রক্তরাগ আবরণ-বসন—

> আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ
> সর্বত্রকিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
> সদ্যো বসন্ত সময়ে সমুপাগতে হি
> রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ॥ ঋ—১৯

কুসুমভারনত বায়ুপ্রদীপ্ত পলাশবনগুলিও বসন্তের আগমনে চকিতেই যেন ধরণীর রূপসজ্জার ভার গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ লাল চেলির সাদৃশ্য আরোপ করেছেন শিমুলের ফুলে—

> 'নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
> রক্ত দুকুল দিল উপহার'

সরোবরে, মণিমেখলায়, চন্দ্রদীপ্তিতে, রমণীর রূপে, স্ফুটমুকুলে-সমানত রসালে রসালে এই বসন্ত যেন এক অপরূপ

রূপমাধুর্যের সঞ্চার করে। কালিদাস বললেন সেই কথাই—

বাপীজলানাং মণিমেখলানাং
শশাঙ্কভাসাং প্রমদাজনানাম্।
চূতদ্রুমাণাং কুসুমান্বিতানাং
দদাতি সৌরভ্যময়ং বসন্তঃ॥ ঋ—৩

রবীন্দ্রনাথ এই রস-রূপেরই কথা ব্যক্ত করলেন বসন্তের জাদু-স্পর্শের মধ্য দিয়ে—তার পরশপাথর ছোঁয়ানোর মহিমায়। বসন্ত 'নিত্যকালের মায়াবী'। তার 'নবীন জাদু'র 'অপরূপ ছোঁয়া'য় ধরণী জেগে উঠে নূতন রূপে। প্রাচীনের ধ্বংসে প্রতিষ্ঠিত হয় নবীন। ধূলিও পরিণত হয় স্বর্ণে, মূল্যহীনও হয় বহুমূল্য।

মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর কাছে আছে তার
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বকীয় স্বতন্ত্র নৈপুণ্যে ঐন্দ্রজালিক বসন্তের বিচিত্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেন যে সে ধরণীর এত প্রিয় সে সম্বন্ধে মহাকবি নীরব। তাঁর অকথিত কথা বলবার ভার নিলেন যেন তাঁরই ভাবসহচর রবীন্দ্রনাথ। বসন্ত যে শুধু বহির্বিশ্বকে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেই ক্ষান্ত হয় তা নয়, সে স্বর্গের সঙ্গে মর্তের যোগ-সূত্রও স্থাপন করে। কৌতূহলী প্রণয়ীর মত সে ধরণীর ধ্যান ভেঙে দেয় তার চকিত আবির্ভাবে। মাটির ধরিত্রী পায় স্বর্গের সুষমা। সুন্দরের সঙ্গে মিলনের মহালগ্ন উপস্থিত জেনে সে হয় পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা। এই মিলনের আনন্দে থাকে কত অতীত বিরহের ব্যথার স্পর্শ। বসন্তের পুষ্পে লেখা থাকে কত 'জগতের প্রাচীন দিনের বিস্মৃত বারতা' আর সেই পুষ্পসৌরভে ভেসে আসে 'ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের কান্ত মধুরতা'। 'প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবনে'র উচ্ছ্বাসে ভেসে আসে 'লক্ষদিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা অশ্রু, গান, হাসি'র কত সুখদুঃখ-জড়ানো স্মৃতি। অতীতের হারানো ধন ফিরে পাওয়ার আনন্দ-বেদনা হৃদয়কে উপচিত উচ্ছ্বাসে ভরে দেয় বলেই বসন্ত ধরণীর এত প্রিয়। তাই বসন্তের উপহার-মাল্য গাঁথতে গিয়ে কবিরও মনে উদিত হয় কত 'নামহারা নায়িকা'র ব্যর্থ প্রণয়-কাহিনীর ব্যথিত স্মৃতি, আর সেই স্মৃতির ভারে গুরুভার হয়ে উঠে তাঁর গ্রথিত মালা। ব্যথিত হৃদয়ে কবি বলেন—

যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্নসেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে॥

অগণিত ব্যর্থ প্রেম-কাহিনীর বেদনাভরা স্মৃতিকে বহন করে আর স্বর্গে-মর্তে 'বন্ধনদোলরজ্জু'র দোলা সৃষ্টি করেই কুসুমাকর অনন্যোপম। তাই তারই জন্য ধরণীর সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা—

'আপনারে তপ্ত করে ধৌত করে ছাড়ে আভরণ
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ'।

তার আবির্ভাবে, তার মাধুর্যের পরশ লাভে ব্যাকুল হয়ে উঠে মুগ্ধা ধরণী। বসন্তের উতলা উত্তরীয় হতে আশীর্বাদ ঝরে পড়ে ধরণীর অবনত শিরে নন্দনের মন্দার বেণুরূপে—'মাটির বিচ্ছেদপাত্র' ভরে উঠে 'স্বর্গের উচ্ছ্বাসরসে'।

সোনালি মুহূর্ত

শ্রীকরুণাময় বসু

মেঘের ছায়ার খেলা, অরণ্যের উদাস মর্মর
তরুণ তরুর কুঞ্জে পাখীদের করুণ কূজন ;
সোনালি রৌদ্রের রঙ, পুষ্পগন্ধে বাতাস মন্থর,
ছায়াঢাকা বনবীথি, চলো সেথা বসিব দুজন।

কনকচাঁপার কুঁড়ি কবরীতে গেঁথে নিও তুমি,
নির্জন বনের পথে ঘুঘু-ডাকা নিস্তব্ধ দুপুর ;
মেঘ আঁকা নদীজল, ফুলে ফুলে মুগ্ধ বনভূমি,
মিঠে মিঠে হাওয়া বয়, চলো কোথা দূর আরো দূর।

বিস্মৃত কৈশোর কাল, মদির মুহূর্তগুলি বুঝি
রঙীন পাখার ভরে উড়ে এল তোমার আঁচলে ;
হাওয়ায় নূতন গান, হারানো সে দিনগুলি খুঁজি,
ঝিনুক-কুড়ানো দিন, শুক্তি-শুভ্র রৌদ্র জ্বলজ্বলে।

কাশবনে প্রজাপতি, ঘাসে ঘাসে কাঁচপোকা ওড়ে,
তুমি আমি কতো দিন চলে গেছি পদ্ম, কেয়া-বনে ;
বিস্মৃত সুরভি-স্বপ্ন স্মরণের পথে আজো ঘোরে,
আচমকা গন্ধ আসে ছায়া-ঢাকা ব্যাকুল শ্রাবণে।

মনের মৌচাক ভাঙা, মৌমাছিরা তবু জাল বোনে,
যে গান ফুরায়ে গেছে, তার সুর আজো বুঝি শোনে।

নেপথ্যে

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

মফস্বল শহর। কলকাতার কাছেই। তবু এই গলিটা খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। বাড়ীটায় ঢোকবার মুখে দেখা হ'ল একজোড়া ছেলেমেয়ের সঙ্গে। নিশ্চয়ই ভাইবোন। যেমন নোংরা ওদের জামা প্যান্ট, তেমনি নোংরা খেলা খেলছিল। দেয়ালের গায়ে আঁটা রং-চটা নম্বরের প্লেটটা দেখেও নিঃসন্দেহ হবার জন্য শুধালাম, এইটেই ত এগারো নম্বর?

আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করলে, কাকে চাই?

উত্তরের বদলে পাল্টা প্রশ্ন শুনে বুঝলাম—ঠিকই এসে পড়েছি। নিজের পরিচয় দিয়ে মেয়েটিকে বললাম, বাবাকে বলগে হুগলী থেকে এসেছি।—খবর দিতে গেল না মেয়েটি। ফ্রক ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। যেন আমাকে চিনে নেবার চেষ্টা করছে, কিশোরী-মনের দুর্ব্বল স্মৃতি হাতড়ে ভাবছে—কোথায় আমাকে দেখেছে।

'বাবা, মা, দেখবে এসো', হঠাৎ আমাকে চিনে ফেলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, 'মেসোমশাই এসেছে।' ছেলেটি বয়সে ওর চেয়ে ছোট। এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার দিদির সঙ্গে গলা যোগ করে গোলযোগের সৃষ্টি করল।

এদের হাঁকডাকে সদর দরজাটার পেছনে এসে দাঁড়াল সুমিতা। দরজার আড়ালে আব্রু রক্ষা করে শুধু মুখটা বাড়িয়ে আমাকে দেখল একবার। আমাকে আশা করে নি সুমিতা। খবর না দিয়ে আমি যে হঠাৎ একদিন এমনি করে এসে পড়ব, এ কথা ভাবতেও পারে নি সে। আমাকে দেখে সুমিতার মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। নিজেকে সামলে নিল সুমিতা। গায়ে তার ব্লাউজ নেই। কাপড়ের আঁচলটা টেনে টুনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে নিল। তার পরেই একটু শুষ্ক হাসি হেসে বললে, আসুন, ভেতরে আসুন।

সুমিতার পিছনে পিছনে গিয়ে বসলাম একটা সাদামাটা খুপরি-মতন ঘরে। খুব গরম। একখানা হাতপাখা নিয়ে বসে সুমিতা বললে, এত দিনে মনে পড়ল, জামাইবাবু?

অভিমান। মামুলি অভিযোগ। অনেক চিঠি লিখেছে সুমিতা। বছর চারেক ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। চিঠিতে অনুরোধ করেছে যেন একবার আসি তার বাসায়। সে সুযোগ আর হয় নি। শেষটায় মাস চারেক বোধ হয় রাগ করেই আর কোন চিঠি দেয় নি। আজ এদিকে এসেছিলাম সরকারী কাজে। এত কাছে এসেছি, ভাবলাম অন্ততঃ একবার যাওয়া উচিত। নইলে ভাল দেখায় না। এ সব কথা এখন আর বললাম না সুমিতাকে। পরে বলেছি। তা ছাড়া তার প্রশ্নটা ত আর উত্তর পাওয়ার জন্য নয়। তাই অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। কৈ, তোমার কর্ত্তাকে ত দেখছি না? কোথায় গেল শৈলেন?

ও-ঘরে গুরুগিরি করছে। আস্তে উত্তর দিল সুমিতা। ওর কথাগুলো যেন কেমন শোনাল!

সুমিতার কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে এসে ঢুকল শৈলেন। তার দুটি হাত দুই পুত্রকন্যা ধরে আছে। ওঘরে শুনলাম কারা যেন কথা বলছে। পরক্ষণেই কতকগুলো পায়ের শব্দ—জুতো, স্যাণ্ডেল আর চটির ঐকতান।

শৈলেনের মেয়েটির নাম সুজাতা। খুব চটপটে, আর বাকপটু। ও বললে, এই যে বাবাকে ধরে এনেছি। যেন কত বড় কৃতিত্ব! তারপর আমার খুব কাছ ঘেঁসে এসে মিহি সুরে বললে, চারটে পয়সা দিন না মেসোমশাই, ডালমুট খাব।

পকেটে হাত দিয়ে একটা আধুলি বার করে দিলাম সুজাতাকে। আর ওর ভাই টুমুকে ডেকে দিলাম চার আনা। ওরা খুব খুশী। ছুটে পালাল দু'জনেই।

সুমিতা কিন্তু একটু যেন বেজার হ'ল। বললে, এ কি করলেন জামাইবাবু! ওদের হাতে পয়সা দিতে আছে? বলেই কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুমিতা। বললে, দেখি ওগুলো আবার কোথায় গেল। আপনারা দু'জনে মিলে গল্প করুন, আমি এখুনি আসছি।

সুমিতা চলে গেল ছেলেপুলেদের তদারক করতে। আমি আর শৈলেন ঘরে রইলাম। কত রকম গল্প হ'ল। তারই মধ্যে এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, সুমিতা বললে, 'গুরুগিরি করছে'; সেটা আবার কি?

আর বলেন কেন দাদা, এক গাল হেসে বললে শৈলেন, উপরোধে ঢেঁকি গিলছি আর কি। পাড়ার কয়েকটা ছেলে এবার ম্যাট্রিক দেবে, তাই ধরেছে তাদের পড়াতে হবে। টুইশানি করি কখন, সময় কৈ? আর ও আমার ধাতে সয়ও না। তাই বলেছি, মাঝে মাঝে এসো, দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। এই আর কি!

কিছুক্ষণের মধ্যে এক কাপ চা নিয়ে এসেছে সুমিতা। আর কিছু নয়, শুধু এক কাপ চা। সুমিতা বললে, ছোট গিন্নীর হাতের চা, শুধুই খেতে হবে কিন্তু। বাজারের কেনা খাবার দিয়ে ভদ্রতা আপনার সঙ্গে করতে পারব না। এখন আছেন ত ক'দিন, দেখি যদি নিজের হাতে করে কিছু খাওয়াতে পারি।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, তোমার হাতের চা 'চা' 'টা'রই সমান। নাই বা হ'ল আর কিছু। তবে থাকতে আমি পারব না সুমিতা, মাপ করো।

এবারে শৈলেন চেপে ধরল, তাও কি হয় দাদা। কত দিন পরে এলেন। অন্তত পাঁচ-সাত দিন—

কিছুতেই এড়াতে পারি না শৈলেনকে। কোন ওজর-আপত্তি সে শুনবে না। সুমিতাকে বুঝিয়েছি, সরকারী কাজ, ছুটি নেই। তাতেই ও শান্ত হয়েছে। কিন্তু শৈলেন নাছোড়-বান্দা। শেষটায় বলতে হ'ল, আচ্ছা, আজকের রাতটা ভেবে দেখি, কাল বলব।

তখনকার মত তুষ্ট হ'ল শৈলেন। হঠাৎ দেয়াল-ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই উঠে দাঁড়াল সে। বললে, আপনি এবার বসুন, আমি উঠি।

ও, তোমার ত আবার আপিস আছে, আজ যে সোমবার। আমি বললাম। তা তোমার যে দেরি হয়ে যাবে।

দেরি যখন একবার হয়েছে, বললে শৈলেন, তখন আজ ডুব মেরে দিই। কি বল তুমি?—যেন সমর্থনের জন্য তাকাল সুমিতার দিকে।

সুমিতা কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। কিছু না বলে চলে গেল সে রান্নাঘরের দিকে।

রেগে গেল নাকি সুমিতা?

শৈলেনের দিকে চেয়ে ঠাট্টার সুরে চাপা গলায় বললাম, ঘন ঘন কামাই কর বুঝি? অত কামাই করো না হে, গিন্নী বেজার হয়।

পরক্ষণেই শৈলেনের ডাক পড়ল রান্নাঘরে। বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত এলে যা হয়। কি খাওয়ানো হবে, বিছানায় কোন চাদরটা পাতা হবে সেই সব সলাপরামর্শ। আমি জামা কাপড় বদলে একটা বই নিয়ে শুলাম। কোন রকমে সময় কাটানো।

বইয়ের গোটা দুয়েক পাতা সবে উল্টেছি অমনি রান্নাঘরের দিকে কান্নার শব্দ শুনলাম। এমন আকস্মিকতায় বিস্মিত হলাম। গিয়ে দেখলাম কাঁদছে টুনু আর সুজাতা। সুমিতা ওদের থামাবার চেষ্টা করছিল চাপা গলায় ধমক দিয়ে। আমাকে দেখে লজ্জা পেল।

একটা থলে হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে শৈলেন। বাজারে যাবে সে। আমাকে সে বোধ হয় দেখে নি। বললে, আরে বাপু তোদের পয়সা দিয়ে তোদেরই আম এনে দেব, তাতে কাঁদবার কি হ'ল?

তখনকার মত থামল ওরা। কিন্তু আবার কান্না জুড়ে দিল, শৈলেন যখন ফিরল বাজার করে। ওদের জন্য কিছুই আনে নি।

কিন্তু আমার জন্য ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নি। দু' বেলাই বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। রাত্রে শোবার ব্যবস্থা হয়েছে পাশের ঘরে যেখানে শৈলেনের ছাত্রেরা আজ পড়ে গেছে।

অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম আসছে না। নতুন জায়গা। পুরনো ঘর—অসম্ভব গরম। সুমিতা মাথার কাছে একটা ঘটি ভরে জল আর একটা গেলাস রেখে গেছে। বার বার উঠে জল খাচ্ছি। রাত দশটার পর বাড়ীওয়ালা ইলেকট্রিক আলো জ্বালতে দেয় না। তাই একটা হারিকেনও দিয়ে গেছে সুমিতা। সেটা 'ডিম' করে রেখেছি।

রাত একটা বা দেড়টা বাজল ও ঘরের দেয়াল ঘড়িতে। এবার ঘুমনো দরকার। জোর করে চোখ বুজেছি। তন্দ্রাও বোধ হয় একটু এসেছে। হঠাৎ দরজায় টোকা মারার শব্দ। প্রথমে আস্তে, তারপরে জোরে—আরও জোরে। উঠে দরজা খুললাম।

একি, তুমি সুমিতা? এত রাত্রে? ভূতাবিষ্টের মত আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সুমিতা নীরবে এসে আমার বিছানায় বসল। আমি হারিকেনের কলটা ঘুরিয়ে আলোটা বাড়িয়ে নিলাম। ঘুম-ঘুম চোখে হারিকেনের আলোয় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে সুমিতাকে। তবু বেশ বুঝলাম, ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, ঠিক যেমনটি হয়েছিল সকালে দরজার আড়াল থেকে আমাকে দেখে।

জামাইবাবু! সুমিতার গলায় কিসের বেদনার আভাস।

আমি অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কালকে আপনি আর থাকবেন না জামাইবাবু, বললে সুমিতা। উনি অনুরোধ করলেও না। কথা দিন, কাল সকালেই আপনি চলে যাবেন?

কিন্তু কেন? মুখ থেকে ছুটে বেরুল প্রশ্নটা। কৌতূহল আমার অপরিসীম।

ওঁর আজ তিন মাস হ'ল চাকরি নেই। সুমিতা কান্না-মেশানো গলায় বলে, প্রাইভেট ট্যুইশানি করে কোন রকমে দিন কাটে। আপনি এলেন, কত আনন্দ হবার কথা। কিন্তু আনন্দ করব কি দিয়ে? ছেলেপুলের হাতে আপনি পয়সা দিলেন তাই দিয়ে বাজার হ'ল। কত কষ্টে যে আছি!

একটু দম নিতে থামল সুমিতা। তারপর বললে, পাছে উনি আঘাত পান তাই সারা দিন কত মিথ্যে অভিনয় করতে হ'ল। আপনি আর একটা দিন থাকলে এই অভিনয়টুকুও চলবে না। ধরা পড়ে যাবেন উনি। ওঁর তাতে বড় কষ্ট হবে।

কান্নায় জড়িয়ে আসে সুমিতার গলা। আমি কথা দিলাম, কাল ফার্স্ট ট্রেনেই চলে যাব।

সুমিতা ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল আমি ডাকলাম, সুমিতা!

কাছে এস। বালিশের তলা থেকে মানিব্যাগ বার করে দশ টাকার পাঁচখানা নোট ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, কিছু মনে করো না, এ আমার—

কথা শেষ হবার আগেই সুমিতা টাকাগুলো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর আবার আমার দিকেই ছুঁড়ে দিয়ে বললে, এর পর থেকে কোনদিন এদিকে এলে হোটেলে এসে উঠবেন।

কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল সুমিতা।



পাম্‌-টি জ এভিনিও :—আলাস্‌সিও, ইটালী

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

ছয়

২৪শে ফেব্রুয়ারী '৫৪। আজ থেকে সুরু হ'ল আমার সাত দিনের কার্নিভ্যাল-ট্যুর ইটালীয়ান ও ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাতে।

ইটালীর লোকেরা ভূমধ্যসাগর-পারের রিভিয়েরাকে বলে 'রিভিয়েরা দেই ফিয়োরি', ফুলের রিভিয়েরা। এই আশী মাইল লম্বা রিভিয়েরার সর্ব্বত্রই রীতিমত ফুলের চাষ হয়—যেমন হয় আমাদের পাটের ও ধানের। 'সান রেমো'র ফুলের মিছিল বের হয়। সীমান্ত-ষ্টেশন 'ভেন্তি মিল্লিয়া'র আন্তর্জাতিক ফুলের বাজার বসে। দেশ-বিদেশের ফুল আসে, ফুল-রসিক আসে—ফুলপরীদের হাট বসে।

এই ফুলের দেশের রাজধানী হ'ল সান রেমো। ট্রেন থেকে নেমে ট্যুরিষ্ট-আপিসের মহিলাটির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম—একটু কম খরচে কোন হোটেলে একটা ঘর পাওয়া যাবে কি দিন সাতেকের জন্য?

ভদ্রমহিলার ব্যস্ততার সীমা নেই, হয়তো বদান্যতারও। সাত-আট জায়গায় ফোন করে অবশেষে জানালেন—অসম্ভব। এই সপ্তাহেই 'নীস'এ কার্নিভ্যাল, সান রেমোয় ফুলের মিছিল। অতএব হোটেলগুলোয় দর্শকবৃন্দ মৌমাছির মত চাক বেঁধেছে।

একে তো আমি বিদেশী, তার উপর পকেট একেবারে বরফ-ঠাণ্ডা না হলেও, ঈষদুষ্ণও নয়। আমি মিনতি-মাখানো অসহায় দৃষ্টিতে তাকালাম। রণে ভঙ্গ দেওয়ার আগে শেষ অস্ত্র ছাড়লাম।

খানিক পরে ভদ্রমহিলার চোখে মুখে হঠাৎ খুশির ঢেউ উঠল। কাগজে আঁকজোক করে, 'বর্দিগেরা'তে ছোট্ট পাহাড়ের উপর ইয়ুথ হোষ্টেলের অবস্থিতি বুঝিয়ে দিলেন। ওখানে জায়গা নেই বলে কেউ কখনও ফিরে আসে নি, এ কথাও বললেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামলাম।

বাস থেকে নেমে এক পথ-চলতি বুড়ীকে জিজ্ঞেস করে ইয়ুথ হোষ্টেলে যাবার পাহাড়ে রাস্তায় যখন এসে পৌঁছলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল দেখা দিয়েছে। প্রায়-শেষ-হয়ে-আসা শীতের বৈকালিক বাঁকা রোদ পাহাড়ের ধাপে ধাপে রঙীন ফুলের ঝোপে অপরূপ মায়ার সৃষ্টি করেছে। চোখ ফেরানো যায় না। পথের ওপারে ঢালু জমি খানিক দূরে গিয়ে মিশেছে সমুদ্র-বালুতে। নীল জল হাল্কা সাদা পালক-মেঘের ছায়া বুকে নিয়ে বহুদূরে আকাশ-সীমায় ঠেকেছে।

আধ মাইল পাহাড়ে পথ ভেঙে ইয়ুথ হোষ্টেলে পৌঁছলাম। ভারী সুটকেসটা নামিয়ে হাল্কা হলাম। জায়গাটা শ্মশানের মত নিস্তব্ধ, ছেড়ে-আসা ভূতুড়ে বাড়ীর মত নির্জ্জন। মানুষের চলাফেরার কোন চিহ্ন নেই।

এই সন্ধ্যার মুখে এক ঝাপটা ঠাণ্ডা হাওয়া বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিল, মনটাকেও দমিয়ে দিল। অবশেষে উন্মুক্ত আকাশ-তলে তিন-পায়া বেঞ্চের উপর রুমাল পেতে বসলাম।

ভেবেছিলাম, কোলাহল-মুখরিত ছেলেমেয়েদের ঝাঁকে এসে উঠব। অফুরন্ত প্রশ্নের জবাবে ওদের আকণ্ঠ কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করব। কার্নিভ্যালের সপ্তাহটা ওদেরই একজন হয়ে আমি যে একলা, একথা নিজেকেও ভাববার সময় দেব না।



সাদা পাথরের অপূর্ব মূর্তি —সান রেমো,

কিন্তু এখানে যে একেবারে কানামাছি ভো ভোঁ, তা কি ভাবতে পেরেছিলাম!

এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল থেকে এক প্রৌঢ়া দেখা দিলেন। কাছে এসে প্রশ্ন করলেন—ক'দিন থাকবেন?

আমি অম্লান বদনে বললাম—যদি ভাল লাগে তো ছ'সাত দিন।

—সব দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন।

উনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে সব দেখালেন। বিরাট হলঘরে পাশাপাশি বিস্তর খাট। ঘরটা ঠাণ্ডা হিম, গরম রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। ওয়াশ বেসিন ত দূরে থাক, প্রায় দশ গজ দূরে একটা চৌবাচ্চা ও কল। দেয়ালে, বেঞ্চে, আগের দলটির নাম উৎকীর্ণ করার সযত্ন প্রয়াস।

আমি বললাম—অন্ততঃ একজনও যে এখানে আছে, তাও তো মনে হচ্ছে না।

প্রৌঢ়া বললেন—না। একজন জার্মান ছোকরা আছে। এখখুনি আসবে।

—ধন্যবাদ। ও, হ্যাঁ, আজকের রাতটা আপনার এখানে খেতে পাব কি?

—নিশ্চয়ই।

ঘরে স্যুটকেস নামিয়ে বিছানায় বসলাম নিতান্তই হতাশ হয়ে। ভাবলাম, ফিরে যাই। কিন্তু অসীম ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অবসন্ন।

দরজায় একটা ছায়া পড়ল। জার্মান ছেলেটি এল। দু'হাত ভর্তি রুটি, হ্যাম, মদ ও কমলা। ওগুলো নামিয়ে গভীর আগ্রহের সঙ্গে করমর্দ্দন করল।

মিনিট পনেরর মধ্যেই অতি দ্রুত কথাবার্ত্তায় সমস্ত খবর নেওয়া হয়ে গেল দু'জনেরই। তার বাড়ী ন্যুর্নবার্গ শহরে। বাগানে কাজ করে। কবির ভাষায় মালঞ্চের মালাকর। রিভিয়েরাতে এসেছে সান রেমোর বিখ্যাত ফুলের বাগানগুলো দেখতে।

তার মাতৃভাষা জার্মান, আমার বাংলা, কিন্তু আমাদের আলাপ হ'ল ইটালীয়ানে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী '৫৪। ভোরে হাড়-কাঁপানো শীতে ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে এসেই বললাম—দেখ রুডলফ, আমি ভাই এখানে থাকতে পারব না। রাত্রে ঠাণ্ডায় একদম ঘুমোতে পারি নি। তুমি ত দিব্যি ঘুমিয়েছ। ন্যুর্নবার্গের তুলনায় তুমি ত ট্রপিকসে এসেছ।

জার্মান ছেলেটির নাম রুডলফ আইরিশ।

রুডলফ বলল—বেশ তো! সান রেমো যাবার পথেই দেখে নেব।

পাহাড়ে পথটার তিন ভাগেই ও আমার ভারী স্যুটকেসটা বইল। সঙ্কোচ বোধ করলাম, কিন্তু উপায়ও ছিল না। আমার আপত্তিকে ও আমলই দিলে না।

বর্দিগেরা ও সান রেমোর মাঝখানে অসপেদালেত্তি, সমুদ্রতীরের ছোট শহর। এখানকার বাসিন্দা চার হাজার। এখানেই হোটেল 'ইতালীয়া'তে একটা ঘর জুটল। স্যুটকেসটা ঘরে নামিয়েই সান রেমোর বাস ধরলাম দু'জনে। তখন বেলা ন'টা।

সমুদ্রের ধার দিয়ে মসৃণ রাস্তাটা এঁকে বেঁকে গাছপালার মধ্যে মিশে গেছে। আমাদের পুলম্যান চলেছে অলস গতিতে—যেমন চলেছিল ব্যাগ-হাতে বুড়ীরা বাজারের পথে। ভূমধ্যসাগরের ঘন নীল জলে রোদ চক্ চক্ করে উঠছে। মনকে, জানি না, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এমন পরিপার্শ্বের তুলনা হয় না।

সান রেমোর উপান্তে নামলাম। রুডল্ফের কাছে বিশেষ পরিচয়পত্র থাকায় একটি স্যুইস ও একটি ইটালীয়ান্ ফুলবাগানে আমরা সাদর অভ্যর্থনা পেলাম। গাইডের পিছু পিছু খুটে খুটে

দেখলাম। পাঁচ মহাদেশের পাঁচ হাজার রকম ফুলগাছ নিয়ে ওখানে গবেষণা চলেছে সারা বছর ধরে।

রুডল্ফ আমাকে বোঝাচ্ছিল, কোন্ ফুলের ডাটা কতখানি সরু হবে, কতখানি লম্বা হবে। পাপড়ির কোন্ রঙে কমনীয়তা বেশী, কোন্‌টায় উন্মাদনা বেশী। পাপড়ির আকার-রেখায় কোন্‌টার সৌন্দর্য্য মন-মাতানো।

বাগান থেকে বেরিয়ে বেল, কদম, কাশগুচ্ছ নিয়ে আলোচনা করতে করতে এক সময় সান রেমোর শহরকেন্দ্রে পা দিলাম। কেন্দ্রের জলুস আমাদের টানল না। সমুদ্রের ধারে এলাম। লম্বা টানা রাস্তা চলে গেছে। পাশেই চওড়া ফুটপাথ। ফুট-পাথের উপরেই মাঝে মাঝে পাম গাছের মরুদ্যান, নানা আকারের ও নানা রঙের ফ্লাওয়ার-বেড। একদিকে কিছুদূর এগোলেই সাদা পাথরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি 'প্রিমাভেরা'। 'প্রিমাভেরা' মানে বসন্ত। চিরবসন্তের দেশ রিভিয়েরাতে ওরা বসন্ত-সত্তাকে প্রকাশ করেছে জীবনের যৌবনরূপে। ঐ মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখে দিনের শেষে শ্রান্ত-ক্লান্ত মজুরও একটিবার থামবে। ভাববে, মজুরি, আয়ব্যয় আর দেনা-পাওনার হিসেব করেই জীবনের পাতাগুলো ভরাট করলে চলে না। বসন্ত যে এল, গেল দু'একটি ছেঁড়া পাতাতেও হিজিবিজির আঁচড় কেটে, সে হিসেব রাখতে হয়।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে কখন সান রেমোর পুরানো শহরে চলে এসেছি। এখানে চলার পথ বড় একটা নেই, আছে উঠবার সিঁড়ি। বাড়ীগুলোর প্রসাধন ঝরে গেছে, ভাঙাচোরা দেয়ালে প্রৌঢ়তার কাঠিন্য ফুটেছে। তবু কোনটির গায়ে দু'এক ফালি রোদ, কোন জানলায় দু'একটি ব্যাকুল মুখ—আমাদের প্রাণে পুলকসঞ্চার করল।

অনেক আর্চের নীচে দিয়ে এলাম, অনেক সিঁড়ি ভাঙলাম। অবশেষে ক্লান্ত পায়ে আমি আর রুডল্ফ বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম—তখন বিকেল তিনটে।

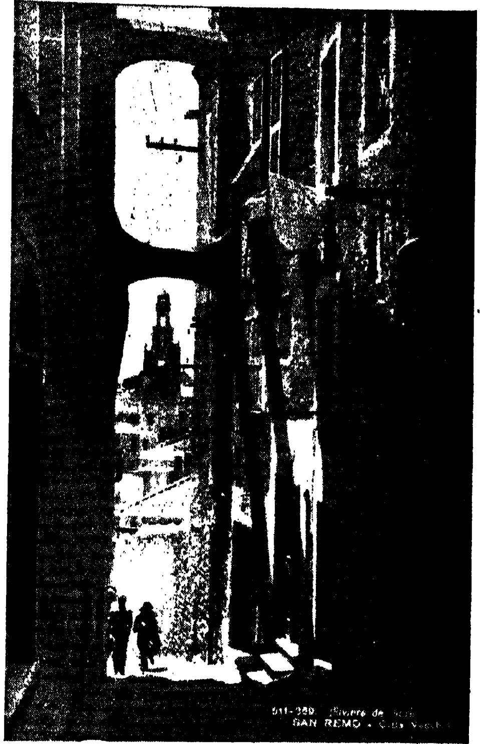
অল্পক্ষণ পরেই সুরু হ'ল ফুলে সাজানো গাড়ীর মিছিল। মোটর, লরী, ল্যাণ্ডো নানান ডিজাইনে ফুলে ফুলে সাজান—রঙে রঙে রঙীন—ভেতরে ঝলমলে পোশাকে রকমারি ভঙ্গীতে ফুলপরীরা দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে ওরা জনতার দিকে ফুল ও লজেন্স ছুড়ছে। পথ থেকে ভাঙা লজেন্সের টুকরো কুড়োতে ব্যস্ত হ'ল সবাই। যেন স্ফটিক-জলে হঠাৎ ঢেউ এল।

বেলা চারটে নাগাদ 'অসপেদালেত্তি'তে ফিরে এলাম। পরস্পরের নাম ঠিকানা লিখে নিলাম। আমি গেলাম ওকে বাসে তুলে দিতে। অনেকক্ষণ হাতে হাত রেখে মুখের দিকে চেয়ে দু'জনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বাসে উঠে হাত নেড়ে রুডল্ফ বলল—ভুলো না গিয়ে চিঠি দিও।

—নিশ্চয়ই দেব।

২৬শে ফেব্রুয়ারী '৫৪। বিশেষ প্রোগ্রাম ছিল না। সান রেমোয় একবার চক্কর দিয়ে এলাম।

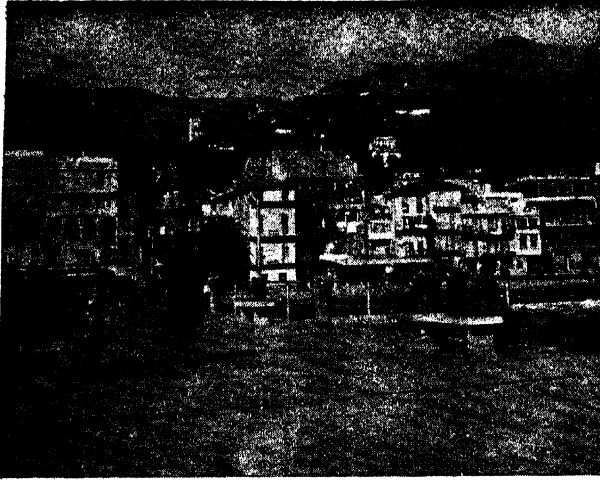


সান রেমোর পুরনো শহর

বিকেলে হোটেলে ফিরে ডায়েরী খুলে বসেছিলাম কিছু লিখব ভেবে। দু'এক কলম লেখার আগেই অনেক চিন্তা ভিড় করে এল। মনে পড়ল মিলানে আমার ছোট্ট ঘরখানির কথা। মনে পড়ল বাড়ীর কথা। কেমন যেন একটা হু-হু করা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মনটাকে চঞ্চল করে তুলল। টেবিলে সবকিছু ফেলে রেখে বাইরে নির্জ্জন রাস্তায় নেমে এলাম।

সকালে-সুরু-হওয়া সেই অশান্ত সাইক্লোনিক বাতাস এই সন্ধ্যাতেও গাছের পাতায় পাতায় যুদ্ধ-সাইরেন বাজিয়ে চলেছে। প্রায়ান্ধকার গলিগুলো ব্ল্যাক-আউট-রাত্রির আভাস দিল। দূরে পাথুরে পথে একটা ক্ষীণ খট খট শব্দে প্রহরী-সৈনিকের ভারী বুটের কথা স্মরণে এল। বাকী ছিল শুধু আকাশে দানবীয় প্রপেলারের আক্রোশভরা গর্জ্জন। আর হয় ত হাইড্রোজেন বোমাও।

যে-কোন মুহূর্ত্তে গোলা ফাটবে, এমন সময় এক কোণে 'নিয়নে' লেখা 'সিনে' দেখে রোমাঞ্চিত হলাম। যেন শত্রুপক্ষ চলে যাবার-পর 'অল ক্লিয়ার' হয়েছে।



সিমেন্ট-বাঁধানো জেটি আলসসিও

মালিক-গিন্নী স্কার্টের এক প্রান্ত দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে এল।

মালিক আমার পরিচয় দিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক সপ্রতিভ হাসিতে হাত বাড়িয়ে দিল গিন্নী, তার পর গল্প হ'ল অনেকক্ষণ। বাড়ীর কথা, মা, ভাই-বোনদের কথা, ভারতের সমাজ ও জীবন-যাত্রার কথা।

এক সময় হঠাৎ মালিক-গিন্নী উঠে দাঁড়িয়ে বলল—এখন আমাকে বাড়ী যেতে হবে। কিছু খাব, পোশাক বদলাব, এসে ফিল্মটা চালাব। চললাম, কিছু মনে করবেন না।

আমিই পয়া ছিলাম কিনা জানি না, দেখলাম, আশা না করা সত্ত্বেও বেশকিছু দর্শক জুটল। মালিকের উপর আন্তরিক সহানুভূতিতে আমারও মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

ঘড়ির দিকে তাকালাম, সাতটা বাজে। সিনেমাতেই ঢুকে যাই, ভাবলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি সিনেমা-মালিক কাগজ পড়ছে, আর প্রাণপণে সিগারেটে টান দিচ্ছে। বোধ হয়, মালিক-গিন্নী, ক্রুশ্চিক দিয়ে হল ঝাট দিচ্ছে। ছোট্ট হলটা ধুলোয় ধুলোয় লণ্ডন 'ফগ'-এর চেহারা নিয়েছে। বুঝলাম, পর্দা উঠতে রীতিমত বিলম্ব আছে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কখন সুরু হবে?

কাগজ ভাজ করল মালিক, সিগারেটের পোড়া অংশটুকু নিভিয়ে পকেটে পুরল। আমার দিকে বেশ খানিকক্ষণ গোল-চোখে চেয়ে থেকে বলল—আটটায়।

—মাত্র একটাই বুঝি শো?

হ্যাঁ। তাও রোজ নয়। সপ্তাহে চার দিন। এর চেয়ে বেশী আর কি আশা করা যায়? মাত্র চার হাজার বাসিন্দা। তার উপর সবাই গরীব—ক্ষেতে-বাগানে কাজ করে। কাজেই আমার অন্ন জোটে না। আর আজ দেখুন না, কি ভয়ানক বাতাস। কেউ বাড়ী থেকে বেরোবেই না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ মালিক আবার জিজ্ঞেস করল—মাপ করবেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—ইণ্ডিয়া, কালকুত্তা।

ল্যাটিন ইউরোপে কলকাতার নাম কালকুত্তা।

—ও! কিন্তু এখানে কি করে এলেন?

সংক্ষেপে বলতে হ'ল—ইটালীয় সরকারের বৃত্তি পেয়েছি। মিলানে পড়াশুনা করছি। এই সপ্তাহে এখানে এসেছি নীস সান রেমোর কার্নিভ্যাল দেখতে। সান রেমোয় জায়গা নেই, তাই বাধ্য হয়ে এই উপনগরে এলাম।

—ব্রেভো, ব্রেভো!

অনেক চেষ্টা করেও টিকিটের দামটা গছানো গেল না। মালিক নাছোড়বান্দা। বলল—আপনি সরকারের অতিথি, আমাদেরও অতিথি। সামান্য টিকিটের দামটুকু নাই বা নিলাম।

ছবির শেষে আমার হাতে দরদের সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—কাল থেকে 'ওয়ার পাথ' দেখাব, আসতে ভুলবেন না কিন্তু!—ছবি দেখতে ত ভালবাসেন।

—চেষ্টা করব। অনেক ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।

—শুভেচ্ছা রইল। শুভরাত্রি।

২৭শে ফেব্রুয়ারী '৫৪। সান রেমো থেকে 'আলাসসিওর বাস ধরলাম সকাল ন'টায়। ঘণ্টাখানেকের পথ। অতি আরামদায়ক 'পুলম্যান'-এর বাস। শান্তশিষ্ট ও ভব্য যাত্রীদল। নেই কণ্ডাক্টরের কর্কশ যাত্রী-তাড়না ও ঘন ঘন ঘন্টির ঐকতান। নেই ঘটি অথবা গামছা-হারানো তর্কবিতর্ক। নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম পকেট, জুতো ও চশমা বাঁচিয়ে।

ছোট শহর, আর পাঁচটা সমুদ্র-শহরের মতই। বিশেষত্ব শুধু একটা, আর তা অতুলনীয়। যে পথগুলো গিয়ে মিশেছে সমুদ্রের বালুতে, সে-সবগুলোই সাজানো ছোট ছোট পাম গাছের সারিতে, মুখরিত 'রাস্তা-কাফে'র গুঞ্জনে। হয়তো বেশ লাগে ওখানে বসে থাকতে রোমান্স-ভরা পরিবেশে কিছুক্ষণ। ভাল লাগে ঐ তো ওখানে, ঐ রঙিন ছাতাটার নীচে, পথে-চেনা কোন একজনের হাতে হাত রেখে এলোমেলো অর্থহীন কথায় সময় কাটাতে। যেন গোটা জীবনটাই অবসর আমাদের। সময় বয়ে যায়, যেতে দাও।

আরও এগিয়ে বালিতে পা দিলাম। একটা সিমেন্ট-বাঁধানো জেটি অনেক দূরে সমুদ্রের বড় ঢেউগুলোর উপর গিয়ে থেমেছে।

বোধ হয় আর এগোতে সাহস করে নি।

জেটির প্রান্তে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। ঠায় বসে রইলাম অনেকক্ষণ। ভূমধ্যসাগরের নীল জলে ছিল না তরঙ্গ-গর্জ্জন। আকাশ জুড়ে ছিল কালো ভারী নিস্পন্দ মেঘ। ভ্রমণকারীদের পদচারণায় ছিল না ব্যস্ততা, ছিল না চাঞ্চল্য। একটা অদ্ভুত অলসতা দেখলাম আকাশে, বাতাসে ও মানুষের চলাফেরায়!

পিছিয়ে-পড়া দিনগুলোর কত খুঁটিনাটি, কত ছোট ছোট ঘটনা মনে এল, ভাবলাম, এমন পরিবেশ আর কি কখনও পাব। কোন কথা নয়, কোন সঙ্গ নয়, শুধু মনের ভিতরে খুঁটে বেড়ালাম ছড়ানো-ছিটানো স্মৃতিকণাগুলো।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটা বাজে। মনে হ'ল, আজও কেন এই জীর্ণ ঘড়িটা ঠিক চলল? কেন বন্ধ হ'ল না শুধু একবার? ভাবনার মেঘে মেঘে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসত। হয়ত বেশ হ'ত। কিন্তু—না, আর কিন্তু নয়। খেতে হবে, পথের ধারে একটা জায়গা নিতে হবে। বিকেল তিনটায় ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্যান্সি-ড্রেস প্যারেড। ঠিক যে জন্ম আজ সকালে 'আলাসসিও'তে নেমেছি। ভুলেই গিয়েছিলাম।



ছোটদের ফ্যান্সি-ড্রেস প্যারেড: আলাসসিও

ছোটদের ফ্যান্সি-ড্রেসের মিছিল সান রেমোর ফুলের মিছিলের চেয়ে অনেক ভাল লাগল। নানান পোশাকে এল ছেলেমেয়েদের দল। কেউ নিগ্রো, কেউ স্প্যানিশ গো-গাল, কেউ ইণ্ডিয়ান প্রিন্স, কেউ টেক্সাস-কাউবয়, আর কেউ বা সলাজ-ভঙ্গিতে নববধূর সাজে। কত এল, কত গেল। অফুরন্ত। পৃথিবীর সবাইকে এত নিকট করার চেষ্টা আগে কোথাও দেখি নি। আজ এই শিশুদের মিছিলে মনকে খুশি করার মত অনেককিছুই পেলাম।



কার্নিভ্যাল—নীস্, ফ্রান্স

২৮শে ফেব্রুয়ারী '৫৪। সান রেমো থেকে 'নীস'এ এলাম। বাস থেকে নেমে 'নীস'-এর রাস্তায় পা দিয়েই ছুটলাম আপিস-ঘরে। ফেরবার শেষ বাসে একটা জায়গা রিজার্ভ করে হাঁফ ছাড়লাম।

এবার কার্নিভ্যালে এসেছি, তেমনি চালে গুটি গুটি এগোলাম সহরের পানে চেয়ে চেয়ে। হাঁ, কার্নিভ্যালই বটে। নতুন কনের বেনারসীতেও ঝিলিক থাকে না এমন। রাস্তাময় রঙীন কার্টুনছবির ছড়াছড়ি। মোড়ে মোড়ে রঙীন মুখোশের দোকান। পসারিণীরাও রঙ-চঙে পোশাকে অপূর্ব্ব। পথে পথে রঙীন নিশানের লাইন, যে পথে যাবে কার্নিভ্যালের মিছিল।

টিকিট নিতে হবে গ্যালারিতে বসবার। জনা পাঁচেককে জিজ্ঞেস করে তবে টিকেট পেলাম।

নিশ্চিন্ত হয়ে সামনের পার্কটায় কয়েকটা চক্কর দিলাম। কেউ বেঞ্চে চোখ বুজে পা ছড়িয়ে ভাত-ঘুম দিচ্ছে, তার পাশেই একজন 'মাদাম বোভারী' গোগ্রাসে গিলছে। কেউ কেউ পোঁটলা খুলে 'হ্যাম'-এ ও 'রোল'-এ মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত হয়েছে। কেউ হাতের চেটোয় থুতনি রেখে মাটি দেখছে, পিঁপড়ে গুনছে নাকি? হয়ত!

একটা এদো গলির উঁচা রেস্তোরাঁয় ঢুকে বসলাম। ঝা,



কার্নিভ্যাল আর একটি দৃশ্য

শেষে বেলা দুটো নাগাদ একটা জুৎসই জায়গা নিয়ে বসলাম। কার্নিভ্যালের প্রোসেশন্ ত শুধু দেখতেই আসি নি, গেভাকালারে দু'চারটে ছবিও তুলব ভেবেছি। অতএব ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই যাত্রার আসরে 'হত্যে দিয়ে' রইলাম। যেমন ছিল আরও অনেকে নানা গাঁয়ের ওরা। যাত্রাদলের কেষ্ট তখন হয় ত লাঞ্চ সারছিল।

কার্নিভ্যালের প্রসেশন্ ঠিক যেন ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল। নানা রকম গাড়ী সাজানো হয়েছে বিভিন্ন ঢঙে, বিভিন্নতর রঙে। ক্লাউন-পুতুলগুলো হাত পা নাড়ছে, হাসছে, চোখ মিটিমিট করছে। নজতার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়েছে।

কিন্তু ঢাকার মিছিলের সেই কৃষ্ণলীলা, ননীচোর, আর ছাদের ওপর চিনেবাদামের ঢিবি ও আখের বোঝা—এ-সবের অভাবে 'নীস'-এর কার্নিভ্যালও তেমন জমল না। সে জলুসও নেই, সে আন্তরিকতাও নেই। যেন গরম বার্লির জল।

আর দেখলাম পথে পথে অগণিত মানুষের হোলিখেলা। ঠিক এই ফাল্গুন মাসেই ভারতেও আছে আমাদের পবিত্র উৎসব হোলি বা দোলযাত্রা। তফাৎ শুধু এই—আমরা ব্যবহার করি আবির ও সত্যিকারের রং, আর এরা খেলে রঙীন কাগজের কুচি দিয়ে।

ইউরোপের কার্নিভ্যাল-হোলি বেশ ভব্য। একমুঠো কাগজ-কুচি যত্রতত্র গুঁজে দেওয়া চলবে—অথচ সেই একই পোশাকে রাত্রে নাচঘরে অথবা কোন সান্ধ্য-মজলিসে যাওয়াও চলবে।

পথে উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়েদের কি উদ্দীপনা! কার্নিভ্যাল সত্যি করে ওদেরই। বিপুল বিক্রমে একে অপরের ওপর কাগজ-কুচি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ ধরনের গামা-কুস্তির উপর প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের যথেষ্ট অপছন্দ দেখলাম। ওঁদের মতে এতটা নাকি অসভ্যতা।

ভাবলাম, বুড়োবুড়ীরা এখন গেরুয়া পরেছেন, বাবাজী-মাতাজী হয়েছেন। বোধ হয় ভুলেই গেছেন—ওঁদেরও কৈশোর এবং যৌবন ঠিক এই ভাবেই কেটেছিল। বড়রা না শেখালে ছোটরা মহাজনের পথ অনুসরণ করবে কি করে? ওরা ত তা হলে ছোটই থেকে যায় চিরকাল।

বাইরে থেকে যেমন দেখাচ্ছিল, তেমন নয়। বেশ পরিষ্কার। কাউন্টারের মেয়েটিও সুন্দরী।

ওদিকে দেয়ালের কোণটায় একদল পাড়াগেঁয়ে ব্যাগ থেকে বিরাট বিরাট রুটি ও মদ বের করেছে। নিয়েছে রেস্তোরাঁর মাংস। গেলাসে মদ ঢালার শব্দে, শুকনো রুটি ভাঙার আওয়াজে, আর ওদের উপভাষার দ্রুততম গুঞ্জনে যেন 'কুগার্ট'এর কনসার্ট সৃষ্টি হয়েছে।

কেন জানি না, মাঝে মাঝে অদ্ভুত চিন্তা আমাকে পেয়ে বসে। এখনও রেহাই পেলাম না। আমি মনে মনে যেন এক স্বপ্নরাজ্যে চলে এলাম।

মনে হ'ল, ঐ পাড়াগেঁয়ে ওরা যেন 'কুগার্ট'-এর ব্যাণ্ড। ভাঙা ভাঙা কুৎসিত শেডগুলো যেন রঙীন ঝাড়লণ্ঠন। রং-ঝরে-পড়া হতশ্রী দেয়ালে দেখলাম 'পিকাসো'র আর্ট। শাদা জলের চুমুকে পেলাম শ্যাম্পেনের মদিরতা। প্লেটের সিদ্ধ মাংসের অণু-পরমাণুতে পেলাম যেন মোগল-মুসলমানের স্বাদ।

দেখলাম, কাউন্টারের সুন্দরীটি নাচছে, যেন স্প্যানিশ নাচের তালে তালে মাদ্রিদের ধূমাচ্ছন্ন নাইট-ক্লাবকে উন্মত্ত করে তুলেছে। মনে হ'ল, আমি যেন হলিউডের হিরো। এসেছি ডলারের 'কিট' কাঁধে বয়ে। যেন গ্রেগরী পেকের প্যাশন্ পেয়েছি বুকে, পেয়েছি লরেন্স অলিভিয়ারের কমনীয়তা। আর—

—মসিয়ো, ফ্রুইত?

—উঁহু, উঁহু।

ভুলেই গিয়েছিলাম আমি ত আমিই। ভুলে গিয়েছিলাম ঐ যে পাড়াগেঁয়ে দেহাতিরা, ওরাও ত আমাদের সেই পল্লীবাসীদেরই সগোত্র যারা রথের মেলায়—বটতলায় গামছা বিছিয়ে মুড়ি-বাতাসা চিবোয়।

১লা মার্চ '৫৪। 'অসপেদালেত্তি'তে মোটর সাইকেল 'গুৎসি'র টেষ্ট চলছিল। অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড ও ইটালীর সেরা চালকেরা একটা মাপা বৃত্তাকার পথে পাক দিচ্ছিল গোঁ গোঁ রবে। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে চোখদুটোকেও পাক দেওয়াচ্ছিলাম ভোঁ ভোঁ করে—মোটর-সাইকেলের সমান গতিতেই।

হঠাৎ কাঁধের উপর অল্প হাতের চাপ টের পেয়ে পেছনে চাইলাম। ট্রেনে আলাপ হওয়া ছেলেটি। আশ্চর্য্য মিশুকে ও রসিক। সমস্ত বিকেল ও সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিলাম ওর আর ওর দু'বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজবে এবং অলস পদক্ষেপে। অবশেষে রাত দশটার শেষ 'শো'তে ওরা আমাকে নিয়ে গেল সিনেমায়। আমার বন্ধুটি পুরো আড়াই ঘণ্টা জমে রইল পেছনের মেয়েটার সঙ্গে। সামনে পর্দায় যা ঘটল তাতে ওর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল বলে মনে হ'ল না। হল থেকে বেরিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে প্রায় স্বগোতোক্তি করল—মেয়েটা বেশ মিষ্টি ছিল!

আমি মনে ভাবলাম, কোন্ মেয়েই বা তোমার কাছে টক!

পথে অল্প হেঁটেছি, ছোকরা হঠাৎ বলল—এখন চললাম। পরে আবার দেখা হবে।

দেখতে দেখতে ও দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

৩রা মার্চ্চ '৫৪। হোটেল 'ইতালীয়া'র মালিককে হিপ্নোটাইজ করি নি ঠিকই। চেষ্টা করারও কোন কারণ নেই। তবু, কেন জানি না, বেশ নরম সুরে গদগদ ভাবে বলল—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুবই খুশী হলাম। আমি ভারত-ভক্ত। এ সাত দিনের জন্য আপনার কাছ থেকে কিছুই না নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ব্যবসার খাতিরে ঠিক যতটুকু না নিলে নয়, আপনি ততটুকুই দেবেন। আর একটা কথা, ভারতের ডাকটিকিট আমায় পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে। আমার খুব ভাল সংগ্রহ আছে।

মন বলল, যুগে যুগে পৃথিবীময় এমন অসংখ্য হোটেল-মালিক জন্মাও। বাড়ী ফিরেই পাঁচ সিকের ডাকটিকিটের ডালা দেব মায়ের বাড়ী।

সত্যি সত্যিই খুব কম নিল হোটেল-মালিক। এমন ভারত-ভক্ত কন্টিনেন্টের পথে-ঘাটে না হলেও হোটেলে হোটেলেও যদি পাওয়া যেত তা হলে হয় ত বা এক কৌপীনে ইউরোপ-তীর্থে ধর্ম্ম করে বেড়ানো যেত।

নক্ষত্রের বর্ণলিপি ও অধ্যাপক ড. মেঘনাদ সাহা

শ্রীমনোজ রায়

মধ্যযুগের ইউরোপে সব ভূগোল বইয়ের সুরুতে থাকত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এক মানচিত্র, জেরুসালেমকে দেখানো হ'ত তার কেন্দ্র রূপে। এ রকম কল্পনা বর্তমান শতাব্দীতে নিতান্ত ছেলেমানুষি ঠেকবে, কিন্তু অসংখ্য জ্যোতিষ্ক নিয়ে এই যে জগৎ যার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে অসীম মহাশূন্যে বিলীন, তার সীমা সরহদ্দ করবার চেষ্টা মানুষের অনেক দিনের। মধ্যযুগের কাল্পনিক মানচিত্র তারই আদিম রূপ।

টলেমীর যুগ ফেলে এসেছি আমরা অনেক পেছনে, নক্ষত্রলোকের নূতন মানচিত্র আঁকা হয়েছে। মানুষের অসাধারণ জ্ঞানের তপস্যা, দুর্গম সাধনার পথে সঞ্চয় করা নূতনতর তথ্য পুরনো উদ্ভট ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছে। মহাশূন্যের অগণিত নক্ষত্রের সৃষ্টিরহস্য জানবার অদম্য কৌতূহল থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী রূপ নিয়েছিল—আকাশে নক্ষত্র হ'ল মৃত বীরদের আত্মা, শৌর্য্যের পুরস্কার হিসেবে তাঁরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে অসীম শূন্যে স্থান পেয়েছেন। সৃষ্টির গোড়ার কথা অনেকে ভেবেছেন, বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের গতি ও অবস্থিতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা তার সুস্পষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করবার চেষ্টাও করেছেন। অধিকাংশ মতবাদের নির্ভর ছিল নিছক কল্পনার উপর। হিসেবের গরমিল যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, সেখানেই সে মতবাদ বাতিল হয়ে গেছে। একদিন ত মানুষ ভাবত পৃথিবী স্থির হয়ে আছে আর তাকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্য্য, নক্ষত্রের দল। সেই ধারণায় সন্দেহ প্রকাশ করতে গিয়ে গ্যালিলিওকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। পুরনো ধারণা বদলেছে, এসেছে নূতন নূতন মতবাদ, অনেকগুলিই বেশী দিন টেকে নি। কিন্তু তারা মানুষের চিন্তাধারাকে উজ্জীবিত করেছে, ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে গেছে বলিষ্ঠ ইঙ্গিত।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্য্যন্ত নাক্ষত্রিক বিবর্ত্তনের বিভিন্ন ধারা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। মহাশূন্যে দূর-দুরান্তের জ্যোতিষ্কের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল চোখের দেখার। সে পরিচয় কি করে নিবিড় হ'ল, তার ইতিহাস সুরু হয়েছে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন নিউটন সূর্য্যালোককে বিশ্লিষ্ট করলেন রামধনুর সাত রঙে। বেগুনী থেকে সুরু করে একটানা সে রঙের খেলা শেষ হয়েছে লাল প্রান্তে। এ সাতটা রং চোখে দেখা যায়। কিন্তু এদের দুই প্রান্ত ছাড়িয়ে যে তেজের আরও অনেক ছোট-বড় ঢেউ আছে তা দেখালেন হার্শেল ও ডবল্যু. রিটার। তার পর একদিন মিউনিকের ফ্রনহোফারের কাছে ধরা পড়ল—বর্ণলিপি থেকে মাঝে মাঝে রং চুরি গেছে, তার জায়গায় কালো রেখা। এর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে হয়রান হলেন ফ্রনহোফার এবং আরও

অনেক সমকালীন বিজ্ঞানী। হাইডেলবার্গের বৈজ্ঞানিক কীরশফ—তিনি বললেন, সৌরবর্ণালীতে ফ্রনহোফার রেখাগুলি সূর্য্যের আত্মকাহিনীর সঙ্কেতলিপি। সূর্য্যের ভাস্বর কেন্দ্রমণ্ডল (photospere) থেকে আলো বেরিয়ে আসে সেখানকার গ্যাসীভূত মৌলের খবর নিয়ে। এ আলো যখন বাইরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবরণ (chromosphere) অতিক্রম করে তখন এ মহলের মৌল পরমাণু বিশেষ তরঙ্গের আলোক শোষণ করে নেয়। সে রাহাজানির খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে আলোকবর্ণালীর কালো রেখায়। এমনি করে সৌরবর্ণালীর লিপি পাঠ করে কীরশফ্ সৌরপরিবেশে কতকগুলি মৌলকে সনাক্ত করলেন। কীরশফের এ আবিষ্কারের সঙ্গে সৃষ্টিরহস্যের কি সম্পর্ক ?

সৌরজগতের উৎপত্তি নিয়ে অনেকে অনেক মতবাদ প্রচার করেছেন। দু'শ কোটি বছর আগে এক আগন্তুক তারার টানে আদিসূর্য্যের অগ্নিবাষ্পের খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তা থেকেই আমাদের পৃথিবী ও প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম। লামাত্রেঁর মতে মহাকাশ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। আদিম অবস্থায় মহাশূন্যের সমস্ত জ্যোতিষ্ক ছিল সঙ্কীর্ণ পরিবেশে আবদ্ধ। মহাকাশের সম্প্রসারণের সময় একটা বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল, তা থেকেই সূর্য্যকেন্দ্রিক জগতের সৃষ্টি হয়েছে। রাসেলের এ যুক্তি খুব অসঙ্গত নয়। কেমব্রিজের অধ্যাপক লিটলটন বলেছেন, সৌরজগতের জন্ম কোন ভবঘুরে জ্যোতিষ্কের ধাক্কা লেগে আমাদের সূর্য্যের এক সঙ্গীর অপমৃত্যু থেকে। কোন মতকেই নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া যায় না, তবে মোটামুটি নিঃসংশয় হয়ে বলা যায়—সূর্য্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর একটা জন্মগত সম্পর্ক রয়েছে। তারই জন্য জ্যোতির্ব্বিদগণ মনে করেছিলেন, পৃথিবীর বুকে যে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, সূর্য্য এবং নক্ষত্রের মধ্যেও তাদের দেখা মিলবে। কিন্তু সৌরবর্ণালীতে মাত্র চল্লিশটি মৌলের হদিস পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীদের মনে সংশয় জাগল তবে কি পৃথিবী ও নক্ষত্রপুঞ্জ একই উপাদানে গঠিত নয়। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সুরু হ'ল দুঃসাধ্য সাধনা, পথিকৃৎ হলেন ইটালীর সেচি। নরম্যান লকইয়ার ও পিকারিং-এর অক্লান্ত চেষ্টায় হার্ভার্ড কলেজের মানমন্দিরে দু'লক্ষ তারার বর্ণলিপি তৈরি হ'ল। তাঁদের সংগৃহীত তথ্যস্তূপ পণ্ডিতগণকে বিভ্রান্ত করে দিল। কেউই এমন কোন মতবাদ উপস্থাপিত করতে পারলেন না যা দিয়ে নাক্ষত্র বর্ণলিপির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সম্ভব। চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয় ; তবে 'পরমাণুই বস্তুর শেষ কথা' —ড্যাল্টনের এ সনাতনী পরমাণুবাদের সঙ্গে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে।

বিপরীতধর্ম্মী বৈদ্যুতকণার সমন্বয়ে বস্তুগঠনের মতবাদ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় পদক্ষেপ। পণ্ডিতগণ মৌল পরমাণুর যে ছবি দিলেন তাতে আছে পজিটিভ বৈদ্যুতওয়ালা কেন্দ্রবস্তু, তা থেকে নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে কতকগুলি কক্ষপথে চলেছে ইলেক্‌ট্রনের প্রদক্ষিণ। তেজ শোষণ করে ইলেক্‌ট্রন ভিতরের কক্ষপথ ছেড়ে বাইরের কক্ষপথে লাফিয়ে আসে। তেজশোষণের মাত্রাধিক্য হলে কেন্দ্রের টানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইলেক্‌ট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। পরমাণুর যে অংশটা পড়ে থাকবে তার নাম 'আয়ন'। পরমাণু থেকে 'আয়নে' রূপান্তরের জন্য ইলেক্‌ট্রনকে কতটা তেজ শোষণ করতে হবে তা প্রকাশ করা হয় 'আয়োনাইজেশন পোটেন্‌শিয়াল' বা আয়নন-বিভব কথাটার সাহায্যে। পরমাণুতত্ত্বের সূত্রপাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন মহলে তখন মননের ও মতের তোলপাড় চলছে। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অবস্থার কথা আগে বলেছি—সেখানে নক্ষত্রলোক সম্পর্কিত তথ্যের ভিড়, তাদের আপাত অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ দিশাহারা। সে সংশয়াচ্ছন্ন অধ্যায়ের উপর যবনিকা টেনে দিল 'থিওরি অব থার্ম্ম্যাল আয়োনাইজেশন'। অনেক দিন ধরে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে মৌল উপাদানের বৈষম্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ হেনরি নরিস রাসেল। তিনি অধ্যাপক সাহার এ নূতন তত্ত্বের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে 'দি এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব দি প্যাসিফিকে'র মুখপত্রে লিখলেন—'যে মতবাদ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করবে, তা প্রথম উপস্থাপিত করলেন একজন ভারতীয় অধ্যাপক।'

সৌরবর্ণালী বা নাক্ষত্র বর্ণালীতে কতকগুলি মৌলের হদিস কেন পাওয়া যাচ্ছিল না সে প্রশ্নের মীমাংসা করলেন অধ্যাপক সাহা। সোডিয়ামের কথা ধরা যাক, সৌরদেহে যে প্রচণ্ড উত্তাপ তাতে 'থার্ম্ম্যাল আয়োনাইজেশন' তত্ত্ব অনুসারে অধিকাংশ সোডিয়াম পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়ে আয়নে রূপান্তরিত হয়। তাই সৌরবর্ণালীতে সোডিয়াম পরমাণুর অস্তিত্বসূচক রেখা (D. lines) খুব স্পষ্ট নয়। এরই জন্য রুবিডিয়াম, সিজিয়াম ইত্যাদি যে সব মৌলের 'আয়োনাইজেশন পোটেন্‌শিয়াল' খুবই কম, সৌরবর্ণালীতে তাদের সঙ্কেত-রেখা মোটেই দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সৌরমণ্ডলে সর্ব্বত্র তাপ এত প্রচণ্ড নয়। আমরা সূর্য্যের গায়ে যে কালো কালো দাগ দেখতে পাই সেগুলি সূর্য্যের বাইরের আবরণে গ্যাসের আবর্ত্ত। এ সৌরকলঙ্কের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পরিবেশে মৌল পরমাণু মোটামুটি টিকে থাকে। সুতরাং সৌরকলঙ্কের বর্ণালীতে এত দিনের গড়ঠিকানা মৌলগুলির অনেকেরই সঙ্কেত মিলবে। মাউণ্ট উইলসনের

মানমন্দিরে সৌরকলঙ্কের কয়েকটি বর্ণালী তুলেছিলেন ব্র্যাকেট। জ্যোতির্ব্বিদ রাসেল এ বর্ণলিপিতে অধ্যাপক সাহার উক্তির প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত হলেন। অধ্যাপক সাহার নির্দ্দেশিত সন্ধান-পথে সূর্য্যদেহে আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ ধরা পড়ল।

সূর্য্যের ক্রোমোস্ফিয়ারের বর্ণালী তোলা হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরে ধারাবাহিক ভাবে ক্রোমোস্ফিয়ারের বর্ণলিপির তথ্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকেন লক্ইয়ার ও মিল্নে। তাঁরা সৌর-পরিবেশে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি লঘু মৌলের চেয়ে ক্যালসিয়ামের সঙ্কেত-রেখার প্রাচুর্য্য দেখে বিস্মিত হন। নাক্ষত্র বর্ণালী সম্পর্কিত এ রকম অসঙ্গতির কারণ নির্দ্দেশ এবং নক্ষত্রের তাপনির্ণয় কি করে সম্ভব হ'ল দেখা যাক। অধ্যাপক সাহা 'থার্ম্যাল আয়োনাইজেশন'-এর প্রতিটি ধাপ মোটামুটি অঙ্ক কষে বের করেছিলেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্ম্মান রসায়নী ন্যর্ণষ্টের ইকুয়েশনের একটু রদবদল করে তাকে তিনি প্রয়োগ করলেন চাপ ও তাপের মাত্রা অনুসারে মৌল-পরমাণু কতটা আয়নে পরিণত হবে তা গণনার কাজে। কোন মৌলের 'আয়োনাইজেশন পোটেন্শিয়াল' জানা থাকলে, সূর্য্যমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে নির্দ্দিষ্ট চাপ ও তাপের পরিবেশে তার কতটা আয়নীভূত হবে, সেটা বলে দেওয়া যাবে এ নতুন সমীকরণ থেকে। উল্টো দিক থেকে, অর্থাৎ নাক্ষত্র বর্ণালীতে মৌলের সঙ্কেত-রেখার তীব্রতা থেকে যদি আয়নীভবনের মাত্রা হিসেব করা যায় তবে চাপ ও তাপ যে-কোন একটি জানা থাকলে অপরটি স্থির করা সম্ভব। অধ্যাপক সাহার সমীকরণ অনুসারে, তাপ যত বেশী ও চাপ যত কম হবে আয়নীভবন হবে তত বেশী। এখন সৌরকেন্দ্র থেকে ক্রোমোস্ফিয়ারের উচ্চতর স্তরের দিকে চাপ ক্রমশঃ কমতে থাকবে, অধ্যাপক মিল্নে হিসেব করে দেখেছেন—তাপ কিন্তু পাঁচ হাজার ডিগ্রীর কম হবে না। এ অবস্থায় ক্যালসিয়াম পরমাণুর আয়নে রূপান্তর (যা ক্রোমোস্ফিয়ারের ভিতরকার স্তরে আংশিক) বাইরের মহলে প্রায় সম্পূর্ণ হচ্ছে। তাই বর্ণালীতে একটি করে ইলেকট্রন হারানো ক্যালসিয়াম পরমাণুর সঙ্কেত-রেখা (H and K lines) দেখা যায়—ক্রোমোস্ফিয়ারের চৌদ্দ হাজার কিলোমিটার উপরের স্তর পর্য্যন্ত। কিন্তু সোডিয়াম মৌলের 'আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল' ক্যালসিয়ামের চেয়ে কম, ক্রোমোস্ফিয়ারের অনেক নীচের স্তরেই তার আয়নীভবন সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বারো শ' কিলোমিটারের উপরকার বর্ণালীতে সোডিয়াম পরমাণুর রেখা গরহাজির, আর আয়নীভূত সোডিয়ামের সঙ্কেত রেখা আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে, দূর অতিবেগুনীর অদৃশ্য অংশে।

'থার্ম্যাল আয়োনাইজেশন তত্ত্বে'র অনেক-কিছু পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন, তার প্রয়োগসীমাকে বিস্তৃত করেছেন রাসেল প্রমুখ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানীগণ। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দু'জন প্রতিভাশালী স্নাতক মিল্নে ও ফাউলার অধ্যাপক সাহার মতবাদকে গণিতের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এ ছাড়া আর যে একটি মতবাদ অধ্যাপক সাহাকে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিহাসে পথিকৃতের সম্মান এনে দিয়েছে—সেটি হ'ল 'সিলেকৃটিভ র‍্যাডিয়েশন প্রেসার'। তিনি কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সাহায্যে কাগজে কলমে দেখালেন—বস্তুর উপর আলোক চাপ দেয়। তবে সব মৌলপরমাণুর উপর এ চাপ সমান নয়। আলোকের এ ধর্ম্ম পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, অধ্যাপক সাহার আলোর চাপ সম্পর্কিত তত্ত্ব, তাঁর থার্ম্যাল আয়োনাইজেশন তত্ত্বের পূর্ব্বজ। তিনি যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকে এ তত্ত্বের উপর গবেষণা সুরু করেন ফাউলার ও মিল্নে এবং এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁরা যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

খ্যাতনামা আণবিক-বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারকে কোন প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডির‍্যাক বলেছিলেন—'বিজ্ঞান ও কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে আপাতবিরোধটা হ'ল—বিজ্ঞান অজানাকে জেনে তা সাধারণের জন্য সহজভাবে প্রকাশ করে, আর কবিতা…'। তিনি হয় ত বলতে চেয়েছিলেন—কবিতা সোজা কথাকে দুর্ব্বোধ্য করে তোলে। কিন্তু তার সৃষ্টির সৌন্দর্য্যকে অস্বীকার করি কি করে? অধ্যাপক সাহার নূতন তত্ত্ব রূপ নিয়েছিল ভৌতরসায়ন, কোয়াণ্টামবাদ আর পরমাণুর গঠনতত্ত্ব—বিজ্ঞানের এ তিন মহলের মধ্যে সেতুবন্ধনের ফলে। এ সমন্বয়ের যে সৌন্দর্য্য তারই কথা বলেছেন অধ্যাপক মিল্নে:

"The works of Prof. Saha cannot fail to appeal to the sense of beauty of the co-ordination of physical phenomena."

আমরা হয় ত আজ অধ্যাপক সাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মানর্নির্ণয়ের চেষ্টা করব সর্ আর্থার এডিংটনের কথা থেকে—'গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করার পর জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দশটি প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কারের মধ্যে থার্ম্যাল আয়োনাইজেশন তত্ত্ব একটি'। কিন্তু সে মূল্য-বিচারের আর একটা দিকও আছে। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতে কিরূপ প্রাণসঞ্চার হয়েছিল—তার প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বাক্ষর আছে বৃহৎ-সংহিতায়। অতীতে এই ভারত-ভূমিতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বরাহমিহির, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্যের মত জ্যোতির্ব্বিদগণ। বর্ত্তমান যুগে যে কয়জন সত্যসন্ধ ভারতবাসী সে ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আজীবন সাধনা করে গেছেন, অধ্যাপক সাহা তাঁদের অন্যতম।

ইন্দিরার চোখে

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

এখানে এই ম্যাণ্ডাস স্কোয়ার আর রিচি রোডের আকাশে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে। আলো জলে ঘরে ঘরে। এখন এখানে রাত্রির প্রশান্তি। গ্যাসপোষ্টের রহস্যমাখা আলো, ঘন কুয়াসা আর শীতে কাঁপা রাত।

ম্যাণ্ডাস স্কোয়ারের উত্তরে, দশের দুই নম্বর ইন্দিরার বাড়ী। বসবার ঘরের ঘড়িটা যেন বড় ধীরে চলছে—হাতের উলকাঁটা বোনা বন্ধ রেখে এক সময়ে মনে হ'ল ইন্দিরার। ঘড়ির দিকে তাকাল সে, ন'টা বেজে সাতচল্লিশ। দোতলায় বাথরুমের জলঢালার ছর্‌ছর্‌ শব্দ, মগ নামানোর শব্দ—সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ভদ্রলোক বোধ হয় বাড়ী ফিরলেন। আবার উলকাঁটা বুনে চলল ইন্দিরা। এলোমেলো মন উৎকণ্ঠায় অধীর।

দু'চোখে তন্দ্রা, পাঁচ বছরের ভানু এল। ইন্দিরার কোলে মাথা রেখে বললে, মা ঘুমোব।

—একটু পরে বাবা এসে তোমাকে ঘুমোতে দেখলে আমায় বকবে। উঠে দাঁড়াল ইন্দিরা। আবার ঘড়ির দিকে তাকাল—ন'টা বেজে সাতান্ন। কৈ এখনও ত এল না। কি আশ্চর্য্য মানুষ! মনে মনে বললে ইন্দিরা। চোখের ভাব বদলাল, ভ্রূ কুঁচকাল, কপালে ফুটল দুশ্চিন্তার রেখা। এবার বাইরের দরজা খুলে কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ইন্দিরা। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। ওপাশে ম্যাণ্ডাস স্কোয়ার ফাঁকা হয়ে গেছে, রাস্তায় লোক কমে এসেছে। দু'একটা রিক্‌সা চলছে ঘণ্টা বাজিয়ে। ঐ ত, ঐ ত বুঝি এল। অধীর আগ্রহে দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল ইন্দিরা। ভাল করে দেখল, কিন্তু না—ও নয়—আশ্চর্য্য! মাথার চুলগুলো ঠিক ওর মত দেখতে। চুলোয় যাকগে, ঠাণ্ডা ভাত খাবে, আমার কি? আবার দরজা বন্ধ করলে ইন্দিরা। পিছন ফিরে দেখলে ভানু ঘুমিয়েছে, তার শরীরের অর্দ্ধেকটা চেয়ারে, অর্দ্ধেকটা মাটিতে। 'হিটার' জ্বালল ইন্দিরা। ডালটা গরম করল, মাছটাও। ফিরে এসে আবার ঘড়ি দেখল—সোয়া দশ।

এইবার বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল।

—কে?

—আমি, খোল।

গলার স্বর শুনে দরজা খুলে দিলে ইন্দিরা।

—এত দেরি করলে যে? আজও বুঝি প্রবোধ দাসের ওখানে গিয়েছিলে? ঘাড় হেলিয়ে তাকিয়ে রইল ইন্দিরা।

কোন জবাব দিলে না পরিতোষ। মিটিমিটি হাসল। দু' পা এগিয়ে এসে ভানুকে কোলে নিলে। চুমু খেয়ে বললে, গরম জামা পরাও নি কেন? যদি ঠাণ্ডা লাগে?

—তাতে তোমার কি? তুমি ত রাত দশটায় ফুর্ত্তি করে এলে। কোথায় গিয়েছিলে শুনি?

—বলব পরে, খেতে দাও এখন—বড় খিদে পেয়েছে।

হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে খেতে বসল পরিতোষ। ভাত বেড়ে দিলে ইন্দিরা। নিজেও বসল এক পাশে। ভাত মেখে পরিতোষ বললে, ভানু কখন খেল?

—আটটায়।

—ভাতগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠোঁট উল্‌টে বললে পরিতোষ।

—হবে না? ভাতের দোষ কি? রাত দশটায় ফিরলে?

—আরে না না। বাঁ-হাত ঝেঁকে ঝেঁকে বললে পরিতোষ। আড্ডায় গেলে তোমাদের দেরি হয় না? ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয় না?

—না, আমার হয় না। তোমার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন আমি নই।

—ভুল করলে—হীন নয়, হীনা। খেতে খেতে মুচকি হেসে পরিতোষ শুধরে দিলে।

-আমি ত তোমার মত বাংলায় এম-এ পাস করি নি। ভাতের দিকে মাথা নীচু করে তাকাল ইন্দিরা—আহত মনে হ'ল।

—শোন, আজ আপিসে এক মজার কাণ্ড হয়ে গেল। ইন্দিরার গা ছুঁয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরিতোষ।

—কি? বড় বড় চোখ তুলে তাকাল ইন্দিরা।

—শোন, প্রবোধ দাস সেন সাহেবের ঘরে গিয়েছিল। সেন সাহেব ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—তারপর ধমক।

—কেন?

– কি একটা ইংরেজী ভুল লিখেছিল। সেন সাহেব ধমক দিয়ে উঠে বললেন, ধানচাল দিয়ে পড়াশুনো শিখেছেন? অথচ জান, সেন সাহেব পাঁচ লাইন লিখলে অন্ততঃ পাঁচটা ভুল করবেন। হবেই-বা না কেন? সেনসাহেব অর্ডিনারী

গ্রাজুয়েট, ওয়ার কোয়ালিটির আই-এ-এস। প্রবোধ কিন্তু এম-এতে ইকোনমিকসে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিল—সবই ভাগ্য!

প্রবোধ দাসের নাম শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল ইন্দিরার। বললে, রাখ তোমার প্রবোধ দাসের গল্প।

—আরে শোনই না। মজার কথাটা ত শুনলেই না। ধমক খেয়ে প্রবোধ বললে, আসছি সার। এই বলে দৌড়ে পালাল, আর যায় নি। নিজের মনে হো হো করে হেসে উঠল পরিতোষ।

ইন্দিরা কিন্তু হাসল না। ভাতের গ্রাস মুখে তুলে সে বললে, ঐ প্রবোধ দাসের সঙ্গে মিশে তুমি কি পাও শুনি? ওর সঙ্গে তোমার না মেলে স্বভাবে, না মেলে কালচারে। লোকটাকে আমি সইতেই পারি না, বড্ড বাজে বকে। আর কেমন যেন মনে হয় বাজে লোক। আর মদও ত খায়—তোমাকে এত করে বলি ওর সঙ্গে মিশবে না, তাও তুমি শুনবে না। ও কি তোমাকে বশীকরণ করেছে?

—তুমি লোক চেন না। জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল পরিতোষ। যেতে যেতে বললে, প্রবোধ দাস অনেষ্ট ম্যান, খুব সাচ্চা লোক।

—সাচ্চা না ছাই! এক ধরনের মেয়ে থাকে, তারা ছেলেদের বশ করে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, ছেলে হয়েও প্রবোধ দাস তোমাকে তাই করেছে। মুখে চোখে গাম্ভীর্য্য আনলে ইন্দিরা।

হো হো করে হেসে উঠল পরিতোষ। বললে, চমৎকার বলেছ।

বাড়ীর বাড়তি আলোগুলো নিভিয়ে টুকিটাকি কাজ সেরে শুতে এল ইন্দিরা, পরিতোষের অনেক পরে। বললে, ঘুমিয়েছ?

—না।

—এত কথা বললে, দেরি করলে কেন তা ত বললে না।

—সব বলছি।

ভানু মাঝখানে। একপাশে পরিতোষ, ইন্দিরা শুল অপর পাশে। পরিতোষ পাশ ফিরে শুয়ে বললে, আপিস থেকে ফিরে বাস ষ্ট্যাণ্ডে দেখলাম প্রবোধ দাঁড়িয়ে। সোজা ওকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম, চা খেলাম আর গল্প জুড়লাম।

—কেন, বাসা কি জলে ডুবেছে? প্রবোধ দাসের না হয় একখানা ঘর, কাচ্চাবাচ্চার কান্নাকাটি, ঘরে মন টেকে না। কিন্তু তোমার ত তা নয়। তবে তুমি কেন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, বাজে রেস্তোরাঁয় বসবে, কেন আপিস থেকে ফিরে বউ ছেলের সঙ্গে গল্পগাছা করবে না?

—তুমি যে কৈফিয়তের পর কৈফিয়ত তলব করছ! লেপ থেকে মাথা বের করে শুষ্ক হাসল পরিতোষ।

—হ্যাঁ, করছি এবং করবও। কারণ আমি তোমার স্ত্রী। তোমার ভালমন্দের উপর কথা বলবার অধিকার আমার আছে।

—আচ্ছা, বেশ আছে, মানলাম। এখন ঘুমোও ত! আবার পাশ ফিরে শুয়ে বললে পরিতোষ।

ইন্দিরা কিন্তু ঘুমোল না, চুপও করল না। বললে, সত্যি, কৈ আগে ত তুমি এ রকম ছিলে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা বাইরে বাউণ্ডুলের মত ঘুরতে না। প্রবোধ দাসের কি? সে না হয় তিন ছেলের বাপ হয়েছে। বৌটার পোড়া কাঠের মত চেহারা। সারা বছর ভোগে হার্টের অসুখে। তার না হয় সংসারে রূপ রস শুকিয়ে গিয়েছে, তাই বলে কি তোমারও?

ইন্দিরা লক্ষ্য করলে না যে পরিতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম ভাঙল পরিতোষের সকালে। তখন রোদ উঠেছে বাইরে। জানালার সার্সিতে লেগে আছে রোদ, ঘরের মেঝেয়ও। একরাশ চুড়ির রিণি রিণি, মাথার চুলের মিষ্টি একটা গন্ধ—পরিতোষ ইন্দিরাকে দেখলে। ঘুমভাঙা দুটো স্নিগ্ধ চোখ ইন্দিরার—সকালের দীঘির মতই শান্ত। আর কোমরছোঁয়া একরাশ কালো চুল—সিঁথিতে লেপটে আছে গত রাত্রির একরাশ বাসি সিন্দুর। বিছানার পাশে ড্রেসিং টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে সকালের প্রসাধন সারছিল ইন্দিরা। আয়নায় দেখছিল নিজেকে, নিজের রূপকে—হয় ত খুশীও হচ্ছিল মনে মনে।

পরিতোষ হাসল—স্নিগ্ধ এক টুকরো হাসি, বললে—বেশ লাগছে তোমাকে—

আচমকা কথা শুনে পিছন ফিরে তাকাল ইন্দিরা। হাসল ব্রাশকরা সাদা দাঁত ঝিকিয়ে—বেশ, কিন্তু ক'টা বাজে খেয়াল আছে?

—বাজুক গে—ছুটির দিন আমেজ করি। হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলে পরিতোষ। বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল, মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসল খবরের কাগজ খুলে।

চা খেতে খেতে ইন্দিরা বললে, মাংস আনবে?

—খাবে? বেশ ত! আর কি আনব—দই? একবার কাগজে চোখ বুলাল পরিতোষ। আর চায়ে চুমুক দিলে। বেশ লাগছে। আপিসের তাড়া নেই, বড়সাহেবের মেজাজ দেখানো নেই। নিজের মনের মত একটি শীতের সকাল। বাইরে বিচি রোডের উপরকার আকাশের পানে তাকিয়ে মনে হ'ল পরিতোষের—তার এই সংসার—ভানু, ইন্দিরা আর

রিচি রোডের দশের দুই নম্বরের দোতলা বাড়ী। এখানে কত আনন্দ, কত শান্তি, কত স্নিগ্ধতা। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে তার পর সে তৈরী হয়ে উঠে দাঁড়াল থলি হাতে। বাজারে যাবে পরিতোষ।

বাজার করে ফিরে এল পরিতোষ। থলেটা নামিয়ে রেখে ডাকল ইন্দিরাকে। তার পর থলে থেকে নামিয়ে দেখালে সে—তাকে সবকিছু, এক এক করে। এই তোমার মাংস—এই মাছ, এই আলু, এই পেঁয়াজ, আর এই দই। বাথরুমে হাত ধুয়ে সে বললে, মাংসে বেশী ঝাল দিও না।—তার পর স্যাণ্ডেল পায়ে বেরিয়ে গেল পরিতোষ, এই আসছি বলে।

কিন্তু পরিতোষ এল না। ঘড়িতে তখন এগারটা প্রায় বাজে—ভানুকে স্নান করাচ্ছিল ইন্দিরা। বাইরে দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হ'ল। এগিয়ে দরজা খুলে দিয়েই হাসলে ইন্দিরা—আরে দেবাশিস বাবু যে! এত দিন পর মনে পড়ল তবে?

—মনে পড়ে চিরকাল, তবে আসতে পারি না বৌদি, ঘরের ভিতর ঢুকে একগাল হেসে বললে দেবাশিস।

—বসুন, ভানুকে স্নান করিয়ে আসি। খবরের কাগজটা দেবাশিসের হাতে তুলে দিলে ইন্দিরা।

ভানুকে স্নান করালে ইন্দিরা, ভাত খাওয়ালে, হাতের টুকিটাকি কাজগুলো সারলে একে একে—তখনও ফিরল না পরিতোষ। ইন্দিরা চা নিয়ে এল, সঙ্গে খানচারেক মাছ-ভাজা। দেবাশিসের সম্মুখে একটা টিপয়ে চা'টা নামিয়ে রাখল ইন্দিরা। বললে, খেয়ে নিন—এমনি চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কিন্তু পরিতোষ কোথায়? ইন্দিরার মুখের দিকে তাকালে দেবাশিস। হাতে খবরের কাগজ এলোমেলো করে খোলা।

—আমি কি জানি? আপনার বন্ধু আজকাল ঐ রকমই হয়েছে, কাল রাত্রে ফিরেছে দশটায়। আজ সকালে বাজার থেকে এসে সেই যে বেরিয়েছে এখনও ফিরল না। বেলা বাজে বারটা।

শুধু হাসল দেবাশিস, কোন কথা বললে না। চা খেয়ে তার পর খবরের কাগজে মফস্বল সংবাদেও আর একবার চোখ বুলালে।

পরিতোষ ফিরল অনেক পরে। ঘড়িতে তখন প্রায় পৌনে একটা।

ইন্দিরা কলকল করে উঠল, তুমি ত এমন ছিলে না। বাজার করে কোথায় বেরিয়েছ, ফেরার নামটি নেই—ঘরে লোক বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

—কে এসেছে? ঘরে ঢুকে অবাক হ'ল পরিতোষ।

—আরে তুই যে!

খুশী হয়ে দেবাশিসের হাতটা টেনে নিলে সে। বললে, দেবুকে একটু চা খাওয়াবে না?

—না, তোমার বলার অপেক্ষায় আছি। দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে হাসল ইন্দিরা।

আরাম করে পা ছড়িয়ে দেবাশিসও হাসল, চা খেয়েছি, সঙ্গে চারটে মাছভাজা—দিনকাল ভালই যাচ্ছে বলতে হবে।

—খুশী হলাম শুনে। হ্যাঙ্গারে পাঞ্জাবীটা ঝুলিয়ে রাখল পরিতোষ।

—কোথায় গিয়েছিলি? জানতে চাইল দেবাশিস।

—প্রবোধকে তুই চিনিস—আমার ব্রাদার-অফিসার—ওর ওখানে—দু'জনে মিলে বেরিয়েছিলাম একটু জমির জন্য। ঢাকুরিয়ার ওধারে কল্যাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি জমি দিচ্ছে। পাঁচ কাঠা প্লট—দু'হাজার টাকা। মন্দ নয় জমিটা—

হাসল দেবাশিস—তা আমাকেও দিস না একটা প্লট।

—বাড়ী-টাড়ী আমি চাই না। তুমি ঐ প্রবোধ দাসের সঙ্গে মিশতে পারবে না। ও তোমার অপকার ছাড়া উপকার করবে না। জানেন দেবাশিসবাবু, লোকটাকে আমার ভালই লাগে না—কেমন যেন বড্ড বকে, তা ছাড়া কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—আর গল্প করে কি জানেন? আপিসের 'বসে'র পিণ্ডি চটকানো।

পরিতোষ দেবাশিসের দিকে তাকাল, বললে—ভদ্রলোক একটু বেশী কথা বলে আর কি? তা ছাড়া সে সত্যিকারের ভদ্রলোক। হাঁ, ড্রিঙ্ক করে বটে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না।

—রাখ তোমার ভদ্রলোক। যে লোক মদ খায় সে কখনও ভাল, ভদ্র হতে পারে? যাই হোক, তুমি ওর সঙ্গে মিশবে না, মিশবে না। আমার মাথার দিব্যি রইল।

হাসল পরিতোষ। বললে, তোমার ভাল না লাগলে যে, সে লোক খারাপ, তা তোমাকে কে বললে?

—কেউ না বলুক, আমি বলি। আমি লোক চিনি।

দুপুরে দেবাশিস পরিতোষের ওখানে খেলে। খেতে খেতে যখন পরিতোষ ইন্দিরার রান্নার প্রশংসা করছিল তখন বললে দেবাশিস—বৌদির সবই ভাল। কিন্তু একটা কথা বৌদি—রাগ করবেন না ত?

—কি? পাশে দাঁড়িয়ে মাংসের প্যানের ঢাকনি চাপাল ইন্দিরা।

—বলছিলাম কি—দেবাশিস মুচকে হাসল। বললে,

ছ' বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও কি পরিতোষকে চোখে চোখে রাখবেন ?

—রাখবই ত—যার তার সঙ্গে মিশতে দেব কেন ? আপনাদের বিশ্বাস নেই। গম্ভীর হয়ে ভ্রূ কুঁচকাল ইন্দিরা। মিটি মিটি হাসল পরিতোষ, হাসল দেবাশিসও। পরিতোষ বললে, প্রবোধকে তুমি যা ভাব ও তা নয়। সত্যি ও ভদ্র —বড় ভাল।

—কি বললে ? পরিতোষের চোখে চোখে তাকাল ইন্দিরা। বললে, আমি যা দেখেছি, তাই থেকেই ওর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা হয়েছে। কানে শুনে কিছু বলি নি।

—কি দেখেছ, বলই না। বললে পরিতোষ।

—কি আর দেখব ? ওই ত সেদিন দেখলাম ম্যাণ্ডাস স্কোয়ারে—সন্ধ্যার পর, নিরিবিলিতে একটা এংলো মেয়েকে নিয়ে ফিস ফিস করছে।

—মাই গড ! হেসে উঠল দেবাশিস। হো হো করে হাসল পরিতোষ।

খাওয়া শেষ করে ওরা উঠে দাঁড়াল। ইন্দিরা বললে, বুধবারে ভানুর জন্মদিন। দেবুবাবু আসবেন কিন্তু।

—বুধবারে ? যেন মনে মনে হিসেব করলে দেবাশিস। বললে, বুধবারে ব্যস্ত থাকব। আচ্ছা যদি পারি আসব।

বুধবারে কিন্তু দেবাশিস এল না। পরিতোষ ফিরল আপিস থেকে রাত্রি আটটায়। ভানুকে চুমু খেয়ে আদর করে গলার রজনীগন্ধার মালার গন্ধ শুঁকে পরিতোষ খুশী হয়ে উঠল। আমার সোনা বাবা !

ইন্দিরা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বললে, আহা কি আদর ! রাত্রি আটটায় ফিরে !

—কে কে এসেছিল ? দেবু এসেছিল ? চন্দনে লেপটে-থাকা ভানুর মুখে আর একটা চুমু খেয়ে বললে পরিতোষ।

একে একে সকলের নাম করলে ইন্দিরা। কে কি উপহার দিয়েছে তার ফিরিস্তি বললে। শেষে বললে, দেবু আসে নি।

—কাজ ছিল বোধ হয় ! ভানুকে কোল থেকে নামিয়ে জামা-প্যান্ট ছাড়তে ব্যস্ত হ'ল পরিতোষ। খেতে বসে বললে, জান, প্রবোধ 'ডাইরেক্টরেটে' বদলি হ'ল। আরও কয়েক জনকেও এদিক-ওদিক বদলি করবে শুনলাম—আমাকেও করবে কিনা কে জানে ?

চোখেমুখে বিরক্তি রেখায়িত হ'ল ইন্দিরার। বললে, প্রবোধ দাস ত তার নিজের ব্যবস্থা করল, তোমার কি উপকার করলে ?

—আমার দরকার নেই। খেতে খেতে মাথা নাড়ল পরিতোষ। বললে, ভাল কথা মনে করিয়ে দিও, রবিবার সকালে ঢাকুরিয়ায় যাব, ঐ জমিটার সন্ধানে—প্রবোধও যাবে।

কোন জবাব দিলে না ইন্দিরা। আপন মনে হাতের কাজগুলো সারতে লাগল সে।

রবিবার সকাল আটটায় কিন্তু প্রবোধ এল না। ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকিয়ে অপেক্ষা করল পরিতোষ। ইন্দিরাকে বললে, প্রবোধের বোধ হয় অসুখ করেছে। গত দু'দিন আপিসেও যায় নি।

প্রবোধ এল বিকালে। উস্কখুস্ক মাথার চুল, শুকনো মুখ। ইন্দিরাকে দেখে একগাল হাসল। বললে, এই যে বৌদি, ঢাকুরিয়ায় তা হলে বাড়ী করছেন। এইবার পরিতোষের দিকে তাকাল সে, রক্ত আমাশয়ে মরে গেলাম ভাই—

কোন জবাব দিলে না ইন্দিরা। আলনায় কাপড় গুছাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি ত নিজে নিজে ডাইরেক্টরেটে সুবিধে করে নিলেন—বন্ধুটির কি করলেন ?

—সংসারে কে আর কার জন্য করে বৌদি। আপন হাত জগন্নাথ। হে হে করে হাসল প্রবোধ।

প্রবোধের চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ইন্দিরা।—আপনি কতক্ষণ আছেন ?

—কেন ?

—এই মানে আমরা একটু বেরুব।

—ও তাই নাকি—আমিও উঠি।

পরিতোষ তাকাল প্রবোধের দিকে, দু'দিন আপিসে যাও নি কেন ?

—জর, রক্ত আমাশা। বড় কষ্ট পেলাম। পরিতোষকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরাল প্রবোধ। বললে, উঠি, কাল দেখা হবে আপিসে।

জুতার ভারী শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল প্রবোধ দাস। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলে ইন্দিরা। ফিরে এসে পরিতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

—কোথায় যাবে ? সিগারেট টানতে টানতে জানতে চাইল পরিতোষ।

—কোথাও না, ওকে তাড়ালাম। বিছানায় শরীর এলিয়ে হাসল ইন্দিরা।

—কেন ?

—কেন কি ? ওর রক্ত আমাশা—ভানুর ছোঁয়াচ লাগবে না ? ভানুকে কোলে তুলে চুমু খেলে ইন্দিরা। পরিতোষ কিছু বললে না। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল।...

সোমবার সকালে আপিসে যাওয়ার আগে ইন্দিরা মাথার দিব্যি দিয়ে বললে, আপিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে, আর ঐ প্রবোধ দাসের ওখানে যাবে না।

পরিতোষ সেদিন তাড়াতাড়িই ফিরল, সাতটারও আগে। সঙ্গে এল প্রবোধ। ঘরে ঢুকে জুতো খুলে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল পরিতোষ। মুখে-চোখে চঞ্চলতা, দুশ্চিন্তা।

প্রবোধ বললে, আরে, অত ভাবছ কি? আমি দেখব কি করতে পারি। আমার জামাইবাবুর বন্ধু হলেন ডাইরেক্টর ঘোষ সাহেব। আশা করি কিছু করতে পারব।

—কি হয়েছে? পরিতোষ আর প্রবোধের মুখের দিকে তাকাল ইন্দিরা।

—কি আর হবে? ঠেলে দিয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর—বালুরঘাট। যান বুঝবেন এবার কেমন জায়গা। দেখবেন, শুধু পচাই খায় সাঁওতালরা, আর সন্ধ্যার পর কোন ভদ্রলোকের মুখ দেখবেন না রাস্তায়, দেখবেন এখানে-ওখানে কিলকিল করছে ইয়া বড় বড় সাপ! দেখলেই দম্ বন্ধ হয়ে যাবে—ওরে বাবা! হায়রে! কোথায় থাকবে ম্যাণ্ডাস-স্কোয়ার আর রিচি রোড, ফ্লোরেসেন্ট আলো আর পামগাছের হাওয়া। কথার শেষে সশব্দে হাসল প্রবোধ দাস। কোন কথা বললে না পরিতোষ। ইন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটিবার ম্লান হাসল সে।

শরীর জ্বলছিল ইন্দিরার। কি বলবে, কি বলা উচিত বুঝে উঠতে পারছিল না সে। ভাবছিল এক একবার, দেবে নাকি দুটো কড়া শুনিয়ে, আবার ভাবলে, না যাকগে। ওর সঙ্গে বেশী কথা বলতেও উৎসাহ বোধ করলে না ইন্দিরা। হাতঘড়ি দেখে রাত সাড়ে আটটায় উঠল প্রবোধ দাস। পরিতোষ বললে, আর একটু বসবে না?

—না—আটকে রাখছ কেন? ওঁর দেরি হয়ে যাবে না। স্বামীর মুখের দিকে তাকাল ইন্দিরা, কথা বলল সহজ গলায়।

প্রবোধ দাস সেদিন আর বসল না। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে ফিরল পরিতোষ। খেতে বসে ইন্দিরা বললে, সত্যিই তোমাকে বদলি করে দেবে?

—তবে কি মিথ্যে?

—কবে যেতে হবে?

—সাত দিনের ভিতর?

—আমি জানতাম—ঐ প্রবোধ দাসই করেছে এসব।

—বাজে কথা বল কেন? কেন মিথ্যে অপবাদ দাও।

—মিথ্যে কি, সত্যি। আমরা সংসার করি, সুখে থাকি তাই হিংসে ওর। কথাগুলো খুব জোর দিয়ে দিয়ে বললে ইন্দিরা।

পরিতোষ কোন কথা বললে না, ভাত খেতে লাগল অন্যমনস্কের মত। মনে হতে লাগল, এই রিচি রোড, দশের দুই দোতলা বাড়ী, আর ওই ম্যাণ্ডাস স্কোয়ার তার কত পরিচিত। বিয়ের পর আজ ছ'বছর সে এই বাড়ীতে। আজ ছ'বছর এ বাড়ীতে তার নিজের, ভানুর আর ইন্দিরার কত স্মৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

খাওয়ার অনেক পর সেদিন শুতে এল পরিতোষ। ইন্দিরাও এল শুতে। পাশের বাড়ীর দোতলার আলোর এক চিলতে এসে পড়েছে জানালা দিয়ে। দুটো বাড়ীর মাঝে এই কানা গলিটার আকাশে চাঁদ দেখা যায় না, কিন্তু আকাশে কত তারা। তাকিয়ে দেখতে দেখতে এক সময়ে পরিতোষ ইন্দিরার হাতটা টেনে নিলে। বললে, আমি ভাবছিলাম কি ইন্দিরা জান?

—কি?

—ভাবছিলাম যে যদি বালুরঘাট যেতে হয়, তবে কি করব। এ বাড়ীটা আমি ছেড়ে যেতে পারব না। হাতছাড়া হলে পঁচাত্তর টাকায় এ রকম বাড়ী রিচি রোডে আর পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া ধর যদি তোমাকে না নিয়ে যাই তা হলে ওখানে আমার নিজের থাকতে ও খেতে একশ' টাকা লাগবে। তোমার এ বাড়ীর ভাড়া পঁচাত্তর, রইল একশ' পঁচিশ। ওতে তোমার আর ভানুর চলবে? এ বয়সে যদি দুটো টাকা না জমাতে পারি ত জমাব কবে?

ইন্দিরা কোন কথা বললে না শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললে। রাত বাড়তে লাগল, পাশের বাড়ীর দোতলার আলোটাও নিবল; এখন ঘরে শুধু নিস্তব্ধতা—কলকাতার গভীর রাত্রির একটু একটু শীতের হাওয়া—দু'জনের শ্বাসপ্রশ্বাস। এক সময়ে ইন্দিরার গলা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

—কাউকে ধর না কেন? তদ্বির কর।

—ও সব পারব না। কোন দিনই পারি নি। তুমি ত জান।

একথা সত্যিই জানে ইন্দিরা। জানে যে, ওদের গত ছ'বছরের বিবাহিত জীবনে কোন দিন দেখেনি পরিতোষকে কোনও ব্যাপারে কারও কাছে কিছু চাইতে কি কিছু বলতে। পারিবারিক এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে মন ভেঙে গেল ইন্দিরার।

তেমনি মন ভেঙে গেল পরিতোষেরও। আর পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে তা পরিষ্কার বললে ইন্দিরাকে।

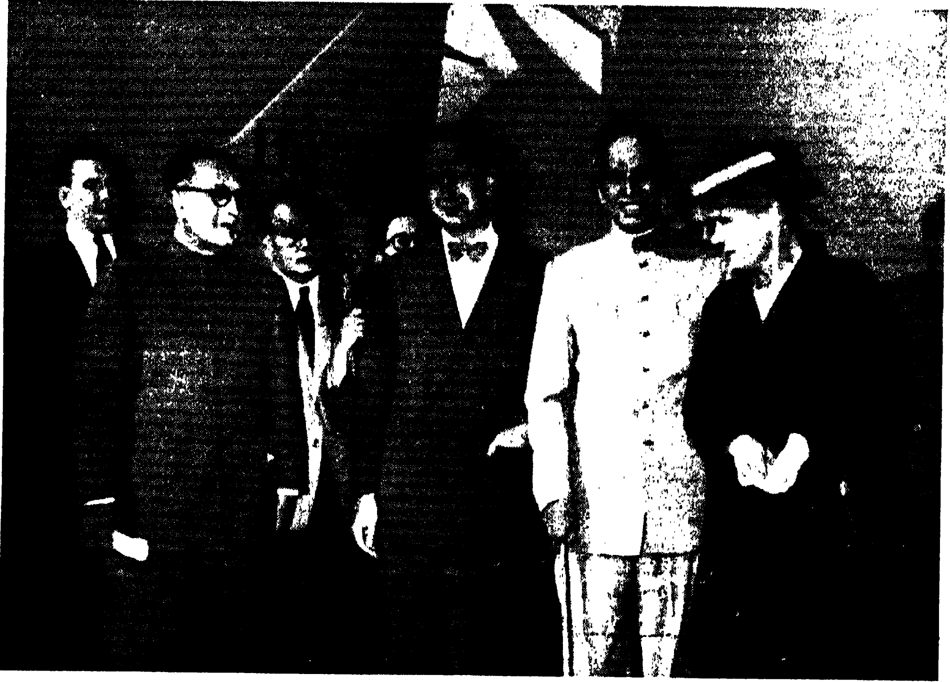
—সত্যি কিছুই বুঝছি না ইন্দিরা। কি করি? বাড়ীটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তা ছাড়া তোমার শরীর খারাপ। অথচ কলকাতায় একটা আস্তানা না রাখলেই নয়। ভানু



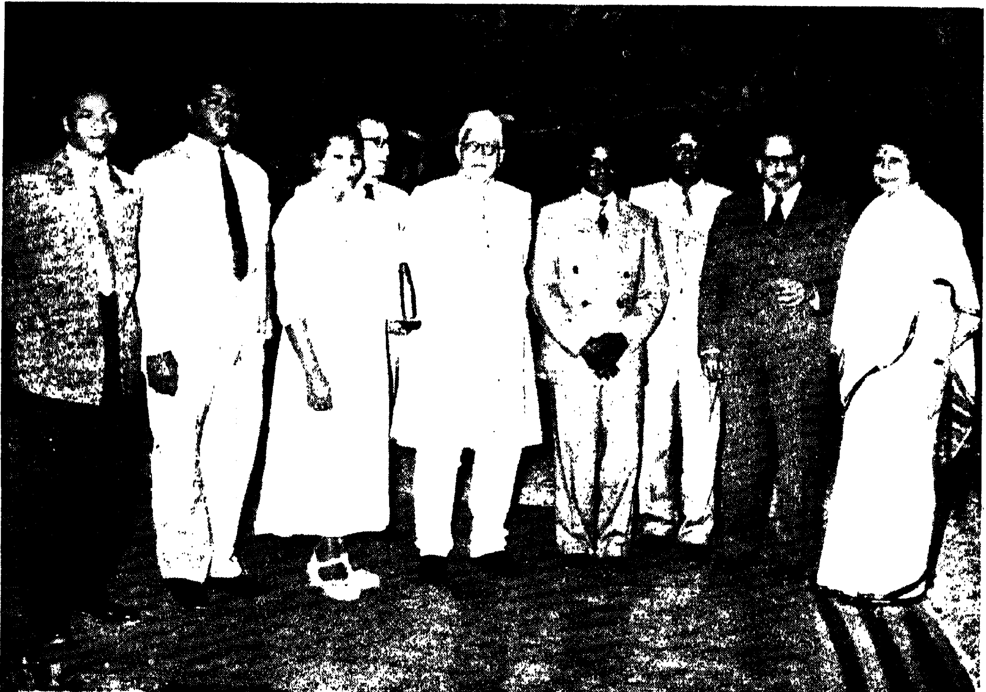
রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিক্ষেত্রে ইরাণের শাহানশাহ ও সম্রাজ্ঞী



ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. পিনো কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে মাল্যদান



নিউ দিল্লী, সফদারজঙ্গ বিমানঘাটিতে শ্রীভি. কে. কৃষ্ণমেনন সহ রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ ডাগ হামার্স্কজোল্ড



নিউ দিল্লীতে উগাণ্ডা 'গুড্ উইল মিশনে'র সদস্যগণের সহিত ডাঃ সৈয়দ মামুদ

বড় হচ্ছে ওকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। কি যে করব, আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। তার পর তুমি কলকাতায় মানুষ হয়েছ। বাইরে তোমার মন টিকবে না। আবার এখানে একাও থাকতে পারবে না। সত্যি ভারি মুশকিলে পড়ে গেছি।

দেবাশিস এল সন্ধ্যার পর। দেখলে পরিতোষ আর ইন্দিরা মনমরা হয়ে ঘরে বসে। দেবাশিসকে বদলীর খবর দিলে পরিতোষ। শেষে বললে, সত্যি দেবু কি করব কিছুই বুঝছি না।

—বুঝবার কি আছে? বদলী করেছে চলে যাও। সব অফিসার কি কলকাতায় থাকে? বাইরে যায় না? সরকারী পয়সায় যত পার ঘুরে নাও। আর কলকাতার আস্তানাও ত তোমার হয়ে যাবে—ঢাকুরিয়ার বাড়ীটা একটু একটু করে শেষ করে ফেল।

দেবুর প্রস্তাব ভাল বলে মনে করল পরিতোষ। ইন্দিরাকে নিয়েই সে চলে যাবে, ছেড়ে দেবে রিচি রোডের এই বাড়ী—ম্যাণ্ডাস স্কোয়ার আর দশের দুই এই দোতলা বাড়ী শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে পরিতোষের আর ইন্দিরার মনে। অনেক দিন পর যদি কখনও কোন দিন সন্ধ্যায়, অথবা সকালে এ পথে ওরা হেঁটে যায়, তখন ভানুকে হাত তুলে দেখাবে ইন্দিরা, এই বাড়ীটায় তুমি হয়েছিলে ভানু, আর বাইরের এই সিঁড়িতে তোমার কপাল কেটেছিল একদিন। তার মা যেমন দেখিয়েছিল পরিতোষকে—ঢাকা শহরে বাংলা বাজারের দোতলা হলদে মামাবাড়ী। আর এই ম্যাণ্ডাস স্কোয়ারে দেওদার ও পাম গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে, সিমেণ্ট-করা বেঞ্চিতে বসে প্রথম বিবাহিত জীবনের রোমান্সের আস্বাদ গ্রহণ করেছে পরিতোষ, ইন্দিরাও করেছে। এ সব ওদের মনে থাকবে—মনে থাকবে একদিন, ভানু তখনও হয়নি, অনেক রাত্রে যখন দু'পাশে ঘেরা বাগানে রজনীগন্ধা ফুটত, ফুটত মাধবীলতা, শান্ত হয়ে যেত পাখীদের কিচির-মিচির, হাওয়া বইত পাম গাছের পাতায়, তখন বাগানের পাশে ঐ বেঞ্চিতে কতদিন বসে ওরা গল্প করেছে। মৃদু মৃদু কথা, চুড়ির রিনিঝিনি, ইন্দিরার অন্ধকার কালো চুলে কি একটা আকুল-করা গন্ধ—ওদের তরুণ প্রাণ সেদিন ভরে গিয়েছে আনন্দে, রোমাঞ্চে আর নতুন প্রেমের আবেগ-মুখরতায়। এ সব কি ভুলতে পারে পরিতোষ? ইন্দিরাও কি পারবে? কেউ কি কখনও পারে? মনে হ'ল পরিতোষের, প্রথম জীবনের এই সব রঙীন দিন কেউ কখনও ভোলে না।

ম্যাণ্ডাস স্কোয়ার আর রিচি রোড ছেড়ে চলে যাবে পরিতোষ। ইন্দিরা রাত্রে কেঁদেছে, দুঃখ করেছে পরিতোষ।

সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরে এল পরিতোষ। অন্য দিনের মত আজও কাছে এল ইন্দিরা—কিছু হ'ল?

—কি আর হবে? গলার স্বরে হতাশা পরিতোষের!

—কেন বন্ধু কি করল?

—কি আর করবে?—এক পেয়ালা চা খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল পরিতোষ বুকে বালিশ টেনে নিয়ে। ইন্দিরাকে ডেকে একটু কাগজ আর কলম চাইল। ফর্দ তৈরি করতে সুরু করল পরিতোষ। কি কি জিনিস সঙ্গে যাবে তারই হিসেব, আর কি কি কিনতে হবে তারও। যেতেই যখন হবে, তখন আগে থেকেই তৈরী হয়ে নেবে পরিতোষ।

বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ হ'ল। দরজা খুলতেই দেখলে প্রবোধ। আর নাকে কি একটা গন্ধ পেলে ইন্দিরা। এ গন্ধ ইন্দিরা চেনে; তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে দাঁড়াল সে, সারা শরীর উঠল ঘিনঘিন করে। পা টেনে টেনে হেঁটে পরিতোষের ঘরে ঢুকল প্রবোধ দাস। চোখ কুঁচকে বললে, কি করছ? ফর্দ? কি কি সঙ্গে নেবে তার হিসেব? ফর্দটা ছিনিয়ে নিলে প্রবোধ দাস। বললে, মাই গড,—বদলী ক্যানসেল করিয়ে এলাম, কালই অর্ডার পাবে।—মুখের কথা জড়ানো, চোখ ঢুলুঢুলু, বেশী হাত নাড়ছে প্রবোধ দাস।

—সত্যি বলছ? মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রবোধের দিকে তাকাল পরিতোষ। উঠে বসল, হাত টেনে নিলে আবেগে।

সেই উগ্র গন্ধটা এখনও পাক দিয়ে উঠছে বাতাসে। ইন্দিরাও পেলে সে গন্ধ এ ঘরে এসে। তবুও এখন এই মুহূর্তে প্রবোধ দাসকে খারাপ লাগল না ইন্দিরার—অন্য দিন যেমন লাগত। বরং মনে হ'ল, পারিবারিক সমস্যা আর সঙ্কটের দিনে বন্ধুর কাজ করেছে প্রবোধ দাস, সত্যিই বন্ধুর মত এসেছে সে। ইন্দিরা হাসল, চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা।

প্রবোধ দাসও হাসল, সারাদিন হেঁটেছি বৌদি, আপিসে আপিসে ঘুরেছি ক্লান্ত হয়ে, সন্ধ্যায় এই একটু—বেশী নয়—। হাতের দুটো আঙুলে একটা পরিমাপের ভঙ্গী আনল প্রবোধ দাস।

তবুও আজ খারাপ লাগল না ইন্দিরার। হেসে বললে, বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

কালিদাস-সাহিত্যে নগর-বর্ণনা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাস যে শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার আবির্ভাবের সময় ভারত যে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে জগতে এক অতি উন্নত দেশ হইয়া উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মেগাস্থিনিস, হুয়েনসাং, ফা-হিয়ান, ইবন বতুতা প্রভৃতি বৈদেশিক পর্য্যটকেরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের যে অফুরন্ত ধনরত্ন এবং দেশবাসীদের উন্নত অথচ সংযত জীবনযাপনের কথা তাঁহাদের ভারত-ভ্রমণের বিবরণ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, মহাকবির কাব্যনাটকগুলির মধ্যে যেন তাহারই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়—পড়িলে মনে হয় যে, বৈদেশিক পর্য্যটকেরা ভারতের যে অপূর্ব্ব মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আদৌ অতিরঞ্জিত নহে।

দেশের সুখৈশ্বর্য্যের কথা শহর ও শহরবাসীদের বিবরণ হইতে যেমন বুঝা যায়, তেমন আর অন্য কোনও বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় না। এই মহাকবির সাহিত্য হইতে তাঁহার সময়ের ভারতের কয়েকটি শহর ও তাহার সহিত শহরবাসীদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহা লইয়া আলোচনা করিব। প্রথমে অবশ্য বলিয়া রাখা ভাল যে, কালিদাস ছিলেন কবি, 'ইঞ্জিনীয়ার' বা 'রাজনীতিবিদ্' নহেন, সুতরাং তাঁহার লেখা যে প্রধানতঃ কবিত্বের ভাবধারায় প্রভাবিত থাকিবে, ইহাই মনে রাখা উচিত।

'কুমারসম্ভব' কাব্যে হিমালয় পর্ব্বতে ওষধীপ্রস্থ নামক এক নগরের বিবরণ পাওয়া যায়। শহরটি ছিল হিমালয়ের রাজধানী মহাকোশী প্রপাত নামক স্থানের অদূরে অবস্থিত। এই শহরের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি প্রথমে বলিয়াছেন, "অলকামতিবাহ্যৈব বসতিং বসুসম্পদাম্। স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতম্।" (কু—৬।৩৭) অর্থাৎ এমন যে ঐশ্বর্য্যের আস্পদ অলকানগরী, তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এই শহরটি, দেখিলে মনে হয় স্বর্গের অতিরিক্ত অধিবাসীদিগকে এখানে আনিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপনা করা হইয়াছে। তার পর তিনি শহরটির ভিতর ও বাহিরের কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন; তিনি বলেন যে, শহরের চতুর্দ্দিক বহুমূল্য প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল ও প্রাচীরের বাহিরে শহরের চারিদিক দিয়াই গঙ্গার স্রোত বহিয়া যাইত। দুর্গ প্রভৃতি নগররক্ষার ব্যবস্থাও অতি চমৎকার ছিল। শহরের বাড়ীগুলির উপর প্রায় সকল সময় মেঘ লাগিয়া থাকিত বলিয়া ভিতরে যখন তবলা বাজানো হইত, বাহির হইতে সে শব্দ শুনিলে মনে হইত বুঝি মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি শুনা যাইতেছে। গৃহগুলির ভিত্তি ছিল স্ফটিকনির্ম্মিত, রাত্রে যখন সেই স্বচ্ছ স্ফটিকের উপর তারকা-রাজির প্রতিবিম্ব পড়িত, দেখাইত যেন ঘরময় পুষ্প ছড়ানো রহিয়াছে, ইত্যাদি। মহাকবি কেবল শহরের বিবরণ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, শহরের অধিবাসীদেরও সুখী-জীবনের সংক্ষেপে বর্ণনা দিয়াছেন এবং শেষে বলিয়াছেন, 'স্বর্গাভিসন্ধিসুকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে' (কু—৬।৪৭)—অর্থাৎ এ হেন শহর (পৃথিবীতে) থাকিতে মানুষ যে স্বর্গে যাইবার কামনায় পুণ্য-সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, মনে হয় যেন তাহা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়; যেন হিমালয় পর্ব্বতের এই সুসজ্জিত, সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ শহরে বাস করা, স্বর্গে বাস করা অপেক্ষা অধিকতর কামনার বস্তু—কালিদাস এখানে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এবার একটি জনপদস্থিত শহরের বিবরণ দিব, শহরটির নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর, রাজা পুরূরবার রাজধানী। 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে কালিদাস এই শহরটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং মুখ্যভাবে ইহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ না দিয়া এমন সুন্দর ভাবে গৌণ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পাঠকের মনে বেশ একটা মনোরম রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। বর্ণনাটি তিনি দিয়াছেন স্বর্গের দুইজন অপ্সরার কথোপকথনের মধ্যে। উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা বিমানে বসিয়া যখন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে প্রতিষ্ঠানপুরে পুরূরবাকে দেখিবার জন্য আসিতেছিলেন, তখন আকাশপথ হইতে অদূরে অবস্থিত নগরীটিকে দেখিয়া চিত্রলেখা বলিতেছেন তাঁহার প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে, "দেখ সখি, আমরা এখন গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে যেন আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতেছি (এমন ভাবে অবস্থিত) রাজর্ষির রাজধানীর শিখালঙ্কার স্বরূপ প্রাসাদে আসিয়া পড়িলাম।" উর্ব্বশী শহরের দিকে চাহিয়া উত্তর দিলেন, "ননু বক্তব্যং স্থানান্তরিতঃ স্বর্গ ইতি", অর্থাৎ 'তোমার বলা উচিত ছিল, স্বর্গই বুঝি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছে।' প্রতিষ্ঠানপুরের কোনও বিবরণ নাই, তবু উর্ব্বশীর এই সংক্ষিপ্ত উক্তি হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সেদিনকার সে প্রতিষ্ঠানপুর স্বর্গের অধিবাসিনী উর্ব্বশীর চোখেও কি অপূর্ব্ব, কি মোহময় রূপে রমণীয় দেখাইতেছিল।

উর্ব্বশীর মনে হইতেছিল স্বর্গের রমণীয়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান-পুরের রমণীয়তার যেন কোনও পার্থক্য নাই।

তখনকার দিনের আর একটি শহর মথুরার বিবরণ দিব। 'রঘুবংশে'র পঞ্চদশ সর্গে মহাকবি এই শহরটির উল্লেখ করিয়াছেন। মথুরায় সোনালী রঙের সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলির কোণ দিয়া প্রবাহিতা যমুনার কালো জল দেখাইত যেন হেমবরণী ধরণীর সোনার অঙ্গে কালো কেশের রাশি এলাইয়া রহিয়াছে। মথুরারও সৌন্দর্য্যবর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন "স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা" (রঘু—১৫।২১)। অর্থাৎ, মথুরা শহর ও তাহার অধিবাসীদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন স্বর্গে বুঝি অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ায় সেখানকার অতিরিক্ত লোকগুলিকে এখানে আনিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপনা করা হইয়াছে। মহাকবির চোখে মথুরা ছিল যেন স্বর্গবাসীদের একটি উপনিবেশ।

এর পর মহাকবির অতিপ্রিয় শহর উজ্জয়িনীর কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। 'মেঘদূতে'র পূর্ব্বমেঘে কালিদাস উজ্জয়িনী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। উজ্জয়িনী অবন্তী রাজ্যের রাজধানী—যে অবন্তীর পল্লীগ্রামের বৃদ্ধলোকেরা উদয়নের চরিতকথার গল্প বলিতে ভালবাসিতেন, যেখানকার শহুরে মেয়েদের 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত লোলাপাঙ্গে' দৃষ্টিপাত যদি না দেখা যায় তাহা হইলে মহাকবির মতে এ চোখ না থাকাই ভাল। শিপ্রানদীর শীতল বাতাসে সুরভিত সেই 'শ্রীবিশাল' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-শোভায় সুশোভিত উজ্জয়িনীর গৃহগুলির জানালা হইতে মেয়েদের কেশ-সংস্কারের ধূপের ধূম বাহির হইত, গৃহে গৃহে পোষা ময়ূরেরা নৃত্য করিত, গৃহগুলি পুষ্পের সৌরভে সুবাসিত থাকিত। বাড়ীগুলি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত থাকিত এবং মেঝের উপর নারী-চরণের আলতার ছাপ লাগিয়া থাকিত যে, দেখিলে মনে হইত যেন এখানকার সর্ব্বত্রই একটা লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করিতেছে। তাই সেদিনের উজ্জয়িনীকে দেখিলে মনে হইত বুঝি স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাংগতানাং। শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্' (পূ-মে—৩১)। অর্থাৎ, স্বর্গে কিছু কাল বাস করার পর সুকৃতির ফলভোগের কাল শেষ হইয়া আসায় যাঁহাদিগকে আবার মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিতে হয়, মনে হয় যেন তাঁহারা তাঁহাদের শেষ পুণ্যটুকুর জোরে স্বর্গ হইতে আসিবার সময় সেখানকার কান্তির খানিকটা অংশ সঙ্গে করিয়া আনিয়া এখানে রাখিয়াছেন। মহাকবি যেন বলিতে চাহেন যে, সারা শহরে এমন একটা স্বর্গের সুষমা বিরাজ করিত, যাহা মর্ত্ত্যলোকের কোথাও থাকা সম্ভব নয়।

এইভাবে বারবার স্বর্গের সহিত ভারতের কয়েকটি শহরের ও স্বর্গের অধিবাসীদের সহিত শহরবাসীদের তুলনা দিয়া মহাকবি যেন ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, ধনে ঐশ্বর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও সুখশান্তিতে ভারতের শহরগুলির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন কোনও শহর পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। এদেশের অধিবাসীদের আচারে-ব্যবহারে আনন্দের ভোগে এবং অত্যুন্নত জীবনযাপনের প্রণালীর মধ্যে এমন এক অত্যাশ্চর্য্য সততা, সরলতা ও ধর্ম্মভাব মাখানো থাকিত যে, তাহা দেখিলে তাহাদিগকে স্বর্গের অধিবাসী বলিয়া ভ্রম করা বিচিত্র ছিল না। সেদিনের ভারতের মাটি ছিল যেন স্বর্গ হইতে আনা স্বর্গেরই একটা খণ্ডবিশেষ, সারা দেশটা যেন স্বর্গবাসীদের উপনিবেশ; সুতরাং কালিদাসের সময়ে ভারত যে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে ও সর্ব্বোপরি দেশবাসীদের সরলতাপূর্ণ চরিত্রের মাহাত্ম্যে উন্নতির চরম শিখরে অবস্থিত ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কালিদাসের যুগ—ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল 'স্বর্ণময় যুগ'।

আমরা আর একটি শহরের বর্ণনার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। শহরটির নাম অলকা, যক্ষপতি কুবেরের রাজধানী। 'মেঘদূতে'র উত্তরমেঘে মহাকবি ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। অলকার বাড়ীগুলির—বাড়ী নয় ত যেন 'অভ্রংলিহ' অর্থাৎ মেঘস্পর্শী এক একটা প্রাসাদ কোনটির ভিত্তি ছিল স্ফটিকনির্ম্মিত, কোন কোনওটির মণি-মাণিক্য দিয়ে বাঁধানো। প্রাসাদগুলির ঘরে ঘরে শুনা যাইত মুরজ বাজানোর মধুর ধ্বনি, রাত্রে জ্বলিত রত্নপ্রদীপে আলো, বড় বড় সাততলা বাড়ীর কক্ষগুলি থাকিত সুন্দর সুন্দর চিত্রে শোভিত, ঘরের জানালায় ঝুলিত চন্দ্রকান্তমণি—যাহাদের উপর রাত্রে চাঁদের কিরণ লাগিলে ভিতর হইতে ফিন্ ফিন্ করিয়া মৃদু শীতল হিম বাহির হইয়া ঘরের ভিতরের নরনারীদের দেহে লাগিয়া তাহাদিগকে সুপ্তির মধ্যেও সুখের অনুভূতি প্রদান করিত। ধনী যক্ষদের পুষ্করিণীর স্নানের ঘাটের সিঁড়িগুলি থাকিত মরকতমণি অর্থাৎ পান্না দিয়া বাঁধানো, পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া রাখা হইত সোনার পদ্মফুল, বাগানের প্রাঙ্গণে থাকিত সোনার কলাগাছে ঘেরা ইন্দ্রনীলমণি দিয়া নির্ম্মিত ক্রীড়াশৈল, ময়ূর নাচাইবার জন্য স্ফটিকনির্ম্মিত বেদীর উপর পান্নানির্ম্মিত যষ্টি ও তাহার উপর সোনার দাঁড়। শহরের সুসজ্জিত উপবনে সুসজ্জিত নরনারীদের প্রমোদ-ভ্রমণের ব্যবস্থা, উপবনের মধ্যে গানবাজনার আসর, নারীদের বহুমূল্য অলঙ্কার, সাজসজ্জা ও বিবিধ প্রসাধনের উল্লেখ এ সমস্ত বুঝাইয়া দেয়—কি অতুল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ ছিল সেদিনকার দেশ। অবশ্য যক্ষদেশ বর্ণনার অধিকাংশ যে কবির কল্পনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবু কল্পনা-বর্ণনার মধ্যেও কবি বা সাহিত্যিকের সমসাময়িক দেশের ও সমাজের কিছু কিছু অবস্থা যে বুঝিতে পারা যায় সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অমৃতসরের চিঠি

(প্রত্যক্ষদর্শী)

ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অমৃতসরে খুব ধুমধামের সঙ্গে কংগ্রেসের একষষ্টিতম অধিবেশন হইয়া গেল। জলের মত টাকা ব্যয় হইল, কয়দিন হৈ-হুল্লোড়ের সীমা ছিল না। এই অধিবেশনের সময়—বোধ হয় কংগ্রেসের সহিত পাল্লা দিবার জন্য শিখ আকালী-দলের দশম বার্ষিক অধিবেশনও আহূত হইয়াছিল। আকালীদল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জাতীয় মুক্তি-সাধনায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু আজ ইহা একটি উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রতিষ্ঠান। খণ্ডিত পঞ্জাবের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া পেপসুকে তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়া একটি নিছক পঞ্জাবী ভাষা-ভাষী রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে এই ইহাদের দাবি। গুরুমুখী হরফে লিখিত পঞ্জাবী ভাষা এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হইবে। তাহা না হইলে নাকি শিখধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এখানে বলিয়া রাখি যে, এই প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে শিখগণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হইবে। সুতরাং রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাহাদেরই হস্তগত হইবে। বর্ত্তমানে পঞ্জাবে তাহাদের সংখ্যা প্রতিশতে ৩০ জন বা তাহার একটু বেশী। আকালী কনফারেন্সের পাল্টা জবাব হিসাবে এই সময়েই আবার জনসঙ্ঘ-প্রভাবিত এবং পরিচালিত মহাপঞ্জাব সমিতির অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অঙ্গচ্ছেদ করা চলিবে না, বরং হিমাচল এবং পেপসুকেও পঞ্জাবের সহিত মিলাইয়া দিয়া একটি বৃহদায়তন রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে—ইহা এই মহাপঞ্জাব সমিতির দাবি। হিন্দী এই রাষ্ট্রের ভাষা হইবে। দেবনাগরী হরফে ইহা লিখিতে হইবে।

বিচিত্র দেশ পঞ্জাব! ততোধিক বিচিত্র পঞ্জাবী চরিত্র। হিন্দু শিখ সকলেই পঞ্জাবীতে কথা বলে। অথচ পঞ্জাবী হিন্দু বলে যে, হিন্দী তাহার মাতৃভাষা। শিখদের মধ্যে অধিকাংশই গুরুমুখী লিখিতে বা পড়িতে পারে না। এতকাল শিখেরা উর্দু হরফেই পঞ্জাবী লিখিত। কিন্তু কয়েক বৎসর হয় হঠাৎ তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে যে, গুরুমুখীতে পঞ্জাবী না লিখিলে শিখ ধর্ম্ম, সংস্কৃতি এমন কি শিখজাতির (!) অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

আকালীদল এবং মহাপঞ্জাবের সমর্থকগণের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। ইহাদের কেহই আবার কংগ্রেসের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করে না। একই সময়ে কংগ্রেস, আকালীদল এবং মহাপঞ্জাব সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকগণ অমৃতসরে জমায়েত হইলে একটা গোলমাল হইতে পারে অনেকে এই ভয় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ একটা বড় রকমের দাঙ্গার আশঙ্কাও করিয়াছিলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রথম দিন। এই দিনই আবার আকালী কনফারেন্স এবং মহাপঞ্জাব সমিতির অধিবেশনের সভাপতিদিগের মিছিল বাহির হইয়াছিল। আকালী-দল বহু দিন হইতেই ঘোষণা করিতেছিল, তাহারা যে মিছিল বাহির করিবে বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে পঞ্জাবে সে রকম মিছিল কেহ দেখে নাই। দুইটি মিছিলই খানিকটা জায়গায় একই রাস্তা দিয়া গিয়াছে। সুতরাং একটা বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা খুবই প্রবল ছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় পরস্পরবিরোধী দুইটি উগ্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনের অনুমতি দিয়া পঞ্জাব সরকার হয় ত অবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার উপর একই দিনে এবং প্রায় একই সময়ে ইহাদিগকে মিছিল বাহির করিতে দেওয়া ত রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পর্য্যায়ে পড়ে। তবে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করিয়া কাইরন সরকার—সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী—এই ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। 'কংগ্রেস সপ্তাহে' অমৃতসরে প্রায় ৮,০০০ ছোট বড় পুলিস কর্ম্মচারীর সমাবেশ হইয়াছিল। পঞ্জাবের বাহির হইতে পুলিস আমদানী করিয়া পঞ্জাব পুলিস-বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এত পুলিস দেখিয়া বাহিরের লোক মনে করিতে পারিত যে, অমৃতসরে বুঝি সর্ব্বভারতীয় পুলিস কনফারেন্স ডাকা হইয়াছে।

আকালীদল এবং মহাপঞ্জাব সমিতির মিছিল দুইটি খুবই বড় হইয়াছিল। প্রথমটিতে আনুমানিক ১২,০০০ এবং দ্বিতীয়টিতে আনুমানিক ২৮,০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। তবে ইহারা সকলেই প্রায় দলের সদস্য বা সমর্থক। গোলমালের ভয়ে মিছিল দেখিতে দলের বাহিরের খুব কম লোকই গিয়াছে।

কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই আকালীদল এবং মহাপঞ্জাব সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবার কারণ অনুমান করিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। আকালী নেতৃবৃন্দ বলেন যে, কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে অমৃতসরে সমবেত সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদিগকে পঞ্জাব সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্যই তাঁহারা 'কংগ্রেস সপ্তাহে' আকালীদলের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। অনেকেই কিন্তু মনে করেন যে, কংগ্রেস তথা সরকারকে ধমক এবং সাংবাদিকদিগকে ধাপ্পা দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। মহাপঞ্জাব সমিতির অধিবেশনও সরকার এবং আকালীদলকে চোখ রাঙানো ভিন্ন আর কিছুই নহে। 'পঞ্জাবী সুবার দাবি মানিয়া না লইলে দেখিয়া লইব' এই ছিল আকালী দলের মনোভাব। শিখপন্থ অর্থাৎ শিখধর্ম্ম বিপন্ন এই জিগীর তুলিয়া লোক জমায়েত করিয়া আকালী নেতৃবৃন্দ এই মনোভাবকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে বলা চলে না। 'অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শিখদিগের

সাম্প্রদায়িক দাবি মানিয়া লইলে আমরাও সহজে ছাড়িব না'—এই মনোভাবই আবার মহাপঞ্জাব সমিতির অধিবেশন আহ্বানের মূল কারণ।

১৯১৯ সনে জাতীয় জীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে অমৃতসরে আর একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী সেই দুর্দিনে জাতীয় মুক্তিসাধকদিগের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তার পর ১৯২৯ সালে লাহোরে পুণ্যতোয়া ইরাবতী-তীরে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতি স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল—'এসেছে সে একদিন'। তার পর জাতি এবং কংগ্রেসের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটিয়াছে। পুরাতন অনেক সমস্যার সমাধান হইয়াছে, নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। দেশ, জাতি এবং সমাজের প্রকৃত মঙ্গল যাঁহারা চান, কংগ্রেসের নিকট হইতে তাঁহারা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

অধিবেশন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থার কার্য্যে পঞ্জাবের কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ অনেকটা ব্যর্থতা এবং অযোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন, শক্তিহীন পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেসের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবার ক্ষমতাই হয় ত আজ নাই। সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও উর্দ্ধতন কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ অমৃতসরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিবার অনুমতি দান করিয়া সুবিবেচনা বা দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলা চলে না। তবে ইহার আর একটা দিক্‌ও আছে। পঞ্জাবের জনসাধারণের মনে কংগ্রেসের প্রতি আস্থা এবং শ্রদ্ধার ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্যই হয়ত অমৃতসর বা পঞ্জাবের যে-কোন জায়গায় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিবার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

এবারকার কংগ্রেসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যেই একটা শৈথিল্য এবং বিশৃঙ্খলার ভাব বড় বেশী চোখে পড়িয়াছে। প্রথমতঃ প্রতিনিধিদিগের থাকিবার ব্যবস্থা। শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং অধিবেশন প্রাঙ্গণে ইহাদিগকে থাকিবার জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। অধিবেশন-প্রাঙ্গণ শহীদনগরে প্রতিনিধি-শিবিরে শৌচকর্ম্মাদিরও সুব্যবস্থা ছিল না। কোন একটি রাষ্ট্রের বিধান-সভার উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker)—ইনি মহিলা—এই জন্যই প্রতিনিধি-শিবির ছাড়িয়া বন্ধু-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বহু প্রতিনিধিকেই অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি যে, অমৃতসর পৌঁছিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুর্ভোগ ভুগিয়া, ঘাটে ঘাটে জল খাইয়া অবশেষে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিয়াছেন। যানবাহন এবং স্বেচ্ছাসেবকের বন্দোবস্ত আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। অভ্যর্থনা সমিতির শৈথিল্য বা অকর্ম্মণ্যতাই হয় ত এই অব্যবস্থার জন্য দায়ী। পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে প্রতিনিধি দল ৯ই ফেব্রুয়ারী সকালবেলা অমৃতসর পৌঁছেন তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ শহীদনগর হইতে দুই-তিন ফার্লং দূরে খালসা কলেজে থাকিবার জায়গা দেওয়া হয়। কলেজের দ্বিতলে কয়েকটি ঘরে ইহাদের মালপত্র উঠানো হইল। অমৃতসরের সমস্ত স্কুল-কলেজের মত খালসা কলেজও তখন কয়দিনের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন উপলক্ষ্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা সমর্থনযোগ্য কি?

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিবৃন্দকে যে ঘরগুলিতে থাকার জায়গা দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলির প্রত্যেকটির মেঝেতে পুরু হইয়া ধুলা জমিয়াছিল। জল, আলো, পায়খানা, প্রস্রাবখানার কোন ব্যবস্থা নাই। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কলেজবাড়ী হইতে এক বা দেড় ফার্লং দূরে কলেজের সন্তরণবাপী (swimming pool) এবং প্রায় সমান দূরে কয়েকটি পায়খানা দেখাইয়া দিয়াছিল। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদিগকে অবশ্য কলেজ হইতে সরাইয়া অন্যত্র আশ্রয় দেওয়া হয়।

কোন কোন রাজ্যের প্রতিনিধিগণ চরম অসৌজন্য এ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী একটি রাজ্যের প্রতিনিধিদিগকে যেখানে থাকিবার জায়গা দেওয়া হয়, সেখানে জায়গা কম এই অজুহাতে তাঁহারা জোর করিয়া অপর একটি প্রতিনিধি-শিবির অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত রাজ্যবাসী প্রত্যেকের এই জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু উল্লিখিত রাজ্যের তরফ হইতে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও এজন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেও শুনি নাই। কোন কোন প্রতিনিধি-শিবিরে আবার চোরের উপদ্রব ছিল। উড়িষ্যার প্রতিনিধিদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও টাকা পয়সা চুরি গিয়াছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা আড়াইটায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়। শহীদনগর হইতে প্রায় দুই ফার্লং দূরে সেই দিনই আকালী কনফারেন্স। বেলা আড়াইটার অনেক পূর্ব্ব হইতেই শহীদনগর পৌঁছিবার একটি প্রধান রাস্তা রামতীর্থ রোড আকালী দলের মিছিলের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। রাস্তা পরিষ্কার হইতে বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছিল। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য যাঁহারা শহীদনগরে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। যাঁহারা ফিরিয়া যান নাই, তাঁহাদের সকলেরই আসিতে অনেক দেরি হইয়াছে। এইজন্যই কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় আড়াই লক্ষ লোকের উপযোগী বিশাল কংগ্রেস মণ্ডপ প্রায় ফাঁকা ছিল বলিলেও চলে। আকালীদলের মিছিল যে খুব বড় হইবে তাহা ত জানাই ছিল। মিছিলের পথ এবং সময়ও পঞ্জাব সরকারের অনুমতি ও অনুমোদন অনুসারেই স্থির হইয়াছিল। সুতরাং কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য যাঁহারা আসিতেছিলেন তাঁহাদের আশাভঙ্গ ও দুর্ভোগ এবং অধিবেশনে জনসমাগমের প্রারম্ভিক স্বল্পতার জন্য পঞ্জাব সরকারই মুখ্যতঃ দায়ী।

কংগ্রেসের প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন চলিবার কালে প্রায় সর্ব্বক্ষণই আকালীদলের শোভাযাত্রার গোলমাল অধিবেশনের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাজি পুড়িবার শব্দও কানে

আসিতেছিল। নেহরুজী ত এইজন্ত প্রকাশ্যেই ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারীর অবস্থা আরও চমৎকার। দ্বিপ্রহরেই আকালী কনফারেন্সের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। বিকালবেলা অধিবেশন-প্রাঙ্গণ 'বাবা ফতে সিং নগর'* হইতে লাউড স্পীকারে হালকা গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। এদিকে কংগ্রেসের অধিবেশনে তখন রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনা চলিতেছে। মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত পন্থ, নেহরুজী প্রভৃতি বক্তৃতা করিতেছেন। পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা শুনিতে ত খুবই অসুবিধা হইতেছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশন-প্রাঙ্গণ শহীদনগরে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা—অব্যবস্থার চূড়ান্ত। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কর্তব্যপালনে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেকে ইংরেজী ত জানিতই না, হিন্দীও জানিত না। এজন্ত যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। অধিবেশন মণ্ডপে টিকিটের মূল্য অনুযায়ী বসিবার ব্যবস্থা। প্রত্যেক শ্রেণীর দর্শকের জন্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানের চারিদিক্ দড়ি দিয়া ঘেরা। কিন্তু সভাপতি শ্রীঢেবরের অভিভাষণ শেষ হইবার কিছুক্ষণ পর হইতেই এই ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। দলে দলে লোক হৈ হৈ করিতে করিতে এবং ছুটিতে ছুটিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে যেখানে পারে বসিয়া পড়িতেছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রথম প্রথম এক-আধটু বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। শোনা গেল যে, কর্ত্তৃপক্ষ টিকিটের দাম কমাইয়া এক টাকা করিয়াছেন। এক টাকার টিকিট কিনিলেই যে-কোন জায়গায় বসা যায়।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী বেলা নয়টায় অধিবেশন বসিল। এই দিন আরও অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন যে, অধিবেশন-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে টিকিটের প্রয়োজন নাই। কেবল তাহাই নয়। লাউড স্পীকারের সাহায্যে শহরের সর্ব্বত্র এই কথা প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা শুনিতে আসিবার জন্ত আমন্ত্রণ করা হইল। অভ্যর্থনা সমিতির এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের ইতিহাসে অভিনব, অভূতপূর্ব্ব। অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষের ভয় যে, কংগ্রেসের অধিবেশনে আকালী বা মহাপঞ্জাব কনফারেন্স অপেক্ষা কম লোক হইলে তাঁহাদের মুখ থাকিবে না।

১১ই ফেব্রুয়ারী অধিবেশন আরম্ভ হইবার সময় অধিবেশন-মণ্ডপ এক রকম ফাঁকাই ছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর কংগ্রেসের কোন অধিবেশনেই বোধ হয় এবারকার মত কম লোক হয় নাই। কেন এমন হইল? প্রথমতঃ, একই দিনে এবং একই জায়গায় তিনটি পৃথক পৃথক অধিবেশনের ব্যবস্থা থাকায় দর্শক ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাপঞ্জাবের সমর্থক এবং আকালীদলের মধ্যে যে প্রীতি-মধুর সম্পর্ক তাহাতে লোকে অধিবেশন উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে একটা সজ্বর্ষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। অনেকেই সেদিন রাস্তায় বাহির হন নাই। তৃতীয়তঃ, আকালীদল এবং মহাপঞ্জাব সমিতি দুইটিই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধ্বজাধারী। সাধারণ মানুষ খুব সহজেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া পড়ে। জাতি বা দেশের কথা অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্নই তাহাদের নিকট বড় হইয়া উঠে। সুতরাং আকালী এবং মহাপঞ্জাব কনফারেন্সে লোকের ভিড় হওয়া সঙ্গত না হইলেও স্বাভাবিক। আর এই জন্যই কংগ্রেস অধিবেশনে জনসমাগম কম হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত দুই টাকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত প্রবেশ-দক্ষিণা নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। বাহির হইতে যাঁহারা কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই স্ব স্ব যাতায়াত, খাওয়া এবং থাকিবার ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে। ইহার উপর প্রতিনিধিদিগকে দশ টাকা হিসাবে প্রতিনিধি-দক্ষিণা (Delegation Fee) দিতে হইয়াছে। দর্শকদিগকে টিকেট কিনিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, আকালী এবং মহাপঞ্জাব কনফারেন্সে যোগদানকারীদিগকে প্রথমে দক্ষিণা দিতে হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, আকালী কনফারেন্সের সঙ্গে অন্ন (রুটির) সত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বাহির হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, বিভিন্ন গুরুদ্বারা এবং শিরোমণি প্রবন্ধক কমিটির দফতর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁহাদিগকে নিখরচায় থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের অনেকের আসিবার ব্যয়ও আকালীদলের কর্তৃপক্ষই বহন করিয়াছেন। অনেককে আবার নূতন পাগড়ীও দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা এবং অপপ্রচারও শিখ জনসাধারণকে আকালী কনফারেন্সে যোগদান করিতে কম প্রলুব্ধ করে নাই। কনফারেন্সে যোগ না দিলে শিখ ধর্ম্মস্থানগুলি হিন্দুদিগের হাতে চলিয়া যাইবে এই কথাও নাকি কোন কোন জায়গায় রটনা করা হইয়াছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশনে যথারীতি বক্তৃতাদি হইয়াছে। নেহরুজী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত পন্থ ইহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর বাগ্মী। সভাপতি শ্রীঢেবর ইহাদের সমপর্য্যায়ের না হইলেও তাঁহার বক্তৃতার আন্তরিকতা মনে রেখাপাত করে। কিন্তু ইহারা কেহই নূতন কথা বলেন নাই। কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে সকলেই নূতন আলোর আশা করে। ঢেবরজী আমাদের প্রায় নিরাশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণের অধিকাংশই কংগ্রেস সরকারের সাফাই। ইহাতে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহ পরিতৃপ্ত হয় নাই। কংগ্রেস সভাপতির নাতিদীর্ঘ অভিভাষণের একটি মন্তব্য কিন্তু খুবই

* এবার অমৃতসরে নগরের ছড়াছড়ি। কংগ্রেস প্রাঙ্গণ শহীদনগর। দুই ফার্লং দূরে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত একটি বেসরকারী শিখ শিক্ষায়তনের মধ্যে আকালী কনফারেন্স প্রাঙ্গণ বাবা ফতে সিং নগর। গুরুগোবিন্দ সিং-এর পুত্র বাবা ফতে সিং। শরহিন্দের মোগল ফৌজদারের আদেশে ফতে সিং নিহত হন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর কংগ্রেস প্রাঙ্গণ হইতে এক মাইলের মধ্যেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামাঙ্কিত মুখার্জ্জি নগরে মহাপঞ্জাব সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রণিধানযোগ্য। বোম্বাই এবং উড়িষ্যায় সম্প্রতি যে ভয়াবহ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে শ্রীডেবর তাহার জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের আদর্শ-নিষ্ঠা যদি জনগণকে প্রভাবিত করিতে পারিত, তাহা হইলে বোম্বাই এবং উড়িষ্যায় প্রাদেশিকতার তাণ্ডব দেখা দিতে পারিত না। কিন্তু জনমতকে প্রভাবিত করিবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আছে কি? ১২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নের প্রকাশ্য অধিবেশনে রাজ্য পুনর্গঠন প্রস্তাবের উপর পণ্ডিত পন্থের বক্তৃতায়—'পশ্চিমবঙ্গকে বিহারের সঙ্গে একত্র করিয়া দেওয়া হইবেই'—("The Merger of West Bangal is going through and shall go through")—এই উক্তির পিছনে কি জনমতকে প্রভাবিত করিবার মনোবৃত্তি কাজ করিতেছে? আমাদের ত তাহা মনে হইল না।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সাধারণের দৃষ্টিতে কংগ্রেস যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, এই প্রতিষ্ঠান আজ তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। কেন, কাহার দোষে? মহাত্মা গান্ধী যে অভিনব প্রাণবন্যার প্লাবনে আকুমারিকা-হিমাচল উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে কেন? আজও আমরা ঘটা করিয়া গান্ধী জন্মদিবস পালন করি, তাঁহার প্রিয় রামধুন গাই এবং সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। কিন্তু গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত কোথায়? শ্রীপিয়ারেলাল তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত গান্ধী-জীবনীতে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।* গান্ধীজীর বাণী এবং উপদেশ ত এখন পোশাকী কাপড়ের সামিল। সভা-সমিতিতে কালেভদ্রে বাহির করা হয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।

বেশী দিনের কথা নহে প্রতিনিধি এবং দর্শকগণ তীর্থযাত্রীর মনোভাব লইয়া কংগ্রেস-মণ্ডপে সমবেত হইতেন। আজ যে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অমৃতসর কংগ্রেসে স্যুট-বুটের ছড়াছড়ি এবং সিগারেটের ধোঁয়া যেন এই সত্যটিই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। ধুমধাম, সমারোহ, জাঁকজমক এবং প্রচারের ত্রুটি হয় নাই। ভাল ভাল বক্তৃতাও কম হয় নাই। কিন্তু অধিবেশনের সময় এবং অধিবেশন শেষে বার বারই মনে হইয়াছে এই কি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সেদিনকার কংগ্রেস? ইহারই সাধনায় কি ভারতবর্ষ পরশাসনের নাগপাশমুক্ত হইয়াছে?

কংগ্রেসের অধিবেশন-প্রাঙ্গণ শহীদনগর সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। অনেকে হয়ত ইহাতে প্রাদেশিকতার গন্ধ পাইবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতার নামে শহীদ নগরের বিভিন্ন মণ্ডপ এবং তোরণের নামকরণ করা হইয়াছিল। ছোট, বড় অতিপরিচিত এবং প্রায়-অপরিচিত অনেক নামই চোখে পড়িল। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামাঙ্কিত কিছুই দেখিলাম না। নেতাজী বসু এবং শহীদ যতীন দাসের নামাঙ্কিত শিবির এবং তোরণ অবশ্য চোখে পড়িয়াছে।

*Almost the fist thing a foreign visitor does on arrival in India is to visit Rajghat—if he happens to be an official guest or otherwise an important person, he is escorted there—to pay homage to the Father of the Nation. *Before he leaves India, he inevitably ends up by asking : Where is Gandhi in India of today?* That is a question which everyone of us owes it to himself, to India, for whom Gandhiji lived and died, and to the world to ask and answer"—*Mahatma Gandhi : The Last Phase, Vol. I.* by Pyarelal, Preface, p. 20

বন্দিনী

লিও হেনিক

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৌলিক

প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসন নিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অরাজকতা ও খণ্ডযুদ্ধ লেগেই আছে। তখন প্রায় ভোর সাতটা হবে। একদল সাদের সৈন্য রু-দ্য টুরনেলের অবরোধ-দুর্গ অধিকার করে নিল।

আকাশ মেঘমুক্ত ও রৌদ্রালোকিত ছিল, জ্বলন্ত গৃহগুলি হতে উদ্গত ধোঁয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা দূর করে দিয়ে প্রভাত-সমীর বায়ুপ্রবাহকে নির্ম্মল করে দিচ্ছিল। মিট্রাইয়ে 'মেশিনগান'গুলি হতে নিক্ষিপ্ত ভীষণ জ্বলন্ত অগ্নি-পিণ্ডগুলি অবিরাম বর্ষণধ্বনি সহকারে রাইফেলগুলির আওয়াজকেও ছাপিয়ে উঠছিল। বাতাস পোড়া বারুদের গন্ধে ভরপূর আর কিছুদূরে কামানের একঘেয়ে অস্পষ্ট গর্জ্জন শোনা যাচ্ছিল।

আক্রমণশেষে বিজয়ী সেনাদলের দুটি দল অল্প বিশ্রামের পর অবরুদ্ধ স্থানের নিকটের গৃহগুলি খানাতল্লাসী আরম্ভ করল। এই বিশ্রামের সময় এম্বুলেন্স গাড়ীগুলি আহতদের সেবাশুশ্রূষার জন্য নিকটবর্ত্তী হবারও সুযোগ লাভ করল। সৈন্যদল ক্রমে ক্রমে বিভক্ত হয়ে গেল আর যেখানেই তারা কোন বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল সেখানেই গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

সৈন্যদলের একজন পদস্থ ব্যক্তি—যাকে বলে 'অফিসর', তিনি তাঁর কয়েকজন লোক নিয়ে যুদ্ধাস্ত্র-অঙ্কিত, বৃহদাকার দরজাসমন্বিত অন্ধকারাচ্ছন্ন এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। বন্দুক হাতে করে এবং সঙ্গীনটি উঁচিয়ে ধরে প্রত্যেকে প্রতিটি জানালা খুলে এবং সমস্ত কোণ পরীক্ষা করে সাবধানে তল্লাসী চালাচ্ছিল।

কোথাও কোন প্রাণীর চিহ্ন দেখা গেল না। সেনাদল তখন সেই গৃহটি ত্যাগ করে কাটাগাছ ও আগাছাপূর্ণ একটি নির্জ্জন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে এমন সময়ে তারা কিছু দূরে ছায়ার মত একটি তরুণীকে পালিয়ে যেতে দেখতে পেল। মেয়েটি ছিল সেনাবাহিনীর সুরাপসারিণী, যার কাজ ছিল সেনাদলে খাদ্য ও সুরা পরিবেশন করা এবং আনন্দ দেওয়া, সে যে বিপক্ষের ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বাড়ীগুলির দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে সে এক নির্জ্জন ছায়াচ্ছন্ন প্রমোদোদ্যানের দিকে যাচ্ছিল। বিরাট বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল থেকে সে তার অনুসরণকারীদের দৃষ্টি এড়াবার ফন্দী খুঁজছিল। ছ'টা বন্দুক নিমেষে তার দিকে লক্ষ্য করা হ'ল আর ছ'টা গুলি পলাতকার দিকে নিক্ষিপ্ত হ'ল। গুলি কয়েকটি মেয়েটির মাথার উপর দিয়ে গিয়ে একটা জানালায় লেগে জানালাটি ভেঙে দিল।

ওর আকস্মিক উপস্থিতিতে হয় ত লোকগুলি অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কিংবা উপযুক্ত লক্ষ্য স্থির না করেই ওরা গুলি ছুঁড়েছিল—আর এমনও হতে পারে যে জানালার কাচ থেকে প্রতিফলিত সূর্য্যালোক তাদের চোখ ঝলসে দিয়েছিল—যাই হোক না কেন, ওদের সমস্ত গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল আর মেয়েটির কানের কাছ দিয়ে যখন ওগুলো সোঁ সোঁ শব্দে যাচ্ছিল তখন মেয়েটি আরও দ্বিগুণ উদ্যমে দৌড়তে লাগল।

ছয়টি লোকই বন্দুকে গুলী ভরতে ভরতে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটতে লাগল এবং যখন সে একটা দেয়াল বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে তখন অফিসারটি দ্বিতীয়বার গুলি করল।

বর্ব্বর ও পাশব আনন্দে তারা সবাই চীৎকার করে উঠল, "তা হলে এবার আমরা ওকে ধরতে পারলাম!" বেচারী সত্যই সাংঘাতিক আহত হয়েছিল। সেনাদল যখন তাকে শেষ করবার জন্য অগ্রসর হ'ল তখন দেয়ালের ভিতরের দিকে সে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল।

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে সে দেখতে পেল ছয়টা বন্দুকই তার বক্ষস্থলে লক্ষ্য করা হয়েছে। অস্পষ্ট উচ্চারণে সে চীৎকার করে উঠল, "নিষ্ঠুর নরপিশাচদল! গৃহে তোদের কি কারও মা নেই? তাই যদি থাকত তোরা এমন ভাবে আমাকে হত্যা করতে অগ্রসর হতিস না।"

যন্ত্রণায় পাংশু হয়ে সে বিজেতাদের দিকে তাকাল আর তার এই কথাগুলি অফিসরটির মনে একটু রেখাপাত করায় সুফল ফলল।

করুণার বশবর্ত্তী হয়ে আর কিছুটা অসহায়া নারীহত্যা ব্যাপারে পুরুষের স্বভাবজাত অনিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বন্দুক নামাল আর নিজেকেই যেন উৎসাহিত করবার মানসে সে ওকে জিজ্ঞাসা করল, "এখন তোমার আর কিছু কি বলবার আছে?"

তীব্র যন্ত্রণা ও তদধিক আক্রোশে সে তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করল, "আমি বলতে চাই—আমি বলতে চাই যে, আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছি—আমি জানতে চাই কোন শয়তান আমায় গুলিবিদ্ধ করেছে?"

সৈন্যদল ক্রুদ্ধস্বরে এর জবাব দিচ্ছিল, কিন্তু তারা মেয়েটির মধুর মুখশ্রীতে আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারল না, ক্ষত-স্থান হতে তখনও বিশেষ রক্তপাতজনিত কোন কালিমা তার অবয়বে দেখা দেয় নি। তারা মেয়েটিকে অফিসরের কিছু পেছনে থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিল।

তার পর তাদের মধ্যে এক জন গর্জ্জে উঠল, "শয়তানী, তোকে ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে বলে দিচ্ছি।" আশে-পাশে তখনও চটপট গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

মেয়েটি উত্তর করল, "আচ্ছা, তোমরা আমাকে নিয়ে কি করবে? রাস্তার অসহায় নিরীহ লোকের মত কি আমাকে হত্যা করবে?"

অফিসরটি তার দলের লোকজনের প্রতি ওদের মতামতের জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। অজ্ঞাতে আহতা মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে নিজের মধ্যে নূতন কিছু অঙ্কুরিত হচ্ছে বুঝতে পারল। ঠিক করুণাপ্রসূত না হলেও যেহেতু তার প্রাণরক্ষা করে, তার সেবাশুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুললে। এক দিন সে তার নিঃসঙ্গ জীবনে সুদ ও আসল সহ আশা এবং আনন্দের উপাদান হতে পারে এই কারণে অফিসরটি তাকে রক্ষা করবার একটি বাসনা প্রবল ভাবে অঙ্কুরিত হচ্ছে বলে বুঝতে পারল।

পসারিণীটি অনুকম্পা ভিক্ষা করে বলে উঠল, "আমাকে দয়া করে কোন দোকানে কিংবা কোন বিপন্মুক্ত স্থানে নিয়ে চলুন। আমার প্রতি অকারণ নিষ্ঠুর হবেন না। দেখুন এখনও আমার সুরাপাত্রে কিছু সুরা আছে। আপনি কিছু পান করবেন কি?"

অফিসরটি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিরুত্তর রইল। তার পর সেনাদলের একজন চুপি চুপি বলে উঠল, "আমার মনে

হয় আমরা ওকে ছেড়ে দিতে পারি।" যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে বলল, "আমরা ওকে ছেড়েই দেব।"

নিরীহ পসারিণীটির চক্ষু হতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরে পড়ল, সে সৈনিকটির করচুম্বন করতে লাগল আর আর্দ্র কণ্ঠে বলল, "আহা, আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ!"

তারা সেই প্রাঙ্গণ হতে তাকে তুলে নিয়ে দেয়াল টপকে বাইরে গেল, আর তাকে গোপনে একটা কাঠুরের গৃহে নিয়ে যেতে সক্ষম হ'ল। কাঠুরিয়াটি অফিসরের কাছ থেকে প্রাপ্ত কিছু অর্থের বিনিময়ে তাকে নিজের শয্যা ছেড়ে দিতে ও তার সেবাশুশ্রূষা করতে স্বীকৃত হ'ল। কাঠুরেটিকে শিখিয়ে দেওয়া হ'ল, মেয়েটি যদি মারা যায় তা হলে সে যেন লোককে বলে যে, মেয়েটি ছিল তার বহুদিন ধরে যক্ষ্মারোগাক্রান্তা ভগিনী।

আহতা মেয়েটিকে বসন পরিবর্ত্তন করে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। নিরাপদে শয্যায় আশ্রয় লওয়ামাত্রই তার শক্তি ক্ষয় হয়ে এল আর সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তার ক্ষতস্থান কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে কাঠুরেটি সুরার কলসীটি তার কাঠকয়লার স্তূপের নীচে নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেল।

সেনাদল রু-দ্য টুরনেলে আবার তল্লাসীর জন্য ফিরে গেল, পরিত্যক্ত গৃহগুলির ভিতর হতে শত্রুপক্ষের কিছু লোক আবিষ্কৃত হওয়াতে কয়েকটি তীব্র খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। অফিসরটির চিন্তাধারা ত্রাণপ্রাপ্তা ও আশ্রিতা মেয়েটিকে কেন্দ্র করে সব সময় ঐ দিকে ধাবিত হচ্ছিল—তা সত্ত্বেও অন্য কোন লোক অপেক্ষা কম নিপুণতার সঙ্গে সে যুদ্ধ করে নি, সে কাঠুরেটিকে তার সেবাযত্নের বিষয়টার গোপনীয়তা রক্ষা করবার বিনিময়ে বেশ মোটা রকমের পুরস্কার দানে স্বীকৃত হয়েছিল। ফিরে গিয়ে সে তাকে দেখবার জন্য অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিল। এ বিষয়ের দুশ্চিন্তা তার বাহুতে নূতন উদ্যম সঞ্চার করল আর যুদ্ধ শেষ না হওয়ার পূর্ব্বেই বিপক্ষ সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দিয়ে সে এক ধাপ পদোন্নতি লাভ করল।

সে তার পদত্যাগ করতে কিংবা যে গৃহে মেয়েটি লুক্কায়িতা ছিল সেখানে গিয়ে পরের সন্দেহভাজন হতে সাহস করল না। তার কোন সংবাদই বাস্তবিক সে পাচ্ছিল না। কিন্তু কি দিবসে কি নিশীথে ঝাঁক ঝাঁক গুলিবর্ষণের মধ্যেই হোক আর ছাউনিতে বিশ্রামরত অবস্থাতেই হোক না কেন, সেই কৃষ্ণ আঁখিতারকাবিশিষ্টা চকিতনয়না, অঙ্গারসদৃশ ঘনকৃষ্ণ কেশরাজিশোভিতা, আহতা পসারিণীটির কি বা হ'ল সেই দুশ্চিন্তায় সে মগ্ন থাকত। তাদের আবাসস্থল হতে বেরিয়ে আসবার কালে এক দিন তার কোন সহকর্ম্মী তাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, "ফ্যাবিয়ানি, তুমি আগে যা ছিলে এখন তোমাকে দেখে তার অর্দ্ধেকও মনে হয় না, তোমার হয়েছে কি? প্রতিপক্ষ গণতন্ত্রীরাই কি তোমার এত দুশ্চিন্তার কারণ, না আর কিছু?"

যখন প্যারিসের অবরোধ-স্থলগুলি একে একে জয় করে নেওয়া হ'ল তখন ফ্যাবিয়ানির সেনাদলকে স্যাটো-দ্য অয়্‌তে স্থাপন করা হ'ল। পক্ষকাল নির্ব্বিবাদে ও শান্তিতে বাস করে তরুণ অফিসরটি কাঠুরের কাছে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল তা সফল করতে স্থিরসঙ্কল্প হ'ল আর তার নূতন আঁটসাঁট পোশাকটি পরে রু-দ্য টুরনেলের দিকে অগ্রসর হ'ল।

পনের মিনিটকাল হেঁটে আসবার পর সে একটা ফলের দোকানে দাঁড়াল এবং সেই রুগ্না মেয়েটির জন্য কিছু বাদাম কিনে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই কাঠুরেটির নোংরা বস্তিটি তার দৃষ্টিগোচর হ'ল ততক্ষণ সে থামল না। সহসা কোন এক সাংঘাতিক চিন্তায় অভিভূত হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বক্ষের দুরু দুরু শব্দ প্রায় থেমে গেল। "সে কি এখনও জীবিত আছে? যদি সেই আঘাত হতে তার মৃত্যু হয়ে থাকে তবে কি হবে?"

এমনকি নিজের মনে মনেও যখন সে এই প্রশ্নটি করছিল, সে বুঝতে পারল যে অনতিবিলম্বে এর উত্তর তার চাই-ই এবং তার গৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত সে প্রায় ছুটে গেল। কাঠুরেটি তখন একবোঝা জ্বালানি কাঠ নামাচ্ছিল।

"সেই তরুণীটি—সে কি অনেকটা সুস্থ?" সে চীৎকার করে বলল, "হাঁ, হুজুর! নিশ্চয়ই?"

যে কক্ষে সে মেয়েটিকে শেষবার দেখে গিয়েছিল লোকটিকে অনুসরণ করে সেই কক্ষে প্রবেশ করল। সে তখনও শয্যাশায়ী ছিল, শয্যা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকাতে তার শুকনো মুখখানা লালিত্যহীন বলে বোধ হচ্ছিল, কিন্তু সেই তরুণ অফিসরটিকে দেখে তার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সোল্লাসে চীৎকার করল, "কি! আপনি এখানে?"

উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে সে প্রায় গোবেচারীর মত উত্তর দিল, "হাঁ, আমাকে আসতে হ'ল! তুমি ত জান ওরা তোমার যত্ন নিচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম। তুমি কি এখন অনেকটা সুস্থ?"

শ্রান্তির সঙ্গে মেয়েটি উত্তর দিল যে, সে পূর্ব্ববৎই আছে আর চিকিৎসক যে তার প্রাণের সামান্য কিছু আশা রেখে-ছিল এ কথাটা সে গোপন করে গেল। তার জন্য যা কিছু

করা হয়েছে এবং যা কিছু সে সয়েছে, যখন সে বিস্তারিতভাবে সে সব খুলে বলল, ক্যাবিয়ানি তখন বুঝতে পারল যে তার কোন আশা নেই—আর তাকে প্রথম সে যেভাবে দেখেছিল সেই সুস্থ ও প্রাণচঞ্চলারূপে তাকে দেখবার বাসনা তার কখনও চরিতার্থ হবে না। সে যেমন স্বপ্ন দেখেছিল যে, একদিন সে তার বন্ধু, হয়ত-বা তার প্রেমিকা রূপে দেখা দিবে, সে আশায় জলাঞ্জলি পড়ল।

মেয়েটি একটা বাদাম খেতে খেতে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করল। শহরে কি হচ্ছে, প্রদেশগুলির কি হ'ল, কে কে নিহত হ'ল, কোন্ পক্ষ জয়ী হ'ল ইত্যাদি নানা সংবাদ সে জানতে চাইল।

"কাঠুরে একটা গো-মুর্খ—সে একেবারে কিছুই জানে না। কখনও সে কোথাও বের হয় না, আর তার খদ্দেরদের নিকট কখনও কিছু জিজ্ঞেসও করে না।"

তার স্বর কাঁপছিল আর ভাঙা ভাঙা কথা বলতে বলতে সে যেন নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছিল না, এমন ভাবে সে হঠাৎ চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, "আর রকফোর্ট? সে কি নিহত হয়েছে? সে কি বন্দী হয়েছে?"

ক্যাবিয়ানি এটা জানত না, মেয়েটি যে তার সংবাদগুলির বিশেষ বিশেষ কয়েকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে আর তখন পর্য্যন্তও তার প্রতি বিশেষ অনুরাগের ভাব দেখাচ্ছে না, এটা তার লক্ষ্য করতে বাকি রইল না—তাই সে বলে উঠল, "গণতন্ত্রীদের দেখছি তুমি খুব পছন্দ কর? এটা কেমন করে সম্ভব?"

সে কোন উত্তর দিল না, বলেই চলল, "ঐ সৈন্যদলের স্থুরা পসারিণীর বৃত্তি কেন তুমি গ্রহণ করেছিলে তা জানতে পারি কি?"

আহতা মেয়েটি রোদন করতে লাগল, তার পর তাকে সব খুলে বলল। সে তার প্রেমিকের—যে রুক-দ্য টুরনেলের প্রথম গুলিবর্ষণের সময়ই নিহত হয়েছে, তার সমীপস্থ হওয়ার জন্য সেনাদলটি অনুসরণ করে আসছিল, কিন্তু তার অশ্রু শুধু ক্যাবিয়ানির অন্তরে তার মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটা হিংস্র আক্রোশ জাগিয়ে তুলল।

কাঠুরেটি দু' গ্লাস মদ নিয়ে এল এবং ক্যাবিয়ানি আহতা মেয়েটির মঙ্গলকামনা করে মদ্যপান করার পর উঠে দাঁড়াল আর পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একটি নোট লোকটির হাতে দিয়ে কেবল বিদায় নেবে এমন সময় মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ শয়তান আমায় গুলিবিদ্ধ করেছিল তা তুমি জান কি?"

তরুণ অফিসরটি লজ্জা পেয়ে বলল, "না, আমি জানি না, কিন্তু সহজেই আমি এটা বের করতে পারি, কেননা সর্ব্বসমেত আমরা ছয় জন ওখানে ছিলাম। এ প্রশ্নে তোমার কি প্রয়োজন?"

"আমি তাকে কি মনে করি এবং চিরকাল কি ঘৃণাই না তাকে করব, তা-ই তাকে বলতে চাই।"

আর একটি কথাও না বলে ক্যাবিয়ানি সম্পূর্ণ নিরাশ ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে চলে গেল। সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরে এসেই সে ভীষণ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে উঠল এবং শপথ করল যে, এই মেয়েটি—যে শুধু তার অশান্তি ও ব্যর্থতার কারণ হয়েছে, তার আর কোন উপকারই সে করবে না। সমস্ত দিন তার বিরক্তির ভাব রয়ে গেল, এমনকি রাত্রিতেও সে সেই পসারিনীকে অভিশাপ দিতে দিতে ঘুমোতে গেল; কিন্তু পর দিন প্রভাতেই শয্যাত্যাগ করে বাইরের আবহাওয়াটা তার এত মনোরম আর সবকিছু এত প্রাণোজ্জ্বল মনে হ'ল যে, সে বেশীক্ষণ তার ক্রোধ জীইয়ে রাখতে পারল না, এবং প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই তার চরণদুটি কাঠুরিয়াটির গৃহাভিমুখে ধাবিত হ'ল।

মেয়েটি একটু সুস্থ ছিল এবং যেহেতু সে সেদিন প্রাতে তার প্রতি বেশ একটু অধিকমাত্রায় বন্ধুর মত ভাব দেখাল, তাই সে তাকে দেখতে আসায় সুখীই হ'ল। তখন হতে প্রতিদিনই সে রু-দ্য টুরনেলে যেত।

কি গভীরভাবেই না সে তাকে আকর্ষণ করে রেখেছে এটা তাকে জানতে দিতে অনিচ্ছুক থাকার জন্য সে ভান করত যে শুধু তার অসুস্থতা ও নিঃসঙ্গতার কারণ হেতুই সে দয়াপরবশ হয়ে তাকে দেখতে যেত। কিন্তু যখন সে ভেবে দেখত যে, যে মেয়েটিকে সে এমন নিষ্ঠুরভাবে আহত করেছে তারই হৃদয় পাবার জন্য সে সচেষ্ট ও লালায়িত তখন তার বিরক্তি ও প্রান্তির সীমা থাকত না। মাঝে মাঝে মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা করত, "কোন দানব আমার কাঁধ গুলিবিদ্ধ করেছিল আপনি এখনও কি তার কোন হদিস পান নি?"

এখন কিন্তু সে আর এতে লজ্জা পেত না। তার ঘন ঘন এই প্রশ্নটা করবার উদ্যম ও একাগ্রতা দেখে সে বাস্তবিকই আমোদ পাচ্ছিল আর সব সময়ই সে এই প্রশ্নটার প্রতীক্ষায় থাকত।

মেয়েটির স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হ'ল না; বরং সে দিন দিন আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিল, অবশেষে ক্যাবিয়ানি এ বিষয়ে তার স্বার্থ কোথায় একথা তার নিকট আর গোপন করল না এবং বিভিন্ন বিষয়ে মাসাধিককাল আলোচনা চালাবার পর সে একদিন অকপটে প্রেমনিবেদন করল আর মেয়েটি বিপন্মুক্ত হওয়ামাত্রই তার প্রেমের প্রতিদান দিতে স্বীকৃত হ'ল।

তা সত্ত্বেও ওরা দুজনে গণতন্ত্রীদের সম্বন্ধে একমত

হতে পারল না। সে তাদের একটা মূর্খ অকেজো দল বলে অভিহিত করত আর প্রতিবাদে মেয়েটি ওরা যে সুমহান শহীদের দল তাই ঘোষণা করত। এই ভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে তর্ক চালাত—যতক্ষণ না তাদের তর্ক পরস্পরের গভীর চুম্বনের ধারাবর্ষণে ধুয়ে যেত। এখন তারা উভয়ে উভয়ের বাঞ্ছিত প্রণয়ী—যদিও তাদের রাজনৈতিক মতামতে বিন্দুমাত্র এদিক-ওদিক হ'ত না।

এই ভাবে তাদের বেশ কাটছিল এবং বোধ হয় অনির্দ্দিষ্ট কালই এভাবেই কাটত যদি ফ্যাবিয়ানির চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে এক রাত্রে অধিকমাত্রায় সুরাপান করবার দুর্ম্মতি না হ'ত। তার সহকর্ম্মীরা তাকে ছাউনিতে ফিরে যেতে বারংবার তাগিদ দিল। তার মাথা ঠাণ্ডা ও সম্বিৎ ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাই তার করা উচিত ছিল; কিন্তু সে তাদের দল হতে চলে এসে প্রণয়িনীর গৃহের দরজায় আঘাত করতে গেল।

সে তাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিল, কিন্তু তার এই অবস্থায় এটা বেশীমাত্রায় বেমানান হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত বিচার-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে সে এত জোরে তাকে বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করল যে, তার আহত স্থানের পুরাতন যন্ত্রণা আবার দেখা দিল। তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়ার চিকিৎসকের বারংবার উপদেশ থাকা সত্ত্বেও সে তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তাকে তার বক্ষে জোর করে টেনে নিল, সে চুম্বনের প্রতিদানে চুম্বন দিল, আর উভয়েই পুনঃ পুনঃ চিরকাল পরস্পরকে বিশ্বাস করবার ও ভালবাসবার অঙ্গীকার করল। অবশেষে যেন পুরাতন যন্ত্রণার তাড়সে মেয়েটি তার পুরাতন প্রশ্নে ফিরে এল। মেয়েটি পিছু হটে জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে কে আহত করেছিল তুমি এখনও কি তা জানতে পেরেছ।" ফ্যাবিয়ানি মূর্খের মত হাসতে হাসতে উত্তর দিল, "আমিই সেই লোক, এ বিষয়ে তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?"

আতঙ্কের চাহনি মেলে মেয়েটি যখন হতবাক্ হয়ে সরে গেল, সৈনিকটি তখন বলতে লাগল, "আমি ছাড়া আর কেউই তোমাকে গুলিবিদ্ধ করে নি। আরও শুনতে চাও তা হলে শোন যে আমিই তোমার প্রণয়ীকেও গুলিবিদ্ধ করেছিলাম।"

উৎকট হাসিটি তার তখনই থামল যখন সে মুমূর্ষু মেয়েটির পতনোন্মুখ দেহ ধরবার জন্য লাফ দিয়ে অগ্রসর হ'ল। আর একটি কথাও না বলে মেয়েটি যখন তার বাহুবন্ধনে প্রাণত্যাগ করল সে কেবল তার অন্তিম নিঃশ্বাসটুকুর সাক্ষী হয়ে রইল।

ঝুমুরের দেশ মানভূম

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

শাল-মহুয়ার বনে ঘেরা এই মানভূম। এরই ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট গ্রাম। বনে আর পাতার কুঁড়েতে পরম মিতালি পাতিয়ে তারা বাস করে। ঊষর প্রান্তরের পাশেই ছোট ছোট শীর্ণকায়া নদী, পাহাড় আর ডুংরির সারি। মাঝি, মাহাতো, ভূঞা চাষী হ'ল এখানকার বাসিন্দা। সারা বছর তারা কাজ করে ক্ষেতে খামারে, অবসর সময় গায় তাদেরই আপনজনের রচা গান। চাঁদের কিরণে যখন ছেয়ে ফেলে বনপ্রান্তর, দূরে দূরে তখন পাহাড়ের কোল থেকে বেজে ওঠে আদিবাসীদের বাঁশীর সুর:

"তুরুরু তুরুরু
তুতুর্ তুআতু—
তুতুর্ তুআ তুতুর্ তুআ
তুতুর্ তুআতু—।"

হয়ত বা থেকে থেকে তাদের মাদলের শব্দও কানে আসে:

"ধা তিন্‌তা ধাতিন্ তা
ধাতিন্ তাতাক্ ধাতিন্ তা
তাতাক্ ধাতিন্ ধাতিন্ তা
তাক্‌তা ধাতিন্ ধাতিন্ তা—।"

আর ঠিক এই সময়েই পুরুলিয়া, মানভূম, সিংভূমের লোককবিরা শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে রচনা করে অসংখ্য ঝুমুর গান। মেয়ে-পুরুষ একত্রেই এ গান গায়।

এই ঝুমুর গানেই আছে মানভূমের প্রাণস্পন্দন। এই গানের মাধ্যমে মানভূমের নিরক্ষর লোককবিদের সত্যিকারের কাব্য-প্রতিভা ধরা পড়েছে, তাদের মুক হৃদয়ের ভাষা গান হয়ে ফুটে উঠেছে।

ঝুমুর গান প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন-কথা নিয়েই রচিত। কিন্তু এ সত্বেও এই সব গানের মধ্য দিয়েই দেশের সামাজিক রাজনৈতিক অনেক খবরই শুনবার অবকাশ পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি, মানভূমের ঝুমুর গানের প্রসার আদিবাসী ও সাধারণ লোকের মধ্যে, একে মোটামুটি ভাবে ভাদরিয়া, সিছুরিয়া ও আধ্যাত্মিক ঝুমুর এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অবশ্য সুবিধার জন্য আমরা আদিবাসীদের ঝুমুরকে পৃথক করে দেখাতে পারি। ঝুমুর গান সবই লোককবির রচনা, সুতরাং যখন এ গান গীত হয় তখন আদিবাসী এবং অপরাপর সকলেই এর রস উপভোগ করতে থাকে। যাঁরা বাঁকুড়া এবং বীরভূমের ঝুমুরের সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরা লক্ষ্য করবেন জলবায়ুর গুণে বাঙালীর রচিত ঝুমুর গানও কি ভাবে হিন্দী ভাষার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে।

কারও কারও মতে মানভূমই হ'ল ঝুমুর গানের উৎপত্তি-স্থল। যদি মানভূম, সিংভূমকে বৃহত্তর বঙ্গের মধ্যে ধরা যায় তা হলে এ কথাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

শ্রীরাধিকা অগুরু চন্দন দিয়ে আজ সেজেছেন। সোনার পালঙ্কের উপর রেশমী সাড়ী পরে কুসুমহার গলায় দুলিয়ে চোখে মায়া-অঞ্জন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-আশায় বসে আছেন। এমন মেঘলা যামিনী—শূন্য বিছানায় কেমন করেই বা তিনি রাত কাটাবেন?

"আঁধারি ভাদর রাতি, দেখিয়া তড়পে (দুঃখে) ছাতি (বুক)
পতি নাহি পালঙ্কের উপর।
(সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে)॥
একেত' অবলা বালা, দোসরে যৌবন জ্বালা
কেমনে রহিব শূন্য ঘরে
(সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে)॥
শুন শুন সহচরী তোদিগে বিনয় করি
বাঁচাও আনিয়া সে নাগরে।
(সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে)।"

ঠিক এই ধরনের গান আদিবাসীদের ভিতরও শোনা যায়। কোন যুবতীর পতি সেই ভোরে মোরগ ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গি ঘাড়ে নিয়ে পাতার তৈরি বিড়ী টানতে টানতে কাজে চলে গেছে। এখন অনেক বেলা হয়েছে, ভাত খাবার সময় হয়েছে এখনও ত সে ফিরে আসছে না, কে জানে কোথায় গেছে তার প্রাণবঁধু:

"টাঙ্গিয়া কান্ধায়ে নাগর বাহন্ গো।
বাইরলেন কুঁকড়ী ডাকে
সোজা গেলেন কুলীর বাটে
চুটিয়া (পাতার তৈরী বিড়ি) ফুঁকিয়া গো।
ভাত খাবার বেলা হল্য
এখন নাগর না আইল,
কোন বাটে কেহ বাছেন গো
মহুল বনে গো—।"

রাত্রি তৃতীয় যাম অতিবাহিতপ্রায়। শ্রীরাধিকা অস্থির হয়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ 'দরশন বিনে'। জগৎ সংসার সবই তার কাছে নিরর্থক বলে মনে হচ্ছে। বাইরের আকাশে বর্ষার মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে পূর্ণচন্দ্রের অকৃপণ জ্যোছ্না। বন প্রান্তর মুখর হয়ে উঠেছে সেই আলোর জোয়ারে! কুঞ্জে কুঞ্জে ডেকে উঠল কোকিল। কিন্তু সে কি শুধু শ্রীরাধার মনে ব্যথা জাগাবার জন্যই? এমন যে চাঁদিনী রাত সবই কি বিফলে যাবে? প্রাণবঁধু কি সত্যিই তার আর আসবে না:

"হের সহচরী, যায় বিভাবরী
এলোনা কপটের মূল রে।
কোকিলা কুহরে, বিঁধিছে অন্তরে
মদনে বিরহ শূলরে।
এলোনা ত্রিভঙ্গ শ্যাম পরাণ আকুল রে।
সুমধুর স্বরে, ভ্রমরা গুঞ্জরে
কুঞ্জে চুমি নব ফুল রে।
সুধাকর কর অনল প্রখর
গরল ভেল তাম্বুল রে।
অঙ্গের ভূষণ, বৃশ্চিক যেমন
সাপিনী নিল দু'কুল রে।
কণ্টক সমান, শয্যা অনুমান
দহিছে কুঞ্জ মঞ্জুল রে।
মরিবার তরে, সে মজিল পরে
পরপ্রেমে প্রেমাকুল।"

শ্রীরাধার যখন মনের অবস্থা এই রকম—কুসুম-শয্যা কণ্টক-শয্যা, কোকিলের ডাক কর্কশ রূঢ়, অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক-দংশন সদৃশ, সখী ললিতা তখন সহজ সরল ভাবে শ্রীরাধার এই ভাব নিম্নের গানে প্রকাশ করছেন:

"ঝিঙাফুলে নিলেক জাতি কুল গো
পিরীতি হইল শূল।
বর্ণ ছিল চাঁপার কলি
ভাইব্যে ভাইব্যে হলাম কালি
কালার এ পিরীতি আমার
ডুবাল দু'কুল
(গো পিরীতি হইলো শূল)।

এক্কে আমার জীর্ণ তরী
তায় চাইপ্যাছেন বংশীধারী
মাঝখানে লাগায়ে তরী
ডুবাল দু'কূল গো
(পিরীতি হইল শূল)।"

কিন্তু এতে কি আর শ্রীরাধার মন শান্ত হতে পারে? এর পরিবর্ত্তে আগুনে ঘিয়ের ছিটে পড়ল। রাত্রি অবসানের আর বড় বেশী বিলম্ব নেই, এখনও সেই 'নিঠুর কালিয়া' দেখা দিল না—এ যাতনা কি প্রাণে সহ্য হয়? তার ত এখন জীবন মরণ সবই সমান, আর একটু পরেই ত পূর্ব্বাকাশে লোহিত ভানুর উদয় হবে, মুখর হয়ে উঠবে বিশ্বচরাচর। নিষ্ফল হ'ল শ্রীরাধার বাসর-সজ্জা। মনের আক্ষেপে সহচরীদের উপর কঠোর হুকুম জারি করলেন, যদি নিঠুর আর কখনও আমার কুঞ্জদ্বারে আসে তা হলে যেন তাঁকে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়:

"হেরলো সজনী ভেল প্রভাতী
শীতল সমীরে শিহরে অতি
দোলে তরুপাত, ডাকিছে বিহঙ্গ জাগিয়া।
সুন্দর সিন্দুর রাশি লো যেমন
শ্যামাঙ্গী বসুধা-সীমন্তে শোভন
তরুণ অরুণ কিরণ দিল ঢালিয়া,
এখনো না এলো কালিয়া
লম্পট বনমালিয়া।
সরোবরে যায় কুলবালাগণ
নিশা জাগরণ অলস নয়ন
চঞ্চল চরণ ঘুমঘোর যায় টলিয়া।
ভ্রমর নিকর মধুপান তরে
নলিনী-কানন অন্বেষণ করে
গুন্ গুন্ স্বরে মনপ্রাণ লয় কাড়িয়া।
অস্তাচল গত রজনীরঞ্জন
কুমুদিনী করে নীরবে রোদন
যায় আ'খিনীরে নিশির শিশির ভাসিয়া।
চকোর চকোরী বসি দুঃখমনে
চক্রবাক সুখী পিয়ার মিলনে
পতি দরশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া।
যাও সহচরী থাক দ্বারদেশে
যদি সে কপট আসে নিশাশেষে
বলিও সরোষে, 'যাও হেথা হতে চলিয়া'।
যার ভাল তবু থাকে কিছু মান
নহে প্রতিশোধ করো অপমান
নহে সুবিধানে কহে ভবপ্রীতা ভাবিয়া।"

এদিকে ত রাই কমলিনীর এই অবস্থা! ওদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাটাও একটু ভাবুন। তিনি আজ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে আটকা পড়েছেন, আজ আর তার নিস্তার নেই। চন্দ্রাও কম যায় না। সেও বহু দিন ওৎ পেতে থেকে আজ নিজ বাহুপাশে বন্দী করেছে 'নিঠুর কালিয়া'কে। কাজেই তার পক্ষে বলা নিশ্চয়ই আর অসম্ভব নয়:

"শ্যামকে রাখিব আদরে হে
হৃদয় মাঝারে।
হেরি ও মুখচন্দ্র লোকে বলে ভালমন্দ
প্রাণনাথ বিনা আমি যাব কোথা বল রে।
* * *
কালার এ পীরিতি জ্বালা
আমার প্রাণে দেয় জ্বালা
হৃদয়ের আলা কালারে আনিয়া দেরে।"

শ্রীকৃষ্ণ এবার বেজায় জব্দ হয়েছেন। চন্দ্রাবলীর নিকট অনুনয়-বিনয় করে কোন ফলই হ'ল না। রাত তাকে কাটাতেই হ'ল চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। নিশাশেষে অতি দ্রুত গিয়ে হাজির হলেন শ্রীরাধিকার কুঞ্জদ্বারে:

"গত বিভাবরী নেহারি শ্রীহরি
পরিহরি নব কামিনী
আসি রাধাদ্বারে সভয়ে নেহারে
কহে বৃন্দা দ্বারবাসিনী।"

শ্রীকৃষ্ণ একবার চারদিক দেখে নিয়ে চুপি চুপি এগোতে চেষ্টা করলেন রাধাকুঞ্জের দিকে। কিন্তু রাধাসখী বৃন্দাও ত কম পাত্রী নন। লোককবি ভবপ্রীতানন্দ এবার শুধু বাংলা কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলা ও হিন্দী সংমিশ্রণে গীত রচনা করে শ্রীকৃষ্ণকে চোর বলে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। পাঠকবর্গ এইবার একই সঙ্গে দুটো জিনিস লক্ষ্য করুন। একটা হ'ল লোককবিদের রসবোধ, অন্য দিকে যেহেতু হিন্দী ভাষাভাষী নিয়ে বাস করতে হয় সে কারণে কবি হিন্দীভাষীদের জন্যও কিছু গান রচনা করেছেন।

বৃন্দা ত শ্রীকৃষ্ণকে বলেই বসলেন, কে বাবা, এই শেষরাত্রে সিঁদকাঠি হাতে নিয়ে চুরির মতলবে ঘুরঘুর করছ। তোমার মতলব ত বিশেষ ভাল বলে মনে হচ্ছে না। যাও না বাবা যেখানে রাত কাটিয়েছিলে সেখানেই। তুমি বাপু খুব সুবিধার লোক নও কিন্তু:

"কোন্ হো তুম্ নেহি কুছ মালুম্ ইধর কাঁহাসে আতে হো?
ছায় সে মানা চৌর সে মানা, আধ মুখড়া দেখলাতে হো।
হট যাওজী বংশীবালে, কাহাকে অন্দর আতে হো?
কাহে লাঠি ক্যা সিধকাঠি হাতমে ক্যা দেখলাতে হো?
রাই রাজাকে ধন হরণেকে চোরি মতলব লাতে হো।
রাত কিয়া বং পরনারী সঙ্গ, ভোর হিয়াপর আতে হো।

সিন্দুর কজ্জল মুখপর ঝলমল, জর্‌রা সরম নেহি যাতে হো;
পাহিরণ কালা, বরণ ভি কালা, নখর দাগ দেখলাতে হো।
রাত জাগরণ তাকে কারণ লাল আঁখ চমকাতে হো,
রাতকা ডেরা যানা তোবা বেহতর হুকুমরহ পাতে হো;
ভবপ্রীতা চিত হরিপদ সে প্রীত দসরে সে কোঁ ভুলাতে হো।"

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন, আমি কেন চোর হতে যাব? আমি খুব ভাল লোক গো। হাতে দেখছ, এ ত মোহন-বাঁশী, আর এই যে কপালে সিন্দুরের দাগ দেখছ, এ হ'ল ভগবতীর পূজো করতে গিয়েছিলাম কি না, তাই ত সিন্দুর পরেছি আর বুকে যে ক্ষতচিহ্ন দেখছ এ হ'ল দেবীপূজার জন্ত পদ্ম (?) ফুল তুলতে গিয়েছিলাম, সেই পদ্মের কাঁটার ঘায়ে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আর নীল রংয়ের কাপড় পরেছি কেন এই কথা জিজ্ঞেস করছ ত তা দেখ, রাত্রে কাপড়ের রং ঠিক করে উঠতে পারি নি। সত্যিই ভাই আমি চোরও নই বা বদমায়েসও নই, পক্ষান্তরে তোমার সখী শ্রীরাধিকারই একান্ত অনুগত ভক্ত:

"মোরে চোর বল কি জঞ্জাল
চিনিলে না সহচরী আমি রাধার প্রহরী
দ্বারে থাকি ধরে অসি ঢাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
সিঁদকাঠি নয় রূপসী, করেতে মোহনবাঁশী
রাধা নামে সাধা সদাকাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
করিতে দেবীর পূজন, করি কমল চয়ন
কাঁটা দাগ হৃদয়ে বিশাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
পূজেছিলাম ভগবতী তাহার প্রসাদে দূতী
সিন্দুর কজ্জলে মাথা ভাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
অভিসারে নীল বাস, আঁধারে নহে কো প্রকাশ
(তাই) পথ ভুলে এমন বেহাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।"

কিন্তু ভবী, ভুলবার নয়। বৃন্দাদূতী যদি বা কোন রকমে ভিতরে যাবার অনুমতি দিল তার বাকচাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে, কিন্তু শ্রীরাধার সেই ধনুকভাঙ্গা পণ—কালো বদন আর হেরব না গো—

শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। নিজের দোষ-ক্ষালনের জন্ত অনেক কাহিনীরই অবতারণা করলেন, কিন্তু না, শ্রীরাধা সেই যে মুখ ফিরিয়ে রইলেন আর এদিকে ফিরেও তাকালেন না।

বেচারী শ্রীকৃষ্ণ! মনের দুঃখে ফিরে গিয়ে সখা সুবলের কাছে প্রকাশ করতে সুরু করলেন তার মনের বেদনা:

"বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়
(গো) পরাণ রাখা দায়।
দেইখেছি তার পথে ঘাটে, জল আনিতে পুকুরঘাটে
দেইখে আমার হিয়া মাঝে
জল বরিষায়।
(গো) বধুর লাগি পরাণ রাখা দায়।
হেরি ও মুখচন্দ, লোকে বলে ভাল মন্দ
আমি বলি বরাত মন্দ
নাই যদি পাই
(গো) বধুর লাগি পরাণ রাখা দায়।"

আর এদিকে? লোককবি কি শুধু শ্রীকৃষ্ণেরই মনোবেদনা প্রকাশ করে ক্ষান্ত হবেন? শ্রীরাধা অভিমান করতে পারেন, তার প্রাণবঁধুর ওপর, কিন্তু তাই বলে ত আর রাগ করতে পারেন না। রাগ আর অভিমান ত এক জিনিষ নয়। তা নইলে এর পরদিনই যমুনার ঘাটে জল আনতে গিয়ে শ্রীরাধাকে বলতে শুনব কেন:

"যাইতে যমুনার জলে, শ্রীরাধা সখীরে বলে
তরুতলে কালিয়া দাঁড়ায় গো।
একাকী সে যাব যমুনায়।
দেখলে যুবতী নারী, শ্যাম বাজায় বাঁশরী
আঁখি ঠারি রমণী ভুলায় গো।
একাকী সে যাব যমুনায়।
সেই ভ্রমর কালিয়া, নারীকুলে জড়াইয়া
অধর চুম্বিয়া মধু খায় গো,
একাকী সে যাব যমুনায়।"

বাংলায় একটা চলিত প্রবাদ আছে, বেদে চেনে সাপের হাঁ, শ্রীকৃষ্ণও কি বুঝতে পারেন নি যে, শ্রীরাধাও ঠিক তাঁরই মত মনে মনে জলে পুড়ে মরছেন! তাঁরও সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে 'শ্রীকৃষ্ণ-পরশন আশে?' হয়ত এ কারণেই তিনিও আড়ি পেতে ছিলেন যমুনা-ঘাটের কোন এক নিভৃত কোণে। ঝোপের আড়াল থেকে শ্রীরাধাকে দেখেই তার পক্ষে বলে ওঠা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়:

"কত গরবে চলেরে ধনী
যখন নীতে সিনানে যায়,
মনে হয় বুকটা বিছায়ে দি
ধনী পা দিয়ে যাক তায়।
মাথায় কলসী, কলসী কাঁখে
ঐ ঘুরে ঘুরে চাইতে থাকে
নাম ভুলে যাই বলব কাকে
ঘটল বিষম দায়।"

যাকে বলে পুরোপুরি ভাবে আত্মসমর্পণ। শ্রীরাধা বুঝেছেন, শ্রীকৃষ্ণ সত্যই তাঁর বিহনে শোকাতুর—এদিকে তাঁর নিজের অবস্থাও তথৈবচ। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি আর কিই-বা করতে পারেন? তাই হয় ত সখী ললিতার কাছে তাঁকে শেষ কথা বলতে শুনি। লোককবি ভবপ্রীতানন্দ অতি সহজে এই অসহনীয় পরিবেশের সমাপ্তি ঘটিয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা পেলেন:

"রাধা রাধা নাম ধরে বাঁশী ডাকে প্রেমভরে
ফুলশরে হিয়া বিঁধিল মদন গো।
ফুলশরে হিয়া বিঁধিল মদন।

কি করিবে কুললাজে, পাই যদি রসরাজে
হৃদিমাঝে তারে ধরিব যতনে গো,
কহে রাধা উৎকণ্ঠিতা, চল ত্বরা ও ললিতা
ভবপ্রীতা ভাবে সে নীলরতনে গো।"

আগে বলেছি—রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন-কথা, তাঁদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়েই রচিত এই ঝুমুর গান। কিন্তু মানভূমের ঝুমুরে এ ছাড়াও জনসাধারণের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কথা, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক খবরাখবরও পাবেন। একঘেয়ে কোন জিনিসই মানুষ বরদাস্ত করতে পারে না। তাই দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা গানের মাধ্যমে শিববন্দনা, শিবস্তুতি ও নীলমাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে তাঁরা দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে নিবেদন করছে দেশের সাম্প্রতিক ঘটনা, প্রতিকার চাইছে দেশজোড়া অনাচারের, অবিচারের; পূর্ব্ববঙ্গের নীলের গানের মাধ্যমেও শোনা যায় কি ভাবে বর্ণিত হয়েছে চোরা-কারবারী, মুনাফাশিকারীদের স্বরূপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সারা ভারতই জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে, যুদ্ধের অবশ্য-ম্ভাবী পরিণতি হিসেবে মানভূমের জনসাধারণও কম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। কাজেই যুদ্ধের হিড়িকে যখন নিত্য-প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই অভাব ঘটতে লাগল তখন মান-ভূমের লোককবিও ঝুমুর গানের মাধ্যমে শোনালেন তাঁদের দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী:

"সঘনে ছাড়ে নিঃশ্বাস, ঘটিল কি সর্ব্বনাশ
উপায়হারা হইল মমিন,
কেমনে কাটিবে এবার দিন হে"
(মনে মনে ভাবিছে মমিন)
যদি বলে দিব সুতা, দাম শুনে ধরে মাথা
হিসাব করিলে মূলে হীন হে।
টুপি, লুঙ্গি, জুতা, ছাতা, সে সকল গেল কোথা
সুতায় 'কটায়' বন্ধ করিল সরকার।
ভরন্ত বলে সে 'পাওয়ার' কি থাকে
চিরকাল হে।"
(কটায়=quota)

শুধু কি সরকারী অব্যবস্থা? সুদখোর মহাজনের কৃপায় দেশের চাষীবাসীরও দুর্দ্দশার একশেষ। চালের অভাবে ক্ষুধার তাড়নায় ধানের জন্য মহাজনের বাড়ী ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়ে পড়ে তারা:

"এ বৎসর ভাদ্র আশ্বিনে, ঋণ না দেয় মহাজনে
হেন অকাল না দেখি নয়নে।
জীবন না যায়রে ধরা, টাকায় চাল পাঁচ সেরা
ঘুরে মরি চালের কারণে।
দিনে যদি চাল পায়, উপাস থাকি সন্ধ্যায়
ভখে (ক্ষুধা) নিদ্রা না আসে নয়নে।
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ, টাকায় তিন সের ধান
তনু ক্ষীণ অন্নের বিহনে।
কিন্তু যারা ধনবান, বিষম তাদের সুনাম
দিবসে তারা দেখে নয়নে।
দেড়ি সুদে টাকা দিব, সুদে মূলে ধান লিব
যে দরে বিকাবে অগ্রাহয়ণে।
মহাজনের বাসায়, যদি বা খাতক যায়
বসিতে না বলে কোন জনে।
তথাপি খাতকগণ, হয়ে দুঃখিত মন
বসে থাকে মলিন বদনে।
কি কারণে মোর ঘর, আসিতেছে বার বার
ডাকাতি করিবে লয় মনে।
সারা দিন কেটে যায়, সবে নিরানন্দ কায়
ঘর আসে বেলা অবসানে।"

কোন রকমে কোন দিন একবেলা, কোন দিন প্রায় উপোস দিয়ে অতি কষ্টে যদি-বা হৈমন্তিক ধানের মুখ দেখল কৃষককুল, কিন্তু এদিকে সুরু হ'ল মড়ক। লোকে খাদ্যাভাবে অখাদ্য খেয়ে রোগ ধাবাল। ঘরে ঘরে উঠল কান্নার রোল। তারা আবার গিয়ে হাত পাতল মহাজনদের কাছে। কোন কোন মহাজন, 'আজ না কাল' বলে ঘোরাতে লাগল। কেউ কেউ স্পষ্টকণ্ঠে বলে ছিল, ওসব হবে না বাপু। মানভূমের এই দুর্দ্দশার দিনে লোককবি তাদের দুঃখের কথা শোনাতে লাগলেন দেশবাসীর কাছে:

"রবিশস্য সব হইল, তা'পরে বরষা আসিল হে
ধান্য মরে জলের বিহনে।
একে ঋণ নাহি পায়, লোকে করে হায় হায়
মারামারি হয় জলের কারণে।
দেবতা বৃষ্টি করিল, ধান্য সকল বাঁচিল হে
কিন্তু রোগ লেগে গেল ধানে।

না দেখি কোন উপায়, গাছি পুড়ে নেমে যায়
আনন্দ না আসে আর কার মনে।
কেহ সাগ সিঝা খায়, কেহ কেহ মণ্ড খায় হে
রক্তহীন অন্নের বিহনে।
বন গুড়লী জনারি, মাড়ুয়া গড়া মুগবিরি
সকল ফুরাল উদর পূরণে।
কোন মহাজন কয়, কাল আসিবে এ সময় হে
পরদিন যায় ততক্ষণে।
তথাপি না দেয় ধান, বরং করে অপমান
ধিক্ ধিক্ ধনহীন জনে।
পেট ভরিলে আনন্দ, না ভরিলে নিরানন্দ হে
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবনে।"

অধ্যাত্মবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজ। তাই ভারতীয় নিরক্ষর পল্লীকবির মুখেও অধ্যাত্মবাদের কথা শোনা যায়। ঝুমুর গায়কেরাও তাদের গানের মধ্যে অধ্যাত্মবাদ প্রচার করতে কসুর করেন নি। তাই মানভূমের লোক-কবি অতি সহজেই বলতে সক্ষম হয়েছেন, পৃথিবীতে এসেছ ত দু'দিনের জন্য। একটু বুঝে-সুঝে চলে, নইলে কালের পাকচক্রে নিস্তার পাবে না:

"দহের মাছ না পড় ভাই ডাঙ্গালে
সাঁতার দিছ ভবজলে।
যদি হবে ইচলা পুটি
যেতে হবে গুটি গুটি
ঘুরাই ঘুরাই মারবে ঘূর্ণ-জালে (?)
সাঁতার দিছ ভবজলে।

* * *

যদি হবে রুই কাতলা
ঘুচাও মনের মাতলা
অনন্ত কই রাখ পদতলে
সাঁতার দিছ ভবজলে।"

শুধু কি তাই? জীবন-প্রদীপের তেল আর কতটুকু? এ ত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে। এখনও কি দুনিয়ার যা কিছু দেখবার দেখতে পারলি না:

"চিন্তাপথে আয়ু-তৈল
ঝরি ঝরি শেষ হৈল
দেখবি মন ভবের ঘানি
চক্ষেতে ঢাকনি।"

মালাধর

শ্রীকালিদাস রায়

হতভাগ্য আমি মালাধর
শুনালেন করে গান নারদ গদগদ প্রাণ
মুগ্ধ তায় পার্ব্বতী শঙ্কর।
সে গানের সাথে সাথে নাচিলাম, দুই হাতে
হর্ষ ভরে দিয়া করতালি,
তুষ্ট হয়ে মা ভবানী করুণার ঝাঁপিখানি
দিলেন উজাড় করি ঢালি'।
মুগ্ধ হয়ে দেবগণ রত্ন হার আভরণ
পরাইয়া দিল কুতূহলে।
শঙ্কর খুলিয়া তাঁর আনন্দে হাড়ের হার
পরালেন নিজে মম গলে।
উপেক্ষায় হাসিলাম বামদেব হয়ে বাম
কুপিয়া দিলেন মোরে শাপ,
"পেয়ে মোর দিব্য দান রাখিলি না তার মান
মর্ত্ত্যে গিয়ে কর অনুতাপ।
কণ্ঠ হতে লয়ে ফণী যার শিরে শোভে মণি
জড়ায়ে দিলেন গলদেশে,
কাড়ি' সে হাড়ের হার বলিলেন, "পুরস্কার
এই মণি হলো তোর শেষে।"

জন্মে জন্মে সেই অহি জ্বালাময় বক্ষে বহি
আসি যাই এই ধরাতলে,
জুড়াইতে বিষজ্বালা খুঁজি সে হাড়ের মালা
স্থলে জলে অনিলে অনলে।
খুঁজি তাই জ্ঞানে, বসে ধনে জনে মানে যশে
সব ফাঁকি সবই ভুয়ো ফাকা,
কত না হাড়ের হার পরাইল এ সংসার
সবি মাংস চর্ম্ম দিয়ে ঢাকা।
শ্মশানে মশানে খুঁজি ভাবি সেথা পাব বুঝি
তীর্থ মঠে বৃথা খুঁজিলাম।
না মিলিলে সেই মালা জুড়াবে না অহিজ্বালা
সার্থক হবে না মোর নাম।
জন্ম জন্ম খুঁজি তাই কোথা গেলে মালা পাই
পরমেষ্ঠ পরশপাথর,
বিনা যোগীন্দ্রের হার মুক্তি মোর নেই আর
ফিরিয়া হ'ব না মালাধর।*

* কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ইন্দ্রপুত্র মালাধর শিব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শ্রীমন্ত-রূপে নরজন্ম লাভ করেন। সেই অভিশাপের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

মাদুলী

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

পৃথিবীতে বহু প্রকারের নেশা আছে। সকলেই এক একটি নেশায় মশগুল হইয়া, দিনরাত বিভোর থাকে। কাহারও খেলিবার নেশা, কাহারও বই পড়িবার, কাহারও বা দেশভ্রমণের নেশা। এই দেশ-ভ্রমণের নেশাটি শৈশব হইতেই যতীনকে পাইয়া বসিয়াছিল। ছাত্রজীবনে একবার বাপের বাক্স ভাঙিয়া, টাকা সংগ্রহ করিয়া যতীন দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, সেবার বহু খোঁজাখুঁজি করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনা হয়। কিন্তু দেশভ্রমণের নেশা যতীনকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, তাহাকে আর কেহ ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাহা ছাড়া বাড়ীতে তাহার সে-রকম টানও ছিল না। অতি শৈশবে মা মারা যায়, সেই হইতেই দূরসম্পর্কীয়া এক পিসীর তত্ত্বাবধানেই সে মানুষ হইতেছিল। পিতা কোন সওদাগরী আপিসে কাজ করেন। তিনি নিজের বাত ও আপিস লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। একমাত্র পুত্রের সকল ভার যতীনের পিসীর হাতেই সঁপিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু যতীনের বার বার নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটা, তাঁহাকে বিশেষ রূপে ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু ভাবিয়া কোন কুল-কিনারা না পাইয়া, একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, কি আর, করব। আমার দশটা নয় পাঁচটা নয়—ঐ একমাত্র ছেলে। যা বেগে যাচ্ছে—এ ত যৎসামান্য, ভেবেছিলাম ওকে মানুষ করে, শান্তিতে মরতে পারব। কিন্তু ভগবানের তা ইচ্ছা নয়। যা ওর কপালে আছে—তাই হবে। আমি মিথ্যে ভেবে আর কি করব।—কিন্তু মুখে ঐ কথা বলিলেও, শশধর বাবু দিনরাত ভাবিয়া কাঠ হইয়া গেলেন।

যতীনের চতুর্থ বারের নিরুদ্দেশের পর, দীর্ঘ সময় অতি-বাহিত হইয়া গেল, কিন্তু আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। যতীন দীর্ঘকাল বহুদেশ, বহু শহর গ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে বাংলায় ফিরিয়া আসিল। পিতা যে ইহলোকে নাই, এ সংবাদও সে পাইয়াছিল। তাই কলিকাতায় না গিয়া, যতীন আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। একরূপ বিনা পয়সাতেই সে এযাবৎ দেশভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। কোথাও হাঁটিয়া—কোথাও ট্রেনে, নৌকায় বা কোন গোযানে সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছে। বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক সময় চেকার তাহাকে ধরিয়া বসিল। যতীনকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া একটি নগণ্য ক্ষুদ্র ষ্টেশনে নামাইয়া দিল। কাঁধে একটি মাত্র বোঝা সম্বল করিয়া, যতীন রেলষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া, চারিধারে চোখ বুলাইয়া লইল। ক্ষুদ্র ষ্টেশনে সামান্য, দুই একটি যাত্রী ওঠা-নামা করিল এবং তাহারা নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। ষ্টেশনের পরেই সরু পায়ে-চলা পথ। একটি পথ দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। অন্যটি চলিয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ গ্রামের দিকে। যতীন সেই সরু ধুলাভরা পথ ধরিয়া হাঁটিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—তদুপরি শীতকাল। এমনি ত শীতকালের বেলা দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। পাঁচটা বাজিতেই চারিদিক অন্ধকার হইয়া উঠে। তাহার উপর এই পল্লীগ্রামে, চতুর্দিকে শুধু আগাছা আর বনঝোপ। রাস্তার দুই ধারে ঘন বাঁশবন আর আম কাঁঠালের ও নানাবিধ আগাছার জঙ্গল। বৈকাল হইতে না হইতেই কোথা হইতে ঘন কুয়াশা ও অন্ধকার জড়াজড়ি করিয়া গ্রামের উপর নামিয়া আসে। বাঁশবন, আম-কাঁঠালের জঙ্গল সব অন্ধকার হইয়া যায়। লোকে সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। যতীন তাহার একমাত্র বোঝাটি কাঁধে ঝুলাইয়া, চলিতে চলিতে গ্রামের বাজারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বাজার ক্ষুদ্র—দুই-একখানি মুদীখানার দোকান ও একটি মুড়ি-মুড়কির দোকান টিম টিম করিতেছে। দোকানীরা দোকানে সান্ধ্য-প্রদীপ দেখাইয়া, ঝাঁপ ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। যতীন তাহাদের নিকট কোন আশ্রয়ের সন্ধান করিতে না পারিয়া অদূরবর্তী অশ্বত্থগাছের তলায়, ছোট্ট সতরঞ্চিখানি বিছাইয়া শুইবার উপক্রম করিতেছিল। এই রকম গাছতলায় মাঠে ঘাটে বহুদিন সে একলা রাত্রি কাটাইয়াছে, ইহাতে তাহার ভয় হয় না—বরং বেশ ভালই লাগে। আপন মনে একটা বিড়ি ধরাইয়া, কোন একটা গানের কলি যখন গুন গুন করিয়া গাহিতেছিল তখন হঠাৎ কাহার ডাকে তাকাইয়া দেখিল, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত, হাতের ছড়িগাছটি তুলিয়া ভদ্রলোক ডাকিলেন—কেও—ওখানে—

যতীন বলিল, আজ্ঞে আমি পথিক—

—পথিক? তা বেশ। কিন্তু গাছতলায় কেন?

যতীন হাসিয়া বলিল, আশ্রয় না জুটলেই, গাছতলায় থাকতে হয়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিলেন, কিন্তু এ যে শীতকাল। না—না—তা হয় না। আচ্ছা আপনার নাম কি?

যতীন বলিল—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ভদ্রলোক বলিলেন, ব্রাহ্মণ? বেশ—বেশ। তবে চলে আসুন আমার সঙ্গে। আমার বাড়ীতেই পায়ের ধুলো দিন আপাতত।

যতীন ভদ্রলোকটির পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। ভদ্রলোক পথ চলিতে চলিতে অপরিচিত পথিকের পরিচয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যতীন একে একে নিজের কথা বলিয়া গেল। বলিল, বাড়ীর অবস্থা খারাপ, তাই চাকরির সন্ধানে বাহির

হইয়াছে। যতীন, নিজের বারবার গৃহত্যাগের কারণ কি তাহা বলিল না।

ভদ্রলোক নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমিও মশাই বামুন। আমার নাম নিবারণ চক্রবর্ত্তী। কিন্তু যতীনবাবু, আপনি শহরে চাকরি না খুঁজে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসেছেন চাকরি খুঁজতে।

যতীন হাসিয়া বলিল, এখানে চাকরি খুঁজতে আসি নি। বলতে গেলে, এক রকম অনিচ্ছাতেই এখানে এসেছি। ট্রেনে যাচ্ছিলাম, ইচ্ছা ছিল কোন বড় জংশনে নামব। কিন্তু বরাবর বিনা টিকিটেই যাচ্ছিলাম। কারণ পকেটে পয়সা নেই, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না। টিকিট চেকার এইখানেই নামিয়ে দিল। ভাবলাম এখানকার গাঁগুলো ঘুরে দেখে যাই—তার পর আবার না হয় ট্রেনে চাপব—

নিবারণ বাবু বলিলেন, তবে ত আপনার সারাদিন খাওয়া হয় নি। চলুন হেঁটে চলুন। ঐ সামনেই আমার বাড়ী।—কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের একপ্রান্তে, মস্ত বড় আম কাঁঠাল ও নারিকেল-গাছের বাগানের মধ্যে দ্বিতল বাড়ীতে আসিয়া উভয়ে পৌঁছলেন। বাহিরের ঘরে চৌকির উপর বিছানা পাতা।

নিবারণ বাবু বলিলেন, বসুন যতীন বাবু। আমি এখনি আসছি। তার পর গলা ছাড়িয়া হাঁকিলেন—ওরে ও বসন্ত! কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বসন্ত আসিতেই নিবারণ বাবু বলিলেন, কলকে রেখে, আগে এক বালতি জল আর একটা ঘটি বারান্দায় রাখ। যতীনবাবু, হাত পা ধুয়ে ভাল হয়ে বসুন। আপনি চা খান ত? খান। বেশ—বেশ—ঠিক হয়ে বসুন—আমি এই এলাম বলে।—শীত বেশ জমিয়া পড়িয়াছে। কনকনে শীতে ও ঠাণ্ডায় হাতের ও পায়ের আঙুল বাঁকিয়া যাইতেছে। যতীন ভাবিল, উঃ, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ের এমন শীতের রাতে গাছতলায় থাকিলে আর উঠিতে হইত না। বসন্ত মস্ত বড় কাঁচের গেলাসে, এক গেলাস গরম চা এবং একথালা গুড় মুড়ি লইয়া আসিল।

যতীন বলিল, বাঃ এ যে অনেক।—নিবারণ বাবু চেয়ারে বসিয়া, চায়ের পেয়ালায় বারবার চুমুক দিয়া, গড়গড়ার নলটি ঠোঁটে লাগাইয়া বলিলেন, অনেক আর কি। সারাদিন খান নি—ওটুকু খেয়ে ফেলুন। চা-টা আগে খান—এর পরে আবার চা হবে। চা আমার ভারি প্রিয় বুঝলেন যতীন বাবু। আমি নিজে যেমন খেতে ভালবাসি তেমনি পাঁচ জনকে নিয়ে মজলিস করে চা খেতেও ভারি ভাল লাগে। নিন্ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বেশ জুৎ করে বসুন। গল্প করা যাক্।—নিবারণ বাবু গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

নিবারণ বাবু যে খুব সঙ্গতিসম্পন্ন তাহা বলা যায় না, তবে দরিদ্রও নন। নিজস্ব বাড়ী, কিছু ধানের জমি ও আম কাঁঠালের বাগান আছে। চাষ আবাদ করিয়া—তরিতরকারী ও ফলমূল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া একরূপ সংসার চলিয়া যায়। বহুদিন হইল নিবারণ বাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে—দুটি মেয়ে ও নিজের এক বিধবা দিদি এই লইয়াই সংসার। নিবারণ বাবু কখনও চাকরি করেন নাই। তাঁহার বৈঠকখানার বিস্তৃত ফরাসে, সন্ধ্যাবেলায় দিব্য আড্ডা জমিয়া ওঠে। নিবারণ বাবুর নিজের অনন্ত অবসর এবং পান-তামাক ও চা বিতরণে তিনি মুক্তহস্ত। সমস্ত দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় তিনি চাষ আবাদের কাজ দেখিয়া, গো-সেবা করিয়া কাটান। দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারিয়া দিবানিদ্রার পরিবর্ত্তে বাহিরের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া, বিস্তৃত ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়া মাঝে মাঝে সঙ্গীতালাপ করেন ও বই পড়েন। ভৃত্য বসন্ত তামাক সাজিয়া দেয়, জ্যেষ্ঠা কন্যা রমা চা লইয়া বৈঠকখানায় আসিলে, নিবারণ বাবু হারমোনিয়মটি একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া বলেন—মা, এই দুপুরে যেন চা খেও না। বেশী চা খাওয়া ঠিক নয়। লিভারটা খারাপ করে। রমা হাসিয়া বলে—এই ত ভাত খেলাম, এখন কি চা খাই—না ভাল লাগে। কিন্তু বাবা—তোমার এই দিনে-রাতে প্রায় ত্রিশ কাপ চা খাওয়া হয়। হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া নিবারণ বাবু বলেন, তা যা বলেছিস মা। তবে তোদের কচি দেহে, বার-বার চা খাওয়াটা ভাল নয়।

যতীন নিবারণ বাবুর আশ্রয়েই থাকিয়া গেল। নিবারণ বাবু যতীনকে লইয়া একসঙ্গে খাইতে বসেন। তাঁহার সহিত সর্ব্বক্ষণ আড্ডা দিবার জন্য অন্ততঃ একজন লোক পাইয়াছেন। অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা নিবারণবাবুর সহিত আড্ডা দিবার মত এমন নিষ্কর্ম্মা লোক পাওয়া কঠিন। তাই যতীনকে নিবারণ বাবু ছাড়িতে ইচ্ছুক নন। দুই জনে একসঙ্গেই খাইতে বসেন। নিবারণ বাবু খাইতে খাইতে সারাক্ষণ বক্‌বক্ করিয়া বকিয়া যান। হঠাৎ এক সময় সচকিত হইয়া বলেন—মা রমা যতীন বাবুর পাতে যে কিছুই নেই। রমা আসিয়া, ডাল তরকারী দিয়া যায়। যতীন একবার মাত্র রমার মুখের দিকে চাহিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া খাইয়া যায়। কি জানি কেন রমার সম্মুখে যতীনের মুখে কোন কথা ফোটে না। শুধু নিঃশব্দে হুঁ হাঁ দিয়া যায়। নিবারণ বাবু বলেন, মাছের কালিয়াটা কেমন হয়েছে যতীন বাবু। যতীনের কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে, বোধ করি, ভাল হয় নি—না যতীন বাবু। যতীন হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলে—কেন? বেশ হয়েছে ত। রমা যত্ন করিয়া নানারূপ রাঁধে, খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তরকারী বা মাছ কেমন হইয়াছে। যতীন উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে—বেশ চমৎকার—

যতীন, রমার ছোট বোন বীণাকে পড়ায়। তাহার অঙ্ক কষিয়া দেয়, ট্রান্সলেশন শুদ্ধ করিয়া দেয়। মাঝে মাঝে নানান দেশের, নানা গল্প বলে, কখনও কখনও নিবারণ বাবুর বৃদ্ধা দিদিকে নানা তীর্থের কাহিনী বলে—তীর্থের পথের কষ্টের কথা, পাণ্ডা পুরোহিতদের কথা ও নানা দেবদেবীর কথা বিস্তারিত ভাবে বলিয়া যায়। রমা চুপ করিয়া শোনে, হঠাৎ এক সময় রমার মুখের পানে

চাহিয়া যতীনের সবকিছু যেন ভুল হইয়া যায়। পরক্ষণে লজ্জিত হইয়া, চোখ ফিরাইয়া আবার সেই তীর্থের কথা বলিতে থাকে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া যতীন ভাবে, এত দিনে সে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের সর্ব্ব দুঃখব্যথার যেন শেষ হইয়াছে। রাত্রে স্বপ্ন দেখে, একটি সুকুমার মুখ—স্বপ্নাবিষ্ট সেই সুকুমার মুখটি—যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঃকণায় চর্চ্চিত। আর পদ্মের মত, দুটি ঘনকৃষ্ণ আঁখিতারকায়, তীক্ষ্ণ প্রেমের আলোকচিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম অধরকোণে এক রহস্য-মধুর অদ্ভুত হাসি। সেই হাসির আদি নাই, অন্ত নাই; সে হাসি এক অপরিসীম রহস্যময় ও প্রহেলিকায় পরিপূর্ণ। যতীন এতদিন শুধু পথে পথে ঘুরিয়াছে—তাহাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। শুধুমাত্র পথের নেশাতেই এবং বিদেশের নূতন নূতন দেশ ও মানুষগুলির সহিত পরিচিত হইবার জন্যই বারংবার ঘর ছাড়িয়াছে। ঘরের বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন চারিপাশের নিরেট দেয়ালঘেরা স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে যতীন যেন কেমন হাঁপাইয়া ওঠে। তাই নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য ঘরের মায়া ত্যাগ করিয়া শুধু পথ ও তেপান্তর দেখিবার প্রেরণায় বার বার গৃহ ছাড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, আজ আর তাহার পলাইতে ইচ্ছা করে না। চিরকাল এমনি ভাবে এই গণ্ডীবদ্ধ স্থানের মধ্যেই থাকিতে তাহার মন চায়। গভীর অরণ্য, বিস্তৃত আকাশের নীচে খোলা মাঠ, তেপান্তর, নিত্য নূতন গ্রাম সহর, নানা দেশের বিচিত্র পরিবেশ—আর যেন তত নিবিড়ভাবে তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না—আর যেন তত গভীর কৌতূহল জাগাইতে পারে না।

কিন্তু চিরকাল ত এখানে থাকা চলে না। এমনি ত নিবারণ বাবুর উপর জুলুম করা হইতেছে। যতীন প্রত্যেক দিন ভাবে, আজই চলিয়া যাইবে। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নিবারণ বাবু বলেন, যতীন বাবু কাল কিন্তু ভোরে উঠতে হবে। খবর পাওয়া গেল, চন্দনবিলে এবার নাকি বহু পাখী আসছে। চলুন শিকার করে আসা যাক। পক্ষীশিকারে যতীনের উৎসাহ না থাকিলেও নিবারণ বাবুর সহিত সারাদিন বন্দুক কাঁধে করিয়া বিলের ধারে, বনে জঙ্গলে টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। দুই দিন যাইতে না যাইতেই নিবারণ বাবুর আবার আর একটি ঝোঁক দেখা দেয়। সকাল হইতে, একগোছা ছিপ ও হুইল লইয়া তিনি সেইগুলিতে নূতন সূতা ও বঁড়শি লাগাইতে ব্যস্ত হন। অনবরত চা হইতেছে—বসন্ত তামাক সাজিতেছে, আর নিবারণ বাবুর মুখে মৎস্যশিকারের নানা গল্প জল-স্রোতের মত বাহির হইয়া আসিতেছে। রমা চা করিতেছে—এবং নানা প্রকারের মসলা ভাজিয়া, মাছের চার করিতেছে।

নিবারণ বাবু বলিলেন, যতীন বাবু রায়েদের পুকুরে আজ বসছি। মাছধরা জানেন ত—

রমা হাসিয়া বলিল, না জানলেও শিখতে কতক্ষণ বাবা। সে-দিন যতীন বাবু বন্দুক কাঁধে করে কাঁধ ব্যথা করে ফেলেছেন, পায়ে কাঁটা ফুটেছে। আজ মাছ ধরতে গিয়ে, সুতোয় ঘষায় হাত কাট-বেন, কিংবা হাতে বঁড়শি ফুটিয়ে ফেলবেন। এতেই ত ও সব বিদ্যে আয়ত্ত হয়ে যায়—

নিবারণ বাবু হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে। এমনি করেই এ সব জিনিষ শিখতে হয়। জানেন যতীন বাবু, আমার রমা মা খুব ভাল মাছ ধরতে পারে।

যতীন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বলেন কি?

যতীনের মুখচোখের চেহারা দেখিয়া রমা হাসিয়া ফেলিল।

কোন কোনদিন, জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া, নিবারণ বাবু এস্রাজ-খানি টানিয়া লইয়া বাজাইতে থাকেন। যতীন পাশে বসিয়া তন্ময় চিত্তে বাজনা শুনিতে থাকে। হঠাৎ এক সময় বাজনা বন্ধ করিয়া নিবারণ বাবু হাঁকেন—মা রমা। রমা আসিলেই নিবারণ বাবু বলেন, অনেক দিন তোর গান শুনিনি মা। নে হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে বস। রমা সামান্য ইতস্ততঃ করিতে থাকে। নিবারণ বাবু বলিলেন, লজ্জা কি মা—যতীন বাবুর সামনে আবার লজ্জা কি? রমা হারমোনিয়মে সুর দিয়া, এক সময় গান সুরু করে। সুন্দর কণ্ঠের সুমধুর সুরে যেন চতুর্দ্দিকে একটা মায়ালোক গড়িয়া উঠে। সেই মধুর সুর, গানের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ঝঙ্কার যেন যতীনের বুকে অনুরণিত হয়। গান থামিলে, যতীন উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে—চমৎকার, সুন্দর।

সেদিন রাত্রে যতীন আর ঘুমাইতে পারিল না। নিদ্রাহীন চক্ষে জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলায় শোনা রমার কণ্ঠের গান এখনও যেন তাহার কানে ধ্বনিত হইতেছে। বাহিরের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকের মাঝে পৃথিবী নিস্তব্ধ, ধ্যানমগ্ন। মাঝে মাঝে ঘনপল্লবিত বৃক্ষশ্রেণীর শাখাগুলি মৃদুমন্দ বাতাসে দুলিতেছে। নিকটে বেড়ার ধারে ধারে হেনাফুলের গাছগুলিতে ফুল ফুটিয়াছে। অদূরবর্ত্তী বকুলগাছের চ্যুত বকুলফুলের নিবিড় সৌরভ এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নালোকিত মনোরম রাত্রিকে আরও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আর এই সকলের মাঝে এক-খানি মুখের আশ্চর্য্য অপরূপ লাবণ্য এবং একখানি কণ্ঠের অমৃতময় মধুর সঙ্গীত-গুঞ্জন, যতীনের সমস্ত দেহমনকে আবিষ্ট করিয়া তুলিয়া এক অদ্ভুত আনন্দ ও সুখমিশ্রিত বেদনায় যেন বিদীর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া একটি নামের দুটি অক্ষর যেন বার বার জ্যোতির্ম্ময় রূপে দেখা দিতে লাগিল। জ্যোৎস্নার মায়া-মন্ত্রে আকাশ ও আকাশের সীমান্ত—এই পথ ঘাট—গাছপালা—পৃথিবী সব যেন একাকার হইয়া গেল। আর যেন স্বর্গ-মর্ত্ত্যের কোন ব্যবধান নাই—কোন সীমারেখা নাই। কালের সকল বাধা-বাহিকতা ছিঁড়িয়া, অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তকে লুপ্ত ও নিঃশেষ করিয়া দিয়া আকাশ এবং এই মাটির পৃথিবী একাকার হইয়া গিয়াছে। যতীন তাহার উদ্বেলিত বক্ষ দুই বাহু দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া কান্নাভরা স্বরে আকুল কণ্ঠে বলিল, রমা—রমা—

সেদিন সকালবেলাতেই নিরাবণ বাবু তাড়া দিলেন। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন, যতীন বাবু চা খেয়ে স্নান করে ফেলুন। আজ বেলা অন্ততঃ বারটা পর্যন্ত শুধু চা খেয়েই থাকতে হবে। রমা মায়ের আজ পূজো আছে। কাল থেকে রমা মা উপোস করেছে। কালীমন্দিরে পূজোর পর তবে জলগ্রহণ করবে। আমাদেরও তাই, এই চা খেয়েই থাকতে হবে। স্নান চান সেরে আসুন, কালীমন্দিরে সবাইকেই যেতে হবে। ইনি ভারি জাগ্রত ঠাকুর। কত লোকের যে কত কঠিন কঠিন অসুখ সেরে গেল—এ ত চাক্ষুষ দেখা। কোন ওষুধ না, কিছুই না, শুধু মায়ের নাম করে মাসে মাসে সোমবার করতে হয়। এতেই কঠিন রোগ ভাল হয়ে যায়। আপনি ত পূজো দেখেন নি। চলুন আজ দেখবেন কত দূর-দেশ থেকে যে কত রোগী আসে—কত জন মানসিক করছে—কত জন মায়ের স্থানে ধরনা দিচ্ছে। এই বলিয়া নিবারণ বাবু মায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

পূজার দুই দিন পর যতীন বলিল, মুখুয্যে মশাই, এখানে অনেক দিন ত রইলাম। কাল একবার কলকাতা ঘুরে আসি। দেখে আসি বাড়ীর অবস্থাটা—

নিবারণ বাবু বলিলেন, কাল যাবেন। বেশ তবে আটকাব না। একেবারে বাড়ীর ছেলের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। এই কটা দিন ভারি আনন্দেই কাটল যতীন বাবু। তবে আসবেন আবার—যেন ভুলে যাবেন না। এ বাড়ীতে আসতে কিছুমাত্র লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করবেন না—

পরের দিন যাত্রার সময় হইয়া গিয়াছে। যতীন নিবারণ বাবুকে প্রণাম করিতেই, নিবারণ বাবু ধরা গলায় বলিলেন, যতীন বাবু আপনাকে আটকাতে চাই নে। মনে করে পৌঁছেই পত্র দেবেন। আর সময় করে শীগগির আসবেন।

বীণা বলিল, দাদা আবার কিন্তু আসা চাই। রমা নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যতীন রমার দিকে চাহিয়া বলিল, তবে আসি—

রমা বলিল, বাবা, যতীন বাবুর জন্য সেইটে—

নিবারণ বাবু বলিলেন, ও হোঃ তাই ত। মাদুলীর কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। দাঁড়ান যতীন বাবু, মায়ের নির্মাল্য দেওয়া মাদুলিটা ধারণ করে যান। এ গ্রামে এসে মায়ের মাদুলি সবাই ধারণ করে। হাতে বেঁধে দাও মা। ডান হাতে মাদুলিটা পরাইয়া দিয়া রমা হেঁট হইয়া যতীনকে প্রণাম করিতেই, যতীন কম্পিত কণ্ঠে মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিল, কল্যাণ হোক? রমা মুখ তুলিতেই যতীন দেখিল সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখে রহস্যময় হাসির আভাস। যতীন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

প্রায় দুই মাস পর হঠাৎ যতীন এই পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাস্তা হইতে সেই অতিপরিচিত বাড়ীখানি দেখিয়া তাহার সমস্ত অন্তর আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

নিবারণ বাবু বাহিরের ঘরে ছিলেন, যতীনকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, আরে একি যতীন বাবু যে—আসুন—আসুন। হাসিমুখে নিবারণ বাবুকে প্রণাম করিয়া যতীন বলিল, কেমন আছেন?

—আমি ভালই আছি। আপনার শরীর কেমন? তার পর হাঁক দিলেন, ওরে ও বসন্ত—ওরে আমাদের যতীন বাবু এসেছেন, যা—শীগগির চা করে নিয়ে আয়। যতীন বাবু আমার কিন্তু একটা মস্ত অপরাধ হয়ে গিয়েছে। আপনার পত্রখানা যে কোথায় হারিয়ে ফেললাম আর তা খুঁজে পেলাম না। তাই উত্তর দিতে পারি নি। যতীন একটু সলজ্জ ভাবে বলিল, বীণা, রমা ভাল আছে—

—হাঁ ভালই আছে। তবে ওরা এখানে কেউ নেই। বীণা তার মামার বাড়ী আর রমা শ্বশুরবাড়ী।

যতীন একরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াই বলিয়া উঠিল—রমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে? কবে—

নিবারণ বাবু বলিলেন, তাই ত বলছি যতীন বাবু, আমার ভারি অপরাধ হয়ে গেছে। রমারা মামার বাড়ী গিয়েছিল। ওর মামারাই বিয়ের সব ঠিকঠাক করে আমায় পত্র দেয়। তাড়াতাড়িতে বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র খুব ভালই—লক্ষ্ণৌতে থাকেন। সেখানকার কলেজে প্রোফেসারী করেন—

—ওঃ। যতীনের মুখ মলিন হইয়া গেল। যন্ত্রচালিতের মত চা খাইয়া বলিল, ডাউন ট্রেনটা কটায়?

—কেন? ওটার ত আর দেরি নেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবে—

যতীন বলিল, তবে উঠি। আমাকে এই ট্রেনে যেতে হবে।

নিবারণ বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তা কি হয়? না—না—সে কি!

যতীন বাধা দিয়া বলিল, না নিবারণ বাবু আমায় যেতেই হবে। মানে, আমি একটা কোম্পানীর কাজ নিয়েছি কিনা। এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম—তাই ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। আমি আবার আসব।

যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল। নিবারণ বাবু বার বার অনুরোধ করিলেন, অবশেষে বলিলেন, যখন কিছুতেই থাকতে পারবেন না, তখন আর বলি কি—রমা মা'রা শীগগির আসবে, এসে মাসখানেক থাকবে। দিন কুড়ি পর অবিশ্যি আসবেন যতীন বাবু। ওরা সত্যি খুব খুশী হবে।—যতীন নিবারণবাবুকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিল। ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে তাকাইয়া, যতীনের মনে হইল, এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তাহার আর কেহ নাই। তাহাকে স্নেহ করিবার, ভালবাসিবার কেহ নাই—সে একা, নিতান্ত একা ও নিঃসঙ্গ। রমার মুখখানি মনে পড়িল—মনে পড়িল, সেই বিদায়ের দিনের কথা—সেই রহস্যময় হাসির আভাস। সে স্মৃতি মনের অবচেতনলোকে সুপ্ত ছিল, নিমেষমধ্যে তাহা যেন জীবন্ত হইয়া দেখা দিল। এই বাড়ী, এই ঘর, এই আম-কাঁঠাল ও নারিকেল-কুঞ্জ—সবার উপর এই গৃহের একখানি রহস্যময় সুকুমার মুখ তাহাকে

ভুলিবার আকর্ষণে সারাক্ষণ যেন টানিত, কিন্তু আজ এইমাত্র যেন সব শেষ হইয়া গেল। কি জানি তাহার ছিল—সব যেন চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন, বিলুপ্ত হইয়া গেল। গ্রামপথ দিয়া টলিতে টলিতে সে চলিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় ডান হাত হইতে রমার দেওয়া সেই কালীঠাকুরের নির্ম্মাল্য দেওয়া মাদুলিটি খুলিয়া পথিপার্শ্বস্থ ঘন জঙ্গলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কান্নাভরা কণ্ঠে যতীন বলিল, কি হবে আমার ভালতে, কি হবে আমার মঙ্গলে। না—কিছু না—কিছু না—

প্রিয়াকে

শ্রীউমাপদ নাথ

গোধূলির মতো আবছা তুমিও তুমি স্বাতন্ত্র্যে লীন।
পদ্মার ঘোলা গভীর জলের ঘূর্ণির নাভি তুমি।
রূপটুকু দেখি, বুঝি না কো কিছু : তুমি যে অবধিহীন।
তুমি অকাট্য অদৃষ্ট-জাল তোমার ইশারা পেলে একবার
ভাতের ভিখারী হয় যে প্রেম-কাঙাল।

তোমার চোখের নীল-নদী থামে কাইরোর তীরে তীরে,
তোমার বেণীর যমুনা তাজের নীচে।
তুমি কৈলাসে শিবের অঙ্কে—জলজমা বরফের
স্ফটী কঞ্চুকি ; জরা ও বর্ষ-জয়ী
চির যৌবনবতী।

তুমি ইরাণের খর্জ্জুরী মাঠে মাঠে
চাঁদ নিয়ে খেলা করেছ যে কত রাতে ;
রাজপুত্রের সাথে
গিয়াছ অচেনা দেশে
বাদশা বাপের চোখে ধুলো দিয়ে মঞ্জিল-পলাতকা।

তোমার মায়ার বীজ দিয়ে রচা আমার জপের মালা।
তোমার স্নিগ্ধ অন্ধকারের ঢেউ এসে লাগে বুকে :
শুধু ইলোরার অমলিন শিলা-ছবি
নও, ওই তনু বাহুর রেখায় গাঁথা
সোনালি জলের একমুঠো তাজা হীরে।

চুম্বন শুধু স্বাদহীন নয়, নিতান্ত পাগলামি :
কোনো সংবাদই বহে না দেহের ছোঁয়া।
তথাপি তোমারে কত টানি আরও কাছে :
ভালবাসি বলে মিথ্যার জালে
বেঁধে নিতে চাই স্ফটিক-জলের বারি।

শিহরণ শুধু নয় কো বিষাদ, যৌন ক্ষুধার জ্বালা।
এক জিজ্ঞাসা শত প্রশ্নের মতো।
তোমার কেশের দারলোকে মায়ামৃগ
চির অধরাই। হায় রে রাজার ছেলে,
ছেলেমানুষিই তবু মানুষের পেশা।

ভুলে যায়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভুলে যায় লতা তার
ঝরে পড়া ফুলটি,
উর্ম্মিরে রাখে মনে
কভু নদীকূল কি!
যায় ভুলে—ভুলে যায়—
ত্রিলোক ভুলে যায়,—
মৃতেরে রাখে কি মনে
শ্মশানের চুল্লী!

কত পাখী ডাকাডাকি
করে কতদিন যে—
তরুটির শাখে তার
থাকে কোনো চিন্ রে?
তুলি' কলগুঞ্জন,
করি' মধুভুঞ্জন—
তারপর মধুকর—
বিস্মৃতিলীন হে!
হারানো তারার কথা
নাহি লিখা গগনে,
রাখে মনে উপবন
দক্ষিণ পবনে?
ভুলে যায়—যায় ভুলে,
ছুটে যায় পাখা তুলে,
'ধরি' 'ধরি' করি' সবে
তবু ডাকে সঘনে!
চলে যায়—ভুলে যায়,—
কেবা ফিরে চায় রে,
ভুবন ভরিয়া বাজে
হায় হায় হায় রে!
কত যে পায়ের দাগ,—
মমতার রঙ ফাগ
জীবন-পথের 'পর চির শোভা পায় রে!



অজানা সৈনিক

[ফিন্‌ল্যাণ্ডের সংগ্রাম (১৯৪১-৪৪) সম্পর্কিত চলচ্চিত্র]

টেম্পারের বয়নশিল্প বিভাগের কর্ম্মী ভাইনো লিনা'র সর্ব্বাধিক বিক্রীত (১৭৫,০০০) উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ইহা ফিন্‌ল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্ম্মানীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল পুস্তকখানি অবশ্য কেবলমাত্র সুইডিস ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং সুইডেনেও ইহা সর্ব্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থের পর্য্যায়ে পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।



চলচ্চিত্রে সৈনিকের ভূমিকায় জনৈক অভিনেতা

১৯৪১ হইতে ১৯৪৪ পর্য্যন্ত ফিনল্যাণ্ডে যে সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল তাহারই সত্য এবং অতিরঞ্জন ও বাহুল্যবর্জ্জিত চিত্র—"অজানা সৈনিক।" যুদ্ধের সময় যে সকল "রীল" তোলা হইয়াছিল তাহাই হইতেছে এই ফিল্মের প্রামাণ্য পটভূমিকা। রক্ষীবাহিনী কর্তৃক এই সকল রীল ফিনিশ ফিল্ম কোম্পানীর হস্তে প্রদত্ত হয়।

এই ফিল্মের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার অনেকগুলি সংগ্রাম-দৃশ্যে সেই সকল সুপরিচিত ফিনিশ অভিনেতা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভূমিকাগুলি যেন একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রহরায় নিযুক্ত থাকাকালে নিহত সৈনিকের মৃতদেহ স্থানান্তরিতকরণ, বিমান আক্রমণের দরুন সার্জেণ্ট হিয়েতানেনের আকস্মিক মৃত্যু, নির্জ্জন নদীতীরে আহত সৈনিককে আনয়ন ইত্যাদি দৃশ্য দর্শকের মনের উপর অনপনেয় ছাপ রাখিয়া যায়—যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বীভৎসতা তাহাকে আভিভূত করিয়া ফেলে।*

---

* "Finlandia Pictorial" অবলম্বনে



বনের ভিতরে সৈনিকদের একটি শিবির



নিহত সৈনিকের মৃতদেহ স্থানান্তরিতকরণ



বিমান আক্রমণে নিহত সার্জ্জেন্ট হিয়েত্তানেন



নদীতীরে আহত সৈনিকের পার্শ্বে একটি যোদ্ধা



সৈনিকসহ প্রহরারত সৈন্যাধ্যক্ষ একটি যোদ্ধা (বাঁদিকে)

কোরিয়ার মহিলা-ঔপন্যাসিক কিম মার্ল-বঙ

কোরিয়ার সর্ব্বপ্রধান মহিলা-ঔপন্যাসিক কিম মার্ল-বঙ সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনান্তে এই মন্তব্য করিয়াছেন—"যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত ধনী এবং কোরিয়া নিরতিশয় দরিদ্র।"



মিসেস কিম ইংরেজী অল্পস্বল্প জানেন বটে, কিন্তু তিনি ঐ ভাষায় স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলিতে পারেন না। তাই ভ্রমণকালে দোভাষীর কাজ করিবার জন্য ওয়াশিংটন হইতে উন সাং চই নামক জনৈক কোরীয় ছাত্রকে তাঁহার সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল। ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্কে কিছুদিন এবং বোষ্টনে একদিন অবস্থান করিবার পর তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজপথগুলিতে মোটরকারের ভিড় অত্যধিক এবং বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি দ্বারা লোকের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের পক্ষে নিভৃত চিন্তার প্রয়োজন আছে—আমেরিকানরা এ বিষয়ে আরও একটু অবহিত হইলে এবং বৈচিত্র্যের সন্ধানে এরূপভাবে নিরন্তর ছুটাছুটি না করিলে তাহাতে তাহাদের কল্যাণই হইত।

যাই হউক, যুদ্ধের দুর্ব্বহ বোঝাগুলি লাঘব করিবার জন্য যে কোরিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তাহার অবস্থার সঙ্গে আমেরিকার বিস্ময়কর বৈষম্য সত্ত্বেও কিন্তু এদেশে তিনি যাহা দেখিতেছেন তাহার প্রতি তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীমতী কিম—যাঁহাকে কখন কখনও কোরিয়ার পার্ল বাক বলিয়া উল্লেখ করা হয়—একবার জনৈক বিশিষ্ট আমেরিকান ঔপন্যাসিকের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। উক্ত মার্কিন ঔপন্যাসিকই তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য নিউ ইয়র্কে গিয়াছিলেন। শ্রীমতী কিমের দুখানি অতিসাম্প্রতিক উপন্যাস হইতেছে— "Song to the Waves" (তরঙ্গগীতি) এবং "Home of the Stars" (নক্ষত্রনিকেতন)। প্রথমোক্তখানি হাওয়াই দ্বীপে বসতিস্থাপনকারী এক বিরাট কোরীয় জনসমষ্টির রোমান্টিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া রচিত। প্রথমে, একদল কোরীয় পুরুষ দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল হাওয়াই দ্বীপে, তার পর স্বদেশের নির্ব্বাচিতা কনেদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল তাহাদের আহ্বান। কনেরা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল উক্ত দ্বীপে। হাওয়াই দ্বীপে বসতিস্থাপনকারী এই সকল ভাবী বরের কাছে কনেরা আগেই নিজ নিজ আলোকচিত্র পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং এই আলোকচিত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল কোরিয়ায় অবস্থানকালেই। এই সকল মেয়ে পরিচিত ছিল চিত্রকন্যা (Picture Brides) রূপে এবং সুদূরের রোমান্স কোরিয়ার মানুষের কল্পনাকে নাড়া দিয়াছিল।

শ্রীমতী কিমের অতিআধুনিকতম গ্রন্থ "হোম অব দি ষ্টার্স"-এর বিষয়বস্তু হইতেছে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই বইয়ের মধ্যে একটি রোমান্টিক ধারা অনুস্যূত রহিয়াছে এবং যুদ্ধের অনেকগুলি সত্য ঘটনা ইহার অন্তর্ভুক্ত—অবশ্য কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্র-সৃষ্টি দ্বারা যুদ্ধ-কাহিনীকে পল্লবিত করা হইয়াছে। 'ফ্রি এশিয়া ফাউণ্ডেশন' কর্তৃক এই উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ এবং পরে হলিউডে ইহার চলচ্চিত্র-রূপায়ণের বিষয়টি এখন বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

আমেরিকায় ভ্রমণকালে শ্রীমতী কিম পরিতেন কোরীয় নারীদের বিশিষ্ট পরিচ্ছদ—খাটো জ্যাকেট ব্লাউজ এবং লম্বা স্কার্ট। সকল সময়ই তাঁহার হাতে থাকিত একটি পাখা। আয়েসী প্রাচ্য কায়দায় এই পাখা চালাইয়া তিনি বোষ্টনের গ্রীষ্মকালীন তাপ নিবারণ করিতেন। তিনি যখন কথা বলিতেন তখন তাঁহার চোখে মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানি পরিলক্ষিত হইত।

তাঁহার নিজের বিবাহ-সম্বন্ধ যে কোরীয় প্রথা অনুসারে স্থির হয়

নাই সেকথা তিনি বুঝাইয়া বলিলেন। ইহার হেতু হয় ত এই যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী। ভাবী স্বামী চুন সাঙ বামের সঙ্গে কুমারী কিমের প্রথম দেখা হয় পুসানে—প্রথম সাক্ষাতের পরেই ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয় এবং পরিবারের লোকেদের সমর্থনক্রমে ইঁহারা দু'জনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কোরীয় নারীদের মধ্যে বিবাহের পরও স্বকীয় নাম এবং পিতৃকুলের পদবী বজায় রাখিবার প্রথা আছে—ইহাতে বুঝা যায় যে, বিবাহিতা নারী তাঁহার স্বামীর কুল হইতে ভিন্ন বংশের। কোরীয় মেয়েদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে কয়জনের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ হইয়াছে, মিসেস কিম তাঁহাদের অন্যতমা। জাপানের কিয়োতোয় সহশিক্ষামূলক বিদ্যায়তন দোশিশা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জাপানকর্তৃক কোরিয়া অধিকৃত হইল ঠিক সেই সময়ে যখন তাঁহার মাতৃভূমি প্রেরণালাভের নিমিত্ত পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া নিজের শিক্ষাপদ্ধতির সংগঠন এবং সাধারণভাবে শিক্ষার সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করিয়াছিল। একথা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন যে, তাঁহার দেশের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত চরম অপরাধসমূহের অন্যতম হইতেছে—তৎকালে সেই অগ্রগতির প্রতিরোধমূলক আচরণ। সেই প্রতিকূল অবস্থায় ধনী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী পরিবারের লোকেরা হয় ত শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, কিন্তু সাধারণ পরিবারগুলির পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠিত না।

শ্রীমতী কিমের স্বামী পরলোকগমন করেন কোরীয় যুদ্ধের সূচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে। তাঁহাদের ছয়টি সন্তান, তন্মধ্যে এক জন নিহত হয় কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়া।

শ্রীমতী কিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র চুন চায়ে কুম নিউ ইয়র্ক সিটিতে 'বিবলিক্যাল সেমিনারি'তে অধ্যয়ন করিতেছেন। মিসেস কিমের এক কন্যার বিবাহ হইয়াছে নিউইয়র্কের হাসপাতালের সার্জ্জন, ডাঃ ম্যাথু কিমের সঙ্গে। তাঁহার অপর তিনটি সন্তান আছে কোরিয়াতে—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে কলেজে এবং একটি মেয়ে হাই স্কুলে পড়িতেছে। যে মেয়েটি কলেজে পড়ে সে বিবাহিতা।

শ্রীমতী কিম বলেন যে, আসলে কিন্তু তিনি তাঁহার মেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন নাই, তবে এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল যে, তাহাদের স্বামী-নির্ব্বাচনে পরোক্ষে তাঁহার হাত ছিল অনেকখানি। কয়েকটি ছেলে রোজই তাঁহাদের বাড়ীতে আসিত তাঁহার বই পড়িবার এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য। মুখে তাঁহারা এ কথাই বলিত বটে, কিন্তু মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না শ্রীমতী কিমের নিকট তাহাদের অন্তরের গোপন অভিলাষ অনুদঘাটিত রহিল না। একথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন যে, তাহাদের আসল অনুরাগ তাঁর মনোহারিণী কন্যাদের প্রতি—বই সে ত আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র।

কাজেই জননীর সতর্ক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা এই সকল তরুণকে পর্যবেক্ষণ করিয়া, নিজ নিজ মনোনীত স্বামীর প্রতি প্রত্যেক কন্যার যাহাতে অনুরাগ উদ্দীপ্ত হয় সেজন্য তাহাদিগকে তিনি উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইহা পরিণামে সুফলপ্রদ হইল। শ্রীমতী কিমের দুটি জামাতাই চমৎকার। মিসেস কিম বলেন, মেয়েরা ভুল করে নাই। তিনি নিজে নাকি কন্যাদের জন্য ইহাদের চেয়ে ভাল বর নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন না।

কথাপ্রসঙ্গে মিসেস কিম ইহাও বলিলেন যে, আমেরিকান আদর্শের মাপকাঠিতে কোরীয় মেয়েদের মর্য্যাদা সমুদয় প্রাচ্যদেশীয় নারীদের মর্য্যাদার ন্যায় খাটো বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে, কিন্তু একথাও তিনি উল্লেখ করিলেন যে, জাপানী অধিকারের সময়ে ইহা অধিকতর নিম্নগামী হইয়াছিল। যাহা হউক, যুদ্ধের পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববশতঃ এই বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং বহু নারীর মধ্যে নেত্রী হওয়ার উপযুক্ত গুণাবলী পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহাদের এই প্রগতিতে পুরুষ-সমাজ কতকটা ঈর্ষ্যাবোধ করিতে পারে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে তাঁহারা ইহা প্রকাশ করে না।

শ্রীমতী কিম বলেন, তাঁহার যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণের* মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে—সামান্যতম সূচনা হইতে প্রবল প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া কেমন করিয়া এই দেশ উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ করা। তাঁহার স্বদেশ কোরিয়াও আজ অনুরূপ ভাবে উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে।

তিনি বাফেলো, নায়াগ্রা প্রপাত, শিকাগো, আইওবা সিটি, সানফ্রানসিস্কো এবং লস এঞ্জেলস-এ যাইবার আশা পোষণ করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, পশ্চিমে যাইতে তাঁর একটু ভয় ভয় করে। কেননা রেড ইণ্ডিয়ান এবং গো-পালকদের জীবনযাত্রার দৃশ্য সম্বলিত যে সকল আমেরিকান চলচ্চিত্র তিনি দেখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের উক্ত অঞ্চলের সকল অংশই ঐ শ্রেণীর লোকের দ্বারা অধ্যুষিত। যাহা হউক, শ্রীমতী কিম সাহস সঞ্চয় করিয়াছেন এবং ঐ বুনো ("untamed") অঞ্চলে সকল রকম এডভেঞ্চারের সম্মুখীন হইতেই তিনি প্রস্তুত আছেন।*

ন, ভ.

---

* "Korean Survey" পত্রিকায় প্রকাশিত Jessie Ash Arndt এর প্রবন্ধ অবলম্বনে

দর্শন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

আমার প্রতি মেয়েটির বিচিত্র মনোভাব অনেকের কাছেই অদ্ভুত বলে মনে হ'ত, কিন্তু আমি নিজে তাতে কোনদিন বিস্মিত হই নি। বিনা কারণে আমার মুখের উপর সশব্দে নিজেদের জানালাটা বন্ধ করে দিলেও নয়, পাশ দিয়ে যাবার সময় অকারণে একটা বিষম ভ্রূকুটি হেনে গেলেও নয়। তার কাণ্ড দেখে মনে মনে শুধু হেসেছি, হয়ত বিরক্ত হয়েছি কদাচিৎ, কিন্তু বিস্মিত হই নি কখনও অথবা ভাবি নি সে রহস্যময়ী।

নিজেকে আমি দার্শনিক বলে প্রচার করি না, কিন্তু আমার জীবন-দর্শন ভিন্ন রকমের, আমার জীবনে বিস্ময় কম। শুধু সে কেন, কোন মেয়েকেই রহস্যময়ী মনে করার কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। আমি সেই চীনা চাষীর দর্শনে বিশ্বাস করি যে, জীবনে সেই প্রথম বার উড্ডীয়মান বিমান দেখে একটুও বিস্মিত হ'ল না কেন এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিল, উড়ার কল আকাশে উড়েছে এতে আশ্চর্য্যের কি আছে! যদি একটা সেলাইয়ের কলকে আকাশে উড়তে দেখতাম তবেই আশ্চর্য্য হতাম।

স্ত্রী-চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য পুরুষের চোখে নারী রহস্যময়ী হয়ে দেখা দেয়? আমি অনেক ভেবে দেখেছি সেটা আসলে তাদের চঞ্চলমতিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। এটা পুরুষ এবং নারী উভয়ের চরিত্রেই বিদ্যমান, তবে নারীচরিত্রে এর পরিমাণ পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। পুরুষ সেটা বুঝেও বুঝতে চায় না। কিন্তু সে বুঝুক আর নাই বুঝুক নারী নারীই থাকে আর বার বার বাস্তবের আঘাতে পুরুষ বিস্মিত হয়, ব্যথিত হয়, তারপর অভিমান করে বলে স্ত্রী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, দেবাঃ অপি ন জানন্তি। সুখের বিষয়, এ রকম ভুল আমি করি নি কখনও। রূপের অভাব থাকলেও বান্ধবীদের ঘনিষ্ঠতার অভাব আমি অনুভব করি নি কোন দিন, ছাত্র হিসেবে একটু কৃতিত্ব অর্জ্জন করার জন্য এ সৌভাগ্যটা আমার অক্ষুণ্ণ আছে বরাবরই। কিন্তু এ আশা আমি কোন দিনই করি নি যে, আমার বান্ধবীরা একমাত্র আমার ধ্যানেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। তাই কলেজের প্রথম জীবনে সিপ্রাকুমারী, পরবর্ত্তীকালে মন্দাকিনী এবং সর্ব্বশেষে শকুন্তলা যখন আমার জীবনে অন্তরঙ্গতমা হয়ে দেখা দিয়েছিল তখনও আমি আবিষ্কারের আনন্দে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ি নি, অথবা আবার যখন তারা ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়েছিল তখনও ক্ষুব্ধ হই নি। সবকিছুই আমি শান্তভাবে গ্রহণ করেছি, ভেবেছি এই ত স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার আসল কাহিনীতে ফিরে আসি। আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকত মেয়েটি, আমি তাকে দেখে আসছিলাম ছেলেবেলা থেকে। অতি শৈশবেই বাপ মা হারিয়ে নিঃসন্তানা মাসীর কাছে মানুষ, মাসী আর মেসোর প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে মেয়েটি অতিরিক্ত রকমের আদুরে আর ছেলেবেলা থেকেই নিজের রূপ সম্বন্ধে অতিসচেতন। আমার ছোট ছোট ভাইবোনেদের সঙ্গে খেলা করার জন্য প্রায়ই সে আমাদের বাড়ীতে আসত আর আমি তার সঙ্গে বড় একটা কথা না বললেও তার আত্মসচেতন ভাব দেখে মনে মনে মজা অনুভব করতাম। কৌতুক বোধ করতাম আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেও—আমার প্রতি তার বিরাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত তার প্রতিটি ব্যবহারে। আমার মত নিরীহ প্রাণীর প্রতি তার এই বিরাগের কারণটা ছেলেবেলায় ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও পরে বুঝতে কষ্ট হয় নি—তার বন্ধুর বাড়ীর সকলেই তাকে আদর করবে, তার রূপের প্রশংসা করবে অথচ একজন তার দিকে ফিরেও তাকাবে না এ ছিল তার পক্ষে চরম অপমান।

শিশুকাল থেকে সঞ্চিত থেকে হতে তার এই বিরূপতা অবশেষে পরিণত হয়েছিল আমার সম্বন্ধে চরম অসহিষ্ণুতায়। হয়ত আপন মনেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ সে এমন ভাবে ঠাস করে নিজের জানালাটা বন্ধ করে দিত যাতে আশেপাশের সকলের চকিত দৃষ্টি এসে পড়ত সেই দিকে। হয়ত কলেজ থেকে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরছি, রাস্তায় দেখা হওয়ামাত্র সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে চলে যেত পাশ দিয়ে। এ ছাড়া ছিল আমার সম্বন্ধে তার অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্য—ভাল ছাত্র বলে আমার নাকি ভয়ঙ্কর গর্ব—আমি নিজেকে একটা প্রকাণ্ড পণ্ডিত মনে করলেও লোকে যে আমাকে দেখে হাসে এটুকু বোঝার মত সামান্য বুদ্ধিও আমার নেই, আমি নাকি বোকার মত রাস্তা দিয়ে হাঁটি, ট্রাউজার পরলে আমাকে ঠিক ক্লাউনের মত দেখায়, নিজেকে ভাল ছেলে বলে প্রচার করার জন্যই আমি ময়লা জামা-কাপড় পরে চলাফেরা করি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বোনেরা হাসতে হাসতে তাদের বান্ধবীর মন্তব্য আমায় শুনাত আর এই রকম একটি দুর্লভ মনোবিকারের কেস পর্য্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে আমিও উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম। ইচ্ছে করলেই আমি তার ক্রোধ শান্ত করতে পারতাম অতি অনায়াসে, কিন্তু তার বদলে কৌতুক দেখার জন্য এমন ভাব দেখাতাম যেন আমি তাকে একেবারেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। বলা বাহুল্য, এর ফলে বোনেদের কাছ থেকে যা রিপোর্ট পেতাম তা আমার প্রাণখোলা হাসির খোরাক যোগাত।

কিন্তু একদিন চিন্তিত হতে হ'ল। বোনেদের কাছ থেকে নয়, পাড়াসুদ্ধ সমস্ত লোক আমার গতিবিধির উপর সতর্ক নজর

রাখতে আরম্ভ করার পর এক বন্ধুর মুখে শুনতে পেলাম কথাটা। আমার প্রসঙ্গ উঠলেই মেয়েটি নাকি হুবহু এই ভাষায় আমার পরিচয় দান করেছে—'ছেলেটা কি অসভ্য রে বাবা! একটা মেয়ে দেখলে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে, যেন চোখ দিয়ে গিলে খেতে চায়। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় হাঁ করে উপর দিকে চাইতে চাইতে যায়। ইচ্ছে হয় চোখ দুটো একেবারে গেলে দিই। আর কোন দিন আমার দিকে অমনি করে তাকাতে দেখলে ঝাঁটা ছুড়ে মারব।' বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পক্ষে অভিযোগটা একটু যেন গুরুতর বলেই মনে হ'ল। কিন্তু উপায়! একমাত্র উপায় যেটা ছিল সেটা অবলম্বন করার স্পৃহা আমার এতটুকুও ছিল না। জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি, সিপ্রাকুমারী-মন্দাকিনী-শকুন্তলার তালিকায় আরও একটি মেয়ের নাম যোগ করতে আমার মন রাজী হ'ল না।

বেশীদিন আমাকে সেজন্য চিন্তিত থাকতে হ'ল না, তার অত্যাচারের হাত হতে আমি নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। সেটা এত বেশী অপ্রত্যাশিত এবং অভাবনীয় যে, সে রকম ভাবে নিষ্কৃতি পেতে আমি স্বপ্নেও চাই নি। পিতৃমাতৃহীনা অনাথার একমাত্র ভরসা তার মেসো হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মারা গেলেন, আর স্বামীর মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে মাসীও তাঁর অনুগমন করলেন। শ্রাদ্ধের গোলমাল চুকলে দেখা গেল এ পৃথিবীতে মেয়েটির আপনজন বলতে আর কেউ নেই; আর দেখা গেল ধনী মেসোর ব্যাঙ্কব্যালান্সও প্রায় শূন্যের কোঠায়। জীবনের প্রথম আঠারোটা বছর রাজনন্দিনীর মত আদর-যত্নে প্রতিপালিত হয়ে অবশেষে সে এক দূরসম্পর্কের পিসীর বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিল।

ভেবেছিলাম ওখানেই মেয়েটির প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই হঠাৎ তাকে দেখে ফেললাম। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে সিঁড়ি দিয়ে অর্দ্ধেকটা উঠেছি এমন সময় চোখে পড়ল মেয়েটি দোতলা থেকে নীচে নামবার উপক্রম করছে, এক পা নীচেও নেমেছে। এই এক বছরের মধ্যে একবারও সে আমাদের বাড়ীতে আসে নি, তাই তার এই আকস্মিক আবির্ভাবে আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম এবং পরমুহূর্ত্তেই নিজের কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভীত হয়ে পড়লাম। একে তো তার নামার পথে বাধা সৃষ্টি করেছি, তার ওপর সরাসরি তার দিকে তাকিয়েছি অবাক দৃষ্টিতে। না জানি এই অপরাধের শাস্তিটা কি রকম হবে! সিঁড়ির অপরার্দ্ধের দু'এক ধাপ ওপরে উঠে গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি নেমে এসে সঙ্কুচিত ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম অন্যদিকে চেয়ে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও সে নামল না দেখে আবার ওপর দিকে তাকালাম আর তাকাতেই বিস্মিত হয়ে গেলাম। একটু রোগা হয়ে গেছে মেয়েটি। তাতে তার রূপ যেন আরো ফুটে বেরুচ্ছে। কিন্তু সেজন্য নয়, বিস্মিত হলাম তার চোখ দুটির দিকে চেয়ে। আমার দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে স্থির দৃষ্টিতে, তার কালো কালো বিশাল চোখ দুটি কিসের ঔজ্জ্বল্যে যেন জ্বল জ্বল করছে আর সেই আলোকে সমস্ত মুখখানা তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে মুখভাব, সে দৃষ্টি আমার কাছে একেবারে নূতন। তাতে অবজ্ঞা নেই, বিরক্তি নেই, বিদ্রূপ নেই, কৌতূহল বা করুণাও নেই। সে দৃষ্টি শান্ত, স্থির।

চোখে চোখ পড়তেও সে কুণ্ঠিত হ'ল না, স্থির ভাবেই চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে আরম্ভ করলাম। তবে কি সে আমার ভেতর নূতন কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছে? কিন্তু সেটা কি হতে পারে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হ'ল আমাকে কিছু বলতে চায় বলে অপেক্ষা করছে না তো! শেষ সম্ভাবনার কথাটা চিন্তা করতেই বিদ্যুতের মত মনে পড়ে গেল অনেকগুলো ক্লেশদায়ক ঘটনার স্মৃতি। সঙ্গে সঙ্গে একটু কঠিন হয়ে উঠলাম। আমার সঙ্গে যদি কোন দরকার থাকে তবে সে নিজেই বলতে পারে সেকথা, আমার গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করার কি হয়েছে! মুখে একটু উপেক্ষার হাসি টেনে এনে গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে এলাম তার পাশ দিয়ে। মেয়েটি সে ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নেমে গেল আস্তে আস্তে।

রাত্রে পরিবেশন করতে করতে দাদাকে উদ্দেশ্য করে মা বললেন, "আজ বিকেলে উর্ম্মিলা এসেছিল রে! সত্যি বেচারার কথা ভাবলে বুক ফেটে যায়। মাসী মেসোর কথা বলতে বলতে মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বললে, কে জানত মাসীমা বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে, আপনাদের সবাইকে ছেড়ে এ পাড়া থেকেই আমাকে চলে যেতে হবে এমনি করে। এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি কোনদিন। পিসীমারা আমাকে মাথায় করে রেখেছেন, একটুও কাজকর্ম্ম করতে দেন না, কিন্তু আমি তো মনে শান্তি পাই না। পিসীমারা আমাকে যত আদর করেন, তত আমার মনে হয় আমি ওঁদের বোঝা হয়ে রয়েছি। ওঁদের এমনিতেই অভাবের শেষ নেই তার ওপর আছে আমার বিয়ের চিন্তা। আমার দাদারা ত ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেলেন। ওঁদের আবার পণ বড়লোকের মেয়েকে বড় ঘরে দিতে না পারেন অন্ততঃ সুন্দর ছেলের হাতে দেবেন। এটা বোঝেন না যে টাকা না থাকলে কিছুতেই হয় না। আমি ক'দিন কাঁদতে কাঁদতে পিসীমাকে বলেছি—আমার জন্য আর ভাল পাত্র খোঁজার দরকার নেই পিসীমা। কালো-কুৎসিত, বোকা-হাবা যাই হোক একটা কারুর হাতে আমায় দিয়ে দিন। আমি যে আর দাদাদের মুখের দিকে চাইতে পারছি না।"

মা একটু চুপ করলেন। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "সত্যি ভগবানের কি বিচার! রূপে গুণে সাক্ষাৎ সরস্বতী, ও তো কোনো অপরাধ করে নি, তবে ওর কপালে এত দুঃখ কেন? আর ওর মাসী-মেসোরও তো যাবার বয়েস হয় নি, ওঁরাই বা গেলেন কেন? আহা কি চমৎকার লোক ছিলেন ওঁরা, হাজারে একটা মেলে না। যাবার সময় মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বললে,

মাসীমা মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি একদিন না একদিন স্বামীর ঘরে যেতেই হবে। দু'দিন আগে গেলে ক্ষতি কি! এই পোড়া চেহারাটার কথা ভাবছেন? বিশ্বেস করুন মাসীমা, রূপের অহংকার আমার নেই। অপরের বোঝা হয়ে থাকার চেয়ে কালো-কুচ্ছিত, গরীব স্বামীর শাক-ভাতও যে শতগুণে ভাল, মেয়েদের পক্ষে সেটাই যে সবচেয়ে গৌরবের।' কথাটা শুনে আমি চোখের জল রাখতে পারি নি। অমন রাজরাণীর মত রূপ নিয়ে মেয়েটা কোন্ অপাত্রের হাতে গিয়ে পড়বে কে জানে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা নীরব হলেন। ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পাশাপাশি দুটি চিত্র। ক্রন্দনরতা মেয়েটির বিষাদময়ী মূর্ত্তি আর তার আলোকোজ্জ্বল মুখের অপূর্ব্ব ভাবসুষমা। যাবার সময় যে মেয়ে কেঁদে বিদায় নেয় কি করে তার মুখ কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই গভীর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে? কি করেই বা সে অতক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে এবং শান্ত ভাবে তাকিয়ে থাকে সেই লোকের দিকে সমস্ত জীবনে যাকে সে কোনদিন দু'চোখে দেখতে পারে নি? পরস্পর-বিরোধী এই ঘটনাগুলোর সংযোগসূত্রই বা কোথায়?

গভীর ভাবে আমি চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই মনঃপূত হ'ল না। ঘটনাগুলো যত রকম ভাবেই সাজিয়ে মেলাতে চেষ্টা করলাম ততই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে লাগল সবকিছু। জীবনে এই প্রথম আমি বিপন্ন এবং বিব্রত বোধ করলাম। দর্শনের ছাত্র হয়ে এবং মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে অবশেষে এই সামান্য বিষয়ে আমার পরাজয় হবে? মেয়েটির এই অদ্ভুত আচরণের অন্তর্নিহিত কারণ আমার কাছে অজ্ঞেয় থেকে যাবে? তবে কি শেষ পর্য্যন্ত রহস্যময়ী বলেই মেনে নিতে হবে কোন মেয়েকে!

ধ্যান ভঙ্গ হ'ল কার যেন চাপা হাসির শব্দে। চেয়ে দেখি সবারই খাওয়া হয়ে গেছে। শুধু আমি বসে রয়েছি হাত গুটিয়ে আর আমার মা আর দাদা আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন অবাক হয়ে। বোনেদের আর বৌদির দিকে নজর পড়ল। তাদের ঠোঁটের কোণে কোণে বিলীয়মান হাসির রেখা। আমাকে আত্মস্থ হতে দেখে তারা তৎক্ষণাৎ নিজেদের সামলে নিল, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার আগে তাদের চোখে চোখে একটা ইশারার বিদ্যুৎ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠল। শুধু আজকের নয়, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার প্রতি মেয়েটির সমস্ত আচরণের প্রকৃত অর্থ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল মুহূর্ত্তমধ্যে। মনে হ'ল, এই এতদিনে আমি যেন চিনতে পারছি মেয়েটিকে।

জীবন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সে যে গহন দ্বীপের আলোকগৃহের ইঙ্গিতময় অঙ্গুলি,
সে যে রাত্রিশেষে শিশির-ধোয়া কুঞ্জকানন, মঞ্জুলই।

সে যে কল্লোলিনী কস্তুরী—
গন্ধ নিয়েই ছন্দ তাহার, এগিয়ে যাওয়ার দস্তুরই!

সে যে শুকতারকার পরশ-পাওয়া কুসুমরাগে স্পন্দিত,
সে যে জ্যোৎস্না আলোর অণিমাতে পূজ্য এবং বন্দিত!

সে যে মহাকালের মহামায়ের পদ্মপায়ের শিঞ্জিনী,
সে যে চন্দ্রচূড়ের বিশ্ববীণায় বিষ্ণুপদের গঙ্গাধারার রিনঝিনি!

সে যে বৃহন্নলার নির্জ্জিতি,
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশলীলার চঞ্চলতার স্বীকৃতি!

সে যে বসন্তেরই রঙিন হাওয়ায় ওড়না খোলার আল্পনা,
সে যে সন্ধ্যারাগের ঝিলিমিলি শঙ্খদীপের কল্পনা!

সে যে অপার ঢেউয়ের বন্ধনী,
অরূপ সুরের তন্দ্রাপারের গোলকধাঁধার দীপান্বিতার
স্পন্দনই!

সে যে তীর্থজলে স্নান-করা ম্লান ধূর্জ্জটি,
সে যে রৌদ্রতাপে বাষ্পভরা অস্তাচলের কুজ্ঝটি!

শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-কর্ম্মশালা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে এবার হাবড়া—বাণীপুরে সাহিত্য-কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বয়স্ক লোক যাহারা সবে অক্ষর চিনিতে শিখিয়াছে, তাহাদের হাতে কি বই দেওয়া হইবে, কি ধরনের বই তাহারা সহজে পড়িতে পারিবে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব দেশবাসীর ও সরকারের। বয়স্ক লোকের অভিমানে আঘাত না লাগে, তাহাদের পক্ষে সহজ হয় ও সরস হয়, এ ভাবে পাঠ্য পুস্তক তৈয়ারী করিতে হয়। স্বাধীন ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার আছে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রই শিক্ষিত নয়, এ অবস্থা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়; সুতরাং বয়স্ক মাত্রেই যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে সেজন্য সরকার চেষ্টিত। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে বয়স্ক পাঠের বিষয় নির্দ্দেশ করিবার জন্য ১৯৪৮ সনের জুন মাসে একুশ জন সদস্য লইয়া এক কমিটি নিযুক্ত হয়, এবং সেই কমিটির অনুমোদিত বিষয়-সূচী সরকার কর্তৃক বিবেচিত হয়। তদনুসারে ১৯৪৯-এর জানুয়ারীতে সরকার হইতে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টার আরম্ভ হয়। কিন্তু বই লেখানো বিষয়ে এ পর্য্যন্ত সরকার হইতে বিশেষ কোনও কাজ হয় নাই।

বাণীপুরের কর্ম্মশালা বিষয়ে বন্ধুবর বিজয়বাবুর নিকট বিস্তারিত শুনিয়াছি; তাঁহার পরিচালনায় এবারকার কর্ম্মশালা অবশ্যই এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে হইতেছে শান্তিনিকেতনের উদ্যোগের বিষয়ে অনেকে ঠিক ঠিক এখনও জানেন না, যদিও একজন কর্ম্মী এ বিষয়ে সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন; তাই এ বিষয়ে কিছু লিখি। ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রীর দপ্তরে সমস্ত বিবরণ যথাকালে পাঠানো হইয়াছিল, তথাপি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সাধারণের গোচরীভূত করা প্রয়োজন মনে হইতেছে। ১৯৫৩ সনে আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে আমাদের ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে অগ্রসর হন। উত্তরে দিল্লীর নিকটে আলিপুর নামক স্থানে, পশ্চিমে বোম্বাই প্রদেশের কোলাপুরে, দক্ষিণে মহীশূরে—পর পর তিনটি সাহিত্য-কর্ম্মশালা হয়। পূর্ব্বাঞ্চলেও একটি সাহিত্য কর্ম্মশালা খোলার কথা চলিতেছিল। শান্তিনিকেতন সম্ভবতঃ এই জন্য নির্ব্বাচিত হয় যে সেখানে বিশ্বভারতীর সহায়তা পাওয়া যাইবে, স্থান ও কাল অনুকূল হইবে। অবশ্য ব্যবস্থা করিতে করিতে যে সময় আসিয়া পড়িল—১৯৫৪ সালের জুন-জুলাই—তাহা বিশেষ অনুকূল নয়। শান্তিনিকেতনে যে গ্রীষ্মকালে জলকষ্ট হয় তাহা যাঁহাদের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন। অবশ্য যতটা কষ্ট হইবে মনে করা গিয়াছিল ততটা কষ্ট হয় নাই।

পরিকল্পনা ছিল যে, শান্তিনিকেতনে একমাসব্যাপী কর্ম্মশালা বসিবে এবং ২৫ জন কর্ম্মীকে নবসাক্ষর বয়স্কদের জন্য বই লেখানো শিক্ষা দেওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা—এই পাঁচটি প্রদেশ বা রাজ্য হইতে কর্ম্মী লওয়া হইয়াছিল। কর্ম্মী সংগ্রহের ভার ভারত সরকারই লইয়াছিলেন।

মণিপুর হইতে দুই জন আসিয়াছিলেন। দুই জনই রাজ্যের সমাজশিক্ষায় নিযুক্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি প্রাপ্ত। ত্রিপুরা হইতে একজন আসিয়াছিলেন, তিনি কংগ্রেসকর্ম্মী ও শিক্ষক। আসাম হইতে দুই জন আসিয়াছিলেন, দুই জনেই সেখানকার সমাজ শিক্ষা অধিকারের কর্ম্মী। উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিলেন চার জন, একজন কলেজের অধ্যাপক, একজন ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক, একজন ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক, আর একজন শিক্ষক। আর দশ জন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত। ২৫ জনের স্থানে ১৯ জন, বাকি যাঁহাদের নাম তালিকায় ছিল, তাঁহারা আসিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি শান্তিনিকেতন হইতে একজন ও শ্রীনিকেতন হইতে একজন দুইটি শিক্ষিকাকে কর্ম্মশালায় শিক্ষানবিশি করিতে দিয়াছিলাম, উভয়েই বি-এ ও সমধিক আগ্রহশীল, সুতরাং কর্ম্মীর মোট সংখ্যা হইল একুশ জন। আমার সহযোগী ছিলেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীমহেশ্বর নিওগ এবং শ্রীনিকেতনের কর্ম্মী ও কবি সুপরিচিত লেখক শ্রীপ্রভাত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের কার্য্যকাল ছিল একমাস; এই একমাসের মধ্যে প্রথম দশ দিন আলাপ-আলোচনা, শাস্ত্র অর্থাৎ গ্রন্থপাঠ; দ্বিতীয় দশ দিন বই লেখা—প্রত্যেককে এক একটি বিষয় দিয়া তাহাকে সেই বিষয় লইয়া লেখাইতে হইবে; পরের দশ দিন, লেখা কেমন হইল তাহার বিচার ও যথাসম্ভব গ্রামে গিয়া গ্রামবাসীদের শুনাইয়া তাহার পরীক্ষা। ইহার মধ্যে প্রতি দশম দিবসে কর্ম্মবিরতি বা বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ বা নৃত্যকুশল শিল্পীদের দ্বারা চিত্তবিনোদন, কর্ম্মীদের নিজেদের কলাকৌশল প্রদর্শন, ঐ অঞ্চলের দ্রষ্টব্য স্থানে গমন—এ সবের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত আর্য্যনায়কম্, রেভারেণ্ড বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু, শরৎচন্দ্র দত্ত ও সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কবিগুরুর সঙ্গী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ সুনীল সরকার, গ্রন্থাগারিক বিমল দত্ত, সংস্কৃতের অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া কর্ম্মীদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয় কর্ম্মশালার উদ্বোধন করেন, এবং কর্ম্মীদের শিক্ষানবিশির

কাল সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের মানপত্রও তিনিই বিতরণ করেন; এই মানপত্র বিতরণী সভায় আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কর্ম্মীদিগকে আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ দানে অনুগৃহীত করেন।

একদিন ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটারী হুমায়ুন কবির সাহিত্য কর্ম্মশালার কর্ম্মীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। সাহিত্য-কর্ম্মশালার উদ্দেশ্য কি তাহা বিবৃত করিয়া তিনি বলেন, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করাও যেমন প্রয়োজন, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য বিধানও তেমনই প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে শহরবাসী ও গ্রামবাসীর মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর যে পার্থক্য আছে সে বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য তিনি সকল কর্ম্মীকে বলেন।

এক দিন সন্ধ্যায় (আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে) মেঘদূত উৎসব হইল। অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। কর্ম্মীদের মধ্যে একজন এই উপলক্ষ্যে কবিতা রচনা করেন; আর একজন কর্ম্মী তাহা আবৃত্তি করেন। একজন ওড়িয়া কর্ম্মী ও একজন অসমীয়া কর্ম্মী স্ব স্ব মাতৃভাষায় কালিদাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা পাঠ করেন। হিন্দী ভাষার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী মেঘদূত হইতে আবৃত্তি করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

কর্ম্মীদের সকলেই এক একখানি বই লেখেন। বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা চিত্রে ভূষিত করিবার ব্যবস্থাও ছিল। শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীযুক্ত বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু একুশখানি বই ছাপার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এখানে ভারত সরকারকে বুঝাইয়া মণিপুরের দুইখানি, ত্রিপুরার একখানি, আসামের একখানি, উড়িষ্যার একখানি ও বাংলার তিনখানি—মোট আটখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারিয়াছিলাম। আসামের বাকি একখানি ও উড়িষ্যার বাকি দুইখানি ছাপাইতে পারি নাই। পশ্চিম বাংলার শুধু মেয়ে কর্ম্মী তিন জনের বই-ই প্রকাশিত করিতে পারিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, ইহার মধ্যে একখানি ভারত সরকার কর্তৃক প্রশস্ত পুরস্কার পাইয়াছে। বইগুলি যথাসম্ভব ক্ষুদ্রায়তন, অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে, যাহাতে সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের পক্ষে বেশী দীর্ঘ না হয়, দুই একখানি এই মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বিষয়বস্তু বিভিন্ন প্রকারের। প্রাচীন পুরাণ, কাব্য বা উপাখ্যান অবলম্বনে, অথবা বিজ্ঞান ও অর্থনীতির অতি সাধারণ সমস্যা লইয়া, কখনও বা চলতি জীবনের কোনও এক অংশ জুড়িয়া কর্ম্মীরা লিখিয়াছেন। লেখার বিষয় প্রত্যেক কর্ম্মীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রবণতা অনুসারে স্থির করিতে হইয়াছিল। ছাপাখানার জন্য পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করা বড় সহজ কথা নয়—অনেক কথাই প্রথমে জানিয়া লিখিয়া রাখা ভাল এবং জ্ঞান অনুসারে হাতে কলমে করিয়া রাখাও চাই। পুস্তকে কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করা হইল প্রত্যেককে তাহার একটা তালিকাও এই সঙ্গে দিতে হইয়াছিল। আমরা অনেকেই লেখার সময় কতগুলি শব্দ প্রয়োগ করিলাম, তাহার হিসাব রাখি না। হিসাব রাখলে লেখার ওজনও বোঝা যায় এবং রাখা যায়।

বয়স্কদের জন্য শান্তিনিকেতনের কর্ম্মশালায় যে সব পুস্তক লেখা হইয়াছিল তাহাদের পাঠকেরা সমাজের কোন শ্রেণীর, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইত। আমাদের সমাজের সকল স্তরের ভাষা সমান নয়; আমাদের সমাজে কেন, সকল সমাজের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে। যতক্ষণ আমরা সমাজের এই সব স্তরের সঙ্গে পরিচিত না হই, ততক্ষণ আমরা তাহাদের ভাষা জানিতেও পারিব না, প্রয়োগ করিতেও পারিব না। গ্রামের সঙ্গে, শহরেরও এই শ্রেণীর অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানহীন বয়স্কদের সঙ্গে না মিশিলে লেখকদের শক্তি বিকশিত হইবে না।

শান্তিনিকেতনে এই একমাসের অবস্থান কালে কর্ম্মীদের মধ্যে যে সৌহার্দ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা মুখ্য না হইলেও গৌণ লাভের মধ্যে কম নয়। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী কয়জন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সাহিত্যে অনুরাগ ছিল, শিক্ষাদানে উৎসাহ ছিল, সুতরাং এক পথের পথিক হইয়া অন্তত এই একমাস কাল চলিয়াছিলেন। "আমাদের শান্তি-নিকেতন" অবাঙ্গালীরা প্রাণ দিয়া গাহিতে শিখিয়াছিলেন; প্রতি-দিনের কর্ম্ম অবসানে সন্ধ্যায় সকলে একত্র হইয়া পরস্পরের চিত্ত-বিনোদন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সাহচর্য্য ও সঙ্গের স্মৃতি আশা করি তাঁহাদের মধুর হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। শুধু ভাষার জন্য নয়, কার্য্যের সঙ্গে অর্থাৎ বয়স্কদের শিক্ষাদানের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার। লেখক ও কর্ম্মীর মধ্যে আমাদের দেশে এক প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে। কর্ম্মী কেন লেখক হইবে না? কর্ম্মীরও যে লেখার সঙ্গে খানিকটা যোগ থাকা চাই, অর্থাৎ আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে বোধ থাকা চাই, এবং সেই বোধ অনুসারে কর্ম্ম সংগঠন চাই। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এই অনতিকঠিন কর্ম্মে আমরা কেন পূর্ণোদ্যমে প্রবৃত্ত হইলাম না, সেই কথাই নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করি। এ কর্ম্মে অর্থের বেশী প্রয়োজন নাই, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সুফল প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। দেশের কল্যাণে যাঁহারা ব্রতী সবিনয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। বয়স্ক শিক্ষার কার্য্য যতই বাড়িবে, পুস্তকও ততই লিখিত হইবে, এবং এই উদ্দেশ্যে লিখিত পুস্তকও ততই সুন্দর ও উপযোগী হইবে।

অস্পৃশ্যতা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যত রকমের অন্যায় চলেছে, তাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার বোধ হয় জুড়ি নেই। এই মহাপাপ এক রকমের কীটের মতই হিন্দু সমাজের অস্থিমজ্জাকে বহু শতাব্দী ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে। এর থেকে অব্যাহতি না পেলে আমাদের নিস্তার নেই।

আমাদের একের মঙ্গল অন্যের মঙ্গলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে।

"যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

এ শুধু নিছক কবি-কল্পনা নয়। সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে অবহেলায় পঙ্গু রেখে আমরা যা কিছু গড়তে যাব, তা হবে বালুতে ইমারত গড়ার মতই একটা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে ফলবতী করবার জন্য কর্মসাগরে আজ ঝাঁপ দিয়েছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিতাভস্মের উপরে আমাদের জাতীয় জীবনকে গড়ে তোলবার দায়িত্ব এখন একান্ত ভাবে আমাদেরই। এই জীবন যাতে সম্পদে কল্যাণময়, স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল এবং শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য জাতীয় সরকার নানারকমের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কেবল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় এই পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ ফলবতী হবার নয়। দরকার জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা, প্রয়োজন জনশক্তির উদ্বোধন। জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশকে ঘৃণাভরে আমরা যদি দূরে সরিয়ে রাখি তবে কোন মতেই তাদের সহযোগিতা পাব না। আর তাদের সহযোগিতা না পেলে আমরা কোন কাজেই এগিয়ে যেতে পারব না। আমরা একই সূত্রে সবাই বাঁধা আছি, আমাদের সকলেরই স্বার্থ এক—এই ঐক্যবোধ যেখানে সুতীব্র সেখানেই শুধু জাতির জীবন মহিমময় হয়ে উঠতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভাঙবার সময় অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রয়োজন আমরা তীব্রভাবেই অনুভব করেছিলাম। সেদিন আমাদের প্রয়োজন ছিল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার, আর ব্রিটিশের প্রয়োজন ছিল ভেদনীতির সাহায্যে জাতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে আমাদিগকে দুর্বল করে রাখবার। শাসকদের ভেদনীতি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারল না। মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করলেন দিগন্তপ্রসারী হরিজন আন্দোলন। তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা 'হরিজন' নাম নিয়ে প্রকাশিত হ'ল। গঠনকর্মীরা চামার এবং মেথর পল্লীতে গিয়ে তাদের সেবায় করল আত্মনিয়োগ। ব্রিটিশ আমাদের একতা দেখে প্রমাদ গনল। অস্পৃশ্যতার ভেদাসুর ঐরাবতের মত ভেসে চলল হরিজন আন্দোলনের সেই বন্যাধারার মুখে। সেই ভাঙার রাতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করবার প্রয়োজন ছিল যত গভীর আজ এই গড়ার প্রভাতে সেই প্রয়োজন নিঃসংশয়ে গভীরতর। ঐক্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তির উৎস। আমরা যদি আত্মীয়বোধে পরস্পরকে ভালবাসতে পারি, সেই ভালবাসার দ্বারা আমরা পৃথিবীতে অজেয় হব। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ঐক্যবোধ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে। আমাদের উপনিষদগুলি সকলের মধ্যে একই পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে সমভাবে স্বীকার করেছে।

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর
তপোবন-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে একদেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরই।

একই ভগবান সর্বভূতের অন্তরাত্মা—এই নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যবোধই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ। বহু শতাব্দীর ঝড়ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করে আজও যে জাতি সগৌরবে বেঁচে আছে, তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কি কোন আমূল পরিবর্তন হতে পারে? সময়ের ধাক্কায় একটু-আধটু পরিবর্তন ত স্বাভাবিক। যে ঐক্যবোধের মধ্যে জাতির প্রাণপুরুষের প্রকাশ, কালের নিয়মে তার শিখা কখনও উজ্জ্বল, কখনও বা ম্লান হতে পারে; কিন্তু জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি তার সাধকদের জীবন ও বাণীকে আশ্রয় করে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করবেই। তাই দেখি জাতির জীবনে ঐক্যবোধকে আচ্ছন্ন করে ভেদবুদ্ধি যখন অত্যুগ্র হয়ে উঠল তখন ভগবান বুদ্ধ এসে শোনালেন মৈত্রীর বাণী। গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের শিলালিপি ঐক্যের বাণীকেই কতকাল ধরে বহন করে আসছে। এই ঐক্যবোধকে জাগ্রত করে তোলবার জন্য মহাপ্রভু পরবর্তী যুগে দিকে দিকে বিতরণ করলেন অমানী এবং মানদ হবার উদার মন্ত্র।

প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনা করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখলেন,

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"

ভারতবর্ষকে তার প্রাণপুরুষের সন্ধান দেবার জন্য আবার এলেন যুগাবতার রামকৃষ্ণ। বললেন: 'সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ

পর নয়। সর্ব্বভূতে সেই হরিই আছেন।' বললেন : 'কালীঘরে দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন, দুষ্টলোক পর্য্যন্ত, ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্য্যন্ত। তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক ঠাকুর-সেবায় লাগবে।' মানুষের মধ্যে ঠাকুর দেখলেন মূর্ত্ত ভগবানকে। বিবেকানন্দের কণ্ঠেও একই বাণী—'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়'। রবীন্দ্রনাথ 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' দাঁড়িয়ে মানুষকে প্রণাম করলেন নর-দেবতা বলে।

"হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে।
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।"

গান্ধীজীরও সমস্ত চিন্তাধারা এবং কর্ম্মধারার মধ্যে মানুষের প্রতি এই অপরিসীম শ্রদ্ধাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একই সুর অরবিন্দের কণ্ঠে। আমাদের সংবিধানের মধ্যেও অস্পৃশ্যতাকে বিলুপ্ত করে দেবার বাণী সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রের আইনে অস্পৃশ্যতা ত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই বলছি : দুনিয়ার বুকে হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকবার দুর্ব্বোধ্য শক্তি রাখে যে জাতি তার সংস্কৃতির স্বকীয়তা কখনও নিশ্চিহ্ন হবার নয়। অস্পৃশ্যতার কদর্য্য ভেদাসুরটাকে আঘাতে আঘাতে আমরা প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলেছি। এবার এসেছে তাকে চরম আঘাত হানবার দিন। গণতন্ত্রের জয়রথ চলতে আরম্ভ করেছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মধ্যে এই রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনিই কি আমরা শুনতে পাচ্ছি না? এবার সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যের আদর্শকে ফলবান করবার দিন এল। কাকে বলছি বড়? কাকেই বা বলছি ছোট? যতক্ষণ আমরা পরস্পরকে ভাল করে না জানছি ততক্ষণই শুধু একজনের পক্ষে আর একজনকে তাচ্ছিল্য করা সম্ভব। মানুষ যখন উপলব্ধি করে তার প্রতিবেশী তারই মত সুখ-দুঃখকে একই ভাবে অনুভব করে, আতঙ্কিত হয় একই ভয়ে, একই উদ্বেগে; কামনা করে একই সুখ; তখন প্রতিবেশীকে বাঁকা চোখে দেখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'কাবুলীওয়ালা' গল্পে কাবুলীওয়ালাকে যে সহানুভূতির চোখে দেখেছিলেন সেই সহানুভূতির চোখে তখন সেও দেখে তার প্রতিবেশীকে। এই অতুলনীয় গল্পটিতে রহমৎ কাবুলিওয়ালার মনের সুন্দর চেহারা দেখে বাঙালী এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় মিনির পিতা উপলব্ধি করেছিলেন : 'সেও যে আমিও সে। সেও পিতা আমিও পিতা'।

আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠুক এই জীবন্ত ঐক্যবোধ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের স্বর্ণযুগের নর-নারী আমরা আকণ্ঠ পান করেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণীর অমৃত, মানুষ হয়েছি মহামানব গান্ধীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের ছায়ায়। সর্ব্বোপরি বাংলাদেশ প্রেমের অবতার মহাপ্রভুর জন্মভূমি। মানুষকে আমরা যদি মর্য্যাদা না দিতে পারি, কারা দেবে? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেশের নর-নারী আমরা রবীন্দ্রনাথের মতই নরদেবতাকে নমস্কার করে যেন প্রাণ খুলে বলতে পারি :

"এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খ্রীষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধর হাত সবাকার।
এস হে পতিত; হোক অপনীত
সব অপমান ভার।*

* 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র সৌজন্যে



ভারতে শ্রমিক-কল্যাণ

ভি. কে. আর. মেনন

শ্রমিক-কল্যাণ কথাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়। এক দিক দিয়া, শ্রমিককে সুষ্ঠুভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী বেতন দেওয়াকেও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কেননা কেবলমাত্র এই ধরনের মাহিনা বা মজুরি দ্বারাই সে যথোচিত ভাবে তার নিজের এবং নিজ পরিবারের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারে, আর অন্ন ও বস্ত্রের প্রয়োজনই ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনুরূপ ভাবে, দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কার্য্যতঃ কিন্তু বেতন, কাজের সময় এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত কর্ম্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদিকে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা হয় না। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বিশিষ্ট কল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা শুধু দেশ-ভেদে নয়, অঞ্চলভেদেও বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ইংলণ্ডের কথা। সেখানে সক্রিয় জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনার (National Health Insurance Scheme) বিদ্যমানতা হেতু কেবলমাত্র শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা এবং চিকিৎসার পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে। কিন্তু একথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না যে, আমাদের দেশে সমগ্র জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় মানে আমরা পৌঁছিয়াছি। একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতেছে। ভারতে প্ল্যানটেশন বা চা-বাগান ইত্যাদির বিরাট অঞ্চলসমূহ বিদ্যমান, সেগুলিতে সাকুল্যে লক্ষাধিক শ্রমিক কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তন্মধ্যে অনেককে আনা হইয়াছে বহুদূর হইতে এবং যদি তাহাদিগকে চিকিৎসাবিষয়ক সাহায্য ও হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে রোগের সময় অনেককেই বিনা চিকিৎসায় থাকিতে হইবে। অথবা ধরুন বাসগৃহের সমস্যার কথা। যে সকল দেশে শ্রমিকদের মজুরির হার এরূপ যে তাহাদের পক্ষে ন্যায্য বাড়ীভাড়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে এবং বাসগৃহের সমস্যা যেখানে তীব্র নয়, সেই সকল দেশে শ্রমিকেরা মালিকের তৈরী গৃহে বাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে। আমাদের দেশের অবস্থা কিন্তু ভিন্ন রকমের। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মালিক নিজ নিজ শ্রমিকদের মধ্যে অন্ততঃ একটা নির্দ্দিষ্ট অংশের বাসগৃহের ব্যবস্থা করিবার নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রমিকেরাও যতদিন পর্য্যন্ত না তাহাদের স্বাধীন গতিবিধি এবং অন্যান্য আইনসঙ্গত কাজ-কর্ম্মের উপর অন্যায় ভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় তত দিন পর্য্যন্ত মালিকদের নির্ম্মিত গৃহে বাস করার ব্যবস্থাকেই মানিয়া লইয়াছে।

আমাদের দেশে অনেকগুলি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পথে এমনি ধরনের প্রতিবন্ধ রহিয়াছে যে, শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টায় তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে না, যেমন—যে এলাকায় কোন হাসপাতাল নাই সেখানে এটা আশা করা যায় না যে, শ্রমিকেরা নিজস্ব হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া তাহা পরিচালনা করিবে। এই সকল ক্ষেত্রে হাস-পাতালের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে মজুরি বাড়াইয়া দিলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সুযোগ-সুবিধা যেখানে বিদ্যমান, টাকা দ্বারা সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসার কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীদের নিকট হইতে কাজ আদায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র টাকাই রোগীদের সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে পারে না। আমি ইচ্ছা করিয়াই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি, কেননা সময় সময় মালিকদের প্রবর্ত্তিত কল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে শ্রমিকেরা সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এমনকি যে-সকল দেশে শ্রমিকেরা শিক্ষার দৌলতে সকল সময়েই নিজে-দের অধিকার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন এবং ট্রেড ইউনিয়ন-

গুলিও যেখানে বেশ জোরালো সেই সকল দেশে পর্য্যন্ত এই ধরনের বিরুদ্ধতা সন্দেহ এবং অবিশ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু তাহাদের এই মনোভাবের একটা বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির শ্রমিকেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ এবং কাজকর্ম্মের সমস্যাগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছে দুরূহ ও জটিল। একথাও তাহারা মানিয়া লইয়াছে যে, জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক বিষয়সমূহ এবং কতকগুলি বস্তু ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ব্যক্তিগত ভাবে আর তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল যে, মালিক অথবা সমাজের দ্বারা প্রবর্ত্তিত এই সকল সুযোগ-সুবিধা তাহাদের কোনপ্রকার মূলগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। এই সকল প্রচেষ্টার কল্যাণমূলক দিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যে বিষয়টির উপর তাহারা জোর দিয়াছে—এবং ন্যায্য ভাবেই দিয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, এই সকল ব্যবস্থা জোর করিয়া তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে সে-গুলি যেন শ্রমিক-সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় কার্য্যে রূপায়িত হয়।

ভারতে সক্রিয় সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহকে মোটামুটি ভাবে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—আইনের বলে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ—মালিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সকল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এমন সব ব্যবস্থাও আছে যাহা শ্রমিকেরা নিজেরাই সমবায়মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এগুলি এখনও পর্য্যন্ত খুব স্বল্পমাত্রায়ই বিদ্যমান।

শ্রমিক-কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারী সক্রিয়তার প্রসঙ্গে বলিতে হয় যে, মাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ভারত সরকার এই ক্ষেত্রে তৎপর হইয়া উঠিলেন। ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহার মানে এই নয় যে, বিশ্বযুদ্ধের চাপে সরকার হঠাৎ শ্রমশিল্পে কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠেন। প্রকৃত তথ্য হইতেছে এই যে, এই আপৎকালে সরকার পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতররূপে ইহা উপলব্ধি করেন যে, শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে এবং উৎপাদনের উচ্চ স্তর বজায় রাখিতে হইলে শ্রমিকদের জন্য যথোচিত কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ভারতবর্ষ যখন যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অন্যতম মুখ্য সরবরাহকারী ছিল তখন শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনের উচ্চ স্তর বজায় রাখা এই দুইটি ছিল একান্তভাবে অপরিহার্য্য। সরকারের প্রত্যাশা যে পূর্ণ হইয়াছিল, লব্ধ সুফলসমূহই তাহার প্রমাণ। সাফল্যের সহিত মালসরবরাহের কাজে ভারতীয় শ্রমিক নিজের ষোল আনা শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। এমনি ভাবে একবার গতিবেগ সঞ্চারিত হওয়ার পর আর তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তন হইল না—এমনকি যুদ্ধের পরেও নয়। বরং স্বাধীনতালাভের পর এবং আমাদের সংবিধানে কল্যাণরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে স্থান দেওয়ার পরে এই বিষয়ে প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত শক্তি অর্জ্জিত হইল।

এখন, দেশে যে সকল শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বর্ত্তমান সেগুলির কথা আমি বর্ণনা করিব। এক্ষেত্রেও আবার দুইটি শ্রেণী আছে। এমন সব ব্যবস্থা প্রথমোক্তটির অন্তর্ভুক্ত যাহা প্রশাসিত হয় কোনো সরকারী এজেন্সী কর্ত্তৃক এবং অপরটি যদিও আইনের আওতার অন্তর্ভুক্ত তথাপি মালিকদের নিজেদেরই এগুলি সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রথম শ্রেণীতে আসে—কয়লা এবং অভ্রের খনির শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক-কল্যাণ ফণ্ড (Labour welfare funds), কতকগুলি বৃহৎ শিল্পের কর্ম্মীদের নিমিত্ত প্রভিডেণ্ট ফণ্ড এবং কারখানার শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহের কথা।

সরবরাহ করা যাবতীয় কয়লার উপর ধার্য্য এক বিশেষ কর হইতে কয়লাখনিসমূহের 'লেবার ওয়েলফেয়ার ফণ্ডে'র অর্থসংস্থান হয় এবং ইহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকার কাছাকাছি। এই ফণ্ডের প্রশাসনের চূড়ান্ত দায়িত্ব যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের, তথাপি যাবতীয় ব্যাপারে ইহা একটি ত্রিদলীয় কমিটির উপদেশ লাভ করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের এবং মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিবৃন্দ এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত। এই ফণ্ডের টাকায় কয়লাখনির শ্রমিক এবং তাহাদের পরিবারের লোকেদের হাসপাতালে ও ডিসপেন্সারীতে চিকিৎসা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য নিবার্য্য ব্যাধি প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা হয়; উপরন্তু বয়স্ক-শিক্ষা ক্লাস এবং খনি-শ্রমিকদের স্ত্রী ও শিশুদের জন্য কারুশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতিও পরিচালিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া সিনেমা, ক্যান্টিন, অবসরবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হয়। অশক্ত খনি-শ্রমিকদের পুনর্ব্বাসনের জন্য একটি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরাসরি ভাবে অথবা 'খনি স্বাস্থ্য পর্ষদ' (Mines Board of Health) প্রভৃতির ন্যায় অনুরূপ কল্যাণকর্ম্মে রত অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় শিশু এবং মাতৃমঙ্গল কর্ম্মেও হাত দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকদের যে বিপুলসংখ্যক 'ধাওড়া' বা আস্তানা এখনো বিদ্যমান তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের বাসোপযোগী গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে মালিকদিগকে প্রভূত অর্থসাহায্য করা হইয়াছে। চিকিৎসার যে 'মান' বজায় রাখা হইতেছে

সে বিষয়ে একটা ধারণা জন্মাইবার জন্য, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি খনি-শ্রমিকদের দুইটি কেন্দ্রীয় হাসপাতালের কথা বলিতেছি—তন্মধ্যে একটি ধানবাদে এবং অপরটি আসানসোলে। প্রতিবাদের কোনো আশঙ্কা না রাখিয়াই আমি বলিব যে, এই সকল হাসপাতাল—যেখানে কয়লাখনির শ্রমিক এবং তাহাদের পরিবারের লোকেদের বিনামূল্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়—দেশের যে-কোন হাসপাতালের ন্যায় সাজ-সরঞ্জামসমন্বিত এবং সুপরিচালিত। আমার যদি হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমি অন্য অনেকগুলি অপেক্ষা বরং বিনা দ্বিধায় এই সকল হাসপাতালেই যাইব, তবে মুশকিল হইতেছে এই যে, আমাকে এগুলিতে ভর্ত্তি হইতে দেওয়া হইবে না। যদিও একটি মাত্র ব্যাপার হইতে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না, তথাপি ঐ ধরনের একটি হাসপাতালের বর্ণনা না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। এক বার এই হাসপাতাল পরিদর্শনকালে আমি এমন একজন খনি-শ্রমিককে দেখিতে পাই, মারাত্মক দুর্ঘটনার ফলে যাহার পা, একটি বাহু এবং অন্য বাহুর দুইটি আঙুল ইত্যাদি অঙ্গচ্ছেদ (amputate) করিতে হইয়াছিল। এই হাসপাতালে রোগীদের যেরূপ যত্ন লওয়া হয় তাহা অন্যত্র বিরল এবং এখানকার সহায়তা না পাইলে খনি-শ্রমিকটি নিশ্চয়ই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইত। যাই হোক, শ্রমিকটি তো বাঁচিয়া উঠিল এখন আমার নিকট সমস্যা দাঁড়াইল তাহাকে লইয়া কি করা যায়—তাহার জীবন রক্ষা করিয়া আমরা কি তাহার ভালো করিয়াছি। এই চিন্তার ফলেই অশক্ত খনি-শ্রমিকদের জন্য একটি পুনর্বাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে দ্রুত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমি তৎপর হইয়া উঠিলাম—উক্ত কেন্দ্রটি এখন চালু হইয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় হাসপাতালসমূহ ছাড়া উত্তম সাজসরঞ্জামযুক্ত কতকগুলি আঞ্চলিক হাসপাতালও আছে।

ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ব্যবস্থার দরুন কয়লা-ক্ষেত্রসমূহে—যেখানে ম্যালেরিয়া ছিল প্রকৃতই মহামারী স্বরূপ, উক্ত ব্যাধি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থাসমূহের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্যও প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

"কোল মাইন্‌স প্রভিডেন্ট ফণ্ড" এবং "এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফণ্ড" নামক দুইটি পরিকল্পনা বেসরকারী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য অর্থসংস্থানকল্পে রাষ্ট্র-প্রশাসিত (State-administered) এক পরিকল্পনার সূচনা করিতেছে। প্রায় ৬.৬৩ লক্ষ শ্রমিককে প্রথমোক্তটির এবং প্রায় ১৫.৪৭ লক্ষ শ্রমিককে দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সমস্ত প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বাস্তবিকই শ্রমিকদের পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যদি নাও বা হয়, তবু অন্যতম প্রধান হইতেছে উপযুক্ত বাসগৃহের সংস্থান। কয়েক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারগুলি এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া আসিতেছেন। কয়লাখনির শ্রমিক এবং অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক উভয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ পরিকল্পনার জন্যই "ওয়েলফেয়ার ফণ্ড" এবং কেন্দ্রীয় সরকার নগদ মোটা টাকা দিয়া সাহায্য করেন; উপরন্তু শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্ম্মাণকল্পে মালিকদিগকে টাকা কর্জ্জও দিয়া থাকেন। যাই হোক্, তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, মোটের উপর এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রগতি নিরতিশয় মন্থর। বিষয়টি সুপরিস্ফুট—যদিও ইহার জন্য কে বা কাহারা দায়ী সে সম্বন্ধে বিতর্কের মধ্যে আমি যাইতে চাহি না। তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই বিষয়টির উপর যে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইবে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

১৯৪৮-এর ফ্যাক্টরি আইনে ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের কল্যাণ-মূলক ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান হইতেছে—বস্ত্রাদি ধৌত করার সুযোগ-সুবিধা, শুকাইবার ব্যবস্থা, বিশ্রান্তি-কক্ষ (Rest room), ক্যাণ্টিন, শিশু-রক্ষণাগার, প্রাথমিক সাহায্য-প্রদান এবং 'ওয়েলফেয়ার অফিসার' নিয়োগ ইত্যাদি। সামান্য সংযোজন এবং পরিবর্জনসহ ১৯৫২ সনের খনি আইনেও (Mines Act) অনুরূপ ব্যবস্থাসমূহ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাইন্‌স মেটানিটি বেনিফিট এক্ট অনুযায়ী খনির নারী-শ্রমিকদিগকে 'মেটানিটি বেনিফিট' দেওয়া বাধ্যতামূলক হইয়াছে। খনির তলদেশে নারী-শ্রমিকদের কর্ম্মে নিয়োগ আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে রাজ্য-সরকারসমূহও শ্রমিক-কল্যাণের উপর ক্রমবর্দ্ধমানরূপে গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। বোম্বাই রাজ্য সরকার 'ষ্টাট্যুটারি লেবার ওয়েলফেয়ার ফণ্ড' প্রতিষ্ঠা-কল্পে আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই ফণ্ডের কল্যাণে ৫৪টি শ্রমিক-কল্যাণকেন্দ্রের ব্যয়নির্ব্বাহ হইতেছে—এই সমস্ত কেন্দ্রে শারীর শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা, শিশুরক্ষণাগার, নার্সারি স্কুল ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যদিও ইহার মানে এই নয় যে, প্রত্যেক কেন্দ্রেই এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হইয়া থাকে তথাপি প্রাপ্ত রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কল্যাণ-কেন্দ্রসমূহে উপস্থিতির সংখ্যা ১৯৪৭ সনে ছিল ত্রিশ লক্ষ, ১৯৫৩ সনে তাহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৯৪০ লক্ষে।

অন্যান্য রাজ্য-সরকারসমূহ কর্ত্তৃকও সরাসরি অথবা পর্ষদ কিংবা প্রতিনিধিমূলক শ্রমিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় শ্রমিক-কল্যাণ-কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। বোম্বাইয়ের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। সৌরাষ্ট্রে ২০টি শ্রমিক কল্যাণ-কেন্দ্র চালু রহিয়াছে।

বেসরকারী মালিগকণ কর্ত্তৃক যে-সকল কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এখন আমি সেই প্রসঙ্গে আসিতেছি। আমি বিশেষভাবে কাহারও নাম করিতে চাই না। কিন্তু এমন কয়েকজন মালিক আছেন যাঁহারা স্বচ্ছন্দে অপরের নিকট আদর্শস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহারা উপযুক্ত সাজসরঞ্জামসমন্বিত হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারী পরিচালনা করেন, শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসগৃহ নির্ম্মাণকল্পে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন; তাঁহারা রেস্ট-হাউস, ক্যাণ্টিন, শিশু-রক্ষণাগার, শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় এবং তাহাদের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন, তাহাদের অবসরবিনোদন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সকল মালিকেরা যে 'মান' বজায় রাখিতেছেন তাহা এত উৎকৃষ্ট যে, আমার মনে হয় কোন রাষ্ট্র-প্রশাসিত পরিকল্পনার পক্ষে এই স্তরে পৌঁছিতে আরও বেশ দীর্ঘ সময় লাগিবে। এ ক্ষেত্রে মালিকদিগকে এরূপ কল্যাণকর্ম্ম চালাইয়া যাইতে দেওয়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। "এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইনস্যুরেন্স স্কীমে"র সম্পর্কে এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই উত্থাপিত হইয়াছে এবং যে-সকল মালিক হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারীর মাধ্যমে উচ্চ মানের কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন তাঁহারা যাহাতে তাহা চালাইয়া যাইতে পারেন সেজন্য তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করা হইবে। কিন্তু ইহা আমার সুনিশ্চিত ধারণা যে, সমুচিত কল্যাণকর্ম্মকৃৎ মালিকের সংখ্যা এখনও স্বল্প এবং কাজ করিবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এখনও পড়িয়া রহিয়াছে।

বাল সহযোগ

(বুট পালিশ করা শিশুদের ক্লাব)

দিল্লীর বুট পালিশ করা শিশুদের (boot polish children) ক্লাবের ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে আমি দেখেছিলাম- কর্ম্মব্যস্ত তরুণ জবাহরলালকে। ঐ ক্লাবে চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুরা খেলাধুলো করবার জন্যে সমবেত হয় এবং এই ক্রীড়া-কৌতুকের ভিতরে অবসর সময়ে তারা নানা বিষয়ে শিক্ষালাভও করে থাকে। এই উপায়ে তারা যে পারিশ্রমিক পায় তা জমা হয় শিশুদের ব্যাঙ্কে এবং আমানতকারীদিগকে একটি পাস বই ও চেক বই দেওয়া হয়। দৈনন্দিন জমা হয় মোটামুটি বলতে গেলে ১০১৲ টাকা, আর সাপ্তাহিক প্রতি-গ্রহণ (withdrawals) হচ্ছে ৫০৲ টাকা। আমানত-কারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বিধবা মায়েদের ভরণ-পোষণের জন্যে বাড়ীতেও টাকা পাঠায়। রাজধানীর পথে পথে যারা ঘুরে বেড়ায় সেই সকল সহায়-সম্বলহীন শিশুর অদৃষ্ট গড়বার জন্যে নিউ দিল্লীর 'বাল সহযোগ' নামক সংস্থা কর্ত্তৃক পরীক্ষামূলক ভাবে এই চমৎকার পরিকল্পনাটি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং দিল্লী রাজ্য সরকারের অর্থসাহায্যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সুষ্ঠু পরিচালনাধীনে এই হোমের কার্য্য নির্ব্বাহ হচ্ছে।

শ্রীকে. জি. সৈয়ীদাইন, শ্রীএস. আর. রঙ্গনাথম, কুমারী মৃদুলা সারাভাই, কুমারী কিশোর কিদওয়াই প্রমুখ বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি এবং সমাজকর্ম্মিগণ বাল সহযোগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে আছেন। এঁরা এই ধরনের ভবঘুরে শিশু এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের শিশুদের যোগাড় করে আনেন। তাদের এখানে দর্জ্জির কাজ, কামারশালার কাজ, বেতের কাজ, বস্ত্রবয়ন, রান্নাবান্না ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। হোমে তাদের রাখা হয় ছয়-সাত মাস এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সময়ে তাদের সদাচার শিক্ষাদান এবং জীবনগঠনের দিকেও প্রযত্ন লওয়া হয়।

এই সংস্থার আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা সবশুদ্ধ ১১০ জন। তন্মধ্যে ৮০ জনই বারো বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু। তারা বিনা খরচে এখানে থেকে কোন-না-কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করে। এখানে এমন ত্রিশটি শিশু আছে যাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে—তারা অভ্যস্ত হয়েছে ক্যাম্প জীবনে, নিজে-দের জীবিকা অর্জ্জন করবার জন্যে তাদের এই সংস্থার উৎ-পাদন বিভাগে কাজ করতে হয়। তাদের হোমে থাকতে

দেওয়া হয়, কিন্তু নিজেদের খোরাকীখরচ তাদেরই বহন করতে হয়।

আবাসিক শিক্ষার্থীরা খাদ্য রান্না করে, বাগানে কাজ করে, গেট পাহারা দেয় এবং ছেলেরা দলে দলে যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাইরে যায় তখন তাদের 'পাস' দিয়ে থাকে।

এই হোমের অধীনে সম্প্রতি দুইটি যোগাযোগ ক্লাব (contact club) আছে—একটি এই প্রতিষ্ঠানের গৃহে এবং অপরটি কনষ্টিটিউশন হাউসে। নগরীর প্রত্যেক অঞ্চলে অনুরূপ ক্লাব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আছে।

হোমের সার্কুলেটিং লাইব্রেরীতে প্রায় ৩০০ ভল্যুম শিশুদের বই আছে। শিশুপাঠ্য পত্রিকা এবং পুস্তকসমূহ থেকে চিত্তাকর্ষক গল্প পড়বার জন্যে শিক্ষার্থীরা রিডিং রুমে নিয়মিত ভাবে যায়।

প্রার্থনাসহ দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী আরম্ভ হয়—রোজ সোয়া পাঁচটার সময় এবং পৌনে দশটার সময় তা শেষ হয়। অন্যান্য জনবহুল নাগরিক অঞ্চলে অনুরূপ কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এই সংস্থার—যাহা রাজধানীর একটি দীর্ঘকাল অনুভূত অভাব পূরণে সক্ষম হয়েছে, কর্ম্মপ্রচেষ্টা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন।

আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশু

চক্ষুচিকিৎসকগণ এবং 'এল. সি. সি'র জন রাসকিন স্কুলের নিষ্ঠাবান শিক্ষক পার্সি ডবসন কর্ত্তৃক যুক্তরাজ্যে গত পঁচিশ বৎসরের অধিককাল যাবৎ আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে তাহাকে ভিত্তি করিয়া অন্যান্য দেশেও অনুরূপ শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

যে সকল শিশু মাইয়োপিয়া, হাইপার মেট্রোপিয়া, চোখের হানি প্রভৃতি জন্মগত, বংশগত অথবা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জাত চক্ষুরোগে ভোগে তাহারা সকল সময়েই সমাজের এক জটিল সমস্যা বলিয়া গণ্য হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই রোগ অবশ্য আরোগ্য হইবার নয়, কিন্তু সকলের পক্ষেই চিকিৎসা এবং বিশিষ্ট পদ্ধতির শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয়ে যখন এই সকল ছেলেকে পাঠানো হয় তখন অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে চলিতে পারে না বলিয়া ইহাদের মনে একটা হীনতাভাব (Inferiority complex) সৃষ্টির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই মানসিক গূঢ়ৈষা (complex) ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না, শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া শিশুর মধ্যে গুরুতর বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হয়। সে অবদমনে (Repression) ভোগে এবং তাহার স্বাভাবিক বিকাশ মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতামাতারা ইহা বুঝিতে পারেন না। শিশুদিগকে নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করা হইলে এবং শিক্ষকদিগকে—এই সকল অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হইয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিলে তবেই আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রবর্ত্তিত এই ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞদের প্রকৃত কাজ ফলপ্রসূ হয়। যে বিশিষ্ট ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে এই সকল শিশুকে পাঠাইতে হয় সেগুলি প্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁহারা আন্দোলন উপস্থিত করেন তাঁহাদের অন্যতম প্রধান ছিলেন গত যুদ্ধের প্রাক্‌কালীন লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের চক্ষু-চিকিৎসক মিঃ বিশপ হারমান। যে জিনিষটি সাধারণতঃ হারমান ডেস্ক নামে পরিচিত তাহা এবং অপর কতিপয় চক্ষু-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি তাঁহারই পরিকল্পিত ও উদ্ভাবিত—এগুলি উদ্ভাবন করা হইয়াছে, শিশু যাহাতে লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে পারে সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিবার নিমিত্ত। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, সাধারণ জ্ঞান এবং শিশুর আচরণ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা কার্য্যে রূপায়িত এই সকল পদ্ধতি আংশিক দৃষ্টিশক্তিহীন শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতি-বিধানে বিস্ময়কর রূপে সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আজিকার দিনে আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়গুলির গর্ব্বের বিষয় এই যে, এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালাভ করিয়া যে সকল শিশু বাহির হয় তাহারা স্বাভাবিক শিশুদের ন্যায় পরিপূর্ণ না হইলেও আংশিক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। শিক্ষা-বিরতির পর বিদ্যালয়ই তাহাদের জন্য উপযুক্ত কাজের সংস্থান করিয়া দেয়।

রাসকিন বিদ্যালয়ে ঐরূপ প্রায় একশতটি শিশু আছে, তাহারা প্রত্যেকেই হেড মাষ্টারের নিকট পরিচিত। এল. সি. সি 'বাস'গুলিতে করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া হয় এবং সপ্তাহে একদিন তাহারা সম্মিলিত ক্রীড়া-এবং ছোটখাটো কৌতুক ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে যায়।

সংগঠনকারীদের আত্মপ্রসাদের প্রধানতম হেতু এই যে, এখন আর অজ্ঞ লোকেরা এই বিদ্যালয়কে তাহাদের শিশুদের পক্ষে অকল্যাণকর বলিয়া মনে করে না।

বোম্বাইয়ের সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টা

কুমারী শ্রীমতী সিন্ধ

১৯৪৯ সনে ভারতীয় সমাজকর্ম্মীদের সম্মেলন (The Indian Conference of Social work) কর্তৃক প্রথম বৃহত্তর বোম্বাইয়ের কল্যাণসংস্থাসমূহের নির্দ্দেশক পুস্তক বা ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে ইহাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ঐ ধরনের ডাইরেক্টরী প্রকাশের আয়োজন হয়। সম্মেলনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক পি. এ. ওয়াদিয়া তখন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন—"ইহা মনে করা কি খুবই দুরাশা যে, বোম্বাই নগরীতে স্থায়ী ভাবে সংবাদ সরবরাহ বিভাগ (Bureau of Information) প্রতিষ্ঠার পথে এই ডাইরেক্টরী হইবে প্রথম সোপান এবং সাহায্য-প্রার্থিগণ ইহাতে সেই সকল সংস্থার উল্লেখ দেখিতে পাইবে যেগুলি তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম।"

"ইণ্ডিয়ান কনফারেন্স অব সোশ্যাল ওয়ার্কে"র বোম্বাই শাখা দীর্ঘকাল যাবৎ এই ধরনের একটি বুরো খুলিবার কথা ভাবিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধের দরুন দীর্ঘকাল উক্ত শাখার পক্ষে এই বিষয়টিকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ১৯৫৩ সনে বোম্বাই শাখার অনারারী সেক্রেটারীর পক্ষে ইংলণ্ডের "সিটিজেন এডভাইসরি বুরো" নামক সংস্থার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ হয়। উক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় যুদ্ধকালে এবং সম্প্রতি ইহা ওখানকার সমাজ-জীবনের স্থায়ী ও অপরিহার্য্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত ভারতীয় কনফারেন্সের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটেনর সি-এ-বি সমূহের চেয়ারম্যান ফেরার ব্রাউনকে পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্রাউন "সি-এ-বি"কে (প্রতিষেধক ঔষধের ন্যায়) প্রতিষেধক সমাজসেবা-কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। কেননা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় ও সমস্যা সম্বন্ধে তৎপর হইয়া এবং তাহাদিগকে নির্দ্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করিয়া উক্ত বুরো ব্যক্তিগত সমস্যার সামাজিক ব্যাধিতে পরিণতিলাভের পথে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

১৯৫৫ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান কনফারেন্স অব সোশ্যাল ওয়ার্কের বোম্বাই শাখার উদ্যোগে, বোম্বাইয়ের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীমঙ্গলদাস পাকবাসা পাঁচটি মোম-বাতি জ্বালাইয়া পাঁচটি সি এ-বির উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই পঞ্চ দীপশিখা বোম্বাইয়ের নাগরিকদিগকে আলো দান করিবে। এতদুপলক্ষে রাজ্যপাল এই মন্তব্য করেন—দেশে যে নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা বিদ্যমান তাহা বিচার করিয়া দেখিলে এই সকল বুরো সাধারণ মানুষের নিকট প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে, কেননা এগুলি তাহার দৈনন্দিন সমস্যায় তাহাকে নির্দ্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করিবে।

বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কল্যাণসংস্থা কর্তৃক এই পাঁচটি বুরোর কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। সমাজকল্যাণ-ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং কেন্দ্রীয় আপিস কর্তৃক সমন্বয়ী-কৃত উক্ত পাঁচটি সংস্থা হইতেছে :

১। নিখিল ভারত ইসমাইলী সহায়ক সমিতি,
২। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী নারী-পরিষদ,
৩। নাগপাদা "নেইবারহুড হাউস"
৪। নাইগাওম সমাজসেবা সঙ্ঘ,
৫। সমাজসেবা সঙ্ঘ।

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য :

ব্যষ্টি হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন বিষয়ে নির্দ্দেশলাভ ও সাহায্যপ্রাপ্তি প্রয়োজন। অল্প বয়সে আমরা ঐরূপ নির্দ্দেশ লাভ করি বাড়ীতে আমাদের পিতামাতার এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিকট হইতে। কিন্তু যখন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা বৃহত্তর জীবন-পথে যাত্রা করি তখনও কিন্তু নির্দ্দেশলাভের প্রয়োজন আমাদের ফুরাইয়া যায় না। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমস্যাসমূহ দেখা দেয় এবং নির্দ্দেশ ও সাহায্যলাভের প্রয়োজনও হইয়া থাকে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়শঃই আমরা জানি না এ ধরনের নির্দ্দেশলাভের জন্য কাহার নিকটে আমরা যাইব। দৈনন্দিন প্রশাসনে নির্দ্দেশ দান এবং তথ্য-সরবরাহের জন্য রাজ্যের প্রধানদের পর্য্যন্ত উপদেষ্টামণ্ডলী এবং মন্ত্রীবৃন্দ আছেন। যে জটিল সামাজিক পরিবেশে আমাদের বাস করিতে হয়, সাধারণ পুরুষ এবং নারী হিসাবে আমাদের প্রত্যেককেই সেই পরিবেশের অন্তর্গত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে হয়; প্রায়ই দেখা যায় যে, আমরা আমাদের নাগরিক অধিকার এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। পরিবার, প্রতিবেশী এবং সমাজের সহিত আমাদের সম্পর্ক লইয়া এমন সব সমস্যার উদ্ভব হয় যেগুলি সম্বন্ধে নিজেদের চেষ্টায় কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমাদের নিকট দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশলাভের জন্য আমাদের যাইতে হয় আইনজীবী এবং বিশেষজ্ঞদের নিকট, আর তাহা আমাদের সাধ্যের বাহিরেও বটে। আমাদিগকে প্রায়ই বলা হয়, আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা কোন যুক্তির কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আইনজীবীদের মধ্যে পর্য্যন্ত অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যাও হইয়া থাকে ভ্রান্তি-পূর্ণ। সুতরাং ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আপনার এবং আমার মত সাধারণ লোকের কত ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দৈহিক অপটুতা ইত্যাদি নানা বিষয়ক অন্যান্য সমস্যাও আছে—যে সকল ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত নির্দ্দেশলাভের প্রয়োজন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করার উদ্দেশ্যেই "নাগরিক উপদেষ্টা বুরো" নামক সংস্থা সংগঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—লোকেরা যে ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপকভাবে সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া প্রণালীবদ্ধ ভাবে তথ্যসংগ্রহ, আর যে সকল লোক নির্দ্দেশলাভের জন্য বুরোতে আছে তাহাদের মধ্যে সেগুলি প্রচার করা।

বুরোর অন্তর্নিহিত মূলনীতি হইতেছে নাগরিকের নিকট রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের ব্যাখ্যাতা রূপে কাজ করা। বুরো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে যে-কোন নাগরিক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে খোঁজ লইতে পারে এবং এ বিষয়েও সে আশ্বস্ত থাকিতে পারে যে, তাহার কথা সহানুভূতির সহিতই শোনা হইবে। সাধারণ লোক যখন বুরোতে আসে তখন নিজের সমস্যার কথা বলিবার জন্য ব্যাকুল হয়। এমতাবস্থায় বুরোর কর্ম্মীর নিকট হইতে ইহা আশা করা যায় যে, তিনি তাহার জিজ্ঞাসার জবাব দিবেন এবং তাহাকে এমন সংস্থায় লইয়া যাইবেন যেখানে সে তাহার সমস্যা সম্পর্কে প্রকৃত পরামর্শ পাইতে পারে।

পোল্যাণ্ডের 'হলিডে হোম'

শ্রীপাতঞ্জলি ভাদ্রেভু

পোল্যাণ্ড দাবি করে যে, তাহার সামাজিক পদ্ধতির একটি মূলগত ভিত্তি হইতেছে মানবিকতা। শ্রমজীবীদের অবসর-বিনোদন এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য এদেশে যে রকম আয়াস স্বীকার করা হয় তাহাতেই এই দাবির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়া থাকে। পোল্যাণ্ডে ১২,০০০ অবসরবিনোদন কেন্দ্রসহ ১,৫০০ 'হলিডে হোম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পর্ব্বতে অথবা সমুদ্রতীরে অবকাশ যাপন করিবার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া শ্রমজীবীরা নিজেদের কঠোর জীবন-সংগ্রামের কথা ভুলিয়া যায় এবং ইহা তাহাদিগকে পরবর্ত্তী কার্য্যকালের জন্য নবীন শক্তি প্রদান করে।

১৯৫০ সনে পাস হওয়া এক আইনের ভিত্তিতে পোলিশ সরকারকে পোল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র ছড়ানো 'হলিডে হোম'গুলিতে প্রত্যেক শ্রমজীবীর জন্য অবসরবিনোদনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে "দি ওয়ার্কার্স হলিডে ফণ্ড" নামে একটি বিশেষ 'ফণ্ড' সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সরকার এই উদ্দেশ্যে বার্ষিক বাজেটে মোটা টাকা পৃথক ভাবে ধরিয়া রাখেন এবং যাবতীয় সাজসরঞ্জামসহ বিশ্রান্তি সদনগুলির (rest homes) জন্য পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক কর্ম্মী এখানে ছুটির চৌদ্দ দিন কাটাইতে পারে, তাহার খাওয়া-থাকার খরচের শতকরা ত্রিশ ভাগ মাত্র তাহাকে দিতে হয়—বাকী ব্যয়ভার সরকার এবং নিয়োগকর্ত্তা সমভাবে বহন করিয়া থাকেন। ওয়ার্কার্স হলিডে ফণ্ডের পরিবহন ব্যবস্থার কল্যাণে অবকাশ যাপনেচ্ছু শ্রমজীবীরা বিনামূল্যে পর্ব্বতের-পাদদেশস্থ পরম নয়নানন্দকর স্থানসমূহে—যেখানে অধিকাংশ সদন প্রতিষ্ঠিত যাইতে পারে।

শ্রমজীবী যে ভাবে অবকাশ যাপন করিতে চায় তদনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হলিডে হোম আছে। আরোগ্য-মূলক অবকাশ-যাপনের (curative holidays) ব্যবস্থা দ্বারা শ্রমজীবীরা যাহাতে উপকৃত হইতে পারে সেজন্য রাজ্য সমাজ জীবনবীমা সংগঠনের (State Social Insurance Organisation) সহযোগিতায় ডবলু. এইচ. এফ. কর্ত্তৃক অভিনব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে উপযোগী আবহাওয়াযুক্ত এলাকায় হলিডে হোমগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বিষয়ক যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রমজীবীদের কাজ যদি তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হয় এবং যদি তাহাদের পক্ষে অধিকতর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে সাধারণ অথবা আরোগ্যমূলক হলিডে হোমগুলিতে সবেতনে অতিরিক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হয়।

যাহারা ভ্রমণের ছুটি চায় তাহারা যাহাতে ডোঙ্গা ইত্যাদি যোগে আরও ব্যাপকতর ভাবে ভ্রমণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ডবলু. এইচ. এফ. "টুরিস্ট হলিডে" সংগঠনের সূচনা করিয়াছে। ভ্রমণপথের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম স্থানে অবস্থিত ওয়ার্কার্স হলিডে হোমে অথবা 'টুরিস্ট হোস্টেলে' সকল সময়েই ভ্রমণকারীর খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হইতে পারে। প্রত্যেক হলিডে হোমে লাইব্রেরী এবং ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা আছে। অবকাশযাপনকারীরা হোমে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয়সমূহ শুধু যে উপভোগ করে তাহা নয়, এগুলিতে তাহারা অংশগ্রহণও করিয়া থাকে।

বিভিন্ন ঋতুর জন্য নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি হলিডে হোমও আছে। শীতকালীন অবকাশযাপন-কেন্দ্র জাকোপেইনে প্রতি বৎসর ১,২০,০০০ শ্রমজীবী ছুটি উপভোগ করিবার

জন্য আসিয়া থাকে, আর শীতকালে জনপ্রিয় হইয়া উঠে লোয়ার সাইলেশিয়া।

এই সমস্ত সদনে থাকার দরুন শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় আর তাহাদের শ্রমোপজীবিনী মায়েরা বৃত্তিমূলক কর্ম্ম হইতে সাময়িক বিরতির পর বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া থাকে—ডবল্যু. এইচ. এফ. বিশেষভাবে এই সকল স্ত্রীলোকের খবরদারি করিয়া থাকে। সাম্প্রতিক কালে সমুদ্র-তীরে পারিবারিক বাসগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে পারিবারিক অবকাশ যাপন বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষিকার্য্যে এবং গ্রামাঞ্চলে কর্ম্মে নিযুক্ত লোকেদের জন্য ডবল্যু. এইচ. এফ. কর্তৃক শহরে অবকাশ-যাপন-ব্যবস্থা সংগঠিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের লোকেরা তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া শহরের চারিদিক ঘুরিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দেখায়। এমনকি ডবল্যু. এইচ. এফ. বিশিষ্ট শ্রমিক চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিদেশে অবকাশ-যাপনের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে এবং অন্যান্য দেশের কর্ম্মীদিগকে পোল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরে অথবা পর্ব্বতে ছুটি উপভোগ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াও থাকে।

আমাদের অজ্ঞানা সৈনিক—ডাক্তার দত্ত

শ্রীরতনপ্রভা বাঈ

যথানির্দ্দিষ্ট তৃতীয় দিবসে আমি এবং আমার খেলার সাথী একটি স্থানীয় ডিসপেন্সারিতে 'কিউ'তে দাঁড়ালাম, কিন্তু তৃতীয় দিনেও আমাদের উদারচেতা ডাক্তার দত্ত এসে তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনটি দখল করলেন না। সেদিন আমরা নিরতিশয় হতাশ হলাম। সেই প্রসন্ন আনন, অট্টহাস্য এবং উদার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হলাম। এই সৌম্য আনন খর্ব্বকায় বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটির মধ্যে লুকিয়ে আছে পীড়িত এবং নিঃস্বের জন্য এমন এক গভীর মানবীয় সহানুভূতি যার প্রেরণায় তাঁকে রাতের পর রাত কাটাতে হয় বাড়ী থেকে দূরে ব্যাধিগ্রস্ত বিপন্নের রোগশয্যাপার্শ্বে। এ ক্ষেত্রেও আবার এমন একটি রোগীর চিকিৎসাকার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পুরো দু'দিন এবং দুই রাত্রির আগে যাকে ছেড়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

কিউ ছেড়ে আসবার অনতিপরেই দেখি, ডাক্তার এগিয়ে আসছেন হাসপাতালের দিকে, কিন্তু গায়ে কোর্ত্তাটি নেই। কোর্ত্তাটি সম্বন্ধে যা মনে করা গিয়েছিল তিনি তাই করেছেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন—"লেভেল ক্রসিঙের নিকটে অশক্ত এবং বৃদ্ধ এক ভিখারী আমার কাছে একটি দুয়ানি ভিক্ষা চাইলে। তোমরা জান, দু'দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমার শেষ কপর্দ্দকটি আমি গতকালই একজনকে দান করে ফেলেছিলাম, এই সকালবেলাকার শীতে এই বৃদ্ধ, নিঃস্ব, শীতার্ত্ত, অর্দ্ধনগ্ন লোকটির দুর্দ্দশা দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম, এ দৃশ্য আর দেখতে পারলাম না। আমি ভেবে দেখলাম যে, এখন যে জিনিষটা দান করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক সেটি হচ্ছে আমার কোর্ত্তা।"

এই কাহিনীটি বলে তিনি আমাদের যে উপদেশ দিলেন সেটি কিন্তু আরও মজার। তিনি বললেন—"দেখ আমি বাড়ী না যাওয়া পর্য্যন্ত কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে এসব কথা বলো না।"

সত্য কথা বলতে কি ডাক্তার দত্তের স্ত্রীও স্বামীর এই ধরনের দানশীলতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যবস্থার দরুন ডাক্তারের কোন পোশাক-পরিচ্ছদ বা কোন জুতোরই শোচনীয় অবস্থা হ'ত না। তারা নূতন আসত এবং নূতন অবস্থায়ই বিদায় নিত। নয়টি শিশুসন্তানসমন্বিত প্রকাণ্ড পরিবার চালানোর সকল ব্যবস্থাই তাঁকে করতে হ'ত, তৎসত্ত্বেও তিনি ডাঃ দত্তের ব্যবহারের জন্য একসঙ্গে ছয়টি শার্ট নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

আর একবার মৌশুমি বাত্যাবিক্ষুব্ধ বর্ষণমুখর এক রজনীর মধ্যযামে ডাক্তার দত্ত দূরবর্ত্তী এক বস্তিতে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। বিনামূল্যে তিনি এই সকল রোগীর চিকিৎসা করতেন। রোগী দেখে রাত্রির ঘন অন্ধকারে ডাঃ দত্ত যখন হাসপাতালে ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তাঁর চোয়াল এবং চিবুক থেৎলে গেছে। ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে, ডাঃ দত্ত যখন অন্ধকারে সাইকেল চড়ে আসছিলেন, তখন হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড পাথরের সহিত সাইকেলের ধাক্কা লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। এই আঘাতের দরুন তাঁকে কয়েক মাস শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল। যাই হোক, এতে তিনি দমে যান নি, চলৎ-শক্তি ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন উৎসাহে আর্ত্ত-পীড়িতের চিকিৎসা ও সেবাকার্য্যে লেগে গেলেন—এর জন্যে তিনি কোন ফি নেন না। এ হচ্ছে তাঁর জীবনের ব্রত।

পীড়িত এবং দরিদ্রের বন্ধু আমাদের ডাক্তার দত্ত সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। প্রত্যহ প্রত্যূষে দেখা যায়, তিনি তার গৃহে গীত প্রভাতী সঙ্গীত শ্রবণ করছেন তন্ময় হয়ে। ডাক্তার দত্তের কন্যারা যখন ভোরে শয্যাত্যাগ করে উঠে নিত্যকার গীতাভ্যাস আরম্ভ করে, তখন সারাদিনের ক্লান্তি যতই গভীর হোক, অথবা আগামী কল্যের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের জন্য বিশ্রাম করা যতই প্রয়োজন হোক না কেন, ডাক্তার দত্ত কিছুতেই বিছানায় ঘুমিয়ে থাকেন না।

পুস্তক-পরিচয়

কালিদাসের রঘুবংশ—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ২৩৭-এ, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

রঘুবংশ মহাকবি কালিদাস-রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য। পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় কলেজের ছেলেরা টীকাটিপ্পনি সহযোগে মূল সংস্কৃত রচনার কিঞ্চিৎ আস্বাদ করিয়া থাকে, কিন্তু সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ইহার রসাস্বাদ সম্ভব নহে। লেখক ইহাদেরই জন্য কাব্যের গল্পটিকে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এটি ঠিক অনুবাদ নহে, ইহাতে আছে কাব্যের প্রতিটি সর্গের বিষয়বস্তুর বর্ণনা এবং তাহার মধ্যে কালিদাসের অনন্যুকরণীয় উপমাগুলির সমাবেশ। সব মিলাইয়া সুখপাঠ্য একটি গল্প এবং কবি-প্রতিভা কিশোর-মনে রেখাপাত করিবেই। দুঃখের বিষয়, বইখানিতে যথেষ্ট মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়ে। একে তো বানান-সমস্যার দোটানায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিপর্য্যস্ত—তার উপর অতি সাধারণ বাক্যগুলির বর্ণাশুদ্ধি তাহাদের বেশী করিয়াই বিভ্রান্ত করিতে পারে।

স্বস্তি—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি গতানুগতিক প্রথায় রচিত নহে। সাধারণতঃ একটি চরিত্রকে মুখ্য করিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে গল্প গড়িয়া উঠে। ঘটনা কোথাও বহির্মুখী—মনোবিশ্লেষণের আলোকে কোথাও বা জীবনকে দেখাইবার প্রয়াস। কোনখানে প্রকৃতি ও পার্শ্বচরিত্র মিলিয়া একটি জীবন-প্রবাহ। স্মৃতিতে দাগ কাটিয়া রাখে—এমন সব প্রধান ঘটনা লইয়াই গল্পের আসর জমে। শুধু বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নহে, বিশ্বের আসরে এই ধরনের কাহিনীরই সমাদর। ইহার ব্যতিক্রম বিদেশী সাহিত্যে কিছু আছে, বাংলা-সাহিত্যে বিরল বলিলেই হয়। গ্রন্থকার আলোচ্য উপন্যাসটিকে পূর্ব্বধারা হইতে ভিন্নমুখী করিয়াছেন।

গল্পের মধ্যে প্রধান একটি চরিত্র অবশ্য আছে, শুধু প্রধান ও স্মরণীয় ঘটনা-সংঘাতে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস নাই। প্রকৃতি অথবা পার্শ্বচরিত্র, সমাজ কিংবা রাজনীতি, এমনকি মানবতাবোধের উপরও আলোচ্য গল্পটি প্রতিষ্ঠিত নহে। নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা—যা মনে আলোড়ন না তুলিয়া তলাইয়া যায়, যা কোন চরিত্রকে আদ্যন্ত সামনে ধরিয়া রাখে না, মহৎ কিংবা অসৎ বৃত্তির তাড়নায় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত বা উৎকেন্দ্রিত করে না—এমন সব ক্ষুদ্র খণ্ড বস্তু লইয়াই গল্প। গল্পটা আর কিছুই নহে, জীবনকে নানাদিক হইতে নানা ভাবে দেখিবার চেষ্টা। জীবন-গতি এখানে অতীত হইতে বর্ত্তমানে পৌঁছিয়াই থামে না, অতীতকেও ছুঁইতে চাহে, অথচ স্পষ্ট করিয়া কোন কিছুই ধরিয়া দিতে পারে না। আগে-পিছের এলো-মেলো ঘটনা জড়াইয়া অনতিস্পষ্ট একটি জীবন। এই ছায়া-ছায়া পট-ভূমিকায় তাহার প্রকাশ। কখনও সামনে, কখনও পিছনে ; কখনও রৌদ্রে অথবা কুয়াসায় নিরবধি কালের ভূমিতে আল্‌পনা আঁকার চেষ্টা। এই ভাবে স্পষ্ট করিয়া কিছু না পাইলেও জীবন অস্পষ্ট হয় না। বরং জীবনের রহস্য-ময়তায় নিহিত থাকে সৌন্দর্য্য ও রস এবং চিরকালব্যাপী একটি প্রশ্ন।

আলোচ্য গ্রন্থে জীবনের দ্বৈতরূপকে পান্নু ওরফে দীপায়নের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন লেখক। দেহসত্তায় অভিন্ন হইলেও দু'জনের জগৎ স্বতন্ত্র, লক্ষ্য পৃথক, চিন্তা রুচি বৃত্তিতে যথেষ্ট অমিল। ব্যক্তিসত্তা প্রতি মুহূর্ত্তের তুচ্ছ ঘটনায় চিন্তার প্রবাহে পাক খাইয়া রূপ বদল করিতেছে। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে অখণ্ড এক সত্তাকে আবিষ্কার করা বিস্ময়কর। অথচ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এমন ব্যাপার ঘটিতেছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতা না থাকিলে ক্ষণ-বিস্মৃত এমন সত্তাকে ধরা যায় না। পান্নুর মধ্যে দীপায়নকে এমনই করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন লেখক। বুদ্ধির আলোকে এই জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্লিষ্ট, একের মধ্যে বহুর প্রকাশে পরিপূর্ণ। লেখকের এই প্রয়াস বাংলা কথা-সাহিত্যে অভিনব সংযোজন—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রচ্ছদপট চমৎকার।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বইয়ের বাঁধাই ও ছাপা ভাল, তবে ইহার কোনও মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থকার বইখানি বিনামূল্যে বিতরিত করিতেছেন, কিন্তু পাঠকসাধারণের পক্ষে ইহা সংগ্রহ করা সব সময়ে সম্ভব নয়। ফলে জিজ্ঞাসুরা তাঁহার শ্রমলব্ধ মহামূল্য জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইবেন এইরূপ আশঙ্কা করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

বিদ্যাসাগর ও পরমহংস—শ্রীঅমলকুমার রায়। বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা। মূল্য দুই টাকা।

সংসার-অভিমুখী আর সংসার-বিরাগী—দুটি মন। অথচ কারও মহত্বই অস্বীকার করবার মত নয়। লেখক এই দুটি পৃথক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তপস্বিনী—শ্রীপরেশপ্রসন্ন সেন। প্রকাশক—শ্রীরাধিকামোহন মুখোপাধ্যায়, ৪১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬। মূল্য দুই টাকা।

সীতা-চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক। লেখকের মতে বাল্মীকির অনুবর্তী কবিগণ সীতা-চরিত্রের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর হৃদয়ে সীতার যে আদর্শ মুদ্রিত হয়েছে তাকে তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। নাটক জমে নি; কিন্তু গ্রন্থের ভূমিকায় রচয়িতার জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে কয়েকটি মহাজন বাণী—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।



রামমোহন স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে মুদ্রিত পুস্তিকা। দেশী ও বিদেশী মনীষীদের সশ্রদ্ধ উক্তি-সংগ্রহ।

প্রণমামি—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—চন্দনকুমার ব্যানার্জি (!) ৭৮ ডব্লু. সি. ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ মূল্য এক টাকা।

একা—শ্রীসত্যেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ১-এ, রামকৃষ্ণ দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য বারো আনা।

দরদী—শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্ণপুর। মূল্য দেড় টাকা।

তিনখানি সাধারণ কবিতার বই। বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, উচ্ছ্বসিত প্রশংসারও কিছু নেই। ভাষা, ছন্দ, মোটামুটি ঠিক আছে, স্বচ্ছন্দে পড়ে যাওয়া যায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কন্যা ও কুমার—কল্যাণী কার্লেকার। প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ডু। কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

উপন্যাস নয়, একটি বড় গল্প। নায়ক ছোটনাগপুরের অরণ্যময় অঞ্চলের এক বড় ভূস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কলিকাতা কলেজের এক মেধাবী ছাত্র। নায়িকা ঐ কলেজেরই এক অধ্যাপক-কন্যা, এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থিনী। অধ্যাপক-গৃহেই পরস্পরের আলাপ-পরিচয়। তা থেকে পারস্পরিক আকর্ষণ। আকর্ষণ থেকে প্রেম। প্রেম থেকে মিলনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু নায়কের পক্ষে বাধা বিপুল। কারণ সে "রাজার ছেলে"। তার উপর সময়টা তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। তাই নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটাতে গল্পটি রোমান্স থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে থ্রিলার—গোয়েন্দাও আছে। কিন্তু থ্রিলারেও সম্ভব-অসম্ভব মাত্রা থাকে। আলোচ্য রচনাটির কয়েক জায়গায় তা নেই। যা হোক, স্ত্রী-পুরুষ বহু ব্যক্তির বহু কাণ্ডের পর নায়ক-নায়িকার মধুর মিলন সম্ভব হয়েছে। তবুও অধিকাংশ চরিত্রই অসম্পূর্ণ। রচনাটিতে অনেক আধুনিক বানান ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অত্যাধুনিক বানানও আছে—যেমন ভংগী, ভাংতে, গাংগুলী, নোতুন ইত্যাদি। ঐ সঙ্গে অনেক অশুদ্ধ বানানও পাওয়া গেল, যেমন, মনি, রানি, অন্তর্ভুক্ত, প্রাংগন তোষামদ ইত্যাদি। এগুলি বানানে অত্যাধুনিকতার পরবর্তী রূপ কিনা বোঝা গেল না। তবে লেখিকার ভাষার বাঁধুনি ও গল্পলেখার ভঙ্গীটি বেশ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কামসূত্র (২য় সংস্করণ)—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। বৈজয়ন্ত পাবলিশার্স, ৭ দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য চারি টাকা।

মহর্ষি বাৎস্যায়নের কালজয়ী গ্রন্থ কামসূত্র তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। নলিনী বাবু মূল সংস্কৃত হইতে এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য রত্ন উপহার দিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা হুবহু মূলানুগ। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় কামসূত্রের শ্লোকগুলির অনুবাদ করিয়াছেন—কোথাও স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা অনুবাদকে ভারাক্রান্ত বা মনগড়া বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠককে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কোন্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা সমালোচ্য গ্রন্থের 'অবতরণিকা'র অনুবাদকের নিম্নোক্ত কথাগুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে। তিনি বলিতেছেন—"বাৎস্যায়ন যে ভারতের চিরন্তন আদর্শের অনুসরণ করিয়াই ভোগ ও সংযমকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা কামসূত্রে ব্রহ্মচর্য্যের প্রসঙ্গ নববিবাহিত, দম্পতির প্রতি উপদেশ ইত্যাদি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।"

বিবাহিত নর-নারীর কল্যাণসাধনই ছিল মহর্ষি বাৎস্যায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুবাদকও সেই উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থের সর্বত্র তিনি যে শালীনতা ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দেশ-বিদেশের কথা

নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী বেবী দাশগুপ্তা

কলিকাতা হাইকোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রভূষণ দাশগুপ্ত এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বেবী দাশগুপ্তা নৃত্যশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।



একটি বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গীতে বেবী দাশগুপ্তা

মাদ্রাজের ভরতনাট্যমের খ্যাতনামা নৃত্যাচার্য্য শ্রীআনন্দম ইঁহাকে ভরতনাট্যম নৃত্যকলা শিক্ষা দেন। শ্রীমতী বেবী উক্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙালী নৃত্যশিল্পীরূপে ভারতের সর্ব্বত্র বিপুল প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকায়" ইঁহার নৃত্যনৈপুণ্য দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হন।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস-নোটে ঘোষিত হইয়াছে যে, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেনকে তাঁহার বাংলা গ্রন্থ 'বিজ্ঞানের ইতিহাসের' জন্য ১৯৫৫-৫৬ সনের ৫,০০০্ টাকা মূল্যের রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং প্রধান গবেষণা-প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা (The Indiah Association for the cultivation of science) কর্ত্তৃক।



শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

১৯১৮ সনের ১লা অক্টোবর কলিকাতায় শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম হয়। উত্তর কলিকাতাস্থ (অধুনাবিলুপ্ত) আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউশনে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই স্কুল হইতে ১৯৩৪ সনে তিনি গণিত এবং সংস্কৃতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। সমরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আই-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হন এবং সরকারী বৃত্তিলাভ করেন। উক্ত কলেজ হইতেই ১৯৩৮ সনে পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ তিনি গ্রাজুয়েট হন। ঐ বৎসরে তিনি সায়াল্স কলেজে ভর্তি হন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "পিওর ফিজিক্সে" এম-এসসি ডিগ্রী লাভ করেন ও ইউনিভার্সিটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

সমরেন্দ্রনাথ ১৯৪১ সনে পদার্থ-বিদ্যার লেক্‌চারাররূপে স্কটিশচার্চ কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ঐ কলেজে কাজ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। কয়েক মাস পর প্যারিসে ইউনেস্কোর সেক্রেটারিয়েটে কাজ করিবার জন্য তিনি ইউরোপে গমন করেন—এখানে তিনি দুই বৎসর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংগঠন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। তিনি বারকয়েক ঐ সকল দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৪৯ সনে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমরেন্দ্রনাথ পুনরায় রেজিষ্ট্রাররূপে ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার কার্য্যে যোগদান করেন। বর্ত্তমানে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানেই ঐ কাজে নিযুক্ত আছেন।

সমরেন্দ্রনাথ ১৯৪২ সনে সহকারী সম্পাদকরূপে "সায়াল্স এণ্ড কালচার" পত্রিকায় যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ সনে তিনি ইহার সম্পাদক হন। ড. মেঘনাদ সাহার সংস্পর্শে প্রথম তিনি আসেন ১৯৩৮ সনে তাঁহার ছাত্ররূপে—'সায়াল্স এণ্ড কালচারে'র সম্পাদকীয় কর্ম্মের মাধ্যমে গুরুশিষ্যের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। প্ল্যানিং, শিক্ষা, পরমাণু শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্ট প্রস্তুতিতে তিনি ডক্টর সাহার সহযোগিতা করেন।

সমরেন্দ্রনাথের প্রথম বাংলা পুস্তক আণবিক বোমা রচিত হয় ১৯৪৬ সনে। ১৯৫২ সনে ভারতীয় সায়াল্স কংগ্রেস এসোসিশনের স্থানীয় সেক্রেটারীরূপে কার্য্যকালে তিনি কলিকাতায় একটি গাইড বুক প্রকাশ করেন। তাহাতে এই মহানগরীতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি এবং বিকাশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রদত্ত হয়। "প্রোফেসার মেঘনাদ সাহা, হিজ লাইফ, ওয়ার্ক এণ্ড ফিলজফি" নামক ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকখানিও তিনি সম্পাদন করেন। ডক্টর সাহার ষষ্টিতম জন্মদিনে উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

ঝাড়গ্রাম কারিগরী বিদ্যালয়

সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম কারিগরী বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীহিমাদ্রিশেখর দে মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীনলিনী মজুমদার ঐ বিদ্যালয়ের যাবতীয় বিভাগ পরিদর্শন করেন। নলিনীবাবু তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে নিম্নের বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

"কিছুকাল আগেও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় কারিগরী বিদ্যা শিখিবার

তেমন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল না। বর্ত্তমানে এখানকার জনগণের পক্ষে উক্ত বিষয়ক শিক্ষালাভের পথ সুগম হইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে সম্প্রতি ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার, বেকার-সমস্যার সমাধান ও দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকর্ত্তার পরিচালনায় বহু 'টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেণ্টার' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে। ঝাড়গ্রাম কারিগরী বিদ্যালয়টিও ১৯৫৫ সনের প্রথমভাগে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ঝাড়গ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে অবস্থিত। এই শিক্ষাকেন্দ্রে (১) কাঠের কাজ, (২) ফাউণ্ডরী, (৩) ষ্টীল মেট্যাল' (৪) স্মিথি, (৫) টেলারিং, (৬) বুক বাইণ্ডিং, (৭) তাঁত, (৮) বেকারী এবং (৯) কন্‌ফেকশনারী এই কয়টি বিভাগে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে ১২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মেধাবী ছাত্রদের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা যাহাতে শিক্ষাসমাপনান্তে ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেজন্য সরকারী অর্থসাহায্যেরও ব্যবস্থা আছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টায় এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ও ছাত্রদের সহযোগিতায় শিক্ষাকেন্দ্রটি যেভাবে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা বাস্তবিকই আশাপ্রদ।"



ঝাড়গ্রাম কারিগরী বিদ্যালয়ের কর্ম্মী ও ছাত্রবৃন্দ সহ শ্রীনলিনী মজুমদার
(উপবিষ্ট, বাঁদিক হইতে তৃতীয়)



সেবায়তনের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে ভাষণদানরত আশ্রম-সম্পাদক শুদ্ধানন্দজী

সেবায়তনের বার্ষিক উৎসব

সম্প্রতি সেবায়তনের দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলদীপ দান, উষাকীর্ত্তন, আশ্রম-পতাকা উত্তোলন ও মঙ্গলঘট স্থাপন, প্রাতে সৎসঙ্গ অধিবেশন, অপরাহ্নে বিদ্যার্থিগণের কুচকাওয়াজসহ জাতীয় পতাকা অভিবাদন ইত্যাদির পর অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যোগমন্দির প্রাঙ্গণে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিবস প্রাতে আশ্রমাচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে ক্রিয়াবান সম্মেলনের অধিবেশন হয়। উহাতে নানাস্থান হইতে ভক্তমণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল।

কুমুদরঞ্জনের জন্মজয়ন্তী

গত ১৯শে ফাল্গুন অপরাহ্ণকালে সাহিত্য-তীর্থের উদ্যোগে বর্ত্তমান বাংলার জীবিত জ্যেষ্ঠ কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাসস্থান কোগ্রামে তাঁহার চতুঃসপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী সংবর্দ্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট কথা-শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ, বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি অন্তে কুমুদরঞ্জন বলেন যে, সাহিত্য-তীর্থের তিনি অতি-সাধারণ মানুষ। এই প্রীতি-অভিনন্দনে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন। পল্লীর মানুষদের নিয়েই তাঁহার জীবন। ভাষণ-শেষে কবি এই উৎসব উপলক্ষে রচিত কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করেন।

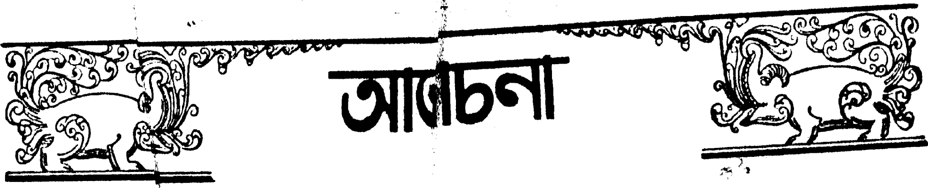
শ্রীঅসিত পালচৌধুরী

রাণাঘাটের শ্রীগৌরকিশোর পালচৌধুরীর পুত্র শ্রীঅসিত পালচৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এসসি ডিগ্রী লাভ করিয়া বাজোড়ো কলিয়ারীতে তিন বৎসর ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর মাইনিং উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ ১৯৪৯ সনের আগষ্ট



শ্রীঅসিত পালচৌধুরী

মাসে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে মাইনিং সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ১৯৫৩ সনে মাইনিং-এ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। ১৯৫৫ সনে তিনি লণ্ডনে মাইনিং-এ বি-এসসি ডিগ্রী লাভ করেন। মাইনিং সম্পর্কে আরও নানা বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া গত জানুয়ারী মাসে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর মাত্র।



"কর্ত্তিক," "কার্তিক"

শ্রীরাজশেখর বসু

ফাল্গুনের প্রবাসীতে কটি পুস্তকের সমালোচনে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিয়াছেন—'কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিক উৎপত্তি, কাজেই এখানে দ্বিত্ববর্জন ভ্রান্তিক। অথচ দ্বিত্ববর্জনের রীতিশব্দে অনেকে অহরহ এরূপ করিয়া থাকেন।' এই মন্তব্য ঠিক হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক নিয়োজিত বানান-সংস্কার-সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য প্রভৃতি অধ্যাপকগণের বিধান অনুসারেই কার্তিক, বার্তা প্রভৃতি বানান বিহিত হইয়াছে। ইহার সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুবর্ধন শাস্ত্রীর একটি পত্র ভাদ্র ১৩৪৩ সালের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম :

"অর্চনা কর্তা আদি শব্দে রেফের পর দ্বিত্ব যেমন বিকল্পে সিদ্ধ, তেমনই কার্তিক, বার্তা আদি শব্দেও বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন। অর্চনা আদি শব্দে পাণিনির 'অচো রহাভ্যাং দ্বে' (৮।৪।৪৬) এই সূত্র অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ করা হয়েছে; কার্তিক আদি শব্দে 'ঝরো ঝরি সবর্ণে' (৮।৪।৬৫) এই সূত্র অনুসারে রেফের পরবর্তী বর্ণদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটা বিকল্পে লোপ করা হয়েছে। প্রথমটায় দ্বিত্ব ছিল না, সেখানে বিকল্পে বিধান করা হয়েছে; দ্বিতীয়টায় কৃত্তিকা আদি শব্দে দ্বিত্ব ছিল তার একটার বিকল্পে লোপ করা হয়েছে। ফল দুটি সমান। ইচ্ছা করলে উভয়ত্র রেফের পর দ্বিত্ব না দিয়ে লেখা চলে। পাণিনির ব্যাকরণ এ কথাই বলে।"

বানান সরল করিবার জন্যই বানান-সংস্কার-সমিতি রেফের পর সর্বত্র দ্বিত্ববর্জনের বিধান দিয়াছেন। ইহাতে ব্যাকরণের নিয়ম মোটেই লঙ্ঘিত হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একীকরণ সম্বন্ধে

"মৈথিলী" যুক্তির বিচার

শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একীকরণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত 'মৈথিলীরা কোন পথে' এই সম্পর্কে আলোচনা কালে ড. গ্রিয়ারসনের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যে মৈথিলী ভাষাভাষীরা শতকরা ৩৯·২, জন। এই তথ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সত্য হইতে পারে, কিন্তু বর্তমানে নহে। এখন মৈথিলীদের অনুপাত বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

মৈথিলী-ভাষীরা সাধারণতঃ ত্রিহুত বিভাগে বাস করে। গত পঞ্চাশ বৎসরে সমগ্র বিহার ও ত্রিহুত বিভাগের লোকসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ বাড়িয়াছে। যথা :

	সমগ্র বিহার	ত্রিহুত	ত্রিহুত বাদে বিহার
১৯০১	২৮৩·৯ লক্ষ	৯৮·৭ লক্ষ	১৮৫·২ লক্ষ
১৯৫১	৪০২·৬ ,,	১২৯.৬ ,,	২৭৩·০ ,,
বৃদ্ধি	১১৮·৭	৩০·৯ ,,	৮৭·৮
শতকরা বৃদ্ধি	৪১·৭	৩১·৩	৪৭·৪

ড. গ্রিয়ারসনের হিসাবমত ১৯০১ সনের কাছাকাছি মৈথিলীদের সংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষ। বর্তমানে তাঁহারা যদি শতকরা ৩২ জন করিয়া বাড়িয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের সংখ্যা হয় ১২১ লক্ষ। ১৯৫১ সনের বিহারের হিন্দী ভাষাভাষীদের সংখ্যা হইতেছে ৩৪৮ লক্ষ। মৈথিলীরা হইতেছে শতকরা ৩২ জন করিয়া। অর্থাৎ তাহাদের অনুপাত শতকরা ৩৯ হইতে কমিয়া ৩২

জন্মে দাঁড়াইয়াছে। মানভূম জেলার অনেক বাঙালীকে জোর করিয়া হিন্দীভাষাভাষী বলিয়া ১৯৫১ সনের সেন্সাসে লেখানো হইয়াছে। এই সব বাঙালীদের বাদ দিলে প্রকৃত হিন্দীভাষাভাষী তথা মৈথিলী-ভাষীদের সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে।

গঙ্গার দক্ষিণে যে সকল মৈথিলী-ভাষাভাষী মগাহী বা ভোজপুরীদের মধ্যে বসবাস করেন তাঁহাদের পঠন-পাঠন হয় নাগরী অক্ষরে লিখিত High হিন্দীতে। এই ব্যবস্থা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইবার পর হইতে খুব জোরালো ভাবে চলিতেছে। এজন্য তাহারা বর্ত্তমানে যে ভাষা বলে তাহা মগাহী কি মৈথিলী তাহা ভাষাতত্ত্ববিদেরা ধরিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ লোকে বলিবে হিন্দী বা বড়জোর মৈথিলী টান মিশ্রিত মগাহী। গঙ্গার উত্তরেও এই প্রক্রিয়া চলিতেছে, সেখানে মৈথিলীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া স্কুলের আদালতের ভাষা High হিন্দী হইলেও বাড়ীতে তাহারা মৈথিলী বলে।

এই মৈথিলীদের মধ্যে নিজ ভাষার প্রতি কত দরদ তাহা নিম্নের তথ্য হইতে জানা যাইবে। গত ১৯৫১ সনে মাত্র ৯৭,৬৮৫ জন নিজেদের মাতৃভাষা মৈথিলী বলিয়া সেন্সাসের সময় লিখাইয়াছে। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, মৈথিলী-ভাষাভাষীদের সংখ্যা ১২১ লক্ষ হওয়া উচিত। এই ১২১ লক্ষ লোকের মধ্যে নিজ মাতৃভাষার প্রতি দরদী মাত্র ৯৮ হাজার জন। বাকী সকলে মাতৃভাষা হিন্দী বলিয়া লিখাইয়াছে। যাহারা মৈথিলীর প্রতি দরদী তাহাদের অনুপাত শতকরা ·০০৮ জন করিয়া। মাতৃভাষার প্রতি যাহাদের এত সামান্য দরদ তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একীকরণ করা কি উচিত হইবে?

এ কথা সত্য যে, মৈথিলীদের মধ্যে কেহ কেহ মিথিলা-রাজ্য গঠনের জন্য রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দাবি এত নগণ্য যে, রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশন হাদের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহাদের মূল ক্তি ছিল ঐতিহাসিক ও ভাষাভিত্তিক। তাঁহারা বিহারের মগাহী ভোজপুরীদের দ্বারা অত্যাচরিত হইতেছেন এজন্য আলাদা য চাহি—এ কথা বলেন নাই। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে ব যে, বিহারের সকল হিন্দী-ভাষাভাষী মিতাক্ষরা দ্বারা অনুত; ছেলে জন্মিলে পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার অধিকার বর্ত্তায়। আমরা বাঙালীরা দায়ভাগ দ্বারা শাসিত। পিতার মৃত্যুর পর ত্তিতে ছেলের অধিকার জন্মে। তাঁহারা কেহই মাছ খান না; মৎস্যভোজী। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের আরও নানা প রহিয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহারা বরাবর আমাদের পক্ষে থান, অপর বিহারীদের সঙ্গে যোগদান করিবেন না—এইরূপ অত্রা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

রে গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাঙালীদের উপর নানা অত হইয়াছে ও হইতেছে। কেও মৈথিলীকে ন্যায়-ধর্ম্মের খাতি সম্বন্ধ ভাব তীয় ঐক্যের খাতিরেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে কেহ দেখিয়াছেন কি? কিষণগঞ্জ মহকুমার বঙ্গভুক্তি প্রস্তাবে বিরোধিতা কি তাঁহারা করে নাই? একীকরণের ফলে রাতারাতি তাহারা সবাই বাঙালী-প্রেমী হইবেন ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করায়।

ড. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সংস্কৃত হইতেছে উত্তর ভারতের সকল ভাষার "দিদি" ভাষা। বাংলা, অসমীয়া ও উড়িয়া ভাষা এক মায়ের সন্তান, অপর এক বোনের সন্তান হইতেছে মৈথিলী, মগাহী ও ভোজপুরী। এক মায়ের পেটের ভাই অসমীয়া-ভাষী আমাদের বাংলা-ভাষাভাষীদের উপর অত্যাচার করিতেছে; আর আমাদের মাসতুতো ভাই মৈথিলী-ভাষাভাষীরা নিজের সহোদর ভাইকে ছাড়িয়া আমাদের সঙ্গে বরাবর সহযোগিতা করিবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে কি?



মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা